“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম

(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠানো আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জানবেন।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা : ৩

ইহাই মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মর্মবাণী এবং এই মহৎ বাণী বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন আমাদেরই কবি রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বমৈত্রীর সেই লক্ষ্য ও সাধনা আজ বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসভায়ও প্রতিফলিত।

সাহিত্যিককে এই নতুন যুগের সারথি হইতে হইবে এবং পৃথিবীতে এখনও যারা মূক আছে, সেই 'মূকে মুখে ভাষা' দিতে হইবে। সাহিত্য কেবল বিশ্রামভোজীদের সেবাদাসী হইবে না, কেবল লোকরঞ্জন এবং মনোরঞ্জনই তার উদ্দেশ্য নয়—তার উদ্দেশ্য আরও মহৎ এবং সেই উদ্দেশ্য হইতেছে জীবন গঠন। মানবাত্মার অপরিমিত সৌন্দর্যের প্রকাশ যে মহৎ সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির মধ্যে, সেই দিকে যেন আমাদের দৃষ্টি-প্রসারিত হয়। এবং সেই সঙ্গে আমরা যেন আরও স্মরণে রাখি যে, মানুষ আজ আকাশ জয় করিয়াছে বিজ্ঞান আজ পৃথিবীর সীমা লঙ্ঘন করিয়া গ্রহান্তরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। মানবেতিহাসের একটি আশ্চর্য সন্ধিক্ষণে আমরা উপস্থিত। বিজ্ঞানের এই মহাশূন্যজয়ী অভিযানে সাহিত্যের সাধকগণ যেন সংকোচবোধ না করেন, যেন মনে না করেন যে, যন্ত্র আজ মন্ত্রের উপর জয়ী!—না, মন্ত্র অপরাজেয়। কারণ, মন্ত্র অমৃতলোকের বার্তাবাহী। গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাবে রহস্য, 'অজানা হইতে অজানায় পৌঁছিবার জন্য মানব মনের যে চিরন্তন তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা বিশ্বের সাহিত্যের। সুতরাং আজিকার এই যন্ত্রের মধ্যে, কঠিন কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে, মন্ত্রের অফুরন্ত জটিলতা ও বিজ্ঞানের আশ্চর্য জয়যাত্রার মধ্যেও আমরা নতুন রোমাঞ্চ অনুভব করিতেছি এবং বিশ্বাস করিতেছি 'অন্তহীন নীল যবনিকা' খুলিয়া সুদূরবর্তী মহাকাশের অমৃত মন্ত্র আমাদের মর্ত্যলোকে পৌঁছিতেছে এবং আজিকার সাহিত্য আগামী দিনের সেই অভয় মন্ত্রকেই মানুষের নিকট উপস্থিত করিবে।

পূর্বগামীদের এবং এই যুগের সমস্ত সাহিত্যাচার্য, প্রবীণ এবং নবীন সমস্ত সাহিত্য ও শিল্পকর্মী এবং বাংলা ও ভারতবর্ষের সমস্ত সাহিত্য পাঠকদের প্রীতি ও আশীর্বাদ আমরা এই যাত্রালগ্নে প্রার্থনা করিতেছি। আমরা যেন অমরলোকের অমৃতের আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত না হই।

কিন্তু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য—ঐ সকল তত্ত্ব অনুসারে জীবনযাত্রার পদ্ধতি নির্ধারণ। গীতা কেবল নীতিশাস্ত্র বা ethics নয়। নীতিশাস্ত্র বলে—এই কাজ ভাল, এই কাজ মন্দ, বড় জোর বলে—এইজন্য ভাল, এই-জন্য মন্দ। কিন্তু গীতাকার অধিকন্তু বলেন—এইরূপে জীবনযাত্রা নিরূপিত কর, তবেই যা শ্রেয় তাতে মন বসবে, যা হেয় তাতে বিরাগ জন্মাবে।

গীতায় যে শিক্ষা আছে তার উদ্দেশ্য কি? সকলেই বলবেন—সকল মোক্ষ-শাস্ত্রের যে উদ্দেশ্য, গীতারও তাই, অর্থাৎ মোক্ষ। মোক্ষের তারতম্য আছে কিনা জানি না, কিন্তু অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য তাঁর সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল আদর্শ ধরেছেন তার সকলগুলিকেই সম্পূর্ণ মুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণের অবস্থা বলা যায় না। মোক্ষ নিশ্চয়ই চরম লক্ষ্য। কিন্তু তাতে পৌঁছবার জন্য যে সোপান বর্ণিত হয়েছে তার কোন পঙ্‌ক্তিতে উঠতে পারলেও মানুষ কৃতার্থ হতে পারে—এও গীতার বক্তব্য। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (২।৪০), এই ধর্মের অতি অল্পও মহাভয় থেকে ত্রাণ করে। সাধারণ লোকের গীতা-অধ্যয়নের এই সার্থকতা।

সাংখ্য

কোনও একটি বিষয় সম্বন্ধে বিশদ ধারণা করতে হলে নানা দিক দিয়ে তার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা যেতে পারে। গণিতের অনেক তত্ত্ব জ্যামিতি ও বীজ-গণিতের সাহায্যে বুঝতে পারা যায়। আত্মতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে বিবিধ দর্শনশাস্ত্র এখন প্রচলিত আছে, গীতা-কারের যুগেও ছিল। সাংখ্যদর্শন তারই একটি। ইউক্লিডের যুগে জ্যামিতি যেরূপ ছিল, বর্তমান যুগে ঠিক সেরূপ নাই, তথাপি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জ্যামিতির পদ্ধতি একজাতীয়। সেইরূপ, গীতার যুগে সাংখ্যদর্শন বললে যা বোঝাত তা অধুনা প্রচলিত সাংখ্যদর্শন থেকে কিছু ভিন্ন, যদিও পদ্ধতি একই প্রকার। ১০।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—তিনি 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'। কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তয়িতা বলে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ কপিলের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। গীতোক্ত সাংখ্যে ব্রহ্মই কেন্দ্র-স্বরূপ, কিন্তু প্রচলিত সাংখ্য ব্রহ্মবর্জিত। গীতোক্ত ও প্রচলিত সাংখ্যের এইটিই প্রধান প্রভেদ।

যোগ

অমরকোষে 'যোগ'এর অর্থ—সংহনন (সংহতি), উপায় (উপার্জন), ধ্যান, সংগতি (মিলন), যুক্তি (প্রয়োগ)। চলিত কথায় যোগ বললে হঠযোগাদি বোঝায়। গীতায় 'যোগ' শব্দ এই সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। দুই-এক স্থলে এর অর্থ উপায় বা উপার্জন, যথা—'যোগক্ষেম'। কিন্তু অন্য সর্বত্র 'যোগ' শব্দ এক বিশেষ অথচ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

গীতায় যোগের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—'সমত্বই যোগ' (২।৪৮); 'কর্মে কৌশল যোগ' (২।৫০); যা সন্ন্যাস তাই যোগ, যার সংকল্প (ফলাশা) সন্ন্যস্ত হয়নি সে কখনও যোগী নয়' (৬।২)।

ধ্যান ও প্রয়োগ এই দুই আভিধানিক অর্থও গীতোক্ত 'যোগ' শব্দে উহ্য আছে। ধ্যান বা একাগ্র চিন্তার দ্বারাই সমত্ব অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান লাভ হয়। ধ্যান দ্বারা কর্মের তত্ত্ব সম্যক্‌ বুঝতে পারলেই লোকে ফল সম্বন্ধে উদাসীন হতে পারে। আবার প্রয়োগেই কৌশল আবশ্যক। কোনও ক্রিয়া (process) না থাকলে যোগ অসম্ভব। চিন্তাও মানসিক ক্রিয়া। আভিধানিক ও গীতোক্ত অর্থ অনু-সারে কোনও ক্রিয়াকে 'যোগ' বলতে হলে তার এই কটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক—

(১) এই ক্রিয়ার কোনও বিষয়ে অপর কোন বিষয় প্রযুক্ত হচ্ছে (যুক্তি বা প্রয়োগ)। (২) এই ক্রিয়া একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠিত (ধ্যান)। (৩) এই ক্রিয়া উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত দক্ষতা সহকারে সুচারু-রূপে অনুষ্ঠিত (কৌশল)। (৪) এর অনুষ্ঠাতা সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম-ভাবাপন্ন, অর্থাৎ তাঁর নিজের কোনও ফলাশা বা স্বার্থ নেই (সমত্ব, সন্ন্যস্ত সংকল্প)।

অতএব, গীতার মতে একাগ্রচিত্তে কাজ করলেই যোগ হয় না। সুকৌশলে কাজ করলেও যোগ হয় না, সমত্ব ও ফলাশা বর্জন চাই। আমি যখন ফলাফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থেকে একাগ্রচিত্তে বুদ্ধি প্রয়োগ করি, তখন আমি 'বুদ্ধিযোগ' অবলম্বন করি। যখন ঐ প্রকারে সাংখ্য সন্ন্যাসিগণের মত অনুসারে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করি, তখন 'সাংখ্যযোগ' অবলম্বন করি। যখন মাথা না ঘামিয়ে কেবল শ্রদ্ধাপ্রয়োগ করে কোনও আপ্তবাক্য উপলব্ধি করে তদনুসারে কর্ম করি তখন 'ভক্তিযোগ' অবলম্বন করি।

কর্ম, কর্মযোগ

গীতায় বহুস্থলে সাধারণ অর্থেই 'কর্ম' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। শ্বাস, আহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জন, যাগযজ্ঞ, সুকর্ম কুকর্ম—সকলই 'কর্ম'। অনেক কর্ম আছে যা ইচ্ছা করলেও ছাড়া যায় না, ছাড়লে মৃত্যু, যথা—শ্বাস, আহার, নিদ্রা। কিন্তু এমন কর্ম অনেক আছে যা করা না করা অথবা করার পদ্ধতি নির্বাচন মানুষের ইচ্ছাধীন। গীতার উপদেশ—এই সকল কর্ম নির্বিচারে ক'রো না, বুদ্ধিযোগ দ্বারা যাচাই ক'রে নাও। যা 'বিকর্ম' (কুকর্ম) তা অবশ্য বাদ দেবে, কিন্তু অবশিষ্ট বিহিত কর্ম যা আছে, যা সমাজরক্ষার অনুকূল অতএব ধর্মসংগত, তাও বিশেষ প্রণালীতে 'যোগস্থ' হ'য়ে সম্পন্ন করবে। যদি এইরূপে সাবধান না হও তবে 'কর্ম-বন্ধনে' পড়বে, কর্ম তোমার বশ না হয়ে তুমিই কর্মের বশ হবে, কামনা সফল হলে আরও কামনা আসবে, বিফল হলে ক্রোধ আসবে, সম্মোহ আসবে, নীতিজ্ঞান লুপ্ত হবে, বুদ্ধি নাশ হবে, তোমার উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট হবে। সাধারণ লোকে এত সতর্ক হতে চায় না, যদৃচ্ছ কর্ম ক'রে যায়। গীতা তাদের জন্য নয়। কিন্তু যিনি উন্নততর অবস্থায় পৌঁছতে চান, তাঁর জন্য গীতা মার্গ নির্দেশ করেছে—'কর্ম-যোগ'। কোন কোন কর্ম বিধেয় গীতায় তার বিস্তৃত তালিকা নেই, কিন্তু প্রসঙ্গ-ক্রমে নানাস্থানে আছে—একপ্রকার কর্মের চেয়ে অন্যপ্রকার কর্ম শ্রেয়, সাত্ত্বিক প্রকৃতির কর্ম কি, জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধাত্মা কি ভাবে কর্ম করেন, ইত্যাদি। তালিকার প্রয়োজন হয়নি, কারণ, গীতার যুগে যে সকল কর্ম বিহিত গণ্য হ'ত, তখনকার ধর্মশাস্ত্রেই তা বিস্তারিত ছিল—'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য-ব্যবস্থিতৌ' (১৬।২৪)—কার্য-অকার্য ব্যবস্থার জন্য শাস্ত্র তোমার প্রমাণ। কিন্তু বিহিত কর্ম হলেই চলবে না, গীতায় তার সম্পাদনপদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়েছে—'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর' (৩।১৯), অনাসক্ত হয়ে সতত করণীয় কর্ম কর। এই অনাসক্তিযুক্ত কর্মের কথা গীতায় নানা স্থানে নানা প্রকারে উক্ত হয়েছে। এই নিষ্কাম কর্মই গীতার মুখ্য বক্তব্য।

নিষ্কাম কর্মের অর্থ লক্ষ্যহীন কর্ম নয়। মানুষ সজ্ঞানে কোনও কর্ম বিনা উদ্দেশ্যে করতে পারে না। নিষ্কামের অর্থ—ব্যক্তিগত স্বার্থহীন। সর্বভূতের বা বহুজনের মঙ্গল ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়। নিজেকে সুস্থ রাখাও নিষ্কাম কর্ম, কারণ, প্রত্যেকের স্বাস্থ্য নিয়েই বহুজনের স্বাস্থ্য। সর্বভূতের সকলে সমান উপকৃত হবে এমন কর্ম করা প্রায় অসম্ভব। আমি যদি যথাসাধ্য সমাজরক্ষার অনুকূল কর্ম করি এবং তার ফলে স্বয়ং উপকৃত হই তাও নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম করার পদ্ধতিই 'কর্মযোগ'।

'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা
ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং
যোগ উচ্যতে॥' (২।৪৮)

'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে
সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ
কর্মসু কৌশলম্॥ (২।৫০)

অতএব গীতার মতে কর্মযোগের লক্ষণ—(১) করণীয় কর্মে বুদ্ধি প্রযুক্ত হবে। (২) যোগস্থ অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হয়ে করতে হবে। (৩) কৌশলে অর্থাৎ বিশিষ্ট উপায়ে দক্ষতার সহিত করতে হবে। (৪) সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হয়ে সুকৃত-দুষ্কৃতের হিসাব না করে নিষ্কামভাবে করতে হবে।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ

গীতায় দুই প্রকার নিষ্ঠা উক্ত হয়েছে—সাংখ্যগণের জ্ঞানযোগ ও যোগিগণের কর্মযোগ (৩।৩)। 'নিষ্ঠা'র অর্থ আস্থা, অনুষ্ঠান বা সাধনা-পদ্ধতি—যাঁদের লক্ষ্য উচ্চে তাঁদের উপযোগী জীবনের প্রণালী। 'সাংখ্য'-এর অর্থ সাংখ্যদর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নয়। যে সকল সন্ন্যাসী সাংখ্যতত্ত্ব শিখে সংসার থেকে দূরে সকল কর্ম বর্জন করে চলতেন তাঁরাই 'সাংখ্য'। এঁদের নিষ্ঠা বা সাধনার মার্গকে গীতায় জ্ঞানযোগ বলা হয়েছে। 'যোগী'র অর্থ—কর্মযোগপরায়ণ,—'কর্মযোগেন যোগিনাম্' (৩।৩)। এঁরাও সাংখ্য-দর্শনকে ভিত্তিস্বরূপ নিতেন, কিন্তু অন্যবিধ মার্গ অনুসরণ করতেন।

গীতোক্ত কর্মযোগ সাধনায় যেমন ইন্দ্রিয়সংযম বুদ্ধিপ্রয়োগ ইত্যাদি বিহিত হয়েছে, সাংখ্য সন্ন্যাসীদের জ্ঞানযোগেও তা প্রয়োজন হয়। প্রভেদ এই—জ্ঞানযোগী আসক্তির সঙ্গে কর্মও পরিহার করেন, জনসাধারণের সহিত সংস্রব রাখেন না, একমাত্র নিজের বা নিজ দলের উন্নতি করতে চান। তাঁর অনুষ্ঠান মানসিক ব্যাপার মাত্র, কেবল তপস্যা। পক্ষান্তরে কর্মযোগী বহুলোকের ব্যাপৃত। তিনি আসক্তি ত্যাগ করেছেন কিন্তু কর্ম ত্যাগ করেননি। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার আছে। তিনি সাধারণ লোকের সম্মুখে সহজসাধ্য হিতের আদর্শ নিজের আচরণ দ্বারা স্থাপন করেন। তিনি 'লোকসংগ্রহচিকীর্ষু' (৩।২৫), অর্থাৎ লোকরক্ষা বা লোকহিত করতে চান। তিনি কেবল নিজেরই উন্নতি করেন না। 'জোষয়েৎ* সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্' (৩।২৬), যোগপরায়ণ হয়ে সর্বকর্ম সমাচরণ করে লোকসেবা করেন। তাঁর অনুষ্ঠান কেবল মানসিক ব্যাপার নয়। তিনি 'ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্ আরভতে' (৩।৭)

* পাঠান্তরে 'যোজয়েৎ'

মনদ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রভাব সংযত ক'রে অনাসক্ত হ'য়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ হাতেকলমে কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন। জ্ঞানযোগী অসামাজিক সন্ন্যাসী, কর্মযোগী সামাজিক গৃহী, তথাপি নির্লিপ্ত।

গীতার মতে জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসীর চেয়ে কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ—

'তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে' (৫।২) শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগের স্পষ্ট নিন্দা করেননি। বলেছেন—বালকের মত লোকেরাই সাংখ্য (জ্ঞানযোগ বা সন্ন্যাস) এবং যোগ (কর্মযোগ) পৃথক বলে, একটিতে আস্থা থাকলে উভয়েরই ফল পাওয়া যায় (৫।৪)। কিন্তু এও বলেছেন—'সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ, যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি' (৫।৬), কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস পাওয়া কষ্টকর, কর্মযোগযুক্ত সাধক অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন। অর্থাৎ কর্মত্যাগ করে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ কঠিন, কিন্তু নির্লিপ্ত হ'য়ে কর্ম করলে সহজে সিদ্ধিলাভ হয় এবং যিনি কর্মযোগী তিনি জ্ঞানযোগীও বটেন।

গীতায় বহুস্থলে 'যোগ' ও 'যোগী' শব্দ কর্মযোগ ও কর্মযোগী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ঐ সকল স্থলে ঐ অর্থই যে অভিপ্রেত তার প্রমাণ গীতার শ্লোকের ভিতরেই পাওয়া যায়। ২।৫০ শ্লোকে আছে—'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্', যোগ কর্মেরই কৌশল। ৩।৩ শ্লোকে—'কর্মযোগেন যোগিনাম্', অর্থাৎ কর্মযোগই যোগিগণের মার্গ। ৫।১ শ্লোকে অর্জুন বলছেন—'সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি', অর্থাৎ একবার কর্মের সন্ন্যাস উপদেশ দিয়ে আবার তারই যোগ (কর্মযোগ), উপদেশ দিচ্ছ।

গীতার সর্বত্রই 'যোগ' অর্থে কর্মযোগ এমন বলা চলে না। মনে রাখা আবশ্যক যে, গীতাকার ২।৪৮-৫০ শ্লোকে যোগের যে সকল লক্ষণ দিয়েছেন তদনুসারে 'যোগ', 'বুদ্ধিযোগ' ও 'কর্মযোগ' এদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং 'যোগ' বললে বুদ্ধিযোগ কর্মযোগ দুইই সূচিত হয়। 'যোগ' শব্দের অর্থ মোটামুটি ধরা যেতে পারে—নির্বিকার ভাবে একাগ্রচিত্তে দক্ষতাসহকারে নিষ্কাম কর্ম (অর্থাৎ লোকহিতে) আত্মনিয়োগ এবং সেইসঙ্গে আত্মোন্নতির চেষ্টা।

হঠযোগ

গীতাকার ইন্দ্রিয়সংযম আসক্তিত্যাগ প্রভৃতি অবশ্যকরণীয় বলেছেন, কিন্তু তিনি জবরদস্তির বিরোধী। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি' (৩।৩৩), মানুষ প্রকৃতির বশেই চলে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি করবে? সংযম ও সবলে নিরোধ এক নয়। গীতাকার বহুবিধ যজ্ঞের বর্ণনাপ্রসঙ্গে (৪।২৪-৩০) পূরক রেচক কুম্ভক ইত্যাদির উল্লেখ ক'রে শেষে বলেছেন—দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বাহ্য অনুষ্ঠান ও বিষয়বর্জন অপেক্ষা জ্ঞানদ্বারা চিত্তশুদ্ধিই অধিক ফলপ্রদ। ১৭।৫-৬ শ্লোকে আছে—যারা দম্ভ ক'রে ঘোর তপস্যায় শরীর ও আত্মাকে কৃশ করে তারা অসুর-প্রকৃতি। গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে কিছুকাল উৎকট তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে তা নিষ্ফল জেনে নিবৃত্ত হন।

চলিত কথায় 'যোগ বললে যা বোঝায় গীতায় তজ্জাতীয় কিছু কিছু প্রক্রিয়া বিহিত আছে, যথা ৬।১১-১৪ শ্লোকে—যোগী অনতি-উচ্চ অনতি-নীচ, কুশাসনে অজিন ও চেল বিছিয়ে স্থিরভাবে ব'সে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে যোগাভ্যাস করবেন। এই 'যোগ' 'আত্মবিশুদ্ধয়ে', মনের বিশুদ্ধির জন্য; এর উদ্দেশ্য—'নির্বাণপরমা মৎসংস্থা শান্তি', নির্বাণ অভিমুখী ব্রহ্ম-আশ্রিত শান্তি, অণিমালঘিমাদি অদ্ভুত ঐশ্বর্যলাভ নয়।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,
মণিলাল, পুরোনো শিলাইদহে এসে মনটা কেমন ঢিলে হয়ে গেছে। কর্তব্য ভারের বিপুল যে-একটা ভারাকর্ষণ ছিল সেটা যেন হঠাৎ আমার চার দিক থেকে খসে পড়েছে। গুরুতর দায়িত্ব বলে যে সমস্ত পদার্থকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতুম হঠাৎ তাদের কথা মনে করে হাসি পাচ্চে। আমের বোলের গন্ধ আসচে, কোকিলগুলো ডেকে সারা হল, আর মন বল্চে, তুমিও খেপ! এমন অবস্থায় ছোট যে-একটা গান একরাত্রি [illegible] ফুটে উঠল — জীবনের পুরোনো বসন্তের সেই একটুখানি সৌরভের মত জিনিষ তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্চি। ইতি ১০ চৈত্র ১৩২৮

রবীন্দ্রনাথ

শেষ বেলা

পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই
অস্তাচলের ধারে আসি।
ডাকলে যে আর দেয় না সাড়া
তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি।

যখন এ কূল যাব ছাড়ি,
পারের খেয়ায় দেব পাড়ি,
মোর ফাগুনের গানের বোঝা
বাঁশির সাথে যাবে ভাসি।।

সেই যে আমার বনের গলি
রঙীন ফুলে ছিল ঢাকা,
সেই ফুলেরি ছিন্নদলে
চিহ্ন তাহার পড়ল আঁকা।

মাঝে মাঝে কোন্ বাতাসে
চেনা দিনের গন্ধ আসে,
হঠাৎ বুকে চমক লাগায়
আধ্-ভোলা সেই কান্নাহাসি।।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ই চৈত্র,
১৩২৮।

ওঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়েষু,
মণিলাল কাল তোমাকে যে গানটি পাঠিয়েছিলুম তার একটি লাইন অল্প একটু বদলেচি—লক্ষ্য কোরো।

ইতি—১১ই চৈত্র,
রবিদাদা

[সংশোধন]

পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই
অস্তাচলের ধারে আসি।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই
তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি।।

চিঠিখানি প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং তৎকালীন 'ভারতী' সম্পাদক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

রবীন্দ্রনাথ

হুমায়ুন কবির

অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান অনস্বীকার্য। তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা হাজারেরো বেশী, গানের সংখ্যাও দুই হাজারের বেশী ছাড়া কম হবে না। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্যকাব্য ও নাটক এবং বিবিধ ধরণের প্রবন্ধ একত্রিত করে তাঁর রচনা পাঁচশো পৃষ্ঠার আটাশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে তবু অনেক অপ্রচলিত ও অপ্রকাশিত রচনা এখনো এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র সংখ্যা ও আয়তনের বিচারে পৃথিবীর খুব কম সাহিত্যিকই নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে এতখানি সমৃদ্ধ করেছেন। দান্তে সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁর একক চেষ্টায় ইতালির একটি প্রাদেশিক ভাষা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের বেলায় সে কথা বোধ হয় আরো বেশী খাটে।

কেবলমাত্র পরিমাণ নিয়ে বিচার করলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অমর্যাদা হবে। গুণের বিচারে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের তুলনা মেলা কঠিন। গীতিকাব্য ও গানে বিশ্বসাহিত্যে তিনি অতুলনীয়, একথা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। কচিৎ কোন কবির গীতিকাব্যে হয়তো তাঁর গীতি কবিতা ও গানের যে উৎকর্ষ, তার সমকক্ষের পরিচয় মিলবে, কিন্তু গীতিধর্মের শ্রেষ্ঠতর বিকাশ বোধ হয় কোন দেশে কোন যুগে কোন কবির রচনাতেই মিলবে না। ছোট গল্পের রচয়িতা হিসাবেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কথাকারদের মধ্যেই তাঁর আসন। নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক হিসাবেও ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের তুলনা বিরল, বিশ্বসাহিত্যেও তাঁর বিশিষ্ট স্থান। সমালোচনা সাহিত্যে ভারতীয় ভাষাগুলি তত সমৃদ্ধ নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনা [illegible] প্রাদেশিক ও দেশজ সংকীর্ণতা লঙ্ঘন করে বিশ্ব-সমালোচনা সাহিত্যে সমান আসন দাবী করে। দেশী এবং বিদেশী যে সব সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর রুচি ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাঁদের সাহিত্য বিচারেও রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও উদার সহৃদয়তার পরিচয় মেলে।

রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও মিসেস জিন মুডি—সিকাগো ১৯১২ (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

সাহিত্য জগতের সকল অঙ্গনেই রবীন্দ্রনাথের সমান অধিকার, কিন্তু সাহিত্যের সর্বমুখী প্রকাশেও তাঁর প্রতিভা ও উদ্যম নিঃশেষ হয়নি। সঙ্গীতের জগতেও তাঁর কীর্তি অনন্যসাধারণ। কেবল গান রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, স্বরচিত গানে তিনি সুর দিয়েছেন এবং কথা ও সুরের সঙ্গতিতে যে বিশিষ্ট গীতিপদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন, তা [illegible]। প্রথম জীবনে ধ্রুপদী রীতি অনুসারেই তিনি সঙ্গীত রচনা সুরু করেছিলেন কিন্তু প্রথম যৌবনেই [illegible] সুর-সঙ্গীত তাঁকে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়। বিদেশী এবং দেশজ সঙ্গীত ও গানের নানান উপাদান আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করলেন, তার বিকাশে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

সাহিত্য ও সঙ্গীতের রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের আজন্ম অধিকার, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে সাধারণ মানুষ যখন সংসার-কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার কথা ভাবে, সেই সময়ে রূপ-কলার জগতে তাঁর নতুন অভিযান সুরু হল। কবিতার কাটাকুটির মকস থেকে যে ছবি আঁকার সুরু, সত্তর বছর বয়সে সেই প্রচেষ্টাই রবীন্দ্রনাথকে চিত্রকলার মায়াবী জগতে

রবীন্দ্রনাথ ও উইল ডুরান্ট (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

পৌঁছে দিল। তাঁর কাব্য-রচনার ধারা তখনো অব্যাহত, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর প্রয়োজনের দাবী মেটাতে তাঁর অক্লান্ত কর্মশক্তি বহুব্যাপৃত, কিন্তু তা সত্ত্বেও দশ-বারো বছরের মধ্যে প্রায় তিন হাজার ছবি আঁকা সহজ কথা নয়। তিনি মামুলী প্রথায় চিত্রাঙ্কন শেখেন নাই, নিজের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যকে উদ্ঘাটন করবার জন্যই তাঁর চিত্র সাধনা। তাই ব্যক্তি ও সমাজের অচেতন ও অবচেতন মানসের পরিচয় রবীন্দ্র-চিত্রাবলীতে মেলে। অনেকে বলেন যে, প্রচলিত ভারতীয় চিত্র-পদ্ধতিকে অস্বীকার করেই রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে সুরু করেছিলেন কিন্তু প্রতিভার সহজ পটুত্ব এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে তাঁর চিত্র আধুনিক ভারতীয় চিত্র-পদ্ধতির অন্যতম পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হবে না। বহু বিদগ্ধ সমালোচকের মতে কল্পনার ঐশ্বর্য ও সৃজনী-শক্তির প্রাচুর্যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের চিত্রকরদের মধ্যে অগ্রণী।
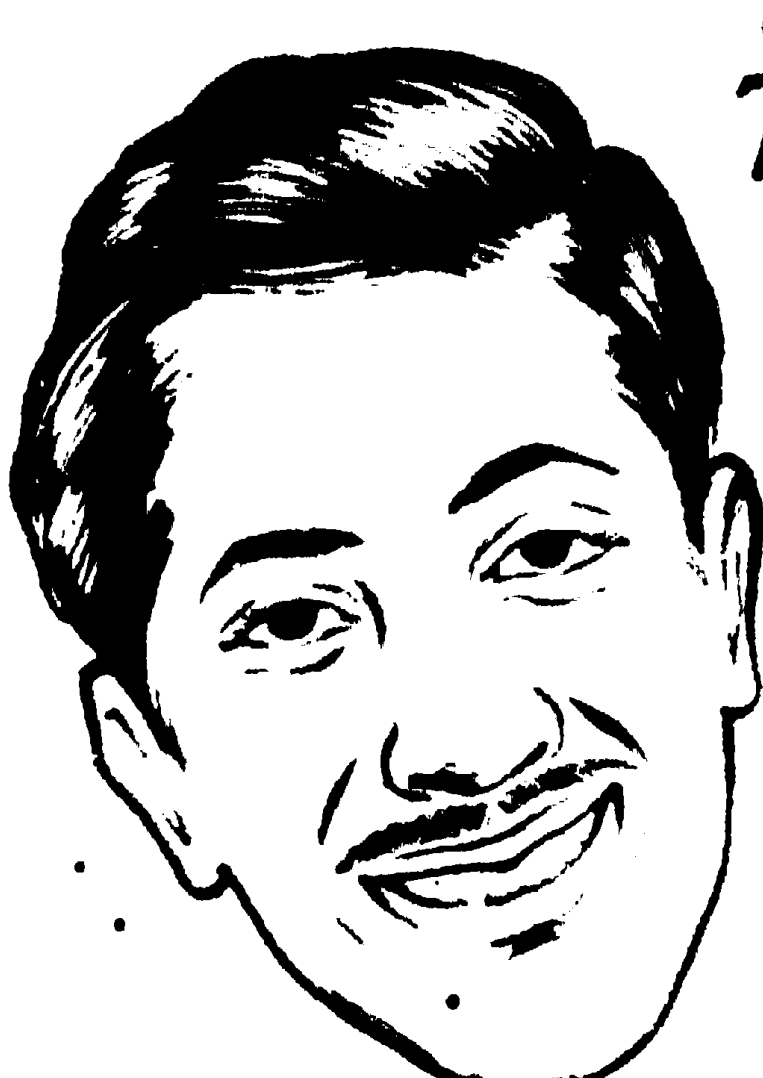
সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ও বিপুল দানের কথা স্মরণ করলে মানতেই হবে যে, তাঁর মত পূর্ণাঙ্গ শিল্পী পৃথিবীতে বোধ হয় আর কখনো দেখা যায়নি। শিল্পের সমস্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করেও কিন্তু মানুষের কল্যাণে তাঁর সাধনা সমাপ্ত হয় নাই। কেবল ভারতবর্ষ বলে নয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য শিক্ষা ও ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজচিন্তা, অর্থনৈতিক সংগঠন এবং পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশের সাধনায় তাঁর গদ্য-পদ্য রচনা অনুপ্রাণিত। প্রবন্ধ ও আলোচনা সাহিত্যে তাঁর গভীর চিন্তা ও সৃজনশালী প্রতিভা এই সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে স্বীকার করে মানবতার নতুন আদর্শের পথনির্দেশ করেই রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হননি, সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যও তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

শিক্ষা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি। শৈশবে বুদ্ধি আবেগ ও চিত্তের যে বিকাশ, ব্যক্তি ও জাতির ভবিষ্যৎ তারই উপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, নিরানন্দ ও সংকীর্ণ শিক্ষা-পদ্ধতি শিশুর চিত্তকে পীড়া দেয়। তাই আনন্দ ও মুক্তির ভিত্তিতে তিনি শিক্ষার নতুন আদর্শ স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সেই আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতির উদার পরিবেশে বন্ধন-মুক্তির মধ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও উৎসুক শিক্ষার্থীর পরস্পরের সাহায্যে তরুণ মন সঙ্গতি ও সমন্বয়ের আদর্শে গড়ে উঠুক—এই ছিল তাঁর শিক্ষার আদর্শ। পরে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করে তিনি সেই আদর্শ ও পদ্ধতিকে বিশ্বজনীন রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। আজ থেকে ষাট বছরেরও পূর্বে তিনি বোলপুরে শিক্ষা নিয়ে যে পরীক্ষা সুরু করেছিলেন, ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠনের সাধনায় তার প্রভাবের পরিচয় পদে পদে মেলে। শুধু ভারতবর্ষে বলে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিক্ষাবিদই আজ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও পদ্ধতির অনুরাগী।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক আজও গ্রামবাসী কিন্তু আমাদের দেশের গ্রামগুলি বহুক্ষেত্রে বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গ্রামে ফিরে যাও বললেই যে মানুষ গ্রামে ফিরবে না—এ-কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই তাঁর

তাঁহারা নিজেদের পূর্বসূরীগণের নিকট **সম্পর্কের** চিহ্ন পাইয়াছিলেন একথা **আমরা** অনেকের কাছেই শুনিয়াছিলাম **এবং তাঁহাদের** সকলেই কিছু শাহেনশাহের **অতিথির** সম্মান বৃদ্ধির জন্য মনগড়া **কথা বলেন** নাই।

শিরাজে আমরা পৌঁছাই ইংরাজী **১৬ই** এপ্রিল, ১৯৩২ সালে। পথের কথা (বুশীর হইতে শিরাজ) না বলাই ভাল। শিরাজের ব্রিটিশ কন্সালের সেক্রেটারী আমাকে বলেন যে, আপনাদের তো খুব সাহস, এই বিশ্ববিখ্যাত বৃদ্ধকে আপনারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম রাস্তায় এখানে এনেছেন। বাস্তবিকই পথে মোটর ভাঙ্গায় এবং রাস্তা ক্রমেই দুর্গম হওয়ায় আমাদের পথে একরাত্রি কাটিয়ে শিরাজে আসতে হয়। শহরের বাহিরে প্রায় দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য ও পুলিশ 'ড্রেস ইউনিফর্ম' পরে গাড়ীর সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজপ্রাসাদে আমাদের নিয়ে এলো। সেখানে শিরাজের গভর্নর মোহাম্মেদ আলি শেরবানি কবিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রাসাদের দোতালায় রাজসভা কক্ষে নিয়ে গেলেন। বিরাট সভাগৃহ, মর্মর ও স্ফটিকখচিত।

কবির মুখ শ্রান্ত ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট। শুধু পারস্যবাসীর যে শিষ্টাচার ও প্রকাশ্য সভায় ব্যবহারের ধারা তাঁর দেখা ছিল তাহারই বশে তিনি অভিনন্দন শুনিলেন শান্তভাবে।

অভিনন্দন ফার্সীতে দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ চলিল ইংরাজীতে। আমাদের মধ্যে কেহই ভাল ফার্সী বা **ফ্রেঞ্চ** না জানায় সারা ইরাণে আমাদের ভাষা নিয়ে ঝঞ্ঝাট অনেক হয়। প্রথমে **অভিনন্দন** পারসীক রীতি অনুযায়ী নানা আখ্যায় নানা প্রকার গুণকীর্তনে পূর্ণ ছিল। পরের অংশে আমরা বুঝিলাম যে কবিকে কাছে পাইয়া ইঁহাদের কি আনন্দ ও উল্লাস। শিরাজের **দিনপঞ্জী**তে অভিনন্দনের শেষাংশে আছে —

Sāadi. Behold: From near the Island, where our Great ancestor transferred his residence from the Paradise, a greatman, full of years, has stepped today into your land. But this time there is not the Descent from Heavens unto the earth but a journeying from one earthly Paradise to another. Thou hast truly and well said. O Sāadi, and we too in protestation of our good will, take the courage to repeat thy words to our Guest:—

"With such goodness and nicety, from whichever way thou enterest.

That way is a way which thou openest to the world!

"দেখো হে সাদি: যে দ্বীপে আমাদের মহান পূর্বপুরুষ স্বর্গ হইতে তাঁহার বাসস্থান তুলিয়া আনেন, সেই স্থানের নিকট হইতে এক মহান পুরুষ, যাঁহার বয়স বহু বৎসরে পূর্ণ, আজ তোমার দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু এইবারের এই যাত্রায় স্বর্গ হইতে মর্ত্যে অবতরণ নাই কেননা ইহা এক ভূস্বর্গ হইতে আরেক ভূস্বর্গে **আগমন**।

হে সাদি: **তুমি যথার্থই সত্য** কথা বলে গিয়েছ এবং **আমরাও আমাদের** মনের কথা প্রকাশ করি আমাদের এই অতিথির কাছে তোমারই ভাষায়:—

তোমার আগমন যে পথেই হউক, তাহা এতই কল্যাণময় ও শোভন যে সেই পথ তুমি উন্মুক্ত কর জগতের কাছে।"

এ অভিনন্দনে যখন সাদির প্রসঙ্গ আসিল তখন সভাস্থলে যেন এক নূতন ভাব দেখা দিল। প্রথমদিকের আড়ম্বর গেল চলে, বক্তার ও শ্রোতাদের মুখের ভাবে বুঝা গেল যে এই অভিনন্দনে সভার লোকের অন্তরের যোগ রয়েছে। সাদির বয়েৎ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব যেন আরও গভীরে গেল।

কবির মুখের ভাব উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হয়ে এলো। বুঝিলাম এই কবির অন্তরের ভাষায় তাঁহার **অন্তর** সাড়া দিয়েছে। কোথা গেল সেই শ্রান্ত-ক্লান্ত ভাব, তিনি উত্তর দিলেন:—

"বন্ধুগণ আমার সামনে এই ভাষার অন্তরাল থাকায়, তোমাদের এই সাদর ও আন্তরিক সম্বর্ধনায় আমার মনে যে কি আনন্দ দিয়াছে তাহা আমি পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

তোমাদের কবিশ্রেষ্ঠ সাদি বাংলায় যাইবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমি সেই বাংলা দেশ হইতেই আজ আসিয়াছি তোমাদের এই সুন্দর বসন্ত-কালে। আমার হৃদয়ে তোমাদের এই চিরসুন্দর ইরাণ ও ইরাণের দেশবাসী কি স্পন্দন জাগাইয়াছে সেকথা আমি ফিরিয়া গিয়া আমার স্বদেশবাসীকে জানাইব। তোমাদের এই বন্ধুত্বের আহ্বান আমি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতেছি।"

১৭ই এপ্রিল পৌরজনের সম্বর্ধনা ও তারপর সাদির সমাধিস্থল (সাদিয়েহ) [illegible] ... [illegible] পড়েন। [illegible] [illegible] চিকিৎসক [illegible] ছিলেন। [illegible] [illegible] এবং [illegible] বলে দিলেন। সেই অনুসারে আমরা [illegible] [illegible] এক [illegible] মোটরে চলিলাম।

কিন্তু কবির মনে ছিল উচ্চ হাফিজের সমাধি দর্শন ও সেখানের পবিত্র পরিবেশে কিছুক্ষণ আনন্দলাভ করা। সেই ইচ্ছা [illegible] [illegible] জানাইলেন যে আমাদের সঙ্গে লইয়া কবি ও তিনি সেখানে যাইবেন।

১৮ই এপ্রিল সকালে [illegible] কবি হাফিজিয়েহ, অর্থাৎ হাফিজের সমাধি-স্থলে, উপস্থিত হইলেন। সেই পবিত্র স্থানের গম্ভীর শান্তিময় পরিবেশ ও তাহার নির্মল সৌন্দর্য সকলের মনে এক

'অমৃতে'র

* সম্পাদকীয় বিভাগের কাজের জন্য যোগাযোগ করুন:

শ্রীমণীন্দ্র রায়
১১/ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১

* গ্রাহকবর্গের চাঁদা ও এজেন্সীর সর্তাবলীর জন্য যোগাযোগ করুন:

শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ
১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১

* বিজ্ঞাপনের হার ও সর্তাবলীর জন্য যোগাযোগ করুন:

শ্রীমিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায়
১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১

কবিতা
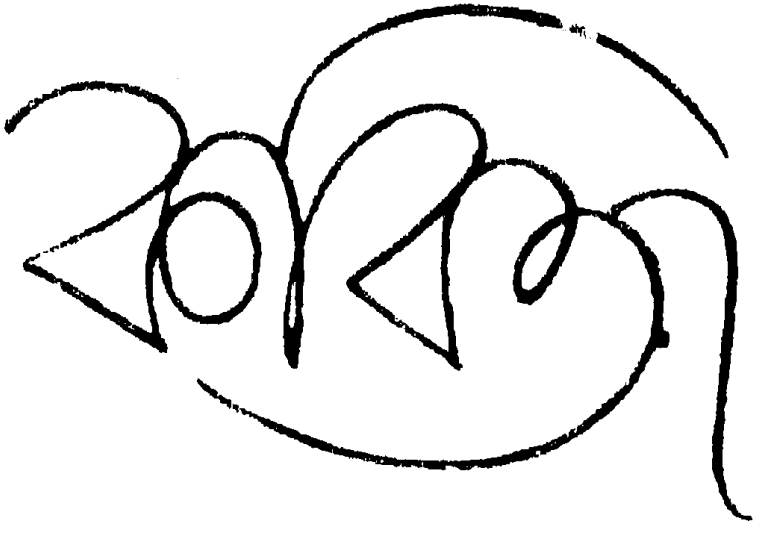
রবীন্দ্রনাথ

বিমলচন্দ্র সিংহ

ঘন অশ্রু বাষ্পেভরা মেঘের দুর্যোগে অন্ধকারে
রচনাশালায় বসি একা ধাতা চিন্তায় মগন
সে ঘন তামসা মাঝে দৃষ্টি ফিরে আসে বারেবারে
পথ খুঁজি নাহি মেলে, নাহি জাগে সৃষ্টির স্বপন
আঁধার গভীর হ'ল কোথা হায় ঊষার সন্ধান?
মৃত্যুর এ নীরবতা ভেদি কোথা প্রাণ কলরব?
নবীন সৃষ্টির তরে মিছে শুধু ব্যাকুলিত প্রাণ,
শিবের জটায় গংগা সুপ্ত আজি নিশ্চিন্ত নীরব
এমনি কাটিল কাল অবশেষে ধাতার অন্তরে
ফুটিল অরুণ আলো, সে আলোয় তমঃ গেলো ভাসি
সে বিভায় ধীরে ধীরে অনন্ত অম্বর গেলো ভরে
আলোর অরুণ রাগে চিত্তস্থল উঠিল উদ্ভাসি
সে আলোয় বহ্নিবীণা বিশ্ব ভরি উঠিল ঝংকারি
সে আলোয় উচ্ছলিল দিকে দিকে জাহ্নবী প্রবাহ
সে আলোয় প্রাণবন্যা চিত্তে চিত্তে খেলো যে সঞ্চারি
আলোর চুম্বনে জাগে প্রাণে প্রাণে শান্তিহীন দাহ
সে আলোর কেন্দ্রে জাগে জ্যোতির কনক পথখানি
অজস্র সৌরভে জাগে, জাগে সে যে অনন্তবিভায়
দীপ্ত স্বর্ণ শতদলে ঝলকিত তাহার যে বাণী
হে কনকপদ্ম আজি নমস্কার জানাই তোমায়।।

[শেষ লেখা]

রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশংকর রায়

কণ্ঠ তোমার পার হয়ে গেল
সাত সমুদ্র তেরো নদী

চীন হতে পেরু গেল সে কণ্ঠ
মেরু হতে মেরু সীমাবধি।

সেই কণ্ঠ কি ফিরে যাবে পার
শতবর্ষের তটদেশে?

শতকের পর শতক পেরোবে
সাত সমুদ্র তেরো নদী।

হারাতে হারাতে যাবে সে কণ্ঠ
মিলাতে মিলাতে ভেসে ভেসে

তবু সে কণ্ঠ পার হয়ে যাবে
যুগ হতে যুগ নিরবধি।

হে আদিত্য বৈতালিক

মনীশ ঘটক

আমরা দেখেছি যারা জলস্তম্ভে জাগে স্পর্ধা উগ্রনিগ্রহ,
দেখেছি শার্দূলশাবে গৌরীশংকরের ভালে দীপ্তসূর্যোদয়,
নৈশসূর্যালোকে নিত্য নব নব কুসুমের জন্মপরিগ্রহ,
সেই আমাদেরও কাছে তব আবির্ভাব বন্ধু, পরম বিস্ময়।

আমরা দেখেছি যারা সঞ্চরণশীল সৃষ্টি, কাল বহমান,
জেনেছি গতির নৃত্য তবু বাঁধা ছন্দোবন্ধে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে।
মৃত্তিকার রসপুষ্টে চিত্ত নবোন্মেষ লভে চিরপ্রাণনে,
তব ধ্যানে হে মহান, ধ্বনিত সে চিদাজ্ঞান প্রবুদ্ধনিঃস্বনে।

আমরা শুনেছি যারা, সম্বোধি অনন্তপারে উদাত্ত আহ্বান,
শুনেছি স্ব-কক্ষ 'পরে লক্ষ গ্রহনক্ষত্রের পরিক্রমাগান।
পশে কানে অনাগত অনিবার্য বিধ্বংসের অস্ফুট নিনাদ,
জানি আছে তারও পরে নবতর সৃজনের পরম প্রসাদ।

শুনেছি তোমার কণ্ঠে, হে আদিত্যবৈতালিক, প্রাণোন্মাদন
জীবনের জয়ধ্বনি, মৃত্যুস্নানে শুচিস্মিত সঞ্জীবনজীবন

আসিলাম। ইতিমধ্যে চা ও জলখাবার উপস্থিত হইয়াছে; আমরা বসিয়া গেলাম।

চায়ের আসরে কিন্তু মেয়েদের দেখিলাম না, কেবল আমরা চারজন। অথচ বাড়িতে অন্তত দুইটি স্ত্রীলোক নিশ্চয় আছেন। মণীশবাবু বোধকরি পুরাপুরি স্বদেশী-বর্জন করেন নাই। তা আজকালকার সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার যুগে একটু অন্তরাল থাকা মন্দ কি?

পানাহার শেষ করিয়া সিগারেট ধরাইয়াছি, একটি প্রকাণ্ড গাড়ি আসিয়া বাড়ির সামনে থামিল। গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। গোরিলার মতন চেহারা, কালিমা-বেষ্টিত চোখ দুটিতে মন্থর কুটিলতা। মুখ দেখিলে চরিত্র অধ্যয়ন যদি সম্ভব হইত বলতাম লোকটি মহাপাপিষ্ঠ।

মণীশবাবু খুব খাতির করিয়া আগন্তুককে ঘরে আনিলেন, আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন, —'ইনি শ্রীগোবিন্দ হালদার, এখানকার একটি কয়লা খনির মালিক। আর এঁরা হচ্ছেন শ্রীগগন মিত্র এবং সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার বন্ধু, কলকাতায় থাকেন। বেড়াতে এসেছেন।'

গোবিন্দবাবু তাঁহার শনৈশ্চর চক্ষু দিয়া আমাদের সমীক্ষণ করিতে করিতে মণীশবাবুকে বলিলেন, 'খবর নিতে এলাম। খনিতে আর কোনো গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

মণীশবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, —'গণ্ডগোল তো লেগেই আছে। পরশু রাত্রে এক কাণ্ড। হঠাৎ পাঁচ নম্বর পিট্-এর পাম্প বন্ধ হয়ে গেল। ভাগ্যে পাহারাওয়ালারা সজাগ ছিল তাই বিশেষ অনিষ্ট হয়নি। নৈলে—'

গোবিন্দবাবু মুখে চুকচুক শব্দ করিলেন। মণীশবাবু বলিলেন,— 'আপনারা তো বেশ আছেন, যত উৎপাত আমার খনিতে। কেন যে হতভাগাদের আমার দিকেই নজর তা বুঝতে পারি না।'

গোবিন্দবাবু বলিলেন,— 'আমার খনিতেও মাস ছয়েক আগে গোলমাল শুরু হয়েছিল। আমি জানি পুলিসের দ্বারা কিছু হবে না, আমি সরাসরি চর লাগালাম। আটজন লোককে গুপ্তচর লাগিয়েছিলাম, তিন হপ্তেকের মধ্যে তারা খবর এনে দিল কারা শয়তানি করছে। পাঁচটা লোক ছিল পালের গোদা, তাদের একদিন ধরে এনে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিলাম। তাদের বরখাস্ত করতে হল না, নিজে থেকেই পালিয়ে গেল। সেই থেকে সব ঠাণ্ডা আছে।' বলিয়া তিনি দন্তুর গোরিলা-হাস্য হাসিলেন।

মণীশবাবু বলিলেন,—'আমিও গুপ্তচর লাগিয়েছিলাম কিন্তু কিছু হল না। যাকগে—' তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। সাধারণভাবে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। গোবিন্দবাবুর জন্য চা জলখাবার আসিল, তিনি তাহা সেবন করিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি কিন্তু আমাদের আশেপাশেই ঘুরিতে লাগিল। আমরা নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি একথা বোধহয় তিনি বিশ্বাস করেন নাই।

ঘণ্টাখানেক পরে তাঁহারা উঠিলেন। মণীশবাবু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত গেলেন, আমরাও গেলাম। ড্রাইভার মোটরের দরজা খুলিয়া দিল। গোবিন্দবাবু মোটরে উঠিবার উপক্রম করিয়া ব্যোমকেশের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া হাসি-হাসি মুখে বলিলেন,—'দেখুন চেষ্টা করে।'

তিনি মোটরে উঠিয়া বসিলেন, মোটর চলিয়া গেল।

মণীশবাবু এবং আমরা কিছুক্ষণ দৃষ্টি-বিনিময় করিলাম, তারপর তিনি বিষণ্ণ সুরে বলিলেন,—'গোবিন্দ হালদার লোকটা ভারি সেয়ানা, ওর চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়।'

রাত্রির খাওয়াদাওয়া সারিয়া শয়ন করিতে এগারোটা বাজিল। শরীরে ট্রেনের ক্লান্তি ছিল, মাথার উপর পাখা চালাইয়া দিয়া শয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে ডুবিয়া গেলাম।

।। খ ।।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

একজন ভৃত্য জানাইল, বড়কর্তা এবং ছোটকর্তা ভোরবেলা কোলিয়ারিতে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখি আমাদের চা ও জলখাবার টেবিলের উপর সাজাইয়া একটি যুবতী দাঁড়াইয়া আছে।

ইতিপূর্বে বাড়ির মেয়েদের দেখি নাই, আমরা একটু থতমত খাইয়া গেলাম। ব্যোমকেশের সুস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে মেয়েটি চোখ নীচু করিয়া ঈষৎ জড়িতস্বরে বলিল,—'আমি ইন্দিরা, এ বাড়ির বৌ।—আপনারা খেতে বসুন।'

ফণীশের বৌ। শ্যামবর্ণা, তনু-দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, মুখখানি তরতরে; বয়স আঠারো-উনিশ। দেখিলেই বোঝা যায় ইন্দিরা লাজুক মেয়ে, অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির সহিত সহজভাবে বাক্যালাপ করার অভ্যাসও তাহার নাই। নেহাৎ বাড়িতে পুরুষ নাই, তাই বেচারী বাধ্য

হইয়া অতিথি সৎকার করিতে আসিয়াছে।

আমরা আহারে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'বোসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ইন্দিরা একটি সোফার কিনারায় বসিল।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় একটু চুমুক দিয়া গলা ভিজাইয়া লইল, তারপর জলখাবারের রেকাবি টানিয়া লইল—'আজ আমাদের উঠতে দেরি হয়ে গেল। কর্তা কি ভোরবেলাই কাজে বেরিয়ে যান?'

'হ্যাঁ, বাবা সাতটার সময় বেরিয়ে যান।'

'আর তোমার কর্তা?'

ইন্দিরার ঘাড় অমনি নত হইয়া পড়িল। সে চোখ না তুলিয়াই অস্ফুট-স্বরে বলিল,—'উনিও।' তারপর জোর করিয়া লজ্জা সরাইয়া বলিল,—'ওঁরা বারোটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া করেন, আবার তিনটের সময় যান।'

ব্যোমকেশ তাহার পানে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিল, আর কিছু বলিল না। আহার করিতে করিতে আমি ইন্দিরাকে লক্ষ্য করিলাম। সে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে ব্যোমকেশের প্রতি চকিত কটাক্ষপাত করিতেছে। মনে হইল অতিথি সৎকার ছাড়াও অন্য কোনও অভিসন্ধি আছে। ব্যোমকেশ কে তাহা সে জানে, ফণীশ স্ত্রীকে নিশ্চয় বলিয়াছে, তাই ব্যোমকেশকে কিছু বলিতে চায়। সে মনে মনে কিছু সংকল্প করিয়াছে কিন্তু সংকোচবশতঃ বলিতে পারিতেছে না। কাল রাত্রে ফণীশের মুখেও এইরূপ দ্বিধার ভাব দেখিয়াছিলাম।

প্রাতরাশ শেষ করিয়া চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ রুমালে মুখ মুছিল, তারপর প্রসন্নস্বরে বলিল,—'কি বলবে এবার বল।'

আমি ইন্দিরার মুখে সংকল্প ও সংকোচের টানাটানি লক্ষ্য করিতেছিলাম, দেখিলাম সে চমকিয়া উঠিল, বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর তাহার সব উদ্বেগ এক নিশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল,—'ব্যোমকেশবাবু, আমার স্বামীকে রক্ষে করুন। তাঁর বড় বিপদ।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া সোফায় বসিল, ইন্দিরাকে পাশে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল,—'বোসো। কি বিপদ তোমার স্বামীর আমাকে বলো।'

ইন্দিরা তেরছাভাবে সোফার কিনারায় বসিল, শীর্ণ সংহত স্বরে বলিল,—'আমি—আমি সবকথা গুছিয়ে

বলতে পারব না। আপনি যদি সাহায্য করেন, উনি নিজেই বলবেন।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,— 'খনি সম্বন্ধে কোনো কথা কি?'

ইন্দিরা বলিল,— 'না অন্য কথা। আপনারা বাবাকে যেন কিছু বলবেন না। বাবা কিছু জানেন না।'

ব্যোমকেশ শান্ত আশ্বাসের সুরে বলিল,—'আমি কাউকে কিছু বলব না, তুমি ভয় পেও না।'

'ওঁকে সাহায্য করবেন?'

'কি হয়েছে কিছুই জানি না। তবু তোমার স্বামী যদি নির্দোষ হন নিশ্চয় সাহায্য করব।'

'আমার স্বামী নির্দোষ।'

'তবে নির্ভয়ে থাকো।'

।। গ ।।

বাড়ির পাশের দিকে বাগানের কিনারায় একসারি ঘর। ইন্দিরার মুখে হাসি ফুটিবার পর আমরা সিগারেট টানিতে টানিতে সেইদিকে গেলাম।

সামনের ঘর হইতে একটি মধ্য-বয়স্ক ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। পরিধানে ফরাসডাঙ্গার ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি, ফিট্‌ফাট্ চেহারা। চুলে নিশ্চয় কলপ লাগাইয়া থাকেন, কারণ চুলের নীচে শ্বেতবর্ণ অঙ্কুর মাথা তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমার নাম গগন মিত্র, ইনি সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। মণীশবাবুর অতিথি।'

ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমাদের সংবর্ধনা করিলেন,—'আসুন আসুন। আপনারা আসবেন কর্তার মুখে শুনেছিলাম। আমি সুরপতি ঘটক, এই অফিসের দেখাশোনা করি।'

সুরপতিবাবু আমাদের প্রকৃত নাম জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল,—'এটা বুঝি কয়লা খনির অফিস। আপনি অফিস-মাষ্টার।'

সুরপতিবাবু বলিলেন,— 'আজ্ঞে। কয়লা খনিতে একটা ছোট অফিস আছে, এটা বড় অফিস। আসুন না দেখবেন।'

ঘরগুলি একে একে দেখিলাম। বিভিন্ন ঘরে কেরানীরা খাতাপত্র লইয়া কাজ করিতেছে, টাইপরাইটারের খটাখট শব্দ হইতেছে, দর্শনীয় কিছু নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে আমরা সুরপতি-বাবুর অফিসে বসিলাম।

সাধারণভাবে কিছুক্ষণ বাক্যালাপ চালাইবার পর ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—'আপনাকে বলি, আমরা দুই বন্ধু মিলে একটা ছোটখাটো কয়লা খনি কেনবার মতলব করেছি। এখানে নয়, অন্য জেলায়। সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কি করে কয়লা খনি চালাতে হয় আমরা কিছুই জানি না; তাই মণীশবাবুর খনি দেখতে এসেছি। অফিসের কাজ, খনির কাজ, সব বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই।'

সুরপতিবাবু মহা উৎসাহে বলিলেন, —'নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ আর বেশী কথা কি? অফিসের কাজ দুদিনে শিখে যাবেন; আর খনির কাজও এমন কিছু শক্ত নয়। তাছাড়া যদি দরকার হয় আমি আপনাকে খুব ভাল লোক দিতে পারি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—কি রকম লোক?

সুরপতিবাবু বলিলেন, 'অফিসের কাজ জানে, কোলিয়ারির কাজ জানে এমন লোক। আমার নিজের হাতে তৈরি করা লোক।'

ব্যোমকেশ আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, —'তাই নাকি! তা কাজ-জানা ভাল লোক পেলে আমরা নেব। এ বিষয়ে আবার আপনার সঙ্গে কথা হবে। অফিসের কাজকর্ম দেখব। আমরা এখন কিছুদিন আছি।'

অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

বারোটার সময় ফণীশ ও মণীশ-বাবু খনি হইতে ফিরিলেন। স্নানাহার

কালবৈশাখী— ফটো : শ্রীশ্যামল বসু

সারিতে একটা বাজিয়া গেল। তারপর খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা চারজন মোটরে চড়িয়া কয়লা খনিতে চলিলাম।

।। ঘ ।।

মস্ত বড় মোটর। ফণীশ চালাইয়া লইয়া চলিল, আমরা তিনজন পিছনে বসিলাম।

মোটর শহর ছাড়াইয়া নির্জন রাস্তা ধরিল। মাইল তিনেক দূরে কয়লা খনি।

ব্যোমকেশ বলিল,—'সকালে সুরপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। উনি কতদিন আপনার কাজ করছেন?'

মণীশবাবু বলিলেন,—'প্রায় কুড়ি বছর। পাকা লোক।'

ব্যোমকেশ কহিল,—'ওঁকে বলেছি আমরা একটা কয়লা খনি কিনব। তাই খোঁজ-খবর নিতে এসেছি। আমাদের সত্যিকার পরিচয় দিইনি।'

মণীশবাবু বলিলেন,—'ভালই করেছেন। সুরপতি অবশ্য বিশ্বাসী লোক, দেশের মধ্যে বছর দুই আগে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে।'

সুরপতিবাবুর চুলের কলপ এবং শৌখীন জামা-কাপড়ের অর্থ পাওয়া গেল। প্রৌঢ় বয়সে তরুণী ভার্যার চোখে যৌবনের বিভ্রম সৃষ্টি করার চেষ্টা স্বাভাবিক।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'সম্প্রতি কেউ আপনার খনি কেনবার প্রস্তাব করেছিল?'

মণীশবাবু বলিলেন,—'সম্প্রতি নয়, কয়েক বছর আগে। একজন মাড়োয়ারী। ওরা দর দিতে চেয়েছিল, আমি বেচিনি।'

ব্যোমকেশ দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল,—'এখানে অন্য যে সব খনির মালিক আছেন তাঁদের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব আছে?'

মণীশবাবু বলিলেন,—'গাঢ় প্রণয় আছে এমন কথা বলতে পারি না, তবে মুখোমুখি ঝগড়া কারুর সঙ্গে নেই।'

'এমন কেউ আছেন যিনি বাইরে ভদ্রতার মুখোশ পরে ভিতরে ভিতরে আপনার অনিষ্ট চিন্তা করছেন?'

'থাকতে পারে, কিন্তু তাকে চিনব কি করে?'

'তা বটে। —কাল রাত্রে যিনি এসেছিলেন—গোবিন্দ হালদার—তিনি কি রকম লোক?'

মণীশবাবু চিন্তা-মন্থর কণ্ঠে বলিলেন,—'গোবিন্দ হালদারকে চেনা শক্ত। পাকাল মাছের মত চরিত্র, ধরা-ছোঁয়া যায় না। তবে গোবিন্দবাবুর ছোট ভাই এবং অংশীদার অরবিন্দ অতি বদ্ লোক। মাতাল, জুয়াড়ী, দুশ্চরিত্র। বছর কয়েক আগে স্ত্রীটা আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে। তারপর থেকে অরবিন্দ একেবারে নামকাটা সেপাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

আর কোনও কথা হইল না, আমরা কয়লা খনির এলাকায় প্রবেশ করিলাম।

কয়লা খনির বিস্তারিত বর্ণনা দিবার ইচ্ছা নাই। যাঁহারা স্বচক্ষে কয়লা খনি দেখেন নাই তাঁহারা নিশ্চয় রঙ্গমঞ্চে বা চিত্রপটে দেখিয়াছেন, এমন কিছু নয়নাভিরাম দৃশ্য নয়। বিশেষতঃ এই কাহিনীতে কয়লা খনির স্থান খুবই অল্প; কয়লা খনিকে এই কাহিনীর কালো পশ্চাৎপট বলাই সঙ্গত। পশ্চাৎপট না থাকিলে কাহিনী উলঙ্গ হইয়া পড়ে, তাই রাখিতে হইয়াছে।

কয়লা! যাহার জোরে যন্ত্র চলিতেছে তাহাকে যন্ত্রের সহায্যে মৃত্তিকার গভীর গর্ভ হইতে টানিয়া আনা হইতেছে; সভ্যতার চাকা ঘুরিতেছে। নমো যন্ত্র। তব খনি-খনিত্র নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র! নমো যন্ত্র। অলমিতি।

খনির ম্যানেজার তারাপদবাবুর সঙ্গে পরিচয় হইল। বয়স্ক লোক, খনির সীমানার মধ্যে তাঁহার বাসস্থান; রাশভারী জবরদস্ত লোক বলিয়া মনে হয়। তিনি আমাদের লইয়া খনির বিভিন্ন অংশের কার্যকলাপ দেখাইলেন। খনির গর্ভে অবতরণ করিবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা রাজী হইলাম না। সীতা পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল; আমাদের সেরূপ কোনও কারণ নাই।

অপরাহ্নে আমরা তারাপদবাবুর অফিসে চা খাইলাম। সেখানে খনির ডাক্তার যতীন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য উচ্চ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হইল। কাজের কথা কিছু হইল না, সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য আমরা ছদ্মনামেই রহিলাম। এক সময় লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশ ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে বেশ ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে, ঘরের এক কোণে বসিয়া নিবিষ্ট মনে তাঁহার সহিত গল্প করিতেছে। ডাক্তার ঘোষ আমাদের সমবয়স্ক, তিনিও খনিতেই ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল লইয়া থাকেন। তাঁহার কোট-প্যান্টলুন-পরা চেহারায় জীবন-ক্লান্তির একটু আভাস পাওয়া যায়।

তারপর সন্ধ্যা হইলে আমরা আবার মোটরে চড়িয়া বাড়ির দিকে যাত্রা করিলাম।

।। ঙ ।।

রাত্রে আহারাদির পর মণীশবাবু উপরে শয়ন করিতে গেলেন, আমরা নিজের ঘরে আসিলাম। ফণীশ আমাদের সঙ্গে আসিল।

ব্যোমকেশ পাখা চালাইয়া দিয়া নিজের শয্যায় লম্বা হইল, সিগারেট ধরাইয়া ফণীশকে বলিল,—'বোসো। কী কাণ্ড বাধিয়েছ? বৌমাকে এত উদ্বিগ্ন করে তুলেছ কেন?'

ফণীশ চেয়ারে বসিয়া হাত কচলাইতে লাগিল, তারপর কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—'ইন্দিরাকে রাজী করিয়েছিলাম আপনাকে বলতে, নিজে বলতে সাহস হয়নি—'

'কিন্তু কথাটা কী? তোমাদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে ভারি গুরুতর ব্যাপার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুতর ব্যাপার। একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছি ঘটনাচক্রে। বাবা যদি জানতে পারেন—'

ব্যোমকেশ বিছানায় উঠিয়া বসিল,—'খুনের মামলা!'

[ক্রমশঃ]
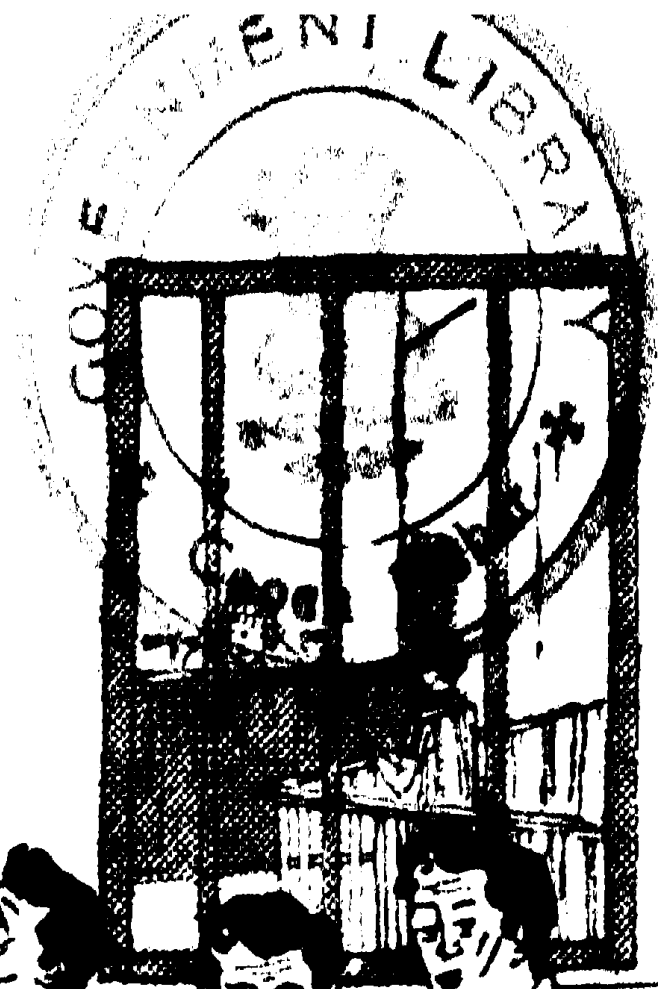
গেল আর ফিরে এল।

হাকিম তাকালেন ঘড়ির দিকে। মোটে বারো মিনিট নিয়েছে। মোটে বারো মিনিটেই বিচার-বিবেচনা শেষ।

কী সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে জিজ্ঞেস করতে হবে না। সিদ্ধান্ত জলের মত পরিষ্কার। আর কিছু নয়, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবার মতলোব।

কাঠগড়ায় আসামীও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে। পারলে ও-ও ছুট দেয় বাড়ির দিকে।

'আপনারা একমত?' ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করলেন হাকিম।

ফোরম্যান বললে, 'না। আমরা ডিভাইডেড। তিন আর দুই। তিন—'

'থাক। মেজরিটি ভার্ডিক্ট বলতে হবে না।' হাকিম হাত তুলে বাধা দিলেন। বললেন, 'আপনারা আবার ফিরে যান দয়া করে। দেখুন সকলে একমত হতে পারেন কিনা। চেষ্টা করুন একমত হতে।'

জুরি পাঁচজন আবার ফিরে গেল।

ঘরে গিয়ে ঢুকতেই বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল চাপরাশি।

একটা টেবিল ঘিরে পাঁচখানা চেয়ারে বসল পাঁচজন।

'ফাস্ট ট্রেনটা আর ধরা গেল না।' কমল দাস বললে বিরক্তমুখে। 'পাঁচ-দিন দোকান-ছাড়া।'

'আমার তো আবার ট্রেনের পরে নৌকো।' বললে দ্বিজপদ। 'নৌকো ভাড়া যে কত পাওয়া যাবে হদিস করতে পারছি না। আগে তো ফুড এলাউয়েন্স হাফ-ডে করেছিলাম, এখন, দেরি হবে যখন, ফুল-ডে পাওয়া যাবে। এই যা লাভ। আইটেম ধরে বিল ঠিক করে নিতে কত টাইম লেগে যাবে তার ঠিক কী।' হাতে-ধরা বিলের হিসেবের দিকে সূক্ষ্ম চোখে আবার তাকাল দ্বিজপদ।

'ট্রেন আর নৌকো!' ফোরম্যান সুবোধ দত্ত হুমকে উঠল। 'একটা

চারজুরি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

লোকের জীবন-মরণ নিয়ে কথা। সেদিক না ভেবে যত ট্রেন আর নৌকোভাড়ার কথা ভাবছেন!'

'জীবন মরণ নিয়ে কথা কোথায়? খুন তো হয়নি কেউ। ফাঁসি তো দিতে পারছেন না।' বললে চতুর্থ জন, সাতকড়ি সরদার।

'আহা, জেল নয় খালাস এই-ই তো জীবন-মরণ।' বললে সুবোধ। 'একটা লোকের স্বাধীনতা চলে যাওয়া তো তার মৃত্যুর সামিল।'

'তা লোকটা যখন ডাকাতি করেছে তখন জেলে যাবে।' সাতকড়ি বললে নিষ্পৃহের মত। 'তাতে অত কী কথাবার্তা!'

'ডাকাতি করেছে?' সুবোধ ফোঁস করে উঠল। 'এক কথায় সাব্যস্ত করবেন? সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বলবেন তো!'

'আপনি মাস্টার মানুষ, আপনি বিশ্লেষণ করুন।' কমল টিপ্পনী কাড়ল। 'আমাদের অত সময় নেই। পাঁচদিন কাজকর্ম বন্ধ। তাহা লোকসান।'

'কাজকর্ম বন্ধ হলে করা যাবে কী!' সুবোধ আচার্যের মত বললে, 'এখানে কত বড় মহৎ কাজ করছেন, পবিত্র কাজ—সত্যসন্ধান!'

'আমরা খাদ্যসন্ধানে বুঝি মশাই!' কমল মুখিয়ে উঠল। 'বিলে যা মিলবে তা নিতান্ত নগণ্য। তাতে আবার আমলা-চাপরাশি ভাগ বসাবে। মহৎ কাজ তো কত!'

দ্বিজপদ হঠাৎ বলে উঠল আপন মনে, 'চণ্ডীতলা থেকে হুনেয়গঞ্জ ক মাইল?'

'কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত করবেন তো?' কমলের দিকে তাকাল ফোরম্যান।

'আমার মতে মশাই আসামী ডাকাত।' কমল বললে সরাসরি।

'ডাকাত?'

'হ্যাঁ, চেহারাটা দেখেছেন? চোখ-দুটো?' প্রায় আঁতকে উঠল কমল। 'ও-রকম চোখওয়ালা লোক ডাকাত না হয়ে যায় না।'

'লোকটার চেহারা খারাপ সেই কারণে তাকে দোষী বলতে হবে?' সুবোধ দত্ত, ফোরম্যান, ছটফট করে উঠল। 'এ একটা যুক্তি হল?'

'দোষী বা নির্দোষী একটা কিছু বলতে হবে তো?' সাতকড়ি এগিয়ে এল। 'আমরা আগেও বলেছি এখনো বলছি, দোষী।'

'তা যুক্তি দেখান।' সুবোধ টেবিলে চড় মারল।

'জুরিদের যুক্তি দেখাতে হয় না, তাদের কোনো দায়িত্ব নেই।' বললে সাতকড়ি, 'এই তো একমাত্র আরাম। যা মতলোবে এল তাই বলে দেওয়া।'

'এখন আপনার মতলোবে কি আসছে?'

'বলেছি তো। দোষী।'

'কেন, মতলোবটা এ রকম হল কেন?' সুবোধ প্রায় মাস্টারের মতই প্রশ্ন করলে।

'মশাই, আমি নোটিশ-পাওয়া জুরি নই।' বললে সাতকড়ি, 'কোর্টের বারান্দায় ঘুরছিলাম, জুরির শর্ট দেখে পেস্কার ছুটে এসে আমাকে ধরলে, সামিল করে নিলে। কি জুলুম বলুন তো?'

'আপনি রাজি হলেন কেন?'

'রাজি হলুম কেন? সত্যি কথা বলতে, রাজি হলুম', সাতকড়ি গলা নামাল, 'লোকটার পক্ষে কিছু তদবির হবে এই আশায়। তা এই পাঁচ-পাঁচ দিন এখানে ঘোরাফেরা করছি, তাকাচ্ছি ইতি-উতি, তা মশাই, তদবিরের নাম-গন্ধ নেই।'

'তাই বলে লোকটা দোষী হবে?' সুবোধ অসহিষ্ণুর ভাব করল।

কী বলে হবে জানি না। আমার মতটা লিখে নিন—দোষী।'

'আমারও সেই মত।' নড়ে-চড়ে উঠল কমল দাস। 'পাঁচ-পাঁচদিন দোকান বন্ধ।'

'আপনি কি বলেন?' জীবন লস্কর এতক্ষণ চুপচাপ ছিল তার দিকে তাকাল সুবোধ।

জীবন হাই তুলল। বললে, 'মশাই, আমি কিছু শুনি নি।'

'শোনেন নি তো কী করেছেন?'

'ঘুমিয়েছি। স্রেফ ঘুমিয়েছি।'

'তা একটা মত তো দেবেন। কেসটা তা হলে শুনুন। বলছি ছোট করে। দেখুন ভেবে-চিন্তে—'

'রক্ষে করুন। বাকি ঘুমটুকু মাটি করে দেবেন না।' আবার হাই তুলল জীবন। 'জীবনে আর কোনো শান্তি নেই। শুধু এই ঘুমটুকু যা আছে।'

'তা হলে আপনাদের মত কী?' ঝাঁজিয়ে উঠল সুবোধ দত্ত।

'আপনি যা বলবেন তাতেই আমার ভিটো।'

'আমি যদি বলি নির্দোষ?'

'তা হলে আমিও তাই।'

'কী মুস্কিল, ইউনেনিমাস হতে হবে যে।'

'পরের ট্রেনটাও গেল।' কমল উত্তেজিত হয়ে বললে, 'ইউনেনিমাস হতে হবে তো লটারি করুন।'

'লটারি? সে আবার কী! ডিসকাশন করে দেখুন না ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়ায়।' সুবোধ মিনতির সুর আনল।

'হ্যাঁ, দেখুন না।' বিলের হিসেবের থেকে মুখ তুলল দ্বিজপদ। 'পাঁচজন ডাকাতি করল, চালান হল একজন। শুধু এই আসামী, মাখনলাল। এর কখনো মানে হয়? আর বাকি চারজন কোথায়?'

'হ্যাঁ, এ একটা চিন্তার কথা।' সায় দিল সুবোধ।

'আপনি চিন্তা করুন।' ঝলসে উঠল কমল দাস। 'আর বাকি চারজন এখানে-ওখানে পালিয়েছে, ধরা পড়েনি। একজন পড়েছে, তাই তাকেই এনেছে বেঁধে। সহরে কোঠা-বাড়ীতে থাকেন কিনা, আমাদের মত তো গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দে নন', সুবোধের প্রতি কটাক্ষ করল কমল, 'চোর-ডাকাতের যন্ত্রণা আপনি কি বুঝবেন? একজন ধরা পড়েছে, একজনকেই ঠুকতে হবে।'

'কিন্তু ওই যে ডাকাত তার কী প্রমাণ?' সুবোধ তাকাল কমলের দিকে। 'চোখ বড় করবেননা। একটা লোকের চোখ দুটো জ্বল-জ্বলে বা ড্যাবডেবে তার জন্যেই সে ডাকাত বলে সাব্যস্ত হবে এ অমানুষের যুক্তি।'

'আপনি অমানুষ।' কমল প্রায় আস্তিন গুটোল। 'আমরা আপনার ছাত্র নই। বলছি দোষী, ব্যস, তাই যথেষ্ট। পাঁচ-পাঁচ দিন মশাই আমার দোকান বন্ধ। তার উপর দেখুন, ফার্স্ট ট্রেনটা ধরতে দিল না।'

'তা-ছাড়া একদিন একটু তদবিরের ব্যবস্থা করল না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাতকড়ি। 'এদিকে উকিল, তো লাগিয়েছে দেখছি। খুব লম্বাই-চওড়াই হাঁকছে। কিন্তু ওর মুহুরি নেই? মুহুরি নেই তহুরি নেই, খালাসও নেই। নিশ্চয়ই দোষী, একশো বার দোষী—'

'আহাহা যুক্তির কথা বলুন না।' জীবন বলে উঠল।

'আপনি তো মশাই ঘুমিয়েছেন।'

'ঘুমই তো আসল যুক্তি।' হাসল জীবন।

'কিন্তু এখন তো আর আপনি ঘুমিয়ে নেই। এখন মাথাটা লাগান না। শুনুন—' সুবোধ উসখুস করে উঠল।

'তারপর আগে দেখুন না চণ্ডীতলা থেকে হৃদয়গঞ্জের ভাড়াটা কত হতে পারে।' দ্বিজপদ তাকাল জীবনের দিকে।

জীবন বললে, 'দাঁড়ান, আগে স্থল-পথ সারি, পরে জল পথ। হ্যাঁ' সুবোধকে লক্ষ্য করলে, 'বলুন ব্যাপারটা কী হল?'

'হ্যাঁ আগে দেখুন ডাকাতিটা হয়েছে কিনা।' সুবোধ উৎসাহিত হল। 'ডাকাতিই যদি প্রমাণ না হয় তা হলে তো মূলেই গেল। আর যদি বোঝেন ডাকাতিটা সত্যি হয়েছে, তখন প্রশ্ন জাগবে, সেইটেই আসল প্রশ্ন, এই আসামী মাখনলাল সেই ডাকাতিতে অংশ নিয়েছে কিনা—'

'আপনি বলছেন ডাকাতিটাই হয়নি?' জীবন এবার ঘুমে নয় বিস্ময়ে হ্যাঁ করল।

'আহা, আমার একার বলায় কী এসে যায়, আপনারা সকলে বলুন।'

'না, না, ডাকাতি হয়েছে বৈকি।' বললে দ্বিজপদ, 'ডাকাতি না হলে আমরা এলাম কেন? ডাকাতি না হলে তো নৌকো ভাড়া কিছুই হয় না।'

'বেশ, হল ডাকাতি। কিন্তু এখন, আসামী যে ডাকাত তার প্রমাণ কী?' সুবোধ মাস্টারের ভাব করল। 'সে তো আর হাতেনাতে ধরা পড়েনি।'

'তাকে চিনেছে।' গর্জন করে উঠল কমল। 'তাকে বাড়ির গিন্নি ক্ষেমদা চিনেছে।'

'হ্যাঁ, সেইটেই দেখুন।' হাতের পেন্সিলটা শূন্যে নাড়তে লাগল সুবোধ। 'কিসে চিনেছে? না, লণ্ঠনের আলোতে। এক সাক্ষী বলছে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুচ্ছিল; আরেকজন বলছে, লণ্ঠন নেবানো ছিল, ডাকাতরা এসে জ্বালিয়েছে। ডাকাতরা লণ্ঠন জ্বালাবে কিনা সেইটে বিবেচনা করুন। অতএব চেনাটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা—'

'কেন, ডাকাতদের কারু কারু হাতে টর্চ ছিল—' তড়পে উঠল সাতকড়ি।

'সেই টর্চ কি ডাকাতেরা পরস্পরের মুখের উপর ফেলবে যাতে ওদের চিনে নিতে সুবিধে হয়?' বিরক্ত হল সুবোধ। 'তা ছাড়া বাড়ির লোকেরা সাক্ষ্য দিয়েছে ডাকাতদের মুখে রঙ মাখা ছিল। রঙমাখা মুখ চেনা যায়?'

'কেন, গলার স্বর শুনে চিনেছে। আসামী তো প্রতিবেশী।' কমল সাতকড়ির সমর্থনে।

'হ্যাঁ, কিন্তু সেই চেনাতে কি ভুলের সম্ভাবনা নেই?'

'অনেক দিনের চেনা গলা না?' জীবন বললে, 'আসামীর সঙ্গে বাড়ির মেয়ে রানুবালার প্রণয় ছিল—'

'মশাই আপনি তো ঘুমুচ্ছিলেন' দ্বিজপদ ফোড়ন কাটল। 'প্রণয়ের কথা শুনলেন কী করে?'

'হ্যাঁ, ওইটুকু শুধু কানে ঢুকেছিল—' জীবন চোখ বুজল।

'তারপর চোরাই কখানা বাসন পাওয়া গেছে আসামীর বাড়িতে।' সাতকড়ি বললে।

'কিন্তু সে সব বাসনে নাম লেখা নেই, চিহ্ন নেই।' সুবোধ কাটান দিতে চাইল। 'অতি সাধারণ জিনিস। যে কোনো গৃহস্থের বাড়িই পাওয়া যেতে পারে।'

'ডাকাতি যদি না হবে তবে ডাকাতির পরের দিন আসামীকে পুলিশ বাড়িতে পায়নি কেন?' কমল দাস মুখিয়ে এল।

'তার তো ন্যায্য কারণও থাকতে পারে।' সুবোধ সাফাই দিল। 'বেশ তো, ধরুন পুলিশের ভয়েই পালিয়েছে। শুধু বাড়িতে পাওয়া যায়নি তারই জন্যে সে ডাকাত হবে? আসামী যে বলছে, সে গিয়েছিল পাশ গাঁয়ে বোনের বাড়ি, ভাগ্নের মুখেভাতে—'

'তার কোনো প্রমাণ আছে?'

'কোনো প্রমাণের ভারই আসামীর উপর নেই। আপনারা দেখুন—'

'আমরা দেখেছি। আসামীই ডাকাত।' সাতকড়ি গাঁট হয়ে বসল।

পাঁচ-পাঁচ দিন দোকান বন্ধ।' কমল সায় দিল। 'আলবৎ ডাকাত।'

'আমার মশাই ভিন্ন মত।' বললে সুবোধ, 'যা সব সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তা নিঃসন্দেহে দোষ প্রমাণ করে না।'

'আমি আপনার দিকে।' জীবন বললে। 'আপনি?' দ্বিজপদকে লক্ষ্য করল।

হিসেবের থেকে মুখ তুলল দ্বিজপদ। বললে, 'আমি বলি কি হুজুরকে গিয়ে বলুন, আপনিই স্যার বুঝে-সুঝে বিচার করে দিন। আমরা একটা নৌকো ভাড়ার বিল তৈরি করতে পারি না—'

'তা হলে একমত হওয়া যাচ্ছে না।' অসহায়ের মত মুখ করল সুবোধ।

'কি করে যাবে?' শাসানোর মত করে বললে সাতকড়ি।

'লটারি করুন।' কমল হুংকার ছাড়ল।

সুবোধ দেখল, বাকি সকলেই লটারির দিকে। একা সে কোন দিক সামলাবে? যাক গে মরুক গে, ঝামেলা মিটুক। হোক লটারি। লটারি করে জুরি, লটারি করে সিদ্ধান্ত।

ছোট একটা কাগজের টুকরোর এ-পিঠে লেখা হল, গিলটি, ও-পিঠে লেখা হল নট-গিলটি। ঘরের মধ্যে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হল।

'কি পড়ল?' উল্লসিত হয়ে উঠল সুবোধ। 'নট-গিলটি।'

'কই, কই, দেখুন ভালো করে।' আর সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'নট কথাটা আপনি বেশি পড়েছেন। আসলে দেখা যাচ্ছে গিলটি।'

তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে সুবোধ দেখল আশার আতিশয্যে নট কথাটা বেশী পড়ে ফেলেছে।

বসে পড়ল সুবোধ। মানুষে আবার কী বিচার করবে? দৈবই বিচারক।

'আপনারা একমত?' হাকিম প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী আপনাদের সিদ্ধান্ত?'

'গিলটি।'

সমস্ত কক্ষ স্তব্ধ হয়ে রইল। তা আর কি করা! জুরির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে উপায় কি।

জুরির দল বেরিয়ে যাচ্ছে কোর্ট থেকে, সুবোধ আসামীকে লক্ষ্য করে নিচু গলায় বললে, 'কী করব বল। তোর অদৃষ্ট মন্দ। লটারিতে গিলটি উঠল।'

'স্যার', মাখনলাল চিৎকার করে উঠল, 'স্যার, ওরা লটারি করেছে। ওরা—'

হাকিম শুনেও শুনলেন না। শুনেই বা কি করবেন? রায় পাশ হয়ে গিয়েছে। চার বছর সশ্রম জেল হয়েছে মাখনলালের।

'স্যার।' অসহায় কণ্ঠে আরেকবার চেঁচাল মাখনলাল।

কেউ গ্রাহ্য করল না। যে যার কাজে উঠে চলে গেল। শুধু আদালত কক্ষের অশরীরী প্রেতাত্মা শূন্য স্বরে বলে উঠল, সবই লটারি। স্পিন অফ দি কয়েন।
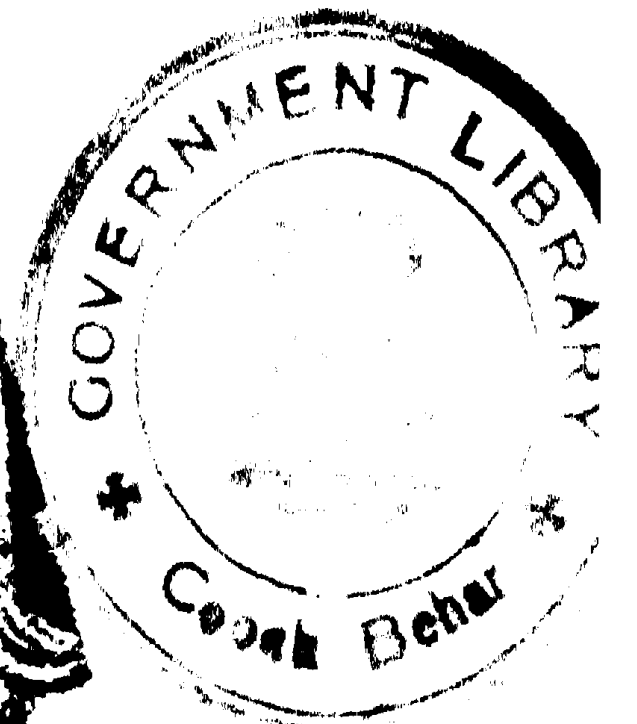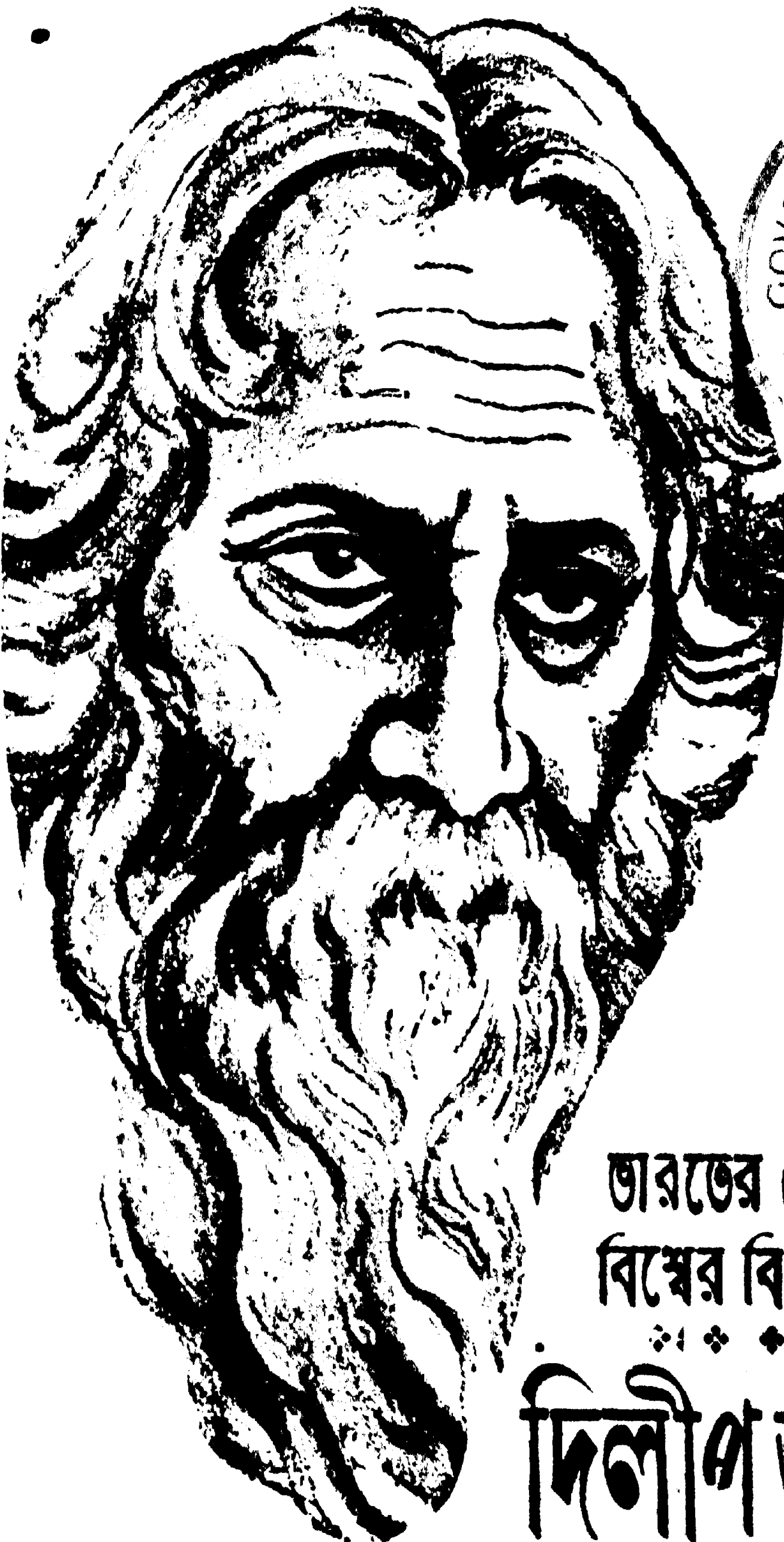
উঃ ভুঃ ফুঃ

কাজল সেন

আমি এক বিশিষ্ট অভাজন।

কিন্তু জগৎ ও জীবন-বিষয়ক যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর একমাত্র আমারই জানা আছে।

খবরের কাগজ খুলুন, দেখবেন আগাগোড়া শুধু সার্থকতার আস্ফালন আর অক্রমের রোষ। অথচ সাতদিন পরে সেই কাগজের পরিণাম ঠোঙায় রূপান্তরিত হওয়া। শাস্ত্র পড়ুন, সাহিত্য পড়ুন—দেখবেন সেখানেও মানুষ এক অনির্দিষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিকার। প্রতি মুহূর্তে সকলে ছুটছে—হয়তো লক্ষ্যও ঠিক নেই—শুধু জানা আছে, তাকে 'করতে হবে'।

অথচ আমি বুঝেছি 'কিছু না করাই' সব থেকে বড় কাজ। সার্থক মানুষ তার সফলতার বিনিময়ে খ্যাতি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্থিতি, শান্তি ইত্যাদি যা চায়—যার জন্য তার এত শ্রম, এত লাফালাফি—তার সবকিছুই আপনার আয়ত্তে আসবে, যখন আপনি ফাঁকি দেওয়ার মহৎ আর্টটি রপ্ত করবেন।

আমার বিস্ময়কর আবিষ্কারটির উৎস হলেন হরিদাসদা। দাদা আমার একেবারে ভোলানাথ। আত্মীয়, বন্ধু, পড়শী—প্রত্যেকের মুখে দাদার মুগ্ধ প্রশংসা শুনেছি। অথচ তাঁদের কাছেই জেনেছি হরিদাসদা একেবারে ভোলানাথ, নিজের হাতে জলটুকুও গড়িয়ে খেতে জানেন না।

আমি নেহাতই ধর্মভীরু ব্যক্তি। তদুপরি দাদা আমার মনে ধর্মোন্মাদনা নতুন করে জাগালেন। সত্যিই তো। দেবাদিদেব যিনি, তিনি কি করেন? নিছক ধুম্র-সেবন এবং ধ্যানস্থ হয়ে থাকা ছাড়া আর কি তাঁর কাজ? ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বড়-মেজো-সেজো দেবতাদের কিছু-না-কিছু কাজ নির্দিষ্ট আছে। এমনকি অশ্বিনীকুমারদ্বয়—তাঁরাও নিষ্কর্মা নন। অথচ এঁরা সকলেই হয় পদ্মশ্রী, নয় পদ্মভূষণ। আর ভারতরত্নটি হলেন সেই দেবতা—কোন গুণ নাই যার কপালে আগুন।

হরিদাসদার জীবন ও আমাদের শাস্ত্র-পুরাণাদি চর্চা করে অতঃপর নিজের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সম্পর্কে আমার মনে আর অনুমাত্র সন্দেহ রইল না। দীর্ঘকাল তা প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছি, একথা বলাই বাহুল্য।

আমার এই তত্ত্বকে গণিতের সূত্রে বাঁধলে যা দাঁড়ায় তা হল এই—

$$\frac{\text{উঃ + ভুঃ}}{\text{ফুঃ}} = \text{হে' হে' হে'}$$

উঃ মানে উৎসাহ। যোগ দিন ভুঃ, যার অর্থ ভুয়োদর্শন বা সহজ জ্ঞান। তাকে সর্বদা ভাগ দিন ফুঃ অর্থাৎ আলস্য বা কাজ-না-করা দিয়ে। তাহলেই আপনি সফল ব্যক্তি, আপনার অস্তিত্বই তখন হতে হে' হে' হে'।

নিজের ঘর দিয়েই পরীক্ষা শুরু করা ভালো। তাতে ঝুঁকি কম।

মনে করুন বালক-বয়সে মা বললেন, খোকন, শিগ্গির এই কাপ-ডিশগুলো সাবান জলে ধুয়ে দে তো। আমি চট্ করে চাটা বানিয়ে ফেলি। তোর বাবা সেই থেকে বসে আছেন। আপনি সবই পরিপাটি করে ধুলেন। শুধু মার সব থেকে প্রিয় নক্সা-করা ডিশটা হাত ফস্কে ভেঙে ফেললেন। মা আফসোস করলেন, আবার আপনাকে এবম্বিধ ফরমায়েশ করার জন্য নিজের মনে অনুতপ্তও হলেন তার থেকে বেশি।

তারপর মনে করুন বড় বয়েসে গৃহিণী বাজারের ফর্দ দিয়ে থলে হাতে আপনাকে ঘুম থেকে তুলে বাজার করতে পাঠালেন। আপনি তখন কী করলেন? বিশেষ কিছুই নয়। শুধু যেতে যেতে বেমালুম ফর্দ হারিয়ে ফেলে অসম্ভব সব জিনিসপত্র খরিদ করে দিগ্বিজয়ী ও নিষ্পাপ মুখে বাড়ি ফিরে ভদ্রমহিলাকে হতবাক্ করে দিলেন। সেইদিনই বিকেলে আপনি নিশ্চিত
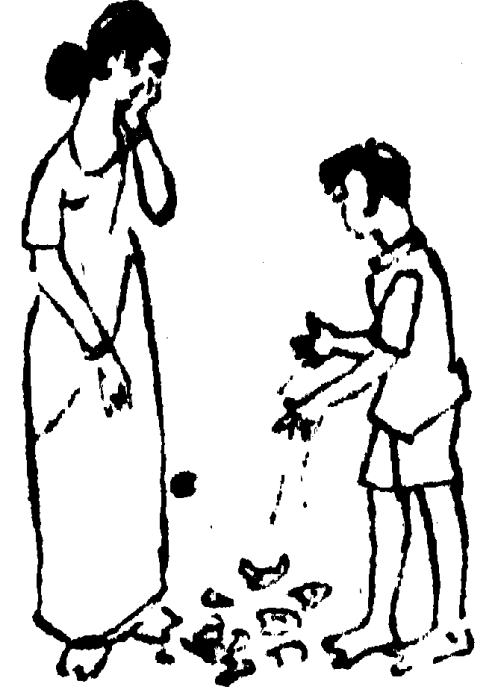
শুনিবেন অর্ধাঙ্গিনী এজমালি চৌবাচ্চায় গা ধুতে ধুতে পাশের ঘরের গৃহিণীকে খুশি-খুশি গলায় বলছেন, আমাদের ওঁকে নিয়ে ভাই আর পারিনে। আজ বাজারে পাঠিয়ে কি না ঝকমারী। একেবারে সন্ন্যিসী।

উত্তরে তাঁর সখী বলছেন, তুমি ভাই কি কপালই করেছ। আমাদের উনিটি তো আবার পান থেকে চুন খসলে—ইত্যাদি।

সুতরাং গৃহ এবং প্রতিবেশীর চোখে এইভাবে ক্রমশ আপনি আত্মভোলা,

সদাশয় ও প্রবীণরূপে চিহ্নিত হয়ে গেলেন।

এরপর আপনার অফিস। ঠিক টিফিন টাইমে পরপর কদিন আপনার কয়েকটা জরুরী ফাইলের কথা মনে পড়ে যাবে। এতক্ষণ যে সব সহকর্মীদের সংগে আড্ডা দিয়েছেন—কিছুতেই তাঁদের সংগে চা খেতে যেতে পারবেন না। অতএব আপনার 'বস্' পরপর কদিন আপনাকে টিফিনের সময় কাজ করতে দেখবেনই। এবং তিনি তো শক্ত হলেও মানুষ। আপনার কাজের চাপ কমবে আর শিগ্‌গির বিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন পদোন্নতিও ঘটছে।

●

আপনার পদোন্নতির সুযোগ করে দিয়ে যে নিশিকান্তবাবু রিটায়ার করলেন, সেই নিশিকান্তবাবুর বিদায় সম্বর্ধনার জন্য আপনিই একটা ফেয়ারওয়েল খোলার ফাণ্ড প্রস্তাব দিলেন এবং সংগে সংগে লজ্জিতভাবে বললেন, অবশ্য এ দায়িত্ব অন্য কাউকে নিতে হবে। আপনার অভিজ্ঞতা নেই। আপনি নিজের চাঁদাটুকু সব আগে দিয়ে কাজ শুরু করাতে চান।

●

তারপর আপনি পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে মৃদু হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভেবেছিলুম এ-মাসে গিন্নির আংটিটা ছাড়িয়ে দেব। সামনের তিন তারিখে বন্ধকী কলটা তামাদি হয়ে যাবে। কিন্তু যাক্, কপালে থাকলে হবে, না হয় হবে না। তবু আগে আমাদের কর্তব্য। এতদিন পাশাপাশি বসে কাজ করেছি, আজ নিশিদা—আপনি কথা শেষ করতে পারবেন না। আর চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। অন্ততঃ দশজন কেরানী বলবেন, কাজ সমস্ত তাঁরাই করবেন তবে যাবতীয় দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকে। আর প্রত্যেকে বলবেন, চাঁদা আপনাকে এবার দিতে হবে না। তাঁরাই দু-চারজন আপনার হয়ে বেশি দেবেন। আসলে হৃদয় আর ঐক্যই তো সব। ইত্যাদি।

অতএব অফিসেও আপনি হৃদয়বান এবং পরহিতব্রতী বলে পরিচিত হবেন। এবং নিশিকান্তবাবুর ফেয়ারওয়েল সভার নিছক বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই আপনাকে করতে হবে না। এদিকে আপনার অসামান্য সংগঠনী শক্তি ও কর্মীদের সকলের প্রতি আপনার মহানুভব সহমর্মিতার জন্য প্রত্যেক বক্তা আপনার সম্পর্কে বলবে দশ মিনিট এবং নিশিকান্তবাবু সম্পর্কে তিন মিনিট। আপনি অফিসের নেতা হয়ে যাবেন।

এইভাবে পাড়ার বারোয়ারী পুজোর, কমিটি, কর্পোরেশন এবং অ্যাসেম্বলির দরজাও আপনার সামনে খুলতে থাকবে। কারণ দেশনেতারা ইতোমধ্যে খবর পেয়ে যাবেন আপনি ত্যাগী, আপনি প্রাজ্ঞ, আপনি ভোলানাথ।

তারপর একদিন আপনি আবিষ্কার করবেন আপনি কিছুই চান নি, কিছুই করেননি, অথচ সারাদেশে আপনার ইস্পাত, তাম্র বা রজত-জয়ন্তী হচ্ছে এবং বিশাল ও রাজসিক মণ্ডপে হাজার হাজার জনতার মুগ্ধ চোখের সামনে অগণিত ভক্তিমান ও ভক্তিমতী পরিবৃত হয়ে মাইকে আপনি বলছেন : হেঁ হেঁ হেঁ, যার বীজমন্ত্র হল উঃ ভুঃ ফুঃ!

শিল্পী : শ্রীচন্ডী লাহিড়ী

বিবাগী ভ্রমর

হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলুম অনেক দূরে। বোধ হয় কলকাতার এলাকার বাইরেই এসে পড়েছিলুম।

কিছুক্ষণ আগে বেবি-ট্যাক্সিখানা ছেড়ে দিয়ে ভুল করলুম কিনা কে জানে। চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্র দপদপ করছিল চারদিকের মাঠ-ময়দানে। ট্যাক্সিওয়ালা বোধ করি আমার মুখে-চোখে কতকটা উদ্বেগের ছায়া দেখে থাকবে। এমন বেপোট অঞ্চলে মেয়ে-ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিব্রত হতে পারি, এটি সে অনুমান করেছিল। এসব অঞ্চলে আমার আনাগোনাও ছিল না।

লোকটা বলল, আপনারা আবার ফিরবেন ত? এদিকে কোথাও ট্যাক্সি পাওয়া যায় না, স্যার। তবে হ্যাঁ, প্রাইভেট বাস আছে। যদি গাড়ি রাখতে হয় বলুন, ওয়েটিং চার্জ না হয় নাই দেবেন! সঙ্গে মহিলা রয়েছেন,—অসুবিধে হতে পারে—

রুমালে ঘাম মুছে আমি হেনার দিকে তাকালুম। ফিস ফিস করে সে বলল, এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে পারিনে,—যা হয় কর।

লোকটা পুনরায় বলল, যদি তাড়া-তাড়ি ফেরেন তা হলে গাড়ি রেখে দিই। এখন বেলা দুটো বাজে, তিনটের মধ্যে ফিরবেন কি?

হেনা ফস করে পিঠের দিকের আঁচলটা মাথার উপর একটু টেনে দিয়ে বলল, কখন আমরা ফিরব ঠিক নেই, ওকে যেতেই বলে দাও।

আমি অনেকটা দোটানায় পড়েছিলুম বৈকি। কারণ এই চৈত্রের রোদে ঠিক কোথায় এবং কতদূরে যাচ্ছি নিজেও স্পষ্ট জানতুম না। হেনার কথাই ঠিক, আমাদের ফিরবার সময় অনিশ্চিত। সুতরাং বলতেই হল, কিছু মনে করবেন না, গাড়ি আমরা ছেড়েই দিচ্ছি।

আচ্ছা স্যার—

ভাড়া বুঝে নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা চলে গেল, এবং আমাদের জন্য ধুলো উড়িয়ে রেখে গেল রৌদ্রদগ্ধ নিঃঝুম প্রান্তর,—যার দূর প্রান্তে নতুন একটা কলোনির এক আধখানা ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে।

হেনা বলল, কিচ্ছু মনে নেই তোমার! বিলেত গিয়ে তোমার মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছে। বছর চারেক আগে এদিকে সেই যে আমরা পিকনিক করতে এসেছিলুম—তোমরা সেই বিলের ধারে ছিপ নৌকো নিয়ে হুটোপাটি করলে! আমি কাদায় পড়ে গেলুম! নবেন্দুর মনিব্যাগ হারাল! সেই যে—

চারিদিক চেয়ে বললুম, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু বদলে গেছে সব। এখন যাবে কোন্‌দিকে বল—বড্ড রোদ্দুর—

হোক না রোদ্দুর। এ তোমার বিলেত নয়। —হেনা বলল, ওই যে দূরে গাছটা দেখছ,—ওইখানে গিয়ে দাঁড়াব চল।

মুখ ফিরিয়ে বললুম, তুমি হঠাৎ ঘোমটা দিলে কেন? আমার গা ছমছম করে বাপু, ঘোমটা সরাও।

ঘোমটা সরিয়ে হাসিমুখে হেনা বলল, ট্যাক্সিওলার জন্যে দিয়েছিলুম, ও না কিছু ভেবে বসে।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে চলে গেলুম অনেক দূর। এক সময় বললুম, বড্ড অস্থির তুমি। এতদূর না এলে কী হত? দুটো কথা বলবার জন্যে একেবারে কলকাতার বাইরে এলে? দাও, হ্যাণ্ডব্যাগটা আমার হাতে দাও। তোমার উত্তেজনা একটু বেশি।

হেনার হাত থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা নিজের হাতে নিলুম। হেনা বলল, রাগ করো না, পার্থ। তোমাকে নিয়ে সোজা স্টেশনে যাব বলেই ত' বেরিয়েছিলুম, তুমিই রাজি হলে না!

রাজি হলেই হ'ত? —বললুম, দেশে থানা-পুলিশ নেই? নবেন্দু যদি হঠাৎ নালিশ ঠোকে? তুমি এম-এসসি পাস করেছ, কিন্তু ল পড়নি!

ঈষৎ উগ্রকণ্ঠে হেনা বলল, থামো। নোংরা কথা বলো না। আইন জানলে তুমিও একথা বলতে না। তোমাকে একান্তে না আনলে সব কথা গুছিয়ে বলব,—নবেন্দু তেমন সময় দিচ্ছে কি? আজ দুবছর ধরে দিন গুনছি তোমার জন্যে! তুমি মাঝখানে না দাঁড়ালে এর মীমাংসা হবে কোনদিন?

হাসিমুখে বললুম, আমার দাঁড়ান নবেন্দু পছন্দ করবে কেন? তোমার মতন সেও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু! তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি?

আমার অজানতে যখন এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, আমার জানবার আগে তার মীমাংসা হলেই ত' ভাল হত! আর যাই হোক, সে তোমার আইনসিদ্ধ স্বামী ত' বটে! তুমি উচ্চশিক্ষিত মেয়ে হেনা—

হেনা সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে বলে উঠল, না, সে আমার স্বামী নয়। যাকে স্বীকার করিনি তাকে স্বামী বলতে বাধ্য করো না, পার্থ।

মুখ ফিরিয়ে বললুম, তাকে বিয়ে করনি?

বিয়ে তাকে বলে না!

কিন্তু পরের কথাটা?

হেনা আমার প্রশ্নের জবাব দিল না, চুপ করে পাশে-পাশে চলতে লাগল। একথা জানতুম তার মনে বিস্ফোরক পদার্থ পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল।

বিক্ষোভ আমার মনেও কতকটা ছিল। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে শান্ত কণ্ঠে এক সময়ে বললুম, গেল তিন বছরের মধ্যে শুধু তোমারই চিঠি অন্তত খান তিরিশেক পেয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য, সব লিখেছ, শুধু সবচেয়ে দামি খবরটা একখানা চিঠিতেও লেখনি! আমি জানি, তুমি বা নবেন্দু কেউই আমাকে বিশ্বাস করতে চাওনি!

না না, এ সত্যি নয় পার্থ—হেনা বলল, একদম সত্যি নয়।

তবে? —মুখ ফেরালুম, —চেপে গিয়েছিলে কেন?

হেনা বলল, লজ্জা করেছিল! বিশ্বাস কর, তোমার কাছে লজ্জা না করলেও যে চলত, এটা মনে আসেনি, পার্থ।

অবশেষে মস্ত এক ঝুরিনামা বটগাছের নীচে এসে দুজনে পৌঁছলুম। ছায়াটা পেয়ে বাঁচা গেল। বাতাসটুকুও কিছু স্নিগ্ধ। আঁচলের শেষ প্রান্তটি দিয়ে হেনা তার রৌদ্র-রাঙা মুখখানা মুছল। তারপর আমার দিকে মুখ তুলে বলল, আমায় ক্ষমা কর পার্থ, কিছু মনে করো না।

কলকাতাটা কিছু দূরে পড়ে রইল। জনবিরল সেই প্রান্তরের ধারে গাছের তলায় দুজনে বসবার জন্য একটা জায়গা বেছে নিলুম। ব্যাগটি রেখে পকেট থেকে রুমালখানা বার করে গাছের গোড়ায় পেতে দিয়ে বললুম, বসো। কথাটা তোমার-আমার মধ্যে পরিষ্কার হওয়া উচিত হেনা।

দুজনে ওখানেই বসলুম কোনমতে। পাশ দিয়ে পায়েচলা একটি কাঁচা রাস্তা পিছন দিকে কলোনির ভিতরে কোথায় গিয়ে যেন ঢুকেছে। সুবিধা ছিল এই, সেদিকে খান তিনচার পাকা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। আমরা যে মধ্যাহ্ন রৌদ্রের নির্জন প্রান্তরে সমাজবিহীন পলাতক দুজন নই, এটি কেউ লক্ষ্য করলে অনুমান করেও নিতে পারে। সত্য বলতে কি, কেমন একটা অস্বস্তিকর নৈতিক দায়িত্ব বোধ করছিলুম।

হেনা চুপ করে রয়েছে লক্ষ্য করে পুনরায় বললুম, সর্বাপেক্ষা আঘাত পেয়েছি কী দেখে জান? তোমার চেহারা দেখে! আশ্চর্য, মাত্র তিন বছরের মধ্যে এমন করে তুমি জড়িয়ে যাবে, না দেখলে বিশ্বাস করতুম না!

সহসা যেন জেগে উঠল হেনা। কপালের উপর থেকে চুলের অলক সরিয়ে দিয়ে সে বলল, তোমার কাছে বসে দুঃখের কথা নিয়ে কাঁদব, এজন্যে তোমাকে বিলেত থেকে ফিরিয়ে আনিনি, পার্থ। আমার গলা পর্যন্ত বিষে ভরে উঠেছে, এর থেকে আমাকে তুমি মুক্তি দাও। তারপর চেয়ে দেখ আমার দিকে, সেই যাকে দেখে একদিন তুমি অবাক হতে! আমি জড়িয়ে গেছি কে বললে? সম্মোহনের ফাঁদে ধরা পড়েছি!

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলুম হেনার কথায়। বললুম, ছি ছি, এসব কথা শ্রদ্ধার সংগে শোনা যায় না, হেনা। কতকগুলো প্রাথমিক নীতি জীবনে মেনে চলতেই হয়, নৈলে মানুষের কোন পরিচয়ই থাকে না। যে-বস্তু সর্বাপেক্ষা পবিত্র বলে গ্রহণ করেছ, স্বীকার করেছ, জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা হিসেবে বরণ করেছ, সেটা তোমার খেয়ালের খেলা নয়, হেনা। খবরটা প্রথম যখন শুনলুম, আমার চেয়ে সুখী সেদিন কেউ ছিল না। কিন্তু এখানে এসে তোমার মুখে সব শুনে আমি অবাক। তুমি বলছ বিষ, আমি দেখছি অমৃত। সম্মোহনের ফাঁদ বলছ? কিন্তু এ-ফাঁদ কার জীবনে নেই? এই ফাঁদ আছে বলেই ত' সংসারের এই ছন্দ আর সুষমা!

হেনা নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে রইল। এমন রৌদ্র আর পথশ্রমে সে অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু দেশে ফিরে সপ্তাহকাল অবধি লক্ষ্য করছি, তার উপর দিয়ে গেছে যেন অনেক ঝাপটা। মনে হচ্ছে অনেক দিনের দুঃখ আর নৈরাশ্যে সে ধূলিধূসর। আন্দাজে বুঝতে পাচ্ছি অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা দুর্বহ বোঝা তাকে নিরন্তর বইতে হচ্ছে, এবং আমার এইসব সদুপদেশের একটি অক্ষরও তার কানে ঢুকছে না।

এক সময় পুনরায় বললুম, এমন কাণ্ড করে রেখেছ যে, নিরিবিলি কোথাও বসে দু দণ্ড তোমার সংগে কথা বলব, তার উপায় নেই। আমার ওখানে তুমি যেতে চাও না, পাছে কেউ প্রশ্ন করে, তোমাদের বাড়ীতে এসব কথা আলোচনা করতে চাও না! —নবেন্দুর ওখানে ত' একেবারেই অসম্ভব। এখন বল ত আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি?

হেনা তার একমাত্র বক্তব্যটারই পুনরাবৃত্তি করল। বলল, তোমার নীতি উপদেশ আমার কোনও কাজে লাগবে না, পার্থ। আমার পথ আমি জানি, তুমি বলে না দিলেও চলবে। কিন্তু সোনার শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে আমি বাঁধা থাকতে পারব না। ভুল আমি করেছি, স্বীকার করে নিচ্ছি। সেই ধিক্কার থেকে যেমন করেই হোক আমার মুক্তি পাওয়া চাই।

কেমন করে? —আমি অনুযোগ জানালুম, তোমরা যতই চাপতে গিয়েছ, ততই নানা মহলে কানাকানি রটেছে তা জান? তুমি রায়চৌধুরী বংশের মেয়ে হয়ে তাদের সামাজিক সম্মান আর আভিজাত্য ক্ষুণ্ন করবে? মেয়েছেলের নামে একটা মন্দ কিছু রটলে তার কোনদিন প্রতিকার হয় না, এ কি তুমি জান না, হেনা?

হেনা এবার চট ক'রে উঠে দাঁড়াল, তুমি আমাকে কী বোঝাতে চাইছ?

এ বিয়ে তোমার স্বীকার করে নেওয়া উচিত। আমি অনেক ভেবে দেখেছি হেনা—

হেনা এবার চট করে উঠে দাঁড়াল, তারপর রুমালখানা তুলে ঝেড়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, চল। এখন আমি বুঝতে পেরেছি, তুমিও নবেন্দুর হাতের পুতুল। বিয়ে আমি অস্বীকার করিনি। কিন্তু কে ছিল সাক্ষী সেই বিয়েতে বলতে পার? কার কাছে আমার আনুগত্য? বাঁধনটা কোথায় আমার?

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, কোনও ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না বলেই কি বিয়েটাকে তুমি উড়িয়ে দিতে চাও? তা হলে কোথায় রইল তোমার সততা, আর তোমার চরিত্রের নিষ্ঠা? তুমি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এম-এসসি পাস করা মেয়ে হেনা, —নিতান্ত নাবালিকা নও! পাঁচজন লোক তোমাদের বিয়েতে অবশ্য সাক্ষী থাকেনি। তার মানে সকলের আড়ালে গিয়ে যে-কাজটি সম্পাদন করেছিলে, সকলের অলক্ষ্যে তার বাঁধনটি কেটে পালাতে চাইছ! শিক্ষিত মেয়েদের সম্বন্ধে আজকাল অনেকের মনে সংশয় জেগেছে কেন বুঝতে পারছ? তোমার সমাজ-দর্শনের সঙ্গে আমার ঠিক মিল হচ্ছে না, হেনা!

ওই মাঠের গাছতলায় আরও কিছুকাল বসে অপরাহ্নের রৌদ্রটাকে এড়ান যেত। কিন্তু হেনার মধ্যে ছিল আত্মতাড়না, সেইটি তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। জলের মাছ স্বচ্ছন্দেই জলের ভিতর সাঁতরে বেড়ায়, কিন্তু টোপ গিলতে গিয়ে যখন গলায় কাঁটাটি আটকে যায়, তখন সে হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য হয়ে চারদিকে ছোটে। না পারে গিলতে, না পারে কাঁটা ছাড়াতে। নবেন্দুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে কেমন করে, এই চিন্তাই ওকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। চেয়ে দেখলুম, হেনার চোখে কেমন এক প্রকার বেপরোয়া বন্যতা। ভিতরের একটা যন্ত্রণায় ও যেন নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে।

ব্যাগটি হাতে নিয়ে আবার ওর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চললুম। হাঁটতে হবে অনেকটা, তা হোক। ছাত্রজীবনে এই ভাবেই আমরা হেঁটেছি অনেক। তবে দুজন নয়,—নবেন্দু থাকত সঙ্গে। যেমন হেঁটেছি পুরীর সমুদ্রতটে, তেমনি হেঁটেছি শিলং-এর বটানিক্যাল গার্ডেনে। গিরিডির উশ্রীর ধারে, লক্ষ্ণৌর গোমতীর আশেপাশে, তাজমহলের শানবাঁধান উঠানে, কাশীর গঙ্গার নৌকায়,—ওই আমরা তিনজনেই! সম্মিলিতভাবে মাত্র একটি মন ছিল আমাদের, তিনটি নয়,—সেই একটি মনই ত্রিধাবিভক্ত হয়ে আমরা তিনটি নামে পরিচিত ছিলুম। ওরা দুজন ছিল সায়েন্সের ছাত্র, আমি ছিলুম আর্টের। কিন্তু হঠাৎ সে-বছর নবেন্দু স্বার্থত্যাগ করে বসল। অসুস্থতা এবং পারিবারিক অসুবিধার অজুহাতে সে ফাইনাল পরীক্ষা দিল না,—অর্থাৎ হেনাকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবার সুযোগটি দিল। এর পরে উভয়ের মধুর সম্পর্কটি আর দুর্বোধ্য রইল না। আমি গিয়ে এক সময়ে সকৌতুকে নবেন্দুর কান মলে দিয়ে এসেছিলুম।

সেই সময়টায় নবেন্দুর হঠাৎ পিতৃবিয়োগ ঘটে। ওর বাবা ছিলেন মস্ত ব্যবসায়ী এবং নবেন্দু তাঁর একমাত্র পুত্র। সুতরাং পরের বছরে পরীক্ষা দেবার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নবেন্দুকে বসতে হল লালদিঘির পাড়ায় মস্ত এক আফিসে। সেখানে সেই হল সর্বময় কর্তা এবং বয়সে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। অবসরপ্রাপ্ত একজন আই-সি-এস হলেন নবেন্দুর অফিসের পরিচালক। ওদের কাজ-কারবার হল জাহাজে মাল আমদানি-রপ্তানি। সরকারি মহলে ওদের প্রতিষ্ঠানের খাতির অসামান্য।

এমনি সময় একটি স্কলারশিপ আমার ভাগ্যে জুটে গেল, এবং আমি দুর্গা বলে যেদিন বোম্বাই থেকে জাহাজে উঠলুম, ওরা দুজন সেদিন বোম্বাইয়ের জেটিতে দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে আমাকে করুণ চোখে বিদায় সম্ভাষণ জানাল।—

হাঁটতে হাঁটতে আবার চললুম অনেক দূরে। মাইলখানেক আরও উত্তর দিকে গেলে মোটরবাসের রাস্তাটা পাওয়া যাবে। বেলা পাঁচটা বাজতে আর বিলম্ব নেই।

হেনা বলল, গালমন্দ তুমি অবশ্যই আমাকে দিতে পার পার্থ,— কিন্তু তাতে আমার জীবনের হেস্তনেস্ত হবে কি? আমার সমস্যা কি ঘুচবে?

হঠাৎ প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা হেনা, এতদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আজ তোমার স্বামী হয়ে উঠল, কিন্তু তার ওপর তুমি এমন কঠিন হচ্ছ কেন বলত?

হেনা জবাব দিল, ফুলের বাগানে সাপ লুকিয়ে ছিল পার্থ, আগে চোখে পড়েনি। এবার হয় তাকে মারব, নয়ত বাগান ছেড়ে পালাব। কিন্তু সাপের সঙ্গে ঘর করতে পারব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে হাঁটতে লাগলুম। পরে বললুম, বেশ, তবে ওই সাপকেই মার, ক্ষমতার পরিচয় দাও।

হেনা হাসল,—সাপটা অজগর! মারলে মরবে না, বরং আমাকে ফাঁদে ফেলে একটু একটু করে পাকিয়ে পাকিয়ে গিলবে!

বললুম, তোমাদের মাঝখানের ঘটনাগুলো আমার কাছে প্রকাশ করনি। ভয় হচ্ছে, তোমার মন বোধ হয় পূর্ব-সংস্কারে আচ্ছন্ন রয়েছে।

হেনা বলল, না, একেবারেই একথা সত্যি নয়। আমাকে যদি ওর স্ত্রী বলেই ধরতে থাক, তবে স্ত্রীর চেয়ে নির্ভুল বিচার স্বামীকে আর কে করে? শুধু মাঝখানের ঘটনাগুলোই সর্বনাশের মূল! আচ্ছা পার্থ, আমি বড্ড নির্লজ্জ, না?

হাসিমুখে বললুম, ভয় জবাব দেবো, না নির্ভয়ে?

অত উত্তেজনার মধ্যেও হেনা হেসে অস্থির হল। তারপর এক সময় বলল, লজ্জার কথা ওঠে না, কেন জান? আমরা তিনজনে একদম এক বয়সী! হিসেব করে দেখ, তিনজনে একই বয়সে একই ক্লাস থেকে পড়ে এসেছি!

এবার বললুম, তখন কি জানতুম মেয়ের মনে পাক ধরে পুরুষের অনেক আগেই?

উচ্চ রোলে হেসে উঠে হেনা যেন পথটাকে মুখর করে তুলল। ব্যাগটা হাতে

নিয়ে ততক্ষণ অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি।

কিন্তু বিশ্বাস কর পার্থ,—হেনা বলল, আমি মেয়ে, তোমরা ছেলে, এ চেতনা তোমার বিলেত যাওয়া পর্যন্ত মনেই আসেনি। মেয়ের প্রকৃতির তলায় মূল বাঁধন যেখানে, তার কথা বাদ দাও,—সেখানে মেয়ে মাত্রই স্বভাব-সংযত। কিন্তু বহুজনের সামনে উর্বশী-নৃত্য করতে কোনও মেয়ে আড়ষ্ট বোধ করে না,—এও তুমি দেখেছ। নাচ-গান শিখেছিলুম তোমাদের দুজনেরই জন্যে। প্রাণের জোরে কতবার তোমাদের দুজনকে তাতিয়ে মাতিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছি। আলুথালু হয়েছি কতবার তোমাদের দুজনের মাঝখানে। কিন্তু একবারও তখন মনে হয়নি, আমার পায়ের ঘুঙুরের সংগে নবেন্দুর বুকের রক্তে দোলা লাগছিল!

লাগাটা অন্যায় ছিল না!

হেনা বলল, তখন কি জানতুম নবেন্দু মনে মনে ছুরি শানাচ্ছে?

বললুম, অবাক করলে তুমি! যা স্বাভাবিক, তার বিরুদ্ধে কথা বল কেন? —থাক্, এখন এসব কথা।

হেনা কতক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, তুমি ত জানতে আমার মধ্যে কখনও কোনও দুর্বলতা ছিল না!

হাসিমুখে বললুম, এখনও তোমার অজ্ঞান কাটেনি, হেনা। দুর্বলতা জন্মায়, বেড়াটা হঠাৎ ভাঙ্গে, হঠাৎ ঝড় ওঠে, হঠাৎ বন্যায় সব ভেসে যায়। এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি শুধু কথায় ভাসিয়ে দিলে! কিন্তু যেটি শুনতে চাইলুম বললে না ত?

হেনা আবার হাসল। বলল, সব বলব তোমাকে, ফিরে যখন তুমি এসেছ! কিন্তু পার্থ, একটা কথা ভেবে দেখো,—ছাত্র আর ছাত্রীর মধ্যে যে এক প্রকার প্রণয় ঘটে—সেটি চিরস্থায়ী হয় কিনা সন্দেহ। তুমি খুব কমই দেখবে, সহপাঠীর সংগে সহপাঠিনীর বিয়ে যাবজ্জীবনের মতো সার্থক হয়েছে! সম্ভবত হয়নি।

এর কারণ কি তুমি মনে কর?

প্রথমত বয়সা, তার সংগে প্রাত্যহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তার ওপর হালকা হাওয়ার সুর। —হেনা বলল, সহপাঠীর সংগে বড়জোর অল্প-স্বল্প প্রণয়াসক্ত হওয়া যায়, কিন্তু বিবাহ অসম্ভব। আমি ছাড়া পৃথিবীর সব মেয়ে সেখানে চতুর, সব মেয়ে সচেতন। সমবয়স বরং চলনসই কিন্তু সহপাঠীর সংগে চিরজীবনের ঘরকন্না বড় বিরক্তিকর। বন্ধু যদি অভিভাবক হয়, তবে তার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। দুইজনের মাঝখানে যে বিশাল স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়া যেত, সেটি কুণ্ঠিত সংকুচিত হয়ে সম্পর্কটাকে প্রাত্যহিক নোংরায় ঘুলিয়ে তোলে।

বললুম, সব জেনেও তুমি একাজ কেন করলে?

সব জানলুম কোথায়? —হেনা বলল, জানলুম জীবন দিয়ে। মুক্তি যদি আমার মার খেল, রইল কি? ভালবাসা? রাম বল! বাধ্যবাধকতার আবর্জনাকুণ্ডে মুখ থুবড়ে চর্বিতচর্বণ,—সে-ভালবাসা আমার জন্যে নয়, পার্থ! ওই তোমার পরম রূপবান নবেন্দুর সেই নোংরা চেহারাটার কথা ভাবলে আজও আমার গা ঘিনঘিন করে।

বাসরুটের পাকা রাস্তাটায় এসে পৌঁছতে আমাদের অনেকটা সময় লাগল। পথটা উত্তর থেকে এসে পশ্চিমের দিকে চলে গেছে। আমি অতঃপর প্রস্তাব করলুম, শোনো হেনা, এভাবে তোমার আলগা এলোমেলো কথায় কোনও কাজ হবে না। এর মীমাংসা কিছু একটা হওয়া দরকার—। সবাই মিলে একদিন একসংগে বসি।

হেনা জবাব দিল, বেশ ত—

আমার মনে হয় তিনজনে কোথাও একত্র হয়ে এর একটা নিষ্পত্তি করে নেওয়া যাক্। তার আগে তুমি একটা কথা দাও।

কি বল?

আমি নিজে নবেন্দুকে ডেকে আনব। কিন্তু তুমি যেন ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না তার সংগে

হেনা এবার হেসে উঠল। বলল, কি নিয়ে ঝগড়া করব?

বললুম, তুমি নোংরামিকে ভয় কর আমি জানি। কিন্তু আমার ভয় পাছে নোংরা ধরনের বিতর্কে তোমরা মেতে ওঠো। ওকে কি তোমারই ওখানে ডেকে আনব?

কৌতুক করে হেনা বলল, বেসরকারি শ্বশুরবাড়িতে কি সে আসতে চাইবে?

সে আমি দেখব। এসো, গাড়ি আসছে

অনেক দূর থেকে একখানা প্রাইভেট বাস এসে এক জায়গায় থামল। হ্যান্ডব্যাগটি নিয়ে হেনার পিছনে পিছনে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

গাড়িতে প্রচুর ভিড়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে অনেক লোক। তিন বছর পরে কলকাতায় ফিরে এই প্রথম বাসে চড়া। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সুশ্রী মেয়েদেরও আদর কমে এসেছে।—সহজে আর কেউ সীট ছাড়তে চায় না। মেয়েরা এখন হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে গেলে সহানুভূতি জাগে না। তা ছাড়া আগেকার মতো মেয়েরাও স্পর্শকাতর নয়। ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়ে গেলেও মেয়েদের দেহ-সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয় না। এবার থেকে বোধ হয় উভয় পক্ষেরই গায়ের চামড়া কিছু কঠিন হবে।

কোথায় যেন এসে গাড়িখানা থামতেই একটি সীট খালি হল। কিন্তু হেনা এক পা এগিয়ে সেটি দখল করার আগেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক সহসা অতি সুকৌশলে ভিড়ের ভিতর থেকে পিছলিয়ে গিয়ে সেটিতে বসে পড়লেন। অতঃপর ঐহিক ব্যাপার সম্বন্ধে এমন অখণ্ড ঔদাসীন্য মুখে মেখে বসে রইলেন যে, হেনা কলকলিয়ে হেসে আমার কানে-কানে বলল, বিপত্নীক!' তাই এত রাগ!

পুরনো বালিগঞ্জের পূর্ব প্রান্তে একটি সুপ্রাচীন বাগানবাড়িতে যখন এসে পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যা। এ বাড়ির বাগান আম-জাম-তাল-কাঁঠালে ঘেরা বহু প্রাচীনের জীর্ণাবশেষ। নগর-সম্প্রসারণের হুজুগে রায়চৌধুরীদের এই বাড়ি ভাগ্যক্রমে আজও গ্রাস করা হয়নি। তবে এই অঞ্চলের নানা লোকের মুখে শোনা যায়, রায়চৌধুরী বংশ লুপ্ত হতে আর বিলম্ব নেই, অদূর-ভবিষ্যতে নাকি এই প্রাচীন পরিবারের বংশে আর কোনও ব্যক্তিকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। হেনার রকম-সকম দেখে সেই কথাই অবশ্য মনে হয়।

আমাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে হেনা ভিতরে গেল। এ বাড়ি আমার অতি পরিচিত। এইখানকার নিভৃত বাগানে বসে আমরা তিনজনে ভবিষ্যতের ইন্দ্রজাল বানাতুম। অনেক শীতের দুপুরে এই বাগানের ঘাসের ওপর চাদর পেতে আমাদের চাঁড়ভাতির আসর বসেছে। প্রাণসমস্যা নিয়ে তিনজনের মধ্যে সেদিন কোনও কথা ওঠেনি।

ভিতরে ঠকঠক্ করে কোথায় যেন অনেকক্ষণ থেকে একটানা আওয়াজ আসছিল। কয়েক পা এগিয়ে দরদালান পেরিয়ে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে দেখি, রাজা ভবানীপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণ কয়েকখানা তক্তাকাঠের টুকরোর মাঝখানে বসে হাতুড়ি-বাটালি-করাত ও পেরেক নিয়ে গভীর মনোযোগের সংগে একটা কাঠের বাক্স বানাচ্ছেন। বয়স তাঁর ষাট পেরিয়ে গেছে, মানুষটি পাতলা, অত্যন্ত ফর্সা রং এবং দাড়ি-গোঁফ কামানো। বয়ঃক্রমে তাঁর কোমরের দিকটা একটু যেন ঝুঁকে পড়েছে।

সাড়া দিয়ে বললুম, ছোটকাকা, কি হচ্ছে এ সব?

হাতুড়িটা একবার ঠুকে তিনি বললেন, আরে, এসো এসো,—কাল তুমি একেবারে আমাকে পথে বসিয়ে পালালে হে? তোমার জন্যে এমন চমৎকার ক'রে একটা কক্‌টেল্‌ বানালুম,—ছুঁলে না পর্যন্ত?

বললুম, মদ আমি খাইনে, ছোট্‌কা—হেনা বড্ড রাগ করে!

ময়লা কেরোসিনের আলোটা পাশে জ্বলছিল। দীপেন্দ্র মুখ তুলে বললেন, নাঃ, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না, পার্থ! কক্‌টেলকে মদ বলব, এমন দুঃসময় আজও আসেনি!—আর হেনার কথা বলছ? ওটাও, দীপেন্দ্রনারায়ণ বললেন, তেমনি মেয়ে হল! একেবারে দলছাড়া গোত্রছাড়া। তোমরা বড় সেকেলে হয়ে যাচ্ছ, পার্থ। নাও, বসো ওই বাক্সটার ওপর চেপে।

এ সব তোমার কি হচ্ছে, ছোট্‌কা?

মুখ তুললেন দীপেন্দ্র। বললেন, বটে, কি হচ্ছে, কি দেখছ বল দেখি? এখন থেকে আর মাটিতে নয়,—বুঝেছ, মাটিতে নয়,— যা কিছু এখন গাছের ডালে! ডালে-ডালে বাসা বাঁধব, পাখীদের পাড়ায় পাড়ায়। আসছে শনিবার এসে আমাকে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ডেকো, আগডালের দিকে তাকিয়ে,—এই বাক্সর ভেতর থেকে সাড়া পাবে আমার!

দীপেন্দ্র আবার হাতুড়ি দিয়ে ঠুকঠাক করতে লাগলেন। বললুম, ঠিক সে রকম বাক্স তুমি বানাতে পারবে?

ছেলের কথা শোনো—। এটা যে রায়-চৌধুরীগুষ্ঠি, এ বংশে কি না জন্মাল! কুলজি ঘেঁটে দেখগে, ফারসী দরবারের আমল থেকে জন্মাল চারজন সভাকবি, তিনজন দার্শনিক, পাঁচ জোড়া শিল্পী, দুজন বড় বড় সেনাপতি,—কে নয় হে? বাঘভাল্লুক শিকারে আমাদের জুড়ি ছিল না দেশে, পোলো খেলার নেমন্তন্ন আসত কত রাজা-রাজড়ার কাছ থেকে,—সব রকমের প্রতিভা জন্মাল এই বংশে। কিন্তু যতই বল, ছুতোর মিস্ত্রী একজনও জন্মায়নি। আমি ওটার জন্যে দুঃখ রেখে যাব না, বুঝলে পার্থ? এই দেখ না এবার বিজ্ঞানের যুগে কি ক'রে যাই। স্রেফ বোতাম টিপব,—নারদ মুনি নেমে আসবে!

হেসে বললুম, তুমি বিজ্ঞানের কি জান?

আমি! ও, কিচ্ছু জান না, তুমি! হেনার মাথায় পেরেক ঠুকে বিজ্ঞান ঢোকাল কে?—দীপেন্দ্র বললেন, মেয়েটা নষ্ট হতে বসেছিল কবিতা লিখে, অক্ষরে অক্ষরে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা পেয়েছিল। হঠাৎ একদিন দেখি, ছবি আঁকছে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেল নাচ-গানের লাইনে। ও হল অরণিকাষ্ঠ, পাথরে ঘষলেই জ্বলতে থাকে। কিন্তু আমার ভয় করে পার্থ, হেনা যদি বিয়ে করে তাহলেই অকালমৃত্যু!

এবার রাগ ক'রে বললুম, ছোটকা, আমাদের দুঃখ কি জান? তুমি আজও সাবালক হতে পারলে না! হেনার ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা তোমার মাথায় ঢুকল না, অথচ ওর মাথায় তুমি ঢুকিয়ে দিলে দুটো সর্বনেশে বস্তু,—বিজ্ঞান আর দুর্বুদ্ধি!

পাগল, পাগল,—দীপেন্দ্র সোৎসাহে বললেন, তোমার মতন অনেকেই পাগল! বিয়ে করবে হেনা কোন্‌ দুঃখে? ওর পাশে দাঁড়াবে কা'র এমন বুকের পাটা? ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশে বজ্রাগ্নির তরোয়াল দেখেছ কখনও? ছোটনাগপুরের পাহাড়ে কখনও দেখেছ দাবানলের লকলকে রসনা? বিয়ের জন্যে ও কি জন্মেছে? নাঃ তোমরা কেউ মেয়েটাকে চিনতে পারনি।

পিছন থেকে এ বাড়ির চাকর সন্তোষ এসে আমাকে ডাকল। স'রে আসছি যখন, ছোটকা বললেন, যদি পার মাঝরাত্রে একবার এসে দেখে যেয়ো, আমি তখন পাখী-মহলে থাকব। ওদের কানাকানিটে শুনে যেয়ো। যাই বল, এখনকার ছেলে-মেয়েরা বড্ড সেকেলে হয়ে যাচ্ছে!

দীপেন্দ্র ব'সে ব'সে আবার পেরেক ঠুকতে লাগলেন।

এ ঘরে এসে দেখি রাঙ্গামার সঙ্গে হেনার রীতিমতো তর্কযুদ্ধ চলছে। বিমাতার সঙ্গে একপ্রকার তর্ক বহুকাল থেকে শুনে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু তর্কের বিষয়বস্তু কিছু বিচিত্র। এই বাগানবাড়ির পাশে ধোবার বস্তির লোকরা নাকি অতিশয় গরীব। রাঙ্গামা সম্প্রতি তাদের ঘরে আহার্য সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য আরেকটি পাচক নিয়োগ করতে চান, কারণ তারা দিন-রাত যখন ময়লা কাপড় কাচে, তাদের রান্নাবান্নার সময় কখন? বাগানের এ পাশে কয়েকজন বিহারী স্ত্রী-পুরুষ গোবর কুড়িয়ে এনে ভাঙ্গা পাঁচিলে ঘুঁটে দেয়,—ওরা ওই হাতে ছাতু কিংবা আটা শানবে কেমন ক'রে? অতএব ওরা যদি দুবেলা এ বাড়িতে এসে আহারাদি সেরে যায়, তবে ওদের কাজ-কর্মের সুবিধা কতকটা হয় বৈকি। রাঙ্গামার যুক্তি অকাট্য।

রাঙ্গামার বয়স বোধ করি পঞ্চাশ হয়নি,—তিনি নিঃসন্তান। পরণে তাঁর থান ধুতি, গলায় একগাছা রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি সহাস্য সরলতার সঙ্গে তাঁর সতীন-কন্যাকে এই সহজ কথাটি বোঝাবার চেষ্টা পাচ্ছিলেন যে, বিনি গয়লানির যখন বাতের ব্যামো হয়েছে তখন রায়-চৌধুরীদের ঘর থেকে মাসোহারা কেন পাবে না? মেয়ে আমার এত লেখাপড়া শিখল কিন্তু জ্ঞানগম্যি একটুও হল না। তুমি ওকে একটু হিসেব-বুদ্ধি শিখিয়ে দাও ত পার্থ!

হেনা ইতোমধ্যে স্নান সেরে এসে একখানা ঘোলাটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। সহসা চিরুণীখানা রেখে মুখ ফিরিয়ে সে সহাস্যে বলল, আমাদের বাড়ির বাসনপত্র কথায় কথায় নিখোঁজ হচ্ছে কেন, বলব তবে?

আমিই বলছি—রাঙ্গামা এগিয়ে এলেন আমার দিকে, পুনরায় বললেন, সাধে কি বলি মেয়ের হিসেব-বুদ্ধি হয় নি। শোন পার্থ, আমাদের থালা-বাসনেই ওদের ঘরে খাবার দিয়ে আসি—

বললুম, আপনি দিয়ে আসেন! ওরা নিয়ে যায় না?

ওমা, ছেলের বুদ্ধি শোন! ওরা কি হ্যাংলা যে নিতে আসবে? ওদের মান-অপমান বোধ বেশি, ওরা যে গরীব। তাই আমিই গিয়ে দিয়ে আসি। তবে হাঁ, ওসব বাসন আর ফিরিয়ে নিয়ে আসিনে। ওতে যে রায়চৌধুরীদের মানহানি হবে! বাসন গেলে বাসন হবে, তাই ব'লে মান খোওয়াতে ত' আর পারিনে! এ সব হিসেব-বুদ্ধির কথা, বাছা। ওই যে হাঁ-করে দাঁড়িয়ে আছে সন্তোষ, ও-ও এ সব বোঝে। যাই, তোমাদের খাবার জোগাড় দিই—

রাঙ্গামা বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু মিনিট দুই পরেই আবার এলেন। বললেন, কই পার্থ, নরেন্দুকে ডেকে আনলে না যে? একমাস হতে চলল, তাকে দেখিনে। আমাদের ওপর বোধহয় সে রাগই করেছে! কেন বলত সে আজকাল আসতে চায় না? হেনা কি মানা করেছে?

কৌতুক ক'রে বললুম, আজ না হয় কাল আসবে নরেন্দু,—যাবে কোথা সে? আচ্ছা রাঙ্গামা, নরেন্দুকে জামাই করুন না কেন?

কথাটা শুনে রাঙ্গামা একবারটি থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে হেনা বলল, রাঙ্গামার পোড়া কপালে এমন চাঁদের মতন জামাই কি আর মিলবে?

এই নির্লজ্জতার মুখের ওপর কি বলব ঠিক ভেবে পেলুম না। কিন্তু রাঙামামা ঈষৎ বিষণ্ণ সুরে শুধু বললেন, পেটের মেয়ে থাকলে আমার পোড়া কপালে অমনি জামাই মিলত বৈকি!

রাঙামামা ভিতরে গেলেন।

এ ঘরে সেজবাতিটি জ্বলছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললুম, তোমাদের সেকেলে ছাঁচ একটু বদলাও ত? এ যেন ভূতের বাড়ি। ইলেকট্রিকের তার খাটানো রয়েছে, আলো রয়েছে, ফ্যানও দেখছি,—তবে জ্বলছে না কেন? মোমবাতি আর গরুর গাড়ির যুগ থেকে একটু না হয় সরেই এলে!

এ সব তুচ্ছ কথা হেনার কানে ঢুকল না। কতক্ষণ সে চুপ ক'রে রইল। পরে বলল, আগাগোড়া ব্যাপারটা রাঙামামা কিছু জানে না। কিন্তু মুশকিল কি জান পার্থ, যে-কোনও লোকের কাছে নরেন্দু ত' আদর্শ জামাই! এমন রূপবান, ধনবান মিষ্টভাষী ছেলেকে পাবার জন্যে কোন্ মেয়ে না কামনা করে? কোন্ মেয়ে না চায় এমন স্বামীর গৌরবে গরবিণী হতে?

তা হলে তোমাকে এমন ভূতে ধরল কেন? কেন নিজের পায়ে এমন ক'রে কুড়ুল মারছ?

তা হোক—হেনা তার সদাস্নাত উজ্জ্বল মুখখানা আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, তা হোক, ওটা মোহ, ওটা লোভের কথা। সবাই মিলে যেটা চায় সেটা আমি তুচ্ছ ক'রে দিই সেই আমার অহঙ্কার। আমি ভিক্ষের হাত বাড়াইনে, সেই আমার পরিচয়। নরেন্দু বন্ধুই থাক্, স্বামী না হয়ে ওঠে। আমি তার প্রভুত্ব বরদাস্ত করব না, পার্থ।

বললুম, এ প্রভুত্ব চিরকাল নারী-জাতি সানন্দে স্বীকার করেছে!

সানন্দে?—হেনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, চেননি তুমি তাদের! সানন্দে কেউ শেকল পরে না, সানন্দে কেউ অপমানের অন্ন মুখে তোলে না, কেউ সানন্দে পরাশ্রিত থাকে না,—চেননি তুমি তাদের, পার্থ।

এবার আমি বললুম, এ সব কথা শোনাবার জন্য নরেন্দুকে এখানে নাই বা নিয়ে এলুম। এতে মিটমাট হবে না, সে তার দাবিও ছাড়বে না। তাছাড়া কি জান হেনা, এ ব্যাপার সম্পূর্ণই তোমাদের দুজনের মধ্যে। এর মধ্যে আমার থাকা অনুচিত। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার মধ্যেই র'য়ে গেছে তোমার প্রকাণ্ড প্রশ্রয়, নৈলে এ রকম ঘটতেই পারত না। তুমিই নরেন্দুকে সুযোগ দিয়েছ!

হেনা বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, তাই ব'লে মানুষের একদিনের আচরণ চিরদিনের অভিসম্পাৎ হয়ে থাকবে? এ তুমি কি বলছ পার্থ?

চুপ ক'রে রইলুম। হেনার কথায় যুক্তি কতখানি, উত্তেজনাই বা কতটা, এইটি আমি তোলাপাড়া করছিলুম। আমার মস্ত সন্দেহ ছিল, নিজের কাছে সে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কোথাও যেন একটা অনুচ্চারিত কারণ থেকে যাচ্ছে। সে এতক্ষণ আমার মুখোমুখি বসেছিল। এবার বলল, মিথ্যে নয়, আমিই দিয়েছি! তুমি ছিলে না সামনে তাই বোধহয় বাঁধন কিছু আলগা হয়েছিল। বোধহয় সেদিন যশিদির সেই গোলাপের বাগানে নরেন্দুর পাশে ব'সে তোমারই জন্যে আমার চোখে জল এসেছিল। ওর হাত ধ'রে হয়ত বা সেদিন তোমাকেই আদর জানিয়ে ছিলুম! তোমার জাহাজ তখনও বোধহয় টেম্‌স্ নদীতে ঢোকেনি!

ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করলুম, তুমি কি বোম্বাই থেকে বেরিয়ে দেওঘরে নরেন্দুর মামার বাড়িতে উঠেছিলে?

না—হেনা বলল, রাঙামামাকে চিঠি লিখে ক'রে আমাদের সেই যশিদির বাড়িতে উঠেছিলুম। নরেন্দু গিয়ে উঠল দেওঘরে।

ও, তারপর?

হেনা হাসল। বলল, তারপর? তারপর হঠাৎ এসে দাঁড়াল নরেন্দু আমার মুখোমুখি। সে একক, একান্ত! তার ঘন নিঃশ্বাসের মধ্যে প্রথম আশ্চর্য এক পুরুষের গন্ধ পেয়ে শিউরে উঠেছিলাম, পার্থ। সেদিন আমার গলার কাছে মুখ রেখে সে চাপা-চাপা ভাষায় জানাল কি যেন অজানা ব্যাকুলতা! সেই ব্যাকুলতায় আমাদের গোলাপের বাগানও ফুঁপিয়ে উঠেছিল। সেই আমি প্রথম কাঁদলুম!

এবার হাসিমুখে বললুম, আমি কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করিনি তোমাকে, তুমি নিজেই বলছ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিজেই বলছি।—হেনা অধীর হয়ে বলল, কেনই বা বলব না? বাধা কোথায়? পদ্মের পাঁপড়ি খোলে নিজের গরজে,—তার মনে প্রশ্ন নেই, প্রকাশ আছে। তুমি কিছু না জানতে চাইলেও বলতুম!

হেনার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিলুম।

হেনা হাসিমুখে বলল, মেয়ের মুখের স্বীকারোক্তি শুনে ভয় পাও কেন? এ আগুনে কে পোড়েনি? শিল্পী, কবি, নর্তকী, জীবনধেয়ানী, গায়ক, দার্শনিক,—আর যেখানে আছে যত প্রতিভা! এই আগুনের অসহ্য যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সংসার ছেড়ে মানুষ পথে পথে সাধক হয়ে ফেরে! আর এই যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে একদিন ভর সন্ধ্যেবেলায় নরেন্দুকে টেনে নিয়ে গেলুম বৈদ্যনাথের মন্দিরের এক নিরিবিলি কোণে। নরেন্দু আমার হাতের মধ্যে তখন থরথর ক'রে কাঁপছিল। ওর হাতে ছিল কাঠের একটি সিঁদুর কৌটো।

তারপর?

এতক্ষণ পরে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সর্বনাশিনী খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল। এমন সময় সন্তোষ ভিতরে ঢুকে বলল, আপনাদের খাবার দিয়েছে।

—ক্রমশঃ

নব কলেবরে বাইবেল
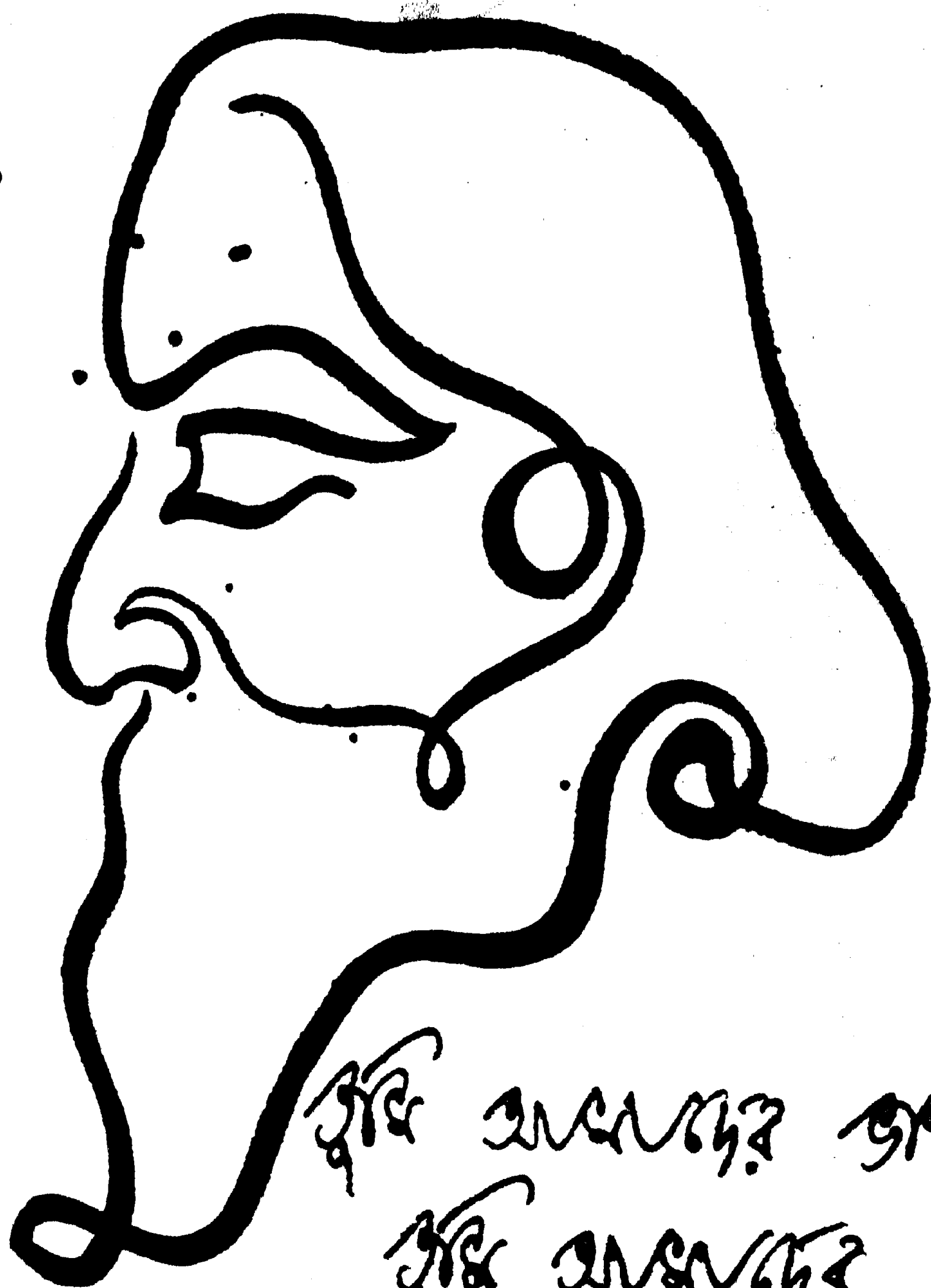
অনিন্দ্য রায়

কোন বই বাংলাদেশে সব থেকে বেশী চলে? কোন বই বেস্ট সেলার? এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত হতে পারে। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত যে সব থেকে জনপ্রিয় বই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে একটি গ্রামও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে এ বই পড়া হয় না, এমন মানুষও নেই যিনি এই রামায়ণ-মহাভারতের অমৃতসমান বাণী না শুনেছেন।
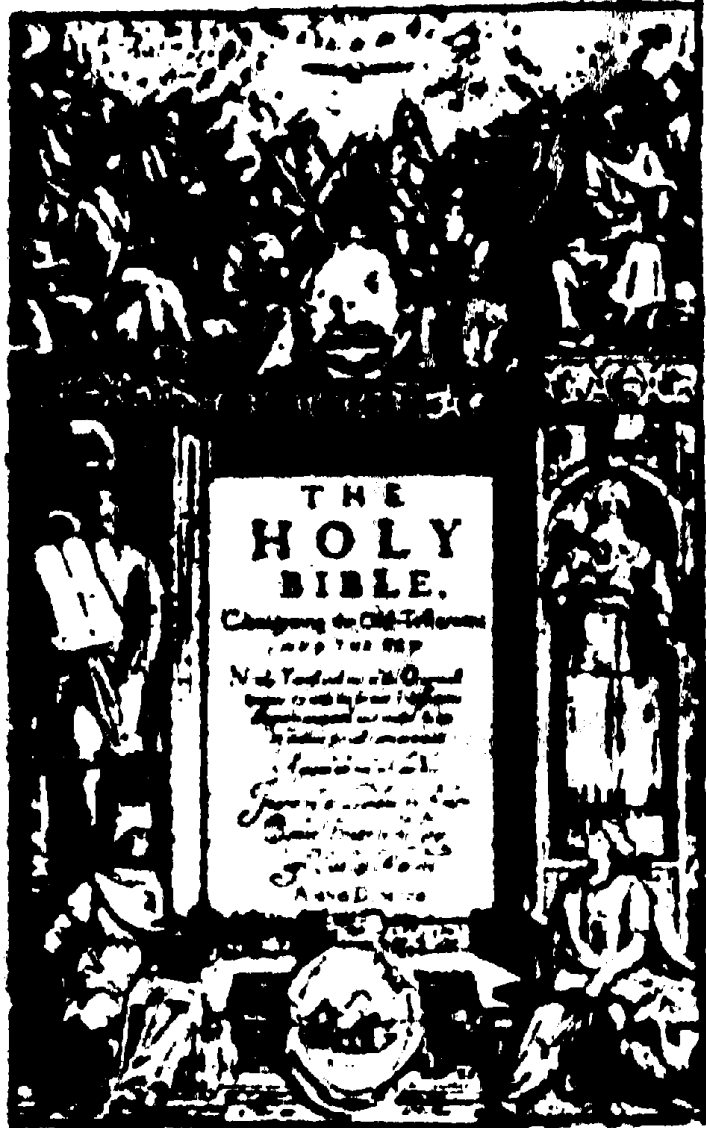
এই যে জনপ্রিয়তা, এর কারণ কী? প্রধান কারণ নিশ্চয়ই পুণ্যলাভের আশা। কিন্তু তাই কী সব? নিছক পুণ্যের লোভই যদি একমাত্র হত, তবে রামায়ণ-মহাভারতের বদলে গীতা পড়া হয় না কেন? জানি এর তৈরী উত্তর হল— গীতা সংস্কৃতে লেখা, তার কোনো প্রামাণ্য অনুবাদ নেই। কিন্তু এ উত্তরেও ফাঁক আছে, ফাঁকি আছে। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদও কি প্রামাণ্য? যাঁরা বাল্মীকী-বেদব্যাসের মূল রামায়ণ-মহাভারত পড়েছেন, তাঁরাই জানেন বাংলা অনুবাদ দুটি যে কেবল ভাবানুবাদ তাই নয়, আসলের সংগে কল্পনার খাদও মিশেছে বেশ ভালোভাবেই। কিন্তু বাঙালী পাঠক তাতে আপত্তি তোলেন। কেন?

কারণ হল এই যে, ধর্মের সংগে এখানে এসে মিশেছে কাহিনী, কাহিনীর মধ্যে কবিত্ব। একই সংগে যেখানে আমন্ত্রণ থাকে মাটির পৃথিবীতে এবং স্বর্গের দিকে, তা যে মন কেড়ে নেবে তাতে আর আশ্চর্য কি। আর সেই সংগে ভাষাটাও যদি হয় মুখের কথার কাছাকাছি, তবে তো হরগৌরী মিলন। যে রামায়ণ-মহাভারত এখন প্রচলিত রয়েছে, তাতে কতোবার ভাষার খোলস বদলে গেছে সেটা খেয়ালই রাখি না আমরা। সত্যি বলতে কি, কৃত্তিবাস আর কাশীরাম দাস যে-বাংলায় কাব্যরচনা করেছিলেন তা এখন প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-প্রার্থীর আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

যাই হোক, এই যখন আমাদের দেশের সব থেকে প্রচারিত বই দুখানির জনপ্রিয়তার আসল রহস্য, বিদেশেরও ঠিক তেমনি। প্রমাণ একেবারে হাতের কাছেই তৈরী রয়েছে। খ্রীস্টান জাতির ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের নতুন ইংরেজী অনুবাদ ছাপা হয়ে বেরিয়েছে খুবই সম্প্রতি। আর বেরোনো মাত্রই পৌনে ১৩ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গেছে কয়েক দিনের মধ্যেই। এবং ১২ লাখ কপি পাঁচটি মুদ্রণ হতে পারে এমন অর্ডার এসে গেছে দেশবিদেশ থেকে।

নব প্রকাশিত এই অনুবাদের কথা বলার আগে বাইবেলে কী কী আছে তার একটু হিসাব নেওয়া যাক।

সকলেই জানেন, বাইবেল ওল্ড টেস্টামেণ্ট আর নিউ টেস্টামেণ্ট এই দুই অংশে বিভক্ত। চৌষট্টি খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে ইহুদীদের পূর্ব-ইতিহাস, আর দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে যীশুর জীবনী বিষয়ে চারটি 'সুসমাচার' এবং সেই সংগে সেণ্ট পল লিখিত পত্রাবলী। এই চিঠিগুলিতে আছে খৃস্টীয় গির্জার প্রতিষ্ঠা এবং সেই প্রথম যুগে ধর্ম-প্রচারের বিষয়ে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য। তাছাড়া যীশু খৃস্টের দ্বারা কথিত 'প্যারাবল' নামে কতকগুলি রূপক কাহিনীও রয়েছে এই অংশে।

'প্যারাবল'গুলি এতোই সুন্দর ও উপদেশপূর্ণ যে, আবাল-বৃদ্ধ নরনারী সকলেই এতে সায় দিতে বাধ্য। শুনলে একেবারে মনের মধ্যে এসে স্থান নেয়। ফলে বাইবেল শুধু ধার্মিক খৃস্টানদের কাছেই মূল্যবান ধর্ম-ও-নীতিগ্রন্থ বলে পূজো পায়নি, সমস্ত ইউরোপেই গত দেড় হাজার বছর ধরে সাহিত্য ও সংস্কৃতির গঙ্গোত্রী হিসাবে মর্যাদা পেয়ে এসেছে। ভারতীয় সভ্যতা যেমন মূলত রামায়ণ-মহাভারতের নানা কাহিনী, চরিত্র ও নীতিবাদের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, ইউরোপেও যেন ঠিক তারই প্রতিরূপ দেখতে পাই বাইবেলের প্রভাব খুঁজতে গিয়ে।

বলা বাহুল্য, বাইবেল ইংরেজীতে লিখিত হয়নি। ওল্ড টেস্টামেণ্ট লেখা হয়েছে হিব্রুতে, আর নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রীক ভাষায়। পরে দুই অংশই অনূদিত হয় ল্যাটিনে। আর এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় রাজা প্রথম জেমসের রাজত্বকালে (১৬১১ খৃঃ)।

কিন্তু সে অনুবাদ শুধু প্রটেস্টাণ্ট মতাবলম্বী খৃস্টানদের জন্য। রোমান ক্যাথলিকেরা ঐ অনুবাদ প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেননি। তাঁরা 'ডোয়াই বাইবেল' নামে পরিচিত বাইবেলের অন্য এক ভাষ্য গ্রহণ করেছেন। তা সত্ত্বেও ইংরেজী ভাষা-ভাষী এক বিরাট জন-সংখ্যার কাছে রাজা জেমসের আমলে প্রকাশিত ঐ প্রাচীন অনুবাদটিই ছিল এতদিন একমাত্র ভরসা।

এ অনুবাদ অত্যন্তই সরল, এবং সেই কারণেই সুন্দর। অখৃস্টানদের কাছেও তার আবেদন বড় কম নয়। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির যে ইংরেজী

অনুবাদ করেছেন, তা রূপায়িত হয়েছে বাইবেলীয় ভাষার আদর্শেই। রবীন্দ্র-নাথের ভাবের সঙ্গে ঐ ভাষার নিরাভরণ সৌন্দর্য এমনভাবে গঙ্গা-যমুনা হয়ে মিশেছে যে, অনুবাদ বলে চেনাই যায় না।

তবে সময় তো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, এগিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে ভাষা। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে অনূদিত এই বাইবেল তাই ইংরেজী ভাষীদের কাছে ক্রমে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিল। আর সাধারণ লোক তাদের মনের প্রতিধ্বনিও খুঁজে পাচ্ছিল না বাইবেলের ঐ ভাষার মধ্যে।

এইসব কারণে ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ বিভাগের উদ্যোগে প্রসিদ্ধ বাইবেলবিদ্‌ পণ্ডিত সি. এইচ ডডের সম্পাদনায় বাইবেলের নতুন অনুবাদ শুরু হয়। তারপর পনের বছরের অসীম অধ্যবসায়ের ফলে সে অনুবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে এতদিনে। আর, আগেই যা বলা হয়েছে, প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার কপি নিঃশেষিত; আরো ৬০ লক্ষের জন্যে অর্ডার এসে গেছে।

এই উৎসাহের অনেকটাই অবশ্য ধর্মের জন্যে। কিন্তু তাই কি সব? তাহলে ইংলণ্ডের বর্তমান রাজকবি মেসফিল্ড নতুন বাইবেলের সুখ্যাতিতে মুখর হয়ে উঠবেন কেন? অনেক কথা আলোচনার পর তিনি যা বলেছেন, অনুবাদের ভিতর প্রসাদগুণ না থাকলে কবির মুখ দিয়ে সে মন্তব্য বেরয় না। "..That which slept has been awakened."

আবার ধর্মের দিক থেকেও এই একই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় বিশপ উইকহ্যামের কথায়—

"..the older text now encourages laziness of belief. The new one compels reaction just because the meanings stand proud."

আরেকজন সমালোচক বলেছেন, "It is written in a beautiful contemporary style; it has a dignity of its own."

এ তো গেল শোনা কথা। আসলে ব্যাপারটা কেমন উৎরেছে তা বুঝতে হলে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে হয়। যেমন ধরুন, পুরনো ইংরেজীতে আগে যেখানে ছিল, "He began to be in want" (Luke 15 : 14.), সেখানে নতুন ইংরেজী একেবারে গায়ে আঁচ লাগিয়ে বলেছে, "he began to feel the pinch. তারপর ধরা যাক, আগে যেখানে ছিল, "But this I say, He which soweth sparingly, shall reap also sparingly," (11. Corinthians 9 : 6) সেখানে এখন এসেছে, "Remember: Sparse sewing sparse reaping." কিংবা দেখুন, "I myself was not burdensome to you." (11 Cornthians 12 : 13) হয়েছে "I never sponged on you.." এতে আবেগের তীব্রতা অনেকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গণ্ডিতে এসে পড়েছে।

চলতি ভাষায় অনুবাদ করার ফলে ভাষার মধ্যে জোর এসেছে, আর সেই সঙ্গে এসেছে ব্যঞ্জনা। অল্প বলেই এতে বেশী বলা গেছে। যেমন, পুরনো অনুবাদ—

"Woman, what have I to do with thee!" (John 2 : 4) নতুন অনুবাদে হয়েছে "Yours concern, mother, is not mine." কিংবা পুরনো অনুবাদে পাইলেট যখন যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "Art thou the King of the Jews?" এবং তার উত্তরে যীশু বলেছিলেন, "Thou sayest it." (Mark 15 : 2) কিন্তু সেই কথাই নতুন অনুবাদে দাঁড়িয়েছে এইরকম। —পাইলেট, "Are you the King of the Jews?" যীশু, "The words are yours." এতে রীতিমত নাটকের স্বাদ পাওয়া যায়।

অবশ্য নতুন অনুবাদের বিরূপ সমালোচনাও যে কিছু কিছু না হয়েছে তা নয়। কোন জিনিসেরই বা তা না-হয়। কিন্তু ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এই নতুন অনুবাদ, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, যীশু খৃষ্টের মতোই বাইবেল আবার কবর থেকে পুনরুত্থান লাভ করেছে। এর প্রভাব দিনে দিনে বেড়েই চলবে।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

১৩৬৭ সন শেষ হল। এই ১৩৬৭-র প্রতি মাসে যে সব বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে বিষয়ভেদে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নাও হতে পারে। সাময়িক পত্রিকার বিজ্ঞাপন এবং সংবাদের ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া পঞ্জিকা, বিজ্ঞাপন পুস্তিকা, ছাত্রবোধ স্কুল-কলেজ পাঠ্য গ্রন্থ বা পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী এই তালিকায় ধরা হয়নি। এই তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাংলা সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কয়েকটি বিভাগে প্রকাশক এবং লেখকদের ঔদাসীন্য লক্ষণীয়। অনেকের ধারণা বাংলা গ্রন্থের বেশীর ভাগ পাঠক উপন্যাস বা গল্পের বই আগ্রহ সহকারে পড়ে থাকেন, উপন্যাস যদিও ১১৩টি প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র একত্রিশটি। প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে ৫৩টি এবং সেই সঙ্গে ২০টি রম্য-রচনা বা লঘু প্রবন্ধের গ্রন্থও হিসাবের মধ্যে ধরা প্রয়োজন। ভ্রমণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মাত্র পাঁচটি এবং জীবনী মাত্র তিনটি। কবিতা গ্রন্থ সারা বছরে প্রকাশিত হয়েছে তেরখানি, নাটক দশখানি আর স্মৃতিকথা চারখানি। শিশু-সাহিত্য এবং খেলা-ধুলো যথাক্রমে নয় এবং চার।

একথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন যে আমাদের সাহিত্য-প্রচেষ্টার ফসল তেমন উৎসাহবর্ধক নয়। প্রকাশক-সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে সেটা যেমন সুলক্ষণ, লেখক-সংখ্যা যে বাড়ছে না সেই দুর্লক্ষণের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন।

আমাদের সাহিত্যকাররা যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণের যোগ্যতা রাখেন তার পরিচয় পাওয়া গেছে, উপযুক্ত বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার মত বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্ট লেখক আছেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু তাঁদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার মত পরিকল্পনা-কুশল প্রকাশক কই? বহু যাত্রী-যাতায়াতে যে পথ মসৃণ, সেই মসৃণ পথে বিচরণের অভিলাষীর সংখ্যা অধিক, কঙ্করকঠিন পাথর কেটে প্রতিমা নির্মাণের উৎসাহ ও আগ্রহের অভাব আছে।

গ্রন্থ প্রকাশে পরিকল্পনা, নির্বাচন এবং নূতনত্ব যে সর্বপ্রধান লক্ষণীয় বিষয় একথা অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিস্মৃত হই। ফলে কোনো রকম পরিকল্পনা পূর্বাহ্নে স্থির না করে এলোপাথাড়ি 'যাহা পাই তাই খাই' নীতির পরিপোষক হিসাবে ভ্রমণ, স্মৃতিকথা, গোয়েন্দা-কাহিনী, রম্য-রচনা, খেলাধুলো, অনুবাদ, জীবনী, অর্থাৎ যখন যেটা সুবিধাজনক মনে হয় এবং পাওয়া যায় সেইটি ছাপার ফলে আজ বাংলার গ্রন্থকার, প্রকাশক ও পাঠক এক বিচিত্র চৌরাস্তায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। শুধু বাংলা গ্রন্থের পাঠক বৃদ্ধি হচ্ছে না এই কথা বলে আক্ষেপ করলে চলে না, পাঠক সৃষ্টি করার চেষ্টা করা চাই। চটকদার বিজ্ঞাপনের ফাঁকি কিছুদিন কিছু পাঠককে ঠকাতে পারে, দীর্ঘদিন ধরে সবাইকে ঠকাতে পারে না।

আজকাল সংকলন গ্রন্থ প্রকাশেরও একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং অধিকার যাঁদের আছে তাঁদের সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ সার্থক হয়েছে এবং সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়েছে, আর অজ্ঞ এবং অর্বাচীন সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। উপহার গ্রন্থ হিসাবে সুসম্পাদিত, সুমুদ্রিত শোভন সংস্করণ সংকলন গ্রন্থের বিশেষ চাহিদা আছে।

ভ্রমণ কাহিনীর সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, তার কারণ বিমান পথের প্রসারে পৃথিবীর দূরত্ব কমে গেছে এবং দ্বিতীয়তঃ ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে উপন্যাসের ভেজাল মিশেল হওয়াতে খাঁটি ভ্রমণ কাহিনী পাঠে যাঁরা আগ্রহশীল তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন, তৃতীয়তঃ সচিত্র সংস্করণ না হলে ভ্রমণ কাহিনীর কোনো মূল্যই থাকে না এটাও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বিষয় :	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	মোট
উপন্যাস	১০	৭	১১	৪	১১	১৬	৫	১৫	১৬	৫	৬	৭	১১৩
গল্প	৩	২	১	৪	৪	৪	৩	১	৪	৩	১	১	৩১
নাটক	—	—	২	৬	—	—	—	১	—	১	—	—	১০
স্মৃতিকথা	২	—	—	—	১	১	—	—	—	—	—	—	৪
প্রবন্ধ ও সমালোচনা	২	৩	৩	৫	৭	৬	৩	৪	৫	৫	৬	৪	৫৩
লঘু প্রবন্ধ ও রম্য-রচনা	২	—	২	১	২	৩	৩	১	২	২	১	১	২০
ভ্রমণ	১	১	—	—	—	২	—	—	—	—	১	—	৫
সংকলন গ্রন্থ	—	—	—	—	—	—	১	১	১	১	১	—	৫
কবিতা	১	১	৩	—	—	—	—	১	১	৫	—	১	১৩
অনুবাদ	—	—	—	—	—	৪	২	২	—	—	—	—	৮
শিশু-সাহিত্য	—	—	—	—	—	—	৯	—	—	—	—	—	৯
জীবনী	—	১	—	—	—	—	—	—	—	১	—	১	৩
খেলাধুলো	—	—	—	১	—	১	—	১	১	—	—	—	৪
													= ২৭৮

স্মৃতিচারণ ইদানীং কিঞ্চিৎ জন-প্রিয়তা অর্জন করেছে, তার কারণ আত্মজীবনী থেকে পাওয়া যায় সমসাময়িককালের ইতিহাস, কনফেসন বা আত্মকথা জাতীয় গ্রন্থও জনসমাদর লাভ করে যদি তার মধ্যে কিছু সত্য কাহিনীর মিশাল থাকে। তবু সারা বছরে স্মৃতিকথা বেরিয়েছে মাত্র চারখানি।

বাংলাদেশে চারটি বাঁধা রঙ্গমঞ্চ

আছে, তাছাড়া প্রতি পাড়া এবং সরকারী বা বে-সরকারী অফিসে আছে ড্রামাটিক রিক্রিয়েশন ক্লাব। সপ্তাহের এমন একটি দিন নেই, যেদিন কোথাও কোনো নাটক অভিনীত হচ্ছে না। তবু সারা বছরে প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা মাত্র দশটি। এর মধ্যে আবার উপন্যাসের নাট্যরূপ আছে। নাট্যকার পেশাদারি মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলে তাঁর নাটক মঞ্চে অভিনীত হওয়ার সম্ভাবনা কম, আর যে নাটকের মঞ্চে অভিনয় হয় না প্রকাশকরা তা ছাপতে নারাজ, ফলে উৎসাহী নাট্যকারের তেমন অভাব না থাকলেও বাংলাদেশে নাটকের যে দৈন্য ঘটেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

জীবনী গ্রন্থও বেরিয়েছে মাত্র তিনখানি, তার মধ্যে দুখানি ধর্মগুরুর জীবনী আর একটি সমাজ-শিক্ষক ফিরিঙ্গি যুবকের। জীবনী সম্পর্কে বাঙালী পাঠক যে উদাসীন একথা মনে করার কোনো হেতু নেই, কারণ, একাধিক জীবনী গ্রন্থ অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা দেখা গেছে, শুধু ধর্মগুরু নয়, শিক্ষাগুরু, রাষ্ট্রগুরু বা সাহিত্য-নায়কের আরো জীবনী প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

শিশু বা কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থের একান্ত অভাব। যে কয়খানি মাত্র শিশুমনোরঞ্জক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার কখানি যে শিশু উপযোগী তা বলা কঠিন। ফলে আজও বাংলা-শিশু-সাহিত্যের আসরে জাগ্রত আছেন উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায় প্রভৃতি। অথচ শুধু শিশু-সাহিত্যের ব্যবসা করেই যে কোনো প্রকাশক লাভবান হতে পারেন, শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ একটি বা দুটি সংস্করণের পর পুরাতন হয় না। টুনটুনির বই, বা ঠাকুরমার ঝুলির কটা সংস্করণ হয়েছে তা লক্ষ্য করার মত।

কবিতা গ্রন্থ প্রকাশও অসম্ভব রকম হ্রাস পেয়েছে। আগেকার দিনে সাময়িকপত্রের সম্পাদকরা রসিকতা করে বলতেন যে সম্পাদকের কাছে দুটি জিনিস অযাচিতভাবে আসে ঝুড়ি ঝুড়ি, একটি কবিতা আর অপরটি অমনোনীত রচনার ফলে নূতন লেখকের গালাগালি। পরীক্ষামূলক কবিতা এর জন্য আংশিক দায়ী হলেও, কবি এবং প্রকাশকরাও কম দায়ী নন, তাঁরা কবিতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিকল্পে যে পাঠক-সমাজ গড়ে তোলা প্রয়োজন সে পাঠকের জগৎ আজো অনাবিষ্কৃত রেখেছেন।

এই সূত্রে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বাংলায় নূতন গ্রন্থ প্রকাশ আশানুরূপ হচ্ছে না, বরং তুলনায় হয়তো দেখা যাবে আগের বছরের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং এখনই সেই সম্পর্কে কোনো একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা যদি না গ্রহণ করা হয়, তাহলে বাংলা গ্রন্থের বাজার বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং সেই সঙ্গে বিপন্ন হবে বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতি।

বিগত বছরটি সাহিত্যিকদের পক্ষে এক হিসাবে দুর্বৎসর। এই বছরের গোড়ার দিকে গেছেন রাজশেখর বসু, বৈশাখের ১৪ তারিখে, আশী বছর পার হয়ে একাশীতে পা দিয়েই বাংলার 'পরশুরাম' লোকান্তরিত হলেন। এর পর আষাঢ়ের শুরুতে মাত্র ৫৯ বছর বয়সে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু ঘটে। আধুনিক কাব্যে ক্লাসিক পদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথ স্মরণীয় হয়ে রইলেন। এই আষাঢ়েই আর একজন কবি লোকান্তরিত হয়েছেন শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। একদা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত তাঁর কবিতা প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রশংসা লাভ করেছিল। 'সচিত্র ভারতের' রাধেশ রায় ও মুরলীধর বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে দুটি প্রবীণ সাংবাদিকের তিরোধান ঘটল। শ্রাবণে পরলোকগমন করেছেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্মিণী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। সাহিত্য ও সংগীতে তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অগ্রহায়ণে কবি পরিমলকুমার ঘোষ বিগত হয়েছেন, রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের তিনি অন্যতম। ফাল্গুন মাসে গত হলেন বাংলা সাহিত্যিক সমাজের জনপ্রিয় নেতা অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। অগ্রণী চিন্তাশীল লেখক ও মানব-দরদী সমাজসেবক হিসাবে অতুলচন্দ্র গুপ্তের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। শিশু-সাহিত্যিক ও কবি প্রভাতকিরণ বসুর মৃত্যুও এই কালে ঘটেছে। চৈত্রে মৃত্যু হয়েছে নাট্যকার ও সাংবাদিক শচীন সেনগুপ্তের আর বৈশাখের শুরুতেই অকালে পরলোকগমন করলেন বিমলচন্দ্র সিংহ।

মৃত্যু যেমন সুনিশ্চিত তেমনই আকস্মিক এবং বেদনাদায়ক। সাহিত্যিক সমাজ এই সব মনীষীদের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত।

বারো মাসে তের পার্বণের মত সারা বছর নানাবিধ সাহিত্য সম্মেলন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ভাদ্র মাসে শরৎ-সাহিত্য সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী উৎসব উল্লেখযোগ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে এই সংস্থা সম্বর্ধিত করেন। নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন সম্মানিত করেছেন প্রমথনাথ বিশীকে তাঁর 'কিংশুক বাহু' কাব্যগ্রন্থের জন্য। পূজার পর আন্দামানে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৬১-র জানুয়ারীর শুরুতে বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন এবং বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হল। ফেব্রুয়ারী মাসে স্টীমারেও একটি সাহিত্য-সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে এই কথাই শুধু বলা যায় যে উৎসব হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে সঙ্গীত সম্মেলন হয় কিন্তু সাহিত্যিক মেলামেশার আনন্দ বা ভাব-বিনিময়ের সুযোগ-সুবিধা তেমন ঘটে না। সাহিত্য সম্মেলনের ব্যর্থতার এ এক কারণ।

সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে বোম্বাই শহরে এবং বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষে কলিকাতায় যে পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। আশা করি ভবিষ্যতে এই জাতীয় বই-মেলা আরো অনুষ্ঠিত হবে।

এই বছর সাহিত্য-আকাদেমী বাংলা সাহিত্যকে অবজ্ঞা করায় কিঞ্চিৎ মনোভঙ্গের কারণ ঘটেছে, কারণ এ অপমান কোনো ব্যক্তিবিশেষের অপমান নয়, এ অপমান সমগ্র বাঙালী সাহিত্যিক সমাজের অপমান। তবে দিল্লীর নরসিংহদাস পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী রাণী রায়। তিনি এ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা পুরস্কার পেয়েছেন আর শরৎ পুরস্কার পেয়েছেন মনোজ বসু। এছাড়া এ বছর শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন প্রমথনাথ বিশী এবং সৈয়দ মুজতবা আলী। মৌচাক পুরস্কার পেয়েছেন, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মিত্র-ঘোষ প্রকাশনীর পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং উল্টোরথ পুরস্কার পেয়েছেন কবি দীনেশ দাস। এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কবি সাঁ জাঁ পার্স। এই ৭৩ বৎসর বয়স্ক

কবির নাম আলেক্সিস লেগার। তাঁর 'এ্যানাবেস' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৪-এ, তখন থেকেই তাঁর কবি খ্যাতি। বিস্মৃত-প্রায় বাঙালী কবি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'সাগর সংগীতে'র কাব্যাদর্শের সংগে সাঁ জাঁ পার্সের কবিতার অপূর্ব সমর্মার্মতা আছে। 'এ্যান্ড কোয়াইট ফ্লোজ দি ডন' উপন্যাসের লেখক মিখাইল সলোকোভ পেয়েছেন সাহিত্যে লেনিন পুরস্কার। আর পেয়েছেন সাংবাদিক ভল্লাদিমির লেবডেভন 'ফেস টু ফেস উইথ আমেরিকা' নামক ক্রুশ্চেভের মার্কিণ সফরের বিবরণী রচনার জন্য। ১৯৬০-এর পুলিটজার পুরস্কার পেয়েছেন উপন্যাসেঃ 'এ্যাড-ভ্যাইস এ্যান্ড কনসেণ্টের' রচয়িতা এ. ড্রুরি। নাটকের পুরস্কার পেয়েছে ফিওরেলো লাগুয়ার্দিয়ার জীবনী উপলক্ষ্যে রচিত 'ফিওরেলো' গীতিনাট্য। ইতিহাসের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন, 'ইন দি ডেজ অব ম্যাক কিনলে' গ্রন্থের

> **এই বিভাগে প্রকাশিতব্য পুস্তক-সমালোচনার জন্যে দু'কপি করে বই আবশ্যক।**

লেখক মার্গারেট লীচ এবং জীবনীর জন্য পুরস্কার পেয়েছেন—এলিঅট মরিসন। গারেট মাটিংগুলির 'দি আর্মাডা' বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। 'লস এঞ্জেলস টাইমস' এবং 'নিউইয়র্ক টাইমস'ও পুলিটজার স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সাহিত্য-পুরস্কার 'প্রি গ'কুর' পেয়েছেন ভিনটিলা হোরিআ 'দিয়ু এ্যত নে অ' অক্সিল' (নির্বাসনে দেবতার জন্ম) নামক উপন্যাসের জন্য। মাদ্রিদে অবস্থানকালে হোরিআ এই উপন্যাসটি রচনা করেন।

কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন এবং কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র 'পদ্মশ্রী' রাষ্ট্রীয় সম্মানলাভ করেছেন।

উপস্থিত আমরা রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তির উৎসব প্লাবনে ভাসমান। রবীন্দ্র-নাথ বলেছিলেনঃ—

'কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না, ডেকো না সভা, এসো
এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।।'

কিন্তু এই উপলক্ষ্যে যে কাণ্ড ঘটছে তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সত্যই কতটুকু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি আর কোথায় তাঁকে অপমান করছি একথা চিন্তা করার প্রয়োজন। এই জন্যই বোধকরি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ—

'তারপরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা সূত্রে-গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে—
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।।'

একালের ধাঁধা

১। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েল্থ ত্যাগ করেছে এবং সাইপ্রাস কমনওয়েল্থে যোগদান করেছে। সবসুদ্ধ ১১টি কমনওয়েল্থের সভ্যদের নাম করুন।

২। SEATO জিনিসটা কি?

৩। মহাকাশ ভ্রমণকারীদের আমেরিকান ও রাশিয়ান নাম কি?

৪। প্রতিদিন এখন কত সংখ্যক জিনিস আমাদের ডাকবিভাগ বন্টন করে?

৫। আমাদের দেশের কয় জন বিখ্যাত মনীষীর জন্ম-শতবার্ষিকী এই বৎসরে হবে? এঁদের নাম করুন।

৬। কোন বিখ্যাত বাঙালী কবির বিখ্যাত কাব্যের প্রথম প্রকাশের শত-বার্ষিকী এই বৎসরের ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সালে হয়ে গিয়েছে। কেবল কাব্য প্রকাশের শতবার্ষিকী নয়, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের শতবার্ষিকীও এই বৎসর। কবির নাম ও কাব্য প্রকাশের সময় উল্লেখ করুন।

৭। পৃথিবীতে পরিবহণ ও ভ্রমণের যে কয়টি রেকর্ড এপর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে মানুষের সম্প্রতি মহাকাশ পরিক্রমাও একটি রেকর্ড বলে গৃহীত হয়েছে। পূর্বের তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রেকর্ড হচ্ছে—রবার্ট ফল্টনের সর্বপ্রথম স্টিমার পরিচালন, রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের এরোপ্লেনে প্রথম ওড়া ও মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করা। এগুলি কোন কোন বছরে হয়েছিল?

৮। রাশিয়া কর্তৃক মহাকাশে মানুষের পৃথিবী পরিক্রমার দ্রুত গতির রেকর্ড হচ্ছে—প্রতি ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইল এবং উচ্চতালাভ ১৮৮ মাইল। এই বর্তমান দ্রুতগতির রেকর্ড পূর্বকার রেকর্ড হতে কত বেশী?

[একালের ধাঁধার উত্তর অন্যত্র আছে।]

পার্থপ্রতিম

মনোজ বসু

সতীদাহ আমলের গল্প। সতীকে বোঝানো হচ্ছে : আগুনে বিষম কষ্ট, সে কষ্টের আন্দাজ নেই তোমার। সতী নিরুত্তরে ঘৃত-প্রদীপটা টেনে নিয়ে তার উপরে হাত রাখলেন। চামড়া পোড়ার উৎকট গন্ধ। সতী কিন্তু তাকিয়েও দেখেন না। হাসিমুখে অন্য হাতে কোলের শিশুটার গায়ে-মাথায় হাত বুলাচ্ছেন।

গল্প পড়ে পার্থ লাফিয়ে ওঠে। এই পথ। একালে সতীদাহ উঠে গেছে, কিন্তু মোটামুটি রেওয়াজটা রয়েছে। সর্বদেহে ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন ধরানো। মেয়েরাই করেন। শক্ত করে ন্যাকড়া জড়াতে পারলে ফল অব্যর্থ। নিভানোর জন্য যত দাপাদাপি কর, আগুন ততই লকলক করে উঠবে। আত্মীয়স্বজনের দিক দিয়েও সন্তোষের কারণ আছে। মৃত্যুর পরে যা-কিছু করণীয়, মানুষটা নিজেই সব সমাধা করে যাচ্ছে। পোড়া-দেহটুকু কেবল শ্মশানের নদীগর্ভে দিয়ে আসা। ঝঞ্ঝাট প্রায় কিছুই নেই।

ভেবে-চিন্তে সে দু-পয়সার এক মোমবাতি কিনে আনে। প্রক্রিয়া আগে একটু পরখ করবে। চোখ বুজে দাঁতে-দাঁত চেপে কড়ে-আঙুলটা জ্বলন্ত বাতিতে ধরেছে। উ-হু-হু—কী জ্বলুনি রে বাবা! ফোসকা উঠে গেল দেখতে দেখতে। শুধুমাত্র কড়ে-আঙুলে এই কষ্ট—আস্ত দেহখানা কী করে যে আগুনে দেয়! মেয়েরাই পারেন—কে বলে নারী অবলা!

আবার কয়েকটা দিন চুপচাপ। যথারীতি পার্থ দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছে। দিবারাত্রি ফাইফরমাস খেটে মাসিমার কিছু মন ভিজিয়েছে। আপন মাসি নয়, একটা-কিছু বলে ডাকতে হয় তাই মাসি। মাসিমার বোন থাকেন ডুয়ার্স অঞ্চলে, ভগ্নিপতি আসাম-লিংকের কোন স্টেশনে স্টেশনমাস্টার। মাসিমা তাঁদেরও লিখেছেন—পার্থকে চা-বাগানের কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারেন যদি। এর উপরে আরও সদয় হয়ে বিকালবেলা ছ-টা করে পয়সা বরাদ্দ করেছেন চা খেয়ে আসবার জন্য। দোকানে বসে পার্থ চা খায় এবং দোকানের খবরের কাগজে কর্মখালি দেখে দেখে ঠিকানা টোকে। সম্বল ক্রমশ প্রতিদিনের ঐ ছ-পয়সায় এসে ঠেকল। চা খাওয়া বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঠিকানা টুকতে যায় এখন দোকানে। বড়-ঘরের ছেলে—সর্বস্ব গেছে, কিন্তু চেহারাটা রয়েছে। খদ্দের না হয়েও খুব খাতির। চায়ের পয়সায় ডাক-টিকিট কিনে দরখাস্ত ছাড়ছে। ক্লাসের ইতর-বিশেষ নেই। গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগের কথা আছে—সেই মহা-সাধনায় পার্থপ্রতিম বছর দেড়েক ধরে লেগে রয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন শ্মশানঘাটে গিয়ে পড়ল। মরণের পর নদীর কিনারে সম্ভবত এই বটের ছায়ায় এনে নামাবে। জীবনকালে এখনও গুঁড়ির উপরে চুপচাপ বসে থাকতে মন্দ লাগে না। নদী-শোভা দেখতে দেখতে আবার এক মতলব মাথায় আসে। আগুনে যন্ত্রণা বটে, কিন্তু নদীর ঠাণ্ডা জল অত্যন্ত আরামের।

সে রাত্রে থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। কম্বলের নীচে থেকে উঠে পার্থ বেরিয়ে পড়ল। টনসিলের দোষ—ছাতা একটা না নিয়ে আসা ভুল হয়েছে। গায়ের র‍্যাপারটা গলায় জড়িয়ে নেয়, গলদেশ গরম থাকলে টনসিলে কায়দা করতে পারবে না। পুলের উপর উঠে—কোন রকম ইতস্তত

নয়—হাত-পা ছেড়ে ঝুপ করে জলে পড়ল।

কনকনে নদীজলে অসাড় হয়ে গিয়ে, ভেবেছিল, সোজা একেবারে পাতালপুরী। পাতালবাসিনী রাজকন্যার অতিথি—বেকার হওয়া সত্ত্বেও নিখরচায় ঘি-মাখন খাবে, দুধে আঁচাবে। ঠিক উল্টো। বাঁচবার উত্তেজনায় পলকের মধ্যে সর্বদেহে যেন আগুন ধরে গেল। কিশোর-বয়সে পূর্ববাংলায় তাদের সাগরগড়ের দীঘিতে কোনাকুনি কত পাড়ি দিয়েছে। সেই অসুরের শক্তি ফিরে আসে হঠাৎ। সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠে পড়ল।

ডাঙায় উঠে শীতে কাঁপে, আর হায়-হায় করে মনে মনে। সাঁতার জানাটাই কাল হল। এক হতে পারত গলায় কলসি বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু কপালখানা যে রকম—কলসিতে হয়তো জলই ঢুকল না। কিম্বা ঝাঁপ দেবার মুখে ভেঙে গেল কলসি। তা ছাড়া এই আধা-শহর জায়গায় দুর্যোগ যত বড়ই হোক, লোক-চলাচল একেবারে বন্ধ হয় না। একটা মানুষ আয়োজন করে গলায় কলসি বাঁধছে, মজা দেখতে ভিড় জমে যেত।

মোটের উপর হল না কিছুই—ভিজে ঢোল হয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে পার্থ বাসায় ফিরল। আর যে ভয় ছিল—টনসিল বিগড়ে এখন থেকেই গলা খুশখুশ করছে। শেষরাত থেকে কাশি। মেসোমশায় উকিল মানুষ—ভোর থাকতে উঠে বইপত্র ঘেঁটে আরজির মুশাবিদা করেন। পাশেই কাছারিঘর, সেখান থেকে তিনি ক্ষেপে ওঠেন : আচ্ছা কেশোরোগির পাল্লায় পড়া গেল। কাজকর্ম করতে দেবে না। বলি, বিদায় হচ্ছ কবে? চাকরি হল না হল জানিনে, এই মাসের মধ্যে বাসা ছেড়ে চলে যাবে। আমার পাকা হুকুম। বাড়ির মধ্যে প্যানপ্যান করে হুকুমের রদ হবে না। এইটে জেনে রেখে দাও।

নতুন মাসের মাঝামাঝি এখন। হপ্তা দুয়েকের মতো সময় আছে। খবরের কাগজে পার্থ ইদানীং কেবল কর্মখালি দেখে না, দুর্ঘটনার কলমেও চোখ বুলায়। হাসফিলের রকমারি আত্মহত্যার খবর। একটা জিনিস প্রায়ই চোখে পড়ে—ইঞ্জিনে কাটা পড়া। বিজ্ঞানের যুগে, মনে হচ্ছে, ইঞ্জিনের কদরটাই সকলের বেশি। বাসা থেকে পঞ্চাশ কদম গিয়েই রেললাইন। ছোট লাইন, ইঞ্জিনও ছোট—কিন্তু একটা মানুষ কাটা পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। পদ্ধতিটা চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই।

অষুধপত্র [illegible] কাশিটা কিছু আরাম হয়েছে। [illegible] নেই সেদিন [illegible] আকাশ মেঘে [illegible] অন্ধকার। জলকাদা [illegible] বিস্তর কষ্টে পার্থ রাস্তা [illegible] স্লিপারের উপর সটান [illegible] একদিককার পাটিতে মাথা রেখে। লাইনের ভিতর জল জমে আছে, পাটির নিচে জল বেরিয়ে যাবার নালাটুকু জঞ্জালে বুজে গেছে। কাজকর্ম কেউ কিছু করে নাকি আজকাল—সবাই ফাঁকিবাজ। এ যেন ক্ষীরোদ-সমুদ্রে নারায়ণের শয়নের মতো হল। কিন্তু নারায়ণ দেবতা বলেই পারেন, পার্থ একবার শুয়ে তখনই উঠে পড়ল। লোহার পাটির উপর উবু হয়ে বসেছে। এসে পড়ুক ট্রেন, টুক করে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়বে।

লাইনের এখানটা বাঁকচুর নেই, টানা সরলরেখা। ইঞ্জিনের আলো দেখা দিল দূরে। ছোট্ট আলো—নক্ষত্রের মতো। কাঁপছে, বড় হয়ে উঠছে। কাছে—আরও কাছে এসেছে, তীব্র আলোয় যেন দিনমান। প্রাগৈতিহাসিক কালের অতিকায় এক সরীসৃপ হুঙ্কার দিয়ে ধেয়ে আসছে। লাফ দিয়ে চক্ষের পলকে পার্থ লাইনের বাইরে এসে পড়ে। গড়াতে গড়াতে চলে যায় বর্ষার জলে ভরভরন্ত নয়ানজুলির ধারে কচুবন অবধি। গাড়ি হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল—তখন নিঃসংশয় হল, বেঁচে আছে সে। হার এবারও। শেষ মুহূর্তে কী রকমটা হয়ে যায়, এতকালের কষ্টেসৃষ্টে লালন-করা দেহপ্রাণের উপর মমতা উথলে ওঠে। হাত দুটো নুলো এবং পা দুখানা পঙ্গু হলেই রেলে কাটা পড়া চলে। শক্তসমর্থ মানুষ ইঞ্জিনের মুখে কেমন করে পড়ে থাকে, কে জানে। পার্থ অন্তত পারবে না।

মাস ওদিকে দ্রুত শেষ হয়ে আসে। কিন্তু ততদিনও সবুর সইল না। মেসোমশায় ডেকে পাঠালেন : শ্যালী-ভায়রাভাই সব এসে পড়ছেন। জায়গার অনটন বুঝতেই পারছ, তাড়াতাড়ি অন্য জায়গা খুঁজে নাও। দু-একদিনের মধ্যে।

ডুয়ার্সের স্টেশনমাস্টার পার্থকে কোথায় ডেকে পাঠাবেন,—তা নয়, নিজেরা এসে পড়ে উৎখাত করছেন। পুরানো ভৃত্য নীলমণির সঙ্গে সে একঘরে শোয়। রাত্রিবেলা ভাত হোক না হোক, আফিমের গুলি গোটা পাঁচেক চাই-ই নীলমণির। আফিমের পরে দুধ। না দিলে চুরি করে অথবা জবরদস্তি করে খাবে। তার পরে চোখ বুজে ঝিম হয়ে থাকে। শতমুখে সে আফিমের মাহাত্ম্য শোনায়। এমন নেশা ইন্দ্রলোকেও বুঝি নেই। উপকারও বিস্তর। সাপে কামড়ালে [illegible] মরবে, নীলমণির কিছু [illegible] ইয়ে অশেষ যত্নে এই [illegible] রপ্ত করেছে। অন্য [illegible] এই পরিমাণ মুখে পুরলে—[illegible] বন্ধ করে বসে আছে, সে [illegible] খুলবে না।

[illegible] পার্থেরও পাঁচটা গুলি [illegible] তাড়াতাড়ি, মেসোমশায় যেমন [illegible] দিলেন—দু-চার দিনের মধ্যে। পাঁচ [illegible] ডবল, দশটা। ডবল ডোজ চাপালে আরও নিশ্চিন্ত। জলের নিচে দম আটকে ছটফটানি কিম্বা ইঞ্জিনের চাকায় হাড়ে-মাংসে মশলা-পেশা নয়, চোখ বুজে বুঁদ হয়ে নন্দনকাননে মনে মনে চরে বেড়ানো। কিন্তু মুশকিল হল, আফিমটা কেউ বিনামূল্যে দান করবে না—নগদ খরচার ব্যাপার। তারও জোগাড় হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। কাছারিঘরের মেজেয় একখানা দশ টাকার নোট। ঈশ্বর সদয় এবারে—বোঝা যাচ্ছে, টাকাটা তিনিই জুটিয়ে এনে দিলেন।

আবগারির দোকানে ছুটল। পয়সা দিয়ে মাল কিনতে এত বখেড়া কে জানত! লোহার রডের অন্তরাল থেকে লোকটা হাত বাড়িয়ে বলে, লাইসেন্স? বিনা লাইসেন্সে চাংড়ামি করতে এসেছ—এইটুকু ছোকরা মৌতাতের অভাবে মারে যাচ্ছ একেবারে! পালা, পালা—দোকানের মধ্যে ঝামেলা করিসনে।

তাড়া খেয়ে মুখ চুন করে পার্থ বেরিয়ে আসে। আর একজন তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছে। সমবেদনার সুরে সে বলে, পাজি লোক! ঠিক সময়ে না হলে জান বাঁচায় নাইক। ব্ল্যাকে আফিম জোগাড় করা যায়। দুটো-চারটে পয়সা বেশি নেবে, কিন্তু পয়সা তো জীবনের চেয়ে বড় নয়।

ব্ল্যাক কোন বস্তু, পার্থ প্রথমটা বুঝে উঠতে পারে না। লোকটা আরও অবাক : আকাশ থেকে পড়লে না বিলেত থেকে এলে? সাদা-বাজারের কাজকর্ম কতটুকু, ব্ল্যাকেই তো চলছে আজকাল সব।

নিয়ে গেল সেই ব্ল্যাকের জায়গায়। গরু-মহিষের খাটাল। মালিক নিজে আফিমখোর, পরহিতার্থেও কিছু কিছু রাখে। চেনা খদ্দের সব—তারা আফিম কেনে, আর অনুপান হিসাবে দুধ কিনে নেয়। আধ-ভরি মাল চাই—উঁহু, তার কমে হবে না। দশ টাকাই লেগে গেল। দমকা খরচ—যাকগে, এই সন্ধ্যেরাতটুকু কেটে গেলে কোনদিন কখনো আর আধেলা পয়সার খরচা নেই।

পোকার মুখে দুকপাত না করে সমস্তটুকু খেয়ে নিল। সামান্য তিতো,

স্বাদ নিতান্ত খারাপ নয়। আলসে চোখ জড়িয়ে আসে। দুনিয়া খারাপ নয়, কিন্তু ফুলের মধ্যে পোকার মতন মানুষগুলো বেয়াড়া। মানুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেল এইবার। মৃত্যুর মুখে চোখ বুজে পার্থ এখনি কত কি ভাবছে......

মরে গেছে, এই অবধি জানা। সকালবেলা ধড়মড়িয়ে উঠল। রক্তচক্ষু মেসোমশায় দুর্দান্ত কিল ঝাড়ছেন : চোর শয়তান মনের ভুলে নোটখানা ফেলে গিয়েছি, অমনি সেটা গাপ করেছ?

পার্থ হতভম্বের মতো চেয়ে থাকে। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে যায়। মরেইতো গিয়েছিল, মেসোমশায়ের কঠিন হাতের কিল মৃতসঞ্জীবনী হয়ে প্রাণ ফিরিয়ে আনল।

সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল, আমি কেন নিতে যাব? আমি চক্ষেও দেখিনি।

মেসোমশায় আবার ধেয়ে আসেন তার দিকে : চুরি, তার উপরে মিথ্যে-কথা! তুমি নাওনি—দশটাকার নোটের তবে পাখনা বেরিয়েছিল, পাখনা বের করে ফুরফুর করে উড়ে গেল? জেলে পাঠিয়ে তোমায় শিক্ষা দেব, সামান্য বলে ছেড়ে দেব না।

নীলমণিকে হুকুম করলেন : ঘরে নিয়ে পোর নীলমণি। শিকল দে বাইরে থেকে। না যেতে চায়, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবি। পুলিশ নিয়ে আসছি আমি।

ঐ যে জেলের কথা হল, তারপরে পার্থর অন্য কিছু কানে ঢোকে না। তাড়িয়ে মেসোমশায় সঙ্গে সঙ্গে অমনি সুরাহা করে দিচ্ছেন। দালানে বসবাস, নিখরচায় খাওয়া-দাওয়া—সদাশয় সরকার বাহাদুরের এমন পাকা বন্দোবস্ত থাকতে কেন আহাম্মুকের মতন মরতে যাচ্ছিল! কতদিন থাকতে দেবে তাই এখন ভাবনা। ছোট মামলা—কিন্তু দুঁদে ফৌজদারি উকিল মেসোমশায় চেষ্টা করে মেয়াদ কিছু বাড়াতে পারবেন না?

নীলমণি টেনে-হিঁচড়ে ঘরে পুরবে কি, পার্থ নিজেই ঢুকে পড়ে থানা-ওয়ালাদের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু কোথায় ছিলেন মাসি, হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়লেন : দশটা টাকা তো? আমি নিয়েছি—কী করবে কর। যাও কেন ফেলে? যেমন ফেলে যাও তেমনি।

সামুদ্রিক সর্বপ্রাণীর ত্রাস হল তিমি। শোনা যায়, আর এক প্রাণী আছে—তিমিঙ্গিল, তিমি থরহরি কম্পমান তার ভয়ে: বাগে পেলে কোঁৎ করে আস্ত তিমি গিলে ফেলবে। মাসিমা হলেন তাই। দুর্ধর্ষ উকিল মেসোমশায় হুঁ-হুঁ করে অস্পষ্টভাবে কী সব বলে সুড়সুড় করে সরে পড়লেন।

এ সুযোগও ভেস্তে গেল অতএব। হায় মাসি, তোমার জন্য এত খেটে মরি—তুমিই শেষটা এই করলে! ইতিমধ্যে মাসিমা একবাটি গুড়-মুড়ি এনে হাতে ঠেসে দিচ্ছেন : খাও—

সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে মোলায়েম কণ্ঠে বলেন, এবারে তোমার হয়ে যাবে উপায়। ছুটি নিয়ে জামাই-বাবুরা এসে যাচ্ছেন। নমিতা সেয়ানা হয়ে পড়েছে, এখানে থেকে বিয়ের বন্দোবস্ত করবেন। অত দূরে থেকে হয় না। সামনাসামনি কথাবার্তা বলব। জামাইবাবু নিজেই এক চা-বাগান কিনেছেন। গোটা দুই ভাল স্টেশন ঘুরেছিলেন, সেই সময়টা রোজগার করে নিয়েছেন। এখন বেনামিতে কিনে রাখলেন, রিটায়ার করবার পর চেপে বসবেন। তদ্দিন খাঁটিলোক চাই একজনা—

পোড়া বোলমাছ শনির প্রকোপে খলবল্ল করে জলে পালিয়ে যায়। পার্থরও হয়েছে তাই, কোন-কিছুতে নির্ভর করতে পারে না আর এখন। জুয়াচোর খাটালওয়ালার উপর রাগে গরগর করছে। গালে চড় মেরে দশ দশটা টাকা নিয়ে নিল। অন্তত গোটা-কয়েক শক্ত কথা না শুনিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছে না। বিকালের দিকে একসময় পার্থ বেরিয়ে পড়ল।

গাই দোওয়া হচ্ছে সামনের দিকে, রকমারি পাত্র হাতে নানান লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। তাদের পাশ কাটিয়ে পার্থ সোজা খোপের মধ্যে মালিকের কাছে গিয়ে পড়ল।

কী আফিম দিয়েছিলে? সমস্তটা খেয়ে ফেললাম, দিব্যি তবু বেঁচে রয়েছি।

মালিক একগাল হেসে বলে, বাঁচবেন না কেন! বেঁচেবর্তে থেকে নেশাভাং আমোদ-ফুর্তি করুন, দুনিয়া ভোগ করে যান। কাঁচা বয়সে মরাছাড়ার কথা ভাল শোনায় না।

পার্থ বলে, ভেজাল আফিম গছিয়ে দশটা টাকা মেরে দিয়েছ তুমি।

মালিকের সাফ জবাব : নিজের ক্ষেত থেকে এনে দিইনি—ষোলআনা খাঁটি, হলপ করে বলি কি করে? মালখানা থেকে অল্পসল্প করে সরায়, খদ্দের সঙ্গে সঙ্গে কার্কাচলের মতো এসে পড়ে। তা বাবু, চোখ গরম কিসের জন্ত! সাচ্চা হলে আপনি চোখ উলটে পড়তেন, আমার হাতে তখন দড়ি পড়ত।

উত্তপ্ত কণ্ঠে আবার বলে, ঝামেলা করবেন না। আমি সাফ বেকবুল যাব, দুধ ছাড়া অন্য কিছু বেচিনে। ব্যস, হয়ে গেল।

গাই দোওয়া সারা হয়ে দুধ মাপা-মাপি হচ্ছে ওদিকে। বচসা দস্তুরমতো। কেউ বলে, মাপে কম। কেউ বলে, স্রেফ গ্যাজলা দিয়ে মেরে দিলে। কেউ বলে, বাঁটের মুখে নিফুটি সাদা জল বেরোয় কি করে, কী খাওয়াও বল দিকি? গোয়ালারও কাটা-কাটা জবাব : না পোষায়, নিও না। পায়ে ধরে কে সাধছে?

পিছনে খানিকটা দূরে দুটো পিতলের বালতি। আধাআধি জলে ভরতি। সুযোগক্রমে এই জল সম্ভবত দুধ হয়ে উঠবে। বালতি তো বালতিই সই। পার্থ দু-হাতে তুলে নিল দুটো। বালতি হাতে হন-হন করে চলেছে।

কী আশ্চর্য, দেখে না কেউ তাকিয়ে! কলহ নিয়ে মত্ত। পার্থ তখন হুড়হুড় করে বালতির জল ঢেলে ফেলল। এবারে নজর না পড়ে উপায় নেই।

বালতি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? সত্যি সত্যি ভেগে পড়ে যে! ধর্, ধর্—

পার্থ দৌড়চ্ছে। লোক-দেখানো একটু না দৌড়লে চোর বলে মানবে কেন? গোয়ালা এসে ক্যাক করে টুঁটি চেপে ধরল। হয়েছে, এবারে হয়েছে। এ জায়গায় মাসিমা নেই, নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ হাসিল হবে।

কোথায় নিয়ে চললে?

যমের বাড়ি।

পার্থর হাসি পেয়ে যায় : বড় দুর্গম ঠাঁই। অনেক চেষ্টা করেছি, মোকামে পৌছতে পারি নি। তার চেয়ে কনেস্টবল ডেকে জিম্মা করে দাও।

নয়তো আর সুখ হবে কিসে? হাতে আধুলি গুঁজে দিয়ে সরে পড়বে। পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলি তো আগে, পরের বিবেচনা মালিকের। মালিক যা করেন।

টেনে নিয়ে ফেলল সেই খোপের সামনে, মালিক যেখানে বিরাজ করছে; দুধের খদ্দের লোকগুলোও রে-রে করে ছুটেছে : মারামারি কিসের? কী হয়েছে?

চোরে বালতি নিয়ে পালাচ্ছিল।

পার্থকে ভাল করে দেখছে সকলে। কষ্টে অযত্নে গৌরবরণ মুখ তামাটে হয়ে গেছে। তবু যে ভালঘরের ছেলে, সেটা লুকানো যায় না। বচসার ব্যাপারে মনে মনে তারা গজরাচ্ছিল, এবারে কারদা পেয়ে গেল।

ভদ্দরলোকের ছেলে দিনদুপুরে বালতি চুরি করতে এসেছে—চালাকির জায়গা পেলে না!

এত লোকের গর্জনে মালিক প্রমাদ গণে : জিজ্ঞাসা করেই দেখুন না। সামান্য ব্যাপারে উনি কি মিথ্যেকথা বলতে যাবেন?

পার্থ বলে, চুরি করেছি, সত্যিকথা। দিক জেলে পুরে।

জনতার একজন কথা কেড়ে নিয়ে বলে, জেল সোজা নয় অত। মাকড় মারলে ধোকড় হয়। বালতি না হয় হাতে করে তুলেছিলেন—আর ওরা এই যে ওজনে কম দেয়, পানাপুকুরের জল মেশায়, হরেক রকম চোরা ব্যবসা করে। কোনটা অজানা আমাদের? ওদের তবে তো নিত্যি দু-বেলা জেল হওয়া উচিত।

ভীত খাটালওয়ালা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে চায় : আরে দূর, কী হয়েছে! চলে যান আপনি বাবু। বর্তন থাকে তো আনুন, এক সের দুধ দিয়ে দিচ্ছি। দাম লাগবে না। বর্তন নেই তো ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিন। জল-দেওয়া দুধের চেয়ে কাঁচায় আরও সোয়াদ ভাল। দেখুন না খেয়ে।

চার চারবারের চেষ্টাতেও যমালয়ের দরজা খোলে না। তখন মাঝামাঝি একটা রফা করে নিচ্ছিল, জেলে গিয়ে থাকবে—তা-ও ভেস্তে গেল। মনের দুঃখে এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরে বেশ খানিকটা রাত্রি করে পার্থ বাসায় ফিরল। মাসিমা একেবারে মুকিয়ে ছিলেন। ইদানীং বিষম ভাল হয়ে গেছেন তিনি। কণ্ঠে মধু ঝরছে।

গিয়েছিলে কোথা বাবা? ওঁর অমনি আলগা মুখ—ওসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে! আমি ঘর-বার করছি—ছেলেমানুষ রাগের বশে একমুখো বেরিয়ে পড়লই বা!

বলেন, জামাইবাবুরা এসে গিয়েছেন। নাকি চিঠি দিয়েছিলেন, সে চিঠি এসে পৌঁছয়নি। তোমার সম্বন্ধে কথাবার্তাও অনেক হল। জামাইবাবুর চা-বাগান তোমাকেই দেখেশুনে গড়ে-পিটে তুলতে হবে। বাগানের অর্ধেক তোমার নামে লেখাপড়া করে দেবেন।

পার্থ অবাক। মাসিমা একেবারে অর্ধেক রাজত্বের বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। গল্পে আছে, রাজহস্তী পথের মানুষ শুঁড়ে তুলে এনে সিংহাসনে বসাল, সেই ব্যাপার।

আরও আছে। অর্ধেক রাজত্বের উপরে রাজকন্যা। মাসিমা বলছেন, নমিতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জামাই করে নেবেন তোমায়। শুধু ছেলে দেখেই দেবেন। বাড়ি-ঘরদোর বাপ-মা আত্মীয়জন থাকলে সে জামাই শ্বশুরের ন্যাওটা হয়ে কাজকর্ম করবে না। দিদিকে বললাম, আমাদের পার্থর মতন চালাক-চতুর সৎ ছেলে কলিকালে হয় না। রাজি করিয়ে ফেলেছি। এখন ওঁরা শুয়ে পড়েছেন। সকালবেলা নমিতাকে দেখো, ওঁদের মুখেই শুনো সমস্ত।

কখন সকাল হবে, নিদ্রার অবসান হয়ে ডুয়ার্সের মানুষ কটি বাইরে আসবেন—পার্থর মোটে সবুর সইছে না। অবশেষে উঠলেন তাঁরা, আলাপ-পরিচয় ও কথাবার্তা হল। ঠিক কনে দেখার মতো না হলেও নমিতাকে একনজর দেখে ফেলল আড়চোখে।

তারপরে পার্থ মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সম্ভ্রান্ত স্টেশনারি দোকান—'রকমারি ভাণ্ডার'। একদঙ্গল মেয়ে এসে কেনাকাটা করছে। চুরি করবে পার্থ এখানে। অশিক্ষিত খাটালের লোক থানা-পুলিশে ভয় পায়, শাস্তি নগদ-নগদ সেরে বিদায় করে। এরা কখনো আইনের বাইরে যাবে না। নেবেও একটা কোন ভাল জিনিস, যার জন্য সহজে নিষ্কৃতি দেবে না। কিন্তু তেমন জিনিস কোথায় হাতের কাছে? কাউন্টারে সব সস্তার মাল। পেরেক পুঁতে করেকটা টর্চলাইট ঝুলিয়ে রেখেছে, এই যা-হোক কিছু দামি ওর ভিতরে। একটা টর্চ খুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। দেখে পকেটে পোরে। খুব ধীরে-সুস্থে পুরছে। তাতে কাজও হয়েছে। একটা মেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখে ফেলল। পাড়ার ডাক্তারবাবুর মেয়ে। নাম, যতদূর জানে, রেখা। পকেটের ভিতর দিয়ে টর্চের মাথার দিককার চেপটা অংশ বেরিয়ে আছে। কিন্তু আসল মানুষ সেলসম্যানটি যে তাকিয়েও দেখে না। ছোকরা মানুষ তো—মেয়ে-খদ্দের নিয়ে খুব ব্যস্ত।

আশায় আশায় তবু পার্থ দোকান ছেড়ে বাইরে যায় না। কেনাকাটা সেরে মেয়েগুলো বিদায় হল অবশেষে। কী আশ্চর্য, পার্থ যেন মাছি-পিঁপড়ে—চোখ তুলে তাকাবে না তার দিকে। কাউন্টারের যেসব জিনিস খালি হয়ে গেল, ভিতর থেকে এনে এনে সাজাচ্ছে। টর্চের দিকটায় তাকিয়ে একজনকে ধমকে ওঠে : কী রকম কাজকর্ম তোমার শুনি? টর্চ রেখেছ তো ব্যাটারি রাখনি। টর্চ কিনলে তার সঙ্গে ব্যাটারি চাইবে না? কোথায় আছে, তখন খুঁজে বেড়াও।

লোকটা টর্চের কাছে ব্যাটারি এনে রেখে গেল। পার্থ মুঠো ভরে ব্যাটারি তুলে নেয়। এবারে তো একটিমাত্র মানুষ—ভাগ্যবশে যদি নজরপাত হয়। কিছু না, কিছু না। তখন পার্থ উত্তপ্ত হয়ে ছোকরার সামনাসামনি দাঁড়ায় : হাতের কাজ সেরে নিন। একটা কথা বলব আপনার সঙ্গে।

ছোকরা সসম্ভ্রমে আহ্বান করে : ভিতরে বসবার জায়গা আছে। আসুন না, চলে আসুন।

দিব্যি চেয়ার-টেবিল পাতা, সেইখানে এনে বসাল। বলে, কী আনব বলুন—গরম চা না ঠাণ্ডা সরবত?

গুরুঠাকুরের শুভাগমন হয়েছে যেন। পার্থ তিক্ত-কণ্ঠে বলে, কী রকম ব্যবসা করেন! গোটা দোকান যদি লোপাট হয়ে যায়, চোখ তুলে দেখবেন না?

অপরাধীর ভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু কণ্ঠে ছোকরা বলে, সত্যি কিছু হয়েছে নাকি?

রাগে রাগে পার্থ পকেটের টর্চ বের করে মুখের উপর ধরল : এই টর্চ নিয়েছি। তারপরেই ব্যাটারি এনে রাখলেন। টর্চ নিলেন তো ব্যাটারিও নিয়ে নিন, তেমনি যেন ব্যাপার। ব্যাটারিও নিলাম পাঁচ-পাঁচটা—

ছোকরা নিরীহভাবে বলে, দরকার হয়েছে নিশ্চয়। পথে তো এখানে আলো দেয় না—ঘুরঘুট্টি আঁধারে ঘুরতে হয়, সেই জন্যে নিয়েছেন।

পার্থ বলে, তবে আর কি! টর্চের দরকার, নিয়ে নিয়েছি। যাদের রুমালের দরকার, পাউডারের দরকার, ফিতের দরকার, নিয়ে যাক ব্যাগ ভর্তি করে। সাইনবোর্ডটা মুছে, তাহলে লিখে দিন, 'সদাব্রত ভাণ্ডার'।

জিভ কেটে ছোকরা বলে, কীটানুকীট আমরা। সদাব্রত করবার লোক কিসে হবে? খদ্দের আপনি—দামই দেবেন। সুবিধা মতো দিয়ে যাবেন।

দাম দেবার জন্য নিইনি। চুরি করেছি। চোখের উপরের চুরি ধরতে পারেন না। ব্যবসা চালান কি করে?

ছোকরা হেসেই খুন। পার্থ বলে, হাসছেন যে বড়?

আপনার কথা শুনে। চুরি করে কেউ কখনো তা বলতে যায়? চোর হলে ঠিক ধরতে পারি। কত ভাগ্যে আমাদের দোকানে পায়ের ধুলো পড়েছে। আবার বলছেন, চুরি করেছি।

চেনেন নাকি আমায়? কিন্তু কই আমি তো ঠিক—

আমরা কি চেনবার যুগ্যি? উঠতি গঞ্জে দোকান সাজিয়ে আজকেই না হয় দুটো পয়সার মুখ দেখছি। আমাদের মতন দশখানা গাঁয়ের মানুষ কত নিয়েছে খেয়েছে আপনাদের সাগরগড়ের বাড়িতে।

ব্যস, তাবৎ আশা-ভরসার ইতি। এখন ছোরাছুরি মেরে সমস্ত দোকান লুঠ করে নিয়ে গেলেও এই ব্যক্তি রা কাড়বে না। টর্চ ছুঁড়ে দিয়ে পার্থ বেরিয়ে পড়ল।

এইবারে সর্বশেষ চেষ্টা। পার্থ সোজাসুজি থানায় গিয়ে উঠল। আজে-বাজে মানুষ নয়, খোদ ও, সি, অর্থাৎ বড়বাবুকে ধরবে।

রাইটার-কনস্টেবল খইনি টিপছিল : কী দরকার বড়বাবুর কাছে?

পার্থ বলে, সেখানেই বলা যাবে।

ফালতু লোকের সংগে বড়বাবু দেখা করেন না। দরকার লিখে স্লিপ পাঠাতে হবে।

চুরির ব্যাপার—

সে তো ঐখানে লেখা হচ্ছে। বেঞ্চির উপর ওদের পাশে গিয়ে বসে পড়ুন।

একগাদা মানুষ। এক একজন করে বলছে, ছোটবাবু লিখে নিচ্ছেন। বড়বাবু অতএব আছেন নিশ্চয় কামরার ভিতরে। কাজকর্মে এমন নিষ্ঠা নয়তো সম্ভব না।

পার্থ যখন অনুগ্রহ চায় না, বরঞ্চ উল্টো—সে কেন স্লিপ পাঠিয়ে খাতির দেখাতে যাবে। দরজা ঠেলে কামরার ভিতর ঢুকে পড়ল। বড়বাবু ঘাড় হেঁট করে কি লিখছিলেন, ভ্রূকুটি দৃষ্টিতে তাকালেন। আরও উত্তেজনার কারণ, পার্থ ধপাস করে বসে পড়েছে সামনের চেয়ার টেনে নিয়ে।

কী চাই?

চুরি—

ওসবের জন্য ছোটবাবু আছেন তো বাইরে। কেউ বলেনি?

ডায়েরি করতে আসিনি। চুরি করেছি আমি নিজে। চাক্ষুষ সাক্ষিও আছে। ডাক্তারবাবুর মেয়ে রেখা।

বড়বাবুর নয়ন বিস্ফারিত হয়ে রইল : চুরি করে এসে ধরা দিচ্ছ। নিজের আসতে হল—যাদের মাল চুরি করলে তারা কি করছে?

পার্থ হেসে বলে, কেউ এগোতে চায় না। একটা মানুষ জেলে ঢুকে যেটুকু কষ্ট পাবে, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট তাকে জেলে ঢোকানোর হাংগামায়।

তোমারই বা মাথাব্যথা কেন তবে?

প্রবীণ বহুদর্শী ব্যক্তি, পার্থর মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কী ভাবলেন। মাথা নেড়ে বললেন, বুঝলাম। খাটতে চাও না, জেলে গিয়ে মজা করে নিখরচায় সরকারি খানা সাঁটবে।

পার্থ সকৌতুকে চেয়ে আছে। স্বর ক্রমেই উগ্র হচ্ছে বড়বাবুর : অপদার্থ! যা-কিছু করবার, লোকে বয়স থাকতে থাকতে করে নেয়। শরীরে সামর্থ্য থাকবে না, নড়তে-চড়তে কষ্ট হবে, লম্বা বিরামে জেলে পড়ে থাকবার সময় তখন। জেল আছেও সেই জন্যে। কাজকর্ম না করে শুধু যদি জেলের ভরসায় থাক, গভর্ণমেণ্ট ফতুর হয়ে যাবে যে!

কী ধরনের কাজকর্ম, বুঝতে পার্থের দেরি হয় না। হঠাৎ বড়বাবু সুর বদলে বললেন, কি চুরি করলে?

টর্চ একটা।

জিনিসটা কি রকম—দেশী না বিলাতি? হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখি—

জিনিস ফেরত দিয়ে এসেছি।

ফেরত দিয়ে ইয়ার্কি করতে এসেছ থানায়?

বড়বাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন : বেরোও, বেরিয়ে পড় এক্ষুণি। সহজে না গেলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করব। জেল মামার বাড়ি কিনা—গিয়ে অমনি পড়লেই হল!

অনেক বেলায় বিরস মুখে পার্থ বাসায় ফিরল। অনুমান হয়, তার অদর্শনে বাড়িতে রীতিমত তোলপাড় পড়েছিল।

মাসিমা বললেন, ঠাকুরমশায় এসে দিন দেখে দিলেন। ভাদ্দর মাসে এর পরে অকাল পড়ে যাবে। বিয়ে আজকেই।

বজ্রাহত পার্থ বলে, সে কী! শুভস্য শীঘ্রম্—সে অবিশ্যি ভালই। কিন্তু আমি যে খেয়েটেয়ে এলাম।

মাসিমা হেসে উড়িয়ে দেন : কনেই কাঠ-কাঠ উপোস। বর একটু চা-টা খেলে দোষের হয় না।

চা কী বলছেন, ভরপেট ঠেসে খাইয়েছে। দেশের একজনের সংগে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল—

হোক গে। পাত্রী অরক্ষণীয়া—ভাত খেলেই বা কী! ঘরে গিয়ে এইবার বিশ্রাম করগে বাবা। একটু পর গায়ে-হলুদ।

নিরুপায় পার্থ ঘরে ঢুকল। নড়বড়ে তক্তপোষ সরে গিয়ে খাট পড়েছে। খাটের উপর গদি, তোষক, বালিশ, পাশ-বালিশ। ধবধবে চাদর। সমস্ত পার্থর জন্যে। জামাই-আদর বলে থাকে, এই বুঝি তার শুরু।

গদির উপর বসে পড়তে মাসিমা খুট করে দরজার শিকল তুলে দিলেন।

পার্থ কাতর হয়ে বলে, শিকল দেবার কী হল মাসিমা? যদি ধরুন কোন কারণে বাইরে যেতে হয় একবার।

জানলায় এসে মধুর হেসে মিষ্টি কণ্ঠে মাসিমা বললেন, যাবে। তার জন্যে কী হয়েছে! দিদির দুই ছেলে—তোমার দুই শালা—রইল বাইরে। নীলমণি আছে। বললেই দুয়োর খুলে দেবে। বিয়ের বর কিনা আজ—ওরা সংগে সংগে থাকবে, যা-কিছু দরকার ওরাই করে দেবে সমস্ত।

শিকলে তালা এঁটে বিয়ে-বাড়ির দশ রকম ব্যবস্থায় মাসিমা দ্রুত চলে গেলেন।

বোঝা গেল ব্যাপার। জেলে যেতে যাচ্ছিল, পাকে-প্রকারে তাই ঘটল। সারা দিন এমনি তালা-বন্ধ থাকবে। বিয়ের মন্ত্র পড়া এবং কনের সাত-পাক ঘোরা সমাধা না হওয়া পর্যন্ত ছাড় নেই। সম্ভবত তার পরেও না। কিছু ছাড় হতে পারে একেবারে ডুয়ার্সের জংগলে নিয়ে। বন্ধ ঘরের মধ্যে সারা দিন পার্থ একা একা ভাবছে। মন্দ কি! সে তো মরীয়া। মরণের চেষ্টা করেছে কতবার। হল না তো জেল। জেলও হল না, তখন এই বিয়ে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে তো মোটের উপর।

শুভদৃষ্টির সময় চারি পাশ থেকে বলছে, বর-কনে ভাল করে তাকাও এইবার। জোরালো আলো ধরেছে চাদর-ঢাকা দু-জনের পাশে। পার্থ তৎক্ষণাৎ চোখ বোঁজে। আড়চোখে সেই একবার কনে দেখে নিয়েছিল, সে আতঙ্ক কাটেনি এখনো। বাসরে ঘুমের ভান করে পাশ ফিরল। দু-তিনটে মেয়ে বাসর জাগতে এসেছিল, বুঝে নিয়ে তারাও রংতামাসা করে না। ফুলশয্যার রাত্রে প্রদীপ নেভানো বড় অলক্ষণ। কিন্তু পার্থর নাকি উৎকট চোখের অসুখ, আলোয় চোখ করকর করে।

অন্ধকার ঘরে নতুন বউয়ের সংগে ফিসফিসিয়ে দু-চারটে কথা। নমিতা বলে, আমিও আয়নায় মুখ দেখিনে। ভয় করে।

পার্থ বলে, এমন হল কি করে?

বাঘে ধরেছিল। ছোট্ট আমি তখন। লোকজন গিয়ে পড়তে বাঘ ছেড়ে দিয়ে পালাল।

নতুন বউয়ের কথাবার্তা কিন্তু ভারি মিষ্টি। অন্ধকারে শুনতে ভাল লাগে। নতুন বউয়ের গায়ে হাত দিয়ে সর্বাংগ শিরশির করে। ঘর অন্ধকার করে নিতে হয়, এই যা। ফাঁক পেলেই পালিয়ে দূর-দূরান্তরে চলে যাবে, পার্থ মনে মনে ঠিক করেছিল। কিন্তু একটা রাতেই সংকল্প মিইয়ে এল। দিনমানটা পালিয়ে থাকবে, রাত্রিবেলা অন্ধকারে কিসের ভয়!

এই রকম সাঁতা সাঁতা চলছিল কিছুকাল। অনেকটা [illegible] পাওয়াও ঘটে। শ্বশুরের বেনামি চা-বাগান নেয়

পার্থ উঠেপড়ে লাগল। ভোররাত্রের ট্রেনে বেরিয়ে পড়ত। ফুলিকামিন নিয়ে কাজ-কর্মে সমস্তটা দিন কোথা দিয়ে কাটত, ঠাহর হত না। ফিরত এক প্রহর রাত্রে। সেই সময় এমন হয়েছে, কাজের চাপে একটা রাত্রি হয়তো ফিরতে পারল না বাসায়। নিশিরাত্র ঘুম ভেঙে গিয়ে উসখুস করেছে বীভৎস-মূর্তি নমিতার জন্য।

* * *

সভা উপলক্ষে আমি ডুয়ার্সে গিয়েছিলাম। কুসুমবাড়ি বাগানে থাকতে দিয়েছে। কুসুমবাড়ির নাম-ডাক খুব। গেস্টহাউস ভূমি থেকে আধতলা সমান উঁচু—সাপ উঠতে পারে না। ঘরে, যত বর্ষাই হোক মেজে কখনো স্যাঁতসেঁতে হয় না। দামি আসবাবপত্র। কলকাতার শৌখিন-পাড়া থেকে সবচেয়ে চমৎকার কয়েকটা কুঠুরি যেন জঙ্গলের মধ্যে এনে বসিয়েছে।

পার্থপ্রতিম ঘোষের সঙ্গে ঐখানে পরিচয়। বাগানের অর্ধেক হিস্যার মালিক ও ম্যানেজার। আমাদের মতো শহুরে মানুষ পেয়ে বর্তে গেছেন। মিনিট দুয়েকের ভিতর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, এবং ঘণ্টা খানেকের ভিতর সমস্ত বলেকয়ে খালাস।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল হঠাৎ। অকাল-বর্ষা। ঘরের মধ্যে পার্থপ্রতিম ও আমি। মুহুর্মুহু চা আসছে। তেমন চা আপনারা মুখে দিতে পান না—অতিথির জন্য আলাদা করে রেখে দেওয়া। চা আসে, সঙ্গে বিবিধ আয়োজন। প্রতিবারেই নতুন নতুন পদ। গল্প থামিয়ে পার্থপ্রতিম অমনি স্ত্রীর কথায় আসেন : আমার স্ত্রী পাঠিয়েছেন খেয়ে দেখুন, আমার স্ত্রী নিজের হাতে তৈরি করেন সমস্ত। বলবেন না আর, আমার স্ত্রী নাবালক বানিয়ে ফেলেছেন আমাকে শুধু নয়—বাগানসুদ্ধ সকলকে.........

এই এক দুর্বলতা দেখছি, স্ত্রীর নামে গদগদ। প্রতি কথায় 'আমার স্ত্রী', 'আমার স্ত্রী'—এক রকম মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। বারম্বার না বললে সেই মহিলা যেন অন্য কারো স্ত্রী হয়ে যাবেন। তখন মনে হল, বিয়ের যাবতীয় গল্প বানিয়ে বললেন হয়তো। আমরা যেমন বানিয়ে বানিয়ে কাগজে লিখি।

অবশেষে দেখলামও মহিলাকে। বাঘ পালিয়ে গিয়েছিল বোধকরি চোয়ালের এক খাবলা মাংস মুখে করে নিয়ে। ফুটো দিয়ে দু-পাটি দাঁতের অনেকখানি দেখতে পাওয়া যায়। একটা চোখ অস্বাভাবিক রকম বড়, আর একটার ঢেলা গলে গিয়ে সাদা মার্বেলের মতো হয়ে আছে। পার্থপ্রতিম তখন বলছেন, এবারে বড়দিনের সময় আমার স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা যাব। বড়দিনের সে জলুষ নেই আর আগেকার মতো। তা হোক, আমার স্ত্রী কলকাতা দেখেননি। কয়েকটা দিন আমোদ-স্ফূর্তি করে আসা যাবে।

বিজ্ঞানের কথা

মহাকাশ অভিযানের খতিয়ান

অয়স্কান্ত

১৯৫৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল—দিনের হিসেবে সাড়ে তিন বছর। তিনশো কোটি বছরের এই পৃথিবীতে সাড়ে তিন বছর কতটুকু! প্রবহমান মহাকালের সীমাহীন ব্যাপ্তিতে এই সাড়ে তিন বছর অণুতম ভগ্নাংশও নয়। কিন্তু তবুও এই অণুর চেয়েও অণু সময়ের খণ্ডটুকু চিহ্নিত হয়ে রইল মানুষের মহত্তম কর্মকাণ্ডের সূচনাকাল হিসেবে, ভবিষ্যতের দেশ ও কালজয়ী মানুষের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে, পৃথিবীর বন্দীত্ব থেকে মুক্তিলাভের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে। কাজেই ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে আমরা বলতে পারি, ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা আরো অনেক বড়ো বড়ো ঘটনার সূত্রপাত মাত্র। এবং ভবিষ্যতের সেই বড়ো বড়ো ঘটনাগুলো যখন সত্যিই ঘটবে তখন আকাশের এই ১২ই এপ্রিলের ঘটনাকে আমরা বড়ো জোর খানিকটা ঐতিহাসিক দাম দেব মাত্র। যেমন আজকের দিনে আমরা দিই ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে প্রথম স্পুৎনিকের আকাশে ওঠার ঘটনাটিকে।

গত ১২ই এপ্রিলের ঘটনাটিকে এক-লাইনে লিখে ফেলা চলে। সোভিয়েতের নাগরিক মেজর ইউরি গাগারিন সাড়ে চার টন ওজনের একটি ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল বেগে পৃথিবীর ১০৯ মাইল থেকে ১৮৭ মাইল উঁচু দিয়ে ৮৯.১ মিনিটে পৃথিবীর চারদিকে পুরো একটি পাক খেয়ে আবার এই পৃথিবীর মাটিতেই ফিরে এসেছেন। ঘটনাটি লিখতে যতো কম জায়গাই লাগুক, পড়তে যতো সাধারণই মনে হোক—ভাবতে গেলে চমকে উঠতে হয়। যেমন, ব্যারোমিটারের পারদের উঠা-নামাটা এত সামান্য মাপের যে অংকের হিসেব ছাড়া হদিশ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ছোট ঘটনা যে আকাশ-জোড়া ঝড়ের সংকেত বহন করে আনে তার পুরো ছবিটা সম্পর্কে ধারণা করতে হলে পুরো ঘটনাটার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। মেজর গাগারিনের দেড় ঘণ্টার পৃথিবী-প্রদক্ষিণও এমনি এক মহাকাশ-জোড়া আলোড়নের সূত্রপাত মাত্র। সেই আলোড়ন পৃথিবীর মানুষকে করে তুলবে মহাবিশ্বের মানুষ। খণ্ডকালের মানুষকে মহাকালের।

ভবিষ্যতের এই ছবিটির জন্যেও অপেক্ষা করা দরকার। আগে থেকে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। এই অবসরে গত সাড়ে তিন বছরের ঘটনাগুলোকে একবার নাড়াচাড়া করে দেখা যেতে পারে। কারণ এই আমাদের জীবনেই এমন দিনও আসতে পারে যে আমরা ভুলে যাব এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল বলে এক সময়ে এই আমরাই কি অবাক হয়েছিলাম!

স্পুৎনিক—

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে এক নম্বর স্পুৎনিক আকাশে ওঠে। এর ওজন ছিল মাত্র ১৮৪ পাউণ্ড।
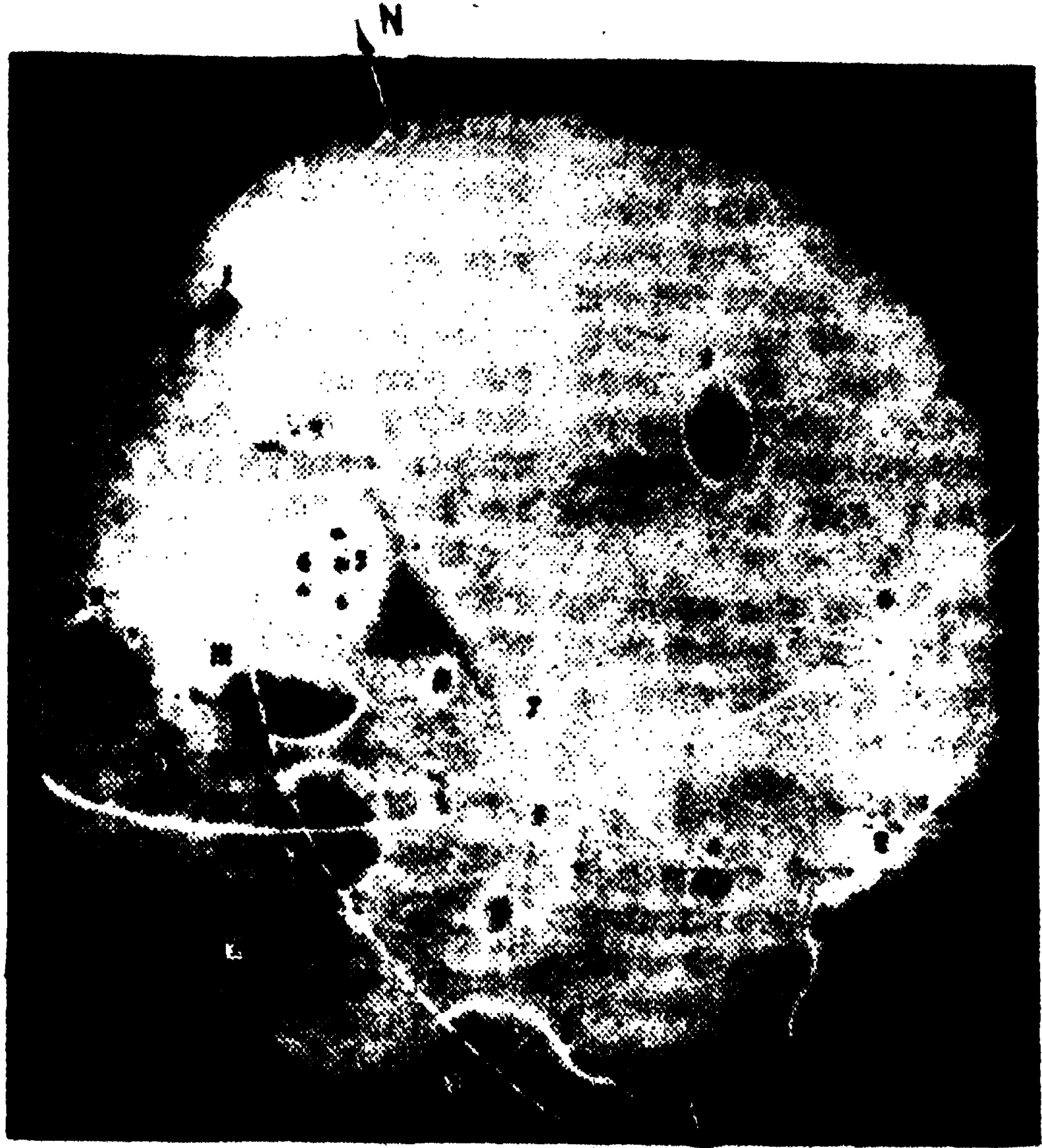
চাঁদের বিপরীত দিক

পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের দূরত্ব (অনুভূ) ছিল ১৪২ মাইল আর সবচেয়ে দূরের দূরত্ব (অপভূ) ছিল ৫৮৮ মাইল। সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল বেগে প্রতি ৯৫ মিনিটে একবার করে পৃথিবীকে পাক খেয়েছিল। ১৪০০ বার পৃথিবীকে পাক খাবার পরে ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি এই স্পুৎনিকটি বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে নেমে আসে ও পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

দু নম্বর স্পুৎনিক আকাশে ওঠে ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে। 'লাইকা' জাতীয় একটি কুকুর এই স্পুৎনিকের যাত্রী হয়েছিল। পৃথিবীর কোনো জীবন্ত প্রাণীর মহাকাশ-পরিক্রমা এই প্রথম। কুকুরটি সাত দিন বেঁচেছিল। কুকুর সমেত স্পুৎনিকের ওজন ১১১৮ পাউণ্ড। বেগ সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল। অনুভূ ১৪০ মাইল। অপভূ ১০৩৮ মাইল। প্রতি ১০৩ মিনিটে এক-একটি পাক। ২৩৭০ বার পাক খাবার পরে ১৯৫৮ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে দু নম্বর স্পুৎনিক পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

তিন নম্বর স্পুৎনিক আকাশে ওঠে ১৯৫৮ সালের ১৫ই মে তারিখে। ওজন ২৯২৫ পাউণ্ড। অনুভূ ১২৩ মাইল। অপভূ ১১৬৮ মাইল। প্রতি ১০৬ মিনিটে এক-একটি পাক। ১০০৩৭ বার

পাক দেবার পরে ১৯৬০ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে তিন নম্বর স্পুৎনিক পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ভ্যানগার্ড-এক্সপ্লোরার—

মার্কিণ বিজ্ঞানীদের কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী করার ব্যাপারে প্রথম প্রচেষ্টা ১৯৫৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে। নাম দেওয়া হয়েছিল এক নম্বর ভ্যানগার্ড। ওজন ছিল সাড়ে তিন পাউন্ড। প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি তারিখে। এক নম্বর এক্সপ্লোরার। ওজন ১৮·১৩ পাউন্ড। এটি সফল প্রচেষ্টা। অনুভূ ২১৮ মাইল, অপভূ ১২৮৪ মাইল।

তারপরে আরো দুটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ১৯৫৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের দু নম্বর ভ্যানগার্ড ও ১৯৫৮ সালের ৫ই মার্চ তারিখের দু নম্বর এক্সপ্লোরার। তারপরে পর পর তিনটি সফল প্রচেষ্টা। ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ তারিখের তিন নম্বর ভ্যানগার্ড (ওজন ৩.২৫ পাউন্ড, অনুভূ ৪০৩.৯ মাইল, অপভূ ২৪৫২ মাইল), ২৬শে মার্চ তারিখের তিন নম্বর এক্সপ্লোরার (ওজন ১৮.৫৬ পাউন্ড, অনুভূ ১২১ মাইল, অপভূ ১৭৪৬ মাইল), ২৬শে জুলাই তারিখের চার নম্বর এক্সপ্লোরার (ওজন ২৫.৮ পাউন্ড, অনুভূ ১৫৭ মাইল, অপভূ ১৩৮০ মাইল)।

তারপরে পর-পর আরো অনেকগুলি সফল প্রচেষ্টা। একটি অ্যাটলাস-স্কোর, দুটি ভ্যানগার্ড, দুটি এক্সপ্লোরার ও ছটি ডিসকভারার।

চাঁদের দেশে রকেট—

চাঁদের দেশে রকেট পাঠাবার প্রথম তিনটি প্রচেষ্টা হয় মার্কিণ বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে ১৯৫৮ সালের ১৭ই আগস্ট, ১১ই অক্টোবর ও ৮ই নভেম্বর তারিখে। প্রথম রকেটটি আকাশ-পথে মাত্র ৫০,০০০ ফুট উঠেই মাটি ছাড়ার ৭৭ সেকেন্ড পরে ফেটে চৌচির হয়ে যায়। দ্বিতীয় রকেটটি ৮০,০০০ মাইল দূরত্ব পার হয়ে আবার ফিরে আসে। তৃতীয় রকেটটির সর্বোচ্চ বেগ হয়েছিল ঘন্টায় মাত্র ১৬,০০০ মাইল এবং মাটি ছাড়ার ৪৫ মিনিট পরেই আবার ফিরে আসে।

চাঁদের দেশে পৌঁছবার ক্ষমতা নিয়ে প্রথম যে রকেটটি পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে রওনা হয়েছিল সেটি হচ্ছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এক নম্বর লুনিক। রওনা হবার তারিখ ১৯৫৮ সালের ২রা জানুয়ারি। রকেটটি শেষ পর্যন্ত চাঁদকে পাশ কাটিয়ে মহাশূন্যের এমন এক অবস্থানে গিয়ে পৌঁচেছে যেখানে সেটি হয়ে উঠেছে সৌরমণ্ডলের নূতন একটি গ্রহ। এই নূতন গ্রহটি ৪৫০ দিনে সূর্যের চারদিকে একবার পাক খাবে। সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের দূরত্ব (অনুসূর) ১৪·৬ কোটি কিলোমিটার আর সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের দূরত্ব (অপসূর) ১৯·৭ কোটি কিলোমিটার।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের দু নম্বর লুনিক রওনা হয়েছিল ১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে। এই রকেটটি সরাসরি চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়েছে।

তারপরে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে তিন নম্বর লুনিক। এই রকেটটি চাঁদের উল্টো দিক দিয়ে চক্কর দিয়ে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে এসেছে এবং চক্কর দেবার সময় চাঁদের উল্টো দিকের ফটো তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। চাঁদের অদেখা দিকের এই প্রথম ফটো।

কৃত্রিম গ্রহ—

এক নম্বর লুনিক মানুষের তৈরি প্রথম কৃত্রিম গ্রহ। তারপরে মার্কিণ বিজ্ঞানীরাও দুটি কৃত্রিম গ্রহ তৈরী করেছেন। পায়োনীয়র চার ও পাঁচ। প্রথমটি রওনা হয়েছিল ১৯৫৯ সালের ১লা মার্চ তারিখে, দ্বিতীয়টি ১৯৬০ সালের ১১ই মার্চ তারিখে। প্রথমটির ওজন ১৩·৪ পাউন্ড, দ্বিতীয়টি ৯৫ পাউন্ড।

পায়োনীয়র পাঁচ সম্পর্কে বিশেষভাবে একথাটি বলা দরকার যে তিনটি কৃত্রিম গ্রহের মধ্যে একমাত্র এই গ্রহটিই সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর চেয়ে ভেতরের দিকে। অর্থাৎ এই গ্রহটির কক্ষ শুক্র ও পৃথিবীর মাঝখানে। অপসূর ৭,৪৭,০০,০০০ মাইল। ১৯৬৩ সালের কোনো এক সময়ে পৃথিবী থেকে গ্রহটির দূরত্ব হবে পাঁচ কোটি মাইলের মধ্যে। সেই সময়ে এই গ্রহটির সঙ্গে পৃথিবীর বেতার যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে।

ব্যোমযান—

১৯৬০ সালের ১৫ই মে তারিখে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা একটি বিরাট ব্যোমযানকে আকাশে তোলেন। রকেট বাদ দিয়ে শুধু এই ব্যোমযানটিরই ওজন ছিল সাড়ে চার টন। অপভূ ২৩০ মাইল, অনুভূ ১৯৪ মাইল। পৃথিবীকে পাক দিতে সময় লেগেছিল ৯১·২ মিনিট। এই ব্যোমযানটিতে দেড় টন ওজনের যন্ত্রপাতি ছিল, কামরাটি ছিল চাপ-নিয়ন্ত্রিত এবং এমন সমস্ত ব্যবস্থা ছিল যাতে একজন মানুষও এই ব্যোমযানের যাত্রী হতে পারত। আর সত্যিকারের না হলেও একজন নকল মানুষকে যাত্রী করা হয়েছিল এই ব্যোমযানের।

দ্বিতীয় সোভিয়েট ব্যোমযান আকাশে ওঠে ১৯৬০ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখে। পৃথিবী থেকে ২৮০ মাইল উঁচুতে এটিকে পাঠানো হয়। এই ব্যোমযানটিতেও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা প্রথম ব্যোমযানটির মতোই। তবে এই ব্যোমযানটিতে জীবন্ত যাত্রী ছিল। স্ত্রেল্কা ও বেল্কা নামে দুটি কুকুর, কয়েকটি ইঁদুর-ছানা, গাছ-গাছড়া ও ফসলের দানা। আকাশ-পথে ৪,৩৫,০০০ মাইল চলার পরে ২১শে আগস্ট তারিখে ব্যোমযানটিকে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানের মাত্র সাড়ে ছয় মাইলের মধ্যে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনা হয়েছিল। ব্যোমযানের যাত্রীদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

তৃতীয় সোভিয়েট ব্যোমযানটি আকাশে উঠেছিল ১৯৬০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে। এই ব্যোমযানটিরও যাত্রী ছিল দুটি কুকুর, ওজন ছিল সাড়ে চার টন। এই ব্যোমযানটিকে মাটিতে ফিরিয়ে আনা যায়নি, বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

চতুর্থ সোভিয়েট ব্যোমযান আকাশে ওঠে ১৯৬১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে। এটির ওজন ছিল সাড়ে ছয় টন। অনুভূ ১৩৯ মাইল। অপভূ ২০৩ মাইল। প্রতি নব্বই মিনিটে একটি পাক। এই ব্যোমযানটির পরিণতি কি হয়েছে তা জানা যায়নি।

আন্তঃগ্রহ স্টেশন—

১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তঃগ্রহ স্টেশন রওনা করিয়ে দিয়েছেন। স্টেশনটি রওনা হয়েছে পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে। আগামী মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে এই স্টেশনটি শুক্রগ্রহের এলাকায় পৌঁছবে।

আবহ-উপগ্রহ—

মার্কিণ বিজ্ঞানীদের এক নম্বর ও দু নম্বর টাইরসকে (TIROS — Television and Infra-Red Observation Satellite) বলা চলে আবহ-উপগ্রহ। এক নম্বরটিকে তোলা হয়েছে ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে। ওজন ২৭০ পাউন্ড। দু নম্বরটিকে তোলা

হয়েছে ১৯৬০ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে। ওজন ২৮০ পাউন্ড। দুটি উপগ্রহই পৃথিবী থেকে প্রায় চার শো মাইল উঁচু দিয়ে প্রায়বৃত্ত কক্ষে পাক খাচ্ছে। দুটি উপগ্রহেই প্রায় ৯২০০ সৌর-ব্যাটারী আছে আর আছে দুটি করে টেলিভিশন ক্যামেরা। পৃথিবীর আবহাওয়া সমস্ত রকমের খবর এই দুটি উপগ্রহ থেকে পাওয়া যাবে।

নৌ-দিশারী—

মার্কিণ নৌ-বিভাগের উদ্যোগে ১৯৬০ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে আকাশে উঠেছে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ, যার নাম দেওয়া হয়েছে ট্রানসিট I-B (Transit I-B)। ওজন ২৬৫ পাউন্ড। এই উপগ্রহটির মারফত নৌ-চলাচলের ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য হবে।

ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কীকরণ—

১৯৬০ সালের ২৪শে মে তারিখে মার্কিণ বিজ্ঞানীরা মিডাস II (MIDAS II—Missile Defence Alarm System) নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে আকাশে তুলেছেন। ওজন ৫,০০০ পাউন্ড। উপগ্রহটির মধ্যে ৩,৬০০ পাউন্ড ওজনের যন্ত্রপাতি আছে। এই সব যন্ত্রপাতির উদ্দেশ্য, ক্ষেপণাস্ত্রের হদিশ দেওয়া। যদি কোনো শত্রুভাবাপন্ন দেশ আমেরিকাকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে তবে এই উপগ্রহটির মারফত সেই খবরটি সংগে সংগে পাওয়া যাবে। উপগ্রহটির কক্ষ এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যাতে উপগ্রহটিকে কোনো সময়েই সোভিয়েট দেশের ওপর দিয়ে যেতে না হয়।

বেতার ও টেলিভিশন রীলে—

১৯৬০ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে মার্কিণ বিজ্ঞানীরা একো-১ (Echo-1) নামে যে উপগ্রহটি তৈরি করেছেন তা আকারের দিকে এতদিনের সমস্ত উপগ্রহের চেয়ে বড়ো। ১০০ ফুট ব্যাসের এই বেলুনটি প্রায় দশ-তলা বাড়ির মত—অ্যালুমিনিয়মের কোটিং দেওয়া প্লাস্টিকের তৈরি। অপভূ ১১৬০ মাইল। অনুভূ ১০১৮ মাইল। ১২১ মিনিটে এক-একটি পাক। বেগ ঘন্টায় ১৫,০০০ মাইল। ওজন ১৫০ পাউন্ড। রাত্রির আকাশে এই উপগ্রহটিকে উজ্জ্বলতম তারার মতো দেখাত এবং খালি চোখেই দেখা যেত। এই উপগ্রহটির সাহায্যে বেতার ও টেলিভিশনের প্রচার-ব্যবস্থাকে কয়েক হাজার মাইল দূর পর্যন্ত নিখুঁতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া গিয়েছিল।

১৯৬০ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে মার্কিণ বিজ্ঞানীরা কুরিয়ার I-B (Courier I-B) নামে একটি উপগ্রহ আকাশে তুলেছেন। অপভূ ৭৪৫ মাইল। অনুভূ ৫০০ মাইল। প্রতি দু ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে পাক খাচ্ছে। এই উপগ্রহটির সাহায্যে বেতার ও টেলিভিশনের প্রচারকে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়া যাবে।

মহাকাশের যাত্রী শিম্পাঞ্জী—

১৯৬১ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে মার্কিণ বিজ্ঞানীরা একটি শিম্পাঞ্জীকে (মিঃ হ্যাম) মহাকাশের যাত্রী করে পাঠিয়েছিলেন। ১৫৫ মাইল উঁচু থেকে শিম্পাঞ্জীটি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে।

অবশ্য মার্কিণ দেশ থেকে জীবন্ত প্রাণীর মহাকাশ-যাত্রা এই প্রথম নয়। শ্রীযুক্ত হ্যামের আগে 'স্যাম' ও 'কুমারী স্যাম' নামে একটি বানর ও একটি বানরী মহাকাশে এক-একবার চক্কর দিয়ে এসেছে। স্যাম (ওজন ৭ পাঃ) আকাশে উঠেছিল ১৯৫৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে। ৫৫ মাইল উঁচু থেকে তাকে আবার নামিয়ে আনা হয়েছে। কুমারী স্যাম (ওজন ৬ পাঃ) আকাশে উঠেছিল ১৯৬০ সালের ২১শে জানুয়ারি তারিখে। ১০ মাইল উঁচু থেকে তাকে নামিয়ে আনা হয়েছে। স্যামকে আকাশে ওঠার সময়ে মাধ্যাকর্ষণজনিত চাপের চেয়েও উনিশ গুণ বেশি চাপ সহ্য করতে হয়েছিল। কুমারী স্যামকে সহ্য করতে হয়েছিল কুড়ি গুণ বেশি চাপ।

মহাকাশে যাত্রার তোড়জোড়—

১৯৬১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মার্কিণ বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে মানুষের যাত্রার উপযোগী একটি প্রকোষ্ঠকে আকাশে তুলেছিলেন। ১১৫ মাইল উঁচু থেকে সেটি আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মার্কিণ বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে এবার তাঁরা সত্যিকারের এক জন মানুষকে মহাকাশের যাত্রী করে

মহাকাশ ভ্রমণের পরে আমেরিকার শিম্পাঞ্জি

পাঠাতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন—লেঃ কর্ণেল জন গ্লেন (বয়স ৩৯), ক্যাপ্টেন ভার্জিল গ্রিসম (বয়স ৩৪) এবং কমান্ডার অ্যালান শেপার্ড (বয়স ৩৭)।

বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী—

ইতিমধ্যে বৃটেনে তোড়জোড় শুরু হয়েছে যে কমনওয়েলথ দেশগুলির সহযোগিতায় বৃটেনের পক্ষ থেকে এক নম্বর ইউ-কে নামে একটি উপগ্রহ আকাশে তোলা হবে। ফ্রান্স এ বিষয়ে একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়েছে এবং সাহারা মরুভূমিতে একটি রকেটও ছেড়েছে। ইতালীও একেবারেই পিছিয়ে নেই। গত ১৩ই জানুয়ারি তারিখে ইতালী সার্ডিনিয়ার সঙ্গে একটি রকেট ছেড়েছে।

এই হল গত সাড়ে তিন বছরের মহাশূন্যে অভিযানের খতিয়ান। মেজর ইউরি গাগারিনের সফল মহাকাশ-যাত্রা এই সাড়ে তিন বছরের বহুব্যাপ্ত কর্মোদ্যোগের উজ্জ্বলতম পরিণতি ও একটি দুরূহ অধ্যায়ের শেষ। পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যে আমরা এখন শুধু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে পারি।

ফেব্রুয়ারিতে ভার্জিনিয়া থেকে এই নতুন মার্কিণ উপগ্রহটি ছাড়া হয়।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের এই পুণ্যদিনে প্রথমেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানাই সেই ঋষিকল্প লোকোত্তর প্রতিভাকে, যিনি আজ থেকে একশো বছর আগে এমনই একটি রবি-করোজ্জ্বল দিনে আমাদের এই মহানগরীর একটি গৃহকোণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ ক'রে আমাদের ধন্য করেছিলেন। আজ সারা পৃথিবী মুখর হয়ে উঠেছে তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীর উৎসব আনন্দে। রবীন্দ্রনাথ নিখিলজনচিত্তমোহন বিশ্বকবি হলেও আমরা ভুলতে পারি না, তিনি একান্ত-ভাবে আমাদেরই স্বজন, আমাদের বাংলা মায়ের অমৃত পুত্র। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে শুরু করে বাংলাদেশের ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানই রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব পালনে মেতে উঠেছেন।

●

এই উপলক্ষে আমাদের বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়গুলির মধ্যে স্টার থিয়েটার গেল ১০ই মে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' ও 'মুক্তির উপায়'-এর নাট্যরূপ দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। ১০ই মে-র অভিনয়ানুষ্ঠানের আগে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা-পতিত্বে কবিগুরুর এক তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্র জন্ম-দিবস, ৮ই মে তারিখে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভায় 'তপতী' অভিনয় করেছেন। এবং ঐ তারিখেই রঙমহল আসর বসিয়েছিলেন 'চিরকুমার সভা'য়। আশা করা অন্যায় হবে না, অপর দুটি থিয়েটার—'বিশ্বরূপা' এবং 'থিয়েটার সেন্টার'-ও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবে না।

●

আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটক ও প্রহসন অভিনীত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে 'চিরকুমার সভা', 'গৃহ প্রবেশ', 'শোধবোধ', 'পরিত্রাণ', 'মুক্তির উপায়', 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'বিসর্জন', 'তপতী', 'শেষরক্ষা' এবং 'যোগাযোগ'। অবশ্য কবি নিজে এগুলির মধ্যে 'চিরকুমার সভা' এবং 'শেষরক্ষা'র অভিনয়ে উপ-স্থিত ছিলেন বলেই জানি। রবীন্দ্র-প্রতিভার কাছে আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়গুলির ঋণ মাত্র এতেই পর্যবসিত হয়নি। তাঁরই অভিনয়ধারাকে কিছু পরিবর্তিত আকারে শিশিরকুমার ভগীরথের মতো নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গ-রঙ্গভূমি প্লাবিত করবার জন্যে।

●

আমাদের চলচ্চিত্র জগৎও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। যুগস্রষ্টা শ্রীসত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প—পোস্টমাস্টার, মণিহারা ও সমাপ্তি—তাঁর তিন মানসকন্যাকে একসঙ্গে 'তিন কন্যা' নামে চিত্ররসিক সাধারণের সামনে উপস্থাপিত করেছেন গেল ৫ই মে। এছাড়া তিনি ভারত সরকারের হয়ে রবীন্দ্র-জীবনী অবলম্বনে যে পাঁচ রীলের প্রামাণ্য চিত্র প্রস্তুত করেছেন, গেল শুক্রবার, ৫ই মে থেকেই তা
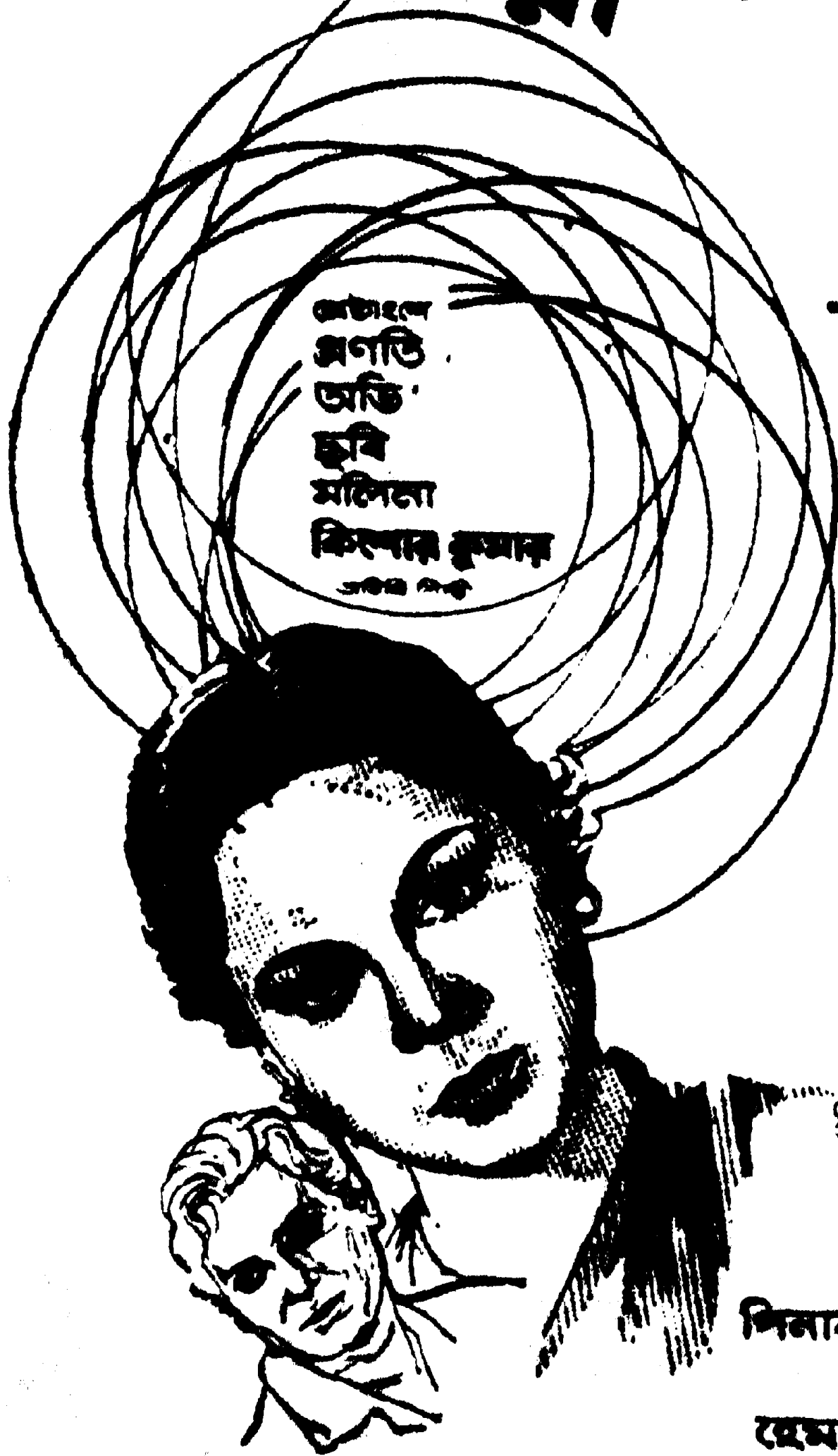
সাধারণ্যে দেখানো হচ্ছে রাধা এবং পূর্ণতে তপন সিংহ পরিচালিত রবীন্দ্র-চিত্র "ক্ষুধিত পাষাণে"র সঙ্গে। এ-ছাড়া অ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্টসের প্রেক্ষা-

'পূজারিণী'তে মঞ্জুশ্রী সরকার (চাকী)

গৃহে গেল ৩রা মে থেকেই ছবিখানি দেখানো হচ্ছে।

●

এখানে সাধারণ্যে দেখানোর আগেই ২৬এ এপ্রিল বুধবার, লন্ডনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট আয়োজিত এক বিশেষ প্রদর্শনীতে 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রটি দেখানো হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গ হিসেবে প্রদর্শিত এই ছবিটি ওখানকার চিত্রজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সমালোচকদের কাছ থেকে একখানি প্রথম শ্রেণীর ছায়াচিত্র হিসেবে প্রশংসা লাভ করেছে। জনৈক সমালোচকের মতে, ছবিখানির ভিতরে রবীন্দ্র-জীবনীর সেই সব ঘটনার ওপর বেশী করে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাদের মাধ্যমে নবভারতের জাগরণের কাহিনী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথের 'সার' টাইটেল পরিত্যাগের ঘটনার উল্লেখ করা যায়। শতবর্ষব্যাপী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এই জীবনীচিত্রের ভিতর দিয়ে শ্রী রায় এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন অত্যন্ত সার্থকরূপে।

●

বাংলার সবাক চলচ্চিত্র জগতের গুরুস্থানীয় শ্রীদেবকীকুমার বসু পশ্চিমবঙ্গ

১৯৬০-এর 'অস্কার'-প্রাপ্ত বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার ও এলিজাবেথ টেলর

সরকারের হয়ে রবীন্দ্রনাথের চারটি কবিতা—পূজারিণী, অভিসার, পুরাতন ভৃত্য এবং দুই বিঘা জমির যে চিত্ররূপ দিয়েছেন, তা একত্রে "অর্ঘ্য" নামে মুক্তি পেয়েছে ৮ই মে তারিখে দর্পণা, জ্যোতি, প্রিয়া এবং ছায়া সিনেমায় অরোরার পরিবেশনায়। এবং ঐ দিনই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উপ-

'অভিসার'-এ সন্ধ্যা রায়

স্থিতিতে নিউ এম্পায়ারে ছবিখানির একটি বিশেষ প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে অস্পৃশ্যতার উপর তিনি যে পাঁচখানি (প্রতিটি দুই রীলে সম্পূর্ণ) চিত্রের নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত আছেন, তার মধ্যে অন্ততঃ দুইখানি রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। একটি, ব্রাহ্মণ এবং অপরটি, শুচি।

●

আমাদের শহর-কলিকাতায় ১৯৬০ সালে কতগুলি দেশী ছবি মুক্তিলাভ করেছে জানেন?—সর্বসমেত ১৪৫টি শুনে দুঃখিত হবেন না, এর মধ্যে মা ৩৬টি বাংলা এবং একখানি পাঞ্জাবী তাছাড়া বাকী সবই হিন্দী। রাষ্ট্রভাষা জয় হোক। বাংলা ছবিগুলির মধ্যে প্রা অর্ধেক, আসলে ১৭টিই ছিল সামাজিক ৬টি হাস্যরসাত্মক, ৬টি অপরাধমূলক ৪টি ভক্তিরসাশ্রিত, একটি কল্পচি (ফ্যান্টাসি), একটি সংগীতবহুল এব একটি ভ্রমণ-সর্বস্ব। এদের মধ্যে তপ সিংহের 'ক্ষুধিত পাষাণ', রাজে তরফদারের 'গঙ্গা', সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ' এবং ঋত্বি ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' দর্শক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি প্রভূত পরিমাণে।

●

হিন্দী ছবিগুলির মধ্যে অত্যা সঙ্গত কারণেই অপরাধমূলক বা রোম হর্ষক ছবির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী ৪৭টি। এর পরেই সামাজিক ছিল ৩৫ পৌরাণিক ৮টি, হাস্যরসাত্মক ৬ ঐতিহাসিক ৩টি, সঙ্গীতবহুল ৪ শিশুচিত্র ২টি এবং কোনো বিশে শ্রেণীতে পড়ে না, এমন ৩টি। গেল ব হিন্দী ছবির রাজ্যে সবচেয়ে ব আলোড়ন এনেছিল প্রচুর অর্থব্যয়ে, দী দিন ধরে তোলা কে. আসিফ পরিচালি 'মুঘল-এ-আজম'। অবশ্য যতটা গজ

বহির্বিশ্বে ও সর্বভারতীয় শুভমুক্তি ৫ই মে!

শততম রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্স-এর

অভিনব চিত্রাঞ্জলি
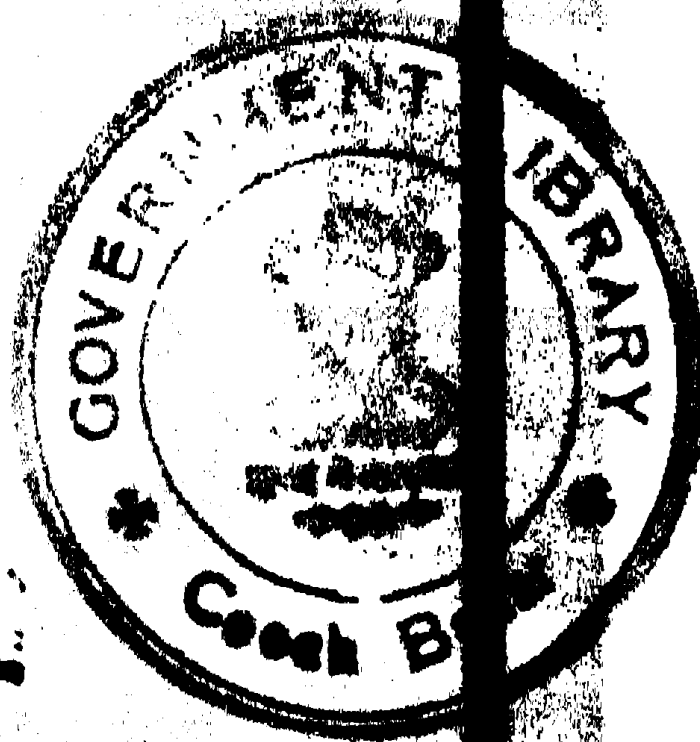
তিন কন্যা

একসঙ্গে
রবীন্দ্রনাথের
তিনটি গল্পের
চিত্ররূপ

প্রযোজনা
চিত্রনাট্য, সংগীত
ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়

পরিবেশক ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

রূপবাণী — ভারতী — অরুণা

যোগমায়া -- পদ্মশ্রী -- নিউ তরুণ -- মৃণালিনী — অলকা

অজন্তা -- অশোক -- গৌরী -- উদয়ন — লীলা

তৎসহ :

রিগ্যাল (নিউদিল্লী) -- এক্সেলসিয়ার থিয়েটার (বম্বে) — মিনার্ভা টকিজ (মাদ্রাজ) -- লিবার্টি (ব্যাঙ্গালোর) — চৌধুরী টকিজ (গৌহাটি, আসাম)

এবং ন্যাশনাল থিয়েটার (লণ্ডন)

'পোস্টমাস্টার' ছবিতে চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

জমানো গিয়েছিল, ততটা বর্ষণ না হ'লেও জাঁকজমকে এবং বিরাটত্বে ছবিখানি কৌতূহলী দর্শক-সাধারণের মধ্যে একটি বিভ্রম সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য। এছাড়া যে-ছবিগুলি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তারা হচ্ছে বিমল রায়ের 'পরখ', হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'অনুরাধা', শান্তারামের 'নবরঙ্গ', সত্যেন বসুর শিশু-চিত্র 'মাসুম', মোহন সেহগালের 'আপনা হাত জগন্নাথ' এবং ফিল্মস ডিভিসনের 'ধরতী কে ঝঙ্কার'।

●

নির্মীয়মাণ বাংলা ছবিগুলির মধ্যে তপন সিংহের 'ঝিন্দের বন্দী'র জন্যে দর্শকমহল সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। এছাড়া রয়েছে অজয় করের 'সপ্তপদী', অগ্রদূতের 'উত্তরায়ণ' ও 'বিপাশা' এবং অগ্রগামীর 'কান্না' প্রভৃতি চিত্র।

●

আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা স্যাটারডে রিভিউয়ের হোলিস্ এল্‌পার্টের মতে ১৯৬০ সালে হলিউডে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় ছবি তৈরী হ'লেও এবং ছবিগুলি উৎকর্ষের বিচারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নশ্রেণীর হ'লেও দর্শকের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এবং সেই কারণে টিকিটঘর মারফত টাকাও আমদানি হয়েছে বেশী। অবশ্য সব কটি কোম্পানীই যে আর্থিক সৌভাগ্যের মুখ সমানভাবে দেখতে পেয়েছে, এমন কথা বলা চলে না। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স-এর একখানি ছবিও এ বছর বড়ো রকম টাকা আনতে পারেনি। আবার ইউ-নিভার্সাল সিটি ও স্টুডিও বিক্রী করার পরে ইউনিভার্সাল পিকচার্স কর্পোরেশন নূতন ক'রে নাম ফিরে পেয়েছে। এম-জি-এম বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে পেরেছে। দর্শকের সংখ্যা গেল বছর ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ; এ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ।

●

অর্থ উপার্জনের দিক দিয়ে ১৯৬০ সালে আমেরিকার চিত্র-শিল্পীদের কেউ কেউ নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। 'পিলো টক' ছবিতে লাভের অংশীদার হিসেবে ডরিস ডে পেয়েছেন ১৫ লক্ষ ডলার। 'অপারেশন পেটিকোট' ছবিতে অভিনয় ক'রে ক্যারী গ্রান্ট লাভের তিন-চতুর্থাংশ বখরা পেয়ে একটি নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং এই বাবদ তাঁর আয় হয়েছে এই বছরে ৩০ লক্ষ ডলার। 'ওসিয়ান্স ইলেভেন' ছবিতে ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা প্রায় ঐ রকমই টাকা পেয়েছেন।

●

আলফ্রেড হিচকক্ এ বছরে যে চমৎকার ফন্দী খাটিয়েছেন, তার জুড়ি মিলবে না। তিনি তাঁর আধুনিকতম ভয়াল ছবি 'সাইকো' তুলতে মাত্র দশ লাখ ডলারের কম খরচ করেছেন। অথচ দর্শক-সাধারণের মধ্যে এই ছবির ব্যাপারে তিনি অসম্ভব কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন দুটি উপায়ে। এক, অপূর্ব চাতুরীপূর্ণ বিজ্ঞাপনের চমক লাগিয়ে এবং দুই, ছবি আরম্ভের পরে কোনো দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতে দেওয়া বারণ ক'রে দিয়ে।

●

১৯৬০ সালে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। হলিউডের প্রযোজকরা খুব বেশী মাত্রায় হলিউডের বাইরে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়েছেন। ইলিয়া কাজান তাঁর 'ওয়াইল্ড রিভার' ছবির বহিদৃশ্য টেনিসি-ভ্যালী অঞ্চলে তোলবার পর বাকী নিউইয়র্কে অন্তর্দৃশ্যগুলি তুলেছেন। এম-জি-এম তাদের 'বাটার ফ্লাই-৮' ছবিখানিও নিউইয়র্কেই তুলেছেন। এছাড়া 'দি গানস্ অব ন্যাভোরোন' তোলা হয়েছে রোডস দ্বীপে, 'এক্সোডাস্' ইসরাইলে, 'দি ওয়ার্ল্ড অব সুজি ওয়াং' ছবি সুদূর প্রাচ্য হংকংয়ে। বহু ছবির অন্তর্দৃশ্য তোলা হয়েছে লণ্ডনের বিভিন্ন স্টুডিওতে।

●

১৯৬০ সালে আমেরিকার মোশন পিকচার অ্যাকাডেমী প্রদত্ত 'অস্কার' লাভ করেছে শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে 'দি অ্যাপার্ট-

মেন্ট'। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য, শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশনা এবং শ্রেষ্ঠ সম্পাদনার পুরস্কারও লাভ করেছে—'দি অ্যাপার্টমেন্ট'। এ বছরে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী-রূপে 'অস্কার' লাভ করেছেন শ্রীমতী

এলিজাবেথ টেলর 'বাটারফিল্ড-৮' ছবিতে তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের জন্যে। আর 'এলমার গ্যান্ট্রি' ছবিতে অভিনয়ের উৎকর্ষতা দেখিয়ে বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

●

কি করে টাকা রোজগার করা যায়, মাত্র এই দিকে লক্ষ্য রাখবার ফলে নিউ-ইয়র্কের থিয়েটার রাজ্য ব্রডওয়ে ১৯৬০ সালে একখানিও উল্লেখযোগ্য নাটক দর্শকদের উপহার দিতে পারেনি। ব্যবসার দিকে অত্যধিক ঝোঁক দেবার জন্যে সুমার্জিত রুচির প্রতি একেবারেই নজর দেওয়া হয়নি; কেন না, এটা তো জানা কথা যে, রূপচাঁদ পক্ষীকে সিন্ধুকস্থ করতে গেলে রুচির বালাই রাখলে চলে না। তাই ব্রডওয়ের কর্মকর্তারা বোধ করি স্থির করেছেন যে, নাটক এবং অভিনয় নিয়ে যা কিছু সাধনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আর্ট-এর সৃষ্টি-প্রয়াস, এ সমস্তই হবে ব্রডওয়ের বাইরে—বৃহত্তর জগতে, ব্যবসায়ীর লীলাভূমি ব্রডওয়েতে নয়।

> * এই বিভাগের জন্যে সিনেমা-থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ, ফোটোগ্রাফ, নির্মীয়মাণ ছবির স্টুডিও-সংবাদ ইত্যাদি সাদরে গ্রহণ করা হবে।
>
> * তাছাড়া কলকাতা ও শহরতলীর নানা প্রতিষ্ঠান ও সমিতির উৎসব-অনুষ্ঠান বিষয়ে সংবাদ ও ফোটোগ্রাফও এই বিভাগের জন্যে আহ্বান করা হচ্ছে।

●

অবশ্য কিছু যে ব্যতিক্রম ছিল না, এমন নয়। এবং এদের মধ্যে নাম করা যায়, হেলেন কেলারের বাল্য-জীবন নিয়ে লেখা 'দি মিরাক্ল্ ওয়ার্কার', নবীন নাট্যকার প্যাডি চেয়েফস্কির 'দি টেন্থ-ম্যান', পিটার সেফারের 'ফাইভ ফিঙ্গার এক্সারসাইজ', স্যাল্ লেভিটের 'দি অ্যান্ডারসনভিল ট্রায়াল', ডুরেনম্যাটের 'দি ভেডসী গেম', লিলিয়ান হেলম্যানের 'টয়েজ্ ইন্ দি অ্যাটিক' প্রভৃতি বইয়ের।

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

আলোক-চিত্রে **রবীন্দ্রনাথ**—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব—দেশপ্রিয় পার্ক।

জুনিয়ার চেম্বার্স আন্তর্জাতিক বৈঠক উপলক্ষে **প্রাচীন চারু ও কারু-শিল্পের প্রদর্শনী**—গ্র্যান্ড হোটেল।

মধ্য রাতের তারা—মিনার, বিজলী, ছবিঘর।

বিষকন্যা—বসুশ্রী, বীণা, প্রাচী, সুরশ্রী।

অগ্নি-সংস্কার— উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা, লীলা।

> **এই কলমে শহরের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের সংবাদ পূর্ব সপ্তাহেই বিজ্ঞাপিত হবে। ব্যবস্থাপকগণ পর্যাপ্ত সংবাদ পাঠিয়ে সহযোগিতা করুন।**

স্বরালাপ—শ্রী, ইন্দিরা, লোটাস, আলোছায়া।

তিন কন্যা—রূপবাণী, ভারতী, অরুণা।

বেনহুর—মেট্রো।

সাইন অব দি গ্লাডিয়েটর—নিউ এম্পায়ার।

হারকিউলিস আনচেনড— লাইট হাউস।

লেট নো ম্যান রাইট মাই এপিটাফ—গ্লোব।

দেয়ার ওয়াজ এ ক্রুকেড ম্যান—এলিট।

কৃষণ্ খান্নার চিত্র-প্রদর্শনী—অশোক গ্যালারী।

খেলাধুলা

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড সফর

●

দর্শক

রিচি বেনোর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়ে নিরাপদে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে গেছে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল এ নিয়ে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে বাইশবার পদার্পণ করলো। এবারের ইংল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটদলে আছেন সতের জন খেলোয়াড়—নবীন ও প্রবীণ মিলিয়ে। এঁদের মধ্যে এগারজন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটদলের পক্ষে ইংল্যাণ্ডে এই প্রথম খেলতে এসেছেন। এই এগারজনের মধ্যে নবীন ও কুলীন এবং নব নিম্পাদন ইংল্যাণ্ডের দর্শকদের কাছে অজ্ঞাত নন, তাঁরা ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট লীগ খেলায় খেলেছেন। দলের সহ-অধিনায়ক পদ লাভ করেছেন নীল হার্ভে। দলের ম্যানেজার হয়ে গেছেন সিডনি ওয়েব। রিচি বেনো একজন নামজাদা ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং সুদক্ষ কৃতী অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটদল ১৯৫৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড, পাকিস্থান, ভারতবর্ষ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলেছে এবং কোন দেশের কাছে অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' হারায়নি। এইসব টেস্ট সিরিজের টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—অস্ট্রেলিয়ার জয় ১০টা, খেলা ড্র ৫টা, অস্ট্রেলিয়ার হার ২টা এবং দুই দলের সমান সংখ্যক রাণ হওয়ার দরুণ 'টাই' একটা খেলা। এই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলটি প্রায় পাঁচ মাস ইংল্যাণ্ডে অবস্থান ক'রে পাঁচটি টেস্ট খেলা নিয়ে মোট ৩৬টি খেলায় যোগদান করবে। প্রকাশিত খেলার তালিকা অনুযায়ী ইংল্যাণ্ড সফরে এই দলের প্রথম খেলা আরম্ভ হয়েছে ২৯শে এপ্রিল থেকে এবং সফরের খেলা শেষ হবে ১৯শে সেপ্টেম্বর।

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আকর্ষণ শুধু এই দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর ক্রিকেট-ক্রীড়ারত সমস্ত দেশের ক্রিকেট ক্রীড়া-রসিক মাত্রেই অধীর আগ্রহে এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী অনুধাবন করেন। ইংরেজ জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং রুচিজ্ঞান শুধু তাদের সাহিত্য, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সাধনার মধ্যেই সমাহিত নয়। ইংরেজ চরিত্রের এবং রুচিজ্ঞানের অনেকখানি পরিচয় মিলবে এই ক্রিকেট খেলায়। ক্রিকেট এবং ইংরেজ জাতি এক অভিন্ন আত্মা। এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি কল্পনা করা যায় না। দেশে দেশে সাংস্কৃতিক অভিযানে ইংরেজ জাতি ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে দেশের লোকের হৃদয় জয় করেছে। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজের খেলায় আমরা যেন এই দুই দেশকে অনেক কাছ থেকে নিরীক্ষণ করতে পারি।

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজের খেলাকে 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ' এই নামে অভিহিত করা হয়। যে দল সব থেকে বেশী টেস্ট খেলায় জয়ী হয় তাদের টেস্ট সিরিজের 'এ্যাসেজ' (Ashes) বিজয়ী বলা হয়। 'এ্যাসেজ' বলতে সত্যিকারের কোন ট্রফি বুঝায় না। 'এ্যাসেজ' একটি কাল্পনিক শব্দ। সাদা বাংলায় 'এ্যাসেজ' কথার অর্থ ছাই। সে এক বেদনাদায়ক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই 'এ্যাসেজ' কথাটির যোজনা হয়েছে। ঘটনাটি অনেককাল আগের, ১৮৮২ সালের আগষ্ট মাসের কথা। সে বছর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে মাত্র একটা টেস্ট ম্যাচ খেলে। এই টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া অপ্রত্যাশিত-ভাবে ইংল্যাণ্ডকে ৭ রাণে হারিয়ে দিয়ে 'রাবার' পায়।

১৮৮২ সালের আগষ্ট মাস, কেনিংটন ওভালে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র ৬৩ করে আউট হয়ে গেল।

ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে ১০১ রাণ করে ৩৮ রাণে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১২২ রাণ করে। দলের ম্যাসাই একাই ৫৫ রাণ করলেন। খেলার এ অবস্থায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ইংল্যাণ্ড ৮৫ রাণ তুলতে পারলেই তাদের জয় হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ডের দুটো উইকেট পড়ে ৫০ রাণ উঠে গেল। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে জয়লাভের জন্যে তখন আর মাত্র ৩৫ রাণ দরকার, এদিকে হাতে জমা আছে ৮টা উইকেট। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বোলার স্পোফোর্থের মারমুখী বোলিংয়ের সামনে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের তখন বলির পাঁঠার মত অবস্থা।
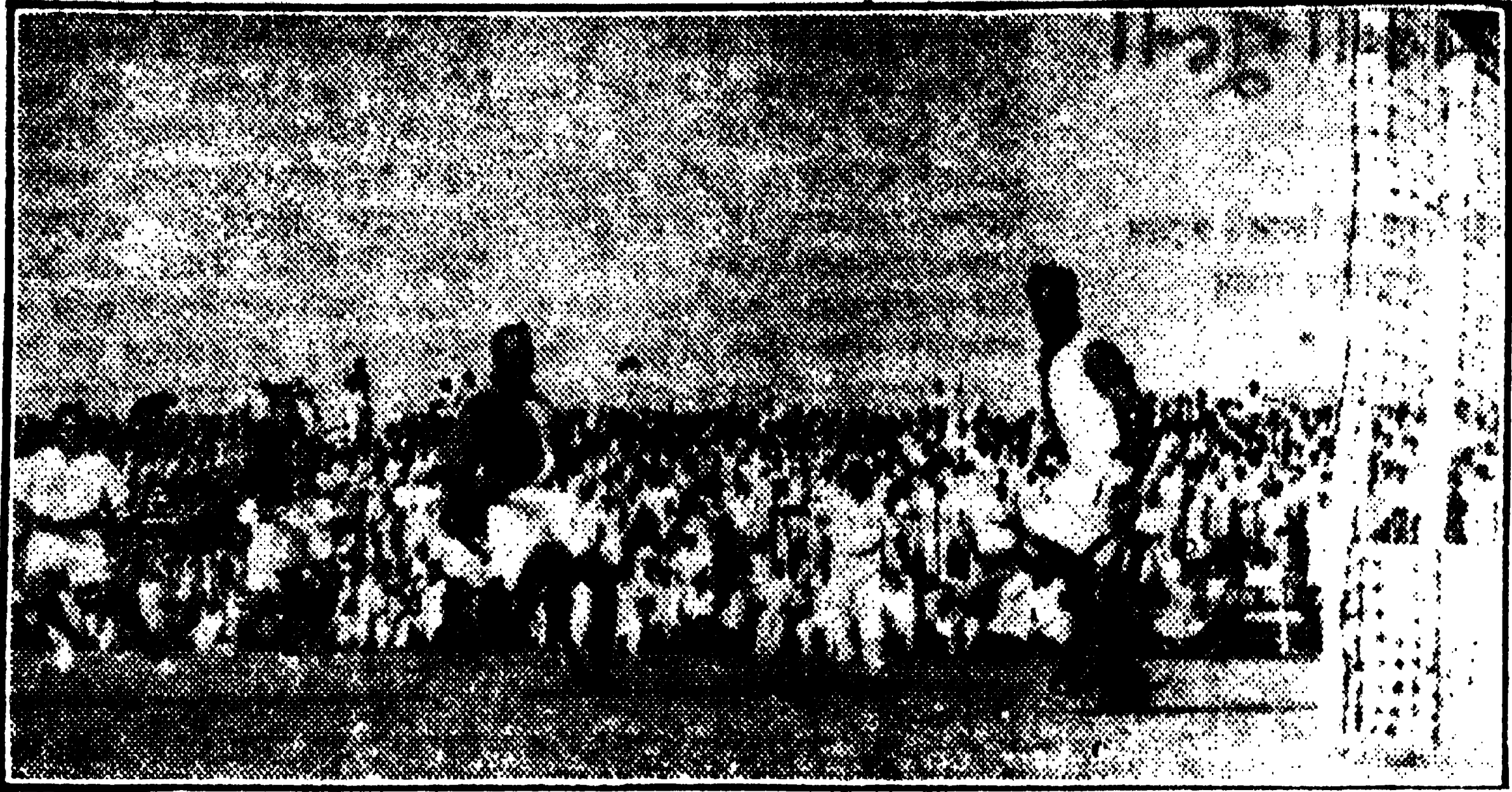
বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি দলের বিপক্ষে মোহনবাগান দলের রাইট আউট সুশেরাজের প্রথম গোল দেওয়ার দৃশ্য। ছবির ডান দিকের শেষ ভাগে ইনফ্যান্ট্রি দলের গোলরক্ষক লক্ষ্মণকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

উইকেট পড়তে পড়তে এক সময় দেখা গেল ইংল্যান্ড প্রায় লক্ষ্য স্থানে পৌঁছে গেছে—আর মাত্র ১৯টা রাণ করতে পারলেই ইংল্যান্ডের জয়—তখনও ৫টা উইকেট পড়তে বাকি আছে।

কিন্তু জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ তুলবার আগেই ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে গেল। ফলে অস্ট্রেলিয়ার ৭ রাণে জিত হল। ইংল্যান্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার এই প্রথম টেস্ট ক্রিকেট জয়লাভ। অস্ট্রেলিয়ার এই জয়লাভে প্রধান যোদ্ধার ভূমিকায় নেমেছিলেন মাসাই এবং স্পোফোর্থ—দুজনে দুই ভিন্ন ভূমিকায় যা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। স্পোফোর্থ মোট ১৪টা উইকেট পান ৯০ রাণে—১ম ইনিংসে ৪৬ রাণে ৭টা এবং ২য় ইনিংসে ৪৪ রাণে ৭টা। আর মাসাই দলের ২য় ইনিংসের মোট ১২২ রাণের মধ্যে একাই ৫৫ রাণ তুলে দেন।

এই টেস্ট খেলায় মাসাই এবং স্পোফোর্থ না খেললে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ' (The fight for the Ashes)-এ কথাটার জন্মই হ'ত না।

ক্রিকেট খেলার ফলাফল আগে থেকে অনুমাণ করা যে কতখানি বোকামী কাজ, দর্শকরা এই খেলার ফলাফল থেকেই অনুধাবণ করতে পারলেন। ইংল্যান্ডের সুনিশ্চিত জয়লাভ হবে মনে ক'রে বহু দর্শক মাঠ ছেড়ে বাড়ী ফিরেছিলেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত কম বেকুব হননি!

খেলার কৌতুকের ঘটনা, এত বেশী উত্তেজনার কারণ হয়েছিল যে, দর্শকদের পক্ষে সহজ অবস্থায় খেলা দেখা সম্ভব হয়নি। একজন দর্শক ওপর থেকে ভীড়ের মধ্যে পড়ে যান। তাঁকে আর ইংল্যান্ডের হার দেখতে হয়নি; তিনি ভাগ্যবান, মরে শান্তি পেয়েছেন—একথা উপস্থিত দর্শকেরা স্বীকার করে নেন। আর একজন দর্শক উত্তেজনার বেগ সামলাতে না পেরে ছাতার বাঁটখানা অম্লান বদনে চিবুতে থাকেন। তাঁর আশে-পাশের লোকেরও সেইরূপ অবস্থা; ভদ্রলোককে নিরস্ত করতে কেউ এগিয়ে যাননি। স্কোরাররাও উত্তেজনা থেকে বাদ পড়েননি; স্কোর লিখতে গিয়ে একজন স্কোরার খাতার ওপর লিখে ফেলেছিলেন 'Geese'। সারা ইংল্যান্ডের লোকের মুখে মুখে ঐ এক বিলাপ—ইংল্যান্ডের জিতা গেম, শেষে কিনা তারা হেরে গেল!

ইংল্যান্ডের লোক সহজভাবে এ পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। সারা দেশের লোক শোকে মুহ্যমান—যেন কোন রাষ্ট্রীয় শোক পালনের আহ্বানে সারা দেশের লোক সাড়া দিয়েছে। ইংল্যান্ডের এ পরাজয় দেশের লোকের কাছে কতখানি বেদনাদায়ক ঘটনা হতে পারে, তারই অভিব্যক্তি ছাপার হরফে উৎকীর্ণ হয়ে আছে পরের দিনের তারিখের বিখ্যাত 'Sporting Times' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে। চারিদিক কালো বর্ডার পরিবেষ্টিত সেই সংবাদটি ছিল—

"In affectionate remembrance
of
English cricket
which died at The Oval,
29th August, 1882.
Deeply lamented by a large
circle of sorrowing friends and
acquaintances.
R. I. P.
N.B. The body will be cremated
and the Ashes taken to
Australia."

এই সংবাদটি রচনা করেছিলেন বিখ্যাত 'Punch' পত্রিকার জনৈক সম্পাদকের পুত্র, শার্লি ব্রুকস।

উপরের সংবাদটির সংবাদ পরিবেশন রীতি থেকেই সে সময়ের ইংল্যান্ডের লোকের মনোভাব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে 'এ্যাসেজ' কথার উল্লেখ এই সংবাদেই প্রথম।

পরবর্তী শীতকালে (১৮৮২—৮৩) এই কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' (Ashes) উদ্ধারের উদ্দেশ্যে আইভো ব্লিগের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। এই সিরিজে চারটে টেস্ট ম্যাচ ছিল। দুই দেশই দুটো করে টেস্ট জয়ী হলে অস্ট্রেলিয়ার হাতেই 'এ্যাসেজ' থেকে যায়। এ টেস্ট সিরিজেও যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। অস্ট্রেলিয়া ১ম টেস্টে জয়ী হয়। ইংল্যান্ড ২য় ও ৩য় টেস্টে জয়ী হলে তারা ২—১ খেলায় এগিয়ে যায়। কিন্তু ৪র্থ বা শেষ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়ে খেলার ফলাফল সমান করে।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে আর এক বেদনাদায়ক ঘটনা—মেলবোর্ণে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট টীম উপস্থিত হলে একদল অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ইংল্যাণ্ডের অধিনায়কের হাতে ছাই ভর্তি একটি মৃৎপাত্র উপহার দেন। তৃতীয় টেস্ট খেলায় ব্যবহৃত স্টাম্পকে পুড়িয়ে এই ছাই তৈরী করা হয়েছিল। এই পাত্রটির গায়ে কেবল ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের নাম উল্লেখ করে নীচের গাথাটি উৎকীর্ণ ছিল।

> "When Ivo goes back with the urn, the urn,
> Studds, Steel, Read and Tylecote, return, return.
> The Welkin will ring loud,
> The great crowd will feel proud.
> Seeing Barlow and Bates with the urn, the urn,
> And the rest coming home with the urn."

এই ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ছাই ভর্তি মৃৎপাত্রটি ক্রিকেট খেলার জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত আছে। অগণিত দর্শকদের কৌতূহল চরিতার্থ করে এই মৃৎপাত্রটি। দর্শকদের চোখে-মুখে এই কথাই যেন মূর্ত হয়ে ওঠে—ছাই, তুমি সত্যিই ধন্য।'

১৮৮২ সালের পরবর্তী টেস্ট খেলায় আজও যে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া যোগদান করছে তা ঐ 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ' (The fight for the Ashes)। এই দুই দেশের মধ্যে যে দেশ বেশী খেলায় জয়ী হয় তাদের অভিহিত করা হয় 'এ্যাসেজ' বিজয়ী।

১৮৭৬ সাল থেকে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট খেলা সুরু হয়েছে। ১৮৭৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে ৪৪টি টেস্ট সিরিজের খেলা হয়েছে। ইংল্যাণ্ড 'রাবার' পেয়েছে ২১ বার, অস্ট্রেলিয়া ২০ বার এবং ৩টি টেস্ট সিরিজের ফলাফল ড্র গেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের ৭টি টেস্ট সিরিজে (১৯৪৬—১৯৫৯) অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ৪টে এবং ইংল্যাণ্ডের ৩টে। অস্ট্রেলিয়া পর পর তিনটে টেস্ট সিরিজে 'রাবার' পায়।

অস্ট্রেলিয়া এর আগে শেষ ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিল ১৯৫৬ সালে। ঐ বছরের টেস্ট সিরিজে ২টো খেলা ড্র যায় এবং ইংল্যাণ্ড ২টো খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়ে উপর্যুপরি তিনবার 'এ্যাসেজ' পাওয়ার গৌরব লাভ করে। এর পর ইংল্যাণ্ড ১৯৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে রিচি বেনোর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে 'এ্যাসেজ' খুইয়ে আসে। ৫টা খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ৪টা টেস্টে জয়ী হয়, একটা খেলা ড্র যায়।

হকি লীগ

১৯৬১ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় সমস্ত খেলা শেষ হলেও লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে দুটি দল—গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং অতীতকালের হকি খেলায় দুর্ধর্ষ কাস্টমস ক্লাব। উভয় দলই ১৮টি খেলায় ৩৩ পয়েন্ট করেছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ নির্ণয়ের জন্যে এখন এই দুই দলকে পুনরায় নিজেদের মধ্যে খেলতে হবে। সেই হিসাবে এই খেলার দিনও ঠিক হয়েছিল গত ২২শে এপ্রিল। কিন্তু কাস্টমস ক্লাব ঐ দিনের খেলায় যোগদানের অক্ষমতা কর্তৃপক্ষ মহলকে নির্ধারিত দিনের দুদিন আগে ২০শে এপ্রিল জানিয়ে দিয়েছিল। তবু একটা চেষ্টা চলেছিল কাস্টমস ক্লাবকে রাজী করাতে এবং সংবাদপত্রে এই দুই দলের প্রদর্শনী খেলার বিজ্ঞপ্তিও ছাপা হয়েছিল। মাঠে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব উপস্থিতও হয়েছিল। কিন্তু খেলাটি শেষ পর্যন্ত হয়নি। খেলায় কাস্টমস ক্লাবের যোগদান না করার কারণ হল নাকি আইন ঘটিত ব্যাপার। প্রকাশ, কাস্টমস ক্লাব কর্তৃপক্ষ নাকি জানিয়েছেন তাদের লীগের দুটি খেলা বাকি থাকতে এই প্রদর্শনী খেলার তারিখ ধার্য এবং ঘোষণা করা হয়—যেটা তাঁদের ধারণায় আইনসঙ্গত হয়নি। খেলার দিনে খেলা আরম্ভের কয়েক ঘন্টা আগে কর্তৃপক্ষ মহল খেলাটি হবে না ঘোষণা করেন। এই অনুষ্ঠিত খেলাটি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গত ২৫শে এপ্রিল তারিখে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের লীগ সাব কমিটির এক সভা ডাকা হয়। কিন্তু সভায় শুধু আলোচনাই হয়, খেলার দিন ধার্য করা সম্ভব হয়নি।

গত কয়েক দিন বিভিন্ন মহল থেকে এই অননুষ্ঠিত খেলা উপলক্ষ্য করে নানা রকম খবর সংবাদ পত্রিকায় বের হয়েছে। এই সব পড়ে অনেকের ধারণা হয়েছে এই খেলাটি আর হয়ত খেলানো সম্ভব হবে না। যদি শেষ পর্যন্ত তাই হয়, তাহলে লীগ চ্যাম্পিয়নসীপ নির্ণয় করা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ মহল কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাই জানার অপেক্ষায় লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

	খে	জ	ড্র	হা	প	বি	প
ইস্টবেঙ্গল	১৮	১৫	৩	০	৪৫	৪	৩৩
কাস্টমস	১৮	১৫	৩	০	৫৫	৫	৩৩

বেটন কাপ

বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। বেটন কাপকে বলা হয়—'Blue Riband of Indian Hockey'। ১৯৬১ সালের বেটন কাপ প্রতিযোগিতার খেলা গত

বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় পঞ্জাব পুলিশ দলের গোলরক্ষক, রাজকুমার ডোগরা মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপের কৃষ্ণমূর্তির কাছ থেকে একটা বল কেড়ে নিয়ে গোল বাঁচাচ্ছেন।

এ বছরের খেলার তালিকায় ৩২টি দলের নাম আছে। স্থানীয় দল ছাড়া ভিন্ন রাজ্যের কয়েকটি দল প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান গত বছরের বেটন কাপের রাণার্স-আপ বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান নেভী এবং বাঙ্গালোরের মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ (১৯৬১ সালের গোল্ড কাপ বিজয়ী), বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল রেলওয়ে প্রভৃতি। ১৯৬১ সালের আগা খাঁ কাপ বিজয়ী এবং গোল্ড কাপ হকি টুর্ণামেন্টের রাণার্স-আপ ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতির একাদশ দল বেটন কাপে নাম দিয়ে পরে নাম প্রত্যাহার করেছে।

খেলার তালিকায় যোগদানকারী ৩২টি দলকে এইভাবে ভাগ করা হয়—১ম রাউণ্ডে ১৬টি, ২য় রাউণ্ডে ৮টি দল বাই এবং ৩য় রাউণ্ডে বহিরাগত ৮টি দল বাই। ১ম রাউণ্ড থেকে যে ৮টি দল ২য় রাউণ্ডে উঠেছিল তাদের মধ্যে মাত্র দুটি— পুলিস এ সি এবং খালসা রুজ দল ৩য় রাউণ্ডে ওঠে। খালসা রুজ দলের ৩য় রাউণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতির একাদশ দল প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় খালসা রুজ সরাসরি ৪র্থ রাউণ্ডে উঠে যায়। গত বছরের বেটন কাপের রানার্স-আপ বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান নেভী ৫—১ গোলে খালসা রুজ দলকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

পুলিস ৩য় রাউণ্ডে মারাঠা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দলের কাছে প্রথম দিন খেলা ড্র করে দ্বিতীয় দিনে ০—২ গোলে পরাজিত হয়।

এ বছরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলায় শীর্ষস্থানীয় ইষ্টবেঙ্গল এবং কাষ্টমস ক্লাব বেটন কাপের খেলায় বিশেষ সাফল্য দেখাতে পারেনি। ইষ্টবেঙ্গল তাদের প্রথম খেলায় (২য় রাউণ্ড) মেসারার্সকে ৪—১ গোলে হারিয়ে দেয় কিন্তু ৩য় রাউণ্ডে ইণ্ডিয়ান নেভী দলের কাছে ১—২ গোলে হেরে যায়।

২য় রাউণ্ডে কাষ্টমস তাদের প্রথম খেলায় মাত্র ১—০ গোলে আর্মেনিয়ান্সকে পরাজিত করে। ৩য় রাউণ্ডের খেলায় তারা বোম্বাইয়ের লুসিটোনিয়ান্স স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে দুদিন গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র করার পর তৃতীয় দিনে খেলার শেষের দিকে পেনাল্টি কর্ণার থেকে গোল দিয়ে ১—০ গোলে জয়ী হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে কাষ্টমস ১—২ গোলে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দলের কাছে হেরে যায়।

গত বছরের বেটন কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ২য় রাউণ্ডে ৭—১ গোলে তালতলাকে, ৩য় রাউণ্ডে মাত্র ১—০ গোলে দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস দলকে এবং ৪র্থ রাউণ্ডে ৪—০ গোলে মারাঠা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দলকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

প্রতিযোগিতায় একদিকের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান খেলবে পঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে এবং অপর দিকে ইণ্ডিয়ান নেভী খেলবে সেণ্ট্রাল রেলওয়ের সঙ্গে।

৪র্থ রাউণ্ড থেকে খেলার তালিকা

৪র্থ রাউণ্ড	সেমি-ফাইনাল	ফাইনাল	সেমি-ফাইনাল	৪র্থ রাউণ্ড
মোহনবাগান—৪	মোহনবাগান		নেভী	ইণ্ডিয়ান নেভী—৫
মারাঠা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি—০				খালসা রুজ—১
মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ—১				কাষ্টমস—১
পঞ্জাব পুলিশ—২	পঞ্জাব পুলিশ		সেঃ রেলওয়ে	সেন্ট্রাল রেলওয়ে—২

তারিখ ৪।৫।৬১

॥ সাহিত্যের আসর ॥

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবারকার নববর্ষের সাহিত্য-আসরটিতে প্রকৃত জ্যেষ্ঠের কাজ করলেন। তাঁর সংযত অথচ সহৃদয় স্বল্প ভাষণে তিনি আসরটিকে এমন এক মর্যাদায় উন্নীত করলেন যে, কোন কোন প্রবীণ সাহিত্যিকের মনঃক্ষোভে প্রীতিসম্মেলন ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কাটুকু তিরোহিত হয়ে গেল। তিনি তাঁর অল্প কটি কথার ভেতরে অনেকগুলো নতুন খবর শোনালেন, নেতৃত্বের আসন থেকে কয়েকটি আশ্বাস দিলেন এবং পুরস্কার-প্রাপ্তি সম্পর্কে উদাসীন থেকে অনন্বী-কার্য সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করার জন্য সাহিত্যিকদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানালেন। বললেন, 'দেশের উন্নতিতে সাহায্য হয় সাহিত্যক্ষেত্রে আপনারা এমন সৃষ্টিতে হাত দিন।'

এবার নিয়ে চার বছর ধরে নববর্ষের এই সাহিত্য-আসরে বাংলা সাহিত্যের কৃতী লেখকদের পুরস্কার দেবার একটি রীতি চলে আসছে। এর উৎপত্তি হয়েছে এম. সি. সরকার এণ্ড সন্সের একটি বাৎসরিক প্রীতিসম্মেলনে। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় দক্ষিণ কলিকাতায় ন্যাশনাল

বৈশাখী সাহিত্য-সভা

তীর্থঙ্কর

হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এমনই এক প্রীতি-সম্মেলনে কৃতী সাহিত্যিকদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের প্রস্তাব করেন। অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, উল্টোরথ ও মৌচাক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এ প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর বৈশাখ মাসে সেই রকম অন্তরঙ্গ পরিবেশে সাহিত্যিক সম্মেলনে পুরস্কার বিতরণ হয়ে আসছে। এবার সে আয়োজন হয়েছিল সাহেব পাড়ার গ্রাণ্ড হোটেলের প্রিন্সেস হলে গত রোববার ১৭ই বৈশাখের সন্ধ্যায়।

প্রশস্ত হল পরিপূর্ণ বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে ডাঃ রায় পুরস্কার বিতরণ করলেন।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পেলেন অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার পুরস্কার; শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পেলেন যুগান্তরের মতিলাল পুরস্কার; শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মৌচাকের; সৈয়দ মুজতবা আলী আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র পুরস্কার; শ্রীপ্রমথনাথ বিশী দেশ সাপ্তাহিকের প্রফুল্লকুমার পুরস্কার; শ্রীদিনেশ দাশ পেলেন 'উল্টোরথ' পুরস্কার। এ ছাড়া কেবল এবারের জন্য মিত্র এণ্ড ঘোষ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তকে একটি বিশেষ পুরস্কার দিলেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সীর' জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে ৫০০১ টাকা দেবেন বলে জানালেন। শ্রীঅশোককুমার সরকার এই শেষ ঘোষণাটির সঙ্গে দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমী এবার কোন বাংলা বইকে পুরস্কার দেবার যোগ্য বলে মনে না করায় কিছু ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

পুরস্কার বিতরণের পর শ্রীসজনীকান্ত দাসও সাহিত্য আকাদেমীর সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানালেন, এটিকে "অপমানকর ব্যাপার" এবং উপসংহারে আকাদেমী পুরস্কারকে "ঘৃণ্য পুরস্কার" বলে অভিহিত করলেন। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার সম্পর্কেও অনুরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এবং দুইজন কবি এবং একজন কথাসাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করে এঁরা উপেক্ষিত হচ্ছেন বলে অনুযোগ করলেন। শ্রীদাসের কথাগুলোরই জের টেনে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী আরও জোরে এবং ক্ষুব্ধকণ্ঠে সাহিত্য আকাদেমীর আচরণে প্রতিবাদ জানালেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন এই সংকল্প ঘোষণা করলেন যে, এরপর তাঁকে ঐ

পুরস্কার দিতে এলে তিনি তা ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করবেন তখন তাঁর ভাষণটি একান্ত ব্যক্তিগত ও অপ্রীতিকর হয়ে উঠল। প্রীতিসম্মেলনের আবহাওয়াটিও যেন ক্ষুণ্ণ হবার উপক্রম। অনেকেরই মনে হল, প্রবীণ সাহিত্যিক দুজন তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্রটি ঠিক বেছে নিতে পারেননি এবং যে পুরস্কার ঘৃণ্য ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য তার উদ্দেশ্যে শিথিল ভাষায় এত অভিমান প্রকাশ করাও তাঁদের বয়স, বৃত্তি ও মর্যাদার উপযুক্ত হয়নি।

হয়নি যে, তা ডাঃ রায়ের সংযত বাক্-ভঙ্গিতে আরও পরিস্ফুট হল।

ডাঃ রায় বললেন, 'ভেবেই পেলাম না আমাকে এখানে কেন ডাকা হল। আগে সব অনুষ্ঠানেই মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল প্রভৃতিকে ডাকা হত, যেন তাঁরা সকল বিষয়েই বিজ্ঞ। আজকাল সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম আসব না—এসে কি করব? তারপর যে এলাম তার কারণ তিনটি।' প্রথমত, যতদিন বাংলাদেশ ও বাংলাভাষা বেঁচে থাকবে ততদিন বাংলা সাহিত্য থাকবে; অথবা কথাটাকে ঘুরিয়েও বলা যায়, যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকবে ততদিন বাংলাভাষা ও বাংলাদেশ থাকবে। সুতরাং, বাংলাসাহিত্যসেবীদের যদি কোন কষ্টের কারণ ঘটে থাকে তবে তা তাঁর ভেবে দেখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, তাঁর মনে হয়েছে, সাহিত্যে বাংলা কেন এত অগ্রসর এ নিয়ে যেন সাহিত্য অকাদেমীর একটু হিংসার ভাব আছে। 'কিন্তু এজন্য আমরা দায়ী নই। ও'দেরও ক্ষোভ প্রকাশের কারণ নেই। ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ মনীষী বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, আমরা ভাগ্যবান, আমরা সেই ইতিহাস, সেই ঐতিহ্য নিয়ে জন্মেছি।' তৃতীয়ত, তিনি একথা বলতে এসেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যতরকম গবেষণা সম্ভব সাহিত্যসেবীরা যেন তা করেন। 'আমরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার কথা ভাবছি। ভাবছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় যেখানে স্পষ্ট সে তো রয়েছেই, যেখানে তিনি ইঙ্গিতমাত্র দিয়েছেন তা নিয়ে গবেষণা দরকার। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সর্বদেশের এবং সর্বসময়ের সত্য; তাই সেসব বক্তব্যের আরও গবেষণা প্রয়োজন।'

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় প্রসঙ্গত বলেন, একবার দিল্লী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছিল; আর্টিস্টদের কিছু অর্থ সাহায্যদানের প্রস্তাব। 'আমি বলেছিলাম, তাঁদের বিচার করবে সে ক্ষমতা তোমাদের কোথায়?' তাঁরা

ললিতকলা আকাদেমী কেন্দ্রানুমোদিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁদের এখানকার আকাদেমী দেখে যেতে অনুরোধ করেন। তাঁরা দেখেন এবং এর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন।

ডাঃ রায় বেশ জোর দিয়েই বলেন, 'যদি ও'রা অবজ্ঞা করেন তো আমরা আরও চাঙ্গা হয়ে উঠব। আমাদের সাহিত্য তাঁরা বোঝেন কিনা সন্দেহ।' প্রসঙ্গত তিনি চলচ্চিত্রায়িত পথের পাঁচালীর কথা উল্লেখ করেন। যখন চিত্রটি কান-এর বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হল তখন এখানেও ছবিটি ভাল বলে রব উঠল। তিনি জানালেন, আজ এ ছবি আমেরিকায় দেখানো হচ্ছে ও তাই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা জমেছে।

ডাঃ রায় বললেন, 'তাঁরা যতই দাবাতে চেষ্টা করুন, যেখানে সত্য আছে তা স্বীকার করতেই হবে। আপনারা সেদিকে লক্ষ্য রেখে বই লিখবেন। সাহিত্যসেবী হিসেবে আপনারা সেই বই লিখুন যাতে দেশের উন্নতি হয়। কি বই লিখলে পুরস্কার পাব সে লক্ষ্য নয়, কি লিখলে দেশের উন্নতি হবে সেই লক্ষ্য।'

ডাঃ রায় প্রসঙ্গত একথাও জানালেন যে, তাঁদের এখানকার সঙ্গীতনৃত্য-নাটক আকাদেমী কেন্দ্রায়ত্ত করারও একটি প্রস্তাব তাঁর কাছে এসেছিল। তাতে এখানকার শিক্ষামান নেমে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি রাজী হননি। সম্ভবত এই কারণে তাঁরা বিরূপ হয়েছেন। যাই হোক, তিনি মনে করেন, এতে উত্তেজিত হবার কারণ নেই; কেননা, আমাদের সৃষ্টি যদি উচ্চস্তরের হয় তবে একটা কেন দশটা আকাদেমীও তা দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

ডাঃ রায় একথাও বলেন যে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক নির্বাচন সাহিত্যিকদের ওপরই ছেড়ে দেয়া উচিত এবং রবীন্দ্র পুরস্কার সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠল তার সত্যাসত্য সম্পর্কে তিনি খোঁজ নেবেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও উপস্থিত সুধীবৃন্দের প্রতি ধন্যবাদ জানালেন শ্রীশচীবিলাস রায়চৌধুরী।

যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং বাংলাদেশের লোক-সাহিত্য বিষয়ে গ্রন্থ রচয়িতা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

এই সাহিত্যসেবীদের বাইরে যাঁরা আসরটিকে বিশেষ উপভোগ্য করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এবং শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র।

এদিনকার সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর মুখে বাৎসরিক সাহিত্য-আসরটি বৈচিত্র্য উপভোগ্য হয়েছিল সন্দেহ নেই এবং অসাহিত্যিক রাজনীতিক হলেও ডাঃ রায়ের কথাগুলো সাহিত্যিকদের অনেকদিন মনে থাকবে, গ্রান্ড হোটেলের বাইরে অবিরাম বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে এ কথাই ভাবছিলাম।

গল্পের পরে

গল্পের শেষ নেই।

তেমন তেমন মানুষের জীবন শেষ হবার অনেক অনেক পরে যুগের বেড়া অতিক্রম করেও বহু বিচিত্র ঘটনা বইয়ের পাতায় পাতায় মানুষের মুখে মুখে ফেরে। পাণ্ডুলিপির রঙ একদিন পাণ্ডুর হয়ে যায়। কিন্তু সেই পাণ্ডুলিপির শিল্পী তার জীবনের সমস্ত সবল ও দুর্বল সত্তা নিয়ে মানুষের মনের আকাশে নতুন নতুন রামধনু রচনা করে।

পৃথিবীর হোমরাচোমরা সাহিত্যিকরা কি কি ব্যাধি বিকারে ভুগেছেন, একালের চিকিৎসকরা বিভিন্ন সময়ে তার সুন্দর ফিরিস্তি দিয়েছেন।

জন কীটস নিউটন-কে 'for having reduced the rainbow to prismatic colours' ক্ষমা করতে পারেননি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি জীবনের সৌন্দর্য হরণ করছে এই ছিল তাঁর অভিযোগ।

এ যুগের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা কাব্য ও সাহিত্যের স্রষ্টাদের প্রেরণার উৎস সম্পর্কে নীরব। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁরা কার্লাইলের 'heavenly unrest' বা বায়রণের 'terrible ennui'-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজেছেন।

ম্যাথু আর্ণল্ডের ছিল এ্যাঞ্জিনা পিক্টোরিস। আধুনিক জীবনযাত্রার দ্রুতগামিতাকে তিনি বারবার আসামীর চেয়ারে বসিয়েছেন তাঁর কাব্যে। অথচ, সেই দ্রুতগামিতার ফাঁদে পড়ে, লিভারপুলে ট্রাম ধরতে গিয়ে তিনি এ্যাঞ্জিনার আক্রমণে প্রাণ হারালেন।

সবুজ চোখ আর লালচে চুলের ছটফটে মানুষ কবি সুইনবার্ণ যখন-তখন মূর্চ্ছা যেতেন। ব্রিটিশ মিউজিআমের মতো জায়গাতেও তাঁর নাটকীয়ভাবে সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে। আবার মদ্যপানের ব্যাপারেও তিনি হাতযশের এমন সব নজীর রেখে গেছেন, যা নজর করলেই নেশা লেগে যায়। টেনিসনের অনুকরণে পোর্ট, প্রি মাস্কেটিআর্সদের অনুকরণে পোর্ট ছেড়ে বার্গাণ্ডি, বায়রণের অনুসরণে বার্গাণ্ডি থেকে ক্লারেট এবং অননুকরণীয় সেক্সপীআরের অনুসরণে ক্লারেট থেকে বিআরে পৌঁছে সুইনবার্ণ পথেঘাটে এমন দামালপনা শুরু করলেন যে, আদর করে বড়রা বললেন, উনি হচ্ছেন আমাদের ভিক্টোরিআন কবিতার 'infant terrible'।

এ হেন নামী মানুষটি একদিন মূর্চ্ছার টাল সামলাতে না পেরে প্যারিস হেন তীর্থে জলে ডুবে প্রাণটি হারাতে বসেছিলেন। ভাগ্যে মোপাসাঁ কাছে ছিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়ে কবিকে তুলে তিনি 'did a service to English poetry.'

রঙ বেরঙ
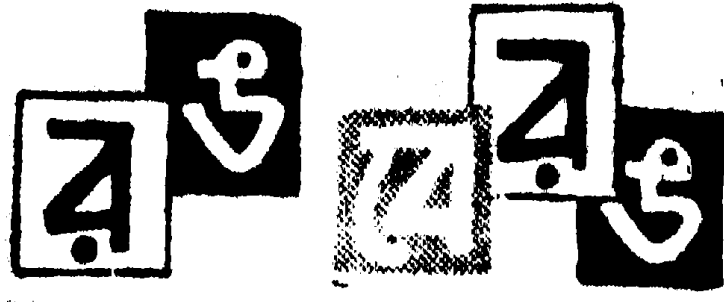
বিশ্ববারা

কিন্তু কবির কি হয়েছিল? ডাক্তাররা বলেন তিনি ছিলেন এপিলেপ্সির এক জবরদস্ত রোগী, তাই জলে ও স্থলে তাঁর ঘন ঘন মূর্চ্ছা ও পতন।

রোগের বিচিত্রতায় ওআর্ডসওআর্থ-এর পরিবারের নামডাক ছিল।

স্ত্রী মেরী সাত বছরে পাঁচবার সন্তান সম্ভাবনার সঙ্গে নানারকম অসুখ আমদানি করেছিলেন। বোন ডরোথী উন্মাদ হয়ে যান। মেয়ে ক্যাথারিণ-এর ছিল পক্ষাঘাত।

কবির নিজের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। এবং প্রকৃতির শোভা ঝাপসা দেখতে দেখতে তাঁর কাব্যও হচ্ছিল ফ্যাকাশে। কবি অবশ্য বলেছেন, তাঁর 'inward eye, the bliss of solitude.' কিন্তু প্রফেসার এডিথ বেডস এবং ডাক্তাররা বলেন, ভাল চশমা পরলে কবির 'outward eye,' তথা কাব্যপ্রবাহ দুই-ই উপকৃত হতো।

মিলটন বজ্রনির্ঘোষে বললেন, অতএব জগৎও স্বীকার করল, তাঁর অন্ধতা হচ্ছে ঈশ্বরের অভিশাপ।

কিন্তু ১৯৩৩ সালে সুবিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ উইনফর মিলটনের চোখের নানারকম লক্ষণ বিচার করে একটি ক্লিনিক্যাল কেস সাজালেন। তিনি বললেন, মিলটনের গ্লকুমা হয়েছিল।

অন্য একদল ডাক্তার গ্লকুমা নয়, মাইওপিআ, এই বলে মিলটনের চোখের অসুখটিকে আবার একটি বিতর্কমূলক সমস্যায় পর্যবসিত করেছেন। মিলটনের সমসাময়িক স্যামুয়েল পেপিসও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতায় কষ্ট পান। যৌবনে তাঁর গলব্লাডার থেকে একটি টেনিস বল সদৃশ পাথর অপারেশন করে বের করা হয়। পেপিস সেই পাথরটি রাখবার জন্যে ১৬৬৪ সালে চব্বিশ শিলিং দিয়ে একটি কেস তৈরী করেন। তিনি বন্ধুবান্ধবকে সগর্বে তাঁর শরীরের এই আশ্চর্য খনিজ দ্রব্যটি (পেপিস তাই ভাবতেন) দেখাতেন। তাঁর চোখের কষ্ট বেড়েই চলেছিল।

পঞ্চাশ বছর আগে ডাঃ ডার্সি পাওআর, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, পেপিস-এর কেসটি অনুধাবন করেন। তিনি রায় দিলেন পেপিস-এর চোখের অসুখটি হলো— 'farsightedness with some degree of astigmatism.

তিনি প্রেসক্রিপশন করলেন চশমার— 'For Samuel Pepys Esqr., spectacles: +2 D.C.+0.50 D. Cyl. axis 90 degree.

চশমাটিও তৈরী করা হয়। যদিও তার শতিনেক বছর আগেই পেপিস অন্য দুনিয়ায় রওনা হয়েছেন।

বায়রণ! রহস্য, রোমান্স, স্ক্যাণ্ডাল এবং কৌতুহলের কেন্দ্র এই মানুষটির 'club foot'ও ডাক্তারদের নজর এড়ায়নি। ডাক্তাররা বায়রণের আনু-

পূর্বিক ইতিহাস ঘাটলেন। বায়রণের পরিচিত বন্ধুবান্ধব এবং অসংখ্য বান্ধবী সকলেই ভিন্নমত। কেউ বলেছেন তাঁর ডান পা খারাপ, কেউ বলেছেন বাঁ পা-টি দোষযুক্ত। কেউ বা বলেছেন তাঁর হাঁটার ভঙ্গীই ছিল বিকৃত।

ডাক্তাররা চিন্তা করলেন। জন মারের বাড়ীতে সুরক্ষিত, বায়রণের শৈশবের সার্জিকাল বুট জোড়া দেখলেন। দুটি জুতোই ডান পায়ের জন্যে তৈরী।

বিখ্যাত গল্পবাজ এডওআর্ড ট্রেলনী আরো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে গেছেন। বায়রণের মৃতদেহ ঢাকনা তুলে দেখে, তিনি নাটকীয়ভাবে বলেছেন—The form and figure of an Apollo with feet and legs of a Sylvan Satyer.' আবার পরে এই উক্তি তিনি প্রত্যাহার করে বলেছেন, বায়রণের পা স্বাভাবিকই ছিল।

ডাক্তারদের মতে—বায়রণ ভুগছিলেন : 'Little's disease. Its distinguishing symptom is a clumsy habit of walking, characterized by rigidity of foot and leg muscles with lack of coordination'.

অতএব, এখন আমাদের কৌতূহলী চোখে কবির চেহারার সঙ্গে club foot-এর কথা না ভেসে ওঠাই ভালো। অবশ্য, মাইকেলকে যাঁরা মদ্যপানের জন্যই ভালোবাসেন, তাঁদের সমগোত্রীয় বায়রণকে যাঁরা club foot-এর জন্যই সমবেদনার চোখে দেখেন, তাঁরা খানিকটা আঘাত পাবেন।

রবার্ট বার্ণস্ নাকি যৌনব্যাধি এবং মদ্যপানের জন্যই অকালে মারা যান। ডাক্তাররা সে কথা মানতে নারাজ। ডাঃ জেমস্ ক্রাইটন ব্রাউন এবং হ্যারি অ্যান্ডারসনের সুচিন্তিত মত হলো—বার্ণস্ বাত এবং তজ্জনিত endocarditis-এ ভুগছিলেন।

তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

থ্যাকারের রুক্ষ মেজাজ, অ-মিত জীবনযাপন, খামখেয়ালীপনা, আমোদ-প্রবণতা সম্পর্কে জীবনীকাররা একমত।

ডাক্তাররা বলেন—বলেন কি মশাই? লোকটি খারাপ দাঁত, মাথাধরা, পেটের গোলমাল, ম্যালেরিয়া এবং আর্থ্রাইটিস্-এ একসঙ্গে ভুগছিলেন। তার ওপর স্ত্রীটি উন্মাদ। ও অবস্থায় আপনারা কি দেঁতো হাসি হেসে মোলায়েম ভদ্রতা দেখাতে পারতেন?

কোলরিজ আফিম খেতেন। নিজেই লিখলেন, আফিমের মেজাজে মোলায়েম একটি স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্নই আমার Kubla Khan-এর উৎস।

প্রফেসার এলিজাবেথ স্নাইডার এবং ডাক্তাররা ঘাড় নেড়েছেন—আফিম রোগীর পঞ্চাশটা কেস্ ঘেঁটেও তো মেডিক্যাল জার্নাল-এ অমন চমৎকার স্বপ্ন দেখবার কোন সগোত্র নজীর পাচ্ছি না। কবি যাই বলুন, ও তাঁর সুসংবদ্ধ, সচেতন চিন্তার ফল। আফিমের সঙ্গে তার কোন যোগই নেই।

বেচারী কোলরিজ!

ডি. জি. রসেটি ক্লোরাল হাইড্রেট-এর সর্বনেশে নেশা করতেন। পরে তাঁর মানসিক সুস্থতা বিপর্যস্ত হয়েছিল।

ডাক্তাররা বলেন—শুধু ক্লোরাল খেলে কি আর হতো? উনি ক্লোরাল খেতেন সর্বনেশে পরিমাণে। তার ওপরে মদ! দুটি জিনিস দুজনের শত্রু। কবির শরীরের মধ্যে ক্লোরাল ও অ্যালকোহল-এর নিরন্তর যুদ্ধ চলতো। তার ফলেই কবি মৃত্যু এগিয়ে আনলেন। ওরা দুজনেই সর্বনেশে। অমন ভয়ঙ্কর দুটিকে না জুটিয়ে একটিকে ঠাঁই দিলে কবি আরো কিছুদিন অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকতে পারতেন।

দশটি ডাক্তার একটি রোগী পেলে, যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সেই রোগ অনুযায়ী প্রেস্ক্রিপশান বাতলে থাকেন। নীরোগ মানুষকে দশ জন ডাক্তার পাইওরিয়া, মাইওপিআ, নার্ভাস্ ব্রেকডাউন, কোলাইটিস প্রমুখ দশটা রোগের রোগী বানাতে পারেন। তাঁদের দোষ নেই। তাঁরা যে বিশেষজ্ঞ।

১৯০০ সালে চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার গোলড্, যে হেতু তিনি চোখের রোগ ছাড়া আর কিছু বোঝেন না, সে হেতু একটি বিরাট প্রবন্ধ ফেঁদে বসলেন। প্রতিটি কবি এবং সাহিত্যিক ও দার্শনিক যে বেদনা, হৃদয়ের ক্রন্দন এবং অশান্ত বিক্ষোভের কথা বলেছেন, তাঁরা সবাই নাকি চোখের রোগে ভুগতেন। চোখের রোগই ছিল তাঁদের সেই স্বর্গীয় অপার্থিব অশান্ত আবেগের কারণ। তাঁর এই এক প্রবন্ধের গুলীতে যে সব মহারথীরা ঘায়েল হয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন ডি কুইন্সী, কার্লাইল, হার্বার্ট স্পেন্সার, ব্রাউনিং, জর্জ ইলিয়ট, নীট্শে ইত্যাদি।

অন্যান্য ডাক্তাররা গোলডের সর্বনেশে যুক্তিকে নস্যাৎ করে আবার মহারথীদের খাড়া করেছেন। এখন তাঁদের জন্যে নতুন নতুন অসুখ ভাবতে হবে।

স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সিমসনের মতে একা শেক্সপীআর যে সব নিউরোটিক, পাগল, খুনে আমদানি করেছেন, তাদের যে কোন একটিকে ধরে, অর্থাৎ প্রেতদ্রষ্টা বিষণ্ণ-চরিত্র হ্যামলেট, সোমনামবুলিস্ট লেডী ম্যাকবেথ, বদমেজাজী ক্যাসিআস, এদের যে কোন একজনের ওপর মাথা ঘামালে হবু-ডাক্তাররা নতুন নতুন Nervous disease আবিষ্কার করতে পারবেন।

তিনি উদাহরণও দিয়েছেন। যেমন—ডাক্তারসাহেব টেবিলে বসে আছেন, ক্যাসিআস এসে সীজারকে গালি দিতে লাগলেন। টাইবারে ঝাঁপিয়ে সীজার বলেছিলেন, 'Help me, Cassius, or I sink'.

ডাক্তার বললেন—মশায়, নিশ্চয় তাঁর হার্ট খারাপ ছিল, হয়তো বাত ছিল, জল লাগলে খিঁচুনি হতো, আপনার আগেই বাধা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনিও যে চোখ ঘোরাচ্ছেন, দাঁত কিড়মিড় করছেন, প্রেসার দেখান এবং ভিটামিন-বি খান।

ম্যাকবেথ বললেন— "Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow".

ডাক্তার লিখলেন—সময় সম্পর্কে obsession; নিশ্চয় কিডনীতে depression হচ্ছে।

ম্যাকবেথ বললেন—'Out, out, brief candle!'

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন—'There is no candle, and man, can you not speak in simple prose?'

ডাক্তারদের হাত থেকে নিস্তার নেই।

ঘটনা প্রবাহ

ঘরে—

২৪শে এপ্রিল—১১ই বৈশাখ :

'পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার উপর ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হইবে না'—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র ভর্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা—দেশের ডাক্তারের বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের নিকট ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের সুপারিশ।

২৫শে এপ্রিল—১২ই বৈশাখ :

কলিকাতা ও হাওড়ার বিস্তৃত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ও নাগরিক জীবনে চরম দুর্গতি—ডি. ভি. সি'র দুর্গাপুর ইউনিট বিকল হওয়ার জের।

উড়িষ্যা রাজ্যে (রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন) রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়নের ক্ষমতা—লোকসভায় যথারীতি বিল পাশ।

২৬শে এপ্রিল—১৩ই বৈশাখ :

দুই মাসে (সাম্প্রতিক) ৮ বার ভারতীয় আকাশ-সীমা লঙ্ঘন—পাকিস্থানী বিমানের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে লোকসভায় সরকার পক্ষের তথ্য পেশ।

'ভারতীয় ফৌজ যে কোন বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম'—রাজ্যসভায় দেশরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেননের আশ্বাসবাণী।

২৭শে এপ্রিল—১৪ই বৈশাখ :

অন্ডালের নিকট ট্রেন দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত ও ৮ জন আহত—কয়লাবাহী মালগাড়ীর সহিত হুপর স্টেশনের সংঘর্ষ।

দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ৩৫ জন বিশিষ্ট ভারতীয়কে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান—রাষ্ট্রপতির (ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ) নিকট হইতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সর্বপ্রথম 'ভারত-রত্ন' উপাধি লাভ।

২৮শে এপ্রিল—১৫ই বৈশাখ :

নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক লাওস তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বৈঠক আরম্ভ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু (ভারত) কর্তৃক বৈঠকের উদ্বোধন।

কংগ্রেস সমর্থিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীতুলসীচরণ পাল ভোটাধিক্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত।

২৯শে এপ্রিল—১৬ই বৈশাখ :

যুদ্ধবিরতি (লাওসের) সংক্রান্ত খসড়া বয়ান সম্পর্কে দিল্লীতে আন্তর্জাতিক লাওস তদারকী নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মতৈক্য—দিল্লীতে দ্বিতীয় দিনে কমিশনের তিন ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশন।

লাওসে শীঘ্র যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থাকল্পে শ্রীনেহরুর নিকট মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির পত্র—রাজধানীতে (দিল্লী) সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাৎকারকালে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তথ্য প্রকাশ।

৩০শে এপ্রিল—১৭ই বৈশাখ :

কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে নেপথ্যে পরস্পরের কুৎসা প্রচারের প্রবণতা—গৌহাটিতে আসাম কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের সভায় কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই'র নিন্দাবাদ।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ-গয়ায় বৌদ্ধদের পবিত্র অনুষ্ঠান—থাইল্যান্ড, তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্ম ও ভারতের সহস্র সহস্র ভিক্ষুর সমাবেশ।

বাইরে—

২৪শে এপ্রিল—১১ই বৈশাখ :

লাওসে যুদ্ধবিরতির জন্য বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের আবেদন—আন্তর্জাতিক তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন পুনরাহ্বানে ভারতকে অনুরোধ—১২ই মে লাওস প্রসঙ্গে জেনেভায় প্রস্তাবিত চতুর্দশ রাষ্ট্র সম্মেলন।

২৫শে এপ্রিল—১২ই বৈশাখ :

আলজিরিয়া অভিমুখে ফ্রান্সের 'ভূমধ্যসাগরীয় নৌ-বাহিনীর' অগ্রগতি—প্যারিস রক্ষার জন্য পশ্চিম জার্মাণী হইতে ফরাসী সৈন্য আমদানীর সংবাদ।

পাক্-আফগান সীমান্তে পুস্ত এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ—ইতস্ততঃ ঘটনায় একটি যাত্রীর ট্রেন চলাচল ব্যাহত।

সাহারায় ফ্রান্সের পরীক্ষামূলক চতুর্থ আণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

২৬শে এপ্রিল—১৩ই বৈশাখ :

আলজিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ ব্যর্থ—প্রেসিডেন্ট দ্য গল সরকারের (ফ্রান্স) কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

কঙ্গোলী সেনাবাহিনীর হাতে লুমুম্বার (পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী) হত্যার ব্যাপারে দায়ী কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট মোয়সে সোম্বে বন্দী—কোকিলহাটভিল বিমান-ঘাঁটিতে বিমানে উঠিবার সময় গ্রেপ্তার।

২৭শে এপ্রিল—১৪ই বৈশাখ :

নেপালের বৈষয়িক উন্নয়নে ভারতের আর্থিক সাহায্য দান।

লুয়াণ্ডার সংবাদদাতার সংবাদ—আঙ্গোলায় (পর্তুগীজ অধিকৃত) সন্ত্রাসবাদী অভিযানে প্রায় দশ সহস্র শ্বেতকায় নরনারী ও শিশুর প্রাণহানি।

মধ্য রাত্রিতে সিয়েরা লিওনের (আফ্রিকা) স্বাধীনতা লাভ—দেড়শত বৎসরব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসনের (বৃটিশ) অবসান।

২৮শে এপ্রিল—১৫ই বৈশাখ :

ওয়াকিফহাল মহলের সংবাদ অনুসারে কঙ্গোলী প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু, সরকারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও কাতাঙ্গার প্রেসিডেন্ট সোম্বে স্ব স্ব গৃহে অন্তরীণ।

২৯শে এপ্রিল—১৬ই বৈশাখ :

কুইলু বন্দরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও কঙ্গোলী সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষে বহু ব্যক্তি হতাহত হওয়ার সংবাদ—রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘানা বাহিনীর উপর কঙ্গোলীদের অতর্কিত আক্রমণ।

আলজিরিয়ার বিদ্রোহী অফিসারদের শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ—সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা।

৩০শে এপ্রিল—১৭ই বৈশাখ :

লাওসে যুদ্ধ-বিরতিকল্পে রাশিয়া ও বৃটেনকে (জেনেভার লাওস সংক্রান্ত সম্মেলনের চেয়ারম্যান) সক্রিয় হস্তক্ষেপের অনুরোধ—লাওসের নিরপেক্ষতাবাদী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সৌভান্না ফৌমার তারবার্তা।

দেশে বিদেশে

মহাশূন্যে :

সেই আদিকাল হইতে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া কত বিচিত্র রঙিন কল্পনা করিয়াছে এবং কল্পিত পাখায় ভর করিয়া দেশে-দেশে মানুষের বাক্‌স্ফূর্তি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সীমাহীনআকাশের গ্রহ-তারকারাজি গণিতে ধরা পড়িয়াছে—দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই সুদূরে অবস্থিত দৃষ্টিগোচরেও আসিয়াছে কৌতূহল আরও বাড়িয়াছে, কিন্তু নাগাল তাহাদের পায় নাই। মানুষ পাখীর মতো আকাশে উড়িতে চাহিয়াছে, বিমানের সাহায্যে তাহাও সম্ভব হইয়াছে। তাহাতেও তৃপ্ত হয় নাই; নিঃসীম ব্যোমলোকে চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাইতে হইবে—সেই মহাশূন্যে। একদা বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠপাদে পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়-পুলকিত চিত্তে শুনিল—মানুষের সেই স্বপ্নও সার্থক হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার ২৭ বৎসর বয়স্ক মেজর ইউরি আলেক্‌সিয়েভিচ গাগারিণ মহাশূন্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া নির্বিঘ্নে মর্ত্যের মাটিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

স্বভাবতই সমগ্র পৃথিবী তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ সগর্বে উল্লসিত হইয়াছেন। জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বীর গাগারিণ যে অতুলনীয় সাহসের পরিচয় দিলেন তাহা কোনো কৃতিত্বের বিশ্লেষণে সীমিত করা অসম্ভব, কেননা, ইহা অভূতপূর্ব। গাগারিণ অমর হইয়া রহিলেন একথাটিও অতি সাধারণ শোনাইবে। মানব-সভ্যতা যদি অনন্তকাল প্রবাহিত থাকে, তবে মহাশূন্যচারী মানুষ হিসাবে গাগারিণ চিরকালের জন্য সর্বপ্রথম হইয়া রহিলেন।

মহাকবি :

শতবর্ষ আগে এক মহাকবির আবির্ভাব হইয়াছিল আমাদেরই বাংলা-দেশে এবং এই বৈশাখ মাসে। আজ সারা বিশ্বের দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগিয়াছে—পৃথিবী জুড়িয়া রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের আনন্দধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। ২৫শে বৈশাখ কালপঞ্জীতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। আজ তিনি সশরীরে আমাদের মধ্যে নাই—কিন্তু আজ শতবর্ষ পরে এই মরজগতের সত্য সাক্ষর মানুষেরা সমস্বরে কেবল তাঁহার কবিতাখানি তাঁহার মহত্ত্বভাবে সমুজ্জ্বল সমগ্র সাহিত্য কৌতূহলভরে পড়িতেছে। তিনি আজ বিশ্ব-কবিরূপে বন্দিত। এবং ঠিক এই কারণেই আমাদের দায়িত্ব সর্বাধিক। আড়ম্বরের আতিশয্যে, অনুষ্ঠানের চাপল্যে, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ বিবাদে আমরা যেন না এই দায়িত্ব বিস্মৃত হই এবং এই শুভ্র পবিত্র সর্বজনীন আবাহন-উৎসবকে পঙ্কিল করিয়া তুলি। তিনি জন্মভূমি বাংলার বন্দনা গাহিয়াছেন, একদা ঋষি কণ্ঠোচ্চারিত ও মন্ত্রপূত ভারতবর্ষের বন্দনা গাহিয়াছেন, বিচিত্র মানবসভ্যতার লীলাভূমি পৃথিবীকে বন্দনা করিয়াছেন এবং সর্বোপরি কালা-তীত অমৃতের বাণী, সমন্বয়ের বাণী শুনাইয়াছেন। যেখানে অসুরের দ্বন্দ্ব দেখিয়াছেন, অপরিমেয় বেদনা বোধ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহা উত্তীর্ণ হইবার বলিষ্ঠ আশাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই জন্ম-শতাব্দীতে এই কথাটি বিশেষ করিয়া স্মরণ করিবার যে আজও তাঁহার সেই আশা সফল হয় নাই, আজও পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত এবং নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে।

উত্তপ্ত পৃথিবী :

ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আফ্রিকার রক্তাক্ত রাজনীতি জটিল গ্রন্থিতে পর্যবসিত হইয়াছে; ইহা ছাড়াইতে যাওয়াও দুঃসাধ্য, নিরুপায় দর্শক থাকাও দুঃসহ। লুমুম্বার হত্যাকাণ্ড অন্ধ উন্মত্ততারই নগ্ন রূপ, অথচ প্রতিকারের উপায় চোখে পড়ে না। উন্মত্ততার প্রশ্রয় না দিয়া উন্মত্ততা বন্ধ করিতে হইবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের খবরদারি এক উপায়। সে উপায়ের প্রয়োগও এতাবৎ ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের দিক হইতে যেটি উদ্বেগের তাহা হইতেছে ভারতবর্ষ সসৈন্য গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া দায়মুক্ত হইতে পারিতেছে না। মুষ্টিমেয় লোক পৃথিবীকে উপহাস ও উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে; দেশে দেশে মারাত্মক অস্ত্র-সম্ভার, সন্দেহ ও আধিপত্যপ্রবণতা এমনই অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত।' লাওসে ঘোর সংগ্রামের মধ্যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রাহ্য হইতে না হইতেই দ্বিধা ও সংশয় প্রবলতর হইয়া পড়িতেছে। লাওসের আগুন এশিয়ার এক প্রান্তকে যখন পুড়াইয়া মারিতেছে তখন কিউবায় ফিডেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের উচ্ছেদে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটিল। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু আগুন নিভে নাই। উত্তাপ প্রশমিত হইবে কি, আলজেরিয়ায় ফরাসী সেনানীরা বিদ্রোহের অনল জ্বালিল; দ্য গলের দৃঢ়তায় এ বিদ্রোহানলও আয়ত্তে আসিল। নিভিল কি? সর্বত্র উত্তাপ এমনই যে, বিশ্বাস হয় না, কোথাও আগুন একেবারে নিভিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সীমান্তে তিব্বতে, সিকিমে, নেপালে—কোথাও শান্তি নাই। অনেকে মিলিয়া পৃথিবীর বায়ু বিষাইয়া তুলিয়াছে। কিউবায় বিদ্রোহীদের পরাজয় মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতিরই পরাজয় একথা পরোক্ষে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রসঙ্গত প্রেসিডেন্ট কেনেডি যে দুইটি কথা বলিয়াছেন তাহাতে এই সর্বজনীন উত্তাপ প্রশমিত হইবে কিনা সন্দেহ। আমেরিকা যে গোলার্ধে অবস্থিত সেই গোলার্ধের একটা বিশালঅঞ্চলে একমাত্র আমেরিকারই খবরদারি করার অধিকার—প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই পুরাতন কথাটির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি আমেরিকার ৯০ মাইলের মধ্যেই কম্যু-নিস্ট-শাসন বরদাস্ত করিবেন না। অথচ তিনিই বলিয়াছেন, কোন দেশে কোন শাসন ব্যবস্থা হইবে তাহা সেই দেশের লোকেরাই স্থির করিবে। এই মৌলিক সত্যটি মানিয়া লইলে কাস্ত্রো-বিরোধী ব্যক্তিদের অর্থ, অস্ত্র, লোকবলে সাহায্য করা নিশ্চয়ই হিংসোন্মত্ত পৃথিবীর উত্তাপ প্রশমনের সহায়ক নয়।

ছায়াপাত :

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা শেষ করিয়া আমরা যখন তৃতীয় পরিকল্পনায় পদক্ষেপ করিতেছি তখন একথা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে, শিল্প প্রচেষ্টা বা শিল্পোন্নতির মূলে বিদ্যুৎ-শক্তির দুর্ভিক্ষে আমরা পীড়িত হইতেছি। এই পরমাণবিক যুগে বিদ্যুৎ-শক্তি যদি কেবলমাত্র ঘরের আলো ঘুচাইতে বা দুই-একটি পাখা চালনায় ব্যবহৃত হইত তবে বলা চলিত এই দুর্ভিক্ষে তেমন ক্ষতি নাই। কিন্তু যেখানে আমরা দিন-রাত স্থানে অস্থানে শিল্পোন্নয়ন ও দেশের উৎপাদন শক্তির কথা বলিতেছি সেখানে এই দুর্ভিক্ষ নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো দুঃসহ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে এই যে আমাদের সম্মুখে মূল শক্তির অভাব প্রকট হইল ইহা আমাদের পরি-কল্পনার দুর্বলতা এবং পরিকল্পনা-রচয়িতাদের দূর-দৃষ্টির অভাবেরই

পরিচায়ক। এই শক্তির সহিত নিশ্চিত বোঝাপড়া না করিয়াই আমরা শিল্প-মন্দিরে মাথা খুঁড়িতে বসিতেছি। বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহে এই ব্যর্থতার জন্য কে দায়ী হইবে? কলিকাতা সহর ক্রমবর্ধমান, ইহার শিল্পাঞ্চল সম্প্রসারণশীল, বিদ্যুৎ-শক্তির চাহিদা ক্রমশ স্ফীতিলাভ করিবে। পরিকল্পনা-রচয়িতাদের দৃষ্টি ইহা কেমন করিয়া এড়াইয়া গেল তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এই চাহিদা বৃদ্ধির সহিত সরবরাহ তাল রাখিয়া চলিবে পরি-কল্পনায় এই স্বীকৃতিও যথেষ্ট মনে করি না, চাহিদা মতো সরবরাহ করিয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে বা থাকিতে পারে এমন ব্যবস্থাই সার্থক পরিকল্পনার সর্বপ্রথম লক্ষণ। যাহার উপর প্রধানত নির্ভর করিয়া দেশের শিল্প গড়িয়া উঠিবে, দেশ সমৃদ্ধ হইবে সেই মূল জিনিসটির উৎপাদনই যদি বিপর্যস্ত হয় তবে উহা গাছের গোড় কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার সমতুল হইবে। এমন কিছুই আমাদের করা বা করিতে দেওয়া উচিত নহে যাহাতে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপর ছায়া-পাত হইতে পারে।

আলোর-আভাস :

কলিকাতা বন্দর ও বাংলাদেশের জীবনে যে ছায়াপাত হইতেছিল, আশা করিবার কারণ ঘটিয়াছে যে, তাহা দূরী-ভূত হইবে। যে ফারাক্কা লইয়া আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ মাথা কুটিয়া আসিতেছি, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সুনজর পড়িয়াছে। অন্তত, লোকসভার ঘোষণা হইতে অনুমাণ করিতেছি যে, তাঁহারা এবার ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সংবাদে দেখিতেছি; প্রাথমিক কাজেও হাত দেওয়া হইয়াছে। এতদিন বাধা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অনিচ্ছা বা অসম্মতি। এবার বাদ সাধিতে চাহিতেছে পাকিস্থান। ইহা স্বাভাবিক মনে করি। কেননা, পাকিস্থানের জন্মই হইয়াছে জাতি বিদ্বেষের মধ্যে; ভারতের বিরোধিতা করাই ইহার প্রকৃতিগত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই পাকি-স্থানকে জেয় এবং দুর্জ্ঞেয় কারণে তোষণ করিয়া আসিতেছেন। এতদিন যে ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের ভালো লাগে নাই ইহা কি পাকিস্থান-তোষণ নীতির ফলে? সম্ভবত লোক-সভায় ঘোষণায় এবার কিছু ভিন্ন সুর ধ্বনিত হইয়াছে, বলা হইয়াছে, পাকি-স্থানের বিরোধিতা সত্ত্বেও ফারাক্কা বাঁধ হইবে। আন্তরিক আশা করিতেছি, কেন্দ্রীয় সরকার আর তোষণ নীতি অনুসরণ করিবেন না এবং পাকিস্থানের ভ্রূকুটিকে ভয় পাইবেন না। আমরা কেবল সুনিশ্চিত হইতে পারিতেছি না এই কারণে যে, আমন্ত্রিত পাকিস্থানের একটি বিশেষজ্ঞদল গঙ্গার মোহানা অবধি সমীক্ষা করিয়া গেল। উভয় পক্ষের চতুর্থ বৈঠক বসিবে ঢাকায়। ইতিমধ্যে পাকি-স্থানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান দাবী তুলিয়াছেন যে, মন্ত্রী পর্যায়ে জল প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন কিন্তু বলিয়াছেন, প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহের পরেই মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা সম্ভব। শ্রীনেহরু প্রেসিডেন্ট আয়ুবের এই দাবী মানিতে রাজী হন নাই যে, ভারতবর্ষে কোন পরি-কল্পনা প্রণয়নে অথবা হাত দিবার পূর্বে পাকিস্থানের সম্মতি লওয়া আবশ্যক। সবিনয়ে জেনারেলকে একথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা আন্তর্জাতিক আইনসম্মত নহে এবং পাকিস্থানও তাহার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতবর্ষের সম্মতি লয় নাই। জেনারেল আর একটি অবিশ্বাস্য দাবী করিয়াছেন,—সর্দার শরণ সিংকে যেন মন্ত্রীপর্যায়ের আলোচনায় ভারতের প্রতিনিধি করা হয়। জেনারেলের দুঃসাহস বটে—ভারতের কে প্রতিনিধি

করিবেন তাহাও জেনারেল বলিয়া দিবেন। যাহা হউক, সকল তদন্ত ফল কি হয় তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্বেগের সহিত অপেক্ষা করিব। কেননা, এই জল লইয়া খেলায় আমরা পশ্চিম পাকিস্থানে ইতিমধ্যেই শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়াছি; পূর্বাঞ্চলে তাহার পুনরাবৃত্তি হয় নাই এই সত্য যতদিন না প্রত্যক্ষ করিতেছি ততদিন নিদারুণ আশংকা ও সংশয় আমাদের চিত্তভূমিকে পীড়িত করিতে থাকিবে।

ভুল-আর-ভুল :

আমাদের আবারও আর একটি ভুলে দণ্ডকারণ্যের মতো একটি সম্ভাবনাময় পরিকল্পনা মুমূর্ষু বাঙ্গালীজীবনে ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। ভবঘুরে জীবন হইতে বিমুক্ত নূতন জীবন গড়িবার যে সুযোগ বাঙ্গালীজীবনে উপস্থিত অত্যন্ত সংকীর্ণ স্বার্থপর রাজনীতির হাতিয়ারে তাহা বিনষ্ট করিয়া চলিয়াছি। উদ্বাস্তু সমাগমের প্রথম ধাক্কা সামলাইতে সামলাইতেই আমাদের বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। ততদিনে ক্যাম্পের কটু অস্তিত্ব উদ্বাস্তুদের জীবনে শিকড় ছড়াইয়াছে। তাহাদের লইয়া দুইটি নির্বাচনের খেলা হইয়া গিয়াছে। পুনর্বাসন অঞ্চলগুলিতে তালকানা হইয়া ফিরিয়াছে। আজ ইহাদের অধিকাংশ ভবঘুরে এবং একাংশ ক্রিমিনাল! তথাপি আমাদের জীবনে দুইটি সুযোগ আসিয়াছিল; একটি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ; আর-একটি দণ্ডকারণ্য। আন্দামান এককালে নির্বাসনস্থল এই আর্তনাদেই আন্দামান পুনর্বসতি বিঘ্নিত হইয়াছে এবং বাঙালী উদ্বাস্তুরা যে সুযোগ একান্তভাবে পাইতে পারিত তাহা আজ বাংলাদেশের সম্পূর্ণ হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর আসিয়াছে দণ্ডকারণ্যের আহ্বান—আবেদন—নিবেদন। কিন্তু বাঙালী উদ্বাস্তুরা ক্যাম্পের কটু জীবন ছাড়িয়া যাইবে না। কেন্দ্রীয় সরকার হুমকি দিয়াছেন, বাঙালী উদ্বাস্তু না আসিলে অপর রাজ্যবাসীকে দণ্ডকারণ্যে বসানো হইবে, এতকোটি টাকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে দেওয়া হইবে না। শ্রীসুকুমার সেন অভিমানে কর্তৃত্বভার ছাড়িয়া আসিতে চাহিতেছেন। আন্দামানের ক্ষেত্রে যাহা হইয়াছে দণ্ডকারণ্যের ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে। নানা মিথ্যা ওজর তুলিয়া নির্বাচনে কতকগুলি ভোট পাইবার লোভে একদল স্বার্থান্ধ রাজনীতিক ইহাদের শিয়ালদহ ষ্টেশনের আশে-পাশে পর্ণকুটিরের অসুস্থ পরিবেশে অমানুষের মত জীয়াইয়া রাখিতেছেন। মানুষের মতো জীবনযাপনের সুযোগ তাঁহারা আন্দামান প্রস্তাবকালেও সাগরে বিসর্জন দিয়াছেন এবং দণ্ডকারণ্যের আহ্বানকেও তাঁহারা অরণ্যে রোদনে পরিণত করিতেছেন। অভিশাপ আর কাহাকে বলে?

রাজপথে অতর্কিত মৃত্যু :

কলিকাতার রাজপথে এখন যেরূপ যান-সংঘাত ও অপঘাত মৃত্যু হইতেছে তাহাতে আর ইহাকে দুর্ঘটনা বলা উচিত নহে, বলা উচিত নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। দুর্ঘটনা আমরা তাহাকেই বলিয়া আসিয়াছি যাহা সচরাচর ঘটে না, যাহা সাধারণ ঘটনার ব্যতিক্রম। কলিকাতার রাজপথের দুর্ঘটনাকে এই সংজ্ঞার মধ্যে ধরা যায় না। কলিকাতার রাজপথে বা ফুটপাথে, এমন কি পথিপার্শ্বের রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়া পড়িয়া যানবাহনগুলি যে মানুষ মারা উৎপাত সুরু করিয়াছে তাহাকে দুর্ঘটনা বলিলে দুর্ঘটনা শব্দটির অপব্যবহার হয় এবং দুর্ঘটনা শব্দটি কোন সবাক প্রাণী হইলে তীব্র প্রতিবাদ জানাইত। কলিকাতার রাজপথ ইত্যাদিতে মানুষ-মারা উৎপাত প্রতিদিনকার এবং প্রতি মুহূর্তের ব্যাপার। যে বাঁচিয়া গেল, সে দৈবক্রমে বাঁচিয়া গেল অথবা বাঁচিয়া যাওয়াটাই এখন একপ্রকার দুর্ঘটনা। রক্তাক্ত চাকা লইয়া বাস, ট্রাক, ট্যাক্সী, মোটর গ্যারাজে ফিরে নাই এমন দিন এখন চিহ্নিত করা কঠিন। লোকে বাড়ীর বাহির হইয়া বাড়ীতে না-ফেরা পর্যন্ত সে বাঁচিয়া ফিরিবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। মা ছেলেমেয়েদের বাড়ীর বাহিরে পাঠাইতে বাধ্য হইয়া দুরুদুরু বুকে ঘর-দুয়ার, ঘর-দুয়ার করিতে থাকে। ফিরিলে দেবতার করুণা। ফুটপাথ যদি বা পাওয়া যায়, সে ফুটপাথেও রক্ষা নাই। রাস্তার মোড়-গুলি তো চিরকাল মরণ-ক্ষেত্র হইয়া আছে; কর্তৃপক্ষ মহলের মগজে কিছুতেই রাস্তা পারাপারের ওভার ব্রীজের কথা স্থান পায় না। রাস্তা যেখানে সোজা সেখানেও রক্ষা নাই। অর্থাৎ, কলিকাতায় 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' মনে না

ফিরিয়া যে রাস্তায় বাহির হইবে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার কিছু নাই। কলিকাতার যানবাহনের নীচে মৃত্যু এখন নিত্য-নৈমিত্তিক এবং মৃত্যুর মতই ইহা ক্রমশ সকল ঘরকে স্পর্শ করিতেছে।

রেলপথে :

যাত্রীরা নানা দেশে চলিয়াছে; কেহ প্রিয়জন-সন্দর্শনে, কেহ প্রিয়জন ছাড়িয়া কাজে, কেহ সফরে, কেহ চিকিৎসালাভে; ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। অকস্মাৎ এক মারাত্মক ঝাঁকি খাইয়া ট্রেন থামিয়া গেল। ভাঙিয়া গড়াইয়া চুরমার। গভীর জঙ্গলের বুক চিরিয়া যে লৌহবর্ত্ম গিয়াছে তাহারই পাশে আহত মানুষের আর্ত্তনাদ; নিহতেরা চিরতরে নীরব। ইহার-ই নাম শিলিগুড়ি ট্রেন-দুর্ঘটনা। কেন এই দুর্ঘটনা হইল, তদন্ত চলিতেছে; জীর্ণ ফিস প্লেট, না, নাশকতা এই দুর্ঘটনার মূলে তাহারই যাচাই চলিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, পোঁড়া বিড়ি, লণ্ঠন ও বল্টু কিছু আলোকপাত করিলেও করিতে পারে। জীর্ণ বা মরিচা পড়া ফিসপ্লেট কিনা তাহাই বা কে বলিবে? কে বলিবে গভীর-জঙ্গলের বুকে তদারকের অভাবে অনাদৃত হইয়াছিল কিনা। কে বলিবে ড্রাইভার অতিরিক্ত বেগে ট্রেন চালাইয়াছিল কিনা। তদন্ত-ফল যাহাই হউক মৃত্যু আসিয়াছে অতর্কিতে। তথাপি বলিব, এ মৃত্যু নিবার্য।

দ্বিতীয় শূন্যচারী : শেপার্ড

গাগারিনের শূন্য-পরিক্রমার ঠিক ২৩ দিন পর আমেরিকার কম্যাণ্ডার অ্যালান শেপার্ড পৃথিবী হইতে ১১৫ মাইল দূরবর্তী ব্যোমপথে ১৬ মিনিট পরিক্রমার পর পৃথিবীতে নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সংবাদের সব চাইতে বড় তাৎপর্য এই যে, শূন্য পরিক্রমার কৌশল পৃথিবীর কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক মহলেই আর সীমাবদ্ধ রহিল না। তুলনা করিলে গাগারিনের পরিক্রমাকাল এবং দূরত্ব শেপার্ডের চাইতে বেশী সন্দেহ নাই; আশা করা যায়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সুস্থ প্রতিযোগিতা শূন্য-পরিক্রমাকে আরও সহজ করিয়া আনিবে এবং স্বল্প-কালের মধ্যেই শূন্যচারীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, শেপার্ডের বয়স গাগারিন অপেক্ষা দশ বৎসর বেশী, উভয়েই বিবাহিত এবং উভয়েরই সন্তান সংখ্যা দুই। উভয়েই শূন্যমার্গ হইতে মর্ত্যভূমির রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। কিন্তু শূন্যে পরিক্রমার আয়োজনের দিক হইতে উভয় দেশের কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। গাগারিন কোথা হইতে কখন শূন্যে উঠিলেন এবং ঠিক কোথায় নামিলেন আজও রহস্যাবৃত হইয়া আছে; কিন্তু আমেরিকার এই আয়োজনটি ছিল আগাগোড়া প্রকাশ্য এবং উৎসুক জনতার মধ্যে রিপোর্টাররা ছিলেন প্রস্তুত। সাফল্যের বিচারে এই পার্থক্য নগণ্য। পার্থক্য যেটুকু বা যেখানেই থাকুক মানব-সভ্যতার গতিপথে যে আর একটি দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাহীন অবকাশ উন্মুক্ত হইল, ইহা আজ তর্কাতীত।
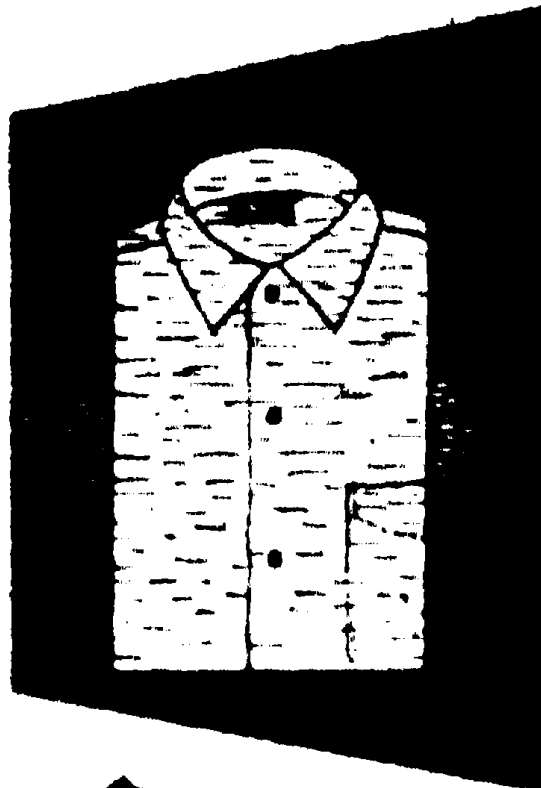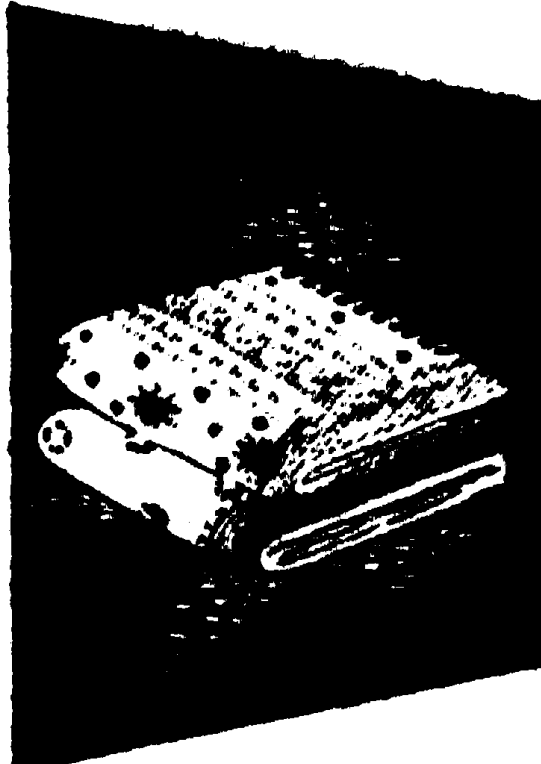
অমৃত খাওয়ার গল্প

পশুপতি ভট্টাচার্য

অমৃত কথাটির কি প্রকৃত অর্থ, তা এখনকার পাঠক-পাঠিকাদের একটু বিশেষভাবে বুঝে দেখতে অনুরোধ করি।

অভিধানে বলছে—"যা খেলে মৃত্যুকে এড়ানো যায় তাই অমৃত"। তার পরেই বলছে—"জীবনরক্ষক খাদ্যকে বলে অমৃত"।

অতএব অন্নই অমৃত, অন্নের মধ্যেই রয়েছে অমৃত। অন্ন অর্থে কেবল ভাত নয়, সকল খাদ্যকেই আমরা অন্ন বলি। তাই আমরা বলি আমাদের অন্নময় দেহ, অন্নগত প্রাণ। বাঁচবার জন্য দেহধারী জীব মাত্রকেই অন্ন গ্রহণ করতে হয়, অর্থাৎ অন্নের ভিতর থেকে অমৃত-বস্তুকে প্রত্যহই গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতির এই অলংঘ্য নিয়ম।

বর্তমান বিজ্ঞান খাদ্যের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করে দেখেছে, যে খাদ্যের মধ্যে দুই রকমের উপাদান আছে—স্থূল উপাদান ও সূক্ষ্ম উপাদান। স্থূল উপাদান হলো প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট। আর সূক্ষ্ম উপাদান হলো ধাতব লবণাদি ও ভিটামিন। স্থূল উপাদানগুলি মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় ইন্ধনাদি যোগায় এবং সূক্ষ্ম উপাদানগুলি মানুষকে সুস্থ সতেজ ও সক্রিয় করে। অতএব স্থূল খাদ্যকে বলা যেতে পারে রসদ এবং তার ভিতরকার সূক্ষ্ম ভিটামিনাদিকে বলা যায় অমৃত।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, বর্তমান সভ্যতার যুগে আমরা খাদ্যের নানারূপে উন্নতি করা সত্ত্বেও তার মধ্যে কৃত্রিমতা এসে পড়ায় খাদ্যের ভিতরকার অমৃত থেকে অনেক স্থলেই বঞ্চিত হচ্ছি। খাদ্যগুলি যথারীতি আমরা খেয়ে যাচ্ছি কিন্তু তার ভিতরকার অমৃতটুকু আমাদের প্রস্তুতি-ক্রিয়ার ফলে বাদ চলে যাচ্ছে। তারই ফলে দেখা যাচ্ছে যে আগেকার কালে যে সকল রোগ ছিল না কিংবা থাকলেও তার কথা কমই শোনা যেতো, সেই সকল দুরারোগ্য রোগের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে—যেমন হার্টের রোগ, রক্তচাপবৃদ্ধির রোগ, ক্যান্সার রোগ, স্নায়ুবিকারের রোগ ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে যে এই সকল রোগে স্থূল বাস্তব ধরণের কোনো কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না, দেহের ভিতরকার সূক্ষ্মতম কলকব্জাগুলি বিগড়ে যাওয়াতেই এই সকল রোগের সৃষ্টি হয়। এবং তার কারণ আমাদের খাদ্যের মধ্যে অমৃতের অভাব।

অত্যন্ত গরিবদের কথা বাদই দিলাম, কারণ তারা অভাবহেতুই যথেষ্ট খেতে পায় না, পরিমাণেও নয় এবং প্রকারেও নয়। কিন্তু সাধারণ ভদ্রলোকেরা আপন আপন অভ্যাসমত যথেষ্টই খেয়ে থাকে, যাকে বলে সুষম খাদ্যের আদর্শ সেটা তারা সাধ্যমত পুষিয়ে নেয়। তারা ভাত, রুটি, তরকারি, মাছ, মাংস প্রভৃতি সবই অল্পাধিক পরিমাণে খেয়ে থাকে। তথাপি দেখা যাচ্ছে যে তার মধ্যে প্রকৃত অমৃত-বস্তুর রীতিমত অভাব ঘটছে। এটা পরীক্ষিত সত্য। শুধু আমাদেরই দেশে নয়, আমেরিকার মতো সমৃদ্ধিপূর্ণ

দেশেও তাই। সেখানকার সরকারী অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে (৬০০০ গৃহস্থের খাদ্যতালিকা পরীক্ষা করে) যে শতকরা ৩০% খাদ্যে ক্যালসিয়মের অভাব, ১০% খাদ্যে লোহের অভাব, ১৬% খাদ্যে ভিটামিন-এর অভাব, ১৭% খাদ্যে ভিটামিন বি-র অভাব, ২৫% খাদ্যে ভিটামিন সি-র অভাব।

আমেরিকাতেই যখন এমন তখন আমাদের দেশের অভাব আরো কত বেশি সে কথা সহজেই অনুমেয়।

খাদ্যের মধ্যে কেন এমন অভাবের সৃষ্টি হয়? প্রকৃতি যেমনভাবে খাদ্য-বস্তু উৎপাদন করে, আমরা তেমনভাবে তাকে গ্রহণ করি না, নিজেদের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে তাকে বানিয়ে নিই, রিফাইন করে নিই, তাতেই আসল জিনিস বাদ চলে যায়।

আমাদের দেশে ভাতই অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য, অতএব ভাতের কথাই আগে ধরা যাক। আগেকারকালে আমরা খেতাম 'লাল চালের' ভাত। অর্থাৎ তখন চাল কলে ছাঁটা হতো না, ঢেঁকিতে ছাঁটা হতো, তার উপরকার লালচে ভুষিটুকু চালের গায়ে লেগেই থাকতো। কিন্তু এখন প্রায় সব চালই কলে ছাঁটা হয়, তার উপরকার ভুষির আবরণটি একেবারে উঠিয়ে দিয়ে চালকে ধবধবে সাদা করা হয়। সুতরাং 'লাল চালের' ভাত আর আমরা খাই না। এখন খাই জুঁই ফুলের মতো ধবধবে সাদা ভাত। কিন্তু ঐ যে তার উপরের ভুষিটা ছাঁটাই হয়ে বেরিয়ে গেল তাতেই লেগে থাকে অধিকাংশ অমৃত-বস্তু। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ঐ ভুষির সঙ্গেই বেরিয়ে যায় চালের শতকরা ১০% প্রোটিন, ৮৫% ফ্যাট, ৭০% ফসফেট প্রভৃতি লবণাদি, এবং শতকরা প্রায় ৪০০% ভিটামিন-বি। এই ভিটামিন ও বিশেষ করে কোলিনের (Choline) খুবই প্রয়োজন লিভারকে সুস্থ রাখার জন্য, এবং তা প্রচুর পরিমাণে থাকে চালের ভুষিতে (Indian Journal & Medical Research, March 1960)। এই ভুষি-বিহীন খাদ্য ও ভুষিযুক্ত খাদ্য ইঁদুরদের দুই স্বতন্ত্র দলের মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে যে তাতে দুই দলের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ প্রভেদ ঘটে।

চালের ভুষি ফেলবার জিনিস নয়। ওর মধ্যে যে ভিটামিন-বি এবং কোলিন থাকে তার দ্বারা আমাদের লিভারের ও সাধারণ স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হতে পারে। ইচ্ছা করলে এই ভুষিকে আমরা আমাদের খাদ্যের সঙ্গে নানা উপায়ে মিশিয়ে নিতে পারি। আরো বেশি চূর্ণ করে তাকে শুক্তো বা ডাল বা পায়েসের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি, আটার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি প্রস্তুত করতে পারি। ভুষি যে অখাদ্য জিনিস তা নয়। একবার একটি পরিবারে দেখা গেল যে সকলেই রুগ্ন, কিন্তু সে বাড়ির চাকরের ছোটো ছেলেটি খুব স্বাস্থ্য-বান। অনুসন্ধানে জানা গেল যে সেই বাড়িতে মুরগিদের জন্য প্রত্যহ কিছু ভুষি দেবার বরাদ্দ ছিল, ঐ ছেলেটি তার ভিতর থেকে প্রত্যহই কিছু খুঁটে খুঁটে খেতো।

ভাতের সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা, ভাত সিদ্ধ করে আমরা তার ফেনটুকু গেলে ফেলে দিই। ঐ ফেনের মধ্যেও থাকে অনেকটা ভিটামিন ও প্রয়োজনীয় লবণাদি। সমস্ত ফেনটা ফেলে না দিয়ে যদি তার থেকে কিছু নিয়ে প্রত্যহ লেবুর রস ও নুন দিয়ে খাওয়া হয় তবে তা পানীয় হিসাবেও উপাদেয় হয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা উপকারী হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে শিশুদের অন্যবিধ খাদ্য হিসাবে কোথাও কোথাও পাংলা রাইস ওয়াটার দেবার ব্যবস্থা আছে, তাতে তাদের পেট ভালো থাকে।

যেমন চালের সম্বন্ধে বলা হলো, আটা ময়দার সম্বন্ধেও ঐ কথা। গমকে রিফাইন করে সাদা ময়দা করতে গেলেই তার উপরকারও অঙ্কুর-বস্তুটা বাদ চলে যায় এবং তার সঙ্গে ভিটামিন প্রভৃতিও বাদ যায়। ভুষিসমেত আটার রুটি খাওয়াই সব চেয়ে ভালো।

শুধু ভাত, রুটি কেন, সকল প্রকার খাদ্য সম্বন্ধেই এই কথাগুলি প্রযোজ্য। খাদ্যকে অতিরিক্ত রকম রিফাইন করতে গেলেই তার পুষ্টিমূল্য অনেক কমে যাবে। সবাই জানে, আখের রস থেকে চিনি প্রস্তুত হয়। কিন্তু আখ চিবিয়ে তার রস খেলে যে কাজ হবে, রিফাইন করা সাদা চিনি খেলে কি সেই কাজ হবে? তা কখনই নয়। আখে আছে প্রচুর ভিটামিন, কিন্তু চিনিতে তার কিছুই নেই। চিনির চেয়ে বরং গুড় অনেক ভালো, কারণ তা ওরূপভাবে রিফাইন করা নয়।

আমরা যে সকল আনাজ-তরকারি খাই তাকে আগে উত্তমরূপে বঁটিতে বানিয়ে নিই। প্রথমত তার সমস্ত ছালগুলি ছাড়িয়ে ফেলি, তারপর তাকে কেটে কুচিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি। তারপর রেঁধে গলিয়ে ঘন্ট করে ফেলি। তার মধ্যে আনাজের সার পদার্থ কতটুকু বা থাকে। আসল জিনিস খোসার সঙ্গেই অনেক বেরিয়ে যায়। তরকারির খোসা কখনই ফেলা উচিত নয়। খোসার দ্বারাই উপাদেয় তরকারি প্রস্তুত হতে পারে। আলু প্রভৃতির খোসা ছাড়ানো কখনই যুক্তিযুক্ত নয়।

উপরের ময়লাগুলিকে দূরে করবার জন্যই খোসা ছাড়ানো হয়, কিন্তু পার্মাঙ্গানেটের জলে উত্তমরূপে ধুয়ে নিলেই সে কাজ সবচেয়ে ভালো ভাবে হতে পারে। তরকারি যত খোসাসমেত রাখতে এবং আস্ত আস্ত রাখতে পারা যায় ততই ভালো। যত কুচোনো হয় ততই তার ভিতরকার অমৃতবস্তুকে নষ্ট করে ফেলা হয়। আস্ত আস্ত আনাজের আস্বাদও অন্যরূপ হয়। আস্ত আলু, পটোল, ঝিঙে, ঢেঁড়স ভাতে দিয়ে তাই একটু নুন দিয়ে খেয়ে দেখবেন কি তার অন্যরূপ আস্বাদ।

তরকারি কিছু কিছু কাঁচা খাওয়াও খুব ভালো। মূলো, গাজর, টোমাটো, কড়াইশুঁটি এগুলি কাঁচা খেতে দোষ কি আছে? পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেরা যেমন কাঁচা তরকারির স্যালাড করে খায় তেমনিভাবেও তা খাওয়া যেতে পারে।

মাছ, মাংসও আমরা যা খাই তার থেকেও কাঁটা হাড় প্রভৃতি সব কিছুকে বাদ দিয়ে কেবল খাই তার পেশী-মাংসটুকু। কিন্তু মাছের কাঁটা, মুড়ো, চোখ প্রভৃতির মধ্যে নরম মাংস অপেক্ষা পুষ্টিকর পদার্থ বেশি থাকে। জন্তু-মাংসের মধ্যেও তার মাংসটুকুর চেয়ে তার মেটুলি, কিডনি, হার্ট, ব্রেন প্রভৃতির মধ্যে অনেক পুষ্টিকর জিনিস থাকে, কিন্তু সেগুলিকে আমরা বর্জন করে কেবল মাংসই খাই।

আর গাছের ফল খাওয়া আমরা তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। দুবেলা দুটো ভাত খেতেই ফুরসৎ মেলে না, ফল খাওয়ার বিলাস কখন বা করি! কিন্তু তা যে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে নিতান্তই দরকার। আর কিছু না হোক, কলা নিত্যই খাওয়া যেতে পারে এবং আমের সময় আম, লেবু, আনারস প্রভৃতি অবশ্যই খাওয়া যেতে পারে।

বর্তমান ব্যস্ততার যুগে যাদের এরূপভাবে খাবার সময়সুযোগ নেই, তাদের পক্ষে প্রয়োজন অন্ততপক্ষে ট্যাবলেট কিংবা বড়ি খাওয়া। খাদ্যের অভাবগুলি তার দ্বারা অনেকাংশে মিটতে পারে। যেমন ভাবেই হোক, ভিটামিন সরবরাহের ব্যবস্থা করতেই হবে, নতুবা বর্তমান পদ্ধতির খাদ্যগুলি খেয়ে স্বাস্থ্য কখনই ভালো থাকবে না।

প্রদর্শনী

কলারসিক

রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ উৎসবে মেতেছে। কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই বোধহয় নিষ্ক্রিয় নেই। নানাভাবে ভারতের এই শ্রেষ্ঠতম সন্তানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি তিনটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

লোয়ার সার্কুলার রোড ও ক্যাথিড্রাল রোডের সংযোগস্থলে গত ১৮ই মার্চ থেকে 'কবি-কাহিনী' নামক প্রদর্শনী শুরু হয়ে ৮ই মে সমাপ্ত হয়েছে। টেগোর সেন্টিনারী সোসাইটি এর উদ্যোক্তা। মাটির পুতুলের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধতন সপ্তম পুরুষ পঞ্চানন ঠাকুরের পরবর্তী বংশধরসহ রবীন্দ্র-জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়গুলি রূপায়িত করেছেন একদল শিল্পী। কৃষ্ণনগর কিংবা কুমারটুলির মৃৎ-শিল্পীদের অনেক সুন্দর সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। বাংলাদেশের মৃৎ-শিল্পের ঐতিহ্যকে এঁরাই এখনও বহন করছেন। কিন্তু আধুনিক শিল্প-কলায় শিক্ষিত ১৪ জন তরুণ শিল্পী তাঁদের কল্পনা প্রতিভার সাহায্যে রবীন্দ্র-জীবনের রূপায়ণে মাটির উপাদানকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন সত্যি তা প্রশংসনীয়। প্রখ্যাত শিল্পী রাজেন আয়ান দাত্তর পরিচালনায় কল্পনাশক্তি দে, বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন চৌধুরী, রমেশ পাল, অশোক সাহা প্রমুখ শিল্পীরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটি সমাধা করতে পেরেছেন দেখে আমরা খুশি।

জব চার্ণক যেদিন প্রথম কলকাতার মাটিতে পদার্পণ করলেন, সেই দিন, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধতন সপ্তম পুরুষ পঞ্চানন কুশারী খুলনা জেলা থেকে জীবিকার সন্ধানে এলেন কলকাতায়। আদিশূর কনৌজ থেকে পাঁচ-জন ব্রাহ্মণকে বাংলায় এনেছিলেন, ইনি সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই এক বংশধর। কলকাতায় ইনি পরিচিত হলেন ঠাকুর মশাই নামে। ঠাকুর-পরিবারের এই আদি প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর পরবর্তী বংশধর জয়রাম, নীলমণি, রামলোচন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত নানা ঐতিহাসিক পর্যায়কে শিল্পীরা অনেকগুলি মডেলের সাহায্যে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এগুলি সৃষ্টির পিছনে তাঁদের ঐতিহাসিক চেতনাবোধ এবং শৈল্পিক

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ — কবি-কাহিনী

দক্ষতার স্বাক্ষর বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। কৃষ্ণনগর কিংবা কুমারটুলির মৃৎ-শিল্পীরা মূর্তি গঠনে যে স্বাভাবিক উৎকর্ষ দেখাতে পারেন, আলোচ্য শিল্পীদের সৃষ্টিতে, বিশেষ করে মণ্ডন পরিচ্ছন্নতায়, ততখানি উৎকর্ষ যেন পরিলক্ষিত হল না। তা হলেও এগুলি দর্শক-মনকে আকর্ষণ করেছে বলে আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্র-জীবনীর অধ্যায়গুলিতেই প্রকৃতপক্ষে শিল্পীরা বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিশেষভাবে তাঁর ভাবনা-চিন্তার মুহূর্তগুলিকে যখন এঁরা রূপায়িত করতে চেয়েছেন তখনি শিল্পী হিসাবে অনেকখানি স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পেরেছেন। ফলে সেই সৃষ্টিগুলিই সুন্দরতর হয়েছে। এমনি কয়েকটি সৃষ্টির মধ্যে 'জল পড়ে পাতা নড়ে', 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ', 'জালিয়নওয়ালা বাগে হত্যা-কাণ্ডের পরে রবীন্দ্র-মনোভাব' 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' প্রভৃতি খুবই উল্লেখ-যোগ্য।

'কবি-কাহিনী' স্রষ্টাদের সামগ্রিক

কাবুলিওয়ালা।

পরিকল্পনায় অনেক অসম্পূর্ণতা আছে। রবীন্দ্র-জীবনের অনেকগুলি বিশেষ অধ্যায় বাদও পড়েছে। তবু এই প্রদর্শনী শত বার্ষিকী উৎসবের একটি অভিনব সংযোজন।

দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি চলছে আপার সার্কুলার রোডের উপর সাহিত্য পরিষদ ভবনের দ্বি-তলে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাদের রবীন্দ্র-জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গরূপে এটির আয়োজন করেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্ম থেকেই রবীন্দ্রনাথ-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য পরিষদও রবীন্দ্র-জীবনের অনেক স্মৃতিকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। সেই সব সংরক্ষিত মূল্যবান নিদর্শন ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কাছে রবীন্দ্র-জীবন এবং সৃষ্টি-কর্মের যে সব দুষ্প্রাপ্য স্মারক নিদর্শন ছিল তার থেকে বাছাই করা আলোক-চিত্র, রবীন্দ্র-রচনার প্রথম সংস্করণ, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, অভিনন্দনপত্র, বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের মুদ্রিত কপি, চিত্রকলা প্রভৃতি নিয়ে উদ্যোক্তারা এই প্রদর্শনী সাজিয়েছেন। ঐতিহাসিক মূল্য বিচারের দিক থেকে এই প্রদর্শনী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনি

একটি প্রদর্শনী করার জন্য আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে অভিনন্দিত করছি।

এই প্রদর্শনীতে অনেকগুলি সুন্দর এবং দুষ্প্রাপ্য আলোক-চিত্রের মাধ্যমে মহর্ষি ভবন থেকে সুরু করে ঠাকুর-পরিবার এবং রবীন্দ্র-জীবনের কয়েকটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়কে তুলে ধরা হয়েছে। বাল্মিকী, রঘুপতি এবং উপালী বেশে অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ, হিজলী বন্দী শিবিরে গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে মনুমেন্টের নীচে জনসভায় আগত রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের নানা পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, পৃথিবীখ্যাত মনীষিদের সঙ্গে আলাপরত রবীন্দ্রনাথ এবং চীন, জাপান, রাশিয়া ভ্রমণকারী রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক আলোক চিত্রগুলি একসঙ্গে দেখতে পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা। শ্রীযুক্ত অমল হোম, পুলিনবিহারী সেন, প্রবোধ-চন্দ্র সেন, বিনায়ক মসোজি, শম্ভু সাহা, হিরণকুমার সান্যাল, অশোককুমার সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের সংগ্রহ থেকে এই আলোক চিত্রগুলি প্রদর্শনের জন্য দিয়ে উদার মনেরই পরিচয় দিয়েছেন।

কবি-কাহিনী, বনফুল, বাল্মিকী প্রতিভা প্রভৃতি ৬৪ খানি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রদর্শনীতে রয়েছে। কত সাধারণ কাগজে, অপরিচ্ছন্ন মুদ্রণে এবং অঙ্গ-সজ্জার দারুণ দৈন্য নিয়ে বিশ্বকবির প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, আজ তা ভাবতেও অবাক লাগে! প্রথম সংস্করণভুক্ত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত। কয়েকখানি দিয়েছেন শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এবং পুলিন-বিহারী সেন।

রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবনের জন্য তাঁর পত্রাবলী অপরিহার্য। কবি কর্তৃক বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রিয় সুহৃৎ প্রিয়নাথ সেন এবং প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত অনেক-গুলি অন্তরঙ্গ চিঠি এই প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ রূপে বিবেচিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ কেমনভাবে, কোন কাগজে লিখতেন কিংবা কিভাবে তিনি পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ সংশোধন করতেন নিশ্চয়ই তা আমাদের কৌতূহলের বিষয়। এমনি ১৬টি নমুনা রাখা হয়েছে প্রদর্শনীতে। বইয়ের ফাঁকে, খাতার দু' পাশে দুটি কলম করে, ছোট-বড় নানা কাগজে, কখনো বা নোট বইয়ে রবীন্দ্রনাথের মানস-চিন্তার ফসল ছড়িয়ে থাকতো। কৌতূহলী দর্শকেরা এগুলি দেখে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করার সুযোগ পাবেন। সাহিত্য পরিষদ থেকে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর ও ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৩১৮ ও ১৩২৮

সালে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয় এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৩২১ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রগুলিও উদ্যোক্তারা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ একদা রবীন্দ্র-সৃষ্টিকে অবলম্বন করে অনেক সার্থক চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। 'তপতী' নাটক ও 'ফাল্গুনী' নাটকের দৃশ্যাবলীর রমণীয় চিত্রগুলি তার মধ্যে অন্যতম। সেই সুন্দর সৃষ্টির ১৩ খানি চিত্র এবং শিলাইদহ ও শাহাজাদপুরের যে পরিবেশে 'রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্র' ও বাংলা সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গান রচনা করে-ছিলেন সেই পরিবেশের সৌন্দর্য অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের তুলিতে যে সব চিত্রে অক্ষয় হয়ে আছে তারও ১৯ খানি চিত্র এই প্রদর্শনীর গৌরব বাড়িয়েছে। এছাড়া প্রখ্যাত শিল্পী রমেন্দ্র চক্রবর্তীর ১০ খানি এবং রবীন্দ্র-নাথের নিজের আঁকা ৩ খানি চিত্রে এই প্রদর্শনী সমৃদ্ধ।

শুনলাম, স্থানাভাবে আরো অনেক মূল্যবান নিদর্শন সাহিত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষ প্রদর্শন করার সুযোগ পাননি। বাংলার রবীন্দ্রানুরাগী সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি-দের কাছে প্রদর্শনীটি যথেষ্ট সমাদর লাভে সক্ষম হয়েছে।

তৃতীয় প্রদর্শনীটি ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির পরিচালনায় পার্ক স্ট্রীটের আর্টিষ্ট্রি হাউসে গত ১৭ই এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা শিল্পীর নানা কল্পনা এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত। দেশী-বিদেশী মোট ২৭ জন শিল্পীর চিত্রকলার নিদর্শন এখানে স্থান পেয়েছে। অনেকগুলি চিত্র শিল্পগত মান রক্ষা করতে পারেনি বলেই আমাদের ধারণা। চিত্রগুলি নির্বাচনের পূর্বে আরো একটু সতর্ক হলে ভাল হত।

প্রখ্যাত শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও ইন্দ্র দুগারের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র, চীনা শিল্পী লী লীন-চিয় ও ইয়াও মন-কু-র পটচিত্র (scroll) এবং জাপানী শিল্পী এস. ফুকুনেজের 'শিকিশ' চিত্র-গুলি এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চীনা শিল্পীর হাল্কা তুলির টানে ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণের কয়েকটি দৃশ্য আশ্চর্য নিপুণতার সংগে পটের উপর বিধৃত হয়েছে। জাপানী শিল্পীর নৈপুণ্যও আঙ্গিক দক্ষতা মনকে নাড়া দেয়।

কয়েকখানি ম্যুরাল চিত্রের মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা চিত্রিত করেছেন শিল্পী অশোক দেব এবং তৃপ্তি রায়। চিত্রগুলির বিশালতা লক্ষ্য-

ণীয় কিন্তু চারু-ধর্ম থেকে এগুলিতে প্রাচীর-পত্রের ধর্মই প্রাধান্য পেয়েছে। পরিকল্পনাও এলোমেলো এবং ইতিহাসানুসারী নয়।

তৈল চিত্রে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে শ্রীমতী অরুন্ধতি রায় চৌধুরীর 'শিশু ভোলানাথ' চিত্রখানি। এই শিল্পীর জল-রঙে অংকিত 'রাখি-বন্ধন' চিত্রখানিও আমাদের ভাল লেগেছে। প্রদর্শনীতে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে শ্রীমতী সি বসুর 'শান্তিনিকেতনে জন্মদিন'। শ্রীমতী বসুরও মাধ্যম তৈল-রঙ। এই বিভাগে শ্রীমতী কৃষ্ণা ঘোষালের 'কবি বন্দনা' একটি ভাল রচনা। তবে মানুষগুলির আকৃতি-প্রকৃতি রচনায় তিনি খুব বেশী শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেননি। এছাড়া পি মনশরম ও তরুণিকা পি মনশরমের 'তাসের দেশ' কাবুলিওয়ালা ও শান্তিনিকেতনের দৃশ্য' চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত শিল্পীদ্বয়কে চিত্রকলায় নির্বিশেষ (abstract) পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বপক্ষে বলে মনে হল।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে একসঙ্গে তিনটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চেতনারই পরিচায়ক। শতবর্ষ পরিক্রমার শেষেও এই চেতনা জাগ্রত থাকে, আমরা এই কামনা করি।

ধাঁধার উত্তর

১। ইংলণ্ড, কেনাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, সিংহল, মালয়, ঘানা, নাইজেরিয়া ও সাইপ্রাস।

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত কয়টি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চুক্তি। এর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে South-East Asia Treaty Organisation. এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ হতে নিজের দেশ রক্ষা করা। সভ্যের যে কোন একজন আক্রান্ত হলে অন্য সকলে তাকে সাহায্য করবে—চুক্তির এই প্রধান সর্ত। এই চুক্তির সভ্য হচ্ছে—আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড।

৩। আমেরিকান নাম Astronaut এবং রাশিয়ান নাম Cosmonaut.

৪। প্রতিদিন ভারতীয় ডাকবিভাগ এক লক্ষ দশ হাজার জিনিস বহন করে।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল নেহরু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মদনমোহন মালব্য ও স্যার নীলরতন সরকার।

৬। মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এ'র মেঘনাদ বধ কাব্য সর্বপ্রথমে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়—বাংলা ভাষায় তাঁর উদ্ভাবিত অমিতাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রকাশ ঐ তারিখেই।

৭। রবার্ট ফুলটন—১৮০৭; রাইট ভ্রাতৃদ্বয়—১৯০৩; রাশিয়ার প্রস্তুত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ—১৯৫৭।

৮। পূর্বের রেকর্ড এইরূপঃ U. S. X-15 rocket plane ঘণ্টায় ২,৯০৫ মাইল গতি; এই rocket plane-এর উচ্চতার রেকর্ড ছিল ৩১ মাইল। বর্তমান রেকর্ড ছয় গুণ বেশী।

অমৃত প্যাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা : ৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীশ্যামল সেন

অমৃত

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা মূল্য ৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 19th May, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে দূর-দূরান্তে চলছে উৎসবের প্রতিধ্বনি। রেডিওর ধ্বনি-তরঙ্গ তা ছড়িয়ে দিচ্ছে গৃহে পরিবারে পল্লীতে নগরে দেশ-দেশান্তরে বিশ্বের সকল প্রান্তে। বিশ্বকবির শত-বার্ষিকী উৎসব আজ পৃথিবীর শিক্ষিত জনসমাজে পরিব্যাপ্ত। ভারতের জাতীয় উৎসব আজ আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত। আমাদের চরম সৌভাগ্য ও পরম আনন্দ এই যে, যে জ্যোতিষ্কের দীপ্তিতে আজ বিশ্ব প্রদীপ্ত, সেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদেরই এই ভারতভূমিতে শস্যশ্যামলা বাঙলার গৃহাঙ্গণে। প্রতিভা চিরকালের চিরবিস্ময়। তার সৃজনীশক্তি পরমাণুশক্তির মতোই বিস্ময়কর। প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ যে কোথাও সীমাকে স্বীকার করে না, প্রতিভা-বান ব্যক্তিগণ যুগে যুগে তারই প্রত্যক্ষ পরিচয় রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও যে এই ধরণীর দুর্লভ প্রতিভা তা আজ আর পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। একটি আলোকশিখা থেকে যেমন সহস্র দীপ জ্বলে, একটি আলোকশিখায় যেমন অমা রজনীর গাঢ় অন্ধকার দূর করে, রবীন্দ্র-প্রতিভার শিখা তেমনি জনগণমনের অধিনায়করূপে বিশ্ববাসীর মন উদ্ভাসিত করেছে। বন্ধনের ডোর ছিন্ন করেছেন, তিনি, উদয়ের পথে অভয়ের বাণী শুনিয়েছেন ভারত-বাসীকে, সত্যের পূজা, সুন্দরের পূজা, মানবকল্যাণের মহাপূজা কিরূপে সার্থক করে তোলা যায়, নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। তাঁরই তালে আজ বাজছে করতালি, তাঁরই সুরে-ছন্দে-নৃত্যে ভঙ্গীতে এসেছে নূতন মাধুরী। জীবনের জয়-যাত্রার পথে পথে উঠছে শঙ্খধ্বনি। তাঁর আহ্বান আমরা শুনেছি, 'এসো কর স্নান নব-ধারা জলে।' হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর নিকট তাঁর আবেদন, 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো', বিশ্বকে করো শান্তিনিকেতন। 'আনন্দধ্বনি জাগাও ভুবনে।' আর মানুষের প্রাত্যহিক জীবন দুঃখ গ্লানিমুক্ত রাখতে বলেছেন, 'মনেরে আজ কহ যে, ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।'' এমন কত কথার টুকরো, হীরের টুকরোর মতো জ্বলজ্বল করছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে। রামায়ণ মহাভারত কালের সীমা ছাড়িয়ে জীবন সমস্যার পথ নির্দেশকরূপে অমর হয়ে আছে। খন্ডে বা অখন্ডে, কথার টুকরোয় বা সমগ্রতায় রবীন্দ্র-রচনাবলীও অমর হয়ে থাকবে, জীবনের রসধারা সিঞ্চনে। মানবের মহাকাব্যরূপেই তা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে জীবনে জীবনে, সকল বিষয় ব্যাপার প্রয়োজনে।

জীবনপ্রবাহ যে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত তার মূল উৎস প্রেম। রাজ্য অপেক্ষা প্রেমের রাজ্যের প্রভাব অনেক বেশী। অন্তর দিয়ে 'ভালোবাসি' বলতে পারলে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সহজ হয়। রাষ্ট্রনায়ক বা ধর্ম-গুরু, রাজনীতিক বা সাহিত্যিক, যাদের জীবন মানবপ্রেমে প্রদীপ্ত, এ ধরণীতে তাঁরাই অমর হয়ে আছেন। যীশু, জোরোয়াস্তার, কনফিউসিয়াস, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, এই মানবপ্রেমের প্রতীক ব'লেই কালের কষ্টিপাথরে তাঁদের সুবর্ণরেখা কখনো ম্লান হয় না। প্রেমের পথ অমৃতের পথ ব'লেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম বাঙলার আকাশ বাতাস ছেয়ে আছে। বৈষ্ণব পদাবলী

ছিল রবীন্দ্র-জীবনের কৈশোর কালে অমৃত রসের আস্বাদনে।

মনীষীরা বলেন, রবীন্দ্রনাথ জীবন-প্রবাহের বিচিত্র বিকাশ। একাধারে তিনি জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মূর্তপ্রতীক। হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলায় তার জাতীয়তা বোধের উন্মেষ, আর বিশ্বভারতীর বিশ্বমেলা পরিকল্পনায় তার পরিপূর্ণতা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি বাঙলার ঐক্যের জন্য যে গান রচনা করেছিলেন, তা শুধু সে যুগের লোককেই প্রবুদ্ধ করেনি, এযুগেও তার প্রেরণা অম্লান রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁর মতান্তর ঘটেছে, কিন্তু মনান্তর ঘটেনি! তাঁদের পারস্পরিক গভীর প্রীতি শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। সিডিসন বিলের বিরুদ্ধে তাঁর 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'কন্ঠরোধ' প্রবন্ধ, মুক্তিকামী যুবকদের বিনা-বিচারে আটক ও অন্তরীণের বিরুদ্ধে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ, পাঞ্জাবের জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পরে তৎকালীন বড়লাটের নিকট তাঁর খোলা চিঠি ও স্যার উপাধি ত্যাগ স্মরণীয় হয়ে আছে। তবু বৈদেশিক মনীষীরা তাঁর সমাদরে কুন্ঠিত হননি। ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিতে স্যার মরিস গাওয়ারের মারফতে তাঁকে শান্তি-নিকেতনে গিয়ে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৩ সালে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার লাভে তাঁর খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশবিদেশের আমন্ত্রণ ও ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ পর্যটন করেছিলেন। আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড ইটালি, জার্মাণী, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, রাশিয়া, মিশর, ইরাক, ইরাণ, সুইজারল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সুমাত্রা, বলীদ্বীপ, যবদ্বীপ ইত্যাদি বহু দেশে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিশ্বপ্রেমের উদার বাণী উদাত্ত করে তুলেছিলেন।

দু'হাজারের বেশী গান, তিন হাজারের বেশী প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, ছড়া, কবিতা, কৌতুক রস রচনা ও চিঠিপত্র বাঙলা তথা ভারতের অক্ষয় সম্পদ ও বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য অবদানরূপে বিরাজ করছে। বহু ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে আরও হচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতবর্ষকে জানতে হ'লে, এদেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচয় লাভ করতে হ'লে, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনাবলীর সহিত পরিচয় লাভই তার প্রকৃষ্ট উপায়। এ উক্তি যে অত্যুক্তি নয় তা যতই দিন যাচ্ছে ততই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কালের সঙ্গে চিরকালের পরিচয়ই তাঁর রচনার বিশেষত্ব। ইতালির দান্তে, রাশিয়ার টলষ্টয়, জার্মাণীর গেটে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু ইংরেজ সেক্সপীয়রের যেমন জুড়ি নেই, তেমনি যথাযথভাবে প্রচারিত হ'লে বিশ্ব-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরও জুড়ি থাকবে না! হয়তো হিমালয়ের শীর্ষের ন্যায় তাঁর সর্বাত্মক রচনার শীর্ষ-স্থানের বিশ্বস্বীকৃতি এখনও অপেক্ষা করছে।

তথাপি বিশ্বকবি হলেও রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ গানের কবি প্রাণের ও ধ্যানের কবি। আলোকের ঝর্ণাধারার ন্যায় মানুষের জীবন-প্রবাহকে তা চিরজীবনের পথে পরিপূর্ণ ক'রে দেয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ভাষায় ''রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দে অমৃত-ঘন রসে অভিষিক্ত।'' অনুভূতির এমন ভাষা কোথায় আছে? কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত সুরে, কত ছন্দে, সীমার মাঝে অসীমের সুর তাঁর গানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে তার ইয়ত্তা কে করবে? তাঁর উদাত্ত উদার আহবান—''দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।'' 'কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই, দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।'' রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এই লাইন দুটি বিদেশীদের চিত্ত কিরূপ অভিভূত করেছে, বহু সম্বর্ধনা সভায় তিনি নিজেই দেখে গিয়েছেন।

অস্পষ্ট ঊষায়, অলস মধ্যাহ্নে, কর্মক্লান্ত দিবালোকে, অবকাশের অপরাহ্নে বা নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাণস্পর্শ মানুষের মন অমৃত সরস করে রাখে। এমন অবস্থা নেই, এমন চিন্তা নেই যা রবীন্দ্র কাব্যে ও সাহিত্যে মোহন তুলিকা বুলিয়ে যায়নি। রূপকে তিনি অপরূপ করে তুলেছেন, তিলকে করেছেন তিলোত্তমা। 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে' চলছে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর মহোৎসব, ৩১টি রাজ্য এই উৎসবে যোগ দিয়েছেন। স্মৃতি নিয়ে, প্রীতি দিয়ে, প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করে এই সর্বজনীন শ্রদ্ধা নিবেদনের রূপ অতুলনীয়, অনির্বচনীয়। পূজা পুষ্পের সৌরভে আজ গৃহ পরিবার পুলকিত, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুধারসে আজ বিশ্ব-মানবের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান অভিসিঞ্চিত। রবীন্দ্র-জন্ম শত-বার্ষিকী উৎসব আমাদের জীবন প্রদীপ্ত করুক, প্রীতির গন্ধ-পুষ্পে আমোদিত হউক বিশ্বের নরনারী। নিখিলের আনন্দধারায় আমরাও নিবেদন করি আমাদের পুলকাপ্লুত সশ্রদ্ধ প্রণতি।

গীতার ভূমিকা

রাজশেখর বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যজ্ঞ

৩।১০-১৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—ব্রহ্মা মনুষ্যসৃষ্টির সংগেই যজ্ঞ সৃষ্টি ক'রে এই বিধান দিলেন যে, মনুষ্যগণ যজ্ঞ ক'রে দেবগণকে তুষ্ট করবে এবং দেবগণও মনুষ্যের ইষ্টসাধন করবেন। এইরূপ পরস্পর আদান-প্রদান দ্বারা মনুষ্যগণ শ্রেয়োলাভ করবে। যে লোক যজ্ঞ না ক'রে অর্থাৎ দেবতাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে ভোগ করে, সে চোর। তারপর ব্রহ্ম, অক্ষর, ব্রহ্মা, কর্ম, যজ্ঞ, পর্জন্য, অন্ন, প্রাণী—এক হ'তে অপরের উৎপত্তি নির্দেশ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—এই প্রবর্তিত চক্রের (আদান-প্রদানের) অনুবর্তী যে না হয় সেই পাপাত্মার জীবনই বৃথা। এরপর আবার ৪।২৩-৩৩ শ্লোকে বলছেন—অনাসক্ত মুক্ত জ্ঞানীর যজ্ঞাচরিত সমস্ত কর্ম বিলীন হয়; তাঁর সমস্ত যজ্ঞই ব্রহ্মময় (অথবা ব্রহ্মই তাঁর যজ্ঞ।; অনেকে অনেক প্রকার যজ্ঞ করেন—দৈবযজ্ঞ ব্রহ্ম-যজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-বিষয়-প্রাণ ইত্যাদির আহুতি, দ্রব্যযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়জ্ঞান যজ্ঞ, কুম্ভক প্রাণায়ামাদি; এঁরা সকলেই যজ্ঞাবশিষ্ট ভোগ করে ব্রহ্মলাভ করেন; যে অযজ্ঞ, অর্থাৎ কোনও যজ্ঞ করে না তার ইহকাল পরকাল নেই। এই প্রকার অনেক যজ্ঞই ব্রহ্মার মুখে বিস্তারিত হয়েছে এবং সে সমস্তই কর্মজ: তা জেনে মুক্ত হও। শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে বলছেন—দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

এই সকল শ্লোক থেকে পাওয়া যাচ্ছে—

(১) পুরাকাল হ'তে যজ্ঞচক্র অর্থাৎ দেবতা-মানবের মধ্যে আদান-প্রদানের একটা ব্যবস্থা চ'লে আসছিল। যজ্ঞ না করা অপরাধ গণ্য হ'ত। শ্রীকৃষ্ণ নিজের মত বলেছেন—'এই চক্রের অনুসরণ যে না করে সে অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারাম, তার জীবনই বৃথা।'

(২) কিন্তু পরে আবার বলেছেন—'অনাসক্ত জ্ঞানীর যজ্ঞাচরিত কর্ম বিলীন হয়; ব্রহ্মকে নিয়েই তাঁর যজ্ঞ।' এর তাৎপর্য—অনাসক্ত জ্ঞানীর ফলাশা নেই, অতএব তাঁর যজ্ঞের আড়ম্বর নিরর্থক। যজ্ঞচক্র সম্বন্ধে তাঁর যা কর্তব্য আছে তা তিনি ব্রহ্মযজ্ঞ ক'রে 'ব্রহ্মকর্মসমাধি' দ্বারাই, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ ক'রেই সম্পন্ন করবেন।

(৩) গীতায় বহুবিধ অনুষ্ঠান যজ্ঞ ব'লে গণ্য হয়েছে। বেদের অর্থ—হিসাবেই যজ্ঞ, যথা—সংযম-অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-আহুতি। কুম্ভকাদি প্রক্রিয়া ও বোধের চেষ্টাও যজ্ঞ (স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ)। কতকগুলি অনুষ্ঠান রূপক যজ্ঞ। এগুলিকেও রূপক বলা যেতে পারে—অপানে প্রাণ-আহুতি।

(৪) ঐ সকল যজ্ঞকারী সকলেই যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন ক'রে ব্রহ্মলাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বা গীতাকার হয়তো নিজের মত না ব'লে ব্রহ্মার মুখের কথামাত্র অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি তার পরেই বলছেন—'অযজ্ঞের ইহকাল পরকাল নেই।' অতএব তাঁর মতে সকলেরই কোনও না কোনও যজ্ঞ করা অবশ্য কর্তব্য। ১৫।৫ শ্লোকেও যজ্ঞের আবশ্যকতা উক্ত হয়েছে।

(৫) শ্রীকৃষ্ণ আবার বলছেন—'ব্রহ্মার মুখে এই যে নানা প্রকার যজ্ঞ উক্ত হয়েছে সে সমস্তই কর্মজ: তা জেনে মুক্ত হও।' এর এক অর্থ হ'তে পারে—তোমাকে যেরূপ হোক যজ্ঞ করতেই হবে; যজ্ঞের ফল আত্মাকে স্পর্শ করে না, যজ্ঞ কর্মেই নিবদ্ধ থাকে; অতএব কেবল কর্তব্য-বোধে যজ্ঞ করলে তোমার মুক্তির ব্যাঘাত হবে না। অথবা এই কথা শ্রীকৃষ্ণের বক্রোক্তিও হতে পারে। —ব্রহ্মা যে সব যজ্ঞের কথা বলেছেন সে সমস্তই কর্মজ ('ক্রিয়াবিশেষবহুলাং' ২।৪৩)' জ্ঞানজ নয়; অর্থাৎ শুধুই কর্ম, বুদ্ধি-চালিত নয়। ওসকল যজ্ঞ সাধারণের জন্য। তাদের যজ্ঞ চাই, কিন্তু তারা অজ্ঞ, কেবল ফরমাশ খাটতে পারে, অতএব তাদের জন্য কর্মজ যজ্ঞের ব্যবস্থা, যাতে বহু আড়ম্বর, বহু ক্রিয়া। ওরূপ যজ্ঞ না করলে তোমার কোন ক্ষতি নেই, তবে 'লোকসংগ্রহের' জন্য করতে পার। তোমার উপযুক্ত যজ্ঞ অন্যবিধ।

(৬) পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ', অর্থাৎ আড়ম্বরবহুল যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানচর্চাই শ্রেষ্ঠ।

(৭) 'যজ্ঞ' শব্দ যেরূপ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তাতে অনেক কর্মকেই যজ্ঞ বলা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কামভাবে সতত কর্ম করতে বলেছেন। অর্জুন সেই উপদেশ অনুসারে চললে অনেক যজ্ঞই তাঁর করা হবে। আর, যদি তিনি জ্ঞানযজ্ঞ করেন তবে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞও করা হবে। গীতার শেষে (১৮।৭০) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'যিনি আমাদের এই সংবাদ (অর্থাৎ গীতা) অধ্যয়ন করেন তাঁর দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে পূজিত হই।'

যজ্ঞ ও নিষ্কাম কর্ম

'পুরাকালে 'যজ্ঞ' বললে যে প্রক্রিয়া বোঝাত তার কতকগুলি নির্দিষ্ট অংগ ছিল, যথা—যজমান বা যজ্ঞকর্তা, (২) যে দেবতার তুষ্টির জন্য যজ্ঞ হ'ত, (৩) যে দ্রব্য দেবতাকে নিবেদিত হ'ত, (৪) যে অভীষ্টলাভের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ত, অর্থাৎ যজ্ঞের সংকল্প। যজ্ঞের উদ্দেশ্য—দেবতার প্রাপ্য দেবতাকে দিয়ে অভীষ্ট আদায়। এই অভীষ্ট ব্যক্তিগত হ'তে পারে, যথা— পুণ্যসঞ্চয়, ধনপুত্র-লাভ; অথবা সামাজিক হ'তে পারে, যথা—সুবৃষ্টি, মারীভয় নিবারণ। যিনি উদ্‌যোগী হয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করতেন তিনিই যজমান। যা দেবতাকে দেওয়া হ'ত, তা প্রধানত হবি বা ঘৃত, কিন্তু পশু, শস্য, পুরোডাশ ইত্যাদিও দেওয়া চলত এবং এ সমস্তই

'হবি' বলে গণ্য হ'ত। অগ্নিই প্রধান দেবতা, তাঁকে সহজে পাওয়া যায় এবং তিনি মূর্তিমান হয়ে হবি গ্রহণ করেন। অপর দেবতারা স্বয়ং দেখা দিতেন না, এজন্য অগ্নিকে তাঁদের প্রতিভূ বা প্রতীক মনে করে আহুতি দেওয়া হ'ত। নিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ করে অগ্নি যা ফেলে রাখতেন তা অতি পবিত্র 'যজ্ঞশিষ্ট' (যজ্ঞাবশিষ্ট) অমৃততুল্য বস্তু। যজমান তা সবান্ধবে খেয়ে ধন্য হতেন।

কালক্রমে এই যজ্ঞে রূপক এল। অনেক অনুষ্ঠান, যাতে কোনও অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, যজ্ঞ বলে গণ্য হ'তে লাগল। যা অর্পণ বা ত্যাগ করা যায় তাই হবি। যাতে বা যে উদ্দেশ্যে অর্পণ করা যায় তাই অগ্নি। দেবগণ জনসাধারণের মঙ্গল বিধান করেন, অতএব তাঁরা জনহিতের বা সমাজের প্রতীক। দেবতাকে বা অগ্নিতে অর্পণ করার অর্থ—জনহিতকল্পে কোনও দ্রব্য নিয়োগ করা, যথা পূর্তযজ্ঞে জলাশয়াদি। হবির অর্থ ব্যাপক হয়ে দাঁড়াল। যা কিছু নিয়োগ করা যেতে পারে—বিত্ত, সামর্থ্য, এমনকি নিজের বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, ইন্দ্রিয় পর্যন্ত। অবশেষে সংকল্প অর্থাৎ যে অভীষ্টের কামনায় যজ্ঞ হচ্ছে তা পর্যন্ত হবির অন্তর্গত হ'ল, নিষ্কাম যজমান যজ্ঞকালে পর্যন্ত উৎসর্গ করতে লাগলেন। যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনের অর্থ হ'ল—উৎকৃষ্ট বস্তুতে যজ্ঞকর্তার আর স্বত্ব রইল না, তা দেবতার অর্থাৎ জনসাধারণের সম্পত্তি হ'ল, তবে যজ্ঞকর্তা জনসাধারণের একজন হিসাবে ক'রে কৃতার্থ হতে পারেন। দেবতা জনহিতের প্রতীক—এই ধারণা হয়তো সর্বত্র স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু সংকল্পবিনিয়োগের ফলই হ'ল ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ এবং পরার্থে দান। এই জন্যই 'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্' (৪।৩১)।

অবশ্য সকলেই সংকল্প উৎসর্গ করে যজ্ঞ করত না। তথাপি অধিকাংশ যজ্ঞই সমাজহিতকর, সেজন্য কোনও যজ্ঞ না করার চেয়ে কাম্যযজ্ঞও বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হত। ব্যাপক দৃষ্টিতে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান মাত্রই যজ্ঞ। কিন্তু যে কর্মে আহুতিদানরূপ আড়ম্বর থাকত, তাই যজ্ঞ নামে বিশেষিত হ'ত। এখনও অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ (৪।৩৩), এবং পরে আবার বলেছেন—যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ (১০।২৫)। জপের অর্থ মন্ত্র আওড়ানো নয়। জপ ও ধ্যান সমার্থক, একাগ্রচিন্তার দ্বারা জ্ঞানলাভের চেষ্টা।

৫

ধর্ম ও স্বধর্ম

যা সমাজকে ধারণ করে, অর্থাৎ যে আচার-ব্যবহার সমাজরক্ষার অনুকূল, তাই ধর্ম। ধর্ম religion নয়, কেবল moralityও নয়। আহার, বিহার, শিক্ষা, বৃত্তি, উপার্জন, স্বজনপালন, শত্রুদমন, সদাচার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই ধর্মের অন্তর্গত। কেবল সমাজের হানিকর কর্ম অধর্ম। কোনও এককালে ভারতবর্ষে গুণকর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হ'ত, কিন্তু পরে বর্ণ, বৃত্তি ও ধর্ম জাতিগত হ'য়ে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হ'ত, যথা দ্রোণ কৃপাদির ক্ষত্রিয়বৃত্তি। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোকই বর্ণগত ধর্মপালন করত। গীতায় স্বধর্ম শব্দের স্পষ্ট অর্থ—স্বীয় বর্ণের নির্দিষ্ট ধর্ম। গীতা যুগের সামাজিক অবস্থা কল্পনা করলে এই অর্থ সংকীর্ণ বোধ হবে না। তখনকার শিক্ষার ধারা বর্ণ বা বংশগত ছিল; যে লোক যে বর্ণে জন্মাত, সেই বর্ণের নির্দিষ্ট আচরণই তার পক্ষে সুসাধ্য এবং স্বভাবের অনুকূল হ'ত। পরধর্ম অর্থাৎ অপর বর্ণের নির্দিষ্ট ধর্ম তার অপরিচিত এবং সমাজ কর্তৃক ভর্ৎসিত, সেজন্য 'ভয়াবহ'। স্বধর্ম তার বর্ণসম্মতও বটে এবং শিক্ষাস্বভাবেরও অনুকূল। কিন্তু বর্তমান কালে বর্ণগত ধর্ম লোপ পেয়েছে। সেজন্য স্বধর্মের প্রাচীন অর্থ ধরলে গীতার বক্তব্য নিরর্থক হয়। এখনকার সমাজে বর্ণগত কর্মভেদ নেই, গুণকর্ম অনুসারেও বর্ণভেদ নেই। ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু নতুন ধর্মশাস্ত্র লিখিত হয়নি। এখন নিজের শিক্ষা, প্রতিবেশ এবং স্বভাব বা রুচির অনুকূল ধর্মই স্বধর্ম। স্বধর্ম শব্দের এই ব্যাপক অর্থ ধরলেই গীতাবাক্যের তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা ও আলোকচিত্র

মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকায় (ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক) ১৮৭৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়। হিন্দু মেলায় তিনি কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির শেষাংশ ও কবির তৎকালীন আলোকচিত্র এখানে পুনর্মুদ্রিত হ'লো। আলোকচিত্র ১৮৭৩-৭৪ সালেই গৃহীত হয়।
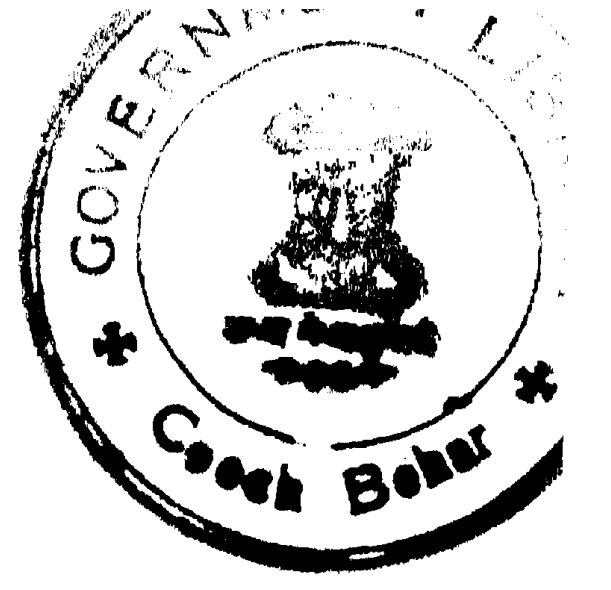
ওঁ

Uttarayan,
Santi Niketan,
Bengal.

কল্যাণীয়েষু—

ইতিমধ্যে বোধ করি তোমার দিদির কাছ থেকে খুব একটা নথনাড়া পেয়েছ পত্রযোগে. সেটা বিজয়ার আশীর্বাদের মতো শোনাচ্ছে না। তাঁকে লেখা আমার একটি পত্র তুমি তাঁর বিনা অনুমতিতে ছন্দায় পাঠিয়েছ বলে তাঁর অপরাধী হয়েছে। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি আমার তরফ থেকে তুমি কোনো অপরাধ করোনি। হেমেন্দ্রকুমার আমার অকৃত্রিম সুহৃদ। কোনো দিন অসম্মান পাইনি তাঁর কাছ থেকে। অথচ তিনি কবি, গল্প লিখিয়ে, সাহিত্যিক এবং কাঙালি। বংগভংগের সময় স্বদেশি চিনির বাজার চড়ে গিয়েছিল, তখন সেই চিনির নিশ্চিত প্রমাণ ছিল তার অশুভ্র মলিনতায়, তার ধূলোতে বালিতে। হেমেন্দ্রকুমারের মাধুর্যে সেই স্বদেশি রং লাগেনি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাঁর ব্যবসা চলে কী করে?

বাপ যখন কন্যাকে জামাইয়ের হাতে দান করে, তখন তার বারো আনা অধিকার হস্তান্তরিত হয় কিন্তু চার আনাও তো থাকে। চিঠির স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে ভাগ-বাঁটোয়ারার পরিমাণ কী জানতে ইচ্ছা করে। যার হাত থেকে যায় এবং যার হাতে গিয়ে পড়ে, জিনিষটা ওজনে কার দিকে ঝোঁকে—সাহিত্যের মূল্য হিসাবে দেখতে গেলে—থাক, ওসব তর্কে কাজ নেই। বোবার শত্রু নেই।

ইতি ২৬।১০।৩৬
রবীন্দ্রনাথ

(শ্রীযুক্ত অশোক মৈত্রকে লিখিত)

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বলিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবিরে পুনঃ,
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতি পটে,
ভাবে না নয়ন বিষাদ জলে?

২০

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

২১

যাক্ ভাগিরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হাসলে মুক্তো

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'অভয় দাও ত বলি আমার উইশ্ কি—
একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হুইস্কি!'

রীতিমত দলিল দস্তাবেজ না থাকলে এ গানের কলি আমরা ফাজিল কোনো বেপরোয়া ছোকরার লেখা ছাড়া ভাবতে পারতাম কি? ভাবতে পারতাম যে, খেয়া-নৈবেদ্য-বলাকা যাঁর লেখা এ-গান তাঁর হাত দিয়েই বেরিয়েছে!

কিন্তু এই ভাবতে না পারাটাই বুঝি রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের গভীর অজ্ঞতার প্রমাণ। পাহাড় ভাবতে আমরা রুক্ষ নেড়া পাহাড়ই ভাবি। ভুলে যাই যে, নেহাৎ ছোটখাট পাহাড়ই শুধু কঠিন মামুলী গাম্ভীর্যে নীরস নিষ্পাদপ হতে পারে, হিমালয়ের মত যা বিরাট তা শুধু তুষারমৌলীই নয়, তাতে বৈচিত্র্য ও রসের ধারা অফুরন্ত। সাহিত্য শিল্পে বা যে কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ ধারণার মেঘ ছাড়ানো যাঁদের যত অসামান্য মহত্ত্ব, তাঁদের মনই প্রসন্ন কৌতূহলের আলোয় তত ঝলমল।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রাত্যহিক আলাপ-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি সুরসিক ছিলেন তার অসংখ্য সাক্ষী এখনও বর্তমান, কিন্তু ভয় হয় যে বর্তমান বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্র-বন্দনার উচ্ছ্বাসে তাঁর সাহিত্যের এই পরম রসাল দিকটাই বুঝি অবজ্ঞাত হতে চলেছে।

বাংলা বেরসিকের দেশ নয়। মঙ্গল-কাব্যের যুগ থেকেই এ-দেশের সাহিত্যে হাসির ঝিলিক অহরহ দেখা দিয়েছে। গোপাল ভাঁড়ের রসিকতার জনশ্রুতি থেকে এ-যুগের পরশুরামের সূক্ষ্ম বিদগ্ধ তির্যক ব্যঙ্গরসের বিস্ময়কর বিবর্তন আমরা জানি, শুধু তার মাঝে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য হাস্যোচ্ছল রসিকতার বৈচিত্র্য সম্বন্ধেই সাধারণত আমরা যথেষ্ট বোধহয় সচেতন নই।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের জাতই অবশ্য আলাদা। তাঁর হাসি এত সহজ স্বাভাবিক যে নিতান্ত সাধারণ বিষয়ই একটু ভাষার কারিকুরিতে পল কাটার গুণে অপ্রত্যাশিত কৌতুকে ঝলমল করে ওঠে। বাঁকা চোখে দেখার হুল ফোটানো হাসি তাঁর নয়, বাঁকা বিসদৃশকে স্বরূপে দেখান তাঁর হাসির উৎস। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁর তূণে নেই এমন নয়, কিন্তু সে শরাঘাতে রক্তপাত হয় না, তাতে শুধু হাসিয়ে নাকাল করে জব্দ করে।

ব্যঙ্গ-কৌতুকে অসত্য ও বিকৃতকে উপহাসাস্পদ করবার অপূর্ব কৌশল আমরা দেখেছি 'নূতন অবতার' বা 'স্বর্গীয় প্রহসন' জাতীয় রচনায়, সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ অহেতুক হাস্যরসের স্বাদ পেয়েছি 'বিনি পয়সার ভোজ' কি 'বশীকরণে'। নাটকের ঢঙে এসব রচনা লেখা। সরস স্বচ্ছন্দ সংলাপের এমন ফুলঝুরি আগে বা পরে বাংলা সাহিত্যে কোথাও আছে বলে জানি না।

যখন তখন যত্র-তত্র আজ ষাট বছরের ওপর অভিনীত, পঠিত হয়ে যাতে অরুচি ধরে যাবার কথা তেমনি একটি অতি-পরিচিত ছোট নাটিকার কৌতুকদীপ্ত

করে উঠছে সাতরঙা হাসিতে। 'চিরকুমার সভা'-র অক্ষয় ও পুরবালার কথা-কাটাকাটি একটু শোনা যাক্—

'অক্ষয়—আমি ত তোমাকে বলেইছি, কোনো ভাবনা কোরো না আমার শ্যালীপতিরা গোকুলে বাড়ছেন।

পুরবালা—গোকুলটি কোথায়?

অক্ষয়—যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভর্তি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার সভা।

পুরবালা—প্রজাপতির সঙ্গে যে তাদের লড়াই।

অক্ষয়—দেবতার সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন? তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয়া মাত্র। সেইজন্যে ভগবান প্রজাপতির বিশেষ ঝোঁক ওই সভাটির ওপরে। সরাচাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে, প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগুলিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন। দিনে দিনে বিবাহযোগ্য হয়ে এসেছেন—এখন পাতে দিলেই হয়......'

নাটকে ও নক্সায় রবীন্দ্রনাথের কৌতুকরস উৎসারিত কথার কুশলতায় আর চরিত্রের উপভোগ্য বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে। সে কৌতুকরস যাকে বলে প্লট-নির্ভর নয়। হাল্কা হাসির বিশুদ্ধতা বজায় রাখবার জন্যেই অতি ক্ষীণ একটি খোলাখুলিভাবে বানানো কৃত্রিম গল্পের সুতোয় নাটক বা নক্সা গাঁথা। সরস চরিত্রগুলির দ্বন্দ্ব-মিলনে কথার ফুলঝুরি ফোটানোর ভেতর দিয়েই তার পরাসিদ্ধি।

কবিতায় গানে এই কৌতুক রস আবার প্রাণের বেগে উচ্ছল, এমন কি উদ্দামও বলা যায়।

'কেউ যে কারে চিনি নাকো
সেটা মস্ত বাঁচন।
তা না হলে নাচিয়ে দিত
বিষম তুর্কি-নাচন।
বুকের মধ্যে মনটা থাকে
মনের মধ্যে চিন্তা—
সেইখানেতেই নিজের ডিমে
সদাই তিনি দিন তা।
বাইরে যা পাই সমঝে নেব
তারি আইন কানুনে,
অন্তরেতে যা আছে তা
অন্তর্যামীই জানুনে।'

কিংবা,—

'সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে
জ্যামিতি আর বীজগণিতে
কারো ইথে আপত্তি নেই।
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে
এবং আমার কবির গানে
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই।
চিত্তদ্বারের মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।'

কিংবা,—

'সুখে আছি লিখতে গেলে
লোকে বলে প্রাণটা ক্ষুদ্র
আশাটা এর নয়কো বিরাট
পিপাসা এর নয়কো রুদ্র।
পাঠক দলে তুচ্ছ করে
অনেক কথা বলে কঠোর—
বলে, একটু হেসে খেলেই
ভরে যায় এর মনের জঠর
কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে
বানাতে হয় দুখের দলিল।
মিথ্যে যদি হয় সে তবু
ফেলো পাঠক চোখের সলিল।
তাহার পরে আশিস কোরো
রুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষুব্ধ বুকে
কবি যেন আজন্মকাল
দুখের কাব্য লেখেন সুখে।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে
স্নানাহারের নিয়ম রাখে
সহজ লোকের মতই যেন
সরল গদ্য কয় গো।'

এসব পড়লে এটুকু অন্ততঃ বুঝতে পারা উচিত যে প্রাণের অগাধ সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গেই শুধু এমন বিচিত্র শুভ্র হাসির ছটায় ফেনায়িত হতে পারে।

দিঙনাগাচার্যেরা রবীন্দ্রনাথের এই হাল্কা দিকটা সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকতে পারলেই বোধ হয় খুশি হ'ন। পারলে তাঁরা হয়ত রবীন্দ্রকীর্তি থেকে এইসব চপলতার নিদর্শন ছেঁটেই বাদ দিতেন। কারণ আকাশকে বড় করতে হলে অমারাত্রির অন্ধকার কি মধ্যাহ্নের রুদ্র দীপ্তিই তাঁরা বুঝাতে ও বোঝাতে ব্যাকুল। ঋতুর পালায় তার মেঘের অলস উদ্দেশ্যহীন খেলা আর প্রভাত সন্ধ্যায় তার রঙের মত্ত বাচালতা বাদে আকাশের মহিমা যে অসম্পূর্ণ থাকে এ খবর তাদের জানা নেই।

শিল্পীঃ শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী
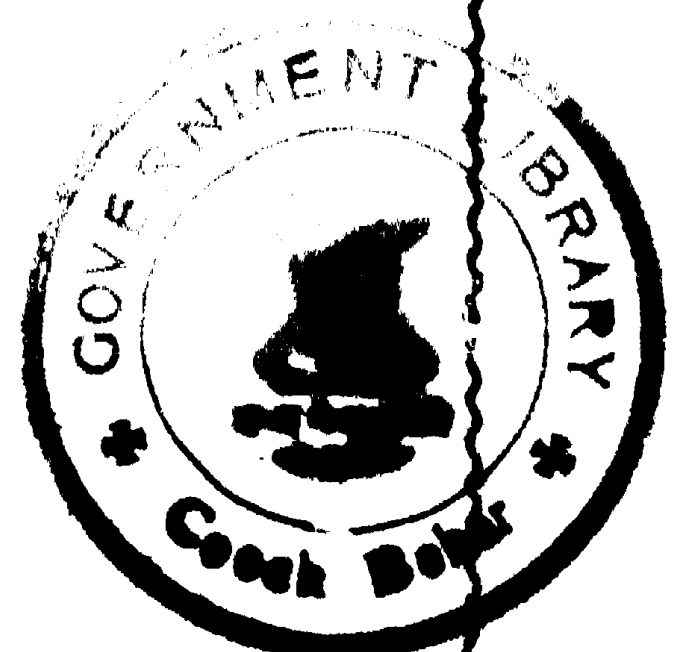
রবীন্দ্রনাথ ও পাঠাগার

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

ইংরেজ দার্শনিক কার্লাইল বলিয়াছেন, —"পুস্তক সংগ্রহই বর্তমান-কালে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।" এই সত্য রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যখন তরুণ তখন কলিকাতায় কোন কোন ধনীর বা পন্ডিতের গৃহে পুস্তক সংগ্রহ ছিল বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ লোকের ব্যবহার করিবার সুবিধা ছিল না। লর্ড মেটকাফ অল্পদিনের জন্য বড়লাট হইয়া এদেশে সংবাদপত্রকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেন (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে)। সেই কাজের জন্য তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদিগের অপ্রীতিভাজন হ'ন এবং তাহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ হয়। কিন্তু এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই কাজের জন্য তাঁহাকে কেবল অভিনন্দিতই করেন নাই, পরন্তু তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে গৃহ নির্মাণ করেন— গঙ্গার পূবে সেই "মেটকাফ হলে" কলিকাতার প্রথম জন-সাধারণের ব্যবহার্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন তরুণ, তখনও কলিকাতায় যানবাহনের সুবিধা ছিল না। সেই কারণে কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন।

এই সময়ে বিডন স্ট্রীট অঞ্চলের কয়জন যুবক একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। যিনি তাঁহাদিগের দলে দলপতি হইয়া সম্পাদকরূপে বহুদিন প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত করিয়াছিলেন—সেই গৌরহরি সেন লিখিয়াছিলেনঃ—

"কিন্তু টাকা কোথায়? ঘর কই? হরলালবাবু মাষ্টার, কত সামান্য মাহিনার কেরাণী, নিতাই হেয়ার স্কুলে পড়ে, কুঞ্জ এফ-এ ক্লাসের ছাত্র, আমি এফ-এ ফেল হইয়া টোটো কোম্পানীর কার্য করি। কুঞ্জ ও নিতাই-এর পিতামহ 'গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের ইংরাজী চিঠিপত্র লিখিয়া আমি তাঁহার স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম। কুঞ্জ ও বিপিনের পরামর্শে তাঁহার নিকট লাইব্রেরীর কথা পাড়িলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল; তিনি বলিলেন—'তোমাদের কিছু টাকা ও এই ঘরটা দেবে।' এই ঘরটা মানে বিডন স্ট্রীটের ৮৩নং বাড়ীতে ঢুকিতে বাঁ ধারের ঘর। ঐ ঘরে দত্ত মহাশয় হরিনাম করিতেন, হিসাব লিখিতেন ও ঘুমাইতেন। লাইব্রেরী ঐ ঘরে বিনাভাড়ায় কিয়দধিক চার বৎসর ছিল।"

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী—সরস্বতী পূজার দিন—লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়; নাম হয়—চৈতন্য লাইব্রেরী অ্যান্ড বিডন স্কোয়ার লিটারারী ক্লাব।

লাইব্রেরী স্থাপনাবধি রবীন্দ্রনাথ ইহার কল্যাণকামী ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। আশু ঘোষচৌধুরী তখন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন—তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, 'ভারতী'তে বিদেশী কবিদিগের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি বার্ষিক অধিবেশনে ইংরেজী প্রবন্ধ—"সাহিত্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়"—পড়িলেন। সভাপতিত্ব করিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নরিস। ইঁহার বাক্যের সমালোচনা করায় 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালতের অপমাননার অপরাধে কারাদন্ড হয়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যখন লাইব্রেরী রেজিস্টারী করা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ইহার অন্যতম সহকারী-সভাপতি। তখন সভাপতি—পাদ্রি আলেকজান্ডার টমরী; সহকারী-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আশুতোষ চৌধুরী, আলেকজান্ডার পেডলার ও রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। এই গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত ৮টি প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং সে সকলের প্রথমটি লাইব্রেরী কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়—

(১) "য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি।" যে সভায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন।

(২) "ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ।" যে সভায় এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণতঃ সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন না—কিন্তু তিনি এই প্রবন্ধ যে সভায় পঠিত হয়, তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেন। এই প্রবন্ধে এদেশের রাজনীতিক চিন্তার মূলধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) "বঙ্কিমচন্দ্র।" বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে চৈতন্য লাইব্রেরী যে শোকসভার আয়োজন করেন, তাহাতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই প্রবন্ধ পঠিত ও 'সাধনায়' প্রকাশিত হয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের অন্যতম।

(৪) "মেয়েলি ছড়া।" যে সভায় এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহাতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

(৫) "স্বদেশী সমাজ।" এই প্রবন্ধ রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করেন। তিনি স্বয়ং সেই সমাজ গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইহার আদর্শে নানাস্থানে সমাজ গঠনের চেষ্টা হইয়াছিল। যে সময় বৈদেশিক আদর্শ বাঙ্গালীকে অভিভূত করিয়াছিল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ ত্যাগ করিয়া কিরূপে আমরা স্বায়ত্ত সমাজ গঠিত করিতে পারি, ইহাতে তাহারই আলোচনা করিয়াছিলেন।

(৬) "পথ ও পাথেয়।" যে সভায় ইহা পঠিত হয়, তাহাতে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি ছিলেন।

(৭) "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।" এই প্রবন্ধ চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে পঠিত হয়।

(৮) "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা।" যে সভায় এই প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহাতেও আশুতোষ চৌধুরী সভাপতি ছিলেন। ইতিহাস রচনার আদর্শে প্রথম পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন—ভলটেয়ার। তিনি দেখাইয়া দেন যে, রাজাদিগের বিবরণ, যুদ্ধের বিবরণ ও জয়-পরাজয় লিপিবদ্ধ করা—এ-সকল প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ নহে। দেশের জনগণের অবস্থা—সমাজের ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যতীত ইতিহাস হয় না। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অপ্রকাশ এবং সেই বৈশিষ্ট্য-বর্জন করিলে যে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইতে পারে না—রবীন্দ্রনাথের তাহাই বক্তব্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সহিত চৈতন্য লাইব্রেরীর ঘনিষ্ঠতাহেতু তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইহার কয়টি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

কিভাবে চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বলা গিয়াছে। তখনই রবীন্দ্রনাথ ইহার কর্মীদিগের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ যে লাইব্রেরীর জনপ্রিয়তা ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তিনি লাইব্রেরীর পরিপুষ্টি ও তাহার গৃহনির্মাণের উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ যে লাইব্রেরীর সদস্যদিগের দ্বারাই হইয়াছে, ইহা দেখিয়া গিয়াছেন।

আজ পরিবর্তিত অবস্থায় জাতীয় সরকার গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বুঝিয়া দেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় ও তাহার উন্নতিসাধনে অর্থব্যয় করিতেছেন। এক বিষয়ে তাঁহারা সংবিধানে প্রতিশ্রুত কর্তব্য এখনও প্রতিপালন করেন নাই—দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন নাই। তাহা যখন পালিত হইবে তখন দেশের উন্নতি কত দ্রুত হইবে, তাহা জাপানে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর তখন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আরও বর্ধিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থাগারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইয়া—তাহার সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ও তাহাতে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লোককে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার কার্যে—তাঁহার বহু কার্যের মধ্যেও—আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন অবস্থা অন্যরূপ ছিল—প্রয়োজনও অন্যরূপ ছিল। তাঁহার যে সকল কার্য তাঁহার দেশবাসীরা সাদরে ও সাগ্রহে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন, গ্রন্থাগারের সৃষ্টি ও পুষ্টি সে সকলের অন্যতম। তিনি দেশের বিদেশী সরকার যখন দেশে শিক্ষা বিস্তারে উদাসীন—প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিতে অসম্মত তখনই গ্রন্থাগারের দ্বারা সে কাজ সিদ্ধির উপায় লক্ষ্য করিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন—

সম্মুখে নীলোর্মিমালা ভাঙ্গি পড়ে
বেলাবালু পরে,
সূচ্যাগ্র মেদিনী যেন কোনরূপে
জয় নাহি করে;
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, শত ক্ষুদ্র
খাতে প্রবাহিয়া
শান্ত নীল সিন্ধুবারি
চারিদিকে পড়ে ছড়াইয়া।

ইহাও প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রবীন্দ্রপ্রতিভা সেই বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে। সেজন্য তাঁহার দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথ ও ধ্রুবপদ সঙ্গীত

॥ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ॥

কৈশোর বয়স হ'তেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। এ সুযোগ ঘটে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ ও আজীবন সহকর্মী স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায়। জোড়াসাঁকোর মহর্ষি-ভবনে এবং বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীর গৃহে নানা সঙ্গীত অনুষ্ঠানে ও সভা-সমিতিতে কবিগুরুর উপদেশ ও আশীর্বাদ লাভ করে নিজেকে ধন্য বোধ করেছি। কিন্তু আমার আবাল্য-আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল, শান্তিনিকেতনের প্রশান্ত সুন্দর পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ; এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ল ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে।

সেই সময় বর্ষার শেষে কবিগুরুর দর্শন-আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পত্রযোগে নিবেদন করি। তিনি সানন্দে আমাকে আহ্বান ক'রলেন এবং আরও জানালেন যে, সেখানকার সংগীত-ভবনে যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রয়োজনীয়। এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কিছু আলোচনাও ক'রতে চাইলেন। বন্ধুবর শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার ঐ সময়ে কবিগুরুর সাক্ষাৎ প্রেরণায় সংগীত-সাধনায় নিমগ্ন। দীনেন্দ্রনাথের দেহান্তের পর তিনিই রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি লিখনে নিযুক্ত হন। শৈলজারঞ্জন কবিগুরুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর সংগীতের সাধনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।
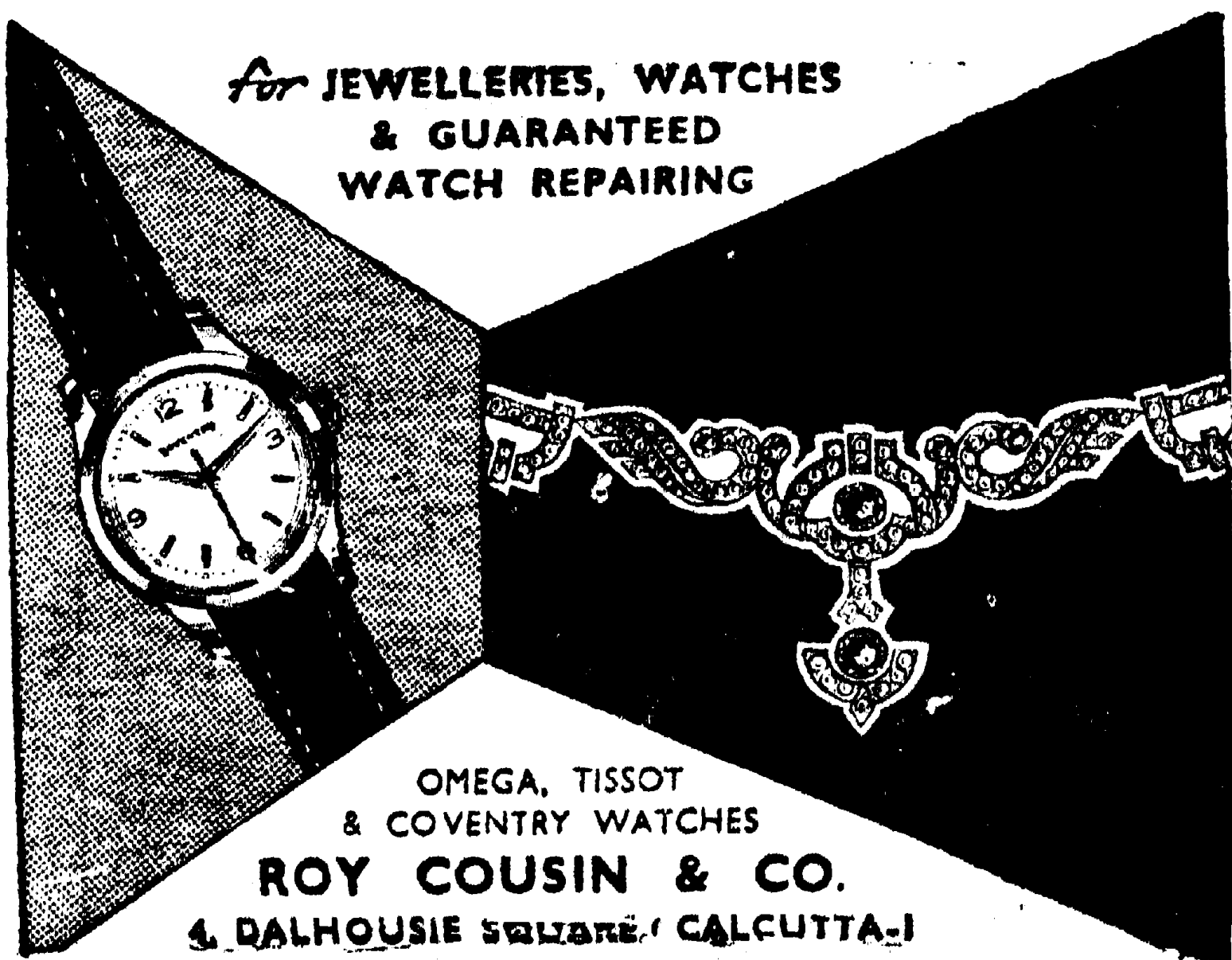
শৈলজারঞ্জন মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোণার মানুষ এবং বাল্যকাল থেকেই তিনি আমার পিতৃদেবের ঐকান্তিক স্নেহ পেয়ে এসেছেন। তিনি আমার ভ্রাতৃতুল্য, তাই আমি শান্তিনিকেতনে যাব শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপরেই আমার দেখাশুনার ভার দিলেন। ওখানে যাবার পর মহর্ষি-ভবনের একটি কক্ষে আমার কয়েকদিনের বাসস্থান নির্দিষ্ট হ'লো।

শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার পরদিন সকালে উত্তরায়ণের কাছে শ্যামলীতে কবিগুরুর দর্শন লাভ ও কথোপকথনের সুযোগ ঘটল। প্রথমেই তিনি আমাকে সুরশৃঙ্গার বাজাতে বললেন। বন্ধুবর শৈলজারঞ্জন সে সময় উপস্থিত ছিলেন। আমি তখন তানসেনের শেষ পুত্রের বংশধর স্বর্গীয় মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের হুবহু শিক্ষা অনুযায়ী ভৈরব রাগের একটি সংক্ষিপ্ত আলাপ বাজালাম—বিলম্বিত ও মধ্যলয়ে। কবিগুরু বললেন যে, ঠিক এই ধরণের সংগীত তাঁর জীবনের পূর্বার্ধ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কলাবন্তী সংগীতে এই পদ্ধতিই তাঁর বিশেষ প্রিয়। আধুনিক যুগের ওস্তাদেরা কি কণ্ঠে বা কি যন্ত্রে যে তানের ঘোড়-দৌড় শুরু করেন, তাতে সংগীতে রসবস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি শৈলজারঞ্জনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আজকালকার ছেলেরা ধ্রুপদ শিখতে চায় না কেন, তার কারণ ব'লতে পার?" আমি নিজেই বললাম, "সম্ভবতঃ আধুনিক গায়ক ও শ্রোতাগণ সংগীতের রস অপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনাই বেশী কাম্য বলে মনে করে থাকেন।" "কবিগুরু তখন বললেন যে, তাঁদের যুগে সংগীত-রসিকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল রস আস্বাদন এবং সংগীতের পরিবেশও ছিল শান্তিপূর্ণ। তাঁর কথা শুনে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ঠাকুর পরিবারের সঙ্গীতের ঐতিহ্য বিশ্ববিদিত। বিগত শতাব্দীতে সংগীতের শ্রেষ্ঠ গুণীগণ, যাঁরাই পশ্চিম থেকে কলকাতায় সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য এসেছেন, তাঁদের সবাই হয় পাথুরিয়াঘাটা

ঠাকুর-বাড়ীতে কিংবা জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি-ভবনের সঙ্গীত-সভায় স্থান পেয়েছেন। আমার বিশেষ একটি কৌতূহল আছে। আপনি নিশ্চয়ই ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাকারদের কণ্ঠ-সংগীত ও যন্ত্র-সঙ্গীত শুনেছেন—আপনার সবচেয়ে কার গান ভাল লেগেছে।" রবীন্দ্রনাথ বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "আমি পশ্চিমের বহু কলাকারের গান শুনেছি, অতি সুকণ্ঠ ও প্রবীণ ওস্তাদের গানও শুনেছি, কিন্তু কণ্ঠ-সঙ্গীতে যদু ভট্টের তুল্য গায়কের গান কোথাও শুনিনি। তাঁর কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত-সৃষ্টি এই দুটিতেই ছিল অসাধারণ প্রতিভার ছাপ। কলাবন্তী সঙ্গীত যে গভীর রসের উৎস, তা যদুর গান শুনলেই বোঝা যেতো।"

এর পরে আমার ও আমার সতীর্থ সঙ্গীত ক্ষিতীশচন্দ্রের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আবদার এড়াতে না পেরে কবিগুরু যদু ভট্টের নিকট তাঁর বাল্যকালে শেখা তানসেনের রচিত দরবারি কানাড়ার একটি ধ্রুপদ গেয়ে শোনালেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্রুপদ গান শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে তাঁকে আমি সম্বোধন করে বললাম, "মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব ও রাধিকা গোঁসাই ভিন্ন এরূপ বন্দেজী ধ্রুপদ আর কারুর গলায় আমি শুনিনি। মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব এই ধ্রুপদকে শুদ্ধ বাণীর ধ্রুপদ বলতেন। আপনি যে কত বড় কলাবন্ত তা এদেশের লোকে জানে না—এইটেই আমার মনে সব থেকে বেশী ব্যথা দিল।"

কবিগুরু হেসে উত্তর দিলেন, "তোমরা ভুল করো না। আমি ওস্তাদ নই, আমি কবি; শব্দের ও সুরে দুদিকেই কবি।"

সেদিন ঐখানেই আমাদের সভা শেষ হ'লো। তার পরে অন্য দু-একদিন সঙ্গীত ভবনের নানা প্রসঙ্গে তাঁর মনোগত অভিপ্রায় জানতে পাই। আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি ভারত সঙ্গীতের বরপুত্র ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আয়েৎ আলি খাঁ সাহেবকে বিশ্বভারতীর যন্ত্র-শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর সঙ্গে একান্ত আলোচনায় ধ্রুবপদ সঙ্গীতের প্রতি তাঁর সুগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হই। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, তাঁর "রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রসঙ্গ" গ্রন্থে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তার পুনরুল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"বাংলাদেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত, তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানিনে, বুঝিনে। আমার আদি-যুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুব-পদ্ধতির রাগ-রাগিনীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাকবিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি এ কথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না।..

"বাংলা দেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্তু এই রূপকে সর্বদা প্রাণবান করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্তন ও বাউল গানের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে; প্রাণের দিকে ভিতরে ভিতরে রাগ-রাগিনীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি।......"
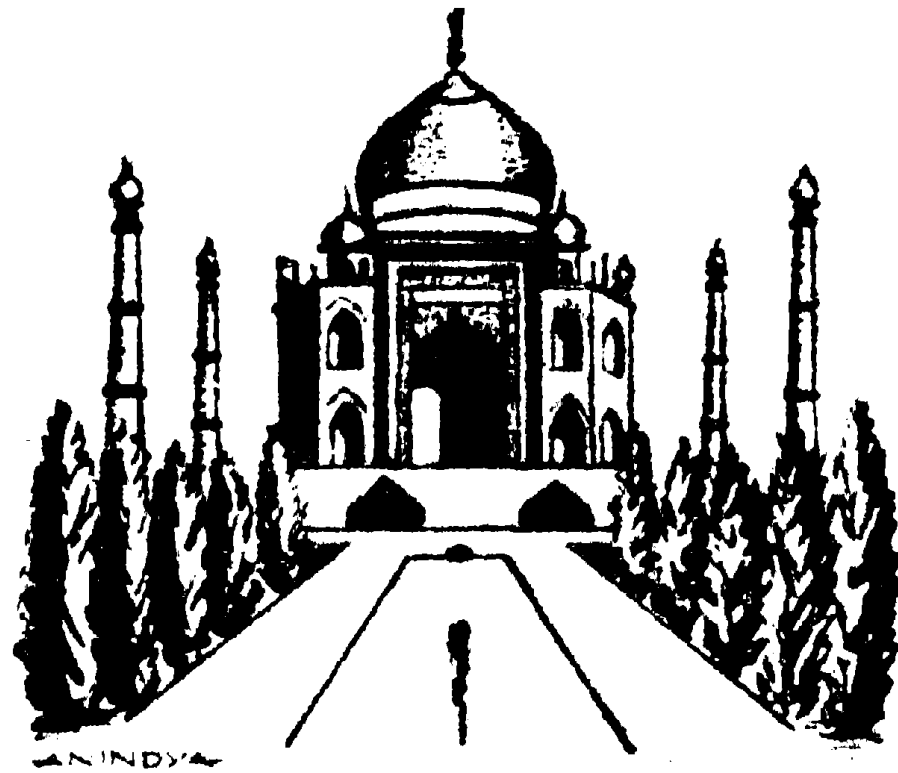
কবিতা
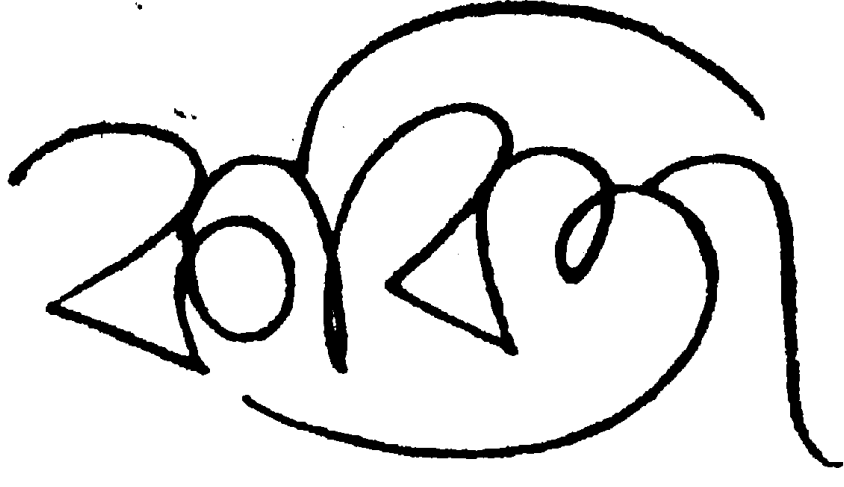
গাঁয়ের পথে

জসীমউদ্দীন

আবার যাইব তোমারে সঙ্গে করে,
ছায়ামায়া ঘেরা মমতা জড়ান মোদের গাঁয়ের ঘরে।
পদ্মার তীরে কাঁপে বেণুবন নতুন চরের বায়,
ফোটায় ফোটায় রোদের গুঁড়ো যে নাচিছে মাটির ছায়।

তার দক্ষিণে ছোট বাড়ীখানি আম্রবনের তলে,
কুটুমে পাখিরা আড়াআড়ি ডাকে কুটুম আসবে বলে।
সেথায় রয়েছে মাটির কলসী সুশীতল জল ভরে,
মেঝেয় বিছান ইন্দ্রপুরী যে নক্সী কাঁথার পরে।
ফুলঝুরি আর কদম্বকেলি সাগরের ফেনা আর,
রঙিন শিকায় শূন্যেরে যেন দোলায় খুশীতে কার।
উঠানের পাশে ডালিম গাছটি হেলিয়া ফুলের ভরে,
এ বাড়ীর বউ হেসে কুটি কুটি গড়ায়ে মাটির পরে।

সেথায় ক্ষণেক বিশ্রাম লভি, এসে নদীটির তীরে,
সাবধানে পায়ে বাঁশের সাঁকোটি পার হয়ে যাব ধীরে।

সাদা বালুচের এঁটেল মাটির সরু আবরণে ঢাকা
তাহার উপর নানা রকমের পাখিদের পা'ও আঁকা
বরষার ঢেউ খেলিতে চলিতে তাহার বুকের পরে
কত রকমের আলপনারেখা এঁকে গেছে থরে থরে
কোথাও ফাটলে ফাটিয়া যে মাটি কোঁকড়ায়ে নানা ছাঁদে
কত রকমের পুতুল হইয়া গড়াইছে মন সাধে।
এখানে ওখানে পাখির পালক রঙিন ঝিনুক আর,
সারা চর ভরি চিত্র এঁকেছে কে বা যেন 'ছবিকর'।
সেইখান দিয়ে চলিতে চরণ কাঁপে যে মাটির গায়,
পাছে বা তাহার আঘাতে কোন বা নক্সা ভাঙিয়া যায়।

একটু উপরে দুলিতেছে চর রাইশরিষার ভারে,
বাতাস আসিয়া ফুলের অঙ্গে বিলি দেয় বারে বারে।
মাঝে মাঝে ফুটে মোটরের ফুল রঙিন বধূর মত,
সোহাগে সোহাগে নাকের নোলক নাড়িতেছে অবিরত।
সেইখানে বসি আমরা দুজন বাঁশীতে ভরিয়া সুর,
হলুদ পরীর দেশেতে পাঠাব লেখন যে সুমধুর।

✲

টিকটিকি

বনফুল

একখানি পাকাঘরে পেয়েছি আশ্রয়,
পোকা খাই সুখে থাকি নাই কোন ভয়।
দামী আসবাব পরে স্বচ্ছন্দে চড়ি
আলমারি, হোয়াটনট্, দামী বড় ঘড়ি
সবই মোর পদ-রেণুপূতঃ বড় বড় ছবি
সুভাষ, সুরেন, চিত্ত, রামানন্দ, রবি
রাজা, রাণী, সেনাপতি সকলের শিরে
চড়িয়া লাঙ্গুল নাড়ি : শিবমূর্তিটিরে
করিয়াছি কেলি-ক্ষেত্র, প্রেয়সীর সনে
প্রায়ই করি ছুটোছুটি শিব-দেহাঙ্গনে।
স্বজাতির মধ্যে বেশ হয়েছে সুনাম
কেহ বা সেলাম করে, কেহ বা প্রণাম।
বাড়ির গৃহিণী কিন্তু লোক ভারি কড়া
ব্যাঘ্রমুখী কোন্দলিনী কণ্ঠস্বর চড়া।
অকারণে সকলেরে করে টিক টিক
আমি কিন্তু সায় দিয়া বলি ঠিক ঠিক।
গৃহিণীও তুড়ি দিয়া উদ্ভাসিত মুখে
চাহেন আমার পানে প্রসন্ন কৌতুকে।

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধকুমার সান্যাল
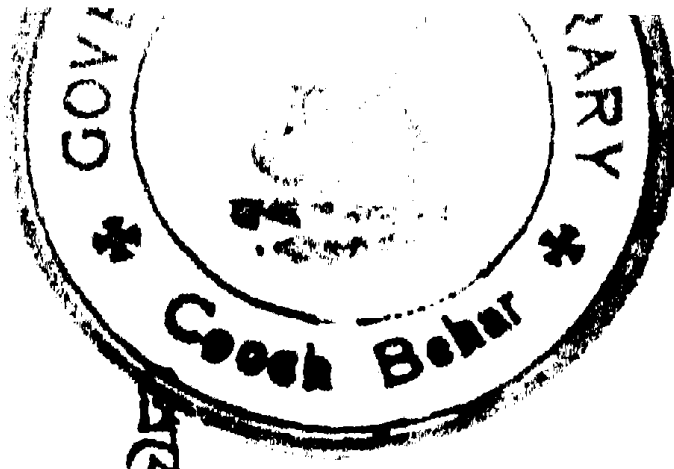
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুই

আমি রক্ষণশীল সমাজে মানুষ হয়েছিলুম। সেই কারণে কেমন একটা নৈতিক সংকোচ আমাকে ঘিরে থাকতো। আমি বাস করে এসেছি একটা মানসিক অবরোধের মধ্যে, সমস্ত চলাফেরার মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন নিষেধ অনুভব করতুম। বিলেত যাবার আগে আমার বড়দিদি যখন আমাকে ডেকে বললেন, সেখানকার সমাজে মেয়েদের সঙ্গে প্রতিদিন সকল কাজকর্মের মধ্যেই মিলতে হয় এবং তোমার আচার-আচরণ যেন সতর্ক থাকে, পার্থ।

বড়দিদির এই অর্থপূর্ণ উপদেশটি আমি মনে মনে অনুধাবন করেছিলুম। ফলে দাঁড়াল এই—লেখাপড়ার বাইরে বৃহত্তর জীবনের চেহারাটা দেখতে পেলুম না এবং যখন কোনও মহিলার সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেতুম—তখনই বড়দিদির উপদেশটি ভূতের মতো আমাকে পেয়ে বসত। আমার সঙ্কোচ কুণ্ঠার চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশপথ না পেয়ে প্রথমত সেখানকার ছাত্রীসমাজের চোখে সমালোচনা ও তামাসার বস্তু হয়ে দাঁড়ালুম, দ্বিতীয়ত সেখানকার প্রবাসী ভারতীয় সমাজের কাছেও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারলুম না। তাদের দলের উইক-এন্ড আউটিং বা পিকনিকের সঙ্গে তাল রেখে চলাও যেমন আমার পক্ষে কঠিন হল, তেমনি হাইড পার্কের ঝোপঝাড়ের আশেপাশে অন্তরঙ্গ মেলামেশার ব্যাপারেও আমি কতকটা অপটু হয়ে রইলুম। এর মধ্যে আরেকটি মনোভাব মানসিক একটা জিদের মতো আমাকে পেয়ে বসে ছিল। ওদেশের বহু মেয়ের মধ্যে কেমন একটা চেষ্টাকৃত কৃত্রিম আমোদ উপভোগের চেহারা দেখতুম, —অনেকটা যেন নিজেদেরকে চাবকিয়ে হুজুগে মাতিয়ে তোলার মতো,—যাকে বলে ফুঁ দিয়ে আগুন জাগিয়ে রাখা,—যেটির মধ্যে দৈন্যের চেহারা লক্ষ্য করতুম। কিন্তু আসল কথাটা থাকত আমার মনের তলায় তলিয়ে। ওদেশের বহু মেয়ের মধ্যে আমি হেনাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা পেতুম এবং এক এক সময় বিমর্ষ হয়ে নিজের বিফলতা নিয়ে তোলাপাড়া করতে করতে ভাবতুম, নতুন ধরণের মেয়ে এবার ভারতবর্ষেই জন্মান সম্ভব—নতুন তেজ এবং নতুন রক্তের মৌলিক চেহারা এবার বোধ করি আমাদের দেশের মেয়েরাই পাবে! এটি আমার অলীক কল্পনা কি না সেটি কারও সঙ্গেই আলোচনা করে দেখিনি বটে, কিন্তু আমার সমগ্র মন পড়ে থাকত হেনার কাছাকাছি,—বিগত নয় দশ বৎসরকাল যাবৎ যাকে আমি অগণিত সহস্রবার বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এ মেয়ের জুড়ি সচরাচর জীবনে মেলে না। আমাদের কালের আগে ও পরে কলকাতার ছাত্র সমাজের দুর্ভাগ্য যে, তারা হেনার মতো মেয়েকে নিজেদের ভিতর থেকে আবিষ্কার করতে পারল না। অনেক নির্বোধ এবং ক্ষীণপ্রাণ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতা আছে বৈ কি। কিন্তু এমন ভয়হীনা, তেজস্বতী এবং মধুরভাষিণী প্রতিভা আমাদের পরবর্তীকালে দু'একটি পাওয়া গেলে ভাল হত। সে যাই হোক, হেনাকে ছেড়ে বিদেশে গিয়ে তিন বছর কাটাবার কালে একবারও আমার মনে হয়নি যে, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি; এবং আজ ফিরে এসে যখন শুনলুম, বৈদ্যনাথের মন্দিরের এক নিরিবিলি কোণে দাঁড়িয়ে ছমছমে এক সন্ধ্যায় লোকচক্ষুর অগোচরে নরেন্দু হেনার সিঁথীমূলে সিঁদুর তুলে দিয়েছে, তখন একবারও আমার মনে হয়নি যে, সামাজিক জীবনে এতকাল পরে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল! একটি কথা অতিশয় স্পষ্ট থাকা দরকার এই যে, নরেন্দু এবং আমার মধ্যে কোন চটুল প্রণয় ব্যাপারের প্রতিযোগিতা ছিল না। একথা কোনও দিন মনে হয়নি, আমাদের মধ্যে কেউ একজন অপরের জন্য বঞ্চিত হচ্ছে। সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা এই, হেনার সর্বপ্রকা[র] আচরণের মধ্যে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্বে[র] ভাব ছিল না। তার চোখ ছিল বন্ধুত্বে[র] দিকে, পুরুষের দিকে নয়। সে এক এ[ক] সময়ে আমাদের দু'জনকে উদ্দীপি[ত] করেছে, রামধনুর রংয়ে আমাদের[কে] বর্ণাঢ্য করে তুলেছে, কিন্তু আমাদে[র] রক্তের মধ্যে যৌবনকালের সেই আ[দিম] বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। আজ য[খন] ফিরে এসে হেনার মুখ থে[কে] এবম্প্রকার বৈপ্লবিক স্বীকারোক্তির ক[থা] শুনলুম, তখন একটি বারও আ[মি] ভাবতে পারলুম না যে, আমাকে ম[ন] ফিরিয়ে এবার ওদের দুজনের মাঝখ[ান] থেকে সরে যেতে হবে। শুধু তাই ন[য়], হেনার কথাবার্তা এবং আচরণের ম[ধ্যে] এমন সঙ্কেত বিন্দুমাত্রও পাওয়া গে[ল]

না যাতে সন্দেহ হতে পারে যে, তার জীবনে এবার কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনা এসেছে। আশ্চর্য, যে বয়সটিতে সাধারণত মেয়েরা যৌবনের সম্রাজ্ঞী বেশ ধারণ করে, সেই আঠারো থেকে ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে হেনার মধ্যে কোনও নূতনতর ভাবান্তর ঘটল না। না এল তার প্রকৃতিতে গাম্ভীর্য, না তার বাক-সংযম, না লাজনম্রতা, না বা ঘরমুখী মনের সংসার-রচনার কল্পনা। এই অনন্যাকে বাদ দিয়ে যখন ভিন্ন কোনও নারীকেই আমার আনন্দ-কল্পনার প্রতীক স্বরূপে ভাবতেই পারিনে তখন একদা আমার ছোট বোনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হল।

সুরমা একদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে প্রথমেই আমাকে বলে বসল, ছোড়দা, তোমার আগাগোড়া ব্যাপারটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ বাড়িতে শান্তি নেই, তা জান?

এইমাত্র জানলুম।—বলে নিজেই আমি হাসলুম।

তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছ সত্যিই বিয়ে করবে না?

সর্বনাশ,—আমি জবাব দিলুম, স্বপ্নেও এমন প্রতিজ্ঞা আমি করিনি সুরমা! আমার বাবা-ঠাকুরদাদা সবাই বিয়ে করেছিলেন। তার প্রমাণ আছে!

সুরমা বলল, তবে? লাবণ্যর বাবার অমন অনুরোধ, ভদ্রলোকের অত চেষ্টা-চরিত্র,—তুমি নাকচ করে দিলে কেন? লাবণ্যও ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে এবার বি-এ পাস করেছে! আর চেহারার কথা? পাঁচজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করো দেখি, তোমার হেনাদির চেয়ে লাবণ্য কি কোনও অংশে কম? তা ছাড়া—

হাসি মুখে বললুম, তোর ওই 'তা-ছাড়া'টাই বোধ হয় আসল কথা! ব্যাপার কি বল দেখি?

ঈষৎ অস্থির হয়ে সুরমা বলল, কেনই বা বলব না, ভয় কিসের? পাঁচ-জনে পাঁচ কথা বলছে, আমাদের কানেই বা আসবে না কেন?

বললুম, তোদের কান যে চিরকালই বড়, তাই সব কথা ঢোকে! যাই হোক, কথাটা কি?

সুরমা বলল, নরেন্দুদা যে হেনাদিকে বিয়ে করেছে এখবর কি তোমার কানে এখনও ওঠেনি?

এবার খুব হাসলুম,—একজন আরেকজনকে বিয়ে করেছে, আমি তার কি করব?

সুরমার গলার আওয়াজটি ঈষৎ উগ্র হয়ে উঠল, তাহলে ওরা এতদিন কারচুপি করল কেন? তুমি কি বলতে চাও, ওরা দুজন তোমাকে ঠকায়নি?

বললুম, তোর সব কথা আমার কাছে নতুন, সুরমা। শুধু বলে রাখি, কেউ আমাকে ঠকায়নি। আমি কোনও আশা করিনি যে, ঠকব। হেনার সঙ্গে নরেন্দুর যদি বিয়ে হয়, সেটা ত' আমার পক্ষে দুঃখের কারণ নয়?

তাহলে তুমিই বা বসে আছ কেন? ভূ-ভারতে আরও অনেক মেয়ে আছে, ছোড়দা! বেশ ত, তুমি নিজেই পছন্দ করার ভার নাও, কেউ তোমার ঘাড়ে চাপাতে আসছে না!

খুশী হয়ে বললুম, বেশ, তাহলে এই কথাই পাকা হয়ে রইল। নিজের পছন্দের ভার নিজের ওপরেই নিলুম আজ থেকে।

সুরমা কি ভাবল জানিনে, কিন্তু কতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সুরমার দোষ নেই। এ বাড়িতে আমি একটা অস্পষ্ট জীব মাত্র। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অপর পাঁচজনের মতো আমারও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। অল্পকাল মাত্র বিদেশ থেকে ফিরেছি। কর্মজীবনের নানা হাতছানি আছে নানাদিক থেকে। চেনাপথে পা বাড়াবার জন্য পিছন থেকে ঠেলছে সবাই। কিন্তু যে মনটাকে নানাদিকে ছড়িয়ে এসেছি এতকাল, তাকে গুটিয়ে আনতে সময় লাগবে বৈ কি। বোধ হয় সংরক্ষণশীল মন বলেই সিদ্ধান্তটা নিতে কিছু সময় লাগবে।

আমি নরেন্দুর কাছে যাচ্ছিলুম। কিন্তু যে-নরেন্দুকে রেখে একদা বিলেত গিয়েছিলুম, ফিরে এসে ইতোমধ্যেই দেখেছি সে-নরেন্দু নেই। এখন সে ব্যস্ত কাজের লোক, চারদিকে তার সময় বাঁধা। তার চেহারা যে এমনটা দাঁড়াবে, এটা অনেকটা অনুমান করা ছিল। হেনা তাকে বলত, রাগ করনা নরেন্দু, তুমি একটু আত্মকেন্দ্রিক। তোমার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে পুরনোকালের ভূত, যেটার নাম ঐতিহ্য। তুমি তারই দাসানুদাস।

নরেন্দু জবাব দিত, বেশ, মানলুম! আত্মকেন্দ্রিক কেমন ক'রে বুঝলে?

নয়ত কি?—হেনা জবাব দিত, তুমি সর্বহারা হতে ভয় পাওনা, কিন্তু আত্মহারা হতে তোমার বাধে। তুমি রাত ন'টার পর হাতঘড়ি দেখতে থাক কেন, বলতে পার?

পাছে তোমার নামে দুর্নাম রটে তাই পালাতে চাই।

রাগ করে হেনা বলত, এটা তোমার আত্মপ্রতারণা নরেন্দু, তুমি নিজেই নিজকে বাঁচিয়ে চলতে চাও। তুমি ওজন রেখে হাঁটতে চাইছ, কথার মাত্রা গুণছ মজলিশে ব'সে। দিন দিন বড্ড সাবধানী হচ্ছ, নরেন্দু।

নরেন্দু একটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিত, বেপরোয়া হওয়াটাই যৌবনকালের একমাত্র পরিচয় নয়!

হেনা ওকে ছেড়ে দিত না। বলত, নরেন্দু, হাঁটতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে কাঁটা ফুটুক এটা কেউ চায় না। কিন্তু হাঁটবার আগে কাঁটা খুঁজে বেড়াব—এটা বিসদৃশ!

তর্কের মীমাংসা হতনা। কিন্তু এটা জানা যেত, মাঝে মাঝে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে বদরঙ জমে উঠত। একজন আরেকজনকে পরাজিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেত।

আমাদের ছাত্রাবস্থার কালে এক এক সময় নরেন্দু বোধ করি গম্ভীর পরিহাসের সঙ্গেই বলত, রায়চৌধুরী বংশের সর্বশেষ জামাই কে হবে জান, পার্থ?

আমার প্রশ্ন শোনবার আগেই নরেন্দু বলত, সে তুমি!

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! আশীর্বাদ করো আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।

নরেন্দু বলত, তামাসা রাখ পার্থ। এটি আমি অনুভব করেছি!

প্রশ্ন করলুম, বটে, কি কি উপসর্গ দেখে এবম্বিধ অনুভূতি হল?

তোমার সম্বন্ধে হেনার পক্ষপাতিত্ব গোপন নেই, পার্থ।

তাহলে আরেকটু বিশদভাবেই বল, শুনে পুলকিত হই!

রাঁচি শহরের অন্তর্গত হিনুর একটি বাগানবাড়ির বারান্দায় বসে আমাদের আলোচনা চলত। এ বাড়িটি হেনাদের এবং যখনকার কথা বলছি, তখন হেনার বাবা ব্রজবল্লভবাবু বেঁচে। হেনা তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছিল। আমি যখন ব্রজবল্লভবাবু ও রাঙামার ঘর-গৃহস্থালীর সর্বপ্রকার বিলি-ব্যবস্থার সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেলুম, তখন কলকাতায় চিঠি লিখে নরেন্দুকে আনিয়ে নিলুম। সে এসে উঠল রাঁচির এক হোটেলে। ব্রজবল্লভবাবুর পক্ষে মুশকিল হল এই, তিনি তাঁর টাকাকড়ি আদায়তশিলের ব্যাপার, বিদেশ বিভূঁয়ে বসবাসের ব্যবস্থাদি, সরকারি-বেসরকারি নানা কাজে ছুটোছুটি, বাজার-হাটের বিবিধপ্রকার ফাইফরমাস,—এসব কাজ অন্য কারোকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না, এবং রাঙামা যখন তাঁকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতেন, পরের ছেলের ওপর এত কাজের চাপ দেওয়াটা দৃষ্টিকটু, তখনই জ্যাঠামশায় কেবল সজাগ হয়ে বলতেন, তুমি ঠিকই বলেছ মেজবৌ, কাল থেকে আমি নিজেই সব করব।

সেই আগামী কাল জ্যাঠামশায়ের জীবনে আর আসেনি।

সে যাই হোক, নরেন্দুর ওইপ্রকার ক্ষুব্ধ পরিহাসের ফলে আমি নিজের একটা নতুন চেহারা আবিষ্কারের চেষ্টা পেতুম। রায়চৌধুরীদের বাড়িতে আবাল্য অচ্ছেদ্যভাবে আমি সম্পর্কিত। ব্রজবল্লভ-বাবুকে জ্যেঠামশায় ছাড়া আর কিছু কোনদিন মনে হয়নি। শিশুকাল থেকে বিমাতার কাছে হেনা কেমন করে সযত্নে মানুষ হল, আগাগোড়া সেটি আমি দেখেছি। রাঙামাকে আমিও মা বলেই এতকাল জেনে এসেছি, কেননা আমার

যাকে আমার মনেও পড়ে না। সুতরাং নবেন্দুর কথার উত্তরে আমি যে ঠিক কি বলব তা ভেবে পেতুম না।

নবেন্দু বলল, তখন দেখলে না গোলাপ ফুল দুটি হাতে করে এনে হেনা তোমাকে একটি দিয়ে অন্যটি নিয়ে হাসিমুখে ভিতরে গেল! আমাকে ওটি দিয়ে গেলেই ত পারত!

ওটা আমাকে দেওয়া নয়, নবেন্দু। তোমাকে দিতে পারল না বলেই অপাত্রে ফেলে দিয়ে গেল!

এটা তুমি আমার লেগ্-পুলিং করছ, পার্থ।

কিন্তু নবেন্দুর আন্দাজটি যে সত্য নয়, ওই হিনুতে থাকতে থাকতেই সেটি বুঝতে পারা গেল। আমরা তিনজনেই তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি। কিন্তু যাকে ফ্রকপরা অবস্থায় বেড়িয়ে এনেছি, ঘাগরাপরা অবস্থায় সার্কাস দেখতে নিয়ে গেছি, শাড়িপরা চেহারায় এক-আধবার সিনেমাতেও নিয়ে ঢুকেছি, আজ তার যৌবন-নিকুঞ্জের পাখির কুজন-গুঞ্জন বুঝতে পারব না,—এ কি সম্ভব! তা ছাড়া নবেন্দুর চেহারাটি অতীব সুশ্রী এবং তার বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের এমন একটি গৌরব চোখে পড়ে, যেটির থেকে সহসা চোখ ফেরানো কঠিন। আমি হলুম জানা মানুষ, অতি পরিচিত ব'লেই আমার অভিনবত্ব কম, আমার মধ্যে সেই অনাবিষ্কৃত পরম বিস্ময় নেই, আমাকে দেখলে আর অধীর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয় না। সেই কারণে ওই হিনুর মাঠে-মাঠে এবং হেমন্তের শিশিরবিন্দুর লক্ষ লক্ষ সূর্যের প্রভায় নবেন্দুর সম্বন্ধে দুর্বার ঔৎসুক্য শ্রীমতী হেনার দুই সুন্দর চোখে দুইটি প্রদীপ্ত ক্ষুধার মতো ঝলমল ক'রে উঠেছিল।

কিন্তু আমি যখন রোগের নানাবিধ উপসর্গ বিচার করে উভয়কে মনে মনে অভিনন্দিত করছি এবং সেই সঙ্গে জেঠামশায়ের নানা কাজে লিপ্ত আছি, সেই সময় একদিন নবেন্দু হঠাৎ এসে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলল, আমাকে ক্ষমা কর, পার্থ, তোমাকে মাঝে মাঝে বড় রূঢ় পরিহাস করেছি। আমার চেয়ে সুখী আজ আর কেউ নেই! জীবন আমার সার্থক।

কি রকম? একটু ভেঙে বল, নবেন্দু।

হাসিমুখে নবেন্দু বলল, দুজনে গিয়েছিলুম পাগলা-গারদের ওদিকে বেড়াতে, সেখানকার নিরিবিলি মাঠে আমার হীরের আংটিটি হেনার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছি!

খুশী হয়ে বললুম, তাহলে জেঠামশাইকে কথাটা বলি? উনি ভারি খুশী হবেন। বাল্যবিবাহ এদেশে এখনও অচল হয়নি!

দাঁড়াও, এখন নয়। ঠিক সময় আমি বলব তোমাকে।

সেদিন নবেন্দু আর দাঁড়াল না। আনন্দে আর উল্লাসে সেদিন সে একটু চঞ্চল ছিল। পরবর্তী পাঁচ সাতদিন সে এখানে ওখানে যেন লাট্টুর মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং সেই অবসরে আমি কেমন করে যেন পর্যবেক্ষণ করে নিলুম, আমার অনুমান সম্ভবত সত্য নয়,—হেনার বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর ঘটেনি। অতঃপর নবেন্দু যখন কলকাতায় ফিরে গেল, তখন আমি ভাবলুম, তরুণী বান্ধবীর আঙুলে হীরের আংটিটি পরাবার আগে নবেন্দু আরেকটু বাজিয়ে নিলেই ভাল করত।

এইসব পুরনো কাহিনী আজ নবেন্দুর কাছে ফেঁদে বসেছিলুম।—

আজ নবেন্দু ভিন্ন ব্যক্তি। বৈষয়িক জীবনে তার মাথা এখন অনেক উন্নত। একটি বড় কোম্পানীর সে অধিনায়ক। পিতার মৃত্যুর পর সে বসেছে অনেক উঁচু গদিতে। তার মনোযোগ এখন নানা লক্ষ্যে ধাবমান।

নবেন্দু তার শোবার ঘরে আমাকে বসিয়েছিল। সচরাচর যেমন হয়। অল্প-বয়সের বন্ধু পরবর্তীকালে আপন কৃতিত্ব এবং ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য একটু ব্যস্তই হয়ে ওঠে। নবেন্দু তার পাঠ্যা-বস্থায় কখনও ধূমপান করেনি। কিন্তু সে মস্ত এক রূপোর ডিবে আমার সামনে ধরে বলল, এর থেকে সিগারেট নাও। বোতামটা টেপো, ডালাটা খুলে যাবে।

কিন্তু সিগারেট আমি আজও ধরিনি, একথা শুনে সে দুঃখিত হল।

অতঃপর যাতে আমরা গুছিয়ে ব'সে গল্প করতে পারি সেজন্য সে তার সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষের দেওয়ালে একটি বোতামে টিপ দিল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে-ব্যক্তি এসে হাজির হল সে একটি বিদেশিনী মেয়ে,—তবে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানও হতে পারে। আমার মনের উপর হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল। কিন্তু আমার এই মনোবিকলন যে অসংগত এবং আমি যে সংকীর্ণচিত্ত—এতে ভুল নেই। সম্ভবত আমার রক্ষণ-শীল মনোবৃত্তির সঙ্গে এই পরিস্থিতির একটি সংঘর্ষ বেধে উঠল।

নবেন্দু হাসিমুখে বলল, আমার এপার্টমেণ্ট সম্পূর্ণ আলাদা, বুঝেছ? এঁকে দেখে বুঝতেই পাচ্ছ, আমার পার্সনাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট। এঁর নাম এ্যানি, ভারি ভাল মেয়ে। নাও, আলাপ করো।

মেয়েটির বয়স বছর কুড়ি বাইশ। তাদের বাড়ি লণ্ডনের উত্তর সীমানা থেকে ত্রিরিশ মাইল দূরে। তাদের কাউণ্টিতে প্রায় পঞ্চাশ জন ভারতীয় থাকেন। এ্যানির বাবা কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকাকালীন নবেন্দুর সঙ্গে ওঁদের আলাপ হয়। মিঃ ব্রুকিজন মেয়েটিকে নবেন্দুর হেপাজতে রেখে দেশে ফিরে গেছেন। সম্ভবত মাস ছয়েক বাদে আবার ফিরবেন। এ্যানি ওদেশের স্কুল অফ ইকনমিকসের পাসকরা মেয়ে। এ্যানি রাত্রের দিকে রাসেল ষ্ট্রীটের কোন বাড়ির ফ্ল্যাটে চ'লে যায়। নবেন্দু তার অষ্টিন গাড়িখানা ওরই জন্য রেখেছে।

বোধ হয় আমাকে একটু বিশেষ অভ্যর্থনা করার দরকার ছিল। সেই কারণে এ্যানি এগিয়ে গিয়ে একটি মেহগনির দেরাজ খুলল, এবং তার প্রতি শেলফের উপর স্তরে স্তরে সাজানো অগণিত সোনালি ও রূপোলি কাগজের লেবেল-আঁটা বোতলের থেকে একটি বার ক'রে আনল। তার পর একটি র‍্যাকের উপর থেকে যখন একটি ফিনফিনে কাঁচের গেলাস এনে সামনে রাখল, তখন ওই আলমারির দিকে আমার উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ দেখে সহাস্যে নবেন্দু বলল, দেখছ কি, ওটার মধ্যে কমবেশি পনেরো হাজার টাকার লিকার আছে, বুঝেছ? তবে ওর চাবি থাকে এ্যানির কাছে।

কেন?

মেয়ে ত! ওর ভয়, পাছে ওই 'সেলারটা' আমাকে পেয়ে বসে।—

—নবেন্দু বলল, অবাক হচ্ছ কি, এটাই কলকাতার আভিজাত্য। আমার বাবা চিরকাল বাড়িতে 'সেলার' রাখতেন।

সুমিষ্টভাবে আলাপ ক'রে শ্রীমতী এ্যানি একটি গেলাসে সামান্য একটু লিকার ঢেলে আমার সামনে দিল। মনে করেছিলুম আমাকে পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওরা দুজনে বুঝি পানাদি আরম্ভ করবে, কিন্তু এসব আয়োজন যে আমারই জন্যে এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। এবার শশব্যস্তে বলতেই হল, না না, আমি এসব এখনও ধরিনি, ভাই! এ্যানি, যদি কিছু মনে না করো, ওটা নবেন্দুকে দাও। তবে আমাকে কিছু একটা নরম পানীয় দিতে পার।

ওয়র্থলেস! তুমি না ইউরোপ ঘুরেছ? —নাম ডোবালে! —নবেন্দু আমাকে ধমক দিয়ে বলল, আমি বলছি পার্থ, ওটা আধ আউন্সের বেশি নয়! বিদেশিনীর সামনে 'ডোন্ট-বি-সিলি!'

হাস্যবিকশিত সুশ্রী মুখখানি নিয়ে এই স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি এবার অন্য দুটি গেলাসে তাদের পানীয় ঢালল। কিন্তু আমি যে কাজে এখানে এসেছি, পাছে নবেন্দুকে চটালে সেই কাজের ব্যাঘাত ঘটে,—সেইজন্য ওইটুকু গলাধঃকরণ করতে আমি রাজি হলুম। বলা বাহুল্য, ইউরোপে থাকার সময়টায় মাছ আর ডিম ছাড়া আর কিছু খাইনি। কিন্তু আজ হেনার ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করার জন্য নবেন্দুকে শান্ত রাখার দরকার ছিল। সেই কারণে আমার জামার ভিতর থেকে পৈতেটি বার করে গেলাসটির উপরে একবারটি গায়ত্রী মন্ত্র জপ ক'রে নিলুম। এ্যানি অবাক হয়ে চেয়ে রইল বটে, কিন্তু নবেন্দু আমার পাশে রেক্সিনের গদি আঁটা কাউচের উপর হেসে লুটিয়ে পড়ল। তা হোক। আমি যে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, এতে আমি আজও লজ্জাবোধ করিনে।

একজন উর্দিপরা বয় নিয়ে এল ফল, ভাজা বাদাম, কিসমিস এবং খানকয়েক কাটলেট। এ্যানির দিকে আমি একটি প্লেট বাড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে বললুম, একদিন তোমাকে শাড়ি পরিয়ে ছবি তুলব, কেমন?

মেয়েটি সহাস্যে আমাকে ধন্যবাদ জানাল।

কিছুক্ষণ পরে এ্যানি চলে যাবার পর নবেন্দু শান্তকণ্ঠে এবার বলল, আমায় কিছু মনে করিয়ে দিতে হবেনা, পার্থ—তুমি যা বলতে চাও আমি জানি। কিন্তু নিশ্চয়ই জেনে রেখ, হেনার অধিকার এ বাড়িতে একটুও কমেনি।

বললুম, তাহলে দুজনের মধ্যে বাধাটা কোথায়?

নবেন্দু বলল, বিয়েটাকে হেনা স্বীকার করতে চায় না। আমাকে স্বামী ব'লে মেনে নিতে সে একেবারেই রাজি নয়।

তাহলে বিয়েটা হল কেন? —প্রশ্ন করলুম?

ওটা নাকি একটা সাময়িক ভাবান্তর, —যাকে বলে ট্রান্স। হেনা বলে, আগা-গোড়া ব্যাপারটা নাকি একটা ভাববিহ্বল অবস্থায় ঘটে গেছে!

অনেকটা এইরূপ বিবরণই হেনার মুখে শুনেছিলুম। এবার একটু গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করলুম, ওই অবস্থার মধ্যে তোমাদের আর কি কি ঘটনা ঘটেছিল, নবেন্দু?

নবেন্দু এবার খুব হাসল। কিন্তু আমি তাকে হাসতে মানা করে দিয়ে বললুম, এসব ব্যাপার অত্যন্ত সিরিয়স, নবেন্দু। আমার কথার ঠিকমতো জবাব দাও। তোমাদের সংগোপন বিবাহে কে কে উপস্থিত ছিল? মনে রেখ, এর মধ্যে একটি মেয়ের কৌমার্যের প্রশ্ন বিজড়িত!

একটু থেমে নবেন্দু বলল, আমার বিশ্বাস আশেপাশে দু'একজন সেখানে উপস্থিত ছিল। তা ছাড়া আমার মামার বাড়ীর সংবাদে দেওঘরে দু'চারজন লোক কানাকানিও ক'রে থাকবে। —নবেন্দু বলল, ওই ট্রান্সের মধ্যেই বিয়েটা রেজেষ্টারী হয়!

গম্ভীর ভাবে আমি মাথা নেড়ে বললুম, সাংঘাতিক ব্যাপার, নবেন্দু। তোমাদের ওই সর্বনেশে ট্রান্সটি কবে কাটল?

নবেন্দু বলল, তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই, পার্থ। মন দিয়েই তাহলে তুমি শোনো। সেটা শ্রাবণ মাসের শেষ। ক্যাডরক টাউনের মাঠ-ময়দানে ঘন মেঘ নেমে এসেছিল প্রবল বর্ষা নিয়ে। সেটা ওই রেজেষ্টারীর দিনই রাত্রে। তারপর সমস্ত রাত মুষলধারে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি কখন থেমেছিল আমাদের মনে নেই। কিন্তু ক্যাডরক টাউনের সেই জন-শূন্য বাড়িটার মাথায় যখন পরদিন প্রভাতের আলো এসে পড়ল, তখন দোতলার একখানা ঘর থেকে ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে দেখি, বারান্দার ধারে ব'সে হেনা অঝোর ঝরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জুঁই ফুলের মালাটা সে ছিন্ন ভিন্ন করেছে ঘুঙুর জোড়াটা ছুঁড়ে ফেলেছে কোন্ দিকে, রেশমী শাড়ীখানা দাঁত দিয়ে ছিঁড়েছে, নখ দিয়ে আঁচড় টেনেছে মুখখানায়। বড় যত্নে আগের রাত্রে সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক একটি অংগবাস তুলে নেবার সময় চোখে দিয়ে-ছিল সুর্মা, চুলে আর কপালে দিয়েছিল

কেয়াফুলের কেশর, গলার নিচে বুলিয়ে দিলে চন্দনচূর্ণ। অবশ্য পিছনে দাঁড়িয়ে আমি তার সাজসজ্জা আর প্রসাধনে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলুম!

একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম, তাহলে কাঁদল কেন? সব মেয়েই কি পরদিন কাঁদতে বসে?

নবেন্দু জবাব দিল, কেমন করে জানব? সান্ত্বনা দিতে গেলুম, আমাকে কড়া-কথা শুনিয়ে বলল, এই তোমার বিয়ে? —কথাটা শুনে আমি যেন নির্বোধ বনে গেলুম। হেনা আর কোনও কথা বলল না। সোজা উঠে নিচে গিয়ে স্নানাদি সেরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেইদিনই সে কলকাতার গাড়ী ধরল।

প্রতিক্রিয়াটা কতদিন অবধি চলল?

গেলাসটিতে একবার চুমুক দিয়ে নবেন্দু বলল, শুনেছিলুম মাসখানেক ধরে সে কেঁদেছিল,—ওই সময়টায় আমার সঙ্গে আর দেখাও হয়নি।

বললুম, বাঃ এর মধ্যে তুমিই বা খোঁজখবর নাওনি কেন? সে ত তোমার রেজিস্টার্ড স্ত্রী, নবেন্দু!

একটি সিগারেট ধরিয়ে নবেন্দু বলল, ব্যাপারটা কি জান পার্থ, মেয়েদের একটা 'ইচ্ছুক' মন থাকে—সেটার খোঁজ পেতে গেলে একটু নিরীক্ষা-দৃষ্টি থাকা দরকার। সম্ভবত সে সময় ওটা আমার ছিল না। হেনার সঙ্গে কিছুকালের মতো সম্পর্ক ঘুচে গেল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি চুপ করে রইলুম। পরে বললুম, আমার মনে হয় তোমাদের এ বিয়ে সার্থক হয়েছে। রূপে গুণে বিদ্যায় তোমরা কেউ কারো চেয়ে কম নয়। সুতরাং আমি বলি, সব বিতর্ক মিটিয়ে তুমি তোমার স্ত্রীকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।

নবেন্দু বলল, হ্যাঁ, তাই আনব। শুধু একটু সময় নিচ্ছি। আমার বিশ্বাস হেনা তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তুমি এসেছ, এবার মিটমাট হবে। এ ঘর আমি সাজিয়েই বসে আছি পার্থ। মন্দির সাক্ষী ক'রে বিয়ে করেছি সেকথা না হয় ছেড়েই দাও, কিন্তু দলিল সই ক'রে এ বিয়ে হয়েছে,—এর এদিক ওদিক হবার উপায় নেই!

নিশ্চয়ই,—আমি বললুম, একশ'বার। একথা হেনাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিও। এ ত' আর এম, এস-সি ক্লাসের ল্যাবরেটরির গবেষণা ক্ষেত্র নয়, জীবন নিয়ে রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার খেলাও চলে না,—এটাও তাকে বুঝিয়ো। এবার আমাকে আরেকটি কথার জবাব দাও, নবেন্দু। শ্রীমতী এ্যানিকে এভাবে তুমি কাছাকাছি রেখেছ কেন?

নবেন্দু বলল, মেয়েটি আমার বিশেষ অনুগত। ওর ওই স্বাস্থ্যশ্রী, মধুর হাসি আর ভদ্র ব্যবহার সকল কাজে আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

কিন্তু হেনা এসে যদি এতে আপত্তি জানায়? মেয়েলি ঈর্ষা যদি তাকে পেয়ে বসে?

নবেন্দু এবার হেসে উঠল। বলল, বাঃ ঠিক ধরেছ তুমি। আরে ওই জন্যই ত আমি এ্যানির বাবাকে বলে ওকে কাজ দিয়ে রেখেছি। এ্যানিই আমার ব্রহ্মাস্ত্র, বুঝেছ পার্থ? হেনাকে এক এক সময় আমার বলতে ইচ্ছে করে, তুমি ত তুমি, টাকা ফেললে আজ যে কোনও দেশের মেয়েকে কেনা যায়!

এবারে বললুম, তাহলে সেবার সামান্য একটা আংটি দিয়ে তুমি হেনাকে কিনতে গেলে কেন?

ওকথা আজকে আর ওঠে না পার্থ। আংটিটা নাকি সে ফেলে দিয়েছে সেই ওদের বাড়ির ডোবায়। —নবেন্দু বলল, লোক-সমাজে অনেক সময় আমাকে বলতে হয়েছে হেনা আমার স্ত্রী, কিন্তু তার উত্তরে আমার কানে এসেছে হেনার মন্তব্য,—আমার মাথায় নাকি মহাভৃঙ্গরাজ তেল মাখা উচিত! এ অহঙ্কার সে পেল কোথায় বলতে পার? বাঙালী মেয়ে হয়ে স্বামীকে উড়িয়ে দিতে চায় সে কোন্ স্পর্ধায়?

বললুম, তোমার স্ত্রী ঠিক কি চায় বল দেখি?

এতদিনেও বুঝতে পারনি কি চায়? চায় স্বাধীনতা, দুরন্ত দুর্বার স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা! পৃথিবীর কোনও দেশে কোথাও এই স্বাধীনতা কি স্বীকৃত হয়েছে, পার্থ? স্বামীকে অস্বীকার ক'রে স্বাধীনতা, সে কি বস্তু! বিয়েটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয়, সে কেমন মেয়ে?

আমি জানিনে। —বললুম, শুধু এইটুকু জানি, আমাদের গায়ের রক্ত লাল, হেনার রক্ত নীল। সব দেশের নীল রক্তেই বোধ হয় নতুন কথা জন্মায়! সে যাই হোক, আমার একটা কথা রাখ, নবেন্দু। এ মেয়ে এগিয়ে আসবে না, এরই পেছনে তোমাকে ছুটতে হবে। তুমি গিয়ে হেনার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটমাট ক'রে নাও। এটা আর বেশি দূর গড়াতে দিয়ো না।

নবেন্দু বলল, তোমার সামনেই আমি মিটমাট করতে চাই পার্থ।

সে কি ভাল হবে? মধ্যবর্তী ব্যক্তি চিরকাল বিপজ্জনক। আজ আমরা ঠিক আগেকার সেই তিন সতীর্থ নই? তোমরা আজ স্বামী-স্ত্রী, ঘন দুধ আর হিমসাগর আম! আমি হলুম সেই আমের আঁটি—যথাসময়ে আমি উচ্ছিষ্টের দলে পড়ে যেতে চাই! —এই বলে সেদিনকার মতো আমি উঠে দাঁড়ালুম।

আমার কথাগুলো তামাসা মনে করে নবেন্দু এতক্ষণ হাসছিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এর মধ্যে কি হেনার সঙ্গে তোমার দেখা হবে?

প্রার্থনা করি যেন না হয়। তা ছাড়া আমাকে বোধহয় শীঘ্রই বোম্বাই যেতে হবে। কর্তাদের কাছ থেকে নোটিশ এসেছে।

নবেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, দৈবাৎ যদি হেনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে এ্যানির কথাটা ওর কানে তুলো না!!

আমি বললুম, সে কি, ওটা যে আমি সালঙ্কারে বলব বলেই মনে করেছি! না না, আমাকে মানা করো না নবেন্দু। প্রথমত এ একটা মুখরোচক কেচ্ছা; দ্বিতীয়ত মেয়েলি ঈর্ষার চেহারাটা আমার দেখার আনন্দ! তুমি এতে ভয় পাও কেন হে? স্ত্রীকে তুমি ত' ভালই চেন!

ভুল পার্থ, কোনও স্বামী তার স্ত্রীকে চেনে না! —নবেন্দু বলল, নির্বোধরাই ভাবে স্ত্রী তাদের মুঠোর মধ্যে,—সেই জন্যেই বোধহয় শাড়ি-গয়না দিয়ে মনে করে বাজিমাৎ। মেয়ে-মজলিশে ঢুকে চুপি চুপি খোঁজ নিয়ে দেখো, স্বামীদেরকে তারা ঠিক কোন্ চক্ষে দেখে! জীবনে এক পয়সাও যারা রোজগার করে না তারা কী সাংঘাতিক চাতুরীর দ্বারা স্বামীদেরকে বাজার-সরকার বানিয়ে গড়ুর-পক্ষী করে রাখে, —দেখেছ কি? কোনও স্বামী তার স্ত্রীর প্রকৃত স্বরূপ চেনে না! অথচ প্রত্যেক দেশের মেয়েই জানে, স্বামী তার কী পদার্থ! শুধু ঘরে ঘরে দাঙ্গার ভয়ে মেয়েরা মুখ খোলে না।

তুমিও কি এই ধরণের স্বামী হয়ে থাকতে চেয়েছিলে?

নবেন্দু বলল, হেনা বোধ হয় আমার মধ্যে সেই ধরণের স্বামীকেই চায়। সে আমাকে চালাতে চায় তারই ছাঁচে। কিন্তু তার খেয়ালের খেলনা আমি নই, পার্থ।

হাতঘড়িতে সময় দেখে বললুম, আচ্ছা, আজকের মতন এসব কথা থাক। মোটকথা যত শীঘ্র পার একটা মিটমাট করে নাও। একটা খবর আমাকে দিও, কবে তুমি হেনার ওখানে যেতে চাও।

নবেন্দু আমাকে গাড়ি দিয়ে সেদিন পৌঁছিয়ে দিল।

দিন চার-পাঁচ পরে আপিস থেকে ফিরে আমি যখন একটু উসখুস করছিলুম ঠিক সেই সময় হঠাৎ নবেন্দু আমার ওখানে এসে হাজির। বলল, ভেবে দেখলুম পার্থ, একা যাওয়া আমার পক্ষে ঠিক হবে না। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। চল ওঠো—

বললুম, তুমি যাবে শ্বশুরবাড়ি, আমি সঙ্গে গিয়ে কি করব? ভয় পাচ্ছ কেন, নবেন্দু? আমি কাকরাত্রেই স্থির করেছি, এ জীবনে তোমার শ্বশুরবাড়িতে আমাকে আর যেতে না হয়!

নবেন্দু বলল, আচ্ছা বেশ, আজকের মতো প্রতিজ্ঞাটা ভাঙো। কাল থেকে বহাল করো। নাও, শিগগির চলো।

ক্রমশঃ

মতিলাল নেহরু

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
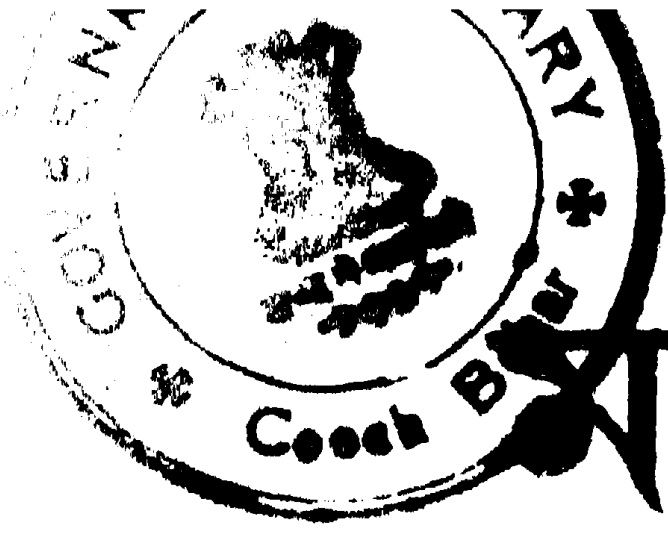
একদিকে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ বংশের* ঐতিহ্য, আর অন্যদিকে ফারসী-আরবী পাঠ। মতিলালের কৈশোরেই এই যে দুই বিপরীত ধারার সঙ্গম ঘটেছিল তার ফল হয়েছিল দ্বিমুখী : একটি, সংস্কার-মুক্ততায় আর অপরটি, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বিধানের জন্য তাঁর ঐকান্তিক বাসনা ও প্রচেষ্টায়। অবশ্য এক হিসেবে এই দুটিই পরস্পরের সম্পৃক্ত।

বাঁধাধরা গন্ডি বা চিরাগত প্রথার মধ্যে তাঁর সত্তার সম্যক বিকাশ ঘটত না। তাই পরবর্তী জীবনে যখন তিনি য়ুরোপ থেকে ফিরে এসে (১৯০০ খৃষ্টাব্দ) তৎকালীন সামাজিক বিধানে অবশ্যকর্তব্য প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজের সঙ্গে আপোষ রফা করেননি, তেমনই তরুণ বয়সে স্কুল কলেজের বিদ্যাভ্যাসের প্রতি পরিমিত উৎসাহ প্রায় অনিচ্ছার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার তুলনায় দুষ্টুমি, কুস্তি দেখা আর দুঃসাহসিক কাজে তাঁর উৎসাহ ছিল অফুরন্ত। তারই পরিণতিতে মাত্র একটি পত্রের পরীক্ষা দিয়ে তিনি অবশিষ্ট বি-এ পরীক্ষা বর্জন করে চলে গেলেন তাজমহল দেখতে! অথচ তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান, ছাত্র। তাঁর স্নেহশীল অধ্যাপক পরে একদিন তাঁকে ডেকে বলেছিলেন : "কি বোকামিই করেছ মতিলাল, তোমার প্রথম পত্রের পরীক্ষা তো বেশ ভালোই হয়েছিল!"

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাওয়ার চেষ্টার এখানেই সমাপ্তি ঘটল। এই ঘটনাটি সম্ভবতঃ তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সংকল্পকে দৃঢ়তর করেছিল। এরপর তিনি একে একে হাইকোর্ট ওকালতির জন্যে পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্যদের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করলেন এবং কানপুর জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় সুরু করে শেষ পর্যন্ত চলে এলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টে।

পিতৃপ্রতিম আইনজীবী পণ্ডিত নন্দলালের আকস্মিক মৃত্যু এই সময়ে তাঁর কাছে প্রচন্ড আঘাত হয়ে এল। নন্দলাল ছিলেন মতিলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দিল্লীর কোতোয়াল পিতা গঙ্গাধরের মৃত্যু হয়েছিল মতিলালের জন্মগ্রহণের (৬ই মে, ১৮৬১) তিন মাস পূর্বেই। নন্দলালের আশ্রয়েই তিনি মানুষ হয়েছেন। আর নন্দলালই ছিলেন পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী। তাঁর মৃত্যুর পর সংসার প্রতিপালনের প্রধান দায়িত্ব পড়ল মতিলালের তরুণ স্কন্ধে। সব কিছু বিস্মৃত হয়ে তিনি আত্ম-নিয়োগ করলেন আইন ব্যবসায়ে। অবশ্য এই নিশ্ছিদ্র সাধনার পুরস্কারও মিলেছিল অল্প বয়সে প্রখ্যাত আইন-জীবীরূপে প্রতিষ্ঠালাভে এবং বিপুল অর্থোপার্জনে।

রাজনীতির জন্যে এ-পর্যন্ত অবশ্য তিনি যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করেননি। আর তার কারণও ছিল বহুবিধ। প্রথমত তৎকালীন যে-কংগ্রেস কথা বলত বেশি, কাজ করত কম, তার প্রতি তাঁর মতো কর্মী-পুরুষের আকর্ষণ ছিল সামান্য। দ্বিতীয়ত অধিকাংশ রাজনীতিকের সম্পর্কে তাঁর ধারণা তেমন উঁচু ধরনের ছিল না। আর সর্বশেষ কারণ, সংকীর্ণ অর্থে তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। পাশ্চাত্ত্য পথ ও মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে তাঁর উৎসাহ ছিল যথেষ্ট, এমন কি শাসক বৃটিশদের গুণাবলী সম্পর্কেও তিনি নীরব থাকেননি।

তবু শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যখন মতিলালকে সক্রিয় রাজ-

* পূর্ব পুরুষদের বাড়ি ছিল নাকি নালার ধারে আর নালার উর্দু হল নাহার। সেই নাহার থেকেই নেহরু বংশের নামের সূত্রপাত।
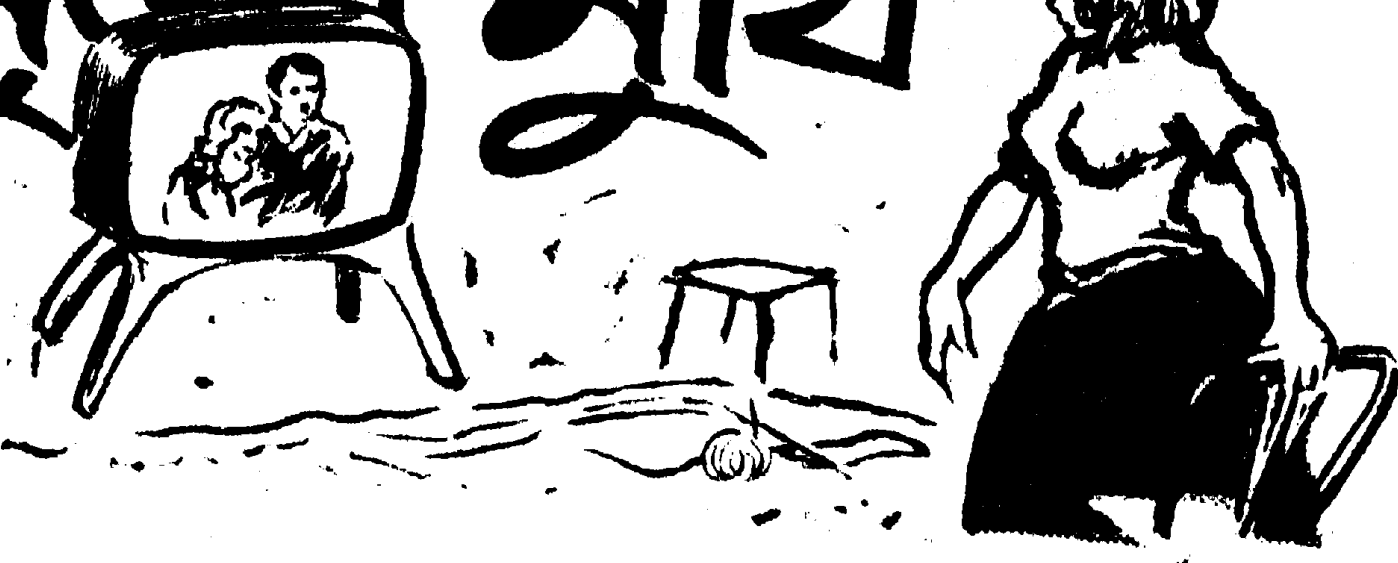
মুখো-মুখি

ভ্রাম্যমান

সরকারী মালিকানায় পরিচালিত ফ্রান্সের টেলিভিশন আর. টি. এফ. যে ধরণের অনুষ্ঠান প্রচার করছে, তাতে একটা সন্দেহই প্রবল হয়ে ওঠে যে সে দেশের রুচি ও নীতি, সম্ভবত বিপদের সম্মুখীন।

পৃথিবীর আর কোন দেশেই রাস্তা থেকে গণিকাদের ধরে এনে টেলিভিসন ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে অশ্লীল প্রশ্ন করার রেওয়াজ নেই, যা ফ্রান্সের সরকারী টেলিভিসনে হচ্ছে। অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়েছে "মুখোমুখি হওয়া যাক"। এজন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয় দুশো টাকা। শুধু প্রশ্নোত্তরই নয়, পথ থেকে লুকোনো ক্যামেরার সাহায্যে ব্যবসায়রত গণিকাদের ছবি তুলে এনেও এই প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের সংগে দেখান হয়েছে।

এর পরই পাঁচটি মেয়ে, 'নৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত' এই অভিযোগে প্যারিস আদালতে মামলা দায়ের করে, তাদের অনেকেই বলেছে, তারা নির্দোষী, কেনা-কাটা করতেই পথে বেরিয়েছিল। একটি মেয়ে নিজেকে গণিকা স্বীকার করে বলে, "আমি একদম চুরমার হয়ে গেলুম। ছেলের ক্লাশের বন্ধুরা দেখবে, তার মা কি ধরণের কাজ করে; এর পর কেউ তো ওর সংগে কথাও বলবে না।"

এই অনুষ্ঠান বাবদ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে ছয় হাজার চিঠি পান। বেশির ভাগই গণিকালয়গুলি তুলে দিতে, নয় তো সরকারী নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, অনেকে নাম-ঠিকানা জানতে চেয়েও চিঠি দিয়েছে।

সমালোচকদের জবাব দেবার মত ক্ষমতা, আর. টি. এফ কর্তৃপক্ষ সর্বসময়ই তৈরী করে রাখে। যেমন একটি নাটকে দেখান হয়েছিল—নায়ক, নায়িকা সম্পর্কে দিবাস্বপ্ন দেখছে। এই দৃশ্যে নায়িকার দেহ থেকে প্রতিটি বস্ত্রই খসে পড়তে দেখা যায়। অভিযোগ তোলা হলে আর. টি. এফ-এর মুখপাত্র বলে, দৃশ্যটিতে নায়িকার পরনে গায়ের 'চামড়ার' রঙের, আঁটো অন্তর্বাস পরা ছিল। সুতরাং কিছুই বলার নেই!

আর একটি ফিল্মে এক নগ্ন স্ত্রীলোককে পর্দার এক ধার থেকে অন্য ধারে চলে যেতে দেখা যায়। মুখপাত্রের বক্তব্য : দর্শকদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সে হেঁটে গেছে। সুতরাং কিছুই বলার নেই!

কিছুদিন আগে একজন আদালতে ক্ষতিপূরণ দাবী করে এই বলে,—স্ত্রীর সংগে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। কারণ মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে সে তার রক্ষিতাকে জড়িয়ে ধরে, আর ঠিক তখনই টেলিভিশন ক্যামেরা তার ছবিটি তুলে নেয়। বাড়ি ফিরেই তিনি স্ত্রীর হাতে প্রহৃত হন। প্যারিসের জনসাধারণ তাকে সমবেদনা জানালেও, ক্ষতিপূরণ আদায়ে তিনি অসমর্থ হন।

তবে একটা আশার কথা এই, প্যারিসের আদালত রুল জারী করে জানিয়েছে, নাগরিকদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আর. টি. এফ বড় বেশি নাক গলাচ্ছে। এ জাতীয় অনুষ্ঠান প্রচার আর চলবে না। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য সালিশ গঠন করা হয়েছে।

তবে সরকারী টেলিভিশন এতে মোটেই দমে যায়নি। কেবলমাত্র প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য অনুষ্ঠানগুলিতে পর্দার ডানকোণে একটা সাদা চৌকো চিহ্ন দেবার ব্যবস্থা তারা করেছে। নাম দিয়েছে, 'বিতর্কমূলক।'

ধূসর ছায়া

আশাপূর্ণা দেবী

প্রতিদিন ঠিক এই সময়টায় আসা চাই ছেলেটার। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রত্যেকটি দিন!

ঠিক এদের এই প্রাক্-সন্ধ্যা চায়ের আসরটায়! যখন সারা দিনের কর্মক্লান্ত শিথিল চেহারা অশোক সবে কোর্ট থেকে ফেরে, আর সুনীপা সারা-দুপুরের অবকাশ আলস্যে ভরাট মন্থর দেহখানিকে নানাবিধ প্রসাধনের চাতুর্যে টাইট করে তুলে সবে চায়ের টেবিলের তত্ত্বাবধানে এসে বসে।

ঠিক, ঠিক সেই সময়টায় আধ-ময়লা হাফসার্ট আর ফাটধরা হাফ-প্যান্ট পরা ছেলেটার আবির্ভাব ঘটে। আশ্চর্য, বছর চার-পাঁচের তো মাত্র ছেলেটা, কিন্তু কী চতুর ধড়িবাজ! কথাটি কয় না, শব্দটি করে না, কোন ফাঁকে চোরের মত সন্তর্পণে দোতলায় উঠে এসে দাঁড়িয়ে থাকে টেবিলের কাছাকাছি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। আবার সেই ঠেস দেওয়ার ভঙ্গীতে যতটা পারবে বেচারী বেচারী ভাব ফুটিয়ে তুলবে!

ওই, ওই ভঙ্গীটাতেই আরো মেজাজ গরম হয়ে ওঠে সুনীপার। বরং যদি ওর বয়সের সঙ্গে মানানসই দুরন্তপনায় হৈ-হৈ করতে করতে এসে হানা দিত, চেয়ে-কেড়ে জবরদস্তি করে খেয়ে এ আসরে নিজের একটা আসন প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে পারতো, বোধকরি সুনীপার এত অসহ্য লাগত না। 'শিশু' বলে 'অবোধ' বলে ক্ষমা-ঘেন্না করে নিতে পারতো হয়তো।

কিন্তু ওই যে গরু-চোরের মত ড্যাবডেবে চোখ দুটোয় দুঃখী-ভাব মাখিয়ে চেয়ে থাকা, এ দেখলে যেন সর্বাঙ্গে বিষ ছড়ায়।

'আশ্চর্য! মা-টাও কি সমান লক্ষ্মীছাড়া হ্যাংলা!' মার্জিত রুচি সুনীপা মনের মধ্যে এই গ্রাম্য কথাটা উচ্চারণ না করে পারে না, 'হ্যাংলা না হলে ছেলেকে একদিনের জন্যে একটু বারণ করে না?' মনের কাছে সভ্যতার দায় নেই, তাই আরও বলে সুনীপা, 'বারণ কি, বরং বোধহয় ইচ্ছে করে লেলিয়ে দেয়।'

ছেলেটার আসা নিয়ে অশোকের আড়ালে চাকর-[illegible]কর-কে অনেক তিরস্কার করেছে সুনীপা, আর আসাটাকে বন্ধ করতে অনেক আদেশ জারি করেছে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। কেমন করেই যে ছেলেটা সব শাসন নির্দেশের কড়া পাহারা ডিঙিয়ে ঠিক এসে উদয় হয় এই এক রহস্য!

অথচ ভীরু স্বভাব।

হ্যাঁ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ওর ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ওর ওই ভয়-কাঁপা মনের গড়নে, সুনীপার সুর্মা-টানা চোখের আগুন-ঝরা দৃষ্টি পাত্তা কি করে কি করে?

সুনীপা বুঝে নিয়েছে পরিপাক করে শুধু চতুর বুদ্ধির জোরে। ও তো শিশু নয়, একটি ধূর্ত বুড়ো। ওর ওই চার বছরের চেহারাটা একটা আবরণ মাত্র। আবরণের নীচেকার সংসারজ্ঞান-পরিপক্ক ফিচেল বুড়োটা ঠিক বোঝে, চোখ যতই অগ্নি-বর্ষণ করুক সুনীপার, কণ্ঠ নিঃশব্দই থাকবে। থাকবে ভদ্রতার দায়ে। সে কণ্ঠ স্পষ্ট করে বলতে পারবে না। "তুই আবার কি করতে?" অথবা "রোজ রোজ আসিস কেন?"

না সত্যিই পারে না সুনীপা মুখে সে কথা উচ্চারণ করতে, মনের মধ্যে সহস্রবার উচ্চারণ করলেও না।

তা' জগতের সমস্ত নিরুপায়তার মূল রহস্য যে ছেলে বুঝে ফেলেছে, সে আর ছেলে কোথা? সুনীপা দাঁতে-দাঁত পিষে নির্জনে বলে "বুড়ো বুড়ো! একের নম্বরের বুড়ো শয়তান!"

ছেলেটা রোজ ঠিক খাওয়ার সময় আসে, আর ওকে খাবারের প্রসাদ-কণিকা দিতে হয় বলেই যে এত রেগে যায় সুনীপা, তাও নয়। ও যে সুনীপাদের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিত্য একটা সুবিধে আদায় করে নিচ্ছে এইটাই ওকে সুনীপার কাছে বিষ করে তুলেছে।

আর সত্যি বলতে—খেতে দেওয়ার ব্যাপারটাও যে একেবারেই কিছু নয়, তাই বা বলা যায় কি করে?

অশোকের বরাবরের নিয়ম হচ্ছে সারাদিনের প্রধান খাওয়াটা এই বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে। সুনীপা শত চেষ্টাতেও এই বেখাপ্পা ব্যবস্থাটাকে সোজা করে তুলতে পারেনি, পারেনি স্বামীকে যথারীতি ডিনার টাইমে 'ডিনারে' অভ্যস্ত করতে। সে চেষ্টা করতে গেলে অশোকের যেন খাওয়াই হয় না।

অশোক বলে, "আসল কথা কি জানো, সেই যে বাল্যকালাবধি স্কুল-কলেজ থেকে ফিরে খিদেয় চোখে-কানে দেখতে পেতাম না, আর মা সেই বুঝে যাবতীয় সুখাদ্য-সম্ভার এই সময়ই সামনে ধরে দিতেন এবং আমার পাকস্থলীর পাম্পটা পাম্প করে কেন বাড়ানো যায় না এই ভেবে আক্ষেপ করতেন, সেই থেকে পাকস্থলীও ঠিক এই সময়টাতেই 'দেহি দেহি' করতে থাকে।"

সুনীপা মুখ বাঁকিয়ে বলে, "ছেলেকে যে ভবিষ্যতে ভদ্র-সমাজে চরে বেড়াতে হবে সেটা বোধহয় তিনি কোনদিন আশা করেন নি।" বলে, কিন্তু নিজেও এই কোর্ট থেকে ফেরার পরই, প্রাক্ সন্ধ্যার চায়ের আসরে স্বামীর সামনে যাবতীয় সুখাদ্যের সম্ভার ধরে দেয়। না দিয়ে কি করবে, অশোকের তারিফ করে করে আর তারিয়ে তারিয়ে খাওয়াটা যে নইলে দেখতেই পাওয়া যায় না।

কিন্তু ওই ছেলেটার জন্যে নিরঙ্কুশ আনন্দে এই সুখময় সময়টুকু উপভোগ করবার জো নেই। হ্যাংলাটাকে সমস্ত জিনিসের ভাগ দিতে হবে। না দিয়ে উপায় কি, নিজে সে যতই চোখে আগুন ঝরাক, অশোকের চোখের দৃষ্টিতে যে প্রশ্রয়ের আশ্রয়।

"ওর জন্যে ছোট-খাটো একটা প্লেট গুছিয়ে রাখলে পারো", কাঁটা-চামচের লীলাকে এক মুহূর্তে সংহত করে অশোক বলে, "আসেই যখন রোজ। হাতে ধরে একটু একটু করে খাওয়ার অসুবিধে।"

"বেশ তো, ওর সুবিধের জন্যে বাড়তি একটা ডাইনিং চেয়ার বানাতে দাও তোমার পার্ক স্ট্রীটের ফার্ণিচারের দোকান থেকে। প্লেট গুছিয়ে রাখা হবে।" নিটোল ফলের মত মাজা-ঘসা মুখখানাকে কঠিন করে কথাটা বলে সুনীপা।

"আহা, তাই কি আর বলছি", অশোক বিব্রতভাবে বলে, "হাতে করে খেলে মেজেটা অপরিষ্কার হতে পারে তো?"

"সে ভয় নেই", কঠিন মুখটা ব্যঙ্গে আলগা করে নেয় সুনীপা, "পাঁপড়ো জন্যেও পড়বে না একগুঁড়ো, ওদের কায়দা অভিনব! আর পরিষ্কারের কথা বলছ? মহাপ্রভুর যা পরণ-পরিচ্ছদ, ঘরে এসে দাঁড়ালেই তো মনে হয় ঘর অপরিষ্কার হয়ে উঠল।"

"সত্যি ছেলেটার জামাটামাগুলো কেন যে একটু সাফ করে দেয় না—", অশোক হাত বাড়িয়ে আধখানা কমলালেবু ছেলেটাকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "মাকে বলবি জামা ফর্সা করে দিতে বুঝলি?"

লক্ষ্মীমন্তের ঘরণী সুনীপা সেই কমলালেবুর দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করে বলে, "সাফ্ করে দেবার জন্যে দ্বিতীয় আর থাকলে-তো! ওই একটা জামাই তো দেখি গায়ের চামড়া। এককাঁড়ি টাকা করে বাড়ী ভাড়া দিতে পারে, অথচ- -"

কাঁটাচামচের লীলাকে আর একবার সংহত করে অশোক একটু দার্শনিক হাসি হেসে বলে, "বাড়ী ভাড়া যে দেয়, সে-তো আর ওর বাবা নয় নীপা, কাকা। কাজেই ওর চাইতে আর কি হবে? আমাদের এখানে আসেটাসে ছেলেটা, কোন উপলক্ষে কিছু জামা-পাজামা প্রেজেন্ট করলেও হয়।"

"উপলক্ষে!" সুনীপার ব্যঞ্জনাময় সুশ্রী মুখটা বিরক্তির ব্যঞ্জনায় কুশ্রী হয়ে ওঠে, "কেন, এমনি দিলে নেবে না?"

"আহা নেবে কি নেবে না সে কথা হচ্ছে না", অশোক ছেলেটার দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে। এ-সব কথা যে তার সম্পর্কেই হচ্ছে, তা' বোঝা যায় না ছেলেটার মুখ দেখে। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে লেবুর কোয়া থেকে রস সংগ্রহ করে চলেছে সে। তবু গলাটা একটু খাটো করে কথা শেষ করে অশোক, "শুধু শুধু তো বলা যায় না দাতব্য করছি, নাও।"

"তাহলে নয় ওর জন্মদিনের উৎসবেই প্রেজেন্ট কোরো কিছু সাটিন-ভেলভেট!" বলে পেয়ালা-পীরিচে ঝঙ্কার তুলে চা ঢালতে বসে সুনীপা।

ঠিক এই সময় আর একবার হাতটা বাড়িয়ে ধরে অশোক, এবং যথারীতি যন্ত্র-চালিতের মত দু-এক পা এগিয়ে আসে আর একখানি বাড়ানো ক্ষুদ্র হাতের মালিক। কাটলেটের একটু কোণ! লেনদেন হয় তার।

সত্যিই সহ্য হয় না।

সুনীপা গলা খাটো করে না, তীব্র স্বরে বলে ওঠে, "দেখ, তুমি হয়তো ভাবো মস্ত বদান্যতা করছো তুমি, কিন্তু সেটা তোমার ভুল! এতে তুমি ওর অনিষ্টই করছো, ওর ওই লোভ আর হ্যাংলামীকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে আরও লোভী আর হ্যাংলা করে তুলছ তুমি শুধু, এই জেনো। এটা দয়া নয়, পাপ।"

"কী মুস্কিল, নিজেকে আমি খুব একটা দয়াবান মনে করি, তা' ভাবছো কেন?" অশোক অপ্রস্তুতভাবে বলে, "কোন কিছুই ভেবে কিছু করি না আমি। বাচ্চা ছেলেটা সামনে থাকে—"

"সামনে থাকে নয়, তাক্ বুঝে সময় বুঝে সামনে এসে দাঁড়ায়। এবং এই আমার পিছনে আর কারো সক্রিয় হাত আছে, এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।"

"আহা থাক থাক, থামো!" অশোক সংকেত বলে, "তুচ্ছ কথা থেকে এ-সব কেন? সংসারে কত দিকে কত যাচ্ছে, কত জিনিস ফেলাছড়া হচ্ছে—"

"সংসারের ফেলাছড়া উচ্ছিষ্ট প্রসাদের ভাগটা মানুষের জন্যে নয়, পোষা জন্তুর জন্যে বুঝলে?" সুনীপা সভ্যতার আর মানবিকতার চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে বাণী বিতরণ করে, "মানুষকে যারা শুধু তার দারিদ্র্যের সুযোগে কানাচের পোষা জন্তুর সমগোত্র ভেবে দয়া দেখায়, আমি তাদের নীতিকে ঘৃণা করি।"

আশ্চর্য যে, রাগ করে না অশোক, শুধু "ভালই করো", বলে মুখটিপে একটু হাসে।

ছেলেটা কিন্তু যে নির্বিকার সেই নির্বিকার। সেই ওর নিজস্ব পদ্ধতিতে ঘাড়টা যথাসম্ভব নীচু করে হাত চেটেই চলেছে। ওকে নিয়েই যে এত চাপা ঝড়, এ কি ও বুঝতে পারে না? চার-পাঁচ বছরের ছেলে এত নীরেট হয়? না কি ওদের মত হ্যাংলা ছেলেদের গায়ের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মাল-মশলা দিয়ে তৈরি হয়?

নইলে সুনীপার আড়াই বছরের ছেলেটার সামনেই তো সাবধানে কথা বলতে হয়। যাকে বলে 'হাঁ' করলে পেটের কথা বোঝা, তাই বুঝতে পারে সে ছেলে। তাই পারে বলেই না তাকে এই সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরে ঘুরতে দিতে হয়। চাকরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে সুনীপা বাবুর খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত খোকাবাবুকে আনবে না।

এই সময়ই তো অশোকের সঙ্গে তার যত কিছু কথাবার্তা। বড়দের কথা ছোটরা বেশী শোনে, এটা পছন্দ করে না সুনীপা। তা ছাড়া—ওই হতচ্ছাড়া ছেলেটার দৃষ্টান্ত। ওই লোলুপ দৃষ্টিতে খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকা, এতটুকু উচ্ছিষ্ট-কণা দিলেও কৃতার্থ হয়ে নেওয়া, এগুলো শিশুর মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কে জানে!

চারটে সন্দেশের একটা একটু সরিয়ে রেখেছিল অশোক ছেলেটাকে দেবে বলেই। হাত ঠেকালো একবার সেটায়, তারপর কি ভেবে পাতে ফেলে রেখে উঠে পড়ল।

সুনীপা বঙ্কিম কটাক্ষে একবার ব্যাপারটা দেখে নিয়ে মুচকে হেসে বলে, "তা' ওটুকুতে আর ইতস্ততঃ কেন? দিয়েই ফেল।"

অশোক কোন কথা বলল না। উঠে চলে গেল।

সুনীপার কথার উত্তর না দিয়ে চলে গেল অশোক, এটা প্রায় অসম্ভবের কোঠায়, কাজেই সকল অপমানের মূলে ওই নোংরা জীবটকে উকুনের মত পিষে ফেলতে ইচ্ছে করে সুনীপার।

তবু সন্দেশটা সে নিজেই তুলে নিয়ে তার হাতে দেয়, দিয়ে বিষাক্ত চাপা স্বরে বলে, "আর কি, সব তো হয়েছে। এবার যাও। এটা নীচে গিয়ে খাওগে।"

নীচে গিয়ে!

ছেলেটা থতমত খেয়ে একবার শুধু ওর সেই গরু-চোরের দৃষ্টিতে সুনীপার মুখের দিকে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি সন্দেশটা মুখে পুরে দেয়। কড়াপাকের শুকনো সন্দেশ, তাকে জব্দ করতে গিয়ে চোখ-দুটো একবার ঠিকরে ওঠে, তার-পরই কাঠ কাঠ ঢোক গিলতে গিলতে আস্তে আস্তে চলে যায় সে। খুব সম্ভব সন্দেশটাকে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শেষ করে তবে নীচে নিজেদের ঘরে যাবে। খুব সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই। এটাও সুনীপার জানা। তাই ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে তেমনি বিষাক্ত সুরে বিড়বিড় করে বলে, "বাড়ী গিয়ে খাবে না তুমি, তা' খুব জানি। গিয়ে খেলে যে বাড়ীর লোকে জেনে ফেলবে কত কি সাঁটছো এখানে। ঘুঘু শয়তান!"

একা আপন মনে এ রকম কথা বলতে সুনীপার দ্বিধা নেই, কেউ শুনতে না পেলেই হ'ল।

পাঁচজনে যখন শোনে, তখনকার সুনীপা অবশ্য আলাদা। তখন এত প্রখরভাবে তো দূরের কথা, ভালভাবে গুছিয়েই কথা বলতে পারে না যেন। ছাড়া ছাড়া আধো আধো ভঙ্গীতে, বুঝি বা উপযুক্ত প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছে না, কথা হাতড়াচ্ছে, এই ভাবে একটু হেসে একটু বিব্রত সুরে সাধারণ ঘরোয়া ধরনের কথাগুলো কয় সুনীপা। হঠাৎ শুনলে মনে হতে পারে অবাঙালী মেয়েটা নতুন বাংলা শিখেছে।

কিন্তু সে সবই তো বাইরের লোকের সামনে। আর বিয়ে যখন হয়নি, তখন অশোকের সামনেও। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে তো আর নয়। ঘরের লোকের সামনে নিজ মূর্তি ক'দিন চাপা থাকে? সুনীপার চাকর-বাকরতো তার ভয়ে থরহরি কম্প।

অশোক?

ব্যবহারিক সীমানায় সেও তাই। সেই ভীত-ত্রস্ত বশংবদ! প্রেমে পড়ে বিয়ে, একচ্ছত্র সংসার। ভারী সুখের রাজ্যটি গড়ে নিয়েছিল সুনীপা। কিন্তু কিছুদিন থেকে ওই ছেলেটা সে সুখে শনি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওকে নিয়েই যেন মাঝে মাঝে অশোক অন্য কি এক রকম মূর্তি নিচ্ছে। তারও কি সেইটা নিজ মূর্তি নাকি?

মাঝে মাঝে সে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারে না সুনীপা। করলে অশোক অবশ্য হাসে। মুখ ভার করলে পুরনো পচা এক প্রবাদ দিয়ে সান্ত্বনাও দেয়, "চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলো কেন? বাচ্চা একটা ছেলে, কি-ই বা করছে সে, আর কি-ই বা আমি করছি তাকে, কিছুই তো না। বাপ-মরা ছেলে, কাকার বাড়ীতে হয়তো খাওয়া-দাওয়া তেমন 'ইয়ে' হয় না, খানিকটা খেতে দিলেই খুশী হয়ে চলে যায়।"

"খুশী?" সুনীপা তীব্র প্রশ্ন করে, "ওর মুখের চেহারায় খুশীর কোন ছাপ তুমি দেখেছ কোন দিন?"

দেখেছে, তা' অবশ্য মনে করতে পারে না অশোক, কাজেই চুপ করে যায়।

তা' একথাটা কিন্তু সুনীপার নিছক আক্রোশের কথা বললে ভুল বলা হয়। সত্যিই ছেলেটার মুখের চেহারায় ওই দীন-দুঃখীর ভাবটা ছাড়া আর কোন ভাবই ফোটে না। ওর কাকীও তাই যখন-তখন ওর মাকে বলে, "ধন্যি বটে দিদি তোমার এই কোলের ছেলেটি! পোড়া-মুখে কখনো একবার আহ্লাদ দেখি না। বিধাতাপুরুষ বোধ হয় গড়বার সময় ও জিনিসটা ওকে দিতে ভুলে গেছেন।"

"সে তো গেছেনই"। ওর মা জয়া ম্লান নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "তার সাক্ষী তো পড়েই আছে।"

হ্যাঁ, সাক্ষ্য-প্রমাণ পড়ে আছে বৈ কি।

জন্মাবার আগেই বাপ খেয়েছে যে ছেলে, মানুষ হচ্ছে কাকার সংসারে দূর-ছাইয়ের মধ্যে, তার মধ্যে আহ্লাদের ঠাঁই কোথায়?

অথচ দূরছাইয়ের জন্যে কাকা-কাকীকে দোষই বা দেওয়া যায় কি করে? যে বড় ভাই এতাবৎকাল আলাদা সংসার পেতে, যত্র আয় তত্র ব্যয়ের নীতি অনুসরণে বেপরোয়া বড়-মানুষী করে চালিয়ে এসেছেন, আর কৃপণ ছোট ভাইকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন, তিনি যদি সহসা চারটি বাচ্চা-কাচ্চা ও বিধবা স্ত্রীটিকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে কেটে পড়েন, তবে দাদার সেই সংসারটির জন্যে কে পারে আদরের আর হৃদয়ের সিংহাসন পেতে দিতে?

তা' ছাড়া এই ছোট ছেলেটা! একে তো অপয়া অলক্ষুণে, তার ওপর আবার কী যে রাক্ষুসে দিশে। খেয়ে যেন কিছুতেই পেট ভরে না ওর। অতটুকু ছেলে একটা বড় মানুষের মত ভাত-ডাল খায়, তক্ষুনি আবার লোকের পাতের মাছ-দইয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। ওর কাকী যে বলে ওর পেটে 'ভস্মকীট' আছে, সেটা মিথ্যা বলে না।

নিত্য ওর বাড়ীওলাদের দোতলায় উঠে যাওয়ার তীব্র আকর্ষণের পিছনে যে কিছু একটা আছে, সে সন্দেহ ওর বাড়ীর সবাই করে; কিন্তু কিছুতেই কবুল করাতে পারে না ক্ষুদে শয়তানটাকে। কাঠকবুলে দাঁড়িয়ে থাকে, সহস্র প্রশ্নের সামনে নিরুত্তর হয়ে।

"রোজ কি করতে যাস?" এ প্রশ্ন করতে করতে ওর মা হেরে গেছে, "খবরদার আর যাসনে" বলতে বলতে কাহিল হয়ে গেছে। "গেলে ওরা কি বলে?" এ প্রশ্নের উত্তর আদায় করে উঠতে পারেনি।

অথচ শিশুর পক্ষে যা সম্ভব, বড়দের পক্ষে তা' সম্ভব হয় না, নিজেরা ওরা কেউ বাড়ীওলাদের দোতলার ওপরে গিয়ে সন্ধান নিতে পারে না, কি আচরণ করে তাদের ছেলেটা এসে।

যেমন-তেমন বাড়ীওলা তো নয়, সাহেব!

কড়াপাকের সন্দেশটাকে কোন রকমে পরিপাক করে নিয়ে, সুড়সুড় করে ঘরে এসে ঢুকতেই ওর মা ছেলের কানটাকে ধরে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, "আবার গিয়েছিলি?"

ছেলেটা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কাঁদে না, নড়ে-চড়ে না। এবং শত অনুরোধেও একবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে না, "আর যাব না।"

কি করে বলবে?

শুধুই কি সুখাদ্যের আকর্ষণ?

দোতলার সমস্ত পরিবেশটা যে তার মনের মধ্যে এক মোহময় মায়াজাল বিস্তার করে বসে আছে। মদের নেশার মত সেই মোহ তাকে টানতে থাকে সকাল থেকে। সেই টেবিল, চেয়ার, আলো, সেই কাঁচের আর রুপোর বাসন-

পত্র, কাঁটা-চামচের টুংটাং ঝঙ্কার, দামী সাবান, সেণ্ট, প্রসাধন দ্রব্য আর সদ্য প্রস্তুত নাম-না-জানা সুখাদ্যসমূহের সম্মিলিত সুবাস ওকে যেন পরীর রাজ্যে পৌঁছে দেয়।

মেমসাহেবকে অবশ্য দেখলে বুক কাঁপে, কিন্তু সাহেবের মুখটা কী ভালো!

তা ছাড়া অপূর্ব সব খাবারের দুর্নিবার হাতছানি তুচ্ছও তো নয়। অতএব প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করা চলে না। বকুনি? মার? সে তো সর্বদাই আছে। ওসব তো অহরহের পাওনা।

পরদিন টেবিলে বসতে এসে অশোক প্রথমটা ভাবল কি একটা ভুলে গেছে যেন।

ঘড়িটা কি বাথরুমের ব্র্যাকেটে ফেলে রেখে এল? আংটি, চশমা? না এই তো পরেছে সেগুলো। ঘাড়ে-গলায় পাউডার, তাও তো লাগিয়ে এসেছে, তবে?

এ অন্যমনস্কতা কিসে? ভুলের, না অভ্যস্ত দৃশ্যের অভাবে?

ওঃ, ছেলেটা এসে দাঁড়িয়ে নেই আজ, তার সেই প্রায় কিনে ফেলা জায়গাটুকুতে।

সুনীপা চেয়ারটাকে শব্দ করে টেনে বসে ব্যঙ্গ হাস্যে বলে ওঠে, "হয়েছে, অমন উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক তাকাতে হবে না আর, নিশ্চিন্ত হয়ে খাও, তাঁকে খেতে বসানো হয়েছে।"

খেতে বসানো হয়েছে!

শব্দটা কোন অমরার ভাষা! বোকার মত সেই শব্দটাই ফের উচ্চারণ করে অশোক, "খেতে বসানো হয়েছে!"

"হ্যাঁ। তোমার শান্তি করতে তাই রোজ বসাবো ঠিক করেছি।"

"কী আশ্চর্য! এতে আবার আমার শান্তি-অশান্তি কি? বসিয়েছ কোথায়?"

"রান্নাঘরের ওদিকে।"

"রান্নাঘরের ওদিকে!"

"হ্যাঁ, যতদিন না ওর ডানলোপিলো দেওয়া ডাইনিং চেয়ারটা গড়িয়ে আসছে, ততদিন অন্ততঃ! দাঁড়িয়ে খেতে অসুবিধে হয় বেচারার।"

তীক্ষ্ণ বাণের মত একটু হাসি ফুটে ওঠে সুনীপার মুখে।

অশোক আর কোন কথা বলে না, আহারে মনোনিবেশ করে। আর তার মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা সুনীপার মনে হয় অশোকের বয়েসটা আর কম নেই, তরুণ যুবকের পর্যায়ে আর ফেলা যায় না ওকে।

অথচ সুনীপা?

মৃদু একটা গর্বের হাসি ফুটে ওঠে সুনীপার ঠোঁটের কোণায়। এই মাত্র তো আর্শি এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে।

সহসা তাল ভঙ্গ হল।

সমস্ত শান্ত ছন্দটার উপর একটা কাঁচের বাসন ভাঙার ঝনঝন শব্দ আছড়ে পড়ল। আর সেই সঙ্গে আর একটা ভাঙা কাঁসরের তীক্ষ্ণ শব্দ! রান্নাঘরের পুরনো আমলের ঝি বিধু চীৎকার করে উঠেছে, "ভাঙলি তো? ভাঙলি তো ওই দামী ডিসটা? কী লক্ষ্মীছাড়া দিশেগুলা ছেলে গো, অত-খানি পেটে পুরেও আশা মেটে না!"

সন্ধ্যা নামে ধীরে ধীরে ফোটো : শ্রীশ্যামল বসু

ডিস্‌খানাকে তুলে চাটছে! তবু যদি ভাল দ্রব্যি হতো, রাস্তায় ফেলে দেবার জিনিষ—"

কথার স্রোতের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে সুনীপা।

কিন্তু সুনীপা যে একা আসেনি, সুনীপার পিছনে অদূরে যে স্বয়ং সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন, এ-কি বিধু দেখতে পায়নি? লক্ষ্য করেনি অপ্রত্যাশিত ভুলে? সত্যি তো রান্নাঘরের অঞ্চলে অশোক কবে এসেছে?

নাকি লক্ষ্য করেও না করার ভান করলো বিধু দুষ্টবুদ্ধির বশে? অন্ততঃ সুনীপার তাই মনে হল। মনে হল, বিধু যেন ইচ্ছে করেই গড়গড়িয়ে কথাগুলো বলে নিল হাটে হাঁড়ি ভাঙতে।

চোখ রাঙাবার কি চোখ টেপবার অবকাশ পেল না সুনীপা। বিধু দ্রুত মেল ট্রেন চালিয়ে গেল, "দেখুন বৌদি, দেখুন, কী হ্যাংলাকুটে ছেলে! সেই পুড়ে আঙার হয়ে যাওয়া পুডিংটা, যেটা তখন বেড়ালে শুঁকে চলে গেল, মুখ দিল না, সেইটা সবখানি চেটেপুটে শেষ করলো ছোঁড়া, তবু আহিংকে মেটে না গো! ডিসখানা তুলে চাটছে। আপনার অমন দামী ডিসটা ভেঙে কুচি করলো!.........কেনই বা ওতে খেতে দেওয়া, আমাদের দিকের একটা কলাই-করা শান্‌কি কি বাটি দিলেই হতো!"

এতক্ষণে সুনীপা ধমকে ওঠে, "থাম তুই, এমনভাবে বলছিস যেন কী না কি অখাদ্য খেতে দেওয়া হয়েছে ওকে। সামান্য একটু তলা ধরে গিয়েছিল পুডিংটার—"

"সামান্য কি গো বৌদি, আপনি তো চড়িয়ে দিয়ে শুতে গেলেন, চাকর ছোঁড়া কি ওর আর কিছু পদার্থ রেখে ছিল? ওই মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো ছেলে বলেই তাই গলা দিয়ে নামাতে পেরেছে, আমরা হলে তো মুখে ঠেকাতে পারতাম না। তাই কি একটু-খানি গো? একসের খানি দুধের—ওমা দাদাবাবু যে! এই দেখেন না কান্ড!" বিধু রসনা থামিয়ে মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে সভ্য হয়। কিন্তু সুনীপা এই খোলা দৃশ্যের ওপর আবরণ দিয়ে সভ্য করবে, আর কোন মিথ্যার জাল টেনে?

মা, চাকর-বাকরদের সামনে তিরস্কার করে সুনীপাকে অপদস্থ করলো না অশোক, আদৌ কোন কথাই বলল না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে সরে গেল।

ছেলেটাও কোন এক সময় চলে গেল বাড়ীর পিছনের জমাদার আসবার লোহার শিঁড়িটা বেয়ে, যেটা তার আসা-যাওয়ার পথ।

চাকর-বাকর বিধু কেউই ঘটনাটার এই ধরণের পরিসমাপ্তি আশা করেনি। হয় মেম সাহেব কিছু তিরস্কৃত হবেন, নয় ওই ভাঙা ডিসের টুকরো আর ছেলেটাকে নিয়ে নীচের তলার ওদের দেখিয়ে ছেলে সামলাবার নির্দেশ দেওয়া হবে, এই ভেবেছিল তারা।

দুটোর একটাও হল না।

অতএব গুজ্‌গুজ্‌ সমালোচনা উদ্দাম হয়ে উঠল তাদের।

অনেকক্ষণ পরে সুনীপাই মান খুইয়ে বলে, "বিধুটার এত বিশ্রী কথা-বার্তা! তুমি হয়তো ভাবলে—"

এতক্ষণ পরে স্তব্ধ অশোক মৌন ভঙ্গ করে, ক্লান্ত-ক্লিষ্ট স্বরে বলে, "আমি কিছু ভাবিনি নীপা, শুধু আমাকে একটু একা থাকতে দাও। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো যেন বিধবার ছেলেটির কিছু না হয়।"

"ওঃ, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা!" সুনীপা নিজস্ব কোর্টে ফিরে আসে, "একটু পুড়ে যাওয়া পুডিং খেয়েছে বলে। ইস্! ওতে ওদের কিছু হবে না, নিশ্চিন্ত থাকো। দু-তিন দিনের বাসি রুটি জলখাবার খায় ওরা তা জানো?"

"নীপা, দোহাই তোমার! জগতে কোন কিছুকে শ্রদ্ধা করতে না পারো, অন্তত নিজের আত্মাকে একটু শ্রদ্ধা করতে শেখো।"

হয়তো সুনীপার মত দুঃসাহসী মেয়ে না হলে আবহাওয়া মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেত। কিন্তু সুনীপা দুঃসাহসী, তাই এ কথারও উত্তর দেয়, "ঠিক আছে, আর কিছু না পারি কাল থেকে তোমার ওই মানাগণ্য অতিথিটিকে সসম্ভ্রমে তোমার পাশের চেয়ারে বসিয়ে রাজ-ভোগ পরিবেশন করবো।"

কিন্তু সুনীপার সেই ব্যঙ্গ প্রতি-শোধ আর নেওয়া হয় না, ছেলেটা তার পরদিন আর আসে না। তার পরদিন না, তার পরদিনও না। দিনের পর দিন গেল, কোনদিনই না।

না, না, ভয় পাবার কিছু নেই, সেই রাত্রেই কলেরা হয়ে মারা যায়নি ছেলেটা! আদৌ কোন অসুখই করেনি তার।

তিন দিনের বাসি রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত পাকস্থলী বিড়ালের অবহেলিত খাদ্যবস্তুটাও দিব্যি পরিপাক করে নিয়েছে দেখা গেল।

তবু, আর কোন দিনই ছোট ছোট দুখানা খালি পা-কে উঠে আসতে দেখা যায় না, জমাদার-আসবার ঘোরানো লোহার সিঁড়িটা দিয়ে!

কিন্তু কেন? সেই পোড়া পুডিংটার চাইতেও গুরুভার আর ক্লেদাক্ত কোন বস্তুকে কি পরিপাক করে উঠতে পারল না অত শক্তিশালী পাকস্থলীটাও?

কে জানে, কেন!

তবে সুনীপাদের এই প্রাক্-সন্ধ্যার চায়ের আসরটা আর কোন দিন একটা ময়লা হাফসার্ট আর একটা ফাটা-ছেঁড়া প্যান্টের ধূসর ছায়ায় নোংরা হয়ে ওঠে না।

কিন্তু সে ছায়াটা কি সত্যিই ধূসর হয়ে মিলিয়ে যায়, না আর কোথাও চিরকালের মত ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে?

শত বার্ষিকী দেশে দেশে

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষ ও এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়েছে। আমাদের প্রিয় জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে পঁচিশে বৈশাখ সভা ও সমিতিতে সঙ্গীত-নাটকের উৎসব অনুষ্ঠান, প্রতি গৃহ দীপাবলীতে সজ্জিত করা ব্যতীত তাঁর পবিত্র স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তাদের জাতীয় কবির স্মৃতি চিরস্থায়ী করার জন্য কী ভাবে অগ্রসর হয়েছিল এবং কী কী উপায় অবলম্বন করেছিল এই উপলক্ষে তার আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেন না জাতীয় কবির প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা যেমন আবশ্যিক, সঙ্গে সঙ্গে এবিষয়েও সজাগ থাকা উচিত যেন ভক্তজনের হাতে জ্বালা ধূপ ও ধুনার ধোঁয়ার আচ্ছাদনে কবির রচনা না আড়ালে চলে যায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় কবি ও সাহিত্যিকদের বাসগৃহ, লাইব্রেরী, বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক রচনা ও তাঁর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত করার জন্যে সংগঠিত বহু সংগ্রহশালা আজও তাঁদের অক্ষয় স্মৃতি বহন করছে। সময়ের নোংরা হাতের স্পর্শ থেকে সেই কীর্তি ও স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব দেশবাসীরা নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমত জার্মাণীর জাতীয় কবি গেটে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

গেটে স্বীয় জীবদ্দশায় বন্ধুমহলে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে সভা-সমিতি ইত্যাদির অনুষ্ঠান একেবারেই না করা হয়। তাই সারা জার্মাণীতে সুষ্ঠু ও রুচিসম্মত-ভাবে প্রিয়তম জাতীয় কবির স্মৃতিরক্ষা করার চেষ্টা সর্বত্র হয়ে থাকে।

গেটে ১৭৪৯ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট-আম-মেইন-এ (মেইন নদীর ধারে ফ্রাঙ্কফুট শহরে) আগস্ট মাসে জন্মেছিলেন। প্রথমে বাড়ীতে মা ও বাবার কাছে পরে স্ট্রাসবুর্গ ও লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করেন। আইনজ্ঞ পিতার মত প্রথমে ভেবেছিলেন আইনজীবী হবেন। কিন্তু লাইপজিগ গিয়ে প্রেমে পড়লেন, কাব্য-নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন। আইন পড়া হল অনেক পরে স্ট্রসবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। ১৭৭৫ সালে হ্বাইমারে গিয়ে মন্ত্রী-দপ্তরের ভার নিতে হল।

১৭৮৬ সালে ইতালী গেলেন দু'বছরের জন্যে। তারপরে দেশে ফিরে স্টেট থিয়েটারের ভার নিয়ে বাকী জীবন সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৩২ সাল অবধি এই দীর্ঘ বিরাশি বছরের স্মৃতি জার্মাণীর নানা শহর ও গ্রামে আজও ছড়িয়ে আছে।

মহাকবি গেটে

১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কটতম মুহূর্তে জার্মাণীর বুকে গেটের বাসভবনে (কবির জন্মস্থান) পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এর থেকেই প্রমাণিত হয় তাঁর স্মৃতি প্রতিটি জার্মাণের হৃদয়ের মণিকোঠায় সংরক্ষিত।

১৯৪৪ সালে বোমায় গেটের বাস-গৃহটি প্রায় ধ্বংসীভূত হয়। তবুও দারুণ বিপদ মাথায় করে জার্মাণরা কবির ব্যবহৃত ফার্ণিচার, দেয়ালে টাঙানো ছবি, লাইব্রেরীর গ্রন্থসমূহ সব বয়ে এনে সুরক্ষিত স্থানে রেখে দেয়। বাড়ির পুরনো প্ল্যান ও স্কেচ অনুযায়ী বাড়িটি নতুন করে আবার তৈরী করা শুরু হয়। এমনকি ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে পাথর তুলে সেগুলোকে লাগানো হয় গৃহ-নির্মাণের কাজে। বাড়ির অন্দরমহলও পূর্বতন কৌশলে এমনভাবে পুনর্নির্মিত হয় যে ১৯৫১ সালে আবার যখন কবির বাসগৃহটির দ্বারোদ্ঘাটন করা হলো তখন পূর্বের মতই অবিকলভাবে ধ্বংস-পূর্ব সজীব মূর্তিতে সাধারণের চোখের সামনে বাড়িটি হেসে উঠলো।

গেটের ব্যক্তিগত পাঠাগার

কবি অন্যান্য যে যে বাড়িতে জীবদ্দশায় বাস করেছিলেন সেগুলিও সর্বদা সযত্নে রক্ষিত, সুসজ্জিতভাবে অবস্থিত। জার্মাণীর অনেক জায়গায় এই 'গেটে হাউস'গুলি ছড়িয়ে আছে। কবির ব্যবহৃত আসবাব ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এই মিউজিয়মগুলিতে সুরক্ষিত। ভক্তিসম্পন্ন জনসাধারণের এই সব মিউজিয়ামে প্রবেশের অবাধ অধিকার আছে।

১৮৩২ সালের মার্চ মাসে ভাইমারে যে বাগানবাড়িতে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিশেষ করে সেই বাড়িটি এই ধরণের একটি প্রথম মিউজিয়ম। অন্যান্য শহরে ও গ্রামে যেখানে যেখানে কবি বাস করেছেন তারাও আজ তাঁর স্মৃতির স্মারক বহন করছে সগৌরবে। অনেক শহরের হোটেল ও 'ইনে'র মালিকেরা এখনো এই বলে জাঁক করে যে তাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি এখানে এককালে অবস্থান করেছিলেন। কবির শততম জন্ম-বার্ষিকীতে সারা জার্মাণীতে সাড়া পড়েছিল। কবি যে শহরে জন্মেছিলেন সেই ফ্রাঙ্কফুর্ট-আম-মেইন-এ প্রধান উৎসবটি ডঃ অ্যালবার্ট স্কুইৎজার-এর পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয়। বহু স্মারক-গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার গেটে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। রোমা রোলাঁ, টমাস্ মান্ প্রভৃতি বিশ্বের সেরা মনীষীদের গেটে সম্বন্ধীয় রচনা নিয়ে এই সময় একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে কবির দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী প্রবলতর উৎসাহে প্রতি-পালিত হয়েছিলো। যদিও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মাণীতে তখন পুরোদমে পুনর্নির্মাণের কাজ চালু হয়েছে। এই উপলক্ষে টমাস মান্ গেটে সম্বন্ধে অবিস্মরণীয় বক্তৃতাটি করেন। টমাস মান্ বলেন, "গেটে সেই আশ্চর্য উদাহরণ যেখানে খাঁটি সরলতার প্রসাদগুণ ও মহৎ অভিজ্ঞতার গভীরতম বোধের সমন্বয় ঘটেছে।" সহজের প্রতি গভীর আনুরক্তি গেটের কিন্বদন্তীর প্রতি-ফলিত। 'ঝিঁঝিঁ', 'ডাস্ট-বিন্', 'কাঠের তক্তা' এই সব সহজপ্রাপ্য বস্তুর অন্তরঙ্গ স্পর্শ তাঁর কাব্যের চিত্রকল্পে ছড়িয়ে আছে। দ্বিশততম জন্ম-বার্ষিকীতে গেটের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল এবং জনসাধারণের পকেটের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বল্পমূল্য ধার্য হয়েছিল। এই সময় ফ্রাঙ্কফুর্টে 'গেটে সোসাইটি' স্থাপন করা হয়। বছরের সেরা লেখককে 'গেটে পুরস্কারে' পুরস্কৃত করাই তার কাজ। এই সব প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান গেটের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় বহন করে। জার্মাণীর প্রত্যেক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ সারা বৎসরে অন্ততঃ গেটের একটি নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। গেটের 'ফাউস্ট' জার্মাণীর জাতীয় নাটক এবং সারা পৃথিবীতে তার অভিনয় বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই নাটক কবির দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল। তিনি যখন বিশের কোঠায় তখন। এই নাটক লেখায় হাত দেন এবং একাশি বছর বয়েসে এর প্রথম পর্ব লেখা শেষ হয়। এই নাটককে এক কথায় কবির জীবন-বেদ বলা যেতে পারে। সর্বদেশে এই নাটকের স্বাদ আধুনিকতম মানুষকে পর্যন্ত অভিভূত করে। যদিও কবি এই নাটকের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন নিজে। তাই তাঁর আশি বছর বয়সের আগে এর অভিনয় অনুষ্ঠান হয়নি। অভিনয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা দেশবাসীর চিত্ত জয় করে। শুধু সভ্য করে অভি-নন্দন জানিয়ে নয়, গেটের নাটক, উপন্যাস, নানা পাঠ করে এবং কবির কাব্য অবলম্বনে রচিত জার্মাণ সুরকার-দের সংগীত শ্রবণ করে তাদের দেশবাসী আজো এই অমর কবিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। কেন না, গেটে একদা যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন—"আমরা, কবিরা কেবল প্রশংসা চাই না, আমরা চাই আমাদের বই পড়া হোক।" বিশ্ব-বিশ্রুত বহু সুরকার গেটের কবিতা ও নাটক অবলম্বনে সংগীত রচনা করেছেন। ব্রাম্‌স্, বেঠোফেন, মেন্ডেলসোন, শুম্যান তার মধ্যে কয়েকটি সুপরিচিত নাম।

গেটেকে দার্শনিক হিসাবেও মর্যাদা দেওয়া হয়। 'গেটেনিয়াম' বলে একদল দার্শনিকের অস্তিত্ব আছে জার্মাণীতে। গেটের দর্শন-চর্চা রুডল্‌ফ্ স্টেইনার বলে এক দার্শনিকের নেতৃত্বে প্রথম শুরু হয়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট-আম-মেইনে যে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় গেটে জন্মেছিলেন তা এখন প্রধানতম গেটে মিউজিয়মে পরিণত।

ঐ বাড়ির নীচের তলায় রান্নাঘর, তার নীচে ওয়াইন সেলার পূর্বের মতন অবিকৃতভাবে রাখা আছে। দ্বিতলে যে ঘরে অতিথিরা এসে থাকতেন তাও ছিমছাম সাজানো।

গেটে-পরিবার থাকতেন তিনতলায়। তিনতলায় মায়ের ঘরটির দেওয়াল বড় বড় শিল্পীদের ছবিতে সুসজ্জিত। গেটের পিতার যে লাইব্রেরীটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে কবি সর্বসময় ঐ লাইব্রেরীতে বসে লেখাপড়া করতেন।

'অমৃতের' পক্ষ থেকে সৌখীন ফোটোগ্রাফীর একটি প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রেরিত ফোটো আগে অন্যত্র প্রকাশিত হলে চলবে না। ফোটোর সংগে ফটোগ্রাফ গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। প্রথম পুরস্কার ১৫ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ১০ টাকা ও তৃতীয় পুরস্কার ৫ টাকা দেওয়া হবে।

প্রেরিত কোনো ফোটোগ্রাফ 'অমৃতের' বিনা অনুমতিতে অন্যত্র প্রকাশ করা চলবে না।

পুরস্কার প্রাপ্ত ফোটো 'অমৃতে' মুদ্রিত হবে। অন্যান্য ফোটোও মুদ্রিত হতে পারে।

ফোটো পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০শে জুন ১৯৬১ সাল।

ঠিকানাঃ অমৃত কার্যালয় ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন

কলিকাতা-৩।
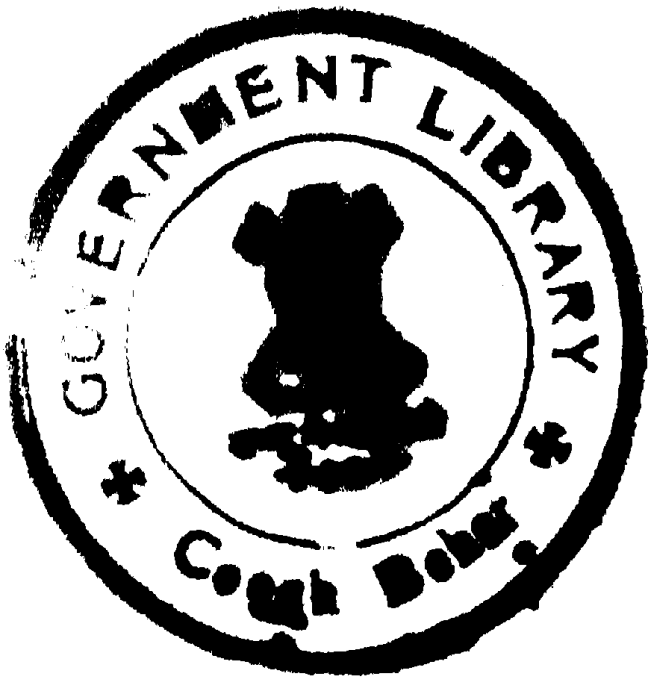
খঞ্জনীবাদিকা
(খাজুরাহ মন্দির)

দর্পণে আপন মুখ—মোহিনী।
(খাজুরাহ মন্দির)

আকাশপথে জলদস্যুতা

ভ্রাম্যমাণ
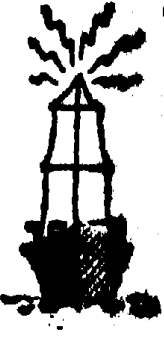
দরকার একটা ছোটখাট জাহাজ, বেতার-প্রেরক যন্ত্রপাতি, প্রচুর খেলো গানের জনপ্রিয় রেকর্ড। আর দরকার এমন একটি দেশ যেখানে দিনরাত বেতারে শুধু বক্তৃতা আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপন প্রচারের কোন ব্যবস্থাই নেই। এবার জাহাজটিকে সেই দেশের ধারে তীর থেকে তিন মাইল জল-এলাকা ছেড়ে দিয়ে, নোঙ্গর করে রাখ'। তারপর বেতারে জনপ্রিয় রেকর্ডগুলি ক্রমাগত বাজিয়ে যাওয়া।

সব দেশেই উন্নাসিকের সংখ্যা কম, সুতরাং অধিকাংশ লোকই যে এই নতুন বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিও টাকা নিয়ে ছুটে আসবে না, এমন কোন যুক্তিও খাড়া করা যায় না।

একে বলা হয় বেতার জল-দস্যুতা। সাম্প্রতিক দস্যুতার খবর পাওয়া গেছে সুইডেন থেকে। ষ্টকহোমের কাছে নোঙ্গর করা 'বোজ'নুর' নামে একটি মার্কিণী জাহাজ থেকে ২০ কিলোওয়াটের বেতার-কেন্দ্র মারফৎ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে রেডিও লর্ড।

সুইডেনে এরা একমাস বে-আইনী অনুষ্ঠান প্রচার করে ফলাও কারবার ফেঁদেছে। এখন রেডিও লর্ড, দিনে মুগ্ধ শ্রোতাদের কাছ থেকে এক হাজার চিঠি পাচ্ছে। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য সময় ভাড়া নিচ্ছে। এক মিনিটের দাম দুশো টাকা।

রেডিও লর্ডের অনুষ্ঠানগুলি ষ্টক-হোমেই টেপ রেকর্ড করে মোটর লঞ্চে বোজ'নুরে পেঁৗছে দেওয়া হয়। খুবলারের লাভ দেখে রেডিও লর্ডের মালিক ঠিক করেছে গোটেবার্গ এবং কুমবালানজে ফ্রান্সের উপকূলে বেতার দস্যুতা শুরু করবে।

আকাশপথে এই দস্যুতা এই প্রথম নয়। তিন বছর আগে সুইস জাহাজ থেকে রেডিও মার্কার নাম দিয়ে ডেনমার্কের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বেতার প্রচার শুরু হয়। জাহাজটিকে নোঙ্গর করা হয় কোপেনহেগেনের কাছে। এখন এদের বাৎসরিক আয় প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা, শ্রোতৃসংখ্যা ৩ লক্ষ। রেডিও মার্কার এখন আরো বড় একটি নতুন জাহাজে স্থানান্তরিত হয়েছে।

বছর খানেক আগে রেডিও ভেরোনিকা এক জার্মাণ জাহাজ থেকে হল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে বেতার প্রচার শুরু করে। এদের ব্যবসা উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে। এমন কি ইংলণ্ডেও ব্যবসা চালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওলন্দাজ শ্রোতাদের আপত্তিতে ইংরেজী অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়।

আন্তর্জাতিক রীতিতে আন্তর্জাতিক জল-এলাকা থেকে বেতার অনুষ্ঠানের প্রচার নিষিদ্ধ। যে-সব দেশের উদ্দেশ্যে এই প্রচার প্রেরিত হচ্ছে তারা শুধু সরকারীভাবে প্রতিবাদ করেই হাত গুটিয়ে বসে থাকে। কারণটা রহস্যময়। তবে বলা হয় যে, এই অনুষ্ঠানগুলো ভীষণ জন-প্রিয় সুতরাং বন্ধ করতে না যাওয়াই ভাল। কিছুদিন আগে সুইডেন সরকার জানায় যে, তাদের জল-এলাকার মধ্যে পেলেই রেডিও লর্ডের যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করে নেবে, অথচ মোটরলঞ্চ মারফৎ যে-সব টেপ রেকর্ড অনুষ্ঠানগুলি কূল থেকে জাহাজে রপ্তানী হয়ে চলেছে তা বন্ধ করার কোন চেষ্টাই তারা করে না। ডেনমার্ক সরকার লিখিতভাবেই রেডিও মার্কারকে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন, অথচ সরকারী সংবাদপত্র 'এ্যাকচুয়েল' রেডিও মার্কারের সংবাদ বিক্রয় করে চলেছে।

কহেন কবি কালিদাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
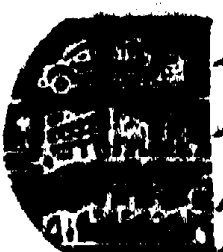
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফণীশ শীর্ণকণ্ঠে বলিল,—'আজ্ঞে বিশ্রী ব্যাপার। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে, তারা জানতে পেরেছে যে, আমরা—'

'কি হয়েছিল সব কথা গুছিয়ে বল।'

ফণীশ অবশ্য সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারিল না। তাহার জট-পাকানো কাহিনীকে আমি যথাসম্ভব সিধা করিয়া লিখিতেছি। —

এই শহরে একটি ক্লাব, কৌতুকবশে তাহার নামকরণ হইয়াছে—কয়লা ক্লাব। ক্লাবের চাঁদার হার খুব উঁচু, তাই বড়-মানুষ ছাড়া অন্য কেহ ইহার সভ্য হইতে পারে না। ফণীশ এই ক্লাবের সভ্য। আরও অনেক গণ্যমান্য সভ্য আছে: তন্মধ্যে উলুডাঙা কয়লা খনির মালিক মৃগেন্দ্র মৌলিক, ধুনিপোতা খনির মধুময় সুর এবং শিমুলিয়া খনির অরবিন্দ ও গোবিন্দ হালদার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্লাবে অপরাহ্নে টেনিস খেলা, ব্যাডমিন্টন খেলা হয়; সন্ধ্যার পর বিলিয়ার্ড, পিংপং, তাস-পাশা চলে। বাজি রাখিয়া তাস খেলা হয়। কিন্তু ক্লাবের নিয়মানুযায়ী বেশী টাকা বাজি রাখা যায় না; তাই যাহাদের রক্তে জুয়ার নেশা আছে তাহাদের মন ভরে না। অরবিন্দ হালদার এই অতৃপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। কিন্তু উপায় কি? শহরে ভদ্রভাবে জুয়া খেলার অন্য কোনও আস্তানা নাই।

বছর খানেক আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ক্লাবের সভ্য হইয়াছিলেন। পয়সাওয়ালা লোক, মহাজনী কারবার খুলিয়াছেন, শহরে নবাগত। বাজার অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র অফিস আছে। কিন্তু থাকেন শহরের বাহিরে নির্জন রাস্তার ধারে এক বাড়িতে। শকুনি-মার্কা চেহারা, নাম প্রাণহরি পোদ্দার।

পোদ্দার মহাশয় ক্লাবে আসিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার সমবয়স্ক বৃদ্ধ ক্লাবে কেহ নাই, বেশীর ভাগই ছেলে-ছোকরা, দু'চারজন মধ্যবয়স্ক আছেন। ক্রমে দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় হইল। কিন্তু বয়সের পার্থক্যবশত কাহারও সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল না।

ফণীশ, মৃগেন মৌলিক, মধুময় সুর এবং অরবিন্দ হালদার এই চারজন মিলিয়া ক্লাবে একটি গোষ্ঠী রচনা করিয়াছিল। ফণীশ ছিল এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে ছোট। আর অরবিন্দ হালদার ছিল সবচেয়ে বয়সে বড়। তাহার বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; দলের মধ্যে সেই ছিল অগ্রণী।

একদিন সন্ধ্যার পর ইহারা ক্লাবের একটা ঘরে বসিয়া ব্রিজ খেলিতেছিল, পোদ্দার মহাশয় আসিয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন। টেবিলের চারি-পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কে কেমন হাত পাইয়াছে দেখিলেন। অরবিন্দ অলস-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি কন্ট্রাক্ট ব্রিজ জানেন?'

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন,—'জানি।'

'খেলবেন?'

'খেলব। কি রকম বাজি?'

'এক টাকা পয়েণ্ট। চলবে?'

'চলবে।'

যে রাবার খেলা হইতেছিল তাহা শেষ হইলে তাস কাটিয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন বাহির হইয়া গেল। প্রাণহরি পোদ্দার খেলিতে বসিলেন।

দেখা গেল পোদ্দার মহাশয় অতি নিপুণ খেলোয়াড়। কিন্তু সেদিন তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না, ভাল হাত পাইলেন না। খেলার শেষে হিসাব করিয়া দেখা গেল তিনি একুশ টাকা হারিয়াছেন। তিনি টাকা শোধ করিয়া দিলেন।

তারপর হইতে প্রাণহরিবাবু প্রায় প্রত্যহই ফণীশদের দলে খেলিতে বসেন। কখনও হারেন, কখনও জেতেন; সকল অবস্থাতেই তিনি নির্বিকার। এই ভাবে তিনি ফণীশদের দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন।

কয়েক মাস এই ভাবে কাটিল।

গত ফাল্গুন মাসে একদিন খেলিতে বসিয়া প্রাণহরিবাবু বলিলেন,—'আপনারা ব্রিজ ছাড়া অন্য কোনো খেলা খেলেন না?'

মধুময় সুর প্রশ্ন করিল,—'কি রকম খেলা?'

প্রাণহরি বলিলেন,—'এই ধরুন, পোকার কিংবা রাণিং ফ্লাশ।'

মৃগেন মৌলিক বলিল,—'আমরা সব খেলাই খেলতে জানি। কিন্তু ক্লাবে জুয়া খেলার নিয়ম নেই। ব্রিজ তো আর জুয়া নয়, 'game of skill.' বলিয়া নাকের মধ্যে ব্যঙ্গ-হাস্য করিল।

প্রাণহরি তখন কিছু বলিলেন না। খেলা শেষ হইলে বলিলেন,—'একদিন আসুন না আমার বাসায়, নতুন খেলা খেলবেন।'
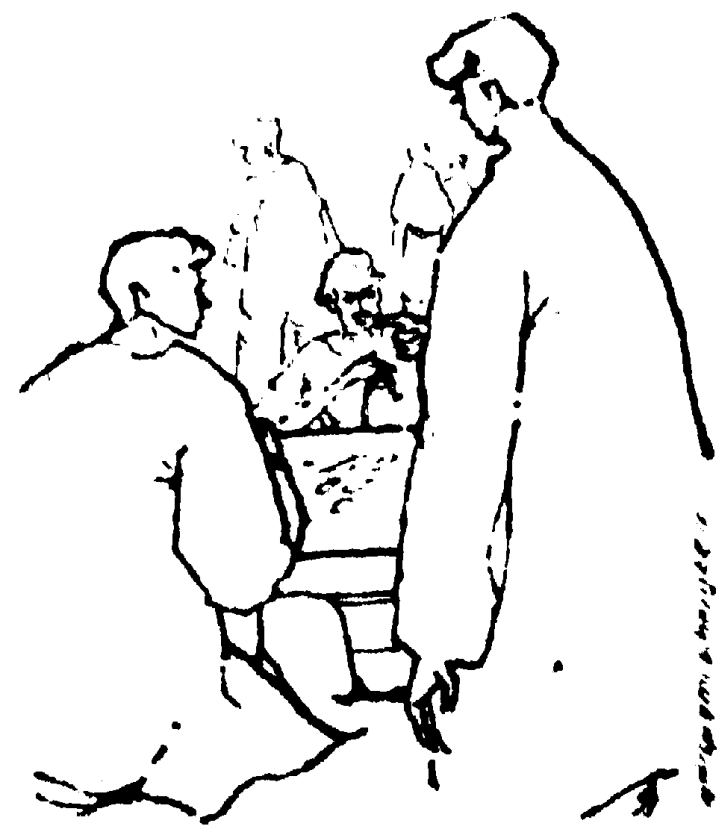
আপনি কন্ট্রাক্ট ব্রিজ জানেন?

কাহারও আপত্তি হইল না। অরবিন্দ বলিল,—'মন্দ কি। আপনি কোথায় থাকেন?'

প্রাণহরি বলিলেন,—'শহরের বাইরে

উলুডাঙা খনির রাস্তায় আমার বাসা। একলা থাকি, আপনারা যদি আসেন বেশ জমজমাট হবে। কালই আসুন না।'

সকলে রাজী হইল। প্রাণহরি ট্যাক্সি ধরিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিজের গাড়ি নাই, ট্যাক্সির সহিত বাঁধা ব্যবস্থা আছে, ট্যাক্সিতেই যাতায়াত করেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর চারজন অরবিন্দের মোটরে চড়িয়া প্রাণহরির গৃহে উপস্থিত হইল। শহরের সীমানা হইতে মাইল দেড়েক দূরে নির্জন রাস্তার উপর দোতলা বাড়ি, আশেপাশে দু'-তিনশত গজের মধ্যে অন্য বাড়ি নাই।

প্রাণহরিবাবু পরম সমাদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, নীচের তলার একটি সুসজ্জিত ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ সাধারণভাবে বাক্যালাপ হইল। প্রাণহরিবাবু বিপত্নীক ও নিঃসন্তান; পূর্বে তিনি উড়িষ্যার কটক শহরে থাকিতেন। কিন্তু সেখানে মন টিকিল না তাই এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে একটি দাসী আছে, সেই তাঁহার রন্ধন ও পরিচর্যা করে।

এই সময় দাসী চায়ের ট্রে হাতে লইয়া প্রবেশ করিল, ট্রে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল, আবার এক থালা কাটলেট লইয়া ফিরিয়া আসিল। দিব্য-গঠনা যুবতী। বয়স কুড়ি-বাইশ; রং ময়লা, কিন্তু মুখখানি সুন্দর, হরিণের মত চোখ দুটিতে কুহক ভরা। দেখিলে ঝি-চাকরাণী শ্রেণীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। সে অতিথিদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল।

গরম গরম কাটলেট সহযোগে চা পান করিতে করিতে অরবিন্দ বলিল, —'খাসা কাটলেট ভেজেছে। এটি আপনার ঝি?'

প্রাণহরিবাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ। মোহিনীকে উড়িষ্যা থেকে এনেছি। রান্না ভাল করে।'

পানাহারের পর খেলা বসিল। সর্ব-সম্মতিক্রমে তিন তাসের খেলা ফ্লাশ আরম্ভ হইল। সকলেই বেশী করিয়া টাকা আনিয়াছিল, প্রাণহরিবাবু পাঁচশো টাকা লইয়া খেলিতে বসিলেন। দুই ঘণ্টা খেলা হইল। বেশী হার-জিত কিন্তু হইল না; কেহ পঞ্চাশ টাকা জিতিল, কেহ একশো টাকা হারিল। প্রাণহরিবাবু মোটের উপর হারিয়া রহিলেন। স্থির হইল তিন দিন পরে আবার এখানে খেলা বসিবে।

ফণীশের মনে কিন্তু সুখ নাই। সে তাস খেলিতে ভালবাসে বটে কিন্তু জুয়াড়ী নয়। তাহার মাথার উপর কড়া প্রকৃতির বাপ আছেন, টাকাকড়ি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। দলে পড়িয়া তাহাকে এই জুয়ার ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু দল ছাড়িবার চেষ্টা করিলে তাহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। ফণীশ নিতান্ত অনিচ্ছাভাবে জুয়ার দলে সংযুক্ত হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দিন খেলা খুব জমিয়া গেল। মোহিনী মুর্গীর ফ্রাই তৈরি করিয়াছিল। চা সহযোগে তাহাই খাইতে খাইতে খেলা আরম্ভ হইল; তারপর মধ্যপথে প্রাণহরিবাবু বিলাতী হুইস্কির একটি বোতল বাহির করিলেন। ফণীশের মদ সহ্য হয় না। খাইলেই বমি আসে; সে খাইল না। আর সকলে খাইল। অরবিন্দ সবচেয়ে বেশী খাইল। খেলার বাজি উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল। সকলেই উত্তেজিত, কেবল প্রাণহরিবাবু নির্বিকার।

খেলার শেষে হিসাব হইল; অরবিন্দ প্রায় হাজার টাকা জিতিয়াছে, আর সকলে হারিয়াছে। প্রাণহরিবাবু দুইশত টাকা জিতিয়াছেন।

অতঃপর প্রতি হপ্তায় একদিন-দুইদিন খেলা বসে। খেলার কোনও দিন একজন হারে, কোনও দিন অন্য কেহ হারে; বাকি সকলে জেতে। প্রাণহরিবাবু কোনও দিনই বেশী হারেন না, মোটের উপর লাভ থাকে।

খেলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পার্শ্বাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল; তাহা মোহিনীকে লইয়া। মধুময় এবং মৃগেন্দ্র হয়তো ভিতরে ভিতরে মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অরবিন্দ একেবারে নির্লজ্জভাবে তাহার পিছনে লাগিল। খেলার দিন সকলের আগে প্রাণহরিবাবুর বাড়িতে যাইত এবং রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া মোহিনীর সহিত রসালাপ করিত। এমন কি দিনের বেলা প্রাণহরিবাবুর অনুপস্থিতি কালে সে তাঁহার বাড়িতে যাইত এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। মোহিনীর সহিত অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতা কতদূর গড়াইয়াছিল বলা যায় না, তবে মোহিনী যে স্তরের মেয়ে তাহাতে সে বড়মানুষের কৃপাদৃষ্টি উপেক্ষা করিবে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

যাহোক এই ভাবে পাঁচ-ছয় হপ্তা কাটিল। ফণীশের মনে শান্তি নাই, সে বন্ধুদের এড়াইবার চেষ্টা করে কিন্তু এড়াইতে পারে না; অরবিন্দ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। তারপর একদিন সকলেরই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তাহারা জানিতে পারিল প্রাণহরিবাবু পাকা জুয়াচোর, তাক বুঝিয়া হাত সাফাই করেন। খুব খানিকটা বচসা হইল, তারপর অতিথিরা খেলা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

হিসাবে জানা গেল অতিথিরা প্রত্যেকেই তিন-চার হাজার টাকা হারিয়াছে এবং সব টাকাই প্রাণহরির গর্ভে গিয়াছে। সবচেয়ে বেশী হারিয়াছে অরবিন্দ; প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

অরবিন্দ ক্লাবে বসিয়া আফসাইতে লাগিল—'আসুক না হাড়গিলে বুড়ো, ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো করব।' মধুময়, মৃগেন্দ্র মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল প্রাণহরিকে হাতে পাইলে তাহারাও ছাড়িয়া দিবে না।

প্রাণহরিবাবু কিন্তু হুঁসিয়ার লোক, তিনি আর ক্লাবে মাথা গলাইলেন না।

দিন সাতেক পরে অরবিন্দ বলিল,—'ব্যাটা গা-ঢাকা দিয়েছে। চল, ওর বাড়িতে গিয়ে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আসি।'

ফণীশ আপত্তি করিল,—'কি দরকার। টাকা যা যাবার সে তো গেছেই—'

অরবিন্দ বলিল,—'টাকা আমাদের হাতের ময়লা। কিন্তু ব্যাটা ঠকিয়ে দিয়ে যাবে? তুমি কি বলো মৃগেন?'

মৃগেন বলিল—'শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

মধুময় বলিল,—'ওর বাড়িতে একটা মেয়েলোক ছাড়া আর কেউ থাকে না, ভয়ের কিছু নেই।'

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় চারজন বাহির হইল। ক্লাবের অনতিদূরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড হইতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া প্রাণহরির বাড়ির দিকে চলিল। নিজেদের মোটরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়: ঐ রাস্তাটা নির্জন হইলেও, রাত্রিকালে উলুডাঙা কোলিয়ারি হইতে বহু যান-বাহন যাতায়াত করে। তাহারা প্রাণহরির বাড়ির কাছে চেনা মোটর দেখিতে পাইবে; তাছাড়া অভিযাত্রীদের মোটর-চালকেরা মূক-বধির নয়, তাহারা গল্প করিবে। কাহাকেও উত্তম-মধ্যম দিতে হইলে সাক্ষিসাবুদ যথাসম্ভব কম থাকিলেই ভাল।

প্রাণহরির বাড়ি হইতে একশো গজ দূরে ট্যাক্সি থামাইয়া চারজনে অবতরণ করিল। রাস্তা নিরালোক, মধুময়ের হাতে একটা বড় বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, তাহাই মাঝে মাঝে জ্বালিয়া জ্বালিয়া তাহারা বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরাইয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেল।

দ্বিতলের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। নীচে সদর দরজা খোলা। রান্নাঘর হইতে ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ আসিতেছে, মোহিনী

রান্না করিতেছে। সকলে শিকারীর মত নিঃশব্দে প্রবেশ করিল।

সদরে একটা লম্বা গোছের ঘর, তাহার বাঁ পাশ দিয়া দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। এইখানে দাঁড়াইয়া চারজনে নিম্নস্বরে পরামর্শ করিল, তারপর অরবিন্দ মধুময়ের হাত হইতে টর্চ লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—'সিঁড়ির মাথায় দরজা আছে, মজবুত দরজা। ভিতর থেকে বন্ধ কি বাইরে থেকে বন্ধ বোঝা গেল না। ইয়েল্ লক্ লাগানো।'

আবার পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, নীচের তলাটা ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখা দরকার। বুড়ো ভারি ধূর্ত, হয়তো উপরের ঘরে আলো জ্বালিয়া নীচে অন্ধকারে কোথাও লুকাইয়া আছে। অরবিন্দ রান্নাঘরের দ্বারে উঁকি মারিয়া আসিল, সেখানে মোহিনী দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া একা রান্না করিতেছে, অন্য কেহ নাই।

অতঃপর চারজনে পৃথকভাবে বাড়ির ঘরগুলা ও পিছনের খোলা জমি তল্লাস করিতে বাহির হইল।

পনরো মিনিট পরে সকলে সিঁড়ির নীচে ফিরিয়া আসিল। কেহই প্রাণহরিকে খুঁজিয়া পায় নাই। সুতরাং বুড়ো নিশ্চয় উপরেই আছে। অরবিন্দ বলিল,—'চল, আর একবার দোর ঠেলে দেখা যাক।'

এবার চারজনেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। বন্ধ কপাটে চাপ দিতেই কপাট খুলিয়া গেল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর প্রাণহরি পোদ্দার কাত হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার বিরল কেশ মাথার ডান পাশে লম্বা রক্তাক্ত একটা দাগ, তিনি যেন মাথার ডান দিকে সিঁথি কাটিয়া সিঁথির উপর সিঁদুর পরিয়াছেন। মুখ বিকৃত, দন্ত নিষ্ক্রান্ত; প্রাণহরি অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভেংচি কাটিতেছেন।

ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া চারজনে হুড়মুড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। তারপর একেবারে রাস্তায়।

ট্যাক্সির কাছে গিয়া দেখিল ট্যাক্সি ড্রাইভার স্টীয়ারিং হুইলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। সকলে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরস্পরকে সাবধান করিয়া দিল, তারপর গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ড্রাইভার জাগিয়া উঠিয়া গাড়ি চালাইয়া দিল।

চারজনে যখন ক্লাবে ফিরিল তখন মাত্র ন'টা বাজিয়াছে। তাহারা একান্তে বসিয়া পরামর্শ করিল। কাহাকেও কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণহরির অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ অবশ্য প্রকাশ পাইবে, কিন্তু তাহারা চারজন যে প্রাণহরির বাড়িতে গিয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ট্যাক্সি ড্রাইভারটা একশো গজ দূরে ছিল। সে তাহাদের প্রাণহরির বাড়িতে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। সুতরাং অভিযানের কথা বেবাক চাপিয়া যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

সেদিন সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্লাবে তাস খেলিয়া তাহারা গৃহে ফিরিল। যেন কিছুই হয় নাই।

পরদিন প্রাণহরির মৃত্যু সংবাদ শহরে রাষ্ট্র হইল বটে, কিন্তু ইহাদের চারজনের নাম ইহার সহিত জড়িত হইল না। তৃতীয় দিন পুলিশ অরবিন্দের বাড়িতে হানা দিল। পুলিস কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছে।

কিন্তু ইহারা চারজনই শহরের মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তি, তাই এখনও কাহারও হাতে দড়ি পড়ে নাই। বাহিরেও জানাজানি হয় নাই। পুলিস জোর তদন্ত চালাইয়াছে, সকলকেই একবার করিয়া ছুঁইয়া গিয়াছে। কখন কী ঘটে বলা যায় না। ফণীশের অবস্থা শোচনীয়। একদিকে খুনের দায়, অন্যদিকে কড়া-প্রকৃতি পিতৃদেব যদি জানিতে পারেন সে জুয়া খেলিতেছে এবং খুনের মামলায় জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে তিনি যে কী করিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফণীশের কাহিনী শেষ হইতে বারোটা বাজিয়া গেল। তাহাকে আশ্বাস দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'তোমাকে কোনো ভাবনার কিছু নেই, আমি রহস্য উদ্ঘাটনের ভার নিলাম। কাল আমরা শহরে বেড়াতে যাব, একটা গাড়ি চাই।'

ফণীশ বলিল,—'ড্রাইভারকে বলে দেব, ছোট গাড়িটা আপনাদের জন্যেই মোতায়েন থাকবে।'

ফণীশ চলিয়া গেল। আমরা আলো নিভাইয়া শয়ন করিলাম। নিজের খাটে শুইয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, মৃদুমন্দ টানিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি বুঝলে?'

ব্যোমকেশ বলিল,— 'পাঁচজন আসামীর মধ্যে মাত্র একজনকে দেখেছি। বাকি চারজনকে না দেখা পর্যন্ত কিছু বলা শক্ত।'
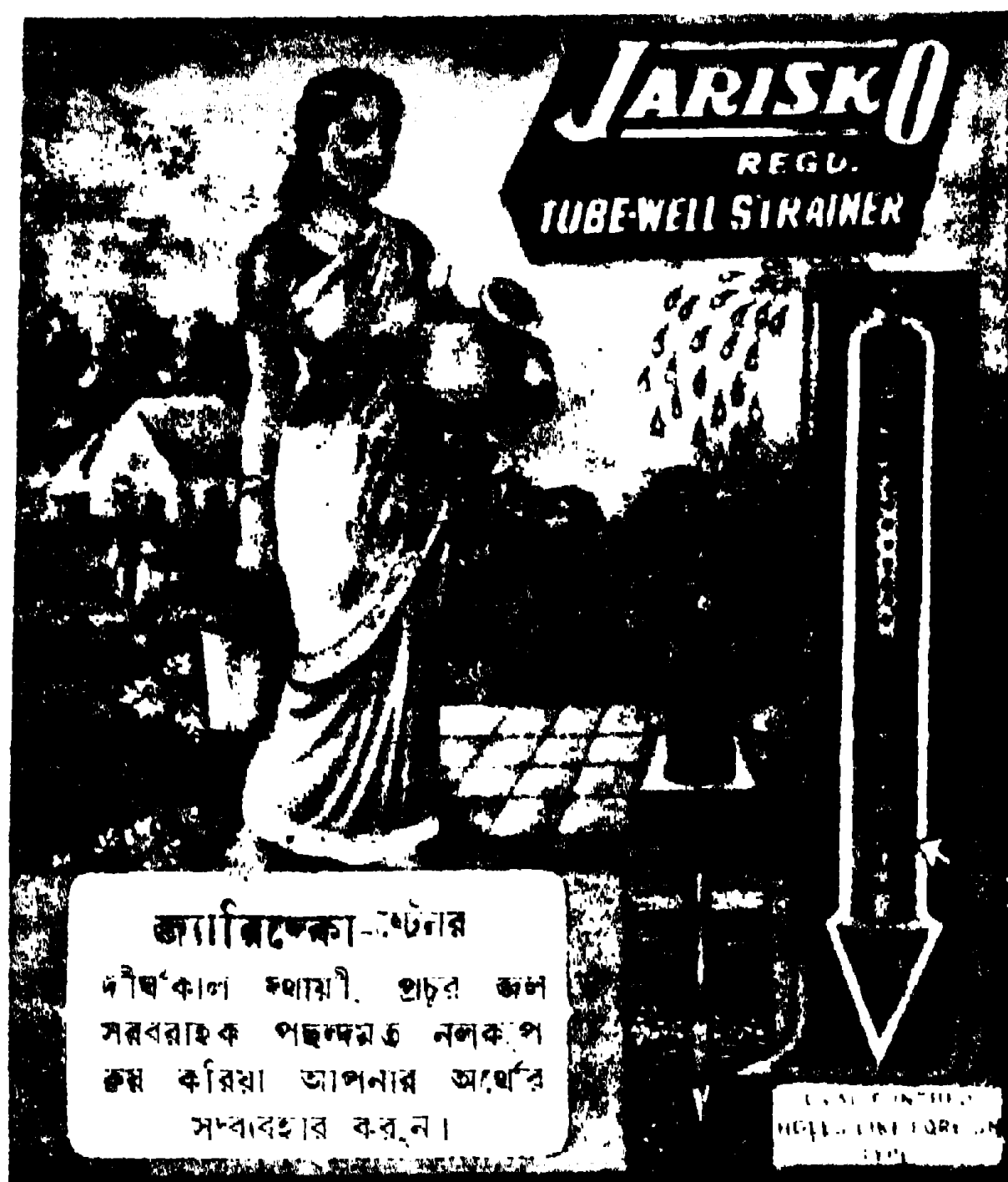
'পাঁচজন আসামী!'

'হ্যাঁ। চাকরাণীটাকে বাদ দেওয়া যায় না।'

আর কথা হইল না। প্রাণহরি পোদ্দারের জীবন-লীলার বিচিত্র পরিসমাপ্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

।। দুই ।।

সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখি ব্যোমকেশ টেবিলে বসিয়া পরম মনোযোগের সহিত চিঠি লিখিতেছে। গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া

বসিলাম, আড়ামোড়া ভাঙিয়া বলিলাম,—'কাকে চিঠি লিখছ? সত্যবতীকে? দু'দিন যেতে না যেতেই বিরহ চাগাড় দিল নাকি?'

ব্যোমকেশ লিখিতে লিখিতে বলিল, 'বিরহ নয়—বিকাশ।'

'বিকাশ!'

'বিকাশ দত্ত।'

'ও—বিকাশ। তাকে চিঠি লিখছ কেন?'

'বিকাশের জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করেছি। কয়লাখনির ডাক্তারখানায় আর্দালির চাকরি। তাই তাকে আসতে লিখছি।'

'বুঝেছি।'

ব্যোমকেশ আবার চিঠি লেখায় মন দিল। সে বিকাশকে আনিয়া কয়লাখনিতে বসাইতে চায়, নিজে দূরে থাকিয়া কয়লাখনির তত্ত্ব সংগ্রহ করিবে। আপনি, রইলেন ডরপানিতে পোলারে পাঠাইলেন চর।—

প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম আজ ইন্দিরার মুখ অনেকটা প্রফুল্ল; দ্বিধা সংশয়ের মেঘ ফুঁড়িয়া সূর্যের আলো ঝিকমিক করিতেছে। ফণীশ তাহাকে ব্যোমকেশের আশ্বাসের কথা বলিয়াছে।

আজও আমরা দু'জনে প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেছি, দুই কর্তা বহু পূর্বেই কর্মস্থলে চলিয়া গিয়াছেন। ব্যোমকেশ টোস্ট্ চিবাইতে চিবাইতে ইন্দিরার প্রতি কটাক্ষপাত করিল, বলিল,—'তোমার কর্তাটি একেবারে ছেলেমানুষ।'

ইন্দিরা লজ্জিতভাবে চক্ষু নত করিল; তারপর তাহার চোখে আবার উদ্বেগ ও শঙ্কা ফিরিয়া আসিল। এই মেয়েটির মনে স্বামী সম্বন্ধে আশঙ্কার অন্ত নাই; ব্যোমকেশ তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল,—'ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা এখন বেরুচ্ছি।'

ইন্দিরা চোখ তুলিয়া বলিল,—'কোথায় যাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'এই এদিক ওদিক। ফিরতে বোধ হয় দুপুর হবে। কর্তা যদি জিগ্যেস করেন, বোলো শহর দেখতে বেরিয়েছি।'

আহার শেষ হইলে আমরা উঠিলাম। মোটর-ড্রাইভার আসিয়া জানাইল, দ্বারে প্রস্তুত গাড়ি।

গাড়িতে উঠিয়া ব্যোমকেশ ড্রাইভারকে হুকুম দিল—'আগে পোস্ট-অফিসে চল।'

পোস্ট-অফিসে গিয়া চিঠিখানাতে এক্সপ্রেস ডেলিভারি টিকিট সাঁটিয়া ডাকে দিল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া ড্রাইভারকে বলিল,—'এবার থানায় চল। সদর থানা।'

থানার সিংহদ্বারে কনেস্টবলের পাহারা। ব্যোমকেশ বড়দারোগাবাবুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে সে একখন্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিল—'নাম আর দরকার লিখে দিন,—এত্তালা পাঠাচ্ছি।'

ব্যোমকেশ কাগজে লিখিল,—'গগন মিত্র। মণীশ চক্রবর্তীর কয়লাখনি সম্পর্কে।'

অল্পক্ষণ পরে কনেস্টবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'আসুন।'

ভিতরের একটি ঘরে ইউনিফর্ম পরা দারোগাবাবু টেবিলের সামনে বসিয়া আছেন, আমরা প্রবেশ করিলে মুখ তুলিলেন, তারপর লাফাইয়া আসিয়া ব্যোমকেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—'এ কি কান্ড! আপনি গগন মিত্র হলেন কবে থেকে!'

গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিলাম—প্রমোদ বরাট। কয়েক বছর আগে গোলাপ কলোনী সম্পর্কে কিছুদিনের জন্য ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পুলিসের চাকরি ভবঘুরের চাকরি, তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে এই শহরের সদর থানার দারোগাবাবু হইয়া আসিয়াছেন। নিকষ-কৃষ্ণ চেহারা এই কয় বছরে একটু ভারী হইয়াছে; মুখের ধার কিন্তু লেশমাত্র ভোঁতা হয় নাই।

সমাদর করিয়া আমাদের বসাইলেন। কিছুক্ষণ অতীত-চর্বণ চলিল। তারপর ব্যোমকেশ আমাদের এই শহরে আসার কারণ বলিল; শুনিয়া প্রমোদবাবু বলিলেন,—'হুঁ, ফুলঝুরি কয়লাখনির কেসটা আমাদের ফাইলে আছে, কিন্তু কিছু করা গেল না। এসব কাজ পুলিসের দ্বারা ভাল হয় না; আমাদের অনেক লোক নিয়ে কাজ করতে হয়, মন্ত্রগুপ্তি থাকে না। আপনি পারবেন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বিকাশ দত্তকে মনে আছে? তাকে ডেকে পাঠালাম, সে কয়লাখনিতে থেকে সুলুক-সন্ধান নেবে।'

প্রমোদবাবু বলিলেন,—'বিকাশকে খুব মনে আছে। চৌকশ ছেলে। তা আমাকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনার কাছে ও-কাজের জন্যে আমি আসিনি প্রমোদবাবু। সম্প্রতি এখানে একটা খুন হয়েছে, প্রাণহরি পোদ্দার নামে এক বৃদ্ধ—'

'আপনি তার খবরও পেয়েছেন?'

'না পেয়ে উপায় কি! আমরা যাঁর বাড়িতে অতিথি তাঁর ছেলেই তো আপনার একজন আসামী।'

প্রমোদ বরাট মুখের একটি করুণ ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'বড় মুস্কিলে পড়েছি ব্যোমকেশবাবু। যে চারজনের ওপর সন্দেহ তারা সবাই এ শহরের হর্তাকর্তা, প্রচন্ড দাপট। তাই ভারি সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। সাক্ষী-সাবুদ নেই, সবই circumstantial evidence, এদের কাউকে যদি ভুল করে গ্রেপ্তার করি, আমারই গর্দান যাবে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'এই চারজনের মধ্যে কার ওপর আপনার সন্দেহ?'

প্রমোদবাবু ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন,—'চারজনেরই মোটিভ্ সমান, চারজনেরই সুযোগ সমান। তবু মনে হয় এ অরবিন্দ হালদারের কাজ।'

'চারজনে এক জোট হয়ে খুন করতে গিয়েছিল এমন মনে হয় না?'

'না।'

'বাড়িতে একটা দাসী ছিল, তার কথা ভেবে দেখেছেন?'

'দেখেছি। তার সুযোগ ছিল সব চেয়ে বেশী কিন্তু মোটিভ্ খুঁজে পাইনি।'

'হুঁ। আপনি যা জানেন সব আমাকে বলুন, হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'সাহায্য করবেন আপনি? ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য পাওয়া তো ভাগ্যের কথা ব্যোমকেশবাবু।'

অতঃপর প্রমোদ বরাট যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ এই—

যে-রাত্রে প্রাণহরি পোদ্দার মারা যান সে-রাত্রে আন্দাজ দশটার সময় উলুডাঙা কোলিয়ারির দিক হইতে একটা ট্রাক আসিতেছিল। ট্রাক ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ি থামাইল, কারণ একটা স্ত্রীলোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে থামিতে বলিতেছে। গাড়ি থামিলে স্ত্রীলোকটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, শিগ্‌গির পুলিসে খবর দাও, এ বাড়ির মালিককে কারা খুন করেছে।'

ট্রাক-ড্রাইভার আসিয়া থানায় খবর দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ইন্সপেক্টর বরাট সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ওকুস্থলে উপস্থিত হইলেন। মেয়েটা তখনও ব্যাকুল চক্ষে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নাম মোহিনী, প্রাণহরির গৃহে সেই একমাত্র দাসী, অন্য কোনও ভৃত্য নাই।

ইন্সপেক্টর বরাট বাড়ির দ্বিতলে উঠিয়া লাস দেখিলেন; তাঁহার অনুচরেরা বাড়ি খানাতল্লাস করিল। বাড়িতে অন্য কোনও লোক নাই। মোহিনীকে

প্রশ্ন করিয়া জানা গেল সে নীচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি কুঠুরিতে শয়ন করে; কর্তাবাবু শয়ন করেন উপরের ঘরে। আজ সন্ধ্যার সময় শহর হইতে ফিরিয়া তিনি নীচের ঘরে বসিয়া চা পান করিয়াছিলেন, তারপর উপরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। মোহিনী রান্না আরম্ভ করিয়াছিল। বাবু ন'টার পর নীচে নামিয়া আসিয়া আহার করেন। আজ কিন্তু তিনি নামিলেন না। আধঘণ্টা পরে মোহিনী উপরে ডাকিতে গিয়া দেখিল ঘরের মেঝেয় কর্তাবাবু মরিয়া পড়িয়া আছেন।

লাস চালান দিয়া বরাট মোহিনীকে আবার জেরা করিলেন। জেরার উত্তরে সে বলিল, সন্ধ্যার পর বাড়িতে কেহ আসে না; কিছুদিন যাবৎ চারজন বাবু রাত্রে তাস খেলিতে আসিতেন; যেদিন তাঁহাদের আসিবার কথা সেদিন বাবু শহর হইতে মাছ, মাংস, কিমা ইত্যাদি কিনিয়া আনিতেন, মোহিনী তাহা রাঁধিয়া বাবুদের খাইতে দিত। আজ বাবুরা আসেন নাই। রন্ধনের আয়োজন ছিল না। বাবুরা চারজনই যুবাপুরুষ, কর্তাবাবুর মত বুড়া নয়। তাঁহারা মোটরে চড়িয়া আসিতেন; সাজপোশাক হইতে তাঁহাদের ধনী বলিয়া মনে হয়। মোহিনী তাঁহাদের নাম জানে না। আজ সে যখন রান্না করিতেছিল তখন কেহ বাড়িতে আসিয়াছিল কিনা তাহা সে বলিতে পারে না। বাড়িতে লোক আসিলে প্রাণহরি নীচের তলায় তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতেন, উপরের ঘরে কাহাকেও লইয়া যাইতেন না। কর্তাবাবু আজ নীচে নামেন নাই, নামিলে মোহিনী কথা-বার্তার আওয়াজ শুনিতে পাইত।—

জেরা শেষ করিয়া বরাট বলিলেন,—'তুমি এখন কি করবে? শহরে তোমার জানাশোনা লোক আছে?'

মোহিনী বলিল,—'না, এখানে আমি কাউকে চিনি না।'

বরাট বলিলেন,—'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে চল, রাত্তিরটা থানায় থাকবে, কাল একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি মেয়েমানুষ, একলা এ বাড়িতে থাকতে পারবে কেন?'

মোহিনী বলিল,—'আমি পারব। নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে থাকব। আমার ভয় করবে না।'

সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। বরাট একজন কনেস্টবলকে পাহারায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রাণহরি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া প্রমোদবাবু জানিতে পারিলেন প্রাণহরি কয়লা ক্লাবের মেম্বর ছিলেন। সেখানে গিয়া খবর পাইলেন, প্রাণহরি চারজন মেম্বরের সঙ্গে নিয়মিত তাস খেলিতেন। ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হইল; এই চারজন যে প্রাণহরির বাড়িতে তাস খেলিতে যাইতেন তাহা অনুমান করা গেল।

প্রমোদবাবু চারজনকে পৃথকভাবে জেরা করিলেন। তাহারা স্বীকার করিল যে মাঝে মাঝে প্রাণহরির বাড়িতে তাস খেলিতে যাইত, কিন্তু প্রাণহরির মৃত্যুর রাত্রে তাহার বাড়িতে গিয়াছিল একথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিল।

তাহাদের চারজন মোটর-ড্রাইভারকে প্রমোদ বরাট প্রশ্ন করিলেন। তিনজন ড্রাইভার বলিল সে-রাত্রে বাবুরা মোটরে চড়িয়া প্রাণহরির বাড়িতে যান নাই। কেবল একজন বলিল, বাবুরা রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় একসঙ্গে ক্লাব হইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু মোটরে না গিয়া পদব্রজে গিয়াছিলেন, এবং ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা একসঙ্গে কোথায় গিয়াছিলেন তাহা সে জানে না।

বরাট তখন ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের মধ্যে খোঁজ-খবর লইলেন, শহরে গোটা পঞ্চাশ ট্যাক্সি আছে। শেষ পর্যন্ত একজন ড্রাইভার অন্য একজন ড্রাইভারকে দেখাইয়া বলিল—ও সে-রাত্রে ভাড়ায় গিয়াছিল, ওকে জিজ্ঞাসা করুন। দ্বিতীয় ড্রাইভার তখন বলিল—উক্ত রাত্রে চারজন আরোহী লইয়া সে উলডাঙা কয়লা-খনির রাস্তায় গিয়াছিল। বরাট ড্রাইভারকে কয়লা ক্লাবে আনিয়া চুপিচুপি চারজনকে দেখাইলেন। ড্রাইভার চারজনকে সনাক্ত করিল।

তারপর বরাট চারজনকে বার বার জেরা করিয়াছেন কিন্তু তাহারা অটল-ভাবে সমস্ত কথা অস্বীকার করিয়াছে। পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে এই যে, একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার ছাড়া অন্য সাক্ষী নাই; এ অবস্থায় শহরের চারজন গণ্যমান্য লোককে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা যায় না।

বয়ান শেষ করিয়া বরাট বলিলেন,—'আমি যতটুকু জানতে পেরেছি আপনাকে জানালাম। তবে একটা অবান্তর কথা বোধ হয় আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল। অন্যতম আসামীর দাদা গোবিন্দ হালদার আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিতে এসেছিলেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ভারি কৌশলী লোক। আমাকে আড়ালে ডেকে ইশারায় জানিয়েছিলেন যে, কেসটা যদি চাপা দিই তাহলে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ পাব।'

।। খ ।।

ঘড়িতে দেখিলাম বেলা সাড়ে ন'টা।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনার এখন কোনো জরুরী কাজ আছে কি? ওকুস্থলটা দেখবার ইচ্ছে আছে।'

বরাট বলিলেন,—'বেশ তো চলুন না।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'মেয়েটা এখনো ওখানেই আছে নাকি?'

বরাট বলিলেন,—'আছে বৈকি। তার কোথাও যাবার নেই, ঐ বাড়িতেই পড়ে আছে।'

তিনজনে বাহির হইলাম; প্রমোদ-বাবু আমাদের গাড়িতেই আসিলেন। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে ব্যোমকেশ ড্রাইভারকে বলিল,—'যে-বাড়িতে বাবুরা তাস খেলতে যেতেন সেই বাড়িতে নিয়ে চল।'

ড্রাইভারের নির্বিকার মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না, সে নির্দেশ মত গাড়ি চালাইল।

দশ মিনিট পরে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়ির সামনে মোটর থামিল। বাড়ির সদরে কেহ নাই। বাড়িটা দেখিতে একটু উলঙ্গ গোছের; চারিপাশে পাঁচিলের বেড়া নাই, রাস্তা হইতে কয়েক হাত পিছাইয়া আগ্রহীনভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সদর দরজা খোলা।

বরাট ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন,—'হতভাগা কনেস্টবলটা গেল কোথায়?'

বরাট আগে আগে, আমরা তাঁহার পিছনে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রান্নাঘরের দিক হইতে হেঁড়ে গলার আওয়াজ আসিতেছে। সেইদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম উর্দি-পরা পাহারালা গোঁফে চাড়া দিতে দিতে রান্নাঘরের দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া অন্তবর্তিনীর সহিত রসালাপ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

বরাট আরক্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিলেন, সে কলের পুতুলের মত স্যালুট করিল। বরাট বলিলেন,—'বাইরে যাও। সদর দরজা খোলা রেখে, তুমি এখানে কি করছ?'

বরাটের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক। অতি বড় নিরেট ব্যক্তিও বুঝিতে পারে পাহারালা এখানে কি করিতেছিল। মক্ষিকা মধুভাণ্ডের কাছে কী করে?

পাহারালা আবার স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল। বরাট তখন রান্নাঘরের ভিতরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। মোহিনী মেঝেয় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল, ত্বরিতে উঠিয়া বরাটের পানে সপ্রশ্ননেত্রে চাহিল।

কালো মেয়েটার সারা গায়ে—

চোখে অংগসঞ্চালনে—কুহকভরা ইন্দ্রজাল, ভরা যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণ। যদি রঙ ফরসা হইত তাহাকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলিত। তবু, তাহার কালো রঙের মধ্যেও এমন একটি নিশীথ-শীতল মাদকতা আছে যে মনকে আবিষ্ট করিয়া ফেলে।

কিন্তু প্রমোদ বরাট কাঠখোট্টা মানুষ, তিনি বলিলেন,—'তুমি তাজা তরকারি পেলে কোথায়?'

মোহিনী বলিল,—'পাহারালাবাবু এনে দিয়েছেন। উনি নিজের সিধে তরিতরকারি আমাকে এনে দেন, আমি রেঁধে দিই। আমারও হয়ে যায়।'

বরাট গলার মধ্যে শব্দ করিয়া বলিলেন,—'হুঁ; ভারি দয়ার শরীর দেখছি পাহারালাবাবুর।'

মোহিনী বক্রোক্তি বুঝিল কিনা বলা যায় না, প্রশ্ন করিল,—'আমাকে কি দরকার আছে দারোগাবাবু?'

প্রমোদবাবু বলিলেন,—'তুমি এখানেই থাকো। আমরা খানিক পরে তোমাকে ডাকব।'

'আচ্ছা।'

আমরা সদর দরজার দিকে ফিরিয়া চলিলাম। চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ স্মিতমুখে বলিল,—'আপনি একটু ভুল করেছেন ইন্সপেক্টর বরাট। আপনার উচিত ছিল একজন বুড়ো পাহারালাকে এখানে বসানো।'

বরাট বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনি ওদের চেনেন না। পাহারালারা যত বুড়ো হয় তাদের রস তত বাড়ে।'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল,—'আর সুদখোর মহাজনেরা?'

বরাট চকিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর নিম্নস্বরে বলিলেন,—'সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না, ব্যোমকেশবাবু। কিন্তু পরিস্থিতি সন্দেহজনক। আপনি মেয়েটাকে জেরা করে দেখুন না, বুড়োর সংগে ওর কোনো রকম ছিল কিনা।'

'দেখব।

সদর দরজার পাশে উপরে উঠিবার সিঁড়ি দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির মাথায় মজবুত ভারি দরজা, তাহাতে ইয়েল-লক্ লাগানো। বাড়ির অন্যান্য দরজার তুলনায় এ দরজা নূতন বলিয়া মনে হয়। হয়তো প্রাণহরি পোদ্দার বাড়ি ভাড়া লইবার পর এই ঘরে নূতন দরজা লাগাইয়াছিলেন।

বরাট পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দ্বার খুলিলেন। আমরা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তারপর বরাট একটা জানলা খুলিয়া দিতেই রৌদ্রোজ্জ্বল আলো ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে দুটি জানালা দুটি দ্বার। একটি দ্বার সিঁড়ির মুখে, অন্যটি পিছনের দেয়ালে। ঘরটি লম্বায় চওড়ায় আন্দাজ পনেরো ফুট চৌকশ। ঘরে আসবাব বিশেষ কিছু নাই; একটা তক্তপোষের উপর বিছানা, তাহার শিয়রের দিকে দেয়াল ঘেঁষিয়া একটা জগদ্দল লোহার সিন্দুক। একটা দেয়াল-আলনা হইতে প্রাণহরির ব্যবহৃত জামা কাপড় ঝুলিতেছে। প্রাণহরির টাকার অভাব ছিল না, কিন্তু জীবন যাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্ত মামুলি। মাথার কাছে লোহার সিন্দুক লইয়া দরজায় ইয়েল্ লক্ লাগাইয়া তিনি তক্তপোষের মলিন শয্যায় শয়ন করিতেন।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু চক্ষু বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'লাস কোথায় ছিল?'

সিঁড়ির দরজা হইতে হাত চারেক দূরে মেঝের দিকে আঙুল দেখাইয়া বরাট বলিলেন,—'এইখানে।'

ব্যোমকেশ নত হইয়া স্থানটা পরীক্ষা করিল, বলিল, 'রক্তের দাগ তো বিশেষ দেখছি না। সামান্য ছিটেফোঁটা।'

বরাট বলিলেন,—'বুড়োর গায়ে কি রক্ত ছিল। চেহারাটা ছিল বেউড় বাঁশের মত।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'অবশ্য মাথার খুলি ভাঙলে বেশী রক্তপাত হয় না।—মারণাস্ত্রটা পাওয়া গেছে?'

'না। ঘরে কোন অস্ত্র ছিল না। বাড়িতেও এমন কোনো কিছু পাওয়া যায়নি যাকে মারণাস্ত্র মনে করা যেতে পারে। বাড়ির চারিপাশে বহু দূর পর্যন্ত খুঁজে দেখা হয়েছে, মারণাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

'যাক। সিন্দুক খুলে দেখেছিলেন নিশ্চয়। কি পেলেন?'

'সিন্দুকের চাবি পোদ্দারের কোমরে ছিল। সিন্দুক খুলে পেলাম হিসেবের খেরো-বাঁধানো খাতা আর নগদ দশ হাজার টাকা।'

'দশ হাজার টাকা!'

'হ্যাঁ। বুড়োর মহাজনী কারবার ছিল তাই বোধহয় নগদ টাকা কাছে রাখতো।'

'হুঁ। ব্যাঙ্কে টাকা ছিল?'

'ছিল। এবং এখনো আছে। কে পাবে জানি না। টাকা কম নয়, প্রায় দেড় লাখ।'

'তাই নাকি! আত্মীয়-স্বজনরা খবর পেয়েছে?'

বোধহয় কেউ নেই। থাকলে শকুনির পালের মত এসে জুটত।'

শহরে বুড়োর একটা অফিস ছিল শুনেছি। সেখানে তল্লাস করে কিছু পেয়েছিলেন?'

'অফিস মানে চোর-কুটুরির মতন একটা ঘর।—দু'চারটে খাতাপত্তর ছিল, তা থেকে মনে হয় মহাজনী কারবার ভাল চলত না।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে কতকটা নিজমনেই বলিল,—'মহাজনী কারবার ভাল চলত না, অথচ ব্যাঙ্কে দেড় লাখ এবং সিন্দুকে দশ হাজার'—চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে বলিল,—'ওই অন্য দরজাটার বাইরে কি আছে?'

বরাট বলিলেন,—'স্নানের ঘর ইত্যাদি।'

এ দরজাটাও নূতন মজবুত দরজা। প্রাণহরি পোদ্দার ঘরটিকে দুর্গের মত সুরক্ষিত করিয়া ছিলেন, কারণ সিন্দুকে মাল আছে।

ব্যোমকেশ দরজা খুলিল। সংকীর্ণ ঘরে পিছনের দেয়ালে একটি ঘুলঘুলি দিয়া আলো আসিতেছে, ঘুলঘুলির সরু একটি দরজা। ঘরে একটি শূন্য বালতি ও টিনের মগ ছাড়া আর কিছু নাই।

সরু দরজার উপরে নীচে ছিটকিনি লাগানো। ব্যোমকেশ ছিটকিনি খুলিয়া কবাট ফাঁক করিল। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, দ্বারের মুখ হইতে শীর্ণ লোহার মই মাটি পর্যন্ত গিয়াছে। মেথর-খাটা রাস্তা; প্রাণহরির দুর্গে প্রবেশ করিবার দ্বিতীয় পথ।

ব্যোমকেশ বরাটকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি সে রাত্রে যখন প্রথম এসেছিলেন, এ দরজা দুটো বন্ধ ছিল?'

বরাট বলিলেন,—'হ্যাঁ, দুটোই বন্ধ ছিল। কেবল সামনে সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'চলুন এবার নীচে যাওয়া যাক। মেয়েটাকে দু'চারটে প্রশ্ন করে দেখি।' —ক্রমশঃ

কিংবদন্তীর পাখি

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কাহিনী-গুলি আলোচনা করলে জানা যায় মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে পাখিদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ছিল। বেদ থেকে শুরু করে হিতোপদেশের গল্পগুলিতে পর্যন্ত দেখা যায় মানুষের জীবননাট্যে তাদেরও ভূমিকা নেহাত সামান্য নয়। তারাও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। এ প্রসঙ্গে রামায়ণ কাহিনীর জটায়ুর কথাই প্রথমে ধরা যেতে পারে। সীতার উদ্ধার সাধনে সে স্বীয় জীবন দান করেছিল। এ জাতের পাখির বংশ পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হলেও জটায়ুর কথা সহজে কেউ ভুলতে পারে না। কাদম্বরীর সেই শুকপক্ষীর কথাও ভুলতে পারা দুরূহ—সম্ভবত তার জন্যেই অনন্যা নারী মহাশ্বেতার হদিস পাওয়া গেল। হিতোপদেশের পক্ষী-চরিত্রগুলির আচরণ তো প্রায় হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের মতো—সময়ে অসময়ে নানান উপদেশ দিয়ে তারা আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে, তাদের অসাধারণ জ্ঞান সমূহ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে সাহায্য করেছে।

বৈদিক সাহিত্য-কুঞ্জও নানা জাতের পাখির কলতানে মুখর। কত পাখির ইতিবৃত্ত, নাম-ধাম যে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। এই থেকে সহজেই অনুমান করা যায় আর্য-জীবনযাত্রায় পাখিদের অবদান অল্প ছিল না। ঋগ্বেদে দেখি, ঋষি গৃৎসমদ সুধাকণ্ঠ কপিঞ্জলকে (শুক জাতীয় পাখি) উদ্দেশ করে বলছেন, 'হে বিহঙ্গ, তোমার মঙ্গল-সংগীতে উত্তর-দক্ষিণ, সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ—সর্বদিক মুখরিত করো।' কোনো শুভ-কর্মের উদ্যোগ-পর্বে বিহঙ্গের গানকে শুভসূচনাসূচক বলা হত। ভরদ্বাজ পাখি (স্কাইলার্ক) আকাশের অনেক উঁচুতে, মেঘের শিখরদেশ থেকে যে গান করে—তার প্রশংসায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবিকুল পঞ্চমুখ। শকুনের সঙ্গে তেমনি অমঙ্গলজনক ঘটনার যোগাযোগ আছে এমন বিশ্বাসও বিরল নয়।

পাখির সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

মহাভারতের একটি অতিপরিচিত উপাখ্যানে পাওয়া যায় যে, ঋষি বিশ্বামিত্র ও স্বর্গের অপ্সরী মেনকা যখন তাঁদের নবজাত কন্যাকে নির্জন কুঞ্জে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন তখন শকুন্তের ডানার আড়ালে শকুন্তলা সুরক্ষিত থাকল। ব্যাধের বাণবিদ্ধ হয়ে ক্রৌঞ্চ যখন প্রাণত্যাগ করে তখন জোড়ভাঙা ক্রৌঞ্চীর আর্তনাদে বিগলিত হয়ে বাল্মীকি মুনিবর ব্যাধকে বহু অভিসম্পাত দিয়েছিলেন। সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত আছে যে, চকোরেরা চাঁদের আলোক পান করে থাকে। বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকার এক সুন্দরী চকোরীর বর্ণনায় দেখি যে, সে চাঁদের আলোর সুধা পান করে রভসে বিবশা।

চাতকের সম্বন্ধে পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, এরা বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্য কোনো জল পান করে না। তৃষ্ণার্ত হলেও এরা বৃষ্টির স্ফটিক জলের জন্যে অপেক্ষা করে। বৃষ্টির স্পর্শে যেমন কদম্ব বিকশিত হয় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চাতকের তৃষ্ণাও নিবারিত হয়। অলংকার শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, এরা দেবরাজ ইন্দ্র ব্যতীত কোনো দেবতাকে জলবিন্দুর জন্য প্রার্থনা জানায় না। শূন্যক্ষরা বৃষ্টিবিন্দু বৃষ্টির দেবতার কৃপাকণার মতই চাতকের কণ্ঠ ভিজিয়ে দেয়।
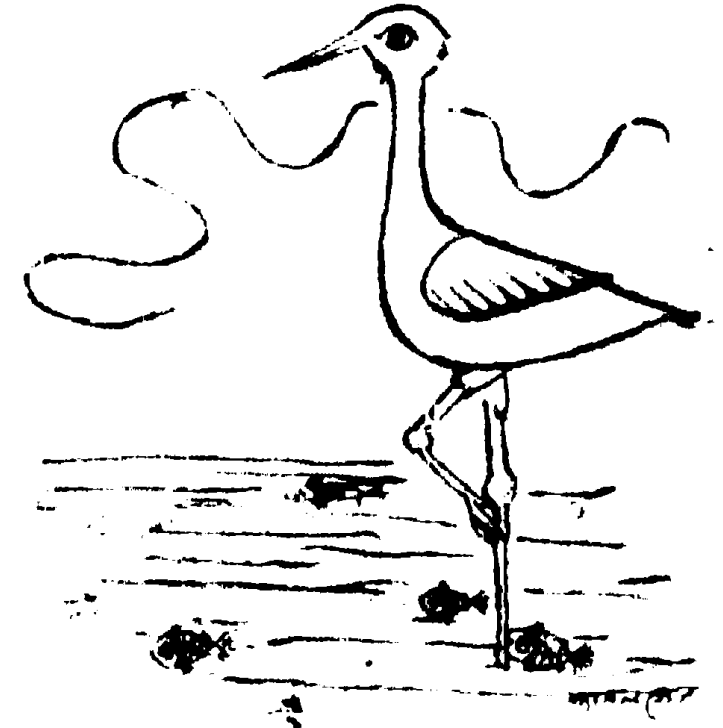
সংস্কৃত সাহিত্যে বককে প্রতারক ও দুষ্ট-চরিত্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যে ভণ্ডপ্রতারক অপরকে ভুলিয়ে শঠতার দ্বারা নিজের খপ্পরে এনে ফেলতে পারে বক যেন তারই প্রতীক। তাই বক-ধার্মিক কথাটি পৌরাণিক যুগ থেকেই চালু হয়ে আসছে। মনু-স্মৃতির আখ্যানভাগে এই 'বকব্রতী' প্রতারকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এরা ধ্যানমগ্নের

ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে সর্বদা নিজ স্বার্থ সাধনের কথাই চিন্তা করে। ধ্যান-মগ্নতা অপরকে চক্ষুদান দেওয়ার চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। মাছের প্রত্যাশায় পুকুর-পাড়ে একপায়ে অব-স্থানরত বকের ভালোমানুষির ছবিটি এর সঙ্গে মেলে। শ্রীকৃষ্ণের সামনে বক নামে এক রাক্ষস বকের মূর্তি ধরে একদা হাজির হয়েছিল; সেই থেকে বক-ধার্মিক এই কিংবদন্তী চালু হয়ে আসছে।

'কুবলয়ানন্দ' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে কাকের নিন্দা ও কোকিলের স্তুতি করে বহু সুপাঠ্য স্তবক লিখিত হলেও কাকের বাসায় কোকিলের ছানা প্রতি-পালিত হওয়ায় কোকিল সম্বন্ধে 'পরভৃত' আখ্যা দেওয়া হয় এবং তা নিঃসন্দেহে কোকিলকুলের গৌরব বর্ধন করে না। কাকের কর্কশ রবের জন্যে কাক ঘৃণিত হলেও তাকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে তিনটি সূত্রের নামকরণ করে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

প্রথম সূত্রটির নাম 'কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়'। কাককে এস্থলে একদৃষ্টি বা একাক্ষ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে কেননা প্রয়োজনে অক্ষিগোলককে চক্ষুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষেই সম্ভব।

বিশেষ বাক্য-বিন্যস্ত কোনো কোনো শব্দাবলী সম্বন্ধে এই সূত্র প্রযোজ্য. সাধারণ অর্থ ভিন্নও যে-যে শব্দাবলীতে অর্থান্তরের আভাস আছে।

রামায়ণের কাহিনীতে পাওয়া যায় যে, চতুর্দশ বৎসর বনবাস কালে একদা কুটিরমধ্যে রাম যখন সীতার অঙ্কে বিশ্রাম-সুখে নিদ্রামগ্ন তখন কাকাসুর কাকের রূপ ধারণ করে সীতার বসন-চ্যুত স্তনবৃন্তে ঠুকরে ক্ষত করে দেয়। সীতার বক্ষস্থলে থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে রামের অঙ্গ সিক্ত হলে রাম আচমকা জেগে উঠে ব্যাপারটা চকিতে বুঝে নিয়েই ধনুর্বাণ হাতে কাকাসুরকে তাড়না করেন। সত্বর পলায়নের চেষ্টায় বিফল হয়ে কাকাসুর বহু অনুনয়-বিনয় ও ক্ষমা ভিক্ষা করলে রাম তাকে প্রাণে মারেন না বটে কিন্তু তাঁর হাতের নিক্ষিপ্ত বাণে কাকাসুরের একটি চক্ষু বিদ্ধ হয় ও সে একচক্ষু হয়ে যায়। কাককে একচক্ষু আখ্যা দেওয়ার মূলে এই কিম্বদন্তী আছে। কাক সম্বন্ধে দ্বিতীয় সূত্রটির নাম 'কাক-দন্ত-গবেষণা'। কোনো ফলহীন কর্মে ব্যাপৃত থাকা কাকের দন্ত নিয়ে গবেষণা করার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেননা কাকের দন্ত যেমন আদপে নেই তেমনি অর্থহীন কর্মে ব্যস্ত থাকাও সাফল্য-বিহীন।

এ বিষয়ে, তৃতীয় সূত্রটির নাম 'কাক-তালীয় ন্যায়' যার সঙ্গে অনেকেরই পরিচিতি আছে। তালবৃক্ষের শাখায় একটি কাক উড়ে এসে বসলো। বসার সঙ্গে সঙ্গেই একটি তাল শাখাচ্যুত হয়ে তার মাথায় পতিত হলো। সেই গুরুভারে কাকটি প্রাণ-ত্যাগ করলো। মানুষের হাতের বাইরে কোনো বিধি নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে ব্যাপারটাকে তুলনা করা হয়ে থাকে।

বশিষ্ট রামায়ণে যে কাকভূষণ্ডের উল্লেখ আছে সে প্রাণায়াম ও যোগাভ্যাস দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছিল। কৈলাস পর্বতে কল্পবৃক্ষে উপবিষ্ট সেই কাকের সঙ্গে বশিষ্টের কথো-পকথনে জানা যায় যে, বিষ্ণুর শততম, বশিষ্টের অষ্টতম, বুদ্ধের সহস্রতম, রামের একাদশতম এবং কৃষ্ণের দশতম জন্ম অবলোকন করেছে।

কোনো কোনো পুরাণ-কাহিনীতে কাককে শনির আজ্ঞাবহ বাহনরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যানে কাকের সাহায্যেই শনিদেব নলের শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে নলরাজার অশেষ দুর্গতি সাধন করেন।

অদ্ভুত রামায়ণের একটি মনোজ্ঞ কাহিনীতে পাই--শ্রীকৃষ্ণ একদা অহঙ্কারী নারদের দর্প এমনভাবে চূর্ণ করে-ছিলেন যে সে সময় নারদমুনিকে বাধ্য হয়ে এক পেচকের কাছে সঙ্গীত শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

লোক-সাহিত্যে রাধা ও কৃষ্ণের রূপের শ্রেষ্ঠতা বিচার নিয়ে শুক ও সারীর দ্বন্দ্বও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। পাখিরা এক সময় কথা বলতে পারতো, মানুষের জীবনের সঙ্গে তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। অনেক পাখির বংশ অধুনা অবলুপ্ত। এখন বাড়ির পোষা কাকাতুয়া, চন্দনা ও টিয়া (এরা প্রত্যেকেই শুক জাতীয় পক্ষী) এবং ময়নার মুখের বুলি শুনলে সে কথা একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় কি?
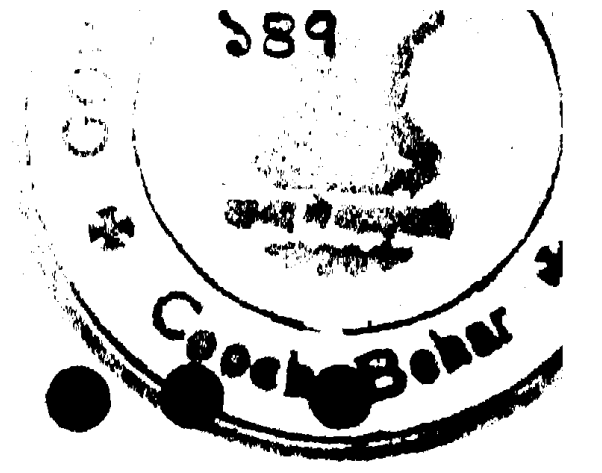
খাও দাও রোগা হও

অলকানন্দ বসু

জীবনে সমস্যার অন্ত নেই। বড় বড় সমস্যার কথা বাদ দেওয়া যাক। সে বিষয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পণ্ডিতেরা গবেষণা করেও কোনো পথ বাতলাতে পারেন না। কিন্তু ছোটখাট সমস্যাগুলো কি কম? তার সমাধান করতেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, সহজে রেহাই পাওয়া যায় না।

ধরা যাক, খাওয়া। মানে, আমি কোন অর্থনীতিক প্রশ্ন আনছি না। কি করে অন্নবস্ত্রের জোগাড় করতে হবে তার কথা বা সে সম্বন্ধে কোনো মতলব বাতলাতে চাই না। ধরেই নিচ্ছি তার সংস্থান আছে। আমি জানাতে চাই তার পথের কথা—অর্থাৎ কি খাবো এবং কেমন করে খাবো।

আমরা, বাঙগালীরা, কিঞ্চিৎ ভোজন-বিলাসী। যা পাই তাই খাই, এও যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি, যা খাবো তা ভালো করে খাবো। রান্না রীতিমত একটা জটিল বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা। হরেক রকমের রান্না আছে এবং তার প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র। শুধু রূপে নয় স্বাদেও। রস ও রসনা বড় কাছাকাছি থাকে। বহু লোক আছেন যাঁরা অবসর সময়ের বেশ কিছু অংশ রান্নাঘরে কাটান। কি রান্না হবে এবং তা কেমনভাবে হবে তার নির্দেশ দিতে বেশ আনন্দ পান। কথা উঠতে পারে তারা পেটুক। কিংবা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলা যেতে পারে স্ত্রৈণ। আমি কিন্তু এই সমালোচনার প্রতিবাদ করবো। আহার্য তাঁরা শিল্পের স্তরে নিয়ে যেতে চান। খাওয়ার পর্বটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে তাঁরা বিশেষ আনন্দ পান। কারণ, তাঁরা জানেন নুন-ঝালের সামান্য তারতম্যে সারাদিনের সার্থকতা আর ব্যর্থতা নির্ভর করে। প্রতিদিনের জীবনযাপনকে তাঁরা সুন্দর করে তুলতে চান।

যাই হোক আহার্য তো শুধু রসনার জন্যে নয়। দেহের জন্যেও বটে। বরং তলিয়ে দেখতে গেলে দেহের জন্যেই আহার। কিন্তু আহার যদি দেহকে বেকায়দায় ফেলে তখন? ভালো ভালো খেয়ে মেদস্ফীতি ঘটিয়ে জীবন্ত অবস্থায় মাংসপিণ্ড হওয়ার কী বেদনা তা কে না জানে! বিশেষ করে আজকের দিনে? আমাদের জীবনযাত্রার মূল কথা হল গতি এবং প্রতিযোগিতা। দেহকে ঠিক সেইমত তৈরী করতে হবে। না, রোগা হাড় লিকলিকে হলেও চলবে না। কুস্তিগির পালোয়ানদের মতো হওয়াও অবাঞ্ছনীয়। দেহ চাই— মাঝারি ওজনের আঁটসাঁট। এই যেমন পুরুষের বেলায়, মেয়েদের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। রূপবতীদের বড় ভরসা তাদের সুগঠিত দেহ-বল্লরী। তাতে ছন্দপতন ঘটলে জীবনটাই চলে বেতালভাবে। তবে সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা বড় পরিবর্তনশীল। এক যুগে সুন্দরী বলতে যাঁদের বোঝায় অন্য যুগে তাঁরাই হতে পারেন কুরূপা। কালিদাস সুন্দরী বলতে বুঝতেন তন্বী-শ্যামা-শিখর-দশনা। আগেকার দিনের রূপবতীরা কি ঠিক কালিদাসের সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে মেনে নেবেন? আমার মনে হয় কিছু সংশোধনী প্রস্তাব আসবেই। যুগের ও জীবনের প্রয়োজনেই অবশ্য তা করতে হবে। কালিদাসের নায়িকারা দশটা-পাঁচটার মসিজীবী কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু সবাই চান তন্বী হতে। অর্থাৎ দৃষ্টি সদাই জাগ্রত রাখতে হয় যেন দেহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক রতি মেদ বৃদ্ধি না হয়।

সত্যি বলতে কি মেদ-নিরোধ সমস্যা আমাদের সাম্প্রতিক জীবনে বেশ গুরুতর হয়ে উঠছে। অবশ্য ব্যাপারটা এখনও জাতীয় সমস্যার পর্যায়ে যেতে পারেনি; মেদ সম্পর্কে উদ্বেগ শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তবু চৌরঙ্গির ফুটপাতে মেদ-নিরোধ বিষয়ক বই পাওয়া যায় যথেষ্টই। বিক্রি যে হয় না, তাও নয়। ভালো বিক্রি হয়। কিন্তু আগেই যা বলেছি, কলকাতায় সে সমস্যা মহামারীর আকার ধারণ করেনি। মার্কিণ মুল্লুকে এই মেদস্ফীতি হয়ে উঠেছে প্রায় জাতীয় সমস্যা। মেদ-নিরোধক বই-এর যে উল্লেখ করেছি, তার প্রকাশক ও প্রণেতা প্রধানত আমেরিকান। মেদ-বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণাও চলছে ওদেশে অনেক দিন থেকে। একটি পরিসংখ্যানে প্রকাশ যে আমেরিকার পুরুষদের প্রায় অর্ধেক এবং মেয়েদের চারভাগের তিনভাগ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেদ সঞ্চয় করতেন। অর্থাৎ সাদা কথায় মোটা হতেন। যেহেতু তাঁরা মোটা এবং যেহেতু মোটা হওয়া প্রীতিকর ও রুচিকর নয় সেহেতু মেদ-নিরোধের জন্য যে বই বার হবে সে বই তাঁরা পড়বেন—এ খুবই স্বাভাবিক কথা। ফলে পরিসংখ্যানেই জানা যায়, এই বিষয়ে যে কোনো বই প্রকাশকেরা হেসে-খেলে পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি করতে পারেন।

তা না হয় হল। বই বেরোল, বই বিক্রি হল, কিন্তু সমস্যা তো ও দুটোর একটাও নয়। সমস্যা হল মেদ কমানো। তার কিছু সুরাহা হয়নি? মোটেই নয়। কারণ এক ধরনের উপদেশ তো সব ডাক্তার দেন না। আবার সেইসব উপদেশ আবার এত পরস্পরবিরোধী যে তার মধ্যে থেকে সঠিক পথটি বেছে নেওয়া জীবিকার পথ বেছে নেওয়ার মতো কঠিন ব্যাপার।

যেমন ডাক্তার স্টানলে এম, গ্রান বলেন, মেদস্ফীতি বন্ধ করতে হলে চর্বি-জাতীয় খাদ্য একেবারে পরিহার করতে হবে। কিন্তু এই ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে কেউ যদি চর্বি-জাতীয় খাদ্য একেবারে ত্যাগ করে বসে থাকেন এবং হঠাৎ ডাক্তার রিচার্ড ম্যাককারলেনের বই হাতে পান, তাহলে তাঁর অবস্থা যে কি হবে তা বলা শক্ত। কারণ ডাক্তার ম্যাককারলেন তাঁর Eat Fat and Grow Slim বইতে খুব দৃঢ়ভাবেই বলছেন, চর্বি-জাতীয় খাদ্যে মেদবৃদ্ধি তো হয়ই না বরং এই জাতীয় খাদ্য আহারের ফলেই মেদ কমানো সম্ভব।

এদিকে কয়েকজন ডাক্তার বললেন যে, মেদ কমানোর জন্য আলু খাওয়া বন্ধ করা দরকার। অন্যদিকে বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে ডাক্তার ম্যারিয়ট বলছেন যে, মেদ কমানোর জন্য আলু খাওয়া বন্ধ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

তারপর আরো আছে। এক ডাক্তার যেই বললেন জল খাওয়া কমালে মোটা হওয়ার পথ বন্ধ করা যায়, অমনি অন্য ডাক্তার এসে নির্দেশ দিলেন প্রচুর পরিমাণে জল খাও। জল খেলে কিছুই হয় না। প্রচলিত ধারণা যে, মদে মেদ বৃদ্ধি হয়! সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে ডাক্তার ম্যাককারলেন বিধান দিলেন যে, ও ধারণার কোনো অর্থ নেই। মদে মেদ বৃদ্ধি তো হয়ই না বরং আরো কিছু উপকার পাওয়া যেতে পারে।

পরস্পর বিরোধী বিধানের নজির ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রকৃতপক্ষে এজাতীয় সমস্যার কোনো ঢালাও সমাধান নেই। একই বিধান প্রতিটি মেদস্ফীত ব্যক্তির উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র মনের দিক থেকে নয়, দেহের গঠন ও প্রয়োজনের দিক থেকেও। যন্ত্রের কথা সহজ। বলা যায় যে, এই ধরনের গাড়ি হলে মাইলে এত পেট্রোল খরচা হবে। তারপর হিসেব নেওয়া যায়। হেরফের হলে যন্ত্র পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় ও নিরাময় করা সহজ। কিন্তু মানুষের বেলায় তা করা যায় না। দেহকে যন্ত্রের সংগে মাঝে মাঝে তুলনা করা হয় বটে, কিন্তু সেটা তুলনাই। আসলে ব্যাপারটা অতোটা যান্ত্রিক নয়। তাই একই নির্দেশ ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ফল দেয়। একথাটা পরীক্ষালব্ধ সত্য।

সুতরাং এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শের জন্য ছোটাছুটি না করে নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর ভরসা রাখা শ্রেয়ঃ। কারণ খাওয়া ব্যাপারটা শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তি নয়। এর সংগে অতিরিক্ত আরো কিছু থাকে। খাদ্য নির্বাচনের সংগে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র, রুচি এবং প্রবৃত্তিও বিশেষভাবে জড়িত। এইজন্যে যা খাওয়া যাবে তাই যেমন গোগ্রাসে খাওয়া অনুচিত ঠিক তেমনি খাওয়ার বিষয়ে অতিরিক্ত খুঁতখুঁতানিও থাকা উচিত নয়। মাঝে মাঝে ওজন নিলে এবং সুবিবেচনার সংগে খাদ্যাবস্থা নিয়ন্ত্রিত করলে মেদস্ফীতির উদ্বেগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাছাড়া আর কোনো পথ নেই। অর্থাৎ নিজেই নিজের ডাক্তারি করতে হবে, অন্তত এই ক্ষেত্রে তো বটেই।

রতন বাই জৈনের ফাঁসি

(সত্য ঘটনা)

বিশু মুখোপাধ্যায়
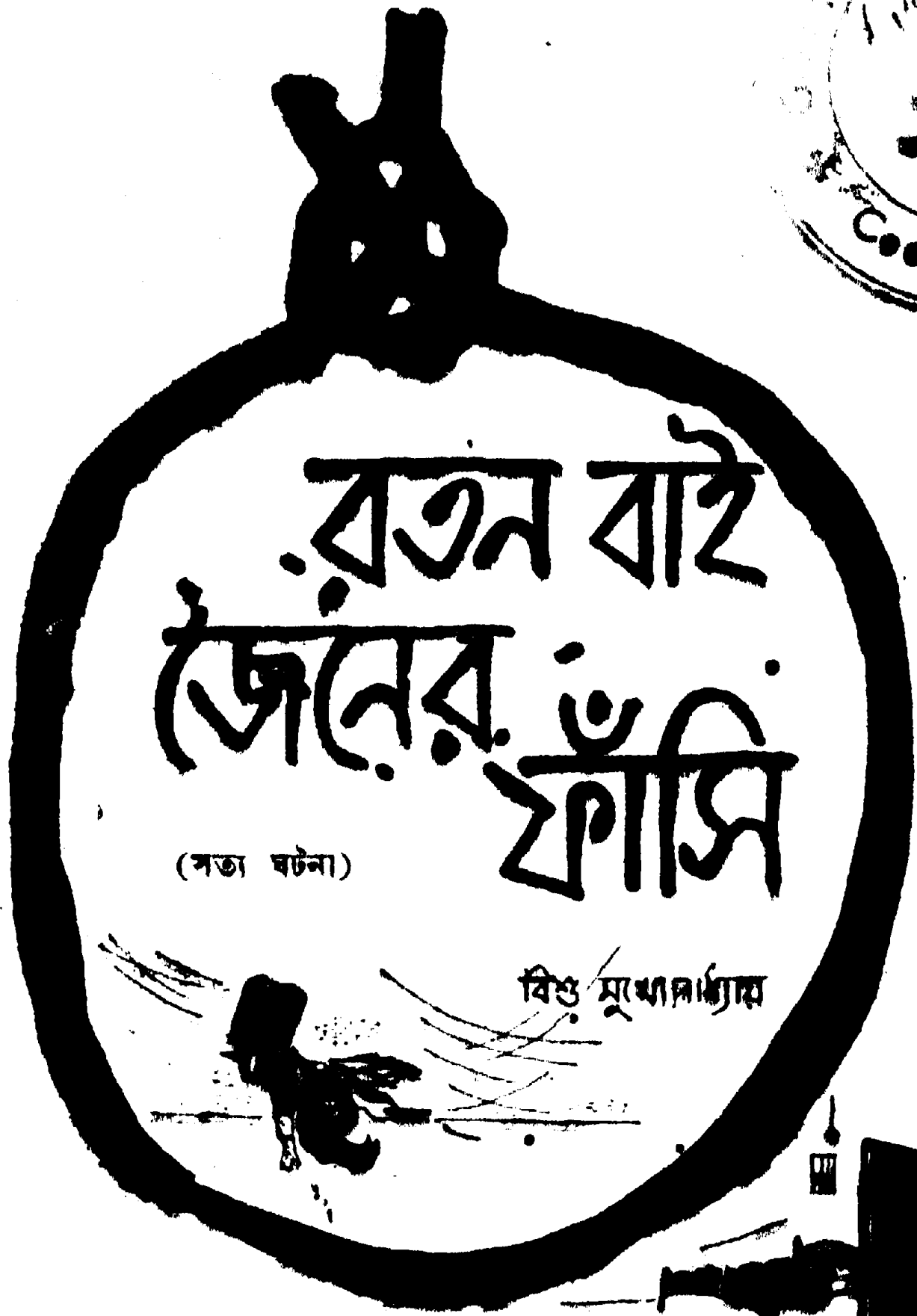
প্রেম, প্রণয় বা ভালবাসার ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধচেতা নারী যে কি জঘন্য প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে, দিল্লীর রতনবাঈ জৈনের প্রজনন-সহায়ক ক্লিনিকের তিন-তিনটি যুবতী কর্মীর মৃত্যু তার ভয়াবহ দৃষ্টান্তস্বরূপ।

খুব বেশী দিনের কথা নয় মাত্র সাত বছর আগে একদিন এই ক্লিনিকের নাম হঠাৎ সারা দিল্লীর লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কেবলমাত্র দিল্লী কেন, সারা ভারতবর্ষেই কাগজের মাধ্যমে এই চাঞ্চল্যকর বীভৎস কাহিনী সর্বত্র সরগরম ক'রে তোলে।

১৯৫৪ সালের মে মাস। দেশ তখন স্বাধীন হয়েছে। নিউ দিল্লীর আবহাওয়া তখন শান্ত। কোথাও শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব নেই। ঢলঢলে যৌবন নিয়ে কুড়ি বছরের সুন্দরী ফিরম মেয়ে সত্যবালা শহরের একটি রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল অত্যন্ত কষ্ট করে। মাঝে মাঝে যেন কুঁকড়ে পড়ছিল সে। কোন দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অন্য দিন ঐ পথ দিয়েই যখন সে বাড়ি ফেরে, তখন দোকানপাট দেখতে দেখতে আসে, কিন্তু সেদিন তার আর সে অবস্থা ছিল না। কেবলই বমির ভাব আসছিল তার; একটা অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর যেন তার ভেঙে দুমড়ে পড়তে চাইছিল পথের উপরেই। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে অবসন্ন দেহটাকে নিয়ে বাড়িতে এসেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে পড়ে গিয়েছিল সত্যবালা —আর নড়তে-চড়তে পারেনি।

সত্যবালার বাপ-মা বাড়িতেই ছিলেন। তাঁরা মেয়ের এই আর্তনাদ শুনে ছুটে এসে দেখেন যে, সত্যবালা প্রায় জ্ঞানহীন অবস্থায় কুঁকড়ে পড়ে আছে, আর তার মুখ দিয়ে গোঁজলা ভাঙছে। সারা শরীরের অবস্থা এমনই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে যে, দেখলে মনে হয় মৃত্যুর করাল ছায়া এসে ঢেকে ফেলেছে তাকে!

মেয়ের এই অবস্থা দেখে সত্যবালার বাবা তখনই ছুটে বেরিয়ে যান সাহায্যের জন্যে। রাস্তায় বেরিয়েই একজন হিন্দু পাহারাওলা সামনে পড়ায়, তিনি তখনই তাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে সত্যবালার মা মেয়ের মাথায় জল দিয়ে এবং মুখ ধুইয়ে দিয়ে, তার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানবার জন্যে বার-বারই চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু সত্য-বালার কথা বলার শক্তি তখন সম্পূর্ণই লোপ পেয়েছিল। এরপর তাকে হাস-পাতালে নিয়ে যাবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ও দু'জন ডাক্তার যখন এসে পৌঁছয়, তখন সত্যবালার অবস্থা সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন।

অকস্মাৎ এই ধরণের ঘটনায় সত্য-বালার মার ধারণা হয়েছিল যে, সে দুর্দশাগ্রস্ত আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এই ধারণার পরিবর্তে একজন ডাক্তার তাঁকে বলেন যে, "না, তা মোটেই হয়নি,—ওর দেহে কোন বিষক্রিয়া হয়েছে, তবে সেটা সাপে কামড়ানোও হতে পারে।"

ডাক্তারের কথার উত্তরে সত্যবালার বাবা বলেছিলেন, "আমার মেয়ে তো শহরের বাইরে কোথাও যায়নি।" তবে তাঁকে প্রশ্ন করে ডাক্তার এই কথাই জানতে পারেন যে, সে একটি ক্লিনিকে কাজ করে এবং আজও সেইখানেই যথা-সময়ে কাজে গিয়েছিল।

বাড়িতে সামান্য একটু-আধটু এই ধরনের কথাবার্তা হবার পরই ডাক্তার তাড়াতাড়ি সত্যবালাকে স্ট্রেচারে তুলে দেবার ব্যবস্থা করে, মনে মনে এই কথাই ভাবতে লাগলেন যে, মেয়েটি ক্লিনিকে অসুস্থতা বোধ করা মাত্র নিরাময়ের ব্যবস্থা না করে বাড়ি চলে আসতেই বা চাইলো কেন।

সত্যবালাকে যখন এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছিল, তখন গাড়ির চারিদিকে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। তাকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে, এ্যাম্বুলেন্সের লোকটি যখন দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, ঠিক সেই সময় ঘটল আর এক অভাবনীয় ঘটনা। একটি যুবক ঐ ভিড় ঠেলে হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ির সামনে এসে বললে, "মশাই, আমি রাজরাণীর ভাই। আমার বোন সত্যবালার বান্ধবী। এ্যাম্বুলেন্স এদিকে আসছে দেখে আমি ছুটে এলুম। আমার বোন ও সত্যবালা একই ক্লিনিকে কাজ করে এবং সেও আজ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। আচ্ছা, সত্যবালার অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা কি সত্যি?"

পুলিসের যে লোকটি সেখানে উপস্থিত ছিল, সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল এবং একথা শোনার পর তার ধারণা জন্মাল যে, দুটি মেয়েই কোন রকম সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে পুলিস-প্রধান মিঃ দিগম্বর আর, বিরলার কাছে সত্যবালাকে হাস-পাতালে পাঠানোর সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। যে পুলিস অফিসারটি এই সংবাদ দিতে গিয়েছিলেন, তিনি কথা-প্রসঙ্গে রাজরাণীর অনুরূপ অবস্থার কথাও তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। এই ঘটনায় পুলিস-প্রধান মিঃ বিরলার প্রথম দিকে ধারণা হয়েছিল যে, হয়ত সর্পাঘাত হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া এরূপ ধারণা হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক ছিল না এই জন্যে যে, আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক প্রতি বছর এই ভাবেই সাপের কামড়ে মরে থাকে। কিন্তু খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একজন পাহারাওলাকে রাজরাণীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন সঠিক খবরটা জানবার জন্য। অপর দিকে কয়েক-মিনিটের মধ্যেই

টেলিফোনযোগে তাঁকে জানান হয় যে, উক্ত যুবতীটির অবস্থা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং একজন পুলিস সার্জন তার জবাববন্দী অনুমোদন করছেন।

পুলিস ইনস্পেক্টর হাসপাতালে সত্যবালার কাছ থেকে ঘুরে আসার পর পুলিস-প্রধানের কাছে এসে বলেন যে "এরকম ব্যাধি আমি পূর্বে আর কখনও দেখিনি। সব লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে সর্পাঘাত ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না বটে, কিন্তু তার বাপ-মার বিশ্বাস তা কিছুতেই হতে পারে না।"

অপর তরুণী রাজরাণীকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নিউ দিল্লীর সেই হাসপাতালে যেখানে সত্যবালা ছিল। বিখ্যাত বিষ-বিজ্ঞানবিশারদ ডাঃ জে, আর, উকিল এই তরুণী দুটিকে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তাদের দু'জনেরই অবস্থা তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন। ডাঃ উকিল উভয়ের পাকস্থলীতেই টিউব চালিয়ে, তা থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে, তা কসৌলির পুলিস বীক্ষণাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পরীক্ষা করার জন্য।

১লা মে সত্যবালা ও রাজরাণী যখন হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, তখন আর একজন রোগিণীকেও ঐ হাসপাতালে এনে হাজির করা হয় রাত্রের দিকে। তার নাম কান্তা। উনিশ বছরের যুবতী মেয়ে কান্তাও ঐ রতনবাঈ জৈনের ক্লিনিকে সত্যবালা ও রাজরাণীর সহকর্মী হিসাবে কাজ করত। পুলিস-সুপারের কাছে সংগে সংগে এ ঘটনাও জানান হয়েছিল যে, কান্তার আয়ু প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে—জীবন-দীপ নিবু নিবু।

সেদিন রাত্রে পুলিস-সুপার মিঃ বিরলা হাসপাতালে কান্তার শয্যার পাশে গিয়ে বসেছিলেন। সেখানে কান্তার মা ছিলেন। মিঃ বিরলার প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কান্তার মা বলেছিলেন, "কান্তা যখন আজ বাড়ি ফিরে আসে তখন তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। প্রথমেই সে বলে যে, তার ভয়ানক মাথা ধরেছে: আমি তাকে বিশ্রাম করতে ব'লে দোকানে কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়ে যাই। ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ি ফিরে এসে দেখি যে, সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে—যেন সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং তার নাড়িরও কোন স্পন্দন নেই। আমি তৎক্ষণাৎ এ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে সংগে করে এখানে নিয়ে আসি। তারপর থেকে সে নড়েওনি, কোন কথাও বলেনি। নিজের সন্তানকে এইভাবে চোখের সামনে মরতে দেখা যে কি নিদারুণ তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন!" এই কথা বলে তিনি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই রাত্রিতেই কান্তার মৃত্যু হয়, এবং অন্য দুটি যুবতীর অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে থাকে। মধ্যে মাঝে আচ্ছন্নতার মধ্যে তাদের যন্ত্রণার ভাব প্রকাশ পায় এবং যতক্ষণ না যন্ত্রণার উপশম হচ্ছিল, ততক্ষণ তারা ছটফট করতে থাকে এবং তার পরই আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

মিঃ এ, এ, মালি নামে মিঃ দিগম্বর বিরলার একজন অতি পুরাতন বিচক্ষণ সহকর্মী ছিলেন। তিনি একথা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ব্যাপারটিকে যথাযথ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কালবিলম্ব না করে তিনি সরাসরি ডাক্তার, শুশ্রূষাকারিণী, এ্যাম্বুলেন্স-চালক এবং পীড়িতা যবতীদের বাপ-মাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে দিলেন। সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলির অনেক যোগসূত্র যখন পাওয়া গেল, তখন মিঃ বিরলার মনে হ'ল যে, এখন একবার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সোন্ধির সংগে এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা প্রয়োজন। মিঃ সোন্ধি ছিলেন ভারতের একজন সর্বাপেক্ষা দক্ষ ফৌজদারী তদন্ত-কারী এবং ফৌজদারী আইনের একজন বিশেষ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। সে সময় তিনি জেলা এ্যাটর্ণীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিঃ বিরলা যখন তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, তখন ইনসপেক্টর মালিকেও তিনি তাঁর সংগে নিয়ে যান।

পুলিস-প্রধান মিঃ দিগম্বর বিরলা ও ইনস্পেক্টর মালির মুখে সমস্ত কথা শুনে মিঃ সোন্ধি প্রশ্ন করলেন যে, "যুবতীরা যে ক্লিনিকে কাজ করত, সেটা কি ধরণের ক্লিনিক?

—"বন্ধ্যা নারীদের প্রজনন-ক্ষমতা সৃষ্টি করতে এরা নাকি বিশেষজ্ঞ এবং তার প্রক্রিয়া হচ্ছে অসটিওপ্যাথি ও মনোবিদ্যা।"

কথাটা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট সোন্ধি একটু হেসে বললেন, "প্রজনন-ক্ষমতাই বটে! আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা একেবারেই ভুয়ো। আচ্ছা, ওখানকার যারা ডাক্তার তাদের লাইসেন্স আছে?"

—"না।" মিঃ মালি উত্তরে বললেন।

—"যা ভেবেছি ব্যাপারটা ঠিক তাইই।" একটু চিন্তান্বিত হয়েই যেন বললেন মিঃ সোন্ধি। তারপর তিনি আরও প্রশ্ন করলেন, "কে এর তত্ত্বাবধায়ক?"

মিঃ মালি বুঝিয়ে বললেন যে, "ক্লিনিকটি একজন খুব বিখ্যাত ব্যক্তির নামেই তালিকাভুক্ত বটে, কিন্তু এর পরিচালনা করেন মিলুখিরাম জৈন ও তাঁর স্ত্রী রতনবাঈ জৈন। স্বামী ভদ্রলোক বিজ্ঞাপনের ব্যাপার নিয়েই বেশীর ভাগ ব্যস্ত থাকেন, আর আসলে ব্যবসাটি পরিচালনা করেন তাঁর স্ত্রী। ব্যবসাটি বেশ লাভের বলেই মনে হয়।"

এই সময় মিঃ বিরলা প্রস্তাব করলেন যে, আগামী কালই ক্লিনিকটি একবার পরিদর্শন করে আসা যাক এবং দেখা যাক সংবাদের ব্যাপারে এর 'প্রজনন-ক্ষমতা' কতদূর। কিন্তু ইনস্পেক্টর মালি জানালেন যে, প্রতি সোমবার ক্লিনিকটি বন্ধ থাকে। প্রধানতঃ ধনী লোকেরাই হচ্ছে এই ক্লিনিকের পৃষ্ঠপোষক; তাই সপ্তাহ-অন্তে দীর্ঘ প্রমোদ-ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকায় সপ্তাহের প্রথম দিনে তাঁরা আর ক্লিনিকে উপস্থিত হতে পারেন না। মিঃ মালি তখনও জৈনদের বাড়ির ঠিকানা জানতেন না, কিন্তু তাঁরা এটাও জানতেন যে, সে ঠিকানা খুঁজে পাওয়া তাঁদের পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না।

—"ঐ তরুণীরা ক্লিনিকে কি করত?" মিঃ সোন্ধি আবার প্রশ্ন করলেন।

—"ও ব্যাপারটাই এখন আমাদের জানতে হবে।" উত্তরে মিঃ মালি বললেন, "ওদের বাপ-মারাও এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানেন না। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয়, ওরা ঐ ক্লিনিকে সহকারিণীরূপে কাজ করত। ওদের চিকিৎসা বিষয়ে বা বীক্ষণাগার সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই ছিল না। প্রধানতঃ ক্লিনিকে কাজ করার জন্য ওদের যা প্রয়োজন হ'ত, তাহলে সুন্দর চেহারা আর মিষ্টি মিশুকে হাবভাব।"

—"আপনার কি মনে হয় যে, ক্লিনিকটি প্রকৃতপক্ষে একটি নোংরা প্রতিষ্ঠান?" মিঃ সোন্ধি মালিকে সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করলেন।

—"প্রথমে আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল বটে, কিন্তু ঠিক তা নয়। যদি তাই হ'ত, তাহলে আশপাশের লোকেরা জানতে পারত। অন্য দিক থেকে ক্লিনিকটির বরং সুনামই আছে। তবে এটা ঠিক যে, অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত মেয়েদের নিয়োগ করার দিকেই জৈনদের লক্ষ্য বেশী—কারণ তাতে খরচ কম।"

ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই জৈনদের বাসস্থানের সন্ধান পাওয়া গেল। শহরতলীর এক প্রান্তে একটি সুন্দর বাড়িতে থাকতেন তাঁরা। পুলিস অফিসাররা সেখানে গিয়ে পৌঁছলে, বাড়ির একজন চাকর এসে দরজা খুলে দিল। কিন্তু সে জানালে যে, মিঃ জৈন এখন বাড়িতে নেই, তবে মিসেস্ আছেন। অফিসাররা তাঁকেই আসতে বলে, তাঁর জন্যে বৈঠকখানার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যে ঘরটিতে তাঁরা বসেছিলেন সেই ঘরটির সাজসজ্জা সুরুচিসম্পন্ন আধুনিক মনোভাবের পরিচায়ক।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিসেস জৈন এসে উপস্থিত হলেন। খিলানযুক্ত

দরজার উপর ছবির মত এসে দাঁড়ালেন অপূর্ব ভঙ্গীতে। বাস্তবিকই মিসেস জৈন একজন দেখবার মত স্ত্রীলোক। ঠিক নিখুঁত সুন্দরী যদিও তাঁকে বলা যায় না, কিন্তু তাঁর প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব ও সূক্ষ্ম রসবোধ সহজেই ধরা পড়ল কথাবার্তার মধ্যে। তাঁর পরনে ছিল রক্ত-রাঙা সিল্কের উপর জরির পাড় শাড়ী। আর তাঁর কাঁধের উপর ঝুলে আছে বিরাট কবরী—দুটি সোনার কাঁটার দ্বারা বিন্যস্ত। যে কোন রাজকীয় উৎসবে যোগদানের উপযুক্ত সাজই তিনি যেন সেজে বসেছিলেন।

মিসেস জৈন অত্যন্ত বিনম্রভাবে অতিথিদের কাছে দ্রুত এগিয়ে এলেন। এবং তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যবান বিদেশী সুগন্ধির সৌরভ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, আর সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল 'রাম'-এর গন্ধ। নীলার মত ঘন নীল দুটি চোখ, যা ভারতীয় নারীদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল, সেই নীলনয়ন মেলে তিনি একবার সবার দিকেই দেখে নিলেন।

বেশ বুঝতে পারা গেল যে, মিঃ সোন্ধিও মাদকদ্রব্যের গন্ধ অনুভব করেছেন। যে কেউ এই শ্রেণীর মদ্যপান করে, সে যে শহরের নোংরা জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এ থেকে তা অনুমান করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মিঃ সোন্ধির মিষ্টি হাসি ও অসময়ে আসার জন্য বিনম্র ত্রুটি স্বীকার, তাঁর বিরূপ মনোভাবের কোন ইঙ্গিতই দিল না।

অতঃপর মিঃ সোন্ধি অত্যন্ত ভদ্র-ভাবে শ্রীমতী রতনবাঈকে ঘটনার সমূহ বিবরণ বলতে লাগলেন ঃ কি ভাবে তিনজন তরুণীর মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটেছে এবং অপর দু'জনের অবস্থাও যে কিরকম সাংঘাতিক তা বিশদভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন। ঘটনার বিবরণ শুনতে শুনতে রতনবাঈ যে বেশ অস্বস্তিবোধ করছিলেন তা বুঝতে কারুরই অসুবিধে হ'ল না। যখন মিঃ সোন্ধির বর্ণনা শেষ হ'ল, তখন রতনবাঈ তাঁর নীল চোখ দুটি তুলে জোর করে বললেন, "আপনি বলছেন আমাদের ক্লিনিকের তিনটি মেয়ে পীড়িত হয়ে পড়েছে, কিন্তু তারা কে কে?"

পুলিস-প্রধান মিঃ বিরজা পর পর ঐ হতভাগিনী যুবতীদের নাম করলেন। নাম-গুলি ধীর-স্থির ভাবে শুনে রতনবাঈ বললেন, "স্যার, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আমাদের ক্লিনিকে এ ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। শনিবার দিন আমি নিজে সমস্তক্ষণই সেখানে ছিলাম এবং আমিই সন্ধ্যার সময় অফিস বন্ধ করে এসেছিলাম।"

—"আচ্ছা, ভুল করে মেয়েদের কি কোন পিল-টিল বা ওষুধ খাওয়ার সম্ভাবনা আছে?" মিঃ বিরজা জিজ্ঞাসা করলেন।

—"না, না, সে ধরনের কোন সম্ভাবনাই নেই!" উত্তরে জোর দিয়েই জানালেন রতনবাঈ। তাছাড়া তিনি আরও বললেন যে, "ওরা যে বিভাগে কাজ করে, সেখানে কোন জোরালো ওষুধ রাখাই হয় না এবং অন্যান্য ওষুধ ওদের তত্ত্বাবধানেও থাকে না। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ মেয়েগুলো খুবই কুঁড়ে এবং আমার ধারণা, কোন কিছু আনবার জন্যে ওরা বড় ঘর পেরিয়ে যাবারও কষ্ট স্বীকার করবে কি না!"

—"যাই বলুন, কান্তা কিন্তু ওকে সকালেই মারা গেছে!" মিঃ সোন্ধি রতন-বাঈকে এটা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

—"তার মৃত্যুর সংবাদে আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু এটা আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এই তরুণী-দের নিয়ে কাজের চেয়ে আমাদের ঝঞ্ঝাটই বেশী ভোগ করতে হয়। এক কথায় ওরা অলস এবং কাজের অযোগ্য। ওদের একমাত্র আকর্ষণ হচ্ছে পুরুষ, [illegible] সম্ভোগ আর অর্থ। নীতিজ্ঞানবোধ বলতে ওদের তো কিছু নেই-ই, উপরন্তু ওরা নির্বোধ।"

—"আপনি এটা ভুল বলছেন মিসেস জৈন," মিঃ বিরজা বললেন, "যে একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছে এবং অপর দু'টিও আর ঘণ্টাখানেক বাঁচবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া প্রত্যেকেরই রোগের লক্ষণ এক। এতক্ষণে বুঝতেই পারছেন আপনার নিজি-গত মতামত ও ইঙ্গিতের চেয়ে এখন এই ঘটনাগুলির গুরুত্ব কত বেশী!"

—"মৃতদেহ পরীক্ষা করে আপনারা কি জানতে পেরেছেন?" জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস্ জৈন।

এই ধরনের প্রশ্নে ম্যাজিস্ট্রেট সোন্ধি বেশ রাগতভাবেই বললেন, "আপনি তো ভেতরের কথাই বলছেন। অন্য মেয়ে দু'টি তো এখনও বেঁচে আছে। এখনো মৃত-দেহের পরীক্ষা হয়নি, কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পারছি যে, খুব কড়া রকমের বিষাক্ত ওষুধ, যার ক্রিয়া খুব সত্বর আরম্ভ হয়, এমন কোন ওষুধ খেয়েই মৃত্যু হয়েছে ওদের।"

—"একথা শুনে আমি একটুও বিস্ময় বোধ করছি না", একটু হেসে রতনবাঈ বললেন, "একেবারে নির্বোধ মেয়ে সব! ওরা গতকাল পিকনিকে গিয়েছিল, ভগবান জানেন সেখানে কোন খারাপ খাবারদাবার ওরা খেয়েছিল কি না!"

মিঃ মালিক এই কথায় রতনবাঈকে বাধা দিয়ে বললেন যে, "তিনি মেয়েদের বাড়ির অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন এ ধরনের কোন ব্যাপার ঘটার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।" এই কথা শোনার পর রতনবাঈ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "এ থেকে আপনারা ঠিক কি প্রমাণ করতে চাইছেন? এটা নিশ্চয়ই আপনারা বোঝেন যে, বাইরে-বেরুনো যুবতী মেয়েদের এমন অনেক গোপন ব্যাপার থাকে যা বাপ-মার পক্ষে জানার কোন সম্ভাবনা নেই। তাঁদের চোখের অন্তরালে কি ঘটে এবং তাঁদের মেয়েরা বাইরে গিয়ে কি ভাবে জীবনযাপন করে এসব কথা তাঁরা কিছুই জানতে পারেন না।"

[illegible]

—[illegible]

—[illegible]

—"আপনার এসব [illegible] আমি প্রতিবাদ করি।" ম্যাজিস্ট্রেট বেশ একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বললেন, "আমি ঐ মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি চাই না। একজন যদি মারা গিয়ে থাকে, আর দু'জন তো বেঁচে আছে, আপনারা তাদের ওদের নিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, কি হয়েছিল। নইলে আপনারা আমার এখানে কাজ করতে পারেন, আমাদের সহকারী ম্যানেজার লোকনাথ দেবকে দিয়ে [illegible] করতে পারেন। আমি খুবই ক্লান্ত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছি।... এখন আমি বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে।"

শ্রীমতী জৈন [illegible] ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সোন্ধি, পুলিস-প্রধান মিঃ বিরজা ও ইন্সপেক্টর মিঃ মালিক [illegible]

ভিতরে চলে গেলেন। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের কাছেই তাঁর উষ্মার ভাব প্রকৃতপক্ষে আসল রহস্যটাকে যেন উদ্ঘাটন করে দিল। সকলেই যেন আরও অকূলে খানিকটা কূলের সন্ধান পেলেন।

ওখান থেকে মিঃ সোন্ধি, বিরলা ও মালি সকলেই তাঁরা সরাসরি হাসপাতালে এসে হাজির হলেন। মাঝরাতের একটু পরেই রাজরাণী মারা গেল। মারা যাবার কিছুক্ষণ পূর্বে সে নাকি ফিসফিস করে বলেছিল, "আমি ওর মিষ্টিগুলো চাইনি,—ওগুলো আমার খাওয়া উচিত হয়নি।"

যে শুশ্রূষাকারিণী রাজরাণীর উপর নজর রেখেছিল, সেও বললে যে, মেয়েটি প্রায় অচেতন অবস্থার মধ্যেই একবার চীৎকার করে বলে উঠেছিল, "কেন আমি পেঁড়াগুলি খেতে গেলুম।"

অপরদিকে সত্যবালা অজ্ঞান হয়েই পড়ে ছিল, এবং একজন পুলিস কর্মচারী তার কাছে সারাক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, যদি সে কিছু বলে তা 'নোট' করে নেবার জন্য।

পরদিন সকাল আটটার সময় গোয়েন্দা পুলিস অফিসাররা জগন্নাথকে মিঃ সোন্ধির অফিসে এনে হাজির করেন। জগন্নাথকে দেখলে মনে হয় না যে ম্যানেজার হবার মত তার কোন যোগ্যতা আছে। সে ভয়, অবসাদ ও বিভ্রান্তিতে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। তাকে যখন প্রশ্ন করা হ'ল, "ঐ যে মেয়ে তিনটি আপনার তত্ত্বাবধানে ছিল, ওদের ব্যাপার আপনি সব শুনেছেন তো?" তখন সে থতমত খেয়ে গিয়ে উত্তর দেয়, "আজ্ঞে হ্যাঁ মশায় শুনেছি।"

এই উত্তর শুনে মিঃ সোন্ধি রেগে উঠে চীৎকার করে বললেন, "তাহলে কি রকম মানুষ আপনি? যে কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই যেটা স্বাভাবিক ছিল —তাদের দেখতে যাওয়া বা তাদের সম্বন্ধে একটা খোঁজ নেওয়া, সেটা আপনি করেননি কেন?"

—"তা তো আমি করেছি। আমি কয়েকবারই হাসপাতালে গিয়েছিলুম, কিন্তু আমার নাম জানাইনি। আমি ওদের বাড়ির লোকের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওদের টেলিফোনের নম্বর না জানায় তা করতে পারিনি।"

—"তাহলে এই কথাই কি বুঝতে হবে যে আপনার কাছে একটা টেলিফোন-ডাইরেক্টারিও ছিল না!" বেশ রূঢ়ভাবেই মিঃ সোন্ধি বললেন।

—"ঐ প্রজনন-সহায়ক ক্লিনিকে কি হয়?" জগন্নাথকে প্রশ্ন করলেন পুলিস-প্রধান মিঃ বিরলা। তিনি আরও বললেন, "আমাদের কাছে সত্য কথা বললেই আপনার মঙ্গল হবে, নইলে এখনকার চেয়ে পরে আরও অনেক বেশী বিপদে পড়তে হবে আপনাকে।"

জগন্নাথ প্রথমটা কোন উত্তর দিতে সমর্থ হননি, কিন্তু পরে তিনি সাহস সঞ্চয় করে বলতে আরম্ভ করেন এবং তাঁর কথা বলার ভংগী থেকে মনে হয় যে, তিনি যেন কোন বই থেকে তাঁর বক্তব্য পড়ে চলেছেন।

—"আমি অতি সামান্য ব্যক্তি," অপরাধীর মত তিনি বলতে থাকেন। "আমার জীবনে আমি যথেষ্ট দুর্ভোগ ভোগ করেছি, জৈনরা আমায় খুবই সাহায্য করেছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁরা আমার কাছে টাকা পান। আজ আমার যা কিছু আছে তা তাঁদেরই অনুগ্রহে সম্ভব হয়েছে। আমি নিজেকে তাঁদের একজন অনুরক্ত কর্মচারী বলে মনে করি। আমি শপথ করে বলছি, ঐ মেয়েদের বিষপান সম্বন্ধে আমি কোন কিছুই জানি না। সকল সময়েই আমি ওদের ব্যাপার থেকে দূরে থেকেছি। আমার ধারণা, ওদের বয়েস খুবই অল্প, ওরা কারু শাসন মানতে চায় না, তার উপর ওরা ঝগড়াটে আর হিংসুটে।"

জগন্নাথকে ক্লিনিকে কি ধরনের কাজ হয় জিজ্ঞাসা করায় সে যখন কিছুই বলতে পারলে না, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে চলে যাবার পর মিঃ সোন্ধি ও মিঃ বিরলা পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সত্যবালা যখন এখনও জীবিত আছে, তখন তার কাছ থেকে একথা এখনও জানবার ক্ষীণ আশা আছে যে, কেমন করে মিসেস্ জৈন এই বিষপানের ব্যাপারে জড়িত।

কোন একটি সূত্র আবিষ্কারের জন্য যখন তাঁরা আবার হাসপাতালে এসে পৌঁছলেন, তখন সত্যবালা অচেতন। কিন্তু একবার মুহূর্তের জন্য তার আচ্ছন্নতা কেটে যেতে, সে তার শুশ্রূষাকারিণীকে বলে ওঠে, "মিসেস্ জৈন আমাকে কয়েকটা পেঁড়া দেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। সেগুলো খাবার পরই আমি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ি।"

সত্যবালা সেই দিনই মারা যায়। বৈকালের কিছু পূর্বে মিঃ বিরলা বীক্ষণাগারের বিবরণ পেয়ে জানতে পারেন যে, প্রথম দুটি মেয়ের মৃত্যুর পূর্বে তাদের যে পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে আরসেনিক বিষ পাওয়া গেছে। মৃত্যুর পরের পরীক্ষাতেও ঐ একই ফল হয়েছে এবং মিঃ বিরলার বিশ্বাস ছিল যে, তৃতীয় মেয়েটির বেলাতেও ঐ একই ফল পাওয়া যাবে।

দীর্ঘদিন পুলিসের কাজে লিপ্ত থেকে মিঃ বিরলার এ অভিজ্ঞতা খুবই হয়েছিল যে, এর পরের ব্যবস্থা কি করা কর্তব্য। কিন্তু এই নৃশংস হত্যার উদ্দেশ্য যে কি হতে পারে তার কোন হদিসই তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কিসের জন্যে এতগুলি মেয়ের প্রতি এক সঙ্গে এই মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে ভাববার কথা। নিশ্চয়ই অদ্ভুত রকমের কিছু একটা ক্লিনিকে ঘটেছিল, যেটা মেয়েগুলি জানতে পেরেছিল, অথচ সেটা তাদের না জানারই কথা। এটা একটা কারণ হতে পারে, অবশ্য এ ছাড়া অন্য কারণও যে হতে পারে না তা নয়; তবু এটাই মিঃ বিরলার মনে অপেক্ষাকৃত বেশী স্থান পেয়েছিল।

এর পর সুন্দরী নীলনয়না রতনবাঈ ও তাঁর স্বামী মিঃ জৈনকে গ্রেপ্তার করার জন্য আদেশ জারি করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দাও নিযুক্ত করা হয় সেই লোকটার সন্ধান করতে, যে আরসেনিক (শংখবিষ) সরবরাহ করেছিল, এবং যা খেয়ে ঐ জলজ্যান্ত তিন-তিনটি তরুণীর জীবনান্ত ঘটে।

ইনস্পেক্টর মালি যখন জৈনদের গ্রেপ্তার করার জন্য তাঁদের বাড়িতে উপস্থিত হন, তখন তাঁদের বাড়ির একটি মালী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে তাঁকে জানায় যে, মিসেস্ জৈন সেইদিনই বিকালে ছুটি কাটাতে শহরের বাইরে বেরিয়ে গেছেন। তিনি চাকরদের বলে গিয়েছেন যতক্ষণ না তিনি ফিরে আসেন, ততক্ষণ বাড়ির দরজা বন্ধ করে রেখে বিশ্রাম করতে।

মিসেস্ জৈনের গৃহত্যাগ পুলিস-প্রধান মিঃ বিরলাকে অবাক করে দিয়েছিল। মিসেসকে দেখে এ-কথা কারু মনেই হয়নি যে তিনি পালিয়ে যাবার মত স্ত্রীলোক। কিন্তু তিনি যে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তা বুঝতে কারুরই আর বাকী রইল না। তাঁর এবং তাঁর স্বামীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে পরের দিনই এক বিজ্ঞপ্তি প্রান্তিক শহরগুলির মধ্যে প্রচার করা হয়। পুলিসের এ ধারণাও বদ্ধমূল হয় যে তাঁরা দুজনে একত্রে নেই। দু' একদিনের মধ্যেই নিউ-দিল্লীর এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত হিসারের রেলকেন্দ্র থেকে পুলিসের কাছে খবর এল, জাখাই-গামী একটি ট্রেনে শ্রীমতী জৈনের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁকে তৎক্ষণাৎ আটক রাখার হুকুম দেওয়া হ'ল এবং ইনস্পেক্টর মালিকে নিউদিল্লী থেকে পাঠান হ'ল তাঁকে ধরে আনার জন্য।

শ্রীমতী জৈনকে নিয়ে পুলিসের লোক তখনও নিউ দিল্লী ফিরে আসেনি, এমন সময় একদিন রতনবাঈয়ের স্বামী মিলখি রাম জৈন নিজে এসে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

একটি অদ্ভুত ধরনের বর্তুলাকার ছাঁদে মানুষ এই মিলখি রাম। চেহারার

মধ্যে গোল মুখ, মাথায় বিস্তৃত টাক এবং চ্যাপ্টা নাক। চোখে পড়ে মিঃ জৈনকে উত্তর দেবার জন্য পেড়াপীড়ি করতে হ'ল না। তিনি পরিষ্কারভাবেই স্বীকার করলেন যে, তিনি জন্মবাচাল এবং রতনবাঈয়ের মত দৃঢ়সংকল্প নারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বন্ধনটা ঠিক সুখের হয়নি।

—"একথা আমি বলতে বাধ্য হ'চ্ছি", কতকটা গর্বের সঙ্গেই তিনি বলতে লাগলেন যে, "ক্লিনিকে যে সব মেয়েরা কাজ করত, তাদের প্রতি তাঁর স্ত্রী ব্যাধিগ্রস্তভাবেই হিংসাপরায়ণা ছিলেন। যে তিনটি মেয়ে মারা গেছে, বয়সের দিক থেকে তারাই সবচেয়ে অল্পবয়সী, এবং একথাও আমি বলব যে তারাই সবচেয়ে সুন্দরী ছিল। এদের প্রতিই তার বৈর ছিল সবচেয়ে বেশী। হতভাগ্য মেয়ে তিনটিই আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করত এবং তারা যে আমার স্ত্রীকে তার ব্যবহারের জন্য ঘৃণা করত, সে কথাও তারা আমাকে বলেছিল।"

মিঃ জৈন একথা অস্বীকার করলেন না যে, তিনি মাঝে মাঝে মেয়েগুলিকে মিষ্টি খেতে দিতেন। সেই সঙ্গে তিনি জোর করে বললেন, "আমি তো কল্পনাই করতে পারি না যে, আমি তাদের বিষাদিগ্ধ পেঁড়া খেতে দিতে পারি! ঈশ্বরই জানেন তা পারি কিনা! ঐ মেয়েরা আমার প্রতি এতই খুশী ছিল যে, যখন-তখন তারা আমার গালে চুমু দিতেও দ্বিধা করত না। এটা আমার পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব যে এমন সুন্দর মেয়েদের আমি হত্যা করতে পারি।"

৭ই মে রতনবাঈ ও তাঁর স্বামী মিঃ মিলাখি রাম জৈনকে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সোন্ধির খাসকামরায় এনে হাজির করা হয়। এই সময় রতনবাঈ অস্বীকার করলেন না যে তিনি মেয়েদের পেঁড়া দেন'ন। তবে তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন যে, "পেঁড়া যেমন হয়, সেগুলি দেখতে ঠিক তেমনিই ছিল। আমি সেগুলি আমার ম্যানেজার জগন্নাথের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। সে হচ্ছে এক নম্বরের একটি শয়তান, চোর ও মিথ্যেবাদী। সেই কুকুরের বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করুন, কোথা থেকে সেগুলো সে এনেছিল!"

শেষ পর্যন্ত মিসেস্ জৈন একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন যে, তিনি কখনও জগন্নাথকে টাকা ধার দিতে রাজী হয়েছিলেন এবং শপথ করে বললেন যে, "সে টাকা তছরুপ করে তার বিশ্বাস ও বন্ধুত্বকে নষ্ট করেছে।" তাছাড়া তিনি আরও বললেন যে, "সে এই নৃশংস কাজে লিপ্ত হয়েছে, আমার সর্বনাশ ক'রে ক্লিনিকটি হস্তগত করার জন্য।"

এই হীন অভিযোগের বিরুদ্ধে জগন্নাথ কিন্তু শান্ত ও স্থির হয়েই ছিলেন। প্রয়োজনসপক্ষে তিনি শুধু বললেন যে, তিনি মিসেস জৈনের কাছ থেকে সত্যিই টাকা ধার করেছেন এবং বেশীরভাগ টাকাই এখনও শোধ দিতে পারেননি। পেঁড়া এনে দেওয়া প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করায় তিনি এতটুকুও দ্বিধা না ক'রে বললেন যে, তিনি কখনও মিসেস্ জৈনকে বিষহীন বা বিষাদিগ্ধ কোন পেঁড়াই এনে দেননি।

মিসেস্ জৈনকে বন্দী অবস্থাতেই আবার ফেরত পাঠান হ'ল, কারণ তখনও তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। তবে হত্যার কারণ সম্বন্ধে পুলিসের কোন সন্দেহই রইল না যে, এর মধ্যে যৌনতা, অর্থ ও সম্পত্তি ছাড়া আর কোন কারণ থাকতে পারে।

ইনস্পেক্টর মিঃ মালি ও পুলিস-প্রধান মিঃ বিরলা ক্লিনিকের প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রশ্ন করেন এবং তা থেকে হত্যার উদ্দেশ্য যা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, তা পোড়ো মাঠে মেঠো আগাছার মতই। মিসেস জৈন উন্মত্তপ্রায় হিংসাপরায়ণ ছিলেন তাঁর ব'টকুলদাস স্বামীটির প্রতি। তিনি কঠোরভাবে প্রত্যেক মেয়েটিকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে। সেটা অবশ্য তাদের প্রত্যেকের কাছেই চ্যালেঞ্জস্বরূপ হয়েছিল ঐ আত্মগর্বী ক্ষুদে ও টেকো মানুষটির সঙ্গে প্রণয়-খেলা খেলতে।

অবশেষে মিঃ মালিই এই তিনটি হত্যাকাণ্ডের শেষ নিষ্পত্তি করেছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। তিনিই হাকিম নামে 'পবিত্রাত্মা' মানুষটিকে খুঁজে বার করেছিলেন, যিনি মিসেস্ জৈনকে শঙ্খবিষ বিক্রি করেন। তাকে নিয়ে গিয়ে মিঃ মালিই দাঁড় করিয়েছিলেন পুলিস-প্রধানের সামনে। মাথায় একটা নোংরা পাগড়িসহ, ঝোলা নোংরা পোশাক পরিহিত সেই লোকটি শান্তভাবে স্বীকারোক্তি করেছিল। বলেছিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একজন সিল্ক-পরিহিতা, বৃষ্টি-ধোয়া নীল আকাশের মত চোখওয়ালা স্ত্রীলোক বাজারে এসে আমার কাছে শঙ্খবিষ কিনতে চেয়েছিল।"

এই হাকিমই শেষ পর্যন্ত পুলিসের প্রধান সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায় এবং নীল-নয়না মাদাম্ জৈন হয়ে ওঠেন এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামী। তাঁর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না। ১৯৫৪ সালের ৬ই জুলাই বিচারপতি জে, এল, টানেজার এজলাসে এই ত্রয়ী যুবতীর ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিচার আরম্ভ হয়। ফরিয়াদী পক্ষে পঁচিশজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল, যাদের বেশীরভাগ জবানবন্দির সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচয় ঘটেছে। ক্লিনিকের কয়েকজন কর্মচারী এই এজাহার দিয়েছিল যে, রতনবাঈয়ের কানে যখন এই গুজব আসে যে, এই মেয়েরা তাঁর স্বামীর সঙ্গে প্রণয়-ব্যাপারে লিপ্ত আছে, তখন তিনি ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এ ক্ষেত্রে মিসেস্ জৈন কিন্তু তাঁর নিজের বক্তব্যকেই আঁকড়ে ধরে থেকে, এটাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন যে, তিনি একজন ধড়িবাজ ম্যানেজারের চালাকির ফাঁদে পড়েছেন, যার লক্ষ্য হচ্ছে ক্লিনিকটিকে সম্পূর্ণ নিজের অধিকারে আনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই বক্তব্য কিছুই টেঁকেনি —ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল মিসেস্ রতনবাঈ জৈনের।

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার আর এক অদ্ভুত অনুবৃত্তি ঘটে। হতভাগিনী সত্যবালার বাপ-মা মিসেস জৈনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক মামলা দায়ের করেন এই মর্মে যে, কন্যার মৃত্যুতে তাঁদের একমাত্র আয়ের উপায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, তাঁরা কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছেন। এই মামলার শুনানির সময় আদালত দাবির অংকটা হ্রাস করে দিয়েছিলেন এই হিসাব করে যে, উক্ত অংকের টাকা রোজগার করতে হ'লে সত্যবালাকে পঁচিশ বছর চাকরি করতে হ'ত। মকদ্দমা চালু থাকাকালীন এটা প্রকাশ পেয়েছিল যে, মিঃ রাম জৈন ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রতনবাঈয়ের একজন প্রেমিক, স্বামী নন। এঁদের সম্পর্কটা ছিল অদ্ভুত ধরনের। রতনবাঈয়ের ছিল দুর্দমনীয় ভালবাসা, তাঁর এই ব্যক্তিত্বহীন প্রেমাস্পদটির প্রতি। তাঁর পিতা গোপনে আমেরিকাতে মাদকদ্রব্য চালানের কাজ করতে গিয়ে নিহত হওয়ায়, তাঁর পরিবারবর্গের চরম দুরবস্থা উপস্থিত হয় এবং মিঃ রাম জৈনের অর্থই তখন রতনের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এঁদের উভয়ের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক রকমের ভাবপ্রবণ আকর্ষণ জন্মায়। রাম জৈন রতনবাঈয়ের জীবনের তিনটি বাসনার চরিতার্থ করেছিলেন—ক্রীড়নকের মত রাম জৈনকে দিয়ে রতন যা খুশি তাই করাতে পারতেন। তাঁর খুশি মত তিনি রামকে পোশাক পরাতেন, আদর করতেন। অপর দিকে সন্তানের মত রামের পরামর্শ নিতেন, স্নেহ-ভালবাসা কামনা করতেন। সর্বশেষ তিনি ছিলেন রামের প্রেমিকা, যার কাছে তিনি তাঁর যা কিছু দেবার সবই উজাড় করে দিতেন। বাহ্যতঃ যদিও তিনি ছিলেন খুবই প্রভাবসম্পন্না নারী, কিন্তু রাম জৈনই ছিল তাঁর প্রণয়বেগের কর্ণধার।

১৯৫৫ সালের ৩রা জানুয়ারী রতনবাঈ জৈনের ফাঁসি হয়ে যায় দিল্লীতে। নবগঠিত স্বাধীন ভারতীয় গণতন্ত্রের তিনিই প্রথম নারী যাঁর ফাঁসি হয়।

জৃম্ভণ

॥ নিরঙ্কুশ ॥

আ-হা-হা-হাই—; শ্রোতাদের মধ্যে একজন সশব্দে হাই তুললেন। আপনি যখন সরস কাহিনীটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করছিলেন তখন সামনে উপবিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে একজন বিকট মুখভঙ্গী করে এবং বিশ্রী আওয়াজ করে হাই তুললেন—আ-হা-হা-হাই। বিরক্ত হলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনিও ঠিক ওইভাবে অনেক ক্ষেত্রে হাই তুলেছেন। ছোটবেলায় মাস্টারমশাই এর কাছ থেকে সুরু করে কলেজে লেকচারের সময়ে এবং এতাবৎকাল পর্যন্ত আপনি কতদিন এবং কতবার যে হাই তুলেছেন তার সংখ্যাটি শোনাতে পারলে আপনি হয়তো লজ্জিত হয়ে হাই তুলতেন।

কিন্তু পাঁচজনের মধ্যে অন্য কেউ হাই তুললে আপনার অবশ্য বিরক্ত হওয়ারই কথা। কথিত আছে পারস্য দেশের কোন এক সম্রাট দরবারে এধরণের বেয়াদবির জন্যে এক পার্ষদকে নাকি কোতল করতে আদেশ দিয়েছিলেন। এটি সত্যি হলেও গল্প। ইতিহাস কিন্তু এ বিষয়ে নীরব। শাহ্‌জাদা সেলিম থেকে সুরু করে অষ্টম এডোয়ার্ড পর্যন্ত মত প্রেমিকের কথা আমরা শুনেছি তাঁদের মধ্যে কেউ কি এধরণের বেয়াদবি করেছিলেন? প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে হয়তো...কিন্তু তাই বা কে বলতে পারে।

ইতিহাস যার দিকে থাকে উপন্যাস বা কাব্য। বিরহী যক্ষ কি মেঘের দিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে তাকিয়ে জৃম্ভণ ত্যাগ করেছিলেন। সে কথা থাক—আপনার বিরক্তির কথা হচ্ছিল, হাই তুলতে দেখে শুধু বিরক্তই হয়েছেন, ভাল লাগেনি? নিখুঁত করে রুচিসম্মত উপায়ে হাই তুলতে আপনিও দেখেছেন। বিউটিশ্রীর ঠোঁটে আঙুল আলতোভাবে ঠোঁটের ওপর রেখে কোন তরুণীকে হাই তুলতে দেখেননি! তখন কিন্তু আপনি বিরক্তি অনুভব করেননি, ভালই লেগেছিল।

এরপর আপনার অনুসন্ধিৎসু এবং বিজ্ঞানী মন নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারে কোথায় এবং কারা হাই বেশী তোলে? জবাব দেওয়া সহজ। বিধান সভায় যে কোনদিন কিছুক্ষণ বসে থাকলে লক্ষ্য করবেন যে, গড়পড়তা সাত সেকেন্ড অন্তর কোন না কোন সভ্য হাই তুলছেন —(সরকারী দপ্তর থেকে সংগৃহীত নয়।) অবশ্য মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কেউ এতাবৎকাল এই বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করেছেন বলে জানা যায়নি।

এই পর্যন্ত পড়ে আপনি হাই তুলেছেন কিনা জানি না, যদি না-তুলে থাকেন তাহলে প্রাণপণ শক্তিতে সে ইচ্ছাকে দমন করতে থাকুন।

প্যারিসের এক আর্ট গ্যালারীতে অনেক ডাচ্‌ শিল্পীর আঁকা একটি ছবি আছে,—একটি সদ্যনিদ্রোত্থিত শিশু হাই তুলছে। কিছুক্ষণ সেটি দেখার পর দর্শক নিজেই হাই তুলতে থাকেন। হাই ভীষণ ছোঁয়াচে, দেখলেই তুলতে হয়। এর ওপর আপনার কোন হাত নেই। যেমন ধরুন হাঁচি, কাশি বা দারুণ শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপা—এগুলো কি আপনি বন্ধ করতে পারেন? পারেন না, কারণ এসব স্বয়ংক্রিয়, ইচ্ছাশক্তির প্রভাব এখানে খাটে না। হাই সকলেই তোলে, এমন কি জন্তুরাও বাদ যায় না। কুকুর বেড়াল থেকে সুরু করে বাঘ ভাল্লুক আর গণ্ডার হিপো পর্যন্ত।

কিন্তু মানুষ হাই তোলে কেন? হাই-তোলার কারণ আছে বৈকি। বহু পুরাকাল থেকে এর কারণ খোঁজার চেষ্টা চলছে। শাস্ত্র পুরাণের কথা জানি না তবে খনার বচনে হাঁচি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে, হাইএর বিষয় অবশ্য কোন উল্লেখ করা হয়নি। সে যাই হোক, বৈজ্ঞানিকরা প্রথমে বলতেন দেহে অক্সিজেন কমে গেলে মানুষ এইভাবে অক্সিজেন সংগ্রহ করে ক্ষতি পূরণ করে, কিন্তু জে, বি, এস, হ্যালডেন প্রমাণ করেছেন যে অক্সিজেন নয় কার্বন ডায়োক্সাইডের আধিক্য হলে দেহ এই-ভাবে গ্যাসটা বার করে দেয়। দেহের মধ্যে অক্সিজেন এবং কার্বন ডায়োক্সাইড পরিমিতভাবে থাকে। যদি কার্বন ডায়োক্সাইড বেশী হয় তাহলে রক্তকণিকা-গুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহ অবসাদ-গ্রস্থ হয় এবং মনে ক্লান্তি আর জড়তা আসে। তখন হাই তুলতে ইচ্ছে যায়। হাই তোলার পদ্ধতিটা একই ধরণের। মুখ ব্যাদন করে দেহের মাংসপেশীগুলো টান করে দেহ-অভ্যন্তরীণ কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাসটা ফুসফুস, শ্বাসনালী এবং মুখের ভিতর দিয়ে বাইরে বার করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে হাতপা এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সজোরে সঞ্চালিত করা হয়।

কিন্তু হাই-তোলার ব্যাপারে আবার বিপদও আছে। আপনি হয়তো আয়েস করে হাত-পা ছুঁড়ে প্রকাণ্ড হাঁ করে হাই তুলতে গেলেন—খুট্‌ করে চোয়ালটা আটকে গেল, হাঁ আর বন্ধ হয় না, আপনি মুখ ব্যাদান করে বসে রইলেন, তারপর সেই অবস্থায় বোয়াল মাছের মত হাঁ নিয়ে ডাক্তার বদ্যি-হাসপাতাল বিস্তর ছুটোছুটি আর হাঙ্গামের পর আপনার চোয়াল-দুয়ার আবার রুদ্ধ হল,—ফ্যাসাদ আর কি!

সে যাই হোক মোদ্দা কথা হল প্রকৃতি সর্বদা দেহকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে।

শারীরিক ও মানসিক অবসাদ এবং ক্লান্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে হাই-তোলাকে একটি স্বাভাবিক দৈহিক প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। যেমন ধরুন, আপনি হয়তো অনেকক্ষণ একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে চুপ করে একভাবে বসে রয়েছেন কিংবা হয়তো গৃহিণীর মুখ থেকে প্রাত্যহিক এবং ধারাবাহিক অসন্তুষ্টির একঘেয়ে এবং ঘ্যানঘ্যানে বিবরণটা শুনছেন তখন আপনার নিজের অজান্তে এক সময়ে হঠাৎ এক বিরাট হাই তুলে বসলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল হাই-তোলার পরই লক্ষ্য করবেন বিরক্তি, ক্লান্তি অবসাদ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে মন আর দেহ বেশ চনচনে হয়ে উঠেছে, এমন কি সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আড্ডায় যাবার কথাও মনে পড়ে যেতে পারে!

অপর পক্ষে আরামেও হাই ওঠে। যেমন দারুণ গরম থেকে ঠান্ডা একটা ঘরে গিয়ে বসলেন। আয়েসে চোখ ছোট হয়ে এল, দেহের সব মাংসপেশী ঢিলে হয়ে এল সেই সঙ্গে—তখন নিশ্চয়ই আরামের আমেজে একটা হাই তুললেন আপনি।

এতক্ষণ ত পড়লেন, এখনও কি হাই তোলেন নি?

যদি না-তুলে থাকেন তা হলে এইবার নিঃশঙ্কচিত্তে বেশ মৌজ করে একটি হাই তুলুন—খুব ভাল লাগবে, আরাম পাবেন প্রচুর।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

মার্কিণ বিজ্ঞানীদের সাফল্য

মেজর য়ুরি গাগারিনের মহাকাশ-যাত্রার ঠিক তেইশ দিন পরে মার্কিণ বিজ্ঞানীদের সাফল্যের সংবাদ এসেছে। গত ৫ই মে তারিখে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা আটটায় প্রথম মার্কিণ মহাকাশচারী-মানব কমান্ডার অ্যালান শেপার্ডের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১১৫ মাইল উঁচু থেকে তিনি আবার ফিরে এসেছেন। আধারটিতে তিনি ছিলেন তার সর্বোচ্চ বেগ ঘন্টায় ৪০০০ মাইল পর্যন্ত হয়েছিল। ষোল মিনিট তিনি মহাকাশে ছিলেন এবং এই ষোল মিনিটের মধ্যে কয়েক মিনিট ছিল তাঁর ভারশূন্য অবস্থা। যাত্রার শুরুতে তাঁকে মাধ্যাকর্ষণজনিত চাপের চেয়ে এগারো গুণ বেশি চাপ সহ্য করতে হয়েছিল। ষোল মিনিট পরে তিনি আধার-সমেত অতলান্তিক মহাসমুদ্রের জলের ওপরে নেমে এসেছিলেন। এই ষোল মিনিটের মহাকাশ-যাত্রার জন্য খরচ হয়েছে চল্লিশ কোটি ডলার।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে য়ুরি গাগারিন মহাকাশে ছিলেন ১০৮ মিনিট। বিশেষ একটি কক্ষে তিনি পৃথিবীকে পুরো একটি পাক খেয়েছেন। কিন্তু কমান্ডার আলান শেপার্ডের আধারটি কক্ষে স্থাপিত হয়নি। কক্ষে স্থাপন করতে হলে আধারটিকে ঘন্টায় আঠারো হাজার মাইলের কাছাকাছি বেগে ছুটে দেওয়াতে হত। আধারটির সত্যিকারের বেগ ছিল অনেক কম! আসলে শেপার্ডের আধারটি একটি অধিবৃত্তাকার পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে—ফুটবল খেলায় গোলকীপারের লাথি খেয়ে ফুটবল যেমন আকাশে উঠে আবার নেমে আসে। অর্থাৎ, কৃত্রিম উপগ্রহ বলতে আমরা যা বুঝি—মার্কিণ বিজ্ঞানীদের তৈরী যে-ধরনের বাইশটি কৃত্রিম উপগ্রহ এখনো পৃথিবীকে পাক খাচ্ছে—শেপার্ডের আধারটি কোনো সময়েই তা হতে পারেনি। এদিক থেকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এখনো মার্কিণ বিজ্ঞানীদের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে আছেন।

বিপুলা এ পৃথিবী

গাগারিন ও শেপার্ড দুজনেই মহাকাশ থেকে প্রথম যে কথাটি বলেছেন তা হচ্ছে এই : কী সুন্দর পৃথিবী!

পৃথিবীকে আমরা এমনিতেই সুন্দর দেখি। এই দুজন নভোচারী মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে আরো সুন্দর দেখেছেন।

এই পৃথিবী সম্পর্কেই এবারে কিছু আলোচনা তুলতে চাই।

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! মহাকাশ-জয়ের প্রথম সফল পদক্ষেপ নিয়ে যখন পৃথিবীময় সোরগোল উঠেছে তখনো কিন্তু এই আক্ষেপটুকু থেকেই যাচ্ছে। মহাকাশ-জয়ী মানুষ এখনো পর্যন্ত তার পায়ের নিচের পৃথিবীটাকেই পুরোপুরি জেনে উঠতে পারেনি।

অথচ মহাবিশ্বে-মহাকাশে পৃথিবীটা যে একটা প্রকাণ্ড বৃহৎ ব্যাপার তা নয়। গোটা পৃথিবীকে একটা পাক খেতে গাগারিনের নব্বই মিনিট সময়ও লাগেনি। বিষুব রেখায় পৃথিবীর বেড় পুরো পঁচিশ হাজার মাইলও নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বিরাট বিশ্ব-সংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান।" তবুও এই অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষুদ্র পৃথিবীর পুরো খবর এখনো পর্যন্ত আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি!

আমরা যে যুগে বাস করছি তাকে বলা হয় নভোচারণার যুগ। স্পুৎনিক ও লুনিকের দৌলতে আমরা এখন মহাকাশ ও মহাবিশ্বের ভাবনা অতি সহজেই ভাবতে পারছি। আমরা অপেক্ষা করছি কবে আমরা চন্দ্রে বা মঙ্গলে বা শুক্রে পাড়ি জমাতে পারব। পৃথিবীটা আমাদের কাছে প্রায় পুরোনো ও মামুলী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যাই হোক না কেন, একথাও সত্যি যে আপাতত বেশ কিছু কালের জন্যে এই পৃথিবীটাই আমাদের বাসস্থান হয়ে থাকবে। আমাদের বাঁচার তাগিদেই এই পৃথিবীকে আমাদের ভালো ভাবে জানতে হবে।

বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারব, শুধু যে পৃথিবীর অনেক কিছুই আমাদের কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে তাই নয়, পৃথিবীর বিপুল সম্পদ-ভাণ্ডারের খুব কম অংশই এখনো পর্যন্ত আমরা কাজে লাগাতে পেরেছি। তিনশো কোটি মানুষের এই পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এখনো বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর পুরনো মামুলী পৃথিবীর সম্পদের ওপরে নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে পারে।

পৃথিবীর বাইরের দিকের চেহারাটা কী? আমরা কথায় বলি, পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। অঙ্কের হিসেবে আসা যাক। যাকে আমরা বলি পৃথিবীর উপরিতল বা ভূপৃষ্ঠ তার মোট আয়তন হচ্ছে ৫১ কোটি বর্গ কিলোমিটার। এর জলভাগের আয়তন ৩৬·১ কোটি বর্গ কিলোমিটার বা মোট আয়তনের শতকরা ৭০·৮ ভাগ। বাকি শতকরা ২৯·২ ভাগ হচ্ছে স্থল।

পৃথিবী বলতেই আমাদের ধারণায় আসে শক্ত নিরেট মাটি। আসলে কিন্তু পৃথিবীর বেশির ভাগটাই জল। মহাসমুদ্র। বিচ্ছিন্ন বা টুকরো টুকরো নয়—উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এক অখণ্ড জলরাশি। ভৌগোলিক সুবিধের জন্যে কোথাও আমরা তার নাম দিয়েছি মহাসমুদ্র, কোথাও সাগর, কোথাও উপসাগর। মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তিনটি অতিকায় বাহুর মতো তিনটি মহাসাগর এই পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর। আর উত্তর মেরুতে রয়েছে উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মেরুতে দক্ষিণ মহাসাগর। আলাদা আলাদা নাম বটে কিন্তু একটির থেকে অপরটি আলাদা নয়।

ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭০·৮ ভাগ জুড়ে এই যে বিপুল জলরাশি তার মোট পরিমাণ হচ্ছে ১৩৭ কোটি ঘন কিলোমিটার। তার মানে সমুদ্র যদি সব জায়গায় সমান গভীর হত তাহলে তার গভীরতা হত ৩৮০০ মিটার। একই ধরনের হিসেব থেকে বলা চলে যে স্থলদেশে যদি সব জায়গায় সমান উঁচু হত তাহলে সেই উচ্চতা হত ৮৪০ মিটার। এ থেকে আরো একটি হিসেব বার করা চলে। ভূপৃষ্ঠ যদি উঁচু-নিচু না হত, অর্থাৎ মহাদেশের উচ্চতা ও সমুদ্রের গভীরতাকে মিলিয়ে দিয়ে ভূপৃষ্ঠকে যদি করে তোলা যেত পুরোপুরি সমতল, তাহলে স্থলদেশ বলে আর কিছু থাকত না—সারা ভূপৃষ্ঠ হয়ে উঠত ২৪৫০ মিটার গভীর এক মহাসমুদ্র। এ থেকে ধারণা করা যাবে যে ভূপৃষ্ঠে স্থলভাগটা নগণ্য। জলভাগটাই প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে আছে।

এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল সমুদ্রের তলদেশ বোধ হয় সমতল। হালে সেই ধারণা পাল্টেছে। সমুদ্রের গভীরতা সব জায়গায় সমান নয়। মোটামুটি হিসেবে বলা চলে তিন হাজার থেকে ছ-হাজার

বলুন তো কী?

প্রশ্ন

১। কোন জাতি একটা মহাদেশ দখল করে আছে?

২। মার্কিণ দেশের দক্ষিণে যে সব রাজ্য আছে, তাদের 'ল্যাটিন আমেরিকা' বলা হয় কেন?

৩। প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবীতে গড়পড়তা কত পরিমাণ জল পড়ে?

৪। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে গরম দেশের মধ্যে একটি—অথচ সে দেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী—সেটি কোন দেশ?

৫। সব চেয়ে কঠিন ধাতু কোনটি?

৬। কোন ফল থেকে ভিনিগার বেশী তৈরী হয়?

৭। কোন পাঁচটি জন্তুর গলার স্বর সব চেয়ে উঁচু?

৮। গরুর পেটে কয়টি ভাগ আছে?

৯। কোন দেশে সব চেয়ে বেশী তামা পাওয়া যায়?

১০। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা গাছ কোনটি?

১১। ইরান ও ইরাকের পূর্বে নাম কি?

১২। কোন জন্তুর চোখ, পা, কান, বা অনুভূতি নাই?

মিটারের মধ্যে। স্থলভাগে যেমন কোথাও রয়েছে পর্বতমালা, কোথাও উপত্যকা—সমুদ্রের তলদেশেও ঠিক তাই। তবে স্থলভাগের পর্বতমালার ক্ষয় আছে সমুদ্রের তলদেশের পর্বতমালার ক্ষয় নেই।

সমুদ্র সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো জানার খবর হচ্ছে এই যে সমুদ্রের জল শুধুই জল নয়, একটা দ্রবণ। অর্থাৎ অনেক রকমের পদার্থ সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। হালের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জানা গিয়েছে যে মেন্ডেলিয়েকের তালিকায় যা কিছু পদার্থের নাম আছে সমস্তই কিছু না কিছু পরিমাণে আছে সমুদ্রের জলে। দ্রবণের পরিমাণ যত কমই হোক সমুদ্রের জলের পরিমাণ এতই বেশি যে শেষ পর্যন্ত মোট পরিমাণটা হেলাফেলা করার মতো নয়। অর্থাৎ আমাদের জানা-চেনা যত রকমের খনিজ পদার্থ আছে তার সবচেয়ে বড় আকর হচ্ছে এই সমুদ্র। ভবিষ্যতের মানুষকে তাই এই সমুদ্রের দিকেই আরো বেশি করে নজর দিতে হবে এবং এই সমুদ্র থেকেই সংগ্রহ করতে হবে তার বেঁচে থাকার উপাদান।

সমুদ্র যে আমাদের জীবনে কতখানি, সমুদ্র ছিল এবং আছে বলেই যে আমরা আছি—এ সম্পর্কে কিছু বিবরণ আগামী সংখ্যায় দেবার ইচ্ছে রইল। ইতিমধ্যে মহাকাশযাত্রার জয়ডংকার আড়ালে চাপা পড়ে যাওয়া একটি খবর পরিবেশন করে এই সংখ্যার আলোচনা শেষ করছি।

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে একটি আন্তর্জাতিক ওসীনোগ্রাফিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এই কংগ্রেসের আহ্বায়ক ছিলেন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাড্ভান্সমেন্ট অব সায়েন্স এবং সহযোগী আহ্বায়ক ছিলেন ইউনেস্কো ও ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক ইউনিয়ন্স। পঁয়তাল্লিশটি দেশ থেকে এগারোশো বিজ্ঞানী এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

এই কংগ্রেসে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা ভারত মহাসাগর সম্পর্কে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে এই মহাসাগরে বিশেষ সামুদ্রিক গবেষণা চালানো হবে। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সামুদ্রিক জাহাজ সরবরাহ করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সোভিয়েত সামুদ্রিক গবেষণা-জাহাজ 'ভিতিয়াজ'-এর পরিক্রমা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতি 'ভিতিয়াজ' যখন কলকাতার বন্দরে এসেছিল তখন অনেকেই এই জাহাজটি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এ সম্পর্কে আরো একটি উল্লেখ করার মত খবর পাওয়া গিয়েছে আমেরিকা থেকে। মার্কিন নৌ-বাহিনীর ব্যাথিস্কেপ 'ত্রিয়েস্ত' পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো এক জায়গায় ৩৫,৮০০ ফুট (প্রায় সাত মাইল) গভীরে নেমেছিল। নৌ-বাহিনীর লেঃ ওয়াল্শ্ ও ডাঃ পিকার্ড যাত্রী হয়েছিলেন এই ব্যাথিস্কেপে। জুলে ভার্নের উপন্যাসের নায়করা ছাড়া আর কেউ আজ পর্যন্ত সমুদ্রের এতবেশি গভীরে নামতে পারেননি।

● ● ● প্রদর্শনী ● ● ●

কলারসিক

আন্তর্জাতিক সমকালীন চিত্র-প্রদর্শনী

ক্যাথিড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে গত ১৬ই এপ্রিল থেকে আন্তর্জাতিক সমকালীন চিত্রকলা প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটস সোসাইটি এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা। ইতঃপূর্বে ১৯৪৬, ১৯৫৩ এবং ১৯৫৭ সালে এঁদের পরিচালনায় আরো তিনটি আন্তর্জাতিক চিত্রকলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সেই হিসাবে আন্তর্জাতিক সমকালীন চিত্রের এটি চতুর্থ প্রদর্শনী। বর্তমান যুগের দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলি তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে অক্ষুণ্ন রেখেও শিল্প সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সম্মিলিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত। অন্ততঃ ২৭টি দেশ যে এই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়ে তাদের সমকালীন শিল্পকলার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে।

কলকাতার প্রদর্শনীতে প্রায় দুই শতাধিক চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এই চিত্রগুলি থেকে আমরা বিভিন্ন দেশের আধুনিক শিল্পীমনের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় পেতে পারি। আধুনিক চিত্রকলার নির্বিশেষত্ব (abstraction) নিয়ে পৃথিবীব্যাপী যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তেমনি কিছু বিতর্কিত চিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যাবে এখানে। আধুনিক হয়েও দর্শকের দর্শন ও মননকে রচনা-গুণে সহজভাবে প্রলুব্ধ করতে পারে, কয়েকটি এমন চিত্রও দেখা গেল। আবার প্রাচীন ঐতিহ্য-অনুসারী এবং একেবারে গতানুগতিক চিত্রের পীড়াদায়ক সমাবেশও ঘটেছে এই প্রদর্শনীতে।

অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে কম্যুনিস্ট-অকম্যুনিস্ট সব দেশই আছে। কিন্তু রাশিয়ার অনুপস্থিতি সত্যি বিস্ময়কর। আমন্ত্রিত দেশ হিসাবে ভারতবর্ষের সমকালীন চিত্রেরও কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা হয়নি।

আধুনিক শিল্পের শ্রেষ্ঠতম পীঠস্থান বোধহয় ফ্রান্স। ফ্রান্স থেকে এসেছে দশখানি চিত্র। এই চিত্রগুলির মধ্যে পিকাসোর কোনো রচনার সন্ধান না পেয়ে অনেকেই হতাশ হবেন। কিন্তু ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্পী ব্রাক, বাফে, লেজে প্রভৃতির কয়েকখানি বলিষ্ঠ চিত্র এখানে প্রদর্শিত হওয়ায় দর্শক-মন খুশি হবে। ব্রাক-এর লিথোগ্রাফটি নিঃসন্দেহে এক চিত্তাকর্ষক রচনা। বাফে তাঁর

টোরেরো শিল্পী : বাফে (ফ্রান্স)

'টোরেরো' চিত্রটিতে তেলরঙের মাধ্যমে যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং লেজে সহজ ভংগীর একটি রচনাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন রঙ প্রয়োগের বৈপরীত্য-দ্বারা।

ইতালীর আধুনিক শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে সত্যি বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। পরিণত বয়স্ক শিল্পী ফন্টানা একখানি ক্যানভাসে কোনো রঙ প্রয়োগ না করেই শুধুমাত্র তীক্ষ্ণ ছুরির ডগায় তাকে বিদ্ধ করে ১১৭টি ছিদ্রের মাধ্যমে

আইনস্টাইন শিল্পী : হেরমান হেনসেন (গণতান্ত্রিক জার্মাণী)
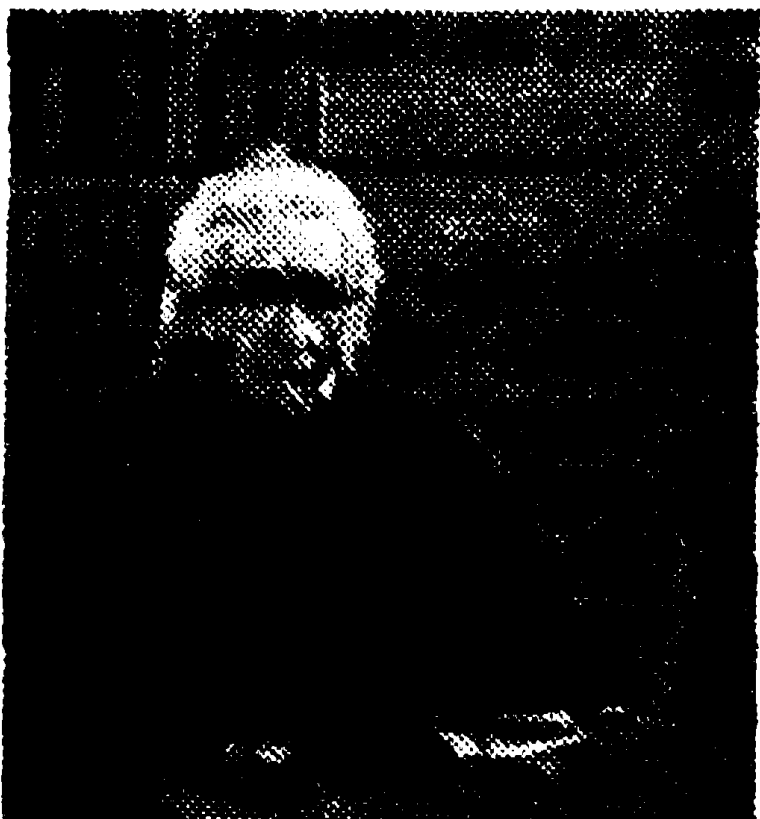
এক ধরণের প্যাটার্ণ সৃষ্টি করে আমাদের কাছে সেটিকে আধুনিক চিত্রের নিদর্শন-রূপে কেন যে তুলে ধরতে চেয়েছেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। একে কারু-কৃতিত্ব বলতে পারি কিন্তু চারু-কৃতিত্বের সিংহাসনে বসালে নিশ্চয়ই আপত্তি করবো। আধুনিক চিত্রের নামে এই স্টান্ট' নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। এরি পাশাপাশি ইতালীর রেনাটো গুট্টুসো অংকিত 'রিক্লাইনিং ফিগার ইন ইন-টিরিয়র' চিত্রটির বলিষ্ঠ আবেদন প্রকৃতি দর্শকের মনকে নাড়া দেবে বলে আমার বিশ্বাস। কাগজের ওপরে তৈল মাধ্যমে শুধু সাদা আর কালো রঙয়ের মধ্য দিয়ে যে প্রচণ্ড ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে তা শিল্পীর শক্তিমত্তারই পরিচায়ক। ইতালীর অন্য কয়েকখানি চিত্র আধুনিকতার নাম শুধু রঙ প্রয়োগের খেলার মধ্যে তার বক্তব্য শেষ করেছে। বৃটেন এবং আমেরিকার শিল্পীরাও এই প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য কোনো চিত্রকলার নিদর্শন উপস্থিত করতে পারেন নি।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও গণতান্ত্রিক জার্মাণীর কিছু উল্লেখযোগ্য চিত্রকলার নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে এসেছে। এতকাল আমাদের ধারণা ছিল এই দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নামে শিল্পীরা হয়তো পশ্চিম ইউরোপের আধুনিক চিত্রকলার ধারাকে বর্জন করেছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে এই কলকাতায় পোল্যাণ্ডের একটি চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখে আমাদের ধারণার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। আলোচ্য প্রদর্শনীতে সেই ধারণা প্রায় চূর্ণ হল। পশ্চিম ইউরোপের আধুনিক চিত্রকলার পরীক্ষা-নিরীক্ষার এরাও বলিষ্ঠ সহযাত্রী। এদের সৃষ্টিতেও নির্বিশেষ ভাবনা-কল্পনা এবং প্রতীকধর্মী ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি ঘটেছে। সামগ্রিক রচনায়, রঙ আর রেখার বিন্যাসে দুঃসাহস দেখালেও এরা অনেকেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েননি, এই-যা পার্থক্য। হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং গণতান্ত্রিক জার্মাণীর কয়েকখানি প্রতিকৃতি-চিত্র (তৈল-রঙ) এবং টেম্পারার কাজ আমাদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। এরমধ্যে 'দি সার্কাস' 'ট্রাকটর ড্রাইভার', 'আলবার্ট আইনস্টাইন' এবং 'টু ওয়ারস্-টু উইডোস' স্মরণীয় সৃষ্টির মর্যাদা পেতে পারে। বিশেষ করে 'টু ওয়ারস-টু উইডোস'—চিত্রে গণতান্ত্রিক জার্মাণীর শিল্পী মাক্স লিংগার টেম্পারার মাধ্যমে দুই বিধবার চোখে-মুখে দুই যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতির ব্যঞ্জনা এমনভাবে এনেছেন, যাকে কখনো ভুলে থাকতে পারবেন না কোনো দর্শক। পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার কিছু

জল চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে এবং রুমানিয়াও আমাদের হতাশ করেনি বলা যায়। বিশেষ করে রুমানিয়ার একখানি পেপেট্রেট অনবদ্য।

এশিয়া মহাদেশের সমকালীন চিত্র এই প্রদর্শনীর অন্যতম দর্শনীয় নিদর্শন। আফ্রিকার ঘানা ব্যতীত অন্য কোনো দেশ এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ না করায় প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্যপুষ্ট সমকালীন চিত্রকলার ব্যাপক পরিচয় থেকে আমরা বঞ্চিত রইলাম। এশিয়া মহাদেশের জাপান, মালয়, চীন, আরব, ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান কিন্তু তাদের ঐতিহ্যময় চিত্রকলার সঙ্গে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট আধুনিক চিত্রকলা প্রদর্শন করে প্রমাণ করেছেন ইউরোপের আধুনিক শিল্পধারা থেকে তাঁরাও নানা শিল্পগত উপাদান সংগ্রহে সক্ষম। পাকিস্তানের শিল্পী মর্তোজা বশির 'ব্রাদার এন্ড সিস্টার' চিত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনামের অধিকাংশ চিত্রকলায় বার্নিশের মাধ্যমে আশ্চর্য ধাতব ঔজ্জ্বল্য আনয়নে শিল্পীরা সার্থক হয়েছেন। ভিয়েৎনাম শিল্পীদের এই ঐতিহ্যময় অলংকরণ প্রশংসার যোগ্য। চীনের চিত্রকলাতেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। চীন তার বিখ্যাত 'উডকাট' ও জল-রঙের মাধ্যমে আধুনিক জন-জীবনকে শিল্পায়িত করেছে। মঙ্গোলিয়া এবং আরব প্রজাতন্ত্রের কয়েকখানি চিত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। জাপান, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়ের শিল্পীরাও কয়েকখানি চিত্রে যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

এই প্রসঙ্গে কিউবার শিল্পী মোরেনো-র অঙ্কিত একখানি চিত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'ব্যাটল' নামক চিত্রখানি আধুনিক হয়েও রঙে-রেখায়, বিন্যাসকলায়, ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনায় আমাদের দর্শন ও মননকে সমানভাবে তৃপ্তি দিয়েছে। শিল্পকলায় এই ধরণের আধুনিকতা অবশ্যই কাম্য। আমাদের আধুনিক চিত্রশিল্পীরা এর থেকে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশজ পরিপ্রেক্ষিতে যদি কাজে লাগাতে পারেন তবে খুশি হব।

অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সমকালীন চিত্রের এই প্রদর্শনীকে তাই আমরা স্বাগত জানাই। সেই সঙ্গে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনের কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা: চিত্রকলার প্রদর্শনীর জন্য সংকীর্ণ স্থান মাত্র অবশিষ্ট রেখে অধিকাংশ স্থান চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য ছেড়ে দিয়ে তাঁরা কি তাঁদের সদ্য-বিঘোষিত নীতি থেকে বিচ্যুত হননি? এত বড় একটি প্রদর্শনীর জন্যও যাঁরা স্থান দিতে পারলেন না, তাঁদের পক্ষে শিল্প এবং শিল্পীর নামে মাঝে মাঝে মায়া-কান্না সত্যি কি শোভা পায়? অর্থ ব্যয় করে এনে এই প্রদর্শনীর মনোনীত অর্ধশতাধিক চিত্র স্থানাভাবে যদি প্রদর্শন করা না যায়, তবে কাকে দায়ী করবো?

অগ্নিকাণ্ডে সাহিত্যিক

বিজন দত্ত

হায় আগুন, তোমার পরশমণি প্রাণে ছোঁয়ালে মহাকবি ধন্য বোধ করেন। কিন্তু বাড়ীতে তার স্পর্শ লাগলে সাহিত্যিক হন সর্বস্বান্ত। কি ভেবে যে অলডাস হাকসলি বই লিখেছিলেন, হোমলেস হন হলিউড! ১৪ই মে তারিখের এক খবরে জানা গেল, হলিউড হিলসে ১৩ই মে যে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়, তারই ক্ষুধিত জিহ্বা বাড়ির পর বাড়ি নিশ্চিহ্ন করে অবশেষে হাকসলির বাড়িটিও উদরস্থ করে ফেলে।

আর হাকসলি? হতে পারেন তিনি মস্ত বড় সাহিত্যিক, কিন্তু তিনিও মানুষ। সাধারণ মানুষের মতোই তিনি হায় হায় করতে থাকেন, আগুনের বেড়া-জালের মধ্যে ছুটে যেতে চেষ্টা করতে থাকেন। ওরই মধ্যে যে রয়েছে তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয়—ধন নয়, জন নয়, বই!—দুষ্প্রাপ্য সব পাণ্ডুলিপি, নানা দেশের নানা কালের স্মারক চিহ্ন। দিনের পর দিন কতো যত্নে, কতো মমতায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন সে সঞ্চয়, রক্ষা করে এসেছিলেন নিজের সন্তানের মতো! চোখের সামনে সে সমস্তই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অবুঝের মতো তাই তিনি ছুটে যেতে চান আগুনের মধ্যে। উপস্থিত লোকজন তাঁকে জোর করে আটকায়, তাই রক্ষা। নাহলে ঐ অগ্নিগর্ভ বাড়িটি হত হাকসলিরও চিতাশয্যা। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে কেবল একটি গাড়ী এবং পরনের সামান্য কিছু জামা-কাপড় ছাড়া আর কিছুই বাঁচানো যায়নি।

অবশ্য আগুনে যা পোড়াতে পারে না, এমন কিছু নিশ্চয়ই রয়ে গেছে হাকসলির। তাঁর সাহিত্যিক অবদান, তাঁর খ্যাতি। আজ তাঁর নাম বড় একটা চমক না লাগালেও বিশ-তিরিশ বছর আগে তিনিই ছিলেন ইংরেজী উপন্যাসের নতুন প্রতিভা। তাঁর 'আইলেস ইন গেজা', 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' কিংবা 'ক্রোম ইয়ালো' সেদিন আলোড়ন তুলেছিল খুবই।

'নতুন নীতি' বলে একটা কথা আজ-কাল বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে ঘন ঘনই শোনা যায়। এ রীতি বাংলায় কিছুটা নতুন হলেও ইংরাজীতে হেনরি জেমস ভার্জিনিয়া উলফ এবং হাকসলির হাতে ব্যবহৃত হয়েছে অনেক কাল আগেই। কাজেই বাংলা গল্পে হাকসলির প্রভাবও বড় কম নয়।

হাকসলির এই ব্যক্তিগত সর্বনাশে আমরা সমবেদনা জানাই। কিন্তু সেই সঙ্গেই এটাও না ভেবে পারি না যে, বাড়িতে আগুন লাগল বলেই আজ তিনি খবরের কাগজের শিরোনামা পেলেন, এই মর্মান্তিক প্রচারের ফলে তিনি যদি আবার পাঠকদের স্মৃতিপথে উদিত হন সাহিত্যিক হিসাবে তবে সেটা তাঁর কম লাভ হবে না।

ঘর থেকে বাইরে

বিশ্ববারা

'দয়া করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি
পূজা করি মোরে রাখিবে আগে
সে নহি নহি
যদি পার্শ্বে রাখো বিপদে সম্পদে
তবেই পাবে চিনিতে মোরে।'

পাশে রাখার দিন এসেছে। চিত্রাঙ্গদার দাবী আজ স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সমানশক্তি সমানাধিকারের দাবী যাঁরা জানিয়েছেন যুগে-যুগে তাঁদের বিদ্রোহ করতে হয়েছে। বিদ্রোহ ব্যতিরেকে এস স্থান আজ মেয়েরা অনেকাংশে অর্জন করেছেন। তার পেছনে অর্থ নৈতিক কারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আমাদের দেশ ক্রমান্বয়ে যে জটিল সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়লো, তার ফলেই এই একদিনের অ-সম্ভব সম্ভব হলো।

অথচ একদিন একথা কল্পনা করা দুরূহ ছিল। সে দিন তেমন বিস্মৃত অতীতে নির্বাসিত নয়।

সভ্যতার ইতিহাস বিবর্তনে সমাজ মেয়েদের কি এবং কতটুকু স্বীকৃতি দিয়েছে তার ইতিবৃত্ত প্রণিধানযোগ্য। একদিন আমাদের দেশে গার্গী, বিশ্ববারা, অপালা, ভারতী বা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী তাঁদের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এ নেহাৎ অতীতের কথা। সেই স্বর্ণ যুগে, তাম্রজাতি অধিকৃত এক মহাদেশে এক নতুন সভ্যতা সৃজন ও বিস্তারের প্রাণপ্রবাহ যখন উচ্ছল তখন তা সম্ভব হয়েছিল। সেদিন আর্য সমাজের ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হতো, তা ছিল সংস্কার মুক্ত এবং স্বাধীন। নরনারীর সম্পর্ক এক সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হতো। সেই কারণে নারীরা স্বামী ব্যতিরেকে বীর্যবান, ধী-মান, গুণবান ও কলাবন্ত পুরুষের সংসর্গে সুস্থ সুন্দর সন্তান উৎপাদন করাতেন। দ্রৌপদী, গান্ধারী বা সুভদ্রা-র মতো রমণী সৃষ্ট হতো।

তারপরে সমাজ বহুধা বিচিত্র রূপ গ্রহণ করলো। স্থায়ী হলো। সময়ের প্রলেপে সংস্কার এলো, এলো পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী।

মেয়েদের স্থান সঙ্কুচিত হলো।

তারপর থেকে, যখন যে নারী, সমাজ নির্দিষ্ট বিধিবিধান অস্বীকার করে পূর্ণতার মুক্তি পেতে চেয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন তাঁদের প্রতিপক্ষ পুরুষ। অতএব, সেইসব বিদ্রোহিণী পুরুষের আচার বা পোষাক বা বৃত্তির মধ্যে নিজেদের প্রতিবাদকে রূপ দিতে চেয়েছেন।

তাই জর্জ স্যাণ্ডকে পুরুষের পোষাক পরতে হয়েছে। জর্জ এলিয়টকে পুরুষের নাম গ্রহণ করতে হয়েছে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ-র বীর মহিলা চিকিৎসক মেরী ওআকার পুরুষ ডাক্তারদের সংগে সমান কৃতিত্ব দেখিয়েও যখন স্বীকৃতি পাননি, তিনি কংগ্রেসে পুরুষের পোষাক পরবার দাবী তুলেছেন। এঁদের স্বীকৃতি দিয়েছে সমাজ।

তবু বলেছে এঁরা trouble maker, বার্নার্ড শ-র Saint Joan নাটকের জোআনের শেষ উক্তিকে আমরা প্রয়োজনীয় অর্থে ব্যবহার করতে পারি। বাঁধা নিয়মকে যারা অতিক্রম করে, তারা প্রতিভা হতে পারে, কিন্তু তাদের গ্রহণ করতে পৃথিবী প্রস্তুত নয়। স্বস্তি ও শান্তির জন্যে মাঝারিরা-ই ভালো।

যে সব মেয়েরা মধ্যপন্থা অনুসরণ করেননি, তাঁরা-ই পরবর্তী যুগে মেয়েদের অধিকার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেছেন। সম-সাময়িক কালে নিশ্চয়ই তাঁরা নিঃসঙ্গতার সাপে ভুগেছেন। তবু, তাঁদের মধ্যেই আমরা শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয় প্রতিভাকে পেয়েছি।

বাইরে থেকে ঘরে আসা যাক।

আমাদের দেশে মেয়েদের আজ নবজাগরণের অবস্থা। জানি একথা বললে প্রতিবাদ শুনতে হবে। পুরনো প্রবাসীর পাতায় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সযত্ন আহরিত সংবাদ থেকে মেয়েদের সে যুগে বহুধা কৃতিত্বের কথা, বিশ বছর আগে ও পরের পরিসংখ্যান তুলে সমালোচনা।

তবু সত্য বলতে হবে। না শুনে শুনলে চলবেনা। গত কয়েক বছরে আমাদের দেশের মেয়েদের সামনে নতুন নতুন জীবিকা ও বৃত্তি গ্রহণের পথ প্রসারিত হয়েছে। এর সঙ্গে আগেকার অবস্থা তুলনীয় নয়। মেয়েদের মধ্যে আজ নতুন নতুন জীবিকা গ্রহণের সাহস। পড়াশোনার সময়ে বিষয় নির্বাচনের নতুনত্ব। কেরিআরের কথা না ভেবে একদিন আই-এ, বি-এ, পাশ করার পর শিক্ষয়িত্রী অথবা কেরাণী হওয়া ছাড়া অন্য পথে হাঁটা হতো না। আজ আমরা সেই সব বৃত্তির কথা আলোচনা করব, যেখানে মেয়েরা আজও পা বাড়াননি, অথচ বৃত্তিগুলো তাঁদের পক্ষে উপযোগী। এখানে, অধিক সংখ্যক মেয়েরা যা করতে পারেন, সেই বৃত্তির কথাই বলা হবে। যে বৃত্তি অতি অল্প সংখ্যক মেয়েরা গ্রহণ করেছেন, তার কথা বলে লাভ নেই।

বাধ্য হয়ে আজও অনেক ছাত্রীরা মধ্যম পন্থায় পড়াশোনা করেন। যে সাবজেক্ট অনুশীলন করলে সুবিধে হবে, সে সাবজেক্টে সব সময় পড়া চলে না। প্রাথমিক প্রতিবন্ধক সারি সারি। অর্থের অসুবিধে, বাসস্থান, মনোমত সাবজেক্টে সিট পাওয়ার অসুবিধে। আর কিছু না পেয়ে ভাঙ্গা আশা নিয়ে ব্যর্থ মনে বাংলা ও ফিলজফিতে গা ভিড়িয়েছেন এ রকম মেয়ের সংখ্যা প্রচুর।

সবগুলো হার্ডল-এর পরের অধ্যায়ে আসা যাক। এত 'তবু' সত্ত্বেও আজকাল ছাত্রীরা খানিকটা প্ল্যান করে পড়তে চান, যাতে কেরিআর করতে সুবিধে হয়।

কেরিআর ওদের কত বিচিত্র রূপ নিয়েছে, তার সম্ভাবনা কত সুদূর প্রসারী, সে সব কথা পরে আলোচনা করা যাবে। আজ আমরা সেইসব কেরিআরের কথাই ভাবব, যেখানে মেয়েদের সম্ভাবনা আছে, অথচ, কোন কারণ বিনাই তাঁরা সেখানে অনুপস্থিত। কতকগুলো বৃত্তির কথা ধরা যাক।

যে সব বৃত্তি পরস্পরকে জড়িয়ে নেই। তবু পরোক্ষে এ ওর হাত ধরে, সে তার কাঁধে ভর দিয়ে বাঁচছে।

সাংবাদিকতা, লেখা, প্রকাশনা, প্রচার-শিল্প।

জার্ণালিজমের কোর্স শেষ করে যাঁরা চাকুরী খোঁজেন, তাঁদের কথা নয়। হাতে-কলমে সাংবাদিকতা। কাগজের ওপর কলম পিষে, কপালের ঘাম রুমালে মুছে যে সাংবাদিকতা শিখতে হয়। মেয়েদের পাতার শৌখীন রকম-ফের লেখা নয়। ইলিশ মাছের বাইশরকম, উত্তরের কাড়িগান, হটি বিদ্যালঙ্কার ও রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রশস্তি বা শাশুড়ী-বৌ, ছাত্রী-শিক্ষিকা এসব সম্পর্কের চর্বিতচর্বণ নয়। পত্র-পত্রিকা ও দৈনিক কাগজে পেশাদারী সাংবাদিক হিসেবে মেয়েদের নিয়োগের প্রচলন নেই। নেই বলেই যে তা অসম্ভব, তাই বা কেন। সাংবাদিকদের কাজ আজ নানাবিধ। কিউবার রাজনীতি, পথের পাশের দুর্ঘটনা, হাওড়া ব্রিজের মরাল, বিরাট পৃথিবী এবং ক্ষুদ্র গৃহকোণ সবটাই আজ সাংবাদিকের কলমে নিরত, নতুনভাবে পরিচয়প্রাপ্ত। সাংবাদিক হতে হলে যে-বিশেষ গুণ প্রয়োজন, যে সব গুণের কথা প্রথমে এবং একঝলকে মনে পড়ে— বুদ্ধিমত্তা, ঝরঝরে চিত্তাকর্ষক ও তেজো বাংলা ইংরেজী লেখবার হাত, পর্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতা, পড়াশুনো করবার অভ্যাস, মিলেমিশে কাজ করবার ক্ষমতা, এবং

একটি নতুন বৃত্তি শেখবার ইচ্ছে, পরিশ্রম করবার ক্ষমতা, এ অনেক মেয়েরেই আছে।

সাংবাদিকতার পরেই পেশাদারী লেখবার কথা।

বাংলা সাহিত্যের অধুনা সমৃদ্ধ অবস্থাতেও সাহিত্যকেই জীবিকার্জনের বৃত্তি করে নেমেছেন এরকম মহিলার সংখ্যা একটি হাতে গোণা চলে। তাঁদের ক্ষেত্রও গল্প, উপন্যাস বা কবিতার মধ্যেই সীমিত।

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের কথা বলছি না। কেননা বিশ্ব-সাহিত্যের পাতায় ও এমিলি ব্রন্টি, ভার্জিনিআ উল্‌ফ, মাদাম পাভিল, সেলমা লাগেরলফ বা গ্রাৎসিআদেলেদ্দা বেশী জন্মাননি। তাঁরা পুরুষ বা মেয়ে নন। তাঁরা সাহিত্যিক। তাঁরা ব্যতিক্রম। পার্লবাক, ভিকিরাম, মার্গারেট মিশেল, দ্যুমেরিআর, এ স্তরের গল্প বলিয়েও এদেশে নেই। আর আগাথা ক্রিষ্টির পাকা গল্প বলা, বা ডরোথী সেআর্স-এর বদগন্ধ-ও এদেশের মহিলাদের প্রভাবিত করেনি। আগাথা ক্রিষ্টি বরং এদেশে অন্যান্য সাহিত্যিকদের পক্ষে স্বর্ণপ্রসূ হয়েছেন।

সাহিত্য আজ বৃত্তি হিসেবে পরিগণিত হবার স্তরে উঠেছে। তবু সেখানে মেয়েদের আগমন কোথায়? লেখবার সহজাত ক্ষমতার স্তর বিভাগ আছে। সে কথা মেনে নিলাম। কিন্তু যাঁরা লেখেন তাঁরাই জানেন inspiration এর এক ফোঁটা কবিতার সঙ্গে perspiration-এর নিরানব্বুই ফোঁটা যে কি অংগাঙ্গীভাবে জড়িত। মহিলাদের মধ্যে আরো লেখক সৃষ্টি হবার প্রয়োজন ছিল। বাধা কোথায়? সাংবাদিকতার ক্ষেত্র না হয় বন্ধ, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তো পত্র-পত্রিকার সহযোগিতা সম্পর্কে কোন সংশয় নেই।

প্রকাশনার কথা তার পরেই মনে পড়ে।

অন্য দেশে বড় বড় প্রকাশনের সঙ্গে অনেক মহিলা যুক্ত আছেন। আমাদের প্রকাশনার প্রচার ক্ষেত্র সীমিত, তাতে হয়তো অন্য দেশের মতো অনেককে জীবিকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। যেটুকু সম্ভাবনা ও সুযোগ আছে, তাতে কি মেয়েরা কাজে লাগতে পারেন না? পান্ডুলিপি সংক্রান্ত বহু কাজ ত' আছেই। তা ছাড়াও প্রকাশনা শিল্পের প্রচারের একটি দিক আছে। একটি বই শোভন প্রচ্ছদপট ও সুন্দর ছাপা নিয়ে বাজারে বেরুবার আগে তাকে বিশেষ কয়েকটি স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। মেয়েরা সেখানে কাজে লাগতে পারেন। যে প্রকাশনীটি বাংলাদেশে সুন্দর ও সুরুচিসম্মত প্রকাশনার একটা নতুন ধারা এনেছিলেন, তাঁরা এক সময় এ বিষয়ে পথ দেখিয়েছিলেন। অধুনা, প্রকাশনা শিল্পে, বৃত্তি নিয়ে কোন মহিলা লিপ্ত আছেন কিনা জানিনা। যে ক্ষেত্রে কোন মহিলা প্রকাশনীটির মালিক, সে কথা এখানে আলোচ্য নয়।

প্রচার শিল্পের জগতে আনা যাক।

প্রচার শিল্পে, বাংলা ও বোম্বাই-এ কিছু কিছু মহিলা লিপ্ত আছেন। কিন্তু প্রচার শিল্পের শিল্পী, কপি রাইটার, একজিকিউটিভ, এসব কাজে মেয়েরা কোথায়? প্রচার শিল্প ব্যবসা আমাদের দেশে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে। প্রচার শিল্পে মনোগ্রাহী ও ফলপ্রদ বিজ্ঞাপন লেখবার জন্যে সাহিত্যিকের কলম না হলেও চলে। সেখানে বুদ্ধিমত্তা, গ্রাহক কি চায়, কোন বিজ্ঞাপনে কাজ হবে, তা বুঝবার মতো পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পরিশ্রম ক্ষমতার প্রয়োজন বেশী। প্রচার শিল্পের শিল্পী, উচুদরের শিল্পী না হলে ক্ষতি নেই, তবে শিল্পের কমার্শিয়াল দিকটি তার বোঝা চাই। এর ওপর প্রচার শিল্পের জগতে মেলামেশা করবার ক্ষমতা, বহু ধরণের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার ক্ষমতা, আর বহু বিষয়ে চালু জ্ঞান রাখবার ক্ষমতা থাকা চাই। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, উদ্যানবিদ্যা, ফুলের স্টাডি, ফ্যাশান, নিরাপদ রাজনীতি, খেলাধুলো, ফটোগ্রাফী, এর অনেকগুলো বিষয়ে কিছুক্ষণ বোবা না বনে কথাবার্তা বলবার ক্ষমতা থাকা দরকার।

যে সব মেয়েরা কর্মঠ, সামাজিক, নতুন লাইনে কাজ করতে আগ্রহী, তাঁদের পক্ষে প্রচার শিল্পের জগতটি উপযোগী। আর যাঁদের প্রতিভা এইদিকেই আছে, তাঁরা প্রচার শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। তাঁদের নাম আমরা জানাতে চাইব না, কিন্তু তাঁদের কাজ দেখেই আমরা তাঁদের কথা মনে রাখব। খবরের কাগজের পাতা উলটে গেছি, সেখানে যে সব বিজ্ঞাপন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাঁদের আমরা ভালবেসেছি। মেয়েরা বিয়ের আগে যে সব মেয়েরা রিসেপশনিস্ট, সেলসগার্ল, স্টেনো বা কেরাণী হতে চান না। অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, লাইব্রেরীআনশিপ, ডাক্তারী বা নার্সগিরি যাঁদের মনে ধরেনা, তাঁরা সুযোগ পেলেই নতুন নতুন বৃত্তির জগতে পা বাড়াবেন। একবার বিজ্ঞাপন বেরোলে হয়।

*সাংবাদিকতা শেখবার জন্যে মহিলা চাই।

*প্রচার বিদ্যা শেখবার জন্যে উৎসাহী মেয়ে দরকার।

*প্রকাশনার বিভিন্ন কাজের জন্যে মেয়েদের দরখাস্ত করতে বলছি।

আমার তো মনে হয় অনেক মেয়েই আনন্দের সঙ্গে সাড়া দেবেন।

কিন্তু এত আলোচনার পরে সেই পুরনো গল্প।

একটি ইমারত প্রয়োজন। মালমসলা এবং তৈরী করবার মানুষ রয়েছে।

প্রথম ইটটি কে গাঁথবে? প্রথম কে হাত দেবে কাজে? বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার লোক চাই।

বলুন তো কী?

উত্তর

১। অস্ট্রেলিয়াবাসী।

২। কারণ ঐ সব দেশের চলতি ভাষা হচ্ছে—ফরাসী, ইতালীয়, স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ—এ সবই ল্যাটিন ভাষা থেকে উদ্ভূত।

৩। প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৬ মিলিয়ন টন।

৪। ভারতবর্ষ (কোন কোন অংশে)।

৫। ভেনেজুয়েলা।

৬। আপেল।

৭। সিংহ, elk, সিন্ধুঘোটক, নেকড়েবাঘ, হাতী।

৮। চার।

৯। চিলি।

১০। অস্ট্রেলিয়ায় এক রকম উক্লেপ্টাস গাছ,—যাকে সাধারণত blue gum বলা হয়—এদের উচ্চতা ৪০০ ফিট।

১১। পারস্য ও মেসোপটেমিয়া।

১২। স্পঞ্জ।

দেশে বিদেশে

আ, মরি, বাংলা ভাষা :

বাঙালীদের পক্ষে এ সপ্তাহের সব চাইতে বড় আনন্দের সংবাদ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সরকারী ভাষার স্বীকৃতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতি। সরকারী বিবৃতিতে সাধারণত বয়ানের কৌশলে যে-যুক্তির ফাঁক থাকে ঐই বিবৃতিটি তাহা হইতে মুক্ত এবং বলিতে বাধা নাই, আন্তরিকতাপূর্ণ। নীতির দিক দিয়া বাংলা রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু এখনই তাহা সর্বস্তরে ও সর্বতোভাবে গ্রহণের পথে যেসব অন্তরায় আছে তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, ইহা ধাপে ধাপে গৃহীত হইবে এবং ইহা ত্বরান্বিত করিতে যেসব ব্যবস্থা অবিলম্বে অবলম্বন প্রয়োজন তাহা করা হইতেছে।

ডাঃ রায় বলিয়াছেন, বাংলা-ভাষায় এখনও সরকারী কার্যে ব্যবহারযোগ্য পরিভাষা সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত হয় নাই; যতদিন না হইতেছে ততদিন ইংরাজী চলিবে। কিন্তু এজন্য ব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের সদিচ্ছা, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও আন্তরিকতাও থাকা দরকার। পরিভাষার জন্য ইতিপূর্বে যে একটি সংসদ গঠিত হইয়াছিল মুখ্যমন্ত্রী আবার তাহাকে সক্রিয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা অপরিহার্য বলিয়াই আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু বিগত সংসদ প্রচলিত কতকগুলি শব্দ আত্মসাৎ করার পরিবর্তে শুচিবাই-বশত এমন কতকগুলি পরিভাষা বাংলা ভাষায় চাপাইতে চাহিয়াছেন যাহা অনাবশ্যক ও অহেতুক বলিয়াই আপত্তির কারণ আছে। পুলিশ, পিয়ন, পোস্টাফিস, রেল স্টেশন প্রভৃতি জাতীয় অনেক বিদেশী শব্দ জনসাধারণেরও যেখানে ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে সেখানে সেগুলি বিদেশী বলিয়াই বর্জন ও তৎস্থলে আরক্ষা সমাহর্তা জাতীয় উদ্ভট ও উৎকট শব্দের আমদানী ঘড়ির কাঁটাকে টানিয়া পিছাইয়া দেওয়ার সমতুল। ম্যাজিস্ট্রেট বা স্টেশন মাস্টার বংগজ না হইলেও কালের দানে আমাদের আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্র মারফত সাংবাদিকদের বহু শব্দ-রচনা লক্ষ লক্ষ পাঠকের মগজে গাঁথিয়া গিয়াছে: তাহাই বাংলা সাহিত্যে বা সরকারী কার্যে থাকিতে দেওয়া উচিত; সেখানে সেক্রেটারী চলিলেও ক্ষতি নাই। তেমনি জনসাধারণের মন হইতে পেনিসিলিন ইঞ্জেকসান জাতীয় শব্দ উৎপাটন করিতে গেলে বিপর্যয়েরই সৃষ্টি হইবে। পরিভাষা ভাষা সৃষ্টি করিতে বসিয়া সংসদের পণ্ডিতবর্গ ভাষাকে যেন জড় না করিয়া ফেলেন এদিকে নির্দেশ দিয়া রাখা ভাল। এটি মৌলিক কথা। এজন্য যে বিলের খসড়া রচনা করিতে হইবে সেই বিলটিও বিদেশী শব্দ, কিন্তু ইহার পরিবর্তন অনাবশ্যক। বাংলা স্টেনো, টাইপরাইটার ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ রায় যে-কথা বলিয়াছেন তাহা সংগত। নিঃসন্দেহে ইহা সময় সাপেক্ষ। এক্ষেত্রেও সময় সংক্ষেপ করা আন্তরিক প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল।

পর্বতাঞ্চলে নেপালী ভাষাকে রাজ্যের আর একটি সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতির প্রশ্নটি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইতেছে। ইহাকেও আমরা শুভ সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করি। মূলত, নেপালীভাষীদের ইচ্ছাকে যোগ্য সমাদরই জানান হইয়াছে: এখন বিধি-বিধান মানিতে যেটুকু অনুষ্ঠান ও বিলম্বের প্রয়োজন তাহা মানিয়া লইতে হইবে। নেপালীভাষীদের সন্তোষ পশ্চিমবঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়ক হইবে—আমরা এই আশাই করিব।

মোদের গরব, মোদের আশা :

জনসাধারণে প্রচারের জন্য রাজ্য সরকার রবীন্দ্র জন্ম-শতাব্দী উপলক্ষে ১২(১৩) খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। উহার পূর্ণ মুদ্রণ সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। ইতিপূর্বেও বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী অনেক বেশী দামে—উপলক্ষ্যে তো বটেই বিনা উপলক্ষ্যেও—প্রচুর বিক্রয় হইয়াছে। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন পুস্তকের মুদ্রণ ও বিক্রয় সংখ্যাও সামান্য হইবে না। জানিতে কৌতূহল হয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গ্রন্থাবলী নানা আকৃতিতে এযাবৎ কত বিক্রয় হইয়াছে। সংবাদে দেখিতেছি, রুশ মহাদেশের মস্কো হইতেও ১২ খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ করা হইতেছে। ইতিমধ্যে গত কয়েক বছরের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১০ লক্ষ ৫০ হাজারেরও অধিক কপি বিক্রয় হইয়াছে। প্রস্তাবিত ১২ খণ্ডের কিরূপ বিক্রয় হইবে এই পরিসংখ্যান হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

কৌতুকপ্রদ তুলনা মনে জাগে। পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি; শিক্ষিতের হার শতকরা ২৫; এই ২৫ জনের মধ্যে কতজন খাইয়া-পরিয়া (পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া) বই কিনিতে পারেন সে সংখ্যা আমাদের অজ্ঞাত। বাংলার বাহিরে কিছু বাঙালী আছে; তাহাদের মধ্যেও কিছু পাঠক আছে। তাহারা এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালীরা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পাঁচালী, ব্রতকথা ইত্যাদি হইতে শুরু করিয়া আধুনিক কালের বিবিধ বিচিত্র সাহিত্যের খরিদ্দার। ইহাদের বিক্রয় সংখ্যাও সামান্য নহে, কিন্তু সংখ্যাটি জানিবার উপায় নাই। ইহারই মধ্যে একান্তভাবে রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিক্রয় সংখ্যা কিরূপ রবীন্দ্র জন্ম-শতাব্দীতে জানিতে কৌতূহল হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ গুণ হইবে—শিক্ষিতের হার ও লোকের ক্রয়ক্ষমতাও পশ্চিমবঙ্গের চাইতে অনেক অনেক বেশী। সেখানকার ভাষা পৃথক। রবীন্দ্র-রচনাবলী সেখানে অনূদিত—মূল নহে; অথচ সেই ভিন্-দেশী সাহিত্যই সেখানে সাড়ে দশ লক্ষাধিক বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—আমাদের কাছে এ সংবাদ অত্যন্ত চমকপ্রদ। ইহা একদিকে যেমন আমাদের গৌরবের বিষয়, অপরদিকে ইহাই আমাদের সাধারণ পশ্চাদ্গামিতার পরিচয় বহন করিতেছে। আমরাও অনূদিত অথবা মূল ভিনদেশীয় সাহিত্য কিনি। কিন্তু তার সংখ্যা কত এবং একান্তভাবে এক-জন সাহিত্যিকেরই বা কত, জানি না। রুশ সাহিত্য টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, গর্কি প্রভৃতি মহৎ সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ—তথাপি সেখানে আমাদের একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই সাড়ে দশ লক্ষাধিক কপির স্থান হইয়াছে, আরও কয়েক লক্ষের স্থান হইতেছে। আমরা আশা করিব, একদিন আমাদের শিক্ষিতের হার শতাঙ্কে পৌঁছিলে আমাদের বই আমাদের কাছে লক্ষ সংখ্যায় বিক্রয় হইবে। অবশ্য একমাত্র

সরকারই এই কাম্য অবস্থাকে ত্বরান্বিত করিতে পারেন।

চমকপ্রদ :

বিশেষজ্ঞগণ শূন্য ও মহাশূন্যে পরিক্রমা বাবদ অর্থ ব্যয়ের গাণিতিক হিসাব করিয়াছেন। মার্কিণ কমাণ্ডার এলেন শেপার্ড ঊর্ধ্বাকাশে উঠিয়া মোট ১৫ মিনিটকাল অবস্থানের পর মর্ত্যের সাগরে নামিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে আমেরিকার ব্যয় হইয়াছে ৪০ কোটি ডলার। ১৮ কোটি মার্কিণের মাথাপিছু ব্যয় ধরা হইয়াছে ২৬ ডলার ২৫ সেন্ট। বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, মার্কিণ মহাশূন্যচারীর পৃথিবী পরিক্রমায় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে যে, মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডি মহাকাশ পরিকল্পনায় আরও অধিক অর্থ বরাদ্দের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ জানাইতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, মহাশূন্য পরিক্রমায় তাঁহাদিগকে আরও ব্যাপক প্রচেষ্টা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে সোভিয়েট ইউনিয়নের গাগারিন কেবল ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হন নাই, ১০৮ মিনিটকাল পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়াছেন। ইহাতে কত রুবল ব্যয় হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। ঊর্ধ্বাকাশে ১৫ মিনিটের জন্য উঠিতেই যেখানে ৪০ কোটি ডলার ব্যয় হইয়া যায় সেখানে গাগারিনের পৃথিবী পরিক্রমায় কত ব্যয় হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে যথাযথ অনুমান করাও দুঃসাধ্য। দ্বিগুণ তো হইবেই তিনগুণ চারগুণও হইতে পারে। মার্কিণ বিশেষজ্ঞগণ আরও হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, চন্দ্রলোকে মানুষ পাঠাইতে চারি হাজার কোটি ডলার ব্যয় পড়িবে, অর্থাৎ, মার্কিণ নাগরিকদের মাথাপিছু ব্যয় পড়িবে ২২৫ ডলার। রুশ রাজ্যের খবর অবশ্য জানা যায় না। কিন্তু অনুমান করা যায়, সেখানেও কাছাকাছি একরূপ ব্যয়ই হইবে। গাণিতিক হিসাবেও দেখা যাইতেছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিতীয় ধাপটি পার হইয়া গিয়াছে, কেবল শূন্য নহে মহাশূন্যে পরিক্রমা করিয়া আসিয়াছে; সুতরাং ব্যয়ও সেই অনুপাতেই হইয়া থাকিবে।

মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘোষণা করিয়াছেন শেপার্ড পরিক্রমায় অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহা বিশ্ববাসীকে সরবরাহ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অভিমান করিয়া বলিয়াছেন, গাগারিন-পরিক্রমায় সংগৃহীত তথ্য বিশ্ববাসীকে সরবরাহ করা হয় নাই। কিন্তু আমরা মনে করি, বিজ্ঞানের ফল কোন দেশে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। দেশে দেশে ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যেখানে প্রতিযোগিতা আছে, প্রশাসন রীতিতে পার্থক্য আছে, সন্দেহ সংশয় আছে, সেখানে এই গোপনতা কিছুকাল থাকিতে পারে; চিরকাল থাকিতে পারে না। আমরা মহাশূন্য পরিক্রমাকে মানব বিজ্ঞানের অগ্রগতি বলিয়া অভিনন্দিত করি এবং যেখানে এই মহাশক্তিদ্বয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ও পরস্পরের সংহারে মারাত্মক অস্ত্র নির্মাণকল্পে সহস্র কোটি ডলার বা রুবল ব্যয় করিতেছে সেখানে মহাশূন্য পরিক্রমায় কোটি কোটি ডলার বা রুবল ব্যয়কে আমরা অপব্যয় বা অপচয় মনে করি না। মহাশূন্য পরিক্রমায় মানব বিজ্ঞানের যে অসাধারণ কৃতিত্বের সম্ভাবনা নিহিত তাহা পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সংকীর্ণতা বিনাশ করিবে এবং বিজ্ঞানের অসামান্য অবদান জাতীয় বিভেদের সমগ্রভাবে মানব কল্যাণে নিয়োজিত হইবে। সেদিক হইতে আজিকার এই অর্থ ব্যয় কতটুকু নগণ্য।

আশাপ্রদ :

লাওসে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ ও অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হইয়াছে জেনেভা সম্মেলনের সহযোগী চেয়ারম্যান বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নির্দেশে তাহা গত ৮ই মে সায়গনে পৌঁছিয়াছে। লাওস যুদ্ধবিরতি তত্ত্বাবধায়ক কমিশনটি যে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধাঞ্চলে যাইতে পারিল ইহা রণক্লান্ত পৃথিবীর পক্ষে সান্ত্বনাই বলিতে হইবে। তিনটি জাতির সমবায়ে গঠিত এই কমিশনের চেয়ারম্যান হইয়াছেন ভারতীয় শ্রীসমর সেন এবং কমিশনে আছে দুইশত পোলিশ, কানাডিয়ান ও ভারতীয় সেনানী। কমিশনের সদস্যগণ, সেক্রেটারী ও সৈনিকগণের প্রথম দলটি এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টার ন্যাশনালের বিমানে এবং ৪৭ জনের অপর একটি দল একটি বৃটিশ বিমানে দিল্লী হইতে সায়গন রওনা হইয়া যায়।

কমিশনের যাত্রার পূর্বে চেয়ারম্যান শ্রীসেন লাওসের বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং তথায় কমিশনের আসন্ন উপস্থিতির কথা জ্ঞাপন করেন। কি কি ব্যবস্থা হইতে পারে এবং কমিশন সেখানে কি কি সুবিধা পাইতে পারেন তাহা লইয়াও আলোচনা হইয়াছে। কমিশনের আশা যে তাঁহারা সেখানে অনুকূল অভ্যর্থনা পাইবেন। প্রাথমিক কিছু অনিশ্চয়তার পর যুদ্ধবিরতি ঘটিয়াছে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থা অনুকূলই বলা যায়। এখন, দ্বিতীয় স্তরে কমিশনের কর্তব্য হইবে, এই বিরতি অবস্থাকে সুদৃঢ় করা। কেননা, এই দিক হইতে সকল প্রতিকূল অবস্থা প্রশমিত হয় নাই। সংবাদে দেখা যাইতেছে, রয়াল লাওস-বাহিনীর প্রতিনিধিমণ্ডলীর সহিত ৬ই মে তারিখে বামপন্থী প্যাথেট লাও প্রতিনিধিবর্গের যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয় তাহাতে সাধারণ যুদ্ধবিরতি সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় নাই। অর্থাৎ, উভয় পক্ষ কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই, বিরোধ ও বিক্ষোভের কারণ রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃত নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভন্না ফুমার পক্ষে তৃতীয় বাহিনীর এক প্রতিনিধিমণ্ডলীও আলোচনাকালে উপস্থিত ছিল। এখনও সুফল কিছু পাওয়া যায় নাই। প্রিন্স সুভন্নার মতে লাওসের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে চোদ্দ-জাতি সম্মেলন একান্তই আবশ্যক। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পক্ষে মার্কিণ সেনাবাহিনীর নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি এখনও বিবেচনাধীন আছে। শঙ্কাজনক অবস্থায় যে শান্তির প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহা ব্যর্থ হইবেই আমরা এমন মনে করিতে পারি না। কমিশনের সদস্যরূপে আছেন পোলিশ মিঃ আলবার্ট মরোস্কি ও কানাডিয়ান মিঃ লিও মেয়াণ্ড। অর্থাৎ তিনটি দেশের প্রত্যক্ষ শুভ ইচ্ছা কমিশনেই আছে এবং বৃটেন-সোভিয়েট ইউনিয়নের আনুকূল্য ও সহযোগিতা আছে। কমিশনের কাজ হইবে সীমানা নির্ধারণ ও যুদ্ধবন্দী বিনিময়। রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে কমিশন মাথা গলাইবেন না। শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হইলে সকলের শুভবুদ্ধিও ফিরিয়া আসিবে আমরা এই আশাই করিব।

শৈথিল্যের অবসান :

কেন্দ্র বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের পাসপোর্টের নিয়ম শিথিল করার প্রস্তাব লইয়া সেদিন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় প্রবল বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে এই পার্সেণ্টেজের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া এক অভিযোগ উঠিয়াছিল। একে তো পাঠ্যক্রমের বাহুল্য ও কলেজসমূহের ছুটির আধিক্যে পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ হয় না, তদুপরি উপস্থিতির ক্ষেত্রে শৈথিল্য মানিলে উহার পরিণাম কি হইবে শিক্ষাবিদগণ তাহা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিবেন। কিন্তু যে-বিষয়ে নিয়ম-শৈথিল্য কল্যাণকর হইতে পারে সেদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্পণ্য একান্তই দুরধিগম্য। পরলোকগত ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কলেজ-বহির্ভূত পরীক্ষার্থীদের এক্সটার্ণাল হিসাবে পরীক্ষা দিতে পারাই সেই অভিনব ব্যবস্থা। যাহারা কলেজে ভর্তি হইতে পারে না, যাহারা চাকুরী করিতে বাধ্য হইয়াছে অথবা যাহারা অন্য কোন প্রতিকূল কারণে কলেজী শিক্ষা লইতে পারে নাই, অথচ নিজ প্রচেষ্টায় সেই পরীক্ষা দিতে চাহে এক্সটার্ণাল হিসাবে তাহাদের পরীক্ষা দিবার সুযোগ খুলিয়া দিয়া ডাঃ ঘোষ বহু শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়া আছেন। কিন্তু কলেজগুলির বিরোধিতার ব্যবস্থাটি তিনি স্থায়ী করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রথমে ৫ বৎসরের জন্য পরে আর এক বৎসরের জন্য এই অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলির ইহাতে কি ক্ষতি হয় আমরা ভাবিয়া পাই না। আগে ছিল যখন কলেজগুলি ফ্যাক্টরীর মত দফায় দফায় দিবারাত্র চলিত এবং কলেজগুলির অর্থাগম হইত। কিন্তু তখনও দেখা গিয়াছে যাহারা এক্সটার্নাল তাহারা কলেজে ভর্তি হইবার মতো নহে। আর এখন তো ম্যাচিং গ্রাণ্টের পর ফ্যাক্টরী চালাইবার উপায় নাই—এখন আপত্তি উঠিবে কেন? কলেজগুলি ইহাদের টেস্ট পরীক্ষা লইতে চাহে নাই, বিশ্ববিদ্যালয় তাহা মানিয়া লইয়াছেন এবং আমরা মনে করি, তাহা এক্সটার্নাল পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শাপে বর হইয়াছে। এক্সটার্নাল পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র একটু কড়া করিয়া দেখা হয় কলেজ অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আমরা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি। কিন্তু কলেজে কলেজে ছাত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট ও ক্ষতিমঞ্জুর করার পর বিরোধ থাকা উচিত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটার্নাল পরীক্ষার্থী বাবদ যে অর্থাগম হইয়া থাকে তাহাও অকিঞ্চিৎকর নহে। তবে কেন এক্সটার্নাল পরীক্ষার্থীরূপে পরীক্ষা দিবার সুযোগ স্থায়ী ও অব্যাহত করা হইবে না? পার্সেণ্টেজ শিথিল করার চাইতেও এই প্রশ্নটি আমরা বেশী জরুরী মনে করি।

তদন্ত ও হাঙ্গামা :

কেন্দ্রীয় সরকার সাফ জানাইয়া দিয়াছেন, আসাম হাঙ্গামার সাধারণ তদন্ত এখনই প্রয়োজন নাই। গোহাটির গুলীবর্ষণ ও গোরেশ্বর হাঙ্গামার তদন্ত হইয়া গিয়াছে। রিপোর্ট দুইটি লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও আসাম রাজ্য সরকার পত্রালাপ চালাইতেছেন। পত্রালাপের মূলে বিষয়টি অজ্ঞাত। গোহাটির গুলীবর্ষণের তদন্ত-ফল কতখানি হাঙ্গামাকারীদের কতখানি রাজ্য সরকারের পক্ষে তাহা সব সব বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে এবং সেইখানেই উহার ইতি। ইহার জের টানিয়া কেহ হাঙ্গামাকারীদের দণ্ডিত বা সরকারকে নিন্দিত করিবেন এমন কার্যকারণ দেখিতেছি না। যাহারা মরিবার তাহারা মরিয়াছে। আসাম হাঙ্গামার সাধারণ তদন্ত আদৌ হইবে না সে বিষয়ে সংশয় থাকার কারণ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই এরূপ তদন্তের বিরোধী ছিলেন। বাংলাদেশের চাপে পড়িয়া "যথাসময়ে" একটা তদন্তের আশ্বাসসূচক সংশোধনী মানিয়া লইয়াছিলেন। কেননা, আসাম অবস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার কোন সময়েই অস্বাভাবিক মনে করেন নাই; বরং যাহারা দগ্ধ গৃহ ও মৃত আত্মীয়ের দেহ ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে তাহাদেরই নিন্দা করিয়াছেন। গত ২৯শে জুলাই হাঙ্গামা হইয়াছিল, আর একটি জুলাই আসিতে চলিল, তদন্তের উপযুক্ত সময় এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের চোখে পড়িতেছে না। শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈনেরও একটি রিপোর্ট বাহির হইয়াছে: তাহাতেও আসামের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ বিবাদের কথা আছে এবং আসামের মোটামুটি মানসিকতার একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্র সুস্থতার পরিচায়ক। আমাদের কথা এই যে, আমরা তদন্ত-ফলের জন্য ব্যস্ত নহি। ভারতবর্ষের যে-কোন এক প্রান্তে যে-কোন ভারতীয়ের ধনপ্রাণ সর্বতোভাবে নিরাপদ থাকিবে এবং সর্বত্র সে তহার বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারিবে—আমরা এই প্রতিশ্রুতি চাই। সেই প্রতিশ্রুতি কে দিবে?

অন্নপূর্ণা শীর্ষে :

ভারতীয় নৌবাহিনীর ইনস্ট্রাক্টর লেঃ এস এস কোহলির নেতৃত্বে ভারতীয় পর্বত অভিযাত্রীদল ৬ই মে শনিবার সন্ধ্যার কিছু আগে অন্নপূর্ণা পর্বতের তৃতীয় শৃঙ্গে আরোহণের সাফল্য অর্জন করিয়াছে। এই শৃঙ্গে এই প্রথম মানুষের পদক্ষেপ হইল। এই শৃঙ্গটির উচ্চতা ২৪ হাজার ৮৫৮ ফুট। ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ফাউণ্ডেশন এই অভিযানের উদ্যোক্তা এবং অভিযাত্রীদলে সোনাম গিয়াৎসো, ক্যাপ্টেন এ বি জংগলওয়ালা, কে পি শর্মা, লেঃ ভি এস শেখওয়াৎ, ফ্লাইট লেঃ পি সি চতুর্বেদী এবং ডাঃ এ এন ডি নানাবতী। তৃতীয় শৃঙ্গে আরোহণের ফলে অন্নপূর্ণা পর্বতের চারিটি শৃঙ্গই জয় করা হইল। ১৯৫০ সালে মঃ মরিস হার্জগের নেতৃত্বে একটি অভিযাত্রীদল অন্নপূর্ণার ২৬,৫০৪ ফুট শৃঙ্গে, ১৯৬০ সালে লেঃ কর্নেল জে ও এম রবার্টের নেতৃত্বে আর একটি দল ২৬,০৯৪ ফুট শৃঙ্গে, ১৯৫৫ সালে হের স্টেইনমেটসের নেতৃত্বে একটি জার্মাণ অভিযাত্রীদল ২৪,৬৮৮ ফুট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এটি চতুর্থ, ইহার আগেরটি দ্বিতীয় ও তাহার আগেরটি প্রথম। এইবার সম্পূর্ণ ভারতীয় দল কর্তৃক তৃতীয়টি বিজিত হইল। চতুর্থটি '৫৭ সালে আর একবার এক ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল আরোহণ করেন।

স্বভাবতই ভারতীয় দলের এই জয়যাত্রা সকলের উল্লাসের এবং ভারতীয়দের গর্বের কারণ হইয়াছে। কেননা, হিমালয় আমাদের ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়রা সাধারণ বিদেশীদেরই হিমালয় অভিযান বিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছে মাত্র। যেন এক্ষেত্রে তাহাদের কিছু করিবার নাই। এইভাবে নিরুপায় দর্শক থাকিয়া পরের গৌরবে হাততালি দিয়া আসিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, শেরপারা এইসব অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং একদা সমগ্র বিশ্বের সহিত আমরাও শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্টে সর্বপ্রথম একান্তভাবে একজন বিদেশীই জয় করেন নাই, তাঁহারই সঙ্গে ছিলেন আমাদের ভারতবাসী তেনজিং নোরকে। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে সর্বতোভাবে ভারতীয়ের উদ্যোগে বা নেতৃত্বে আমরা এ-গৌরব সহসা অর্জন করিতে পারি নাই। সেদিক হইতে ভারতীয়দের এই অন্নপূর্ণা পর্বতের

অন্নপূর্ণা পর্বতের ৩নং শৃঙ্গ বিজয়ী দলের অধিনায়ক লেফ্টন্যান্ট এস এস কোওলি, সোনম গিয়াৎসো এবং সোনম গিরমি।

তৃতীয় শৃঙ্গ আরোহণ সকল দিক হইতেই স্মরণীয় হইয়া রহিল। অনেক রকমের বাধা আসিয়াছিল, আরোহণ প্রচেষ্টার মুখে প্রবল তুষারপাতে একবার আরোহীরা কোমর অবধি আচ্ছন্ন হইয়া যান। কিন্তু নিরস্ত হন নাই। ৪নং ক্যাম্প হইতে তেরো ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তাঁহারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান। উদ্যম, দৃঢ়তা, মনোবল প্রভৃতি যেসব গুণ থাকিলে কোনো জাতি বড় হয় সেগুলি ভারতীয়েরা আয়ত্ত করিতেছে ইহাই গৌরবের কথা।

● ● ● ঘটনা প্রবাহ ● ● ●

ঘরে—
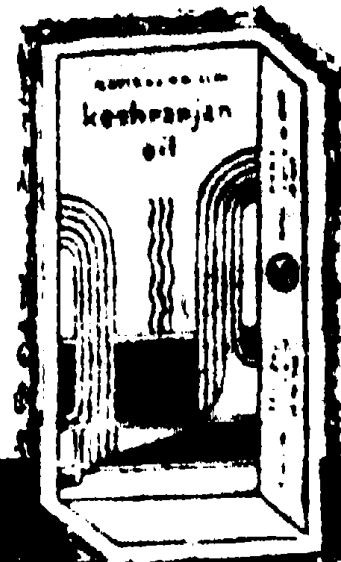
১লা মে—১৮ই বৈশাখ : পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সফল করার প্রয়াস—সরকারী কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনে দপ্তরের সর্বস্তরে পুনর্বিন্যাস ও শক্তিবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বৃটেন কর্তৃক ভারতকে ৫৩ কোটি টাকা ঋণদান—দিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দুইটি চুক্তি স্বাক্ষরিত।

ভারতীয় নিরাপত্তা অফিসার কর্ণেল ভট্টাচার্যকে পূর্ব পাকিস্তান পুলিস ভারতীয় অঞ্চলেই গ্রেপ্তার করিয়াছে—রাজ্যসভায় পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের ঘোষণা।

২রা মে—১৯শে বৈশাখ : কলিকাতা ও সহরতলীর (বৃহত্তর কলিকাতা) সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ—৫০ লক্ষ টাকা সাহায্যদানে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সম্মতি—কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

কলিকাতায় প্রখ্যাত সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্ ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনের (৫৯) পরলোক গমন।

৩রা মে—২০শে বৈশাখ—পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ—এলাহাবাদে স্বরাজ ভবনে প্রধানমন্ত্রী নেহরু (স্বর্গত নেতা মতিলালের সুযোগ্য পুত্র) কর্তৃক সংশিলষ্ট প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

ভারতের আঞ্চলিক সংহতিতে সন্দেহকারীদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা—রাজ্যসভায় ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল গৃহীত।

৪ঠা মে—২১শে বৈশাখ : সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে যথাসম্ভব শীঘ্র সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণায় উদ্যোগ—লোকসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিবৃতি।

আসামের দাঙ্গা হাঙ্গামায় (বাঙালী-বিরোধী) সামগ্রিক তদন্তে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি—পূর্বেকার তদন্ত কমিটিদ্বয়ের রিপোর্ট সম্পর্কে রাজ্য সরকারের (আসাম) মতের প্রতীক্ষা—লোকসভার সরকার পক্ষের বক্তব্য পেশ।

৫ই মে—২২শে বৈশাখ : কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে জাতীয়করণের দাবী—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট রাজ্য কমিউনিষ্ট প্রতিনিধিদলের স্মারকলিপি।

পূর্ব পাকিস্থানে আটক ভারতীয় নিরাপত্তা অফিসার কর্ণেল ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে লোকসভায় প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগদানে স্পীকারের (শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার) অসম্মতি।

লাওস সম্পর্কে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সহিত মার্কিণ প্রেসিডেন্টের (কেনেডি) বিশেষ দূত মিঃ এভারেল হ্যারিম্যানের বৈঠক।

৬ই মে—২৩শে বৈশাখ : বাংলাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা করার দাবীতে ১৯শে মে হইতে বাঙালী গণসংগ্রাম পরিষদের হরতাল ও পিকেটিং অভিযান—পরিস্থিতি প্রসঙ্গে শিলং-এ রাজ্যপালের (জেনারেল শ্রী নাগেশ) উপস্থিতিতে মন্ত্রিসভায় জরুরী বৈঠক।

পণ-প্রথা নিবারণ বিল আলোচনার জন্য পার্লামেণ্টের উভয় সভার (লোকসভা ও রাজসভা) যুক্ত অধিবেশন।

৭ই মে—২৪শে বৈশাখ : 'রবীন্দ্রনাথই ভারতবাসীর প্রাণে স্বাধীন হইবার ব্যাকুল আগ্রহ সৃষ্টি করেন'—কবিগুরুর প্রতি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি—নয়াদিল্লীতে রবীন্দ্রভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে ভাষণদান।

পূর্ব পাকিস্তানে সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের (হত্যা, গৃহদাহ, লুঠতরাজ প্রভৃতি) তীব্র প্রতিবাদ—কলিকাতাস্থ পাক্ ডেপুটি হাইকমিশন দপ্তরের সম্মুখে জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শন।

বাইরে—

১লা মে—১৮ই বৈশাখ : কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম কর্তৃক লাওস সম্পর্কে ১৪-জাতি সম্মেলনের প্রস্তাব প্রত্যাহার—লাওসের রাজা সাভাং বাত্তানার বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশের জের।

২রা মে—১৯শে বৈশাখ : ফরিদপুরের (পূর্ব পাকিস্থান) গোপালগঞ্জ এলাকার কয়েকটি গ্রামে দলবদ্ধভাবে হিন্দুদের (সংখ্যালঘু) উপর সশস্ত্র আক্রমণ—ক্ষিপ্ত মুসলমানদের গুলীতে কতিপয় হিন্দু হতাহত—বিভিন্ন গ্রামে ইতস্ততঃ লুঠতরাজ ও গৃহদাহ।

লাওসে ভাঙ ভিয়েঙের দক্ষিণে গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গণে যুদ্ধ-বিরতি দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সহিত নির্দলীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সৌভান্না ফৌমার মধ্যে বৈঠকের ফল।

৩রা মে—২০শে বৈশাখ : আলজিরিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী আলজিরীয়দের সহিত ফরাসী সরকারের বৈঠক আসন্ন—মন্ত্রিসভার বৈঠকান্তে প্যারিসে ফরাসী তথ্যমন্ত্রী মঃ লুই টেরেনোয়ার ঘোষণা।

লাওসে বামপন্থী প্যাথেট লাও সেনাবাহিনী কর্তৃক সর্বত্র যুদ্ধ-বিরতি—প্যাথেট লাও সৈনিকদের সর্বাধিনায়ক ক্যাপ্টেন কং লের নির্দেশ প্রচার—দক্ষিণপন্থীদের অবিলম্বে অস্ত্র-সম্বরণ করিতে অনুরোধ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পুলিসের বৃহত্তম অভিযান—হাজার হাজার পুলিশ কর্তৃক ঘরে ঘরে তল্লাসী।

৪ঠা মে—২১শে বৈশাখ : শান্তি আলোচনার জন্য প্রিন্স সৌভান্না ফৌমার (লাওসের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) আমন্ত্রণ দক্ষিণপন্থী লাওস সরকার কর্তৃক গ্রহণ।

৫ই মে—২২শে বৈশাখ : মহাকাশে মানুষ প্রেরণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও (সোভিয়েট ইউনিয়নের পর) সাফল্য অর্জন—১১৫ মাইল উর্ধ্বে উঠিয়া ১৬ মিনিট মধ্যে মহাকাশ-যাত্রী কমাণ্ডার আলান শেপার্ডের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা।

৬ই মে—২৩শে বৈশাখ : ঢাকায় দুইজন সাংবাদিক এবং একজন কলেজ-অধ্যাপক গ্রেপ্তার—অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ।

লাওস প্রসঙ্গে প্যাথেট লাও ও দক্ষিণপন্থী প্রতিনিধিদের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি প্রশ্নের উপর প্রথম আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ।

৭ই মে—২৪শে বৈশাখ : আন্তর্জাতিক লাওস তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রথম দলটির নয়াদিল্লী হইতে সায়গন উপস্থিতি।

• • • সমকালীন সাহিত্য • • •

অভয়ংকর

বাংলা বই-এর চড়া দাম

'বাংলা বই-এর দাম বাড়ছে' না বলে বরং 'মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে' একথা বলাই যুক্তিযুক্ত। সস্তা দামে আর বই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, প্রকাশকরাও সে বিষয়ে কোনো চিন্তাও হয়ত করছেন না। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাংলা গ্রন্থের প্রচার সীমাবদ্ধ হচ্ছে একথা বিবেচনা করার সময় এসেছে। দশ টাকা দামে একখানা বই না কিনে দশ টাকায় তিন বা ততোধিক গ্রন্থ কেনার মত অল্প পুঁজির ক্রেতার সংখ্যাই বেশী।

বাংলা গ্রন্থের সর্বোচ্চ বিক্রয় সংখ্যা পুরাতন নাপকাঠিতে ছিল হাজার, সেটা এখন বেড়ে বাইশ শো বা বড়জোর তিন হাজারে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত জনপ্রিয় চটপট সংস্করণের গ্রন্থ এক বছরে তিন চারটির বেশী প্রকাশিত হয় না।

মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এর পিছনে অনেক যুক্তি আছে। যথা: ছাপার কাগজের দাম বেশী, মুদ্রণ ব্যয় বেড়েছে, বাঁধাই খরচা উপেক্ষণীয় নয়, তদুপরি বিজ্ঞাপন খরচা, লেখকের প্রাপ্য ইত্যাদি দিয়ে লাভের অংক খুবই কম হতে থাকে। এ ছাড়াও কয়েকটি কারণে লেখকরা একটু বৃহদায়তন গ্রন্থের দিকে ঝুঁকেছেন। এর দামটাও বেশী হয়, রয়্যালটি বেশী পাওয়া যায়, দেখতে শুনতে ভালো দেখায় এবং কিছু পাঠক মোটা বই পছন্দ করেন। কারণ, তাঁদের ধারণা যে বই যত মোটা, সেটি ততই উপাদেয়। এই সব স্ফীতোদর গ্রন্থ প্রথমটায় হয়ত কিছু বিক্রী হয়, কিন্তু দৌড়ের শেষের দিকে অনেক সময় তার পদক্ষেপ অতি শ্লথ হয়ে পড়ে। প্রকাশকের আলমারি এবং দপ্তরীর গুদামের অনেকখানি অংশ অধিকার করে অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকে।

আমাদের পুস্তক প্রকাশন ব্যবস্থার সব চেয়ে বড় ত্রুটি প্ল্যানিং-এর অভাব। সেই আমরা দেখলাম ঐতিহাসিক উপন্যাস দু একটি বেশ চালু হয়েছে, অমনই ঐতিহাসিক উপন্যাস সংগ্রহে মন দিলাম। যদি দেখা যায়, কোনো প্রতিষ্ঠান একটু চটুল ধরণের বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ করে সাফল্য অর্জন করেছেন, আমরা সেই দিকেই আকৃষ্ট হলাম। রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকীর হিড়িক এসেছে, অতএব চোখ এবং কান বন্ধ করে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশের প্লাবন সুরু হল। পাঠক, ক্রেতা এবং পুস্তক বিক্রেতা সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারের অনেক দিনের পুরাতন ব্যাধি। শোনা যায়, গিরীশ-চন্দ্রের এক নাটকে লব-কুশের চরিত্র থাকার সে নাটক অতিশয় সাফল্য লাভ করে। তখন তাঁর রঙ্গমঞ্চের অ-বাঙালী মালিক উপদেশ দিয়েছিলেন—'গিরীশবাবু, পাক এক কাম কিজিয়ে, ফিন একঠো নাটক লিখিয়ে আর ওই দোনো ছোড়কালো উসমে ডাল দিজিয়ে—'

গিরীশবাবু এই উপদেশ গ্রহণ করে সীতার বনবাস জাতীয় কটি নাটক লিখেছিলেন জানি না। কিন্তু আমরা যে সর্বদাই যে-সাফল্য সহজলভ্য মনে করি সেদিকেই আকৃষ্ট হই, একথা বলা যায়।

মুদ্রণ ব্যয়, কাগজের দাম, বাঁধাই এবং আনুসঙ্গিক খরচ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অধিকতর গ্রন্থ যদি বিক্রী হয় তাহলে লেখক, ক্রেতা এবং প্রকাশক এই তিন তরফই সমান উপকৃত হবেন। লেখকের প্রচার বাড়বে, খ্যাতিবৃদ্ধি হবে, অনেক বেশী পাঠকের হাতে তাঁর গ্রন্থ পৌঁছাবে, প্রকাশকের লাভের অংক বাড়বে, আর ক্রেতার সংগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

তাই মনে হয় প্রকাশন সংস্থার চিন্তা করা প্রয়োজন কি ভাবে এই মূল্য বৃদ্ধির ঝোঁক কমান যায়। মুদ্রণ পারিপাট্য, অলংকরণ এবং গ্রন্থের গুণ হ্রাস না করে কি ভাবে কম দামে ভালো বই ক্রেতার হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় তার উপায় ভাবতে হবে। প্রতিটি গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ এবং রাজ সংস্করণ করা উচিত। সুলভ সংস্করণ অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের কাগজে, মোটা কাগজের বাঁধাই করে বাজারে ছাড়া যায়। যাঁরা ধনী বা যে সব পাঠাগারের মূলধন বেশী, তাঁরা ভালো কাগজে ছাপা, ভালো বাঁধাই করা বই বেশী দামে কিনবেন। তাঁরা লাভবান হবেন, এক মাসের মধ্যেই নতুন বইটিকে আড়াই টাকা খরচ করে দপ্তরী বাড়ি থেকে বাঁধিয়ে আনতে হবে না। সংখ্যায় বেশী বই বিক্রী হলে লেখক তাঁর প্রাপ্য ঠিক মতই পাবেন এবং বেশী পাবেন। প্রকাশককেও ঠকতে হবে না।

বিজ্ঞাপন বাবদ একটি মোটা টাকা ব্যয় হয় সন্দেহ নাই। বিজ্ঞাপন কিন্তু আজো যেভাবে দেওয়া হয় তার প্রচার-মূল্য অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। প্রথম প্রকাশের সঙ্গে একটি বড়ো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সন্দেহ নেই। তারপর শেষ পর্যন্ত লেখকের নাম এবং গ্রন্থের নামে গিয়ে পৌঁছায়। অর্থাৎ ক্রেতাকে নিজের গরজে খুঁজে বার করতে হবে অসংখ্য গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের গোলক ধাঁধা থেকে কোন বইটি তিনি কিনবেন। খুব ওয়াকিবহাল ক্রেতা হয়ত সাময়িক পত্রিকায় সমালোচনা পড়ে বই কিনতে আগ্রহান্বিত হতে পারেন। যিনি সেটুকু কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হন না, তিনি খোঁজেন লেখকের নাম, তারপর বিক্রী।

সেলসম্যান নামক বস্তু বাংলা গ্রন্থের নেই বললেই চলে। পাঠ্যপুস্তকের ঠিকা সেলসম্যান স্কুল পাঠ্যপুস্তক চালু করার জন্য যেভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ফেরিওয়ালার মত ছুটোছুটি করে 'কে নিবি গো-কিনে আমায়, কে

নিবি গো কিনে" বলে ঘুরে বেড়ান, সেইভাবে সাধারণ গ্রন্থের গুণাগুণ প্রচারের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত কোনো প্রকাশক প্রতিষ্ঠান কোনো সেলস্‌ম্যান পাঠিয়েছেন কিনা সন্দেহ। গ্রন্থের বিক্রী কি 'বিনা অস্ত্রে চাঁদসীর চিকিৎসার মতো' বিনা চেষ্টায় বৃদ্ধি পাবে?

অলংকরণের দিকে আজকাল প্রকাশকরা অনেক বেশী আগ্রহশীল। আমরা মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণের নমুনাস্বরূপ দু'একখানি গ্রন্থের মলাট মুদ্রিত করার চেষ্টা করব। বাংলা গ্রন্থের অধিকতর প্রচারই তার মূল উদ্দেশ্য।

বই-এর দাম যদি সস্তা হয়, তাহলে সেই বই-এর গুণ হ্রাস পায় কি। সম্প্রতি প্রকাশিত সস্তা দামের গীতাঞ্জলি কত খণ্ড বিক্রী হয়েছে সে কথা আশা করি অনেকেই জানেন।

এই কর্মে প্রকাশক, লেখক এবং পাঠক তিন পক্ষেরই সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন। প্রকাশক যদি একটা বাঁধা সিরিজ করে, যেমন তিন টাকা সিরিজে শুধু গল্পের বই পাওয়া যাবে, প্রতি মাসে দু'খানি কিংবা চারখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া চাই। উপন্যাস পাঁচ টাকা সিরিজ, কোনোটির আয়তন মোটা, কোনোটির ক্ষীণ হতে পারে, তাতে প্রকাশক বা ক্রেতার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কারণ একবারের ক্ষতি অপর বারে লাভে দাঁড়িয়ে গড়পড়তা হার ঠিক থাকবে। লেখকেরও একটা বাঁধা রয়্যালটি হবে।

আজকাল সংকলন গ্রন্থ প্রকাশেরও একটা হিড়িক দেখা যাচ্ছে। এই সব সংকলন গ্রন্থও একটা বাঁধা দামের সিরিজে বাজারে ছাড়া যায়। মূল্য, আয়তন, মুদ্রণ-বৈশিষ্ট্য, প্রচ্ছদ প্রভৃতি যদি এক ধরনের করা যায় তাহলে এই সিরিজভুক্ত গ্রন্থাবলী সুন্দর ও শোভনভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন রবীন্দ্র রচনাবলী, শরৎ-সাহিত্য-সম্ভার ইত্যাদি।

আমরা টাইপোগ্রাফি বা অক্ষরবিন্যাসে তেমন মনোযোগী নই। অনেক বৃহদায়তন উপন্যাস পাইকা অক্ষরে ছাপানোর রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে, ক্রমশঃ সংক্রামক ব্যাধির মত ছোট উপন্যাস, ছোট গল্পের বইও এভাবে ছাপা হতে সুরু হয়েছে। গুরু প্রবন্ধের বই সেই পাইকা অক্ষর। এর কারণ কি গ্রন্থের আয়তনকে অকারণে স্ফীত করা নয়? তার ফলে অনিবার্য কারণেই মূল্যবৃদ্ধিরও প্রয়োজন।

কিন্তু পরিচ্ছন্ন লাইনো, মনোটাইপ, কিংবা নতুন স্মল পাইকা অক্ষরে ওপরে-নীচে এবং ধারে অধিকতর মার্জিন দিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করলে কি অসুবিধা হয়, অনেক শোভন এবং সুন্দরভাবে গ্রন্থ সহজেই প্রকাশ করা যায়, ক্রেতার নজরেও সহজে আসে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সুন্দর প্রচ্ছদ ভূষিত গ্রন্থ, ভিতরে কিন্তু সেই ভাঙা টাইপ, ধ্যাবড়া ছাপা, কালি সর্বত্র সমানভাবে পরিবেশিত নয়। ফলে গ্রন্থ হাতে করতে ইচ্ছা করে না, সস্তাদরের প্রেসে বই ছাপলে এই অবস্থার হাত থেকে নিস্কৃতি নেই।

বাংলা গ্রন্থের বিক্রী বাড়ানোর জন্য চাই লেখক, প্রকাশক এবং মুদ্রাকরের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা। সাধারণতঃ আমাদের মুদ্রাকররা লেখককে বা প্রকাশককে কোনো সাহায্যই করেন না, অথচ তাঁরা মুদ্রণ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, যা কিছু নির্দেশ, শিল্পগত উপদেশ, অক্ষর বিন্যাসের ব্যবস্থা তাঁদেরই ত' কর্তব্য। খুব প্রথম শ্রেণীর মুদ্রণালয় ভিন্ন এই জাতীয় সহায়তা অন্যত্র বিরল। সেই কারণে প্রথম শ্রেণীর মুদ্রণালয়ে ছাপা বই অধিক বিক্রী হয়।

বাংলা বই-এর বিক্রী যদি বাড়ে তাহলে লেখক, প্রকাশক, মুদ্রক, বাঁধাই-কার, এমন কি কাগজওলা পর্যন্ত লাভবান হবেন। এখন যে অনুকূল পরিবেশ, রুচিশীল পাঠক ও ক্রেতার সংখ্যা যখন ক্রমবর্ধমান, এই শুভ মুহূর্তে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বাংলা বই-এর প্রচার ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত তাঁদের উপরোক্ত কথাগুলি বিবেচনা করতে অনুরোধ করি।
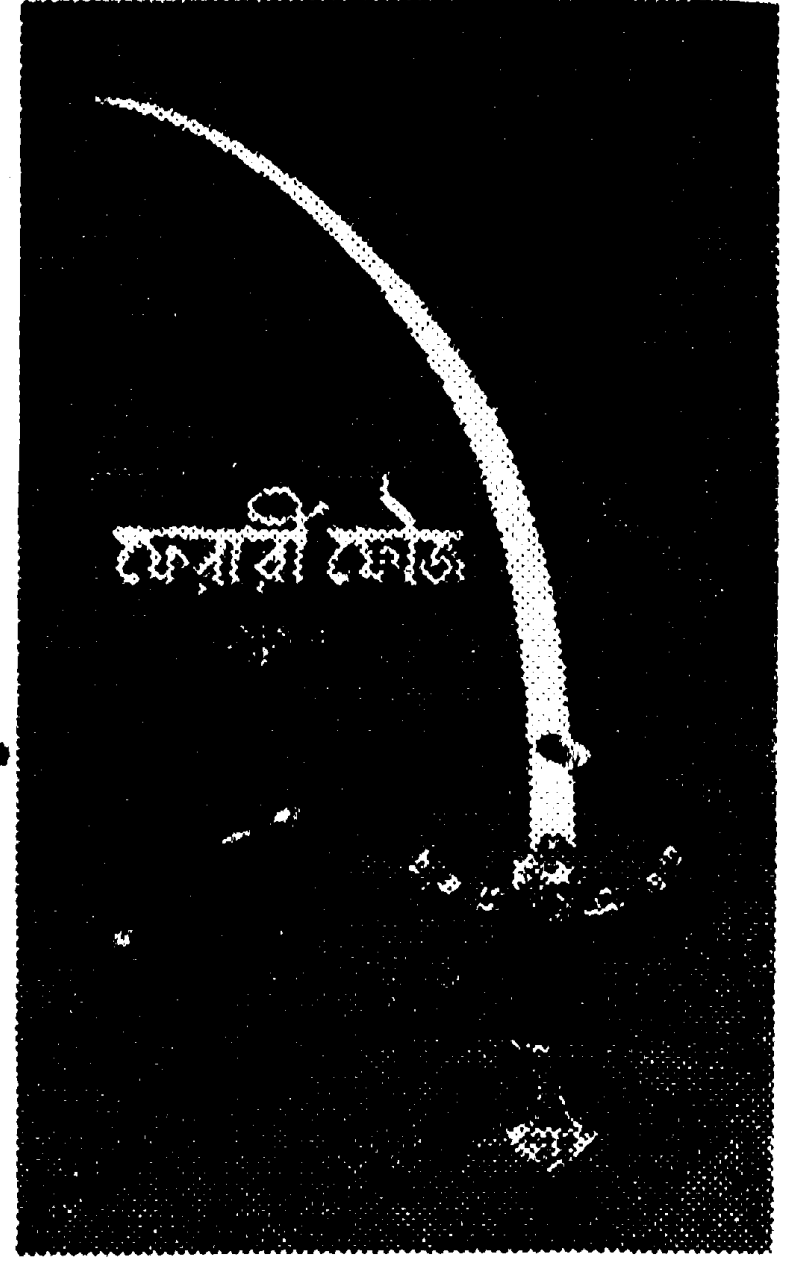
বাঙালীর মিষ্টান্ন ব্যবসাও আজ ক্রমশঃ অন্য হাতে চলে যাচ্ছে, শহরের অলি-গলিতে সর্বভারতীয় খাবারের দোকান গজিয়ে উঠছে। আমাদের অবহেলার ফলে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবসার ক্ষেত্রে উৎসাহী এবং অধিক মূলধনসম্পন্ন সর্বভারতীয় অনুপ্রবেশ কোনো পক্ষেরই কল্যাণ সাধন করবে না। বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের বাংলা বই-এর চড়া দামের ঝোঁক কমিয়ে সুপরিকল্পিত গ্রন্থ ব্যবসার দিকে মনোযোগ দেওয়াই সর্বপ্রধান কর্তব্য। তবেই বাংলা গ্রন্থের প্রচার বৃদ্ধি পাবে।

●

নূতন বই

(১) বীরবল ও বাংলা সাহিত্য : (পৃঃ ১৩০; দাম : ৪ টাকা); (২) রবীন্দ্র-মনীষা : (পৃঃ ১৬৪; দাম : ৫ টাকা) : লেখক : ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : ক্লাসিক প্রেস, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় অল্পকালের মধ্যে কয়েকটি সাহিত্য গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলা গীতিকাব্য, বাংলা গদ্য এবং বাংলার কবিসমাজ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

'বীরবল ও বাংলা সাহিত্য', নয়টি বিভিন্ন বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ পরিচ্ছেদে বীরবলের জীবন ও সাহিত্যের চৌধুরী একটি বিস্ময়কর প্রতিভা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাঁর দানে বিশেষ-ভাবে পরিপুষ্ট কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যকৃতি এবং জীবন সম্পর্কে যে ধরনের আলোচনা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। এই গ্রন্থটি সম্ভবতঃ প্রথম চৌধুরী সংক্রান্ত তৃতীয় গ্রন্থ, তুলনায় আয়তনে ক্ষুদ্র তবে ক্ষুদ্র হলেও ডঃ [illegible]ণকুমার যে পদ্ধতিতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য পাঠকের কাছে তা ভূমিকা হিসাবে গৃহীত হতে পারে। কৃষ্ণনাগরিক প্রমথ চৌধুরী যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, বাঙালীর সামাজিক জীবনের ইতিহাসে তার মূল্যবান ভূমিকা আছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিলেন প্রমথনাথ। তাঁর 'সবুজ-পত্র' এবং চলতি ভাষা বাংলার সাহিত্য ইতিহাসে এক স্মরণীয় পর্ব। প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনাম গ্রহণ করে-ছিলেন তাঁর পরিহাসপরায়ণ যুক্তিবাদী মনের জন্য। তিনি বলতেন আমি বাঙালী জাতির বিদূষক মাত্র। যে ভূমিকা প্রমথ চৌধুরী গ্রহণ করে অতি নীরবে সাহিত্য সাধনা করেছেন সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যে তা অচিন্তনীয়। এই সব কারণে এই গ্রন্থ প্রকাশ সময়োপযোগী হয়েছে। প্রমথনাথের গল্প, প্রবন্ধ রীতি এবং সনেট সম্পর্কে তিনটি মনোজ্ঞ আলোচনা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। গল্প সংক্রান্ত পরিচ্ছদটি কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত হয়েছে, প্রমথনাথের গল্প অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য। প্রবন্ধ-রীতি এবং সনেট এই দুটি অধ্যায় সুলিখিত। শেষের দিকে প্রমথ চৌধুরী ও উত্তরকাল সম্পর্কিত পরিচ্ছদটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা, তবে এই পরিচ্ছেদটিও বিস্তৃততর হওয়ার প্রয়োজন। লেখকের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করি।

প্রমথ চৌধুরীর যেদিন জন্মদিন সেই দিন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথি। রবীন্দ্র-নাথের শিষ্য হিসাবে সচরাচর যাঁদের আমরা নাম করি তার মধ্যে দুটি নাম সর্বপ্রধান, একটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অপরটি প্রমথ চৌধুরী। রবি পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করেও এঁরা দুজনেই স্বয়ং-

সম্পূর্ণ, তাই এই দুজনের সম্পর্কে যত আলোচনা হয় ততই সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে মঙ্গল।

'রবীন্দ্র মনীষা' গ্রন্থেও ডঃ অরুণ-কুমার অনুরূপ আঙ্গিকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের কথা মিলিয়ে তিনি একটি সম্পূর্ণ চিত্র এঁকেছেন, রবীন্দ্রনাথের আত্ম-পরিচয়, গদ্যশিল্প, গল্পকারের পিতৃহৃদয়, গল্পের পটভূমি, ছিন্নপত্র, জীবনস্মৃতি, সে, তিন সঙ্গী, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, এবং গাজিপুরে ও বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ—এই ক'টি পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

পরিকল্পনার দিক থেকে এই গ্রন্থটি অভিনব হলেও, ধারাবাহিকতা যথাযথ রক্ষিত না হওয়ায় পাঠকের একটু অসুবিধা হবে। যদিচ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে বিরাট ক্যানভাসে ছবি আঁকা প্রয়োজন। লেখক অতি সহজে এবং সরল-ভাবে কয়েকটি মূল সূত্র ধরে তুলেছেন। পাঠকের কাছে এই গ্রন্থ প্রয়োজনীয়। কিন্তু তবু অপূর্ণতা থেকে যায়। তার কারণ রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যের আরো বহুবিধ পর্ব সম্পর্কে লেখকের নীরবতা।

গাজিপুরে, বোলপুরে এই দুটি পরিচ্ছেদ অতিশয় সুলিখিত। এত অল্প কথায় এমন বিষয়বস্তুর আলোচনা সাধারণতঃ বিরল। লেখকের সংযম এবং নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। কোথাও এতটুকু বাচালতা নেই। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা পরিচ্ছেদ দুটিও যুক্তি ও তথ্যের সমন্বয়ে মনোজ্ঞ হয়েছে। লেখক ছিন্নপত্র এবং চিঠিপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে কোনো পরবর্তী খণ্ডে যদি রবীন্দ্রজীবনের রূপরেখা অঙ্কন করতে পারেন তাহলে একটা মূল্যবান সাহিত্য-কর্ম করা হবে।

সরস ভাষায় রচিত এই দুটি সুমুদ্রিত গ্রন্থ সমাদৃত হবে আশা করি।

●

বইয়ের খবর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রবীন্দ্র-রচনাবলীর (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এর সৌন্দর্য ও মুদ্রণ পারিপাট্যের জন্য কর্তৃপক্ষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই খণ্ডে সর্বসমেত ৯৪৭ পৃষ্ঠা আছে। ছবির সংখ্যা পাঁচটি—কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ, যৌবনে রবীন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠা কন্যাসহ রবীন্দ্রনাথ, হস্তলিপি ও ছবি, কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবী। এই প্রথম খণ্ডটি কবির পূর্বলিখিত কবিতা-সংকলন বলা যেতে পারে। এতে আছে—সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, ছবি ও গান, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কড়ি ও কোমল, মানসী, নদী, চিত্রা, কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, স্মরণ।

* *

কবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে টাটা কোম্পানী কবি-অঙ্কিত ১৩ ছবির একটি অনবদ্য port folio প্রকাশ করেছে। এই ছবির এলবামটি অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত। মূল্য মাত্র ৮৲ টাকা।

* * *

কবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বভারতী অনেকগুলি কবি-লিখিত বইয়ের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে স্বল্প-মূল্যের 'গীতাঞ্জলি' ও 'বিচিত্রা' উল্লেখযোগ্য। বিচিত্রাকে কবির রচনাবলীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে। কবির সবরকম নির্বাচিত লেখা সংগ্রহ করে বিচিত্রা প্রকাশিত হয়েছে। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০০ এবং মূল্য ৬৲ টাকা।

* * *

সেদিন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাতীয় গ্রন্থগারের নূতন অট্টালিকার যে ভিত্তি স্থাপন করলেন, তা হতে জানা গেল এখন এই জাতীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা হচ্ছে ১০ লক্ষের বেশী এবং ১৯৪৭ সালে এর পুস্তক সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৫০ হাজার।

* * * *

প্রবাসী মাসিক পত্রের ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়া প্রবাসীর একটি বৃহৎ স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আটপেজী ডবল-ক্রাউন আকারে প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বই—ছবি, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে এই স্মারক-গ্রন্থ পরিপূর্ণ।

* * *

ভারত গভর্ণমেন্টের National Book Trust ভারতের বিভিন্ন ভাষায় কয়েকটি বই অনুবাদ করবার ব্যবস্থা করেছে। অনুবাদ কার্যের সুবিধার জন্য এই ট্রাস্ট—অনুবাদকদের একটা তালিকা প্রস্তুত করছে। ১০০০ অনুবাদকের নাম সংগ্রহ করার সংকল্প ছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত ৩০০ নাম লিস্টভুক্ত হয়েছে।

* * *

শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসর্গ (সংকলন : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতি প্রকাশিত)— ৫·০০, রবীন্দ্র-চরিত (স্বল্পশিক্ষিতের জন্য)— বিজনবিহারী ভট্টাচার্য—১·৫০।

রবীন্দ্র-চর্চার আকর গ্রন্থ

(তালিকা অসম্পূর্ণ)

কাব্য পরিক্রমা	...	অজিতকুমার চক্রবর্তী	...		
বাইশে শ্রাবণ	...	নির্মলকুমারী মহলানবিশ	...		৬·০০
রবি দীপিতা	...	ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	...		৫·৫০
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ	...	বিশ্বপতি চৌধুরী	...		৩·৫০
কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ	...	ঐ	...		৩·০৭
সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ	...	শচীন্দ্রনাথ অধিকারী	...		৩·০০
পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ		ঐ			
দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ	...	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...		২·০০
রবীন্দ্র স্মৃতি	...	ঐ			
রবি-রশ্মি	...	চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	(১ম ভাগ)	৮·৫০
ঐ		ঐ	...	(২য় ভাগ)	৭·০০
বলাকা কাব্য-পরিক্রমা	...	ক্ষিতিমোহন সেন	...		৪·০০
রবি-পরিক্রমা	...	কনক বন্দ্যোপাধ্যায়	...		২·০০

রবীন্দ্র কাব্যালোক ...	অমিতা মিত্র ...	৫·০০
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন ...	ডাঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী ...	২·৫০
রবীন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা ...	অশোক সেন ...	৬·০০
বিশ্ব ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ...	জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ...	৩·৫০
শতাব্দীর সূর্য ...	দক্ষিণারঞ্জন বসু ...	
ভারতভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ...	প্রণজিৎকুমার সেন ...	
রবীন্দ্র-বিতান ...	ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ...	
রবীন্দ্র সমীক্ষা ...	ঐ ...	
আমাদের রবীন্দ্রনাথ ..	ধীরেন্দ্রলাল ধর ...	৮·০০
রবীন্দ্র-চর্চার ভূমিকা ..	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ...	
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ...	মনোরঞ্জন জানা ...	৮·০০
রবির আলো ...	মণি বাগচি ...	৩·০০
অরবিন্দর-রবীন্দ্র ...	রবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	৪·০০
রবীন্দ্র-সরণী ...	প্রমথনাথ বিশী ...	১২·০০
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ...	ঐ ...	৪·৫০
রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (১ম) ...	ঐ ...	৪·০০
ঐ (২য়) ...	ঐ ...	৪·০০
রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা ...	সাধনকুমার ভট্টাচার্য ...	৬·০০
রবীন্দ্র সংগীত-প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড) ...	প্রফুল্লকুমার দাস ...	৩·৫০
রবীন্দ্রায়ন (দুই খণ্ড) ...	পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত, প্রতি খণ্ড ...	১০·০০
রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য ...	সজনীকান্ত দাস ...	
রবীন্দ্রনাথ-কালিম্পঙের দিনগুলি ...	...	৩·০০
রবীন্দ্র নির্দেশিকা ...	নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী ...	১০·০০
বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ ...	শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী ...	
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ...	প্রফুল্লকুমার সরকার ...	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প ...	সুধীর চক্রবর্তী ...	৫·০০
রবীন্দ্রনাথ (সংকলন) ...	শশিভূষণ দাশগুপ্ত ...	১২·৫০
রবীন্দ্রনাথের চেনা মানুষ ...	প্রভাত মুখোপাধ্যায় ...	
রবীন্দ্র জীবনী (৪ খণ্ড) ...	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ...	
ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ ...	প্রবোধচন্দ্র সেন ...	
রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ ...	অজয়কুমার রায় ...	
রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ...	ক্ষুদিরাম দাস ...	১০·০০
রাবীন্দ্রিক মূল্য ...	ধীরানন্দ ঠাকুর ...	৫·০০
রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান ...	বিমানবিহারী মজুমদার ...	৬·০০
এই যা দেখা ...	লীলা মজুমদার ...	
ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (১ম খণ্ড) ...	নেপাল মজুমদার ...	
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ...	পুলকেশ দে সরকার ...	৩·৫০
রবীন্দ্র মনীষা ...	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ...	৫·০০
সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ...	ডঃ আদিত্য ওহদেদার ...	
রবীন্দ্র সাহিত্যে সমালোচনার ধারা	ঐ ...	৭·০০
বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ ...	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ...	
রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ ...	ঐ ...	
রবিতীর্থে	ঐ ...	
রবীন্দ্রনাথের বলাকা ...	অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় ...	৪·৫০
রবীন্দ্রনাথের মহুয়া	ঐ ...	৫·০০
রবীন্দ্রনাথের পূরবী ...	ঐ ...	৩·০০
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী ...	ঐ ...	২·০০
রবি তর্পণ ...	সত্যেন জানা ...	৩·০০
Rabindranath Tagore, His Life and Work ..	E Thomson ..	5.00
The Great Wanderer ..	Maitrayee Devi	
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ...	মৈত্রেয়ী দেবী ...	৭·৫০
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ...	ঐ ...	৭·৫০
কবি স্মরণে ...	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ...	২·০০
রবীন্দ্রনাথের গান ...	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩·০০
রবীন্দ্র রচনাকোষ (১ম খণ্ড) ...	চিত্তরঞ্জন দাস ও বাসুদেব মাইতি ...	৬·৫০
রবীন্দ্র দর্শন ...	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২·০০

বই	লেখক / সম্পাদক	মূল্য
রবীন্দ্র স্মারক গ্রন্থ ...	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত ...	৫·০০
কবি-প্রণাম ...	বিশু মুখোপাধ্যায় (প্রকাশিতব্য) ...	
মাধুর্য্যাংশচ ...	সম্পাদনা : দক্ষিণারঞ্জন বসু ...	
সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ...	জগদীশ ভট্টাচার্য ...	৬·০০
রবীন্দ্র-স্মৃতি ...	ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ...	
রবীন্দ্র-প্রদক্ষিণ	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত ...	
রবীন্দ্রনাথ ...	গুণময় মান্না ...	৪·৫০
রবিতীর্থে ...	বিনায়ক সান্যাল ...	৪·৫০
রবীন্দ্র অভিধান ...	সোমেন বসু ...	৬·০০
রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা ...	নীহাররঞ্জন রায়	
রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব ...	বিমলকান্তি সমাদ্দার ...	৫·০০
রবীন্দ্রনাথ ...	(ন্যাশনাল বুক এজেন্সী সংকলন)	
নাট্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ ...	হরনাথ পাল ...	২·৭৫
শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ ...	(সংকলন : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত) ...	৫·০০
রবীন্দ্র-চরিত ...	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ...	১·৫০
রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয় ...	শচীন সেন	
পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ...	অমল হোম ...	২·৭৫
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা ...	শুভ গুহঠাকুরতা ...	৬·০০
রবীন্দ্র-সংগীতের ভূমিকা ...	কণিকা ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২·০০
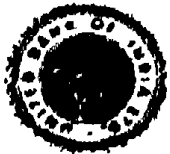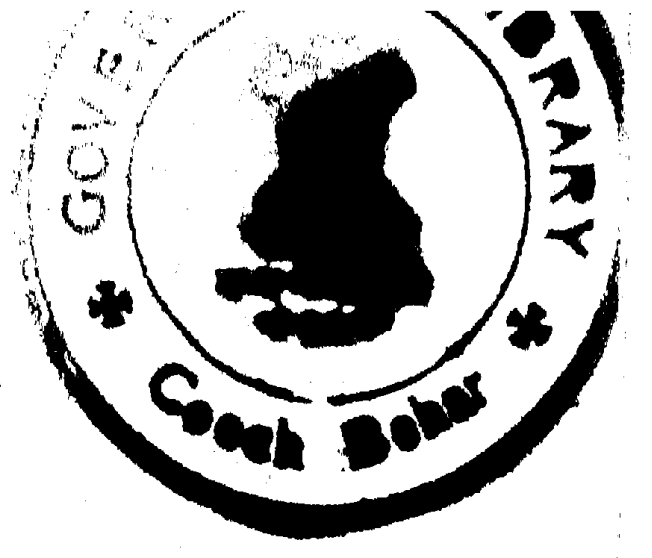
প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

গেল হপ্তার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজওহরলাল নেহেরু কর্তৃক কলকাতার ক্যাথিড্রাল রোডে নির্মীয়মান জাতীয় নাট্যশালা 'রবীন্দ্র স্মরণী'তে আনুষ্ঠানিকভাবে মর্মরশিলা স্থাপন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা থেকে জানতে পারা যায় যে, এই নাট্যশালার প্রেক্ষাগৃহে অন্ততঃ এগারশো দর্শকের বসবার মতো আসন থাকবে এবং প্রেক্ষাগৃহটি সম্পূর্ণরূপে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। আশা করা অন্যায় হবে না যে, মহাজাতি সদন, ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, আশুতোষ কলেজ হল প্রভৃতি জায়গায় মঞ্চ থেকে স্বরপ্রক্ষেপণে যে দুরতিক্রম্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। কয়েক মাসের মধ্যেই নাট্যশালাটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হবে, এমন আশ্বাসও পাওয়া গেছে ডাঃ রায়ের কাছ থেকে।

●

সংগীত, নৃত্য, নাটকের অনুশীলন এবং রবীন্দ্র রচনার সম্যক পঠন-পাঠনের জন্যে যে "ঠাকুর" বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে, তারও ভিত্তি স্থাপন করেছেন পণ্ডিত নেহেরু ঐ একই দিনে অর্থাৎ রবীন্দ্র জন্মদিন, ৮ই মে তারিখে। সংগীত, নৃত্য ও নাট্যকলার অনুশীলন প্রধান উপলক্ষ্য হলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস দর্শন, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়েও রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হবে বলে শোনা গিয়েছে।

●

স্টার থিয়েটারের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে সভাপতিরূপে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় যে-কথা বলেছেন, তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে আমাদের সাধারণ রংগালয়ের কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তারাশংকর বলেছেন, যদি 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'গুরুপরতন', 'রাজা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাটোর রস সাধারণ রংগমঞ্চের মাধ্যমে অগণিত সাধারণ দর্শকের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করা হোতো, তাহ'লে আমি আরও বেশী খুশী হতুম। কারণ আমার মতে, এই সব নাটকেই লেখক এবং দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সত্যকার পরিচয় আছে।" তারাশংকরবাবুর মতো আমরাও আশা করব, রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীর বছরটিতে আমাদের বিভিন্ন রংগমঞ্চের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট রূপক নাটকগুলি সাধারণের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হবে।

●

১৬ই মে, মংগলবার রঙমহল "চিরকুমার সভার" দ্বিতীয় অভিনয় করেছেন এবং ১৭ই মে, বুধবার স্টার থিয়েটার 'কাবুলিওয়ালা' এবং "মুক্তির উপায়"-এর পুনরভিনয় করেছেন।

●

নবনাট্য উৎসব :

গন্ধর্ব নাট্যসংস্থা এপ্রিল থেকে সুরু করে পর পর ছ'মাসের ছ'টি রবিবারে প্রতিদিন দু'খানি করে বারোটি একাংক নাটকের অভিনয় করে 'নবনাট্য উৎসব' পালন করছেন মিনার্ভা রংগমঞ্চে। ১৬ই এপ্রিল তাঁরা অভিনয় করেছিলেন অতনু সর্বাধিকারীর 'অন্য স্বর' এবং কৃষ্ণ ধরের 'একরাত্রির জন্য'। গেল ১৪ই মে এঁরা করলেন গিরিশংকরের 'রক্তকরবীর পরে' এবং অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার রঙ'। প্রথম একাংকিকাতে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র প্রধান চরিত্রগুলিকে গার্হস্থ্য পরিবেশে নিয়ে এসেছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই নন্দিনীকে রাজার স্ত্রী হিসেবে, যদিও রঞ্জনের মৃত্যুর ফলে তার কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। এই দুই ভূমিকায় দীপিকা দাস এবং শ্যামল ঘোষের সু-অভিনয় দর্শকদের আরও বেশী খুশী করতে পারত, যদি তাঁরা স্বরপ্রক্ষেপণের দিকে আর একটু মনোযোগী হতেন। 'সন্ধ্যার রঙ'-এ সেই অতি-পুরাতন প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বের চিত্র কিছুটা কাঁচা হাতেই রূপায়িত

তপন সিংহ পরিচালিত 'ঝিন্দের বন্দী' চিত্রে উত্তমকুমার

করবার চেষ্টা হয়েছে। অভিনয় অবশ্য মোটের উপর মন্দ হয়নি। গন্ধর্বের পরবর্তী অভিনয় হবে ১১ই জুন। ঐদিন তাঁরা সুরঞ্জন মিত্রের 'নেপথ্য দর্শন' এবং চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দেববাজের মর্ত্য' নামে দুখানি একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করবেন।

নাট্য-রসিকদের কাছে 'রঙ্গসভা' নাম নতুন নয়। কলকাতা ও তার আশে-পাশে একাধিকবার এদের প্রযোজিত নাটকাভিনয় রসিকচিত্ত আমোদিত করেছে। অতীতে 'বোবাকান্না' অভিনয় করে এরা নাট্যামোদিদের কাছে প্রশংসা ভাজন হয়েছেন। গত ১৩ই মে দেশপ্রিয় পার্কে 'দক্ষিণী'র রবীন্দ্র শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে, এদের 'দালিয়া' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এরা 'দালিয়ার' পুনরাভিনয় করবেন ২৮শে মে নিউএম্পায়ার মঞ্চে। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন পীযূষ বসু এবং পরিচালনার ভার তিনিই নিয়েছেন।

* * *

দুটি অনাথ বালকের পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসার কাহিনী 'দুই ভাই'-এর চিত্রগ্রহণ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ছবির জন্যে বিশেষভাবে কাহিনী লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চাটার্জি, বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী এবং আরো অনেকে। পরিচালনা করছেন সুধীর মুখার্জি, সংগীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণে বিভূতি চক্রবর্তী।

* * *

নিউ ইউরেকা পিকচার্সের প্রথম প্রয়াস ছোটদের ছবি 'মায়ের গলার হার'। এক অনাদৃত কিশোরের অশ্রুসজল জীবনের দুঃসাহসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছবিখানি নির্মিত হচ্ছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন সুজিত নাগ। ছবিতে ছড়ায় গান লিখবেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মাস্টার দীপক, মধুছন্দা, মাধুরী চক্রবর্তী, তপতী ঘোষ, পদ্মাদেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, শিবেন বন্দ্যো, মিহির ভট্টাচার্য, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলাহা, সুচিতাদেবী, প্রীতি মজুমদার ও মালা ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

চিত্র-সমালোচনা:

তিনকন্যা: সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশনস-এর চিত্র। কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ রচিত তিনটি গল্প, মণিহারা, পোস্ট-মাস্টার ও সমাপ্তি; প্রযোজনা, পরিচালনা চিত্রনাট্য ও সংগীত পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়; চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়; শব্দগ্রহণ: দুর্গাদাস মিত্র; শিল্প-নির্দেশনা: বংশীচন্দ্র গুপ্ত; সম্পাদনা: দুলাল দত্ত। ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার (মণিহারা); অনিল চট্টোপাধ্যায় ও চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় (পোস্ট মাস্টার) এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা দাশগুপ্ত (সমাপ্তি)। পরিবেশনা: ছায়াবাণী লিমিটেড। ৫ই মে থেকে রূপবাণী, ভারতী এবং অরুণায় দেখানো হচ্ছে।

বাংলার চলচ্চিত্র-জগতে 'তিন কন্যা' নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায়ের একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। বারো-চোদ্দ রীলে সম্পূর্ণ একখানি বড়ো ছবি দেখানোর পরিবর্তে তিনটি ভিন্ন রসের বাহন, তিনটি ছোট ছবিকে পর পর দেখিয়ে দর্শকদের সমান খুসী করতে পারা যায় কিনা, এই পরীক্ষা তিনি করতে চেয়েছেন 'তিন কন্যা'কে চিত্ররসিক দর্শকসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করে। তিনি যেন দর্শকদের বলতে চেয়েছেন, 'পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয় ত' রোজই দেখেন, তিনখানি স্বতন্ত্র একাঙ্কিকার অভিনয় পর পর দেখুন না—নতুনত্বের আনন্দ পাবেন।' বলতে বাধা নেই, দর্শকরা তাঁর এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন; তাঁর তিনটি অনবদ্য শিল্প-সৃষ্টিকে তাঁরা প্রাণ ভ'রে উপভোগ করেছেন। রবীন্দ্র মানসলোকের তিনটি ভিন্ন চরিত্রের মেয়ে—মণিমালিকা, রতন ও মৃন্ময়ী দর্শকদের যে তিনটি ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়, প্রদর্শনী অন্তে সেখান থেকে ফিরে এসে বেশীর ভাগ দর্শকেরই মনে হয়েছে,

প্রাণের স্পিরিটা দেশীই যেন পাওয়া গেল। এক ঢিলে দুই পাখী মারবার কথা শোনা যায়, এ একেবারে তিন তিনটি রাজা ভব প্যারাডাইস!

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত, আমাদের বাঙলাদেশে সত্যজিৎ রায়ের এই প্রচেষ্টা নতুন হলেও বিদেশে এ-জিনিষ অনেক আগেই হয়ে গেছে। ও' হেনরীর 'ফুলহাউস', মমূ-এর 'ট্রায়ো' এবং 'কোয়ার্ট্রেট' এই সম্পর্কে স্মরণীয়।

'তিন কন্যা'তে সত্যজিৎ রায় তাঁর একটি কাজ করেছেন। মহৎ শিল্প-সৃষ্টির আবেশে তিনি সাধারণ [illegible] দর্শককে ভুলে যাননি। সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন দর্শকের মনে কিছুমাত্র বিরক্তি উৎপাদন না ক'রে তিনি সাধারণ দর্শকের উপভোগ করবার মতো হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ছবি তিনটির এখানে-সেখানে, যা দেখে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে প্রাণ খুলে হেসেছে। চলচ্চিত্র শিল্প-প্রচেষ্টা হলেও এর যে একটা ব্যবসায়িক দায়িত্ব আছে, সেটা বেমালুম বিস্মৃত হওয়া কোনো সময়েই বাঞ্ছনীয় নয়।

অত্যন্ত অল্প যন্ত্রের সহায়তায় স্থান এবং কালোপযোগী আবহসঙ্গীত রচনা করে এবং রতনের কণ্ঠে খালি গলার গান দিয়ে সত্যজিৎ রায় সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাধারণভাবে এই কথা কয়টি বলবার পর আমরা প্রত্যেকটি চিত্রের গুণাগুণ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

(১) **মণিহারাঃ** রবীন্দ্রনাথ একজন "ক্ষুধা ও রোগজীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়ো বড়ো চক্ষু"-বিশিষ্ট স্কুল মাস্টারের মুখ দিয়ে মণিহারার কাহিনী বিবৃত করিয়েছিলেন ঘাটে-প্রত্যাগত নায়ক শ্রীফণিভূষণ সাহার কাছে। 'মণিহারা' চিত্রে কথক সম্ভবতঃ একজন সাহিত্যিক যদিও পুস্তিকাতে স্কুল মাস্টারই বলা হয়েছে।) এবং শ্রোতা নিঃসন্দেহে নায়িকা মণিমালিকার দূর সম্পর্কীয় ভাই মধুসূদনের অশরীরী আত্মা, যে গল্প-শেষে কথকের চোখের সামনে বায়ুতে মিলিয়ে গিয়ে তাকে রীতিমত ভয়চকিত ক'রে তোলে। এই পরিবর্তনে গল্পের নাটকীয়তা বৃদ্ধি না পেলেও উপভোগ্যতা অবশ্যই বর্ধিত হয়েছে। ছবির মধ্যে গল্পের মূল সুরটি সহজেই ধরা পড়েছে। একদিকে নিঃসন্তানা মণিমালিকার মনোবেদনা, স্বামীর ভালোবাসার প্রতি তার নিরাসক্তি, নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের ফলে গহনার প্রতি তার মোহ এবং ক্রমশঃ সেই মোহের মানসিক বিকারে পরিণতি এবং অন্যদিকে স্বামী ফণিভূষণের স্ত্রীকে ভালোবাসার নিষ্ফল প্রয়াস, গহনা দিয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা, টাকা সংগ্রহের জন্যে স্ত্রীর গহনা দাবী করা সম্পর্কে তার দুর্বলচিত্ততা এবং সব শেষে নিরুদ্দিষ্ট স্ত্রীর প্রতীক্ষায় তার অন্তরের আকুলতা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছবির শেষাংশ ভৌতিক গল্পের নিশ্বাস-বন্ধ-করা সাসপেন্সে ভরা এবং তা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। ছবিটিতে স্বাভাবিকত্ব ফুটিয়ে তুলতে দৃশ্যপটসংস্থাপন এবং চিত্রগ্রহণ অত্যন্ত সাহায্য করেছে। সাজ-সজ্জায়, চলনে-বলনে ও চরিত্র-চিত্রণে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফণিভূষণ স্মরণীয় সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং নবাগতা কণিকা মজুমদার চরিত্রানুগ রূপে ও ভাবাভিব্যক্তিতে মণিমালিকার ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন।

(২) **পোস্ট মাস্টারঃ** সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এবং অত্যন্ত সহজ সরল অভিনয় গুণে রবীন্দ্রনাথের এই সুপরিচিত গল্পটির [illegible]

অজিত সেন পরিচালিত 'স্বয়ম্বরা' ছবিতে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি এই সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে।

শ্রীসত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'তিন কন্যা' ছবির 'সমাপ্তি' অংশে অপর্ণা দাশগুপ্তা (মৃন্ময়ী) এবং সীতা মুখোপাধ্যায়।

যেন আরও নিবিড়ভাবে অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে। চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রতন কবির রতনকেও ছাপিয়ে গেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। জীবনে যে সব বিষয়েই বঞ্চিত, সে যখন সামান্য একটু সহানুভূতির ছোঁয়াচ পেল, তখন তার হৃদয় হয়ে উঠল কাণায় কাণায় পূর্ণ। বেঁচে থাকাও যে একটা আনন্দের ব্যাপার, এই অনুভূতি তাকে করে তুলল মহিমাময়ী। রুগ্ন পোস্ট্ মাস্টারকে সেবা করল সে মায়ের সমস্ত স্নেহকে অন্তরে নিয়ে। এবং তাকে ভালো করে তুলতে পেরে সে কৃতার্থ। এমনিভাবে ছোট্ট মেয়ে রতনের জগত যখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়েই তার কাণে এল, পোস্ট মাস্টার গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং তাকে একথা আগে থাকতে না জানিয়েই। তখনি তার মনে জাগল হৃদয় জোড়া অভিমান, যে অভিমান তাকে পোস্ট মাস্টারের সঙ্গে একটি মুখের কথাও কইতে দিল না। তার আচরণে মনে হল, পোস্ট মাস্টারের চলে যাওয়াকে সে ভ্রূক্ষেপও করে না। অভিমানের এমন করুণ অভিব্যক্তি কচিৎ আমাদের নজরে পড়েছে। শ্রীরায়কে ধন্যবাদ দেব এই জন্যে যে, রতনের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে তিনি এমন একটি মেয়েকে খুঁজে বার করেছেন, যাকে আদৌ অভিনয় করতে হয়নি। মাত্র গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তার হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নয়) কান্নাটুকু বড়ই দৃষ্টিকটু লেগেছে। পোস্ট মাস্টারের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সহজ স্বচ্ছন্দ অভিনয় করে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। আর চোখে লেগেছে সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট বিশু পাগলা এবং গ্রাম্য গাইয়েটি।

(৩) **সমাপ্তি :** একদা রবীন্দ্রনাথের এই সুমধুর গল্পটির পূর্ণাঙ্গ হিন্দী চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছিল এই কলকাতা সহরেই এবং যথারীতি তা ব্যর্থও হয়েছিল। সত্যজিৎ রায় নিশ্চয়ই একথা জানেন এবং তিনি তাই 'সমাপ্তি'কে পূর্ণাঙ্গ চিত্ররূপে উপস্থাপিত না করে তার যতটুকু দীর্ঘ হওয়া উচিত, ততটুকুতেই তাকে 'সম্পূর্ণ' করেছেন। তবুও বলব ছবির শেষের দিককে আরও সংক্ষিপ্ত করবার অবসর ছিল। এবং আরও বলব, সমাপ্তির চিত্রনাট্যের ভিতর কিছুটা ত্রুটি রয়ে গেছে, যার ফলে বনের পাখী মৃণ্ময়ীর খাঁচার পাখীতে রূপান্তরিত হওয়ার কারণটি বেশ পরিস্ফুটরূপে দর্শকের চোখে ধরা পড়ে না। স্বামী অমূল্যর (আসল গল্পে অপূর্ব) সঙ্গে নৌকো করে বিদেশে (কুশীগঞ্জে) বসবাসকারী বাপের কাছে গিয়ে কয়েকদিন সেখানে বাস করার ফলেই স্বামীর জে-রূপ মৃণ্ময়ীর চোখে ধরা পড়ে, কলকাতায় অমূল্য চলে যাবার পর সেই রূপটিই অত্যন্ত অকস্মাৎ প্রকাণ্ড হয়ে মৃণ্ময়ীর হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তার "বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত" হয়ে পড়ে। তাই মৃণ্ময়ী যখন বিনা নোটিশে মার কাছ থেকে শ্বশুরবাড়ী চলে এল এবং মাথায় কাপড় দিয়ে শাশুড়ীর পায়ের কাছে প্রণাম করল, তখন শাশুড়ী সবিস্ময়ে এক নূতন মৃণ্ময়ীকে আবিষ্কার করলেন—'তরুর সহিত শাখা-প্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ড সম্মিলিত হইয়া গেল।" মৃণ্ময়ীর এই পরিবর্তন ছবিতে তেমন ধরা পড়েনি। তবুও সমাপ্তি সার্থক হয়ে উঠেছে শ্রীরায়ের নবাবিষ্কৃত তারকা অপর্ণা দাশগুপ্তের অনন্যসাধারণ দীপ্ত অভিনয় গুণে। বন্য হরিণীর মতো প্রাণোচ্ছল 'পাগলী' তার সমস্ত রূপ-রস নিয়ে ছবির পর্দায় আবির্ভূত হয়ে দর্শকচিত্তকে নিমিষে হরণ করেছে। তার হাসি, কথা কওয়ার ভঙ্গী, চাউনি, চলন এবং বন্য প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে কাঠবিড়ালীকে আদর—মৃণ্ময়ীর ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলেছে। মনে হয়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অমূল্য সুন্দর সংযত, ভাব-গম্ভীর হওয়া সত্ত্বেও মৃণ্ময়ীর পাশে কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিশনের ৬ রীলে সম্পূর্ণ প্রায় পাঁচ হাজার ফুটের প্রামাণ্য বা দলিল-চিত্র : রচনা ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায় : সংগীত পরিচালনা : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র।

৪ঠা মে থেকে আ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের প্রেক্ষাগৃহে এবং ৫ই থেকে লাইট হাউস, রাধা, পূর্ণ প্রভৃতিতে দেখানো হচ্ছে।

যে লোকোত্তর প্রতিভার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা সভ্য পৃথিবী আজ উৎসব-মুখর, তাঁর পরিচয় কি শুধু কবি বলে? কিংবা তিনি শুধুই গীতিকার, নট বা নাট্যকার অথবা গল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার? তাই যদি হবে, তাহ'লে মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রভৃতি দেশ-নায়কেরা তাঁকে গুরুদেব বলেছেন কেন? তবে রবীন্দ্রনাথ কি রাজনীতিজ্ঞ, কিংবা দার্শনিক?—রবীন্দ্রনাথ এ-সবই ছিলেন; তবুও এ-সব মিলিয়েও তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয়না। তিনি ছিলেন আধুনিক জগতে মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। কোন্ কুলে, কি পরিবেশে জন্মগ্রহণ ক'রে, কোন্ কোন্ প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কত বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়ে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধীরে ধীরে শতদল পদ্মের মত বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথে বিকশিত হয়েছিলেন, তারই বর্ণাঢ্য কাহিনী বিবৃত হয়েছে সত্যজিৎ রায়-রচিত এই প্রামাণ্য দলিল-চিত্রে। জব চার্ণক দ্বারা এই শহর কলিকাতার পত্তনির দিন থেকে সুরু ক'রে এখানে ঠাকুর-বংশের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির ইতিহাস জানিয়ে ঠাকুর বংশলতার সাহায্যে এবং ঠাকুর পরিবারের বহু কৃতী পুরুষের স্থিরচিত্র দেখিয়ে কোন্ ঐতিহ্যপূর্ণ বিরাট বংশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-

রূপে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সেই তথ্য দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিমার পিছনে যেমন চালচিত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উপেক্ষা করা যায়না, তেমনি রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে এই ভূমিকার বিন্যাসের সুনিশ্চিত আবশ্যকতাও অনস্বীকার্য। (অবশ্য সতীদাহের দৃশ্যটির সার্থকতা কোন্‌খানে, তা' আমাদের বোধগম্য হয়নি।) এর পর রবীন্দ্রনাথের বাল্য জীবনটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এবং তারই মধ্যে বিশেষ ক'রে দেখানো হয়েছে অত্যন্ত শিশুকাল থেকেই প্রকৃতি তাঁকে কি দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করেছে। কিশোর রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ, বিদেশ গমন প্রভৃতি তথ্য উপস্থিত করার সংগে সংগে মাত্র বারো বৎসর বয়সে 'সন্ধ্যা সংগীতের' প্রকাশবার্তা দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পদক্ষেপ সূচিত করা হয়েছে। এইভাবে বহু স্থিরচিত্র, বইয়ের প্রথম পত্র (টাইটেল পেজ), চিঠিপত্র, খবরের কাগজের শিরোনামা বা অংশোদ্ধৃতি, বাসগৃহ, নদী, মাঠ প্রভৃতির চিত্র এবং চলচ্চিত্রের অংশবিশেষের সংগে কিছু নূতন ক'রে তোলা দৃশ্যের সুষ্ঠু সংমিশ্রণে জগতের সংগে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ককে কি অপূর্ব নিবিড় ক'রে দেখানো হয়েছে, তা না দেখলে কেউ অনুভব করতে পারবেন না। আবার চিত্রাংশকে সজীব হতে সাহায্য করেছে নেপথ্যভাষ্য, কণ্ঠসংগীত (গুটি দুয়েক রবীন্দ্রনাথের নিজের গাওয়া), আবৃত্তি এবং আবহ-সংগীত। তথ্যবহুল প্রামাণ্য-চিত্র নির্মাণ যে উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, এই ছয় রীলে সম্পূর্ণ প্রায় পাঁচ হাজার ফুট দীর্ঘ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' চিত্রে সত্যজিৎ রায় তা অকাট্যভাবে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। শিল্পী শ্রীরায়ের জীবনে এ একটি মহৎ কীর্তি। সবশেষে একটি ক্ষোভের কথা বলা দরকার। সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মনকে কতখানি অধিকার করেছিলেন, তা' তাঁর বহু চিঠিপত্র এবং রচনার মধ্যে জাজ্বল্যমানভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তাই সুভাষচন্দ্রের সম্পূর্ণ অনুল্লেখ, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' চিত্রের অংগহানি ঘটিয়েছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।

অর্ঘ্য ঃ পশ্চিমবংগ সরকারের চিত্র· রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী', 'দুই বিঘা জমি', 'অভিসার' এবং 'পুরাতন ভৃত্য'— এই চারটি কবিতার চিত্ররূপ। প্রতিটি চিত্র দুই রীলে প্রায় দু' হাজার ফুটে সম্পূর্ণ। পরিচালনা ঃ দেবকীকুমার বসু; চিত্র-গ্রহণ ঃ দেওজীভাই, বিশু চক্রবর্তী ও নির্মল গুপ্ত; সংগীত-পরিচালনা ঃ সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত। রবীন্দ্র-জন্মদিন, ৮ই মে থেকে জ্যোতি সিনেমা, দর্পণা, ছায়া ও প্রিয়া সিনেমা-তে দেখানো হচ্ছে।

দেবকীকুমার বসু সম্পূর্ণ একটি নূতন পদ্ধতিতে ছবিগুলির রূপদানের চেষ্টা করেছেন। প্রামাণ্য বা দলিল-চিত্রের নেপথ্য-ভাষ্যের মতো এই ছবিগুলিতে মূল-কবিতাকে ব্যবহার করা হয়েছে; এমন কি পাত্র-পাত্রীদের কথাবার্তাও মূল-কবিতা অবলম্বন ক'রেই রচিত। একটি ছোট উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। 'দুই বিঘা জমি'তে উপেনকে জমিদারবাবুর সামনে হাজির করা হয়েছে। সেখানে উপেনের কণ্ঠকে নেপথ্যভাষ্য রূপে ব্যবহার ক'রে বলা হয়েছে ঃ

"শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই,
আর সবই গেছে ঋণে, বাবু কহিলেন—"

এর পরই জমিদারবাবু ব'লে উঠলেন—

"বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে"

তারপরেই আবার উপেনের নেপথ্য-কণ্ঠ —"কহিলাম আমি—" ইত্যাদি। অবশ্য মূল-কবিতার ব্যবহার ছাড়াও প্রয়োজনমত পাত্র-পাত্রীদের মুখে গদ্য কথোপকথন শুনতে পাওয়া গেছে এখানে সেখানে। তা ছাড়া পাত্র-পাত্রীদের মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যে কয়েকটি রবীন্দ্র-সংগীতেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

'মন দিল না বংধু' চিত্রের নায়িকা সবিতা বসু

বিশেষ ক'রে "পূজারিণী ও অভিসার" চিত্রে। অবশ্য গানগুলি যে সব জায়গায় সুপ্রযুক্ত হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। এর ওপর আবহ-সঙ্গীত তো আছেই। কিন্তু শ্রীবসুর এই প্রচেষ্টা সর্বাংশে সাফল্য লাভ করেনি। গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে সংলাপ বলানোতে একটা কৃত্রিমতার ছাপ এসে গেছে। তার ওপর বিভিন্ন ছবির চিত্রায়ণেও ত্রুটি ঘটেছে। প্রথম ছবি "পূজারিণী"তে শেষ-ভাগে নতুন ক'রে নাটকীয়তা আনবার জন্যে শ্রীমতীকে রাজাদেশ জানানো হয়েছে, তাকে নটীর বেশে স্তূপপদমূলে নৃত্য করতে হবে এবং প্রভু বুদ্ধের দাসী শ্রীমতী নিজের ভিক্ষুণী বেশ প্রচ্ছন্ন রেখে নটীর বেশে নৃত্য সুরু করেছেন। এতে শ্রীমতীর চরিত্র নিঃসন্দেহে ক্ষুন্ন হয়েছে। এবং এরও আগে প্রস্তুতির সময়ে একটি নৃত্যের মাধ্যমে শ্রীমতীর মনোভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সরকার (চাকী) নিশ্চয়ই নৃত্যনিপুণা; কিন্তু শ্রীমতীর ভূমিকায় যে-নৃত্য দর্শকসাধারণ দেখতে চায়, তা হবে লীলায়িত এবং সুষমাপূর্ণ আত্মনিবেদনের ভঙ্গীতে। এখানে চটুল চরণক্ষেপের কোনো স্থান নেই, এ-কথা পরিচালক সম্ভবতঃ বিস্মৃত হয়েছেন। "দুই বিঘা জমি"তে বাঙলার চাষী উপেনের (অবশ্য উপেন আদৌ চাষী ছিল কি না, এ সন্দেহও কারো কারো মনে উঠতে পারে।) শান্ত নিরুপদ্রব জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে তাকে যে বিসদৃশভাবে ধানের আঁটি ফেলতে বা তুলসীমঞ্চতে কাদার প্রলেপ দিতে দেখা গেছে, তা একান্তই অস্বাভাবিক। এ-ছাড়া ছবিটিতে নীতিশ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের ভিতর দিয়ে জমিদারের ক্রূরতা দেখা গেলেও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে উপেনের ব্যথা-বেদনা বিন্দুমাত্রও পরিস্ফুট হয়নি। "অভিসার"-এ সন্ধ্যা রায় এবং দ্বিজু ভাওয়ালকে সুন্দর মানিয়েছে এবং তাঁরা সু-অভিনয়ও করেছেন। কিন্তু ঐ ছবিতে বসন্ত উৎসবের যে-দৃশ্য বারংবার দেখানো হয়েছে, তা রুচি এবং রসের দিক থেকে সমীচীন নয়। "পুরাতন ভৃত্য"-এ অনুপকুমারের অভিনয় কয়েক জায়গায় ভাঁড়ামোর পর্যায়ে পড়লেও মোটের উপর হৃদয়গ্রাহী; অবশ্য একেবারে শেষভাগে "বাবু"র রোগ-সেবার সময়ে তাঁর পরিধানের জামাটি অত্যন্ত বেমানান হওয়ার দরুণ তাঁর অভিনয়ও ব্যাহত হয়েছে। এই ছবিতে বিস্ময়কর বাস্তব অভিনয় করেছেন গৃহিণী রূপিণী অনিতা বন্দ্যো-পাধ্যায়; ইনি নবাগতা হলেও প্রাচীনার মতো অভিনয় করেছেন।

চিত্র গ্রহণের কাজ "পূজারিণী" এবং "অভিসার"-এ মোটের উপর সুন্দর; অন্য দু'খানি ছবিতে চলন সৈ-এর উপরে উঠতে পায়নি। শিল্প-নির্দেশনা সম্পর্কেও সমানই কথা বলা চলে। সঙ্গীতে সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া গানগুলি স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর। আবহসঙ্গীতে নূতনত্ব কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি।

●

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও দুটি চিত্র নির্মাণ করেছেন। তার মধ্যে একটি হ'ল লিটল সিনেমার শান্তি চৌধুরী পরি-চালিত "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" এবং অপরটি হচ্ছে আশিস মুখো-পাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলা "রবীন্দ্র-নাথ ও গ্রাম পুনর্গঠন"। শম্ভু সাহার তোলা বহু স্থির-চিত্রের সাহায্যে উপযুক্ত নেপথ্যভাষা, কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্র-

সংগীতের সহযোগিতায় শ্রীচৌধুরী প্রথম তথ্য-চিত্রটি নির্মাণে বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রটি নিঃসন্দেহে একটি রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি। শেষের ছবিটিতে শ্রীনিকেতনের জন্ম থেকে সুরু ক'রে তার বর্তমান পরিপুষ্ট রূপ এবং গ্রামোন্নয়নের কাজে তাঁর অসামান্য দানের কথা নিষ্ঠার সংগে বিধৃত হয়েছে। তবে দক্ষিণীর সহায়তায় এর সঙ্গে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে, তা অপেক্ষাকৃত সুগীত হওয়ার অবকাশ ছিল।
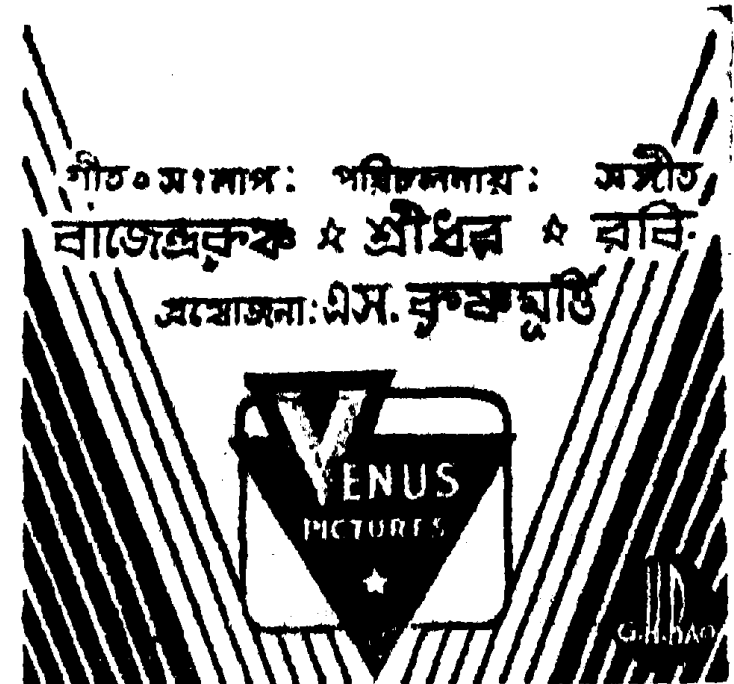
টুকিটাকি

এই বছরে বার্লিন ফিল্ম ফেস্টি-ভ্যালে 'সেলজ্‌নিক গোল্ডেন লরেল' পুরস্কারটি গৌরবের সংগে এগারো বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই সংস্থার পরিচালক ডাঃ আলফ্রেড ব্যাওয়ার ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ২৯শে জুন বার্লিন ফেস্টিভ্যালের শুভদিনটি শুরু হবে। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, এর আগে এই 'সেলজ্‌নিক' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন বিখ্যাত পরিচালক স্যার আলেকজাণ্ডার কোরডা, স্যার মিকেল ব্যালকন, ভিটোরিয়ো ডি সিকা, স্যার লরেন্স অলিভার, রিনি ক্লেয়ার ও সত্যজিৎ রায়। মিঃ সেলজনিক এই প্রথম বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গোল্ডেন লরেল পুরস্কার সভায় উপস্থিত থাকবেন।

•

একটি উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি হ'ল 'বারাব্বাস' ছবিটি। মার্কিণ পরিচালক রিচার্ড ফ্লিশ্চার রোমের উত্তরে ইতালীর একটি পাহাড়ী অঞ্চলে ছবিটি তুলছেন। 'বারাব্বাস'-এর চিত্রনাট্য করেছেন কবি ক্রিস্টোফার ফ্রাই। ছবিটির নাম-ভূমিকায় রয়েছেন বার্ট লাংকাষ্টার আর নায়িকার চরিত্রে রয়েছেন সিলভানা ম্যানগানো।

•

ইটালী দেশের বাস্তবধর্মী ছবি-গুলির আজ পৃথিবীময় সম্মান। যে সব পরিচালক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছবি তুলেছেন ইটালীতে. তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছেন পরিচালক ফেডেরিকো ফেলিনি। এ'র বর্তমান ছবিটির নাম 'লা

হলিউডের বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা গ্যারী কুপার ১৩ই মে, পরলোকগমন করেন। তাঁর জন্ম হয় ১৯০১ সালে। ১৯৪১ এবং ১৯৫২ সালে তিনি যথা-ক্রমে 'সার্জেণ্ট ইয়র্ক' ও 'হাই নুন' চিত্রে অভিনয়ের জন্য Academy Award পান।

ডলসি ভিটা' -দ্বিতীয় জন হলেন লুচিনো ভিসকণ্টি। এ'র পরিচালিত ছবিটির নাম 'রোকো।' এরপর যে ছবিটি বর্তমানে সারা ইউরোপে সাড়া জাগিয়েছে, তার নাম 'লা এ্যাভেনচুরা', পরিচালক হলেন মিচেলয়েনজিলো এ্যানটনিওনি। এরপর আছেন—গিলোপনটিকর্ভো; এ'র ছবি 'কাপো'। সবশেষে পরিচালক মরোবোলোনিনি-এর নাম করবো। তিনি যে ছবিটি তুলেছেন, তার নাম 'লা নোটে ব্রাভা'। এই পাঁচজন পরিচালকের তোলা ছবিগুলির মধ্যে 'লা ডলসি ভিটা', 'লা এ্যাভেনচুরা' ও 'রোকো' ছবি তিনটি পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে ইটালীর সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায় সূচনা করেছে।

●

অ্যালফ্রেড হিচকক তাঁর 'সাইকো' ছবি শেষ করে 'ভিলেজ অফ স্টারস'-এর প্রযোজনা ও পরিচালনার কাজে ব্যস্ত আছেন। 'সাইকো' ছবিটির সম্বন্ধে হিচককের খুব উচ্চ ধারণা আছে, তিনি বলেছেন—
'First excursion of the screen into the realm of metaphysical sex'.
মন্তব্যটি শোনার পর ছবিটি দেখার আগ্রহ আরও বেড়েছে।

সাতজন ফরাসী লেখকের ছোট গল্প নিয়ে, সাতজন পরিচালক একটি ছবি করেছেন, যার নাম 'লাভ এন্ড দি ফ্রেঞ্চ-ওম্যান'। ছবিটি বিশেষ বাস্তবধর্মী না হলেও বেশ আমোদপূর্ণ। এই চিত্রটি সিনে-ম্যানথোলজির একটি নতুন দিক বলা যেতে পারে।

যাকে একবার দেখলে মন ভরে না, সেই নায়িকার নাম ব্রিজিট বার্ডট। সম্প্রতি ফরাসী 'লা ব্রিদে সার লে কন' ছবিতে অভিনয় করে 'অ্যান্ড গড ক্রিয়েটেড ওম্যান' ছবিটির মত শিহরণ এনেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ব্রিজিট বার্ডটের ভূতপূর্ব স্বামী রোজার ভাডিম। একটি স্বপ্নের মধ্যে নাচের মাধ্যমে, ব্রিজিটের যৌবনকে বিশেষভাবে ধরা হয়েছে; যার ফলে দর্শকদের ছবি দেখার ভীড় 'হাউসফুল'-এ দাঁড়িয়েছে। এছাড়া মেক্সিকোর 'লা বাম্বা' সঙ্গীত রয়েছে।

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

তিন কন্যা—রূপবাণী, অরুণা, ভারতী।

....

অর্ঘ্য—দর্পণা, প্রিয়া, ছায়া, জ্যোতি।

....

হারকিউলিস আনচেন্‌ড সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্রনাথ—লাইট হাউস।

....

ক্ষুধিত পাষাণ সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ—রাধা, পূর্ণ।

....

মধ্য রাতের তারা সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর।

....

বিষকন্যা সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ—বসুশ্রী, বীণা।

....

নজরাণা—লক্ষ্মী, কৃষ্ণা, রূপালী, চিত্রা।

....

ডাব্‌ল্‌ ট্রাব্‌ল্‌—এলিট।

....

সেতু—বিশ্বরূপা।

....

অনর্থ—রঙমহল।

....

শ্রেয়সী—স্টার।

কৃষণ খান্নার চিত্র প্রদর্শনী—অশোক গ্যালারী।

....

রবীন্দ্র জন্মোৎসব ও প্রদর্শনী—রণজি স্টেডিয়াম।

....

দক্ষিণীর রবীন্দ্র জন্মোৎসব—দেশপ্রিয় পার্ক।

....

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—শ্যাম স্কোয়ার।

....

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—বিডন স্কোয়ার।

....

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—রবীন্দ্র সরোবর।

....

রবীন্দ্র গ্রন্থ ও চিত্র প্রদর্শনী—ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

....

রবীন্দ্র প্রদর্শনী।--ওরিয়েন্টাল সেমিনারী

....

রবীন্দ্র গ্রন্থ ও চিত্র প্রদর্শনী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—আশুতোষ বিল্ডিংস।

গোরিলা নয় গোরিলা

সুমিত সেন

এক পলকে দেখেই মানুষ অবশ্য ধারণা করে নেয়। সে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকে। দূর করা দুঃসাধ্য। কিন্তু দূর হলে দেখা যায় প্রথম দৃষ্টির রায় সব সময় সত্য নয়।

গোরিলা আমরা দেখেছি। দেখেছি চিড়িয়াখানায়। ভারতবর্ষের জংগলে গোরিলা নেই। দূর থেকে দেখে আমরা ধারণা করে নিয়েছি গোরিলা বড় হিংস্র। অবশ্য গেরিলা যুদ্ধ আর গোরিলা জন্তু ধ্বনিগত দিকে থেকে এক রকম হওয়ায় মনের মধ্যে ভয় জমে থাকতে পারে। সেই জন্যে কেউ যদি বলে গোরিলারা শান্তি-প্রিয় জীব, তবে সে কথা উড়িয়ে দেবার লোকের অভাব হবে না।

কিন্তু গোরিলারা সত্যিই শান্তিপ্রিয়, অমায়িক ও সামাজিক। মেজাজ তাদের রুক্ষ নয়। প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁচতে জানে। ওরা মাংস খায় না। খাদ্য ওদের শাক-পাতা, ফল-মূল। মানুষকে ঘৃণা করে না। তাই আক্রমণ করে কদাচিৎ। সুতরাং বোঝাই যায় তাদের প্রকৃতি সাত্ত্বিক।

কেমন করে জানলাম? বলছি তাই। জর্জ শেলার একজন মার্কিণ বৈজ্ঞানিক। প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে তাঁর গবেষণা। ১৯৫৯ সালে আগষ্ট মাসে সস্ত্রীক তিনি গিয়েছিলেন কঙ্গোতে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, নিছক গোরিলা দেখতে আর ওদের তিনি দেখেছেন খুব নিকট থেকে। তাদের মাঝখানে দিনের পর দিন থেকেছেন। তিনি কয়েকদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখেছেন তাঁরই খুব কাছে শুয়ে আছে, আস্ত একটি গোরিলা। এবং তিনি বেঁচেই আছেন।

শেলারের সঙ্গে গোরিলাদের বন্ধুত্ব কিন্তু খুব সহজে হয়নি। দেখা গেছে, এই বন্ধুত্ব পাতাতে বিশেষ সাহসের দরকার। শেলারের তা ছিল। এর আগে যাঁরা কঙ্গোর জঙ্গলে জীব-জন্তুদের প্রকৃতি পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গিয়েছেন, তাঁরা সবাই গিয়েছেন রীতিমত সশস্ত্র অবস্থায়। ট্রাক, ক্যামেরা, বন্দুক লোক লস্কর নিয়ে। নবাগত মানুষের দিকে তাই গোরিলা খুব স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহের চোখে দেখেছে। আর সব সময়েই তারা পাশ কাটিয়ে থাকতে চেয়েছে। নিতান্ত সামনা-সামনি পড়লে আক্রমণ, যাকে বলে সম্মুখ সমর। কিন্তু আক্রমণ করেছে ভয় থেকে, আত্মরক্ষার জন্য। শেলার তাই ঠিক করলেন যে তিনি দলবল, ক্যামেরা, বন্দুক নিয়ে যাবেন না। যাবেন একা একা এবং গোরিলা পাড়ার মাঝখানে।

ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তার দেখা হল এক গোরিলার দলের সঙ্গে। খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল তারা। প্রায় তিরিশ ফুট দূরে। শেলার এমন ভাব দেখালেন যে তিনি যেন গোরিলার দলকে দেখতেই পাননি। একমনে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন তিনি। এইভাবে আরো কয়েকদিন গেল। প্রথম প্রথম শেলারকে দেখে গোরিলার দল পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের অনুসরণ করেননি। গোরিলার দল দেখলো লোকটা তাদের গ্রাহ্য না করে কাজ করে যায়। ক্রমে-ক্রমে তাদের ভয় ঘুচলো। তারাও নিজে-দের মত থাকে। বোধ করে না যে শেলার নামক তরুণ বৈজ্ঞানিক তাদের খুব কাছেই বসে আছে।

মাঝে মাঝে জংগলের মধ্যে সস্ত্রীক গিয়েছেন শেলার। প্রথমে গোরিলারা ভীত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারপর তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওদের হাতে অস্ত্র নেই—এইটাই প্রধান কথা। এবং সেই প্রধান কথাটি বুঝতে পেরেছে তারা। বুঝতে পেরেছে যে এই নবাগতরা তাদের কোন ক্ষতি করবে না। তাই মানুষ ও গোরিলারা পাশাপাশি থাকে। যে যার কাজ করে যায়।

শেলার দেখেছেন যে, কারণ উপস্থিত হলে পুরুষ গোরিলারাই প্রথমে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এদের একজন দলপতি থাকে। দলপতি পুরুষ হবেই। গোরিলা বাহিনী নিতান্তই দলপতির অনুগত। দলপতি যদি একটু ভীতু গোছের হয়, বিনা বাধায় শত্রুকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য যদি প্রস্তুত থাকে, তবে সমস্ত বাহিনী নীরবে তাকে অনুসরণ করবে। পুরুষ গোরিলারা উত্তেজিত হলে চিৎকার করে, বুক চাপড়ায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেয়ে গোরিলারা বড় একটা উত্তেজিত হয় না। তারা কেবল অনুসরণ করে।

শেলার বলেন যে, পুরুষ গোরিলার চেয়েও মেয়ে ও শিশুরা বেশী কৌতু-হলী। বড় গোরিলাগুলো ঝোপ ঝাড়ের ফাঁক থেকে শেলারকে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু বাচ্চারা এগিয়ে এসেছে তার খুব কাছে। মেয়েরা গাছে চড়ে লক্ষ্য করেছে কর্মরত শেলারকে।

সকলেই মনে করেন, গোরিলারা বড় হিংস্র। মোটেই তা নয়। শেলার এই ধারণার প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, যদি তাদের আক্রমণ না করা হয় তবে তারাও আক্রমণ করবে না। গোরিলারা হিংস্র ত নয়ই বরং খুবই ভদ্র।

ঘুম ভাঙার পর থেকে এদের আহার সন্ধান আরম্ভ হয়। শেলার লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, গোরিলারা প্রায় পঁচিশ রকমের গাছ গাছালি খায়। গাছে চড়ার ব্যাপারে গোরিলারা খুব পোক্ত নয়। পুরুষ বড় গোরিলারা গাছে প্রায় চড়েই না। আর যারা চড়ে তারা খুব ভয়ে ভয়ে থাকে। এক ডাল থেকে ঝুলে অন্য ডাল ধরা এদের কাছে অসম্ভব ব্যাপার।

সমস্ত দলটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব দলপতির। সে যখন দলের পিছনে গিয়ে ডাকতে আরম্ভ করে তখন ওরা বুঝতে পারে যে বিপদ এসেছে এবং তারা আশ্রয়ের খোঁজে ছোটে। এদের কোন নির্ধারিত বাসা নেই। যখন যেখানে থাকে সেখানেই বাসা তৈরী করে নেয়। শেলার বলেন যে, দেহ সৌষ্ঠবের দিক থেকে গোরিলারা মানুষের কাছাকাছি। এমন কি হাঁচি এলে এরা মানুষের মত হাত দিয়ে নাক চাপা দেয়। আর বাচ্চাদের আদর করে মানুষের মতোই। কাজেই তাদের যতো জংলী মনে করা হয়, অতো জংলী তারা নয়, যদিও তারা বাস করে জঙ্গলেই।

খেলাধুলা

দর্শক

বেটন কাপ ফাইনাল

১৯৬১ সালের বেটন কাপ ফাইনালে বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল রেলওয়ে ২—১ গোলে পাঞ্জাব পুলিশ দলকে পরাজিত করে বেটন কাপ জয়ী হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি; উভয় দলই একটি করে গোল দেয়। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় রেল দলের আর্মাণ পেনাল্টি কর্ণার থেকে দলের জয়সূচক গোলটি করেন। বিজয়ী রেল দলের পক্ষে দুটি গোলই করেন আর্মাণ। অপরদিকে পাঞ্জাব পুলিশ দলের পক্ষে দর্শন সিং একটি গোল শোধ দেন। প্রথমার্ধের খেলার ১৩ মিনিটে পুলিশ দলের গুরুজিৎ সিং রেলওয়ে দলের আর্মাণকে নিষিদ্ধ এলাকায় অন্যায়ভাবে বাধা দিলে রেল দল পেনাল্টি কর্ণার পায়। আর্মাণ এই কর্ণার থেকে প্রথম গোল দিয়ে নিজ দলকে ১—০ গোলে অগ্রগামী করেন। প্রথমার্ধের শেষ আট মিনিটের খেলায় পাঞ্জাব পুলিশ দলই প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু এই সময়ে গোল দিতে পারে নি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার চতুর্থ মিনিটে পুলিশ দল পেনাল্টি কর্ণার পায়। এই পেনাল্টি কর্ণার দেওয়া সম্পর্কে আম্পায়ারের সঙ্গে অনেকেই একমত হ'তে পারেন নি। যাই হোক, পৃথিপাল সিং এই পেনাল্টি কর্ণার থেকে বলটি গোলে মারলে বলটি রেল দলের গোলরক্ষকের প্যাডে লেগে মাঠের ভেতরে ফিরে যায়; পুলিশ দলের লেফট-আউট দর্শন সিং এই বল থেকে গোলটি পরিশোধ করেন। খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ১—১।

অতিরিক্ত সময়ের খেলায় পুলিশ দলের ওপর রেলওয়ে দল প্রাধান্য বিস্তার করে; এক কথায় তারা পুলিশ দলকে কোণঠাসা করে রাখে। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমভাগেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

ফাইনাল খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হয়েছিল; খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ক্রীড়ানৈপুণ্যের কোন অভাব ছিল না।

আর্মাণ
সেন্ট্রাল রেলওয়ে
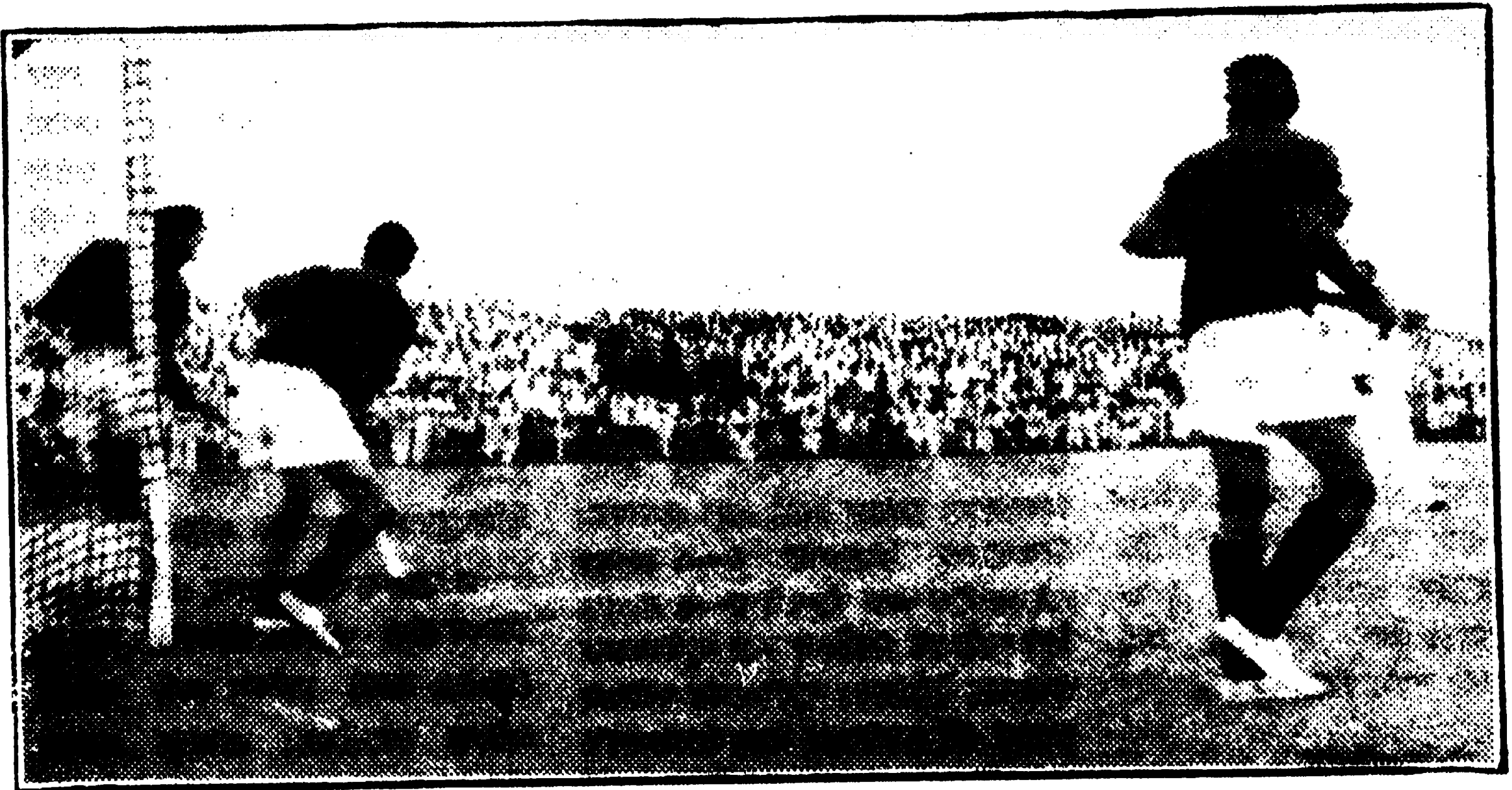
বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় সেন্ট্রাল রেলওয়ে দলের জয়সূচক গোল দেওয়ার দৃশ্য। রেল দলের আর্মাণ (ছবিতে নাই) সর্ট-কর্ণার থেকে হিট করে গোল দেন।

সংঘবদ্ধ খেলায় এবং সুপরিকল্পিত আক্রমণ রচনায় রেল দলের খেলোয়াড়রাই নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন বেশী। এই দিনের খেলায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পান রেল দলের রাইট-ইন খেলোয়াড় শিবরাম। তাঁর স্টিক চালনা এবং বল আদান-প্রদানের কৌশল দেখে দর্শকেরা আনন্দ পেয়েছিলেন।

বোম্বাইয়ের প্রথম হকি দল হিসাবে বোম্বাই কাস্টমস বেটন কাপ জয় করে ১৯৩৬ সালে। টাটা স্পোর্টস ক্লাব মোট চারবার বেটন কাপ পায়—১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে। এ ছাড়া বোম্বাইয়ের ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ১৯৫৫ সালে ইউ পি দলের সঙ্গে যুগ্মভাবে বেটন কাপ জয়ী হয়। ১৯৬১ সালে বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল রেল দলের বেটন কাপ জয়লাভের ফলে বোম্বাইয়ের চারটি দল বেটন কাপ জয়ী হ'ল।

বেটন কাপ বিজয়ী সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৩য় রাউণ্ডে ১—০ গোলে ওয়েস্ট বেংগল পুলিশকে, কোয়ার্টার ফাইনালে ২—১ গোলে কাস্টমসকে এবং সেমি-ফাইনালে ১—০ গোলে গত বছরের রাণার্স-আপ ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকে পাঞ্জাব পুলিশ দল ৩য় রাউণ্ডের খেলায় ০—০, ০—৩ গোলে গ্রীয়ার স্পোর্টিংকে, কোয়ার্টার ফাইনালে ২—১ গোলে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপকে এবং সেমি-ফাইনালে ১—০ গোলে গত বছরের বেটন কাপ বিজয়ী মোহনবাগানকে পরাজিত করে ফাইনালে সেন্ট্রাল রেলওয়ে দলের সঙ্গে মিলিত হয়। উভয় দলই এই প্রথম বেটন কাপের ফাইনালে ওঠে।

ফাইনালে দুই দলের খেলোয়াড়

সেন্ট্রাল রেলওয়ে ঃ চিনাপ্পা; কে এণ্টনী এবং নন্দকিশোর; রত্তি, পিয়ারেলাল এবং এ এস খাঁন; মতিলাল, শিবরাম, আর্মাণ, মুলচাঁদ এবং প্রকাশ-কিশোরী।

পাঞ্জাব পুলিশ ঃ রাজকুমার; পৃথিপাল সিং এবং গুরুজিৎ সিং; ভাটিয়া, চরণজিৎ সিং এবং গুরুজিৎ সিং; মদনমোহন, গুরুদেব সিং, হরবিন্দর সিং, উধম সিং এবং দর্শন সিং।

সেমি-ফাইনাল

আলোচ্য বছরে বেটন কাপের দুটি সেমি-ফাইনাল খেলাই দর্শকদের খেলা দেখার আনন্দ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে; খুব কম সময়েই খেলা দুটি দর্শকদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সেমি-ফাইনাল খেলায় চারটি দলের মধ্যে তিনটি দলই ছিল বহিরাগত—একমাত্র স্থানীয় দল ছিল গত বছরের বেটন কাপ বিজয়ী মোহনবাগান। এক দিকের সেমি-ফাইনালে বিখ্যাত পাঞ্জাব পুলিশ খেলার দ্বিতীয়ার্ধে গোল দিয়ে মোহনবাগানকে ১—০ গোলে হারিয়ে দেয়।

পুলিশ দল জয়ী হলেও তাদের খেলা মোহনবাগান দলের থেকে উচ্চাঙ্গের হয় নি; ৪র্থ রাউণ্ডে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপের বিপক্ষে বরং তারা অনেক ভাল খেলেছিল। মোহনবাগান বনাম পাঞ্জাব পুলিশ দলের সেমি-ফাইনাল খেলায় উভয় দলই কয়েকটি গোলের সুযোগ নষ্ট করে।

অনেকের মতে, এই দিনের খেলাটিতে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি না হয়ে যদি খেলাটি ড্র যেত তাহলে খেলার ফলাফল খুব অসংগত হ'ত না। সেন্ট্রাল রেলওয়ে বনাম ইণ্ডিয়ান নেভী দলের সেমি-ফাইনাল খেলাটি সম্পর্কেও ঠিক এই অভিমত প্রকাশ করা যায়। রেলদল খেলা ভাঙ্গার শেষের দিকে অপ্রত্যাশিতভাবেই জয়সূচক গোলটি দেয়। নেভী দলের গোলরক্ষকের মারাত্মক ভুল খেলার দরুণই খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। নতুবা এই ধরণের গোলের কথা কেউ ভাবতেও পারেন না।

ডেভিস কাপ পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল

আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করেছে। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় দিল্লী জিমখানা কোর্টে। পাঁচটি খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ জয়ী হয় চারটিতে—তিনটি সিংগলস এবং একটি ডাবলসের খেলায়। জাপান মাত্র একটি সিঙ্গলসের খেলায় জয়ী হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষ ৫—০ খেলায় থাইল্যাণ্ডকে এবং জাপান ৩—২ খেলায় ফিলিপাইনকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে উঠেছিল। পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় এই জয়লাভের ফলে ভারতবর্ষের পরবর্তী খেলা পড়েছে আমেরিকান-জোন বিজয়ী দেশের সঙ্গে।

পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে (৬ই মে) জাপান প্রথম সিংগলস খেলায় জয়ী হয়ে ১—০ খেলায় এগিয়ে যায়। এইদিন কৃষ্ণান বনাম ইসিগুরোর দ্বিতীয় সিংগলস খেলাটি উপযুক্ত আলোর অভাবে অসমাপ্ত থেকে যায়; প্রথম সেটে ইসিগুরো জয়ী হন। দ্বিতীয় সেটে জয়ী হন কৃষ্ণান। তৃতীয় সেটে কৃষ্ণান ৩—১ গেমে অগ্রগামী হওয়ার পর খেলা বন্ধ হয়। খেলার দ্বিতীয় দিনে অসমাপ্ত দ্বিতীয় সিংগলস খেলায় কৃষ্ণান জয়ী হলে খেলার ফলাফল সমান ১—১ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনের ডাবলস এবং তৃতীয় দিনের বাকি দুটি সিংগলস খেলায় ভারতবর্ষ জয়লাভ করে। সর্বশেষ সিংগলস খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে জয়দীপ মুখার্জির যোগদানের কথা ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষ ৩—১ খেলায় জয়ী হয়ে পরবর্তী খেলার যোগ্যতা লাভ করাতে শেষের সিংগলস খেলায় আর কোন গুরুত্ব ছিল না; তাই মুখার্জির বদলে আখতার আলিকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়। শেষের খেলাতে ভারতবর্ষের হার হবে ধরে নিয়েই দর্শকরা বসে রইলেন; কিন্তু আখতার আলি শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে দর্শকদের তাক্ লাগালেন।

জাপানের এক নম্বর খেলোয়াড় আৎসুসি মিয়াগি ৬—২, ৯—৭, ২—৬, ৬—২ গেমে ভারতীয় দুই নম্বর খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

ভারতীয় ১নং খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৬-৩ গেমে জাপানের ২নং খেলোয়াড় ওসামো ইসিগুরোকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণান এবং প্রেমজিৎ লাল ৬-৪, ৬—৩, ৬—৪ গেমে জাপানের মিয়াগি এবং মাসাও নাগাসাকিকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণান ৬—৪, ৬—১, ৬-৪ গেমে জাপানের আৎসুসি মিয়াগিকে পরাজিত করেন। আখতার আলি ৪—৬, ৬—৪, ৬—০, ২—৬, ৬—৪ গেমে জাপানের ইসিগুরোকে পরাজিত করেন।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র জাপানই একবার (১৯২১ সাল) ডেভিস কাপ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছিল। এ-ছাড়া জাপান দু'বার (১৯২৬ এবং ১৯২৭) ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলবার যোগ্যতাও লাভ করেছিল।
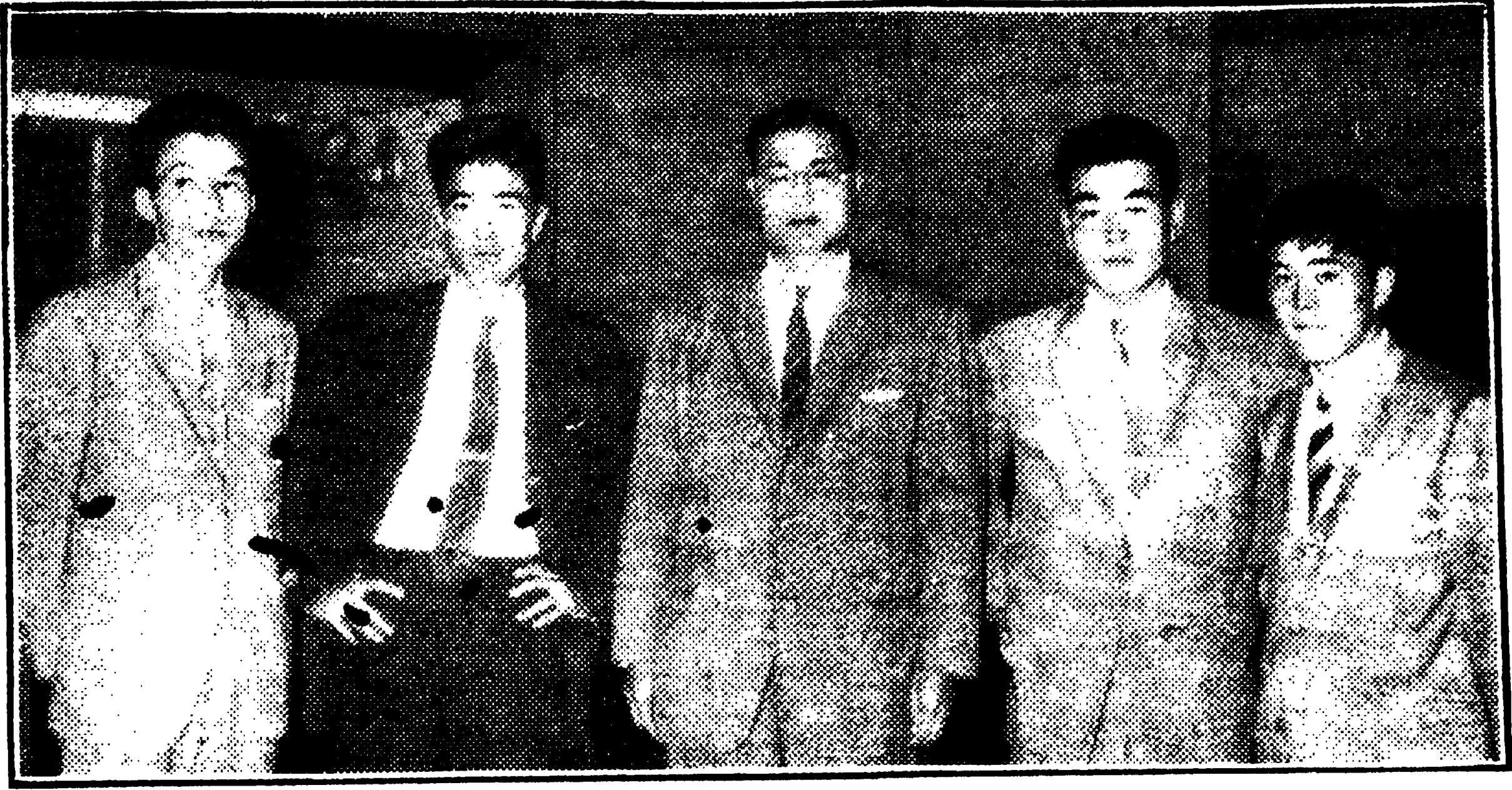
ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চল-ফাইনালে ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানের লন টেনিস দল : মধ্যস্থলে দলের ম্যানেজার

ডেভিস কাপের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আমেরিকার খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ফিলে ডেভিস এই প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯০০ সাল। যুদ্ধের দরুণ খেলা বন্ধ ছিল ১০ বছর (১৯১৫-১৮ এবং ১৯৪০-৪৫)। এপর্যন্ত মাত্র চারিটি দেশ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে—আমেরিকা ১৯ বার, অস্ট্রেলিয়া ১৭ বার (নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অস্ট্রেলেশিয়া নামে ৭ বার। ১৯২৩ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়া পৃথকভাবে খেলায় যোগদান করছে), বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে ১৯৪৬-৫৯ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা, এই দুটি দেশই চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অর্থাৎ ফাইনালে খেলেছিল। ১৯৬০ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে এর ব্যতিক্রম হয়—অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইটালীর খেলা হয়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এই পনের বছরের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে ৯ বার (১৯৫০-৫৩, ১৯৫৫-৫৭, ১৯৫৯-৬০) এবং আমেরিকা ৬ বার (১৯৪৬-৪৯, ১৯৫৪, ১৯৫৮)।

মোহনবাগান ফুটবল দলের পূর্ব আফ্রিকা সফর

মোহনবাগান ফুটবল দল পূর্ব আফ্রিকার সফর শেষ করে স্বদেশে ফিরে এসেছে। খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : মোট খেলা ২৫, মোহনবাগানের জয় ২০, হার ৩, খেলা ড্র ২।

লক্ষ্মীবিলাশ হকি কাপ

১৯৬১ সালের লক্ষ্মীবিলাশ হকি কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৩-১ গোলে গ্রীয়ার স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে বালু 'হ্যাটট্রিক' করেন।

ইংলিস এফ এ কাপ

ইংল্যান্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কাপের সংক্ষিপ্ত নাম 'এফ এ কাপ'। ১৯৬১ সালের এফ এ কাপ ফাইনালে টোটেনহাম হটস্পার ক্লাব ২-০ গোলে লিস্টার সিটি ক্লাবকে পরাজিত ক'রে একই বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ কাপ এবং এফ এ কাপ জয়লাভের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছে। এফ এ কাপ প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৭২ সালে। আর প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা ১৮৮৭ সালে। ইংল্যান্ডের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার অনেক আগে এফ এ কাপ প্রতিযোগিতার সূচনা। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনটি ক্লাব একই বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ কাপ এবং এফ এ কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে—১৮৮৯ সালে প্রেসটন নর্থ এন্ড, ১৮৯৭ সালে অস্টন ভিলা এবং সুদীর্ঘ বছর পর ১৯৬১ সালে টোটেনহাম হটস্পার ক্লাব। অনেক ক্লাবই এই দুর্লভ সম্মান লাভের সুযোগ পায়, কিন্তু উল্লিখিত তিনটি ক্লাব ভিন্ন অপর কোন ক্লাব শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ১৮৮৯ সালের পর টোটেনহাম হটস্পার ক্লাবের পক্ষে এই দুর্লভ সম্মান লাভ ইংল্যান্ডের ফুটবল খেলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টোটেনহাম হটস্পার দল পূর্বেও এফ এ কাপ জয়ী হয়েছে, ১৯০১ ও ১৯২১ সালে।

লন্ডনের বিখ্যাত উইম্বলে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৬১ সালের এফ এ কাপ ফাইনাল খেলা দেখে দর্শকসাধারণ খুবই নিরাশ হয়েছেন। কোন দলেরই খেলায় জৌলুষ ছিল না—একেবারে অতি সাধারণ খেলা। ক্রীড়ানৈপুণ্যের বদলে ভাগ্য যে অনেক সময় খেলায় জয়লাভের পক্ষে কতখানি প্রধান ভূমিকায় নামতে পারে এই ফাইনাল খেলাটি তারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন। লীগ বিজয়ী হটস্পার দল টসে জয়ী হয়ে প্রথমেই বাতাসের সহায়তা লাভ করে। তাদের দ্বিতীয় সুবিধার কারণ হল, খেলার ১৮ মিনিটের সময় লিস্টার সিটি দলের রাইট-ব্যাক আঘাত পেয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে যখন অপরের জায়গায় খেলতে বাধ্য হ'লেন। লন্ডনের পরিবেশও বিজয়ী হটস্পার দলের অনুকূলে ছিল। এতগুলি সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বিজয়ী দল সুনাম অনুযায়ী ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেনি, শুধু জয়লাভ করেছে মাত্র। স্টেডিয়ামের মধ্যে এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়; তবে সকলেই সমান ভাগ্য নিয়ে খেলা দেখতে আসেন নি। বহু দর্শক চড়া দামে কালোবাজার থেকে টিকিট কিনতে বাধ্য হন। পুলিশের উপদেশ না মেনে

ইংল্যাণ্ডের বহু ক্রীড়ামোদি চড়াদামে টিকিট কিনে কালোবাজারীদের সমর্থন করেন। সংবাদে প্রকাশ, জাল টিকিট বিক্রীর অভিযোগে অনেক লোককে আটক করা হয়েছে।

ইংল্যান্ড সফররত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

অস্ট্রেলিয়া দলের ইংল্যান্ড সফরের সূচনা মোটেই শুভ হয়নি। সফরের প্রথম তিনটে খেলাই অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই অবাঞ্ছিত ফলাফলের জন্য একমাত্র দায়ী বৃষ্টিপাত। ওরস্টারের বিপক্ষে সফরের প্রথম খেলায় বৃষ্টির জন্যই অস্ট্রেলিয়া পরাজয়ের সম্ভাবনা থেকে খুব জোর বেঁচে যায়। বৃষ্টিপাত পরের দু'টি খেলাকে (ডার্বিশায়ার এবং ইয়র্কশায়ার দলের বিপক্ষে) ভণ্ডুল করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিচি বেনোর শারীরিক অসুস্থতা এবং সেই কারণে দুটি খেলায় তাঁর যোগদানের অক্ষমতা—এসমস্তই কেন যেন মনের মধ্যে ধোঁকা ধরিয়ে দেয়। ভাগ্যদেবী কি তাহলে রিচি বেনোর 'পয়মন্ত টাই'-এর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন!

সংবাদে প্রকাশ, ইংল্যান্ড সফরে এসে রিচি বেনো তাঁর একটি ব্যবহার করা 'টাই' প্রিন্স ফিলিপকে (ডিউক অব্ এডিনবরা) উপহার দিয়েছেন। একটি টাইয়ের দাম কত আর, তাও আবার ব্যবহার করা! কিন্তু এই টাইটির ঐতিহ্য আছে এবং সেইদিক থেকে অমূল্য সম্পদ। এই টাইটির ইতিহাস রিচি বেনো নিজ মুখেই প্রকাশ করেছেন; অধিনায়ক রিচি বেনো এই টাইটি গলায় বেঁধেই ইংল্যান্ড, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং ওয়েস্টইন্ডিজ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে প্রতিটি টেস্ট খেলায় নেমেছেন এবং শেষ পর্যন্ত টেস্ট সিরিজে জয়লাভের সম্মান 'রাবার' লাভ করেছেন। রিচি বেনো নিজ মুখেই বলেছেন, 'টাই'টি তাঁর পয়মন্ত। অন্ধ-বিশ্বাস থাকার অভি-যোগে ভারতবাসী ইউরোপের কাছে পদে পদে বিদ্রূপের পাত্র। কিন্তু ঐসব দেশের সাধারণ লোক অন্ধ-বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। এমনকি খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। খেলোয়াড়দের পয়মন্ত জুতো, জামা, পেন্টুলুন, ব্যাট, টাই—আরও কতরকম থাকে। তাই ভাবছি, এই পয়মন্ত 'টাই' হাতছাড়া ক'রেই কি অস্ট্রেলিয়া দলের

ক্যালকাটা বাস্কেট বল প্রতিযোগিতার (নকআউট) ফাইনালে ওয়াই এম সি এ বনাম বয়েজ ট্রেনিং এসোসিয়েশনের খেলার দৃশ্য। ফাইনালে ওয়াই এম সি এ ৩৭—৩৪ পয়েন্টে জয়লাভ করে।

এই প্রাথমিক বিপর্যয়! মনের এ কুসংস্কারের মীমাংসা হবে সফরের শেষে। ইংল্যান্ড-সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের এখন অনেক খেলা বাকি--সবে তো খেলা শুরু; খেলার রাজা টেষ্ট খেলাই এখনও আরম্ভ হয়নি।

এপর্যন্ত (১০ই মে) অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল তিনটি কাউন্টি দলের সংগে খেলেছে—ওরস্টার, ডার্বিশায়ার, এবং ইয়র্কশায়ার দলের বিপক্ষে। বৃষ্টির দরুণ তিনটি খেলাই ভণ্ডুল হয়েছে। খেলার ফলাফল ড্র। ওরস্টার দলের বিপক্ষে সফরের প্রথম খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে পরাজয়ের খুবে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া এযাত্রা খুবে রক্ষা পেয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বরুণদেবই অস্ট্রেলিয়ার মান-সম্ভ্রম রক্ষা করেন। খেলার শেষ দিন লাঞ্চের সময় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; পরে আর খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। এই সময় জয়লাভের জন্য ওরস্টার দলের আর মাত্র ১০৮ রাণ প্রয়োজন ছিল—হাতে উইকেট জমা ছিল ৬টা। ওরস্টার কাউন্টি দলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল প্রথম খেলতে নামে ১৯০২ সালে। সেই থেকে এই খেলা ধরে দুই পক্ষের মধ্যে ১৩টা খেলা হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে—অস্ট্রেলিয়ার জয় **৮টা** এবং খেলা ড্র **৫টা**। ডার্বিশায়ার দলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় খেলাটি ছিল তিন দিনের; কিন্তু বৃষ্টির দরুণ ৬৫ মিনিটের বেশী সময় খেলা সম্ভব হয়নি। বৃষ্টির দরুণ ইয়র্কশায়ার দলের বিপক্ষে তৃতীয় খেলাটি নির্ধারিত দিনে আরম্ভ হয়নি। খেলাটি শেষ পর্যন্ত ড্র যায়। উল্লেখযোগ্য ঘটনা—অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড় ও'নীলের সেঞ্চুরী এবং হার্ভের 'হ্যাট-ট্রিক'—(ইয়র্কশায়ার দলের তিনজন খেলোয়াড়কে পর পর লুফে আউট করেন)।

হকি লীগ

ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়ে গেলেও হকি লীগ খেলা নিয়ে উত্তেজনা কিছু কমেনি। সাধারণতঃ হকি লীগ খেলার সমস্ত উত্তেজনা ফুটবল মরসুম আরম্ভের আগেই উবে যায়। কিন্তু বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের কর্মদক্ষতায় প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রশ্নটি ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সংবাদে প্রকাশ, বি এইচ এ কর্তৃপক্ষ দুই পত্রদ্বারা ইষ্টবেংগল এবং কাষ্টমস ক্লাবকে জানিয়ে দিয়েছেন, এ বছরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ বাতিল করা হয়েছে। ইষ্টবেংগল ক্লাবের তরফ থেকে চ্যাম্পিয়ানশীপের দাবি জানিয়ে পত্রের উত্তরও চলে গেছে।

২২শে এপ্রিল তারিখের খেলায় কাষ্টমস ক্লাবের যোগদানের ঘোর আপত্তি জানা সত্ত্বেও চ্যাম্পিয়ানশীপ নির্ণয়ের জন্য ২২শে এপ্রিল তারিখেই ইষ্টবেংগল ও কাষ্টমস দলের প্রদর্শনী খেলার দিন স্থির করা, আবার ঐ দিনেই খেলা আরম্ভের কয়েক ঘণ্টা আগে পূর্ব-সিদ্ধান্ত বদলে খেলা হবে না ঘোষণা করা, এই খেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ইষ্টবেংগল ক্লাবকে না জানানোর ফলে ইষ্টবেংগল ক্লাবের যথারীতি মাঠে আগমন ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার যে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল তা চ্যাম্পিয়ানশীপ বাতিল করার সিদ্ধান্তে আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘ প্রায় আড়াই মাস প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলার পর লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ মীমাংসার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে চ্যাম্পিয়নশীপ বাতিল করার সিদ্ধান্ত—প্রতিযোগিতার এক ব্যর্থ পরিণতি এবং খেলাধূলায় সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার পক্ষে তা অনুকূল নয়। চ্যাম্পিয়নশীপ বাতিল করার কারণও জানা যায়নি। আশা করি, কর্তৃপক্ষ মহল বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন।

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের রাণার্স-আপ মিখাইল বটভিনিক (রাশিয়া) গত বছরের বিজয়ী তরুণ খেলোয়াড় মিখাইল তহেলকে (রাশিয়া) ১৩-৮ পয়েন্টে পরাজিত ক'রে পুনরায় বিশ্ব খেতাব লাভ করেছেন। ইতিপূর্বে বটভিনিক বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় চারবার বিশ্ব খেতাব পান।

●

মানকড় এবং চান্দু বোরদের সাফল্য

গত ১৩ই মে শনিবার ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ল্যাঙ্কাসায়ার ক্রিকেট লীগের খেলায় ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় ভিনু মানকড় এবং চান্দু বোরদে উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মানকড় ওয়াকডেন ক্রিকেট দলের সাত-জনকে মাত্র ৩০ রাণের বিনিময়ে আউট করেন। ফলে তাঁর দল শেষ পর্যন্ত ২ উইকেটে জয়ী হয়।

মানকড়

বোরদে রটেনস্টল দলের পক্ষে খেলছেন। টডমর্ডেন ক্লাবের বিপক্ষে একটা চমৎকার ক্যাচ লুফে, দুজনকে রাণ-আউট করে এবং বিপক্ষের মোট ১০১ রাণের মধ্যে মাত্র ২৫ রাণ দিয়ে ৩টি উইকেট পান। দুটো উইকেট পড়ে যখন দলের মাত্র ৬ রাণ তখন তিনি তৃতীয় উইকেটে জুটি বেঁধে ৮৮ রাণ তুলে নিজস্ব ৪১ রাণে আউট হ'ন। তাঁর দল শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে জয়ী হয়। /

বোরদে

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

স্থান	প্রথম খেলা	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	ইংলণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অষ্ট্রেলিয়া	১৮৭৬-৭৭	৫৩	৩৮	৬	৯৭
ইংলণ্ড	১৮৮০	২১	২৪	৩৬	৮১
	মোট	৭৪	৬২	৪২	১৭৮

যুদ্ধপরবর্তী কালের ফলাফল

		অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	ইংলণ্ড জয়ী	খেলা ড্র	মোট	রাবার লাভ
১৯৪৬-৪৭	—	৩	০	২	৫	—অষ্ট্রেলিয়া
১৯৪৮	—	৪	০	১	৫	—অষ্ট্রেলিয়া
১৯৫০-৫১	—	৪	১	০	৫	—অষ্ট্রেলিয়া
১৯৫৩	—	০	১	৪	৫	—ইংলাণ্ড
১৯৫৪-৫৫	—	১	৩	১	৫	ইংলাণ্ড
১৯৫৬	—	১	২	২	৫	—ইংলাণ্ড
১৯৫৮-৫৯	—	৪	০	১	৫	—অষ্ট্রেলিয়া
মোট ঃ		১৭	৭	১১	৩৫	

ফুটবল মরসুম

ক'লকাতার মাঠে ময়দানে এবছরের ফুটবল মরসুম অনেকদিন হ'ল সুরু হয়েছে ; কিন্তু আই-এফ-এ পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিভাগের লীগ খেলাগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে গত ১০ই মে তারিখ থেকে। গত তিন বছর বিভিন্ন বিভাগের লীগের খেলায় উঠা-নামা বন্ধ ছিল। এবছর থেকে পুনরায় লীগের খেলায় উঠা-নামা চালু হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে খেলায় জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে হয়। তবে এই 'উঠা-নামা'র ঘোষণা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ মহলের মতি-গতি সম্বন্ধে যাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বলেন 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর খেলার সামগ্রিক মান-উন্নয়নের সাধু উদ্দেশ্যেই লীগ-প্রথার প্রবর্তন করা হয়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, যেসব দেশ ফুটবল খেলায় শক্তিমান তারাও লীগ-প্রথায় ফুটবল খেলা আমাদের আগে থেকেই চালু করেছে। ক'লকাতার ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে 'ওঠা-নামা' স্থগিত রাখার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই নেই। একমাত্র দলীয় স্বার্থ কায়েমী করা ভিন্ন এইরূপ অবৈজ্ঞানিক নীতি দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

ক'লকাতার ময়দানে আর এক নতুন অসন্তোষের বীজ অংকুরিত হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের লীগের খেলায় যোগদানকারী ফুটবল দলগুলির মধ্যে মাত্র চারটি প্রথম বিভাগের ক্লাবের দুটি ঘেরা এজমালি মাঠ আছে। দ্বিতীয় বিভাগের ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ঘেরা মাঠ নিয়ে ঘেরা মাঠের মোট সংখ্যা মাত্র তিনটি। যেসব ক্লাবের ঘেরা মাঠ নেই তাদেরই একটি বৃহৎ অংশ আর একটি ঘেরা মাঠের দাবী তুলেছে। এই দাবী পূরণ না হলে এবছরেই লীগের খেলা থেকে তারা শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়াবে—এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিল। তারা আরও কয়েকটি দাবীর কথা তুলেছে যেগুলি অন্যায় আবদার নয় বা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিচয় দেয় না ; বরং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে এই দাবী-গুলি যত শীঘ্র পূরণ করা যায় দেশের খেলাধুলোর পক্ষে ততই মঙ্গল।

আপাতত কর্তৃপক্ষ মহল থেকে আশ্বাস পেয়ে এই দাবীর আন্দোলন স্থগিত আছে। যদি শেষ পর্যন্ত একটা আপস-রফা না হয় তাহলে এবছরের ফুটবল মরসুম ভণ্ডুল হতে পারে, অনেকেই সেই রকম আশঙ্কা করছেন।

তারিখ ১৫।৫।৬১

অর্থনৈতিক সাময়িকী

উমাপদ মজুমদার

মধ্যবিত্ত সংসারের হাল

মধ্যবিত্ত ঘরের হাল নির্ণয় করে নেওয়ার আগে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞাটা ঠিক করে নেওয়া উচিত। কাজটা অবশ্য সহজ নয়। কারণ মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের চৌহদ্দীতে ধাক্কা খেয়ে নিম্নপথে নিম্নবৃত্তির উঠানে আশ্রয় নিয়েছে। হরেক রকম মানুষের বিচিত্র সমাবেশই হচ্ছে মধ্যবিত্তের প্রকৃতি নির্দেশক।

উপরতলার মিঃ ও মিসেসদের বাদ দিলে মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আওতায় রাম থেকে রহিম সকলেই আসে। পরিকল্পনার সম্প্রসারিত অর্থনীতির গৌরবে গৌরবান্বিত কে নয়—মন্ত্রী থেকে মাছওয়ালী পর্যন্ত। কিন্তু মধ্যবিত্তের এমন ভাগ্য যে এত বৃদ্ধিতেও তাদের ক্ষয়ের অঙ্ক শেষ হচ্ছে না। এদের সংসার অস্বচ্ছলতায় ভরা। মনে হয় যেন কলুর বলদের মত তারা করের বোঝা বইছে পরের জন্য। বহু হাজার কোটি টাকা লগ্নী বৃদ্ধির ফলস্বরূপ তারা পেয়েছে গোটা কতক চাকুরী তাও বেশীর ভাগই এমন মাহিয়ানায় যাতে সংসার চলে না।

করের বোঝা

মধ্যবিত্তের উপর করের বোঝা দ্রুত বেড়ে চলেছে। কর ব্যয়ের প্রত্যক্ষ সুবিধার ভাগ তাদের কমই মেলে। মধ্যবিত্ত যে একটা বৃহৎ করের বোঝা বইছে তাও চোখে ধরাণ মুস্কিল কারণ প্রত্যক্ষর চেয়ে পরোক্ষ করই বেশী। করের ভারে মূল্যস্ফীতি এত দ্রুতহারে বাড়ছে যে আয়ের অঙ্ক ব্যয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। সেই কারণে আজ মধ্যবিত্ত সংসারে শুধু আনন্দের অভাব হয়নি দিন গুজরাণের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও টানাটানি পড়েছে।

সামাজিক কর্তব্যের ঠেলাঠেলি

মধ্যবিত্ত সংসারে জীবনধারণের সঙ্গে আরও অনেক কিছুর দরকার হয়। শিক্ষা, ভদ্রভূষণ, সামাজিক কর্তব্যের নিয়ম পালন সবই এদের কাছে অবশ্য। সামাজিক ও নৈতিক মূল্যের মাত্রাজ্ঞান অপেক্ষাকৃত বেশী থাকায় সামাজিকতার উচ্চমূল্য এদের সীমিত আয় থেকে দিতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দ্রব্যমূল্যের মান শতকরা ২৫ ভাগ বেড়েছে। সেই পরিমাণে আয় বাড়েনি উপরন্তু ঘাটতি বেড়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় একটি বৃহৎ পরোক্ষ করের বোঝা চাপানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্তাব্যক্তিরা অনেকেই এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন ও দিল্লী থেকে বলা হয়েছে ওয়েজ-গুডস-এর উপর করস্ফীতির প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া হবে না, কিন্তু প্রমাণ হচ্ছে সব ঝুটা হায়। তার মধ্যবিত্ত সংসারের আনন্দ উজ্জ্বল ছবি কল্পনাবিলাস মাত্র।

মধ্যবিত্তের গার্হস্থ্য বাজেট

মধ্যবিত্তের বাজেট একটি নির্দিষ্ট পথে চলে। সাময়িক অদল-বদল করে বৈচিত্র্য আনার মত স্বচ্ছলতা মধ্যবিত্ত ঘরে নেই। শতকরা ৯০ ভাগ আয় পূর্ব নির্দিষ্ট কারণে ব্যয় করতে হয়। বেশীর ভাগ সংসারে খাওয়া থাকার পর শিক্ষা খরচেও টানাটানি পড়ে। ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসার কথা এখানে উঠতেই পারে না। অভাব, অনটন, মহামারী, ভেজাল খাদ্য ও নিরাপত্তার অভাবের মধ্যেই এরা বাস করে।

বসন্তের পর এল গ্রীষ্ম

শীত ও বসন্তকালের সুমধুর আবহাওয়ার সঙ্গে আসে ভিন্ন রুচির খাদ্য সম্ভার। বছরের অতৃপ্ত আকাঙ্খা এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু গত শীতে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মাছের ব্যাপারে বড়ই নিরাশ হয়েছে। কালোবাজারের রহস্য তাদের বিশেষভাবে বিচলিত করেছে। তায় ১০৭ ডিগ্রী আবহাওয়ায় গ্রীষ্মকালীন ফলের আস্বাদের লোভ থাকলেও এই কৃতী পুরুষদের কৃতিত্বের কথা মনে পড়লে নিরাশ হবার কারণ আছে। সুতরাং দামের কথা চিন্তা করে আশান্বিত হওয়ার কারণ নেই।

যে সংসারে গ্রীষ্মের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আছে সেখানেও হতাশার কারণ দেখা দিয়েছে। তাপদগ্ধ কলিকাতায় কর্ম-ক্লান্ত অবসরে ঠাণ্ডা হবার উপায় নেই। করের জন্য এই সকল সামগ্রীর দাম বেড়েছে আর তাছাড়া বিদ্যুৎশক্তির অভাবে ফ্রিজিডিয়ার চলছে না, পাখা চলছে না, এয়ার-কনডিশনের অভাবে ঠাণ্ডা-ঘর গরম হয়ে গিয়েছে। হাতপাখা চালিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করা সহজ নয়। এই সব সুখী পরিবারের মনের আগুনের সঙ্গে বাইরের তাপ মিশিয়ে আবহাওয়া গরম করে তুলেছে।

ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত

আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের স্বাচ্ছন্দ্যবহুল জীবনের কোনই তুলনা হয় না। সত্য তবুও পার্থক্য জেনে রাখা ভাল। ১৯৬০ সালে বৃটেনের লোকেরা ১৬৬৪ কোটি পাউণ্ড জীবনযাত্রা খাতে খরচ করেছে। পূর্ব-বৎসরের তুলনায় প্রায় হাজার কোটি টাকা বেশী। এর মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের জন্য খরচ করেছে ৪৯১ কোটি পাউণ্ড। মদ আর তামাক খেয়েছে ২১৪ কোটি পাউণ্ডের, বাড়ীভাড়া, আলো, [illegible] খাতে খরচ ২২৭ কোটি পাউণ্ডের বেশী।

উপরের বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় যে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা খাবারের জন্য সমুদয় ব্যয়ের ৩০ ভাগের মতো খরচ করেছে। মদ ও তামাকের খরচ খাওয়া খরচের প্রায় অর্ধেক। এই স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য আমরা এখন আশা করি না, কিন্তু স্বাধীন ভারত এই জীবনধারণের মানকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে।

চিনির প্রয়োজন

গ্রীষ্মকালে চিনির প্রয়োজন বেশী। কিন্তু চিনির দর এত বেশী যে কেনা মুস্কিল হয়েছে। চিনি মিলে ও গুদামে পড়েছে তবুও বিক্রয় হচ্ছে না। গত বৎসরের ২৫ লক্ষ টন চিনি বিক্রয় হয়নি, এই বছর উৎপাদন বেড়ে ৩০ লক্ষ টনে পৌঁছবে।

একথা বললে ভুল হবে যে বর্তমান উৎপাদন হার প্রয়োজনাধিক। ভারতে গড়পড়তা মাথা পিছু চিনি খাওয়া হয় মাত্র ৫·৩ কিলোগ্রাম, আর্জেন্টিনায় ৩৬·২, কানাডায় ৪৩·৪, চীনে ১১·১, ডেনমার্কে ৫৪·১, আমেরিকায় ৪৩·৬। চিনিজাত দ্রব্য ব্যবহারও ভারতের অন্য দেশের তুলনায় কম। ভারতে গড়পড়তা মাথা-

পিছু চিনি জাতীয় দ্রব্যের প্রয়োজন হয় মাত্র ১·৩ আউন্স, সেই তুলনায় ইংল্যাণ্ডে সপ্তাহে খাওয়া হয় মাথা-পিছু ৪ আউন্স।

ভারতে নানা রকমের চাল জন্মায়। কনফেকসানারি ও আচার শিল্পের প্রসার কষ্টসাধ্য নয়। চিনি রপ্তানী না করে এই সব শিল্পকে রপ্তানী শিল্প হিসাবে গড়ে তুললে ভাল হয়।

অবশ্যই চিনির ব্যবহার বাড়াতে হলে চিনির দাম কমানর ব্যবস্থা করতে হবে। উৎপাদন খরচ কমিয়ে দাম নামাতে হবে। এখন ভারতে ৪০৲।৪৫৲ টাকা মণ দরে চিনি বিক্রয় হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে মণকরা দাম মাত্র ১৫৲ টাকা। সরকার প্রতি টনে ২৫০ থেকে ৩০০৲ টাকা খয়রাতি দিয়ে বিদেশে চিনি বেচেবেন ঠিক করেছেন। বিদেশের বাজারে লোকসান করা মানে অর্থনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করা। যদি সরকারী তহবিল থেকে লোকসানই দিতে হয় তবে ভারতীয়দের সুবিধার জন্য করা ভাল। এইভাবে যে সামান্য বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হবে তা নগণ্য। আর তাছাড়া অন্য উপায়ে এই মুদ্রা অর্জন করা অসম্ভব নয়। লোকসান দিয়ে চিনি রপ্তানী না করে চিনিজাত দ্রব্য রপ্তানী করলে অনেকগুলি ছোট শিল্পকে সাহায্য করা হবে।

উচ্চমূল্যের জন্য মিল মালিকরা দুষছেন সরকারকে করভারের জন্য, আখের উচ্চমূল্যের জন্য, শ্রমিক কল্যাণ উন্নয়ন আইনের জন্য আর আক্ষেপ করছেন আখের স্বল্প চিনি জাতীয় পদার্থের জন্য। ক্রেতা বিভ্রান্ত। কাকে দোষারোপ করবে। কাউকে না পেয়ে নিজের কপালকেই করছে। দেশটাকে অদৃষ্টবাদী করা কি উচিত হচ্ছে?

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

স্মরণীয় ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়

৭ই বৈশাখের বই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সদাশিবের হৈ হৈ কান্ড (সচিত্র) টাঃ ৩·০০

শৈলেন বিশ্বাসের
মহাভারত (সচিত্র) টাঃ ৩·০০

সদ্য প্রকাশিত

শিবরাম চক্রবর্তীর **ফানুস ফাটাই** (সরস প্রবন্ধ গ্রন্থ) টাকা ২·৫০ ॥ নিমল মিত্রের **মনুষ্যহীন প্রাণ** (নূতন সংস্করণ) টা ২·৭৫ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (গল্পগ্রন্থ) **কোকিল ডেকেছিল** টা ৩·২৫ ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের (উপন্যাস) **কঙ্কাল নাম তার** টাকা ৫·৫০ ॥ 'বনফুল'-এর (নূতন সংস্করণ উপন্যাস) **স্থাবর** টাকা ৮·০০ ॥ নরেন্দ্র ঘোষ-এর (গল্পগ্রন্থ) **পঞ্চমরাগ** টাকা ৩·২৫ ॥

পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হলো

'বনফুল'-এর **জলতরঙ্গ** টা ৪·৫০ ॥ লীলা মজুমদারের **ঝাঁপতাল** টা ২·৭৫ ॥ সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর **হিন্দুস্থানী উপকথা** টা ৩·৫০ ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগীর **রজনীগন্ধা** টা ২·২৫ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **অদ্বিতীয় ঘনাদা** টা ২·৭৫ ॥ নিমল মিত্রের **কন্যাপক্ষ** টা ৩·২৫ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সসেমিরা** টা ৩·০০ ॥

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ও উপহারযোগ্য গ্রন্থ :

উপন্যাস : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **দিবারাত্রির কাব্য** টা ৩·২৫ ॥ বুদ্ধদেব বসুর **হে বিজয়ী বীর** টা ৩·৫০ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর **অনুষ্ঠান ছন্দ** টা ৪·০০ ॥ জ্যোতির্ময় রায়ের **আচমকা** টা ২·০০ ॥ শরৎচন্দ্র, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ প্রভৃতির বারোয়ারী উপন্যাস **ভালমন্দ** টা ৪·০০ ॥ শচীন্দ্র মজুমদারের **লীলা মৃগয়া** টা ৩·০০ ॥ দেবেশ দাশের **রক্তরাগ** টা ৪·৫০ ॥ ভবানী মুখোপাধ্যায়ের **কান্নাহাসির দোলা** টা ৩·৭৫ ॥ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের **ফুটলো কুসুম** টা ২·০০ ॥ কণাদ গুপ্তের **পূর্ব মীমাংসা** টা ২·৫০ ॥ প্রশান্ত চৌধুরীর **স্বগতোক্তি** ২·২৫ ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **অভিষেক** টা ৫·৭৫ ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষের **গান্ধর্ব** টা ৩·৫০ ॥ দীপক চৌধুরীর **নীলে সোনায় বসতি** টা ৩·৫০ ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **এক ছিল কন্যা** টা ৬·৫০ ॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের **সোহো স্কোয়ার** টা ২·৫০ ॥ চিত্তরঞ্জন মাইতির **অগ্নিকন্যা** টা ৩·০০ ॥ চিত্রিতা দেবীর **দুই নদীর তীরে** টা ৬·৭৫ ॥

গল্পগ্রন্থ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **সপ্তপদী** টা ২·৫০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **ডবল ডেকার** টা ৩·০০ ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **কাঠগোলাপ** টা ৩·০০ ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সিন্দুর টিপ** টা ২·৫০ ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ-এর **পারাবত** টা ৩·০০ ॥ নিমল মিত্রের **পুতুল-দিদি** টা ৩·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **কায়কল্প** ৩·৫০ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **রূপহলুদ** টা ২·৫০ ॥ দ্বারেশ শর্মাচার্যের **জ্যোতিষীর ডায়েরী** টা ২·২৫ ॥ দেবেশ দাশের **রোম থেকে রমণা** টা ৩·৫০ ॥ অনুরূপা দেবীর **ক্রৌঞ্চ মিথুনের মিলন-সেতু** টা ২·৫০ ॥ নিরুপমা দেবীর **আলেয়া** টা ২·০০ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জাতিস্মর** ২·২৫ ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসুর **বাস্তীমাং** টা ১·৭৫ ॥ জ্যোতির্ময় ঘোষের (ভাস্কর) **ফাংশন** ৩·০০ ॥

কবিতাগ্রন্থ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **সম্রাট** টা ২·০০ : **প্রথমা** টা ২·৫০ : **সাগর থেকে ফেরা** ৩·০০ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **নীল আকাশ** ২·০০ ॥ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের **কবি-চিত্ত** টা ৫·০০ ॥

বিবিধ : শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটমি** টাঃ ৩·০০ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ** টা ৩·৫০ ॥ হিমানীশ গোস্বামীর **লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায়** টা ৩·০০ ॥ নলিনীকান্ত সরকারের **হাসির অন্তরালে** টা ৩·০০ ॥ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের **অবনীন্দ্র চরিতম্** টা ৫·০০ ॥ অনাথনাথ বসুর **সৃষ্টি সমুচ্চয়** টা ৩·৫০ ॥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালচার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা ঃ ৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

। ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা মূল্য ৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday 26th May, 1961
40 Naye Paise

রবীন্দ্র জন্ম-শত-জয়ন্তীর বৎসরেই কাছাড়ের হতভাগ্য বাঙ্গালীরা মাতৃভাষার দাবীতে প্রাণবলি দিচ্ছে—এ কী ইতিহাসের ক্রূর পরিহাস? অথবা বর্তমান ভারত শাসনের নীতিই এই? বাংলা যার মাতৃভাষা, যে শিশু জীবনে প্রথম মাতৃ সম্বোধন করেছে "মা" বলে, আজিকার মধ্যবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সে-শিশুর ললাটে বিধাতাপুরুষ কী দুর্ভাগ্যের রক্ততিলক পরিয়ে রেখেছেন? জানি ইতিহাস বাঙ্গালীকে বহু দুর্লভ গৌরব দিয়েছে, তার মধ্যে তার ভাষার ঐশ্বর্য অন্যতম। কিন্তু এই ভাষাই কী তার জন্মের অপরাধ? বর্তমান ভারত রাষ্ট্রে দিল্লীতে হিন্দীর শাসন দরবারে বাঙ্গালী কী আজ বার বার এই অপরাধেই দন্ডিত, যার জন্য আসামে তার ক্ষোভ প্রতিকারহীন? এবং বছরে বছরে তার প্রাণবলি এবং বঞ্চনা সুনিশ্চিত? আমরা একথা জিজ্ঞাসা করছি কারণ, শিলচরের গুলীবর্ষণ এবং নয়জন নরনারীর হত্যা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দশ মাস পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ব্যাপক দাঙ্গা, বাঙ্গালী নরনারীর নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের দ্বারা আজিকার এই গুলীবর্ষণের পটভূমিকা রচনা করা হয়েছিল বিভীষিকার অক্ষরে। সেই পটভূমিকার উপরে বিগত দশ মাস যাবৎ ক্রমশঃ বিক্ষোভ ও অন্তর্দাহের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়েছে, সহস্র সহস্র উৎখাত এবং আর্ত বাঙ্গালী নরনারী গৃহহীন ভিখারীর দশায় পশ্চিমবঙ্গে পৌঁচেছে, দাঙ্গার প্রতিকার কিংবা বিচারের জন্য দিল্লীর দরবারে সমস্ত আবেদন নিষ্ফল হয়ে ফিরেছে এবং আসাম সরকারের উগ্রভাষামূর্তিকে কাছাড় ও পার্বত্য জেলার অধিবাসীরা

সম্পাদকীয়

প্রতিরোধ করতে পারেনি। আজ চালিহার গভর্ণমেণ্ট তার ধাত্রীমাতার বক্ষের উপরে ছুরিকা উদ্যত করেছে। কারণ, আসামের রাজনীতির ইতিহাসে কাছাড় এই অপরাধ করেছিল যে, একদা চালিহা যখন তাঁর জন্মভূমি শিবসাগরের নির্বাচন এলাকায় পরাজিত, সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমীয়া রাজনীতি যখন তাঁকে ক্ষমতা থেকে নিষ্ঠুর নির্বাসন দিতে চাইছে, তখন এই সহায়হীন এবং আশ্রয়হীন চালিহাকে কাছাড় মাতৃস্নেহে আশ্রয় দিয়েছিল। কাছাড় আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করছে রক্ত, অশ্রু ও বেদনার ইতিহাসে।

কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভাষার জন্য বাঙ্গালীর নির্যাতন এই প্রথম নয়। এই রক্তপাতের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে পাকিস্থান থেকে। পাকিস্থানেই প্রথম তরুণের বুকের টক রক্ত রাজপথ সিঞ্চিত করেছিল। কারণ, সেদিন পশ্চিম পাকিস্থানের উগ্রভাষামূর্তিকে সে অস্বীকার করে বাংলার কণ্ঠকে জীবিত রাখতে চেয়েছিল। তার জন্য পূর্ব পাকিস্থানের বাঙ্গালীকে প্রাণ বলি দিতে হয়েছে। এখানে, পুরুলিয়ার সত্যাগ্রহ রুদ্রমূর্তি হিন্দীর রোলারকে প্রতিরোধ করেছিল এবং সেই প্রচণ্ড রোলারের নীচে নারী ও পুরুষ নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় পিষ্টও হয়েছে। তার প্রতিবাদ দিল্লীর রাজধানীতে পৌঁছুতে পারেনি। বিগত জুলাই মাসে পনেরো দিন যাবৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যখন দাঙ্গার বীভৎস দৃশ্য অনুষ্ঠিত হল এবং কলকাতার সংবাদপত্র আচ্ছন্ন হয়ে গেল আর্ত নরনারীর ক্রন্দনে, তখন আসামের পুলিশ ও সৈন্য-

বাহিনী ছিল নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায়। আইন ও শৃঙ্খলার জন্য গভর্ণমেণ্ট চিন্তিত হল না এবং মুখ্যমন্ত্রী চালিহা "রোগশয্যার" আড়ালে তাঁর কলঙ্কিত মুখ আবৃত করলেন। আর আজ? শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের প্রথম দিনই কাছাড়কে ঘেরা হয়েছে সৈন্যবাহিনীর দ্বারা, পুলিশ এবং শান্ত্রীর উপস্থিতিতে সমস্ত কাছাড় সন্ত্রস্ত এবং প্রথম দিনই আসামে গভর্ণমেণ্টের পুলিশ নির্মম দক্ষতায় নয়জনের প্রাণ নিয়েছে। বাঙ্গালী যখন আত্মরক্ষার জন্য আইন ও শৃঙ্খলা, কিংবা রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার অথবা সংবিধানের রক্ষাকবচ যখন প্রার্থনা করল, আসামের আইন তখন সাড়া দিল না, দিল্লীর সংবিধান নীরব রইল এবং রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার অসমীয়াদের পদপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিত হল। কিন্তু আজ যেখানে বাঙ্গালীকে আক্রমণের প্রশ্ন, যেখানে বাঙ্গালী নারী ও পুরুষের উপর নির্যাতন ও অত্যাচারের সুযোগ, সেখানে আসামের আইন সরব। গুলীর আওয়াজে তার শক্তি ও দক্ষতা প্রকম্পিত হচ্ছে। রক্তে সংবিধানের রাষ্ট্রীয় অধিকারের পাতা সে সিঞ্চিত করছে। বলা বাহুল্য, আজ আর চালিহা অসুস্থ নন, তাঁর ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তারা কাছাড়কে কণ্ঠরুদ্ধ করে এনেছে। সর্বোপরি শ্রীচালিহা স্বয়ং এই অভিমন্যু বধের নিষ্ঠুর ব্যূহ রচনা করেছেন।

নেহরুজী গৌহাটির বক্তৃতায় কাছাড়ের ঘটনার জন্য শুধু "বেদনা" প্রকাশ করেছেন এবং কাছাড়ের বঙ্গভাষীদের উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁদের ভাষার অধিকার আদায়ের পথ সত্যাগ্রহ নয়। তবে পথ কোথায়? দিল্লীর দরবারে কাছাড় এবং বঙ্গভাষী আসাম বিগত দশ মাসের মধ্যে কোন্ প্রতিকার আদায় করতে পেরেছে? নেহরুজী বাঙ্গালীকে কোন্ আশ্বাস, কোন দৃঢ়তা এবং কেন্দ্রীয় শাসনের কোন্ অভয় মন্ত্র দিতে পেরেছেন? জুলাই-এর দাঙ্গার পর বাংলাদেশে হিংসার আগুন জ্বলে নি। আসামে যে সমস্ত অঞ্চলে বাঙ্গালীর সংখ্যাধিক্য, সেখানেও প্রতিশোধস্পৃহা হিংসার মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়নি। ২০ লক্ষ বাঙ্গালীর নির্যাতনের পরেও বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। তারা পার্লামেণ্টের কাছে প্রতিকার চেয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার প্রার্থনা করেছে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি নিয়ে গেছে। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক এবং আইনসংগত প্রচেষ্টার কোন সম্মান দিল্লী বাঙ্গালীকে দিয়েছে? আসামের বাঙ্গালীর সামগ্রিক তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি, পুনর্বাসনের ব্যাপারে এবং তদন্তের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। গোরেশ্বরে যদিবা তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার রিপোর্ট আজ কবরস্থ। দাঙ্গাকারীদের শাস্তিবিধান ঘটেনি, আসাম তিরস্কৃত হয়নি, আসামের এই কুৎসিত রাজনীতির কোনো সংস্কার দিল্লী চিন্তা পর্যন্ত করেনি, চালিহার কলুষিত গভর্ণমেণ্ট সসম্মানে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে। বাঙ্গালীর জন্য কোন্ নিয়মতন্ত্রের পথ নেহরুজী অবশিষ্ট রেখেছেন? পন্ডিত পন্থ ভাষার ব্যাপারে যে চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন, আসাম তার উপরে ছুরিকাঘাত করেছে এবং ভাষা আইনের গতিরোধ করার মতো সৎ সাহস নেহরুজী দেখাতে পারেন নি। যদি পন্ডিত নেহরুর কোনো বিবেক বোধ অবশিষ্ট থাকে তাহলে কোন্ মুখে তিনি কাছাড়ের বঙ্গভাষীদের বলবেন যে, আন্দোলনের পথে যেও না। আন্দোলন, রক্তপাত এবং হিংসা ছাড়া আর কোন্ ভাষাকে দিল্লী সম্মান করে? কোন পন্থায় আসাম তার দাবী আদায় করেছে এবং নেহরুকে বশ্যতায় এনেছে? গত দশ মাসের মধ্যে নিয়মতন্ত্র এবং সংবিধানকে দিল্লী কতখানি মর্যাদা দিয়েছে?

গত দশ মাসে আসামের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা, হিংসা এবং সংবিধানের অবমাননার দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। এই কদর্য ইতিহাস আগামী দিনের ভারতবর্ষকে এবং আজিকার বাঙ্গালীকে কোন্ শিক্ষা দেবে আমরা জানি না। কিন্তু এই নির্যাতন শুধু বাঙ্গালীর নয়, দিল্লীর দৃষ্টির অলক্ষ্যে আসল নির্যাতন ঘটেছে সংবিধানের উপরে এবং সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত যদি কোথাও পড়ে থাকে, সে আঘাত পড়েছে ভারতবর্ষের ঐক্য বন্ধনের উপরে। নেহরুজীর ইতিহাসবোধ যদি আজও সচেতন থাকে, তাহলে তাঁর জানা উচিত যে, আসামে তিনি আইকম্যানের বংশধরদের সৃষ্টি করছেন। বাঙ্গালীর উপরে আজ এই যে ইহুদী নির্যাতন চলছে, এর জন্য তাঁর কাছে আমরা করুণাভিক্ষু নই। আর কোনো নিষ্ফল প্রার্থনাও তাঁর কাছে বাঙ্গালীরা পেশ করবে না। কিন্তু এই নির্যাতনের সৈনিকেরা একদিন নির্যাতির অমোঘ সর্বনাশরূপে দেখা দেবেই এবং সেদিন আজিকার নেহরুর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অক্ষমতার মূল্য দিতে হবে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের এই হতভাগ্য জাতিকে। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, যেহেতু বাঙ্গালী ছিল ভারতের ঐক্যের মন্ত্র উদ্গাতা, সেইজন্য বাঙ্গালীর রক্তে ও বেদনায় ভারতের ভাঙ্গনের দুর্দিনও আজ সূচিত হচ্ছে!

গীতার ভূমিকা

রাজশেখর বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গীতার দার্শনিক মত

প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে দুই প্রকার সত্তা স্বীকৃত হয়—পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ বা আত্মা অসংখ্য; প্রকৃতি একই যদিও তার প্রকাশ বহুরূপে। পুরুষ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি গুণান্বিত ও সদা ক্রিয়ারত। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হলে প্রথমে মহৎ উৎপন্ন হয়। 'মহৎ' কি, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন বুদ্ধি, কেহ বলেন মন, কেহ বলেন চিন্তা, কেহ বলেন চেতনা। মহৎ থেকে ক্রমে ক্রমে অপর সমস্ত উৎপন্ন হয়েছে। পুরুষ বা আত্মা যখন মহতের অংশ আপনাতে আরোপিত ক'রে গুণান্বিত এক স্বতন্ত্র আত্মা কল্পিত করে, তখন অহংকার (আমিত্ব বোধ) উৎপন্ন হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, স্থূলভূত প্রভৃতি অন্যান্য তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এ সমস্তই প্রকৃতির বিকার এবং বস্তুত সত্তাবিহীন। মূল প্রকৃতি অব্যক্ত, কিন্তু পুরুষের সহিত সংযোগের ফলে উক্ত বিবিধ তত্ত্ব উৎপন্ন হয় এবং পুরুষ প্রকৃতির ব্যক্ত রূপ দেখতে পায়। পুরুষ তখন আপনাতে নানা গুণের আরোপ করে এবং তার ফলে সুখ-দুঃখাদির অধীন হয়। সাধনার দ্বারা পুরুষ তার স্বতন্ত্র নির্গুণ অবস্থা বা কৈবল্য ফিরে পেতে পারে, তখন সুখ দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

গীতাকার এই সাংখ্যতত্ত্ব মোটামুটি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি একে বেদান্তের অনুগামী ক'রে বলেছেন—পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই মূলে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই সত্তা।

ব্রহ্মের এক অনির্বচনীয় শক্তি আছে—'মায়া'। তার ফলে জীব ও জগৎ স্বতন্ত্র সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ আমি আছি এবং আমা হতে পৃথক জগৎ আছে এই ধারণা হয়। ব্রহ্মের এই দ্বিধা প্রকাশই প্রকৃতি। সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতির দুই ভেদ বর্ণিত হয়েছে—'অপরা ও পরা'। জীবাত্মা থেকে পৃথক

যে জগৎ প্রতীয়মান হয় (objects), তাই অপরা প্রকৃতি। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আত্মা না থাকলেও 'মমৈবাংশ' বহু স্বতন্ত্র জীবাত্মা বা পুরুষের প্রতীতি হয়; এই পুরুষবর্গ (subjects) 'জীবভূতা পরা প্রকৃতির' অন্তর্গত—'যয়েদং ধার্যতে জগৎ' (৭।৫), যার দ্বারা এই জগতের ধারণ (conception) উৎপন্ন হয়। সাংখ্য মতে বহু পুরুষ বা বহু জীবাত্মার অস্তিত্ব সত্য, কিন্তু গীতার মতে তাদের অস্তিত্ব প্রতীত বা ব্যবহারিক সত্য মাত্র।

অষ্টম, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে গীতাকার মনুষ্যের সত্তার বিশ্লেষ করেছেন। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদির নাম 'অধ্যাত্ম', এদের সমষ্টিই মনুষ্যের স্বভাব (character, individuality)। 'ক্ষরের ভাব' অর্থাৎ নিত্য-বিকারী স্থূল শরীর 'অধিভূত'। দেহে যে পুরুষ বা জীবাত্মা অধিষ্ঠান করেন তিনি 'অধিদৈবত'। এই পুরুষের ব্যক্তিত্ববোধ আছে, কিন্তু বস্তুত সকল পুরুষ এক এবং তিনিই সকল দেহরূপে যজ্ঞের 'অধিযজ্ঞ' বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই অধিযজ্ঞরূপে পুরুষ, যিনি 'সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি' (৮।২০), 'যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি' (৮।২২)—ইনিই 'পুরুষঃ পরঃ', 'অব্যক্ত অক্ষর' 'পরম অক্ষর', 'পরমাত্মা'।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে এই তত্ত্ব আরও বিস্তারিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়মনাদিযুক্ত বিকারশীল দেহই 'ক্ষেত্র' এবং পরমাত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। স্থাবর জঙ্গম সমস্তই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফল (১৩।২৭), অর্থাৎ আত্মা দেহধারী হলেই সমস্ত জগতের প্রতীতি উৎপন্ন হয়, নতুবা জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

সাধকের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের সহিত তাঁর সম্বন্ধের বোধও পরিবর্তিত হয়। ১৫।১৬ শ্লোকে গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার পুরুষের কথা বলেছেন—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। 'ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে'। সাধারণ বদ্ধ জীব যারা বিকারশীল ইন্দ্রিয়মনাদিযুক্ত দেহকেই 'আমি' মনে করে, তারা ক্ষর। আর যিনি কূটস্থ, অর্থাৎ স্বীয় আত্মাকে নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, প্রকৃতি হতে স্বতন্ত্র বলে বুঝেছেন, তিনি অক্ষর। কিন্তু যিনি কূটস্থ অক্ষর, তারও প্রতীতি থাকতে পারে যে, তা থেকে পৃথক আর এক সত্তা আছে—প্রকৃতি। গীতাকার এক উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ (১৫।১৭-১৮) উল্লেখ করেছেন, যিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত 'পুরুষোত্তম' বা পরমাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকট।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ও গীতায় ভক্তিবাদ

মহাভারতে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান আছে যা প্রাচীন বিশ্বাসেরই উপযোগী। মহাভারতের লেখক বহু হতে পারেন, কিন্তু যিনি গীতা রচনা করেছেন তিনি মহাভারতের সাধারণ ধারাই অনুসরণ করেছেন। অতএব মহাভারতে বর্ণিত অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত গীতার শ্রীকৃষ্ণের সংগতি থাকা স্বাভাবিক। গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের মুখে তত্ত্বকথা শোনাবেন বলেই যে শ্রীকৃষ্ণের চার হাত (১১।৪৬) এবং অন্যান্য পৌরাণিক অলংকার ছেঁটে ফেলবেন এমন আশা করা যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বারংবার বলেছেন—আমিই ব্রহ্ম, আমিই ঈশ্বর, বাসুদেবঃ সর্বং, আমাকেই উপাসনা কর, যে আমাকে দ্বেষ করে তাকে আমি নরকে নিক্ষেপ করি, ইত্যাদি। এ সকল উক্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু সরল ব্যাখ্যা এই মনে হয় যে, গীতাকার তাঁর দুরূহ প্রসঙ্গের অবকাশে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য পৌরাণিক রীতিতেই কীর্তন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা, তিনি বাস্তবিক কিরূপ ছিলেন—তার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। গীতাকার তাঁকে ধর্মসংস্থাপক নরদেহধারী পুরুষোত্তমরূপে চিত্রিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ জ্ঞানমূলক। কিন্তু জ্ঞানলাভের ক্ষমতা সকলের নেই। সমস্ত বুঝে উপদেশ পালন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু যদি বোঝবার ক্ষমতা না থাকে তবে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উপদেশ মেনে চললেও ফল হয়। চিকিৎসকের ব্যবস্থিত ঔষধের গুণাগুণ বুঝে নিয়ে তারপর ঔষধ সেবন করা সকল রোগীর সাধ্য নয়। চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা বা ভক্তির বশেই সাধারণ রোগী ঔষধ সেবন করে। ব্যবস্থার কারণ যে বুঝতে চায় তারও শ্রদ্ধা ও 'অনসূয়া' আবশ্যক, নতুবা বোঝবার সামর্থ্যই আসবে না। এইজন্যই গীতায় বারংবার ভক্তিশ্রদ্ধার অবতারণা হয়েছে। যিনি জ্ঞান চান, শ্রদ্ধা তাঁর সহায় এবং জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাবে। যাঁর জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা নেই, তিনি শ্রদ্ধার দ্বারাই নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারবেন। ভক্তি বা শ্রদ্ধার অবলম্বন চাই, গীতাকার ধর্মব্যাখ্যাতা পুরুষোত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সেই অবলম্বন বলেছেন।

গীতোক্ত ধর্মের উপসংহার

গীতাকে যোগশাস্ত্র বলা হয়। এই যোগের ধর্ম—আত্মোন্নতির জন্য সর্বতোভাবে সাধনা, spiritual, moral and physical culture। বঙ্কিমচন্দ্র একেই 'অনুশীলন' নাম দিয়েছেন। যিনি এই সাধনা করেন তাঁর সামাজিক বৃত্তি যাই হ'ক—গীতাকার তাঁকে যোগী বলেন। এই যোগসাধনার উপায়—ইন্দ্রিয়সংযম, আসক্তিত্যাগ, নিষ্কাম কর্মাচরণ বা কর্মযোগ, তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন বা জ্ঞানযোগ এবং পুরুষোত্তমরূপে কল্পিত গীতাধর্মের ব্যাখ্যাতা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে অবিচলিত ভক্তি বা ভক্তিযোগ। গীতাকার নির্বিচারে সর্বপ্রকার ভোগ বর্জন করতে বলেন না, সমাজত্যাগী কৃচ্ছ্রসাধক তপস্বী হতেও বলেন না। তাঁর আদর্শ রাজর্ষি জনক। যিনি উপযুক্ত অধিকারী তিনি সমাজে থেকে নিজ স্বভাব অনুযায়ী সমাজধর্ম পালন করেও এই সাধনা করতে পারেন। মানুষ কর্ম না করে থাকতে পারে না, সেজন্য গীতাকার কর্মপ্রবৃত্তি রুদ্ধ না করে সমস্ত চেষ্টা দ্বারা সাধনার অঙ্গ করতে বলেছেন। এরই নাম কর্মযোগ, যা গীতোক্ত সাধনার প্রধান উপায়। সাধারণ মানুষ কেবল আপনার বা স্বজনের হিতার্থে কর্ম করে। কর্মযোগী সর্বভূতের সহিত একাত্ম হয়ে নিষ্কামভাবে সর্বভূতের হিতার্থে কর্ম করে স্বভাবজ নিজ কর্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। এই কর্মযোগচর্চার ফলে তাঁর সাধনার অন্যান্য অঙ্গও (জ্ঞান, ভক্তি) উৎকর্ষলাভ করে। গীতাকারের মতে কর্মবিহীন হয়ে কেবল জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ কঠিন। ভক্তিকেও তিনি উচ্চস্থান দিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞানই সাধনার উচ্চতম সোপান, 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' (৪।৩৩), সমস্ত কর্ম জ্ঞানেতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং ভক্তির পরেও বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয়, 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্, দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে' (১০।১০), যাঁরা সতত যোগযুক্ত প্রীতিপূর্বক ভজমান তাঁদের আমি এ প্রকার বুদ্ধিযোগ দিই, যাতে তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন।

কিন্তু গীতা সর্বসাধারণের জন্য রচিত হয়নি। 'ইদং তে নাতপস্কায়

শিল্পী : যামিনী রায়

নাহভক্তায় কদাচন, ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি' (১৮।৬৭) এই গীতোক্ত ধর্ম তোমার কদাচ তপস্যা-হীনকে বক্তব্য নয়, অভক্তকে নয়, অশ্রবণেচ্ছুকে নয়, যে আমাকে অসূয়া করে তাকেও নয়। কাম্য কর্মে আসক্ত বিষয়সেবী অজ্ঞলোকের বুদ্ধিভেদ করতে গীতাকার নিষেধ করেছেন, 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসংগিনাম্' (৩।২৬), ফললোভে কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিজনের বুদ্ধিভেদ জন্মাবে না। গীতার উপদেশ—জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ আচরণ দ্বারা সামাজিক আদর্শ রক্ষা করবেন, যাতে জনসাধারণ একটা সুনির্দিষ্ট বিধিবন্ধ সুগম মার্গ অনুসরণ করতে পারে। বিষয়াসক্ত অজ্ঞলোকের বুদ্ধিভেদ করলে কুতার্কিক সমাজদ্রোহীর উদ্ভব হবে এই আশংকা গীতাকারের ছিল। বর্তমানকালে গীতা সম্বন্ধে এই সতর্কতা অবলম্বন করা অসম্ভব, কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, আপামরসাধারণকে গীতা মুখস্থ করিয়ে কোনও লাভ নেই।

তৎকালপ্রচলিত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর গীতাকারের শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু নিম্ন অধিকারীর পক্ষে এ সকল কর্ম তিনি হিতকর বলেই মনে করেন। শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও যজ্ঞাদি, অনুষ্ঠান বর্জনীয় বলা হয়নি, কারণ তাতে ইতর সাধারণের আদর্শ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।

গীতায় শান্ত সহিষ্ণু মৃদু অহিংস হবার বহু উপদেশ আছে, কিন্তু ক্লীবের তুল্য পীড়ন সইতেও নিষেধ আছে। দুষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই গীতার উপলক্ষ্য। 'তস্মাৎ যুদ্ধায় যুযাস্ব'—এই বাক্য বহুস্থলে গীতাধর্ম বিবৃতির সহিত জড়িত আছে। বিশ্বরূপ বর্ণনায় ব্রহ্মের ভয়াবহ সংহারমূর্তিই প্রকটিত হয়েছে। গীতাধর্ম শৌর্য-বীর্যাদি পুরুষোচিত গুণের এবং সমাজ রক্ষার্থ নিষ্ঠুরতারও পরিপন্থী নয়।

গীতায় বহু প্রসংগ আছে যা অনেক আধুনিক পাঠকের ধারণার বিরোধী। জন্মান্তরবাদ, দেহ থেকে উৎক্রান্ত সূক্ষ্ম-শরীর (১৫।৮), দেবযান পিতৃযান (৯।২৫) প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব, এমন কি তাঁর ঐতিহাসিকত্ব অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হতে পারে। গীতার অনেক অংশ দুর্বোধ, ভাষাটীকাকারগণের ব্যাখ্যাও বহুস্থলে বিভিন্ন। কিন্তু সমস্ত অস্পষ্ট ও বিসংবাদী বিষয় বাদ দিলেও যা থাকে তা অতুলনীয়। বহু পূর্বে বহু প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে রচিত হলেও গীতায় সর্বকালের উপযোগী শ্রেষ্ঠ সাধনাপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

বরং জেনো

বিষ্ণু দে

হয়তো ঠিক তোমারই কথা, তুচ্ছতার গ্লান
যখন চাপে গোটা দেশের মুখ—এবং মনও,
তখন বুঝি ভরসা শুধু লক্ষ্মী কল্যাণী
অথবা নানা রকম ফেরে উর্বশীই কোনো,
তখন বুঝি নাট্য শুধু চা বা ফুলদানিই,
তুফানে ঠেলে ঘরেই সারা সাগরমন্থনও।

কিন্তু তুমি জানো কি কেন সন্দ্বীপের চরে
আত্মঘাতী শূন্যে সব মক্ষিরাণী খুঁজি?
হাজা এদেশে বাঁজা সমাজে খঞ্জপরিসরে
হৃদয় দিয়ে হৃদয় নিয়ে বাড়াতে চাই পুঁজি?
হয়তো ভুলে সতীকে ফেলে দিকদিগন্তরে
সহজিয়ার সভ্য লোভে খুঁজেছি গলিঘুঁজি।

তাই ব'লে কি তাতানো ঝড়ে করব মাতামাতি
সংস্কৃতি মাথায় ক'রে স্বাধীনতার চেলা,
কিংবা দশভুজাকে খুঁজে শ্মশানে পাঁতিপাঁতি
ঘুরব? নাকি কাঠের হাতে করব হাতাহাতি?
ইতিহাসের ফাঁক কখনও ভরাট করে ঢেলা?
বরং জেনো হে মঞ্জরী, একটি মুখে মেলা

আদি-অন্তব্যাপী গভীর আবেগ পায় বাণী,
মূর্তি পায়, সত্তা পায়। তাই তো প্রাণ, মনও
নৈতির প্রেমে প্রতীক সাধে, জীবনপণ খেলা॥

*

স্বল্প প্রাণের গল্প

গোপাল ভৌমিক

স্বল্প প্রাণের গল্প বলতে গিয়ে
রইলো সলতে, টান ধরে গেল ঘিয়ে।
তাইতো পেলে না উজ্জ্বল আলো,
পোড়া পলতের কালিমা মিশালো
যে আঁধারে ছিলে সে আঁধারে ভয়াবহ;
ব্যর্থতা-গ্লানি তাই বই অহরহ।

শত শতাব্দী পরেও পৃথিবী জুড়ে
অনেক আঁধারে দেখি মরে মাথা খুঁড়ে।
দূর করি তাকে এমন সাধ্য কই?
কি আছে আমারি প্রাণের প্রদীপ বই।
কালিঝুলি মাথা সেই শিখাটিকে ঘিরে
স্বল্প প্রাণের গল্পই আসে ফিরে।

*

রঙ্গমঞ্চে

রাম বসু

চাই না নিষ্ফল সজ্জা
নীহারিকা বলয়িত আমি
রঙ্গমঞ্চে স্থির
করপুটে ধুলো, অভিজ্ঞান
জীবনের গ্লানি ও গৌরব।

বিয়োগান্ত নাটকের দৃশ্য শেষ হল
ফিরে গেছে বিমূঢ় দর্শক
সামনে আকীর্ণ শূন্য
সাজঘরে ক্লান্ত কুশীলব।
থামাও বেহালা
মুখ থেকে সরাও আলোক
রাখালের শিঙা, স্মৃতি
পাহাড়ে অরণ্যে ঘুরে ঝরে যাবে শেষে।

যা আমি এবার তাই হতে চাই
পরিপূর্ণ ফল, পাখী, জল
এবং সৌরভ, ক্ষমা শুশ্রূষা আঁধারে।

নিসর্গ রক্তের নীচে
প্রেমিকার শরীরের মত
বিকশিত অপরিমেয়তা
প্রোথিত প্রাচীন স্থির বৃক্ষ-ইব আমি
চেতনার পারে, ঐক্যে, মৃদু ও দুর্জ্ঞেয় আলোড়নে
নির্জনে পুষ্পিত হবো ঈশ্বরের মুখের মতন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে
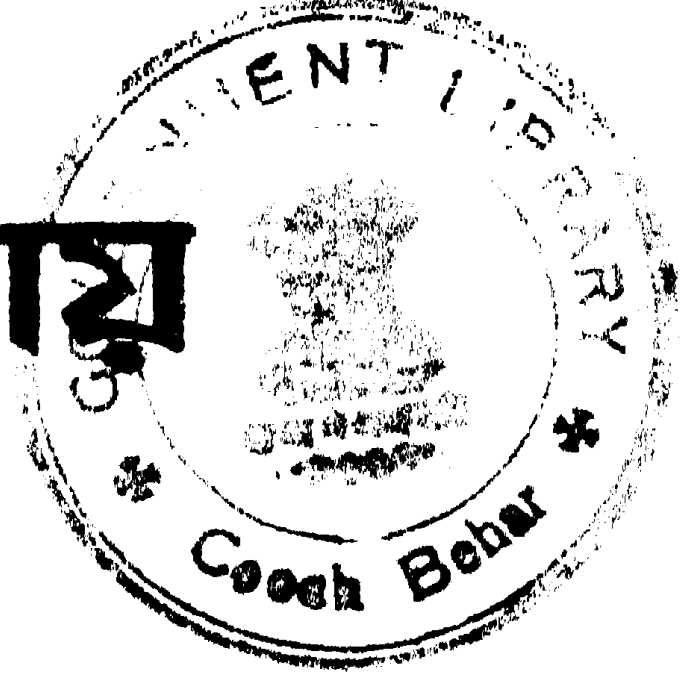
অন্নদাশঙ্কর রায়

এই যে বাংলা টাইপরাইটার, যাতে এই মুহূর্তে লিখছি, এটি চারু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কিনতে বলেছিলেন। কেমন করে এতে টাইপ করতে হয় দেখিয়েও দিয়েছিলেন।

তখন আমি ঢাকায়। আটাশ বছর আগেকার কথা। চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। সেই প্রথম দেখি বাংলা টাইপরাইটারে লেখা ফুলস্ক্যাপ কাগজের পৃষ্ঠা। গল্প না উপন্যাস ঠিক মনে নেই। আরম্ভটা বোধহয় ছোট একটি বাক্য। "নলিনীবালা মিত্র।" চারুবাবু লিখতেন বেগুনী রঙের রিবনে। দেখতে সুন্দর। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটিয়ে দেখি কোথাও কাটাকুটি নেই। পরিপাটি পাণ্ডুলিপি। আমি তো মুগ্ধ।

চারুবাবুর হাতের লেখাটিও ছিল পরিপাটি ও সুন্দর। কেন তিনি হাতে না লিখে টাইপ করতে যান? এর উত্তরে তিনি বলেন, 'রাইটার্স ক্র্যাম্প জানেন তো। হাতে লিখতে কষ্ট হয়। উপায়ান্তর না দেখে টাইপরাইটার কিনি।"

টাইপরাইটারের একটি সুবিধে সঙ্গে সঙ্গে নকল তৈরি হয়ে যায়। পরে আবার নকল করতে হয় না। সময় বাঁচে। আমার হাতে ক্র্যাম্প ছিল না, কিন্তু সময়ও ছিল না। টলস্টয়ের মতো স্ত্রীকে বলতে পারিনে নকল করতে। আর কাউকে দিয়ে নকল করালে সেটা নিখরচায় হবে না। খরচ যদি করতেই হয় টাইপরাইটার কিনলেই বা ক্ষতি কী?

চারুবাবু আমার আগ্রহ দেখে টাইপরাইটারের এজেন্টকে খবর দেন। আমিও তাঁর মতো টাইপরাইটার ধরি। কিন্তু এর ব্যবহারের কতকগুলো কৌশল আছে। তিনি সেগুলো আমাকে শিখিয়ে না দিলে টাইপের কাজ বিশ্রী দেখাত।

ঢাকায় আমাদের একটা আড্ডা ছিল। তার নাম "বারো জনা"। নামকরণটা আমার। বারো জনের বেশী সভ্য নেওয়া হতো না। যাঁদের নাম বাদ পড়ে গেল তাঁদের স্বতন্ত্রভাবে নিমন্ত্রণ করা হতো। যেমন করা হয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে। গোড়া থেকেই বারোর বদলে বিশ কি ত্রিশ নিলে মন্দ হতো না বোধ হয়। কিন্তু যাঁরা এর স্থাপয়িতা তাঁরা সভাসংখ্যা বাড়াতে দেবেন না বলে বদ্ধপরিকর। সভ্য বাছাইও তাঁরাই করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চারুবাবু। বারো মাসে বারো জনের বাড়ীতে সমাবেশ। প্রথম সমাবেশ যতদূর মনে পড়ে চারুবাবুকে ঘিরে, কিন্তু তাঁর ওখানে নয়। তিনি পাঠ করে শোনান ময়মনসিংহ গীতিকা। ব্যাখ্যাও করেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা হয় তাই নিয়ে। প্রত্যেক বৈঠকে একটিমাত্র বিষয়, একজনমাত্র মূল বক্তা বা সূত্রধার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবার আগে চারুবাবু ছিলেন "প্রবাসী"র সহকারী সম্পাদক। সেই ভাবেই তিনি ছিলেন সর্বজন পরিচিত। ছেলেবেলায় আমি টলস্টয়ের একটি গল্প অনুবাদ করে "প্রবাসী"তে পাঠাই। সাহিত্যে সেই আমার হাতেখড়ি। দিন কয়েকের মধ্যে উত্তর এলো। পোস্টকার্ডের পিঠে পরিচ্ছন্ন কয়েক লাইন। লেখা মঞ্জুর। ছাপা হবে। উত্তর যিনি দিয়েছেন তাঁর নাম এক কথায় "চারু"।

আমি তো পরম আপ্যায়িত। ভদ্রলোক কি মনে করেছেন আমি তাঁর সমবয়সী বা বয়োজ্যেষ্ঠ? তখনো আমি স্কুলের ছাত্র। রচনাটা সত্যি সত্যি পরের মাসের "প্রবাসী"তে বেরিয়ে গেল। ছাপার হরফে নিজের নাম দেখা সেই প্রথম। তাও "প্রবাসী"র মতো বনেদী মাসিকপত্রে। আর কি মাটিতে পা পড়ে? আমি তখন সপ্তম স্বর্গে। তাড়াতাড়ি টলস্টয়ের আর একটি গল্পের অনুবাদ করে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু সেটি—হায়! বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে—অবিলম্বে ফেরত আসে।

চারুবাবুর উপর কেমন করে খুশী হই? আর অমন কর্ম করিনে। অর্থাৎ পরের গল্পের অনুবাদ। নিজেকে আবিষ্কার করতে আমার অনেক দিন লাগল। আরো বড় হয়ে একদিন সাহস করে "প্রবাসী" আপিসে হাজির হই। বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখি চারুবাবু কাজ করছেন। কে একজন একখানা ছবি এনেছেন প্রকাশের জন্যে। সেই ছবির উপরেই তাঁর দৃষ্টি। ততক্ষণে আমার সাহসের টেম্পারেচার নেমে নর্মালের চেয়েও কম হয়েছিল। আমি বিনা বাক্যে পলায়ন করি।

তার পরে চারুবাবুর সঙ্গে আমার আর কোনো সংস্রব ছিল না। "প্রবাসী"তে লেখা মাঝে মাঝে গেছে, কখনো ফিরে এসেছে, কখনো ছাপা হয়েছে। একবার তো "বিবিধ প্রসঙ্গে"র ঠিক পরেই। তখনো আমি কলেজে। কিন্তু চারুবাবুর হস্তলিপি আর পাইনি। ঢাকায় যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তিনি এই পূর্ব ইতিহাস জানতেন না। পরিচয়টা নতুন করেই হলো।

ছেলেবেলা থেকে তাঁর লেখার আমি একজন পক্ষপাতী পাঠক। পুরোনো "প্রবাসী"র স্তূপ ছিল আমার স্কুলের হেড মাস্টার মশায়ের বাড়ী। সেখান থেকে পড়তে নিয়ে আসতুম। তাতেই পড়ি "বায়ু বহে পূরবৈয়া।" মনে রাখবার মতো গল্প। "ভারতী" নেওয়া হতো আমাদের স্কুলে। তাতে পড়ি "স্রোতের ফুল" উপন্যাস। তার পরে "প্রবাসী"তে "পরগাছা" ও "দুই তারা"। এমনি আরো অনেক গল্প, আরো অনেক উপন্যাস। তা

ছাড়া তাঁর প্রবন্ধ। বাড়ীর জন্যে তাঁর বইও আমার কথায় কেনা হয়। এখনো মনে আছে "ঘেন্না" কেমন করে "ঘিনু" হলো। যদিও কেটে গেছে একচল্লিশ বছর।

ঢাকায় চারুবাবুর বাড়ী আরো দু'একবার গেছি। বেশী দিন তো ছিলুম না। আট মাস কি ন' মাস। চারুবাবুকে দেখতুম অতিশয় ক্লান্ত। বলতেন আর পারছেন না। একসঙ্গে পায়চারি করেছি। থাকতেন তিনি ঢাকা হলে না জগন্নাথ হলে, ঠিক মনে পড়ছে না। পায়চারি করেছি তাঁরই কম্পাউণ্ডে।

চারুবাবু ছিলেন রসিক ব্যক্তি। একবার কী একটা উপলক্ষে বলেন, "আমার নাম চারু। ওই যে, কথায় বলে চারুটি।"

চারুবাবুর সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তার নোট রাখিনি। বিচ্ছিন্ন ভাবে টুকরো টাকরা মনে পড়ে। প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কথা বলতেন। একবার তিনি লেখার জন্যে কবির সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথের সদ্য স্বজনবিয়োগ হয়েছে। সে অবস্থায় লেখা চাইতে যাওয়া অন্যায়। চারুবাবু জানতেন না। দেখেন রবীন্দ্রনাথের মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ। শুনলেন। শুনে পাথর হয়ে গেলেন। লেখা না নিয়ে উঠে যাচ্ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শুধু হাতে ফিরে যেতে দিলেন না। লেখা তৈরি করে দিলেন। অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও স্থৈর্য। কবি বললেন তাঁর শোক তাঁর একার। পাঠকরা কেন ভুক্তভোগী হবে। ধারাবাহিক উপন্যাসের কিস্তির খেলাপ তিনি করবেন না। সম্পাদকের সঙ্গে শর্ত রক্ষা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ চারুবাবুকে কয়েকটি গল্পের ও উপন্যাসের প্লট দিয়েছিলেন নিজের জন্যে না রেখে। একবার তিনি নাকি চারুবাবুকে বলেন, "দ্যাখ হে, হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে আমি এত কম জানি যে, খুঁটিনাটির ভুল হয়ে যায়। সাহস পাইনে লিখতে। অতি সাবধানে লিখি। উপন্যাস বা গল্প লেখা যে আমার পক্ষে কী পরিমাণ কষ্টের তা কেমন করে বোঝাব। তোমাদের পক্ষে তেমন নয়।"

চারুবাবুর সৌজন্য ও স্নিগ্ধতা কখনো ভুলব না। বয়সের ব্যবধান প্রায় সাতাশ বছর। অন্তরঙ্গতার সুযোগ ছিল না। আন্দাজ করতুম যে তাঁর কি একটা দুঃখ আছে। লোকে বলত সেটা আর কিছু নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপকদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কিন্তু আমার মনে হতো সেটা আরো অনেক গভীর। এবং আরো পুরাতন। ঢাকায় তাঁর একদল গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁরা বলতেন "আচ্ছা, আপনিই বলুন, চারুবাবুর সঙ্গে কি অমুক বাবুর তুলনা হয়।" অপর পক্ষের মুখেও সেই একই কথা। "অমুক বাবুর সঙ্গে কি চারুবাবুর তুলনা হয়।" চারুবাবু লড়তে নারাজ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষপাতীরা তাঁর হয়ে লড়তে পেছপাও ছিলেন না। সাহিত্যে আমি তাঁর পক্ষপাতী, অপর ক্ষেত্রে আমি নিরপেক্ষ থাকি।

আমার ঢাকা থেকে চলে আসার পর চারুবাবুর সঙ্গে আর যোগাযোগ ছিল না। বছর পাঁচেকের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। শুনে দুঃখিত হই। কিন্তু বিস্মিত হইনে। তিনি যে প্রায়ই বলতেন তিনি ক্লান্ত। বড় ক্লান্ত। ক্লান্তির লক্ষণও দেখেছি যে।

এই বিদগ্ধ সুজনের "শ্রেষ্ঠ গল্প" সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল। সেই বিখ্যাত গল্প "বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ" আছে এতে। "চুড়িওয়ালা"ও আছে। এটিও আমার প্রিয়। আরো অনেকগুলি গল্প আছে। আগে পড়িনি। চারুবাবুর উপন্যাসের হাতের চেয়ে গল্পের হাতই ছিল পাকা। উপন্যাসের চেয়ে গল্পই উত্তীর্ণ হয়েছে রসলোকে। তা বলে উপন্যাসের চিত্তাকর্ষিতা কম নয়। মানুষটিকে আমরা উভয়েই পাই। মানুষটি একান্তই মানুষ। মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন। মানুষ তাঁকে ভালোবাসত। উদার, দরদী, মহৎ লেখক ছিলেন চারুবাবু। মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে। একজন তাঁকে ভোলেনি।

একটা ক্ষমতা আছে, সে 'জানি না' বলিয়া অনেক কথা জানাইয়া দিতে পারে।

ব্যোমকেশ সিগারেটের দগ্ধাংশ জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এঁরা তাস খেলার সময় ছাড়াও অন্য সময়ে আসতেন কি?'

মোহিনী কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'একজন আসতেন। কর্তাবাবু সকালবেলা আপিস চলে যাবার পর আসতেন।'

'কে তিনি?'

'নাম জানি না বাবু। কালো মোটা গতন চেহারা, খুব ছেঁদো কথা বলতে পারেন।'

বরাট অকুণ্ঠস্বরে বলিলেন, 'অরবিন্দ হালদার।'

ব্যোমকেশ মোহিনীকে বলিল, তাহলে তোমার সঙ্গেই তিনি দেখা করতে আসতেন?'

মোহিনী কেবল ঘাড় নাড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'কোনো প্রস্তাব করেছিলেন?'

মোহিনীর দৃষ্টি হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল, সে তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল,—সোনার আংটি দিতে এসেছিলেন, সিল্কের শাড়ী দিতে এসেছিলেন।'

'তুমি নিয়েছিলে?'

'না। আমার ইজ্জৎ অত সস্তা নয়।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাহাকে নির্বিষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করিল, তারপর বলিল,—আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। পরে যদি দরকার হয় আবার সওয়াল করব।—তুমি উড়িষ্যার মেয়ে, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলতে পারো দেখছি।'

মোহিনীর সুর এবার নরম হইল। সে বলিল,—'বাবু আমি ছেলেবেলা থেকে বাঙালীর বাড়িতে কাজ করেছি।'

।। ঘ ।।

ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিলাম, মোহিনী বর্ণিত ছেলেমানুষ এবং ভালমানুষ লোকটি অবশ্য ফণীশ। অন্য তিন জনের মধ্যে অরবিন্দ হালদার একজন কাটা লম্পট। আর বাকি দুজন? বোধ হয় অতটা বেহায়া নয়, কিন্তু মনে লোভ আছে; ডুবিয়া ডুবিয়া জল পান করেন। মোহিনী বলিয়াছিল তাহার ইজ্জৎ অত সস্তা নয়। তাহার ইজ্জতের দাম কত? রূপযৌবনের অনুপাতেই কি ইজ্জতের দাম বাড়ে এবং কমে? কিংবা অন্য কোনও নিরিখ আছে? এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই দিতে পারেন।

থানার সামনে বরাট নামিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'ওবেলা আবার আসব। সিভিল সার্জন—যিনি অটপ্সি করেছেন—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

বরাট বলিলেন,—'আসবেন। আমি সিভিল সার্জনের সঙ্গে সময় ঠিক করে রাখব। পি এম রিপোর্ট অবশ্য তৈরি আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,— 'পি এম রিপোর্টও দেখব।'

বরাট বলিলেন—'আচ্ছা। চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখব।'

বাড়ি ফিরিলাম তখন বারোটা বাজিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে মণীশবাবুরা ফিরিলো। মণীশবাবু ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলে সে বলিল,—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যা করবার আমি করছি। পুলিসের সঙ্গে দেখা করেছি। একটা ব্যবস্থা হয়েছে, পরে আপনাকে সব জানাবো।'

মণীশবাবু সন্তুষ্ট হইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। ফণীশ উৎসুক ভাবে আমাদের আশেপাশে ঘুর ঘুর করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—'তুমিও নিশ্চিন্ত থাকো, কাজ খানিকটা এগিয়েছে। বিকেলে আবার বেরুব।'

বেলা তিনটার সময় পিতাপুত্র আবার কাজে বাহির হইলেন। আমরা সুরপতি ঘটকের দপ্তরে গেলাম। সুরপতিবাবু আমাদের অফিস-ঘরে বসাইয়া কয়লাখনি চালানো সম্বন্ধে নানা তথ্য শুনাইতে লাগিলেন। তারপর দ্বারদেশে দুইটি যুবকের আবির্ভাব ঘটিল। খদ্দর-পরা শান্তশিষ্ট চেহারা, মুখে বুদ্ধিমত্তার সহিত বিনীত ভাব। সুরপতিবাবু বলিলেন,—'এই যে তোমরা এসেছ! গগনবাবু, এদেরই কথা আপনাকে বলেছিলাম। ওরা দুই ভাই, নাম বিশ্বনাথ আর জগন্নাথ। ওদের আমি নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছি। বয়স কম বটে কিন্তু কাজকর্মে একেবারে পোক্ত।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ বেশ। এখানকার কাজ ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে আপনাদের আপত্তি নেই তো?'

বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ মাথা নাড়িয়া জানাইল, আপত্তি নাই। সুরপতিবাবু বলিলেন,—'ওদের দুজনকে কিন্তু একসঙ্গে ছাড়তে পারব না, তাহলে আমার কাজের ক্ষতি হবে। ওদের মধ্যে একজনকে আপনারা নিন, যাকে আপনাদের পছন্দ।'

'তাই সই' বলিয়া ব্যোমকেশ পকেট হইতে নোট-বুক বাহির করিয়া দুজনের নাম-ধাম লিখিয়া লইল, বলিল—'যথাসময় আমি আপনাকে চিঠি দেব।'

বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ সুরপতিবাবুকে বলিল,—'দুজনকেই আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি যাকে দিতে চান তাকেই নেব।'

সুরপতিবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'ওরা দুই ভাই সমান কাজের লোক, আপনারা যাকেই নিন ঠকবেন না।'

চারটে বাজিতে আর দেরী নাই দেখিয়া আমরা উঠিলাম।

বরাট আফিসে ছিলেন, বলিলেন,—'সিভিল সার্জন সাড়ে চারটের সময় দেখা করবেন। এই নিন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট।'

ব্যোমকেশ রিপোর্টে চোখ বুলাইয়া ফেরৎ দিল। তারপর আমরা হাসপাতালের দিকে রওনা হইলাম। সিভিল সার্জন মহাশয়ের অফিস হাসপাতালে।

সিভিল সার্জন বিরাজমোহন ঘোষাল অফিসে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন। বয়স্থ ব্যক্তি, স্থূল গৌরবর্ণ সুদর্শন চেহারা, আমাদের দেখিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—'আপনার আসল নাম আমি জেনে ফেলেছি ব্যোমকেশবাবু। ইন্সপেক্টর বরাট ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধাপ্পা টিকল না।' বলিয়া আবার অট্টহাস্য করিলেন।

ব্যোমকেশ বিনীত ভাবে বলিল,—'বে-কায়দায় পড়ে পঞ্চ পান্ডবকে ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিল, আমি তো সামান্য লোক। একটা গোপনীয় কাজে এখানে এসেছি তাই গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে।'

'ভয় নেই, আমার পেট থেকে কথা বেরুবে না। বসুন।'

কিছুক্ষণ সাধারণ ভাবে আলাপ-আলোচনা হাস্য পরিহাস চলিল। ডাক্তার

ঘোষাল আনন্দময় পুরুষ, সারা জীবন মড়া ঘাঁটিয়াও তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত অট্টহাস্য প্রশমিত হয় নাই।

অবশেষে কাজের কথা আরম্ভ হইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'প্রাণহরি পোদ্দারের পোস্ট্ মর্টম্ রিপোর্ট আমি দেখেছি। আপনার মুখে অতিরিক্ত কিছু শুনতে চাই। লোকটী বুড়ো হয়েছিল, রোগা-পটকা ছিল, তার দৈহিক শক্তি কি কিছুই অবশিষ্ট ছিল না?'

বিরাজবাবু বলিলেন,—'দৈহিক শক্তি—?'

'মানে—যৌবন। পুরুষের যৌবন অনেক বয়স পর্যন্ত থাকতে পারে; একশো বছর বয়সে ছেলের বাপ হয়েছে এমন নজিরও পাওয়া যায়। প্রাণহরি পোদ্দারের দেহ-যন্ত্রটা সেদিক দিয়ে কি সক্ষম ছিল?'

বিরাজবাবু আবার অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন—'ও—এই কথা জানতে চান? তা ডাক্তারের কাছে এত লজ্জা কিসের? না, প্রাণহরি পোদ্দারের শরীরে রস-কষ কিছু ছিল না, একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং।' দুবার গড়গড়ায় টান দিয়া বলিলেন—'আমি লক্ষ্য করেছি যারা রাতদিন টাকার ভাবনা ভাবে তাদের ওসব বেশী দিন থাকে না। প্রাণহরি পোদ্দার তো সুদখোর মহাজন ছিল।'

দাঁড়ার দিক দিয়ে যদি সজোরে মাথায় মারা যায় তাহলে ওই ভাবে খুলির হাড় ভাঙতে পারে।'

'রান্না ঘরের হাতা বেড়ি খুন্তি—?'

'না, তার চেয়ে ভারী জিনিস।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'অস্ত্রটাই ভাবিয়ে তুলেছে। যাদের ওপর সন্দেহ তারা দা-কাটারি জাতীয় অস্ত্র

'অতঃপর? বাকি তিনজন আসামীকে দর্শন করতে চান?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'চাই বৈকি। এখন তাদের বাড়িতে পাওয়া যাবে?'

বরাট বলিলেন,—'না, এসময় তারা খেলা-ধুলো করতে ক্লাবে আসে।'

'তাহলে এখন থাক। আপনার সঙ্গে ক্লাবে গেলে শিকার ভড়কে যাবে। ভাল কথা, পোদ্দারের হিসেবের খাতাটা দিতে

মনে হইল ব্যোমকেশ একটু নিরাশ হইয়াছে। ক্ষণেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া সে বলিল,—'আচ্ছা ওকথা যাক। এখন মারণাস্ত্রের কথা বলুন। খুলির ওপর ওই একটা চোট্ ছাড়া আর কোথাও আঘাতের দাগ ছিল না?'

'না।'

'এক আঘাতেই মৃত্যু ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'অস্ত্রটা কী ধরণের ছিল?'

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ গড়গড়া টানিলেন—'কী রকম অস্ত্র ছিল বলা শক্ত। অস্ত্রটা লম্বা গোছের, লম্বা এবং ভারী। কাটারির মতন ধারালো নয়, আবার পুলিসের রুলের মতন ভোঁতাও নয়—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ইলেকট্রিক টর্চ হতে পারে কি?'

'ইলেকট্রিক টর্চ!' বিরাজবাবু মাথা নাড়িলেন,—'না, তাতে এমন পরিষ্কার কাটা দাগ হবে না। এই ধরুন, কাটারির ফলার উল্টো পিঠ দিয়ে, অর্থাৎ শির-

নিয়ে খুন করতে গিয়েছিল ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে একেবারে অসম্ভব নয়। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আততায়ী সামনের দিক থেকে অস্ত্র চালিয়েছিল, না পিছনদিক থেকে?'

বিরাজবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—'সামনের দিক থেকে। কপাল থেকে মাথার মাঝখান পর্যন্ত হাড় ভেঙেছে, পিছন দিকের হাড় ভাঙেনি।'

'পিছন দিক থেকে মারা একেবারেই সম্ভব নয়?'

বিরাজবাবু ভাবিয়া বলিলেন,—'পোদ্দার যদি চেয়ারে বসে থাকত তাহলে ওভাবে মারা সম্ভব হত, দাঁড়িয়ে থাকলে সম্ভব নয়। তবে যদি আততায়ী দশ ফুট লম্বা হয়—'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল—'দশ ফুট দৈর্ঘ্যমার লোক এখানে থাকলে নজরে পড়ত। আচ্ছা, আজ চলি। নমস্কার।'

থানায় ফিরিয়া বরাট বলিলেন,—

পারেন? ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে চাই, যদি কিছু পাওয়া যায়।'

'অফিসেই আছে, নিয়ে যান। আর কিছু?'

'আর—একটা কাজ করলে ভাল হয়। প্রাণহরি পোদ্দারের অতীত সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। বছর দেড়েক আগে বুড়ো কটকে ছিল। কটকের পুলিস-দপ্তর থেকে কিছু খবর পাওয়া যায় না-কি?'

বরাট বলিলেন—'কটকের পুলিস-দপ্তরে খোঁজ নিয়েছিলাম, প্রাণহরি পোদ্দারের পুলিস-রেকর্ড নেই। তবে তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে যদি জানতে চান, আমার একজন চেনা অফিসার কয়েক বছর কটকে আছেন—ইন্সপেক্টর পট্টনায়ক। তাঁকে লিখতে পারি।'

'তাই করুন। ইন্সপেক্টর পট্টনায়ককে টেলিগ্রাম করে দিন, যত শীগ্‌গির খবর পাওয়া যায়। আজ উঠলাম, কাল সকালেই আবার আসছি।'

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা

ক্ষিতীশ রায়

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পূর্তির উৎসবে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা প্রসংগ উত্থাপনের একটি মহৎ সার্থকতা আছে। কবির মধ্যে যে-সৃজনশক্তি তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে জীবনের সমস্ত ঘটনাকে ঐকতান, তাৎপর্যদান করেছে, যে-শক্তি তাঁর রূপ-রূপান্তরের জন্ম-জন্মান্তরকে একটি সূত্রে গেঁথে রেখেছে, যার মধ্যে দিয়ে তিনি বিশ্বচরাচরের সংগে ঐক্য অনুভব করেছেন, তাকেই তিনি নাম দিয়েছিলেন জীবনদেবতা। এই যে বিশ্বানুভূঃ চিন্ময় সত্তা যা আজ বিশ্বদেবতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তার তো ক্ষয় নেই শেষ নেই, সে জ্যোতি-শিখা তো নিবতে পারে না। তাই আজকে মরণসাগরপারে কবিজীবনের যে অমর অধিষ্ঠাতা বিরাজ করছেন, তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করার দিন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে তাঁর জীবনকে তিনি একটা অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে রচনা করেছেন তিনিই হলেন জীবনদেবতা। বস্তুত রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রজীবন দর্শনের মূল ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবটুকু এই জীবনদেবতা-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জীবন-বোধ কবির কবিজীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তি অবধি একটি অখণ্ড অনির্বাণ প্রেরণারূপে কাজ করেছে। তাঁর সৃষ্টিকে যদি খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখতে যাই তাহলে বহুধা বিচিত্র রচনার শাখা উপশাখায় আমরা খেই হারিয়ে ফেলি, মূল ধারাটিকে অনুসরণ করতে পারিনে। তাঁর সকল প্রকাশের মধ্যে এই প্রকাশ-স্বরূপ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, এ-কথা যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে জীবনদেবতা কবিজীবনের একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হওয়া বিচিত্র নয়। তাতে উপলব্ধির বিষয় সমালোচনার খণ্ডদৃষ্টির বিচারে খণ্ডিত হয়ে পড়ে।

আমাদের ধারণা কবিজীবনের প্রধানতম ঘটনা বলে স্বীকৃত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় রবীন্দ্রকাব্যস্রোত তার স্বকীয় ধারায় সর্বপ্রথম প্রবাহিত। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবনদেবতা-বোধের আদি সূচনা। পাতার আড়ালে সূর্যোদয়ের প্রথম আলো দেখতে দেখতে তাঁর চোখের উপর থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। "দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরংগিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।" জগতের তুচ্ছতার আবরণ ঘুচে গিয়ে সত্য স্বপ্রকাশ সৌন্দর্যে দেখা দিল, অন্তরে ও বাহিরে সমন্বয়ে জীবনদেবতা-বোধের প্রতিষ্ঠা হল অপ্রত্যক্ষ আভাসে রবীন্দ্রনাথের কিশোর জীবনে।

প্রভাত সংগীতে এই যে তাঁর কবি-জীবন সম্বন্ধে সচেতনতার প্রথম উন্মেষ, এই যে জীবনদেবতার সংস্পর্শ, এর প্রকাশ হয়েছে পর্বে পর্বে, পর্যায়ে পর্যায়ে, কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, চিঠিতে, গানে এবং সর্বোপরি তাঁর জীবন-সাধনায়। জীবনদেবতা কবির জীবন-রচনার জীবনকাব্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের মহৎ সত্য এই যে, তাঁর বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি একে সমগ্রতার ভিতর দিয়ে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। কেবলমাত্র উপলব্ধির ভাষায় এর বাণীরূপ রচনা করার জন্য একটু চেষ্টা করা চলে। আনন্দের বিষয় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর কয়েকটি লেখায় আত্ম-বিশ্লেষণ প্রসংগে তাঁর জীবনদেবতার কথা বলে গেছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে এসব লেখার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কাব্যগ্রন্থের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়ক মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত একখানি চিঠি। চিঠিখানি এই:

"আমার নিগূঢ়তার মধ্যে যে একটি বৃহৎ অতি পুরাতন 'আমি' আছে—যে বিশেষ রূপে আমার জীবনের দেবতা—যাহার গভীর গোপন আবির্ভাবের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে দেবতাত্মা—যে অতি-জগতে বাস করিয়া আমাকে জগতে সঞ্চালন করিতেছে নানা সুখদুঃখ অনুকূলতার প্রতিকূলতার ভিতর আমাকে সার্থক করিয়া সার্থকতা লাভ করিবার জন্য যাহার অহরহ চেষ্টা—যে আমার মধ্যে কখনো বিফল কখনো সফল হইয়াও এক মুহূর্ত আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না—যাহার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের সহিত আমার যোগ, ঈশ্বরের শান্তি আদেশ ও আনন্দ যে আমার মধ্যে আনয়ন ও সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমার পাপকে দহন করিয়া আমার পুণ্যকে উজ্জ্বল করিবার জন্য যাহার অজস্র প্রয়াস, আমাকে গড়িয়া তুলিয়া যে সম্পূর্ণতা লাভ করিবে—যাহার শক্তিতে আমি সংসারের মধ্যে অগ্রসর এবং আমার মঙ্গলভাবেই যাহার বলবৃদ্ধি—যে আমার বাহ্যচেতনার অন্তরালে অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া গৃহিণীর ন্যায় আপন সমস্ত ভাণ্ডারে ক্রমাগতই গৃহসজ্জা করিতেছে তাহার সহিত প্রেমের আনন্দে যুক্ত হইয়া পরস্পরায় সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই অতিজগতের সহিত জগতের নিত্যপ্রেমের সম্বন্ধ আপনার মধ্যেই বুঝিতে পারিব—ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে কোনো অবস্থাতেই বর্জিত হইয়া থাকিবেন না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার সহিত আমাদের মিলন সাধনের চেষ্টা করিতেছে—নানা ঘটনা নানা সুখ-দুঃখের মধ্যে সে সেই মিলনপথ রচনা করিতেছে—মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যায় আবার সে জোড়া দেয়, মাঝে মাঝে ভাঙিয়া যায় আবার সে ধীরে ধীরে চেষ্টা করিতে থাকে—আমার সেই চিরসঙ্গী চিরন্তন সহচরটির সহিত—এই সূর্যালোকে, এই সমীরণে, এই আকাশের নীলিমা ও ধরাতলের শ্যামলতার মাঝখানে, এই জনতাপূর্ণ বিচিত্র কলরবমুখর মানবসভা প্রাঙ্গণে এই জীবনেই যেন আমার শুভপরিণয় সম্পূর্ণভাবে সমাধা হইয়া যায়—আমি যেন তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনি ও তাহার দক্ষিণ করতলে আমার দক্ষিণহস্ত সমর্পণ করি—সে আমাকে যেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে সেখানে নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে যেন

যাই—তাহাকে পদে পদে বাধা দিয়া আমাদের মহাযাত্রাকে যেন ব্যাঘাতদুঃখে নিয়ত পীড়িত না করিয়া তুলি। আমার মধ্যে আমার এই চিরসঙ্গীর ছন্মলীলাই আমার কবিতায় নানা সুরে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তখন তাহা কিছুই জানিতাম না এখন তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি। সেই চিরসঙ্গীই আমার অত্যন্ত অপরিণত বয়সেও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আমার দীর্ঘকালের একান্ত আত্মীয়তার পরিচয় কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল তেমনি চিরসঙ্গীই সমস্ত সুখ-দুঃখ বিচ্ছেদ মিলনের মধ্যে এই পরিণত বয়সে পরমাত্মার সহিত আমার সম্বন্ধ বুঝাইবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে। সে আছে, সে আমাকে ভালবাসে, তাহার ভালবাসার দ্বারাই ঈশ্বরের ভালবাসা আমি লাভ করিতেছি। জগতে যেমন পিতাকে মাতাকে বন্ধুকে প্রিয়াকে পাইয়াছি—তাহারা যেমন জগতের দিক হইতে ঈশ্বরের দিকে আমাকে কল্যাণ-সূত্রে বাঁধিতেছে—তেমনি আমার জীবনের দেবতা আমার অন্তর্জগতের সহচর একটি অপূর্ব নিত্যপ্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত আমার একটি পরম রহস্যময় আধ্যাত্মিক মিলনের সেতু রচনা করিতেছে।"

এই চিঠির উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপের একটি কারণ আছে। মোহিত-চন্দ্রের সহায়তায় সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন, তাৎপর্য অনুসারে আটাশটি বিভিন্ন খণ্ডে কবিতাগুলিকে বিন্যস্ত করেছেন, নামকরণ করেছেন এবং প্রত্যেক খণ্ডের মূল ভাবধারার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক প্রবেশক কবিতাও লিখে-ছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় নিপুণভাবে দেখিয়ে-ছেন এই বিন্যাসের মধ্যে কবি তাঁর কাব্য-জীবনের মূল সূত্রগুলি কীভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন। কাব্যগ্রন্থের প্রথমখণ্ডের নাম যাত্রা ও শেষখণ্ডের নাম জীবনদেবতা।

রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুরাগী পাঠক-মাত্রই কোনো না কোনো সময়ে এই জীবনদেবতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়েছেন। সমালোচক, জীবনীকার সকলেই এই একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেনঃ জীবনদেবতা কে, জীবনদেবতা কি, জীবনদেবতা কেন? অজিতকুমার চক্র-বর্তীর পর থেকে এই জীবনদেবতা রহস্যের চারদিকে একটি যে আলোচনার শুরু হয়েছে তার পরিক্রমণ আজও শেষ হয়নি। বিচিত্র মতবাদের সাহায্যে এই জীবনদেবতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। বেদ বেদান্ত থেকে আরম্ভ করে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ অতিক্রম করে বের্গ্‌সঁ পর্যন্ত এই আলোচনার বিস্তার। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, বেদান্তের সোঽহম্‌-বাদ, বৈষ্ণবদর্শনের আনন্দময় রসাবস্থা, তন্ত্রসাধনার নিগূঢ়তত্ত্ব—নানা দিক থেকে কবির জীবনদেবতাকে শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরম্পরাসূত্রে যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। অন্যদিকে দেখি পূর্বসূরী কবিদের সঙ্গে একটা তুলনা স্থাপনের প্রয়াস। কালিদাসের জননান্তর সৌহৃ-দানি, গ্যেটের ডাইমোন Daimon, ওয়ার্ডস্বার্থের প্রকৃতিপ্রেম, শেলির Intellectual beauty, প্রভৃতি ভাবা-দর্শের মূল সুর যেন রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মধ্যে অনুরণিত—এই প্রকার কল্পনা করে অনেকে জীবনদেবতা-রহস্য সমাধানের চেষ্টা করেছেন। জীবন-দেবতা-বোধ কত যে গভীর ও কত যে ব্যাপক তা এ সব আলোচনা থেকেই সূচিত। একদিকে ঐতিহ্যের পরি-প্রেক্ষিতে ও অন্যদিকে সৃষ্টিধর্মী অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে তুলনা ভিত্তিতে এরূপ বিচার করবার চেষ্টা স্বাভাবিক। বুদ্ধি খাটিয়ে সঙ্গতি আবিষ্কার করতে গেলে এরূপ নজির অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছেন জীবনদেবতা বিচারের বিষয় নয়, অনুভবের বিষয়। তিনি বলেছেন,

"তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকি। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি আমার মধ্যে আমার অন্ত-র্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে —সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার বুদ্ধিমন আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরি-প্লুত করিয়া আছে।"

রবীন্দ্র-রচনার একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য এই যে, কবিই কবির সমালোচনা করেছেন —কখনো আত্ম-অগোচরে কখনো বা বলিষ্ঠ আত্মদর্শনের মধ্য দিয়ে। উদ্ধৃত অংশটি যে লেখা থেকে নেওয়া জীবন-দেবতা-প্রসঙ্গে সেটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১০ অব্দে। এক বছর পরে বঙ্গ-ভাষার লেখক গ্রন্থের জন্য কবি তাঁর জীবনবৃত্তান্ত লিখতে অনুরুদ্ধ হন। কাব্যের মধ্য দিয়ে সে সময় তাঁর কাছে তাঁর জীবনটা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী তিনি রেখে গেছেন। এই জীবন-বৃত্তান্তের মূল আলোচ্য বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা। আলোচনার সার সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায়ঃ

১। কবি লিখেছেন কিন্তু কবিতা লেখার উপরে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি খণ্ডভাবে একটির পর একটি কবিতা যোজনা করে গেছেন। তখন বুঝতে পারেননি তাদের মধ্য দিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য গড়ে উঠেছে।

২। এই তাৎপর্যের সূত্র গেঁথে তুলেছেন রচয়িতার মধ্যে একজন রচনা-কারী যিনি কেবল কবিতা নয়, সমগ্র জীবন গড়ে তোলেন।

৩। এই যে রচয়িতার মধ্যে রচনা-কারী, ইনি একদিকে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের সামঞ্জস্য স্থাপন করছেন, অন্য-দিকে অস্তিত্বধারার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অতীতের সঙ্গে বর্তমান, ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সেতু রচনা করে চলে-ছেন। সেই জন্য এই জগতের তরুলতা পশুপাখির সঙ্গে কবি এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করতে পেরেছেন। বলতে পেরেছেনঃ

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি;
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।

কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে-কথা অনেক ভুলেছি,
তারায় তারায় যে-আলো কাঁপিছে
সে-আলোকে দোঁহে দুলেছি।

এই প্রাণভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী
পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।......

হে চির পুরানো চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

৪। কবির অন্তর্নির্হিত এই যে সৃজনশক্তি, এই যে এক মহান আবির্ভাব যা কবির জীবনকে একটা অখণ্ড আনন্দ-সূত্রে গ্রথিত করেছে; অস্তিত্বের অধিকারে সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে যিনি কবিকে স্নেহভরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁকেই কবি নাম দিয়েছেন জীবনদেবতা। ইনি অতীতের মধ্য থেকে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপর প্রেমের হাওয়া লাগিয়ে কবিকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করে নিয়ে চলেছেন।

আত্মপরিচয়ের এই-সে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া গেল এ থেকে মোটামুটি যা বোঝা যায় তা হল—জীবনদেবতা রবীন্দ্রসাহিত্য তথা তাঁর জীবনদর্শনের মূল ভাব। এই ভাবের মধ্য দিয়ে তাঁর মানবিক অভিব্যক্তি বা প্রকাশ সহজ হয়েছে। আপনার মানবিক মাহাত্ম্যবোধের পথে তিনি বিশ্বগত আত্মীয়সূত্রে ধরতে পেরেছিলেন।

এই সামগ্রিক ঐক্যের উপলব্ধিই তাঁকে তাঁর জীবনের দেবতার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। সেই-যে একদিন শুভমুহূর্তে তাঁর প্রাণ-নির্ঝরের স্বপনভঙ্গ হয়েছিল, দূর হতে মহাসাগরের গান শুনে তিনি পাষাণ-কারাগার ভেঙে বেরিয়ে এসে-ছিলেন তাঁর সেই নিত্যধারা প্রাণ বয়ে চলেছে আদিম উদ্বর্তনের সূচনা থেকে। তার শেষ নেই ক্ষয় নেই। সে প্রাণ-প্রবাহের বিচিত্রগতি, বিচিত্র প্রকাশ। কখনো তিনি অন্তরতম, কখনো প্রকৃতির অন্তরবাসিনী, কখনো নিষ্ঠুরা, কখনো লীলাসঙ্গিনী। কৌতুকময়ী যিনি, তিনিই বঁধু, জীবননাথ, প্রাণেশ, প্রিয়তম; তিনিই কবির অন্তিম কবিতার ছলনা-ময়ী। জীবনের ঘাটে ঘাটে জ্ঞান কর্ম প্রেমের মধ্য দিয়ে এই প্রাণের দেবতা কবিকে ব্যক্তিজীবনের মধ্যে থেকে বিশ্ব-জীবনে, সীমার মধ্য থেকে অসীমে, রূপের মধ্য থেকে অরূপে এবং মৃত্যুর মধ্য থেকে অমৃতের মধ্যে নিয়ে গেছেন।

সীমা এখানে আপনাকেই বড়ো করে দেখাতে চাচ্ছে—তারই পরে আমাদের মন না দিয়ে উপায় নেই। তার চরমকে সে আপনার পালোয়ানির দ্বারা ঢেকে ফেলছে। সীমা আপন সংযমের দ্বারা আপনাকে আড়াল করে সত্যকে প্রকাশ করে। সেইজন্যে সকল কলাসৃষ্টিতেই সরলতার সংযম একটা প্রধান বস্তু। সংযমই হচ্ছে সীমার তর্জনী দিয়ে অসীমকে নির্দেশ করা। কোনো জিনিষের অংশগুলিই যখন সমগ্রের তুলনায় বড়ো হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসংযম। সেটাই হোলো একের বিরুদ্ধে অনেকের বিদ্রোহ। সেই বাহ্য-অনেকের পরিমাণ যতই বড়ো হোতে থাকে অন্তর্যামী এক ততই আচ্ছন্ন হয়। যিশু বলেছেন, 'বরঞ্চ উট ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে গলতে পারে কিন্তু ধনের আতিশয্য নিয়ে কোনো মানুষ দিব্যধামে প্রবেশ করতে পারে না।' তার মানে হচ্ছে অতিমাত্রায় ধন জিনিষটা মানুষের বাহ্য অসংযম। উপকরণের বাহুল্য দ্বারা মানুষ আত্মার সুসম্পূর্ণ ঐক্য-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। তার অধিকাংশ চিন্তা চেষ্টা খণ্ডিতভাবে বহুল সঞ্চয়ের মধ্যে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হোতে থাকে। যে-এক সম্পূর্ণ যে-এক সত্য, যে-এক অসীম, আপনার মধ্যে তার প্রকাশকে ধনী বহুবিচিত্রের মধ্যে ছড়াছড়ি ক'রে নষ্ট করে। জীবন-বাঁশিতে সেই তো খেলো সুর বাজায়—তানের অদ্ভুত কসরৎ, দূনে চৌদূনের মাতামাতি, তার-স্বরের অসহ্য দাম্ভিকতা। এতেই অরসিকের চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। রূপের সংযমের মধ্যে যারা সত্যের পূর্ণরূপ দেখতে চায় তারা রূপের জঙ্গলের প্রবলতার দস্যুবৃত্তি দেখে পালাবার পথ খুঁজে বেড়ায়। সেখানে রূপ হাঁক দিয়ে দিয়ে বলে আমাকে দেখো। কেন দেখব? জগতে রূপের সিংহাসনে অরূপকে দেখব ব'লে এসেছি। কিন্তু জগতে বিজ্ঞান যেমন অবস্তুকে খুঁজে বের ক'রে বলছে এইতো সত্য, রূপ জগতে কলা তেমনি অরূপ রসকে দেখিয়ে বলছে ঐ তো আমার সত্য। যখন দেখলুম সেই সত্য তখন রূপ আর আমাকে লোভ দেখাতে পারে না, তখন কসরৎকে বলি ধিক্।

—রবীন্দ্রনাথ

* * * **রবীন্দ্রনাথের ছবি** * * *

সমন্ত ভদ্র

ভারতীয় চিত্রশিল্পের ঐতিহ্যের পশ্চাৎপটে, রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রকৃতি 'আধুনিক' কথাটি দিয়ে বোঝানো চলে। ব্যক্তিত্বে ও মেজাজে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই ছিলেন আধুনিক। তাঁর গান কবিতা গল্প ও অন্যান্য সৃষ্টির মতোই চিত্রশিল্পও, এদেশী ভাবধারার সঙ্গে আন্তরিক অচ্ছেদ্য যোগকে অস্বীকার না করেও, সমস্ত গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে, চিত্রশিল্পে এ-যুগের মন ও উপলব্ধিকে উপস্থিত করেছে। আর্টের মধ্যে প্রবহমান জীবনের সমগ্রতাকে প্রত্যক্ষ করার বাসনায় পাশ্চাত্যের শিল্পীদের, ছবির বিষয় ও রীতিনীতি নিয়ে পরীক্ষা ও সাধনায় যত ধাপ ও অসাফল্য পেরোতে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যেন তা একলাফে অতিক্রম করে, এদেশে জীবনের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে চিত্রশিল্পের বনিয়াদ পাকা করলেন। বস্তুত, তিরিশের প্রথমদিকে শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে "রেবেল আর্ট সেন্টার" দলের আন্দোলনে বিদ্রোহের যে অস্পষ্ট স্ফুরণ দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের হাতেই তা প্রকৃত সার্থকতার পথ খুঁজে পায়; ভারতের চিত্রধারায় শিথিলতা থেকে মুক্তি ও প্রগতির সড়ক তৈরি হয়।

তখন ওরিএন্টাল স্কুলের অনুগামী শিল্পীরা প্রাচীনের থেকে নতুন প্রেরণা সংগ্রহ করতে না পেরে, অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তিতে দায় মোচন করছে। চিত্রশিল্পে তার অনিবার্য কুফল—বন্ধ্যাত্ব ও নূতনত্বের অভাব। ছবির প্রাণশক্তিহীন জড় প্রথাগত রীতি ও সংস্কারের ছাঁচে-ঢালাই চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নতুন ধারা প্রবর্তনার প্রয়োজন উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: "The time has come when our artists should come into closer touch with modern life in India. They must realise the artistic meaning of life and give expression to it, for there can be no great Art which does not move with life itself". (Some Stray Thoughts on Modern Art in India, Four Arts Annual, 1935)

বলা বাহুল্য, চিত্রশিল্পকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যরচনার মাঝে 'রিসেস' হিসাবে নেন নি। তাঁর ছবি কোন ভাবালু লঘু অনুষঙ্গ সৃষ্টি করে না, বরং দর্শককে রীতিমত ঝাঁকুনি দেয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি স্পষ্ট তীক্ষ্ণ ও পরিণত। ছবি তাঁর সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলেই, তাঁর প্রতিভা নিরূপণ ও ব্যক্তিত্ব-বিচারে অপরিহার্য।

মাত্র ১২।১৩ বছরের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ আড়াই হাজার ছবি এঁকেছেন। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়সে তাঁর নতুন মাধ্যম দরকার হল। যে শিল্পী নিরন্তর পরিপূর্ণতা খোঁজেন, তাঁর দুর্নিবার অতৃপ্তিই তাঁকে নতুন পথে শিল্প-যাত্রায় সাহস যোগায়।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি

"The world of sound is a tiny bubble in the silence of the infinite." অথচ "The universe has its only language of gesture, it talks in the voice of pictures and dance. Every object in this world proclaims in the dumb signal of lines and colours, the fact that it is not a mere logical abstraction or a mere thing of use, but it is unique in itself, it carries the miracle of its existence".—(Chitralipi).

রেখারূপের তুলনায় শব্দের সামান্যতার বিষয় এই প্রতীতি সাময়িক ও কবির আবেগপ্রাবল্যের সাক্ষী হলেও, রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, স্বীয় আবেগানুভূতির সবটাই শব্দপ্রতিমা বহন করতে পারে না। তাই চিত্রশিল্পের আশ্রয়গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনিবার্য ছিল, একথা বলা চলে।

কবিতা সংশোধনের মধ্য দিয়ে তাঁর চিত্রশিল্পের যাত্রা শুরু। কবিতার আবেগ-স্রোতকে রূপ দেবার জন্যে যখন তিনি শব্দ ও শব্দশৃঙ্খল পরীক্ষা করছেন, এবং একের পর এক বাতিল করে দিচ্ছেন, তখন, তাঁর সৃষ্টিমগ্ন চেতনার এক বিচ্যুত ভগ্নাংশ সেই বিনষ্ট শব্দগুলির দেহ নিয়ে খেলা শুরু করেছিল। কিন্তু বেশিদিন তা খেলা রইল না। খেলার ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথ রেখার নিজস্ব শক্তি ও গতি উপলব্ধি করতে পারলেন। কবিতার কাটাকুটি রূপ নিচ্ছিল বেশির ভাগ জীবজন্তু ও সরীসৃপের, কতক নদীনালার আর কিছু-বা কিম্ভূতকিমাকার ও জটিল—যার কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নেই। অনায়াস-গতি রেখা রবীন্দ্রনাথের কলমে তৎপর হয়ে উঠে চোখে-দেখা জগতের অভ্যন্তর থেকে ছেঁকে তুলতে লাগল রূপমূর্তি, অর্থাৎ 'ফর্ম'—অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'প্রকৃতির খেলাঘরে লুকোন সামগ্রী হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ দিয়ে নির্মিত।'

সুইস চিত্রশিল্পী পল ক্লী একবার বলেছিলেন যে, তাঁর রেখা নাকি বেড়াতে বেরিয়েছে। বস্তুত রেখার স্বভাবের মারফত ফর্মের জগতের সঙ্গে শিল্পীর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পীর ঘর, তার আসবাব, জানালার বাইরে গাছপালা ও প্রাণিজগৎ এবং নিসর্গ—সবকিছুর মধ্যে রূপকে, অবয়বকে প্রত্যক্ষ করাতেই তাঁর আনন্দ, কারণ এ সবই তাঁর সৃষ্টির উৎস। এই রূপ-দর্শনের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার বলেছেন। "আজকাল আমাকে রেখায় পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছিনে। কেবলি তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই।" (রানী মহলানবীশকে লিখিত পত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)।

রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই এই বস্তু-রূপের সন্ধান পেয়েছিলেন। ছবিতে শিল্পীর ভাবাবেগের ঘনীভূত রূপ প্রতীকী দ্যোতনা সৃষ্টির জন্য বস্তুর বস্তুত্ব চেনা দরকার, বস্তুর স্থূলে বাহ্য চেহারার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে যা সম্ভব হতে পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খত্ব বা সাবধানী অনুসরণ পরিহার করলেন। তাঁর কলম দ্রুত আঁচড় টেনে চলেছে। তাঁর রেখা নিশ্চিত ও সবল, একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠে। ছবির মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে রেখার সংস্থান অভ্রান্ত। মুহূর্তে তারা একত্র মিলিত হয় ও অখণ্ড তাৎপর্য পায়। ছবিতে গতি, বুনুনি বা texture, সজীবতা সঞ্চারিত হয়,—এক কথায় বিষয়ের চরিত্রগত গুণ ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ছবি কোন দৃষ্ট জিনিসের আনুরূপ্য সৃষ্টি, অথবা তার ব্যাখ্যার জন্য নয়। রজনীগন্ধা আঁকতে গিয়ে স্বভাবতই তিনি ভাববার প্রয়োজন বোধ করেন নি, সেটা কতটা হুবহু ঐ ফুলের মতই দেখতে হল, অথবা উদ্ভিদতত্ত্বের দিক থেকে নির্ভুল ও নিখুঁত হল কিনা। কারণ বস্তুর ত্বকের নিচে থেকে তার সত্যস্বরূপকে ফোটানোই শিল্পের কাজ। যেহেতু তিনি গাছ আঁকতে তার কাঠিন্য ও দৃঢ়তাই আঁকেন, পাখীকে আকাশের গায়ে স্থাপন না করেও তার নভো-বিচরণের আনন্দ ফোটাতে পারেন, তাই তাঁর ছবি ফটো না হয়ে হয় Universal ideograph।

সুন্দর জিনিস যথাযথ সুন্দর করে এঁকে চিত্রগত সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব। কারণ, ছবির উদ্দেশ্যই হল সুষমা ও সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তোলা, রেখার অনায়াস স্বাধীন গতি ও সিমেট্রির মধ্যে রূপ সৃষ্টি করা। রেখার গতিকে অনুসরণ করে, আমাদের চোখ কল্পনা ও অনুভূতির জগৎ গড়ে তোলে, যে জগতের বিশেষত্ব ছন্দের সুসম সমন্বয়ে। তাই তাঁর অধিকাংশ ছবি যখন আমাদের চোখে দেখা জিনিসের সঙ্গে মেলে না, এমনকি কোন কোনটা অদ্ভুত ও অপ্রাকৃত বলে বোধ হয়, তখনো আমরা নালিশ করি না।

আমাদের চোখ দেহযন্ত্রের একটি অংশাবিশেষ মাত্র নয়। দর্শনেন্দ্রিয়, মনের যোগাযোগে, ছবির রেখা রঙ ও ম্যাসের মধ্যে চিত্রদত্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক আস্বাদ লাভ করে। বাক্যযোজনা দ্বারা চিত্রের সম্ভোগ অন্যের মনে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব। তাই লোকে যখন রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করত, ওমুক ছবির মানে কি, তিনি নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন।

পাশ্চাত্য চিত্রকলায় যেসব পরীক্ষা প্রয়াস চলেছিল, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মন সে বিষয়ে সর্বদা আগ্রহী ছিল। অবশ্য Subjective Expressionism ও Abstract art-এর নৈরাজ্য-প্রবণতাকে তিনি কাছে ঘেঁসতে দেননি। পাশ্চাত্যের সার স্বাঙ্গীকরণে তিনি তাঁর চিত্রের ঐশ্বর্য ও জীবনীশক্তি বাড়ালেন। ছবিতে শিথিলতা ঘুচে গিয়ে ঋজুতা ও দৃঢ়তা দেখা দিল। কমনীয় বিষয়, ললিত ভাবের রাজত্ব ভেঙেচুরে অসুন্দর ছবিতে স্থান নিল। প্রথমদিককার গাছপালা পশুপাখি অসংখ্য grotesque মূর্তি ও মুখোস, আপাতদৃষ্টিতে যার কোনই অর্থ নেই, দ্রুত শেষ করা এমন অজস্র ছবি কলমে বা পেন্সিলে আঁকা। কলমকে তিনি ত্যাগ করেন নি। কতক আঁকা কলমের বাঁট, ফাউন্টেনপেন বা অন্যকিছু দিয়ে। তুলির উপর দখল আসতে কিছুটা দেরি হয়েছিল। প্রথমদিকে পারস্পেকটিভের নিয়ম মানার তাঁর দরকার হয় নি—সবই ছিল দুই মাত্রার ছবি। ছবি আঁকবার ব্যাকরণ বা প্রথাগত নিয়মকানুন রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই লংঘন করেছেন। তাঁর ড্রইং নিখুঁত নয়, অ্যাকাডেমিক ট্রেনিং-এর অভাবজনিত অন্যান্য ত্রুটিও বহুত আছে। অথচ তাঁর বিষয়-সংস্থান এত নিপুণ ও অব্যর্থ, যে তা একমাত্র অভিজ্ঞ চিত্রশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

ছবিতে পরিমিতিবোধ, সুপরিণত সংযত শৃঙ্খলা, ছবির স্পষ্টতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা যে দুর্লভ শিল্পবোধের থেকেই আসে, রবীন্দ্রনাথের তাতে স্বভাবসিদ্ধ অধিকার ছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাঁর তিন মাত্রার ছবিও আগেকার মতই স্পষ্ট ও গতিময়, তার নির্বাহুল্য সংযত রূপ এখানেও উপস্থিত। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের সমস্ত চিত্রগুণ—পারস্পেকটিভ গভীরতা ভর ও ঘনত্ব তাঁর ছবিতে দেখা দিল। তাঁর রঙ যথার্থই বিস্ময় ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করল। রঙের নির্বাচন ও প্রয়োগের মৌলিকত্ব রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ। পাশাপাশি রঙের দ্বন্দ্ব ঘটিয়ে রঙের আন্তরিক প্রভা প্রকাশিত করলেন তিনি। পটভূমির গাঢ় গভীর রঙ ঠেলে সরিয়ে উষ্ণ আলোর রঙ তাঁর ছবিতে ফুটে বেরোল।

রেখার মত, রঙের সত্যস্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরলেন। এতকাল ভারতীয় ছবিতে রঙ ছিল অনেকটাই গৌণ, ডেকরেটিভ মূল্য ছাড়া তার নিজস্ব মূল্য উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রঙকে ছবির কেন্দ্রস্থলে এনে বসালেন। রঙ ছবির নায়ক হল। উপন্যাসের চরিত্রের যেমন স্বধর্ম আছে তেমনি রঙেরও স্বকীয়তা ও স্বধর্ম আছে, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তা প্রথম ধরা পড়ে।

রঙের এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে গেলে, চিত্রে প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ অসার্থক হয়ে পড়ে। প্রকৃতির সমকক্ষ হবার চেষ্টায় প্রকৃতির রঙ বা আলো ছবিতে ফোটাবার চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। তাছাড়া আর্টের এই দাসত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নেই। ক্যামেরার দায় ঘাড়ে নিয়ে, চিত্রগত সৌন্দর্যসৃষ্টির লক্ষ্যের দিকে শিল্পী এক পা-ও এগোতে পারেন না।

একথা সত্য যে, নিরবয়ব নিরালম্ব বর্ণে আমাদের সংবিৎ দীর্ঘক্ষণ নিমজ্জিত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের সৌন্দর্যবোধ আদৌ তৃপ্ত হয় কিনা সন্দেহ। ছবিতে রঙের ভূমিকা প্লাস্টিক সংগত সৃষ্টি ও দৃশ্য-অবহ রচনা। ছবিতে গভীরতা ও ঘনত্ব সঞ্চার করা। শিল্পী বাহ্য-জগতের একটি খণ্ডকে পরিবর্তিত রূপে এমন একটি কম্পোজিশনে বেঁধে নেবেন, যেখানে রেখা ও রঙ অবিভাজ্য অভিন্নাত্মা হবে। দর্শনক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের চেতনা রূপ ও রঙের সমন্বয় সাধন করে। ছবির কম্পোজিশন থেকে তাই যেমন রঙকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তার বিকল্পও তেমনি অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের ছবির আবহে দর্শকের কল্পনা ও অনুভূতি ছাড়া পায়। রঙ ও আলোর গভীরে অবগাহন করে তার চেতনা। ছবির এই অপূর্ব গভীরতা ও ঘনত্ব, প্রকৃতির রঙ অনুসরণ করে, প্রকৃতির পিছু হেঁটে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের রঙ সত্যই বিশিষ্ট। তাঁর ভাস্বর দ্যুতিময় তাঁর রঙ। তাঁর হাতেই ভারতীয় চিত্র প্রথম রঙের ভাষায়
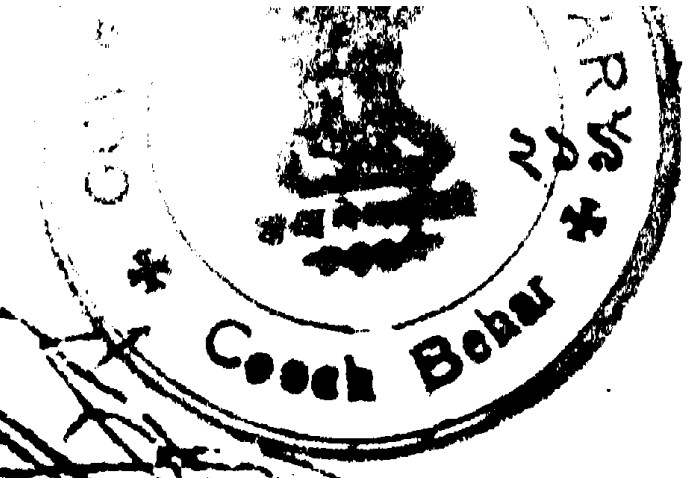
কথা বললে। প্রকৃতির দাসত্বের নিগ্রহ থেকে মুক্ত হয়ে ছবিতে তার নিজস্ব স্থান খুঁজে না পেলে, রঙের এই যাদুশক্তি অর্জন করা সম্ভব হত না—যা, ছবি দর্শন মাত্র তার মেজাজ সরাসরি আমাদের ইন্দ্রিয়ে পৌঁছে দিতে পারে। রেখার বেষ্টনীর মধ্যে রঙ যেন দর্শকেরও মেজাজ এবং ব্যক্তিত্বের চালক। যাকে সংগীতের ঐকতান বলি, Bird of the fairy-land ছবি (Chitralipi—Plate 6) আমাদের মনে সেই ঐকতান সৃষ্টি করে। লাল ও কালোর একরকম ব্যঞ্জনাময় সন্নিবেশ রবীন্দ্রনাথের ছবিতে অনেকবার পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ল্যান্ডস্কেপ অনেকগুলি। মনে হয়, আমরা তার আলো ও হাওয়ায় বিচরণ করছি, যার মাঝে প্রকৃতির প্রতিরূপে প্রত্যক্ষ করার সুখ নিশ্চিতই তুচ্ছ। রঙের শরীরে গাছপালা আকাশ মাটি ও জলভাগকে তিনি মিশিয়েছেন। কালো ও নীলের মিশ্র পটভূমিতে হংসের ছবির ভঙ্গি ও দেহলাবণ্যে কোমল জলক্রীড়ার দ্যোতনা আনলেন। জলধারার স্নিগ্ধ স্পর্শ আমরা অনুভব করি। তাঁর মনুষ্যাকৃতিতে পোর্ট্রেটে আমরা মানুষটিকেই দেখি না, তার চরিত্র পেশা অভিপ্রায়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুখোস বা জ্যামিতিক ছাঁদের ছবির নাটক অনায়াসে প্রতীকী তাৎপর্য পায়।
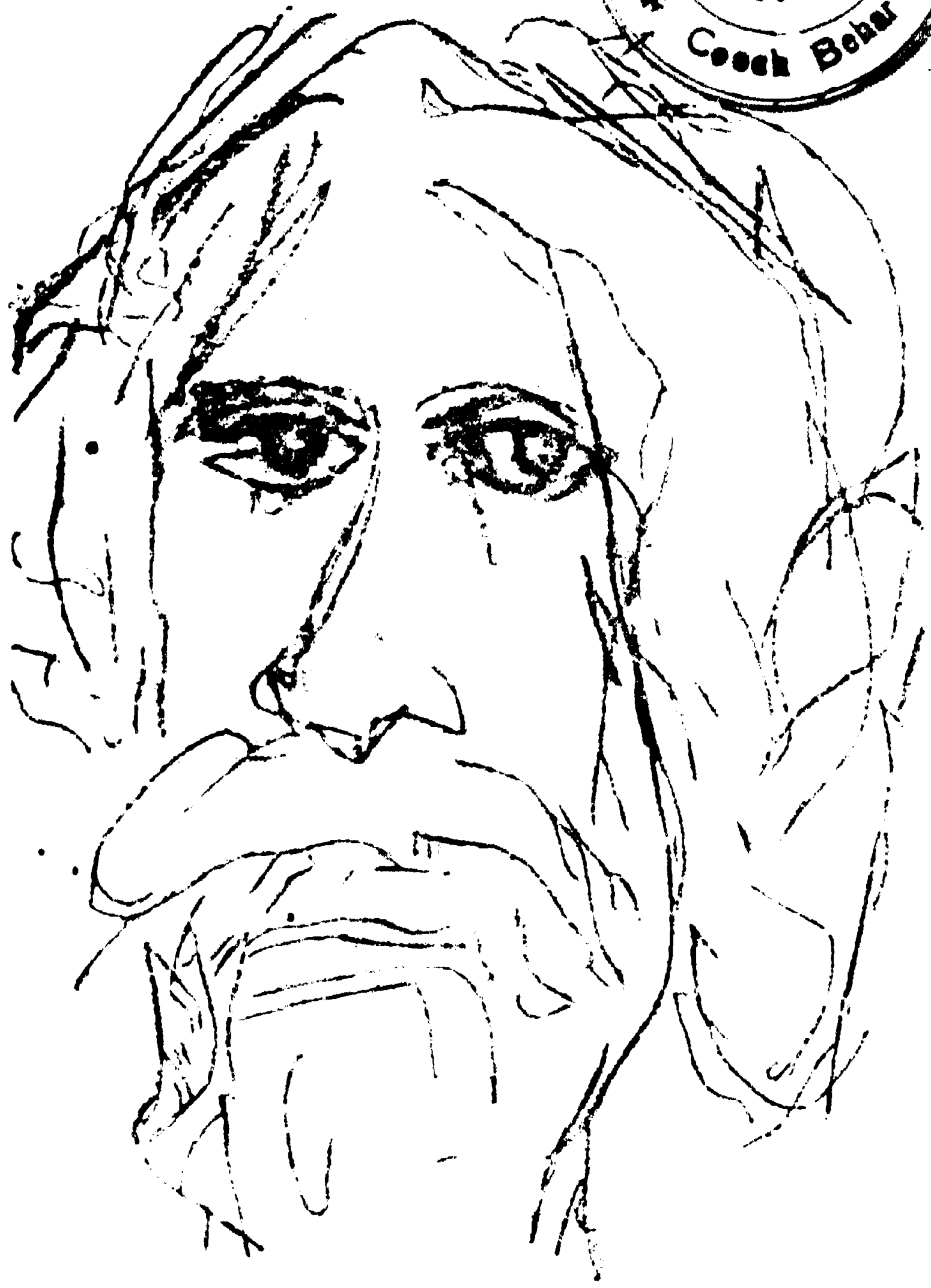
রেখার সাযুজ্যে রঙ এ সবই সম্ভব করে। ছবি রঙের অপরিমিত শক্তিকে পেয়েছে। রঙ এখন স্বাশ্রয়ী, স্বপোষণক্ষম। স্বচ্ছন্দ ও অবাধ। রবীন্দ্রনাথ রঙের আত্মোপলব্ধি স্বীকার করেছেন, রঙকে মুক্তি দিয়েছেন। সুইস পল ক্লী যে কথা বলেছিলেন তাঁর রেখা সম্পর্কে, রবীন্দ্রনাথ রঙ সম্বন্ধে বলতে পারতেন সেকথা: 'তিনি হয়তো বলতেন যে ছবি নাচের আসরে যাবার পোশাক পরেছে।

রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত প্রতিকৃতি

একালের ধাঁধা

১। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডি সংঘটিত পিস কোর (Peace Corps) কি জিনিস?

২। ভারতীয় পার্লামেন্টের সর্বপ্রথম যৌথ-অধিবেশন কবে হয়েছে এবং কোন আইন এতে পাশ করা হয়েছে?

৩। হিমালয় পর্বতের কয়টি চূড়া জয় করবার চেষ্টা এই বৎসর চলছে এবং কোন কোন জাতির অভিযানকারীরা এইসব প্রচেষ্টায় আছে?

৪। ভারতের কোন অংশে সমুদ্র হতে প্রতি বৎসর এই সময়ে মুক্তো তোলা হয়?

মূক বিহঙ্গ

দীপক চৌধুরী
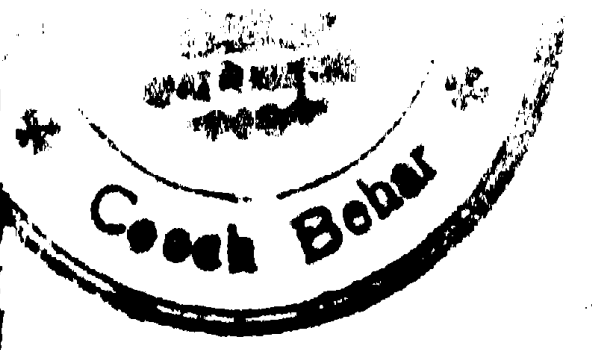
চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে এসেছি। বছর তিন কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। পূর্ব খান্দেশের যে অঞ্চলে আমি চাকরি করি সেখানে একমাত্র বাঙালী হচ্ছেন ডাক্তার সেন। পুরো নাম প্রীতি-রঞ্জন সেন। মৃতদার। বছর পঁচিশ আগে স্ত্রী মারা গিয়েছেন। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। একটি কন্যা-সন্তান রেখে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী।

বছর দুই চেষ্টা করেও ডাক্তার সেনের সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না। তাঁর সঙ্গে সোজাসুজি দেখা করা যায় না। তাঁর একজন সহকারী আছেন। প্রথমে সহকারীর সঙ্গে দেখা করে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে হয়। ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক কারণে ডাক্তার সেন কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

প্রথম দু'বছরের মধ্যে আমার কোনো ব্যারাম-পীড়া হ'ল না। সত্যি কথা বলতে কি কলকাতা ত্যাগ করবার পর আমার স্বাস্থ্য গেল বদলে। এতো ভাল হ'ল যে, কলকাতার চৌষট্টি টাকা ভিজিট ওয়ালাদের নাম গেলুম ভুলে।

একদিন ডাক্তার সেনকে নিজের বাড়িতে 'কল' দিলুম। দিনটা ছিল রবিবার। তিনি ব্যস্ত মানুষ। এই সময় আমালনীরের ডাক্তারদের ব্যস্ততা আরও বাড়ে। তুলো বেচা-কেনার সিজিন। লোকের হাতে পয়সা জমতে থাকে। দরকার না থাকলেও ডাক্তার ডেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো এদের একটা বাতিকের মতো হয়ে দাঁড়ায়। পাঁচ দশটা ভিজিট না দিলে এদের সামাজিক ইজ্জত যেন নষ্ট হয়ে যায়। অতএব সময়ের অভাব বলে ডাক্তার সেন এসে উপস্থিত হলেন সন্ধ্যার পরে।

আমালনীরে দু'বছর বাস করবার পর তাঁর সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমি যে বাঙালী সেই জন্য তাঁর কোনো দিনই কৌতূহল জাগেনি। এতো দূরদেশে একমাত্র বাঙালীর প্রতি তাঁর এই কৌতূহলহীনতা যে একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার তাতে আর সন্দেহ নেই। হয়তো মনে-প্রাণে তিনি মহারাষ্ট্রীয় বনে গিয়েছেন।

দেখে মনে হ'ল পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে। কালো কুচকুচে গায়ের রং। মাথায় একটিও চুল নেই। গোঁফ আছে। প্রথম দৃষ্টিতে খুবই কুৎসিত বলে মনে হ'ল। ভাবলুম আলাপ-আলোচনা শুরু হলে হয়তো খানিকটা ভাল লাগতে পারে। কুৎসিত মানুষেও ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে কখনো কখনো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন।

দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি। গাড়ি থেকে নেমে ডাক্তার সেন নিজেই চলে এলেন ভেতরে। কাউকে ডাকলেন না। সিঁড়ি দিয়ে যখন ওপরে উঠছিলেন তখন আমি ওপর থেকে তাঁকে হাতজোড় করে অভ্যর্থনা জানালুম। প্রতিনমস্কার করলেন তিনি। অন্য কোনো কথা বললেন না। দ্রুত পায়ে আমার শোবার ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন। মনে হ'ল এখানে তিনি আগেও এসেছেন। সবই চেনা।

আমি তাঁকে খাবার ঘরের দিকে ডেকে এনে বললুম, "দয়া করে এদিকে আসুন একবার। হ্যাঁ, এই চেয়ারটাতেই বসুন আপনি। কি খুঁজছেন ডাক্তার সেন?"

"রোগী?"

"রোগী আমি নিজেই। দেখে বুঝতে পারছেন না বোধ হয়?"

"না। বাইরে থেকে রোগ ধরা যায় না।"

দু'বছর পর এই আমি প্রথম বাংলা কথা শুনলুম অপরের মুখ থেকে। একটা অলৌকিক আনন্দানুভূতিতে সারা শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এ যেন মরুভূমি অতিক্রম করতে করতে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে জলের বিন্দু গড়িয়ে পড়ল জিবের ডগায়! চাতক পাখির মতো কয়েক মুহূর্ত আমি তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। দু'বছরের তেষ্টা মাত্র দু'চারটে বাংলা কথা শুনে মিটতে চাইছিল না।

খাবারের টেবিলে বসে স্টেথেস-কোপটা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন ডাক্তার সেন। একটা প্লেট তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, "একটু মিষ্টিমুখ করুন। সবই ঘরের তৈরি।"

"রোগী দেখতে এসে আমি কখনো খাই না। আমার সম্পর্ক শুধু রোগের সঙ্গে........"

"সে রকম ধরনের রোগ আমার নেই......এই সন্দেশটা অন্ততঃ আপনাকে খেতেই হবে।"

দু'সারি প্লেটের ওপর দিয়ে হাত বাড়ালেন ডাক্তার সেন। তৃতীয় সারি থেকে একটা কড়াইশুঁটির কচুরি তুলে নিয়ে বললেন, "মাঝে-মাঝে সুচুও আগে এমন জিনিস তৈরি করত।"

"সুচু?" কৌতূহল প্রকাশ করতে দেরি করলুম না আমি।

"আমার মেয়ে সুচিত্রা। কলকাতায় আছে। বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।" একটু হেসে তিনিই বললেন আবার, "বাংলার সংস্কৃতি বলতে আমালনীরে কিছুই নেই। কিন্তু আপনার টেবিলের ওপরে দেখছি বাংলাদেশের একটি পুরো রান্নাঘর তৈরি করে রেখেছেন! কে করল এ-সব? বৌমা আছেন না কি?"

"বিয়ে করিনি। এ-সব আমারই তৈরি।"

ডাক্তার সেন উঠে পড়লেন হঠাৎ। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বললেন, "চলুন। এখনো রোগী দেখা বাকী আছে। এই অঞ্চলে কতোদিন এসেছেন?"

"দু'বছর।"

"কোথায় চাকরি করেন?" ঘরের বাইরে চলে এলেন ডাক্তার সেন।

"দেশাই এণ্ড দেশাই কোম্পানীর কেমিস্ট আমি।"

সিঁড়ির দিকে না গিয়ে ডাক্তার সেন আমার শোবার ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন। বাড়িটা তাঁর খুব ভাল করে চেনা বলে এখন আমি নিঃসন্দেহ হলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "আগের ভাড়াটেকে চিনতেন বুঝি?"

শোবার ঘরে ঢুকে তিনি চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে লাগলেন। গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন তিনি, "হ্যাঁ। আগের ভাড়াটেও দেশাই এণ্ড দেশাই কোম্পানীর কেমিস্ট ছিলেন। আমাদের স্বজাত। তাঁর সঙ্গেই সুচুর বিয়ে দিয়েছি। এবার আপনি শুয়ে পড়ুন—দেখি কি অসুখ আপনার।"

হাসি এল আমার। বললুম, "আমায় ক্ষমা করবেন ডাক্তার সেন। অসুখ আমার মনের। দু'বছর বাংলায় কথা কইতে পারি নি। হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। কারখানা থেকে ফিরে এলে মনে হতো নিঃসঙ্গতার কয়েদখানায় আমার দম আটকে আসছে। আমি বোধ হয় বাঁচব না। আপনার সঙ্গে বসে যে দু'-দশ মিনিট গল্প করব তারও উপায় নেই। অতএব কল দিলুম আপনাকে। অনেকটা হাল্কা বোধ করছি। মাঝে মাঝে যদি বাংলায় কথা বলবার জন্য আপনাকে কল দিই, আশা করি বিরক্ত বোধ করবেন না। ডাক্তার সেন, একটু দাঁড়ান—"

তিনি সিঁড়ির দিকে হাঁটছিলেন। ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললুম। হাত বাড়িয়ে বললুম, "এই যে আপনার ভিজিট—"

"এতো খেয়ে গেলাম, আবার ভিজিট কেন? মাঝে মাঝে আমার ওখানে আসবেন......মাতৃভাষায় আলাপ-আলোচনা করা যাবে। নমস্কার।"

ভিজিট না নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার সেন।

এর পর থেকে মাঝে মাঝেই তাঁর ওখানে যাই। অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল। নানা রকমের গল্প-গুজব করে সময়টা মন্দ কাটছিল না। শুধু বাংলায় কথা বলবার জন্যই গায়ে পড়ে ডাক্তার সেনের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আমার। বছর খানেক যাওয়া-আসার পরেও আমি তাঁর পারিবারিক খবর জানবার আগ্রহ প্রকাশ করিনি। প্রথম সাক্ষাতের দিন ডাক্তার সেন নিজে থেকেই বলেছিলেন যে, আমার আগে এই বাড়িটাতে অন্য একজন বাঙালী ভাড়াটে বাস করতেন। এবং তাঁর সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সেই খবরটাও আমি পেয়েছিলুম ডাক্তার সেনের কাছ থেকে। তারপর এক বছর তো পার হয়ে গিয়েছে। মেয়ে-জামাই সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা উত্থাপন করেননি তিনি। আমার কিন্তু সব সময়েই মনে হতো এই বিয়ের ব্যাপারটার মধ্যেই তাঁর জীবনের গভীরতম ব্যথাটা লুকিয়ে রয়েছে। তাঁর নিঃসঙ্গতা আমার চেয়েও বেশি মর্মান্তিক। হয়তো সেই কারণেই রোগ আর রোগী নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত হয়ে থাকেন। পয়সা রোজগারের লোভটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমার বাড়িওয়ালা একজন মহারাষ্ট্রীয়। রাও সাহেবের বয়স ডাক্তার সেনের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি বলেন, ডাক্তার সাহেব হঠাৎ একেবারে বদলে গিয়েছেন। পয়সা রোজগারের লোভটা নাকি তাঁর সম্প্রতিক। আগে সপ্তাহের মধ্যে একটা দিন তিনি চেম্বারে বসে বিনে ভিজিটে রোগী দেখতেন। দান করেছেন প্রচুর, চেহারাটা অত্যন্ত কুৎসিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সুখ্যাতির খবর রটেছে পূর্ব খান্দেশের সর্বত্র। তাঁর জন্যই বাংলাদেশের মান বেড়েছে অনেক।

ক'দিন থেকে বর্ষা শুরু হয়েছে। কারখানা থেকে সেদিন আর বাড়ি ফিরলুম না। এই সময়টাই আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে। নিঃসঙ্গতার রূপ যায় বদলে। আরও ঘনতর হয়ে ওঠে। ঘুম আসে না। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্য ছটপট করতে থাকি।

কারখানা থেকে সোজা চলে এলুম ডাক্তার সেনের বাড়ি। ভেতরে ঢোকবার জন্য আজকাল আর কারো অনুমতি নিতে হয় না। ফটক দিয়ে বাগানে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই সেন সাহেবের পুরাতন ভৃত্য মদন মেহ্‌তা ছুটে এসে আমন্ত্রণ জানায়। আজও নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ঘটল না। ছাতা হাতে নিয়ে বাইরের ফটক পর্যন্ত ছুটে এল সে। লক্ষ্য করলুম, প্রাতিদিনকার মতো মুখে তার হাসি নেই। একটু গাম্ভীর্য। চোখের পাতা ভেজা ভেজা। বর্ষার ছোঁয়াচ লেগেছে বোধহয়।

ডাক্তার সেন ড্রইং-রুমেই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ আর রোগী দেখতে বেরুবেন না তো?"

"না"—একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দরজার দিকে মুখ তুলে হাঁক দিলেন, 'কইরে মেহ্‌তা, আমাদের কফি খাওয়া। ওহে সুখেন্দু, জল নাবলেই তো মন খারাপ হয়ে যায় তোমার। আজ আর বাড়ি ফেরবার দরকার নেই। খাওয়া-দাওয়া করে এখানেই থেকে যেও। কি বলো?"

"আপনি যা হুকুম করবেন,—" গল্পের গন্ধ পেলুম আমি। জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা আপনার কখনো একা-একা বোধ হয় না এখানে? টাকা-পয়সার অভাব নেই, কলকাতা গিয়ে থাকতে পারেন মেয়ের কাছে।"

কফি খাচ্ছিলুম আমরা। পেয়ালাটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে ডাক্তার সেন উদাসভাবে বললেন, "বাইরে থেকে কোনো কিছুই বোঝা যায় না, ধরাও যায় না। সুখেন্দু, টাকার অভাব আমার ঘটেছে।" উঠে পড়লেন ডাক্তার সেন। পূব দিকের খোলা জানলাটার কাছে হেঁটে গেলেন তিনি। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাসপাতালের উঁচু বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। সেইদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। কফির পেয়ালাটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে এলুম। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। স্মৃতি-মন্থনে সময় লাগছে তাঁর। কিংবা তিনি হয়তো ভাবছেন গল্পের বোঝাটা বুক থেকে নামিয়ে দেবেন কিনা। আমি কিন্তু জানতুম, গল্পের বোঝা বুকে নিয়ে মানুষ চিরকাল চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

"বুঝলে সুখেন্দু, প্রায় তিন বছর ধরে রোগের চিকিৎসা করছি—" ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার উন্মোচন করতে লাগলেন ডাক্তার সেন, "বাইরে থেকে কোনো কিছুই ধরতে পারিনি। রোগ শুধু দেহাশ্রিত নয়......মনেরও। আমি নিজেও যে মানসিক ব্যাধিতে ভুগছি সে খবর আমার জানা ছিল না। মনোবিজ্ঞানের রহস্য নিয়ে কোনোদিনও মাথা ঘামাইনি। সুখেন্দু, সুচু অর্থাৎ সুচিত্রা যে আমার একমাত্র সন্তান তা কি তুমি জানো?"

"জানি। আপনার মুখেই শোনা।"

বর্মা চুরুট ধরিয়ে বার কয়েক টান মারলেন ডাক্তার সেন। তারপর বলতে আরম্ভ করলেন, "সুচুর যখন বারো ঘণ্টা বয়স তখন ওর মা গেলেন মারা। সেই থেকে মেয়েটাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করতে হয়েছে। মস্তবড় কাজ পেয়েছিলাম হাতে—কোনোদিনও একা-একা বোধ হয়নি। মায়ের অভাব বুঝতে দিইনি। মদনের কৃতিত্বও কম নয়। রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলে মদন ওর দেখা-

শোনা করত। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল সচু। যতদূর মনে পড়ে সিনিয়ার কেমব্রিজ পরীক্ষায় ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছিল সে। পিয়ানো বাজায় অতি চমৎকার। মায়ের সঙ্গ কোনোদিনই পায়নি, কিন্তু কেমন ক'রে যেন অনেক রকমের রান্নাবান্নাও শিখে ফেলেছিল। মায়ের মতো মন পেয়েছে সচু। সবাইকে দিতে চায়, খাওয়াতে চায়—ভালবাসতে চায়। গরীব আত্মীয়দের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে পুজোর সময় কাপড়চোপড় কিনে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেয় সে। টাকা রোজগার করতে আনন্দ পেতাম আমি। ভাবতাম, সচু দিক—প্রাণ ভরে দিক। সমাজ-সংসারের কাজে লাগুক সে। আমি একা মানুষ। আমার কি দরকার ব্যাঙ্কে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ফেলে রাখবার? ও যাতে আনন্দ পায় আমারও তাতে আনন্দ। ওর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার নিজের চরিত্রের উন্নতি হয়েছে অনেক। মনের প্রসারতা বেড়েছে। সুখেন্দু, তোমার সিগারেট কি ফুরিয়ে গেল? আনিয়ে দেব?"

"সিগারেট? সিগারেট খেয়ে কি করব—মন দিয়ে গল্প শুনছি। এতোকাল তো জানতুম সন্তানরাই পিতামাতার কাছে শেখে। আজ শুনছি উল্টো কথা। শুনতে ভাল লাগছে, ডাক্তার সেন। সিগারেটের পুরো টিন আমার পকেটে আছে। আনাতে হবে না।"

"বেশ বেশ, সিগারেট যতো কম খাওয়া যায় ততো ভাল। প্রায় বছর তিন ধরেই তো দেখছি তোমায়......আগে যদি পরিচয় হতো ...বুঝলে সুখেন্দু, সচুকে দেখতাম আর ভাবতাম ভগবানের কি অদ্ভুত বিচার! সচুকে তিনি কতো রকমভাবে ঐশ্বর্যশালিনী করেছেন... কিন্তু...কিন্তু..."

মদন মেহ্তা ঘরে ঢুকল। কফির সরঞ্জাম সব পড়েছিল টেবিলের ওপর। সেগুলো গুছিয়ে নিল সে। গুছোতে দেরি করছিল। বোধ হয় গল্প শোনবার আগ্রহ দমন করতে পারেনি। ওর দেরি দেখে ডাক্তার সেন বললেন, "আচ্ছা এবার তুই যা মদন।" আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ডাক্তার সেন বলতে লাগলেন, "জন্মের পর থেকেই সচুকে দেখছে মদন। পানের থেকে কখনও চুনটুকু পর্যন্ত খসতে দেয়নি। যত্নের বাহুল্য দেখে আমিও মাঝে মাঝে অবাক হ'য়ে যেতাম। একটা কোলের শিশুকে যুবতী বয়স পর্যন্ত গ'ড়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। সচু যখন বি-এ পড়তে বোম্বে গেল মদন তখন প্রতি মাসেই একবার ক'রে দেখতে যেতো ওকে। সচুর কোনো অসুবিধে হচ্ছে শুনতে পেলে নিজেই গিয়ে দেখা করত হস্টেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। অসুবিধা দূর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করত সে। আমার এই ফাঁকা সংসারে জীবন কাটিয়ে দিল। যাক গে, এবার সচুর কথাই বলি। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে যেবার আমালনীরে এল সচু—"

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেসা করলুম আমি, "ভগবানের বিচার সম্বন্ধে কি একটা বলছিলেন না?"

"ও হাঁ, ঠিক কথাই মনে করিয়ে দিলে। ভগবানের কৃপায় সচুর কিছু অভাব ছিল না। শুধু...শুধু রূপ বলতে যা বোঝায় তার ছিটেফোঁটাও পায়নি সচু। সুখেন্দু, তোমার কাছে ঘুরিয়ে কথা বললে লাভ হবে না কিছু। আমি ওর বাপ, তবুও বলব মেয়ে আমার দেখতে খুবই বিশ্রী—রূপ সে পায়নি। কেন পায়নি তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। এই জন্য আমি দায়ী। আমার রং পেয়েছে সে। ওর মা খুব সুন্দরী ছিলেন। বিয়ের পর মনে মনে লজ্জা পেতাম, তাঁর পাশে আমাকে দেখতে পেলে পাড়ার লোকেরা মুখ টিপে টিপে হাসত। যাক গে, সে তো পুরনো কাহিনী। কিন্তু এটাই ছিল আমার অবচেতন মনের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা। সামাজিকভাবে কখনো আমি মেলামিশি করতে চাইতাম না। এই নিয়ে সচুর মায়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি কম হয়নি। তোমার কাছে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, তাঁর মৃত্যুর পর আমি যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেললাম।

"বি-এ পরীক্ষার পর সচু এল আমালনীরে। ওর বিয়ের জন্য গত দু' বছর থেকে পাত্র খুঁজছিলাম। অনুরোধ ক'রে প্রথমে চিঠি লিখলাম কলকাতার আত্মীয়স্বজনদের। বন্ধুবান্ধবদের খোসামোদ করতেও বাকী রাখিনি। রূপ থাকলে মেয়েদের রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না। কিন্তু সচুর যে রূপ নেই তেমন খবরটা ছড়িয়ে পড়বার জন্য সময়ের কোনো দরকারই হয়নি। ওর জন্মের পর থেকে সবারই সেটা জানা হয়েছিল। দিন দিন ব্যর্থতার বোঝা বাড়তে লাগল আমার। সারা ভারতবর্ষে পাত্র খুঁজে পাচ্ছি না! সচুর মতো একটি ব্রিলিয়ান্ট মেয়ের বাপ হওয়ার জন্য এতোকাল আমি গর্ব বোধ করতাম। এখন অনুশোচনার আগুনে পুড়তে লাগলাম আমি। সচু যে কুৎসিত হয়ে জন্মেছে তার জন্য নিজেকে প্রতি মুহূর্তে অপরাধী করতে লাগলাম। এই অপরাধবোধটা আমার একটা মনের ব্যাধি হয়ে দাঁড়াল। মেয়ের সামনে মুখ তুলতে লজ্জা পেতাম। ওকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম আমি। রোগীদের নিয়ে এতো বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম যে, বাড়ি ফিরতাম রাত করে। সচু তখন ঘুমিয়ে পড়ত। অনেকদিন এমন ব্যাপার ঘটেছে যে, সন্ধ্যার পর একটাও কল নেই, চেম্বারও ফাঁকা—কি করি, কোথায় যাই ভেবেচিন্তে ঠিক করতে না পেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছি আমালনীরের বাইরে। পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, সময় নষ্ট করেছি অনেক। সুখেন্দু, সেই সময়টাই আমার বড্ড একা একা লাগত। মনে হতো, সচুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কুৎসিত হওয়ার জন্য সেও নিশ্চয়ই ঘরে বসে আমায় অপরাধী করছে।

"কলকাতার ডাকের জন্য দুটো বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বসেছিলাম আমি। রোজই ভাবতাম পাত্রের সন্ধান পাব বুঝি। কিন্তু দু'বছরের মধ্যে আত্মীয় কিংবা বন্ধুদের কাছ থেকে একটা চিঠিও এল না। উপরন্তু আমার মনে হতো, পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না বলে এঁরা সবাই আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতেন। সামাজিক সহানুভূতি কারো কাছ থেকেই পাইনি আমি। কেমন একটা ছেলেমানুষী অভিমানে মন আমার ছেয়ে গেল। বহুদিন বাংলাদেশের বাইরে। প্রবাসী বাঙ্গালী আমি। এখন থেকে ভাবতে লাগলাম, বাংলাদেশের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। মনেপ্রাণে মহারাষ্ট্রীয় হওয়ার জন্য কতো রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছি। আমালনীরের মহিলা সমিতির সেক্রেটারীকে ডেকে এনে একদিন পাঁচ হাজার টাকার চেক দিয়ে দিলাম। মদনকে হুকুম দিলাম অতঃপর আমার বাড়িতে শুধু মহারাষ্ট্রীয় রান্না হবে। বুঝলে সুখেন্দু, এরপর বিচারবুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেল আমার। বাঙ্গালী আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অ-বাঙ্গালীদের কাছে নানা রকমের কুৎসা রটাতে লাগলাম!

আমার এই আকস্মিক পরিবর্তনটা চোখে পড়ল সচুর। আমি যে ওর জন্য পাত্র জোগাড় করতে পারছি না তা সে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছে বলেই আমার লজ্জার পরিমাণ আরও বাড়ল। রাত্রে ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে ভাবি, আমাকে সবাই হারিয়ে দিতে চায়। সামাজিক ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতায় কল্পনার রং মাখিয়ে কতো আজগুবী গল্পই না মনে মনে তৈরি করেছি আমি। একদিন সন্ধ্যেবেলা বাইরে বেরুবার মুখে সচু এসে ঢুকে পড়ল ঘরে। জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি একটু সময় হবে বাবা?' গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম, 'আমার তো সময়েরই অভাব মা। দু'এক মিনিট সময় দিচ্ছি, যা বলবি তাড়াতাড়ি বল।' শেষের দিকে গলার আওয়াজটা আমার রূঢ় হয়ে উঠল। তা সত্ত্বেও শান্তভাবে সচু বলল, 'আমার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই বাবা। আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজেই ঠিক করে ফেলেছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সচু।

সেদিন আর রোগী দেখবার জন্য বাইরে গেলাম না। ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলাম। সচু তার নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই ঠিক করে ফেলেছে—কথাটির অর্থ কি? কারো সঙ্গে প্রেমে পড়েছে না কি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পড়েছে। ওর মতো অমন ধীর-স্থির স্বভাবের মেয়ে ফালতো কথা বলতে পারে না। বলা অসম্ভব। আমি নিজেও কিন্তু চেয়েছিলাম সচু প্রেমে পড়ুক। এতোদিন কেন প্রেমে পড়েনি সেই কথা ভেবে ওর উপর রাগ হতো খুব। সেই জন্য আমি ক'দিন আগে কলকাতা থেকে ভি-পি যোগে গোটা বারো বাংলা উপন্যাস আনিয়েছিলাম। একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে পুরো বাণ্ডিলটা রেখে এসেছিলাম ওর টেবিলের ওপর। এখন মনে হল উপন্যাসগুলো কাজে লেগেছে।

"আমি রোজই অপেক্ষা করে থাকতাম সচু এসে তার প্রেমের কাহিনী খুলে বলবে আমার কাছে। যাকে সে ভালবাসে সে বাঙালী, না মারাঠী? জবাবটা জানবার জন্য এতো বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম যে, সচুর অনুপস্থিতিকালে ঢুকে পড়লাম ওর ঘরে। এক মাস ধরে সচু এখানে এসেছে। ছেলেটি কি একটা চিঠিও লেখে নি? বই-এর ভাঁজে যদি তার একটা ফোটো পাওয়া যায়? আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সচু যাকে ভালবাসবে তার চেহারা হবে খুবই সুন্দর। লম্বা, চওড়া এবং ফরসা।

"ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের ওপর মাত্র একটা বই পড়ে রয়েছে। উপন্যাস নয়। বিরাট মোটা একটা অর্থ-বিজ্ঞানের বই। অর্থ-বিজ্ঞান নিয়ে অনার্স পরীক্ষা দিয়েছে সে। অতএব হাতের কাছে একটা মোটা বই পড়ে থাকা অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু না। কিন্তু আমার তবু ধারণা জন্মাল মেয়েটা একেবারে পয়লা নম্বরের বোকা। পরীক্ষার পরেও ভারবাহী পশুর মতো অর্থ-বিজ্ঞানের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। উপন্যাসগুলো কোথায় গেল? খুঁজতে গিয়ে দেখি খাটের তলায় বাণ্ডিলটা সরিয়ে রেখেছে সে। ঠিক যেমনভাবে ভি-পি পার্সেলটা এসেছিল সেইভাবেই আছে। ভেতরের বস্তু সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল পর্যন্ত জাগেনি মেয়েটার! রাগ হল খুব। উবু হয়ে বসে বাণ্ডিলটার গায়ে হাত বুলতে লাগলাম। আহা, উপেক্ষার ধুলো জমেছে কতো। এমন সময় সচু এসে ঘরে ঢুকে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছ বাবা?' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আজ একটু ফুরসত পেয়েছি, ভাবছিলাম উপন্যাস পড়ব। হ্যাঁ-রে সচু, সেদিন যে তুই বললি নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই ঠিক করে ফেলেছিস, ব্যাপারটা কি? আমায় খুলে বল। কাউকে ভালবেসেছিস নিশ্চয়ই? আমি জানতাম, তোর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ছেলের অভাব হবে না। ছেলেটি কে রে? বাঙালী, না মারাঠী? অবিশ্যি ইয়োরোপীয়ান হলেও আমি আপত্তি করব না। তোর মতো ব্রিলিয়ান্ট—' আমার কথা শুনে সচু আকাশ থেকে পড়ল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর শাড়ির আঁচলটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। কান্না চাপছিল সচু। হাজার চেষ্টা করেও চাপতে পারল না সে। দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

"আগেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ওর হাতের মুঠোতে একটা কাগজের টুকরো। সেটা এবার আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'অধ্যাপক ওয়াদিয়া টেলিগ্রাম করেছেন। আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেছি। যদি টাকা দাও তো এবার আমি বিলেত চলে যাই। লেখাপড়া করাই আমার ভবিষ্যৎ। আমার জন্য তুমি লাঞ্ছনা আর অপমান সহ্য করবে তা আমি চাই নে। দেবে টাকা?' প্রবলভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বললাম, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। টাকা দিয়ে আমি কি করব? প'চাত্তর হাজার টাকা আমার ব্যাঙ্কে জমেছে। স-ব তোর। যতোদিন ইচ্ছে লেখাপড়া করিস মা। আমি জানি, জ্ঞান-বিদ্যার জগতে সুখ্যাতি তোর ছড়িয়ে পড়বে। আমাকে দেখিয়ে সবাই বলবে, ঐ হচ্ছেন সচুর বাবা। শুধু আর ক-টা দিন আমায় সময় দে মা। কলকাতার খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছি। ফলাফলটা একবার দেখে নিই।' জিজ্ঞাসা করল সচু, 'কিসের বিজ্ঞাপন বাবা?' বললাম, 'পাত্র চাই। ব্যাপারটা কি জানিস মা? বিয়ের পর বিদুষী হওয়াই ভাল।' সুখেন্দু, আমার কথা শুনে সচিত্রা চুপ করে রইল। হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। টেলিগ্রামটা শুধু হাত দিয়ে চটকাতে লাগল। তারপর মেঝের ওপর কাগজের টুকরোটাকে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। চলো সুখেন্দু, খেয়ে আসি। মদন মেহতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।"

খাবার ঘরে গিয়ে খেতে বসলাম আমরা। খাবার দিকে মন ছিল না ডাক্তার সেনের। অতীতের কাহিনী-অন্বেষণে মনটা তাঁর ব্যস্ত হয়ে আছে। হয়তো বা কাহিনীর বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলো গুছিয়ে উঠতে পারছেন না। আমি তাঁকে বললুম, "বিয়ের জন্য এতো বেশি পেড়াপিড়ি না করলেও পারতেন। পৃথিবীর সব মেয়েরই কি বিয়ে হয়? তা ছাড়া সচুর মতো ব্রিলিয়ান্ট মেয়ের লেখাপড়া করাই উচিত ছিল। আর কিছুদিন যদি আপনি অপেক্ষা করতেন—"

"হ্যাঁ, তোমাকে দেখবার পর থেকে শুধু সেই কথাই ভাবছি। কিন্তু তখন আমি ওকে বিয়ে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি। ক্রমাগত ভেবে চলেছি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই আমার পেছনে পেছনে হাসছে। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় এবং কৃতী চিকিৎসক আমি, আমাকে হারিয়ে দেওয়া কি সহজ কথা? বিজ্ঞাপনের জবাব আসতে লাগল। ওতে লেখা ছিল উচ্চ শিক্ষার জন্য পাত্রকে প'চিশ হাজার টাকা নগদ দিতে প্রস্তুত আছেন কন্যার পিতা। কয়েক শো চিঠি এসে উপস্থিত হল

আমার কাছে। আর সবাই এল শুধু কলকাতা থেকে। যেন কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের অস্তিত্ব নেই! আমার ধারণাই ছিল না যে, কলকাতার রকের ছেলেরা পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার জন্য এতো বেশি উদগ্রীব।

"আসা-যাওয়ার ভাড়া দিয়ে চারটি ছেলেকে বিভিন্ন তারিখে ডেকে আনলাম এখানে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, চারটি ছেলের মধ্যে একজনও সুচুকে দেখতে চাইল না! সকলের শেষে যে ছেলেটি ইন্টারভিউ দিতে এল সে বলল, 'দেখবার দরকার নেই। সাত-দিন পরেই ওর বিয়ের একটা তারিখ আছে। সেই দিনই দেখব। আমি পাস-পোর্টের জন্য দরখাস্ত করে এসেছি। ব্যাংকে একটা ছোট্ট একাউন্ট খুলতে হল। এখান থেকে পঁচিশ হাজার টাকা নগদ নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনি আমায় একটা ক্রসড্ চেক দিন—' ছেলেটি সত্যি সত্যি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। বালিগঞ্জের কালচারড্ ছেলে সে। ডান হাতের আংগুলগুলো দেখলাম খুবই শীর্ণ এবং তামাটে। সিগারেট-বিড়ির ধোঁয়া লেগে লেগে স্বাভাবিক রংটা আর নেই। পুরনো এবং পচা চিটে গুড়ের মতো দেখতে। পঁচিশ হাজার টাকার চেকখানা ধরবার জন্য সেই আংগুলগুলোই এখন উদ্যত হয়ে উঠল। সামর্থ কিংবা সংযম তাতে নেই, স্বাভাবিক দুর্বলতায় হাতের পাঞ্জাটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। পার্স থেকে টাকা বার করে বললাম, "আসা-যাওয়ার তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া, দূরের পথ খাওয়া-দাওয়ার জন্য পনরোটা টাকা বেশি দিলাম।" খপ করে টাকাগুলো টেনে নিয়ে ছোকরাটি বলল, 'তা যা বলেছেন—পথ যেন আর শেষ হতেই চায় না।' সুখেন্দু চলো বসবার ঘরে গিয়ে বসি। টেবিলটা ওরা সাফ করে ফেলুক।"

খাবার ঘর থেকে ড্রইং-রুমের দূরত্ব খুব বেশি নয়। সামনে একটা চওড়া করিডোর। বাঁদিকে পাশাপাশি গোটা তিন ঘর। সেই ঘর তিনটে পার হয়ে এলেই ড্রয়িং-রুম। এই পথটুকু হেঁটে যেতে যেতে মনে হল আমার, ডাক্তার সেন আর দূরের মানুষ নন। অতীত কাহিনীর করিডারটা আমরা দু'জনেই আজ এক সংগে পার হয়ে এলুম। রাত কম হয়নি। টুং টুং করে দেয়াল ঘড়িতে ঘন্টা বাজল। রাত এগারোটা। মুখোমুখি হয়ে বসলুম আমরা। ডাক্তার সেন বলতে লাগলেন, "ছেলেটিকে আমি বাইরের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। চলে গেল সে। হঠাৎ দেখি, বাঁ দিকের পথ দিয়ে অপরিচিত একজন যুবক আমার ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা। বাঙ্গালী বলেই তো মনে হচ্ছে। অতি সুপুরুষ। বাগানের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে-ছিলাম আমি। সে ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকল। পরিচয় ঘোষণা করার আগেই পায়ের ধুলো নিল আমার। অমন একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবকের বিনয়-নম্র স্বভাবের প্রমাণ পেয়ে মনটা আমার পুলকোচ্ছল হয়ে উঠল। ভাবলাম, আমন্ত্রণ পায়নি, হয়তো বিজ্ঞাপন পড়ে ছুটে এসেছে আমালনীরে। কোনো কিছু প্রশ্ন করবার আগেই মনে মনে ছেলেটিকে আমি সুচুর সংগে বিয়ে দিয়ে ফেললাম। ছেলেটি বলতে লাগল, 'আমার নাম গুণময় গুপ্ত। আপনাদেরই স্বজাত। চাকরি নিয়ে মাস দুই হল এখানে এসেছি। দেশাই এন্ড দেশাই কোম্পানীর কেমিস্ট আমি। আপনি আমায় গণু বলে ডাকবেন। বছর দুই আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এস-সি পাশ করেছি। দারু-হরিদ্রার রাসায়নিক গুণ সম্বন্ধে রিসার্চ করছিলাম। হঠাৎ এখানে চাকরি পেয়ে গেলাম। বাবা এবং মা কেউ নেই। একটি বোন ছিল বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কলকাতার কাছে হালিশহরে আমার বাড়ি। কতো দিন ভেবেছি আপনার সংগে এসে দেখা করব, সময় করে উঠতে পারিনি। আপনি কি মিস্টার দেশাইকে চেনেন?' বললাম, 'হ্যাঁ চিনি।' মৃদু হেসে গুণময় গুপ্ত বলল, 'তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, মাস দুই-এর মধ্যে কোম্পানীর চেহারা দিয়েছি বদলে। একটা কুটির শিল্পের মতো টিম টিম করছিল......বিরাট পরিকল্পনা আছে আমার মাথায়।' বুঝলে সুখেন্দু, এমন সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথাগুলো বলে গেল গুণময় যে, আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। তুমি যে বাড়িটাতে আজ ভাড়াটে সেখানেই সে প্রথম এসে উঠেছিল। তুমি যে চাকুরি নিয়ে এসেছ, গুণময় গুপ্তও এসেছিল সেই চাকরি নিয়ে। ঘটনার মধ্যে কি অদ্ভুত মিল রয়েছে, না সুখেন্দু?"

"হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। তবে দারু-হরিদ্রা নিয়ে আমি কখনো রিসার্চ করিনি।"

"তা ঠিক, তা ঠিক। কয়েক দিনের মধ্যে গুণময় আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। মিস্টার দেশাই একদিন বললেন, 'হ্যাঁ, এমন লোকই আমি চেয়েছিলাম। কী অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি। এতো অল্প সময়ের মধ্যে নিজের কারখানা নিজে চিনতে পারি না। বাঙ্গালীর মাথা আছে বটে। চব্বিশ ঘন্টাই চিন্তা করছে, সৃষ্টির প্রেরণায় টগবগ করে ছেলেটি।' খবর শুনে খুশী হলাম। পরিচয় করিয়ে দিলাম সুচুর সংগে। আমার অবচেতন মনে গুণময় জামাই হয়ে বসেছে প্রথম সাক্ষাতের দিন। কথাটা একদিন ওর কাছে উত্থাপন করলাম। বললাম, "পঁচিশ হাজার টাকা আমি নগদ দেব। আমি জানি মেয়ে আমার সুন্দরী নয়।" আমার প্রস্তাব শুনে কেমিস্ট গুণময় গুপ্ত অপমানিত বোধ করল। বলল সে, "ছি ছি, টাকার কথা তুলবেন না—" উবু হয়ে বসে পায়ের ধুলো নিয়ে গুণময়ই বলল, "মানুষের সৌন্দর্য শুধু দেহের ওপর ভেসে থাকে না। আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম। কাণাকড়িও লাগবে না আপনার।" কথা শুনে উত্তেজনা এতো বাড়ল যে, আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলাম। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিয়েছি আমি! সুচুকে খবরটা দেবার আগে আমালনীরের অন্য সবাইকে জানিয়ে এলাম তার বিয়ের কথা। কল-কাতার আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে সেই দিনই চিঠি লিখলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল চিঠির সংগে গুণময়ের একটা করে ফটো পাঠিয়ে দিই। সবাই দেখুক আর ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরুক। আহা, এমন সুন্দর বর জুটল সুচির। এরপর আরও একটা কাণ্ড করে বসলাম আমি। গুজব রটিয়ে দিলাম, কেমিস্ট গুণময় গুপ্ত সুচুর প্রেমে পড়েছে। ওকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে সে। গুজবটা কেউ বিশ্বাস করল কি না জানি না, কিন্তু আত্ম-তুষ্টির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম আমি। এতোদিন মনে হতো আমার এই সুন্দর বাগানওয়ালা বাড়িটার মধ্যে প্রাণ নেই, মরুভূমির মতো সারাটা দিন খরখরে হয়ে থাকে। এমন সুন্দর ঝাউ আর পাম গাছগুলোকে মনে হতো রোদের তাপ লেগে লেগে ঝলসে গিয়েছে। সবুজের বুকে শ্মশানের ছাই দেখতাম আমি। সৃষ্টির সাবলীল ছন্দ-বেগের চিহ্ন কোথাও ছিল না। কতো-দিন উদাস দৃষ্টিতে ঐ গাছগুলোর দিকেই চেয়ে রয়েছি। ঐ ডাল থেকে

ও ডালে পাখীগুলি উড়ে উড়ে বসছে— কিচির মিচির আওয়াজও করছে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ওরা বোবা। কথা কয় না, গানও গায় না। জন্ম-অভিশপ্ত মূক বিহঙ্গ। পুরো বাড়িটা আমার চোখে একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকের মতো ভেসে উঠত। ভাবতাম, আধুনিক সভ্যতার মতো এটাও বুঝি পুরুষত্বহীন। ওয়েস্ট ল্যান্ড। আজ সেই ছবিটাই একেবারে বদলে গেল। সৃষ্টির ছন্দবেগ নিজের মধ্যেও অনুভব করলাম।

"বিয়ের তারিখ পর্যন্ত ঠিক করে ফেললাম। সচুর সম্মতি নেয়া দরকার বোধ করিনি। একদিন তোমার বাড়িওয়ালা বৃদ্ধ রাও সাহেব এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বিয়ের খবর তিনি পেয়েছেন। আমার পাত্র নির্বাচন তাঁর পছন্দ হয়নি। গুণময় গুপ্ত তাঁরই ভাড়াটে। কয়েক মাস থেকে ছেলেটিকে দেখছেন তিনি। ভাল লাগেনি তাঁর। কেন ভাল লাগেনি তার কারণ? রাও সাহেব কারণ কিছু দেখাতে পারলেন না। গুণময় কি ঠিক মতো ভাড়া দেয় না? দেয়। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে নিজে এসে পেঁাছে দিয়ে যায়। তবে? বাড়ি বসে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাড়াটে তাঁর মদ খায় না কি? না, তাও নয়। মদ খাওয়া তো দূরের কথা, সিগারেট পর্যন্ত খায় না সে। তবে তিনি গুণময়কে পছন্দ করেন না কেন? ছেলেটিকে তাঁর খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়। চব্বিশ ঘন্টাই বড় বড় কথা বলে। যা কিছু দেখে সবই তার কাছে ছোট মনে হয়। কোনো কাজেই সন্তুষ্টি নেই। এক কোটি টাকা হাতে এলেও খুশী হবে না। বোধ হয় পরশ্রীকাতর, নির্মম এবং লোভী। লোভী? হোঁচট খেলাম যেন! পঁচিশ হাজার টাকা স্বইচ্ছায় দিতে চেয়েছিলাম, হাত বাড়াল না সে। তবে তাকে লোভী বলব কেন? হ্যাঁ, সাধারণের তুলনায় গুণময় অস্বাভাবিক। সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল। গবেষণা-প্রবণ মন। দারু-হরিদ্রার মধ্যে বিরাট বড় একটা ওষুধের কারখানার স্বপ্ন দেখে সে। তাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলা চলে, কবি বলতেও আপত্তি নেই—কিন্তু লোভী কিংবা পরশ্রীকাতর বলব কি করে? হ্যাঁ, একটু বাড়াবাড়ি আছে। সৃষ্টির উন্মাদনা মাঝে মাঝে পাগলামী বলে মনে হয়। অল্প বয়স, আত্ম-নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত নয়। সৃষ্টিপ্রয়াসী মনের ব্যাকুলতা ওর এতো প্রচণ্ড হয়ে উঠত যে, মাঝে মাঝে আমার চোখেও অস্বাভাবিক ঠেকত। কিন্তু খুশী হতাম আমি। আমি ডাক্তার, গুণময়ের দৈহিক সামর্থ আমার কাছে অসাধারণ মনে হতো। ওর ঐ ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে চেয়ে আমি ভাবতাম সচু সুখী হবে।

"একদিন সচুকে ডেকে বললাম, বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলেছি মা। তুই এখন বড় হয়েছিস, তোর সঙ্গে সব কথাই খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা চলে। বিয়ের আগে পর্যন্ত বাইরের সৌন্দর্য নিয়ে মানুষ মাথা ঘামায়। পরে সে সব কথা পুরুষ মানুষের মনে থাকে না। সে চায় স্বাস্থ্য, অর্থাৎ দেহ-গত সুখটাই তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। তোর রূপ না থাকতে পারে, স্বাস্থ্য আছে। গুণময়ও জোয়ান পুরুষ। হাত, পা, আঙ্গুল সব কিছুই লম্বা ধরনের। যে রূপ দিয়ে স্বামীর তৃষ্ণা মেটাতে পারে না, সে দেহ দিয়ে তার ক্ষুধা মেটাতে পারে। আমি ডাক্তার, ভেতরের রহস্য খুলে বললাম তাকে। অর্থ-বিজ্ঞানের সেই মোটা বইখানা বুকের ওপর চেপে ধরে ঘরে ঢুকেছিল সচু। বোধ হয় পড়তে পড়তে উঠে এসেছিল। আমার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনল। দু এক মিনিট চিন্তাও করল। আমি ওকে আজ ভাল ক'রে দেখলাম। হ্যাঁ, ওর মায়ের মতোই স্বাস্থ্য পেয়েছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সতেজ পরিণতি যে কোন পুরুষের চোখে সুন্দর লাগবে। দেহ-নৈবেদ্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতারণা নেই। ভোগের সাধনায় সিদ্ধি আনবে সচু। একটু পরেই সে বলল, 'আমি বিলেত যেতে চাই, বাবা। বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে ফিরে এসে করব। এখন এসব বন্ধ করে দাও। আমি না হয় গুণময়-বাবুকে বুঝিয়ে বলব।' ছিলে লাগানো ধনুকের মতো মনটা আমার টনটন করছিল। ওর কথা শুনে ছিলেটা ছিঁড়ে গেল যেন। ধমকে উঠলাম আমি, 'বিয়ের পর বিলেত গেলে কি তোর অর্থ-বিজ্ঞানের ওজন কিছু হ্রাস পাবে? বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। তা ছাড়া গুণময়ের পক্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকা সম্ভব নয়।' বুঝলে সুখেন্দু, বিয়ে দেওয়ার জন্য আমি যে মরিয়া হয়ে উঠেছি তা বোধ হয় মেয়েটা বুঝতে পারেনি। আমি তো সচুর কাছে হেরে যেতে পারি না। আমার মনটা কুৎসিত হয়েছে বলে সে কি আমায় সারাজীবন ধরে অপরাধী করে রাখবে না? তুমি হয়তো বলবে এটা আমার মানসিক দুর্বলতা। হ্যাঁ, দুর্বলতা হলেও সত্য। আমার সব কিছু কর্ম-তৎপরতার মূলে এই দুর্বলতাটাই কাজ করছিল। সুখেন্দু, ক'টা বাজল?"

সজাগ ও সতর্কভাবে গল্প শুনছিলুম। প্রশ্নটা যেন ধাক্কার মতো আমার গায়ে এসে লাগল। হাতঘড়িতে সময় দেখাটাও বিরক্তিকর মনে হ'ল আমার। তবুও বাঁ হাতটা চোখের কাছে টেনে তুলে বললুম, "মাত্র দুটো।"

"কাল সকালে ডিউটিতে যাবে না?"

"যাব। এখান থেকেই সোজা চ'লে যাব কারখানায়। আমি বাঙালী। আমার কাছে ডিউটির চেয়ে গল্পের দাম বেশি। এবার আপনি বলুন—" —

"নির্দিষ্ট তারিখে বিয়ে হ'য়ে গেল। আমালনীরের কাউকে বাদ দিইনি, সবাইকে নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এলাম। আমার কর্মচাঞ্চল্য বেড়ে গেল অস্বাভাবিক মাত্রায়। গুণময় যখন নগদ টাকা নিয়ে নি তখন খরচ করতে আপত্তি কি? আসা-যাওয়ার ভাড়া দিয়ে কল-কাতা থেকে আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে এলাম আমালনীরে। গুণময়কে দেখাতে চেয়েছিলাম আমি। এঁরা সবাই ভেবে রেখেছিলেন সচুর জন্য পাত্র আমি জোগাড় করতে পারব না।

"বিয়ের আগের দিন রাত্রে সচুকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে এসে বললাম, 'তোর মাসী পিসীর দল ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরছেন। ওদের জ্বলুনী স্বচক্ষে দেখবার জন্যই কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছি। সচু, কাছে আয় মা। আমি তোর শুধু বাপ নই, ডাক্তারও। বিয়ের পর বছরখানিক সন্তান না হওয়াই ভাল। একটা বছর ঘুরে বেড়া, আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দে।' বুঝলাম আমার কথা শুনে লজ্জা পেল। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

"বিয়ের পরদিন সচুকে নিয়ে গুণময় চলে গেল নিজের বাড়িতে। অর্থাৎ যে বাড়িটায় তুমি এখন বাস করছ সেটাই ছিল ওর বাড়ি। তোমার শোবার ঘরটা ওদেরও শোবার ঘর ছিল। সেই দেয়াল, সেই মেঝে, সেই সিলিং—নেই শুধু সেই বিরাট সাইজের দশবাই ন' ফুট খাট-খানা। গুণময় সঙ্গে ক'রে সেটা কল-কাতা নিয়ে গিয়েছে।

"দিন পাঁচেক পর সচু এসে বলল, 'আজ আমরা কলকাতা যাচ্ছি। তোমার

দেশের অমূল্য কলা-সম্পত্তির বিদেশ যাত্রা

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

একদেশের কলা-শিল্পের নিদর্শন দূরে দেশান্তরে প্রেরিত হয়, নির্বাসিত হয়—নানা কারণে—নানা মানুষের মধ্যস্থতায়, বিদেশের দূতগণের মারফত, রাষ্ট্রবিপ্লব ও দেশ আক্রমণের ফলে, লুণ্ঠন ও অপহরণের দ্বারা, বণিক ও ব্যবসাদারের পণ্য বিনিময়ের মারফত, পরিব্রাজক ও ধর্মযাজকদের ঝোলায় চড়িয়া এবং বিদেশের শিল্প-সংগ্রাহকদের ও কলারসিকদের সৌন্দর্য-পিপাসার চাহিদার তাগিদে।

ভারতের শিল্পকলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দৃষ্টান্তের প্রমাণ পাওয়া যায়—প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার প্রাক্-ঐতিহাসিক কীশ্ নগরীতে প্রাপ্ত সিন্ধু-সভ্যতার কলার পরিচায়ক বৃষাঙ্কিত শীলমোহরের আবিষ্কারে। স্যার জন মার্শেলের মতে—এই শীলমোহর খণ্ড কোনও বণিক ভারত হইতে কীশ্ নগরীতে বহন করিয়া লইয়া যায়। বৈদিক যুগের কলা-শিল্পের দেশান্তরিত হইবার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পর (খৃঃ পূঃ ৩২৬) সম্ভবতঃ ভারতের কিছু কিছু শিল্পের নিদর্শন গ্রীস দেশে পৌঁছিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। কুষাণ-যুগে রচিত একটি সুন্দর হস্তিদন্তের যক্ষিণীর মূর্তি রোমের একটি ধ্বংস স্তূপ হইতে পাওয়া গিয়াছে। কুষাণ যুগে একটি অপরূপ অনুপম বুদ্ধ প্রতিমা দেশান্তরে নির্বাসিত হইয়াছিল। এটি হইল কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ কর্তৃক খোদিত চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমা। অনেকের বিশ্বাস প্রতিমাটি বুদ্ধের জীবিতকালে খোদিত হইয়াছিল। প্রতিমাটি কুষাণ-সম্রাট কণিষ্ক পুরুষপুরে স্থানান্তরিত করেন। পরে মূর্তিটি তাকলামাকানের খোটান শহরে আনীত হয় এবং তথা হইতে চীনদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে পিকিনের এক প্রাচীন মন্দিরে অদ্যাবধি সুরক্ষিত আছে। তারপর আসে চীন পরিব্রাজকদের যুগ। ফাহিয়েন (৩৯৯ খৃঃ অব্দ), হুয়েন্ থসাং (৬২৯-৬৪৫ খৃঃ অঃ), ইৎসিং (৬৭১ খৃঃ অঃ) প্রভৃতি প্রায় ৮।১০ জন চৈনিক পরিব্রাজক ভারত হইতে অনেক পুঁথি, চিত্র, প্রতিমাদি সংগ্রহ করিয়া চীন দেশে লইয়া যান।

শিব-পার্বতী
অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজপুত চিত্র [বোস্টন মিউজিয়াম]

এই সব ভারতের কৃষ্টিমূলক চিত্র, প্রতিমাদির সংখ্যা খুব কম ছিল না—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় হুয়েন্ থসাংয়ের জীবন-চরিতে উল্লিখিত একটি কথায়। হুয়েন্ থসাং যখন ১৫ বৎসর

ভারতে ভ্রমণ করিয়া দেশে তাঁহার গৃহের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার সংগৃহীত বস্তুগুলি বহনকারী অশ্বচালিত শকটশ্রেণীর দৈর্ঘ্য অর্ধক্রোশের অধিক।

আট, নয় ও দশ শতকের ভারতীয় শিল্পকলার বিদেশ যাত্রার বিশেষ বিবরণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

একাদশ শতকের গোড়ায় নূতন ইতিহাস শুরু করিলেন গজনীর সুলতান মামুদ (১০০০—১০৩০ খৃঃ অব্দ)। গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের উপর উপর্যুপরি আক্রমণ করিয়া ঐ মন্দিরের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন ও অপহরণ করিয়া উহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত নানা উৎকৃষ্ট প্রতিমা ছিল। বহু কোটি মুদ্রার সহিত অপূর্ব শিল্পকলায় রচিত এইসব অমূল্য মূর্তি-কলার নিদর্শন সুলতানের দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী হস্তে ভারত হইতে অপসারিত হয়।

দিল্লীর সুলতান, খিলজি ও তুঘলক বংশের রাজত্বকাল—আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে [illegible] নিরাশ। মুঘল সম্রাটদের কালে (১৫২৬—১৭০৭ খৃঃ অঃ), জেহাঙ্গীর শাহ (১৬০৫ [illegible]) ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮—১৭০৭) অনেক বিদেশের [illegible] মানুচি, [illegible] পিয়ের, [illegible] প্রভৃতি অনেকে মুঘল সম্রাটদের দরবারে প্রবেশ লাভ, [illegible] উপঢৌকনাদি লাভ করিয়াছিলেন। [illegible] মধ্যে [illegible] অনেক উৎকৃষ্ট মুঘল [illegible] ছিল। মানুচী ছিলেন ঔরঙ্গজেবের চিকিৎসক; তিনি অসংখ্য চিত্র সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে লইয়া যান। তাঁহার সংগৃহীত চিত্রমালা—এখন প্যারিসের লুভর্ চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর কিছু পরে ভারতীয় চিত্রাদির অভিযান নূতন পথ অবলম্বন করে। লুণ্ঠন নয়, কূটনৈতিক উপহার নয়, রূপরসিকদের ভারতের চিত্রের ক্রয়ের কৌতুকপূর্ণ ইতিহাস। অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসিয়া (১৭৪০—১৭৮০) ভিয়েনা শহরের উপকণ্ঠে তাঁহার সুবিখ্যাত শোনব্রুণ প্রাসাদ নির্মাণ করান এবং এই প্রাসাদের একটি কক্ষ উৎকৃষ্ট মুঘল-কলমের চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত করান। ৬০ খানি আঁকাবাঁকা (rococo) ফ্রেমে সাজান ৬০ খানি মুঘল কলমে লেখা এইরূপ উৎকৃষ্ট চিত্র তখনকার কালে ইউরোপের আর কোন সংগ্রহে ছিল না। খবর পাওয়া গিয়াছে যে, ছবিগুলি কনস্টান্টিনোপল শহর হতে ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে খানকয়েক ছবি বোধ হয় হল্যান্ড হইতে আসিয়াছিল —কারণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে —ইহার মধ্যে কয়েকখানি চিত্রের নকল করিয়াছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ওলন্দাজী চিত্রশিল্পী রেম ব্রান্ট্। যাহা হউক শোনব্রুণ প্রাসাদের এই চিত্রগুলির প্রমাণে বলা যায় যে, ভারতের চিত্রকলার আদর ও গুণ গ্রহণ করিয়াছিল সমকালীন ইউরোপীয় কলা-রসিকেরা।

মুঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের বিচক্ষণ কলাবিদ্যার প্রীতির ফলে বহু সহস্র দুর্মূল্য সুচিত্রিত পুঁথিপত্র এবং বিখ্যাত ওস্তাদ শিল্পীদের হাতে লেখা উৎকৃষ্ট চিত্রাবলী ও সূক্ষ্ম লিপিকারদের হাতে লেখা পুঁথি ও "খুসখতের" বিরাট সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল দিল্লীর বহুমূল্য রাজকীয় পুঁথিশালায়। আকবরনামা, জাহাঙ্গীরনামা প্রভৃতি সমসাময়িক ইতিহাসের পাতায় এই পুঁথিশালার রত্নরাজীর চমকপ্রদ বর্ণনা আছে। ভিনসেন্ট্ স্মিথ এবং অন্যান্য বিদেশীরা এই পুঁথিশালার কলাবস্তুর মূল্য নিরূপণ করেছেন বহু কোটি স্বর্ণমুদ্রা। এইসব অলৌকিক কলা-সম্পদ উপযুক্ত দায়িত্বশীল কর্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছিল, অন্ততঃ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত। এবং প্রমাণ পাওয়া যায় সম্রাটরা স্বয়ং পুঁথিশালার কলাবস্তু প্রতি বৎসর পর্যবেক্ষণ করে তাদের সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলার [illegible] করিতেন। কিন্তু হায়, মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর রাজকীয় পুঁথিশালার দুর্দিন উপস্থিত হইল। নাদির শাহের (১৭৩৯) দুর্ধর্ষ আক্রমণে দিল্লীর ধনরত্ন ও কলাবস্তু লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইল। ঐ সময়ে বিশ্ববিখ্যাত "কোহিনুর" হীরকখণ্ড এবং বহু কোটি স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে বিরচিত "ময়ূর-সিংহাসন" পারস্য দেশে স্থানান্তরিত হইল। নাদির শাহের লুণ্ঠনের পরে দিল্লীতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল—তাহা অপহৃত হইল আহাম্মদ শাহ দুরাণীর উপর্যুপরি নিষ্ঠুর আক্রমণে (১৭৪৮—১৭৫৮)। তাহার পর শাহ-আলাম ও বাহাদুর শাহের সময় জাঠ ও মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণে দিল্লীর পুঁথিশালা নিঃশেষিত হইল। ইহার কিছু পূর্ব হইতেই দিল্লীর কলাবস্তু অপহৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইউরোপের বাজারে চালান হইতে শুরু হয়। প্রথমেই অপহৃত হইয়া বিদেশে চালান যায়—আকবর বাদশাহের আমলে চিত্রিত শতাধিক বৃহদাকারের চিত্রিত "আমীর হামজার" চিত্রাবলী। এইগুলি মুঘল চিত্রকলার আরম্ভের কালে চিত্রিত প্রথম "মুঘল" চিত্র—এবং এই জন্য বিশেষজ্ঞরা এই চিত্রমালাকে মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা দিয়াছেন। এই চিত্রাবলীর নিদর্শন ভারতবর্ষে কেবলমাত্র দুইখানা অবশিষ্ট আছে—বাকী সমস্ত চিত্রিত পুঁথিগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার চিত্রশালা ক্রয় করিয়াছে। ২৫ খানা নিদর্শন স্থান পাইয়াছে বিলাতের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট চিত্রশালায়। অনেক অনেক খণ্ড খণ্ড চিত্র আমেরিকার নানা চিত্রশালায় আদরের বস্তুরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক "কপি"—৬১ খানা চিত্রিত-পত্র ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল মিউজিয়ামের মূল্যবান সম্পত্তি।

ভারতের ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতনভুক ইংরাজ কর্মচারিগণ এবং "কুঠির" বড় বড় সাহেবরা—এদেশের চিত্রকে খুব অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন—কারণ, এদেশী 'কালা আদমী' যাহারা ইংরাজের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের উচ্চাঙ্গের কলা-সৃষ্টির যোগ্যতা কোথায়? জন রাস্কিনের ভারতীয় শিল্পের উপর বিদ্বেষমূলক বক্তৃতা ভারতে প্রবাসী যুবক ইংরাজগণের ভারতীয় কলার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ স্থায়ী করিয়াছে। তথাপি, অনেক ইংরাজ সিভিলিয়ান ও কোম্পানীর কর্মচারিগণ ভারতের কলা-শিল্পের না হউক, পাথর, কাষ্ঠ ও তাম্র ও পিতলে নির্মিত বহু কারু-শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া বিলাতে রপ্তানী করিয়াছিল—এই চমৎকার কারুকীর্তিগুলি এখনও সাউথ কেনসিংটন চিত্রশালায় সমাদৃত হইতেছে।

কিন্তু ভারতের চিত্রকলার ক্ষেত্রে একজন সমজদার ইংরাজ সংগ্রহকারের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। ইনি হইলেন মিঃ রিচার্ড জনসন—ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন লিপিকার ও হিসাব-রক্ষক নিযুক্ত হন (১৭৭০—১৭৯০)। ইনি ছিলেন ভারতের চিত্রকলার বিশেষ প্রেমিক এবং বহু উৎকৃষ্ট খণ্ড-চিত্র এবং ছবির মুরক্কা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংরক্ষণ করিয়াছেন। এই সংগ্রহে ৭০০ খন্ড প্রাচীন ভারতীয় প্রতিমা-শিল্পের নিদর্শন আছে, রাজপুত চিত্র আছে অন্ততঃ ৭০০ খন্ড, মুঘল চিত্র আছে অন্ততঃ ৩০০ খন্ড। এই তিন শাখার ভারতীয় চিত্রাবলী এবং বহু বস্ত্র-শিল্পের নমুনা ও কারু-শিল্পের নানা নিদর্শন একত্রিত হইয়া ভারতীয় কলাসৃষ্টির ইতিহাসের সামগ্রিক প্রদর্শনী—একস্থানে দ্রষ্টব্য বিরাট মেলা—পৃথিবীর আর কোন স্থানে, এমন কি ভারতেরও কোথাও দেখা যায় না।

ভারতের স্থাপত্যকলার শাখার অনেক খন্ড নিদর্শন স্থানান্তরিত হইয়া আমেরিকার নানা চিত্রশালার শোভা বর্ধন করিতেছে। কখনও সম্পূর্ণ প্রতিমাগৃহ বা মন্দির কোনও চিত্রশালায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যেমন গুজরাটের পাটন শহরের বাড়ি পার্শ্বনাথের কাষ্ঠ নির্মিত মন্দির নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান চিত্রশালায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯৩৯ সালে মাদুরার এক মন্দিরের স্তম্ভযুক্ত মন্ডপম্ সমূলে উৎপাটিত হইয়া সমুদ্র পার হইয়া দক্ষিণ দেশের স্থাপত্যকলার নিদর্শন স্বরূপে ফিলাডেলফিয়া চিত্রশালায় স্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে।

এখনও প্রতি বৎসর ভারতের শিল্পকলার নানা নিদর্শন আমেরিকার নানা চিত্রশালায় সংগৃহীত হইতেছে। এই সব বহুমূল্য নিদর্শন এই দেশ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ভারতবর্ষের কলা-সম্পদকে নিশ্চয়ই অনেক অংশে নিঃস্ব করিয়াছে। পক্ষান্তরে, ভারতের কলাকৃতি পৃথিবীর সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্থান লাভ করিয়া খ্যাতি ও গৌরব অর্জন করিয়াছে।

একদা নিন্দিত — বর্তমানে পাঠ্য

॥ ভ্রাম্যমান ॥

মাত্র তিরিশ বছর আগের ঘটনা।

লণ্ডনের স্ট্র্যাণ্ডে, সাউথ আফ্রিকা হাউসের মাথায় কতকগুলো মূর্তি ছিল। এক গোয়েন্দার কি খেয়াল হল, একদিন দূরবীন কষে দেখল। দেখে মনে হল মূর্তিগুলো ভীষণ অশ্লীল কারণ তাদের পরনে কোন বস্ত্র নেই। এই আবিষ্কার করেই গোয়েন্দাপ্রবর ছুটলো তার বড়-কর্তার কাছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে জানাল, হুজুর সর্বনাশ! দেশের চরিত্র রসাতলে যেতে বসেছে।

বড়কর্তা সরেজমিন তদন্ত করতে পাঠালেন এক কনেষ্টবলকে। বহু কষ্টে ছাদে উঠে কনেষ্টবলমশাই বহুক্ষণ ধরে নগ্ন নারী মূর্তিগুলিকে পরীক্ষা করে, পেন্সিলে থুতু লাগিয়ে বহু কষ্টে নোট বইয়ে মাত্র একটি কথা লিখল, 'অসভ্য'।

পুরনো সাউথ আফ্রিকা হাউস ভেঙ্গে ফেলে এখন সেখানে নূতন বাড়ি তোলা হয়েছে। আর সেই কনেষ্টবল কথিত 'অসভ্য' মূর্তিগুলিকে শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে ইংলণ্ড সরকার যত্নে তুলে রেখে দিয়েছেন। মূর্তিগুলি বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পী এপষ্টিনের রচনা।

'অশ্লীল' শব্দটির নানান অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়। যথা: নোংরা, বিরক্তিকর, বিবমিষা উদ্রেককারী ইত্যাদি। উক্ত অর্থগুলি যদি নগ্ন মূর্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়, তাহলে স্নানের সময় আমাদের কি বলা হবে?

মার্কিণ পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল ১৯৫৯ সালে 'লেডী চ্যাটার্লির প্রেমিক'কে অশ্লীল এবং নোংরা বলে-ছিলেন। কিন্তু ১৯৬১ সালে সেই বইটিই হু-হু করে বিক্রী হয়েছে। শুধু তাই নয় ধার্মিক এবং তরুণীদেরও পাঠ্য হিসাবে ছাড়পত্র পেয়েছে। উদার মতামত গোঁড়া-দের আর একটি দুর্গ এইভাবেই ধূলিসাৎ করে দেয়।

বইটিতে এমন বহু কথা আছে যা তথাকথিত সভ্য সমাজে অচল এবং যৌন-ক্রিয়াকলাপের এমন বর্ণনা আছে যা পড়ে ধর্মীয় পাঠশালার শিক্ষকরা আর্তনাদ করে উঠতে পারেন। কিন্তু এ সবের উদ্দেশ্য নোংরা ঘাঁটা নয়, নোংরা পরিষ্কার করা। ক্যাথলিক চার্চও এ বই অনুমোদন করেছেন।

এ্যাংলো-স্যাক্সন দুনিয়া গোঁড়ামির চাপে পড়ে ত্রাহি ডাক ছাড়তে শুরু করেছে। স্ফূর্তিকে তারা বলে বদমাইসি; যৌন প্রসঙ্গ উঠলেই তারা বলে নোংরামি। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে, দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকা এবং এশিয়ার মানুষদের কাছে এই মনোভাব দুর্জ্ঞেয় মনে হয়, এই মনোভাবের জন্যই সরকারী কর্তৃপক্ষ, আদালতে রাণী ভিক্টোরিয়ার নিম্নাঙ্গ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে বলেছিল, 'রাণী-দের পা বলে কিছু নেই।'

অথচ এই গোঁড়ামি জ্যাকোবিয়ানদের ছিল না। সবাই বুঝতে পারে এমন মনোভাব নিয়েই তাঁরা বাইবেল লিখে-ছিলেন। এমন পদও তাঁরা রচনা করেছেন যা এখনো প্রকাশ্যে পাঠ করা হয় না। এর কারণ কি? সেগুলি অশ্লীল না আমরাই গোঁড়ামি রোগে ভুগছি?

'লেডী চ্যাটার্লি' লরেন্সের শ্রেষ্ঠ রচনা নয় তবু এর ভীষণ বিক্রীর কারণ, অসুস্থ কৌতূহল। সন্দেহ নেই, বৃটেনের লোকেরা হায় হায় করে বুক চাপড়াবেন এই আক্ষেপে যে তাদের বই কেন নিষিদ্ধ ঘোষিত হল না।

মজার কথাটা হল, 'নিষিদ্ধ' বইয়ের সেরা সংগ্রহ রক্ষিত আছে ভ্যাটিকান এবং বৃটিশ মিউজিয়ামে। অছিমণ্ডলীর সভা-পতি হিসাবে ক্যান্টরবেরীর আর্চ বিশপ এবং ভ্যাটিকানের পোপ এই নোংরা বইগুলি যখন ইচ্ছে পড়তে পারেন, আর পারেন গবেষকরা।

অতীতে বহু বই অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল কিন্তু এখন তারা সগর্বে বইয়ের বাজারে বিরাজমান, যেমন হার্ডির 'টেস অফ ডি উবেরভিলে' এবং 'জুড দি অবস্কিওর'; শার্লটি ব্রন্টির 'জেন আয়ার' জর্জ এলিয়টের 'এ্যাডাম বিড'; দু মরিয়রের 'ট্রিবলী' ড্রেইজারের 'সিষ্টার ক্যারী'; হ্যামলিন গারলাণ্ডের 'রোজ অফ ডাচারস কুলি'; জেমস ব্রাঞ্চের 'জারগেন'; শেরউড আণ্ডারসনের 'ডার্ক লাফটার'; সিনক্লেয়ার লিউইসের 'এলমার গ্যান্ট্রি'; হেমিংওয়ের 'দি সান অলসো রাইজেস' ইত্যাদি আরো শতাধিক বই।

এইচ জি ওয়েলস যখন 'এ্যান ভেরোনিকা' লিখলেন তখনো তিনি অখ্যাত, অপরিচিত। তার আগের লেখা বইগুলির কাটতিও বিশেষ সুবিধার নয়। 'এ্যান ভেরোনিকা' ছাপাবার জন্য সর্বস্বত্ব মাত্র দেড় হাজার পাউণ্ডে প্রকাশক ফিসার আনউইনের কাছে বিক্রী করে দেন। ১৯০৯ সালে বইটি বাজারে বার হবামাত্রই 'স্পেকটেটর' পত্রিকা বইটিকে বিষাক্ত বলে ধিক্কার জানায়। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের মেয়েরা পাড়ামারি করে বইটি কিনতে শুরু করে দেয়। বইয়ে কি আছে তাই জানতেই তাদের এই ব্যাকুলতা। রাতারাতি ওয়েলস বিখ্যাত হয়ে গেলেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের পাবলিক লাইব্রেরীগুলি বইটিকে নিষিদ্ধ করে দেয়, ফলে বিক্রীও অসম্ভব বেড়ে যায়। জে এ হবসন তখন মন্তব্য করেন, 'সূর্য যদি ম্যাঞ্চেষ্টারে কিরণ ছড়ায় তাহলে অশোভন উদ্ঘাটনের দায়ে তাকেও বোধহয় অভিযুক্ত করা হবে।'

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত, পাঠক হারাবার ভয়ে কোন সম্পাদকই তার কাগজে 'সিফিলিস' শব্দটি ছাপাত না। কিন্তু সৈনিকরা রোগটির কবলে এমন হারে পড়তে শুরু করে যে সময় কর্তৃ-পক্ষ ব্রিয়ু'র বই অবলম্বনে তোলা 'ড্যামেজড গুডস' নামে ফিল্মটি সাবধানী হিসাবে সেনাবাহিনীর লোকে-দের দেখাবার নির্দেশ দেন। অথচ ব্রিয়ু'র

এই বই তখন বৃটেনে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত ছিল।

'ভাল 'শব্দ, 'মন্দ' শব্দ বলে কোন কথা, বোধহয় থাকতে পারে না। যারা পড়ছে বা শুনছে তাদের উপর শব্দের প্রতিক্রিয়া দ্বারাই অর্থ নির্ধারিত হয়। শ্রমিকরা তো কথায় কথায় দিব্যি গালে, তাই বলে নিশ্চয় তারা খারাপ লোক নয়। বরং বলা যেতে পারে যে, এদের শব্দের ভাণ্ডার অতি ছোট, তাই ভাবপ্রকাশের জন্য দিব্যি গালতে বাধ্য হয়।

মারি স্টোপস 'বিবাহিত প্রেম' বইটি লিখে প্রকাশের জন্য স্ট্যানলী আন-উইনের কাছে পাঠান। বিখ্যাত সম্পাদক, ওরেজ তখন বলেন, 'বইটি ছাপালে কাঠগড়ায় হাজির হতে হবে।' সুতরাং পাণ্ডুলিপি ফেরৎ পাঠান হয়। অন্য প্রকাশক কর্তৃক বইটি ছেপে বার হবার পর যাজকরা দেশের নীতিরক্ষার্থে ক্ষেপে ওঠেন। তখন শ্রীমতী স্টোপস ওয়েস্ট মিনিষ্টারে রোমান ক্যাথলিক ক্যাথিড্রালে গিয়ে বক্তৃতা দেবার ডেস্কের উপর এক খণ্ড বই বেঁধে রেখে আসেন। পরদিন সংবাদপত্রের শিরোনামায় খবরটি উঠে যায়। বইয়ের বিক্রীও দশ লাখে পেঁছয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে প্রত্যেকটি লোকই আজ এই বইটির প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন।

নগ্নমূর্তি যদি হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে চলাফেরাও করে তবু তাকে অশ্লীল বলা যায় না। সত্য কখনোই অশ্লীল নয়। তবে কেউ কেউ আছেন যাঁরা সব কিছুর মধ্যেই পাপ খুঁজে পান। উপায় থাকলে এ সব লোক বোধহয় রাস্তার ঘোড়াকেও প্যাণ্টলুন পরিয়ে সভ্য করবেন।

একটা ছোট্ট গল্প বলে প্রবন্ধ শেষ করি। এক বই-বিক্রেতা একবার প্রচুর বই সস্তায় কিনে বিজ্ঞাপন দেয় 'যে এই প্রত্যেকটি অবিবাহিতার অবশ্য পাঠ করা উচিত। মূল্য অতি সুলভ।' অতি অল্প সময়েই বইগুলি বিক্রী হয়ে যায়। লাভও হয় যথেষ্ট। যে মহিলারা দাম পাঠিয়েছিল তারা সকলেই সস্তায় ছাপা একখণ্ড করে বাইবেল পায়। বই-বিক্রেতা ঠকিয়েছে, এমন কথা কি বলা যায়?

বধূরাণী কমলকুমারীর সুন্দর তনু-লতাটি বুঝি আজও কোথাও গচ্ছিত আছে,—যার কাকচক্ষুসম জলরাশির উপরে আজকের কচুরিপানার পরিবর্তে সেদিন রক্তকমলের দল ভেসে থাকত!

নরেন্দুর গাড়িখানা ঘুরে প্রাচীন ইমারতের সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা দুজনে নেমে এলুম।

সামনের দিকে কারোকে দেখা যাচ্ছে না। এক সময় সন্তোষ শুধু বেরিয়ে এল, এবং সামনে নরেন্দুকে দেখে সহাস্যে নত হয়ে নমস্কার জানাল। বলল, আসুন আপনারা, মাকে ডেকে আনি।

এ বাড়ির সমস্তটাই আমাদের অতি পরিচিত। নরেন্দু ভিতরে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে এক সময় কুমার দীপেন্দ্র-নারায়ণকে আবিষ্কার করল। বলা বাহুল্য, আমাদের পুনর্মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে কিছুকালের জন্য যে-যার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা ভুলে গেলুম। ওর মধ্যেই ছোট্কা চেঁচিয়ে উঠলেন, এবার আর মানুষ নয়, পশুপক্ষী জগৎ—বুঝেছ? মানুষ নিয়ে আর কিছু হবে না!

নরেন্দু হাসতে হাসতে বলল, তোমার নতুন জগতের চেহারা একটু দেখাও, ছোট্কা। এদিকে ত সব খাঁচা দেখছি,—আর কি কি বানিয়েছ বল দেখি?

দাঁড়াও,—ব্যস্ত হয়ো না,—ছোট্কা বললেন, সব একে একে! ওরে, ওই সন্তোষ, আগে আমার মইখানা নিয়ে আয় ত?

যে আজ্ঞে—সন্তোষ বাগানের দিকে ছুটল।

ছোট্কা বললেন, এস এদিকে,—ওই যে বাক্সগুলো দেখছ, ওসব মৌমাছিদের। ওটা কি বল দেখি? ওই যে গর্ত করা—

আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম, কী ওটা—?

ওই দ্যাখ, ধরতে পারলে না ত? ওটা বেজীদের গর্ত! সাপের উৎপাৎ এদিকে বেড়েছে, তাই বেজী এনেছি। কাকের ছানা পেয়েছি দুটো সেদিন,—রেখেছি যত্ন করে!

ছোট্কার সুন্দর ও শীর্ণ মুখে কী উদ্দীপনা!

কিছুক্ষণ পরে সন্তোষ একখানা বাঁশের সিঁড়ি নিয়ে এল। সেটি সে রাখল আম গাছের গোড়ায়, এবং ছোটকা সেই মই বেয়ে হাত দশ বারো উপরে উঠে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে ঢুকলেন। সেখান থেকেই বললেন, বুঝলে নরেন্দু, এই আমার শেষ বয়সের বাসা,—এখানে পাখী সমাজ। থাক পড়ে পিছনে তোমাদের ওই পুরনো পৃথিবী,—ওটায় আমি আর রস পাইনে।

নরেন্দু নিচে থেকে বলল, যদি এরা তোমার মই কেড়ে নেয়?

ছোটকা বললেন, নিকনা কেন। চেয়ে দেখ, এবার ওড়বার দিন আসছে এগিয়ে। মানুষের পাখা পেতে আর দেরি নেই হে। আমি এরই মধ্যে পশু-পাখীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছি, বুঝলে পার্থ? দাঁড়াও, এখন তোমরা যেন পালিয়ো না, অনেক কথা আছে। আগে ভেতরটা একটু গুছিয়ে নিই।

নরেন্দু উদ্বিগ্ন ঔৎসুক্যের সঙ্গে বলল, ওটার মধ্যে রাত্রি বাস করতে পারবে, ছোটকা?

শোনো কথা!—ছোট্কা ওখান থেকেই জবাব দিলেন, ওই জন্যেই ত গাছের ডালে ঘর বাঁধলুম! আর দিনকয়েক পরে এসে দেখো, মাটিতে আর নামব না। স্রেফ এডাল থেকে ওডালে!

হেনা বাড়িতে ছিল না। আমরা গিয়ে তার ঘরে ঢুকলুম। সেই পুরনো কালের দু-চারটি আসবাবপত্র, যা আমরা আট-দশ বছর ধরে দেখে আসছি। এ ঘরের গোপনীয়তা কিছু নেই, প্রায় প্রত্যেক সামগ্রী আমাদের পরিচিত। এ আমাদের 'কমনরুম'।

বোধ করি কাছাকাছি কোনও বস্তিতে রাঙামা গিয়েছিলেন তাঁর সমাজ সেবার তাড়নায়। কেউ কিছু তাঁর হাত থেকে নিলে তিনি ভারি খুশী হন। বস্তিতে অসুখ দেখা দিলে তিনি এঘরে ওঘরে নিজের হাতে দুধ-বার্লি পৌঁছে দিয়ে আসেন। ঔষধপত্রের খরচ তাঁরই, এ তিনি স্বীকারই করে নেন। আজও বোধ করি তিনি অমনি কোনও একটা মস্ত জরুরী কাজ নিয়েই বেরিয়ে ছিলেন। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আমার সঙ্গে নরেন্দুকে দেখে মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। নরেন্দু এসেছে অনেক দিন পর। রাঙামা বললেন, এই একটু কাজ ছিল বাবা—

কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?—নরেন্দু সহাস্যে জানতে চাইল।

আর বলো না বাবা,—রাঙামা সোৎসাহে জবাব দিলেন, কাঁচা আম চারটি পেড়ে দিয়ে এলুম ওদের। লছমির বড় সাধ, আমের আচার খাবে।

নরেন্দু সহাস্যে বলল, লছমী আবার কে? আপনার গরজ কিসের?

ওমা, ওর যে খাবার ইচ্ছে, বাবা।

নরেন্দু রাঙামাকে ভালই চেনে, সুতরাং কথাটা বাড়াল না। পুরনো চেয়ারখানায় অনেক দিন পরে গা এলিয়ে দিয়ে বসে নরেন্দু এবার প্রশ্ন করল, হেনাকে দেখছিনে যে?

রাঙামা বললেন, বসো তোমরা, এক্ষুণি সে আসবে। হেনা যে আজকাল টুইশনি করতে যায়!

টুইশনি!—নরেন্দু যেন চমকে উঠল,—কবে থেকে? আমি ত জানতুম না। কেমন পেয়ে হঠাৎ রোজগার করতে ছুটল কেন? কতই বা টাকা টুইশনিতে!

নরেন্দুর দিকে আমি তাকালুম। হেসে মনে মনে বললুম, নিজের পরিশ্রমের টাকা সোনা হয় বেশি মিষ্টি লাগে!

রাঙামা বললেন, বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক, পার্থ। বাড়িভাড়ার দরুণ এক গোছা টাকা যখন আসে, মেয়ে আমার [illegible] ছিটকেয়। বলে, ওটাকা নিজের পরিশ্রমে পাওয়া। ওর দাম কি! এক কালে দেখছি মানুষের মন অনেক বদলেছে, নরেন্দু। আমাদের কালে চারদিকে এত কথা ছিল না।

আমি আড়চোখে নরেন্দুর দিকে তাকালুম। কিন্তু রাঙামার কথাগুলো সে যে যথেষ্ট মন দিয়ে শুনছে এমন মনে হল না। রাঙামা যখন আমাদের বসিয়ে রেখে খাবার প্রস্তুত করতে গেলেন, আমি তখন একটা আসন্ন নাটকীয় পরিস্থিতির সম্ভাবনায় ঈষৎ আকৃষ্ট হয়েই নরেন্দুকে বললুম, রাঙামা বা ছোট্কা তোমাদের কোনও কথাই জানেন না দেখতে পাচ্ছি! আজ তোমাদের কথা কাটাকাটি থেকে হয়ত ওঁরা কিছু জেনে নিতে পারেন।

নরেন্দু ঈষৎ গম্ভীর স্বরেই বলল, কথা কাটাকাটি করতে আমি আসিনি, পার্থ। তবে এটা খুব দুঃখের কথা, আমার এত থাকতেও হেনা রোজগার করতে বেরোল। অথচ এটা সে নিশ্চয় জানে, টুইশনি তার না করলেও চলে। ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়িভাড়া তার পক্ষে

যথেষ্ট নয় কি? খেয়াল-খুশিকে স্বাধীনতা বলে না, পার্থ!

নবেন্দুর কথাবার্তাতেই বোঝা যায়, স্বামীর ভূমিকা নিয়েই সে কথা বলছে। হেনার চলাফেরা এবং আচার আচরণের সংগে তার আত্মসম্মান খানিকটা জড়িত, এটি নবেন্দু প্রকাশ করতে চাইল। সুতরাং আমি এবার স্পষ্ট করেই বললুম, সব দিক বিবেচনা করেই আমি বলছি, এঁদের কাছে তুমি আগাগোড়া সব ঘটনা প্রকাশ কর নবেন্দু। অন্যায় তুমি কিছু করনি, [illegible] সই করে বিয়েই করেছ। শুধু [illegible] নয়, এ[illegible] সত্য, এর সংগে তোমাদের দুজনের নৈতিক শুচিতার কথাও রয়েছে!

নবেন্দু আমার কথাগুলি শুনছিল। আমি পুনরায় বললুম, আমার দুএকজন সেই ম্যাজিস্ট্রেটের সংগে চেনাশোনা আছে। তুমি যদি তোমাদের পুরনো চিঠিপত্রগুলো দাও, আমি তাঁদের দেখাতে পারি।

চিঠিপত্র!—নবেন্দু বলল, আজ পর্যন্ত একখানা চিঠিও হেনা আমাকে লেখেনি। তাছাড়া কি জান পার্থ, সে ঘোড়াটা জল খাবে না, তাকে জোর করে খাওয়ান যায় কি? আমি যদি সব ঘটনা এঁদের কাছে বলি, আর হেনা মুখের ওপর সব উড়িয়ে দেয়, তা হলে আমার দশাটা দাঁড়াবে কেমন? দলিলের কথা শুনিয়ে বিয়ে প্রমাণ করব? তাতে হয়ত বিয়ে প্রমাণ হবে, কিন্তু অনিচ্ছুক ঘোড়াটা জল খাবে কি?

তা হলে উপায়?

হাতের কাছে একখানা কাগজ নাড়াচাড়া করতে করতে নবেন্দু বলল, ধৈর্যের পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত চলুক!

বাইরের জানলা দিয়ে অতি মধুর শিরীষ ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল, সেইদিকে তাকিয়ে নবেন্দুর কণ্ঠের যখন মর্ম উপলব্ধি করছিলুম ঠিক সেই সময়টিতে হেনাকে বাগানের পাঁচিলের পাশ কাটিয়ে ভিতর দিকে দ্রুতপদে আসতে দেখা গেল। সন্ধ্যা তখনও হয়নি। কান পেতে শুনলুম, হেনা গুন্-গুনিয়ে গান ধরেছিল। আমার উৎকণ্ঠা যেন বেড়েই গেল।

কয়েকটি উদ্বিগ্ন মুহূর্ত, তার পরেই হেনা এসে ঘরের দরজায় থমকিয়ে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, আলোটাও জ্বালাতে পারনি, পার্থ? নবেন্দুর চাঁদমুখখানা দেখতুম!

বললুম, মোমবাতি খুঁজে পাইনি।

কিছু খবর রাখনি তুমি!—হেনা এগিয়ে এসে সুইচ টিপে আলো জেলে এবং পাখা খুলে দিয়ে বলল, সেদিন আর নেই। মিস্তিরি ডেকে নিজেই সব সারিয়েছি, লাইনগুলো মেরামত করিয়েছি,—আর অসুবিধে নেই। নবেন্দু, অত আড়ষ্ট হচ্ছ কেন? শ্বশুরবাড়ি ঠিক এখনো পুরনো হয়নি?

নবেন্দু এতক্ষণ পরে এবার হাসল। তারপর বলল, অনেককাল পরে তোমার মুখে তামাসা শুনলুম।

আমি বললুম, আজ তোমার ভাগ্য ভাল হেনা, নবেন্দু আজ নিজেই এসে হাজির। ডাকাডাকি করতে হয়নি!

নিশ্চয়, একশ'বার,—হেনা বলল, ডাকার মত করে ডাকতে পারলুম না,—এই দুঃখ রয়ে গেল!

বটে!—হাসিমুখেই নবেন্দু জবাব দিল, মনে হচ্ছে তোমরা দুজনে মিলে আজ আমাকে যেন বোকা বানাতে বসলে! সেই তোমাদের পুরনো অভ্যাস আর গেল না!

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে আমি নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, কোনও এক অজুহাতে ওদের দুজনকে নিরিবিলি কথা বলার সময় দেওয়া। আমার বোম্বাই যাবার আগে ওদের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়ে গেলে আমি সুখী হই। মেয়েদের সংগে মোমবাতির তুলনা চলে। হেনা ধীরে ধীরে গলতে থাকবে নবেন্দুর উত্তাপে, এটি অস্বাভাবিক নয়। প্রকাশ্যে ওদের বিবাহ উৎসবটি ঘটুক, এইটি আমার কাম্য। বিগত কয়েকদিন থেকে আমার নিজের মনে একটি সংশয় দেখা দিয়েছে,—ওদের মাঝখানে আমার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়, এবং আমার দিকের এবম্বিধ দৌত্যগিরিও ওদের পক্ষে কল্যাণজনক নয়। আমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে হেনা কেমন যেন একটা জিদ খুঁজে পায়। হেনাকে আমি সমর্থন করিনে।

প্রায় আধঘন্টাখানেক ধরে যখন এক পেয়ালা চায়ের উদ্দেশ্যে রান্নাঘরের সামনে এসে হাজির হচ্ছি, দেখলুম হেনা সদ্য স্নান করে এসে দাঁড়াল। পরণে তার মিহি সিল্কের সবুজ একখানা থান,—তার পাড় নেই, গায়ে একটি বন-নীল জামা। ঝুরঝুরে ভিজে মাথার চুল যেমন তেমনভাবে ফেরানো। হেনাকে মানিয়েছে ভাল। সর্বাপেক্ষা সামান্য পরিচ্ছদেও তাকে কেমন যেন অসামান্য করে তোলে। কিন্তু তার ভাবভংগী দেখে বুঝতে পারলুম নবেন্দুর সংগে তার বিতর্ক এখনও কিছু ঘটেনি। সেই বিস্ফোরণ ঠিক কখন ঘটতে পারে, আমি সেটি মনে মনে যখন অনুমান করছিলুম ঠিক সেই সময় নবেন্দু উপরতলার বারান্দা থেকে আমাকে ডাকল।

হেনা বলল, এস, ছাদে যাই। সন্তোষ, আমাদের খাবার ওপরে দিয়ে আয়। ছাদে বেশ হাওয়া আছে, এস।

হেনা আগে ভাগেই ওদের ছাদে উঠে গেল। তার উৎসাহের প্রকৃত চেহারাটা আমার ঠিক বোধগম্য হল না। আমি তার অনুসরণ করলুম।

নতুন বাক্সতলায় এই বাড়ির পুরনো বাগানটি এখনও সুন্দর, এবং শহরের জনকোলাহল এখনও এতদূরে এসে পৌঁছয়নি। দেখে মনে হয় এটি যেন নিভৃত অরণ্যলোক। প্রায় আধ মাইল দূর দিয়ে গেছে রেলপথ, এবং ওরই আশেপাশে অল্পস্বল্পে রেফুজিদের কয়েকটা চালাঘর কবে থেকে যেন বসে গেছে। উপরের বারান্দাটার দক্ষিণ দিকস্থিত ছাদটিতে ফাটল ধরা জায়গাগুলির মেরামত করা হয়েছে। আমাদের ছাত্রজীবনে এই ছাদে কতদিন বসে বসে আমরা পড়াশুনোর আলোচনা করেছি। সেদিন আমাদের প্রাণসমস্যা নিয়ে কোনও দিন একটিবারও কথা ওঠেনি। আমাদের সেইকালের অনাবিল আনন্দের স্মৃতি এতদিনে বোধ হয় ভুলতে বসলুম।

সন্তোষ আগেই এসে মস্ত এক পুরনো জাজিম পেতে তার ওপর কয়েকটা বালিশ ও তাকিয়া দিয়ে গেছে। গাছপালার ভিতর দিয়ে মৃদু মধুর হাওয়া দিচ্ছিল। বিশ্রম্ভালাপের ক্ষেত্রটি আজ বড় প্রশস্ত।

হেনা বলল, নবেন্দু আজকাল এমন একটা গাম্ভীর্য তৈরি করেছে যে, ওর মন কিসে উঠবে বোঝা ভার।

নবেন্দু বলল, দাঁড়াও, কোন্ দিক থেকে তুমি শরনিক্ষেপ করবে, আগে থেকে একটু সাবধান হই।

আজ আমি নবেন্দুর দলে। বললুম, গাম্ভীর্যই পুরুষের [illegible]। কিন্তু-

বড় সম্ভ্রম জড়ানো আছে, হেনা—ভুলে যেয়োনা।

অতি রুচিকর আলুর বড়ায় আমি কামড় দিয়েছিলুম। আমার দেখাদেখি নবেন্দু ও হেনাও কি যেন দু'একটা তুলে নিল ট্রে থেকে। তারপর হেনা বলল, নিজেকে সেজন্য অনেকবার ধিক্কার দিয়েছি। আমরা দুজনের একজনও তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলুম না—এটা মনে রেখেছ ত? থাক্ নবেন্দু, পুরনো কথা আর নাই তুললে।

আহার্য বস্তুগুলির প্রতি তিনজনের রুচি এবং আগ্রহ প্রায় সমানই দেখা যাচ্ছিল। এ অভ্যাস আমাদের পুরাতন। প্রথম তারুণ্য থেকেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা,—সেটা সমবয়সের, এবং একই পাঠাতালিকার মধ্যে সেই ঘনিষ্ঠতা শিক্ষাচর্চার ভিতর দিয়েই এগিয়ে গেছে। সেখানে মেয়েপুরুষের বিচিত্র রসের চেতনা কোনদিন কাজ করেনি। অন্যান্য মেয়ের দিকে কখনও যে চোখ পড়েনি তা নয়, হয়ত ক্ষণকালের জন্য ভাবান্তরও ঘটে থাকবে,—বিবাহিত মেয়েরা সিনেমা চিত্রে যেমন তরুণ হিরোকে দেখে বিমনা হয়! কিন্তু হেনার কাছে ফিরে এসে আবার দুজনে সহজ হয়েছি, চিত্ত-দৌর্বল্যকেই কঠোর পরিহাস ক'রে তিনজনে মিলে উড়িয়ে দিয়েছি। সেই জীবনে মালিন্য জন্মেনি।

নবেন্দু চুপ ক'রে কি যেন ভাবছিল। হেনা এবার গলাটা একটু ঝেড়ে বলল, পার্থ, তোমাকেই বলি। ভালবাসার জন্য কাঁদব সেই মন নিয়ে আমি জন্মাইনি, ঘরকন্নার লোভে স্বামীর জন্য হা-হুতোশ করব, তেমন সময়ও আমার নেই। লোভ থাকলেই দুঃখ, তাই মেয়েরা প্রেমাস্পদের জন্য কাঁদে।—আমি প্রেমের মধ্যে বাস করিনে, পার্থ।

বললুম, একটা দিন বাস করেছিলে বৌক। মনে ক'রে দেখ।

ওপাশ থেকে নবেন্দু বড় বড় চোখে তাকিয়ে আমাকে তারিফ করল।

হেনা ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, না, একদিনের জন্যও না,—ওটা তোমাদের ভুল। শ্রাবণের সমস্ত আকাশ সেদিন কালো হয়ে ডুকরে উঠেছিল আমার দিকে চেয়ে, ভয় দেখিয়েছিল বজ্রদণ্ড, কেয়াবন থরথরিয়ে উঠেছিল, কালিবর্ণ অন্ধকারে নেমেছিল মুষলধারে বৃষ্টি! রঙগীন ময়ূর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল পাখা মেলে। আমি ভুলিনি পার্থ, মাটির অনেক নিচের থেকে বাসুকির ফণা সেদিন কেঁপে উঠেছিল! অনন্ত কৌতূহলের কান্নায় সেই সর্বনাশা রাত্রে ভেঙেগ পড়েছিলুম নবেন্দুর পায়ের তলায়। তারপর দুর্যোগ কেটে গেল। পরের দিন সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বেরোলুম!

প্রশ্ন করলুম, রেজেস্টারী হয়েছিল ঠিক কোন্ তারিখে?

হেনা জবাব দিল, দুর্ঘটনারই দিনে, —অপরাহ্নের দিকে আকাশের কালো
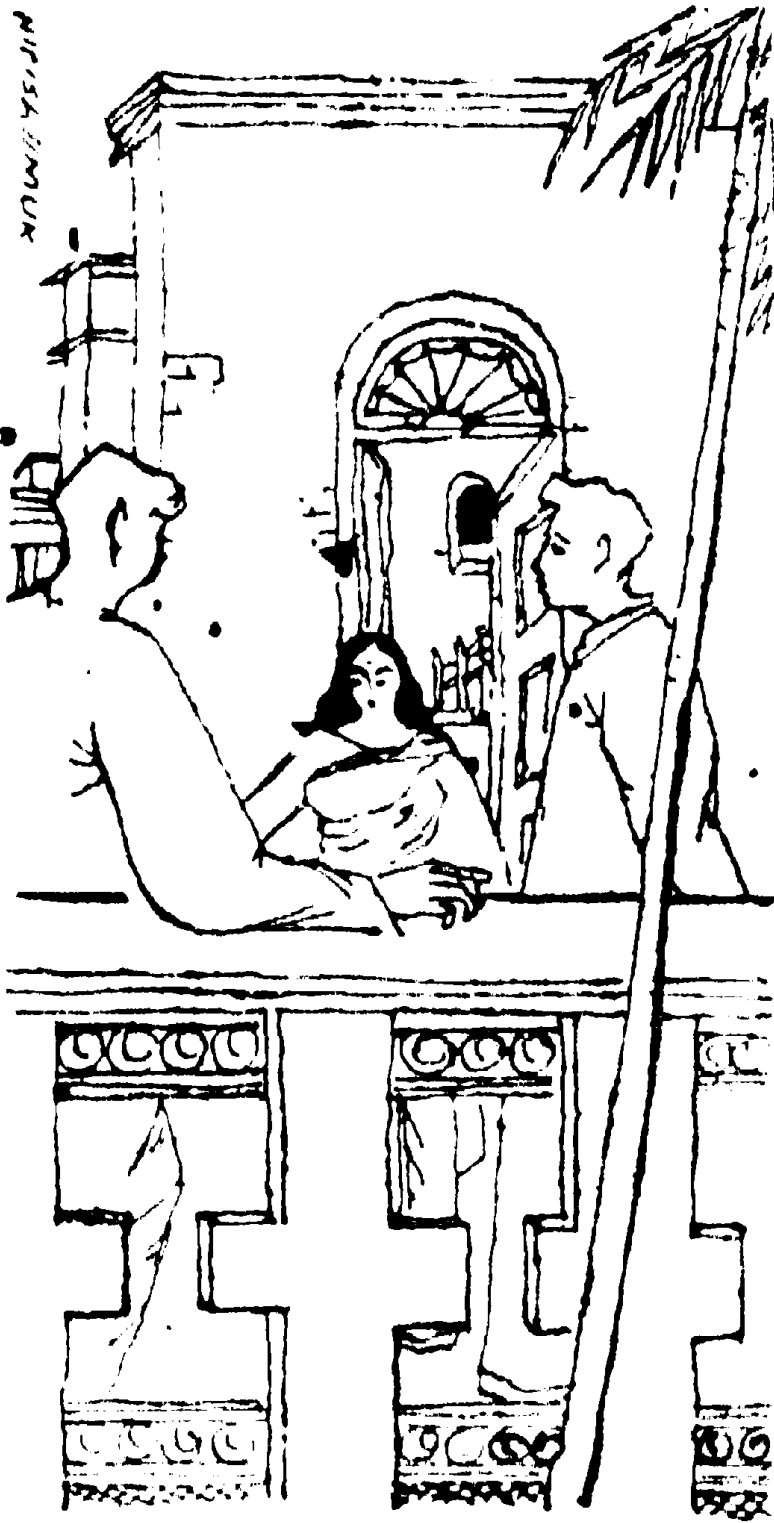
...একটা দিন বাস করেছিলে বৌক। মনে ক'রে দেখ।

মেঘ যখন সর্বগ্রাসিনী মহাকালীর ক্ষুধিত রসনার মতো লকলক ক'রে উঠেছিল!

বললুম, এবার কতকটা যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে, কি বল হে, নবেন্দু? সংস্কারে আঘাত লাগছিল তাই একটা রাত্রের জন্য লেখাপড়া ক'রে নিয়েছিলে,—কেমন?

নবেন্দু ভদ্র পুরুষ, তাই চুপ ক'রে রইল। হেনা পুনরায় বলল, কথাটা মিথ্যে নয়। আমাদের মধ্যে ফাঁকি ছিল, বৃহত্তম সমাজের প্রতি প্রতারণা ছিল, সমগ্র ইতিহাসটির মধ্যে চটুলতা ছিল। সেই রাত্রে সেই লগ্নে সেই যন্ত্রণায়—ওটা সুন্দর ছিল, শরীরতত্ত্বের নির্ভুল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও হয়ত ছিল,—কিন্তু প্রেম ছিল না, নবেন্দু। ছিল না সেখানে স্বামী-স্ত্রীর প্রসন্ন এবং প্রশান্ত সম্পর্ক। আমি স্বীকার করিনে, যা তুমি আমাকে দিয়ে স্বীকার করাতে চাও!

নবেন্দু এবার বলল, তোমার মনে কি সেদিনের জন্য আজও অনুশোচনা আছে?

আছে বৈ কি,—চিরদিন থাকবে।—হেনা বলল, কোনও দিন স্বীকার করব না যে, আমার আচরণে ভালবাসা ছিল, তোমার ভালবাসায় সাধুতা ছিল! মিথ্যে, আগাগোড়া সব মিথ্যে, নবেন্দু।

তা হলে জীবনকে তুমি কি এইভাবে নষ্ট করবে?

নষ্ট! কে বললে? জীবনের মূল্য যে জানে, তার জীবন নষ্ট হবে কেন?—হেনা বলল, আমি ত দুঃখে নেই!

আমি এবার ফস ক'রে প্রশ্ন করলুম, কোথায় সুখ তোমার?

প্রতি পদে! —হেনা আবার জবাব দিল, নিরানন্দের স্বাদ আমার কোথাও নেই! দুঃখ দিইনে বলেই দুঃখ পাইনে, পার্থ। চাঞ্চল্য নেই ব'লেই ব্যর্থতা নেই। টানাটানি করিনে বলেই ব্যথা বোধ করিনে!

এতক্ষণ পরে সন্তোষ চা নিয়ে এল। কেটলীটা তুলে প্রতিটি পেয়ালায় সযত্নে চা ঢালতে ঢালতে হেনা বলল, আমি বলি তুমি তোমার স্বামীর আসন থেকে নেমে এস, নবেন্দু—ওটা তোমার সইবে না। তোমার প্রভুত্ববোধের মধ্যে আত্ম-প্রকৃতির বিকার না ঘটে। তোমার লোভ আছে ব'লেই আমাকে বার বার লোভ দেখাতে চেয়েছ। তোমার সহজাত সংস্কারকে নষ্ট করতে চাও না বলেই আমাকে তোমার ঘরে তুলতে চাও। কিন্তু আমারই দুর্ভাগ্য, সহপাঠীকে স্বামী ব'লে ডাকতে পারলুম না!

চায়ের বাটিতে এক একবার চুমুক দিচ্ছিলুম। এবার আমাকে বলতেই হল, —আমি সবিনয়ে তোমাদের কাছে একটি কথা নিবেদন ক'রে রাখি। ওই অভিশপ্ত দলিলটি যতদিন আছে, ততদিন তোমাদের দুজনকে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে যেতে হবে, একথা ভুল না যেন। অর্থাৎ বিভ্রান্তিবশত যদি অন্য কোথাও বিয়ে ক'রে বসো, তাহলে লাল-পাগড়িরা এসে আসল শ্বশুরবাড়িতেই নিয়ে যাবে! মনেও করো না সেখানে গিয়ে দুজনে

ঠিক জামাইষষ্ঠির রাতটি খুঁজে পাবে! সাবধান।

হেনা আমার কথায় হাসছিল। এবার সে চায়ের বাটি হাতে নিয়ে বলল, দলিলটা নাকচ করবার কি ব্যবস্থা করবে, নবেন্দু?

নবেন্দু বলল, আমার দিক থেকে নাকচ করবার কোনও কারণ কি ঘটেছে?

আমার দিক থেকে ঘটেছে বৈ কি। তুমি নিশ্চয় আমাকে বেঁধে রাখতে চাও না! —হেনা মুখ তুলে স্পষ্ট চক্ষে তাকাল।

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে নবেন্দু বলল, চাই বৈকি।

আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও? —হেনা তাকাল।

নবেন্দু বলল, আমার ইচ্ছার দিকটা বিবেচনা করলে সুখী হই। যাকে আমি সর্বমনপ্রাণে গ্রহণ করেছি, পাকে পাকে আমার শিরা-উপশিরায় অন্ত্রেতন্ত্রে যাকে জড়িয়েছি,—সেই বাঁধন একে একে কাটবার মতন শক্তি আমার যদি না থাকে?

হেনার গলা এবার উঠল। বলল, তোমার এ শতসহস্র পাকের বাঁধনে যদি আমার দম বন্ধ হয়ে আসে? আমার বন্ধনজর্জর হৃৎপিণ্ড থেকে যদি ভলকে ভলকে মৃত্যু উঠতে থাকে? নিজের গলার শির ছিঁড়ে যদি চরম মুক্তির জন্য চীৎকার করতে থাকি,—তবুও তুমি বাঁধন কাটবে না? তুমি নিশ্চয় এত নিষ্ঠুর নয়, নবেন্দু?

পেয়ালাটা রেখে নবেন্দু এবার উঠে পড়ল। সমস্ত কথাবার্তা এতক্ষণ পরে যেন এবার বাঁকা পথ ধরল। বন্ধুর সঙ্গে আমিও উঠে পড়ব, না ব'সে থাকব—ঠিক বুঝতে পারলুম না।

হেনা বলল, তোমার এই প্রভুত্ব-লোভের পায়ের তলায় পড়ে আমি কাঁদব একথা মনে করো না, নবেন্দু। যত বাঁধবে ততই হারাবে। একে ভালবাসা বলে না, মায়ামোহও বলে না,—এ হল সেই আদিম লোভ! এই শৃংখলের বিরুদ্ধে আজ সব দেশে প্রতিবাদ উঠেছে, চেয়ে দেখ! সকল বন্ধন আর সমস্ত বাধ্যবাধকতার বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, আত্মার স্বকীয়তাকে সর্বান্তকরণে মেনে নাও,—নৈলে মেয়েমানুষের কাছে মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু পাবে না, নবেন্দু।

জুতোটা পায়ে দিয়ে নবেন্দু কোন দিকে না তাকিয়ে এবং আমাকে না ডেকেই মসমস ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সটান চ'লে গেল।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলুম হেনার পাশে। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে সে কাঁদছিল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। নিচের বাগানে নবেন্দুর মোটরের হাঁসফাঁস শব্দ একবার শোনা গেল, তারপরেই মোটর স্টার্ট নিল। আমি একবার মৃদুকণ্ঠে ডাকলুম হেনাকে। কিন্তু সে কঠিন মেয়ে। তার অশ্রু-ভারাতুর আবেগবিহ্বলতাটা সম্ভবত সে আমাকে জানতে দিল না।

এক সময় উঠে আমিও নিচে নেমে এলুম।—

—ক্রমশঃ

শিল্পী: শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী

শত বার্ষিকী দেশে দেশে

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

ভিক্টর হ্যুগো

আজীবন স্বাধীনতার যোদ্ধা ভিক্টর হ্যুগোর সঙ্গে ফরাসী রিপাবলিকের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। হ্যুগোর স্মৃতি ফরাসীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে বিজড়িত। হ্যুগোর জন্ম ১৮০২ সালে। ভিক্টর হ্যুগোর বাল্যকাল অধিকাংশ বিদেশেই অতিবাহিত হয়েছে। বাবা ছিলেন ইতালীতে নাপোলিয়ঁ-র কার্শিকান রেজিমেন্টের এক কর্ণেল। কয়েক বছর ইতালীতে থাকার পর বাবার সঙ্গেই তাঁকে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে যেতে হয়। সেখানে 'ইয়ং নোবলম্যান'দের শিক্ষায়তনে পড়াশুনো করবার সুযোগ তিনি পান। মাত্র ১৪ বছর বয়েসে ক্লাসিকাল রীতিতে 'ইয়েতাঁম্যান' নামে একটি ট্রাজেডি রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর দীর্ঘ ৮৩ বছর বেঁচে নিরলস ও সৃষ্টিশীল বিচিত্র সাধনায় অজস্র কাব্য-উপন্যাস-নাটকে তিনি ফরাসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। হ্যুগো ছিলেন প্রকৃত মানবদরদী শিল্পী। বহু দুঃখ-নিপীড়নের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত শুভ মানসিক বোধে সমুজ্জল বিশ্ববিখ্যাত 'লে মিজারেবল' বইটি থেকে তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার সূত্র পাওয়া যায়। এই মানবিকতার জন্যই প্রথম জীবনে তাঁকে সম্রাট তৃতীয় নাপোলিয়ঁ-র বিষ নজরে পড়তে হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ১৮ বছর নির্বাসন দণ্ড কবিকে ভোগ করতে হয়েছিল ব্রাসেলসে এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জার্সি ও গেনের্সি দ্বীপে নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদের জন্য। তৃতীয় নাপোলিয়ঁ-র পতন এবং নব-জাগ্রত রিপাবলিকের অভ্যুত্থানের সঙ্গে দেশের ছেলে দেশে ফিরে এলো। ১৮৯৫ সালে হ্যুগোর যখন মৃত্যু হয় তখন ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জনতা প্যারীর রাজপথে ভেঙে পড়েছিল, ঠিক যে অবস্থা হয়েছিল প্রথম নাপোলিয়ঁ-র শবানুগমনে। প্যারীর আম্পাস দ্য ফিঁতিন অঞ্চলে 'লে ফিয়ঁতিন' আবাসটি হ্যুগোর শৈশব-স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করে আছে। হ্যুগো এখানে তাঁর মায়ের সান্নিধ্যে শৈশবের দিনগুলি কাটিয়েছিলেন পিতার অনুপস্থিতিকালে মার কাছেই জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। স্মারকচিহ্ন থেকে জানা যায় কবি ১৮০৮ থেকে ১৮১৩ সাল অবধি সময়কাল এখানে অতিবাহিত করেছেন। এই আবাসটি মূলত একটি কনভেন্টের মত।

ভিক্টর হ্যুগো

ভিক্টর হ্যুগোর বাড়ী—প্লাস রয়াল

ফরাসী দেশে থাকাকালীন হ্যুগোর পরবর্তী জীবনের অনেক সময় কাটে 'ওতেল দ্য রহ' গেমিনি' নামে পরিচিত একটি বাড়িতে। ঐ বাড়ির ত্রিতলে হ্যুগো একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করেছেন ১৮৩২ থেকে ১৮৪৮ সাল অবধি। এই বাড়িটিকে 'হ্যুগো মিউজিয়মে' পরিণত করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে 'পাঁতিয়ঁ' নামে বিখ্যাত সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। লণ্ডনের 'ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবি'র মতো এটি একটি ঐতিহাসিক সমাধিস্থান যেখানে বিখ্যাত ব্যক্তিদেরই শুধু সমাধিস্থ করা হয়।

তৃতীয় নাপোলিয়ঁ-র রাজত্বকালে বিত্তবান অভিজাত ব্যক্তিরাই কেবল মৃত্যুর পরে এখানে প্রবেশের অধিকার পেতেন, কিন্তু সম্রাটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রথা লোপ পায়। তাই মীরাবো, ভলতেঅর, রুশো, বালজাক, এমিল জোলার পাশাপাশি ভিক্টর হ্যুগোও এইখানেই শায়িত।

১৯০২ সালে কবির জন্মশত-বার্ষিকীতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয় যার ভাস্কর্যের নির্দেশনা দিয়েছিলেন বিখ্যাত ভাস্কর এর্নেস্ট ব্যারিয়া। প্রসিদ্ধ স্থপতি পাস্কালের তত্ত্বাবধানে ঐ স্তম্ভ স্থাপিত হয়।

প্যারী শহরে 'ওতেল দ্য রহ' গেমিনীতে' হ্যুগো মিউজিয়ম একটি বিরাট সংগ্রহশালা; কবির সম্বন্ধে যাবতীয় বিচিত্র তথ্যের ভাণ্ডার। ১৯০৩ সালে এই সংগ্রহশালা কবিবন্ধু মরিসের দানে ও প্যারীর পৌর-কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। তারপর হ্যুগো পরিবারের স্বজনবর্গ ও ভক্ত বন্ধু-মণ্ডলীর আনুকূল্যে কবির স্বহস্তে

রচিত পাণ্ডুলিপি, পুস্তকের প্রথম সংস্করণ, অংকিত চিত্রাবলী এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, কবির স্বহস্ত-নির্মিত ফার্ণিচার ও পায়রোগ্রাফির নানান নিদর্শন সংগ্রহশালাটিকে সমৃদ্ধশালী করেছে। মিউজিয়মের পরিচালকমণ্ডলী সুশিক্ষিত গাইড নিযুক্ত করেছেন। জনসাধারণের জন্য মিউজিয়ামের প্রবেশ-পথ সদা উন্মুক্ত। দ্রষ্টব্য বিষয়ের ছাপানো ক্যাটালগ নিয়ে ও গাইডের নির্দেশে ইচ্ছেমতো কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরলে চোখের সামনে প্রেরণাময় কবি-জীবনের নানা বিচিত্র অধ্যায়ের পরিচয় উন্মুক্ত হয়। 'ইয়েত্রী-ম্যান'-এর পাণ্ডুলিপি দেখা যাবে—মাত্র ১৪ বছর বয়েসে কবি এইটি লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আরো জানা যাবে ছাত্রাবস্থায় 'অন দি জয়েস্ অব স্টাডি'—অধ্যয়নরত ছাত্র-জীবনের এই প্রশস্তি রচনা করে 'ফ্রেঞ্চ আকাদেমি'র প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন মাত্র পনেরো বছর বয়সে। দেখতে পাওয়া যাবে 'লে কঁসারভেতর্ লিতেরার্'-এর কয়েক কপি। কবি ১৭ বছর বয়েসে ঐ সাহিত্য পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। দু' বছর যদিও কাগজটির পরমায়ু ছিল। ভাবতে মজা লাগে কবি ডিউক অব্ ব্যারির মৃত্যুতে একটি 'ওড' রচনা করে রাজসভা থেকে পাঁচশো লুই পুরস্কার পান আর এই রাজরোষেই তাঁকে ১৮ বছর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ও প্রেমিকাকে লেখা চিঠির প্রতিলিপি থেকে জীবনধেয়ানী কবির রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মতামত জানা যায়।

চিঠিপত্র থেকে তৃতীয় নাপোলিয়ঁ-র স্বেচ্ছাতন্ত্র সম্বন্ধেও তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রদর্শনীতে নাপোলিয়ঁ-র বিরুদ্ধে তিনি যে পুস্তিকা লিখে নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তাও সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। স্বদেশ থেকে নির্বাসনের বেদনা কোনো কোনো চিঠিপত্র ফুটে উঠেছে।

কবি ভিক্টর হুগো ও তাঁর পরিবার, স্বজনবর্গ, স্ত্রী ও প্রেমিকার বহু ফোটোগ্রাফ, কবির সম্বন্ধে প্রকাশিত বহু স্মারকগ্রন্থ, কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও স্ব-নির্মিত আসবাবের পরেই প্রদর্শনীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হলো কবির অংকিত ৩৫০ খানা স্কেচ, পেন্টিং, পোর্ট্রেট, ভাস্কর্য ও স্বীয় রচনার অলংকরণ স্বরূপে অংকিত বহু অনবদ্য চিত্রাবলী যা এই সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে।

হুগো অংকিত বিখ্যাত ছবি "ডেস্টিনি" সংগ্রহশালার দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। দিগন্তজোড়া গাঢ় রঙের কুটিল ঘূর্ণাবর্তে নিয়তির স্বরূপ কবি রূপায়িত করেছেন। সেই বিখ্যাত প্রতীকী ছবিটি দেখতে পাওয়া যাবে যেখানে করোটির শিরর থেকে একটি সবুজ গাছ নবপত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে ঊর্ধ্ব আকাশে শাখা বিস্তার করেছে।

অনিন্দ্য - সুন্দরী বিষাদ - প্রতিমা কোজেৎ-এর ছবি কবি স্বহস্তে এঁকেছিলেন। যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করুণ-কোমল 'লে-মিজারেবল'-এর নায়িকা কোজেৎ-এর মধ্যে হুগো মানসী-প্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছিলেন—যার মুখচ্ছবিতে শেষরাত্রির দিগন্তের শুভ্র শুকতারার বিষণ্ণ লাবণ্য। র‍্যাঁবো তাই এই গ্রন্থ পাঠ করে বলেছিলেন—"হুগো একজন অগ্নিদগ্ধ ঋষি। তাঁর দুঃখীরা একটি আশ্চর্য প্রাণবন্ত কবিতায় রূপান্তরিত।"

হুগোর সমসাময়িক লামার্তিন, বোদলেঅর্, পোল ভের্লেন, র‍্যাঁবো-র মত কবি, বালজাক, গতিয়ের মতো ঔপন্যাসিক এবং সাঁৎ বভ্ ভিনি-র মতো লেখক ও সমালোচক বিভিন্ন গ্রন্থে কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। সাঁৎ বভ্ হুগোর সাহিত্যে এক সোনালি ঈগলের আর্তনাদ শুনেছেন। গতিয়ের কাছে হুগো-র ব্যক্তিত্ব গ্রীক পুরাণের ঈস্কাইলাসের মত প্রতিভাত হয়েছে। বোদলেঅরের মনে হয়েছে হুগো সেই পুরাণ-কথিত দেব বা দানব, যাঁর ভ্রূমধ্যে শোভা পাচ্ছে একটি মাত্র বিশাল চক্ষু।

হুগোর উত্তরসাধক মালার্মে, এবং ভালেরি তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন—"১৮৩০ সালে হুগোর অভ্যুত্থান প্রচণ্ড উল্কার মত।... ......আজও তিনি আমাদের ভাব-জগতে সৌরমণ্ডলের আবর্তিত কক্ষে যেন জুপিটার বা শনিগ্রহের মতো শোভিত।" মালার্মের ভাষায় ভিক্টর হুগো যেন স্বয়ং মূর্ত কবিতা।

"......আমি কী বোঝাব তোমাদের কাকে বলে সাহিত্য, কাকে বলে কলাচিত্র? বিশ্লেষণ ক'রে কি এর মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারি? কোন আদি উৎস থেকে এর স্রোতের ধারা বাহির হয়েছে এক মুহূর্তে তা বোঝা যায় যখন সেই স্রোতে মন আপনার গা ভাসিয়ে দেয়। আজ সেই বাঁশির সুরে যখন মন ভেসেছিল তখন বুঝেছিলেম বুঝিয়ে দেবার কথা এর মধ্যে কিছু নেই, এর মধ্যে ডুব দিলেই সব সহজ হয়ে আসে। নীলাকাশের ইসারা আমাদের প্রতিদিন বলেছে, আনন্দ-ধামের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ। একথা বলেছে, বসন্তের হাওয়ায় বিরহের মরীমিয়া কবি; সকাল বেলায় প্রভাত-কিরণের দূত এসে ধাক্কা দিল। কী? না নিমন্ত্রণ আছে। উদাস মধ্যাহ্নে মধুকরগুঞ্জিত বনচ্ছায়া দূত হয়ে এসে ধাক্কা দিল, নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যা-মেঘে অস্ত-সূর্যচ্ছটায় সে দূত আবার বললে, নিমন্ত্রণ আছে। এত সাজ সজ্জা এই দূতের, এত ফুলের মালা, এত গৌরবের মুকুট। কার জন্যে? আমার জন্যে। আমি রাজা নই, জ্ঞানী নই, গুণী নই—আমি সত্য, তাই আমার জন্যে সমস্ত আকাশের রং নীল ক'রে, সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল ক'রে, সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জ্বল ক'রে আহ্বানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হবে না কি? সে উত্তর ঐ আনন্দ-ধামের বাণীতেই যদি না লিখি তাহোলে কি গ্রাহ্য হবে? মানুষ তাই মধুর ক'রেই বললে, 'আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল, হে চিরসুন্দর আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর ক'রে তোমাকে চিঠি পাঠাব, যেমন ক'রে তুমি পাঠালে। যেমন তুমি তোমার অনির্বাণ তারকার প্রদীপ জেলে তোমার দূতের হাতে দিয়েছ, আমাকেও তেমনি ক'রে আলো জ্বালতে হবে, যে-আলো নেবে না; মালা গাঁথতে হবে, যে-মালা শুকোতে জানে না। আমি মানুষ, আমার ভিতর যদি অনন্তের শক্তি থাকে তবে সেই শক্তির ঐশ্বর্য দিয়েই তোমার আমন্ত্রণের উত্তর দেব!' মানুষ এমন কথা সাহস ক'রে বলেছে, এতেই তার সকলের চেয়ে বড় গৌরব।

—রবীন্দ্রনাথ

সুর-সুন্দরী দর্পণহস্তে
কালী মন্দির
খাজুরাহ

সুর-সুন্দরী জলপাত্র হস্তে
মহাদেব মন্দির
খাজুরাহ

মোৎসার্টের মৃত্যু রহস্যের সন্ধানে

ভ্রাম্যমাণ

খানিকটা পুশকিনের জন্যেও বটে, রুশ সংগীতবিদরা অন্যান্যদের থেকেও মোৎসার্টের মৃত্যু সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে রয়েছেন। প্রবাদ এই যে মোৎসার্টের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। স্যালিয়েরি নামে এক সুরকার তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। ১৮৩০ সালে পুশকিন দুই অংকের একটি নাটক লেখেন। তাঁর লেখা সব থেকে নিখুঁত নাটক। দুই অংকের না বলে দুই দৃশ্যের বলাই ভাল। নাটকটির নাম, "মোৎসার্ট এবং স্যালিয়েরি।"

তাঁর সময়ে স্যালিয়েরি ছিলেন খ্যাতনামা সুরকার এবং সংগীত শিক্ষক। মোৎসার্ট সম্পর্কে তাঁর ঈর্ষা ছিল। সংগীতের স্বার্থেই মোৎসার্টের মৃত্যু বাঞ্ছনীয়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। মোৎসার্টকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে তিনি ভাবেন একটি "পবিত্র কর্ম" সম্পন্ন হল। কিন্তু মোৎসার্ট মারা যাবার পর সন্দেহের দংশনে তিনি ক্ষত বিক্ষত হতে থাকেন। স্যালিয়েরি যে মোৎসার্টকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন এই প্রবাদটি যে কারণেই হোক পুশকিন বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, এই প্রবাদটির মধ্যে তিনি সেকসপীয়রের নাটকের মত উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন এবং আশ্চর্য দক্ষতা এবং কারুতার সংগে একে নাট্যায়িত করেন। সমগ্র নাটকটি দৈর্ঘ্যে ৩০০ লাইনেরও কম।

সম্প্রতি প্রকাশিত সোভিয়েট সংগীতবিদ ক্রেমনেভের 'লাইফ অফ মোৎসার্ট'-এ মোৎসার্টের মৃত্যু সম্পর্কিত প্রশ্নটি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এতে তিনি ভিয়েনার একটি সংবাদপত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। মোৎসার্টের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরেই পত্রিকাটিতে নাকি, তাঁর মৃত্যু বিষপ্রয়োগে হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এই থেকেই প্রবাদের জন্ম এবং তা ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল ধরে স্যালিয়েরিকেই এজন্য সন্দেহ করা হয়, কারণ মোৎসার্টকে তিনি যে ঘৃণা করতেন, তা সবাই জানত। স্যালিয়েরির জীবদ্দশায় এই প্রবাদ তাঁকে উত্তক্ত করে। থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে তিনি সুর-রচনা এবং সংগীত শিক্ষাতেই মগ্ন থাকেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন মোৎসার্টের পুত্র, বিঠোফেন এবং শুবার্ট। ১৮২৫ সালে বিঠোফেনকে নাকি তাঁর এক বন্ধু জানান যে, আসন্ন মৃত্যু সম্ভাবনা বুঝতে পেরে স্যালিয়েরি, মোৎসার্টকে তিনি বিষ প্রয়োগ করেছেন এ কথা স্বীকার

মোৎসার্ট

করেছেন এবং কনফেসরের কাছে তাঁর এই পাপের কথা স্বীকার করে গেছেন।

১৯৫৩ সালে আর এক খ্যাতনামা সোভিয়েট সংগীতবিদ ইগর বেলজা, 'মোৎসার্ট এবং স্যালিয়েরি' নামে তাঁর এক বইয়ে এ সম্পর্কে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক কথা লিখেছেন। অস্ট্রীয়ান সংগীতবিদ গাইডো অ্যাডলারের কথাকে ভরসা করে বেলজা বলেছেন ভিয়েনার নথিঘরে স্যালিয়েরির স্বীকারোক্তির নকল রক্ষিত আছে, সংগে বিশপের কাছে পাঠানো কনফেসরের রিপোর্টটিও আছে। রিপোর্টে শুধু বিষপ্রয়োগে হত্যার স্বীকৃতিই নয়, যে অবস্থার মধ্যে এবং যে ভাবে ধীর প্রক্রিয়ায় মোৎসার্টকে বিষ দেওয়া হয় তার কথাও লেখা আছে।

গাইডো অ্যাডলার মারা যান ১৯৪১ সালে কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কারের কথা বা স্বীকারোক্তিটির পূর্ণ বয়ান কোথাও লিখিত ভাবে প্রকাশ করেন নি। শুধু মৌখিক ভাবে কিছু সহকর্মী এবং ছাত্রদের এ কথা জানিয়েছিলেন। একথা তাঁর এক সোভিয়েট সংগীতবিদ আসাফিয়েভকেও নাকি তিনি বলেছিলেন। কিন্তু অ্যাডলারের কথিত এই সংবাদটির কথা আসাফিয়েভও কখনো কোথাও লিখে যান নি।

আশ্চর্যের কথাও বটে অ্যাডলার বহু লোককে একথা বললেও কেউ কিন্তু ভিয়েনার নথিঘরে গিয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করে আসেন নি।

বহু বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসক মনে করেন যে মোৎসার্ট বিষ ক্রিয়াতেই মারা গেছেন কিন্তু এজন্য তাঁরা স্যালিয়েরিকে দায়ী করেন না। সোভিয়েট সংগীতবিদ চিচেরিন এবং পশ্চিমের পমগার্টনার, আইনস্টাইন, কোর্ট, মোসার প্রভৃতি সংগীত বিশেষজ্ঞরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে মোৎসার্টের মৃত্যু বিষ ক্রিয়ার ফলে হয়নি এবং স্যালেয়েরির সংগে তাঁর মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই।

ভিয়েনা থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত মোৎসার্ট সম্পর্কে রেক শোলিভরের বইয়ের মুখবন্ধে অধ্যাপক মোসার এই প্রবাদটির কথা আলোচনা করেছেন। প্রবাদটি বিঠোফেনের 'আলাপন পুস্তক' গ্রন্থটিতেও উল্লিখিত হয়েছে। মোসার বলেছেন, মূত্রাশয়ের পীড়াতেই মোৎসার্টের মৃত্যু ঘটে।

স্যালিয়েরির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে গাইডো অ্যাডলার এমন এক রহস্য তৈরী করে গেছেন যে সারা পৃথিবীতে মোৎসার্ট ভক্তদের মাথায় এখন শুধু একটিই চিন্তা—স্যালিয়েরির মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তি বলে সত্যি সত্যিই কিছু আছে কি?

চক্র

সুশীল রায়

সে অনেক দিনের কথা হয়ে গেল। কত বছর? এবার দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন বিভুপদবাবু। হিসেব পাওয়া গেল না। ওতে মাত্র একটি বছরের তারিখ ছাপা আছে। আঙুলের কর গুনতে লাগলেন তাই তিনি।

কবে জন্মেছিল তাঁর এই কন্যাটি অনেক ভেবে তিনি সেই জন-তারিখটা বের করলেন। কিন্তু আজ, নিভার বয়স হয়ে গেল অনেক।

বসে ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন বিভুপদ মজুমদার। বড় অস্থির অস্থির ঠেকতে লাগল তাঁর।

পুরনো কথা ভেবে আর লাভ নেই। লাভ নেই বটে, কিন্তু ভাবতে ক্ষতি কি? বিভুপদবাবু আবার সমস্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বসলেন ইজিচেয়ারে।

দোতলার বারান্দা। দক্ষিণটা সম্পূর্ণ খোলা। বিকালের অবাধ হাওয়া সম্মুখের ঐ নিমগাছের কচি কচি পাতায় তরঙ্গ তুলে এই বারান্দায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ বাতাস মিষ্টি লাগার কথা। কিন্তু বিভুপদবাবু যেন পুরো আরাম পাচ্ছেন না।

এইখানেই, অনেকটা এইভাবেই প্রায় এইরকম সময়েই একদিন তিনি বসে ঠিক এইরকমের হাওয়াই খাচ্ছিলেন। সে দশ বছর আগের কথা।

বিভুপদ আবার উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ার ছেড়ে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। পায়চারি করতে লাগলেন বারান্দায়।

তাঁর এই পদচারণা শুরু হয়েছে অনেকদিন হল। এবং নিয়মিতভাবে তিনি এই বারান্দায় এঁকে চলেছেন তাঁর অদৃশ্য পদচিহ্ন।

অদৃশ্য! থমকে দাঁড়ালেন বিভুপদবাবু। কত অদৃশ্য চিহ্নের কথা মনে হতে লাগল তাঁর। কিন্তু, কিন্তু, কেন ঐ ছোট একটা দাগ মুছে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল না? অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলেন বৃদ্ধ বিভুপদ।।

একটি মাত্র মেয়ে বিভুপদ মজুমদারের। একটি মেয়েকে সুখী করার মত সম্পদ তাঁর আছে। এই বাড়ি—পাঁচ বিঘে জমির উপর তিন-মহলা এই কুঠি: আর ঐ দেরাজ, তাতে আছে একটা বই—তার পাতা ওল্টালেই জানা যাবে ব্যাঙ্কে তাঁর জমা আছে কত টাকা।

পুনার হাওয়া-আপিসে বড়-দরের চাকরে ছিলেন তিনি। মাইনে মোটা, কিন্তু সংসার ছোট। সুতরাং টাকা পুঁজি করতে কোনো অসুবিধে তাঁর হয় নি। কৃপণের ধনের মতন সে টাকা জমিয়ে রাখাই তাঁর কামনা ছিল না। তাঁর কামনা ছিল অন্য। লেখাপড়া শিখিয়ে মেয়েকে আত্মনির্ভর করবেন। এবং উপযুক্ত সহচর নির্বাচন করে তার হাতে সমর্পণ করবেন। সে নির্বাচন তিনিই করে দিন, কিংবা নিভা নিজেই করুক।

নিভার মাথাটা ছেলেবেলা থেকেই বেশ সাফ। লেখাপড়ায় তাই কোনোদিন কোনোরকম বেগ পেতে হয়নি তাকে। প্রবাসে থাকতে হয় বিভুপদবাবুকে, মেয়েকে তাই তিনি কলকাতার হস্টেলে রেখে শিখিয়েছেন লেখাপড়া।

বছর দশ হল তিনি রিটায়ার করেছেন। তখনই উঠেছে সদর্ণ অ্যাভিনিউয়ের এই বাড়ি।

বাড়িটা তৈরি করতে পারায় এবং বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারায় তাঁর মনে আনন্দ দ্বিগুণ হল।

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর নিভাকে তিনি ভর্তি করে দিলেন মেডিকেল কলেজে।

খুব স্মার্ট, খুব জলি আর খুব চটপটে মেয়ে এই নিভা মজুমদার। বাপের বেশি বয়সের মেয়ে বলে বাপের কাছে নিভার দামই আলাদা। বাপের কাছেই কেবল অবশ্য নয়, মায়ের কাছেও।

অপর্ণা দেবী বলতেন, "মেয়ের বিয়ে দেব। কিন্তু কোনো ছেলের হাতে একে সমর্পণ করব না, কোনো ছেলে এসে যেন নিজেকে সমর্পণ করে এর হাতে। কেন, মেয়ে বলে ফেলনা নাকি! মেয়েদের কি মান-সম্ভ্রম নেই।"

বাধা দিতেন বিভুপদবাবু, বলতেন, "থামো, থামো; অকারণ অদৃশ্য শত্রুর উপর খাপ্পা হয়ে উঠছ কেন। আমি কি আমাকে সমর্পণ করি নি তোমার হাতে? মেয়েরা ফেলনা হবে কেন!"

অপর্ণা দেবী বলতেন, "রসিকতার কথা নয়। ভেবে দেখ—মেয়েরা লেখা-পড়া শিখবে, ডাক্তার, উকিল হবে, তবু বিয়ে হবে আর বদলে যাবে পদবী, বদলে যাবে সব।"

"বেশ, বেশ, বেশ। অপর্ণা মজুমদার হতে যদি তোমার আপত্তি, আজ থেকে তুমি রায় হয়ে যাও আবার।"

অপর্ণা দেবী আবার বললেন, "রসিকতার কথা না। ব্যাপারটা তুমি ভেবে দেখ একবার।"

গম্ভীর হয়ে বসে ভেবে দেখতে লাগলেন বিভুপদবাবু। সত্যি, মেয়েদের কুলশীল সবই যদি ত্যাগ করতে হয় তাহলে তাদের লেখাপড়া শেখাই বা কেন, কেনই বা আত্মনির্ভর হওয়ার জন্যে এত চেষ্টা আর এত নিষ্ঠা।

একটি মাত্র মেয়ে, তাই সেই মেয়েকে কেন্দ্র করে নিত্যই চলে নানারকম জল্পনা-কল্পনা। এইরকম জল্পনা-কল্পনা হয়তো আরও চলত দিনের পর দিন। কিন্তু একদিন হঠাৎ ছেদ পড়ে গেল এই দাম্পত্য গবেষণায়।

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে এল নিভা। প্রত্যহ যেমন আসে তেমনিই এল। কাঁধ থেকে এপ্রন নামিয়ে হুকে লটকে দিল, স্টেথিসকোপ রাখল টেবিলের উপর। হাত থেকে রিস্টওয়াচ খুলে দেরাজের মধ্যে সেটা রেখে দিয়ে খালি হাতটা উল্টে যেন ঘড়ি দেখল। এইভাবে কিছুক্ষণ দেখে সে তার বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখ তো বাবা, এটা কি, কিসের দাগ!"

খুব ভালো করে দেখলেন বিভুপদ-বাবু, রগড়ে মুছে দেবার চেষ্টা করলেন—মুছল না। চোখের কাছেই হাতটা টেনে নিয়ে তিনি আবার দেখলেন। —একটা শ্বেত চক্র।

একটু উদ্বেগের সঙ্গেই যেন জিজ্ঞাসা করল নিভা, "কিসের দাগ মনে হচ্ছে বাবা?"

কি যে মনে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছেন না বিভুপদ, একটু চিন্তা করে মেয়েকে কিছু একটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে তিনি বললেন, "হয়তো ঘড়ির চাপে আর ঘামে হেজে গিয়েছে—তারই দাগ। সেরে যাবে।"

নিভার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন বিভুপদ, বললেন, "এইটুকুতেই কি মন খারাপ করতে হয়! ডাক্তার হতে চলেছিস, কতরকম রোগের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তার কি ঠিক আছে?"

নিভা কি বুঝল বোঝা গেল না। সে ধীরে ধীরে চলে গেল বাবার কাছ থেকে।

চন্দ্র বাড়ে কলায়-কলায়। অমাবস্যার অন্তে ধীরে ধীরে তার ভাঙা কোণটা মেরামত করতে করতে পূর্ণিমায় পৌঁছে সে হয় পৌর্ণমাসী। অবিকল সেইরকম কলায়-কলায় বেড়ে উঠে নিভা আজ পরিপূর্ণ রূপে দেখা দিয়েছে। সুগোল সুঠাম আর সুডোল তার অঙ্গ। সে অঙ্গ দেখে অনঙ্গেরই মতিভ্রম হওয়ার কথা, শিবাজি বসু তো সামান্য মানুষ।

সামান্য মানুষ বটে, কিন্তু শিবাজি যেন সাধারণ মানুষ নয়। সে যেন একটা স্ট্যাচু—ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করা একটা কঠিন কাঠামো।

পুনায় অশ্বারোহী শিবাজির মূর্তি দেখেছে নিভা। ঐ মূর্তিটার সর্বাঙ্গে যেমন পাথরে পেশী কঠিন আর কঠোর হয়ে জেগে আছে ঠিক তেমনিই কোমল চাহনিতে প্রস্তরনির্মিত চোখ-দুটি হয়ে আছে বিনম্র। পাথরের কাঠিন্য পরাভূত করে ঐ দুটি চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে শান্ত দুটি দৃষ্টি।

তুলনা করতে চায় না নিভা। কিন্তু ঐ মূর্তিটার সঙ্গে এই মানুষটার একটু মিল যেন আছে।

এই মিল যখন পাওয়া গিয়েছে, মিলনে তাহলে কোনো বাধাই নেই। আজ যে হয়েছে তার সহাধ্যায়ী ও সহচর, সেই হবে তার জীবনের সঙ্গী—এ বিষয়ে নিভার মনেও সংশয় নেই, শিবাজির মনেও না।

বিভুপদ আর অপর্ণা দেবী দুজন দুজনের দিকে চেয়ে থেকে একটু মুচকে হাসেন, দুজনে প্রায় একসঙ্গেই যেন বলে ওঠেন, "কি বল? ভালোই। ওরা সুখী হোক।"

অপর্ণা দেবী বললেন, "সুখী ওরা হবেই। ওদের দুজনের চালচলন কথা-বার্তা সবই বেশ—যাকে বলে মার্জিত। এই কাঁচা বয়স, তবু ওদের মধ্যে কোনো চঞ্চলতা নেই, লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়?"

দক্ষিণের বারান্দায় বাতাসের দাক্ষিণ্যের অভাব নেই। সেই সুমিষ্ট হাওয়ায় আত্মসমর্পণ করে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন বিভুপদ মজুমদার। দুই হাত ঘাড়ের নীচে রেখে তিনি চেয়ে ছিলেন আকাশের দিকে।

স্ত্রীর কথা শুনে এবার তিনি হাত দুটো কোলের মধ্যে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, "লক্ষ্য করেছি সব। কিন্তু ভাবছি অন্য কথা।"

মোড়াটা একটু কাছে টেনে নিয়ে অপর্ণা দেবী বললেন, "কি? কি কথা ভাবছ?"

বিভুপদ আবার গা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, "তোমার চাহিদা মেটাবে কিনা।"

"কে, নিভা?"

"উঁহু। শিবাজি। ভাবছি অমন মজবুত ঐ ছেলে কি তোমার মেয়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে?"

অপর্ণা দেবী হাসলেন, বললেন, "করে বসে আছে।"

বিভুপদও হাসলেন, বললেন, "তোমার মেয়ে গ্রহণ করেছে তো?"

"যত বুড়ো হচ্ছ ততই রস বাড়ছে তোমার। কথায় কথায় ততই রসিকতা করার সাধ জাগছে।"

অপর্ণা দেবী অনেকটা ভর্ৎসনা করার মত করে বললেন। এইটুকু তিরস্কারেই যেন কাজ হল। বিভুপদ-বাবু এ কথার জের আর টানলেন না, বললেন, "সুখী হোক ওরা।"

সুখী হওয়া কারো আশীর্বাদের উপর নির্ভর হয়তো করে না, ও জিনিসটা হয়তো সকলেরই নিজের হাতে, তবুও কারও সুখের সম্ভাবনা দেখলে তাকে সুখী দেখার জন্যে সাধ জাগে সব শুভানুধ্যায়ীরই। মেয়ের কল্যাণই যে চান এঁরা। তাই বার বার মুখ দিয়ে

আশীর্বাদের কথা বেরিয়ে যায়। কখনো ইচ্ছায়, কখনো বা অজানিতেই।

এই শুভেচ্ছা আর শুভাশীষ মাথায় বহন করে ভাবী দম্পতি তাদের কর্তব্য করে চলেছে অকাতরে—তারা অধ্যয়নে মগ্ন হয়ে আছে। মানুষের সহস্র রকমের ব্যাধি এবং সেই ব্যাধি নিরাময়ের কৌশলের সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করে নিচ্ছে ওরা।

বিভুপদ মজুমদারের ও অপর্ণা দেবীর কথোপকথন শোনার সুযোগ আমাদের হয়েছে। তাঁরা তাঁদের মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পেরেছেন এবং নিশ্চিন্তও। তাঁদের আলোচনা শুনে এ ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হয়েছে।

আমরা এঁদের কথোপকথন শুনেছি বটে, কিন্তু ওদের আলাপ-আলোচনা শোনার সুবিধে আমাদের হয়নি। দূরে থেকেই কেবল দেখেছি ওদের, কাছে গিয়ে দাঁড়াতে কখনো পারি নি। আমরা মুগ্ধ হয়েছি ওদের দেখে। মনে হয়েছে এ যুগল মূর্তি যেন চোখের পাতার উপর এঁকে রাখবার মত। আমরা দেখেছি কলেজের ফটক পার হয়ে ভরদুপুরে প্র্যাকটিকাল খাতা দিয়ে কড়া রোদ আড়াল করে ওরা দুজন পাশাপাশি হেঁটে চলেছে কলেজ স্কোয়ারের দিকে। কখনও দেখেছি, ঈষৎ সন্ধ্যার অবকাশ যাপনের জন্যে কার্জন পার্কের কচি ঘাসের উপর পা ফেলে ফেলে চলেছে দুটি বলিষ্ঠ ছায়া।

কাছে যাইনি, দূর থেকে দেখেছি। কাছে যাইনি, কি জানি কোনো আগন্তুকের আবির্ভাবে তাদের কথায় যদি ছেদ পড়ে যায় হঠাৎ। কাছে যাইনি, ভরসা হয়নি, কেউ তাদের অনুসরণ করছে বুঝতে পেরে পাছে তাদের কথার খেই যায় হারিয়ে।

নিভা মজুমদার আর শিবাজি বসু—প্রফেসরমহলেও যেমন, ছাত্রমহলেও তেমনি, এদের নিয়েই আলোচনা। এরা নাকি দুটি জুয়েল।

জহুরীই জহর চেনে। আমাদের সে যোগ্যতা নেই। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা আমাদের সাজে না। কিন্তু, স্বীকার করতে হবে, ওদের দেখে অনেক সময় আমাদের মনে হয়, সত্যি বুঝি ওরা সামান্যও নয়, সাধারণও নয়। ওরা সত্যিই দুটি রত্ন।

বিভুপদ আর অপর্ণা দেবীও এই রকম আলোচনা করেন। তাঁদের একটি-মাত্র মেয়েকে নিয়ে এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত তাঁদের নেই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সে-আলোচনায় ছেদ পড়ে গেল। সেই কল্পনার রাজ্যে হঠাৎ এসে উপস্থিত হল অকল্পনীয় একটি ঘটনা। শ্বেতচন্দনের ফোঁটার মত একটিমাত্র বিন্দু তাঁদের কল্পনার জগৎকে এমনভাবে আড়াল করে দাঁড়াল যে, তাঁদের চোখের সম্মুখ থেকে সমস্ত ভবিষ্যৎটাই যেন উহ্য হয়ে গেল।

দেখতে-দেখতে সেই সামান্য বিন্দুটা হয়ে উঠল একটি অসামান্য চক্র।

যে-নিভা এমন জলি, এমন স্মার্ট, সেই নিভা যেন নিভে গেল এই চক্রান্তে। ভাগ্যকে নিজের হাতেই গড়া যায় বলে ধারণা তারও ছিল, কিন্তু কোন্ অলক্ষ্যে বসে কে বা কারা যে চুপে চুপে ষড়যন্ত্র করে চলে, সে সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ ধারণা ছিল না নিভার।

বিভুপদবাবুরও ছিল না। অপর্ণা দেবীরও না। তাঁরা ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে রইলেন। আর, ওদিকে নিভার শরীরে ধীরে ধীরে জেগে উঠতে লাগল ঐ দাগ।

বিষণ্ণ আর বিমর্ষ দুটি মূর্তিকে ধীর পায়ে হেঁটে যেতে আমরা এখনও লক্ষ্য করি দূর থেকে—কখনও কার্জন পার্কের দিকে, কখনও কলেজ স্কোয়ারে, কখনও আবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের রাস্তায়।

ডাক্তারি-পড়া শেষ করেছে দুজনেই। দুজনেই পাস করেছে কৃতিত্বের সঙ্গেই। অধ্যাপক ও ছাত্রমহল তাদের জুয়েল বলে মনে করেছিল, তারা যে সত্যিই জুয়েল তার প্রমাণ তারা দিতে পেরেছে তাদের পরীক্ষার ফল দেখিয়ে।

ওদের আমরা দেখতে পাই নানা জায়গায়। কখনও দেখেছি ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে, কখনও পরেশনাথের মন্দির-চত্বরে, কখনও ইডেন উদ্যানে। কিছু-একটা জটিল সমস্যা নিয়ে ওরা বিব্রত, ওদের কাছে গিয়ে না দাঁড়ালেও ওদের চলাফেরা-বসার ধরণ দূরে থেকে দেখেই তা বোঝা যায়। কিন্তু কী সেই সমস্যা তা জানার কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না।

তাই সেদিন যখন ওরা রেস্-কোর্সের সাদা কাঠের রেলিঙের এপারে ঘাসের উপর পাশাপাশি বসল, তখন ওদের আলাপ-আলোচনা শোনার কৌতূহল চেপে রাখা গেল না। এইজন্যে একটু তফাতে থেকেই কান পাতলাম ওদের কথায়।

শিবাজি বলল, "বিদায় চাই। যদি সফল হই, আবার ফিরে আসব, আবার দেখা হবে।"

নিভা কিছু বলল না, মাথা নীচু করে বসে দুটি আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘাস ছিঁড়তে লাগল।

শিবাজি বলল, "এ জিনিস সারবে না কেন—জানতে চাই। না জানতে পারলে সুখ নেই আমার।"

"আচ্ছা।" নিভার গলা বুঝি একটু কাঁপল, বলল, "আচ্ছা। তোমার অপেক্ষায় আমি বসে থাকব। ফিরে এলে দেখা হবে।"

আর কেউ কোনো কথা বলল না। চুপচাপ বসে রইল পাশাপাশি।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়ে পেঁৗছল রাতে। রাত্রি গভীর হতে লাগল, তবু আর কোনো কথা বলল না কেউ। তারা বসে বসে কী যে গবেষণা করতে লাগল বোঝা গেল না।

শিবাজি চলে গিয়েছে পুনায়। পুনার রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে বসে সে একমনে গবেষণা করে চলেছে। যে-রোগে শরীর অসুস্থ হয় না, কোনো অঙ্গের কোনো বিকৃতি ঘটে না, অথচ মানুষকে বীভৎস দেখায়—এ রোগ কী রোগ এবং কেন এই রোগ? এর প্রতিকারই বা কী।

নিজের শরীরের উপরেই তার পরীক্ষা চলেছে। একমনে, একান্তমনে যেন সাধনা করে চলেছে শিবাজি বসু।

যদি কখনো দুর্বলতা এসে যায়, যদি তার এই শ্রম ও সাধনার পথে কোনোরকম বাধা এসে দাঁড়ায়—এই ভয়ে তার এই আত্মগোপন।

বিদায় নিয়ে এসেছে নিভার কাছ থেকে। কিন্তু বিদায় নিয়ে কোথায় যাচ্ছে, কবে ফিরবে—সে কথা সে বলেনি। নিভার অনুরোধ সত্ত্বেও না। বলেছে, "মানুষ আমরা। আমরা অসহায় জীব। নিজেরা নিজেদের বশে রাখতে পারি, এটুকু শক্তিও নেই আমাদের। এইজন্যে ও-প্রশ্ন কোরো না। নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে চাই কিছুকাল, সে-কিছুকালটা কতটা কাল, তা বলতে পারব না।"

নিভা ধীরে ধীরে বলেছে, "এ-দাগ যদি আমার গায়ে থাকেই, যদি এ-দাগ বাড়েই—ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কিছু নেই। কিন্তু ও-লাঞ্ছনা মেনে নেব কেন। পারি কি না-পারি—তাকে পরাস্ত করার চেষ্টা অন্তত করতে হবে। কোনো-একটা কাজে প্রেরণা পেতে হলে তার একটা উৎস চাই, যাকে বলে সোর্স। তোমার গায়ের ঐ চক্র আমাকে—"

ফুঁপিয়ে উঠেছে নিভা মজুমদার। শিবাজি বসু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজেছে অকারণেই।

শিবাজির নিরুদ্দেশ হবার আগে এইভাবে কয়েকদিন তাদের কেটেছে বেদনায় ও রোদনে।

এদিকে এই দুই ভাবী দম্পতি তাদের জীবনের জটিলতা নিয়ে ব্যস্ত, ওদিকে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের দক্ষিণের বারান্দায় বসে সেই পুরাতন দম্পতি তাঁদের জীবনের জটিলতা নিয়ে বিব্রত—তাঁদের কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে।

শিবাজি—সে যেন ব্রোঞ্জের স্ট্যাচু। অমন ছেলে কি এমন মেয়েকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করবে। তাদের জীবনের এই চটুল ছেলেখেলা সাঙ্গ হয়ে যেতে কতক্ষণ?

শিবাজির অন্তর্ধানের কিছুদিন পরেই তাঁরা তাঁদের অনুমানটিকে মর্মান্তিক সত্য বলে স্বীকার করে নিলেন। ছেলেটা তার ছেলেখেলা সমাপ্ত করে উধাও হয়েছে নিশ্চয়। নইলে একটা ঠিকানা পর্যন্ত না দিয়ে এভাবে আত্মগোপন করে থাকার মানে কি।

তার হাতের শ্বেত চক্রটি একটি বৃহৎ বৃত্ত হয়ে ওঠার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। নিভা নিভৃতে বসে বসে তার সমস্ত শরীর খুঁজে খুঁজে দেখতে আরম্ভ করল আর কোথাও কোনো বিন্দু দেখা দিয়েছে কিনা।

খুঁজে খুঁজে সে দেখে। নিজের চিকিৎসা নিজেই করে। নিজের শরীরের উপরেই যেন চলেছে তার পরীক্ষা। চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ে যতটা তার জ্ঞান হয়েছে সেই জ্ঞান সে প্রয়োগ করে নিজেরই উপর। বড় হয়ে উঠতে দেয় না চক্রটিকে। ওষুধ খায়, ইনজেকশন দেয়, প্রলেপ লাগায়। নিজেকে নিয়েই নিজে সে বিব্রত।

কিন্তু নিভাকে নিয়ে নিভা একা বিব্রত নয়। অপর্ণা দেবী আর বিভূপদবাবুও মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে বিব্রত।

নিভা ভাবে অনেক কথা। অনেক দিনের কথা। শিবাজি চলে যাবার পর বছর-তিন কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে একটা খবরও তার পাওয়া গেল না কেন। কেন কেন কেন। ব্যাকুলভাবে নিজেকেই সে প্রশ্ন করে কেবল।

প্রশ্ন করে আর ডিভাইডার দিয়ে মেপে দেখে সেই চক্রের ডায়ামিটার। একি একি একি। আবার সে মাপে। একটু যেন কমেছে। গত সপ্তাহের থেকে মাপ যেন কিছু কম। কেঁপে ওঠে তার শরীর। সে কম্পন পুলকের না পলকের—তা সে নিজেও জানে না। আজ মাপে যা কম মনে হচ্ছে কাল তার পরিমাপ কি দাঁড়াবে কে জানে।

শিবাজির কথা মনে পড়ে। তার সব কথা তবে কি মেকি আর ভুয়ো? অভিমান হয় শিবাজির উপর। অপমানও বোধ করে সে। তাকে অসার আশ্বাস দিয়ে শিবাজির এ পলায়নের মানে কি? তার চেষ্টা যদি আন্তরিক হত তাহলে এই তিন বছরের মধ্যে একটা চিঠি দিয়েও কি তাকে স্মরণ করতে পারত না শিবাজি বসু? সত্যি সে বুঝি রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া মানুষ নয়, সে সত্যিই একটা স্ট্যাচু।

সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের দক্ষিণের বারান্দায় হাওয়ার দাক্ষিণ্য অফুরন্ত। মেঘ কেটে গিয়ে শরৎকালের প্রসন্ন আলো এসে পড়েছে বাড়িটার সারা গায়ে।

এ বাড়ির বাসিন্দাদের মনেও সেই আলো বুঝি রোদের আল্পনা এঁকে চলেছে। ওদিক থেকে ভেসে আসছে নিমের হাওয়া।

রোদের আল্পনা আঁকা হবে না কেন। যে শ্বেত আল্পনা এঁকে উঠছিল নিভার শরীরে, সে যে মুছে যেতে আরম্ভ করেছে—সে যে উহ্য হতে চলেছে এবার। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিভা দেখে, নিভৃতে গিয়ে অন্বেষণ করে সারা শরীর।

শিবাজির কথাটা মনে পড়ে তার। —এ জিনিস সারবে না কেন, সারে না কেন জানতে চাই।

শিবাজি যদি সত্যিই তা অন্বেষণ করতে গিয়ে থাকে তাহলে এত দিনেও তার সে অন্বেষণ শেষ হচ্ছে না কেন।

"ধূর্ত, চতুর, ঠগ।"

বারান্দায় বসে হাওয়া খেতে খেতে বলে উঠলেন বিভূপদবাবু।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অপর্ণা দেবী, এগিয়ে এসে বললেন, "কে কে কে? কাকে গাল পাড়ছ?"

"কাউকে না। আমার অদৃষ্টকে আর নিভার বরাতকে।"

অপর্ণা দেবী বুঝলেন, বললেন, "মিথ্যাই চটছ। পুরুষরাই অমনি। তাদের হৃদয়ও নেই।"

সোজা হয়ে বসে বিভূপদবাবু বললেন, "মেয়ের বিয়ে দেব আমি। আলবত।"

"উঁহু।" বাধা দিলেন অপর্ণা দেবী, বললেন, "তা হবে না। কারও হাতে মেয়ে দেব না। আমার মেয়ের হাতে যেন—"

"চুপ করো। তোমার ঐ এক এয়ো।"

অপর্ণা দেবী চুপ করে গেলেন।

মেয়েরও বয়স হয়েছে। কয়েক বছর ধরে চক্রের চক্রান্তে যে উৎকণ্ঠায় কাটছিল তার অবসান হয়েছে। এর মধ্যে মেয়ের জীবনের কতগুলো বছর নষ্ট হয়ে গেল। ভগবানের চক্রান্ত কে খণ্ডাবে। গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে থাকেন অপর্ণা দেবী।

এদিকে এঁরা যখন শিবাজি সম্বন্ধে সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন—এমনকি নিভাও যখন আর কোনো আশা রাখেনি, তখন হঠাৎ একটা চিঠি এল। শিবাজি লিখছে—সে আসছে।

কোথায় ছিল এতদিন? সে কথা চিঠিতে সে জানায় নি নাকি?

অপর্ণা দেবীর উপর চটে উঠলেন বিভূপদবাবু, বললেন, "দেখছ না? ঐ তো লেখা—প-য়ে হ্রস্বউকার দন্ত্য-নয়ে আকার?"

"পুনায় ছিল সে? কী ছেলে রে বাবা! আমাদের সেই পুনা?"

"হ্যাঁ।" বিভূপদবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তোমার সেই পুনা।"

দিন যেন কাটে না। কবে আসবে কবে আসবে করে দিন গোনে সকলে। ক্যালেণ্ডারের তারিখগুলো যেন নড়ে না।

নড়ে গেল তারিখ। সেই বিশাল আর বলিষ্ঠ স্ট্যাচু এসে দাঁড়াল ফটকের সামনে।

উপরের বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখেই নিভার বয়স যেন কমে গেল হঠাৎ। দৌড় দিল সে—তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল সে।

শিবাজি বলল, "এসেছি।"

নিভা তার মুখের দিকে তাকাল। কথা বলতে পারল না। আনন্দেই বুঝি আটকে গেল কথা।

শিবাজি বলল, "রেগেছ। খবর দিইনি বলে। সময় পাইনি—বিশ্বাস করো। নিজেকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে শতচ্ছিদ্র করেছি। কিন্তু—"

"ভিতরে এস। তুমি বড় ক্লান্ত।"

"হ্যাঁ, ক্লান্তই আমি। যুদ্ধ করতে গিয়ে হেরে গেলাম নিভা।"

ব্যস্ত হয়ে নিভা বলল, "কিসের হার?"

"এই দেখ, কি জুটেছে কপালে। শ্বেত চন্দনের তিলক নয় কিন্তু।"

উপর থেকে অপর্ণা দেবী আর বিভূপদবাবু চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন ওদের। উপরে চলে আসতে বলতে লাগলেন।

নিভা বলল, "চল। উপরে চল। হার নয় ওটা। ওটা তোমার তিলকই। তুমি এস।"

আমরা সবাই আলাদা

সুমিত সেন

মানুষ বড় অদ্ভুত। মানুষকে ব্যাখ্যা করার জন্য কত পণ্ডিত মনীষী কত সাধনা পরিশ্রম করেছেন। কবি সাহিত্যিক ধ্যান করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি। ক্রমশ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। পণ্ডিতেরা কপালের ঘাম মুছে রায় দিচ্ছেন, মানুষ বড় জটিল। জ্যামিতিতে যেমন নিয়ম আছে, অঙ্কে যেমন সূত্র আছে, অর্থনীতিতে যেমন পদ্ধতি আছে, মানুষ বিচারে যদি তেমনি একটা কোন নিয়ম-পদ্ধতি থাকতো তবে সমস্যার সুরাহা হলেও হতে পারতো। কিন্তু তার কোন উপায় নেই। প্রত্যেক মানুষই আলাদা। এক জনের ছাঁচে নয় ঠিক অন্যজন। পুতুলের মুখ এক রকম। তাদের বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। বাঁকুড়ার পুতুলের মুখের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের পুতুলের মুখের ফারাক অনেকখানি। কিন্তু কৃষ্ণনগরের এক কারিগরের পুতুলের মুখ থেকে অন্য পটুয়ার পুতুলের মুখের তফাত কতখানি? খুব বেশী নয়। কেন না ওরা ছাঁচে ঢালা। মানুষ ত আর ছাঁচে ঢালা নয়। তাই সে স্বতন্ত্র, সে আলাদা।

কিন্তু সকল মানুষই কি আলাদা? অসাধারণ মানুষদের কথা আমরা জানি। তাঁরা নিশ্চয়ই বিশিষ্ট। কিন্তু সাধারণ মানুষ ত অনেকটাই এক রকম— চেহারায় না হোক, প্রকৃতিতে! সেখানে তারা এক নয় কেন? এর জবাব দিতে গেলে পরিসংখ্যানে আসতে হয়। আমাদের দেশের নয়, হাতের কাছে অন্য একটি দেশের খবর আছে। তাই দিয়েই ব্যাপারটা স্পষ্ট করি তাহলে।

মার্কিণ দেশ। সে দেশে মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের গবেষণা চলছে রীতিমত এবং এ দিকে তাঁরা বেশ উন্নত। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ আছে। তাঁরা প্রচুর কাজ করেন। প্রমাণ যোগাড় করেন।

কিছুকাল আগে গবেষকরা কয়েকটা প্রশ্ন বেছে নিয়ে বহু মার্কিণ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের দোরে দোরে ঘুরেছেন। তাঁদের উত্তর টুকে নিয়েছেন, প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু কি ফল হল? ঐক্য ত হলই না, বরং বৈচিত্র বাড়ল। কয়েকটা প্রশ্ন তোলা যাক।

যেমন একটা প্রশ্ন ছিল, "আপনি কি সুখী?" প্রশ্নটি খুবই ছোট, সন্দেহ নেই। মাত্র কয়েকটি শব্দের ব্যাপার। কিন্তু উত্তর দিতে গেলে বেশ বিপাকে পড়তে হয়। কে বলতে পারে যে, সে সুখী! বলা শক্ত। আবার এও বুক ফুলিয়ে বলা যায় না যে সুখী নই। আমরা কখন সুখী কখন দুঃখী। কিন্তু সে ত আর উত্তর হল না। অধিকাংশ লোক ভাবে যে, নিজের বাড়ী-গাড়ী থাকলে, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সঙ্গে বনিবনা থাকলে, পাড়া-পড়শীর সঙ্গে সম্প্রীতি থাকলে, মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা এবং ঋণভার না থাকলে সুখী হওয়া যায়। এমন আদর্শ অবস্থা খুঁজে পাওয়া দায়। অধিকাংশ লোকের তা থাকে না। আবার যাদের আছে, তারাও কিন্তু সুখী নয়। তাদের অন্য সমস্যা। সে সমস্যা মনের প্রবণতার। পরিসংখ্যানে প্রকাশ যে, সুখী হবার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অতি নিকটের। যাঁরা ধর্ম বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের প্রতি সত্যি-সত্যি আস্থাবান, তাঁরা নিরীশ্বর ব্যক্তির তুলনায় সুখী। নিরীশ্বর ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিরোধ এবং সঙ্কট খুবই প্রবল। তাঁদের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির যোগাযোগের মধ্যে অন্য আর একটা সুর বাজে। মানুষকে তাঁরা বুকের খুব কাছে টানতে পারেন না। তাঁদের কোন মুহূর্তে নিঃসংশয় ও প্রশ্নাতীত নয়। কাজেও তাঁরা খুব উন্নতি করতে পারেন না। অর্থনীতির দিক থেকে তাঁরা অপেক্ষাকৃত বিপন্ন। এই হল আমেরিকার লোকের প্রতিক্রিয়া। আমাদের দেশে কি উত্তর হবে আন্দাজ করা যায় না। মনে হয় সত্যি দেখা যাবে যে, নাস্তিকদের তুলনায় আস্তিকরা আরো সুখী। কিন্তু তাকে কি সুখ
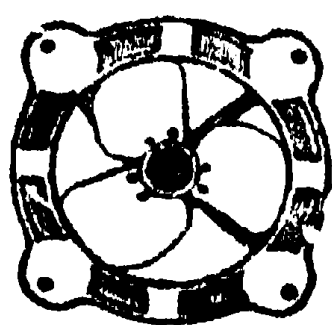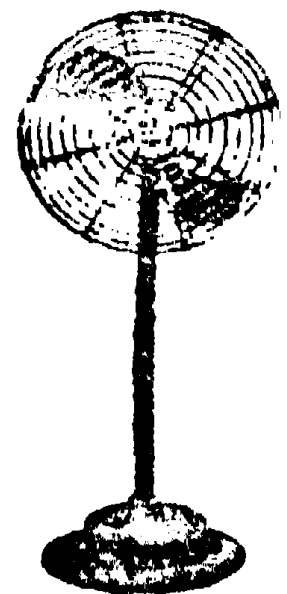
বলা যায়? আস্তিকেরা যা কিছু সমর্পণ করেন ঈশ্বরকে। নিজের ইচ্ছার চেয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা জয়যুক্ত হোক, এই দেখতে চান। কিন্তু নাস্তিকেরা নিজের ওপর নির্ভরশীল। একদল মনস্তাত্ত্বিক আস্তিকদের আখ্যান দিয়েছেন, "বুড়ো খোকা।" অর্থাৎ সাবালক হয়েও তাঁরা শিশুর মত নির্ভরশীল এবং নাবালক। তাঁরা সুখী নন। তাহলে? উত্তর আপনারা ভেবে নিন।

বড় প্রশ্ন থাক। ছোট প্রশ্নে আসি। একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আপনি কি হিসেব করে সংসার চালাতে পারেন"?

যদি বলেন, পারি, তবে আপনি সত্যিই আলাদা। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বলবে, হিসেব করে সংসার চালানো যায় নাকি! আমেরিকায় যে পরিসংখ্যান করা হয়েছিল, তাতে প্রকাশ যে, প্রতি-দশ জন আমেরিকানের মধ্যে চার জন সংসারের জন্যে বাজেট তৈরী করেন। অধিকাংশ লোক বাজেট তৈরী করতেই জানেন না। কিন্তু যাঁদের টাকা পয়সা বেশী, সাদা কথায় যাঁরা বিত্তবান তাঁরাই কিন্তু হিসেব-নিপুণ, বাজেট-প্রবণ।

"আপনি কি পাহাড়ে চড়েছেন?"

লজ্জা পাবার কিছু নেই। স্বচ্ছন্দে 'না' বলতে পারেন। তাতে প্রমাণিত হবে না যে, আপনি ঘরকুনো, ভীতু। আমেরিকার শতকরা ৫৭ জন পুরুষ আর ৬৩ জন মহিলা পাহাড়ে চড়েন নি। ওদের তুলনায় আমাদের অর্থ, সামর্থ্য, শক্তি কম। আমাদের দেশে এই হিসেব নিলে কি ফল পাওয়া যাবে তা বেশ বোঝা যায়। থাক না আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয় নাম্বার নাগাধিরাজঃ।

"আপনি কি সংস্কারে বিশ্বাস করেন?"

বিংশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে এই জাতীয় প্রশ্নকে যদি আপনি অপমান বলে মনে করেন তবে আপনাকে অন্ততঃ ব্যক্তিরে মিথ্যাবাদী না বললেও, বলবো, আপনি নিজেকে জানেন না। আমাদের দেশে হাঁচি-কাশি-টিকটিকির প্রভুত্ব তর্কের আসরে কমলেও ব্যবহারিক জীবনে অপ্রতিহত। এবং তার প্রতিক্রিয়া এমনভাবে আমাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে গেছে যে, সচেতন মন জেগে ওঠার আগেই অভ্যাসের তাড়ায় আমরা সেই নিয়মেই পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবহার যথাযথভাবে করি। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাবৎ বড় বড় নৈয়ায়িক ঠিক এই ভাবে ব্যবহার করে আসছেন। আমাদের দেশের কথা থাক। এদেশে এখনও এ জাতীয় পরিসংখ্যান হয়নি। কিন্তু আমেরিকায় হয়েছে এবং এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতি তিন জন প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানের মধ্যে এক জন সংস্কারাচ্ছন্ন। অন্য একটা হিসাবে দেখা গেছে যে, প্রতি দশ জনের মধ্যে নয় জনই 'তাঁরা সংস্কারাচ্ছন্ন নন'—এই বলে আত্ম-প্রবঞ্চনা করছেন। একটা মজার ঘটনা বলি। এক ভদ্রলোক প্রচণ্ড তর্ক করে প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে, হাঁচি-কাশি-টিকটিকির প্রতাপ স্বীকার করেন না। তর্ক বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে যাবার পর নিজেই বলে বসলেন: বেশ কয়েক বছর আগে আমার হাত থেকে আয়না পড়ে ভেঙে যায়। মন খুঁতখুঁত করছিল। সে দিনই আমি যেই ঘরের বাইরে পা দিয়েছি, অমনি গাড়ী-চাপা পড়লাম।

সংস্কার কিন্তু অশিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের প্রতি স্তরে ছড়িয়ে আছে। এখানে শিক্ষা-অশিক্ষার কোন প্রশ্ন নেই। কালো বিড়াল, পোড়া দুধকে অশুভ ইঙ্গিত বলে মনে করেন সবাই। মোটর গাড়ীতে যদি বাচ্চা-ছেলের ছোট জুতো টানানো থাকে, তবে অনেকের ধারণা দুর্ঘটনা হবে না। হিসেব বাড়িয়ে লাভ নেই। দেখা যাবে কালা-ধলায় বিরোধ যতই থাক, সংস্কারের চেহারাগুলো মোটামুটি এক রকমের। তাই আপনি যদি সংস্কারাচ্ছন্ন না হন তবে আপনি সত্যিই স্বতন্ত্র।

"মনে করুন, আপনার নতুন জন্ম হবে। আপনি ছেলে হয়ে জন্মালে সুখী হবেন না মেয়ে হয়ে জন্মালে সুখী হবেন?"

নিজের বাড়ীর আলাপ-আলোচনা মনে করে দেখুন। উত্তর পাবেন। কিন্তু আমেরিকার ছেলে-মেয়েরা অন্য উত্তর দিয়েছে। শতকরা মাত্র ২৫ জন মহিলা উত্তর দিয়েছেন যে, তাঁরা পুরুষ হতে চান এবং শতকরা মাত্র ৩ জন পুরুষ জানিয়েছেন যে, তাঁরা মহিলা হতে চান।

"আপনি কি জীবন আবার নতুন-ভাবে সুরু করতে চান?"

এ প্রশ্নের উত্তর [illegible] আমরা এই জীবনে [illegible] সুখী নাও হতে পারি। কিন্তু আবার নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করতে বড়ই দ্বিধাগ্রস্ত হব। আমেরিকায় দশ জনের মধ্যে ছয় জন বলেছেন যে, তাঁরা জীবন আর নতুন-ভাবে আরম্ভ করতে রাজী নন। বাধা তাই অ[illegible] সার্থকতাই মানুষ যা হয়েছে তাই ভাল। বাকী চার জন অন্যভাবে জীবন আরম্ভ করতে চান। কি ভাবে? মোটামুটি বলতে গেলে, চার রকমের অভাব তাঁরা বোধ করেছেন। কেউ বলেছেন আরো লেখা-পড়া শেখা উচিত ছিল। কারো কারো বর্তমান পেশা ভাল লাগছে না। কেউ বিবাহিত জীবনে ভুল করেছেন বলে ধারণা। অন্য কাউকে বিয়ে করা উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি। কেউ আবার বলেছেন সঞ্চয় তাঁদের যথেষ্ট নয়। নতুনভাবে যাঁরা জীবন সুরু করতে চান তাঁদের মধ্যে সংখ্যায় বেশী মহিলারা।

গোড়ার কথায় ফেরা যাক। প্রশ্নের উত্তর থেকে প্রমাণ হয়েছে ব্যক্তিগত রুচি-প্রকৃতির দিক থেকে এক জাতের মানুষের মধ্যে পার্থক্য কত বেশী। এই পার্থক্যই জীবন। এই-ই মানুষ।

লোকে বলে সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ। সে কথা বিচার ক'রে দেখবার যোগ্য। সৌন্দর্য-রহস্যকে বিশ্লেষণ ক'রে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্ট্‌স্‌কে অধিকার ক'রে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়। অসুন্দর সামগ্রীরও প্রকাশ আছে, সেও একটা সমগ্রতা, একটা ঐক্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বস্তুরূপী তথ্যটাই মুখ্য, ঐক্যটা গৌণ। গোলাপের আকারে আয়তনে তার সুষমায় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্য বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তা সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে, সেইজন্যে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।

—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

আদিম সমুদ্র ও আদি প্রাণ

সমুদ্র ছিল ও আছে বলেই আমরা আছি। বিজ্ঞানীদের মতে, আজ থেকে দুশো কোটি বছরেরও আগে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে আদি প্রাণের সূত্রপাত হয়েছিল। কি ভাবে হয়েছিল তা রুশ বিজ্ঞানী ওপারিন্ ছক্ কেটে কেটে ব্যাখ্যা করেছেন। এমন কি বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে জড় থেকে প্রাণের বিবর্তনের কয়েকটি ধাপ সত্যিকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, উদ্ভিদ ও জীবদেহে যেসব জটিল জৈব পদার্থ আছে সেগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব নয়। যেমন, শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ইত্যাদি। এগুলোকে পেতে হলে উদ্ভিদ বা জীবদেহ থেকেই পেতে হবে। কিন্তু শতাব্দী পার হবার আগে বিজ্ঞানীরা নিজেরাই প্রমাণ করলেন যে, এ-ধারণা ভুল। তারপর থেকে হরেক রকমের জৈব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হয়ে চলেছে। এককালে নীল পেতে হলে চাষ ছাড়া গতি ছিল না। এই নীলের চাষ আমাদের দেশের ইতিহাসের পুরো একটি অধ্যায় জুড়ে আছে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরি হবার পর থেকে নীলের চাষের কোনো প্রয়োজনই আর নেই। শুধু নীল কেন, নানা ধরনের শর্করা, গন্ধদ্রব্য, স্নেহপদার্থ, গাছপাতার রং আজকাল অতি সহজেই কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হতে পারে। শুধু কি তাই! কিছুকাল আগে যা কল্পনা করা যেত না— ভিটামিন, হর্মোন ও অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে যা তৈরি হতে পারে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেগুলো তৈরি হতে বাধা কি! আদিম সমুদ্র ছিল প্রকৃতির সেই বিপুল গবেষণাগার যেখানে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অজস্র ধরনের জৈব পদার্থ তৈরি হয়ে চলেছিল।

কিন্তু জৈব পদার্থ মানেই প্রাণ নয়। জীবদেহ গড়ে ওঠে এক বিশেষ ধরনের উপাদানে, যার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাজম্। প্রোটোপ্লাজম্-এর মুখ্য অংশ হচ্ছে প্রোটিন। কিছুকাল আগেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, প্রোটিন এমন একটা পদার্থ যার রহস্য ভেদ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু হালের বিজ্ঞানীদের কাছে প্রোটিনের রহস্যও ধরা পড়ে গিয়েছে। প্রোটিন হচ্ছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুর এক বিশেষ ধাঁচের জোট। এবং আদিম পৃথিবীতেও এই বিশেষ পদার্থগুলি এই বিশেষ ধাঁচে অনায়াসেই জোট বাঁধতে পেরেছিল।

কিন্তু তবুও সেই কথাটা থেকেই যাচ্ছে। জৈব পদার্থ মানেই তো আর জীবন নয়। জৈব পদার্থকে আশ্রয় করে জীবনের ফুলকিটি কি ভাবে জ্বলে উঠেছিল?

জীবনের লক্ষণ কি? পুষ্টি ও বংশ-রক্ষা। জৈব পদার্থ এই দুটি লক্ষণ-বিশিষ্ট হলে পরেই আমরা বলতে পারি যে পদার্থটি জীবন্ত। অর্থাৎ, লক্ষণ দুটি থাকা দরকার, তার চেহারা যেমনই হোক। ডাক্তার যেমন রোগ ধরেন রোগের লক্ষণ দেখে রোগীর সাজ-পোষাক দেখে নয়- এ ক্ষেত্রেও জীবনকে স্বীকার করে নিতে হবে জীবনের লক্ষণ দেখে।

একটি কথা মনে রাখা দরকার। সেই আদিম সমুদ্রে যা কিছু জৈব পদার্থ তৈরি হয়েছিল সবই ছিল জলে-গোলা অবস্থায়, ইংরেজিতে যাকে বলে 'সলিউশন'। চিনি-গোলা বা নুন-গোলা জলকেও বলা যেতে পারে সলিউশন। খুব মিহি ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকলেও এই সলিউশনের চিনি বা নুনকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু কাদাগোলা জল সলিউশন নয়। জল থেকে কাদাকে আলাদা করতে হলে ছাঁকুনির দরকারও হয় না। জলকে স্থির থাকতে দিলেই কাদা থিতিয়ে পড়ে।

কিন্তু আরেক ধরনের সলিউশন আছে যাকে বলা হয় 'কলয়ডাল' সলিউশন। এক ধরনের গাদের আঠা আছে যা জলে গালিয়ে নিলে চোখের দেখায় মনে হয় জলের সংগে একেবারে মিশে গেছে। আসলে কিন্তু মেশেনি। মিহি ছাঁকুনিতে এই গাদ আটকে যায়। এই হচ্ছে কলয়ডাল সলিউশন।

আদিম সমুদ্রেও জৈব ও অজৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন তৈরি হয়েছিল। অজৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন নিয়ে আমাদের কোনো মাথা-ব্যথা নেই। জৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশনকেই বলা যেতে পারে আদি প্রাণ। কারণ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, জৈব পদার্থের এই কলয়ডাল সলিউশন জলের সংগে অন্য যেসব জৈব ও অজৈব পদার্থ মিশে থাকে সেগুলোকে সহজেই আত্মসাৎ করতে পারে। তার মানেই পুষ্টি। আর আত্মসাতের পালা যতোই চলতে থাকে ততোই সেই কলয়ডাল জৈব পদার্থটি ফুলতে থাকে। ফুলতে ফুলতে শেষে এক সময়ে দু-ভাগ হয়ে যায়। অর্থাৎ আগে ছিল একটি, এখন দুটি। তারপর থেকে এই দুটি ভাগ আলাদা আলাদাভাবে আত্মসাতের পালা চালাতে থাকে। তার মানেই বংশবৃদ্ধি।

এই হচ্ছে জীবনের শুরু। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা, জীবনের শুরু
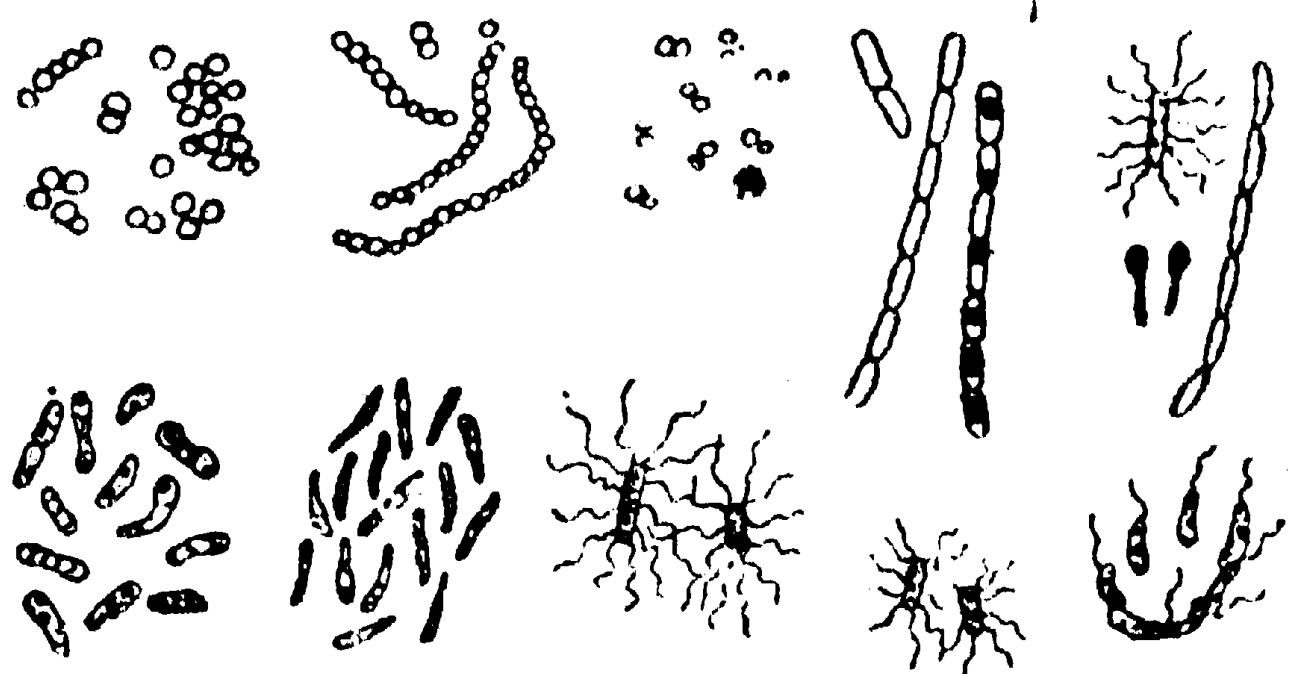
প্রোটোজোয়

এ্যালগি

হয়েছিল সূর্যের আলোর আশীর্বাদে। তখনো বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন তৈরি হয়নি। ফলে বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে ওজোন-গ্যাসের কোনো পর্দা তৈরি হতে পারেনি। এই পদার্থটি আছে বলেই সূর্যের আলোর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু তখন এই পদার্থটি ছিল না। কাজেই আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি অবাধে এসে পড়েছিল সমুদ্রের জলে। সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুমন্ত রাজকন্যে জেগে উঠেছিল যেন। সেই আদিম সমুদ্রের জলে একটি প্রোটোপ্লাজম্-এর বিন্দুকে আশ্রয় করে তৈরি হয়েছিল আদি প্রাণ। সমুদ্র হচ্ছে আদি-জননী। প্রাণ হচ্ছে সূর্যের আশীর্বাদ।

সমুদ্র সম্পর্কে আরো কিছু খবর পরবর্তী কোনো সংখ্যায় দেবার ইচ্ছে রইল।

শুক্রগ্রহের অক্ষ-আবর্তন

১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রুশ বিজ্ঞানীরা একটি রকেট ছেড়েছিলেন শুক্রগ্রহের উদ্দেশে। আগামী ১৯শে মে কিংবা ২০শে মে তারিখে এই রকেটটি শুক্রগ্রহের সবচেয়ে কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছবে। তবে এই রকেটটি শুক্রগ্রহের গায়ে আছড়ে পড়বে না, শুক্রগ্রহ থেকে প্রায় ১,১২,০০০ মাইল দূর দিয়ে পার হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে আরো যে সব খবর বেরিয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, সোভিয়েত ও মার্কিণ বিজ্ঞানীরা এই গ্রহটির দিকেই বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন। তার কারণও আছে। শুক্রকে বলা হয় পৃথিবীর সহযাত্রী। চন্দ্র পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক, তার পরেই শুক্র। প্রতি উনিশ মাস পরে পরে শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে আর তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হয় ২,৬০,০০,০০০ মাইল। শুক্র যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে তখন তার দূরত্ব ১৬,০০,০০,০০০ মাইল। মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে তখন পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব হয় ৩,৪০,০০,০০০ মাইল। এ-বছরের ১১ই এপ্রিল তারিখে শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিল।

শুক্রগ্রহ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের প্রচণ্ড কৌতূহলের কারণ এই যে, শুক্রগ্রহটি রয়েছে ঘন মেঘের আড়ালে। ঘোমটা না সরালে যেমন নতুন বৌয়ের মুখ দেখা যায় না, তেমনি এই ঘন মেঘের আড়াল না সরাতে পারলে শুক্রগ্রহের উপরিতল দেখা সম্ভব নয়। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই মেঘের প্রায় সবটাই কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন না থাকার মতো, জলীয় বাষ্পের ছিটেফোঁটা আছে কি নেই তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে খুবেই মতভেদ। কাজেই এই গ্রহটিকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের জল্পনাকল্পনার আর শেষ নেই। কারও মতে শুক্র-গ্রহের উপরিতল মরুভূমির মতো, সেখানে অনবরত শুধু ধুলোর ঝড় ফুঁশে ফুঁশে উঠছে, প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। কারও মতে, শুক্রগ্রহের উপরিতলে রয়েছে নিবিড় উদ্ভিদ ও প্রাথমিক স্তরের জীবজগৎ।

এসব মতামতের অনেকটাই অনুমান মাত্র। কাজেই শুক্রগ্রহ নিয়ে সমানে গবেষণা চলেছে। আর শুক্রগ্রহকে পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে বড়ো সুযোগ আসে যখন শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে। যেমন এসেছিল এ-বছরের ১১ই এপ্রিল তারিখে। সোভিয়েত ও মার্কিণ বিজ্ঞানীরা এই সুযোগে শুক্রগ্রহের উদ্দেশে জোরালো বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তিনটি বিষয়ের খবর সংগ্রহঃ (১) শুক্রগ্রহের অক্ষ-আবর্তন, (২) শুক্রগ্রহের উপরিতল, (৩) সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বা জ্যোতিষিক এককের সঠিক মাপ।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষাকার্যের সাফল্য ঘোষণা করে জানিয়েছেন যে, শুক্রগ্রহের অক্ষ-আবর্তন পৃথিবীর দশ দিনে একবার। তার মানে যেখানে পৃথিবীর একটি দিন ও একটি রাত চব্বিশ ঘণ্টায় সেখানে শুক্রগ্রহের একটি দিন ও একটি রাত দশ দিনে। এই পরীক্ষাকার্যের পুরো ফলাফল এখনো জানা যায়নি। এখনো তা অধ্যয়নের পর্যায়ে রয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে ব্রিটেনের জর্ডেল ব্যাংক মানমন্দির থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছে।

মার্কিণ দেশে এই একই পরীক্ষা কার্য চালানো হয়েছিল ন্যাশনাল এরোনটিক্স্ অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন-এর পক্ষ থেকে। তাঁদের ঘোষণায় জানা যায় যে, গত ১০ই মার্চ তারিখে শুক্রগ্রহের উদ্দেশে বেতার-তরঙ্গ পাঠানো হয়েছিল। সাত কোটি মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে সাড়ে ছয় মিনিট পরে সেই বেতার-তরঙ্গ আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ

> পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ
> বলে, আপন সূদীর্ঘ কক্ষে
> তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান
> তুমি মহিমান্বিত,
> সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণ পথে
> তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
> রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা
> দুলছে তোমার কণ্ঠে
> যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
> তোমার নিগূঢ় জগদ্ ব্যাপার
> সেখানে তুমি স্বতন্ত্র,
> সেখানে সুদূর।
> সেখানে লক্ষকোটি বৎসর
> আপনার জনহীন রহস্যে
> তুমি অবগুণ্ঠিত।

তবে দুই দেশের বিজ্ঞানীরা যে রকম উঠে পড়ে লেগেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে, শুক্রগ্রহের অবগুণ্ঠন খসতে আর খুব বেশী দেরি নেই। এবং তারপরেও আর খুব বেশী দিন শুক্রগ্রহকে জনহীন থাকতে হবে না, রহস্যে তো নয়ই।

মহাবিদ্যার গুপ্তকথা

কাঙাল সেন

প্রথম ভাগের প্রথম পাঠ 'চুরি করা মহাপাপ।'

অথচ বাইবেলে বলে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের কারণই হল চৌর্যবৃত্তি। চুরি করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েই যে আদি মানবদম্পতী স্বর্গ থেকে মাটিতে নির্বাসিত হয়েছিল, তার পর থেকে মানুষের ইতিহাসে অপহরণের পালার আর শেষ নেই। দেশ বিদেশের মোটা মোটা ইতিহাসের প্রধানতম নায়ক সেই সমস্ত বীর—যারা অন্যের দেশ, অন্যের ঐশ্বর্য, অন্যের সম্পদের সব থেকে বড় অপহারক। তারপর দিন যত যায় মানব তত সভ্য হল রুচিবান হল আর এফিশিয়েন্ট হল। ফলে চৌর্যবৃত্তিরও ধরন পালটাল। আধুনিক চোর পৃথিবীর বড় বড় বাজারে বসে সবার অগোচরে অনায়াসে এমনকি মানুষের হৃদপিণ্ডটিও চুরি করে নিতে পারে। শৌর্য বলুন, চৌর্য বলুন—পৃথিবীর যা কিছু বড় ব্যাপার সবই এখন সূক্ষ্ম অর্থে আর্ট।

তাহলে 'চুরি করা মহাপাপ' প্রথম পাঠের এই শিক্ষার অর্থ কি? অর্থ মানবসভ্যতার সব থেকে বড় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। কারণ, পাপ কথা মানেই ব্যাপারটাকে লোভনীয় করে তোলা। ভেবে দেখুন, নিষেধ করা হয়েছিল বলেই আদম ফল খেয়েছিল। মহাপাপ জেনেই মানুষ চুরি করে। তাছাড়া এর একটা ধর্মসংগত ব্যাখ্যাও আছে। কারণ, সে যদি হিন্দু হয় তাহলে বেদান্তের কথানুসারে সে মানে, পাপ-পুণ্য কিছুই মানবাত্মাকে স্পর্শ করে না। আর সে যদি খৃষ্টান হয় তাহলে তো তার জানাই আছে আদিম পাপ তার রক্তে এবং পাপের অভিজ্ঞতা ছাড়া স্বর্গের দরজা খোলার আবেগ কোনদিনই কারো জন্মাতে পারে না।

সুতরাং পাপ-পুণ্য থাক, নীতি-শিক্ষাও থাক। আসুন আমরা এক ধরনের নিরীহ চোর, ভদ্র ভাষায় যাকে পকেটমার বলা হয়, তাঁদের সম্পর্কে দু-কথা আলোচনা করি। আমার ধারণা পকেটমাররা চৌর্যকার্যে উপেক্ষিত। পৃথিবীর তাবৎ পুঁথি প্রাচীন আর নবীন চোরদের গুণকীর্তনে বোঝাই। এঁদের সকলে ভুলে গেছে। কাল বিচারে আমি এই পকেটমারদের বলি প্রাগাধুনিক। ডাকাত, লুটেরা—এরা ছিল প্রাচীন চোর। আধুনিক চোরদের কথা আগেই বলেছি। এঁরা ঘরে বসেই কাগজ-কলমের খোঁচায় মানুষের আত্মা কিনে নিতে পারেন।

কিন্তু পকেটমাররা প্রাচীন নন, কারণ বর্বর নন। আধুনিক নন, কারণ এত-খানি সূক্ষ্মতা ও এতটা এফিশিয়েন্সি তাঁদের নেই। তাই তাঁরা প্রাগাধুনিক অর্থাৎ দুই মেরুর মাঝখানের লোক।

প্রাগাধুনিক হলেও পকেটমাররা সভ্য প্রাণীরই অংশ। সভ্য মনুষ্য একা কিছু করে না, এমনকি চুরিও না। সে বিচারে পকেট-কর্তন তো রীতিমত চৌর্য সমবায় প্রচেষ্টা। সর্দার প্রায়ই নেপথ্যে থাকেন। কারণ সামনে তিনি প্রতিষ্ঠিত। কারণ দান-ধ্যান এবং জনসভায় দুর্বৃত্ত-দের ঠাণ্ডা রাখা প্রভৃতি গুরুত্বর কাজের জন্য তিনি বিখ্যাত।

যাই হোক, যারা হাতেনাতে কাজ করে অর্থাৎ ফিল্ড্ ওয়ার্কার তাদের পক্ষে দুজন থাকলেই ছোট একটা দল হতে পারে। একজন—সে নিয়তি। ঠিক লক্ষ্য-বস্তু ঠিক করে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেবে। অন্যজন ঘাতক—সে আপনার পকেট কর্তন করবে। তবে, অধিকন্তু ন দোষায়।

ছিঁচকে চোররা পকেটমার সমাজে হরিজন। যে ভদ্রমহিলা দোকানের কাউন্টারে তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ বা গর্ব-পেটিকা রেখে জিনিসের দরদস্তুর করছেন—তাঁর থলেটি সরানোয় কোন বাহাদুরি নেই। ভেতর পকেটে হাত গলিয়ে যে টাকা তুলে আনতে পারে, সে হল এ সমাজের ব্রাহ্মণ। কলিযুগে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কমছে। এমনকি সমুদ্রপারের নৈষ্ঠিক চোরদের সমাজেও এ ধরনের ব্রাহ্মণের সংখ্যাল্পতা তাদের আক্ষেপের কারণ হয়ে উঠেছে।

এখন দলের কথায় আসা যাক। নিয়তি এবং ঘাতক। নিয়তি বলতে নারী বোঝায়। পকেটমারের জগতে নিয়তি পুরুষও হতে পারে নারীও হতে পারে। তবে আজকাল মেয়েরাই নিয়তির ভূমিকা নিচ্ছে বেশী করে। এবং ঘাতকেরও। তবে সংখ্যায় তারা কম।

আপনি ছাপোষা বাঙালী ভদ্রলোক—পান চিবুতে চিবুতে আপিস যান ট্রাম-বাসের ধাক্কাধাক্কিতে গলদঘর্ম হয়ে রাজা-উজির মারেন, আপিসে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ আড্ডা ও গৃহিণীর যত্নে-সাজা তাম্বুল সেবন করেন (কখনও বা কাজও করেন), তার পর টিউশ্যানি যান এবং পুনরায় ট্রামে-বাসে কোনরকমে নিজেকে এঁটে রেখে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও তৃতীয় পরিকল্পনার জ্ঞান জাহির করতে

করতে বাড়ি ফেরেন অবশ্য ইতিমধ্যে যদি না কোনো মানুষখেকো গাড়ি আপনাকে অন্যত্র যাবার ব্যবস্থা করে দেয়।

এই তো আপনার জীবন। আপনি ক্লান্ত, বিরক্ত, অন্যমনস্ক। পকেটমারের ভয়? টাকার ব্যাগটিতো সেইজন্যে ভেতর পকেটেই রেখেছেন। এবং রেখে প্রায় নিশ্চিন্তই আছেন।

কিন্তু এমন হতে পারে যে আপনার এই উদ্বেগহীনতাই আপনাকে নিয়মিত লক্ষ্যবস্তু করল। ট্রেণের টিকিট চেকার যেমন এক পলকে বিনা টিকিটের যাত্রীকে চিনে নেয়, কোনো নামাজাদা ডাক্তার যেমন এক নজরে রোগীর অসুখ নির্ণয় করেন, নিয়তি তেমনি পলকের মধ্যে আপনার থলের রহস্যটি আবিষ্কার করবে।

আপনার ভেতর-পকেট নেই? বুক-পকেট বা পাশ পকেটে রেখেছেন? সেই জন্যে মাঝে মাঝে বাঁ হাত দিয়ে ছুঁয়ে তার নিরাপদ অস্তিত্ব অনুভব করছেন?

আপনার নিয়তি ঠিকই তা বুঝল।

মেয়ের বিয়ে বলে ব্যাঙ্ক থেকে শেষ সঞ্চয়টুকু তুলতে গেছেন? একটা গরীব-গুর্বো গোছের লোক খুব সমীহ নিয়ে আপনাকে টাকা গুনতে দেখছে বলে আপনি একদিনের বাদশা হওয়ার আত্ম-প্রসাদ ভোগ করছেন? আপনার নিয়তি কিন্তু ওই লোকটাও হতে পারে। কোন পকেটে আপনি টাকা রাখলেন সে তা দেখল। রাস্তায় নেমে সেই পকেটে সে নিজের নোংরা রুমালটা গুঁজল। দূরে ঘাতক ছিল। আপনি চিহ্নিত হয়ে গেলেন।

কিংবা হয়তো জনপ্রিয় তারকা-জুটির বহুপ্রতীক্ষিত ছবিটা দেখাতে এসেছেন। সঙ্গে পুরো মাইনের টাকা, লটারীর টাকা, ধারের টাকা। মনে ক্লান্তি বা বিষাদ, অথচ টাকা সম্পর্কে সচেতনতা। আধা অন্ধকার হলে চেয়ারের গায়ে পিঠ এলিয়ে দিয়ে খুব সূক্ষ্ম বিচারে বেছে বেছে বাদামভাজা খাচ্ছেন। এমন সময় আপনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে মহিলাটিকে টিকিট কাটতে দেখেছিলেন, তিনি আপনার সামনে দিয়ে সেই সরু জায়গা-টুকু পেরিয়ে ওপাশের এক সীটে বসতে যাচ্ছেন। গায়ে পা লেগে গেল। রোমাঞ্চিত বা লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন। হায়! যাকে নায়িকা ভেবেছিলেন সে আপনার নিয়তি। পাশেই ঘাতক বসে-ছিল।

অতএব দেখা যাচ্ছে নিয়তির কাজ হল আপনাকে চিনে নেওয়া, বেছে নেওয়া। তারপর সে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেবে কোথায় গুপ্তধন। অর্থাৎ কিভাবে আপনাকে আক্রমণ করতে হবে। ঘাতক প্রস্তুত। তারপর নিয়তি হঠাৎ আপনার পা মাড়িয়ে দেবে বা গায়ে ধাক্কা দেবে। সভ্যতা আমাদের এক মুহূর্ত নির্জনে থাকতে দেয় না। ভীড় আপনি কখনোই এড়াতে পারেন না। সুতরাং ধাক্কা লাগবেই। আপনি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ বা হিংস্র হয়ে উঠবেন। (আহা, আপনি তো রক্ত মাংসেরই মানুষ)। তখন নিয়তি হঠাৎ লজ্জিতভাবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে। ইতিমধ্যে ঘাতক আপনাকে হত্যা করে গেছে। আপনি তা জানতেও পারেননি।

অবশ্য এদেশে পকেটের ঐতিহ্যই বেশী দিনের নয়। কিছুকাল আগেও আমাদের পকেট ছিল না, ছিল গাঁট। তখন গাঁটকাটাদের প্রাদুর্ভাব যেমন ছিল, তেমনি ছিল তাদের সমাজের নিজস্ব রীতি-নীতি ও সমস্যা।

বলতে গেলে বঙ্গদেশীয় বাবু-কালচারের প্রবক্তারাই আমাদের সমাজে পকেটের আমদানি করেছেন। ১৯ শতকীয় ইয়ংবেঙ্গলরা ধুতি ছেড়ে পাৎ-লুন ধরলেন। সুতরাং বাংলা দেশে গাঁট ব্যবহারের বিলোপ ঘটল।

তারপর আস্তে আস্তে বর্তমান সমাজব্যবস্থার শুরু এবং পকেটের স্ফীতি। ফলে এদেশে পকেট একটা লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠল। আর ধোঁয়া থাকলে যেমন আগুন থাকে পকেট থাকলে পকেটমারও থাকবে। ফলে এই-ভাবে ভারতবর্ষে পকেটমার সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক আবির্ভাব হল। রেনেসাঁস ও পকেট কর্তনের এবংবিধ সম্পর্ক আমার নিজের আবিষ্কার হলেও এ বিষয়ে অন্য কেউ থীসিস রচনা করলে আমি কপি রাইটের মামলা আনব না। তবে পকেটের দিনও ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। গাঁট যেমন গেছে, পকেটও তেমনি যাবে। এমন দিন আসছে, যেদিন চোর আর গাঁট বা পকেট কেটে সন্তুষ্ট থাকবে না। হয়তো তখনও নিয়তি থাকবে, ঘাতক থাকবে। আপনি নিজেই জানবেন না কখন হত হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে কাটা যাওয়ার গতি ক্রমেই উপরের দিকে উঠছে। গাঁট থাকে কোমর, পকেট-বুক। কোমর থেকে বুক পর্যন্ত উঠে এবার হয়তো কাটা যাবে গলা, নাকি মস্তিষ্ক!
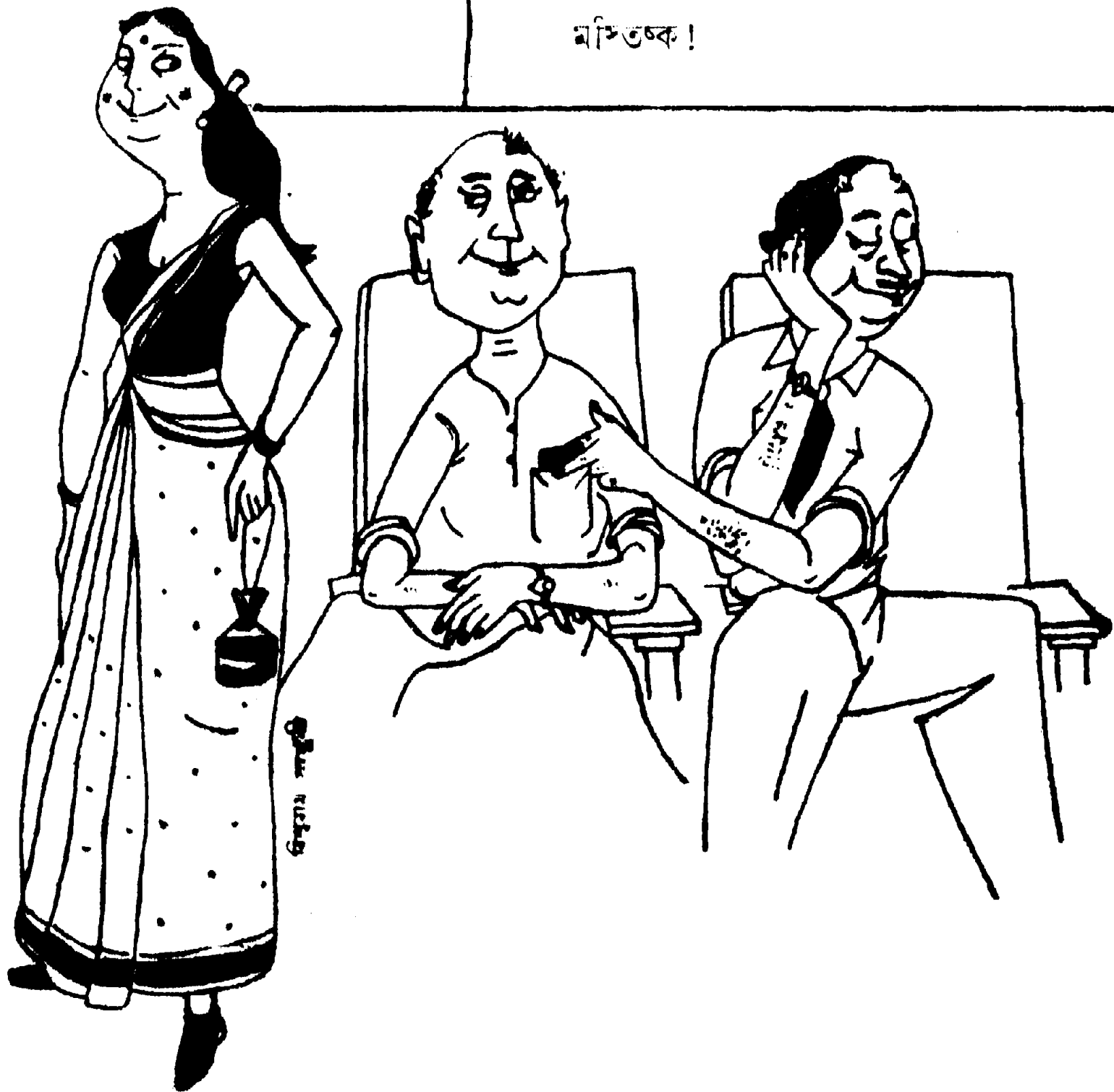
হায়! যাকে নায়িকা ভেবেছিলেন......

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

গতবারে বাংলা বই-এর চড়া দামের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সূত্রে গ্রন্থের দাম কিভাবে হ্রাস করা যায় তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় সস্তা দামের বই নিয়েই কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

আমাদের বাংলাদেশে সুলভে মহৎ সাহিত্য প্রচারের সুমহান ভূমিকা 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে'র। কপিরাইট আইন মেনে, বিখ্যাত সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলী তাঁরা নামমাত্র মূল্যে অনেকদিন ধরে প্রচার করেছেন। আজো তাই করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, রমেশ দত্ত, মাইকেল, সেক্সপীয়র, কালিদাস এমন কি বর্তমানকালে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, শিবরাম কিছুই তাঁরা বাকী রাখেন নি। অথচ এই দিকে তাঁদের কেউ অনুসরণ করেন নি। কি যে কারণ তা আমরা ভাবার চেষ্টাও করি না। আমার মনে হয় এর কারণ, এবং একমাত্র কারণ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশক হিসাবে যে দুঃসাহস ছিল, এ যুগে তার অভাব আছে।

একটি সতেরো বছরের ছেলে একদিন সভাশেষে অটোগ্রাফের খাতা হাতে করে বার্ণাড শ'র সামনে দাঁড়াল, অনুরোধ, "দু লাইন লিখে নাম সই করে দিন।" সে আজ প্রায় বেয়াল্লিশ বছর আগের ঘটনা।

বার্ণাড শ' অতি ঠোঁটকাটা ব্যক্তি, সামাজিক সৌজন্য তাঁর কুষ্ঠিতে নেই। তিনি বললেন,—"ওসব হবে না, পরের হাতের লেখা সংগ্রহ করে কি হবে, তোমার হাতের লেখার জন্য যাতে সবাই কাঙাল হয় সেই চেষ্টা করো।" ছেলেটিও নাছোড়বান্দা।

এই সতেরো বছরের ছেলেটির নাম এ্যাল্যান লেন। সেদিন বার্ণড শ'র সেই শ্লেষমিশ্রিত উপদেশ ছেলেটির জীবনে কাজে লাগল। ১৯১৯-এ অতি কষ্টে ধনী ব্যবসায়ী এবং আত্মীয় "বড্‌লে হেড" পুস্তক প্রকাশকের সংস্থায় ঠিকা চাকর হিসবে প্রবেশ করলেন, ঘরদোর সাফ রাখা, 'ধুনো গঙ্গাজল' দেওয়া প্যাকিং-এর কাজ করা, পোষ্ট অফিস ও রেল ষ্টেশনে পার্শেল নিয়ে যাওয়া, খদ্দেরকে দেখা ইত্যাদি খুচরা কাজ করতে হয়। মনে মনে কিন্তু বাসনা— উন্নতি করতে হবে। মানুষ হতে হবে। "বড্‌লে হেড" ইংলন্ডের খুব বড়ো পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তার সকল বিভাগের খুঁটিনাটি কাজ শিখলেন এ্যাল্যান লেন। একেবারে যাকে বলে সব ঘুরে পাকা ঘুঁটি হয়ে উঠলেন। চাকরীতে উন্নতি হল।

১৯২৫-এ সেই ধনী আত্মীয়টি মারা গেলেন, এ্যাল্যানকে আরো কিছু দায়িত্ব নিতে হল। তিনি ক্রমে তাঁদের বিজ্ঞাপন বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা হলেন। নানা ধরণের লোক, প্রকাশক, পাঠক প্রভৃতির সংস্পর্শে এলেন। এ্যাল্যান বুঝলেন ক্রেতার সংখ্যা কেমন, কি ধরণের বই বেশী বিক্রি, কত দামের মধ্যে বই ক্রেতা খোঁজে। বলা বাহুল্য সস্তা দামের বই সবাই চায়, যা সকলের ট্যাঁকের উপযোগী, তাহলে বই ছাপতেও সস্তা কাগজ, সস্তা মলাট দেওয়া প্রয়োজন।

তাঁর প্রস্তাব কোনো অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী গ্রহণ করলেন না। খুন, গুম-খুন, রঙদার বড়ঘরের গুপ্তকথা ছাড়া সস্তা দামের বই কল্পনাতীত।

এ্যালান, রিচার্ড এবং জন এই তিন ভাই চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে সুলভে গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়, গল্প, উপন্যাস, রোমাঞ্চ কাহিনী, জীবনী প্রভৃতি। বিভিন্ন জাতের বই-এর বিভিন্ন রঙের মলাট হবে, উপন্যাসে কমলালেবুর রঙ, জীবনীর গাঢ় নীল, আর রোমাঞ্চের সবুজ। কিন্তু এই যে সস্তা দামের গ্রন্থরাজি এর একটা বেশ গ্রহণযোগ্য নাম চাই, কোথায় সে নাম পাওয়া যায়, চারিদিকে খোঁজ চলল। এমন কি পুরস্কার ঘোষণা করেও আশানুরূপ ফল হল না। এমনই যখন অবস্থা তখন এ্যাল্যানের সেক্রেটারী হঠাৎ বললেন, একটা নাম। এ্যাল্যান লাফিয়ে উঠে বললেন—'থ্যাংকস্' মিস কোলফ্। এই নামই রাখবো।'

কিন্তু সুকুমার রায়ের পরিকল্পিত 'চলচিত্তচঞ্চরীর' মত মলাট, বাঁধাই, কম দাম, সব ঠিক হলেও তখনও ব্যবসায় নামা যাচ্ছে না। এরিক লিংক লেটারের 'পোয়েটস পাব' গ্রন্থটি নিয়ে একটা নমুনা সংখ্যা তৈরী করে দোরে দোরে ঘোরেন। বিখ্যাত দোকান উলওয়ার্থে একদিন এই বিষয়ে কথা বলছেন, কর্মকর্তা কিন্তু এই পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন না, এমন সময় তাঁর স্ত্রী মিসেস প্রেসকট এসে নমুনা সংখ্যা দেখে খুসী হয়ে বললেন,—চমৎকার, এই ত চলবে। স্বামী বেচারীকেও স্ত্রীর কথা মেনে নিতে হল। এ্যাল্যানের পরিকল্পনা সার্থক হল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এ্যাল্যান লেনের 'পেংগুইন সিরিজে'র প্রথম প্রকাশে সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল, দেড় মাসেই পাঁচ লক্ষ কপি পেংগুইন সিরিজের বই প্রকাশিত হল। আঁদ্রে মাঁরোয়ার— 'এরিয়েল', হেমিংওয়ের— 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস', লিংক লেটারের —'পোয়েটস্ পাব', সুসান আরজের— 'মাদাম ক্লেয়ার', ডরোথী এল সায়ার্সের —'বোলোনা ক্লাব', মেরী ওয়েবের— 'গোজ টু আর্থ', কম্পটন ম্যাকাঞ্জীর— 'কার্ণিভ্যাল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সেই গোড়ার দিকে ছাপা হয়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে 'পেলিক্যানের' জন্ম; তার প্রথম গ্রন্থ জর্জ বার্ণাড শ কৃত 'দি ইনটেলিজেন্ট ওম্যানস্ গাইড টু 'সোস্যালিজম', ক্যাপিটালইজম্, সোভিয়েটইজম্, ফ্যাসিজম' —এই অল্প দামে গ্রন্থ বিক্রীর ব্যবস্থায় বার্ণাড শ খুসী হলেন—তাঁর মতে এ হল 'Better bargain although the price is so much modest'.

পেংগুইন লিমিটেডের বই দশ কোটির ওপর বিক্রী হয়েছে, আর সব চেয়ে বেশী বিক্রী হয়েছে বার্ণাড শ'র গ্রন্থাবলী।

এ্যাল্যান তাঁর জীবনে বার্ণাড শ'র উপদেশ বাণী সার্থক করেছিলেন। সাফল্য লাভ করে তিনি 'অটোগ্রাফের'

খাতায় সই করার অধিকার লাভ করেছিলেন, বার্নাড শ'র স্নেহ ও প্রীতিও তাঁর ব্যবসায়ের মূলধন।

এই সূত্রে আরেকটি কথা বলি. আমাদের দেশের প্রকাশকদের সঙ্গে তার এক জায়গায় মিল আছে, তিনি বই পড়তে ভালোবাসেন না। সন্দেশ তৈরী করাতেই তাঁর আনন্দ, খাওয়ার রুচি নেই।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে আমাদের দেশেও অনুরূপ প্রচেষ্টা করা যায় এবং বর্তমানকাল বিচারে এ কথা বলাও কর্তব্য যে এ কাজ ছোট ব্যবসায়ীর চেয়ে যাঁরা বৃহৎ ব্যবসার সামর্থ রাখেন তাঁদের সুবিধা বেশী কারণ, এই ব্যবসা তাঁরাই অল্প পুঁজির কারবারীর চেয়ে তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে পারবেন। সাধারণ পাঠক, লেখক এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন, কারণ পাঠক সুলভে সৎ সাহিত্য পাবেন এবং লেখকের বক্তব্য বহুজনের কাছে সহজে পৌঁছাবে।

আমাদের দেশে অনেক বছর আগে কেউ কেউ অতি সুলভে সৎসাহিত্য প্রচারের প্রচেষ্টা করেছেন এবং এই বিষয়ে একদা যিনি যুগান্তর সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম শিশিরকুমার মিত্র। তাঁর 'শিশির পাবলিসিং হাউস' থেকে ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৌদ্ধ-জাতকের কাহিনী থেকে সুরু করে তখনকার প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকের সং গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে মাসে মাসে। এই গ্রন্থাবলীর ছাপা ও বাঁধাই ছিল বেশ সুরুচিসম্পন্ন। সেই কালটা বোধ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের কাল। গুরুদাসের ছিল আট আনা সিরিজ।

'কমলিনী সাহিত্য মন্দির'ও সুলভে উপন্যাস প্রকাশ করতেন, বোধকরি এক টাকা সিরিজের গ্রন্থমালা, তবে তার ছাপা এবং ছবি সুরুচিমাফিক হত না।

এর পর একটা বিরাট ফাঁক, বন্ধ্যাকাল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই মনে হয় বিশ্বভারতীর প্রচেষ্টায় 'বিশ্ব-বিদ্যা সংগ্রহ', 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'। মাত্র আট আনা দামে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তাঁরা প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থ বিশেষজ্ঞ রচিত, পূর্ণাঙ্গ, সংক্ষিপ্ত, সুমুদ্রিত। এক রকমের মলাটেই পরিবেশিত।

এ ছাড়া 'রত্নসাগর গ্রন্থমালা' 'আমরাও হতে পারি', 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' প্রভৃতি কয়েকটি ছোটখাটো প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

আজ বাংলা সাহিত্যের পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোথায় সেই উপেন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্রের পরিকল্পনা? কোথায় গুরুদাসের আট আনা সিরিজের গ্রন্থাবলী, যার মধ্যে শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত। কোথায় শিশির পাবলিসিং বা বিশ্বভারতী। নুতন প্রাণ সঞ্চার, নতুন জীবন দান করার জন্য যে মৃত সঞ্জীবনীর প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য।

লাভ হয় না, একথা গ্রহণযোগ্য নয়। আসল কথা লাভ চাই প্রথম গ্রন্থটির প্রকাশের প্রথমতম মুহূর্ত থেকে, তারজন্য চিন্তা, ভাবনার প্রয়োজন নেই, বিজ্ঞাপনের চটকে যদি সাময়িক সাফল্যের পাত্রলিগোলা পান করে এ-যুগের অশ্বত্থমারা নৃত্য করেন, তাহলে দুঃখের কি প্রয়োজন?

বাংলা প্রকাশন ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা আমদানী করা প্রয়োজন চাই এ্যালান লেনের মত মানুষ, যে ঘর-দুয়ার পরিষ্কারের কাজ নিয়ে জীবনযাত্রা সুরু করে 'পেঙ্গুইন', 'পেলিকান' জাতীয় গ্রন্থাবলীর মালিক হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের বিশ্বাস এ মানুষ নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আছে, আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগেই যখন 'বসুমতী' সুলভ সংস্করণ পরিকল্পনা করতে পেরেছিলেন তখন বর্তমান কালের মুদ্রণ এবং প্রকাশন পদ্ধতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে যে-সহজ এবং অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে কি সস্তা দামে মহৎ সাহিত্য প্রচারের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যবসায় নামা কোনো উৎসাহী প্রকাশকের পক্ষে অসম্ভব?

হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ-প্রকাশকরা 'পেপার ব্যাকে' মনোনিবেশ করেছেন। কোনো কোনো বাঙালী সাহিত্যিকের উপন্যাসের হিন্দী সংস্করণও তাঁরা প্রকাশ করেছেন। যে কথা আগেও বলেছি সেই কথা আবার বলি, বাংলা গ্রন্থ ব্যবসায়ের জগতে অন্য প্রদেশবাসীর অনুপ্রবেশ আসন্ন হয়ে উঠেছে, এবং একবার যদি সাহিত্য সরস্বতী তাঁর চিরচঞ্চলা সোদরা দেবী কমলার মত বাঙালীর ঘর ছেড়ে অন্য পরিবেশে গিয়ে পড়েন তাহলে তাঁকে ফিরিয়ে এনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত এই দীন দুর্বল সমস্যা-কণ্টকিত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত, বহু-নিন্দিত বাঙালী জাতির পক্ষে আর সহজে সম্ভব হবে না।

নতুন বই

মুক্তি প্রিয়া—সুবোধ ঘোষ প্রণীত। (গ্রন্থশ্রী লিমিটেড, কলিকাতা : ১৯)। দাম—আড়াই টাকা।

এক দুই তিন—শংকর বোক্-সাহিত্য, **কলেজ রো, কলিকাতা** ৯। **দাম—তিন টাকা আট আনা।**

সুবোধ ঘোষ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবে যে বিস্ময় এবং চমক সৃষ্টি করেছিলেন সৌভাগ্যের বিষয় আজও তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। তিনি সেই বিরল সংখ্যক লেখকদের অন্যতম যিনি অনেক লিখেও লেখার গুণে এবং বৈশিষ্ট্য অম্লান রাখতে পারেন। সেই কারণে তাঁর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'মুক্তি প্রিয়া' একটি উল্লেখনীয় উপন্যাস।

সুবোধবাবুর বৈশিষ্ট্য তাঁর কাহিনীর বিষয়বস্তু নির্বাচনে এমন এক স্বকীয়তার পরিচয় প্রদান করেন যা পাঠকের মনে কৌতূহল ও আনন্দ সৃষ্টি করে। সুবোধবাবু তাঁর মনোরম ভাষা এবং পরিবেশন পদ্ধতিতে কাহিনীকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যান, পাঠককে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না, অথচ ফর্মুলামাফিক সেই থোড়-বড়ি-খাড়ার মসৃণ নির্ভেজাল প্রেমের কাহিনীও নয়। গীতি-কবিতার মাধুর্য সুবোধবাবুর প্রেমের উপাখ্যানে পাওয়া যায়, সেই তাঁর চরম বৈশিষ্ট্য। সেসন জজ সামন্ত সাহেবের মেয়ে অর্চনা, বাপের উদ্ধত রুক্ষ মেজাজে যেন শীতল চন্দন প্রলেপ। সুচরিতের সংযম এবং শালীনতা, তার পাশে তার মা-বোনের ছোটো সংসার, রূঢ় সামন্ত সাহেবের সমস্ত অশালীন আচরণ। সুচরিত শুধু হাসি দিয়ে উপেক্ষা করে কিসের শক্তিতে। প্রেম তাকে যে রাজমুকুটে অভিষিক্ত করেছে তার কাছে আর সব তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও নগণ্য। সুবোধবাবুর এই ছোট উপন্যাসটির মাধুর্য হৃদয় স্পর্শ করে।

'শংকর' এই ছদ্ম নামে যে তরুণ লেখক সাম্প্রতিক কালে 'কত অজানারে' নামক জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন 'এক দুই তিন' তাঁর সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ। প্রথম কাহিনীর আঙ্গিকটি নূতন,—নায়িকা আছেন পর্দার অন্তরালে। ভাগ্যবিড়ম্বিতা

বইয়ের খবর

ইউরোপ ও আমেরিকায় এখন 'পেপার ব্যাকের' যুগ এসেছে। মোটা চকচকে নমনীয় মলাট দিয়ে বাঁধা বইকে paper back বই বলা হয়। এই ধরনের বই সাধারণতঃ দামে সস্তা করা হয়। প্রথমে যখন এই ধরনের বই প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়, তখন প্রধানতঃ খেলো বই পেপার ব্যাক রূপে বাজারে দেখা দেয়। ডিটেক্‌টিভ্‌ বা রোমাঞ্চকর বই পেপার ব্যাকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হত। কিন্তু আজকাল ভাল ভাল 'ক্লাসিক', বিজ্ঞানের বই বা পূর্ব-প্রকাশিত দামী বইয়ের সস্তা সংস্করণ পেপার ব্যাকে প্রকাশিত হয়। হালকা সাহিত্য ছাড়া সব রকম বই—যেমন ধর্ম পুস্তক, ইতিহাস, জীবনী, দর্শন ইত্যাদি সব ধরনের বই পেপার ব্যাকে প্রকাশিত হয়ে অসম্ভব রকম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

* * *

১৯৫৭ সালে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সৎগ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্যে National Book Trust স্থাপন করেন। সাধারণ শিক্ষার উন্নতির জন্য জীবিত বা মৃত গ্রন্থকারের শ্রেষ্ঠ বই প্রকাশ করা এই ট্রাষ্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য বিদেশী সাহিত্য থেকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অনুবাদ করে প্রকাশ করা এর একটি প্রধান কাজ বলে মনে করেন। নির্দেশ ছিল বছরে ২৪ খানা করে সৎগ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে। এই জাতীয় বুক ট্রাস্টের তিন বৎসরের প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যায় মাত্র তের খানা বই ছাপা হয়েছে। এই তিন বৎসরের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর এই পর্যন্ত আরও এগার খানা বই প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল বই ৫০০০ করে ছাপা হলেও এই বিরাট দেশে সমুদ্রে জলবিন্দুর মত মনে হবে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সব রকম সক্রিয় সাহায্য পেয়েও ট্রাস্টের এই দুরবস্থা। ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলির নির্বাচন ও গুণাগুণ সম্বন্ধেও নানারূপে বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হয়েছে। অনেকেই বলেন, রাজাগোপালাচারীর আণবিক যুদ্ধ, হিন্দীতে নেহরুর আজাদ স্মৃতি বক্তৃতা বা নেহরু বা রাধাকৃষ্ণনের যে কোন বক্তৃতা যে কোন সাধারণ প্রকাশক মুদ্রিত করতে পারতো। ট্রাস্টের কাছ থেকে সকলে সত্যিকার শিক্ষণীয় বই আশা করে। এ অভাব বুক ট্রাস্ট এ পর্যন্ত পূরণ করতে পারে নি। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা এ কয় বৎসর অপব্যয় হয়েছে।

* * *

দক্ষিণ ভারতের একটি পুস্তক প্রকাশনের নাম হচ্ছে Southern Languages Book Trust. ১৯৫৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই ট্রাস্টের উদ্বোধন করেন। এই ট্রাস্ট দক্ষিণ ভারতের চারিটি আঞ্চলিক ভাষায় ২৮০টি বই প্রকাশ করেছে। এ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা সাড়ে দশ লক্ষ; তার মধ্যে এ পর্যন্ত বিক্রিত হয়েছে পাঁচ লক্ষ বই। সব রকম বইয়ের দামও যথাসম্ভব সুলভ রাখা হয়েছে। ফরাসী, জার্মাণ, রাশিয়ান, জাপানী, চীনা, ইংরাজী ভাষা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে এই ট্রাস্ট প্রচুর বই অনুবাদ করেছে। এই বিষয়ে Ford Foundation এই ট্রাস্টকে অর্থ দিয়ে নানা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেছে। UNESCO এঁদের উপর নানা প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের প্রকাশকরাও এই ট্রাস্টকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করছে।

সরকারী রিপোর্ট—সাদা, নীল, হলদে, সবুজ ও কমলা রং

প্রতিমাসে আমাদের দেশে হাজার হাজার বিভিন্ন গভর্ণমেন্টের সরকারী রিপোর্ট ছাপা হচ্ছে। এই সব রিপোর্টের খবর আমরা খুব কমই রাখি। এই সব সরকারী রিপোর্টের একটা বিশেষ বিশেষ নাম আছে। মলাটের রং অনুসারে এই সব রিপোর্টের নাম ঠিক করা হয়। এই প্রথা প্রথম আরম্ভ হয় ইংলণ্ডে ১৬৮৪ সালে, যখন বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন বিষয়ের সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ করতে আরম্ভ করলো। প্রথমে এই সরকারী রিপোর্টের নাম দেওয়া হোল White Paper. বর্তমানে এই White Paper-এর অর্থ হচ্ছে—কোন সরকারী রিপোর্ট, সরকারী নীতির বিবৃতিসূচক বই বা এই ধরনের কোন কিছু, যা আকারে মোটা না হওয়াতে সাদা হালকা মলাট দিয়ে বাঁধা। আর এক রকম সরকারী রিপোর্টের নাম হচ্ছে Blue Book. এই রিপোর্ট মোটা আকারের হওয়াতে মোটা শক্ত ধরনের নীল রং-এর মলাট দিয়ে বাঁধা হয়। এই জন্যে এই রিপোর্টের নাম Blue Book. ব্লু বুকের বর্তমান সংজ্ঞা হচ্ছে—কোন সরকারী রিপোর্ট, পরিসংখ্যান বা সরকারী প্রকাশন যা আকারে মোটা হওয়াতে নীল রং-এর শক্ত ও মোটা মলাট দিয়ে বাঁধা। এই নীল ও সাদা মলাট বৃটিশ গভর্ণমেন্ট প্রকাশিত সমস্ত সরকারী রিপোর্টের পক্ষে প্রযোজ্য। ভারতীয় গভর্ণমেন্টও এই দুই রং অনুসরণ করে আসছেন।

অন্যান্য দেশেও এই সব সরকারী রিপোর্ট বিভিন্ন রং-এর মলাট যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়—এবং রং অনুসারে বইয়ের নাম হয়। ফরাসীরা Yellow Book, জার্মাণরা White Book, ইটালিয়ানরা Green Book প্রচার করে। রাশিয়ানরা এ পর্যন্ত কোন বিশেষ রং অবলম্বন করে নি। এমনকি লাল রংও নয়। ইংরাজদের অনুসরণ করে মার্কিণ সরকার এখন বেসরকারীভাবে White Paper এবং Blue Book—এই দুই রংএর বই প্রচার করে থাকে।

মলাটের রং বাদ দিয়ে এবার অন্য রকম বইয়ের নামের কথা বলা যাক। এক শত বৎসর আগে বিলাতে Bradshaw নামে এক ভদ্রলোক সমস্ত রেলওয়ের 'টাইম টেবল' ও ভাড়ার কথা একখানা বইয়ে বের করতে আরম্ভ করেন। সেই হতে Bradshaw-র নাম থেকে অর্থ হোল সমস্ত রেলওয়ের সময় ও ভাড়া নিরূপক বই। তাই ভারতবর্ষেও Indian Bradshaw নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

বিলাতের পার্লামেন্টের দৈনিক কার্যপ্রণালী ও তার বিবরণী প্রকাশ করবার ভার পড়ে Hansard নামে একজন প্রকাশকের উপর। সেই থেকে এই মুদ্রিত কার্য বিবরণীর চলতি নাম হোল Hansard—এ প্রায় দুই-তিন শত বৎসর আগের কথা। এখন এই পার্লামেন্টের রিপোর্ট বিলাত সরকার নিজেই প্রকাশ করে—কিন্তু এখনও এর নাম রয়ে গেছে Hansard Report.

প্রদর্শনী

।। কলারসিক ।।

'অন্তহীন ডানার' শিল্পী নীরোদ মজুমদার

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে চৌরঙ্গীর মার্কিন প্রচার দপ্তরের প্রদর্শনী কক্ষে শিল্পী নীরোদ মজুমদারের একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছিলেন ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রীডম। কলকাতার কলারসিকদের কাছে প্রদর্শনীটি নানা কারণে সমাদৃত হয়েছে।

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ইউরোপে শিল্প-সাধনায় রত থেকে নীরোদবাবু ১৯৫৮ সালে কলকাতার আর্টিস্ট্রী হাউসে যখন তাঁর 'ইমেজেস এক্লোজেস' নামক চিত্র-প্রদর্শনীর মারফৎ স্বদেশবাসীর কাছে সর্বপ্রথম উপস্থিত হলেন তখনি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বলা যায়, সেদিন থেকেই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে একজন শক্তিমান শিল্পীরূপে নীরোদবাবুর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

তারপর তিন বছর পরে নীরোদ মজুমদার তাঁর একক প্রদর্শনীর মাধ্যমে দ্বিতীয়বার হাজির হয়েছেন আমাদের সম্মুখে। ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন সংগ্রহশালা এবং আর্ট গ্যালারী ঘুরে নীরোদবাবু যে শিল্প-সত্য আবিষ্কার করেছেন সেটাই তাঁর নিজস্ব ঢঙে ৬০খানি চিত্রে বিধৃত করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। নীরোদবাবুর শিল্পী-মন যে এলোমেলো চিন্তা-ভাবনায় পীড়িত নয়, বরং সচেতন যুক্তি-কেন্দ্রিক তাঁর শিল্প-সত্তা, শিল্পীর অনুসন্ধিৎসা এবং নির্বাচনের পদ্ধতি দেখে দর্শকেরা সহজেই তা অনুমান করতে পারেন।

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পী খন্ডকাল আর অনন্তকালকে যে প্রতীকের মাধ্যমে বাঁধতে চেয়েছেন নীরোদবাবুর অনুসন্ধিৎসায় সেটাই আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর, ভাস্কর, পটুয়া কিংবা কারুশিল্পী নানা ঢঙের, নানা রঙের, নানা ভঙ্গীর পাখির আকৃতি-প্রকৃতির মধ্য দিয়ে এমনি এক নিগূঢ় সত্যকে প্রকাশ করেছেন বলে নীরোদবাবুর বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের আলোকেই নীরোদবাবুর বর্তমান প্রদর্শনী, 'অন্তহীন ডানা'-র (Wing of no end) চিত্রগুলি উদ্ভাসিত।

শিল্পীর এই কাল ও ব্যাপ্তি চেতনা নিঃসন্দেহে এক মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্ন নিয়ে মত-পার্থক্যও অস্বাভাবিক নয়। আমরা ও-সব জটিল প্রশ্নের দিকে পা না বাড়িয়েও বলতে পারি পাখিকে গতির প্রতীকরূপে কল্পনা করা সুস্থ শিল্প-ভাবনার পরিচায়ক। নীরোদবাবু যদি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'লেডা' (২ নং চিত্র), চৈনিক স্ফটিকের পাখি (১৩ নং চিত্র), সুমের মৃৎপাত্র (২১ ও ২২ নং চিত্র) যবদ্বীপের কিন্নর (১৫ নং চিত্র), মিশর, এশিরীয় বা গ্রীক দেশের কোনো শিল্প-কর্ম, এমনকি বাংলার নক্সী কাঁথাকে ভিত্তি করে 'অন্তহীন ডানা'র প্রতীক ধর্মীতাকে ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয়ে থাকেন, তাতে ক্ষতি কি?

নীরোদবাবু তাঁর কল্পনা-প্রতিভাকে ঐ পর্যন্ত টেনে এনেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁর এই বক্তব্যকে আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি আশ্রয় খুঁজেছেন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে। মহাভারতের গরুড়কে নিয়ে পনেরখানি চিত্র রচনা করে শিল্পী 'অন্তহীন ডানা' সিরিজে আধুনিক ভারতীয় চিত্র-শিল্পীর অবদানকে সংযোজন করলেন। এটাই নীরোদবাবুর কৃতিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের উজ্জল স্বাক্ষর।

আধুনিক ভারতীয় শিল্পীরা যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় চিত্র-শিল্পের অনুকরণে নিজেদের শিল্প-বক্তব্য উপস্থিত করছেন, এমনকি রূপায়ণ পদ্ধতিতেও প্রয়োগ করছেন পাশ্চাত্য দেশের শিল্প-আঙ্গিক, নীরোদবাবু তখন পাশ্চাত্য-প্রয়োগ পদ্ধতিকে ভারতীয় শিল্প-বক্তব্য এবং প্রকরণে নিয়োজিত করে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অগ্রসরমান। সেদিন প্রদর্শনী কক্ষে কয়েকজন প্রখ্যাত আধুনিক শিল্পী আমার কাছে তাঁদের বর্তমান উন্মার্গগামিতার কথা স্বীকার করে নীরোদবাবু সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। আধুনিক তরুণ শিল্পীদের এই বক্তব্যকে কিঞ্চিৎ দ্বিধার সঙ্গে আমিও স্বীকার করছি।

শিল্পী নীরোদ মজুমদারের মাধ্যম তৈল-রঙ। তৈল-রঙ প্রয়োগে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। কোনো চড়া রঙের পাশে একটি মৃদু রঙ ব্যবহার করেও চিত্রে বর্ণ-সমতা রক্ষায় তাঁর পারদর্শিতাকে তিনি অক্ষুন্ন রাখতে পারেন। এ-এক

গরুড়কে বিনতার আশীর্বাদ

চাইবার অভিজ্ঞতা। তাঁর রচনা পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। ভারতীয় আল্পনা রীতির মত তিনি একটি কেন্দ্রবিন্দু থেকে বৃত্ত বিস্তারের মাধ্যমে বিষয়বস্তু অনুযায়ী রঙ আর রেখায় তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু নীরোদবাবুর রচনায় আল্পনা-রীতির সারল্য নেই, আছে বৃত্তজাল। ফলে, অনেক সময় তাঁর সামগ্রিক বিন্যাসপদ্ধতি মনকে টানলেও জটিল বৃত্ত-জালের মধ্যে দর্শকের দিশাহারা হয়ে আসল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে সরে থাকতে বাধ্য হন। এখানেই বোধহয় নীরোদবাবুর [illegible]। আমার কাছে এই জটিল পদ্ধতি খুব হৃদয়গ্রাহ্য নয় বলেই মনে হয়েছে। অবশ্য নীরোদবাবু হৃদয় থেকে বুদ্ধির জগতেই বিচরণ করতে ভালবাসেন। অন্ততঃ প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত শিল্পীর লেখা "উইং অফ দি এণ্ড" নামক পুস্তককে এই মতের সপক্ষেই প্রচার করা হয়েছে।

আধুনিক চিত্র-শিল্পের এই শক্তিমান শিল্পীকে তাই আমরা অভিনন্দন জানিয়েও বলতে পারি: হৃদয় আর মনের সেতুবন্ধেই শিল্পের কাজ। শিল্পী নীরোদ মজুমদার যেন এর একদিকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর শিল্প-ক্ষমতাকে অপপ্রয়োগের বন্ধুরপথে পরিচালিত না করেন। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ প্রদর্শনী দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলাম।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিকর্তা। আজকের দিনের সভ্যতা মানুষকে মজুর করছে, মিস্ত্রী করছে, মহাজন করছে, লোভ দেখিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে খাটো করে দিচ্ছে। মানুষ নির্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়। ব্যবসায়ের প্রয়োজন যখন অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠতে থাকে তখন আত্মার বাণী নিরস্ত হয়ে যায়। ধনী তখন তীর্থধামের পথের চিহ্ন লোপ করে দেয়, সকল পথকেই হাটের দিকে নিয়ে আসে।

যেখানে মানুষের শেষ কথা : মানুষের সঙ্গে যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্য-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে আত্মার চরম সম্বন্ধ নিয়ে যায়; যা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ তারই মধ্যে। সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরব দাবি করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্যে সমস্ত মানুষের তপস্যা। সেখানে মহাসাধকেরা সাধনা করছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাবীরেরা প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে। সেখানে একজন ধনী সহস্রজনকে শোষণ করছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ করে একজন শক্তিশালী হচ্ছে, সেখানে বহু লোকের ক্ষুধার অন্ন একজন লোকের ভোগ-বাহুল্যে পরিণত হচ্ছে, সেখানে মানুষের সত্যরূপ শান্তিরূপ আপন সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেল না।

যে মানুষ লোভী চিরদিনই সে নিন্দিত; যে লোক শক্তির অভিমানী, সত্যযুগেও নিখিলের সঙ্গে আপন অসামঞ্জস্য দিয়েই সে দম্ভ করছে। কিন্তু সেকালে তার লজ্জাহীনতাকে, তার দম্ভকে তিরস্কৃত করবার লোক ছিল। মানুষ সেদিন লোভীকে, শক্তিশালীকে, এ কথা বলতে কুণ্ঠিত হয়নি—'পৃথিবীতে সুন্দরের বাণী এসেছে তুমি তাতে বেসুর লাগিয়ো না; জগতে আনন্দ-লক্ষ্মীর যে সিংহাসন সে যে শতদল পদ্ম, মত্তকরীর মতো তাকে দলতে যেয়ো না।' এই কথা বলছে কবির কাব্য, চিত্রীর চিত্রকলা। আজ বিবাহের দিনে বাঁশি বলছে, 'বরবধূ তোমরা যে সত্য এই কথাটিই অন্য সকল কথার চেয়ে বড়ো করে আপনাদের মধ্যে প্রকাশ করো। লাখ দুলাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমছে বলেই যে সত্য তা নয়, যে সত্যের বাণী আমি ঘোষণা করি সে সত্য বিশ্বের ছন্দের ভিতর চেক বই-এর অঙ্কের মধ্যেই নয়। সে-সত্য পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অমৃত সম্বন্ধে,—গৃহ সজ্জার উপকরণে নয়। সেই হচ্ছে সম্পূর্ণের সত্য, একের সত্য।'

—রবীন্দ্রনাথ

দেশে বিদেশে

সংগত দাবী :

সকল রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকার নানাবিধ উপায়ে যে অর্থ আদায় করে থাকেন তার কিছুটা রাজ্যগুলোর মধ্যে বিলি-বন্দোবস্তের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার প্রতি অবিচার চিরকালের। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় দরবারে বারংবার মাথা কুটেও তার কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। এবারে পাওয়া যাবে এমন কথা বলা কঠিন। কিন্তু পাওয়া যাবে এই প্রত্যাশাতেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার অর্থ কমিশনের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করছেন। এই স্মারকলিপিতে তাঁরা তৃতীয় পরিকল্পনার চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত দুইশত কোটি টাকা চেয়েছেন। বলেছেন তৃতীয় পরিকল্পনা বাবদ ৩৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। রাজ্যের রাজস্ব হবে অনধিক ১৩৩ কোটি টাকা। বৈদেশিক ও অন্যান্য সূত্রে ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। মোট দাঁড়াবে ১৪১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। কম পড়বে ১৯৫ কোটি ২৯ লক্ষ। অর্থাৎ দু'শ কোটি টাকার মত। সেদিক থেকে দাবী বেহিসেবী হয়েছে একথা নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা বলতে পারেন না। অথচ জনসংখ্যার ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গ এ দাবী করতে পারে। পাছে করে এজন্য মাদ্রাজের এক মন্ত্রী মাদ্রাজ রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে এক অনুচিত মন্তব্য করেছিলেন। একজন পদস্থ ব্যক্তির মুখে এই রকম উক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কোন কোন রাজ্যের বিরূপ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে একথা মনে করার কারণ আছে। বাংলাকে কেটে যে স্বাধীনতা ভারতবর্ষ লাভ করেছে তার সামান্যতম বেদনাও মাদ্রাজকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে যা উদ্বেগের তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের (অর্থ কমিশনের) অর্থ বণ্টন ব্যাপারে কোনো কোনো রাজ্যের বিরোধিতার সম্ভাবনা। কেননা, মাদ্রাজের মন্ত্রী একথাটিই স্পষ্ট করে বলেছেন। অর্থাৎ, টাকা পাওয়ার জন্যই যেন 'ভূতুড়ে' উদ্বাস্তুর অজুহাতে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। মাদ্রাজের মন্ত্রী বোধহয় লক্ষ্য করেননি, এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সমস্যা-জর্জরিত পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী উল্লাসের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি। সমস্যা বাড়ল বলেই তাঁরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। বর্তমান দাবীর সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধিরই একমাত্র সম্পর্ক নেই। এর আগেকার দুটি অর্থ কমিশনই এই রাজ্যের প্রতি অবিচার করেছেন। ক্রমবর্ধমান শিল্প থেকে উদ্ভূত সকল সমস্যার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, কিন্তু শিল্প থেকে যে অর্থ আদায় হয় তা ভাগ-বাঁটোয়ার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ পায় সবচাইতে কম। পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের বেকার-সমস্যা যেমন একদিকে অত্যন্ত দুরূহ, অন্যদিকে তেমনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র মণিঅর্ডারযোগেই বছরে প্রায় নয় কোটির মত (১৯৫৯ সালের হিসাবে—৮,৭৭,৬৩,১২৭) টাকা বাইরে চলে যায়।

অসংগত নীতিবোধ :

চলতি বছরে বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাউলের দাম অপেক্ষাকৃত কম আছে; কিন্তু আর একটি প্রধান খাদ্যের বড় অনটন চলেছে। সেটি মাছ। আগে আমরা ঘি-দুধ-মাখন-ছানার যে গল্প শুনতাম বা আমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যভাগে পর্যন্তও যা দেখেছি তা মিথ্যে হয়ে গেছে। খাঁটি ঘি এখন একটি আবিষ্কারের বস্তু। দুধে কতভাগ দুধ আর কতভাগ জল এ নিয়ে গবেষণা চলে। মাখনে আদৌ মাখন থাকে না। ছানায়ও ভেজাল। নিজেদের বাড়িতে গরু রেখে খাঁটি দুধ-ঘি-মাখন-ছানার ব্যবস্থা করতে পারেন এমন ভাগ্যবানের সঙ্গে ক্বচিৎ সাক্ষাৎ হয়। ছিল মাছ। কিন্তু তারও এমন অনটন চলছে কয়েক বছর থেকে যে, মাছেও নানা কারসাজি। আজকাল আর ইলিশ মাছের মরশুম চলছে এমন শোনা যায় না; বাজারে ইলিশ মাছের প্রাচুর্য দেখা যায় না। সারা বছর লোককে শেষ পর্যন্ত কাটা-পোনার ওপর নির্ভর করতে হয়। যেখানে গুঁড়ো মাছে পচ ধরেছে সেখানে তা স্পষ্টই চোখে পড়ে। যে-দোকান সাজায় সে জানে, যে-কেনে সে জানে, বাজারের মালিক জানে, কর্পোরেশনের লোকেরা জানে। যাদের রোগাক্রমণের ভয় তাঁরা এড়িয়ে যান। কিন্তু এড়িয়ে যাবেন কোথায়? আসতে হবে তাঁকে কাটা-পোনার সেকটাবে। সেখানেও তেমনি ভীড়; অফিসের তাড়া; মেস-হোটেলের তাগিদ; একপো আধ-পো নেবার গেরস্থেরা সসঙ্কোচে হাত বাড়ায়। দোকানী—এবং অত্যন্ত ব্যস্ত দোকানী—যা দেবে তাই নিতে হবে। দোকানীর তর্কের যুক্তি এই যে, মাছ টাটকা, এই তার টাটকা রক্ত। ও-রক্ত ও-মাছেরই খদ্দের তা হলফ করে বলতে পারবে না, ও-রক্ত আসলে রক্ত কিনা তাও সন্দেহ করা যাবে না। সবাই প্রতিকারহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে বরফে চাপা কোল্ড-স্টোর বা রাতের উদ্বৃত্ত রক্তশূন্য বিবর্ণ কাটা মাছের খণ্ড-গুলোয় না কোন রক্ত—রক্তের অভাবে রক্তিম বর্ণের পলেস্তারা পড়ছে। আর তাই খুশীমনে বাড়ি বাড়ি নিয়ে চলল খদ্দেররা। বহু উপদেশ বর্ষিত হয়েছে, মাছ খায় ব'লে বহু নিন্দা হয়েছে বাঙালীর—তথাপি দীর্ঘকালের অভ্যাস তাদের ছাড়া সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি আরও এই কারণে খাদ্যের মধ্যে ঐ এক টুকরো মাছই পুষ্টিকর। একথা সত্যি, জনসংখ্যা বেড়েছে, চাহিদা বেড়েছে। মাছ প্রধানতঃ প্রকৃতির দান। তাই কি? মাছের চাষ কি তবে কথার কথা। আমরা তো আজ ধান্যোৎপাদনের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করছি নে। মাছেরই বা চাষ হবে না কেন? আছে, মাছেরও চাষ আছে। এ বাড়ানো যায়। যতদিন না বাড়ানো যাচ্ছে ততদিন যদের হাতে মাছ আছে, তারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করবেই, পচা মাছও খেতে হবে। সমুদ্রের গভীর জলের মাছ নিয়ে অনেক ব্যর্থতার পরিচয় আমরা দিয়েছি। মাছ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি কি একটি উপযুক্ত তদন্তের বিষয় নয়? জাতির নীতিবোধ কোন্ অসংগত স্তরে নামলে রক্তের বদলে রঙ প্রশ্রয় পায় অন্তত সেটুকু খবরও তো আমরা উত্তরপুরুষদের জন্য রেখে যেতে পারি?

পণপ্রথা দমনে নূতন আইন :

ভারতীয় পার্লামেন্টের যুক্ত অধিবেশনে সেদিন পণপ্রথা দমন আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু এই আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও দেশবাসী সন্তোষ লাভ করতে পারে নি। এইরূপ একটি সামাজিক প্রথা আইন দ্বারা নিবারণ করা যায় না।—এইটেই অনেকের সংগত মত। এই পণপ্রথা নানা ভাবে, নানা আকারে পূর্বের বা পশ্চিমের সব দেশেই

বর্তমান আছে। প্রশ্ন ওঠে, কন্যার পিতা স্বেচ্ছায় যদি স্নেহ বা ভালবাসা বশতঃ নিজের কন্যাকে কিছু দান করেন, তবে দেশের সরকার কোন্ ন্যায্য অধিকার-বলে তার বাধা দেন। অথচ প্রতিনিয়ত দেখা যায়, অনেক স্থলে জোর জুলুম করে কন্যার পিতার কাছ হতে অন্যায় ভাবে পণ আদায় করা হচ্ছে। এই দুরূহ সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতীয় পার্লামেন্টের এই সর্বপ্রথম যুক্ত অধিবেশন হল। এবং এই যুক্ত অধিবেশনে পণপ্রথা দমন আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু এই আইন এমন অক্ষতিকর ভাবে লিখিত হয়েছে, তাতে বোধহয় প্রকৃত দোষীকে কোনদিনই শাস্তি দেওয়া যাবে না। এই আইনের প্রধান ধারা হচ্ছে—এই সম্পর্কে কোন সরাসরি মোকদ্দমা করা চলবে না—পূর্বে হতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি নিয়ে এই সম্পর্কে মোকদ্দমা করা চলবে। তা ছাড়া বিবাহের জন্য উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে—এই কথা কোন বর, কন্যা বা তাদের পিতামাতা পরস্পরের বিরুদ্ধে কোর্টে নিশ্চয়ই সাক্ষী দেবে না। এই ক্ষেত্রে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হবার সম্ভাবনা এসে পড়ে, আত্মীয়তা বিচ্ছেদ হয়। শেষে আচার্য কৃপালনী বলেছেন এই ধরনের মোকদ্দমা আদালতে দাখিল হলে দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাবে। তাই অনেকেরই মত এই, এই ধরনের আইন পাশ হলেও কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মেঘপ্রান্তে সোনালি রেখা :

জেনেভার ১৫ই মে তারিখের সংবাদ—লাওস সম্পর্কে চোদ্দ জাতির সম্মেলন ১৬ই তারিখে হবে বলে সরকারীভাবে জানানো হয়েছে। সম্মেলনে যেসব সরকার অংশ নিচ্ছেন তাঁদের সবাইকে স্বনির্বাচিত প্রতিনিধিদের আসন দেওয়া হবে ব'লে স্থির হয়েছে। আলোচনার বিষয় লাওসের আন্তর্জাতিক দিক। এই হল ভালর দিক। মন্দের দিকে দক্ষিণপন্থী সরকারের প্রতিনিধিদল এখনও বিরোধিতা করছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, তাঁরা যদি সম্মেলন বর্জনও করেন, সম্মেলন চলবে। অবশ্য বাধাগুলো দূর হয়নি। আমেরিকা সম্মতি-অসম্মতি দোলায় দুলছে। ভারত ও বৃটেনের প্রস্তাব মার্কিণ কূটনীতিকদের কাছে খানিকটা উদ্ভট ব'লে মনে হচ্ছে। কম্যুনিষ্ট পন্থী পাথেট লাও প্রতিনিধিদের যদি প্রতিদ্বন্দ্বী লাওস সরকার প্রতিনিধিদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয় তবে আমেরিকা সম্মেলনে যোগ না দিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, একটি বিবৃতিযোগে প্রতিবাদ জানিয়ে আমেরিকা যোগ দিলেও দিতে পারে। সোভিয়েট রুশিয়ার মঃ গ্রোমিকো অভিযোগ করছেন, লাওসে যুদ্ধবিরতি, আন্তর্জাতিক কমিশনের কাজ ও জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠানের সামগ্রিক চুক্তি কোনো কোনো পশ্চিমী রাষ্ট্র লংঘনের মতলব করছেন।

ওদিকে লাওসের না মনে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিয়ে যে সম্মেলন চলছিল তার অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। ভিয়েন্টিয়েন সরকার বলছেন যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থাবলীকে কার্যসূচীতে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হোক। কম্যুনিস্ট পাথেট লাও ও প্রিন্স সুভান্না ফুমার প্রাক্তন নিরপেক্ষ সরকার-এর প্রতিনিধিরা এর বিরোধী। দক্ষিণপন্থীরা বলেন, যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থাপনা ও কোয়ালিশন সরকার গঠনের বিষয় একসঙ্গে আলোচিত হোক। এই আপস প্রস্তাবও উভয়পক্ষ অগ্রাহ্য করেন। কাম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম সিহানুক যে শীর্ষ-সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন তাও অগ্রাহ্য হয়েছে। তবু এই বিরোধের মধ্যেও কিছু কিছু শুভবুদ্ধি সক্রিয় আছে ; কালো মেঘের গায়ে গায়ে এটিই আশার রেখা। এই শুভবুদ্ধি বলেই লাওসে আন্তর্জাতিক কমিশনের যাওয়া সম্ভব হয়েছে, প্রধান প্রধান রণক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি ঘটেছে ; জেনেভা সম্মেলন হবে না-হবে না ক'রেও হ'তে চলেছে এবং খোদ লাওসেও কোনো-না-কোনো সম্মেলনের প্রস্তাব চলেছে। লক্ষণ দেখে মনে হয় চলবে—হয়তো একটা আপস মীমাংসায়ও পৌঁছানো যাবে। আমেরিকা ও সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে চীনও যদি আন্তরিক আগ্রহে এগিয়ে আসেন তবে লাওসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকার কয়টি মীমাংসায় আসতে বাধ্য হবে।

ইন্দোচীন ভেঙে যে চারটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হয়, ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি অনুসারে লাওস হচ্ছে তাদের একটি। তিনটির মধ্যে ভিয়েৎনাম ও কাম্বোডিয়ায় যথাক্রমে সোভিয়েট ও চীন সমর্থক সরকার কায়েম আছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার মার্কিণ প্রভাবান্বিত।

লাওসে প্রিন্স সুভান্না ফুমার প্রধানমন্ত্রিত্বে প্রথমে যে সরকারের প্রতিষ্ঠা হয় দক্ষিণপন্থী ক্যুদেতায় তার অবসান ঘটে। পাথেট লাও ছিল ফুমা সরকারের প্রধান স্তম্ভ। এরা মার্কিণ প্রভাব ও ক্রিয়াকলাপের বিরোধী। আমেরিকার সহায়তায় তাই সেখানে সামরিক ষড়যন্ত্রের যন্ত্র হিসেবে নোসাভান সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে ঐ সামরিক ষড়যন্ত্রকারীদেরই একটি দল নোসাভান সরকারের অবসান ঘটায়। আমেরিকার দিক থেকে অনেক জল গড়ায়, তারপর বুনউম-নোসাভানের নেতৃত্বে এক তাঁবেদার বাহিনী লাওসের খানিকটা দখল করে। এখন এই বিরোধেরই মীমাংসা অভিপ্রেত হয়ে পড়েছে।

আফ্রিকার অরণ্য :

শোম্বে গ্রেপ্তার হয়েছেন এ খবর পুরোনো। লুমুম্বা জহ্লাদদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন এখবর আরও পুরোনো। কিন্তু এ-দুটোর মধ্যে বেশ একটি কার্য-কারণ যোগসূত্র আছে। শোম্বে নিজেকে এমন বাড়িয়ে তুলেছিলেন যে, তিনি সেই ফাঁদে ধরা পড়লেন। অকস্মাৎ যে বন্দী হলেন তা নিশ্চয়ই আকস্মিক নয়। আগুনের 'ধোঁয়া' দেখা যাচ্ছিল না এইমাত্র। শোম্বের গ্রেপ্তারের পর অভাবিত ঘটনা ঘটল। শোম্বের গ্রেপ্তারকে বৈধ করার জন্য এক অর্ডিনান্স জারী হ'ল এবং শোম্বে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন সেই অভিযোগই বড় হ'য়ে দেখা দিল। বোঝা যায়, শোম্বের অজ্ঞাতে তাঁর ক্ষমতা স্খলিত হয়ে আর কারও হাতে পড়েছে। কাতাংগার শাসনভার মন্ত্রিসভার তিনজন নিয়েছেন ব'লে ১১ই মে একটি খবর পাওয়া গেছে। শোনা যাচ্ছে কাতাংগার বন্দী প্রেসিডেণ্ট শোম্বে কোকিলহাট-ভিলেতেই আছেন। কিন্তু লুমুম্বার পর আফ্রিকার এইসব সংবাদ সহসা বিশ্বাস করা কঠিন। কাতাঙ্গা সাধারণতন্ত্রী কঙ্গো থেকে বিচ্ছিন্ন। শোম্বের গ্রেপ্তারের পর কাতাংগা সরকারের চেষ্টা হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করা। তাঁদের আশংকা কঙ্গোর সঙ্গে বিরোধ বাঁধতে পারে। যাই হোক শোম্বে রাষ্ট্রসংঘের ব্যাপারে যে অচলায়তন সৃষ্টি করেছিলেন তার বেড় বোধ হয় শিথিল হ'ল। রাষ্ট্রসংঘ ঘাঁটিতে যে তিন হাজার সৈন্য ছিল শোম্বে সরকার তাদের প্রতি বিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। শোম্বে-মুক্ত বর্তমান সরকার তা প্রত্যা-

হার ক'রে নিচ্ছেন। কামিনিয়ায় এই ঘাঁটি। ভারতীয়েরা বিরূপ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের পর কামিনিয়াতে চলাফেরার কিছু কিছু সুবিধা পেতে শুরু করেছে।

কাতাঙ্গার এই বিরোধটি মূলতঃ কি? কঙ্গো ছিল বেলজিয়াম পদানত। প্যাট্রিস লুমুম্বার নেতৃত্বে দেশ জেগে উঠলে বেলজিয়াম ভেদনীতির অস্ত্রে কঙ্গোর কাতাঙ্গাকে কেটে শোম্বের নেতৃত্বে এক তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করল। মূল কঙ্গোতে সেনানায়ক মোবুতুর এক ক্যুপ ঘটানো হ'ল। রাষ্ট্রপতি কাসাভুবু মোবোতুর হাতে পুতুল। লুমুম্বা রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য চাইল। তারপরই গজিয়ে উঠল এক রহস্যের অরণ্য। কোথা দিয়ে কোন চক্রের তাড়নায় লুমুম্বার অপঘাতে প্রাণ গেল। এখানে বেলজিয়াম-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাটিই আরও উদ্বেগের। কঙ্গো হ'চ্ছে আফ্রিকার মধ্যে সমৃদ্ধতম, তার মধ্যে আবার কাতাঙ্গা ইউরেনিয়ামের সম্পদে আকর্ষণীয়—যে ইউরেনিয়াম পারমাণবিক বোমার অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং, শোম্বে আজ বন্দী বটে এবং নতুন সরকার রাষ্ট্রসংঘের সংগে মিতালি পাতাবার লক্ষণ প্রকাশ করছে বটে, কিন্তু এই সামরিকপ্রধান কূটনীতির অরণ্যে আবার কোন লুকোচুরির খেলা চলবে কেউ বলতে পারে না। আফ্রিকার অরণ্য হয়তো সেদিন আরণ্য ন্যায় থেকে মুক্ত হবে—যেদিন সেখানে ঔপনিবেশিকবাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না।
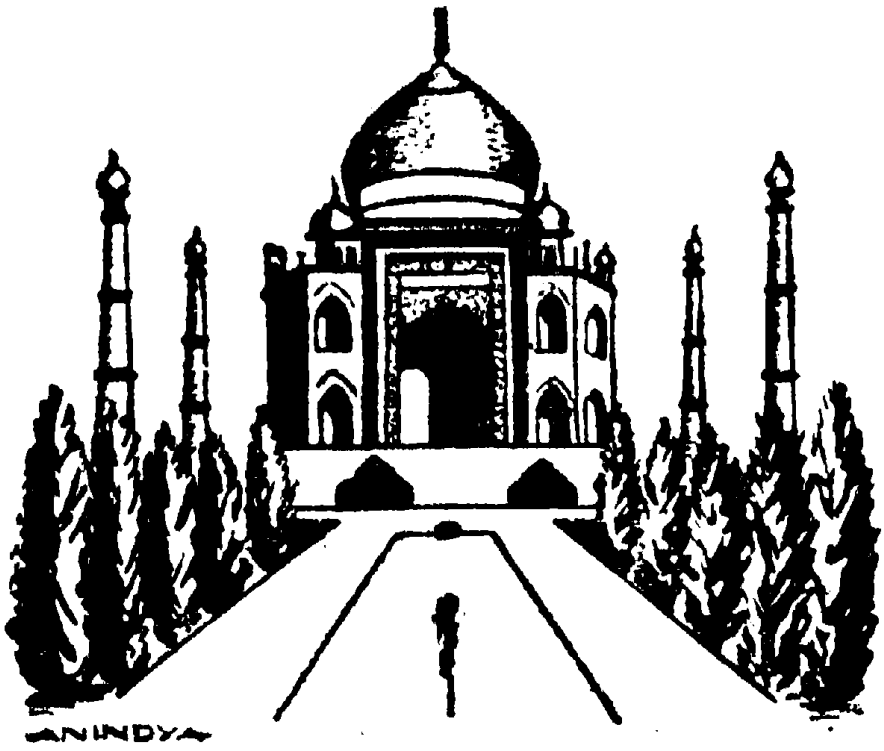
ঘটনা প্রবাহ

৮ই মে—২৫শে বৈশাখ ঃ সারা ভারতের সহিত পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী জাতীয় উৎসবরূপে উদ্‌যাপিত—রবীন্দ্রনাথের জন্মধন্য কলিকাতা মহানগরীর সর্বত্র উৎসব-সজ্জা এবং সভা-সমিতি ও বিচিত্র সংস্কৃতি কর্মসূচীর অনুষ্ঠান—জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

২৪,৮৫৮ ফুট উচ্চ [illegible] অন্নপূর্ণা গিরিশৃঙ্গে বিজয়—দলের নেতা ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লেঃ এইচ. এস. কোহলি সহ তিনজনের শীর্ষে আরোহণ।

৯ই মে—২৬শে বৈশাখ ঃ পণ-প্রথা নিরোধ বিল ভারতীয় সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে গৃহীত—বিবাহে পণের দাবী অথবা পণ প্রদান কিংবা গ্রহণের জন্য শাস্তির বিধান।

হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহৎ আদর্শ অনুসরণের আহ্বান—শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর (বিশ্বভারতীর আচার্য) ভাষণ।

প্রচণ্ড ঝড়ে ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অংশে অভাবনীয় ক্ষয়-ক্ষতি—আগরতলা ও সহরতলীতে পাঁচজন নিহত ও ৫০ জনেরও বেশী আহত।

কলিকাতা বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেন্ট্রাল রেলওয়ে দলের (বোম্বাই) বাইটন কাপ লাভের কৃতিত্ব—খ্যাতিসম্পন্ন পাঞ্জাব পুলিশ দলের ২-১ গোলে পরাজয় বরণ।

১০ই মে—২৭শে বৈশাখ ঃ সমস্যা-জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য অতিরিক্ত ২০০ কোটি টাকা দাবী—অর্থ কমিশনের (ভারতীয়) নিকট রাজ্য সরকার কর্তৃক স্মারকলিপি পেশ।

১১ই মে—২৮শে বৈশাখ ঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ বিপর্যয়ের প্রতিবাদে কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন কল-কারখানার সহস্র সহস্র শ্রমিকের ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও রাইটার্স বিল্ডিংস-এর (কলিকাতা) সম্মুখে তীব্র বিক্ষোভ—বিদেশী ইলেকট্রিক কোম্পানী জাতীয়করণের দাবী।

বিদ্যুৎ শক্তির অভাবে কলিকাতা সহরতলী এলাকার বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত—হাওড়া স্টেশনে হাজার হাজার যাত্রী আটক।

পশ্চিমবঙ্গের হসপাতালসমূহে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘট—কলিকাতার কয়েকটি হাসপাতালে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নিয়োগ।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট (১৯৫৬-৫৭) ফাঁস মামলায় দিল্লীর আদালত কর্তৃক রাষ্ট্রপতি প্রিন্টিং প্রেসের প্রাক্তন ফোরম্যান এফ এক্স জেকবস সহ ৪জন আসামী দণ্ডিত।

১২ই মে—২৯শে বৈশাখ : ইউ সি সি সদস্যদের বাদ দিয়া কর্পোরেশনের (কলিকাতা) বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত—বিরোধী পক্ষ হইতে কংগ্রেসের কার্য-ব্যবস্থার প্রতিবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী হাসপাতাল কর্মীদের (চতুর্থ শ্রেণী) ধর্মঘট প্রত্যাহৃত—রাজ্য সরকার কর্তৃক ৩১শে অগস্ট মধ্যে দাবী-দাওয়া মোটামুটি পূরণের আশ্বাস দান।

১৩ই মে—৩০শে বৈশাখ : দিল্লীতে নেহরু-সন্ত ফতে সিং (প্রধানমন্ত্রী ও পাঞ্জাব নেতা) আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত—পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলিবে, আকালী নেতা মাস্টার তারা সিং-এর ঘোষণা—১৭ই মে দলের অমৃতসর বৈঠকে নূতন কর্মসূচী নির্ধারণ।

বর্তমান বর্ষ (১৯৬১) শেষ হইবার পূর্বেই গোয়াকে পর্তুগালের শাসন হইতে মুক্ত করার অভিযান—গোয়ার আজাদ বিমোচন গোমন্তক দলের 'করেঙ্গে, ইয়ে মরেঙ্গে' সংগ্রাম আরম্ভ।

১৪ই মে—৩১শে বৈশাখ : কছাড় কংগ্রেসের আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি হইতে বিচ্ছিন্ন করার দাবী—কংগ্রেস হাই-কমান্ডের (দিল্লী) নিকট কাছাড় প্রতিনিধিদলের দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ।

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী—কলিকাতার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত—কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বেকার ভাতা দেওয়ারও দাবী।

বাইরে—

৮ই মে—২৫শে বৈশাখ : সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন, আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা রাজ্যে রবীন্দ্র শতাব্দী জন্ম-জয়ন্তী—বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহামনীষীর প্রতি অগণিত মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আলজীরিয়া সমস্যা সমাধানে ফরাসী সরকারের আগ্রহ—বিদ্রোহী নেতাদের সহিত শীঘ্রই (২০শে মে) ইভিয়ানে আলোচনা বৈঠকের প্রস্তাব—প্রেসিডেন্ট দ্যগলের (ফ্রান্স) বেতার ভাষণ।

৯ই মে—২৬শে বৈশাখ : অ্যাঙ্গোলায় (পর্তুগীজ উপনিবেশ) পর্তুগীজদের নরমেধযজ্ঞ—এযাবত কমপক্ষে ২০ হাজার আফ্রিকান নিহত হওয়ার হিসাব।

সমগ্র পূর্ব পাকিস্থানে বিশেষভাবে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, খুলনা, ফরিদপুর জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা—বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় এক সহস্র লোকের প্রাণহানি—হাজার হাজার ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত।

১০ই মে—২৭শে বৈশাখ : পশ্চিম বার্লিনের স্বাধীনতা রক্ষায় 'ন্যাটো' (উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা) জোটের দৃঢ় সংকল্প—অসলোতে তিন দিবসব্যাপী বৈঠকান্তে মন্ত্রিপরিষদের যৌথ বিবৃতি—পূর্ব জার্মাণীর সহিত রাশিয়ার শান্তি চুক্তিতে পশ্চিমীদের আতংক।

সিরিয়ার সন্নিহিত তুরস্কের কয়েকটি অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে প্রায় একশত তুর্কী হতাহত—কর ও সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদের জের—সরকার কর্তৃক বহু 'প্রতিবিপ্লবী' গ্রেপ্তার।

১১ই মে—২৮শে বৈশাখ : লাওস সংকট সমাধানে বিদ্রোহী নেতা প্রিন্স সৌভানা ফৌমা ও প্রিন্স সোফানু ভঙ্গ কর্তৃক সহযোগিতার আশ্বাস দান—বামপন্থী নেতাদের সহিত আলোচনান্তে ত্রিরাষ্ট্র কমিশনের আন্তর্জাতিক লাওস তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন চেয়ারম্যান (ভারত) শ্রীসমর সেনের ঘোষণা।

১২ই মে—২৯শে বৈশাখ : বন্দরনায়ক (সিংহলের এককালীন প্রধানমন্ত্রী) হত্যা মামলায় বুদ্ধরক্ষিত থেরো সহ তিনজন আসামীর মৃত্যুদণ্ড—সিংহল সুপ্রীম কোর্টের রায়।

নূতন সংবিধান অনুসারে কঙ্গোতে ফেডারেশন গঠনের উদ্যোগ—লুমুম্বাপন্থীদের (প্রথম বৈধ প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত প্যাট্রিস লুমুম্বার সমর্থক দল) বাদ দিয়া কঙ্গোতে নূতন পার্লামেন্ট গঠনের ষড়যন্ত্র।

১৩ই মে—৩০শে বৈশাখ : লাওস সম্পর্কে জেনেভায় নির্ধারিত চতুর্দশ রাষ্ট্রের সম্মেলন এখনও অনিশ্চিত—প্যাথেট লাও দলের (লাওস) প্রতিনিধিত্ব লইয়া রুশ-মার্কিণ মতদ্বৈধতা।

১৪ই মে—৩১শে বৈশাখ : পূর্ব পাকিস্থানের গোপালগঞ্জ মহকুমায় ৪০টি গ্রামে হিন্দু উৎসাদন—সংখ্যালঘুদের প্রতি নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের সংবাদ।

প্রেক্ষাগৃহ

—নান্দীকর—

একাঙ্কিকা ও অভিনয়ঃ

একদিন ছিল, যেদিন আমাদের সাধারণ রংগালয়ের দৈনিক প্রোগ্রামে থাকত একটি পূর্ণাংগ পঞ্চাংক নাটক এবং তার সংগে একটি তিন অংকের কৌতুক-নাটিকা। অভিনয়কাল বিস্তৃত ছিল সাত-আট ঘণ্টা পর্যন্ত। এমন কি, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দিরেও এক সময়ে নিয়মিতভাবে একসংগে অভিনীত হয়েছে—শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'। খুব তাড়াতাড়ি ক'রে হ'লেও দুটি বইয়ের অভিনয় শেষ করতে সময় লাগত কম ক'রে সাড়ে ছ'ঘণ্টা। কিন্তু এখনকার সাধারণ রংগালয়ের নিয়মিত প্রোগ্রামে থাকে একখানি নাটক, যার অভিনয় শেষ হ'তে তিন ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। তাই রবিবার এবং ছুটির দিনে তাঁরা অনায়াসেই দু'বার অভিনয় ক'রে থাকেন—তিনটের এবং সাড়ে ছটায়। আজকের অভিনেয় নাটক তিন অংকের, কি পাঁচ অংকের, তা নিয়ে দর্শক আদৌ তার মস্তিষ্ককে ব্যথিত করে না; তার প্রধান জ্ঞাতব্য হচ্ছে, ছ'টায় অভিনয় আরম্ভ হ'লে ন'টার ভিতর সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে কিনা।

এই জেট বিমানের যুগে মানুষ তার মনোজগতেও দুরন্ত স্পীডের ভক্ত হয়ে উঠেছে; কোনো একটি জিনিষের ওপর সে একটানা বেশী সময় দিতে অনিচ্ছুক। তাই দেখি, পশ্চিম দেশে একটি বড়ো উপন্যাস বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে তার একটি চুম্বক সংস্করণ—digest—বেরুনো দস্তুর দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের বাঙলা দেশে অবশ্য এই সবে আকারে অভিধান গোছের উপন্যাস বেরুতে সুরু হয়েছে, তাই digest আকারে ছাপবার বুদ্ধি এখনো তৎপর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অপরদিকে ছোট গল্পের চাহিদা বেড়েই চলেছে। এককালে মাসিক এবং সাপ্তাহিকের পাতাই ছিল ছোট গল্পের আসর জমাবার একমাত্র স্থান; বইয়ের পৃষ্ঠায় প্রকাশ পাওয়া ছিল রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এখন হামেশাই ছোট গল্পের বই প্রকাশিত হচ্ছে। তা ছাড়া স্বনির্বাচিত গল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প ইত্যাদি আকারে স্ফীত সংস্করণগুলি ত' আছেই।

ঠিক যে-কারণে আজ পূর্ণাংগ নাটকের পরিসর কমে গিয়েছে, ছোট গল্পের চাহিদা বেড়ে চলেছে, ঠিক সমান কারণেই বিদেশের দেখাদেখি আমাদের এখানেও একাংক নাটক রচনা এবং তার অভিনয় ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে, শিগ্‌গিরই দেখা যাবে, আমাদের সাধারণ রংগালয়ে হয়ত দু'খানি বা তিনখানি একাঙ্কিকা নিয়ে দৈনিক প্রোগ্রাম তৈরী হবে। অবশ্য একাঙ্কিকা সম্পর্কে সকলের ধারণা সমান নয়। এমনও একাঙ্কিকা অভিনীত হ'তে দেখেছি, যা কুড়িটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এবং মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে (এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট!) অভিনীত হ'তে পারা ছাড়া আর কোনো দিক দিয়েই একাংক নাটকের পর্যায়ে পড়েনা। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, একাংক নাটকের বিশেষত্ব কোথায়? দুই বিরুদ্ধ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত নইলে নাটক হয় না— তা সে ঘটনা বা চরিত্রের মাধ্যমেই হোক, বা একই চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই হোক। কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাত যদি একটি মাত্র নাটকীয় আবর্তের সৃষ্টি করে এবং একটি চরম বিয়োগান্ত বা মিলনান্ত ফলাফলে—যাকে ইংরেজী ভাষায় বলি climax—পর্যবসিত হয় এবং তাও স্বল্পকালের মধ্যে, তাহ'লে তখন নাটক হবে একাংকে সমাপ্ত। একাংক নাটক সাধারণতঃ এক ঘণ্টার বেশী অভিনীত হয় না এবং আদর্শ একাঙ্কিকা মাত্র একটি অংকেই সম্পূর্ণ নয়, একটি দৃশ্যেও সম্পূর্ণ। একাংক নাটকে নাট্যকারের একটিমাত্র বক্তব্য বা প্রতিপাদ্য থাকে এবং সব কটি চরিত্রই সেই একই বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য করে। নাটকের গতি হয় একমুখী এবং ঘটনার উপস্থাপন ও বিন্যাস হয় অত্যন্ত ঋজু। পাত্রপাত্রীর সংলাপ হয় বাহুল্য-বর্জিত ও বলিষ্ঠ।

আমাদের দেশে যথার্থ একাঙ্কিকার সুরু হয় শ্রীমন্মথ রায়ের "মুক্তির ডাক" দিয়ে। কিন্তু মাত্র গেল পাঁচ-ছয় বৎসর ধ'রে যেভাবে নতুন নতুন একাঙ্কিকা রচিত হয়ে বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত হচ্ছে, তাতে বলা যেতে পারে, বাঙলা দেশে একাঙ্কিকার প্লাবন এসেছে।

এই প্লাবন আনতে সহায়তা করেছে বিশ্বরূপা, থিয়েটার সেন্টার, পশ্চিমবঙ্গ যুব-কংগ্রেস প্রভৃতি আয়োজিত একাঙ্ক প্রতিযোগিতাগুলি। অবশ্য সকল একাঙ্কই যে রচনাশৈলীর দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে বা সকল একাঙ্কিকার অভিনয়ই সমানভাবে সাফল্য অর্জন করেছে, এমন নয়। কিন্তু পূর্বের সেই চর্বিতচর্বণের বদ অভ্যাস ত্যাগ করে সৌখীন নাট্যসংস্থাগুলি যে নবসৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছেন এবং শক্তিমান লেখক নূতন রচনা করবার প্রেরণা পাচ্ছেন, এটাই কি কম কথা? কিরণ মৈত্রের 'বুদ্বুদ', 'বারোঘণ্টা', ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক পশলা বৃষ্টি', অমরেশ দাশগুপ্তের 'দৈনন্দিন' প্রভৃতি একাঙ্কিকা বাঙলা নাট্য সাহিত্যের মর্যাদা যে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে, একথা অনস্বীকার্য। এবং এই কারণেই অভিনন্দন জানাই বর্তমান বাঙলায় একাঙ্ক নাটক এবং তার অভিনয় আন্দোলনকে।

সুধীর মুখার্জি পরিচালিত "দুই ভাই" চিত্রে সুলতা চৌধুরী ও উত্তমকুমার

গ্যারী কুপার

১৯৬১ সালের আমেরিকার মোশান পিকচার অ্যাওয়ার্ড কমিটির সভ্যরা নিশ্চয়ই ভবিষ্যদ্রষ্টা ছিলেন। নইলে এই বছরই হঠাৎ তাঁদের কেন খেয়াল হবে, বহু স্মরণীয় চলচ্চিত্রাভিনয়ের জন্যে" গ্যারী কুপারকে একটি বিশেষ অস্কার দিয়ে সম্মানিত করতে?

আসল নাম কিন্তু গ্যারী নয়, ফ্রাঙ্ক জেম্‌স্ কুপার। ১৯২৪ সালে কুপার যখন ওয়েস্টার্ণ ছবিতে ঘোড়ায়-চড়া কাউবয় হিসেবে স্টান্ট দেখিয়ে সামান্য রোজগার করতে ব্যস্ত, তখন তিনি নিজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করবার জন্যে একজন ভদ্র মহিলার সাহায্য প্রার্থনা করেন—এই ভদ্রমহিলা ছিলেন একজন খ্যাতনামা অভিনেতার এজেন্ট। ইনিই কুপারকে পরামর্শ দেন তাঁর ফ্রাঙ্ক জেম্‌স্ নামটি পাল্টাতে। ভদ্রমহিলার বাড়ী ছিল ইন্ডিয়ানার গ্যারী শহরে। কুপার ঐ শহরের নামটিই তাঁর নিজের নামে যোজনা করলেন। ছিলেন ফ্রাঙ্ক জেম্‌স্ কুপার, হলেন গ্যারী কুপার। এবং এই নাম পরিবর্তন কুপারের সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিল।

১৯২৬ সালে "দি উইনিং অব বারবারা ওয়ার্থ" ছবির জন্যে নির্বাচিত দ্বিতীয় নায়ক হঠাৎ অনুপস্থিত হয়ে পড়ায় গ্যারী ঐ ভূমিকাটিতে অভিনয় করবার সুযোগ পান। ঐ ছবির নায়ক ছিলেন রোনাল্ড কোলম্যান; তাঁর পার্শ্ব-অভিনেতা রূপে অভিনয় ক'রে গ্যারী বেশ নাম কিনে ফেলেন, অবশ্য ঐ কাউবয় হিসেবেই। কিন্তু তিনি যখন প্যারামাউন্টের "উইংস্" ছবিতে নায়ক উড়োজাহাজ চালক রূপে কৃতিত্বের সংগে অভিনয় করলেন, তখন সকলকেই স্বীকার করতে হ'ল, পূর্বের শিক্ষা থাক, আর নাই থাক, গ্যারী কুপার এক-জন যথার্থ অভিনেতা। প্রায় ৩৬ বছর ধ'রে তিনি ফিল্মে অভিনয় করেছেন এবং তাঁর অভিনীত চরিত্রের সংখ্যা কম ক'রে ১০০। তাঁর প্রথম সবাক চিত্র "দি ভার্জিনিয়ান"-এই তিনি অভিনেতা হিসেবে নিজেকে খুঁজে পান। ওয়েন উইস্টারের এই উপন্যাসখানি যেন বিশেষ ক'রে গ্যারীর [illegible] মতোই লেখা হয়েছিল।

অথচ ক্লার্ক গেবেলের মতো "কুপ"—ঐ নামেই গ্যারী কুপার নিজের বন্ধু-মহলে পরিচিত ছিলেন—নিজেকে কখনই প্রকৃত অভিনেতা ব'লে মনে করতেন না। যখন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা রূপে তিনি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত, তখনও তিনি প্রায়ই অভিনয়-জীবনে ইস্তফা দিয়ে তাঁর অঙ্কন-শিল্পীর জীবনে ফিরে যেতে চাইতেন। কেননা, ফিল্মে যোগ দেবার আগে তিনি ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন আঁকা অভ্যাস করেছিলেন; এমন কি স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রত্যহ চার ঘণ্টা ধ'রে অঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করতেন। যখন তিনি আইয়োয়ার গ্রীনেল কলেজে তিন বছর ধ'রে পড়ার পরেও গ্র্যাজুয়েট হতে পারলেন না, তখন তিনি তাঁর জন্মস্থান হেলেনায় ফিরে গিয়ে একটি স্থানীয় সংবাদপত্রের কার্টুন-আঁকিয়ে হিসেবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন। সংবাদপত্রটির মালিক তাঁর আঁকা কার্টুন সাদরে গ্রহণ করত, কিন্তু পরিবর্তে তাঁকে পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করত না। বিরক্ত হয়ে তিনি চিকাগোতে গেলেন বিজ্ঞাপন-চিত্র (কমার্সিয়াল আর্ট) আঁকার কাজে হাত পাকানোর জন্যে। কিন্তু এখানেও তিনি সফল না হয়ে লস্ এঞ্জেলস্ রওনা হলেন। উদ্দেশ্য, যদি মরতেই হয়, তবে শীতে কাঁপতে কাঁপতে না ম'রে অন্ততঃ একটু অপেক্ষাকৃত গরম জায়গাতে দেহ-রক্ষা করা। এখানে তিনি প্রথমে একটি অ্যাডভার্টাইজিং সাইন্‌স্ (বিজ্ঞাপনের বোর্ড) বিক্রীর কাজ পান, কিন্তু এক-খানিও বোর্ড বিক্রী করতে না পারার দরুণ তাঁর কাজ যায়। এরপরই সুরু হয় তাঁর ফিল্ম-জীবন, কাউবয় এক্‌স্ট্রা-রূপে বিপজ্জনক কাজ ক'রে। পরি-চালকের নির্দেশমত ক্যামেরার সামনে

এক একবার ছুটন্ত ঘোড়া থেকে প'ড়ে যান, আর মনে ভাবতে থাকেন, শিল্প-সাধনার পথে এক পা করে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন।

গ্যারী কুপার তাঁর অভিনয়-জীবনে বহুরকম চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যদিও তিনি প্রধানতঃ আমেরিকার ওয়েস্টার্ণ র‍্যাণ্ড-জীবনের সারল্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন। ছ'ফুট পৌনে তিন ইঞ্চি লম্বা, সাগরের জলের মত উজ্জ্বল নীল চোখ, আধখানা মুখে হাসি—গ্যারী কুপার অন্তরে "অত্যন্ত পরিশ্রম-মনা মন্টানা স্পোর্টসম্যান",—"প্রকৃত স্বভাব-আমেরিকানের প্রতীক"। কুপারের স্মরণীয় ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ "এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্", "ডিজাইন ফর্ লিভিং", "লাইভস্ অব এ বেংগল ল্যান্সার", "ডিজায়ার", "দি জেনারেল ডায়েড অ্যাট ডন", "মিঃ ডীড্স্ গোজ টু টাউন", "দি অ্যাডভেঞ্চার্স অব মার্কোপোলো", "ব্লু বেয়ার্ডস্ এইট্থ্ ওয়াইফ্", "বো জেস্ট", "নর্থ ওয়েস্ট মাউন্টেড পুলিশ", "মিট জন ডো", "সার্জেন্ট ইয়র্ক", (স্মরণ থাকতে পারে, প্রথম মহাযুদ্ধের যে-যোদ্ধার জীবনী নিয়ে ছবিটি তৈরী হয়, তিনি ছবি তৈরীর সময়ে নিজে বে'চে ছিলেন এবং গ্যারী কুপার যদি তাঁর চরিত্রটি অভিনয় করেন, তবেই তিনি ছবিটি তুলতে দেবেন, এই ছিল তাঁর সর্ত), "ফর হুম দি বেল টোল্স্", "দি ওয়েস্টার্ণার" "প্রাইড অব দি ইয়াঙ্কিজ" (বেসবল-খেলোয়াড় লুই গেরিগের জীবনী), "সারাটোগা ট্রাঙ্ক" ও "হাইনুন"। এর মধ্যে "সার্জেন্ট ইয়র্ক" (১৯৪১) এবং "হাইনুন" (১৯৫২)-এ অভিনয়-দক্ষতা প্রকাশের জন্যে তিনি দু-দুবার অভিনয়-জীবনের চির আকাঙ্ক্ষিত "অস্কার" লাভ করেন। এ-বছরের বিশেষ "অস্কার" পুরস্কারের কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে।

ডিবোরা কারের সঙ্গে তিনি যে-রহস্যচিত্রে সবশেষে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তার নাম হচ্ছে—"দি নেকেড এজ" (The Naked Edge) কিন্তু এরও পরে তিনি "দি রিয়াল ওয়েস্ট" নামে একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামে বিবৃতি-কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যথার্থ ওয়েস্টার্ণ আমেরিকান হিসেবে নিজের জীবনকে সার্থক করলেন।

দীর্ঘ ৬০ বছর আগে ১৯০১ সালের ৭ই মে যে-জীবনের সুরু হয়েছিল মন্টানা প্রদেশের হেলেনাতে, মাত্র কিছুদিন কালব্যাধি কর্কট-রোগে (ক্যান্সার) ভোগবার পর তারই অবসান ঘটল ১৯৬১ সালের ১৩ই মে তারিখে। গ্যারী কুপার অমর হোন।

বিবিধ সংবাদ

আজ শুক্রবার, ২৬শে মে বসুশ্রী ও বীণাতে মুক্তিলাভ করছে নবগঠিত চিত্র-প্রতিষ্ঠান, পটমঞ্জরীর প্রথম প্রচেষ্টা —"মেঘ"। একটি নিখুঁত খুনের কাহিনী ব'লে বিজ্ঞাপিত হ'লেও দর্শকরা এই ছবির মধ্যে আবিষ্কার করতে পারবেন বর্তমান সমাজ-জীবনের নানা অলি-গলি, যে-পথের কুটিল স্বরূপ মানুষকে ভীত, সন্ত্রস্ত, উৎপীড়িত ক'রে তোলে। প্রথিতযশা অভিনেতা ও মঞ্চাধিনায়ক উৎপল দত্তের পরিচালকরূপে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ জয়যুক্ত হোক। "মেঘ"-এর চিত্রগ্রহণ করেছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত এবং সংগীত পরিচালনায় আছেন রবিশংকর। ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন উৎপল দত্ত, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মালবিকা গুপ্তা, শোভা সেন, নীলিমা দাস প্রভৃতি।

●

এল, বি, ফিল্মস্ নিবেদিত হিন্দী ছবি "মেমদিদি"ও আজই মুক্তি পাচ্ছে জনতা, প্রিয়া, পূর্ণশ্রী, প্রভাত, ম্যাজেস্টিক ও এন্টালী টকীজ-এ। ১৯৬০ সালের রাষ্ট্রপতির সুবর্ণপদক বিজেতা হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এর চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক। সংগীত পরিচালনা করেছেন সলিল চৌধুরী। শচীন ভৌমিকের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত হয়েছে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—ললিতা পাওয়ার, ডেভিড, জয়ন্ত, ধুমল, তনুজা এবং কেশী মেহরা। জনতা পিকচার্স এর পরিবেশক।

●

বিশ্বভারতী চিত্রমন্দিরের প্রথম প্রয়াস "পংক্তিতিলক" আসছে মাসেই মুক্তিলাভ করবে ব'লে শোনা যাচ্ছে। রাসবিহারীলাল রচিত কাহিনী অবলম্বনে গঠিত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন মঙ্গল চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালক সুধীর দাসগুপ্তের নির্দেশে এতে গান গেয়েছেন লতা মুঙ্গেশকর, গীতা দত্ত, মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, তরুণ রায়, ছায়া দেবী, সবিতা বসু, অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় এবং আরও অনেকে।

●

আর. ডি. বনসালের পরবর্তী চিত্র-

"রতনলাল বাঙ্গালী" চিত্রে তন্দ্রা বর্মণ ও আশীষকুমার

নিবেদন "কাঞ্চন-মূল্য" বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচিত কাহিনীর উপর ভিত্তি ক'রে গঠিত হয়েছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল মিত্র। পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নির্মল মিত্র। সংগীত পরিচালনায় আছেন নির্মল চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন—ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, গীতা দে এবং বাসবী নন্দী।

●

আর একখানি নির্মীয়মান ছবির নাম হচ্ছে "রতনলাল বাঙ্গালী"। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলা এই ছবিতে অভিনয় করছেন—আশিসকুমার, তন্দ্রা বর্মণ, সন্ধ্যা রায়, চন্দ্রাবতী, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি। নিয়োগী পিকচার্স (প্রাঃ) লিমিটেড ছবিখানির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

●

মেলোডি ইন্টারন্যাশনালের প্রথম ছবি "বনানী কন্যা"র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে গেল ৩০-এ এপ্রিল ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। ছবিখানির পরিচালনা করবেন রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন চিন্ময় লাহিড়ী। এতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার, দ্বিজু ভাওয়াল, মঞ্জুলা এবং প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ভারতী রায়।

●

চিত্রজগতের স্বনামধন্য ব্যবস্থাপক বিমল ঘোষ "বিমল ঘোষ প্রডাকসনস্" নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়েছেন গেল অক্ষয়তৃতীয়ার দিন। তাঁর প্রথম প্রয়াস হবে শৈলেশ দে রচিত "বধূ" উপন্যাসের চিত্ররূপ দান। এর চিত্রনাট্য ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে দেবনারায়ণ গুপ্ত ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একটি সম্মিলিত গোষ্ঠী এর পরিচালনাভার গ্রহণ করবেন। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন ছবি বিশ্বাস, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, সন্ধ্যারাণী এবং উত্তমকুমার।

●

"থিয়েতর লাইবার" আনছে মঙ্গলবার, ২৩-এ মে সন্ধ্যা সাতটায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সমরেশ বসুর "মদনের স্বপ্ন"র ছায়া অবলম্বনে শ্রীঅগ্নি মিত্রম্ রচিত ও পরিচালিত "ধূলিমাটির সুর" অভিনয় করবেন।

●

সুখচর [illegible]শধর পাঠাগার ২৩, ২৪ ও ২৫-এ বৈশাখ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী

অসিত সেন পরিচালিত "স্বয়ম্বরা" চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী

উৎসব পালন করেছিলেন নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

রঙ্গসভার নতুন নাটক রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' আগামী রবিবার, ২৮-এ মে সকাল ১০-৩০টায় নিউএম্পায়ার মঞ্চে অভিনীত হবে। গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীপীযূষ বসু এবং পরিচালনার ভার তিনি নিজেই নিয়েছেন। প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করবেন দিলীপ রায়, রথীন ঘোষ, পরিতোষ রায়, চন্দন রায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুলতা চৌধুরী। রঞ্জনা দেবী এই প্রথম মঞ্চে অবতীর্ণ হবেন।

চিত্র-সমালোচনা

স্বয়ম্বরা : ইউনাইটেড ফিল্মসের চিত্র, ১০৪০০ ফুটে ১২ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : সন্তোষ-কুমার ঘোষ; পরিচালনা : অসিত সেন; সংগীত-পরিচালনা : রবি-শংকর; আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত; শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত; সঙ্গীতগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ; ভূমিকায় : সুপ্রিয়া চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, গীতা দে ইত্যাদি। কালিকা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১৯-এ মে থেকে রাধা, পূর্ণ, প্রাচী প্রভৃতি সিনেমায় দেখানো হচ্ছে।

'স্বয়ম্বরা'র মূল কাহিনী আমরা পড়িনি। তবে কাহিনীকার নিজেই যখন চিত্রনাট্যের দায়িত্ব বহন করেছেন, তখন অনুমান করা অন্যায় হবে না, মূল থেকে ছবির গল্প পৃথক নয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক নিশ্বাসে এও বলা চলে যে, স্বয়ম্বরা সেই শাশ্বত ত্রিভুজাকৃতি মামুলি প্রেমের গল্পকেই চিত্ররসিক দর্শক-সাধারণের সামনে উপস্থাপিত করেছে সাত-রঙা রামধনু রঙে রঙীন ক'রে এবং সুন্দর চোখজুড়োনো ফ্রেমে এঁটে।

মধ্যবিত্ত সংসারের বেশীর ভাগ খরচ চালানোর গুরু দায়িত্ব বহনকারী স্কুল শিক্ষয়িত্রী লীলার সামনে এসে পড়ল ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামশীল ছেলে স্মরজিৎ। নানান দিনের নানা ছোট-বড় ঘটনার ভিতর দিয়ে যখন তারা একে অপরের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে, তখন লীলার সামনে এসে দাঁড়াল অতুল বিত্তশালী অনুপম, তার পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ থেকে উজাড় ক'রে দেওয়া প্রেমের পশরা নিয়ে, যে-অনুপমকে লীলা একদিন বড়লোকের বাউণ্ডুলে ছেলে জেনে শিক্ষিতা নারীকে প্রেম নিবেদন করবার উপযুক্ত হয়ে আসবার সদুপদেশ দিয়েছিল। 'স্ত্রিয়াঃ চরিত্রম্' মানুষের জানবার কথা নয়। তাই অত মেলামেশার পরেও স্মরজিৎ সম্পর্কে ভুল ধারণা ক'রে লীলা অনুপমকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হবার পরক্ষণেই শুনল, "আমি ত তোমার সংসারসুদ্ধ বিয়ে করছি না, শুধু তোমাকেই বিয়ে করছি" এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জানল, স্মরজিৎ তার মার কাছ থেকে রূঢ় আঘাত পেয়ে ফিরে গেছে। এরপর আর লীলার মনস্থির করতে একমুহূর্তও দেরী হ'ল না এবং সে স্মরজিতের কাছে গিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করল—সে স্বয়ম্বরা।

স্বয়ম্বরা লীলার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। কর্তব্যপরায়ণা লীলার নারীহৃদয় যখন প্রেমের পরশে ধীরে ধীরে জেগে উঠল, তখন তার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটিকে তিনি সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। আবার ছবির শেষের দিকে স্মরজিতের জন্যে লীলার অস্থির আকুলতাও মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়ে। শিক্ষয়িত্রী, পিতৃস্নেহাকুল কন্যা এবং স্নেহপরায়ণা দিদির রূপও যথাযথভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। স্মরজিৎ আশাবাদী যুবক; ভাগ্যের কশাঘাতকে সে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। তার প্রাণের প্রাচুর্য তাকে হিসাব ক'রে কথা বলতে দেয় না; এক এক সময় সে এমন কাজও ক'রে বসে, যা সাধারণভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু সমগ্রভাবে তার জীবনদর্শন তাকে ভালোবাসার সামগ্রী ক'রে তুলেছে। এই নূতনস্বপূর্ণ মিষ্ট ভূমিকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সার্থক অভিনয় ক'রে দর্শকহৃদয়কে অনায়াসেই জয় করেছেন। দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অনুপম, বাচনের দিক দিয়ে যতখানি
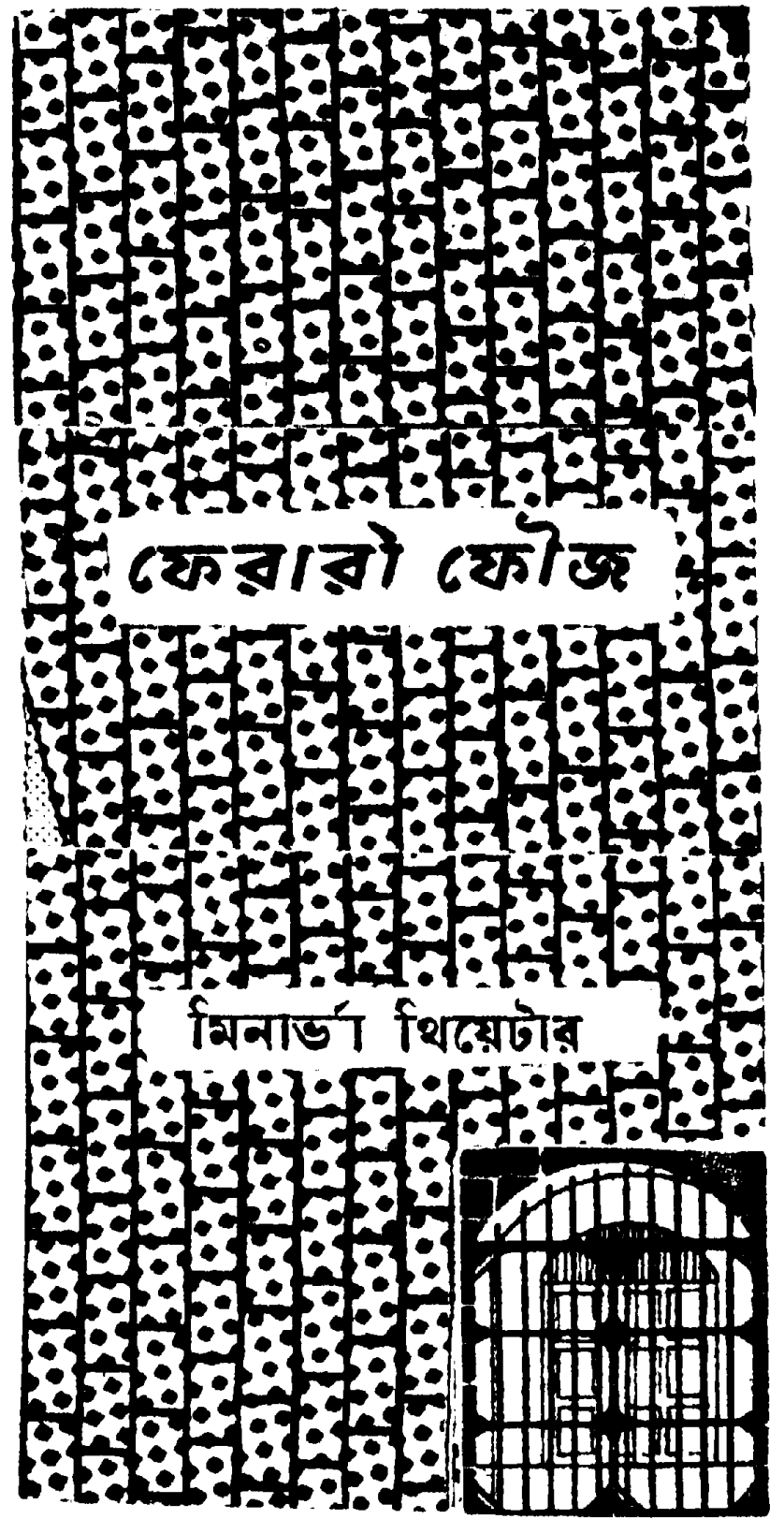
ভালো, অভিব্যক্তির দিক দিয়ে ততখানি নয়। অক্ষম পিতার স্নেহপরায়ণ মনকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বিকাশ রায়। আর প্রসন্নহাসির মাধ্যমে মাধুর্যময়ী মায়ের রূপটি ধরা পড়েছে ছায়া দেবীর অভিনয়ে। এ'ছাড়া চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় গীতা দে, সাধনা রায়চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

পরিচালক অসিত সেন একটি মামুলী প্রেমের গল্পকে যতদূর সম্ভব মনোরম ক'রে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন। এবং তাঁর এ-কাজে সাহায্য করেছেন আলোকচিত্রশিল্পী। এই সম্পর্কে রেলওয়ে ওভারব্রীজের ওপরের দৃশ্যগুলি মনে রাখবার মতো। বিশেষ ক'রে যেখানে লীলা এবং স্মরজিতের মধ্যে 'আপনি'র ব্যবধান ঘুচে গিয়ে 'তুমি'র সান্নিধ্য আসন্ন হয়ে উঠল, সেখানে সাদা ধোঁয়া (এঞ্জিনের স্টীম) দিয়ে তাদের ঢেকে দেওয়া দর্শকের মনে মুগ্ধবিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। বাগানপথে গাছের পাতা ভেদ ক'রে আলোর খেলাও নিঃসন্দেহে নূতনত্বের দাবী করে। বহির্দৃশ্য এবং অন্তর্দৃশ্য—উভয় স্থানেই ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়। দৃশ্যপট সাধারণভাবে ঘটনানুযায়ী। রবিশঙ্করের সংগীত পরিচালনায় কোনো নূতনত্ব দেখলুম না। ছবির গান দুখানি সুগীত হ'লেও সুরের মধ্যে যেমন নেই কোনো বৈশিষ্ট্য তেমনই আবহ-সংগীতও বহু জায়গাতেই পরিবেশসৃষ্টিতে আদৌ সাহায্য করেনি; এমন কি সময় সময় বিরক্তি উৎপাদন করেছে।

গল্প এবং সংলাপে কয়েকটি ত্রুটি বর্জন করতে পারলে ভালো হ'ত। স্মরজিৎ বলছে কালি, কলম, পেন্সিল কাগজ—সবই তার কারখানায় তৈরী হয়। এমন আশ্চর্য দশকর্মা কারখানার কথা কল্পনাও করা যায় না। স্কুলের হেড মিস্ট্রেস স্মরজিৎকে বললেন, 'স্যাম্পেল রেখে যান'; কিন্তু দেখা গেল সে সমস্ত জিনিষই ব্যাগে পুরে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু আবার যখন হেড-মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা, তিনি অনায়াসে বললেন 'আপনার কালিটা খারাপ ছিল, আর একটা স্যাম্পেল রেখে যাবেন।' স্মরজিৎ কাজের উৎসাহে কথার ঠিক রাখতে পারে না, এ জানা সত্ত্বেও লীলা কেমন ক'রে তার সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা করতে পারল এও সাধারণবুদ্ধির অগোচর। অবশ্য গোড়াতেই বলেছি—স্ত্রিয়াঃ চরিত্রম্‌।

এই রকম ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও 'স্বয়ম্বরা' মোটের উপর একখানি সার্থক প্রেমের চিত্র যা দেখে সাধারণ দর্শক খুশী না হয়ে পারবেন না।

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

সিনেমা

রূপবাণী—তিন কন্যা
ভারতী—তিন কন্যা
অরুণা—তিন কন্যা
মিনার—মধ্যরাতের তারা
বিজলী—মধ্যরাতের তারা
ছবিঘর—মধ্যরাতের তারা
রাধা—স্বয়ম্বরা
পূর্ণ—স্বয়ম্বরা
প্রাচী—স্বয়ম্বরা
উত্তরা—অগ্নিসংস্কার
পূরবী—অগ্নিসংস্কার
উজ্জ্বলা—অগ্নিসংস্কার
আকাদমি অফ ফাইন আর্টস—তথ্যচিত্র (রাধাকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হলিডে ইন ইমালয়াজ)
রক্সি, কৃষ্ণা, রূপালী, চিত্রা—নজরানা (হিন্দী)
জ্যোতি, দর্পণা, গ্রেস, ছায়া—ক্রোড়পতি (হিন্দি)
হিন্দ, গণেশ, ছায়া—শশুরাল (হিন্দী)
প্যারাডাইস—জিস্ দেশমে গঙ্গা বৈহতি হ্যায়
শ্রী—স্বরলিপি
ইন্দিরা—স্বরলিপি
বসুশ্রী—বিষকন্যা
বীণা—বিষকন্যা
নিউ এম্পায়ার—Hercules Unchained
লাইট হাউস—Doctor in Love
মিনার্ভা—Dark at the Top of the Stairs
গ্লোব—13 Shorts
এলিট—North to Alaska
মেট্রো—Ben-Hur

থিয়েটার

ষ্টার—প্রেয়সী
রংমহল—অনর্থ
বিশ্বরূপা—সেতু
থিয়েটার সেণ্টার—আর হবে না দেরী

বিবিধ

রবীন্দ্র-শতাব্দী-জয়ন্তী—হাওড়া ময়দান (২৭শে মে—২রা জুন)
নিউ এম্পায়ার—রঙ্গ সভার দালিয়া (২৮শে মে)
ইডেন গার্ডেন—রবীন্দ্র মেলা (বেলা ২—রাত্রি ৯টা)
রঞ্জি ষ্টেডিয়াম—থিয়েটার (সন্ধ্যা ৬-৩০)
আকাদমি অফ ফাইন আর্টস—রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী

খেলাধুলা

দর্শক

নীল হার্ভে

নর্মান ও'নীল

ইংল্যাণ্ড সফরকারী অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

গত সপ্তাহে ইংল্যাণ্ড সফররত অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের খেলার আলোচনা প্রসঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিচি বেনোর পয়মন্ত ঐতিহাসিক টাই-এর উল্লেখ করেছিলাম; সেই পয়মন্ত টাইটি এখন আর রিচি বেনোর গলায় জয়মাল্য হিসাবে দলছে না; যোগ্যপাত্র প্রিন্স ফিলিপকে তিনি তাঁর স্বযত্নে রক্ষিত ঐতিহাসিক টাইটি উপহার দিয়ে নিজে ধন্য হয়েছেন। এই পয়মন্ত টাইটির সঙ্গে আলোচ্য ক্রিকেট সফরের কতখানি প্রভাব আছে জানি না, তবে টাইটি হাত ছাড়া করার পরই হাতেনাতে ফল ফলে গেল; অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সফরের সূচনা ভাল হ'ল না—পর পর তিন তিনটে খেলা ড্র এবং দলের অধিনায়ক বেনো অসুস্থ হয়ে দুটো খেলা থেকে বাদ পড়লেন। সফরের প্রথম পর্যায়ের এই ধাক্কা অষ্ট্রেলিয়া এখন সামলে নিয়েছে। সফরের ৪র্থ খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে ল্যাংকাশায়ার দলকে হারিয়ে দিয়ে নিজের খোলে ঝোল টেনে নিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া এ পর্যন্ত (২০ মে) পর পর তিনটে খেলায় জয়ী হয়েছে। ল্যাংকাশায়ার দলের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার আলোচ্য সফরের প্রথম জয়লাভের জন্যে যদি কোন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যের কথা উল্লেখ করতে হয় তাহলে নীল-হার্ভের নামই করবো। হার্ভের ১ম ইনিংসে ১২০ রাণ এবং ২য় ইনিং ২৪ মিনিটের খেলায় ৩৮ রাণ অষ্ট্রে লিয়ার জয়লাভের পক্ষে খুবই কা দেয়। এর পরই উল্লেখযোগ্য রাণ পিট বার্জের নট আউট ১০১। ৩য় বা শে দিনের খেলাটাই জমে ছিল বেশী উত্তেজনায় অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসে খেলা দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ছিল। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১১ রাণের থেকে এক রাণ বাড়তি তুলে দি অষ্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে জয়ী হয়।

নিউজিল্যাণ্ড সফররত ভারতীয় হকি দল

ওভাল মাঠে সফরের ৫ম খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে সারে কাউণ্টি ক্রিকেট দলকে হারিয়ে দেয়। পর পর তিনটে খেলায় অসুস্থতার জন্যে অনুপস্থিত থেকে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বেনো পুনরায় দল পরিচালনার ভার নেন। অস্ট্রেলিয়া সারে দলকে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য করে। অস্ট্রেলিয়ার গুগলি বোলার ববি সিম্পসন একাই ৪টে উইকেট পান মাত্র ১৩ রাণ দিয়ে। ২য় ইনিংসেও সারে দলের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে; ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে ২৬ রাণ করার পর আহত অবস্থায় খেলা থেকে সেই যে বিদায় নিলেন তারপর খেলায় আর যোগ দিতে পারেন নি; ডেভী ফ্লেচার আঙ্গুল ভেঙ্গে দুটো ইনিংসেই খেলতে পারেননি। দলের অধিনায়ক পিটার মে ১ম ইনিংসে ৫৮ রাণ করে রাণ আউট হন। অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণের মুখে যা একমাত্র দাঁড়িয়ে খেলেছিলেন পিটার মে, উইলেট, (৪২ ও ৫২) এবং ব্যারিংটন (রাণ- আউট ৪৩)। অস্ট্রেলিয়া জয় লাভের প্রয়োজনীয় ৩৫ রাণের জায়গায় ৩৮ রাণ তুলে দেয় ৪০ মিনিটের খেলায়। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ১ম ইনিংসে বিল লরী ১৬৫ রাণ করেন।

সফরের ৬ষ্ঠ খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তিনটে খেলায় জয়লাভের কৃতিত্বলাভ করে। এই খেলাটিতে 'সেঞ্চুরী' রাণ করার ছড়াছড়ি পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৪ জন সেঞ্চুরী করেন—ম্যাকডোনাল্ড ১০০, লরী ১০০, বুথ ১১৩ এবং ম্যাকে ১০৬ নট আউট। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করে ৩ উইকেটে দলের ৪৪৯ রাণে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। কেম্ব্রিজ দলের ১ম ইনিংস ২৩০ রাণে শেষ হলে তারা 'ফলো-অন' করে। ১ম ইনিংসে ৮নং ব্যাটসম্যান উইকেট-কিপার ব্রিয়ারলী দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৩ রাণ করেন। ২য় ইনিংসের খেলায় তাঁকে এক নম্বরে প্রমোশন দেওয়া হয়। ২য় দিনের খেলায় ব্রিয়ারলী ৬৯ রাণ করে নট আউট থাকেন। তাঁর খেলার উপরই দলের ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড়ান পাওয়া নির্ভর করছিল। ২য় দিনের খেলার পর ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তখন আরও ৯৯ রাণ দরকার ছিল। খেলার ৩য় বা শেষ দিনে কেম্ব্রিজ দলের ২য় ইনিংস ২৮৫ রাণে শেষ হয়ে যায়। ব্রিয়ারলী দলের পক্ষে কেবল সর্বোচ্চ ৮৯ রাণই করেন নি—তাঁর এই ৮৯ রাণই এ পর্যন্ত আলোচ্য অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের বিপক্ষে সর্বোচ্চ রাণ দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় ছাত্র ন্যাটা খেলোয়াড় এন রেড্ডীর ২২ এবং ৪৩ রাণও উল্লেখযোগ্য।

ইংল্যাণ্ড সফররত অস্ট্রেলিয়ান দলের ৭ জন খেলোয়াড় এ পর্যন্ত ৮টা সেঞ্চুরী করেছেন। এ'দের মধ্যে ন্যাটা খেলোয়াড় বিল লরী করেছেন ২টো। পক্ষান্তরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের কোন দলের খেলোয়াড়ই সেঞ্চুরী করতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ান দলের বিপক্ষে সর্বোচ্চ ৮৯ রাণ করার কৃতিত্বলাভ করেছেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ বছর বয়সের ন্যাটা খেলোয়াড় উইকেটরক্ষক জে এম ব্রিয়ারলী।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ পর্যন্ত যাঁরা সেঞ্চুরী রাণ করেছেন : ইয়র্কশায়ার দলের বিপক্ষে নর্মাণ ও'নীল ১০০ নট-আউট; ল্যাঙ্কাশায়ার দলের বিপক্ষে নীলহার্ভে ১২০ এবং পিটার বার্জ ১০১ নট আউট; সারে দলের বিপক্ষে বিল লরী ১৬৫ (এপর্যন্ত সর্বোচ্চ রাণ) এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিপক্ষে ম্যাকডোনাল্ড ১০০, লরী ১০০, বুথ ১১৩ এবং ম্যাকে ১০৬ নট-আউট।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

৪র্থ খেলা : ম্যাঞ্চেস্টার, মে ১০-১২ই। অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে জয়ী।

ল্যাঙ্কাসায়ার : ৩১০ (৭ উইকেটে ডিক্লে:) ও ২০৪।

অস্ট্রেলিয়া : ৪০২ (৮ উইকেটে ডিক্লে:) ও ১১৪ (৬ উইকেটে)।

৫ম খেলা : ওভাল, ১৩ই, ১৫ই ও ১৬ই। অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জয়ী।

অস্ট্রেলিয়া : ৩৪১ (৭ উইকেটে ডিক্লে:) ও ৩৮ (উইকেট না পড়ে)।

সারে : ১৬১ ও ২১৪।

৬ষ্ঠ খেলা : কেম্ব্রিজ, মে ১৭—১৯শে। অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জয়ী।

অস্ট্রেলিয়া : ৪৪৯ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় : ২৩০ ও ২৮৫।

নিউজিল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় হকি দল

নিউজিল্যাণ্ড সফরের উদ্দেশ্যে গঠিত ইণ্ডিয়ান ওয়াণ্ডারার্স হকি দল গত ১৯শে মে শুক্রবার বিমানযোগে দমদম বিমান ঘাঁটি থেকে নিউজিল্যাণ্ড যাত্রা করেছে। এই হকি দলে আছেন ১৬ জন খেলোয়াড়। বাংলা দেশ থেকে মাত্র গুরুবক্স সিং দলভুক্ত হয়েছেন। দলের অধিনায়কের পদ লাভ করেছেন প্রখ্যাত অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় উধম সিং (পাঞ্জাব)। দলের মোট ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে পাঞ্জাবের ৮ জন, সার্ভিসেস দলের ৩, দিল্লী ২ এবং বাংলা, উত্তর প্রদেশ এবং মাদ্রাজের একজন ক'রে খেলোয়াড় নিয়ে দলটি গঠিত। ভারতীয় হকি দলটি 'নিউজিল্যাণ্ডে তিনটি টেস্ট খেলা নিয়ে মোট

২৯টি খেলায় যোগদান করবে। এই সফরের ব্যবস্থাপনা করেছে পাঞ্জাব ফারমার্স স্পোর্টস এসোসিয়েশন।

কলকাতার ফুটবল লীগ

কলকাতার মাঠে আই এফ এ পরিচালিত বিভিন্ন বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম বিভাগের লীগ খেলার আকর্ষণ সব থেকে বেশী। এ আকর্ষণ শুধু ক'লকাতার অধিবাসীদের নয় কিম্বা যারা পশ্চিম বাংলার নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের প্রবাসী বাঙ্গালীদেরও। শুধু তা বলি কেন, অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদেরও। প্রথম বিভাগের কয়েকটি বড় বড় ক্লাবে বিভিন্ন রাজ্যের ফুটবল খেলোয়াড়রা যোগদান করায় ক'লকাতার ফুটবল খেলার আকর্ষণ পশ্চিম বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে গেছে। প্রথম বিভাগের ফুটবল খেলায় বাংলার বহিরাগত খেলোয়াড়দের যোগদান যেমন নতুন ঘটনা নয়, অনেক দিনের পুরনো ইতিহাস।

ভারতীয় ফুটবল খেলার প্রাণকেন্দ্র এই ক'লকাতা সহর ফুটবল মরসুমের আগমনে পুনরায় সজাগ হয়ে উঠেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলা গত ১০ই মে থেকে আরম্ভ হলেও এখনও খেলার উত্তেজনা তেমন দানা বাঁধেনি। তবে যে কয়েকটা খেলা হয়েছে তার মধ্যে দু'একটায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল—নাটকীয়ভবে খেলা শেষও হয়েছে।

গত চোদ্দ দিনে (১০ই মে থেকে ২০শে মে) প্রথম বিভাগের লীগে ২৩টা খেলা হয়েছে; ১৭টা খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ড্র গেছে ৭টা খেলা। 'হ্যাট-ট্রিক' করেছেন মাত্র একজন খেলোয়াড়—অলিম্পিক ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক পি কে ব্যানার্জি (ইস্টার্ণ রেলওয়ে) খিদিরপুরের বিপক্ষে লীগের উদ্বোধনী খেলায়।

গত বছরের প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান এবং রণার্স-আপ মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলার আলোচনা প্রথমে করা যাক।

মোহনবাগান এ পর্যন্ত ৩টে ম্যাচ খেলে একটা পয়েন্ট নষ্ট করেছে, জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে। লীগের প্রথম খেলায় মোহনবাগান তাদের এক সময়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হাওড়া ইউনিয়নকে ৩—০ গোলে সহজেই হারিয়ে দেয়। পুলিশের বিপক্ষে দ্বিতীয় খেলায় ৩—১ গোলে জয়ী হলেও এ জয়লাভ সহজসাধ্য হয়নি। মোহনবাগানের এ জয়লাভ রীতিমত এক নাটকীয় ব্যাপার এই কারণে যে, গত কয়েক বছরে ক'লকাতার মাঠে এইভাবে কোন খেলার সমাপ্তি ঘটেনি। দল হিসাবে পুলিশ মোহনবাগানের থেকে অনেক দুর্বল। পর পর দুটো খেলায় তারা হেরে যায়। মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের তৃতীয় খেলায় পুলিশ প্রথমার্ধের খেলার ১২ মিনিটে প্রথম গোল দেয়; এর পর মোহনবাগান গোল পরিশোধ দেওয়ার একাধিক সুযোগ নষ্ট করে; কিন্তু খেলার শেষ তিন মিনিটে তিনটে গোল দিয়ে মোহনবাগান ৩—১ গোলে জয়ী হয়। গোল শোধ দিতে দীর্ঘ সময় এবং সহজ সুযোগগুলি বিফল যাওয়াতে স্বভাবতই দর্শকেরা খেলার শেষ তিন মিনিটের উপর আগে থেকে কোন গুরুত্বই দেননি। খেলার শেষ তিন মিনিটে এইভাবে তিনটে গোল দেওয়া এক অভাবনীয় ব্যাপার; বিশেষ করে যখন কোন শক্তিশালী দল দুর্বল দলের কাছে গোলের ব্যবধানে পিছনে পড়ে থাকে এবং গোল করার একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করে। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত শক্তিশালী দল দৈহিক শক্তি এবং মনের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে খেলার শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এই খেলাতে মোহনবাগান যেমন মনের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তেমনি তাদের গোল না করতে পারার অক্ষমতাও প্রকাশ পেয়েছে। শুধু দুর্ভাগ্যের কথা তুলে দায়িত্ব লাঘব করা যায় না। মোহনবাগান দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে জর্জ টেলিগ্রাফের বিপক্ষে তাদের তৃতীয় খেলায়। খেলাটি ড্র হওয়ার জন্যে জর্জ টেলিগ্রাফ দলের কৃতিত্ব খুব বেশী ছিল না; মোহনবাগান দল গোল করার সহজ সুযোগগুলি নষ্ট করাতে খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি।

গত বছরের রাণার্স-আপ মহমেডান স্পোর্টিং এ পর্যন্ত ২টো খেলে একটা পয়েন্ট নষ্ট করেছে। তারা খিদিরপুরের সঙ্গে খেলা ড্র করে। প্রথম খেলায় তারা কোন রকমে ২—১ গোলে ইণ্টারন্যাশনালকে হারায়। তাদের দ্বিতীয় খেলায় খিদিরপুর প্রথম গোল দেয় দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ১৬ মিনিটে। খেলা ভাঙ্গার দু'মিনিট আগে মহমেডান দল গোলটি শোধ দেয়।

গত বছরের লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

এ পর্যন্ত তিনটে খেলেছে এবং পুরো পয়েণ্টই পেয়েছে। প্রথম খেলায় পুলিশকে মাত্র ১—০ গোলে, দ্বিতীয় খেলায় বি এন আর দলকে ১—০ গোলে এবং তৃতীয় খেলায় ওয়াড়ী দলকে শোচনীয়ভাবে ৪—০ গোলে হারিয়েছে। বি এন রেলওয়ে দলের বিপক্ষে ইষ্টবেঙ্গল দলের রাইট আউট সমজুদার নিজের চেষ্টায় যে দর্শনীয় গোলটি দেন ইদানীংকালের খেলায় তা একটি দুর্লভ বস্তু।

ইষ্টার্ণ রেলওয়ে চারটি খেলায় একটা পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। জর্জ টেলিগ্রাফ দলের বিপক্ষে তাদের তৃতীয় খেলাটা গোলশূন্যভাবে ড্র যায়।

লীগের খেলা শেষ হতে এখনও অনেক দেরী; সুতরাং লীগ চ্যাম্পিয়নসীপের পূর্বাভাস দেওয়ার উপযুক্ত সময় এখনও হয়নি। তবে এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়, গত বছরের লীগের তালিকায় ওপর দিকে যে চারটি দল স্থান দখল করেছিল তাদের হটিয়ে দিয়ে অন্য কোন দলের পক্ষে লীগ চ্যাম্পিয়নসীপের খেতাব লাভ করা সম্ভব হবে না

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

১৯শে মে তারিখে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের এক সভায় প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক হয়েছে; শেষে বিষয়টি ভোটে দেওয়া হয় এবং ভোটের ফলাফল অনুযায়ী ইন্টবেঙ্গল এবং কাষ্টমস দলকে যুগ্মভাবে ১৯৬১ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। লীগ সাব-কমিটি কর্তৃক চ্যাম্পিয়ানসীপ বাতিল করার পূর্ব সিদ্ধান্তটি শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকে না।

ইউরোপ সফরে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়বৃন্দ

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান, নরেশকুমার, প্রেমজিৎ লাল, জয়দীপ মুখার্জি এবং আখতার আলি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ইউরোপ সফর করছেন। সকলেই বিশ্ব বিখ্যাত উইম্বলডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন।

পশ্চিম জার্মাণীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতার সিংগলস এবং ডাবলস ফাইনালে ভারতীয় এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান জয়লাভ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সিংগলস ফাইনালে কৃষ্ণান ৬-১, ৩-৬, ২-৬, ৬-৩, ৬-১ গেমে উলফ গ্যাং স্টাককে (পশ্চিম জার্মাণী) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে কৃষ্ণান এবং বৃটেনের এ্যালেন উইলসন ৬-২, ৬-২, ৬-৩ গেমে পশ্চিম জার্মাণীর উলফ-গ্যাংস্টাক এবং মার্টিন মুলিগানকে পরাজিত করেন।

প্যারিসের ফ্রেঞ্চ লন টেনিস চ্যাম্পিয়নসীপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন এই তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড়—২নং ভারতীয় খেলোয়াড় প্রেমজিৎ লাল, জয়দীপ মুখার্জি এবং আখতার আলী।

প্রথম রাউণ্ডের খেলায় বৃটেনের ৪নং খেলোয়াড় মিকি স্যাংস্টার ৬-৪, ১২-১০, ৬-৩ গেমে ভারতীয় ২নং খেলোয়াড় প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করেন। এই খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হতে ২ ঘন্টা ২০ মিনিট সময় লাগে। ১ম রাউণ্ডের অপর এক খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের মার্ক ওটওয়ে ৪-৬, ৬-০, ৬-৩, ৬-২ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে হারিয়ে দেন। আখতার আলী পরাজিত হন অষ্ট্রেলিয়ার রড লেভারের কাছে ২য় রাউণ্ডে।

পুরুষদের ডাবলসের ৩য় রাউণ্ডে উঠেছেন প্রেমজিৎলাল এবং জয়দীপ মুখার্জির জুটী। ডাবলসে আখতার আলীর জুটি প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে।

পশ্চিম বার্লিনের অপর এক আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতায় এক নম্বর ভারতীয় খেলোয়াড় এবং প্রতিযোগিতায় ২নং বাছাই খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান সেমি-ফাইনালে উঠেছেন। নরেশকুমার ১ম রাউণ্ডের খেলাতেই হেরে যান। রমানাথন কৃষ্ণান এবং নরেশকুমারের জুটি পুরুষদের ডাবলস খেলার সেমি-ফাইনালে উঠেছেন।

মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

ভূপালে মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা শেষ পর্যায়ে এসে গেছে।

এক দিকের সেমি-ফাইনালে মাদ্রাজ ৪-১ গোলে উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী মহীশূরের দল ২—০ গোলে গত বছরের রাণার্স-আপ মহারাষ্ট্রকে হারিয়েছে।

টাইগার পাতৌদির সাফল্য

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক ভারতীয় ছাত্র টাইগার পাতৌদি ইংল্যাণ্ডের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন। তিনি এ পর্যন্ত ৮টি ইনিংস খেলেছেন; ফলাফল দাঁড়িয়েছে নট আউট ২ বার, মোট রাণ ৫২৩, তাঁর সর্বোচ্চ রাণ ১৪৪ এবং এভারেজ ৮৭·১৬।

মিডলসেক্স দলের বিপক্ষে তিনি তাঁর এই সর্বোচ্চ ১৪৪ রাণ করেন। তাছাড়া উপর্যুপরি তিনটি ইনিংসে সেঞ্চুরী রাণ করার কৃতিত্ব লাভও করেন। ইংল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব প্রখ্যাত টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় নবাব পাতৌদির পুত্র এই টাইগার পাতৌদি।

২১।৫।৬১

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও [illegible] আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা ঃ ৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা মূল্য—৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 2nd June, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

দুর্গাপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ায় নিশ্চয়ই আমরা গৌরবান্বিত, কিন্তু এই অধিবেশন থেকে বাঙ্গালী কি পেয়েছে? প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস বাংলাদেশের উত্তপ্ত মনোভূমির উপরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ক্ষণকালের জন্যও অন্তত আবেগতপ্ত বঙ্গদেশের হাওয়া তাঁদের অধিবেশন কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করেছিল এবং ডাঃ রায় এই মর্মবেদনার কয়েকটি প্রশ্ন তাঁদের সম্মুখে রেখেছিলেন? কিন্তু বঙ্গদেশের জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শেষ বাণী কি রেখে গেছেন?

রাজনৈতিক আপ্তবাক্য এবং মৌখিক স্তুতির কথা বলছি না, সেই স্তুতি নেহরুজী দুর্গাপুর অধিবেশন থেকে বর্ষণ করেছেন—বঙ্গভাষা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু, তার ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই, বাঙ্গালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য, আসামকে সে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করবে ইত্যাদি। কিন্তু এই বালখিল্য প্রবোধ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কেউ প্রার্থনা করেনি। বাংলাদেশ যথেষ্ট বর্ষীয়ান, সুতরাং এই বালখিল্য প্রবোধে বঙ্গদেশ কোনো সান্ত্বনা পাবে না। যদি বাংলার আজিকার প্রশ্ন শুধু নিজের স্বার্থের প্রশ্ন হত, শুধু গোষ্ঠীস্বার্থের রক্ষার জন্যই এ-আই-সি-সি'র কাছে যদি আমরা প্রার্থীর মতো দাঁড়াতাম এবং আসামে কোনো অন্যায্য অধিকার চাইতাম, এই প্রবোধ এবং প্রচ্ছন্ন তিরস্কার হয়ত আমাদের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু সে দাবী আমরা তুলতে যাইনি।

আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, স্বার্থচেতনায় কোনোদিন এই বাঙ্গালী জাতির মর্মস্থল এবং আবেগ আলোড়িত হয়নি। অতীতেও নয়, আজও নয়। অতীতে যেদিন ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষকাল— সেদিন এক শতাব্দী পূর্বে বাঙ্গালী প্রথম সর্বভারতীয় ঐক্যের মূর্তি কল্পনা আরম্ভ করেছিল। ক্ষুদ্র আঞ্চলিক স্বার্থের বিরুদ্ধে বহু শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষে এই প্রথম জাতীয়তার চেতনা, এই প্রথম ঐক্যের অভিযান। সেই চেতনার বশে স্বদেশী আন্দোলন থেকে পার্টিশানের রক্তমোক্ষণ পর্যন্ত বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে যা দিয়েছে, আর কোনো প্রদেশ তা দিতে পারেনি—জাতীয়তার মানসপটভূমি এবং ইনটেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড এই গাঙ্গেয় বঙ্গভূমির দান। কিন্তু তার চেয়েও বেশী আমরা দিয়েছি। ভারতবর্ষের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পার্টিশানের রক্তপদ্মা আমরা পার হয়েছি এবং আজ বিখণ্ডিত বিধ্বস্ত বঙ্গদেশের অশ্রু ও হতাশার মধ্যে আমরা পরিত্যক্ত। কাজেই যখন দেখি নিখিল ভারত কংগ্রেস থেকে নাবালক জাতীয়তাবাদীরা আমাদের প্রতি স্বার্থত্যাগের এবং জাতীয় চেতনার উপদেশ বর্ষণ করছেন, তখন নাবালকের ঔদ্ধত্যে ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা ঘটে। এবং সমস্ত পুরাতন বেদনা ক্ষতমুখ ছিঁড়ে বেরোতে চায়।

এই উপদেশ এবং স্কুল-পাঠ্য স্বদেশীয়ানা কাদের জন্য? এ কি ভীরুতার নামান্তর নয়? আসামে জাতীয় চেতনাকে বাঁচাবার [illegible] কংগ্রেসের এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের বৃহত্তম স্বার্থত্যাগ ও সৎসাহসের প্রয়োজন ছিল। সেই স্বার্থত্যাগে এঁরা ভীরু, এঁরা সঙ্কুচিত এবং দুর্বল। কাজেই জাতীয়তার উপরে যেখানে বর্বর অত্যাচার ঘটছে, যেখানে সংবিধান পদদলিত, সেখানে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী সমস্ত দলই নীরব। তাঁদের শাসনের দম্ভ সেখানে উত্তোলিত নয়। সেখানে আঞ্চলিকতার সঙ্গে তাঁদের তোষণের নীতি—ভেদবুদ্ধির সঙ্গে তাঁদের নির্লজ্জ আপোষ। কিন্তু বাংলাদেশ-এর বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়েছিল—এই তোষণ এবং নির্লজ্জ আপোষের বিরুদ্ধে। কারণ এ-আই-সি-সি'র দূরদৃষ্টি যদি প্রখর হত তাঁরা দেখতে পেতেন, এই তোষণ ভারতবর্ষের ঐক্যকে বিধ্বস্ত করে আনছে। কেন্দ্রের শক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে আস্থা ইতিপূর্বেই দুর্বল হয়েছে, কিন্তু আসাম সেই আস্থাকে আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। এভাবে গণতন্ত্র টিঁকতে পারে না, এভাবে ৪০ কোটি বহু ভাষী, বহু ধর্ম সংস্কৃতি মতাবলম্বী মানুষ 'এক জাতি এক প্রাণ একতায়' পৌঁছুতে পারে না। এ হচ্ছে গণতন্ত্রের আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত। এ হচ্ছে আইনের রাজত্বের বিনাশের সূচনা। গত এক শতাব্দীর সমস্ত স্বপ্ন ও আদর্শের এ হচ্ছে আসন্ন করুণ বিসর্জনের ধ্বনি।

কিন্তু নেহরুজী এই সর্বনাশের ইঙ্গিত গ্রহণ করেননি। নতুবা তিনি এই সমস্যার অতি সরলীকরণের দ্বারা এ-আই-সি-সি'র সদস্যদের বোঝাতে চাইতেন না যে, এই বিরোধ হচ্ছে আসাম বনাম বাংলার বিরোধ। তিনি যদি বুঝতেন যে, আসলে এই বিরোধ গণতন্ত্রের সঙ্গে বর্বরতার, এই বিরোধ সংবিধান বনাম সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের তাহলে উপদেশ বাক্যেই তাঁর বিবৃতি শেষ হত না। দৃঢ় শাসন এবং কর্মনীতির অভাব দুর্গাপুরে অধিবেশন থেকে পাওয়া যেত। কিন্তু নেহরুজী তার পরিবর্তে বলেছেন যে, এই বিরোধগুলি শুধু আলোচনার দ্বারাই মীমাংসা করা চলে, শাসনের দ্বারা নয়। কারণ কেন্দ্রীয় শাসন প্রয়োগ করতে গেলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ণ হবে। বলা-বাহুল্য যে, এই যুক্তির অসারতা যেমনি হাস্যকর এবং তেমনি বেদনাদায়ক! স্বায়ত্তশাসনের নামে নেহরুজী আসামের সাম্প্রদায়িক পীড়নকে ক্ষমা করতে চাইছেন? যে পীড়নের অভিযানে ৩৬ হাজার ভারতীয় প্রজার গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে এবং অর্ধ লক্ষ নর-নারী উদ্বাস্তু হয়েছেন, অত্যাচার ও হত্যার ভয়ে মানুষকে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হয়েছে? ইচ্ছা হয়, প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি—স্বায়ত্তশাসনের অর্থ কি এই যে, সংবিধানের সমস্ত মৌলিক ধারাগুলি লঙ্ঘিত হবে এবং কেন্দ্রের উপদেশ অপমানিত হবে? সংখ্যালঘুর জীবনের এবং নাগরিকত্বের কোনো মর্যাদা থাকবে না? ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনীতির আর কোন্ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ সম্বন্ধে এমন স্পর্শকাতরতা দেখিয়েছেন? রাজ্য সরকারগুলির বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী আজকাল দিল্লীতে নির্ধারিত হয়, কোনো বৃহৎ শিল্প বা ব্যবসায় সৃষ্টি হতে পারে না দিল্লীর অনুমোদন ছাড়া, মোট রাজস্বের শতকরা বোধহয় ৩০ ভাগও রাজ্যের নিজস্ব কর্তৃত্ব নয়, প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশ ছাড়া এক পা চলার উপায় নেই, স্কুলের পাঠ্য-তালিকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ মঞ্জুরী পর্যন্ত সমস্ত বিষয় যেখানে কোন না কোন কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দেশে চালিত হচ্ছে, সেখানে নেহরুজী স্বায়ত্তশাসনের মহিমা শুধু বজায় রাখতে চান দুর্বৃত্তের লাঠি-বাজির, অধিকারের দ্বারা অথবা প্রাদেশিক রাজনীতির কুৎসিত অধঃপতনের মধ্যে? যদি তাই হয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের এই ভণ্ডামী আমরা চাই না, এর অবসান হোক। বরং দৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ,কেন্দ্রীয় শাসন এবং অখণ্ড জাতীয়তার জন্য এই অদ্ভুত স্বায়ত্তশাসনের বলিদান বহুগুণ শ্রেয়। কারণ তাতে ভারতবর্ষ রক্ষা পাবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার থেকে ভারতীয় প্রজার জীবন নিরাপদ হবে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের জন্য দুর্গাপুরে অধিবেশন যে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে, সে সান্ত্বনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ বাঙ্গালীর প্রতিভা এবং বুদ্ধিবৃত্তি যদি বিনষ্ট না হয় ভাষার এই অমর ঐতিহ্য কেউ কেড়ে নিতে পারে না—সাহিত্য রাষ্ট্র দরবারের স্তুতি কিংবা পৃষ্ঠপোষণার অপেক্ষা রাখে না। অথবা দুঃশাসনেও সে নিহত নয়। কিন্তু এই সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ যে জাতীয় চেতনা ভারতবর্ষকে শতাব্দীকাল ধরে দিয়ে এসেছে, যে চেতনা আজ ভারত রাষ্ট্রের এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে, সেই চেতনাকে কে রক্ষা করবে আসন্ন দুর্দিনে পথভ্রষ্ট নেতৃত্বের হাত থেকে?

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
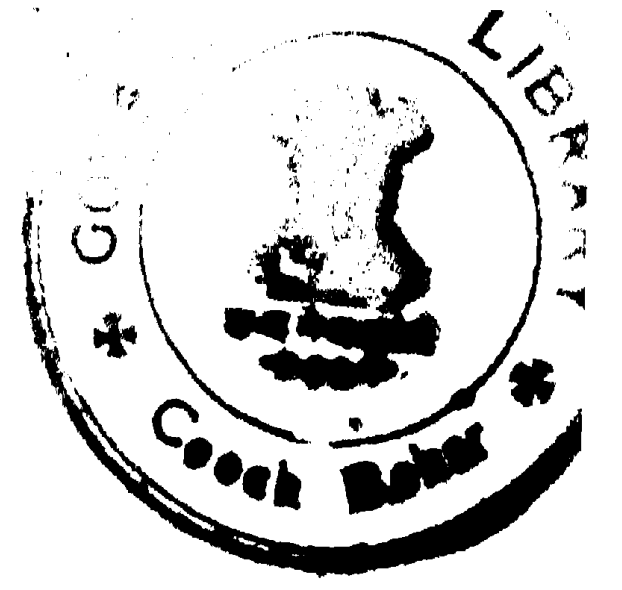
১৩।৫।৫৭

এক বছর কাটল। কেমনভাবে ঠিক জানি না। এই না-জানার মধ্যে বুদ্ধির অংশ নেই। তার অতিরিক্ত কি আছে, তাও জানি না। ভগবদ্‌বিশ্বাস এখনও জন্মাল না। অনালোকের পক্ষে ব্যাপারটা বিশ্বাসেরই অন্তর্গত মনে হয়। মা ঠাকুমা অভ্যাস তৈরী করেন। তার না হয়, বিপদে পড়ে বিশ্বাস জন্মায়। আমার মনে এমন কোন বিশ্বাস তৈরী হয়নি; মা ঠাকুমা, বাবা-কাকা কিছুই শেখাননি। এবং বিপদ? সেটা মৃত্যুজনিত বিপর্যয়ের মধ্যেও এমন কোন ভীতিপ্রদ আশংকা উপস্থিত হয় নি, যার দরুণ ভগবানের প্রতি প্রত্যয় সৃষ্ট হবে। বোধ হয়, বিপদ আরো ঘনালে। হয়ত নিজের থেকে সহজে, অনায়াসে উত্তীর্ণ হব। এ সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ নেই।

সাধারণতঃ হিন্দুদের মধ্যে দেব-দেবীতে বিশ্বাস আছে, কিন্তু ভগবানের উপর বিশ্বাস নেই বললেই চলে। আর যদি থাকে ত নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক, 'এবস্ট্রাক্ট' ধরনের। ভগবান হোন রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির মাধ্যমে। পরে এক হয়ে যায়, যেমন গান্ধীজীর বেলায়। অন্য ক্ষেত্রে ততটা নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রথমে উপনিষদের ব্রহ্ম, পরে মানুষে পরিণতি। দুটোর মধ্যে মিল পাই না। আমাদের বেলা ঐ দেব-দেবী পর্যন্ত।

১৬।৫ (পুনশ্চঃ)

মনোবিকলনের মতে ধর্মের আদিতে ভয়, পরে পাপবোধ। হিন্দুদের ও-সব বালাই নেই। আমার মনে অন্ততঃ পাপ-জ্ঞান নেই। কখনও পাপী হয়েছি বলে মনে পড়ে না। অন্যায় করেছি নিশ্চয়ই, কিন্তু সে জন্য পাপী কখনও হইনি। না অন্যায় করলে, হোত নিশ্চয়। কিন্তু অন্যায় করেছি ভেবে নিজেকে পাপী ভাবিনি। মনোভাব আমার নিতান্ত নর্মাল।

পাপবোধ না থাকার দরুণ সংস্কৃত সাহিত্য নিরঙ্কুশ হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতে, সাহিত্যে, নাটকে সমস্যা আছে নিশ্চয়। কিন্তু য়ুরোপীয়ান সাহিত্যে সমস্যার আদিতে পাপবোধ যেন জমাট-বাঁধা। এক হিসেবে আমাদের সমস্যার যেন ধার নেই। যতটুকু আছে, ততটুকু সমাজজ্ঞান এবং সেটুকুই হোল ধর্ম। তার অতিরিক্ত যেটা, সেটা আমাদের নয়। তার নাম 'evil' এবং তারই কারসাজি। আমাদের ধাতে evil নেই। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নিয়তির সঙ্গে বিরোধ ছিল। এবং সেটাও এক রকমের 'evil', 'enmenides'-এর বিপক্ষে। কিন্তু নিয়তির বিপক্ষেও বিরোধ না থাকার দরুণ ভারতে ট্র্যাজেডি খুলল না, এবং আমার মনেও জমল না। বোধ হয়, সেই জন্য জীবদ্দশায় বিশেষ কোন ভয় পাই না। মৃত্যুতে 'মিসট্রি' আছে, ভয় নেই। অদ্ভুত হিন্দু সংস্কার!

২০।৫।৫৭

খৃষ্টান-দর্শনে essence আর existence-এর বিরোধ খুব জটিল। সেটা প্রায় হাজার বছর চলেছিল। মধ্যে সরে গিয়েছিল, এখন টোমিস্টরা এবং একসিজট্যানসিয়ালিস্টরা চালাচ্ছেন। কোনটা পূর্বের, কোনটা পরের? আমার ধারণা—সত্ত্বাই প্রধান, যদিও process-টা, ক্রিয়াশীলতা, এতে অটকায়। স্বভাব হোল বুদ্ধিসম্মত নিদান, সত্তা তাই থেকে জন্মায়। আমি আছি, এই আমার প্রথম জ্ঞাতব্য, প্রথম ভবিতব্য, তারই ফলে বিমূর্ত-প্রত্যয়। যদি স্বভাবকে প্রধান, প্রথম ও একান্ত ভাবতাম, তাহলে নতুন সৃজন সম্ভব হোত না। যা ছিল তারই প্রকাশ হোত, তারই সম্ভাব্যতা থাকত, তাইতেই শেষ হোত।

নতুন কিছু হয় কি না? এইখানেই process-এ বিশ্বাসী হতে হয়। কখনও কখনও একেবারে নতুন দেখা যাচ্ছে।

Essence (সত্ত্বা) আর existence (স্বভাব) ছাড়া অন্য প্রত্যয়, process, (চলন্ত ক্রিয়াশীলতা) রয়েছে। এমন কি process ছাড়া অন্য কিছু নেই মনে হয়। যাকে Constant (সনাতন) বলি, সেটাও চিরন্তন নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে কিছু নেই। স্থায়ীর মধ্যেই গতিশীলতা রয়েছে।

অর্থাৎ essence আর existence-এর বিরোধ এ যুগের নয়। এ-যুগের সমস্যা process-এর।

২১।৫।৫৭

আমার ধারণা যুদ্ধের সময় আণবিক বোমা চলবে না, কারণ তাতে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ গেল-গেল ভাবটা দেখাতে হবে। এই হোল brinkmanship। সেই সঙ্গে শান্তি-মূলক আণবিক চেষ্টাও চলছে, ও চলবে। কোনটা বেশী চলছে? যেন মনে হয় যুদ্ধের দিকটা দ্রুতভাবেই এগচ্ছে। যুদ্ধ চালাবার জন্য যে খরচপাতি হচ্ছে তাই দেখে মনে হচ্ছে যে, লোকসানের ভাগটা অত্যন্ত বেশী। খরচ না থাকলে অবশ্য সবটাই লাভ হোত। অথচ যুদ্ধ না থাকলে শান্তি আসত না। যুদ্ধ আর শান্তি—এ-দুটির উদ্ধত সম্বন্ধ। আর্থিক আর সামরিক ব্যাখ্যার কোনটিকে ত্যাগ করা যাচ্ছে না। উনবিংশ শতাব্দীর সুবর্ণ-সুযোগে আর্থিক ব্যাখ্যার জয় হোল, আমরা অত্যন্ত র‍্যাশনাল হোলাম। এ যুগে আমরা ইর‍্যাশনাল হয়েছি, তাই সামরিক ব্যাখ্যা প্রধান মনে হচ্ছে। সকলে যদি সোশিয়ালিস্ট হয়ে যায় তবে সামরিক ব্যাখ্যা আপনা থেকেই উঠে যাবে। ইতিমধ্যে তাই চলবে, এবং তারই ফলে, অনেক দিন, বহু দিন

পারে, বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি আণবিক বোমার অপেক্ষা কার্যকরী হবে। যদি না ইতিমধ্যে আমরা উন্মাদ হয়ে যাই!

৬।৭।৫৭

আজকাল মনে হয় যে, মনের ভেতর থেকে কথা উঠছে। আমার কথা? খানিকটা তাই, খানিকটা নয়। এক এক সময় কথা অস্পষ্ট। অ-রূপ, চেষ্টা করলে রূপ ফোটে। তখনও রূপ যায় বদলে। যা মনে ছিল সেটা হোল 'মনে এলো'। কথার সাহায্যে রূপ? বাক্য বিনা অর্থ? কখনও কখনও বাক্যহীন, রূপহীন শব্দ মনে ওঠে। শব্দও নয়, অমনই, অনাহত। বেশীর ভাগ লোকের তাই হয় নিশ্চয়। কথাই পরে আসে। ভেতর থেকে জন্মালেই সাবজেক্টিভ হয়ে ওঠে না। সাবজেক্টিভ-অবজেক্টিভ কথাগুলির মানে নেই। একই সত্যের ভিন্ন দিক। আমার কিন্তু মনে হয় সত্য এক, দিক অনেক। ভিন্ন ভিন্ন সত্যের অস্তিত্বে অসম্পূর্ণতা থাকে; অস্তিত্ব হোল পূর্ণ।

২১।৮।৫৭

General Education সম্বন্ধে আরম্ভ হচ্ছে। সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক (humanities) এইভাবে ভাগ করা হোল। ভাগের পর কিভাবে জোড়া দেওয়া হবে? এতে সমস্যার সমাধান হয় না।

একটা গোড়ার কথা: প্রথম জীবনে প্রাথমিক সমস্যা থেকে ওঠাই ভাল। তার সমস্যা তার পর, তার আগে নয়। ধরা যাক সর্বপ্রথমে ছাত্র তার বাবা-কাকাদের গুড়ের ব্যবসায়ে জন্মেছে। ব্যবসার খানিকটা সে জেনে নিলে। তারপর গুড় থেকে আখ, আখ থেকে জমি, ক্ষেত-খামার, তারও পর উদ্ভিদ-বিদ্যা—এই রাস্তায় চলল। চলতে চলতে জ্ঞান বৃদ্ধি হোল। পরে ধারণা ও প্রত্যয় জন্মাবে। এই উপায়ে জ্ঞান বাস্তব হয়, নচেৎ জ্ঞান হয় প্রত্যয়, প্রত্যয় হয় শুকনো।

এই ধরণের কথা জনকয়েক কর্মীদের বললাম, কিন্তু কেউ শুনলে না। আমার আগ্রহ গেল কমে। মৌলিক শিক্ষা দেশে জমছে না কেন? আমাদের শিক্ষার দোষ হোল প্রত্যয়বাদ, সে-শিক্ষার গোড়া থেকে শেষ অবধি প্রত্যয়। বাস্তব, জীবনযোগ থেকে প্রত্যয় আসবে, তা না হয়ে উল্টো। এই জীবন-সংযোগ, life-orientation-এর ভিত্তি সামাজিক, তার অভাবে আমাদের শিক্ষা নিতান্ত অ-সামাজিক হয়ে গেছে! General Education নিয়ে কি হবে! সবই থিওরি! আর না হয়, নিছক তথ্য, General ইনফরমেশ্যন!

২।৯।৫৭

ভারতবর্ষের মহামানবদের জীবনী-লেখা আজও অসম্পূর্ণ ব্যাপার। উত্তরাধিকারসূত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। [illegible] জীবনীতে বাপ-মা সম্বন্ধে দু-চারটি কথা থাকে। বিদেশে কিন্তু অন্য রকম। সেখানে তিন পুরুষ তো থাকেই, তার বেশী পর্যন্ত উদ্ধৃত হয়। অথচ এ-দেশে কুলজী-সাহিত্য রয়েছে অনেক দিন থেকে; সেখানে কিন্তু বংশ-পরিচয় ও শ্রাদ্ধ-পরম্পরা আছে। কিন্তু পিতা-মাতার কীর্তি-কলাপের খবর নেই। গোষ্ঠীর পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু তার ব্যক্তি-পরিচয় নেই। গান্ধীজীর বাবা, রবীন্দ্রনাথের মা—এঁদের কোনো হিসেব নেই; অথচ তাঁরা ছিলেন। সংসারের চোখে তাঁরা ছিলেন সাধারণ, কিন্তু সাধারণ জীবনের কি কোন ইতিহাস নেই? তোমরা, ছোট বাবা নিয়ে কি অ-সাধারণ জীবন চলে না?

২০।১।৫৮

বহু পূর্বে 'মনোবিজ্ঞান' নাম দিয়ে 'বিচিত্রা'য় একটা গল্প লিখি। অমিয় চক্রবর্তী—আমার বহু পুরানো বন্ধু [illegible] চাঁদা ফেরৎ দিলেন। [illegible] ফ্রয়েডের বিপক্ষে, ভাবলেন [illegible]। ফ্রয়েড নিয়ে লিখেছি এবং লেখাটি পছন্দ হয়নি, এখনও হয় না। অমিয়র সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রইল। এখন আশ্চর্য লাগে, তার এত রাগ কেন হয়েছিল! এটাই কি 'রিয়্যাকশন' [illegible]? চল্লিশ সালের ঘটনা আমার মনে হঠাৎ এলো কেন? আঘাত পেয়েছিলাম বলে?

২১।১।৫৮

একটা ছোট গল্পের প্লট মনে এলো। এক বিধবা মায়ের চার মেয়ে। তিনটির বিবাহ হয়েছে, সুবিধের নয়, ছোটটির হয়নি। অনেক দিন হয়ে গেল তবু বিয়ে হচ্ছে না, অনেক চেষ্টা করেও হচ্ছে না। কারণ কি? মা চেষ্টা করেও নিষ্ফল হয়েছেন। মায়ের অসুখ করে, প্রত্যেকবারই অসুখ করে। গল্প এইটুকু। এই থেকে আরম্ভ: শেষে মেয়েটিকে মা একদিন খেতে দেবেন। কোথাও পড়েছি কি?

দু-রেখা [illegible]; একটা সোজা অন্যটি বাঁকা। এই ধরণের লেখা ভাল লাগে। শরৎচন্দ্রের 'সতী'।

২২।১।৫৮

বই পড়ার স্বভাব বদলেছে। খুব অল্প বয়সে বই গিলতাম। তারপর পড়তাম, ভালো না লাগলে ছেড়েও পরে পড়তাম ও বুঝতাম, সঙ্গে সঙ্গে। সেটা বীরেনের সাথে, সতীশ চাড়ুয্যে ও প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাদে। কখনও বা পড়ার চেয়ে বেশী বুঝেছি, এই সময় বই লিখি। কিন্তু পড়াশুনো বেশী, লেখার চেয়ে বেশী পড়েছি। যা লেখা হয়নি, তার সম্বন্ধেই বেশী। সেগুলো কি হোল? সব ভুলে গেলাম? তা অবশ্য হয় না, কিছু থেকেই যায়। তথ্য নয় নিশ্চয়। নাম, তারিখ, ঘটনা থাকে অথবা না। নিশ্চয় তারিখ ভুলে যাই, প্রায় সব। কিন্তু একটা পলি পড়ে থাকে সন্দেহ নেই। বুদ্ধির উন্নতি অনেকটা হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধির শেষে একটা কিছু থেকেই যায়। কথাটা সামান্য, কিন্তু সামান্যই মনে থাকে। অল্প-বয়সে সাহিত্যের পড়াশুনা, বৈজ্ঞানিক দর্শন, রাষ্ট্র দর্শন, ভাবের দর্শন, ইতিহাস, সৌন্দর্য-তত্ত্ব, সব কিছুই পড়লাম, যদিও সেই প্রতীক-কল্পনার। প্রতীক সম্বন্ধে আরও একাধিক বই পড়লাম, কিছু চিন্তাও করেছি; কাসিরারের রচনায় মনোবিজ্ঞান নিশ্চয়ই পেয়েছি। কিন্তু মেটাফরটি যেটা, সেটা সামান্য। অসামান্য নয়, সামান্য। পূর্ববর্তী প্রতীক-কল্পনার যুক্তিধারা নিশ্চয়ই বদলেছে। তৎসত্ত্বেও, এই বয়সের পর, নতুন শিল্পী চিন্তার সাক্ষাৎ পেলাম না, মনে হয়। সমাজটা গড়ে ওঠে যুগের পর, একজনের লড়াই নয়। ব্যাপারটা যেন সর্বসাধারণের; তাদেরই হাতে ভাঙে-গড়ে, ওঠে-নামে।

তবু বলি, ক্যাসিরারের মতন জনকয়েকের লেখা আবার পড়তে ইচ্ছে হয়। চাহিদা আমার মিটল না।

২৩।১।৫৮

কবিতায় সুর বসান উচিত? ইয়েট্‌স বলতেন, নয়। তাঁর ছন্দ অপূর্ব, কিন্তু পিচ্ ছিল না। কবির ভাবকে গানে অনুবাদ করা বৃথা—ইয়েট্‌সের মতে।

অর্থাৎ, কবিতার ছন্দকে সংগীতের ছন্দে পরিণত করা অন্যায়।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় সুরে বসান চলে। রবীন্দ্রনাথের গানে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য দুটি মুহূর্ত আছে: এক, কবিতা ও সঙ্গীতের অংগাংগী মিলন। আর দ্বিতীয়,—কখনও কবিতা প্রথম, পরে সুর: আবার কখনও সুর প্রথম, কবিতা পরে। একটি মুহূর্তের অংগাংগী মিলন নিতান্ত কম, আমি রবীন্দ্রনাথে তা পেয়েছি। বেশীর ভাগ সময়ে কবিতা প্রথম পরে সুর। পরে সুর আসা সময়-সাপেক্ষ। প্রথমে সুর আসবার সময় একটা গুনগুনোনি ওঠে। অ-জানিত অবস্থা থেকে ওঠে মনে হয়, কিন্তু জানিত সুর থেকেই আসে। হিন্দুস্থানী সংগীতে জানিত সুরই বেশী, যদিও রবীন্দ্রনাথের বেলা খানিকটা নতুন। গুনগুনোনির ওপর জারিজুরী। কোন্ শব্দ, কোন্ ছায়া, কোন্ ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে, দেখতে হয়। রেডিওতে খুব কমই ধরা পড়ে। হিন্দী ও উর্দু কবিদের আড্ডায় আরও কম। সুর ও কথা যখন এক হয়, তখনই লাগডাট।

ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বে কবিতাই সংগীত। কবিতায় সৌন্দর্যতত্ত্বের ছড়াছড়ি। সংগীতে তা নেই, অন্ততঃ আমার জানিত নেই। এক অবশ্য 'সহৃদয়হৃদয়বেত্তা' রয়েছেন। সর্বত্রই রসিক বিদগ্ধজনের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু সংগীতরসিক নেই বললেই চলে। সংগীত শাস্ত্রের শাস্ত্রাংশ ছেড়ে দিলে, রসের দিক থেকে যেন কিছুই থাকে না। অবশ্য শুদ্ধ সংগীতে কাব্যরস নেই, কিন্তু অর্থসংগীতে থাকতে বাধ্য। সেটা নিয়েই বা কতটুকু কাজ করা হল?

২৯।১।৫৮

মন নেওয়া-দেওয়া চলে না: হয় নেওয়া, না হয় দেওয়া: তাও আবার নেওয়াই হয়, দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। স্বার্থপর? বোধ হয় তাই। নিজস্ব-বস্তু একটা থাকা চাই। সামাজিক লেন-দেন সমান-সমান নয়: একজন অন্যের চেয়ে বেশী; সেই বেশীটাই স্বার্থপর।

৩০।১।৫৮

এ বছর শীত এলো না দেখছি। আলিগড়ের নুমায়েস-এর সময় বৃষ্টি পড়বেই পড়বে, শুনতে পাই। এবার কি হয় দেখা যাক! সারা বছর এই ক'দিনের নুমায়েস-এর জন্য আলিগড়ের লোক অপেক্ষা করে। ছেলে-মেয়েদের কি স্ফূর্তি! দলে দলে লোকজন চলেছে! বেশ লাগে। পাড়াগাঁয়ের ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই কেনে, বড় লোকেরা দিল্লী-লক্ষ্ণৌ থেকেই জিনিসপত্র আনে। শহরে শ্রেণী বিভাগ রয়েছে, কিন্তু উগ্র নয়। মুসলমানদের ভেতর শ্রেণী বিভাগ অপেক্ষাকৃত কম মনে হয়। সামাজিক ডিমক্রাসি মুসলমানদের ভেতর একটু যেন বেশী। খাওয়া-পরা যেন এক। আমার ড্রাইভার ব্রাহ্মণ, অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু আমার মুসলমান বাবুর্চি'র সঙ্গে এক কোঠায় থাকে, ভিন্ন ঘরে। পৃথক হয়েও মিল, মিল হয়েও পৃথক নয়। এখন তা তাই দেখলাম। অনেক আগে এই ছিল; গত পঞ্চাশ বছরে অন্য হয়েছে।

* * *

মধ্যে ডাঃ ব্যানার্জির বাড়ি যাই। বিস্তর রেকর্ড আর বিস্তর ফণীমনসা দেখলাম। অদ্ভুত লাগল! পুরোনো রেকর্ডের মধ্যে গহরজানের গান শুনলাম, ঠিক তেমনটি আর জমল না। কত রকমের ফণীমনসা? একজন বল্লেন, ভারতবর্ষে নাকি অত Cactus-এর সংকলন আর কারও নেই। একটা অদ্ভুত বড় ফুল দেখলাম, সাদা ফুল। আমার লক্ষ্ণৌ-এর বাগানে প্রায় পঁচিশ বছর পর ফুটেছিল। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে এলো, অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথের গান শুনলাম। নোটেশন থেকে সুর তোলা হয়েছে।

লজ্জা আসে কেন? সহজ নয় বলে? আজকাল মিশতে পারি না, আগে পারতাম, অত্যন্ত সহজে। ফর্স্টার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ চান; পান না বলে, না পারেন না বলে? বয়সের সঙ্গে সহজভাব কমে যায়।

(ক্রমশঃ)

কবিতা
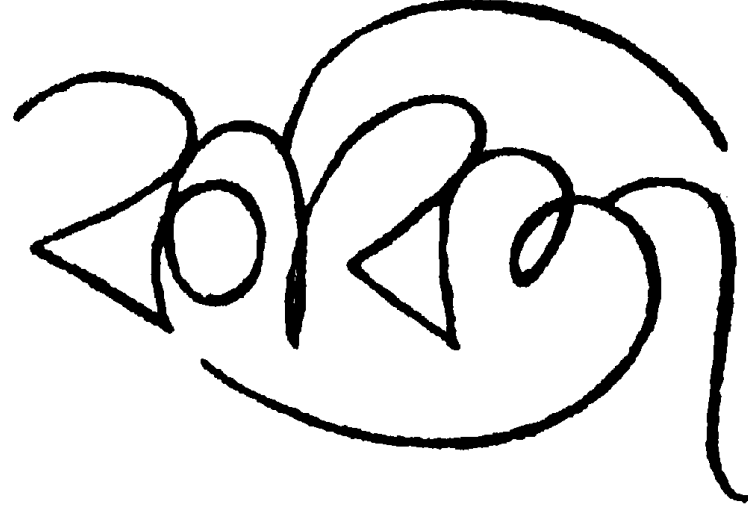
প্রণাম

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যাঁর মা[illegible] মূর্ত হল মানুষের অমৃত পিপাসা
তাঁহারে প্রণাম!
প্রাণের নিগূঢ় ছন্দ যাঁর কণ্ঠে পেল নিজ ভাষা,
তাঁহারে প্রণাম!
যাঁর চোখে হেরিলাম এ নিখিল সব মধুময়,
তাঁহারে প্রণাম!
যাঁর সৃষ্টিলোক হ'তে তরঙ্গিত নিয়ত বিস্ময়
তাঁহারে প্রণাম!
ভূমার খেয়ালে যাঁর এক হ'ল নিকট ও দূরে
তাঁহারে প্রণাম!
বাণী যাঁর বজ্রগর্ভ তবু বন-মর্মর-মধুরে
তাঁহারে প্রণাম!

*

অরণ্যকাল

দক্ষিণারঞ্জন বসু

প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে সূর্যালোকপাতে
যে উচ্ছল প্রসন্নতার প্রকাশ,
তোমার সুখ-স্পর্শের আনন্দ-আকুলতায়
তেমনি প্রসন্নতা আহরণই
আমার প্রতিক্ষণের প্রত্যাশা।
পাইনের পাতায় পাতায় আর
চেস্টনাটের পুষ্পগুচ্ছের সবুজে শাদায়
এবং নাম-না-জানা ঘাসফুলের
হলুদ-নীল হাসির স্বচ্ছতায়
আমায় পবিত্র পূর্ণতায় স্নান করিয়ে দাও!
ইচ্ছে হয় আমি পাহাড়ের মতো
উঁচু হয়ে দাঁড়াই,
তাহলে যদি তোমার মুখোমুখি
হবার সুযোগ মেলে!
তুমি যে অনেক বড়ো, অনেক বৃহৎ!
ক্ষুদ্রতার খণ্ড সীমায় সেই বিরাটকে
সেই পরমকে অনুভব করাও যে কঠিন।
কিংবা সাগরের মতো ব্যাপক উদারতায়
এবং গভীর অতলতায় যদি বিছিয়ে দিতে
এবং তলিয়ে দিতে পারি নিজেকে
তাহলেও কি তোমার সম্পূর্ণতাকে
আস্বাদন করা সম্ভব?

আজ আর চাঁদে যাওয়ায়
তেমন কোনো বাধা নেই;
তোমার সন্ধানে যে কোনো
গ্রহ-উপগ্রহে ঘুরে আসাও
আজ আর মোটেই কোনো
নির্বোধ কল্পনা নয়।
কিন্তু আপাতত সে সবের কোনোটার কথাই
ভাববার অবকাশ নেই,
এখন আমি মহামহিমান্বিত এই
কৃষ্ণ-অরণ্যেই—বাদেন বাদেন বা
তারই আশেপাশে তোমার আনন্দ-জ্যোতিকে
আবিষ্কার করে বেড়াবো,
শুধুমাত্র সেই জ্যোতির আলোকরশ্মিকে
আলিংগন করে ধন্য হবার প্রত্যাশায়।

ট্যাক্সো

বিমল মিত্র
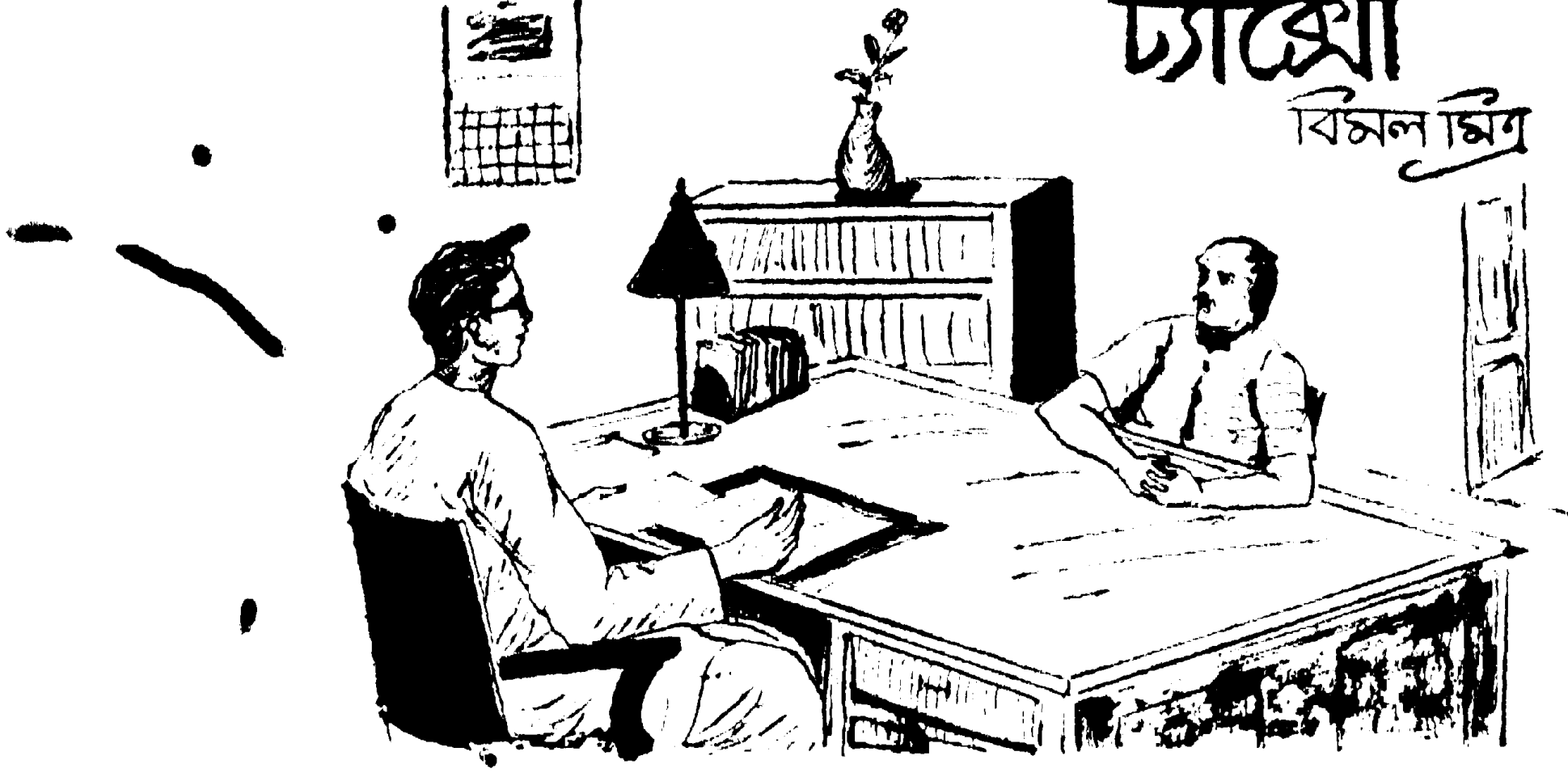
সকলের শেষে বদ্রীদাস আগর-ওয়ালার ডাক পড়লো। হাকিম-সাহেব তাকেও ডেকে পাঠালেন।

বদ্রীদাস আগরওয়ালা কারবারী লোক। বাজারের রাস্তার পুব-কোণে বদ্রীদাসজীর কারবার। মস্ত বড় গুদাম। গুদামের ভেতরে টন্ টন্ ছোলা, তিসি, গম, চাল, সরষের বস্তা সাজানো। ওয়াগন থেকে রেলের সাইডিং-এ মাল আন্‌লোড্ করে তার গুদামে এসে গাদা হয়। তারপর মাল গুণে হিসেব নিকেশ করে, গুদাম ঘরের দরজায় তালা-চাবি বন্ধ করে, চাবিটা কোমরের ঘুন্‌সিতে ঝুলিয়ে দেয়। তখন হাসি বেরোয় বদ্রীদাস আগরওয়ালার মুখে।

অকারণ হাসি দেখে কেউ কেউ অবাক হয়। বলে—কী শেঠজী, হাসছেন কেন হঠাৎ?

বদ্রীদাসজী বলে—শালা ব্যাওসার বারোটা বাজিয়ে গেল—

—কেন? বারোটা বাজলো কেন শেঠজী?

বদ্রীদাসজী আসলে প্রাণখোলা লোক। বলে—বারোটা বাজবে না তো কি ছ'টা বাজবে মোশয়? শালা ট্যাক্সো দিতে দিতে জান্ নিক্‌লে গেলে ব্যাওসা কী-রকম চলবে? শালা রেলের বাবুরা ট্যাক্সো নেবে, গাড়ির গাড়োয়ান ট্যাক্সো নেবে, কুলি-মজদুর ভি ট্যাক্সো নেবে! এত ট্যাক্সো নিলে বারোটা বাজবে না?

সত্যিই প্রাণখোলা মানুষ বদ্রীদাস আগরওয়ালা। মুখে কিছু আট্‌কায় না বটে, কিন্তু কথাগুলো খাঁটি।

নিজেই বলে—আমি খাঁটি বলবো মোশয়, আমার মুখে বিলকুল খাঁটি কথা শুনবেন—

তা বটে। এই জেলায় আরো ব্যবসাদার আছে, আরো কারবারী আছে। বদ্রীদাসজী তাদের মত নয়। বাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে রুস্তমজীর পেট্রল ডিপো আছে, বোস কোম্পানীর অয়েল মিল আছে, হনুমান পোদ্দারজীর রাইস মিল আছে, মনোহর সিং-এর মোটর ওয়ার্কশপ আছে। হরেক রকমের কারবার ছড়ানো আছে সারা শহরে। কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয় বছরে। কিন্তু কেউ বদ্রীদাসজীর মত খাঁটি কথা বলে না। এক-একজন বছরে বছরে নতুন-নতুন গাড়ি কিনছে আর পরের বছরেই গাড়ি বদলাচ্ছে। এক-একজনের নতুন-নতুন বাড়ি হচ্ছে—হাল ফ্যাশানের কন্‌ক্রীটের বাড়ি। ড্যাম্প-প্রুফ, এয়ার-রেড-প্রুফ, আর্থকোয়েক-প্রুফ বাড়ি সব। বোস কোম্পানীর প্রাণকৃষ্ণ বসুর বাড়িটা তো এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড করা হয়েছে অতি সম্প্রতি। প্রাণকৃষ্ণ বসুর মেয়ের বিয়েতে ফ্রান্স থেকে ডিনার-সেট কিনে আনা হলো বরকে দেবার জন্যে।

সেই প্রাণকৃষ্ণবাবুই কথায় কথায় বলেন—না মশাই, এবার বিজ্‌নেস্ গুটিয়ে ফেলতে হবে—কিছু প্রফিট থাকে না আজকাল—

হনুমান পোদ্দারজীর ছ'মাস ধরেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। বিকেল-বেলার দিকে হাই ওঠে, ঘি খেলে অম্বল হয়। শেষকালে তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে এলেন। আর সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যখন একবার খরচপত্র করে যাওয়া, তখন কাছাকাছি দেশ-গুলোও দেখে আসতে হয়। সুতরাং লণ্ডন, নিউইয়র্ক, রোম, বার্লিন, প্যারিস—কিছুই আর বাদ দিতে পারেননি,

এখন আবার দেশে ফিরে এসে সব খাচ্ছেন আর হজম করছেন।

কিন্তু তাঁরও মুখে ভার। বলেন—না স্যার, গভর্ণমেন্টের জ্বালায় আর ব্যবসা করা দেখছি হয়ে উঠবে না। আর রুস্তমজী? রুস্তমজী এই সেদিন পেট্রল ডিপোটা খুললেন। পাঁচ বছরও হয়নি। এরই মধ্যে একটা ফরেস্ট কিনে ফেলেছেন সি-পি'তে। দরকার হলেই প্লেনে করে যান সেখানে, আর পরদিনই ফিরে আসেন। বলেন—ট্যাক্স দিতে দিতেই গেলাম মশাই। এরা দেখছি আর ভদ্রলোকদের বিজনেস্ করতে দেবে না—

এই যুদ্ধের আগেও এ শহরের চেহারা এমন ছিল না। বাজারের আশে-পাশে ছিল শুধু খানকয়েক টিনের চালা।

বৃটিশ আমলে টাকায় আট সের দুধ বেচেছে গয়লারা। মাছ ছিল পাঁচসিকে সের। চালের দর তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় চড়েছিল বটে, কিন্তু আবার নেমে এসেছিল। কিন্তু তারপর থেকেই ভোল্ পাল্টে গেল শহরের। মনোহর সিং এসে মোটর ওয়ার্কশপ খুললো। রুস্তমজী পেট্রোল ডিপো খুললো। বোস কোম্পানীর অয়েল মিল চালু হলো। হনুমান পোদ্দারজীর রাইস্ মিলও চললো।

কিন্তু বদ্রীদাস, যে বদ্রীদাস সেই বদ্রীদাস অগ্রবালই রয়ে গেল।

বদ্রীদাসের সেই খাটো নুন-ময়লা ধুতি, সেই চুলভর্তি খালি গা, সেই টিনের গুদাম ঘর।

বদ্রীদাস সব দেখে চোখ মেলে আর বলে—শালা কত বাড়বি বাড়, আমি সকলকে একচোট দেখে নেব—! শালা কারবারের বারোটাই বাজুকে আর একটাই বাজুকে, আমি সকলকে দেখে নেব এক-চোট—

বদ্রীদাসের ছোট কাঠের ক্যাশ-বাক্সটা সামনে থাকে, আর চাবির গোছাটা থাকে কোমরের ঘুন্‌সিতে। আর কিছুর দরকার নেই। বদ্রীদাসের কংক্রীটের এয়ার-কণ্ডিশনড বাড়িও দরকার হয় না, হাল-মডেলের গাড়িও দরকার হয় না। বদ্রীদাসের মেয়ের বিয়েতে ক্লাব থেকে বরের জন্যে ডিনার-সেটও আনতে হয় না। বদ্রীদাস ঘি খেয়েও হজম করতে পারে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা করাতেও হয় না। অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ করে রিক্সায় চড়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে ডাল-রোটি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

তা এই বদ্রীদাসের একদিন ডাক পড়লো। ডাক পড়লো সকলের শেষে। হাকিম-সাহেব বদ্রীদাসজীকেও ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে।

হাকিম-সাহেবের বাঙলোর সামনে একটা বেঞ্চিতে বসে ছিল বদ্রীদাস আগরওয়ালা। সেদিন বদ্রীদাস গায়ে পিরান চড়িয়েছে, পায়ে চটি গলিয়েছে, ধুতিটা কুঁচি করে পরেছে। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে অনেকবার গণেশজীকে নমস্কার করেছে।

—জয় বাবা গণেশজীউ, জয় বাবা সিদ্ধিনাথজীউ—

তারপর যেখানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস করেছে—আচ্ছা, হাকিম-সাহেব আমাকে বোলিয়েছে কেন বলুন তো?

কে জানে কেন ডেকেছে হাকিম-সাহেব। কেউই বলতে পারেনি। কার এত মাথা ব্যথা। হাকিম-সাহেবের আর্দালীকেও জিজ্ঞেস করেছে বদ্রীদাস—আচ্ছা ভেইয়া, হাকিম-সাহেব আমাকে তলব্ দিয়েছে কেন?

আর্দালী মুখ নিচু করে বলেছে—চাঁদা—

—চাঁদা?

বদ্রীদাস আগরওয়ালা ভয়ে দশ হাত পেছিয়ে এসেছে শুনে। চাঁদা! কিসের চাঁদা হে। জোর করে ভয় দেখিয়ে হাকিম-সাহেব ট্যাক্সো আদায় করে নেবে নাকি!

আবার বদ্রীদাস আর্দালীকে জিজ্ঞেস করলে—ট্যাক্সো?

আর্দালী বললে—না শেঠজী, চাঁদা—

তবু ভয় গেল না বদ্রীদাসজীর মন থেকে। যার নাম চাঁদা তার নামই তো ট্যাক্সো। ট্যাক্সো দিতে দিতেই তো জান নিক্‌লে গেল। রেলের বাবুদের ট্যাক্সো, গাড়ির গাড়োয়ানদের ট্যাক্সো, কুলি-মজদুরদের ভি ট্যাক্সো—ট্যাক্সোর কি হিসেব-কিতাব আছে? ইংরেজ জমানাতে ট্যাক্সো ছিল, কিন্তু সে এমন নয়। আজকাল যেন ট্যাক্সো বেড়েছে, কথায়-কথায় ট্যাক্সো, উঠতে-বসতে ট্যাক্সো।

খানিক পরেই ডাক পড়লো ভেতরে। বদ্রীদাসজী উঠলো। উঠে ইষ্ট-দেবতাকে একবার স্মরণ করে নিল ঊর্ধনেত্র হয়ে। তারপর বললে—চলিয়ে আর্দালী-সাহাব, চলিয়ে—

বিরাট বৈঠকখানা। হাকিম-সাহেবের খাস-কামরা। প্রথমে ঘরে ঢুকে হাকিম-সাহেবকে দেখাই গেল না। এতবড় একটা টেবিল। টেবিলের এক কোণে বসেছিলেন তিনি।

বললেন—এসো বদ্রীদাসজী, এই-দিকে এসো—

এতক্ষণে হাকিম-সাহেবের হদিস পেয়ে বদ্রীদাসজী মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করলে। বললে—গুড্ মর্ণিং স্যার—

—এসো, এসো, এইখানে বোস।

বদ্রীদাসজী অতি সন্তর্পণে গিয়ে বসলো একটা ছোট চেয়ারে।

হাকিম-সাহেব বললেন—ওটাতে কেন, এদিকে এই গদি-আঁটা বড় চেয়ারটায় বোস না—

বদ্রীদাসজী বিনয়ে নম্র হয়ে বললে—আমি ছোট আদমী, আমি এখানেই বসি হুজুর—

—না না, তুমি ছোট আদমী কে বললে? তুমি এত বড় একজন হোলসেল্ মার্চেণ্ট এখানকার।

বদ্রীদাস বললে—না হুজুর, আমি তো হুজুরের কাছে ছোট সওদাগর আছি। আজকাল কত বড় বড় সওদাগর এসেছে এখানে, হনুমান পোদ্দারজী আছেন, রুস্তমজী আছেন, মনোহর সিংজী আছেন, বোস কোম্পানী আছে—আমি তাদের কাছে কি হুজুর?

হাকিম-সাহেব বললেন—তারা অবশ্য বড়ই, কিন্তু তুমিও ছোট নও বদ্রী-দাসজী! আমি শুনেছি সব—

—কী শুনেছেন হুজুর?

—শুনেছি তোমার অনেক বড় কারবার, রাইসের হোলসেল্ মার্চেণ্ট, গম, ডাল, তিষি, সরষে, গ্রাউণ্ড-নাটেরও হোলসেল্ মার্চেণ্ট তুমি!

বদ্রীদাস বললে—হুজুর সবই ঠিক বাত্ আছে!

হাকিম-সাহেব বললেন—কিন্তু আমি তোমাকে অন্য কথা বলতে ডেকেছি

বাড়ীবাড়ি বদ্রীদাসজী, পাঁচ হাজার টাকা তোমার কাছে কিছু না—

—না হুজুর, আজকাল ট্যাক্সো দিতে দিতে কারবারের বারোটা বেজে গেছে হুজুর, আমি মারা যাবো ... বে-ফিকির মারা যাবো, কিছু কম্‌তি করিয়ে দিন হুজুর—

হাকিম-সাহেব তবু গলবার পাত্র নন। বললেন—আমি তো তোমাকে কম্‌তি করেই ধরেছি বদ্রীদাসজী, আর সকলের অনেক বেশি-বেশি ধরেছি, তোমার বেলায় কম করেই পাঁচ হাজার টাকা ধরেছি—

—পাঁচ হাজার রুপেয়া কেমন করে দেব হুজুর? আমি বে-ফিকির মারা যাবো। আপনি তার চেয়ে আমার গলাটা কাটিয়ে লেন্ হুজুর—

হাকিম-সাহেব বললেন—আঃ, তুমি দেখছি হাসালে বদ্রীদাসজী! লোকে শুনলে বলবে কী বলো তো! পাঁচ হাজার টাকা দিতে তুমি মরে যাবে, এ কেউ বিশ্বাস করবে?

—না হুজুর, আমার কথা বিশোয়াস করুন, আমি একদম মারা যাবো, আমি বে-ফিকির মারা যাবো, আপনি বিশোয়াস করুন—

হাকিম-সাহেব এবার আরো কাগজ-পত্র বার করলেন। বললেন—তবে দেখ, এই লিস্টটা পড়ে দেখ—বলে লিস্টটা বদ্রীদাসজীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

বদ্রীদাসজী বললে—এ দেখে আমি কী করবো হুজুর, আমি কী লিখি-পড়ি জানি?

—তবে শোন, আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি—

বলে হাকিম-সাহেব লিস্টটা নিজেই পড়ে শোনাতে লাগলেন। বললেন—হনুমান পোদ্দার—দশ হাজার টাকা এবং ইঁট কাঠ সিমেণ্ট লোহা—। সি-পি-রুস্তমজী—পনেরো হাজার টাকা। প্রাণকৃষ্ণ বসু—দশ হাজার। মনোহর সিং—আট হাজার। জমিদার—এন চৌধুরী পদ্মশ্রী—পাঁচ হাজার টাকা এবং দু'বিঘা জমি। বদ্রীদাস আগরওয়ালা—পাঁচ হাজার।

তারপর বদ্রীদাসজীর দিকে চেয়ে হাকিম-সাহেব বললেন—দেখলে তো বদ্রীদাসজী, তোমার কত কম চাঁদা ধরেছি—

বদ্রীদাসজী কিছু কথা বললে না।

হাকিম-সাহেব আবার বলতে লাগলেন—সকলের কত বেশি-বেশি ধরেছি আর তোমার কত কম চাঁদা ধরেছি—দেখলে তো?

বদ্রীদাসজী এবার মাথা তুললো। বললে—না হুজুর, আমি পাঁচ হাজার দেব না—

—কেন? পাঁচ হাজার কি তোমার পক্ষে বেশি হলো?

—আজ্ঞে না হুজুর, তা নয়, আমি বিশ হাজার দেব! আপনি লিখে লিন্, আমি কাল এসে আপনাকে বিশ হাজার টাকা ট্যাক্সো দিয়ে যাবো—

হাকিম সাহেব অবাক হয়ে গেলেন বদ্রীদাসজীর মুখের চেহারা দেখে। বদ্রীদাসের মুখের চেহারা বড় কঠিন হয়ে উঠেছে।

—আপনি লিখে লিন্ হুজুর। আপনি লিখে লিন্।

হাকিম-সাহেব বললেন— কেন বদ্রীদাসজী, তোমাকে তো আমি বিশ হাজার দিতে বলিনি, তুমি ওদের থেকে ছোট কারবারী, তোমাকে পাঁচ হাজারের বেশি দিতে হবে না—পাঁচ হাজার দিলেই আমাদের চলে যাবে—

বদ্রীদাস বললে—না হুজুর, আপনি লিখে লিন্ আমার নামে বিশ হাজার—

—কেন বদ্রীদাসজী? তুমি অত রেগে যাচ্ছো কেন?

বদ্রীদাসজী বললে—না হুজুর, রাগের কথা বলিনি, আমি বিশ হাজারই দেব। যত ট্যাক্সো চাইবে সরকার, তত দেব। যত চাইবে—

—কিন্তু তুমি ভুল করছো বদ্রীদাসজী, রবীন্দ্র-সেণ্টিনারি তো সরকারী ব্যাপার নয়, এ তো এখানকার কমিটির ব্যাপার, আমি কমিটির চেয়ার-ম্যান হিসেবে বলছি—

বদ্রীদাসজী তবু নাছোড়বান্দা। বললে—রবীন্দরনাথের নাম আমি জানি না হুজুর, রবীন্দরনাথের দোঁহা ভি আমি পড়িনি, আমি আপনাকে দিচ্ছি, আপনিই আমার সরকার—আপনি যত ট্যাক্সো চাইবেন, তত ট্যাক্সো দেব—আপনি লিখে লিন্—

সেদিন গদীতে ফিরে এসে বদ্রীদাসজীর আর খাওয়া হলো না, বিশ্রাম হলো না। মুনিম, মুহুরী, যত কর্মচারী আছে সকলকে ডাকলে। চাল, ডাল, গম, সরষে, তিষি সব জিনিসের হিসেব হতে লাগলো। অনেক রাত পর্যন্ত খাতা-পত্র নিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগলো গদীবাড়ির ভেতরে। বদ্রীদাসজী নিজে লেখা-পড়া জানে না। কিন্তু লেখা-পড়া হিসেব-পত্র করবার জন্যে লোক-জন আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব মালের দর-দস্তুর যাচাই হলো। কিছু মাল সরিয়ে রাখা হলো আলাদা করে, কিছু মাল সামনে। সেদিন সমস্ত রাত ধরে সমস্ত গদীবাড়ি ওলোট্-পালোট্ হয়ে গেল একেবারে।

বদ্রীদাসজী জিজ্ঞেস করলো—বোস্ কোম্পানীর গদীর কী খবর মুনিম্?

মুনিম বললে—ওদের ভি মাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে হুজুর—

—আর হনুমান পোদ্দারজী?

—ওদের ভি!

তারপর রাত যখন দুটো তখন সবাই ছুটি পেলে। সেই রাত দুটোর সময় বদ্রীদাসজী গদী থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল।

পরের সপ্তাহে 'রাঢ়-সমাচার' পত্রিকার স্থানীয় সংবাদ-স্তম্ভে একটি খবর প্রকাশিত হলো। খবরটি এই ঃ

সম্প্রতি এই জেলার কয়েকটি গ্রামে বন্যার ফলে স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত অর্থকষ্টে দিন-যাপন করিতেছেন। নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য হঠাৎ চড়িয়া গিয়াছে। চাল, ডাল, তেল, সরিষা, গম, তিষি, চিনা-বাদাম প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যাদির দর যে-হারে বাড়িয়াছে তাহাতে এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। জেলার হাকিম-সাহেব এই অগ্নি-মূল্য নিবারণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই নিজে ইহার সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন বলিয়া আমাদের প্রতিনিধিকে আশ্বাস দেন।
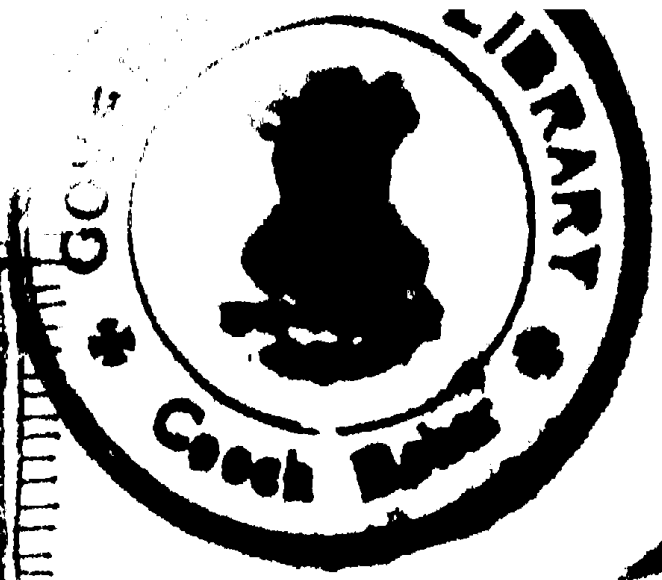
শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দ—কাব্য না উপলব্ধি

॥ চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ॥

ভক্তি ও ভাবমূলক কাব্য ও কবিতার বিশেষত্ব এই, উহার রচনার মূলে একটা অপ্রাকৃত প্রেরণা দেখা যায়। কবির সৃষ্টি হৃদয়ের ও অনুভূতির এমন একটা স্তর হইতে ওঠে যাহার গভীরতা সাধারণ বিচারে পরিমাপ করা যায় না। যিনি রচনা করেন তিনি উহা উপলব্ধি করেন এবং মর্মগ্রাহী হইয়া যাঁহারা সেই রচনা পাঠ ও অনুশীলন করেন তাঁহারাও হয়তো উপলব্ধি বা অনুভব করিতে পারেন। কবির সৃষ্টির মূলে এই যে প্রেরণা থাকে ইহা সাধারণ মানব-বুদ্ধির ও সাধারণ অনুভূতির অতীত বলিয়াই ইহাকে বলা হয় দৈব প্রেরণা, ভগবৎ—প্রেরণা, অথবা ঐরূপ অপর কোন আখ্যা দেওয়া হয়।

ভক্তিমূলক কবিতা ও কাব্যের এই যে পরিচয়, ইহা শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জয়দেবের এই অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি যাঁহারা পাঠ ও আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইহা অনুভব করিয়াছেন। কবির ভাবময় রচনা পড়িতে পড়িতে যে রচয়িতা পূর্বোল্লিখিত প্রেরণার স্তরকে ছাড়াইয়া আরও ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন। চিরসুন্দরের আত্মবিলাসের যে চিত্র তিনি দিয়াছেন তাহা ভাবের রঙে এমন উজ্জ্বল এবং মাধুর্যঘন রসাবেশে তাহা এমন নিবিড় যে স্পষ্টই মনে হয় ইহা কেবলমাত্র কল্পনার সৃষ্টি হইতে পারে না। সাধক কবি আপনার ইষ্টদেবতার লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে দেখিতেই যেন এই অপূর্ব রসাশ্রিত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সমগ্রভাবে গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে ইহা সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও উহার একটি বিশেষ অংশ সম্বন্ধে ইহা সমধিক সত্য বলিয়া মনে হয়। সে অংশটি হইল শ্রীরাধার মান-ভঞ্জনের বর্ণনা, কাব্যের দশম সর্গের প্রথমে সুপ্রখ্যাত ও সুপ্রচলিত গীত পদাবলী যাহার প্রারম্ভ—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্"

এই গীতের পদগুলি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। সুরে, ভাবে এবং রসের আবেদনে এই গীত পদটির মধ্যে সমগ্র কাব্য যেন চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। মানের উৎকট অবস্থায় শ্রীমতী যখন প্রিয়জনের প্রতি কঠোর, প্রণতের প্রতি উদাসীন, অনুরক্তের প্রতি বিরক্ত এবং উন্মুখের প্রতি বিমুখ, সেই অবস্থায় নন্দনন্দন-নায়কের আর্তি ও বেদনা এই গীতপদের ছন্দে ও সুরে অপরূপ রূপ লাভ করিয়াছে। এখানে প্রকাশ এমন সুস্পষ্ট যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহা কবির রচনার বা কল্পনার সৃষ্টি নহে। কবিকে ভাবিয়া লিখিতে হয় নাই, প্রত্যক্ষে দেখিয়া ও শুনিয়া লিখিয়াছেন; যেমন দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, ঠিক ঠিক তেমনি লিখিয়াছেন। রাধানাথের শ্রীমুখের উক্তিগুলি তিনি সদ্য সদ্য শুনিয়া অক্ষরে বসাইয়াছেন। সকলে ইহা বিশ্বাস করিবে কিনা জানি না। সকলের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগাইতে পারিব কিনা তাহাও জানি না। কিন্তু আমার নিজের এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। গীতগোবিন্দ যতবার পড়িয়াছি, "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" এই পদটি যতবার আবৃত্তি করিয়াছি এই একটি কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে হইয়াছে প্রত্যক্ষে না দেখিলে ও না শুনিলে এমন করিয়া লেখা যায় না। মনে হইয়াছে ভক্তকবি ও তাঁহার লীলা-সঙ্গিনী পদ্মাবতীকে অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা যুগলে আপনাদের

নিত্যলীলা তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকটিত করিয়াছেন। এখানে শ্রীল বৃন্দাবনদাসের উক্তিই যথার্থ হইয়াছে—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে শ্যামরায়
কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

সংসারে সেইরূপে মহাভাগ্যবান যদি কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তিনি যে কবি জয়দেব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" এই গীত পদটিকে গীতগোবিন্দের সার বলা যাইতে পারে। কাব্যের সমগ্র রস হৃদয়ের সমগ্রভাব এবং অনুভূতির সম্পূর্ণ নিবিড়তা এই পদটির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবতঃ সেই জন্যই ইহার এমন সর্বজনীন আবেদন এমন হৃদয়-গ্রাহিত্ব ও এমন সর্বব্যাপী প্রচার। গীত-গোবিন্দের আর কিছু কাহারও জানা থাকুক আর নাই থাকুক, 'বদসি যদি...' পদটি প্রায় সর্বত্র সুবিদিত।

বস্তুতঃ গীতগোবিন্দের যে গৌরব তাহা এই "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" পদ। ইহা দেবতার নিজের উক্তি, জয়দেবের রচনা বলিয়া খ্যাতমাত্র। বেদের মন্ত্র যেমন ঋষি কবির নিকট ইহাও তেমনি ভক্ত কবির নিকটে আপনি প্রকাশিত। ইহাকে কাব্যের সার বলিয়াছি কিন্তু তাহাই সমস্ত নহে; ইহার মধ্যেই আরাধনার ও সাধনার সার তত্ত্ব নিহিত আছে, সেকথা পরে বলিতেছি। গীত পদটি কবি যে শুনিয়া লিখিয়াছেন সে স্বীকৃতি পদের শেষেই রহিয়াছে:—

"ইতি চটুল-চাটু-পটু চারুমুরবৈরিণো
রাধিকামধি বচনজাতম্।
জয়তি পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব-কবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্।।"

কবি বলিতেছেন যে রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া মুরারী যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাই কবির ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই বিশেষত্ব ছাড়া পদটির আরও একটি গৌরব আছে, যাহা গীত-গোবিন্দকে একটা অসাধারণ গৌরব দিয়াছে—এমন গৌরব দিয়াছে যে গৌরব পৃথিবীর অপর কোনো গ্রন্থের বা অপর কোনো সাহিত্যের নাই।—এই গীত পদের মধ্যেই আছে—"দেহি পদপল্লব-মুদারম" চরণ যাহা কেবল দেবতার উক্তি নহে, যাহা দেব-লেখনীপ্রসূত। এই অংশটির রচনা সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধি প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত পরিচিত বলিয়া সবিশেষ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। শ্রীমতীর মানভঞ্জনের জন্য সকল প্রকার আবেদন করিয়াও শ্যামসুন্দর যখন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না তখন নিতান্ত আর্তির সহিত বলিতেছেন,—"তবে তোমার শ্রীচরণ আমার মাথায় দাও। আমার অন্তরের দাহ শান্ত হউক।" কবি লিখিতে লিখিতে ইহার পূর্ব পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গিয়াছিলেন। ইষ্ট-দেবতা শ্রীমতীর চরণ মস্তকে লইতেছেন—ইহা কল্পনা করিয়াও, লিখিতে তাঁহার লেখনী সরে নাই। ভাবের বেগ তাঁহার লেখাকে এই পরিণতির দিকেই লইয়া আসিতেছিল। কিন্তু......

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" পদটি লিখিতেই সংশয় দেখা দিল। সংশয়ের সমাধান হইল না। কবি গ্রন্থ রাখিয়া স্নানে গেলেন। এই অবকাশে ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ভক্তবৎসল স্বয়ং জয়দেবরূপে কুটিরে আসিয়া দেখা দিলেন। ভক্তকবির সংশয়ের সমাধান করিয়া স্বীয় অভীপ্সিত পদ নিজেই লিখিয়া বসাইয়া দিয়া গেলেন। আসল জয়দেব স্নান হইতে ফিরিয়া পদ্মাবতীর মুখে সমস্ত শুনিয়া যখন গ্রন্থ খুলিলেন তখন আনন্দে আপ্লুত হইয়া দেখিলেন— যে পদ অন্তরে ভাবিয়াও সংকোচবশে তিনি লিখিতে পারেন নাই অন্তর্যামী স্বয়ং আসিয়া তাহা লিখিয়া দিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন; যে উপলব্ধিতে তিনি লিখিতেছিলেন সে উপলব্ধির যে সত্য তাহার স্বীকৃতি ও প্রমাণ স্বীয় দিব্য অক্ষরে রাখিয়া গিয়াছেন।

এখানে কথা উঠিতে পারে। পূর্বে বলিয়াছি এই গীতপদের রচনায় কবি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে লিখিয়াছেন। তাহা হইলে পদের এই অংশটুকু লিপিবদ্ধ করিতে তাঁহার সংকোচ হইল কেন? সে কথার উত্তর এই: কবি যে প্রত্যক্ষ হইতে লিখিয়াছেন তাহা ঠিকই; পদের এই অংশটুকু তাঁহার অন্তরে ছিল তাহাও ঠিক। তথাপি স্বহস্তে ইহা লিখিতে সংকোচ আসিয়াছিল—সংশয় দেখা দিয়াছিল। ইহা মানববুদ্ধির সহজ দুর্বলতা। এরূপ ক্ষেত্রে নিজের উপরেও সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু একথা নিশ্চিত-ভাবে সত্য যে, উক্ত পদাংশটুকু লিখিতে সংশয়ভীরু হইলেও উহা লিখিবার আবেগ তাঁহার মধ্যে আসিয়াছিল এবং ভক্তের মধ্যে এই আবেগ উঠিয়াছিল বলিয়াই ভক্তাধীন বিচলিত হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং জয়দেবের রূপে আসিয়া ইহা লিখিয়া যাইতে আগ্রহী হইয়াছিলেন।

সংশয়বাদীরা পুনরায় বলিতে পারেন 'এ সমস্তই তো অপ্রাকৃত ব্যাপার।' সে কথা স্বীকার করিব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিব—'অপ্রাকৃত বলিয়াই ইহা অসত্য হইবে এমন কোনো কথা নাই।' অপ্রাকৃতকে সত্য বলিয়া জানি এবং স্বীকার করি [illegible] বাঁচিয়া আছি। ঐ সজীব ও সচেতন ব্যক্তিসত্তা আজ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে এই রচনা লিখাইতেছে অপ্রাকৃত অসত্য নহে বলিয়াই তাহার পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছে। জয়দেবের কাব্যের বস্তু যে অপ্রাকৃত বটেই; কিন্তু তাহা ছাড়াও, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, কাব্যটিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া একটা অপ্রাকৃত আবেষ্টন ও পরিবেশ। কাব্যের প্রথম শ্লোকটিকে ব্যাখ্যা করিতে টীকাকারগণকে ভাবিত হইয়াছে। শ্লোকটির মধ্যে—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং
বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ—
নক্তং ভীরুরয়ং"

এই অংশটুকুই প্রাকৃত ব্যাপার—সাধারণ বুদ্ধির গ্রাহ্য। বাকী সমস্তই অপ্রাকৃত। কবি নিজে কি উপলব্ধি হইতে ইহা রচনা করিয়াছেন জানি না। কিন্তু তিনি নিজে উপলব্ধি করিয়াছেন এমন কেহ বুঝাইয়া না দিলে ইহার অর্থ গ্রহণ বা ভাবগ্রহণ—দুই-ই দুঃসাধ্য। ভাবগ্রহণ যদিও বা হয় অর্থগ্রহণ হয় না।

গীতগোবিন্দের এই প্রারম্ভ শ্লোকটির উপলব্ধি সম্বন্ধে একটি স্মৃতি আমার নিজের জীবনে জড়াইয়া আছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব। সদ্য প্রাণঘাতী পীড়ার অকস্মাৎ আক্রমণে সেদিন সহসা জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দোদুল্যমান। অসহ্য যন্ত্রণা এবং অন্ধকার-ময় আসন্ন পরিণাম! যথাসম্ভব শান্ত-চিত্তে মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া নিঃসীম আকাশের দিকে চাহিয়া আছি। বৈশাখ—অপরাহ্ণের দারুণ উত্তাপ প্রশমিত করিয়া সহসা সুস্নিগ্ধ মেঘ দেখা দিল। যন্ত্রণা ভুলিলাম, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিলাম, আসন্ন পরিণাম ও তাহার ভবিষ্যৎ ফল সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। আপনা হইতেই যেন মন্ত্রধ্বনির মত মুখে আসিল

—'মেঘৈর্মেদুরম্বরম্।' ম্লান ও আনন্দ হাস্যে পাশ্বর্বর্তীদের দৃষ্টি আকাশের দিকে আকর্ষণ করিয়া বলিলাম,—'ঐ দেখ— মেঘৈর্মেদুরম্বরম্।' বাহিরে সেদিনকার সেই স্নিগ্ধ মেঘোদয় এবং অন্তরে শ্রীগীতগোবিন্দের স্নিগ্ধ পদ্মা-বলীর সঞ্চার আজও স্মরণে উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেই অবস্থায় গীত-গোবিন্দের এই প্রথম শ্লোকটি কেন স্মরণে আসিয়া ছিল আজিও মধ্যে মধ্যে তাহা ভাবি। জীবনের সংকটস্থলে ইহা কি অপ্রাকৃতের উপলব্ধি? আশা ও সান্ত্বনার আশ্বাস লইয়াই তাহা দেখা দিয়াছিল। যে অবস্থায় কেহ আশা রাখিতে পারিতে-ছিল না তাহা হতাশায় পর্যবসিত হয় নাই।

গীতগোবিন্দের এই অপ্রাকৃত উপাদান স্বীকার করিয়া লইলে যাহা দাঁড়ায় তাহা এই—গীতগোবিন্দ জয়দেবের রচনা কিন্তু উহার মধ্যে একটি চরণ দেবতার নিজের রচিত, কেবল রচিত নহে, তাঁহারই শ্রীহস্তে লিখিত। এত বড় গৌরব অন্য কোনো গ্রন্থের ভাগ্যে ঘটে নাই। বেদমন্ত্র মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নিকটে স্বয়ম্প্রকাশ—ভগবৎসত্তার প্রত্যক্ষ প্রেরণা—'তস্য নিঃশ্বাসিতং বেদঃ'। কিন্তু তাহা ঋষিদের মুখ দিয়া উচ্চারিত এবং পরে শ্রুতি হইতে অনুলিখিত। কিন্তু 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' গীতপদের—'দেহি পদপল্লব-মুদারম্' চরণ ভগবৎ সত্তার প্রত্যক্ষ লিখন। তাহা হইলে এই অংশটুকুকে কি বলিব? মন্ত্র? না মন্ত্র হইতেও উচ্চতর? সাধকের পক্ষে দেবতার মন্ত্র লাভ করিতে গুরু মধ্যবর্তী। এখানে কোনো মধ্যবর্তী নাই। সাধক-কবির ইষ্টদেবতা স্বয়ং গুরুর পদ গ্রহণ করিয়া এই পরম মন্ত্রদান করিয়া গিয়াছেন—'দেহি পদপল্লব-মুদারম্।' এখানে উপলব্ধি প্রত্যক্ষ এবং কবি অপেক্ষা কবি-পত্নী অধিকতর সৌভাগ্যশালিনী। জয়দেব শুধু শ্যাম-সুন্দরের শ্রীহস্তের লিপি পাইয়াছিলেন, পদ্মাবতী স্বয়ং শ্যামসুন্দরকেই প্রাণ-নাথের রূপে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। কবি যে আপনাকে "পদ্মাবতী চরণ-চারণ চক্রবর্তী"—পদ্মাবতী-চরণের শ্রেষ্ঠ পরি-চারক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন তাহা অকারণ নহে।

ইষ্টদেবতা স্বয়ং যে মন্ত্র দান করিয়াছেন সাধনার তত্ত্ব ও নির্দেশ নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে নিহিত আছে। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ আপনার মস্তকে মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার চরণকমল প্রার্থনা করিয়াছেন। কেন? ইহার তত্ত্ব বুঝিতে হইলে শ্লোকটির পূর্ববর্তী তিন চরণের উল্লেখ করিতে হইবে এবং সমগ্রভাবে "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" গীতপদের মর্ম ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহার স্থান এখানে নাই। শ্লোকটির অন্য পদত্রয়ের উল্লেখ করিতেছি:—

"স্মরগরলখণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো
মদন-কদনারুণো
হারতু তদুপাহিত বিকারম।।"

স্মর-গরল খণ্ডনের জন্য শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর শ্রীচরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া-ছেন। স্বয়ং রাসেশ্বর ছাড়া অন্যে কেমন করিয়া বুঝিবে ওই চরণ মস্তকে ধারণ ছাড়া স্মরগরল প্রশমণের উপায়ন্তর নাই? এই শ্লোকের পূর্ব পর্যন্ত "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" গীতপদের যে অংশ তাহাতে মদন জ্বালা প্রশমনের সাধারণ পরিচিত লৌকিক পদ্ধতির পরিচয়। তাহার পর এই শ্লোকে আসিয়া সহসা যেন সমস্ত ভাবনার মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে, স্মর-গরল খণ্ডনের এক অলৌকিক উপায়ের কথা মনে হইয়াছে। যিনি 'সাক্ষাৎ "মন্মথমন্মথ" তিনিই যখন প্রচার করিলেন শ্রীমতীর শ্রীচরণাশ্রয় ছাড়া স্মর-গরল খণ্ডনের অন্য উপায় নাই তখন সাধারণ জীবলোকের পক্ষে তাহাই যে একমাত্র শরণ সে কথা বলিতে হইবে কি? কামক্লেশের দাহন অন্তরে যে বিকারের সৃষ্টি করিতেছে শ্রীচরণ মস্তকে গ্রহণ মাত্র তাহা অপসারিত হইবে—তাপ শান্ত হইবে।

ইহাই শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের উপলব্ধি। গীতগোবিন্দ কাব্য সন্দেহ নাই। কাব্য হিসাবে ইহা উৎকৃষ্ট এবং ইহার আবেদন চিরন্তন। সারা ভারতে ইহার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা প্রতিপাদিত হইবে। কিন্তু মাত্র কাব্যরস ছাড়াও ইহার গভীরতর আবেদন আছে। সে আবেদন উপলব্ধির। যে গভীরতর আবেদনের জন্য গীতগোবিন্দ মহাপ্রভুর দিব্য সাধনায় নিত্য শ্রবণীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই আবেদনের জন্যই শ্রীগীতগোবিন্দ দাঁড়াইয়া আছে। কেবল শৃঙ্গার রসের কাব্য হইলে ইহা দাঁড়াইত না, এমন প্রসার লাভও করিত না। "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" পদে উপলব্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং "দেহি-পদপল্লবমুদারম" চরণে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিয়াছে।

ধুলিমুঠি থেকে সোনামুঠি

অনন্য রায়

যদি বলি, একখানা নড়বড়ে সাইকেল আর কিছু ইস্কুল পাঠ্য পুরনো বই নিয়ে একজন লোক কোটিপতি হয়ে গেল, তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা হেসে উঠবেন। কারণ আপনারা অভিজ্ঞ লোক, বিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনারা কলেজ স্ট্রীট পাড়ার ফুটপাথে আর রাস্তার রেলিঙে এই ধরনের দোকান দেখেছেন। এবং কাউকেই কোটিপতি হ'তে দেখেননি। কাজেই হাসি আপনাদের অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমিও ঠিক হাসি-ঠাট্টার জন্যে এ কাহিনী শুরু করিনি। হাতে রীতিমত নজির আছে বলেই বলছি। সত্যিই এমন ঘটনা ঘটেছিল একবার বইয়ের ব্যবসার জগতে। তবে আমাদের দেশে নয়, বিলেতে। আর সেই ঘটনা এখন হীরক-জয়ন্তী পালন করল এই '৬১ সালে।

আজ থেকে ৬০ বছর আগের ব্যাপার। লণ্ডনের এক মুদিখানার মালিক ছিলেন মিষ্টার ফয়েল বলে এক ভদ্রলোক। ছোট দোকান, আয়ও যৎসামান্য। কিন্তু তাঁর আশা-ভরসা ছিল দুটি ছেলের উপর—তারা যাতে মানুষ হয় এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। যাই হোক, ১৭ আর ১৮ বছর বয়সের সেই ছেলে দুটি কোনো রকমে লেখাপড়া শিখল। তারপর চাকরির ধান্ধায় সরকারী কাজের তৃতীয় বিভাগের কেরানীর পদের জন্যে পরীক্ষা দিল। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন না। পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল তারা ফেল করেছে। তখন তারা নিরুপায়। মুদিখানার পিছনে তাদের পড়ার ঘরে পাঠ্য বইয়ের গাদার সামনে গালে হাত দিয়ে বসল। এর পর পৈতৃক ব্যবসাতে হাত লাগিয়ে দিনগত পাপক্ষয় করা ছাড়া আর উপায় কি?

হঠাৎ এক ভাই মৌন ভঙ্গ করে প্রস্তাব করল, পড়াশোনা করে যখন কোনো উপকারই হল না, তখন বইগুলো দিয়ে আর কাজ কি? অযথা জায়গা জুড়ে রয়েছে অনেকখানি। তাছাড়া বেচলে কিছু পয়সাও পাওয়া যায়। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক।

যেমন কথা তেমনি কাজ। ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। কিন্তু তাতেই উত্তর এল অনেকগুলো। দেখে-শুনে ভাই দুটির মাথায় হঠাৎ একটা মতলব এল। ইস্কুলে-পড়া পুরনো বইয়ের যদি এতো খদ্দের থাকে, তবে পুরনো বইয়ের কেনা-বেচারও তো বেশ একটা ব্যবসা চলতে পারে। বলতে গেলে, সম্বল তাদের প্রায় কিছুই ছিল না। তাই দিয়ে তারা একটা পুরনো সাইকেল কিনে, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বই কিনবে বলে বিজ্ঞাপন দিল কাগজে। তারপর যতো জায়গা থেকে উত্তর আসে সেখানে নিজেরা গিয়ে নামমাত্র দামে বই কিনে এনে জমা করতে থাকে রান্না ঘরের কোণায়। এবং কয়েকদিন পরে সেই বইগুলোর তালিকা তৈরী করে সস্তা দামে বেচবে বলে বিজ্ঞাপন দেয় আবার কাগজে। হু-হু করে ক্রেতাদের চিঠি আসে। বেশ জমে ওঠে ব্যবসা।

ক্রমে রান্নাঘরে আর কুলোয় না। দোকান দেখতে হয়। বইয়ের বাজার থেকে দূরে এক বেপাড়ায় পাওয়া গেল একটা ঘর। তাই আচ্ছা। দুই ভাই দোকান সাজিয়ে বসল। দোকানেই থাকে দিন-রাত, পিছনের দিকে রান্না আর শোওয়া চলে। এইভাবে কেটে গেল কয়েক বছর।

ইতিমধ্যে হাতে বেশ পুঁজি জমে উঠেছে। এবার তাদের নজর পড়ল চারিং-ক্রশ রোডের দিকে। সেখানেই আসল বাজার। সেখানে না যেতে পারলে ব্যবসা আর বাড়ানো চলছে না।

অতএব এসে গেলেন তাঁরা চারিং ক্রশ রোডের পাড়ায়। তখন আর তাঁরা অখ্যাত এক মুদির অকেজো ছেলে নন। তখন তাঁরা মিষ্টার উইলিয়াম ফয়েল এবং মিষ্টার গিলবার্ট ফয়েল। মস্ত বড় বইয়ের ব্যবসা, 'ফয়েল কোম্পানী'র মালিক।

এরপর থেকে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁদের দরজায় বাঁধা পড়লেন। যাতে হাত দেন তাঁরা তাই সার্থক হয়ে ওঠে। ধুলিমুঠি ধরলে সোনামুঠি। ১৯২৯ সালে এই কোম্পানী এতোদূর নামজাদা হয়ে উঠল যে, লণ্ডনের লর্ড মেয়র এলেন তাঁদের এক প্রতিষ্ঠানে দ্বারোদ্ঘাটন করতে। সে সভায় উপস্থিত হলেন শহরের বাছা-বাছা লোক। মস্ত বড় রিপোর্ট বেরোল কাগজে। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

পড়বে নাই বা কেন? ফয়েলরা কিছুই তো রাস্তায় পড়ে পাননি। সবই যে তাঁদের গায়ের রক্ত জল করে গড়ে তুলতে হয়েছে। পরিশ্রমের সম্মান আছে সব দেশেই। ইংরেজরা আবার এদিক দিয়ে সবার চাইতেই বেশী গুণগ্রাহী। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল ফয়েল কোম্পানীর নাম।

তারপর চলে গেছে আরো ৩২ বছর। ইতিমধ্যে গিলবার্ট ফয়েল পরলোকগত হয়েছেন। বৃদ্ধ উইলিয়াম ফয়েলও অবসর নিয়েছেন কাজ থেকে। ব্যবসা দেখেন এখন তাঁরই কন্যা শ্রীমতী ক্রিষ্টিনা।

বর্তমান বছরে একটা হিসেব করে দেখা গেছে, রান্নাঘরের কোণায় গাদা-করা বইয়ের ব্যবসা দিয়ে যার শুরু সেই প্রতিষ্ঠানে এখন যতোগুলো বইয়ের শেলফ আছে সেগুলো পাশাপাশি জোড়া দিলে লম্বা হবে ৩০ মাইল! আর তাতে বই আছে ৪০ লক্ষ।

তাছাড়া ফয়েল কোম্পানীতে এখন আছে—একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠান, একটি মুদ্রণালয়, কয়েকটি পাঠাগার, একটি আর্ট গ্যালারী, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থাপনা, ২৫ হাজার সভ্যের একটি বুক ক্লাব, ৩০০টি আলোচনা-চক্র এবং একটা মস্ত বড় আপিস যেখানে দিনে প্রায় ৩০ হাজার চিঠির জবাব দিতে হয়। এছাড়া প্রতি মাসে সেখানে আছে একটি 'সাহিত্যিক ভোজে'র ব্যবস্থা। এই সব ভোজসভায় বিখ্যাত সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করে এনে বক্তৃতা দেওয়ানো হয়। শ্রোতারা অধীর আগ্রহে তাঁদের কথা শোনেন, তাঁদের দেখেন। লেখক-পাঠক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এই সব বিবরণ কাগজে পড়ি আর ভাবি, আমাদের দেশেও কি এমন প্রতিষ্ঠান তৈরী হতে পারে না?

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধ কুমার সান্যাল

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—চার—
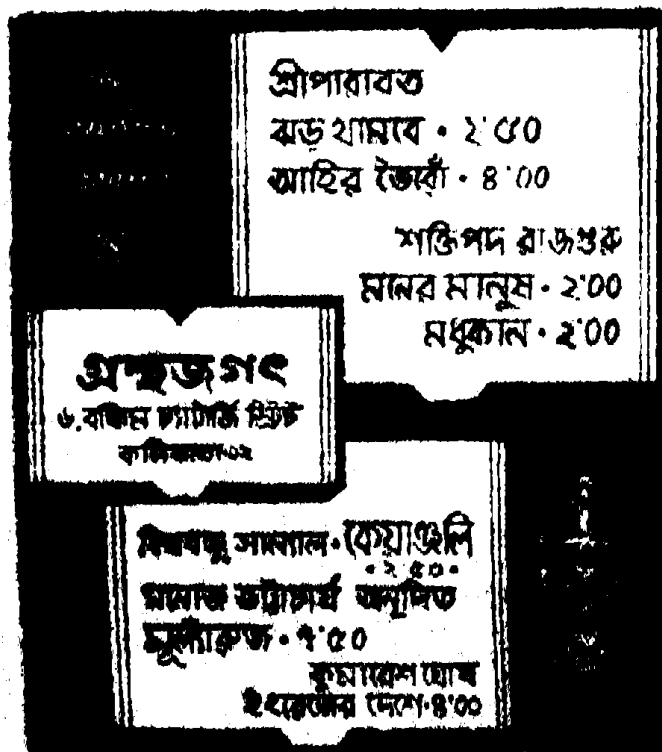
দুজনের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু আমার মনোভাবটি অস্পষ্ট নয়। হেনা তার ভবিষ্যৎ সংসার-রচনা কিভাবে করবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যুক্তির দিক থেকে একথাটা পাওয়া যায়, নবেন্দুর সঙ্গে তার বিবাহটা সম্পূর্ণই আইনসিদ্ধ। আমার ধারণা কোনও দেশের সমাজ শ্রীমতী হেনার এরবিম্বধ আচরণ বরদাস্ত করবে না। এবং—আমিও না।

হেনার যুক্তি একটু অভিনব। সে বলে, বিয়েটা পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলবে না। আমরা নিতান্ত যন্ত্র নই যে, কথায় কথায় তাদের দ্বারা পরিচালিত হব। যে কোনও সামগ্রী নিয়েই জুয়াখেলা চলুক, কিন্তু মেয়েদের জীবন নিয়ে নয়। আমার উপরে কেবলমাত্র বাধ্যবাধকতার বোঝা চাপিয়ে দিলে সে ভার বইতে আমি পারব না।

আমি বলি, তোমার আর নবেন্দুর বিয়েটা কি ঠিক জুয়াখেলার হারজিতের মতন হয়েছে? তুমি ত ঠিক ঘোমটা তুলে প্রথম শুভদৃষ্টি করোনি?

তোমার বক্রোক্তির মূল কথাটা আমি জানি, পার্থ।—হেনা বলে, কিন্তু এ আমাদের ঠিক প্রণয় বিবাহ নয়,—এর মধ্যে ছিল সাময়িক উদ্দীপনা, অনেকটা উদ্‌ভ্রান্তির মতন। এর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আমি করব।

চুপ করে হেনার কথা শুনতে থাকি।

প্রবল একটা চাপা বিক্ষোভ হেনার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। সে বলে, শোনো পার্থ, পুরুষের প্রকৃতির বিচিত্র পথঘাট আমার জানার কথা নয়। কিন্তু দেখতে পাই বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরে পুরুষের চেহারা ঠিক এক রকম থাকে না। প্রণয়াসক্ত অবিবাহিত পুরুষ আর পরবর্তীকালের স্বামী—এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। নবেন্দু যখন আমার বন্ধু থেকে হঠাৎ স্বামী হয়ে উঠল, তার চেহারা দেখে আমি চমকে গেলুম। চোখ চেয়ে দেখলুম, সে দাম্ভিক, সে আত্মাভিমানে জরোজরো। আমি তার সম্পত্তি, সে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সে যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। তার সঙ্গে সমান স্তরে আমি দাঁড়িয়ে নেই,—একটু যেন উঁচু-নিচু হয়ে গেছি! আমি একটা বিশেষ শিক্ষা আর স্বাধীন চিন্তায় মানুষ। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল, নবেন্দুর কাছে সেগুলোর কোনও দাম নেই। সে চাইল কর্তৃত্ব, আমি চাইলুম বন্ধুত্ব!

আমাকে প্রশ্ন করতে হয়,—নবেন্দুর সম্বন্ধে কি তোমার হৃদয়াবেগ ছিল না?

হেনা বলে, বন্ধুর সম্বন্ধে আমার হৃদয়াবেগের অভাব কি তুমি কখনো দেখেছ? তুমিও ত সেই একই আবাল্য সহপাঠী বন্ধু!

আমি চুপ ক'রে গেলেও মূল প্রশ্নটা থেকেই যায়। মুখ তুলে এক সময়ে বলি, যেখানে তর্কবিতর্ক প্রবল, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে একজন অপরকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়,—হৃদয়াবেগ সেখানে শুষ্ক। ভালবাসা দাঁড়িয়ে থাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভিত্তির ওপর।

হেনা এক সময় হঠাৎ এক ঝলক হেসে ওঠে। বলে, বছর খানেক আগে নবেন্দু এসে একবার কান্নাকাটি করতে থাকে। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে দিন তিনেকের জন্যে চড়িভাতির নাম ক'রে রাঙামার কাছে ছুটি নিয়ে নবেন্দুর ওখানে যাই। ছেলেমানুষের মতন সে আমাকে তার সমস্ত সম্পত্তির আড়ম্বর দেখাতে থাকে। তোমার মনে আছে, ছাত্রাবস্থায় কতবার তার ওখানে তুমি আমি গিয়েছি। কিন্তু এবার তাকে ভূতে ধরেছিল। সে আমাকে তা'র শোবার ঘরে রাখতে চাইল, কিন্তু আমি রইলুম তার অতিথিশালায়।

দিনমানে, না রাত্রিকালে?

আমার তামাশা শুনে হেনা উল্লসিত হাসি হেসে ওঠে। তারপর বলে, ওই তিনটে দিনের মধ্যেই বুঝে নিলুম, তার কর্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে আমি পারব না। এমন সব ছোট ছোট লক্ষণ তার প্রকৃতির মধ্যে দেখতে পেলুম যেগুলো আমার রুচি আর শিক্ষায় বাধে। তার কর্মক্ষেত্রটা মালিন্য আর ধুলো-কাদায় ভরা। সব চেয়ে বিপদ, কথায় কথায় নবেন্দু আমাকে দান খয়রাৎ করতে চায়!

বলি, দানখয়রাৎ, না উপহার?

ওই একই। এটা নবেন্দুকে বোঝানো যায় না যে, পুরুষের মতো পুরুষ হলে কাঠুরিয়ার সঙ্গে জঙ্গলেও বাস করা যায়, এবং ভালবাসা যদি সত্য হয় তবে যমের হাত থেকেও স্বামীর জীবনকে ফিরিয়ে আনতে মেয়েমানুষ ভয় পায় না!—হেনা বলে, দুঃখের কথা কি জান পার্থ, নবেন্দু আমার সমস্ত শক্তি অপহরণ করে তার কর্তৃত্বটা আমার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়! ছেলেমানুষ! সুতরাং একদিন তাকে না জানিয়েই তার ওখান থেকে চলে এলুম।

এবার বললুম, প্রত্যেক স্ত্রীর নিজস্ব জগৎ হল তার স্বামীর এলাকা, সেইটি তার আত্মবিকাশের ক্ষেত্র,—এটা কি তুমি স্বীকার কর না, হেনা?

হেনা হাসিমুখে বলল, তুমি কি সেই পুরনো আমলের লক্ষীমন্ত স্ত্রীদের কথা বলছ?

তারা মন্দ কিসে?—জবাব দিলুম, বিশ্বসৃষ্টির ওপর তারা বিশ্বাস রেখে এসেছে, লক্ষ্মীর স্পর্শে স্বামীরা হয়ে

উঠেছে দিগ্বিজয়ী. ষোড়শ উপচারে তারা পুজো দিয়ে এসেছে ঘরের প্রতিমার পায়ে, সমস্ত জীবনটাই স্ত্রীর পায়ে সঁপে দিয়েছে।

হেনা সকৌতুকে বলে, এসব শুনতে ভাল! শুধু লক্ষ্মীপ্রতিমাদের মনের কথাটা কেউ শুনতে চায়নি। স্ত্রী-স্বাধীনতা-বাদের বন্যায় মেয়েদেরকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, মনের কথাটা বলবার সময় তাঁদের দেওয়া হয়নি। আদর্শ স্বামী কাকে বলে, মেয়ের মুখ থেকে একথা তোমরা শুনেছ কি? কখনও শুনেছ মেয়ের মুখের নিঃসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি? বিয়ের পর বহু মেয়ে বহু স্বামীকেই চায় না,—একথা বিশ্বাস করতে বাধে কেন? মেয়েদের বিয়েটাকেই সবাই জানে,—সমগ্র জীবনের বিবিধ প্রশ্নের খবর কেউ রাখে কি?

নিজের কথায় আবার ফিরে এসে হেনা বলল, না, নবেন্দুকে স্বামী বলে স্বীকার করতে পারব না, পার্থ। চেহারাটা তার সুন্দর, ধনবান সে, অপূর্ব তার স্বাস্থ্যশ্রী, আমার প্রতি সে হয়ত একান্তই অনুগত,—কিন্তু এগুলি লোভনীয় বলেই আমি তাকে চাইব না। লোভের ক্রীতদাসী আমি নই। আমি অর্জন করতে চাই, বিনা-মূল্যে পেতে চাইনে। কপাল আমার পুড়ুক, সে সইবে,—কিন্তু যার সঙ্গে আমার মনের সায় নেই, আমার মন যেখানে অবারিত মুক্তি পাবে না,—সেখানকার ফাঁদে আমি কিসের লোভে পা বাড়াব?

বললুম, নবেন্দুর ওপর তোমার অবিশ্বাস এত গভীর কেন?

হেনা জবাব দিল, তা জানিনে। ওটা বোধ হয় জন্ম নিয়েছে তিলে তিলে। ওটা আজকের নয়, তোমার সঙ্গে ওকে যখন দেখি সেই সতেরো বছরের নাবালক, তখন থেকেই আমার সংশয়। ওর অন্তেতন্ত্রে, স্বভাবের নানা অন্ধকার সুড়ঙ্গে সাপ-বিছে-শুয়ো-কেঁচো সব লুকিয়ে আছে।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললুম, এত জেনেও তবে তুমি ওকে নিয়ে এই কেলেঙ্কারীটা করতে গেলে কেন?

হেসে উঠল হেনা। বলল, তোমার বিলেত যাওয়াই এজন্য দায়ী!

মানে?—আমি ভয়ে কেঁপে উঠলুম।

হেনা বলল, বোম্বাইয়ের জাহাজে তোমাকে তুলে দিয়ে দুজনে ফিরছিলুম। তোমাকে ছেড়ে দিয়ে দেখি, ভয়ানক নিঃসঙ্গ আমরা দুজন,—মস্ত কিছু একটা যেন হারিয়ে ফেলেছি। ট্রেনের 'কুপেতে' মাত্র দুটি সীট। সেই নিবিড় নিঃসঙ্গতাই দুজনকে যেন আরও কাছে দুটো ঘন গরম নিঃশ্বাসের মধ্যে টেনে আনল। আমার বিশ্বাস, আমরা তিন মিলিয়েই ছিলুম একই মন। কিন্তু তোমার যাবার পর মনে হল শরীরের একটা অংশ যেন ট্রেনে কাটা পড়েছে। বোধ হয় ওই নিঃসঙ্গ রুদ্ধবাক 'কুপের' মধ্যে বসে আমরা দুজনেই মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিলুম।

সকৌতুক এবার বললুম, আমার বদলে নবেন্দু বিলেত গেলে কুপের ভেতরটা অন্য রকম চেহারা নিত কিনা তাই ভাবছি!

হাসিমুখে হেনা বলল, আমিও ভেবেছি অনেকবার। সে যাকগে শোনো, বোধ হয় ওই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই নবেন্দুর শারীর-তন্ত্রে রি রি করে জ্বলছিল। থমথম করছিল ফিরবার পথের সেই রাত। গাড়ির দোলা লাগছে দেহে আর মনে। মধুর মরণের দোলা বোধ হয় লেগে থাকবে চারটে চোখে। নবেন্দু এক সময় বলে বসল, তুমি আমাদের চিরকালের বন্ধু হেনা, কিন্তু আজ প্রথম চেয়ে দেখছি তুমি মেয়ে!

মাথায় ভূত চাপল। বললুম, এতদিন জানতে না?

দপদপ করছিল একটা সর্বনাশা রক্তিম তারুণ্য নবেন্দুর এলোমেলো চুলের গোছায়, ঘাসের ফোঁটায়, উজ্জ্বল চোখের তারায়, তার স্বাস্থ্যের আভায়। সে শুধু বলল, না!

হাসিমুখে বলে বসলুম, বিয়ের আগে বন্ধুকে মেয়ে ব'লে জানতে নেই, নবেন্দু!

বোধ হয় আমার হাসির মধ্যে পুরুষ তার পরম প্রশ্রয়কে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল। বোধ হয় তা'র চোখে আমিও কিছু দেখে থাকব। সেই জন্য সভয়ে এক সময় আলোটা নিবিয়ে দিলুম। বললুম, এবার ঘুমিয়ে পড়, নবেন্দু!

নবেন্দু ঘুমোল কিনা খবর নিইনি। কিন্তু শেষ রাত্রে কোনও একটা স্টেশনে গাড়ি থামতেই সে বলল, নেমে এস।

তার গলায় আওয়াজে ছিল স্পষ্ট প্রভুত্বের নির্দেশ। অন্ধকার তখনও কাটেনি। অজানা মধ্য প্রদেশের প্রান্তরে ঝরঝরিয়ে নেমেছে বর্ষাকাল। ভোরের আগেই আমরা গিয়ে উঠলুম বনবাগানঘেরা নির্জন ডাক-বাংলায়। যৌবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সম্মোহন শক্তি, সেটি নবেন্দুর ছিল। পরদিন যখন নবেন্দু বলল, এদেশে ঘোমটা দিয়ে থাকা মেয়েদের রীতি, ওটা সম্ভ্রমের প্রশ্ন। তুমি মাথায় কাপড় তুলে দাও, হেনা। —আমি তখনই অনুগত ভৃত্যের মতন তার হুকুম তামিল করলুম। জীবনে এমন ক'রে আর কোথাও বশ্যতা স্বীকার করিনি, পার্থ।

হাঁসমুখে বললুম, তোমার সেই 'ট্রান্স' বোধ হয় ওই গাড়ি থেকেই আরম্ভ?

সম্ভব! —হেনা জবাব দিল। পরে বলল, ওই ট্রান্স কাটল না, পার্থ। পথের পরিশ্রমে, উপবাসে, অনিদ্রায়—কাটল দিন পনেরো।—যেখানে খুশি নামলুম, যেখানে সেখানে বাস করলুম, আর নবেন্দুর নিত্য সংগ্রাম রোধ করে চললুম। ট্রেন থেকে ট্রেনে, এক ডাক-বাংলা থেকে অন্যটায়। কখনো হাসির ঝড় উঠেছে বনে জঙ্গলে আর পাহাড়-তলীতে, কখনো মান-অভিমানের পালায় জনহীন জলাশয়ের ধারে বসে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটেছে। ভুল করো না পার্থ, এটা ভালবাসা নয়। আমি বিজ্ঞানের মেয়ে, গবেষণাগারে ব'সে রাসায়নিক পরীক্ষায় আমার হাত পাকানো। প্রতিরোধ ক'রে যাচ্ছি প্রকৃতির নির্দেশে,—ওটা পরমনিয়ন্তার কলহ-কৌতুকের খেলা! দুই বিড়ালের ঝগড়া কখনো কি শোননি মাঝরাত্রে? কখনো কি খতিয়ে দেখনি, দুই হিংস্রতার কখনু অবসান ঘটে?—অবশেষে একদিন ক্লান্তদেহে দুজনে নামলুম যশিদি স্টেশনে। আমার মনে অপমৃত্যুর ইচ্ছা ততদিনে বাসা বেঁধেছে বৈকি। আমি বোধহয় তখনকার ভাব-বিহ্বলতার মধ্যে এই কথাটাই চোখের জলে বলেছিলুম, আর পারিনে নবেন্দু, এবার আমাকে দিয়ে দাসখৎ লিখিয়ে নাও! নবেন্দু ভুল করেনি।

হেনার এই কথাগুলি ভাবতে গিয়ে অনুভব করছিলুম, তার প্রতি আমার চিত্ত আর প্রসন্ন নয়। পুরুষ মাত্রেরই মন আহত হয় হেনার এই আচরণে। নবেন্দুর অপরাধ কিছু আছে আমি স্বীকার করিনে।

বোম্বাই যাবার দিনস্থির ক'রে আমি ভাবছিলুম, বিগত দুই সপ্তাহের মধ্যে
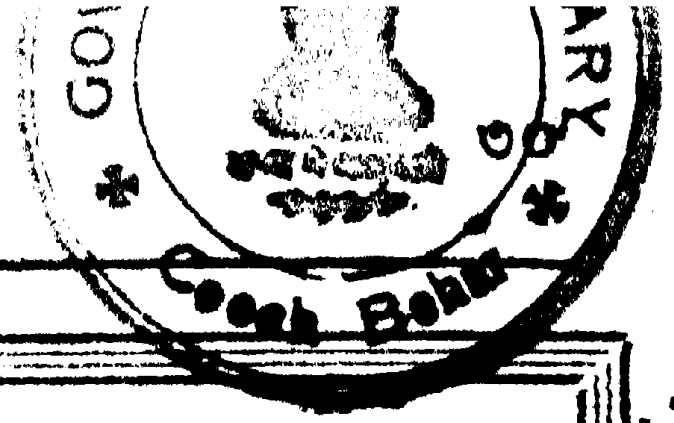
হেনা আমার খোঁজখবর করেনি কেন। হয়ত সে আমার মধ্যে তার এই আচরণের শেষ সমর্থন খ‍ুঁজে পায়নি, আর নয়ত কোনও অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে নবেন্দুর ব্যাপারে। আমার মনে স্বস্তি ছিল না।

যাবার আগের দিন হেনার কাছে বিদায় নিতে গেলুম। আমি খুশী হতুম যদি হেনার সঙ্গে আমারও একটা মনোমালিন্যের কারণ ঘটে যেত। কিন্তু আমারও একপ্রকার চিত্তদৌর্বল্য ছিল বৈকি। পুরনো [illegible] গঞ্জের এই পর্বপ্রান্তের দিকে আমার মন কেমন একটা স্বপ্নজাল বুনে রেখেছে সেই তরুণ বয়স থেকে। রায়চৌধুরীদের এই প্রাচীন বাগানবাড়ির বাইরে আমার কল্পনা কখনও ছোটেনি এবং [illegible] দিগন্তের পটভূমিতে সেপ্টেম্বরের [illegible] দিক থেকে যে অপরূপ বকশোভা দেখা দেয়, সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেনাদের এই অযত্ন রক্ষিত বাগানবাড়িটি যেন আমাকে মনে মনে অধিকার [illegible] করে রাখত। এই বাগানের প্রতিটি বৃক্ষ আমাদের বহুকালের রঙকল্পনার সাথী। এখানকার আম্রমুকুল আর শিরীষ ফুলের সৌরভ আমাদের হৃদয়ে বসন্তের নিমন্ত্রণ এনে দিত। কিন্তু আমার আশা ছিল এই, হেনা আমার এই সব দুর্বলতার সংবাদ একটুও রাখত না। আমাদের উত্তরের [illegible] সংমিশ্রণে একটা একটা [illegible] দাঁড়িয়েছিল, সেটি [illegible] কদাচিৎ দেখা যায়। আমাকে সে কোনকালে পুরুষ বলে মনে করেনি বলেই তার যৌবনের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ স্বীকারোক্তিগুলি আমার কাছে সে গচ্ছিত করেছে। নবেন্দু আমাদের এই সম্পর্কটির সংবাদ রাখেনি কোনদিন।

বিকালের দিকে হেনা ট্যুইশনি করতে যায়, এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফেরে এটি আমার জানা ছিল। সেই কারণে রবিবার সকালে হেনার ওখানে আসাই প্রশস্ত মনে করেছিলুম।

একটু লৌকিকতার ব্যাপার ছিল। হেনা তার অনেক তিক্ততা এবং চিত্তদাহ আমার কাছে প্রকাশ করেছে। আমার যাবার আগে তার মুখখানা মিষ্ট করে দিয়ে যেতে চাই। সেইজন্য তারই বিশেষ প্রিয়খাদ্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট সন্দেশ এবং চানাচুর আমার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সামনে আজ প্রথম পাওয়া গেল ছোটকাকে। তাঁর হাতে ছিল একখানা কোদাল। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে

ছোটকা বললেন, আর, এই যে, তোমার কথাই কদিন ভাবছিলুম। এতগুলো কাজ একসঙ্গে আরম্ভ করলুম,—কিন্তু তারিফ করবার লোক পাচ্ছিলুম না। এস, দেখবে এস।

বললুম, তোমার হাতে কোদাল কেন?

শোনো কথা—ছোটকা বলল, কোদাল ছাড়া পুকুর কাটা যায়? একি তোমার গাইতি নাকি যে, রাস্তা কাটব? পুকুর চাই হে, পুকুর!

কি হবে তোমার পুকুরে?

আরে, পুকুর ছাড়া পদ্ম ফোটে? তা ছাড়া রাজহাঁস হল পুকুরের শোভা। ও কিছু না, ঠিক আছে। একটু পরিশ্রম, এই যা।

বাগানের দক্ষিণ-পূব প্রান্তে এগিয়ে গেলুম ছোটকার সঙ্গে। দেখে শুনে হাসি পেল। যতটা গর্জন শোনা গেল, বর্ষণ সে পরিমাণে কম। লম্বা চওড়ায় হাত দুই এবং গভীরতায় ফুটখানেক—এইটুকু মাটি কাটতে ওঁর প্রায় সপ্তাহ-খানেক লেগেছে, এবং আমার বিশ্বাস একটি রাজহংসচরা ও পদ্ম ফোটা সরোবর প্রস্তুত করতে ছোটকার বছর দশেক লাগবে। সহাস্যে বললুম, তুমি যদি রাজি থাক তাহলে কাল থেকে আমিও কোদাল নিয়ে তোমার সঙ্গে লেগে যাই। বছর পাঁচেকের মধ্যেই দুজনে শেষ করতে পারব!

ছোটকা তাঁর পরিকল্পিত পুকুরের সম্ভাব্য সীমানার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, তুমি ছেলেমানুষ, এসব কাজ পারবে কেন? ও আমি একাই করব, দেখে নিয়ো। কি জান পার্থ, এটা হল একমুখী মন! যাবে কোথা! চুপ করে বসে থাকব, শালিক পাখিরা কাঁধের ওপর চরবে, একপাতে বসে খাব আমি আর দোয়েল—তবে না! যাবার সময় দেখে যেয়ো কাঁচের বাক্সে টিকটিকি পুষেছি!

টিকটিকি? কেন?

টিকটিকিই ত পরীক্ষা হে। বাক্সর দরজায় হাতের ওপর খাবার নিয়ে বসে থাকব,—টিকটিকি হাত থেকে খাবে। তবেই না?

বললুম, তাতে তোমার ফললাভটা কি?

হা-হা-হা হা,—ছোটকা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। তারপর চোখ থেকে চশমাজোড়া খুলে মুছতে মুছতে বললেন, বুঝলে কিছু? আরে ওইটেই ত আসল। ওকে বলে প্যাশন্। টিকটিকিও কিছু নয়, খাবারটাও সামান্য! কিন্তু হাতখানা যে অকম্প! মুনিঋষিদের ধ্যানের কথাটা কি ভুলে গেলে? তুমি এক খেয়াল থেকে অন্য খেয়ালে চলে যেতে পার তাতে জীবনবৈচিত্র্যের অনন্ত কৌতুক আছে। কিন্তু সূচাগ্রবিন্দুর ওপর তোমার একাগ্র লক্ষ্য থাকা চাই। ওর নামই ত সাধনা হে। নাঃ তোমরা বড্ড সেকেলে লোক! কি যে হবে তোমাদের ভবিষ্যতে!

বলতে বলতে ছোটকা তাঁর পাখীর খাঁচার ভিড়ের দিকে এগোলেন।

বলা বাহুল্য ছোটকা সেই একই মানুষ রয়ে গেলেন। এককালে তাঁর সখ ছিল এই বাগানে বসবে পৃথিবীর সব জাতির কুকুরের প্রদর্শনী। কুকুরের পরেই নাকি এসেছিল পায়রা,—রাঙ্গামার মুখে শুনেছি। তারপর তিনি বসলেন ছবি আঁকতে। ছবির পর এল পুতুলের কারখানা। এক সময় তাঁর বুঝি সখ হয়েছিল বটগাছে জামরুল ফলাবেন,—এবং উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের ডেকে তিনি নিজেই লেকচার দিয়ে বলেছিলেন, বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যের কতটুকু জানেন আপনারা? যা আপনাদের জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে, তাই কি মিথ্যে? আপনাদের ভূয়োদর্শন কেবল ওই কাকের বাসা, যেখানে কোকিলের ছানা মানুষ হয়!

......দিদিমণি অনেকদিন এ বাড়িতে নেই।

কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের সম্মান রক্ষার্থে সেদিন অধ্যাপকের দল মুখ বুজে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু সেইদিন থেকে ছোটকা গাছে-গাছে অসীম উৎসাহসহকারে 'গ্রাফটিংয়ের' কাজ নিয়েছিলেন। হেনা তাঁর সকল কর্মের উৎসাহদাত্রী ছিল।

একদিন আমাকে ধমক দিয়ে ছোটকা বলেছিলেন, ছেলেমানুষের মতন ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়িয়োনা,—আমার কাছে তাঁর সন্ধান নিয়ে যেয়ো, বুঝেছ?

আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলুম।

ছোটকা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, দুটি বস্তু পরীক্ষা করে দেখো, ঈশ্বরকে পেয়ে যাবে। একটি হোমিওপ্যাথী, অন্যটি বীজগণিত। যদি তোমার ইচ্ছায় জোর থাকে, হাসিমুখে ঈশ্বর এসে সামনে দাঁড়াবে!

বলা বাহুল্য, হোমিওপ্যাথী চর্চার ফাঁকে ছোটকা কঠোরভাবে তখন বীজ-গণিত নিয়ে কালাতিপাত করছেন। হেনা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকত।

অন্দরমহলের দিকে ফিরে আসছিলুম, রাঙ্গামা তখন স্নান সেরে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকছিলেন। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, তোমাদের মনের খবর আগে আমি পেলুম না কেন, পার্থ?

রাঙ্গামার ঠিক এই প্রকার দাঁড়ানোর ভঙ্গী, গাম্ভীর্য এবং মুখের ভাবের সঙ্গে আগে আমার পরিচয় ছিল না। সন্দেশ ও চানাচুরের বাক্স দুটো যেন আমার হাতের মধ্যে আটকে রইল। বললুম, কেন, কি হয়েছে রাঙ্গামা?

তোমরা যে সাবালক হয়েছ একথা আগে আমাকে বলনি কেন?

রাঙ্গামা ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং সেখান থেকেই বললেন, ঠাকুরপো একটু এলোমেলো মানুষ, কিন্তু যে-কথা তাঁর মনে লাগল, সে কি তোমরা ভেবে দেখেছ?

সামনে সন্তোষকে পেয়ে বাক্স দুটো তার হাতে গছিয়ে বললুম, দিদিমণির হাতে দিয়ে দাওগে।

সন্তোষ বলল, দিদিমণি ত নেই!

বেশ ত, বাড়ি এলে দিয়ো।

সন্তোষ এবার বলল, দিদিমণি অনেকদিন এবাড়িতে নেই।

মুখ তুলে এবার তাকালুম সন্তোষের দিকে। কিন্তু ভিতর থেকে রাঙ্গামাই আমার নিঃশব্দ প্রশ্নের জবাব দিলেন,—মেয়ের বয়েস যখন দু'বছর, তখন থেকে

মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেছি—আর আজ জানলুম আমাদের না জানিয়ে তিন বছর আগে সে নবেন্দুকে বিয়ে করে বসেছে। এটা কেমনতর হল, পার্থ? তুমি কি কিছু জানতে না?

তিন বছর আগে আমি বিলেতে ছিলুম, রাঙামামা?

ফিরে এসে শোনোনি কিছু?

বললুম, ওদের মধ্যে তর্কবিতর্কই ত শুনেছি! ওদের কথাবার্তায় বোঝাই যায় না যে, ওরা স্বামীস্ত্রী! হেনা কোথায় গেছে, রাঙামামা?

রাঙামামা বললেন, আমাকে বলে যায়নি। তুমি তার শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার।

রাঙামামা আর কোনও কথা বললেন না।

আমি দাঁড়াব কিংবা চলে যাব ঠিক বুঝতে না পেরে যখন বিব্রত বোধ করছি সেই সময় ছোটকা দেখা দিলেন। রোদ্রে তাঁর মুখখানা রাঙা, মোটা চশমার ভিতর দিয়ে চোখ দুটো তাঁর তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে, পাকা চুলগুলির কোল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নেমে এসেছে। বললেন, তুমি কি শুনতে কি শুনলে! আরে বীজগণিতের গণনা কখনও ভুল হয় না, পার্থ। আসল অঙ্কটা অনেকদিন আগে আমার কষা আছে!

হাসিমুখে বললুম, তোমার কোনোদিন অঙ্কে ত' মাথা ছিল না, ছোটকা?

ওই নাও, আবার সেই পুরনো তর্ক! আরে, সমস্ত অঙ্কের মূলে হল দিব্যদৃষ্টি! তুমি আমি দাঁড়িয়ে আছি তারই কাঠামোয় বুঝলে কিছু? আমার হিসেব কি একেবারেইই মিথ্যে? তবে এতদিন ধরে মেয়েটাকে শিখালুম কি? বীজগণিতের বাইরে সে যাবে কেমন করে?

রাঙামামা এবার বেরিয়ে এসে বললেন, ঠাকুরপো, এ্যানি এসে যে খবরটি আপনাকে দিয়ে গেল, পার্থকে বলুন সে কথা?

ছোটকা হেসেই লুটোপুটি। বললেন, বাঃ বিয়ে হল তোমার মেয়ের, জামাই তোমার হাতধরা,—তাদের বিয়ের খবর দিচ্ছে এসে বিলেতের মেয়ে? অঙ্কটা তোমার কেমন লাগে, পার্থ?

আমি একটু অবাক হবার ভান করে রাঙামামার দিকে তাকালুম। রাঙামামা বললেন, এ্যানি বলে একটা মেমের মেয়ে কাজ করে নবেন্দুর আপিসে। সেই মেয়েটি সটান এসে হেনার সঙ্গে দেখা করে। বোধ হয় দুজনে একটু চাপা কথা কাটাকাটি হয়। এ্যানি গিয়ে ঠাকুরপোকে বিয়ের খবরটা দেয়। তার পরদিন সকালে হেনা সেই যে বেরিয়েছে, আজ এগারোদিন হল তার খোঁজখবর নেই। তোমাদের কেমন ধারা বন্ধ সমাজ, পার্থ? আমি ঠিক জানি হেনা শ্বশুর-বাড়িতে আছে।

শোনো, কান পেতে শোনো,—ছোটকা উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। বললেন, বীজগণিতে আমার পরমারাধ্য ভ্রাতৃজায়ার পারদর্শিতা কেমন, দেখে নাও। পৃথিবীতে যা ঘটে সব উনি বিশ্বাস করেন। মানুষের খবর যা রটে তাই ওঁর কাছে বেদবাক্য! না-জানিয়ে থাকুক, নবেন্দুর অঙ্কে সে ধরা দেবে না!

কোদালখানা ঝুলিয়ে নিয়ে ছোটকা আবার বাগানের দিকে চলে গেলেন।

পরদিন বোম্বাই রওনা হবার জন্য আমি প্রস্তুত হচ্ছিলুম। সুরমা আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবার ভার নিয়েছিল। এক সময় সে বাঁকা চোখ বাগিয়ে বলল, এই যা তোমার গুছিয়ে দিলুম ছোড়দা, এই শেষ। এর পরের বার থেকে তোমার বউ এসে সব গোছাবে, বলে রাখলুম।

আমিও দৃষ্টি বাঁকালুম,—বউরা আজকাল গোছায় নাকি? তারা এসেই ত সব ভাঙতে থাকে।

তবে কি তুমি বিয়ে করবে না বলছ?

একবারও বলেছি সে কথা?

সুরমা কিয়ৎক্ষণ গরগর করতে লাগল। ইচ্ছাপূর্বক ঠকাঠক আওয়াজ

হেনা বিয়ে করবে, এমন হাস্যকর কথাটা না হয় ছেড়েই দাও! হেনা যে বিয়ে করবারই মেয়ে নয়, এ উনি বিশ্বাস করতে চাননা। এই জন্যেই সময় থাকতে একদিন বলেছিলাম স্বর্গীয়ান,—দাদা না হয় স্বর্গে গেছেন,—আমি না হয় আরেকটি দাদাকে মর্তধাম থেকে ধরে আনি!

আঃ কি হচ্ছে, ঠাকুরপো? আমার ছেলে না দাঁড়িয়ে আমার সামনে? যা মুখে আসে তাই।—রাঙামামা ভিতরে চলে গেলেন।

অঙ্ক, অঙ্ক, বুঝলে পার্থ,—অঙ্ক! অঙ্কের বাইরে হেনা কখনও যাবে না, দেখে নিয়ো।—ছোটকা তাঁর মাথা দোলাচ্ছিলেন।

এবার বললুম, অঙ্ক কষে বল ত' ছোটকা, হেনা এখন ঠিক কোথায়?

ছোটকা আবার মিষ্ট স্নিগ্ধ কণ্ঠে হেসে উঠলেন, বললেন, যেখানেই সে করল এখানে-ওখানে। তারপর বলল, তোমার বন্ধুর মতন তুমিও যদি একটা কাণ্ড করো, তাহলে শ্বশুরবাড়িতে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না, তা জেনো।

মুখ তুলে তাকালুম।

সুরমা বলল, তুমি যে দু'তিনদিন বাড়িতে মুখ ভারি ক'রে রয়েছ, আমরা কি বুঝিনে কিছু? হেনাদি আর নবেন্দুদার এই কেলেঙ্কারী আর কতদূর গড়াবে বলতে পার?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলুম, কেন? হয়েছে কি?

সুরমা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আহা, কিছু যেন জানেন না। পরশু-দিনকার সেই খবরের কাগজের কাটিং সকলের কাছে আছে, মনে রেখ, ছোড়দা। চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গেছে!

খবরের কাগজের কাটিং? কই আন্ ত' দেখি?

সুরমা বোধ করি এইটির জন্যই এতক্ষণ ভূমিকা রচনা করছিল। এবার ছুটে চলে গেল পাশের ঘরে, এবং কিছুক্ষণ পরে ইংরেজি ও বাঙলা সংবাদপত্রের দুটি কাটা টুকরো এনে আমার হাতে দিল। ওতে দেখতে পাওয়া গেল, জনৈক এডভোকেটের নামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার ক'রে বলা হয়েছে, তাঁর মক্কেল মিঃ নবেন্দু রায়ের বিবাহিতা পত্নী শ্রীমতী হেনা রায় কিছুকাল যাবৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর আরোগ্যলাভ ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য মিঃ রায় গত সপ্তাহে তাঁকে দার্জিলিং নিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীমতী রায় সহসা দার্জিলিং শহর থেকে নিরুদ্দেশ হন। এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে, শ্রীমতী রায় যদি কারও নিকট ঋণ গ্রহণ করেন অথবা তাঁর সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি হেতু কোনও প্রকার অবৈধ আচরণ করেন তবে তার জন্য মিঃ রায় দায়ী হবেন না। কেহ যদি শ্রীমতী রায়ের বর্তমান গতি-বিধির খোঁজ দিতে পারেন তাহলে তাঁকে যথাসাধ্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

হঠাৎ সুরমা বলল, এই ভয়ানক খবর প'ড়ে তোমার হাসি পেল, ছোড়্দা?

হাসিমুখে বললুম, সব মেয়ে যদি পাগল সেজে বার-বার বিয়ে ক'রে বসে, তাই ভাবছিলুম!

তা হলে বল ওদের দুজনের বিয়ে হয়েছিল?

কেমন ক'রে জানব? আমি যে তখন বিলেতে!

ফিরে এসে কতবার যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে!—সুরমা অনুযোগ জানাল।

আমি বললুম, তুই একেবারে নাছোড়বান্দা, সুরমা। দেখছিস নিজের কাজ নিয়ে ছুটোছুটি করছি। ওদের কথা ভাববার সময় ছিল আমার? বিয়ে হলে ত হেনার মাথায় সিঁদুর দেখতুম।

সুরমা বলল, সিঁদুরে না ছাই। ও মেয়ে সাংঘাতিক, তোমায় বলে রাখলুম, ছোড়্দা। নবেন্দুদাকে বোকা বানিয়ে শুধু খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। এই জন্যেই বলি, তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে ক'রো না।

হাসিমুখে এবার বললুম, আচ্ছা ধর, যদি বলি আমি বিয়েই করব না?

সুরমা ভীষণ চটে উঠল। বলল, অমন কথা মুখেও এনো না তুমি, ছোড়্দা। ভাত-জল দেবে কে? অসময়ে দেখবে কে?—হঠাৎ একবার থমকিয়ে সুরমা পুনরায় বলল, আমার শ্বশুরবাড়িতে একেই ত সন্দেহ করে। খোঁটা দিয়ে ছাড়া কথা বলে না।

খাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম। এবার বললুম, সন্দেহটা কি, এবং খোঁটাটিই বা কি প্রকার শুনি?

সুরমা বলল, বিলেত থেকে ফিরলে আজকাল সবাই যা বলে তাই! তুমি নাকি সেখানে বিয়ে করেছ, এবং এখান থেকে লুকিয়ে টাকা পাঠাও!

সহাস্যে বললুম, তাহ'লে ফিরেই বা এলুম কেন?

ওটা লোক-দেখানো!—সুরমা বলল, এদেশের চাকরিতে মাইনে কম, এই ছুতোয় নাকি তুমি আবার চ'লে যাবে!

বললুম, তোর শ্বশুরবাড়ির আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ নয়! কথাটা একবার তলিয়ে দেখি, তারপর বোম্বাই থেকে উড়ে যাবার আগে তোকে চিঠি দিয়ে যাব,—কথা দিচ্ছি!

সুরমা ধমক দিল—আমি কিন্তু ঠিক এবার গলায় দড়ি দেবো, ছোড়্দা—বলে রাখলুম! তুমি বরং বিয়ে না কর সে সইবে, কিন্তু বাইরে থেকে ঘাগ্‌রা-পরা ধিঙ্গি ধরে এন না! আমাদের ঘরে সে সইবে না।

সুরমার সঙ্গে মজলিশ করতে গেলে আজকে গাড়ি ধরবার আশা থাকবে না। সুতরাং ওর মধ্যে ব্যস্তবাগিশ হয়ে আমাকে চারদিক গুছিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই বেরিয়ে যেতে হল।

মনে মনে আমি কাঁপছিলুম। হেনার সম্বন্ধে এবম্বিধ অদ্ভুত সংবাদ রাঙামা অথবা ছোটকার কানে ওঠেনি, তাই রক্ষা। আমি নিজে কল্পনাও করিনি হেনা নবেন্দুর সঙ্গে দার্জিলিং যেতে পারে। নবেন্দুদের দার্জিলিংয়ের সেই সুন্দর বাংলোটি আমাদের অতি পরিচিত। পাহাড়ের সেই একান্ত পল্লীর এক কোণে অবস্থিত নবেন্দুর বাংলো থেকে কেমন ক'রেই বা হেনা নিরুদ্দেশ হল, এবং সে গেলই বা কোথায়,—এটি আমার কাছে রহস্যময় হয়ে রইল।

হাওড়া ষ্টেশনে এসে ভাবলুম, নবেন্দুর ওখানে টেলিফোন করে একবার খোঁজ নিই। কিন্তু নবেন্দু বাড়িতে আছে কিনা, অথবা আমার এই উৎসুকতা তার কানে ভাল ঠেকবে কিনা,—এ সম্বন্ধে আমার অনিশ্চয়তা আছে। তা ছাড়া আমার ধারণা, আগাগোড়া ব্যাপারটা এবার বোধ হয় সামাজিক নোংরামিতে ঘুলিয়ে উঠবে। ওরা দুজনেই যখন আমার সান্নিধ্য এড়িয়ে এবং আমাকে না জানিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিল, তখন আমারও উচিত এ ব্যাপারে মাথা না গলানো। আর যাই হোক, ওরা রেজেষ্টারী করা স্বামী-স্ত্রী,—এবং আমি সেখানে বাইরের লোক।

বোম্বাই মেল ছাড়বার পর ভাবছিলুম, হেনার কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ছিল, প্রণয়ঘটিত কোনও ব্যাপার নিয়ে নোংরা কানাকানি। একদিন সে আমাকে বলেছিল, নবেন্দুর মনের গর্তে মস্ত এক সাপের বাসা আছে। তুমি দেখো, সেই সাপ একদিন উদ্যত ফণা ধরে বেরিয়ে আসবে। সে সুপুরুষ, উদার, বন্ধুবৎসল,—কিন্তু মেয়েমানুষের চোখ পুরুষকে ভুল করে না, পার্থ। পুরুষ চরিত্রের তলায় গোপন গর্ত আছে অনেক,—সামাজিক জীবনে আমরা তার সন্ধান পাইনে। মা তার ছেলেকে চেনে না, বোন তার ভাইকে চেনে না, প্রণয়িনী তার প্রণয়পাত্রকেও জানে না। কিন্তু স্ত্রী হয়ে স্বামীকে সে চিনে নেয় অতি অল্পকালে,—এমন কি একটি রাত্রেই!

হেনা কথায় কথায় বলত, জীবনকে নিয়ে জুয়া খেলতে আসিনি, পার্থ। একবার হেরে গেলে জেতবার লোভ আমাকে পেয়ে বসে না। লক্ষ নবেন্দু আসুক,—মুখের ওপরেই বলতে পারব, আমি মেয়ে বটে কিন্তু পুরুষের ভালবাসা ছাড়াও বাঁচতে পারব। দেশ পড়ে রয়েছে আমার, দুনিয়ার কাজ আমাকে ডাকছে,—ঘরে যদি আমার জায়গা না হয়, নাই হল! আমি টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ব সবখানে। দুঃখ পাই, বাধা পাই,—ভয়ের কিছু নেই। আমার মন এবং মানসের পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বাধীনতা যেখানে নেই, আমার বিচার এবং বিশ্লেষণ পথ যেখানে অবরুদ্ধ,—বিবাহিত জীবনের সেই অতল নরককুণ্ডে আমি কিলবিল করতে পারব না, পার্থ।

বোম্বাই মেল দ্রুতগতিতে অন্ধকারে ছুটেছিল। (—ক্রমশ)

এলোপাতাড়ি ইতিহাস

দুলকেশ দে সরকার

কোন জিনিসের সূচনাটুকু ভারী কৌতুক ও চমকপ্রদ। এই ধরুন, কলকাতা। কে-না জানে, গ্রামের সকল বৈশিষ্ট্যবর্জিত শহরের কলকাতার সূচনা সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রাম থেকেই। সুতানুটি তালুকের গায়েলাগা গ্রাম দুটোর নাম বাগবাজার আর হোগলকুরিয়া।

কলকাতা শহর পত্তনের সঙ্গে জব চার্ণকের নাম প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর সেই বৈঠকখানায় ব'সে আলবোলায় ধোঁয়া ছাড়ার মতই কলকাতা এলোপাথাড়ি গড়ে উঠেছে। হঠাৎ কর্তাদের খেয়াল গেল, এ ঠিক নয়, আগাছার মত ঘরবাড়ির বন সৃষ্টি করা বা হতে দেয়া কোন কাজের কথা নয়, ওতে ননারকম হানির আশঙ্কাই বেশী। তখন আইনের আওতায় আনা হ'ল কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনা।

১৬৯৮ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে যে-সময়ের ব্যবধান তাতে যেমন-তেমন একটা গল্প সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, শেষ পর্যন্ত যা হ'য়ে দাঁড়ায় অনাসৃষ্টি। অনাসৃষ্টি গজিয়ে উঠতে যে বেদনা, অনাসৃষ্টি অপসারণ বা উন্নয়নের বেদনা তার চাইতে অনেক বেশী।

তবু প্রত্যেক সূচনা ভারী কৌতুক ও চমকপ্রদ। ১৬৯৮ সালে ওয়ালস নামে ইংরাজ বণিক কোম্পানীর এক কর্মচারীকে ঔরঙ্গজেবের নাতি আজিম-আলসানের দরবারে পাঠান হয়। ঔরঙ্গজেবের এই নাতি তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বা আধুনিক পরিভাষায় রাজ্যপাল। তিনি ওয়ালসকে এক নিশান বা অনুমতিপত্র দেন। এই অনুমতিপত্রবলে ওয়ালস জমিদারদের কাছ থেকে ঐ গ্রাম কটি (মানে সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা) কেনবার অধিকার পান। কিন্তু নবাবকে বার্ষিক ১১৯৫ টাকা রাজস্ব দিতে হবে। এই গ্রাম তিনটির ব্যাপ্তি ছিল নদী বরাবর তিন মাইল এবং ভেতরের দিকে বা প্রশস্ততায় এক মাইল।

ডাঃ হ্যামিল্টন সম্রাট ফেররোখশেরের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭১৭ সালে তিনি সম্রাটের কাছ থেকে এক ফরমান পান। এই ফরমানবলে কোম্পানীর সব জমি-জমা পাকাপাকি হয়। ১৭৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার রাজ্যপালের কাছ থেকে কলকাতা পরগনার খাজনা-মুক্ত জমিস্বত্ব পান। ১৭৬৫ সালে শাহ-আলম কোম্পানীকে দেওয়ানী ও তাঁদের জমিদারী স্বত্ব মঞ্জুর করেন। ১৭৫৮ সালে ১৭৭২ অবধি কোম্পানী চাষীদের কাছে জমি-জমা দিয়ে খাজনা তোলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া ছিলেন এই গ্রামগুলোর তালুকেদার।

১৭৫৮ সাল থেকে ১৭৭২ সাল অবধি যাবার আগে বাংলাদেশের পক্ষে একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা আমরা পেছনে ফেলে যাচ্ছি। সে হচ্ছে পলাশীর যুদ্ধ। একথাটি না বললে, কলকাতার পরবর্তী ইতিহাস বড্ড বেখাপ্পা শোনাবে।

কেননা ফজল রুবীর মতে (বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট, এপ্রিল-জুন, ১৯১৬, দ্বাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগের ২৪নং সংখ্যার ২৫২ পৃঃ) ইংরাজেরা পলাশীর যুদ্ধে এদেশ পায়নি ; পেয়েছে সিরাজদ্দৌল্যার হাত থেকে কলকাতা উদ্ধারের পর ইংরাজ-নবাবে যে যুদ্ধ চলল তার শান্তিচুক্তিতে ; এই চুক্তিতে সিরাজদ্দৌল্যা স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং শান্তির চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৭৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী। প্রত্যেকে তখন ইংরাজকে, ইংরাজের কামান ও তরবারীকে ভয় করছে। পলাশীর যুদ্ধের পর তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হল। মীরজাফরের আমল পর্যন্ত তারা ছিল বণিক। মীরজাফরের মৃত্যুর পর দিল্লীর বাদশা স্বেচ্ছায়, তাঁর প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যার নবাব সুজাদ্দৌল্যা, মীরজাফরের উত্তরাধিকারী নজমুদ্দৌল্যা এবং দিল্লীর, বাংলার ও অযোধ্যার অভিজাত-বর্গ একযোগে ইংরাজদের দেশশাসনে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

ফজল রুবীর প্রবন্ধটি স্পষ্টতঃই ইংরাজের পক্ষে সুচতুর ওকালতি। কিন্তু কলকাতার প্রসঙ্গে এবং কলকাতা পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গে তিনি যেসব তথ্য দিয়েছেন সেগুলো ইতিহাস পুনরালোচনার পক্ষে অংকুশের কাজ করে। ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্রেয় বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের অথবা স্বদেশপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজের কপোল-কল্পিত অন্ধকূপ হত্যার কলঙ্ক-কালিমা বিমোচনে সিরাজের সমগ্র চরিত্রেরও পরোক্ষ কলঙ্ক-স্খালন করেছিলেন ; পরবর্তী-কালে নাট্যকারদের হাতে পড়ে সিরাজ হয়েছেন স্বদেশ-প্রেমের প্রতীক। এ-নিয়ে আজ যখন তর্ক উঠেছে তখন উৎসব উপলক্ষে সিরাজ নাটকটি নিছক তথ্যাতীত ভাবাবেগ বলে মনে হ'তে পারে। সিরাজও নতুন ক'রে আবিষ্কৃত হচ্ছেন। সেদিক থেকে ফজল রুবীর কথাগুলো শোনা যেতে পারে।

সিরাজদ্দৌল্যাকে নায়ক ক'রে তোলায় ফজল রুবী খুব উষ্মা প্রকাশ করেছেন। ইংরাজের বিরুদ্ধে দোষারোপ তাঁর মতে একান্তই অসঙ্গত। এইসব ভুল ইংরাজী-বাংলা-উর্দু ইতিহাস পড়ে "আমাদের সন্তানেরা" মীরজাফরকে বিশ্বাসঘাতক বলে জানছে এবং তাঁকে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সম্বন্ধেও

একটা খারাপ ধারণা জন্মাচ্ছে। ফজল রুবী স্বীকার করতে রাজী নন যে, মীরজাফর ইংরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে সিরাজকে মেরেছেন, অথবা মীরজাফরের কারসাজিতেই ইংরাজ পলাশীর যুদ্ধে জিতেছে ও অন্যায়ভাবে সিরাজকে হত্যা করেছে। একথাও তিনি স্বীকার করতে রাজী নন যে মীরজাফর দেশবাসীর হাত থেকে দেশটি স্বায়ত্তে এনে বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছেন অথবা মীরজাফরের যোগসাজসে ইংরাজ ভারতবর্ষ পেয়েছে। সিরাজ ১৭ বা ১৯ বছরের তরুণ ছিলেন একথাও ফজল রুবীর মতে ঠিক নয়, অপরের মুখে কলঙ্ক লেপনের জন্যই এরকম বয়সের পরিমাপ করা হয়েছে। আসলে সিংহাসন আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল সাতাশ।

ফজল রুবী বলছেন, সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণ, কি পার্শী কি ইংরাজ সকলেই তাঁর অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বলে তিনি সির-উল-মুতাখেরিন, মুজাফফর নামা, ওরমে, নানাপ্রকার চিঠিপত্র, চুক্তি, ফার্মান সনদ, দলিলপত্র উদ্ধার করেছেন। মূল উদ্দেশ্য, মীরজাফর ও ইংরাজদের সিরাজ সম্পর্কে দোষমুক্ত করা।

সির-উল-মুতাখেরিন উদ্ধার ক'রে তিনি দেখাচ্ছেন : আলিবর্দী খাঁর এই প্রাণপুত্তলি রাস্তার এমাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত যাচ্ছেতাই গালগল্প ক'রে বেড়াত আর এমন সব কাজ করত যে, লোকে তাজ্জব হ'য়ে যেত। সে দলবেঁধে ঘৃণ্য জীবন যাপন করত, বয়সেরও বিচার ছিল না, মেয়ে-পুরুষেরও বিচার ছিল না। বরং বহু আয়াসে ও ঝুঁকি নিয়ে প্রতিষ্ঠাতা যে সমৃদ্ধি ও সার্বভৌমত্ব গড়ে তুলছিলেন তার ধ্বংসের পথ সুগম করাই যেন ছিল এ সবের লক্ষ্য। এই অপরাধপ্রবণ চরিত্রের দিকে দৃকপাত করারও কেউ ছিল না ; ফলে, পরোক্ষে আস্কারা পেয়ে তা শুধু বেড়েই চলে। আলিবর্দী খাঁর ঔদাসীন্যে এর প্রকৃতি অসঙ্গত কার্যানুষ্ঠানে নির্ভয় হ'য়ে উঠল, তাতে না ছিল অনুতাপ, না কোন মহলের ভর্ৎসনা। কি নর, কি নারী, তার কামনার শিখায় ক্রীড়ার বস্তু ছিল ; বিভিন্নমুখী অনুরাগ-বিরাগে তার অভিব্যক্তি হ'ত। তার মানসিকতার অনুরূপ মানুষের ভীড় বাড়ল তার আশেপাশে, ফলে ঔদ্ধত্য, অমিতাচার সীমাহীন হয়ে পড়ল। তার প্রকৃতিতে এগুলো এমনই সহজ হ'য়ে গেছল যে, কোন একটা অসঙ্গত অনুষ্ঠান না করতে পারলেই সে বিষণ্ন হ'য়ে পড়ত। অথচ এই বিষণ্ন মুহূর্তে একবারও তার কোন কৃতকার্যের স্মৃতি তার চিত্তে অনুশোচনার লেশমাত্র দাগ কাটতে পারেনি। ধর্ম অধর্ম সম্পর্কে চেতনাহীন এবং নিকটতম আত্মীয় সম্পর্কেও বোধশূন্য এই মানুষটির সর্বক্ষণের সহচর ছিল অনাচার; কারও মর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তার গার্হস্থ্য পবিত্রতা অনায়াসে ক্ষুণ্ন করত।

ফজল রুবী কাসিমবাজারে ফরাসী কারখানার প্রধান মঃ ল'কে সাক্ষ্য মেনেছেন। তিনি বলছেন, সিরাজের বয়স ২৪-২৫ হবে ; দেখতে অত্যন্ত সাধারণ। আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর আগে সিরাজ-চরিত্রের বিশেষ কুখ্যাতি ছিল। ব্যাভিচার ও নিষ্ঠুরতার কুখ্যাতি। হিন্দু মেয়েরা গঙ্গায় স্নান করত, সিরাজ চরমুখে খবর পেয়ে সুন্দরীদের নৌকাযোগে হরণ করাতেন। ফেরী-নৌকো উল্টে দিয়ে কেমন ক'রে সাঁতার না জানায় নর-নারী, শিশু ডুবে মরে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন। যদি কোন পদস্থ ব্যক্তিকে অপসারণের দরকার হ'ত, সিরাজ স্বয়ং সেক্ষেত্রে উদ্যোগী হতেন এবং আলীবর্দী খাঁ বহু দূরবর্তী উদ্যানে আশ্রয় নিতেন। লোকে সিরাজের নামে কাঁপত।

সিরাজদ্দৌল্যা অত্যন্ত বিত্তবান নবাব ছিলেন। পূর্ববর্তী তিন নবাবের প্রচুর সোনা, রুপো ও জহরতের মালিক ছিলেন তিনি। তথাপি ঐশ্বর্যের লালসা ছিল তাঁর অপরিসীম। কোন বিশেষ খরচের মুখে পড়লে তিনি সেজন্য চাঁদা আদায় করতেন। এই ব্যাপারে তিনি আত্মীয়-স্বজনকেও রেহাই দিতেন না। তাঁর ধারণা ছিল ইংরাজের বিত্ত অপরিমেয়। লোকে তাঁকে ভয় করত, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন ভীরু।

সিরাজের বদলে কাকে নবাব করা যায়, ইংরাজ ও শেঠেরা যখন এই চিন্তা করছে, তখন তাদের দৃষ্টি পড়ল মীরজাফরের ওপর। মীরজাফর ছিলেন সেনাবাহিনীর বক্সী ও স্ত্রীর দিক থেকে সিরাজের নিকট আত্মীয়। তাঁর সমর্থন ছাড়া সিরাজ কখনো নবাব হ'তে পারতেন না। তিনি আলীবর্দীর অত্যন্ত অনুগত ছিলেন ; তাঁর কথা স্মরণ করে তিনি সিরাজের অনাচার সহ্য করতেন ; ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। সিরাজ দিল্লীশ্বরকে মানতেন না, বিদ্রোহ করেছিলেন।

ফজল রুবী বলছেন, মীরজাফর কক্ষনো সিরাজের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি বা বক্সী ছিলেন না। ছিলেন আলীবর্দী-বাহিনীর। তিনি সিরাজের সঙ্গে আদৌ পলাশীতে যাননি। সিরাজের সঙ্গে ছিলেন সেনাপতি মীরমদন ও দেওয়ান মোহনলাল। মনসবদার হিসাবে মীরজাফরের ৪০০০ সৈন্য ছিল। সিরাজ পলাশীতে গেলে মীরজাফর তাঁর পেছনে যান এবং পলাশী থেকে দু-মাইল দূরে থাকেন। মনসব মানেই-হচ্ছে তিনি সনদে নির্দিষ্ট সৈন্যবল রাখতে পারতেন, এজন্য একটা জায়গীর থাকত এবং প্রয়োজনে রাজাকে সাহায্য করতেন। মীরজাফর ও দুর্লভরাম—দুজনেই মনসবদার ছিলেন। দুর্লভরামের সেনাবল ছিল ৫০০০। জগৎ শেঠের অধীন ইয়ার খাঁর ছিল ২০০০ সৈন্য। মোট ১১,০০০। মীরজাফরের আয়ত্তে এই সেনাবাহিনী পলাশী যুদ্ধে একান্ত পৃথকভাবে অবস্থান করছিল। সিরাজদ্দৌল্যার অসন্তুষ্ট সেনা ও সর্দাররাও মনেপ্রাণে মীরজাফরের সামিল ছিল। মীরজাফর পলাশীতে এজন্য গেছলেন যে, যদি সিরাজ জয়ী হন তো দেশ ছেড়ে যাবেন। পলাশীর আগেই দুজনের মনোমালিন্য চরমে উঠেছিল, কেউ কাউকে বিশ্বাস করতেন না। দেশের অভিজাতবর্গেরাও আপন আপন সম্পদ-সম্পত্তি রক্ষায় সিরাজের বিরোধী ছিলেন; আর ইংরাজেরাও তো দেশ জয়ের জন্য পলাশীতে যুদ্ধ করেনি। পলাশীর পর সবাই মীরজাফরকে কুর্নিশ জানান, সিরাজ যখন পালিয়ে মুর্শিদাবাদ গেলেন তখন কেউ তাঁর সঙ্গে গেলেন না। তাই তাঁকে মুর্শিদাবাদও ছাড়তে হ'ল। দিল্লীর বাদশা দ্বিতীয় আলমগীরও সিরাজের আচরণে চটে ছিলেন, সৌকৎ জঙ্গকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু সৌকৎ সিরাজের হাতে নিহত হন। তাই এবার যখন সিরাজের পরাজয় সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি মীরজাফর ও ক্লাইভকে উপাধি ও উপঢৌকন পাঠালেন। মীর মুহাম্মদ জাফর খাঁকে যে হীরকখচিত তরবারি দিয়েছিলেন সেটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আছে। মিঃ ওয়াটসও বাদশার আশীর্বাদ লাভ করেন; মীরজাফর আর ইংরাজের সঙ্গে ইনিই কিন্তু পরে সে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল।

যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং পলাশীর আগেই সন্ধিসর্তের ব্যবস্থা করেন।

তখন বাংলার অভিজাতেরা ছিলেন দুই শ্রেণীরঃ (১) যাঁরা খোদ বাদশাহের আশীর্বাদ পেতেন, (২) যাঁরা সুবাদারের আশীর্বাদ লাভ করতেন। মীরজাফর, দুর্লভরাম, জগৎশেঠ, এরাজ খাঁন প্রভৃতি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর, আর মোহনলাল, মীরমদন ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর [illegible] সিরাজের সঙ্গে [illegible] না।

ঘসিটি বেগমের কাহিনীটিও সিরাজের খুব অনুকূলে নয়। ঘসিটি বেগম ছিলেন সিরাজের বড় মাসী, সিরাজের মা ছিলেন আমিনা বেগম। সিরাজ ভাবলেন বড় মাসী আলীবর্দী মারা গেলে দাবী তুলতে পারেন। সিরাজ দিনের বেলায় বড় মাসীর বাড়ি গিয়ে তাঁর ম্যানেজার হোসেনকুলি খাঁকে হত্যা করলেন। ম্যানেজারের ভাইকেও। মসনদে বসে বড় মাসীকে গৃহচ্যুত ও তাঁর সম্পদ লুন্ঠন করেন। দেওয়ান রাজবল্লভকে বন্দী করেন। পুত্র কিষেণদাসকেও নজরে রাখতে চাইলেন মুর্শিদাবাদে। কিষেণদাস ঢাকা থেকে সপরিবারে পালালেন এবং কলকাতায় ইংরেজের আশ্রয়ে এলেন। ইংরেজকে সিরাজ বললেন, কিষেণকে দাও; ইংরেজরা বলল, না। সিরাজদ্দৌলা কলকাতা অভিযান করলেন, দখলও করলেন, কারখানা পোড়ালেন, সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ইংরেজদের মারলেন। মীরজাফরকে আচ্ছা রকম অপমান ক'রে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করলেন। মীরমদন প্রধান সেনাপতি হলেন। মহারাজ দুর্লভরামের পদাবনতি ঘটিয়ে মোহনলালকে দেওয়ান করলেন। মীরজাফর, দুর্লভরাম ও জগৎ শেঠের ওপর আদেশ হ'ল মোহনলালকে নজর দিতে। শেষের দুজন রাজী হলেন, মীরজাফর নয়। সিরাজদ্দৌল্লা যেদিন শুনলেন সৌকৎ জং রাজদরবারে ফারমান পেয়েছেন তখন তিনি জগৎ শেঠের কৈফিয়ত তলব করলেন, কেন দিল্লী দরবারের প্রাপ্য পাঠিয়ে ওটা আনা হয়নি। শেঠ বললেন, এমন তো আদেশ ছিল না। কষে এক চড় মারলেন সিরাজ জগৎ শেঠের গালে, বললেন, পাঠাও দিল্লীতে তিন কোটি টাকা। কোথায় অত টাকা? সিরাজ বললেন, আটদিনের মধ্যে ও টাকা না জোগাড় হ'লে শেঠের ছুন্নৎ হবে। শেঠ বন্দীও হলেন। মীরজাফর পূর্ণিয়া থেকে আসার পথে বৃত্তান্ত শুনলেন, মুর্শিদাবাদে পোঁছে সদলে জগৎ শেঠের মুক্তি দাবী করলেন। দ্বিধাগ্রস্ত সিরাজ শেঠের মুক্তিদানে বাধ্য হলেন। মীরজাফর একথাও শাসিয়ে রাখলেন, আপনি যদি দিল্লীর দরবারে বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী ফারমান না পান, আপনার হয়ে আর আমরা অসি-মুক্ত করব না। সিরাজ এ ফারমানও পাননি, মীরজাফরের হুমকিও সত্য হয়েছে।

পলাশী যুদ্ধের আগে অবধি দেশকে ইংরেজের হাতে তুলে দেয়ার আয়োজন মীরজাফর করেননি, ইংরেজদেরও এদেশ দখলের ইচ্ছে ছিল না। তাঁর সঙ্গে ১৭৫৭ সালের ৪ঠা জুন যে সন্ধিসর্ত-নামা সম্পাদিত হয়েছিল তাতে এযাবৎ ইংরেজেরা যে সব অধিকার ভোগ করছিলেন তারই স্বীকৃতি ছিল মাত্র।
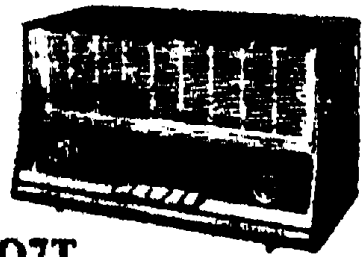
কিন্তু ফজল রুব্বী একথা স্বীকার করেছেন বা অস্বীকার করতে পারেননি যে, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে মীরজাফর ইংরেজের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। এই ষড়যন্ত্রে বাংলার সকল অভিজাত ও পদস্থ ব্যক্তিই ছিলেন। সবাই কলকাতায় দূত পাঠিয়েছিলেন এবং সম্মিলিত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করে ইংরেজকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মীরজাফর ও ক্লাইভ যে সব ছল-চাতুরী বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন, ফজল রুব্বী বলছেন, ওসব এমন অবস্থায় হয়েই থাকে। ফজল রুব্বীর এ সব কথায় বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, সিরাজকে পদচ্যুত করাই ছিল লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যে বাংলার তৎকালীন অভিজাতবর্গ সামিল হয়েছিলেন, কারো চিত্তে বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম ছিল না ব'লে শক্তিমান ইংরেজের হাতে গিয়ে যে দেশ পড়বে এভাবনাও তাঁদের ছিল না। তাঁরা সবাই ইংরেজের সাহায্য চেয়েছেন, সুতরাং সেখানে যে হীনমন্যতা কাজ করেছে, তাই সর্বনাশের মূল হয়ে রইল। সিরাজের অজস্র ঘৃণ্য অপরাধ সত্ত্বেও দেশকে যে সে বিদেশীর হাতে বিলিয়ে দেয়নি, এতেই ইতিহাসে তার সকল দোষ স্খালন এবং মীরজাফরের শত গুণ সত্ত্বেও সংগত কারণেই তিনি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিমূর্তি হয়ে আছেন। অভিজাতবর্গের মধ্যে মীরকাসিম ও মহারাজ নন্দকুমারও ছিলেন, কিন্তু বহু বিলম্বে ঘুরে দাঁড়িয়েও তাঁরা ইতিহাসের সম্মান অর্জন করেছেন। ফজল রুব্বী সিরাজের যৌনলিপ্সা বা নৃশংসতার দিকটা তুলে ধরে মীরজাফরের বা ইংরেজের দোষ ঢাকতে চেয়েছেন, মীরজাফরের অথবা যে কোন দেশসন্তানের ঘৃণ্যতম অপরাধ যে দেশস্বার্থহানিকর, সেদিকটা আদৌ বিচার করেননি। সিরাজ কিছু নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করেছে, পরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে, মানুষের রূপে পশুর আচরণ করেছে— কিন্তু মীরজাফর সর্বশক্তিহৃত হয়ে এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে 'ক্লাইভের গর্দভ' হয়ে সারা দেশের বহু নর-নারীর, বহু পরিবারের দাসত্বজীবনের লাঞ্ছনা এনে দিয়েছেন।

যাকগে সে ইতিহাস, আজকের কলকাতা সে কলকাতা নয়, কিন্তু কলকাতার ভূখণ্ডটি পলাশীর পরে পরেই পাকাপাকি দেশবাসীর হাত ছাড়া হয়ে গেল। এই ভৌগোলিক ভূখণ্ডেই তিন শতাব্দী ধরে আজকের কলকাতা গড়ে উঠেছে। বহুদিন এই গড়ে ওঠায় পরিকল্পনা ছিল না—অন্তত দেড়শ' বছর তো ছিলই না। তার পর এল কলকাতা উন্নয়নের পরিকল্পনা।

বলুন তো কী?

প্রশ্ন

১। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ মহাসমুদ্র বা সমুদ্র সবচেয়ে অগভীর?

২। পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠ দেশবাসীদের সমুদ্র থেকে ১০০ মাইল দূরে থাকা অসম্ভব?

৩। আমাদের সৌরজগতে পৃথিবী থেকে ছোট তিনটি গ্রহের নাম কি?

৪। আমাদের পায়ে সর্বশুদ্ধ কয়টি হাড় আছে?

৫। মোটর গাড়ীর কার্বুরেটর কি কাজ করে?

৬। সবচেয়ে বৃহৎ প্রবাল পাহাড়ের সমষ্টি কোথায়?

৭। পৃথিবীতে কয়টি ভাষা আছে?

৮। কোন্ স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণী কখনও হাঁটে না এবং কোন্ সামুদ্রিক পাখী উড়তে পারে না?

৯। পাহাড় থেকে কি আঁশযুক্ত জিনিস তৈরী হয়?

১০। মস্তিষ্কের কোন্ জিনিসে চিন্তাশক্তি থাকে?

[উত্তর অন্যত্র আছে]

খরদে মাঝি

ফটো : শ্যামল বসু

প্রত্যুপকার
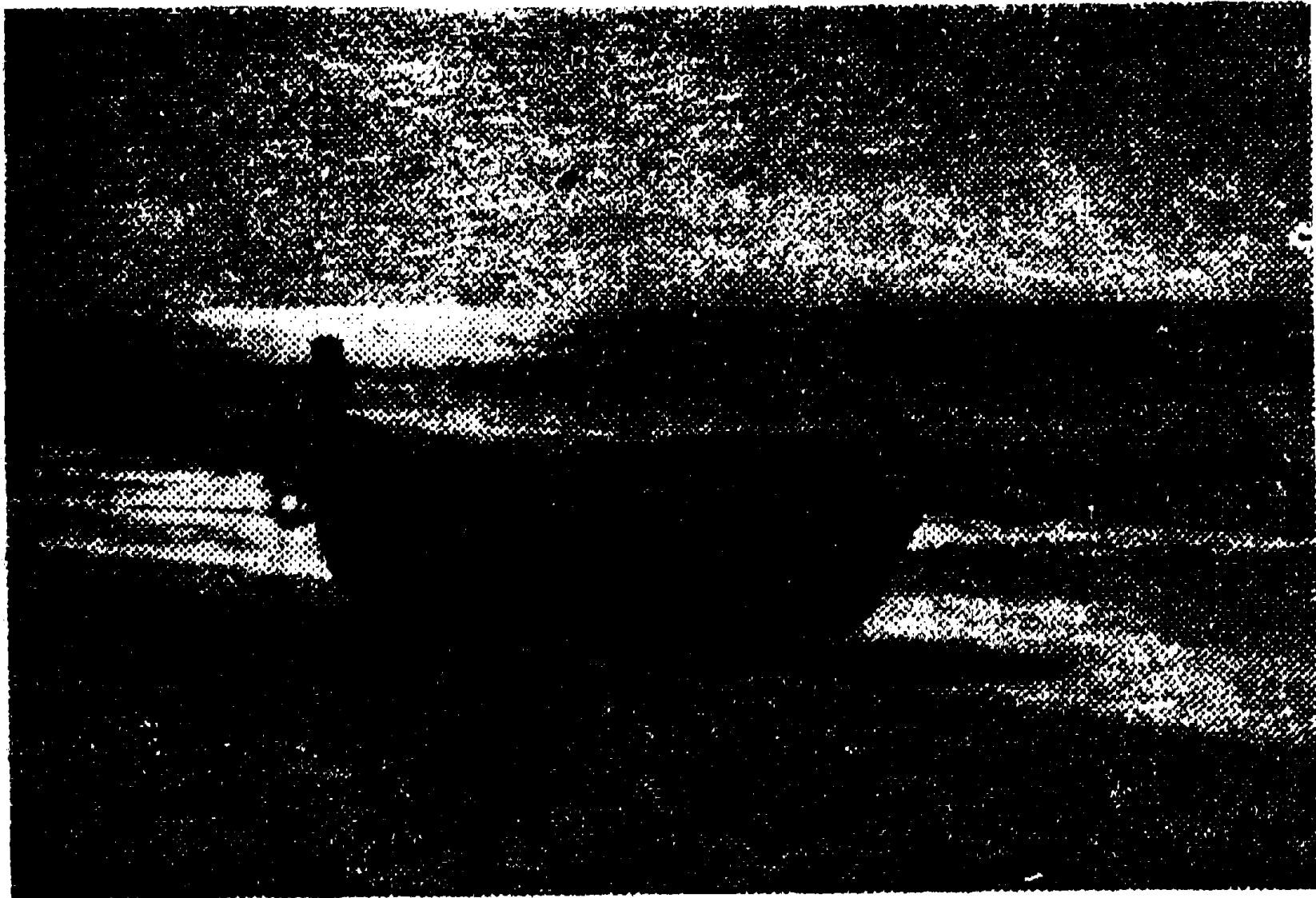
গজেন্দ্র কুমার মিত্র

ব্রজনাথবাবু যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়েই নিচে নামলেন। ষাটের ওপর বয়স হয়েছে তাঁর—একথাটা যেন কারুরই মনে পড়ে না। নিজের স্ত্রীরই যদি মনে না পড়ে তো আর ঘরের কাছ থেকে সে বিবেচনাটা আশা করবেন তিনি? এই সবে বাজার করে বাড়ি ফিরেছেন, এখনও আহ্নিক পুজো কিছু হয়নি অর্থাৎ বাসি মুখে জল পড়েনি। ভোরে এক কাপ চা খেয়েছেন, তারপর থেকে চলছে যাবতীয় সাংসারিক কাজ। ছুটোছুটি করে গৃহিণীর ভাঁড়ারের কাছ হয়ে, বাজার সেরে এইতো ফিরছেন তিনি, গায়ের ঘামটা একটু না শুকোলে স্নান করা যায় না। স্নান করে পুজো সারলে তবে একটু কিছু মুখে দিতে পারবেন। এসব 'ফ্যাচাং' ছিল না, এও ঐ গৃহিণীর জন্যই; দীক্ষা দীক্ষা করে পাগল হয়ে উঠলেন একেবারে। তাও নিজে নিলে শুধু হবে না, তাঁকে সুদ্ধ ঐ প্যাঁচে ফেলা চাই। কেনরে বাপু! যেতে হয় স্বর্গে তুমি যাও, আমার অত শখ নেই! একথা অন্তত একশটিবার বলেছেন, কিন্তু শোনে কে। দিনরাত ঘ্যান ঘ্যান সহ্য হয় না। বিরক্ত হয়েই শেষে মত দিতে হয়েছে।

ঈশ্বরকে তো তিনি ঢের ডাকলেন। কালীঘাটের কালী, বাবা তারকেশ্বর থেকে শুরু করে মৌলালির বড় পীর সাহেব—এককালে সবাইকেই মানতেন। প্রকাশ্যে গোপনে ঢের পুজো বা সিন্নি চড়িয়েছেন তিনি। কী ফল হল? তাঁর মুখ কেউ চাইল? আজ এই বয়সে এমন ছুটোছুটিই বা করতে হবে কেন? মরা হাজা একটা ছেলে আর একটা মেয়ে—কী কাণ্ডই না করেছিলেন ওদের জন্য। যাকে বলে এক পিঠ রুইকে আর এক পিঠ ভুঁইকে দিয়ে মানুষ করেছেন। ভাল সরকারী চাকরি করতেন ঠিক কথা—কিন্তু তবু ঠিক অত টাকা ব্যয় করার মত অবস্থা তাঁর ছিল না, সাধ্যের অতিরিক্তই খরচ করেছেন তিনি। ছেলে-মেয়ে দুজনকেই বিলেত পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তার ফল কী হল? বিপুল দেনা মাথায় নিয়ে রিটায়ার করতে হল। আজ দেখবার কেউ নেই, অসুখ হলে মুখে জল দেবার না। একটা রাতদিনের চাকর রাখার ক্ষমতা নেই তাঁর—যাঁর বাড়িতে একদা তিন চারজন ভৃত্য ছিল। খালি বাড়িতে বুড়োবুড়ী দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দিন কাটান। এই বয়সে আর একটা চাকরির জন্য ছুটোছুটি করতে হচ্ছে, যদি কিছুও একটা মিলে তো একটা ঠাকুর বা কম্‌বাইণ্ড হ্যাণ্ড রাখতে পারেন, স্ত্রীর চিকিৎসাটাও ভাল করে হয়। তা তাঁর এই কষ্ট দেখছেই বা কে, বুঝছেই বা কে!

স্ত্রীই এসে খবরটি দিলেন, 'ওগো দ্যাখো একটি ছেলে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে। নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়।'

'ছেলে? কী রকম ছেলে? কত বড়?' ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন ব্রজনাথ।

'তা বয়স—মানে আমার খোকার বয়সী হবে। কী দু এক বছরের ছোট।'

এই তুলনাটাতে যেন আরও জ্বলে উঠলেন ব্রজবাবু। প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই চাকরির ধান্দা। বলে দাও, ওসব হবেটবে না। আমি রিটায়ার করেছি, এখন আর আমার কোন ক্ষমতাই নেই। বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া সাপ হয়ে বসে আছি!'

'সব বলেছি, কিন্তু কিছুতেই শুনছে না। খুব কাকুতি মিনতি করছে। বলছে, অন্য একটু দরকার আছে। পাঁচটি মিনিট সময় চাইছে শুধু। যাও না বাপু একবার। শুনেই এসো না।'

একেবারে যেন ক্ষেপে উঠলেন ব্রজনাথবাবু, 'আমি পারব না। পারব না। ব্যস! সাফ কথা আমার! আমি কারুর বাবার চাকর নই যে, বললেই শুনতে হবে। আমার শরীর আর বইছে না। আর বয় না। বওয়া সম্ভব নয়।'

স্ত্রীও ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তোমার স্বভাব বাপু আজকাল বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কেউ বাপ বললেও জবাবে শালা বলে ওঠো। নিচেই তো নামবে এখুনি চান করতে—দু মিনিট আগে নামলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে তাই শুনি। ......কত কী দরকার থাকতে পারে—একটা ভদ্দরলোকের ছেলে অমনভাবে হাত জোড় করছে, শোনই না একবার। উপকার কিছু না করতে পার নাই করলে, কিন্তু একবার দেখা পর্যন্ত না করে অমন কুকুর বেড়ালের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক? দিতে হয় তুমি দাওগে। আমি পারব না। ...মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়েই আছে।...ওঁরই ঘা লেগেছে, আর আমার লাগেনি? আমি মা নই, আমি তাদের দশ মাস দশ দিন পেটে ধরিনি—না?' ইত্যাদি ইত্যাদি। গজ গজ চলতেই থাকে।

অগত্যা নামতে হয় ব্রজনাথকে। আর কিছু না হোক এই গজগজানি থেকে অব্যাহতি পেতেও অন্তত॰

নেমে এসে দেখলেন, ছেলেটি তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। না, তাঁর ছেলের চেয়ে বরং কিছু ছোটই হবে। বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। আজকালকার চালে কাটা পোশাক নয়, নেহাৎই ধুতি পাঞ্জাবি পরা। সাধারণ বাঙালী ধরনের চেহারা, বেশ বিনয়ী এবং নম্র বলেই মনে হয়। উচুংগা উগ্রচণ্ডী গোছের নয় অন্তত।

চেহারা ও ভাবভঙ্গী দেখে নিজের অজ্ঞাতেই মনটা নরম হয়ে আসে। তবু ভ্রূ কুঁচকেই প্রশ্ন করেন, 'কী চাই আপনার?'

ছেলেটি এগিয়ে এসে নমস্কার করে বলে, 'আপনিই ব্রজনাথবাবু? নমস্কার। আপনাকে একটু অসময়ে বিরক্ত করলুম মনে হচ্ছে, তা যদি হয় তো মাপ করবেন। একটু বিশেষ প্রয়োজনেই

এসেছি অবশ্য। কিন্তু তার আগে আমার পরিচয়টা বোধ হয় দেওয়া দরকার—।'

ছেলেটি কিছু কুণ্ঠার সঙ্গেই যেন বলে কথাগুলো। কিন্তু বাচনভঙ্গী বেশ পরিষ্কার। সে কথাটা অসমাপ্ত রেখেই বাড়ির দিকে চায়।

এ চাহনির অর্থ না বোঝবার কথা নয়। অর্থাৎ কোথাও একটু বসতে পারলে ভাল হত।

ভ্রূ অধিকতর কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তবু বলতেই হয়—অভ্যস্ত মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে যায় কথাটা—'ভেতরে এসে বসুন—। তবে অবশ্য বেশী সময়—মানে আমি এখন স্নান করতে যাচ্ছি।'

'না, বেশী সময় নেব না।'

ছেলেটি একরকম তাঁকে পাশ কাটিয়েই ভেতরে বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢোকে। কিন্তু বসে না, বসার চেয়ে নিরিবিলিটাই বোধ হয় তার বেশী দরকার। বুকপকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা চিঠি বার করে ওঁর হাতে দিয়ে বলে, 'দেখুন তো এটা চিনতে পারেন কিনা!'

ব্রজনাথবাবু চিঠিটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে থাকেন অনেকক্ষণ।

হ্যাঁ, চিঠিখানার সঙ্গে একটা কি বিচিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের মধ্যেকার অনুভূতির সমুদ্রে প্রচণ্ড তরঙ্গ উঠেছে, সুবিপুল ঢেউএ ফুলে উঠেছে প্রবল একটা আবেগ। কিন্তু মনে পড়ছে না কিছু।

সাধারণ একটা চিঠি। তাঁর ভগ্নী-পতির হাতের লেখা। তাঁকেই লেখা। খামের অভাবে কাগজখানাই ভাঁজ করে ওপরে নাম-ঠিকানা লিখেছিলেন। অর্থাৎ কারুর হাত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।

অনেকক্ষণ চিঠিখানা হাতে করে সামনের রাস্তাটার দিকে চেয়ে ভাবলেন ব্রজনাথবাবু। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'ঠিক তো মনে করতে পারছি না। এ চিঠি আপনার কাছে কী করে গেল? আপনার পরিচয়টা পেলেও বুঝতে পারি।'

'আমার পরিচয় যদি ঐ চিঠিটা থেকে না পান তো, নাম বললে পাবেন না। এমন কি বাবার নাম-ঠিকানা বললেও কিছু বুঝবেন না। থাকগে—মিছিমিছি বিরক্ত করলুম আপনাকে। আচ্ছা আসি। নমস্কার।'

কিন্তু ততক্ষণে চোটটা খুলে ফেলেছেন ব্রজনাথবাবু।

ভগ্নীপতিরই চিঠি। ভাগ্নেকে দিয়ে পাঠানো। ওঁদের সকলকে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন। সামান্য সাধারণ দু ছত্র চিঠি।

তবু মনে পড়েছে তাঁর। তারিখটার দিকে নজর পড়তেই মনে পড়েছে। বারো বছর আগের চিঠি। সরস্বতী পুজোর ভাসানের দিন লেখা। শীতল-ষষ্ঠীর দিন ওঁদের বাড়িতে উনুন জ্বলে না—তাই প্রতি বছরই এইদিন ওঁদের নিমন্ত্রণ করতেন যোগেশবাবুরা। আমৃত্যু করেছেন। এমনি করেই চিঠি লিখে পাঠাতেন বরাবর—কখনও ছেলেকে দিয়ে কখনও বা চাকরকে দিয়ে। এ সে-ই অগণিত চিঠিরই একটি।

না, স্মৃতিটা চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে জড়িয়ে নেই।

জড়িয়ে আছে তারিখটার সঙ্গেই।

চিঠিটা দেখেই যে তাঁর আবেগ এমনভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, তার কারণ এই চিঠির সঙ্গে যে স্মৃতি বিজড়িত আছে, সেটা বড় সামান্য নয়।

ছেলেটি আগের মতই ওঁকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ব্রজনাথবাবু কথা বলার শক্তির অভাবেই প্রধানত, তার জামার একটা প্রান্ত ধরে টেনে তাকে নিবৃত্ত করলেন। তারপর কোনমতে কেমন একরকমের আবেগ-বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'এবার মনে পড়েছে। বসুন আপনি। অনেকদিনের কথা তো, চট করে তাই মনে করতে পারিনি।'

ছেলেটি মিষ্টি হেসে ফিরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। ব্রজনাথবাবুরও তখন আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। তিনি পাশের সেটীটায় বসে পড়ে বললেন, 'তা আপনি এর আগে যোগাযোগ করেন নি কেন? আমার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই?'

'যোগাযোগ মানে—বকশিশ নিতে আসা তো। বড্ড লজ্জা করত। নেহাৎ এবার প্রাণের দায়েই তাই, এতকাল পরে এই সামান্য সূত্র ধরে পরিচয় ঝালাতে এসেছি। মোদ্দা আপনি আমাকে আপনি-আজ্ঞে করবেন না। আমি আপনার ছেলের বয়সী হব।'

আর একটু হাসল সে।

ছেলের বয়সী নয়, তার চেয়ে বরং ঢের ছোটই হবে, মনে মনে ভাবলেন, ব্রজনাথবাবু। তার বড় ছেলেটা বেঁচে থাকলে আজ সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছর বয়স হত। যে বেঁচে আছে, তারও বয়স এর চেয়ে বেশী। আটাশ ঊনত্রিশ তো বটেই। বে-ওজর। এর আর কত বয়স হবে, বড় জোর ছাব্বিশ।

চুপ করে বসে রইলেন ব্রজনাথবাবু। আসলে কথা কওয়ার শক্তিই ছিল না।

অনেকদিন আগেকার স্মৃতি জেগেছে মনে। বড় বেশী দিন আগেকার। তখন ছেলে ছিল প্রাণ, নয়নের মণি। পথ দিয়ে হেঁটে গেলে বুকে বাজত। পর পর চারটি ছেলে শৈশবে মারা যাওয়ার পর এইটি বেঁচে ছিল—এই তারক। তারক-নাথের দোরধরা ছেলে। তাই দিনেরাতে কখনই ওকে চোখ ছাড়া করতে মন চাইত না।

যেদিনের চিঠি এটা—সেদিনের কথা তো মনেই আছে। ছেলে তখন ইস্কুলে ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। ওদেরই সেবার সরস্বতী পুজোর পালা। ছেলে বলেছিল, 'ভাসান দিয়ে ফিরে আমি সোজা পিসেমশাইয়ের কাছে চলে যাব, তোমরা আগে বেরিয়ে যেও।'

তাই গিছলেন ব্রজনাথবাবু, কিন্তু গিয়ে সুস্থির হতে পারেন নি। ছুটে চলে এসেছিলেন আহিরীটোলার ঘাটে, ওদের ইস্কুলের ঠাকুর এইখানেই ভাসান হয় তিনি জানতেন। ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন ওদের। যথাসময়েই এসেছিল ওরা, সোমু ওঁর ছেলেই ছিল পাণ্ডা, হাঁকডাক করে লরী থেকে ঠাকুর নামানো, লোকজন বাজনাবাদ্যি ঠিক করে গুছিয়ে নেওয়া, ইস্কুলের ছেলেদের প্রতিমার আগে পিছে লাইন বেঁধে দেওয়া—এসবই করছিল সোমু, সোমনাথ। দূরে থেকেই দাঁড়িয়ে দেখছিলেন ব্রজনাথ। ছেলে তাঁকে দেখতে পায়নি, তিনিও দেখা দেননি। তাঁকে দেখলে হয়ত একটু কুণ্ঠা বোধ করবে—সেই ভেবেই দেখা দেননি। দূর থেকে ছেলের নেতৃত্বশক্তি দেখছিলেন, উপভোগ করছিলেন বলাই উচিত। নেতৃত্ব করার শক্তি নিয়ে কেউ কেউ জন্মায়, ওটা মানুষের সহজাত ক্ষমতা। নিজের ছেলের মধ্যে সেই সুদুর্লভ শক্তির সহজ বিকাশ দেখে পুত্রগর্বে স্ফীত হয়ে উঠছিল তাঁর বুক, দেখে যেন আশ মিটছিল না, চোখ ফেরাতে পারছিলেন না।

তন্ময়, মুগ্ধ হয়েই দেখছিলেন। মন চলে গিয়েছিল বোধ হয় বহুদূরে

ভবিষ্যতে, নিজের একমাত্র পুত্রের জন্য উন্নতির সর্বোচ্চ শৃংগ রচনা করছিল তখন সে সম্ভব অসম্ভব কত কী স্বপ্ন দেখছিল। তাই কখন যে সোমু পা ঠিক রাখতে না পেরে হঠাৎ বেশী জলে গিয়ে পড়েছিল তা তিনি টের পাননি। অনেক লোকের ভিড়ে সে মাঝে মাঝে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছিল। সেই শেষ মুহূর্তেও ছেলের মুখটি হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি, ওপর দিকে চোখ রেখে অসংখ্য মাথার মধ্যে সেই বিশেষ মাথাটাকেই খুঁজছিলেন—না উৎকণ্ঠিত হয়ে নয়, উৎকণ্ঠার কারণ অতটা বুঝতেও পারেননি, দেখার সাধেই খুঁজছিলেন তাকে, নিচের দিকে সে পা পিছলে বেশী জলে পড়ে প্রথম ভাঁটার প্রবল টানে ভেসে চলে যাচ্ছে তা টের পাবার কথাও নয় তাঁর।

হৈ-চৈ চেঁচামেচিতেই তাঁর সেই আধো-জাগা স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। যখন অবহিত হলেন যে, একটা কিছু বড় রকমের বিপদ ঘটেছে কোথাও, তখন সোমু অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছে, হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে খরস্রোতে। তীরে প্রচণ্ড ভিড়, এই গোলমালে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি আরও বেড়ে গিয়েছে। সে ভিড় ঠেলে জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেননি ব্রজনাথ। পাগলের মত চিৎকার করা ছাড়া আর লোকজন সরাবার একটা বৃথা চেষ্টা ছাড়া কিছুই করতে পারেননি বস্তুত। আর যারা ছিল ওর সংগী এবং অন্য প্রতিমার সংগী তারাও ঐ কার্যটিই করতে পেরেছে শুধু, কারণ অনেকেই সাঁতার জানে না, তা ছাড়া ভাল কাপড়-জামার মায়াও আছে। মাঝিমাল্লাদের চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে সোমু বহু দূরে গিয়ে পড়েছিল। সেই অসহায় হট্টগোলের মধ্যে এই ছেলেটিই কিছুটা স্থিরবুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। সে ঘাটের ওপর দিয়েই যথাসম্ভব ছুটে গিয়ে পাশের আঘাটা—যেখানে ভিড় কম সেইখান থেকে লাফিয়ে পড়েছিল জলে এবং তীরবেগে সাঁতার কেটে গিয়ে ধরেছিল সোমুর চুল।

সোমু তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নেহাৎ সেও কিছুটা সাঁতার জানে তাই একেবারে প্রথমেই তলিয়ে যায়নি। কিন্তু এই প্রবল ভাঁটার টানের উজানে বাওয়ার মত সাঁতার সে জানত না, কী কৌশলে এ ক্ষেত্রে স্রোতের অনুকূলেই সাঁতার কেটে একটু একটু করে তীরের দিকে আসতে হয় তাও জানত না, অকারণ বৃথা হাঁকড়পাকড় করে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। আর দুটি মুহূর্ত দেরি হলেও বোধ হয় আর ওকে বাঁচাবার আশা থাকত না। কলকাতার গংগার ঘোলা জলে তলিয়ে গেলে দেখে তোলা মুস্কিল। অভ্যস্ত ডুবুরি ছাড়া সে কাজ প্রায় দুঃসাধ্য। অথবা বেড়াজাল ফেলে তুলতে হতো। কিন্তু সেসব আয়োজন করতে করতেই তো মরে যেত সোমু।

না, এই ছেলেটি সেদিন দৈব-প্রেরিতের মতই, সাক্ষাৎ দেবদূতের মতই এসে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সোমুর চেয়ে ছোটই বটে, তখন বোধহয় মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়স ছিল। কিন্তু সাঁতারটা জানত অসাধারণ রকমের ভাল। কী অনায়াসেই না সে চুলের মুঠি ধরে অর্ধ-অচৈতন্য সোমনাথকে পাড়ের দিকে নিয়ে এসেছিল। একেবারে উৎকণ্ঠাব্যাকুল বাপ ও শিক্ষকের হাতে তুলে দিয়ে দম নিতে থেমেছিল সে। ঈষৎ কৃতিত্বের সংগে অপ্রতিভতা মেশানো হাসি হেসে বলেছিল, 'অনেক জল খেয়েছেন ইনি, তাই রক্ষে, আমাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করতে পারেননি। নইলে মুস্কিল হত।'

তখন তার নামধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করার কথা মনে পড়েনি ব্রজনাথের। তখন বস্তুত কোন কথাই মনে পড়েনি। ছেলেকে শুশ্রূষা করে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টাও করছিল অপরে। তিনি শুধু অকারণে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন।

তারই মধ্যে ছেলেটি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল দেখে শুধু কোনমতে বলেছিলেন, 'বাবা দাঁড়াও একটু তুমি—আমি, মানে আমরা—'

'না, বাড়ি যাই! শীত তত নেই, তবু এই সন্ধেবেলা ভিজে কাপড়ে বড্ড কাঁপুনি ধরেছে। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পাল্টানো দরকার!'

ছেলেটি বরাবরই এমনি সপ্রতিভ। কাটাকাটা কথা। এখনকার কথাবার্তার সংগে মিলিয়ে মনে হল ব্রজনাথের।

ব্রজনাথ আরও ব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন, 'চল একটা গাড়ি করে পেঁ‌ৗছে দিই তোমাকে। কেউ একটা গাড়ি ডাকুন না, ছেলেকেও তো নিয়ে যেতে হবে।'

তাতে সে বলেছিল, 'না না গাড়ি-টাড়ির দরকার নেই, আমার এই পাশেই বাড়ি। চললুম আমি।'

চলেই যাচ্ছিল একদম। পাশ কাটিয়ে ভিড়ের বাইরেই গিয়ে পেঁ‌ৗচেছিল। তখন ঠিক কী করা উচিত, নামধাম পরিচয় নিয়ে ভবিষ্যতে গিয়ে ওর বাপমায়ের সংগে দেখা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, না এখনই ওকে কিছু পুরস্কৃত করা উচিত কিছুই ভেবে পাননি তিনি। নিতান্ত চলে যায় দেখে হঠাৎ তার মনে হয়েছিল যে, পকেটে তাঁর একখানা দশ টাকার নোট আছে। তিনি চট্ করে সেইটেই বার করে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, 'কিছুই তো করতে পারলুম না বাবা, এইটে নিয়ে যাও, অন্তত একটু মিষ্টি কিনে খেও—ভাইবোন মিলে—'

ছেলেটি অনর্থক প্রতিবাদ করেনি, টাকাটা ফিরৎ দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করেনি, একটু মুচ্‌কি হেসে টাকাটা মুঠো করে ধরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি ছেলেকে নিয়ে ভগ্নীপতির বাড়ি পেঁ‌ৗছে। পকেট থেকে কী একটা বের করতে গিয়ে দেখেছিলেন সেই দশ টাকার নোটটা অক্ষত থেকে গিয়েছে। ভাল করে চেয়েও দেখেননি তিনি, চিঠিটার কথা মনেও ছিল না সম্ভবত, নোট মনে করে সকালে পাওয়া ভগ্নী-পতির আমন্ত্রণ-পত্রটাই দিয়ে দিয়েছেন!

ছিঃ ছিঃ ছেলেটা কী ভাবল! কী অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন তাঁকে মনে করল সে। হয়ত ভাবল যে, তিনি ইচ্ছে করেই এই তামাশাটা করেছেন টাকা দেবার। নিজের ভুলের জন্য নিজেই গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছা করল ব্রজনাথের।

তারপর সত্যিই অনেক খোঁজ করেছেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন। দু' তিনটে ইংরেজী বাংলা দৈনিকে। কিন্তু হয় সে বিজ্ঞাপন ছেলেটির চোখে পড়েনি, নয়ত সে ইচ্ছে করেই যোগাযোগ করেনি। এখন, আজ, ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে শেষের অনুমানটাই ঠিক।

ব্রজনাথ নীরবে ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বহু-দিনের স্মৃতি যেন ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে মনের মধ্যে, অনেক রকমের পরস্পর-বিরোধী আবেগ ঠেলাঠেলি করছে সেখানে। কথা বলবার মত, সহজ কথা সহজভাবে প্রকাশ করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে কিছুটা দেরি হল। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় সাধারণভাবে প্রশ্ন

করলেন, 'বেশ। তা কী দরকার আপনার বলুন, এতকাল পরে কী মনে করে এলেন। আপনার নামটাও তো জানা হয়নি!'

'আমার নাম শ্রীপ্রদোষ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু আমাকে আর বারবার আপনি বলে লজ্জা দেবেন না!'

আর যাই হোক—ছেলেটির ভাবভঙ্গী কথাবার্তা কিন্তু আজকালকার উদ্ধত উচংগা ছেলেদের মত নয়। বেশ বিনয়ী, ঠান্ডা। হাসিটিও মিষ্টি। নামের আগে শ্রী বলার অভ্যাসটাও আছে এখনও।

অতি অল্পসময়ের মধ্যে অনেক কিছুই লক্ষ্য করলেন ব্রজনাথ। একটু নরম হয়েও এলেন। বললেন, 'তা একটু বোস বাবা—চা করতে বলি তোমার জন্য।'

'না না। ব্যস্ত হবেন না। এতবেলায় আর ওসব হাঙ্গামা করে লাভ নেই। চা আমি খেয়েই বেরিয়েছি। গরমের দিনে বেশী চা খেতে ইচ্ছাও করে না। আপনি বসুন।'

ছেলেটি বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অগত্যা বসেই রইলেন ব্রজনাথ। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁরও অত হাঙ্গামা করতে ঠিক ইচ্ছা করছিল না। পায়ের জোরটাও যেন বড্ড কমে গেছে অকস্মাৎ, এই গত কয়েকটি মিনিটে। ওঠাও কষ্টকর।

'তাহলে তোমার কী দরকার সেইটেই বল্ট এতকাল পরে—খোঁজ করে বার করলেই বা কী করে?

ছেলেটি একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে, সামনের দিকে অর্থাৎ একেবারে চেয়ারের প্রান্তে এগিয়ে এসে বসে যা নিবেদন করল, তার অসমার্থ হচ্ছে: ছেলেটি যে অফিসে কাজ করে তার একজন বড় কর্তাব্যক্তি হচ্ছেন ব্রজনাথের ছোট ভায়রা—চারুবিকাশবাবু। অবশ্য তাঁর সঙ্গে ওর যোগাযোগ খুবই কম—কখনও হবে তাও আশা করেনি। ও বি-এ পাস করে বহুকাল বসেছিল, সম্প্রতি বছর দুই হল চাকরিতে ঢুকেছে। ভাল চাকরি আর ভাল, সে আর আরও বাড়বে এই ভরসাতে তার মা ইতিমধ্যেই ওর এক বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন। এখন হঠাৎ হুকুম হয়েছে তার বদলীর। এবং সেও কাছেপিঠে কোথাও নয়, একেবারে বোম্বাই। বদলী হয় ওদের অফিসে পাঁচ বছরের জন্য—তার আগে আর ফেরার বা অন্যত্র বদলীর কোন প্রশ্ন ওঠে না। বাড়িতে বাবা আছেন, পেন্সন পান বটে যৎসামান্য, কিন্তু একেবারেই অশক্ত। এখনও একটি অনূঢ়া বোন আছে। মায়ের শরীরও ভাল নয়। স্ত্রী তো নিতান্তই ছেলেমানুষ, তায় নবাগতা। এ অবস্থায় কার ভরসায় তাদের ফেলে যায়? বাজার করার লোক পর্যন্ত নেই, অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাবার নেই। তাছাড়া বোম্বে নাকি খুব খরচের জায়গা, সেখানে গিয়ে যদি ওকে বাসা বাঁধতে হয় তো ওর যা মাইনে, তাতেই খরচ হয়ে যাবে, এখানে এক পয়সা পাঠাতে পারবে না। ওর বাবার পেন্সনে এখানের সংসার চলা সম্ভব নয়. তাছাড়া বোনের বিয়ের চেষ্টা করবে কে? ওর এক দাদা আছেন, তিনিও ভাল চাকরি করেন, কিন্তু তাঁকেও গোয়ালিয়রে বাসা করে থাকতে হয় বলে তিনি কিছুই পাঠাতে পারেন না, বরং মধ্যে মধ্যে এদের কাছেই দশ বিশ চেয়ে পাঠান। পাজোর সময় এরা কাপড়জামা পাঠায়, তবে তাঁরা পরতে পান। গাড়িভাড়ার সমস্যার জন্য আসা-যাওয়াও চলে না, কালেভদ্রে অফিসের কাজে এলে আসা হয়, কিন্তু সে শুধু দাদাই আসেন। ভাইপো ভাইঝিরা কি বৌদিকে সে ওরা কতকাল দেখেনি তার ঠিকই নেই। বোম্বে গেলে প্রদোষেরও ঐ দশা হবে; কারণ রেলের চাকরি নয়, পাস নেই। একবার যাওয়া-আসা মানে থার্ড ক্লাসেও সত্তর আশি টাকা খরচ। দেবে কোথা থেকে?

এই পর্যন্ত জানিয়ে কিছুটা উৎকণ্ঠিত কিছুটা আশান্বিতভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল প্রদোষ ব্রজনাথবাবুর মুখের দিকে। বোধহয় প্রতিক্রিয়াটা বোঝবার জন্যই। তারপর পাথরের মত ঈষৎ ভ্রূকুটিবদ্ধ মুখ দেখে কিছুই বুঝতে না পেরে আস্তে আস্তে আবার বলতে লাগল, 'আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম চাকরির। এ অবস্থায় সত্যিই কিন্তু বোম্বে যাওয়া যায় না—অথচ এই বয়সে চাকরি ছেড়ে আর একটা জোটানোও যে কত মুস্কিল তা তো বোঝেন? তবু, ওখানে গেলে কিছুই পাঠাতে পারব না, বুড়ো বাপ-মার অসুখ হলে চোখের দেখা দেখতে পর্যন্ত পাব না। এখানে যদি গোটা দুই টিউশ্যানিও করি তো সংসারের তবু কিছুটা সুসার হবে, অন্তত আমার দৈহিক সাহায্যটা এঁরা পাবেন—এইসব ভেবেই রেজিগনেশন দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ কালই চারুবিকাশবাবুর একটা চিঠি নজরে পড়ল। লিখে ফেলতে দিয়েছেন, কী এক মহিলার নাম লেখা—কেয়ার অফ আপনার নাম-ঠিকানা। ওঁর বেয়ারা এসে আমাদের সেকশ্যানের বেয়ারার হাতে দিচ্ছে ডাকে ফেলবার জন্য, চিঠিটা ঠক করে আমার টেবিলে পড়ল। কুড়িয়ে তুলে দিতে গিয়ে মনে হল নাম-ঠিকানাটা চেনা চেনা, অথচ ঠিক মনে পড়ল না। বাড়ি ফিরে ভাবতে ভাবতে অনেক রাত্রে মনে পড়ে গেল। আপনার এই চিঠিটা ফেলিনি, কী একটা মনে হয়েছিল, বরাবরই আমি নিজের [illegible] সঙ্গে তুলে রেখে দিয়েছি। সেই অত রাত্রেই উঠে মিলিয়ে দেখলাম—ঠিক মিলে গেল। নাম আবার ঠিকানার মিল বড় সহজ নয়, মনে হল, নিশ্চয়ই সেই। চারুবাবুর পি. এ. অসীম আবার থাকে আমাদেরই পাড়ায়, ভোরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, উনি আমার সাহেবের বড় ভায়রাভাই, আমি জানি, কারণ চিঠিপত্র আসা-যাওয়া করে। কথাটা শুনে মনে হল এ ঈশ্বরেরই যোগাযোগ, তাই একেবারে ছুটে এলাম আপনার কাছে।'

আবারও সেই আশা-আশংকার মেশা করুণ প্রত্যাশার ভঙ্গীতে চুপ করে যাওয়া, আবারও অস্বস্তিকর নীরবতা একটা।

খানিকক্ষণ, বেশ খানিকক্ষণ পরে ব্রজনাথবাবু কেমন একরকমের বিরস-কণ্ঠে বললেন, 'তা আমাকে কী করতে হবে এখন?'

একটু থতমত খেয়ে গেল প্রদোষ: বোধ হয় একটু দমেও গেল। ঈশ্বরের যোগাযোগটায় কোথাও একটা বড় রকমের 'লাট' আলগা আছে মনে হল। ভয়ে ভয়ে যৎপরোনাস্তি কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'না-মানে বিশেষ কিছু নয়—আপনাদের মধ্যে তো হৃদ্যতা রয়েছে যথেষ্ট, অনেক সময়ই আত্মীয়ে আত্মীয়ে এরকম হৃদ্যতা থাকে না, আর সত্যিই আত্মীয় হলেই যে থাকতে হবে তার মানে কি? আপনি মানে যদি একটু বলে দেন, বদলীটা বন্ধ না হলে আমার চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকবে না, আর এই বাজারে চাকরি ছাড়ার মানে কি তাতো বুঝছেনই!'

ব্রজনাথবাবু পূর্ববৎ ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টি নিজের হাতের ওপর স্থির রেখে জবাব দিলেন, 'হুঁ। কিন্তু আমি যতদূর চারুবিকাশবাবুকে জানি, তিনি

তাঁর অফিসের ব্যাপারে কোন বাইরের লোকের ইনটারফিয়ারেন্স পছন্দ করেন না!'

হিম হয়ে গেল বোধ হয় প্রদোষের বুকের মধ্যটা। এমনিই নীরস কঠিন কণ্ঠ ব্রজনাথবাবুর। সে কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে থেকে প্রায় স্খলিত কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু এতো ঠিক ইণ্টারফিয়ারেন্স—মানে নিতান্তই তাঁর দয়া ভিক্ষা করা। এই বাজারে পাকা চাকরি একটা। কোন রকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে না গিয়ে আপনি একটু কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারেন না? তিনি না পারলে আর কি করব। শুধু কথাটা বুঝিয়ে বলা—। মানে—'

কথার খেই হারিয়ে ফেলে প্রদোষ। হতাশায় ওর বুদ্ধিসুদ্ধি সব যেন গুলিয়ে যায়।

ব্রজনাথবাবু একটু গলাখাঁকারি দিয়ে যেন কথার জড়তাটা দূরে করে নেন। তারপর মুখ তুলে সোজা তাকান প্রদোষের মুখের দিকে। বলেন, 'আমিও বড় চাকরি করেছি একসময়, এরকম ইণ্টারফিয়ারেন্স কেউই পছন্দ করে না তা আমি জানি। তা ছাড়া আমি সম্পর্কে বড়, মান্যে বড়, আমি একটা কথা বললে সে যদি না রাখে তো আমার পক্ষে বড় অপমানের ব্যাপার হবে সেটা। তার-চেয়েও বড় কথা—কেন আমি করতে যাব এত কাণ্ড? এ রিস্ক নেব কী জন্যে? আপনার জন্যে? কী করেছেন আপনি আমার? ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন? এই তো? এই দাবীতে আজ পুরস্কার চাইতে এসেছেন কেমন তো? কিন্তু কে বললে আপনাকে যে সেদিন আপনি আমার উপকার করেছিলেন?'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ব্রজনাথবাবু। যেন হাঁপাতে থাকেন।

দারুণ লজ্জিত বোধ করে প্রদোষ, আকুল হয়ে জিভ কেটে বলতে যায়, 'না না—তা কেন, ছি ছি, সে কথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন, সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে এসেছি এই মাত্র—'

'হ্যাঁ—সেই পরিচয়ের সূত্রটাই হল উপকারের সূত্র। নিজেকে ঠকাবেন না. আপনি প্রত্যুপকার আশা করে এই অনুরোধ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু শুনুন, আপনি সেদিন আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে আমার এতটুকুও উপকার করেননি। ঘোর অনিষ্টই করেছেন। কোন কৃতজ্ঞতা পাওনা নেই আমার কাছে আপনার। যান। ...ছেলেকে বাঁচিয়েছেন! সে ছেলে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু আজ পৃথিবীর মধ্যে তা জানেন? সে মল্লে আমি আজ এই যন্ত্রণার হাত থেকে অন্তত রেহাই পেতাম। এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচতাম!'

প্রদোষ আরও কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে বসে রইল। তারপর একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি অতটা বুঝতে পারিনি। মাপ করবেন। আপনি দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছেন, এখন ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবতেও পারবেন না। অসময়ে এসে বিরক্ত করলুম শুধু শুধু। আচ্ছা আসি। নমস্কার।'

সে সত্যিই দু হাত তুলে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। মনে হল যেন ব্রজনাথবাবু তাকে বাধা দেবেন, একটু যেন ওঠবারও চেষ্টা করলেন চেয়ার ছেড়ে, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। স্থানুর মত বসেই রইলেন সেই চেয়ারে।

কিন্তু বেশিক্ষণ শান্তিতে বসা হল না। স্ত্রী এসে ঢুকলেন ভেতরের দিকের দরজা ঠেলে।

'গেছে সে ছেলেটি? কী জন্যে এসেছিল? যেন চারুর নাম করছিল না মনে হল?'

'হ্যাঁ। চারুর অফিসে কাজ করে। তাকে বলে বদলি রদ করাতে এসেছিল!'

'ওমা! তা ও কে? তোমার সংগে চেনা হল কি করে?'

'ঐ ছেলেটিই সেবার সরস্বতী পুজোর ভাসানোর দিন তোমার শতুরকে. বাঁচিয়েছিল!'

'ওমা তাই নাকি? কী হবে! কি করে জানলে? তবে যে তুমি বল তার কোন খোঁজ পাওনি, বিস্তর খোঁজ করেছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ। এতদিন পাইনি। আজই পেলাম। প্রমাণ নিয়েই এসেছিল!'

'তা তুমি ওকে অমনি অমনি ছেড়ে দিলে! বেশ লোক তো তুমি? একটু কিছু খাওয়ালে না, এবেলা খেয়ে যেতে বললে না—। কী গো! আমাকে একবার ডেকে দিলেও তো পারতে!'

'কেন? কিসের জন্যে? কী উনি আমার মহা-উপকার করেছেন তাই শুনি! সেদিন সে ভেসে যাচ্ছিল, ভেসে যাওয়াই উচিত ছিল। ঈশ্বর যা করেন, ভালর জন্যেই! ...কেন ও তাতে বাধা দিতে গেল? খোদার ওপর খোদকারি করতে গিয়েছিল ও কী জন্যে?'

আবারও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ব্রজনাথবাবু।

স্ত্রী অমিয়ার মুখও কঠোর হয়ে ওঠে।

'অত তো ও হাত গুণে দেখেনি সেদিন। মানুষের যা কাজ তাই করেছিল। তুমিও কি হাত গুণতে পেরেছিলে? সেদিন তো ঐ শত্তুরের জন্যেই আছাড় পেছাড় খেয়েছিলে? ..ঐ ছেলেটা বাঁচিয়ে ছিল বলে, ওকে খোঁজবার জন্যে টাকা খরচা করে কাগজে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিয়েছিলে? তোমার ছেলেকে তুমি মানুষ করতে পারনি, সে যদি আজ বাঁদর হয়ে গিয়ে থাকে তো তার জন্যে কি ও দায়ী? ওর উপকারটা ছোট হয়ে গেল কী করে? ছিঃ ছিঃ! তুমি কি মানুষ? আর কাউকে পেলে না তাই তোমার মনের বিষটা ঢাললে গিয়ে ঐ নির্দোষ ছেলেটার ওপরে! তুমিও যদি এত বেইমান হও তো তোমার ছেলে কত ভাল হবে?'

অমিয়া এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁপাতে থাকেন।

তাঁরও বয়স হয়েছে, তাঁও শরীর ভাল নয়। তা ছাড়া, আঘাত তাঁরও কম লাগেনি। ধৈর্য রক্ষা করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে ক্রমশ।

এতক্ষণ একতরফা নিজের কথাটাই ভাবছিলেন ব্রজনাথ। এমনভাবে তলিয়ে ভাবেননি কিছু। একটু যেন থতমতই খেয়ে গেলেন। তবে কি তিনি একটা বড় রকমের অন্যায়ই করে বসলেন? তিনিই একটা প্রকাণ্ড রকমের বেইমানি করলেন!

ব্রজনাথ পাখার নিচে বসেও ঘেমে উঠলেন যেন।

অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সদর পর্যন্ত এগিয়ে আবার ফিরে এসে বসে পড়লেন।

কিন্তু ততক্ষণে অমিয়া ভেতরে চলে গেছেন। তাঁর অন্তরের ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করে গেছেন দরজাটা প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ করে দিয়ে।

ব্রজনাথ খানিকটা পরে কতকটা অপরাধীর মতই উঠে এসে বাথরুমে ঢুকলেন।

স্ত্রীর শেষ কথাটাই ব্রজনাথকে আঘাত করেছে খুব বেশী।

তবে কি তিনিও আসলে একটা বড় রকমের বেইমান? বেইমানীর বীজ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছে তাঁর ছেলে?

তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, তাঁর আচরণেই এমন একটা কিছু ছিল যার জন্য তাঁর ছেলে এমন হৃদয়হীন এমন নিষ্ঠুর হতে পারল?

মাথায় ঘটির ওপর ঘটি জল ঢালতে ঢালতে সেই কথাটাই ভাবতে লাগলেন ব্রজনাথবাবু।

কিন্তু তিনি কি অত বেইমান? তাঁর ছেলের মত?

কী করল সোমু! শুধু সোমু কেন, তাঁর ছেলেমেয়ে দুজনেই। তবে নীলা অতটা করেনি, সামনে এসে দাঁড়িয়ে এমন করে দণ্ধায়নি।

বক্সতে গেলে যথাসর্বস্ব ব্যয় করে ওদের দুজনকেই বিলেতে পাঠিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। এদেশের শিক্ষায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না, সর্বশ্রেষ্ঠ যা তাই তিনি দিতে চেয়েছিলেন ওদের। পাঁচটা নয় সাতটা নয়—একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ওদের জন্যই তো তাঁর সব কিছু, ওরা যদি মানুষ হয়ে ওঠে, মানুষের মতো মানুষ তাহলে আর তাঁর অন্য কিছুতে দরকার নেই। এই ভেবেই সাধ্যের অতীত ব্যয় করেছিলেন তিনি। ইংরেজীতে যাকে বলে ভবিষ্যৎ বাঁধা দেওয়া, তাই দিয়েছিলেন। শুধু এই বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাঁর কোথাও।

মেয়ে প্রথমে বিলেতে গেল, সেখান থেকে আমেরিকা। নিজেই তম্বিরতদারক করে স্কলারশিপ নিয়ে গেল। বিলেতের পড়ার পালা শেষ হওয়া পর্যন্ত সব খরচ তিনিই দিয়েছিলেন, মায় ফিরে আসবার টাকাও—সেই টাকা খরচ করেই সে আমেরিকা চলে গেল। বাবাকে লিখলে যে, ওখানকার স্কলারশিপের থেকে টাকা বাঁচিয়ে ফেরার গাড়ি-ভাড়া সংগ্রহ করবে। কিন্তু সে আর ফিরল না। মাস কতক পরেই চিঠি এল যে, সে এক মার্কিণ ফ্লাইং অফিসারকে বিয়ে করেছে—আপাতত তার আর দেশে ফেরার কোন সম্ভাবনা নেই। বাবা-মা যেন তাকে ক্ষমা করেন। তবে সে যাকে বিয়ে করেছে সব দিক দিয়েই সে তাঁদের মেয়ের যোগ্য এই ভেবে নিশ্চয়ই তাঁরা সান্ত্বনা পাবেন।

ভগবান যদি কখনও দিন দেন তো সে তাঁদের জামাইকে নিয়ে দেখিয়ে আসবে!

নীলা তবু এর চেয়ে বেশী কিছু করেনি। তাঁদের টাকা খরচ করিয়ে দূরে সরে গেছে—এই মাত্র। তাঁদের মায়া করেনি, তাই বলে অনিষ্টও করেনি।

সোমু এখান থেকে পাস করে বিলেতে গিয়েছিল কী ট্রেনিং নিতে। সেখানে এখন বহু ছেলেই লেখাপড়ার সঙ্গে রোজগার করে, কিন্তু পাছে ওর পড়ার ক্ষতি হয় বলে ব্রজনাথবাবুই তা করতে দেননি। ছেলে যেটুকু করতে পারত, সেটুকুও করেনি—অর্থাৎ কোন রকম কৃচ্ছ্রসাধনের ধার দিয়েও যায়নি, বরং বেশ ধনী সন্তানের মতোই বাস করেছে সেখানে।

তারপর সেখানকার পালা শেষ করে ভারত সরকারের চাকরি নিয়েই ফিরেছে বটে, তবে সেই সঙ্গে সেখান থেকে একটি স্ত্রীও নিয়ে এসেছে। সাধারণ মেম বলতে যা বোঝায় তাও নয়, সেখান থেকে বিয়ে করে এনেছে একটি ফিরিঙ্গির মেয়ে। বধূর নিজের কথাতেই প্রকাশ, তার মা ছিল এক রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস বা মেয়ে-খানসামা এবং বাপ চাটগাঁয়ের লস্কর। সে নিজেও এক কাটা পোশাকের দোকানে ম্যানেকুইনের কাজ করত, সেইখান থেকেই সোমুর সঙ্গে তার পরিচয়।

নিজের এতদিনের স্বপ্ন, সর্বস্ব পণকরা ঐকান্তিক সাধনা এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে ব্রজনাথবাবু আর নিজেকে সামলাতে পারেন নি। কঠোর এবং রূঢ় ভাষাতেই সেদিন ছেলেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর কাছে আজ থেকে তাঁর ছেলেমেয়ে দুজনেই মৃত। তিনিও তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করবেন না, তারাও যেন না করে। সোজা বাড়ির সদর দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু তাতেই যদি তাঁর আশাভঙ্গের শেষ হত!

তাঁর আদরের ছেলে সোমু, তাঁর একমাত্র পুত্র—ভবিষ্যতের আশা, বর্তমানের আনন্দ, তাঁর নয়নের মণি কী করল অতঃপর?

ওর ঠাকুমার কিছু টাকা ছিল, সেটা তিনি নাতি সোমনাথের নাম করেই চিহ্নিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। নাবালক ছেলের তরফ থেকে সে টাকার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল ব্রজনাথের ওপরই। ছেলেমেয়েকে বিলেতে পাঠাতে এবং সেখানে তাদের রাজার হালে রাখতে তাঁর বহু টাকাই খরচ হয়েছিল, সেই সঙ্গে সেই টাকাটাও চলে গিয়েছিল—বলাবাহুল্য। হয়ত সে ঋণ তিনি রাখতেন না। ছেলে দুর্ব্যবহার করেছে বলে তিনিও করতেন না, কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে সেটা দেবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ছেলে সোমনাথ সেই টাকার দাবী জানাতে সটান আদালতে গিয়ে হাজির হল এবং বাবাকেই সাক্ষী মানল। ব্রজনাথ আদালতে হলফ নিয়ে মায়ের শেষ ইচ্ছা অস্বীকার করতে পারলেন না। স্বীকার করলেন, এবং ডিগ্রি জারী হতে বাড়ি বাঁধা দিয়ে সে টাকা শোধ করলেন। সেদিন তিনি হয়তো ওকে বিলাত পাঠাবার খরচটা আদালতে পেশ করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি—ঘৃণা বোধ হয়েছিল তাঁর। নিদারুণ, বিজাতীয় ঘৃণা। মনে হয়েছিল এমন ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে এত টাকা খরচ করেছেন শুনলে সবাই হাসবে—আদালত পর্যন্ত।

সেই বাড়ি বাঁধা দেওয়ার দেনা শোধ করতে হয়েছে অনেকখানি পেন্সন বিক্রী করে, আর সেই জন্যই আজ তাঁদের এত টানাটানি। একটা ঠাকুর—এমনকি একটা রাতদিনের ঝি রাখবারও ক্ষমতা নেই আজ তাঁর।

সেই ছেলেকে বাঁচাবার কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তিনি যাবেন ছোট ভায়রার কাছে ছোট হয়ে আর্জি জানাতে?

ছোঃ!

বেশ হয়েছে হাঁকিয়ে দিয়েছেন ছোকরাকে!

ভালই করেছেন!......

স্নান করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্রজনাথবাবু, তাই কখন যে গায়ের জল গায়ে শুকিয়ে উঠেছে তা টেরও পাননি। এখন খেয়াল হল স্ত্রীর তাড়নায়।

'কী গো! আজ কি আর বাথরুম থেকে বেরোবে না নাকি? খাওয়া-দাওয়া হবে না আজ?'

ব্যস্ত হয়ে শুকনো গা-ই মোছবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে বেরিয়ে এলেন ব্রজনাথবাবু।

খেতে বসে অন্যদিন স্বামী-স্ত্রীতে নানা গল্প হয়। দুজনে একসঙ্গে বসেই

খান; দুটি তো মাত্র লোক বাড়িতে—একা একা খাওয়ার কোন অর্থই হয় না। একসঙ্গে খেতে খেতে গল্প করেন, গল্প করতে করতে খেতে দেরি হয়ে যায় প্রত্যহ। কিন্তু আজ দুজনেই নিঃশব্দে বসে খেয়ে গেলেন। অমিয়ার মুখ থমথমে, গম্ভীর। ব্রজনাথ অন্যমনস্ক। ঠিক থমথমে নয়, কিন্তু তাঁর মুখ দেখলে অন্তরে বিপুল দুর্যোগের আভাস পাওয়া যায়।

ব্রজনাথ ভাবছিলেন সকালের কথাটাই।

তখন থেকেই ভাবছেন বলতে গেলে।

পুজোয় বসেও ভেবেছেন। ঠাকুরের কথা বিশেষ ভাবাই হয়নি আজ তাঁর।

তিনি কি সত্যিই কিছু অন্যায় করলেন?

আজ আর ও ছেলের দাম তাঁর কাছে কিছুই নেই বটে, কিন্তু তাতে কি প্রদোষের উপকারটার মূল্য কমে যায়? এটা তো ঠিক যে সেদিন ঐ ছেলের কোন বিপদ ঘটলে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পাগল হয়ে যেতেন! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তো পাগল হতে বসেছিলেন তিনি। মরা-হাজা একমাত্র ছেলে তাঁর। আজ সে শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু সেদিন তো সে-ই ছিল তাঁর আত্মার আনন্দ, জীবনের একমাত্র অবলম্বন!

অম্বল মাখা ভাত কাঁসার থালায় কলঙ্ক লেগে গেল ভাবতে ভাবতে। অন্যমনস্কভাবে এক গ্রাস মুখে দিতেই বিস্বাদ টের পেলেন। তাড়াতাড়ি ফেলে দিলেন থু-থু করে। অমিয়া ততক্ষণে উঠে পড়েছেন খাওয়া শেষ করে। তিনিও তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। চেয়ে দেখলেন স্ত্রীর পাতেও প্রচুর ভাত পড়ে রয়েছে।

অমিয়ার মনেও স্মৃতির তুফান উঠেছে, বিস্মৃতির ওপার থেকে ভেসে আসা দমকা বাতাস সেখানে তুলেছে আবেগের তরঙ্গ। আজ আর স্থিরভাবে, স্বাভাবিকভাবে খাওয়া-দাওয়া করা ও'র পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্রজনাথ সেদিন অভ্যাসমত ওপরের ঘরে শুতে গেলেন না, সিগারেটটা ধরিয়ে বাইরের ঘরে এসেই বসলেন একা।

বেশ ছিলেন তিনি বা তাঁরা। এসব কথা একরকম ভুলেই এসেছিলেন। নিস্তরঙ্গ জীবন সুখে না হোক শান্তিতে না হোক—নিস্তরঙ্গ শান্তভাবেই কেটে যাচ্ছিল। আজ এই ছোকরা এসে এ এক মহা উৎপাত বাধিয়ে তুলল। ওর কথা শোনাই উচিত হয়নি—আগেই, প্রসঙ্গ-মাত্রেই বিদায় করে দেওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু—

প্রথম সিগারেটটা পুড়ে যাবার পর চিন্তাটা অনেকখানি থিতিয়ে এলে মনে পড়ল, ঋণটা ওঁর অনেকদিনের। যে ব্যবসার জন্য ঋণ করা হয় সে ব্যবসা ফেল হলে মহাজন ঋণ থেকে অব্যাহতি দেয় না, ঘটি বাটি বেচেই পাওনা আদায় করে। এ ছোকরা যদি তাঁর বিজ্ঞাপন দেখে সেই সময়ই আসত এবং মহা-মূল্যবান কোন বস্তুও চেয়ে বসত তো তিনি নিশ্চয়ই দিয়ে দিতেন। এতদিন পরে এসেছে বলেই একেবারে হাঁকিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি।

ছেলেই তাঁর না হয় আর নেই। তাবলে ঋণটা যাবে কোথায়?

লোকের ছেলেমেয়ে যখন সত্যি-সত্যিই মরে, রোগে ভুগে বিছানায় শুয়ে মলেও ডাক্তার ও ওষুধের দেনাও তো শোধ করতে হয়। আজ আর না হয় ছেলের কোন মূল্য নেই, এককালে তো ছিল। সে ঋণ তিনি শোধ করতে ন্যায়তঃ ধর্মতঃ বাধ্য।

আচ্ছা, সত্যিই কি ছেলের কোন মূল্য আর নেই তাঁর কাছে?... দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে প্রশ্নটা আপনিই জাগল মনে, সত্যিই কি তিনি ছেলেকে মৃত বলে ধরে নিতে পেরেছেন মনে মনে? তাঁর সোমু, তাঁর আদরের সেই ছোট্ট একরত্তি সোমু? আজও—এই মুহূর্তে যদি তাঁর চোখের সামনে সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে, ছেলে যদি তেমনিভাবে জলে ভেসে যায়, তিনি কি উল্লসিত বোধ করবেন? তিনি কি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবেন সে দৃশ্য? ঝাঁপিয়ে পড়বেন না নিজে গিয়ে?

বাপ্‌রে! চিন্তাটা মস্তিষ্কের বুদ্ধি-কোষ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ শিউরে কেঁপে উঠলেন ব্রজনাথবাবু।

নারায়ণ! নারায়ণ!

ঠাকুর রক্ষা কর।

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ব্রজনাথ।

সেই মুহূর্তেই কানে গেল ওপরের সিঁড়িতে নরম চটি জুতোর আওয়াজ। শব্দটা নিচের দিকেই আসছে ক্রমশ।

উঁকি মেরে দেখলেন অমিয়া—বাইরে বেরোবার সাজে সজ্জিত হয়েই নামছেন।

'একি। চললে কোথায়?' বিস্মিত হতভম্ব ব্রজনাথের মুখ থেকে অতিকষ্টে প্রশ্নটা বেরোয়।

'চারুবিকাশদের বাড়ি।' সংক্ষেপে উত্তর দেন অমিয়া।

'একটু দাঁড়াও। আমিও যাব। তৈরী হয়ে আসছি।'

ব্রজনাথ দ্রুত ওপরে উঠে যান জামাটা গায়ে গলিয়ে নিতে।
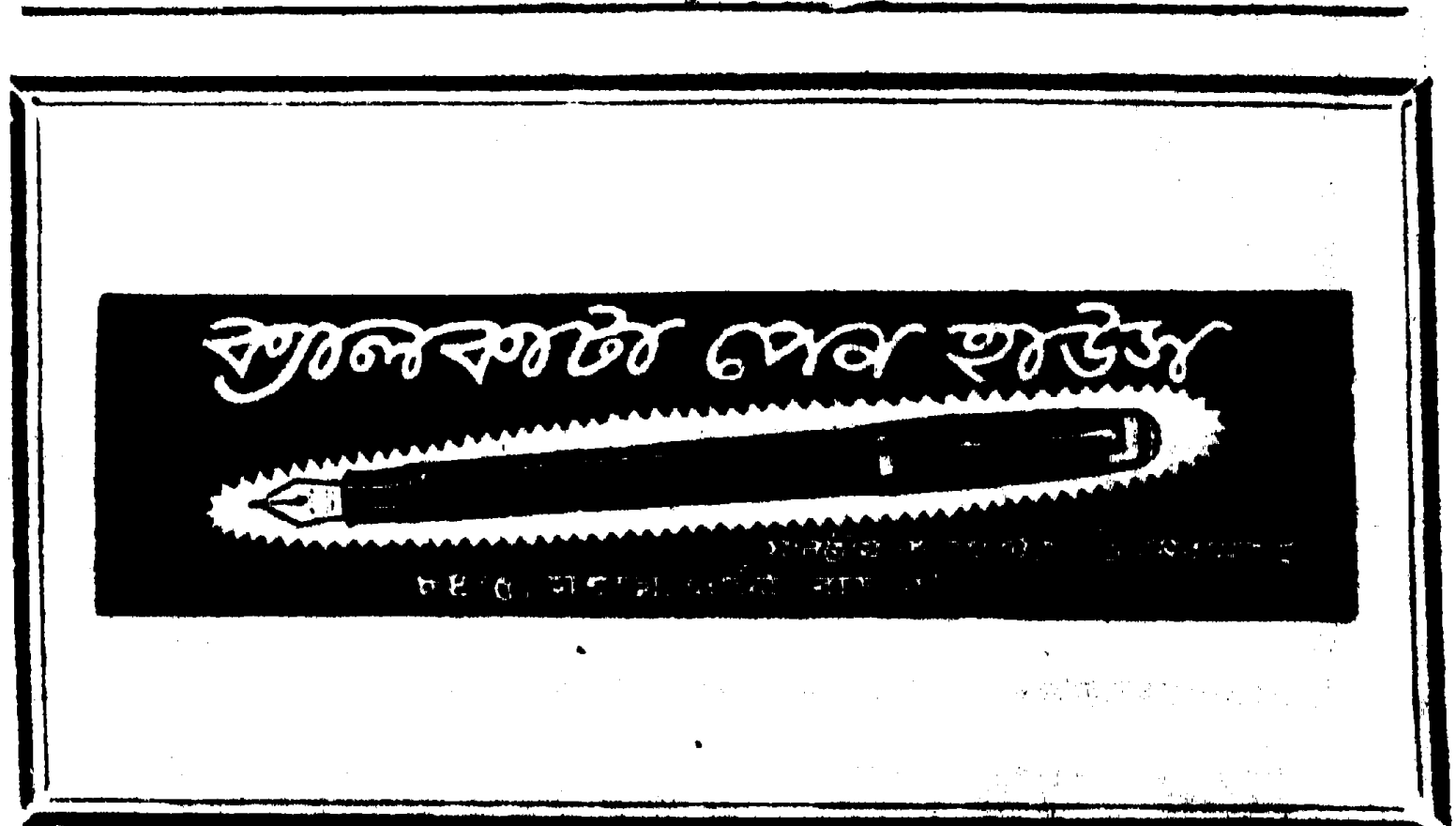
বলুন তো কী?

উত্তর

১। দক্ষিণ মেরু মহাসমুদ্র—এর সাধারণ গভীরতা মাত্র ২০০০ ফ্যাদম অর্থাৎ ১২,০০০ ফি

২। ইংল্যাণ্ডবাসী।

৩। শুক্র, মঙ্গল ও বুধগ্রহ।

৪। ২৬টি হাড়।

৫। পেট্রলকে বাষ্পে পরিণত করা।

৬। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। Great Barrier Reef.

৭। ফরাসী আকাদমীর মতে পৃথিবীতে ২,৭৬৯টি ভাষা আছে।

৮। তিমি ও পেঙ্গুইন।

৯। এ্যাসবেসটস।

১০। ধূসর রং-এর জিনিষ যা বৈজ্ঞানিকরা বলে **Cordex!**

উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, শ্রীজওহরলাল নেহরু, ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন
শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু

বিশ্বভারতীর বিশেষ সমাবর্তন উৎসব সমাপনে শান্তিনিকেতনের 'উদয়ন' ভবন প্রাঙ্গণে এই বিশেষ আলোকচিত্রখানি গৃহীত হয়।
ফটো : অরিজিৎ রায় (বোলপুর)।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নেহরু

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সর্ববিধ সংস্কার-আন্দোলনে ঠাকুর-পরিবারের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বহু নিপুণ লেখক, শিল্পী এবং অধ্যাত্মবাদী মানুষের দেখা মিলেছে এই পরিবারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সকলের ঊর্ধ্বে। এবং প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতবর্ষে তাঁর আসন সংশয়শূন্য শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছেছিল। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সৃষ্টিমুখর কর্মব্যস্ততা দুটি বিগত যুগকে পরিপ্লাবিত করেছিল। তবু তাঁকে আমাদের এ যুগের বলেও মনে হয়। তিনি রাজনীতিক নন কিন্তু ভারতীয় জনগণের মুক্তি-আন্দোলনে তাঁর সচেতনতা এবং আনুরক্তি ছিল বলেই কাব্য-সঙ্গীতের গজদন্ত মিনারের নিভৃতে তিনি সর্বদা থাকতে পারতেন না। তা থেকে তাঁকে বার বার আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে। যখনই কোন অবস্থা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে তখনই কখনো শাসক ইংরেজকে কখনো স্বদেশবাসীর উদ্দেশে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যে বন্যা বয়েছিল তাতে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য—অমৃতসর হত্যাকান্ডের সময়ে প্রতিবাদে তিনি 'নাইট' উপাধি বর্জন করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর গঠনাত্মক কাজ শুরু হয়েছিল নিঃশব্দে এবং তা ইতিমধ্যেই শান্তিনিকেতনকে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল করে তুলেছে। অন্য সমস্ত ভারতীয়ের চেয়ে তিনিই সব থেকে বেশী সহায়তা দিয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারার সুষম সমন্বয়ে ও মিলনে এবং ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিভূমিকে তিনিই করেছেন সুদূর বিস্তৃত। তিনি ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদী। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী হয়ে এবং তার স্বপক্ষে কাজ করে তিনি ভারতের বাণীকে বহন করে নিয়ে গেছেন দেশ-দেশান্তরে এবং দেশ-দেশান্তরের বাণীকে বহন করে এনেছেন নিজ দেশে। তাঁর সমস্ত আন্তর্জাতিকতাবাদ সত্ত্বেও ভারতের মাটির সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরের নিগূঢ় যোগ এবং তাঁর অন্তর পরিপ্লুত ছিল উপনিষদের প্রজ্ঞা-বাণীতে। জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণতার দ্যোতক। জঙ্গী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সংঘাতে সৃষ্টি হয় নানানতর বিভ্রান্তির এবং সমস্যার। ভিন্নক্ষেত্রে গান্ধীজির মতই ভারতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পর্যাপ্ত সেবা-সহায়তা সাধারণ মানুষকে সঙ্কীর্ণ চিন্তার জটাজাল থেকে বেরিয়ে আসতে এবং মানবের বৃহত্তর সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে সহায়তা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী।

['ভারত-দর্শন' থেকে]

রোমের ভনভনে মাছি

ভ্রাম্যমাণ

রোমের ভিআ ভেনেটো এলাকার রাত্রি এক আশ্চর্য জগৎ। পথের ধারে কাফের সারি। নাচ, গান, হল্লার প্রচুর উপকরণ। বিদেশীদের তীর্থক্ষেত্র। রোমে এলে এখানে আসতেই হবে ফূর্তি করার জন্য।

এখানকার যে কোন কাফেতেই তাদের দেখতে পাওয়া যাবে। পরনে চামড়ার জ্যাকেট, এসপ্রেসো কফিতে চুমুক দিতে দিতে নবাগতদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকাবে। কাঁধে ঝোলান আছে ক্যামেরা।

বিখ্যাত ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক ফের্দেরিকো ফেল্লিনি তার একটি ছবিতে এই রকম এক ফোটোগ্রাফারের নামকরণ করেছিলেন 'পাপারাজ্জো'। অর্থাৎ ভনভনে বিরক্তিকর মাছি।

এই মাছিদের উৎপাতে ভিআ ভেনেটোতে কোন নামকরা বিদেশীর আসা মুস্কিল। নামকরা বলতে বিশেষ করে বোঝায় অভিনেত্রীদের। কেন না এদের নিয়ে সহজেই একটা গোলমাল পাকিয়ে তোলা যায়। আর গোলমালের ছবি তোলাই পাপারাজ্জোদের পেশা।

এদের শিকারক্ষেত্রটি অল্প একটু জায়গাতেই সীমাবদ্ধ। খোলা কাফে, রেস্তোরা, হোটেল, দোকান প্রভৃতিতেই এদের শিকার ঘুরে বেড়ায়। ক্যামেরার আলো টিপে এরা নাকের কাছ থেকেই শিকারকে ঘায়েল করে। এইটাই এদের রুজিরোজগারের উপায়।

পাপারাজ্জোরা সংখ্যায় খুবই অল্প। বড়জোর কুড়ি-পঁচিশ। সংবাদপত্রের ফোটোগ্রাফার না বলে এঁদের চ্যাংড়া ছেলে বলাই ঠিক। ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে, পিস্তলের মত ক্যামেরা বাগিয়ে এরা দাঁড়ায়। মুখে সিগারেট।

এইভাবে অপেক্ষা করে কখন নাইট ক্লাবের দরজা খুলে বাঞ্ছিত শিকারটি পথে বেরোয়। বেরোলেই আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। চারদিক থেকে ঘিরে মুহুর্মুহু ঝলসে তোলে তাদের ক্যামেরার আলো।

এদের হাতে কারুরই নিস্তার নেই। রোমের রাস্তায় স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছিল বিখ্যাত মার্কিণ অভিনেতা আর্নেষ্ট বোর্জনীন, সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি ছাপা হয়ে গেল। আর এক অভিনেতা কর্ণেল ওয়াইল্ডের ছবি ছাপা হল স্থানীয় একটি বাজে ধরনের মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায়। এক নাচের আসরে নৃত্যরতা অ্যানিটা একবার্গের অসম্বৃত মুহূর্তের ছবিও এদের ক্যামেরা ধরে রাখে। ক্যাথরিন হেপবার্ণ মোটরে রোমের রাস্তা দিয়ে চলেছে, তার পিছনে স্কুটারে ক্যামেরা নিয়ে তাড়া করে চলেছে পাপারাজ্জো। আভা গার্ডনার একবার এক পাপারাজ্জোকে নোংরা ভাষায় গালি দেয়। সিনেসিটা ষ্টুডিওয় কার্ডবোর্ডের স্তূপের মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে একদিন সে বসে থাকে। যে জন্য আসা তা অবশ্য সে পেয়ে যায় : আভা গার্ডনারের প্রায় নগ্ন একটি অসতর্ক মুহূর্ত।

এই জাতীয় নোংরা ছবি তুলতে এরা যে কোন শ্রম স্বীকারে সদা প্রস্তুত। তাদের মনোমত ভঙ্গীতে কেউই দাঁড়াবে না, একথাটা তারা জানে। তাই গায়ে পড়ে লোকেদের এরা উত্যক্ত করে, ঝগড়া বাধায়। সেই কুরুচিকর দৃশ্যের অবতারণা ঘটে অমনি ক্যামেরাও সক্রিয় হয়ে ওঠে!

ইতালির সংবাদপত্রগুলি এই সব ছবি এদের কাছ থেকে কেনে। ছবির সর্বনিম্ন দর ২৫০ টাকা। আর অশ্লীল হলে দর ওঠে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত।

সংবাদপত্রের ফোটোগ্রাফাররা এদের সংবাদ-জগতের গণিকা হিসাবে গণ্য করে। কিন্তু গণিকার মতই সংবাদপত্র সমাজে এরা জায়গা জুড়ে রয়েছে। ভিআ ভেনেটোর কাফেগুলি এদের শিকারক্ষেত্র। এদের চেহারা দেখলেই লোকে বুঝতে পারে, এবার একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠবে।

পাপারাজ্জোদের মধ্যে কেউ কেউ ফলাও ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। এক পাপারাজ্জো পাঁচজন ফটোগ্রাফার ভাড়া করে কাজে লাগিয়েছে, অন্যান্য জায়গা থেকে এই ধরনের ছবি তুলে আনার জন্য। তবে অধিকাংশই ভিআ ভেনোটোকেই আঁকড়ে পড়ে আছে।

দৃষ্টিপথে জোর করে না এসে পড়লে আমি খুব কম বিজ্ঞাপনই দেখি। নিজে একটু বিকৃত ধরনের বলে জোর করে যা আমার চোখের সামনে আসে তার বিরুদ্ধাচারণ করি। প্রথমটা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হলেও পরে এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ি। এই জিনিসটা খেতে বা এই জিনিসটার সম্বন্ধে ভাবতে কেন আমি বাধ্য হব। এইরূপভাবে আমাকে কিছু বললে আমার বিরক্তি উৎপাদন করে। —কয়েক মাস আগে কোন বিজ্ঞাপন-সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর বক্তৃতা।

কহেন কবি কালিদাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
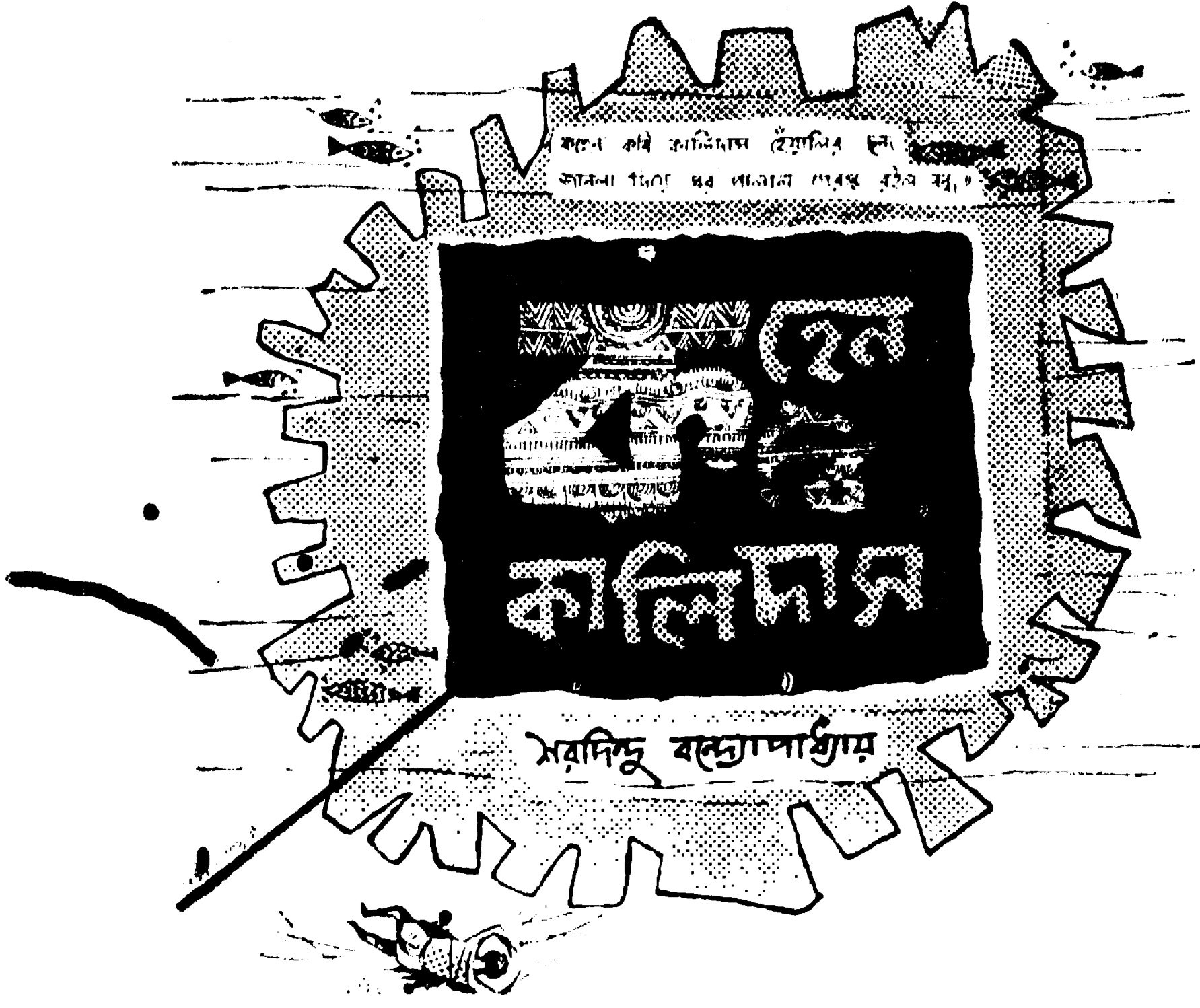
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৬ ।।

নৈশ ভোজনের পর মণীশবাবু উপরে চলিয়া গেলেন, আমরা নিজেদের ঘরে আসিলাম। মাথার উপর পাখা খুলিয়া দিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিলাম, ব্যোমকেশ কিন্তু শুইল না, প্রাণহরির হিসাবের খাতা লইয়া টেবিলের সামনে বসিল। খেরো বাঁধানো দু-ভাঁজ করা লম্বা খাতা, তাহাতে দেশী পদ্ধতিতে হিসাব লেখা।

ব্যোমকেশ হিসাবের খাতার গোড়া হইতে ধীরে ধীরে পাতা উল্টাইতেছে, আমি খাটের ধারে বসিয়া সিগারেট প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি এমন সময় ফণীশ আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিল, তারপর এক অদ্ভুত কাজ করিল। তাহার সামনে টেবিলের উপর একটি কাঁচের কাগজ-চাপা গোলক ছিল, সে চকিতে তাহা তুলিয়া লইয়া ফণীশের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

ফণীশ টপ করিয়া সেটা ধরিয়া ফেলিল, নচেৎ মেঝেয় পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইত। ব্যোমকেশ হাসিয়া ডাকিল, 'এস ফণীশ।'

ফণীশ বিস্মিত হতবুদ্ধি মুখ লইয়া কাছে আসিল, ব্যোমকেশ কাঁচের গোলাটা তাহার হাত হইতে লইয়া বলিল, 'অবাক হয়ে গেছ দেখছি। ও কিছু নয়, তোমার রিফ্লেক্স পরীক্ষা করছিলাম। বোসো, কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

ফণীশ সামনের চেয়ারে বসিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি আজকাল ক্লাবে যাও না?'

ফণীশ বলিল,—'ওই ব্যাপারের পর আর যাইনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাওনি কেন? হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'

ফণীশ বলিল,—'আচ্ছা, কাল থেকে যাব।'

'আমরাও যাব। অতিথি নিয়ে যেতে বাধা নেই তো?'

'না। কিন্তু—ক্লাবে আপনার কিছু দরকার আছে কি?'

'তোমার তিন বন্ধুকে আড়াল থেকে দেখতে চাই।—আচ্ছা, একটা কথা বল দেখি, সেদিন তোমরা যে প্রাণহরি পোদ্দারকে ঠেঙাতে গিয়েছিলে তোমাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছু ছিল?'

'অস্ত্র ছিল না। তবে মধুময়বাবুর হাতে একটা লম্বা টর্চ ছিল, মুণ্ডুওয়ালা টর্চ। আর মৃগাঙ্কবাবুর হাতে ছিল বেতের ছড়ি।'

'কি রকম ছড়ি? মোটা, না লচপচে?'

'লচপচে। যাকে Swagger Cane বলে।'

'হুঁ, তোমার হাতে কিছু ছিল না?'

'না।'

'অরবিন্দ হালদারের হাতে?'

'না।'

'কাপড়-চোপড়ের মধ্যে লোহার ডাণ্ডা কি ঐরকম কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল কি?'

'না। গরমের সময়, সকলের গায়েই হাল্কা জামা-কাপড় ছিল, ধুতি আর পাঞ্জাবি। কারুর সঙ্গে ওরকম কিছু থাকলে নজরে পড়ত।'

'হুঁ'—ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া কিছুক্ষণ টানিল, শেষে বলিল,—'কোথা দিশা খুঁজে পাই না। তুমি যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে।—কবিতা আওড়াতে পারো? বৌমাকে বোলো—নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।'

ফণীশ লজ্জিত মুখে চলিয়া গেল। আমি শয়ন করিলাম। ব্যোমকেশ আরও

কিছুক্ষণ খাতা দেখিল, তারপর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

অন্ধকারে প্রশ্ন করিলাম,—'খুব তো কবিতা আওড়াচ্ছ, আজ সারাদিনে কিছু পেলে?'

উত্তর আসিল—'তিনটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। এক. প্রাণহরি পোদ্দারকে যিনি খুন করেছেন তাঁর টাকার লোভ নেই; দুই,—তিনি সব্যসাচী, তিন, মোহিনীর মতন মেয়ের জন্য যে-কেউ খুন করতে পারে। —এবার ঘুমিয়ে পড়।'

।। তিন ।।

সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ আবার হিসাবের খাতা লইয়া বসিয়াছে।

তারপর যথাসময় প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ হিসাবের খাতাটি সঙ্গে লইল।

থানায় পৌঁছিলে ইন্সপেক্টর বরাট হাসিয়া বলিলেন, 'এরি মধ্যে হিসেবের খাতা শেষ করে ফেললেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ খাতায় মাত্র দেড় বছরের হিসেব আছে, অর্থাৎ এখানে আসার পর প্রাণহরি নতুন খাতা আরম্ভ করেছিল।'

বরাট জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিছু পেলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'খুনের ওপর আলোকপাত করে এমন কিছু পাইনি। কিন্তু একটা সামান্য বিষয়ে খটকা লেগেছে।'

'কী বিষয়?'

'একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে প্রাণহরির ব্যবস্থা ছিল, সে রোজ তাকে ট্যাক্সিতে বাড়ি থেকে নিয়ে আসত, আবার বাড়ি পৌঁছে দিত। মাসিক ভাড়া দেবার ব্যবস্থা ছিল নিশ্চয়। কিন্তু হিসেবের খাতায় দেখছি ঠিক উল্টো। এই দেখুন খাতা।' ব্যোমকেশ খাতা খুলিয়া দেখাইল। খাতার প্রতি পৃষ্ঠায় পাশাপাশি জমা ও খরচের স্তম্ভ। খরচের স্তম্ভে এক পয়সা দুই পয়সার খরচ পর্যন্ত লেখা আছে, কিন্তু জমার স্তম্ভ অধিকাংশ দিনই শূন্য। মাঝে মাঝে কোনও খাতক সুদ জমা দিয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। ব্যোমকেশ আঙুল দিয়া দেখাইল—'এই দেখুন, ওরা মাস জমার কলমে লেখা আছে, ট্যাক্সি-ড্রাইভার ৩৫৲ টাকা। এমনি প্রত্যেক মাসেই আছে। কিন্তু খরচের কলমে ট্যাক্সি বাবদ কোনো খরচের উল্লেখ নেই।'

'হয়তো ভুল করে খরচটা জমার কলমে লেখা হয়েছিল।'

'প্রত্যেক মাসেই কি ভুল হবে?'

'হুঁ। আপনার কি মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না। খাতায় জুয়া খেলার লাভ লোকসানের হিসেবও নেই। একটু রহস্যময় মনে হয় নাকি?'

'তা মনে হয় বৈকি। এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে?'

ব্যোমকেশ ভাবিয়া বলিল,—'প্রাণহরি যার ট্যাক্সিতে যাতায়াত করত তাকে পেলে সওয়াল জবাব করা যায়। তাকে চেনেন নাকি?'

বরাট বলিলেন,—'না, তার খোঁজ করা দরকার মনে হয়নি। —এক কাজ করা যাক. ভুবন দাসকে ডেকে পাঠাই, সে নিশ্চয় সন্ধান দিতে পারবে।'

'ভুবন দাস?'

'সে-রাত্রে ওদের চারজনকে যে ট্যাক্সি-ড্রাইভার প্রাণহরির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তার নাম ভুবনেশ্বর দাস।'

'ও—তাকে কি পাওয়া যাবে?'

'কাছেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। আমি লোক পাঠাচ্ছি।'

পনরো মিনিট পরে ভুবনেশ্বর দাস আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল। দোহারা চেহারা, খাকি প্যান্টুলুন ও শার্ট, মাথায় গার্ড-সাহেবের মতন টুপী। বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ, চোখ দুটি অরুণাভ, মুখ গম্ভীর। সন্দেহ হইল লোকটি গভীরভবে নেশাভাঙ করিয়া থাকে।

বরাট ঘাড় নাড়িয়া ব্যোমকেশকে ইঙ্গিত করিলেন, ব্যোমকেশ ভুবন দাসকে একবার আগা-পাস্তলা দেখিয় লইয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল—'তোমার নাম ভুবন দাস। মিলিটারিতে ছিলে?'

ভুবন দাস বলিল,—'আজ্ঞে।'

'সিপাহী ছিলে?'

'আজ্ঞে না, ট্রাক্ ড্রাইভার।'

'ট্যাক্সি চালাচ্ছ কত দিন?'

'তিন-চার বছর।'

'তিন-চার বছর এখানেই ট্যাক্সি চালাচ্ছ?'

'আজ্ঞে না, এখানে বছর দেড়েক আছি, তার আগে কলকাতায় ছিলাম।'

'বাড়ি কোথায়?'

'মেদিনীপুর জেলা, ভগবানপুর গ্রাম।'

'তুমি সেদিন চারজনকে নিয়ে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়িতে গিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে বাড়িতে নয়, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে।'

'বেশ। তোমার ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেছিল?'

ভুবন দাস একটু নীরব থাকিয়া বলিল,—'বলেছিল। আমি সব কথায় কান করিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিছু মনে আছে?'

ভুবন দাস আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'বোধহয় কোনো মেয়েলোক সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। চাপা গলায় কথা হচ্ছিল, ভাল শুনতে পাইনি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আচ্ছা যাক। বল দেখি তোমার চারজন যাত্রীর মধ্যে কারুর হাতে কোনো অস্ত্র ছিল?'

'একজনের হাতে ছড়ি ছিল।'

'আর কারুর হাতে কিছু ছিল না?'

'লক্ষ্য করিনি।'

'তুমি নেশা কর?'

'আজ্ঞে না' বলিয়া ভুবন দাস ইন্সপেক্টর বরাটের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিল।

'শহরে তোমার বাসা কোথায়?'

'বাসা নেই। রাত্তিরে গাড়িতেই শুয়ে থাকি।'

'গাড়ি তোমার নিজের?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শহরের অন্য ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের সঙ্গে তোমার নিশ্চয় জানাশোনা আছে।'

'জানাশোনা আছে, বেশী মেলামেশা নেই।'

'বলতে পারো, কার ট্যাক্সিতে চড়ে প্রাণহরি পোদ্দার শহরে যাওয়া-আসা করতেন?'

মনে হইল ভুবন দাসের রক্তাভ চোখে একটু কৌতুকের ঝিলিক খেলিয়া গেল। সে কিন্তু গম্ভীর স্বরেই বলিল,—'আজ্ঞে স্যার, আমার ট্যাক্সিতে।'

আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তারপর বরাট কড়া সুরে বলিলেন,—'একথা আগে আমাকে বলনি কেন?'

ভুবন বলিল,—'আপনি তো সন্ধোন নি স্যার।'

ব্যোমকেশ হাসি চাপিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল। ট্যাক্সি-ড্রাইভার সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা খুব বিস্তীর্ণ নয়, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি তাহারা অতিশয় স্বল্পভাষী জীব, অকারণে বাক্য ব্যয় করে না। অবশ্য ভাড়া লইয়া ঝগড়া বাধিলে স্বতন্ত্র কথা।

ব্যোমকেশ বলিল,—'তুমি তাহলে প্রাণহরি [illegible]কে আগে থাকতে চিনতে?'

ভুবন বলিল,—'আজ্ঞে।'

'তিনি কি রকম লোক ছিলেন?'

'ভাল লোক ছিলেন স্যার, কখনো ভাড়ার টাকা ফেলে রাখতেন না।' ভুবনের কাছে ইহাই সাধুতার চরম নিদর্শন।

'রোজ নগদ ভাড়া দিতেন?'

'আজ্ঞে না, মাস মাইনের ব্যবস্থা ছিল।'

'কত টাকা মাস-মাইনে?'

'পঁয়ত্রিশ টাকা।'

বরাটের সহিত ব্যোমকেশ মুখ তাকাতাকি করিল, তারপর ভুবনকে বলিল,—'প্রাণহরি পোদ্দার সম্বন্ধে তুমি কী জানো সব আমায় বল।'

ভুবন বলিল,—'বেশী কিছু জানিনা স্যার। শহরে ওঁর একটা অফিস আছে। বছর খানেক আগে উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে মাস-মাইনেতে ট্যাক্সি ভাড়া করার কথা তোলেন, আমি রাজি হই। তারপর থেকে আমি ওঁকে সকালে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতাম, আবার বিকেল বেলা পৌঁছে দিতাম। বাংলা মাসের গোড়ার দিকে উনি আমাকে অফিসে ডেকে ভাড়া চুকিয়ে দিতেন। এর বেশী ওঁর বিষয়ে আমি কিছু জানি না।'

'তুমি মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাস-মাইনেতে রাজি হয়েছিলে? লাভ থাকতো?'

'সামান্য লাভ থাকতো। বাঁধা ভাড়াটে তাই রাজি হয়েছিলাম।'

ব্যোমকেশ খানিক চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল,—'অন্য কোনো ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে প্রাণহরিবাবুর কারবার ছিল কিনা জানো?'

ভুবন বলিল,—'আজ্ঞে আমি জানি না।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'আচ্ছা তুমি এখন যাও। যদি প্রাণহরি সম্বন্ধে কোনো কথা মনে পড়ে দারোগা-বাবুকে জানিও।'

'আজ্ঞে।' ভুবন দাস স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল।

তিনজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিলাম। তারপর বরাট বলিলেন,—'কিছুই তো পাওয়া গেল না। হিসেবের খাতায় হয়তো ভুল করেই খরচের জায়গায় জমা লেখা হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,— 'কিংবা সাংকেতিক জমা-খরচ।'

ভ্রূ তুলিয়া বরাট বলিলেন,—'সাংকেতিক জমা-খরচ কি রকম?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মনে করুন প্রাণহরি পোদ্দার কাউকে ব্ল্যাক্‌মেল করছিল। ভুবন দাস তাকে যত ভালো লোকই মনে করুক আমরা জানি সে প্যাঁচালো লোক ছিল। মনে করুন সে মাসিক সত্তর টাকা হিসেবে ব্ল্যাক্‌মেল আদায় করছে, কিন্তু সে-টাকা তো সে হিসেবের খাতায় দেখাতে পারে না। এদিকে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে দিতে হয় মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা। প্রাণহরি খাতায় সাংকেতিক হিসেব লিখল, সত্তর টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা বাদ দিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা জমা করল। যাকে ব্ল্যাকমেল করছে তার নাম লিখতে পারে না, তাই ট্যাক্সি-ড্রাইভারের নাম লিখল। বুঝেছেন?'

বরাট বলিলেন,—'বুঝেছি। অসম্ভব নয়। প্রাণহরির মনটা খুবই প্যাঁচালো ছিল, কিন্তু আপনার মন আরো প্যাঁচালো।'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল,—'আচ্ছা, আজ উঠি। প্রাণহরি কাকে ব্ল্যাকমেল করছিল জানতে পারলে হয়তো খুনের একটা সূত্র পাওয়া যেত। কিন্তু ওর দলিল-পত্রে ওরকম কিছু বোধহয় পাওয়া যায়নি?'

'না। যে দু'চারটে কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাতে বে-আইনী কার্যকলাপের কোনো ইঙ্গিত নেই। —আজ ওবেলা আসছেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,— 'ওবেলা আপনাকে আর বিরক্ত করব না। ফণীশের সঙ্গে কয়লা ক্লাবে যাচ্ছি।'

[ক্রমশঃ]

"ঠিক হয়েছে, চাঁদে ওজন কম। সেখানে গেলে তোমার—!" শিল্পী : চণ্ডী লাহিড়ী
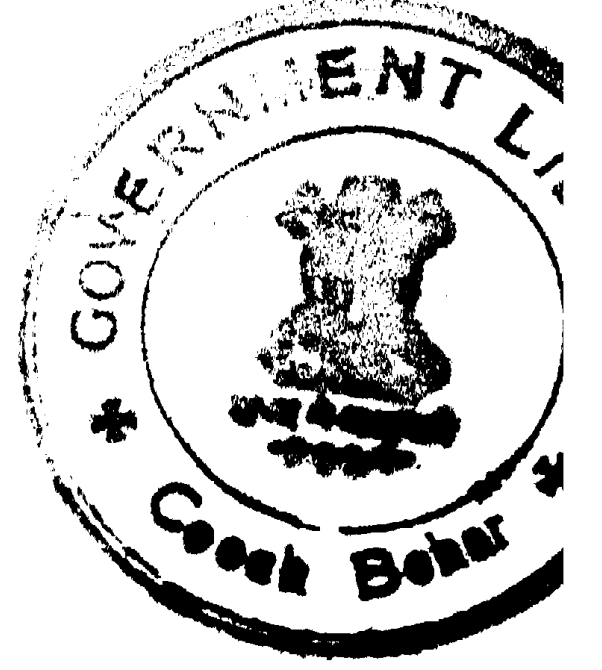
শত বার্ষিকী দেশে দেশে

ওয়াল্ট হুইটম্যান

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

গৃহযুদ্ধে বিদীর্ণ, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত আমেরিকার আকাশে ওয়াল্ট হুইটম্যান গণতন্ত্রের এক নবজাত উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের ধ্রুব আলোকের উদ্ভাস লেগেছিল ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত আমেরিকায়—যেখানে গণতন্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা বেশি।

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের গর্ভে গণতন্ত্রের যে দামাল শিশু জন্মেছিল তরুণ গরুড়ের মত তার প্রচন্ড দাবী ও ক্ষুধা। জন্মলগ্নেই সুতীব্র চীৎকারে সে তার দাবী ঘোষণা করেছিল, অহম্ অয়ম ভোঃ—এই যে আমি আমাকে দেখ। শুধু রাজনীতিজ্ঞরাই নন—ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী, ব্রাউনিং-এর মতো কবিরাও অদম্য ভালোবাসাতেই তাকে বন্দনা করেছিলেন তাঁদের কাব্যে। কিন্তু এই নবজাত গণতন্ত্রের নগ্ন, ক্ষুরধার সৌন্দর্য পূর্ববর্ণিত কবিদের লিরিক উচ্ছ্বাসে যথাযথ ভাষা পায়নি। রক্তমাংসে জীবন্ত তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হলো ওয়াল্ট হুইটম্যানের দীর্ঘমাত্রাস্বর উদাত্ত পয়ারে। এই উদাত্ত প্রবহমান পয়ারেই আমেরিকার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি রূপায়িত করেছেন। তাই ম্যাক্সওয়েল গেস্‌মার হুইটম্যানের 'লিভস্ অব্ গ্রাস'এর শততমবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লিখেছেন, "'লিভস্ অব্ গ্রাস' আমাদের সাহিত্যের বোধহয় প্রথমতম এবং প্রকৃত মহাকাব্য; আজ এই গ্রন্থের শততম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই সত্য ধারণা স্পষ্টতম হয়েছে।"

ওয়াল্ট হুইটম্যানের জন্ম ১৮১৯ সালের ৩১শে মে ওয়েস্ট হিলস্-এর লর্ড আইল্যান্ডে। বাপ ছিলেন সূত্রধর। মার শরীরে ছিল ডাচ কোয়েকার বংশের রক্ত। তাঁর সাহায্যেই কবির অন্তরে জেগেছিল শুভ্র মানবিক বোধ—যা তাঁর কাব্যকে অনুরঞ্জিত করেছে।

নানা পেশা উপলক্ষ্যে বহু ধরণের লোকের সঙ্গে কবিকে মিশতে হয়েছে। বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শজাত বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর কাব্য ঐশ্বর্যময়।

ব্রুকলিনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর এক আইনজীবীর আপিসে কবিকে চাকুরি নিতে হয়। কিছুকাল পরে ছাপাখানার কাজ শিখতে যান। এই কাজে হাত পাকিয়ে মন-প্রাণ ঢেলে বেশ কিছু-দিন শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষকতা ছেড়ে আবার বারো বছর সাময়িক ও সংবাদপত্রে সম্পাদকের কাজ করেন। আবার ভাবলেন পিতৃ-ব্যবসা ছুতোরের কাজেই বোধ হয় তৃপ্তি পাবেন। কিন্তু পিতৃ-বিয়োগের পরে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কবি আসল কাজে মনোনিবেশ করলেন। প্রকাশিত হতে লাগলো তাঁর কবিতাবলী। ১৮৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হলো 'লিভস্ অব্ গ্র্যাস'। এই কাব্য সারা দেশ তোলপাড় করে তুললো। ভাগ্যে জুটলো যেমন প্রশংসা তার চতুর্গুণ নিন্দা। অভিজাত শ্রেণী নাক কুঁচকে বলতে শুরু করে দিলো "এ যেন সুসজ্জিত ড্রইংরুমে ময়লা জলের বালতি উপুড় করে দেওয়া হলো!" আসলে হুইট-ম্যানের কাব্যের নগ্ন সত্যের সৌন্দর্য নীরক্ত সভ্যতার শৌখিন সমাজের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। এই স্পষ্টতা তাঁরা সহ্য করতে পারেননি। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তীব্র মৌসুমী হাওয়ার মত বয়ে গিয়েছিল এই কাব্যের ঝঙ্কার,—তার ঢেউ লেগেছিল ইংলন্ডেও। তাই গৃহযুদ্ধের সময় নার্স-এর কাজ নিয়ে আর্তের শুশ্রূষায় কবি যে দেশসেবা করেছিলেন তার পুরস্কারস্বরূপ কবিকে সরকারী চাকুরি দেওয়া হলেও ঐ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করা হয়। পরে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় তাঁকে পুনর্বহাল করা হলেও অসুস্থ কবিকে বেশিদিন চাকরি করতে হয়নি। কিছুকাল পরে ১৮৯২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কবির জীবিতকালে জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমেরিকা ও ইংলন্ডের বহু গুণীজনেরা তাঁর সান্নিধ্যে এসে কিংবা ডাকযোগে অভিনন্দন জানাতেন, তার উত্তরে হুইটম্যানের আবেদন ছিল তাঁরা যেন কবিকে সন্ত হিসেবে না দেখেন। সারা জীবন ধরে পৃথিবীর পথে পথে নানান পেশা ও পথের নেশায় কবি বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাঁর যাযাবরের ঝুলিতে। নানা ধরণের নর-নারীর সঙ্গে তিনি একাত্মভাবে জীবন কাটিয়েছেন। পথ-ঘাটের ইস্কুল থেকেই তিনি জীবনের পাঠ গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়—

"আমি পথে-ঘাটে লালিত হতেই ভালবেসেছি ; যারা মেষ চরায়, লোহা গলিয়ে বানায় কুড়ুল আর যারা ঘোড়ার সহিস তাদের সঙ্গে আমি আহারে-বিহারে কাটাতে পারি সপ্তাহের পরে সপ্তাহ।"

এজন্যই বলা যায়, গণতন্ত্রের প্রথম কবিকণ্ঠ ওয়াল্ট হুইটম্যান।

আমেরিকায় হুইটম্যান সংগ্রহশালাটি বিরাট এবং কবির সম্বন্ধে বিচিত্র জ্ঞাতব্য তথ্যের ভান্ডার। এই সংগ্রহশালায় দেখা যাবে বারোটি কবিতা নিয়ে ১৮৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত 'লিভস্ অব্ গ্র্যাস'এর সংস্করণ—যার মলাটের রঙে সামুদ্রিক হরিতের আভাস। ভাবতে বেশ মজা লাগে এমার্সন এই কাব্য পাঠ করে বিরক্ত

হয়ে নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে এরকম স্পষ্ট ভাষণ করতে কবিকে নিষেধ করেছিলেন—তা যতই পবিত্র হোক না কবির মনোভাব। প্রকাশকেরা আদালতের আইনের ভয়ে বাজার থেকে বই তুলে নিয়েছিল। দেখতে পাওয়া যাবে ঐ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ আরো বত্রিশটি কবিতা সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হলো আর তখনই দেশরক্ষা দপ্তরের সচিব মিঃ হর্লান হুইটম্যানকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করলেন। ঐ কাব্যের পঞ্চম সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৮৭১ সালে যার মধ্যে 'ড্রাম ট্যাপস' কবিতাগুচ্ছ সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। জানা যাবে ঐ কাব্যগুচ্ছ গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত। আরো মজার খবর জানা যায় যে, এই 'লিভস্ অব্ গ্র্যাস' সম্বন্ধে এমার্সন পরে নিজ মনোভাব পরিবর্তন করেন ও কবিকে যথেষ্ট অভিনন্দন জানান। হুইটম্যানের প্রবন্ধাবলীর প্রদর্শনীর মধ্যে রয়েছে 'ডেমোক্রাটিক ভিস্টাস'—যে গ্রন্থে কবি রাজনৈতিক চেতনা ও মতামত লিপিবন্ধ করেছেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে।

১৮৭৫ সালে প্রকাশিত 'মেমোরান্ডা ডিউরিং ওঅর', 'স্পেসিমেন ডেজ' (১৮৮২), 'নভেম্বর বাউস' (১৮৮৮) ও অন্যান্য সংকলন প্রদর্শিত। শেষ বার্ধক্যের অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে বর্ণিত।

মনে পড়বে 'চিলড্রেন অব্ অ্যাডাম্' কাব্যগুচ্ছ পড়ে নর-নারীর স্বাভাবিক যৌনচেতনা সম্পর্কে হুইট্ম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে স্টিভেনসন মন্তব্য করেছিলেন যে, "চয়নাশপের বুল'-এর মতো দাপাদাপি করে হুইটম্যান আমাদের নজর বড় বেশি কাড়তে চান।" এর পাশাপাশি থরো-র উক্তি মনে পড়ে, যিনি বলেছিলেন "যৌনতা যার কাছে আবিল, প্রকৃতির পুষ্পরাজিও তার কাছে অপবিত্র ও দূষিত।" কবি ছিলেন এই থরো-র মন্ত্রশিষ্য।

কবি যত সংবাদপত্র সম্পাদন করেছিলেন তাও এই সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত। 'দি মিরর', 'লঙ আইল্যান্ডার'-এর মতো সাপ্তাহিকের কয়েক কপি রাখা আছে। প্রদর্শিত আছে 'নিউ ওয়ার্ল্ড', 'ডেইলী ঈগল' এবং 'ডেইলী ক্রিসেন্ট'-এর কয়েক কপি।

হুইটম্যান সম্বন্ধে ১৯০২ সালে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ ও বহু দুষ্প্রাপ্য ফোটোগ্রাফ সংকলন ও স্মারকগ্রন্থ আছে এই সংগ্রহশালায়।

তৎকালীন চিন্তানায়ক জন বারোস্, উইলিয়ম ক্লার্ক থেকে আরম্ভ করে স্টিভেনসন, সুইনবর্ণ, হ্যাভলক এলিস, হেনরি জেমস সকলেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কবিকে।

আমেরিকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানবিকতার উদ্গাতা এই কবির কাব্যগ্রন্থ 'লিভস্ অব্ গ্র্যাস'এর শততম জয়ন্তী ১৯৫৬ সালে মহাসমারোহে পালিত হয় এবং বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়।

এই কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশের সময় যে হৈ-চৈ হয়েছিল এই জয়ন্তী উৎসব যেন তার প্রায়শ্চিত্ত ও পাপস্খালন।

সম্প্রতিকালে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত লুই আণ্টারমায়ার সম্পাদিত 'লিভস্ অব্ গ্র্যাস'এর নব প্রকাশিত সংস্করণে এমার্সন, থরো, হেনরি জেমস, ইংলণ্ডের সুইনবর্ণ, এ্যানি গিলক্রিস্ট প্রভৃতি অনেকের তৎকালীন সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। একশো বছর পূর্বের সাহিত্যিক সমাজের মেজাজ ও মর্জি বুঝতে তা সাহায্য করবে। কবির অন্যান্য গ্রন্থের সংকলন ও বহু স্মারকগ্রন্থ এই জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস হুইটম্যান শতবর্ষপূর্তি বক্তৃতামালা প্রচারের আয়োজন করেন।

আমেরিকার বহু ইউনিভার্সিটি ও গ্রন্থাগার ও বিদেশের অনুরূপ সংস্থা-সমূহে কবির ও কাব্যের জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়।

অমৃত

বামদিকে—

মৃদঙ্গ বাদিকা

কোণার্ক

✤

মিথুন

কোণার্ক

একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান

ভ্রাম্যমাণ

নামটা গালভরা, জাঁকজমকও বিস্তর কিন্তু ক্ষমতার দিক থেকে প্রায় নিধিরাম সর্দার। তবু আন্তর্জাতিক আদালতকে মান্য করতেই হবে।

পুরণো লীগ অফ নেশনসের বিশ্ব-আদালত যেখানে দেহত্যাগ করল সেখানেই আন্তর্জাতিক আদালতের জন্ম। রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদকে অনুমোদন করার জন্য ১৯৪৫ সালে যখন বিশ্ব রাষ্ট্রগুলি সানফ্রানসিস্কোয় জমায়েত হয় তখনই আন্তর্জাতিক আদালতের পত্তন। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান আইনগত সংস্থা হিসাবে এর কাজ হল, 'শান্তিপূর্ণভাবে সেই সব আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করা যা শান্তিভঙ্গের কারণ হতে পারে।'

রাষ্ট্রপুঞ্জের সব কয়টি সংস্থার মধ্যে এই আদালতকেই ভাবা হয়েছিল সব থেকে কার্যকরী হবে। পাছে কোন রকম বিরোধ বা মন কষাকষি হয় সেজন্য এর সভ্যপদের ভাগ-বাটোয়ারা খুব সতর্কতার সঙ্গে করা হয়। এর বিধান-বলী রচনাতেও খুব যত্ন নেওয়া হয়। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, দেখা গেল বাঘা-বাঘা বিরোধ-বিসম্বাদ যেমন, লাওস, বার্লিন, সুয়েজ, কিউবা প্রভৃতি বিশ্বশান্তি ভঙ্গের কারণগুলি এই আদালতের দরজা মাড়াতে চাইল না। টুকোপুটি বিরোধগুলিই শুধু নিষ্পত্তির জন্য এল। বিবাদী দুই পক্ষকে এই আদালত তাদের নির্দেশ মানাতে বাধ্য করতে পারে না, যতক্ষণ না দুই পক্ষ রাজী হচ্ছে। ফলে আদালতের রায় যার বিরুদ্ধেই যায় সেই রায় মানতে অস্বীকার করে বসে।

১৯৫৯ সালে জাপানের সমুদ্রে একটি বি-২৯ বিমান গুলি করে নামিয়ে দেওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আদালতে সোভিয়েট রাশিয়াকে অভিযুক্ত করে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, ব্যাপারটা আদালতের এক্তিয়ারে পড়ে না। তখন হাতগুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আদালতের আর কোন উপায় রইল না।

নিয়তির এমনি পরিহাস, মার্কিণ সিনেট যখন আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মেনে নেবার সপক্ষে এক প্রস্তাব পাশ করে তখন টম কনোলি নামে এক সিনেটর সংশোধনী তুলে বলে যে, "যখন আমাদের ইচ্ছে হবে তখন আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের শরণ নেব।" সংশোধনটি গৃহীত হয়। মার্কিণ প্রস্তাবই বুমেরাং হয়ে মার্কিণীদের ঘায়েল করে দেয়।

১৯৪৬ থেকে ৪৬টি মামলা আন্তর্জাতিক আদালতে আজ পর্যন্ত এসেছে। এর মধ্যে সব থেকে চমকপ্রদ হল, ১৯৫২ সালে বৃটেন এবং ইরাণের মধ্যে তেল বিরোধ। ইরাণের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ মোসাদেক নিজেই বৃটিশ তৈলকূপ এবং পরিশোধনাগারগুলি জাতীয়করণের পক্ষ নিয়ে, মামলার সওয়াল করতে উপস্থিত হন। কিন্তু আদালত যখন বৃটেনের পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন এক রুল জারী করে তখন মোসাদেক পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ইরাণ আদালতের এক্তিয়ার মানতে রাজী নয়।

গত বছর হণ্ডুরাস এবং নিকারাগুয়ার মধ্যে সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কে আদালত হণ্ডুরাসের পক্ষে রায় দেন। কিন্তু নিকারাগুয়া সেই রায় মানল কি না সে সম্পর্কে আদালত আজও সরকারী-ভাবে কোন খবর পায়নি।

আন্তর্জাতিক আদালতে একজন প্রধান বিচারপতি সমেত মোট বিচারপতির সংখ্যা ১৫। এদের গড় বয়স ৭৫। বছরে বেতন পান এক লক্ষ টাকা, টাকাটা কর-রহিত। গত বড়দিনে এদের ছুটি শুরু হয় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, ছুটি ফুরোয় মার্চ মাসের শেষ দিনে।

গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে আদালতের সৃষ্টি, তাদের হাতে এখন যে কাজটি রয়েছে তা হল, এক হাজার বছরের পুরণো একটি বৌদ্ধ-মন্দিরের মালিকানা নিয়ে কম্বোডিয়া এবং থাইল্যাণ্ডের মধ্যে ৫০ বছরের পুরণো বিরোধের মীমাংসা করে দেওয়া। এ বিরোধ আগামী ৫০ বছরেও মিটবে কিনা তা ভগবান জানেন।
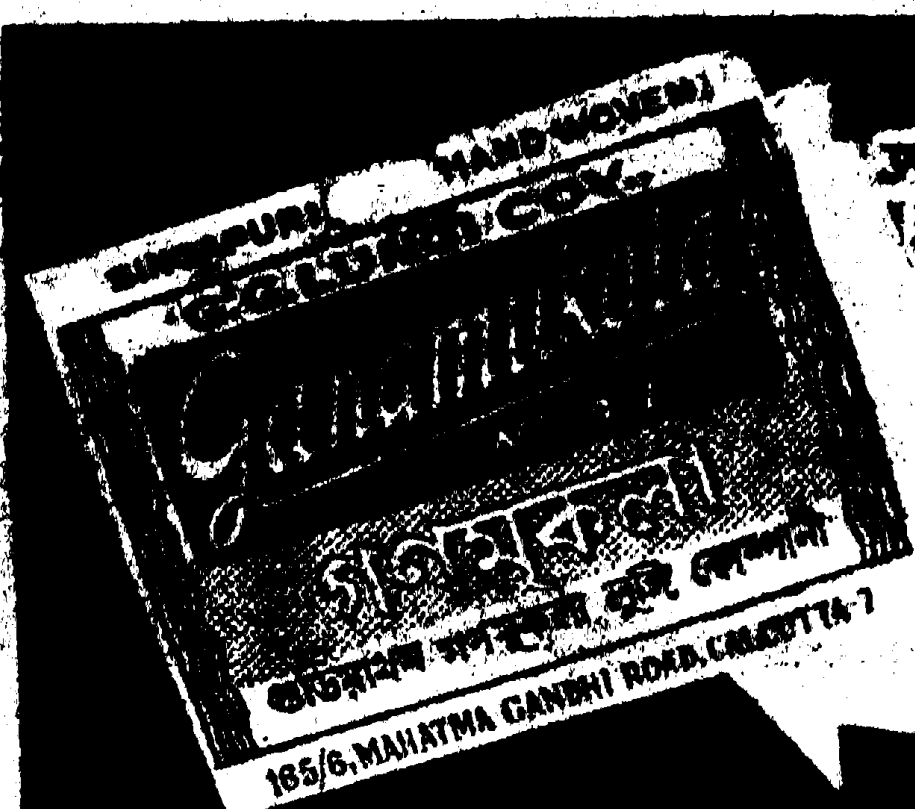
বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

ভারতে ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কার

এই প্রথম ভারতের মাটি থেকে ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া গেল। এই অদ্বিতীয় আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের জিওলজিক্যাল স্টাডিস ইউনিটের। টুকরো টুকরো অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে পুরো ডাইনোসরটি এখনো খাড়া করা হয়নি। কিন্তু অন্যান্য যে-সমস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তা থেকে বোঝা যায় যে আকারে ও আয়তনে ডাইনোসরটি রীতিমতো দশাসই। টুকরো টুকরো অংশগুলোর মোট ওজন দশটন এবং অনুমানে বোঝা যায় যে এই দশ টন ওজনের ডাইনোসরটি লম্বায় অন্তত ৫০ ফুট, উচ্চতায় অন্তত ১৫ ফুট। ডাইনোসরটি পাওয়া গিয়েছে গোদাবরী নদীর ধার থেকে, মহারাষ্ট্রের শিরঞ্চা অঞ্চলে। মাটির যে বিশেষ স্তর থেকে ডাইনোসরের ফসিলটিকে পাওয়া গিয়েছে তা থেকে ডাইনোসরটির বয়েস সম্পর্কেও মোটামুটি একটা অনুমান করা চলে। ডাইনোসরটি বেঁচেছিল আজ থেকে অন্তত পনেরো কোটি বছর আগে।

এই প্রসঙ্গে জীবজগতের বিবর্তনে ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীর অবস্থান নিয়ে কিছুটা আলোচনা চলতে পারে। নইলে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি হবে না। কিন্তু তার আগে আবিষ্কারকদের সম্পর্কে কিছু বিবরণ দিতে চাই।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের জিওলজিক্যাল স্টাডিস গঠিত হয়েছে ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ও জীবাশ্মবিদ ডক্টর (মিস) পামেলা রবিনসন এই উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন। বিশেষ করে তাঁরই উৎসাহে এই ইউনিটটি গড়ে উঠেছিল। দুজনকে নিয়ে খুবই ছোট ইউনিট—একজন ভূতত্ত্ববিদ ও মেরুদণ্ডী জীবাশ্মবিদ যাঁর নাম ডক্টর সোহনলাল জৈন এবং একজন রিসার্চ সহকারী যাঁর নাম শ্রীতপনকুমার রায়চৌধুরী। ইউনিটটি গঠিত হবার সময়ে ডক্টর পামেলা রবিনসন কথা দিলেন যে ফসিল সংগ্রহের প্রথম কয়েকটি অভিযানে তিনি সঙ্গিনী হবেন এবং কি-ভাবে ফসিলের সন্ধান করতে হয় তা হাতেকলমে শিখিয়ে দিয়ে যাবেন।

ডক্টর পামেলা রবিনসনের নেতৃত্বে ফসিল সংগ্রহের প্রথম অভিযান শুরু হয় ১৯৫৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে। ১৯৫৮ সালের ৩রা জানুয়ারী অভিযাত্রী দল কলকাতায় ফিরে আসেন। মাত্র পঁচিশ দিনের শিবির। স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল আসানসোল জেলার পাঞ্চেৎ। জিওলজিক্যাল সা[illegible] অব ইন্ডিয়া এই অভিযানের সঙ্গে স[illegible] যোগিতা করেছিলেন।

এই প্রথম অভিযানেই যে-সম[illegible] ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছিল তার গু[illegible] ও তাৎপর্য কিছুমাত্র কম নয়। [illegible] অভিযানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আ[illegible]ষ্কার ছিল একটি সরীসৃপ জাত[illegible] জীবের আবিষ্কার যার নাম '[illegible] সরাস' (Lystrosaurus)। অ[illegible] পূর্ণাঙ্গ জীবটিকে পাওয়া যায়নি, [illegible] অংশবিশেষ। লিস্ট্রোসরাসের ফ[illegible] আবিষ্কারও ভারতে এই প্রথম। [illegible] কোটি বছর আগে এই জীবটি [illegible] ছিল।

দ্বিতীয় অভিযান শুরু হয় ১৯[illegible] সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দি[illegible] স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়ে[illegible] অন্ধ্রপ্রদেশের তন্দুর ও চিনুর ([illegible] আদিলাবাদ)। এই অভিযানেও কয়ে[illegible] কৌতূহলোদ্দীপক ফসিল আবি[illegible] হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য [illegible] পনেরো কোটি বছর আগেকার ক[illegible] ধরনের মাছ, উভচর জীব ও সরীস[illegible]

ডক্টর পামেলা রবিনসন ১৯[illegible] সালের ১৭ই এপ্রিল ইংলন্ডে [illegible] যাবার সময়ে সংগৃহীত কয়েকটি ফ[illegible] সঙ্গে নিয়ে যান। পরে জানা যায়

ব্রন্টোসরাস

ইংল্যন্ডে এই সমস্ত সংগ্রহ উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে।

এই প্রশংসার একটা বাস্তব স্বীকৃতি আসে ইংলন্ডের রয়াল সোসাইটির পক্ষ থেকে। রয়াল সোসাইটির ত্রি-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতে ফসিল সংগ্রহের কাজের জন্যে ৯০০ পাউন্ড মঞ্জুর করা হয়। এই অর্থসাহায্য একদিকে যেমন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছোট ইউনিটকে প্রেরণা দিয়েছে, তেমনি অপরদিকে এই ইউনিটটিকে ভূতাত্ত্বিক অভিযানের উপযোগী আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত করে তুলেছে।

১৯৬০ সালের শেষদিকে ডক্‌টর পামেলা রবিন্‌সন্‌ আবার কলকাতায় এসেছিলেন তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করার জন্যে। এবারে স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল মহারাষ্ট্রের গোদাবরী নদীর অববাহিকা। অভিযানটি যে সার্থক হয়েছে সে-খবর শুরুতেই বলেছি। এই প্রথম ভারতের মাটি থেকে একটি ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কৃত হল। ভারতীয় উপদ্বীপ বা দাক্ষিণাত্য পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখন্ডের অন্যতম। অথচ ভূতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এই অঞ্চলে এখনো তেমন বিস্তৃতভাবে কিছু হয়নি। বলাই বাহুল্য, একটি বেসরকারী উদ্যোগে যতটুকু ফললাভ হয়েছে তার সংগে সরকারী আনুকূল্য ও অর্থসাহায্য যুক্ত হলে ফললাভ বহুগুণ বেশি হত। আমরা আশা করব এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা উদ্যোগে ও আয়োজনে ব্যাপকতর হবে এবং ভারতের প্রাগৈতিহাসিক পৃষ্ঠাগুলি আরও অনেক তৎপরতার সংগে আবিষ্কৃত হবে।

* * *

এই আলোচনায় 'ফসিল' শব্দটি অনেক বার ব্যবহার করা হয়েছে। ফসিল কি? ফসিল হচ্ছে এমন একটা নিদর্শন যার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো জীব বা গাছপালার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ফসিল নানাভাবে তৈরি হতে পারে। তবে ফসিল তৈরি হবার সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে অগভীর সমুদ্র। এমন ঘটনা অনায়াসেই ঘটতে পারে যে কোনো সামুদ্রিক জীবের মৃতদেহ বা নদীর স্রোতে ভেসে আসা কোনো ডাঙার জীবের মৃতদেহ সমুদ্রের তলায় থিতিয়ে পড়া পলিস্তরে আটকে গেছে। তখন সেই মৃতদেহের ওপরেই স্তরের পর স্তর পলি জমতে থাকে। প্রচন্ড চাপে এক সময়ে সেই পলিস্তর হয়ে ওঠে পাললিক শিলা। তারপর ভূপৃষ্ঠের ভাঙাগড়ার স্বাভাবিক নিয়মে এক সময়ে সেই পাললিক শিলার স্তর ঠেলা খেয়ে উঠে আসে সমুদ্রের তলা থেকে। এইভাবে শিলাস্তরের মধ্যে একটি বিশেষ সময়ের জীবের সাক্ষ্য থেকে যাচ্ছে। এরই নাম ফসিল বা জীবাশ্ম।

ফসিল নানা ধরনের হতে পারে। এক ধরনের ফসিল আছে যেখানে প্রাগৈতিহাসিক জীবের সত্যিকারের দেহাবশেষটুকুকেই পাওয়া যায়। হয় গোটা শরীরটাই কিংবা শরীরের কোনো অংশ। আরেক ধরনের ফসিল আছে যেখানে পাওয়া যায় অবিকৃত একটি ছাপ। এই ছাপের মধ্যে সত্যিকারের গড়নের আভাসটুকুও থাকে। আরেক ধরনের ফসিল আছে যার মধ্যে কোনো প্রাগৈতিহাসিক জীবের জীবনধারণের খানিকটা ইংগিত থাকে মাত্র। যেমন কোনো ডাইনোসরের পায়ের ছাপ বা কোনো পোকামাকড়ের বাসা বা এমনি ধরনের কিছু। ফসিলকে বলা চলে প্রকৃতির নিজের হাতে লেখা শিলালিপি। এই শিলালিপি পাঠ করে জীববিজ্ঞানীরা প্রাগৈতিহাসিক জীবজগতের বিবরণ সংগ্রহ করছেন।

* * *

জীবজগতের বিবর্তনে কোন্ স্তরে ডাইনোসরদের আবির্ভাব হয়েছিল?

পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ পঞ্চাশ কোটি বছরকে তিনটি বড় বড় অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে:

(১) পুরাজীবীয় (Paleozoic); (২) মধ্যজীবীয় (Mesozoic); (৩) নবজীবীয় (Cainozoic)।

নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে কোন্ সময়ে কোন্ ধরনের জীব পৃথিবীতে বাস করেছে তারই ভিত্তিতে এই নামকরণ। গত সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছি জীবের উৎপত্তি কি-ভাবে হয়েছিল ও কখন হয়েছিল। আমরা বলেছি যে আদিম সমুদ্রে আদি প্রাণের আবির্ভাব প্রায় দুশো কোটি বছর আগে। কিন্তু জীবজগতের বিবর্তনে চোখের দেখায় চিনতে পারার মতো জীবের জন্ম পঞ্চাশ কোটি বছর আগে হয়নি। আর এই সময় থেকেই পুরাজীবীয় যুগের শুরু।

মধ্যজীবীয় যুগটির শুরু প্রায় উনিশ কোটি বছর আগে আর নবজীবীয় যুগটির শুরু প্রায় সাত কোটি বছর আগে।

আবার প্রত্যেকটি যুগকে ভূবিজ্ঞানীরা কয়েকটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। যেমন পুরাজীবীয় যুগের ছ'টি ভাগ: (১) ক্যাম্‌ব্রিয়ান, (২) অর্ডোভিসিয়ান, (৩) সিলুরিয়ান, (৪) ডেভোনিয়ান, (৫) কার্বনিফেরাস ও (৬) পার্মিয়ান। মধ্যজীবীয় যুগটির তিনটি ভাগ। নবজীবীয় যুগের পাঁচটি।

এক-একটি যুগকে এভাবে ভাগাভাগি করার মধ্যে বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। এক-একটি যুগের নিদর্শন হিসেবে নানা ধরণের শিলাস্তর পাওয়া গিয়াছে। এরই ভিত্তিতে উপযুগের নামকরণ। যেমন ক্যাম্‌ব্রিয়ান নামটি এসেছে ইংলন্ডের কেম্‌ব্রিজশায়ারে পাওয়া নিদর্শন থেকে। জুরেসিক নামটি এসেছে জুরা পর্বতমালায় পাওয়া নিদর্শন থেকে। এমনি প্রত্যেকটি নাম।

তাহলে এবার গোটা ছবিটি একটি ছকের মধ্যে তুলে ধরা চলে:

যুগ: নবজীবীয়
(স্তন্যপায়ীদের যুগ)

উপযুগ	বয়স
প্লিস্‌টোসেন	৫০ লক্ষ
প্লিওসেন	১½ কোটি
মাইওসেন	৩ কোটি
অলিগোসেন	৪ কোটি
ওয়োসেন	৭ কোটি

যুগ: মধ্যজীবীয়
(সরীসৃপদের যুগ)

উপযুগ	বয়স
ক্রেটাসিয়াস	১১ কোটি
জুরাসিক	১৪ কোটি
ট্রিয়াসিক	১৯ কোটি

যুগ: পুরাজীবীয়
(আদিম প্রাণীদের যুগ)

উপযুগ	বয়স
পার্মিয়ান	২২ কোটি
কার্বনিফেরাস	২৮ কোটি
ডেভোনিয়ান	৩২ কোটি
সিলুরিয়ান	৩৪ কোটি
অর্ডোভিসিয়ান	৩৯ কোটি
ক্যাম্‌ব্রিয়ান	৫০ কোটি

এই ছকের দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি যে, ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া গিয়েছে সেটি হচ্ছে মধ্যজীবীয় যুগের ট্রিয়াসিক উপযুগের জীব। সিল্টোসরাসও তাই।

মধ্যজীবীয় যুগটিকে বলা হয়েছে সরীসৃপদের যুগ। এই যুগে পৃথিবীতে যে-সব জীবের আধিপত্য হয়েছিল তাদের মতো প্রকাণ্ড চেহারার জীব পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। যেমন, এ-যুগের একটি হিপোপটেমাসের ওজন বড় জোর দু'টন, লম্বায় দশ ফুটের বেশি নয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় যুগের জল-জন্তু ব্রন্টোসরাসের ওজন অন্তত পঞ্চাশ টন এবং সেটি লম্বায় অন্তত পঁচিশ গজ। আর গায়ে[illegible] যদি তুলনা করতে হয় তাহলে এ-যুগের পশুরাজ সিংহ মধ্যজীবীয় যুগের টাইরানোসরাসের কাছে ছারপোকার মতো দুর্বল।

ডাইনোসর বলতে কিন্তু একটি বিশেষ কোনো জীবকে বোঝায় না। সরীসৃপ জাতীয় কয়েক ধরনের জীবের সাধারণ নাম ডাইনোসর (Dinosaur)। ইংরেজ জীবাশ্মবিদ স্যার রিচার্ড আওয়েন এই নামের উদ্ভাবক। ব্রন্টোসরাস ও টাইরানোসরাসকেও বলা চলে ডাইনোসর।

কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যে এই ডাইনোসর নামটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। কোনান ডয়েলের বিখ্যাত উপন্যাস 'দি লস্ট ওয়ার্ল্ড'-এ ডাইনোসরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এইচ, জি, ওয়েলস-এর গল্পে একাধিকবার ডাইনোসর এসেছে। হালের একজন সোভিয়েত লেখক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লিখতে গিয়ে ডাইনোসরের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। হেমেন্দ্রকুমার রা.... অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাস 'ময়নাবতীর মায়া-কানন' বইতেও ডাইনোসর আছে।

কিন্তু একথা এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে কোনো মানুষই ডাইনোসরকে চাক্ষুষ দেখেনি। আজ থেকে সাত কোটি বছর আগেই ডাইনোসররা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ডাইনোসরদের পক্ষ নিয়ে আরো একটি কথা এখানে বলা দরকার। গল্পে-উপন্যাসে ডাইনোসরদের যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে মনে হয় এরা বুঝি খুবই হিংস্র জীব। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। কোনো কোনো ডাইনোসর নিতান্তই তৃণভোজী ও নিরীহ আর চেহারার দিক থেকে এমন কিছু একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার নয়।

মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপদের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে, তারাই প্রথম ডাঙাকে জয় করেছে। অর্থাৎ সত্যিকারের অর্থে তারাই প্রথম পুরোপুরি ডাঙার জীব। পুরাজীবীয় যুগের শেষ দিকে এক-দল উভচর সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু উভচর

মধ্যজীবীয় যুগের আতংক টাইরানোসরাস

হওয়া সত্ত্বেও তাদের থাকতে হত জলের কাছাকাছি, কারণ ডিম পাড়বার সময়ে তাদের জলে ফিরে যেতেই হত। কিন্তু সরীসৃপদের এ অসুবিধে ছিল না। তাদের ডিম শক্ত খোলায় ঢাকা থাকত বলে তারা অনায়াসেই ডাঙাতেও ডিম পাড়তে পারত। জীবজগতের ইতিহাসে ডিমের ওপরে শক্ত খোলার আবরণ সরীসৃপদের বেলাতেই প্রথম।

মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপরা আকাশকেও জয় করেছিল। এমনি এক আকাশচারী সরীসৃপের নাম টেরোডাক্টিল। এদের গায়ে পালক বা রোঁয়ার চিহ্ন-মাত্র ছিল না, তার ওপরে ছিল ধারালো দাঁত। ডানা-ছড়ানো অবস্থায় এদের এক ডানা থেকে অপর ডানার মাপ হত অন্তত পঁচিশ ফুট। টেরোডাক্টিল ছিল মধ্যজীবীয় যুগের উড়ন্ত বিভীষিকা।

মধ্যজীবীয় যুগটি শুধু বিজ্ঞানী-দের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে তাই নয়, শিল্পীদেরও। প্রাণের এমন মহোৎসব বড় একটা দেখা যায় না। গোটা পৃথিবীকে যেন একটা আতস কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে। সবই বৃহৎ, সবই বিপুল। পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পীরা কল্পনার রঙে এই যুগের গাছপালা ও জীবজন্তুর ছবি এঁকেছেন। বিজ্ঞানের দৌলতে এমন দিন যদি কখনো আসে যে মানুষ ইচ্ছে করলেই অতীতে ফিরে যেতে পারবে, তাহলে, আমার মনে হয়, জীববিজ্ঞানীরা ও শিল্পীরা সবচেয়ে আগে যেতে চাইবেন এই মধ্যজীবীয় যুগে। প্রাণের এই মহোৎসব চোখে দেখেও আনন্দ।

তার আগে আমরা বড় জোর শিল্পী-দের আঁকা ছবি দেখতে পারি। তাতেও যদি তৃপ্তি না হয় তাহলে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে গিয়ে সত্যিকারের ডাইনোসরের ফসিল দেখে আসা যেতে পারে।

রঙ্গমঞ্চের রঙ্গকথা

অখিল নিয়োগী

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে বলে গেছেন—

"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায়—জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক—সে শুধু ছবিই আঁকে।"

ছেলেবেলা থেকে এইরকম কত ছবি যে স্মৃতির পটে আঁকা হয়ে গেছে—তার তালিকা তৈরী করা সম্ভবপর নয়।

আজ **যখন** কোনো বর্ষণ-মুখরিত **সন্ধ্যায় অতীতের** দিকে তাকাই—তখন কত **ছবিই অকারণে** জল ভরা মেঘের মতো মনের আকাশে ভেসে বেড়ায়।

বাঙলার নাট্য-জগতের সংগেও **একদিন অন্তরের** যোগাযোগ সৃষ্টি **হয়েছিল।** সেদিনকার সেই সব মধুর আর কৌতুকজনক কাহিনী অনেক সময় মনকে পুলকিত করে তোলে।

আমি **যখন স্কটিশ** স্কুলের ছাত্র—**সেই সময় কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের** ১৪৫নং **বাড়ীতে মামার কাছে থাকতাম।** আমার মামা **শ্রীযদুনাথ** সেনগুপ্ত, কবিবন্ধু—**স্বর্গত** শ্যামাদাস বাচস্পতি মশায়ের প্রিয় **ছাত্র ছিলেন। সেই সম্পর্কে শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ** তাঁকে যদুদা বলে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করেন।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের এই বাড়ীটির **মালিক ছিলেন—সে যুগের যশস্বিনী অভিনেত্রী বিনোদিনী** দাসী। সেই **ছেলেবেলায় শুনেছিলাম** বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রের মন্ত্র-শিষ্যা—সেকালের **শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। বিনোদিনী** রোজ **আমাদের কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের** বাড়ীর **সামনে দিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন।**

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে **ভাবতাম, গিরিশচন্দ্রের কাছে** অভিনয়-**বিদ্যা আয়ত্ত করে এই** প্রথিতযশা **অভিনেত্রী এককালে** হাজার হাজার **দর্শকের মনোরঞ্জন করে** করতালিধ্বনিতে **অভিনন্দিত হয়েছেন!**

আজ ইনি বৃদ্ধা **হয়েছেন—এঁকে কেউ ডেকেও** জিজ্ঞেস করে না!

গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত কবিতার **লাইনটি মনে পড়ত—**

"দেহ পট সনে নট সকলি হারায়।"

আজ এঁর দেহ পট অথর্ব হয়েছে—তাই সকল সম্মান ইনি হারিয়ে বসে আছেন!

মাস শেষ হয়ে গেলেই **ইনি মামার কাছ** থেকে বাড়ীর ভাড়া নিয়ে যেতেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ওপরকার অত বড় বিরাট বাড়ীর ভাড়া ছিল তখন মাত্র একশ' টাকা।

আমাদের বাসার উল্টোদিকেই ছিল চির-চেনা ষ্টার থিয়েটার। প্রতি শনি-রবিবার সেই নাট্যগৃহ আলোক-মালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত, দর্শকবৃন্দের আনা-গোনায় শব্দ-মুখর হত। দুটি বাড়ীর সামনের রাস্তা ল্যান্ডো, ফিটন ইত্যাদি ঘোড়ার গাড়ীতে অনেক সময় **ট্রাম বন্ধ** হয়ে যেত। তখনো কলকাতায় মোটরের এত প্রচলন হয়নি। বিরাট বিরাট ল্যান্ডো গাড়ী ছিল—বড় লোকের বাহন।

"সামনে ওয়ালা ভাগো" বলে পেছনে দাঁড়ানো সহিস আচমকা হাঁক দিত—আর আমাদের পেটের পিলে চমকে উঠত।

আমি বড় রাস্তার ওপর বাইরের ঘরে বসেই পড়া-শোনা করতাম। যে দিন মাষ্টারমশাই আসতেন না—সেদিন অবাক হয়ে ষ্টার থিয়েটারের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভেতর থেকে চড়া সুরে বাঁধা কনসার্টের আওয়াজ ভেসে আসত। কখনো বা নর্তকীদের নূপুরের মৃদু গুঞ্জন শোনা যেত। দূরে থেকে পরম বিস্ময়ে ভাবতাম—**ওই** মায়াপুরীতে **প্রবেশের অধিকার আমার নেই! না জানি** কি রহস্য লুকিয়ে **আছে ওখানে।**

আমার পিসতুতো দাদা কে, এম, **নিয়োগী তখন "রয়টারের" কলকাতা অফিসের ম্যানেজার। নাট্যকার অপরেশচন্দ্র তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রায়ই ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের** দিন বেড়াতে আসতেন, **আর সেই সংগে** আমাদের বাসাতেও দেখা-সাক্ষাৎ করে যেতেন। ইচ্ছে করলেই আমি তাঁর সংগে গিয়ে **ষ্টার থিয়েটারের নাটক** দেখতে পারতাম।

কিন্তু মামার কড়া নির্দেশ ছিল—ম্যাট্রিক পাশের আগে থিয়েটার দেখা চলবে না।

সেই সময় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অপরেশ-চন্দ্রের "অযোধ্যার বেগম" সাফল্যমণ্ডিত-ভাবে অভিনীত হচ্ছিল। নাম-ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করছিলেন—সর্বজনপ্রশংসিতা তারাসুন্দরী। সেই জন্যে প্রতি শনি-রবিবার ষ্টারে লোকজন একেবারে ভেঙে পড়ত! গাড়ী-ঘোড়ার চলাচলে বড় রাস্তাটা একেবারে বন্ধ হয়ে যেতো।

এই তারাসুন্দরীর সংগে পরবর্তী-কালে নাট্যনিকেতনে যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। সে স্মৃতি-কথা যথা সময়ে পাঠকদের শোনাবো।

তখনকার দিনে নাট্য-সমালোচনার জন্যে ছোট-বড় অনেক সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। কিন্তু বাঙলা দৈনিক কাগজে—যতদূর স্মরণ হয়—নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত "বাঙলার কথা" কাগজে আমিই সর্বপ্রথম "মঞ্চ ও চিত্রকথা" সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা সুরু করি। তখন অবশ্য সাপ্তাহিক কাগজ "নবশক্তি" যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। "বাঙলার কথার" সম্পাদক ছিলেন তখন বন্ধুবর শ্রীগোপাল সান্যাল। এসব ঘটনা অবশ্য অনেক পরের কথা। যথাসময়ে তারও আলোচনা করবো।

আজ মনে পড়ছে,—প্রথম থিয়েটার কবে দেখি—সেই দিনকার মধুময় স্মৃতির কথা।

মামা বলেছিলেন, প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ না করলে থিয়েটার দেখার অনুমতি পাওয়া যাবে না।

যে দিন **স্কটিশ স্কুল থেকে আমাদের দলের সংগে প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ** হলাম—সেদিন পাশ করার আনন্দের সংগে **এই প্রশ্ন** মনে জেগেছিল—এইবার থিয়েটার দেখতে পারব ত?

একটা সুযোগ খুব শীগ্গিরই এসে গেল। মনোমোহন থিয়েটারে গিরিশ-চন্দ্রের "শাস্তি-কি-শান্তি" অভিনীত **হচ্ছে। নাম ভূমিকায়—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ**
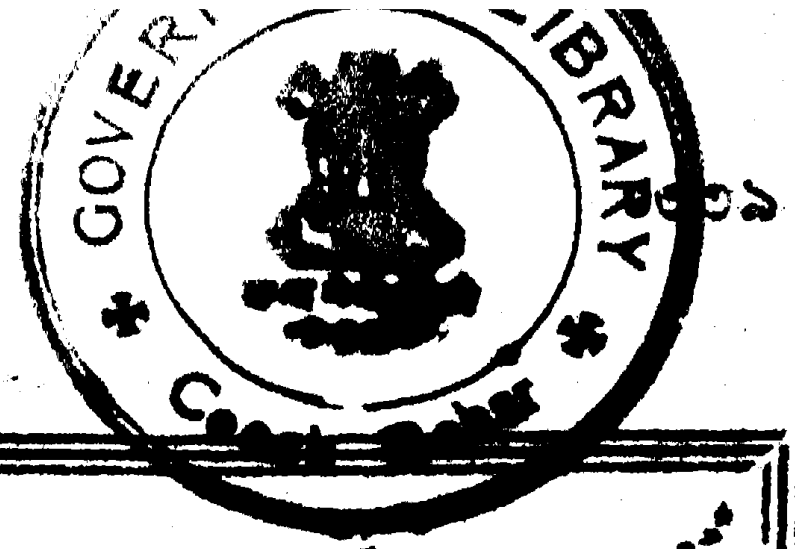
(দানিবাবু)। মনোমোহন থিয়েটারের অস্তিত্ব এখন লোপ পেয়েছে। বিডন স্ট্রীট থেকে চিত্তরঞ্জন এভেনিউ যেখানে সোজা গিরিশ ঘোষের বাড়ীর দিকে চলে গেছে—ওই খানেই—ঠিক বিডন স্ট্রীটের ওপরেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল মনমোহন থিয়েটার।

আমার এক ভাইপো ছিলেন বয়েসে আমার অনেক বড়—নাম অমিয় সেন। সেইকালে রাজশাহী কলেজের ছাত্র সমাজে তিনি অন্যতম দলপতি-স্থানীয় ছিলেন। শোনা যায় সেই সময় রাজশাহী অঞ্চলে বিপ্লবীদের দ্বারা যেসব স্বদেশী ডাকাতি হত—তার সংগৃহীত অর্থ এই বিশ্বাসী কর্মীর হাতেই জমা থাকত। তিনি ছিলেন বিপ্লবী দলের কোষাধ্যক্ষ। অভিনয়েও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল ছাত্রমহলে। তিনি তাঁদের কি কাজে কলকাতা এসেছিলেন। এসেই জানালেন —'শান্তি-কি-শান্তি'-তে দানী ঘোষের অভিনয় দেখতে যাচ্ছেন। আমি এই সুযোগকে হাতছাড়া করলাম না। যথা যথা সময়ে আমার আবেদন পেশ করলাম মামার কাছে। বলা বাহুল্য—এইবার আমার আবেদন মঞ্জুর হল।

সারাটা দিন যেন শুয়ে-বসে আর কিছুতেই কাটতে চায় না। কখন সেই মায়াপুরীতে প্রবেশের অধিকার পাবো—সেই চিন্তায় মসগুল হয়ে থাকলাম। যদিও অভিনয় আরম্ভ হবে সাতটায়—তবু বিকেল থেকেই জামা-কাপড় ঠিক করে তৈরী হয়ে নিলাম। যেন কোনো-ক্রমেই দেরী না হয়। অভিনয়ের ক্ষুদ্রতম অংশও যেন ফাঁকি দিতে না পারে।

পরবর্তী জীবনে দানিবাবুর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি, তাঁর কাছাকাছি বসে আলোচনা করবার অবসর পেয়েছি, দানিবাবু মানুষটি কেমন ছিলেন—তা জানবার সুযোগ ঘটেছে আমার, কিন্তু সেই মনোমোহন থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক "শান্তি-কি-শান্তি" অভিনয়ে দানিবাবুর যে অনবদ্য অভিনয় অবলোকন করে ক্ষণে-ক্ষণে বিস্মিত—মুগ্ধ —চকিত ও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিলাম—তার মধুর স্মৃতি আজও মন থেকে মুছে যায় নি।

সেই আমার বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশের প্রথম রজনী।

পরবর্তী জীবনে—দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, অহীন্দ্র চৌধুরী, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার—এ'দের প্রত্যেকেরই স্নেহ-

লাভে ধন্য হয়েছি। দিনের পর দিন তাঁদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেছি—নাটক নিয়ে আলোচনা করেছি—তাঁদেরকে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছি—সে সব কাহিনী ধীরে ধীরে লিপিবদ্ধ করার বাসনা রইল।

"শাস্তি-কি-শান্তির" পর আবার যখন যবনিকা উত্তোলিত হল—তখন আমি সরকারী শিল্প-বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ছবি আঁকার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছি।

শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণ চক্রবর্তী, ফনী গুপ্ত, নরেন দত্ত—এদের নিয়ে এক শিল্পী-নিবাস স্থাপন করেছি নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের ভবনের অতি সন্নিকট ৩০, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে।

এক গ্রীষ্মের ছুটিতে দিনাজপুরে গিয়েছিলাম—ফিরতি পথে ট্রেণে নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছেন—মনোমোহন থিয়েটারের জন্যে নৃত্য-গীতমুখর নাটক "মহুয়া" রচনা করতে হবে।

সেই সময় আর্ট থিয়েটারের পরি-চালনায়—ষ্টার ও মনোমোহন থিয়েটার চলছে। মনোমোহনের জন্যে নতুন নাটকের প্রয়োজন। তাই তরুণ নাট্যকার মন্মথ রায়ের আহ্বান এসেছে। মন্মথ রায় তখন বালুরঘাটে থাকতেন। তিনি আমায় জানালেন, শীগ্গীরই কলকাতায় আসছেন—তখন আবার দেখা হবে। আমি আমার কলকাতার ঠিকানা তাঁকে দিয়ে দিলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন বাদেই মন্মথ রায়ের পত্র পেলাম—"মহুয়া" নাটক লিখতে তিনি কলকাতায় আসছেন। সুতরাং আবার নতুন করে তাঁর সঙ্গে কলকাতায় যোগাযোগ হল।

মন্মথবাবু আমায় অনুরোধ করলেন, চলুন, মনোমোহন থিয়েটার থেকে ঘুরে আসি। ওখানেই প্রবোধবাবু প্রতি সন্ধ্যায় বসেন। সেইখানেই দেখা করতে লিখেছেন।

নাট্য জগতের নেপথ্য লোক। এই-খানেই নাটক সম্পর্কে আলোচনা হয়। নাটকের জন্মের উৎস হচ্ছে এইখানে। তখনকার দিনে থিয়েটারের একজন ম্যানেজার থাকতেন। তাঁরই নির্দেশ মতো নাটক রচনা করতে হত। কে কে সেই নাটকে অভিনয় করবেন—সে সম্পর্কে মোটামুটি স্থির হত আগেই। সেই পাত্র-পাত্রীকে অবলম্বন করেই মোটামুটি নাটকের ভূমিকা বণ্টন করা হত। তারপর সাজ-সজ্জা দৃশ্যপটের কথা ভাবা হত। একজন করে সুরশিল্পী ও কনসার্ট পার্টি থাকতো প্রতি রঙ্গালয়ের সংশ্লিষ্ট হয়ে। তাঁরা নাচ গানের রিহার্সেল নিয়ে মেতে উঠতেন। অপর দিকে প্রতি সন্ধ্যায় নাটকের মহলা চলতো। এই সব ব্যাপার চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাবে—এ সুযোগ কেউ কখনো ছাড়ে? কাজেই নাট্যকার মন্মথ রায়ের আমন্ত্রণে আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় দুইজনে গিয়ে হাজির হলাম—অধুনালুপ্ত মনোমোহন থিয়েটারের তোরণ-দ্বারে। বহুকাল আগে এই মনোমোহন থিয়েটারেই গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক—"শাস্তি কি শান্তি" দেখে গিয়েছিলাম। সে কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল।

দারোয়ানের কাছে জিজ্ঞেস করতে জানতে পারা গেল শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ-ঠাকুরতা দোতলার বৈঠকখানায় আছেন।

আমরা দুজনে একটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম। সেখানে দক্ষিণ দিকে মুখকরা একটি বারান্দা আর সেই বারান্দা সংলগ্ন একটি বড় বৈঠকখানা।

এই বৈঠকখানায় অনেকেই আসর জমিয়ে বসেছেন। ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকলাম—কেননা নাট্যজগতের রীতি-নীতি কিছুই জানি না। প্রবোধবাবু মন্মথ রায়কে দেখতে পেয়ে সোল্লাসে ধ্বনিতে অভ্যর্থনা জানালেন। একে একে ওখানকার সকলেরই পরিচয় পাওয়া গেল। দাবার ছক নিয়ে বসেছিলেন স্বয়ং প্রবোধচন্দ্র গুহ এবং অনাদিনাথ বসু। অনাদিবাবুর হাতের কাছেই একটি চকচকে পানের ডিবে। তিনি সর্বক্ষণ তাম্বুল চর্বণ করছেন। পাতলা এবং লম্বা ধরনের মানুষ—মুখে হাসি লেগেই আছে। এই অনাদিবাবুই অরোরা ফিল্ম ও অরোরা ষ্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী জীবনে এই প্রবোধবাবু এবং অনাদিবাবুর স্নেহ লাভে আমরা সকলেই ধন্য হয়েছিলাম। তাঁদের বাড়ীর প্রত্যেক সামাজিক কাজে নিজেরা এসে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—এমনি ছিল তাঁদের সেকালের ভদ্রতা জ্ঞান। এই ব্যবস্থা তাঁরা চিরকাল মেনে এসেছেন—আজ ভাবতে গেলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

এই বৈঠকখানায় ছিলেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়—যিনি ভারতী দলের লোক বলে সেই সময়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশেষ করে তৎকালে তিনি বহু নাটকের সঙ্গীত রচনা করে এবং নৃত্য পরিকল্পনা করে নাট্যরসিকবৃন্দের মনোজয় করে নিয়েছেন। বৈঠকখানার এক দিকে বসে ছিলেন সাংবাদিক শ্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়—যিনি বন্ধু মহলে জংলী গাঙ্গুলী নামে খ্যাত ছিলেন। শিল্পী যামিনী রায়কেও আমরা সেদিন এই আসরে দেখতে পেয়েছিলাম। আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী যামিনী রায়ের পরিচয় না দিলেও চলবে। নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাই সেদিনকার সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা—দুর্গাদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়। সে যুগে দুর্গাদাসের মতো জনপ্রিয় অভিনেতা আর একজনও ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক মজার মজার গল্প পাঠক-পাঠিকাদের শোনাতে পারবো। আজ নমুনা হিসেবে একটি গল্প উপহার দিয়ে রাখছি—

অবশ্য মনোমোহনের এই ঘটনার অনেক পরের কাহিনী। তখন দুর্গাদাস আমাদের দুর্গাদা হয়ে গেছেন। তাঁর কাছে আমাদের আবদারের অন্ত নেই! তিনিও ছোট ভাইদের সব আবদার রক্ষা করতেন। তাঁর স্নেহলাভে ধন্য হয়েছি আমরা। এখন যেখানে উত্তরা-শ্রী সিনেমা—সেইখানেই তখন ছিল ক্রাউন-কণ্ডয়ালিশ সিনেমা। সেই ক্রাউন সিনেমায় একটি নামকরা বিদেশী ছবি এসেছে। আর সেই সঙ্গে মধুর প্রস্তাব এলো—দুর্গাদা আমাদের ছবিখানি দেখাবেন। দুর্গাদা, মন্মথ রায়, ধীরেন গাঙ্গুলী (সিনেমা জগতের বিখ্যাত ডি, জি) ও আমি—এই চারজনকে নিয়ে আমাদের দল তৈরী হল। আমি তখন রূপবাণীর প্রচারসচিব। চারজনে সন্ধ্যা-বেলায় ঐখানেই মিলিত হলাম। যথারীতি চা-পর্ব শেষ করে দলপতির নির্দেশে আমরা ক্রাউনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। দুর্গাদা আমাদের হোষ্ট, কাজেই ভাবনার কিছু নেই। উচ্চ শ্রেণীর টিকিট কেনা হল। দুর্গাদা আমাদের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকলেন। এ বিষয়ে লঙ্ম্যান মন্মথ রায় তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। নইলে জনগণের সোল্লাস ধ্বনিতে তক্ষুণি হৈ-চৈ সুরু হয়ে যেত! খ্যাতির বিড়ম্বনায়—দুর্গাদাকে সব সময় লুকিয়ে-চুরিয়ে পথ চলতে হত! যাই হোক—মহানন্দে আমরা সিনেমা উপ[illegible]গ করছি, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে চলছে কৌতুক কথোপকথন!

ইণ্টারভ্যালে আলো জ্বলে উঠল।

দুর্গাদা বল্লেন, আমি সবাইকে লেমনেড্ খাওয়াচ্ছি। তাঁর ডাকে এক লেমনেড্ওয়ালা এসে আমাদের সবাইকে কাচের গ্লাসে লেমনেড পরিবেশন করে গেল। ইতিমধ্যে যে কি কৌতুকজনক কাণ্ডের সৃষ্টি হল—সে কথা কিছুই জানতে পারিনি। যথা সময়ে সিনেমা-শো শেষ হল। আমরা দুর্গাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে যার মতো ঘরে ফিরে এলাম।

পরদিন দুপুরবেলা কলেজ স্কোয়ারের যে কোনো বইয়ের দোকানে ঢুকি দেখি, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা চোখের ইসারায় কি যেন ইঙ্গিত করে, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি সুরু করে দেয়। একজন ত' সহসা লুকিয়ে না রেখে বলেই ফেল্ল, কি হে ভায়া, দুর্গাদাসের চ্যালা হয়ে খুব যে চাকুচালি সুরু করেছ। প্রথমটা কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। পরে অনেক ভেবে চিন্তে আবিষ্কার করলাম—কাল রাত্রের শোতে আমরা যে লেমনেড্ খেয়েছিলাম তার রঙ ছিল লাল। পরে আরো জানতে পারলাম, আমাদের এক সাহিত্যিক বন্ধু রাত্রের ওই সিনেমা-শোতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দূর থেকে আমাদের দুর্গাদাসের সঙ্গে লাল রঙের তরল পদার্থ পান করতে দেখে অনুমান করে নিয়েছেন যে, আমরা মদ্যপান করেছি। সেই কথা আজ তিনি পরম উল্লাসে কলেজ ষ্ট্রীটের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে প্রচার করে বেড়িয়েছেন যে, আমরা গত রাত্রে পানাসক্ত হয়ে সিনেমা-শোতে কি কাণ্ড করেছি! এই সব ঘটনার বর্ণনা দিতে সাধারণত একটু রঙ মাখিয়ে নিতে হয়। বন্ধুবর সে কাজেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি! ফলে,—একদিনেই সকল প্রকাশকের গৃহে বার্তা রটে গেছে যে, আমি দুর্গাদাসের চ্যালা হয়ে খুব রঙীন হচ্ছি আজকাল!

এই কাহিনী যখন দুর্গাদাকে সবিস্তারে বল্লাম, তখন তার মুখে হাসি দেখে কে!

এইভাবে তিলকে তাল করার রেওয়াজ প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে।

যাই হোক—আসল আলোচনায় আবার ফিরে আসা যাক। মনোমোহনের সেই দিনকার আসরে আরো দুইজন অভিনেতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের একজনের নাম —প্রভাত সিংহ এবং আর একজনের নাম মণি ঘোষ।

এই সন্ধ্যাবেলার বৈঠকখানায় পর পর কয়েকদিন যাতায়াতের পর জানতে পারলাম, এখানে আসেন—সাংবাদিক ও নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত (নবশক্তি) শিল্পী চারু রায়, সাংবাদিক কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, 'বাঙলা' কাগজের যতীন রায়, নাট্যকার ও সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—এবং আরো বহু খ্যাত ও অখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিকবৃন্দ।

নাট্যকার মন্মথ রায় আমাকে যথারীতি প্রবোধবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এবং জানালেন যে, আমি একজন উদীয়মান শিল্পী। সম্প্রতি সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ও বইয়ের ছবি আঁকছি।

প্রবোধবাবু আমাকে পেয়ে খুশী হলেন এবং "মহুয়া" নাটকের একটি প্রাচীর-পত্র (পোষ্টার) আঁকতে অনুরোধ করলেন।

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বে বাঙলাদেশের রঙ্গালয়গুলির প্রচারের কাজে বড় বড় কাঠের টাইপ ব্যবহার করে দেয়াল-পত্র মুদ্রিত হত। সেইগুলিই বিভিন্ন রাস্তার দেয়ালে লটকে দেয়া হত। "মহুয়া"তেই সর্বপ্রথম লিথো-প্রিণ্টে তিন রঙা পোষ্টার ছাপা হয়। এই পোষ্টার আঁকতে দিয়ে প্রবোধবাবু আমায় যে সম্মান দান করেছিলেন, সেকথা আজ আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। তিনি আমাকে একথাও বলে দিয়েছিলেন, দেখ অখিল, এই পোষ্টারটি খুব ভালো করে আঁকতে হবে। তুমি জানো, শিল্পী চারু রায় আমার বিশেষ বন্ধু। সে প্রায়ই আমাদের বৈঠকখানায় আসে। তাকে অনুরোধ করলে সে এক্ষুনি এই পোষ্টার এঁকে দেবে। কিন্তু আমি চিরকাল নতুন মানুষকে সুযোগ দিতে ভালবাসি। তা ছাড়া তুমি মন্মথর বন্ধু। তাই পোষ্টারটি তোমাকেই আঁকতে দিলাম।

তখনকার দিনে শিল্পী চারু রায় কমার্শিয়াল আর্টে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-শিষ্য। তা ছাড়া বাঙলা টাইপে তিনি যে যুগান্তর আনয়ন করেছিলেন, সেকথা প্রত্যেক শিল্পী চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন। তাই চারু রায়কে ছোট-বড় প্রত্যেক শিল্পীই সম্মান করে চলতেন। আরও একটি কথা, পরবর্তীকালে শিশিরকুমারের 'সীতা' নাটকের দৃশ্যপট পরিকল্পনা করে তিনি অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিলেন। তাই শিল্পী চারু রায়ের কথা প্রবোধবাবু আমায় এমনভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথমে আমি পেন্সিলে একটা "রাফ স্কেচ" করে প্রবোধবাবুকে দেখাই। তিনি সেই ড্রইং মনোনীত করেন। এই আসা-যাওয়ার কাজে প্রবোধবাবুর মানুষটিকে চিনতে বিলম্ব হয়নি।

থিয়েটার জগতে সবাই প্রবোধ গুহের নাম দিয়েছিল—রঙ্গমঞ্চের বিসমার্ক। তিনি নাকি তাঁর তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক পরিচালনা করে অসাধ্য-সাধন করতে পারেন। অনেকে তাঁকে ভয় করে চলত।। তিনি নাকি মানুষকে বিপদেও ফেলতে পারেন—একথাও অনেকের মুখে শুনেছি।

কিন্তু প্রবোধাবুর মধ্যে আমি আবিষ্কার করলাম এক দিলদরিয়া, আপনভোলা সদানন্দময় পুরুষকে। ঘরে ঢোকা মাত্র তিনি যে সাদর আহ্বান জানাতেন তাতেই তিনি মানুষকে এক মুহূর্তে আপনার করে নিতেন। তিনি তাঁর স্নেহভাজন প্রত্যেককেই একটি করে আদরের নামে আহ্বান করতেন। তাতে সকলেই মনে করত, তিনি আর সবার চাইতে আমাকেই বেশী স্নেহ করেন। তিনি প্রত্যেকের বাড়ীর খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন এবং সুখে-দুঃখে সকলের সমভাগী হতেন।

প্রবোধবাবুর আর একটি মজার সখ ছিল। তিনি প্রায় প্রত্যহ চপ, কাটলেট, মাংস ইত্যাদি নিজের হাতে রান্না করতেন এবং তাঁর স্নেহভাজনদের খাইয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করতেন। এই গত বছরের কথা। পার্কসার্কাস অঞ্চলে তিনি নিজের বাড়ীতে দুর্গাপূজোর [illegible] করলেন। মহাষ্টমীর দিন আমার মতো অনেককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গিয়ে দেখি সে যুগের অনেক স্নেহভাজন ব্যক্তি তাঁর গৃহে সমবেত হয়েছেন। তিনি তাঁর পুরোনো অভ্যাসটি আজও ছাড়তে পারেননি দেখলাম।

মঞ্চ-জগতে এই প্রবোধবাবুর সান্নিধ্য লাভ করে আমরা সত্যি উপকৃত হয়েছিলাম। এবং তাঁর মাধ্যমে আমরা সেই বিখ্যাত বৈঠকখানায় বহু বন্ধু লাভে ধন্য হয়েছিলাম।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় (আমাদের সর্বজনপ্রিয় হেমেনদা') এই সময় "নাচঘর" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এই সাপ্তাহিকে প্রতি সপ্তাহে নাটক সম্পর্কে বহু সারগর্ভ আলোচনা থাকতো। এছাড়া বিভিন্ন রঙ্গালয় সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনাও নাচঘরের স্থান পেত। নাচঘরের সহকারী সম্পাদক ছিলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। এম-এ পাশ করে তিনি হেমেন্দ্রকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এই নাট্য সমালোচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিদেশী নাটক ও সিনেমা সম্পর্কেও বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সময় 'নাচঘরে' লেখনী পরিচালনা করতেন। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বৈঠকে আমাদের নিবিড় বন্ধুত্ব হয়েছিল। বর্তমানে পশুপতি চট্টোপাধ্যায় বাঙলাদেশের একজন নামকরা চিত্র-পরিচালক।

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বৈঠকখানায় নিয়মিতভাবে আসতেন। তখনো শচীনদা নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেননি। তাঁর নাটক সম্পর্কিত আলোচনা আমরা সকলেই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতাম। পরবর্তী কালে তাঁর সামাজিক নাটক 'রক্তকমল' এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা' এই মনোমোহন থিয়েটারেই অভিনীত হয়।

আরো একজনের কথা আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে,—যিনি বেঁচে থেকেও আজ যেন আমাদের মধ্যে নেই! তাঁর অপূর্ব লেখনী আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু একদা মনোমোহন থিয়েটারের সেই বৈঠকখানায় তাঁর প্রাণখোলা হাসি শুনে সবাই উৎসাহে ও আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বসতেন।

তাঁর কণ্ঠের গান এমন দরদ মাখানো থাকতো যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনলেও সে সঙ্গীত পুরনো মনে হত না!

আমি কবি নজরুল ইসলামের কথা বলছি। এই বিদ্রোহী কবি কি ভাবে রঙ্গালয়ে এলেন এবং তাঁর অনন্যসাধারণ গান সুর দিয়ে সারা বাঙলাদেশকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেল্লেন—সে উপভোগ্য কাহিনী বারান্তরে প্রকাশ করবার বাসনা রইল।

আতঙ্ক

সরল দত্ত

১৯৬০ সালের ২৯শে আগস্ট টাইম-এ একটা সংবাদ বেরিয়েছিল।

সাঁইত্রিশ বছরের এক ভদ্রমহিলার জীবন বিপন্ন। তিনি বেরালের আতঙ্কে ভুগছেন। বেরাল দেখলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। দৌড়ে পালান।

ভদ্রমহিলার পাশের বাড়ি কিছুদিন ধরে খালি পড়ে আছে। লোকজন না থাকাতে পাড়ার বেরালগুলো খালি বাড়ির বাগানে খেলা করে। কিন্তু সেদিকে ভদ্রমহিলাকে যেতেই হয়। ওই পাশটা ফাঁকা। জামা-কাপড় ওদিকে তিনি মেলতে দেন। কিন্তু বেরালের দৌরাত্ম্যে তাঁর সে পথ বন্ধ। রাত্রে একা বার হন না। ভয় করে।

মনস্তাত্ত্বিকের পরামর্শ নেওয়া হল। তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় ভদ্রমহিলা বললেন, যখন তাঁর বয়স মাত্র চার বছর, তখন তাঁর বাবা চৌবাচ্চার জলে একটা বাচ্চা বেরাল চুবিয়ে মেরে ফেলেন। সেই থেকে তাঁর আতঙ্ক। ছোটবেলা থেকেই তাই তিনি বেরাল দেখলেই কেঁদে ফেলেন।

ডাক্তারেরা চিকিৎসায় মন দিলেন। তাঁকে এক টুকরো ভেলভেটের কাপড়ে হাত বুলাতে দেওয়া হল। বড় নরম ভেলভেট। বেরালের গায়ের কোমল পশমের কথা যেন মনে পড়ে। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। ভদ্রমহিলার মনের মধ্যে যে গুপ্ত আতঙ্ক আছে তা তখনও জাগেনি। তাই তারপর তাঁকে আরও নরম কাপড় দেওয়া হল। তারপর খরগোশের চামড়ার দাস্তানা। ভদ্রমহিলা ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন। হাতে নিতে পারলেন না। কিন্তু ভয়টা অনেক কম হল। শেষে একদিন একটা বেরালছানা তাঁর কোলে দেওয়া হল। তিনি কেঁদে ফেললেন। এ কান্না ভয়ের নয়, আনন্দের। তিনি ভয় জয় করেছেন।

এ গল্প কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু এমন বহু জানা গল্প আছে। এমন কি আমরাও কেউ কেউ এমন ধরনের আতঙ্কে ভুগি। কেউ একা থাকতে ভয় পান। মাকড়সা সহ্য করতে পারেন না কেউ। ফাঁকা জায়গায় কারো ভয় লাগে। পুলের ওপর উঠলে কেউ মরীয়া হয়ে যান। এমন ধরনের বহু আতঙ্ক আমাদের আছে।

আতঙ্ক কেটে গেলে সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করে আমরা নিজেরাই হেসে ফেলি নিজের বোকামিতে। কিন্তু কোন উপায় থাকে না। ভয় আসে এবং আমাদের সব যুক্তি বুদ্ধি ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মনস্তাত্ত্বিকেরা এই ধরনের আতঙ্ক নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তাদের চেষ্টা ফলবতী হয়েছে। তাঁরা একটা ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন। এর সাহায্যে আমরা হয়ত ভয় জয় করতে পারবো।

ফরমুলা আবিষ্কারের প্রধান কৃতিত্ব লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার নিকলাস ম্যালিসনের। তিনি এই কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আতংক জিনিসটা অনেকটা ঘড়ির মত। ঘড়িতে দম না দিলে বন্ধ হয়ে যায়। আমরাও তেমনি আমাদের আতঙ্কের বাতিকে দম দিয়ে থাকি।

ডাক্তার ম্যালিসন বলেন যে, যেই আমরা ভয় পেয়ে পালাতে থাকি তখনি সেই ভয় বেড়ে যায়। যাকে দেখে ভয় পাই তার সামনে যদি দাঁড়াতে পারি তবে ভয় পালিয়ে যাবে। কথাটা আমাদের দেশে এমন কিছু নতুন নয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথা বলেছেন। যদিও তাঁর পটভূমি অন্য, তাৎপর্য আরও গভীর।

যাই হোক, ধরা যাক আপনি মাকড়সা দেখে ভয় পান। আনমনে আছেন। ভালই। আপনার কোন অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু জানালার দিকে হঠাৎ আপনার নজর পড়ল। আপনি আঁতকে উঠলেন। দেখলেন মাকড়সাটা গুটি গুটি আপনার দিকেই এগিয়ে আসছে। চেয়ার ছেড়ে আপনি পালিয়ে গেলেন। আপনার ভয়টা সাময়িকভাবে গেল। কিন্তু সারলো না। আপনি জানেন না আবার কখন আক্রমণ আসবে। সে আক্রমণ এবং আপনার প্রতিক্রিয়া আরো তীব্র হবে। কারণ ভয়টা আপনার মনের ভিতরে জমে আছে।

ডাক্তার ম্যালিসন বলেন যে, এই পলায়ন-প্রবৃত্তিই আপনাকে নতুন জালে জড়িয়ে ফেলছে। তার চেয়ে বরং সাহস সঞ্চয় করে ভয়ের সমস্ত দাপটটা সহ্য করুন। একবার যদি সহ্য করতে পারেন, তবে ভয় ঘুচে যাবে। ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুঞ্জয় কবিতার মত। যতক্ষণ আঘাত নামেনি ততক্ষণ ভয়। আঘাত নামার পর বোঝা গেল, তেমন কিছু নয়। তাই ডাক্তার সাহেব বলছেন যে, যে-জিনিস অথবা জায়গায় আপনার ভয়, তার কাছে যান। তার দিকে ভালভাবে তাকিয়ে থাকুন। অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়া হবে আপনার দেহে এবং মনে। কিন্তু তাকে সহ্য করুন। ভাল ভাবে অনুভব করতে থাকুন ভয়ের সমগ্র প্রক্রিয়াকে। ভয়ের অনুভবকে কোনক্রমে আটকে রাখবেন না। সমস্ত দাপটটা গায়ের ওপর ভেঙে পড়ুক। ভেঙে পড়ছে—স্বচ্ছ ভাবে এই কল্পনা করুন। তারপর দেখবেন ভয়ও ভেঙে যাবে।

কিন্তু যাদের আতঙ্ক বিশেষ বস্তু কিংবা স্থানে, সেখানে এই পদ্ধতিতে না

হয়ে নিস্তার পাওয়া গেল। কিন্তু এ ছাড়াও তো আরো বহু রকম আতঙ্ক আছে। কেউ কেউ কোন একটা সম্ভাব্য অবস্থা কল্পনা করে বিমূঢ় হয়ে যান। এমন কয়েকজন হাসিখুশী বৌকে আমি জানি যারা 'শ্বাশুড়ী আসছেন' এই কটি কথাতেই আড়ষ্ট হয়ে যান। ডাক্তার বলেন এই ভয়েরও চিকিৎসা করা যাবে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র পরীক্ষার আগে অসহায় হয়ে পড়ল। পরীক্ষার দিন যতই এগিয়ে আসে, ছাত্রটির উদ্বেগ ততই বাড়তে থাকে। অবশেষে তার প্রায় হিস্টিরিয়ার মত অবস্থা। ছাত্রটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ডাকা হল।

ডাক্তার এসে তার ফরমুলা বুঝিয়ে দিলেন ছাত্রটিকে। বললেন, উঠে বস এবং তোমার ভয়কে অনুভব করার চেষ্টা করো। ছাত্রটি উঠে বসল।

ডাক্তার বললেন, তুমি যদি পরীক্ষায় ফেল করো তবে কি কি হতে পারে? ভাবো। তোমার বন্ধুরা তোমাকে করুণা করবে। তোমার পরিবার হতাশায় ভেঙে পড়বে। আর্থিক ক্ষতি হবে। ছেলেটি ভাবতে চেষ্টা করল। তারপর ডাক্তার বললেন, এইবার ভাবো ঠিক ওই ঘটনাগুলো ঘটছে। ভাবো তোমার বন্ধুরা তোমার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। তোমার স্ত্রীর চোখে জল। তোমার মায়ের মুখ ভার। ছেলেটি যতই ভাবে ততই তার উত্তেজনা বাড়তে থাকে। তারপর নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

যাবার সময় ডাক্তার বলে গেলেন, তোমার ভয়গুলো কল্পনা করো। কখনও দূরে সরিয়ে রেখো না। বরং গভীর ভাবে কল্পনা করো বিপর্যয়গুলো ঘটছে।

ডাক্তারের কথা মত ছেলেটি নিজে নিজেই ভাবতে থাকলো। ক্রমে ক্রমে ভয়ের ভান্ডার ফুরিয়ে গেল। ছেলেটি হাসিমুখে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি গেল।

আমাদের আতঙ্কগুলো ছাত্রটির মত গভীর নাও হতে পারে। কিন্তু অনেকেরই এ রকম কোন না কোন ব্যাধি আছে। ডাক্তার ম্যালিসনের কথায় কিছু উপকার হতে পারে হয়ত।

• • • প্রদর্শনী • • •

কলারসিক

শিল্পী শ্রীকৃষ্ণ খান্না'র চিত্র-প্রদর্শনী

গত সপ্তাহে ২১ থিয়েটার রোডের অশোক গ্যালারীতে একজন তরুণ শিল্পীর চিত্রকলার প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। শিল্পীর নাম শ্রীকৃষ্ণ খান্না। আমাদের কাছে তিনি অপরিচিত হলেও ইউরোপের কলারসিকদের কাছে কিন্তু অপরিচিত নন। এই শিল্পী ১৯৫৯ সালে লন্ডন, নিউইয়র্ক, পশ্চিম জার্মাণী, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি শহরে চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে শিল্প-সমালোচকদের প্রভূত সুখ্যাতি কুড়িয়ে এনেছেন। এ-ছাড়া কায়রো, জাপান, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং দিল্লীতেও তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছে বলে শুনেছি। এবার কলকাতায় এই প্রথম আমরা তাঁর চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলুম। অশোক গ্যালারীর কর্তৃপক্ষকে এই সুযোগ প্রদানের জন্য অভিনন্দন জানাই।

বাইশখানি চিত্র নিয়ে শ্রীখান্না কলকাতার কলারসিকদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। চিত্রগুলির মাধ্যম তৈল রঙ। তার এই তৈল রঙের মাধ্যমেই তিনি আধুনিক শিল্পীর বিমূর্ত ভাবনা-চিন্তাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন ক্যানভাসের উপর। প্রথম দর্শনে চিত্রগুলিকে মনে হবে অস্পষ্ট, অবিন্যস্ত। কোনো এক খেয়ালী মন বুঝি রঙ আর রেখা নিয়ে খেলা করেছে শুধু। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই প্রাথমিক বিরাগ অতিক্রম করে আমাদের মন ঐ রঙ আর রেখার অস্পষ্ট জগতে কী যেন খুঁজে পেয়েছে। অবিন্যস্ত রঙ আর রেখাও যেন একটা ছন্দিত নিয়ম এবং প্রয়োগ-পদ্ধতি মেনে আমাদের আকর্ষণ করছে। এর পরে শ্রীখান্নাকে শিল্পী হিসাবে স্বীকার না করে উপায় কি?

সত্যি, শ্রীখান্না একজন শক্তিশালী শিল্পী। চিত্রে তিনি যতখানি বলেন, তার চেয়ে না-বলা কথার ব্যঞ্জনায় দর্শক-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন অনেকখানি। আধুনিক কবিরা চিত্র-কল্প, প্রতীক এবং আশ্চর্য সুন্দর উপমার সাহায্যে যেমন কবিতার ব্যঞ্জনাকে বহুদূরে বিস্তৃত করে দেন, শ্রীখান্নাও তেমনি বিশেষ কোনো বস্তুকে যথাযথ না এঁকে বস্তু-পরিবেশ সঞ্জাত আবেগ-বিহ্বল মুহূর্ত কিংবা বহু প্রাচীন কোনো বিষয়কে তাঁর কল্পনার রঙে রাঙিয়ে শুধুমাত্র রঙ প্রয়োগের সুনিপুণ কৌশলে অথবা রেখার-বিন্যাসে আভাসিত করে তোলেন। তাঁর 'মা[illegible]নং চিত্র), 'জলমগ্ন গ্রাম' ([illegible]৪নং চিত্র), কিংবা 'মহেঞ্জোদাড়োর শোক সংগীত' (১নং চিত্র) নামক চিত্র তিনখানির কথাই ধরা যাক এবার। 'মাছে'র চিত্রে তিনি মাছের কোনো চিত্র অঙ্কন করেননি। জলের তলদেশে মাছ থাকলে কি হত তারই তরঙ্গায়িত বর্ণাঢ্য রূপ শুধু তুলে ধরেছেন আমাদের সম্মুখে। 'জলমগ্ন গ্রামে'রও কোনো স্পষ্ট বাস্তব চিত্র অঙ্কনে অগ্রসর হননি শ্রীখান্না। শুধু গ্রাম জলমগ্ন হলে কি রূপ ধারণ করতো তারই ইঙ্গিতে তিনি আমাদের চেতনাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন মাত্র। চমৎকার তাঁর রঙ-প্রয়োগের কৌশল। তৈল রঙের মত কঠিন মাধ্যমকে কী স্বচ্ছন্দে তিনি ব্যবহার করেছেন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। হাজার বছর আগে মহেঞ্জোদাড়োর রূপ কি ছিল—মনশ্চক্ষে তা কল্পনা করে তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক তথা স্থাপত্য-পরিকল্পনাকে শিল্পী তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর 'মহেঞ্জোদাড়োর শোক-সঙ্গীত' নামক চিত্রখানিতে। আমরা এই রেখায়িত ব্যঞ্জনা এবং সাদা জমিনের উপর কালো আর ধূসর বিবর্ণ রঙকে ছুঁয়ে সেই দূর অতীতে যেন পৌঁছে যেতে পারি। শিল্পী খান্না এই ভাবেই তাঁর শিল্পের জগতে আমাদের টেনে নিয়ে যান। একজন তরুণ শিল্পীর পক্ষে এ কম কৃতিত্বের কথা নয়।

শিল্পী শ্রীখান্না তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি রচনায় তারুণ্যের দীপ্তি এনেছেন। সজীব বর্ণ প্রলেপনে করে তুলেছেন জীবন্ত। তিনি শুধু বাস্তব মানুষ খুঁজে বেড়াননি; প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে নির্বিশেষে মানুষকে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তের ভঙ্গীতে বিধৃত করেছেন। সুতরাং বলা যায়, কোনো কল্পস্বর্গকে যেমন শিল্পী প্রাধান্য দেননি, তেমনি জীবনের সমালোচকও হতে চায়নি তাঁর মন। বরং বলতে পারি, শিল্পীর প্রবণতা রোমান্টিক-তার দিকে। 'এলো মেলো বন-জঙ্গল' (২নং চিত্র), 'উষর নিসর্গে পূর্ণ চাঁদ'

(৯নং চিত্র), 'উত্তপ্ত হাওয়ায় দগ্ধ গ্রাম' (১০নং চিত্র), কিংবা 'গ্রীষ্ম-সূর্যে আচ্ছন্ন গ্রাম' (১১নং চিত্র) তাঁর রোমাণ্টিক মনের পরিচয়ই বহন করছে। এগুলিকে চিত্রিত করতে কোথাও সাদার প্রাধান্য আবার কোথাও বা সাদা প্রায় অবলুপ্ত। কিন্তু হলুদ রঙের বর্ণপ্রলেপনে চিত্রগুলিতে সুন্দর এক বিমূর্ত ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পী হিসাবে এখানে তিনি প্রকৃতই সার্থকতার দাবী করতে পারেন।

কয়েকখানি চিত্রে শ্রীথাপ্পা এমন অস্পষ্ট ইঙ্গিতে তাঁর বিমূর্ত (abstract) প্রকরণ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেছেন যে তাকে হৃদয়ঙ্গম করা বেশী দুঃসাধ্য। 'ব্রিজ এন্ড হেজেস' ও 'উওম্যান হোল্ডিং এ বাস্কেট অফ ফ্লাওয়ার'—এই জাতীয় দুইখানি চিত্র।

শ্রীথাপ্পার শিল্পী হিসাবে দুঃসাহস আছে। আশা করি এই দুঃসাহস তাঁকে শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে পরিচালিত করবে না, পরিণত চেতনায় তিনি ভবিষ্যতে জীবনের সমালোচক হয়েও আমাদের উপহার দিতে পারবেন নতুনতর চিত্র-সম্পদ। আমরা সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

।। ফলবিক্রেতা ।।

জাতি-বিদ্বেষ, রাজনীতি বা ধর্ম সম্বন্ধে কোন দেশই আজ দোষমুক্ত হতে পারেনি। —ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ম্যাক-মিলান।

মানুষ তো দূরের কথা, ঘোড়াকে চাবুক মারলে তার কাছ থেকে কোন কাজ আদায় করা যায় না।

—নিকিটা ক্রুশ্চেভ।

রঙ বেরঙ

বিশ্ববারা

পর্দার পেছনে

ইংরেজী সাহিত্যে ওআর্ডসওআর্থ-কে নিয়ে কারো দুশ্চিন্তা ছিল না। ওদিকে বায়রণ, এদিকে অস্কার ওআইলড দুজনে দুই রকমে স্ক্যান্ডালের বাজার সরগরম করেছিলেন। ওআর্ডসওআর্থ প্রৌঢ় হবার আগে ভাল ভাল স্মরণীয় কবিতা লিখে তাড়াতাড়ি একেবারে প্রথম শ্রেণীতে জায়গা কিনে নিলেন।

তারপর আয়েশী জীবনে বেশ মেজাজ করে থিতিয়ে গেলেন। নিরীহ এবং নীতিবাদী কবিতা লিখলেন। তাঁর রাইডাল মাউনট্-এর বাড়ীতে দর্শক ও অনুরাগীরা ভিড় জমাল। 'প্রকৃতির কোলে ফিরে চল,' এই ঘোষণা করতে করতে ওআর্ডসওআর্থ পোএট্ লরিএট্ হলেন। তখন তিনি, রেলরোড, রিফর্ম-বিল, সব কিছুর মধ্যেই বিজ্ঞানের করাল অগ্রগতির ছায়া দেখে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন। এমনি করেই তাঁর মৃত্যু হলো। আর, বায়রণ নন, ওআইলড নন, ওআর্ডস্ওআর্থের নিজস্ব কাবার্ড থেকেই বেরুল কঙ্কাল।

ওআর্ডসওআর্থ সম্পর্কে নতুন কৌতূহল জাগল। আর একটা নতুন সত্যি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেল।

ওআর্ডসওআর্থএর 'The Thorn' বা 'The Ruined Cottage' পড়তে পড়তে কারো কারো এমন প্রশ্ন মনে জেগেছে যে, কুমারী মাতা এবং প্রবঞ্চিতা প্রণয়িনীর সমস্যা নিয়ে এই গোঁড়া মানুষটি এমন ভাবপ্রবণ হয়েছেন কেন। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর কেউ আশা করেনি।

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের বিখ্যাত ফরাসী লেখক অধ্যাপক এমিল লেগুই ওআর্ডসওআর্থ সম্পর্কে একখানি বই লেখেন। ১৮৯৬ সালে, লন্ডনে, বিখ্যাত প্রকাশক টমাস হাচিনসন সাহেব লেগুইকে একটি মুখরোচক গুজব শোনালেন। কোলরিজ পরিবারের রূপবিশ্রুত উৎস থেকে গুজবটি মিলেছে। ফ্রান্সে, একটি তরুণীর গর্ভে ওআর্ডসওআর্থএর একটি ছেলে হয়। সেই ছেলে এবং মা রাইডাল মাউণ্টে কবির অতিথি হয়ে এসেছিলেন।

লেগুই এই গুজবটিতে কান দিলেন না। তবে বছর পনেরো তাকে মগজে ঠাঁই দিলেন। তাড়িয়ে দিলেন না।

পনেরো বছর বাদে, প্রিন্সটন য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক জর্জ হার্পার যখন কবির জীবনী লেখবার চিন্তাটিকে কাজে মেলে ধরতে ব্যস্ত, লেগুই তাঁকে মূল্যবান গুজবটি উপহার দিলেন।

১৯১৪-১৫ সালে, ব্রিটিশ মিউজিয়াম-এ ডরোথী ওআর্ডসওআর্থ-এর চিঠিপত্র ঘেঁটে হার্পার এক তাজ্জব খবর পেলেন। কবির ফরাসী প্রণয়িনী ও মেয়ে কেরোলাইনের কথা লিখছেন কবি-ভগ্নী। কবির মেয়ের সঙ্গে বদোআ-র আসন্ন বিয়ের খবরও মিলল। তারপর হার্পার এই রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হলেন। জগৎসুদ্ধ লোক জানে কবিপত্নী মেরী হাচিন্সন। এ কি নতুন এবং আশ্চর্য খবর!

এবার কবিসুহৃদ হেনরীক্র্যাব রবিন্সন সাহেবের দিনলিপি পাওয়া গেল। ১৮২০ সালে ওআর্ডসওআর্থ পরিবারের সঙ্গে রবিন্সন ফ্রান্সে যান। প্যারিসে তাঁরা কেরোলাইন এবং কেরোলাইনের মা মাদাম ভ্যালোন্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এবার হার্পারের সঙ্গে সঙ্গে লেগুইও হাত মেলালেন। হাজারটা পুঁথিপত্র ঘেঁটে চমৎকার একটি অধ্যায় বিস্মৃতির গ্রন্থি থেকে উন্মোচিত হলো।

১৭৯২ সালে, বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ ফ্রান্সে মারিঅ্যান্ বা অ্যানেট্ ভ্যালোনের সঙ্গে কবির পরিচয় ও প্রণয় হয়। তারই ফলে কেরোলাইনের জন্ম। জন্মের সার্টিফিকেট লিখবার সময়ে ভারপ্রাপ্ত কেরানীটি পালকের কলমের নিব ভেঙে বানান লিখেছেন Words Wodsth এবং 'Words Odsth, an English Man.

তাঁদের বিয়ে হয়নি। এবং এ মিলনকে বৈধ করবার দিকে অ্যানেটের নজর ছিল না। অ্যানেটের পরিবার গোঁড়া রয়্যালিস্ট। সাধারণতন্ত্রের বিরোধী গুপ্ত ষড়যন্ত্রে তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। কবি ফিরে এলেন দেশে।

১৮০২ সালে, আমিয়েনস-এর সাধার পর ডরোথী ও কবি ফ্রান্সে গেলেন। দীর্ঘ দশ বছর বাদে ক্যালে-তে দেখা হলো দুজনের। অ্যানেট আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে আবেগপ্রবণ, ভাবদীপ্ত তরুণ ইংরেজকে তিনি দেহমন দিয়েছিলেন, সে তরুণকে কোথায় নির্বাসিত করে তার জায়গায় এক পরিণত এবং শান্ত পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। এবং অ্যানেট! কবির হয়তো ভয় ছিল, অ্যানেট যদি আবেগে অধীর হয়ে ওঠেন, এ-যাত্রা বিয়েটা করতেই হবে।

কিন্তু অ্যানেট তখন নতুন করে নেপোলিয়ানের উচ্ছেদ সাধনের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত।

দুজনে দুজনকে নিরুত্তাপ এবং সহজভাবে গ্রহণ করলেন। সকৃতজ্ঞ কবি, 'It is a beauteous evening' সনেট লিখে এই সাক্ষাৎকারকে অমর করেছেন। এই সনেটে উল্লিখিত 'my child' ডরোথীকেই ধরা হতো। ডরোথী তখন শিশুটি নন্। এবং আজ আমরা জানি, কেরোলাইনকেই তার পিতা স্নেহ জানিয়েছেন।

ইউস্টেস্ বদোয়া নামক এক ফরাসী অফিসার ইংল্যাণ্ডে অন্তরীণ ছিলেন। কবির কুশলবার্তা অ্যানেটকে তিনি পৌঁছিয়ে দেন। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গেই কবিদুহিতার বিয়ে হয়।

১৮৪৩ সালে, অ্যানেটের মৃত্যুর দুই বছর বাদে প্রৌঢ়া কেরোলাইন, ওআর্ডসওআর্থকে এই সম্পর্ক বৈধ করতে অনুরোধ করেন। কবি তখন সবে পোএট লরিএট হয়েছেন। পুরনো স্মৃতির ছাই খুঁচিয়ে তুলতে তিনি নারাজ হলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো ক্রিস্টোফার অ্যানেটের প্রসঙ্গটি সাধারণে প্রকাশ করতে চেয়েও পিছিয়ে এলেন।
পোএট লরিএট সম্পর্কে 'অবৈধ কন্যা', 'প্রণয়' এই সব অপাঙ্‌ক্তেয় কথা কি ব্যবহার করা যায়?

অতএব সত্য মানুষটি চাপা পড়লেন কাগজপত্রের তলায়। সমালোচকরা ফরাসী বিপ্লব ও কবির মানস সংগঠন এই সব বিচার করে মাঝে মাঝে 'Personally pompous', কখনো বা Philosophically infantile এই সব আদরের নামে কবিকে গালি দিতে থাকলেন।

হার্পার ও লেগুই কবির কাবার্ড থেকে কঙ্কালটি বের করবার পর হঠাৎ অ্যানেট ভ্যালোঁ-এর ঐতিহাসিক কাহিনী কবির সমগ্র কাব্যকে বিচার করবার হাতিয়ার হয়ে পড়ে গেল। অ্যানেট যে কবির জীবনে তাঁর স্বল্পস্থায়ী একটি বহির্ভাগের স্ফুলিঙ্গ মাত্র, সে কথা ভুলে সমালোচকরা হৈ-চৈ বাধালেন।

এবং হুজুগের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী সে মাতামাতিও বেলুনের বাতাস ফুরোতেই মিইয়ে গেল।

এখন আবার কবির জীবনীতে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতিটুকু পেয়ে থাকেন। প্রফেসার ডগ্লাস বুশ্-এর উক্তি স্মরণীয়।

তিনি বলেন, ভিক্টোরিয়ানরা বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখেশুনে ঘাবড়ে গিয়ে কবির ওপর ধর্মপ্রাণ, নীতিবাগীশ এইসব বিশেষণ চাপিয়ে রক্তমাংসের মানুষটাকে একটা প্লাস্টারের ছাঁচে ঢালাই করে জাহির করেছিল। এই সেই কবি, যিনি তাদের 'natural religion' দিয়েছেন। কিন্তু এ যুগে আমরা মানুষকে দোষেগুণে গ্রহণ করতে শিখেছি। এখন আমরা **'have acquired a new respect for the poet who gave to society a natural daughter'.**

শেষের কথাটিতে প্রফেসারের একটু মুচকি হাসি আছে। ওটুকু বাদ দিয়ে আমরাও প্রফেসারের সঙ্গে একমত। অর্থাৎ, কবি হতে গেলে ওটুকু অত্যাবশ্যকীয় নয়। তবে তেমন একান্ত মানবীয় কোন বিচ্যুতি যদি ঘটে-ই থাকে, তৎসত্ত্বেও আমরা কবিকে কাছের এবং ভালবাসার মানুষই মনে করব।

* দেশে বিদেশে *

জটিল গ্রন্থি :

লাওসে যখন যুদ্ধবিরতি হল, যুদ্ধবিরতি কমিশন গেল এবং জেনেভায় চোদ্দ রাষ্ট্রের সম্মেলন বসল তখন স্বভাবতই সকলেই আশান্বিত হয়েছিলেন যে, লাওসের জটিল সমস্যার একটা সমাধান এবার হবে। কেননা, যে কটি পর্যায় উত্তীর্ণ হওয়া গেছে তা সামান্য নয়। তবুও সম্মেলনের আশা সফল হবে লাওস ও জেনেভার দিকে তাকিয়ে সুনিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন অবশ্য বলছেন, লাওস সম্পর্কে চোদ্দ রাষ্ট্রের সম্মেলনে একটি চুক্তি সম্পাদিত হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সম্মেলনের কাজ লাওস সমস্যার আন্তর্জাতিক ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত বলে প্রতিনিধি দল একমত হয়েছেন। নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে লাওসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সকলেই একমত। এগুলি সবই সুলক্ষণ সন্দেহ নেই।

কিন্তু দুর্লক্ষণগুলিও লক্ষ্য করবার। সোভিয়েট রুশিয়া প্রস্তাব করে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র থেকে বিদেশী সামরিক কর্মচারীদের সরিয়ে আনতে হবে। পরে-পরেই ফ্রান্স ঘোষণা করে যে, সে লাওসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পেশ করবে। এসব নিয়ে আলোচনা চলছে এমন সময় দক্ষিণপন্থী লাওসীয় প্রতিনিধি পত্রযোগে জানান যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও লাওসে ...তীব্র সংঘর্ষ চলছে। কম্যুনিস্ট-সমর্থক প্যাথেট লাও প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ ফাও ফেমি ভঙ্গভিচিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেন। মার্কিণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডীন রাস্ক বলেছেন যে, জেনেভা চুক্তিতে নির্দিষ্ট সামরিক কর্মচারী ছাড়া লাওস থেকে সকল বিদেশী সামরিক কর্মচারীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড হোম লণ্ডনের এক ভোজসভায় বলেন, যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে লাওসে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ও আগ্নেয়াস্ত্র আমদানী বন্ধ করার আয়োজন না হলে লাওস সম্পর্কে জেনেভা সম্মেলন সফল হতে পারে না।

এদিকে কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম জেনেভায় বলেন, লাওসে একটি সম্মিলিত সরকার গঠনের ব্যাপারে সেখানকার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির তিন প্রধানকে এক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানে সম্মত করার চেষ্টায় তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন। নিরপেক্ষতাবাদী প্রিন্স সুভান্না ফুমা ও দক্ষিণপন্থী সরকারের প্রিন্স বুন উম বর্তমানে জেনেভা সম্মেলনে যোগ দেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। দক্ষিণপন্থী সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্যাথেট লাও প্রতিনিধিরা জেনেভা সম্মেলনে থাকলে ভিয়েণ্টিয়েন সরকারের প্রতিনিধি দল সম্মেলনে যোগ দেবেন না। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এমন এক জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রিন্স নরোদম হতাশ হয়ে বলছেন, নিরপেক্ষ লাওস গঠনের আশা (অন্ততঃ) এখন সুদূরপরাহত। সর্বশেষ সংবাদ এই যে, কি ভাবে লাওসকে নিরপেক্ষ রাখা হবে, আন্তর্জাতিক কমিশন কিভাবে কাজ করবে এই নিয়ে মতৈক্যের পরিবর্তে সম্মেলন প্রতিনিধিরা দ্বিধাবিভক্ত।

দুর্বোধ্য চক্র :

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক চক্রের জেনারেল চ্যাং সরকারকে কার্যত স্বীকার করেছেন। প্রথমে যে ঘোর আপত্তি প্রকাশ পেয়েছিল তা থিতিয়ে গেছে। কিউবায় মার্কিণ কূটনীতি প্রতিহত হওয়াতে সম্ভবত এক্ষেত্রে মার্কিণ রাজনীতিকে সংশোধিত করতে হয়েছে। সিওলে মার্কিণ দূতাবাস থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁরা সামরিক বিপ্লব পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। সামরিক চক্রের কম্যুনিস্ট-বিরোধী কূটনৈতিক ঘোষণার মধ্যে এই পরিণতির বীজ নিহিত ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট পো সুন ইউনের সামরিক চক্রের প্রতি তুষ্ণীম্ভাব এবং চ্যাং সামরিক চক্রের অপ্রতিকূল মনোভাবে মনে হয়েছিল হয়তো প্রেসিডেণ্ট দ্বিধাগ্রস্ত। তারপর সংবাদ এল তিনি পদত্যাগ করেছেন। তারও পর জানা গেল, তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু ডঃ চ্যাংয়ের মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারের হুমকি আগাগোড়াই ছিল। এবার ডাঃ চ্যাং ও তাঁর মন্ত্রিসভার ১১ জন মন্ত্রীকে অনুকূল অবস্থায় গ্রেপ্তার করে প্রথমে ওয়েস্টগেট কারাগারে পরে একেবারে সামরিক আওতায় এক বিশেষ জেলে আটক করা হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থানে

সহযোগিতা করেনি ব'লে এপর্যন্ত আট-জন জেনারেলকে বন্দী করা হয়েছে। লেঃ জেনাঃ ডু নং চ্যাংয়ের নেতৃত্বে ১৩ জনকে নিয়ে সামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিয়ে পূর্বতন শাসনাবশেষ নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। বিপ্লবী পরিষদের নাম বদলে সুপ্রীম কাউন্সিল রাখা হয়েছে। এই কাউন্সিলের এক হুকুমনামা অনুসারে বছরে ৩৬৫ দিনই কাজ হবে। রবিবারেও।

ইতিমধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংস্থা ভেঙে দেওয়া হয়েছে; ২,০১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কিন্তু সব চাইতে কৌতুককর ঘটনা হয়েছে কারাগারে। ডাঃ চ্যাং সরকার ডাঃ সিংম্যান রী সরকারের স্থলাভিষিক্ত হন; ডাঃ রী লিবারেল পার্টি ও ডাঃ চ্যাংয়ের ডেমোক্রাট দল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী। ডাঃ চ্যাং সরকার গত বছর থেকে দুর্নীতি প্রভৃতি অভিযোগে কারারুদ্ধ আছেন। এবার সদল ডাঃ চ্যাংকে যখন বন্দী অবস্থায় জেলে আনা হয় তখন বন্দী ডাঃ সিংম্যান রীর দল হর্ষধ্বনি ক'রে ওঠে। ডাঃ সিংম্যান রীর বারো বছর রাজত্বকালে সেনাবাহিনী নাকি তাঁর খুবই অনুগত ছিল। তবে কি সামরিক চক্র আমেরিকাকে যে অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়েছে সে কি এই সরকার?

অঙ্গচ্ছেদের দুঃখ :

আমরা ভৌগোলিক অঙ্গচ্ছেদের দুঃখ জানি। রাজনীতির যূপকাঠে অখণ্ড সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক স্থিতি কি ভাবে পর্যুদস্ত হয়, আমরা খণ্ড বাংলার অধিবাসীরা তা প্রতিদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। আফ্রিকার কঙ্গোরও সেই দুঃখ। সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়ে ভেদ-বিভেদের বীজ পুঁতে যায়, নয়তো নিজ হাতেই যে রাজ্য তার স্বার্থে অখণ্ড রাখছিল তা খণ্ড ক'রে যায়। কঙ্গো থেকে কাতাঙ্গা ইত্যাদির কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে তা আজ সুবিদিত। সন্দেহ নেই, বিভেদের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টাও আছে এবং সে চেষ্টা রাজ্যাধিবাসীদের মধ্যে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের তা কখনই মনঃপূত নয়। ১৮ই মে কোকিলহার্টভিলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ১৯টি রাজ্যকে অঙ্গীভূত ক'রে কঙ্গো সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। ২৬ দিন ধরে আলোচনা চলেছে। কঙ্গোলী নেতারা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কঙ্গোকে কতকগুলো স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে ভাগ করা হবে। এক্ষেত্রে যুক্তি এই যে, কঙ্গোর বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মানবগোষ্ঠি (সুতরাং সমাজ) বিরাজমান। সেই সব মানবগোষ্ঠির বিচারেই রাজ্যগুলোর সীমানা স্থির হবে। কাসাইয়ে গোষ্ঠিগত বিভেদ খুব বেশী, অতএব সেখানে পাঁচটি রাজ্য হবে। লিওপোল্ডভিল, ইকোয়েটর ও ওরিয়েণ্টাল এবং কিভু, কাতাঙ্গা—সব আলাদা আলাদা রাজ্য থাকবে।

কিন্তু এই আপাতঃ-ঐক্যের মধ্যে ফাটল প্রচুর। প্রথমত, এ কাগজের পরিকল্পনা মাত্র, অন্ততঃ অর্ধেক কঙ্গোর ক্ষেত্র তো তাই। সম্মেলনে এমন প্রতিনিধিও ছিলেন যাঁরা স্বদেশ থেকে নির্বাসিত। ওরিয়েণ্টাল, কিভু ও কাসাইয়ের প্রতিনিধিরা নির্বাসিত সরকারের প্রতিভূরূপে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এ পরিকল্পনার পরিণতি কি হবে তা অনুমান করা যায়। বেলজিয়াম তার সাম্রাজ্য ভুলতে পারছে না, সে নেপথ্যে তার ক্রিয়া ক'রে চলেছে।

বর্ণবৈষম্য—বাসেও :

আমেরিকার আলবামার বাস ষ্টেশনে শ্বেতকায় আর কৃষ্ণকায়দের মধ্যে বৈষম্য করা হয়ে থাকে। এই নাকি সেখানকার প্রথা। বাসের সামনের আসনগুলো শ্বেতকায়দের, পেছনের আসনগুলো কৃষ্ণকায়দের। অথচ বাসে চলাফেরা বা বাস ষ্টেশনে বর্ণবৈষম্যের কোন স্থান নেই মার্কিণ সংবিধানে। বরং ব্যক্তিস্বাধীনতার গ্যারাণ্টি আছে। সুপ্রীম কোর্ট মারফত একথা ভাল ক'রে ঘোষণাও হয়েছে। এই সংবিধানে আমেরিকানদের কি রকম শ্রদ্ধা তার যাচাইয়ের জন্য একদল শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় নিগ্রো আমেরিকান একটি বাসে ক'রে দক্ষিণাঞ্চলে রওনা হয়ে যান। কিছু দূর বেশ নির্বিঘ্নে কাটল। এই বাসে কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা সামনের আসনগুলোয়, আর শ্বেতকায়েরা পেছনে বা পাশাপাশি বসে এসেছেন। আলবামায় এ বার্তা আগেই পৌঁছেছিল যেমন পৌঁছেছিল অন্যান্য রাজ্যে। সংবিধান যাচাইয়ে ভ্রমণরত এই শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায় দলটি দুটি বাসে ছিল। আলবামাবাসীরা একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দিল। যাত্রীদের ওপর হামলা করল। আর এক বাস ষ্টেশনে দ্বিতীয় বাসযাত্রীদের ওপরও হামলা হয়। পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিল। লাঞ্ছিত যাত্রীদের অন্য বাস ড্রাইভাররা নিতে চাইল না। তখন তাঁরা বিমানে গন্তব্যস্থলে গেলেন। ভাগ্যিস বিমানওয়ালারা বিগড়ে বসেনি।

আমেরিকার ঐশ্বর্যের ও শিল্প প্রগতির যে জৌলুষ চোখে পড়ে তার আড়ালে এই অবিশ্বাস্য বর্বরতা আমাদের চমক লাগায়। লিঞ্চ কথাটা ওদেশের। লোকে চাঁদা তুলে প্রকাশ্য রাস্তায় মেরে ফেলতে পারে একটা মানুষকে—যে মানুষের একমাত্র অপরাধ সে কৃষ্ণকায়। বাস পোড়ানো বা বাসযাত্রীদের লাঞ্ছিত করা এই বর্ণবিদ্বেষেরই আর একটি প্রকাশ মাত্র। আমেরিকার মানুষই যাচ্ছে শূন্য পরিক্রমায়—কিন্তু এই বিজ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাত-সংস্কার শূন্যে বিলিয়ে চিত্তের প্রসার তো হচ্ছে না।

বাতিল :

গ্রাজুয়েট নির্বাচকমণ্ডলী থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে যে নির্বাচন হচ্ছিল তা চ্যান্সেলার শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর আদেশক্রমে বাতিল হয়ে গেছে। নির্বাচনে দেখা যায়, ভোটারদের কাছে যতগুলো ভোটপত্র পাঠানো হয়েছিল, তার চেয়েও সাত হাজার বেশী ভোটপত্র রিটার্নিং অফিসারের কাছে ফিরে এল। এ ম্যাজিক কি ক'রে সম্ভব হয়? রিটার্নিং অফিসার পাঠিয়েছিলেন ২১ হাজার—ফিরে এল আটাশ হাজার। রিটার্নিং অফিসার কোথাও জালিয়াতি হয়েছে ব'লে সন্দেহ করেন। নির্বাচন স্থগিত রেখে তিনি উপাচার্যকে (ভাইস চ্যান্সেলারকে) জানান। উপাচার্য আচার্যের (চ্যান্সেলারের) গোচরে আনেন এই যাদুবিদ্যার খবর। অতিরিক্ত সাত হাজার ভোটপত্র জাল এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে আচার্য বাতিলী আদেশ জারী করেছেন। এই আদেশ জারী করতে রাজ্যপালকে ১৯৫১ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের জন্য এক অর্ডিন্যান্স জারী করতে হয়। অর্ডিন্যান্সটি কলকাতা গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স ও আচার্যের আদেশ—দুইই পেয়েছেন। আদেশ পাবার পর উপাচার্য ভোটপত্র জালিয়াতি সম্পর্কে তদন্তের ভার নেবার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেছেন। রেজিস্ট্রার পুলিশকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা জানা গেল। এজন্য পুবাহে।

ম্যাজিস্ট্রেটের যে অনুমতি নিতে হয় পুলিশ তাও দু'এক দিনের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছে। কেননা, জালিয়াতি অভিযোগের নিয়ম এই যে, অভিযোগকারীকে তা প্রমাণ করতে হয়। এরপর নতুন করে ভোট নেবার ব্যবস্থা হবে—নতুন করে ভোটপত্র (বা ব্যালট পেপার) ছাপতে হবে। ভোটার তালিকা ও প্রার্থীর তালিকা অপরিবর্তিত থাকবে। নির্বাচনের তারিখটি স্থির করতে কিছু দেরী হবে।

কিন্তু এগুলো সবই বাহ্য কথা। যেটি গভীর [illegible]গের কথা সেটি এই যে, বড় রকমের একটি ষড়যন্ত্র না হলে সাত সাতটি হাজার ভোটপত্র অতিরিক্ত হতে পারে না। আমরা আশা করব তদন্ত দল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্ক-মুক্তির পথে সহায়তা করবে।

হরতালে খেলা :

হরতাল বিক্ষোভ প্রকাশের একটি উপায়। কোন গুরুতর আপত্তির বা দুঃখের কারণ ঘটলেই তা হরতাল আকারে প্রকাশ করা হয়। এবং এই উপায়টি অন্তরের। কিন্তু আমরা দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, এক শ্রেণীর লোক এই হরতাল যথোচিত গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে না। স্বদেশী আন্দোলনকালে এমন একটি দিনকে অত্যন্ত শুচিতা ও পবিত্রতার সঙ্গে পালন করা হত। মূক আচরণ একটি সুদৃঢ় ভাষার রূপ পেত। চেহারাটি দেখলেই বোঝা যেত, মানুষের হৃদয় ভারাক্রান্ত এবং সংকল্প গভীর। সেকালে এমন দিনটি অরন্ধন ও উপবাস, এমন কি গঙ্গাস্নানের অনুষ্ঠানে বিশেষ হয়ে উঠত। আজ অরন্ধন বা উপবাস আদৌ প্রত্যাশিত নয়। কালো ব্যাজ পরিধানও যেন কেমন হাল্কা ব্যাপার। কিন্তু এমন যাদেও এই পরিবেশের মধ্যেই হরতালের যে একটি বিশেষ শ্রী ফুটিয়ে তোলা যেত যদি এক শ্রেণীর লোক এই দিনটিকে অবকাশ যাপনের, ছুটির বা স্ফূর্তির দিন মনে না করত। সকল কারণ, হেতু বিস্মৃত হয়ে তারা নানা খেলাধুলোয় মেতে ওঠে। হরতাল পালনের জন্য যে রাস্তায় গাড়ী চলতে দেওয়া হল না সেখানে ক্যাম্বিসের বল নিয়ে খেলাধুলো বা হৈ-হল্লাই বা হবে কেন? সেই বিশেষ কারণটি মনে রাখার জন্যই, সেটি নিয়ে ভাববার জন্যই—এবং কোনো সংকল্প নেবার জন্যই হরতাল যদি হয় তবে তার কি এই রীতি? হরতালের আহ্বান যাঁরা দেন এবং তা যথাযথ পালনের ভার নেন তাঁদের এই চটুলতা নিবারণের জন্য অগ্রণী হওয়া উচিত বলে মনে করি।

বিদ্রোহী কবি :

আজ তিনি মূক, নিষ্ক্রিয়। একদিন কণ্ঠে উদ্গীত সংগীত, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান বাংলার তরুণ সমাজকে মাতিয়েছে, অকুণ্ঠচিত্তে নির্ভীক প্রাণে তারা স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। এমন অনুষ্ঠান তখন দেখা যেত না যেখানে নজরুল সঙ্গীত বিশেষ স্থান পায়নি এবং প্রতিধ্বনিত হয়নি। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও একান্ত স্নেহভাজন ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম কেবল যে কবি ছিলেন তাই নয়, তিনি বাঁশী হাতে নেবার আগে অসিও হাতে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সিপাহী। রণাঙ্গন থেকে ফিরে তিনি ধূমকেতুর পুচ্ছস্পর্শে তরুণদলকে আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানালেন এবং নিজেও কারা-বরণ করলেন। তিনি কারাগারে অনশন করতে থাকলে রবীন্দ্রনাথ তারবার্তা পাঠিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত হবার জন্য বললেন, "অনশন ত্যাগ কর, আমাদের সাহিত্য তোমায় চায়।" ২৫শে মে তাঁর ৬৩তম জন্মবার্ষিকী। আমরা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

তৃতীয় পরিকল্পনা :

২৪শে তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তিন ঘণ্টাকাল তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়াটির পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাই করেন। আর সাত দিনের ভেতরেই এটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে যাচ্ছে। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয়-বরাদ্দ দাঁড়াচ্ছে ৭,৫০০ কোটি থেকে ৮০০০ কোটি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের পক্ষ থেকে যে চাহিদার চাপ এসেছিল, তা মন্ত্রিসভা মেনে নিতে পারেনি। যদি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠক ৩০শে ও ৩১শে তারিখে হয়, তবে অর্থ সঙ্গতির প্রশ্নই মুখ্য হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। সে সময় রাজ্যসমূহের পক্ষ থেকে যার যার সাধ্যমতো নিজেদের বক্তব্য নানা-ভাবে পৌঁছে দেবার চেষ্টা নিশ্চয়ই হবে। কেননা, সব রাজ্যই নিজেদের সর্ববিধ উন্নয়নের জন্য বিশেষ সচেষ্ট। গণতন্ত্রের এ একটি আশীর্বাদ, বিশেষ করে যেখানে কল্যাণপ্রসূ রাষ্ট্রই রাজ-নীতিকদের লক্ষ্য। সেদিন কেন্দ্রীয়

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলেছেন, তাঁরা যদি পরিকল্পনাগুলো একের পর এক পার হ'য়ে যেতে পারেন, তবে ভারতবর্ষ অন্যতম সুখী দেশে পরিগণিত। স্মরণ রাখা দরকার প্রথম পরিকল্পনা বা দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুফল, কিন্তু এখনও আমাদের সমাজ-জীবনে প্রতিফলিত হয়নি; বিশেষ ক'রে বেকার সমস্যা এক প্রকার অমীমাংসিতই আছে। পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অঙ্কটাও অবশ্যই ধরে নিতে হবে। সেদিক কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধিই এই বেকার সমস্যা সমাধানের এবং সমাজের শ্রী বৃদ্ধির একমাত্র পথ। তবেই দেশ সুখী হবে।

একটি ফুল ঃ

পুনার একটি সভায় গত ১৬ই মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিশিষ্ট অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় একটি করে ফুল দিলেই যথেষ্ট। কারণ, ফুলের মালায় বহু ফুলের অপচয় হয় এবং ফুলের মালা গলায় পরাতে কিছু সময় কেটে যায়। সত্যি কথা, অপচয় কোনো ক্ষেত্রেই কাম্য নয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রথা—শ্রদ্ধেয় অভ্যাগতকে চন্দন মাল্য প্রভৃতি দিয়ে বরণ করা এবং যাঁকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয় তাঁর গলায় বরমাল্য দুলিয়ে দেওয়া হয়। একটি ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো আমাদের দেশী প্রথা নয়। তবে সভাসমিতিতে এ-ধরণের অনুষ্ঠান বা প্রথা সংক্ষিপ্ত করা বিশেষ দরকার। সেখানে মালার বদলে একটি ফুল দিলে সত্যিই অনুষ্ঠানটি সংক্ষিপ্ত হয়। এ তো গেল অভ্যাগতকে মালার বদলে একটি ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো। কোনো কোনো অনুষ্ঠানে সভাসৌষ্ঠবের জন্য যে ফুলের সমারোহ দেখা যায় সে সম্বন্ধে অবশ্যই প্রধান-মন্ত্রী কিছু বলেন নি। তাতে ফুলের অপচয় হয়তো কিছু হয়, কিন্তু সভার সময় যায় না। সম্ভবত এই কারণেই তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

বিনা-টিকিটের যাত্রী ঃ

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে টিকিটহীন যাত্রীর আর বিনা মাশুলে মাল বহনের একটি হিসেব দিয়েছেন। চলতি বছরের ৩১শে অবধি যে চার মাস গেছে সে সময় বিনা-টিকিটের যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩,০৪,৮৮৯। ধরা পড়ায় তাদের কাছ থেকে ৮,১৫,০৯২ টাকা আদায় হয়েছে। ৮৫০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। কারো কারো এক টাকা থেকে ১০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬০ দিন পর্যন্তও জেল হয়। লাগেজ যথাযথ বুক না করার জন্য ৩২,৮৯৪ জনের কাছ থেকে ৮৫,৪৮৩ টাকা আদায় হয়। আমাদের ছিঁচকে দুর্নীতি দূর হবে কবে?

মানবতার হত্যা ঃ

এঙ্গোলার যেটুকু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তা এমনই ভয়াবহ যে তাকে মানবতার হত্যা আখ্যা দেওয়াই সমীচীন। এঙ্গোলা পর্তুগীজ অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকায় একটি উপনিবেশ। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমায় গোয়াও একটি পর্তুগীজ উপনিবেশ। পর্তুগালে এখন সালাজারের শাসন চলছে। তার ক্রোধ গোয়ায় আমরা যা দেখেছি তা দিয়ে এঙ্গোলার ব্যাপক হত্যালীলা সহজ—বোধগম্য নয়। গত দু'মাসে কমসেকম ২০ হাজার এঙ্গোলাবাসী এঙ্গোলীকে সালাজার চালিত পর্তুগীজেরা হত্যা করেছে—বিমান থেকে বোমা ফেলে, নয়তো গুলীতে। এখানেই শেষ নয়, লিসবন থেকে আরও ২৫ হাজার সৈন্য ও বৈমানিক আনা হচ্ছে—কারণ, স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী এঙ্গোলীদের দমন করতেই [illegible] লক্ষ্য। এই যে, সেখানে স্থানীয় অধিবাসীরা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হোক, পর্তুগীজদের লুণ্ঠনের ক্ষেত্রটি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এঙ্গোলার কফি, তেল ও হীরা পর্তুগালের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। এদেশ স্বাধীন এঙ্গোলাবাসীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। তাতে যে পর্তুগালের বর্তমান সালাজার সরকারেরই পতন হবে তা নয়, পর্তুগালেরও হবে মুমূর্ষু অবস্থা।

মহামারী ঃ

কলকাতায় এবার কলেরা মহামারীর রূপ নিয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে; লোককে টীকা নিতে বলা হচ্ছে এবং অতিরিক্ত পরিস্রুত জল সরবরাহ ও নলকূপ স্থাপনের কথা হচ্ছে। বৎসর আবর্তিত হওয়া যেমন প্রকৃতির স্বভাব, কলকাতায় প্রায়-মহামারী আর মহামারীর আবির্ভাব তেমনি নিয়মিত। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্রুত জল সরবরাহ ও নলকূপ স্থাপনের প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তিও অনিবার্য। কিছুকাল হৈ চৈ হয়, বর্ষা নামে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। যারা মরবার তারা মরে। এ এক রকম বাৎসরিক অনুষ্ঠান। একদিকে কলেরা চলছে, পচা নর্দমা জমে কঠিন হচ্ছে, রাস্তায় আবর্জনার পাহাড় জমছে, ধুলো উড়ছে, সেই ধুলোর ঝড়ে খোলা খাবার দিব্যি বিক্রী হচ্ছে আর খাদ্যবিলাসীরা নিঃসংশয়ে খাচ্ছে। বাজারে পচা মাছ, বাসি খাবার, আঢাকা খাদ্য অবাধে কেনা-বেচা চলছে। গঙ্গার জলও যেমন ঘরে-বস্তিতে প্রবাহিত, টীকার টাকাও তেমনি অনন্তকাল প্রবাহিত থাকবে। কলেরা আসবে, লোক মরবে—স্থায়ী প্রতিকার কোনবার হয়নি—এবারই যে হবে অত আশা না করাই ভাল।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

ডায়েরী সাহিত্য

লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকার ব্যক্তিগত কলমের বিজ্ঞাপনে একটি মজাদার বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তাই নিয়ে ওদেশে বেশ হৈ চৈ সুরু হয়েছে। বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন লর্ড রীথ। বারো লাইনের বিজ্ঞাপনে তিনি সাধারণের কাছে উপদেশ ও অভিমত জানতে চেয়েছেন, কি করা কর্তব্য তাঁর পঞ্চাশ বছরের ডায়েরী নিয়ে। প্রায় বারো খন্ডের পান্ডুলিপি। একটি দিনও বাদ নেই। এছাড়া দশ খন্ড আছে ফটোগ্রাফ, চিঠিপত্র, সংবাদপত্রের কাটিং। তাঁর মনে হচ্ছে এসব ধ্বংস করাই ভালো। ছেলেদের ঘাড়ে চাপাতে চান না, যদি নষ্ট করতে হয় নিজেই করবেন,— 'he does not want these to be such records of himself'.

B· B· C-র স্রষ্টা লর্ড রীথের এই ডায়েরীর প্রকাশকের অভাব নেই—। কিংসলে মার্টিন 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকার 'লন্ডন ডায়েরী' স্তম্ভের লেখক। তিনি রসিকতা করে বলেছেন—

'would some library, trust, publisher, or collector give him some kindly advice about the best way of disposing of this collection?'

ডায়েরী রাখাও শক্ত, লেখাও কঠিন এবং সর্বশেষে তার বিলি ব্যবস্থা করাও সহজ নয়। জীবনের কোনও এক মুহূর্তে ডায়েরী লিখতে প্রলুব্ধ হননি এমন শিক্ষিত মানুষ বিরল, নিজের মনের সকল কথা সকল ভাব, ব্যক্তিগত মনোভঙ্গী, চলতি সাময়িক চিন্তা, এমন কি গোপনতম কথাও লেখা যায়। জীবনের বিরলতম মুহূর্তের অন্তরঙ্গ কথা ডায়েরীতে লেখক লিপিবদ্ধ করেন। শুধু তাই নয়, ডায়েরী সমসাময়িক কালের নিখুঁত ইতিহাস। শুধু লেখকের মানসিক প্রতিকৃতি বা গোপন গহনের রোজনামচা নয়, ডায়েরী অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবান সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছেচে এবং তার বিচারও হয়েছে সেই মাপকাঠিতে। ডায়েরী শুধু সচেতন মন নয় অবচেতন মনেরও ইতিহাস।

আমাদের দেশে ডায়েরী- লেখক হিসাবে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় রবীন্দ্রনাথের। তিনি 'ছিন্নপত্র', 'চিঠিপত্র', 'য়ুরোপের চিঠি', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়েরী', 'রুশিয়ার চিঠি', 'জাপান-যাত্রী' 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'পত্রধারা' 'ভানুসিংহের পদাবলী'—ইত্যাদির মধ্যে তাঁর মনের গহন কোণের অনেক গোপন কথা প্রকাশ করেছেন, বেদনা, অভিমান, আনন্দ, কৌতুককর অবস্থা, আসক্তি, বিরক্তি, অনুরাগ, বিরাগ, সাহিত্য-চিন্তা ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত রচনা এবং ডায়েরী-ধর্মী রচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল পরিচ্ছেদ। তাঁর এইসব রচনা ব্যক্তিগত হলেও—তার আবেদন বিশ্বজনীন।

বছরের সুরুতে ডায়েরী রাখার মহৎ সংকল্প অনেকেই করেন, কিন্তু পয়লা, দোসরা, বড়জোর তেসরা, তারপর সেই মহৎ সংকল্প কোথায় মিলিয়ে যায়। যাঁরা ডায়েরী লেখেন তাঁরা সংখ্যায় কম, যাঁরা লেখেন না তাঁরা দলে ভারী। দেখা যায় সকল শ্রেণীর মানুষের মনেই একটা সময় আসে যখন কিছু লিখে যাওয়ার জন্য হস্ত কণ্ডুয়ন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বাসনা মনে জাগে। সপ্তদশ শতাব্দীতেই ইংলন্ডে ডায়েরী রচনার ফ্যাসানটা পাকাপাকি ভাবে চালু হয়।

স্যার উইলিয়াম ডাগডেল (১৬০৫-৭৫), জর্জ ফক্স (১৬২৪-৯০) লিখেছেন প্রথমদিকের উল্লেখযোগ্য ডায়েরী, আর জন ইভিলিন (১৬২০-১৭০৬) সত্তর বছরের ধারাবাহিক বিবরণ তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেই হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অপরূপ কৌতূহলময় ডায়েরীটি কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের আগে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এইসব ডায়েরীর গৌরব ম্লান করে দেয় স্যামুয়েল পেপিসের (১৬৩৩-১৭০৩) ডায়েরী। এই ডায়েরী ১৬৬০-এর পয়লা জানুয়ারী সুরু হয়ে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে পর্যন্ত বিরামবিহীন ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই বিখ্যাত ডায়েরীটি সাংকেতিক অক্ষরে রচিত। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল পেপিসের ডায়েরী প্রথম প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক কালের আচার-ব্যবহার ও সামাজিক জীবনের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি এই ডায়েরী। সম্প্রতি B· B· C· টেলিভিসনে "A Peep into the Diary of Samuel Pepys". এই সিরিজের ব্যবস্থা করেছিলেন, অচিরেই তা অসীম জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ডায়েরী রাখার অভ্যাস পুরুষদের চাইতে মেয়েদের বেশী, তাই মহিলা ডায়েরী-লেখিকারা সংখ্যায় বেশী। সিলিয়া ফিনেস ইংলন্ডের সর্বপ্রথম রমণী ডায়েরী-লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকের ইংলন্ডের প্রায় গ্রাম নগর, বাগান এবং বাগানবাড়ির চমৎকার বিবরণ সিলিয়া ফিনেসের ডায়েরীতে পাওয়া যায়। মাদাম দ্য আরবলের ডায়েরী সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে, এই বহুনিন্দিত এবং বহু প্রশংসিত ডায়েরীতে ১৭৬৮-১৮১৯ সালের কথা আছে, এই ডায়েরীর বৈশিষ্ট্য এই যে, লেখিকা কথাবার্তা এবং নানাবিধ আলাপাচার যথাযথ লিপিবদ্ধ করেছেন, স্মরণশক্তির সাহায্যে এমন নিখুঁত ইতিহাস রচনার দৃষ্টান্ত বিরল। ডাঃ জনসন সম্পর্কিত আলোচনা এবং ওয়ারেণ হেস্টিংসের বিচার বর্ণনা সমালোচকদের মতে অপূর্ব দক্ষতার পরিচায়ক।

ইংলন্ডের রাজ-পরিবারের দুজনের মাত্র ডায়েরী পাওয়া যায়, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড এবং কুইন ভিক্টোরিয়া। আঠারো বছর বয়সে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া ডায়েরী লিখতে সুরু করেন এবং আটষট্টি বছর ধরে।

ইংরাজ ডায়েরী-লেখিকারা সাধারণতঃ উঁচুতলার সমাজের অধিবাসী। শুধু মিসেস ব্রাউন নামক ডায়েরী-লেখিকার তেমন পরিচয় জানা যায় না। এই পরিচয়হীনা রমণী ভার্জিনিয়া অঞ্চলে ব্রাডকের অভিযান সম্পর্কে তাঁর তিন বছরের ডায়েরীতে অনেক বিচিত্র কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই অভিযাত্রী দল ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন সমুদ্র-যাত্রা করেন তখন তাঁদের অদৃষ্টে যেসব

দুর্ভোগ ঘটেছিল তার নিখুঁত ছবি এঁকেছেন মিসেস ব্রাউন। ঘটনা, চরিত্র-চিত্র, কাহিনী সেই সঙ্গে লেখিকার পর্যটন-ক্লেশ সবই অতি চমৎকার ভঙ্গিতে এই ডায়েরীতে লেখা হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে লিখিত নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত লেখিকা ক্যাথারিণ ম্যানসফিল্ডের ডায়েরী সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ ডায়েরী হিসাবে বিশেষ প্রশংসিত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্যারী শহরে এই ডায়েরীর সূচনা এবং ১৯২২-এ তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে এর সমাপ্তি ঘটেছে। এই ডায়েরী নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়।

আধুনিক জীবনে ডায়েরীর রচনা লুপ্ত শিল্প-কৌশল নয়, কারণ একালের বহু খ্যাতনামা নর-নারী ডায়েরীর জন্য প্রশংসা অর্জন করেছেন। ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকদের পক্ষে এইসব ডায়েরী অতি মূল্যবান দলিলে পরিণত হবে।

ষ্টেলা বেনসন উপন্যাসিক এবং প্রবন্ধকার হিসাবে প্রখ্যাত। অতি অল্প বয়স থেকে তিনি ডায়েরী রেখেছেন। তা প্রায় ত্রিশ খণ্ডে পূর্ণ এবং আগামী চল্লিশ বছরের আগে প্রকাশিত হবে না।

নিকট-প্রাচ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং আরবের লরেন্সের বন্ধু রোণাল্ড ষ্টোরস রাতে শোওয়ার সময় বিছানার পাশে ডিকটাফোন তাঁর দিনলিপি বলে যেতেন।

প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অক্স্‌-ফোর্ড ছাড়ার পর থেকেই ডায়েরী রাখা সুরু করেন। এর প্রথম খণ্ডে তাঁর লাইমহাউসের যুগের বিবরণ আছে, পরবর্তী খণ্ডে আছে সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস। এটলির ডায়েরী তথ্যবহুল, মন্তব্যহীন এবং প্রকাশের উদ্দেশ্যে রচিত নয়।

মুসোলিনীর জামাতা কাউন্ট চিয়নো এবং তাঁর স্ত্রী টডা যে ডায়েরী লিখে গেছেন, যুক্তরাষ্ট্র তার স্বত্ব বাবদ ১২,৫০০ পাউন্ড মূল্য দিয়েছেন। এডার স্বামী যখন ইতালীর বন্দীশালায় তখন এইসব ডায়েরী তাঁর স্ত্রী গোপনে সুইজারল্যান্ডে নিয়ে যান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সকল শ্রেণীর সৈনিকদের মধ্যে ডায়েরী রচনার প্রেরণা দান করে। জাপানী বন্দীশালায় ডায়েরী লেখা নিষিদ্ধ ছিল, এমন কি একটা পেনসিল রাখাও চলত না। তবু লণ্ডন পোষ্ট আফিসের ইঞ্জিনিয়ার আলফ্রেড উইকসন (৪১) ৮৪,০০০ শব্দসম্বলিত ধারাবাহিক বিবরণ লিখে এনেছেন তাঁর বন্দী জীবনের। এই ডায়েরী থেকে অনেক মূল্যবান সামরিক তথ্য পাওয়া গেছে।

১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ৩০,০০০ জার্মাণ স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের বড় বড় ডায়েরী দেওয়া হয়েছিল, তাতে ছবি রাখা এবং সংবাদপত্রের কাটিং রাখার ব্যবস্থা ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ দিনপঞ্জী-লেখকের জন্য একটা উঁচু মূল্যের পুরস্কারও ঘোষিত হয়েছিল। মিত্র-দল এই রকম কিছু ডায়েরীর সন্ধান পেয়েছিলেন এবং জার্মাণ কিশোর-কিশোরীদের মনোভাব বিচারে এইসব ডায়েরী সাহায্য করেছিল।

আধুনিকতম কালে 'ডায়েরী অব এ্যান ফ্রাংক' বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। পনের বছরের মেয়ে নাৎসীদের চোখ এড়িয়ে যখন হল্যান্ডে বাস করছিল তখন এই ডায়েরীতে আর্ত বেদনাদায়ক ভঙ্গীতে নাৎসী বর্বরতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে। ইহুদী ব্যাঙ্কার ওটো-ফ্রাঙ্কের ছোট মেয়ে এই এ্যান। নাৎসীদের ইহুদী বিতাড়ণের আন্দোলনের সময় তিনি হল্যান্ডে পালিয়ে আসেন। এ্যান তাদের পরিবারবর্গ নাৎসীদের হামলার কবলে পড়ার আগেই এই ডায়েরী লিখেছিল এবং নাৎসীদের হামলার সময় এই ডায়েরী গোপন রাখতে পেরেছিল। ১৯৪৫-এ আমস্টার্ডাম মুক্ত হওয়ার পর এই ডায়েরী এ্যানের পিতার হাতে পড়ে। বন্দীশালা থেকে একদিন রাশিয়ানদের দ্বারা তিনি মুক্তিলাভ করেন, আর এ্যান ১৯৪৫-এর গোড়ার দিকে বেলসেনের পীড়নশালায় তার অন্য বোন এবং মার সঙ্গে মারা যায়।

'The Diary of Ann Frank'. উপন্যাস হিসাবে একুশটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এবং জার্মাণ ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটির এতাবৎ মোট বিক্রয় সংখ্যা—দুই মিলিয়ন।

ফ্রান্সিস গুডরিচ এবং এলবার্ট হ্যাকেট এই ডায়েরীটিকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। এই নাটক পুলিটজার পুরস্কার লাভ করেছে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে কুড়িটি বিভিন্ন দেশে কুড়ি মিলিয়নের ওপর দর্শকের সামনে অভিনীত হয়েছে। হলিউড এটিকে রূপালী পর্দায় রূপান্তরিত করেছেন এবং সফল চিত্র হিসাবে ছবিটি খ্যাতি লাভ করেছে।

ডায়েরী সমসাময়িক কালের ইতিহাস, এই বিংশ শতাব্দীর সংকট-সংকুল মুহূর্তে বসে স্পুটনিক, গাগারিণ, সহ-অবস্থান, মুদ্রাস্ফীতি, জনসংখ্যার অসম্ভব বৃদ্ধি, এ্যাটম বোম, সিগারেট-পানে ক্যানসার হয় কি হয় না, প্রভৃতি বহু বিচিত্র ঘটনা এবং সমস্যার কথা এ যুগের মানুষ কি চোখে দেখছেন তার বৃত্তান্ত পাঠ করে আগামী যুগের মানুষ এদিনের মানুষ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে।

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু লোকেন পালিত মহাশয়ের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে দিনলিপিটি পেয়েছিলেন তার লেখক জেনেভা নিবাসী দার্শনিক ও কবি প্রফেসর আঁরি ফ্রিডরিশ আমিয়েল (১৮২১-১৮৮১)। তাঁর 'Journal in time' নামক দিনলিপি সম্পাদনা করে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জেনেভায় প্রকাশ করেন তাঁর বন্ধু মঁসিয়ে সেরার। চৌত্রিশ বছরের দিনলিপি 'Journal in Time'—(১৮৪৮-১৮৮১)। এই গ্রন্থের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। মিসেস হাম্‌ফ্রে ওয়ার্ড কৃত এই অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৮৯) রবীন্দ্রনাথের হাতে আসে।

রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রে' লিখেছেন—"আমার একটি নির্জনের প্রিয় বন্ধু জুটেছে। আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি। যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টে পাল্টে দেখি, ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি, এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি।"

অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে লিখিত ডায়েরী অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত মুখোমুখি কথা বলার সাহিত্য। আমিয়েলের জীবনে ছিল অসফলতার, জীবনব্যাপী ব্যর্থতার, নিষ্ফল জীবন ধারণের দুঃখকর ইতিহাস। এই ডায়েরীতে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে বর্তমান কালে 'ডাক্তারের ডায়েরী' বা 'উকীলের ডায়েরী' জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে বটে, আত্মজীবনীরও অভাব নেই, কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কালে রচিত উল্লেখযোগ্য পত্র-সাহিত্য, ডায়েরী বা দিনপঞ্জীর আবির্ভাব আজো ঘটেনি।

একালের সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ অতি সুন্দর ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে যে সব ছোটখাটো ঘটনার নক্‌সা আঁকেন সে-গুলি যদি সংগ্রহ করা যায় তাহলে মূল্যবান সংযোজন হবে। সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ এবং যার আবেদন সর্বকালীন এমন রচনা নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তা অর্জন করবে এবং পাঠকের রুচির ক্ষেত্রে হাওয়া বদলের সুযোগ মিলবে।
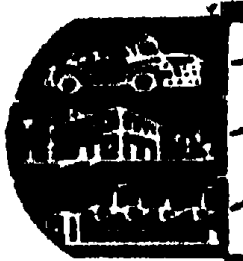
নতুন বই

বিদ্রোহী ডিরোজিও —বিনয় ঘোষ (বাক্ সাহিত্য, কলিকাতা—৯, দাম পাঁচ টাকা)।

বাংলার নবজাগরণ এবং চিন্তা-বিপ্লবকালে দুজন মহাপুরুষের মাঝখানে ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিরাজ করছেন একথা গ্রন্থকার তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের একদল নও-জোয়ান 'ডিরোজিয়ান' বলে চিহ্নিত ছিলেন, সুতরাং ডিরোজিও আমাদের দেশের চিন্তানায়কদের মধ্যে অন্যতম। হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও উনিশ শতকের দ্বিতীয় প্রহরে বাংলার সামাজিক জীবনে বিচিত্র আলোড়ন এনেছিলেন। তিনি জাতে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী। তাঁর সংগে এদেশী মানুষের সংগে যোগাযোগ হওয়াতে একটা রোমান্টিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। রামমোহন ইতিমধ্যে তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তারপর এসেছেন বিদ্যাসাগর। ডিরোজিও নব্য বংগের দীক্ষাগুরু, তাঁর কাছে আমাদের অশেষ ঋণ। অতি সামান্য কালের জীবন পেয়েছিলেন ডিরোজিও কিন্তু সেই অল্প দিনের মধ্যেই এক বিচিত্র ইতিহাস রচনা করে-ছেন নিজের জীবনেতিহাসের মধ্যে। ছাত্রদের তিনি শিক্ষক ও বন্ধু ছিলেন, ফলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ সিকদার,

মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রভৃতির মত ছাত্রসমাজ নবীন বাংলার চিন্তা ও সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে এক নূতন ইতিহাস রচনা করেছেন। নব্য-বঙ্গের এই দীক্ষা-নায়কের জীবনের ইতিহাস বহু মূল্যবান তথ্য দ্বারা পরিবেশন করেছেন বাংলার নব জাগরণের কালের বিখ্যাত গবেষক এবং জীবনীকার বিনয় ঘোষ। এমন একটি সুন্দর ও তথ্য-বহুল গ্রন্থকে অপূর্ব লিপিকুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত এই জীবনেতিহাসটি একালের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। আঙ্গিকে পরিচ্ছন্ন এবং প্রচ্ছদটি শোভন।

বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ —বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (বাণী নিকেতন, কলিকাতা—৬, দাম তিন টাকা)।

কবি বিজয়লালকে আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের বাংলা বিদ্রোহী কবি বলেই জানত। তিনি সেই পরাধীনতার যুগে বাঙালীর চেতনাকে অগ্নিগর্ভ বাণীতে সঞ্জীবিত করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' (৩য় সংস্করণ). প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে। সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন, সম্ভবতঃ 'বিদ্রোহী' এই বিশেষণটির জন্যই। রাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষা, সভ্যতা, নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি সর্বকিছু অচল ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য বলেছেন স্পষ্ট ভাষায়। তাঁর অকপট সত্যভাষণের ফলে এবং বক্তব্যের যুক্তিতে সেদিনের অনেক স্বার্থপরায়ণ মানুষকে বিচলিত করেছিল। তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য, মৌল-বিচার এবং নির্মম সত্যনিষ্ঠা 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিধৃত করেছেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সাবলীল ভাষা ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সেকালে যথেষ্ট প্রশংসাও লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও খুসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর কালে পুনর্মুদ্রিত এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান সংযোজন।

দিগন্তের মেঘ —(কবিতা), সন্তোষকুমার অধিকারী। (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা—৩৭), দাম দু টাকা।

সন্তোষকুমার অধিকারী সাম্প্রতিক কালের কবি সমাজে একটি সুপরিচিত নাম। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলির একটি নির্বাচিত সংকলন 'দিগন্তের মেঘ'। তাঁর এই কবিতাগুলির মধ্যে মূলতঃ প্রকৃত প্রেম ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির কবি হিসাবে সন্তোষকুমার নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। তরুণ কবির আঙ্গিক এবং লিখন-শৈলী প্রশংসনীয় সার্থকতা লাভ করেছে। হিমশান্ত মৌন রাত্রির মধ্যে আলোকের দীপ্তির মত কবিতাগুলি উজ্জ্বল এবং বর্ণময়। 'মৃত্যুর গভীরে বসে' ও 'একটি মৃত্যুর সংবাদ' কবিতা-দুটিও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

দাশরথি রায় ও তাঁহার পাঁচালী

—ডাঃ হরিপদ চক্রবর্তী। (এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—১২)। মূল্য ১২-০০।

দাশরথি রায়ের পাঁচালী সম্পর্কে এই প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখকের ডি-ফিল থিসিস সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে রচিত হয়েছে। ভূমিকা লিখেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঁচটি পরিশিষ্টসহ গ্রন্থখানি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে পাঁচালীর পটভূমি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দাশরথি রায়ের জীবন-কথা, তৃতীয় অধ্যায়ে দাশরথির পাঁচালী, চতুর্থ অধ্যায়ে পাঁচালীর বিচার এবং পঞ্চম অধ্যায়ে উনবিংশ শতকের পরিচয় আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া পরিশিষ্টে দাশরথির পাঁচালী-বিচিত্রা, বিশিষ্ট সঙ্গীত পঞ্চাশৎ, দাশরথির প্রবাদ-প্রবচন প্রদর্শনী, দাশরথির পাঁচালীর দল ও অন্যান্য পাঁচালীকারগণ প্রভৃতি বিষয়গুলিও গ্রন্থখানির আলোচিত বিষয়।

মাঝে মাঝে গীত-সংবলিত ও সুর-সংযোগে আবৃত বিবৃতিমূলক আখ্যান-কাব্যকেই পাঁচালী নামে সাধারণভাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রায়াবলুপ্ত দাশরথি রায়ের পাঁচালী আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতির প্রয়োগে ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী বিদগ্ধ পাঠক সমাজের নিকট নূতন করে উপস্থাপিত করেছেন। গ্রন্থের শেষাংশে আলোচনা-পদ্ধতির সমীচীনতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে লেখক মন্তব্য করেছেন। এ প্রশ্ন সমস্ত মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সাধারণ প্রশ্ন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় লেখক সম্পর্কে বলেছেন,..."এই নিবন্ধ রচনায় লেখক যেরূপ শ্রম ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাহা সর্বথা অভিনন্দনযোগ্য। তিনি এ সম্বন্ধে প্রায় জার্মান পণ্ডিতদের অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা ও বিষয়বস্তুর সামগ্রিক উপস্থাপনার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছেন।"...সুতরাং লেখক কেবলমাত্র তাঁর বৈদগ্ধ্যের জন্যই নয় অনাবশ্যক বোঝা কমিয়ে বঙ্গ-সাহিত্য পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

দাশরথি রায়ের গানগুলির মধ্যে কতগুলি গান আত্ম-সচেতনতা, অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও ভাবগভীরতার উচ্চতম চূড়ায় পৌঁচেছে। 'ধনি আমি কেবল নিদানে', 'তেমনি সুখে সজনিলো বিচ্ছেদের পর গিরীতখানি', কিংবা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গান 'হৃদি-বৃন্দিবনে বাস কর যদি কমলাপতি' অনন্যসাধারণ কলা-কৌশল ও আত্ম-সমীক্ষার পরিচায়ক। দাশরথি একাধারে ভক্ত ও কাব্য-রসিক। তিনি শেষবারের মত পাঠকগণকে প্রেম-যমুনা কুলে আমন্ত্রণ করে আশা বংশী-বটমূলে বাঁশরীধ্বনি শুনিয়েছেন।

গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উচ্চাঙ্গের এবং প্রচ্ছদপটটিও সুরুচির পরিচায়ক

গৃহকোণ

কল্পনা সরকার

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থ-ঘরে দেখা যায়—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ীর গিন্নী নানা রকম রান্না নিয়েই ব্যস্ত আছেন। চাকর, ঝি বা ঠাকুরের মাহিনা দিন দিন এত বেড়ে যাচ্ছে যে, তাদের দিয়ে এই সব কাজ করা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক রান্নার কাজের বেশী ভাগই এখন মেয়েদের করতে হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে সখের বা সৌখিন রান্না নয়—দৈনন্দিন জী[illegible]র জন্যে এই রান্না। এই দৈনন্দিন ব্যাপারেও [illegible]টা সময় [illegible]ট হয়, কতটা পরিশ্রম হয়, কতটা স্বাস্থ্যহানি হয়, কাজের নানা বিশৃঙ্খলা হয়—তা বাড়ীর অনেকেই ভেবে দেখেন না। কিন্তু আজকের [illegible]নে, যখন সব দিক দিয়েই জিনিষের ও লোকের দর অসম্ভব ভাবে বেড়ে চলেছে, তখন ক করে রান্নার কাজটা সংক্ষেপে ও সরল-ভাবে সম্পন্ন করা যায় তা অনেকেই ভাবছেন। কিন্তু পুরাতন পদ্ধতি ও নিয়ম এমনভাবে আমাদের উপর চেপে বসে আছে যে, সহজেই আমরা কোন জিনিষ পরিবর্তন করতে চাই না। প্রাচীন পন্থীরা কোন রকম নূতন পথ গ্রহণ করতে বাধা দেন, আর নবীনরা এক রকম নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন।

রান্নার নানা যান্ত্রিক সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হওয়ায় আজকাল রান্না জিনিষটা অনেকটা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রগতিশীল সমস্ত দেশেই রান্নাঘরগুলি বিজ্ঞানের দানে সমৃদ্ধ। সহরে আজকাল বড়লোকদের রান্নাঘর যেন একটা কারখানা। চারিদিকে রান্নার যান্ত্রিক সরঞ্জামের ছড়াছড়ি। তাই সাধারণ গৃহস্থরাও এইরূপ ছোট ধরনের আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করে রান্নার খুঁটিনাটি অনেকটা সরল করে নিতে পারেন।

আজকাল গ্যাস, ইলেকট্রিক বা নূতন ধরনের কেরোসিন কুকারের কল্যাণে ঘুঁটে ও কয়লার আবর্জনা এক রকম দূর হয়েছে। যাঁদের পক্ষে গ্যাস বা ইলেকট্রিক খরচ বেশী মনে হবে, তাঁরা অনায়াসে এই আধুনিক কেরোসিন কুকার ব্যবহার করতে পারেন। রান্নাঘর পরিষ্কার থাকবে, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে না। এতে কেরোসিন তেল কয়লার তুলনায় কিছু কমই খরচ হয়। তা ছাড়া, উনুন ধরানোর হাঙ্গামা নাই। ঘুঁটের দরকার নাই। রান্নাঘরে কয়লার উনুনে আঁচ দিলেই সারা বাড়ী ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়—তারপর ঘরদোর কিছুদিন বাদে বুল[illegible]কালিতে কালো হয়ে যায়। জামাকাপড় তাড়াতাড়ি ময়লা হয়। আর এই কয়লার ধোঁয়ায় টনসিলের ব্যারাম, বুকের রোগ, চোখের রোগ ইত্যাদি সহজেই হয়।

কয়েক বৎসর হোল আমাদের দেশে 'প্রেসার কুকার' বলে একটা জিনিষের খুব প্রচলন হয়েছে। রান্নার পক্ষে এর চেয়ে সুবিধাজনক জিনিষ বাজারে আর নাই। এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটের মধ্যে চার-পাঁচটা রান্না অনায়াসে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। মাংস রান্না করতে ২০ মিনিটের বেশী লাগে না। এবং এই সময়ের মধ্যে মাংস এত সুসিদ্ধ হয় যা উনুনে আড়াই ঘণ্টা রান্না করলেও হয় না। তাছাড়া ভাত, তরকারী, ডাল, নানারকম সিদ্ধ খুব কম সময়ের মধ্যেই সুসম্পন্ন হয়ে যায়। প্রথমে অবশ্য একটু বড় ধরনের প্রেসার কুকার কিনতে ৭০।৮০৲ টাকা লাগে, কিন্তু হিসাব করে দেখলে দেখা যায় সময় সংক্ষেপের দরুণ নানা দিক দিয়ে প্রেসার কুকারের রান্না সর্বশেষে সস্তাই হয়। প্রেসার কুকারের জন্যে দরকার হয় একটা আধুনিক কেরোসিন কুকার বা কয়লার ছোট উনুন। অবশ্য যাদের গ্যাস কুকার বা ইলেকট্রিক কুকার আছে—তাদের তো কথাই নাই।

যতদূর সম্ভব আধুনিক প্রণালীতে রান্নাঘরটি সাজাতে হবে। একটা রেফ্রিজারেটার সাধারণ গৃহস্থের ঘরে রাখা সম্ভবপর নয়। এই জিনিষ কিনতে প্রায় দুই হাজার টাকা লাগবে। এটা বাদ দিয়েও নানা প্রকারে আমরা এখন রান্না-ঘরের উন্নতি করতে পারি। এপর্যন্ত বাড়ীর সব চেয়ে খারাপ ঘরকে আমরা রান্নাঘর করে আসছি। এই জিনিষের একেবারে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। ঘর ছোট হোক তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু খোলা হাওয়া বাতাসযুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর দরকার। আধুনিক প্রণালীতে আমাদের রান্নাঘর তৈরী করতে হবে। কয়লায় রান্না করতে হলে ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার চিমনির

ব্যবস্থা করা দরকার। অবশ্য যারা নূতন কেরোসিনের স্টোভ, গ্যাস-কুকার বা ইলেকট্রিক কুকার ব্যবহার করেন তাঁদের এই কয়লার হাংগামা ভাবতে হবে না। বাসন-কোশন পরিষ্কার করবার জন্যে প্রত্যেক রান্নাঘরে একটা সিংক দরকার। তা ছাড়া জলের কলতো একটা চাই-ই। রান্নার নানারকম সরঞ্জাম ও হাঁড়িকুড়ি তুলে রাখার জন্য দেওয়ালের সংগে গাঁথা লম্বা সিমেন্টের তাক তৈরী করে নিতে হবে। তা ছাড়া জালের একটা আলমারী রান্নাঘরে রাখা দরকার। এতে তরিতরকারী, নানারকম মশলা, তৈল, নুন ইত্যাদি রান্নার জিনিষ থাকবে। জালের মধ্যে থাকলে এই সব জিনিষ ধুলো, ময়লা, পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। ফ্ল্যাট বাড়ীতে বা নিজের বাড়ীতে হোক, এক কোনে চাটাই বা পর্দা দিয়ে বা সিঁড়ির নিচে রান্নাঘর তৈরী করা চলবে না। যেটা ৩৬৫ দিনের কাজ, যার ওপর সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্য নির্ভর করছে —সেই জিনিষটাকে এই রকমভাবে অবহেলা করা মোটেই সংগত নয়।

ঝি-চাকরের অভাবে অধিকাংশ সময়েই বাড়ীর গিন্নী রান্নার সময় মশলার ব্যাপারে বড়ই অসুবিধায় পড়েন। ভারতবর্ষে বাংগালী বোধ হয় একমাত্র জাতি যারা জল দিয়ে বাটা মশলায় রান্না করে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিরা রান্নায় গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করে। এতে যে কতটা দৈনন্দিন হাংগামা এড়ানো যায় তা আমাদের গিন্নীরা উপলব্ধি করতে পারেন না। রান্নার ব্যাপারে গুঁড়ো মশলার প্রচলন করলে আমরা অনায়াসে কাজকর্ম থেকে একজন ঝি-চাকরকে বাদ দিতে পারি। রোজ শিলনোড়ায় মশলা বাটা যে কতটা পরিশ্রমসাধ্য ও কতটা সময়ের অপব্যয় হয়, তা সকলেই জানেন। এ ছাড়া বাটা মশলার অপব্যয় তো আছেই। অতিরিক্ত বাটা মশলা বেশী হলে সাধারণতঃ ফেলে দিতে হয়। কারণ কয়েক ঘণ্টা পরে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, এই মশলা অত্যধিক গরমের জন্যে পচে ওঠে। রান্না ঘরের মেঝে, দেওয়াল, জানালা ইত্যাদি অন্যান্য ঘরের মত সব সময় ঝকঝকে তকতকে রাখতে হবে। রান্না ঘরের সুবন্দোবস্তের সংগে সংগেই অবশ্য সুগৃহিণীর কাজ শেষ হোল না। এরপর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার কথা আছে, রান্নার নানারকম আধুনিক সরঞ্জামের কথা আছে। নূতন প্রণালীতে তরিতরকারী কাটার কথা আছে। যে গৃহিণী এই চারপাঁচ রকম ব্যবস্থার মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য আনতে পারবেন তিনিই গৃহের গৃহ-কোণের একদিকে যে শৃংখলা আনতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঘটনা প্রবাহ

ঘরে—

১৫ই মে—১লা জ্যৈষ্ঠ : কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিয়ন্ত্রণের উদ্যম—সংসদের (ভারতীয়) পরবর্তী অধিবেশনে আবশ্যক বিল উত্থাপনের আয়োজন।

শ্রীনেহরুকে (প্রধানমন্ত্রী) করিমগঞ্জ সহ কাছাড় সফরের অনুরোধ জ্ঞাপন—দিল্লীতে কাছাড় জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের পক্ষ হইতে তারবার্তা।

১৬ই মে—২রা জ্যৈষ্ঠ : বোম্বাই-এর অ্যালেকজান্দ্রম ডকে বিস্ফোরণ ও বিরাট অগ্নিকাণ্ড—প্রায় ৫০ হাজার বস্তা মার্কিণ গম ও চাউল বিনষ্ট।

১৭ই মে—৩রা জ্যৈষ্ঠ : স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্য গঠন ভিন্ন অন্য কোন সমাধান নাই—দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সমীপে পার্বত্য প্রতিনিধি দলের (আসাম) স্মারকলিপি পেশ।

১৮ই মে—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ : 'ভারত অবশ্যই ফরাক্কায় গংগার উপর বাঁধ নির্মাণ করিবে'—পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের নিকট লিখিত পত্রে শ্রীনেহরুর (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) সাফ কথা।

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত ভারত সফরকারী মার্কিণ ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ লিন্ডন জনসনের বৈঠক—ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে উভয় নেতার মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা।

১৯শে মে—৫ই জ্যৈষ্ঠ : কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ভাষা-আন্দোলনের (বাংলাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির দাবীমূলক) প্রথম দিনেই শিলচরে নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশের নির্বিচারে গুলী-বর্ষণ—নারী ও শিশু সমেত ৪১ জন হতাহত; সহরে কারফিউ জারী, রাজপথে সৈন্য বাহিনীর দাপট—কাছাড়ের সর্বত্র সত্যাগ্রহীদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার।

কাছাড় জেলার ঘটনাবলীতে গোহাটি সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দুঃখ প্রকাশ—উত্তেজনা বর্জনে ও শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানে মামুলি উপদেশ।

২০শে মে—৬ই জ্যৈষ্ঠ : কারফিউ পরিব্যাপ্ত শিলচরে ৪০ সহস্র নর-নারীর নীরব শোক মিছিল—শংখ ও হুলুধ্বনি সহ ভাষা আন্দোলনের শহীদদের মৃতদেহ সংকার—শোকমগ্ন সহরে গৃহে গৃহে কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলন।

শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর আসাম সরকারের নারকীয় হত্যালীলায় সারা বাংলায় বিষাদের কালোছায়া ও প্রতিবাদের ঝড়।

বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ে হাওড়া পৌরসভার ঝাড়ুদার ও মেথরদের ধর্মঘট আরম্ভ।

২১শে মে—৭ই জ্যৈষ্ঠ : শিলচরে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের হত্যার প্রতিবাদে ২৪শে মে সারা পশ্চিমবংগে হরতাল পালনের আহ্বান—কলিকাতা ময়দানে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ('যুগান্তর' সম্পাদক) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় আসাম সরকারের প্রতি প্রবল ধিক্কার।

স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের দাবী সংক্রান্ত প্রশ্নে শিলং-এ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত আসাম মন্ত্রিবর্গের বৈঠক।

২২শে মে—৮ই জ্যৈষ্ঠ : রক্তস্নাত শিলচরের সরকারী অফিস ও আদালতে আবার শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ সুরু—পিকেটিং-এর ফলে সর্বত্র অচল অবস্থা।

২৩শে মে—৯ই জ্যৈষ্ঠ : শিলচর হইতে ৫৩ মাইল দূরবর্তী পাথারকান্দিতে সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মম লাঠিচার্জ ও বেপরোয়া মারপিট—৩২ জন সত্যাগ্রহী গুরুতর আহত—করিমগঞ্জেও অনুরূপ লাঠিচালনা ও নির্যাতনের সংবাদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের স্নাতক কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল—রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু (চ্যান্সেলার) কর্তৃক অর্ডিন্যান্সের বলে আদেশ জারী—নির্বাচনে জাল ও ভুয়া 'ব্যালট পেপার' ব্যবহৃত হওয়ার জের।

২৪শে মে—১০ই জ্যৈষ্ঠ : আসাম সরকারের নারকীয় হত্যালীলার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ পশ্চিমবংগে সর্বাত্মক হরতাল—শিলচর হইতে আনীত একাদশ শহীদের চিতাভস্ম লইয়া কলিকাতায় অবিস্মরণীয় মৌন মিছিল—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে পূতাস্থি আদি গংগায় বিসর্জন।

২৫শে মে—১১ই জ্যৈষ্ঠ : নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বর্তমান অধিবেশন স্থল দুর্গাপুরে সশস্ত্র পুলিশ শিবিরে পরিণত—শিল্পচরের বর্বরতার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ারোধে সতর্কতা।

বাইরে—

১৫ই মে—১লা জ্যৈষ্ঠ : সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক জেনেভা আণবিক সম্মেলন ত্যাগের হুমকি—ফ্রান্স ও অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির আণবিক অস্ত্র পরীক্ষার প্রতিবাদ।

১৬ই মে—২রা জ্যৈষ্ঠ : দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান—বিদ্রোহী সামরিক চক্র কর্তৃক ক্ষমতা হস্তগত—পার্লামেণ্ট বাতিল ও সরকারী নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার।

জেনেভায় ১৪-জাতি লাওস সম্মেলন পুনরারম্ভ।

১৭ই মে—৩রা জ্যৈষ্ঠ : লাওসে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্নে সরকারী ও বিদ্রোহী লাওস নেতাদের নীতিগত মতৈক্য হওয়ার সংবাদ।

১৮ই মে—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ : সামরিক অভ্যুত্থানের পর দক্ষিণ কোরিয়ায় ডঃ চ্যাং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ—প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক সেনানী চক্রকে সমর্থন দান।

১৯শে মে—৫ই জ্যৈষ্ঠ : ৩রা ও ৪ঠা জুন ভিয়েনায় রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের সহিত মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডির সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা।

২০শে মে—৬ই জ্যৈষ্ঠ : দক্ষিণ কোরিয়ার নূতন সামরিক মন্ত্রিসভা গঠিত—ডাঃ চ্যাং ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দকে জেলে আটক—সুপ্রীম কাউন্সিল কর্তৃক জাতীয় পরিষদ বাতিল।

২১শে মে—৭ই জ্যৈষ্ঠ : আলজিরিয়ায় ফরাসী বাহিনীর সহিত আলজিরীয় বিদ্রোহী বাহিনীর পুনরায় লড়াই।

২২শে মে—৮ই জ্যৈষ্ঠ : আলজিরীয় বিদ্রোহীদের সহিত আলোচনার সুবিধার্থ ফ্রান্স কর্তৃক আলজিরিয়ায় সামরিক অভিযান এক মাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

২৩শে মে—৯ই জ্যৈষ্ঠ : পাক্ সীমান্তে রাশিয়া কর্তৃক উস্কানীদের অভিযোগ—ঢাকায় সাংবাদিক বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

২৪শে মে—১০ই জ্যৈষ্ঠ : সিংহলে তামিলভাষী প্রদেশসমূহে সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার—সিংহলী সেনেটের বৈঠকে বিরোধী পক্ষের অভিযোগ।

২৫শে মে—১১ই জ্যৈষ্ঠ : জেনেভায় আন্তর্জাতিক লাওস সম্মেলনে পুনরায় অচল অবস্থা সৃষ্টি—২৯শে মে পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

মেঘ : পটমঞ্জরীর চিত্র; ১০৬৫৯ ফিট দীর্ঘ, ১২ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : উৎপল দত্ত; চিত্রগ্রহণ : রামানন্দ সেনগুপ্ত; শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত ও হৃষি বন্দ্যোপাধ্যায়; সংগীত পরিচালনা : রবিশংকর; শিল্প-নির্দেশ : নির্মল গুহরায়; ভূমিকায় : অনিল চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, জহর রায়, রবি ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মালবিকা গুপ্ত, শোভা সেন, নীলিমা দাস প্রভৃতি।

মুক্তিপ্রাপ্ত "মেঘ" চিত্রে মালবিকা গুপ্ত ও উৎপল দত্ত।

বিলিমোরিয়া লালজীর পরিবেশনায় গেল ১৬-এ মে থেকে বসুশ্রী, বীণা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

ব্যর্থ ঔপন্যাসিক সমরেশ সান্যালকে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। এক বছর সেখানে থাকবার পর সে যখন ফিরে এল, তখনও সে তার মানসিক ভারসাম্য ফিরে পায়নি। তাই নিখুঁত খুনের কাহিনী লিখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদগ্র বাসনার মাঝে সে অনায়াসেই কল্পনা করে আনন্দ পায় যে, ইচ্ছে করলেই সে নিজেই একজন পাকা নরঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এই মনোবিকলনের ফলেই সে কল্পনা করে যে, সে তার প্রাক্তন প্রেমিকা সুজাতাকে হত্যা করেছে এবং দুই আর দুইয়ে চারের মতো তার এই কল্পনা প্রায় বাস্তবের রূপ ধারণ করে সমরেশের এককালের বন্ধু, জুয়াচোর ব্যবসায়ী সাগর সেনের গ্রেপ্তার হওয়া ও তার বিদ্রোহী স্ত্রী সুজাতার সাময়িক অন্তর্ধানের ফলে। বহু রকম ঘটনার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন "মেঘ" কেটে গেল তখন মনে হয় যেন, সমরেশের নিজের মনোজগতের মেঘও সরে গিয়েছে এবং তাই সে প্রতিজ্ঞা করে, সে অতঃপর আধুনিক সভ্য জগতের ধুরন্ধর ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত যে অগুন্তি সামাজিক খুনের পৈশাচিক লীলায় মত্ত, তারই কলঙ্কিত কাহিনী লিখতে তার কলম ধরবে।

প্রসিদ্ধ নট এবং মঞ্চ পরিচালক উৎপল দত্ত এই ছবির মাধ্যমে পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন। বলতে বাধা নেই, চিত্রজগতে তিনি যে কালে একজন সার্থক পরিচালক রূপে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, সে প্রতিশ্রুতি তাঁর এই প্রথম ছবির মধ্যেই আমরা পেয়েছি। চিত্রনাটক রচনার ধারা মঞ্চনাটক থেকে ভিন্ন; মঞ্চে যেখানে দুটি চরিত্রকে প্রথম সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েই দৃশ্যান্তর ঘটিয়ে সেই দুটি চরিত্রকেই যেন অনেকক্ষণ বাদে কথোপকথনে মত্ত দেখালে দর্শক তা মেনে নেন, চিত্রে তা করতে গেলেই দর্শক চেঁচিয়ে উঠবেন, 'ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি।' বৃষ্টির মধ্যে একটি চরিত্র ছাতা মাথায় দিয়ে আসছে [illegible]রের দৃশ্যেই তাকে বাড়ীর [illegible]ভিতরে যদি ছাতা বন্ধ অবস্থায় দেখা যায়, ছবির দর্শক সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন করবেন, লোকটি ছাতা বন্ধ করল কখন? উৎপল দত্তর চিত্রনাট্য বহু স্থানেই এই রকম মঞ্চঘেঁষা, চিত্ররচনার রীতি পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেনি। তবুও পরিচালক রূপে তিনি আমাদের প্রশংসা পাবেন এই কারণে যে, তিনি একটি গতানুগতিক প্রেমের গল্প বা ক্রাইমড্রামা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেননি; এমন একটি মনস্তত্ত্বমূলক গল্পকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, যা বক্তব্যের দিক দিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের "ম'সিয়ে ভার্দু"র মত আমাদের অভিভূত করবার ক্ষমতা রাখে। তা ছাড়া ছবির টাইটেলে আলোর চমক দেওয়া থেকে সুরু করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ছবিটির মধ্যেই কলা-কৌশলে গতানুগতিকতাকে সযত্নে পরিহার করে একটি নূতনত্বের ছাপ পরিস্ফুট। এমন কি, যেখানে ছবির বেশীর ভাগ ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘরের মেঝেকে দাবাবোড়ের ছকের অনুকরণে কালো-সাদা ছকে চিত্রিত করে দর্শককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, জগতের দাবাখেলায় নিয়তির হাতে আমরা এক একটি ঘুঁটি ছাড়া কিছু নয়। চিত্রোপস্থাপনে এই বলিষ্ঠ ভঙ্গীর জন্যে উৎপল দত্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

রামানন্দ সেনগুপ্ত ক্যামেরা স্থাপনে এবং আলোছায়ার খেলায় গল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছেন। শব্দগ্রহণ এবং আবহসঙ্গীত সম্ভবতঃ পরিচালকের নির্দেশেই একটু বেশী সোচ্চার। রবিশঙ্করের আবহসঙ্গীত ঘটনা এবং চরিত্রের মর্মকথা প্রকাশে প্রভূত সাহায্য করেছে; বিশেষ করে কোথাও তবলা আবার কোথাও তারের প্রাধান্য দিয়ে তিনি নাটকের পরিবেশ রচনা করেছেন বলিষ্ঠ ভাবে। দৃশ্য সংস্থাপনার মধ্যে প্রচুর নূতনত্ব থাকলেও বহু জায়গায়

ছবির ভৌগোলিক সংস্থান অনুধাবন কষ্টকর।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই অভিবাদন জানাব নবাগতা মাধবিকা গুপ্তকে। তিনি যে মাত্র চিত্রোপযোগী দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী, তাই নন, চিত্রাভিনয়ের রীতি তিনি আয়ত্ত করেছেন; বিশেষ করে তাঁর চোখ ছবির ভাষায় কথা কয়। সমরেশের স্ত্রী মাধুরীর সম্পূর্ণ রূপটিকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য ছবির সবখানিই জুড়ে আছেন সমরেশের ভূমিকায় উৎপল দত্ত নিজে। তিনি এই ভূমিকাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, অভিনয়ও করেছেন প্রচুর; কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গাতেই তাঁর অভিনয় হয়েছে মঞ্চঘেঁষা। ধূর্ত ব্যবসায়ী সাগর সেনের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়কে মানিয়েছে চমৎকার; তাঁর সিগারেট খাওয়ার বিশেষ ভঙ্গীটি চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। দীপ্তিমা দাসের সুজাতা সেন স্বাস্থ্যরূপে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে ছবির পর্দায়। জহর রায়ের তারাপদ দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মত খুব তাড়াতাড়ি কথা বলার চেষ্টা করায় একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। তারাপদর ছেলে প্রণবের ভূমিকায় রবি ঘোষ একটি নতুন টাইপ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং আর একটি টাইপ হয়েছে সমরেশের চাকর মহাদেবের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া সাধারণ ভাবে অভিনয় করেছেন শোভা সেন, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ভোলা দত্ত প্রভৃতি।

মেমদিদি : এল বি, ফিল্মসের চিত্র; ১২৯১৩ ফিট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়; কাহিনী : শচীন ভৌমিক; সঙ্গীত পরিচালনা : সলিল চৌধুরী; ভূমিকায় : ললিতা পাওয়ার, ডেভিড, জয়ন্ত, ধুমল, তনুজা ও কেসী মেহরা। জনতা পিকচার্সের পরিবেশনে ২৬-এ মে থেকে জনতা, প্রিয়া, পূর্ণশ্রী, প্রভাত, ম্যাজেষ্টিক ও এণ্টালী টকীজে দেখানো হচ্ছে।

আশ্চর্য মানবিক আবেদনে পূর্ণ একটি রসালো আনন্দের ঝর্ণা এই 'মেমদিদি'। 'মেমদিদি' হিন্দী চিত্রজগতে একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এমন একটি রসঘন প্রাণবন্ত চিত্র উপহার দেবার জন্যে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়কে আমরা অজস্র ধন্যবাদ দিচ্ছি।

"মেমদিদি" চিত্রে তনুজা।

কায়িক পরিশ্রম করে যারা জীবন-যাপন করে, ভালো লেখাপড়া করবার সুযোগ যারা জীবনে পায়নি, সমাজের নিম্ন স্তরের সেই সব মানুষে ভরা এক বস্তীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সৎ এবং সুস্থ পথে চালিত হয় প্রৌঢ় বাহাদুর সিং ও মোটর লরীর মালিক শের খানের সতর্ক খবরদারিতে। তামাম মহল্লার লোক যেন একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হাস, খেল, কাজ কর—এই ছিল বাহাদুর সিংয়ের নির্দেশ। সরল প্রাণ শের খান মোটা বুদ্ধির লোক হলেও বাহাদুর সিংয়ের ছিল অকৃত্রিম বন্ধু ও দোসর। এমন সময় এই মহল্লায় ধূমকেতুর মতো উদয় হোলো এক দেশী মেমসাহেব এবং এসেই করল মহল্লার সবচেয়ে মান্য দুজন—বাহাদুর সিং এবং শের খানকে অপমান। হকচকিয়ে গেল বাহাদুর সিং এবং শের খান। এই হ'ল ছবির সূচনা। কিন্তু এই দেশী মেমসাহেবই তাঁর কর্মনিষ্ঠা, শ্রমনিষ্ঠা, সদাচরণ এবং সর্বোপরি তাঁর চরিত্র মাধুর্য গুণে মাত্র যে বাহাদুর সিং ও শের খান সমেত সমস্ত মহল্লার লোকেরই হৃদয় জয় করে নিল, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দর্শকেরও। তিনি হয়ে উঠলেন সকলেরই 'মেমদিদি'। মেমদিদি আসলে একজন ভারতীয় খৃষ্টান আয়া, যিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করে অর্থ

উপার্জ্জন করছেন একদা বড়লোকের এক অনাথ মেয়ের পড়াশুনার খরচ চালাবার জন্যে, যদিও মেয়েটি ভাবে তার আয়া তারই পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির আয় থেকেই এই অবশ্য কর্তব্যটি করে যাচ্ছে। সিমলা মিশনারী স্কুলে পড়া মেয়ে রিটা এবং তার প্রেমাস্পদ, ধনবান পিতার একমাত্র পুত্র দিলীপকে ঘিরে "মেমদিদি" ছবির প্রণয়-কাহিনী। একদিকে মেমদিদি এবং তার অনুরক্ত ভক্ত বাহাদুর সিং ও শের খানের জীবনকথা, অন্যদিকে রিটা ও দিলীপের মধুর রোমান্স—এই দুইটি সূত্রকে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক এমন দক্ষতার সঙ্গে টানা-পোড়েনের মতো করে গেঁথেছেন, দুইয়ের মধ্যে দিয়ে এমন আলোছায়ার খেলা দেখিয়েছেন যে, দর্শক চরিত্রগুলির সঙ্গে একান্ত হয়ে কখনও হেসেছে, কখনও বা অশ্রু-বিসর্জ্জন করেছে। যদিও বোম্বাই ছবির 'গানের' ছড়াছড়ি বা বাড়াবাড়ি এতেও কিছু কিছু আছে, তবু সমগ্র ভাবে দর্শকচিত্তকে এমন অপরূপ ভাবে সম্মোহিত করে তোলবার ক্ষমতা খুব কম ছবিরই দেখেছি।

গানের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও 'মেমদিদি'র একটা বড়ো আকর্ষণ হচ্ছে তার সংগীত। সলিল চৌধুরীর সুরারোপের গুণে এর অধিকাংশ গানই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 'রাতোঁকী জব নীন্দ উড় জায়ে' বা 'ভুলা দে জিন্দগীকে গম', কিংবা 'ম্যায় জানতী হুঁ তুম ঝুটে বোলতে হো' বার বার শোনবার মতো গান। এবং আবহ-সংগীতও পরিবেশ রচনায় সুন্দরভাবে সাহায্য করেছে। চিত্রগ্রহণ এক কথায় উজ্জ্বল, সুন্দর এবং ঘটনোপযোগী—কোথাও মুড ব্যক্ত করেছে, আবার কোথাও নয়নানন্দকর। শব্দ গ্রহণ ত্রুটিহীন। দৃশ্য-সংস্থাপনা বাস্তব ধর্মী; বিশেষ করে বস্তীর রাস্তার দৃশ্যটি স্মরণীয়। মাত্র বহির্দৃশ্যে দু-এক জায়গায় সিমলার সৌসাদৃশ্য রাখা সম্ভব হয়নি বোম্বাইয়ের ধারে কাছের দৃশ্যের মাধ্যমে।

'মেমদিদি'র ভূমিকায় ললিতা পাওয়ার তাঁর বিস্তৃত অভিনেত্রী জীবনের এক স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। 'মেমদিদি'কে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর আন্তরিক অভিনয় গুণে। আর আশ্চর্য অভিনয় করেছেন সরল প্রাণ, বুদ্ধিতে খাটো পেশোয়ারীর ভূমিকায় জয়ন্ত; এই ভূমিকায় তিনি যেন নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন। 'ওরা দুজনে রয়েছে, তবু ওরা একলা রয়েছে বলছ কেন,'—তাঁর এ উক্তি ভোলবার নয়; যেমন ভোলবার নয়, তাঁর 'খোদাকে কশম'। বাহাদুর সিংয়ের ভূমিকায় ডেভিড যে সহানুভূতিমূলক সু-অভিনয় করেছেন, তার জন্যে তিনি বিখ্যাত। এ ধরণের ভূমিকায় তাঁর জোড়া নেই। তনুজার রিটা সুন্দর, সহজ, স্বচ্ছন্দ। তিনি তাঁর গানে, অভিনয়ে, চলনে-বলনে, পোষাকে, পরিচ্ছদে এবং সর্বোপরি তাঁর চেহারায় রিটাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর পার্শ্ব সঙ্গিণীরাও তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। কেশি মেহরাকে দিলীপের চরিত্রে মানিয়েছে ভালো; তবে তাঁকে খুব একটা কিছু অভিনয় করতে হয়নি। তিনি এ ছবিতে হচ্ছেন 'ললিপপ'-নায়ক। অপরাপর ভূমিকায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন ধুমল, রসিদ খান, অরুণা শিবদাসানী, শিবজী ভাই প্রভৃতি অনেকে।

'মেমদিদি' নিঃসন্দেহে হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে একটি সার্থক সৃষ্টি এবং সমগ্রভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে একটি সুমহান সংযোজন।

দুটি সৌখীন অভিনয়

গেল ২৩-এ মে, মঙ্গলবার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে থিয়েতর্ লাইবার নামে একটি নাট্য প্রতিষ্ঠান সমরেশ বসু লিখিত গল্প "মদনের স্বপ্ন"র ছায়া অবলম্বনে গঠিত "ধুলি-মাটির সুর" নাটকটি অভিনয় করলেন। এঁরা জানিয়েছেন, 'সমাজের একেবারে নীচের তলার ছেলে-মেয়েদের সমস্যা নিয়ে এই নাটক।' আমরা কিন্তু অভিনয়ের মাধ্যমে নীচের-তলার ছেলেমেয়েদের কতকটা বাহ্যিক রূপ মাত্র দেখতে পেয়েছি, তার বেশী কিছু নয়। না দেখলুম তাদের সত্যকারের জীবন, না সন্ধান পেলুম তাদের কোনো সমস্যার। আমরা দেখলুম; বাচ্চা নামে একটি ছেলে তার দলের সকলকেই সৎ জীবনযাপন করতে বলছে, জুয়া খেলতে বারণ করছে; আর পল্লীগ্রামের কিশোর মদন যখন তাদের কাছে এসে পড়ল, তাকে নিজের দলে ভিড়িয়ে নিচ্ছে। অপরদিকে ধাংড়া নামে একটি ছেলে পকেটমারের জীবন বেছে নিয়েছে এবং বাচ্চার অসাক্ষাতে তার দলের এক আধ-জনকে নিজের দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করছে। এ-ছাড়া বাচ্চার সদুপদেশ

সত্ত্বেও 'জমি কেনার স্বপ্ন দেখা' মদন চুরি ক'রে টাকা রোজকার করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করল। 'নাটক সম্বন্ধে' তাঁরা যা লিখেছেন, তাকে আমরা মল্লিনাথের টীকা বলব এবং সবিনয়ে জানাব, টীকা অবলম্বন ক'রে কাব্য পড়া যায়, নাটক দেখা যায় না। নাটক আপনিই আপনার ভাষ্যকার হবে। অভিনয়ে বাচ্চার ভূমিকায় নাট্যরূপদাতা ও পরিচালক শ্রীঅগ্নিমিত্রম্, মায়ের ভূমিকায় তিলোত্তমা ভট্টাচার্য এবং মদনের ভূমিকায় সমীর ঘোষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় প্রকাশ দত্ত, দিলীপ মল্লিক, রাজা ঘোষ, অসীম মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেকেই চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। মঞ্চসজ্জাটি প্রশংসনীয়।

●

২৮-এ মে, রবিবার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে রঙ্গসভা রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পের নাট্যরূপ অভিনয় করলেন। বহুকাল আগে—সম্ভবতঃ প্রায় ৩০ বছর হোলো—মধু বসু সম্প্রদায় ক্যালকাটা অ্যামেচার (পরে আর্ট) প্লেয়ার্স নাম নিয়ে দালিয়ার নাট্যাভিনয় করেছিলেন এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে (বর্তমানে রক্সী সিনেমা) এবং ম্যাডান থিয়েটার গল্পটির নির্বাক চিত্ররূপও দিয়েছিলেন। অবশ্য এ-সবেরও বহু আগে ক্ল্যাশিক থিয়েটারে সে-যুগের প্রথিতযশা নট, নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত "দালিয়া"কে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করেছিলেন।

রঙ্গসভা অভিনীত "দালিয়া"র নাট্যরূপদাতা এবং পরিচালক হচ্ছেন পীযূস বসু। এবং এই দুই কাজেই তিনি যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর বিস্তৃত নাট্যরূপে রবীন্দ্রনাথের মূল গল্পের কাব্যধর্মিতা কিছু ক্ষুণ্ণ হলেও নাটকীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে এবং সেইটে হওয়া দরকার ছিল। তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত একটি নাট্যমুহূর্ত উপেক্ষা করেছেন। জুলিখা যেখানে আমিনাকে ছোরা দিয়ে বলছে, 'আমিনা, এইবার তোর জীবনে কর্তব্য পালন করবার সময় এসেছে', সেখানে রবীন্দ্রনাথ দালিয়াকে উপস্থিত রেখেছেন; শুধু তাই নয়, 'আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল: দেখিল, সে সকৌতুকে হাসিতেছে।'

রঙ্গসভার বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জা ও পাত্র-পাত্রীর পোষাক-পরিচ্ছদ প্রায় নিখুঁত হয়েছে বলতে পারা যায়। এবং সমগ্রভাবে নাট্যপ্রযোজনা অকুণ্ঠ প্রশংসালাভের যোগ্য। অভিনয়ের মধ্যে সমগ্রভাবে একটি করুণ রসাত্মক মেলোড্রামার সুর ধ্বনিত হলেও প্রতিটি অভিনেতা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। এবং এরই মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় তিমির (আমিনা) ভূমিকায় রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জুলিখার ভূমিকায় সুলতা চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয়ের কথা। এর পরেই নাম করব দিলীপ রায় (দালিয়া), রথীন ঘোষ (আরাকানরাজ), অজয় দত্ত (মন্ত্রী), ভোলা বসু (সুজা) ও চন্দন রায় (রহমৎ)। পরিতোষ রায়ের ধীবরকে খুবই ভালো বলতে পারতুম, যদি না তিনি সময়ে সময়ে অস্বাভাবিক চীৎকার ক'রে অভিনয়ের সহজ সুরকে ব্যাহত করতেন। আলোছায়ার খেলা এবং আবহ-সঙ্গীতও নাটকের ঘটনা-পারিপার্শ্বিক সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। রঙ্গসভার এই "দালিয়া" অভিনয়ে একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন নাট্য-প্রয়োগ দেখে আনন্দিত হয়েছি।

●

লিটল থিয়েটার গ্রুপের নূতন অবদান

বর্তমানে কোলকাতার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হচ্ছে লিটল থিয়েটার গ্রুপের নূতন নাটক ফেরারী ফৌজ। বর্তমানে এ নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়মিতভাবে অভিনীত হচ্ছে। অত্যাচারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীকে ভারতের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, বিংশ শতকের গোড়ায় একদল তরুণের মনে যে বহ্নি-শিখা প্রজ্জলিত হয়েছিল এবং যার স্ফুলিঙ্গ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই মহান দেশপ্রেমিক

শহীদদের কর্মজীবন ও সমাজ জীবন নিয়ে এই নাটকের পটভূমি। এই নাটকের রচনা ও পরিচালনা উৎপল দত্ত, সুর রবিশঙ্কর, দৃশ্যসজ্জা নির্মল গুহরায়, উপদেষ্টা তাপস সেন। ভূমিকা লিপির পুরোভাগে আছেন রবি ঘোষ, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, শ্যামল সেন, শোভা সেন, তপতী ঘোষ, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

কমল মুখোপাধ্যায়, অময় নাগ, সুনীল রায়, ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত, ভোলা দত্ত, নিমাই ঘোষ, বিধান মুখোপাধ্যায়, অরুণ রায় ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদীচীর বিশেষ অনুষ্ঠান

আগামী ১০ই ও ১১ই জুন সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় রবীন্দ্র-ভারতী ভবনে 'উদীচী'র ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্র গীতি-বৈচিত্র্য, গৃহপ্রবেশ (নাটক) ও 'নটরাজ' (নৃত্য-বিচিত্রা) পরিবেশিত হবে। অংশগ্রহণ করবেন—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সমর গুপ্ত, সুনীল ঘোষ, শচীন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলী গাঙ্গুলী, গীতি রায়, জয়া দত্ত, মৃদুলা চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা রায়, মীনা পাল, আনন্দ রায়, চৈতী গাঙ্গুলী, শচীন দত্ত, ইরা সান্যাল, চিত্রিতা মণ্ডল, শেফালী দে। নাট্ক পরিবেশনা করবেন মমতা দত্ত, দেবযানী মুখোপাধ্যায়, কণিকা রায়, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনায় শৈলেশ ভড়, নৃত্য পরিকল্পনায় কল্পনা কর, অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বহুরূপী কর্তৃক রক্তকরবী ও পুতুল খেলা

আগামী ৫ই জুন নিউ এম্পায়ারে 'রক্ত করবী' ও ৭ই জুন বিশ্বরূপায় 'পুতুল খেলা' সর্বজনপ্রিয় নাট্যসংস্থা 'বহুরূপী' কর্তৃক শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় অভিনীত হবে। শ্রেষ্ঠাংশে অংশ গ্রহণ করবেন তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, আরতি মিত্র ও শান্তি দাস।

রূপণ শিল্পানুশীলন কেন্দ্রের নাট্যপ্রয়াস

রূপণ শিল্পানুশীলন কেন্দ্রের নাট্য প্রয়াস ঋষি দাসের "দুয়ে দুয়ে বাইশ" আগামী রবিবার ৪ঠা জুন, ১৯৬১, সকাল সাড়ে ৯টায় মিনার্ভা মঞ্চে অভিনীত হবে। নাটকটি পরিচালনা করবেন বিভাস ঘোষ ও সুরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

টুকিটাকি

ইটালীর একটি ছবি—'টু উইম্যেন।' পরিচালক ডি সিকা। নায়িকা সোফিয়া লরেন। এই দুইয়ের সমন্বয় একটি রঙিণ স্বপ্ন বলতে পারেন। বাস্তবতার পটভূমিকায় এক যুদ্ধের কাহিনী। মোরাভিয়া এই ছবির কাহিনীকার। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন জাভার্ডিনি।

* * *

পৃথিবীর চলচ্চিত্রে যাঁরা অগ্রদূত তাঁদের মধ্যে রাশিয়ার আইজেনষ্টাইন ও পুডভকিন অন্যতম। এঁদের পরিচালিত ছবিগুলি এক একটি ক্লাসিক। পরবর্তী যুগে সোবিয়েৎ রাশিয়া থেকে তেমন বরনীয় ছবির নাম তো মনে পড়ে না। তবে বর্তমানে কয়েকটি ছবি বেশ আলোড়ন এনেছে। তার মধ্যে দুটি ছবির নাম করি। একটি 'ক্রেনস আর ফ্লাইং' এবং দ্বিতীয়টি 'ব্যালাড অফ এ সোলজার।' কান্‌স ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে ছবি দুটি বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে।

* * *

ফরাসীরা এবার সত্যিই অবাক করলো। এতদিন যেসব রূপকথার কাহিনী ছিল, আজ তাদের কোন মূল্যই নেই। এই দেখুন না, চাঁদের দেশে মানুষ চলেছে। আরও কত কি! এবারে আপনিও আকাশে বসে অনেক রঙিন ছবি দেখতে পাবেন। ফ্রেঞ্চ করপোরেশন থেকে এক বিরাট প্লাসটিকের বেলুন তৈরী করেছে। যার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ থাকবে। ভ্রাম্যমান এই সিনেরমা আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি তার প্রথম যাত্রার পদক্ষেপের দিন গুণছে। এই ইটিনেরমায় একসঙ্গে তিন হাজার দর্শক বসে সিনেমা দেখতে পাবেন। প্রেক্ষাগৃহটি লম্বায় ২১০ ফিট, চওড়ায় ১৪৪ ফিট ও উচ্চতায় ৬২ ফিট। পর্দার পরিমাপ হল ১০০ ফিট। এই

সঙ্গে সিনেমার সবরকম যন্ত্রপাতিসহ পঞ্চাশজন লোকের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বুঝুন, কি এলাহী কান্ড। যেন আকাশপুরী। ছবি দেখতে দেখতে পৃথিবী ভ্রমণ।

* * *

সম্প্রতি কান্স-এর 'গোল্ডেন পাম' উৎসবের ফলাফল চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ চরিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসেবে বিবেচিত হলেন টনি পারকিন্‌স ও সোফিয়া লরেন। এবারে কোন ছবিই গ্রাণ্ড প্রিক্স পায়নি। দুটি ছবি বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। একটি ফরাসী, 'সো লং এন এ্যাবসেন্স।' অন্যটি স্পেনিস, 'ভিরিডিয়ানা।' এই সংস্থার বিচারকমন্ডলী একটি বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন স্বর্গতঃ অভিনেতা গ্যারী কুপারকে তাঁর 'এ রেজ ইন দি সান' ছবিটির জন্য।

* * *

হলিউডের সেন্সার বোর্ড সম্প্রতি 'টাউন উইদাউট পিটি' ছবিটি প্রদর্শনের উপযুক্ত নয় বলে ঘোষণা করেছেন। ছবিটির অমনোনীত দৃশ্যটি ছিল—চারজন আমেরিকান সৈনিকের একটি জার্মাণী মেয়ের প্রতি পাশবিক অত্যাচারের একটি নাটকীয় মুহূর্ত। মূল কাহিনীর নাম 'দি ভারডিকট।' লেখক ম্যানফ্রেড গ্রেগর। এ'র লেখা আর একটি ছবি 'দি ব্রিজ' নিউইয়র্কে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে। তবে ভরসা যে 'টাউন উইদাউট পিটি' শেষ বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্ট নয়, নিউইয়র্কের 'ইউনাইটেড আর্টিস্টস্'-এর কর্তৃপক্ষদের কাছে পাঠানো হয়েছে। দেখা যাক কি রায় হয় এই ছবির।

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

সিনেমা

রূপবাণী—তিন কন্যা
ভারতী—তিন কন্যা
অরুণা—তিন কন্যা
মিনার—মধ্যরাতের তারা
বিজলী—মধ্যরাতের তারা
ছবিঘর—মধ্যরাতের তারা
রাধা—স্বয়ম্বরা
পূর্ণ—স্বয়ম্বরা
প্রাচী—স্বয়ম্বরা
উত্তরা—অগ্নিসংস্কার
পূরবী—অগ্নিসংস্কার
উজ্জ্বলা—অগ্নিসংস্কার
আকাদমি অফ ফাইন আর্টস—তথ্যচিত্র (রাধাকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হলিডে ইন হিমালয়াজ)
রক্সি, কৃষ্ণ, রূপালী, চিত্রা—নজরানা (হিন্দী)
অপেরা, ক্রাউন, নাজ—মদন মঞ্জুরী (হিন্দী)
জনতা, ম্যাজেস্টিক, প্রভাত, প্রিয়া, পূর্ণশ্রী—মেমদিদি (হিন্দী)
জ্যোতি, দর্পণা, গ্রেস, কালিকা, ছায়া—ক্রোড়পতি (হিন্দী)
হিন্দ, গণেশ, ছায়া—শশুরাল (হিন্দী)
প্যারাডাইস—জিস্‌ দেশমে গঙ্গা বৈহতি হ্যায়
শ্রী, ইন্দিরা—স্বরলিপি
বসুশ্রী—মেঘ
বীণা—মেঘ
লাইট হাউস—স্যামসন এন্ড ডেলাইলা
গ্লোব—কাম ডান্স উইথ মি
মেট্রো—বেন হুর

থিয়েটার

মিনার্ভা—ফেরারী ফৌজ (২৮শে মে)
ষ্টার—শ্রেয়সী
রঙমহল—অনর্থ
বিশ্বরূপা—সেতু
গিরিশ নাট্যোৎসব শনিবার ১লা জুন হতে আরম্ভ
থিয়েটার সেন্টার—রজনীগন্ধা

বিবিধ

আকাদমি অফ ফাইন আর্টস—রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী

খেলাধুলা

•

দর্শক

গত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট সফরে (১৯৬০-৬১) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে প্রখ্যাত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রোহেন কানহাই যে উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তারই স্বীকৃতিস্বরূপে তাঁকে 'কার্ল নুনেস ট্রফি' দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়েছে। কানহাই অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে সর্বাধিক মোট ৫০৩ রান করার কৃতিত্ব লাভ করেন। দলের গড়পড়তা তালিকায় তিনি দ্বিতীয় স্থান পান (খেলা ৫, ইনিংস ৫, নট

রোহেন কানহাই

আউট ০, মোট রান ৫০৪, ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ১১৭, এভারেজ ৫০·৩০)।

পিটার মে'র ব্যাটিং সাফল্য

ইংলণ্ডের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের অধিনায়ক পিটার মে তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ২৫,০০০ রাণ পূর্ণ করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন। তাঁর মোট রান দাঁড়িয়েছে ২,০৫৭২, ৫৫০ ইনিংসের খেলায়। এই রানের মধ্যে তিনি সেঞ্চুরী রান করেছেন ৮০টা। আর ৫৫০টা ইনিংসের খেলায় ৬৯ বার নট আউট ছিলেন। মে'র প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবন আরম্ভ হয় ১৯৪৮ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবন থেকে।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ২৫,০০০ রাণ পূর্ণ করেছেন এমন দু'জন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এ মরসুমের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট লীগ খেলাতেও খেলছেন। তাঁদের নাম টম গ্রেভনী এবং ডন কেনিয়ান।

ইংলণ্ড সফররত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল কার্ডিফ : ২০, ২২ ও ২৩শে মে খেলা ড্র

অস্ট্রেলিয়া : ৪০২ (ও'নীল ১২৪, নীল হার্ভে ১১৭, ডেভিডসন ৬৮। হুইটলী ৭৮ রাণে ৩, শেফার্ড ৬৬ রাণে ৩, ওয়ার্ড ৪২ রাণে ২ উইকেট) ও ৯০ (কোন উইকেট না পড়ে)।

গ্লামার্গান : ২৩৫ (পার্কহাউস ৭০, প্রেসডি ৫৪। ডেভিডসন ৬৩ রাণে ৫, ম্যাকেঞ্জি ৫৭ রাণে ৩ উইকেট) ও ২৮৩ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ; প্রেসডি ১১৮ নট আউট)।

গ্লামার্গান দলের জন প্রেসডি ২য় ইনিংসের খেলায় যে সেঞ্চুরী করেন তা ইংলণ্ড সফররত অস্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে এই মরসুমের প্রথম সেঞ্চুরী।

ব্রিস্টল : ২৪, ২৫ ও ২৬শে মে খেলা ড্র

অস্ট্রেলিয়া : ২৯১ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড, ও'নীল ৭৩, ডেভিডসন ৯০) ও ১৫৪ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বেনো ৫৩)।

গ্লস্টারসায়ার : ১৬৭ ও ২৪৪ (৮ উইকেটে। কার্পেন্টার ৮৫)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত কয়েকদিনে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেছে। বি এন রেল দলের কাছে গত বছরের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের পরাজয় এবং হাওড়া ইউনিয়ন এবং এরিয়ান দলের বিপক্ষে গতবারের রানার্স আপ মহমেডান স্পোর্টিং দলের দুটি খেলা ড্র।

বি এন রেল দল ১-0 গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত ক'রে এ বছর প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় প্রথম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। শক্তিশালী মোহনবাগান দলের বিপক্ষে বি এন রেল দলের জয়লাভ খুব বড় কৃতিত্ব সন্দেহ নয়

পরলোকে শ্রী এ এস ডিমেলো

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীএ্যান্টনী ডিমেলো গত ২৪শে মে সকালে অল্ ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস হাসপাতালে কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় ক্রীড়ামহল একজন অভিজ্ঞ সংগঠক হারালো। শ্রীডিমেলো ১৯০০ সালে করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া এবং বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম তাঁর বহু কীর্তির মধ্যে অমর হয়ে থাকবে।

কিন্তু এই জয়লাভই এইদিনের খেলায় একমাত্র দ্রষ্টব্য ছিল না। মোহনবাগান দলের নামজাদা খেলোয়াড়রা কিভাবে গোল দেওয়ার সহজ সুযোগগুলির অপচয় করতে পারে তা স্বচক্ষে দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না—এ'রাই কি নামজাদা খেলোয়াড়? স্বীকার করি অনেক নাম-

জাদা খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়-জীবনে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছে; কিন্তু একসঙ্গে পাল্লা করে এরকম ব্যর্থতার জন্যে শুধু ভাগ্যের উপর দোষারোপ করলে সত্যকেই গোপন করা হয়। মোহনবাগানের আক্রমণভাগের খেলায় যথেষ্ট গলদ ছিল এবং তার জন্যে দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড চিদানন্দন সবথেকে বেশী দায়ী ছিলেন। হাতের নাগালে বিপক্ষের গোলপোষ্ট এবং একমাত্র অসহায় গোলরক্ষককে পেয়েও বলটিকে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে মেরে বিপথগামী করা হয়েছে; সেই কারণে গোল না হওয়ার মধ্যে ভাগ্যদেবীর হাত কোথায়? এধরণের ক্রীড়াপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভুল। শুধু এই ধরণের ভুল ক্রীড়াপদ্ধতি নয়, মোহনবাগান দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা সেদিনের খেলায় একাধিক ভুল পদ্ধতিতে খেলে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। দেখা গেছে, ফাঁকা অবস্থায় দলের খেলোয়াড়কে নাগালের মধ্যে পেয়েও বলটি পা-ছাড়া করা হয়নি; এইভাবে অযথা বিলম্বের দরুণ বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগ হয় নিজেদের গোল সীমানা সুরক্ষিত করতে সময় পেয়ে আক্রমণ ব্যর্থ করেছে নয়তো বলটি কেড়ে নিয়ে দলকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

নামকরা খেলোয়াড়পুষ্ট মোহনবাগান দলের কাছে শক্তি এবং নামডাকের দিক থেকে বি এন আর দল তো প্রায় পুঁটি মাছ, কিন্তু দুই দলের খেলায় শক্তির এ প্রভেদ ধরা পড়েনি। মোহনবাগান বেশীর ভাগ সময় বি এন আর দলকে আক্রমণ ক'রে গোল দেওয়ার বহু সুযোগ পায় সত্য—এবং খেলার এইদিক বিচার করলে নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয় মোহনবাগান দল বিপক্ষ দলের উপর আধিপত্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল; কিন্তু এই প্রাপ্ত সুযোগগুলির সদ্ব্যবহারের অক্ষমতা নিশ্চয়ই খেলোয়াড়দের চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মোহনবাগানের তুলনায় রেল দল খুব কমই গোল করার সুযোগ পায়। মোহনবাগান দলের গোল দেওয়ার কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট হওয়ার পর রেল দলের আপ্পলারাজু দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৮ মিনিটে অতর্কিতে গোল দেন। রেল দলের গোলরক্ষক ডি দাশের একটি লম্বা সট মোহনবাগান দলের রক্ষণভাগের সীমানায় এসে পড়লে মোহনবাগানের জার্নেল সিং এবং রেল দলের আপ্পালারাজু বলটি আয়ত্তে আনার জন্যে যথা চেষ্টা করতে থাকেন, ঠিক সেই সময়ে মোহনবাগান দলের গোলরক্ষক আর গুহ গোল ছেড়ে দিয়ে বলটি ধরবার জন্যে এগিয়ে আসেন। আপ্পলারাজু এই সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেননি, ফাঁকা গোলে বল মেরে উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেন। এই গোল পরিশোধের জন্যে মোহনবাগান রেল দলের গোল সীমানা বারম্বার আক্রমণ করেও রেল দলের প্রায় এগারজনের রক্ষণব্যূহ ভেদ ক'রে গোল দিতে পারেনি।

রেল দল জয়সূচক গোলটি দেওয়ার পরই আত্মরক্ষামূলক খেলায় সংঘবদ্ধ হয়। রেল দলের এই ধরণের পিছিয়ে খেলার পদ্ধতি খুবই ঝুঁকির কাজ হয়েছিল—বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। শক্তিশালী দলের বিপক্ষে এইরকম আত্মরক্ষামূলক খেলা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত হিতে বিপরীত হয়েছে। মোহনবাগানের খেলায় খানিকটা দুর্ভাগ্য এবং চরম ব্যর্থতা না থাকলে রেলদলকে এই ভুলের মাশুল দিতে হ'ত না, তা জোর করে বলা যায় না। খেলায় জয়লাভের জন্যে রেল দলের খেলোয়াড়দের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা প্রশংসার যোগ্য। এইদিনের এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিপক্ষে হাওড়া ইউনিয়ন এবং এরিয়ান দলের খেলা থেকে একটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের স্থানীয় খেলোয়াড়রা অবজ্ঞার পাত্র নয়। তবে কি মোহে বড় বড় ক্লাবগুলি স্থানীয় খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরা খেলোয়াড় আমদানীর উপর এত বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেন তা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারেন না।

মোহনবাগান তাদের খেলায় ২-১ গোলে খিদিরপুর দলকে পরাজিত করলেও তাদের জয়লাভ সহজসাধ্য হয়নি। এইদিনের খেলাটি তাদের দুর্ভাগ্য এবং ব্যর্থতা মিশ্রিত বলে অভিহিত করলে অসংগত হবে না। এইদিনের খেলায় মোহনবাগানের দলগঠনে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়; কিন্তু এর ফলে পূর্ব অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। মোহনবাগানের সালাউদ্দিন, অরুময়নৈগম এবং বি চ্যাটার্জির সট গোলপোষ্ট এবং বারে বাধা পাওয়ার দরুণ খিদিরপুর দল সৌভাগ্যক্রমে গোলের হাত থেকে বেঁচে যায়। বিশ্রাম সময়ের কয়েক সেকেন্ড

আগে চুণী গোস্বামী গোল থেকে মাত্র পাঁচ গজ দূরে বল পেয়েও গোল দিতে পারেননি; আর একবার সেন্টার ফরওয়ার্ড অমিয় ব্যানার্জি গোলের মুখে বল পেয়ে গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ হেলায় হারান; তিনি গোলে বলটি না মেরে পাশ ক'রে দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যান। এইদিনের খেলায় মোহন-বাগানের গোলরক্ষক শেঠ এবং খিদির-পুর দলের ব্যাক যাদব দুটি অবধারিত গোল থেকে দলকে রক্ষা করেন।

মোহনবাগান দল গত তিনটি খেলায় গোল দেওয়ার মত যথেষ্ট সহজ সুযোগ সৃষ্টি করেও সেগুলির নামমাত্র সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। খেলায় এই ব্যর্থতার কারণ, শুধু খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্যের অভাব নয়; এক্ষেত্রে সে কারণ গৌণ। প্রধান কারণ, খেলোয়াড়দের মানসিক বলের অভাব।

গোলপোস্টে ও বারে লেগে বল ফিরে আসা, বার বা পোস্টের গা ঘেঁষে বল ছুটে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলি খেলোয়াড়েরা উপেক্ষা করতে পারেনি। খেলোয়াড়দের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে এই সব ঘটনাগুলি খেলায় জয়লাভের পক্ষে অনুকূল নয়—খুবই দুর্লক্ষণ; এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল খেলায় দ্বিধাবোধ, অস্থিরতা, নৈরাশ্য এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা বড় ক'রে দেখা দিয়েছে। এইরকম অবস্থা পৃথিবীর নামজাদা খেলোয়াড় এবং বড় বড় দলের খেলাতেও দেখা দেয় এবং তার জন্যে বিধি-ব্যবস্থা আছে। আশা করি কর্তৃপক্ষ মহল এইদিক চিন্তা করবেন; বার বার খেলোয়াড় অদল বদলে সুফল হবে ব'লে মনে হয় না।

বর্তমানে মোহনবাগান পাঁচটা খেলায় তিনটে পয়েন্ট নষ্ট করেছে।

গত বছরের লীগের রানার্স-আপ মহামেডান স্পোর্টিং দল তাদের লীগের প্রথম খেলায় জয়ী হয়ে খিদিরপুর, হাওড়া ইউনিয়ন এবং এরিয়ান দলের সঙ্গে পর পর তিনটে খেলা ড্র করার পর ৫ম খেলায় ২—০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে পরাজিত করে। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবও অনেক নামকরা খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী কিন্তু দলটি সেই অনুপাতে খেলতে পারছে না। গোল করার সহজ সুযোগ এই দলটিও নষ্ট করেছে।

গত বছরের লীগের তৃতীয় স্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বর্তমানে লীগের শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছে। পাঁচটা খেলায় তারা পুরো পয়েন্ট পেয়েছে। প্রথম দুটো খেলায় তারা মাত্র এক এক গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়; কিন্তু পরবর্তী তিনটে খেলায় প্রভূত উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে বেশী গোলে জয়ী হয়েছে। উয়াড়ীকে ৪—০

লীগ তালিকায় প্রথম পাঁচটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পঃ	বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল	৫	৫	০	০	১৫	১	১০
ইস্টার্ণ রেলওয়ে	৫	৪	১	০	১০	১	৯
এরিয়ান্স	৬	৩	২	১	৭	৪	৮
মোহনবাগান	৫	৩	১	১	৮	৩	৭
মহঃ স্পোর্টিং	৫	২	৩	০	৬	৩	৭

গোলে, বালী প্রতিভাকে ৩—১ গোলে এবং ইন্টার ন্যাশনালকে ৬—০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দলের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখেছে। ইন্টার ন্যাশনালের বিপক্ষে ৬ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ এ বছরের লীগের খেলায় সর্বাধিক গোলের জয় হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। ইন্টার ন্যাশনালের বিপক্ষে ইস্ট-বেঙ্গল দল কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে আরও বেশী গোলের ব্যবধানে জয়ী হ'ত। ইন্টার ন্যাশনালের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল দলের সুনীল নন্দী একাই ৩টি গোল দেন। ইস্টবেঙ্গল দল এ পর্যন্ত ৫টা খেলে ১৫টা গোল দিয়েছে আর মাত্র ১টা গোল খেয়েছে বালী প্রতিভার কাছে। বলরাম দলের পক্ষে সর্বাধিক গোল ৫টা দিয়েছেন।

লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টার্ণ রেলওয়ে। তারা ৫টা খেলায় ৯ পয়েন্ট পেয়েছে অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে মাত্র এক পয়েন্ট কম। জর্জ টেলিগ্রাফ দলের সঙ্গে খেলা ড্র রেখে তারা একটা পয়েন্ট নষ্ট করে।

মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

ভূপালে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বার্ষিক মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী মহীশূর দল ২-১ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছে। মহীশূর দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড এ নির্মলা খেলার প্রতি অর্ধে একটি ক'রে গোল করেন। বিজিত দলের অধিনায়ক ন্যামফোর্ড এবং লেফট-ব্যাক এম রোজের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই মাদ্রাজ দলকে অধিক গোলের ব্যবধানে হার স্বীকার করতে হয়নি।

জাতীয় কপাটি প্রতিযোগিতা

অমৃতসরে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় কপাটি প্রতিযোগিতায় পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেরই ফাইনালে মহারাষ্ট্র জয়লাভ করেছে।

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে মহারাষ্ট্র ১৭-৬ পয়েন্টে রেলওয়ে সার্ভিস কন্ট্রোল বোর্ডকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, গতবার এই দুটি দলই যুগ্ম-ভাবে চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছিল।

মহিলাদের ফাইনালে মহারাষ্ট্র ৩৭-১১ পয়েন্টে কোলাপুর দলকে পরা-জিত করে। পুরুষ বিভাগে ১৫টি এবং মহিলা বিভাগে ৮টি দল যোগদান করে।

কৃষ্ণান এবং নরেশকুমার পরাজিত

পশ্চিম জার্মানীর ইন্টারন্যাশনাল হুইটসান হার্ড কোর্ট টুর্নামেন্টে পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে ওয়ারেন উডকক এবং গত বছরের উইম্বলডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৬-১, ৩-৬, ৪-৬, ৬-৩ গেমে রমানাথন কৃষ্ণান এবং নরেশ-কুমারকে পরাজিত করেন। প্রথম দুটি সেটে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে; ৩য় ও ৪র্থ সেটে ভারতীয় জুটি জয়লাভ করায় খেলার ফলাফল সমান ২-২ দাঁড়ায়। ৫ম অর্থাৎ ফাইনাল সেটে ভারতবর্ষ ৩-২ গেমে অগ্রগামী থাকে; কিন্তু অস্ট্রেলিয়া খেলাটি সমান-সমান করে শেষের তিনটে গেমে জয়ী হয়।

পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারেন উডকক স্ট্রেট সেটে প্রতিযোগিতায় ২নং বাছাই খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। উডকক ফাইনালে ইটালীর মার্লোকে ৬-২, ০-৬, ৬-৪, ৬-৪ গেমে পরাজিত করে সিঙ্গলস খেতাব পান।

২৮।৫।৬১

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পান্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা : ৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৪২৪	অমূর্ত শিল্পের বিমূর্ত ধাপ্পা	—শ্রীগোপাল বসু
৪২৫	গৃহকোণ	—শ্রীসীমা সরকার
৪২৬	দেশে বিদেশে	
৪২৮	বিজ্ঞানের কথা	—শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৩০	ঘটনা-প্রবাহ	
৪৩১	বলুন তো কী : (উত্তর)	
৪৩২	লায়লি	—শ্রীবাসব
৪৩৬	সমকালীন সাহিত্য	—শ্রীঅভয়ংকর
৪৪০	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনান্দীকর
৪৪৫	এ সপ্তাহের আকর্ষণ	
৪৪৭	দর্শকের মজা—খেলোয়াড়ের অভিশাপ	—শ্রীভ্রাম্যমাণ
৪৪৯	খেলাধূলা	—শ্রীদর্শক

অমৃত

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা মূল্য—৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 9th June 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

পর পর দুইবার আমরা কাছাড়ের সংগ্রাম এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু এর গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে সব কথা নিশ্চয়ই বলা হয়নি, কিংবা বলা সম্ভবও নয়। বাঙ্গালীর মন আজ এই প্রশ্নে গভীরভাবে আলোড়িত, কিন্তু প্রশ্নটির গুরুত্ব শুধু আবেগের এই আলোড়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোনো রাজ্যের সংখ্যালঘু ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের পক্ষে কাছাড়ের এই সংগ্রামের ফল এবং ইতিহাস তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর হিংস্র উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষেই সংখ্যালঘুর অধিকারের উপরে বর্তমান মুহূর্তে প্রচন্ড এক আঘাত এসে পড়েছে। এই সংকীর্ণ, হিংস্র আন্দোলনের নীট ফল হিসাবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্য থেকেই সংখ্যালঘুর উৎখাত এবং বিদায়পর্বেরও সূচনা দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষা আন্দোলনের গতি যদি রুদ্ধ না হয় তাহলে সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতি এবং সমন্বয়ের যে গৌরব আমরা এতকাল ঘোষণা করে এসেছি, তার ধ্বংস অনিবার্য—প্রত্যেকটি রাজ্য ভাষার দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে অনতিকালের মধ্যেই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং সংযুক্ত ভারতবর্ষের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিণামের পূর্বেই সংখ্যালঘুর উচ্ছেদ, পীড়ন এবং বিদায়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে আর একটি নূতন উদ্বাস্তু স্রোতও প্রবাহিত হতে বাধ্য। সে স্রোত হয়ত গত জুলাই মাসে আসাম থেকে পলাতক ৫০ হাজার আর্ত নরনারীর ন্যায় অকস্মাৎ বিপুল আকারে প্রবাহিত হবে না। ধীরে ধীরে আসাম থেকে, বিহার থেকে, বাঙ্গলা থেকে ওড়িষ্যা থেকে কিংবা অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, বোম্বাই ও মারাঠা থেকে সংখ্যালঘুরা উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হবেন।

কাছাড়ের সংগ্রাম মূলত এই পরিণামের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যাপারে এতবড় সঙ্কটও কোনোদিন দেখা দেয়নি এবং এমন ব্যাপক, তীব্র, সংঘবদ্ধ আন্দোলনও আমরা কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। শিলচরের গুলীবর্ষণের ঘটনা, অথবা করিমগঞ্জে লাঠি চালনার নিষ্ঠুর এবং তুলনাহীন বর্বরতা গত কয়েকদিন সংবাদপত্রের শিরোনামা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এবং এই বিবরণগুলি স্বাভাবিকভাবেই বাঙ্গলা দেশের মানুষকে শোকার্ত ও বিহ্বল করেছে, অশ্রু ও সহানুভূতি কাছাড়ের মানুষের জন্য বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাছাড়ের সংগ্রামে এই ঘটনাগুলিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কোনো কারণ নেই। তার চেয়েও বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ এই যে, বাঙ্গালীর বর্তমান হতাশা, অনৈক্য, এবং দলীয় বিভ্রান্তির মধ্যেও কাছাড়ে এমন একটি শক্তিশালী এবং অসমসাহসী আন্দোলন জন্মলাভ করেছিল, যার ব্যাপকতার তুলনা অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গেও করা চলে না। একথায় বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই যে, এই আন্দোলন যেভাবে কাছাড়ের শহরাঞ্চলে প্রত্যেকটি গৃহে এবং পরিবারের মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছিল, ১৯২০-২১ সালের অসহযোগের সময়ও সেই বিস্তৃতি দেখা যায়নি এবং এত আগুন ও এত তেজ বাঙ্গালীর হৃদয় থেকে কখনো বোধ করি উচ্ছ্বসিত হয়নি। কাছাড়ের শহরাঞ্চলে এমন কোনো পরিবার ছিল না যার কোন-না-কোন একজন সদস্য এই আন্দোলনে আইনভঙ্গের কর্মসূচীতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেননি। একথা ভাবতে বিস্ময় এবং গৌরব বোধ হয় যে, করিমগঞ্জ এবং শিলচরে মোট প্রায় ২০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক আইনভঙ্গের জন্য খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন, যদিও এই দুইটি শহরের মোট জনসংখ্যা সোয়া লক্ষের বেশী হবে না। গুলীতে ১১ জন নিহত এবং ৫০ এর অধিক আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা যে, গুলীবর্ষণের পরে সেই রক্তপ্লাবিত রেল লাইন থেকে সত্যাগ্রহীদের বিচ্যুত করা তো সম্ভব হয়ই নি, বরং ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখে আধ ডজন যুবক শার্টের বোতাম খুলে বুকের ছাতি তুলে দাঁড়িয়েছিল : বুক পেতে তারা গুলী নিতে চায়।

শিলচরের হাসপাতালে বুলেটে ও বুটের আঘাতে আহতদের আজও নার্সেরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে

শোনায়েছে—ভাষার প্রতি এতবড় গভীর মমতা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল, একথা দুর্ভাগ্যের সংগে লড়তে গিয়ে আজ প্রথম আবিষ্কার করলাম। কাজেই দুর্ভাগ্যকে তিরস্কার করি না, বরং তাকে নমস্কার। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেও মেয়েদের ভূমিকা এমন ব্যাপকভাবে এবং দুঃসাহসের সংগে কোথাও ঘোষিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। শিলচরে গুলীবর্ষণের ধারা বৃষ্টির মধ্যে সত্যাগ্রহী মেয়েরা আহত সত্যাগ্রহী যুবকের বক্ষের রক্তাক্ত ক্ষতমুখ শাড়ির আঁচলে চেপে ধরেছে এবং নারীর অশ্রু তার সহযোগীর ললাট সিক্ত করেনি—সেই নারী আহতকে বহন করে নিয়ে গেছে আধ ফার্লং দূরে রেডক্রস সেন্টারে—একথাও আমাদের অদ্যকার ইতিহাসে লেখা থাকুক। কারণ এর চেয়ে গৌরবের, এর চেয়ে তেজস্বিতার আর কোনো নিদর্শন আজ আর মনে পড়ে না। এখনও যাঁরা শিলচর, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি পরিদর্শন করে ফিরছেন তাঁরা এই অর্ধ সমাপ্ত আন্দোলনের বিপুল উদ্দীপনা দেখে অভিভূত। যে বেসরকারী তদন্ত কমিশন কয়েকদিন পূর্বে কাছাড়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন, শিলচরে, তাঁদের অধিবেশনে ১৬ বছরের একটি বালিকার সাক্ষ্য একাধারে আগুন এবং অশ্রু এমনভাবে বর্ষণ করেছিল যে, অভিজ্ঞ আইনজ্ঞদের চোখের জলও রুদ্ধ থাকতে পারেনি। বজ্রবিদ্যুতের মতো এই আগুন এবং পুঞ্জীভূত অশ্রু অদ্যকার ভারত ইতিহাসের মর্মমূলে বাঙ্গালী উপহার দিয়েছে। কিন্তু এতে ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হবে কিনা আমরা জানি না।

একথা জানি যে, এই দুর্ভাগ্যের পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। বাঙ্গলাদেশে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য, ১৯৪০—'৫০-এর উপর্যুপরি আঘাত ও হতাশা থেকে অর্ধমৃত এই জাতিকে টেনে তুলবার জন্য কাছাড়ের আত্মদান দরকার ছিল। সেদিন শ্রীজওহরলাল নেহরু গভীর সহানুভূতি ও মমতা সহকারে আসাম সম্বন্ধে বলেছেন যে, বৃটিশ আমলে এই রাজ্য ছিল উপেক্ষিত এবং এখানকার অধিবাসীরা অগ্রসরতার কোনো সুযোগ পায়নি। তাদের দাবী ও আকাঙ্ক্ষা (এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকেও?) আজ মমতা সহকারে দেখতে হবে। কিন্তু ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ থেকে আরম্ভ ক'রে '৪৭ সালের পার্টিশান এবং '৫১ সালের বিপুল উদ্বাস্তু স্রোতের ভিতর দিয়ে বাঙ্গলা দেশের যে বিপর্যয় বার বার ঘটেছে—সমাজ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, দারিদ্র্য ও বেকারী প্রতিদিন মেরুদন্ডে শক্তির শেষবিন্দু নিঃশেষে পান করছে, শিক্ষা গেছে, শাসন অধঃপাতের মুখে এবং নেতৃত্ব বিপর্যস্ত। আশ্রয় নেই, মাটি নেই, আহার্য নেই। এই ক্ষুধার্ত, রোগগ্রস্ত, আহত রাজ্যের বেদনার কথা ভারতবর্ষে কী কান পেতে শুনেছে, অথবা একবার সহানুভূতির বাণী উচ্চারণ করেছে? আমাদের এই রাজ্যের জনঘনত্বের পাঁচ ভাগের একভাগ জনঘনত্বও আসামে নেই, তথাপি আসাম উদ্বাস্তুর ভার কতখানি গ্রহণ করেছে? বেকারী এখানে দুর্বিষহ, আসামে এখনও প্রাচুর্য অবারিত। তথাপি আসাম হাত বাড়িয়ে তার প্রতিবেশীর দুর্ভাগ্যকে কখনো মোচন করতে চেয়েছে? বরং স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালের আসামকে বিখণ্ডিত ক'রে সিলেট বাদ দেওয়ার ফলে যে উদ্বাস্তু-সমস্যা দেখা দিয়েছে, ন্যায্যত সে সমস্যা যদিও আসামেরই গ্রহণীয়, তথাপি সেই উদ্বাস্তুদের আসাম থেকে বিতাড়িত করার জন্য শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীর আমল থেকে শ্রীচালিহার আমল পর্যন্ত একই ষড়যন্ত্র এবং একই বিদ্বেষের অভিযান অবাধভাবে চলছে। আসামে কয়েক লক্ষ বঙ্গভাষী 'সানস্ অব দি সয়েলের' দাবী রাখতে পারেন এবং বাকি কয়েক লক্ষ সিলেটের বাস্তুত্যাগীরূপে ন্যায্যত বর্তমান আসামের নাগরিকত্বের অধিকারী। কিন্তু আসামের সহানুভূতি কখনো এই হতভাগ্যদের প্রতি বর্ষিত হয়নি। এমন কি যারা নিজের চেষ্টায়, প্রাণপণ জীবন-সংগ্রামে আসামের মাটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের উৎখাতের জন্য আসামের বুদ্ধিজীবী সমাজ থেকে আরম্ভ ক'রে দুর্বৃত্ত সমাজ পর্যন্ত সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে "বঙ্গাল খেদার" বীভৎসতা রচনা করেছেন। যদিও আসাম ও বঙ্গের ইতিহাস এই, তথাপি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখে সহানুভূতি এবং করুণা শুধু আসামের জন্য।

এর কারণ আর কিছু নয়—কথাটা অপ্রীতিকর, তবু আজ একথা স্পষ্টভাষায় বলা প্রয়োজন হয়েছে—উত্তর ভারতীয় রাজনীতি বাঙ্গালী সম্বন্ধে অসহিষ্ণু, ঈর্ষান্বিত এবং নির্মম। যে দৃষ্টি ঈর্ষার বিষের দ্বারা আচ্ছন্ন, তার কাছে সমদর্শিতা এবং ন্যায়বিচার আশা করা বাতুলতা। কেন্দ্রের কাছে বাঙ্গালীর জন্য সহানুভূতি আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমাদের অপরাধ এই যে, ভারতবর্ষের প্রথম অগ্রসর বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হিসাবে একদা আমরা সমগ্র উত্তরখন্ডের মধ্যবিত্ত অর্থনীতির অনেকখানি জায়গা দখল করেছিলাম—সরকারী চাকরিতে, সওদাগরী উচ্চপদে, চিকিৎসা ও আইনের ব্যবসায় এবং শিক্ষকতায়, কলকাতা থেকে সিমলা এবং লাহোর পর্যন্ত। আজ উত্তরখন্ডের স্থানীয় মধ্যবিত্ত স্বার্থ এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী জেগে উঠতে গিয়ে বাঙ্গালী স্বার্থের সংগে প্রতিযোগিতায় টক্কর খাচ্ছে। যদিও আমরা সঙ্কুচিত হয়ে পিছু হঠছি, ক্রমশঃই নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত স্বার্থগুলির কাছে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে আসছি এবং যদিও আমাদের বুদ্ধিজীবী-কৃতিত্বের অবক্ষয় ও অধঃপতন ঘটছে এবং নূতনেরা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের শূন্য স্থান পূরণ করছেন, তথাপি বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে ঈর্ষার অবসান ঘটেনি। কারণ এই ঈর্ষা বহুক্ষেত্রে আজ একটি রাজনৈতিক মূলধনে পরিণত হয়েছে। কাজেই ইহুদির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ঈর্ষার মতো ভারতবর্ষেও এই ঈর্ষা একটা রাজনৈতিক বাস্তবরূপে উপস্থিত।

কিন্তু এর বিরুদ্ধে আমরা আর ক্রন্দন ও আবেদনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তৈরী করতে প্রস্তুত নই। বরং আমরা প্রস্তুত আজ দুঃসাহসের, চ্যালেঞ্জের এবং সংগ্রামের পথে। আমরা প্রথম রক্ত কাছাড়ের মাটিতে বর্ষণ করলাম, প্রথম চিতাভস্ম এল বরাক নদীর তীর থেকে এবং আজ বাঙ্গালী জনপদের সেই উত্তর-পূর্ব প্রান্ত থেকে নবজাগরণের যে গম্ভীর ওজস্বী গর্জ্জন শুনতে পাচ্ছি—ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতার এই যদি অলক্ষ্য আহ্বান হয় তাহলে আসুন আমরা সমস্ত বাঙ্গালী জাতি সেই আহ্বানই গ্রহণ করি, যেখানে হতাশা নেই, অশ্রু নেই, আবেদন নেই। আছে সঙ্কল্প, আছে আত্মবিশ্বাস, আছে তেজস্বিতা।

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১।২।৫৮

ধরা যাক, গল্পের ছাঁদ নেই, চরিত্রের আমেজ নেই। কেবল ঘটনা চলছে, সময় অতিবাহিত হচ্ছে। গল্প-লেখকের মনে এক জোড়া চোখ যেন চাইছে না, যেন একটা সমগ্র চোখ চাইছে, এবং সেই প্রকাণ্ড বিশ্বজনীন চোখ প্রতি জিনিসটি লক্ষ্য করে, বিষয়, আকার-প্রকার, আকাশ-বাতাস, তার প্রত্যেক বস্তুকে রূপ দিচ্ছে। অথচ তার কোন গুণ নেই, কোন ভাব নেই। পাঠকের মনে এই বিশ্বজনীন চোখকে ফুটিয়ে তুলতে হবে উপস্থিতির দ্বারা—অর্থের সাহায্যে নয়। নব্য বাস্তববাদে এই ধরণের কথা পেলাম।

উপস্থিতির মধ্যে অর্থ থেকেই যায়, অর্থ থাকতে বাধ্য। অবশ্য লুকিয়ে রাখাই ভাল, নচেৎ ধর্মের আকার ধারণ করবে।

তবু, এই ধরণের লেখা চেষ্টা করা যায়। বিশেষ চোখ নয়, সাধারণ চোখ। অর্থ নয়, উপস্থিতি।

১২।২।৫৮

একটি কথা বারবারই মনে আসছে। শ্রেষ্ঠ আর্টের নিদর্শন শান্তি। তবু শান্তিতে তদবস্থতা নেই। ক্রিয়াশীলতাই আছে। কিন্তু তার মধ্যেই বিরতি। রবীন্দ্রনাথে শান্তি বেশী; রিল্‌কে-তে শান্তি কম, একটু বেশী রকমই কম। সেক্সপীয়ার ও গ্যেটে-তে শান্তি ও অশান্তির সুসমঞ্জস্য সমাবেশ। উপনিষদে বিরোধ নেই। গীতায় দুয়ের সম্বন্ধ। উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণ পৃথক, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শান্তি, তার পরেও শান্তি। উপনিষদ ছেড়ে দিলে, গীতা, রামায়ণ-মহাভারত ও অন্য পুরাণে অশান্তি রয়েছে অনেকখানি। যুদ্ধ আর শান্তি; একধারে বিরোধ, অন্যধারে আত্মার স্বপ্রকাশ; সেটা হিন্দুর হিন্দুত্ব। চীনে কবিতা-দর্শনে বিরোধ কম; প্রকাশ আছে, কিন্তু আত্মার নয়, সেজন্য বুদ্ধ-ধর্ম, কনফুসীয়স আর লাও-তাওই দায়ী।

১৩।২।৫৮

রবিশঙ্করের অর্কেস্ট্রায় খাম্বাজ শুনলাম। তিনটি জিনিস লক্ষ্য করলাম; (১) এক নতুন ডিমেন্‌শান; (২) যন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্যবহার, যাকে টিম্‌বার বলে; (৩) গতির মধ্যে বক্রতা।

কন্ঠে কেদারার ধামার ভালো লাগল। উদাত্ত কন্ঠস্বর। ধামারের গতি বুঝতে যেন দেরী লাগল, আগে অত্যন্ত সহজে বুঝতাম; সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানর মতন।

আলি আকবর রাগেশ্রী বাজালেন, সুরকারীর চেয়ে লয়কারী বেশী। কিন্তু অ-প্রচলিত ও নতুন রাগ চলছে কেন? আনন্দের উপভোগ কি কমে আসছে? ওস্তাদের ভৈ'রো-ব্যবহার আর রবীন্দ্র-নাথের বাউল-ভৈরবী আমার পছন্দ হত না। নতুনত্বের আস্বাদে এক ধরণের আনন্দ আছে, কিন্তু সেটা রসের নাও হতে পারে। ওটা একপ্রকার ইনটেলেক্‌চুয়াল বাহাদুরী।

আলাপে সাহিত্য-ভাব ব্যতীত অন্য সুরগত ভাবের ছবি পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গীতে সাহিত্য ও চিত্রভাবই প্রায় সব, কিন্তু সুরভাবও রয়েছে। আমি প্রায় দশ-বারোটা গান পেয়েছি যেগুলোতে সুরের দিকটাই সব—তার মধ্যে বেশীর ভাগ নতুন সৃষ্টি, দু-চারটি পুরাতন। তাকে কথা-বিহীন সুরই বলা চলে। চিত্র-বিহীনকে abstract design নাম দিলে অন্যায় হবে না।

১৪।২।৫৮

আজ আবার গানের কথা মনে উঠছে। ছেলেবেলায়, কাশিমবাজারে রাধিকা গোঁসাই-এর গান শুনি। একজন সুন্দর যুবক সঙ্গে গাইলেন। অমন সুন্দর চেহারা দেখা যায় না। নাম শুনলাম গিরিজাবাবু। দুজনে ধ্রুপদ গাইলেন। রাগ ঠিক মনে নেই, তবে চাল মনে আছে। কাশিমবাজারের পর রাধিক-বাবু আবার কোলকাতায় এলেন। সঙ্গে প্রায়ই মহিমবাবু থাকতেন। কিন্তু একত্র দুজনের গান বেশী শুনতে পাইনি, আট-দশবার ছাড়া। মহিমবাবুর কন্ঠের তুলনা মেলে একমাত্র অঘোর চক্রবর্তীর। মহিম-বাবুর জুয়ারী ছিল অপূর্ব; যেন এক চাক ভোমরার বাসা। অঘোরবাবুর কন্ঠ তখন পড়ে এসেছে, তবুও তার তুলনা হয় না। গোলা, ভরাট, তার সপ্তকে যাওয়া--আসা নিতান্ত স্বাভাবিক, নীক সুর একেবারে নেই, চিড় খায় না, জোয়ারী গম্‌গম্‌ করছে। বিষ্ণু দিগম্বরেরও কন্ঠ ছিল অদ্ভুত। তাঁর অবস্থাও আমি যখন শুনি তখন পড়ে এসেছে, কেবল ভজনই গাইছেন। দুবার তাঁর মুখে খেয়াল শুনি—শেষবার ভূপেন ঘোষের বাড়ীতে, ভোরবেলা, ভৈ'রো। সে ভৈ'রো আর কখনো শুনিনি, শুনবও না।

কন্ঠ হয় তারের, না হয় বাঁশীর। অঘোরবাবু, বিষ্ণু দিগম্বর, মহিমবাবু, জ্ঞান গোঁসাই, ফৈয়াজ খাঁ এদের কন্ঠ তারের; আর চন্দন চৌবে, রবীন্দ্রনাথের ছিল বাঁশীর। বাঁশীর কন্ঠে ধ্রুপদী গান চলে না, চলে তারের কন্ঠে। আমাদের সঙ্গীতে প্রশ্রয় পেয়েছে তারের। বাঁশীর আওয়াজ খোলা হাওয়া, মাঠে-ঘাটে, নির্জনে, তারের আওয়াজ দরবারে। বাঁশীতে কারুণ্য, উদাস ভাবটাই বেশী।

২২।২।৫৮

বিদ্যাসাগরের একাধিক রচনা পড়লাম। খুব wit! যেখানে wit সেখানেই ভাষা সবল, এমনকি নিতান্ত উদ্দানীংকার! বাচস্পতি মশাই-এর সঙ্গে খুড়ো-ভাইপোর ঝগড়াটি চমৎকার। প্রায় চলতী কথা। অবার একটি তিন বছরের মেয়ের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। রাইমণির কথা শুনতে গলা কেঁপে ওঠে। সীতার বনবাস প্রভৃতিতে ছন্দের এক অদ্ভুত দোলা পাই—যেন ধ্রুপদ শুনছি।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে মনে হয় যেন খানিকটা সিনিসিজম এসে গিয়েছিল—অবশ্য বাল-বিধবা সম্বন্ধটি ছাড়া। কিংবা সিনিসিজম কেবল ভাষারই মারপ্যাঁচ। তার মধ্যে ভাষার ফন্দী আছে অনেকখানি। ভেতর-ভেতর বোধহয় বিদ্যাসাগর একটু বেশী সেন্টিমেন্টাল, ভাবপ্রবণ ছিলেন, সেটা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কখনও কখনও বোধহয় উল্টো কথা কইতেন। অবশ্য পুরোপুরি সিনিক্যাল কারও পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়, এক ইয়াগো হওয়া ছাড়া। জোর পেসিমিস্ট বলা চলে। তাও টাইমনের মতন নয়। ভগবদ্‌বিশ্বাসীও ছিলেন না। অসম্ভব কাজের লোক এই পুরুষটি। অর্থাৎ এপিকিউরিস্ট।

১।৩।৫৮

ভোরবেলা, বেলা আটটা নাগাদ, একটু সংস্কৃত কবিতা পড়েন। ঠিক বোঝা যায় না। একটু গোপনে, কোণের ঘরে। শুয়ে শুয়ে চা খেতে খেতে সংস্কৃত শব্দ কানে আসে। অত্যন্ত বাংলা ঘেঁসা। আজ তিন দিন কানে আসছে— ক' দিন থাকবে বলা যায় না।

হঠাৎ মনে হোলো, মারা গেলে এই রকম বাংলা শব্দের সুর করে সংস্কৃত ভাষা আর শোনা যাবে না। সংস্কৃত না পড়াই ভালো। সংস্কৃত ছন্দে মৃত্যুর ছাপ আছে।

১৭।৪।৫৮

নিমগাছের বাহার খুলেছে। নিমগাছ সাত দিনে পাতা ঝরে, নতুন পাতা গজায়, আর তার পরে, ফুল ধরে। সুন্দর, তীব্র গন্ধ, সবুজ রঙের। আমার জোয়ান গাছটা ফুলেলা হয়ে উঠল। অদ্ভুত মাদকতা!

হঠাৎ মনে ওঠে গোটা কয়েক বিস্ময়। লক্ষ্ণৌ-এর বীরবল সাহিনী রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া আর আমলতাসের লাল ও হলদে, আমার বাগানে মান্দার প্রথমে তিন-চার রকমের কাঞ্চন, কোনো পাতা নেই, সবটাই ফুল, রাশিকেতের রাস্তায় গেটগাট, খোয়া নিমের বাতিদান, আর আলিগড়ের বুগেনভিলিয়া—এরা সব গরমে ফোটে। আর, বর্ষায় কেয়া আর কাশ। কি অপূর্ব ভারতবর্ষ! এত সূর্য, এত আলো, এত রঙ, এত গন্ধ।

ছবি দেখি আরো বেশী। নৈসর্গিক দৃশ্যে মহত্তের আস্বাদ পাই। হয়ত আকাশ বৃহৎ তাই। ছবিতে রূপের অনুভূতি, নিসর্গে রূপ নেই, ভূমাই সব। অবশ্য কালোর মহিমা অপূর্ব—একবার মাত্র দেখেছি। দাদার সঙ্গে অনেক রাত্রে মানপুরে যাচ্ছি। ঘনঘটা করে বৃষ্টি নামল, সঙ্গে গরুর গাড়ী আসছিল, তাই গেল মাল্লালের দিকে। তারপর চলতে লাগলাম দুজনে, পথ হারিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে রইলাম রাস্তার ধারে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, হঠাৎ ধারে সান-বাঁধান ভাঙা পুকুর দেখলাম। শুনেছিলাম একজন আত্মহত্যায় মরেছে পুকুর পাড়ে। জমাট অন্ধকার। রাস্তা ফুরিয়ে গেল। সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকার দেখতে লাগলাম। দু ঘন্টায় রাস্তা ভোরবেলা বাড়ী পৌঁছলাম। এ কয়েক ঘন্টার মধ্যে অস্তিত্ব ছিল না—অন্ধকারের। অস্তিত্ব ছিল, তার গুণ ছিল না, দোষ ছিল না, কেবল তাই ছিল।

২০।৪।৫৮

আলিগড়ে নতুন বই-এর দোকান খোলা হোলো। এই প্রথম। বিস্তর ছাত্র-ছাত্রী দোকানে আসছে। পরীক্ষা, গ্রীষ্মের ছুটি এসে গেল—তবু আসছে। অনেক নতুন বই দেখছি। কিনতে চাই না, তবু না কিনেও থাকতে পারি না। প্রত্যহ যাই, উল্টে-পাল্টে দেখি, বেশ লাগে। আগে লক্ষ্ণৌ-এ বই-এর দোকানে রোজ সন্ধ্যায় যেতাম, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতাম, রোজ সন্ধ্যায় বই কিনতাম, কেনাতাম। এখন আর সামর্থ্যে কুলোয় না।

আমার লাইব্রেরীর এক অংশ এক বিশ্ববিদ্যালয় কিনতে চান কিন্তু বেচবার কথা উঠলেই প্রাণটা খাঁ-খাঁ করে ওঠে। পড়ে কিছু হয় না, না পড়েও উপায় নেই। অথচ বইগুলি আমার কাছে আর থাকবে না ভাবতে জীবন খারাপ লাগে। কখন কোন্ মুহূর্তে পাতা উল্টাতে ইচ্ছে হয় জানি না। বই হাত থেকে চলে যাওয়া—এটা এক রকমের মৃত্যু।

২।৫।৫৮

বার্ট্রান্ড রাসেল, ক্রুশেভ, আর ডালেস—এদের পত্র-বিনিময় পড়লাম। ডালেস নীতিপ্রধান লোক, ক্যাল-ভিনিস্টিক; ক্রুশেভ বিশ্বাস করেন ঐতিহাসিক নিয়তিতে, আর রাসেল মানেন তর্কবুদ্ধিতে। কোথায় কারুর সঙ্গে মিল নেই। লেখাটাই বৃথা।

৯।৫।৫৮

মৃত্যু নঙর্থক। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মৃত্যু মিথ্যা। ব্যক্তিগত জীবনের পর যে জীবন সে জীবন আমার কাছে নেই। তারপর অন্য জীবন থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন থাকে না, সব সরে যায়। এই সরে যাওয়া, অগ্রসৃতি হোলো কাল, তার দর্শন কাল-প্রত্যয়। সে প্রত্যয়ের গোড়ায় থাকে গ্রীণউইচ, তার পর ঋতু, তারও পরে সমাজ, শেষে আবার দর্শনও পৃথক হতে বাধ্য। তারও শেষে, যুক্তির দিক থেকে, কাল-প্রত্যয় থাকে না। অতএব মৃত্যু নিরর্থকই মনে হয়।

১০।৫।৫৮

রবীন্দ্রনাথের বার্ষিক জন্মতিথি উদ্‌যাপন বাংলা দেশেই আছে। বিদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যেই যা কিছু হয়। অন্য দেশের অন্য অবাঙ্গালীর মধ্যে প্রায় নেই বল্লেই চলে। যৎসামান্য জওহরলাল আর গোপাল রেড্ডীর মুখ থেকেই রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শুনতে পাই। গুজরাতীদের মধ্যে কিছু কিছু আছে; অন্ধ্র দেশী ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে মাত্র দু-চারজন। মাত্র কংগ্রেসের মধ্যে কাল-চারের কোন সম্বন্ধ নেই, গান্ধীজীর সময় ছিল না, স্বদেশী যুগে বাঙ্গালী-দের মধ্যে ছিল। এখনও সামান্য কিছু কালচার, বোধ হয়, বাঙ্গালীদের মধ্যে রয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই সে কালচার। রবীন্দ্রনাথের পরের যা কালচার সেটা প্রথমত রবীন্দ্রিক।

অথচ বাংলার কালচার নিয়ে অন্যে একটু হিংসে করে। Emotional integrity কি এইভাবে হয়! অন্য দেশের কালচার উন্নতি করছে শুনলে অত্যন্ত খুশী হই, কিন্তু তাঁরা হিংসে করেন কেন? বাঙ্গালীর দাম্ভিকতা অনেক কমেছে। রবীন্দ্র-নাথকে নিয়ে হিংসে ত' হবেই। তার আর উপায় নেই! তবুও তাঁর বার্ষিক জন্মতিথি নিয়ে আমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছি। পুজোর দিন কবিপক্ষ।

১৫।৫।৫৮

কোলকাতা শহরকে জওহরলাল দুঃস্বপ্ন বলেছেন। তাই মনে হয়। কিন্তু দুঃস্বপ্ন ওঠে কেন? গরম জমে নিশ্চয়ই। উদ্বাস্তুর দল বাংলা দেশকে জর্জরিত করেছে; চাকরি নেই লক্ষ লোকের; মানুষে শিক্ষা পাচ্ছে না: আরও কত কি! কিন্তু গরম হজম কেন? গরম-হজম হয় বেশী খাওয়া আর বেশী না-খাওয়া থেকে। বাংলা দেশে দু-চারজন ছাড়া বেশীই না-খাওয়া থেকে। অথচ পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা অন্ন সংগ্রহ করে নিয়েছে, আর আমরা পারি নি। প্রথম কারণ মনে হয় জমি সর্বস্বতা। তাছাড়া কোলকাতা ছাড়া বড় শহর নেই, এবং সেই কোলকাতায় অবঙ্গালীরা ঢুকে পড়েছে। বেহারী, পাঞ্জাবী, গুজরাতি, মাড়োয়ারী, উত্তর প্রদেশীরা কোলকাতায় ছেয়ে গেল। তার ওপর বঙ্গভেদের বন্যা। এ অবস্থায় সবারই মত বদলায়। এখনও যে বাংলা দেশ দুঃস্বপ্ন সত্ত্বেও টিকে আছে এই যথেষ্ট।

আমার এক এক সময় মনে হয় বাংলা দেশে শতখানেক পলিটেকনিক খুললে মন্দ হয় না। এখানে একটা সুবিধা—প্রায় সকলেই মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত। সে সম্প্রদায় থেকে পলিটেক-নিকের দিকে মোড় ফেরান যায়। পলিটেকনিকের অন্যাংশে চাষ। প্রথমে ঠিক খেত-মজুরে নয়, সেটা পরে। শহর আর গ্রামের সংযোগ ভিন্ন উপায় নেই। গ্রাম গ্রাম থাকলে চলবে না, আর প্রকাণ্ড শহরে প্রকাণ্ড শহর থাকলে চলবে না। গ্রাম থেকে ছোট শহরে পরিণত হতে হবে। ছোট শহর অর্থে small town বলছি না; এটা dcentralised economy-র মতন। এই হোল, আমার মতে, দেশের ডাইনামিক্‌স্‌।

১৭।৫।৫৮

Prediction-এর বৈজ্ঞানিক অর্থ ভবিষ্যৎবাণী ঠিক নয়। তার অর্থ, কোনো বর্তমান বক্তব্যের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বক্তব্যটুকু। ভবিষ্যৎবাণীর বক্তব্য শেষের দিকে; অর্থাৎ, সেখানে যুক্তি-ধারা ছিন্নভিন্ন হচ্ছে না। Prediction থেকে explanation—ব্যাখ্যা জন্মায়। পূর্ব-ব্যাখ্যান prediction থেকে নয়। দর্শনের পূর্বে পূর্ব-ব্যাখ্যান ছিল; ক্রমে দর্শনের সঙ্গে পূর্ব ও পরের দূরত্ব কমে আসছে। দূরত্ব প্রায় শেষ হয়েছে বিজ্ঞানে। তবু কিন্তু থেকে যায়, এবং সেইখানেই গণ্ডগোল বাধে। এক দল বলছেন, বিজ্ঞানের সবখানেই prediction, ব্যাখ্যা বলে কোন জিনিস নেই। আরেক দল বলছেন, ব্যাখ্যা আছে। আমার সন্দেহ, ব্যাখ্যা আছে, যদিও তর্কের শেষ নেই। বিজ্ঞানের শেষ আর দর্শনের শেষ এক বস্তু নয়। বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া শেষের পূর্বকার। কিন্তু মানুষে ব্যাখ্যা চায়, আমি চাই, পাই না। Prediction আর explanation এক বস্তু নয়, পৃথক বস্তু।

২১।৫।৫৮

অষ্টআশী বছরে যদুনাথের মৃত্যু হোল। বহু আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু তাঁকে বহন করতে হয়েছে! তবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বুদ্ধির পরিশ্রম করে গেলেন। একেই বলি মানুষ! ভিক্‌টোরিয়ান যুগের মানুষ! কিন্তু লেখার চেয়ে বলবার শক্তিই বেশী মনে হয়। চোখের সামনে ইতিহাস ভেসে উঠত। লক্ষ্মৌ-এর বড় ইমামবাড়ার কাছে একটা মসজিদকে কি অদ্ভুতভাবে আওরংগজেবের হাত থেকে তুলে

ধরলেন! তবু সব চেয়ে বেশী ছিল চরিত্রের দৃঢ়তা। আশুতোষকে তিনি দৃঢ়ভাবেই ঘৃণা করতেন—সেটা তাঁর উচিত ছিল না। তবু চরিত্রের জন্যই তাঁর দোষ সকলে মাপ করতেন। বড় ঐতিহাসিক ত' বটেই, কিন্তু সাহিত্যে ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। প্রায় ত্রিশ বছর Times Literary Supplement পড়ে গেলেন।

২১।৫।৫৮

কবিতার আলোচনা দিয়েই কবিতা সম্ভব—স্পেংগেলের এ মন্তব্য চলে না। কবিতার আলোচনাটা কি? তার মধ্যে থাকে নিশ্চয়ই কবিতা, কিন্তু তার সংগে, আশে-পাশে রয়েছে সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। সেগুলো মিলে হোল idea, সেই ideas আবার এসে জোটে কবিতার ওপর। প্রথমে একত্র, পরে ভিন্ন, আবার একত্র, নতুনভাবে। এই হোল সৃষ্টির ত্রয়ী-বিচার।

কবিতার সংগে ছবি। আবার ছবির সংগে কবিতা। ছবির মধ্যে ছবিত্ব আছে নিশ্চয়, কিন্তু বিশুদ্ধ ছবিত্ব বলে কিছু আছে ঠিক বুঝি না। Cubism abstract Art? তাতে কিন্তু আশ মেটে না, ছবিত্ব মিশে যায় অছবির সংগে। Cubism-এর Cube হোল ব্লক, সেটাও স্থাপত্যের অংগ, বিশুদ্ধ ছবি নয়। ইস্পাতের তার দিয়ে আজকাল যে ছবি আঁকা হয় তার মধ্যেও আছে রেখা। সে রেখার মধ্যে ছবি আর স্থাপত্য দুইই রয়েছে। তাও সংগে architectures জ্যামিতি প্রভৃতি। বিশুদ্ধ কবিতাও ঠিক সেই কারণেই হয় না। যেটা মনে হয় বিশুদ্ধ কবিতা, সেটা হোল সংগীত এবং সেটাও বিশুদ্ধ সংগীত বা যন্ত্র-সঙ্গীত নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছবি, সুর . ইত্যাদি মিশে যায়। শুধু তাঁর ছবির বেলা একটু আলাদা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে সুর আসছে না, কথাও আসছে না, কেবল অবচেতনা। আর ছবি আসছে—তার বেশী নয়। Archetype? সেটাও বিশুদ্ধ নয়। আর্টের বিভাগ শেষে, গোড়ায় নয়। সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম কথা অ-খণ্ড সত্য। সেটা বোধ হয় ছন্দ।

ধ্বনির প্রথম আঘাত থেকে প্রায় সব আর্টের জন্ম। প্রায় এই জন্য যে ছবি, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের ধ্বনি কোথায়? যদি না অবশ্য ধ্বনিকে শব্দের অন্যরূপে ব্যবহার করা চলে! সঙ্গীতে কবিতায় ধ্বনি রয়েছে নিশ্চয়। আমাদের সৌন্দর্যতত্ত্ব কবিতা—সর্বস্ব। অন্য তিনটির আদি কথা দৃষ্টি। ভারতীয় আর্ট ঠিক দৃষ্টিপ্রধান নয়, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চারুশিল্প সত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনে দৃষ্টি নেই, ধ্বনি আছে। গুহ্য-ধর্ম ধ্বনির অন্তর্গত। কিন্তু meta-physics কথার ধ্বনি। তাই আমাদের metaphysics দুর্বল। (হঠাৎ মনে হোলো, ধ্বনির পিছনে ছন্দ নেইত? দেখতে হবে, এখন পেলাম না।)

২২।৫।৫৮

এইটা নিয়ে উনিশখানা বই লিখলাম। আরো দু একটা লেখা চলত, যদি স্বাস্থ্যে কুলুত। কি লিখেছি তাই জানি না। তবে বোধ হয় একটা মোটা ধারা আছে। তাকে Personality বলা চলে—নভেলে তাই, সমাজতত্ত্বে তাই, অর্থনীতিতে তাই, ইতিহাসেও তাই, সংগীতেও তাই। এরই আশে-পাশে কার্ল মার্কস। আমার জীবনে মার্কসিজম্-এর প্রভাব বেশী। দশ বারোটা প্রবন্ধ ছাড়া অর্থনীতি সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখতে পারি না, মাথা নেই এবং মার্কসিজম্ ছাড়া অন্য অর্থ-নীতিতে অবিশ্বাসী। এমন কি কীন্‌স্‌কেও গ্রহণ করতে পারলাম না। (এখন আলিগড়ের আবু সালিমই এক-মাত্র কীন্‌স্‌কে পুরাপুরি বিশ্বাস করে, এমন কি অনুন্নত দেশের অবস্থা সত্ত্বেও।) সমাজতত্ত্বে, ইতিহাসে, মার্কসি-ইজম চলে, তাই এখনও লিখি। আমার নভেলেও তাই আছে। নিজেকে Marxologist বলা চলে। ভারতবর্ষে সে বস্তু বিরল, তাই আমিও বিরল।

পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বই লিখে আসছি। থিতিয়েছে কিনা তাই জানি না। যে সব বই লিখেছি তার প্রায় অনেক কথাই মনে নেই। অনেক বই আমার কাছেই নেই। চোখে পড়লে হঠাৎ মনে পড়ে—নিজের কাছেই অদ্ভুত ঠেকে। বই লেখবার পরই ভুলে যাই, মনে থাকে না। এই চলে আসছে চিরকাল। পাঠকের প্রতি নজর করি নি, পাঠকও আমার প্রতি নজর করেন নি। পাঠক লেখকের সম্বন্ধ নিতান্ত আলগা, আলগোছা, আবছা গোছের। অবশ্য আমার চিন্তাধারা চলছে এবং বেশীর ভাগ পাঠকের চিন্তাধারা কম, নিতান্ত কম, নেই বল্লেই হয়। তাই আমার-তোমার সম্বন্ধটি প্রায় ছিন্ন হয়েছে আমার লেখায়।

আমার কোনো লেখাই থাকবে না, আর থাকা উচিতও নয়। চিন্তার গতি নিয়েই আমার কারবার। চিন্তা নেই, আমিও নেই। চিন্তার দানা বাঁধত তো আমিও থাকতুম। স্বল্পপক্ষগের জন্যই বেঁচে থাকা। স্বল্পপক্ষগের জন্য যারা ভাববে তারা আমার কথা মনে রাখবে—তার বেশী নয়। এটা বোধ হয় দম্ভ হল!

২৪।৫।৫৮

'পুতুল খেলা' দেখলাম। বহুরূপীর দলকে আমি শ্রদ্ধা করি। অভিনয় ভালো finish ভালো, প্রযোজনা ভালো, সব দিক থেকেই চমৎকার।

আমার কাছে Dolls' House বই-খানি হাতের কাছে নেই, তবু যেন মনে হচ্ছে 'পুতুল খেলা' ঠিক বাঙগালী নয়। তপন, বুলু, ডাক্তার, কেষ্ট ও কৃষ্ণা ঠিক যেন কেমন কেমন, অথচ বাংলা ভাষায় কথা কইছে। ডাক্তার বিদেশী, বুলু বিদেশী, তপন আরো বিদেশী। আসল কথা, ইবসেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের য়ুরোপীয় মানুষ। 'পুতুল খেলার' বুলু নিতান্ত সরল, তার ওপর আঘাত এলো গুরুতর, তারই ঘায়ে স্বামী ত্যাগ করলে এবং স্বামীও সেটা মেনে নিলে। বাঙগালী সমাজে এত দ্রুত চলে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকে নভেলে স্ত্রী কিন্তু স্বামী ত্যাগ করে না—এটা তাঁর বাঙগালীত্ব (আজকালকার নভেলে নাটকে করছে কি?) তপন সামাজিক, ঘরোয়া মানুষ, সংসার চালায় মোটা ধারায়, বুর্জোয়াভাবে। সে বুলুকে বুঝতে পারে না, চায়ও না। এ ভুলের মধ্যেও সংসার চলত, টোল খাওয়া, চিড় খাওয়া সত্ত্বেও। এই ভুলের মধ্যেই ট্রাজেডী। Dolls' House গেল ভেঙ্গে, কিন্তু বাঙগালী নাট্যকারের হাতে ভাঙত না।

তাই মনে হয় পুতুল খেলার তপন, বুলু, উভয়েই অতিরঞ্জন করেছেন। অভিনয়ের দোষে নয়, নাটকের দোষে। বুলুর সরলতা, তপনের সামাজিকতা একটু যেন অত্যধিক। বুলুর সরলতা একটু কম হলেও চলত। তপনের সাধারণতা একটু বেশী। অবশ্য সাধারণ লোকের সাধারণত্ব কাটান কঠিন।

অভিনয়ের প্রথম অঙ্ক একটু দ্রুত। দ্বিতীয় অংক ঠিক ঠিক, তৃতীয় অংক আবার দ্রুত। তৎসত্ত্বেও পুতুল খেলা আমার খুবই ভালো লেগেছে। ইবসেনের নাটকের গঠন অপূর্ব। (ক্রমশ)

রবীন্দ্রনাথ ও মেলা

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে কলিকাতায় যে মেলা হয়, তাহার উদ্বোধনে সভাপতি শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ মেলার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; কারণ, মেলা আমাদিগের দেশের জিনিস। যাত্রার সহিত থিয়েটারের যে সম্বন্ধ, মেলার সহিত প্রদর্শনীর সেই সম্বন্ধ। মেলা স্বতঃস্ফূর্ত— প্রদর্শনী একজন বা একাধিক লোক ব্যবসার জন্য বা অনুরূপ কারণে করিয়া থাকে। মেলার দ্বার অবারিত—প্রদর্শনীর অধিকাংশে দর্শনী দিতে হয়।

মেলা যেমন বহুদিনের, তেমনই নানাপ্রকারের। কতকগুলি মেলা বিশেষ ব্যাপারের উপলক্ষে হয়—যেমন কুম্ভ, অর্ধকুম্ভ, অর্ধোদয় প্রভৃতি যোগে যেবার যে স্থানে স্নান, সেবার সেই স্থানে—প্রয়াগে, হরিদ্বারে, নাসিকে মেলা হয়। সে সকলের বৈশিষ্ট্য—সাধু-সন্ন্যাসী সমাগমে। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন সম্প্রদায় অগ্রাধিকার পাইবেন, তাহা লইয়া বিবাদ ও রক্তপাতও হয়; আবার সাধু-সন্ন্যাসীরা ধর্মপ্রচার ও ধর্মের ব্যাখ্যা করেন, বহু নরনারী সমবেত হইয়া সে সব শুনিয়া উপকৃত হয়। সে সব মেলা ধর্ম্য অর্থাৎ ধর্মের সম্বন্ধপ্রধান বলা যায়। আর এক-জাতীয় মেলা প্রতি বৎসর কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানে হইত, এখনও হয়। যেমন কলিকাতায় শিয়ালদহ অঞ্চলে রথের মেলা, মধ্য-কলিকাতায় রামদুলাল সরকারের বাড়ীর সম্মুখে (এখন পথে) চড়কের মেলা।

বিশ্বযুদ্ধের সময় নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা ও দুর্ভিক্ষ অনেক মেলার গঙ্গাযাত্রার কারণ হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন মেলা আবার মরিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে—গঙ্গাসাগরের ধর্ম্য মেলা সকলের অন্যতম।

মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—অর্থনীতিক। নানাস্থানের নানা নিত্য-ব্যবহার্য পণ্য—কুলা ডালা হইতে পাথরের থালা বাটী প্রভৃতি মেলায় বিক্রীত হয়। গৃহস্থরা প্রয়োজনের জন্য সে সব কিনিয়া থাকেন।

তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পণ্যের ও মতের আদানপ্রদান। ব্যবসায়ীরা মেলায় কিরূপে লাভের ব্যবস্থা করেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। "সাগরী" নামক একপ্রকার কাঁসার থালা গঙ্গাসাগরের মেলায় বিক্রীত হয়। তাহা প্রস্তুত হয় কলিকাতায়; কিন্তু ঐ সময়েই বিক্রয় করা হইবে বলিয়া কাঁসারীরা কলিকাতার বাজারে তাহা বিক্রয় করিতে দেন না।

মেলায় আমোদের ব্যবস্থা না থাকিলে মেলা "জমে" না অর্থাৎ লোককে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তেলেভাজা, ফুলুরী ও পাঁপড় হইতে বিস্কুট ও লজেন্স পর্যন্ত মেলায় পাওয়া যায়।

মেলাই বাঙালী ব্যবসায়ীর ব্যবসা ছিল—তাঁহারা পণ্য লইয়া মেলা হইতে মেলান্তরে যাইতেন। এখন মেলার সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় তাঁহারা অসুবিধা ভোগ করিতেছেন।

কোন কোন মেলা বিরাট ব্যাপার—যেমন পুষ্করের মেলা—উট ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র; আর শোণপুরের মেলা। শোণপুরের মেলা "হরিহর সত্রের মেলা" নামে প্রসিদ্ধ। তাহাতে হাতী হইতে আরম্ভ করিয়া সূচ পর্যন্ত বিক্রীত হয়। ভারতবর্ষে এই মেলা এত বড় যে, ইহার জন্য শোণপুরের যে রেলষ্টেশন নির্মিত হইয়াছে, তাহা দৈর্ঘ্যে পৃথিবীতে আর সব প্ল্যাটফর্মকে পরাভূত করিয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য ২৪১৫ ফিট।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সব ভারত-সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।"

এই মেলায় গাছতলায় দাঁড়াইয়া বালক রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত "স্বদেশী" কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। সে ১২৭৩ বঙ্গাব্দের কথা—প্রায় একশত বৎসর পূর্বে। নবগোপালবাবু তাঁহার মাসিক-পত্রের নাম দিয়াছিলেন 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন', তাঁহার সার্কাস পর্যন্ত "ন্যাশনাল" ছিল। লোকে তাঁহাকে "ন্যাশনাল নবগোপাল" বলিত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য বিবৃতিতে দেখা যায়—

(১) "এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। × × × আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য - ইহা ভারতভূমির জন্য।"

(২) "ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। × × × ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব। আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি। ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? অতএব এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়,—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে

পারি এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।"

"হিন্দুমেলার" কর্মীরা কিরূপ-ভাবে দেশের উন্নতির বিষয় কামনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণে আমরা দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণ হইতে "বিদ্যা সম্বন্ধীয়" বিভাগের একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—

"যশোহর স্থানের নিকটবর্তী অমৃতবাজারস্থ অমৃত যন্ত্রালয় হইতে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে।"

এই মেলার সময় যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রসিদ্ধ জাতীয়সংগীত "মিলে সব ভারত-সন্তান" রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। মেলার জন্য রচিত আর একটি গানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটি 'হরিশচন্দ্র' নাটকে বহু বৎসর গীত ও বাঙ্গলার সর্বত্র প্রচারিত হইবার পরে ইংরেজ সরকারের দ্বারা "নিষিদ্ধ" বলিয়া ঘোষিত হয়। সেটি মনোমোহন বসুর রচনা—

"দিনের দিন সবে দীন, হ'য়ে পরাধীন।
অন্নভাবে শীর্ণ চিন্তাভারে
অনশনে তনু ক্ষীণ।
× × ×
অগণিত ধনরত্ন দেশে ছিল
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কেন দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে
সারশস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভুষি শেষে
হায়গো রাজা কি কঠিন!
তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার,
দেশী অস্ত্র-বস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হ'ল দেশের কি দুর্দিন!
× × ×
সুঁইসুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দিয়াশলাই কাটি তাও আনে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে, যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।"

দেশের মেলাকে রাজনীতিক কাজে প্রথম ব্যবহার—"হিন্দুমেলায়"। তাহার উদ্যোগী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"মেলার" প্রয়োজন ও কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া লোককে—বিশেষ শিক্ষিত সমাজকে তাহার বিষয় বুঝাইবার জন্য মেলার পুনঃপ্রবর্তন করেন—'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রবর্তক শিশিরকুমার ঘোষ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, ইলবার্ট বিল লইয়া যে আন্দোলন ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদ প্রবল হয় তাহারই প্রত্যক্ষ ফলে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিশিরকুমার জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি ও হিতকামী ছিলেন। যখন হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলেন, এ দেশেও সিভিল সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা প্রবর্তন, ব্যবস্থাপক সভা সম্প্রসারণ প্রভৃতি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও অল্প লোকই বুঝেন—নিরক্ষর জনসাধারণ ত পরের কথা। এই জনসাধারণ বরং রোডসেস্ টাকার অপব্যয়, পুলিশের অত্যাচার প্রভৃতি বুঝে এবং সেই সকলের আলোচনাই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার উপায়।

হিউম শিশিরবাবুর কথার যাথার্থ্য অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, জানিনা—পারিলেও তিনি বিদেশী, কি উপায়ে ঐ কাজ করা যায় তাহা স্থির করিবার উপায় তাঁহার জানা ছিল না। শিশিরবাবু তাহা বুঝাইয়া দিলেন—অমৃতবাজার গ্রামের নিকটবর্তী বড় গ্রাম ঝিকরগাছায় একটি মেলা করিয়া। তাঁহার ভ্রাতাদিগের সহযোগে তিনি মেলার ব্যবস্থা করিলেন এবং সেই সঙ্গে যে সভা ছিল, তাহাতে উপস্থিত ৫০ হাজার লোক তাহাদিগের অবস্থা-ব্যবস্থার কথা শুনিল। সে সভায় সভাপতিত্ব করিলেন সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু প্রমুখ ব্যক্তিরা তাহাতে যোগ দিলেন। অনেকে জানেন না, এই মেলা করিবার জন্য শিশিরবাবুকে সাহায্য করিয়াছিলেন—দ্বারবঙ্গের তৎকালীন মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ। তিনি বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা লইয়া গঠিত বাঙ্গালা প্রদেশে সর্বাপেক্ষা বড় জমিদার—অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। শুনা যায়, তিনি যখন নাবালক তখন তাঁহার সম্পত্তি ম্যানেজার কর্ণেল মণীর নৈপুণ্যে থাকায় এত টাকা জমিয়াছিল যে, একজন ভারতীয় জমিদারের হাতে এত টাকা থাকায় বিপদ ঘটিতে পারে মনে করিয়া ইংরেজ সরকার ত্রিহুতের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষ্য করিয়া অনাবশ্যক কাজে বহু অর্থের অপচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন এবং গোপনে কংগ্রেসকে অর্থসাহায্য করিতেন। তিনি শিশিরবাবুকে শ্রদ্ধা করিতেন।

ঝিকরগাছা মেলায় ফল ফলিল। সরকার তখন যে চৌকিদারী আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা ত্যক্ত হইল। বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎলাভে কলিকাতায় আসিয়া মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে শিশিরবাবুকে বলেন, ঝিকরগাছা মেলায় সরকার বিচলিত হইয়াছিলেন। প্রথম সভার কার্যবিবরণ পাঠ করিয়া সরকার বুঝেন, লোককে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে—সরকার কৃষকদিগের—জনগণের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করিতেছেন; লোক যেন তাহার প্রতিবাদে তৎপর হয়। পরবর্তী সভাগুলির কার্যবিবরণ পাঠ করিয়া সরকার বুঝেন—কোনরূপ শৃঙ্খলাভঙ্গ করা সভার আয়োজকদিগের উদ্দেশ্য নহে।

কিরূপে জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা শিশিরকুমার এই মেলার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। তৎকালীন কোন সংবাদপত্র এই মেলা উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন:—শিশিরবাবু যে সাধারণ সভাসমিতিতে যোগ দেন না, তাহার কারণ—সেই সকল সমিতি——"have no understanding of the first principles of organisations and proceed to undertake government of a country on the strength of quoted sentences and borrowed ideas which they themselves comprehend very little and their countrymen less".

এই মেলার গীত হইবার জন্য শিশিরকুমার কয়টি গান রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পরে সখারাম গণেশ দেউস্করের চেষ্টায়—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব অগ্রণী হইয়া কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করিলে তাহার অঙ্গ হিসাবে একটি স্বদেশী মেলা করা হইয়াছিল। মতিলাল ঘোষের প্রস্তাবে বালগঙ্গাধর তিলক সেই মেলার উদ্বোধন করেন। তিলক সেই মেলাকে political festival বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

হিন্দুমেলা, ঝিকরগাছা মেলা, শিবাজী উৎসবের মেলা যথাক্রমে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই তিনটি মেলায় রাজনীতিক উদ্দেশ্য ছিল। তাহাই এই কয়টি মেলার বৈশিষ্ট্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "শান্তিনিকেতনের" ট্রাষ্টীদিগকে "ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য" বৎসর বৎসর যে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ট্রাষ্টী ডীড ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ২৬শে ফাল্গুন সম্পাদিত হয়।

মতামত

বেশী দামের বই

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

'অমৃত' পত্রিকার গত সপ্তাহের সংখ্যায় (৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৬৭ পৃঃ) 'বাংলা বই-এর [illegible] দাম' সম্বন্ধে [illegible] সুষ্ঠু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়টির আর এক দিক আছে—যে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কিছু আলোচনা করিতে চাই। জ্ঞানের নানা প্রদেশে ও উচ্চ চিন্তার জগতে যদি ভারতকে সম্মানের আসন লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্যিক মহাশয়দের কেবল লঘু-সাহিত্যের সুলভ প্রকাশনের ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে—জাতীয় মনীষার সম্মান রাখা সম্ভব হইবে না। এমন অনেক বিষয় আছে—যথা ভারতের গবেষণামূলক ইতিহাস রচনা (কেবল স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক নহে) এবং ভারতীয় কলা-বিদ্যা সম্বন্ধে বহুচিত্রযুক্ত বেশী দামের বই অবশ্যই আমাদের প্রকাশ করিতে হইবে,—যে বিষয়ে এদেশের প্রকাশক মহাশয়েরা নির্মমভাবে উদাসীন ও দায়িত্বহীন। সম্প্রতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে উচ্চ গবেষণামূলক বেশী দামের বই (হিস্‌ট্রি এণ্ড কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল) ৪।৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য প্রতি খণ্ড— ৩৫৲ টাকা, কিন্তু ভারতের ইতিহাসের এই কয়েক খণ্ড গ্রন্থের প্রকাশক কোনও ভারতীয় প্রকাশক নহেন—বিলাতের বিখ্যাত প্রকাশক 'এলেন আন্‌উইন'।

গর্বের সহিত উল্লেখ করিতে হইবে যে একজন উদ্যমশীল সাহসী প্রকাশক—শ্রীযুক্ত অমূল্য গোস্বামী ভারতের কলা-শিল্পবিষয়ক বহুচিত্রশোভিত, উৎকৃষ্ট কাগজে সুমুদ্রিত কয়েকখানি উপাদেয় পুস্তক ('আর্ট অফ্ দি চান্দেলাস্', 'আর্ট অফ দি পল্লবস্' মূল্য ৩২৲) প্রকাশ করিয়া ভারতীয় প্রকাশনার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। আশা করা যায় ভারতের অন্যান্য প্রকাশকরা—গোস্বামী মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে—তাঁহার উদ্যমশীল ঐতিহ্যের ধারা রক্ষণ করিবেন; কেবল লঘু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া ভারতের প্রকাশনের দায়িত্ব সীমিত ও সংকুচিত করিবেন না।

কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের আবির্ভাবের বহু পূর্বে—ভারতের কলা-বিদ্যার ব্যাখ্যান ও পরিচয়মূলক বহুচিত্র-সুশোভিত, অতি উৎকৃষ্ট কাগজে ও চমৎকার টাইপে ছাপা কয়েকখানি চিত্ত-হারী চিত্র-পুস্তক ভারতের প্রকাশনার ক্ষেত্রে গৌরবযুক্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছে—সাধারণ পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই তাহার খবর রাখিতে পারেন নাই।

প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় ১৯২৭ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ভারতের চিত্র-কলা বিষয়ক একখানি অতিকায় গ্রন্থ (১৮"×১৩")। হস্ত নির্মিত মূল্যবান কাগজে, উৎকৃষ্ট রীতির নূতন টাইপে মুদ্রিত পুস্তকখানি মুদ্রণ-শিল্পের একটি স্মরণীয় কীর্তি-স্তম্ভ। ঐ পুস্তকের পত্রসংখ্যা ছিল ৬০ পৃষ্ঠা। পুস্তকখানির গর্বের বস্তু হইল—বিলাতে ছাপা চার বর্ণের ২৫ খানা রঙ্গীন প্রতিলিপি এবং বিলাতে ছাপা ২৭ খানা এক বর্ণের ফটোগ্রাভিয়র প্রতিলিপি। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় কলকাতার থ্যাকার-স্পিঙ্ক কোম্পানীর মুদ্রণ যন্ত্রালয়ে। প্রকাশক ছিলেন একজন বাঙ্গালী। বই-খানা মাত্র ২১০ কপিতে ছাপা হয়। মূল্য প্রতি কপি, ৩৫০৲ টাকা। এক বৎসরের মধ্যে বইখানা নিঃশেষ হয়। এখনও বই-খানার চাহিদা যথেষ্ট আছে। পুরাতন কপি বাজারে আসিলে প্রতি খণ্ড ৫০০—৬০০ শত টাকায় বিক্রয় হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বেশী দাম দিয়া বই কিনিতে ইচ্ছুক পুস্তক-প্রেমীর সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও—ভারতে অন্ততঃ ২।৩শ জন আছেন—যাঁহাদের উপর ভরসা করিয়া—বেশী দামের বই প্রকাশ করিয়া লাভ করা যায়।

আমার দ্বিতীয় প্রমাণ হইল—তার একখানি বহু চিত্রযুক্ত অতিকায় গ্রন্থ (১৬½"×১১½")। ১৯৩৫ সালে কলি-কাতার ক্লাইভ প্রেস পুস্তকখানি দুই খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। বই-খানিতে ৫ খানি রঙ্গীন চিত্র এবং ৩৩০ খানা মূল ফটোগ্রাফ (হাফ-টোন প্রতিলিপি নহে) সংযুক্ত করা হয়। বইখানা মাত্র ৩৬ খানা কপিতে ছাপা হয়—প্রত্যেক কপির মূল্য ৭৫০৲ সাত শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র। বইখানা প্রকাশ করিবার দুই বৎসর পূর্বে ঐ ৩৬ খানা কপির দাম—৩৬ জন গ্রাহক—একুনে ২৬ হাজার টাকা প্রকাশকের কাছে পাঠাইয়া দেন। তাহার পর প্রকাশক বইখানা প্রেসে ছাপাইতে পাঠান। বলা বাহুল্য বইখানা প্রকাশ করিয়া প্রকাশক কোনও লোকসানের দায়ে পড়েন নাই। এই বই ছাপিতে কোনও মূলধন খরচ করেন নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—বিশিষ্ট পদ্ধতিতে ছাপিলে যে কোনও বেশী দামের বই ভারতে ছাপা যায়—এবং তাহা ছাপিয়া কিছু লাভ করা যায়। বিলাতে ও অন্যান্য দেশে পুস্তক-প্রেমীর জন্য—অল্প সংখ্যক বই বেশী দামে Subscription basis-এ) ছাপিয়া প্রায় প্রকাশিত হয়। এই পদ্ধতিতে 'লরেন্স অফ্ এরেবিয়া' তাঁহার 'পিলারস অফ্ উইজডম্' বইখানা স্বল্প সংখ্যক ছাপিয়া প্রত্যেক কপি ৫০ পাউণ্ডে (অর্থাৎ ৬৫০৲ টাকায়) বিক্রয় করেন। ভারতের ক্লাইভ প্রেস উপরে উল্লিখিত বইখানা প্রকাশ করিয়া ৭৫০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া—বিলাতের প্রচেষ্টাকে পরাজিত করিয়া—ভারতে প্রকাশন-পদ্ধতির গৌরবজনক ইতিহাস রচনা করিয়াছে।

ইহার পর আর একজন প্রকাশক উক্ত সাবস্‌ক্রিপ্‌সনের পদ্ধতিতে একখানা বই প্রকাশ করেন, কলিকাতা হইতে, ১৯৫২ সালে। উৎকৃষ্ট কাগজে, উৎকৃষ্ট টাইপে—বইখানা ছাপেন 'প্রবাসী' প্রেস—মাত্র ১০০ সংখ্যক কপিতে—প্রতি কপির মূল্য ছিল ৫০৲ টাকা মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—যে বেশী দাম দিয়া সুদৃশ্য বই কিনিবার জন্য পুস্তক-প্রেমী যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহক এ দেশে আছেন।

আমাদের দেশে—বিশ্বজয়ী ভারতের কলা-শিল্পের জ্ঞান প্রচারিত হইতেছে না উদ্যমশীল প্রকাশকের অভাবে। এই বিষয়ে সুচিত্রিত পুস্তকের একান্ত অভাব। প্রকাশক মহাশয়েরা যদি সমবেত চেষ্টা করিয়া কেবল ভারতের কলা বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের একটি বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে কলা-বিদ্যার প্রচার ও প্রসারের অভাব নিশ্চয় দূর করা যাইতে পারে। আমি এ বিষয়ে উদ্যমশীল প্রকাশক মহাশয়দের আমার বিনীত আবেদন জানাই।

বেপরোয়া নজরুল

রাম বসু

১৩৩৫ সালে নজরুল সম্পর্কে এই উক্তি করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। "তাঁহার কবিতার সহিত পরিচিত হইয়া দেখিলাম—এতো কম কথা নয়। এ যে খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে। আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতলার প্রাসাদে বসিয়া লিখিতেন। ......তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নূতন ভাব জন্মিয়াছে, তাহার সুর পাই। তাহাতে পালিশ বেশি নাই, আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।" প্রকৃত পক্ষে এই-ই নজরুলের কবিতার সত্য। নজরুল বাংলার আপামর জনসাধারণের ইচ্ছার বাণী-মূর্তি। বৈদগ্ধ্য নেই, বুদ্ধির শাণিত ফলার আস্ফালন নেই, স্ব-কৃত জটিলতার চোরাবালি নেই। যা বাংলার মানুষ ভাবে, তার সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে মিশে যেতে আর কেউ পেরেছেন বলে জানা যায় না। এই কি রবীন্দ্রনাথের 'অখ্যাত জনের অজ্ঞাত মনের' কবি? তা ছাড়া এমন বিপুল আন্তরিকতা সম্ভব কি করে? গ্রামের ছন্দ মাটির গন্ধ এমন নিবিড়ভাবে থাকে কি করে? তার কারণ বোধ হয় নজরুলের জীবন। প্রচলিত অর্থে শিক্ষার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে নজরুল প্রকৃতপক্ষে কু-শিক্ষা ও অর্ধ-শিক্ষার উদ্ধত কলুষ থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন, তাঁর আত্মাকে। দিতে পেরেছিলেন বাংলা কবিতায় পৌরুষের দুর্লভ দীপ্তি। অথচ তখন রবীন্দ্র-প্রতিভা মধ্যাহ্ন গগনের প্রচণ্ড মার্তণ্ড।

১৩০৬ সাল, ১১ই জ্যৈষ্ঠ। বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মেছিলেন নজরুল। দুরন্ত দামাল ছেলে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, যাত্রা করে, গান গায়। দারিদ্র্য স্পর্শ করিতে পারে না। রুটির দোকানে চাকরের কাজ করে, গার্ড সাহেবের বাবুর্চি হয়ে, মক্তবের মাস্টার হয়ে কেটে গেছে জীবনের বেশ কটি দিন। শেষে কিছুদিন পড়েছিলেন শিয়াড়সোল রাজার ইস্কুলে।

জীবনের আরম্ভ যাঁর এইভাবে, তাঁর শিক্ষা হল তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতা। নজরুল পাঠ নিলেন জীবনের পাঠশালায়।

অন্ধকার থেকে তাঁর আবির্ভাব। বাংলার কৃষকের জীবনের গভীর থেকে তাঁর উদ্ভব। তাই তাঁর কবিতায় যে শব্দ আমাদের চমকে দেয়, আমাদের মার্জিত মিহি কানে যা স্থূল ও কর্কশ আওয়াজ বলে মনে হয়, তা আদপে বাংলার মাটির বন্যা। কলকাতার বুদ্ধিজীবি মহলের মৃদু ও মোলায়েম আলাপ নয়। তা গর্জন, তা ঘোষণা। ঘোষণা জীবনের, যৌবনের, জয়ের।

নজরুলের কবিতা পাঠে মনে হয়, সত্যিই সৈনিক বৃত্তি তাঁর কোনো আকস্মিক খেয়াল নয়। এ যেন তাঁর নিয়তি। যুদ্ধে গেছেন তিনি স্বভাবের তাড়নাতেই। আর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই মানুষ নজরুল হয়েছেন কবি নজরুল। সৈনিকের জীবনকে নেন প্রবলভাবে। ঘৃণা যেমন তার প্রচণ্ড, তেমনি প্রলয়ংকর তার ভালবাসা। নজরুলও সেইভাবেই জীবনকে নিয়েছেন এবং এই শিক্ষার জন্যেই মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে মাতিয়ে দিলেন তিনি বাংলাদেশ। নজরুলই সেই প্রথম বাঙালী কবি যিনি ভাবনা দিয়ে নয়, শরীর দিয়ে মানুষকে অনুভব করতে চেয়েছেন। তিনি বাংলা কবিতার বিস্ময়। এমন প্রবল ও প্রচণ্ডভাবে বেঁচেছিলেন শুধু তাঁর পূর্বসূরী মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর উত্তর-সূরী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনের গরল ও অমৃত তাঁরা তুলে নিয়েছেন অলৌকিক নিষ্ঠায়।

প্রকৃতপক্ষে নজরুলের জীবন ও কবিতা অবিচ্ছেদ্য। বৈচিত্র্য তাঁকে মুগ্ধ করে। নতুন তাঁকে সম্মোহিত করে। অজানাকে জানবার জন্য অচেনাকে চেনবার জন্য হাবিলদার নজরুল ও কবি নজরুল একাত্মক। অনেক কবি আছেন যাঁদের জীবন ও কবিতা স্বতন্ত্র। হয়ত তাদের সম্পর্ক বিপরীত মেরুতে। তাই ব্যক্তিকে দেখে বোঝা যায় না কবিকে। ভাবাই যায় না এই ব্যক্তির দ্বারা ওই বিশেষ মেজাজের কবিতা লেখা সম্ভব। কিন্তু নজরুল ঠিক তার উল্টো। গেরুয়া রঙের

পাঞ্জাবী, কাঁধে গেরুয়া চাদর, পায়ে মিলিটারী বুট, হাতে হাতপাখা, একরাশ চুল কাঁধের ওপর ঝামরে পড়েছে। তার ওপর ক্ষণে ক্ষণে প্রাণখোলা হাসি, দিল-দরিয়া মেজাজ। এবং এই বেপরোয়া ভাব ছিল বলেই, অশংকিতভাবে বাংলা শব্দের সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দ। অনায়াস স্বাচ্ছন্দে লিখে যেতে পেরেছেন প্রাণ যা চায়। কিন্তু একি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মরিয়া চেষ্টা, না রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বগ্রাসী প্রবাহ থেকে আত্মরক্ষা করার প্রয়াস? মনে হয়, কারণ এ দুটির একটাও নয়। প্রথমতঃ নজরুল যে ধারার মানুষ, যে মানসিকতায় মণ্ডিত, সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ, এই দুটি ধারাকে কিছুতেই মেলানো সম্ভব নয়। একটি ধ্যান গম্ভীর মহিমান্বিত সংহত হিমালয় আর একটি ক্ষুরধার বেগান্বিত বৈশাখী বাতাস। দ্বিতীয়তঃ যদি তাই হবে, যদি রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার সচেতন প্রয়াসই হবে, তবে সেই কষ্টের ছাপ থাকতো কবিতায়। বাজতো আত্ম-করুণার সুর, গোপন গ্লানি। কোথাও সেই গ্লানি নেই নজরুলের কবিতায়। তাই তাঁর কণ্ঠস্বর আকাশের নগ্নতার নীচে নিষ্কোষিত তরবারির মত উদ্দাম।

নজরুলের বিদ্রোহ আরোপিত নয়। এ হল বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের কণ্ঠস্বর। "ওরে হত্যা নয় এ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।" উদ্বোধন হচ্ছে প্রাণের। যে ছিল বন্দী, সে শিকল ছিঁড়ছে। উপবাসে কৃশ, অনাচারে দীর্ণ, তামসিকতায় মগ্ন, যে ছিল এত-দিন পঙ্গু, সেই প্রাণ জাগছে। সে নিজেকে জেনেছে, বুঝেছে। তাই সে বিরাট, অপরিমিত। তাকে ধরা যায় না সমাজ নিয়মের কৃত্রিম খাঁচায়। আত্ম-সচেতনায় প্রবল, উম্মাদনায় ভয়ংকর। সে স্বতন্ত্র, অনন্য। এবং তাই সে ব্যক্তি। বিদ্রোহীর মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের এমন কবিতা (না ফতোয়া?) বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। হয়ত এই ক্ষেত্রে তাঁর সমগোত্রীয় একমাত্র ওয়াল্ট হুইটম্যান। কারণ, হুইটম্যানের মতোই নজরুলের কবিতাতেও সকল রকম দাসত্ব থেকে মুক্ত অনাবিল বিশুদ্ধ মানুষের 'জয়-ধ্বনি' শোনা যায়। জানি এতে বাহুল্য আছে, উচ্ছ্বাস আছে, পরিমিতির অভাব আছে। কিন্তু তা যদি না থাকতো, তবে নজরুল নজরুল হতে পারতেন কি? এই দোষগুলিই তাঁর গুণ ও চরিত্র। এবং এখানেই তাঁর অনন্যতা। ত্রুটিগুলি কাব্যের ব্যাকরণের দিক থেকে কলঙ্ক হলেও, কবিতার আবেগের দিক থেকে ঐকান্তিক। "দেশ মাতা সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, যাহার বিবেক আছে, কর্তব্য জ্ঞান আছে, মনুষত্ব আছে, সে-ই বুক বাড়াইয়া আগাইয়া যাইবে। তোমার কি নিজের ব্যক্তিত্ব নাই যে, কে কি করিল আগে দেখিয়া তবে তুমি তার পিছু, পিছু পো ধরিবে? নেতা কে? বিবেকই তোমার নেতা, তোমার কর্তব্য জ্ঞানই তোমার নেতা!" —দেশবাসীর প্রতি এই নজরুলের উক্তি। নিজেকে তিনি শোনালেন: "তোমার মাতৃ-ঋণ—তোমার স্বদেশের ঋণ শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ?" আমি বললাম, 'সাবধান; আমার মাঝে প্রলয় সুন্দর আছেন।' সেই ভয়ংকর বিরুদ্ধ শক্তি প্রবলবেগে নিম্নপানে টানতে লাগল। বললে, 'সেই প্রলয় সুন্দর তোমার মত অজ্ঞানোন্মাদ নন, তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাংলার ঋণ, মানব-রূপী তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না করে তুমি যেতে পারবে না।" নজরুল ঋণ শোধ করেই গিয়েছেন। সমগ্র প্রতিভা দিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে, সেই ঋণ শোধ করেছেন কবি।

তাই 'ধূমকেতুর' অভিযুক্ত সম্পাদক রাজদ্রোহী নজরুল কোর্টে জবানবন্দী দেন, "দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়। দোষ তাঁর যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাকে শাস্তি দেবার মত রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নেই।..." নজরুলের এই উক্তি ফরাসী কোর্টে অভিযুক্ত জোলার কথা মনে করায়। যে জোলা বিচারকেই অভিযুক্ত করেছিলেন, "আই একিউজ" বলে।

আজ নজরুল জীবন্মৃত, কিন্তু বাঙালীর হৃদয়ে মনে তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। কারণ, তিনি স্থান পেয়েছেন আমাদের ভাবার মধ্যে যে ভাবা আমাদের জীবনের চেয়েও প্রিয়।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমগ্র পৃথিবী যখন বিশ্বকবি রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব পালনের আনন্দে মগ্ন, তখনই দেরাদুন থেকে শোক সংবাদ এল—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ইহজগতে নেই। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্ববরেণ্য কবির পাঁচটি সন্তানের মধ্যে কন্যা মীরা দেবী ছাড়া আর কেউই জীবিত রইলেন না।

মৃত্যুকালে রথীন্দ্রনাথের বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর। সাধারণ বাঙালীর আয়ুষ্কালের তুলনায় একে অকালবিয়োগ বলা না গেলেও, তাঁর পিতৃদেবের শতবার্ষিক জন্মোৎসব পালনের বৎসরে এই মৃত্যুকে শান্তচিত্তে গ্রহণ করা কঠিন।

অথবা এই পরিণতিই স্বাভাবিক? যে কবির কবিতায়-গানে, ছবিতে-অভিনয়ে সমগ্র বিশ্ব জীবনের অমরতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে, যাঁর কর্মকেন্দ্র শান্তিনিকেতন হয়েছে আজ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, তাঁরই জীবন্ত প্রতিনিধি রথীন্দ্রনাথ পিতার অমরতার মধ্যে আত্মনিবেদন করে পেলেন তাঁর সারাজীবনের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি!

বাস্তবিক, এই স্বভাববিনয়ী মানুষটি যে কতো বড় পিতৃভক্ত পুত্র ছিলেন, তাঁর সমগ্র জীবনই তার পরিচয়। তাঁর প্রথম জীবনে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠাভ্যাস থেকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্যে আমেরিকা যাত্রা, সেখানে স্নাতক উপাধি লাভ করে দেশে ফিরে এসে প্রতিমা দেবীর সঙ্গে বিবাহ এবং বিশ্বভারতীতে যোগদান, তারপর সুরুলে (শ্রীনিকেতনে) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিবিদ্যার প্রয়োগ এবং গ্রাম সংগঠনের উদ্বোধন—সমস্ত ব্যাপারেই তিনি পিতার ইচ্ছাকেই মেনে গেছেন। এতে তাঁর ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য পথরোধ করে দাঁড়ায়নি। একাধারে মহাকবি এবং কর্মবীরের পুত্র হয়ে প্রায় একলব্যের মতো নিষ্ঠা নিয়ে তিনি সকলের অগোচরে তাঁর বিরাট দায়িত্বের ভার বহন করে গেছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সারা বিশ্বেরই সম্পদ। কিন্তু এই বিশ্বভারতী তো কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, আরো একজনের তিল তিল আত্মদানে গঠিত। তিনি রথীন্দ্রনাথ। তাঁর মতো পুত্র, প্রিয় শিষ্য, একনিষ্ঠ বন্ধু এবং অক্লান্ত সহযোগী পেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের সেই অখ্যাত পল্লীর অজ্ঞাত পরিবেশে, বিদেশী শাসনের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর সাধনার অনির্বাণ আলোকস্তম্ভ। আজ মহাকাল নিজের হাতে উৎকীর্ণ করে দিল রথীন্দ্রনাথের নাম সেই অক্ষয়কীর্তি প্রতিষ্ঠানের বেদীমূলে।

পিতার মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ হতে চেয়েছিলেন। তাঁরই শত শতবার্ষিকী জন্মতিথিতে তিনি চিরজীবন লাভ করলেন।

অনিদ্রা-অসুখ

চিত্ত ঘোষ

কী এক পীড়ায় মগ্ন অবিরাম আরোগ্য খুঁজেও
সন্তাপ নিঃশ্বাস, বৃথা মধ্যবর্তী সেতুর সন্ধান:
অরণ্য অপরিচিত, হংসচ্ছবি, নৌকায় তুফান
প্রবল ধবল গ্রীষ্ম বৃষ্টিপাত চিহ্নকে মুছেও।
অবিরাম ধ্বনিস্রোত, অবিরাম স্মৃতির মুখর
চিত্রে নদী, পাত্রে জল, বিন্দু বিন্দু অশ্রুমালা মুখ:
একাগ্র ব্যাধের লক্ষ্য কেন্দ্রমণি, অদ্ভুত অসুখ
ছিন্নভিন্ন প্রতিজ্ঞার বাষ্পময় অবরুদ্ধ স্বর।

দৃষ্টির দুঃসহ দুঃখ তিলে তিলে পরিণাম শোক:
নিবে আসে সে অঙ্গার, অপরাহ্ণে যেন বৃষ্টিপাত,
দূরে বিসর্জন বাজে, চতুর্দিকে ধূমল বিষাদ;
ইতস্তত খণ্ড ছায়া, কীটদষ্ট শস্যের পালক!
আর এই জলধারা বেগবান তরঙ্গের মুখ
গলে গলে অন্ধকার, জমে জমে অনিদ্রা, অসুখ।

বিতৃষ্ণা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমার দৈন্যের ভার কোথা রাখি। দীর্ঘ অপেক্ষিত
সময় যখন দ্বারে অনুগত ভৃত্যের মতন
আমি তাকে ভুলে গেছি, তার প্রেম হয়ে অপসৃত
অকুণ্ঠ মত্ততা বশে তোমাকেই করেছি স্মরণ।

আজ শ্রান্ত অবেলায় বহুরেখা খচিত শরীরে
নশ্বর আলোর শিল্প সমবেদনায় ধরো-ধরো
আকাশ পৃথিবী ঘোরে—শতশোক তমসার তীরে
রচনা করেও সেই হাহাকার ক্রমে হয় জড়ো।

কামনা, অজেয় পদ্ম ফোটাও বৃথাই শেষ বেলা
অজস্র দৈন্যের ভারে অবনত শ্রান্ত দেহমন
কোথা স্নিগ্ধ বনরাজি, ডুবে যায় অসহায় ভেলা
আশ্রয় না পেলে প্রিয় করে যাই কি করে তর্পণ?

শেষতম রজনীর অভিনয় সাঙ্গ হলে তুমি
এসো এ বিচ্ছিন্ন মঞ্চে দলিত মথিত রঙ্গভূমি॥

রাত্রি-বধূ

প্রানতোষ ঘটক

মধ্যরাতের কলকাতা।

ভয় আর শান্তি; আতঙ্ক আর সুখ-নিদ্রা, আলো আর অন্ধকার। দুই বিপরীত, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহঅবস্থান যেন একই আধারে। অন্ধকার থমথম করছে রাস্তার মুখে মুখে। আকাশে ফ্যাকাশে চাঁদ পঞ্চমীর। তাও থেকে থেকে ঢাকা প'ড়ে যায় শীতের মন্থরগামী মেঘের আড়ালে। তখন আরও যেন ঘন হয়ে ওঠে এই ভয়ভয় আঁধার। বিশালবিস্তৃত শহর কলকাতার কাছে চাঁদ যেন হার মেনেছে। আলোকদানে অসমর্থ হয়ে যখন তখন লুকিয়ে পড়ছে সলজ্জায়।

ল্যাম্পপোস্ট আছে একটা একটা। অনেক দূরে দূরে।

না থাকলেই যেন ভাল ছিল। ধাঁধা আর রহস্য সৃষ্টি করছে যেন, অন্ধকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালিয়ে। চোরের উপদ্রবে আলোকস্তম্ভে আবার আলো থাকে না। ল্যাম্পপোস্ট আছে, কিন্তু ল্যাম্প নেই। ছিঁচকে চোরের উৎপাতে আলোর বাল্ব উধাও হয়ে যায় রাতারাতি। কলকাতার বিখ্যাত চোর। যেমন কাকের মত শঠ, তেমন শিয়ালের মত ধূর্ত। পাঁকাল মাছ যেন, পুলিশের হাত ফসকে বেরিয়ে যায়। ধরা পড়ে না, ধরা যায় না।

বহুবার ঠকেছে বিজলী কোম্পানী। লোকসান দিয়ে দিয়ে নাচার কোম্পানী বাধ্য হয়ে আলোর মাথা আরও উঁচিয়ে দিয়েছে আকাশপানে। ফল হয়েছে এই, পথের আলো কমে গেছে। আলো থাকাই সার হয়েছে এখন। নামেমাত্র আলোর নামমাত্র ছটা। খুন আর রাহাজানির পক্ষে বড় বেশী কার্যকরী এই স্বল্প আলো। অন্যায় আর অধর্মের মূর্তিমান প্রশ্রয়দাতা। ঘুষখোর ট্রাফিক পুলিশের মত স্বেচ্ছায় ঘুমিয়ে আছে যেন। কিম্বা জেগেই ঘুমিয়ে আছে হয়তো।

ভীতির রাজ্য, জেনেশুনেও পা পা এগিয়ে চলেছে মালবিকা।

জানে, যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন বিপদ আর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তবুও থামে না সে। পরিণাম ভয়ঙ্কর জেনেও কীটপতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, মালবিকা তেমনি যেন অন্ধ অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে। আতঙ্কে আর আশঙ্কায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু মালবিকা যেন নিরুপায়। বেঁচে ম'রে থাকার চেয়ে ম'রে বেঁচে যাওয়া না কি অনেক সুখের। জীবন যার বিষিয়ে গেছে তার কাছে মরণ—অনেক শান্তির, অনেক আরামের। মৃত্যু তো নয় যেন ঘুমের ওষুধ। একটু বেশী জোরালো, এই যা।

আজকের দুনিয়াতে সব কিছুই যেন কত দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলেছে।

দিনেদিনে রাতারাতি বদলে যাচ্ছে বিলকুল। স্পুৎনিক আর এ্যাটলাসের দ্রুততম গতির মত দিন-কাল যেন এগিয়ে চলেছে, পাক খেয়ে খেয়ে। যোগসূত্র নেই আগে-পিছনে, এমনই খাপছাড়া ঘটনা যখন তখন। আশাতীত, কল্পনাতীত একেকটা দুর্ঘটনা। প্রস্তুতির সময় দিতে চায় না যেন। ভূমিকম্পের আবির্ভাব যেমন। পূর্বাভাস নেই আদপেই। ক্ষেপা শ্রাবণ যেন, হঠাৎ মত্তবেগে ছুটে আসে। ঝড়ের দোলায় ওলট-পালট হয়ে যায় প্রকৃতি। মানুষের যত কিছু পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায় চক্ষের নিমেষে।

অনেক মিনতি জানিয়েছিল সুমন্ত। তার ব্যাকুল প্রতিরোধ, আকুল নিষেধ ব্যর্থ হয়ে গেল যেন। সুমন্ত বলেছিল,—বারণ অমান্য করাই যেন আজকালকার মেয়েদের স্বধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দোহাই তোমার, তুমি যেও না।

চরম অবাধ্যের মত কথায় কর্ণপাত করে না মালবিকা। পাষাণ মূর্তি যেন সে।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুঃখে আর রাগে। কত দুঃখে আর কত অনিচ্ছায় যে মালবিকা যেতে হচ্ছে সকল কিছু ত্যাগ ক'রে, কেউ জানে না। কেউ জানে না।

সুমন্ত শেষ পর্যন্ত বলেছিল,—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুমি যেও না।

সত্যিই স্বামী হয়ে স্ত্রীর পায়ের কাছে সুমন্ত লুটিয়ে পড়ে প্রায়। সুমন্তর মুখ-ভংগীতে নির্ভেজাল আবেদনের কান্না-চাপা আভাষ। সুমন্তর দুই হাত মালবিকার দুই পায়ে।

তবুও প্রসন্ন হ'লেন না দেবী।

যেমনকার তেমনি মুখ ফিরিয়ে থাকলো মালবিকা। ঘরের জানলার বাইরে, শুভ্র আকাশে তার চাউনি থমকে আছে। নিষ্পলক দুই আয়ত্ত চোখের কোণ থেকে দু'টি জলের ধারা নেমেছে, শীর্ণ নদীর মত। টুপ টুপ পড়ছে একেক ফোঁটা অশ্রু। বুক ভিজে উঠছে নীরব কান্নায়।

—আমিও তোমাকে অনেক মানা করেছি, শুনতে চাইলে না কোনদিন।

হঠাৎ কথা বললে মালবিকা। সেতারে যেন এক দুঃখের সুর বেজে উঠলো। মালবিকার করুণ কণ্ঠ গুমরে গুমরে ওঠে।

—আর কক্ষণও হবে না, কথা দিচ্ছি আজ আমি। সুমন্ত বললে, নেহাৎ অনন্যোপায়ের মত।

—এই একই কথা তুমি অন্ততঃ হাজারবার ব'লেছো এর আগে। মালবিকা বললে অস্ফুট কান্না সামলে। বললে,—তুমি কথা দিয়েছিলে জুয়া খেলবে না আর। কথা দিয়েছিলে যে কাবুলীওলার কাছে টাকা ধার করবে না। কথা দিয়েছিলে আর কখনও মদ খাবে না। আমিও বোকার মত তোমার কথা বার বার বিশ্বাস ক'রেছি। কিন্তু আর নয়। আমার কাছে তোমার কথার কোন দাম নেই আর।

—তবে আমি কি করতে পারি?

নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলে সুমন্ত। তার আবেদন নিবেদন আর কোন কাজ করছে না। কথার পর কথা ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে কি মাথা খুঁড়বে সুমন্ত, মালবিকার পায়ে?

—কোথায় যাবে তুমি? কার কাছে যাবে?

জামার আস্তিনে ঘাম-ঘাম মুখ মুছতে মুছতে বললে, সুমন্ত।

উত্তেজনায়, লজ্জায়, অপমানে সুমন্তকে দেখায় যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকের মত। সর্বহারার দৃষ্টি তার চোখে। হেরে যাওয়ার ব্যর্থতায় সে যেন কেমন নিঃশেষ হ'তে চলেছে। যেন মালবিকা না থাকলে তার জীবনীশক্তি দিনে দিনে লুপ্ত হয়ে যাবে। সলতে নেই, জ্বলবে না আর দীপশিখা।

খানিক নিশ্চুপ থাকলো মালবিকা। ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে উর্ধমুখে তাকিয়ে থাকে। সজল চোখের পলক পড়ে এতক্ষণে। দুই বিন্দু অশ্রু পড়লো বুকে। মালবিকার ঘন লাল সাটিনের ব্লাউজে কালো দাগ ফুটলো সংগে সংগে। তার বুকের আঁচল খসে পড়েছে মেঝেয়। সে যেন শেষবারের মত তার রূপ, তার অম্লান অক্ষত যৌবন দেখায় সুমন্তকে।

কোথায় যাবে তা যেন ফাঁস করতে চায় না মালবিকা।

বেশ জানে সে, নেশার ঝোঁকে কোনদিন হয়তো গিয়ে হাজির হবে সুমন্ত। আবার একটা দৃশ্য সৃষ্টি করবে সুমন্ত। নাটকীয় আর অবাস্তব। থিয়েটারের ঢঙে এ্যাকটিং করতে শুরু করবে হয়তো। বলবে কতকগুলো সাজানো কথা।

তাই আর সুমন্তর কোন কথায় কান দেয় না মালবিকা ইদানীং। সুমন্ত যা যা বলে, তৈরী একটা লেকচারের মত শোনায় যেন।

—আমি জাহান্নামে যাবো। তাতে তোমার দরকার কি?

অনেকক্ষণ চুপ থেকে থেকে হঠাৎ বললে মালবিকা। ঝাঁজালো সুর তার কথায়। কথা বলছে যেন অনাত্মীয়ের মত। এক অচেনার সংগে। কে বলবে সে একদা সাত পাক ঘুরেছে।

—টুলটুল! টুলটুল কোথায় থাকবে?

সুমন্ত অনেক চেষ্টার পর, ভেবে-চিন্তে একটা যেন প্রতিরোধ তুলে ধরতে চায়। এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া করতে চায় মালবিকার সমুখে। সুমন্ত ভাবছে, যদি একমাত্র বাচ্চা ছেলেটার প্রসংগ তুলে এ যাত্রায় বাধা দিতে পারে মালবিকাকে।

—কেন? তোমার ছেলে তোমার কাছেই থাকবে। টুলটুল আবার কোথায় যেতে যাবে! কথার শেষে খানিক থেমে মালবিকা আবার বলে,—আমি যাবো একা একা। কেউ আমার সংগে যাবে না।

—আমারই ছেলে, তোমার ছেলে নয়?

শিশুর মত অভিমানী কণ্ঠ সুমন্তর। কথা বলছে না কাঁদছে ধরা যায় না। তার আশাহত চোখে জল চিকচিকিয়ে ওঠে। ভোরের প্রথম সূর্যরেখা যেন।

—না। আমি ছেলের দায়িত্ব নিতে পারবো না। বললে মালবিকা, পরম নির্দয় নিষ্ঠুরের মত। বললে,—আমারই ঠাঁই নেই কোথাও। টুলটুলকে মানুষ করবো তেমন সামর্থই বা আমার কৈ? ছেলে তোমার। তুমি যা ইচ্ছে কর [illegible] নিয়ে। নিজের আদর্শ দেখিয়ে [illegible]গোল্লায় পাঠাও, আমি আর দেখতে আসবো না কখনও।

—আমার কথা শুনবে না তবে? আমাকে অবজ্ঞা করবে?

কোথা থেকে যেন সামান্য সঞ্জীবনী পেয়ে সহসা সরব হয়ে ওঠে সুমন্ত। কাপড়ের কোঁচায় খুঁট চেপে চেপে মুখের ঘাম মুছে নেয়।

—না। তুমি আমার হাজার হাজার কথা কখনও শুনলে না। আমার বারণ কানে নাওনি একদিনও। আমি তোমার মাত্র একটি কথা শুনবো না। মিথ্যে আর কথার স্তূপ জড় ক'রে কি লাভ আছে বল'। আমাকে যেতে হবেই। আমি, আমি, আর পারছি না।

চোখে আঁচল চাপে মালবিকা। আর পারে না কান্নার বেগ ঠেলাতে। আর পারে না যেন কথা বলতে। যেন তার বলার মত কথা আর নেই। সব ফুরিয়ে গেছে।

পায়রার খোপের মত বাসাবাড়ী। বেলেঘাটার নোংরা বস্তী অঞ্চলের এক ম্যানশনে মাত্র দেড়খানি ঘরের ত্রিশ টাকার ফ্লাট। না আছে আলো, না আছে একরত্তি বাতাস। এমনিতেই দম আটকে আসে। শীতের দিনে স্যাঁতসেঁতে ঘরের নোনাধরা দেওয়ালে ড্যাম্প। বরফকুন্ড ঘরে তখন ছেলেটা সর্দিজ্বরে ভুগতে শুরু করে। ভিজে কাপড় শুকোতে চায় না। ওই পাতাল-পরিবেশ অসহ হয়ে উঠছে দিন দিন, মালবিকার কাছে। এ যেন এক প্রাগৈতিহাসিক গুহা-গহ্বর।

ভেবে ভেবে দেখেছে মালবিকা, আমরণ তাকে সইতে হবে দিন-যাপনের গ্লানি। বাসা বদল করতে পারবে না সুমন্ত সাতজন্মেও। মাসে ত্রিশ টাকা ভাড়া, তাই-ই যোগাতে পারে না ঠিকমত। ম্যান-শন মালিকের বেতনভুক প্রতিনিধি এসে অকথা-কুকথা শুনিয়ে যায় প্রায় প্রতি মাসে। সুমন্ত তখন আজ দিচ্ছি কাল

চিৎকার করে। কানে আঙুল দেয় মালবিকা, ভাড়া না দেওয়ার অজুহাতে যখন অশ্রাব্য গাল পাড়ে সেই লোক। সুমন্ত শুধু হাসে নির্লজ্জের মত। যেন গা সওয়া হয়ে গেছে।

শুধু মালবিকা মেনে নিতে পারে না এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। অভদ্র পরিবেশ। নোংরা আর দূষিত আবহাওয়া। এর চেয়ে গাছতলা ভাল।

কথার স্টক ফুরিয়ে গেছে যেন। সুমন্ত থেমে থাকে মালবিকার কান্না আর কথা শুনে। কিছু যেন আর বলবার নেই। ধনুকভাঙ্গা পণ করেছে মালবিকা। যা বলেছে তার নড়নচড়ন নেই।

একফালি বারান্দায় টুলটুল। একখানা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে দিয়েছিল মা। টুলটুল পড়ছে দুলতে দুলতে। নামতা মুখস্থ করছে, সাত এগারোং সাতাত্তর, আট—

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ছেলে দেখছে এই ধরনের কলহ-দ্বন্দ্ব। শুনছে কথা কাটাকাটি। তার মায়ের অভাব-অভিযোগ। আর দেখছে তার নির্বিকার জন্মদাতাকে। কারও কথা কানে তোলে না। গায়ে মাখে না।

কিন্তু মালবিকা যখন চ'লে যেতে চায় তার সংসার ছেড়ে, তখনই সুমন্তর ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুমন্তর মাথায় যেন বজ্রপাত হয়। লজ্জা আর অপমানে সুমন্ত তখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে যেন। তার নিজের সমাজ আছে একটা। আত্মীয়-স্বজন আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে। তাদের কাছে মুখ দেখাবে কোন্ লজ্জায়। স্ত্রী যাকে ত্যাগ করে, তার গলায় দাঁড় দেওয়াই ভাল। মৃত্যুই মঙ্গলের।

কিন্তু পশুর মত বাঁচতে চায় না মালবিকা। আশায় আশায় ছিল, সুমন্তর একদিন নিশ্চয়ই জ্ঞানের উদয় হবে। ভেবেছিল, সুমন্ত আর মদ খাবে না। জুয়া খেলবে না। যেখানে সেখানে গিয়ে রাত কাটাবে না নেশায় বেঁহুশ হয়ে। মাস-মাইনের একশো টাকার পুরো অঙ্কটা মাসের শেষে মালবিকার হাতে তুলে দেবে।

আশায় ছাই পড়েছে তার। স্বপ্ন আর কল্পনা কর্পূরের মত উবে গেছে। আর নয়, আর নয়।

সত্যিই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে মালবিকা। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই পিছুডাক শোনে। সুমন্ত ডাক দেয় কাতরস্বরে। বলে,—মালবিকা! যেও না। শুনে যাও। ফিরে এসো। লক্ষ্মী মেয়ে।

—না। আমি তোমার অলক্ষ্মী। বিদেয় হয়ে যাই আমি। তুমি বেঁচে যাবে।

সিঁড়ির ধাপে ধাপে নামতে নামতে বললে মালবিকা। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। কাছ থেকে দূরে চ'লে গেল।

খাঁচা থেকে মুক্ত বাঘিনী যেন সে। আর কখনও যেন ধরা দেবে না সে। এমনই দুর্নিবার গতিতে ম্যানশনের সিঁড়ি বেয়ে সে নীচে নামছে।

এতশত বোঝে না টুলটুল। জানে না কোথা থেকে কি সব হয়ে গেল। ঠাওরাতে পারে না, মা তার চিরদিনের মত অদৃশ্য হয়ে গেল। টুলটুল তখনও পড়ছে.—তিন বারোং ছত্রিশ, চার—

দম-ফুরিয়ে যাওয়া কলের পুতুলের মত বসে থাকে সুমন্ত।

উত্থান-শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে পক্ষাঘাত-রোগী। হাত উঠছে না, পা চলতে চাইছে না। বোবার মত নির্বাক।

মালবিকার পিছু পিছু ছুটবে, ফিরিয়ে আনবে তাকে—ইচ্ছা হয় না সুমন্তর। লোকলজ্জা নেই একটা! ম্যানশনের অন্যান্য ফ্লাটের মেয়ে আর পুরুষ এসে ভীড় জমিয়ে তাকে সমবেদনা জানাবে—তা যেন চায় না সুমন্ত। তার চেয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়া ভাল গলায় ফাঁস বেঁধে। সেঁকো বিষ খাওয়া ভাল।

পড়া বন্ধ করে না টুলটুল। তার মা বলেছে, পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা, ঘুমের সময় ঘুম। তাই পাঠ থামায় না সে। একবার শুধু ড্যাবা ড্যাবা চোখ ফিরিয়ে দেখে সুমন্তকে। প্রতিহিংসার ছায়া যেন তার শিশু-চোখে। আজ অসহায় সে, ভবিষ্যতে যেন প্রতিশোধ নেবে একদিন। দেখে নেবে সুমন্তকে।

একটা সস্তা সিগারেট ধরায় সুমন্ত। আধ-খাওয়া।

যেমন বিশ্রী গন্ধ, তেমনি অফুরন্ত ধোঁয়া। খেতে খেতে কখন নিভিয়ে রেখেছিল। টুলটুল আরেকবার তাকায় হিংস্র চোখে। সুমন্ত দেখতে পায় না। সুমন্তর চোখের সমুখে ধোঁয়ার জাল। এক টুকরো মেঘের মত। এখনও সুমন্ত আশা করছে, মালবিকা শেষ পর্যন্ত যাবে না। ফিরে আসবে। আশায় আশায় থাকে।

সাত কুলে কেউ নেই মালবিকার। যারা ছিল তারা এখন পরপারে। শুধু আছে এক দূর-সম্পর্কের মাসী। ঢাকুরিয়ার কাছে থাকে কোথায় বুড়ী।

—চ'লে এলাম মাসীমা। কিছুদিন থাকবো তোমার কাছে।

মালবিকা কথা বলে মাসীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে। দৃষ্টি গেছে অনেকদিন, শ্রুতিও যেতে বসেছে। কানের কাছে চেঁচিয়ে না বললে কিছুতেই শুনতে পান না তিনি।

—সে কি লা মালু! ঘর-দোর ছেড়ে চলে এয়েছিস?

মাসী শুধোলেন অবাক-মানা চোখে। গালে হাত তুললেন বিস্ময়ের আধিক্যে।

—হ্যাঁগো মাসী। সাতকাল গিয়ে তোমার এককালে ঠেকেছে। শেষ-সময়ে সেবা করবো না দু'দিন?

দন্তহীন হাসি হাসলেন মাসী। প্রবুদ্ধ দার্শনিকের মত। ভাব দেখালেন এমন, যেন মালবিকার আন্তরিক সেবা ব্যর্থ হয়ে যাবে। মূল্য থাকবে না কিছু। তবুও বললেন মাসী। হাসির জের টেনে বললেন,—তা যখন এয়েছিস তখন থেকে যা ক'টা দিন। সোয়ামী পুত্তুর ভাল আছে তো সব?

হেসে ফেললে মালবিকা। শুষ্ক হাসি। বললে,—হ্যাঁ গো মাসী, তারা সব ভালই আছে। তারা ভাল না থাকলে আমি আসতে পারি কখনও?

—তা বটে। তা বটে। আমার কি আর এত জ্ঞান আছে!

নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করলেন মাসী। জ্ঞানবুদ্ধি লুপ্ত হতে বসেছে তাঁর। আবার যেন ফিরে আসছে পিছনে-ফেলে-আসা শিশুকাল।

—ডাক্তার কি বলছে তোমাকে? অন্য প্রসঙ্গ তুলতে চায় মালবিকা। যাদের ফেলে এসেছে চিরদিনের মত, ভাল লাগে না তাদের কথা। বললে, কি বলছে ডাক্তার? এ যাত্রায় রক্ষা পাবে?

আবার হাসলেন মাসী। শিশুসুলভ সরল হাসি। ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকলেন খানিক। ধীরে ধীরে মালবিকার একটি হাত ধরলেন নিজের হাতে। শিশু যেমন সজোরে ধ'রে থাকে হাতের

খেলনা। মালবিকা বুঝলো, মাসীর হাত কাঁপছে থরথর। মাসী বললেন,—ডাক্তার কি বলবে ! ডাক এসেছে, সাড়া দিতেই হবে। কালা হয়ে গেছি এখন, কানে শুনতে পাই না একদম। তাই ব'লে যমের ডাকে সাড়া না দিয়ে রেহাই আছে মা ! ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। এখন কোবরেজ দেখছে।

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে মালবিকার। যেন লুকাতে চায়, তার চোখের জলের চিকণ। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

ঘরের মধ্যে অসুস্থ আবহাওয়া। ডাক্তারী আর কবিরাজী ওষুধের একেকটা উগ্র গন্ধ ভেসে উঠছে হাওয়ায়। কিছু গোটা ফল রয়েছে একটা চুবড়ীতে। কমলালেবু, মর্তমান কলা, আঙুর এক গুচ্ছ।

—ঘর-দোরের কি ব্যবস্থা করলে ? কে দেখবে ? কার হাতে তুলে দিলে ?

ধরা গলায় বলে মালবিকা। মনে হয়, মাসীর শারীরিক অবস্থার কথা না তুললেই ঠিক হ'ত। চোখের সামনে দেখছে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। দেখছে মাসীর চোখে মুখে করাল কালো ছায়া। শ্বাসের গতি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

—মুরলীধরের হাতে তুলে দিয়েছি। মাসী বললেন আস্তে আস্তে। একটা কি দু'টি কথা বলতেই হাঁফ ধরছে বুকে। টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিতে থাকেন একটা একটা। আবার বললেন,—দেবোত্তর ক'রেছি আমার সামান্য সম্পত্তি। নাতিদের সেবায়েৎ ক'রে দিয়েছি।

—বেশ ক'রেছ। তবেই রক্ষা পাবে। তোমার মুরলীধরও সেবা পাবেন নিয়মমত।

খুশীর সুরে বললে মালবিকা। বিষয়-বন্দোবস্ত শুনে যেন সে মাসীর বুদ্ধির তারিফ করে। দ্বিতীয় জন নয়, তৃতীয় জন নয়, প্রথম পুরুষে উৎসর্গী-কৃত হয়েছে মাসীর ভূসম্পত্তি, শুনে যেন সে কত সুখী হয়। নিশ্চিন্ত হয় এক সুব্যবস্থায়।

—তবে একটা কথা মা। ক্ষণেক থেমে বললে মাসী কাঁপা কাঁপা সুরে,—আমার মুরলীধর তো হাত বের ক'রে সত্যিই আর ভোগ খেতে আসবেন না। আমার নাতিরাই ভোগ-দখল ক'রে খেয়ে প'রে থাকবে। ভোগ দেবেন পুরোহিত, প্রসাদ পাবে আমার বংশধরেরা।

মালবিকা লক্ষ্য করেছে এসেই, মাসীর নাতিরা উন্মুখ উৎসুক হয়ে মাসীর ঘরের আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করছে। নজর রেখেছে কড়া, কখন শেষ-শ্বাস পড়বে বুড়ীর। অপেক্ষায় প্রতীক্ষায় আছে যেন সাগ্রহে।

এক সপ্তাহ কাটলো না আর। শ্বাস উঠলো শেষ সময়ে।

অক্সিজেন গ্যাসের সুনাম ঘুচিয়ে দিয়ে মাসী হঠাৎ এক মধ্যরাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। যেন অনেক কষ্ট-ভোগের পর এক গভীর সুখনিদ্রায়, চিরসুসুপ্তিতে ডুবে গেলেন তিনি।

অভাগা যেদিকে চায়—

মালবিকার শেষ ভরসাও ঘুচে গেল ঘন তমসাবৃত এক মধ্যরজনীতে। নাতিরা হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে বুড়ীকে নিয়ে চ'লে যায় গঙ্গার পথে। তর সয় না যেন তাদের। যদি আবার হঠাৎ বেঁচে ওঠে বুড়ী কোন মন্ত্রবলে, তাই যত তাড়াতাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া যায় বুড়ীকে। যতক্ষণ না ছাই উড়ছে চিতা থেকে, ততক্ষণ চিন্তামুক্তি নেই। স্বস্তি নেই।

শবদেহ রাস্তার মোড়ে তখনও। মালবিকাও বেরিয়ে পড়লো মাসীর বাসা থেকে। মাসীর গুণধর নাতিদের চোখের চাউনি কেমন যেন ভাল লাগলো না তার। বলা যায় না কপালে কি আছে। তাই মানে মানে স'রে পড়াই ভাল। বিদেয় হয়ে যাওয়ার হুকুম শোনার আগে সসম্মানে বিদায় হয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

—বল হরি—

নাতিরা চীৎকার করছে পাড়া জাগিয়ে। নীরব-রাত্রে প্রতিধ্বনি ভেসে উঠছে শ্মশানযাত্রীদের গগনবিদারক শব্দে। শুনলে মনে হয়, হরি স্বয়ং সম্পূর্ণ বধির। ঠিক এই ধরনের সরবে না ডাকলে কিছুই তাঁর কর্ণগোচর হয় না।

হঠাৎ যেন মনে পড়লো মালবিকার। চার দেওয়ালের ঘর থেকে সে রাস্তায় নেমে প'ড়েছে। বদ্ধতা থেকে এসেছে সে শূন্যতায়। চেতনা হারিয়েছিল যে এত-ক্ষণ। সাড় ফিরলো সহসা।

কে বলবে দিনের জনবহুল শহর কলকাতা। গভীর রাতে চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না জনতার। শোনা যায় না ডবলডেকার বাসের ঘর্ঘর। ট্রামের ঘণ্টা-ধ্বনি নেই। একখানা বেবী ট্যাক্সিও নেই। রিক্সা পর্যন্ত দেখা যায় না একটাও। রাস্তার এক বাঁকে এক পাল কুকুরের জটলা। পথের কুকুর, পথ আগলে ব'সে আছে।

ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলছে একটা একটা। অনেক দূরে দূরে। নির্বাক নিস্পন্দ প্রহরীর মত দেখায়। সোনালী-পাগড়ী-মাথায় পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে যেন। পাহারা দিচ্ছে।

কিন্তু আলো না থাকলেই চলতো। আরও যেন ভয় আর রহস্য সৃষ্টি করছে নিঃসীম আঁধারে। পঞ্চমীর ফ্যাকাশে ফালি চাঁদের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। সঞ্চরমান মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে সলাজে।

ভয় ভয় করছে মালবিকার। আড়ষ্ট পা যেন চলতে চাইছে না।

বরফ-ঠাণ্ডা হাওয়া চলেছে। শীত শীত করছে। শাড়ীর আঁচল টেনে টেনে বুকে পিঠে এঁটেসেঁটে জড়িয়ে নেয় মালবিকা। অত্যন্ত মন্থরগতিতে এগিয়ে চললো সে। বরাতে যা আছে তাই হোক।

ঐ তো অদূরে ঢাকুরিয়া ষ্টেশন। অন্ধকার আকাশে মাথা তুলেছে ষ্টেশনের ওভার-ব্রীজ দেখা যায় অস্পষ্ট। প্রথম দৃষ্টিতে দেখায় কিউবিষ্ট দানব একটা। জ্যামিতিক আকার। কতকগুলি সরল-রেখার সম্মেলন যেন।

মাঝরাতের ঘন অন্ধকারের মতই শীতও বেশ ঘন হয়েছে।

কাঁপুনি ধরছে যেন থেকে থেকে হিমার্ত হাওয়ায়। হিম পড়ছে রেণু রেণু। না কি ভয় আর দুশ্চিন্তায় কেঁপে কেঁপে উঠছে মালবিকা। ঘর ছেড়ে এসেছে সে। মাসীও চলে গেল তার। এই সব দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া কি না কে জানে। মালবিকার নিজেকে মনে হয় সে যেন শক খেয়েছে বিজলী-কারেন্টের। একটার পর একটা আঘাত পেয়ে পেয়ে মালবিকা আজ জর্জরিত।

রাস্তার দু'পাশের দোকানে দোকানে সাইনবোর্ড ঝুলছে। দোকানের নাম লেখা। অস্পষ্ট পড়া যায় আলো-আঁধারে।

ইঞ্জিনের সান্টিং ভেসে উঠলো হঠাৎ। একখানি ইঞ্জিন মাত্র, বগী নেই পেছনে। লাঙ্গুলহীন এখন। লাইন বদল করছে হয়তো। কার সঙ্গে এখনই

ভিড়িয়ে দেবে রেল-কর্তৃপক্ষ। আপে দেবে না ডাউন দেবে, কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু কি ভীষণ অন্ধকার। ভয়ে জড়সড় হয়ে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মালবিকা। আবার চলতে থাকে তখনই। হয়তো সে একা ব'লেই এতটা ভীতি অকারণে। এই জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করে আজকের মধ্যরাতে, সত্যিই সে একা। একেবারে নিঃসঙ্গ।

স্টেশনের টিকিট-ঘরের জালি-জানলার সামনে গিয়েই ঘড়ির দিকে তাকালো মালবিকা। রাত এখন কত। চারটে বেজে গেছে প্রায়। সাড়ে সাত মিনিট চারটে বেজে।

—কলকাতার টিকিট একখানা।

—কোন ক্লাশ ?

—থার্ড ক্লাস।—থার্ড ক্লাশের টিকিটই দিন।

হাতের মুঠিতে টিকিট মালবিকার। এগিয়ে চলে সন্ত্রস্ত পদক্ষেপে। প্ল্যাট-ফর্মে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে স্থাণুর মত।

হিম পড়ছে ঝির ঝির। চতুর্দিক যেন ঢেকে আছে হিমানী কুয়াশায়। বেশী দূরে যেন দৃষ্টি চলছে না। উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাস চলছে এলো-মেলো। শাড়ীর আঁচল টেনে টেনে বুকে পিঠে জড়ায় মালবিকা। এদিক ওদিক দেখতে থাকে, ঘুম ঘুম চোখে। মাসীর সেবায় থেকে ক'রাত্রি চক্ষে ঘুম ছিল না। আজ যেন জড়িয়ে আসছে চোখ। দুবার ঘুম নামছে।

কার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে শিউরে উঠলো মালবিকা।

খুব কাছে থেকে কে যেন শ্বাস ফেললো। ফিরে তাকালো সে। মানুষ দেখে কোথায় এত ভয়ে স্বস্তি পাবে একটুকু, তা নয়। মালবিকা শিউরে শিউরে ওঠে যেন। এগিয়ে যায় কয়েক পা, ভয়ে ভয়ে। শ্বাস আটকে যায় গলায়।

এক লহমায় ঠিক দেখতে পাওয়া যায় না যেন। স্টেশনের হিমেভেজা প্ল্যাটফর্মে লাল সুরকি আর বেলে-পাথর। মালবিকার স্লিপারে শব্দায়িত হয় প্ল্যাটফর্ম। মালবিকার অসংলগ্ন পদশব্দেই ধরা যায় সে অস্বাভাবিক ভয় পেয়েছে। সে দ্রুতপায়ে এগোতে থাকে আর প্ল্যাটফর্মে ভীরু সুরের এক অস্ফুট বাজনা চলতে থাকে যেন।

অথচ ভয় পাওয়া সমীচীন নয়, লোকটি যখন টিকিট কেটেই প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেশ কিছুদূরে পেঁছে একবার পিছু ফিরে তাকালো মালবিকা। তার-পরেই থমকে থাকলো যেন। শীতের হাওয়ায় কাঁপছে তার বক্ষদেশ। দুরু দুরু শিহরণ লাগছে তার বুকে।

কে একজন যেন মাতালের মত টলতে টলতে মন্থরতম গতিতে এগিয়ে আসছে মালবিকার দিকেই। তাই এত ভয় পেয়েছে সে। মালবিকা লক্ষ্য করে. সে থামলেই সঙ্গে সঙ্গে লোকটিও থেমে পড়ছে যেন। মালবিকা চলতে শুরু করলেই সেও চলতে থাকে তখন।

ভয়ে কণ্ঠ শুকিয়ে যায়। লোকটি সত্যিই আবার আসছে তার দিকেই। চলছে যেন সাবধানী পশুর মত! হয়তো পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় চলছে থেমে থেমে। যেন চোর-চোর খেলছে মালবিকার সঙ্গে। যেন ধরেই নিয়েছে আর খানিক এগিয়ে মালবিকা আর যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে না। প্লাটফর্ম শেষ হয়ে যাবে।

আর নয়। মালবিকা ন যযৌ ন তস্থৌ। সে যেন জোর করে নিজেকে থামিয়ে রাখে। যদিও ভয়ে আর শীতে সে ভীষণ কাঁপছে। সে পণ করেছে, আর এক পা নড়বে না।

লোকটি দাঁড়িয়ে পড়লে কি হবে, হয়তো পরমুহূর্তেই পা চালাবে আবার। মালবিকা চোখে-মুখে আঁচল চাপলো সজোরে। ইচ্ছা হচ্ছে এখুনি সে আত্মহত্যা করুক। কিন্তু উপকরণ নেই কিছু হাতে। মরণের কোন অস্ত্র কিম্বা ওষুধ। একটা শানানো ভোজালী। কিম্বা একটুকরো বিষ।

কে জানতো ঢাকুরিয়া স্টেশনের প্লাটফর্ম এমন সময়ে এত বেশী ফাঁকা আর জনশূন্য। মালবিকা ভাবতে পারে-নি। তার সঙ্গে দেখা হবে এমন একজন অদ্ভুত মানুষের। এ হেন পরি-স্থিতিতে। মালবিকা এদিক-ওদিক চোখ ফেরায়। একটা কুলিও নেই।

দূর থেকে দেখে বয়স অনুমান করা যায়। মাঝবয়েসী। লোকটি কেমন কান পেতে কি যেন শুনছে। সাপের হিস্ হিস্ শব্দের মত দূরাগত এক আওয়াজ তার কানে পেঁছেছে। ঘাড় বেঁকিয়ে শুনছে সে। তারপর আবার চলতে শুরু করে ধীরে ধীরে। পশু যেমন শিকার ধরতে এগোয় নিঃশব্দ পায়ে।

বিশ হাত দূরের তফাৎ মাত্র হবে। পা পা অগ্রসর হতে থাকে লোকটি। মালবিকার কণ্ঠ থেকে গুমরানি ককিয়ে উঠছে। ভয় আর ঠাণ্ডায় কাঁপছে সে ঠকঠক। হঠাৎ মনে হয় মালবিকার, গুণ্ডাই হবে হয়তো। ঠিক তার মতই দেখতে যেন। একটু বেশী মাত্রায় মদ খাওয়ার পর সুমন্তর চালচলন হয় ঠিক এই ধরনের।

—না সুমন্ত, তুমি আমাকে ধরতে এসো না। সুমন্ত, সুমন্ত—

ফিসফিসিয়ে বললে মালবিকা। উচ্চারিত কথাগুলি কিন্তু কানে যায় না লোকটির।

কোথায় সুমন্ত। সে এখন তার বেলেঘাটার বাসায় হয়তো মালবিকার প্রতীক্ষায় জেগে বসে আছে। আশায় আশায় আছে, হয়তো মালবিকা আবার ফিরে আসবে রাগ পড়লেই।

সাপের ফোঁস ফোঁস ক্রমে অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। মাথায় আলোর মণি জ্বালিয়ে বিরাট একটা ময়াল সাপ এঁকেবেঁকে আসছে জোরালো গতিতে।

ট্রেণখানা এসে থেমে যায় প্লাটফর্মে। প্রথম প্যাসেঞ্জার ট্রেণ। দিনের প্রথম লোকাল কলকাতামুখী।

মালবিকা প্রায় ছুটতে ছুটতে এক-খানা কামরায় উঠতে যাবে, দেখলো লোকটিও ছুটছে তার পিছু পিছু। কামরার পা-দানিতে উঠতেই টান পড়ে তার উড়ন্ত আঁচলে। লোকটি সজোরে ধরেছে মালবিকার আঁচল। তার একটি হাত ধরতে গিয়ে ফসকে যায় যেন। মালবিকা কামরায় উঠে বসে পড়লো একটি বেঞ্চিতে। হাঁফাতে থাকলো ঘন ঘন।

আবার সেই দম-আটকানো ভয়। কামরায় আর অন্য কেউ নেই। শুধু তারা দুজন। লোকটির চোখে শূন্য দৃষ্টি। কেমন যেন হাসছে মৃদু মৃদু। ঠিক কোন দিকে তাকিয়ে আছে, বোঝা যায় না।

মালবিকা উঠে পড়লো বেঞ্চি থেকে। সে অন্য কামরায় যেতে চায়। এমন এক

অদ্ভুত মানুষের সহযাত্রী হতে চায় না সে। কামরার দুয়োর পেরিয়ে নামতে গিয়ে মালবিকা দেখতে পায় একজন টিকিট-চেকারকে। প্রায় মুখোমুখী সংঘর্ষ লাগতো। চেকারের হাতে পাঞ্চিং মেশিন।

—কি হয়েছে বলুন তো? জিজ্ঞেস করলে চেকার সবিস্ময়ে।

—ঐ যে ঐ লোকটি। বললে মালবিকা। হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বললে,—লোকটি আমাকে ধরতে আসছিল। কি অভদ্র বলুন তো!

চেকার গাড়ীতে উঠে পড়ে। দেখে নেয় লোকটিকে। তারপর তাচ্ছিল্যের হাসি ফোটে তার মুখে। বলে,—না না। আমি ওকে চিনি। ও কারও ক্ষতি করে না। তেমন মানুষই নয়।

—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? ক্রোধের সঙ্গে বললে মালবিকা। চাপা রাগের সুরে। বললে,—বাধা দিচ্ছিল আমাকে। ট্রেণে উঠতে যাবো এমন সময়ে—

—না না। হেসে হেসে বললে চেকার। বললে—ও হচ্ছে আমাদের কৃপাবিন্দু। খবরের কাগজের হকার। কলকাতায় যায় রোজ এই ট্রেণে, কাগজ ডেলিভারী নিতে। কৃপাবিন্দু চোখে অন্ধ, দেখতে পায় না কিছু। ট্রেণের দরজা খুঁজে পায় না তাই এমন হাতড়ায়। চোখে দেখতে পায় না, কান দিয়ে শুনে শুনে চলাফেরা করে। আন্দাজে রাস্তা চলে।

ট্রেণের হুইসিল ককিয়ে উঠলো। একটা যান্ত্রিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ চলতে শুরু করলো। মালবিকা বসে পড়লো একখানা বেঞ্চিতে। কথার শেষে কখন ট্রেণ থেকে নেমে গেছে চেকার, খেয়াল হয় না মালবিকার। সে তখনও হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে উঠছে। এত শীতেও ঘামছে মিন মিন।

বেঞ্চি থেকে আবার উঠে পড়লো মালবিকা। লোকটির প্রায় পাশে গিয়ে আসন নেয়। তার একখানি হাত লোকটির পিঠে রাখলো। বললে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। শত সহস্র ধন্যবাদ।

কৃপাবিন্দু দৃষ্টিহীন চোখ ফেরায় মালবিকার মুখে। বলে—কেন বলুন তো? আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনি কি আমাকে চেনেন? আমি চোখে একেবারে দেখতে পাই না। আমি একজন হকার কাগজের।

—না, আপনি আমাকে চেনেন না। আমিও নয়। খুশী খুশী সুরে বললে মালবিকা। বললে,—তবুও আপনাকে ধন্যবাদ।

—কেন বলুন তো? কি আমি করেছি যে ধন্যবাদ পাওনা হবে?

—আপনি বুঝবেন না। বললে মালবিকা। ফিসফিসিয়ে বললে,—আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, মেয়েরা কখনও একলা থাকতে পারে না। মেয়েরা বাঁচতে পারে না একা একা।

ট্রেণ স্পীড ধরেছে বেশ। ভোরের হাওয়া আসছে মিষ্টি মিষ্টি। চূর্ণ কুন্তল উড়ছে মালবিকার কপালে।

কে জানে সুমন্ত হয়তো প্রতীক্ষার জেগে বসে আছে। আশায় আশায় আছে, হয়তো রাগ পড়লে তার মালবিকা আবার ফিরে আসবে তার কাছে।

ট্রেণ ছুটলো শান্টিং শুনিয়ে শুনিয়ে। প্রথম লোকাল প্যাসেঞ্জার।

এখানে
কলেরার
টিকা
দেওয়া হয়

টাটকা
ফলের রস

শিল্পী : অমিয় ঘোষ

মৃত বার্ষিকী দেশে দেশে

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

লিও তলস্তয়

রুশ দেশের ইতিহাসে ১৯৬০ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই তারিখে পঞ্চাশ বছর পূর্বে মহৎ মানবতাবাদী ঔপন্যাসিক লিও তলস্তয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত বছর সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৭ই নভেম্বর থেকে ২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত 'তলস্তয় দিবস' পালিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও গত বছরে 'তলস্তয় দিবস' উদ্‌যাপিত হয়েছে।

এই উপলক্ষে ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারতবর্ষ, আর্জেন্টিনা, ব্রিটেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশ থেকে প্রখ্যাত লেখক বিদ্বজ্জন ও তলস্তয় রচনাবলীর অনুবাদকেরা আমন্ত্রিত হয়ে মস্কোয় এসে এই মহান লেখকের স্মৃতি-তর্পণে সমবেত হয়েছিলেন।

তলস্তয়ের জন্ম হয়েছিল ১৮২৮ সালে। তলস্তয়ের সাহিত্য পাঠ করে আসলে আমরা রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে, সুখ-দুঃখে দোলায়িত মানুষের গভীর জীবন-সত্যের সঙ্গে পরিচিত হই। পুশকিন-গোগোলের আমল থেকে গোর্কি পর্যন্ত কোনো মহৎ রুশ লেখকই সামাজিক পটভূমি ও সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন নি। রাজা-রাজড়া থেকে কৃষক জীবনের নিরূপকরণ সারল্য—সর্বপ্রকার জীবন-স্রোতেই তলস্তয় অবগাহন করেছিলেন। সব মানুষের হৃদয়ের চাবিকাঠি ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। মস্কোতে তলস্তয়ের পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছিল বলশয় থিয়েটারে রুশ লেখক ও পণ্ডিত লিওনিদ লিওনফ-এর পৌরোহিত্যে। তুলা ও ইয়াসনায়া পলিয়ানাতে (জীবদ্দশায় যে দুটি জায়গায় তলস্তয় থাকতেন) সেখানকার বাসভবন দুটি পূর্বের মত সুসজ্জিত অবস্থায় রাখা আছে। এ উপলক্ষে ঐ দুটি অঞ্চলে বিরাট জনসভায় তলস্তয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করা হয়। তলস্তয় বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ত্রেতিয়াকফ আর্ট গ্যালারিতে রুশশিল্পীদের দ্বারা তলস্তয় রচনাবলীর চিত্রায়ণের এক প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করা হয়। ১৯৬০ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখটি 'তলস্তয়

লিও তলস্তয়

স্মরণোৎসব দিবস' হিসেবে পালন করবার জন্য আহ্বান জানিয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের "নিখিল-সোভিয়েট তলস্তয় পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী কমিটি" একটি কার্যসূচী প্রণয়ন করেছিলেন। সেই কার্যসূচী অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রকাশালয় তলস্তয়ের সম্পূর্ণ রচনাবলীর অনেকগুলি খণ্ড প্রকাশ করেছেন। মোট কুড়ি খণ্ডে এই সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত। প্রথম ১৪টি খণ্ডে তলস্তয়ের সমস্ত গল্প উপন্যাস ও নাটক অন্তর্ভুক্ত; ১৫শ খণ্ডে সংকলিত সাহিত্য-শিল্পনন্দনতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে লেখা তলস্তয়ের প্রবন্ধাবলী; রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধাবলী ১৬শ ও ১৭শ খণ্ড দুটিতে সংকলিত; অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খণ্ডে স্থান পেয়েছে তলস্তয়ের পত্রাবলী এবং শেষ খণ্ডটিতে আছে তলস্তয়ের দিনলিপি ও নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁর নোট ও মন্তব্যসমূহ। এ ছাড়াও এই উপলক্ষে তলস্তয়ের উপন্যাসগুলির একাধিক বিশেষ সংস্করণ, তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিনের প্রবন্ধাবলী ও মন্তব্যসমূহ এবং বিদেশী ও সোভিয়েট-সাহিত্য সমালোচকদের অনেকগুলি আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত করার উদ্যোগও হয়েছিল। বিদেশী ভাষায় লেখা গ্রন্থের রাষ্ট্রীয় প্রকাশালয় তলস্তয়ের রচনাবলীর অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশ করার আয়োজন করেছেন। "ওঅর এণ্ড পীস্", "আনা কারেনিনা", 'রেজারেকশন্' এবং 'হাজী মুরাত', 'সেবাস্তোপোল স্টোরিজ্' ইত্যাদি শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে।

১৫ই নভেম্বর থেকে ২৫শে নভেম্বর পর্যন্ত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৫৫টি রঙ্গমঞ্চে তলস্তয়ের নাটক বা উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করা হয়েছে এছাড়া আরও মোট ৩৭টি রঙ্গমঞ্চে তলস্তয়ের গল্প, উপন্যাসের নৃত্যনাট্যরূপ (ব্যালে) ও গীতিনাট্যরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়া 'রেজারেকশন' ও 'দি কসাকস্' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে তলস্তয়ের গল্প-উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপায়ণের নির্বাচিত কয়েকটি ফিল্ম-এর নতুন প্রিন্ট প্রদর্শিত হচ্ছে এই উপলক্ষে।

মস্কোর তলস্তয় রাষ্ট্রীয় স্মৃতি-ভবনে এবং ইয়াসনাইয়া পোলিয়ানায় তাঁর বাসভবনে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, তলস্তয়ের দিন-

লিপি ও পত্রাবলীর বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অসংখ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তলস্তয়ের সাহিত্য ও কর্মজীবন সম্পর্কে বক্তৃতা-মালা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়েছিল।

লিও তলস্তয় শুধু একজন মহৎ লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর কালের একজন মহান মানবতাবাদী। তাঁর সমস্ত রচনাবলী শান্তি ও মানবপ্রেমের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। 'সেবাস্তোপোলের গল্পগুচ্ছ', 'সংগ্রাম ও শান্তি' উপন্যাসে বীরত্বব্যঞ্জক অথচ করুণার রসে সিঞ্চিত এই মানবতার রূপকে প্রত্যক্ষ করা যাবে। 'আনা কারেনিনা'র বিভিন্ন চরিত্রের মহানুভূতিশীল রূপায়ণেও এই মানবতারই প্রকাশ। 'রেসারেকশন' (পুনরুজ্জীবন) উপন্যাসে সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে আবেগময় প্রতিবাদে এই মানবতার সুর সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত। মস্কোতে তলস্তয় রাষ্ট্রীয় স্মৃতিভবনে তলস্তয়ের উপরোক্ত উপন্যাসসমূহের বহু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, পত্রাবলী ও রোজনামচার সংগ্রহ সুরক্ষিত আছে। তলস্তয় কক্ষটির নামকরণ করা হয়েছে 'ইস্পাত'। এই কক্ষের দেওয়াল, মেঝে ও ছাদ ইস্পাতের তৈরী। এই কক্ষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিস এক সিন্দুক ভর্তি তলস্তয়ের পত্রাবলী—যা সম্পূর্ণ ব্যক্তি মানুষটিকে চিনতে আমাদের সাহায্য করে।

ভারত, চীন, জাপান, মিশর, সিরিয়া, ইরাণ প্রভৃতি এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহ থেকে আগত পত্রাবলী একটি পৃথক সিন্দুকে রাখা হয়েছে। লিও তলস্তয়ের বন্ধু ছিল সারা দুনিয়ায়—সাময়িক পত্রের সম্পাদক, প্রকাশক, ধর্মগুরু, সাহিত্যিক ও দেশনেতা এঁদের ভিতর ছিলেন। এইসব পত্রে ইউরোপ ও এশিয়ার অবস্থা রুশ-বিপ্লব, ভারতের বিকাশ ও প্রাচ্যের বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও ব্যক্তিগত মতামত। স্বভাবতই তাঁরা এই মহান লেখকের রচনা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতেন, তাঁর চিন্তাধারা ও তাঁর পরিকল্পনা জানতে চাইতেন। তাঁর পুস্তকাবলী অনুবাদ করার অনুমতি কিম্বা পত্রিকার জন্য তলস্তয়ের নতুন প্রবন্ধ চেয়ে পত্র লিখতেন। সিন্দুকে বিভিন্ন দেশ থেকে আলাদা পত্রাবলী পৃথক পৃথকভাবে ধুলোবালি ও আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করার জন্যে বিশেষ কাগজ দিয়ে সাবধানে মুড়ে রাখা হয়েছে। অনেক পত্রাবলীর ওপরে মাদ্রাজ, কলকাতা, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, গুরুকুল-কাংড়া প্রভৃতি নানা জায়গার পোস্টাপিসের ছাপ সবিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে। গ্রাম থেকেও এসেছে বহু চিঠি। তলস্তয়ের পত্রোত্তরগুলির কপি পার্শ্ববর্তী সিন্দুকে রাখা রয়েছে। তলস্তয়ের লেখা কোনো কোনো পত্র ৩০।৪০ পৃষ্ঠা এবং সুন্দর ঘন করে লেখা।

মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত পত্রিকার প্রকাশক ডাঃ ডি গোপাল চেট্টি, 'দি বৈদিক ম্যাগাজিন' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক রামদেব, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দি লাইট অব দি ওয়ার্লড্' পত্রিকার প্রকাশক অধ্যাপক সোহ্‌রাবর্দী এবং আরো অনেকের কাছে তলস্তয় সহানুভূতি ও সদিচ্ছাপূর্ণ পত্রোত্তর দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষ থেকে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে মহাত্মা গান্ধীজী লিখিত ঐতিহাসিক পত্রাবলী। পৃথিবীর বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন উপলক্ষে উক্ত পত্রাবলীর তাৎপর্যপূর্ণ অংশ মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষীদের প্রতি ঘৃণা ও বিক্ষোভ এবং রাশিয়ার এই শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে পূর্ণ পত্রখানিতে গান্ধীজী তলস্তয়কে শ্রেষ্ঠ বন্ধু মনে করেই উচ্ছ্বাসে ভারতীয় দেশভক্তদের সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে দেশ-ভক্তরা যে নির্যাতন ভোগ করেছেন, তার কথা জানিয়েছিলেন। তলস্তয় সেই প্রথম পত্রের যে জবাব দিয়েছিলেন, গান্ধীজীকে, তা সত্যই মর্মস্পর্শী। তলস্তয় লিখেছিলেন, 'ট্রান্সভালের প্রিয় ভাইদের ভগবান সাহায্য করুন'। তিনি আরো লিখেছিলেন "আমার চিঠি যে ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে—সে খবরে আমি আনন্দিত।" এমনি করে চিন্তানায়কদ্বয়ের ভিতর বিখ্যাত পত্রালাপ শুরু হয় ১৯০৯ সালে। এই পত্রাবলী একদা প্রাচ্যের জনসাধারণের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের পীড়কদের বিরুদ্ধে যে কি দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতের জন-সাধারণের পক্ষে সমর্থন জুগিয়েছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'জনৈক ভারত-বাসীর নিকট পত্র' নামক বিখ্যাত পত্রে। তলস্তয় লিখেছিলেন, "একটা ব্যবসায়ী কোম্পানী কুড়ি কোটি মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে—একথা কুসংস্কার মুক্ত কোনো মানুষকে বললে তিনি এ কথার অর্থ বুঝে উঠতে পারবেন না। মাত্র ৩০ হাজার মানুষ, তাও সবল নয়, দুর্বল ও বিদ্বেষপরায়ণ মানুষ, এরা কী কুড়ি কোটি জীবন্ত, বিজ্ঞ, শক্তিমান স্বাধীনতাকামী মানুষকে দাসত্বের নিগড়ে বেঁধে রাখতে পারে।" তলস্তয় সর্বদা ভারতীয়দের স্বাধীনতার সংগ্রাম সমর্থন করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধী ১৯০৯ সালে প্রথম আশ্রমটির নামকরণ করেন তাঁরই নামানুসারে। তলস্তয় প্রায় এক দশকব্যাপী ১০।১২ জন ভারতীয়ের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তলস্তয় ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। ভারতের যাবতীয় বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, সাহিত্য, মহাকাব্য, চারুকলা ও লোকগাথা তিনি যেরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেছেন, গ্যেটে ছাড়া আর কোনো ইউরোপীয় লেখক তা করেন নি।

ভারত (কাংড়া) থেকে প্রকাশিত 'বৈদিক ম্যাগাজিন' নিয়মিতভাবে ইয়াসনায়া পোলিয়ানাতে পাঠানো হতো। ইউরোপীয় ভাষায় বেদের শ্রেষ্ঠ অনুবাদগুলিই তিনি পাঠ করেছিলেন। তলস্তয় শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, তাই নয়, রাশিয়ায় তিনি ঐ সমস্ত গ্রন্থ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তিনি দুটি প্রবন্ধ লিখে ছিলেন। 'শিল্প কাকে বলে' এই পুস্তকে তলস্তয় লিখেছেন, 'শাক্যমুনির ইতিহাস ও বেদের স্তোত্রাবলী মহৎ মনোভাবের পরিচায়ক এবং অশিক্ষিত-শিক্ষিত সব মানুষের কাছেই সহজবোধ্য।' তিনি বেদের আদর্শ রাশিয়ায় প্রচারও করেছিলেন। "পাঠ্য বিষয়ের পরিধি" নামক মানবের চিন্তাধারা ও অন্যান্য পুস্তকে তলস্তয় বেদ ও উপনিষদের অনেক বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। মহাভারত, রামায়ণ ও অন্যান্য ভারতীয় মহাকাব্য-গুলির রুশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে তিনি পাঠ করে-ছিলেন। ইয়াসনায়া পোলিয়ানার গ্রন্থা-গারে দুই-খণ্ডে সমাপ্ত রামায়ণের ফরাসী সংস্করণ দেখা যাবে। এই পুস্তক ১৮৯৪ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।

বেদ, শঙ্কর দর্শন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় দার্শ-

লিকের মতবাদের সঙ্গে তিনি রুশ-বাসীদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের গভীর প্রজ্ঞা এবং সহস্র বৎসরের সমৃদ্ধ মহাকাব্য ভারতবাসীর আত্মিক শক্তির প্রকাশ বলে তিনি মনে করতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তলস্তয়ের চিঠিপত্র ও দিনলিপিতে এবং তাঁর গ্রন্থ "লোকপ্রজ্ঞা সংগ্রহে" মহাভারত ও রামায়ণ থেকে শত শত বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত সংগ্রহে এমন লোকগাথা, উপাখ্যান ও প্রবচন আছে যেগুলি এদেশের কৃষকদের মধ্যে আজও চালু। তলস্তয় এই প্রচলন ও লোকগাথাগুলি তাঁর "রুশ পাঠ্যপুস্তকে" সংযোজিত করেছেন। ১৮৭০ সালের পর তিনি বয়স্কদের জন্যে ঐগুলিকে ক্ষুদ্র গল্পের আকারে লিখেছিলেন। রুশ ও ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে মৈত্রীর উজ্জ্বল অধ্যায় তিনি প্রায় এক শতাব্দী আগে সূত্রপাত করেছিলেন। বিশ্বের অনেক মনীষী, লেখক, কবি ও ঔপন্যাসিক তলস্তয়ের প্রতি অকৃত্রিম ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। তন্মধ্যে গোর্কি, আন্তন চেখভ, রোমাঁ রলাঁর মত উপন্যাসিক আছেন। লুই আরাগঁ, নাজিম হিকমতের মত কবি। ফ্রান্সের লুই আরাগঁ তলস্তয় প্রসঙ্গে বলেছেন—"এমন একটা সময় গেছে যখন গোটা ফ্রান্স জুড়ে যে কোনো ট্রেণযাত্রীকে তলস্তয়ের 'ওঅর এ্যান্ড পীস্' পড়তে দেখা যেত। এপর্যন্ত পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় যত্তো উপন্যাস লেখা হয়েছে, তার মধ্যে এটিকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। ১৯৪২-৪৩ সালে ফরাসীদের কাছে এই বইটি হয়ে উঠেছিল সব সময় হাতের কাছে রাখবার এবং সুযোগ পেলেই পড়বার মতো একটি রচনা। বারবার মনে হত (মহযুদ্ধের সময়), তলস্তয় যেন উপন্যাসটি অসমাপ্ত রেখে গেছেন। এর শেষ যে-কয়টি অধ্যায় তিনি লিখে উঠতে পারেন নি, সেই অধ্যায়গুলি আমাদের চোখের সমানে ঘটে চলেছে।"

'এ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোস দি ডন'এর লেখক মিখাইল শোলোকফ যথার্থ বলেছেন—'রুশ সাহিত্যে এবং বিশ্ব সাহিত্যে লিও তলস্তয় যেন সার্থকতার এক উত্তুঙ্গ ও অনধিগম্য পর্বতশৃঙ্গ।"
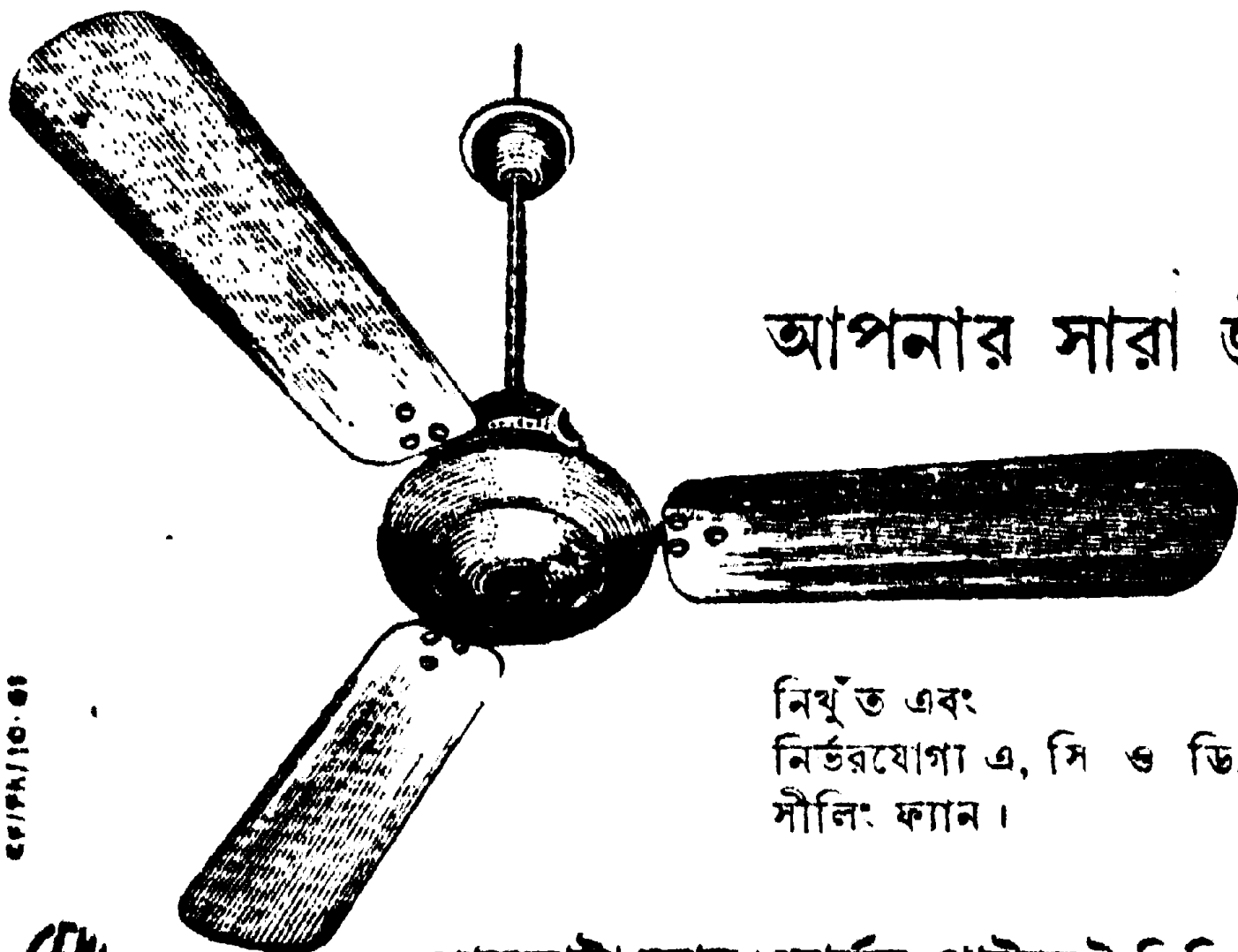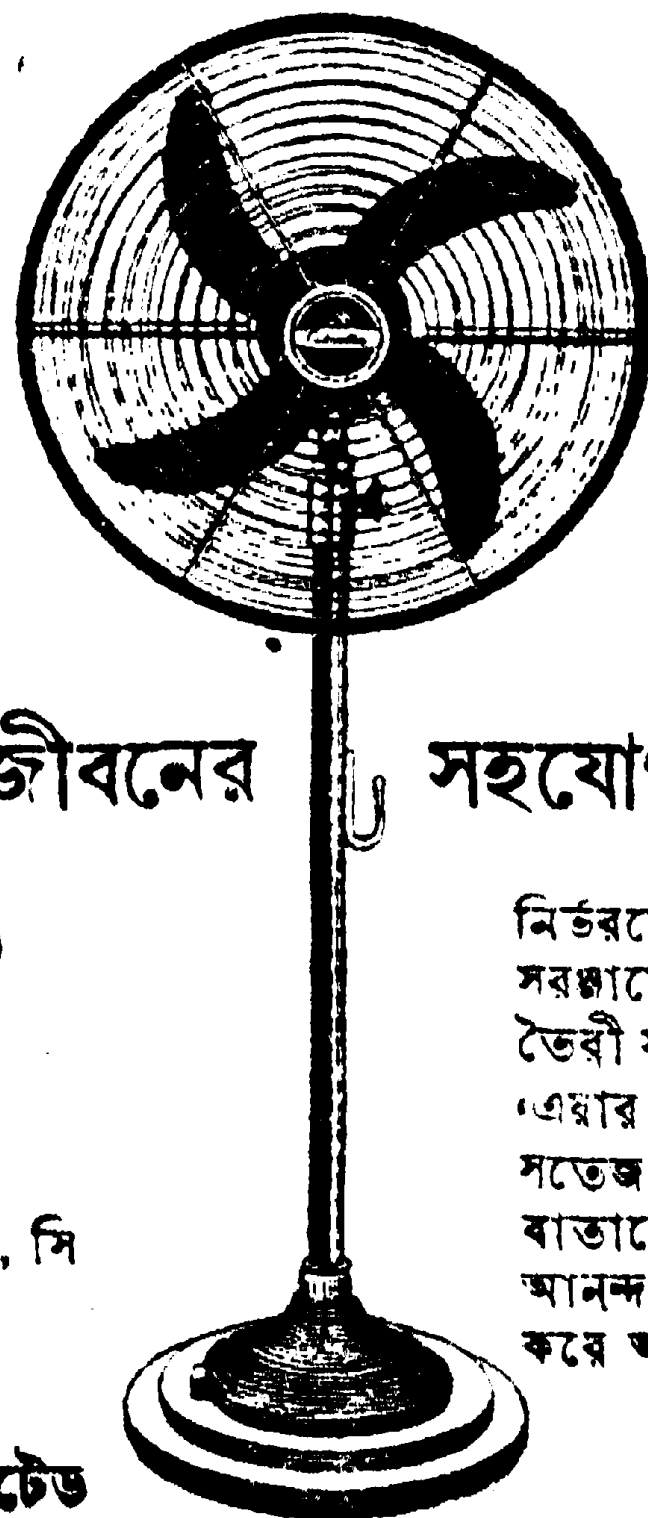
কুমীর শিকার

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রাণীবিজ্ঞানে সরীসৃপ বলতে যে জীবগুলি বুঝায় তার মধ্যে সকলের চাইতে হিংস্র ও ভয়ানক বোধ হয় কুমীর। কুমীরের অবশ্য নানা জাত আছে, এবং তার মধ্যে সব কয়টিই সমান বড় বা হিংস্র নয়, অবশ্য সব কয়টিই মাংসাসী। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, পৃথিবীতে একুশ রকম কুমীর আছে, যেগুলি যথাক্রমে কুমীর, এলিগেটর ও কেয়মান এই তিন নামে পরিচিত। আমাদের দেশে কুমীরকে সাধারণতঃ দুই জাতে ভাগ করা হয়। মেছো কুমীর, যাকে হিন্দীতে বলে ঘড়িয়াল এবং কুমীর, যাকে হিন্দীতে বলে মগর। ঘড়িয়ালের লম্বা সরু চোয়াল, পাখীর ঠোঁটের মত এবং তার ডগায়, নাকের ছিদ্রের আশে-পাশে, একটা বড় মাংসের পিণ্ডের মত থাকে। বড় কুমীরের চোয়াল ভারী এবং খাটো ত্রিভুজের আকৃতির। দেখলেই বুঝা যায়, তার চোয়ালে ভয়ানক জোর, বড় বড় পশুও সে কামড় সহজে ছাড়াতে পারে না।

মেছো কুমীর সাধারণভাবে মাছ ধরেই খায় এবং তার মুখের ও চোয়ালের গড়ন মাছ ধরার পক্ষে খুব সুবিধার। কিন্তু তাই বলে মেছো কুমীরের শাস্ত্রে এমন কিছু নেই যাতে, তার অন্য জীব—এমনকি সুবিধা পেলে মানুষ পর্যন্ত ধরে খাওয়া নিষেধ আছে। তবে আমাদের দেশে বড় পশু, যথা—গরু, বাছুর, মানুষ ধরে খায় অন্য কুমীরই বেশী এবং সেই কারণে তাদের কাছেই ভয়ের কারণও বেশী। এই জাতের কুমীর আমাদের দেশ থেকে নিয়ে দক্ষিণ চীন পর্যন্ত সব এলাকায় নদী অঞ্চলে পাওয়া যায়।

হিংস্র ও মানুষখেকো কুমীরের মধ্যে গঙ্গার মোহানা অঞ্চলের কুমীরই সবচেয়ে বড় ও ভয়ানক হয়ে থাকে। এখানের কুমীর ৩৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় বলে জানা গিয়েছে। অবশ্য এখন বন্দুক ও রাইফেল বহুলোকের হাতে গিয়েছে এবং সেগুলির পাল্লা ও মারণ-শক্তিও প্রবল হয়েছে। উপরন্তু কুমীরের চামড়ার তৈরী সৌখীন জিনিসের চাহিদা হওয়ায় কুমীর শিকারে লাভের পথও হয়েছে। সেই কারণে যে সকল অঞ্চলে মানুষের বসতি ঘন বা যাওয়া-আসা সহজ সেখানে কুমীরের সংখ্যাও কমেছে এবং কুমীর অত বড় হওয়ার সুযোগও আর পায় না। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে বড় কুমীর এখনও আছে এবং সেখান থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করার পথ তাদের বন্ধ হয়নি। যদিও সেই যাতায়াত আগের মত তাদের পক্ষে নির্বিবাদে হয় না। বড় কুমীর নদীতে এসে গরু-ছাগল নিয়েছে এসংবাদ পেলেই শিকারীদের কান খাড়া হয় এবং মানুষ নিলে সে-কুমীর মারতে একাধিক শিকারী ঘোরাফেরা আরম্ভ করেন। যদি স্থানীয় লোকেরা কিছু সহায়তা করে, কুমীরের খোঁজ খবর দেয়, তবে তাকে ঘায়েল করতে বা মারতে খুব বেশী দিন লাগে না। আগেকার দিনে এতো বন্দুক, রাইফেলের লাইসেন্সও ছিল না এবং গঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলির তীরে এত ঘন . বসতিও ছিল না। সুতরাং এক একটা অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে একই কুমীর উৎপাত করে যেতো। সাহেব শিকারীদের কুমীর মারায় খুব উৎসাহ ছিল না। কেননা কুমীর শিকারে ঝঞ্ঝাট অনেক এবং কুমীর গুলী খেলেই সর্‌সর্ করে জলে নেমে যায় বলে তার চামড়া পাওয়াও কঠিন।

যে সব জায়গায় গরু-ছাগল, লোক-জন নদীর জলে নামে, জল খেতে বা নিতে অথবা ধোয়া-মাজা বা স্নানের জন্যে, তারই কাছে কুমীর ঘোরেফেরে। জলের উপর ভাসে তার দুই চোখ ও নাকের ডগা, যা খুব লক্ষ্য করে না দেখলে নজরে পড়ে না। কোন পশু বা অসাবধান লোক জলে নামলে কুমীর দূরে থেকে লক্ষ্য করে জলের ভিতর দিয়ে তীরবেগে এসে তাকে ধরে বা ধরতে না পারলে লেজের প্রবল ঝাপটায় জলে ফেলে। তারপর জলের ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে বারে বারে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ভাল করে কামড়ে ধরে নিয়ে ডুবিয়ে মেরে, নিজের গর্তের কাছে বা নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে যায়। কত নির্বোধ পশু, কত অসাবধান স্ত্রী-পুরুষ, চঞ্চল ছেলেমেয়ে যে এইভাবে আগেকার দিনে কুমীরের কবলে যেতো, তার গোণাগুণতি নেই। বিশেষতঃ বড় নদ-নদী অঞ্চলে তো ঐ রকম দুর্ঘটনা প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারই ছিল।

গল্প আছে যে এক অন্যমনস্ক বউ এবং তার অল্প-বয়সি ননদ ভোরের দিকে জন-মানুষ চলাফেরার আগে নদীতে যায়। সেখানের কাজ শেষ করে সে বাড়ী ফিরে চুপচাপ কিসের চিন্তায় ডুবে থাকে; এদিকে বেলা হবার সংগে সংগে বাড়ীর লোকে তার সেই ছোট ননদের খোঁজ করে, কিন্তু সে যে ঐ বৌয়ের সংগে ভোরে বেরিয়েছিল, তা কেউ দেখেনি কাজেই তাকে কেউ জিগেসও করে নি।

বেলা হতে বাড়ীর বৌ-ঝিরা খেয়ে-দেয়ে যখন মুখ ধুচ্ছে, সেই সময় সেই তেল্লা-মন বৌ দেখলো বাড়ীর একটি ছোট মেয়ে লাফালাফি করে নাচছে। সেই দেখে সে ছড়া কেটে বললে,

"কিবা কথা মনে এলো আঁচাতে আঁচাতে
ঠাকুরঝিরে লইয়া গেল নাচাতে নাচাতে।"

গল্পে তারপর কি হোলো সে কথা বলে না। তবে কুমীরে মানুষ-নেওয়া প্রায় এই রকম সাধারণ ব্যাপারই ছিল।

কুমীর মারার ব্যবস্থাও নানা রকম ছিল। এক রকম বঁড়শী-কল ছিল যাতে ছটা কি আটটা বড় বড় ফলা দেওয়া বঁড়শী ইস্পাতের স্প্রীংয়ের উপর আঁটা থাকতো। সেই স্প্রীংগুলো চেপে বঁড়শীগুলো এক সংগে করে তাঁত দিয়ে বাঁধলে সেটা পদ্মের কুঁড়ির মত দেখতে হোতো। সেই বঁড়শীর ভিতরে ও উপরে মাংসের তাল তাঁত দিয়ে বেঁধে, তার গোড়ার দিকের লোহার বোঁটায় ইস্পাতের সরু তার অনেকটা লম্বা করে বেঁধে তারপর দড়ি দিয়ে ডাংগায় মজবুত খোঁটা বা গাছের গুঁড়ির সংগে শক্ত করে বেঁধে কুমীরের বাসার কাছে ফেলা থাকতো। কুমীর গিলে খায়, টুকরোও করে না, চিবিয়েও খায় না। সুতরাং এই টোপ-শুদ্ধ বঁড়শী গিলে আটকা পড়তো। এদিকে কুমীরের পেটে গিয়ে সেই বঁড়শীর তাঁত গলে গিয়ে ছিঁড়ে যাবা মাত্রই স্প্রীং খুলে সেই লোহার পদ্ম খোলা-ছাতার মত ছড়িয়ে কুমীরের পেটের ভিতর গেঁথে যেতো। তারপর কুমীরকে টেনে ডাংগায় তুলে শেষ করতে আর কতক্ষণ?

ইছামতি নদীতে পঁচিশ ত্রিশ বছর পূর্বেও খুব কুমীরের উৎপাত ছিল। আড়ংহাটায় নদীরঘাটে একটু গভীর জলে অনেক বড় বড় সুঁদরী-গরাণ বা শালের সরু, মোটা গুঁড়ি পোঁতা থাকতো দেখেছি। ঘাটে নৌকা আসার বাঁকা পথ ছিল, তা ছাড়া প্রায় সমস্ত ঘাটই এই রকম ছয় সাত সারি খোঁটায় ঘেরা ছিল। এই ঘেরা জায়গায় কুমীর ঢুকতে সাহস করতো না, কেননা সেখানে লুকিয়ে ঢোকা সহজ নয় এবং শিকার নিয়ে যাওয়াও সহজ নয়। তবে আঘাটা জায়গায় গরু-ছাগল তো যেতই আবার অসাবধান মানুষও যেতো এবং মাঝে মাঝে তাদের কুমীরেও ধরত।

আমার এক বন্ধুর জমিদারী ছিল ঐ অঞ্চলে। তাঁরা কয়েক ভাই কুমীর শিকারে খুব দক্ষ ছিলেন, বিশেষতঃ মেজ ও সেজ ভাই। একবার তাঁরা আড়ং-হাটার কাছারি বাড়িতে গিয়ে খবর পেলেন যে, একটি বড় কুমীর খুব উৎপাত করছে। শুনে ঐ দুই ভাই ওখানের জেলেদের ডেকে খোঁজ করতে বললেন যে, ঐ কুমীরটা নদীর পাড়ে কোথায় রোদ পোয়াতে ওঠে। এখানে বলা দরকার যে, কুমীর মাত্রেই বিশেষ করে শীতের দিনে নদীর পাড়ে একটা রোদ পোয়াবার জায়গা ঠিক করে। জায়গাটার ডাঙ্গার দিক ঝোপঝাড় বা খানাখন্দে ঘেরা হওয়া চাই যাতে ডাংগার দিক থেকে কুমীরকে দেখা অসম্ভব এবং তার কাছে পোঁছানও শক্ত। জায়গাটা নদীর দিকে খোলা ও উঁচু পাড়ের উপর হওয়া চাই, যাতে কুমীর নদীর দিকে দূর পর্যন্ত নজর রাখতে পারে এবং দরকার পড়লে ঢালু পাড় দিয়ে সড়সড় করে জলে নেমে যেতে পারে।

বড় কুমীর মাত্রেই খুব হুঁসিয়ার। শীতের দিনে প্রায় নির্জীবের মত অসাড় হয়ে শুয়ে রোদ পোয়ায়। আমরা জেলে নৌকায় চড়ে দূরে থেকে দেখে আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়েছি। নৌকার খোলের মধ্যে পাটা দিয়ে শুয়ে গিয়েও দেখেছি নৌকা যেমন কুমীরকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এনেছে সংগে সংগে কুমীরও আস্তে আস্তে পাড় বেয়ে নেমে জলে গিয়েছে। যদিও এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে সে শিকারীকে দেখতে পায়নি। অথচ যদি সেই নৌকায় শুধু জেলেরা থাকতো তবে সে নড়ে দেখতো কিনা সন্দেহ। এমন কথাও শুনেছি যে, সুন্দরবনের কুমীর পাড় থেকে নেমে এসে জেলে-ডিঙিগ উল্টে দেবার চেষ্টাও করেছে। ফিরিঙ্গিখালের প্রসিদ্ধ মানুষ-খেকো তো জেলে-নৌকা পর্যন্ত আক্রমণ করতো। নৌকা ছোট বা জেলে-ডিঙ্গি হলে, স্রোতের সংগে দাঁড় টেনে দ্রুত এঁকেবেঁকে পালানো ছাড়া উপায় ছিল না, কেননা তার সেই ত্রিশ-ফুট-লম্বা তাল গাছের গুঁড়ির দেহ দিয়ে সে যদি নৌকার বা ডিঙিগর নিচে ঘসড়া দিতে একবার পারতো, তবে হয় নৌকা উল্টে লোকজন জলে পড়তো নয়তো তলার কাঠ খুলে গিয়ে নৌকা ডুবে যেতো। আর জলে পড়া মানেই যমের সংগে সাক্ষাৎ।

যাই হোক আমার বন্ধুরা দুই ভাই স্থির করলেন যে, কুমীরটাকে মারতে হবে। তার খোঁজের জন্যে কিছু বখশিশের ব্যবস্থা করায় জেলেরা নদীর পাড় অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজে দেখতে লাগলো। তারপর একদিন খবর এলো যে বেশ কিছু দূরে একটা বড় কুমীরকে দেখা গিয়েছে নদীর পাড়ে ঐভাবে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। জায়গাটা খারাপ, নদীর পাড় অনেকখানি ভাংগাচোরা, কোথায়ও জলা কোথায়ও খুব ঝোপঝাড়, মানে সেখানে লোকজন চলাচলের মত জায়গাই নেই। অনেক খোঁজখবর করার পর ঠিক হোলো যে সেই জায়গা ছাড়িয়ে, নদী পথে একটু এগিয়ে একটা বাঁকের আড়ালে নেমে, ডাংগার পথ দিয়ে কুমীরের ঐ আড্ডার পিছন দিক দিয়ে ওখানের কাছবরাবর পোঁছানো যাবে। তারপর তো শিকারের পালা, তাতে ঝোপ-জংগলই বা কি আর নদীনালা, জলা বা ভাংগনের চড়াই বা কি? সে সবই তো শিকারের অংগ।

জলপথে গিয়ে পাড় ঘেঁসে নৌকা নিয়ে, কুমীরের কাছে সহজেই পোঁছানো

যেতো—অন্ততঃ রাইফলের পাল্লার মধ্যে। কিন্তু তারপর একটার বেশী দুটো গুলী মারার সুযোগ হোতো না কেননা নৌকো দেখবা মাত্রই কুমীর ঝাঁপিয়ে জলে পড়তো। গুলী খেয়ে সে মরে জলে ডুবে গেলে ঐ পর্যন্তই। তারপর তার চিহ্নও দেখা যেতো কিনা সন্দেহ, বড়-জোর তার পচা দেহটা কোথায়ও নদীর পাড়ে বা চড়ায় পাওয়া যেত, তাতে শিকারীর লাভ কি?

খোঁজ খবর মতো সব ঠিক করার পর একদিন ঐ শিকারী দুই ভাই, সঙ্গে লোকজন নিয়ে নৌকায় করে যথাস্থানে পৌঁছলেন। তারপর পোয়া মাইল মাঠ ভেঙ্গে হেঁটে কুমীরের আড্ডার কাছে পৌঁছলেন। যারা খোঁজ এনেছিল তাদের দুজন খুব সন্তর্পণে সরু পথ দেখিয়ে, ঝোপ-ঝাড় আস্তে ফাঁক করে, ওদের নিয়ে চলল। ঐ দুই ভাইয়ের মধ্যে মেজ যিনি তাঁর দেহ ছিল বিলক্ষণ মোটা এবং শরীরে শক্তিও ছিল অসাধারণ, কিন্তু শিকারের সময় তিনি যখন চলতেন তখন কোনও শব্দ হোতনা তাঁর চলায় এ আমি নিজে দেখেছি। তিনি আগে, এবং তাঁর পায়ের চিহ্নের ওপর পা ফেলে সেজ ভাই চললেন। হঠাৎ সামনের দুজন একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গুঁড়ি মেরে বসে গেল। বুঝা গেল যে শিকারের কাছেই পৌঁছন গেছে। তখন মেজভাই সেজভাইকে ইসারায় খুব সাবধানে, ঝোপের আড়াল করে, এগিয়ে আস্তে বল্লেন।

সামনের লোক দুটির কাছে পৌঁছতেই ঝোপের ভিতর দিয়ে দেখা গেলো যে পাঁচ-সাত গজ তফাতে একটা প্রকান্ড কুমীর শুয়ে রয়েছে। দুই ভাইয়েরই হাতে দো'নলা বারো বোরের বন্দুক 'রেডী' করা ছিল। সেজভাই উঠে দাঁড়িয়ে কুমীরের গর্দান লক্ষ্য করে গুলী চালালেন। গর্দানের কাছে শির-দাঁড়া "রোটাক্স" বুলেটের মারে ঘায়েল হয়ে যাওয়ায় কুমীরটা দ্রুত এগিয়ে জলে পড়তে পারলো না। কিন্তু বন্দুক তুলে মারবার মধ্যেই কুমীর যেটুকু সময় পেয়েছিল তার মধ্যেই সে ঘাড় ফিরিয়ে শত্রুর দিকে তাকিয়ে সেই সঙ্গে পাড়ের নীচের দিকে চলতে আরম্ভ করে। সেই জন্যে গুলীর চোট পুরোমাত্রায় শিরদাঁড়ায় লাগেনি। গুলী লেগে কুমীর উল্টে-পাল্টে নিচের দিকে গড়িয়ে গেল, কিন্ত সে কাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য ব্যারেলের গুলী তার সামনের দুই পায়ের মাঝ বরাবর বুকে লাগল। দুই গুলী খেয়ে কুমীরের অবস্থা তখন শেষ হয়ে এসেছে এবং মেজবাবু বন্দুক নিয়ে এগিয়ে যেতেই সাত আটজন লোক লগি দিয়ে এবং বোটহুক্ দিয়ে কুমীরকে চেপে ধরল।

ইতিমধ্যে ব্যবস্থা মত দুটো নৌকা, গুলীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে, নদীর বেয়ে ঐ জায়গার সামনে এসে তীরে ভিড়লো। তারপর কুমীরকে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে 'হাইয়ো জোয়ান' করে নৌকায় তোলা হোলো। যখন কাছারীর কাছের ঘাটে শিকার নিয়ে নৌকা ফিরলো তখন কুম্ভীর মহাশয় শেষ হয়ে গেছেন।

কুমীরটা বাইশ ফুট লম্বা ছিল এবং তার পেটে বড় কয়েকটা নুড়ীর সঙ্গে রুপোর বালা, মল, চুড়ি বেশ কয়েকটা পাওয়া যায়। কয়েকটি হতভাগিনী মেয়ে যে ওর পেটে গিয়েছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ ঐ থেকেই পাওয়া যায়।

এসব কথা ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর আগেকার। তখন এদেশে জাপানীদের এক খুব বড় কোম্পানী মিৎসুই বুশেন কাইশা অনেক আমদানী রপ্তানীর কারবার করতো। তার জাপানী অফিসারেরা খেলা-ধূলায়, বিশেষতঃ টেনিসে, খুব ভাল ছিল। দুজন, ওকোমাটো এবং সিমিটজু, টেনিস খেলায় বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল।

ঐ সব কোম্পানীর সঙ্গে আমার ঐ বন্ধুর চতুর্থ ভাই কাজে-কারবারে খুবই পরিচিত ছিল। একবার তাঁদের কল-কাতার বাড়ীতে ঐ জাপানী সায়েবদের নিমন্ত্রণ করায় তারা এসে ঐ বাইশ ফুট কুমীর এবং আরো তিনচারটা কুমীরের "ট্রফি" দেখে মেজবাবুকে ধরে বসলো যে তাদের কুমীর শিকারে নিয়ে যেতে হবে। তাদের বলা হোলো যে কুমীর শিকারে কষ্ট আছে, কিন্তু তারা সে কথা হেসেই উড়িয়ে দিল। বললে যে, "আমরা মিলিটারি শিক্ষাপ্রাপ্ত জাপানী পল্টনের লোক, আমরা ওসবে থোড়াই ভয় পাই। কুমীরের কাছে নিয়ে গেলে আমরা দেখিয়ে দেবো জাপানী রাইফেলে কুমীর মরে কিনা।"

আমার বন্ধুর দল বনেদী জমীদার গোষ্ঠীর কাজেই এই রকম অনুরোধ তারা ফেলতে পারেন না। তার কিছুদিন পরেই এক ছুটিতে চারজন জাপানী সাহেবকে নিয়ে তারা তিন ভাই গেলেন ঐ ইছামতিতে কুমীর শিকারে। এবং আগের থেকে খোঁজ রাখার কথা কাছারীতে জানিয়ে দেওয়ায় তাঁরা যাওয়া মাত্রই শুনলেন যে একটা মাঝারি গোছের কুমীর, ষোল সতেরো ফুট আন্দাজের, নদীর পাড়ে এক জায়গায় ডেরা করেছে, সেখানে যাওয়া খুব মুস্কিল হবে না। খবর পেয়ে তো জাপানীরা খুব খুসী, তাদের আর তর সয় না একটা রাত্রিশেষ হয়ে ভোর হতে।

পরের দিন যথা সময়ে নৌকায় করে সেই কুমীরের আড্ডার কাছাকাছি, শিকারীর দল তো এসে পড়লো। তার পর কিছুটা হেঁটে যাবার পর মেজবাবু নিচু গলায় বললেন "এবারে নিঃশব্দে এগোতে হবে।" তার পরের কথা সেজ-বাবুর জবানীতে এই মতঃ—

"আমরা তো পা টিপে টিপে একজনের পায়ের দাগের ওপর পেছনের জন এই করে এগোচ্ছি। যত এগোই ততই জাপানীরা দাঁত বার করে হাসে, অবশ্য নিঃশব্দে। সেই সঙ্গে মাথা নেড়ে জিগেস করে 'কোথায়?' রাইফ্ল্ তো চারজনাই বাগিয়ে ধরেছে, আমার তো ভয় হতে লাগলো যে উৎসাহের চোটে আমাদেরই না মেরে বসে।

"তারপর কাছাকাছি এসে পড়েছি যখন, তখন মেজদা হাত দিয়ে জোরে ইশারা করে বললেন গুঁড়ি মেরে নিচে ঝুঁকে এগোতে, যাতে ঝোপের ওপারে কুমীর টের না পায় যে আমরা কাছে এসে পড়েছি। আমরা তো ঝুঁকে পায়ে পায়ে এগোতে যাচ্ছি, দেখলাম যে জাপানীরা একেবারে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে চললো। বোধ হয় ওটা মিলিটারী চাল এই কথা ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছি। কয়েক পা এভাবে গিয়েছি কি-না গিয়েছি, এমন সময় ওদের বড়সাহেব জাপানী ভাষায় গাঁ—গাঁ করে চেঁচিয়ে উঠে লাফাতে আরম্ভ করলো। আর যত লাফায় তত তার গায়ের কোট সার্ট গেঞ্জী সব খুলে ছুঁড়ে ফেলে, রাইফ্ল্ তো মাটিতেই পড়ে। বলবো কি দাদা, লোকটা নিমেষের মধ্যে উদম ন্যাংটা হয়ে গেলো।"

"যাই হোক ফিরবার মুখে একটা চড়ায় এক দশ-বারো ফুট কুমীর দেখা গেল। সে ব্যাটা উল্টো দিকে মুখ করে ছিল সুতরাং চারজন জাপানী কাছে পৌঁছে চারটে রাইফেলের গুলীতে তুবড়ী ছুটিয়ে তাকে শেষ করলে। তাতেই তারা মহা খুসী, আর আমাদের ও আপনাদের শান্তি।"

এই হলো জাপানী মতে কুমীর শিকারের পালা।

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধকুমার সান্যাল

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাস তিনেক আমার সুখে কাটল, কিন্তু স্বস্তি ছিল না। যদি শুনতুম অজানা কোনও দেশের পথেঘাটে কোথাও শ্রীমতী হেনার অপমৃত্যু ঘটেছে, তবে আমি সানন্দে এবং সোৎসাহে আমার নানাবিধ সরকারি কাজে মনোযোগ দিতে পারতুম। দেশের বিশিষ্ট বাঙালি চট্ করে করোনারি থ্রম্বোসিস্ রোগে মারা যায়, কিন্তু মেয়েদের ইনফ্লুয়েঞ্জা বড় কম। সুখেই ছিলুম। গভর্নমেন্টের ধারণা আমি একজন পদস্থ কর্মচারী এবং সহকর্মীদের বিশ্বাস, আমার বয়সের তুলনায় একটু বেশি মাইনে পাই। এই দুই মিলিয়ে আমার কর্মজীবন এবং বসবাসের বাবস্থাদি ছিল বিশেষ আরামদায়ক। বিগত তিন মাসের মধ্যে আমি কেবল বোম্বাইতেই বসে ছিলুম না। আমাকে কখনও কখনও যেতে হচ্ছিল দিল্লী, অথবা ব্যাঙ্গালোর, জামসেদপুর অথবা মাদ্রাজ। আমি 'পারচেজিং' কমিশনের লোক। মধ্যে কয়েকটা দিন মহাবালেশ্বরের পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে গিয়েছিলুম।

বোম্বাই সমুদ্রে হাওয়া পড়ে গেলে গ্রীষ্মকালটা বড় যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। সেই কারণে আমি যখন এখান থেকে সরকারি কাজের অজুহাতে পালাবার ফিকির খুঁজছিলুম, ঠিক এমনি সময়ে রাঙামামার একখানা চিঠি পেলুম। তিনি লিখেছেন, হেনার বাবা মারা যাবার পর থেকে বৈষয়িক ব্যাপারটা লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। হিনুর বাড়িখানা আমারই নামে, কিন্তু সেখানা বিক্রি করা আমার ইচ্ছা নয়, অথচ ক্রেতা টাকা নিয়ে প্রস্তুত। ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়ির ভাড়াটেদের সঙ্গে খিটিমিটি চলছে, তার মিটমাট দরকার। এটর্ণী অবনীবাবুর আপিস থেকে আগেকার পরিমাণ মতো টাকা আসছে না—কাগজপত্রে কোথায় যেন কি গণ্ডগোল বেধেছে। এ-বাড়ির বাগানের উপর দিয়ে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট নাকি একটা রাস্তা বানাবে, সেজন্য কয়েক দিন আগে তারা জরীপ করে গেছে। তবে শুনতে পেলুম, আমাদের জীবদ্দশার পরে নাকি এখানকার খেবি ডাঙাগুলোর কিছু উন্নতি হবে। তারা নক্সা তৈরি করতে বসেছেন।

চিঠির শেষের দিকে রাঙামামা পারিবারিক সংবাদ দিয়েছেন সামান্য। ঠাকুরপো সম্প্রতি ভূতপ্রেত তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছেন। তিনি দিনের বেলা ঘুমোন, আর রাত্রে বাগানের কোণে গিয়ে ধ্যান পেতে বসে থাকেন। হেনা বাড়িতেই থাকে, পড়াশুনো করে। তুমি না এলে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারগুলো মিটবে না।

চিঠিখানা পড়ে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলুম কেন, তার সঠিক কারণটা নিজেও তলিয়ে বুঝলুম না। সম্ভবতঃ যার অপমৃত্যু কামনা করেছিলুম, সে যে নিরাপদে এবং সুস্থ শরীরে জীবিত আছে, এই সংবাদটি পেয়ে। প্রকৃতপক্ষে আমার মনোভাব একটু বিচিত্র। হেনা পরস্ত্রী হয় হোক, ও ব্যাপারটায় আমার ঔৎসুক্য কম। নবেন্দু যদি হেনাকে নিয়ে কোনও এককালে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করে করুক—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আবাল্য যে মেয়েকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখে এসেছি এবং আমার চোখের সামনে দিয়ে যার জীবনের প্রতিটি পল্লবের প্রস্ফুটন ঘটেছে,—তার অস্তিত্বটাই আমার নিকট আনন্দদায়ক। বলা বাহুল্য, নবেন্দুর প্রতি হেনার আচরণ কোনও মতেই আমি সমর্থন করিনে। প্রতি বিবাহের মধ্যে নর-নারীর যে একটি অলিখিত পবিত্র প্রতিশ্রুতি আছে এবং জীবনের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা, দুর্গতি ও বিবিধ বিপর্যয়ের মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতির মহিমা যে অবিচল সত্তে উজ্জ্বল হয়ে থাকে, এটি আমি বিশ্বাস করি। সেই কারণে হেনার এই বৈপ্লবিক বিভ্রম আমার ভাল লাগেনি।

প্রতি মানুষের মধ্যে পশু বাস করে। সেই পশু কোথাও উগ্র, কোথাও বা নিদ্রিত। বিজ্ঞান পড়া মেয়ে হেনা নবেন্দুর প্রকৃতির ভিতরে সরীসৃপের সন্ধান পেয়েছিল এবং তাকেই খুঁচিয়ে বার করা হয়েছে। আজ নবেন্দু সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে হেনার জীবনে। হেনাকে সে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে সংবাদপত্রে প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি, হেনাকে সে কলঙ্কিত করল জনসমক্ষে। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আজ অলঙ্ঘ্য। এই নাটকীয় সংঘাত দুর্ভাগ্যজনক, দুঃখদায়ক। কিন্তু তবু আমি বলতে বাধ্য, নবেন্দুর অপরাধ কম। রায়চৌধুরী বংশের মেয়ের ধমনীতে নীল রক্তের প্রবাহ যদি কিছু কম হত, তাহলে এ সমস্যার মীমাংসা সহজেই হতে পারত। হেনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাক, কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক ঘুচুক, এইটি আমি কামনা করি। আমার ঘৃণা এসে গেছে।

কিছুদিন আগে সুরমা এক চিঠিতে লিখেছিল, ছোড়দা, এবার তোমার ঘাড় থেকে ভূত নেমেছে, আমরা বাঁচলুম। তোমার মাথা ঠাণ্ডা হোক, চোখ পরিষ্কার হোক। এবার তুমি মাথা তুলে দাঁড়াও।

ইতোমধ্যে মাস দুই আগে নবেন্দুর কাছে আমি একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছিলুম, এ তুমি করলে কি, নবেন্দু? সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে তুমি যে কেবল শ্রীমতী হেনার
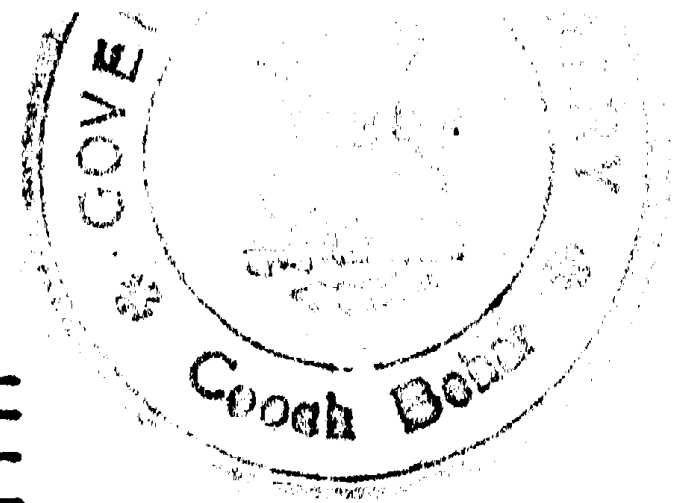
সর্বাঙ্গীণ ক্ষতিসাধন করলে তাই নয়, নিজেরও সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে নষ্ট করলে! যে দুই একটি অসত্য সংবাদ এই বিজ্ঞপ্তির মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলি তোমার বিরুদ্ধেই একদিন প্রমাণিত হতে পারে। তা ছাড়া আরেকটি কথা। তুমি যাকে তোমার বিবাহিত স্ত্রী বলে মনে কর, সে যে বিকৃত মস্তিষ্ক নয় এবং এ-জীবনে সে যে কোনও দিন কোথাও ধারকর্জ করে বেড়ায়নি,—এ তুমি অবশ্যই জান। এক-দিন যার সঙ্গে অবশ্যই তুমি মিলবে এবং যার সঙ্গে গৃহস্থজীবন যাপন করবে, সেই অম্লানচরিত্রা মহিলার নামে এই অপযশ না রটালেই পারতে! হেনাকে তুমি ভাল করেই জান। তাকে এইভাবে কাদায় ফেলে দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাবার যে অপচেষ্টা তুমি করেছ, তার বদলে সেও এই নালিশ জানাতে পারে, একটি অবিবাহিতা ইংরেজ মেয়েকে নিয়ে তুমি যে-ধরণের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছ সেটি বিবাহিত স্ত্রীর পক্ষে প্রতিদিন বরদাস্ত করে চলা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। আমার একান্ত অনুরোধ, শ্রীমতী হেনা যেখানেই থাকুন তুমি তাঁর কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বল, তুমি স্বকীয় মহিমায় তোমারই সংসারে এসে বিরাজ কর এবং আমার মধ্যে যে সব পাশববৃত্তি আমার গুহাগহ্বরে লুক্কায়িত রয়েছে, তাদেরকে আমূল সংস্কার করে আমাকে তোমার গ্রহণযোগ্য করে নাও। মনে রেখ, দুর্গা প্রতিমাকে নৈবেদ্য নিবেদন করে নিজেরাই আমরা ধন্য হই! তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিই হল পূজারীদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপহার। তোমাদের উভয়ের নিত্য কল্যাণকামী বলেই আমি এই কথাগুলি আজ লিখে পাঠালুম।

নবেন্দু আমার চিঠির জবাব দিয়ে-ছিল। কিন্তু তার ভাষাটা ছিল ভিন্ন ধরণের:

তোমার চিঠি নিয়ে আমার এটর্নীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলুম। তোমার নিজের অপরাধ স্খালনের জন্য তুমি আমাকে ভীতি প্রদর্শন করবে এটি ভাবিনি। তোমাকে বন্ধু বলেই এত-কাল বিশ্বাস করে এসেছি। আমার স্ত্রী কোথায় প্রশ্রয় পেয়ে এসেছেন এবং স্বামীকে না জানিয়ে কি প্রকার গতি-বিধিতে তিনি অভ্যস্ত, সেটি আমার জানা ছিল না. তোমার চিঠি প'ড়ে সেটি বুঝতে পারা গেল। আমার বিবাহিত স্ত্রীকে আমার চেয়ে তুমি বেশি জান এইরূপ আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ করে তাঁর সঙ্গে তোমার অবৈধ এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নিজেই স্বীকার করে নিয়েছ। এতদিনে আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হল। আমার আপিসের জনৈক ইংরেজ মহিলার চরিত্র সম্পর্কে তুমি যে কদর্য ইঙ্গিত করেছ, সেটিতে তাঁর মানহানির প্রশ্ন জড়িত। বুঝতে পারা কঠিন নয় যে, এই হাস্যকর ধারণাটা নিয়ে তুমি গোপনে আমার স্ত্রীকে প্রভাবিত করে এসেছ। আমার এটর্নী মহাশয়ের ধারণা, তোমার এই পত্র তাঁর বিশেষ কাজে লাগবে। অধিক বাহুল্য। ইতি নবেন্দু।

অর্থাৎ নৈরাশ্য পীড়িত নবেন্দু এবার আমাকেও আঘাত করবার জন্য উদ্যত হয়েছে। তার চিঠি পড়ে আমি খুব হেসেছিলুম।

হেনা বলত, জন্তুকে জন্তু হিসেবে দেখলে খুশী হই। এর ব্যতিক্রম হল বিস্ময়। বানরের মধ্যে মানুষের কিছু পরিচয় আছে বলেই চিড়িয়াখানায় দর্শক দলের ভিতরে এত কৌতুক। বন-মানুষের মধ্যে অনেকটাই মানুষ,—সেই কারণে তার শালীনতার অভাব দেখে অতিশয় লজ্জায় আমরা মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে আসি। কিন্তু মানুষের ভিতরে যখন বানর বাসা বাঁধে, তখন পোষাক-আসাকের আড়ালে হঠাৎ তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়েই তার হিংস্র বন্যতা প্রকাশ করে।

হেনার এই তুলনামূলক সমাজ-দর্শন আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত। কিন্তু বিজ্ঞানের একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও এই সব বিষয়ে তার পড়া-শুনো নবেন্দু অথবা আমার চেয়ে বেশি। এ নিয়ে সে ভেবেছে অনেক।

আমি বলতুম, সব মানুষই ত এই। মানুষ হল জন্তুশ্রেষ্ঠ!

বটেই ত,—হেনা বলত, আমি তারই মাত্রাবিচার করে বলছি, নবেন্দু এখনও জন্তুশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। পিছনের একটা স্তরে পড়ে রয়েছে. বলেই তার সঙ্গে মিল ঘটছে না। একই গাছে একই কালে শক্ত কাঁচা আম সুন্দরভাবে পেকে উঠেছে, কিন্তু তার অনেকগুলির আস্বাদ যথেষ্ট মধুর নয়,—অথচ তাদের বাইরেটা মনোহর। মানুষ মাত্রই যে প্রকৃত সুস্বাদু মানুষ হয়ে উঠেছে, একথা সত্য নয়। প্রতিমা বিসর্জনের দিন কলকাতায় যে সব ছেলেমেয়েরা কদর্য চেহারা নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মাতে, তাদের দিকে চেয়ে আমার কথাটা ভেবে দেখো। ওটা আমোদ নয়, বন্য কিচিমিচি। মানুষীর গর্ভেই ওদের জন্ম, কিন্তু হয়ে উঠেছে মানবেতর। ওদের পক্ষে আর দু' এক মাত্রা বাকি, যেমন বনমানুষ,—তার পর হয়ে উঠবে তোমার 'জন্তুশ্রেষ্ঠ'! নবেন্দুর ওপর রাগ কর না পার্থ, ওর স্বভাবের মধ্যে যে অভাবটুকু আছে, সেটি ওর নিজস্ব অপরাধ নয়। ওটা আজন্মের দৈন্য।

তুমি কি চাও?—প্রশ্ন করতুম।

হেনা জবাব দিত,—আমি ঠিক কি চাই সেটি আমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। বোধ হয় একটা পরিপূর্ণ মানুষের কল্পনা নিয়েই আমার জন্ম হয়েছিল, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যাকে পরীক্ষা করে বুঝব অতিমানবীয় পথের দিকে তার স্বভাবের গতি আছে এবং বিবর্তনবাদের দিক থেকে যে মানুষটির প্রকৃতি গতি-রুদ্ধ হয়নি!

হেনার কথায় মাথা গুলিয়ে যেত। বলতুম, এটা ত' ইউটোপিয়া!

তা হবে কেন, পার্থ? আমি ত' জন্তুশ্রেষ্ঠই খুঁজে বেড়াচ্ছি, দেবতা খুঁজছিনে!—হেনা জবাব দিয়ে শেষ করত।

নানা সরকারি কাজের জটলায় নবেন্দুর চিঠিখানার কথা ভুলে গিয়ে-ছিলুম। রাঙামার চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম যে, হেনা বাড়ি ফিরে এসেছে। বলা বাহুল্য, সেই দিনই চিঠি দিয়ে রাঙামাকে জানালুম, আগামী সপ্তাহের শেষ দিকে আপিসের কাজে আমার কলকাতা যাবার কথা আছে।

কেউ যদি এখনই আমাকে বেমক্কা প্রশ্ন করে বসে, তোমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন? তুমি কি হেনাকে ভালবাসো? —সেই মূর্খকে তখনই থামিয়ে আমাকে বলতে হবে, চুপ কর, হেনা শুনতে পাবে। কেননা বিশেষ একটা শব্দের

বন্ধনে আমাদের সম্পর্ক কোনদিন সীমাবন্ধ ছিল না।

হেনার বাবা ব্রজবল্লভবাবু যে আমার সত্যকার জেঠামশায় ছিলেন না, এ কথা অনেকেই একদিন বিশ্বাস করেনি। একদা আমার বাবাই রাঙ্গামাকে পছন্দ করে এসে ব্রজবল্লভের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। আমারই পরলোকগতা জননী হেনার নাম-করণ করে যান—কারণ রায়চৌধুরীদের বাগানের কোণে যেখানে একটা হেনার ঝাড় ছিল তারই পাশে হেনার মায়ের আঁতুড়ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। এই সব গল্প একদা আমি জেঠামশায়ের মুখ থেকেই শুনেছি। আমার বাল্যকালের খেলার জায়গাটাই ছিল ওদের ওই বাগান। আমার সামনেই হেনা সাঁতার শিখেছে ওই পুকুরে, যেখানে আমি শিখতে ভয় পেয়েছি। মধ্যাহ্নকালের পলাতক ছেলেমেয়ে দুটো ওই বাগানেরই গাছতলায় বসে লুডো আর ক্যারম খেলত! সেদিন একবারও মনে হয়নি যে, আমরা পরস্পর নিঃসম্পর্কিত। ভালবাসা নিয়ে কোনওদিন একবারও কথা ওঠেনি, বাল্যপ্রণয়ের চেহারাটা কেমন, আমাদের জানা ছিল না,—এবং বনশালিকের চূর্ণ-কণ্ঠের ডাকে কখনও চকিত হয়ে হেনার নবোদ্ভিন্ন তারুণ্যের দিকে আমার উৎসুক দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকেনি। আমাদের সম্পর্কটার ভিতরে এমন একটা অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য চেহারা ছিল যে, আমরা পরস্পরকে একটি প্রয়োজনীয় ব্যবধানের দুই পারে দাঁড় করিয়ে কখনও পর্যবেক্ষণ করতে পারিনি। আজ ভাল-বাসার কথা উঠলে হাসিমুখেই আমি চুপ করে থাকব। আমার বিশ্বাস এ প্রশ্ন হেনার কাছে তুললেও সম্ভবত সেও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবে না। আমরা একই ভাবনার দুই প্রকাশ মাত্র।

হেনা এক একদিন বলত, তোমার কি মনে হয় না পার্থ, নবেন্দু অনেকটা যেন বাইরের লোক? ছিটকে এসে পড়েছে তোমার আমার মাঝখানে?

ভালই ত—আমি জবাব দিতুম,—নবেন্দু এনেছে বাইরের হাওয়া, দূরের খবর। নবেন্দু আমাদের মাঝখানে নতুন কথা নিয়ে এল। আমাদের স্রোত থেমে এসেছিল, নবেন্দু জোয়ার আনল।

কথাটা বোধ হয় হেনার ঠিক মনঃপূত হত না, সে হাসিমুখে চুপ করে যেত।

আমি আবার বলতুম, নবেন্দু অপরিচিত ছিল বলেই আমরা তাকে আবিষ্কার করতে বসেছিলুম। সে আমাদের কাছে নিয়ে এল বিস্ময়, নিয়ে এল কৌতুক আর প্রাণোচ্ছলতা! সে আমাদের চড়িভাতির প্রধান সঙ্গী হয়ে উঠল।

হেনা বলত, কিন্তু সে মাঝে মাঝে অসভ্য কথা বলে ফেলত। আমি তোমার অত্যন্ত বাধ্য বলে তোমাকে সে টিটকিরি দিত।

দিক না—আমি বলতুম, ওটা আমাদের চড়িভাতির চাটনি ছিল। ওটা মসলা। ওই মসলায় আমাদের বন্ধুত্ব সুস্বাদু হয়ে উঠত।

হেনা বলত, নবেন্দু অত টাকাকড়ি খরচ করত কেন জান? আমার ওপরে ওটার 'এফেক্ট' নেবার চেষ্টা পেত। নবেন্দু একেবারেই নাবালক ছিল।

তা হোক—আমি হেসে বলতুম, সে এনেছিল অভিনবত্ব, এনেছিল প্রাণের প্রবাহ, একটা কলরব। আমরা চারদিকে বেড়া বেঁধে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, সে এসে বেড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল। আমরা মুক্তি পেয়েছিলুম।

হেনা তামাশা করে বলত, তুমি নবেন্দুর কোনও দোষ দেখতে পাও না।

তুমিও পেতে না,—আমি বলতুতুম, স্টুডেন্টস ফেস্টিভ্যালের দিনগুলি মনে কর হেনা! তুমিই না বলতে, এই নির-বচ্ছিন্ন অপরিসীম স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়া যেত না যদি নবেন্দু আমাদের মাঝখানে না আসত! তুমিই না একদিন সাতপুরার গিরিদরির তলায় তলায় ঝরণার আশেপাশে আমাদের দু'জনকে রবি ঠাকুরের গান শুনিয়ে বেড়াতে? ছোটনাগপুরের পাহাড়তলীর বনে-জঙ্গলে তুমিই না হালকা হাওয়ায় পাখা মেলে দিয়ে প্রজাপতি-পতঙ্গের দলকে লজ্জা দিতে? নবেন্দুর সেদিনকার দুর্বার উদ্দীপনা তোমাকে কি সেদিন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় মাতিয়ে তোলেনি? একদিনের সত্যকার আনন্দ চিরদিনের পাথেয়-সঞ্চয়, এ কথা ভুলে যেয়ো না, হেনা!

সে-নবেন্দু হারিয়ে গেছে, পার্থ।

না—আমি জোর দিয়ে বলতুম, হারায়নি! একই চরিত্রের ধারাবাহিক পরিবর্তন স্বীকার করে নাও, হেনা।

তুমিই না হালকা হাওয়ায় পাখা মেলে দিয়ে প্রজাপতির-পতঙ্গের দলকে লজ্জা দিতে?

নবেন্দু হল প্রাণবাদী, ভোগধর্মী, জৈব-শক্তির প্রতীক। সে বাস্তবপন্থী, সক্রিয়, সোৎসাহী, তেজোদ্দীপ্ত। সে যৌবনের অর্থ জানে, স্ত্রীজাতি-সৃষ্টির তাৎপর্য বোঝে, তার কথায় ও কর্মে কল্পনার অবকাশ নেই। সে জানত তার মনের জোর প্রচণ্ড, তার বাসনার আগুন উজ্জ্বলন্ত, তার যৌবনের মাদকতা অফুরন্ত। এও সে জানত, তার দেহশ্রীর আকর্ষণ দিগ্বিজয়ী। তোমার আচরণে তার সেই প্রবল আত্মাভিমান আহত হয়ে নিজকেই সহস্র দংশনে ক্ষতবিক্ষত করত। তোমাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারত না বলেই নবেন্দু পরাজয়ের গ্লানিতে জরোজরো হত।

হেনা আমার কথার প্রতিবাদ করত না।

আমি ছিলুম পর্যবেক্ষক। আমি জানতুম তোমার এই সচ্ছল আনন্দের বিহ্বলতা ঘটছে কেমন করে। নবেন্দুর ভাবোন্মাদনার মূল উৎসটা কোথায়—এও জানতুম বৈকি। এ খেলায় চিরকাল অনন্ত কৌতুক, অন্তহীন উদ্দীপনার এ কৌতুক নিত্য নতুন। তুমি তার বাইরে ছিলে না, হেনা।

হেনা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রশ্ন করত, তুমি কি শুধু জৈবজীবনের অন্ধ উদ্দীপনার কথা বলছ?

না—আমি জবাব দিতুম, একেবারেই না। আমি বলতে চাইছি প্রকৃতির তাড়না।

সেই তাড়নার হাতে তুমি কলের পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। হেনা, বিজ্ঞান-বিদ্যায় গবেষণা করেছ অনেক, কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ-বিদ্যায় তুমি একটু পিছিয়ে ছিলে। এই তাড়নার ভিন্ন নাম হল যৌবন-কাননে ঋতুরাজের আবির্ভাব! তার উড়ুনির হাওয়া লেগে কেউ আনন্দে কেঁদে ওঠে, কেউ বেদনায় কেঁপে ওঠে, কেউ বা বুককাটা যন্ত্রণায় কুঁড়ির মতন ফুটে উঠে হৃৎপিণ্ডের গন্ধ ছোটায়।

মুখের হাসি চেপে হেনা এবার বলে উঠত, কই, নিজের কথাটা ত' তুমি বলতে চাও না, পার্থ? তোমার চেহারা নরেন্দ্রর চেয়েও' কম চকচকে নয়? তুমি কি শুধুই পর্যবেক্ষক ছিলে।

এই গম্ভীর পরিহাস শুনে এক সময় আমরা দুজনেই উচ্চহাস্য করে উঠতুম। আমার সুদীর্ঘ বক্তৃতা হাসির ঝড়ে উড়ে যেত।

দমদম বিমানঘাঁটিতে যখন প্লেন নেমে এল, রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা। মালের মধ্যে কেবল ছিল বড় একটা সুটকেস, এবং সঙ্গে হ্যাণ্ডব্যাগ। সুট-কেসটা খালাস করতে মিনিট দশেক লাগবে।

লাউঞ্জের দিকে যাবার পথে করিডরের বারান্দার সামনে হেনা হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলুম, তুমি যে?

শ্রাবণের আকাশ একটু নরম ছিল বলেই একটি ছাতা আনতে হেনা ভোলেনি। এবার [illegible] বলল, নিতে এলুম তোমাকে!

কেন, আমি কি পথ চিনিনে?

অন্ধকারে পথ যদি হারিয়ে যাও?—হেনা হাসল।

হেনার সঙ্গেই কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললুম, অন্ধকার হলেও চিনব। আমার পথ অনির্দিষ্ট নয়। সে যাক—তুমি একলা এসেছ এত-দূর? পথে-ঘাটে নরেন্দ্রর চর নেই?

শেষ কথাটার জবাব হেনা দিল না। শুধু বলল, সন্তোষকে সঙ্গে এনেছি, সে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। রাঙাদার কাছে তোমার চিঠিতে দেখলুম, তুমি বিকেলের প্লেনে ধরে আসছ।

শান্ত কণ্ঠে আমি বললুম, তুমি এসেছ এটি আনন্দের কথা। কিন্তু তোমার আসাটা আমি পছন্দ করতে পারলুম না। কারণ, তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি এখন তোমার বিরুদ্ধেই যেতে পারে। আমার বিশ্বাস, তোমাদের মামলা বেধে উঠতে আর দেরি নেই।

লাউঞ্জের মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়ালুম। অত্যন্ত শাদা-মাটা একখানা সুতী ইস্তিরি ভাঙা শাড়ি কোনমতে জড়িয়ে হেনা বেরিয়ে এসেছে, বুঝতে পারা গেল। চুলের রাশি পিছন দিকে এমন ভাবে টেনে বেঁধেছে যে, কপালটা বুঝি ছিঁড়েই যায়। চেহারায় প্রসাধন-পারিপাট্যের চিহ্নমাত্র নেই। মনে হচ্ছে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়ি ধরে হেনা চলে এসেছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময় লাগল, যখন হঠাৎ দেখলুম তার হাত দুখানায় একগাছি কাঁচের চুড়ি পর্যন্ত নেই এবং পায়ে চটি জোড়াটাও পরে আসেনি। বোধ হয় এই সব কারণেই অগণিত মানুষের দৃষ্টি তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণের

মধ্যেই বুঝতে পারলুম আমার অনুমান সত্য নয়,—মস্ত একটা আন্তর্জাতিক জনতা আশ-পাশ থেকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও সম্মোহিত দৃষ্টিতে ভারতীয় এক নারীর প্রসাধনবিহীন কাঁচা দেহলাবণ্যের দিকে চেয়ে রয়েছে—যেটি তারা সচরাচর দেখতে পায় না! লক্ষ্য করে দেখলুম, হেনার কোন দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই এবং সে যখন শুনল, তার খালি পায়ে ট্যাং ট্যাং করে আসাটা আমার পক্ষে অতিশয় বিরক্তিকর ঠেকছে, কেবলমাত্র তখনই সে নিজের পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে আমার মুখের উপর হেসে দিল—তোমার কিছুু নজর এড়ায় না! জুতোর কথা মনে ছিল না! চল, রেষ্টুরেণ্টে বসে তোমাকে কফি খাওয়াব!

না—আমি বললুম, এ নিয়ে লোক-সমাজে আর তোমার মুখ দেখাতে হবে না! যাও, গাড়িতে গিয়ে ওঠো, সুটকেসটা নিয়ে আসি। আর নয় ত' হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে একটু দাঁড়াও, এটা তোমারই,—আসছি আমি।

হ্যাণ্ডব্যাগটা হেনার হাতে গচ্ছিত করে দিয়ে আমি লগেজ-কাউণ্টারে গেলুম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই যখন ফিরলুম,—দেখি তিন-চার জন সাহেব-মেম হেনাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে কি যেন বলছে এবং হেনার হাতে রয়েছে একটি ফুলের তোড়া। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হেনা ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। ওরা দুই জোড়া আমেরিকান স্বামী-স্ত্রী,—ভারত-গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের আমন্ত্রণে ওঁরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছেন। প্রকৃত ভারতীয় নারীর রূপ দেখে ওঁরা নাকি বিমোহিত। আমি ওঁদের কাছে বিশেষ অভিনন্দন লাভ করলুম বোধ করি এই কারণে যে, আমি হেনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু! শুনে আমার ভয় হল। সুশ্রী স্ত্রীলোকের বন্ধু হওয়ার বিপদ সকল কালেই একটু বেশি।

গাড়িতে ওঠবার আগে সন্তোষ আমার জুতোর ধুলো তার মাথায় তুলল। আমি তখন পারিপার্শ্বিক জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রয় যুদ্ধের ঐতিহাসিক কারণটির কথা ভাবছিলুম!

গাড়ি যখন ছাড়ল, তখন কৌতূহলী দৃষ্টির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমি বাঁচলুম। কিন্তু ততক্ষণে ঝম-ঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে।

প্রথম প্রশ্ন আমিই করলুম, টুইশানিটা তুমি ধরেছিলে বেশ, হঠাৎ ওটা ছেড়ে দিতে গেলে কেন?

হেনা বলল, ওটা যে ঠিক টুইশানি তোমাদের কে বললে? আমার বন্ধু অণিমার ছোট বোন বি-এ দিচ্ছে, তাকে সাহায্য করছিলুম মাত্র।

কত টাকা নিয়ে সাহায্য?

হেনা রাগ করল,—টাকার দরকার থাকলে চাকরি নিতুম, পার্থ?

বললুম, হঠাৎ টুইশানি ছেড়ে দার্জিলিং গেলে যে? আমি যেটি কামনা করে এসেছি এতদিন, সেইটিই আমি জানতে পারলুম না? নবেন্দুর সঙ্গে তোমার মিটমাট হয়ে যাক, এই না আমার কাম্য ছিল? একথা সত্যি আমি তোমা-দের হাতে দিন দিন বোকা বনে যাচ্ছি, হেনা!

হেনা ছোট্ট জবাব দিল,—এসব কথা এখন থাক।

বোধ করি বেবি ট্যাক্সির বাঙ্গালী ড্রাইভার এবং সন্তোষের উপস্থিতি—এই দুই কারণেই হেনা আমাকে থামাতে চাইল। কিন্তু আমি তখনই সাঙ্কেতিক ইংরেজিতে ধরলুম, তোমার 'অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর' শেষ চিঠি পাবার পর আমি স্থির করেছি, এই নোংরা দাম্পত্য-কলহের মামলায় আমি কোনমতেই জড়িত থাকতে পারব না। এটা রাগের কথা নয় হেনা, এটা রুচিবোধের কথা, কাল্‌চারের কথা। সেই জন্যই তখন বলছিলুম—কিছু মনে করো না,—তোমাদের সঙ্গে

সর্বপ্রকারে সংস্পর্শশূন্য হতেই আমি চাই। তোমার গতিবিধির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকা অতঃপর বাঞ্ছনীয় নয়।

তুমি কি ভয় পাচ্ছ?—হেনার বোধ হয় গলা ধরে আসছিল।

ভদ্রলোক মাত্রই ভয় পায়। সস্তা সাহস আমার নেই, হেনা।

গাড়ী অনেক দূর চলে এসেছে। দুপাশের জানলা প্রায় সব বন্ধ। আকাশ ডাকছিল বাইরে। গুরুগুরু গম্ভীর রবে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। চাকার তলায় তার আওয়াজ পাচ্ছিলুম।

কতক্ষণ পরে পরিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় হেনা বলল, এই প্রথম বুঝতে পারছি তোমার-আমার মাঝখানে অনেক-দূর।

জবাব দিলুম, অনতিক্রমনীয় দূরেই শুধু নয় হেনা, অতলস্পর্শ!

কিন্তু তুমি আমাকে সমস্ত বিপদ আর দুর্যোগের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকতে পারবে? —হেনা জানতে চাইল।

আমি নির্ভয় কণ্ঠে বলে বসলুম, চেষ্টা করব।

হেনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, এ তোমার চাকরির অহঙ্কার! চেষ্টা করলে তোমার মতন মাইনের চাকরীর আমিও একটা পেতে পারি, তা জান?

হেসে বললুম, এটা বিজ্ঞানের বাহবার যুগ,—বেশিও পেতে পার!

হেনা একবার গলাটা পরিষ্কার করে নিল। পরে মৃদু জড়িতস্বরে বলল, তুমি নিশ্চয় আমাকে কাঁদাবার জন্যে এবারে ফিরে আসনি?

কি যেন একটা জবাব দিতে গিয়ে মুখের মধ্যে আমার বেধে গেল। বোধ হয় গাড়ির ভিতরকার অন্ধকারে হেনা বড় বড় বাঁকা চোখে আমার প্রতি তাকাবার ফলে আমার ভিতরে ভূমিকম্পের প্রবল একটা দোলা লেগে থাকবে—সেই কারণে। কিন্তু আমি চুপ করে রইলুম বলেই সম্ভবত হেনা আমাকে ভুল বুঝল। বেবি ট্যাক্সিখানা ট্রাম রাস্তাটা ছেড়ে যেইমাত্র চওড়া রাস্তায় পড়ল, হেনা বলল, বাঁদিকে একটু রাখুন ত? সন্তোষ নেমে আয়।

পাঁচমাথার মোড় ছাড়িয়ে এসে গাড়ি বাঁদিকের ফুটপাথের ধারে থামল, এবং আমাকে কিছু বলবার অবকাশমাত্র না দিয়ে হেনা তার জামার ভিতর থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বা'র ক'রে ড্রাইভারকে দিয়ে বলল, দেখবেন বৃষ্টিতে গাড়ি যেন স্লিপ্ করে না। ওঁকে ভাল-ভাবে পৌঁছে দেবেন। সন্তোষ, আয়।

ছাতাটা মাথার ওপর খুলে হেনা অগ্রসর হল। সন্তোষ তার পিছু পিছু অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এগোতে লাগল সেই বৃষ্টির মধ্যে।

ঝড়ের ঝাপটা আর বৃষ্টির মাঝখানে এইপ্রকার নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটবে এ আমি ভাবিনি। সহসা যেন উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করলুম। ড্রাইভার বোধ-হয় কতকটা বুঝতে পেরেছিল, সেইজন্য সে গাড়িখানা ছাড়বার আগে বলল, গাড়ি ঘুরিয়ে ও'দের কি আবার তুলে নেব, বাবু?

কেন?

এত বৃষ্টিতে ও'রা এখন ট্যাক্সি পাবেন না! দিদি বোধহয় একটু রাগ করেই নেমে গেলেন, বাবু।

এবার হেসে উঠে আমি বললুম, না না, বিলক্ষণ, রাগ কেন করবেন? এইত' কাছেই ও'র শ্বশুরবাড়ি, ও'র স্বামী আমাকে আনতে পাঠিয়েছিলেন! আমি যদি না শুনে দুঃখিত হয়ে গেলেন!

ড্রাইভার আবার গাড়ি ছেড়ে দিল। অতঃপর ফাঁকা রাস্তা দিয়ে সটান্ চ'লে গিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে নিজের বাড়িতে যখন পৌঁছলুম, রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। বৃষ্টি একটু ধরেছে। ড্রাইভার বলল, বাবু, আপনাদের সাড়ে পাঁচ টাকা বেঁচেছে। এ আপনি ফেরৎ নিন্।

না, ওটা আপনারই—ব'লে আমার সুটকেস, ব্যাগ এবং হেনার হাতের সেই আমেরিকান ফুলের তোড়াটা নিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। বুড়িপিসি এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। একগাল হেসে বলল, তাইত বলি, এত দেরী হচ্ছে কেন! যাও তুমি গিয়ে জামা ছাড়, আমি সব গুছিয়ে রাখছি। বাঁচলুম, বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরল।।

আমি বললুম, থাক্, তুমি গিয়ে শিগগির ভাত চড়াও, ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে!

ওমা—বুড়িপিসি একটু অবাক হয়ে বলল, ছেলের কথা শোন! সন্ধ্যেবেলা হেনা এসে নিজে বলে গেল, বুড়িপিসি, তোমার আর রাঁধতে হবে না, পার্থ আমাদের ওখানেই খাবে—রাঙামা একঘর রান্না করতে বসেছেন! ওমা, কি হবে! সবই ভেল্কি? যাই, উনুনটা ধরিয়ে দিই! মাগো মা, ছুঁড়ির যেন আর মাথার ঠিক নেই! তিন পুরুষ ধরে এ-বাড়িতে রাঁধছি, এমন অসৈরোন শুনিনি কখনও!

বুড়িপিসি হনহনিয়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। আমার কিন্তু চট ক'রে পা উঠল না। হেনা জানত সুরমা এখানে নেই, এবং পার্টিশনের ওদিকে খুড়িমারা থাকলেও এত রাত্রে তাঁরা আমার আহারাদির ব্যবস্থা করবেন,—এ

বিশ্বাসও হেনার ছিল না। এতক্ষণ পরে এবার যেন একটু লজ্জাই পেলুম। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ওই আলুথালু অবস্থায় হেনা যে শুধু দমদমাতেই গিয়েছিল তা নয়, সে খাবার ব্যবস্থাও রেখে গিয়েছিল।

অনেক অনভিজ্ঞ লোক আছে যারা এর মধ্যে একটা অসামাজিক বা অবৈধ প্রণয়ের আভাস পেতে পারে। যারা দেখে এসেছে আমাদেরকে চিরকাল, তারা বলবে আমাদের সম্পর্কটা পারিবারিক। আমরা একটা অচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য সম্পর্কে আশৈশব বিজড়িত. সেটার ব্যাখ্যা অভিধানে পাওয়া কঠিন। কেবলমাত্র প্রণয়সূত্রের বন্ধন হলে সেটা কবেই ছিঁড়ে যেত, এবং সেটা নরনারীর মধ্যে প্রচলিত আদিম সম্পর্ক হলে তার একটা পরিণতিও পাওয়া যেত। আমি তাকে বিপদ আর দুর্যোগের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকতে পারব কিনা, অথবা তাকে কাঁদাবার জন্য এবার ফিরে এসেছি কিনা—একথাগুলির ভিতরে আমাদের দুজনের আশৈশব ইতিহাসের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাই কেঁদে উঠেছে। অন্ধকার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সেই কান্নাই যেন শুনতে পাচ্ছিলুম। আমাদের দুজনেরই মা-বাপ নেই; আমার দুটি বোন তবু আছে, হেনার আছে শুধু সৎমা। লেখাপড়া কম শিখিনি দুজনে, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের কোনও একটা কাঠামো আজও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। এ-যুগের সংশয় আর অবিশ্বাস নিঃশব্দে আমাদের মনে কাজ ক'রে গেছে, আমাদের ঘটেছে চিন্তা-বিভ্রম। সুরমার কাকুতি-মিনতির জন্য আমি যদি আজ ঘরে বৌ এনে সুন্দর সংসার রচনার কাজে মন দিই, হেনা তাতে একটুও বাধা দেবে না। বরং বলবে, তুমি যে তোমার পথ বেছে নিলে পার্থ, এতে আমি সুখী! হেনা যদি আজ নবেন্দুর সঙ্গে সব বিবাদ ও বিতর্ক মিটিয়ে তার ঘরে গিয়ে ওঠে, তবে আমার চেয়ে আনন্দিত আর কেউ হয় না! আমরা যেন আজও দুটো প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্নের মতো পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

এক সময় গজগজ করতে করতে বুড়িপিসি বেরিয়ে এল। ততক্ষণে ঘরের আলোটা আমি জেলেছি। বুড়িপিসি বলল, ত খোকন, দাও দেখি বাছা চারটি ছেঁড়া কাগজ? মাগি সেই যে ঘুঁটে দেব বলে চলে গেল, আর পাড়া মাড়াল না। যত নচ্ছারের মরণ এই পাড়ায়। চারটি ছেঁড়া কাগজ দাও, দেখি যদি কয়লা ধরে।

হয়েছে, থামো বুড়িপিসি! তোমাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না। এই কাছেই হোটেল, তুমি ত' জান।—আমি বললুম, আমি যা-হোক কিছু খেয়েই আসছি।

বুড়িপিসি বলল, আচ্ছা, তা বরং মন্দ নয়। আমি জেগেই রইলুম।

জামা-জুতো তখনও ছাড়িনি, এই অবস্থায় গিয়েই আমার ক্ষমা চাওয়া উচিৎ।

রাস্তায় বেরিয়ে সামনেই একখানা রিক্সা পাওয়া গেল। এখান থেকে হেনাদের বাড়ি আধ মাইলেরও কম, সুতরাং নিরিবিলি রাস্তায় পাঁচ-সাত মিনিটই যথেষ্ট। একটা রাত কিছু না খেয়ে থাকলে কিছুই অসুবিধা হত না, কিন্তু নিজের অসৌজন্য এবং অবিবেচনা এমনই নিজের মধ্যে রি-রি করছিল, যার জন্য নিশ্চয়ই আমার বসে থাকা চলে না।

রাস্তাটা গিয়ে বাগানের পুরনো ফটকে ঢোকবার মুখেই দেখি, সন্তোষ বেরিয়ে আসছে। বললুম, কোথা চললে সন্তোষ এত রাত্রে?

ও আপনি?—সন্তোষ জবাব দিল, আপনার ওখানে খাবার পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলুম। আমরা ফিরলুম এইমাত্র।

পথে কষ্ট হয়েছিল

না, তেমন নয়। আধকোশটাক হাঁটতে হয়েছিল শুধু জল-কাদায়। দিদির ত' অভ্যেস নেই হাঁটা,—কাঁচে পা কেটে গেছে অনেকটা। পরে গাড়ি পেয়েছিলুম।

আমি বললুম, তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলুম হে। রাঙামা রান্নাবান্না ক'রে বসে আছেন এ'ত জানতুম না। যাই হোক, এ ভালই হল।

সন্তোষের হাতে ছিল পাঁচটা বাটি-ওয়ালা পিতলের একটি টিফিন ক্যারিয়র। বললুম, দাও, ওটা আমিই নিয়ে যাই।—তোমাকে আর যেতে হবে না, সন্তোষ। দিদিকে বলো পা কাটলে ভয় কিছু নেই। মাঝে মাঝে কাটাকুটি একটু হওয়া ভাল। দিদির খাওয়া হ'য়েছে?

সন্তোষ বলল, না, উনি শুয়ে পড়েছেন। মাথাটা ধরেছে!—এই বলে সে খাবারের পেটিটি আমার পাশে তুলে দিল।

হাতখানা বাড়িয়ে বললুম, এই ফুলের তোড়াটা নিয়ে যাও সন্তোষ, তোমার দিদি এটা গাড়িতে ফেলে এসেছিলেন। ও'কে শুঁকতে বলো, বেশ চমৎকার গন্ধ, মাথাটা ছাড়তে পারে।

তোড়াটা হাতে নিয়ে সন্তোষ বাগানের মধ্যে ঢুকল। আমি রিক্সা ঘুরিয়ে আবার ফিরে চললুম। ভালই হল। একটা কঠিন পরীক্ষা থেকে যেন উত্তীর্ণ হয়ে এলুম।

একটু অবাক হলুম, হেনার যেন ঈষৎ পরিবর্তন ঘটেছে। সহসা মাস-তিনেকের মধ্যে যেন একটা গাম্ভীর্য এসে তাকে ঘিরেছে—যেটা আমার পক্ষে নতুন স্বাদ। নবেন্দুর উল্লেখ পর্যন্ত হেনা করল না, বরং দার্জিলিং সম্বন্ধে আমাকে থামিয়েই দিল। সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞপ্তিটি দেখে-ছিলুম. হেনার সঙ্গে তার কোথাও মিল খুঁজে পেলুম না। হেনা যেন আশ্চর্য-রকম সহজ হয়েছে।

হয়ত রিক্সাখানা পুনরায় ঘুরিয়ে হেনার কাছে গিয়ে বসাই আমার উচিৎ ছিল,—হোক না কেন রাত বারোটা! কিন্তু পুরুষের স্বভাব-নির্লজ্জতাটাই বোধকরি আমাকে বাধা দিল। পা উঠল না।

রিক্সাখানা এসে থামল বাড়ির দরজায়।

(—ক্রমশ)

তৃতীয় শক্তি শিবির

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ছ'বছর আগে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির যে সম্মেলন হয়েছিল নানা কারণে তা এক ঐতিহাসিক ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ঐ দুই মহাদেশে তখন স্বাধীন দেশের সংখ্যা ছিল বত্রিশ। তার মধ্যে ইস্রেল ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশেষ কতকগুলি অসুবিধা ও আপত্তির জন্যে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশন আমন্ত্রণ পেয়েও তা গ্রহণ করেনি। ফলে বান্দুং সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিল ঊনত্রিশটি দেশ।

বান্দুং সম্মেলনের সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব ছিল এইদিক থেকে যে নিজেদের স্বার্থ ও সমস্যাগুলি আলোচনা করে সকলের গ্রহণযোগ্য কতকগুলি মৌল নীতি ও কর্মপন্থা স্থিরীকরণের উদ্দেশ্যে এই প্রথম এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় দেড় শত কোটি মানুষের প্রতিনিধিরা এক জায়গায় সমবেত হয়েছিলেন। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল পাঁচটি:—(১) অর্থনৈতিক সহযোগিতা, (২) সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, (৩) মানব অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, (৪) পরাধীন দেশগুলির সমস্যা, (৫) বিশ্বশান্তির উন্নয়ন।

উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম তিনটি নিয়ে সম্মেলনে বিশেষ কোন মতদ্বৈধ দেখা দেয়নি। কিন্তু পরাধীনতা ও ঔপনিবেশিকতা নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই দেখা যায় যে পরাধীনতার প্রকৃত সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছে বিপুল মতদ্বৈধ্য। বিশ্বের সর্বত্র ঔপনিবেশিকতার অবসানের দাবী জানিয়ে যখন সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তখন সিংহলের প্রধানমন্ত্রী দাবী করেন, সোভিয়েট রাশিয়ার কুক্ষিগত পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিকেও উপনিবেশ বলে ধরতে হবে এবং তাদের ওপর থেকেও রাশিয়ার কর্তৃত্বের অবসান দাবী করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সিংহলের প্রস্তাবে সমর্থন জানায় পাকিস্থান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, তুরস্ক, ইরাক ও ইরান, আর সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভারত, বর্মা, চীন, সিরিয়া ও আরও অনেক দেশ। এই মতদ্বিধা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কারণে বহু সাদৃশ্য থাকলেও রাজনৈতিক চিন্তা বা স্বার্থ তাদের এক নয়। আর এই কারণেই আফ্রো-এশিয় শক্তিজোট বলে কোন রাজনৈতিক শক্তি সংস্থা আপাততঃ গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই বিভিন্ন পক্ষ থেকে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গত ছ'বছরের মধ্যে বান্দুং সম্মেলনের আর পুনরাবৃত্তি হয়নি।

তারপর গত ছ'বছরের এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনীতিতে আরও অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। বান্দুং সম্মেলন যখন হয়েছিল তখন আফ্রিকায় স্বাধীন দেশের সংখ্যা ছিল মাত্র ছটি, আর আজ আফ্রিকায় স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা হল আটাশ যার মধ্যে ছাব্বিশটি ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। এশিয়াতেও কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ফলে আফ্রিকা ও এশিয়ায় এখন স্বাধীন রাষ্ট্রের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতচল্লিশ এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই এ সংখ্যা পঞ্চাশ অতিক্রম করে যাবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে বর্তমানে রাষ্ট্র সদস্যের সংখ্যা হল ৯৯, যার মধ্যে ৪৫টি হল এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্র। এই বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রভাব যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যে কথা আগেই বলা হয়েছে যে, বৃহৎ দুই শক্তি-শিবিরের প্রভাবে এই ঐক্য বর্তমানে কোন মতেই সম্ভব নয়।

এই বছরেই সাধারণ পরিষদের অধিবেশনকালে দেখা যায় যে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে খুব বেশী মতৈক্য নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে গিনি এবং মালিকে প্রায়ই দেখা গেছে রাশিয়ার পক্ষে ভোট দিতে, আবার ফরাসীভাষী সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশ্চিমী শক্তিজোট, বিশেষ করে ফ্রান্সের পক্ষে ভোট দিতে। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ঘানা ও নাইজেরিয়াকেই দেখা গেছে সাধারণত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে। আরব ও এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও এমন দেশ অন্তত দশ-বারোটি আছে যারা কোন অবস্থাতেই পশ্চিমী শক্তিজোটের বিরোধিতা করবে না। এই পরিস্থিতিতে এটা সহজেই অনুমেয় যে আফ্রো-এশিয় সংহতির আশা আপাততঃ দুরাশা মাত্র।

তাছাড়া আজকের এই আন্তর্জাতিকতা ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে, মানুষ যখন মর্ত্যসীমা লঙ্ঘন করে মহাশূন্য জয়ের চিন্তা করছে তখন অঞ্চল বা বর্ণের ভিত্তিতে কোন শক্তিজোট গড়ে তোলার প্রয়াস সমর্থনযোগ্য কিনা এ প্রশ্নও অনেকের মনে দেখা দিয়েছে। উপরন্তু আফ্রিকা ও এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলি তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে যে, দেশকে বড় করতে হলে ইউরোপ বা আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর দেশগুলির সাহায্য ও সহযোগিতা অনিবার্য প্রয়োজন। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মাণী প্রমুখ দেশগুলির সঙ্গে আজ এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর দেশগুলির এমনই আর্থিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যে তাকে অস্বীকার করে এশিয়া ও আফ্রিকার পক্ষে কোন স্বতন্ত্র শক্তিজোট গড়ে তোলা সম্ভব নয়, এমন কি সকল ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়ও নয়।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ, প্রেসিডেন্ট নাসের এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু

কিন্তু তাই বলে পাকিস্থান বা থাইল্যান্ড যেমন করে নিজেদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছে, বা চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড প্রমুখ দেশগুলি মেনে নিয়েছে সোভিয়েটের প্রভুত্ব, সেটাও কোনভাবেই সমর্থিত হতে পারে না। এই তথাকথিত মৈত্রী দাসত্বেরই নামান্তর এবং বৃহৎ শক্তিগুলির কাছে এভাবে নতি-স্বীকার করা বা তাদের সঙ্গে সামরিক জোট বাঁধার অর্থ সারা পৃথিবী জুড়ে একটা অশান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে সম্ভাব বজায় রেখেও যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায়, এবং কোন শক্তিজোটে যোগ না দিয়েও যে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ যন্ত্র, শস্য, খাদ্য, অর্থ ও কারিগরী সাহায্য পাওয়া যায় তা সর্বপ্রথম প্রমাণ করেছে ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সকল দেশেরই বিশ্বস্ত বন্ধু, যদিও রাশিয়ার হাঙ্গেরী-আক্রমণ বা যুক্তরাষ্ট্রের কিউবা-বিরোধিতা সমালোচনা করতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করেননি। এজন্যে বহুবার ভারতকে খুবই বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয়েছে, কিন্তু তবুও ভারত নিরপেক্ষতার পথ ত্যাগ করেনি। সে কারণেই পৃথিবীর সকল বৃহৎ শক্তি আজ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে যে ভারত তার শত্রু নয়। একটি রাষ্ট্রের পক্ষে এই আস্থা ও সুনামের মূল্য যে কি সীমাহীন তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না।

ভারতের এই নীতি প্রথমে প্রভাবিত করেছে বর্মা, সিংহল, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্থান প্রমুখ তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে, তারপর ক্রমে এই নীতি স্বীকৃতি লাভ করেছে আরব ও কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকায়। আরব নেতা নাসের, নিগ্রো নেতা নক্রুমা ও নেহরু—এই তিন 'ন' আজ তাই বিশ্বের নিরপেক্ষ রাজনীতির তিন প্রধানরূপে পরিচিত। তাঁদের এই নিরপেক্ষ নীতি পরবর্তীকালে আরও বেশী শক্তিশালী হয়েছে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর সমর্থনে।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন নিরপেক্ষ রাজনীতির এই চার প্রধান ও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণ। নেহরু, নাসের, নক্রুমা, টিটো ও সুকর্ণ সম্মিলিতভাবে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের মধ্যে পুনরায় সাক্ষাতের অনুরোধ জানিয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী না হলেও তাঁদের সদিচ্ছা বিশ্বের শান্তিকামী দেশগুলির মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল।

আগামী ৫ই জুন কায়রোয় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের একটি প্রস্তুতি সম্মেলনের আহ্বান জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণ। তিন মহাদেশের এই তিন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতা সম্মেলনে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পাঁচ মহাদেশের বিশটি দেশকে এবং প্রায় সবকটি দেশই সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা স্থির করেছেন, প্রস্তুতি সম্মেলনে নিরপেক্ষতার সঠিক সংজ্ঞা নিয়ে তাঁরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবেন, যাতে সেপ্টেম্বর মাসে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের পূর্ণ সম্মেলনে তাঁরা আরও বেশী দেশকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

গত বছরের মত এই বছরেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হবে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তাই তার আগেই বিশ-ত্রিশটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সহযোগে এমন একটি শান্তি-শিবির গড়ে তুলতে চান যাঁরা সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বৃহৎ শক্তিসমূহের যাবতীয় প্রস্তাবকে বিচার করবে নিরপেক্ষতার

দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এবং যে কোন শক্তি-শিবিরের প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন করবে নিরপেক্ষতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে। বলা বাহুল্য, উদ্যোক্তাদের এই প্রয়াস যদি সফল হয় তবে তা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক নূতন যুগের সূচনা করবে। ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, নাইজেরিয়া, ঘানা, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, যুগোশ্লাভিয়া, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, আর্জেন্টিনা ও সেই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের আরও প্রায় বিশটি দেশ যদি বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রশ্নে সব সময় ঐক্যমত হয়ে চলতে পারে তবে তাদের মতই যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর যত দিন যাবে ততই নতুন নতুন রাষ্ট্র এসে যোগ দিয়ে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করে তুলবে এই তৃতীয় শক্তি-শিবির বা শান্তির শিবিরকে।

এই কারণেই আফ্রো-এশিয় রাষ্ট্র সংহতি গড়ে তোলার চেয়ে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রজোট গড়ে তোলার কথাটাকেই আজ বড় করে দেখছেন বিশ্বের প্রকৃত শান্তি-কামী রাষ্ট্র নায়করা। যদিও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রজোটেরও প্রাণশক্তি হবে এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি। তৃতীয় শক্তি-শিবিরের মধ্যে কোন মতপার্থক্য থাকবে না, বিশ্বের যাবতীয় সমস্যাকে তারা একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবে এবং সকল ক্ষেত্রে সকলে মিলে একই সিদ্ধান্ত নেবে এমন আশা করা চলে না, এমনটি হওয়া সম্ভবও নয়। পশ্চিমী শক্তিজোট বা কমিউনিস্ট শক্তিজোটের মধ্যেও এই জাতীয় নিশ্ছিদ্র ঐক্য নেই। কমিউনিস্ট শক্তি-শিবিরে রাশিয়া ও চীনের মতপার্থক্য সর্বজনবিদিত। পশ্চিমী শক্তিজোটেও যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন বা ফ্রান্স সব সময় এক কথা বলে না বা এক পথে চলে না। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বৃহত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সঙ্কটের মুহূর্তে তারা তাদের সব বিরোধ সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে একজোট হয়ে দাঁড়াবে। তৃতীয় শক্তি-শিবিরেও যদি এই প্রয়োজনীয় মুহূর্তের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মনোভাব বজায় থাকে তবে তাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস সর্বতোভাবে সার্থক হবে। পূর্ব ও পশ্চিমের দুই প্রবল শক্তি-শিবিরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা যে আর একটি প্রলয়ংকর বিশ্ব-যুদ্ধের সমূহ সম্ভাবনাকে চিরকালের জন্যে দূর করে দিতে পারবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অথ বিজ্ঞান ঘটিত

অশোক গুহ

'যদি' অসম্ভবের রাজ্য, অসম্ভব সম্ভবের রাজ্য। এ-রাজ্যের ফসল আজব-কথা, আষাঢ়ে কথা, রূপকথা-উপকথা। আর একেবারে একালের খন্দের ফসল বিজ্ঞান-ঘটিত কথা। বিজ্ঞান-কিস্‌সা। যাকে ইংরেজীতে বলে 'সায়ান্স ফিকশন' (Science Fiction); আদ্য অক্ষর দুটি দিয়ে যার সর্বজনপ্রিয় নাম—S. F.

ফসলটি একালের হলেও বহু যুগ আগেই এর বীজ পড়েছিল। দু-একটি অংকুরও যে উদ্গত না হয়েছিল এমন নয়। বাল্মিকী-বেদব্যাস-হোমার থেকে শুরু করে হীনতম কথা-কোবিদেরাও তার বীজ এখানে-সেখানে নিজেদের দরকারে বুনো খইয়ের মতো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার ফসলে অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল তাঁদের কাব্য-কাহিনীতে। তবে বিশেষ জ্ঞানকে তাঁরা তখন বলতেন মায়া, ইন্দ্রজাল, দৈবশক্তি, দিব্যদৃষ্টি, আর তাদের যাঁরা অধিকারী—তাঁরা হয় ছিলেন দেবতা বা দেবতাপ্রিয় মানুষ, নয়তো দৈত্য বা মায়াবী। বিজ্ঞান-ঘটিত কাহিনীর এইভাবেই জন্ম।

বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলন চলতে লাগল। দলের পর দল বিজ্ঞানী দেখা দিতে লাগলেন। হতে লাগল রকমারি আবিষ্কার। বিশেষ জ্ঞানের অধিকারীরা নাস্তিক বলে শাস্তি পেলেন, আবার কেউ বা শিরোপায়ও বিভূষিত হলেন। 'যদির' রাজ্যের যারা ওয়ারিশ, সেই জনগণের কাছে কিন্তু বিশেষ জ্ঞান, নাস্তিকের জ্ঞান, কাফেরের জ্ঞান হয়ে রইল। সেখানে ইন্দ্রজাল আর অলৌকিকতার পালাই চলতে লাগল। তবু খৃীষ্টধর্ম বুঝি সে জমাট মেঘে একটু বা ফাটল ধরিয়ে দিতে পেরেছিল। তাই ১৬০ খৃীষ্টাব্দে লুসিয়ান নামে এক দুঃসাহসিক কথাকার মহাশূন্যে ভ্রমণের এক স্বকপোল-কল্পিত কাহিনী রচনা করে ফেললেন। সেখানে শুধু নামমাত্র রইল বিশেষ জ্ঞানের কথা, বাকিটা সুবই কল্পনায় ঠাসা হল। তার কারণ, বিশেষ জ্ঞানও তখন কল্পনার আওতার বাইরে [illegible] করে যেতে পারেনি, মহাশূন্য তখন প্রায়-অনাবিষ্কৃত। যাহোক, তবু মহাশূন্যে বিচরণের পথ পড়ল। আর সেই পথ ধরেই রুশ গ্যাগারিণ আজ মহাশূন্য প্রদক্ষিণ করে এসেছেন। লুসিয়ানের 'ভেরা হিস্টরিকা'র পরে বহু বছর কেটে গেল, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তখন শুরু হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা বিশেষ জ্ঞানকে কায়েম করবার জন্য তখন অতি তৎপর। কিন্তু কাহিনী-কারের বিজ্ঞানী মন তৈরি হল না বলে এ ফসলের খন্দ তখনো জাদুর জলেই বেঁচে রইল।

তারপরে সতেরো শতক। বিজ্ঞান তখন মহাশূন্যকে খোলা পুঁথির মতো এনে তুলে ধরেছে মানুষের চোখের সম্মুখে। সেই খোলা পুঁথি প্রেরণা জোগালে মানুষকে। কথাকারেরাও মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য সেই মহাশূন্যকে এনে বিজ্ঞ কাহিনীতে ঠাঁই দিলেন। বিজ্ঞানের তথ্য এসে মিশল, তত্ত্ব এল না; আবার জাদুর মায়াও রইল। এই অদ্ভুত মিশোলে সূর্য আর চন্দ্র ভ্রমণের কাহিনী ফাঁদলেন ফরাসী সাইরানো দ্য বার্জেরাক। আঠারো শতকে খন্দা তেমন তেজী হোক না হোক, মন্দা পড়ল না। ভাল খন্দ দেখা দিল উনিশ শতকে। আগে যা ছিল শতকরা প্রায় একশো ভাগই উদ্ভট কল্পনা, কোনরকমে তাতে একটু বিজ্ঞানের ছিটে দিয়ে যাকে বিজ্ঞান-কাহিনী বলে চালানো হোত, তাই-ই ফরাসী জুল ভার্নের হাতে দস্তুরমতো বাস্তব হয়ে উঠল, আর তাতে বিশেষ জ্ঞানের আলোও ঠিকরে পড়ল। মেরী শেলীও এই শতকে পিতা গডউইনের বিজ্ঞানী মতবাদের সঙ্গে উদ্ভট কল্পনার মিশোল দিয়ে 'ফ্রাঙ্কেন-স্টাইন' নামে এক মহাবিভীষিকার সৃষ্টি করলেন। খাঁটি বিজ্ঞান-ঘটিত গল্পের ফসল ফলতে পারে, তার জমি তৈরি হল।

কিন্তু সে-ফসল ফলতে-ফলতে ঊনিশ শতক প্রায় কাবার। আঠারোশো পঁচানব্বই খৃষ্টাব্দে একজন অজ্ঞাত এবং অখ্যাত লেখক এক অদ্ভুত বিজ্ঞান-ঘটিত কাহিনী উপহার দিলেন। উড়ো-জাহাজই তখন বেলুনের পর্যায় থেকে ক্রমিক-উন্নতির পথে একধাপও বেশি এগোতে পারেনি; তখন কিনা তিনি সময়-সাগরে ভ্রমণের এক সময়-যান বা টাইম-মেশিন আবিষ্কার করে ফেললেন। বিজ্ঞান-কাহিনীর এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হল. আর এই অধ্যায় সৃষ্টি করে অখ্যাত-অজ্ঞাত এইচ জি ওয়েলস্ সীজারের মতোই পৃথিবীর পাঠক-সমাজকে দেখলেন ও দেখামাত্রই জয় করে ফেললেন। তাঁর হাতে বিজ্ঞান-ঘটিত কাহিনী বৈজ্ঞানিক তথ্য আর তত্ত্বের সংমিশ্রণে খাঁটি হয়ে উঠল। এক কথায় তিনি তাকে জাতে তুললেন।

এইচ জি ওয়েলস্ যা করলেন, পরবর্তী দল কেউ তা পারেননি। একমাত্র ওলাফ স্টাপলডনকেই তাঁর প্রতিভার শরিক বলে ধরে নেওয়া যায়। শরিক না হোন, সাহিত্যের অন্য ক্ষেত্রের দিক-পালেরাও মাঝে মাঝে এ ফসল ফলাতে এসেছেন। তাদের মধ্যে অল্ডাস হাক্সলী, জর্জ অরওয়েল, আলেকসাই তলস্তয়, আঁদ্রে মোরোয়া, কারেল কাপেকের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অল্ডাস হাক্সলী যখন তাঁর সাহসী নতুন পৃথিবীর চিত্র আঁকেন, তখন টেস্টটিউব-শিশু আর অনুভূতিময় চলচ্চিত্র 'ফীলী' ছিল কল্পনা; গবেষণাগারে টেস্টটিউব-শিশু তারপরে প্রসূত হয়েছে এবং 'ফীলী'ও এখন অবশ্য সম্ভাব্য কল্পনার আওতায়। যে-কোনদিন তা ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে এসে ফুলের গন্ধ আর সাগর-শিকরের অনু-ভূতি ছড়াতে শুরু করবে। আর কাপেকের R U R তো ভাষায় রোবটকে জন্ম দিয়েছে আর কারখানায় তাকে গড়ে তোলার প্রেরণা জুগিয়েছে।

বিজ্ঞান-ঘটিত কাহিনীর এই-ই মোটামুটি ইতিহাস। এবার ইতিহাস শেষ করে এর গঠনের কারখানায় প্রবেশ করতে হল।

এর কথকতায় নানা কিসিমের কর্ম জাঁকিয়ে বসতে ঠাই পায় না। সহজ, সরলভাবে বলাই এর একমাত্র কর্ম। আর সেই কর্মেই পাঠককে অবাক করে দেওয়া চলবে, তার ভীতির উদ্রেক করা হবে; আবার তার আনন্দেরও খোরাক জোগাবে। রূপকথা আর তার ধর্ম এক। কিন্তু এক বিষয়ে সে হবে আলাদা। রূপকথা আজবকে আমদানী করে, তাকে বিশ্লেষণ করে না; কিন্তু বিজ্ঞান-কথার সেইটেই কাজ। রূপকথার অবিশ্বাসকে শ্রোতা হজম করে নেয়, অবিশ্বাসই বিশ্বাস হয়ে উঠে; কিন্তু বিজ্ঞান-কথার অবিশ্বাস সম্পূর্ণ বদহজমী ব্যাপার। তাতে বিজ্ঞান-কথাকেই মাটিই করে। রূপকথার সিণ্ডেরেলা বা পাশকুড়োনীর গাড়ি কুমড়ো থেকে এক নিমিষে তৈরি হয়, আর রূপকথার শ্রোতারা তা মেনেও নেয়। কিন্তু বিজ্ঞান-কথা সেখানে থেমে গেলে তার বিপদ। তাই সে বলবে, কি করে ইলেকট্রো-ক্যামিকাল পদ্ধতিতে তা সম্ভব। ডাইনী বা দুষ্ট পরীর শিশু-হরণকেও সে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখাবে যে, তারাও পৃথিবীর মতো অপর কোন গ্রহের অধিবাসী—টাইটানিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে অ্যালফা-কনার বিস্ফোরণে তাদের ঐ মতিগতি, ঐ দশা।

এই যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, এরই উপর বিজ্ঞান-ঘটিত কাহিনীর প্রাণ নির্ভর করছে। এইখানেই আষাঢ়ে উদ্ভট কথা থেকে তার কৌলিন্য। এর পরে আসছে তার সুর, তার ভাষা, তার দর্শন এবং অন্যান্য ব্যাপার। এগুলি সবই লেখক-নির্ভর। লেখকের মর্জির উপর বিজ্ঞান-কথার যেমন বিভীষিকার ভয়াবহতা নিয়ে দেখা দিতে পারে, তেমনি আবার বিদ্রুপে তীক্ষ্ন বা হাস্যরসে তরল হয়ে উঠারও তার সুযোগ আছে; আবার বিষাদে ঘন হয়ে উঠতেও তার বাধে না। কিন্তু বিভীষিকা নিয়েই তার বেশি কারবার। তাই মনে হয়, রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীর সে যোগ্য শরিক। আবার হয়তো এ শরিকানা ঘুচিয়ে দিয়ে সে-ই হবে অদূর ভবিষ্যতে সে-রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক। এই সত্য বিজ্ঞান-কথার বিষয়-বস্তুতে নিহিত। মানুষের অজানার প্রতি ভীতি, কৌতূহল, তার নিজের যান্ত্রিক সৃষ্টির প্রতি তার শঙ্কাই বিজ্ঞান-কথাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে দেবে।

বিজ্ঞান-কথা রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পের সমধর্মী, সে সমান ভাগিদার। এখানে চরিত্রকে বলি দিতে হয় শ্বাসরোধী ঘটনার বেগের কাছে; তাছাড়া পুরুষ ও নারীর ভালবাসা দেখাবার ক্ষেত্রও এটি নয়। যদিও রহস্য-রোমাঞ্চ আজকাল সাইকোথ্রিলার বা ক্রাইমের মুখোসে সে-কাজ হাসিল করছে। কিন্তু বিজ্ঞান-কথা এখনো সেদিকে মন দিতে পারেনি। যদিও হলেও খুশিই হব। উন্নাসিকতায় তাঁরা বিজ্ঞান-কথার হলিউডী চলচ্চিত্রায়িত সংস্করণে তার ফলাও প্রকাশে ত্রুটি নেই।

গঠনকর্ম বা আঙ্গিকের দিক থেকে যত ত্রুটিই থাক, বিজ্ঞান-ঘটিত কাহিনী বা বিজ্ঞান-কথা এ-কালের সাহিত্য হিসেবে কায়েম হয়ে বসেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এই শতকের দ্বিতীয় দশকে তার জনপ্রিয়তার ফসল কয়েক-খানি মাত্র মাসিক ও দ্বিমাসিক দেখা দিয়েছিল আমেরিকায়, আজ তো সেখানে ছত্রকের মতো গজাচ্ছে পত্র-পত্রিকা। তাছাড়া য়ুরোপের সর্বত্রও এরই চাষ চলছে, আর যারা চাষী, তাদের মধ্যে যেমন আনাড়ি আছে, তেমনি পাকা লোকেরও অভাব নেই। এটা বিজ্ঞানের যুগ, তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এই বিজ্ঞান-ঘটিত কাহিনী।

এই অবশ্যম্ভাবী সাহিত্যে দুঃখবাদের ঘনঘটা দেখে কেউ কেউ বা শঙ্কিত, তার উপরে রাজনীতিও তার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অস্ত্র হিসেবে একে ব্যবহার করতে ছাড়ছে না। তাই সমালোচকেরা এবং মানুষের দুষ্টির নেতারা একে জাতপাত করতে চাইছেন। কিন্তু তারা চালের এক পিঠই দেখছেন, অপর পিঠে, দুনিয়ার শান্তি আর কল্যাণের দূত-হিসেবেও যে তাকে ব্যবহার করা সম্ভব—সে কথা ভাবছেন না।

এর পরেও একটি বক্তব্য বাদ থেকে যায়। সেটি পুনশ্চ হিসেবেই জুড়ে দেওয়া চলে। 'পুনশ্চ'—এই জন্যেই বলা হল যে, বিজ্ঞান-কথা খাঁটি বিদেশী কথা। এ-দেশে যদি তা থাকে তো জাদুকথা হয়েই আছে। আমাদের জমিতে এ ফসল কেউ ফলাতে চাননি, এর মধ্যে বিদেশী গাছে কলম বেঁধে দু-একজন মধু ফলাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশীলকুমার মিত্র এবং স্বর্গত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে-ফল কুড়িয়েছে শিশু আর কিশোরেরা। কালেভদ্রে যদি পরিণত বয়সের হাতে সে-ফল পড়েছে, তারাও স্বাদ নিয়েছেন বইকি। পরিণত বয়স্কদের জন্যে একথা মাত্র দু-একটি পরিবেশন করেছেন পরশুরাম। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে আরো যদি এ বেশি লিখে যেতেন তো, বাংলা সাহিত্যে এ ফসল ফলতো ভাল। যাহোক, যা পাইনি, তা নিয়ে দুঃখ না করে বলব—এদিকে আমাদের সাহিত্যিকেরা এবং বিজ্ঞানীরা অবহিত যদি একে ফেল্‌না বলে তুচ্ছ করেন, তাহলে বলব, এই ফেল্‌না কাহিনী লিখেছেন এইচ জি ওয়েলস, অল্ডাস হাক্সলী, জর্জ অরওয়েল; আবার বিখ্যাত বিজ্ঞানী হলডেনও একাহিনী লিখতে সঙ্কোচবোধ করেননি। আর যদি তাঁরা বিজ্ঞান-কথা লিখতে ভয় পান তো তাঁদের কানে কানে বলি কুম্ভীলক হোন; পরস্বাপহরণ করুন! সে-পাতি তো বীরবলই দিয়ে রেখেছেন।

কবিতা
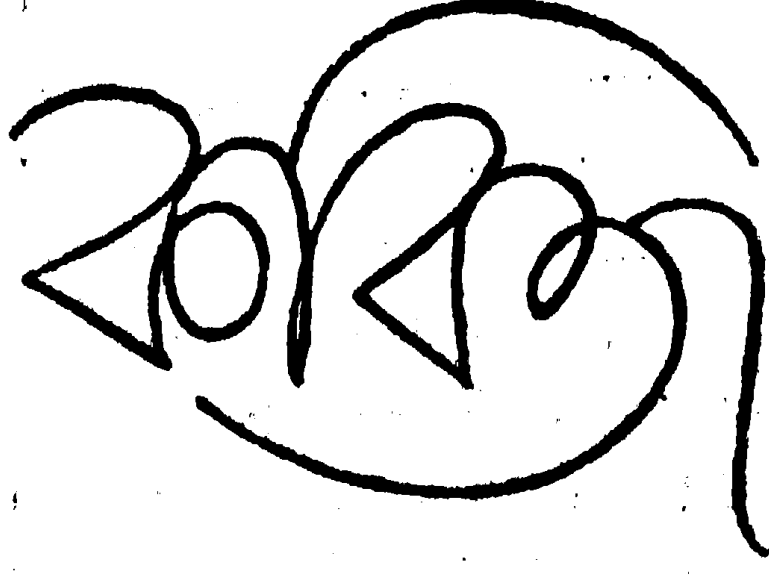
কবিপ্রণাম

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃন্ময়ী মায়ে তুমি ভালোবেসেছিলে,—
অমর প্রেমের অমৃতে ভরিয়া দিলে
শত বরণের সুরের প্রদীপ জেলে
কোথা গেলে কবি, আজি সে মায়েরে ফেলে

বিধাতার দূত যুগে যুগে এল যারা
পাষাণ টুটিয়া ছুটিল নির্ঝরধারা
তুমি তাহাদের সকলের ভালোবাসা
ধ্বনিয়া তুলিলে তাদের সবার আশা—

জীবনের দান সাদরে লয়েছ করি',
ধরণীর ধূলি পরেছ তিলক করি',
আশা দে'ছ তুমি লাঞ্ছিতে বঞ্চিতে,
সরস করেছ তব মনোমাধুরীতে

কবি, আজি হ'তে শত বৎসর আগে
দু'দিনের বাসা বেঁধেছিলে অনুরাগে;
প্রাসাদে কুটিরে তুমি আজো আছ সাথে—
উৎসবসাথী, শোকের আঁধার রাতে

তুমি চলে গেছ, আমাদেরো দিন যায়;
পূজাবলি ল'য়ে তব মন্দির ছায়,
তোমারি ভাষায় আজো এরা কথা বলে,
তোমারে যে করে অপমান পলে পলে

শুধু ভাষা নয়,—প্রাণ থাকা চাই পিছে,
শুধু আশা নয়,—কাজ ছাড়া সব মিছে।
কঠিন তরুর চাই দৃঢ় আশ্রয়,
রসের সাধনা লালসার লীলা নয়—

তুমি শিখায়েছ জ্বালিতে যে দীপশিখা
আকাশে-বাতাসে প্রলয়ের বিভীষিকা!
কামানের মুখে গাহিতে ফুলের গান
তোমার চরণে মোদের অর্ঘ্যদান

এত ভালো বুঝি কখনো বাসেনি কেহ!
মরমানবের মলিন এ লীলাগেহ!
দিনে রাতে তুমি আরতি করেছ যারে
অশ্রুসাগরে—অকূলে অন্ধকারে?

করুণার বাণী বহি অকরুণ ভবে,—
বারে বারে হেথা যাদের শঙ্খরবে—
আহরিয়া বুঝি এনেছিলে এক প্রাণে?
ভুলে-আসা বাণী—তোমার বীণার তানে!

জীবনের গান গেয়েছ কণ্ঠ ছাড়ি;
ধরণীর মন স্নেহ দিয়ে নেছ কাড়ি'।
মৌনমূকেরে গেছ তুমি ভাষা দিয়া।
কত কোটি ধরে কত নরনারী-হিয়া!

তুমি এসেছিলে একদা মোদের মাঝে,
ছেড়ে চ'লে গেছ, মন তবু মানে না যে!
মিলনে বিরহে—সুখে-দুখে অহরহ।
আজো পাশে বসি' সান্ত্বনা বাণী কহ।

আগামী দিনের জনতা হতেছে জড়ো
তুমি ইহাদের অন্তরে সঞ্চরো।
আজো নাচে এরা তোমারি গানের সুরে,
নাহি জানে সরে ক্রমে দূর হ'তে দূরে।

শুধু দান নয়,—মান সাথে দিতে হবে।
শুধু শোভা নয় কুসুমিত পল্লবে,—
চাই পৌরুষ, শ্রমস্বেদজলসেবা।
তুমি না বুঝালে এদের বুঝাবে কেবা?

কেমনে সে আভা জ্বালিয়া রাখিব, গুরু?
কে জানে কখন মহামারী হবে শুরু।
তুমি দাও বল, তুমি দাও মুখে কথা।
জীবনে-মরণে লভে যেন সফলতা।

* *

*

কহেন কবি কালিদাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
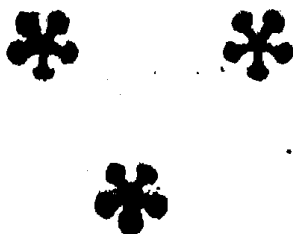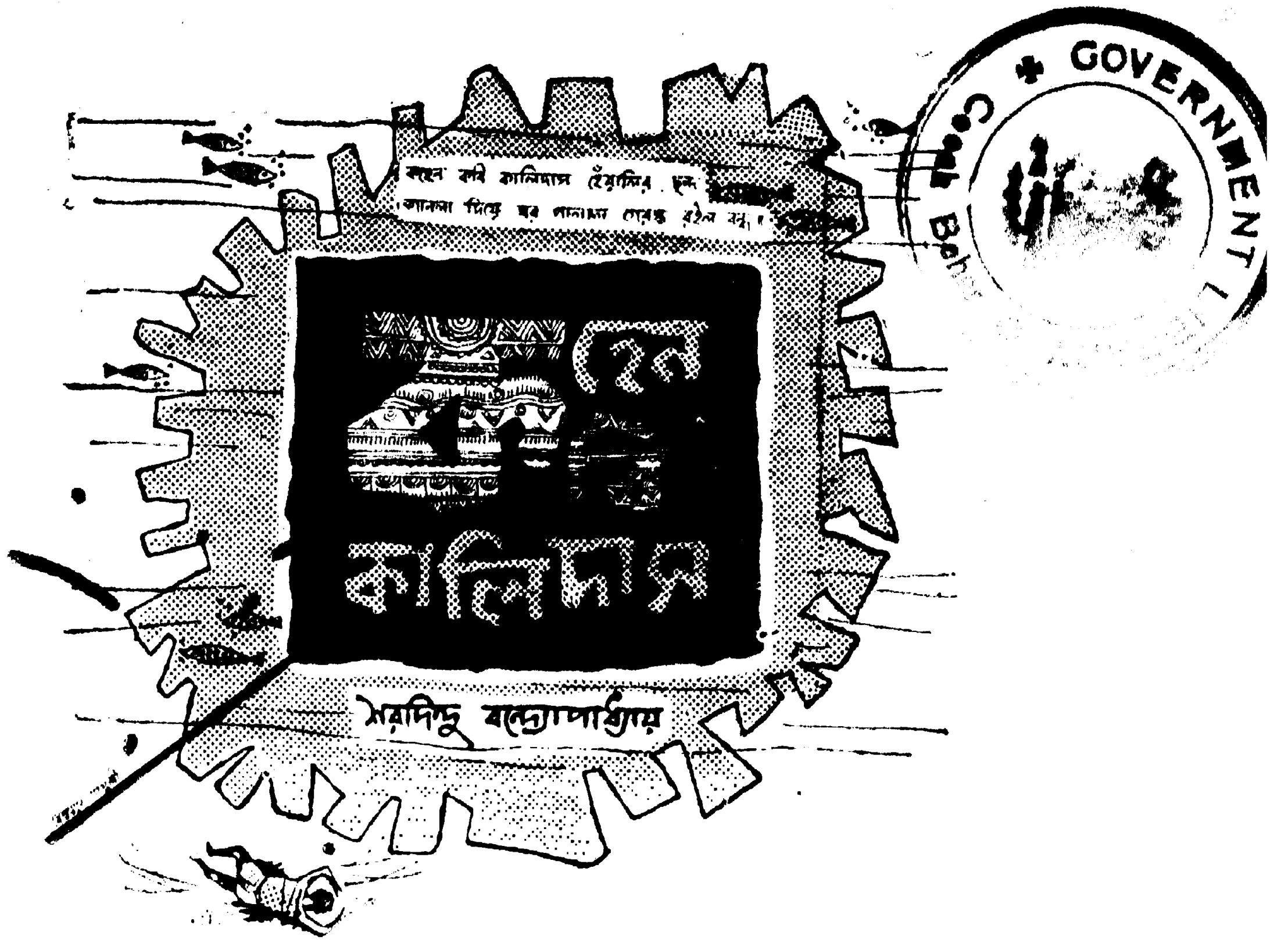
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। খ ।।

কয়লা ক্লাবের বাড়িটি সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। সামনে বাগান ও মোটর রাখিবার পার্কিং লট্, দুই পাশে ব্যাডমিণ্টন টেনিস প্রভৃতি খেলিবার স্থান। বাড়িটি একতলা হইলেও অনেকগুলি বড় বড় ঘর আছে। মাঝখানের হল-ঘরে বিলিয়ার্ড খেলার টেবিল; অন্য ঘরের কোনোটিতে পিঙ্‌পঙ্‌ টেবিল, কোনোটিতে চার পাঁচটা তাস খেলার টেবিল ও চেয়ার। আবার একটা ঘরের মেঝেয় ফরাস পাতা, এখানে দাবা ও পাশা খেলার আসর। বাড়ির পিছন ভাগে দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর; একটিতে ম্যানেজারের অফিস, অন্যটিতে পানাহারের ব্যবস্থা, টুকিটাকি খাবার, নরম ও গরম নানা জাতীয় পানীয় এখানে সভ্যদের জন্য প্রস্তুত থাকে।

আমরা যখন ক্লাবে গিয়া পৌঁছিলাম তখনও যথেষ্ট দিনের আলো আছে। অনেক সভ্য সমবেত হইয়াছেন। বাহিরে টেনিস কোর্টে খেলা চলিতেছে; চারজন খেলিতেছে, বাকি সকলে কোর্টের পাশে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া খেলা দেখিতেছেন, ফণীশ আমাদের সেই দিকে লইয়া চলিল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া খেলা দেখিবার পর ব্যোমকেশ ফণীশের কানে কানে বলিল,—'তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ এখানে আছে নাকি?'

ফণীশ বলিল,—'ঐ যে খেলছেন, তোয়ালের নীল গেঞ্জি আর শাদা প্যাণ্টলুন, উনি মুগেন মৌলিক।'

একটু রোগা ধরণের শরীর হইলেও মুগেন মৌলিকের চেহারা বেশ খেলোয়াড়ের মতন। খেলার ভঙ্গীতে একটু চালিয়াতি ভাব আছে, কিন্তু সে ভালই টেনিস খেলে। ব্যাক্‌হাণ্ড বেশ জোরালো; নেটের খেলাও ভাল।

ব্যোমকেশ খেলা দেখিতে দেখিতে বলিল,—'বাকি দু'জন এখানে নেই?'

ফণীশ বলিল,—'না। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।'

এই সময় পিছন হইতে কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—'ব্যোমকেশবাবু — থুড়ি —গগনবাবু যে!'

ফিরিয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্ব-পরিচিত গোবিন্দ হালদার ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া মধুর গোরিলা-হাস্য হাসিতেছেন।

ব্যোমকেশ কিন্তু হাসিল না, স্থির-দৃষ্টিতে গোবিন্দবাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'আসল নামটা জানতে পেরেছেন দেখছি। কি করে জানলেন?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন,— 'প্রথম দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর দুই আর দুয়ে মিলিয়ে দেখলাম ঠিক মিলে গেল। গগন — ব্যোমকেশ, সুজিত — অজিত।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমাদের নাম-করণ ভাল হয়নি, কাঁচা কাজ হয়েছিল। কিন্তু আসল নামের বহুল প্রচার কি বাঞ্ছনীয়?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন,— 'আমি প্রচার করছি না। নামটা আল্‌টপ্‌কা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। যাহোক, আমাদের ক্লাবে পদার্পণ করেছেন খুবই আনন্দের কথা। উদ্দেশ্য কিছু আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনার কি মনে হয়?'

গোবিন্দবাবুর মন্থর চক্ষু-দুটি একবার ফণীশের দিকে গিয়া আবার ব্যোমকেশের মুখে ফিরিয়া আসিল,—'আপনি কাজের লোক, অকারণে আড্ডা করে বেড়াবেন বিশ্বাস হয় না। কাজেই

এসেছেন। কিন্তু কোন্ কাজ? কয়লা-খনির রহস্য উদ্ঘাটন?'

ব্যোমকেশ আবার বলিল,—'আপনার কি মনে হয়?'

গোবিন্দবাবুর চক্ষু দুটি কুঞ্চিত হইয়া ক্রমে দুইটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হইল—'তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছি। দেখুন, আপনি হুঁশিয়ার লোক, তবু সাবধান করে দিচ্ছি। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করবেন না।' তাঁহার

'......তবু সাবধান করে দিচ্ছি। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করবেন না।'

কুঞ্চিত চক্ষুযুগল একবার ফণীশের দিকে সঞ্চারিত হইল, তারপর তিনি টেনিস কোর্টের কিনারায় গিয়া চেয়ারে বসিলেন।

ফণীশের মুখে শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছিল, সে স্খলিত স্বরে বলিল,—'গোবিন্দবাবু অরবিন্দবাবুর বড় ভাই। উনি যদি বাবাকে বলে দেন—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভয় নেই, গোবিন্দবাবু কাউকে কিছু বলবেন না। উনি নিজের দুর্বৃত্ত ছোট ভাইটিকে ভালবাসেন। —চল, ভিতরে যাই।'

বাড়ির সামনের বারান্দায় একটি টেবিলে দৈনিক সংবাদপত্র সাপ্তাহিক প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে, আমরা সেইখানে গিয়া বসিলাম। ফণীশ একজন তকমাধারী ভৃত্যকে ডাকিয়া তিন গেলাস ঘোলের সরবৎ হুকুম করিল।

বরফ-শীতল সরবৎ চাখিতে চাখিতে দেখিতেছি, ঘোর ঘোর হইয়া আসিতেছে। বাহিরে টেনিস খেলা শেষ হইল। সভ্যেরা ভিতরে আসিতেছেন, নানা কথার ছিন্নাংশ কানে আসিতেছে। বাড়ির ভিতরে ঘরে ঘরে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। টেব্‌ল-টেনিসের ঘর হইতে খটাখট শব্দ আসিতেছে। হঠাৎ কোনও সভ্য উচ্চ-কণ্ঠে হাঁকিতেছেন—এই বেয়ারা!

সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার একটি চলমান চিত্র।

সরবৎ নিঃশেষ হইলে আমরা সিগারেট ধরাইয়া বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। মাঝের হলঘরে দুইজন নিঃশব্দ খেলোয়াড় নিরুদ্বেগ মন্থরতায় বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন; প্রকাণ্ড টেবিলের উপর তিনটা বল তিনটি শিশুর মত লুকোচুরি খেলিতেছে। ......এখানে আমাদের দ্রষ্টব্য কেহ নাই। এখান হইতে টেব্‌ল-টেনিসের ঘরে গেলাম; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, হাফ্-ভলির খেলা চলিতেছে; খটাখট শব্দে বল্ টেবিলের এপার হইতে ওপারে ছুটাছুটি করিতেছে; ব্যস্ত-সমস্ত একটি শুভ্র বুদ্বুদ। —এ ঘরেও আমাদের দর্শনীয় কেহ নাই।

ফরাস-পাতা ঘর হইতে মাঝে মাঝে হল্লার আওয়াজ আসিতেছিল। সেখানে পাশা বসিয়াছে, চারজন খেলোয়াড় ছক ঘিরিয়া চতুষ্কোণভাবে বসিয়াছেন। একজন দুহাতে হাড় ঘষিতে ঘষিতে আদুরে সুরে পাশাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,— 'পাশা! বারো-পাঞ্জা-সতরো! একবারটি বারো-পাঞ্জা-সতরো দেখাও! এমন মার মারব, পেটের ছানা বেরিয়ে যাবে।' তিনি পাশা ফেলিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠিল—'তিন কড়া! তিন কড়া!'

আমরা দ্বারের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া তাসের ঘরে উপনীত হইলাম।

তাসের ঘরে সব টেবিল এখনও ভর্তি হয় নাই; কোনও টেবিলে একজন বসিয়া পেশেন্স খেলিতেছেন, কোনও টেবিলে তিনজন খেলোয়াড় চতুর্থ ব্যক্তির অভাবে গলা-কাটা খেলা খেলিয়া সময় কাটাইতেছেন। একটি টেবিলে চতুরঙ্গ খেলা বসিয়াছে; চারজন খেলোয়াড় গভীর মনঃসংযোগে নিজ নিজ তাস দেখিতেছেন। একজন বলিলেন—'থ্রি হার্টস্।' কন্ট্রাক্ট্ খেলা।

ফণীশ ফিস্ ফিস করিয়া বলিল,—'যিনি ডাক দিলেন উনি মধুময় সুর, আর তাঁর পার্টনার অরবিন্দ হালদার।'

ব্যোমকেশ টেবিলের কাছে গেল না, দূর হইতে সেইদিক পানে চাহিয়া রহিল। অরবিন্দ হালদার যে গোবিন্দ হালদারের ছোট ভাই, তাহা পরিচয় না দিলেও বোঝা যায়। সেই গোরিলা-[illegible]জন রূপ, কেবল বয়স কম। মধুময় সুর ফিট্‌ফাট [illegible] লোক, চেহারায় ব্যক্তিত্বের অভাব গিলে-করা পাঞ্জাবি ও হীরার বোতাম প্রভৃতি দিয়া পূর্ণ করিবার চেষ্টা দেখা যায়।

খেলা আরম্ভ হইয়াছে, ডামি হইয়াছেন বিপক্ষ দলের একজন। স্ল্যামের খেলা, কাহারও অন্য দিকে মন নাই।

পাঁচ মিনিট খেলা দেখিয়া ব্যোমকেশ ইশারা করিল, আমরা বাহিরে আসিলাম। সে সম্ভাব্য আসামীদের দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, শুষ্ক স্বরে বলিল,—'যা দেখবার দেখা হয়েছে, চল এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

মোটরে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কী দেখলে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তিনটে মানুষকে দেখলাম, তাদের পরিবেশ দেখলাম, হাত-পা নাড়া দেখলাম। —ফণীশ, কাল সকালে আমরা ওদের বাড়িতে যাব। আলাপ-পরিচয় করা দরকার। আজ যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশী কিছু পা'ব আশা করি না, তবু—'

'আজ কিছু পেয়েছ তাহলে?'

'পেয়েছি। যদিও সেটা নেতিবাচক।'

গ

পরদিন সকালে ফণীশ বাপের সঙ্গে কয়লাখনিতে গেল না, মণীশবাবু একাই গেলেন। ফণীশ আমাদের গাড়ি চালাইয়া লইয়া চলিল। গাড়িতে স্টার্ট দিয়া বলিল, 'আগে কোথায় যাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমার কারুর প্রতি পক্ষপাত নেই, যার বাড়ি কাছে তার বাড়িতে আগে চল।'

'তাহলে মৃগেনবাবুর বাড়িতে চলুন।'

মৃগেন মৌলিকের বাড়িটি অতিশয় সশ্রী, গৃহস্বামীর শৌখীন রুচির পরিচয় দিতেছে। আমাদের মোটর বাগান পার হইয়া গাড়ি-বারান্দায় উপস্থিত হইলে দেখিলাম মৃগেন মৌলিক বাড়ির সম্মুখে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে, তাহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও সিল্কের ড্রেসিং গাউন। আমরা গাড়ি হইতে নামিলে সে কাগজ মুড়িয়া আমাদের পানে চোখ তুলিল। অভ্যাগত সম্ভাষণের হাসি তাহার মুখে ফুটিল না, বরঞ্চ মুখ অন্ধকার হইল। আমরা তাহার নিকটবর্তী হইলে সে রুক্ষ স্বরে বলিল,—'কি চাই ?'

আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ফণীশ বলিল,—'মৃগেনবাবু, এঁরা আমার বাবার বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছেন—'

ফণীশের প্রতি তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃগেন বলিল,—'জানি। ব্যোমকেশ বক্সী কার নাম ?'

ফণীশ থতমত খাইয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি ব্যোমকেশ বক্সী। আপনার সঙ্গে দুটো কথা ছিল।'

মৃগেন মুখ বিকৃত করিয়া অসীম অবজ্ঞার স্বরে বলিল, 'এখানে কিছু হবে না, আপনারা যেতে পারেন।' বলিয়া নিজেই কাগজখানা বগলে লইয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। ফণীশের মুখ অপমানে সিন্দুরবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ব্যোমকেশের অধরে লাঞ্ছিত হাসি। সে বলিল,—'গোবিন্দ হালদার দেখছি আসামীদের সতর্ক করে দিয়েছেন।'

ফণীশ বলিল,—'চলুন, বাড়ি ফিরে যাই।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল,—'না, যখন বেরিয়েছি তখন কাজ সেরে বাড়ি ফিরব। ফণীশ, তুমি লজ্জা পেও না। সত্যান্বেষণ যাদের কাজ তাদের লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করতে হয়। চল এবার মধুময় সুরের বাড়িতে।'

মোটরে যাইতে যাইতে আমি বলিলাম,—'কিন্তু কেন ? এরকম ব্যবহারের মানে কি ? মৃগেন মৌলিক যদি নির্দোষ হয় তাহলে তার ভয় কিসের ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ওদের ধারণা হয়েছে আমি ফণীশের দলের লোক, ফণীশকে বাঁচিয়ে ওদের ফাঁসিয়ে দিতে চাই।'—

মধুময় সুরের বাড়িটি সেকেলে ধরণের, বাগানের কোনও শোভা নাই। বাড়ির সদর বারান্দায় মধুময় সুর গামছা পরিয়া মাদুরের উপর শুইয়া ছিল এবং একটা মুস্কো জোয়ান চাকর তৈল দিয়া তাহার দেহ ডলাই-মলাই করিতেছিল। মধুময়ের শরীর খুব মাংসল নয়, কিন্তু একটি নিরেট গোছের ক্ষুদ্র ভুঁড়ি আছে। আমাদের দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল।

ফণীশ ক্ষীণ কুণ্ঠিত স্বরে আরম্ভ করিল,—'মধুময়বাবু, মাফ করবেন, এটা আপনার স্নানের সময়—'

মধুময় তাহার কথা কর্ণপাত না করিয়া আমাদের দিকে কয়েকবার চক্ষু মিটিমিটি করিল, তারপর পাখি-পড়া সুরে বলিল,—'আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন, আমি প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানি না। যদি কেউ ব'লে থাকে আমি তার মৃত্যুর রাত্রে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম তবে তা মিথ্যে কথা। অন্য কেউ গিয়েছিল কিনা আমি জানি না, আমি যাইনি।' বলিয়া মধুময় সুর আবার শয়নের উপক্রম করিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ট্যাক্সি-ড্রাইভার কিন্তু আপনাকে সনাক্ত করেছে।'

মধুময় বলিল,—'ট্যাক্সি-ড্রাইভার মিথ্যাবাদী।—আসুন, নমস্কার।'

ব্যোমকেশ চট করিয়া প্রশ্ন করিল,—'আপনার একটা টর্চ আছে ?'

মধুময় বলিল,—'আমার পাঁচটা টর্চ আছে। আসুন, নমস্কার।'

মধুময় শয়ন করিল, ভৃত্য আবার তৈল-মর্দন আরম্ভ করিল। আমরা চলিয়া আসিলাম।

অরবিন্দ হালদারের বাড়ির দিকে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা আসব মধুময় জানতো, আমাদের কী বলবে মুখস্থ করে রেখেছিল। যাই বল, মৃগেন মৌলিকের চেয়ে মধুময় সুর ভদ্র। কেমন মিষ্টি সুরে বলল—আসুন, নমস্কার। নিমচাঁদ দত্তের ভাষায়—ছেলেটি বে-তরিবৎ নয়।'

অরবিন্দ হালদার ও গোবিন্দ হালদার একই বাড়িতে বাস করেন, কিন্তু মহল আলাদা। অরবিন্দ নিজের বৈঠকখানায় ফরাস-ঢাকা তক্তপোষের উপর মোটা তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া সিগারেট টানিতেছিল, আমাদের দেখিয়া কনুই-এ ভর দিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, চুল এলোমেলো, কালো মুখে অঙ্কোরিত দাড়ির কর্কশতা। সে আমাদের পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল,—'এস ফণীশ।'

ফণীশ পাংশুমুখে বলিল, 'এঁরা—'

অরবিন্দ বলিল,—'জানি। বসুন আপনারা।' বলিয়া সিগারেটের কৌটা আগাইয়া দিল।

শিষ্টতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তাই একটু থতমত হইলাম। ব্যোমকেশ তক্তপোষের কিনারায় বসিল, আমরাও বসিলাম। অরবিন্দ সহজ সুরে বলিল,—'কাল রাত্রে মাত্রা বেশী হয়ে গিয়েছিল। এখনো খোঁয়ারি ভাঙেনি।—ওরে গদাধর।'

একটি ভৃত্য কাঁচের গেলাসে পানীয় আনিয়া দিল, অরবিন্দ এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিয়া গেলাস ফেরৎ দিয়া বলিল,—'আপনাদের জন্যে কী আনাব বলুন। চা ? সরবৎ ? বীয়ার ?'

[ক্রমশঃ]

বলুন তো কী?

প্রশ্ন

১। কয়েক সপ্তাহ আগে লাওসের রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য জেনিভাতে ১৪টি বিভিন্ন জাতির সম্মিলিত সভা বসেছিল, এই ১৪টি জাতি কারা ?

২। প্রেসিডেন্ট নক্রুমা, সেকরু টুয়ের (Sekru Toure) এবং মডিবো কিটা (Modibo Kieta)—এই তিনজনে এই নীতি প্রচার করেছেন যে তাঁরা তাঁদের তিনটি দেশকে একত্রিত করে ফেলবেন। এই তিনটি দেশের নাম উল্লেখ করে প্রত্যেক দেশের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের নাম যুক্ত করুন।

৩। Aid India Club কি ধরনের সমিতি ?

[উত্তর অন্যত্র আছে]

প্রদর্শনী

কলারসিক

রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিজস্ব ভবনে (ক্যাথেড্রাল রোড, কলকাতা) গত ১৮ই জুন থেকে রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করে সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকীতে এইভাবে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদিত হওয়ায় আমরা খুশি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজোর এই রীতি ভিন্ন শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার অন্য কোনো পন্থা নেই।

এই প্রদর্শনীর ফলে দীর্ঘকাল পরে একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ৫১ খানি ছবি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করলেন কলকাতার অধিবাসীবৃন্দ। জানি, সমগ্র রবীন্দ্র-চিত্রকলার পরিমাণ বিচার করলে এই সংখ্যা একেবারেই নগণ্য মনে হবে। সত্তর বছর বয়সে পরিণত মন নিয়ে যে মহত্তর স্রষ্টা কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেও রেখা আর রঙের ছন্দে প্রচণ্ড গতিবেগে ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪০ সাল—মাত্র এই কয় বছরের মধ্যে আমাদের উপহার দিলেন দ্বি-সহস্রাধিক চিত্রের আশ্চর্য ফসল, তাঁকে শুধু ঐ ৫১খানা ছবি দিয়ে কি ভাবে বিচার করবো? এইভাবে শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে বিচার করা যায় না। শিল্প-রসিক সাধারণ দর্শকেরা এই প্রদর্শনী থেকে তাই রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে শুধু একটা আটপৌরে ধারণাই গ্রহণ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। যে দেশের মানুষ রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে অজ্ঞ, সেখানে এইটুকুই বোধহয় যথেষ্ট, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস কি এই মনোভাব পোষণ করেন?

জানিনে প্রদর্শনী-কর্তাদের মনোভাব কি ছিল। কিন্তু কি হলে আরো ভাল হত সে-কথা আমরা বলতে পারি বৈ-কি! অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ এই প্রদর্শনীর জন্য ছবি সংগ্রহ করেছেন, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ, শ্রীমতী নলিনী বসু, শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনবযুগ আচার্য, ডঃ ভাণ্ডারকার প্রমুখ ব্যক্তিদের নিকট থেকে। আমার তো মনে হয়, অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ আর একটু চেষ্টা করলে বিশ্বভারতীর নিকট থেকেও রবীন্দ্র-চিত্রকলা সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল না। এবং এই-ভাবে এক সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রবীন্দ্র-চিত্রকলার ব্যাপক পরিচয় তাঁরা আমাদের মত অভাজনদের জন্য উপস্থিত করতে পারতেন। শতবার্ষিকীতে অ্যাকাডেমীর কাছে আমরা এই প্রত্যাশাই করেছিলাম। আশা করছি, পরবর্তী কালে তাঁরা আমাদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ করতে অগ্রসর হবেন।

এবার প্রদর্শিত চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। ভারতীয়-চিত্রের পুনরুজ্জীবনের দিনে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, একথা সকলেরই জানা। কিন্তু সেই পুনরুজ্জীবন যখন পরবর্তী কালে নিষ্প্রাণ নকল--নবিশীয়ানায় পর্যবসিত হল, ভারতীয় শিল্পে তথা প্রাচ্য রীতির নামে নিছক সুন্দর ললিত-লবঙ্গলতা ও পেলব-পুরুষ প্রেমিকের ছবিই শিল্পীর কাম্য হয়ে উঠলো, তখন রবীন্দ্রনাথের গতি-ধর্মী সজীব মন শিল্পের এই পরিণতিকে যে স্বীকার করতে পারেনি, শিল্পী শ্রীমুকুল দে-কে লিখিত এক-খানি চিঠি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়:
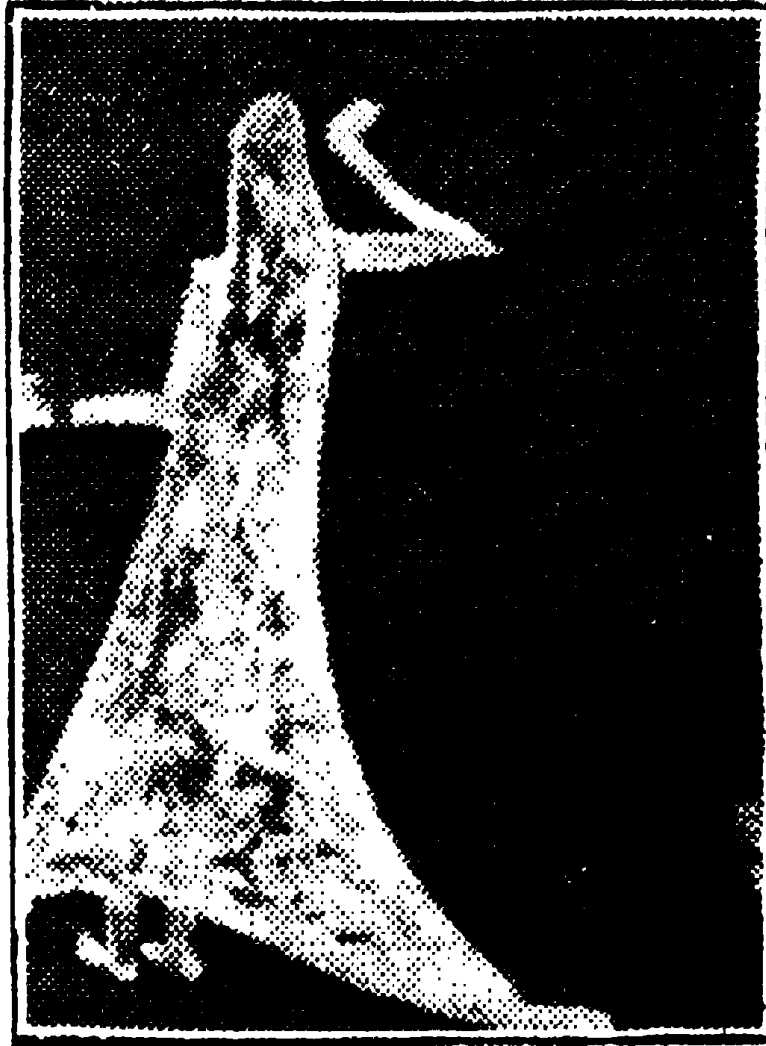
"বিশ্বসৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখ এর সর্বত্রই খুব একটা জোর আছে, এ ভারি শক্ত—এর সৌন্দর্য বাবুয়ানার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—এ আমাদের বাংলা দেশের কার্তিকের মত গোঁফে তা দিয়ে ময়ূর চ'ড়ে বেড়ায় না। বিশ্বের এই বিশাল সৌন্দর্য অসুন্দরকেও অনায়াসে আপনার অঙ্গীভূত করে নিতে পারে এবং তাতে তার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। তোর তুলি মায়া সরস্বতীর পায়ের-তলায় আলতা দেবার তুলি হলে চলবে না। যথার্থ সৌন্দর্য জিনিসটি মোহ নয়, মায়া নয়, তা দশজনের চোখ ভোলাবার ফাঁদ নয়—সৌন্দর্য হচ্ছে সত্য। যতক্ষণ সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে সত্যের সেই স্বাভাবিক দৃঢ়তা প্রশস্ততা কঠোরতা পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করা যেতে পারবে না।......তোর তুলিতে পৌরুষ দেখতে চাই—তার বাঁট বজ্রের মত শক্ত হবে এবং সর্বত্রই সে অকুণ্ঠিত প্রবেশাধিকার লাভ করবে। তোর চারিদিকে যা তুচ্ছ জিনিস আছে, যা অসুন্দর, তার মধ্যেও সুন্দরকে তুই দেখবার সাধনা কর। তাহলেই বিশ্ব-সরস্বতী তোর সহায় হবেন।"

[২৫শে এপ্রিল, ১৯১৩]

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর সুন্দর, মুক্তার মত হাতের লেখাতে 'অসুন্দর' কাটা-কুটির মধ্য দিয়ে প্রথম চিত্রের আভাস ফুটিয়ে তুললেন, তখনি উপরোক্ত চিঠির মানস-কামনা তাঁর অজ্ঞাতে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে। সেদিন থেকেই ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন যুগের সূচনা। ভারতীয় চিত্রের গীতিকাব্য-ধর্মী, পেলব, সুকুমার পুরুষ ও নারী দেহ 'সুন্দরপানা' ছবির জগতে সাধারণ 'তুচ্ছ জিনিস' আর 'অসুন্দর' কিম্ভূত-কিমাকার বিভীষিকাময় পরিবেশে 'দৃঢ়তা প্রশস্ততা কঠোরতা' নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হল। রবীন্দ্রনাথ যে 'পৌরুষ' দেখতে চেয়েছিলেন মুকুল দে-র ছবিতে, সেই পৌরুষ-কাঠিন্যই

জগতে। এ-এক বিস্ময়কর পরিণতি। রেখার এমন নির্ভীক প্রয়োগ, আকারের এমন সুশৃংখল বিন্যাস, পটাবকাশের বণ্টনে সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান, দ্বি-মাত্রিক থেকে ত্রি-মাত্রিক রীতিতে উত্তরণ, স্বাধীনভাবে রঙ প্রয়োগের নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে জোরালো বর্ণ-দ্যুতি আনয়ন, বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণ,—অর্থাৎ আঙ্গিককে এবং বক্তব্য বাস্তব সত্য থেকে ভাব-সত্যের বিমূর্ত চিত্রাঙ্কন, আমাদের শিল্পের রাজ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্য শ্রেষ্ঠ দান।

জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে সৃষ্টির এক অপরিচিত রাজ্যে এমন অসংকোচ অভিযান এবং শিল্পের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার কি করে যে সম্ভব হয়, রহস্যাবৃত সে ইতিহাস। হয়তো কবি রবীন্দ্রনাথ শব্দের যে 'অসুন্দর'কে প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করেছেন, পরিণত বয়সে ভারতবর্ষের সেই সাধারণ ভেঙাখোঁড়া, অভাব-অনটন ও বিভীষিকা পর্যুদস্ত জীবন তাকে চেতনার এক বিশেষ মুহূর্তে রেখার ছন্দে টেনে নিয়ে গেছে সেই 'অসুন্দর'কে ছবির ভাষায় প্রকাশ করার জন্য। এই প্রদর্শনীতেও তেমন কয়েকটি চিত্র আছে, দেখতে পেলাম। চিত্রপটের অন্ধকার দীর্ণ করে বিকৃত মুখমণ্ডলের অশুভ প্রতিকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেখানে। কদর্য পৃথিবীর রবীন্দ্র-মানসের সন্তান যেন এরা।

রবীন্দ্রনাথ অনেক আজগুবি ও বস্তুবিচ্ছিন্ন আকৃতির ছবি রচনা করেছেন। এই প্রদর্শনীতেও এরকম কয়েকখানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলি বাস্তবের সত্যরূপকে তুলে ধরেছে, কোনো বস্তুর চেহারা নয়। অন্য কয়েকখানি ছবি দেখলে মনে হবে এর সর্বাংগে যেন ভাস্কর্য শিল্পের ঋজু কাঠিন্য বিদ্যমান। প্রস্তর মূর্তি, ব্রোঞ্জের মূর্তি কিংবা দারু-শিল্পের স্পষ্ট আভাস ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের চিত্ররীতির মধ্যে। চিত্রে এই পৌরুষ কাঠিন্য আনয়ন একমাত্র প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। এখানে প্রদর্শিত ১৫, ১৬, ৪২ ও ৪৩নং চিত্রে এরই উজ্জ্বল স্বাক্ষর পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব সুবিদিত। তাঁর চিত্রকলাতেও এই বহিঃপ্রকৃতির প্রাচুর্য তাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ অনেক নিঃসর্গ চিত্র রচনা করেছেন। এই সব চিত্রে রবীন্দ্রনাথ আলো-আঁধারের যে আশ্চর্য জাল বুনেছেন, রঙে-রেখায় যে পরিমিতি বোধ, যে গভীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন সত্যি তা তুলনাহীন। তাঁর নৈসর্গিক আবহ রচনার কৌশল এবং স্থানিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এই প্রদর্শনীর ৩৯নং চিত্র এরই উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এছাড়া আরো ১১খানি নিঃসর্গ-চিত্র এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে প্রদর্শিত অন্যান্য চিত্রেও আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্য দর্শকেরা খুঁজে পাবেন আশা করি।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা যে 'ক্যাটালগ' প্রকাশ করেছেন, তাতে রবীন্দ্র-চিত্রের নামকরণ করায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে শুনেছি। ক্ষোভের কারণ আমার অন্ততঃ বোধগম্য হয়নি। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির কোনো নাম দেননি, সেইহেতু অন্য কেউ নামকরণ করলে অশুদ্ধ হয়ে যাবে সেই নাম বা ছবি, এমন সংস্কারের প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সম্পর্কে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে যা লিখেছিলেন উদ্ধৃত করছি এখানে:

"ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।" তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকিনে—দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক রাজার লাঙলের ফলায় যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষত সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি—তারা অনাহূত এসে হাজির—রেজিস্টার দেখে নাম মিলেয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন,—নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন। অনাথাদের জন্য কত আপিস বের করেন: অনামাদের জন্যে করতে দোষ কী। দেখবেন যেখানে এক নামের বেশি আশা করেননি, সেখানে বহু নামের দ্বারা ছবিগুলো নামজাদা হয়ে উঠবে। রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ তার পরে নামবৃষ্টি অপরের।" [২ পৌষ, ১৩৪৮]

এর পরে নামকরণ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। প্রদর্শনীটি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত খোলা থাকবে। প্রদর্শনীটি দেখার জন্য আমরা কলকাতার শিল্প-রসিকদের অনুরোধ করছি। কারণ, এমন সুযোগ (যতই অসম্পূর্ণ হোক) সচরাচর ঘটবে না আমাদের জীবনে।

লক্ষ্মীনারায়ণ :

খাজুরাহো

সুর-সুন্দরী

কোণারক

জনসনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক

দীনরঞ্জন ঘোষ

ডাঃ স্যামুয়েল জন্‌সনের নাম ইংরাজী সাহিত্যে সুপরিচিত। ডিক্সনারী অফ দি ইংলিশ ল্যাংগোয়েজ প্রণেতা বলিয়াই নহে—পরন্তু পাণ্ডিত্যের গভীরতায়, সূক্ষ্ম বিচারশক্তিতে তিনি সমগ্র শিক্ষিত সমাজের নিকট আদরণীয়। লেখক, কবি, প্রবন্ধকার হিসাবেও তাহার খ্যাতি কম নয়।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু নারী ও পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা ছিল, তাহারই আলোচনা করিব।

তাঁহার প্রথম ভালবাসার পাত্রী ছিলেন জনৈক পাদ্রীর বিধবা। জনসন নিজ মুখে তাঁহার জীবনীকার জেমস বস্‌ওয়েলের নিকট একথা ব্যক্ত করিয়াছেন। সত্যিই পুরুষের জীবনে কেবলমাত্র একটি নারীকেই ভালবাসা সম্ভব কি না, একথার উত্তরে জনসন স্পষ্টই বলিয়াছেন —না। একটি নির্দিষ্ট নারী একটি বিশেষ পুরুষের জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ ধারণাও তাঁহার মতে ভ্রান্ত। তাঁহার নিজের জীবনেও অবশ্য ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে; কেননা, তিনি প্রথম প্রণয়িনীকে বিবাহ করেন নাই। পরন্তু বিবাহ করিয়াছেন একজন বিধবাকে যাহার বয়স ছিল তাঁহার বয়সের দ্বিগুণ এবং যাহার ব্যক্তিত্ব ও আচরণ অন্যের নিকট মোটেই মধুর বলিয়া মনে হইত না। কিন্তু জন্‌সন তাঁহার স্ত্রীকে কি অদ্ভুত ও অকৃত্রিমভাবে ভালবাসিতেন, তাহা স্ত্রীর মৃত্যুর পর নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি জন্‌সন একবার স্ত্রীর জীবদ্দশায় তাঁহার (স্ত্রীর) নিকট হইতে প্রায় শপথ করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তিনি জন্‌সনের অবর্তমানে পুনরায় বিবাহ করিবেন না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় কোন এক ব্যক্তির দ্বিতীয়বার বিবাহ উপলক্ষে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তাহার বিবাহ করা-ই উচিত। তাহাতে নাকি ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রথমবার বিবাহে তিনি এত সুখী হইয়াছেন যে, দ্বিতীয়বার বিবাহেও তাঁহার অনিচ্ছা নাই এবং এইভাবে, দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় প্রথমার প্রতি নাকি সর্বোচ্চ সম্মান দেখানো হয়। বিধবা-বিবাহে তাঁহার অবশ্য আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাঁহাকে একবার এক বিধবা-বিবাহে বিপরীত মন্তব্য করিতে শোনা গিয়াছে।

— "He has done a very foolish thing. Sir, he has married a widow when he might have had a maid".

আবার তাঁহার এ বিশ্বাসও ছিল যে সাধারণভাবে বিবাহে প্রতিটি নর-নারীর মিলনই সুখদায়ক।

জন্‌সন

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন—নারীর চাইতে পুরুষেরই বিবাহের প্রয়োজন বেশী; কারণ, তাঁহার মতে গৃহগত স্বাচ্ছন্দ্য মানেই নারীর সহযোগিতা। গৃহ থাকিলেই গৃহিণীর প্রয়োজন। অবিবাহিত যুবতীদের বেলায় তাঁহার মন্তব্য আরও বিস্ময়কর মনে হয়। তিনি বলেন—কেন যে যুবতী মেয়েরা বিবাহ করে, তাহার অর্থ তিনি বুঝিতে পারেন না। বিবাহের পর তাহারা এত স্বাধীনতা পায় না; অবিবাহিত অবস্থায় তাদের প্রতি সবার যে মনোযোগ, যে যত্ন সোহাগ বর্ষিত হয়, বিবাহের পর ততটা হয় না। কিন্তু তিনি একথা মানিতেন যে, মেয়েদের বিবাহের কারণ তাহাদের প্রকৃতির ভিতরেই আছে। তিনি বিশ্বাস করেন না যে, সুখের চাইতে দুঃখ বেশী ঘটে প্রবৃত্তির তাড়নায়। এই বিষয়ে তাঁহার জীবনীকার জেমস্ বস্‌ওয়েলের সংগে তাঁহার মতের অনৈক্য দেখা যায়।

একথা তাঁহার মতে অযৌক্তিক যে, সমাজের স্ত্রী ও কন্যাগণের সতীত্ব রক্ষার্থে বেশ্যাবৃত্তির অস্তিত্ব প্রয়োজন। তাঁহার মতে কঠোর আইনের দৃঢ় প্রয়োগই ইহার নিরোধকল্পে যথেষ্ট। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে বিবাহের প্রসারতাও ঘটিবে। জন্‌সনের এই মতের সমর্থনে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। জারের আমলের Yellow Card System কেমন করিয়া ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল আইনের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতলে, সে-কথা অনেকেই জানেন আশা করি। নর-নারীর দাম্পত্য বন্ধনকে তিনি অতি পবিত্র মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, এই বন্ধনের মধ্যে একটি নর ও একটি নারী-ই নাই, উপরন্তু তৃতীয়পক্ষ বিরাজমান—মনুষ্যসমাজ। আর যদি আনুগত্যের পবিত্র শপথ ধরা যায়, তবে তৃতীয়পক্ষ দাঁড়ায়—সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। স্বামী হয়ত নানা ধরনের দুঃসাহসিক কাজ করেন; স্ত্রীও দাবী করেন তাঁহার ন্যায় সমান অধিকার। বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও তিনি এই স্বাধীনতাটুকু দাবী করিয়াছেন, অবশ্য অবাঞ্ছিত অতিথির আগমন রুদ্ধ করিয়াই তিনি তাঁহার স্বাধীনতার অভিযান চালাইবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু জন্‌সন উত্তরে বলিলেন, এধরনের নারীর স্থান সমাজের ভিতরে নেই। বারবণিতার

গৃহেই এরা সব চেয়ে ভাল মানায়। (very fit for a brothel)।

প্রসঙ্গতঃ তাঁহার নিজের দাম্পত্য-জীবনের কথা উল্লেখ করা চলে। স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেই ইহার আভাস আছে। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, স্ত্রীর বিবাহের আংটি সযত্নে একটি কাঠের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর স্মৃতি তাহার মনে সারাটি জীবন উজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপ্যমান ছিল—মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন সঙ্গিণের বিচ্ছেদ-ব্যথা। বহুদিন পর (২০শে জানুয়ারী, ১৭৮০ খৃঃ)—প্রায় ত্রিশ বছরের ব্যবধানে, (স্ত্রীর মৃত্যু: ২৮শে মার্চ, ১৭৫২ খৃঃ) এক বন্ধুর স্ত্রী-বিয়োগে, ডাঃ জনসন তাহাকে সান্ত্বনা ছলে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে তাঁহার নিজের মানসিক ব্যথা-বেদনার আক্ষরিক রূপ। চিঠির অংশবিশেষ তাঁহার নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করিয়া দিই :—

"The loss, dear Sir, which you have lately suffered, I felt many years ago, and know therefore how much has been taken from you, and how little help can be had from consolation. He that outlives a wife whom he has long loved, sees himself disjoined from the only mind that has the same hopes, and fears, and interest; from the only companion with whom he has shared much good or evil; and with whom he could set his mind at liberty, to retrace the past or anticipate the future. The continuity of being is laccreted; the settled course of sentiment and action is stopped; and life stands suspended and motionless, till it is driven by external causes into a new channel. But the time of suspense is dreadful. . . . . ."

ভাষা ও ভাবের অপূর্ব সংমিশ্রণ। বন্ধুকে লিখিতে গিয়া ডাঃ জনসন নিজেই অতীত দিনের এক ব্যথা-মৌন কাহিনীতে এমনই আত্মহারা হইয়া অবগাহন করিয়াছেন যাহার তুলনা বিরল।

স্ত্রীর পীড়ায় জেমস্ বসওয়েলকে তিনি নানাভাবে মিসেস্ বসওয়েলের শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন। তিনি জানিতেন, পবিত্র দাম্পত্য-বন্ধন অবিচ্ছেদ্য, একজন ইহাতে আর এক-জনের উপর নির্ভরশীল। তিনি এক পত্রে তাঁহাকে বলিয়াছেন—"স্ত্রীকে হারাইলে তুমি নোঙর-ছেঁড়া নৌকা, জীবনসমুদ্রের ঢেউয়ে উঠিবে ও পড়িবে; কোন দৃঢ়তা থাকিবে না। জীবন মানেই গতি নয়, থামা-ও প্রয়োজন। তাই জীবন-তরীতে নোঙরের দরকার। বিবাহিত জীবনের গতির নিয়ামক স্ত্রী আছেন-তাই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন।"—ইহাই ডাঃ জনসনের বক্তব্য।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। এটিতেও তাঁহার সহানুভূতিশীল ও দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী স্বামীর উপার্জন হইতে লুকাইয়া বেশ মোটা একটা অংশ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে হয়ত বিবেকের দংশনেই স্ত্রী প্রকাশ করেন কথাটা। কিন্তু কোথায় সে সঞ্চিত অর্থ রাখেন, সে-কথা বলিতে পারার পূর্বেই তাঁহার জীবন-দীপ নিবিয়া যায়। জনসনের নিকট স্বামী ঘটনাটি বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, অর্থের চাইতে তিনি বেশি আঘাত পাইয়াছেন তাঁহার প্রতি স্ত্রীর এই অনাস্থায়! জনসন উত্তর দেন—নিজেকে তাহার সান্ত্বনা দেওয়া উচিত; কারণ টাকা আজ না পাওয়া গেলে কাল পাওয়া যাইবে, কিন্তু যে গেল সে তো আর কোনদিন ফিরিবে না।

দৈহিক আনন্দেরও তিনি একটা সীমা নির্ধারণ করিতে চাহিয়াছেন। এ আনন্দ অনেকখানি নাকি নির্ভর করে নিজের কল্পনার উপর। তাহা না হইলে একজন পুরুষ ডাচেস-এর আলিঙ্গনের ও পরিচারিকার আলিঙ্গনের তারতম্য বুঝিতে পারিত না। শুধু তাই নয়, একজন পুরুষ যে একজন নির্দিষ্ট নারীর পদতলে মান-মর্যাদা, ধন-ঐশ্বর্য হেলায় লুটাইয়া দেয়, ইহার মূলেও ঐ একই যুক্তি। অথচ যে আনন্দের মরীচিকার পিছনে তাহার লুব্ধ মন উধাও হয়, সে আনন্দ সে অপর কোন জায়গায় পাইতে পারে।

ধনীর সালংকারা কন্যা-বিবাহে অনেকের আশঙ্কা আছে, তাহার খরচের হাত খুব খোলা ও দরাজ হয়। বিবাহের পর এই কারণেও অনেকের জীবনে নানা অনর্থের সূচনা দেখা দেয়। গরীব স্বামীর পক্ষে বিবাহিত জীবন বিড়ম্বনময়—পরিণামে বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। ডাঃ জনসনের ধারণা, প্রচলিত মতের বিরোধী। তিনি বলেন, যেহেতু ধনী-গৃহে পালিতা কন্যা প্রচুর অর্থ লেন-দেনে অভ্যস্ত, সেই কারণে সে জানে—কি করিয়া হিসাব করিয়া খরচ করিতে হয়, কোন্ পথে আয়-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, কোন্ উপায়ে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বাড়ানো যায়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে এই মন্তব্যের মধ্যে জোরালো যুক্তি আছে স্বীকার করিতেই হয়। দরিদ্র গৃহস্থের কন্যা নাকি ইহার বিপরীত। চিরদিন অভাব-অনটনের মধ্যে কাটাইয়া অগাধ ঐশ্বর্যের বিলাসে যখন সে আসিয়া পড়ে, তখন সে "দিনে দেখে তারা"। আমাদের মনে হয় ইহার মধ্যেও অযৌক্তিকতা কিছু নাই।

তবে মহিলাদের সম্পর্কে ডাঃ জনসনের কিছু দুর্বলতা ছিল, একথা বলা যায় এবং তা প্রণয়গতও বলা চলে। এই মনোভাব তাঁহার মধ্যে অন্ধগতিতে প্রবাহিত ছিল। তাই শহরের জনারণ্যে এই সব মহিলাদের সংগে কথা বলিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারিতেন না—তাহাদের কোন "পাবলিক হাউসে" লইয়া যাইতেন; আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনিতেন তাহাদের জীবন-ইতিহাসের কাহিনী।

কোপেনহেগেনের একটি সংবাদপত্রের প্রকাশ, ছাপাখানা ধর্মঘটের জন্য ১৭ দিন বন্ধ থাকে। কাগজ না পেয়ে, ভীষণ রেগে এক মহিলা, সম্পাদককে টেলিফোনে বলেন, "এ রকম ঘটবে, তা আপনি আগেই জানতেন, তবু কেন যথেষ্ট কাগজ আগাম ছাপিয়ে রাখেন নি?"

অমূর্তশিল্পের বিমূর্ত ধাপ্পা

গোপাল বসু

প্যারিসের অভিজাত প্রকাশনালয় গ্যালিমার বইটি ছেপেছেন, ফরাসী সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরোকে বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে এবং বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পিকাসো বইটি সম্পর্কে উচ্ছ্বাস-ভরে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। অসাধারণ যত্নে ও নিষ্ঠায় বইটি ছাপা হয়েছে। অথচ যাকে নিয়ে এ বই লেখা, তাকে কেউ কখনো কোথাও দেখেনি। চিত্র-শিল্পী জুসেপ ভোরে কাম্পালান এই বইয়ের নায়ক।

ম্যাক্স এয়াব নামে ৫৮ বছরের এক স্প্যানীশ লেখক ও সমালোচক কাম্পালানের আবিষ্কর্তা। বছর পাঁচেক আগে উপন্যাস লেখায় ক্লান্ত হয়ে এবং জীবনী রচনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে এয়াব ঠিক করেন জীবনী এবং উপন্যাসের মিলন ঘটিয়ে নতুন আঙ্গিকে নতুন একটা কিছু করবেন। অত্যন্ত খেটেখুটে এয়াব যা রচনা করলেন, শিল্পকলার সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার থেকে বড় ধাপ্পাবাজি আর ঘটেনি।

ভেবেচিন্তে এয়াব ঠিক করেন, কাম্পালান নামের এক শিল্পী, তার জন্মস্থান স্পেনের কাটালুনিয়ায়, জন্ম-সাল ১৮৮৬, এক চাষী পরিবারের পঞ্চম সন্তান।

এরপর রঙ চড়ান শুরু হয়—কাম্পালান বাড়ি থেকে একদিন পালায়, বার্সিলোনায় এক অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ে, পিকাসোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কিউবিজম্ উদ্ভাবন করে, অমূর্তবাদ নিয়ে অনুসন্ধান চালায়, অবশেষে ১৯১৪-এর আগস্টের একদিনে প্যারিস থেকে উধাও হয়ে যায়।

তারপর কাম্পালানের আর কোন খোঁজ-খবর নেই। ১৯৫৫ সালে অর্থাৎ প্যারিস থেকে অন্তর্ধানের প্রায় ৩০ বছর পরে মেক্সিকোয় বক্তৃতা দিতে গিয়ে এয়াব নাকি তার সাক্ষাৎ পায়। ততদিনে কাম্পালানের দেহ জরা কবলিত, তার প্রতিভাও বিশ্ববাসীর কাছে বিস্মৃত। আধুনিক চিত্রকলার এই 'মিসিং লিংক' তখন চাষীর মত বাস করছে।"

দেখেশুনে এয়াব এতই অভিভূত হয়ে পড়ে যে, নিজের কাজকর্ম ফেলে কাম্পালানের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে জীবন পণ করে বসে। রীতিমত পাণ্ডিত্যসহযোগে সে এক জীবনী লিখে ফেলে। তাতে ফুটনোট এবং ফুটনোটেরও ফুটনোট পর্যন্ত দিয়ে দেয়। কাম্পালানের চাষী পিতামাতার ছবির জন্য স্পেনীয় ছবির পোস্টকার্ড থেকে দরকার মত একজোড়া মুখ বেছে নেয়। পিকাসোর সঙ্গে যে তার বন্ধুত্ব ছিল তাই বোঝাবার জন্য এয়াব সংবাদ-পত্রের এক ভিড়ের ছবি থেকে একটি মুখ বেছে নিয়ে পিকাসোর ছবির সঙ্গে জুড়ে দেয়।

এরপর এয়াব পিকাসোর কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়ে। এই তুচ্ছ মিথ্যাটুকু তাকে সমর্থন করতেই হবে। শোনা মাত্রই পিকাসো হো হো করে হেসে ওঠেন।

"কাম্পালান! তাকে আমি কি করে চিনব। যা খুশি তুমি লিখতে পার।"

যেহেতু কাম্পালান চিত্রশিল্পী অতএব তার আঁকা ছবিও তাহলে সর্বজন সমক্ষে দেখাতে হয়। এয়াব নিজেই তখন আঁকতে শুরু করে দেয়। কি ভাবে ছবি আঁকতে হয় এয়াবের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। ক্যানভাসের উপর তেলরঙ ঢেলে তুলি দিয়ে যাহোক একটা কিছু আঁকার চেষ্টা করে গরম জলের ভাপে ধরে রাখত। তারপর মাথায় যা আসত তাই দিয়ে ছবির নামকরণ করত। এইভাবে নতুন রীতিতে কাম্পালানের ছবিগুলি আঁকা হতে থাকে।

এরপর ছবির প্রদর্শনী। ১৯৫৮ সালে মেক্সিকো সিটির এক্সেলসিয়র গ্যালারিতে এয়াবের আঁকা ছবিগুলি কাম্পালানের নামে প্রদর্শিত হয়। বেশির ভাগ ছবিই চটপট বিক্রি হয়ে যায়। বিশ্ববিখ্যাত মুরাল চিত্রকর ডেভিড সিকুইরস পর্যন্ত এই ধাপ্পাবাজিতে বিভ্রান্ত হয়ে বলে ফেলেন, "হ্যাঁ, প্যারিসে কাম্পালানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল বটে, ওরোজকো ওকে খুব ভালবাসতেন।"

এর কয়েক সপ্তাহ পরেই এয়াব তার এই ধাপ্পার কথা স্বীকার করে ফেলেন। মেক্সিকোর লোকেরা প্রথমে রেগে ওঠে, পরে ব্যাপারটাকে রসিকতা হিসাবে গ্রহণ করে।

চেষ্টা করেও এই ধাপ্পাবাজি লুকোন সম্ভব হয়নি। এয়াবের লেখা কাম্পালানের জীবনীর ফরাসী স্বত্ব কেনার পর গ্যালিমার প্রকাশনালয় কাম্পালানের মধ্য-জীবনের আঁকা কতকগুলি স্কেচ চায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে এয়াব স্কেচগুলি এঁকে দেয়। বইটির পাঁচ হাজারের প্রথম সংস্করণ এখন বেশ ভালই বিক্রি হচ্ছে। না হবার কোন কারণও নেই। বুদ্ধিমান গ্যালিমার কোম্পানি ফরাসী চিত্রজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম বইটিতে যুক্ত করে দিয়েছে।

সত্যিই যদি কাম্পালান নামে শিল্পীটি বেঁচে থাকতেন, সন্দেহ নেই দুহাত তুলে তিনি নিশ্চয় এয়াবকে আশীর্বাদ জানাতেন।

গৃহকোন

সীমা সরকার

নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ

আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের মূলে আছে দুইটি উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ শীতাতপ থেকে দেহকে রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়তঃ দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা ও সুরুচি সম্পন্ন করা। কাজেই পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন করার ব্যাপারে—এই দুটি ব্যাপারে—এই দুটি বিষয়ের ওপর আমরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকি, তাই দেশভেদে, ঋতুভেদে ও সৌন্দর্যভেদে বিভিন্ন প্রদেশের পোশাক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এই সৌন্দর্যভেদের দুটি দিক আছে—একটি নিজের সৌন্দর্যবোধ এবং অন্যটি নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের সৌন্দর্যবোধ। অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্যে পরোক্ষভাবে পুরুষরা আকৃষ্ট হন—এটাও নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদের একটি উদ্দেশ্য। যে সমস্ত দেশ শীতপ্রধান—আমেরিকা বা ইংলন্ডের কথা না তুলেও আমাদের ভারতবর্ষের যে সব অংশ শীতপ্রধান, সে অংশের পোশাকের সঙ্গে গ্রীষ্মপ্রধান অংশের পোশাকের তুলনা করলেই আমরা এ তথ্যটি বুঝতে পারবো।

ধরুন পাঞ্জাবের রাজপুতানা বা পাহাড়ী অঞ্চলগুলির কথা। সেখানে শীত বেশী, সেখানকার অধিবাসীদের পরতে হয় আঁট-সাট জামা, পাজামা, কোর্তা, খাটো কোট জাতীয় জিনিস, সালোয়ার, কামিজ, ওড়না প্রভৃতি। দেহকে সব-সময়ে বেশ আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে রাখতে হয়। কাশ্মীর বা কুলু উপত্যকায় মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদের সঙ্গে গঙ্গা তীরবর্তী প্রদেশের তুলনা করলেই এবিষয় স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

বাংলা দেশ বা মাদ্রাজের কথা ধরুন—এ সব দেশে গ্রীষ্মই বছরের অধিকাংশ সময় জুড়ে রাজত্ব করে—সুতরাং পোশাকও সেজন্যে ঢিলে-ঢালা, খোলা-মেলা—শাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদি সবই হাল্কা। ওড়না বা অন্য কোন রকম আবরণের দরকার নেই।

আগেতো বাংলা দেশে মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের বড় বেশী বালাই ছিলো না। ইউরোপীয় সভ্যতার আগমনে ও ফ্যাশানের খাতিরে তার পরিবর্তন হোয়েছে। এই পরিবর্তন যে অবাঞ্ছনীয় তা বলা যায় না, তবে এর পরিণতি যদি বিরাট অন্ধ পোশাক-পরিচ্ছদ ফ্যাশানে গিয়ে পৌঁছয় তবে দুঃখের বিষয় হবে। এই ফ্যাশানের খাতিরে সভ্যদেশের নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ এমন চরম পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছিয়েছে, যাকে নিন্দা না করে থাকা যায় না।

বাংলা দেশের প্রচন্ড গরমে প্রাণ আই-ঢাই করে ওঠে। স্বভাবতঃই এখন আমাদের এমন পোশাক চাই যা এই গরম আবহাওয়ায় আমাদের দেহকে তাপের হাত থেকে রক্ষা করবে। দেহে যতটা সম্ভব হাওয়া চলাচলের পথ খোলা রেখে দেবে। অথচ সব সময়ে দেহের সৌন্দর্য ও ভব্যতা রক্ষা হয়—এদিকেও দৃষ্টিপাত করতে হবে।

গরম কালের পক্ষে সুতী বস্ত্রই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। সিল্কের কাপড় পাতলা হলেও গরম বেশী লাগবে।। কারণ সিল্কের ভিতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাওয়া যাতায়াত করতে পারে না। আর নাইলনের বস্ত্রাদিতো আমাদের মত এই গরম দেশে একেবারে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ এর ভিতর দিয়ে বায়ু প্রবেশের পথ একেবারেই নেই। আমরা অনেকেই সখ করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নাইলনের বাহারী জামা ও কাপড়, মোজা প্রভৃতি পরিয়ে থাকি। একবারও আমরা ভেবে দেখি না যে গরমে ও ঘামে সত্যিই তারা কাহিল হয়ে পড়ে। কাজেই নাইলন বস্ত্র যতটা সম্ভব এই দুর্দান্ত গ্রীষ্মে পরিহার করাই ভাল, এগুলি কষ্টকরতো বটেই অস্বাস্থ্যকরও।

দিনের বেলার জন্য হাল্কা রংএর পাতলা ভয়েলের শাড়ী, ছাপা শাড়ী প্রভৃতি বেশ উপযোগী। মনে রাখতে হবে শাড়ীর গাঢ় রং অনেকটা তাপ বৃদ্ধির সহায়তা করে। তাই হাল্কানীল, হাল্কা-সবুজ, পেস্তা রং প্রভৃতি যেগুলি নয়ন ও মনকে স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা করে তোলে সেগুলিই এসময়ে ব্যবহার করা উচিত। সবচয়ে ভাল অবশ্য সাদা শাড়ী। সাদা রং গরমকালের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। গুমোট-করা বিষণ্ণ বিকালে ভাল করে বৈকালিক স্নান বা 'গা-ধোয়া'র পর একখানি শুভ্রশাড়ী মনের প্রসন্নতা ফিরিয়ে আনে ও দেহের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে।

অনেকে আবার একেবারে সাদা বা সাদাসিধা শাড়ী পছন্দ করেন না। তাঁরা সাদা ভয়েলের ওপর বা একরঙা ভয়েলের ওপর মানানসৈ কোন ছিটের পাড় বসিয়ে এবং তারই টুকরো জামার সঙ্গে মিলিয়ে বসিয়ে নিতে পারেন। এতে পোশাকের সৌন্দর্য বাড়বে আর বৈচিত্রও দেখা দেবে।

সন্ধ্যার পর অথবা রাত্রে অবশ্য একটু গাঢ় রঙের বস্ত্রাদি পরিধান করলে ভাল হয়। 'সিল্কে'র কাপড় ব্যবহার না করাই ভাল, যদি গরমের হাত এড়াতে হয়। আজকাল বাজারে নানান ধরনের সুতিবস্ত্রাদি বেরিয়েছে—যা খুবই সুন্দর এবং রুচিসম্মত। উৎসবাদিতে ও অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে—যেখানে মেয়েরা পরিচ্ছদের জাঁকজমক দেখাতে চান, সেখানে এই রুচিসম্পন্ন নানান ধরনের সুতি শাড়ী ব্যবহার করা চলে। এই ধরনের শাড়ী রুচি, ফ্যাশান বা সৌন্দর্যে অন্য কোন মহামূল্যবান শাড়ীর চেয়ে কম নয়।

খুব মিহি সুতোর জমিতে জরির পাড় ও নক্সা তোলা একরকম বেনারসী

শাড়ী আজকাল বাজারে প্রচলন হোয়েছে। সেগুলি সৌন্দর্য ও রুচি সম্পাদনে সাহায্য তো করেই, আবার সিল্কের কাপড়ের চাইতে আরামদায়কও বটে।

গ্রীষ্মকালের ব্যবহারোপযোগী জামা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে—এগুলোও যতটা সম্ভব ঢিলে হওয়া দরকার। দেহের সৌন্দর্য দেখাবার খাতিরে অনেক মেয়ে টাইট জামা পরতে ভালবাসেন, কিন্তু পরে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে হাঁসফাঁস করেন। সেই জন্যে ব্লাউজ টাইট না হয়ে দেহের মানানসৈ হওয়াই দরকার। ব্লাউজের হাতা একটু ছোট ও ঢিলে হোলে দেখতে ভাল হয়। ব্লাউজের হাতা সম্বন্ধে একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। আজকাল অনেকেই হাতাহীন (Sleeve-less) ব্লাউজ পরতে ভাল বাসেন। কারণ এতে নাকি দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, যাঁদের দেহের গড়ন বেশ লম্বা ও ছিমছাম, বা slim figure তাঁদেরই এই জামা মানায়। একটু স্থূলাঙ্গী হয়ে পড়লেই (অধিকাংশ বিশোত্তীর্ণা বাঙ্গালী মেয়েই যা হয়ে থাকেন) এই ধরনের জামা পরলে অত্যন্ত বিসদৃশ দেখায়।

ব্লাউজের কাপড় যতটা সম্ভব পাতলা হওয়া উচিত। পরবার শাড়ী কিছুটা মোটা হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু ব্লাউজের কাপড় যাতে মোটা না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। পাতলা আদ্দির জামার ওপর সরু লেস বসিয়ে নিলে—বা সামান্য একটু সূচীকর্মের সাহায্য নিলে সুন্দর মানায়।

এই সমস্ত প্রবন্ধে মোটামুটিভাবে আমাদের দেশের মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দুই-চার কথা লিখলাম, এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতামত। আর এটা সাধারণ গৃহস্থ পরিবার সম্বন্ধেই লেখা। বৃহৎ অর্থশালী নারীরা যাঁরা পোশাক-পরিচ্ছদে অজস্র অর্থ কারণে-অকারণে ব্যয় করে থাকেন বা যাঁরা ফ্যাসানের মোহে মুগ্ধ হয়ে অর্থের অপব্যয় করেন তাঁদের কাছে আমার এই সব কথা ভাল লাগবে না। তবে আজকাল বিবিধ সমস্যার দিনে পোশাক-পরিচ্ছদ সমস্যাও একটা সমস্যা, তাই সকলেই—মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালীরা সকলেই আশা করি এবিষয়ে একটু চিন্তাশীল হয়ে উঠবেন।

● ● ● দেশে বিদেশে ● ● ●

স্বাধীনতা চাই :

আলজেরিয়ার স্বাধীনতা-বিরোধী ফরাসী সমরনায়কদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট দ্যগলের দৃঢ়তা ও নৈপুণ্যে এ সম্ভব হয়েছে—ইউরোপীয় নায়কদের এই অভিমত। আলজেরিয়ায় সে ঝড় কেটে গেছে বটে কিন্তু যে আবহাওয়ায় ঝড় হয় সে আবহাওয়া কাটেনি। অর্থাৎ আলজেরিয়ার মূল সমস্যার সমাধান হয়নি। সে সমস্যা হচ্ছে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সমস্যা। আলজেরিয়াবাসীরা ফরাসী আধিপত্য মুক্ত স্বাধীনতা চান। বিদ্রোহী সমরনায়করা জবরদস্তি এই দাবীটাই নাকচ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট দ্যগল এই বিদ্রোহ দমন করলেন এজন্য নয় যে, তিনি আলজেরিয়াকে নিষ্কণ্টক সর্তহীন স্বাধীনতা দিতে উদ্যত বা বিদ্রোহ দমনের পরই তা দিয়ে দিলেন। তাঁর পয়লা নম্বর প্রতিআক্রমণ ছিল জঙ্গীগোষ্ঠির বিষদাঁত তুলে ফেলা; আলজেরিয়ার সমস্যাটা গৌণ। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে আজকাল যেরকম কমনওয়েলথ-জাতীয় মোলায়েম সাম্রাজ্যবাদ চলছে আলজেরিয়ায় সে জিনিসটি প্রবর্তন করা। আলজেরিয়া স্বাধীন হবে কিন্তু ফরাসী আওতায়। এজন্য আলোচনার তারিখগুলি তিনি টেনে টেনে চলেছেন। এই ঢিমেতালের অবকাশেই বিদ্রোহ ঘটে। এমন বিদ্রোহ এই প্রথম। আগেরবার যে বিদ্রোহ হয়েছিল তাতেই কিন্তু দ্যগলের অভ্যুত্থান হয়। এবার দ্যগলের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। এর মূল কারণ কি? কাদের অদৃশ্য হস্তে এ পুতুল খেলা চলছে? আলজেরিয়া প্রধানত মুসলিম দেশ। ইউরোপীয়ের সংখ্যা দশ লক্ষের মতো—সমগ্র অধিবাসীর এক-দশমাংশ। কিন্তু ইউরোপীয়েরাই আলজেরিয়ার ধনসম্পদের চাবিকাঠিটি হাতে রেখেছে। ফরাসী ইন্দোচীন হাতছাড়া হবার পর আলজেরিয়ার প্রতি ফরাসী শিল্পপতির নজর প্রগাঢ়তর হয়। এখানকার জাতীয় আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৭৬ ভাগ এই ইউরোপীয়দের হাতে। স্বভাবতই এরা ইউরোপীয়দের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে চায়। সেজন্য আলজেরিয়ার দশ লক্ষ ফরাসী সৈন্য রয়েছে। আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকে এরাই বাধা দিচ্ছে এবং মাঝে মাঝে সামরিক বিদ্রোহের মধ্যে বিরাগ প্রকাশ করছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারছে স্থানীয় অধিবাসীদের অসহযোগিতা চিরকালের পক্ষে কল্যাণকর নয়। দ্যগল ক্ষমতায় আসার পর একটি গণভোটের ফর্মুলা দিলেন: আলজেরিয়া কি চায়? ফ্রান্সে থাকতে? স্বায়ত্তশাসন পেতে? অথবা একেবারেই স্বাধীন হ'তে? আলজেরিয়ার কাছ থেকে এর কোনটিরই জবাব পাওয়া যায়নি; কেননা, আলজেরিয়াবাসী এ গণভোটে অংশ নেয়নি। তারপরেও অবশ্য বৈঠকের আয়োজন হ'য়েছে। কিন্তু আলজেরীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উক্তিতে এপ্রিলে যে বৈঠক হবার কথা তা ভেঙে যায়। আবার এভিয়াঁতে বৈঠকের আয়োজন হয়েছে। আমাদের দেশে এককালে যেমন বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবী অগ্রাহ্য করতে মুসলিম লীগের অজুহাত দিতেন এবং যে-কোন বৈঠকে মুসলিম লীগের আসন ক'রে দিতেন এখানেও তেমনি; ওখানে আব্বাসের নেতৃত্বে এফ এল এন নামে পরিচিত যে বিদ্রোহী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁদের ছাড়াও অন্য একটি "আশ্রিত" দলকে প্রশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা হয়। বিদ্রোহী সরকার তাতে নারাজ হন। এবারে বলা হ'চ্ছে বিদ্রোহী সরকারের সঙ্গে আলোচনাটা ব্যর্থ হ'লে আর সবার কথা ভাবা হবে। অর্থাৎ প্যাঁচটা থেকেই যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের ধারা একই — তারা নানা অছিলায় কালহরণ ক'রে শোষণ ব্যবস্থাটাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চায়।

সংহতি চাই :

বিশেষ জোর দিয়েই আজ সংহতির কথাটা বলা হচ্ছে। কেননা, সারা পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে, কোনরকম জোড়াতালি দিয়ে স্বাধীনতা পাওয়াও বিপদ। সেটা যেন একদিক দিয়ে স্বাধীনতা এনে আর একদিক দিয়ে বিদেয় দেওয়া। এজন্য কঙ্গোর দিকে তাকানোর দরকার নেই, আমরা নিজেদের দিকেও তাকাতে পারি। যদিও দেশ-খণ্ডনের বেদনা ভুলে যাওয়া কঠিন, তথাপি আমরা চেয়েছিলাম এই ভৌগোলিক খণ্ডসত্তার মধ্যে ইংরেজের কৃপণহাতে দেওয়া স্বাধীনতাটুকু যেন আমরা অক্ষুন্ন রাখতে পারি। আজ

দেশরক্ষা ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা, সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা রক্ষা ব্যবস্থা এবং সংবিধানে দেওয়া ব্যক্তির অধিকার রক্ষাব্যবস্থার ভার নিঃসন্দেহে আমাদের নিজেদের হাতে। এগুলোতে যদি আমরা সার্থক হ'য়ে থাকি তো সে গৌরব আমাদের; যদি ব্যর্থ হ'য়ে থাকি তো সে অগৌরবও আমাদের। কেবল অগৌরব নয়, এই ব্যর্থতা আমাদের সামগ্রিক নিরাপত্তার পক্ষেই এক মস্ত আপদ এবং একটি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা সামগ্রিক বিপদ আনতে পারে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের নেতৃবৃন্দ এবিষয়ে সচেতন হয়েছেন এবং দুর্গাপুরে এ আই সি সি'র অধিবেশনে জাতীয় সংহতি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সোজা-ভাষায় যে মৌলিক প্রশ্নটি করেছেন তাতেই আমাদের এতদিনকার অন্যায় ঔদাসীন্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

ডাঃ রায়ের জিজ্ঞাসার মর্ম হচ্ছে এই যে, সাতচল্লিশে আমরা স্বাধীনতা পাবার পর একষট্টি সালে, অর্থাৎ চৌদ্দ বছর পর এপ্রশ্নটি উঠল কেন? উঠলই যখন তখন বুঝতে হবে যে, আমরা এদিকটায় বিশেষ অবহিত ছিলাম না অথবা একে সার্থক ক'রে তুলতে কোন দৃঢ়নীতি আমরা অনুসরণ করিনি। দেশরক্ষা বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের দৌর্বল্য বা ঔদাসীন্য প্রকাশ পেল যখন চীনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে বড়রকমের বিবাদ বাঁধল। ম্যাক-মোহন লাইন বা ভারত-চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পেল হিমালয় প্রমাণ। অর্থাৎ খণ্ডিত ভারতবর্ষ পাবার পরে তার কোথায় কোথায় সীমানা তা নির্ণয় করার জন্য বা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদের নেতৃবৃন্দ কোন আগ্রহপ্রকাশ করলেন না। পাকিস্থান এ-গ্রাম সে-গ্রাম নিয়ে ঝগড়া চালাচ্ছিল তাকে আমরা সামান্য, নগণ্য মনে করেছি এবং ভৌগোলিক সংহতি ক্ষুন্ন ক'রে তাদের শুধু দিয়েই আসছি এবং আরও দেব। কিন্তু মস্ত দাগা পেয়েছি পঞ্চশীলের বন্ধু চীনের কাছে। চীনাধিকৃত ভারত ভূখণ্ড আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারিনি। অনেক টাকা ঢেলেও কাশ্মীরকে পাকিস্থান কবলমুক্ত করতে পারিনি। গোয়াকে পর্তুগীজমুক্ত করতে পারিনি। তেমনি আবার ভারতেরই একদল অধিবাসী যে চীনা দাবীর সমর্থক তাদেরকেও নিরস্ত করা যায়নি। বিভিন্ন রাজ্যের বাজেট প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় অর্থে পরিপুষ্ট হ'লেও এবং পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় থাকলেও স্ব স্ব রাজ্যের মানসিক স্বাতন্ত্র্য কি চরম রূপ নিতে পারে তাও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আমরা প্রত্যক্ষ করছি আমরাই সুস্পষ্ট-সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে সমর্থন করছি। সব কিছু রেখে আবার সব কিছু নিন্দা ক'রেই কি সংহতি আসবে?

আদিম বর্বরতা:

পর্তুগাল আধুনিক কালের অন্যতম প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী। এর এখনও পৃথিবীতে এখানে-ওখানে ছিটোনো যে সাম্রাজ্য রয়েছে সেখানে সে মরণ-কামড় দিয়ে রেখেছে। ভারতবর্ষের একপ্রান্তে ছোট্ট একটু গোয়া ভারতবর্ষের বুকে কাঁটার মত বিঁধে আছে। এখানকার মুক্তিআন্দোলনে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদী-দের বিষদাঁত প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু সে যে কতখানি ক্রুর, হিংস্র ও অন্ধ তা আফ্রিকার এঙ্গোলায় যেমন নগ্ন হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি। এই যুগেও তারা কত বর্বরতার পরিচয় দিতে পারে এঙ্গোলার কাহিনী উদ্ঘাটিত না হ'লে জানা যেত না। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজসে সেখানকার খবরও যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু যতটুকু পাওয়া গেছে তার বীভৎসতা অপরিমেয়। এঙ্গোলাবাসীর অপরাধ তাঁরা পর্তুগীজ শাসনমুক্ত হ'তে চান, স্বাধীন হ'তে চান। এই অপরাধে পর্তুগীজরা একটি দুটি নয়, হাজারে হাজারে এঙ্গোলিজদের হত্যা করেছে এবং সমগ্র এঙ্গোলিজ জাতিটাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে ছুটছে। আজ পর্তুগালের প্রাচীন জৌলুস নেই, প্রকৃতি আছে এবং সেই প্রকৃতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে সেই সব সাম্রাজ্য-বাদী যারা পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার জন্য বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। পর্তুগাল ন্যাটোর অন্যতম সভ্য। ইংলণ্ড পর্তুগালকে "প্রাচীনতম সখা" ব'লে আদর করছে। আমেরিকার মনোভাবও স্পষ্ট নয়, অন্ততঃ পর্তুগাল অধিকৃত এঙ্গোলায় হাজার এঙ্গোলিজের নির্বিচার হত্যায় পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে ব'লে মনে করে— আমেরিকার আচরণ তো বোঝা যায় না। ভারতবর্ষ পরাধীনতার বেদনা জানে, বিদেশী শাসনের উৎপীড়নের অভিজ্ঞতাও তার আছে। কিন্তু পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের রূপটি যেন জঘন্যতর এবং এই কারণে ভারত-বাসী মাত্রেরই মনে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য-বাদের প্রতি যে ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতীত এঙ্গো-লিজদের জন্য যে সমবেদনা জেগেছে, সুখের কথা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সদ্য অনুষ্ঠিত এ-আই-সি-সি অধিবেশনে প্রসঙ্গত প্রকাশ করেছেন। এই সম্পর্কে রাষ্ট্র-পুঞ্জের নম্রতা ও নিষ্ক্রিয়তা লজ্জাকর।

ভাগাভাগি:

ব্রিটিশ আমলে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে একটি লাইব্রেরী গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ভারত-বর্ষের হক দাবী নিয়ে অনেক টাল-বাহানা হয়েছে। দেশ বিভক্ত হয়েছে— সব চাইতে এই মারাত্মক অজুহাত তো ছিলই। সম্প্রতি ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন যে, পাকিস্থান ও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নীতিগতভাবে কয়েকটি মতৈক্য হয়েছে। এখন এই মতৈক্যের ভিত্তিতে বিশদ কর্তব্য স্থির করা হবে। ভারতের পক্ষ থেকে পুনর্বাসন বিভাগীয় সচিব শ্রীধরম বীর পাকিস্থান ও বৃটেনের সঙ্গে আলাপ চালাবেন। বিশদ কর্তব্যটি কি তার আভাষ পর্যন্ত মন্ত্রীমশাই দেননি। বরং বলেছেন, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। তবু খানিকটা নাকি এগোনো গেছে।

এই লাইব্রেরীটিতে তিন লক্ষ বই, পাণ্ডুলিপি, দলিল, কলা-শিল্পের নিদর্শন ইত্যাদি আছে। বর্তমান পর্যায়ে বিশদ কর্তব্য স্থির হ'য়ে গেল মন্ত্রীদের পর্যায়ে পরে আলোচনা হবে। কবে আলোচনা সুরু হবে তা বীরমশাই বলতে পারেন নি; তাঁকে দুই দেশেই যেতে হ'তে পারে। মন্ত্রীমশাই নিজেও ইতিমধ্যে লণ্ডনে কমনওয়েলথ সচিব মিঃ ডানকান স্যাণ্ডিসের সঙ্গে দেখা ক'রে এবিষয়ে কথা কইবেন।

অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে, শেষ পর্যন্ত মীমাংসা যাই হোক লাইব্রেরীটা ভাগাভাগি হবে। ভারত-বর্ষকে দেবার হ'লে অনেক আগেই তার মীমাংসা হ'ত। অথবা বৃটেনকে দিলেও সমস্যা চুকে যেত। কিন্তু ভারত মূলতঃ দুটি এবং বৃটেন তৃতীয় শরিক কেউই কারো অংশ ছাড়বে না। ফলে, লাইব্রেরীটি ভাগাভাগি হবে এবং ঠিকভাবে হবে— বিশদ কর্তব্য নির্ধারণটা তারই ভূমিকা মাত্র।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

এ যুগের তিনটি আবিষ্কার

তিনটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের এই যুগকে চিহ্নিত করেছে। পারমাণবিক তেজ, ইলেকট্রনিক কম্পিউটর ও স্পুৎনিক। পারমাণবিক তেজের প্রথম প্রকাশ্য বিক্রম টের পাওয়া গিয়েছিল হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে। তার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত বিশ্ব-রাজনীতির টানাপোড়েনে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল আর আমরা উত্তরোত্তর উপলব্ধি করেছিলাম কী প্রচণ্ড এক শক্তি মানুষের আয়ত্তাধীন। সেই উপলব্ধির সঙ্গে ছিল আতঙ্ক, কারণ তখনো পর্যন্ত পারমাণবিক তেজের বিধ্বংসী ভূমিকাটুকুই শুধু প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। তারপরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদেরই তৎপরতায় প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল যে, গঠনমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে পারমাণবিক তেজ কী অবিশ্বাস্য বরদান করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে হালে তৈরি করা সবচেয়ে বড়ো বড়ো পাওয়ার স্টেশনগুলি চলে পারমাণবিক তেজে। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও পারমাণবিক তেজের প্রয়োগ হতে চলেছে। ঘটনার গতি দেখে মনে হয়, কিছুদিনের মধ্যেই জাহাজ ইঞ্জিন ও এরোপ্লেন চলতে শুরু করবে পারমাণবিক তেজে—সেজন্যে আর কয়লা বা তেলের যোগান দিতে হবে না। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে পারমাণবিক তেজে চালিত 'লেনিন' নামে একটি বরফ-কাটা জাহাজ। তাছাড়া বিদেশের অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সাড়ে চার টন ওজনের ব্যোমযানগুলিকে আকাশে তোলবার জন্যে যে রকেট ব্যবহার করেছেন তাও চালিত হয়েছে পারমাণবিক তেজে। অবশ্য সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত এ-বিষয়ে নিশ্চয়তার সঙ্গে কথা বলা শক্ত। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই করা চলে যে, পারমাণবিক তেজে চালিত রকেটের দিন আসতে খুব দেরিও নেই। পারমাণবিক তেজের সাহায্যে আরো কত কি যে কাণ্ড করা যাবে তার ফিরিস্তি দেওয়াও আগে থেকে সম্ভব নয়। এতকাল আকাশের সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যের তেজের বিপুলতার কথা ভেবে আমরা অবাক হয়েছি। কিন্তু কিছুকাল আগেও কি আমরা ভাবতে পেরেছিলাম যে, সূর্যের তেজের রহস্য আমাদেরও আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে! এই পৃথিবীতেই আমরা ক্ষুদে সূর্য বানিয়ে নিতে পারব!

ইলেকট্রনিক কম্পিউটরকে সহজ বাংলায় বলা চলে বিদ্যুতের সাহায্যে অঙ্ক-কষার যন্ত্র। খুব ছোটছাটো ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের সাহায্যেও সেকেণ্ডে আটশোটি যোগ বা বিয়োগ করা যেতে পারে। তাছাড়া এমন অনেক অঙ্ক আছে যা কষতে কয়েক-শো মানুষকে কয়েক বছর ধরে হিমসিম খেতে হতে পারে। ইলেকট্রনিক কম্পিউটর এজন্যে কয়েক ঘণ্টার বেশি সময় নেবে না। কিন্তু শুধু এটুকু বললেই ইলেকট্রনিক কম্পিউটর সম্পর্কে সব কথা বলা হয়ে যায় না। এই অঙ্ক-কষার ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আশ্চর্য সব ক্রিয়াকাণ্ডের সূত্রপাত হবে। ভবিষ্যতের মস্ত মস্ত কারখানা চালাবার জন্যে মানুষের প্রয়োজন হবে না—কয়েকটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের সাহায্যেই কয়েক হাজার মানুষের কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হবে। নিখুঁত মানে যে কতখানি নিখুঁত তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে স্পুৎনিক ও লুনিক। দু-নম্বর লুনিকটি চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়েছিল। হিসেব কতখানি নিখুঁত হলে পরে মহাশূন্যের বিপুল বিস্তৃতিতে এই বিন্দুসদৃশ লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করা যেতে পারে তা অনুমান করাটাও আমাদের পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার নয়। ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করা হচ্ছে, ভাষান্তর করা হচ্ছে—এসব খবর কাগজেও বেরিয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রটির কৃপায় বিকলাঙ্গরা অঙ্গ ফিরে পাবে, এ-খবরটি হয়তো অনেকে জানেন না। সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে যে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে এমন একটি কৃত্রিম হাত তৈরি করেছেন, যা চালনা করার জন্যে কোনো সুইচ টিপতে হয় না, মস্তিষ্কের চিন্তার দ্বারাই যা চালিত হবে। অর্থাৎ স্বাভাবিক হাতের সঙ্গে এই কৃত্রিম হাতের কোনো পার্থক্যই নেই। আগামী কয়েক বছরে ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের আশ্চর্য সব ক্রিয়াকাণ্ডের খবর আরো অনেক শুনতে হবে। ইতিমধ্যেই খবরের কাগজের ভাষায় এই যন্ত্রটির নাম হয়েছে ইলেকট্রনিক মগজ। মগজ আছে বলে মানুষ যেমন চিন্তা করতে পারে, তেমনি এই যন্ত্রটির কাণ্ডকারখানা দেখেও ধারণা হয় যে, যন্ত্রটির চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। যেমন, ভবিষ্যতের রোবোট মানুষ ট্র্যাফিক পুলিসের চেয়েও অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করবে। সেক্ষেত্রে সহজেই ধারণা হতে পারে যে, মানুষের মতো এই রোবোটটিরও সত্যিকারের মগজ আছে। আসলে কিন্তু কথাটা ভুল। যন্ত্র যন্ত্রই। তার স্মৃতি বা 'মেমোরি' থাকতে পারে, তার মধ্যে এমন কিছু লক্ষণও প্রকাশ পেতে পারে যা মগজওলা জীব মানুষের মধ্যে আছে—কিন্তু তবুও তা মগজ কিছুতেই নয়। শেষ পর্যন্ত মগজওয়ালা জীব মানুষকেই কৃতিত্ব দিতে হবে এজন্যে, কারণ এই আশ্চর্য যন্ত্রটি তারই হাতে তৈরি। ইলেকট্রনিক কম্পিউটর সম্পর্কিত গবেষণা ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সাইবারনেটিক্স্'। পরবর্তী কোনো সংখ্যায় এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

আর স্পুৎনিক সম্পর্কে এই স্তম্ভে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো আলোচনা উঠবে। কারণ বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটি যতটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এমনটি আগে আর কখনো দেখা যায়নি। মানুষের সমস্ত অসম্ভব কল্পনা যেন একটা বাস্তব আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে এই স্পুৎনিকের মধ্যে। আর এক-একটি ঘটনায় মানুষ যত বেশি চমৎকৃত হচ্ছে ততই যেন আরো বেশি বেশি মাত্রায় চমৎকৃত হবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় এ-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার আর শেষ নেই। বিশেষ করে সত্যিকারের

রক্তমাংসের মানুষ মহাকাশকে জয় করে ফিরে আসার পরে পৃথিবীর মানুষ যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এর পরে কী? আরো কী? আরো চমকপ্রদ কিছু একটা ঘটুক। এই মুহূর্তেই ঘটুক। মানুষের ধৈর্য আর বাঁধ মানতে চাইছে না।

শোনা যাচ্ছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নাকি দু-একদিনের মধ্যেই আরেকটি ব্যোমযানকে আকাশে তুলবেন। এবারে নাকি ব্যোমযানের যাত্রী হবে একাধিক আর একটিমাত্র পাকেই যাত্রা শেষ না করে একাদিক্রমে কয়েক পাক খাবার পরে ব্যোমযানটি মাটিতে নামবে। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন যে-কোনো সময়েই যে-কোনো অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে পারে। কাজেই কোনো জল্পনা-কল্পনাকেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এমনও হতে পারে যে, এই লেখাটি ছাপার হরফে বেরোবার আগেই এই আশ্চর্য কাণ্ডটিও ঘটবে।

* * *

পশুপাখির ভাষা

বৈজ্ঞানিক কর্ম-তৎপরতা যে কত বিচিত্র ও বিভিন্ন দিকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সকল ব্যাপারেই বিজ্ঞানীদের সমান আগ্রহ। এই কারণেই একদল বিজ্ঞানী যেমন ইলেকট্রনিক কম্পিউটর বা স্পুৎনিকের মতো বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে মেতে রয়েছেন তেমনি আরো অজস্র বিজ্ঞানী সারা জীবন ব্যয় করছেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ পোকা-মাকড়ের জীবনকে খুঁটিয়ে জানবার জন্যে। বহু বিজ্ঞানীকে প্রাণও দিতে হয়েছে। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে, পোকামাকড়ের জীবনকে জানবার জন্যে এতখানি পরিশ্রমের তেমন কোনো সার্থকতা নেই। কথাটা ঠিক নয়। মানুষ কি করে মানুষ হয়েছে এই খবরটুকুও যদি জানতে হয় তাহলেও উদ্ভিদ ও জীবজগৎ সম্পর্কে খুঁটিয়ে খবর সংগ্রহ করা দরকার।

হালের গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, পশুপাখির ভাষা ও জীবনযাত্রার মধ্যে আদিম মানুষের ভাষা ও জীবন-যাত্রার প্রাথমিক আভাসটুকু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অধ্যাপক জে বি এস হলডেন এ-বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। একটি নিবন্ধে তিনি মৌমাছি ও কয়েক ধরণের পাখির ভাষা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে গ্রীক ক্লাসিকের কয়েকটি দৃষ্টান্তের এমন আশ্চর্য নজির টেনেছেন যে, অনভিজ্ঞ পাঠকও বুঝতে পারবেন, এ-বিষয়ে গবেষণার কী এক বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে।

লণ্ডনের এক খবরে জানা যায় যে, ব্রিটেনের 'কাউন্সিল ফর নেচার' জীব-জন্তুর ভাষা রেকর্ড করবার উদ্দেশ্যে বিস্তৃত এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটেনের বনে-জঙ্গলে শুরু হবে ৭০,০০০ প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর অভিযান। তাদের সঙ্গে থাকবে টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদি যন্ত্র।

খবরে আরও বলা হয়েছে যে এই অভিযানের মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনের সমস্ত জীবিত প্রাণীর ভাষা রেকর্ড করা হবে। স্তন্যপায়ী জীবজন্তু, পাখি, পোকা-মাকড়, মাছ—কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না। আর এই রেকর্ডগুলি রক্ষিত হবে 'ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অব রেকর্ডেড সাউণ্ড'-এর লাইব্রেরিতে। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের বিজ্ঞানীরা বিনা খরচে এই রেকর্ডগুলি ব্যবহার করতে পারবেন।

বলা বাহুল্য, এই রেকর্ডগুলি প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের কাছে মহামূল্যবান সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে। এমন অনেক জীবজন্তু আছে যাদের গলার স্বর আগে রেকর্ড করা দূরে থাকুক, ভালো করে শোনা পর্যন্ত যায়নি।

জীবজন্তুর গলার স্বর রেকর্ড করার এত বড় পরিকল্পনা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে হয়নি। এমন কি ব্রিটেনেও এতদিন পর্যন্ত পাখির ডাকের রেকর্ড ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু ছিল না। আর মাছও যে আওয়াজ বার করতে পারে এ-খবর হয়তো অনেকেরই জানা নেই। পরিকল্পনাটি কার্যকরী হলে জীবজগতের অনেক রহস্য যেমন উদ্ঘাটিত হবে, তেমনি অনেক নতুন বিষয়েও আলোকপাত হবে।

* * *

প্রত্নবিদ্যা ও জীবাশ্মবিদ্যা

ফ্রান্স থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে যে পূর্ব-ফ্রান্সের অনো নদীর ধারে বালির তলা থেকে পাওয়া গিয়েছে এমন একটি জন্তুর কঙ্কাল যাকে বলা চলে ক্যাঙারুর প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষ। খবরটির বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু এই খবরটি বিজ্ঞানের আরো দুটি সক্রিয় ও কৌতূহলোদ্দীপক শাখার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রত্নবিদ্যা ও জীবাশ্মবিদ্যা। এখন এই মুহূর্তে যখন আমরা অধীর আগ্রহ নিয়ে আরো একটি স্পুৎনিকের খবর শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি, তখনো প্রত্নবিদরা ও জীবাশ্মবিদরা সমস্ত নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যকে অনায়াসে ত্যাগ করে পাহাড়ে-জঙ্গলে-মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের দৃষ্টি আকাশের দিকে নয়, মাটির দিকে। বা, আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে মাটির নিচে। ওই মাটির নিচেই লুকনো রয়েছে পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক কালের নানা নিদর্শন। মাটি খুঁড়ে তাঁরা এই নিদর্শনগুলিকে পৃথিবীর আলোয় তুলে আনছেন। এ যে কত বড় উন্মাদনা তার দৃষ্টান্ত রয়েছে সাম্প্রতিক কালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর জীবনদানের মধ্যে। গর্ডন চাইল্ডের নাম আমরা সবাই শুনেছি। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস হওয়া সত্ত্বেও অসমর্থ শরীর নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে বেরিয়েছিলেন। একটি পাহাড়ের চুড়ো থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কয়েক বছর আগের ঘটনা, কিন্তু এখনো যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তবুও সান্ত্বনা এই যে, মহৎ জীবনের এ এক মহৎ সমাপ্তি।

* * *

হিমালয়ের অতি-উচ্চতায় নতুন অভিযান

আরো একটি উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া গিয়েছে, এভারেস্ট বিজয়ী স্যার হিলারি সম্পর্কে। এবারে আর নতুন কোনো শৃঙ্গ জয় নয়—এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের বৈজ্ঞানিক অভিযান।

অবশ্য শুনতে তেমন চমকপ্রদ নয়। নজন বিজ্ঞানীর একটি দল ১৯৬০-৬১ সালের পুরো শীতকালটি হিমালয়ের ১৯,০০০ ফুট উচ্চতায় কাটিয়ে এসেছেন। ইতিপূর্বে আর কোনো দল এত বেশি উচ্চতায় এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেননি। শীতকালে তো নয়ই। হিমালয়ের পাহাড়ীয়াদের বসবাস বড়োজোর ১৭,০০০ ফুট পর্যন্ত। তাও শীতকালে তারা নিচে নেমে আসে।

শীতকালে হিমালয় যে কী ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে সে সম্পর্কে কোনো তথ্যই আগে থেকে জানা ছিল না। প্রচণ্ড শীত ও তুষারঝড় সম্পর্কে খানিকটা অনুমান মাত্র নিয়ে বিজ্ঞানী-দের এই দলটি আস্তানা গেড়েছিলেন। মানুষের শরীরের পক্ষে সেই অবস্থা সহ্য করা সম্ভব কিনা তাও তাঁরা জানতেন না। জীবন হাতে নিয়ে তাঁরা এই অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আমাদের পক্ষে গর্বের কথা এই যে, দুজন ভারতীয় ডাক্তারও ছিলেন এই দলটিতে।

নানা বিষয় নিয়ে এই দলটি গবেষণা করেছেন। আবহতত্ত্ব, হিমবাহ-তত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব সম্পর্কিত নানা জটিল প্রশ্নের ওপরে এই গবেষণা নতুন আলোকপাত করবে। বিশেষ করে অতি-উচ্চতায় মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডের ও মগজের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একেবারে নতুন ধরনের সমস্ত তথ্য জানা গিয়েছে। গবেষণার কোনো ফলাফলই এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে আশা করা চলে যে, এই গবেষণার ফলে ভবিষ্যতের পর্বতারোহণ অভিযান অনেক বেশি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে।

অভিযানের সাজসরঞ্জামের মধ্যে ছিল প্লাস্টিকের তৈরি অভিনব একটি বাড়ি। উনিশ হাজার ফুটের সেই অসহায় উচ্চতায় এই বাড়িটিই ছিল একমাত্র আশ্রয়। এই কারণেই বাড়িটিকে সবদিক থেকে খুবই মজবুত করে তৈরি করতে হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে বাড়িটি খুব যে একটা জবরজঙ্গ ধরনের ব্যাপার হয়েছিল তা নয়। একশো জন কুলি গোটা কাঠামোকে মাথায় তুলে নিয়ে সতেরো দিনের দুর্গম রাস্তা পার হয়েছিল। বাড়িটি ভারত সরকারকে দান করা হয়েছে। আশা করা চলে যে, অন্তত এই দানের সদ্ব্যবহার করার জন্যেও পুরোপুরি একটি ভারতীয় দল হিমালয়ের অতি-উচ্চতায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রসর হবে। হিমালয়কে যত বেশি আমরা জানতে পারব, ততই পৃথিবী সম্পর্কে ও নিজেদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়বে।

* * *

পোলিশ বিজ্ঞানী লিওপোল্ড ইন্‌ফেল্ড এক সময়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। কাজ শুরু করার পরে একদিন তিনি আইনস্টাইনকে বলেছিলেন, 'কাল রবিবার। আমি কি কাল আসব? কাল কি কাজ হবে?'

আইনস্টাইন জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন কাজ হবে না?'

ইন্‌ফেল্ড বললেন, 'কাল রবিবার কিনা, তাই ভাবছিলাম, আপনি হয়তো কাল বিশ্রাম করবেন।'

আইনস্টাইন হো-হো করে হেসে উঠে শুধু বললেন, 'ভগবানও কি আর রবিবার বিশ্রাম করেন!'

ঘটনা প্রবাহ

ঘরে—

২৬শে মে, ১২ই জ্যৈষ্ঠ : দুর্গাপুরে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে হত্যার চেষ্টা—রেল স্টেশনে ছুরিকা হস্তে আসামের হত্যাকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ যুবক গ্রেপ্তার।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা কর্তৃক কাছাড়ের বিধান সভা ও পার্লামেন্ট সদস্যদের (কংগ্রেসী) শিলং-এ আমন্ত্রণ—ভাষার প্রশ্নে আসাম ও কাছাড় কংগ্রেসের মতভেদ দূরীকরণের চেষ্টা।

২৭শে মে, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ : কৃষ্ণ পতাকা ও শোকচিহ্ন সহ ছয় সহস্র নরনারীর দুর্গাপুরে বিক্ষোভ প্রদর্শন—শিলচরে পুলিসের গুলী চালনার তীব্র প্রতিবাদ—বাংলাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতির দাবী।

বাহিরের যে কোন আক্রমণ ভারত দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করিবে—দুর্গাপুরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত—চীন ও পাকিস্থানকে ভারতীয় অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া উল্লেখ।

দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা শ্রমিকদের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ—১৩জন আহত ও কয়েকটি বাসে অগ্নি-সংযোগ।

আসামের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত শ্রীগোপালজী মারহোত্রের উপর ১৯শে মে শিলচরের গুলী বর্ষণের ঘটনার তদন্তভার অর্পণ।

২৮শে মে, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ : শিলং-এ দুই সহস্র বিক্ষুব্ধ লোকের থানা আক্রমণ—ধৃত কয়েক ব্যক্তিকে বলপূর্বক খালাস করিবার চেষ্টা।

ভাবাবেগ ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে ভাষা সমস্যার সমাধান করিতে হইবে—শ্রীনেহরু কর্তৃক শিলচরের শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ—দুর্গাপুরে এ আই সি সি অধিবেশনে জাতীয় ঐক্য কমিটির রিপোর্ট প্রসঙ্গে ভাষণ দান—আসামের ভাষা প্রশ্নে এক বছরের জন্য স্থিতাবস্থা-রক্ষাকল্পে সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের নিকট প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ জ্ঞাপন (দুর্গাপুরের জনসভায় উক্তি)।

২৯শে মে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ : কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে করিমগঞ্জে পূর্ণ হরতাল—সরকারী দপ্তর ও আদালতের সম্মুখে পিকেটিং—দোকানপাট ও যানবাহন চলাচল বন্ধ।

কলিকাতা প্রবাসী কাছাড়বাসীদের অরন্ধন, অনশন ও কর্মবিরতি—শিলচরে ভাষা আন্দোলনে নিহত শহীদের স্মৃতি-তর্পণ।

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনয়নের মানদণ্ড নিরূপণ—দুর্গাপুরে এ আই সি সি বৈঠকে বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত—সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দেশের সংহতি রক্ষায় দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা।

আসামের কাছাড় ছাড়া অপরাপর এলাকাতেও সত্যাগ্রহ আহ্বান—নিখিল আসাম বঙ্গভাষী কমিটির প্রস্তাব—৪ঠা জুন দাবী দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত।

৩০শে মে, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ : কাছাড়ের ঘটনাবলী তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের দাবী—উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন কমিটি গঠনে ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ—দুর্গাপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ।

৩১শে মে, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ : নূতন শক্তি ও প্রেরণা লইয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল করিয়া তোলার আহ্বান—বিভেদবাদ দেশের উন্নতি ব্যাহত করিবে বলিয়া সতর্কবাণী—নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে পরিকল্পনা কমিশন চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রস্তাবিত কাছাড় সফরসূচী বাতিল—ভাষা সমস্যা সম্পর্কে শিলং-এ আসাম মন্ত্রিসভার সহিত দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা।

১লা জুন, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ : দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদিত—সরকারী শিল্পক্ষেত্রে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ।

কাঁচা পাটের অভাবের দরুণ পাটকলসমূহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মিল বন্ধের প্রস্তাব অনুমোদন—প্রতিবাদে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক (কলিকাতায় রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরে আহূত) ত্যাগ।

ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারকে পূর্ব পাকিস্থানের সাম্প্রদায়িক হাংগামা বিধ্বস্ত অঞ্চল সফরের সুযোগদানে পাক্ সরকারের অসম্মতি জ্ঞাপন।

বাইরে—

২৬শে মে, ১২ই জ্যৈষ্ঠ : লাওস প্রসংগে ১৪ জাতি জেনেভা সম্মেলনে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি—আন্তর্জাতিক তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে নূতন নির্দেশ দান সম্পর্কে ঐক্যমতের অভাব।

২৭শে মে, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ : পাঞ্চেন লামা (তিব্বতী নেতা) হঠাৎ লাসা হইতে পিকিং স্থানান্তরিত—কম্যুনিষ্ট চীন বিরোধী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে বিচারের আশংকা।

অ্যাংগোলা পরিস্থিতি আলোচনার্থ রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানে আফ্রো এশীয় উদ্যম।

২৮শে মে, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ : ২৯শে মে হইতে ৩১শে মে পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপক আয়োজন।

২৯শে মে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ : সমগ্র ইটালীতে প্রায় ১৫ লক্ষ কৃষি শ্রমিকের ধর্মঘট—সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্কার দাবী।

পূর্ব পাকিস্থানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে পুনরায় ঘূর্ণিবাত্যা—সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে কক্সবাজার সহর প্লাবিত।

৩০শে মে, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ : পাক্ বিমান বহরের আক্রমণে আফগান সীমান্ত এলাকায় ৯২জন হতাহত—পাকিস্থান সরকারের স্বীকৃতি।

৩১শে মে, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ : জেনেভায় লাওস প্রসংগে চতুর্দশ রাষ্ট্রের প্রকাশ্য সম্মেলন আরম্ভ—সম্মেলনের কো-চেয়ারম্যান বৃটেনের মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মঃ জর্জি পুসকিনের মধ্যে কার্য পরিচালনা সম্পর্কে মতভেদের অবসান।

'বিভ্রান্তি ঘটিলে বিশ্ব-মানুষের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা দিতে পারে' —ভিয়েনা বৈঠকের (আসন্ন ক্রুশ্চেভ—কেনেডি বৈঠক) গুরুত্ব সম্পর্কে প্যারিসে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির মন্তব্য।

১লা জুন, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ : প্যারিসে প্রেসিডেন্ট চার্লস দ্য'গলের সহিত মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির বৈঠক—আফ্রিকার সমস্যাবলী সম্পর্কে উভয় নেতার আলোচনা।

কিভু প্রদেশে শতাধিক উপজাতির লোক কংগোলীদের হাতে নিহত—বহু গ্রাম ভস্মীভূত—রাজধানীর চতুর্দিকে ভয়াবহ হাংগামা।

বলুন তো কী?

উত্তর

১। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, কম্যুনিষ্ট চীন, উত্তর ভিয়েটনাম, দক্ষিণ ভিয়েটনাম, কাম্বোডিয়া, বর্মা, থাইল্যান্ড, লাওস, ভারতবর্ষ, পোল্যান্ড ও কানাডা।

২। ঘানা—প্রেসিডেন্ট নকুমা; গিনি—সেকরু টুয়র; মালি—প্রেসিডেন্ট কিটা।

৩। ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা কার্যকরী করতে হলে যে টাকার দরকার, তার একটা বড় অংশ বিদেশী গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করতে হবে। কয়েকটি দেশ ঋণ দিতে রাজী হয়েছে বা অন্য কয়েকটি দেশ ঋণ দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করছে। ২৫ বৎসর মেয়াদী হিসাবে এই ঋণ গ্রহণ করা হবে। প্রধান ঋণদাতা হচ্ছে—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মাণী, কানাডা, ইংল্যান্ড। এদের সংগে যোগ দেবে জাপান, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফ্রান্স ও ইটালী। এই সব দেশই হবে Aid India Club-এর সভ্য বা পর্যবেক্ষক।

শ্রী বাসব

লায়লি

সাঁওতাল পরগনার একটা আধা শহর। স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশ। চারিপাশ পাহাড়ে ঘেরা। ধূমেল পাহাড়ের পটভূমিকায় ছবির মত সুদৃশ্য বাঙলো। অধিকাংশই বাঙালীদের। স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙালীরা বাঙলা থেকে এসে এখানে ভিড় জমায় এই কটা মাস।

সে বছর পুজোর ছুটিতে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে উঠেছিলুম সপরিবারে।

বেশ পছন্দসই বাড়িটি। সামনের ফাঁকা জমিতে সাজানো ফুলবাগান। পাঁচিলের ধারে স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ, চামেলি, কামিনীর ঝাড়। মাঝে মাঝে লম্বা একহারা ইউকালিপটস। বাড়ির সামনেটা সিনেমা হাউসের মত চিত্র-বিচিত্র। বাড়ির মালিকের সুরুচির ও সৌন্দর্যবোধের প্রশংসা করতে হয়।

বাড়ির মালিককে দেখে কিন্তু আমি রীতিমত ভড়কে গেলুম। তার চেহারা বা রুচির সংগে বাড়ির কোন সাদৃশ্য নেই। কে বলবে যে এই ঝকঝকে তকতকে বাড়ির মালিক ঐ রোদে-পোড়া, রগ-ফলা, চোয়াড়ে লোকটা। বাড়ির মালিক না হয়ে মালি হলেও বা কথা ছিল।

লোকটার নাম বিশাই মাহতু। এ অঞ্চলের বিত্তশালী ব্যবসায়ী বিশাই মাহতু। শহরের টাঙ্গাওয়ালা থেকে রেল স্টেশনের মাস্টারমশায়, মুটে মজুর কে না চেনে বিশাই, মাহতুকে। শহরের একজন কেষ্টাবিষ্টু এই বিশাই মাহতু।

আমার সামনে এসে বিশাই দাঁড়ালো. সবিনয়ে, গড়ুর পক্ষীর মত হাত দুটি জোড় করে। স্থূল নগ্ন দেহ। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। পরণে ময়লা ধুতি। কোমরে জড়ানো ততোধিক ময়লা একখানা গামছা। কানে আধপোড়া বিড়ি। আউট অ্যান্ড আউট রিফ্-র‍্যাফ্!

আমি অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে দেখলুম। আমার চোখে সে প্রচন্ড বিস্ময়। বিশাই-এর নাকি শহরে আরো পাঁচ-সাতখানা ভাড়াটে বাড়ি। ইঁট, টালি, চুন, সুরকির কারবার। বনের ইজারা। জমির দালালী।

আমার স্ত্রী বলে, পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। নইলে মা লক্ষ্মী ওর ঘরে বাসা বাঁধবেন কেন?

বিশাই নাকি প্রথম জীবনে বনে, জংগলে, পথেঘাটে ঘুটিং কুড়িয়ে চুনের কারবার শুরু করে। সেই চুনের কারবার ফেঁপে ফুলে উঠলো। তার সৌভাগ্যের দৌড় শুরু হল।

আমি অবাক হয়ে ভাবি আর লোকটার পানে চেয়ে চেয়ে দেখি।

বাড়ির পাশ দিয়ে একটা চওড়া রাস্তা চলে গেছে। চমৎকার অ্যাসফালটন করা রাস্তা। বোধ হয় যুদ্ধের হিড়িকে এর অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে। সকালে বিকালে শহরের স্বাস্থ্যকামী নরনারী এখানে ভিড় জমায়। এই রাস্তায় টহল দেয়।

রাস্তার ওদিকে দূরপ্রসারী ঢেউ খেলানো মাঠ। দূরে ধূসর পাহাড়। পাহাড়ের পাদভূমিতে ছোট বস্তি! ভুট্টা জনারের ক্ষেত।

কুয়াশা-ঘেরা পাহাড়ের পেছন থেকে লাল ফানুসের মত ভেসে ওঠে প্রভাত-সূর্য, কাঁচা সোনার রঙে পাহাড়ের গা ধুয়ে দেয়। কমলা রঙের কাঁচ রোদে ঝলমল করে ওঠে দিগদিগন্ত। মর্মরিয়ে ওঠে বনস্থলী।

কোন ভোরে, সূর্যোদয়ের পূর্বেই পথের ধারে একটা ছায়াঘন মহুয়া গাছের তলায় বসে বিশাই বিড়ি টানে আর কুলি মজুরদের কাজ আরম্ভ করায়। পথের নীচে, ঢালু জমিতে চুন পোড়াবার খাঁটি। মজুরেরা খাঁটিতে ঘুটিং-এর মাপ করে। বিশাই হিসেব মেটায়। তারপর সারা সকাল মাঠে মাঠে ঘুরে বেলা বাড়লে গদিতে যায়। শহরের গঞ্জে তার গদি।

বিশাই আমার চোখে শুধু বিস্ময় নয়, দুর্ভেদ্য রহস্য। তার সম্বন্ধে আমার অপার কৌতূহল। কেন, নিজেই বুঝতে পারি না।

পুজোর পর একদিন আমার স্ত্রী বললে, ওগো জানো, বিশাই-এর আর একটা বউ ছিল। সে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

আমি কৌতুক করে বললুম, পাঁচ সাত লাখ টাকার মালিক হলে আমি পাঁচ সাতটা বউ রাখতুম। ওর তো মাত্র দুটো।

গিন্নী তেরছা চোখে ঝিলিক দিয়ে বললে, তা রাখতে' কিন্তু তোমার কথা তো হচ্ছে না। আমাদের বাড়িওলা বিশাই-এর কথা। তার আর এক বউ আছে। রীতিমত সুন্দরী বউ। তাকে ও নেয় না কিংবা সে ওর কাছে থাকে না। তবে সেই প্রথম বউ।

—তাই নাকি? তার এখানে আসার কারণ?

—সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। গোপনে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ উকিলের পরামর্শ চায়। কলকাতার বড় উকিল। উকিলের নাম-ডাক শুনে এসেছে। সে বলে, আসলে এ সব বিশাই-এর কিছুই নয়। সব তার। বিশাই ফাঁকি দিয়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

হবে। কে জানে, আমি প্রথম থেকেই একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছি এর গোপন তলে।

রাতের গোপন অন্ধকারে, লায়লি কখন এসে আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে। বিশাই-এর প্রথমার নাম লায়লি। বিশাইকে দেখে প্রথম দিন আমি চমকে গিয়েছিলুম কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী চমকে দিল আমায় লায়লি। বিশাই-এর ঐশ্বর্য যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অবিশ্বাস্য এই সুন্দরী মেয়েটির পরিচিতি। কে বিশ্বাস করবে এই মেয়েটি একদা ঐ বিশাই-এর শয্যাসঙ্গিনী ছিল। বিশাই-এর সাথে তার মধুর অন্তরঙ্গতা ছিল।

সম্ভ্রান্ত চেহারা। পরিচ্ছন্ন বেশ-বাস। দেহের বর্ণ গৌর। দীর্ঘ পল্লবে ঢাকা কালো বড় বড় দুটি চোখ। চোখের দৃষ্টিতে অগ্নিচাঞ্চল্য। দেখলেই বোঝা যায় যৌবনে লায়লি ছিল অপরূপ সুন্দরী। দেহে এখনো যৌবনের আঁচ আছে। যৌবন স্তিমিত হয়ে এলেও শীতের পত্রপুষ্পহীন বনলতার মত তার বসন্তদিনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

লায়লি উদ্ঘাটিত করে দিল তার বিস্ময়কর বিচিত্র জীবনকাহিনী। রহস্য-ভরা রোমাঞ্চকর প্রেমের কাহিনী। উপকথার মত অদ্ভুত আর হৃদয়গ্রাহী।

কবে কোন ছেলেবেলায় লায়লির বিয়ে হয়েছিল বিশাই-এর সঙ্গে। লায়লি তখন শিশু। বিশাই বালক। বিশাই-এর বাপ কাজ করতো এক বাঙালী ঠিকা-দারের কাছে। কুলি-কামিনরা বনজঙ্গল ও পাহাড়ের নীচে থেকে ঘুটিং কুড়িয়ে আনতো ঠিকাদারের চুনের জন্যে। ঘুটিং পুড়িয়ে চুন তৈরী হত। বিশাই-এর বাপ ছিল তাদের সর্দার। লায়লির বাপ কাজ করতো বিশাই-এর বাপের তাঁবে। তাদের এক বস্তিতে ঘর।

বিশাই-এর বাপ মরে গেলে, বিশাই পেল সেই কাজ। এদিকে ঠিকাদার মারা গেল। তার ছেলে এলো কলকাতা থেকে এখানকার কাজ চালাতে। ঠিকাদারের ছেলে বয়সে তরুণ সুদর্শন চেহারা। নাম বসন্ত। বিশাই প্রথম থেকেই নতুন বাবুজিকে খুশী রাখবার চেষ্টা করল। তার বুদ্ধি প্রখর। মনিবের কাছে নিজেকে সহজ করে নিয়ে অতি অল্প-দিনেই বসন্তের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল।

তার মূলে কিন্তু লায়লি।

লায়লি সবে স্বামীর ঘর করতে এসেছে। বয়স তার অল্প হলেও বাড়ন্ত তার দেহের গড়ন। ফুলন্ত লতার মত প্রাণচঞ্চল। ফুটফুটে গৌর-বর্ণ নিটোল দেহ। দেহের স্তবকে স্তবকে যৌবনের ঝলকানি।

বিশাই কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে বসন্তকে গ্রাস করবার চেষ্টায়। বিদেশী, সৌখিন বাঙালীর ছেলে। ছেলেমানুষী হাবভাব। ব্যবসা বোঝে না। হাতে অগাধ পয়সা। বিশাই তাকে শিকার ভেবেই তার চারিপাশে জাল ফেলতে লাগল। তার মন ভোলাবার জন্য লায়লিকে পাঠিয়ে দিত বসন্তর বাঙলোয়। তার অগোছাল ঘরদোর গুছিয়ে দেবার জন্যে।

নির্মল নিষ্পাপ লায়লি। তার মনে কোন আবিলতা ছিল না। সে বুঝবে কেমন করে বিশাই-এর মনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য। খুশী মনেই লায়লি বাবুজির অনুপস্থিতিতে তার ঘরদোর গুছিয়ে দিয়ে আসত। সোরাই ভরে জল রেখে আসত।

বসন্তর ঘরের সৌখিন পরিবেশটি লায়লির মনের তলায় একটা অজানা পুলকের ঢেউ তুলত। বিহ্বল বিস্ময়ে সে বসন্তের জামা কাপড় জিনিসপত্রগুলি নেড়েচেড়ে দেখত। দেখত তার প্রসাধনের সামগ্রীগুলি। ধপধপে বিছানাটা পরিষ্কার করে পাট করে লুব্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত। বিছানার গায়ের সুগন্ধে তার মনে নেশা ধরে যেত। শরীরে রোমাঞ্চ জাগত। চুপচাপ, একা ঘরটির মাঝে বসে থাকতেও তার ভাল লাগত।
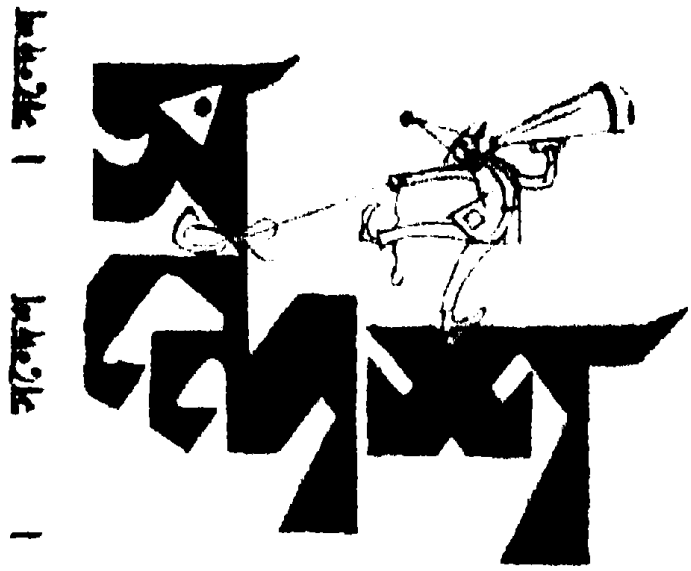
খেয়ালি মেয়ে। ছেলেমানুষী বুদ্ধি। দৈবাৎ একদিন বসন্তর টেবিল ঝাড়তে ঝাড়তে কি ভেবে তার সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগ্রেট বের করে ধরিয়ে বসল। মাঝে মাঝে সে পাতার বিড়ি খায়। দামী সিগ্রেটের মিষ্টি গন্ধে তার মনে নেশার আমেজ লাগল। সে পরমানন্দে গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে সিগ্রেট টানতে লাগল।

জানতে পারল না বসন্ত এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ চোখে পড়তেই সে মাথা হেঁট করে জড়সড় হয়ে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করলে। বসন্ত তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

ধরা পড়ার লজ্জায় ও ভয়ে লায়লির চোখে জল এলো। তা'র হাত থেকে জ্বলন্ত সিগ্রেটটা মাটিতে খসে পড়লো।

হাসতে হাসতে বসন্ত বললে, ফেলে দিলি কেন? তুলে নে। খা না। লজ্জা কিসের? তোদের সব মেয়েই তো খায়।

কাঠের পুতুলের মত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দুচোখে অশ্রুর ধারা নেমেছে।

বসন্ত তাকে দুচোখ ভরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ভালো লাগল তাকে। তরুণ দেহের নিচে যে লোভের আগুন চাপা থাকে, সেটাকে খুঁচিয়ে জ্বালিয়ে দিল, লায়লির পুষ্পিত দেহের লালিত্য।

বসন্ত এক সময় বললে, তুই এতো ময়লা কাপড় পরিস কেন লায়লি?

বসন্তর গলায় নিজের নামটা বড় মধুর শোনালো। লায়লি মুহূর্তের জন্যে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বসন্তকে আচ্ছন্ন করে চোখ নামিয়ে নিল।

বসন্ত জিজ্ঞেস করলে, বিশাই তোকে শাড়ি কিনে দেয় না?

প্রশ্রয় পেয়ে লায়লির সাহস বাড়ল। মুখে কথা ফুটল। সে বসন্তর চোখে চোখ রেখে দ্বিধাজড়িত স্বরে বললে, ছাই! কাপড় কাচবার সাবুন দেয় না।

—তাই নাকি? অন্যায় তো? তাকে বলবো, এতো নোংরা কাপড় পরে বাবুজির ঘরে কাজ করা চলবে না।

লায়লি মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল।

ভারি মিষ্টি হাসি। বসন্তের বুকটা দুলে ওঠে। সর্বাঙ্গে একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ অনুভব করে লায়লির দৃষ্টির স্বচ্ছ আলো থেকে।

বসন্ত চোখ বুজে জালে পা দিল। লায়লি তার কাছে ধরা দিল স্বচ্ছন্দে। সানন্দে। আদিম প্রাণের অনিবার্য আলোড়নে।

লায়লির ধাঁজ বদলে গেল। ছাঁদ বদলে গেল। সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদে তার খিদের ভোল বদলে গেল। সে আর বিশাইকে সইতে পারে না। তার সঙ্গে এক বিছানায় রাত্রিবাস করতে গা ঘিন ঘিন করে। সে বিশাই-এর পাশে শুয়ে বাবুজিকে ভাবতে ভাবতে নিসুত রাত্রির প্রহর গোনে। ঘুমিয়ে বাবুজিকে স্বপ্ন দেখে।

বিশাই লায়লির পানে চেয়ে শিউরে ওঠে। তার মনে হয় ওর রূপের আলোয় তার বাড়িঘর সব পুড়ে যাবে। এ আগুন সে চেপে রাখবে কি দিয়ে?

লায়লির রূপ এনেছে তার ঘরে স্বচ্ছলতা। লায়লিকে এখন আর তার কাছে হাত পাততে হয় না। বিশাইকে হাত পাততে হয় লায়লির কাছে। বাবুজি লায়লির হাতের খেলনা। লায়লি বাবুজির সর্বময়ী।

বিশাই-এর সাধ্য নেই লায়লিকে বাধা দেয়। বাধা দিতে তো সে চায় না।

লায়লি বাবুজির ঘরে কাজ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে রাত্রে বাড়ি ফেরে না। কখনো গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে একা মাঠ পেরিয়ে বাবুজির কাছে চলে যায়। পরের দিন সকালে ফিরে এসে বিশাইকে একমুঠ টাকা ফেলে দেয়। বিশাই নিঃশব্দে হাসে। লায়লি তাকে গাল দেয়। নিজেকে স্পর্শ করতে দেয় না।

বিশাই-এর সৌভাগ্য বয়ে আনে লায়লি। এতো টাকা সে একসঙ্গে চোখে দেখেনি। কখন কল্পনা করেনি।

বসন্ত লায়লিকে সত্যি ভালবেসেছে। আর লায়লি বিশাই-এর প্ররোচনায় রূপের ফাঁদ পেতে তার জন্য টাকা রোজগার করতে এসে, নিজেই আটকে পড়েছে তার ফাঁস-কলে। আর তার বেরোবার পথ নেই। বেরোতে সে চায় না। এখন সে বিশাই-এর সংস্পর্শ থেকে মুক্তি পেলে বাঁচে।

বসন্তকে সে উগ্রভাবে ভালবেসেছে। তার সেবায় সে প্রাণমন উৎসর্গ করে দিয়েছে। সে আর বসন্তর বাঙলো ছেড়ে গাঁয়ে যেতে চায় না। সে কাছে না থাকলে বাবুজির অসুবিধা হয়। তা ছাড়া গাঁয়ের বস্তিতে আর তাকে মানায় নাকি? ভাবে-ভঙ্গিতে, বেশবাসে, চলাফেরায় সে পুরো-দস্তুর বাঙালী বনে গেছে।

বিশাই ওদিকে টাকার নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। টাকা! আরো টাকা! তার ওপর বসন্তর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু সে বিশ্বাস আর সে রাখতে পারছে না। ব্যবসার আদায়ী টাকা সে তছরূপ করছে। বসন্তর চোখে ধরা না পড়লেও ধরা পড়ে লায়লির চোখে। লায়লি তাকে শাসায়। তাকে সাবধান করে দেয়। এমনভাবে বাবুজির টাকা তাকে সে লুঠ করতে দেবে না। বিশাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে লায়লিকে ভয় দেখায়। লায়লি রুখে দাঁড়ায়।

দুর্গাপুরে গিয়েছিল বসন্ত। সেখানে তার শাল জঙ্গল ইজারা নেওয়া আছে। সেখান থেকে ফিরে এসে বসন্ত লায়লিকে খবর দিল, তার বন্দুকটা খোয়া গেছে। কোথায় বলতে পারলে না।

শঙ্কিত হয়ে উঠল লায়লি। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বসন্তকে অনেক প্রশ্ন

হলো। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারে না। ট্রেনেও যেতে পারে। দুর্গাপুরেও যেতে পারে।

লায়লির আতঙ্কিত ভাব-ভঙ্গি দেখে সে হাসতে হাসতে বললে, ভয় কি? পুলিশে খবর দিয়ে রেখেছি। লাইসেন্স করা বন্দুক। ভাবনার কোন কারণ নেই। লায়লিকে আদর করে সে কাছে টেনে নিল।

লায়লির ভয় দৈবের সঙ্কেত।

বিকেলে বসন্তকে চা দিয়ে লায়লি পারে যাবে বলে রওনা হলো।

ঝিকিমিকি বেলা। বাইরের কম্পাউন্ডে দাঁড়িয়ে বসন্ত সিগ্রেট খাচ্ছিল। লায়লি তার দিকে এক ঝলক হাসি ছুড়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে [illegible] বসন্তও মৃদু হা[illegible]

রাস্তা পার হয়ে মাঠে নেমেছে লায়লি, ঠিক সেই সময়ে দূরে বন্দুকের আওয়াজ হলো।

লায়লি থমকে ফি[illegible]ড়াল।

মাথার উপর দিয়ে কলরব করে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল।

লায়লি বুঝতে পারলে না কোথায় আওয়াজটা হলো। একবার ভাবলে, কে কোথায় পাখি মারলে। আবার কি ভেবে সে পায়ে ফিরে এলো। রাস্তা পার হয়ে সে কম্পিত বুকে বাংলোর কাছে এসে দেখে, বিপর্যয় কাণ্ড! সিঁড়ির ধাপের উপর বসন্ত লুটিয়ে পড়ে আছে। তার গলায় কে গুলি করেছে। রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। তার চারিপাশে ভিড় জমেছে। পাশে পড়ে আছে বসন্তর বন্দুকটা।

আর্তনাদ করে লায়লি বসন্তর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তাকে যেতে দিল না। বাধা দিল জনতা: ওকে ছুঁয়ো না। ও মরে গেছে। ডাক্তার আসছে। পুলিশ আসছে।

লায়লি মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

লায়লি ধরা পড়ল। বসন্তকে হত্যা করার অপরাধে। হত্যার পূর্ব মুহূর্তে লায়লিই তার কাছে ছিল। গুলি করেছে বসন্তর বন্দুকে। সে বন্দুক ক'দিন লুকিয়ে রেখেছিল লায়লি। বসন্তর ডান হাতে জড়িয়ে ছিল কতকগুলো লায়লির মাথার ছেঁড়া চুল। কাছেই পড়েছিল রূপোর খাঁপ দেওয়া লায়লির মাথার একটা কাঁটা। খুনের পূর্বমুহূর্তে দুজনে ঝগড়া এবং চুলোচুলি হয়েছে। দুজনের অবৈধ প্রণয় ছিল। নিত্য কলহ হতো। আর কি চাই? নিরেট নিটোল একটি গল্প। ফাঁসির পক্ষে যথেষ্ট।

বিচারে সাক্ষীর অভাব হলো না।

বিশাই সাক্ষী দিল। দোষী সাব্যস্ত হলো লায়লি। স্ত্রীলোক বলে ফাঁসি হলো না। হলো আজীবন কারাদণ্ড।

কুড়ি বছর বয়সের লায়লি, রঙিন যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কাটিয়ে এলো জেলে। ট্র্যাজেডি হচ্ছে [illegible]রি হত্যা[illegible] অপরাধে যাকে সে জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসতো। যাকে হারিয়ে সে সর্বহারা।......

কাহিনী শেষ করে লায়লি আমাদের মুখের পানে চাইল অশ্রুভরা চোখে। মরণোন্মুখ ভঙ্গিতে। একটু থেমে বললে, পনেরো বছর পরে, এক হপ্তা হলো ফিরে এসেছি। ভাবতে পারিনি যে আবার ফিরে এসে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখতে হবে। কেন এলুম বলতে পারেন?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, দেখা হয়েছে [illegible]মার স্বামীর সঙ্গে?

হঠাৎ তার ভঙ্গিটা শক্ত হয়ে উঠল। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে সে আবেগ রোধ করবার চেষ্টা করলো।

স্বরটা কঠিন করে দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, না। দেখা এখনো করিনি। সে সুযোগ এখনো হয়নি। সেই শুভক্ষণের অপেক্ষায় আছি।

দম নিয়ে চাপা গলায় বললে, কেউ জানে না যে আমি ফিরে এসেছি। এখানকার সবাই আমার কথা ভুলে গেছে। আপনাদেরই প্রথম জানাতে হলো। কেন জানেন?

আমার স্ত্রীর মুখের পানে অশ্রু-আকুল চোখে চেয়ে কম্পিত কণ্ঠে লায়লি বললে, এই বাড়ি ছিল [illegible]। এই ছিল আমাদের প্রেমের তীর্থ-ভূমি। এই মাটিতেই বাবুজি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। তাই এখানে না এসে উপায় নেই।

অশ্রুভরা চোখে হাসল লায়লি। প্রাণান্তকর হিংস্র হাসি। আপন মনে অস্ফুটস্বরে বললে, অপরাধ করবার আগেই তার শাস্তি ভোগ করে এলুম। এতো দিন পাপের তপস্যা করেছি, ধ্যান করেছি, অন্ধ-কারার নির্জনে বসে। এইবার তাকে প্রত্যক্ষ করবো।

এক হপ্তা পরে। দেওয়ালির আগের দিন বোধ হয়।

খুব ভোরে বাড়ির সামনে রাস্তায় পায়চারি করছিলুম। তখনো প্রভাতী তারাটি মিট-মিট করে আকাশের কোণে জ্বলছিল। চারিদিক কুয়াশায় ঝাপসা। হঠাৎ ধপধপে সাদা শাড়ি পরে একটি নারীমূর্তি অন্ধকারের আবছা থেকে বেরিয়ে এলো। ঊর্ধ্বশ্বাসে পথ বেয়ে এসে হঠাৎ আমার সামনে চকিতে দাঁড়িয়ে হাতদুটি কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠল, নমস্তে বকিল সায়েব। সঙ্গে সঙ্গে চকিত বিদ্যুৎ শিখার মত পাশের আমবাগানের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লায়লি। লায়লির কণ্ঠে ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততা। আমি জড়ের মত তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কোথায় গেল, কে জানে?

সকাল হতেই, সোরগোল শোনা গেল। বিশাই খুন হয়েছে। পথের ধারের সেই মহুয়া গাছের তলায়। গলায় একখানা নিকেলের ভোজালি বিঁধে আছে।

লোক ছুটেছে পথের দিকে।

আমার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি বোবা বনে গেলুম। লায়লি নাকি?—

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-কর্ম

পাবলিসার্স এণ্ড বুক সেলার্স এসোসিয়েশন অফ বেংগল কর্তৃক বিগত ২৮শে এপ্রিল ১৯৬১ সালে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে এসোসিয়েশন হলে। ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সংস্কৃতি বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির এই পাঠাগারটির উদ্বোধন করেন। সভায় অনেক সাহিত্যিক, প্রকাশক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

এই দিন ভাষণদান কালে শ্রীহুমায়ুন কবির ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,—বাংলা ভাষায় অনুবাদ-কর্ম আশানুরূপ হচ্ছে না, এই বিভাগটি অবহেলিত। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের বঙ্গানুবাদের প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি অতঃপর প্রকাশকদের অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশে অধিকতর তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

এখন প্রশ্ন এই বাংলা-সাহিত্য অনুবাদ বিভাগ সত্যই কি অবহেলিত? যদি এর উত্তর হয় যে অভিযোগ সত্য, তাহলে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এর কারণ কি। বর্তমান প্রবন্ধে সেই দিকটাই আলোচ্য।

বাংলাদেশে রামমোহন রায়, তারাকুমার কবিরত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, চণ্ডীচরণ সেন, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির অনুবাদ-কর্ম বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত হওয়ার দাবী রাখে। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদ দিয়ে বাংলা ভাষার একদিন গোড়াপত্তন হয়েছিল একথা বলা যায়। চণ্ডীচরণের 'টম কাকার কুটির', গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'ম্যাকবেথ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মূল ফরাসী থেকে অনূদিত পীয়ার লোটির—'ইংরাজ বর্জিত ভারতবর্ষ', দীনেন্দ্রকুমার রায়ের অনূদিত এ্যাবটের—'নেপোলিয়ান', টডের 'রাজস্থান', মনমোহন রায়ের অনূদিত 'লা মিজারেবল', সত্যেন্দ্রনাথের 'জন্ম-দুঃখী' উপন্যাস এবং অসংখ্য কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতা বাংলাভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে সন্দেহ নেই।

ভারতী যুগে আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগে যামিনীকান্ত সোম ইবসেনের 'ডলস হাউসের' সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন 'খেলাঘর'। তিনি ১৯২১—২২-এ অনুবাদ করেন মারিস মাতারলিংকের 'ব্লু-বার্ড'—(নীল পাখি)। সবুজ পত্রের কান্তিচন্দ্র ঘোষ কৃত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম অজো বাংলা দেশে প্রিয় গ্রন্থ।

এরপর কল্লোলযুগের সাহিত্যিকবৃন্দ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল অনেকগুলি বিখ্যাত বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই সূত্রে বিশ্ব-সাহিত্যের গোর্কী, বোয়ার, হামসুন, বার্ণাড শ, অস্কার ওয়াইল্ড, টলষ্টয়, ডি এচ লরেন্স, সমর সেট মম প্রভৃতি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত এবং পরিচিত হয়েছেন।

ইদানীংকালে অশোক গুহ, বিশু মুখোপাধ্যায়, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, বিমল মিত্র, শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভাদুড়ি, নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ অনেকগুলি সদগ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। সুতরাং অনুবাদ-কর্ম বাংলা সাহিত্যে অবহেলিত নয়।

এই সঙ্গে বলা যায় যে প্রতিবেশী প্রদেশের প্রেমচাঁদ, মহাদেবী বর্মা, কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী, কে এম পান্নিকর, কিষণ চন্দর, মুল্কেরাজ আনন্দ প্রভৃতির রচনাবলীও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং অনুবাদ যাঁরা করেছেন তাঁদের কৃতিত্ব এবং অনুবাদক্ষমতা সর্বত্র স্বীকৃত।

তবু 'অনুবাদ সাহিত্য' অবহেলিত—এ অনুযোগ ওঠে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় অতি সাম্প্রতিককালে অনুবাদ-কর্মে বাংলাদেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায় নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন।

অনুবাদ কথাটির আগে 'অনু' থাকায় হয়ত অনুবাদ সম্পর্কে এদেশে একটা স্বাভাবিক অবজ্ঞা আছে। সাহিত্যিক এবং প্রকাশক উভয়েই সমান তালে নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেন,—এঃ অনুবাদ! ও আর কি দেখব!

সাধারণতঃ ধারণা (১) অনুবাদ-কর্ম সৃজনীমূলক সাহিত্য-কর্ম নয়, (২) মৌলিক রচনার অক্ষমতাই অনুবাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে, (৩) অনুবাদ উদ্দেশ্যমূলক, অর্থাৎ আর্থিক লাভটাই লক্ষ্য!

এ ছাড়া বিখ্যাত সমালোচক ডেভিড হোইট বলেন, সাধারণের ধারণা—

(1) that a work in original must *ipso facto* be better than translation;

(2) the translation is less 'creative' than other kind of writing—a matter of compromise as of making somebody else's blue print—

সুতরাং অনুবাদ সাহিত্য-সমাজের অগ্রদানী ব্রাহ্মণের মত অপাঙক্তেয়।

অথচ যদি অনুবাদ-কর্ম কেউ না করত তাহলে, বাইবেল, বেদ, কোরাণ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, কালিদাস, সেক্সপীয়র, টলষ্টয়, চেকভ, গোর্কী, বালজাক, ফ্লবেয়ার, মোপাসাঁ, ওমর খৈয়াম, হাফিজ ইত্যাদি পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ সাহিত্য অজ্ঞাত থাকত। দুধের স্বাদ হয়ত ঘোলে মেটে না, তবু বিকল্প হিসাবে অভাবের মুখে ঘোলও কম প্রয়োজনীয় নয়। অনুবাদ নামক ঘোল দুধের বিকল্পে তাই সর্বদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশ্ব-সাহিত্যের যাঁরা খ্যাতনামা লেখক যেমন আঁদ্রে জিদ, হ্যারল্ড ল্যাকসনেস, সাল-ভাতর কাশীমদ, আলবেয়র কামু, এ'রা সবাই অনুবাদ কর্মের জন্যও খ্যাতি অর্জন করেছেন। এজরা পাউণ্ড বলেছেন,—'Great period of literature are usually great ages of translations. or are preceded by them.'

সাহিত্যের এক-একটি যুগ অনুবাদ-সাহিত্যের দ্বারা পুষ্ট, যেমন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন 'ফরেণ এড', সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 'ফরেণ এড' প্রয়োজন এবং সেই সাহায্য আসতে পারে অনুবাদের মাধ্যমে। যাঁরা কৃতী অনুবাদক তাঁরা শুধু অপরের লেখার ওপর দাগা বুলান না, তাঁরা সেই রচনাকে স্বীয় মাতৃভাষায় নবরূপে রূপায়িত করেন; Great translators—as distinct from the merely competent are as creative as original writers (David Wright).

যেমন ফিট্জিরাল্ড-কৃত ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের অনুবাদ, যদি অন্য কোনোভাবে এর অনু[illegible]ত তাহলে কি সেই অনু[illegible] এত[illegible]প্রিয়তা অর্জন ক[illegible]। অপরেওত ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন, তার কোনো খ্যাতি নেই। বাংলা-ভাষায় যাঁরা 'রুবাইয়াৎ' অনুবাদ করেছেন (এক বোধকরি [illegible] হিতেন্দ্রমোহন বসু ছাড়া), সকলে[illegible] ফিটজিরাল্ডের এই অনুবাদ থেকে অনুবাদ করেছেন। কান্তি ঘোষকে সকলে যদি বিস্মৃত হয়, তাঁকে মনে রাখতেই হবে 'রুবাইয়াৎ'-ই-ওমর খৈয়ামের সার্থক অনুবাদক হিসাবে।

এজরা পাউণ্ড অনেক অনুবাদ করেছেন,—তাঁর অনুবাদে ভুল, ত্রুটি, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতির জন্য সমালোচকরা কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। এই ত্রুটির কারণ, ডেভিড রাইটের মতে, I believe, that pound does more than translate—he revives, he recasts, he recreates. যাঁরা দক্ষ অনুবাদক তাঁরা তাই কিছু গ্রহণ, কিছু বর্জন করে অন্যভাষার রচনাকে মাতৃভাষায় পুনরুজ্জীবিত করেন। তাই রাইটের মতে ভুল হোক, ত্রুটি হোক "Yet Pound remains unquestionably the greatest living translator of the century."

বাংলা অনুবাদ হঠাৎ এমন অবজ্ঞেয় এবং অবহেলিত হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরও আছে,—সুবৃহৎ গ্রন্থের কঠিন অংশ বাদ, সংক্ষিপ্তসারকে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বলে চালানো হচ্ছে, ইংরেজী 'আন্ট' কথাটির অনুবাদ কোথাও খুড়ি, কোথাও মাসি, কোথাও আবার মামি (একই গ্রন্থে), ফীলড কথাটির অর্থ যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র, তার অনুবাদ হল 'মাঠ': এই জাতীয় অক্ষম অনুবাদকদের কৃত অনুবাদ স্বাভাবিক কারণেই যাঁরা শিক্ষিত পাঠক এবং মূল গ্রন্থের সম্মান রাখেন তাঁদের কাছে অরুচিকর। সংবাদপত্রে যেমন 'Police are patroling the street—অনুবাদে দাঁড়ায় 'পুলিসগণ পথে পেট্রল ছড়াইতেছিল' তেমনই অনুবাদ অনেকে করেন। এঁদের যেমন জ্ঞান মাতৃভাষায় তেমনই জ্ঞান বিদেশী ভাষায়, সুতরাং অনুবাদও হয়ে ওঠে অখাদ্য। পাঠক বা সমালোচকদের কি দোষ!

বিদেশী রাষ্ট্রের আনুকূল্যে ইদানীং কিছু ভালো বই এবং প্রচারণামূলক গ্রন্থ যাকে-তাকে দিয়ে অনুবাদ করানো হয়েছে। তার ভাষা এবং অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন জঘন্য যে একবার কোনো পাঠক সেই বই একটু পড়লে আর দ্বিতীয়বার হাতে করবেন না। অক্ষম অনুবাদক বর্তমানে বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে ছেয়ে আছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রে সার্থক অনুবাদক, অধিকাংশ সার্থক অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে সাফল্য লাভ করেছেন। যে সব ক্ষেত্রে অনুবাদক স্বয়ং সাহিত্যিক সেই সব ক্ষেত্রে অনুবাদও সাফল্য লাভ করে। বাংলা ভাষায় এতাবৎ যে সব গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে তার অধিকাংশ সাফল্য লাভ করেছে তিরিশ শতকের গোড়ার দিকে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই অনুবাদ সাহিত্যের মান অনেক নেমে গেছে, ফলে মহাযুদ্ধের পরেই অনুবাদ গ্রন্থের ক্ষেত্রে যে 'Boom Period' এসেছিল সেটা অতিতাড়াতাড়ি Slum Period' এ পরিণত হল। অনুবাদ-গ্রন্থ মাত্রেই তাই তাচ্ছিল্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কোনো প্রকাশকই আজ সাহস করে অনুবাদ গ্রন্থের পসরা নিয়ে ব্যবসা চালাতে রাজী হচ্ছেন না। এর ফলে বাংলাদেশে একদা অনুবাদের ক্ষেত্রে যে শুভ সূচনা দেখা গিয়েছিল তা আজ চাকা ভাঙা রথের মত মধ্যপথে থমকে দাঁড়িয়েছে।
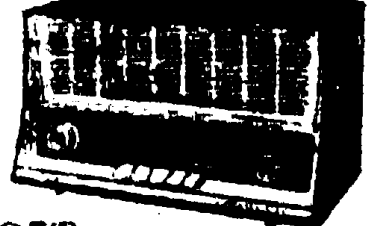
শ্রীহুমায়ুন কবির অনুবাদ সম্পর্কে আক্ষেপ করেছেন, সেই আক্ষেপের ফলে প্রকাশক সমাজের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে জানা নেই। তবে, এই সূত্রে একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধকরি, প্রাদেশিক সাহিত্যকে বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় করা নিশ্চিত প্রয়োজন, কিন্তু বেতার মারফৎ মাঝে মাঝে প্রাদেশিক সাহিত্যের বঙ্গানুবাদে যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা অতিশয় হতাশাজনক। কোনো ভাষা বা কোনো লেখকের প্রতি অসম্মান না জানিয়ে এই কথা বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যের মান আজ যা দাঁড়িয়েছে সেখানে তার চেয়ে উন্নততর মানের গ্রন্থের অনুবাদ সম্মানিত ও গৃহীত হবে, নিম্নমানের গ্রন্থের কোনো ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎ নেই। কারণ এখানকার পাঠকের রুচি চড়া পর্দায় বাঁধা। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট সারা ভারতবর্ষের অনুবাদকদের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। কি উদ্দেশ্যে তা জানি না, তবে যদি জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতাবলীর সংস্কৃত অনুবাদ বা রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মকথার অনুবাদে তাঁদের উৎসাহ হ্রাস পায় তাহলে কিছু বলার নেই। এখন যা পরিস্থিতি তাতে প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। নইলে এ কাজে কেউ সাহসী হবেন এমন আশা কম।

আর উচ্চ শ্রেণীর বিদেশী গ্রন্থ, এমন কি বিজ্ঞান বা কারিগরি বিদ্যার গ্রন্থাবলী অনুবাদের জন্য একটা অনুবাদকগোষ্ঠী সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, তাঁরা নির্বাচন করবেন অনুবাদক এবং অনুবাদ-যোগ্য গ্রন্থ, তবেই অনুবাদ-সাহিত্যের মান বৃদ্ধি পাবে।

অনুবাদে আগ্রহ কম হয়েছে সাহিত্যিকদের তার কারণ (১) এই কর্মে

পরিশ্রম বেশী, খ্যাতি কম, (২) প্রকাশকের আগ্রহের অভাব, (৩) মৌলিক রচনার জন্য সময়াভাব। এর ফলে বাংলাদেশে অনুবাদের ক্ষেত্রে একটা ভাঁটা পড়েছে।

অনুবাদ সম্পর্কে আমাদের একটি মাত্র নীতি থাকা উচিত, সেই নীতি 'দিবে আর নিবে'। অন্য ভাষা থেকে আমরা গ্রহণ করব যা কিছু ভালো, এবং অন্য ভাষায় আমাদের যা ভালো তা অনুবাদ করে পাঠাব। 'অনুবাদক গোষ্ঠী' যদি এদেশে কোনোদিন গড়ে ওঠে তবেই এই পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করা সম্ভব।

আজ শ্রীহুমায়ুন কবিরের বক্তব্যটি বিশেষভাবে বিচার করা প্রয়োজন এবং শুধু প্রাদেশিক সাহিত্য নয়, সকল শ্রেণীর সাহিত্যের সুনির্বাচিত অনুবাদ করানো বাংলা সাহিত্যে নতুন রক্ত দানের প্রয়োজনেই বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

পরিশেষে স্বীকার করি যে, প্রয়োজনবোধে এই প্রবন্ধে এই লেখকেরই অন্য প্রবন্ধ থেকে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

নতুন বই

প্রবাসী ষষ্টি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ : শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী ও অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত—(প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—৯) মূল্য সাড়ে বারো টাকা।

বিখ্যাত সাময়িকপত্র প্রবাসীর ষষ্ঠিপূর্তি ঘটেছে ১৩৬৭-র চৈত্র মাসে। বর্তমান গ্রন্থ সেই ষষ্টি-পূর্তির স্মারক। বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ প্রবাসী পত্রিকা এবং প্রবাসীর প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে ঋণী। অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল এই পত্রিকা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অতি প্রিয় পত্রিকা। নানাবিধ কারণে 'প্রবাসী'র পূর্ব-গৌরব ইদানীং কিঞ্চিৎ ম্লান হয়ে এসেছিল, এই বিরাট গ্রন্থটি প্রকাশনের মধ্যে 'প্রবাসীর' পুনরুজ্জীবনের এক প্রচেষ্টা এবং প্রযত্ন লক্ষ্য করা যায়।

প্রবাসী-প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, রাষ্ট্র-প্রসঙ্গ, অর্থনীতি-প্রসঙ্গ, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা, ইতিহাস-চর্চা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা প্রভৃতি ছাড়াও মহিলা বিভাগ এবং শিশু বিভাগে বর্তমান কালের কৃতবিদ্য এবং প্রখ্যাতনামা লেখক লেখিকাদের রচনায় এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়েছে। পুরাতন প্রবাসী থেকে অনেকগুলি ত্রিবর্ণ চিত্রও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, তাতে স্মারক গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়েছে। এইরকম একখানি গ্রন্থে শিশু-বিভাগ, মহিলা বিভাগ, এবং দুটি বড় উপন্যাস এবং দুটি নাটক প্রকাশ না করে সম্পাদকদ্বয় যদি পুরাতন প্রবাসীর কিছু মূল্যবান রচনা পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করতেন তাহলে গ্রন্থটির মূল্য আরো বৃদ্ধি পেত। রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ রচনা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়েছে এই শতাব্দী [illegible] একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশিত [illegible] হলে [illegible]দের পক্ষে সুবিধা হত। স্বর্গতঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গ মাঝে [illegible] অংশিক উদ্ধার করে পাদপূরে [illegible] মুদ্রিত হয়েছে এবং ভালোই হয়েছে। এই ষাট বৎসরে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় যে সব লেখকের রচনাদি প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের কথাও থাকা উচিত ছিল। অর্থাৎ প্রবাসী পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

এই জাতীয় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বর্তমানকালে প্রকাশ করা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক, সম্পাদকদ্বয় নিঃসন্দেহে বিশেষ প্রশংসা ও ধন্যবাদের দাবী রাখেন। বাংলাদেশে বিগত অর্ধ-শতাব্দীতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কি কাজ হয়েছে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বিশেষ প্রবন্ধ রচনার ব্যবস্থা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। বাংলাদেশে শিশুসাহিত্যের পত্রিকা 'মৌচাকের' একটি জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল আর 'প্রবাসী'র এই ষষ্টিপূর্তি স্মারক-গ্রন্থ, এ ছাড়া এই জাতীয় মহাগ্রন্থের আর কোনও রেকর্ড নেই।

সমগ্র গ্রন্থটি অলংকরণ করেছেন শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার ও শৈল চক্রবর্তী। প্রচ্ছদটি এঁকেছেন শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরী।
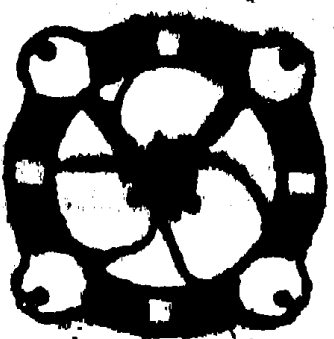
রবীন্দ্র-স্মৃতি—(সংকলন গ্রন্থ)— সম্পাদক—বিশ্বনাথ দে। (ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা—১২) মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রণাম নাও—(সংকলন গ্রন্থ)— সম্পাদক—চিত্তজিৎ দে, শ্যামাপ্রসাদ সরকার। (শ্রী প্রকাশ ভবন, কলিকাতা—১২) মূল্য চার টাকা।

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে নানাবিধ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো অনেকগুলি প্রকাশ [illegible] অপেক্ষায়। এক-একটি ধারা অনুসারে এই সংকলন [illegible]গুলি সম্পাদিত হয়েছে। এতদ্ব্যরা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী বি[illegible]লে যা বলেছেন তা [illegible] পাও[illegible]য়। ছাত্র এবং [illegible]দের পক্ষে এই জাতীয় গ্রন্থ মূল্যবান।

প্রথম গ্রন্থটিতে [illegible]বনীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে [illegible]তিভূষণ চাকী পর্যন্ত বিভিন্ন [illegible]কের রচনা সংকলিত হয়েছে। এই রচনাগুলি স্মৃতিকথা, জীবনকথা ও সৃজনকথা এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। অধিকাংশ রচনা লেখকদের বৃহদায়তন গ্রন্থের অংশ বিশেষ হওয়ায় ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলে না, তবু বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ মেটানোর এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই সংকলিত অংশ পাঠ করে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের আগ্রহ মূল গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হবে। সম্পাদক নির্বাচনের ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি চিত্র সম্বলিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য বর্ধিত হয়েছে। সম্পাদকের পরিকল্পনা এবং সুরুচি প্রশংসার দাবী রাখে।

'প্রণাম নাও' সংকলন গ্রন্থটির মেজাজ অবশ্য বিভিন্ন। বিশেষভাবে শিক্ষকদের জন্য এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে। ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—"মহৎকে প্রণাম করে আমরা পাই মহত্ত্বের আদর্শ ও প্রেরণা, অসামান্যকে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে আমরা তারই প্রাণশিক্ষার উদ্দীপনা পাই আমাদের অন্তরে। আজ যাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি সেই রবীন্দ্রনাথ শুধু মহৎ নয়, মহতো মহীয়ান। ভারতবর্ষের শিয়রে হিমালয় যেমন সমস্ত পৃথিবীর নগাধিরাজ, রবীন্দ্রনাথ তেমনি মানুষের ইতিহাসের এক অতুলনীয় বিরাট পুরুষ।"

এই বিরাট পুরুষ সম্পর্কে কবিতা এবং প্রবন্ধে যারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁরা অনেকেই খ্যাতনামা এবং শিল্পসাহিত্যের অগ্রণী লেখক। এই সংকলন গ্রন্থটি ছোটদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। কয়েকটি ছবিতে সেই মূল্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিচ্ছেদ — (উপন্যাস) — সুধীন্দ্রকুমার দেব (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা—৬)—মূল্য দুই টাকা মাত্র।

ছদ্মনাম—(উপন্যাস)—গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর (বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার—১২)—মূল্য সাড়ে চার টাকা মাত্র।

সুধীন্দ্রকুমার দেব একজন পুরানো দিনের লেখক ও কবি, এ যুগে প্রায় বিস্মৃত। একদা তিনি একটি মাসিকের সম্পাদনাও করেছেন, এই শহরের তিনি একজন প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী। বর্তমান উপন্যাসটিও ব্যবসাসূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত মনে হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন চালু হওয়ার পর বাংলা কথাসাহিত্যের স্বল্প পরিসর বিচরণ ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হয়েছে। লেখককে এই উপন্যাসের ক্ষিতীনবাবু উকীলের ভূমিকায় বসিয়ে গ্রন্থটির বিচার করলে পাঠকের প্রাণে কৌতুক বোধ জাগবে। ক্ষিতীনবাবুর চেম্বারে তাঁর মক্কেল জ্যোতিষ পাল ও তাঁর স্ত্রী কণিকা পালের আবির্ভাব ও অভিনয় এবং সেই সূত্রে দীর্ঘ বিলম্বিত মামলার পর বিবাহ-বিচ্ছেদ এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য। কণিকাই জিতল শেষ পর্যন্ত, আপীলেও জ্যোতিষ পাল হেরে গেল। কণিকা কি আবার বিবাহ বসবে? এইখানেই গ্রন্থ শেষ। প্রবীণ লেখক অপূর্ব লিপি-কুশলতার সঙ্গে কাহিনীটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

'ছদ্মনাম' একটি প্রেমের উপন্যাস। লেখক ছদ্মনামের আড়ালে এক সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত করেছেন। ধনী ব্যবসায়ী অমিতাভ এবং তার সঙ্গে রহস্যময়ী সুসানার পরিচয় এবং পরিণতি। তার ভগ্নী হেমাঙ্গিনী, আর এক বিস্ময়কর নারী-চরিত্র। এই দুটি নারী এবং অমিতাভের চরিত্র বিচিত্র নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর। সুন্দর প্রচ্ছদভূষণ উপন্যাসটির শোভাবর্ধন করেছে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

বর্তমানে নাট্য আন্দোলন : এ-কথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে, আজকাল প্রচুর নাটক লেখা হচ্ছে এবং অভিনয় হচ্ছে প্রচুরতর। কিন্তু সব নাটকই কি নাটক, সব অভিনয়ই কি অভিনয়?

নাটকের আর এক নাম হচ্ছে দৃশ্য-কাব্য। তাই কোনো নাটকের রস সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে তার সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থক অভিনয় দেখা দরকার। নাট্যকার যখন নাটক লেখেন, তখন মনশ্চক্ষে তিনি তার মঞ্চাভিনয় দেখতে থাকেন—তাঁর কল্পনার পাত্র-পাত্রীরা সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত হয়ে রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে তাঁর চোখের সামনে ঘোরাফেরা করতে থাকে। আমাদের দেশে গিরীশচন্দ্র তো কোন্ কোন্ অভিনেতাকে পাওয়া যাবে, তাই জেনে নাটক রচনা করতেন। "রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয় প্রযোজনা" প্রবন্ধে অ[ধ্যা]পক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "কবি কল্পনার রঙ্গমঞ্চে যেন তাঁর নাটকের অভিনয় অনেকবার দেখেছেন। মহলায় যেন তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে—কবি মিলিয়ে দেখছেন।" তাই এ-কথা অনস্বীকার্য যে, সর্বাঙ্গীন রূপারোপ বিশিষ্ট সার্থক অভিনয় দেখতে না পেলে কোনো নাটকের রসাস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না। নাটকের সফলতা নির্ভর করে নাট্য-কারের রচনানৈপুণ্য, মঞ্চ ও সাজসজ্জা পারিপাট্য, অভিনেতাদের দক্ষতা এবং দর্শক-শ্রোতাদের মানসিক গঠন ও রস-বোধের উপর। নাটকের সারবস্তু কথার মালা নয়, তার অন্তর্নিহিত গতি বা অ্যাক্‌শান (action). এমনও দেখা গেছে, কোনো নাটকে মঞ্চ, দৃশ্যপট, আঙ্গিক এবং অভিনয়ের তুলনায় তার রচনাংশ অপ্রধান হয়ে পড়েছে, অথচ দর্শক-শ্রোতা তার থেকে উদ্ভূত নাট্যরস যথেষ্ট [প]রিমাণে উপভোগ করেছে।

আজকাল সাধারণ নাট্যশালার বাইরে যে-সব সৌখীন বা পেশাদারী নাট্যাভিনয় দেখতে পাওয়া যায়, তাতে এই সার্থক অভিনয়োৎকর্ষ [...] সমগ্রভাবে একটি নিখুঁত রূপারোপ [...] প্রয়োজনা[...] সংগঠনকারীদের একটি সুষ্ঠু সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। এক বা দু'জন অভিনেতা-অভিনে[ত্রী]র নাট্যনৈপুণ্যের ওপর নির্ভর না [করে] যেমন দলগত অভিনয়কে ভালো করবার দিকে নজর দেওয়া হয়, তেমনই মাত্র অভিনয়গত সাফল্যকেই চরম লক্ষ্য হিসেবে মেনে না নিয়ে সমগ্র নাট্য-প্রযোজনাটিকে একটি উচ্চ স্তরে পৌঁছে দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করা হয় সঙ্ঘবদ্ধভাবে। দৃশ্য সংস্থাপন, পাত্র-পাত্রীদের সাজ-সজ্জা, খুঁটিনাটি জিনিষপত্রের সমাবেশ, প্রয়োজনবোধে কৃত্রিম উপায়ে পশ্চাদপটে মেঘের খেলা বা সাগরের ঢেউ দেখানো, ঘটনানুযায়ী আবহ-সঙ্গীতের অবতারণা, মাইকযোগে নেপথ্য ভাষণ ও শব্দসৃষ্টি এবং সবশেষে বৈচিত্র্যময় আলোক-সম্পাত প্রভৃতির সহায়তায় নাট্য প্রযোজনার মধ্যে একটি সমগ্রতা বা সর্বাঙ্গীনতার রূপ ফুটিয়ে তোলবার দিকে বর্তমান নাট্য সম্প্রদায়-গুলির এই যে সজাগ দৃষ্টি, তা আগেকার যুগে একেবারেই অবজ্ঞাত, এমনকি অজ্ঞাত ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এরই সঙ্গে আধুনিক নাট্য-সম্প্রদায়গুলি আরও একটি কাজ করে থাকেন, যা আগেকার যুগের সৌখীন নাটুকে দলগুলির কল্পনার অতীত ছিল। সে-যুগে সৌখীন অভিনয় দেখতে গিয়ে হামেশাই যা দেখতে পেতুম, তা' হচ্ছে সাধারণ নাট্যশালায় বহু অভিনীত সুখ্যাত জনপ্রিয় নাটক-গুলির সগৌরবে পুনরভিনয় বা চর্বিত-চর্বণ। সেই সুপরিচিত 'প্রফুল্ল'.

সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'কঠিন মায়া' চিত্রের একটি আবেগমধুর দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ

'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'প্রতাপাদিত্য', 'জনা' বা 'বিল্বমঙ্গলে'র সাধারণ মঞ্চের ধারানুযায়ী অভিনয় চেষ্টা। এমনকি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয়ের পীঠস্থান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটেও ঐ একই ব্যবস্থা। কাউকে দিয়ে নতুন করে নাটক লিখিয়ে তাকে পাদপ্রদীপের সামনে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা তখনকার দিনে বাতুলতারই নামান্তর ছিল। এর একমাত্র মাননীয় ব্যতিক্রম ছিল—ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়। রবীন্দ্রনাথের রচনাকে ঘিরে সেখানকার প্রতিটি অভিনয় মঞ্চোপস্থাপন, সাজ-সজ্জা, আঙ্গিক, সাঙ্কেতিক রূপারোপ, [illegible] পরিবেশন প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই নাট্য প্রযোজ[illegible]ক্ষেত্রে কবির নব নব স্বাক্ষর [illegible]।

নতুন নাট[illegible] লিখিয়ে অভিনয় করা আধুনিক নাট্য-সম্প্রদায়গুলির এক[illegible] বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে [illegible] গেছে এবং এ-ক[illegible] বললে সম্ভবতঃ [illegible] হবে না যে, বর্তমা[illegible] নাট্য-আন্দোলন[illegible] হয়েছে ভারতী[illegible] গণনাট্য সঙ্ঘের বহু প্রশংসিত "নবান্ন" নাটক এবং তার অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় থেকে। পশ্চাদপট হিসেবে চট টাঙিয়ে কণ্ঠ ও যন্ত্রোদ্ভূত শব্দ এবং বাস্তবানুগ রূপসজ্জার আঙ্গিকে মোড়া "নবান্ন"-এর নাটকাভিনয় দর্শক-সমাজে যে-বিস্ময় ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তা অবিস্মরণীয়। এমনকি, "নবান্নে"র ভিতর যতই নাটকীয় মুহূর্ত থাকুক না কেন, সমগ্রতার বিচারে "নবান্ন" যে রচনা হিসেবে একটি উচ্চাঙ্গের নাটকই হয়ে উঠতে পারেনি, আবেগময় অভিনয়ের তীব্র ঔজ্জ্বল্য সেই বিচারের চোখকে ক্ষণকালের জন্যে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল।

নতুন নতুন নাটক লেখার প্রচেষ্টাকে বিদ্বজ্জন মাত্রই প্রশংসার চোখে দেখবেন। কারণ, এতো জানা কথা, চেষ্টা থেকেই সিদ্ধি আসে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সেই সিদ্ধি আমাদের নব-নাট্যকারদের আজও করতলগত হয়নি। "নবান্ন" থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত নাটক নামে অভিহিত বহু রচনারই সাক্ষাত পেয়েছি, কিন্তু এদের মধ্যে কোনও একটিকেও রসোত্তীর্ণ সার্থক নাটক হিসেবে অভিনন্দিত করতে পারিনি। কেবলই মনে হয়েছে, আজকের নাট্য-যশপ্রার্থীরা নাটক রচনার মূল সূত্র সম্বন্ধেই সবিশেষ অবহিত নন। দুই বিপরীত-ধর্মী চরিত্রের মধ্যে গুরুতর সংঘাত দেখাতে না পারলে নাটক হয় না, এই মোদ্দা কথাটা তাঁরা মনেই রাখেন না। তাই দেখি, রচনার মধ্যে কয়েকটি চমক বা সামান্য নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেই তাঁরা বাজীমাৎ করেছেন বলে আত্ম-তুষ্টি লাভ করেন। পাত্র-পাত্রীদের দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করবার পর নাটককে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের সাহায্যে ছোট ছোট ক্লাইম্যাক্সের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে কেমন করে দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে চরম সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, সেই বিশেষ শৈলী বা আর্টটি যেন তথাকথিত আধুনিক নাট্যরচয়িত'-দের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। কোথায় কেমন করে একটি দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটাতে হয়, দর্শক মনকে ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে কতখানি উদ্গ্রীব করে তুলে একটি অঙ্কের ওপর যবনিকা পাতন করতে হয়, নাটকীয় পরিস্থিতিকে কতখানি ঘোরালো ক'রে তুললে দর্শক-চিত্তে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি করা সম্ভব, এ সব তথ্য সম্বন্ধে আধুনিক নাট্যরচয়িতারা একেবারেই উদাসীন কিংবা অজ্ঞ। তাই দেখি, যেমন তেমন-ভাবে যেখানে সেখানে দৃশ্য শেষ হয়ে যাচ্ছে, দর্শকমনে এতটুকুও উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি না ক'রেই অঙ্কের শেষে যবনিকা নেমে আসছে, একটি দৃশ্যের

'কাঞ্চনমূল্য' চিত্রে বাসবী নন্দী

পর আর একটি দৃশ্য কেন আসছে এবং তার পরের দৃশ্যটি নাটকের মধ্যে একেবারেই না এলে কিই বা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত, তা আদৌ বোঝবার চেষ্টা নেই। আজ প্রায় প্রতিটি নাট্য-প্রযোজনা যেমন তার সর্বাঙ্গসুন্দরতার জন্যে দর্শকচিত্তকে নিয়ত প্রশংসামুখর করে তোলে, ঠিক তেমনই যে বস্তুকে অবলম্বন করে এই নাট্যপ্রচেষ্টা, সেই নাট্যরচনাসমূহের ব্যর্থতা তাকে বারংবার পীড়িত করে।

তবুও বলব, নাটক লেখা নিয়ে আজকের দিনে যে প্রবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তা আজই হোক বা কালই হোক, একদিন না একদিন সুফল-প্রসু হবেই। অন্ততঃ 'মহেঞ্জোদড়ো', 'দৈনন্দিন', 'দাও ফিরে সে অরণ্য', 'বুদ্বুদ', 'বারো ঘণ্টা' বা 'একপশলা বৃষ্টি' প্রভৃতি সার্থক একাঙ্কিকার অভিনয় দেখে এই আশাই মনে জাগছে। এবং সেই কারণেই বর্তমানের নাট্য-আন্দোলনকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না।

চিত্র সংবাদ ঃ

বি, এন, রায় প্রোডাকসন্সের নবতম চিত্র নিবেদন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে গঠিত "ঝিন্দের বন্দী" গেল কাল ৮ই জুন থেকে দেখানো হচ্ছে—মিনার, বিজলী এবং ছবিঘরে। তপন সিংহ পরিচালিত এই বিরাট চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা রায়, তরুণকুমার, দিলীপ রায় প্রভৃতি চিত্রজগতের নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী। সংগীত পরিচালনা করেছেন আলী আকবর খান। আশা করা অন্যায় হবে না, ছবিটি জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হবে।

খবর নিয়ে জানা গেল যে, অন্ততঃ দশ-বারোখানি বাঙলা ছবি মুক্তি প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। এদের মধ্যে কেউ বা আসছেন একটু আগে, কেউবা কিছু পরে ঃ—(১) বিশ্বভারতী চিত্রমন্দিরের প্রথম প্রয়াস, রাসবিহারী লাল রচিত কাহিনী অবলম্বনে গঠিত "প্রস্তুতিলুক"। পরিচালনা করেছেন মঙ্গল চক্রবর্তী; সুরারোপে অ[illegible] সুধীর দাশগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, তরুণ [illegible] [illegible]য়া দেবী, সবিতা বসু, অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতি। (২) আর, ডি, বনশালের পরব[illegible] নিবেদন "কাঞ্চন-মূল্য"। বিভূতি [illegible]পাধ্যায় রচিত কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন [illegible]পেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে নির্মল মিত্র ও নির্মল চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, গীতা দে ও বাসবী নন্দী। (৩) চলচ্চিত্রালয়ের "আজ কাল পরশু"। ছবিখানির কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন নির্মল সর্বজ্ঞ। সুরকার হচ্ছেন অপরেশ লাহিড়ী। এর শ্রেষ্ঠাংশে রয়েছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার ও মাধবী। এ ছবিটি শীঘ্রই রূপবাণী, ভারতী ও অরুণায় মুক্তি পাবে বলে ঘোষিত হয়েছে। (৪) ডি-এম-এন প্রোডাকসন্সের "নেকলেশ"। ছবিটির পরিচালনা করেছেন দিলীপ নাগ। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন উত্তম-কুমার ও রুমা গুহঠাকুরতা (গাঙ্গুলী)। ছবিটি রাধা ও পূর্ণর পরবর্তী আকর্ষণ বলে শোনা যাচ্ছে। (৫) জাওয়ালা প্রোডাকসন্সের "সন্ধ্যারাগ"। পরিচালনা করেছেন জীবন গঙ্গোপাধ্যায়। মুখ্য ভূমিকায় আছেন নির্মলকুমার এবং একটি নূতন মেয়ে। (৬) ফিল্ম ক্র্যাফ্ট-এর "বেনারসী"। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতা (গাঙ্গুলী) এবং পরিচালনা করেছেন অরূপ গুহঠাকুরতা। (৭) রেনেশাঁশ ফিল্মসের "ঢেউয়ের পরে ঢেউ"এ অভিনয় করেছেন নূতন অভি-

নেতা-অভিনেত্রীরা। (৮) এস-কে-এস ফিল্মসের "শিলালিপি"। পরিচালনা করেছেন সুধীর হাজরা। প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়। (৯) মৃণাল সেন প্রোডাকসন্সের "পুনশ্চ"। পরিচালক মৃণাল সেনের এই ছবিটিতে অভিনয় করেছেন কণিকা মজুমদার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক বিশ্বনাথন প্রভৃতি। (১০) আলোছায়া প্রোডাকসন্সের নবতম চিত্র, তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে গঠিত "সপ্তপদী"। [illegible]রিচালনা করেছেন অজয় কর এবং প্রধান ভূমিকায় [illegible] বাঙলা দেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় জুটি—উত্তমকুমার ও সুচি[illegible] সেন। (১২) সুশীল মজুমদার প[illegible]ত "কঠিন মায়া"। [illegible] ভূমিক[illegible] আছেন বিশ্বজিৎ ও [illegible] রায়। ([illegible]২) তারু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলা "ইঙ্গিত"। ছবিটির বিশেষত্ব এই [illegible]বে, সবাক যুগে তোলা হলেও এটিতে [illegible]-পাত্রীরা কেউই কথা কয়নি।
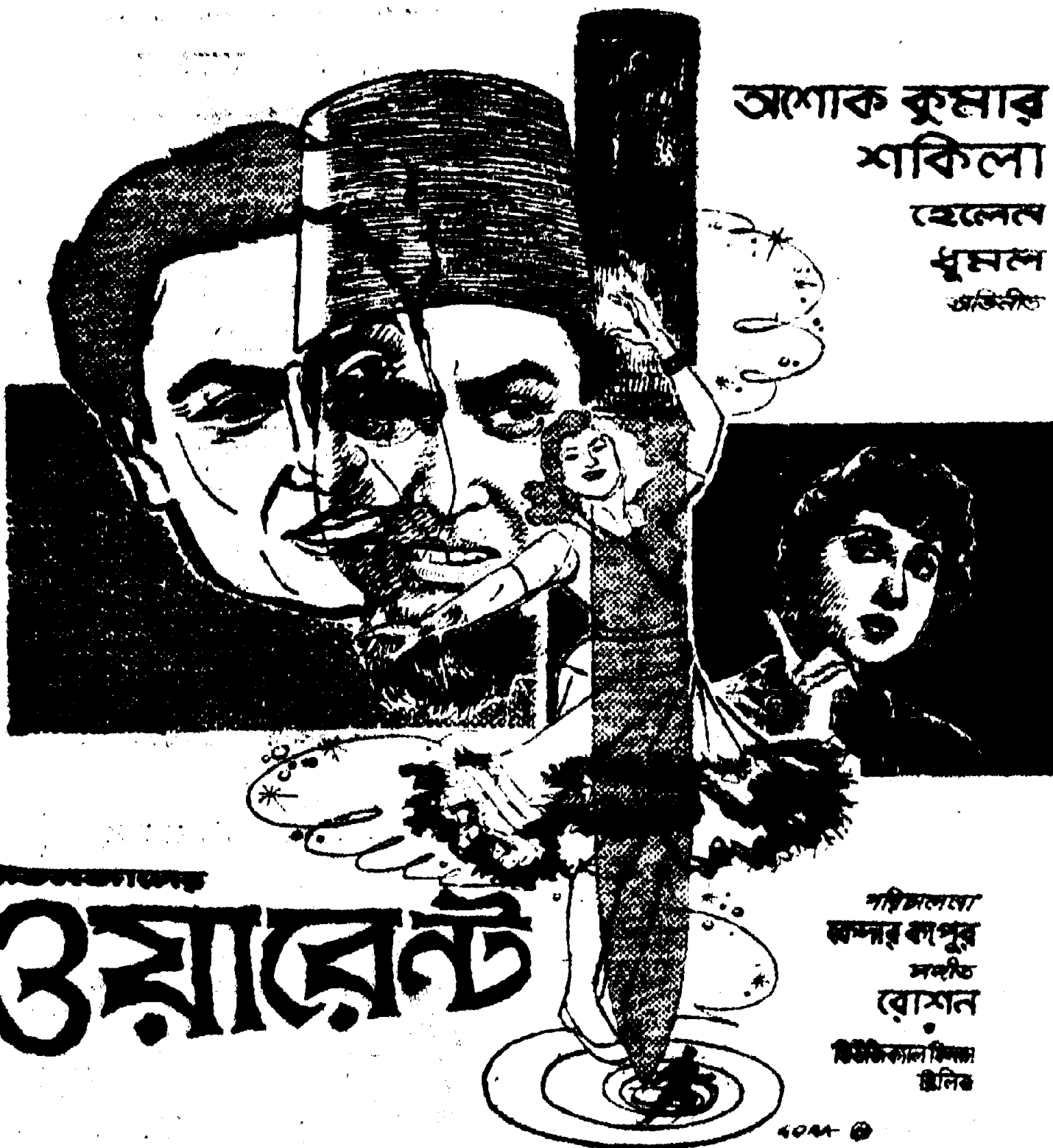
বাঙলা দেশে নির্মীয়মান ছবিগুলির মধ্যে যে নামগুলি কানে এসেছে, এইবার তাদের তালিকা দিচ্ছি: (১) অগ্রদূত পরিচালিত উত্তরায়ণ (উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া) ও (২) বিপাশা (উত্তম ও সুচিত্রা), (৩) অগ্রগামী পরিচালিত কান্না ও (৪) নিশীথে, (৫) সুধীর মুখোপাধ্যায়ের দুই ভাই (উত্তম ও বিশ্বজিৎ)

'আজ কাল পরশু' চিত্রে মাধবী, বুলবুল এবং অনুপকুমার

(৬) যাত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত চিত্রযুগের [illegible]র স্বর্গ (দিলীপ মুখোঃ, মঞ্জু দে ও [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়), (৭) ফিল্ম এজ-[illegible]র কুমারী মন। ভূমিকায় আছেন কণিকা মজুমদার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়। একটি কলাকুশলী গোষ্ঠী এর পরিচালনা ভার নিয়েছেন। (৮) চিত্রশোভনার শাস্তি। পরিচালনা করেছেন দয়াভাই। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতিকে। এস-কে-জি প্রোডাকসন্সের নবতম নিবেদন অনুরূপা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে "মা"—চিত্ত বসুর পরিচালনায় তোলা হচ্ছে। (১০) অসীম পালের পরিচালনায় পরিচয় (১১) পশ্চিমবঙ্গ শিশু চিত্র প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ শিশু চিত্র ডাকাতের হাতে—পরিচালনা করেছেন শান্তি চৌধুরী। (১২) মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায় ন্যায়দণ্ড। (১৩) গৌর শীর পরিচালনায় "ভেবো না, শুনতে পাবে"। (১৪) জরাসন্ধের কাহিনী অবলম্বনে সরকার প্রোডাকসন্সের নূতন চিত্র; পরি-

[illegible]-প্রতীক্ষিত '[illegible]' চিত্রে [illegible]

চালনা করেছেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। (১৫) দিল্লী থেকে কলকাতা। (১৬) দশচক্র। (১৭) কালচক্র। (১৮) অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত আহ্বান। (১৯) সুনীল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত কাজল। (সুপ্রিয়া ও অসীমকুমার)। (২০) মনোজ ভট্টাচার্যের ডাইনী। (২১) টাস-ফিল্ম-ইউনিটের কানা মাছি। (২২) বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের চেনা মুখ (সুপ্রিয়া ও প্রবীরকুমার)। (২৩) এল-বি ফিল্মসের চিত্র প্রমোদ লাহিড়ী পরিচালিত নফর সংকীর্তন। (২৪) আশিষ-কুমার, সন্ধ্যা রায়, তন্দ্রা বর্মণ অভিনীত ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত রতনলাল বাঙ্গালী। (২৫) কাশ্মীরের পটভূমিকায় তোলা উমা মৈত্র পরিচালিত মনে মনে। (২৬) কনক প্রোডাকসন্সের আশায় বাঁধিনু ঘর (বিশ্বজিৎ ও রঞ্জনা)। (২৭ রমাপদ চক্রবর্তীর তৃষ্ণা। (২৮) মাধবী চিত্রম-এর একলা চলরে।

বিবিধ সংবাদ :

চিত্রামোদীদের কাছে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির নাম অপরিচিত থাকবার কথা নয়। এক যুগেরও বেশী দিন ধরে এই সংস্থাটি সাধারণতঃ যেসব শিল্পকর্ম হিসেবে সুখ্যাত বিদেশী ছবি কলকাতার চিত্রগৃহগুলিতে দেখানো হয় না, সেই সব ছবির প্রদর্শন ব্যবস্থা করে গুণীজনের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। এঁদের দ্বারা একদা প্রকাশিত 'ফিল্ম বুলেটিন'গুলির কথা আজও সপ্রশংস চিত্তে স্মরণ করি। এঁরা সম্প্রতি অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে জগদ্বরেণ্য চিত্র পরিচালক আইসেনস্টিনের পাঁচখানি ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন, ছবি পাঁচখানির নাম—ব্যাটলশিপ পোটেমকিন, দি জেনারেল লাইন, টাইম ইন দি সান (কিউ ভিভা মেক্সিকো ছবির জন্যে তোলা দৃশ্যাবলীর কিছু অংশ থেকে মেরী সিটন দ্বারা চিত্রাকারে গ্রথিত) আলেকজাণ্ডার নেভস্কি এবং আইভান দি টেরিবল্ (১ম অংশ)। ২৭-এ মে সোভিয়েত কনসাল এস. আই. রোগভ কর্তৃক প্রদর্শনীটির উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধনী সভায় এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানে মেরী সিটন আইসেনস্টিনের সৃজনী-প্রতিভার বিশ্লেষণ করে যে বক্তৃতা দেন, তা তাঁর চিত্রগুলি বেশী করে উপভোগ করবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে।

*

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্যে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের "তিন কন্যা" আমন্ত্রিত হয়েছে বলে জানা গেল। শ্রীরায় এই উপলক্ষে তাঁর ছবি তিনটিকে আর একবার সম্পাদনা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

*

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম বিচারক হিসেবে কাজ করবার জন্যে যে আমন্ত্রণ পেয়েছেন, শ্রীসত্যজিৎ রায় তা সাদরে গ্রহণ করেছেন। ২২এ জুন থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত এই উৎসব চলবে।

দক্ষিণ কলিকাতার নাট্য সম্প্রদায় "অনীক" গেল ২রা জুন অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস গৃহে হেনরিক ইবসেনের ওয়াইল্ড ডাক অবলম্বনে রচিত "বুনো হাঁস"-এর অভিনয় করেন।

*

বিখ্যাত চিত্র পরিবেশক রাজশ্রী পিকচার্সের কর্ণধার তারাচাঁদ বরজাতিয়া বাঙলা ছবির প্রযোজনা সুরু করবেন বলে মনস্থ করেছেন। "মধ্যরাতের তারা"র আর্থিক সাফল্যই তাঁকে এই কাজে উৎসাহিত করেছে।

রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের নির্মীয়মান হিন্দী ছবি "আরতি" [illegible] দারের পরিচালনায় পুরো দমে চলেছে।

পঞ্চাশ সপ্তাহে বিভিন্ন [illegible] দ্বারা পঞ্চাশটি নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

সিনেমা

রূপবাণী—তিন কন্যা
ভারতী—তিন কন্যা
অরুণা—তিন কন্যা
মিনার—ঝিন্দের বন্দী
বিজলী—ঝিন্দের বন্দী
ছবিঘর—ঝিন্দের বন্দী
রাধা—স্বয়ম্বরা
পূর্ণ—স্বয়ম্বরা
প্রাচী—স্বয়ম্বরা
উত্তরা—অগ্নিসংস্কার
পূরবী—অগ্নিসংস্কার
উজ্জলা—অগ্নিসংস্কার
আকাদমি অফ ফাইন আর্টস—তথ্যচিত্র (সুইট গোল্ড, অপারেসান খেদা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পতনজালের '[illegible]' চিত্রে শাকিলা।

[illegible] বার্ষিকী [illegible] নাট্যোৎসব" সুরু হয়েছে গেল [illegible] জুন থেকে।

উৎসবের উদ্বোধন করলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। উদ্বোধনের আগে গেল বছরের প্রতিযোগীদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, তাঁদের পুরস্কার বিতরণ করে সম্মানিত করা হয়। যে অভিনয়ের দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়, তা হচ্ছে অচলায়তন সম্প্রদায়ের "কুলীন কুল সর্বস্ব"। রাম নারায়ণ তর্করত্নের লেখা, এই শতাধিক বর্ষের পুরোণো নাটকটিকে যথাসম্ভব যুগোপযোগী ও রুচিসম্মত করে আজকের দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। কিন্তু বলতে আনন্দ পাচ্ছি যে, শ্রীসুধী প্রধান অসামান্য মুন্সিয়ানার সঙ্গে এই নাটকের প্রযোজনা ও সম্পাদনার কাজ করেছেন। এ ছাড়াও যেটা কৃতিত্বের কথা সেটা হচ্ছে, এই নাটকের উপস্থাপনে ১৯টি অভিনেতা এবং ১৭টি অভিনেত্রীর একত্র সমাবেশ করা—এ যে কি অসম্ভব দুরূহ কাজ তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

*

'ওয়ারেন্ট' চিত্র-মুক্তি

কেদার কাপুর পরিচালিত 'ওয়ারেণ্ট' ছবিটি আজ (৯ই জুন) থেকে নিউ সিনেমা, প্রভাত, চিত্রা, রূপালী প্রভৃতি কলিকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে। সংগীত পরিচালনা করেছেন রেশন। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন—অশোককুমার, শাকিলা এবং হেলেন।

বহুরূপী

আগামী ১১ই জুন রবিবার সকাল দশটায় বহুরূপী কর্তৃক নিউ এম্পায়ার রঙ্গ-মঞ্চে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'কাঞ্চন-রঙ্গ' অভিনীত হবে। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, আরতি মৈত্র, শান্তি দাস, লতিকা বসু, সমীর চক্রবর্তী, শোভেন মজুমদার ও বনানী ভট্টাচার্য।

রক্সি, কৃষ্ণা, রূপালী, চিত্রা—নজরানা (হিন্দী)

অপেরা, ক্রাউন, নাজ—মদন মঞ্জরী (হিন্দী)

জনতা, প্রিয়া, পূর্ণশ্রী—মেমদিদি (হিন্দী)

জ্যোতি—ক্রোড়পতি (হিন্দী)

হিন্দ, গণেশ, খান্না—শশুরাল (হিন্দী)

শ্রী, ইন্দিরা, লোটাস—স্বরলিপি

প্যারাডাইস—জিস্ দেশমে গঙ্গা বৈহতি হ্যায়

বসুশ্রী বীণা—মেঘ

সোসাইটি—মুঘল-ই-আজম

লাইট হাউস—Samson & Delilah

গ্লোব—Come Dance With Me

মেট্রো—Ben Hur

মিনার্ভা—A Summer Place

এলিট—Flaming Star

টাইগার—Lil Abner

নিউ এম্পায়ার—দি রাট রেস

নিউ সিনেমা, প্রভাত, চিত্রা, রূপালী, পার্ক শো, প্যারামাউণ্টে—'ওয়ারেণ্ট'

ওরিয়েণ্ট, ম্যাজিষ্টিক, গ্রেস দর্পণা, কালিকা, মেনকা, ছায়া—আশকা পঞ্ছী (হিন্দী)

সুরশ্রী—শুন বরনারী

থিয়েটার

ষ্টার—শ্রেয়সী

রঙমহল—অনর্থ

মিনার্ভা—ফেরারী ফৌজ

বিশ্বরূপা—সেতু

গিরিশ নাট্যোৎসব শনিবার ১লা জুন হতে আরম্ভ

থিয়েটার সেন্টার—রজনীগন্ধা

বিবিধ

আকাদমি অব ফাইন আর্টস—রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী

দর্শকের মজা—খেলোয়াড়ের অভিশাপ
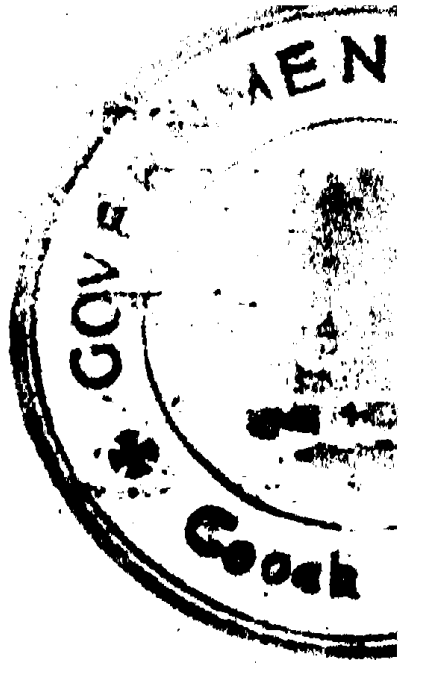
ভ্রাম্যমাণ

গত বছরের জুন [illegible] নিউইয়র্কে বিশ্ব-হেভিওয়েট [illegible] মুষ্টিযুদ্ধের দৃশ্য আমরা কোলকাতাতেও প্রত্যক্ষ করেছি ফিল্ম মারফৎ: ইনজেমার জোহান্সন, বিশ্ব খেতাবের অধিকারী হিসাবে শেষ কয়েকটি সেকেন্ড রিঙের মধ্যে চীৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। মুখ [illegible] রক্ত নামছে, আম্পায়ার এক, দুই, তিন গুণতে গুণতে তাঁকে বিশ্বখেতাব থেকে বঞ্চিত করার দিকে এগিয়ে চলেছে, যন্ত্রণায় মুচড়ে যাচ্ছে জোহান্সনের পায়ের পাতা। দূরত্ব বজায় রেখে তার প্রতিপক্ষ ফ্লয়েড প্যাটার্সন, ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায়।

প্যাটার্সনের বাঁ হাতের ঘুঁষিতে কাঠের মত শক্ত হয়ে দড়াম করে জোহান্সন পড়ে যায়।

যন্ত্রণার আক্ষেপ ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড পর্যন্ত থাকে। এবার আট মিনিট সে নিশ্চল হয়ে থাকে। রিঙের কোণে টুলের উপর তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়, আরো আট মিনিট ধরে থাকে তার এই নিশ্চলতা। শুধু মাথাটি ঘন ঘন এধার ওধার নড়ে আর জনতার উপর শূন্য, নির্বাক দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ড্রেসিং রুমে আধ ঘন্টা পরে সে বলতে পারে তার নাম জোহান্সন, বাড়ি সুইডেনের গোটেবার্গে।

হাজার হাজার দর্শকের কাছে এ লড়াই অতীব উপভোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারদের কাছে জোহান্সনের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যন্ত্রণার আক্ষেপ মস্তিষ্কে চোট লাগারই এক প্রকৃষ্ট লক্ষণ বলে তাঁরা মনে করেছেন।

কেউ জানে না সেই রাতে জোহান্সন মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছিল কিম্বা চিরকালের মত অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছিল, যদি সেই লড়াইয়ে সে মরা যেত তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

এই লড়াইয়ের এগারো দিন আগেই [illegible] বছরের টীম পাচেকো, বেনি গর্ডনের [illegible] লড়তে গিয়ে নিউইয়র্কে মারা যায়। [illegible] সে পেত দেড় হাজার টাকা। শব [illegible]চ্ছেদ করেছিলেন নিউইয়র্ক সিটির [illegible]ফ মেডিক্যাল এগজামিনার ডাঃ হেল-পার্স। তাঁর মতে, মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়ে পাচেকোর মৃত্যু ঘটেছে। যদিও চিকিৎসার কোন কসুর ছিল না।

সাম্প্রতিককালে মৃতদের মধ্যে পাচেকো ছাড়াও অনেকে রয়েছে। ১৯৫৯ সালে মেক্সিকোয় আট রাউন্ড লড়াইয়ের পর পালোমারেস নামে এক মুষ্টিক মারা যায়। ১৯৬০-এর এপ্রিলে মারা যায় উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস মোর। ওই মাসেই ওই একই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিকি গলুবিফ লড়াই করতে গিয়ে মারা যায়। রিঙের মধ্যে এ ধরণের ট্রাজেডী ইতোপূর্বে ঘটেনি বললেই চলে, কিন্তু এখন যেন অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লড়াই করতে করতে মারা গেলে ব্যাপারটা নিয়ে তোলপাড় হয়, কিন্তু লড়াইয়ের পর দুর্ঘটনা ঘটলে তা অন্তরালেই থেকে যায়। একদা হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন এজার্ড চার্লস, স্যাম বারোদিকে নক আউট করে। পর দিন বারোদি মারা যায়। বব ফিজিমনস-এর সঙ্গে লড়াইয়ের পর দুজন মারা গেছে। ফ্র্যাঙ্ক ক্যাম্পবেল মারা যায় ম্যাক্স বেয়ারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর। সুগার রে রবিনসনের সঙ্গে লড়াইয়ের পরদিন মারা যায় জিমি ডয়েল।

নক আউট ব্যাপারটা কি? চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক থেকে ডাঃ আর্ণষ্ট জোকল তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন: মস্তিষ্কের সব থেকে অনুভূতিবেদ্য অংশ সাবট্যানু-সিয়া রেটিকুলারিসে প্রচণ্ড আঘাত পেলে যে আলোড়ন হয়, নক আউট তারই ফল। মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মস্তিষ্কের টিসুগুলিতে রক্তক্ষরণ ঘটে-ছিল।

মৃত্যুর থেকেও যন্ত্রণাকর অথচ নৈমিত্তিক হল পংগুত্ব। ঘুঁসি খাওয়ার ফলে দৈহিক এবং মানসিক পংগুত্বের জন্য বহু মুষ্টিকই আজ পারিবারিক এবং সমাজ জীবনের বোঝা হয়ে রয়েছে। মুষ্টি-যুদ্ধের এই সব শিকারদের কাহিনী অত্যন্ত দুঃখদায়ক।

কারমাইন ভিংগোর মত অনেকেই আছে, যে বারো বছর আগে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নের খেতাবের জন্য রকি মার্সিয়ানোর সংগে লড়েছিল। লড়ার কারণ হল অর্থ। ভিংগো খেতাব চায়নি, চেয়েছিল সাজানো গোছানো একটি সংসার আর যে মেয়েটিকে সে ভালবাসে তার স্বামী হতে।

কারমাইন যেদিন কুড়ি বছরে পড়ল তার পরদিনই এই লড়াই হয়। কিটিরিয়া তার বাড়িতে অপেক্ষা করছে হবু স্বামীর জন্য। জন্মদিনের কেক সাজিয়ে রেখেছে টেবলে। ছুটতে ছুটতে এল ভিংগোর ভাই। জানাল, কারমাইন আসতে পারবে না। এখন সে হাসপাতালে। মার্সিয়ানো তাকে মারাত্মক জখম করেছে।

কিটি ছুটে এল হাসপাতালে। মার্সিয়ানোর ঘুঁষিতে তার মস্তিষ্কে প্রবল রক্তক্ষরণ ঘটেছে। ফলে দেহের পুরো বাঁ দিকটাই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে, একটা চোখ দৃষ্টি ক্ষমতা হারিয়েছে।

এই পঙ্গুকেই বিটি বিয়ে করেছে। কারমাইন এখন হাঁটতে পারে তবে আড়ষ্টভাবে। বাঁ চোখে দেখতে পায় না। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। পঙ্গু স্বামীকে ভরণ-পোষণের জন্য বিটি এখন কারখানা-কর্মী।

মৃত্যু বা পঙ্গুত্ব ছাড়াও আছে আর এক অভিশাপ, অন্ধত্ব। তিনবার চ্যাম্পিয়ন হেনরী আর্মস্ট্রং, লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ন জিমি কার্টার, ভূতপূর্ব চ্যাম্পিয়ন স্পিডি ডাডো, ভিন্স ডান্ডি, জিন হেয়ারস্টন, ফ্র্যাঙ্ক জেনারো প্রভৃতি পুরো বা আংশিক অন্ধত্বের হাত এড়াতে পারেনি।

কয়েক বৎসর আগে ডাঃ জোকল ১৮৫ জন মুষ্টিককে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফলে তিনি দেখতে পান যে দীর্ঘ মেয়াদী জখমের ফলে, দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি, শারীরিক অক্ষমতা, মাথার যন্ত্রণা, নার্ভ ব্যবস্থার ওলটপালট ইত্যাদি রহিত হয় বা ঘটে। মনোবিকলনের নানান লক্ষণ দেখা দেয় যেমন, নির্বুদ্ধিতা, হতাশা, মারমুখীতা ইত্যাদি। তাঁর মতে ভাগ্য-জোরে মাত্র কয়েকজন মুষ্টিকই মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতির হাত এড়াতে পেরেছে। অধিকাংশই দুর্ভাগ্য, মুষ্টিকের বরাতে মস্তিষ্কের মলিনতা অবশ্যম্ভাবী। মস্তিষ্কের জখম কখনো সারে না।

অথচ এই সব জখমী মুষ্টিকদের লড়তে দেওয়া হয়। এর কারণ, ডাক্তারী পরীক্ষায় গাফিলতী, অন্য কারণ না লড়লে মুষ্টিক খেতে পাবে না। এইটাই তার জীবিকা। দৃষ্টিহীনতার জন্য রুডেল স্টীচকে ইলিনয়েসে লড়তে দেওয়া হয়নি। কিন্তু কেন্টাকিতে সে লড়াইয়ে অনুমতি পায়; মস্তিষ্কের আঘাতের জন্য হারিকেন জ্যাকসনের লড়াই নিউইয়র্কে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অন্য রাজ্যে গিয়ে সে লড়াই করেছে। এছাড়া লড়াইয়ের উদ্যোক্তারা সব সময় এমন লোককেই চায় যে ঘুসির পর ঘুসি হজম করে দর্শকদের আনন্দ যোগাতে পারে। টেলিভিশনের কল্যাণে ঘরে বসেই লড়াই দেখে তৃপ্ত হচ্ছে অগণিত দর্শক।

দর্শকদের এই রক্ত-তৃষা মেটাতে উদ্যোক্তারা একের পর এক মুষ্টিককে রিঙে তুলে দিয়ে পয়সা রোজগার করছে। অভাবী মুষ্টিক জেনে-শুনেও বধ্যভূমিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাচ্ছে। তারা জানে জেতার আশা নেই তবু প্রাণ ধারণের তাগিদে তারা প্রাণটাই বাজী ধরছে। জলি কর্কফিল্ড হেরেছে ৫৪ বার, জিতেছে দুবার। স্যাম শামওয়ে ৬৬ মাসে লড়েছে ৭৯ বার, ৪৩ বার নক-আউট হয়েছে। অস্কার পিয়ের ২৭ বার নক-আউট হয়েছে। জনি পারভিয়া ৪৩টি লড়ায়ে ৩০ বার নক আউট হয়েছে। ন্যাট হাইন্স ২৩টি লড়ায়ে একবার জিতেছে, ১০ বার নক-আউট হয়েছে। শেষ নক-আউটের তিনদিন পরেই সে মারা যায়।

মরণ-বাঁচার এই খেলায় যারা প্রতিযোগী তাঁরা আমাদের কাছে বীরতুল্য আবার অভিশপ্তও। জিতলে প্রচুর অর্থ পান কিন্তু সুস্থ দেহে তা ভোগ করতে পারেন না। সুখী এবং লাভবান একমাত্র তারাই যারা এর উদ্যোক্তা এবং দর্শক। এদের কোন্ বিশেষণে অভিহিত করা যায়?

* * *
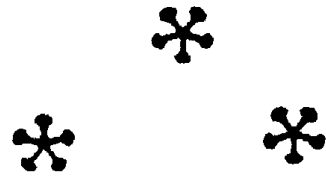
মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু

ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে অনেকেই দুটি মহান ঐতিহ্যের মাঝে লালিত হয়েছি—বলা যায় আমাদের এই ভারত-ভূমি গড়ে উঠেছে দুই মহামানব ঃ ঐতিহ্যের মূর্তবিগ্রহ মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায়। এঁরা বর্তমান ভারতের স্রষ্টা ও রূপকার। এঁদের মধ্যে থেকেই আজকের ভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে।

আমরা এই দুজনার মানস সন্তান—আমরা অত্যন্ত অবোধ, আমাদের অসম্পূর্ণতা বহুবিধ; তথাপি আমরা তাঁদের আত্মজ।

উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতভূমি থেকেই তাঁদের দুজনার আবির্ভাব ঘটেছে—দশ হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে রয়েছে উভয়েরই ঘনিষ্ট যোগ। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বৈষম্য তবু তাঁরা ভারতের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্মরণে এনে দেন।

তাঁরা উভয়েই আশ্চর্যভাবে ভারতীয় —উভয়ের মধ্যে অগাধ অনৈক্যের মধ্যে রয়েছে প্রগাঢ় ঐক্য ও মিল।

নবভারতের আদর্শবাদের তাঁরা মূর্ত বিগ্রহ—এই আদর্শবাদ আমার যৌবন দিনের স্বপ্ন এবং সম্ভবতঃ আজও সে স্বপ্ন বহু মানুষের অন্তরে জাগ্রত হয়ে আছে।

মনে হচ্ছে আজ যেন তাঁরা দূর নীহারিকার মানুষ। তাঁদের দুজনের নাম যদিও আমরা অহরহ করি, তবু আমাদের চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতি গেছে বদল হয়ে এবং আমরা গ্রহণ করেছি এক ভিন্নতর আদর্শ।

এই আধুনিক যুগেও আপন আপন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়ে এই দুই মহামানব মূর্ত করে তুলেছিলেন যে আশা-আশ্বাস ও সৃজনমুখী সক্রিয়তার মহান আত্মার—তার পরিবর্তে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষও বঞ্চনা আর বিনাশের ভাবকে অধিকতর প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছে।

আর সেজন্যেই আমার এই ভয় জন্মেছে ঃ আমাদের সামর্থের বাইরে অপ্রতিরোধ্য কোন-কিছুর ভয়াল বন্যায় আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে উদ্যত হয়েছে?

তাই যদি হয়, তাহলে গজদন্ত মিনারের মধ্যে বসে করণীয় কাজের সম্পর্কশূন্য সৎ কাজ করার চেয়ে 'সেই কিছুকে' প্রতিরোধ করা অথবা দমন করার চেষ্টা কি অভিপ্রেত নয়?

['ভয় হতে মুক্তি' থেকে]

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড সফররত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

ইংল্যান্ড সফররত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল সফরের নবম খেলায় এম সি সি-কে ৬৩ রাণে পরাজিত [illegible]ছে। এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া নয়টি খেলেছে, [illegible] চারটি খেলায়; বাকী ৫টি খেলা বৃষ্টিপাতের দরু[illegible] পরিত্যক্ত অথবা ড্র গেছে।

[illegible] এম সি [illegible] বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার এই জয়[illegible]ড [illegible] বড় কথা নয়। সব থেকে বড় ক[illegible] অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচী বেনো [illegible]থা দিয়ে কথা রেখেছেন। এই ইংল্যান্ড[illegible]রের অনেক আগে বেনো ঘোষণা [illegible]লেন ক্রিকেট খেলার জৌলুসে যে মালিন্য দেখা দিয়েছে এবং নিষ্প্রাণ ক্রিকেট খেলার দরুণ দর্শক সাধারণের মধ্যে ক্রিকেট খেলার উপর যে বিতৃষ্ণার ভাব দেখা দিয়েছে তার প্রতিকার হিসাবে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তিনি তাঁর এই উক্তির আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এম সি সি'র বিপক্ষে খেলার শেষের দিনে খেলা ভাঙ্গার চার ঘণ্টা আগে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে তিনি বিপক্ষ দলের প্রতি যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ক্রিকেট খেলাকে আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে অধিনায়ক বেনো দলের দুজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের যথেষ্ট সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় যে সময়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়, তখন অস্ট্রেলিয়ার রান উঠেছিল ১৮৬, কোন উইকেট না পড়ে; লরী ৮৪ এবং ববি সিম্পসন ৯২ রান করে নট আউট ছিলেন। সিম্পসন আর মাত্র ৮টা রান করলে আলোচ্য সফরে তাঁর নিজস্ব প্রথম সেঞ্চুরী রান করতেন; অপরদিকে লরী সেঞ্চুরী রান করলে লর্ডস মাঠে একই খেলায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী রান করার গৌরব লাভ করতেন। সেঞ্চুরী রান করতে লরীর ১৬ রান বাকি ছিল। লরী এবং সিম্পসনের পক্ষে সেঞ্চুরী রান করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ইনিংস সমাপ্তির ঘোষণায় তাঁরা লক্ষ্যস্থলের নিকটে এসেও সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। দলের অধিনায়ক রিচী বেনো এক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্য বিকাশের সম্ভাবনাকে ক্রিকেট খেলার বৃহত্তর স্বার্থে উপেক্ষা করেন এবং খেলা ভাঙ্গার চার ঘণ্টা আগে এম, সি, সি-কে ব্যাট করতে ছেড়ে দিয়ে বিপক্ষ দলকে জয়লাভের একটা সুযোগ দেন। এম, সি, সি, বেনোর এ 'চ্যালেঞ্জ' গ্র[illegible] করে।

[illegible]স্ট্রেলিয়ার প্রথম দিনের খেলার পাঁ[illegible]উইকেট পড়ে ৩৮১ রান ওঠে। রান তোলার উপযুক্ত উইকেট পেয়ে অস্ট্রেলিয়া সে সুযোগ হাত-ছাড়া করেনি। নর্মান ও'নীল এবং বিল লরী ক্রিকেট খেলার তীর্থস্থান লর্ডস মাঠে প্রথম খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেন।

কলিন কাউড্রে

খেলার দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া পূর্বদিনের ৫ উইকেটে পাওয়া ৩৮১ রানের ওপরই ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এম, সি, সি-র খেলার গোড়াপত্তন ভাল হয়নি; খেলার প্রথম বলেই প্রথম উইকেট পড়ে যায়; ২য় উইকেট পড়ে দলের ২৯ রানে। কলিন কাউড্রে এবং স্মিথ ৩য় উইকেটে জুটি বেঁধে খেলাটা অনেকটা ভদ্রস্ত করেন; ৩য় উইকেটের জুটিতে ১৩১ মিনিটের খেলায় ১২৮ রান ওঠে, ৩য় উইকেট পড়ে দলের ১৪৭ রানে। কাউড্রে সেঞ্চুরী করেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় এটা তাঁর ৪৯ সেঞ্চুরী। আড়াই ঘণ্টার খেলায় তিনি শতরান পূর্ণ করেন। তাঁর নিজস্ব ১১৫ রানে ১৯টা বাউণ্ডারী ছিল, সময় লাগে ১৭৬ মিনিট। কাউড্রের বিদায়ের পর ব্যারিংটনের ৫৫ রান উল্লেখযোগ্য। ২৭৪ রানে এম, সি, সি-র ১ম ইনিংস শেষ হয়। ডেভিডসন ৪৬ রানে ৬টা উইকেট পান। অস্ট্রেলিয়া ঐদিন প্রায় ১ ঘণ্টার মত খেলার সময় পায়। এই সময়ে অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে ৫৭ রান করে।

৩য় দিনে লাঞ্চের সময় স্কোর-বোর্ডে দেখা গেল কোন উইকেট না পড়ে অস্ট্রেলিয়ার ১৮৬ রান উঠেছে। এই রানের উপরই অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে এম, সি, সি-কে ব্যাট করতে ছেড়ে দেয়। তখন খেলার সময় পড়েছিল ৪ ঘণ্টা এবং এম, সি, সি-র পক্ষে জয়লাভের জন্যে ২৯৪ রানের প্রয়োজন ছিল।

চা-পানের বিরতির সময় দেখা গেল এম, সি, সি জয়লাভের প্রায় অর্ধেক পথ ছাড়িয়ে গেছে। উইকেটে আছেন ৩য় উইকেটের জুটি কাউড্রে এবং স্মিথ। হাতে খেলার সময় আছে ১১৫ মিনিট। সময়ের দিক থেকে জয়লাভ অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু রিচি বেনো ৩য় উইকেটের জুটি ভেঙ্গে দিলেন দলের ১৭৬ রানে। জয়লাভের জন্যে তখন ১১৮ রান দরকার, হাতে ৭টা উইকেট জমা এবং খেলা ভাঙ্গতে ৯০ মিনিট সময় বাকি। কিন্তু বেনের বোলিংয়ে এম, সি, সি শোচনীয়ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। খেলা ভাঙ্গার আধঘণ্টা আগে এম, সি, সি-র ২য় ইনিংস ২৩০ রানে শেষ হয় আর অস্ট্রেলিয়া ৬৩ রানে জয়ী হয়। বেনো ৬৭ রানে ৫টা উইকেট পান।

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৩৮১ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নর্মান ও'নীল ১২২; বিল লরী ১০৪ এবং বুথ ৫৯) এবং ১৮৬ (কোন উইকেট না পড়ে। লরী ৮৪ এবং সিম্পসন ৯২)।

এম, সি, সি ঃ ২৭৪ (এম, সি, কাউড্রে ১১৫ এবং কেন ব্যারিংটন ৫৫। ডেভিডসন ৪৬ রানে ৬টা এবং সিম্পসন ৭৩ রানে ৩টি উইকেট) এবং ২৩০ (কাউড্রে ৬৮ এবং স্মিথ ৫৮। বেনো ৬৭ রানে ৫ এবং ডেভিডসন ৫৮ রানে ৩টি উইকেট)।

●

অস্ট্রেলিয়া বনাম অক্সফোর্ড দলের খেলা ড্র যায়।

অক্সফোর্ড ঃ ৩২০ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। আব্বাস আলী বেগ ৯৫, ড্রাইব্রাউ ৮৮, নীট ৭৮। ম্যাকেঞ্জী ৪৯ রাণে ৩ উইকেট) ও ২৩৫ (৫ উইকেটে। ওরসলে ৮০, বেগ ৭৩)।

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৩৬২ (সিম্পসন ১৪৮, লরী ৭২ এবং ম্যাকে ৫৪; পিথে ৪৭ রাণে ৭ উইঃ)।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব ১ম ইনিংসে শূন্য রাণ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইংলন্ডের এ বছরের ক্রিকেট মরসুমে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান এখনও অধিকার করে রয়েছেন এবং এ মরসুমের খেলায় তাঁর এই প্রথম শূন্যে রাণ। এই খেলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অস্ট্রেলিয়া দলের সিম্পসনের সেঞ্চুরী (১৪৮), অক্সফোর্ড দলের পিথের ৪৭ রাণে ৭টি উইকেট লাভ এবং আব্বাস আলী বেগের ৯৫ ও ৭৩ রাণ।

ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া)

টেস্ট ক্রিকেট রেকর্ড

ঘটনার বৈচিত্র্যে অন্য কোন খেলাই ক্রিকেট খেলার সমকক্ষতা লাভ করতে পারে নি; কখনও পারবেও না। সার্থক নাম এর—'খেলার রাজা'—সার্থক জীবন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের। ক্রিকেট খেলা দেখা কিম্বা খেলার বিবরণ শোনা বা পড়ার মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে, কিন্তু মাঠের ক্রিকেট খেলা আরও বেশী মাত্রায় উপভোগ্য হয় যদি বিগত-দিনের ক্রিকেট খেলার রেকর্ড-গুলির সঙ্গে দর্শক, শ্রোতা এবং পাঠক সাধারণের সম্যক পরিচয় থাকে। ক্রিকেট খেলার 'রেকর্ড' ক্রিকেট খেলার সঙ্গে ব্যাট-বলের যে অবিচ্ছেদ সম্পর্ক সেই সম্পর্কে আজ এসে দাঁড়িয়েছে।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা সুরু হওয়ার তারিখ ৮ই মে। সুতরাং টেস্ট খেলার সময় এই দুই দেশের বিগত ১৭৮টি টেস্ট খেলার প্রতিষ্ঠিত বিবিধ রেকর্ড বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করবে। নীচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড পাঠকদের অবগতির জন্যে দেওয়া হ'ল।

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রাণ

ইংল্যান্ড ঃ ৯০৩ (৭ উইকেটে), ওভাল, ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৭২৯ (৬ উইকেটে), লর্ডস, ১৯৩০

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রাণ

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৩৬, এজবাস্টন, ১৯০২

ইংল্যান্ড ঃ ৪৫, সিডনি, ১৮৮৬-৮৭

এক ইনিংসে দলগত ৬০০ রাণ

অস্ট্রেলিয়া ৭ বার **ঃ ইংল্যান্ড** ৪ বার

একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক রাণ

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ঃ ৯৭৪ (এভারেজ ১৩৯·১৪)—ডন ব্র্যাডম্যান; ১৯৩[illegible]

[illegible] পক্ষে ঃ ৯০৫ (এভারেজ ১১৩·[illegible])—ডবলিউ [illegible] হ্যামন্ড; ১৯২৮-[illegible]

একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যান্ডের পক্ষে ঃ ৪৬ (এভারেজ ৯·৬০)—জে, সি লেকার; ১৯৫৬।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ঃ ৩৬ (এভারেজ ২৬·২৭)—এ, এ, মেলী; ১৯২০-২১।

একটি টেস্ট খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যান্ডের পক্ষে ঃ ১৯টা (৯০ রানে)—জে, সি, লেকার; ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ঃ ১৪টা (৯০ রানে)—এফ, আর, স্পোফোর্থ; ওভাল, ১৮৮২।

হ্যাট-ট্রিক

বোলিংয়ে পর পর তিনটি বলে তিনজনকে আউট করার কৃতিত্বকে 'হ্যাট-ট্রিক' নামে অভিহিত করা হয়। ইংল্যান্ডের পক্ষে এই দুর্লভ কৃতিত্ব লাভ করেছেন তিনজন বোলার। অপর-দিকে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে দু'জন; দুই দেশের টেস্ট খেলায় একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার ট্রাম্বল দু'বার 'হ্যাট-ট্রিক' ক'রেছেন।

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ডবলিউ বেটস (মেলবোর্ন, ১৮৮২-৮৩); জে ব্রিগস (সিডনি, ১৮৯১-৯২) এবং জে [illegible] হিয়ার্নি (লিডস, ১৮৯৯)।

[illegible] : এফ আর স্পোফোর্থ (মেলবোর্ন, ১৮৭[illegible]) এবং এইচ ট্রাম্বল (মেলবো[illegible] ১-২ এবং [illegible] ১৯০৩-০[illegible])।

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ৩[illegible]৪—লেন হাটন; ওভাল, ১৯৩৮।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : [illegible]৪—ডন ব্র্যাডম্যান; লিডস, ১৯৩[illegible]।

উপর্যুপরি টেস্ট খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী

৬টা—ডন ব্র্যাডম্যান (২৭০, ২১২ এবং ১৬৯ রান ১৯৩৬-৩৭ সালের টেস্ট খেলায়; ১৪৪* ১০২* এবং ১০৩ রান ১৯৩৮ সালের টেস্ট খেলায়)।

সর্বাধিক টেস্ট সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ১২টা—জে, বি হব্স। **অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে :** ১৯টা—ডন ব্র্যাডম্যান।

সেঞ্চুরী সংখ্যা

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১৩২

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ১২৩

সর্বাধিক 'ডাবল সেঞ্চুরী'

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৮টা—ডন ব্র্যাডম্যান—(২৫৪, লর্ডস, ১৯৩০; ৩৩৪, লিডস, ১৯৩০; ২৩২, ওভাল, ১৯৩০; ৩০৪, লিডস, ১৯৩৪; ২৪৪, ওভাল, ১৯৩৪; ২৭০, মেলবোর্ন, ১৯৩৬-৩৭; ২১২, এডলেড, ১৯৩৬-৩৭; ২৩৪, সিডনি, ১৯৪৬-৪৭;)

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ৪টে—ডবলিউ হ্যামণ্ড (২৫১, সিডনি, ১৯২৮-৯; ২০০, মেলবোর্ন, ১৯২৮-৯; ২৩১* সিডনি, ১৯৩৬-৭; ২৪০ লর্ডস, ১৯৩৮)

উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী রাণ

ইংল্যান্ডের পক্ষে : এইচ সার্টক্লিফ (১৭৬ ও ১২৭ মেলবোর্ন ১৯২৪-৫); ডবলিউ, হ্যামণ্ড (১১৯* ও ১৭৭, এডলেড, ১৯২৮-৯) এবং ডেনিস কম্পটন (১৪৭ ও ১০৩* এডলেড, ১৯৪৬-৭)

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ডবলিউ বার্ডসলে (১৩৬ ও ১৩০ ওভাল, ১৯০৯) এবং এ, আর মরিস (১২২ ও ১২৪* এডলেড, ১৯৪৬-৭)
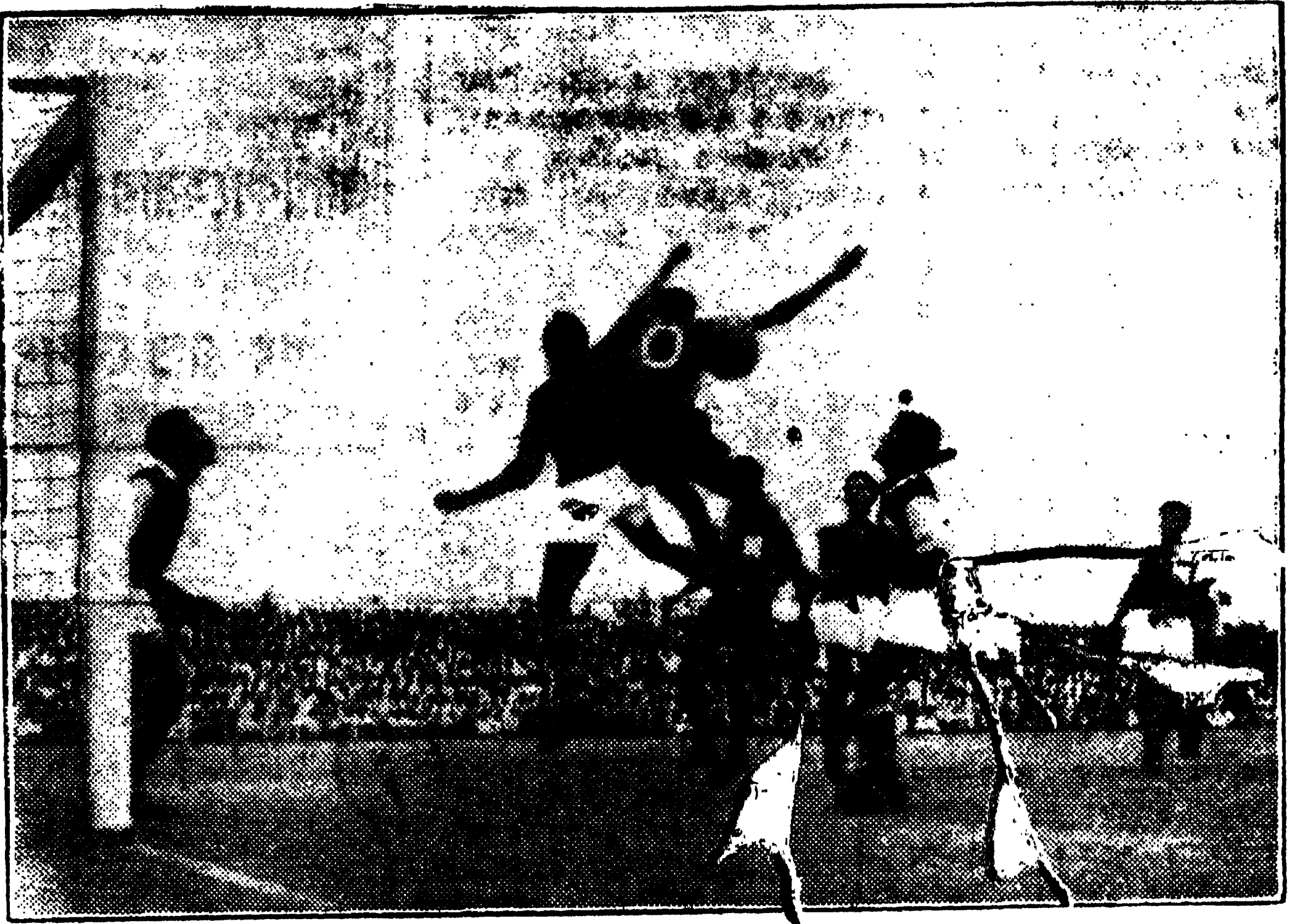
ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলা: মহমেডান দলের গোলের সামনে একটি উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার দৃশ্য।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সাত দিনে (২৯শে মে থেকে ৪ঠা জুন) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য খেলা হয়েছে দুটি—মোহনবাগান বনাম ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের চ্যারিটি ম্যাচ।

২৯শে মে তারিখের খেলায় মোহনবাগান ২—১ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে দুটি মূল্যবান পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। এই খেলাটি ছিল উভয় দলেরই লীগের ৬ষ্ঠ খেলা। মোহনবাগানের পক্ষে এই দিনের খেলার গুরুত্ব ছিল খুব বেশী—মরণ-বাঁচনের খেলা। প্রতিদ্বন্দ্বী রেলওয়ে দল ৫টা খেলায় এক পয়েন্ট নষ্ট করে লীগের তালিকায় তখন ছিল দ্বিতীয় স্থানে; অপর দিকে মোহনবাগান ৫টা খেলায় তিন পয়েন্ট হারিয়ে রেল দলের থেকে দু পয়েন্টের ব্যবধানে ৩য় স্থানে ছিল।

এই খেলায় মোহনবাগানের জয়লাভের ফলে দুই দলেরই তখন সমান খেলায় সমান ৯ পয়েন্ট দাঁড়ায়। তীব্র গতিতে রেলদলের গোল সীমানা আক্রমণ করাই ছিল মোহনবাগান দলের খেলার বৈশিষ্ট্য। এই দিনের খেলাতেও মোহনবাগান দলের আক্রমণ ভাগের কোন কোন খেলোয়াড়ের ব্যর্থতার দরুণ গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ নষ্ট হয়েছে। শেষে খেলা ভাঙ্গার ৪ মিনিট আগে দীপু দাস জয়সূচক গোলটি দিয়ে পূর্বের সহজ সুযোগ নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ করেন। রেলওয়ে দলের পক্ষে পি কে ব্যানার্জি দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৯ মিনিটে মোহনবাগানের গোলটি শোধ করে দেন। মোহনবাগান লীগের ৭ম খেলায় উয়াড়ীকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। এইদিন মোহনবাগান দলের খেলায় সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণধারা এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বল আদান-প্রদানে বুঝাপড়ার যথেষ্ট অভাব ছিল। একক ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলেই এই দিনের খেলায় মোহনবাগান শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছে। সেণ্টার ফরওয়ার্ড চিদানন্দন কয়েকটি খেলায় অনুপস্থিত থাকার পর এইদিনে পুনরায় খেলতে নামেন; কিন্তু তাঁর খেলায় সজীবতা এবং উদ্দীপনার পরিচয় ছিল না। গোল করার কয়েকটি সুযোগ তিনি ঠিক মত নিতে পারেননি। ইণ্টারন্যাশনালের বিপক্ষে ৪—০ গোলে

মোহনবাগানের জয়লাভ এ মরসুমে তাদের পক্ষে অধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভ। চারটি গোল দেওয়া ছাড়াও কম পক্ষে তারা আরও চারটি গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করে। দলের অধিনায়ক চুণী গোস্বামী একাই তিনটি গোল করেন। বর্তমানে মোহনবাগান দলের খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—৮টা খেলায় ১৩ পয়েন্ট, জয় ৬টা, হার ১ এবং খেলা ড্র ১।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতি-যোগিতায় ১৫টি দলের মধ্যে একমাত্র ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবই কোন খেলায় এখনও হার স্বীকার করেনি বা কোন খেলা ড্র করেনি। একটানা [illegible] খেলায় জয়ী হয়ে তারা এখন [illegible]গের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকা[illegible]র আছে। আটটি খেলার মধ্যে তা[illegible]-দিকের মাত্র দুটি খেলায় কম [illegible]নে জয়ী হ[illegible] পরের ৬টি[illegible] খেলায় নিরংকুশ প্রাধান্য বিস্তার ক'রে স[illegible]জভাবে বেশী গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। আটটি খেলায় তারা মোট ২৯টি [illegible]ল দিয়ে মাত্র ২টি গোল খেয়েছে। এই [illegible] দলের রক্ষণ এবং আক্রমণভাগের [illegible]ড়দের শক্তির পরিচয় দেয়। আলো[illegible] গত সাত দিনের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ৪—১ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ এবং হাওড়া ইউনিয়ন ও মহমেডান স্পোর্টিংকে ৫—০ গোলে পরাজিত করেছে।

খেলার সামগ্রিক বিচারে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বর্তমানে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। দলের এ সাফল্যের মূলে আছে সংঘবদ্ধ খেলা এবং জয়লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

লীগ তালিকায় ইস্টবেঙ্গল দলের অতি নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইস্টার্ণ রেলওয়ে —দুই দলের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র এক পয়েন্টের। মোহনবাগান দলের কাছে ইস্টার্ণ রেলদলের পরাজয়ে সে ব্যবধান এখন তিন পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লীগের তালিকায় উপস্থিত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মোহন-বাগান এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে।

গত শনিবার লীগের প্রথম চ্যারিটি খেলায় ইস্টবেঙ্গল ৫—০ গোলে গত বছরের লীগের রাণার্স-আপ মহমেডান স্পোর্টিং দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে দুটি মূল্যবান পয়েন্ট পেয়েছে। মহ-মেডান দলের পক্ষে এ মরশুমের লীগের খেলায় এই প্রথম পরাজয় এবং এই রকম শোচনীয় পরাজয় অপ্রত্যাশিত; কারণ মহমেডান দল কাগজে-কলমে নামকরা খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী এবং এই খেলার আগে পর্যন্ত তারা অপরাজেয় ছিল। ৫—০ গোলে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হলেও খেলাটি একেবারে একতরফা হয়নি।

প্রথমার্ধে দুই দলই সমান পাল্লা দিয়ে খেলেছে। প্রথমার্ধের খেলার ১২ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল গোল দেয় এবং বিরতির সময় ১—০ গোলে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়া-র্ধের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণে মহ-মেডান স্পোর্টিং দল ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ইস্টবেঙ্গল আরও ৪টি গোল দেয়, তার মধ্যে একটি পেনাল্টি থেকে। মহমেডান স্পোর্টিং দলও একটি পেনাল্টি পায় এবং ইস্টবেঙ্গলের আগে; কিন্তু এই পেনাল্টি থেকে মহমেডান স্পোর্টিং গোল দিতে পারেনি; এই সময় ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। এই পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট করার পরই সমস্ত দলটি হতাশায় ভেঙে পড়ে। ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে গোল করেন বলরাম ২টি এবং এস নন্দী, আর দেবনাথ এবং এস সমাজপতি একটি ক'রে। নীলেশ সরকার কোন গোল করতে না পারলেও তাঁরই ক্রীড়ানৈপুণ্যের ফলে বলরাম ১ম এবং এস নন্দী ২য় গোলটি [illegible]ন।

এইদিনের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের বিরাট [illegible] শুধু দলের সাফল্য বা গৌর[illegible] বাঙ্গালী তরুণ খেলো-য়াড়দের [illegible] সামর্থ্যের সাফল্য এবং বাঙ্গালীর গৌরব। এইদিন ইস্টবেঙ্গল দলের এগারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে আটজন ছিলেন তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড়।

আশা করি, যে সব বড় বড় ক্লাবের কর্তৃপক্ষ, সমর্থক ও সদস্যবৃন্দ লীগ-শীল্ড জয়লাভের অদম্য আকাঙ্খায় বাঙ্গলার বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানীর পক্ষ-পাতী তাঁরা "পেঁয়ো যুগীর ভিক্ মিলে না" এই প্রবাদ বাক্যটিকে অসত্য প্রমাণ করতে অতঃপর তৎপর হবেন এবং প্রয়ো-জন বোধে আঞ্চলিক ফুটবল প্রতিযোগিতার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আই এফ এ-র উপর চাপ দিবেন।

মোহনবাগান দলের অতি নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৭টা খেলার ১১ পয়েন্ট পেয়েছে। হার হয়েছে মাত্র একটা—মোহনবাগান দলের বিপক্ষে এবং খেলা ড্র ১টা। রেলদল তাদের ৭ম খেলায় খেলা ভাঙ্গার শেষ মিনিটে গোল দিয়ে, ১—০ গোলে এরিয়ান্স দলকে পরাজিত করে। এরিয়ান্সের দুর্ভাগ্য, দ্বিতীয়ার্ধের ৪ মিনিট বাদে বাকি সময়টা ১০ জন খেলোয়াড় নিয়ে তাদের খেলতে হয়েছে। লেফট-হাফ হাঁটুতে চোট খেয়ে

খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। প্রথমার্ধের খেলায় দুই দলই একটি করে গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ নষ্ট করে।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা
(৩রা জুন তারিখের খেলার পর)

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল	৮	৮	০	০	২৯	২	১৬
মোহনবাগান	৮	৬	১	১	১৬	৪	১৩
ইঃ রেলওয়ে	৭	৫	১	১	১২	৩	১১
এরিয়ান্স	৮	৩	৩	২	৮	৬	৯
বি এন আর	৬	৩	২	১	৫	২	৮
মহঃ স্পোর্টিং	৭	২	৪	১	৬	৮	৮
রাজস্থান	৬	১	৪	১	৩	৩	৬
হাঃ ইউনিয়ন	৭	২	২	৩	৬	১০	৬
খিদিরপুর	৮	১	৪	৩	৬	১০	৬
জর্জ টেলিঃ	৭	০	৫	২	২	৭	৫
স্পোর্টিং ইউঃ	৭	২	০	৫	৫	১৩	৪
ইন্টারন্যাশনাল	৭	২	০	৫	৪	১৪	৪
পুলিশ	৭	০	৩	৪	২	১০	৩
বালী প্রতিভা	৫	১	০	৪	৪	৯	২
উয়াড়ী	৪	০	১	৩	১	৮	১

দ্বিতীয়ার্ধের ৬ মিনিটের খেলায় এরিয়ান্স গোলের হাত থেকে অব্যাহতি পায়। রেল দলের বলটা এরিয়ান্স দলের গোলের ক্রস বারে লেগে ফিরে যায়।

কাগজে-কলমে মহমেডান স্পোর্টিং দল নামকরা খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী হলেও খেলায় তার কোন পরিচয় নেই। সাতটি খেলায় তারা জয়ী হয়েছে মাত্র দুইটিতে—হেরেছে একটি এবং খেলা ড্র করেছে চারটি। লীগের প্রথম খেলায় ইন্টারন্যাশনালকে ২—১ গোলে পরাজিত করে পর পর তিনটে খেলা—খিদিরপুর, হাওড়া ইউনিয়ন এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে খেলা ড্র করে। পঞ্চম খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ২—০ গোলে হারিয়ে পরবর্তী খেলায় রাজস্থানের সঙ্গে খেলা ড্র করেছে।

জর্জ টেলিগ্রাফ, পুলিশ এবং উয়াড়ী এখনও কোন খেলাতেই জয়লাভ করতে পারেনি।

ভারতীয় ওয়ান্ডারার্স হকি দল

নিউজিল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় হকি দল এ পর্যন্ত চারটি খেলায় যোগদান ক'রে চারটিতেই জয়লাভ করেছে।

রোতানি দলকে ১৩—০ গোলে, হোয়াংগেরি দলকে ৪—২ গোলে, ফ্রাঙ্কলিন দলকে ১০—০ গোলে এবং ওয়াকাতো দলকে ১০—১ গোলে পরাজিত করে।

৬।৬১

ভ্রম-সংশোধ[illegible]

বিগত চতুর্থ সংখ্যায় [illegible] প্রকাশিত ফটো 'খুদে মাঝি'র ফটোগ্রাফ[illegible]র নাম পার্থসারথি সেন। ভ্রমক্রমে [illegible]অন্য নাম ছাপা হইয়াছে। এ-জন্য আমরা দু[illegible]খিত।

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আমাদের প্রকাশনার গ্রন্থ সম্বন্ধে

বিশিষ্ট একটি পত্রিকার অভিমতের কতকাংশঃ

'বনফুল'-এর উপন্যাস

হাটে বাজারে টাঃ ৩·৫০ নঃ পঃ

"নামকরণে চমক নেই, গল্পের ঘনঘটা অনুপস্থিত, গভীর মনের ভাবনা-বাসনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের চেষ্টা নেই। তবু 'হাটে বাজারে' বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজনা। গ্রন্থখানি যশস্বী প্রবীণ উপন্যাসকারের তীব্র সমসময়-চেতনার স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। 'হাটে বাজারে' একটি যুগের [illegible]......

"গ্রন্থখানিতে অনেক চরিত্রের ভিড়, যারা সবাই নদীর মত প্রবহমান একটি কেন্দ্রীয় [illegible]ত্রের স্পর্শে উজ্জীবিত। ড্রাইভার আলী, আহার-বিলাসী বাঁড়ুজ্যে মশাই [illegible]ষ্টি নিম্নবিত্ত খগেন সরখেল, মেহরুন ছিপলী পাঠকের মত [illegible]রে।"......

"[illegible]ক্ততার স্পর্শ [illegible]কলেও মানুষের প্রতি আস্থা, ভালবাসা থেকে উৎসারিত একটি জীবনদর্শন বা শিল্পদৃষ্টি গ্রন্থকারের রয়েছে এবং তার শিল্পমানস পাঠকের হৃদয়ে সহজেই সঞ্চারিত। এই দিক থেকে এই উপন্যাসখানি একটি বৃহৎ [illegible], তাতে সন্দেহ নেই।"

স্মরণীয়

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৮ই জ্যৈষ্ঠের বই

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
দক্ষিণের বারান্দা
টা. ৪·০০

বাণী রায়ের
সেই চেনা ছেলেটি
(ছোটদের উপন্যাস)
টা. ১·৭৫

সদ্য প্রকাশিত

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড
টা. ১·৫০

শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের
মহাভারত (সচিত্র) টা. ৩·০০

আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যগ্রন্থ
সাগর থেকে ফেরা টাঃ ৩·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস
কলকাতার কাছেই টাঃ ৬·০০

আমাদের প্রকাশনার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

উপন্যাস : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **মৌসুমী** টাঃ ৩·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **তুমি আর আমি** টাঃ ২·৩০ ॥ লীলা মজুমদারের **ঝাঁপতাল** টাঃ ২·৭৫ ॥ 'বনফুল'-এর **ভীমপলশ্রী** টাঃ ৫·০০ : **স্থাবর** টাঃ ৮·০০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **ঠিক-ঠিকানা** টাঃ ২·০০ ॥ প্রতিভা বসুর **মনোলীনা** টাঃ ২·৫০ ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর **অনুষ্টুপ ছন্দ** টাঃ ৪·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **কাঞ্চন-মূল্য** টাঃ ৫·৫০ ॥ প্রবোধকুমার সান্যালের **অগ্রগামী** টাঃ ৪·০০ ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের **হাসপাতাল** টাঃ ৬·৫০ : **কৃষ্ণকলি নাম তার** ৫·৫০ ॥ বিমল মিত্রের **সুয়োরাণী** টাঃ ৩·২৫ ॥ অনুরূপা দেবীর **উত্তরায়ণ** টাঃ ৫·৫০ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **সৃষ্টি** টাঃ ৫·৫০ ॥ অজিতকৃষ্ণ বসুর **প্রজ্ঞাপারমিতা** টাঃ ৬·০০ ॥ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **দিবা-রাত্রির কাব্য** টাঃ ৩·২৫ ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **বারো ঘর এক উঠোন** টাঃ ৭·৫০ ॥ দীপক চৌধুরীর **নীলে সোনায় বসতি** টাঃ ৩·৫০ ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **জলপ্রপাত** টাঃ ২·৭৫ ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষের **গান্ধর্ব** টাঃ ৩·৫০ ॥ দেবেশ দাশের **রক্তরাগ** টাঃ ৪·৫০ ॥ রামপদ মুখোপাধ্যায়ের **মেঘলা আকাশ** টাঃ ২·০০ ॥ নিরুপমা দেবীর **অন্নপূর্ণার মন্দির** টাঃ ৩·২৫ ॥ কণাদ গুপ্তের **পূর্ব-মীমাংসা** টাঃ ২·৫০ ॥ 'বিক্রমাদিত্য'-এর **অনোখীলাল পখোটিয়া** টাঃ ২·৫০ ॥ মতি নন্দীর **নক্ষত্রের রাত** টাঃ ৩·৫০ ॥ প্রশান্ত চৌধুরীর **স্বগতোক্তি** ৩·২৫ ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **অভিষেক** ৫·৭৫ ॥ চিত্রিতা দেবীর **দুই নদীর তীরে** ৬·৭৫॥

বিবিধ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের **অবিস্মরণীয় মুহূর্ত** টাঃ ৩·৫০ ॥ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটমি** টাঃ ৩·০০ ॥ হিমানীশ গোস্বামীর **লণ্ডনের পাড়ায়** টাঃ ৩·০০ ॥ অনাথনাথ বসুর **সুক্তিসমুচ্চয়** টাঃ ৩·৫০ ॥ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের **অবনীন্দ্র-চরিত্রম্** টাঃ ৫·০০ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ** টাঃ ৩·৫০ ॥ নলিনীকান্ত সরকারের **হাসির অন্তরালে** টাঃ ৩·০০ ॥

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭ ফোন [illegible] ২৬৪[illegible] [illegible] কালকাটা

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা-৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা মূল্য—৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ১লা আষাঢ়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 16th June 1961.
40 Naye Paise

অমৃত

সম্পাদকীয়

একথা অনেকেই স্বীকার করবেন যে, ডাঃ রায় গত ১০ই জুন ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে যে বিবৃতিটি প্রকাশ করেছেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বোধকরি সেটি শ্রেষ্ঠ ষ্টেটসম্যান-শিপের পরিচায়ক হিসেবে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে উল্লিখিত থাকবে। সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এমন প্রকান্ড সম্ভাবনাযুক্ত কোনো প্রস্তাব ১৯৫৪ সালের পর ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে আর উত্থাপিত হয়নি। ১৯৫৪ সালের উল্লেখ করা হল এই জন্য যে, ঐ বৎসর রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের ঐতিহাসিক দলিলটি রচিত হয়েছিল এবং ভারতবর্ষ তার রাষ্ট্র-নেতাদের অজ্ঞাতসারে ভাষার গৃহ-যুদ্ধে দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অধ্যায়ে প্রবেশ করেছিল ঐ বৎসর। তারপর থেকে রাজনীতিতে ভাষার স্রোত ক্রমাগত এক দিকেই প্রবাহিত হয়েছে। সেই গতি বিচ্ছেদের দিকে, অন্তর্ভেদী কলহের দিকে এবং নূতন সংঘাতের দিকেই ভারতবর্ষকে নিয়ে গেছে।

ডাঃ রায়ের প্রস্তাবের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে এই স্রোতের গতিমুখ পরিবর্তন করা। প্রকৃতপক্ষে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের প্রধান যে লক্ষ্য ছিল, গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ডাঃ রায়ের প্রস্তাব সেই লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীতগামী। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়েছিল, ভারতবর্ষকে মোটামুটিভাবে কতকগুলি একভাষী রাজ্যে ভাগ করার জন্য। সেই একভাষী রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, প্রত্যেক রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা সম্প্রদায় তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের একটি নূতন হাতিয়ার করায়ত্ত করেছেন এবং সংখ্যালঘু ভাষীদের উপরে পীড়ন ও বঞ্চনার একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। ডাঃ রায় আজ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, দিল্লীতে তা যদি সর্বাংশে গৃহীত হয় তাহলে এই একভাষী রাজ্যগুলি মিশ্রভাষী রাজ্যে পরিণত হবে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন যে ভৌগোলিক সীমানা নির্দিষ্ট করেছিলেন, তার কোনো পরিবর্তন ঘটছে না বটে। কিন্তু ডাঃ রায়ের লক্ষ্য হচ্ছে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভাষা সম্প্রদায়ের আধিপত্য থেকে সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া এবং সেই মুক্তি যাতে অবাধ ও নিঃসংশয় হতে পারে, সেজন্য প্রত্যেক একভাষী রাজ্যের সীমানার মধ্যেই একাধিক ভাষাকে সরকারী মর্যাদা দেওয়া। অর্থাৎ প্রত্যেক রাজ্যকে মিশ্র-ভাষী রাজ্যে পরিণত করা। যদিও মূলত এই প্রস্তাব আসামের ঘটনা-বলীর পরিপ্রেক্ষিতেই উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু এর লক্ষ্য সমস্ত ভারতবর্ষ। বলা বাহুল্য যে, ডাঃ রায় তাঁর নিজ রাজ্যে বাংলাকে যদিও অবিসম্বাদিতভাবেই অদ্বিতীয় সরকারী ভাষার অধিকার দিতে পারতেন, তথাপি এই প্রস্তাব অনুসারে পশ্চিম-বঙ্গে বাংলা ভাষার পাশেই অন্য যে কোনো ভাষার সরকারী মর্যাদা লাভের সুযোগ তিনি স্বহস্তে তৈরী করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ এই প্রস্তাবের পিছনে সেই উদারতা এবং বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যার ফলে ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা সম্প্রদায়ের স্বার্থও বহুলাংশে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এককথায়, ভাষার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তাঁর এই প্রস্তাব ঘোষিত হয়েছে এবং এর ফলে দার্জিলিঙে নেপালী এবং কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে হিন্দীকে যদি সরকারী মর্যাদা দিতে হয়, ডাঃ রায় তার জন্যও প্রস্তুত।

তাঁর প্রস্তাবের মূল সূত্র হচ্ছে তিনটি : (১) প্রত্যেক রাজ্যকে মিশ্র-ভাষী বা একাধিক ভাষাভাষী হিসাবে স্বীকৃতি দানের জন্য সংবিধানের ৩৪৫নং ধারাকে সম্প্রসারিত করতে হবে;

(২) সংখ্যালঘুভাষীদের পরিমাণ যদি মোট জনসংখ্যায় শতকরা ৩০ ভাগের কম, অথচ শতকরা ৫ ভাগের বেশী হয় তাহলেও তাঁদের ভাষাকে রাজ্যের অন্যতম সরকারী ভাষারূপে স্বীকার করা হবে; কিন্তু শতকরা ৫ ভাগেরও যাঁরা কম তাঁদের ভাষা আঞ্চলিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারবে;

(৩) ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের স্মারকলিপির অস্পষ্ট প্রস্তাব-গুলি কার্যকর এবং নির্দিষ্ট, পালনীয় সর্তরূপে প্রত্যেক রাজ্য সরকারের উপরেই প্রয়োগ করা হবে।

ডাঃ রায় তাঁর এই বিবৃতির মুখ-বন্ধে শাস্ত্রী ফরমুলার সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের ফরমুলার তাৎপর্য শাস্ত্রী ফরমুলার সমর্থক নয়, যে কোনো বুদ্ধিমান লোক একনজরে তা বুঝতে পারবেন। কেননা, রায় ফরমুলা যদি আসামে প্রয়োগ করা হয় তাহলে বাংলাকে দ্বিতীয় সরকারী ভাষারূপে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হয়, যে স্বীকৃতি শাস্ত্রী ফরমুলার নেই। তাছাড়া, শাস্ত্রীজী যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৬ সালের স্মারকলিপির উপরে প্রভূত গুরুত্ব দিয়েছেন, তথাপি ডাঃ রায়ের বিবৃতির অন্যতম প্রধান বিষয়ই হচ্ছে, এই স্মারকলিপির অন্তঃসার-শূন্যতা প্রমাণ করা। ডাঃ রায় দেখিয়েছেন যে, স্মারকলিপির প্রস্তাব-গুলি অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে। কার্যকর সিদ্ধান্তের নির্দেশ তার মধ্যে নেই। সুতরাং শাস্ত্রীজীর পরেও আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ডাঃ রায় বলছেন যে, ঐ স্মারকলিপি, মাইনরিটি কমিশনের নির্দেশ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের কয়েকটি রিপোর্ট এক সঙ্গে গভীর-ভাবে পর্যালোচনার পর একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে নূতন রক্ষাকবচ সংখ্যালঘুদের জন্য ঘোষণা করা দরকার।

ডাঃ রায়ের এই দূরপ্রসারী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা হাই-কম্যান্ড কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবেন আমরা জানি না। কিন্তু যদি একভাষী রাজ্যের ভাষাগত প্রভুত্ব থেকে সংখ্যালঘুদের মুক্তিদানের জন্য এই উদার এবং ন্যায়সম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার যদি সংবিধানের সংশোধনে সম্মত হন এবং বলিষ্ঠভাবে এই নূতন ফরমুলাটিকে রূপ দিতে অগ্রসর হন তাহলে ভারতের বর্তমান গৃহযুদ্ধের হয়ত অবসান সূচিত হতে পারে। এই প্রস্তাব আরও একদিক থেকে লক্ষণীয়। আসামের অর্থমন্ত্রী জনাব ফকরুদ্দিন আহমেদ কয়েকদিন পূর্বে স্পর্ধিত অভিযোগ করেছিলেন যে, কাছাড়ের গোলযোগের পশ্চাতে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দের উস্কানী আছে। থাকা অবশ্য অন্যায় বা অসঙ্গত ছিল, একথা আমরা মনে করি না। একথাও মনে করি না যে, পাকিস্তানের সঙ্গে যে কূটনৈতিক দূরত্ব রক্ষা করতে হয়, আসামের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গকে অনুরূপ দূরত্ব ও নীরবতা অবলম্বন করতে হবে এবং সেখানে সংবিধান ও গণতন্ত্র পদদলিত হলেও তার প্রতিবাদ চলবে না। আমরা এই নীরবতা অবলম্বন করব এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বৈদেশিক দূরত্বের ব্যবধান তৈরী করতে সম্মত হব, কিংবা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নামে আসামকে তাঁরা গভীর চক্রান্তের পথে নিয়ে গেলেও আমরা নীরবে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করব—এই যদি জনাব ফকরুদ্দিনের অন্তরের বাসনা হ'য়ে থাকে তাহলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এত বড় ভুল ভারতবর্ষে সহজে আমরা ঘটতে দিতে প্রস্তুত নই। ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্য যেমন আসামে পার্লামেন্টের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের অধিকার আছে, তেমনি সেই অধিকার প্রার্থনার জন্য বলিষ্ঠ দাবী এবং জনমত গঠিত করার অধিকারও পশ্চিমবঙ্গের কিংবা ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্যের আছে। স্বায়ত্তশাসনের অর্থ এই নয় যে, পার্লামেন্টে পশ্চিম-বঙ্গের সদস্যেরা আসাম গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা করতে পারবেন না, অথবা সেই সমালোচনার ভূমিকা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জনমত মুখ খুলতে পারবে না।

কিন্তু নীতি হিসাবে যেমন একথা সত্য, তেমনি [illegible] ন্যাদিকে বাস্তবে একথাও লক্ষণীয় [illegible] আসামের সাম্প্র-তিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ শুধু যে হস্তক্ষেপে বিরত থেকেছে তা নয়, অসাধারণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। তদুপরি, আজ ডাঃ রায়ের বিবৃতি ঘোষিত হওয়ার পর নিশ্চয়ই সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মুখে একথা সুপ্রমাণিত হবে যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আন্দোলন এবং জনমতের ভিতর দিয়ে আমরা যেকথা বলতে চেয়েছি তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ভাষার এই গৃহযুদ্ধ ক্ষান্ত করা, সংখ্যা-গরিষ্ঠের প্রভুত্বকামিতাকে খর্ব করা এবং গণতন্ত্রের উদার ও প্রশস্ত অধিকারের মধ্যে জনগণের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অংশকেও সমান অধিকারের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ রায়ের প্রস্তাব ঘোষিত হওয়ার পূর্বে প্রায় একই মর্মে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন নেতা এবং যেকোনো কোনো সংবাদপত্রের অভিমতও প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর ফরমুলায় জনমতের একটি বৃহৎ অংশ প্রতিফলিত হয়েছে। এই ফরমুলার নিরিখে যদি বিচার করা হয় তাহলে একথা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিমবঙ্গের জনমত ভাষার সংকীর্ণ কলহ এবং দুর্বিনীত প্রভুত্বকামিতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে,—নিজের রাজ্যে আত্মস্বার্থের অনেকখানি বলি দিয়ে তারা ভারত-বর্ষে সংখ্যালঘুর মহান অধিকার রক্ষা করতে অগ্রসর হয়েছে।

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

২৫।৫।৫৮
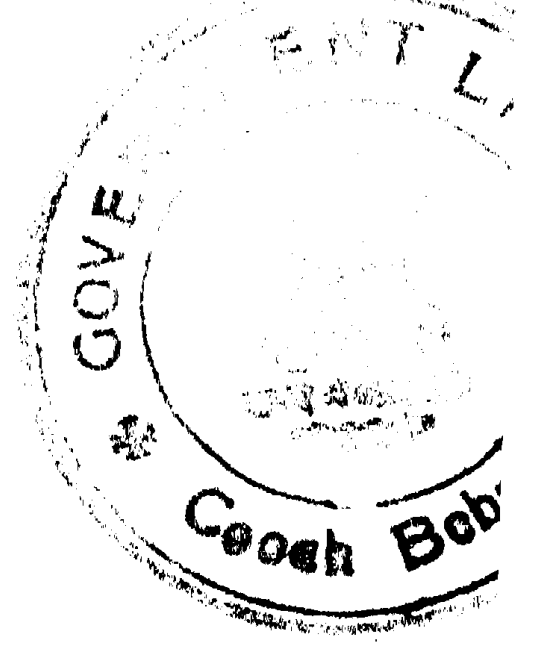
রবিশঙ্করের সেতার আর আল্লা রাখার তবলা শুনলাম। তিলক-শ্যামটি চমৎকার। জাপান থেকে রবিশঙ্কর অনেক জিনিস শিখে এসেছেন। ওস্তাদী গান-বাজনাকে আকারে ছোট করতে চাইছেন, বিলেতে ছোট, জাপানে আরো ছোট। বিদেশী সংগীতকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। আমিও করি। কিন্তু একটা বিপদ আসতে পারে। ছোট করতে গিয়ে সংগীতের কারুকার্য যেন নষ্ট না হয়ে যায় এবং কাঠামোটি যেন অটুট থাকে। নতুনত্বও তিনি করছেন এবং সেজন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু নতুন রাগের সব রূপ কি খুলেছে? যেমন মোহনকোষটি? এটা যেন খাপ খায়নি, একেই ত চন্দ্রকোষ বরাবরই কিছু খাপছাড়া। অবশ্য অনবরত শুনলে সুমধুর হবে নিশ্চয়। অভ্যাসের ফলে কি না হয়?

আল্লারাখার হাত কড়া মনে হোলো। বীরু মিশ্রের বাঁয়ার কাজের তুলনা নেই, খালিফা আবিদ হোসেনের না ধিন্ ধিনের তুলনা পাই না। লক্ষ্ণৌ-কাশীর চালই ভালো লাগে। আমার মতে এবং বোধ হয় অনেকেরই মতে ভারতের শ্রেষ্ঠ তবলিয়া থেরকুয়া আহমাদ জান। আল্লারাখা চমৎকার বাজান, তবে বাঁয়া একটু কম বলে। বয়সের সঙ্গে হয়ত বাজনা জমবে।

২৭।৫।৫৮

যে ইকনমিক্স পৃথিবীতে যেভাবে চালু হচ্ছে সেটা আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না। রাশিয়া-চীনের ইকনমিক্স গ্রহণ করি, কিন্তু পুরোপুরি নয়। যেখানে দারিদ্র্য সেখানেই আমার মিল। আমার বিশ্বাস যে ভারত প্রভৃতি দেশের ইকনমিক্স ও সোসিয়লজি হোলো দারিদ্র্য। অপরিণত অবস্থার (under-developed) ইকনমিক্স হোলো সৃষ্টির পরম্পরা। এক হিসাবে নতুন কিছু নয়, যেটা হচ্ছে সেটা হবে কিংবা একটু বেশী করে হবে। সে দিক থেকে পরম্পরার গতিহার একটু বেশী, তার চেয়ে নয়। গতিহার একটু বেশী হলে ভালো। কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ কিছু নতুনত্ব নেই। কিন্তু (un-developed) অনুন্নতের ইতিহাস হোলো দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের পরিণতি সম্পূর্ণ নতুন রকমের। অপরিণতর ইকনমিক্সে দারিদ্র্য ঘোচে না, ক্রমোন্নতি ঘটে, তার ফলে অধিক অধিকতর হবে, উন্নত অবস্থা অ-পরিণত অবস্থার চেয়ে অধিক থাকবে, কিন্তু নীচু থাকবে আরো নীচুতে, তুলনায় অধিকতর নীচুতে। এই ধরনের উন্নতি আমার কাছে নিরর্থক। আমি সম্পূর্ণ নতুনত্ব চাই, যে নতুনত্ব kind-এর। গান্ধীজীর প্রাথমিক সমস্যা কিন্তু তাই। সে যাই হোক, আমি অনুন্নতর ক্রমবর্ধমান পরিণতি চাই না, দারিদ্র্য-মোচন চাই, সোজা কথা এই।

কিন্তু ভারতের কোনো ইকনমিষ্টই তা চান না। অমিয় দাশগুপ্ত থেকে অমর্ত্য সেন, সুখময় চক্রবর্তী পর্যন্ত। অবশ্য তাঁদের কথাই আমাদের ভারতবর্ষ মেনে নেবে। আমার কথা মানবে না; এই জন্য আমি ইকনমিষ্ট হতে পারলাম না।

২৯।৫।৫৮

হারীত (—কৃষ্ণ দেব) শহরের উচ্চতম তাপের দিনই আমার কাছে বেড়াতে আসে। একবার ১১৫ হয়েছিল, এবার ১১১। ইচ্ছে করে আসে না, আপনি আসে। অমৃতলাল বোসের সম্বন্ধে গল্প হয়। আমি শুনি, সেই বলে যায়। একবার জিজ্ঞাসা করলে, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, বড় ভয় হয়, যদি কিছু না মনে করেন।" অমৃতবাবু বল্লেন, 'নির্ভয়ে বলো।' অনেক সংকোচের পর হারীত প্রশ্ন করলে, 'আজ্ঞে আপনি অল্প বয়স থেকেই থিয়েটার করতেন...।' 'কাপড় নামিয়ে মই তুলে রাস্তায় রাস্তায় প্ল্যাকার্ড লাগাতুম।' 'তা নিশ্চয়ই লাগাতেন কিন্তু ওদের সঙ্গে তো মিলেছেন-মিশেছেন। কখনও কখনও একটু বেশী মিশে ফেলতেন না?' বলেই হারীত জিভ্ কাটলে। অমৃতবাবু উত্তর দিলেন, 'মিশেছি, খুবই মিশেছি। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের মতন বলতে পারি, I am surprised at my moderation।" (এটা ক্লাইভ না ওয়ারেন হেস্টিংস?)

অমৃতবাবুর সত্যবাদিতা ছিল অসাধারণ। তাঁর অবশ্য প্রধান গুণ তাঁর নাগরিকতা। অত্যন্ত ভালো জামা কাপড়, ফতুয়ার পাঞ্জাবি (সেটা পাঞ্জাবি নয়, মুচ্ছুদ্দীর মতন পোষাক), ধুতি চুনোট করা, আর চুলের কি অদ্ভুত পরিপাটি বাহার। সেই সঙ্গে অম্বুরী তামাক। আর চলত কথার ফোয়ারা। ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর সঙ্গে গল্প করেছি, কিছুতে আর ফুরোত না। একটু আদিরসাত্মক ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তা না হলে জমে না। রবীন্দ্রনাথের সে বালাই ছিল না। ছেলেবেলায় আদিরসাত্মক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু বোধ হয় মুখে বলেন নি, অন্ততঃ জানতাম না। আমি তাঁকে 'ওগো গোলাপবালা' গাইতে অনুরোধ করি— সে বহুদিন পূর্বে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'একটা বয়সের পর যেসব গান, কবিতা লিখতাম তার অনেকগুলিই ভুলে যাওয়া ভালো।' সে গানটি আর গাইলেন না।

৩১।৫।৫৮

পুরুষ কেবল, পরম, নিরালম্ব, নিরাশ্রয়ী; স্ত্রী সাম্বন্ধিক।

"It is man's function to be absolute, to act in an absolute fashion, or to give expression to the absolute. Woman's sphere lies in her relativity." Kierkegrad—The Banquet.

অতএব আত্মহত্যা পুরুষের, মেয়েদের আত্মঘাত। এর বেশী স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে বলা চলে না।

২।৬।৫৮

বই মধ্যে মধ্যে পড়ি, কিন্তু সে সম্বন্ধে লিখতে চাই না। আজ কিন্তু লিখছি। Duditsnev-এর Not by Bread Alone নিয়ে মাতামাতি করতে কানে বাজে। স্টালিন-পারিতোষিকের চেয়ে ভালো নিশ্চয়, কিন্তু এমন কি Sologub ও Sholokhov-এর চেয়ে ভালো। তা কারণ এই, অন্যাগুলোর সমস্যা সম্পূর্ণ মানবিক, দুদিন্সেহ নিতান্ত আপেক্ষিক।

Motherlant-র Desert Love আমার কাছে নিতান্ত উপাদেয়। চরিত্রাঙ্কন চমৎকার। সাধারণ লোকের মনস্তত্ত্ব এবং অ-সাধারণ লোকের বিচারবুদ্ধি, দুটিই নির্মমভাবে দেখিয়েছেন। পুরুষ-স্ত্রী সম্বন্ধের অত সূক্ষ্ম বিচার এক ফরাসীরাই পারে।

S. Beauvoire-এর Mandarin শেষ করতে পারলাম না। কি বলতে চাচ্ছেন বুঝি না। তবে অসম্ভব বুদ্ধিমতী।

পেয়ারীলালের দুভল্যুমে Last Phase শেষ করলাম। ভারী সুন্দর লাগল। চমৎকার লেখার কায়দা। কিন্তু একটা যেন খটকা বাধছে। গান্ধীর চরিত্রে কি কোন দোষ নেই? অমন নিভাঁজ পবিত্রতা যেন বিসদৃশ ঠেকে। গান্ধীর চরিত্রে ভুল স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু দোষ? সেটা নেই। গান্ধীর জীবনে যদি খৃষ্টানী গন্ধ থাকে এবং সেটাই স্বাভাবিক, তবে evil জিনিসটা কোথায় গেল? Last Phase-এ সুনীতির যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে, কিন্তু evil? হিন্দুদের মধ্যে evil নেই অবশ্য, কিন্তু গান্ধী কি বিশুদ্ধ হিন্দু?

Von Mises-এর Theory and History বুদ্ধিপ্রধান বই। কিন্তু বুদ্ধিমানের বই নয়। চটে লেখা। [A well-drafted petition for cold war]

Camus-র Fall অত্যন্ত, যাকে বলে, উজ্জ্বল লেখা। Fall কেন, Ascent বলাই ভালো। Judge Penitent উগ্র খৃষ্টান। Camus শেষে না খৃষ্টান, ধার্মিক হয়ে যান।

আজকাল বই পড়া, লেখার মধ্যে গড়পড়তা অভিজ্ঞতাই ফুটে ওঠে। এক হিসেবে ভালো। কিন্তু বিচারের পদ্ধতিটা কমছে মনে হোলো। অবশ্য বিচারের ফলটাই শেষ অবধি দাঁড়ায়। Gide-এর ডায়েরীতে অভিজ্ঞতার অংশই বেশি, যদিচ আদান-প্রদান, কথা-বার্তা, তর্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। Amiel-এর সবটাই অভিজ্ঞতা, নিছক অভিজ্ঞতা।

মোটামুটি দুই প্রকারের ডায়েরী হয়—অভিজ্ঞতাপ্রধান আর ঘটনাপ্রধান। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ একই ধরনের, সবই Montaigne থেকে। পার্থক্য উনিশ-বিশ।

নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রদত্ত Camus-র বক্তৃতা পড়লাম। ছোট্ট গাঢ়-সম্বদ্ধ এবং সব চেয়ে বড় কথা, সৎ ও sincere। সত্য আর স্বাধীনতা, এই দুটি জিনিসের প্রতি তাঁর প্রধান আগ্রহ। এই ধরনের অ-বাস্তব সংজ্ঞা তাঁর কাছে নিতান্ত বাস্তব, আত্মীয় হয়ে উঠস। Silence-টা কি? স্ব-অবলম্বী? একক? সব আঁধারের মধ্যে একটি আলো? একটি মানুষ একা—কথাটার কোনো মানে হয় না। কারণ সে অন্যের বিপক্ষে একা, বিপক্ষতা নিশ্চয়ই, কিন্তু সবটা নয়, প্রধানও নয়। উত্তীর্ণ হয়ে বাইরের মানুষ অতিক্রান্ত পুরুষ, তবেই স্বাধীন। সৎ বস্তুটি স্বাধীনতারই অঙ্গ।

* * *

Thomas Mann-কে Proust-এর সঙ্গে একাসনে বসাতে চাই না। Mann সম্পূর্ণ নতুন জগৎ সৃষ্টি করেন। Proust-ও অবশ্য তাই। কিন্তু Mann ঘটনার বাইরে থেকে শুরু, অন্তরে সমাপ্তি; Proust শুরু করেন ভেতর থেকে, এবং ভেতরেই শেষ। এই অন্তরের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিটা কী অপূর্ব। অবশ্য Death in Venice-এর দৃষ্টি অভ্যন্তরিক। শেষ নভেল Felix Krull, এ-যুগের Don Juan। Mann এবং Proust উভয়ই সৃষ্টি করেন। পুরানো টাইপ নয়, নতুন, অদ্ভুত টাইপ। রবীন্দ্রনাথ মনে হয় টাইপ সৃষ্টি করতে পারেননি। সে হিসেবে তিনি খর্ব। বাংলা দেশের, ভারতের শ্রেষ্ঠ নভেলিস্ট, তবু যেন কিছু খাটো। আসল কথা—রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথই বেশী, যতটা উচিত ছিল তার চেয়েও বেশী। অর্থাৎ, তিনি মোটেই Impersonal নন। এক দিন গোপনে স্বীকার করেছিলেন; "আমার সব চরিত্রই রাবীন্দ্রিক।"

১০।১১।৫৮

Boris Paste[illegible]-এর Dr. Zhivago পড়লাম। [illegible] এই যে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগল পড়তে। শেষ ক[illegible] এই যথেষ্ট।

Pasternak নিয়ে অত্যন্ত গোলমাল [illegible]। আমার বিশ্বাস সুইডিশ একাডে[illegible]তে cold war শুরু হোলো. তার পর থেকে সোভিয়েট সাহিত্যিকদের চূড়ান্ত অভদ্রতা। ফেউ লেগেছে বিস্তর। ভদ্রলোকের সহ্যশক্তি অসম্ভব। তিনি এই গালাগালি সত্ত্বেও দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন না। অবশ্য তাঁরাও তাঁকে মেরে ফেলেননি। পৃথিবীর মধ্যে যদি জঘন্যতম বস্তু থাকে ত সে কোল্ড ওয়ার!

বইটি কিন্তু ভালো, ও বিশেষ রকমের ভালো। অর্থাৎ, গত ত্রিশ বৎসরে যে-সব রাশিয়ান বই রাশিয়া থেকে বেরিয়েছে তার মধ্যে একাধিক বই পড়েছি, এবং তার প্রায় সবগুলিই অপদার্থ। সবই এক ছাঁচে ঢালা, এবং ছাঁচও নিতান্ত বাজে। কিন্তু এই বইখানির সম্পদ চরিত্রগত। এই হিসেবে বইটি ক্লাসিকাল।

কিন্তু একটা কথা মনে হয়। ১৯১৭ সালে বিপ্লব বাধল। সে-বিপ্লব ঠিক ক্লাসিকাল নয়, মত-গত। সে-মত সমগ্র মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মত-গত বিপ্লব পাস্টারনাকের মনে বসেনি, একটা আবছা গোছের ছায়া এসেছে মাত্র। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, অত বড় বিপ্লব লোকটির উপর দিয়ে আলতো আলতো এল, আর চলে গেল। বিপ্লবের নাস্তিমূলক দিকটাই চোখে পড়েছে।

শেষ দিকের কবিতাগুলি অনবদ্য। জিভাগোর অবনতিটাও অদ্ভুত, কিন্তু

লারা-র সঙ্গে প্রেম খাপছাড়া। নিসর্গ চিত্রগুলি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সেই দিক থেকে, খুবই লিরিক্যাল।

টলস্টয়, দস্তয়েফস্কী, তুর্গেনীভ, গর্কী প্রভৃতির লেখার সঙ্গে জিভাগো সমপর্যায়ে ফেলতে রাজি নই। আদৎ কথা—জিভাগো অবনতির ইতিহাস, অন্যগুলো পরিণতির। ওটা পাকবার পরের অবস্থা, সুন্দর দৃশ্যের মধ্যেও পচা গন্ধ। জিভাগো De-tumescence-এর চিহ্ন।

২৫।১১।৫৮

জওহা[illegible]র [illegible]পত্রের মধ্যে অন্যের লে[illegible] পত্রই [illegible]শী। সব মিলিয়ে [illegible]ত ত্রিশ-চল্লি[illegible] বছরের রাজকীয় ইতিহাস পা[illegible]য়া যায়। অবশ্য [illegible]খবর সব পুরা[illegible] কিন্তু ঐতিহা[illegible]ক মূল্য তার [illegible] বেশী। চিঠিগুলির মধ্যে গোটাকয়েক বিষয়গত, আর কয়েকটি ব্যক্তিগত। অবশ্য ঠিক নিছক ব্যক্তিগত নয়, কারণ সুভাষের সঙ্গে জওহারলালের বিবাদ প্রাথমিক, মেজাজগত বৈষম্যের সঙ্গে বিষয়গত বৈষম্য মিশে গেছে, যদিও জওহারলালের বাচনভঙ্গী একপ্রকার ব্যক্তিসম্পর্করহিত। লোদিয়ান-এর চিঠি কয়খানি রাজকীয় মনোভাবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তবে অবশ্য মনে হয় লোদিয়ান ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাইতেন না। অ-রাজকীয় চিঠির মধ্যে সেরা সরোজিনী নাইডুর, —এডোয়ার্ড টমসনের নয়, বোধ হয় রবীন্দ্রনাথেরও নয়। টমসন সাহেব বেশী কথা কন। মতিলাল ও গান্ধীর চিঠি চমৎকার, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। মতিলাল বুদ্ধিমান, এবং গান্ধী জ্ঞানী। জওহারলালের খান দু-এক চিঠি সত্যই অতুলনীয়। য়ুরোপ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের হয়ত তুলনা থাকতে পারে, কিন্তু এ-যুগে য়ুরোপের অমন বিশদতর বিচরণ ও ব্যাখ্যা ভারতবাসীর মধ্যে আর কারুর নেই। সে জওহারলাল কি এই জওহারলাল?

৩।১।৫৯

আমার মধ্যে এক মজার জিনিস লক্ষ্য করছি। চিন্তা আসছে, উঠছে, যাচ্ছে, কিন্তু প্রকাশ, ভাষা, বক্তব্য ছোট্ট। কেন এমন হোল? আগে ছিল না, এখন হচ্ছে। গোটা কয়েক কারণ টের পাচ্ছি:

(১) পৃথিবীর ধারাই তাই। ভাবনা সব পাতলা হয়ে যাচ্ছে, mass-culture গড়ে উঠেছে, এমন সব চিন্তা আসে না যাতে দানা বাঁধতে পারে। তাই ভাষা যেন যথার্থ রূপ পাচ্ছে না। আমার ভাষা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে।

কথাটা অবশ্য ঠিক, কিন্তু দুনিয়ার দুরবস্থা কি আমার স্বভাবে বেশী ধরা পড়ে?

(২) স্বাস্থ্যভঙ্গ। সত্য, কিন্তু সবটা নয়। চুপ করে থাকলে ভাবনা বরঞ্চ বেশীই ওঠে।

(৩) হয়ত আমার বলবার কথাই নেই। সেটা সম্ভব। আগে কি ছিল?

(৪) বাক্যহীন প্রতিবিম্ব, non-verbal image মানি। অ-বাকের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। যেটা ব্যক্ত নয় সেটা নেই—এ-কথা মানি না। বিশুদ্ধ

music কি? কথাবিহীন সুর ত নিশ্চয়ই আছে।

এ-বিষয়ে ভাবতে হবে।

১৩।৩।৫৯

ছোট্ট ছোট্ট কথাগুলি ফুটে ওঠে। ভাষার সংযোগ দীর্ঘ। অর্থাৎ সংযোগটাই দীর্ঘ, ভাষাটা নয়। ভাষা ছোট্ট, মন্ত্রের মতন। রবীন্দ্রনাথের সংযোগটাই প্রধান; উপনিষদের ভাষা মন্ত্রের মতন; গীতায় দুএর মিলন। বাঙলা ভাষায় কথা বেশী; অত্যন্ত বেশী; সংস্কৃতে নিতান্ত কম. অবশ্য সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের অনেকাংশ ছাড়া। সাহিত্যে অবশ্য বাঁধুনী বাঁধতেই হয়; তবু ভিন্ন ভিন্ন রীতি আছে, তার সেরা বিদর্ভরীতি। আর বাংলায় গৌড়ীয় রীতি!

আমার 'মনে এলো'র লেখা ঠিক সাহিত্য-পদবাচ্য নয়, কাটাকাটা, ছেঁড়া-ছেঁড়া লেখা। তার মধ্যেকার সংযোগ কম। তবে অবশ্য নতুন ধরনের সাহিত্য হতে পারে। ভাষার অন্তরে বক্তব্য, আছে. তার বেশী সংযোগ 'বক্তব্যে'র মধ্যে নেই।

আমার 'মনে এলো'র ভাষাটা কি, 'বক্তব্যে'র ভাষা তবু বুঝতে পারি। সংযোগ আর ভাষা এই দুএর মিশ্রণে বাক্। কত রকম বাক্ই না হতে পারে!

২৫।৪।৫৯

'লু' চলতে আরম্ভ হয়েছে। আলি-গাড়ের নিম গাছ সবুজে ভরে গেল। আবার সবুজ ফুলের গন্ধ। রাতের গন্ধ তেতে ওঠে। ছোয়াবেলা কাতারে কাতারে টিয়া পাখি উড়ছে। আমার মনে হয় টিয়া পাখি অ-ভারতীয়।

অনেক রাতে লাল-নীল আলোর আকাশ প্রদীপ উড়ে গেল। হাওয়াই জাহাজ নিশ্চয়। কয়েক বছর আগে এইখান দিয়ে একবার এসেছিলাম মনে পড়ে।

২৯।৪।৫৯

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সোপেনহরের মতামত কিন্তু গ্রহণ করি। বিশেষ কিছু রূঢ় মন্তব্য বলে ত মনে হয় না। শিশু-সন্ততি লালন-পালন করা, অর্থাৎ জাতির (species) ক্রিয়া ত' তাঁদেরই কর্তব্য! এবং মোটামুটি বলতে হয় যে এঁদের বয়স হলেও কথাবার্তায় একটু ছেলে-মানুষী। বয়সের অনুপাতে যেন তাঁদের প্রবীণতা হয়নি। এক-এক বিষয়ে দু-একজন ভারী পন্ডিত, বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধি-মতী, কিন্তু শেষ বেশ, গড়পড়তা তাঁরা যেন নাবালিকা, অর্থাৎ পঞ্চাশ হলেও পঁচিশ। একটা বয়সের পর যেন তারা আটকে যান, বাড়তে চান না। সে যাই হোক; মরে গেলে আবার যদি জন্মাতেই হয় তবে মেয়ে না হয়ে জন্মানই ভালো। অত কষ্ট, অত অত্যাচার সহ্য হবে না। অবশ্য জন্মাতে হবেই এমন কিছু বাধ্য-বাধকতা নেই।

* * *

মন্টু (দিলীপ) তখন ছেলেমানুষ। এখনও তাই, তবে তখন তার বয়স বছর কুড়ি হবে। তার থিয়েটার রোডের বাড়ীতে সকালে গিয়ে হাজির। মন্টু বরাবরই একই ধরনের, সে মেয়েদের সুখ্যাতি শুরু করে দিলে। আর সে কি সুখ্যাতি! আমি কিন্তু আস্তে, নম্রভাবে সে সুখ্যাতির ছোট একটা জবাব দিলাম। মন্টু বল্লে, 'আচ্ছা বেশ! রবিবাবু ত' মেয়েদের ভালো করেই জানেন, তিনি এখনই কোলকাতা এসেছেন, চল, তাঁর মতামত জেনে রাখাই ভালো। তাই চল!' যথা ইচ্ছা তথা কাজ, তখনই ট্যাক্সী নিয়ে গেলাম চিৎপুরে। ঘরে ঢুকেই মন্টু বল্লে. 'রবিবাবু কি কবিতা লিখছেন।' মন্টু ঝোঁকের মাথায়, ঠান্ডা মাথাতেও, কবিকে সামনেই রবিবাবু বলে ফেলত। রবিবাবু চোখ নামিয়ে বল্লেন, (এ রকম মেয়েলী চোখ নামান আর কারুর দেখিনি) 'আমাকে তুমি অত সন্দেহ কর কেন বলত দিলীপ?' জবাব না দিয়ে মন্টু অনর্গল বক্তৃতা চালালে—মেয়েদের মমতা, স্নেহ, দান, নম্রতা, আরো কত কি! আমি ছিলাম চুপ করে বসে। রবিবাবুর তখন আমের থালা সাজান। তাঁকে আম খেতে, আম শুঁখতে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না যে কবি আম খেতেন। সে যাই হোক,—আমাদের সামনে আম তুলে ধরলেন, জোর করে খাওয়ালেন, তারপর স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বল্লেন, একটি কথা এই: 'জীব জগতে মেয়েরা বীজ বহন করে, লালন করে, সেবা করে, সেখানে পুরুষ-দের কাজ সামান্য। সৃষ্টির কাজে (creative work) মেয়েরা কিন্তু বীজ বপন করে, পুরুষেরা করে পালন।' (এই কথাটি বহুবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন)। আমি ত শুনে উল্লসিত। মন্টু কিন্তু বলতে লাগল, 'দেখলে ত' রবিবাবু কি বল্লেন! ঠিক আমার কথা যেন কপি করছেন। একেই না বলে কবি!' ইত্যাদি, প্রভৃতি—আজ ভাবছি সেদিনের দুপুর-বেলায় একই লোক দুজনকে দু'রকম রায় দিলেন? না একই মতের?

হাতের গঠন-সৌষ্ঠব কীনস (Keynes)-এর চোখে খুবই পড়ত। রবিবাবুর ছাড়া আমার কাছে অন্য মানুষের হাতের গড়ন ধরা পড়ে না। অথচ ছবিতে ডুরার, দ্য ভিঞ্চি, এল গ্রেকো, রোঁদার হাত আমাকে পাগল করে দেয়। এল গ্রেকোর হাত লম্বা, শিখার মতন' দ্য ভিঞ্চির হাত মেয়েলী, ভগবানের নির্দেশে নয়, মানুষের অভিযোগে রোঁদার হাত ভগবানেরই। রবিবাবুর হাতে কাজ করা যায় না, অভিজাত শ্রেণীর, প্রত্যেকটি যেন রেখায়িত হয়।

হাঁস দেখেছি রামেশ্বরম আর লুভ-এ। সম্পূর্ণ [illegible] ধরণের। একটা অ-পার্থিব, [illegible] ব। বুদ্ধ-মূর্তিও প্রতি অঙ্গে হাসি—হাসি শান্তিতে, করুণাতে [illegible] গেছে। রুগার্থের চিংড়ী মাছওয়ালা আনন্দে ফেটে পড়ে কিন্তু সে পার্থিব।

*

অনেক দৃশ্য ভেসে এলো। অটারলু-র শরৎ-হেমন্তের রঙের ভিয়ান, অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চের গাছ আর মাঠ, কেম্ব্রিজের ব্যাকথ, King's Chapal ফ্রান্সের Notre Dame আর Chartres, ইটালীর রেণার পাস, টিরোলের ইনস-ব্রুক, প্রাগ-এর পাহাড়, রাতের হাওয়াই জাহাজ, কায়রোর আলো—আরো কত কি ওদেশের। আরো কত এদেশের! এ সব মনে এলো নয়, এগুলো বর্তমানের। লিখতে গেলে মনে এলো, হয়ত মনের সর্বপ্রকার সাহিত্যিক ভাষাই তাই, কিন্তু যখন আসে তখন সেগুলিই মন, মনে এলো নয়, মনে পড়ে নয়, মনে ওঠে নয়। এগুলো মন, মনের নয়। ভাবতে গেলে, লিখতে গেলে একটু পৃথক হয়েই যায়। বিশেষ থেকে বিশেষণ। ভিটগেনস্টাইনের মধ্যে তর্কই বেশী!

* * *

রেডিওর মারফৎ বড়ে গোলাম আলির গান শুনলাম দুবার। অনেক আগে শুনেছিলাম। এবার মন দিয়ে শুনতে পেলাম।। আমার যন্ত্রটাও ভালো। আর গোলাম আলি সত্যিই ভালো গান। অত্যন্ত সুকণ্ঠ. নিতান্ত মেজাজী, প্রত্যেকটি Combination সম্পূর্ণ, কথা ও সুরের, বাক্য ও রাগের চমৎকার সমাবেশ, গঠন সুচারু, ধরার কায়দা অপূর্ব, বন্দেশ চমৎকার।

[ক্রমশ]

বাংলা সাহিত্যে জীবনী-নাটক

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বিংশ শত[illegible] বাংলা নাট্য-সাহিত্যের অ[illegible]কটি [illegible]শিষ্ট রূপ প্রকাশ পায়, তাহা জীবনী-নাটক। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ রোমাণ্টিক নাটক; ঐতিহাসিক জীবন-চরিত ইহাদের মধ্য দিয়া কীর্তিত হইলেও ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি ইহাদের মধ্যে নিষ্ঠা প্রকাশ করা হয় নাই, বরং উচ্ছ্বাস ও আবেগমূলক তথ্য ও অতথ্যে পূর্ণ হইয়া ইহার কতকগুলি সাময়িক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু জীবনী-নাটক প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট কতকগুলি জীবন-চরিতই ভিত্তি করা হইয়াছে। এই চরিত্রগুলি সুদূর ঐতিহাসিক লোক হইতে আসে নাই, বরং তাহার পরিবর্তে বহুলাংশে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত জগৎ ও জীবন আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে; সেইজন্য ইহাদের রচনায় কোন অতথ্য কিংবা যুক্তিহীন হৃদয়াবেগ প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। বাংলার মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব অবলম্বন করিয়া বিপুল এক জীবনী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সর্বাংশেই যুক্তি ও বিচারভিত্তিক না হইলেও যে বিশেষ সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত এবং প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া সহজেই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতেও যে জীবনী-নাটক কয়খানি রচিত হইয়াছিল, তাহাও সুগোচিত যুক্তি ও বিচারকেই আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে; সমসাময়িক ইতিহাসাশ্রিত রোমাণ্টিক নাটকের ধারা হইতে ইহারা স্বতন্ত্র। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ যে 'প্রতাপাদিত্য' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে 'রাণা প্রতাপ' ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যবর্তী কালে রচিত জীবনী-নাটক কয়খানি ইহা অপেক্ষা সকল বিষয়েই স্বাতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে যে কয়টি জীবনী আশ্রয় করা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজ হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মধ্যে সমাজ-চেতনা যতখানি শক্তিশালী ছিল, রাষ্ট্রীয় চেতনা ততখানি শক্তিশালী ছিল না। এই সমাজ-চেতনার উপরই রাষ্ট্রীয় চেতনা ক্রমে শক্তিলাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তথাপি শিক্ষা এবং সমাজ-সম্পর্কিত চেতনার ভিতর দিয়াই পরিণামে ইহার উন্মেষ হইয়াছিল। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মনীষা সমাজ ও সাহিত্য-চিন্তার ভিতর দিয়াই বিকাশলাভ করিয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের নায়ক মাত্রই রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী—রাজাবাদশাহ। চৈতন্যদেব, তাঁহার পার্ষদ, কিংবা অনুরূপ ভারতীয় অন্যান্য কোন কোন ধর্মগুরুকে অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি নাটক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগেও রচিত হইয়াছিল, অলৌকিকতা-বিশ্বাসকে আশ্রয় করিবার ফলে তাঁহাদের জীবনীভিত্তিক নাটকগুলিও পৌরাণিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে—আধুনিক জীবনী-নাটকের রস তাহাদের মধ্য দিয়াও সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। এমন কি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ও কর্ম ঊনবিংশ শতাব্দীরই বিষয় হইলেও ক্রমে তাঁহার কর্মজীবন ও সাধনা সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী জন্মলাভ করিবার ফলে তাঁহার জীবনভিত্তিক যে কয়খানি নাটক সাম্প্রতিক কালে রচিত হইয়াছে, তাহাও পৌরাণিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে জীবনী-নাটকের কথা এই স্থলে আলোচনা করিতে চাই, তাহার সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী-সম্পর্কিত নাটকগুলির এই জন্যই কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না; ইহারা রচনার দিক দিয়া আধুনিকতম হইলেও প্রেরণার দিক দিয়া মধ্যযুগীয়। আধুনিকতম জীবনী-নাটকের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহারা মানুষেরই লৌকিক জীবন ভিত্তি করিয়া রচিত, কোন প্রকার অলৌকিকতা বা mysticism-এর কথা তাহাদের মধ্যে নাই। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে এ দেশের সমাজ অলৌকিকতা-সিদ্ধ ভগবান্ বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকে; সাধারণ মানবিক নিয়মে তাঁহার জীবন উদ্‌যাপিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। সেইজন্য কিছুদিন পূর্বে, এমন কি ১৯৪৮ সনে তাঁহার জীবন ভিত্তি করিয়া তারকনাথ মুখোপাধ্যায় যখন একখানি নাটক রচনা করিয়া ব[illegible] অধুনালুপ্ত রঙ্গমঞ্চ 'কালিকা থিয়েটারে' অভিনয় করাইবার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তখন রামকৃষ্ণের ভক্ত ও শিষ্য সম্প্রদায় কর্তৃক এই বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়; কারণ, তিনি পরমপুরুষ ভগবান, তাঁহার জীবন লৌকিক জীবন নহে, নিগূঢ় ধর্মীয় তাৎপর্যব্যঞ্জক, সুতরাং রঙ্গমঞ্চে তাহা অভিনেয় নহে। এই আপত্তির বিরুদ্ধে রঙ্গমঞ্চ পরিচালক ও নাট্যকারকে সেদিন নতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। নাট্যোল্লিখিত সকল

চরিত্রেরই নাম ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া সেদিন তাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। তারপর দর্শকগণ যখন উক্ত নাটকের মধ্য হইতে লৌকিকতার পরিবর্তে অলৌকিকতারই আস্বাদ লাভ করিল, নাটকের নায়ককে প্রকৃতই মানুষের পরিবর্তে ভগবান্ বলিয়াই প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহারা তৃপ্তিলাভ করিল। ইহার পর হইতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী আশ্রয় করিয়া এই যুগেও যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল চরিত্রেরই নাম উল্লেখ করিবার পথে কোন অন্তরায় অনুভব করে নাই। ধর্ম সম্পর্কিত যে গোঁড়ামির ভাব ছিল, পরমহংসদেবের জীবনী-সম্পর্কিত অলৌকিকতা প্রচারের মধ্য-দিয়াই তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সম্পর্কিত যে নাটক অদ্যাবধি রচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যথার্থ জীবনী-নাটকের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। অথচ নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে তাঁহার জীবন ও সাধনা অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর চরিত্র রামপ্রসাদের জীবন অবলম্বন করিয়াও নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে দুই একখানি নাটক রচিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাও জীবনী-নাটকের পর্যায়ভুক্ত করিবার উপায় নাই; যে কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর চরিত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন অবলম্বন করিয়া রচিত নাটক জীবনী-নাটকের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না, সেই জন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর চরিত্র রামপ্রসাদের জীবন অবলম্বন করিয়া রচিত নাটকও জীবনী-নাটক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তাঁহার জীবনের সঙ্গেও এমন কতকগুলি অলৌকিক বৃত্তান্ত আসিয়া জড়িত হইয়াছে যে, তাহাদিগের দ্বারা কোন বাস্তবধর্মী নাটক রচিত হওয়া অসম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর চরিত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী অবলম্বন করিয়াও সাম্প্রতিক কালে ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাহাও অনৈতিহাসিক তথ্য দ্বারা ভারাক্রান্ত বলিয়া রোমান্টিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে; জীবনী-নাটকের বিশেষত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

সুতরাং জীবনী-নাটক বলিয়া বাংলা সাহিত্যে যাহা রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। যে দেশের সাহিত্যে যথার্থ ঐতিহাসিক নাটকও রচিত হইতে পারে নাই, সেই দেশে জীবনী-নাটক বহুল পরিমাণে রচিত হইবে, তাহা আশা করা অসঙ্গত। কারণ, এই জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম ঐতিহাসিকতাবোধ থাকিলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটক রচনাই রোমান্টিক নাটকে পর্যবসিত হইত না। ঐতিহাসিক নাটকের সূত্র ধরিয়াই জীবনী-নাটক রচিত হইয়া থাকে। কারণ জীবনী-নাটকও একদিক দিয়া ঐতিহাসিক নাটকই। তবে ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে প্রধানতঃ রাজনৈতিক চরিত্র অর্থাৎ রাজা বাদশাহ কিংবা তাহাদের সম্পর্কিত জীবনসমূহই প্রাধান্য লাভ করে। কারণ, আমাদের দেশের ইতিহাস রাজা বাদশাহ-রই ইতিহাস মাত্র, তাঁহাদের সিংহাসন লইয়া সংগ্রামের বৃত্তান্ত ব্যতীত এদেশের ইতিহাস আর কিছুই লিখিয়া রাখে নাই, সুতরাং এই ইতিহাস পাঠ করিয়া যাঁহারা নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ইঁহাদেরই জীবন আশ্রয় করিয়া নাট্য-কাহিনী পরিকল্পনা করিয়া থাকেন; কিন্তু জীবনী-নাটক এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে কয়খানি রচিত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই কোন যুগেরই এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই। বরং তাহার পরিবর্তে সামাজিক মানুষেরই চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক প্রকৃতির জীবন-চরিত রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, জীবনী-নাটক প্রধানতঃ তাহা হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে ইহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবন-চরিতের নাট্যরূপ মাত্র। জীবন চরিতের অতিরিক্ত ইহাদের মধ্যে কোন নূতন তথ্য নাই। সুতরাং ইহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের জীবনী-সম্পর্কিত নূতন কোন উপকরণ উপহার দেওয়া হয় নাই; বরং বিস্তৃত জীবন-কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রচলিত জীবনী (biography) হইতে যে ইহাদের তথ্যগত মূল্য কোনদিক দিয়াই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে—কেবলমাত্র কোন কোন বিষয় যাহা পাঠ্য মাত্র ছিল, তাহা রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া দৃশ্য হইয়াছে, এই মাত্র। সুতরাং ইহাদিগকে জীবনী-নাটক বলিয়া উল্লেখ করিলেও এমন কথাও মনে হইতে পারে যে, ইহাদের মধ্যে যতখানি 'নাটক' আছে, ততখানিও 'জীবনী' নাই। এমন কি, বাংলা রোমান্টিক কিংবা ঐতিহাসিক নাটক অপেক্ষা ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য যে সর্বদাই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও স্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, রোমান্টিক নাটক রচনায় নাট্যকারগণ কাহিনীর দিক দিয়া যে স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে তাঁহারা তাহা পান নাই; প্রতিপদেই জীবন-চরিতকে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইয়াছে। অথচ প্রত্যেক জীবনীতেই যে নাটকীয় অংশ সুপ্রচুর আছে, তাহাও সত্য নহে; যে জীবনীতে তাহা যে পরিমাণ আছে, তাহাই নাট্যকারকে কাজে লাগাইতে হইয়াছে; স্বাধীনভাবে নূতন নূতন পরিবেশ কল্পনা করিয়া তাহাতে নাটকীয় অবকাশ সৃষ্টি [illegible]র সুযোগ পান নাই। মৌলিক সা[illegible]ক নাটক রচনাতেও এই বিষয়ে যে সুযোগ পাওয়া যায়, জীবনী-নাটকের কাহিনীতে তাহা পাওয়া যায় না।

একদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কেও কোন কোন বিষয়ে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, জীবনী-নাটক সম্পর্কে তাহাও পাওয়া যায় না। কারণ, ইতিহাস পরিবেষিত তথ্যাবলীর মধ্যে মধ্যে যে ফাঁকটুকু পড়ে, তাহা ঐতিহাসিক নাটকের নাট্যকার ইচ্ছামত পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, এই বিষয়ে কেবলমাত্র তাঁহার চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়; কিন্তু জীবনী-নাটকের নাট্যকারের চরিত্র-সম্পর্কিত কাল্পনিক কোন কাহিনীর আশ্রয় লইবার উপায় থাকে না, তাহা হইলে পরিচিত চরিত্রগুলি সম্পর্কে যে সংস্কার সাধারণের মধ্যে গড়িয়া উঠে, তাহাতে আঘাত লাগে। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দাতা বলিয়া পরিচিত থাকিলেও তাঁহার দানশীলতা সম্পর্কে কোন কাল্পনিক কাহিনী তাঁহার জীবনী-নাট্যকারের রচনা করিবার অধিকার নাই; অথচ ঐতিহাসিক নাট্যকার কেবলমাত্র ঐতিহাসিক পরিবেশ রক্ষা করিয়া তাহাও কল্পনা হইতে রচনা করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবনী-নাটক রচনার দায়িত্ব অনেক বেশী, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নাট্যকারগণ নাটক রচনায় তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কিত যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অভ্যাস আয়ত্ত করিবার ফলে জীবনী-নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করিতে পারেন না। জীবনী-নাটক শিক্ষাগত বা academic প্রকৃতির রচনা, ইহাতে জীবনরস অপেক্ষা তথ্য অধিক

প্রকাশ পায়; সেইজন্য কোন জীবনী-নাটকই বাংলা সাহিত্যে জীবন-চরিতকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। তবে এ কথা সত্য ইউরোপীয় সাহিত্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এমিল জোলার জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়া যে নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবন-চরিত অপেক্ষাও শক্তিশালী রচনা বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে।

জীবনীমূলক রচনার আর একটি প্রধান ত্রুটি প্রায়ই দেখা যায় যে, ইহা বিশেষ কোন জীবনের একটিমাত্র পরম নাটকীয় [illegible] আশ্রয় করিয়া রচিত হইবার পরিবর্তে জীবনের একটি বিরাট অংশ লইয়াই রচিত হইয়াছে। তাহার ফলে ইহাদের মধ্যে কালগত ঐক্য যেমন রক্ষা পাইতে পারে না, তেমনই ঘটনাগত ঐক্যও রক্ষা পাইতে পারে না। অথচ এই দুইটি বিষয়ই নাটকের স্বার্থরক্ষার জন্য যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। জীবনী-নাটকে যাঁহার চরিত্র কীর্তিত হয়, তাঁহার জীবন স্বভাবতই বৈচিত্র্যবহুল হইয়া থাকে। সর্বদাই যে তাঁহার কর্ম একলক্ষ্যমুখী হইয়া থাকে, তাহাও নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথাই যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, তাঁহার বিচিত্র কর্মমুখী জীবনের বিভিন্ন স্বতন্ত্র ধারা ছিল। তিনি আদর্শ মাতৃভক্ত, তিনি পরদুঃখকাতর, স্ত্রীস্বাধীনতা ও বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, তিনি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ইত্যাদি। তাঁহার এই সকল বিভিন্ন গুণ একই নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করাই বাংলা জীবনী-নাট্যকারের উদ্দেশ্য। এই কথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল বিভিন্ন গুণের পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি গুণ আশ্রয় করিয়া যদি একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হয়, তবে নাট্যকাহিনীর উদ্দেশ্যগত ঐক্য যেমন রক্ষা পায়, সবগুলি বিষয়কে এক সঙ্গে গ্রহণ করিলে, তাহা তেমন রক্ষা পাইতে পারে না—এই জন্য নাটক হিসাবে কাহিনী শক্তিহীন হইয়া পড়ে। অথচ বাংলা-জীবনী-নাট্যকারের ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ, ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি সম্পর্কে কয়েকটি যে কাহিনী প্রচলিত আছে, কেবলমাত্র তাহা ভিত্তি করিলে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হইতে পারে না। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এতই পরিচিত যে, তাঁহার সম্পর্কে নূতন কিছু কাহিনী যোগ করিয়া তাঁহার মাতৃভক্তির বিভিন্নমুখী পরিচয় প্রকাশ করিতে গেলে, পাঠকসমাজ তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। এমন কি, পৌরাণিক নাটক সম্পর্কেও কেবলমাত্র প্রচলিত কাহিনীই গৃহীত হইয়া থাকে—দাতা কর্ণের দান সম্পর্কে যে কয়টি কাহিনী পুরাণে কীর্তিত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত একটি কাহিনীও পৌরাণিক নাটকে গ্রহণ করিবার উপায় নাই। ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া যাহা জন্মলাভ করে, ঐতিহ্যের সূত্র ধরিয়াই তাহার অনুসরণ করিতে হয়। পৌরাণিক নাটক রোমান্টিক জগতের কাহিনী বলিয়া ইহাতে কল্পনার সংমিশ্রণ করিয়া ঐতিহ্যানুসারী বিবরণকেও পল্লবিত করা গেলেও জীবনী-নাটকে তাহা করিবার একেবারেই অধিকার থাকে না। সেই জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কেবলমাত্র মাতৃভক্তির বিষয় অবলম্বন করিয়া কোন পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হইতে পারে না। বাধ্য হইয়া নাট্যকারকে তাঁহার জীবনের অন্যান্য উপকরণ ইহার মধ্যে আনিয়া যুক্ত করিতে হয়। তাহার ফলে নাটকে উদ্দেশ্যগত ঐক্য থাকে না। সুতরাং ইহা দ্বারা নাটকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ ইহা দ্বারা যাহা হয়, তাহা নাটক নহে। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইতে পারে, জীবনী-নাটকের মধ্যে কোন জীবনচরিতের খণ্ডিত কোন কোন অংশ থাকিলেও তাহা জীবনীই—নাটক নহে—কেবলমাত্র নাট্যাকারে পরিবেশিত জীবনীর তথ্য, সেই তথ্যও সম্পূর্ণ নহে; কারণ আনুপূর্বিক জীবনকে কোন নাটকেরই উপজীব্য করিবার উপায় নাই। সুতরাং এই কথাই সত্য যে, জীবনী-নাটকে আমাদের জীবনী-পাঠের যেমন জ্ঞান পূর্ণ হয় না, তেমনই নাটকের আনন্দও পরিপূর্ণভাবে লাভ করিতে পারা যায় না।

নাটক মাত্রেরই প্রাণ ইহার দ্বন্দ্ব; যে কাহিনীর মধ্যে পরস্পর বিপরীত দুইটি আদর্শ বা স্বার্থের দ্বন্দ্ব নাই, তাহা নাটক নহে, তাহা জীবন-পাঁচালী। জীবন-পাঁচালী যে নাটক নহে, তাহা পূর্বেও বলিয়াছি। জীবনচরিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিলেও, সেই দ্বন্দ্ব সর্বদাই যে নাটকীয় পরিচয় লাভ করিতে পারে, তাহা নহে। বিশেষতঃ যে জীবনীর মধ্য দিয়া বিভিন্নমুখী কর্মের সন্ধান দেওয়া হয়, তাহাতে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, তাহাও বিভিন্নমুখী হইতে বাধ্য। কিন্তু নাটকীয় কাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্বের দিক দিয়াও যদি ঐক্য না থাকে, তবে তাহা যে সক্রিয় হইতে পারে না, তাহাও সত্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিভিন্ন লোকহিতকর কার্যে বিভিন্ন দিক হইতে বাধা পাইয়াছেন, সমাজের বিভিন্ন প্রকৃতির স্বার্থকে আঘাত করিয়া তাঁহার সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে; সুতরাং তাঁহার জীবনী-ভিত্তিক নাটকের মধ্যেও একটি অখণ্ড দ্বন্দ্বের শক্তি সঞ্চারিত করা সম্ভব নহে; এইভাবে নাটকীয় বিষয়বস্তুও দৃঢ়-সংবদ্ধ হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় না, নিতান্ত শিথিলবন্ধ হইয়া পড়ে। জীবনী-নাটকের এই একটি প্রধান ত্রুটি প্রায় অপরিহার্যরূপেই দেখা যায়। শিথিলবন্ধ কতকগুলি চিত্রের সমাবেশে জীবনী-নাটক প্রধানত রচিত হয়, নাটকের বিষয়বস্তু এখানে একটি পরিচিত জীবনীকে অনুসরণ করে; স্বাধীনভাবে স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে না বলিয়া নিজের মধ্যে একটি অখণ্ডতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং নাটক-রূপে এখানেও ইহার ত্রুটি প্রকাশ পায়।

বাংলা সাহিত্যে যে সামান্য কয়খানি জীবনী-নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় কোনখানিই উপরোক্ত ত্রুটি হইতে মুক্ত নহে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের জীবনচরিতই প্রধানতঃ বাংলা জীবনী-নাটকের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হইয়াছে। পরমহংসদেবের জীবনী লইয়া সাম্প্রতিক কালে যে একাধিক নাটক রচিত হইয়াছে সে সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তাহা পৌরাণিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত তিন জন মনীষীকে অবলম্বন করিয়া যে নাটক কয়খানি রচিত হইয়াছে, তাহার সব কয়খানিতেই উক্ত জীবনীসমূহকে প্রায় জন্ম হইতে না হইলেও, কৈশোর বা যৌবনকাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অবলম্বন করা হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকালে বিভিন্নমুখী কর্ম-ধারার পরিচয়ে ইহারা বিচিত্র হইয়াছে [illegible] সত্য, কিন্তু নাটকীয় গুণ ইহাদের মধ্য দিয়া কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমাদের আলোচনার বিষয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দুই-একটি জীবনীর খণ্ডাংশ অবলম্বন করিয়া সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দুই-একটি একাঙ্ক নাটকও রচিত হইয়াছে। এক-দিক দিয়া বলিতে গেলে জীবনচরিত হইতে বিষয়বস্তু আহরণ করিয়া যত

সার্থক একাঙ্ক নাটক রচনার সুযোগ পাওয়া যায়, পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার সুযোগ তত পাওয়া যায় না। কারণ, একাঙ্ক নাটক সমগ্র জীবনীর একটি মাত্র নাটকীয় ঘটনা বা বিষয় লইয়া রচিত হইতে পারে। প্রত্যেক কর্মী কিংবা সাধকের জীবনে এই প্রকার প্রচুর অবকাশ আছে। জীবনী হইতে কেবলমাত্র সেই বিষয়গুলি যথাযথ সন্ধান করিয়া লইতে পারিলে তাহা দ্বারা সার্থক একাঙ্ক নাটক রচিত হইবার পথে ভাব কিংবা আঙ্গিকগত কোন বাধা থাকিতে পারে না। কিন্তু এই বিষয়ে এই পর্যন্ত যে প্রয়াস দেখা যায়, তাহা যে খুব ব্যাপক, তাহা আজও বলিতে পারা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দী হইতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক জীবনচরিত রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে; ইহাদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মজীবনী' ইত্যাদি রচনা আত্মজীবনী (autobiography) মূলক। এই শ্রেণীর রচনা আধুনিক কোন জীবনী-নাটকের অবলম্বন হয় নাই, বিশেষতঃ ইহাদের প্রত্যেকেরই জীবন প্রধানতঃ ভাবমূলক, কর্মমূলক নহে—সুতরাং ইহাদের সাধনায় ভাব-গভীরতা যতই থাকুক না কেন, কর্মের বৈচিত্র্য নাই: সেই জন্য জীবনী-নাট্যকারের দৃষ্টি ইহাদের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' এবং যোগেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', 'আত্মজীবনী' শ্রেণীর রচনা নহে, কিন্তু তথ্য পরিবেশনের দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যে এই দুইখানি জীবনচরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। এই দুইখানি জীবনচরিতই মুখ্যতঃ আধুনিক জীবনী-নাটকের অবলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন সম্পর্কেও বিস্তৃত তথ্য সংগৃহীত হইয়া ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবন ও ভাব এবং জ্ঞানের গভীরতার দিক দিয়াই নহে, প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়াও সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সেই জন্য তাঁহার জীবনও একখানি উল্লেখযোগ্য জীবনী-নাটকের অবলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবনী-নাটকে বিষয়-বৈচিত্র্য নাই; দুইজন সমাজ-সংস্কারক এবং একজন জীবনদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত ভাববিলাসী কবির জীবন অবলম্বন করিয়াই মাত্র আধুনিককালে তিন-চারিখানি জীবনী-নাটক বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র একখানি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

আরও একটি [illegible] এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, বাংলা সাহিত্যে যাঁহারা এই সামান্য কয়খানি জীবনী-নাটকও রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই সুপরিচিত নাট্যকার নহেন, বরং কথা-সাহিত্যিক। সুতরাং দেখা যায়, বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে এই সংস্কার গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

বলুন তো কী?

প্রশ্ন

১। সিনেমা কত বৎসরের পুরোনো ব্যবসা?

২। মানুষের মাংসপেশী কোন সময়ে খুব [illegible] শালী হয়ে ওঠে?

৩। বন্যজন্তুরা বনের সাধারণ অবস্থায় না চিড়িয়াখানায় বেশীদিন বাঁচে?

৪। এক পাউণ্ড তামাক থেকে কটা সিগারেট তৈরী হয়?

৫। কোন্ জন্তু সব চেয়ে বেশী দূর পর্যন্ত দৌড়তে পারে?

৬। চারটি লাঙ্গুলহীন বানরের নাম করতে পারেন?

৭। বৈজ্ঞানিকদের মতে এক-একটা স্বপ্ন গড়পড়তা কতক্ষণ থাকে?

৮। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ও ব্যবহৃত বাদাম কোনটি?

[উত্তর অন্যত্র দেখুন]

শকুন

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

সকাল হলো। আকাশে মেঘ ছিল না। বাতাস বইছিল না। ভরা জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড প্রখর তাপ মানুষটাকে পুড়িয়ে দিল। সে ঈষৎ নড়ে চড়ে চোখ খুলল। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে চেয়ে দেখল, না, আকাশে একটা মেঘ-ও নেই।

নিজের বমিতে, নিজের ময়লাতে তার ঘেন্না করছিল। সে সরে যেতে চাইল। কিন্তু শরীরটাকে নড়াবার মতো এতটুকু শক্তি-ও পেল না। বুকের কাছে, গলার কাছে কিসের আঠা তার শরীরের সঙ্গে জামাটাকে জুড়ে রেখেছে।

বমি। সে মনে করতে পারল, সে কাল যতবার বমি করেছে, উঠে গিয়ে বমি ফেলবার শক্তি ছিল না। তাই সেই দুর্গন্ধ, সেই ময়লা তার-ই শরীরকে নোংরা করেছে।

দূরে একটা গাছ। ঐ গাছটার তলায় গেলে সে একটু ছায়া পায়। কিন্তু সে কি যেতে পারবে? তার শরীরে কি শক্তি আছে?

সে কাঁদতে চাইল। চোখ ফেটে জল এল না। শুধু, চোখের মণিটা বিস্ফারিত হয়ে কুঁচকে একটা জ্বালার সৃষ্টি করল।

—হা ভগবান! নিজের মাথায় হাত চাপড়ে, মুখটা মাটিতে ঘসে সে কাঁদতে চাইছিল। সে চীৎকার করতে চাইছিল। সে নিজের গলাটা দূরে পাঠিয়ে দিতে চাইছিল। তার গলায় স্বর ছিল না। তার মাথায়, মুখে ধুলো। তার জামা-কাপড় নোংরায় ঘিনঘিনে। পায়ের কাছে পেতলের ঘটিটা সে দেখতে পেয়েছিল। ঘটিটায় কিছু ছিল না। সে যখন পেটের যন্ত্রণায় পা ছুঁড়েছিল, ঘটি উলটে [illegible]টুকু জল মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গীদের প্রাণভরে গালি পাড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল।

গ্রাম ছেড়ে কংকালীতলার মাঠে নেমে তার যখন অসুখ শুরু হলো, তারা ভয় পেয়েছিল। তারা তার দিকে চেয়ে উবু হয়ে বসেছিল।

তখন রাত। লণ্ঠন জেবলে তারা ধোঁয়া-ওঠা আলোয় তার মুখ দেখতে চেষ্টা করছিল। তারা ভাবছিল এই এই কলেরার রোগী নিয়ে তারা কোথায় যাবে।

কাছে পিঠে গ্রাম নেই। এই মাঠের ধারে কাছে কোন দীঘি নেই। এ মাঠে গরু চরে না। এই মাঠটা রাতে রাতে হাঁটলে তারা সকালে খাগড়াঘাট পৌঁছতে পারত।

তার অসুখটা তাদের ভয় দেখাল। পেটের ব্যথা, বমি এবং দাস্ত। হাতে পায়ে [illegible] খিঁচে ঝিম মেরে থাকা। থেকে থেকে কাতরানি। রাত হয়েছিল। দূরে, অনেক দূরে কোথায় আগুন দেখা যাচ্ছিল। উদ্ধব আর প্রসাদ সেদিকে সভয়ে তাকিয়েছিল। ওখানে কঙ্কালীতলার বিখ্যাত শ্মশান। সে শ্মশান তারা দুপুরে পেরিয়ে এসেছে। ঐ শ্মশানে দিনে রাতে চিতা নেভে না। ঐ শ্মশানে পোড়ালে অক্ষয় স্বর্গ হয়। ঐ স্বর্গবাসটা উপরিলাভ। স্বর্গের প্রলোভন না থাকলে-ও গ্রামের মানুষ ঐ শ্মশানেই

আসত। কাছে পিঠে আর শ্মশান নেই। সংকীর্ণ খালটি শ্মশানের ছাই ও পোড়া-কাঠে বুজে এসেছে। তবু-ও তাদের জন্য উপায় নেই।

দিনের বেলা তারা দেখেছিল শ্মশানে মাদুর, ভাঙা কলসী, বালিশের তুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে। একজন স্থূল-শরীর প্রৌঢ়ার কালো, কুৎসিত চেহারাটাকে স্নান করাতে দেখেছিল তারা।

অসুস্থ মানুষটার কাতরানি শুনতে শুনতে তাদের চোখ ওদিকে চলে যাচ্ছিল। তারা কি ভাবছিল ঐ দিক থেকে কোন প্রেত তাদের দেখতে পাচ্ছে?

শকুনের বাচ্চা কোথায় কাঁদছিল চাঁ্যা চাঁ্যা করে। তারা কি অমানুষী জগতের এই শব্দে ভয় পেয়েছিল? তারা কি শেয়ালের ডাক শুনে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল?

এই মানুষটা নারিকেলায় জল চাইছিল। এরা তার থেকে সভয়ে সরে যাচ্ছিল। এ বুঝতে পারছিল এরা পালাবে। সকাল হলে-ই। এ জানছিল একে এইভাবে মরতে রেখে পালালে, নিজেদের গাঁয়ে গিয়ে এরা মুস্কিলে পড়বে। এ জানছিল, এরা তাকে ফেলে পালাবে তা-ও যেমন ঠিক, তেমনি, সকালের আলোতে কাছের গাঁয়ে পোঁছে, লোকজন ডেকে, তাকে পোড়াবার জন্যে ফিরে আসবে তা-ও ঠিক।

এ ওদের চরিত্র জানছিল। তাই সব বুঝতে পারছিল। এ নিজে হলেও ঠিক তাই করতো।

রাতটা ফিকে হতেই এরা পালিয়ে-ছিল। কলেরা রোগী নিয়ে ঘাটিতে তারা রাজী ছিল না।

এরা যেতে যেতে ভাবছিল, লোকটা মরবেই। কলেরা রোগী বিনা চিকিৎসায় বাঁচে না। এরা নিজেদের আচরণের হীনতা বুঝতে পারছিল। ... ভাবছিল, গাঁয়ে পোঁছে লোকজন ডেকেই ফিরে আসব। আবার, এ-ও ভাবছিল, নিজেরা স্নান করে দুটো দই চিঁড়ে খেয়ে নিলে ক্ষতি কি? দুজনেই যে একই কথা ভাবছে তা দুজনেই বুঝেছিল। উদ্ধব বলেছিল—শরীরকে এতটুকু দুধ, ঘি দেয়নি। পরে কষ্ট দেবে।

তারা, জ্যান্ত মানুষটা যখন শবদেহ হবে, তখন পোড়াতে কি রকম কষ্ট দেবে তাই ভাবছিল। উদ্ধব সেই লোকটার কোমরে বাঁধা থলিটার কথা ভাবছিল। ওতে লোকটার তীর্থ-সঞ্চয় ছিল। আশী টাকা ছিল। প্রসাদ কিছু বলছিল না।

সে ভাবছিল, লোকটার পকেটের টাকার থলেটা সে ফিরে এসে প্রথমেই নিয়ে নেবে। আশী টাকা অনেক টাকা। গাঁয়ে ফিরলে সে টাকার কথা কেউ তাদের জিজ্ঞাসা করবে না।

লোকটা তখন যন্ত্রণায় ঝিমিয়ে পড়েছিল। সে ভাবছিল, কলেরা যখন হয়েছে, তখন আমি মরব।

এই রকম মৃত্যুর কথা ভাবিনি। তীর্থে যাব বলে গাঁয়ের মানুষ খোল করতাল বাজিয়ে দুধমিষ্টি খাইয়ে আমাকে যাত্রা করিয়েছিল। সে কামনা করেছিল মৃত্যু যেন তাড়াতাড়ি আসে।

মৃত্যু এল না।

তাই, সকাল হতে, সে একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ চেতনার অনুভূতির মধ্যে জাগল। তারই মধ্যে তার চেতনা ফিরল। সে বুঝল তার কলেরা হয়নি।

রোদ বাড়ল।

মাটিটা জ্বলতে লাগল। মাটিটা রোদের তাপ শুষতে না পেরে তাপ ছড়াতে লাগল। রোদ পড়ে পড়ে মাটিটার আর তাপ নেবার ক্ষমতা ছিল না।

সেই তাপে, সেই ভাপে, ঐ রক্ত-মাংসের মানুষটা পুড়তে লাগল।

সে অনুভব করল তার গায়ে কিসের জ্বালা।

সে চেয়ে দেখল, একসার লাল পিঁপড়ে রোদের তাপ সইতে না পেরে তার শরীরে উঠে এসেছে। লাল, বড় বড় পিঁপড়ে। তার গা দিয়ে তারা গলার কাছে এগোচ্ছে। একটা পিঁপড়ে তার নাকের ওপর এল।

সে দেখতে পেল পিঁপড়েটার শুঁড়, গোল মাথা। তবে কি ওরা মনে করেছে আমি একটা মরামানুষ? তাই কি ওরা উঠে এসেছে?

হঠাৎ ঐ ছোট প্রাণীগুলোর সম্পর্কে তার আতংক হলো।

সে মরে যায়নি। সে বাঁচতে চায়। সে জল চায়। একটা অদ্ভুত বিদ্বেষে সে পিঁপড়েটাকে টিপে মারল।

তার শরীরটা একটু নড়তেই পিঁপড়েগুলো কামড় দিতে থাকল।

সে কোনটাকে ছাড়াতে পারল, কোনটা তার শরীরে রইল। সে বুকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ঐ গাছটার দিকে যেতে থাকল। ঐখানে একটু ছায়া আছে। ঐ ছায়াটা হয়তো তাকে শান্তি দেবে।

যেতে যেতে, সে মাথার ওপরকার আকাশে একটা বড় পাখীকে পাক দিতে দেখল।

অমনিই তার মনে হলো ওটা শকুন। শকুন যে ভারী শরীর নিয়ে অত দূরে উঠতে পারে না। ঐ ভঙ্গীতে উড়তে পারে না, এইসব কথা তার মনে এল না।

অথচ এ সব কথা-ই সে জানত।

শরীরের যন্ত্রণা, [illegible] তৃষ্ণা, উত্তাপের [illegible] তাকে [illegible] বাঁচবার ইচ্ছে-তে পরিণত করেছিল। তার শরীরটা তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার মাথাটা কাজ করছিল না।

সূর্য যখন মাথার ওপরে, তখন লোকটা গাছটার থেকে দুইশো গজ দূরে এসেছে।

সে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তার বুকের ফতুয়া, পায়ের চামড়া, ধুতি সব কাঁকরের ঘষায় ঘষায় রক্তাক্ত। তার কনুই থেকে মাংস বেরিয়ে এসেছে। তার শরীরটা অল্প অল্প ধুঁকছে।

মাথা তুলে, ঘোলাটে চোখে গাছটাকে দেখে তার মনে হলো, ছয় ঘন্টা আগে গাছটাকে যতটুকু দেখাচ্ছিল, এখন তার থেকে একটু বড় দেখাচ্ছে। সে চেয়ে রইল।

তার জিভটা ফুলে উঠেছে। তার জিভটা মুখটাকে ভরে ফেলেছে। তার ঘাড়, পিঠ, মাথা, সব রোদের ঘায়ে পুড়ছে। তার ঘাড়ে ফোস্কা পড়েছে। পায়ে ফোস্কা পড়েছে।

ফোস্কার জ্বালা, রোদের বর্শা, কিছুই তাকে বিঁধছে না।

তার চোখটার সামনে অনেক রঙ নাচছে। ঘোলাটে, অস্পষ্ট সব রঙ। জলরঙ ছবি এঁকে কে যেন সে রঙের ওপর জলহাতে ধ্যাবড়া করে দিয়েছে। হলুদের সঙ্গে বাদামী, সবুজের সঙ্গে নীল, সব সে দেখছে একসঙ্গে।

চোখের পাতাটা পুরো পড়ছে না। চোখের মণির ওপর জলাভ পিচ্ছিল আবরণটা শুকনো। তাই সে রঙগুলোর ওপর চোখটা বন্ধ করে দিতে পারছে না।

ঐ ধূসর ধূমলসবুজ গাছটাকে ঐ রঙ-গুলোর জালের ভেতর দিয়েই দেখতে হচ্ছে। সে আবার এগোল।

এগোতে এগোতে সে দেখল গাছটার পাতা কি কম! কি কুৎসিত তার আঁকা-বাঁকা ডালগুলো! গাছের নিচে ছায়া কি কম! ঠিক বারোটার সময়, সূর্যের নিচে, ছায়াটা যে অতি স্বল্প, একটা বেষ্টনীর মতো দেখাবে, এ কথা তার মাথায় এল না। সে এগোতে থাকল। আধ হাত এগোয়, মুখ থুবড়ে পড়ে। মুখে ধুলো কাঁকর ঘসে যায়। আবার আধ হাত এগোয়। আবার মুখ থুবড়ে পড়ে।

প্রসাদ [illegible] তখন স্নান করতে গ্রামটার কাদা-[illegible] ডে[illegible]ম, স্বল্প জলে শরীর ঠান্ডা হয়নি।

তারা দোকানীর দোকানঘরের সামনে বসে মুড়ি-মুড়কী দিয়ে জল খেয়ে নি[illegible] গাছের নিচে বসল।

তারা বিড়ি ধরাল।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইছিল না। যেন তারা একটা মৃত্যুমান মানুষকে ফেলে আসেনি সেই ছাতিফাটা কঙ্কালীতলার মাঠে। যেন সেই লোকটার বিধবা চল্লিশ বছরের মেয়েটা তাদের হাত-পা ধরে বাপকে দেখবার দিব্যি দিয়ে দেয়নি দুই মাস আগে। কৈফিয়ত দেবার সুরে উদ্ধব বললো—এখন গাঁয়ে মানুষ কোথায়? রোদ না পড়লে কেউ বেরুবে?

—এতক্ষণে হয়ে গিয়েছে।

উদ্ধব হঠাৎ বলে উঠলো—খাটিয়া গামছা নিয়ে যেতে হবে।

—নতুন কাপড়।

—তামাক আর মদ না দিলে কেউ ভিন গাঁয়ের মড়া নিয়ে রাতে পোড়াতে যাবে না।

—টাকার দরকার।

উদ্ধব হ[illegible] [illegible]য়ে উঠল—টাকার দরকার, দেব টাকা। যার দয়ায় গয়াকাশী করে এলাম, সে মানুষটার জন্যে যা দরকার সব দেব।

—তুই টাকা কোথায় পেলি?

—টাকার কথা কে বলেছে?

হঠাৎ উদ্ধবের তেজটা ঝিমিয়ে গেল। সে অস্বস্তির সঙ্গে বললো—টাকার কথা কি বলছিস?

প্রসাদ ভীষণ চোখে চেয়ে বিড়ি টানতে লাগল। বিড়বিড় করে বললো—এতদিনের মধ্যে তুই একটা পয়সার মুখ দেখাসনি।

উদ্ধব উঠে পড়ল। সে বুঝল প্রসাদও সেই টাকার কথা-ই ভাবছে। সে নীরেস গলায় বললো—নে, ওঠ, লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করি।

লোকটা যখন গাছের ছায়ায় পৌঁছল, তখন সমস্ত মাঠে-ই ছায়া নামার সময় হয়েছে।

গাছের ছায়াটা লম্বা হয়েছে। কাঁকরের ঢিপি, ছোট ছোট শুকনো ডালের ছায়া-ও লম্বা লম্বা। সে ছায়াতে কোন ঠান্ডা নেই।

তবু, তাতেই মুখ গুঁজে সে নিষ্পন্দ পড়ে রইল।

আস্তে আস্তে সূর্য চলতে লাগল।

সে চোখ খুলল।

চোখ খুলে, সে সভয়ে দেখল, তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে একটা ভয়। সেই ভয়টা তার মুখে দুর্গন্ধ বাতাস ফেলেছে। তার বাঁকানো নখ, ভীষণ চোখ।

সে ভয়ংকর চেঁচিয়ে উঠল।

একটুও শব্দ হল না। গলা চিরে রক্ত পড়লো, এবং ফ্যাসফেঁসে একটা শব্দ হলো।

সে একটু নড়তে গিয়ে ঢালুতে গড়িয়ে গেল। গড় গড় করে নিচে পড়লো।

শকুনটা ওপরে বসে নিস্তব্ধ হয়ে তাকে দেখতে লাগলো।

তখন সে সামনে দেখলো।

জল। সে যেখানে পড়ে আছে তার থেকে আর এক হাত দূরে। সে পড়েছে ডাবাটার খাতে। আর মাঝখানে, লাল জলের ওপর থেকে ভাপ উঠছে। সে বুঝল তার শেষ সময় এসেছে। সে মরীচিকা দেখছে। সে চোখ বুজল।

আবার তাকাল। না। সামনে সে ভয়টা নেই। ঐ জলটা আছে।

ঐ ভয়টা আমার মনই তৈরী করে নিয়েছিল। আমি মরছি, তাই আমি এই সব বিভীষিকা দেখছি। ঐ জলট'ও একটা স্বপ্ন। মরছি, তাই দেখছি। ওখানে জল থাকতে পারে না।

সে চোখ টেনে বন্ধ করতে গেল। আর চোখ বন্ধ করা গেল না। শরীরটাকে আর একটুকু নাড়াবার শক্তি ছিল না। পা দুটো আর ছে'চড়ে ছে'চড়ে এগোতে পারছিল না। তাই, তাকে চেয়ে থাকতে-ই হলো।

চোখটা ঝাপসা হতে হতে আঁধার হতে থাকল। আর, সেই আঁধার কেটে ডানার শব্দ করে শকুনটা নিচে নেমে ঐ জলে তার বাঁকানো ঠোঁট দুটো ডোবাল। খানিকটা জল ছিট্‌কে-ও উঠল।

তখন লোকটা বুঝল ওটা সত্যিই জল, মরীচিকা নয়। ঐ ভয়টা যেমন জ্যান্ত, ঐ জলটা-ও তেমনি সত্যি।

তবু সে নড়তে পারল না। যেতে পারল না। তাকিয়ে তাকিয়ে তার চোখটার সামনে জলটা কালো হতে থাকল। তার শরীর নাড়িয়ে গলা দিয়ে শুকনো হে'চ্‌কি উঠতে থাকল। তারপর, আবার সে সব একটু একটু করে থেমে-ও গেল। তার জীবনটা কণ্ঠার কাছে এসে থেমে রইল।

লাল আকাশের পটভূমিতে কালো শকুনটা বসে ছিল। কালো শকুনটার আরো আরো সংগী জুটেছিল। তারাও বসছিল। তারা বড় শকুনটার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

সেই শকুনটার চিহ্ন দেখে লোক-গুলো ঠাহর করতে পারল। তারা খাটিয়া নিয়ে আসছিল। তাদের হাতে লণ্ঠন ঝুলছিল। তারা লণ্ঠনগুলো জ্বালিয়ে নিয়েছিল। [illegible] কতগুলো আলো দুলে দুলে আসছে। আকাশটা তখনো সম্পূর্ণ কালো হয়নি বলে আলোগুলো তেমন জ্বল-জ্বলে দেখাচ্ছিল না। অদ্ভুত মিটমিটে দেখাচ্ছিল। শুধু আলোগুলোর দোলানি দেখে বোঝা যাচ্ছিল লোকগুলো খুব তাড়াতাড়ি আসছে।

উম্ধব-ই আগে নেমে এসেছিল। সংগে সংগে প্রসাদও। দুজনেই লোকটার কোমর হাতড়াচ্ছিল। দুজনেই দুজনের দিকে হিংস্র চোখে তাকাচ্ছিল। তারপর উম্ধব হিসহিস করে বললো—সাবধান!

প্রসাদ আর উম্ধব দুজনের আঙুল-গুলো লোকটার কোমরের ওপর পড়ছিল। দুজনেই দুজনকে গাল দিতে দিতে ভীষণ হয়ে উঠেছিল। তাদের চোখ জ্বলছিল। তাদের চুল লোকটার মুখের ওপর ঘস-ছিল। তাদের টানাটানিতে মানুষটার শরীরটা নড়ছিল।

লোকটার চোখ একটু নড়ল। লোকটার চোখ নড়ল, তার শরীরটা কাঁপল।

আর এতক্ষণ যে টাকার কথা তার একবারও মনে হয়নি সেই টাকার কথাই তার মনে হলো।

টাকার চিন্তায় তার মাথাটা একটু কাজ করতে পারল, তার জিভটা একটু নড়তে পারল।

সে যেই একটু জীবনের লক্ষণ দেখাল, অমনি লোক দুটো সভয়ে চীৎকার করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তাদের মুখে গালাগালি, তেতো বিস্বাদ হিংস্রতা সব থেমে রইল। তারা ভাবল ওকে [illegible]য় পেয়েছে। ও প্রেত হয়েছে।

অন্ধকার, [illegible], দূরে শ্মশানের আলো, সব তাদের [illegible] ভাবনাটাকে একটা আতংক এনে দাঁড় করাল। সে আতংকের নাম নেই।

আর, লোকটা দেখল কারা যেন মানুষের অবয়ব নিয়ে তার টাকার থলে ছিনিয়ে নিতে এসেছে।

সে বলল—আমি টাকা দেব না।

লোকগুলো একটা বিশ্রী ঘড়ঘড়ে শব্দ শুনতে পেল। পালাতে গিয়ে তাদের পা আটকে গেল। ওপর থেকে গ্রামের লোকগুলো তাড়া দিচ্ছিল। একজন লণ্ঠন নিয়ে নেমে আসছিল।

শকুনগুলো ভাবছিল এই মানুষ শকুনগুলো সরে না গেলে তারা নামতে পারবে না। তাদের হয়তো সকাল অবধি বসে থাকতে হবে। তারপর পুব আকাশে যখন সূর্য উঠবে তখনই তারা সুনিশ্চিত ডানায় একের পর এক উড়ে নামবে। তারা অন্ধকারে বসে রইল।

টিকিটের [illegible] লস এঞ্জেলসে জেট বিমানে যেতে গেলে [illegible] থেকে আসন সংরক্ষণের দরকার হয় না। [illegible] বিশেষ কাউণ্টারে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে বিমানে উঠে বসতে হয়। ৩০ হাজার ফুট উপরে একজন টিকিট বিক্রি করে যায়। নগদে বা চেকে দাম দেওয়া চলে। এমনকি টাকা না থাকলেও, বিমান থেকে নেমে পুলিসকে তা জানিয়ে রেখে চলে যাওয়া যায়।

*

যাদের কাজ শুধুই চিন্তা করা, তাদের মনে চিন্তা যে কিভাবে জুড়ে বসে থাকে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট। মনের সংগে অনেক বোঝাপড়া করে ঠিক করলেন যে, তিনি বিয়ে করবেন। অব-শেষে তাঁর পূর্ব-পরিচিতা মহিলাটির বাড়ি গিয়ে দেখেন যে, সে নেই। ২০ বছর আগেই সে শহর ছেড়ে চলে গেছে।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগ

সুনির্মল বসু

রবীন্দ্রনাথের [illegible]বিস্তৃত প্রতিভা বহু পর্যায়ে চিহ্নিত, সাহিত্যের বহুধারা তাঁর জীবনবীণায় [illegible]। তাঁর এই বহুধা বিকাশ সম্বন্ধে [illegible] তিনি [illegible] এক জায়গায় বলেছেন, "তরুণ যৌবনের বাউল সুর বেঁধে নিল' আপন একতারাতে, ডেকে বেড়ালো নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে অনির্দেশ্য বেদনার ক্ষেপা সুরে।...... যে পথে বকুল বনের পাতার দোলনে ছায়ায় লাগত কাঁপন, হাওয়ায় জাগত মর্মর, বিরহী কোকিলের কুহুরবের মিনতিতে আতুর হ'ত মধ্যাহ্ন, মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন, ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইসারা বেয়ে, সেই তৃণবিছানো বীথিকা পেঁছিল এসে পাথরে বাঁধানো রাজপথে। সে দিনের কিশোরক সুর সেধেছিল যে একতারাতে, একে একে তাতে চড়িয়ে 'দল তারের পর নতুন তার।" এমনি নতুন নতুন তারে ভরে উঠেছিল বিশ্বকবির বিশ্ববীণা। মানুষের কর্মপ্রয়াসের বা মর্মপ্রয়াসের কোন দিকই কবির লেখনীকে বা দর্শনকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাঁর কবি-মন মানসচোখে পড়ে নিল শিশুর অনুভূতি থেকে শুরু করে জীবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত বৃদ্ধের মন পর্যন্ত। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির বেশ পরিবর্তন, জীবনের প্রতিপদে বিশ্বাত্মার প্রেরণা, মানুষের মনে প্রেমের প্রকাশ—সব প্রকাশ পেল তাঁর কাব্যে, তাঁর ব্যঞ্জনায়। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবন বিজ্ঞান ও যন্ত্রের প্রভাবান্বিত যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ব্যক্তিগতভাবেও তিনি অনেক দেশী ও বিদেশী বিজ্ঞানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই তিনি এই বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে দেখেছেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি আর দূরদৃষ্টি দিয়ে; দরদী মন আর লেখনী দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁর সেই দৃষ্টির মহিমা।

বিজ্ঞানের প্রকাশ সাধারণত দুই ভাবে, বিশুদ্ধ অনুশীলন আর ব্যবহারিক প্রয়োগ অর্থাৎ যন্ত্রযুগের ফলশ্রুতি। বিজ্ঞানের এই দ্বিবিধ প্রকাশ সম্বন্ধেই কবি তাঁর ভাব ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন সময়ে। সত্যদ্রষ্টা কবি বুঝেছিলেন যে, আধুনিক যুগ এবং সামনে যে যুগ আসছে তার প্রতি পদক্ষেপে স্বীকার করতে হবে বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি, বিজ্ঞানের চিন্তাধারা। তাই বলেছেন "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার জন্যে প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।" কিন্তু আমাদের দেশে যথাযথভাবে তা হয়নি; আর এ সবেরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে "আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।" তাই তাঁর মতে "আধুনিক বিজ্ঞান হল ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দান মানব সমাজের প্রতি সর্বকালের জন্য। আমাদের উচিত এ দান কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করা, যাতে ক'রে আমরা পিছিয়ে না পড়ি আর নিষ্ফলতার অভিশাপে না পতিত হই। এই গ্রহণ করার কাজে দেরি করলে আমরা বর্তমান যুগ থেকে কোন ফসল কাটতে পারব না।" কিন্তু সে দিনের সমাজে কিছু সংখ্যক শ্রেণী এই নতুন শিক্ষা ও চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে নারাজ ছিল। তারা চাইত আমাদের যা সনাতন বিধি চলছে তাই চলুক, 'যায় যদি দিন এমনি করেই যাক না'। কিন্তু কবি বুঝেছিলেন যে কূপমণ্ডুকতার বেড়া ভেঙে নতুনকে স্বীকার করা আশু প্রয়োজন। তাই, 'আধ-[illegible]দের ঘা মেরে তুই বাঁচা' এই [illegible] নিয়ে রক্ষণশীল শ্রেণীকে ব্যঙ্গ ও নতুনকে আহ্বান করে তিনি রচনা করলেন তাঁর রূপক নাটক 'অচলায়তন'। ক্ষুদ্র আচারসর্বস্ব আনুষ্ঠানিক কর্ম আবদ্ধ করে রেখেছিল মহাপঞ্চক আর অচলায়তনিকদের। অচলায়তন নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব—সত্য সাধনার বাধা ও সমস্যার রূপ, আর তারই সঙ্গে আছে সম্ভাব্য সমাধানের ইঙ্গিত। সত্যসাধনা তিন পথে প্রবাহিত—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম। জ্ঞান যখন বৃহৎ ব্যাপ্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, অনাদি অনন্তের বোধ থেকে হয় বিচ্ছিন্ন, তখনই আসে সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা। তখন পুঁথিপত্র, তন্ত্রমন্ত্র, অন্তরসার-শূন্য আচার-অনুষ্ঠান, যুক্তিহীন আর অর্থহীন সব বাধা-নিষেধ জ্ঞানকে করে বিকৃত, দৃষ্টিকে করে আচ্ছন্ন। আর তখনই বাহির বিশ্বের স্পর্শ বাঁচিয়ে নিজেকে রক্ষার জন্যে প্রাচীর তোলা হয়। তাকেই কবি বলেছেন অচলায়তনের প্রাচীর। অচলায়তনিকদের সাধনা এই বিকৃত জ্ঞান অনুশীলনের প্রকাশ, শোণপাংশুদের মধ্যে কর্মের উদ্দেশ্যহীন সংকীর্ণতা। কিন্তু নতুন বিশ্বের নতুন যুগে এসব ভাঙ্গতেই হয় নতুনের ডাকে। তাই অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙ্গল, গুরু এলেন নতুনের বাণী নিয়ে, একাকার করে দিলেন জ্ঞান, কর্ম, আর প্রেমের সাধনা। মিথ্যা জ্ঞান আর ক্ষুদ্র সংস্কার, দিগভ্রান্ত মানবতা আর জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের সত্য-সাধনায় নতুনের জয়গান হল অচলায়তনের মর্মবাণী।

অচলায়তনের প্রকাশকালে বাংলা দেশের সুধীসমাজে একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিষয়ে কবির নিজের লেখা [illegible] একটা চিঠিই বোধ [illegible] ১৩১৮ সনের ৭ই অগ্রহায়ণ শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীঅমল হোমকে তিনি লিখেছিলেন, "...অচলায়তন নিয়ে বাংলা দেশে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তার উত্তাপ তোমাদের ছাত্রমহলেও সঞ্চারিত হয়েছে দেখছি। তোমার বন্ধুদের বোলো যে ভারতের ধর্মসাধনাকে ছোট করবার জন্য শোণপাংশুদের বড় করা হয়েছে এ কথা ভুল। ধর্মের নামে, যে বিরাট কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি সেই বন্দীশালা

থেকে আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে, যুক্তিকে মুক্তি দেবার আহ্বানই অচলায়তনের আহ্বান।...প্রাচীনের জয় ঘোষণায় করতালি লাভ আমার পক্ষে কঠিন নয়, এক দিন তা পেয়েওছি, কিন্তু মনকে আর দেশকে সনাতনের চুষিকাঠি হাতে ধরিয়ে ছেলে ভোলানোর প্রবৃত্তি নেই আর। দেশের তরুণদের কাছেও প্রিয়বচন ছাড়িয়ে প্রিয় হতে চাই নে—আঘাত দিতে ও নিতে প্রস্তুত যত দুঃখই পাই না কেন।"

বিজ্ঞানের যে ব্যবহারিক প্রয়োগে যন্ত্রপ্রাধান্য তাকেও কবি দেখেছেন নানা দৃষ্টিতে। যন্ত্রের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ক্ষমতায় তিনি স্তম্ভিত হয়েছেন, অভিভূত হয়েছেন, অকুণ্ঠচিত্তে বন্দনা করেছেন।

"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র,
নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র,
তব দীপ্ত অগ্নি শত-শতঘ্নী
বিঘ্ন বিজয় পন্থ,
তব লৌহ গলন, শৈলদলন
অচল চলন মন্ত্র।"

কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, যন্ত্রের প্রয়োগ ভাল, যান্ত্রিকতার প্রাধান্য ভাল নয়। তাই পশ্চিমের যান্ত্রিক উপাসনাকে লক্ষ্য করে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "...যান্ত্রিকতা অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিম সমাজের মানব সম্বন্ধের বিশিল্গতা ঘটেছে। কেন না, স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃ প্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায় সেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে।" যান্ত্রিক বিজ্ঞানের ক্ষমতাপ্রাবল্য ও অপপ্রয়োগের ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ দেখে 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "......মধ্যযুগে এক সময়ে ইউরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে।... আজকের দিনে তার বিপরীত হল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। ... প্রভাব মানব মনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তকমা পরে কোথাও অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।" বিজ্ঞানের প্রভূত সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী হীনচেতা মানুষের হাতে পড়ে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে আজ সাধারণ মানুষ ভীতত্রস্ত, তার অন্তরাত্মা রোরুদ্যমান। তাই কবি এক প্রবন্ধে বলেছেন, ..."বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে-স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে, তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালই নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু করে এগল, এক করবার অন্তরশক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।"

যন্ত্র-বিজ্ঞানে বলীয়ান মানুষ আজ প্রভাব বিস্তার করেছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। রাষ্ট্রনীতি, [illegible]নীতি, সমাজনীতি সর্বত্রই তার অবাধ গতি। কিন্তু মানুষের হীনবৃত্তিগুলি বিজ্ঞানের বহুল শক্তি করেছে অপপ্রয়োগ, মানবিক হৃদয় তাই আজ নিষ্পেষিত। যন্ত্রযুগের অন্তর্দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় পরিশেষে মানবিকতার জয় সূচনার ভিত্তিতে কবি রচনা করেছিলেন তাঁর রূপক নাটক 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'। প্রকৃতির সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে যন্ত্র যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে তারই এক কাব্যিক বিকাশ এই দুটি রচনায়।

মুক্তধারায় রাজা রণজিতকে আচ্ছন্ন করেছিল বিজ্ঞানের বলদৃপ্ত শক্তিমত্ততা। মানবতার স্বচ্ছন্দ গতিই আসলে মুক্তধারার প্রতীক। রাজার কঠোর আদেশে এক বিশালকায় লৌহযন্ত্রের আবেষ্টনীতে বন্ধ করা হয়েছে মুক্তধারাকে। বস্তুতঃ যান্ত্রিকতায় উদ্ধত রাষ্ট্রনৈতিক শাসনে নিপীড়িত মনুষ্যত্ব এবং মানবতাই এই কাহিনীর রূপক। মানুষের অন্তরাত্মা এই যান্ত্রিকতার কঠোরতা থেকে মুক্তি চায়, কুমার অভিজিত সেই মুক্তিকামী মানবাত্মার প্রতিনিধি। আর সমষ্ঠিগতভাবে পদদলিত বৃহত্তর সমাজের প্রতিভূ ধনঞ্জয় বৈরাগী। অভিজিতের অভিযান যন্ত্রশক্তির অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে আর ধনঞ্জয় বৈরাগীর বিদ্রোহ যান্ত্রিক বলদৃপ্ত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আসলে দুজনেই বৃহত্তর মানবতার মুক্তিকামী। মানুষের অন্তরের মহান শক্তির বিকাশ হয় বহু আঘাত-প্রতিঘাত ও ব্যথা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। তখনই হয় মহাসত্যের দর্শন, হয় পরিপূর্ণ আত্ম-উপলব্ধি। তাই রাজা রণজিতের মুক্তিস্নান কুমার অভিজিতের প্রাণদানে।

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্ঘ 'রক্তকরবী', অনবদ্য রূপক নাটক এবং ছন্দোসুষমায় অতুলনীয়। যান্ত্রিক বলে বলীয়ান মানুষের অপরিমিত ক্ষমতা ও ধনলিপ্সা আর তারই আড়ালে নিষ্পেষিত তার নিজস্ব মানবিক হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় রচিত এই নাটক। রহস্যাবৃত যক্ষপুরীর মকররাজ পৃথিবীর অন্তর বিদীর্ণ করে তাল তাল সোনা তুলছে, বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক তার প্রধান সহায়। বিজ্ঞান আর যন্ত্রশক্তির জোরে সে বিশ্বকে জয় করে তার শক্তির মহিমা বিস্তার করছে। কিন্তু এই রাজা আছে লোকচক্ষুর অগোচরে, এক রহস্যাচ্ছন্ন জালের আড়ালে। কিন্তু এমন রহস্যাবৃত অমিত শক্তিশালী রাজার জীবনও তৃপ্তিহীন, শক্তিহীন। তাই তার কণ্ঠেও জাগে ব্যাকুলতা, 'নন্দিনী, তুমি জান না আমি কত রিক্ত, কত ক্লান্ত।' তার অন্তরাত্মা [illegible] সহজ সুন্দর জীবন, চায় [illegible] উপলব্ধি, চায় প্রেম। তাই রাজার এই চিত্তসত্তার মুক্তির বাণী নিয়ে এলো নন্দিনী। নন্দিনী উন্মুক্ত প্রাণ-চাঞ্চল্যের লীলাময় প্রতীক, রাজার নিজের ভাষায়, 'সে সমুদ্রের অগম পারের দূতী।' প্রাণের চাঞ্চল্যের উদ্দামতায় আসে যৌবন, আসে যৌবনের সৃজন মহিমা। তাই নন্দিনী অপেক্ষা করে কবে আসবে রঞ্জন। রক্তকরবীর মালা গাঁথে সে রঞ্জনের পথ চেয়ে। রঞ্জন আসলে যৌবনের প্রতীক। এদিক থেকে নন্দিনী আর রঞ্জন অবিচ্ছেদ্য। রহস্যরাজা তার সীমাহীন শক্তিমত্ততায় যৌবনকে করেছে নিপীড়িত, প্রাণ গেছে শুকিয়ে। তাই রঞ্জনকে হত্যার পর রাজার ব্যাকুল আক্ষেপ, "আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধ'রে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।" রঞ্জন হত্যার পর নন্দিনী রাজার রহস্যজাল দিল ছিন্ন করে, রাজার নতুন জন্ম হল নন্দিনীর হাতে। রাজা বলল, 'নন্দিনী, তুমি যে সোনা, সে সোনা তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর।" রাজা নিজেই তার ধ্বজা ভেঙে, জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো নন্দিনীর হাত ধরে নতুন জীবনের পথে। এই নাটকে কবি রূপায়িত করেছেন, যন্ত্রের চাপে মানুষের অন্তরাত্মার অবরোধ এবং মুক্ত জীবন ও স্বচ্ছন্দ প্রাণলীলার আহ্বানে সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। আজকের সমস্ত মানব সমাজ সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে বিজ্ঞান আর যন্ত্রেরই মুখাপেক্ষী, কারণ তারাই তাকে সম্পদ আহরণের আর আনন্দ সম্ভোগের সব ক্ষমতা দিয়েছে ও দিতে পারে। তবে এই যন্ত্রসাধনায় মানুষ যেন তার অন্তরের সূক্ষ্মসত্তাকে বিস্মৃত না হয়, দূরদ্রষ্টা মহাকবি তারই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের কাছে।

কহেন কবি কালিদাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

ব্যোমকেশ বিনীত কণ্ঠে বলিল,—'ধন্যবাদ। ওসব কিছু চাই না, অরবিন্দবাবু; আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলবার সুযোগ পেলেই কৃতার্থ হয়ে যাব।'

অরবিন্দ বলল,—'বিলক্ষণ! কি বলবেন বলুন। তবে একটা কথা গোড়ায় জানিয়ে রাখি। ফণীশ আপনাকে কী বলেছে জানি না, কিন্তু প্রাণহরির পোদ্দারের মৃত্যুর রাত্রে আমি তার বাড়িতে যাইনি।'

ব্যোমকেশ একটু নীরব থাকিয়া বলিল,—'অরবিন্দবাবু, আমার কোনো কু-মতলব নেই। নির্দোষ ব্যক্তিকে খুনের মামলায় ফাঁসানো আমার কাজ নয়, আমি সত্যান্বেষী। অবশ্য আপনি যদি অপরাধী হন—'

অরবিন্দ বলল,—'আমি নিরপরাধ। প্রাণহরির মৃত্যুর রাত্রে আমি তার বাড়ির ত্রিসীমানায় যাইনি। এই কথাটা বুঝে নিয়ে যা প্রশ্ন করবেন করুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, ও প্রসঙ্গ না হয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু প্রাণহরির মৃত্যুর আগে আপনি কয়েকবার তার বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

অরবিন্দ বলিল,—'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। আমরা চারজনে জুয়া খেলতে যেতাম।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'জুয়া খেলার সময় ছাড়াও আপনি কয়েকবার একলা তার বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

অরবিন্দের মুখে একটা বিশ্রী ফচ্‌কেমির হাসি খেলিয়া গেল, সে বলিল, —'তা গিয়েছিলাম।'

'কি জন্যে গিয়েছিলেন?'

নির্লজ্জভাবে দন্ত বিকাশ করিয়া অরবিন্দ বলিল, 'মোহিনীকে দেখতে। তার সঙ্গে ভাব জমাতে।'

ব্যোমকেশ বাঁকা সুরে বলিল,—'কিন্তু সুবিধে হল না?'

অরবিন্দের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে বড় বড় চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিল—'সুবিধে হল না—তার মানে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মানে বুঝতেই পারছেন। আপনি কি বলতে চান যে—'

অরবিন্দ হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর হাসি থামাইয়া বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনি মস্ত একজন ডিটেক্‌টিভ হতে পারেন কিন্তু দুনিয়াদারির কিছুই জানেন না। মোহিনী তো তুচ্ছ মেয়েমানুষ, দাসীবাঁদী। টাকা ফেললে এমন জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কত টাকা ফেলেছিলেন?'

অরবিন্দ দুই আঙুল তুলিয়া বলিল, —'দু'হাজার টাকা।'

'মোহিনীকে দু'হাজার টাকা দিয়েছিলেন? দাসীবাঁদীর পক্ষে দাম একটু বেশী নয় কি?'

'মোহিনীকে দিইনি। মোহিনীর দালালকে দিয়েছিলাম। প্রাণহরি পোদ্দারকে।' অরবিন্দের কথাগুলো বিষমাখানো।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা ও কথা থাক। প্রাণহরি পোদ্দার লোকটা কেমন ছিল।'

অরবিন্দ নীরসকণ্ঠে বলিল, 'চামার ছিল, অর্ধ-পিশাচ ছিল। সাধারণ মানুষ যেমন হয় তেমনি ছিল।'

সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে অরবিন্দের ধারণা খুব উচ্চ নয়। ব্যোমকেশ বলিল, 'জুয়াতে প্রাণহরি পোদ্দার আপনাদের অনেক টাকা ঠকিয়েছিল?'

অরবিন্দ তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'সে জিতেছিল আমরা হেরেছিলাম। ঠকিয়েছিল কিনা বলতে পারি না।'

'তবে তাকে ঠেঙাতে গিয়েছিলেন কেন?'

অরবিন্দ উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়া থামিয়া গেল, ব্যোমকেশকে একবার ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'কে বললে ঠেঙাতে গিয়েছিলাম। যারা গিয়েছিল তারা নিজের কথা বলুক, আমি কাউকে ঠেঙাতে যাইনি।'

আমি ফণীশের দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সে হেঁটমুখে শুনিতেছিল, একবার চোখ তুলিয়া অরবিন্দের পানে চাহিল, তারপর আবার মাথা হেঁট করিল।

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে বলিল,—'আপনি যেটুকু বললেন, তাতেও গরমিল আছে. মোহিনীর কথার সঙ্গে আপনার কথা মিলছে না। হয়তো আপনার কথাই সত্যি। আচ্ছা নমস্কার। আপনার দাদাকে বলবেন, পুলিসকে ঘুষ দিতে যাওয়া নিরাপদ নয়, তাতে সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। সব পুলিস-অফিসার ঘুষখোর নয়।'

— চার —

অতঃপর তিনদিন আমরা প্রায় নিষ্কর্মার মত কাটাইয়া দিলাম, প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যুরহস্য ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলিয়া রহিল। নূতন তথ্য আর কিছু পাওয়া যায় নাই, পূর্বে সামান্য যেটুকু পাওয়া গিয়াছিল তাহাই সম্বল। কটক হইতে ইন্সপেক্টর বরাটের বন্ধু পট্টনায়ক প্রাণহরির অতীত সম্বন্ধে যে পত্র দিয়েছিলেন তাহার দ্বারাও খুনের উপর আলোকপাত হয় নাই। প্রাণহরি পোদ্দার পেশাদার জুয়াড়ী ছিল, কিন্তু কোনওদিন পুলিসের হাতে পড়ে নাই। সে বছর-দুই কটকে ছিল, কোথা হইতে কটকে আসিয়াছিল তাহা জানা যায় না। তাহার পোষ্য কেহ ছিল না, কাজকর্মও ছিল না। নিজের বাড়িতে কয়েকজন বড়মানুষের অর্বাচীন পুত্রকে লইয়া জুয়ার আড্ডা [illegible]। ক্রমে অর্বাচীনেরা বুঝিল প্রাণহরি জুয়াচুরি করিয়া তাহাদের রুধির শোষণ করিতেছে, তখন তাহারা প্রাণহরিকে উত্তম-মধ্যম দিবার পরামর্শ করিল। কিন্তু পরামর্শ কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই একদিন প্রাণহরি পোদ্দার নিরুদ্দেশ হইল। তাহার বাড়িতে একটি যুবতী দাসী কাজ করিত, সেও লোপাট হইল। অনুমান হয় বৃদ্ধ প্রাণহরির সহিত দাসীটার অবৈধ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

পট্টনায়কের চিঠি হইতে শুধু এইটুকুই পরিস্ফুট হয় যে প্রাণহরির কর্মজীবনে একটা বিশিষ্ট প্যাটার্ন ছিল।

ব্যোমকেশের চিত্তে সুখ নাই। ইন্দিরার চোখে আবার উদ্বেগ ও আশঙ্কা ঘনীভূত হইতেছে। ফণীশ ছটফট করিতেছে। মণীশবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কিন্তু তিনিও যেন একটু অধীর হইয়া উঠিতেছেন। কয়লাখনির অনামা দুর্বৃত্তেরা এখনও ধরা পড়ে নাই।

বিকাশ দত্ত আসিয়াছে এবং কয়লাখনির হাসপাতালে যোগ দিয়াছে। আমরা একদিন বিকালে মণীশবাবুর সঙ্গে কয়লাখনিতে গিয়াছিলাম, ব্যোমকেশ হাসপাতাল পরিদর্শনের ছুতায় বিকাশের সঙ্গে দেখা করিয়াছে এবং উপদেশ [illegible] আসিয়াছে।

[illegible] তিন দিনের মধ্যে কেবল একটি-[illegible] বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার উল্লেখ করা যায়। ব্যোমকেশ ক্রমান্বয়ে বিছানায় শুইয়া, ঘরে পায়চারি করিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কাল সন্ধ্যার পর আমাকে বলিল,—'চল রাস্তায় একটু বেড়ানো যাক।'

রাস্তাটি নির্জন, আলো খুব উজ্জ্বল নয়, বাতাস বেশ ঠান্ডা। মাঝে মাঝে দু'একজন পদচারী, দু-একটি মোটর যাতায়াত করিতেছে। ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, প্রাণহরি পোদ্দারের মতন একটা থার্ড ক্লাস লোকের হত্যারহস্য তদন্ত করার কী দরকার? যে মেরেছে বেশ করেছে, তাকে সোনার মেডেল দেওয়া উচিত।'

বলিলাম, 'সোনার মেডেল দিতে হলেও তো লোকটাকে চেনা দরকার।'

আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহিনীর কাছে আর একবার যেতে হবে। তাকে একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি।'

এই সময় বাই-সাইকেল প্রথম লক্ষ্য করিলাম। আমরা রাস্তার একটু পাশ ঘেঁষিয়ে পায়চারি করিতেছিলাম, দেখিলাম সামনের দিকে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সাইকেল আসিতেছে। সাইকেলে আলো নাই, রাস্তার আলোতে আরোহীকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, তাহার মাথায় সোলার টুপি মুখখানাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সাইকেল আমাদের কাছে আসিয়া পড়িল, তারপর আরোহী আমাদের পায়ের কাছে একটা সাদা-

অরবিন্দ দুই আঙুল তুলিয়া বলিল,—'দু'হাজার টাকা।'

গোছের বস্তু ফেলিয়া দিয়া দ্রুত পেডাল ঘুরাইয়া অদৃশ্য হইল।

ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। দশ-হাত দূরে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে শ্বেতাভ বস্তুটার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু কিছু ঘটিল না, টেনিস বলের মত বস্তুটা জড়বৎ পড়িয়া রহিল। উহা যে বোমা হইতে পারে একথা আমার মাথায় আসে নাই; এখন ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার বুক ঢিবঢিব করিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'অজিত, চট্‌-করে বাড়ি থেকে একটা টর্চ নিয়ে এস তো।'

সে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি ছুটিয়া বাড়িতে গেলাম। ফণীশ ও মণীশবাবু দুজনেই খবর শুনিয়া আমার সঙ্গে আসিলেন।

'কি ব্যাপার?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাছে আসবেন না। হয়তো কিছুই নয়, তবু সাবধান হওয়া ভাল। অজিত, টর্চ আমাকে দাও।'

টর্চ লইয়া সে ভূ-পতিত বস্তুটার উপর আলো ফেলিল। আমি গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, কাগজের একটা মোড়ক ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছে। ব্যোমকেশ কাছে গিয়া আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া বস্তুটা তুলিয়া লইল। হাসিয়া বলিল, 'কাগজে মোড়া এক টুকরো পাথুরে কয়লা।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'কয়লা—!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কয়লা মুখ্য নয়, কাগজটাই আসল। চলুন, বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক।'

ড্রয়িংরুমে উজ্জ্বল আলোর নীচে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ সন্তর্পণে মোড়ক খুলিল। পাথুরে কয়লার টুকরো টেবিলে রাখিয়া কুঞ্চিত কাগজটির দুই পাশ ধরিয়া আলোর দিকে তুলিয়া ধরিল। কাগজটা আকারে সাধারণ চিঠির কাগজের মতন, তাহাতে কালি দিয়া বড় বড় অক্ষরে দুছত্র লেখা—'ব্যোমকেশ বক্সী, যদি অবিলম্বে শহর ছাড়িয়া না যাও তোমাকে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না।'

'কী ভয়ানক, আপনার নাম জানতে পেরেছে।' মণীশবাবু হাত বাড়াইয়া বলিলেন, —'দেখি কাগজখানা।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, আপনার ছুঁয়ে কাজ নেই। কাগজে হয়তো আঙুলের ছাপ আছে।'

কাগজখানি সাবধানে ধরিয়া ব্যোমকেশ শয়নকক্ষে আসিল। আমিও সঙ্গে আসিলাম। টেবিলের উপর একটি সচিত্র বিলাতী মাসিকপত্র ছিল, তাহার পাতা খুলিয়া সে কাগজখানি সযত্নে তাহার মধ্যে রাখিয়া দিল। আমি বলিলাম, 'কোন পক্ষের চিঠি। অবশ্য কয়লা দেখে মনে হয় কয়লাখনির আসামীরা জানতে পেরেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ওটা ধাপ্পা হতে পারে। গোবিন্দ হালদার জানেন আমি কয়লাখনি সম্পর্কে এখানে এসেছি।'

ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম অফিসের বড়বাবু সুরপতি ঘটক আসিয়াছেন, কর্তার সঙ্গে বোধকরি অফিসঘটিত কোনও পরামর্শ করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া সবিনয়ে নমস্কার করিলেন।

তিনি বাক্যালাপ করিয়া প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ মণীশবাবুকে বলিল,—'আপনি সুরপতিবাবুকে কিছু বলেন নি তো?'

মণীশবাবু বলিলেন,—'না।—পাজি ব্যাটারা কিন্তু ভয় পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভয় না পেলে আমাকে ভয় দেখাতো না।'

মণীশবাবু খুশী হইয়া বলিলেন,—'আপনি তলে তলে কি করছেন আমি জানি না কিন্তু নিশ্চয় কিছু করছেন, যাতে পাজি ব্যাটারা ঘাবড়ে গেছে।—যাহোক, চিঠি পেয়ে আপনি ভয় পাননি তো?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—'ভয় বেশী পাইনি। তবু, আজ রাত্তিরে দোর বন্ধ করে শোব।'

—৪—

সকালবেলা ফণীশ আমাদের থানায় নামাইয়া দিয়া বলিল,—'আমাকে একবার বাজারে যেতে হবে, ইন্দিরার একটা জিনিস চাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। অসুবিধা হবে না তো?'

'না। আমরা এখানে ঘণ্টাখানেক আছি।'

ফণীশ মোটর লইয়া চলিয়া গেল, আমরা থানায় প্রবেশ করিলাম।

প্রমোদবাবু টেবিলের সামনে বসিয়া কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, ব্যোমকেশ সচিত্র বিলাতী মাসিক পত্রটি তাঁহার
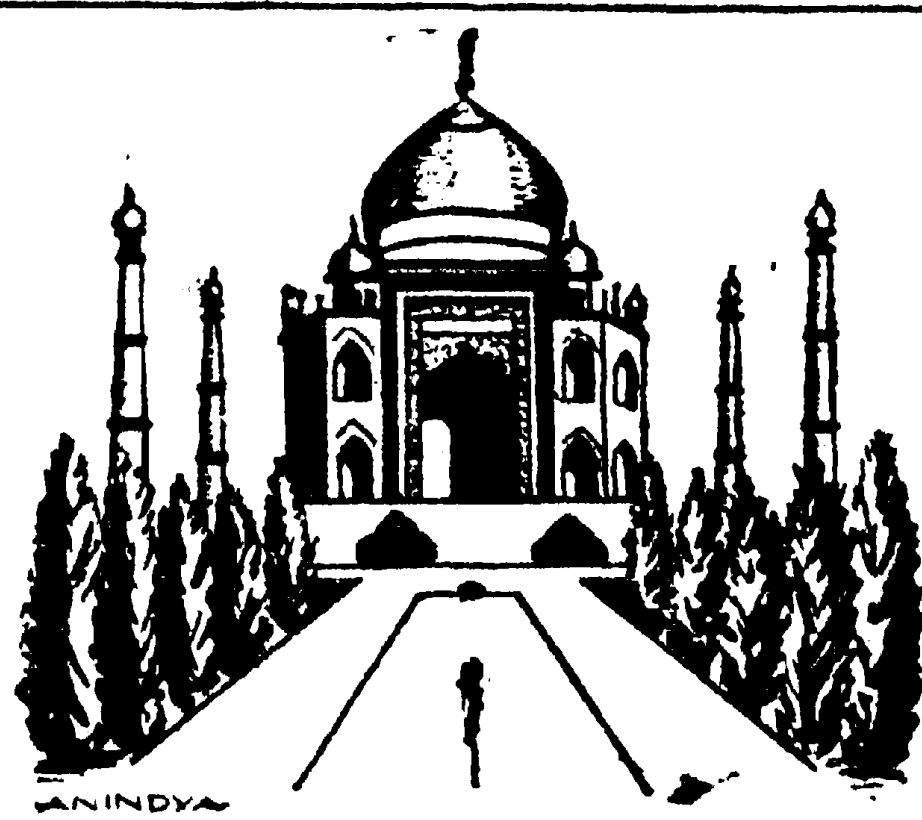
সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—'এর মধ্যে এক টুকরো কাগজ আছে, তাতে আঙুলের ছাপ থাকতে পারে। আপনার finger-print expert আছে?'

পত্রিকার পাতা তুলিয়া দেখিয়া বরাট বলিলেন,—'আছে বৈকি। কি ব্যাপার?'

ব্যোমকেশ গত রাত্রির ঘটনা বলিল। শুনিয়া বরাট বলিলেন,—'কয়লাখনির ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। এখনি ব্যবস্থা করছি। আজ বিকেলবেলাই পাবেন।'

তিনি লোক ডাকিয়া পত্রিকাসমেত কাগজখানা করাঙ্ক বিশেষজ্ঞগণের কাছে পাঠাইয়া দিলেন, তারপর বলিলেন,—'তিনদিন আপনি আসেননি, ওদিকের খবর কি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যথা পূর্বং তথা পরং, নতুন কোনো খবর নেই। কিন্তু একটা খট্‌কা লাগছে।'

'কিসের খট্‌কা?'

'মোহিনীকে প্রাণহরি পনরো টাকা মাইনে দিত। হিসেবের খাতায় কিন্তু মোহিনীর মাইনের উল্লেখ নেই।'

বরাট চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'হুঁ। প্রাণহরির হিসেবের খাতায় দেখছি কিন্তুর গলদ। এখন কি করবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মোহিনীকে প্রশ্ন করে দেখতাম। সে এখনো আছে তো?'

বরাট বলিলেন,—'দিব্যি আছে, নড়বার নামটি নেই। আমিও ছাড়তে পারছি না, যতক্ষণ না এ মামলার একটা হেস্তনেস্ত হয়—'

'তাহলে আমরা একবার ঘুরে আসি।'

'চলুন।'

'না না, আপনার অন্য কাজ রয়েছে, আপনি থাকুন। আমি আর অজিত যাচ্ছি। [illegible] সেই তরুণ কনেষ্ট-বলটিকে সেখানে পাব তো?'

বরাট হাসিলেন,—'আলবত পাবেন।'

থানা হইতে বাহির হইলাম। ফণীশের এখনও ফিরিবার সময় হয় নাই, আমরা ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে চলিলাম।

থানার অনতিদূরে রাস্তার ধারে একটি বিপুল পাকুড় গাছের ছায়ায় ট্যাক্সি দাঁড়াইবার স্থান। সেইদিকে যাইতে যাইতে আমি বলিলাম,—'ব্যোমকেশ, প্রাণহরির সঙ্গে কয়লাখনির ব্যাপারের কি কোনো সম্বন্ধ আছে?'

সে বলিল, কিছু না। একমাত্র আমি হচ্ছি যোগসূত্র।'

ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের কাছাকাছি গিয়া দেখিলাম গাছতলায় মাত্র একটি ট্যাক্সি আছে এবং রাস্তার ধার ঘেঁষিয়া একটা প্রকাণ্ড কালো রঙের মোটর আমাদের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভুবন দাস কালো মোটরের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া চালকের সহিত কথা বলিতেছে। আমরা আর একটু নিকটবর্তী হইতেই কালো মোটরটা চলিয়া গেল। ভুবন দাস নিজের ট্যাক্সির কাছে ফিরিয়া চলিল।

ব্যোমকেশ তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া বলিল,—'কার মোটর চিনতে পারলে? গোবিন্দ হালদারের মোটর। প্রথম দিন নম্বরটা দেখেছিলাম।'

'গোবিন্দ হালদার ট্যাক্সিওয়ালার কাছে কী চায়?'

'বোধ হয় সাক্ষী ভাঙাতে চায়। এস দেখি।'

[ক্রমশঃ]

ক্লান্ত বোধ করার হাত থেকে মায়েদের রেহাই নেই। ডক্টর লিওনার্ড লভ্‌শিস-এর মতে, এজন্য মনোবিশ্লে-ষণের কোন দরকারই নেই। "তিনি অসুস্থ নন্ বা ভুল বোঝাপড়ার জন্যও নয়—তিনি শুধুই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। দিনে তাঁকে ১৬ ঘন্টা পরিশ্রম করতে হয়, সপ্তাহের সাতটা দিনই তিনি কাজ করেন। সত্যিকারে ছুটি বছরে একদিনও তিনি পান না। তাঁকে, স্বামী, পুত্র, [illegible] নিয়ে নানান উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটা[illegible]।" এ ছাড়া সংসারে অনেক গৃহপালিত [illegible] তত্ত্বাবধানও তাঁকে করতে হয়। "একটি কুকুর ছাড়া দেড়টি শিশুর সমান, সন্তানসহ বিড়াল, দুটি শিশুর সমান।"

কটি সন্তানের মা, তাই দিয়ে কিছু এসে যায় না। ডঃ লভ্‌শিস লেখেছেন, "চার সন্তানের মায়ের যে উদ্বেগ, তার চারগুণ উদ্বেগ এক সন্তানের মায়ের।" বয়সে তফাত হলে কোনকিছু তফাত হয় কি? "৩০ বছরের পর নার্ভাস সিস্টেম চাপ সহ্য করতে কষ্ট পায়। দু'ঘণ্টা কান্নাকাটি সহ্য করা যে-কোন বয়সের মায়েদের পক্ষেই খারাপ। ৩৬ বছরের পর তা অসহ্য।"

এক্ষেত্রে তাঁর মতে.—ছোটখাট ব্যাপারে, সিনেমায় যাওয়া, নতুন ব্লাউজ ইত্যাদি কেনা, বাইরে খাওয়া প্রভৃতি ব্যাপার-গুলি অনেক সাহায্য করে। ক্লান্ত মায়েদের মাদক ঔষধ দেবার তিনি বিরোধী। তাঁর মতে, ফুটবল দলকে ওষুধ খাওয়াবার সমান ফলই এর দ্বারা ফলবে। সবচেয়ে ভাল ওষুধ হল, ছেলে-মেয়ে, স্বামী, সংসারের মধ্যেই তাঁদের মগ্ন থাকতে দেওয়া।

রবিন হুড কে ছিলেন?

সুধীময় চৌধুরী

শেরউড অরণ্যের [illegible] ডাকাতের গল্প কে না জানে। [illegible] ডাকাত ছিলেন না রবীন হুড। তিনি ছিলেন সামন্ত ভূস্বামী। রাজরোষে পতিত হয়ে অরণ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেখানে থেকে ধনীর গৃহে ডাকাতি করে তিনি দরিদ্রকে প্রতিপালন করতেন। সেকালে তাঁর তুল্য তীরন্দাজ কেউ ছিল না, আর উপস্থিত বুদ্ধি তাঁর এত প্রখর ছিল যে, আইনের লম্বা হাত তাঁকে কব্জা করতে অপারগ হয়েছে।

রবীন হুডের জীবনের বিচিত্র কাহিনী সুবিদিত—এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ ঘেঁটে বার করবার চেষ্টা করব রবীন হুড বলে সত্যি কেউ ছিলেন কিনা। যদি থেকে থাকেন—তিনি কে ছিলেন এবং কখন তিনি বেঁচে ছিলেন।

•

অনেকের মতে বর্তমান বৎসর হচ্ছে রবীন হুডের জন্মের অষ্টশতবার্ষিক বৎসর। আবার অন্যেরা বলে থাকেন আজ থেকে ছ'শো বছর আগে মৃত্যু হয়েছে রবীন হুডের। এই দুই পক্ষের বক্তব্যই যদি সত্য বলে ধরা যায়—তা'হলে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, রবীন হুড দু'শো বছর বেঁচে ছিলেন। রবীন হুডের কীর্তিকলাপের যে সব চমকপ্রদ কাহিনী লোকগাথায় বিবৃত হয়েছে—তা যদি সব সত্য হয় তাহলে মেনে নিতেই হয়, তিনি অনেক কাল বেঁচে ছিলেন, কেননা স্বল্পায়ু লোকের জীবনে অত ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলেও কোন মানুষের দু'শো বছর পরমায়ু ছিল—এমন কথা কোনক্রমেই সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না।

তাহলে কি রবীন হুডের কাহিনী নিছকই কিংবদন্তী? এই প্রশ্নের ইতি-বাচক উত্তর দিলে অবশ্য হাঙ্গামা মিটে যায়। তারিখের গরমিল নিয়ে মাথা ঘামাবার আর দরকারই হয় না। কিন্তু কথা হচ্ছে, লোকসাধারণের উর্বর কল্পনার বাইরে রবীন হুডের যদি কোন অস্তিত্ব নাই থাকবে তাহলে ইংলণ্ডের সেকালের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা মিছে কেন গুজবের পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরে মরবেন?

যদি ধরে নেই রবীন হুড বলে কেউ ছিলেন তাহলে আমাদের দুটি প্রচলিত মতের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়। এই দুটি মতের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশী চালু তদনুসারে রিচার্ড দি লায়ন হার্টের রাজত্বকালেই রবীন হুড দোর্দণ্ড প্রতাপে শেরউড অরণ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা রিচার্ড ক্রুসেডে যোগ দিতে গেলে প্রিন্স জন রাজ্যচালনার ভার নেন। তিনি লোক ভালো ছিলেন না এবং তার স্যাঙ্গাপাঙ্গরা ছিলেন ততোধিক খারাপ লোক। এঁদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার জন্যই রবীন হুড অরণ্যচারী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই মত অনুসারে আনুমানিক ১১৬০ সালে রবীন হুডের জন্ম।

•

অন্য মত অনুসারে ১৩২০ সালে দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বকালই রবীন হুডের জীবৎকাল। সাক্ষ্য-প্রমাণ এই দ্বিতীয় মতের পক্ষেই জোরালো। রবীন হুড সংক্রান্ত প্রাচীনতম লোক-গাথাগুলিতে রাজা এডোয়ার্ডেরই উল্লেখ আছে—রিচার্ড বা জনের নাম নেই। এই সময়েই আবার লম্বা ধনুকের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তীরন্দাজ হিসাবে রবীন হুডের যে খ্যাতি, এই উন্নত ধরনের ধনুক না হলে সে ধরনের পারদর্শিতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হত না। তাছাড়া ১৩৭০ সনের আগেকার

কোন লিখিত বিবরণে বিখ্যাত দস্যু হিসাবে রবীন হুডের কোন উল্লেখ নেই।

অবশ্য এই সব দলিল-দস্তাবেজের সাক্ষ্য রবীন হুডের কুলপঞ্জী নির্ণয়ের ব্যাপারে খুব বেশী সহায়ক হয় না। রবার্ট বা রবীন হুড একটা অত্যন্ত প্রচলিত নাম। দলিল-দস্তাবেজ থেকে দেখা যায় ১২০০ থেকে ১৫০০ সনের মধ্যে অনেকবারই এক বা একাধিক রবীন হুড আইনের কবলে পড়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে রবীন হুড অব ওয়েকফিল্ডের কথা।

সুতরাং যেখোক্ত মতই ইতিহাস-সম্মত এরূপ মনে করবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে। এ-প্রসংগে শুধু একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। এক শতাব্দী পরেকার ঘটনা কেন লোকগাথায় এক শতাব্দী আগে সংস্থাপিত হল?

ইতিহাসে অবশ্য এই ধরনের সংস্থাপনের নজীর আরও পাওয়া যায়। কিংবদন্তী অনুসারে হাই হলের স্যার উইলিয়ম ক্রুসেডে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী লেডী ম্যাবেল তাঁকে মৃত মনে করে পুনরায় বিবাহ করেন। স্যার উইলিয়ম ফিরে এলে লেডী ম্যাবেলকে কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রতি সপ্তাহে একদিন একটি বিশেষ স্থানে নগ্নপদে তাঁকে হেঁটে যেতে হত। সেই জায়গাটি ম্যাবস ক্রস নামে পরিচিত। স্যার ওয়াল্টার স্কট তাঁর 'বাগদত্তা' গ্রন্থে এই কাহিনীটি ব্যবহার করেছেন। লোকগাথার [illegible] কাহিনীটিকেও সংস্থাপিত করা [illegible] প্রথম [illegible] কিন্তু স[illegible] উইলিয়ম ও লেডী ম্যাবেল দ্বিতীয় [illegible] ডোয়ার্ডের সমসাময়িক। স্যার উইলি[illegible] কখনও ক্রুসেডে যাননি—তিনি রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত হয়েছিলেন।

[illegible]ল্যান্ডের ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা [illegible] দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক [illegible]ন্য রাজনৈতিক চক্রান্তের জন্য কুখ্যাত এবং কোন পক্ষই তখন অপাপ-বিদ্ধ ছিলেন না। স্যার উইলিয়ম বা রবীন হুডের মত জনপ্রিয় নায়কেরা কোন জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন এমন কথা বলছি না। তাঁদের চরিত্রে যাতে যুগের কলংক কালিমার ছাপ না পড়ে সেই জন্যই হয়ত লোকগাথায় তাদের কাহিনীকে সংস্থাপিত করা হয়েছে এক শতাব্দী আগে—রিচার্ড দি লায়ন হার্টের ও ক্রুসেডের রোম্যান্টিক যুগে।

রবীন হুডকে কেন্দ্র করে যত কাহিনী রচিত হয়েছে তার সবই সত্য এমন কথা অবশ্য বলা যায় না, কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু কাহিনী যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই; এবং আমরা এ-সিদ্ধান্তে সংগতভাবেই করতে পারি—রবীন হুড সত্যই ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

বলুন তো কী?

উত্তর

১। ৬৪ বৎসরের পুরোনো: সিনেমা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৯৬ সালে।
২। ২০ থেকে ২৫ বৎসর বয়সে।
৩। চিড়িয়াখানায়।
৪। প্রায় ৩৫০টি।
৫। [illegible]
৬। গরিলা, গিবন, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং।
৭। প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড
৮। নারকেল।

সাম্প্রতিক বচন

পৃথিবীটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, কিন্তু আমরা সকলে মনে করি পৃথিবীর সবচেয়ে দরকারী জিনিস হচ্ছে, সমস্ত বিশ্ববাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বিকাশ। আজকের পৃথিবীর দুই বা তিন শত কোটি অধিবাসী যারা দারিদ্র্য হতে, বশ্যতা হতে এবং হীনতা হতে মুক্তি-লাভ করেছে এবং যারা মাথা তুলে নিয়তির দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারছে, তাদেরকেই আমরা আজ সাহায্য করতে চাই।

—ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট দ্য গল

* *

আন্তর্জাতিক রাজনীতি কোন কালেই সোজা বা সরল হবে না, যে পর্যন্ত না রাজনীতিজ্ঞরা পরস্পরের সংগে দেখা করবার সময় বিমানের পরিবর্তে সমুদ্র-পথে যাতায়াত না করেন।

—ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ

আমি অশোভন ভাবে বলছি না—চীনকে যদি আজ জাতিপুঞ্জের (U. N.) সভ্য করে নেওয়া যায়, তবে পৃথিবীর রাজনৈতিক ঘটনাগুলির সুমীমাংসা হয়ে যায়।

—চীনের বৈদেশিক মন্ত্রী ই

* * *

আফ্রিকার জমি ও আফ্রিকার খনি-গুলির দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজ যুদ্ধ চলেছে। এই সব জাতীয় ধনসম্পদই হচ্ছে জাতীয় পতাকার একমাত্র খুঁটি।

—মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের

* * *

এমন উপগ্রহ আপনাদের দরকার নাই, যারা টাকা পাবার লোভেই যন্ত্র-চালিত হয়ে আপনাদের পক্ষে ভোট দেবে। আপনাদের এমন বন্ধু চাই যারা দৃঢ়বিশ্বাসে আপনাদের সমর্থন করবে বা দরকার হলে বিরুদ্ধাচরণ করবে।

—মার্কিন কংগ্রেসে টিউনিশিয়ার প্রেসিডেণ্ট হাবিব বুরগুইবা

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধকুমার সান্যাল

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ছয়—
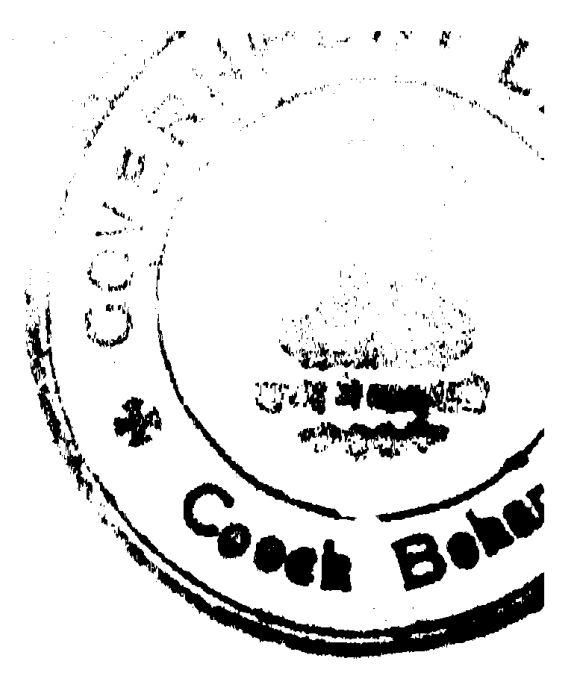
পরদিন ভোর থেকেই দে[illegible] বুড়িপিসি কোমর বেঁধেছে। আমার বিছানা ছাড়বার আগেই ঘরদোরের সব কাজ তার শেষ। হাট-বাজার অবশ্য খুবেই বাছাকাছি,—কিন্তু বুড়িপিসির হাতেই সব। তার মাইনে কত, এ আমার বাবার আমল থেকেই জানা নেই। খরচপত্র সবই তার হাতে। সন্দেহক্রমে যদি কখনও হিসেব চাও তবে ধমক খাবে। বলবে, চুরি করেছি বেশ করেছি। যা পার করগে। সে এ বাড়ির কর্তা, দারোয়ান, ঝি, রাঁধুনি, বাজার সরকার—সবই। ওকে ঘাঁটাতে কারও সাহস নেই। হেনা ওকে ডাকে, 'চরকী পিসি'!

আটটার মধ্যে তার রান্নার যোগাড় সব প্রস্তুত। সে জানে, শুক্তো আমার পছন্দ। লাউ-নারকেল-সরষের গুঁড়ো ও কুচো চিংড়ি মিলিয়ে ঘণ্ট হয় উপাদেয়। মুগের ডালের মধ্যে মাংস আর পালং শাক মিলিয়ে হয় দেবভোজ্য। আলুবাটার সঙ্গে ময়দার পরোটা,—ওর মধ্যে দাও কাঁচালঙ্কার কুচি,—মরা মানুষ উঠে বসে লালাসিক্ত হবে। এসবগুলো সুরমা ধরিয়ে দিয়ে গেছে বুড়িপিসিকে। মাঝে মাঝে হঠাৎ হেনা এসে বুড়িপিসির রান্নাঘরে বসে চিতল মাছের বড়ার উপর ভাগ বসিয়ে যায়। এ-বাড়ির সব রান্নার খবর হেনা রাখে।

বুড়িপিসি বলে, তোমার বাপকেও একদিন এই হাতে রেঁধে দিছি, বুঝলে মেয়ে? পাড়ায় পাড়ায় তখন আমার নামডাক!

তোমার বিয়ে হয়েছিল কবে, চরকী-পিসি?

বিয়ে! —বুড়িপিসি বলে, শোন মেয়ের কথা! বিধবা হলুম কবে যে বিয়ে করব? আমাদের পুরনো আমলে কথায় কথায় কেউ সোয়ামির [illegible] তুলত না! তাদের লাইনে তারা, আমাদের লাইনে আমরা!

হেনা হাসিমুখে বলে, তোমার ছেলেপুলেরা কোথায়?

বুড়িপিসি জবাব দেয়—বড্ড অলুক্ষণে কথা তোমার বাছা। তোমাদের তিনপুরুষ আমাকে বুড়িপিসি ডাকত, —সেই ঠাকুরকর্তার আমল থেকে! বাপ থাকলে তবে না পিসি! ছেলেপুলের আর ভাবনা কি? তোমার মাকে আমিই না কোলে নিয়ে ঘরে তুলেছিলুম। খোকনের বাপকে আমি যে আঁতুড় থেকে মানুষ করেছি!

এই সকল আলাপচারীর সুযোগে বুড়িপিসিকে ভুলিয়ে থালা পেতে গরম গরম দুটি ভাত খেয়ে হেনা গা ঢাকা দিত। কিন্তু এ সবই ঘটত আমার চোখের আড়ালে এবং মাঝে মাঝে গল্প করার সময় হেনা চোখ বুজে জ্যোতিঃশাস্ত্র গণনা করে আমাকে বলে দিত, অমুক-অমুক দিন আমার আহার্য তালিকায় কি কি ভোজ্যবস্তু ছিল!

হেনার এবম্প্রকার চাতুরী অনেক দিন ধরতে পারিনি।

বোম্বাই থেকে গতকাল সকালে হেনার জন্য খান দুই গুজরাটি শাড়ি কিনেছিলুম। কিন্তু গতকাল আমার নির্দয় আচরণের পর কোন্ মুখে শাড়ি দুখানা তার হাতে দেব, এইটি যখন প্রভাতকালে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ভাবতে বসেছি, ঠিক সেই সময় সন্তোষ এক কেট্‌লি ফুটন্ত চা এবং মস্ত এক থালায় ঢাকা প্রাতরাশের আয়োজন নিয়ে ঘরে ঢুকল। এটা নিত্যনৈমিত্তিক, বিস্ময় কিছু নেই। উঠে বসে আমি বললুম, ওই হ্যাণ্ডব্যাগ আর টিফিন্ ক্যারিয়রটা নিয়ে যাও, সন্তোষ। দাঁড়াও, আরেকটা কাজ কর। সুটকেসটা খুললে সামনেই দুখানা শাড়ি আছে, নিয়ে যাও ব্যাগে ক'রে।

প্রাতরাশের বাসনাদি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা এখন ওঠে না, সুতরাং অন্যান্য সামগ্রীগুলি একে একে গুছিয়ে নিয়ে সন্তোষ বেরিয়ে চলে গেল।

তিন মাস পরে ফিরেছি, সুতরাং আমার ঘরকন্নার দিকে এবার একটু মনোযোগ দেবার দরকার ছিল। কেট্‌লি থেকে এক পেয়ালা চা আগে ঢেলে নিয়ে বাইরে এসে বুড়িপিসিকে ডাকলুম। বললুম, ওই দ্যাখো, আবার মেঘ ক'রে এল! সব কাজ পণ্ড হতে বসল, দেখছ ত?

বুড়িপিসি বলল, তা আমি কি করব, খোকন?

তুমি কি করবে? তোমায় কে বলছে করতে? তোমার যে সেই এক ভাইপোর নাতি এখানে কাজ করত, সে গেল কোথায়?

ভাইপোর নাতি?—বুড়িপিসি [illegible] আগুন হল,—ধম্ম তুলে [illegible] বল? বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং [illegible] বাছা!

[illegible] তৎক্ষণাৎ বুড়িপিসি আ[illegible] রান্না-ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখান [illegible]কই সে গরগর করতে লাগল,—আ[illegible] কারও ধার ধারিনে, গতর খাটিয়ে খা[illegible]

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হাস-ছিলুম, এমন সময় ও-বাড়ি থেকে খুড়িমা এসে সামনে দাঁড়ালেন। ব[illegible]লেন, বুড়িপিসি, খোকনের কথাটা [illegible] কান দিয়ে শোননি—

বললুম, বল তৎখুড়িম[illegible] ওকে বুঝিয়ে?

খুড়িমা বললেন, নীলু গো নীলু, সেই যে তোমার ভাইপোদের সুবাদে নাতি হয়।

ও, তাই বল। নীলু! নীলুকে এনে রাখবে, মাইনে গুণবে কে?

বললুম, তুমিই গুণবে, আবার কে? আমার দেরাজ-বাক্সর চাবি সবই ত তুমি গিলে বসে আছ! তিনমাস বাড়ি ছিলুম না, এসে দেখছি তোমার স্বাস্থ্য ফিরেছে। কি কি খেয়েছ, বলনা খুড়িমাকে?

খুড়িমা হেসেই অস্থির। বললেন, আর বাড়াসনে খোকন, ঘরে যা। নীলুকে তুমি ডেকে এনো বুড়িপিসি, খোকনের ফাই ফরমাস খাটবে।

বুড়িপিসি গম্ভীর মুখে চোখ পাকিয়ে বলল, ছোট বৌ, ও ছেলের কক্ষনো বিয়ে দিয়ো না তোমরা। উটকো মেয়ে যদি ঘরে আসে তবে দেখো আমাকে শুকিয়ে মারবে! সাত পুরুষের সতীন এল খোঁটা তুলতে! মরণদশা আমার।

বুড়িপিসি আবার রান্নাঘরে ঢুকল। খুড়িমা এলেন আমার ঘরে। তাঁকে সামনে বসিয়ে প্রাতরাশের ঢাকাটা সবেমাত্র খুলে তাঁর পেয়ালায় চা ঢেলে দেব, এমন সময় হাসি মুখে হেনা এসে ঘরে ঢুকল। কলকণ্ঠে হেসে বলল, যাক ঠিক সময় এসেছি, নৈলে ভাগটা মারা যেত।

ওই শোনো খুড়িমা, খাবার পাঠিয়ে শান্তি নেই, আবার খেতেও এল!—হাসি মুখে বললুম।

কেটলির চা যথেষ্ট গরম ছিল। আমরা তিনজনে খেতে বসে গেলুম। খুড়িমা চিরকাল আমাদের দলে।

একটু আগে যে গুজরাটি শাড়ি দুখানা পাঠিয়েছিলুম, তারই একখানা হেনা বেশ [illegible] ছিয়ে পরে এসেছে। অতঃপর কাগজে [illegible] মোড়কটি সে সঙ্গে এনেছিল, সে [illegible] খুড়িমার সা[illegible] এবার বলল, [illegible] মার গায়ের যে চড়া রং, এই শাড়িটি [illegible] তোমাকে মানাবে, দেখে নিয়ো, খুড়ি[illegible]

খুড়িমা বললেন, ওমা, এ কি আমার জন্যে? কো[illegible]থেকে আনলি?

বলা [illegible]হুল্য, এ খানি দ্বিতীয় গুজরাটি [illegible]ড়ি। হেনার কূটনীতি লক্ষ্য ক'রে আমি [illegible] চুপ ক'রে গেলুম। এসব মেয়েমহলের বৈশিষ্ট্য। ওদের জগতের [illegible]টিল মনস্ত[illegible] ওরা ছাড়া কেউ বোঝে না।

হেনা বলল, বাঃ তোমাকে ও মাসে যে বলে গেলুম, দেওঘর হয়ে পাটনায় যাব? এ শাড়ি দুখানাই পাটনায় কেনা।

খুড়িমা প্রসন্ন মুখে বললেন, অনেক দাম নিয়েছে দেখছি। বেশ, চমৎকার হয়েছে।

এবার আমি বললুম, হেনা, তোমার পায়ে ব্যাণ্ডেজ কেন? কি হল?

হেনা রাগ করে বলল, কি ভাগ্যি যে এতক্ষণ পরে খবরটা নিলে? কাল বৃষ্টির সময় বাগানে কাপড় তুলতে গেছি,—কাঁচের টুকরো প'ড়ে ছিল দেখতে পাইনি।

আমি চুপ ক'রে গেলুম। এমন সময় বুড়িপিসি ঘরে ঢুকে এক প্লেট গরম মাছভাজা রাখল।

সর্বনাশ!—আমি শিউরে উঠলুম,—এবং বুড়িপিসিকে অধিকতর উত্তেজিত করার জন্য বললুম, এত মাছ কোত্থেকে পেলে? এ যে অনেক দাম!

শোনো!—বুড়িপিসি বলল, কান দিয়ে শোনো তোমরা! পাঁচজনের ঘর, মাছ-ভাতের কি অভাব? বাপ ছিল রাজপুত্তুর। বাপের সেই চেহারাটি পেয়েছ, বুকের ছাতিটি পাওনি, বাছা। পাঁচজনকে দিয়ে খেতে শেখনি।

হেনা যোগ ক'রে দিল, ঠিক বলেছ, চরকীপিসি!

বুড়িপিসি আমাদের হাসির রোলের মধ্য দিয়ে আবার গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। আমরা তিনজনে তার উপাদেয় মাছ-ভাজাগুলির সদ্ব্যবহার করতে ব'সে গেলুম।

খুড়িমা বললেন, কাল তুই কখন্ এলি আমি টের পাইনি, খোকন। বুড়িপিসির গলার আওয়াজেই জানলুম। তুই থাকবি ত কিছুদিন?

হেনা উৎকর্ণ হয়ে উঠল বুঝতে [illegible]ম। আমি বললুম, সঠিক কিছু বলতে [illegible] না। এ ত বদলীর চাকরি নয়, সরকারি কেনা-বেচার তদ্বির করা, মালপত্র পরীক্ষা করে মিলিয়ে নেওয়া! এ হল ছুটোছুটির চাকরি। আজ এখানে কাল সেখানে।

হেনা প্রশ্ন করল, যাদের ঘর-সংসার আছে তারা কি করবে?

তারা হয় ঘরসংসার সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে, নয়ত চাকরি ছাড়বে।

চমৎকার চাকরি!—হেনা বলে উঠল, আমাকে এমন একটা কাজ জুটিয়ে দাও না কেন?

গত সন্ধ্যার বিতর্কের কথা স্মরণ ক'রে সহাস্যে বললুম, এসব চাকরি করলে বড্ড অহঙ্কার বাড়ে হেনা, এ তুমি নাই করলে!

হেনা বলল, সেকথা সত্যি, তোমাকে দেখেই বুঝি।

খুড়িমা বললেন, তুই চাকরি করবি, ছুটোছুটি করবি,—নবেন্দু শুনবে কেন? সে যদি আবার [illegible] ক'রে গণ্ডগোল বাধায়?

হঠা[illegible] হেনা[illegible]র জেগে উঠল! চায়ের [illegible]লাটা নামিয়ে সে খুড়িমার দিকে তাকাতেই আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। হেনা বলল, তুমি আগা-গোড়া সব জেনেও একথা কেন বলছ খুড়িমা? নবেন্দুর কাছে আমি কি দাসখৎ লিখে দিয়েছি? সে কি আমার অভিভাবক?

খুড়িমা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, সে তোর চুলের মুঠি ধ'রে দার্জিলিং নিয়ে গেল, তার সঙ্গে বাস করলি, তোকে স্ত্রী বলে সে দাবি জানাল, তোর মাথার দোষ রটাল,—তার একটার প্রতিবাদও তুই করলি নে। এর পরেও বলবি সে তোর অভিভাবক নয়? অবাক করলি, হেনা।

হেনা হাসল। আমি জানি সেটি হাসি নয়। হেনা তার মানসিক বিপ্লবের অগ্নি-জ্বালাটা ঢোক গিলে চাপল। পরে শান্ত সংযত কণ্ঠে সে বলল, খবর রটতে দেরি হয় না, দেরি হয় তার প্রতিকার করতে। আগে তোমার প্রথম কথাটার জবাব দিই।

বল্ শুনি—খুড়িমা ফিরে বসলেন।

নবেন্দু আমায় চুলের মুঠি ধ'রে দার্জিলিং নিয়ে যায়নি, নিজের ইচ্ছেতেই গিয়েছিলুম। সেখানে তার একখানা বাড়ি আছে, কিন্তু সে বাড়িতে আমি ঢুকিনি। এক হোটেলেই বাস করেছি খুড়িমা, তবে আলাদা ঘরে। মাত্র চব্বিশটি ঘণ্টা দার্জিলিংয়ে ছিলুম, এবং হোটেলের খাতায় রায়চৌধুরী বলেই আমার পরিচয় লেখা হয়েছে। নবেন্দুর সঙ্গে তার কোনও যোগই হয়নি। এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছয় নবেন্দুর তথা-কথিত পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট শ্রীমতী এ্যানি ব্রুকলিন। মেয়েটি অতি ভদ্র, কিন্তু অতি নির্বোধ। পুরুষের খলতা-কপটতার সঙ্গে আজও মেয়েটির ঠিক

পরিচয় হয়নি। ওর কথা ভাবলে দুঃখ পাই।

তারপর?

হেনা বলল, নরেন্দু তার এটর্ণীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। সেই ভদ্রলোক সমস্ত দিন ধরে আমাকে ভয় দেখাতে থাকেন, আর নরেন্দু অন্যদিকে আমার পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে থাকে। আমি যেন তাকে স্বামী বলে স্বীকার করে নিই।

খুড়িমা বললেন, তোরই বা এমন ধনুর্ভাঙ্গা পণ কিসের? তোর মা বিয়ে করেনি? ঠাকুমা বিয়ে [illegible]নি?

হেনা এবার স[illegible] উঠল। তারপর বলল, অ[illegible] ও[illegible]লাগে না খুড়িমা।

স্বামী বলে কারোকে ভাবতে তো[illegible] ভাল লাগে না?

স্ত্রী হবার জন্যে আমি জন্মাইনি যে! আমি মেয়ে, খুড়িমা—কিন্তু স্ত্রীলোক নই। আমার জন্মলগ্নে রাহু ছিল না, ছিল শনি, শুক্র আর বৃহস্পতি!

হেসে আমি বললুম, বোধ হয় কেতুও ইশারা করেছিল!

কলরোলে খুড়িমা হেসে উঠলেন হেনার সঙ্গে। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন, তারপর? পালিয়ে গেলি কেমন করে?

পালাব কেন?—হেনা বলল, পরদিন চলে আসবার আগে নিজের মনিব্যাগ থেকে হোটেলের বিল শোধ করলুম, যেমন যাবার সময় নিজের রাহা-খরচ দিয়েছি কড়ায় গণ্ডায়। পিছনে দাঁড়িয়ে নরেন্দু আর তার এটর্ণী আমার ওপর তম্বিগম্বি করতে লাগল। হাসি পেয়েছিল আমার।

খুড়িমা বললেন, নরেন্দু তোর খরচপত্র দেয়নি?

হেনা তিক্ত হাস্যে বলল, ধনীর কাছে কখনও নিজের জন্যে হাত পাততে নেই, খুড়িমা। তাদের প্রতিটি টাকার থাকে কূটনীতি, দয়ায় থাকে ঘুষ। অবিশ্যি এ আমার নিজের ধারণা।

এবার আমি প্রশ্ন করলুম, দার্জিলিংয়ে তোমার তবে যাবারই বা কি দরকার ছিল?

হেনা বলল, শুধু তোমার জিদের জন্যে! তুমি বার বার চেয়েছ আমি একা যাই তার কাছে, আমি যেন তার স্ত্রী হয়ে ঘরকন্না পাতি, আমি যেন গিয়ে সব বিবাদের মীমাংসা করি। এই আমার দুঃখ যে, তুমি এটাকে সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ বলে সন্দেহ ক'রে এসেছ। আমি যে আমার মাথার ওপর কোনও ব্যক্তিকে স্বীকার করিনে, এটা তুমি কিছুতেই মানতে চাও না! তুমি বুঝতে চাও না সেও স্বামী নয়, আমিও স্ত্রী নই!

আমি বললুম, শাস্ত্রের অনুশাসন অমান্য করতে আমি শিখিনি! কারণ মূল প্রকৃতির নীতি এখনও বদলায়নি। এখনও [illegible] সূর্য ওঠে, ফুল থেকে ফল হয়, মৌমাছি আজও চাক [illegible]ধে, মেয়ে আজও পুরুষের মুখচাওয়া, সৃষ্টি আজও পুরুষের হাতে! নরেন্দু বিশ্বাস করে তুমি তার স্ত্রী!

খুড়িমা চুপ করে আমাদের বিতর্ক [illegible]ক্ষণ শুনছিলেন। এবার বললেন, আমার দুটো কথার জবাব দে হেনা। নরেন্দুর সঙ্গে এ্যানির মেলামেশা দেখে কি তোর মন খারাপ হয়েছিল?

হেনা হেসে বলল, কি যে তুমি বল খুড়িমা। ওদের সম্পর্ক খুঁটিয়ে দেখবার কথা আমার মনেও আসেনি!

ফোড়ন দিয়ে বললুম, সতীন বলে মনে হয়নি বলছ?

আঃ অসভ্যতা করো না, পার্থ!

খুড়িমা বললেন, দ্বিতীয়টা এই, নরেন্দুকে কি তোর পছন্দ নয়? তোদের তিন জনের এত বন্ধুত্ব—এত ঘনিষ্ঠতা—

নতমুখে নির্ভয়শান্তকণ্ঠে হেনা বলল, খুড়িমা, লজ্জা করব না আজ তোমাকে। পার্থ-নরেন্দু—দুজনের কেউ আমার অপছন্দ নয়। কিন্তু দুজনের একজন যদি রাতারাতি ফাঁদ পেতে স্বামী হয়ে উঠতে চায় তবে সে অনাচার কিছুতেই আমি বরদাস্ত করব না।

রাঙ্গাদিকে একথা বুঝিয়ে বল[illegible] পারবি?

না, রাঙ্গামা আমার মা নয়,—এতদিন পরে প্রথম জানলুম তিনি সৎমা!—অশ্রুস্বরে হেনা বলল, বোধ হয় নিজের মা হলে সন্তানের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা পেত। রাঙ্গামাকে এবার বোধ হয় আমি হারালুম।

ও-বাড়ির ঝি এসে দরজার পাশে দাঁড়াল। ঘোমটা একটু টেনে বলল, বাজার এসেছে মা, আমি কি কুটনো কুটে দেব?

খুড়িমা বললেন, এই যে যাচ্ছি। তুমি এই বাসনগুলো ধুয়ে মেজে দাও ত খাঁদার মা?

হেনা উঠে দাঁড়াল, আমি সরে বসলুম,—খাঁদার মা এগিয়ে এসে একে একে বাসনগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল। খুড়িমা এবার বললেন, এদিকে অন্তুর খবর বুঝি তোমরা শোনোনি কিছু?

অন্তু? কেন, কি হয়েছে তার?

খুড়িমা হাসিমুখে বললেন, পার্থ, বাড়ির বড় ছেলে হয়ে তুই রইলি আইবুড়ো। ওদিকে ছোট ভাই যে জার্মানিতে বসে এক কাণ্ড বাধাল?

হেনা অবাক হয়ে বলল, অন্তুর কথা বলছ? তার বয়স কত?

তোমাদের চেয়ে আড়াই বছরের ছোট।—খুড়িমা বললেন, ভাবছিলুম ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ফিরবে, দেখে শুনে ধীরে সুস্থে এবার একটি মেয়ে আনব! তা আর হল কই? অন্তু সেদিন লিখেছে, লক্ষ্মী মা, তুমি অ[illegible]ত্তি ক'র না, সামনের মাসের তিন তারিখে এখানে একটি জার্মান মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে। সে বলেছে, শাড়ি সিঁদুর দুই পরে সে বিয়ে করবে। তুমি ভয় পেয়ো না মা, সে আমার চেয়ে দু' বছরের ছোট। আমি ওকে বাংলা শেখাচ্ছি। ওর একখানা ছবি পাঠালুম। লক্ষ্মীটি মা, আমাদের আশীর্বাদ ক'রো। একটুও রাগ ক'রো না, মা।

আমি বললুম, অন্তুর এ সন্দেহ কেন যে তুমি আশীর্বাদ করবে না?

খুড়িমা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ছেলেমেয়ের বয়স চোদ্দ-পনেরো ওদের চোখে ঝাপসা দেখে, খোকন! অন্তু বোধ হয় যেন ভাবল, আমি এতই ছোট যে, একালের ছেলেমেয়েদের ওপর [illegible]মা-[illegible] ফলাতে যাব!

[illegible] হেসে খুড়িমা [illegible]র থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হেনা জানত আমার [illegible]ক পেয়ালা চায়ের দরকার। এক সময় উ[illegible] গিয়ে সে খুড়িপিসির ঘরে চায়ের ব্য[illegible]থা ক'রে এল। খবরের কাগজখানা মু[illegible]র ওপর থেকে সরিয়ে এবার বললুম, প[illegible] খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নাই বা এত ছুটো[illegible] করলে?

হেনা হাসল। বলল, মা[illegible]য়ে ক[illegible]লের তোড়া পাঠালে, সকালে [illegible]কালে নতুন

শাড়ি,—এর পরেও যদি না আসি তবে শস্তাদামের উপন্যাস হয় কোত্থেকে? যারা এক কথায় সম্পর্ক কেটে পালায় তারা তোমার মতন দুর্বল প্রকৃতি নয়। কাল তোমার ছেলেমানুষী চরমে উঠেছিল, তা জান পার্থ?

বললুম, তুমি কাল ট্যাক্সি থেকে ওই মুক্তিতে নেমে গেলে কেন? দু'চারটে বেমক্কা কথাই না হয় বলে ফেলেছিলুম, তাই বলে ট্যাক্সিওলার সামনে আমাকে অপ্রস্তুত ক'রে ছাড়লে?

তুমি যে গাড়ির মধ্যে আমাকে টি'কতে দিলে না!—হেনা বলল, নিছক জেদটা নিয়ে নেমে গেলুম। বে-মানুষটার জন্য ছুটতে ছুটতে গেলুম এরোড্রামে, যাঁর জন্যে সমস্ত আকাশে ঘুরেতে লাগল আমার অস্থির দুটো চোখ,—

এসব উচ্ছ্বাসের কথা রাখ হেনা—

নয়ত কি?—হেনা বলল, আকণ্ঠ উদ্‌গ্রীব হয়ে একদৃষ্টে দেখছি কতক্ষণে নিরাপদে প্লেনখানার চাকা মাটিতে ছোঁবে! আর সেই মুখে তুমি এই আচরণ করলে? তোমার লজ্জা-শরম, ভদ্রতা কোথা গেল?

খবরের কাগজখানা দিয়ে মুখখানা আড়াল করলুম। হেনা কিন্তু থামল না। সে বলল, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিছু নেই যার সঙ্গে তাকে তাড়ান খুব সহজ এ কি জানিনে? ভাগ্যি তুমি অন্তু নও, আর আমি জার্মান মেয়ে নই!

কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে বেপরোয়া-কণ্ঠে বললুম, হলে মন্দ কি হত?

হেনা ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর, মুখ নেড়ে কথা বলো না! আমি তোমার ভালবাসার প্রত্যাশী নই যে, যে পায়ে লাথি মারবে সেই পা ধ'রে কাঁদব!

[illegible]র ভালবাসার পাত্র রয়েছে ত! তাকেই [illegible]মলাও!

চুপ ক[illegible] হেনা ব[illegible] ভালবাসা [illegible] না। কে আমার ভালবাসার পাত্র, [illegible]মার মুখ থেকে শুনলে আমার গা [illegible]ন-ঘিন করে। ভাল দুটি বন্ধু জ[illegible]ল আমার—দেশসুদ্ধ ধিক্কার দি[illegible]ছ। দুজনের একজন হল হতভাগ্য, আরেকজন অপদার্থ!

বুড়ীপি[illegible] দু'পেয়ালা চা নিয়ে এল। চা রেখে [illegible]র যাবার আগেই সন্তোষ এসে দাঁড়া[illegible] বলল, দিদি, এগুলো এনেছি! বা[illegible] নিয়ে যাব কি?

হেনা বলল, হ্যাঁ,—তুই যা, আমি যাচ্ছি। ততক্ষণ একটু গরম জল চড়িয়ে দিস।

প্রশ্ন করলুম, কি এনেছ সন্তোষ?

সন্তোষ বলল, দিদির পায়ের ওষুধ।

কই দেখি? এদিকে আন।

হেনা আপত্তি জানাল, আমি ভ্রূক্ষেপ করলুম না। বুড়ীপিসিকে গরম জল আনতে বললুম। সন্তোষ ব্যাণ্ডেজের বাক্সটা খুলতে বসল। আমি বললুম, খুড়িমা না এসে পড়লে আমিই যেতুম তোমাদের ওখানে।

হেনা বলল, না থাক, অত কষ্ট নাই করলে।

কথাটার মধ্যে বিদ্রূপবাণ ছিল, কিন্তু সন্তোষের সামনে আমি কিছু বলতে পারলুম না। বুড়ীপিসি গরম জল এনে হেনার পায়ের ক্ষতটা দেখে শিউরে উঠে বলল, আ সব্বনাসী, দেখে শুনে পা ফেলতে পারনি? একেবারে ফালা ক'রে কেটেছ?

মিনিট পাঁচেক লাগল পদসেবায়। তারপর ঔষধপত্র গুছিয়ে নিয়ে সন্তোষ এক সময় উঠে গেল। প্রায়শ্চিত্ত এতক্ষণে আমার সম্পূর্ণ হল। আগে ফুলের তোড়া, মাঝখানে শাড়ি, সবশেষে পায়ে-ধরা! এক সময় হাসিমুখে হেনা বলল, মনে ক'র না আমার মাথা কিনলে! সেবার তোমার প্যারাটাইফয়েডের সময় আমি আট-দশদিন রাত জেগেছিলুম তোমার মাথার পাশে।

বললুম, নবেন্দুও কম করেনি। ডাক্তার-বদ্যির জন্য কত ছুটোছুটি সে করেছিল, মনে নেই? একা বাহাদুরি নিয়ো না!

হেনা প্রশ্ন করল, নবেন্দুকে তুমি ভুলতে পার না কেন বল ত?

অনেকদিনের আনন্দের সঙ্গী, তাই ভুলিনে।

হেনা উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি ভুলতে চাই পার্থ। হতভাগ্য সে, তাই ভুলতে চাই। [illegible]—আমি যাই এখন। তোমার [illegible] বল ত!

হেনার মুখে চোখে যে ঘৃণাটা প্রকাশ পেল সেটি লক্ষ্য করবার মতো। কথাটা অতঃপর বাড়িয়ে তুলতে কোনমতেই আমি আর সাহস পেলুম না। শুধু বললুম, আমার চাকরিতে ছুটি কম। তবু এরই মধ্যে রাঙামামা কি বলেন শুনতে হবে। আপিস থেকে ফিরে যাব তোমাদের ওখানে।

বুড়ীপিসিকে একখানা রিক্সা ডাকতে বলে আমি স্নান করতে গেলুম। হেনা চলে গেল।

হাসিমুখে হেনা বলল, মনে কর না আমার মাথা কিনলে!

হেনার সঙ্গে আমি সর্বপ্রকার সংস্পর্শশূন্য হতে চাই, এটি তাকে বলবার সময় গতকাল নিজের মনেই আমি হেসেছিলুম। কারণ এটি আমার মনের কথা নয়। ওদের সমস্যাগুলোই

আমার সমস্যা, আবাল্য এইটিই দেখে আসছি। ওদের সমস্ত জটিলতার মধ্যেই আমি জড়িত, আমি তার বাইরে নয়। আমাদের এই অবিভাজ্য সম্পর্কের তলায় বোধ হয় আরেকটা কোনও অদৃশ্য বন্ধনবোধ আমাদের ভিতরে গোপনে গোপনে কাজ করে গেছে, যেটার মধ্যে প্রণয়চৈতন্যের ভাগ হয়ত সর্বাপেক্ষা কম ছিল। আমরা উভয় উভয়কে না দেখলে যেমন উদ্বিগ্ন হতুম, দেখলেও তেমনি ঔদাসীন্য থাকতুম। ঠিক জানিনে, এবং এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও কখনও করিনি যে, আমাদের উভয়ের অতি-ঘনিষ্ঠতার ফলেই হয়ত আমাদের স্ব স্ব প্র... বিশেষ ভাবনা কালক্রমে কোনও ... মাথা তুলতে পারেনি। ওটা আমাদের আড়ষ্টতা কিংবা চেতনাহীনতা কিংবা একটা কোনও বিচিত্র ধরণের মূঢ়তা, এও আমরা কোনদিন বিচার করতে বসিনি। তরুণ কৌমার্যের অন্তরালে যে অসীম কৌতূহল পরম জিজ্ঞাসার মতো মেয়েদের রক্তের ভিতর লুকিয়ে থাকে, বোধ করি তারই প্রেরণায় হেনা একদা নবেন্দুকে নিয়ে দেওঘরের সেই অভিশপ্ত নির্জন বাড়িটিতে ঢুকেছিল! কিন্তু তাই নিয়ে আমার নিজের বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা আজও ঘটেনি। বলা বাহুল্য, সাধারণ মেয়ে এটাকে অপরাধ মনে করে এসেছে চিরকাল, সযত্নে এটাকে লুকিয়েছে লোকচক্ষুর সম্মুখে নীতিভঙ্গের আশঙ্কায় এবং নারীর স্বাভাবিক লজ্জায়। কিন্তু কতকটা অসাধারণ বলেই হয়ত হেনা এটাকে গোপন করেনি। তার জ্ঞানোন্মেষের পথে এটা সাহায্য করেছে বলেই তার সঙ্কোচ-কুণ্ঠা ঘুচেছে। বলা বাহুল্য প্রকৃতির এই খেলার সে নিরুপায় ক্রীড়নক হতে চায় না, তাই নিজহস্তে সে এর বল্গা ধরতে চেয়েছে। সন্দেহ নেই, মনে মনে আমি তাকে তারিফ করেছিলুম।

অপরাহ্নের দিকে বাড়ি ফিরে স্নানাদি সেরে যখন বেরোচ্ছি, বুড়িপিসি সামনে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে বললুম, তোমার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, আজ সেখানেই খাব!

বুড়িপিসি ফস করে রাগে আগুন হয়ে উঠল এবং রাগলে তার ঘাড় কাঁপতে থাকে আমি জানতুম। সে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার শ্বশুরবাড়ি আর আমার বাপের বাড়ি কি আলাদা?

বাঃ তুমি আবার বাপ জোটালে কোত্থেকে?

মুখ সামলে কথা বলিস, খোকন—এই বলে বুড়িপিসি কি যেন একটা আনতে ছুটল রান্নাঘরে,—সেই সুযোগে আমি বেরিয়ে পড়লুম।

পথে নেমে পিছন ফিরে দেখি, বুড়িপিসি ছেঁড়া ও ময়লা একখানা হাত-পাখার বাঁটটা ধরে ফোকলা দাঁতে হাসছে। ... শান্তমনে হেঁটে চললুম।

রায়চৌধুরীদের বাগানে ঢুকে কয়েক-পা এগিয়ে দেখি, কাঠের একখানা লাঙ্গল একটি গাছের পিঠে দাঁড় করানো এবং সামনের হাত-দশেক জমি চষা। বাড়িতে ঢোকবার মুখেই দেখা গেল, সরু কয়েকটা লোহার চেন দিয়ে পাঁচ-সাতটা বেজি বাঁধা রয়েছে এবং আমাকে দেখামাত্র তারা সেই বাঁধা অবস্থাতেই ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। বুঝতে পারা গেল, এগুলি ছোটকার সর্বশেষ খেয়াল। ওদিকে সন্তোষ ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করছিল। হেনার ঘরে হেনাকে না পেয়ে আমি ছোটকার মহলে গিয়ে ঢুকলুম।

একটু অবাক হলুম। ছোটকার বসবার ঘরটি হেনা দখল করেছে, এবং একপাশের একটি টেবলে বসে একটি টাইপ-রাইটারের সাহায্যে একমনে সে টাইপ করছে। টেবলের উপর নানা কাগজপত্র ছড়ানো। আমাকে দেখে হেনা থামল। বলল, এত সকাল সকাল? আপিস যাওনি?

গিয়েছিলুম বৈকি। ওসব কি করছিলে?

চিঠিপত্র জমে গেছে অনেক, তা-ছাড়া কাজও অনেক। চেষ্টা করছি কলকাতা ছাড়বার।

বললুম, ছোটকা কোথায়?

হেনা বলল, ওই ত পাশের ঘরে। দাঁড়াও, এখন ওঘরে যেয়ো না। ছোটকা যোগ করছেন! বেলা চারটে অবধি উনি দরজা ভেজিয়ে রাখেন।

হেনার হাসিমুখ দেখে কৌতূহল হল। আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে ঘরের দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ঘরের একধারে দেয়ালের দিকে ছোটকার মাথাটা নিচের দিকে এবং দেহের ভারসাম্য রাখার জন্য দুখানা পা উপর দিকে দেয়ালের সঙ্গে লটকানো। দেখে মনে হল অনেকক্ষণ উনি ওইভাবে রয়েছেন। আমি হাসি চেপে যখন সরে আসছি, সন্তোষ এগিয়ে এসে বলল, মা আপনাকে ডাকছেন।

ছোটকার মহল ছেড়ে আমি রাঙ্গামার ওদিকে এলুম। রান্নার ঠাকুর এরই মধ্যে এসে গেছে। রাঙ্গামা তাকে একেলার রান্নার ফর্দ দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, ঘরে বসো পার্থ—আসছি। ঠাকুর, এদের চা-জলখাবার আগে দাও।

একটু পরেই রাঙ্গামা হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন। আমি বললুম, ষাক্, ভয়ে ভয়ে আজ এসেছিলুম। আপনার হাসিমুখ দেখে বাঁচলুম, রাঙ্গামা।

শোনো ছেলের কথা!—রাঙ্গামা বললেন, বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরলে কোন্ মায়ের মুখে হাসি ফোটে না? তোমার জন্যেই আমি দিন গুনছিলুম পার্থ।

রাঙ্গামা আমার সামনে এসে বসলেন। কিন্তু তাঁর পিছনে পিছনেই হাসিমুখে হেনা এসে তাঁর পাশে বসল। রাঙ্গামা জানতে চাইলেন, আমার ছুটি কতদিনের, এবং এখানকার সব ব্যবস্থা সেরে যাবার সময় পাব কিনা। আমাকে বোঝাতে হল, ছুটি বলতে আমার কিছু নেই, তবে এখানকার কাজ পড়ে থাকবে না। যেভাবে যেমন করেই হোক আমার কর্তব্য আমি সম্পাদন করব। ... ভাববার কিছু নেই।

রাঙ্গামা বললেন, শেষ ...বেলা এ বাড়ির মাটি কামড়েই ...ব মনে ... হল ... বাবা। ...ঠাকুরপোকে ফেলতে পার... উনি আমাকে সেই কনেবৌ করে ... এনেছিলেন। যেখানেই আমি ...না কেন, ঠাকুরপো আমার কাছেই থাকবে... ওঁর আর কিন্দনই বা। আমাদের ...জনকে তুমি হিনুর বাড়িতে রেখে এস, পার্থ।

হেনা চুপ করে শুনছিল। ... আমি প্রশ্ন করলুম, এ বাড়ি?

এ বাড়ি আমাদের নয়, বাবা ... সায়েব পাড়ার বাড়ি, এ বাড়ি—এ সব ... হেনার। রাঙ্গামা পুনরায় বললেন, আর্দ্ধ... হিনুর

সম্পত্তিও হেনার, তবে আমার যাবজ্জীবনের ভোগদখল স্বত্ব।

আপনার খরচপত্র?

মায়েরপাড়ার বাড়িভাড়ার চার ভাগের এক ভাগ।

ছোটকার কি আছে?

সরিকের ভাগ কিছু আর নেই। ওদের সব গেছে।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে গেলুম। অতঃপর রাঙগামা পুনরায় বললেন, এ বাড়ি কেমনধারা লোক আনাগোনা করছে আজ দুমাস। তোমার জানেই বসে ছিলুম, পার্থ। আমার মেয়ের কথাটাও বলি। সে কিছু চায় না। সমস্ত ছেড়ে দানপত্র লিখে দিয়ে সে চলে যেতে চায়।

বললুম, দানপত্র? কা'কে?

হেনা এবার মুখ তুলল। শান্তকণ্ঠে বলল, মামলায় যদি [illegible]রি, নবেন্দুর ক্ষতিপূরণ করতে আমি বাধ্য।

যদি জেতো?

তা হলে রামকৃষ্ণ মিশন্!—হেনা জবাব দিল।

বুঝতে পারা যাচ্ছে, ওঁদের শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আমার বলবারও কিছু নেই, এবং নতুন কোনও প্রস্তাবও নেই। এ যেন নিয়তির টানের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আমার সর্বাপেক্ষা আশঙ্কা ছোটকাকে নিয়ে। উনি নিঃস্ব, সর্বহারা। উনি থাকেন এ বাড়িতে শুধু [illegible]ক্ষের অধিকারে। এ বাড়ির প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে ওঁর প্রাণের সম্পর্ক। প্রা[illegible], গাছপালা, প্রতিটি লতাপাতা,—এ [illegible] ডোবা, ভাঙা পাথরের মূর্তি, [illegible]রনো ইমারতের [illegible] ইঁট, এদের [illegible] সঙ্গে ওঁর আজন্মের মমতা জড়া[illegible]। উনি নির্লোভ, নিস্পৃহ এবং নির[illegible]। আমি জানি ওঁরই ইষ্টমন্ত্রে হেনা দীক্ষিত, হেনা ওঁরই হাতে তৈরি। আমি নিজে নিঃসন্দেহেই বাইরের লোক, কিন্তু ছোটকার ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দে[illegible] আমার ভিতরটাও যেন হাহাকার ক[illegible] উঠল।

[illegible]ঙগামা এক সময় বললেন, তোমরা কো[illegible]নে ক'রো না, হেনার ওপর রাগ ক'রে চলে যাচ্ছি। এ রাগ নয় পার্থ, এ আমার স্বামী আর শ্বশুরের মনেরকে। তাঁরা জানাতেন বিয়ে মানেই স্বামীস্ত্রী—যাদের সম্পর্ক আগুনে পোড়ে না, জলেও ডোবে না—যেটা জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে চলে। তুমি আমার সন্তান, পার্থ—কতটুকুই বা তোমাকে বলতে পারি? কিন্তু মাথায় সিঁদুর চড়িয়ে স্বামীর সঙ্গে রাত কাটিয়ে এসে আমাদের তিন কুলে কেউ বলেনি যে, ও ব্যক্তি আমার স্বামী নয়! এ কথা শুনে কানে আঙুল দেবো, না গঙ্গায় ডুববো, না আগুনে ঝাঁপ দেবো,—কোনটা ঠিক পাইনি। এই আমার কপালে ছিল, পার্থ?

আপনি শান্ত হোন, রাঙগামা।

কিন্তু রাঙগামার কথা তখনও শেষ হয়নি। তিনি পুনরপি বললেন, ঠিক ব্যাপারটি জানবার জন্যে আমি নিজেই গিয়েছিলুম নবেন্দুর ওখানে। এ যে জাতধর্মের কথা পার্থ; কেমন ক'রে চুপ ক'রে থাকব? কই, নবেন্দু ত' একটি অন্যায় কথা বললে না? সে বিয়ে করেছে যাকে, ন্যায়ত ধর্মত সেই হল স্ত্রী! রূপে গুণে ব্যবহারে—সে হীরের টুকরো ছেলে! কোনও অপরাধ সে করেনি। হেনা যদি রাজী হয় আজই সে মাথায় ক'রে নিয়ে যায়!

এবার বললুম, নবেন্দু কি মামলা করবে মনে করেন?

জবাব দিল হেনা,—মামলা আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার ওপর তার নোটিশ এসে গেছে। আমি তৈরি হয়েই ছিলুম।

ভয়চকিত হয়ে আমি হেনার দিকে তাকালুম। পরে বললুম, এ মামলা চালাতে তুমি পারবে?

হেনা হাসল। বলল, ভয় পেয়োনা পার্থ। পৃথিবীর কোনও ব্যক্তির সাহায্য না পেলেও পারব! তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

বললুম, সব মামলারই ত একটা আপস মীমাংসা আছে। এখানে কি সেটা অসম্ভব?

না, অসম্ভব কেন?—হেনা বলল. রাঙগামার কথা অনুসারে মাথায় সিঁদুর চড়িয়ে ওই দাম্ভিক আত্মাভিমানী ছিদ্রের [illegible] ঘরে গিয়ে উঠলে এখনই আপোষরফা হয় বৈ কি।

আমি চুপ ক'রে গেলুম। এর পরে বলবার আর কিছু রইল না।

হেনা এবার ধীরে ধীরে বলল, ভুল আমি করেছি, তবে অন্যের হাতে শাস্তি আমি নেবো না, পার্থ। যদি দরকার হয় শাস্তি আমি নিজেই নেবো। কিন্তু তোমরা কেউ আমার গায়ে কলঙ্কের ছিটে দিতে চেয়ো না[illegible]আবার তোমাকে বলি, শোন রাঙগামা, মানুষের সাময়িক ভুল[illegible]কলঙ্ক নয়। আমি যদি স[illegible] জ্বালিয়ে পুড়িয়ে উঠে দাঁড়াই সেই আমার শক্তি। পাঁচজনে মিলে আমার মাথায় নোংরা চাপিয়ে দিয়ো না—কোনও অপরাধ আমি করিনি! আবার আমি শুনিয়ে রাখি, নবেন্দুকে কোনও দিন স্বামী বলে স্বীকার করব না। দাবি জানিয়ে স্বামী হওয়া যায় না, রাঙগামা। অত্যন্ত ছেলেমানুষ সে, তাই আমার সামাজিক জীবন ধ্বংস করবার জন্য সে চেষ্টা করছে, বদনাম রটিয়ে আমাকে দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাতে চাইছে। আমি ভয় পাইনে, তোমাদের বলে রাখি।

রাঙগামা বললেন, শুনলে ত', এই আমার মেয়ের কথা! তাই তোমাকে বলছি পার্থ, যত শিগগির পার আমাদের এ ঘর ভেঙ্গে তচনচ করে দাও, এ সংসার তুলে দাও। আমি আমার স্বামী-শ্বশুরের সম্মান নিয়ে এখন পালাতে পারলেই বাঁচি! তুমি ব্যবস্থা করে দাও, বাবা।

আমার গলার আওয়াজটাও কেমন যেন জড়িয়ে এসেছিল। বললুম, কিন্তু আপনিই ত' এতদিন বলে এসেছেন, মেয়ে আপনার রত্ন, বংশের গৌরব!

আজও বলছি,—রাঙগামার কণ্ঠস্বর অশ্রুতে ডুবে গেল,—আজও বলছি রত্ন! তবু সেই রত্ন আমি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাব, পার্থ।

রাঙগামা উঠে বাইরে চলে গেলেন। তাঁর পাশ কাটিয়ে এবার সন্তোষ ও ঠাকুর আমাদের জলযোগাদির সরঞ্জাম নিয়ে খাবার ঘরে ঢুকল।

(—ক্রমশ)

আমাদের সময়কার শান্তিনিকেতন

অবনীনাথ রায়
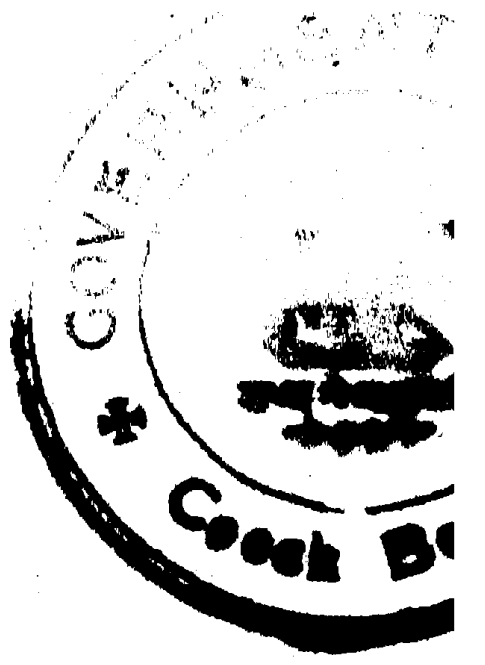
ঠিক পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। ১৯১১ সালে আমি শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসাবে যাই। তখন আমার বয়স ষোল বছরেরও একটু কম হবে।

কি করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি শান্তিনিকেতনে গেলাম তার ইতিহাস নানা পত্র-পত্রিকায় এবং [illegible] বইয়ের পাতায়* ইতিপূর্বে লিখেছি। সুতরাং সে প্রসঙ্গ এখানে বাদ দেব।

আমরা যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়তাম, তখন আশ্রম এত বড় হয়নি, ছাত্র-সংখ্যা আন্দাজ দুই শত ছিল, 'বিশ্বভারতী' ত হয়ই নি। এই ছাত্রেরা পড়ার মান (Standard) অনুসারে তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল—শিশু বিভাগ, মধ্য বিভাগ এবং আদ্য বিভাগ। আমি আদ্য বিভাগে গিয়ে স্থান পেলাম। তখন থেকেই আমাদের হাতে-লেখা কাগজ ছিল, আদ্য বিভাগ থেকে দু'খানি কাগজ বেরুতো—বাংলায় 'শান্তি' এবং ইংরাজীতে 'The Gardener'। যতদূর মনে আছে, প্রথমখানির সম্পাদক ছিলেন অতুলেন্দু সেনগুপ্ত এবং দ্বিতীয়খানির হিতেন্দ্রনাথ নন্দী। এই কাগজে হাতে-আঁকা ছবিও থাকতো। কাগজ বেরুলে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হত এবং তিনি সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।

এই সময় শিক্ষকদের সংখ্যাও কিছু কম ছিল। তার ফলে রবীন্দ্রনাথকে মাঝেসাঝে ক্লাশ নিতে হত। আমরা বিনা কারণে, বিনা কৈফিয়তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ লাভ করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছি। কবিতা লিখে তাঁকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিয়েছি। আজ সে-কথা মনে করলে নিজেরই হাসি পায়। কিন্তু তাঁর প্রকৃত রূপটি এর থেকে ধরা পড়ে। প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হত বয়স্ক ছাত্রদের জন্য, আর বৃহস্পতিবারে অল্প বয়সের ছেলেদের জন্য। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে উপস্থিত থাকলে তিনিই উপাসনার ভাষণ দিতেন। তিনি কলকাতায় বা অন্য কোথাও গেলে অজিতবাবু কিংবা ক্ষিতিমোহনবাবু দিতেন। এ ছাড়া সপ্তাহে দু'দিন রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে গল্প বলতে আসতেন। এটা হত সমবেত সন্ধ্যা উপাসনার পর এবং খেতে যাওয়ার আগে। কথা ছিল একদিন বড় ছেলেদের গল্প শোনাবেন, আর একদিন ছোটদের। কিন্তু দু'দিনই সকলে সমানভাবে যেত।

রবিবারের বদলে আমাদের বন্ধ থাকতো বুধবারে। সেই দিন ধোপাকে কাপড় দেওয়া, চুল-দাড়ি কামানো ইত্যাদি করতে হত। আমাদের সময় মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। দিনের বেলা ঘোল এবং রাত্রে দুধ দেওয়া হত। জলখাবারও দু'বার দেওয়া হত। কি শীত, কি গ্রীষ্ম রাত্রি ৪টার সময় শয্যাত্যাগ করতে হত। জুতা পায়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল না। শাল গাছে একটা পেটা ঘণ্টা (gong) ঝুলানো থাকতো—তারি ঘণ্টা অনুসারে শয্যাত্যাগ, ঘর ঝাঁট দেওয়া, মাঠে মলত্যাগ করতে যাওয়া, স্নান, প্রাতঃকালীন উপাসনা, সমবেত উপাসনা, জলখাবার খাওয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হত। এই সব পর্ব চুকিয়ে সকাল সাতটার সময় আমাদের পড়ার ক্লাস শুরু হয়ে যেত। যিনি যখন মনিটার (বাংলায় যা বলা হত ভুলে গেছি) থাকতেন, তিনি ঐ ঘড়ি নিজের হাতে বাজাতেন।

আমাদের ইংরাজী পড়াতেন অজিতকুমার চক্রবর্তী এবং নেপালচন্দ্র রায়। গণিত এবং বিজ্ঞান জগদানন্দ রায়, বাংলা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তেজেশচন্দ্র সেন এবং সংস্কৃত বিধুশেখর শাস্ত্রী। ইতিহাস কে পড়াতেন মনে পড়ছে না—বোধ হয় ক্ষিতিমোহন সেন। আর ভূগোল নগেন্দ্রনাথ আইচ।

ডাঃ সুধীরঞ্জন দাস যিনি এখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়েছেন, তিনি আমাদের চেয়ে এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। সোমেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মা (কর্ণেল মহিম ঠাকুরের ছেলে) যিনি পরে ত্রিপুরা স্টেটের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ হয়েছিলেন, তিনিও এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। আমাদের ব্যাচের মধ্যে প্রফুল্ল সেন (ক্ষিতিমোহন সেনের শ্যালক) এবং ব্যারিস্টার ও সুলেখক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

এর পরে একেবারে ১৯৩৮ সালে চলে আসছি, যখন আমি এলাহাবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম। এই যাওয়ার মূলে ছিল এলাহাবাদের রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রাঘবানন্দের আগ্রহ। স্বামীজীর সঙ্গে আমার বিশেষ সখ্যতা হয়েছিল। তাঁর ছাত্রজীবনের নাম ছিল সীতাপতি চট্টোপাধ্যায়—ইনি ভবানীপুরের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান ছিলেন। প্রেসিডেন্সী [illegible] যখন এম-এ ক্লাসে পড়েন, [illegible] পড়া [illegible] সন্ন্যাস গ্রহণ [illegible] এঁর বাবা রামকৃষ্ণ মিশনের [illegible] মোকদ্দমা এনেছিলেন [illegible] যেত [illegible] তিনি [illegible] নিঃসঙ্গ [illegible] গ্রহণ করেছেন বলায় [illegible] খেপরোয়া [illegible] হয়নি। ইনি রবীন্দ্রনাথের [illegible] তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করছিলেন [illegible] সাধ্যমত এড়িয়ে যেতে চেটা [illegible] বললাম, আপনি সন্ন্যাসী মানুষ [illegible] মঠের অধ্যক্ষ, আপনি [illegible] যাবেন তাতে সঙ্গে একজন [illegible] যাওয়ার দরকার কি? তিনি [illegible] বল্লেন, না, সে কি হয়? [illegible]

শ্রীআর্য মুখোপাধ্যায়
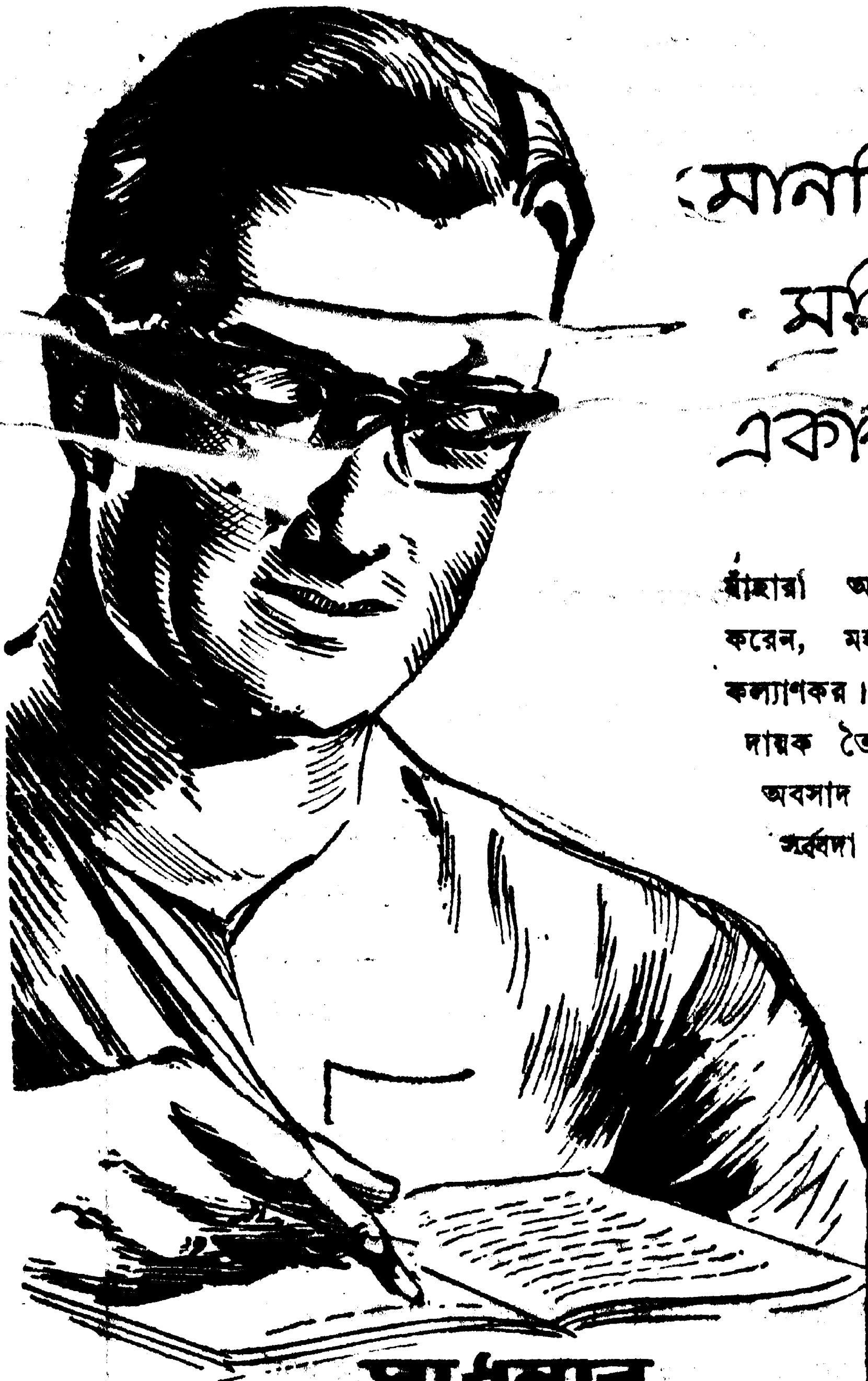
কালী পাহাড়ের পশ্চিমদিকেই একটা কুলী বস্তি। পাহাড় কাটার কাজ নিয়ে এসেছে ওরা দূর দূর গাঁ থেকে। এপ্রিল মাস। দুপুরে প্রচণ্ড গরম। তার ওপর ওই পাথুরে জায়গার ওপর দিয়ে বয় 'লু'। এর ভেতর আবার সেই বিভীষিকা। কর্মক্লান্ত শরীরটাকে দিনের শেষে বিশ্রামের জন্যে মেলিয়ে দিয়েও নেই স্বস্তি। আবার কোন ঘরের অদৃষ্ট কুলুম ঝরে যাবার পালা কে জানে! ত্রস্তভীত চোখে বুকের মধ্যে নিজেদের বাচ্ছা চেপে ধরে করুণ প্রার্থনা জানায় কামীনগুলো ভগবানের উদ্দেশ্যে।

সকালবেলা দেখতে গিয়েছি জানোয়ারদের ওঠা-নামার ট্র্যাক পাহাড়টার অপর পারে, ঘুরতে ঘুরতে রোদ বেড়েছে, রওনী হোয়েছি বাড়ি-মুখো। সঙ্গী আমার তিন বন্ধু। গল্প কোরতে কোরতে বস্তিটার প্রায় কাছেই এসে পড়েছি, ছুটতে ছুটতে এসে হাজির এক কুলী, সারা দেহে তার পাথরের গুঁড়ো আর ধুলো। কিছু বলার আগেই তার চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেলো। জোয়ান লোকের এরকম হঠাৎ কান্নার কি কারণ না জানতে পেরে যখন অস্বস্তি বোধ কোরছি মনে মনে, মুখ খুলে কুলীটা। অজানা এক জানোয়ার তার দুধের বাচ্ছাটাকে নিয়ে গেছে গতকাল রাত্তিরে, একটা রক্তমাখা কাঁথা ছাড়া আর কিছুই পায়নি বাচ্ছাটার। এরকম আরো অনেকের গেছে নাকি এই ক'মাসের মধ্যে। অনেক চেষ্টাতেও কোরতে পারেনি কিছুই। আবছা চাঁদের আলোয় যা দেখেছে, তাতে কেউ বলছে চিতওয়া (লেপার্ড বা প্যান্থার), কেউ বলছে লাকার (হায়েনা), আবার কেউ বা বলছে নাকড়া বাঘ (নেকড়ে)।

বস্তিতে আসতেই ভিড় জমে চারি-দিকে। নানা ধরনের কথা শুনি নানা লোকের মুখ থেকে এ সম্বন্ধে। সন্তান-হারা মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আমাদের দেখে। প্রতিশোধের আগুন মনের মধ্যে চেপে বিস্তারিত বিবরণ শুনি এই নিদারুণ অপহরণের যার একমাত্র উদ্দেশ্য—হত্যা। বন্ধুদের ওখানে রেখে কুলীটার সঙ্গে দেখতে যাই সেই কাঁথা পাওয়ার জায়গাটা, দু'একটা পাথরের ওপর কয়েক ফোঁটা জমা রক্তের দাগ। ওই রুক্ষ পাথুরে জায়গায় কোনোই চিহ্ন নেই পায়ের ছাপের, অনেক দেখেও বুঝতে পারলুম না জানোয়ারটার স্বরূপ। ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে আবার এলুম বস্তিতে। মোটা-মুটি সাবধানতা নেবার কথা বলে জানালুম যে, এর প্রতিকার করার চেষ্টা কোরবো আপ্রাণ। সারা রাস্তাটা ভাবতে ভাবতে এলুম, কানে তখনো কান্নাটার রেশ রয়েছে জেগে।

একটা হিংস্র শ্বাপদের মুখ ভেসে এলো, ছিন্ন ভিন্ন কোরে মাংস খাচ্ছে শিশুদেহ থেকে। ট্রিগারে চাপ দিয়েছি আঙুলের, আওয়াজ হোলো খট। মিস ফায়ার। চোখ খুলে দেখি বিছানাটা ঘামে ভিজে গিয়েছে একেবারে, সেই সংগে গায়ের জামা কাপড়। বালিশের নিচে থেকে ঘড়িটা বার কোরে দেখি বেলা ৫টা প্রায়। তাড়াতাড়ি উঠে বন্ধুকে ডেকে তুলি এবার। বিকেলের চায়ের সংগে রাত্তিরের খাওয়ার পালাটাও চুকি[illegible] নিয়ে বেরোলুম [illegible] বিকেল ছ[illegible] তখন। আবার সেই বস্তি। বস্তিট[illegible] সামনের আম গাছে দুজনকে একটা ছোট চারপাইয়ের ওপ[illegible] বসিয়ে, আমি[illegible] গিয়ে বসলুম পাহাড়টার কিছু [illegible] দুটো পায়ে-চলা পাহাড়ের রাস্তার মাঝামাঝি। সূর্য গেছে অস্তাচলে, শেষ আলোর রেশ রয়েছে লেগে পশ্চিম দিগন্তে। আমাদের পিঠের কাছে একটা বড়ো কাঁটা ঝোপ, সামনে একটা মাঝারি পাথরের আড়াল। বস্তির শেষ ঘরটা পঞ্চাশ গজের মধ্যেই। রাইফেলের ওপরের আলোটা ঠিক কোরে দেখে নিলুম আবার। সব চুপচাপ। একটা একটা কোরে নাইটজারের ডাক শুরু হোলো এবার কাছের আর দূরের জংগলগুলো থেকে; রাত্তিরের পর্দা ঢাকতে লাগলো চারিদিক। এর কিছু পরেই পাহাড়ের মাথা থেকে ডাক ভেসে এলো হুতুম পেঁচার চাপা গম্ভীর গলায়—হুড়ুগুম্ মুমুম।

বসে আছি তো বসেই আছি। রেডিয়ম ডায়াল ঘড়িটা সময় ঘোষণা কোরছে রাত্তির সাড়ে দশটা, এগারোটা, সাড়ে এগারোটা। হঠাৎ মাথার ওপরের পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ! আবার! এবার আমাদের বাঁ-দিকে পাহাড়ী রাস্তায়! আবছা তারার আলোয় দুটো ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো। একটা ছোট, আরেকটা বড়ো। রাইফেলের ওপর মুঠোটা দৃঢ় হোয়ে ওঠে, নিশ্বাস বন্ধ কোরে অপেক্ষা করি সুযোগের। আরো কাছে আসায় দেখলুম একটা মাদী সম্বর আর তার বাচ্ছা। রাইফেলের ওপর মুঠোটা আলগা করি এবার। আস্তে আস্তে নেমে চলে গেলো বেশ দূরের ছোট জঙ্গলটার দিকে। আড়ষ্ট পা দুটোকে একটু আরাম দিয়ে আবার বসলুম গুছিয়ে। কোনো শব্দ নেই আর, প্রহরের পর প্রহরই কেটে গেলো শুধু। শেষ রাত্তিরে একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিলো বোধ হয়, চমক ভাঙলো মুনো মুরগীর ডাকে; তখনো আলো ফোটেনি, শুকতারাটা জ্বল জ্বল কোরছে পাহাড়টার মাথা ঘেঁসে। ব্যর্থ প্রতীক্ষা। বন্ধুদের সব ডেকে নিয়ে যখন বাড়ি-মুখো রওনা হোলুম, পূব আকাশে তখন সবে আলো দেখা দিয়েছে।

আজ রবিবার। কুলীদের ছুটি আজ, সজাগ থাকবে সবাই। তাই আর বোসলুম না আজ। সন্ধ্যেটা বেড়িয়ে কাটলো এধার-ওধার। শহরের প্রায় সবটাই দেখা হোলো।

সোমবার সকালেই আবার গিয়ে হাজির হোলুম বস্তিটায়। জানলুম অঘ[illegible] কিছু। নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো অনেকটা। আম গাছটার গোড়ায় আড়ালে [illegible] কোরতে ব[illegible] দিলুম, যাতে বসতে পারি দুজন। আবার গেলুম পাহাড়ের ওপর, ট্র্যাকগুলো ভলো কোরে দেখতে। কাঁকর আর পাথরে, চিহ্ন নেই পায়ের ছাপের। নিচে নেমে দেখি গর্ত তৈরী হোয়েছে যাতে স্বচ্ছন্দে বসা চলে দুজনের। বিকেলেই আসবো জানিয়ে চলে এলুম ওদের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির সামনে থেকে।

যখন এসে হাজির হোলুম আবার, সূর্য তখন সিঁদুর রং ছড়িয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের মাথা আর গাছপালাগুলোতেও সেই রঙেরই ছোঁয়া রয়েছে লেগে। একে একে হাজির হোতে লাগলো কুলীগুলো তাদের কাজ সেরে। আমাদের জায়গাটা থেকে দক্ষিণদিকের একটা পাতায় ছাওয়া ঘর ঠিক কোরেছি, যাতে কেউ থাকবে না, শুধু জ্বলবে একটা কেরোসিনের ছোট্ট আলো। আর যে চারপাইটা থাকবে ঘরে, তার ওপর থাকবে কাঁথা আর ছেঁড়া কাপড় জড়ানো একটা ছোট ছেলের মতো মূর্তি (খড়ের) যেটা আমি তৈরী কোরেছি। দরজাটা থাকবে আধ খোলা, যাতে বাইরে থেকে আবছা আলোয় দেখা যাবে চারপাইটা। মনোমতো সব গুছিয়ে নিয়ে জানিয়ে দিলুম ওদের যে, কেউ যেন না বেরোয় আর আমি না ডাকলে যেন বন্দুকের আওয়াজ শুনেও না আসে আমার কাছে। প্রত্যেক দিনের মতো আজও যখন ওদের বাড়িগুলো নিস্তব্ধ হোলো তখন রাত প্রায় আটটা। সব কুঁড়ে ঘরগুলোই বন্ধ ভেতর থেকে খালি একটা বাদ, সেটা আমারটা। দেখলে মনে হোচ্ছে কেউ যেন এখুনি বেরিয়েছে বাচ্ছাটাকে শুইয়ে। সজাগ উৎকর্ণ হোয়ে বসে আছি আমরা দুজন। হাতে আজ আর রাইফেল নেই, আছে বন্দুক। কাছাকাছি মারতে গেলে বন্দুকেই সুবিধে বেশী। বন্ধুর হাতে পাঁচ সেলের টর্চ।

ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে একটানা, মাঝে মাঝে ভেসে আসছে নিশাচর পাখীর ডাক। দূর জংগল থেকে কানে ভেসে এলো সম্বরের ডাক—গ্যাঁক্। একটা বাচ্ছা কেঁদে উঠলো কোন ঘরে, ঘুম জড়ানো গলায় তার মা কি বলাতে একটু ফুঁপিয়েই চুপ কোরলো আবার। কি দেখবো আর কি দেখতে বসে আছি নিজেই জানি না, কিন্তু আগ্রহ অসীম। রাত্তির বাড়ছেই ক্রমশঃ, আর আমরাও ভাবছি আজও বুঝি ব্যর্থ হোলো এ প্রতীক্ষা। রাত প্রায় এগারোটা বাজে! কখন আসবে সেই শিশু-হন্তারক!

সাড়ে এগারোটা! পিঠে আঙুলের চাপ পড়ায় ফিরে দেখি, বন্ধু ইশারা কোরছে একটা বড়ো পাথরের ঢিবির দিকে। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম সেইদিকে, একটা অস্পষ্ট ছায়া নড়লো যেন ঢিবিটার পাশ ঘেঁসে। একটু এগিয়েই আবার একটা ছোট ঝোপের আড়াল নিলো জানোয়ারের ছায়াটা। বস্তিগুলোর কাছে আসতে হলে, একটু ফাঁকায় তাকে আসতেই হবে। সময় যেন হু হু কোরে কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আর বেরোচ্ছে না কেন জানোয়ারটা। আমার ফাঁকিটা বোধ হয় ধরে ফেলেছে। নাঃ, ওইতো এবার বেরোচ্ছে ঝোপের পাশ থেকে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে। কি নিঃশব্দ আর সন্তর্পিত পদক্ষেপ! আরো একটু এগোলেই আসবে আমার সুযোগ। মনে সন্দেহ হোচ্ছে এটাই তো সেই, না খাদ্য লোভাতুর অন্য আরেকটা! দেখা যাক, যদি ওই ঘরটার সামনে যায় ওর ভাব-ভংগীতে বোঝা যাবে অনেকটা। এইবার সেই আধ ভেজানো দরজাটার দিকে এগোচ্ছে আস্তে আস্তে। ছায়াটার আকৃতি দেখে এবার বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা বেশ বড়ো সাইজের হায়না। এই সেই হন্তারক।

ইশারায় মুহূর্তে বন্ধুর হাতের টর্চের উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়তেই, খানিকটা থমকে ছুটের চেষ্টা করার মুখে পাক খেয়ে পড়ে ঘাড়ে একটা 'এল-জি' লাগায়। বন্ধু উত্তেজনায় চীৎকার কোরে ওঠে 'আবার মারো ওকে, নয়তো পালাবে।' নিষ্ফলভাবে পা ছুঁড়ে আস্তে আস্তে নিশ্চল হোয়ে গেলো দেহটা। বন্ধ হোলো ওর শিশুমেধ চিরদিনের মতো। বন্দুকের আওয়াজের পর বন্ধুর ডাকে একে একে লোক ছুটতে লাগলো বস্তিটা থেকে। কাছে গিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড একটা বুড়ো হায়না রয়েছে পড়ে। আজ আর শিশুরক্ত নয়, ওরই রক্ত রয়েছে চারিদিক ছড়িয়ে, ধুলো আর কাঁকর বেছানো জমির ওপর।

খেলাধুলা

দর্শক

ম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সাতদিনে (৫ই জুন থেকে ১১ই প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ যোগিতায় উল্লেখযোগ্য খেলা— ংগাল বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়নের ড্র. ইষ্টার্ণ রেলদলের বিপক্ষে ন, রেলদলের. রাজস্থানের বিপক্ষে ীর এবং এ মরসুমের দ্বিতীয় ট খেলায় মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ক্ষ মোহনবাগানের জয়লাভ।

লীগের শীর্ষস্থান অধিকারী ইষ্ট- ল ক্লাব তাদের ৯ম খেলায় লীগ কার নীচের দিকের স্থান অধিকারী র্টিং ইউনিয়ন দলের সঙ্গে ১—১ খেলা ড্র করে একটি মূল্যবান ট নষ্ট করেছে। গত বছরের লীগের রাণার্স-আপ মহমেডান স্পোর্টিংকে ৫—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ঠিক পরবর্তী খেলায় দুর্বল স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে যে তারা এক-টানা জয়লাভের পথে বাধা পাবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। এ একটা অপ্রত্যা[illegible] ঘটনা। এইদিন ইষ্টবেঙ্গলের দলগঠনে [illegible]রিবর্তন ছিল, [illegible] স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে যে টিম খেলেছিল এইদিন স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিপক্ষেও সেই টিমই খেলেছিল কেবল দু'জন খেলোয়াড় বাদে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২১ মিনিটে প্রথম গোল দেয়; খেলা ভাঙ্গার পাঁচ মিনিট আগে ইষ্টবেঙ্গল দলের বলরাম গোলটি শোধ দেন। খেলার গোড়ার দিকে তিনি গোল দেওয়ার দুটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল-দল একতরফা আক্রমণ চালায়; আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতায় এবং অন্য দিকে স্পোর্টিং ইউ-নিয়ন দলের রক্ষণভাগের খেলো-য়াড়দের উদ্দীপনা[illegible] আত্মরক্ষা-[illegible] খেলার দরুণ একটির বেশী গোল দিতে [illegible]রেনি। এই খেলা ড্র করার ফলে স্পোর্টিং [illegible]উনিয়নের [illegible]টি খেলায় ৫ পয়েণ্ট দাঁড়ায়। [illegible]লের বিপক্ষে অধিকাংশ বা[illegible]লী তরুণ খেলো-য়াড়পুষ্ট ইষ্টবেঙ্গল দলের জয়লাভে আমরা যেমন বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড়-দের সম্বন্ধে আশান্বিত হয়েছিলাম তেমনি হয়েছি স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের খেলা থেকে।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন, এরিয়ান্স, খিদিরপুর প্রভৃতি ছোট ছোট ক্লাবগুলিকে

জয়সূচক গোল : মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলা ভাঙ্গার দশ সেকেণ্ড পূর্বে চুণী গোস্বামীর কর্ণার সট থেকে দীপু দাস হেড দিয়ে গোল করেছেন। বলটি রহমনকে পরাভূত করে জালে প্রবেশ করে (চিত্রে দীপু দাসকে দেখা যাচ্ছে না); বামদিকে মঈন ও মুস্তাক আমেদ অসহায়ভাবে বলের দিকে চেয়ে আছেন।

অনেক অসুবিধার মধ্যে ক্লাব পরিচালনা করতে হয়। তাদের সভ্য সংখ্যা, আর্থিক এবং সমর্থকবল বড় তিনটি ক্লাবের তুলনায় অনেক অনেক কম। এইসব ছোট ছোট দল ভাল ভাল খেলোয়াড় তৈরী করে এবং বেশীর ভাগই খেলোয়াড় নামকরার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ক্লাবে অথবা অফিস ক্লাবে চলে যায়। এইসব ছোট ছোট ক্লাবগুলির পক্ষে লীগ-শীল্ড পাওয়ার আশা খানিকটা বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর মত।

কিন্তু সময় সময় দেখা [illegible]ছে এই [illegible] ক্লাবগু[illegible] [illegible] বেগ দিয়ে খেলায় অথ[illegible] [illegible]য়েছে। আলোচ্য বছরের খেলাতেও তার কয়েকটি নজির আছে। এই রকমের অপ্রত্যাশিত ফলাফলের মধ্যে দিয়েই ছোট ছোট ক্লাবগুলি প্রমাণ করে এখনও বাঙালার যুবশক্তি নিঃশেষিত হয়নি।

ইষ্টবেঙ্গল দল তাদের ১০ম খেলায় সহজভাবেই ৪—০ গোলে খিদিরপুরকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের খেলায় যখন ইষ্টবেঙ্গল ২—০ গোলে অগ্রগামী তখন খিদিরপুর পেনাল্টি পেয়েও গোল দিতে পারেনি। ইষ্টবেঙ্গল খেলার প্রথম দিকে গোল দেওয়ার দুটি সুযোগ নষ্ট করে। ইষ্টবেঙ্গল তাদের একাদশ খেলায় কোনক্রমে ১—০ গোলে রাজস্থানকে পরাজিত করে জয়ী হয়। অথচ উয়াড়ী এই রাজস্থান দলকেই শোচনীয়ভাবে ৩—০ গোলে হারিয়ে দেয়। ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলায় যথেষ্ট দুর্বলতা প্রকাশ পায়। হাতের কাছে গোলপোষ্ট পেয়েও গোলে ঠিকমত বল মারতে পারেনি। এ ছাড়া এইদিনের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলের ভাগ্যও খারাপ ছিল; সমাজপতির দুটি তীব্র সট গোলরক্ষককে পরাভূত ক'রে বারের নীচে লেগে ফিরে আসে।

গত সপ্তাহে মোহনবাগান ২টি ম্যাচ খেলেছে। এরিয়ান্সকে ২—০ গোলে এবং এ মরশুমের ২য় চ্যারিটি ম্যাচে ১—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের পাল্লায় ইষ্টবেঙ্গল দলের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মোহনবাগান অবস্থান করছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের ১১টা খেলায় ২১ পয়েন্ট এবং মোহনবাগানের ১০টা খেলায় ১৭ পয়েন্ট উঠেছে।

মোহনবাগান [illegible] গোলে এরিয়ান্সকে পরাজিত করে। মোহনবাগান খেলতে নেমেই দ্রুতগতিতে আক্রমণ চালিয়ে প্রথমভাগের খেলায় গোল দেওয়ার দুটি সুযোগ নষ্ট করে। এরিয়ান্স খেলায় প্রথমার্ধে বেশ দ্রুতগতিতে খেলতে থাকে; কিন্তু আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা শেষরক্ষা করতে পারেনি। তাদের দ্বিতীয়ার্ধের খেলা ঝিমিয়ে পড়ে।

মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার দিন এবং খেলা আরম্ভের ঠিক আগে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছিল। মাঠে জলও জমেছিল প্রচুর—পায়ের চেটো ডুবে যাচ্ছিল। সুতরাং মাঠের অবস্থা বিচার করে কেউ প্রথম শ্রেণীর খেলা আশা করতে পারেন না; কিন্তু জল-কাদায় খেলাটি নিম্নস্তরে নামেনি। বরং জল-কাদায় এ রকম খেলা আশাতিরিক্ত বলা যায়। জলের জন্যে মোহনবাগানের দ্রুতগামী খেলোয়াড়দের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল; অন্যদিকে এই জলই মহমেডান স্পোর্টিংকে খেলায় অনেকটা সুবিধা করে দেয়। মোহনবাগান দলের দুই অতি নির্ভরশীল খেলোয়াড় জার্ণেল সিং এবং শুভাশিষ গুহকে আহত থাকার দরুণ এই দিনের খেলায় দলভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড অমিয় ব্যানার্জিকে পায়ে চোট নিয়ে খেলতে হয়েছিল। অসুস্থতার দরুণ মহমেডান স্পোর্টিং দলেরও একজন খেলোয়াড়কে এই দিনের খেলা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

প্রথমার্ধের খেলায় মোহনবাগান এবং দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় মাঝে মাঝে মহমেডান স্পোর্টিং দল প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু আক্রমণের মধ্যে কোন ধার ছিল না। গোল মুখে বল পেয়ে দুই দলের খেলোয়াড়ই ঠিকমত বল সট করতে পারেনি। সমস্ত খেলার মধ্যে দুই দলের গোলরক্ষককে মাত্র একটি ক'রে শক্ত সট প্রতিরোধ করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ১৬ মিনিটে মোহনবাগান গোল দেওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করে। চুণী গোস্বামী হামিদকে কাটিয়ে যখন বলটি নিয়ে অগ্রসর হতে যাচ্ছিলেন তখন হামিদের বে-আইনী ধাক্কায় তিনি বাধা পান। ঘটনাটি ঘটে পেনাল্টি সীমানার বাইরে। এই ঘটনার সময় মহমেডান স্পোর্টিং দল খুবই অসহায় অবস্থায় ছিল—শেষ ভরসা হিসাবে ছিল একমাত্র গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২১ মিনিটে মোহনবাগান দলের লেফট আউট অরুময় গোল লক্ষ্য করে যে তীব্র সট করেন, বলটা গোলরক্ষককে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে গোষ্টে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে বাইরে চলে যায়। তারপর আসে খেলা ভাঙ্গার শেষ সময়—অনেকেই খেলা ড্র গেল ভেবে উঠে পড়েছেন। খেলা ভাঙ্গাতে কয়েক সেকেন্ড বাকি, মোহনবাগান এইদিনের ৬নং কর্ণার পেল। এই কর্ণার-কিক্ উপেক্ষা করে অনেকেই চলে যাচ্ছেন। এই খেলাতেই তো এর আগে মোহনবাগান ৫টা এবং মহমেডান স্পোর্টিং ২টো কর্ণার কিক্ পেয়েছে; দুই দলের মোট ৭টা কর্ণার-কিকের যা অবস্থা হয়েছে মোহনবাগানের এই ৬নং কর্ণার-কিকের একই অবস্থা দাঁড়াবে—এই ধারণাতেই তাঁরা মাঠ ছেড়ে যাচ্ছেন। মোহনবাগানের অধিনায়ক চুণী গোস্বামী কর্ণার-কিক করলেন আর দীপু দাশ মাথা পেতে গোল দিলেন। অনেকেরই এই গোল দেখা হল না। খেলায় এই-রকম শেষ মুহূর্তে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি—এক দলের পক্ষে যেমন পরম তৃপ্তি অপর দলের পক্ষে তেমনি বেদনাদায়ক।

ইষ্টার্ণ রেলদল তাদের ৮ম খেলায় ১—০ গোলে বি, এন, রেলদলের কাছে হেরে গিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়নসীপের পাল্লা থেকে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। ইষ্টার্ণ রেলদলের বিপক্ষে বি, এন, রেলদলের জয়লাভ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এই খেলার সময় ইষ্টার্ণ রেলদলের ১১ পয়েন্ট উঠেছিল ৭টা খেলায় আর বি, এ, রেলদলের ৬টা খেলায় ৮ পয়েন্ট। খেলার প্রায় প্রথম মিনিটেই বি. এন, আর গোল দেয়। ভাগ্যক্রমে বি, এন, আর একবার গোলের হাত থেকে রক্ষা পায়। ২৪ মিনিটের সময় ইষ্টার্ণ রেল অপেপর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। শেষের দিকে বি. এন, আর আত্মরক্ষামূলক খেলায় মন দেয় এবং অতি সাফল্যের সংগেই বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত ক'রে জয়লাভ করে। খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হলেও খেলাটি খেলার পর্যায়ে ছিল না; উভয় দলই তীব্র উত্তেজনা এবং উদ্দীপনার মধ্যে খেলেছিল; কিন্তু গায়ের জোরের উপর বেশী প্রাধান্য দেওয়াতে খেলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

লীগের খেলায় আর এক অঘটন ঘটিয়েছে উয়াড়ী. তাদের ষষ্ঠ খেলায় ৩—০ গোলে রাজস্থানকে হারিয়ে। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য, লীগের খেলায় উয়াড়ীর এই দ্বিতীয় জয়। এই জয়লাভের ফলে উয়াড়ীর দুর্ভাবনা একেবারে না গেলেও কিছুটা কমেছে। তারা ৫টা খেলায় মাত্র ২ গোল দিয়ে ৮টা গোল খেয়ে ৩ পয়েণ্ট পেয়েছিল।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা

(৫ই জুন থেকে ১০ই জুন পর্যন্ত)

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পঃ
ইঃ বেংগল	১১	১০	১	০	৩৫	৩	২১
মোঃ বাগান	১০	৮	১	১	১৯	৪	১৭
ইঃ রেল	৯	৬	১	২	১৪	৪	১৩
বি এন আর	৮	৫	২	১	১০	২	১২
এরিয়ান্স	১০	৪	৩	৩	৯	৮	১১
মঃ স্পোর্টিং	৯	৩	৪	২	৭	৯	১০
খিদিরপুর	১০	২	৪	৪	৭	১৪	৮
হাঃ ইউনিঃ	৯	২	৩	৪	৬	১১	৭
রাজস্থান	৮	১	৪	৩	৩	৭	৬
জর্জ টেলিঃ	৮	০	৬	২	৩	৮	৬
উয়াড়ী	৬	২	১	৩	৫	৮	৫
স্পোর্টিং ইঃ	৯	২	১	৬	৬	১৫	৫
ইঃ ন্যাশনাল	৯	২	১	৬	৪	১৬	৫
বাঃ প্রতিভা	৭	১	১	৫	৫	১১	৩
পুলিশ	৯	০	৩	৬	২	১৫	৩

টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় জয়লাভের গুরুত্ব দলগত বিভাগে বিশ্ব খেতাব লাভ। প্রতিযোগিতার সূচনাকাল থেকে মালয় দেশ উপর্যুপরি তিনবার টমাস কাপ জয়লাভ করে। চতুর্থ প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়া টমাস কাপ জয়ী হয়ে মালয় দেশের একটানা আধিপত্য খর্ব করে।

আলোচ্য পঞ্চম প্রতিযোগিতা[illegible] দিকের আঞ্চলিক সেমি-ফাইনালে থাই-[illegible] খেলায় এবং অপর দিকের আঞ্চলিক সেমি-ফাইনালে ডেনমার্ক ৭-২ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত ক'রে ইন্টার-জোন ফাইনালে ওঠে। ইন্টার-জোন ফাইনালে থাইল্যান্ড ৭-২ খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত ক'রে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গতবারের টমাস কাপ বিজয়ী দেশ ইন্দোনেশিয়ার সংগে মিলিত হয়। চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ইন্দোনেশিয়া ৬-৩ খেলায় থাইল্যান্ডকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার টমাস কাপ জয়লাভের গৌরবলাভ করেছে।

বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতা

জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত অপেশাদার বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতার ফ্রি-স্টাইল অনুষ্ঠানে মোট ৮টি স্বর্ণপদকের মধ্যে ইরাণ ৫টি স্বর্ণপদক এবং মোট ৪১ পয়েন্ট লাভ ক'রে ১৯৬১ সালের বিশ্ব-খেতাব পেয়েছে। ইরাণ স্বর্ণপদক লাভ করে—ব্যাণ্টামওয়েট, লাইট ওয়েল্টার, মিডলওয়েট এবং লাইট হেভী ওয়েট বিভাগে। রাশিয়া স্বর্ণপদক পায় দুটি—ফ্লাইওয়েট এবং ফেদরাওয়েট বিভাগে। পশ্চিম জার্মাণী একটি স্বর্ণপদক পায় হেভীওয়েট বিভাগে।

প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান লাভ করে রাশিয়া (৩৩ পয়েন্ট) এবং ৩য় স্থান তুরস্ক (২৬ পয়েন্ট)। ভারতবর্ষের উদয়চাঁদ একটি ব্রোঞ্জপদক পান।

বিশ্ব গ্রীকো-রোম্যান কুস্তি প্রতিযোগিতা

১৯৬১ সালের বিশ্ব-গ্রীকো রোম্যান কুস্তি প্রতিযোগিতায় রাশিয়া মোট ৮টি বিভাগের মধ্যে ৫টি বিভাগে স্বর্ণপদক লাভ ক'রে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে।

প্রতিযোগিতায় ১৪টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান [illegible] দলগত ফলাফল [illegible] তিনটি দেশ) : ১ম রাশিয়া ৩৮ পয়েন্ট, ২য় তুরস্ক ২৭·৫ পয়েন্ট এবং ৩য় রুমানিয়া ২৩·৫ পয়েন্ট।

অস্ট্রেলিয়া [illegible] সাসেক্স

সাসেক্স: ৩৩৬ (সাট্‌ল ৭৫, গ্রাহাম কুপার ৬২, টমসন ৫৬। মেনো ৮৩ রাণে ৫ এবং ডেভিডসন ৭৯ রাণে ৩ উইকেট) ও ১৮৯ (সাট্‌ল ৪২, কুপার ৪৩। মিশন ৭৫ রাণে ৬ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া: ২৮১ (পিটার বার্জ ১৫৮, হার্ভে ৪১। বেটস ৫৬ রাণে ৩ এবং টমসন ৪৭ রাণে ৩) ও ২০৬ (৮ উইকেট। ম্যাকডোনাল্ড ১১৬*, ডেভিডসন ৪১)

অস্ট্রেলিয়া বনাম সাসেক্স দলের খেলা ড্র গেছে। অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৯ রাণের জন্যে খেলাতে জয়ী হতে পারেনি। শেষের দিনের খেলায় ২১০ মিনিট সময় হাতে পেয়ে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৫ রাণ তুলতে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কিন্তু খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেট পড়ে ২৩৬ রাণ উঠেছে—জয়লাভের ৯ রাণ উঠতে বাকি।

অস্ট্রেলিয়ার কপাল খারাপ, জয়ের জন্যে জয়ী হ'তে পারলো না। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়া দল খোঁড়া হয়ে গেল; দলের অতি নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় নর্মাণ ও'নীল হাঁটুর যন্ত্রণায় খেলার প্রথমদিনে সাসেক্সদলের ১ম ইনিংসের খেলার সময় মাঠ থেকে সেই যে বেরিয়ে গেলেন তারপর আর খেলায় নামতে পারেননি।

ছাই, তুমি ধন্য!

এই সেই ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ 'ছাইপাত্র', এই মৃৎ-পাত্রের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত আছে টেস্ট ক্রিকেট খেলার উইকেটের চিতাভস্ম। ১৮৮২-৮৩ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের তৃতীয় টেস্ট খেলার স্টাম্পগুলি দাহ ক'রে এই পাত্রের মধ্যে তাদের চিতাভস্ম রাখা হয়। ঐ বৎসরই অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক আইভো ব্লিগকে একজন অস্ট্রেলিয়ান মহিলা এই ছাই-ভর্তি' পাত্রটি উপহার দেয়। পাত্রটির গায়ে কেবল ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের নাম নিয়ে একটি গাঁথা উৎকীর্ণ আছে।

ক্রিকেট খেলার পীঠস্থান লর্ডস মাঠের মিউজিয়ামে এই ছাই-পাত্রটি অগণিত দর্শক সাধারণের অদম্য কৌতূহল চরিতার্থ করে। এই চিতাভস্ম উপলক্ষ্য করেই ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় জাতীয় সম্মানের লড়াই—দুই দেশের মধ্যে কত প্রস্তুতি, উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট

ইংল্যান্ড : ১৯৫ (সুব্বা রাও ৫৯। ম্যাকে ৫৭ রাণে ৪ এবং বেনো ১৫ রাণে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৫১৬ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নীল হার্ভে ১১৪, নর্মান ও'নীল ৮২, বেগ সিম্পসন ৭৬, লরী ৫৭ এবং কেন ম্যাকে ৬৪। স্টাথাম ১৪৭ রাণে ৩, ট্রুম্যান ১৩৬ রাণে ২, ইলিংওয়ার্থ ১১০ রাণে ২ এবং এ্যালেন ৮৮ রাণে ২ উইকেট)

লণ্ডন সহর থেকে [illegible]০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বার্মিংহাম সহর—শিল্প-বাণিজ্যের জন্যে [illegible] বার্মিংহাম সহরে ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের খেলার মাঠ এজবাস্টন। এই এজবাস্টন ক্রিকেট মাঠেই ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলা গত ৮ই জুন থেকে আরম্ভ হয়। টেস্ট ক্রিকেট মাঠ হিসাবে লর্ডস এবং ওভাল মাঠের যে কৌলিন্য এজবাস্টন মাঠের তা নেই। ইংল্যান্ডের মাটিতে আলোচ্য টেস্ট খেলা নিয়ে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৮২টি টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হ'ল। এজবাস্টন মাঠে টেস্ট খেলা হ'ল মাত্র তিনটি—১৯০২, ১৯০৯ এবং ১৯৬১ সালে। ১৯০২ সালের টেস্ট খেলাটি বৃষ্টির দরুণ ড্র যায়। ১৯০৯ সালের টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ১০ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার রেকর্ডের তালিকায় এজবাস্টন সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। এই মাঠে ১৯০২ সালে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসে সর্বনিম্ন ৩৬ রাণ করে। এই ৩৬ রাণ উভয় দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় এক ইনিংসের সর্বনিম্ন রাণের রেকর্ড হিসাবে আজও গণ্য।

আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলায় উভয় দলই তাদের পুরো শক্তি নিয়ে দল গঠন করতে পারেনি। যাঁরা দলভুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সম্পূর্ণভাবে সুস্থ নন ; টেস্ট খেলার পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং খেলার মধ্যে শরীরে আঘাত পান। ইংল্যান্ডের পিটার মে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ার কারণে টেস্ট খেলায় যোগদান করতে অক্ষমতা জানিয়ে

স্টাথাম

দেন। তাঁর জায়গায় কলিন কাউড্রে দলের অধিনায়ক হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিচি বেনো সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ করতে পারেননি।

টসে জয়ী হয়ে ইংল্যান্ড প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের (৮ই জুন) খেলায় ইংল্যান্ডের ৮টা উইকেট পড়ে মাত্র ১৮০ রাণ ওঠে। ইংল্যান্ড প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। ক্রিকেট খেলায় টসে জয়লাভের গুরুত্ব অনেক বেশী। এই নিয়ে ইংল্যান্ড উপর্যুপরি ১১টি টেস্ট খেলায় টসে জয়লাভের রেকর্ড করলো। এই জয়লাভের মধ্যে কলিন কাউড্রের নেতৃত্বেই ইংল্যান্ড শেষ ৮বার টসে জয়ী হয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের এই চরম দুর্গতির জন্যে বরুণদেব অনেকখানি দায়ী। গত এক মাস এখানে কোন বৃষ্টিপাত হয়নি; প্রথম টেস্ট খেলার দিন থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ। খেলার মধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে খেলা কয়েকবার বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির দরুণ পীচের অবস্থা খুব খারাপ হয় এবং ব্যাটসম্যানদের পক্ষে এই পীচে খেলা খুবই শক্ত হয়ে পড়ে। রমন সুব্বারাও এবং শেষের দিকের কয়েকজন খেলোয়াড়ের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ইংল্যান্ড কিছুটা মান-সম্ভ্রম রাখতে

ও'নীল

[illegible]পেরেছে। তা না হলে অবস্থা আরও [illegible]হিল হ'ত। সুব্বারাও দলের সর্বোচ্চ [illegible]২৯ রাণ করেছেন। অষ্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেছেন [illegible]কন ম্যাকে। পরপর চারটি বলে তিনি [illegible]কান রাণ না দিয়েই তিনজনকে আউট [illegible]রেন। তাঁরই বোলিংয়ের চোটে [illegible]ইংল্যান্ডের ৪র্থ উইকেট ১২১ রাণে, [illegible]ম উইকেট ১২১ রাণে এবং ৬ষ্ঠ [illegible]উইকেট ১২২ রাণে পড়ে যায়। [illegible]কন ম্যাকে একই ওভারের ৪র্থ বলে ব্যারিংটন, ৬ষ্ঠ বলে স্মিথ এবং পরবর্তী ওভারের প্রথম বলে সুব্বা রাওকে আউট করেন। প্রথম দিনের খেলায় ম্যাকে ৪টা উইকেট পান ৫০ রাণে। বাকি ২টো উইকেট হস্তগত করেন বেনো, ৯ রাণে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের খেলা মোট ১৯৫ রাণে শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনে তারা ২১ মিনিটের খেলায় ১৫ রাণ তুলে। প্রথম [illegible]নিংসের মোট ১৯৫ রাণ তুলতে ইংল্যান্ডের [illegible] ঘন্টা ৪৭ মিনিট সময় লাগে। অষ্ট্রেলিয়া এই দিন নিষ্প্রাণ উইকেটেই পিটিয়ে খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৫৯ রাণ করে। ফলে তারা ইংল্যান্ডের থেকে ১৬৪ রাণের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। নীল হার্ভে, নর্মান ও'নীল এবং টেষ্টে নবাগত খেলোয়াড় বিল লরীর আকর্ষণীয় ব্যাটিং উপভোগ্য হয়।

হার্ভে এবং ও'নীলের কভার ড্রাইভ, স্কোয়ার কাট এবং হুক খুবই দর্শনীয় হয়েছিল।

নীল [illegible]

ও'নীল ২১৭ মিনিট খেলে নিজস্ব ৮২ রাণ করে আউট হয়ে যান। আর মাত্র ১৮টা রাণ তুলতে পারলেই তিনি সেঞ্চুরী রাণ করার গৌরব লাভ করতেন। নীল হার্ভে ১৯৪ মিনিট খেলে তাঁর নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ করেন এই নিয়ে তিনি টেষ্ট খেলায় ২০টি সেঞ্চুরী করলেন—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার এই ৫ম সেঞ্চুরী। ইংলন্ডের বিপক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ—
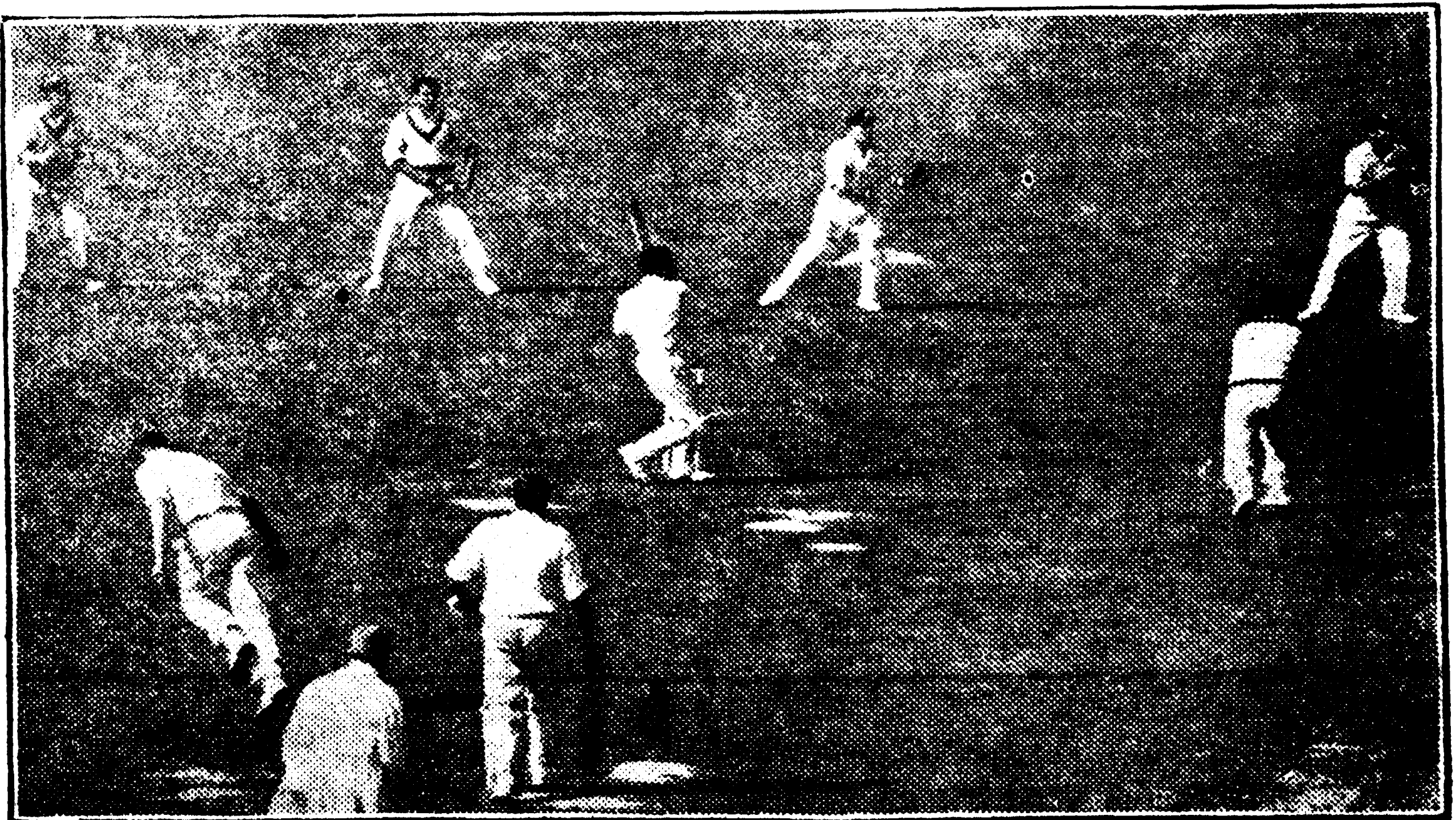
ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের কেন ব্যারিংটন ফ্র্যাঙ্ক মিশনের একটি বলে দর্শনীয় হুক মেরেছেন। অপর দিকের উইকেটে সুব্বারাও এবং তাঁর বাঁ দিকে বোলার ফ্র্যাঙ্ক মিশনকে দেখা যাচ্ছে।

১৬৭, মেলবোর্ণ, ১৯৫৮-'৯। হার্ভে এবং ও'নীলের ৩য় উইকেটের জুটি ভেঙ্গে গেল দলের ২৫২ রাণে। ও'নীল নিজস্ব ৮২ রাণ করে আউট হলেন আর হার্ভে তখন নট আউট ৮৮। অস্থিরতাই ও'নীলের আউট হওয়ার প্রধান কারণ; সেঞ্চুরী করার জন্যে তিনি বড় বেশী চঞ্চল হয়েছিলেন। অন্যদিকে নীল হার্ভে এই সময়টায় যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে খেলেছিলেন। ৩য় উইকেটে হার্ভে এবং ও'নীলের জুটি ১৮৩ [illegible]।

৩য় দিনের খেলায় অ[illegible]লিয়া ৯ উইকেটে ৫১৬ রাণ [illegible] প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি [illegible] করে। এই দিনের খেলায় উল্লেখযোগ্য রাণ—সিম্পসন ৭৬ এবং ম্যাকে ৬৪। অধিনায়ক বেনো ৩৬ রাণ করে নট আউট থাকেন। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ১৯৩৪ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার এই ৫১৬ রাণই এক ইনিংসের সর্বোচ্চ রাণ।

তৃতীয় দিনের খেলার সময়ও প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; ফলে দুবার খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই খেলা ভেঙ্গে যায়। ইংল্যান্ড ৩২১ রাণের পেছনে পড়ে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং কোন উইকেট না হারিয়ে ৫ রাণ করে।

রমণ সুব্বারাও

রবিবার বিশ্রামের দিন ছিল।

সোমবার, ১২ই জুন, খেলার ৪র্থ দিনে মাত্র ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট খেলা হয়েছিল। লাঞ্চের বিরতির স[illegible] ইংল্যান্ড দলের রাণ ছিল ৯৩, এক উ[illegible]কেট পড়ে। ন্যাটা ব্যাটসম্যান সুব্বা[illegible] ৬০ রাণ করে নট আউট ছিলেন।

লাঞ্চের বিরতির পর মাত্র ২০ মি[illegible] খেলা হয়। এই সময়ে ইংল্যা[illegible] আরও ১৩ রাণ ওঠে। তারপর প্র[illegible] বৃষ্টিপাতের জন্যে ঐ দিনের মত খে[illegible] বন্ধ থাকে। ইংল্যাণ্ডের রাণ দাঁ[illegible] ১০৬, এক উইকেট পড়ে। সুব্বার[illegible] ৬৮ এবং ডেক্সটার ৫ রাণ করে নট আ[illegible] আছেন।

ইংল্যাণ্ড এখনও ২১৫ রাণ পিছ[illegible] পড়ে আছে। খেলা শেষ হতে অ[illegible] মাত্র একদিন বাকি। যদি খেলার শে[illegible] দিন বৃষ্টি বন্ধ হয় এবং রোদ প[illegible] পীচ শুকিয়ে যায়, তাহলে খেল[illegible] অবস্থা অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলে যাব[illegible] মনে হয়, আক্রমণ এবং আত্মরক্ষামূ[illegible] খেলায় উভয় দলই খেলাটি উপভো[illegible] করে তুলবে।

১২।৬।৬

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 23rd June, 1961.
40 Naye Paise.

সম্পাদকীয়

বর্তমান ১৯৬১ সাল রবীন্দ্রজন্ম-শত-বার্ষিকীর বছর বলে চিহ্নিত হয়েছে। অর্থাৎ সারা বছর ধরেই শত-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান চলতে পারে। ১লা জানুয়ারী কিম্বা ইংরেজী নব-বর্ষের প্রথম দিনে বোম্বাইতে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন ঘটেছিল একান্ত-রূপে রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিকীর উৎসব অনুষ্ঠানের দ্বারা। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু স্বয়ং সেই উৎসবের উদ্বোধন করেন। তারপর তিনি কলিকাতা মহানগরীতে ২৫শে বৈশাখের এবং সেই সঙ্গে শান্তি-নিকেতনের এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের বিশেষ অনুষ্ঠানগুলিতেও পৌরো-হিত্য করেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধা-কৃষ্ণন প্রভৃতি সর্বভারতীয় অনেক নায়ক এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালগণ শত-বার্ষিকীর নানা অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন ও ভাষণ ইত্যাদি দিয়েছেন। ভারত-বর্ষের বাইরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরো-পীয় দেশগুলিতে, বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মাণী ইত্যাদি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, চীন ইত্যাদি দূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে এবং পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় মহা-কবির জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্যাপিত হয়েছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রধানতঃ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ —সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা এবং রাষ্ট্রনেতা প্রভৃতি যোগ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের যেমন প্রচার ও সমাদর বেড়েছে এবং সমুদ্রপারবর্তী বহু দেশে যেমন বাঙ্গলা ভাষা শেখবার ও জানবার জন্য আগের তুলনায় কিছু আগ্রহ বেড়েছে, তেমনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই দিকটার প্রতিও অনেক চিন্তাশীল বিদেশী মনীষীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যদি কোন সংস্থা—যেমন, বিশ্বভারতী কিম্বা কোন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী পৃথিবীব্যাপী এই সমস্ত অনুষ্ঠানের এবং ভাষণ ইত্যাদির বিবরণ সংগ্রহ করে একটি সুসম্পাদিত গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করেন, (ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীতে) তবে, রেফারেন্স বা ইতিহাসের দিক দিয়ে যেমন তা' উল্লেখযোগ্য হবে, তেমনি বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের এবং আন্তর্জাতিক চিন্তাসূত্রের দিক থেকেও তা' মূল্যবান সংযোজনরূপে সমাদৃত হবে। আমরা আশা করবো এই দিকে সরকারী ও বেসরকারী দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। এখন থেকে এই চেষ্টা সুরু হলে ১৯৬১ সাল ব্যাপী সারা বছরের বিবরণসহ এই মূল্যবান সঙ্কলন গ্রন্থ নিশ্চয়ই ১৯৬২ সালের শেষভাগে প্রকাশ করা সম্ভব হতে পারে।

ভারতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক জগতের উচ্চতর শিক্ষিত মহলের এই রবীন্দ্র-উৎসব ছাড়াও শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আর একটি দিক আছে এবং সেটা বিশেষভাবে পশ্চিম-বাঙ্গলার। যদিও পশ্চিমবাঙ্গলায় এবং বিশেষভাবে বড় বড় শহরগুলিতে গত ২০ বছর ধরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী নানাভাবে পালিত হচ্ছে, তথাপি এবার শতাব্দীজয়ন্তী উপলক্ষে যেন উৎসবের বান ডেকেছে। বাঙ্গলায় ও

বাঙলার বাইরে যেখানে যত বাঙালী আছেন, তাঁদের বৃহত্তম অংশই এবার শতবার্ষিকীর উৎসবে মেতে উঠেছেন। বর্ষাকালে যেমন সমস্ত নদীনালা খানা ডোবা ইত্যাদি জলে ভর্তি হয়ে যায়, তেমনি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবার সমগ্র সমাজ-জীবনের খানা ডোবায় পর্যন্ত রবীন্দ্র-উৎসবস্রোত প্রবেশ করেছে। অতি সাধারণ পল্লীতে, অজ্ঞাত গ্রাম্য শিক্ষা-সংস্থায়, কলকারখানার শ্রমিক অঞ্চলে, শহর ও বন্দরের উল্লেখযোগ্য পাড়ায় পাড়ায় এবং দরিদ্র ও জীর্ণ বস্তী অঞ্চলে পর্যন্ত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর সাড়া পড়ে গেছে। একথা সর্বজনবিদিত যে, বাঙালী একটু বেশী 'সেন্টিমেন্টাল' বা ভাবপ্রবণ এবং হুজুকপ্রবণ। অতএব রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর আহ্বানে তার সমাজচিত্ত প্রধানতঃ নাচে গানে আবৃত্তিতে ও অভিনয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বসন্তকালের অজস্র পুষ্প-কোরকের মত এই সমস্ত অনুষ্ঠানে চারদিকে যেন ভ্রমর গুঞ্জন তুলেছে এবং ছেলেরা ও মেয়েরা নবযৌবন-ধর্মে এই সমস্ত সভাসমিতি ও অনুষ্ঠানে ভীড় করছেন। হুজুক ও উচ্ছ্বাসের বাহুল্য এর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে এবং সর্বত্র কর্মসূচীর একঘেয়েমিও লক্ষ্য করার মত। তবু রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে এই যৌবন জলোচ্ছ্বাসকে আমরা স্বাগত জানাই। কারণ, উপলক্ষটি মহৎ এবং কল্যাণ-দ্যোতক।

কলকারখানার শ্রমিকপ্রধান অঞ্চলে কিম্বা বিষণ্ণ ও দরিদ্র বস্তীবাসীদের মধ্যে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী পালনের এই চেষ্টাকে লঘু করে দেখা উচিত নয় কিম্বা উন্নাসিকতার সুরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একথাও বলা উচিত নয় যে—'দ্যাখো, রবীন্দ্রনাথকে কোথায় টেনে নামানো হচ্ছে।' বরং আমরা বলবো যে, রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে এই সমস্ত দুর্গত ও বিষণ্ণ মানুষকে ঊর্ধ্বে—লাবণ্যলোকে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। শ্রমিক বা বস্তী অঞ্চলে এমন মানুষ যথেষ্ট আছেন, যাঁরা লেখাপড়া এবং চিন্তাধারা থেকে বঞ্চিত—এমন কি রবীন্দ্রনাথের নাম কিম্বা 'সংস্কৃতি' নামক শব্দটি পর্যন্ত হয়তো তাঁরা এর আগে শোনেন নি। বিশেষভাবে এই কারণেই অজ্ঞাত পাড়াগাঁয়ে, শ্রমিক ও বস্তীবাসীদের মহল্লায় রবীন্দ্রনাথের প্রচার করা প্রয়োজন। রাজনীতির আন্দোলনের ভাষায় যাকে আমরা গণ-সংযোগ (mass contact) বলি, রবীন্দ্রচিন্তাধারার মাধ্যমে এই সমস্ত উৎসব উপলক্ষে সেই সংযোগ সাধিত হতে পারে। যারা আলো থেকে, চিন্তা থেকে, বৃহৎ জগৎ ও জীবনের আশ্চর্য বিকাশের ধারণা থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত, তাঁদের মধ্যেই তো রবীন্দ্র-উৎসবের বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, মহাকবির মধ্য দিয়ে আমরা সমাজ-মহাজীবনের নতুন বোধন করতে চাই। আমাদের আরও বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ এই মূক জীবনকেই মুখর করতে চেয়েছিলেন—যে জীবন অজ্ঞতায়, দারিদ্র্যে, কুসংস্কারে ও আবর্জনায় বিড়ম্বিত। অর্থাৎ রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিকী কেবল মাত্র সমাজের উপর-তলার জন্য নয়। একমাত্র তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জন্যই নয়। কিম্বা ফ্যাসনদুরস্ত সম্পন্ন লোকের ড্রয়িং-রুমে যেমন ফ্রেমে-আঁটা বিলাতী ছবি কিম্বা সোনার-জলে-লেখা বাঁধানো বই সাজানো থাকে, আমরা রবীন্দ্র-নাথকে তেমনি একমাত্র উচ্চশ্রেণীর এবং পণ্ডিত্যাভিমানীদের বিলাস-বিতর্কগৃহে আবদ্ধ রাখতে চাই না। আমরা 'বাঁধ ভেঙ্গে' দিতে চাই—শ্রেণী-আভিজাত্যের গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে গণ-মানসের বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই এবং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গণ-জীবনের নতুন সাংস্কৃতিক ক্ষুধা উদ্রেক করতে চাই। যেমন করে যুগ-যুগান্তর ধরে রামায়ণ ও মহাভারত নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে একেবারে জন-মানসের চিত্ত ও চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, ঠিক ততখানি না হলেও আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই অনেক পরিমাণে জনচিত্তের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি। কারণ, এর ফলে জীবনে চিন্তার, অনুভূতির এবং [illegible] ও অগ্রগতির নতুন প্রেরণা আসবে। [illegible] শ্রমজীবী এলাকায় এবং বস্তী অঞ্চলে রবীন্দ্রশত-বার্ষিকীর একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতা সমাজের চরিত্র উন্নয়নের মধ্যে, শুচিতা ও পবিত্রতার পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যে এবং প্রকৃত রবীন্দ্র-উৎসব এই শুচিতা ও পবিত্র-তার পরিবেশ ছাড়া সম্ভব নয়।

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিকী জনসমাজের এই দিকটাকেও আকৃষ্ট করেছে এবং উৎসবের হুজুকের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের ইঙ্গিত বহন করে আনচে। ভাঙ্গাচোরা ও বিদীর্ণ বাঙলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ নামক ভূখণ্ডে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজকে বস্তীজীবন ও শ্রমিক মহল্লার সঙ্গে যুক্ত করেছে। এখন কলেজেপড়া ছেলেকে কিম্বা মেয়েকে বস্তীর ঘরেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শ্রম-জীবী পরিবারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি তারা অনায়াসে গড়ে তুলছে। এক কথায় ভদ্রসমাজ ও শ্রমিক সমাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান কমে আসছে। রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিকী অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে এই দুই সমাজস্তরের মধ্যে নতুন সেতু তৈরী করছে—যে সেতু একদিন হাওড়া ব্রীজের চেয়ে কম মূল্যবান হবে না।

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তবু যেন খিচ রয়েছে। পাঞ্জাবী বুলি আমার ভালো লাগে না। একটু যেন স্থিরতার অভাব, অথচ বেশী দ্রুত নয়। মধ্য লয়। প্রত্যেক গানটি রাগে বাঁধা, তবু যেন নিরাল[illegible] রাগ পে[illegible] গোলাম আলি গান [illegible] মনে হয় যেন রাগ সৃষ্টি করে না, কথাই যেন প্রথম। (রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করছি না।) সুর নিতান্ত যথার্থ, তবু যেন কথাপ্রধান গান। মোস্তাক হুসেনের আস্থায়ীতেও কথা, তবে সেটা নিতান্ত অ-প্রয়োজনীয়, না থাকলেই চলত। আমীর খাঁর আস্থায়ীও খুবই ভালো। কিন্তু সে যেন ঘুমিয়ে পড়া গান এবং ঘুম ভাঙবার পর অজস্র ঝড়ের তান। মধ্যেকার গঠন নেই যাকে construction বলে। বিলায়েৎ হুসেন নিষ্ঠুর, নির্মমভাবে সত্য, কিন্তু তার এখনকার গানে রস-কস নেই। নিয়ার হুসেন খাঁ চলেন সর্পগতিতে—আর পলুস্কার ছিলেন অত্যন্ত competent তার বেশী কিছু নয়। এ'রা সবাই খাসা, তবু যেন ফৈয়াজ, আব্দুল করিম, নসীরুদ্দীন, রজ্জব আলি, ওয়াহিদ খাঁ, এমন কি এখনকার কৈসার বাইও যেন অন্য ধরণের, অন্য জাতের। (কৈসার বাই ছাড়া) সেকালের গাইয়েরা রাগ গাইতেন, গান গাইতেন না। ফৈয়াজ ইচ্ছা করলে গানও গাইতে পারতেন। যাই হোক এতৎসত্ত্বেও বড়ে গোলাম আলি সত্যকারের বড় গাইয়ে। (আজকাল গোলাম আলিকে ছেড়ে দিলে ভীমসেন যোশীই প্রধান মনে হয়। কি অদ্ভুত সুর ও sense of proportion.

* * *

ব্যালজাক আর ফ্লবেয়ার—দুজনের লেখা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু রুচি পৃথক। ব্যালজাক যেন জীবনকে ছিঁড়ে কুটে ফেলছে; ফ্লবেয়ার ছুরি দিয়ে dissect করে দিচ্ছে। ফ্লবেয়ারের সবখানি যেন আর্টিস্ট। ব্যালজাকের হাত কাঁচা, মানুষ কাঁচা, গা থেকে ছিঁড়তে গেলে গা থেকে রক্ত বেরোয়, ঘাম ঝরে, ভালো-মন্দ গন্ধ আসে। ফ্লবেয়ারের ত্রুটি ছিল না। একটা অক্ষর পঞ্চাশবার বদলাতেন; জমির ওপর বরফ, তার ওপর

গাড়ি, সেই গাড়ির চাকা; কিন্তু বরফ এলো ভাড়া করে এবং পঞ্চাশবার বদলে আবার সেই প্রথমবার। ব্যালজাকের প্রথমবারই শেষবার। তাঁর প্রতিভা যেন বেশী। ওস্তাদি গান আর পল্লীসংগীত।

*   *   *

প্রভাতকুমার (মুখোপাধ্যায়) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি গভীর কথা বলেছেন; 'আসল কথা, তাঁহার শোক বা সুখ কোনোটাই মনে স্থায়ী রেখাপাত করিত না—তাঁহার ভাবাবেগের পূর্ণ প্রকাশের জন্য—তাহা শোকই হোক বা সুখই হোক, তাহাদের উদ্‌বোধিত করিবার জন্য যতটুকু আঘাত (stimuli) প্রয়োজন হইত, ততটুকু তিনি সহ্য করিতেন—তদতিরিক্তকে আমল দিতেন না। এই নিরাসক্তি তাঁহার চরিত্রে যে নৈর্ব্যক্তিকতা দান করিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি অন্যকে দুঃখ দিয়াছেন। তাঁহার দুঃখ intellectual emotion-এর আর একটি রূপ মাত্র, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু মাত্র; তারপর সৃষ্টি-সুখ সম্ভোগ হইয়া গেলে বিস্মৃতির চির পাথারে স্মৃতি ডুবিয়া যাইত।'

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য কিন্তু প্রভাতবাবুর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। তিনি প্রমাণসহ দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ দুঃখে কাতর হতেন। আমার বিশ্বাস যে প্রভাতবাবু রবীন্দ্রনাথের স্বভাব জানতেন। কতখানি জানতেন জানি না। কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে প্রভাতবাবু ঠিক।

মন থেকে পুঁছে যায় না, কিছু থাকেই থাকে, তবে পাতলা হয়ে যায়। কতক্ষণ? যতক্ষণ বুদ্ধিবৃত্তি সম্বল রয়েছে। না হয় নিছক বোকামি। তিনি বুদ্ধি দিয়ে হজম করে নিতেন, তাই সহজে মনে হোতো ভুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন (জ্যোতিবাবু সম্বন্ধে) আমাকে বলেছিলেন, 'আমার দাদার মতন দাদা হয় না!' কথা বলতে গিয়ে চোখ আর কণ্ঠ বদলে গেল।

*   *   *

আমাকে শীঘ্রই আলিগড় ছাড়তে হবে, সাড়ে চার বছর হতে চলল, আর, ছ' মাস আছি। লাগল কি রকম? সর্বপ্রথম, কৃতজ্ঞতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার সংগে অত্যন্ত সদ্ ব্যবহার করেছেন। ভারতবর্ষের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রকার ব্যবহার হোতো না। আমাকে পড়াতে হয়নি দু বৎসর, ছোটখাট সেমিনার নিয়েছি, আর ডিপার্টমেন্ট ও রিসার্চ চালাতে হয়েছে। ঘণ্টা তিন-চার ডিপার্টমেণ্টে থাকতুম।

ফল কি হয়েছে? এই ক'বছর ছয়-সাতজন লেকচারারকে বিলেত পাঠালাম। তাদেরই বাহাদুরী, আমার নয়। আমি দরখাস্ত দিতে ও যেতে সাহায্য করেছি। এরা কিছু নিয়ে ফিরেছে—য়ুরোপ-আমেরিকা থেকে ইকনমিক্স শিখেছে নিশ্চয়। ডিগ্রী পেয়েছে এবং দুজন ছাড়া অন্যে ডক্‌টারেট পাননি। ভালোই, ডক্‌টারেটে নিতান্ত একপেশে [illegible], এবং শিক্ষার পক্ষে সুবিধের হয় না। অর্থাৎ, স্ট্যান্ডার্ড বেড়েছে এবং তারই ফলে ছেলেদের কিছু উন্নতি হয়েছে।

তারপর? সেইখানেই সমস্যা। তারা দু-এক বছরেই ঢিলে পড়ে গেল। আলিগড়ের অমনই অপূর্ব হাওয়া যাতে academic life বাঁচতে পারে না। কারণ কি ভাবছি। কারণ, আলিগড়।

আলিগড়ে ১৯৫১ সালে লোক ছিল এক লাখ প্রায় সত্তর হাজার—এখন বোধ হয় দু' লাখ অন্ততঃ। অতএব লোক নেহাৎ কম নয়, এ থেকে একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা যায়। আগে ছিল সত্তর-আশী হাজার, তখনও কলেজ থাকতে যা এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের আশীর্বাদে তা। কারণ দুটি; (১) সহরের মধ্য দিয়ে ট্রেন দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। একধারে হিন্দু, অন্য ধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মুসলমান। এধারে মুসলমানের জোর হাজার দশেক, তাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ত। এত কম সংখ্যা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলে না; সহরের সব ছাত্রদের প্রায়ই ধর্মসমাজ, বারসেনী ও আগ্রা বিদ্যালয়ে চলে যায়, জোর শতকরা ত্রিশজন হিন্দু ছেলে সহরের ওপার থেকে এখানে আসে। এনজীনিয়ারিং কলেজের শতকরা ত্রিশজন পাঞ্জাবী শিখ, হিন্দু এবং অন্য প্রদেশের হিন্দু।

(২) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ছেলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিরাগ্রহ, এবং অল্পসংখ্যক পাকিস্তানী। আমরা সকলেই নিরাগ্রহ, সকলেই আমরা, ছাত্ররা চাকরির জন্য আগ্রহশীল। কিন্তু নিরাগ্রহতা এখানে একটু বেশী। এদের level of aspiration নিতান্ত কম। বলেন চাকরি পান না; কিন্তু একথা ঠিক কি? আলিগড়ের মুসলমান শিক্ষকরা ত, প্রায়ই বিলেত যাচ্ছেন। I A S, P C S প্রভৃতিতে মুসলমান ছাত্র যাচ্ছে না। তারা প্রথমতঃ ভয়ে যাচ্ছে না এবং দ্বিতীয়তঃ যে সব সম্প্রদায়ের পরিবার থেকে এরা উঠছে এদের মধ্যে শিক্ষা কম। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির দেবার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় [illegible], যেটা দু-চারটি জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শেখাচ্ছে।

*   *   *

কমল ফোটে পুট্ করে, কলি পিছু নয়। জাত উঠবে সমগ্রভাবে, প্রায় একই সময়ে ও প্রায় সম্পূর্ণভাবে। এ-দেশে প্রথমে রাজনীতি, তারপর অর্থনীতি, তারও পরে সমাজনীতি এবং শেষকালে বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত[illegible]দেশের স্বদেশী যুগে কিন্তু প্রথম দিকে সাহিত্য, চিত্র, কলা প্রভৃতি গোড়ায় ছিল। এখনও আছে এখানে রবীন্দ্রনাথের জন্যে। দেশ এগিয়ে চলছে, কিন্তু একই সময়, সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে নয়। প্রথমে physicist, পরে engineer, আরো পরে economist তৈরি হচ্ছে। আমাদের উন্নতি organic নয়।

*   *   *

১৯১৯ সালেই বোধ হয়, কোলকাতা য়ুনিভার্সিটিতে গেছি। সতীশ রায়ের ঘরে ব্রজেন শীল ও বিজয় মজুমদারকে দেখলাম। আমার বয়স অল্প, কিন্তু অনেক কথা কইলাম। বাড়ি এসে বাবাকে বললাম, 'দু-তিনজন বড়লোকের সংগে দেখা হোলো।' বিজয় মজুমদারের কথা উঠতে বাবা বললেন, 'কথায় কথায় আমার বিষয় উল্লেখ করতে পার, আর বাবার বিষয়েও।' অল্প কয়েক দিন পরে সেইখানে দেখা। আস্তে আস্তে বাড়ির কথা পাড়লাম, প্রথমে বড় জ্যাঠামশাই, পরে কাকা, তারপর মেজ জ্যাঠামশাই, শেষে বাবার কথা। এত যে তাঁর ইয়ত্তা নেই। ১৮৮৩-৮৪ সালে নারানপুরে পুজোর দালানে খাওয়া, পুজোর সময় পরিবেশন, পুজোর দালানের মাথায় পায়রা, পিসতুতো ভাই, পিসেমশাই, মায় পাড়াপড়শীর খবরা-খবর, যাদের নাম পর্যন্ত আমি জানি না, সকলের খবর নিলেন। পিতামহের নাম নিলেন—অসম্ভব সুখ্যাতি! পরে বাবা! বাবা অল্প কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছেন। বিজয় মজুমদার ছিলেন অন্ধ। 'তুমি আগে কিছু বললে না কেন?' চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়তে লাগল। আমার গালে হাত বোলাতে লাগলেন।

তারপর অনেকবার বিজয়বাবুর সংগে দেখা হয়েছে। আমার ছেলেকে নিয়ে গেছি, আমার ভাইও (বিমল্যা-

প্রসাদ) গেছেন। 'খোকা আমার চার পুরুষের।' তাঁর সঙ্গে সব সময় পাণ্ডিত্যী আলোচনা করেছি। আমার কিন্তু মনে হয়, তিনি কেবল দিগ্‌গজ নন, সরল, অকপট মানুষ, আর থেকে থেকে উঠছে প্রাণখোলা, অট্টহাসির রোল। আর মনে পড়ে তাঁর অত্যন্ত বেসুরো গান, এবং আমার গালে হাত দেওয়া।

বিজয় মজুমদার, সতীশ চাটুজ্যে, আর সত্যেন (বোস)—তিনজনের বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় বেশী উন্নত।

* * *

একজন পণ্ডিত ব্যক্তি প্রায় চল্লিশ-খানি বই লিখেছেন; এবং এখনও লিখছেন, প্রতিদিন লিখে চলেছেন। (প্রায় পঞ্চাশখানাও হতে পারে।) পঞ্চাশ বছরে তাঁর লেখার বিরাম নেই। চল্লিশ-খানা ভিন্ন ভিন্ন বই নয়, প্রায় একই বই চল্লিশ পঞ্চাশ ভাবে লেখা। ভেবে-চিন্তে লিখলে তবু এক-আধখানা বই বেরুত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জমি পতিত রাখতে হয়, নচেৎ ফসল ফলে না। আমি পারি না, লিখেই যাই।' তাঁর ছিল অসীম প্রাচুর্য, তবু......।

* * *

আমার জমিতে জাকারাণ্ডার নীল ফুল এসেছে। পাশের বাড়িতে পাঁচটা জাকারাণ্ডা, অনেক করবী, বিস্তর বগেনভিলিয়া। আমার কাছে বেলী, চামেলির গন্ধ ভুরভুর করছে। মিসেস রায়ের বাগানে কনক চাঁপা, গোলক চাঁপা, স্বর্ণ চাঁপা, কাঁটালী চাঁপা। ভারতীয় ফুলের কি গন্ধ! এম. এন. রায় দেশী ফুল অত্যন্ত ভালবাসতেন। দেরাদুন ফুলে ভরা। এক সময় মার্চ মাসের শেষে লাটসায়েবরা আসতেন; এখন মহারথীরা আসেন না—এঁদের ফুলের সখ নেই। দেরাদুনের গাছপালা নষ্ট হয়ে গেল, গ্রীষ্মের তাপ বেড়েই চলেছে, সে সৌন্দর্য আর নেই। তবু যা আছে তা উত্তর ভারতে কোথাও নেই। পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যে যে-সব দৃশ্য আছে তার তুলনা নেই। সহর অবশ্য নিতান্ত পাঞ্জাবী, সেইজন্য sophisticated.

একবার গুজব শুনেছিলাম দেরাদুনে মুসলিম কলেজ করবার চেষ্টা হয়। আলিগড়েই রইল, কারণ আলি-গড়ের আশেপাশে অনেক মুসলমান রাজা-তালুকদার ছিলেন। আলিগড়ে

বুগেনভিলিয়া জন্মেছে, শিক্ষা কিন্তু ঠিক জন্মেনি।

* * *

এককালে যুবাবয়সে, অত্যন্ত অধীর হতাম। বন্ধু এখনও আসছেন না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি ব্যাকুলভাবে, এখনও এলেন না, এখনও এলেন না, তারপর এলেন, ব্যগ্রতা যেন ঝরে গেল। এখন অত অধীর হই না।

অনেক রকম কাল-প্রত্যয় হয়। বন্ধুর জন্য অপেক্ষা, সময় যেন আর কাটতে চায় না; বন্ধু এল, সময় তাড়িতে কেটে গেল। একই কালের দুই ক্ষণ। ঘড়ির কাঁটা যেন অন্য কালের। সেটা গ্রীণউইচের নিয়মে চলে—তার ছন্দ প্রায় এক। প্রায় কিন্তু ঠিক নয়। ঝড়ের দিনে জন্মাল, দড়ি কেটে সময় মাপল, কোনোটা গ্রীণউইচ নয়, অথচ ঠিক। ঋতুর কাল আলাদা। আবার আলোর কাল? তারও পরে অনন্ত মুহূর্ত, অর্থাৎ অতিপাত নেই, গোটা, আস্ত, সম্পূর্ণ। যোগীর কাছে অনন্ত। না, একটিমাত্র অনন্ত? বিস্তর অনন্ত রয়েছে মনে হয়। ক্যানটর কি বলেন?

১৫।৫।১৯৫৯

আজ প্রমথ চৌধুরীর কথা কেবলই মনে উঠছে। ১৯১৫ সাল থেকে মাথামাখি, তারও আগে মোরাবাদীতে দেখা সাক্ষাৎ। মোরাবাদী গেলাম জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি ধ্যানে বসেছেন। এলেন একজন, সুদর্শন, ন্যস্ত গোঁফ ও আলখাল্লা পরা। চৌধুরীবাড়ির লোক মনে হোলো এবং তাই, নাম প্রমথ চৌধুরী। সবুজ পত্রে বিপিন পালের সমালোচনা শুনলাম ও করলাম। একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠল। সামনে দেখি পিয়ার লেটির Disenchanted. জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন লাগল?' 'তুমি পড়েছ?' 'আজ্ঞে হাঁ।' 'কোন জায়গায়?' অপ্রস্তুতে পড়লাম, কেমন যেন সংকোচ লাগল। যা মনে এলো তাই বল্লাম। তার পরই খেতে বল্লেন। বুদ্ধির দীপ্তিতে চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, এখনও তাই, যে কাউকে কোনো দিন সম্পূর্ণ সুখ্যাতি করেননি। ভালবাসা তাঁর কাছে যা পেতাম তা গুনে গুনে। এক অতুল (গুপ্ত) বাবুকে ছাড়া; তাঁকে তিনি সর্বান্তকরণে সুখ্যাতি করেছেন, স্নেহ করেছেন এবং খাতির করেছেন। পেয়েওছেন। তাঁর স্বভাবই ছিল সমালোচকের, critical। বিশেষ ২ লেখা তাঁর খুবই ভালো লাগত। 'বহুৎ আচ্ছা, ইয়ে তুম্হারী কাম' ইত্যাদি কথাগুলি বলতেন, যথা কেদারবাবুর 'পেনসানের পর', অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে' এবং সৈয়েদ আয়ুবের প্রবন্ধ। আমার লেখার সুখ্যাতি তাঁর কাছ থেকে শুনিনি, তবে তিনি মন দিয়ে পড়তেন, কাটতেন-কুটতেন, একরকম দাঁড় করিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, 'ধূর্জটি আগে কথা কও, পরে লেখো।' অনেক পরে এলিয়ট সম্বন্ধে Criterion-এ এই ধরণের মন্তব্য করেন; "দু ধরণের লেখা লেখে—এক চিন্তার আগে, অন্যটি চিন্তার পরে। পরেরটাই ভালো।" আমার তা ঠিক মনে হয় না। অল্প বয়সে চিন্তার পূর্বে লেখা আসে, কখনও কখনও সেই সঙ্গে। চিন্তার স্বর যে লেখা জন্মায় তার মধ্যে ক্রিয়া অধিক হয় জানি, কিন্তু তার পর লেখা আর হয়ে ওঠে না। একপ্রকার আলস্যেমি আসে। বয়সের সঙ্গে চিন্তার পরই লেখা হয়, সাধারণতঃ।

* * *

আজ ক' বৎসর প্রমথবাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনতে পাই। এখন বলছেন যে, রবীন্দ্রনাথের পরই তাঁর লেখা সাহিত্যপদবাচ্য। (অবশ্য, অবনী ঠাকুরের লেখা কোথায়?) অন্ততঃ দুখানি সমালোচনার বইও বেরিয়েছে। এমন কোনো সমালোচনা নেই যার মধ্যে প্রমথবাবুর সুখ্যাতি নেই। কিন্তু এ অবস্থা ছিল না। মাত্র দু'চার জন নবীন যুবক ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার কদর করতেন। অন্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পছন্দও করতেন অ-পছন্দও করতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর লেখা, সাহিত্য ও মানুষ সম্বন্ধে লোকে অবিচার করতেন। একা শনিবারের চিঠি নয়, অন্যত্রও বীরবলী ভাষা, বীরবলী রুচি, খানিকটা ফরাসী স্টাইল এবং চৌধুরীবাড়ির আভিজাত্য, অর্থাৎ দাম্ভিকতা, ধরা পড়ত। তাঁর রচনা-শৈলীর ওপর লোকের কোনো মমতা ছিল না। এখন উল্টো হাওয়া বইছে। খুবই ভালো। তিনি চোদ্দ বছর বয়সে লিখতে আরম্ভ করেন, আর তারপর লিখলেন পঞ্চাশ বছরে। মাথা পাকতে দেরী লাগেনি, কিন্তু সাধারণ লোকের বুঝতে দেরী লাগল। এখনও কি সকলে বুঝতে পেরেছেন?

* * *

বাংলা সাহিত্যে belles letters-এর চলন নেই। ইংরেজী সাহিত্যে আছে কি? Augustin Birrell-ই বোধ হয় একমাত্র, আর খানিকটা Hilaire Belloc তাও তিনি ফরাসী। ফরাসী সাহিত্যে আছে প্রচুর। ঠিক প্রবন্ধের সমষ্টি নয়, অথচ প্রবন্ধ; ঠিক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নয়, অথচ ব্যক্তিসম্পর্কজনিত। প্রবন্ধ ছাড়া আরো অনেক জিনিস রয়েছে, যেমন ছোট গল্প, কবিতা, কিন্তু প্রধান নয়। যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে যে belles letters ব্যক্তি-সম্পর্কের একটা কোনো বিশেষ সাহিত্যিক রূপ, বৃহৎ রূপ নয়, ছোট্ট-খাট্ট রূপ রয়েছে, কিন্তু তাইতে উজ্জ্বল। প্রমথবাবুর সাহিত্য এই অংশের। রবীন্দ্রনাথের মতন monumental নয়। তিনি ছিলেন নৈসর্গিক, প্রমথবাবুর ছিল বাগান ও তৈরী বাগান। ও-দুটোর জাত পৃথক, দুটোকে সমপর্যায়ে রাখা চলে না।

* * *

ফাল্গুনে প্রভৃতি কয়েকটি রচনা ভিন্ন তাঁর বেশী লেখাই পুরোপুরি সাহিত্য-রসাত্মক নয়। অর্থাৎ তার মধ্যে মোটামুটি 'কাব্য'-রস নেই, সবই গদ্য-গন্ধী। গদ্যের রস ব্যাখ্যাপ্রসূত। সেটা বাক্য থেকে ওঠে, বাক্যতেই নামে। কথার মধ্যে সীম্বল আসে কবিতায়, যেখানে প্রতি সীম্বল পৃথক ও ঘন। গদ্যে তা নেই—সেখানে সীম্বল যদি থাকে ত' ছড়ান; ছড়ান সীম্বল সীম্বল নয়। প্রমথবাবুর কবিতাতেও সীম্বল নেই—অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী কবিতা, কিংবা হয়ত সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী কবিতা। তাঁর কবিতা যেন বাক্য, টুকরো বাক্য। সবই যেন wit রসঘন গদ্য, প্রাঞ্জল, ভাবের ইঙ্গিত নেই, নিতান্ত স্পষ্ট।

*

গল্পের স্টাইল এবং প্রবন্ধের স্টাইল একই। কিন্তু গল্পতে একটা fantasy পাই। চার ইয়ারী কথায় একটা ভুতুড়ে ভাব, নীল লোহিতের স্বয়ম্বর, বীণা বাই, ফরমায়েশী গল্পেও তাই, fantasy। স্টাইল এক, কিন্তু গল্প হোলো তর্কের বাইরেকার জিনিস। সেখানে খামখেয়াল।

* * *

আমি কতখানি প্রমথবাবুর কাছ থেকে পেয়েছি? প্রায় সবখানিই, কাঁচিয়ে কাপড় পরা থেকে, সিগারেট খাওয়ার ধরণ, চলন-বলন, সবই। রচনারীতি? তাও তাঁর, তবে ঠিক সম্পূর্ণ তাঁর নয়। দাদার ডায়েরী, ধরতাই বুলি, নর্মাল—এ-সব লেখা আমার নিজের, তিনি বদলে-সোদলে বোধ হয় দেননি। অন্য

সবুজ পত্রের লেখায় তাঁর হাত আছে। সবুজপত্রের লেখা ছাড়া তিনি অদল-বদল করেননি। তবু তাঁর ছাঁচ থেকে গেছে। অন্যত্র কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর। আমি তাঁর ছাত্র। তাঁর কাছে কেমিষ্ট্রি পড়তাম, আর যাগ-যজ্ঞের ব্যাখ্যা শুনতাম। প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে পরিচয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাব আমার মনে বসে যায়। তাঁর ভঙ্গী না পেলেও তাঁর মনোভাব কিছু আমি পেয়েছি। গত বৎসর বসুমতীতে একজন আমার 'বক্তব্য' নিয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। এমন যথার্থ লেখা আমি কম পেয়েছি। তিনি বলেছেন যে আমি রামেন্দসুন্দরের শিষ্য পরম্পরা। তিনি ছাড়া এ-কথা অন্য কেউ লেখেননি, আমিই কেবল জানতাম। তবু আমি প্রমথবাবুরই শিষ্য। রামেন্দ্রসুন্দর আর প্রমথবাবু দুজনের কাছেই আমি ঋণী: প্রমথবাবু সর্বতোভাবে, রামেন্দ্রসুন্দর গোপনে।

* * *

ঐতিহাসিকু জ্ঞান নিয়ে যেন একটু বাড়াবাড়ি করে আসছি। সায়েবে বলে, ভারতের ইতিহাস-জ্ঞান কখনও ছিল না। ভীষণ আপত্তি করেছি। কখনও কখনও মনে হয় আজকাল যেন না-থাকাই ভালো ছিল। উপনিষদের ঋষিদের কি জীবন-চরিত লেখা হোতো? তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান, যতটা সঞ্চয় ততটা, এর বেশী নয়। জ্ঞান-সঞ্চয়ের ইতিহাস কিছু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু জ্ঞানের পূর্বেকার ইতিহাস নিতান্ত কম। শিক্ষা অবশ্য ছিল, কিন্তু অধ্যয়নের অংশ তার ফলের চেয়ে কম। জ্ঞান পাওয়াটাই শেষ-বেশ। নাট্যকারের পিছনে কি আছে জানতে যেন চাই না; এইটাই মঞ্চ, এইটাই সনাতন, এইটাই বর্তমান। ইতিহাস নিয়ে অত মাতামাতি কেন? সেটা এ-যুগের রোগ। আমি নিজে এ-রোগে দুষ্ট। আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে এখন ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছুই ভালো লাগে না।

ইতিহাসের নিয়ম বিজ্ঞানের নিয়ম থেকে পৃথক। ওয়াটারলুর আগের রাত্রে নেপোলিয়ন পচা আলুর বড়া খেয়েছিলেন, (যদি সত্য হয়); সেটা হবে বৈজ্ঞানিক নিয়ম, ঐতিহাসিক নিয়ম নয়। তফাৎটা মাইক্রো আর ম্যাক্রো নিয়ে—একটা একক, অন্যটা গড়পড়তা। ইতিহাসের কার্যকারণ সম্বন্ধ হোলো গড়পড়তা, মোটা গতিহার, যার সঙ্গে একের, প্রত্যেকের হার মিলে না। কখনও মনে হয় যে, প্রত্যেকের গতিই নেই যেন স্থানু। ইতিহাসের গতি ও গতিহার আছে, যদিও সেটা বোঝা শক্ত।

মার্ক্সিস্ট ইতিহাসের প্রধান বক্তব্য এই গতিহার। কিন্তু কম্যুনিজমের ওপর এতই রাগ যে তার জন্য কয়েকজন ঐতিহাসিক মার্কসিস্ট-ইতিহাসের প্রধান বক্তব্যটি ত্যাগ করতে তৎপর। ইসায়া বার্লিন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি, কিন্তু মার্সিজম ছাড়তে গিয়ে পম্পারের গর্তে পড়ে গেলেন। বুদ্ধিমান, অতি বুদ্ধিমান, যার পশ্চাৎভাগে এই ধরণের দাঁড় পড়ে।

এক এই উপনিষদের ঋষি, তাঁর ইতিহাস নেই; আর মার্কসিস্ট ইতিহাস, সত্যকারের ইতিহাস, তার গতি ও গতিহার আছে—এই দুটোর সমন্বয় কিভাবে?

* * *

আজ শিবনারায়ণ রায় বল্লেন যে, ইসায়া বার্লিনের Mangural Address পম্পার থেকে নেওয়া। বার্লিনের নতুন লেখা পড়িনি, তাঁর অন্য সব লেখা পড়েছি। কিন্তু মনে হয় বার্লিন সুন্দরভাবে বেশী কথা কন। পম্পার-ও মানি না, তিনি ইতিহাসের নিয়ম-কানুন স্বীকার করেন না। অনেক ভুল আছে স্বীকার করি, তৎসত্ত্বেও ইতিহাসের একটা না একটা নিয়ম আছে জানি। তা যদি হয়, তবে social engineering হোলো ইতিহাসের অন্তর্গত, তার বাইরে নয়।

* * *

আমার চার হাজার বইয়ের মধ্যে ঠিক এক হাজার, শুধু Economics-এর বই বিক্রী করে দিলাম। মাত্র একশ' রেখেছি। তার বেশী পড়তে পারব না। তবু, প্রিয় জিনিস হাত থেকে বেরিয়ে গেল। একটু আফশোষ আছে, দুঃখ ঠিক নেই।

ছেলেবেলা থেকে বই কিনে আসছি আর পড়ছি। প্রায় স্কুল থেকেই আরম্ভ হোলো। শিয়ালদা ষ্টেশনে ছ' আনার জিনিস আট আনায় জর্জ এলিয়টের Adam Beade কিনলাম। তার পর মেকলের ইতিহাস, এখনও আছে। কলেজে সেন ব্রাদার্স, প্রথম খোলে কলেজ ষ্ট্রীট আর বৌবাজারের কোণে, তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে উঠে এলো। বিদেশী সাহিত্য আর ইতিহাস কিনেই পড়তাম। ভোলা সেনের মৃত্যুর পর সে দোকানে আর ঢুকিনি। তার পর থেকে বুক কোম্পানি। কত ধরণের বই-ই না কিনেছি। প্রফুল্ল ঘোষ, সতীশ বাগচি, প্রভৃতি দু'-এক জনের কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু তাঁদের বাদ দিলে আমাদের বন্ধুরাই সবচেয়ে বেশী বই কিনতেন। অঙ্ক ছাড়া সব বিষয়ের বই-এর প্রতি আমাদের মমতা ছিল। লক্ষ্ণৌ-এ যখন এলাম, (বুক কোম্পানি লক্ষ্ণৌএ বসেই কিনতাম) তখন নতুন করে তিনটি এবং পরের আরেকটি, বই-এর দোকান খোলা গেল বলতে হবে। লক্ষ্ণৌর এই চারটি ভিন্ন কোলকাতার দুটি আর বোম্বাইএর দুটির সঙ্গে আমার কারবার ছিল। বোম্বাই-এর Co-operator Book Depot ইকনমিক্সের শ্রেষ্ঠ দোকান। এর পর বিলেতী বইত, আছেই। এত বই জমে গেছে, এত নিয়ে কি করব! অথচ ছাড়তেও মন চায় না! দেরাদুনে বসে মাত্র দু হাজার বই রাখব ভাবছি। আর্ট, সাহিত্য, ইতিহাস এবং সভ্যতা, আর কিছু সামান্য ইকনমিক্স ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে থাক!

বই পড়া weariness of the flesh জানি, কিন্তু না পড়েও ত গতি নেই! প্রায় বছর দুই অকর্মণ্য ছিলাম। এখন আবার যেন ভালোই লাগছে। কাজ না করে থাকতে পারব কি?

* * *

দেরাদুনের বাড়ি থেকে দৃশ্য অপূর্ব। ঠিক পাশেই বেদের ঋষিপর্ণা (রিসপানা) সামনে, চারধারে হিমালয় আর শিবালিক। নদীতে জল নেই, কিন্তু বর্ষা নামলে পাগলের মতন পাহাড় থেকে হুড়মুড় করে চলে আসে। নদীর ওপারে শালের বন, তারই পরে সবুজ পাহাড়, তারও ওপর দুসার বনহীন পাহাড়। চোখে পড়ে তিনটি পর্বত—আলো খুললে চারটি, এমন কি পাঁচটি। আজ দুদিন মেঘ ছিল, সামনের পাহাড় ঘন নীল হয়ে গেল, আধ ঘণ্টা পরে আবার সবুজ, ঘন সবুজ, হঠাৎ দেখি পাটল। পর্দায় পর্দায় রঙের বাহার—থিয়েটার দেখছি। মানুষের দৃষ্টি দিয়েই প্রকৃতি দেখে, প্রকৃতি দিয়ে ছবি দেখে না।

(কথাটা কিন্তু কেমন লাগল? নৈসর্গিক দৃশ্যে কি মানুষ এক কোণে থাকবে, না থাকবে না?)

বাড়ির সামনে শুখনো নদী, আর ও-পাশে বন, কিন্তু সেই বনের মধ্যে Cheshire Home, ভদ্রলোক যুদ্ধের সময় হাওয়াই জাহাজের বিখ্যাত চালক ছিলেন। হঠাৎ ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ভারতের দুঃস্থ ব্যক্তিদের সেবা করতে মন দিলেন। অদম্য শক্তি! একটা মানুষে এত কাজ করতে পারে! লোক-জন জুটছেও অনেকে।

কিন্তু এ ধরণের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কত দিন চলবে। সমবেত কাজের দাম এ-যুগে বেশী। মানুষ নিশ্চয়ই, কিন্তু একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে নয়, দশটা, অর্থাৎ সমবায়। ইতিহাসে চলাটাই যদি শ্রেয় হয় তবে কার্য হবে একত্রে।

* * *

ছোট্ট ছোট্ট অভিজ্ঞতা, ছোট্ট ছোট্ট জ্ঞান, ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা, এই সব মিলে-মিশে মালা গাঁথা। বৌদ্ধধর্মের দানা বাঁধা, আত্মা নেই। কোথা থেকে সত্যি আসে কে জানে? ওটা কি কেবল construct মাত্র?

[ক্রমশ]

কবিতা
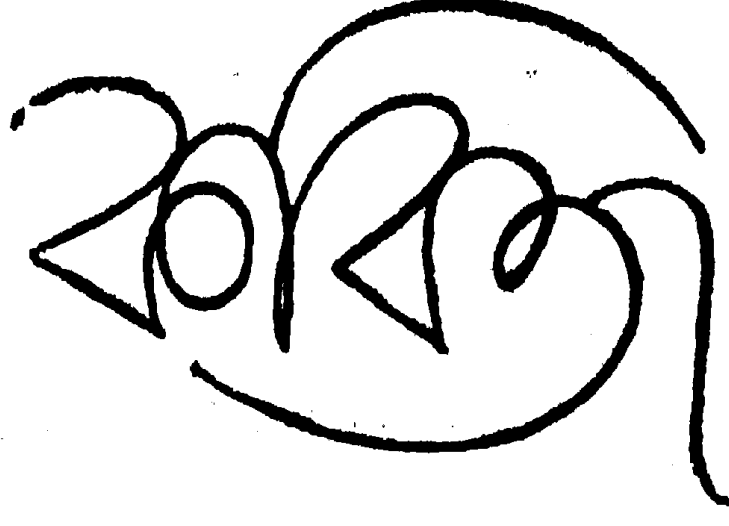
তোমাকে চিঠি

গোবিন্দ চক্রবর্তী

যখন-তখন তোমার কণ্ঠস্বর শুনি।
আলোয়-হাওয়ায়, রোদ্রে কি অন্ধকারে
নিশিরাতের তারায়-তারায়
ঝড়ে অথবা বৃষ্টিতে:
সরস্বতীর বীণার মত
সেই প্রাণমাতানো কলকন্ঠ
যা প্রায় নিমেষে ছাড়িয়ে যায়
জীবনের দিক থেকে দিগন্তে।

সেই আয়ত দুটি চোখ,
পাটির মত কপাল,
তিল ফুলকে হার-মানানো নাক,
সেই ওষ্ঠ, চিবুক, চিবুকের ছোটো তিলটিও
আর পানের পাতার মত
সেই পানরঙা মুখের ভোল :
আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাই সবটুকু!

অশান্ত সমুদ্রের ফেনিল উর্মিমালা
আর সেই অবাধ্য কুঞ্চিত কেশদাম
যারা আমাকে সহস্র স্বর্গের ইশারা দেয়
নিত্য-নিয়ত,
তা কি কখনো ভোলা যায়
না ভোলবার,
যতই বল না ভুলতে।

যখন-তখন তোমার কণ্ঠস্বর শুনি।
অসীম শূন্যতায়
যেমন একটি [illegible]।
যেমন পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে
উদ্দাম পৃথিবীর শিয়রে
আরো না হঠাৎ।
এক ঝলক সাগর-হাওয়ায়
দূর কোনো অরণ্যের
উগ্রগন্ধ স্বর্ণচাঁপা যেমন।

তুমিই আমার দেবতার মুখ।
সেই মুখের গঙ্গোত্রী থেকে
অমৃতস্রাবী এক স্বরগঙ্গা
শুধু ঝরঝর শব্দে
অবিরাম আমার ওপর বয়ে যায়—
আমার শোয়া-বসায়, খাওয়া-দাওয়ায়
লেখা-পড়ায় কি আলস্য-বিলাসে!
আমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটিতে
কী স্নেহোজ্জ্বল সেই দৃষ্টিপাত!
আমার সামান্যতম কল্যাণ কামনায়
কী অসামান্য সেই স্নেহশাসন।

তা কি কখনো ভোলা যায়,
না ভোলবার,
যতই বল না ভুলতে!

*

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা ঘাসের মতন
শিশিরে, চপেটাঘাতে কিংবা ঝাউবন-চূর্ণকরা
হাওয়ায় জাগিনি আগে ভোরবেলা জাগিনি, এমন
জাগিনি; আমার চিত্ত চিরকাল ছিল জয়-করা
বিকালবেলার। আমি মাঝরাতে ঘুরেছি বাগানে।
একী স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়—
জন্ম কি এমনই ভালো? সন্ধ্যা হতে দেয় না সেখানে;
অহংকার আলো করে রেখে দেয় মলিন জামায়!

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা, না জাগিলে আর
কেমনে পেতাম ঘাসে শিশিরের নৈঃশব্দ্যে করুণা?
সবিরাম বুকে হেঁটে পার হওয়া জীবনে পাহাড়
বাঘেরও অসাধ্য। আমি বাঘ হতে বড় জন্তু কিনা!
একী স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়
একী এ-একাকী জন্ম ভোরবেলা উজ্জ্বল জানায়।

প্রেমের চতুর্দশ পদাবলী

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

প্রতিচ্ছবি সমুদ্রেই যায়। ওই মুখ স্মৃতির দর্পণে;
একান্তে ধূসরবেলা, ও দাঁড়ায় এলোচুলে, মনে
কুমারীসন্তাপ, ছাদ, বিধুর রোদ্দুর, ওই চোখ
প্রখর চেতনা যেন, অন্তরালে অহর্নিশি শোক।

দুপুর কি সমুদ্রেই, বহে কাল ঢেউ ছলছল,
বয়সের অগ্রসরে কৈশোর যৌবন সীমারেখা
হঠাৎ দিগন্তে লীন, সূর্য ডোবে, প্রতিচ্ছবি ছল,
ও-দর্পণ কৌতূহল অলস দুপুরে ও যে একা!

দুপুরের ছাদ, ক্লান্ত পাখি ডাকে, আপন অন্তরে
অনুগত স্বপ্নভার, খসে বাস, উত্তাপের স্বরে
কটি স্বেদবিন্দু হাসে, চোখ মেলে প্রকৃতির টানে,
বালিকাভীরুতাভয় অতীতের প্রতিচ্ছবি আনে।

প্রতিচ্ছবি সমুদ্রেই যায়। বধূ মম স্মৃতির দর্পণে
ধূসর বেলায় একা, এলোচুল, একান্ত মননে।

কহেন কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছন্দে
জানলা দিয়ে ঘর পালাল গেরস্ত রইল বন্ধ

কহেন কবি কালিদাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা যখন ট্যাক্সির কাছে পৌঁছিলাম তখন ভুবন গাড়ির বুট্ হইতে জ্যাক্ বাহির করিয়া চাকার নীচে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছে, আমাদের দেখিয়া স্যালুট করিল, বলিল,—'ট্যাক্সি চাই স্যার?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ, একবার প্রাণহরিবাবুর বাড়িতে যেতে হবে। সেখানে একজন মেয়েলোক থাকে তার সঙ্গে দরকার আছে।'

ভুবন আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, মাথা চুলকাইয়া বলিল,—'আমার তো একটু দেরী হবে স্যার। টায়ার পাঙ্চার হয়েছে, চাকাটা বদলাতে হবে।'

ব্যোমকেশ অতর্কিতে প্রশ্ন করিল, 'গোবিন্দ হালদার তোমার সঙ্গে কী কথা বলছিলেন?'

ভুবন চমকিয়া উঠিল,—'আজ্ঞে? উনি—উনি আমাকে চেনেন, তাই দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলছিলেন। ভারি ভাল লোক।' বলিয়া জ্যাকের হাতল প্রবলবেগে ঘুরাইয়া গাড়ির চাকা শূন্যে তুলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া দেখি সে তন্দ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চক্ষু ভুবনের উপর নিবদ্ধ কিন্তু সে মনশ্চক্ষে অন্য কিছু দেখিতেছে। আমি ডাকিলাম, 'ব্যোমকেশ!'

সে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিল,—'অজিত, পনরোর সঙ্গে পঁয়ত্রিশ যোগ দিলে কত হয়?'

বলিলাম,—'পঞ্চাশ। কী আবোল-তাবোল বকছ?'

সে বলিল,—'এসো।' বলিয়া থানার দিকে ফিরিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া আমি ফিরিয়া চাহিলাম, ভুবন একাগ্র দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকাইয়া আছে।

থানায় উপস্থিত হইলে বরাট মুখ তুলিয়া বলিলেন,—'এ কি, গেলেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'প্রমোদবাবু, আপনার থানায় কোথাও নিরিবিলি জায়গা আছে? আমি নির্জনে বসে একটু ভাবতে চাই।'

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। বরাট তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন,—'আসুন আমার সঙ্গে।'

থানার পিছন দিকে একটি ঢাকা বারান্দা, লোকজন নাই, কয়েকটা চেয়ার পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ একটি ইজি-চেয়ারে লম্বা হইয়া সিগারেট ধরাইল। বরাট মৃদু হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে গোটা পাঁচেক সিগারেট নিঃশেষ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'চল, হয়েছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কী হয়েছে?'

সে বলিল,—'দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, সত্যদর্শন হয়েছে। এস।'

বরাটের ঘরে গিয়া তাঁহার টেবিলের পাশে দাঁড়াইতেই তিনি উৎসুক মুখ তুলিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'প্রমোদবাবু, কোন্ ব্যাঙ্কে প্রাণহরির টাকা আছে?'

বরাট বলিলেন,—'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে। কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সেখানে সেফ্ ডিপসিট্ ভল্ট্ আছে কিনা জানেন?'

'আছে বোধ হয়।'

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'এতক্ষণে ব্যাঙ্ক খুলেছে।—চলুন।'

বরাট আর প্রশ্ন না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ফণীশ ফিরিয়াছে এবং গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে। ব্যোমকেশ

বলিল,—'নেমো না, আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকে পৌঁছে দিতে হবে।'

শহরের মাঝখানে ব্যাংকের বাড়ি, দ্বারে বন্দুকধারী শান্ত্রীর পাহারা। গাড়ি হইতে নামিবার পূর্বে ব্যোমকেশ ফণীশকে বলিল,—'ফণীশ, তুমি বাড়ি যাও, আমাদের ফিরতে একটু দেরী হবে।—ভাল কথা, বৌমার বাপের বাড়ি কোথায়?'

ফণীশ সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল,—'নবদ্বীপে।'

বরাট আমাদের ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ঘরে লইয়া গেলেন; ম্যানেজারের সংগে তাঁহার আগে হইতেই আলাপ ছিল। বলিলেন,—'প্রাণহরি পোদ্দারের ব্যাপারে এসেছি। আপনার ব্যাংকে সেফ্‌-ডিপসিট্ ভল্ট আছে।'

ম্যানেজার বলিলেন,—'আছে।'

বরাট ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল,—'প্রাণহরি পোদ্দার ভল্ট ভাড়া নিয়েছিলেন নাকি?'

বরাট বলিলেন,—'প্রাণহরি পোদ্দারকে খুন করা হয়েছে। তার সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র অনুসন্ধান করবার পরোয়ানা পুলিসের আছে।'

ম্যানেজার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'বেশ। চাবি এনেছেন?'

'চাবি?'

'সেফ্‌-ডিপজিটের প্রত্যেকটি বাক্সের দুটো চাবি; একটা থাকে যিনি ভাড়া নিয়েছেন তাঁর কাছে, অন্যটা থাকে ব্যাংকের জিম্মায়। দুটো চাবি না পেলে বাক্স খোলা যায় না।'

ব্যোমকে[illegible] সংগে দৃষ্টি-বিনিময় করিল। বরাট বলিলেন,—'ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয় আছে?'

ম্যানেজার বলিলেন,—'আছে। কিন্তু ব্যাংকের ডিরেক্টারদের হুকুম না পেলে আপনাদের দিতে পারি না। হুকুম পেতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগবে।'

ব্যোমকেশ বরাটকে বলিল,—'চলুন, আর একবার প্রাণহরির সিন্দুক খুঁজে দেখা যাক। নিশ্চয় ওই ঘরেই কোথাও আছে।'

বরাট উঠিলেন, ম্যানেজারকে বলিলেন, 'আমরা আবার আসছি। যদি চাবি খুঁজে না পাই, দরখাস্ত করব।'

আমরা থানায় ফিরিয়া গেলাম, সেখান হইতে আরও দুইজন লোক লইয়া পুলিস-কারে প্রাণহরির বাড়িতে উপনীত হইলাম।

আজ তরুণ কনেষ্টবলটি বাড়ির সামনে টুল পাতিয়া বসিয়া ছিল, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে স্যালুট করিল।

দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ বরাটকে বলিল,—'আমি মোহিনীকে দু'একটা প্রশ্ন করি, ততক্ষণ আপনারা ওপরের ঘর তল্লাস করুন গিয়ে। আমার বিশ্বাস চাবি খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। হয়তো সিন্দুকেই আছে, আপনারা লুকোনো জিনিস খোঁজেন নি, তাই পান নি। তখন তো আপনারা জানতেন না যে প্রাণহরির সেফ্‌-ডিপসিট্ আছে।'

পুলিসের দল সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ব্যোমকেশ ও আমি রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

"কিছু দরকার আছে বাবু?"

ব্যোমকেশ বলিল,—'হুঁ। তাহলে নিশ্চয় মালপো তৈরি করতে জানেন। তাঁকে বলে দিও আজ বিকেলে আমরা মালপো খাব।'

আমরা নামিয়া গেলাম, ফণীশ একটু নিরাশভাবে গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। সে বুঝিয়াছিল, প্রাণহরির মৃত্যুরহস্য সমাধানের উপান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ম্যানেজার একজন কর্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল,—'হ্যাঁ, নিয়েছিলেন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তার সেফ্‌-ডিপসিটে কী আছে আমরা দেখতে চাই।'

ম্যানেজার কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—'কিন্তু ব্যাংকের নিয়ম নেই। অবশ্য যদি পরোয়ানা থাকে—'

মোহিনী দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া রান্না করিতেছিল, আমাদের পদশব্দে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। আমাদের দেখিয়া চকিত ত্রাসে তাহার চক্ষু একবার বিস্ফারিত হইল, তারপর সে উনান হইতে কড়া নামাইয়া আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'কিছু দরকার আছে বাবু?' তাহার ক্ষণিক ত্রাস কাটিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল,—'তুমি এখনো আছ দেখছি। দেশে ফিরে যাচ্ছ না কেন?'

মোহিনী বলিল,—'কি করব বাবু, পুলিস ছেড়ে না দিলে যাই কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তোমার বাপ-মা'কে কিংবা স্বামীকে খবর দিয়েছ?'

মোহিনী ক্ষণকাল চক্ষু নত করিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'স্বামী কোথায় জানিনা। বাপ-মা'কে খবর দিইনি। তারা বুড়ো মানুষ, কি হবে তাদের খবর দিয়ে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তা বটে। আচ্ছা, একটা কথা বল দেখি, যে-রাত্রে প্রাণহরিবাবু খুন হয়েছিলেন, সে-রাত্রে তিনি যখন খেতে নামলেন না, তখন তুমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলে।'

মোহিনী সায় দিয়া বলিল,—'হ্যাঁ বাবু।'

'ঘরে আলো জ্বলছিল?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'ঘরের পিছন দিকের দরজা, অর্থাৎ স্নানের ঘরের দরজা খোলা দেখেছিলে?'

'না বাবু।' মোহিনীর চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

'দরজা বন্ধ ছিল?'

পলকের জন্য মোহিনী দ্বিধা করিল, তারপর বলিল,—'আমি কিছুই দেখিনি বাবু। কর্তাবাবু মরে পড়ে আছেন দেখে ছুটে পালিয়ে এসেছিলুম।'

'তুমি স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করে দাওনি?'

'আজ্ঞে না।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল—'প্রাণহরিবাবু তোমাকে পনরো টাকা মাইনে দিতেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'প্রতি মাসে ঠিক সময়ে মাইনে দিতেন?'

মানুষ যখন মনে মনে এক কথা ভাবে এবং মুখে অন্য কথা বলে তখন তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা যায়, তেমনি অন্যমনস্কভাবে মোহিনী বলিল,—'আমার মাইনে কর্তাবাবুর কাছে জমা থাকত, দরকার হলে দু'এক টাকা চেয়ে নিতুম।'

ব্যোমকেশের পানে কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলাম, সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সে বলিল,—'তোমার মাইনের টাকা বোধহয় মারা গেল। আচ্ছা এবার আমার শেষ প্রশ্ন: তুমি কোনো ন্যাটা লোককে চেন?'

মোহিনী অবাক হইয়া বলিল,—'ন্যাটা লোক! সে কাকে বলে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ন্যাটা জান না? যে ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাত বেশী চালায় তাকে ন্যাটা বলে।'

মোহিনী সহসা বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল,—'না বাবু, সে রকম কাউকে আমি চিনি না।'

মোহিনী দাঁড়াইয়া রহিল, আমরা উপরে প্রাণহরির শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলাম।

চাবি পাওয়া গিয়াছে। বেশী খোঁজাখুঁজি করিতে হয় নাই; সিন্দুক ও দেয়ালের মাঝখানে যে স্বল্প-পরিসর স্থান ছিল সেই স্থানে সিন্দুকের পিঠে চাবিটা মোম দিয়া আট্‌কানো ছিল। বরাট বলিল,—'এই নিন।'

নম্বর খোদাই-করা লম্বা একটি চাবি। ব্যোমকেশ তাহা পরিদর্শন করিয়া বলিল,—'চলুন আবার ব্যাঙ্কে।'

ব্যাঙ্কে গিয়া ম্যানেজারের নিকট চাবি পেশ করা হইল। তিনি এবার আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, স্বয়ং উঠিয়া আমাদের ভল্টে লইয়া গেলেন। ব্যাঙ্কের বাড়ির নীচে মাটির তলায় ঘর, তাহার তিনটি দেয়াল জুড়িয়া কাতারে কাতারে দ্বারবদ্ধ স্টীলের খোপ শোভা পাইতেছে।

দুইটি চাবি মিলাইয়া প্রাণহরির খোপের কবাট খোলা হইল। খোপের মধ্যে টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি কিছু নাই, কেবল কয়েকটি পুরাতন চিঠি এবং এক বাণ্ডিল বন্ধকী তমসুক।

চিঠিগুলি প্রাণহরিকে লেখা নয়, প্রাণহরির দ্বারাও লিখিত নয়। অজ্ঞাতনামা পুরুষ বা নারীর দ্বারা অজ্ঞাতনামা লোকের নামে লেখা। সম্ভবত এই পত্রগুলিকে অস্ত্র করিয়া প্রাণহরি লেখক ও লেখিকাদের রুধির শোষণ করিতেন।

চিঠিগুলিতে ব্যোমকেশের প্রয়োজন ছিল না, সে তমসুকগুলি লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া সে একে একে তমসুকগুলিতে চোখ বুলাইল। তারপর একটি তমসুক তুলিয়া ধরিয়া বরাটকে বলিল,—'এই নিন আপনার আসামী।'

তমসুকে আইনসংগত ভাষায় লেখা ছিল, মহাজন প্রাণহরি পোদ্দার ভগবানপুর নিবাসী ভুবনেশ্বর দাসকে ক্রেতব্য মোটরগাড়ি বন্ধক রাখিয়া আড়াই হাজার টাকা কর্জ দিয়াছেন। কীভাবে ভুবনেশ্বর দাস এই ঋণ শোধ করিবে তাহার শর্তও দলিলে লেখা আছে: পঞ্চাশ টাকা নগদ; প্রাণহরি মোটর ব্যবহার করিবেন তাহার মাসিক ভাড়া পঁচিশ টাকা; একুনে পঁচাত্তর টাকা হিসাবে মাসে শোধ হইবে।

বরাট ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার যা করবার আপনি করবেন।'

বরাট বলিলেন,—'কিন্তু খুনের প্রমাণ?'

'প্রমাণ আছে। তবে আদালতে দাঁড়াবে কিনা বলতে পারি না। এবার আমরা বাড়ি ফিরব, বেলা দেড়টা বেজে গেছে।'

'চলুন, আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

পুলিস-কারে যাইতে যাইতে বেশী কথা হইল না। একবার বরাট বলিলেন,—'ভুবনকে অ্যারেস্ট করি তাহলে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'করুন। সে যদি স্বীকার করে তাহলে সব ন্যাটা চুকে যাবে।'

বাড়ির ফটকের সামনে আমাদের নামাইয়া দিয়া গাড়ি চলিয়া গেল, বরাট বলিয়া গেলেন,—'বিকেলবেলা আসব।'

(ক্রমশ)
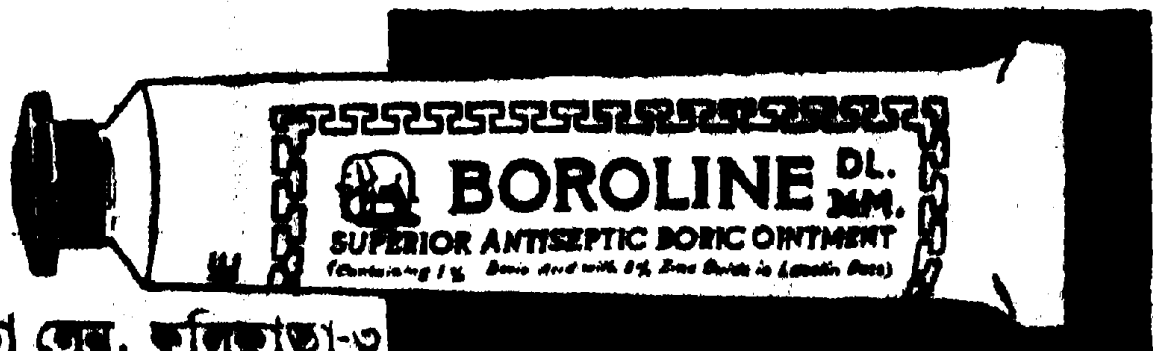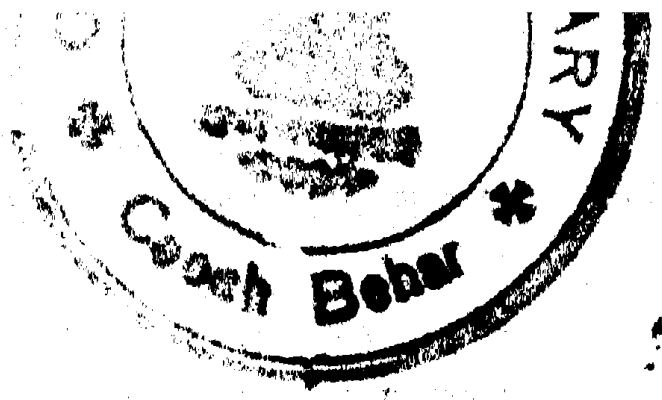
নিপ্পনি ইংরিজি

ইঙ্গ-ভারতীয় লেখক ঃ দ্বীপমণ্ডূক ইংরেজ

বুদ্ধদেব বসু

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬১

জ্যোতি,

চলেছি প্রশান্তমহাসাগর পেরিয়ে হনলুলুর দিকে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, মাথার উপর বর্তুল আকাশ নিখুঁত ছাতার আকারে ছড়িয়ে আছে, নিচে আর একখানা নীল আকাশ নানা রঙের মেঘ নিয়ে প্রসারিত। সমুদ্র, কিন্তু মেঘের সমুদ্র: ফেনিল, কিন্তু সে-ফেনা মেঘের, জলের সমুদ্র কত নিচে ধারণা করা যায় না। এখন তেইশ তারিখের বেলা প্রায় তিনটে, আমার ঘড়ির সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ হনলুলু পেঁছবো, তখন সেখানে হবে বাইশ তারিখের মধ্যরাত্রি। এই সব বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। কিন্তু বিস্মিত হবার মতো বয়স আর আমার নেই সেটা প্রতিদিন অনুভব ক'রে প্রতিদিন মনে-মনে কষ্ট পাই।

জাপানে দশদিন চমৎকার কাটলো। দুই শহরে গোটা ছয়েক বক্তৃতা, টোকিওতে রেডিওতেও কিছু বলতে হ'লো। অনেক বন্ধু পেলাম, জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না তাঁদের সঙ্গে, কিন্তু কে জানে—! অধ্যাপক ওটার স্ত্রী আমাদের জন্য এয়ার-পোর্ট পর্যন্ত এসেছিলেন—প্লেনের দেরি ছিলো, আমাদের জন্য দু-ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে ছিলেন, তারপর মাত্র মিনিট দশেকের জন্য দেখা হ'লো। শুধু চোখেরই দেখা, কেননা কথা বলার ভাষা নেই, তাঁর ভাঙা ইংরেজি ও সরল চোখের নম্র শুভেচ্ছা নিয়ে যাত্রা করলাম। কিয়োতোর বন্ধুদের সহৃদয়তাও ভোলার নয়। ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ বা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এরা জানে অল্পই, কিন্তু জানবার আগ্রহ আছে, এঁদের বোঝার সুবিধের জন্য আমি অত্যন্ত মোটামুটি মামুলি কথা বলেছি—টোকিওতে আবার আমি এক-একটি বাক্য বলছি, ওতা তার জাপানি অনুবাদ করছেন, এইভাবে বক্তৃতা সারতে হয়েছে। P. E. N.-এর কোনো এক সভায় ভালেরির বক্তৃতাটা মনে পড়ছিলো, বলছেন—বিভিন্ন ভাষার কবিদের মধ্যে কী ক'রে যোগাযোগ হ'তে পারে—তা অসম্ভব ! খুব গোঁড়া মত, পুরোপুরি মানতে পারি না, কিন্তু এক ফোঁটা সত্যও আছে কথাটায়। তবু জাপানে এসে বারম্বার মনে হয়েছে যে আমাদের সাহিত্যের কিছু অনুবাদ হওয়া অতি জরুরি প্রয়োজন এখন—এমনও হ'তে পারে যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোনো ইংরেজ-মার্কিনের উৎসাহ জাগলো না—আমাদের দিক থেকে কিছু চেষ্টা করা কি যায় না ? এটা তোমার কাজ জ্যোতি, তুমি এ বিষয়ে চিন্তা কোরো। জাপানিরা আমাদের মনে-মনে ঈর্ষা করে আমরা ইংরেজি ভালো জানি ব'লে—কিন্তু সত্যি ক-জন ভারতীয় ইংরেজি লিখতে পারে, আর তা পারবেই বা কেন, ইংরেজির অধঃপতন আমাদের দেশে অনিবার্য। জাপানে বিদ্বান লোকেরা স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে পারে না—যারা মার্কিনফেরৎ তারাও না, কেননা এদের কাজকর্ম পড়াশুনো সবই মাতৃভাষায়। কিন্তু কোনো-কোনো জাপানি (সংখ্যায় খুব কম তাঁরা) নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ইংরেজি লিখতে শিখেছেন—কেননা জাপানি সাহিত্যের অনেক অনুবাদ স্থানীয় লোকেরাই করেছে। কালক্রমে আমাদের দেশে এই-রকম অবস্থা এলে ভালো হয় না কি ? কলকাতার কোনো-কোনো অধ্যাপক অনর্গল ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁদের সেই মৃত নিশ্চল আক্ষরিক ইংরেজির চাইতে জাপানিদের ব্যাকরণহীন মৌখিক ইংরেজি অনেক সপ্রাণ বোধহয়। আমাদের "শুদ্ধ" ইংরেজি আমাদের দাসত্বের চিহ্ন—ঐ মৌখিক বাগ্মিতার লোভ ছাড়লে হয়তো আমাদের দেশেও দু-চারজন সত্যিকার ইংরেজি লিখতে পারবেন। অবশ্য বিষয়টা ভালো করে ভেবে দেখিনি, কিন্তু সোজা কথাটা এই যে, বাংলা সাহিত্যের কিছু ইংরেজি অনুবাদ হওয়া উচিত—বই বেরোনো উচিত—তুমি চেষ্টা কোরো।

প্লেন বড্ড কাঁপছে, কাগজও ফুরোলো।

বু, ব

জ্যোতি,

সেদিন এশিয়া সোসাইটির মিসেস ক্রাউনের সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম। ছিপছিপে তরুণী সুশ্রী মহিলা, আমার চোখে প্রায় মিমির মতো লাগলো, রকফেলারের টাকায় তৈরি এক ঝকঝকে বাড়ির উজ্জ্বল ঘরে আপিশ করেন। যে-রেস্তোরাঁয় খাওয়ালেন সেটার নাম The Left Bank—রাস্তা থেকে কয়েক সিঁড়ি নেমে যেতে হয়, চৌখুপি কাপড়ে ঢাকা ক্ষুদ্র টেবিল, চেয়ারগুলো প্রায় পানীয়নের চেয়ারের মতো নড়বড়ে—বুঝলাম, এই প্যারিসীয় দারিদ্র্যের অভিনয়টাই এখানকার আকর্ষণ। মহিলাটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ লাগলো, খুব সরল ভালোমানুষ গোছের অথচ বুদ্ধিমতী; বিশেষ কয়েকটা মার্কিনী মুদ্রাদোষ থেকে মুক্ত।

মিসেস ক্রাউনকে গল্পের কথা ব'লে ফেলে এখন ভয়ে-ভয়ে আছি। এখানে ঘরকন্নার কাজ এতো করতে হয়, আর এতো নিমন্ত্রণ থাকে, যে সত্যি নিবিষ্ট হ'য়ে বসারই সময় পাচ্ছি না। তার উপর ঘরে দিনের আলো নেই, তার উপর পড়ানোর হাঙ্গামাও কম নয়। আমার অদৃষ্টে ছাত্রসংখ্যা মন্দ জোটেনি, তারা মূর্খ নয়, এবং কেউ-কেউ বেজায় উৎসাহী, অচিরেই আমার অজ্ঞতা ধ'রে ফেলবে এইরকম আশা করছি; তখন আর তথ্যপরিবেশনের অপচেষ্টা ক'রে ক্লান্ত হ'তে হবে না। যা-ই হোক, কথা হচ্ছে আমার সেই "একটি জীবন" গল্পটার অনুবাদে কি হাত দেবে এবার ? জনরব শুনছি আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি আমার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে "কবিতা"য় ছাপাবার মৎলব আঁটছো—খবরদার, কখনো না, আমি যতদিন সম্পাদক আছি "কবিতা"য় আমার বিষয়ে আলাদা কোনো প্রবন্ধ বেরোবে না, বড়ো জোর বুক-রিভিয়ু পর্যন্ত মার্জনীয়। কাজের কাজ হবে যদি ঐ গল্পটা অনুবাদ ক'রে পাঠাও। শক্ত কাজ, কিন্তু তুমি পাত্রটিও তো সোজা নও। লেখা, টাইপ করা, আমার সংশোধন, পুনশ্চ টাইপ—সব মিলিয়ে দু-মাসের ব্যাপার নিশ্চয়ই, হয়তো বেশি। অর্থাৎ, ততদিনে আমি প্রায় ফিরতি প্লেনের যাত্রী—কিন্তু তবু কিছু দিয়ে যেতে চাই এদের হাতে, আর যা দেখছি এমনি তাড়াহুড়োর মধ্যে ছাড়া কিছুই হ'য়ে ওঠে না আজকাল। আমার লেখার ধরণটা হালকা হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে আমার অভিপ্রায়ে গুরুত্বের অভাব নেই তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ?

ডরথি নর্ম্যানের সঙ্গেও দেখা হয়েছে এর মধ্যে। ভারতীয় সিল্কের কাপড় প'রে তিনি আমাদের চা খাওয়ালেন; চা-টা যদিও **ঈষদ্‌গন্ধী গরম জলের মতো** অনুভূত হ'লো, তবু অন্যান্য বিষয়ে তিনি **ও তাঁর পরিবেশ এতো উল্লেখযোগ্য যে তাঁর প্রতি চিত্তের উৎসুকতা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে।** রাণু খুঁটে-খুঁটে **দেখতে লাগলো তাঁর ঘরের** আসবাবপত্র, **গাছপালা,** মহিলাটির নিজের...আর আমি তাকিয়ে-তাকিয়ে **দেখতে লাগলাম ছবির বই, কবিতার বই, দেয়ালে ঝোলানো ছবি ও ছবির মতোই জীবন্ত ফোটোগ্রাফ্‌, কী অপর্যাপ্ত** সংগ্রহ **ভদ্রমহিলার। আমার কেবল** তোমার কথা **মনে হ'তে লাগলো—মনে-মনে কতবার বললাম,** "জ্যোতির এখানে আসা **উচিত।"** আমার **বয়স** হ'য়ে গিয়েছে, **জীবনের** আর নতুন **কিছু** দেবার নেই আমাকে—রাসবিহারী ছেড়ে ফিফথ এভিনিউতে এসে সত্যি লাভবান হবার **দিন আমার** ফুরিয়ে গেছে। অনেক **কিছু না-হ'লেও আমার** এখন চলে যায়, বরং **না-হ'লেই** ভালো থাকি। **কিন্তু তোমার মনের দগদগে** খিদে নিয়ে **তুমি** এ-রকম **একটা জায়গায়,** এসে পড়লে **কতই না সঞ্চয় করতে পারো।** তাই ব'লে **এমন কথাও ভাবি** না যে, বিদেশে আসার সত্যি কোনো জরুরী প্রয়োজন আছে। **পরিণতির শক্তি থাকলে** কোনো দেশেই **উপাদানের** অভাব হয় না, তুমি তোমার নিজেরই উদ্যমেই **নিশ্চয়ই বিকশিত হবে**—তোমার জীবনে অন্য যা-কিছু **ঘটছে বা ঘটবে সেগুলো উপলক্ষ-মাত্র।**

George Oppen নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে **এসেছিলেন।** দেখতে ভালো নয় **মানুষটা,** কিন্তু তিন **মিনিট** কথা **ব'লেই বুঝলাম** তিনি সত্যি কবিতা পড়েন, বোঝেন, ভালোবাসেন। আর-একটু আলাপের পর ধরা পড়লো তিনি নিজেও ও পাপকর্মটি ক'রে থাকেন বা এককালে **করতেন। যখন বললেন** যে, "কবিতা"র **ইংরেজি** সংখ্যায় আমার কবিতা তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, এমন সুরে **লাগলো** কথাটায় যে অবিশ্বাস করতে পারলাম না। "স্মৃতির প্রতি" ১ ও ২ তিনি আমার ইংরেজি থেকে আধুনিক মার্কিনীতে তর্জমা করেছেন—আমার অনুমতি পেলে ছাপাতে চান। কী বলবো, "আত্মা" হয়তো আমারই, কিন্তু গলার আওয়াজ একেবারেই হাল আমলের মার্কিনী—বাংলাতেও ঐ ধরণটা **আমার ইহজন্মে** আসবে না। (পরে তোমাকে লেখা দুটো পাঠিয়ে দেবো।) আমার আপত্তি তাঁকে ক্ষীণভাবে বল-**লাম। আমার সহযোগে আমার কবিতা** অনুবাদ করা তাঁর ইচ্ছা, খুবই আগ্রহ **করলেন।** সবই ভালো, কিন্তু সময় **কোথায় বলো ?** ক-দিন পরেই তো পাখি আবার উড়ে যাবে। কথা হচ্ছে, অনন্ত সময় ব্যতীত কিছু হবার কোনো উপায় নেই— অতএব সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকাই ভালো। একটা জানলা, কিছুটা আকাশ, আকাশে মেঘ, তাকিয়ে-তাকিয়ে বেলা কেটে গেলো, ভাবতে মন হু-হু ক'রে উঠে। "ছিন্নপত্র" পড়েছো ?

তোমার পত্র-প্রবন্ধ [illegible] ভেবো না, কিন্তু তার যথাযোগ্য উত্তর লেখার সময় নেই।

বু, ব

১৯-৩-৬১

জ্যোতি,

*** আরো অনেকের সঙ্গে আজ দেখা হ'লো। ডনাল্ড, কীন, জাপানি-**অনুবাদক;** প্যারিস রিভিয়ুর অন্যতম **সম্পাদক** সিলভার্স; শ্রীমতী জিমার, অর্থাৎ হাইনরিখ জিমারের বিধবা পত্নী। শেষোক্ত মানুষটির সংস্পর্শে এসে রোমাঞ্চিত হয়েছি;—যদিও জানি উনি ও'র স্বামী নন, এবং স্বামীর প্রতিভাও ও'র মধ্যে কিছু বর্তায়নি, তবু আমাদের পৌত্তলিক স্বভাবদোষে যে-কোন একটি প্রতীক পেলেই আমরা নমস্কার জানাই। উনি বললেন ও'র স্বামী রবীন্দ্রনাথের "রাজা"র একটা জর্মান অনুবাদ করে-ছিলেন, সেটা এখনো ছাপা হয়নি—শুনে খুব কৌতূহল হচ্ছে। এই তিনজনের সঙ্গেই আবার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে—প্যারিস রিভিয়ুতে হয়তো কিছু বাংলা লেখার অনুবাদ ছাপানো যেতে পারে—যদি তুমি অনুবাদ ক'রে দাও। বাঙ্‌লার জন্য ডনাল্ড কীন-এর মতো কোনো অনুবাদক যতদিন তৈরি না হয়, তোমার উপরেই আমরা নির্ভর ক'রে থাকবো। ওখানে ভেড মেহতাও ছিলো—হাত-ঝাঁকানি হ'লো আমার সঙ্গে—কথাবার্তা ইচ্ছে ক'রেই এড়িয়ে গেলুম। আর-একজন ভারতীয় ছিল—সে ইংরেজিতে কবিতা লেখে, সম্পাদকরা ফেরৎ পাঠাবার সময় তাকে মনোরম চিঠি লেখেন—সেটাই তার পক্ষে গর্বের বিষয় মনে হ'লো। এই ইংরেজি-লিখিয়ে ভারতীয়দের মতো বেচারা জীব ভূ-ভারতে নেই—পায়ের তলায় দাঁড়াবার মতো মাটি নেই এদের, যার কোনো মাতৃভাষা নেই তার মতো দুর্ভাগা আর কে আছে বলো। কৌতুকের বিষয় এই যে, এরা কেউ-কেউ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত, কেননা রবীন্দ্রনাথ "ইংরেজিতে কবিতা লিখেছিলেন!"

পরশু রাত্রে চ্যাপেল হিল্‌-এ তোমার বয়সী ছেলেমেয়েদের আড্ডায় আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। তারা অনেকে প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে "বীট" সম্প্রদায়-ভুক্ত: ছেলেরা দাড়ি রাখে, গোঁফ কামায়; মেয়েরা রাখে লম্বা চুল, কালো রঙের মোজা পরে, লিপস্টিক লাগায় না। তাদের সঙ্গে কবিতা বিষয়ে কথা ব'লে সুখ পেয়েছিলাম। আমার অনেক বয়স হ'লো, অথচ আমার [illegible] মুশকিল এই যে প্রবীণ [illegible] অধ্যাপকীয় সংসর্গে আমাকে ঠিক খাপ খায় না—সাহিত্যিক ছেলে-ছোকরাদের মহলে বরং আসর জমাতে পারি; একটা জীর্ণ দেহের মধ্যে তপ্ত হৃৎপিন্ড অত্যন্ত অসংগতভাবে বহন করে বেড়াচ্ছি। তপ্ত? না—হয়তো তাও ম'রে গেছে, হয়তো শুধু স্মৃতির তাড়নায় ছাইয়ের তলা থেকে মাঝে-মাঝে ফুলকি জ্ব'লে ওঠে—যখন কবিতা পড়ি, কবিদের কথা পড়ি, বা যখন এমন কারো সঙ্গে দেখা হয় কবিতা যার শিরায়-শিরায় বইছে, সমালোচনার কেতাবে আবদ্ধ হ'য়ে নেই।

চ্যাপেল হিল-এ প্রণবেন্দু বেশ সুনাম রেখে এসেছে, আমার পক্ষে এটা বিশেষ আনন্দের কথা।

মানিক যদি নিউ ইয়র্কে আসে তুমি তার হাতে তোমার উপন্যাস পাঠাতে পারো—অন্তত খানিকটা। এই চিঠি পেয়েই তার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো—কবে রওনা হবে, সত্যি আমেরিকা পর্যন্ত আসবে কিনা, ইত্যাদি। এসেনিন আর মায়াকভস্কির আত্মহত্যার কথা ভেবে আজ নতুন ক'রে কম্পিত হচ্ছি—নতুন ক'রে মনে পড়ছে ডস্টয়েভস্কিকে, কিন্তু মরবার আগেও এ'রা যদি কবিতা লিখতে পেরেছিলেন তাহ'লে আত্মহত্যার কী প্রয়োজন ছিল?

বু, ব

২২শে মার্চ, ১৯৬১
রাত্রি

রুমি,

*** আমার সাম্প্রতিক সবচেয়ে বড়ো খবর হ'লো—অ্যালান গিনসবার্গ। 'বীট' বংশের দুই নম্বর কবি **ইনি (এক নম্বর হলেন কেরুয়াক—জ্যোতি এদের** বিষয়ে **সবই** জানে।) নোংরা **জামা-কাপড়, গাঁজা ইত্যাদি সেবনের অভ্যাস,** ততোধিক নোংরা **এক ছোকরার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার মুদ্রাদোষ—এ-সব সত্ত্বেও ছেলেটিকে আমার ভারি ভালো** লেগেছে। সেদিন রাত্রে **এসে অনেকক্ষণ** কাটালো আমাদের **সঙ্গে—অনেক কথা**

হ'লো। ওর কথায়, হাসিতে, সবচেয়ে বেশি চোখের দৃষ্টিতে এমন একরকম শান্ত সরলতা আছে যা ভারি আশ্চর্য ও বিরল। আমার বিশ্বাস হ'লো ওর মধ্যে খাঁটি পদার্থ কিছু আছে—তাইতে বড়ো আনন্দ পেলাম। ওর কবিতাও চোখে দেখলাম একটু একটু—মাঝে মাঝে ঝিলিক আছে কিন্তু উচ্ছ্বাসে চাপা পড়ে যায়। আমার শুধু এই কথাই মনে হয় যে, হুইটম্যানের পর র‍্যাঁবোর পর এবং সুরিয়ালিস্টদের পর—এরা নতুন পথের জন্য দেয়ালে মাথা ঠুকছে শুধু—কিন্তু বেরোতে পারছে না। হয়তো পথ খুঁজে পেতো ছন্দ-মিলের শরণ নিলে, কিছু পরিমাণে বুদ্ধিকে স্বীকার করলে। —কিন্তু ওর কবিতা যেমনই হোক, ছেলেটিকে ভালো লেগেছে।

আর একটা পার্টিতে জর্মান কবি হান্স এ্যান হোল্টহুজেনের সঙ্গে দেখা হলো, যাঁর অনুবাদ আমরা 'কবিতা'য় ছেপেছি। বড়ো পার্টিতে শুধু দেখাই হয়, কথা হয় না—আশা করি আবার যোগাযোগ ঘটবে। তোরা কি ফিল্ম অভিনেতা ফ্রেডেরিক মার্চ-এর নাম শুনেছিস বা ছবি দেখেছিস? তিনিও সস্ত্রীক ছিলেন সেখানে। আমি যখন তাঁকে বললুম যে, আমি অনেক বছর আগে তাঁর 'ডক্টর জেকল অ্যান্ড মিস্টার হাইড' ছবি দেখেছিলুম, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে চেঁচিয়ে উঠলেন, "Oh boy!" বলা বাহুল্য, 'boy' মানে এখানে ঠিক বালক নয়, যদিও হোল্টহুজেন আমার বয়স শুনে অবাক হ'য়ে বললেন, 'you look thirty!' হায়, 'প্রতারক প্রচ্ছদ'! **

বাবা

২৯শে মে, ১৯৬১

মিমি, লণ্ডন

ইংলণ্ডে এসে একটুও ভালো লাগছে না। এখানে কনকনে শীত এখনো, ঘরেও তাপ নেই, মানুষের মুখ হাস্যবর্জিত, ভাষা স্বল্প ও অর্ধস্ফুট এবং আতিথেয়তা ইঞ্চি-মাপা। এই রক্তবর্ণ শ্লেষ্মাভারাক্রান্ত, মিতাচারী, শুচিবায়ুগ্রস্ত, কৃপণ ও অসুন্দর জাতির সঙ্গে আমাদের স্বভাবের কিছুই মিল নেই—কেমন ক'রে এদের সংসর্গ আমরা এতোকাল সহ্য করেছিলাম সে কথা ভেবে অবাক লাগে, আর এখানে এসে ভগবানের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই সংকীর্ণ দ্বীপবাসীদের সঙ্গে আমাদের সংস্রব ছিন্ন হয়েছে বলে। এরা সাম্রাজ্য হারিয়েছে, বিদেশে সর্বত্র এরা আজ অপমানে জর্জর—তবু নিজের দেশে এরা দাপিত., প্রাদেশিক, আমেরিকার বিষয়ে ঈর্ষাপরায়ণ এবং অন্যদের বিষয়ে নিতান্ত কৌতূহলহীন। আরো মুশকিল হয়েছে আমি আইনত ব্রিটিশ কাউন্সিলের 'অতিথি' বলে; এতে সুবিধে এই যে, চলাফেরার জন্য গাড়ি ও গাইড অধিকাংশ সময় পাওয়া যায়, আর অসুবিধে এই হচ্ছে স্বাধীনতার অভাব—কোন্ দিকের পাল্লা ভারি বলা শক্ত। অবশ্য বোকামিটা আমারই হয়েছিল, আমি যা-যা দেখতে বা করতে চাই বলে আগে জানিয়েছিলুম ও'রা সেই মতোই ব্যবস্থা করেছেন—কিন্তু এখন দেখছি তাড়াহুড়ো আর সহ্য হয় না, দুজনেরই শরীর অবসন্ন। আজ আমাদের কথা ছিলো অক্সফোর্ড থেকে স্ট্র্যাটফোর্ডে যাবার, সেখানে রাত্রে 'হ্যামলেট' নাটক ও পরের দিন সেক্সপীয়রের স্মৃতিসমূহ দর্শন ক'রে আগামী কাল সন্ধ্যায় লণ্ডনে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মত-বদল ক'রে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপকদের হয়তো কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট ক'রে হঠাৎ লাঞ্চের পরেই লণ্ডনে ফিরে এলাম। ইংরেজের চিবোনো কথা ও তিমিরাচ্ছন্ন মন আর যেন সহ্য হচ্ছিল না। অক্সফোর্ডের কলেজগুলোর স্থাপত্য মনোরম, স্মৃতি ঐশ্বর্যময়, প্রাকৃতিক দৃশ্য হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু বর্তমানে যিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে নিরাশ হ'তে হ'লো। পদে পদে আমেরিকানদের সঙ্গে তুলনা মনে পড়ছে—ইংরেজের শুধু যে সামর্থ্য কম তা নয়, উদারতারও অভাব, প্রতিটি তামার পেনির হিসেব রেখে, এবং চিত্তেরও কোনো প্রসার নেই। আমি আমার ছেলেকে কখনো বিশ্ববিশ্রুত অক্সফোর্ডে পড়তে পাঠাবো না। এরা এখন স্মৃতিসম্বল, ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে।

লণ্ডনে আজ বিদেশীর মধ্যে আফ্রিকানরা সবচেয়ে জোরালো, সংখ্যায় তারা ভারতীয়দেরও ছাড়িয়ে গেছে। ইংরেজ তরুণীর কাছে এখন সবচেয়ে কাঙ্ক্ষণীয় হ'লো কাফ্রি (এক-একজনের তিনটি ক'রে বান্ধবী জোটে) তারপর ইটালিয়ান, তারপর ভারতীয় এবং চতুর্থ ও সর্বশেষ তার স্বজাতি। পক্ষান্তরে, ইংরেজ যুবক একটি ভারতীয় তরুণীর সঙ্গ পেলে নাকি স্বর্গ হাতে পায়। অন্ততঃ কাফ্রিদের বিষয়ে কথাটা যে বানানো নয় তার প্রমাণ পথে-ঘাটে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। একদিক থেকে অবশ্য লণ্ডন প্রায় বাঙালি শহর—এসেই তো সুধীন ঘোষের সঙ্গে দেখা হ'লো, তারপর বেঙ্গলি ক্লাবের সভায় গিয়ে যাঁদের দেখতে পেলুম তাদের মধ্যে আছেন কল্যাণী (তোদের কল্যাণী কাকিমা), সাগরময় ও সন্তোষ ঘোষ, মৈত্রেয়ী দেবী, সরোজ দাসের পুত্রবধূ, এমনি অনেকে। সভার পরে কয়েক বাঙালি দল বেঁধে বেরিয়ে অনেকক্ষণ আড্ডা দেয়া গেল, কাল সন্ধ্যায় কল্যাণী এসে অনেকক্ষণ ছিল, আজ আসবেন সন্তোষ ও সাগরময়। অতএব দেখতে পাচ্ছি, ঈশ্বর একেবারে নিষ্ঠুর নন, নিরবচ্ছিন্ন কষ্টে আমাদের দিন কাটছে না। রাজেশ্বরীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে, এখনো দেখা হয়নি। তবু—ডক্টর জনসন স্কটল্যাণ্ড বিষয়ে যা বলেছিলেন, আমি সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ বিষয়ে তা-ই বলতে রাজি আছি,—এই ভূমি সবচেয়ে সুখদা হয় তখন, যখন আমরা একে ছেড়ে যাচ্ছি। আগামী শনিবার যাচ্ছি স্কটল্যাণ্ডে, সেখান থেকে আর লণ্ডন শহরে ফিরবো না—এয়ারপোর্টে প্লেন বদল ক'রে ছয় তারিখ সন্ধ্যায় প্যারিস পৌঁছবো। এই চিঠি পাবার পর থেকে তোরা প্যারিসের ঠিকানায় লিখিস ***।

বাবা

এর পরে আর কোনো চিঠিতে ভুতোর কথা লিখিস না—তোর মা এমনিতেই মাঝে-মাঝে কাঁদেন।

এডিনবরা

রুমি, ৩রা জুন, ১৯৬১

রাত্রি

এখন 'রাত' প্রায় সাড়ে দশটা, এতক্ষণে পথে আলো জ্বলার সময় হ'লো, আকাশে এখনো স্পষ্ট দিন ছড়িয়ে আছে। শরীর ক্লান্ত, কিন্তু শুতে যেতে পারছি না, অন্ধকারের প্রতীক্ষায় বসে আছি। শেলী রাত্রিকে দ্রুতগামিনী হবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, হয়তো সেইজন্যেই তাঁকে দক্ষিণ দেশে বাসা নিতে হ'লো, এ-সব দেশে রাত্রি তাঁর মিনতি শোনেনি। পৃথিবীর এতো উত্তরে আমি আগে কখনো আসিনি, এ-যাত্রায় এর বেশি উত্তরে যাবো না, এই দীর্ঘায়িত দিন আমাদের পক্ষে এক নতুন অভিজ্ঞতা। আগের বারেও লণ্ডনে হোটেলে শুয়ে শুয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত আকাশে অস্তরাগ দেখেছি, কালও গল্প করতে করতে রাত চারটে নাগাদ আকাশ ফর্শা হয়ে এলো। কার সঙ্গে গল্প? কল্যাণী আর বারীণ গেঠ নামে একটি যুবক কাল আমাদের ঘরেই রাত কাটিয়ে দিলে, আজ সকালে আমাদের বিদায় দিতে গিয়ে কল্যাণীর কান্না আর থামতেই চায় না। এবারকার লণ্ডনে সবচেয়ে বড় স্মৃতি কল্যাণী আর সুধীন ঘোষ—দুজনের জন্যেই বেদনা অনুভব করছি, ঐ অনুভূতিটুকুই আমাদের সর্বস্ব—আর কিছু পারি না। লণ্ডনে আর যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রাজেশ্বরী আর অমলেশ ত্রিপাঠী, সন্তোষ ঘোষ সাগরময়ের কথা আগেই লিখেছি, বলতে গেলে বাঙালি পরিবেশে লণ্ডনে একটা সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়া

গেল। আজ অপরাহ্নে স্কটল্যাণ্ডের রাজধানীতে পৌঁছলুম। আমার ধারণা ছিল না এডিনবরা শহরটি এমন চোখ-ডোবানো সবুজ, এমন ঘন গাছপালায় আচ্ছন্ন, আর এমন ধূসর, প্রাচীন ও কঠিন। শহরের এক প্রান্তে ছাইরঙা সমুদ্র—হাইনের উত্তরসাগর—মধ্যস্থলে পাহাড়ের উপর বিরাট কঠিন ঐতিহাসিক দুর্গ বা প্রাসাদ, সেদিকে তাকাতেও যেন ভয় করে, মনে হয় খোপে খোপে নিহত ও হত্যাকারী রাজ-রাজড়াদের প্রেতেরা বাসা বেঁধে আছে। বাড়িগুলো প্রায় সবই পাথরে তৈরি, বয়সে ও কারখানার কালিতে কৃষ্ণবর্ণ হ'য়ে আছে, চোখের পক্ষে প্রীতিকর নয়। এদিকে লোকগুলো খাঁটি, ইংরেজের তুলনায় কিছু বেশি মিশুক ও হাসিখুশি, হয়তো সেইজন্যে, আর এদের প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতার জন্যে লণ্ডনে অনেক বন্ধু ছেড়ে এসেও এখানে খারাপ লাগছে না। মঙ্গলবার ছয় তারিখ প্যারিসে যাচ্ছি, সেখানে তোদের চিঠিপত্রের আশায় থাকবো।

****আসামের খবর আমি লণ্ডনে "যুগান্তরে"র দক্ষিণাবাবুর মুখে শুনলাম—বাঙালির প্রতি অবিচার যদি অনবরত চলতে থাকে, যদি মাতৃভাষাকে ভালোবাসার মূল্য পুলিশের গুলির ওজনে দিতে হয়—তাহ'লে 'ভারতবর্ষ' নামক ধারণাটিও চুরমার হ'য়ে ভেঙে যাবে, কোনোদিকেই কোনো কল্যাণ হবে না। অমিয় নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন—একবার মা-বাবার কাছে ওর যাওয়াই দরকার, জার্নাল না হয় আরো দুদিন পরে বেরোবে। আর এক কথা : কলেজ খুললে পরীক্ষাটা তোকে দিতেই হবে, ও-সব পেছোনো-টেছোনো কোনো কাজের কথা নয়—বিশেষত তুই যখন আমারই মেয়ে তখন একেবারে বাঁধা আইনের পথে না চ'লে তোর উপায় নেই। কেমন, রাজি তো? দশ-বারো দিন পড়াশুনো ক'রে অনায়াসে উত্তর লিখতে পারবি—কিছু ভাবিস না। সুহৃতাদের পরীক্ষা ঠিক কোন্ তারিখে আরম্ভ? মহুয়ার? সব জানাস আমাকে। তুই লিখেছিস তেসরা জুলাই তের পরীক্ষা— কলেজ কি তাহ'লে তেসরাই খুলবে? আমি অবশ্য ৩০শে জুন রাত্রে কলকাতায় ফেরার ব্যবস্থা করেছি, পয়লা খুললে ঠিক হাজির হ'তে পারবো। তবু—তারিখ আবার বদল হয়ে থাকলে জানাস।

আরো দুটো মাল লণ্ডন থেকে জাহাজে পাঠালাম—কলকাতার ঠিকানায় রশিদ ইত্যাদি যাবে, সাবধানে রাখিস। মোটের উপর জাহাজের মাল ন-টা হ'লো। নিউইয়র্ক ছাড়ার আগের দিন তোকে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠিয়েছিলাম—পেয়েছিস তো? পাম্পাকে বড়ো চিঠি লিখতে বলিস।

বাবা

৪ঠা জুন সকাল

কাল রাত্রে লক্ষ্য করলাম যে, সারা রাত প্রায় অন্ধকার হয়ই না। আকাশ শাদা থাকে—ডস্টয়েভস্কির 'শাদা রাত্রি'। পুনশ্চ—পেন্সিলে লেখার জন্যে ক্ষমা-প্রার্থী—কলমের কালি ফুরিয়ে বা শুকিয়ে গেছে, পথ চলার ব্যস্ততায় কলমের সংস্কার হচ্ছে না।

প্যারিস

মিমি, ৬ই জুন, ১৯৬১

আজ সকালে ছিলুম এডিনবরায়, বিকেলে প্যারিস। প্রথমেই একটা খবর দিই, স্কচদের বিষয়ে ছেলেবেলা থেকে বহু দুর্নাম শুনে এসেছি, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড কতগুলো বিষয়ে ইংলণ্ডের চেয়ে বেশি ভালো লাগলো—তোর মা-র, আমার, দু'জনেরই। কোন দেশ কেমন লাগে তার পিছনে অনেকটা ভাগ্যেরও হাত আছে, অর্থাৎ কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে দেখা হয়, সেই লোকগুলো ব্যক্তি হিসেবে কেমন সেটাই আমাদের ধারণা-গুলোর ভিত্তি। লণ্ডনে ব্রিটিশ কাউন্সিল আমাদের যে গাইড দিয়েছিলো সেই বিশ্রী বদমেজাজি বুড়ি—কর্তব্যে কোনো ত্রুটি নেই তার, কিন্তু তার সঙ্গ শেষের দিকে রীতিমতো পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছিল, শুধু ওরই জন্য (কল্যাণী প্রভৃতি বাঙালি সত্ত্বেও) যেন লণ্ডন ছাড়তে পেরে বেঁচেছি। এডিনবরায় যাঁরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই চমৎকার মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কজনের সঙ্গে যোগাযোগ হ'লো প্রত্যেকেই সহৃদয় ও সজ্জন এবং কাল রাত্রে এঁরা আমাদের যে ভোজ দিলেন অমন উৎকৃষ্ট আহার্য ও পানীয় যে-কোনো দেশেই বিরল মনে হয়। অথচ এঁরা সকলেই জাতিতে স্কচ নন—কেউ কেউ ইংরেজ। Norman Daniel নামে এক ভদ্রলোক (আধা ওয়েলশ তিনি) আজ সকালে আমাদের একেবারে এয়ার-পোর্টে পৌঁছিয়ে দিলেন, এটা তাঁর কর্তব্য নয়, বন্ধুতা—খুবই ভালো লাগলো। অন্য দু'দিন আমাদের গাড়ির চালক ও গাইড ছিল একটি সুশ্রী মিষ্টভাষী যুবক, নাম Kellas, তার বাবা কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। রবিবার স্কটল্যাণ্ডে প্রায় দুশো মাইল মোটরে ঘুরলাম, হাইলাণ্ডস, Loch Earne ও Loch Lomond দেখা হ'লো—কিন্তু আমার এত অসম্ভব ঘুম পাচ্ছিলো যে ভালো ক'রে কিছুই দেখতে পাইনি। প্যারিসে বালতুন ডিংরো সস্ত্রীক এয়ার-টার্মিনাসে এসেছিলেন, ভালো হোটেল পেয়েছি, খারাপ লাগছে না, তোর মা অবশ্য আপাতত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন—ক্লান্তির প্রধান কারণ আমাদের হাতে ক'রে বহু মাল বইতে হচ্ছে—পার্থর ক্যামেরা তোর মা-ই বহন করছেন—এই-ভাবে তেইশ দিনে আরো আটটা শহরে নামা-ওঠা আছে। এডিনবরা থেকে পুনশ্চ ডাকে কিছু জিনিস পাঠানো হয়েছে, কিন্তু প্রায় সর্বত্র কিছু কেনা-কাটা হচ্ছে ব'লে হাতের মাল কিছুতেই লঘু হচ্ছে না।

৭ই জুন, সকাল

*** কাল প্যারিসে পৌঁছেই তোদের চিঠি না পেয়ে একটু নিরাশ হয়েছি, আশা করছি আজ পাওয়া যাবে। এতদিনে তোরা আমেদপুর থেকে ফিরেছিস নিশ্চয়ই? এখানে এসে Quest দেখলাম, জ্যোতির লেখা এক ফাঁকে প'ড়ে ফেলবো। আইয়ুবের কোনো খবর জানিস? কেমন আছেন?

বাবা

প্যারিস

রুমি, ৯ই জুন, ১৯৬১

তোদের একটা চিঠি কাল লণ্ডন ঘুরে এখানে পৌঁছলো। দেশের বাইরে আর যে ক'দিন আছি, তোদের চিঠি-পত্র খুব নিয়মিত পাবার আশা নেই, তবু তোরা তারিখ ধরে ধরে যথাযথ ঠিকানায় লিখে যাবি— কিছুতেই যেন ভুল না হয়। সেদিন মিমিকে মুনিখের একটা ঠিকানা পাঠিয়েছি, কোপেন-হেগেন, বার্লিন, মুনিখে তোদের চিঠি আশা করবো। এর পরের ঠিকানাগুলো জানাই—* * *

কাইরোর ঠিকানা দিলাম না, ততদিনে প্রায় কলকাতা পৌঁছে গেছি। এই তিনটে শহরে তোদের অন্তত একটা ক'রে চিঠি চাই। আজ সকালে উঠেই Quest-এ জ্যোতির অনুবাদ ও প্রবন্ধ প'ড়ে ফেললাম, দুটোই খুব ভালো লাগলো, তবে—কিন্তু এইসব 'তবে'র আলোচনা সাক্ষাৎমতো হবে। এখানে রাজেশ্বরীর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হচ্ছে—তাড়াহুড়োর মধ্যে ভালো ক'রে ভাবা পর্যন্ত যায় না, তবু তিনজনকে থেকে থেকে মনে পড়ছে—বোদলেয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্র। তোর মা-কে ভুতোর কথা আর লিখিস না—এখনো এত কাঁদেন, আমার পক্ষে সান্ত্বনা দেবারও সাধ্য নেই। বাবা

Dr. Relfeld-এর ঠিকানা? আমার রেজিস্ট্রি চিঠির প্রাপ্তিসংবাদ? *

* প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসু সাম্প্রতিক আমেরিকা ও ইউরোপ প্রবাসকালে এই চিঠিগুলি তাঁর জামাতা শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত (জ্যোতি) এবং কন্যাদ্বয় শ্রীমীনাক্ষী দত্ত (মিমি) ও শ্রীদময়ন্তী বসু (রুমি)-কে লিখেছেন।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে [illegible]"

আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে—১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি যখন স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর সেবায় অতিশ্রমে জীবনীশক্তি এবং অমিত ব্যয়ে শেষ কপর্দক নিঃশেষ করিয়া গৌরবোজ্জ্বল অবস্থায় মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে মৃত্যুপথ-যাত্রী তখন বাঙ্গালার একজন মনীষী (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) আর একজন মনীষীকে (রাজনারায়ণ বসুকে) লিখিয়াছিলেন:—

জীবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমাদিগের শিক্ষিত সমাজে আর কেহই হরিশচন্দ্রের মত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু মানসিক ও চিন্তার স্বাধীনতার উন্নতির পক্ষে প্রকৃত ক্ষতির কারণ হইবে।

এই মন্তব্যে সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজে হরিশচন্দ্রের কিরূপ আদর ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তাহার দারুণ দারিদ্র্যের পরিমাপ করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, বালক হরিশচন্দ্র বিদ্যালয়ে বিনা-বেতনে ছাত্র হইলেও পাঠ্যপুস্তক কিনিবার সামর্থ্যের অভাবে ও অর্থার্জনের প্রয়োজনে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু দারিদ্র্য তাঁহার বিদ্যার্জনের আগ্রহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারা ত দূরের কথা—সে আগ্রহ বর্ধিত করিয়াছিল। তিনি আপনার চেষ্টায় বিদ্যার্জন করেন। যখন তিনি মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে একটি সামান্য চাকরী লাভ করেন, তখনও তিনি মাসে এক টাকা পুস্তক ক্রয়ে ব্যয় করিতেন এবং কাজ শেষ হইলে পাঠাগারে যাইয়া প্রতিদিন ৩ হইতে ৪ ঘণ্টা পুস্তক পাঠ করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় সফলকাম হইয়া সামরিক হিসাব বিভাগে একটি চাকরী পান—মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা। কাজে যোগ্যতার পরিচয় দিয়া পদোন্নতিতে ক্রমে তাঁহার বেতন বর্ধিত হইয়া ৪ শত টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল।

সাংবাদিকতা বাল্যকাল হইতেই হরিশ-চন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তিনি সেই কাজের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়ছিলেন। তখন এ দেশে দেশীয় লোকের পরিচালিত পত্রের প্রারম্ভ বলিলে অসংগত নয়। তিনি সে সময়ের একাধিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বড়-বাজারের মধুসূদন রায় তাঁহার ছাপাখানা হইতে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে থাকেন। যাঁহারা ঐ পত্রের সম্পাদন ভার লইয়াছিলেন হরিশচন্দ্র সে কাজে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। কয় মাস পরে সম্পাদক মহাশয়রা "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্র সম্পাদন ত্যাগ করিয়া "বেংগলী" পত্র প্রতিষ্ঠিত করিলে হরিশচন্দ্রই প্রথমোক্ত পত্রের সম্পাদকের কাজ করিতে থাকেন। পর বৎসর মধু-সূদনবাবু অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ছাপাখানা বিক্রয় করিয়া ফেলেন। "হিন্দু পেট্রিয়ট" কয় সপ্তাহ ভবানীপুরে সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। তখন হরিশচন্দ্র একটি ছাপা-খানা প্রতিষ্ঠা করিয়া "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্র গ্রহণ করেন। তখন পত্রের বার্ষিক মূল্য ১০৲ টাকা—গ্রাহক-সংখ্যা একশতও নহে। কিন্তু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও হরিশচন্দ্র পত্র পরিচালিত করিতে থাকেন। তিনি সে কাজে কাহারও অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন—পাছে পত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা কোনরূপে সংকুচিত হয়।

তিনি প্রবন্ধে স্বাধীনভাবে সমালোচনা ও আলোচনা করিতেন—এমন কি বড়লাটের অবলম্বিত নীতিরও প্রতিবাদ করিতে দ্বিধানুভব করিতেন না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয়। পলাসীর যুদ্ধের শত বৎসর পরে এই বৎসর সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। সৈনিকদিগকে বন্দুকে যে টোটা ব্যবহার করিতে হইত তাহা গরুর ও শূকরের চর্বিতে ভিজান হইত। সেই সংবাদ পাইয়া সিপাহীরা, হিন্দু ও মুসলমান সকলে, উহা ব্যবহার করিতে আপত্তি করিলে ইংরেজ কর্মচারীরা মিথ্যা কথায় তাহা-দিগকে প্রতারিত করেন—ঐ চর্বি ব্যবহৃত হয় না! সত্য কিন্তু গোপন থাকে না। নানা স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দুই সম্প্রদায়ের নিকট হইতে তাহারা উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করে—

(১) যে সব সামন্ত রাজ্যের রাজা ঔরষপুত্রহীন অবস্থায় মরিলে ইংরেজ সরকার তাঁহাদিগের রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারী-দিগের কেহ কেহ।

(২) একদল মুসলমান। ইঁহারা মুসলমান শাসনের অবসানে ক্ষুব্ধ ছিলেন—এই সুযোগে ভারতে আবার মুসলমানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন।

সিপাহীদিগের উপযুক্ত নেতার অভাব ছিল—যুদ্ধ করিবার উপকরণ অল্পই ছিল; বিশেষতঃ দেশে তখনও দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হয় নাই, ঐক্যের অভাব। বঙ্কিম-চন্দ্র বলিয়াছেন—দেশাত্মবোধে রামমোহন রায় অগ্রণী—রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার পরবর্তী। সিপাহী বিদ্রোহ সফল হইবে না বুঝিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীরা তাহাতে যোগ দেন নাই; পরন্তু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মত লোক সক্রিয়ভাবে ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করেন।

অল্প দিনের মধ্যেই সিপাহীদিগের পরাভব হয়। উত্তেজনায় বিশৃংখল সিপাহীরা কোন কোন স্থানে নিরপরাধ ইংরেজ নরনারীকেও হত্যা করিয়াছিল। তাহাদিগের পরাভবের সংগে সংগে ইংরেজরা প্রতিহিংসা গ্রহণে উৎসাহী হইয়া ভারতীয় মাত্রকেই অত্যাচার ভোগে বাধ্য করিতে থাকে। তাহারা এ দেশের লোককে ভয় দেখাইয়া অধীন রাখিতে চাহে। ৬ই জুন হইতে ১৬ই জুলাই এই ৪০ দিনে এক এলাহাবাদ সহরে প্রায় ৮ শত লোককে ফাঁসী দেওয়া হয়। সেনাপতি নীল বারাণসী হইতে যে পথে এলাহাবাদে গমন করেন সে পথে কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া ভারতীয়-দিগকে হত্যা করা হয়—অধিবাসীদিগের গৃহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। জয়মদমত্ত ইংরেজরা সর্বপ্রকারে ভারতীয়দিগের উপর অত্যাচার সমর্থন করে।

হরিশচন্দ্র প্রথমাবধি এই ব্যাপারে স্থিরভাবে বিবেচনার ও ধীরভাবে মত প্রকাশের পরিচয় দেন। তিনি অপরাধী সিপাহী প্রভৃতির দণ্ডও সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি নির্বিচারে ভারতীয়-দিগকে লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত করার প্রতি-বাদ করেন—ইংরেজদিগকে সুশাসকের কর্তব্য ও ন্যায়ের মর্যাদা বুঝাইতে থাকেন। তিনি বলেন, ইংরেজের আইনের কথা, দশজন অপরাধী যদি দণ্ড পায়, সে-ও ভাল, তবুও একজন নিরপরাধ যেন দণ্ডিত না হয়। এক্ষেত্রে সেই নীতি পদদলিত হইতেছে—নিরপরাধ ব্যক্তিদিগকে কঠোর দণ্ড প্রদান করা হইতেছে—হত্যা করাও হইতেছে। ইহা ন্যায়সংগত নহে, সভ্য সরকারের অনুপযুক্ত কাজ, লজ্জাজনক।

বড়লাট লর্ড ক্যানিং তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অনুমোদিত কঠোর ব্যবস্থা চাহিতেছিলেন না বটে, তাহাদিগকে রুষ্ট করিতেও চাহিতেছিলেন না। তিনি হরিশচন্দ্রের কথার যাথার্থ্য অনুভব করিলেন—দ্বিধা ত্যাগ করিয়া ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সুশাসকের কর্তব্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরেজরা ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাকে "করুণাময় ক্যানিং" আখ্যা দিল। কিন্তু দেশের লোক অনাচার হইতে রক্ষা পাইল।

লর্ড ক্যানিং "হিন্দু পেট্রিয়টের" মত একটি মূল্যবান মনে করিতেন যে, ভবানীপুরে যেদিন "হিন্দু পেট্রিয়ট" প্রকাশিত হইত সেদিন লাট প্রাসাদ হইতে ঘোড়সোয়ার তাহার জন্য হরিশচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে অপেক্ষা করিত—সংবাদপত্রখানি লইয়া যাইবে।

এইরূপে হরিশচন্দ্র ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করাইলেন— ভারতীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রের শক্তির প্রমাণ দিলেন। হরিশচন্দ্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে শিক্ষিতরা যে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীরা জানিতেন ও বিশ্বাস করিতেন—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—
বিধাতার অভিশাপ দোঁহা পরে রহে।"

সেই জন্য সিপাহী বিদ্রোহের ৩ বৎসর পরে—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় নীলকরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে গণ-আন্দোলন হইল, তাহা অতুলনীয় ও নূতন প্রকৃতির। বাঙ্গালী তাহার ধাতুসহ ও সংস্কার সম্মত অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিল—অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ। বাংলায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উদ্ভাবিত এই অস্ত্রই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে গণ-আন্দোলনে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর হস্তে সেই অস্ত্র সুদর্শন চক্রের মত কাজ করিয়াছিল। তখনও রসায়ন কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিতে পারে নাই—ভারতে নীল গাছ হইতে নীল রং প্রস্তুত হইত। সমগ্র জগতে তাহার চাহিদা থাকায় তাহার মূল্য অধিক ছিল। লাভের লোভে বহু য়ুরোপীয় এদেশে আসিয়া নানা স্থানে নীলের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে। তাহাকে 'নীল কুঠী' বলা হইত। কোলসওয়ার্দী গ্রান্ট নীল কুঠীর বর্ণনা করিয়াছেন। নীলকররা রাজার জাতি—আইন তাহাদিগকে অতিরিক্ত অধিকার দিয়াছিল, জিলার শাসকরা তাহাদিগের বন্ধু হইতেন, ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদ-পত্র তাহাদিগের পক্ষে লিখিতেন, সমগ্র য়ুরোপীয় সম্প্রদায় তাহাদিগের সমর্থক ছিলেন। তাহারা নির্ভয়ে প্রজার উপর অত্যাচার করিত—প্রজার সংগত স্বার্থ নষ্ট করিয়া আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধি করিত। প্রজারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতে লাগিল। হরিশচন্দ্র "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রে তাহাদিগের অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মফঃস্বল হইতে যাঁহারা তাঁহাকে অত্যা-চারের বিবরণ, প্রবন্ধের উপকরণ যোগাইতে লাগিলেন—তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য— পরবর্তীকালে বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ আর পরবর্তীকালে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' শিশিরকুমার ঘোষ।

বাংলার প্রজারা কিরূপে সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিয়াছিল, তাহা তৎকালীন ছোটলাটের বিবৃতিতে বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন—

তিনি জাহাজে ৬০।৭০ মাইল জল-পথ ভ্রমণ করিবার সময় দেখেন, নদীর উভয়কূলে নর-নারীর সমাবেশ। তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাহারা কেবল নীল চাষের বিষয়ে সুবিচার প্রার্থী।

এইরূপ সংঘবদ্ধতা দেখিয়া ছোটলাট আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন; বড়লাটও ইহার গুরুত্ব স্বীকার করেন।

ফলে হরিশচন্দ্রের কথাই থাকিল—অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সরকার কমিশন নিযুক্ত করিলেন। বাঙ্গালী সাংবাদিকের জয় হইল।

হরিশচন্দ্রের বিশ্রাম করিবার সময়ও রহিল না। তিনি প্রজাদিগের আবেদনপত্র লিখিয়া দিতে লাগিলেন। বহু কৃষক মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইল। সে গৃহ তাহাদিগের তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়াইল।

হরিশচন্দ্র স্বয়ং কমিশনে সাক্ষ্য দিলেন।

অতিশ্রমে তখনই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে। তিনি যখন শয্যা লইয়াছেন, তখন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। সাক্ষ্যে "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রকাশিত সব অভিযোগ প্রমাণিত হইল।

নীলকররা হতমান হইলেও ইংরেজ-পরিচালিত পত্রসমূহকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল।

কিন্তু হরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্য আর ফিরিল না। ১৪ই জুন সেই বিজয়ী বীর, বাংলার জনগণের বন্ধু, বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ সেবক সন্তান, ভারতীয়-পরি-চালিত সংবাদপত্রের পথিকৃৎ হরিশচন্দ্র শেষ শ্বাস ত্যাগ করিলেন। জীবন—কর্ম-বহুল গৌরবোজ্জ্বল জীবন—শেষ হইল। রহিল কীর্তি আর রহিল স্মৃতি।

সনদ

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

অবস্থা ঠিক ফাঁসির আসামীর সামিল। পায়ের তলা থেকে চাকরির তক্তাটা সরে যেতেই অনশনের ফাঁসটা গলায় চেপে বসল। এরকম যে হবে এটা যেন অসিতের জানাই ছিল। অন্ততঃ মাস ছয়েক আগে থেকেই বাতাসে গন্ধ পেয়েছিল।

মনুজারাম বাগেরিয়ার অফিস। মানুষ ছাড়া সব কিছুরই ব্যবসা আছে। প্রথমে শুরু হয়েছিল তিল দিয়ে, বছর কয়েকের মধ্যেই সেই তিল তাল হয়ে উঠল। পাট, তুলো আর গালা। ছোটখাটো একটা ওষুধেরও দোকান। অভ্রের খনিও একটা এসে গেল হাতে। সংগে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা।

আগে ছোট ঘরে জনতিনেক বাবু বসত। মালিক বসতেন তাকিয়া ঠেস দিয়ে। অবস্থা ফেরার সংগে সংগে তিন থেকে বাবুর সংখ্যা উঠল তিরিশে। ফরাস তাকিয়া উধাও হ'ল। কর্তার কাঁচ ঢাকা চেম্বার, পালিশ-ঝকঝকে ফার্ণিচার, ঘোরানো চেয়ার, সুবিধা এই যখন যে কোন দিকে ফেরা যায়, যার দিকে খুশি।

অসিত তখন চাকরির জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। সকালে দুটি খেয়ে বেরোয়, সারাটা দিন টো টো করে ঘোরে। অফিসের দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে। নো-ভেকেন্সির বোর্ডে মাথা ঠুকে ঠুকে কপাল ফাটল কিন্তু খুলল না। জুতোর তলা ক্ষয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন।

এমনই সময়ে বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। খবরের কাগজের একেবারে এক কোণে।

মনুজারাম বাগেরিয়ার অফিসে কনিষ্ঠ এক কেরাণীর প্রয়োজন। অবিলম্বে। হাতের লেখা ভাল হওয়া চাই, হিসাবের কাজও জানা দরকার, ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখার অভিজ্ঞতা থাকলে ভাল আর টাইপের সার্টিফিকেট থাকলে তো সোনায় সোহাগা।

অসিত আর কালবিলম্ব করল না। চায়ের দোকানে বসে ঠিকানাটা টুকে নিল নিজের নোটবুকে, তারপর দরখাস্ত ছাড়ল। লিখল, জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব তার আয়ত্বে। একবার শুধু চেয়ারে বসিয়ে পরখ করা হোক।

শিকে কেবল বেড়ালের ভাগেই নয়, অসিতের ভাগেও ছিঁড়ল।

আবেদনপত্র প্রাপ্তির চিঠি এল। তিন দিন পরে দেখা করার নির্দেশ-লিপি।

অফিসে পৌঁছেই অসিতের চক্ষু স্থির। তার মনে হ'ল অফিসপাড়ায় নয়, বুঝি মাহেশের রথের মেলাতেই এসে হাজির হয়েছে। সিঁড়িতে, চাতালে, ওয়েটিংরুমে লোকে লোকারণ্য। সবাই চাকরি-প্রার্থী।

ভিতরে ঢুকে অসিতের ধড়ে প্রাণ এল। ওষুধের কারখানায় কাজজানা কিছু লোকের দরকার, দুজন কেমিষ্ট, আর কিছু সাধারণ কেরাণী, তার উমেদারও রয়েছে এই ভিড়ের মধ্যে।

বেলা একটা নাগাদ ডাক পড়ল অসিতের। সাড়ে নটা থেকে সে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে নীচে গিয়ে একবার লাঞ্চ সেরে এসেছে। এক আনার ছোলা আর এক আঁজলা জল।

একটি মাড়োয়ারী, মাথায় ছাপ্পান্ন প্যাঁচের হলদে পাগড়ী। কানে মাকড়ী। পাশে মদ্রতনয়। মাথার অর্ধেকটা কামানো, কপালে বিভূতি। পরনে সুট, বুট, টাই। একেবারে কোণের দিকে একটি বাঙালী। বিপুল বপু। কোন-রকমে চেয়ারে এঁটেছেন, কি করে উঠবেন ঈশ্বর জানেন।

অসিত ঘরে ঢুকেই সকলের দিকে করুণ দৃষ্টি বোলাল। বিশেষ করে বাঙালী ভদ্রলোকটির দিকে। ভাবটা, বাঙালীকে বাঙালী না দেখিলে আর কে দেখিবে!

হাতের লেখা, টাইপ, সাধারণ জ্ঞান সব কিছুর পরীক্ষা হ'ল। মাদ্রাজীটি বললেন, যথাসময়ে খবর যাবে।

দিন দশেক কেটে গেল, কোন সংবাদ নেই। অসিত যখন প্রায় ঠিক করে ফেলেছে যে, বুক ঠুকে আর একবার খোঁজ নেবে, এমনি সময়ে নিয়োগ-পত্র এল।

শহরে অসিত একলা। তার বাপ মা ভাই বোন সব দেশে। বর্ধমান থেকে গরুর গাড়ীতে মাইল সাতেক। সুখবরটা অসিত তখনই বাবাকে পাঠিয়ে দিল। পোষ্টকার্ড মারফত। দেবদেবীর ছবির আশায় এ-দেয়ালে ও-দেয়ালে চোখ ফেরাল, কিন্তু গোটা দুয়েক সিনেমা ষ্টারের ফটো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

ষাট টাকায় জীবন শুরু। কাজ অফুরন্ত। মালিকের মন পাওয়া দায়। তাঁর ইচ্ছা, শুধু অফিসের কাজই নয়, অফিসের টেবিলগুলো ঝাড়লে যেন ভাল হয়। দরকার হ'লে তাঁর মোটরটাও।

দুবছরের মধ্যে ষাট টাকা আশী টাকায় দাঁড়াল। ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ডিপার্টমেণ্টে লাভ হল প্রচুর। মালিক কাউকে অখুশী রাখলেন না। অসিতের পরেও তার নীচে দুজন ভর্তি হ'ল অফিসে। একজন বাঙালী, একজন মাদ্রাজী।

এই সময় অসিত মেস ছাড়ল। তার শরীরটা চিরদিনই খারাপ। খাওয়ার গোলমাল একেবারে সহ্য হয় না। আগের ঠাকুরটাকে কোন রকমে বরদাস্ত করেছিল, কিন্তু নতুন ঠাকুর এল বালেশ্বর থেকে। মেজাজে লঙ্কেশ্বর। ঈশ্বর জানেন বাপের লঙ্কার চাষ ছিল কি না, কিন্তু লঙ্কার ব্যাপারে একেবারে দরাজ-হাত। অসিত বহু কষ্টে বাড়ীর

সন্ধান পেল। মাস তিনেক অক্লান্ত ঘোরাঘুরির পর। গলির নাম রাজা সীতারাম ঘোষ লেন, সড়কের ব্যবস্থা মোটেই রাজকীয় নয়। বাড়ীর অবস্থাও তথৈবচ। সিঁড়ির নীচে ছোট কুঠুরি আর তার সামনে একটু বড় একটা কামরা। রান্নাঘর নেই। বারান্দায় টিন দিয়ে ঘিরে একটু জায়গা করা আছে। বাড়ীর মালিকের অবস্থা এক সময়ে স্বচ্ছল ছিল, কিন্তু দিনের পর দিন রোজগারের টাকা ঘোড়দৌড়ের মাঠে পুঁতে আসার পর ইদানীং ভগ্নদশা।

অসিত লঙ্কেশ্বরের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে এই আস্তানাতেই এসে উঠল। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। সুহাসের মাকে পাওয়া গেল। পাচিকা আর ঝির কম্বাইণ্ড সংস্করণ। কিছুদিন পরে অভিভাবিকাও হ'য়ে উঠল। ফিরতে রাত হলে তাকে কৈফিয়ত দিতে হ'ত। বাজার থেকে চড়া দামে বাজে জিনিস আনলে সুহাসের মা বাজার করার নিয়মকানুন প্রক্রিয়া বাতলাত।

যাহোক সুখে দুঃখে অসিতের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। দেশ থেকে মা কয়েকবার হুমকি দিয়েছিলেন বিয়ের জন্য। কনেও দেখে রেখেছেন এমন কথাও লিখেছিলেন। কিন্তু অসিত তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল আইবড়ো বোনের কথা। বোনের বিয়ে না দিয়ে নিজের বিয়ের প্রশ্নও ওঠে না, বিশেষ করে এই স্বল্প পুঁজির পাত্রকে মালা দিতে এগিয়ে আসবে এমন মেয়ের হয়তো শহরে অভাব নেই, কিন্তু মালার সঙ্গে মেয়েও ঘরে আসবে, সমস্যা সেইখানেই। তার ভরণপোষণের ভার নিতে হ'লে এ মাইনেতে কুলোবে না, এটুকু অসিতের খুব জানা ছিল।

হঠাৎ নীল আকাশে মেঘের টুকরো দেখা দিল। খুব ছোট টুকরো, কিন্তু ঈশান কোণে ছোট টুকরোও অবহেলার নয়। অসিত শঙ্কিত হল। আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে খোদ সরকারের কর্তাদের সঙ্গে মুক্তারাম বাগেরিয়া কোম্পানীর মালিকদের বিরোধ বাঁধল। ফলে পারমিট বন্ধ হ'য়ে গেল। মুক্তারাম বাগেরিয়াও অটল-প্রতিজ্ঞ। কোম্পানী তুলে দেবে তাও স্বীকার, তবু মাথা নোয়াবে না, ইজ্জত খোয়াবে না।

রাজায় রাজায় যুদ্ধের ব্যাপারে উলুখড়ের প্রাণান্ত। ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের তিনটি কেরাণীর মুখ শুকিয়ে আমসি। বাজার খুব খারাপ। এক নৌকা টলমল করছে তো লাফিয়ে আর এক নৌকায় উঠবে, এ আশা ক্ষীণ। সারা দেশ জুড়ে বেকারের মিছিল। মাঝে মাঝে কর্তাব্যক্তিরা সান্ত্বনা আর সহানুভূতির বুলি ছাড়ছেন পাইকারী হারে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতন।

কাজ প্রায় নেই। লেজার সামনে রেখে অসিত চুপচাপ বসে থাকে। অফিসরদের দেখলে মাথা [illegible] শুধু পাতায় টোটাল দেবার চেষ্টা।

আরো বিপদে ফেলল মাদ্রাজী টাইপিষ্ট। ভাগ্যবান পুরুষ। সুযোগ সুবিধা দেখে অন্য গাছে বাসা বাঁধল। ফুটো নৌকায় বসবাস করা নির্বুদ্ধিতা।

অসিতের খুব আশা ছিল, সে ডিপার্টমেন্টের পুরনো লোক। যদি এ বিভাগ বন্ধও হ'য়ে যায়, তাকে নিশ্চয় অন্য বিভাগে চালান করবে। হাজার হোক গ্র্যাজুয়েট তার ওপর টাইপের চাবি টেপা অভ্যাস আছে।

কিন্তু অসিতেরই ডাক পড়ল সকলের আগে।

একেবারে খোদ মালিকের ঘরে।

যতগুলো দেবদেবীর নাম মনে এল, সবগুলো স্মরণ করতে করতে অসিত কামরায় ঢুকল।

মুক্তারামবাবু হাত দিয়ে সামনের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

লক্ষণ খারাপ। অসিত প্রমাদ গুণল। এত ভব্যতা আবার ভাল নয়। অধস্তন কর্মচারীকে এভাবে আপ্যায়ন করা রীতিমত মারাত্মক।

বসব না, বসব না করে অসিত বসল। চেয়ারে আলগোছে দেহ ঠেকিয়ে।

মুক্তারামবাবু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, কোম্পানীর কারবারের অবস্থা যে ভাল নয়, সেতো বুঝতেই পারছেন অসিতবাবু। গভর্ণমেন্টের লোকেরা বড় ঝামেলা বাঁধিয়েছে। সৎভাবে কাজকর্ম করতে আর দেবে না। আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি অন্যায় করব না। এতে যদি কারবার তুলে দিতে হয় তাও রাজী। শুধু একটা লোটা নিয়ে এদেশে এসেছিলাম, না হয় লোটা নিয়েই ঝনেঝনে ফিরে যাব।

অসিত চেয়ারের হাতল ধরে টাল সামলাল। চাকরি গেলে তার দেশে নিয়ে যাবার মত একটা লোটাও অবশিষ্ট থাকবে না, সে কথা মনে হ'তেই মাথাটা ঘুরে উঠল।

খেয়াল যখন হ'ল, তখন সর্বনাশ হয়ে গেছে। তিনমাসের আগাম মাইনের একটা চেক অসিতের হাতের মুঠোয়, সেই সঙ্গে টাইপ করা একটা চিঠি। সে চিঠিতে কি লেখা আছে তা আর দেখবার দরকার হল না। অমঙ্গলের বার্তা মুক্তারামবাবুর দৃষ্টিতে, ভ্রূর কুঞ্চনে, অবসাদে, ঝুলে পড়া অধরোষ্ঠে।

আমার এতদিনের চাকরি স্যর।

অসিত দু হাত যোড় করে ফেলল।

মুক্তারামবাবু লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে, আমাকে অপরাধী করবেন না অসিতবাবু। আমার নসীব আর আপনার বরাত, নইলে চালু কোম্পানী এমন হবে কেন। যাহোক, আপনার ঠিকানা তো রইলই, দরকার হ'লেই ডেকে পাঠাব।

কথা শেষ করে মুক্তারামবাবু কলিং বেল টিপলেন, তার মানে অসিতের এ ঘরে বসা আর চলবে না।

অসিত যখন বাইরে এল তখন সব কিছু ঝাপসা। অফিস ছাড়বার আগেই সারা অফিস মুছে গেল চোখের সামনে থেকে আস্তিন দিয়ে দুটো চোখ মুছেও জল শেষ হ'ল না।

পাঁচটার সময় অসিত রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখনও বেশ চড়া রোদ। বৈশাখের দাবদাহ। কিন্তু অসিতের মনে হ'ল সমস্ত পৃথিবীটা ম্লান, বিবর্ণ। কোথাও এক বিন্দু আলো নেই।

ট্রামে, বাসে নয়, হেঁটেই ফিরল। মাঝখানে গড়ের মাঠে জিরিয়ে নিল ঘন্টাখানেক। হাঁটতে হাঁটতেই হিসাব করল পাড়ার পোষ্ট অফিসের পাশ বইয়ে জমানো কড়ির অঙ্ক ছাপান্ন টাকা দশ নয়াপয়সা। টিনের কৌটোয় আছে সাড়ে সাত টাকা। আর সামনে অফুরন্ত ভবিতব্য। কোথাও তীরের ইশারাটুকুও নেই।

বাড়ীর চৌকাঠে পা দিয়ে মনে হ'ল, কয়েকদিন আগে মার পোষ্টকার্ড এসেছে, চোখের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। অনবরত জল পড়ছে চোখ দিয়ে। সামনের মাসে অসিত যদি কিছু বাড়তি টাকা পাঠায় তো চোখদুটো একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন। জলপড়া যদি বন্ধ হয়।

এত দুঃখেও অসিতের হাসি পেল। বিষে বিষক্ষয় হয়, এটা তার জানা ছিল, কিন্তু জলে জলক্ষয় হয় এমন কথা কোনদিন শোনেনি। তা হলে, অসিতের অফুরন্ত চোখের জল তার মার চোখের জল বন্ধ করতে পারত।

বিছানা পাতাই ছিল। সুহাসের মা বিকেল বেলাই বিছানাটা করে রাখে। অসিত সোজা চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। পাশের ছোট জানালা দিয়ে নীল আকাশের টুকরো নজরে পড়ল। নীল নয়, রাত্রির কালো আকাশ। অন্ধকার তারার চুমকি বসানো।

চা খাবেন না বাবু? সুহাসের মা দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

একবার অসিতের মনে হল বলে চা বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে, আর খাবে না, কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েই মনে পড়ল, চা যখন তৈরীই হয়ে গেছে, তখন নষ্ট করাটা বোকামী। বিশেষতঃ এখন অপচয় করবার বিলাসিতা তার সাজে না।

চা খেয়ে অসিত আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। ঘরের কোণের আবছা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা মশার পালের মতন চিন্তার ঝাঁক এসে ঘিরে ধরল তাকে। প্রথমেই মনে হল কাল থেকে অখণ্ড অবসর। ভোরে উঠে বাজারে দৌড়াতে হবে না, তাড়াহুড়ো করে স্নান-খাওয়া নয়, দশটা বাস ছেড়ে, পরের বাসটায় হাতল ধরে সার্কাসী কেরামতী দেখাবার প্রয়োজন হবে না।

মা-বাবাকে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিতে হবে। তাঁদের অন্ধকারে রেখে লাভ নেই। অবশ্য মাস তিনেকের রসদ অসিতের হাতের মুঠোয়। সমস্যা শুরু হবে চতুর্থ মাস থেকে।

এ বাড়ীও অসিতকে ছাড়তে হবে। এ সময় কলকাতা অবশ্য ছাড়া চলবে না। কোন মেসে সস্তা সীট খুঁজে নিয়ে সারা দুপুর টহল দিয়ে বেড়াতে হবে, অফিসের দরজায় দরজায়। টাইপ করা দরখাস্ত হাতে নিয়ে। এ ক'বছর আরামের পর খুবই হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু উপায়ই বা কি। শাস্ত্রবাণী সুখ-দুঃখের চক্রবৎ পরিবর্তনের রূপটা বার বার স্মরণ করা ছাড়া।

আরও একটা সমস্যা আছে। সেটা সুহাসের মাকে নিয়ে। ছোট একটা ছেলে কোলে নিয়ে আঠার বছরে বিধবা হয়েছিল। লোকের বাড়ীতে দাসীগিরি করে ছেলের মুখে অন্ন জুগিয়েছিল। তিল তিল করে বড় করে তুলেছিল। অনেক ধরাধরি করে ছেলেকে একটা মোটর মেরামতের কারখানায় ঢুকিয়েছিল। প্রথমে ঢুকেছিল গাড়ী ধোয়া-মোছার কাজে; তারপর একটু একটু করে হাতুড়ী ঠোকার কাজ শিখেছিল। তারপরই ছেলে লায়েক হয়ে উঠেছিল। মাসান্তে পাওয়া মাইনের টাকাটা আর বাড়ী অবধি পৌঁছত না। বিড়ি-সিগারেটের দোকান আর তাড়ির গ্লাসেই [illegible] যেত। মাকে একটা পয়সা সাহায্য করা চুলোয় যাক, উল্টে রাতের অন্ধকারে হাতিয়ে হাতিয়ে মার লুকিয়ে রাখা দু-পাঁচ টাকাও সরাতে আরম্ভ করল।

ব্যাপার আরো চরমে উঠল, মা বাধা দিতে। হাতের থাটো লাঠি ঘুরিয়ে ছেলে মায়ের ঋণ শোধ করল।

বস্তির মালিক রোজ রোজ এসব ঝামেলা সহ্য করতে রাজী নয়। মা আর ছেলে দুজনকেই পথে বের করে দিল।

ছেলে মোটর মেরামতীর দোকানে ফিরে গেল। মা বস্তায় বস্তায় ঘুরে বেড়াল।

ঠিক এমনই সময় সুহাসের মার সঙ্গে অসিতের দেখা হয়ে গেল। একেবারে বাড়ীর দরজায়।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সুহাসের মা কাঁদছিল, অফিস ফেরত অসিত সামনে এসে দাঁড়াল।

দুঃখের কাহিনী শোনার পরে অসিত আর দেরী করল না। তারও একটা লোকের খুব দরকার ছিল। হাত পুড়িয়ে রান্না আর পোষাচ্ছিল না।

সুহাসের মা থেকে গেল। শুধু হাঁড়ি ঠেলাই নয়, ঘরদোরের চাবিও আঁচলে তুলল। প্রথম প্রথম সুহাস হামলা করতে এসেছিল, কড়া সুরে অসিত তাকে ভাগিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে কোনদিন এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ালে পুলিশের হাতে তুলে দেবে সে ভয়ও দেখিয়েছে।

এই সুহাসের মাকেও জবাব দিতে হবে। এক বছরেই অসিতের সংসারের কত গভীরে সুহাসের মার শিকড় গিয়ে ঢুকেছে তার পরিমাপ অসিত জানে না। সম্ভবত সুহাসের মাও নয়। কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

একটা মানুষের কি করে চলবে তাই সমস্যা, এর ওপর বাড়তি লোকের কথা ভাবতে যাওয়াও হাস্যকর।

দিন দুয়েকের মধ্যে অসিত বাড়ী-ওয়ালাকে বাড়ী ছাড়ার নোটিশ দিল। চাকরি যে নেই একথা বলতে সম্মানে বাধল। বলল, বদলীর চাকরি। কর্তারা কলমের খোঁচায় একেবারে রায়পুরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তবে মাইনেটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছে এই ভরসা।

সুহাসের মাকেও সেই কথাই বলল।

সুহাসের মা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল অসিতের দিকে। এমন একটা নিরুপদ্রব স্থায়ী আশ্রয় যে কোনদিন যেতে পারে, এটা সে কল্পনাও করেনি।

কথাটা বলেই অসিত বেরিয়ে গিয়েছিল। কতকগুলো দরখাস্ত টাইপ করানোর দরকার। কোথায় সস্তায় এ ধরনের কাজ হয় এটা অনিলের নখদর্পণে। কম করে শ'খানেক দরখাস্ত এর আগে টাইপ করিয়েছে।

ফিরল যখন, ঝাঁ ঝাঁ রোদ। সিঁড়িতে পা দিয়েই দেখল সুহাসের মা বারান্দায় রেলিংয়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। উদাস দৃষ্টি আকাশের দিকে। যেখানে আশ্রয় পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, চাউনি সেই দিকেই।

মনে পড়ে গেল অসিতের, চাকরি যাবার খবর পেয়ে এইরকম বিহ্বল দৃষ্টি মেলেই বুঝি চেয়েছিল। ময়দানে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে এইভাবেই বসেছিল।

সুহাসের মার অবস্থাটা বুঝতে কোন অসুবিধা হল না অসিতের। এক সময় সুহাসের মা বাড়ী বাড়ী কাজ করে বেড়াত, ঠিক যেমন অফিসে অফিসে মাথা ঠুকে বেড়াত অসিত। তারপর অসিতের মতনই সুহাসের মা স্থায়ী হল এক জায়গায়। একটা অফিস যেমন অসিতকে জড়াল, একটা সংসার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল সুহাসের মাকে।

বিকেলের দিকে পাওনা নিয়ে সুহাসের মা বাড়ী ছাড়ল। একটি কথাও না বলে। একটি বারের জন্যও চোখ না তুলে।

অসিত ছাড়ল তার দিন তিনেক পরে। খুব সস্তা এক হোটেলে বাসা বাঁধল। উল্টাডাঙ্গার কারখানাবহুল এক গলিতে।

অফিসপাড়ায় বাঁধা টহল, জানা-আধ-জানা লোকের কাছে খোঁজ নেওয়া, মাঝে মাঝে ডাকে চিঠি ছাড়া, পিয়নের প্রত্যাশায় দিনের পর দিন কাটানো। ফুটপাতে বসা দু একজন জ্যোতিষীর কাছেও অসিত

হাত পাতল। অবস্থাটা সাময়িক একটু খারাপ যাচ্ছে, গ্রহ শান্তি করতে পারলে রাজতক্তে বসার সম্ভাবনা। দু-একজন বন্ধুর পরামর্শে হাতে বিপদনাশন মাদুলি বাঁধল। কিন্তু বরাত ফিরল না। সামনের অন্ধকার একটু কমল না।

ওরই মধ্যে দু-একজন উপদেশও দিলেন। দেশ তথা দেশের ছেলেরা ক্রমে ক্রমে অধঃপাতের অতল জলে তলিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা। ব্যবসা, ব্যবসা, এ ছাড়া এ জাতের বাঁচবার কোন পথ নেই। অসিতের মতন জোয়ান, বুদ্ধিমান ছেলেরাও চাকরির জোয়াল কাঁধে নিতে উৎসুক, এ কথা ভাবতেও তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে আসছে।

মাথা হেঁট করেই অসিত পকেটের খুচরোগুলো নাড়াচাড়া করল। এ ছাড়াও অবশ্য সম্বল আছে। সুটকেসের মধ্যে কয়েকটা টাকা আর হাতের আংটি আর ঘড়ি।

এই সামান্য অর্থে বাঙালী জাতের অসম্মান ঘোচাতে পারবে এমন ভরসা আর যার থাক, অন্ততঃ অসিতের নেই।

পুরনো অফিসেও বার কয়েক খোঁজ করেছিল। পুরনো আসনে যদি বসতে পারে। কিন্তু সুবিধা হয়নি। মুক্তারাম বাগেরিয়া দেশে গেছেন, নতুন এক ধর্মশালা তৈরী করছেন, তারই তদারকে।

এক দুপুরে অফিসে টহল দেবার ফাঁকে এক জনবিরল পার্কে অসিত বিশ্রাম করছিল। সঞ্চয় যা আছে, বড় জোর আর তিন কুড়ি। এর মধ্যে কিছু একটা না হলে দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। মেসের মালিক ইতিমধ্যেই বাঁকা বাঁকা কথা শুরু করেছেন। যে কোন প্রভাতে মিল বন্ধ করে দিলেই হ'ল। জামা-কাপড়ের অবস্থা সাধারণ উপভোগ্য নয়। দু'হাতে নিজের মাথার চুলগুলো অসিত বসে বসে টানছিল, এমন সময়ে সামনে যেন ভূত দেখল।

একই গাছের তলায় এসে দাঁড়াল সুহাসের মা। আরো কালো হ'য়ে গেছে গায়ের বর্ণ, দেহ আরো শীর্ণ। অসিতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই খসে পড়া ঘোমটা মাথার ওপরে তুলে দিল, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এল অসিতের দিকে।

সুহাসের মা!

সুহাসের মা কোন উত্তর দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অসিতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল।

বাবুরও তাহলে একই অবস্থা? আমি ভাবলাম বাবু রায়পুরে মোটা মাইনের চাকরি করছেন।

লজ্জায় সঙ্কোচে অসিত মাথা তুলতে পারল না। প্রথমে ভেবেছিল বলবে রায়পুর থেকে কলকাতায় এসেছে ছুটি নিয়ে, দেশে যাবে। কিন্তু বুঝতে পারল, তার পোশাক, মুখ-চোখের চেহারা বাদ সাধবে। দর্পণের মতন তুলে ধরবে প্রকৃত অবস্থা।

তাই আস্তে আস্তে কেবল বলল, তোমারও বুঝি এক অবস্থা সুহাসের মা? কোথাও কিছু জোটাতে পারনি?

সুহাসের মা ঘাড় নাড়ল, না বাবু, লোকের অবস্থাও পড়ে গিয়েছে। চট করে কেউ আর বাড়তি লোক রাখতে চায় না। এক জায়গায় কাজ পেয়েছিলাম, কিন্তু সে রাবণের পুরী, কম মাইনে আর খাটুনী বেশী। আপনার বাড়ী কাজ করে বেশ আয়েসী হয়ে পড়েছি। আপনি এখন আছেন কোথায়?

মেসে? ঘাসের ডগা চিবোতে চিবোতে অসিত উত্তর দিল।

তা অবশ্য চেহারাতেই মালুম হচ্ছে। আঁচল দিয়ে সুহাসের মা কপালের ঘাম মুছে নিল তারপর বলল, আমি আর লোকের বাড়ীতে চেষ্টা করছি না বাবু। বস্তির কয়েকটা মেয়ে কারখানায় কাজ করে। ওষুধের বোতল ধোয়া, লেবেল লাগানো, ছিপি আঁটা, এই সব কাজ। খাটুনি এমন কিছু নয়, মাইনে ভাল। সেখানেই আজ যাব। আপনি অফিসে অফিসে না ঘুরে, কলকারখানাগুলোয় ঘুরুন না। সেখানে তবু খালি পেতে পারেন। জোয়ান ছেলে, খাটতে কিসের ভয়?

সুহাসের মা রোদের দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে পড়ল পার্ক থেকে। বোধ হয় সময় হয়েছে। মনে জোর আছে সুহাসের মার, বুকে সাহস। যে কোন কাজ করতে পেছপা নয়। ঠিক একটা জুটে যাবে। দরকার হলে কারখানায় ঝাঁট দেবার কাজও করবে। কথায়বার্তায় তাই মনে হ'ল।

খুব ভাল হ'ল যে আচমকা সুহাসের মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নির্জীব, ক্লান্ত একটা প্রাণে নতুন করে আশার ক্ষীণ দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। সত্যিই তো জোয়ান মানুষ, যে কোন চাকরিতে ঢুকে পড়া ভাল। দরকার হলে মেশিন ঘোরাবে, আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘাম ঝরাবে, কয়লার খাদে নেমে যাবে।

অসিত উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে টাইপ করা দরখাস্তগুলো বের করল। এ গুলোর আর দরকার হবে না। কিন্তু নতুন দরখাস্ত লিখতে হবে, কিংবা হয়তো এ চাকরির জন্য দরখাস্তই দরকার হবে না। সোজা মিলের মধ্যে গিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়াবে। কাজ চাই তার। যে কোন ধরনের কাজ।

দরখাস্তগুলোর সঙ্গে আরো একটা শক্ত কাগজ উঠে এল। ভাঁজ করা। সেটা খুলে অসিত পড়তে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ। তলায় ভাইস চ্যান্সেলারের সই। মাঝখানের কয়েক পংক্তিতে লেখা আছে, অসিতকুমার সেনের গ্রাজুয়েট হবার কাহিনী।

সঙ্গে সঙ্গে কনভোকেশনের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। গাউন পরা নিজের চেহারাটা। খোঁজ করলে দেশের বাড়ীতে এই পোশাকের একটা ফটোও পাওয়া যেতে পারে।

সযত্নে সনদটা অসিত ভাঁজ করে আবার বুক পকেটে রেখে দিল। মাথাটা ঝেঁকে নিয়ে এলোমেলো চিন্তাগুলো দূর করে দিল। দেরী হয়ে গেছে। রিমলার কোম্পানীর অফিসে একবার খোঁজ নিতে হবে। সেখানকার বড়বাবু বলেছিলেন একটা ফাইল ক্লার্ক নেওয়া হতে পারে। রিমলার কোম্পানী থেকে পটনায়েক এণ্ড সন্সে। ডেসপ্যাচার ছুটিতে যাবার কথা, দু'মাসের জন্য। সেখানে যদি কিছু হয়।

পার্ক থেকে বেরিয়ে অসিত একবার ভাল করে চারদিক দেখে নিল। না, সুহাসের মাকে দেখা যাচ্ছে না। ধারে কাছে কোথাও নেই।

সনদটা সন্তর্পণে বুকে চেপে ধরে অসিত দ্রুতপায়ে রাস্তাটা পার হ'ল।

অজন্তা-বিহার

সুশীল রায়

আজি হতে কত বর্ষ আগে?

ঐতিহাসিকরা যে রকম হিসাব দিয়েছেন তাতে খুব কম করে দেড় হাজার বছর। অজন্তা-গুহায় পাথরের গায়ে সেই আমলের ভারতীয় শিল্পীরা এঁকে তোলেন নানা রকমের চিত্র। সুদীর্ঘকালের কঠিন শাসনে সেসব চিত্র এখনো সম্পূর্ণ মুছে যায় নি।

সেইজন্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এমন কি ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকেও, উৎসাহী পর্যটকেরা আসেন এই গুহাচিত্র দেখতে।

গুপ্ত আমলে আঁকা হয় এইসব চিত্র। খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে। বর্তমানকালে আমরা আছি বিশ শতকে। মাঝখানে গত হয়েছে সুদীর্ঘ সময়। তবুও আজও সেইসব চিত্রের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে পাথরের গায়ে। কিন্তু আর কত দিন থাকবে, বলা কষ্ট। বোধ হয়, আর বেশি দিন থাকবে না। অনেক চিত্র ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, অনেক চিত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে অজন্তা-গুহাচিত্র দেখার সুযোগ ঘটল।

শীতের সকাল। মহারাষ্ট্রের গ্রাম্য রাস্তা ধরে চলেছে আমাদের বাস্‌। বাস্‌এ যাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ চেহারাচরিত্র সবই যেন আলাদা রকম। নানাদেশের লোক জমায়েত হয়েছে বাস্‌এ। কেউ গুজরাটি, কেউ মরাঠী, কেউ পাঞ্জাবী, কেউ বাঙালী। তাছাড়া বিদেশী পান্থও আছেন কেউ কেউ—ইতালীয় জর্মান ইরানী। বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা চলেছে বাস্‌এর মধ্যে। বিভিন্ন রকমে হাসছে সকলে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে সিগারেট টানছে। সিগারেট টানছে—মহারাষ্ট্রের বাস্‌এ সিগারেট খাওয়া নিষেধ হয়নি এখনো। তাই, বড় বড় হরফে 'নো স্মোকিং' লেখা নেই; তার জায়গায় লেখা আছে অন্য কথা; লেখা আছে—'থুক নকা', অর্থাৎ থুতু ফেলা নিষেধ। বাস্‌ ছাড়াও অনেক জায়গায় ঐ নির্দেশ লেখা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে—হয়তো ভারতের ঐ রাজ্যটির অধিবাসীদের মধ্যে থুতু ফেলার অভ্যাস একটু বেশি।

বিভিন্ন দেশের লোক চলেছি একত্রে। আলাদা আলাদা রকমের আচার আচরণ ভাষা নিয়ে, এবং সম্ভবত আলাদা রকমের আশা নিয়েও। কালো পীচের রাস্তা প্রকান্ড বিষধর সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে—কোথায়, কতদূরে, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। দূরে দেখা যাচ্ছে, দিগন্তকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু ঢিবির মত সার-সার পাহাড়। ঐ পাহাড়ের দেশে যেতে হবে আমাদের। ওরই একটা পাহাড়ের নীচে অজন্তা গ্রাম। ঐ গ্রামের দিকে ছুটে চলেছি আমরা। দু ধারে ক্ষেত ও খামার। মারাঠী বধূরা রঙীন শাড়িতে অঙ্গ আবৃত করে কাজ করছে ক্ষেতে। ক্ষেতের মাঝে মাঝেই কুয়ো। টেনে টেনে জল তুলে ঢেলে যাচ্ছে, নালা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জল, ছড়িয়ে যাচ্ছে চারধারে। সেচের কাজ চলেছে।

সকাল ন টায় জলগাঁও স্টেশন থেকে বাস্‌ নিয়েছি। তখন বুঝি দশটা বেজেছে। বাস্‌ থামল। একটা গ্রাম। রাস্তার দু ধারে দোকানপাট, গাছের নীচে নীচে কাঁদি কাঁদি পাকা কলা নিয়ে বসেছে মারাঠী ললনারা, কেউ বা মোটা মোটা পাকা পেঁপে।

অজন্তায় চলেছি বুঝি অন্য কারণে—হয়তো এঁকে বলা যায় মনের ক্ষিদে মেটানো। কিন্তু এই গ্রাম্য হাটে অমন কলা, অমন পেঁপে দেখে অনেকেরই ক্ষিদের উদ্রেক হল। একা আমরাই নয় অবশ্য—দেশী ও বিদেশী সব যাত্রীদেরই। যাত্রীতেই ভরা ছিল বাস্‌, ঐ সব সওদায় বাস্‌ আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

আমরা প্রস্তুত। কিন্তু বাস্‌ ছাড়ে না। তার কারণ গুরুতর কিছু নয়। আমাদের বাস্‌এর ড্রাইভার চা খেতে গিয়েছেন। খুব ভারিক্কে আর গুরু-গম্ভীর ধরনের মানুষ তিনি—তাঁর পরনের সাজটিও বেশ জমকালো। একটা সাধারণ বাস্‌এর ড্রাইভারের মতনই তিনি না—তাঁর স্কন্ধে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভার চাপানো হয়েছে, এ বিষয়ে তিনি যেন সচেতন। মোটা কালো প্যান্ট ও কোটে আপাদকণ্ঠ আবৃত, মাথায় পাইলট-টুপী, কোটের কাঁধের কাছে কিসের যেন ডেকরেশন। তাঁর এই সাজপোশাক এবং চলাবলার ভঙ্গি দেখে সহজেই বোঝা যায়, তিনি তাঁর কাজের উপর খুব শ্রদ্ধাশীল—এ কাজকে তিনি সামান্য কাজ বলে মনে করছেন না, নিজেকে সাধারণ বলেও জ্ঞান করছেন না। এইজন্যেই সম্ভবত তাঁর চা-পানে শেষ হতে কিছু সময় লাগল।

তিনি যখন একটা মাটির ঘরের মধ্যে থেকে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলেন, আমরা অনেকেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলাম—"এসেছেন, এসেছেন, আমাদের পাইলট এসেছেন।"

অজন্তায় গিয়ে কি দেখব তখনও জানিনে। কিন্তু যাওয়ার পথে এই পাইলটকে দেখে মনে হল, অনেকই দেখা হয়ে গেল, যথাস্থানে গিয়ে কিছু দেখতে না পেলেও বুঝি বিশেষ লোকসান বলে মনে হবে না।

অর্ধ বৃত্তাকারে গুহার সারি।

২৩ নম্বর গুহার পাথরে কারুকাজ।

আরও ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম অজন্তায়। মাঝে আরও দু-একটা গ্রামের হাটে বাস থেমেছিল, কিন্তু তার বিষয়ে আর উল্লেখ করার দরকার নেই।

সেখানে পৌঁছেই ইলোরা যাবার জন্যে ঔরঙ্গাবাদে যাবার বাস্‌এর খবর নিলাম। শুনলাম, আড়াইটায় বাস ছাড়বে। সেই বাস্‌এর সীটই রিজার্ভ করব কিনা হিসাব করছিলাম। আড়াই-তিন ঘণ্টার মধ্যে অজন্তা দেখা শেষ করা যাবে কি না বুঝতে পারছিলাম না।

ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির প্রবীণ মরাঠী ভদ্রলোকটি খুব চটপট উত্তর দিচ্ছিলেন, সীট রিজার্ভ করে যাবার জন্যেই তিনি পরামর্শ দিচ্ছিলেন। একটু ভেবে বললেন, "কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

তিনি একটু হাসলেন, বললেন, "মুশকিল আছে। বহুত যাত্রী আসে এখানে, চটপট দেখে তারা নেমে আসে। কিন্তু বাঙালী আর গুজরাটিদের সময় লাগে অনেক। তারা খুঁটেখুঁটে দেখেন।"

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি তো বাঙালী।"

সুতরাং সীট রিজার্ভ করা হল না। তাঁকে নমস্কার করে রওনা হলাম।

আমার সঙ্গে আছেন অনেকে— আমার দিদি শচীন্দ্র গুপ্তা, ভাগ্নে সাধন মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী মায়া, আর এক ভাগ্নে কাজল গুপ্ত। সুতরাং দল খুব ছোট না।

দলবল নিয়ে আমরা অজন্তা পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। কাজটা কঠিন বলে মনে হল না, কেননা উপরে উঠবার জন্যে সিঁড়ি বাঁধানো আছে।

উপরে উঠে গেটের মুখে টিকিট কেটে নিলাম। কয়েকটি গুহা খুবই অন্ধকার, সেগুলি দেখার জন্যে আলোর ব্যবস্থাও আছে, আলোর বাবদ আলাদা টিকিট, পার্টি পিছু পাঁচ টাকা। আমরা টিকিট নিয়ে ঢুকলাম।

অজন্তা। এখানে দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম পুরো অজন্তাটা। অর্ধবৃত্তাকারে বেঁকে গিয়েছে পাহাড়, তারই গায়ে গায়ে কতকগুলি খোপ ঐগুলি হচ্ছে এক-একটি গুহা। কারিগরের, ভাস্করের, আর চিত্রশিল্পের সমন্বয় ঘটেছে এখানে। পাহাড় কেটে গুহা রচনা করা হয়েছে, পাথর কুঁদে মূর্তি গঠন করা হয়েছে পাথরের গায়ে রং-তুলি দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে। মোট বুঝি চাব্বশটি গুহা। এর মধ্যে চারটিতে আলো ঢোকে অল্প। সেইজন্যে লম্বা তার লাগানো ইলেকট্রিকের বাতি দিয়ে এই গুহা কয়টির কারুশিল্প দেখানোর ব্যবস্থা আছে। এখন ইলেকট্রিক হয়েছে, আগে দেখানো হত নাকি মশাল জেলে। চিত্রগুলির ক্ষতি হয়েছে সম্ভবত মশালের আগুনে আর ধোঁয়ায়ও।

গুহা ১, ২, ১৬, ১৭, ১৯ ও ২৩ এই ছয়টি গুহায় এখনো গুপ্ত-আমলের সেই স্বর্ণযুগের স্মৃতি তবু কিছুটা স্পষ্টরূপে চিহ্নিত আছে। দেখতে-দেখতে মনে হল—বড় দেরিতে আসা হয়েছে এখানে। যাকে মহাকাল বলে, ইতিমধ্যে সেই নিষ্ঠুর মহাপুরুষ অনেক চিহ্ন প্রায়-উহ্য করে দিয়েছেন।

কিন্তু কেবল সেই মহাপুরুষের উপরেই বুঝি সব দোষ দেওয়া যায় না। যে শক-হূনদল পাঠান-মোগল ভারতবর্ষে একদেহে লীন হয়েছেন তাঁদের কারও কারও নিষ্ঠুরতাও এইসব শিল্পকলার ক্ষতির জন্যে দায়ী—ঐতিহাসিকেরা এই রকম বলে থাকেন।

কুষাণ সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার প্রায় এক শতাব্দী পরে মগধের গুপ্ত-বংশের রাজাদের চেষ্টায় আর্যাবর্তে গড়ে উঠল নতুন এক সুসাম্রাজ্য। এই নতুন সাম্রাজ্যের

তৃতীয় রাজা প্রথম-চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ৩৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা হলেন। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য পেলেন, তাঁর রাজত্বকাল ৩৭৫ থেকে ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইনি শকরাজ্য জয় করেন, এইজন্য 'শকারি' নামে খ্যাত হন, এবং শক-রাজধানী উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে ইনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। এই বিক্রমাদিত্য নামটির সঙ্গে অনেক কাহিনী যুক্ত আছে, এঁরই নবরত্ন-সভার একটি রত্ন হচ্ছেন কবি কালিদাস।—এই সময়টাই ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ। শিল্পে, চারুকলায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এই যুগটি বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। এই সময়েই অজন্তা-গুহায় সেকালের শিল্পীরা এঁকেছেন জীবজন্তুর চিত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য, বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের চিত্র। সেই সময়েই ভাস্করেরা গঠন করেছেন বিভিন্ন চৈত্য এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। এই সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়—সংস্কৃত সাহিত্যেরও স্বর্ণযুগ এই সময়ে। মহাকবি কালিদাস রচনা করেছেন তাঁর অমর কাব্যাবলী। এছাড়া এই সময়ের অন্যান্য সাহিত্যসাধকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—হরিষেণ বীরসেন ভারবি শূদ্রক। পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা বিষ্ণুশর্মাও এই সময়ের। ইতিপূর্বে রামায়ণ ও মহাভারত প্রচারিত হত কবি ও কথকের মুখে মুখে, এই গুপ্ত-যুগে তা গ্রন্থাকারে স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে। এবং এই সময়েই বিজ্ঞানেরও উন্নতি ঘটে, গণিতে দশমিক ভগ্নাংশের আবিষ্কারও ঘটে এই যুগে।

সেই সুদূরের স্বর্ণযুগের স্মৃতির সম্মুখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভারতভাগ্য-বিধাতার কথা মনে হতে লাগল।

যাই হোক, দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত বা শকারি বিক্রমাদিত্যের পর রাজ্য পেলেন প্রথম-কুমারগুপ্ত, তার পরে স্কন্দগুপ্ত। কিন্তু তখন রাজ্যে সংকট উপস্থিত হয়েছে। স্কন্দগুপ্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট। রাজ্য আর টিকল না, হূন-আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

গুপ্ত-আমলের এই শিল্পকলার গায়ে যেসব নিষ্ঠুরতার চিহ্ন দেখা যায়, তাতে হূনেদের হাতে কতটা তার বিস্তৃত হিসাব অবশ্য স্পষ্টভাবে কেউ দেন নি। কিন্তু একটি সাম্রাজ্যের উচ্ছেদে যাদের হাত আছে, সেই সাম্রাজ্যের কীর্তিচিহ্ন বিলোপচেষ্টায় তাদের হাত না থাকার সম্ভাবনা অল্প।

সে যাই হোক, সব গিয়েও এখনো যা আছে তাই আপাতত আমাদের কাছে অনেক। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম দৃশ্যাবলী।

১৭ নম্বর গুহার ছাদে চিত্রসজ্জা।

১ নম্বর গুহায় চিত্র ও স্থাপত্যের যুগল মিলন ঘটেছে। তার একটি চিত্রের কথারূপ আছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়—

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তিপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
ক্ষুধিতের অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বল কে বা।

বিশাল দেয়ালে সুবৃহৎ চিত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছে বুদ্ধের সেই অনুরোধ-সভা। এবং আর একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র—পদ্মফুল-হস্তে বোধিসত্ত্ব-প্রিয়'। এবং এই গুহাতেই পাথরে উৎকীর্ণ আছে চার শরীরবিশিষ্ট মৃগমূর্তি।

২ নম্বর গুহার সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে এর ছাতের কারুকার্য।

সব গুহারই এক-একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এর মধ্যে চিত্রের দিক থেকে ১৭ নম্বর গুহার আকর্ষণ একটু বেশি। ১৯ নম্বর গুহার আকর্ষণ অন্য দিক থেকে—ভাস্কর্যের দিক থেকে এখানে নাগরাজমূর্তি, উপদেশদানরত বুদ্ধ-মূর্তি ও চৈত্যের প্রবেশপথের উভয়

পার্শ্বের প্রস্তরশিল্প দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এইসব গুহাশিল্প দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেকেরই, অনেককাল আগে থেকেই। ১৯১০ সালের কথা— আজ হতে অর্ধশত বৎসর আগে—লেডি হেরিংহ্যাম ভারতবর্ষে এলেন অজন্তার আকর্ষণে। তাঁর ইচ্ছা অজন্তার এইসব বিলুপ্তপ্রায় গুহাচিত্র নকল করিয়ে রাখা। ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শে শিল্পী নন্দলাল বসু গেলেন ঐ কাজে।

তারপর থেকেই অজন্তার চিত্রের সঙ্গে অনেকের পরিচয় ঘটল। অজন্তার চিত্রাবলী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে আরম্ভ হল। সেই সব ছবি আমাদেরও দেখা ছিল। এবার পাথরের গায়ে-আঁকা আসল ছবি দেখার সৌভাগ্য ঘটল।

এক অতি বৃদ্ধা জার্মান মহিলার উৎসাহের অন্ত নেই। তিনি প্রায় ছুটো-ছুটি করছেন ক্যামেরা নিয়ে। ক্লিক ক্লিক করে ছবি তুলছেন। শীতকাল হলেও দুপুরের রোদে পাহাড় তেতেছে, আমাদের ঘাম হচ্ছে, কিন্তু জার্মান মহিলাটি থামছেন না, তিনি একেবারে লাল হয়ে গিয়েছেন।

তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, তিনি মুখ তুলে একটু হাসলেন, এগিয়ে এসে যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে—এখন তিনি তরুণী তখন থেকে তাঁর ইচ্ছে 'অজান্টা' দেখবেন, কিন্তু অনেক বাধা এল—দু-দুবার লড়াই; আর সময় নেই তাঁর, তাই এবার ছুটে এসে-ছেন দেখতে। যা দেখলেন—ও, নিশ্চয়—ফর এভার তিনি মনে রাখবেন। ভাঙা ইংরাজিতে কথা বললেন মহিলাটি। কিন্তু তাঁর 'ফর এভার' কথাটা শুনে বেশ ভালো লাগল। বয়সে তিনি প্রাচীনা, অথচ মনটা রেখেছেন—

তিনি হন হন করে এগিয়ে গেলেন, ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখি—মোটা থামের গায়ে একখণ্ড পাথরের উপর বসে আছে নিটোল একটি মসৃণ মূর্তি। "পাথরের মূর্তি অবশ্য নয়, একটি নারীমূর্তি—এক ফরাসী তরুণী। অপরূপ দেখতে।

তরুণীটি বুঝি দেখতে আসেনি কিছু। তার মুখ দেখে মনে হল সে যেন ক্লান্ত। তার দলের সকলে কাছে-ভিতেই ঘুরছে। অল্প আগেই তারা পেঁছেছে এখানে। আমরা অনেকক্ষণ ঘুরছি, এদের দেখলাম এই প্রথম। দূর থেকে তার সংগীরা ইশারায় তাকে ডাকল, সে মাথা নাড়ল—যাবে না।

এই তো বেশ। সে দেখতে চায় না কিছু। তাতে বুঝি ক্ষতি হল না কারও। কিন্তু পাথরের মূর্তিতে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে যাদের চোখ হয়রান হয়েছে তাদের চোখের সামনে এটা হয়তো একটা রিলিফ।

সকলেই তাকাতে লাগল ফরাসী মূর্তিটির দিকে। নীচে যখন নেমে এলাম তখন বেলা প্রায় পড়-পড়। অনেক দেরি করে ফেলেছি। ইলোরার বাস বুঝি ছেড়ে গেল।

ক্ষিদেয় নাড়ি জ্বলছে। খাদ্যাখাদ্য বাছবিচার চলে না। কলা আর পেঁপেও নিঃশেষ হয়েছে। অগত্যা ঢুকলাম সামনের টিনের শেডে—অজন্তার সরাই-খানায়। অনেক লোকের ভিড়, অনেক রকমের খাদ্য—মাছ মাংস ডিম, রুটি ভাত।

প্রবৃত্তি বিশেষ হল না। কিন্তু তবু খেতে হল। খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে বাসের খোঁজের জন্যে যাব, আমার দিদি বললেন, "কি যে দেখলাম, কে জানে!"

তিনি থুতু ফেলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে বললাম, "থুক নকা। এদেশে ওটা বারণ।"

সকলে হেসে উঠল।

বলুন তো কী?

প্রশ্ন

১। গত বৎসর (১৯৬০ সালে) কত বিদেশী (কমন-ওয়েলথের সভ্য নয়) ভারতে প্রবেশাধিকার লাভ করে-ছিল? এবং প্রধান জাতি হিসাবে এদের প্রত্যেক জাতির সংখ্যা কত?

২। ১৯৫৯-৬০ সালে কতজন লোক ভারতবর্ষে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আয়ের উপর আয়কর (Income Tax) দিয়েছিল? এবং এই হিসাবে কোন প্রদেশের আয়-করদাতা সবচেয়ে বেশী?

৩। এই বৎসর ভারতবর্ষে কোন বিখ্যাত শহীদ-স্মৃতিচিহ্ন উন্মোচন করা হয়েছে? এর নাম কি?

৪। ভারতবর্ষে এখন কতজন আই. এ. এস (I. A. S) কর্মচারী কাজ করে?

৫। বর্তমানে কেন্দ্রীয় গভর্ণ-মেণ্টের এবং সমস্ত প্রাদে-শিক গভর্ণমেণ্টের টাকার ঋণ (বৈদেশিক ঋণ বাদ) কত?

[উত্তর অন্যত্র দ্রষ্টব্য]

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধকুমার সান্যাল

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—সাত—

হেনার প্রতি আমি যে অপ্রসন্ন এবং তার আচরণে বিশেষ ক্ষুব্ধ একথা তার চেয়ে বেশি আর কেউ জানত না। কিন্তু তাকে আমি যতটা নিন্দিত করার চেষ্টা পেয়েছি সে ঠিক ততটা হেয় কিনা, এতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আমি নিজে একটা সংস্কার নিয়ে জন্মেছি, সেটি আমার কাছে মূল্যবান। নতুনকে গ্রহণ করতে মেয়েদের বাধে না, পুরুষ বরং কতকটা যেন প্রতিবাদ তোলে। একই সঙ্গে আমরা পড়াশুনা করেছি, কিন্তু হেনা কোথা থেকে তার এই বৈপ্লবিক প্রকৃতি নিয়ে এল বুঝতে পারিনি। বিয়ের বন্ধন যে শাস্ত্রীয় বন্ধন—এটি মানতে তার বাধে। সে বলে, স্নেহের সম্পর্ক যেখানে সত্য নয়, বিবাহ সেখানে মিথ্যে। এগুলো অবশ্য নতুন কথা নয়। এর মধ্যে কথার চাতুরী আছে, ভাবের ঘরে চুরি আছে, সমাজধর্মের শস্তা প্রতিবাদ আছে এবং এদের চেয়েও বড় একটা বুজরুকি আছে,—যেটাকে বলা যেতে পারে একালের একটা চটুল স্লোগান্। যারা স্লোগান্ মাত্রেরই পিছনে ছোটে, তারা মেষপাল ছাড়া আর কি?

হেনা স্লোগানের পিছনে ছোটেনি, এই রক্ষে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, নৈতিক সমস্যাটা তার কাছে বড় নয়, তার সমস্যাটা হল আপন চিত্তকে আশ্রয় ক'রে। সে বলে, স্বামী আমার আত্মবিকাশের উপকরণমাত্র হোক, আমার বন্ধু হোক,—আমার প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য যেন তার জন্য দায়গ্রস্ত না হয়ে ওঠে।

আমি নিজে সংরক্ষণশীল অভিমত নিয়ে থাকি। অগ্রসরবাদ প্রচার করা আমার রুচিতে বাধে। ভাগ্যের এটা মস্ত বিদ্রূপ যে, আমি হেনার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হতে পারছিনে। কথায় কথায় হেনা আমাকে শোনায়, পাখীসমাজে বশ্যতা স্বীকারের কথা ওঠে না! ওরা স্বচ্ছন্দ বলেই সুন্দর। ভোরের পাখী প্রভাতী বন্দনা গায়, তখন তারিফ করি। কিন্তু পাখীর ধর্ম স্বীকার করিনে কেন? ওরা আপন আপন খাদ্য অর্জন করে, বিশেষ ঋতুতে বাসা বাঁধে, অজানার ডাকে পাখা মেলে উড়ে যায়। ওরা দুই বন্ধু বড় কাছাকাছি, একান্তভাবে ওরা পাশাপাশি,—ওদের মধ্যে বিতর্ক নেই। দুই জীবনের মিলিত উদ্দেশ্য একই।

আমি হেসে বলতুম, শুনতে ভাল!

হেনাও হেসে উঠত,—শুধু শুনতে? রঙীন ছোট পাখী দেখতেও যেমন ভাল, ওদের কথা ভাবতেও যে তেমন ভাল লাগে!

আমি বলতুম, তুমি কি পক্ষীসুলভ স্বাধীনতা চাইছ?

হেনা বলত, মন্দ কি?

এখন বুঝতে পাচ্ছি তোমার ছোটকা গাছের ডালে কেন ঘর বেঁধেছিলেন! ভাগ্যি তুমি ডানা নিয়ে জন্মাওনি!

আমাদের মধ্যে হাসির ঝড় বয়ে যেত।

রায়চৌধুরীদের বাগানবাড়ি হস্তান্তরের কথাটা যখন চলছে সেই সময় আমার উপরে সরকারি নোটিশ এল—পত্রপাঠ আমাকে দিল্লী যেতে হবে। তথাস্তু। সেই দিনই অপরাহ্ণে দিন পনেরোর জন্য আমাকে কলকাতা ছাড়তে হল। দিল্লীতে বসেই সংবাদপত্রে দেখলুম হেনার মামলা উঠেছে আদালতে। এ মামলার পরিণাম কি হতে পারে অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এই কথা চিরকাল শুনে এসেছি, যুদ্ধে এবং মামলায় যেখানে সত্যোদ্ধারের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, সত্যের আদর্শ সর্বাপেক্ষা সেখানেই মার খায়। তা হবে, এও আমি জানিনে। শুধু এইটুকু জানি, নবেন্দু এই মামলায় জয়ী হবার জন্য যত টাকা লাগে, ঢালতে কসুর করবে না। কিন্তু জয়ী যদি সে হয়, পাবে কি কিছু? হেনা কি ফিরবে তার ঘরে স্ত্রী হয়ে? কেমন হবে সেই সম্পর্ক? দুজনের মাঝখান থেকে যে-বস্তু চিরদিনের জন্য হারাবে তার অভাব পূরণ হবে কী দিয়ে? নবেন্দু এ কি করল?

স্বামী-স্ত্রীর কলহ লোকসমক্ষে প্রকাশ পাওয়ার মতো নোংরা আর কিছু নেই একথা বিবাহ না করেও বুঝতে পারা যায়। কিন্তু জনসাধারণের সামনে এক ব্যক্তি যদি প্রমাণ করবার চেষ্টা পায় যে, অমুক মেয়ে আমার রেজেস্টারী-করা স্ত্রী, এবং মেয়েটি যদি এই কথাটি বলতে থাকে, বিশেষ মনোবিকারের কালে একটিমাত্র দিনের জন্য তাকে স্বামী ব'লে স্বীকার করেছিলুম,—তবে তার চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছু নেই। ওরা দুজন এক জায়গায় ব'সে বিষপান করলে আমি সর্বাপেক্ষা সুখী হতুম।

আমার ফিরবার তারিখ জানিয়ে রাঙামাকে চিঠি দিয়েছিলুম। কিন্তু তার উত্তরে হঠাৎ একদিন হেনার এক টেলিগ্রাম পেলুম: অমুক দিন অমুক সময়ে আমি পাটনার বিমানঘাঁটিতে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

চিঠি এবং টেলিগ্রাম এক বস্তু নয়, সুতরাং হেনার প্রয়োজনটি অবশ্যই জরুরী। কিন্তু দিনক্ষণ মিলিয়ে একটা হিসাব পাওয়া গেল এই, বিমান অপেক্ষা ট্রেনে গেলে আমি যথাসময়ে পৌঁছই। সুতরাং আমিও তৎক্ষণাৎ একটি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানালুম: পাটনার বিমানঘাঁটি নয়, পাটনা জংশন স্টেশনে ঠিক সময় উপস্থিত থাকব!

আমার সম্বন্ধে হেনা যেখানে সেখানে বলে বেড়াত, আমি চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্ত। [illegible]

সময় গিরিডির নিরিবিলি পাহাড়-তলীতে উশ্রীর তটে যখন রান্নার আয়োজন করতে গিয়ে কাঠের ধোঁয়ায় নবেন্দুর চোখ রাঙ্গা হত এবং হেনা যখন আহার্য পরিবেশন করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেত—আমি তখন স্বার্থপরের মতো ঘুরতুম ঝোপঝাড়ের আশেপাশে গুন-গুনিয়ে। হেনা আমাকে বলত, কাজ না করতে পার, চুপ ক'রে বসে থাকতেও কি পার না?

আজ হেনার সম্বন্ধে আমি বদনাম রটাতে পারি, সে অতিশয় দ্রুতগতিশীল। সে স্থির নয় কোথাও। তার চিন্তাধারা ও প্রবৃত্তি যেন নিত্য পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চলতে চায়। তার স্বভাবের মধ্যে দেখি যেন চ'লে বেড়াবার সুর। তার নিজের ভিতরেই আরেকজন কেউ যেন তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাইছে। হেনাকে দেখে মাঝে মাঝে একটু যেন উদ্বিগ্ন হতুম। মাত্র বছর চারেক আগে রাস-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় তাজমহলের পিছন দিকে মর্মর পাথরের রোয়াকে ব'সে হেনা যখন একটি ভজন গাইল, মনে হয়েছিল—অনাদ্যন্ত কাল ধরে ক্রন্দসীর মর্মে মর্মে যে-বিরহ বেদনা অবরুদ্ধ রয়েছে সেইটি বুঝি ছাড়া পেয়ে গেছে সম্মুখবর্তিনী যমুনার তটে তটে। সেদিনকার বুকভরা পূর্ণিমার তলায় বসে গম্বুজের ঘোমটার নিচে মমতাজ বিবি কত কান্না যে কেঁদে-ছিল বলতে পারিনে! আমি একটু দূরে গিয়ে বসেছিলুম। কিন্তু গানের শেষে ফিরে এসে দেখি, নবেন্দুর চোখ দুটো জলে চকচক করছে! ভাল গান শুনলে চোখে জল আসে বৈকি, এখানে সেটি প্রধান কথা নয়। কিন্তু হেনার কণ্ঠে সেদিন যে বিবাগী এক ভ্রমরের মুক্তিপিপাসার অপরিসীম বেদনা ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, সেটি স্মরণ ক'রে আজও আমি অন্যমনা হই।

পাটনা জংশন ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমের সামনে হেনা দাঁড়িয়েছিল। সেটি অপরাহ্নকাল। আমাকে দেখে হাসিমুখে হেনা এগিয়ে এল। কিন্তু তার সেই বিশুষ্ক চুলের রাশির মাঝখানে অনবদ্য মুখচন্দ্রমা দেখামাত্রই যেন আমার ইচ্ছা হল, নিজের চোখ দুটোকে লোহশলাকার দ্বারা এখনই উপড়ে ফেলি! হেনার রূপ-লাবণ্য যদি দিন দিন বাড়ে ত বাড়ুক, আমার দৃষ্টিতে যেন পাপের স্পর্শ না ঘটে।

সুটকেস, হ্যাণ্ডব্যাগ এবং একটি ছোট ফলের ঝুড়ি নিয়ে নেমে এসে সোজা গিয়ে ঢুকলাম ওয়েটিং রুমে। হেনা বলল, কষ্ট হয়নি?

বিলক্ষণ—আমি বললুম, পরস্ত্রীর হুকুমে [illegible] লোকে সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ছোটে, এটা ত' দিল্লী-পাটনা। তোমার সঙ্গে কি আছে? জিনিসপত্র কই?

হাসিমুখে হেনা বলল, আমি উঠেছি সেই চেনা হোটেলে। সেখানে তোমার জন্যেও একখানা ঘর নিয়েছি। আমার সুটকেস সেখানে।

কা'র নামে ঘর নিয়েছ?

তোমারই নামে!

তীব্র দৃষ্টিতে হেনার দিকে তাকিয়ে বললুম, তুমি কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েমানুষ! যাও, এক্ষুণি একা গিয়ে বিল চুকিয়ে তোমার সুটকেস নিয়ে চলে এস। মামলা চলছে মনে নেই তোমার? সাক্ষী রাখতে যাও কি জন্যে?

হেনা হাসছিল। এবার গিয়ে সে আমার মাথার উপরকার পাখাখানা খুলে দিয়ে এল। তারপর খানসামাকে ডেকে চা ইত্যাদির ফরমাস করল। ওতেও হল না,—হ্যাণ্ডব্যাগটি খুলে সে ছুরি কাঁটা ও প্লাসটিকের দুখানা প্লেট বার করল। অতঃপর ফলের ছোট টুকরিটি খুলে অতি উৎকৃষ্ট পাঞ্জাবী আম, আঙুর ও আপেল বার ক'রে ছুরি দিয়ে কাটতে বসল। জগৎ সংসার সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র তাড়া আছে অথবা মামলা-মোকদ্দমা সম্বন্ধে এতটুকুও উদ্বেগ তার আছে, এ মনে হল না। হেনাকে বড় বিচিত্র মনে হল।

কই, গেলে না?

গেলেই চলবে!—হেনা জবাব দিল।

আমিও তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠলুম এবং তাকে কিছু বলবার সময় না দিয়ে খপ ক'রে প্লেট দুখানা তুলে নিয়ে অদূরবর্তী জলের ঘর থেকে ধালো দুখানা ধুয়ে আনলুম। তাড়াতাড়ি কাণ্ডগুলো [illegible]

করার চেষ্টা পেলুম। কিন্তু এমন কোনও কাজ সহসা খুঁজে পাওয়া গেল না যাতে আমার অপরিসীম পরিশ্রমটা তাকে দেখাতে পারি! এমন সময় খানসামা টিফিনের ট্রে নিয়ে ভিতরে ঢুকে আমাকে বাঁচাল। তার হাত থেকে তৎক্ষণাৎ সেটি নিয়ে আমি কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলুম।

হেনার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। ধীরেসুস্থে ফলপাকড় কেটে থালায় গুছিয়ে সে টেবিলের ওপর পরিবেষণ করল। তার পাশে ডিম ভাজা ও টোস্ট-মাখন প্রভৃতি রাখল। তারপর চেয়ারখানা টেনে কাছাকাছি বসে বলল, খেতে [illegible] কর, পরে চা ঢেলে দেবো।

কেমন করে জানলে আমার ক্ষিধে পেয়েছে?—প্রশ্ন করলুম।

সহাস্যে হেনা বলল, বাইরে গেলেই তুমি ক্ষিধে নিয়ে ফেরো দেখেছি। সেবার দমদম বিমানঘাঁটির কথা মনে নেই? সেদিন যদি তোমাকে রেস্টুরেন্টে বসিয়ে কফি খাওয়াতে পারতুম, তাহলে সেই ঝড়-বৃষ্টিতে পথে নেমে আমার পা কাটত না! অনেক দুঃখ তুমি দিলে।

সেবারের ঘটনা স্মরণ করে একটু যেন মুষড়েই পড়লুম এবং জবাব দেবার অনর্থক চেষ্টা না করে খেতে বসে গেলুম। আমের একটা অংশ তুলে দিলুম হেনার থালায়। ফল-পাকড় ওরই জন্যে এনেছিলুম।

খেতে খেতে হেনা বলল, ভয় পেলে মানুষ সংযম হারায়। তুমি ত ভীরু নও, পার্থ?

আমি বললুম, হোটেলে যদি কেউ প্রশ্ন করে, আপনারা কে? কী সম্পর্ক আপনাদের? কি জবাব দেবো?

জবাব আমিই দেবো, পার্থ। বলব, মানব আর মানবী!

যদি বলে, কোথা থেকে এসেছেন?

কয়েকটা টসটসে বড় আঙ্গুর মুখের ভিতরে নিংড়ে হেনা বলল, সেটা অবিশ্যি খাতাতেই লেখা থাকবে। তবে যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে বলব, "অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে!"

হেনার এই হালকা কথায় হঠাৎ আমার হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু রাগ করে বললুম: যদি এর আগের লাইনটা ওদের মুখস্থ থাকে? তারপরেও কি মুখ দেখানো যাবে?

মূল কবিতাটি হেনার মুখস্থ ছিল, সুতরাং সে একবার সচ্ছল হাসি হেসে উঠল।

হেনা যে কাজে এখানে এসেছে তার গুরুত্ব কম নয়। নবেন্দু মামলা রুজু করেছে তার বিরুদ্ধে এবং কোর্টে হাজির হবার একটি দিনস্থিরও হয়েছে। কিন্তু আদালতে দাঁড়াবার আগে তিন বছর আগেকার বিশেষ দু'একটি দিনের রেকর্ড তার পক্ষে তদন্ত করে দেখা দরকার বৈ কি। অতএব আমার সাহায্য ছাড়া তার চলবে না। কিন্তু আজ এখন সন্ধ্যা হতে চলল। পাটনা শহরে আজকে আর কোনও কাজ হবার সময়ও নেই। সুতরাং যেমন করেই হোক, আজকের রাতটা কাটানো দরকার। কেমনভাবে কাটানো যাবে, সেইটি ভাবনার বিষয়।

"বিকল্প ব্যবস্থা হেনার হাতে ছিল, সে কাঁচা মেয়ে নয়। মাঝখানে সে কয়েক মিনিটের জন্য কোথায় গিয়ে যেন ঘুরে এল। ফিরে এসে ছোটখাট সামগ্রীগুলি গুছিয়ে যথাস্থানে রেখে বলল, নাও, বেরিয়ে এস।

আমি অবশ্য তার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু স্পষ্ট করে বললুম, আমি তোমার সেই হোটেলে যাব না কিন্তু, মনে রেখ।

হেনা আমার কথাটা একপ্রকার কানেই তুলল না। সে গিয়ে একবারটি স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে কি যেন কথাবার্তা করে একটি লোককে নিয়ে বেরিয়ে এল। লোকটি এদিকে ওদিকে ঘুরে অবশেষে একস্থলে এসে চাবি দিয়ে একটি ঘর খুলে দিল। আমি হাসলুম। এটি রেস্টরুম। স্টুডেন্টস্ ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে বেরিয়ে আমরা এককালে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়তুম। সেইসব সুযোগ সুবিধার ইতিহাস হেনা আজও ভোলেনি। বাইরে বেড়াবার সমস্ত প্রকার শিক্ষা তার নখদর্পণে। হেনার এ ব্যবস্থা আমাকে মেনে নিতেই হল।

ঘরটি বেশ বড়। দুইদিকে দুটি বিছানা। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করেই আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। ঠিক কি করা অথবা কি বলা আমার উচিত, বুঝতে না পেরে একটু হকচকিয়ে গেলুম। হেনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। শুধু বলল, রুম-কিপার বাইরেই রইল। যখন যা দরকার ওকে বলো। কাল ভোরে আমি আসব।

তুমি কি চলে যাচ্ছ সেই হোটেলে?

হ্যাঁ—

আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে হেনা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমি কেমন যেন বোকা বনে গেলুম। আমি ঠিক এমনটি অবশ্য অনুমান করিনি।

প্রথমটা ভাবলুম হেনার আচরণটা বড় রূক্ষ—দুদণ্ড বসে দুটো কাজের

কথা বলে গেলে পারত। এটা তার জানা উচিত, গরজটা তার—আমার নয়। আমাকে দিয়ে যখন সব কাজই করাতে হবে, তখন আমাকে একটু তুষ্ট রাখা উচিত। বৈকি। যাই হোক, আমার তখনকার তিরস্কারের জবাব সে ঠিক এইভাবে দিয়ে যাবে ভাবিনি। একটা অভিমান আমাকে ঘিরে দাঁড়াল।

ঘরখানা একটু বেশী বড় বলেই বোধ হয় ভাল লাগছে না। ঘরের দুদিকে দুটো আলো, মাঝখানে একখানা পাখা। বিছানা-দুটো এত স্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ যে, প্রথম থেকেই আমার খারাপ লাগছিল। শূন্য ঘরখানার মধ্যে বিছানা দুটো যেন দুই বিদ্রূপের মতো কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি বিরক্ত হয়ে উঠলুম।

মাঝে মাঝে ভুলে যাই, যে-মেয়ের সঙ্গে লেন-দেন করছি, সে ঠিক প্রচলিত ধাতুতে গড়া মেয়ে নয়। হয়ত চেনা জগতেই এরা থাকে, হয়ত বা চকিত ইশারায় এরা এদের অস্তিত্বের খোঁজ দিয়ে অদৃশ্য হয়। কিন্তু আমার জানা উচিত ছিল হেনার স্বভাবের সেই দিকটা, যেখানে কাঠিন্য তার জন্মগত। সিদ্ধান্ত যেখানে তার কঠোর সেখানে সে দয়া-স্নেহলেশহীন পুরুষের মতো। আমার দবন্দ্ব ও দুর্বলতা সে জানে, আমার ভীরুতা এবং অপৌরুষ তার কাছে অবিদিত নয়। আমার সর্বপ্রকার নৈতিক বিবেচনার আড়ালে আমার মধ্যে যে একটি মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তি বাস করে, সেটিও তার জানা আছে। সেইজন্য তার এই বিনা নোটিশে চলে যাওয়ার মধ্যে আমি নিজকে এমন অসম্মানিত এবং উপেক্ষিত বোধ করলুম যে, এই ঘরখানার মহা-শূন্যের মধ্যে আমি স্থির থাকতে পারলুম না। বাইরের লোকটিকে দিয়ে আবার একটি কুলিকে ডাকিয়ে তার মাথায় সুটকেশ আর ব্যাগ চাপিয়ে রুম-কিপারকে কিছু বকশিশ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

পাটনা শহর আমাদের কারও অপরিচিত নয়।। এক্জিবিশন রোড ধরে যে সুন্দর পথটি নিরিবিলি ময়দানের ধার দিয়ে আজকাল বিমানঘাটির দিকে ঘুরে গেছে, ওখানকার মাঠের কোন কোনও গাছতলায় নবেন্দুসহ আমরা তিনজন কতদিন কলরব করে গেছি। শহরের নানা পথ আমাদের চেনা। সুতরাং একখানা সাইকেল রিকসা নিয়ে পরিচিত পথ ধরে হোটেলে এসে পৌঁছতে আমাকে বেগ পেতে হল না।

আমার পকেট থেকে কার্ডখানা বার করে দেখালুম এবং তাতেই বুঝতে পারা গেল আমার জন্য একটি ঘর রিসার্ভ করা আছে। বোর্ডে দেখলুম ঠিক পাশের নম্বরের ঘরটি হেনার নামে। হঠাৎ আমার হাসি পেয়ে গেল। আমাদের তিন-জনের জীবনে একটি জন্মগত পরিচয়ের কৌতুক চিরদিন তিনজনকে ভূতের মতো পেয়ে বসে আছে। সেটি হল নবেন্দু রায়, পার্থ চৌধুরী এবং হেনা রায়চৌধুরী। হেনার এই বংশগত পদবীটি যে তার দুটি সহপাঠী বন্ধুকে একই সঙ্গে ধারণ করে রয়েছে, এ নিয়ে তামাশা শুনতে হয়েছে অনেক জায়গায় অনেকবার।

রাত নটা তখনও বাজেনি। আমার সুটকেশ ও ব্যাগ আমার ঘরটিতে রেখে বেরিয়ে এসে দেখি, হেনার ঘরের পর্দা ফেলা। ভিতরে আলো জ্বলছে। সাড়া-শব্দ কিছুমাত্র না পেয়ে এক সময় দরজার পর্দা তুলে দেখি টেবলে বসে হেনা নানা-বিধ কাগজপত্র দেখছে। আমার সাড়া পেয়ে সে ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। বলল, এখানে এলে যে? মন টি'কল না?

না।—বলে ভিতরে ঢুকে একখানা গা-এলানো কেদারায় বসলুম।

হোটেলের চাকর ফরমাস নিতে এসেছিল। আমি তাকে এই ঘরেই দু-জনের খাবার দিতে বলে দিলুম। সে চলে গেল।

হাসিমুখে হেনা বলল, তোমার এমন হঠাৎ সাহস বেড়ে গেল কেন, পার্থ? পৌরুষে ঘা লেগেছে বুঝি? ভয়টা ঘুচল কেন?

আমি হাসলুম না। শুধু বললুম, অন্যায় যে কখনো করেনি সে কেনই বা ভয় পাবে?

হেনা বলল, তুমি যে একই হোটেলে উঠেছ আমার সঙ্গে, এটি যদি সত্যিই সাক্ষী হিসেবে তোমার বিরুদ্ধে যায়? নবেন্দু কত নিচে নামতে পারে জেনেছ কি?

ভয় দেখিয়ো না হেনা—আমি বললুম, মামলা মাত্রেই ভদ্রলোকরা ভয় পায়। কিন্তু আমার লোভ নেই বলেই ভয় নেই। যাক্ এখন ছাড় এসব কথা। ওসব কাগজপত্র কিসের?

এর অনেকগুলো নবেন্দুর চিঠি,—এগুলো মামলার—

কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করে হেনা নিজেই হাসল। পরে বলল, উকীলের চিঠি ক'খানা হাস্যকর। শুধু আমাকে কথায় ফাঁদে ফেলার চেষ্টা। আমি যে জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকতে পারি এটা সে-ব্যক্তি বোঝেনি। বেচারির দোষ নেই। আর এই নাও, নবেন্দুর নোংরা চিঠিগুলো তুমি পড়তে পার।

থাক্ রেখে দাও।—জবাব দিলুম।

হেনা হাসছিল। বলল, এমন বীর পুরুষ তুমি যে, একটা রাত স্টেশনে একা থাকতে পারলে না। চরকিপিসি না থাকলে নিজের বাড়িও তুমি ছেড়ে পালাতে। এবার আমি তোমার বিয়ে দেব, পার্থ। একটি নোলক-মাকড়িপরা মেয়ে তোমাকে ধরে এনে দেব। সে এসে তোমার সাহস যোগাবে।

চোখ পাকিয়ে বললুম, মনে রেখ নিজের পছন্দসই মেয়ে বিয়ে করব! সুরমাকেও বলে রেখেছি।

ঘাড় ফিরিয়ে হেনা বলল, তুমি কি বিয়ে করতে সত্যিই প্রস্তুত? কই, আমাকে বলনি ত?

এত সোজাসুজি জিজ্ঞেস করছ কেন? ঠিক বয়সে কে প্রস্তুত নয়?

হেনা বলল, বেশ, শোনা রইল। অনিমার ছোটবোনের সঙ্গে আমি তোমার সম্বন্ধ করব। মেয়েটি তোমাকে ভালই জানে। সে খুশীই হবে। আমার মতন সে খোঁদ-পেঁচি নয়।

আমি বললুম, কাল প্রথম ট্রেনেই আমি কলকাতা ফিরব!

কেন?

এরপর যদি তোমার সঙ্গে কাজের ছুতোয় ঘুরি, তাহলে আমার নিজেরই মনে হতে থাকবে,—বিয়ের লোভে তোমার মোসায়েব হয়ে ঘুরছি। সে আমি পারব না।

হেনা একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ল। আমিও আমার গাম্ভীর্যের তলায় হাসি চেপে উঠে পড়লুম। এবার স্নান করে প্রস্তুত হয়ে নেব।

এ হোটেলে আমাদের অবস্থানকাল কতটুকু, সেটি আগামী কাল বুঝতে পারব। আজ দশ তারিখ, আগামী যোলই তারিখে হেনাদের মামলার শুনানি। এদের এই মামলায় আমার স্থান ঠিক কোথায়, সেটি নিজেও আমি জানিনে। তবে আমার ডাক পড়লে সাড়া দিতে হবে বৈকি।

চাকরটি পরিপাটি করে বিছানা পেতেছিল। স্নান সেরে কাপড়চোপড় বদলে আমি প্রস্তুত হয়ে এলুম। হেনার ঘরেই দুজনের খাবার দেওয়া হয়েছিল।

উভয়েই আহারে বসে গেলুম। দুটি ছোট ছোট টেবল জুড়ে বেশ রুচিকর আহার্য সামগ্রী সাজান। হেনা বলল, কাল যদি আমাদের এখানে কাজ শেষ হয় তাহলে আর এখানে থাকার দরকার হবে কি?

বললুম, রাঙামামাকে কি বলে এসেছ?

বলেছি তিন-চার দিনের মধ্যেই ফিরব।

মামলার কথাবার্তা ওঁরা কি সব জানেন?

জানেন বৈকি। তবে ছোটকা এসব এড়িয়ে থাকতে চান্।

বললুম, ছোটকা কি বিশ্বাস করেছেন যে, তুমি একদিনের জন্যে বিয়ে করেছিলে?

হেনা বলল, আঃ তুমি আবার ওই নোংরা কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছ! ওটা ভুলতে দাও, পার্থ। বলো যে, একদিনের ফাঁদ, একদিনের কলঙ্ক, একদিনের ঝড়-তুফান! বলো যে, আমার একটি দিনের শোচনীয় অপমৃত্যু! না, ছোটকা বিশ্বাস করেননি।

লুচি ও মাংসের প্রতি আমার মনোযোগ বেশি ছিল। কিন্তু হেনার শেষ কথাটায় আমি মুখ তুললুম। বললুম, এ্যানির মুখে শোনবার পরেও বিশ্বাস করেননি?

হেনা বলল, তোমার চেয়ে কে বেশি জানে, ছোটকার সমস্ত খেয়াল-খুশি-হুজুগ, তাঁর নিজস্ব আইডিয়ার ধরণ, তাঁর অদ্ভুত রকমের কাণ্ড-কারখানা, তাঁর বিচিত্র কাজ আর অকাজ,—এই সব নিয়ে আমি মানুষ? তাঁর মন্ত্রে সব ছিল, শুধু বিয়ের মন্ত্র ছিল না!

বললুম, তিনি একবারও তোমার ভবিষ্যৎ ভাবেননি?

আবার তোমার সেই পুরনো প্রশ্ন। ভবিষ্যৎ বলে ছোটকার মনে কিছু নেই। —হেনা বলল, তিনি সমাজপতি নন্, পার্থ, তিনি জীবন-রসিক। তিনি শিল্পী, কবি, কিন্তু অভিভাবক নন্। তিনি চিরদিন আমাকে আনন্দের, হুজুগের, স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে এসেছেন, কিন্তু একবারও বলেননি যে, আমি মেয়ে, আমার সমাজনৈতিক দায়িত্ব আছে, আমার বিধিনিষেধ আছে, আমার পক্ষে শাসন-শৃঙ্খলা মেনে চলা দরকার। ছোটকা আমার সকলের বড় গুরু, পার্থ।

এবার বললুম, এটা আশ্চর্য, এমন একটা ঘটনা ঘটল, অথচ তিনি একবারও এ নিয়ে প্রশ্নও করেননি?

একবারও না! তিনি আমাকে জানেন, এই তাঁর কাছে সত্য। কিন্তু একদিন আমিই তাঁর কাছে গিয়ে বসলুম। বোধ হয় কথাটা বলতে গিয়ে প্রথমে কেঁদে ফেলেছিলুম, ছোটকা হা হা করে হেসে উঠলেন—

তারপর?

হেনা বলল, গুরুর কাছে সেদিন অসত্য বলিনি, লজ্জায় কুণ্ঠায় কোনও কথা চেপে রাখতেও ইচ্ছে হল না—

হেনার দিকে চেয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। হেনা পুনরায় বলল, সেদিন সন্ধ্যায় ঋষির সেই শান্ত শূন্য দৃষ্টি, প্রসন্ন সুন্দর সেই মূর্তি তোমাকে বোঝাতে পারব না, পার্থ। তিনি শুনলেন আদ্যোপান্ত। তারপর হাসিমুখে বললেন, যেখানে আনন্দ নেই, সেখানে দাসত্ব স্বীকার করবি কেন? দে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়া!—ছোটকা সেদিন আবার আমাকে নতুন মন্ত্র দিলেন। তাই এখন আমি কোন হিছুতেই ভয় পাইনে, পার্থ।

আহারাদি শেষ ক'রে আমরা উঠে পড়লুম। চাকরটি এসে থালা-বাসন ইত্যাদি সব তুলে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে যথাসময়ে বেরিয়ে আমরা দুজনে খুঁজতে খুঁজতে এসে বিবাহ রেজেষ্টারী আফিসে পৌঁছলুম। ছোট একটি আপিস। সেখানে এক বিহারী ভদ্রলোক ব'সে নানা কাগজপত্র ওলটাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের মাথায় টিকি, কপালে একটি বড় লাল চন্দনের ফোঁটা, চোখে চশমা। আমরা ভিতরে এসে দাঁড়াতেই তিনি সসম্মানে বসবার জন্য আহ্বান করলেন। ভদ্রলোকের সদ্যস্নাত পরিচ্ছন্ন চেহারাটি আমাদের খুব ভাল লাগল।

এক সময় সামনের খাতাগুলি সরিয়ে তিনি ডেস্কের ভিতর থেকে ধূসরবর্ণের দুখানা বড় ছাপা ফর্ম বার করলেন। পরে সামিশ্র সহজবোধ্য হিন্দী ভাষায় বললেন, আপনারা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত ক'রে এসেছেন ত? দুজনকেই সই করতে হবে এই অঙ্গীকারপত্রে।

তাঁর কথা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে আমি বললুম, আজ্ঞে, আমরা এসেছিলুম—

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ, এই সময় সব ছেলেমেয়েই কথাটা বলতে একটু লজ্জা পায়। শুনুন, এই ফর্ম দুখানা আপনাদের ফিল্-আপ্ করতে হবে। এসব কাজ আজ সেরে যান্, তারপর আবার আসবেন একমাস পরে। বস্তুত, সেইদিনই আপনাদের আসল বিয়ে। সাক্ষীসাবুদ, অভিভাবক—সবাইকে সেদিন আনতে হবে। সেইদিন কাগজে সীল্ পড়বে।

হেনা এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিল। এবার হাসিমুখে বলল, পাঁড়েজি, আমরা বিয়ে করতে আসিনি। এসেছি অন্য কাজে। আমাদের একটু সাহায্য করুন।

আমরা দুজনে বিবাহ রেজেস্টারী অফিসে পৌঁছলুম।

ভদ্রলোক এবার একটু অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর বললেন, ও, তবে বিয়ে নয় অন্য কথা! কি বলুন?

তিনি ডেস্কের মধ্যে ছাপা ফর্ম দুখানা যখন ঢুকিয়ে রাখছিলেন তখন আমাদের পিছন দিয়ে কোটপ্যান্টপরা এক ভদ্রলোক আপিসে ঢুকে সর্বাপেক্ষা প্রধান চেয়ারখানায় এসে বসলেন। ইনিই রেজিস্ট্রার সাহেব। আমরা নমস্কার করলুম।

আমাদের পক্ষের আর্জিটি হেনাই নিবেদন করল। সে তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে রেজিস্ট্রারের দিকে বাড়িয়ে বলল, তিন বছর আগে এই বিয়েটা বোধ হয় হয়ে থাকবে, এর কোনও রেকর্ড আপনাদের এই আপিসে আছে কিনা!

রেজিস্ট্রার বললেন, নিশ্চয়ই আছে, এটা হেড কোয়ার্টার্স! সব ডিস্ট্রিক্টের রেকর্ডই এখানে থাকবে। মিঃ পান্ডে, এটা একবার দেখুন ত?

পাঁড়েজি কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

মেয়েমানুষের জীবনে দু'একটি অবিস্মরণীয় তারিখ থাকে। সে সব তারিখ তারা কেন মনে রাখে আমি জানিনে। তিন বছর আগেকার সেই তারিখ দেওঘরের এক বর্ষণমুখর রাত্রির সঙ্গে বিজড়িত,—এটি হেনা ভোলেনি। পাঁড়েজি একখানা ধুলোবালিভরা মস্ত খাতা বার করলেন। খাতাখানা উল্টে-পাল্টে তিনি পরীক্ষা করলেন। সন, তারিখ এবং দেওঘর—সবই মিলল। মিলল না কেবল হেনা ও নরেন্দুর বিবাহ! পাঁড়েজি একটুও ভুল করেননি,—তিনি এই কাজেই সেই ইংরেজ আমল থেকে হাত পাকিয়েছেন। প্রমাণ প্রয়োগ সবই তাঁর নখদর্পণে। অবশেষে এক সময় তিনি বললেন, কই না, এই দুই নামের কোনও বিয়ের রেকর্ড আমাদের এখানে নেই। এ বিয়ে হয়নি! আপনারা ইচ্ছে করলে দেওঘরে খোঁজ নিতে পারেন।—এই বলে তিনি কাগজের টুকরোটা হেনার হাতে ফেরত দিলেন।

কথায় কথায় আপিসে লোকজন বেড়ে গিয়েছিল। পাঁড়েজি তাঁর অন্য কাজে মন দিলেন। আমরা তাঁদেরকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলুম। হেনা হাসিমুখে আমার দিকে তাকাল।

মাঝরাত্রে ট্রেন ধরেছিলুম পাটনায়। বাঁশীদিতে এসে পৌঁছলুম ভোর ছটার কিছু পরে। প্রথম শরতের কাঁটা দিয়েছে বাঁশীদির হাওয়ায়। হেনার রাঙা চোখে তখনও তন্দ্রা জড়ান।

হেনাদের বাড়িটি আধ মাইলের কিছু দূরে নিরিবিলি মাঠের মধ্যে। এ বাড়ির সঙ্গে আমাদের আবাল্য ইতিহাস জড়িত। আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াতেই মালি ও মালিবৌ ছুটে এল। জ্যেঠামশায়ের মৃত্যুর পর আমি এলুম এই প্রথম। ওরা ঘরদোর খুলে তখনই সর্বপ্রকার কাজকর্মে লেগে গেল। মালি-বৌ ছুটল রান্নাঘরের দিকে। জমাদার এসে পৌঁছল বাগান পরিষ্কার [illegible] আমিও আমার চিরাভ্যাসের মতো সবকিছুর তদারকে লেগে গেলুম। ওরা আজও জানে, কর্তাবাবুর অবর্তমানে আমিই অভিভাবক। হেনাকে ওরা এখনও সাবালক বলে গণ্য করে না।

ঘণ্টাখানেক বাদে ঘুরে এসে দেখি, হেনা তার বিছানায় অকাতরে ঘুমিয়ে। নলিহারি নিদ্রা! গতকাল পাটনায় দুপুর থেকে সে ঘুমোচ্ছে। ট্রেনে উঠে অঘোর অচৈতন্য। তারপরে আবার এখানে।

মালিবৌ এবার আর শুনল না। সে সোজা এসে হেনার মাথার ধারে বসে কপালে হাত বুলিয়ে আদর জানাল। হেনা এবার জাগল। হাসিমুখে উঠে যাবার সময় বলল, আমাদের চা দিয়ে যাও, মালিবৌ।

এখানে স্নানাদি ও প্রাতঃরাশ সেরে আমরা যখন গিয়ে দেওঘরে পৌঁছলুম বেলা তখন প্রায় এগারোটা। কাছারি-পাড়াটা আমাদের অজানা নয়। সেখানে গিয়ে এক জায়গায় গাড়ি রেখে বিবাহ রেজেস্টারী আপিসের ছোট্ট ঘরটিতে যখন ঢুকলুম, তখন আমার গা ছমছম করছিল অজানা আশঙ্কায়। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে হেনার অখণ্ড আত্মপ্রত্যয় দেখে আমি চমৎকৃত হচ্ছিলুম। আপিসে একটি তরুণ যুবক বসে কাজ করছিল। হেনা তার হাতে কাগজের টুকরোটি দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি জানতে চাইল। কিন্তু এখানকার রেকর্ডও পাটনার মতোই শূন্য। অবশেষে হেনা যখন জিদ ধরে বলল, ঠিক এই তারিখে তিন বছর দু-মাস আগে সে এক ছাপা ফর্মে নিজে ও নরেন্দু সই করেছে, ছোকরাটি তখন পুরনো ফাইলের পর ফাইল হাটকিয়ে অবশেষে এক-খানা রং চটা পাণ্ডুর লম্বাটে কাগজ বার করল। কাগজখানার নীচের দিকে নরেন্দু ও হেনার দস্তখত রয়েছে বটে। এ কাগজের এখন কোন অর্থও নেই।

ছোকরাটি বলল, এখানা বাতিল হয়ে গেছে, এর আর কোনও দাম নেই। বিয়ে করতে গেলে আবার নতুন দরখাস্ত দিতে হবে।

কেন?

এ বিয়ে ত হয়নি! পার্টিরা এক-মাস পরে আর আসেনি, রেজেস্টারীও হয়নি। এসব কাগজ আমরা ছিঁড়ে ফেলে দিই। আপনারাই কি সেই পার্টি?

হঠাৎ আমার গলা শুকিয়ে উঠল। হেনা জবাব দিল, হ্যাঁ। আপনার যদি আপত্তি না থাকে কাগজখানা দিয়ে দিন। আমরা ওখানা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

ছোকরা বলল, প্রত্যাহার করুন বা না করুন, ও কাগজের কোনও দাম নেই।—এই বলে সে কাগজখানা আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল। এখানে ছিঁড়ে ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই।

কাগজটি নিয়ে অসীম কৃতজ্ঞতা সহকারে হেনা ও আমি ছোকরাটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলুম। গাড়িতে উঠে হেনা আমার একখানা হাত নিয়ে তার হাতের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলল, পার্থ, এবার তুমি খুশী হয়েছো কিনা সত্যি বলত?

না, হইনি।

আমার মুক্তিতে তুমি খুশী নও?

শান্ত কণ্ঠে বললুম, যে-মুক্তি তুমি পেলে, সে হল মরুভূমির। দূরে দাঁড়িয়ে এবার থেকে আমাকে দেখতে হবে, সেই অন্তহীন মুক্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে তুমি জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছ!

উল্লাসে ও উদ্দীপনায় হেনা এতক্ষণ অধীর হয়ে উঠেছিল। গাড়ি ছুটছে। এবার সে ধীরে ধীরে আমার হাতখানা আলগা করে দিল। বলল, তুমি চিরকাল সন্দেহবাদী! আমি জানি এই নিয়ে তুমি চিরদিন আমাকে দুঃখ দেবে! আমি সুখের মধ্যে পুড়ে-পুড়ে ছারখার হই, এই কি তুমি চেয়েছিলে? জবাব দাও পার্থ?

হেনার গলাটা শেষের দিকে কেঁপে উঠল।

এবার আমিই হেনার হাতটি ধরে বললুম, রাগ করো না, সত্যিই আমি তোমার কল্যাণ চেয়েছিলুম হেনা।

বোধ-হয় এই প্রথম আমি তার হাত ধরেছিলুম, সম্ভবত সেই কারণেই হেনার চোখে জল এসেছিল। সে শুধু বলল, আনন্দকে বাদ দিয়ে কল্যাণ, মুক্তিকে বাদ দিয়ে ভালবাসা—সে আমার জন্যে নয়, পার্থ! এবার আমার পথ আমি চিনেছি।

আমার পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব ছিল না। দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ি এসে হেনাদের বাগানে ঢুকল।

(ক্রমশ)

নতুন আফ্রিকার পুরনো মানুষ

প্রিয়ব্রত সেন
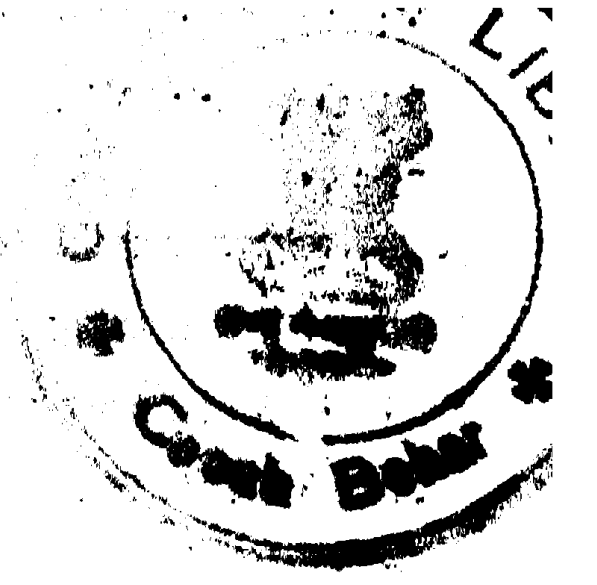
রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন, ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা ! কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন এই মহাদেশ আজ আর একেবারেই অন্ধকারে নেই। প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজ খুললে আফ্রিকার কোনো না কোনো দেশের খবর চোখে পড়ে। তার সংগ্রাম আর স্বাধীনতা লাভের কথা আজ সকল মানুষের মুখে মুখে।

'কৃষ্ণ মহাদেশের' কৃষ্ণবর্ণের মানুষগুলির বিষয়ে অনেক কিছুই তবু আমরা জানিনে। আমরা যাকে সভ্যতা বলি, সে বস্তু আফ্রিকাতে নতুন এসেছে। এই সভ্যতা এসেছে অত্যাচার ও অশ্রুপাতের ভিতর দিয়ে। তাই আফ্রিকাবাসীরা একে সানন্দচিত্তে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু বাধাটা শুধু সেইখানেই নয়। বিদেশী প্রভুদের চাপানো জিনিস বলেই আফ্রিকাবাসীরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে সন্দেহের চোখে দেখছে, তা নয়। বাধা রয়েছে তাদের আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস আর সমাজব্যবস্থার মধ্যেও। এই ভিতরের বাধাটা ঠিক কী ধরণের তারই আভাস দেওয়া হল এখানে।

উত্তরে সাহারা মরুভূমি থেকে দক্ষিণে জাম্বেসী নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় ১০০০ উপজাতি বাস করে আফ্রিকাতে। ইউরোপীয়রা আসার পর আফ্রিকার নানা অঞ্চল বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ করে নেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু এই রাজ্য-বিভাগের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ইউরোপীয় অর্থে 'জাতি' বা নেশান গড়ে ওঠেনি। আফ্রিকার উপজাতিদের জাতিগোষ্ঠীগুলি যেভাবে ছড়ানো তাতেই নিরিখে তাদের এক ধরণের মমত্ববোধ আছে। কিন্তু একটা বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় ইউরোপীয়গণ যেভাবে এক-একটা দেশ বা কালিষ্ট ভাগ করে নিয়েছে, সেই এলাকার সকল জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। আফ্রিকার বহু রাজ্যই তাই এখনো 'নেশান' নয়, বিভিন্ন 'ন্যাশনালিটি' বা জাতিসত্তার ভৌগোলিক সহাবস্থান।

বলা বাহুল্য এর জন্যে আফ্রিকাবাসীরা নিজেরা দায়ী নয়। আধুনিক শাসনযন্ত্র স্থাপিত হলেও আফ্রিকায় আধুনিক ধরণের শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ছিল খুবই সংকুচিত। আর শিক্ষাই যে বর্তমান সভ্যতার গোড়ার কথা এতো জানা কথা। সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে আফ্রিকাবাসীরা কত অশ্রু, রক্তপাত ও সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়ে নিজেদের গড়ে তুলছে তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়।

আমরা যদি আফ্রিকাবাসীদের মন নিয়ে আফ্রিকাকে বিচার করি তাহলে কী দেখতে পাই ? ইউরোপীয়গণ আসার আগেও আফ্রিকাতে ১০০০ উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সমাজব্যবস্থা ছিল। সেই সব সমাজের অজস্র অসম্পূর্ণতা ও অপটুতা সত্ত্বেও এক রকম নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা ছিল, যা ইউরোপীয়দের আসার ফলে ভেঙে পড়ছে। তাই, ইউরোপীয় সভ্যতা তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে মস্ত বড় একটা বিরুদ্ধ শক্তির মতো। বলাই বাহুল্য আফ্রিকাবাসীরা কখনোই এ সভ্যতাকে পুরোপুরি মেনে নেবে না। আফ্রিকার আদিম সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করেই তবে একে গ্রহণ করতে হবে। যতোদিন ত না হচ্ছে ততোদিন ঐ মহাদেশে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে।

ইউরোপীয় সভ্যতার গোড়ার কথা হল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। জাতিচেতনার দিক থেকে একটা দেশের সকল মানুষের ঐক্য আছে, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তারা স্বতন্ত্র। আফ্রিকায় তার বিপরীত অবস্থা। জাতি-চেতনা সেখানে স্পষ্ট হ'য়ে না উঠলেও গোষ্ঠীচেতনা সেখানে বড়ই প্রবল। কোনো আফ্রিকাবাসীই একক নয়। সে প্রথমত পরিবারের মানুষ, তারপর সে হল জাতিগোষ্ঠীর একজন। এই জাতিগোষ্ঠী অনেকটা আমাদের সগোত্রের মতো। তারপর হল সে তার 'উপজাতির' সদস্য। এদিক থেকে 'উপজাতিও' একটা বড় রকমের পরিবার ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক উপজাতি আবার তাদের আদি-পুরুষ বলে মানে একজন মাত্র ব্যক্তিকেই। উত্তর নাইজিরিয়ার ৪০ লক্ষ হাউসা উপজাতি যেমন বাইবেলে বর্ণিত নিমরড্-এর জনৈক পুত্রের বংশধর বলে দাবী করে নিজেদের।

উপজাতির সমস্ত লোকেরা তাদের সমস্ত কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিবারের সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে ব্যবহার করে। অভাবগ্রস্ত কোনো লোক অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যতোদিন ইচ্ছা বাস করতে পারে। যেমন মাসাই উপজাতির অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো গ্রামে গিয়ে যদি কোনো কুঁড়েঘরকে অব্যবহৃত অবস্থায় দেখতে পায়, সে তার ব্যবহারে

সেই কুঁড়ের সামনে পুঁতে দিলেই ঘরখানির ভোগদখলের অধিকার এসে যায়। যতোদিন ইচ্ছা সে তখন সেখানে বসবাস করতে পারে।

উপজাতিদের বেশীর ভাগই কাজ-কর্মই সম্পন্ন হয় যৌথভাবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, কেনিয়ার ওয়াকাম্বা উপজাতির লোকেরা তাদের শস্য রোপণের কাজ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সম্পন্ন করে। ধরা যাক, কোনো গোষ্ঠীভুক্ত এক-জন লোকের কাছে একখানি লাঙল আছে। সে ঐ লাঙলখানা নিয়ে গিয়ে উপজাতিদের যৌথ গুদামঘরে জমা দেবে। এর জন্যে সে শস্যের ফলনের বাড়তি কোনো অংশ পাবে না। কিংবা ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির অসুখ করল, অথবা সে চাষবাসের ব্যাপারে ছন্নছাড়া, উদাসীন। তখন অন্য সকলে এসে তার জমিতে চাষ দিয়ে ফসল ফলাবে। গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকলের মঙ্গলই ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকের চিন্তার বিষয়। কেউ যদি তা না করে, গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্যেই অন্য সকলে এসে তাতে হাত লাগাবে। এজন্যে সেই অক্ষম বা অকর্মণ্য লোকটিকে শাস্তি দেওয়ার কথা তাদের মাথায় আসে না। তবে কেউ যদি স্বভাবদুর্জন হয়, কিংবা অত্যন্তই অলস এবং পরগাছা-স্বভাবের মানুষ হয় তাকেও কি শাস্তি পেতে হয় না? হয় বই কি। এমন লোকের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক শাস্তি হল, 'একঘরে' ক'রে রাখা, বা 'পতিত' করে দেওয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যারা সমাজের অজস্র বন্ধন ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে জীবন কাটায় তারা জাতিচ্যুত হলে যে কী নিদারুণ অবস্থার মধ্যে পড়ে, পঁচিশ বা একশ বছর আগেকার ভারতীয় সমাজব্যবস্থার কথা মনে রাখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সমাজের শাসন ছাড়াও উপজাতিদের উপর আইনের শাসনও বলবৎ আছে। কোথাও কোথাও নবাবী-আমলের আব-হাওয়া। একজন লোকই সর্বেসর্বা। অজস্র তার পার্শ্বচর, হারেম ভর্তি বেগম। নাইজেরিয়ার 'ফুলানি'দের মধ্যে এই ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু ঐ নাই-জেরিয়াতেই 'য়োরুবা'দের ভিতর আবার অন্য ব্যবস্থা। একজন-কেউ সেখানে দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা নয়, শাসনের কাজ চলে যৌথভাবে কয়েকজন সর্দারের সহায়তায়। আবার ঐ অঞ্চলেরই 'ইবোস' উপ-জাতিদের মধ্যে দেখা যায় গ্রাম-পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা, গ্রামের মাতব্বরদের সালিশী ব্যবস্থাই সেখানে আইনের মর্যাদা পায়।

এছাড়াও আরো অনেক রকম শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে উপজাতিদের মধ্যে। যেমন, কেনিয়ার 'কিকিয়ু'দের মধ্যে চলে বিভিন্ন বয়স অনুসারে বিভক্ত লোকেদের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা। সুদানের 'ডিঙ্কা'দের মধ্যে চলে দ্বৈতশাসন—সর্দার এবং একজন যাদুকর সেখানে ভাগাভাগি করে শাসনের কাজ চালায়। নীয়াসাল্যাণ্ডের 'এনুগোনি'দের মধ্যে সর্দারের পদ বংশানুক্রমিকভাবে চলে, তবে সর্দারের অনেকগুলি স্ত্রীর মধ্যে কোনো বিশেষ স্ত্রীর পুত্রই কেবল এই সৌভাগ্যলাভের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

বিভিন্ন উপজাতির শাসনব্যবস্থা এমনিতে যতোই বিচিত্র মনে হোক, একটা ব্যাপারে কিন্তু তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। কোনো রাজা বা সর্দারই শেষ পর্যন্ত নিরঙ্কুশ নয়, সমাজের প্রচলিত বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যেই তাকে শাসনকর্ম পরি-চালনা করতে হয়। সেদিক থেকে তার স্থান অনেকটা পরিবারের প্রধান ব্যক্তিটির মতো। শাসন এবং ক্ষমতা একসঙ্গে জাগ্রত থাকে তার দৃষ্টিতে, বিরাট উপজাতিরূপ পরিবারের মঙ্গল-বিধানই তার একমাত্র চিন্তার বিষয়।

উপজাতি-সমাজে বয়সের সম্মান খুবই লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই পরিবারের প্রধান হিসাবে সম্মান পায়। যে সব পরিবারের গৌরবজনক অতীত ইতিহাস আছে, তাদের প্রধানদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয় গোষ্ঠীপতি। আবার যে সব গোষ্ঠীর বংশপঞ্জিকাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী কৌলিন্যের ছাপ আছে তাদের ভিতর থেকেই মনোনীত হয় সমস্ত উপ-জাতিটির শাসনকর্তা বা সর্দার।

'মাসাই'দের ব্যবস্থা আবার অন্য রকম। তাদের মধ্যে বয়সানুক্রমিক পদাধিকার ঘটে এইভাবে : কিশোর থেকে শিক্ষার্থী যোদ্ধা, শিক্ষার্থী যোদ্ধা থেকে পুরোদস্তুর যোদ্ধা। তারপর সেই পুরো-দস্তুর যোদ্ধা মনোনীত হয় শিক্ষার্থী মাতব্বর হিসাবে এবং এই সময় সে বিবাহযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। বিয়ের পর সে হয় পুরোদস্তুর মাতব্বর। এই সময় থেকে সে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ক্যামেরুনের একটি উপজাতির মধ্যে ৩৫ বছর বয়স না হলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারে কথা বলারই অধিকার পায় না কেউ। ৩৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে বয়স হলে তাদের কথা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হয়। ৫০ থেকে ৬৫ বছর বয়সের লোকেরা শাসনকার্য ও সামাজিক ক্রিয়াচার নির্বাহ করে। ৬৫ বছর বয়সের পর তারা অবসর গ্রহণ করে, কিন্তু সামাজিক সম্মান তাদের আরো বেড়ে যায়।

এইসব কারণেই পশ্চিমী গণতন্ত্রের মহিমা আফ্রিকার উপজাতিরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত এই ধরণের গণতান্ত্রিক শাসনে ২১ বছর বয়সের একটা বেপরোয়া ছোকরা ৬০ বছর বয়সের একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে একাসনে বসে একই গুরুত্ব পায় তার মতামতে। এতে কী করে সমাজের মঙ্গল হতে পারে তা আফ্রিকার উপজাতিরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়।

এছাড়া অন্যদিকও আছে। আফ্রিকা-বাসী উপজাতিরা এমন কতকগুলি ধ্যানধারণার বিশ্বাসী যার সঙ্গে পশ্চিমী জগতের মিল নেই। বরং এ সবের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার মিল যেন অনেকটা বেশী।

প্রথমত, আফ্রিকাবাসীরা বিশ্বাস করে—একজন পরমনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি অনেকটা আমাদের বেদান্তের ব্রহ্মের মতো—মঙ্গলময়, অথচ নির্বিকার।

দ্বিতীয়ত, তারা বিশ্বাস করে—জীবের পারলৌকিক সত্তা আছে। মৃত্যুর সংগেই জীবাত্মার বিনাশ ঘটে না। কখনো তারা ভৌতিক দেহ ধারণ করে অনিষ্ট ঘটায়, কখনো বা দিব্য-যোনি প্রাপ্ত হয়ে মংগলকর্মে উৎসাহ দেয়। আবার কেউ কেউ জন্মান্তরও গ্রহণ করে।

তৃতীয়ত, তারা বিশ্বাস করে—যাদুবিদ্যা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী। যাদু-বিদ্যার বিশ্বাস আফ্রিকাবাসীদের মনে এতো গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করেছে দেখে বাইরের লোক যতোই অবাক হোক না কেন, উপজাতিদের কাছে এর মধ্যে আজগুবি কিছু আছে বলে মনে হয় না। বাস্তবিক জীবের দেহসত্তা বিনাশ-প্রাপ্ত হলেও যদি আত্মা অবিনাশী থেকে যেতে পারে, তবে যা কিছু চোখে দেখা যায় না তাকেই অবাস্তব বলা যায় কী করে! কাজেই বাস্তব ও কল্পনা তাদের কাছে একই সত্যের দ্বৈত-অস্তিত্ব বলে অনুমিত হয় এবং সেই-জন্যেই তারা মনে করে যন্ত্রের দ্বারা যেমন গাছ কাটা যায় বা মাটিতে চাষ দেওয়া যায়, তেমনি মন্ত্রের দ্বারাও ঝড় ঠেকানো বা বৃষ্টি নামানো সম্ভব।

ভালোমন্দ সব কিছু মিলিয়ে উপ-জাতিরা হাজার হাজার বছর ধরে এই সব ধ্যানধারণার ভিতর দিয়েই বাস করে এসেছে। হিংস্রপ্রাণীসংকুল ঐ আরণ্যক মহাদেশের বিচিত্র প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করে এসেছে যুগের পর যুগ। কাজেই বংশানুক্রমিক এই অভ্যস্ত নিরাপত্তার চেতনা তাদের রক্তের মধ্যে মিশে গেছে, বলা যায়। এ নিরাপত্তার বদলে ইউরোপীয় সভ্যতা তাদের কি দেবে সেটা এখনো তাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। এইজন্যই এতো বিভ্রান্তি, এতো হানা-হানি।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতারও যে অনেক কিছুই দেবার আছে তা আমরা জানি। নিত্য অনাহার, দুরারোগ্য ব্যাধি, উপজাতীয় যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির ফলে মানুষ সেখানে অর্ধমানবিক অস্তিত্বে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। তাদের না আছে শিক্ষা, না আছে পরিচ্ছন্ন সুন্দর জীবনের কোনো আদর্শ। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাস করার ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ, জাতিগত যে নিরাপত্তা উপজাতিরা এতো মূল্যবান বলে মনে করে, তাও সংকীর্ণ। কোনো মানুষই সেখানে তার বাস-স্থানের ২০।২৫ মাইল দূরে পরিচিত নয়, নিরাপদ নয়। উদ্ভিদ বা ইতর প্রাণীর মতো সে নেহাতই স্থাননির্ভর, তার বাইরে গেলেই সে হবে মাটিছাড়া গাছ বা দলছাড়া বন্য প্রাণীর মতো অসহায়।

আফ্রিকাবাসীদের অনেকেই আজ-কাল এ সব কথা বুঝতে পারেন। মানুষের মতো বাঁচতে হলে যে পশ্চিমী সভ্যতার অনেক কিছু সদ্গুণ বিবেচনার সংগে গ্রহণ করতে হবে, এ বিষয়ে তাঁরা সচেতন। তাঁরাই এনেছেন ছায়াচ্ছন্ন ঐ মহাদেশে সূর্যোদয়ের নব-জাগরণ। একদিকে তাঁরা আন্দোলন চালাচ্ছেন বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে বন্ধন মুক্তির জন্যে, অন্যদিকে তাঁদের সংগ্রাম নিজেদের যুগ-যুগব্যাপী সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তাঁরা চান বিভিন্ন রাজ্যে বহুধা-বিচ্ছিন্ন উপজাতিরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই উন্নততর জাতিস্বার্থের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হোক, ইউরোপীয় অর্থে নেশান বা জাতি হয়ে উঠুক।

নতুন আফ্রিকার পুরনো মানুষ কি করে নবজন্ম লাভ করছে, আমাদের যুগে সেইটেই হল ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

নীরেন রায়

—ওরে ওঠ্! সভাপতির ভাষণ শেষ হ'য়ে গেছে। এবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুরু হচ্ছে। উঠে পড়ু!

প্রদর্শনী

কলারসিক

রবীন্দ্র-চিত্রকলার উত্তরসাধক শ্রীচিত্ত সিংহ

বাংলা দেশ বড় বিচিত্র দেশ। এর একদিকে যেমন অবক্ষয় অন্যদিকে তেমনি নতুন সৃষ্টির গোপন পদধ্বনি। কখন যে এখানে নতুন প্রতিভা হঠাৎ এসে সকলকে চমকে দেবে কেউ বলতে পারে না সে-কথা। বারংবার এমনি ঘটনাই ঘটেছে। চারু-কলার ক্ষেত্রেও আমরা এমনি অভাবনীয় ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি এবার। তরুণ সাহিত্যিক শ্রীচিত্ত সিংহ ১, চৌরঙ্গী টেরাসে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে বিস্মিত করেছেন সকলকে।

গত সপ্তাহে কবি দিলীপ রায়ের চিত্র-প্রদর্শনী দেখে আমি যখন লিখ-ছিলাম, রবীন্দ্র-পরবর্তী কালে অন্য কোনো কবি-সাহিত্যিক চিত্র-শিল্পের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আর এগিয়ে এলেন না, তরুণ সাহিত্যিক শ্রীচিত্ত সিংহ আমার সেই আক্ষেপকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তখনি যে প্রদর্শনী করার আয়োজন সংগোপনে সমাধা করেছেন, কে জানতো সে-কথা। আমন্ত্রণ পেয়ে ভেবেছিলাম রবীন্দ্রোত্তর যুগে কবি দিলীপ রায়ের সঙ্গে সাহিত্যিক চিত্ত সিংহের নাম শিল্পীর তালিকায় যুক্ত করেই আমার দায়িত্ব বুঝি শেষ হবে। কিন্তু প্রদর্শনী দেখে আমি শুধু বিস্মিত হইনি, মনে হয়েছে এক অসাধারণ শিল্পী-প্রতিভার বিকাশোন্মুখ সজীব স্পর্শ অনুভব করছি যেন বহুকাল পরে। অশিক্ষিত পটুত্বের এমন চমৎকার চিত্র-নিদর্শন একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় ভিন্ন বাংলা দেশ অন্য কোথাও প্রত্যক্ষ করেছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। রবীন্দ্র-জন্মশত-বার্ষিকীতে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হয়তো

ফুল

যোগ্য উত্তরসাধকের জন্ম হল বাংলা দেশে। সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই কথাগুলি উচ্চারণ করছি আমি বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক তথা জনসাধারণের কাছে।

শ্রীসিংহ নিজেই জানতেন না মাত্র এক বছরে কি কাজ করেছেন তিনি। কবিতা, গল্প ও উপন্যাস রচনার ফাঁকে যে অবকাশ পেয়েছেন নেহাৎ খেয়ালের বশে সেই অবকাশ-অবসাদকে কাটাতে যেয়ে সৃষ্টি হয়েছে চিত্ত সিংহের চিত্র-সম্পদ। কোনো দিন কোনো শিল্প-শিক্ষালয়ে পদার্পণ না করে জীবনে একবারও তুলি কালি হাতে না নিয়ে, এমন কি অন্য কোনো শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনীতে তেমন গতায়াত না করেও শ্রীসিংহ প্যাস্টেল ও জল-রঙের মাধ্যমে কাগজের সাদা জমিকে কি করে রঙে আর রেখায় চিত্রিত করেছেন নানা ভঙ্গীর, নানা আকৃতির ৩২খানি মুখ, ৪টি জীবজন্তু, ৩টি পাখি, ৪খানি নিঃসর্গ দৃশ্য, তিনটি ফুল এবং সাতখানি বিমূর্ত শৈলীর ছবি, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। বাংলা দেশের কয়েকজন প্রবীণ কলারসিক এবং একজন প্রখ্যাত আধুনিক শিল্পী যখন তাঁর এই খেয়াল-খুশির সৃষ্টি দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে অভিনন্দন জানালেন শিল্পীকে, তখন 'দর্শক' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এলেন চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করতে। নানা সূত্র থেকে আমি নেপথ্যের এই সংবাদটুকু সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, শিল্পীর নিজের মুখে তাঁর এই অসাধ্য সাধনের কথা শুনে, সত্যি কথা বলতে কি আমার মন দ্বিধা-হীন চিত্তে তা গ্রহণ করতে পারেনি।

আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লেগেছে রবীন্দ্র-চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর চিত্রকলার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে। এগুলি যে অনুকরণ নয় তা সহজেই বোঝা যায়। তবু আমি শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা দেখেছেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এই সেদিন অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে এবং 'সে' ও 'খাপছাড়া' এবং অনন্য দু-এক-খানা বইতে ছাড়া আর কোথাও তিনি রবীন্দ্র-চিত্রকলা দর্শনের সুযোগ পাননি। অথচ সেই শিল্পী কি করে অমন বিকৃত মুখের আকৃতি ছবিতে তুলে ধরতে পারলেন, আনতে পারলেন পৌরুষ-কাঠিন্য, বর্ণময় রঙের মূর্তি, আকারের সুশৃঙ্খল বিন্যাস, বাস্তব সত্য থেকে তাকে
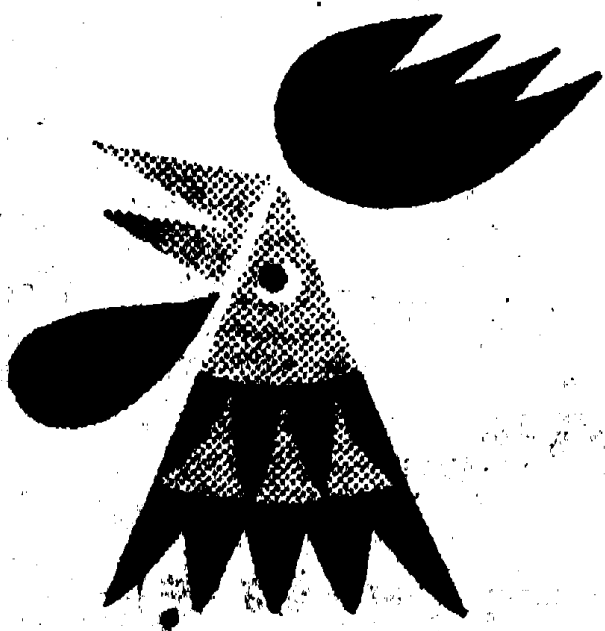
সাত্যের বিমূর্ত্ত দ্যোতনা, তা ভাবতেও অবাক লাগে। ক্ষয়িষ্ণু যুগের যে 'অসুন্দর' মানুষগুলি তাদের বিকৃত মুখাবয়ব নিয়ে আমাদের মানস-জগতে বারংবার হানা দেয়, রবীন্দ্রনাথ যাদের প্রথম ঠাঁই দিলেন তাঁর চিত্রের জগতে, তরুণ শিল্পী চিত্ত সিংহ তাঁর অবকাশ-মুহূর্তে সেই যন্ত্রণা-জর্জর মানুষকে বলিষ্ঠ রেখা আর রঙে তুলে ধরতে হয়তো উৎসাহ বোধ করে থাকবেন। ৯ ও ৫৩ নং ছবি দেখলে আমার এই কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন সকলে। শুধু [illegible]র, প্যাস্টেলে আঁকা ১২নং ছবিতে কালোর আস্তরণে সাদার আভাসে শুধু কপাল, ভ্রূ ও টিকালো নাক এঁকে মুখের যে সাবলীল আকৃতি অঙ্কিত করেছেন শিল্পী, তা যে কোনো পাকা শিল্পীর কাজ বলে বিবেচিত হবে। ২২নং চিত্রখানিতে শুধু চোখের প্রাধান্যে অত্যন্ত দক্ষ হাতে রঙ-প্রয়োগের অপূর্ব কৌশলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মুখের আদল। রবীন্দ্রনাথের হাতে ছাড়া এমন বলিষ্ঠ রূপ আমি ইদানীং কালের কোনো আধুনিক শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনীতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জলরঙে আঁকা একটি নারী মুখও (৫নং চিত্র) আমাকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। গভীর কালো রঙের মুখের রেখার পশ্চাতে হলুদ এবং ঈষৎ নীলের প্রলেপে এমন বর্ণদ্যুতি ফুটে উঠেছে যে দূর থেকে দেখলে ভাস্কর্য দৃঢ়তায় সে-মুখ খোদিত বলে মনে হবে। জলরঙে আঁকা মা ও ছেলের (৩৩নং ছবি) ক্ষুদ্রাকৃতি একখানি ছবিতেও সুন্দর মাত্রাজ্ঞান ও রঙ প্রয়োগের দক্ষতা আবিষ্কার করতে পারবেন যে কোনো দর্শক।

জন্তুর ছবির মধ্যে প্যাস্টেলে আঁকা চারটি শৃগাল (৩৯নং চিত্র) এবং একটি ঘোড়ার ছবি (৯নং চিত্র) খুব ভাল লেগেছে আমার। যে শিল্পী জীবনে কোনোদিন ছবির ব্যাকরণ শিখলেন না তাঁর হাতে এমন গতিময় ছন্দ-সুষমা-মণ্ডিত চারটি শৃগাল মূর্ত্ত হয়ে উঠবে, এ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঘোড়াটি যেন বাঁকুড়ার পোড়া মাটির (টেরা [illegible]) [illegible] বিধৃত হয়েছে। এ ছাড়া একটি মোরগের প্রত্যূষ-সূর্যবন্দনকে শুধুমাত্র লাল আর কালো রঙের মধ্য দিয়ে যেভাবে গতিময়তা দান করেছেন শিল্পী, তাও উল্লেখ্য শিল্প-সৃষ্টি।

একখানি নিঃসর্গ চিত্র সত্যি অপূর্ব। একটি বিরাট বৃক্ষকাণ্ডের উপরে আচ্ছন্ন বিপুল শাখা-প্রশাখা আর পত্রজাল। কাণ্ডের মধ্যস্থান দিয়ে দূরে দৃষ্টিপাত করলে শাখা-প্রশাখা-পত্রজালের বহু পশ্চাতে দিগন্তের কোণ ঘেঁসে রৌদ্রের যে স্বর্ণদ্যুতি, তাই প্যাস্টেলে ধরেছেন শিল্পী চিত্ত সিংহ। কালো আর রৌদ্র রঙের আশ্চর্য বর্ণ-সুষমায় উদ্ভাসিত হয়েছে চিত্রখানি। বৃক্ষটিও তার দৃঢ়তা বলিষ্ঠতা নিয়ে যেন সমুপস্থিত। দক্ষ শিল্পীর চোখ ছাড়া এ দৃশ্য রঙে আর রেখায় তুলে ধরা অসম্ভব। চিত্ত সিংহ সেই দক্ষতারই পরিচয় দিয়েছেন। ৩৬নং চিত্রে ফুলের স্টাডিটিও চমৎকার। বিমূর্ত্ত শৈলীর চিত্রের মধ্যে জ্যামিতিক কোণ এবং বৃত্তজাল সৃষ্টি করে শিল্পী কি বলতে চেয়েছেন আমি তা বুঝতে অক্ষম। তবে রঙ প্রয়োগের পদ্ধতি মন্দ লাগল না।

এই আলোচনা শেষ করার আগে আবার বলছি : সাহিত্যিক চিত্ত সিংহ কতখানি শক্তিশালী তা জানিনে, কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ যে বিমূর্ত্ত চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির জনক, শিল্পী চিত্ত সিংহ নিঃসন্দেহে তার বলিষ্ঠ উত্তরসাধক। তাঁর এই আকস্মিক আবির্ভাব যেন আকস্মিকতাতেই শেষ না হয়। বাংলার রসিকজনকে এই তরুণ শিল্পীর প্রদর্শনী দেখে আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি। সম্ভব হলে প্রদর্শনীটি ১৮ই জুনের পরেও চালু রাখা প্রয়োজন।

কুকুর

মৃদঙ্গবাদিকা ঃ কোনারক মন্দির

সুরসুন্দরী
ভুবনেশ্বর

ফটোঃ রজত মিত্র

খুদে বনাম ধাড়ী

ভ্রাম্যমাণ

ট্যাক্সি ড্রাইভার জিম বাণ্টিন, নাইটস-ব্রীজে সবেমাত্র তৃতীয় খেপের যাত্রীদের নামিয়েছে এমন সময় রেডিও মারফত হুকুম এল, বেলগ্রেভ স্কোয়ারে যেতে হবে। ছোট্ট ফিয়াট গাড়িটা নিয়ে সে বেলগ্রেভ স্কোয়ারে পৌঁছন মাত্রই শত্রুপক্ষ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিজেলের কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, লণ্ডনের কালো বাক্স গড়নের লম্বা ট্যাক্সিগুলো 'ফর হায়ার' ফ্ল্যাগ উঁচিয়ে বাণ্টিনকে ঘিরে ধরেছে। তাদের চালকরা ঘুঁষি তুলে এমন ভাষা প্রয়োগ করতে শুরু করল যা ছাপার অযোগ্য।

স্কোয়ারে এবং তার আশপাশের রাস্তায় শতাধিক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে যায়, যানবাহন দাঁড়িয়ে পড়ে, পুলিশ এসে বহু কষ্টে রাস্তা পরিষ্কার করে বাণ্টিনকে উদ্ধার করে।

লণ্ডনের ৬,৬০০ প্রাগৈতিহাসিক ট্যাক্সির চালকরা বাণ্টিনের এই ছোট্ট ট্যাক্সিটার ওপর এত যে ক্ষেপে গেল তার কারণও আছে। এই সব খুদে গাড়িগুলো (মিনি ক্যাব) ট্যাক্সি লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা করছে, ফলে নিয়ম-কানুনগুলো এদের মানতে হয় না। নিয়ম মানলে, ট্যাক্সি তৈরির খরচ অসম্ভব বেড়ে যেত, ট্যাক্সির চেহারা কুৎসিত হয়ে যেত, তবে আরাম-দায়কও হত। ১৮৬৯ সালের মেট্রো-পোলিটান ক্যারেজ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ট্যাক্সিকে লম্বায় ১৪ ফুট ১১½ ইঞ্চি হতেই হবে। এতে পাঁচজন লোক যথেষ্ট আরামে বসতে পারে, লম্বা টুপি মাথায় দিয়ে ঢুকতে বা বেরোতে গেলে টুপি পড়ে যাবার ভয় নেই, আর ২৫ ফুট ব্যাসার্ধের কমে গাড়িটি ঘুরতে পারে না। আইন আছে, ট্যাক্সি ড্রাইভার হতে গেলে, লণ্ডনের প্রতিটি অলিগলির অবস্থান পর্যন্ত জানতে হবে। এজন্য পরীক্ষায় পাশ করতে হয়।

খুদে গাড়ির মালিকরা যুক্তি দেখাতে শুরু করেছেন এই বলে, রাস্তায় যারা ফ্ল্যাগ তুলে ভাড়া খাটার জন্য ঘুরে বেড়ায়, আইনটা শুধু তাদের জনাই, খুদে গাড়ি ভাড়া করতে হলে প্রধান অফিসে ফোন করতে হয়, সেখান থেকে রেডিও মারফত খুদে গাড়িকে খবর দেওয়া হয়।

কিন্তু এর মধ্যে ফাঁকিও যে নেই তা নয়, রাস্তায় হাত দেখিয়ে অনেক যাত্রীই খুদে গাড়িতে চেপে বসেন। ড্রাইভাররা রেডিও সংবাদের অপেক্ষা না করেই তাদের তুলে নেয়। এর পর অবশ্য নিয়ম রক্ষা করা হয়। অর্থাৎ ড্রাইভার যাত্রীর হাতে ফোনটা তুলে দেয়, যাত্রী প্রধান অফিসে ফোন করে বলে, গাড়ি চাই। অফিস তখন ড্রাইভারকে হুকুম দেয়। ব্যাস, সবই নিয়মমত হয়ে গেল।

দামের দিক থেকে এই খুদে গাড়ি-গুলো আইনমাফিক পুরনো ট্যাক্সির অর্ধেক দামের, ভাড়াও শতকরা ১৪ ভাগ কম।

বেলগ্রেভ স্কোয়ারের যুদ্ধে কিন্তু খুদে ট্যাক্সিওলাদেরই লাভ হয়েছে। ধাড়ী বড়ো গাড়িগুলো একটা খুদে গাড়িকে ঘিরে হামলা করছে, এ দৃশ্যে লণ্ডনবাসীর মন গলে গেছে। অবশ্য কম ভাড়ার কারণও কিছুটা বটে। তারা এখন পুরনো ট্যাক্সি সম্পর্কে নানা নিন্দা শুরু করেছে। কেউ বলছে, চালু পথ যেতে অনেক ঘুরতে হয়, কেউ বলছে একবার চাপলে পকেটে পয়সা থাকে না।

এক বুড়ো ড্রাইভার দুঃখ করে বলেছে, "সবাই ওদের পক্ষে। আমরা দশ হাজার লোক যদি না খেয়ে মরি তবু কেউ ফিরেও তাকাবে না। তবু জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে আমাদের থেকে দক্ষ এবং ভদ্র ট্যাক্সি ড্রাইভার যদি কোথাও থাকে তো নাম করুন? নিউ ইয়র্কের লোকেরা পর্যন্ত আমাদের তারিফ করে।"

কিছুদিন পরেই অবশ্য বেলগ্রেভ স্কোয়ারে আবার এক খুদে ট্যাক্সির ওপর হামলা হয়। খুদে ট্যাক্সির মালিকরা কিন্তু তাতে মোটেই ঘাবড়াননি। একজনের পঁচিশটা খুদে ট্যাক্সি আছে সে আরও পঁচাত্তরটা ফিয়াট কিনছে। উইম্বলেডন শহরতলীতে খুদে ট্যাক্সির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ। আর একজন আটশো রেনল্ট ডাফনের অর্ডার দিয়েছে। এই বছরেই গাড়িগুলো লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়াবে।

দুটো

মতি নন্দী

রাস্তা পার হয়েই সুকুমারের সঙ্গে দেখা। প্রায় ছ'বছর পর। অশোকও অবাক হল। হেসে এগিয়ে গিয়ে বলল "কেমন আছ।"

ওদের দেখা চৌরঙ্গীর বাসস্টপে। সুকুমারের হাতে পোর্টফোলিও। পোশাকে সাহেব। চালচলন ভারিক্কি। মোটা গলায় সে উত্তর দিল "ভাল, করছ কি এখন?"

"মাস্টারি।" বলেই অশোক একটু অস্বস্তি বোধ করল। সুকুমার ঠিক কত মাইনে পাচ্ছে তা সে জানে না। ছ'বছর আগে ছিল সাড়ে তিনশো। এখন নিশ্চয় অনেক হয়েছে।

"কেন, আর কিছু করার মত পেলে না?"

প্রশ্নটা শুকনো হাসিতে এড়িয়ে গিয়ে অশোক বলল, "এখন বাসা কোথায় করেছ? বহুদিন পরে দেখা, না?"

"পাইকপাড়া। একটা ভাল ফ্ল্যাট দেখে দিতে পার?"

"কেন? জায়গাটাতো ভাল।"

"ভাল তো, কিন্তু বর্ষার অসহ্য। দুশো পর্যন্ত দিতে পারি, সাউথে কিংবা তোমাদের ওদিকে যদি পাও তো—"

"একটা পরশু পর্যন্তও ছিল, আলিপুরে। আমার পিসতুতো ভাইয়ের বাড়ি। দুশো পঁচিশে ভাড়া হয়ে গেল।"

"দিন তিন-চার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত।"

সুকুমার হেসে উঠল। দাঁতে সুতো কাটতে কাটতে যেন হাই তুলল।

"ঠিকানাটা রেখে দাও, পেলেই খবর দিও। কুলোয় না আর, ছেলে দুটো যা দুরন্ত হয়েছে। একটু বড় জায়গা না হলে থাকা যাচ্ছে না।"

সুকুমার ব্যাগ খুলে কার্ড এগিয়ে দিল। না দেখেই অশোক পকেটে রাখল। অন্যমনস্কের মত দুজনেই বাসের আনাগোনা, লোকেদের উঠানামার দিকে তাকিয়ে থেকে এক সঙ্গেই পরস্পরকে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। অশোক বলতে যাচ্ছিল, আচ্ছা চলি এখন, একদিন যাব। আর সুকুমার বলতে যাচ্ছিল, সময় করে একদিন এস। না বলতে পারার অপ্রতিভতা এড়াতে সুকুমার বলল, "চল, বহুদিন পরে দেখা, কোথাও বসা যাক।"

সঙ্গে সঙ্গে অশোক রাজী হয়ে গেল।

তারা চৌরঙ্গীর পুব ফুটপাথ ধরে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করল। অশোক লক্ষ্য করল সুকুমার একটু মোটা হয়েছে। ফলে চলনটা যেন পরিশ্রান্ত মানুষের। সে ভাবল, ও নিশ্চয় খুব যত্নে রয়েছে। অতসী ভাল মেয়ে, স্বামীর সম্পর্কে উদাসীন হতেই পারে না। ভাল মেয়ে বললে সব বলা হয় না, রূপে, গুণে, স্বভাবে—। অশোক হাতড়াতে শুরু করল কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সুকুমার একটা বইয়ের দোকানের সামনে থেমে পড়ল। বেছে বেছে একটা

জিনিস। কাঁধে খাতা, মলাটে পুরুষদের উল্কানো দেওয়া ছবি।

"আজকাল এইগুলোই পড়ি, বেশ লাগে।"

পোর্টফোলিওর মধ্যে বইটা ভরে নিল। চলতে চলতে সুকুমার বলল, "কলেজে ঢুকে এই ধরনের বই পড়তাম। তখন বেশ লাগত, মাঝে লাগত না, এখন লাগে। ঐই মাঝামাঝি সময়টাতেই তোমার সঙ্গে, অতসীর সঙ্গে আলাপ। আগেওবা পরে হলে হত না, সিরিয়াস মানুষের তখন সহাই করতে পারতুম না। তুমি কি এখনো আগের মতই সিরিয়াস রয়ে গেছ?"

জবাব দিতে গিয়ে অশোক থ হয়ে গেল। সুকুমার এ কোথায় তাকে নিয়ে ঢুকছে। এযে শুঁড়িখানা! সবাই ওদের দিকে তাকাল। এতটুকু হয়ে সুকুমারকে অনুসরণ করে একটা চেয়ারে বসল। পাশের টেবিলে তিনটি মেয়ে। অশোক প্রাণপণে সিধে তাকিয়ে ভাবল, সুকুমার অধঃপাতে গেছে।

"তুমি কি খাবে?"

"কিছু না।"

"অন্ততঃ দু ঢোক।"

অশোক মাথা নাড়ল। না। সেলাম দিয়ে বেয়ারা হাসল। সুকুমারও হাসল।

"ও জানে আমি কি খাই। প্রায়ই আসি। তবে অন্য কিছু ভেব না, শুধু খেতেই আসি। মেয়েদের সম্পর্কে আমি এখনো সিরিয়াস, ওঃ, তখন তো তুমি কথাটার জবাব দিলে না।"

"কি আর দোষ, আমি আগের মতই রয়ে গেছি। রোজগার তো আর বাড়েনি যে বদলে যাব।"

"প্লিজ, প্লিজ, রাগ কোর না, ওধরনের কিছু বলতে চাইনি। আমিও সিরিয়াস হতে চাই। রোজগার বাড়লেই মানুষ বদলায় এসব তোমার মাথায় কে ঢোকাল, বদলেও তো বদলায়। তার মানে তুমি এক জায়গাতেই রয়ে গেছ?"

অশোক কথা বলল না। বেয়ারা গ্লাস বোতল ইত্যাদি নিয়ে হাজির হয়েছে।

"কিছু একটা খাও অন্তত, বাবুর জন্য ডিমটো দাও।"

বেয়ারা মাথা নাড়ল। অশোক ভাবল জীবনের এক জায়গায় সে নিশ্চয় নেই। জীবনযাত্রার মান বাড়েনি বরং কমেছে। তাহলে তার বদলান উচিত, কিন্তু কই সেটাতো কখনো সে টের পায়নি। কিছু একটার সঙ্গে তুলনা করলে টের পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কার সঙ্গে করবে? সুকুমার তো বদলেছে সুতরাং তুলনা করে বোঝা যাবে না। অতসী, সেও কি বদলেছে? যদি আগের মতই রয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ওর পাশে নিজেকে দাঁড় করিয়ে বোঝা যেতে পারে। বাড়ির কেউ, মা, বোনেরা—এদের লক্ষ্য করে [illegible] পাওয়া যেতে পারে। নাকি ওরাও বদলেছে। কিন্তু আমিতো টের পাই না।

"ভাবছ কি, খাও। মাস্টারি করে চলছে কেমন? বিয়ে-থাতো করনি নিশ্চয়।"

অশোক মাথা নাড়ল, না।

"করবে নিশ্চয়। রোজগারপাতি বাড়াও।"

অশোক গ্লাসের কানায় আঙুল বোলাতে বোলাতে চিন্তিত সুরে বলল, "ভাবছি একটা কোচিং খুলব। খাটলে-খুটলে শ' পাঁচেক টাকা হতে পারে।"

"গ্র্যান্ড, শুরু করে দাও। তারপর বিয়ে করে ফেল। টাকা লাগলে বল, হাজারখানেক পর্যন্ত ধার দিতে পারি। চাকরি বড় বিশ্রি জিনিস, স্বাধীন কিছু একটা রোজগারের ব্যবস্থা থাকা অনেক ভাল। পারি না আর।"

অশোকের কষ্ট হল সুকুমারের জন্য। এ লোকটাও সুখী নয়। ঘরটায় চোখ বোলাল। এ মানুষগুলোও সুখী নয়। ভাগ্যিস গোটা দেশটায় চোখ বোলান যায় না।

"বুঝলে অশোক, আমি বৌকে ভালবাসি। অতসীকে তুমিতো জানই, ভালবাসার মত মেয়ে নয়? বল, তাই নয়?"

মাতাল হচ্ছে বোধ হয়। অশোক অসুবিধা বোধ করতে শুরু করল। তবে পথেঘাটের মাতালদের মত নয়। কথাগুলো যা অস্বাভাবিক। তা নয়তো কি, বৌকে ভালবাসার মধ্যে নতুনত্বের কি আছে!

"ওকে সুখে রাখার জন্য কি না করেছি, মুখের রক্ত তুলে খেটে চলেছি। অথচ জান, ও কিন্তু আমায় ভালবাসে না।"

সুকুমার একচুমুকে গেলাস শেষ করল।

"আর নয়, আমার কাজ আছে।" হঠাৎ যেন সুকুমার বদলে গেল। মাতাল বোঝার মত একফোঁটা চিহ্নও কোথাও নেই। অশোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! প্রতিদিন বাড়িতে ঢোকার সময় সে এ জাতীয় কষ্টে ভোগে। দুখানা মাত্র ঘরে মা আর বোনেরা দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছে। ইচ্ছে করে ওদের নিয়ে বেরোতে, কিন্তু বেরোন মানেই পয়সা খরচ। শহরে এখন কত রকমের মেলা, ওদের সেখানে নিয়ে যাবার ইচ্ছে, কতদিনই তো মনে জেগেছে। বিশেষ করে বাড়িতে ঢোকার সময়ই ওদের মুখগুলো মনে পড়ে। ভীতু চোখে সবাই তাকায়, সংসারের একমাত্র রোজগেরে, সবাই তাকে তুষ্ট করতে ব্যস্ত। ওরা যত ব্যস্ত হয় ততই অশোকের কষ্টটা বাড়ে। ভয়ও হয়, এদের ভবিষ্যতকে জাঁইয়ে রাখার সামর্থ তার কতটুকুই বা। বর্তমানকেই বা কতটুকু পারছে।

বেয়ারার লম্বা সেলাম পিছনে ফেলে ওরা বেরোল। সন্ধ্যা নেমেছে প্রায়। কলকাতার এই অংশটি ফুরফুরে হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

"আমি চলি। দেখা করতে হবে একজনের সঙ্গে। ভাল কথা, ইন্সিওর করেছ?"

"পাগল, প্রিমিয়াম দেবার টাকা কোথায়।"

"তা বটে, তবু করে রাখা ভাল, এ শহরকে তো বিশ্বাস নেই। আর করলে আমায় খবর দিও কিন্তু।"

লম্বা পা ফেলে সুকুমার এগিয়ে গেল। টলছে না। ক্লান্তও দেখাচ্ছে না। অশোক নিজের হাঁটাটাই ক্লান্তিকর বোধ করল। এবার টিউশানী তারপর বাড়ি। দুটো বোন আর মা। আধময়লা জামাকাপড়ের গন্ধ, আরশোলা ওড়ার শব্দ। ওরা কেউ এখন কথা বলবে না যাতে একটু হাসা যায়, যা দুটো হাসির কথা বলা যায়। এমন কোন পরিস্থিতি তৈরী হবে না যাতে মনে হবে আমি সকলের ভালবাসার পাত্র। ফিসফিস করে ওরা ঝগড়া করবে কিংবা নিজেদের মধ্যেই হাসাহাসি করবে। শুধু ওদের কথাই দিনরাত ভাবতে হয়। অশোক ভাবল, ওরা আমার থেকেও অসহায় তাই ওদের ভালবাসি হয়তো। সুকুমার বিয়ে করেই

বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেল। সংসারের চাপ পড়ল ছোট ভাইয়ের ঘাড়ে। ডাঁটো ছেলে, দিব্যি তো চালিয়ে যাচ্ছে। আমিও পারি একটা বিয়ে করে আলাদা হতে। অশোক বোধ হয় বিয়ের কথা ভাবল বছর পাঁচেক পরে। পাঁচ বছর আগে মা একবার কথাটা তুলেছিল। দূর সম্পর্কের এক অফিসার দাদা তখন বলেছিল, চেষ্টা করব। উচিত ছিল বড় মেয়ের বিয়ের কথা বলা, তা না বলে ছেলের বিয়ের কথা তুলেছিল! অশোকের কাছে তখন আশ্চর্যের ঠেকেছিল।

চৌরঙ্গীতে পেঁৗছেই একটা দমকা বাতাসের ঝাপটা খেল অশোক। ভাল লাগল। অন্ধকার ময়দানের দিকে তাকাল। তাকিয়ে ইচ্ছে করল মাঠে ঘুরে আসতে। রাস্তা পার হবার জন্য ডানদিকে তাকাতেই দেখল দূরে কি যেন একটা হয়েছে। ছুটে ছুটে মানুষ জড়ো হচ্ছে রাস্তার মধ্যে। একটা ডবল-ডেকার বাস অচল হয়ে দাঁড়িয়ে।

অশোক কৌতুহলী হল। একটু জোরে হেঁটে ভীড়ের কাছে পেঁৗছল। যা প্রথমে তার মনে হয়েছিল। তাইই ঘটেছে। একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "কি করে চাপা পড়ল?"

"যা করে পড়ে। চলন্ত বাসে উঠতে যাচ্ছিল, পিছলে পড়ল। পেছনের বাসটা ব্রেক কষার সময়ও পেল না।"

একজন বলল, "আহা, এই বাজারে একটা লোকের মরা মানে যে কি সর্বনাশ হয়ে যাওয়া!"

শুনে বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে গেল অশোকের। যদি সে নিজে বাসের তলায় যেত। বাড়ির তিনটি প্রাণীর অবস্থা তাহলে কি হত!

"একদম মরে গেছে কি?"

"একদম, সঙ্গে সঙ্গে।"

অশোকের ইচ্ছে করল একটুখানি দেখে। ভীড় ঠেলে গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁকি দিল। একি! থরথর করে কাঁপল সে। সন্দেহ নেই কোন। ব্যাগটা পুলিশের জিম্বায়, দেখেই সে চিনল। ভয় তাকে কোনঠাসা করে ফুটপাথের কিনারে হাজির করল। কাঁপুনি থামেনি। এখন সে কি করবে? ইচ্ছে করছে ছুটে পালাতে, কিন্তু তা নয়, কিছু একটা করা উচিত। যে চাপা পড়েছে সে তার বন্ধু একথা বললে কোন লাভ নেই।

সুকুমারকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। কিন্তু সেও অনর্থক, কারণ ওতো মরেই গেছে। তবু কিছু একটা করা দরকার। একটি লোককে দেখে অশোকের মনে হল অনেকগুলি সন্তানের পিতা, স্বল্প আয় করে কিন্তু টাকা জমায়। লোকটিকে সে জিজ্ঞাসা করল, "যে চাপা পড়ল তার সঙ্গী কেউ ছিল না?"

"কি জানি মশাই, থাকলে তো দেখতেই পাওয়া যাবে।"

"তা বটে, তবে থেকেই বা আর কি করত, করার মত কিছুই তো নেই।"

"তবু বাড়িতে তাড়াতাড়ি খবরটা পেঁৗছত।"

বাড়িতে খবর দেওয়া। অতসীকে খবর দেওয়া। তাড়াতাড়ি কার্ডটা বার করে অশোক ঠিকানা পড়ল। ছুটল বাস স্টপের দিকে। পাইকপাড়ার বাস ছেড়ে যাচ্ছে। বেপরোয়ার মত লাফিয়ে উঠে পড়ল।

বাসে উঠেই মনে হল এ ভাবে লাফিয়ে ওঠাটা তার উচিত হয়নি। বহু লোক এই ভাবেই মারা গেছে। মরার কথা ভেবে অশোক প্রাণপণে হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে রইল। ফলে দোতলায় উঠতে অসুবিধা হওয়ায় দুচারজন বিরক্তি প্রকাশ করল। রেগে উঠল অশোক। একটু আগেই যে সে মরতে বসেছিল সে কথাটা কেউ ভাবছে না। ঠেলেঠুলে দোতলায় উঠল। বসার জায়গাটাও কিছুটা অভদ্রের মতই জোগাড় করে নিল।

বসার পরই সে ভাবল খবরটা কি ভাবে অতসীকে দেওয়া যায়। শোনা আছে, আনন্দের খবর, লটারীতে বহু টাকা পাওয়া বা চাকরী পাওয়ার মত খবরগুলো গ্রহণের প্রস্তুতি হিসাবে মনকে দুঃখিত করে দিতে হয়। ধাক্কা সামলাবার জন্যই এর দরকার নয়তো আনন্দে নাকি কেউ কেউ মারাও গেছে। অতসীও মরে যেতে পারে। সুতরাং ওকে প্রথমে আনন্দিত করে তারপর খবরটা দিতে হবে। কী বীভৎস কাজ। অসম্ভব, প্রায় দুবছর পরে এই রকম এক খবর নিয়ে কারুর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে না।

নেমে যাবার কথা অশোক ভাবল। কিন্তু মাঝ পথে নেমে কি লাভ! বহুদিন পরে বাসে বসবার জায়গা পাওয়া গেছে, এক্ষুনি ছেড়ে উঠতে তাই আলস্যি ধরল। বাড়ির কাছাকাছি এলে বরং নামা যাবে। অশোক যা [illegible] পাইকপাড়া পর্যন্তই [illegible]। এতদিন পরে অতসী কেমন দেখতে হয়েছে, তাই জানবার লোভটুকু ইতিমধ্যে প্রবল হতে শুরু করেছে।

বাস থেকে নেমে ঠিকানা অনুযায়ী বাড়ি খুঁজে নিতে অশোকের দেরী হল না। তিনতলা বাড়ি। দোতলা থেকে বিনিয়ে কান্নার শব্দ আসছে। কড়া না নেড়ে অশোক রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। খবর পেয়ে গেছে তাহলে। নিশ্চয় অতসীই কাঁদছে। বীভৎস দায়িত্বের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে অশোক খানিকটা ঝরঝরে বোধ করল। এখনতো চলেও যাওয়া যায়। কিন্তু এতটা পথ এসে এবং দুবছর পরে এসে ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। তাছাড়া অনেক কিছু করবার মত কাজও রয়ে গেছে। আত্মীয় স্বজনদের খবর দেওয়া, হাসপাতালে যাওয়া, সেখান থেকে শ্মশানে। তারপরের [illegible] অবশ্য অতসীর ভাইয়েদের। [illegible] বোনকে নিশ্চয় তারা ফেলে দেবে না। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল নয়, সম্পর্কও ভাল নয়। আলাদা হওয়াতে সুকুমারের মা বা ভাইয়েরা খুশী হয়নি।

বাড়ির মধ্য থেকে এক বিধবা বুড়ি বেরিয়ে এল, অশোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, "কাকে খুঁজছেন?"

মুখে আসছিল সুকুমারের নাম, সামলে নিয়ে অশোক ফিসফিস করে বলল, "অতসী কি ওপরে?"

"ওপরে কেন, ওরাতো নিচের ভাড়াটে।"

"তবে কাঁদছে [illegible]?"

"সেতো বাড়িওয়ালা [illegible], ও হপ্তায় খবর এসেছে শ্বশুর[illegible] জলে ডুবে মরেছে।"

"অতসী কোথায়?"

"সে তো ছেলেদের নিয়ে [illegible] বেড়াতে বেরিয়েছে।"

অশোকের পায়ের [illegible] মাটি কেঁপে উঠল। ইচ্ছে [illegible] পালাতে। কিন্তু হুটতে [illegible] যাবে, মাটি জড়িয়ে [illegible]। [illegible] তা হলে [illegible] দিতে হবে। হায় ভগবান, এই বিনিয়ে কান্নাটা কেন অতসীর [illegible]নাথ কেন তার সঙ্গেই আজ সুকুমারের [illegible] হল, কেন দুর্ঘটনা [illegible]

...ন তো রোজই কতকগুলো মানুষ বাসচাপা যাচ্ছে, কই তাদের বাড়িতে খবর দেবার জন্য তো তার মাথা ব্যথা হয় না।

অশোক একটু একটু করে নিজের উপর রেগে উঠতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নিচের মাটিও শান্ত হয়ে গেল। এসেছে যখন খবরটা দিয়েই যাবে। একটা রাস্তার লোকের মতই নিরাসক্ত ভাবে খবরটা দেবে। সুকুমার যে বাসে চাপা গেছে, সেটা যখন অন্য লোকেই চালাচ্ছিল, তখন ভয় পাবার কি আছে। তা ছাড়া সুকুমারকে তো সে বাসের নীচে ঠেলে দেয়নি, সুতরাং ভয় পাবার কি আছে। সুকুমার নিজের দোষেই মরেছে. মদ খেয়ে চলন্ত বাসে উঠতে গেছল, কেউ তাকে অমন করে উঠতে বলেনি, কাজেই নির্ভয়ে খবরটা দেওয়া যায়।

ভাবতে ভাবতে অশোক একটু জোরে হেঁটেই পার্কে পোঁছল। খুব ছোট পার্ক নয়, মাঝে মস্ত পুকুর। লোকও জমেছে অনেক। খেলাধুলোর পাট সাঙ্গ করে দামালরা ঘরে ফিরে গেছে। শান্তিপ্রিয় বয়স্করা এখন জিরোতে এসেছে। এ পার্কে অশোক অনেকবার এসেছে। বহুদিন আগে অতসীর সঙ্গেই একবার এসেছিল।

খুঁজে বার করতে হবে। কোন দিক থেকে শুরু করবে ভাববার জন্য অশোক দাঁড়াল। ঘাসের উপর বসা দুটি কিশোর আই, এ, এস, পরীক্ষার দুরূহতা বিষয়ক আলোচনায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, বেঞ্চে বসা বৃদ্ধদের মধ্যে কেউ হেসে উঠল, ঝালমুড়িওয়ালার কাছ থেকে এক যুবতী কাঁচা লঙ্কা নিল, ওপর থেকে পিঠে কি যেন পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে অশোক জামাটা টেনে তুলে দেখল। বিরক্তিতে কিশ্‌কিশ্‌ [illegible] দাঁত। আরো তিনদিন জামাটা পরার কথা। একটা কাঠির জন্য নিচু হয়ে খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়ল পকেটে দেশলাই আছে।

ঝেড়ে ফেলেও দাগটা রয়ে গেল। অশোক অসন্তুষ্ট রয়ে গেল। এখন অতসীকে খুঁজে বার করতে হবে। দুপাশে চোখ রেখে সে পুকুর ধার দিয়ে এগোল। সামান্য যেতেই মনে হল, দুটি ছেলে নিয়ে যে মহিলাটি চিনেবাদাম খাচ্ছে, সেই অতসী। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য লক্ষ্য করতে লাগল। শরীরটা ভারী হয়েছে মাত্র নয়তো মাথা নোয়ালে ঘাড়ের কাছে শিরদাঁড়াটা আগের মতই ঠেলে ওঠে, চিবোবার সময় রগের কাছটা সেই রকমই দপদপ করে, ঝুরো চুল তুলে দেবার জন্য সেই ভাবেই আঙুলগুলো বেঁকে যায়।

প্রথম কথা অতসীই বলল।

"তাই বলি কে এমন ভাবে এতক্ষণ ধরে তাকাচ্ছে!"

"চিনতে পেরেছিলে?"

"একটু একটু, খুব বেশি বদলাওনি দেখছি।"

"চিনেছিলে যদি ডাকলে না কেন।"

"ছ'বছরেও যে-মানুষের টিকি দেখা গেল না, তাকে কেন যেচে ডাকতে যাব?"

"না ডাকতে পার কিন্তু বসতে বলতেও তো পার।"

"অনুমতির দরকার আছে নাকি, এটাতো পার্ক।"

"বিনা অনুমতিতে বসা যায় কিন্তু কারুর সঙ্গে তো বসা যায় না।"

অশোক বাবু হয়ে গুছিয়ে বসল। অতসীর ছেলে দুটি অবাক হয়ে দেখছে। বড়টি মার কানে কানে কথা বলল। অতসী তাকে বোঝাল—"মামা হয়, বুড়ো মামা, নাড়ু মামা যেমন আছে না, তেমনি অশোক মামা হয়।"

"বাদাম ভাঙতে ভাঙতে অশোক বলল, "রোজই আস নাকি।"

"নাঃ, তবে মাঝে মাঝে আসি। বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারছি না, বাড়িওলার মেয়ে মরেছে জলে ডুবে, আজ দশ দিন ধরে কান্নার বিরাম নেই। উঠতে বসতে শুতে খেতে একটা স্বর খালি তাড়া করে চলেছে। এমন একঘেঁয়ে লাগে না—"

একঘেঁয়ে শব্দটাকে অতসী একটু বেশি টেনে ধরেছিল। অশোক ওর মুখের দিকে তাকাতে বাধ্য হল।

"এই ভাবে মরাটা ভারী বিশ্রী, অবশ্য সব মরাই বিশ্রী তবু এমনি মরা আর অপঘাতে মরায় তফাত আছে। আছে না?"

মরা কথাটা অশোককে চারবার আঘাত করল।

দাঁতের ফাঁকে চিবুনো বাদাম আটকে গেছে। জিভ দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, "সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

"কবে, আজ?"

"বাসা বদলাতে চায়, কেন এ জায়গাটা তো ভালই।"

"আমি দরকার মনে করি না, এটা ওর বাতিক, এই নিয়ে তিনবার বদলানো হয়েছে। বাসায় ফেরার পথে ওর এখানে আসার কথা আছে, আমরা একসঙ্গে ফিরব। কটা বাজে?"

"ঘড়ি নেই।"

"ছিল তো!"

"গ্যাছে।"

অতসী যেন আহত হল। একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "সেই বাসাতেই আছ।"

"হ্যাঁ।"

"বোনেদের বিয়ে হয়েছে?"

"না।"

"করছ কী?"

"মাস্টারী।"

"বিয়ে করবে না?"

হেসে অশোক চুপ করে রইল। দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ বাদাম আটকে ছিল তাই খালিখালি লাগছে।

"একটা চাকরে কাউকে বিয়ে কর, সুবিধে হবে। আমার মত লেখাপড়া-জানা অকর্মাকে কোর না।"

"কেন তুমি খারাপ হলে কিসে?"

"নয়? শুধু তো খরচই করছি, নিজে রোজগার তো করতে পারি না। অথচ মেয়েরা তো স্বামীদেরও আজকাল সাহায্য করে।"

"সুকুমার বলছিল, ও তোমায় ভীষণ ভালবাসে।"

"ও আমার জন্যে খুব খাটে। অমন করে আর কাউকে কিন্তু খাটতে দেখলাম না।"

"কজনকে তুমি দেখেছ।"

অতসী তাকিয়ে রইল অশোকের মুখের দিকে। গলার স্বরটা মোচড়ান, তেতো। অশোক বুঝতে পেরে লজ্জা পেল। ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, "ভাল না বাসলে খাটা যায় না, সে মানুষ বা কাজ যাকেই হোক না কেন। বিয়ে করে সুকুমার আলাদা হয়ে গেল। ভাইয়েদের সংসার বড়, রোজগার কম তাই ভালভাবে থাকার জন্য আলাদা হল। কেন একসঙ্গে সুখদুঃখ ভাগ-বাটোয়ারা করে রইল না?"

"অন্যের দুঃখের ভাগ নিয়ে, নিজেকে বঞ্চিত করে মহত্ব দেখানোর সময় আর নেই।"

"আমি কি বিগত যুগের মানুষ?"

অতসী চুপ রইল। অশোক ভাবল, এসব কথা সে কেন বলতে গেল, যে কথাটা বলার, তাই তো বলার উপায় থাকছে না। একটা আনন্দিত পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

"যাকগে এসব কথা, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আর দেখা হয়?"

অতসী গম্ভীর হয়ে থাকল।

"মিনতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মেদিনীপুরে ওর স্বামী বদলী হয়েছে। তোমার মতই মোটা হয়েছে। বিয়ে করলে কি মোটা হয়? সুকুমার পর্যন্তও হয়েছে।"

অতসী মুখ ফিরিয়ে জলের দিকে তাকাল। ছেলেদুটি ভীষণ লক্ষ্মী, ছোটা-ছুটি না করে ঢিল ছোঁড়ার খেলায় ব্যস্ত। বেড়ুনে মানুষগুলি আলগোছে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। অতসীর ভারী চেহারা এবং দুটি ছেলে সঙ্গে থাকার জন্য অশোক স্বস্তিবোধ করল। ওরা কেউ তাদের প্রেমিক-প্রেমিকা ভাবছে না। স্বামী-স্ত্রী ভাবতে পারে, তা ভাবুক। অশ্লীল চিন্তার সুযোগ ওই সম্পর্কের মধ্যে নেই। অশোক কনুয়ে ভর দিয়ে ঘাসে শরীর বিছিয়ে হাল্কা সুরে বলল, "এত ভাবছ কি? নিজের সুখের কথা সবাই ভাবে, আমিও ভাবি। অস্বস্তিকর, দুঃখজনক পরিস্থিতি এড়াতে সবাই চায়,
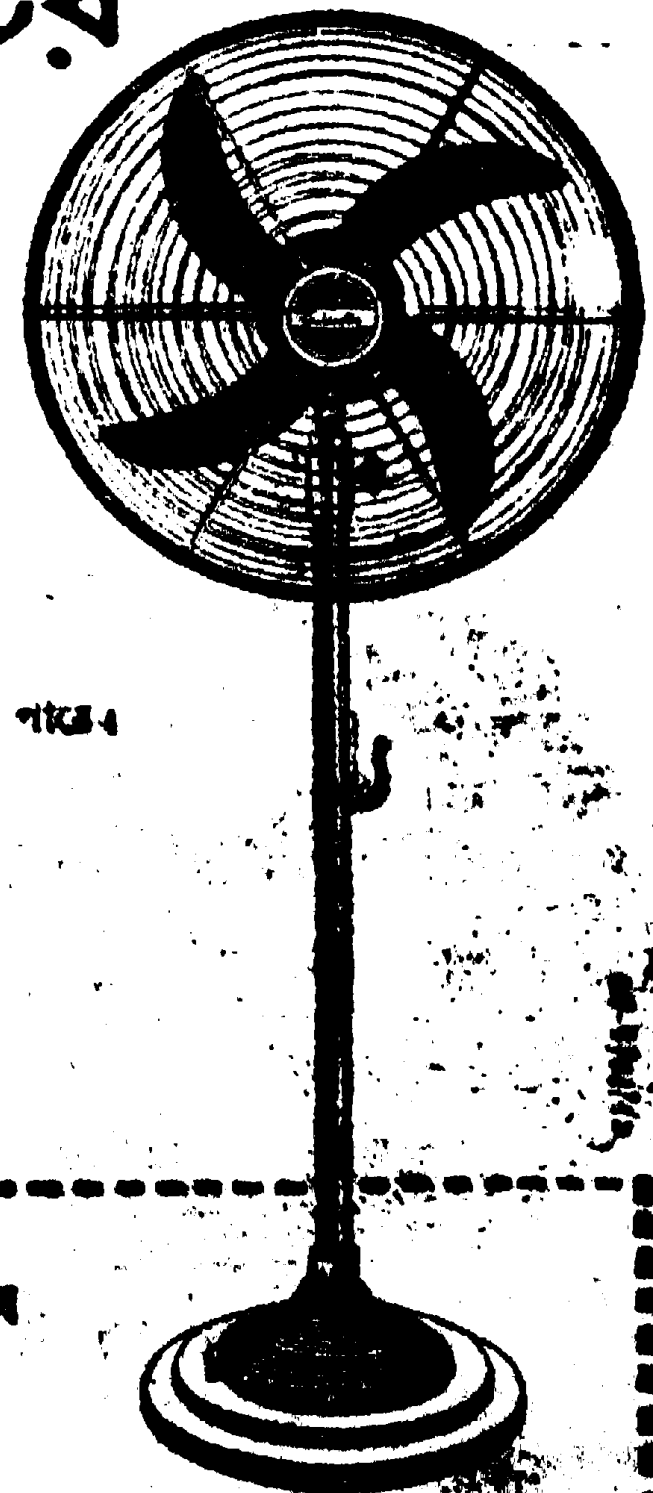
আমিও চাই, সুতরাং গম্ভীর হয়ে থেকে যদি আমার অস্বস্তির কারণ হও তাহলে বরং আমার চলে যাওয়াই উচিত।"

"তা কেন? আলাদা হয়েই যে খুব সুখী হয়েছি তাতো নয়। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের চিন্তাটা তো সরিয়ে দেওয়া যায় না। বিগত আর বর্তমানে তফাতটা যে কি, অতশত বুঝি না, কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি আলাদা থাকতে আমার ভাল লাগে না। আবার কষ্ট করে থাকতেও ভাল লাগে না।"

"সংসারের সবাই যদি সমান আয় করে তাহলে আর এই সমস্যাটা ওঠে না। কিন্তু তা আর হয় কই।"

"কিন্তু সুকুমার যা পরিশ্রম করে, খাটে, তা ওরা করে না। সেই জন্যই তো সুকুমার রাগ করত, তাই নিয়েই ঝগড়া হল।"

"সুকুমার আলাদা হয়েও এখনো সেই পরিশ্রমই করে যাচ্ছে।"

"অভ্যাস হয়ে গেছে, ছাড়তে পারে না।"

ছেলেদুটি পুকুরের কাছাকাছি চলে গেছে। অতসী ডাকল। বাধ্যের মতো ওরা কাছে এল। জলের দিকে না গিয়ে ওদের খেলতে বলল অতসী।

"সুকুমার বলেছিল ওরা খুব দুষ্টু।"

"সুকুমার ওদের খুব ভালবাসে।"

"তোমাকেও।"

অতসী হাসল। অশোক মন দিয়ে লক্ষ্য করল। হাসলে আগের মত টোল পড়ে না। মাংস জমেছে।

"সুকুমারের কিন্তু একটা বদ অভ্যাস হয়েছে দেখলুম।"

"হ্যাঁ, তবে মাত্রা ছাড়ায় না। আমিও কিছু বলি না। কি হবে বলে, ওইতে আনন্দ পায়, তা থেকে কেন বঞ্চিত করব।"

"তোমার ভয় করে না?"

"কিসের?"

অশোক চুপ করে রইল। একটা ঝোপকে মাঝে রেখে ছেলে দুটি লুকোচুরি খেলছে। তাই দেখতে সে ব্যস্ত হল।

"কিসের ভয়?"

"যদি মাত্রা ছাড়ায়?"

"নাঃ, তাতে ভয় পাবার কি আছে। ওসব ভয়টয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।"

"যদি কাজের ক্ষতি হয়, চাকরী চলে যায়?"

"তার মানে যদি রোজগার বন্ধ হয়? আমিও তা ভেবেছি। যদি তাই হয় তাহলে আমাকেও কাজ খুঁজতে হবে। বিয়ের আগে স্বামী, পুত্র, সংসার ইত্যাদির চমৎকার একটা ধারণা করেছিলাম, বিয়ের পরও কিছুদিন ছিল। এখন আর ওসব ভাল লাগে না। কেমন যেন ন[illegible] করি সব সময়। কিছু একটা না করা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার।"

"কি করতে চাও, চাকরী?"

"হ্যাঁ, যে করেই হোক সংসারে আমিও কিছু দান করতে চাই।"

"এতে সুকুমার আপত্তি করবে না?"

"করবে। ওইতো আমার কাজের প্রধান বাধা, নয়তো এই পাড়াতেই মেয়েদের স্কুলে একটা কাজ পেয়েছিলাম।"

"সুকুমার যদি বাধা না দেয়, ধর সে হয়তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোনদিন আর হয়তো ফিরবে না বা পাগল হয়ে গেল—"

উঠে বসল অশোক। ছেলে দুটির আর খেলাও ভাল লাগছে না। মায়ের কোলে আর পিঠে দুটিতে ঠাঁই নিয়েছে। অতসী ঝুঁকে পড়েছে। কোলেরটির চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "তুমি কি বলছ বুঝছি না। সুকুমার পাগল বা নিরুদ্দেশ হতে যাবে কেন?"

"ঠিক তা নয়, মানে ধর ওর অস্তিত্ব তুমি ভুলে যেতেও তো পার।"

"পাগল, তাই হয় কখনো। অত সহজেই ভোলা যায় নাকি? এই পার্কেই বহুদিন আগে আমরা এসে একদিন বসেছিলাম, পেরেছ সে কথাটা ভুলতে?"

"তা পেরেছি। কতদিন যে ভুলে ছিলুম তার হিসেব দিতে পারব না, এই পার্কে পা দিয়েই কথাটা মনে পড়েছিল। এত ব্যস্ত, এত ঝঞ্ঝাট যে, এসব কথা মনে পড়ার সময়ই পাই না।"

ছেলেদুটি বায়না ধরেছে বাড়ি যাবার। অতসী উঠে দাঁড়াল। অশোক উঠল না।

"আমার এবার বাড়ি যেতে হবে, তুমিও চলো।"

"আর একটু থাক। কি হবে এখনি গিয়ে, বসে বসে তো কান্না শুনবে।"

"এদের বসতে ভাল লাগছে না, বরং একটা চক্কোর দি।"

পুকুর ধারের রাস্তা দিয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করল। আলো কম, রাস্তা অসমান। অশোক একটি ছেলের হাত ধরল। অন্যটিকে অতসী কোলে তুলে নিল। দূরে কোথায় কালী-কীর্তন হচ্ছে। পার্কের পাশ দিয়ে ঝড়ের মত বাস ছুটে চলেছে। অন্ধকার বেঞ্চে বসা একজোড়া ছেলেমেয়ের পাশ দিয়ে ওরা হেঁটে গেল। বেতার[illegible]দের এরিয়াল পোস্টের ডগায় লালবাতিটা ঠায় জ্বলছে। বাতাসে জল-ঘাসের গন্ধ। পুকুরের মধ্যে একটা দ্বীপ, সেখানে কিছু গাছপালা। দ্বীপটায় অন্ধকার ঝোপ হয়ে রয়েছে। পার্কের বাতি-গুলোর রশ্মি জলের উপর বিছানো আঙুলের মত অন্ধকার ধরার জন্য পাতা। উত্তেজনায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। হোঁচট খেয়ে অতসী টলে পড়ছিল, কোন রকমে সামলে নিল। ছেলেটিকে কোল থেকে নামাতে চাইল। ছেলে গলা জড়িয়ে গোঁ ধরল, নামবে না।

"না নামলে, যদি পড়ি তো, দুজনেই পুকুরে গিয়ে পড়ব, নামো, লক্ষ্মী ছেলে, নামো।"

ছেলে এক গুঁয়ে, হঠাৎ অতসী তাকে চড় কষিয়ে দিল। কেঁদে উঠল ছেলে, অশোক তাকে কোলে নেবার জন্য হাত বাড়াতেই অতসী বেঁকে দাঁড়াল।

"থাক কাঁদাই উচিত।"

ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল। সাবধানে আস্তে আস্তে। অতসীর গলায় মুখ গুঁজে ছেলেটি কাঁদছে। কলে-আটকান ক্লান্ত ইঁদুরের ডাকের মত শব্দ। লাল বাতিটা ঠায় দাঁড়িয়ে, জলা গন্ধ, আর এক জোড়া নারী-পুরুষ ঘাসের উপর। অশোকের হাতটা প্রাণপণে আঁকড়ে ছেলেটি হাঁটছে। মাঝে মাঝে গায়ে লেপটে আসছে। অশোক ওর চুলে হাত দিল।

"পুকুরটা বেশ বড় তো! অনেকক্ষণ হাঁটছি।"

"কোলে বোঝা নিয়ে হাঁটতে বিশ্রী লাগছে।"

অশোক হাসিটা বোঝাবার জন্য মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, "একা হাঁটতে সব সময়ই ভাল লাগে, বোঝা নয় এমন

কাউকে নিয়ে হাঁটতে আরো ভাল লাগে। যেমন তোমার সংগে এখন ভাল লাগছে।"

সুকুমার আমায় নিয়ে বেরোতে চায় না। আগে বেরোত।"

"কেন চায় না?"

"জানি না।"

মনে হল সামনেটা যেন ঢালু। অশোক ছেলেটির হাত শক্ত করে ধরল।

"সুকুমারকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।" অতসী চুপ রইল।

"তোমারও কি ক্লান্ত [illegible]?" অতসী চুপ।

"কথা বল।" অশোক চাপা সুরে প্রায় ধমকে উঠল।

"ভাল লাগছে না কথা বলতে।"

"তখন থেকে শুনছি ভাল লাগে না, আর ভাল লাগে না। কি ভাল লাগে তবে?"

"তা যদি জানতুম? অদ্ভুত এক-ঘেয়েমির মধ্যে পড়ে গেছি যেন। যা হোক একটা কিছু এসে যদি নাড়া দিয়ে যায়, প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়।"

অশোক এতক্ষণে অতসীর চোখ দেখতে পেল। আলোর মধ্যে ওরা এসে পড়েছে। রাস্তাটা সমান। ছেলেটি হাত ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল. আলোর নীচে তাস খেলছে বৃদ্ধরা, যুবকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করছে। অতসীর চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। ছেলেকে অনেকক্ষণ কোলে নিয়ে আছে, নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে।

"ওকে নামিয়ে দাও বরং।"

[illegible]ই ছেলেটি প্রাণপণে গলা আঁকড়ে ধরল। অতসী টলে উঠল একবার। কোন রকমে ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে অশোকের দিকে তাকাল, হাসলও করুণভাবে। ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল অশোকের মাথা। অতটুকু ছেলের এত জেদ কেন? দুহাতে ছেলেটির কাঁধ ধরে সে টানল।

"থাক অশোক।"

অশোক গ্রাহ্য করল না। শক্ত করে ধরে জোরে টানল। তার থেকেও জোরে ছেলেটি গলা জড়িয়ে ধরেছে ফলে অতসীও টানের সংগে এগিয়ে এল।

"অশোক থাক, ছেড়ে দাও।"

"না।"

"ওকে জান না, ও কিছুতেই ছাড়বে না।"

অশোক এবার রীতিমত জোর দিল। ছেলের হাতের চাপে লাল হয়ে উঠল অতসীর মুখ। দম আটকে গেছে। প্রাণ-পণে মাথা ঝাঁকল। হাত দিয়ে নিজের গলা ছাড়াতে গিয়ে সে হঠাৎ অশোককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

পিছিয়ে এল অশোক। অতসী হাঁপাচ্ছে। ছেলেটি আবার কলেপড়া ক্লান্ত ইঁদুরের মত শব্দ করতে লাগল। বাতাসে জলা গন্ধ। বৃদ্ধরা তাস খেলছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অতসী স্বাভাবিক হয়ে উঠল। আবার চলতে শুরু করল সে। অশোক নিজেকে বিস্বাদ-বোধ করল। ক্লান্ত লাগছে।

"অতসী একটু আস্তে হাঁট, একটা খবর আছে।"

অতসী গতি কমাল না। অশোক যেন আরও পিছিয়ে পড়ছে।

"অতসী আস্তে হাঁট, একটা ভাল খবর আছে। তোমাকে সেই কথাটা বলার জন্যই এসেছি, আমি শিগ্গিরই বিয়ে করছি।"

বলুন তো কী?

উত্তর

১। সর্বসমেত ৩৫,১৩৪ জন বিদেশী ১৯৬০ সালে ভারতবর্ষে এসেছিল। এদের মধ্যে প্রধান জাতির সংখ্যা এইরূপ— আমেরিকান (১৫,৩৩১), আফগান (৯৭০), ফরাসী (২,৩৩০), জার্মান (২,৬২০), ইন্দো-নেশিয়ান (১,৫৪৩), ইতা-লিয়ান (১,৭৫৪), ইরাণী (৭০২), পর্তুগীজ (৪৪৬), রাশিয়ান (৮৭২), সুইস (৭১৮) এবং থাই (৮৯৩)।

২। সবসুদ্ধ ১,৯১,৩৫৫ জন লোক ১০ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের উপর আয়-কর দিয়েছিল; এর মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের লোক সবচেয়ে বেশী।

৩। গত ১৩ই এপ্রিল অমৃত-সহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে বিখ্যাত শহীদ স্মৃতি-স্তম্ভ উন্মোচন করা হয়েছে। এই স্মৃতি-স্তম্ভের নাম হয়েছে স্বাধীনতার অগ্নিশিখা (Flame of Liberty)। এখানে ৪২ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারের অধীনে সৈন্যরা সাধারণ সভার জন্য সমাগত জনতার উপর ১,৭০০ বার গুলী বর্ষণ করে ৩৭৯ জনকে নিহত এবং ১,২০০ জনকে আহত করে। এই স্মৃতি-স্তম্ভটি ৪৫ ফিট উচ্চ।

৪। সরকারী হিসাব অনুসারে এখন সর্বসুদ্ধ কর্মরত ১৭৮৬ জন আই. এ. এস কর্মচারী (I. C. S. সমেত) আছেন।

৫। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে ১৯৬০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির আর্থিক ঋণ (টাকায়, অর্থাৎ বৈদে-শিক ঋণ বাদ) ২,৫৮১ কোটি টাকা,—এর মধ্যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ঋণ হচ্ছে ২,১৩৮ টাকা।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

বৃষ্টি ও সমুদ্র—

কলকাতায় এবার পয়লা আষাঢ়ের অনেক আগেই বর্ষা নেমেছে। সারাদিনে সূর্যের একটুখানি উঁকিঝুঁকিও নেই। গাছপালা আর ঘাসের রঙ গেছে পালটে। এ-সময়ে বর্ষা মাথায় নিয়ে আপিসে যেতে যত বিরক্তিই লাগুক, চৌরঙ্গী দিয়ে যেতে যেতে একবার ময়দানের দিকে তাকিয়ে দেখবেন। কী সবুজ! কী সবুজ! এমন আশ্চর্য সবুজ অন্য কোনো দেশে খুঁজে পাবেন না। এমন কি আমাদের দেশেও অন্য কোনো সময়ে দেখতে পাবেন না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে কলকাতার প্রথম বর্ষা যতটা সম্ভব ধুলো আর ময়লাকে পরিষ্কার করে নিয়ে সারা বছরের এই নোংরা শহরটায় এক নতুন রূপ খুলে দিয়েছে।

অবশ্য কলকাতা শহরের বর্ষার অন্য একটা কদর্য চেহারাও আছে। তা দেখতে পাবেন যাদবপুরের রিফিউজি কলোনীতে, উত্তর কলকাতার কানা গলিঘুঁজিতে বা এমন কি গর্ত-সমাকীর্ণ কলকাতার রাজপথেও এবং এই পরিবেশে কলকাতার ঊর্ধ্বশ্বাস জীবনে বর্ষা অনেক সময়েই একটা উৎপাত বলে মনে হতে পারে।

এজন্যই দেখা যায় কলকাতার মানুষের কেউ বর্ষাকালকে খুবই পছন্দ করে, আবার কারও কাছে এটাই সারা বছরের সবচেয়ে বিশ্রী সময়। কিন্তু এই দু-দলের কেউ-ই বর্ষাকে তার নিজস্ব পরিচয়ে বিচার করছেন না। আমাদের ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বা মন্দ-লাগাকে ছাড়িয়েও বর্ষার এমন একটি নিজস্ব পরিচয় আছে যার মাহাত্ম্যে সে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় মর্যাদার আসন দাবী করতে পারে।

বর্ষার আকাশের দিকে কি আপনি কখনো তাকিয়ে দেখেছেন? রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইনে আছে : "নীল নবঘনে আষাঢ়-গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।" এ থেকে মনে হতে পারে, আষাঢ় মাসের আকাশ নীল মেঘে ঠাসা থাকে। কথাটা কিন্তু সব সময়ে সত্যি নয়। বর্ষার আকাশে সত্যিকারের নীল মেঘ খুব কমই দেখা যায়, থরে থরে সাজানো পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ যদিও কখনো দেখা যায় তা খুবই ক্ষণস্থায়ী, পেঁজা তুলোর মত মেঘ প্রায় কোনো সময়েই নয়। বরং বর্ষার আকাশের দিকে তাকিয়ে খুবই প্রচলিত একটি উপমা নূতন করে মনে পড়বে: শ্লেটের মতো আকাশ। বর্ষার আকাশের চমৎকার একটি বর্ণনা আছে প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা' বইতে। সুযোগমতো পড়ে দেখবেন আর নিজের দেখার সংগে মিলিয়ে নেবেন।

এই শ্লেটরঙা আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও মেঘের কোনো সীমানা টের পাওয়া যাবে না। মনে হবে সারা আকাশটার গায়ে কেউ যেন একটা ন্যাতা বুলিয়ে দিয়ে গেছে। রাশি রাশি জল না ঢাললে এ আকাশ কিছুতেই পরিষ্কার হবে না।

কিন্তু বর্ষার আকাশে কোনো না কোনো সময়ে এমন মেঘও নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে যখন মনে হবে কেউ যেন আকাশভরা রাশি রাশি মেঘকে প্রচণ্ড ভাবে তাড়া করেছে। সাধারণভাবে মনে হবে, মেঘগুলো দক্ষিণ থেকে তাড়া খেয়ে উত্তর দিকে ছুটে পালাতে চাইছে। এ থেকে বোঝা যাবে মেঘগুলো এসেছে সমুদ্রের দিক থেকে।

আসলে সমস্ত মেঘেরই জন্ম সমুদ্র থেকে। কথাটি হয়তো খুবই মামুলি ও পুরনো শোনাচ্ছে। আজকাল স্কুলের খুব নিচু ক্লাশের ছেলে-মেয়েরাও এই তথ্যটি জানে। অনেকে হয়তো এতক্ষণে মুখ বেঁকিয়ে ভাবছেন, এই সামান্য কথাটি শোনাবার জন্যে এতখানি ভণিতা না করলেও চলত। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করলেই আমরা বুঝতে পারব, কথাটা এমনিতে যত সামান্য মনে হচ্ছে, কার্যক্ষেত্রে তা নয়। অবশ্য মেঘের জন্মকথাই শুধু আমার বক্তব্য নয়; কিভাবে এই মেঘ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে ভর করে কলকাতার আকাশে এসে হাজির হচ্ছে, শুধু তাও নয়; আমি আপনাকে বিশেষ ভাবে অবহিত করতে চাই বৃষ্টি ও সমুদ্র সম্পর্কে। ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি আমাদের জীবনে সমুদ্রের কতখানি ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সমুদ্র সম্পর্কে শুধু এইটুকু আলোচনাও আংশিক আলোচনা মাত্র। সমুদ্র এমনই এক বিস্ময় যে সমুদ্র সম্পর্কে আলোচনার কোনো শেষ নেই। কিন্তু সমুদ্র থেকে জন্ম নিয়ে যে বৃষ্টির ফোঁটাটি অনেকখানি আকাশ পার হয়ে এসে আমাদের ঘরের আঙিনায় ফেটে পড়ছে তার মধ্যেও সমুদ্রের ঘ্রাণ পাওয়া যেতে পারে। এমন কি কল্পনাশক্তি, একটু প্রখর হলে, বৃষ্টিভেজা মাঠ আর গাছপালার দিকে সমুদ্রের রূপকে দর্শন করাটাও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তন হচ্ছে ৫১ কোটি বর্গ কিলোমিটার। এই মোট আয়তনের শতকরা ৭০·৮ ভাগ বা ৩৬.১ কোটি বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে সমুদ্র। আমরা এও জানি যে সমুদ্রের

জলের পরিমাণ হচ্ছে ১৩৭ কোটি কিলোমিটার।

এই তথ্যগুলো মনে রাখলে আমরা তে পারব, পৃথিবীতে স্থলভাগটা া, জলভাগটাই প্রধান।

আবার স্থলভাগের প্রত্যেক মহা- শই রয়েছে মস্ত মস্ত নদী। এই স্ত নদী থেকে প্রতি ঘন্টায় ১.৩ কোটি কিলোমিটার জল সমুদ্রে এসে পড়ে। ার সমুদ্র থেকেও প্রায় সম-পরিমাণ বাষ্প হয়ে উবে যায়। এই বা ক তৈরী হয় মেঘ; বাতাসের ঠেলা য় এই মেঘ দেশে-মহাদেশে উড়ে ায় এবং কোনো না কোনো সময়ে বৃষ্টি ঝরে পড়ে। শেষ পর্যন্ত এই জলই বার নদীপথে এসে হাজির হয় সমুদ্রে। প্রবাহের এমনি একটা চক্র অবিরাম ক খেয়ে চলেছে।

জলকে বলা হয় জীবন। তা এই রণে যে জল ছাড়া আমাদের খাদ্য ও নীয়ের যোগান সম্ভব নয়। জল আছে লই আমাদের মাঠে ফসল, গাছে ফল, কুরে মাছ, বা এক কথায় আমাদের এই জলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা পৃথিবী ও মাদের এই বিচিত্র জীবন। এসব কথা মরা সবাই জানি। কিন্তু এ-বিষয়ে মরা অনেকেই হয়তো অবহিত নই যে জলের যোগান বৃষ্টি থেকে। বৃষ্টি থাকলে পৃথিবীর চেহারাটা যে কি য়ংকর হত তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। ং কথাটাকে উল্টো দিক থেকে ভাবা তে পারে। অর্থাৎ, দেখা যেতে পারে বৃষ্টি আছে বলে পৃথিবীর চেহারাটা দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের অয়ি ভুবনমনমোহিনী ানটি স্মরণ করুন। একটু ভাবলেই ঝতে পারবেন, যে আশ্চর্য সৌন্দর্যের থা গানটিতে বলা হয়েছে তার অনেক- ানিই বৃষ্টির জলের অবদান।

কিন্তু আমি আরো গভীরে যেতে াই। আমাদের এই পৃথিবীর আজকের চহারাটি চিরকালের চেহারা নয়। ভাবলে াবাক হতে হবে যে কয়েক কোটি বছর াগেও এখন যেখানে আমাদের হিমালয় সখানে ছিল সমুদ্র। এবং আগামী কয়েক কাটি বছরের মধ্যে এই হিমালয়ের মতো র্দ্ধর্ষ আকাশছোঁয়া পর্বতও রেণু রেণু য়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে। পৃথিবীর মতীত ইতিহাসে হিমালয়ের মতো পর্বতমালা আরো অন্ততঃ দশবার তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরকালের নয়। ধ্বংস ও সৃষ্টির এক সর্বগ্রাসী প্রক্রিয়ায় এই পৃথিবীর উপরিতল অনবরত রূপ পরিবর্তন করছে।

হিমালয়ের মতো একটি পর্বত কি-ভাবে রেণু রেণু হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে তা বুঝতে হলে আমরা গোড়ায় একটি শিলাখণ্ডের দিকে তাকাব।

খোলা জায়গায় যদি একখণ্ড শিলা পড়ে থাকে ... যাবে সেই শিলার ওপরে বাতাসের জলীয় বাষ্পের রাসায়নিক ...া চলেছে। কিছুকালের মধ্যেই শিলার ওপরে ছোপ ছোপ দাগ পড়ে, শিলাটি ঝাঁঝরা হয়ে যায় এবং শিলার গা থেকে টুকরো টুকরো অংশ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে। এইভাবে অনেক অনেক বছর কাটবার পরে এক সময়ে দেখা যাবে অখণ্ড শিলাটি একস্তূপ ধুলোয় পরিণত হয়েছে। সেই ধুলো বাতাসে উড়তে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায়।

এই প্রক্রিয়ার নাম বিচূর্ণীভবন।
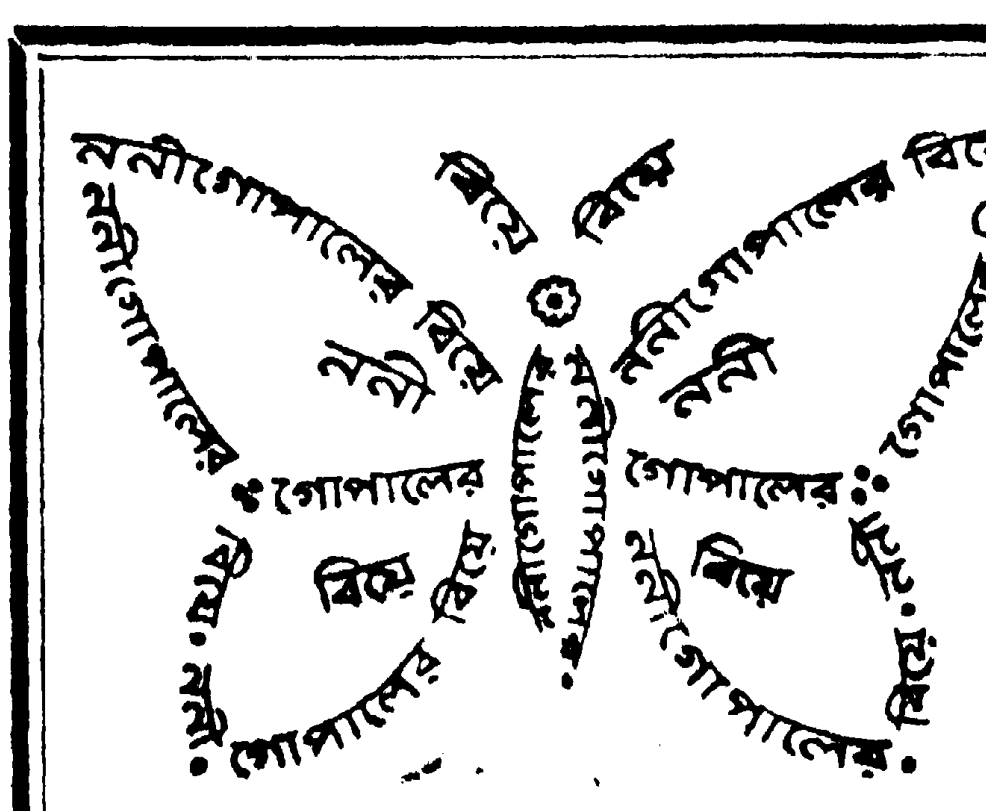
বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়া নানা-ভাবে হতে পারে কিন্তু এ-ব্যাপারে বাতাসের জলীয় বাষ্পের বা বৃষ্টির জলের ভূমিকা অনেক-খানি। শিলাখণ্ডে যদি কোনো গহ্বর থাকে তাহলে সেই গহ্বরে বৃষ্টির জল জমে আর রাত্রিবেলা (যদি রাত্রিবেলার উত্তাপ হিমাঙ্কে নেমে আসে) সেই জল জমে বরফ হয়ে যায়। জল বরফ হলে আয়তনে বাড়ে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গহ্বরটি আগে থেকেই জলে ভরাট ছিল। সেই ভরাট জল বরফ হবার পরে বাড়তি আয়তনের জায়গা খুঁজে পায় না। ফলে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড এক চাপ। দিনের পর দিন এই ব্যাপার চলতে থাকে। শেষকালে একদিন ঠিক যেন একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে এমনি-ভাবে শিলাখণ্ডটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। অনেক মস্ত মস্ত পর্বতের চূড়ো পর্যন্ত এইভাবে চৌচির হয়ে গিয়েছে।

এই বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়া পৃথিবীর সর্বত্রই ক্রিয়াশীল। কোনো কিছুরই অখণ্ড ও অপরিবর্তিত থাকার উপায় নেই। সবকিছুই ভাঙছে ও গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আজকের পৃথিবীর প্রত্যেকটি শিলাখণ্ডের এই অনিবার্য ও অমোঘ পরিণতি।

বৃষ্টির জলের দ্বিতীয় ভূমিকা হচ্ছে ক্ষয়।

শিলাখণ্ড পরিণত হচ্ছে ধুলোর স্তূপে এবং শেষ পর্যন্ত এই ধুলোর

অন্তুপকে ধুয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বৃষ্টির জল। আর বৃষ্টির জল যে শেষ পর্যন্ত এসে সমুদ্রে পৌঁছয় সেকথা আগেই বলেছি।

বৃষ্টির গড়ানে জল যখন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে তখন তা সংগে করে আনে প্রচুর পরিমাণ ধুলো। এই ধুলোগোলা জল এসে পড়ে নদীতে—তারপরে সমুদ্রে।

আমরা যাকে মাটি বলি তা এই বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ারই সাক্ষ্য, অর্থাৎ অনেক পরিমাণে বাতাসের জলীয় বাষ্প যা বৃষ্টির জলের অবদান। আমাদের পায়ের তলার এই মাটিটুকু না থাকলে আমরাই থাকতাম কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আবার এই বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়া চলে বলেই আমাদের পৃথিবী এত সুন্দর। নদী বা সমুদ্রের ধার থেকে যখন আমরা একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিই তখন অনেক সময়েই আমরা খেয়াল করি না যে, সেই নুড়িটি কী আশ্চর্য মসৃণ। এই মসৃণতা বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ের সাক্ষ্য। বৃষ্টির গড়ানে জল কোথায় কোন্ এক পাহাড়ের গা থেকে একটা পাথরের খণ্ডকে খসিয়ে নিয়ে এসেছিল। সেই পাথর অনেক বছর ধরে স্রোতের সংগে গড়াতে গড়াতে এসেছে। সেই দীর্ঘ যাত্রায় কখনো ঠোকাঠুকি হয়েছে অন্য পাথরের সংগে, কখনো ঘষা লেগেছে জমির সংগে—আর সর্বকিছুর মোট ফল হিসেবে পাথরটির এই মসৃণতা। ঠিক এই পকই প্রক্রিয়াপ ভূপৃষ্ঠে এমন বৈচিত্র্য, এমন ছন্দ, এমন ভঙ্গিমা। চাঁদের দেশে হাওয়া নেই জল নেই, কাজেই সমুদ্রও নেই বৃষ্টিও নেই। চাঁদের দেশেও পাহাড়-পর্বত, গুহা-গহ্বর আছে কিন্তু তা এত এবড়ো-খেবড়ো ও এত রুক্ষ যে পৃথিবী থেকে শুধু কল্পনায় তার চেহারা সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। মাটি বলতে আমরা যা বুঝি তাও চাঁদের নেই।

যাই হোক, পৃথিবীর কথায় আসা যাক। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর সর্বকিছুই ভাঙছে, সর্বকিছুই ক্ষয়ে যাচ্ছে। আবার এই ভাঙন ও ক্ষয় খাড়া পাহাড়ের বেলায় যতটা বেশি, সমতল জমির বেলায় ততটা নয়। কারণ পাহাড়ে বৃষ্টির জল তোড়ে নেমে আসে সমতল জমিতে জলের বেগ অনেকটা কমে যায়। এই কারণেই ভাঙন ও ক্ষয়ের মোট ফল শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে এই উঁচু-নিচু পৃথিবী ক্রমশ সমতল হয়ে ওঠে।

ওদিকে বৃষ্টির জলে ধুয়ে আসা ধুলো সমুদ্রে এসে পড়াতে সেখানেও নতুন একটি ব্যাপার ঘটতে থাকে। ধুলো চিরকালই গা ভাসিয়ে থাকতে পারে না, এক সময়ে না এক সময়ে থিতিয়ে পড়তেই হয়। এইভাবে সমুদ্রের তলদেশে স্তরের পর ধুলো জমতে থাকে এবং ওপরকার জলের প্রচণ্ড চাপে এক সময়ে তা হয়ে ওঠে পাললিক শিলা। এইভাবে ভূপৃষ্ঠের একদিকে যখন ভাঙন ও ক্ষয় চলেছে অন্যদিকে তখন স্তরের পর পাললিক শিলা জমে উঠছে। অর্থাৎ একদিকে খরচ, অন্যদিকে জমা। এই ব্যাপার অনন্ত-কাল ধরে চলতে পারে না। এক সময়ে ভূত্বকের ভারসাম্য টলে ওঠে এবং ভূত্ব-কের বিন্যাসে বড় রকমের একটা ওলোট-পালোট ঘটে যায়। হয়তো সমুদ্রের তলা থেকে মস্ত একটা দ্বীপ গা ভাসিয়ে ওঠে, হয়তো তৈরী হয়ে যায় বিরাট এক পর্বতমালা। এমনি ধরণের আরো অনেক কিছু ঘটতে পারে। হিমালয় পর্বতমালাটি পাললিক শিলায় তৈরি বলেই নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এমনি এক ওলোট-পালোটের মধ্যে গিয়েই এই পর্বতমালার জন্ম। এবং ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই বলে একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে একদিন না এক-দিন এই হিমালয় পর্বতমালাকেও রেণু রেণু হয়ে ধুলোর সংগে মিশে যেতে হবে।

পৃথিবীতে যতদিন সমুদ্র আছে তত-দিন মেঘ তৈরি হবেই হবে। আর বায়ু-মণ্ডল যদি থাকে ও সমুদ্রও যদি থাকে তা হলে বায়ুপ্রবাহ থাকবেই থাকবে। আর এই বায়ুপ্রবাহে গা ভাসিয়ে জল-ভরা মেঘের আবির্ভাব ঘটবে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে। বৃষ্টি পড়বে কখনো ঝির ঝির করে, কখনো বড় বড় ফোঁটায়। এই বৃষ্টির জল উঁচু উঁচু পর্বতের চুড়োয় তুষার হয়ে জমে থাকবে। এই বৃষ্টির জল পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ঝরনা ও নদী হয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলবে। আর এই বৃষ্টির জল দিনে দিনে রূপবতী করে তুলবে আমাদের এই পৃথিবীকে।

সৌরমণ্ডলের নটি গ্রহের মধ্যে পৃথিবী ছাড়া আর একমাত্র মঙ্গলগ্রহেই বৃষ্টি আছে। কিন্তু মঙ্গলগ্রহে মোট জলের পরিমাণ এতই কম যে, মঙ্গলগ্রহের বৃষ্টি আমাদের কাছে বৃষ্টি বলেই মনে হবে না।

আর মঙ্গল গ্রহের চেয়েও দূরে আরো যে পাঁচটি গ্রহ আছে সেখানে এমনিতেই উত্তাপ এত কম যে সমস্ত জল জমে বরফ হয়ে আছে, সুতরাং বৃষ্টিপাতের কোনো প্রশ্নই উঠে না। বুধ গ্রহে হাওয়া নেই, জল নেই। শুক্র গ্রহে ঘন মেঘ আছে কিন্তু মেঘের প্রায় সবটাই কার্বন ডাই-অক্সাইড। সেখানে ছিটে-ফোঁটা জলীয় বাষ্প আছে কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্কের শেষ নেই।

এদিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর মানুষ হওয়াটা আমাদের কাছে এক দুর্লভ সুযোগ। আর এই পৃথিবীতে বৃষ্টি যতদিন আছে ততদিন আমরাও আছি।

আর বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমরা তো বর্ষাকে আরো বেশি পছন্দ করব। কারণ, আমাদের রবীন্দ্রনাথ এই বর্ষার ওপরেই আশ্চর্য সুন্দর সব কবিতা লিখেছেন।

দেশে বিদেশে

শুভবুদ্ধি :

কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজে ডক-মজদুর ধর্মঘট আসন্ন হয়ে উঠেছিল। ধর্মঘটের নোটিশ পড়েছিল। ধর্মঘট হলে এক লক্ষ শ্রমিকের কর্মবিরতি ঘটত। কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ ভারতবর্ষের সবচাইতে সমৃদ্ধ বন্দর। আজকের দুনিয়ায় আমদানী-রপ্তানী হচ্ছে সমাজ-দেহে অপরিহার্য রক্ত সঞ্চালন। ধর্মঘট হলে এই রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যেত; বন্ধ হলে কি হয় তা বলা বাহুল্য। শ্রমিকেরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হয় কেন? ট্রেড ইউনিয়নের নিয়ম অনুসারে ইউনিয়ন আলাপ-আলোচনা চালান। প্রায়ই দেখা যায় কর্তৃপক্ষ আলোচনার যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না এবং শ্রমিকদের দাবী-দাওয়ায় কর্ণপাত করেন না অথবা কোন সিদ্ধান্তে আসতে দ্বিধা বোধ করেন। শ্রমিকদের সব দাবীই সংগত এমন না হতে পারে, হয়ও না। দাবী উপস্থিত করার দীর্ঘ তালিকা একটা রীতি এবং তা নিয়েই আপোষ-আলোচনায় কিছু বাদ পড়ে। কিন্তু আজকের এই শিল্পমুখী ভারতবর্ষে শ্রমিকেরা কেন ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হয় এবং ধর্মঘটের নোটিশ না দিলে কর্তৃপক্ষ কেন মীমাংসায় উদ্যোগী হন না এবং আপোষ-মীমাংসা হয় না একথাটি আজ ভাববার দিন হয়েছে। যে আপোষ ধর্মঘটের নোটিশ দেবার পর অথবা ধর্মঘটকালে সম্ভব হয় তা আগে কেন সম্ভব হয় না? এমনিতেই আমাদের দেশের শ্রমিকেরা তেমন শিল্প-সচেতন বা উৎপাদন-সচেতন নয়, তারপর ধর্মঘটের দিকে ঝোঁক গেলে এবং সেজন্য প্রস্তুত হলে শ্রমিকদের মনোগত ভাবটি যে-কোন সংস্থার পক্ষে ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে সেই প্রাথমিক ক্ষতি সত্বেও ধর্মঘটের আগেই মীমাংসা হল—সাধারণের পক্ষে এ এক মস্ত স্বস্তির কারণ।

জুনের মাঝামাঝি যে-কোন সময় অনির্দিষ্টকালের জন্য এ ধর্মঘট চলতে পারত। কিন্তু আপোষ হওয়ায় ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। দুদিনব্যাপী আলোচনার পর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয়েছে যে, ১৯৫৮ সালে সারা ভারত ডক মজদুর ধর্মঘটের পর যে সব মীমাংসার সর্ত হয়েছিল তা পোর্ট কর্তৃপক্ষ [illegible] ডক-মজদুরেরা মান্য [illegible]ন। ঐ মীমাংসার সর্তগুলি কার্যে পরিণত করার জন্য যে জিজিভয় কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল তাঁদের সুপারিশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং উভয় পক্ষ মেনে চলবেন। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও ভারত সরকারের নৌ-চালন মন্ত্রী শ্রী রামবাহাদুর। চুক্তি সম্পাদনের কথা শোনার জন্য যে শ্রমিকেরা অপেক্ষা করছিল তারা হর্ষধ্বনি করে ওঠে। আমরা রাজবাহাদুরের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলতে চাই—তার সব ভাল যার শেষ ভাল।

কে-কে'র জার্মাণী :

একটি জার্মান পত্রিকায় কার্টুন বেরিয়েছে। সেখানে শ্যামচাচা ও সোভিয়েট রুশিয়া যথাক্রমে নর ও নারী-বেশে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাদের সম্মুখে দুহাত ছড়িয়ে একটি বালিকা বলছে—আমার কিন্তু এখন হল বছর ষোলো। ইঙ্গিতটা হচ্ছে জার্মান সমস্যা আজ ষোলো বছর ধরে অমীমাংসিত আছে। এবং এ সমস্যার জন্ম দিয়েছেন চতুঃশক্তি, কিন্তু প্রধানত আমেরিকা ও সোভিয়েট রুশিয়া। এই সমস্যাটি যেন তাদেরই সন্তান—কিন্তু তার ভবিষ্যৎ এখনও অনির্দিষ্ট। কথা রটেছিল ভিয়েনায় দুই-কে-কে'র যখন বৈঠক হবে, তখন এ নিয়ে আলোচনা হবে। হয়েওছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, অবিলম্বে জার্মান সমস্যা সমাধানের জন্য, অথবা

জার্মাণ শান্তিচুক্তির উপসংহারের জন্য ও পশ্চিম বার্লিনকে মুক্ত শহর গণ্য করার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করা হোক। আর একটি প্রস্তাব এই যে, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর আলাপের জন্যও ছ' মাসের মধ্যে একটি বৈঠক হোক এবং চতুঃশক্তি, অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স, শান্তিচুক্তি ও জার্মান একীকরণে একমত হবেন। পশ্চিম বার্লিনে প্রতীক হিসেবে চতুঃশক্তির কিছু সৈন্য মোতায়েন রাখতেও রাশিয়ার কোন আপত্তি নেই। রাশিয়া আমেরিকা বা পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করতে চান না এসব কথাই মঃ ক্রুশ্চেভ একটি স্মারকলিপির আকারে মিঃ কেনেডির হাতে দেন।

আমেরিকার মতামত তেমন সুস্পষ্ট জানা যায়নি, কিন্তু যাকে নিয়ে কথা সে পশ্চিম জার্মানীর প্রতিক্রিয়া সর্বাংশে প্রতিকূল। পশ্চিম জার্মানীর মুখপাত্র রূপে ডাঃ আদেনার যে রকম জোরালো ভাষায় সোভিয়েট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন তাতে মীমাংসা যে কোন পর্যায়ে এবং কিভাবে হবে তা এখনও অনিশ্চিত। পূর্ব-পশ্চিম জার্মানে আলোচনা-বৈঠক সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট কিছু না বললেও পশ্চিম জার্মানী বরাবর এমন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এসেছেন; এবারই যে নেবেন এমন লক্ষণ চোখে পড়ে না। তবে ইতিহাসে দেখা গেছে বড়য় বড়য় মিল হ'লে ছোটর সব কথাই রদ হ'য়ে যায়।

বেকারের ফসল :

জেনেভায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীবাবুভাই চিনাই নাকি বলেছেন যে, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার ভারতে এক কোটি বেকার থাকবে। অংকটা ভয়াবহ; কেন না, প্রথম পরিকল্পনা বেকার সমস্যাকে স্পর্শ করেনি, দ্বিতীয়তে কিছু বেড়েছে, তৃতীয়ের ইঙ্গিতও শুভ নয়। তাঁর হিসেবটা হচ্ছে এই : আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে (১৯৬৫ সাল অবধি) ২॥ কোটি কি আর ১০ লক্ষ বেশী শ্রমিক পাওয়া যাবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান হবে ১॥ কোটি শ্রমিকের; এর বেশী হওয়া সম্ভব নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকেও তিনি এজন্য দায়ী করেছেন। শ্রীচিনাই মালিক পক্ষের প্রতিনিধি হয়ে সেখানে গেছেন। খবরে একথা স্পষ্ট নয়, এ হিসেবটা শুধু শিল্প-শ্রমিকদের ক্ষেত্র থেকে আহৃত অথবা শিল্প-শ্রমিক, কৃষি-শ্রমিক, জন-মজুর, কেরাণী প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেরই হিসেব। কিন্তু শুধু যদি এক কোটি সর্বসাকুল্যেও ধরা যায়, হিসেবটা উদ্বেগজনক। আমাদের দেশ নিঃসন্দেহে অনগ্রসর, আরো স্পষ্ট কথায়, পশ্চাদপদ: ভূমিতে বটেই অন্যত্রও বরাবরই কিছু বেকার ছিল—লোক সংখ্যার অনুপাতেও সে সংখ্যা সামান্য নয়। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথাটা খুব বড় কথা নয়। বড় কথা, এই সম্ভাব্য বৃদ্ধির হার মনে রেখেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় কিনা এই প্রশ্নটি। আমাদের দেশে সমস্যা সমাধানের একটি সহজ পথ আমরা আবিষ্কার করেছি। তার নাম জন্ম-নিয়ন্ত্রণ। জাতিবর্ণনির্বিশেষে এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ, যারা শিক্ষিত ও কিঞ্চিৎ সংস্কারমুক্ত তারা অবশ্যই এতে সহায়তা করবেন। কিন্তু এ যারা করে না তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবীতে ভৌগোলিক অখণ্ডতা বার বার ক্ষুণ্ন করতে পারে। আসলে আমাদের উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও জন্মনিয়ন্ত্রণে দুর্বল নীতি অবলম্বন বেকার সমস্যার উত্তরোত্তর তীব্রতা বৃদ্ধির কারণ। শিল্প ও কৃষির উন্নতিতে গ্রামীণ দৃষ্টি থাকলে এ সমস্যা এত তীব্র হত না।

আরও একটি ভাবনা :

প্রত্যেক রাজ্য শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য নানা পরিকল্পনা নিচ্ছে, বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করছে, শিক্ষক নিয়োগ করছে। কিন্তু যেহেতু এদের নিজস্ব বাজেটে সবটা বেড় পায় না সেজন্য ক্রমশই রাজ্যশিক্ষা ভারত সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে। এক কথায় বলা যায়, আজ সারা ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রায়ত্ত। কেন্দ্রীয় অর্থের দিকে চেয়ে রাজ্য-সরকারকে রাজ্যাধিবাসীদের জন্য শিক্ষা-খাতে অর্থ মঞ্জুর করতে হয়। কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য সর্তহীনও নয়। এর স্থায়িত্ব বা অবিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধেও কোন
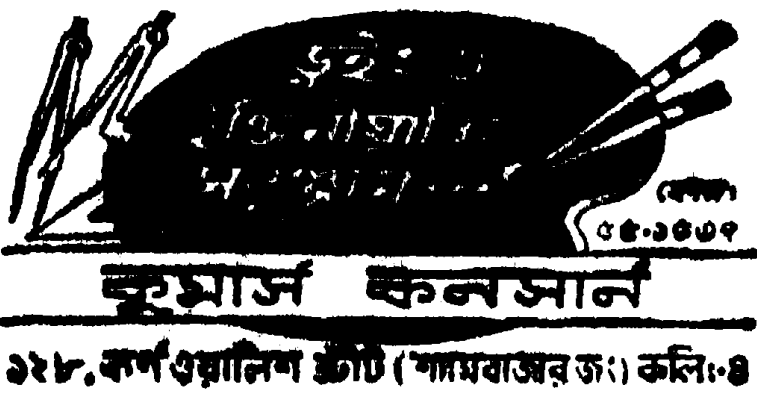
নিশ্চয়তা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-মঞ্জুরী কমিশন এমনই একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই কমিশনের সাহায্য এখন পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী কলেজগুলির পক্ষে অপরিহার্য। পশ্চিমবঙ্গে এমন ১২৫টি বেসরকারী কলেজ আছে। একটি খবরে দেখা যাচ্ছে এই সাহায্য বন্ধ হবার উপক্রম। বন্ধ যদি হয় তবে কলেজে কলেজে নিদারুণ অর্থাভাব দেখা দেবে। শোনা যাচ্ছে, আমাদের সরকার নয়াদিল্লীতে জোর তদ্বির চালাচ্ছেন। আশ্চর্য এই, শিক্ষার উন্নতি হবে এজন্য একদিকে কলেজগুলির ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস করার নির্দেশ জারী হয়েছিল আর একদিকে শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য কমিশন ১৯৫৭ সাল থেকে অর্থসাহায্য দিয়ে আসছেন; কিন্তু ১৯৬২ সালে তা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে করে, ১৯৬২ সালে কি পশ্চিম-বঙ্গ তথা ভারতবর্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থার ইতি হবে, না কি, এর মধ্যেই সবাই উচ্চশিক্ষিত হ'য়ে যাবে? ছাত্রসংখ্যা কমানো হয়েছে, শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হয়েছে, কলেজ কর্তৃপক্ষেরা কমিশনের সাহায্য বন্ধ হলে তাল সামলাবেন কেমন করে? কলেজের নিজস্ব আয় ছাড়া আর থাকে রাজ্যসরকারের ম্যাচিং গ্রান্ট। কিন্তু রাজ্যসরকারের বাজেটেও দেখা যায় রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী। ঐ সেই পরিকল্পনা কমিশন। এখন সবকিছু পরিকল্পনার মধ্যে এবং এই পরিকল্পনা কেন্দ্রায়ত্ত। আমাদের বক্তব্য শিক্ষাব্যবস্থা এইভাবে কেন্দ্রায়ত্ত ক'রে অকস্মাৎ কেন্দ্রচ্যুত করা মারাত্মক অপরাধ। কেউ কেউ আরও পাঁচ বছরের জন্য সুপারিশ করছেন। আমরা বলি, পাঁচ বছর কেন? শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়া ঐ টাকা কোথায় যাবে? শিক্ষার চাইতে কোন্ জিনিস বেশী মূল্যবান, খাওয়া-পরা বাদে? একটা বন্দুক তৈরীর চাইতে একটা শিক্ষিত মানুষ তৈরী করা রাষ্ট্রের পক্ষে অনেক মহত্তর প্রচেষ্টা। কি কেন্দ্রীয় কি রাজ্যসরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য না করেন; ওভাবে কোন শাসক সম্প্রদায়ই বেশী দিন টি'কতে পারেনা—যত পরমায়ু নিয়েই তাঁরা আসুন।

এদিকে একই দিনে দেখছি আর একটি খবর এবং নয়াদিল্লীরই খবর। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিক্ষার উন্নয়নে ৪১১ কোটি টাকা নিয়োগ করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। ইউনেস্কো ও ইউনেস্কোর কোন কোন সদস্য উল্লেখ-যোগ্য সাহায্য করবেন। এ সম্পর্কে যিনি কথাবার্তা কয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের সেই সচিব শ্রী পি. এন. কৃপাল বলেছেন, এ যাবৎ বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার জন্যই ইউনেস্কোর সাহায্য পাওয়া গেছল, এবার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ সাহায্য পাওয়া যাবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেবার যে পরিকল্পনা আছে তার কাগজ স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড বছরে দশ হাজার টন করে দেবেন। পাঠ্যপুস্তকগুলি ছাপাবার জন্য জার্মানী মুদ্রণ-যন্ত্র দেবে। এসবই সুখের ও আশার কথা—কিন্তু এদিকে যে সমূহ বিপদ ঘটতে চলেছে।

জোট-বহির্ভূত :

আজ একথা সুবিদিত যে, যথাক্রমে সোভিয়েট রুশিয়া ও আমেরিকার নেতৃত্বে পৃথিবী দুটি শিবিরে ভাগ হয়েছে।

কিন্তু এমন কয়েকটি দেশ আছে যারা বলছে আমরা কোন জোটে নেই. আমরা নিরপেক্ষ। যারা জোটভুক্ত তারা বলে কেউই এজগতে নিরপেক্ষ নয়, ঝোঁকটা বা প্রবণতাটুকু ঠিকই থাকে——বিপর্যয়কালে কোন একটাতে জুটে যায়। তবু নিরপেক্ষতার দাবীটা ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে। এই উদ্দেশ্যে সকল নিরপেক্ষ দেশগুলি—নিশ্চয়ই জোটবদ্ধ হবার জন্য নয়—আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ কোথাও সম্মিলিত হ'তে যাচ্ছেন। এর অর্থ, তাঁদের যেসব সমস্যা আছে অথচ জোটবন্দীদের প্রতিরোধে সমাধান হচ্ছে না, তারই একটা নিরাকরণের পথ বের করা। কায়রোতে এ নিয়ে এক বৈঠকও হয়ে গেছে। ১৩ই জুন এই বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, ২২টি রাষ্ট্র এবিষয়ে এক মতাবলম্বী এবং ১লা সেপ্টেম্বর যুগোশ্লাভিয়ার গোষ্ঠি বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলির এক সম্মেলন হবে। এই সব রাষ্ট্রনেতা যে এক জায়গায় মিলতে চাইছেন এটি অবশ্যই ভরসার কথা। কিন্তু দুই শিবিরে বিভক্ত শক্তিপুঞ্জ যেসব বিধ্বংসী আয়ুধ নিয়ে আস্ফালন করেছেন সেখানে এই অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলির সংকল্প দীর্ঘায়ু হতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। কেন না, বারে বারে বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেছে এই নিরপেক্ষ প্রতিরোধ শক্তিগুলিকে বৃহত্তর সংগ্রামী রাষ্ট্রগুলি অনায়াসেই পযুদস্ত করেছে। জোট-বহির্ভূত থাকার আশংকা সেইখানে। একথা আমাদের ভাববার, কেন না, আমাদেরও নিরপেক্ষ নীতি: সুতরাং, আমরা নিশ্চয়ই আশা করব, এই নিরপেক্ষ সম্মেলনের নৈতিক চাপ পড়বে ঐ দুই শিবিরে।

গোয়া :

শাসক হিসেবে ইংরেজরা যখন এদেশ ছেড়ে যায় তখন গোটা ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদভুক্ত ছিল না। কিছু জায়গা ফরাসীদের, কিছু জায়গা পর্তুগীজদের ছিল। ফরাসীরা এক রকম মীমাংসায় এসেছে কিন্তু পর্তুগীজরা বাগ মানছে না। গোয়া, দামন, দিউ তাদের সাম্রাজ্য থেকে তারা বিচ্ছিন্ন করতে রাজী নয়। পর্তুগীজদের মনোভাব আফ্রিকার আংগোলাতেই প্রতিফলিত। সেখানে তারা কৃষ্ণকায় আংগোলীজদের নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালিয়েছে। পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মনে পর্তুগীজ বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে বটে কিন্তু এই পৃথিবীরই বড় বড় কয়েকটি রাষ্ট্রশক্তি এদের সাহায্য করছে। নইলে পর্তুগালের এত দম্ভ হত না। তবু ভারতের স্বাধীনতা লাভের কিছু পরেই গোয়াকে কেন্দ্র করে এক মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। নানা রাজ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা সীমান্ত অতিক্রম করে এবং তাদের উপর অত্যাচার হয়। দুঃখের বিষয়, আন্দোলন অব্যাহত থাকতে থাকতেই ভারত সরকার এই আন্দোলনের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেন এবং আমেরিকা পর্তুগালকে গোয়াচ্যুত না করার জন্য হুমকি দেন। আন্দোলন রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সে-সময় এই ভরসা দেন যে, গোয়া সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়েই মিটবে। তারপরও তিনি মাঝে মাঝে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু গোয়ার মুক্তি হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর অবশিষ্ট খণ্ড ভারতের পক্ষে গোয়া একটি লজ্জাকর কলংক হয়ে আছে। যে স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বশক্তিমান বৃটিশ শাসকদের বলতে পারল—ভারত ছাড়ো এবং ছাড়তে বাধ্য করল তার ঢেউ গোয়ার মতো একটি মানচিত্রের বিন্দুতে এসে প্রত্যাহত হয়ে আছে। কিন্তু মুক্তি-প্রয়াসী জনসাধারণ নিরাশ হয়নি। তারা আবার আন্দোলনে উদ্যোগী হচ্ছে। বোম্বাইয়ের এক সভায় কংগ্রেস কম্যুনিস্ট পি এস পি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের এক জনসভায় ভারত সরকারকে অবিলম্বে গোয়ামুক্তির জন্য ফলপ্রসূ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ১৯৬১ সালেই যেন তা হয়। সত্যি, এ কলংক আর কত দিন সহ্য করতে হবে?

আংগোলার অভ্যন্তরে :

আফ্রিকায় পর্তুগীজ অধিকৃত আংগোলায় যে দ্বন্দ্ব চলেছে তাতে বিদ্রোহীদের শক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর [illegible] প্রধানতঃ আন্তরিক শক্তি, দুর্জয় মনোবল। পক্ষান্তরে নানা বৃহৎ শক্তি সমর্থিত পর্তুগাল সমরাস্ত্রবলে ভেতরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাইছে। কংগো বেলজিয়ামের হাত থেকে স্খলিত হওয়ায় আংগোলা বা আংগোলীজদের কিছু সুবিধে হচ্ছে। কংগোর সীমান্ত তাদের অনুকূল—অস্ত্রশস্ত্র যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে তাও ঐ পথে। ফলে আগে যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থান ঘটছিল এখন তা এক সঙ্ঘবদ্ধ রূপ নিয়েছে। আংগোলায় প্রচুর অশিক্ষিত পর্তুগীজ আছে—যাদের তুলনায় বহু কৃষ্ণকায় আংগোলীজ কাজের উপযুক্ত। কিন্তু আংগোলীজরা কৃষ্ণকায় বলেই সে সব কাজ পেত না বা পায় না। এই নিয়ে স্বভাবতই অসন্তোষের সঞ্চার হয় এবং পর্তুগীজ পীড়নে আজ সেই অসন্তোষ সারা আংগোলায় সঞ্চারিত হয়েছে। এখন আংগোলাকে পর্তুগীজ কবলমুক্ত করাই তাদের লক্ষ্য। কেউ কেউ এরকম মন্তব্য করেছেন যে, আংগোলা যদি মুক্তি পায়ও (পাবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম), আংগোলীজরা শাসনকার্যের উপযুক্ত হবে না: কংগোর মতই বিবাদ দেখা দেবে। মুক্তিকামীরা বলে, বেশতো অরাজকতার মধ্যেই আমাদের রেখে যাও—দোহাই তোমাদের, তোমরা যাও।

ঘটনা প্রবাহ

ঘরে—

৯ই জুন—২৬শে জ্যৈষ্ঠ : কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদের অভিযান কমিটি কর্তৃক শাস্ত্রী ফরমুলা অগ্রাহ্য—বাংলা-ভাষার দাবী এড়াইয়া যাওয়ায় গ্রহণের অযোগ্য—দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলিতে থাকিবে।

১১ই সেপ্টেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট—কলিকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা—রাজ্য সরকার কর্তৃক শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া পূরণে অস্বীকৃতির জের।

১০ই জুন—২৭শে জ্যৈষ্ঠ : ভাষা সমস্যা সমাধানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নূতন ফরমুলা—সকল রাজ্যকেই বহুভাষী বলিয়া ঘোষণার দাবী—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব।

উড়িষ্যায় অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন—বিধানসভায় মোট ১৪০টি আসনের মধ্যে ৮২টি আসন অধিকার।

দিল্লীতে ভারতীয় মুসলিম সম্মেলন সুরু—শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের জন্য সম্মেলন সভাপতি ডাঃ সৈয়দ মামুদের দাবী।

১১ই জুন—২৮শে জ্যৈষ্ঠ : করিমগঞ্জ সহরে দূরাগত পাঁচ হাজার গ্রামবাসীর মিছিল—বাংলাকে অন্যতম সরকারী ভাষা করার দাবীতে প্রচন্ড বিক্ষোভ।

১২ই জুন—২৯শে জ্যৈষ্ঠ : 'আসামে ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলীবর্ষণ অন্যায় ও অযৌক্তিক'—বিশিষ্ট আইনজীবীদের বে-সরকারী তদন্ত কমিশনের রায়—শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে হত্যা ও নির্যাতন পূর্বপরিকল্পিত বলিয়া মন্তব্য।

'শাস্ত্রী ফরমুলা ও নেহরুর (প্রধান-মন্ত্রী) স্থিতাবস্থা প্রস্তাব কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে'—করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও শিলচর কংগ্রেস কমিটিত্রয়ের স্পষ্ট অভিমত।

১৩ই জুন—৩০শে জ্যৈষ্ঠ : করিমগঞ্জে চার সহস্র গ্রামবাসীর বিরাট মিছিল—শিশুক্রোড়ে শত শত মহিলার যোগদান—শাস্ত্রী প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে ধিক্কার।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বহু ভাষাভাষী রাজ্য গঠন প্রস্তাবকে শ্রীজ্যোতি বসুর অভিনন্দন—রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত প্রস্তাবের খুঁটিনাটি আলোচনা।

তেজপুরের অনতিদূরে ওটাং চা বাগানে মারমুখী জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—১ জন নিহত ও ১১ জন আহত হওয়ার সংবাদ।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ কে এস কৃষ্ণাণ (৬২) নয়াদিল্লীতে জীবন-দীপ নির্বাণ।

গোপালগঞ্জে (পূর্ব পাকিস্থান) সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণে পাঁচশত লোক হতাহত—ভারত সরকারের নিকট ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী এস কে চৌধুরীর রিপোর্ট।

১৪ই জুন—৩১শে জ্যৈষ্ঠ : হাইলা-কান্দিতে আসাম রাইফেলসের হামলা ও অত্যাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল—পুলিশী বর্বরতার তীব্র নিন্দা—১৯শে জুন সমগ্র কাছাড়ে হরতাল পালনের প্রস্তাব।

'মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট অবাঞ্ছনীয়'—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতি—ধর্মঘট না করার জন্য আবেদন।

অমরাবতীতে অনশনরত কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রী এ কে গোপালনকে গ্রেপ্তার—গ্রেপ্তারের পর কোট্টায়াম হাসপাতালে স্থানান্তরকরণ—গোপালন প্রসঙ্গে কেরল বিধানসভায় স্পীকার কর্তৃক মুলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত—১ম শ্রেণী হইতে বাংলা, ৩য় শ্রেণী হইতে ইংরেজী, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মানে হিন্দী ও ৮ম শ্রেণীতে সংস্কৃত বাধ্যতামূলক।

১৫ই জুন—৩২শে জ্যৈষ্ঠ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের স্নাতক কেন্দ্রের নূতন নির্বাচনের বিরুদ্ধে আবেদন—কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর রুল জারী।

বদ্রীনাথের পথে দুইটি বাস দুর্ঘটনা—কয়েকজন মহিলা-সহ ৪৪ জন তীর্থযাত্রী নিহত।

বাইরে—

৯ই জুন—২৬শে জ্যৈষ্ঠ : পর্তুগালকে অবিলম্বে অ্যাঙ্গোলায় অত্যাচার বন্ধ করার নির্দেশ—রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গ্রহণ—পর্তুগাল কর্তৃক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার হুমকী।

সিকিমের রক্ষী-বাহিনী সংগঠনে ভারত অংশ গ্রহণে সম্মত—ভারত সরকার ও সিকিমের মহারাজকুমারের মধ্যে আলোচনান্তে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১০ই জুন—২৭শে জ্যৈষ্ঠ : আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসকল্পে সর্বতোভাবে চেষ্টার সংকল্প—ক্রুশ্চেভ ও কেনেডির ভিয়েনা বৈঠকের গুরুত্ব—সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভের মন্তব্য।

জার্মান শান্তি চুক্তি সম্পাদনে অবিলম্বে সম্মেলন আহ্বানের দাবী—পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট সোভিয়েট ইউনিয়নের স্মা র ক লি পি—প শ্চি ম বার্লিনকে স্বাধীন নগরীতে পরিণত করিতে হইবে।

১১ই জুন—২৮শে জ্যৈষ্ঠ : লাওস সম্মেলনের অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হোম ও সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকোর বৈঠক—সাফল্য সম্পর্কে পশ্চিমী কূটনৈতিক মহলে আশার সঞ্চার।

বিশ্বের নিরপেক্ষ জাতিসমূহের শীর্ষ সম্মেলন—১লা সেপ্টেম্বর (১৯৬১) যুগোশ্লাভিয়ায় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত—কায়রো-এ প্রস্তুতি-বৈঠকের আলোচনার ফলাফল।

১২ই জুন—২৯শে জ্যৈষ্ঠ : এক সপ্তাহ পর লাওস-সংক্রান্ত জেনেভা সম্মেলন পুনরায় আরম্ভ—লাওসে বিভিন্ন দলের নিকট ইঙ্গ-সোভিয়েট আবেদন প্রেরণের ব্যবস্থা—জুরিখে লাওসের বাম, দক্ষিণ ও নিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দের বৈঠক।

'আণবিক পরীক্ষা আর বন্ধ রাখা যায় না'—প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের উক্তি।

১৩ই জুন—৩০শে জ্যৈষ্ঠ : 'লাওসের মাটিতে বিদেশী সৈন্য ও সিয়াটো জঙ্গী সংস্থা দায়ী—জেনেভায় ১৪ জাতি লাওস সম্মেলনে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল চেন ই'র মন্তব্য।

১৪ই জুন—৩১শে জ্যৈষ্ঠ : পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়া বন্ধের প্রশ্নে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বোঝাপড়া—ওয়াশিংটন সফরকালে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হোমের প্রস্তাব।

কঙ্গোলী সৈন্য কর্তৃক ভারতীয় দূতাবাস কর্মচারী গ্রেপ্তার—কঙ্গোর মোবুতু-কাসাবুভু দলের দৌরাত্ম্য অব্যাহত।

১৫ই জুন—৩২শে জ্যৈষ্ঠ : 'লাওসের মাটিতে বিদেশী সৈন্য ও বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি বরদাস্ত করা হইবে না'—জেনেভায় ১৪ জাতি লাওস সম্মেলনে লাওসের নিরপেক্ষ নেতা প্রিন্স সৌভান্না ফৌমার ঘোষণা।

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তির এলাকা সম্প্রসারণ করিতে চাই'—পিকিং-এ ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণোর সম্বর্ধনা-সভায় চীনা প্রধান-মন্ত্রী চৌ এন-লাই-এর ঘোষণা।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর
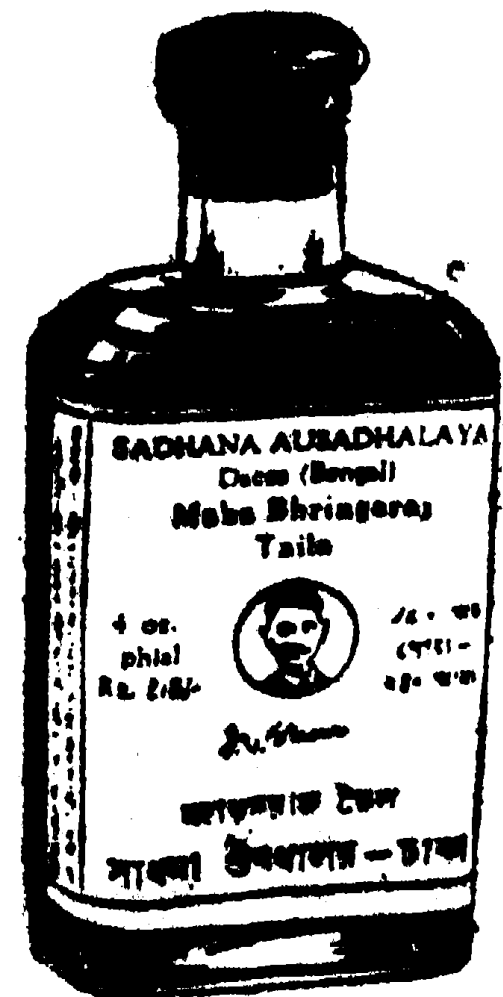
পড়াশোনার কথা

সেদিন UNESCO থেকে World Facts and Figures নামে একখানা বই বেরিয়েছে। পাতার সংখ্যায় এই বই ছোট বটে, কিন্তু পৃথিবীর লেখাপড়া বা পড়াশোনার ব্যাপারে এতে একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হয়েছে। এই বইয়ে সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা জানতে পাই—

সবচেয়ে আগ্রহী সংবাদপত্র-পাঠক হচ্ছে ইংরাজ জাতি।

সবচেয়ে কোন দেশে লাইব্রেরীর সংখ্যা বেশী, কথা উঠলে দেখা যায়—রাশিয়ার সাধারণ লাইব্রেরীর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। অবশ্য লাইব্রেরীর সংখ্যা বেশী হলেই সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যাও সব চেয়ে বেশী হবে—এই সিদ্ধান্ত আমাদের মনে সব সময়ে উঠতে পারে। কিন্তু গণনা করে দেখা গিয়েছে, মার্কিন দেশে ছাত্রসংখ্যা পৃথিবীতে যে কোনো দেশের চেয়ে বেশী; যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রসংখ্যা রাশিয়ায় অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় বেশী।

এইবারে এখানে বিভিন্ন দেশের ইউনিভার্সিটি ছাত্রসংখ্যার বিবরণ দেওয়া যাক। এই হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মার্কিন দেশ—এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩,২৩৬,৪১৪; রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা— ২,২৬০,০০০ এবং ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা—৮৩৩,৪৫০; জাপানের ছাত্রসংখ্যা—৬৩৬,২৩২; ফ্রান্সের ছাত্রসংখ্যা—২২৬,১৭৩; জার্মাণীর ছাত্রসংখ্যা—১৬৪,০১৫; সর্বশেষে ইটালীর ছাত্রসংখ্যা—১৬৩,৬৪৫। অতএব দেখা যাচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হিসাবে ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

দেশের সাধারণ শিক্ষার সহায়ক হিসাবে যাদুঘর বা মিউজিয়াম একটি শিক্ষাপ্রদ স্থান। আধুনিক গণনা অনুসারে রাশিয়ায় প্রতি বৎসরে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ লোক মিউজিয়াম দর্শন করে। ইংল্যাণ্ডে মিউজিয়ামে যায় প্রতি বৎসর ১০,৯১৪,০০০ জন আর জাপানে প্রতি বৎসর যায় ১০,৪৩৯,০০০ জন লোক।

এবারে বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্র-পাঠকের সংখ্যার একটা হিসাব নেওয়া যাক। ইংল্যাণ্ডে হাজারকরা গড়পড়তা ৫৭৩ জন, সুইডেনে ৪৬৪ জন, লাক্সেমবার্গে ৪২৯ জন এবং ফিনল্যাণ্ডে ৪২০ জন লোক খবরের কাগজ পড়ে।

দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা মার্কিন দেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী—সংখ্যায় ১৭৪৫খানা, কিন্তু হাজারকরা মার্কিন নরনারীর মধ্যে মাত্র ৩২৭ জন দৈনিক কাগজ কেনে; জনসংখ্যার প্রতি হাজারের তুলনায় ক্রেতার সংখ্যা কম হলেও, পত্র-সংখ্যা হিসাবে মার্কিন দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা সবচেয়ে বেশী। সেইজন্যে মার্কিন দেশে নিউজপ্রিন্টের ব্যবহার বা খরচ অন্যান্য দেশের তুলনায়ও সবচেয়ে বেশী। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জনপ্রতি বৎসরে নিউজপ্রিন্টের খরচ হচ্ছে ৩৩·৬ কিলোগ্রাম (প্রতি কিলোগ্রাম ২·২ পাউণ্ড)। জনপ্রতি কাগজ খরচ হিসাবে এইটাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এর পরে অস্ট্রেলিয়া—সেখানে জনপ্রতি খরচ হয় ২৭·২ কিলোগ্রাম এবং তার পরে নিউজিল্যাণ্ড—সেখানে জনপ্রতি খরচ হচ্ছে ২৫·৫ কিলোগ্রাম কাগজ।

এবারে সিনেমার ছবির সংখ্যার একটা সাম্প্রতিক হিসাব দেওয়া যাক। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, প্রতি বৎসর জাপানে সবচেয়ে বেশী ছবি নির্মাণ হয়। ১৯৫৮ সালে জাপানে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির সংখ্যা ৫১৬, ভারতবর্ষে ২৯৫, যুক্তরাজ্য ২৮৮, হংকং-এ ২৪০, ফ্রান্সে ১২৬, আর ইংল্যাণ্ডে ১২১। এই তো হোল প্রতি দেশের বৎসরে নির্মিত ছবির সংখ্যা। কিন্তু কোন দেশের লোকরা সবচেয়ে বেশী ছবি দেখে? এর উত্তর হচ্ছে, অস্ট্রিয়া দেশবাসী।

কোন দেশে কত বই ছাপা হয়, তার হিসাব অবশ্য প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয়। সংখ্যা হিসাবে প্রতি বৎসর কোন দেশ সবচেয়ে বেশী বই প্রকাশ করে—তার হিসাব নিতে গেলে দেখা যায়, প্রতি বৎসরেই এর পরিবর্তন হচ্ছে। বেশী প্রকাশের সম্মান, প্রতি বৎসর এক দেশের মধ্যে আবদ্ধ নেই। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, নতুন বই প্রকাশন হিসাবে রাশিয়া প্রথম, জাপান দ্বিতীয়, ইংল্যাণ্ড তৃতীয়, পশ্চিম জার্মাণী চতুর্থ, মার্কিণ পঞ্চম, আর ফ্রান্স ষষ্ঠ। পৃথিবীময় পড়াশোনার সাম্প্রতিক হিসাব এইরকম।

ইংরাজি সাহিত্যের সম্মানিত পদ

সম্প্রতি বিলাতে Companions of Literature নামে একটি সম্মানিত পদ (order) স্থাপিত হয়েছে। এই সম্মানিত সমিতিতে (Companion) মাত্র দশ জন বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক সভ্য হতে পারবেন। একজন মৃত হলে তবে আর একজন সাহিত্যিককে সভ্য করা যেতে পারে। এই নতুন Companions of Literature-কে ফরাসী আকাদমীর সংগে তুলনা করা যেতে পারে। ফরাসী আকাদমীর নির্দিষ্ট সভ্য সংখ্যা ৪০ জন, যাঁদের বলা হয় 40 immortals। ইংল্যাণ্ডের এই নবলব্ধ সম্মানপ্রাপ্ত পাঁচজন বিখ্যাত সাহিত্যিকদের নাম—স্যার উইনস্টন চার্চিল (History of the English Peoples), সোমারসেট মম (Of Human Bondage), জন মেসফিল্ড (Sea Fever), ই এম ফর্স্টার (Pasage to India), জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ান (English Revolution)।

'পেপার ব্যাক' বই

সম্প্রতি যাঁরা ইউরোপে বা আমেরিকায় বেড়াতে গিয়েছেন, সেখানে 'পেপার ব্যাক' বইয়ের ছড়াছড়ি দেখে তাঁরা অবাক হবেন। 'পেপার ব্যাক' অর্থাৎ কাপড় বা বোর্ড দ্বারা বাঁধানো বই নয়; সোজাসুজি সাধারণ শক্ত ও মোটা কভার মোড়া বই। কাগজও সস্তা দরের। এই 'পেপার ব্যাক' বই এখন বইয়ের দোকানের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে। ওষুধের দোকান, স্টেশনারী দোকান, স্টেশনে, এয়ারপোর্টে, রাস্তায় রাস্তায়, —প্রায় সর্বত্রই এই বই এখন বিকোচ্ছে

পাওয়া যায়। 'পেপার ব্যাক' বইয়ের দাম কম, দেখতেও সুন্দর। অনেক দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য ও আবশ্যকীয় বই এই 'পেপার ব্যাক' সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে ছাত্র ও শিক্ষিতদের বিশেষ অভাব দূর করেছে।

২৫ বৎসর আগে এই ধরনের বই প্রথম প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে গত বৎসর আমেরিকায় প্রতি-দিন প্রায় একলক্ষ 'পেপার ব্যাক' সংস্করণ বিক্রি হয়েছে। এই অভাবনীয় বিক্রি থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, আমেরিকার এই ধরনের বই শিক্ষার ও সংস্কৃতির একটি প্রয়োজনীয় খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে আমেরিকার পুস্তক ব্যবসায়ের সমস্ত লাভের এক-পঞ্চমাংশ লাভ এই 'পেপার ব্যাক' থেকে আসে এবং এই সংস্করণে এখন ১২,০০০ বিভিন্ন নামের বই প্রকাশিত হয়েছে।

সব রকম বিষয়ের বইই এখন এই 'পেপার ব্যাক' সংস্করণে প্রকাশিত হয়—যেমন, ডিটেক্‌টিভ, উপন্যাস, ছোটগল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ছোট ছোট এনসাইক্লোপিডিয়া, মূল্যবান গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ ইত্যাদি। হালকা বই ছাড়া- ইতিহাস, জীবনী, ক্লাসিক্স, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ের বইও 'পেপার ব্যাকে' প্রচারিত।

নতুন বই

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ— হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। দাম—সাত টাকা।

বর্তমান ১৯৬১ সাল মনস্বী কর্মবীর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকীর বৎসর। তাঁর জীবন ও কর্মের বিস্তৃত আলোচনা করে এই গ্রন্থের প্রকাশ বর্তমান বৎসরে খুবই সময়োচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁকে কবি সেকালের শান্তিনিকেতনে অন্যতম শিক্ষক হিসাবেও পেয়েছিলেন। পরে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়, কিন্তু শ্রদ্ধায় কোন ঘাটতি হয়নি। ব্রহ্মবান্ধবের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "......তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর পক্ষে বৈদান্তিক—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে। ......

"এমন সময় লর্ড কার্জন বঙ্গ বঙ্গচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হলেন।... বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড ম্যাক্‌লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে।..."

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে বাংলাদেশেই। সেই জাতীয় ভাবধারার প্রসার ও পুষ্টি সাধনের জন্যে ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' কাগজ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কাজেই ব্রহ্মবান্ধবকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে এ গ্রন্থে যে পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে তার উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

গ্রন্থের সূচনায় অন্যতম প্রবীণ বিপ্লবী এবং সুপন্ডিত সমাজতত্ত্ববিদ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সম্বলিত থাকায় এর মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে।

আমরা গ্রন্থটির প্রচার কামনা করি।

কানু কহে রাই : শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। দাম ২-৫০ নয়া পয়সা।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে প্রধান গুণ হল, লেখার মুন্সীয়ানা। তাঁর অত্যন্ত সাবলীল এবং কৌতুকোজ্জ্বল কাহিনীগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, ঠিক যেন লেখকের সামনে বসে তাঁর মুখ থেকেই গল্পগুলি শুনছি। পাঠকের সঙ্গে এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করা সকল লেখকেরই কাম্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, খুব সহজপ্রাপ্য নয়। শরদিন্দুবাবু সেই বিরল ভাগ্যবানদেরই অন্যতম।

'কানু কহে রাই' দ্বিতীয় মুদ্রণ। এতে 'কানু কহে রাই', 'বড় ঘরের কথা', 'কল্পনা', 'অপদার্থ', 'নিরুত্তর', 'অষ্টমে মঙ্গল', 'ভূত ভবিষ্যৎ', 'ভ্রান্তিভঞ্জন' 'গ্রন্থি রহস্য', ইত্যাদি বারোটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই স্বতন্ত্র এবং চিত্তাকর্ষক। প্রথম প্রকাশের পর তাদের ঔজ্জ্বল্য একটুও কমেনি, বরং বেড়ে গেছে।

এক সূত্রে গাঁথা— (অনুবাদ), বোম্মানা বিশ্বনাথন্। প্রকাশক—গ্রন্থবিহার, কলিকাতা। দাম—তিন টাকা।

একসূত্রে গাঁথা হয়েছে সতেরটি গল্প, ভারতের বারোটি ভাষার অবদান। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প লেখকের সংখ্যা কম নয়। বাংলা গল্পের মানও যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু তাই বলে ভারতের অন্যান্য ভাষায় রচিত গল্পের বিষয়ে উদাসীন থাকা আমাদের মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার একটা বড় কারণ এই যে, ভাষার ব্যবধান যতই থাক, রাজনীতির দিক দিয়ে এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আমরা অন্যান্য ভাষাভাষীদের সঙ্গে একই কাঠামোর মধ্যে বাস করছি। এবং পরস্পরকে বুঝে নেওয়া আমাদের অন্যতম প্রধান জাতীয় দায়িত্ব। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে যত সহজে ও আনন্দের সঙ্গে এ পরিচয় সমাধা হয়, এমন আর কিছুর দ্বারাই সম্ভব হয় না। বাঙালী পাঠকের কাছে এমন একটি সুযোগ উপস্থিত করার জন্যে অনুবাদক আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। অনূদিত বারোটি গল্প তিনি মূল থেকেই অনুবাদ করেছেন, পাঠকের পক্ষে এটাও কম তৃপ্তির কারণ নয়। অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ গল্পে যে মূল কাহিনীর সৌরভ অনেকটাই টিকে আছে এমন আশা করা অন্যায় হবে না। শ্রীবিশ্বনাথনকে আমরা এই ঈষৎ অবহেলিত অনুবাদ কর্মে ভবিষ্যতেও ব্যাপৃত দেখতে চাই।

অন্য এক সমুদ্র—শান্তিকুমার ঘোষ। প্রকাশক—এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা।

'অন্য এক সমুদ্র' কবিতার বই।

কবিতার ক্ষেত্রে শান্তিকুমার ঘোষ নবাগত নন। তাঁর অন্য পুস্তকও চোখে পড়েছে। প্রথমে তাঁর কবিতার কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ এবং তার প্রকৃতি। বর্তমান বইয়ে তাঁকে দেখা গেল বাংলা ভূপ্রকৃতি ছাড়িয়ে ইউরোপীয় পরিবেশে। যাই হোক, কবিতায় তিনি কিন্তু তেমন সার্থকভাবে ঐ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে উত্তীর্ণ করতে পারেন নি। তাঁর যে একটি শান্ত সমাহিত আত্মপ্রকাশের রীতি ছিল সেইটেই মনে হয় তাঁর স্বাভাবিক ধর্ম। আশা করি তিনি অচিরেই উচ্ছাশার হাতছানি উপেক্ষা করে স্বধর্মে ফিরে আসবেন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা :

পংক তিলক : বিশ্বভারতী চিত্র-মন্দিরের প্রথম চিত্র; ১৪২৫২ ফুট দীর্ঘ ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্তী; কাহিনীঃ রাসবিহারী লাল; সংগীত-পরিচালনা : সুধীন দাসগুপ্ত; চিত্রগ্রহণ : অজয় মিত্র; শব্দগ্রহণ : শিশির চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশ: সুনীল সরকার; সঙ্গীত গ্রহণ: বি. এন. শর্মা ও কৌশিক; ভূমিকায় : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, তরুণ-কুমার, তরুণ রায়, উৎপল দত্ত, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মাষ্টার দীপক, ছায়া দেবী, সবিতা বসু, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতি। বিশ্বভারতী পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল ১৬ই জুন থেকে উত্তরা, উজ্জলা, পূরবী ও শহরতলীর অপরাপর চিত্র-গৃহে দেখানো হচ্ছে।

এই দীর্ঘ ছবিটিতে সবই আছে। সৎ-অসৎ-এর দ্বন্দ্ব, নীরব প্রেম, মুখর প্রেম, দুর্বৃত্তদের জীবন, আড্ডা, নাচগান, সত্যাশ্রয়ী মানুষের অবস্থাবৈগুণ্যে সাময়িক পতন, পতিপ্রাণা নারীর সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, জাল ঔষধ বিক্রয়কারী ধনীর একমাত্র পুত্রের জাল ঔষধ প্রয়োগের ফলে মৃত্যু, অবহেলিত জীবনযাপনে বাধ্য কিশোর-বালকদের প্রতি সমবেদনা, অন্ধের চক্ষু লাভ, কিশোর বালকের আত্মত্যাগ প্রভৃতি বহু উপাদানের ভিড় এই 'পংক তিলক' চিত্রে। অনেক সামাজিক অন্যায়, অবিচার এবং ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে প্রচুর বক্তৃতা ও গান শুনতে পাওয়া যায় এই ছবির ভিতরে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছি, এত আয়োজন সত্ত্বেও কেন ছবিটি যথেষ্ট সার্থক হ'য়ে উঠল না এই কথা ভেবে। কোন্ গল্প আজকের দিনে দর্শকের হৃদয়গ্রাহী হবে এবং গল্পকে ছবির মাধ্যমে বক্তব্যর বিশেষ শৈলী বা টেক্‌নিক্‌টি কি, এ সম্পর্কে কোনো সরল ফর্মুলা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতি ক্ষেত্রেই তার ছক যায় পাল্‌টে। পরিচালক শ্রীচক্রবর্তী এবার ঠিক জায়গায় ঘা দিতে পারেন নি। কিন্তু শিল্পী হিসাবে তিনি যদি তাঁর সাধনা থেকে বিচ্যুত না হন, ভবিষ্যতে হয়তো তিনি সার্থক হ'তে পারেন। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যো-পাধ্যায়, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, ছায়া দেবী প্রভৃতির অভিনয় অবশ্য ভালোই হ'য়েছে। 'পংকতিলকে'র আলোকচিত্র,

একতা প্রোডাকসন্সের 'আহ্বান' চিত্রে সন্ধ্যা রায়।

মমতাজ ফিলমসের 'ছোটে নবাব' চিত্রে মেহবুব ও অমিতা।

শব্দধারণ এবং শিল্পনির্দেশনার কাজ মন্দ নয়।

মঞ্চ নাটক :

ফেরারী ফৌজ : মিনার্ভা থিয়েটারে লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপের নিবেদন; রচনা ও পরিচালনা : উৎপল দত্ত; সংগীত সৃষ্টি : রবিশংকর; বিশেষ কলাকৌশল : তাপস সেন; দৃশ্যসজ্জা: নির্মল গুহরায়; শব্দগ্রহণ : প্রভাত হাজরা। ভূমিকায়—উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল রায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায়, ভোলা দত্ত, [illegible] সেন, তপতী ঘোষ, নীলিমা দাস, [illegible] চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ লবণ-সত্যাগ্রহের পর যখন ব্রিটিশ সরকারের চণ্ডনীতির ফলে স্তিমিতপ্রায় হয়ে এসেছিল, তখন দেশ জুড়ে একটা নৈরাশ্যের কালো ছায়া বহু জনমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে; আর তারই ফলে বাঙলার যুবশক্তির একটি অংশ আবার নতুন করে স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ এই সন্ত্রাসবাদের জাজ্বল্যমান নিদর্শন হিসেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। এই পটভূমিকাতেই "ফেরারী ফৌজ" রচনা করেছেন উৎপল দত্ত। তাঁর নাটকের মাষ্টারমশাই দেবব্রত ঘোষ ঐতিহাসিক মাষ্টারদা সূর্য সেনেরই প্রতিচ্ছবি। 'বন্দেমাতরম্‌' মন্ত্রে দীক্ষিত যুবকবৃন্দ পুলিশ সুপার উইলমট্‌কে হত্যা করে ভুবনডাঙায় সন্ত্রাসবাদের যে বিভীষিকা জাগিয়ে তুলল, বিপ্লবীদের কারুর কারুর ব্যক্তিগত দুর্বলতা, মিথ্যাসন্দেহ এবং দৈববিড়ম্বনায় হিসাবের ভুলে তা সাময়িকভাবে শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হলেও নাট্যকার দর্শককে বিশ্বাস করাতে পেরেছেন, বিপ্লব কখনও মরে না, এক বিপ্লবীর রক্তবিন্দু থেকে শত বিপ্লবীর জন্ম হয়, বিপ্লবের বহ্নিশিখা একবার প্রজ্বলিত হ'লে তা নিজের কাজ শেষ না ক'রে কখনও নেভে না। এবং এইখানেই নাটক হিসাবে "ফেরারী ফৌজে"র সার্থকতা। নাটকের প্রধান কর্মী অশোক চাটুজ্জে (chief protagonist) অত্যন্ত জ্যান্ত রক্তমাংসের মানুষ; দলের প্রতি আনুগত্যে সে যেমন অবিচল, নিজের মা-বাপ, স্ত্রী-কন্যার প্রতি ভালোবাসাও তার তেমনই অকৃত্রিম। বিপ্লবীদের মনে কোনো রকম দুর্বলতা থাকা অন্যায়, এ-কথা জেনেও নিজের আত্মজনকে একবার চোখের দেখা দেখবার লোভ সে সংবরণ করতে পারেনি এবং তারই ফলে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে সে নাটকীয় পরিস্থিতিকে ঘোরালো ক'রে তোলে। কিন্তু নাটকের কেন্দ্র-চরিত্র, বিপ্লবী দলের নেতা শান্তি রায়ই যে মীরজাফরের ভেকধারী নীলমণি রূপে সকলের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সে-কথা দর্শক বুঝতে পারেন, নাটক শেষ হবার দুটি দৃশ্য আগে। শান্তি রায়ের স্বরূপ সম্পর্কে দর্শককে প্রায় গোটা নাটকটাই অন্ধকারে রেখে চমক সৃষ্টি করা উচ্চাঙ্গের নাট্যরীতি হয়েছে কিনা, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে ওঠে। বিশেষ করে দলের কোনো কর্মীই যাকে দেখেনি, সে একটা সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছে, এ-কথা সাধারণভাবে অবিশ্বাস্য যদিও বাঙলার বিপ্লবী দলের কোনো কোনো নেতা সাধারণ কর্মীদের কাছে মাত্র নামেই পরিচিত ছিলেন, তাঁকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য তাদের হয় নি, এটা ঐতিহাসিক সত্য। বারাঙ্গনা মায়ারাণীর চরিত্র নাট্যকারের একটি অনবদ্য সৃষ্টি—এই মহিমময়ী রমণীকে দর্শক শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে চিরকাল। বিপ্লবী দলের জ্যোতির্ময় তার সরস বাক্যালাপের গুণে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং জীবন্ত ব'লে প্রতিভাত হয়। কুমুদ যে একটি দুর্বল চরিত্রের লোক, এ-কথা গোড়া থেকেই যেমন বুঝতে পারা যায়, তেমনই বুঝতে পারা যায় না, এমন লোককে দলে নেওয়া হ'ল কেন এবং নেবার পরেও সে দুর্বল চরিত্রের লোক জেনেও তাকে দল থেকে সরিয়ে না দিয়ে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করবার সুযোগ দেওয়া হ'ল কেন? এবং কুমুদের বিশ্বাসঘাতকতা কি নাটকের

সিন্ধির পক্ষে অপরিহার্য? বিকারের ঝোঁকে মাস্টারমশাইয়ের প্রলাপোক্তি এবং পুলিসের অতি-সতর্কতাই কি নাটককে তার পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত না? বিপ্লবী অশোকের বাবা-মায়ের চরিত্রও যেন রক্তমাংসধারী জীবন্ত নয়, তাঁরা যেন এক একটি টাইপের প্রকাশ। পুলিসের নির্মমতার বাস্তব রূপ কিছুটা বাড়াবাড়িতে পরিণত হয়ে বীভৎস রসের সৃষ্টি করেছে কোথাও কোথাও। কিন্তু এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও "ফেরারী ফৌজ" একটি বলিষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি এবং এর জন্যে আমরা নাট্যকার উৎপল দত্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

"ফেরারী ফৌজ" মঞ্চ উপস্থাপনায় এবং প্রয়োগনৈপুণ্যে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের সুনামকে বহুগুণে বর্ধিত করবে এবং বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে প্রয়োগরীতির নবতম পথিকৃৎ বলে স্বীকৃত হবে। সাধারণ নাট্যশালার অভিনয়ে ত্রিস্তর মঞ্চের প্রবর্তনা এই বোধ হয় প্রথম এবং নাটককে গতিশীল রাখবার পক্ষে ঘূর্ণ্যমান মঞ্চ থেকে এই ত্রিস্তর মঞ্চ যে ঢের বেশী সহায়তা করেছে, এ-কথা অনস্বীকার্য। এবং শুধুই গতি নয়, নাটকের বিশেষ মুডটিও এতে প্রকাশ পেয়েছে আশ্চর্যভাবে। গার্হস্থ্য জীবনকে সাধারণ স্তরে রেখে সামাজিক উচ্চমধ্যবিত্ত পর্যায়ের লোকেদের এবং বিপ্লবী আড্ডাকে মধ্য স্তরে স্থান দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে প্রথমে জমিদার-গৃহিণী এবং পরে প্রচণ্ড শক্তির ব্যঞ্জক পুলিস বাহিনীকে উপস্থাপিত ক'রে নাটকের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ একটি অদৃষ্টপূর্ব নবতম নাট্যশৈলী সন্ধান দিয়েছে। অবশ্য অল্পক্ষণের জন্যে সিনেমার টেক্‌নিকে ক্রমান্বয়ে তিনটি স্তরের মূকাভিনয় দেখানো বিশেষ কোনো নাট্যরস সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে করতে পারছি না; ওটুকু লোভ সংবরণ ক'রলে ক্ষতি ছিল না। বিশেষ নাট্যমুহূর্তে গতিশীল আলোছায়া বিভ্রম সৃষ্টির সহায় হ'লেও কৃত্রিমতার প্রতি দর্শক-চোখকে সজাগ করে ব'লে উচ্চাঙ্গের নাট্যরস সৃষ্টির পরিপন্থী। এর থেকে স্থির আলোর সাহায্যে মুড-লাইটের সৃষ্টি বেশী কার্যকরী বলে মনে হয়। রবিশঙ্করের আবহ-সঙ্গীত নাটকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে আরোপিত হয়েছে এবং নাটকের তাৎপর্য প্রকাশে সহায়তা করেছে।

অভিনয়ে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের টীম ওয়ার্কের আর একটি নিখুঁত নিদর্শন দেখা গেল। তবে ওরই মধ্যে সবচেয়ে চোখে লেগেছে রাধারাণীর ভূমিকায় নীলিমা দাসের অত্যুজ্জ্বল অভিনয়। এর পরেই নাম করতে হয় উৎপল দত্তের নীলমণি, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশোক, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনস্‌পেক্টর হিতেন দাসগুপ্ত, অরুণ রায়ের প্রকাশ মুকুটি, নিমাই ঘোষের পাদ্রী ফ্ল্যানাগান, তপতী

ঘোষের শচী, শোভা সেনের বঙ্গবাসী দেবী, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যোতির্ময়, ভোলা দত্তের যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা চট্টোপাধ্যায়ের গোপা এবং বালক-বেশে 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার অভিনয়ের।

নব দিগন্তের সূচক "ফেরারী ফৌজ" দর্শকচিত্তজয়ী হয়ে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হবে, এ ভবিষ্যম্বাণী অনায়াসেই করতে পারি।

বিবিধ সংবাদ :

'স্বয়ম্বরা'র পরেই রাধা, পূর্ণ ও প্রাচীতে আসছে ভি এম এন প্রোডাকসন্সের 'নেকলেশ'। দিলীপ নাগ পরিচালিত এই ছবিটি মোপাসাঁর বিখ্যাত গল্প অবলম্বনে রচিত। প্রধান চরিত্রে উত্তমকুমারের সংগে আছেন নবাগতা শিল্পী সুজাতা এবং অপরাপর চরিত্রে রূপদান করেছেন রুমা দেবী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, দীপক, ভারতী, পদ্মা ও মলিনা দেবী। সংগীত পরিচালনা করেছেন আলি আকবর খাঁ। হিন্দুস্থান সুপার ফিল্মস্ ছবিটির পরিবেশক।

আজ, শুক্রবার ২৩শে জুন জ্যোতি, প্রিয়া, প্রভাত, নাজ, পূর্ণশ্রী, ইটালী টকীজ এবং আরও কয়েকটি চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে নরেশ সায়গল পরিচালিত শঙ্কর মুখার্জির রোমাঞ্চকর চিত্র 'ডার্ক ষ্ট্রীট'। এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন অশোককুমার, নিশি, কে এন সিং, অনুপকুমার প্রভৃতি। মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিটির পরিবেশক।

২৬শে জুন, সোমবার মিনার্ভা থিয়েটারে 'ফেরারী ফৌজ'-এর একটি বিশেষ অভিনয় হবে। কলকাতার প্রত্যেকটি পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা, অভিনেত্রী, নেপথ্যশিল্পী, পরিচালক প্রভৃতি সকল কর্মীকে এই অভিনয়ে উপস্থিত থাকবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এছাড়া বাঙলার নাট্য আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সংস্থাকেও এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। এই ধরণের বিশেষ অভিনয় ব্যবস্থা একদিকে যেমন পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাত্র বৃদ্ধির সহায়ক তেমনই সাধারণভাবে নাট্যমঞ্চের উন্নতিরও পরিপোষক।

গেল ১৮ই জুন বিশ্বরূপার 'সেতু' নাটকটির ৪০০তম অভিনয় হয়ে গেছে। এই সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে আসছে ২৫শে জুন বেলা আড়াইটার সময় একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ 'সেতু'র নাট্যকার, বিভিন্ন শিল্পী ও নেপথ্য-কর্মীদের সম্মানিত করবার আয়োজন করেছেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শৈলী এবং রূপ নিয়ে চলচ্চিত্রানুরাগীদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা করবার অভিপ্রায় 'সিনে ক্লাব অব্ ক্যালকাটা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে চলেছে। এরই উদ্বোধন উপলক্ষে ২৪শে জুন, শনিবার জ্যোতি সিনেমায় বিখ্যাত পোলিশ-চিত্র 'কানাল' দেখানো হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ডঃ সুবোধ মিত্র এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন পোলাণ্ডের কন্‌শাল মিঃ রোমান কাওইন্‌স্কি।

বাঙালী মেয়ে কুমারী বন্দনা দাশগুপ্ত লণ্ডনের বিভিন্ন মঞ্চাভিনয়ে পেশাদারী অভিনেত্রী হিসেবে পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের বাহবা পাচ্ছেন দিনের পর দিন।

পিটার সেলারের 'রোহাহা', হেমার্কেট প্রোডাকসন্সের 'টি হাউস অব দি আগষ্ট মুন' প্রভৃতিতে তিনি অভিনয় করেছেন। বহু জাপানী, চীনা, মিশরীয়, পার্সিক এবং ভারতীয় চরিত্রে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। বি-বি-সির টেলিভিসান মারফৎ রেটিগানের 'অ্যাডভেঞ্চার ষ্টোরী'তে রোয়ানা চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে তিনি সকলকে চমৎকৃত করেছেন। মিস্ দাশগুপ্তের সাফল্যে আমরা গর্ব অনুভব করছি।

দীপায়ন সংস্থা গেল ১৬ই জুন রবীন্দ্র সরোবারের ইনডোর ষ্টেডিয়ামে রবীন্দ্রনাথের 'দোলিয়ার', বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু কৃত নাট্যরূপ অভিনয় করেছিলেন।

উত্তরীর উদ্যোগে ১৫ই জুন থেকে ১৮ই জুন পর্যন্ত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব বিশেষ সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলিকাতার মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রলাল মজুমদার এবং সভাপতিত্ব করেন পঃ বংগ বিধান-

সভার অধ্যক্ষ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কর। ১৫ই জুন তারিখের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিদেশী রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের আপন আপন দেশে রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রচারের অনুরোধ জানিয়ে ডঃ কালিদাস নাগ তাঁদের প্রত্যেককে একখণ্ড "গীতাঞ্জলি" পুস্তক উপহার দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন রুশ, বৃটিশ, পোলিস, পাকিস্তানী, ইন্দোনেশিয়া এবং তুরস্ক দূতাবাসের প্রতিনিধিরা। রুশ প্রতিনিধি মিঃ ডি আই গুরুগেনোভ বাংলায় বক্তৃতা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ দিনের অধিবেশনে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সভাপতিত্ব করেন। প্রথম দু' দিনের অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীসুধীন ভট্টাচার্যের গ্রন্থনায় এবং শ্রীসমর গুপ্তের পরিচালনায় 'পূজা' এবং 'বর্ষামঙ্গল' নৃত্যনাট্য সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান—'শেষরক্ষা' এবং 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য।

মমতাজ ফিল্মসের বহু প্রশংসিত চিত্র "ছোটে নবাব" শুক্রবার ২৩শে জুন কলকাতার জনতা, গ্রেস, লোটাস পার্কশো, ছায়া, কালিকা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। চিত্রটির বৈশিষ্ট্য—নবাগত চিত্রশিল্পীদের সার্থক অভিনয় এবং অনুপম গীতি ও সুরমাধুর্য। ছবিটি পরিচালনা করেছেন এস এ আকবর; সঙ্গীত রাহুল দেব বর্মণ এবং চরিত্র রূপায়নে—অনীতা, মামুদ, হেলেন, নাজির হোসেন, মিনু মমতাজ, অচলা সহদেব এবং জনি ওয়াকার প্রভৃতি।

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

।। সিনেমা ।।

রূপবাণী, ভারতী, অরুণা—তিন কন্যা

মিনার, বিজলী, ছবিঘর—ঝিন্দের বন্দী

রাধা, পূর্ণ—স্বয়ম্বরা

উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা, আলোছায়া—পঙ্কতিলক

রক্সি—নজরানা (হিন্দী)

জ্যোতি—ক্রোড়পতি (হিন্দী)

হিন্দ, গণেশ, খান্না—শশুরাল (হিন্দী)

শ্রী, ইন্দিরা, রূপম—স্বরলিপি

প্যারাডাইস—জিস্ দেশমে গঙ্গা বৈহতি হ্যায়

বসুশ্রী, বীণা—শাপমোচন

সোসাইটি—মুঘল-ই-আজম

লাইট হাউস—Inherit the Wind

গ্লোব—Scarface Mob

মেট্রো—Ben-Hur

মিনার্ভা—Moment of Danger

এলিট—The Wizard of Baghdad

টাইগার—Witness for the Prosecution

নিউ সিনেমা, প্রভাত, চিত্রা, রূপালী, প্যারামাউণ্ট—ওয়ারেণ্ট

ওরিয়েণ্ট, ম্যাজেস্টিক, দর্পণা, মেনকা—আশকা পঞ্ছী (হিন্দী)

সুরশ্রী, আলেয়া, প্রাচী—মধ্যরাতের তারা

জ্যোতি, প্রিয়া, প্রভাত, নাজ, পূর্ণশ্রী—ডার্ক স্ট্রীট (হিন্দী)

জনতা, গ্রেস, লোটাস, পার্কশো, ছায়া, কালিকা—ছোটে নবাব (হিন্দী)

চিত্রা—Sign of the Gladiator

অপেরা, ক্রাউন, কৃষ্ণা, পূর্ণশ্রী—দো ভাই (হিন্দী)

।। থিয়েটার ।।

ষ্টার—শ্রেয়সী

রঙমহল—অনর্থ

মিনার্ভা—ফেরারী ফৌজ

বিশ্বরূপা—সেতু ও গিরিশ নাট্যোৎসব প্রতি শনিবার

থিয়েটার সেন্টার—রজনীগন্ধা

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া
প্রথম টেস্ট

ইংল্যাণ্ড : ১৯৫ (সুব্বারাও ৫৯। ম্যাকে ৫৭ রাণে ৪ এবং বেনো ১৫ রাণে ৩ উইকেট।) ও **৪০১** (সুব্বারাও ১১২: টেড ডেক্‌স্‌টার ১৮০; কেন ব্যারিংটন নট আউট ৪৮। ফ্যাংক মিশন ৮২ রাণ ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ৫১৬ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নীল হার্ভে ১১৪; ও'নীল ৮২; বব্‌ সিম্পসন ৭৬; কেন ম্যাকে ৬৪; বিল লরী ৫৭। স্টাথাম ১৪৭ রাণে ৩; এ্যালেন ৮৮ রাণে ২; ইলিংওয়ার্থ ১১০ রাণে ২; ট্রুম্যান ১৩৬ রাণে ২ উইঃ)।

বার্মিংহামের এজবাস্টন মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের রাণের থেকে ৩২১ রাণে অগ্রগামী ছিল; কিন্তু ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার দরুণ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হয়নি। প্রথম ইনিংসে ইংল্যাণ্ডের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল, খেলার মধ্যে বৃষ্টিপাত; ফলে ইংল্যাণ্ডকে প্রতিকূল উইকেটে খেলতে হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ, দলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় এবং অধিনায়ক পিটার মে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ার কারণে দলে যোগদান করতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই দলের মনোবল বেশ কিছুটা ভেঙে যায়। বলতে কি, ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় কোন সজীবতার ছাপ ছিল না; খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার একান্ত অভাব ছিল। একমাত্র সুব্বারাও যা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন। শক্তিশালী বিশ্ববিজয়ী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের বিপক্ষে ৩২১ রাণের ব্যবধানে পিছনে পড়ে এই প্রতিকূল অবস্থায় ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে কি রকম খেলবে—এই বিপর্যয় থেকে ইংল্যাণ্ড কিভাবে উদ্ধার পাবে—এই সব প্রশ্ন খুব জটিল আকার ধারণ করে। বিপর্যয়ের মধ্যে থেকে ইংল্যাণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বিপদের বেড়াজাল থেকে যে উদ্ধার লাভের পথ খুঁজে নিতে জানে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তা প্রমাণ করে দেয়। ইংল্যাণ্ড দলের দুজন খেলোয়াড় দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে তাঁদের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যে ইংল্যাণ্ডকে দারুণ বিপর্যয় থেকে উদ্ধার ক'রে অস্ট্রেলিয়া[illegible] পাকা ভাতে ছাই' দিয়েছেন। ইংল্যাণ্ড দলের এই বিপদে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় নেমেছিলেন রমণ সুব্বারাও এবং টেড ডেক্সটার। বিশেষ ক'রে টেড ডেক্সটারের খেলা অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সাফল্যকেও ম্লান ক'রে দিয়েছে এই কারণে যে, ডেক্সটারকে যথেষ্ট প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়িয়ে খেলতে হয়েছিল। এই সঙ্গে আর একজনের খেলার কথা উল্লেখ করতে হয়—তিনি বৃষ্টির দেবতা বরুণদেব। টেস্ট খেলার প্রথম দিন থেকে [illegible] ক'রে খেলার শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বাভাবিক খেলা দেখিয়েছেন; কেবল একদিন বাদ দিয়েছেন—বোধ হয় বিশ্রামের জন্যে। এজবাস্টনের প্রথম টেস্ট খেলায় অনেক গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বৃষ্টির দেবতা বরুণদেবের নাম প্রধান অতিথির পর্যায়ে উল্লেখ করলে যোগ্যপাত্রকেই সম্মানিত করা হবে। তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের কাছে খেলোয়াড়[illegible]। নতি স্বীকার ক'রে হেঁট মাথায় প্যাভিলিয়ানে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। টেস্ট খেলার নির্ধারিত সময়ের বেশ কয়েক ঘন্টা তাঁর খেয়ালীপনায় বিফলে গেছে। প্রথম দিনেই ঘন্টাখানেক সময় নষ্ট হয়েছে। খেলার দ্বিতীয় দিন—অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় তিনি কোন হস্তক্ষেপ করেননি; বোধ হয় ঐ দিন তাঁর বিশ্রামের দিন ছিল। খেলার তৃতীয় দিনে তিনি ৩½ ঘন্টার বেশী খেলতে দেননি। এই দিন তাঁর জন্যে চারবার মাঠ ছেড়ে দিতে হয়। খেলার

ত্রাণকর্তার ভূমিকায়

রমণ সুব্বারাও

টেড ডেক্সটার

চতুর্থ দিনে খেলার নির্ধারিত সময় আরও কেটেছে'টে তিনি সংক্ষেপ ক'রে দিলেন; এইদিন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ইংল্যান্ড মাত্র ২ ঘন্টা ২০ মিনিট সময় ব্যাট করতে পায়। লাঞ্চের সময় এক উইকেট পড়ে ইংল্যান্ডের ৯৩ রাণ ছিল। লাঞ্চের বিরতির পর ইংল্যান্ড আর মাত্র ১৩ রাণ যোগ করলে বরুণদেব মাঠ থেকে খেলোয়াড়দের খেদিয়ে দিলেন আর মাঠে নামতে দেননি। খেলার শেষ দিনে নির্ধারিত সময়ের আধঘন্টা আগে খেলা বন্ধ করতে হয়। খেলা আরম্ভ করা আর সম্ভব হয়নি। প্রথম টেস্ট খেলার সঙ্গে তাঁর খেলাটাও প্রধান্যলাভ করেছে। তিনিও তাঁর স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। ফলে অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের পথে শেষ পর্যন্ত তিনিই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান।

গত ৬ষ্ঠ সংখ্যায় চতুর্থ দিনের টেস্ট খেলার খবর পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। চতুর্থ দিনে লাঞ্চের বিরতির পর মাত্র ২০ মিনিট খেলা হয়। এইদিন মোট ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটের খেলায় ইংল্যান্ড পূর্বদিনের ৫ রাণের সঙ্গে আরও ১০১ রাণ যোগ করে। মোট রাণ দাঁড়ায় ১০৬, এক উইকেট পড়ে। সুব্বা রাও ৬৮ রাণ এবং ডেক্সটার ৫ রাণ করে নট আউট থাকেন।

৫ম অর্থাৎ টেস্ট খেলার শেষ দিনে ইংল্যান্ড যখন অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে তখন ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যান্ডের আরও ২১৫ রাণের প্রয়োজন ছিল। লাঞ্চের কিছু আগে সুব্বা রাও নিজস্ব ১১২ রাণ ক'রে দলের ২০২ রাণে মিশনের বলে বোল্ড আউট হন। সুব্বা রাও এবং ডেক্সটার ২য় উইকেটের জুটিতে দলের মূল্যবান ১০৯ রাণ তুলে দেন ১১৭ মিনিটের খেলায়। সুব্বা রাও তাঁর ১১২ রাণ করতে ২৪৪ মিনিট সময় নেন, বাউণ্ডারী করেন ১৪টা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ইংল্যান্ডের মাটিতে সুব্বা রাওয়ের এই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। এই নিয়ে ৯টা টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর মোট রাণ দাঁড়াল ৬৮৭। সেঞ্চুরী সংখ্যা দু'টো— ১০০ এবং ১১২।

সুব্বা রাওকে নিয়ে ইংল্যান্ডের ১২ জন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী রাণ করার গৌরব লাভ করলেন। ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডের পক্ষে তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড়— নওনগরের জামসাহেব কে এস রণজিৎ সিংজী (১৫৪ নট আউট, ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৮৯৬), তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কে এস দলীপ সিংজী (১৭৩, লর্ডস, ১৯৩০) এবং পতৌদির নবাব ইফতিকার আলী (১০২, সিডনি, ১৯৩২-৩৩) এই সম্মান লাভ করেছেন। সুব্বা রাওয়ের ঠিক আগে এই সম্মান পেয়ে গেছেন ওয়াটসন (১০৯ রাণ, লর্ডস, ১৯৫৩)।

সুব্বা রাওয়ের বিদায়ের পর দলের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে ৩য় উইকেটে ডেক্সটারের জুটি হলেন। তখনও ইংল্যান্ড ১১৯ রাণের পিছনে পড়ে আছে। লাঞ্চের আট মিনিট আগে কাউড্রে তাঁর ১৪ রাণে আউট হলে অস্ট্রেলিয়া একটা মূল্যবান উইকেট পেল। লাঞ্চের বিরতির সময় দেখা গেল ইংল্যান্ডের বিপদ কাটেনি—তখনও পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে ইংল্যান্ডের ৮০ রাণ প্রয়োজন। লাঞ্চের পর ৪র্থ উইকেটের জুটিতে খেলতে নামলেন ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন। লাঞ্চের কিছু পরেই ডেক্সটার সেঞ্চুরী করলেন— ইংল্যান্ডের মাটিতে তাঁর এই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রাণ ছিল মাত্র ৫৬, লর্ডস মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তাঁর টেস্ট সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়াল ৪টে। লাঞ্চের পরের খেলায় ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন অস্ট্রেলিয়ার সব রকমের আক্রমণ পদ্ধতি তুচ্ছ ক'রে দিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলিং ভোঁতা হয়ে গেল। চা-পানের বিরতির সময় ইংল্যান্ডের রাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৩৩৯, ৩টে উইকেট পড়ে। ডেক্সটার ১৪২ নট আউট। চা-পানের বিরতির পর ডেক্সটার ঝাঁকিয়ে খেলতে থাকেন। বৃষ্টির দরুণ খেলা বন্ধ হওয়ার ৯ মিনিট আগে ডেক্সটার নিজস্ব ১৮০ রাণ করে আউট হন। ডেক্সটার এবং ব্যারিংটনের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১৬১ রাণ ওঠে। ডেক্সটার উইকেটে খেলেছিলেন ৫ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। বাউণ্ডারী ৩১টা। ১৯৪৮ সালের নটিংহামের টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ডেনিস কম্পটন ১৮৪ রাণ করেন। পরবর্তী ৩১টি টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের যে সব ব্যক্তিগত রাণ হয়েছে তাদের মধ্যে ডেক্সটারের ১৮০ রাণই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণের গৌরব লাভ করেছে। মোট ১৮টি টেস্ট খেলায় ডেক্সটারের মোট রাণ দাঁড়িয়েছে ১২২৭। মোট সেঞ্চুরী ৪টে। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ ১৮০। তাঁর পূর্বের সর্বোচ্চ রাণ ছিল ১৪১, নিউ-জিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৯ সালে।

৫ম দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘন্টা আগে বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের রাণ দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৪০১। ব্যারিংটন ৪৮ এবং স্মিথ ১ রাণ করে নট আউট থাকেন।

এজবাস্টন মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্ট খেলা নিয়ে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট খেলার ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে :

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

(১৮৭৬-৭৭ থেকে ১৩ই জুন, ১৯৬১)

	মোট খেলা	ইংঃ জয়ী	অস্ট্রেঃ জয়ী	ড্র
ইংল্যান্ডে	৮২	২৪	২১	৩৭
অস্ট্রেলিয়াতে	৯৭	৩৮	৫৩	৬
	১৭৯	৬২	৭৪	৪৩

ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল

মাঠের নাম	খেলা	ইংল্যান্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র
লর্ডস	১৯	৫	৭	৭
[illegible]	২১	১১	৪	৬
ম্যাঞ্চেষ্টার	১৭	৪	২	১১
নটিংহ্যাম	১০	২	৩	৫
লিডস	১১	১	৪	৬
বার্মিংহাম	৩	১	০	২
সেফিল্ড	১	০	১	০
	৮২	২৪	২১	৩৭

মিলখা সিংয়ের সাফল্য

প্যারিসের কলম্বাস ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 'গ্র্যান্ড-প্রিক্স' ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতবর্ষের অলিম্পিক দৌড়বীর মিলখা সিং ৪০০ মিটার দৌড় অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করেন। ৪০০ মিটার পথ অতিক্রম করতে তাঁর ৪৭ সেকেন্ড সময় লাগে। ইউরোপ সফরে এই সময়ই তাঁর পক্ষে রেকর্ড সময় হয়েছে। তাঁর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের ভারকামেন ৪৮·৩ সেকেন্ডে ২য় স্থান এবং ফ্রান্সের লুন্ড ৪৮·৬ সেকেন্ডে ৩য় স্থান পান।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সাত দিনে (১২ই জুন থেকে ১৮ই জুন) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য ফলাফলঃ এরিয়ান্স দলের কাছে ২—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলের প্রথম পরাজয়, বি এন আর দলের বিপক্ষে ২—০ গোলে এবং উয়াড়ীর বিপক্ষে ১-০ গোলে গত বছরের রাণার্স-আপ মহমেডান স্পোর্টিং দলের পরাজয়, হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে ইষ্টার্ণ রেল দলের ৭—০ গোলে জয়লাভ, লীগ তালিকায় গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের সমান খেলায় সমান সংখ্যক পয়েন্ট পেয়ে ১ম স্থান লাভ এবং লীগের তালিকায় বি এন আর দলের দ্বিতীয় স্থানে পদোন্নতি।

ইষ্টবেঙ্গল তাদের দ্বাদশ খেলায় ১—০ গোলে ইষ্টার্ণ রেল দলকে পরাজিত করে ১২টা খেলায় ১১টা জয়লাভের কৃতিত্ব অর্জন করে। রেল দলের বিপক্ষে তারা পেনাল্টি কিক থেকে গোল দিতে পারেনি। খেলা শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে ইষ্টবেঙ্গল জয়সূচক গোলটি দেয়। ইষ্টবেঙ্গল দল এইদিন গোল দেওয়ার যে সব সুযোগ পেয়েছিল সেগুলির কিছুটা সদ্ব্যবহার করতে পারলেই বেশী গোলের ব্যবধানে জয়ী হত। কিন্তু আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত তাদের কোন রকমে জয়লাভ করতে হয়েছে। গোলের সুযোগ সৃষ্টি করা যেমন কৃতিত্বের পরিচয় তেমনি সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে না পারা চরম ব্যর্থতার পরিচয়। গত কয়েকটি খেলায়—স্পোর্টিং ইউনিয়ন, রাজস্থান এবং ইষ্টার্ণ রেল দলের বিপক্ষে ইষ্টবেঙ্গল দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা যে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তা দেখে দলের সমর্থকদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের এই ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত সমস্ত দলের মনোবল ভেঙে দেয় এবং তার ফলে দলকে পরাজয় স্বীকার অথবা খেলা ড্র করতে দেখা যায়।

পরবর্তী ত্রয়োদশ খেলায় এরিয়ান্স দলের কাছে শোচনীয়ভাবে ২—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলের পরাজয় প্রধানতঃ এই কারণেই হয়েছে। এরিয়ান্স দল হিসাবে ইষ্টবেঙ্গল দলের তুলনায় যে দুর্বল তা লীগের তালিকায় খেলার ফলাফল থেকেই পাওয়া যায়। ইষ্টবেঙ্গল দলের তুলনায় এরিয়ান্স দলে কোন নামকরা খেলোয়াড় নেই, বরং কাগজ-কলমের হিসাবে এরিয়ান্স দল অখ্যাত খেলোয়াড়-পুষ্ট বলা যায়। শক্তিমান ইষ্টবেঙ্গল দলের বিপক্ষে দুর্বল এরিয়ান্স দলের জয়লাভের প্রধান কারণ—এরিয়ান্স দলে তরুণ খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেশী; এ ক্ষেত্রে তারুণ্যের স্বাভাবিক ধর্ম খেলাতে খুব কাজ দিয়েছে। এরিয়ান্স দলের তরুণ খেলোয়াড়দের নিষ্ঠা, খেলায় ক্ষিপ্রগতি এবং জয়লাভের অদম্য আকাংখা এই দিনের খেলাতে ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়দের তুলনায় খুব বেশী করে চোখে পড়েছে। এরিয়ান্স ভাগ্যক্রমে জয়ী হয়নি—জয়লাভের মত খেলা খেলে জয়ী হয়েছে। খেলার মাঠের চলতি কথায় এরিয়ান্স একটা 'শক্ত গাঁট'। অর্থাৎ বিশেষ ভয়ের কারণ। এ শুধু কথার কথা নয়। বিগত দিনের অনেক খেলায় এরিয়ান্স অনেক বড় বড় শক্তিশালী দলকে হারিয়ে দেয়, ফলে এরিয়ান্স সম্বন্ধে এই প্রবাদ চলে আসছে। শক্তিশালী ইষ্টবেঙ্গল দলকে এ মরসুমের লীগের খেলায় পরাজিত ক'রে এরিয়ান্স আবার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরিয়ান্সের কাছে ইষ্টবেঙ্গল দলের এ পরাজয় নতুন কিছু নয় বা অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। অনেকবারই ইষ্টবেঙ্গল দলকে এরিয়ান্সের কাছে আগে হার স্বীকার করতে হয়েছে। একবারের কথা চিরকাল লোকের মনে থাকবে। অনেককাল আগে জোড়াতালিমারা দুর্বল এরিয়ান্স ক্লাব লীগের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলকে হারিয়ে দেয়। এই পরাজয়ের ফলে প্রথম ভারতীয়দল হিসাবে প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ পাওয়ার গৌরব থেকে ইষ্টবেঙ্গল দল বঞ্চিত হয়।

ইষ্টবেঙ্গল বনাম ইষ্টার্ণ রেলের খেলায় রেলের গোলরক্ষক বর্মন বলরামের নাগাল থেকে বলটি টেনে নিয়েছেন।

দুটি ক্ষেত্রে দুই দলই অল্পের জন্য গোল দিতে পারেনি। প্রথমার্ধের খেলার দু মিনিটে ইষ্টবেঙ্গল দলের কাননের সট গোল পোস্টে লাগে এবং খেলার ৬ মিনিটে এরিয়ান্স দলের পুরকায়স্থের সট ক্রশ-বারে বাধা পায়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৬ মিনিটে এরিয়ান্স দলের এ রায় ১ম গোল এবং ১৩ মিনিটে পুরকায়স্থ ২য় গোল দেন।

ইষ্টবেঙ্গল ১২টা খেলায় ২৩
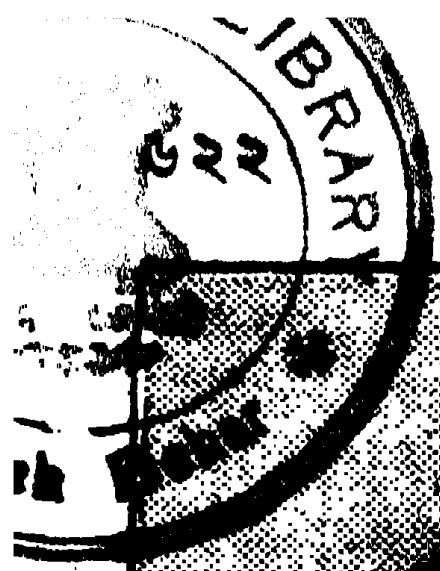
প্রাক্তন বিশ্ব-মহিলা উচ্চ লম্ফন বিজয়িনী মিস থেলমা হপকিন্স (বেলফাস্ট) ত্রিরাষ্ট্র মহিলা পেণ্টাথলনে বৃটেনের পক্ষে উচ্চ লম্ফনে ৫ ফিট ৪½ ইঞ্চি অতিক্রম করছেন।

পয়েণ্ট এবং এরিয়ান্স ১০টা খেলায় ১১ পয়েণ্ট নিয়ে এ দিনের খেলায় নেমেছিল।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান গত সপ্তাহে তিনটে ম্যাচ খেলেছে। রাজস্থানকে ২—০ গোলে, স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ৩—০ গোলে এবং বালীপ্রতিভাকে ২—০ গোলে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৯টি খেলায় জয়লাভ করেছে। বর্তমানে মোহনবাগান দলের খেলায় ফলাফল দাঁড়িয়েছে ১৩টা খেলায় ২৩ পয়েণ্ট। ফলে ইষ্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে তারা সমান ১৩টা খেলায় সমান ২৩ পয়েণ্ট করে যুগ্মভাবে লীগ তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছে। এক সময় দুই দলের সমান ৮টা খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল মোহনবাগান দলের থেকে ৩ পয়েণ্টে এগিয়ে ছিল। ইষ্টবেঙ্গল দল তাদের ৯ম খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা ড্র করায় এবং ত্রয়োদশ খেলায় এরিয়ান্স দলের কাছে তাদের হার হওয়াতে বর্তমানে দুই দলেরই সমান সমান ২৩ পয়েণ্ট দাঁড়িয়েছে। লীগের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলের পরাজয়ে আর কোন দলই অপরাজেয় রইলো না।

গত বছরের রাণার্স-আপ মহমেডান স্পোর্টিং দলের এ বছরের ব্যর্থতা খুবই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বর্তমানে তাদের ১২টা খেলায় জয় ৪, ড্র ৪, হার ৪ এবং মোট পয়েণ্ট ১২। লীগ তালিকার মাঝখানে এখন তারা নেমে গেছে।

মহমেডান স্পোর্টিং দলের হার হয়েছে ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, বি এন আর এবং উয়াড়ী দলের কাছে। খেলা ড্র —খিদিরপুর, এরিয়ান্স, হাওড়া ইউনিয়ন এবং রাজস্থানের কাছে।

ইষ্টার্ণ রেলওয়ে লীগের খেলার গোড়ার দিকে বেশ খেলেছিল। ৫টা খেলায় ৯ পয়েণ্ট করে তারা এক সময়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে ছিল; কিন্তু এখন তারা নেমে গেছে ৩য় স্থানে। ইষ্টার্ণ রেল দল তাদের একাদশ খেলায় ৭—০ গোলে হাওড়া ইউনিয়নকে পরাজিত ক'রে এ বছরের প্রথম বিভাগের লীগ খেলায় উপস্থিত সর্বাধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভের কৃতিত্বলাভ করেছে। ইতিপূর্বে ইষ্টবেঙ্গল দল ৬—০ গোলে ইণ্টারন্যাশনাল দলকে পরাজিত করে রেকর্ড করেছিল। লীগের খেলায় বি এন আর দল প্রভূত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে নীচ থেকে উপরে উঠেছে। তারা এক সময়ে ৬টা খেলায় ৮ পয়েণ্ট করে লীগ তালিকায় ৫ম স্থানে ছিল। উপর্যুপরি ৪টি খেলায় জয়ী হয়ে বর্তমানে ১০টা খেলায় ১৬ পয়েণ্ট করে তারা তালিকার ২য় স্থানে উঠেছে—মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের ঠিক নীচে।

বি এন আর খেলা ড্র করেছে দু'টি —রাজস্থান এবং জর্জটেলিগ্রাফ দলের সঙ্গে। তারা উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করেছে ১—০ গোলে মোহনবাগানকে, ২—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে এবং ১-০ গোলে ইষ্টার্ণ রেল দলকে হারিয়ে।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা

(১৮ই জুন পর্যন্ত ফলাফল নিয়ে)

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইষ্টবেঙ্গল	১৩	১১	১	১	৩৬	৫	২৩
মোহনবাগান	১৩	১১	১	১	২৬	৪	২৩
বি এন আর	১০	৭	২	১	১৩	৩	১৬
ইষ্টার্ণ রেল	১১	৭	১	৩	২১	৬	১৫
এরিয়ান্স	১১	৫	৩	৩	১১	৮	১৩
মঃ স্পোর্টিং	১২	৪	৪	৪	১১	১২	১২
উয়াড়ী	৯	৪	২	৩	৮	৮	১০
খিদিরপুর	১২	২	৬	৪	১১	১৮	১০
রাজস্থান	১১	১	৬	৪	৫	১১	৮
হাওড়া ইউঃ	১১	২	৪	৫	৭	১৮	৮
জর্জ টেলিঃ	১১	০	৭	৪	৫	১৫	৭
পুলিশ	১১	১	৪	৬	৩	১৫	৬
বালী প্রতিভা	৯	২	১	৬	৭	১৩	৫
স্পোর্টিং ইউঃ	১১	২	১	৮	৬	১৯	৫
ইং ন্যাশনাল	১১	২	১	৮	৪	১৯	৫

উত্তর কলিকাতা টেবল টেনিস

বাগবাজার জুনিয়র স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উত্তর কলিকাতা টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী হ্যারী আও ৩—১ খেলায় দীপক ঘোষকে পরাজিত করেন। ডাবলসের ফাইনালে দীপক ঘোষ এবং সি এন ইয়ং ৩—১ খেলায় হ্যারী আও এবং ডি কে ঘোষকে পরাজিত করেন।

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমর কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমাদের নিকট পাইবেন

উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

স্বামী	টাঃ ১·৭৫	পল্লীসমাজ	টাঃ ৩·০০	ছবি	টাঃ ১·৫০
পণ্ডিত মশাই	টাঃ ২·৫০	শুভদা	টাঃ ২·৫০	বড়দিদি	টাঃ ২·০০
শেষ প্রশ্ন	টাঃ ৫·৫০	মেজদিদি	টাঃ ২·০০	দেনাপাওনা	টাঃ ৪·৭৫
নববিধান	টাঃ ১·৭৫	বামুনের মেয়ে	২·০০	অরক্ষণীয়া	টাঃ ১·৭৫
বৈকুণ্ঠের উইল	টাঃ ১·৭৫	নিষ্কৃতি	টাঃ ১·৫০	চরিত্রহীন	টাঃ ৬·৫০
শ্রীকান্ত (১ম)	টাঃ ৩·৫০	(২য়)	টাঃ ৩·০০	(৩য়) টাঃ ৩·৭৫	(৪র্থ) ৩·০০
চন্দ্রনাথ	টাঃ ২·২৫	হরিলক্ষ্মী	টাঃ ১·৭৫	গৃহদাহ	টাঃ ৬·০০
দেবদাস	টাঃ ২·৫০	পরিণীতা	টাঃ ১·৫০	অনুরাধা, সতী ও পরেশ	টাঃ ১·২৫

প্রবন্ধ গ্রন্থ

নারীর মূল্য টাঃ ২·০০ শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী টাঃ ৫·০০

নাটক

বিপ্রদাস	টাঃ ১·৫০	রাজলক্ষ্মী	টাঃ ২·০০	নিষ্কৃতি	টাঃ ১·৫০
পথের দাবী	টাঃ ২·০০	গৃহদাহ	টাঃ ২·০০	রমা	টাঃ ২·০০
দেবদাস	টাঃ ২·০০	বিজয়া	টাঃ ২·৫০	ষোড়শী	টাঃ ২·০০

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি
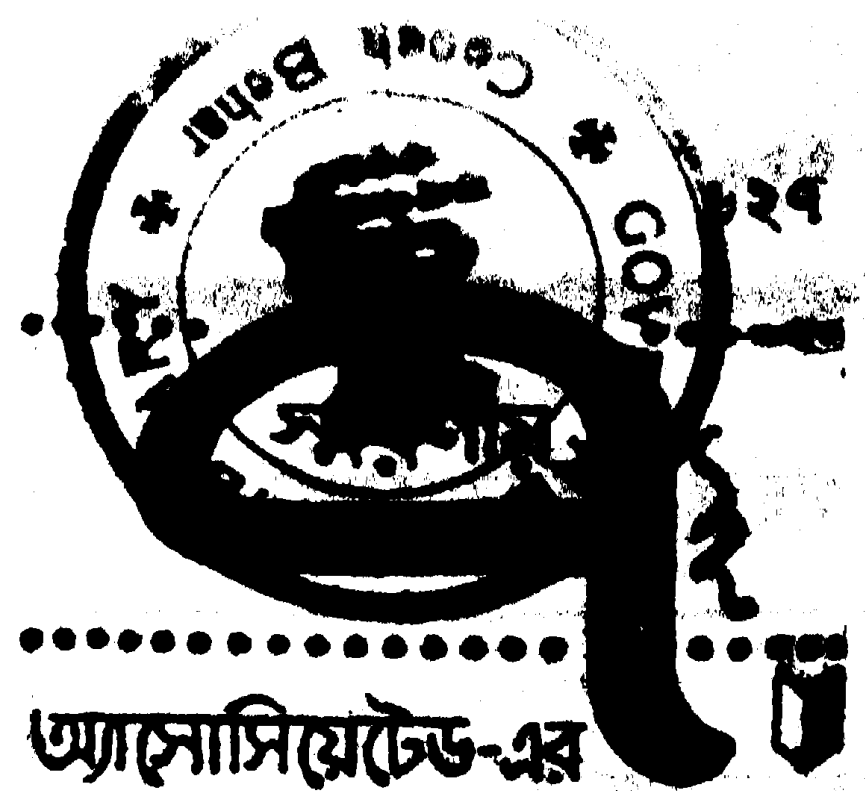
৮ই জ্যৈষ্ঠের বই

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
দক্ষিণের বারান্দা (সচিত্র) ৪৲

বাণী রায়ের
সেই চেনা ছেলেটি (সচিত্র) ১৸৹
(ছোটদের উপন্যাস)

সদ্য প্রকাশিত

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড ১৷৹
(সচিত্র)

শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের
মহাভারত (সচিত্র) ৩৲

শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটদের গল্পগ্রন্থ
ঘনাদার গল্প ৩৲

লীলা মজুমদারের ছোটদের উপন্যাস
হলদে পাখীর পালক ২৲

আমাদের প্রকাশনার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

গল্পগ্রন্থ : প্রবোধকুমার সান্যালের **অঙ্গার** টাঃ ৩·০০ নবেন্দু ঘোষের **পঞ্চম রাগ** টাঃ ৩·২৫॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **সপ্তপদী** টাঃ ২·৫০॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **রূপহলুদ** টাঃ ২·৫০॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **কোকিল ডেকেছিল** টাঃ ৩·২৫॥ বিমল মিত্রের **পুতুলদিদি** টাঃ ৩·০০॥ সন্তোষকুমার ঘোষের **পারাবত** টাঃ ৩·০০॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **শালিক কি চড়ুই** টাঃ ৩·০০॥ 'রঞ্জন'-এর **সংকরী** টাঃ ৩·০০॥ দেবেশ দাশের **রোম থেকে রমনা** টাঃ ৩·৫০॥ দক্ষিণারঞ্জন বসুর **বাজীমাৎ** টাঃ ১·৭৫॥ জ্যোতির্ময় ঘোষের ('ভাস্কর') **কাংশন** টাঃ ৩·০০॥

উপন্যাস : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **মৌসুমী** টাঃ ৩·০০॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **তুমি আর আমি** টাঃ ২·৩০॥ বনফুল-এর **জলতরঙ্গ** ৪·৫০, **ভীমপলশ্রী** টাঃ ৫·০০॥ বুদ্ধদেব বসুর **লাল মেঘ** টাঃ ৩·০০॥ ভবানী মুখোপাধ্যায়ের **কান্নাহাসির দোলা** টাঃ ৩·৭৫॥ প্রতিভা বসুর **মনোলীনা** টাঃ ২·৫০॥ অমলা দেবীর **ছায়াছবি** টাঃ ২·০০॥ জ্যোতির্ময় রায়ের **আচমকা** টাঃ ২·০০॥ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের **ফুটলো কুসুম** টাঃ ২·০০॥ বিমল করের **ত্রিপদী** টাঃ ২·০০॥ বিমল মিত্রের **সুয়োরাণী** টাঃ ৩·২৫॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের **নীল আলো** টাঃ ৩·০০॥ অনুরূপা দেবীর **উত্তরায়ণ** টাঃ ৫·৫০॥ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **দিবারাত্রির কাব্য** টাঃ ৩·২৫॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **নীল রাত্রি** টাঃ ৩·৫০॥ কণাদ গুপ্তের **পূর্ব-মীমাংসা** টাঃ ২·৫০॥ মতি নন্দীর **নক্ষত্রের রাত** টাঃ ৩·৫০॥ দীপক চৌধুরীর **নীলে সোনার বাতি** টাঃ ৩·৫০॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **এক ছিল কন্যা** টাঃ ৬·৫০॥ আশাপূর্ণা দেবীর **মেঘপাহাড়** টাঃ ৩·০০॥

বিবিধ : শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটমি** টাঃ ৩·০০॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ** টাঃ ৩·৫০॥ হিমানীশ গোস্বামীর **লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়** টাঃ ৩·০০॥ অনাথনাথ বসুর **মুক্তিসমুদ্র** টাঃ ৩·৫০॥ নলিনীকান্ত সরকারের **শ্রদ্ধাস্পদেষু** টাঃ ২·৫০॥ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের **অবনীন্দ্র চরিতম্** টাঃ ৫·০০॥

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, —৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 30th June, 1961.
40 Naye Paise.

সম্রাট নীরোর কথা আমরা সকলেই জানি। সমস্ত রোম শহর যখন আগুনের বেড়াজালে বিপর্যস্ত, তখনও তিনি বেহালাবাদনে মত্ত ছিলেন।

কিন্তু আমাদের কালে তা সম্ভব নয়। আমরা নীরো নই। ঐ নিষ্ঠুর উদাসীনতা আমাদের যুগে সর্বত্রই ধিক্কৃত। সেইজন্যে 'অমৃত' বিশেষভাবে সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা হলেও কাছাড়ের ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে একাধিকবার আমরা মতামত জানাতে বাধ্য হয়েছি। এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের 'বহুভাষী রাজ্য' ফর্মুলাকে স্বাগত জানিয়ে এ ব্যাপারে একটা নতুন রাস্তার সন্ধান পাওয়া গেল বলে আশ্বস্ত হয়েছি।

কে জানত, সে আশ্বাস এত ক্ষণস্থায়ী? যখন ভাষা আন্দোলন প্রায় স্থগিত রাখা হয়েছে, কাছাড়ের স্থানীয় নেতৃবর্গ যখন দিল্লিতে শ্রীশাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত, সেই শান্তিপূর্ণ আপোষকামী আবহাওয়ায় শোনা গেল হত্যাকারীর নির্লজ্জ জয়ধ্বনি, আকাশবাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িকতার লালাক্ষরণে। কেন এই আক্রমণ? মানুষের জীবন নিয়ে কেন এই ছিনিমিনি খেলা? পূর্বাপর ঘটনা দেখে একে আকস্মিক বলব এমন মূঢ় আমরা নই। বরং সমস্ত ব্যাপারটাই যে পূর্বপরিকল্পিত এবং স্বার্থপ্রণোদিত, এ প্রায় দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। গোয়েন্দাকাহিনীর হত্যাকারীর বেলায় যেমন ঘটে, এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি আততায়ী তার দুষ্কর্মের সব চিহ্ন এখনো মুছে ফেলতে পারেনি। আমরা আশা করব, কেন্দ্রীয় সরকার অচিরেই এক ব্যাপক তদন্তের মারফৎ সুড়ঙ্গবাসী বিষধরের জঘন্য স্বরূপ জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করার ব্যবস্থা করে দেবেন।

বলা বাহুল্য, এটা আমাদের মামুলী অনুরোধ নয়। এর মধ্যে আরো একটা দিক আছে। গত মে মাসে আন্দোলনকারী নিরুপদ্রব স্বেচ্ছাসেবকদের উপর গুলীবর্ষণের ফলে যে নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে পশ্চিমবঙ্গের সমবেদনা নীরব থাকেনি। কিন্তু এক বছর আগে আসামের ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলের বাঙালী বিতাড়নের সময়েও যেমন, তেমনি ঐ গুলীবর্ষণের পরেও

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই সভ্য জগতের নিয়ম মেনে শান্ত এবং অনুত্তেজিত থেকেছেন। আমরা জানি, এবারকার এই চক্রান্তকারী দাঙ্গার ফাঁদেও তাঁরা ধরা দেবেন না। বাইরের প্ররোচনা যতোই তীব্র হোক, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং জন-সংস্কৃতি এতই পরিণত যে সেই উস্কানিতে ইতর প্রাণীর মতো পাঁকে নামা তার পক্ষে সম্ভব নয়। জানি, এ আত্মপ্রত্যয় অনেকের কানে শ্লাঘার মতো শোনাবে, তবু বলব—আসামের একশ্রেণীর জনতা এবং তাদের নেতৃবৃন্দ যতো অত্যাচারই করুক তাদের অন্যায়ের মাত্রাহীনতা যে নিছক দুর্বলতা ঢাকারই অক্ষম প্রচেষ্টা তা বোঝার মতো ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গের আছে। তাই একদিকে যেমন আমরা অভিনন্দন জানাব বাঙালী জনসাধারণের অবিচল শুভবুদ্ধির প্রতি, অন্যদিকে তেমনি কেন্দ্রকেও বলব—ভারতের অখণ্ডতা, সামাজিক অগ্রগতি এবং মানুষের অধিকার যারা ব্যাহত করতে চায় তাদের বিচার করা হোক এবং শাস্তি দেওয়া হোক। ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষাই গ্রহণ করতে বলে। ক্ষুদ্র স্বার্থের সংকীর্ণ দৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ থাকলে আজ তার অব্যাহতির কোনো পথ নেই।

আমরা প্রতিদিন অনুভব করি, পশ্চিমবঙ্গ যেন সমস্ত ব্যাপারেই ঈষৎ অবহেলিত এবং করুণার পাত্র। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদীমূলে বাঙালীর আত্মদানের উল্লেখমাত্রই আজকাল নানাস্থানে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বহির্বিশ্বে অকুণ্ঠ সম্মানের পাত্র হলেও সেই মহাকবিরই মাতৃভাষা আজ কাঙালিনীর মতো অপাংক্তেয়। কিন্তু সত্য কখনো বেশীদিন চাপা থাকে না। আমরাও আমাদের আত্মত্যাগ ও সাধনার ফল অবশ্যই লাভ করব। আমাদের চিন্তাকে একাগ্র ক'রে হৃদয়কে উন্নত ক'রে আবার আমরা মানবতার সাধনায় নেতৃস্থান অধিকার করব, এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি মানুষ আজ সতর্ক প্রহরীর মতো জেগে উঠুন, সাম্প্রদায়িক নাগিনীর বিষাক্ত নিশ্বাস যেন আমাদের জীবনযাত্রাকে কলুষিত করতে না পারে।

গান্ধীজীর অতলস্পর্শী মানবিক করুণা এবং রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী জীবনচেতনা আমাদের সমস্ত রকম ক্ষুদ্রতা ও দীনতা থেকে রক্ষা করুক।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১—'৬০, ২৫শে জুন)

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দেখতে দেখতে একটি বৎসর অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল। এক বৎসর আগে এমনি দিনেই কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের ত্যাগ ক'রে পরলোকগমন করেছেন। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমাদের মনে এখনো অম্লান। এখনো সেই হাস্যময় সুদর্শন মূর্তিটি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান কবি। প্রথম জীবন থেকেই রবীন্দ্রনাথের নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি. কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেও সে প্রভাবকে অতিক্রম করে যাওয়াই ছিল তাঁর সারা জীবনের সাধনা।

বস্তুত পরিণত বয়সে তাঁর জীবনদর্শন অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের থেকে বিভিন্ন হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর মতো অধীত বিদ্যা এবং মনীষা এ যুগে খুবই বিরল। সেই বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রয়োগে সুধীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' এযুগে প্রায় কালাতিক্রমণদোষে দুষ্ট। জীবনের সমস্ত রকম মূল্যবোধই এখন ধ্বংসের দিকে। এবং এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সমর-মন্থনে এখন কালকূট ছাড়া আমাদের ভাগ্যে বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। একালের শিল্পী ও কবিদেরও তাই একমাত্র দায়, এই সর্বগ্রাসী অবক্ষয়কে অনুধাবন ক'রে সেইভাবে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা। তিনি লিখেছেন—

"আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই
ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না
দুর্বিপাকে।..."

সুধীন্দ্রনাথ কেবল কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। অনেকগুলি গদ্য-প্রবন্ধে শিল্প-সাহিত্য, সমাজ ও সমসাময়িক জীবনধারার বিষয়ে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। আমাদের জীবনে তিনি যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কাজেই তাঁর মতামতকেও প্রত্যেক পাঠক যুক্তির দ্বারা যাচাই করে দেখলেই তাঁর প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানো হবে। আসলে এ সব প্রবন্ধে কতোটা পাওয়া গেল কিম্বা পাওয়া গেল না, সেটা বড় কথা নয়। আমাদের 'আত্মরতি'কে নাড়া দিয়ে জীবন সম্বন্ধে সচেতন করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

স্বীকার করতে হবে, তাঁর দৃঢ়-সংবদ্ধ গদ্যশৈলীতে এবং নিরাভরণ কবিতার অন্তরাবেগে সুধীন্দ্রনাথ এদিক দিয়ে কৃতকার্যও হ'য়েছিলেন অনেকখানি। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকা এককালে বাংলাদেশে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তনা দিয়ে উল্লেখযোগ্য হ'য়ে উঠেছিল। সত্যি বলতে কি বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর পর এতবড় ব্যক্তিত্ব আর দেখা যায় নি—যিনি নিজেই শুধু একজন কৃতি লেখক নন, নতুন ধরনের লেখক তৈরীর কৃতিত্বও যাঁর নিঃসংশয়ে প্রাপ্য।

এই নতুন ধরনের লিখনরীতির ভিতর দিয়েই সুধীন্দ্রনাথ চিরজীবী হ'য়ে থাকবেন।

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্ধকারে বসে ছিলাম। একটা জোনাকি এলো। আলোয় ভরে গেল। হিন্দীতে বলে জুগনু। আমার এক বন্ধুর অতি সুন্দরী ছোট্ট মেয়েকে জুগনু বলে ডাকতাম। একবার বহু বছর আগে, বোধহয় ইন্টারমিডিয়েট পড়বার সময়, দার্জিলিং থেকে পাহাড়ী ট্রেনে চড়ে নামছি, তিনধেরিয়া আর শুখনার মাঝামাঝি জায়গাটায়, শুখনার জঙ্গলের কাছ বরাবর, রাত্রি হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটাও থামল, লোকজন সব নিঝুম, নিস্তব্ধ, হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি এল, লক্ষ লক্ষ জোনাকি, কিন্তু আলো হয়ে উঠল না, বনের অন্ধকার আরো ঘন কালো হয়ে গেল। আলো যেন মিইয়ে গিয়েছে, কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। অনেকক্ষণ গাড়ি চুপ করে থামবার পর আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল।

১৯০৯—১০ সালের দৃশ্যটি মনে এলো। সে দৃশ্য গত পঞ্চাশ বছরে একবারের বেশী মনে ওঠেনি। মনের মধ্যে রেকর্ড থাকে, পিন গাঁথলে মনে পড়ে যায়। কিন্তু পিনটা গাঁথল কখন? পঞ্চাশ বছর বাদে হঠাৎ মনে পড়ল কেন?

আমেরিকান অধ্যাপকরা বেশী কথা কন। সবচেয়ে বেশী সমাজতাত্ত্বিকদেরই। এত অবান্তর কথা কখনও শুনিনি। Organisation Man, Lonel Crowd প্রভৃতি বই একশ পৃষ্ঠায় লেখা চলত। নতুন কি বলছেন বুঝি না। কিন্তু বুঝতে আর বোঝাতে চাইছেন—এইটাই বড় কথা। মাথার ভেতর গিজ্-গিজ্ করছে, কমই দানা বাঁধে, কোনোটা বাঁধে না। অনেকটা জীব-জগতের ব্যাপার। মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোক, ঘটনা নিয়েই খেলা, ধর্মের খেলাও আছে, কিন্তু মরমী কবিতা নয়। ঠিক আইডিয়াও সেই রকমই। স্পীনোজা, লাইবনিটজ, ডেকার্ট, লক, এঁরা অল্প কথার লোক। আরো অল্প, নিতান্ত অল্প উপনিষদের কথা। চীনে দর্শন অত্যন্ত স্বল্প। অবশ্য ব্যাখ্যার দর্শন অত্যন্ত স্বল্প। অবশ্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকবেই। আমার নিজের ইচ্ছা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বুঝতে চাই, বোঝাতে চাই না। বুঝতে চাওয়াটাই বোধহয় অব্যক্ত।

আজকাল যেন একটু সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছি। আগে অত্যন্ত কথা কইতাম, এখন আর ভালো লাগে না। বক্তব্য যেন ঘন হয়ে আসছে। 'মনে এলো'র লেখাটা যেন এই পর্যায়ের ঘন, খাপছাড়া নয়। গত এক মাসে একশ কথা কয়েছি? বেশ চুপচাপ বসে আছি। লোকজন খুব কমই আসে, তাঁরা নিজেরাই আলাপ করেন, আমি শুনি, বিরক্ত হয়ে চলে যান বোধহয়। শুনে বাক্য আসে না, ভাব ওঠে, কিন্তু ব্যক্ত হয় না। আমার আমেরিকান হওয়া আর হলো না।

ভালো লাগা, ভালো না-লাগা, এ দুটি ভিন্ন আরেকটি তৃতীয় স্তর আছে। তাকে বোধহয় আমি good বলি; ছেলেটি ভালো নয়, good; বইটি ভালো নয়, good, ছবি ভালো নয়, good—ইত্যাদি। Good-এর অস্তিত্বই পৃথক।

আরেকটি সত্তা, যেমন শংখনার জংগলে জোনাকি, বারাসাতের বাড়িতে চিলকোঠায় রাত্রে একলা শুয়ে বেহাগ গাওয়া, ভগবান সহায়, সত্যেন বোস এদের কেবল অস্তিত্ব, দোষ নেই, গুণ নেই, নিছক অস্তিত্ব, sublime নয়, strange নয়, romantic নয়, lyrical নয়, কেবল আছে, সেইটাই তাই, তার বর্ণনা সেই, বর্ণনার প্রয়োজনই নেই, একটা ফুল ফোটে তাই সব, তার নাম জানি না, তবে কেবল আছে। তা নিয়ে পাগল হবার দরকার নেই—এটা ভালো-মন্দর ওপারে। মঙ্গলের অস্তিত্ব আছে, কেবল থাকাটাই অস্তিত্ব, কিন্তু প্রান্ত অস্তিত্ব স্বতন্ত্র।

* * *

আমি পোলিটিক্যাল জীব নই, কেবল ভালোভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চাই। সব পার্টির সংগেই আমার যোগ আছে। কংগ্রেসের সংগে যুক্ত হয়ে কাজ করেছি; কম্যুনিস্টদের অনেককে আমি চিনি, জানি, দু-চারজনকে ভালোবাসি: পি-এস-পি-র নেতাদের সংগে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। সকলের দোষ-গুণ কিছু কিছু জানি। Conservative Party-র একজনকে ছাড়া কাউকে চিনি না। বাংলাদেশের দু'চারজন ছাড়া বেশী লোক এ দলে ভিড়বে না। আমি বোধহয় তাঁদের নাম জানি।

২২।৬।৫৯

সত্যেন (বোস) মশুরী থেকে আমার কাছে দেরাদুনে এল। সংগে তিনটি অধ্যাপক-ছাত্র নিয়ে। দুদিন পরে চলে গেল। জন পঞ্চাশেক Theoretical Physics-এর তরুণ ও অ-তরুণ অধ্যাপক নিয়ে এক মাস ধরে মশুরীতে রোজ আলাপ-আলোচনা করলেন। সত্যেনের মতে বাঙালী ছেলেদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভালো ছেলে মনে হোলো। হুমায়ুন কবিরের ছেলে ও অল্লাডি কৃষ্ণস্বামীর ছেলে খুব বুদ্ধিমান, এই দুটিকে বিশেষ করে তার মনে ধরেছে। এক মাস সত্যেন তাদের নিয়ে খুব খেটেছে।

আমি প্রশ্ন করলাম, "বিজ্ঞানে আপনারা সারাদিন সমস্যা নিয়ে সমালোচনা করেন। Social Science-এ সে ধরণের সমস্যা সর্বক্ষণ চলে না। বোধহয় অর্থনীতিতে যাদবপুর ও দিল্লীতে কিছু হচ্ছে। অন্যত্র বোধহয় না. বি-এ এম-এ পাস করিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সমস্যামূলক শিক্ষার জন্য বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে। Social science-এর শিক্ষা problem-centred নয়, নিতান্ত পুরোনো বই ঘাঁটা তাও নয়, তৃতীয় শ্রেণীর text book নিয়ে নাড়া-চাড়া। বক্তৃতাকে সেমিনারে পরিণত না করা ছাড়া উপায় নেই।

* * *

৮ই মে তারিখের Times Literary Supplement-এ আমার বইয়ের একটি ছোট রিভিউ বেরিয়েছে। সুখ্যাতি, কিন্তু নিরর্থক।

২৩।৬।৫৯

নবেন্দু (বসু) বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অল্পই লিখেছে, মাত্র দুখানি কিন্তু অত সুন্দর বই দুর্লভ। কি রকমভাবে বাংলা কাব্য বুঝতে হয় তার বিশদ ব্যাখ্যা সে করেছে। যাকে কাব্য-পরিচিতি বলে তা এখানেই পাওয়া যায়। অল্প বয়সে মারা গেল। আমি ছিলাম তার 'বড়দা'। উনাও-র গঙ্গায় তার সৎকার করলাম। গঙ্গার পুলের নীচে, ট্রেনের ধারে, তার দাহ করা হোলো বালুর ওপর চড়া, তাইতে আগুন দেওয়া হোলো, মাত্র দশ-পনের মিনিটে পুড়ে গেল। একবার জ্বলে উঠল—তার পরই শেষ! এত অল্পতে নিঃশেষ হয়ে যায়! সেখান দিয়ে যখন যাই তখন চোখ বুজে ফেলি, লক্ষ্ণৌ-এর তার বাড়ির কাছেও তাই। তার কথা ভাবতে প্রাণটা ছাঁৎ করে ওঠে।

প্রফুল্ল ঘোষ আমাকে বলেছিলেন, 'নবেন্দুর মত সাহিত্য-রসিক দুটি নেই।' সত্যই তাই, তার মধ্যে নিষ্ঠা ছিল। কিন্তু বাঙালীরা তাঁকে চিনলে না—এটা বড় দুঃখ!

রবীন্দ্রনাথ, (হয়ত) অজিত চক্রবর্তী, মোহিত মজুমদার, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং নবেন্দু—এঁরাই যথার্থ কাব্য-সমালোচক। ভিন্ন স্তরের ভিন্ন শ্রেণীর, ভিন্ন ধরণের, তবু তাঁরা কাব্যকে ভালবেসেছেন, বুঝেছেন এবং (সুধীন্দ্র ছাড়া) অন্যকে বুঝিয়েছেন। সুধীনকে বোঝা একপ্রকার snoblery! সব চেয়ে সহজ লেখা নবেন্দুর। গদ্য-ছন্দ সম্বন্ধে নবেন্দু সামান্য লিখেছে, কিন্তু সেটা মহামূল্য।

২৪।৬।৫৯

এখনও গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের নাম কথায় কথায় মনে ওঠে। দিনে একবার নেই যে তাঁদের কথা মনে পড়ে না। তার পরেই বোধহয় অরবিন্দ। শেষে আসে আরেক জন চতুর্থ ব্যক্তি।

গান্ধীর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিপক্ষাচরণ করেছি। মরবার পর কিন্তু বুঝলাম। তাঁর মৃত্যু অ-ভারতীয়, সমগ্র বিশ্বের বস্তু। রবীন্দ্রনাথকে ১৯১০ সাল থেকেই বুঝেছি তিনি মহৎ। মৃত্যুর আক্রমণে মহৎ, কিন্তু ব্যক্তিগত মৃত্যু সম্পর্কে সেটি প্রহেলিকা। উপনিষদ ও personality দুটোই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু দার্শনিক সমন্বয় পারেনি। আর অরবিন্দ, তিনি মহাপুরুষ, তাঁর সব কথা প্রায় শুনি, কিন্তু অনেক জিনিস গ্রহণ করতে পারি না। তিনজনই ভগবান মানতেন। আশ্চর্য লাগে শুনে যে লেনিন ভগবান মানতেন না জেনেও তিনি মহৎ। মানুষ হিসেবে এঁরা একশ্রেণীর।

আমি কিন্তু একজনকে জানি যে মোটেই মহামানব নয়, মহাপুরুষ নয়, মহাত্মা নয়, মানুষ, স্থিতপ্রাজ্ঞ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং আত্মজ্ঞানী। ভক্তিমান, কীর্তন গায় ও ভগবানের নাম নেয়, তবু মহাপ্রাণ। তার সংগে ১৯২২ সাল থেকে আলাপ, আলাপের চেয়ে বেশী। কত আলোচনা করেছি, তার কৃষ্ণভক্তিকে ঠাট্টা করেছি, সে কিন্তু আমার কাছে এলেই গা জুড়িয়ে যায়, আমার জঞ্জাল দূর হয়, নতুন, ঠান্ডা মানুষ হয়ে যাই, ভেতরকার সমস্যা সরে যায়। সে কেষ্টঠাকুর মানে, পুজো করে; আর আমি সম্পূর্ণ অন্য জীব। তবু যেন এক। আমাদের ঐক্যের সন্ধান জানি না, কিন্তু ঐক্য আছে এই জানি। Spiritualityটা ভগবদভক্তির চেয়ে উঁচু জিনিস মনে হয়।

২৫।৬।৫৯

সত্যানন্দ যোশী বলতেন, 'চারজন মানুষ গান শুনতে শুনতে 'মস্ত' হয়ে যান, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, অতুলপ্রসাদ সেন এবং আরেক জন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক পাগল হোতেন না, মশগুল হয়ে যেতেন, চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে শুনতেন এবং সংগে সংগে গাইতেনও। গান্ধীজীর পাশে বসে (দিলীপের বাড়িতে) আবদুল করিমের গান শুনেছি। তাঁকে 'মস্ত' হতে, কি মশগুল হতে দেখিনি। গান বন্ধ হবার পরই টাকা তুলতে লাগলেন, আর মেয়েরা হাত থেকে গয়না খুলে দিতে লাগল। গান্ধীজী যাবার পর সোমনাথ (মৈত্র) একটা গল্প শোনালেন। তিনি তখন আব্দাল্লাহ মারাজাইয়ের বাড়িতে

পড়াতেন। একদিন আম্বালালের স্ত্রীর ওখানে গানের বৈঠক হয়, গান্ধীজী আসেন। (বোধহয়) মোরাদ আলি বীনকার বাজাচ্ছিলেন। আম্বালালের স্ত্রী গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগল?' গান্ধীজী উত্তর দিলেন ঃ "It is sweet indeed, but it is not so sweet as the music of my Charka'. গুজরাতিতে এই কথা বলেন।

সেদিন ঐ আসরে শরৎচন্দ্র ও অতুলপ্রসাদও ছিলেন। এমন মণিকাঞ্চন যোগ কথনও দেখিনি। সেইদিন সকালে শরৎচন্দ্রকে ডাকতে গিয়ে দিলীপ বল্লে, 'মস্ত ওস্তাদ! আপনাকে আসতেই হবে।' শরৎদা উত্তর দেন, 'মস্ত ওস্তাদ! কিন্তু থামে ত?'

অতুলপ্রসাদই 'ম্যস্ত' হোতেন। একেবারে পাগল হয়ে যেতেন, গান শুনতে শুনতে কোলের ওপর ফরাস টেনে নিতেন, আর ওয়া-ওয়া শব্দ!

আরো দু একজনের ব্যাপার জানি। গোলাগঞ্জের নবাব যিনি ঠুংরি শুনতে শুনতে গলে যেতেন। আর একজন সেই লক্ষ্ণৌ-এরই এক অজানা বৃদ্ধ। এক পুরানো, বুড়ো বাড়ি, শহরের এক ভাঙ্গা পল্লীতে। আমীর খাঁ সুহা সুঘরাই গাই-ছিলেন। গান থামবার পর এত ভিড়ের মধ্যে একজন অতিবৃদ্ধ লোক ময়লা চুড়িদার পায়জামা আর কুর্তা পরে উঠে এসে ওস্তাদের সামনে হাজির হলেন, আর 'ওয়াহা, ওয়াহা' ডাক ছাড়লেন। তার পরই ওস্তাদের গালে চুমু খেয়ে ধীরে ধীরে উঠে নিজের আসনে সমাসীন হলেন। লক্ষ্ণৌ-এ এ জিনিস ছিল!

তানকারীর সময় আমীর খাঁ মাথা চুলকোতেন এবং মাথায় ও গালে থুতু মাখতেন। কিন্তু সত্যি গুণী, বাঘের মতন রাগকে কামড়ে ধরতেন। হায়দ্রাবাদের তান রাজ খাঁর ভাইপো।—অন্ততঃ তাই শুনেছিলাম। একদিন সকালে ললিত গান। মম্মন খাঁর সারেঙগীতে আর আমীর খাঁর গানে যে ললিত শুনেছি তার তুলনা হয় না। ললিত অত মিষ্টি জানতাম না। আলাউদ্দীনেরও ললিত শুনেছি, কিন্তু যেন অত মধুর নয়। সে কী দুই মধ্যম!

আলাউদ্দীনের, নসীরুদ্দীনের আর মম্মন খাঁর কেদারা আর কোথায় শুনতে পাব না। তাঁর শুদ্ধ মধ্যম যেন জমে গেল. সেইটাই তাঁর জমি, তাঁর স্বর, তাঁর প্রাণ।

এই সব শুনে 'ম্যস্ত' না হয়ে আর থাকা যায় না।

২৬।৬।৫৯

কথাটা খাঁটি ঃ "But science does not grow non-science in stages; for all its imperfections a science is science from the first question asked". ইকনমিক্স ধীরে ধীরে বিজ্ঞান হয়ে ওঠে না, খানিকটা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া যায়। অংক দিয়েও পুরোপুরি বিজ্ঞান হয় না। আমার ধারণা এই: এখন অঙ্কের সাহায্যে ইকনমিক্স হচ্ছে, তার পরে আর হবে না। তারপর সমাজতত্ত্ব আসবেই আসবে। অবশ্য অনেক দিন পরে।

২৬।৬।৫৯

একসঙ্গে এক মানুষের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন জিনিস লক্ষ্য করেছি। গিরিজা-পতি (ভট্টাচার্য) তিনটের সমন্বয় করেছে, বিজ্ঞান, বাংলা ছন্দ আর শিকার। কবিতা ও ছন্দ নিয়েই তার প্রতি আমার প্রথম আকর্ষণথ; তার মাতামহের কাছে সংস্কৃত ছন্দের একটা বই ছিল, তাই পড়ত এবং তারপর সত্যেনের (বোস) মুখ থেকে রবীন্দ্রনাথ পড়া। তারপর বিজ্ঞান এল প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে, সেখানে রিসার্চ করত এবং এখনও তাই চালান। দুটো এক হোলো কি করে বুঝি না, বোধহয় অঙ্ক ও জ্যামিতির ব্যাসকূট থেকে। শিকারের ঝোঁক এল অল্পবয়সে জন্তু-জানোয়ারের সখের জন্য। বড় বৈজ্ঞানিক, বড় ছান্দসিক হতে পারল না, তাই শিকার শুরু হোলো। একটি মাত্র বাঘ শিকার ছাড়া অন্য কিছু করতে পারলে না। বড় হতে পারলে না, হোলো কিন্তু একজন ভদ্রমানুষ। কজনই বা ভদ্র হয়?

২৬।৬।৫৯

কোনো মানুষ কথনও আর্টিস্ট হয়ে জন্মায় না; সব মানুষই কখনো, কোনো সময় আর্টিস্ট হয়। এরিক গিল ও ডেভিড জোন্স-এর এই কথাটি মানি।

তা যদি হয় তবে আর্টিস্ট হয় না কেন? কুশিক্ষার দোষে, পিতা-মাতার ও শিক্ষকের দোষে।

শিক্ষার বেশীর ভাগ স্বকীয়। অসিত (হালদার) অবনীবাবুও ওকাকুরার কাছ থেকে কিছু পেয়েছিলেন, বাকিটা নিজের। কতখানি ও কতটা নিজের? নিজের যেটুকু সেটা হোলো mystical আর abstract অংশ।

রোয়েরিক-এর পাহাড়ের ছবির রঙ চমৎকার, কিন্তু বেশী mystical। মদ্রিয়ান-এর abstract art অপূর্ব। তার সবটাই ডিজাইন। মদ্রিয়ান আমাকে মুগ্ধ করে—অশুদ্ধ রঙ আর শুদ্ধ ডিজাইন, দুটো মিশে যেন বিশুদ্ধ intellectual নয়। পিকাসোর পেঁচা একটা abstraction। প্যারিসে একটা পিকাসোর চায়ের বাটি দেখি—বিশুদ্ধ plasticity।

যামিনী রায়ের তিনখানা ছবি আমার কাছে আছে, তার মধ্যে একটা গলির। যত দেখি ততই নতুন মনে হয়। ভাল ছাপার মধ্যে একটা মাতিস-এর Odalisque, আর একটি ওয়াক-এর Chanticleer আছে। Odalisque-এর বর্ণ সমাবেশ একটু আলঙ্করিক, জাপানী। Chanticleer-এর মোটা রেখার টান একটি ওপরে অন্যটি নীচের। আজকাল যেন কিছুর অভাব দেখি। অসিত হালদারের অলিন্দ যেন বেশী কালো হয়ে গেছে। দুটি মেয়ের গতিভঙ্গী ও খোঁপার চাঁদের আলো—কিন্তু sentimental নয়। আরো একটি পাহাড়ী মেয়ের ছবি, অল্প বয়সের একটি মেয়ের আঁকা, কিন্তু লালিত যেন মুখটা সবই বদলে দিয়েছিল।

বসে বসে ছবির প্লেট দেখি—একজিবিশন দেখতে ইচ্ছে হয় না। মালরো-র কথাই মনে হয়।

২৮।৬।৫৯

হঠাৎ খেয়ালের মাথায় হৃষিকেশ আর লছমন ঝোলা দেখে এলাম। স্বর্গদ্বারটি সত্যই মনোরম, দূরে থেকে। লছমন ঝোলার সামনে বোকা পাঁঠার গন্ধ। ঝোলার চারধারে জঘন্য সন্ন্যাসী আর কুষ্ঠরোগী। হৃষিকেশে বাঙালী মেয়ে দেখলাম—কেবলই ভিক্ষা চাইছে। তীর্থস্থানে কোনো সৌন্দর্য নেই। দেবতাত্মা হিমালয়ের বদলে ঘৃণাত্মা হিমালয়। অবশ্য এ অংশটি হিমালয় নয়, টেহেরী। রোমের রাস্তায় সাধু আবার হৃষিকেশেও সাধু। রোমের সাধু জামা পরে এখানকার সাধু ন্যাংটো। এত গরমে নগ্নতাই শোভা পায়।

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসছিলাম। প্রায় আট-দশ হাত দূরে পর্যন্ত হলদে তিৎলীর (প্রজাপতি) ঝাঁক—খুব খেলা করছে।

সন্ধ্যার ঝোঁকে বৃষ্টি নামল। পাহাড়ী স্রোতের নদী বইছে জোরে। পূবের জানলা দিয়ে টেহেরীর পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আর বাঁ পাশের জানলা দিয়ে মশৌরী পাহাড়। শালবনের ভেতর দিয়ে ঘোলাটে মেঘ আর মেঘলা আলো। পূবের দিক পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এখনও অন্ধকার হয়নি। ঘন নীল, কত রকমের নীল, সবুজ গাঢ় হোলো নীল তিন রকমের, সবুজ চার। হাজার চারেক ফুট থেকে মেঘ নামতে শুরু হয়েছে। একটা পাহাড়ের ওপর থেকে চুনের প্রকাণ্ড চ্যাঙড় পড়েছে। সরকার চুন তুলতে দিয়েছে। এটা মহাপাপ।

* * *

দেরাদুনের অত্যন্ত কাছে, রাজাজী sanctuary-তে মোড়ের মাথায়, সন্ধ্যাবেলায় একটা বাঘা বেরিয়েছে। মোটরের সামনে এসেছিল, তারপর আসতে আসতে চলে গেল। শুনলাম গোটা পাঁচেক আছে। আমি একটাও দেখিনি। দেখতে ইচ্ছে হয়, আবার হয়ও না।

রাজপুরে, রথীবাবুর বাড়ির সামনে একটা গুল বাঘা রাস্তা পার হয়ে প্রায় রোজই সন্ধ্যার ঝোঁকে বনের মধ্যে চলে যায়। আমি তাকেও দেখিনি। কিন্তু কেন এত বাঘ আসছে?

৩০।৬।৫৯

'মা'র (শাশুড়ী) কাছে শুনতাম সবই কর্মফল। আমি ঠিক বুঝি না, লোকের মুখেই শুনি। আচ্ছা যদি কর্মফলই হয় তবে কোটি কোটি অস্পৃশ্যরা সকলেই কর্মফল ভোগ করে কেন, কোটি কোটি লোক গরীব কেন?'

সত্যই উত্তর পাই না। যদি কার্য-কারণ সম্পর্কই থাকবে তবে একজনের একবার থাকবে, জন্মের পর জন্ম বরাবরই থাকবে না একত্রে সকলের থাকবে না। কর্মফলের সঙ্গে জন্মান্তর জুড়ে আছে। জন্মান্তর একটি বিশ্বাস, কার্য-কারণ সম্বন্ধ ব্যক্তিগত।

১।৭।৫৯

শিশিরবাবু (ভাদুড়ি) মারা গেলেন প্রায় সোত্তর বৎসর বয়সে। বাংলাদেশের তুলনায় যথেষ্ট নিশ্চয়, তবু মনটা খারাপ হয়ে যায়। স্কটিশ চার্চে জুলিয়াস সীজার আর এক সপ্তাহে তিনটি একই ধরণের পাট, যোগেশ, জীবানন্দ আর নিমচাঁদ, প্রায় সবগুলিই দেখেছি, মাইকেল মধুসূদন ছাড়া। ১৯০৭।৮ সাল থেকে থিয়েটার দেখে আসছি, অনেক বড় অভিনেতা দেখেছি, কিন্তু তাঁর মতন কেউই নন। হয়ত আমার ভুল। শেষে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই ধরণের cynicism অনেক দিনই ছিল। ওটা প্রথমে রপ্ত করেছিলেন, পরে অভ্যাস হয়ে যায়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত খেয়েছেন; আবার দিয়েওছেন হয়ত, কিন্তু বেশীর ভাগ পাওয়াই। গুরুদাসবাবুর কথা মনে উঠছে, আজ কিন্তু লিখতে হচ্ছে না, হাসি পাবে। শিশিরবাবুর সঙ্গে শরৎবাবু, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়ার, গিরীশবাবু প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথাই কয়েছি। প্রত্যেক কথাটি নতুন। তাঁর ভেতর মাইকেলের অংশ ছিল। অভিনয়ের স্মৃতি মনে থাকবে না, স্বপ্ন হয়েই থাকবে।

৫।৭।৫৯

দুজনের নীরবতায় সত্যকারের বিনিময়; তিনজনের কথোপকথনে জমে আড্ডা; পাঁচজনে বসে পঞ্চায়েৎ: এবং আরো বেশীতে ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে ওঠে ডিমক্রাসী, আর না হয় একস্তম্ভ সমাগম। ভিড়ের পরিমাণই বেশী; প্রথমটা সংখ্যামূলক, পরে গুণাত্মক।

৭।৭।৫৯

নিতান্ত concrete ভাবে আজকাল বাংলা ভাষায় লেখা উচিত। রবিবাবুর প্রভাবে ভাব এত বেশী আসে যে তা থেকে দূরে থাকাই ভালো। অনেকটা হেমিংওয়ের মতন, নেহাৎ না হয় গ্রাম্য গ্রীণ। প্রমথবাবুর সাহায্য নেওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি।

আজকালকার আমাদের নভেলিস্টরা রূপকে concrete করতে গিয়ে realist কিংবা naturalist করে তুলেছেন। ভাবের পরশ এখনও লেগে রয়েছে, তাই romantic realism,

যেমন মাণিক বন্দ্যোর লেখা। আমার বিশ্বাস, আমাদের উদ্দেশ্য realist হওয়া নয়, concrete হওয়া।

আমাদের চলন-বলন ক্রিয়াপ্রধান নয়, আমাদের বিশেষ্যও কম, সবই যেন বিশেষণ। কৃ-ধাতুকে বাদ দিয়ে সোজা-সুজি বিশেষ্যকে ক্রিয়াতে পরিণত করা যায় কি না, দেখতে হবে।

Concrete হওয়ার অর্থই হোলো নিষ্ঠুরভাবে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া। পরে ব্যক্তিসম্পর্কতা থাকে ত দেখা যাবে। আমেরিকান কবিদের অনেকেই ভীষণ নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু mood এসে থেকেই যায়। mood নিয়ে কিন্তু আরম্ভ করা অন্যায়—লেখবার সময় অন্যায়।

এইখানেই বুদ্ধির খেলা। প্রকৃতিতে বিশ্বাস অচল। বুদ্ধি দিয়েই concrete হতে হবে। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা—তাদের প্রধান কথা stream of consciousness যতটা নয় ততটা romantic প্রভাব থেকে concrete-এ আসা। আশ্চর্য! তিন-চারজন ছাড়া কেউ ঠিক বোঝেননি—বুঝলে সুবিধে হোতো। দেশের পাঠক, শিক্ষিত পাঠক, realism চায়।

সীরিল কোনোলি বড় লেখক নয়. তবু তাঁর Unquiet Grave-এ অনেক concrete লেখা রয়েছে। ইংরেজরা গাছপালা আঁকে ভালো। আমাদের গাছ-পালা নেই, আর না হয় ভাবে গদগদ; যেমন বিভূতিবাবুর লেখা।

৮।৭।৫৯

বিশুদ্ধ জলের ইনজেকশন অত্যন্ত পীড়াদায়ক। সেজন্য কিছু নুন দিতে হয়, শতকরা ·৮ থেকে ৩ পর্যন্ত। তেমনই বিশুদ্ধ মুক্তা শ্রেষ্ঠ নয়, সুন্দর মুক্তায় মেশান থাকে। বিশুদ্ধ কবিতার মধ্যে সংগীত এসেই যায়। ম্যালার্মে বলতেন, বিশুদ্ধ কবিতা হোলো বিশুদ্ধ সংগীত। বিশুদ্ধ সংগীতের মধ্যে বাখ্-এর ফিউগ্, বেঠহোভেন নয়। Abstract painting-এ রঙ থাকে।

১০।৭।৫৯

লক্ষ্ণৌ-এ তেত্রিশ বৎসর থাকলাম। লক্ষ্ণৌ-এর দিনগুলি ভালোভাবেই কেটেছে। কয়েকজন যুবক কিন্তু বিশ্বাস করতে চান না; যে মানুষ বিশ বছর লেকচারার ছিলেন তাঁর মনে কি ছাপ পড়েনি?

বিশ বছর লেকচারার ছিলাম মনেই পড়েনি। আমার ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর সেরা ইয়ুনিভার্সিটিতে যে সব লেকচারার আছেন, আমি যেন তাঁদের দলেই থাকি। I am the minimum lecturer in a first rate University in Europe—এই আমার বিশ্বাস ছিল। লেকচারার হওয়াটা সম্মানের কথা, তার বেশি হতেও চাইতাম না। অন্যে আমার চেয়ে বেশি কর্মশীল তাও বোধ হয় জানতাম না, বীরবল সাহানীকে ছাড়া। সামান্য দু একটি ঘটনা ছাড়া মনেই পড়ে না যে লেকচারার হয়েছি বলে সম্মান কম পেয়েছি। সাহিত্য ও সংগীতে আমি তাঁদের সমানই ছিলাম, হয়ত কখনও কখনও বেশি। অতএব আমার তিলমাত্র আফশোষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎ চাটুয্যে, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির সঙ্গে তুলমূল্য হিসেবে মিশতে পারতাম, কোনো তফাৎ থাকত না। গানের আসরে ত জগন্নাথক্ষেত্র! বাহবা দিয়েই এক হয়ে যেতাম। গানের আসরেই বোধ হয় সত্যকারের ডিমক্রাসী পেয়েছি। লক্ষ্ণৌএ সাহিত্য ও গানের আসরে ঐ ডিমক্রাসীর জন্যই যা কিছু শ্রেণী-বিভাগের ক্ষতিপূরণ করেছে। যে লক্ষ্ণৌএর মুশায়রা দেখেছে সেই জানে এই কথা।

তার পরেও রীডার, প্রোফেসার হয়েছি, প্রথম ভুজঙ্গভূষণ মুখুয্যে ও দ্বিতীয় আচার্য নরেন্দ্র দেবের জন্য। নিজে থেকেই এসেছে, আমি জানতাম না। অতএব আমার কাছে শ্রেণী বিভাগের মূল্য নেই।

কিন্তু অন্যত্র আছে ও ভীষণভাবেই আছে। সেটা জানি, notionally। সেই থেকে আমি অবশ্য আমার মত গড়ে তুলেছি। আমার সোশিয়ালিজম সম্পূর্ণ বুদ্ধিসুলভ। সেটা দোষের?

১১।৭।৫৯

সবুজ পত্রের প্রায় সব রচনায় প্রমথ-বাবুর হাত থাকত—রবীন্দ্রনাথের বেলা নয়। পরিচয়ের জন্য এক আধজন ভিন্ন সুধীন্দ্র অন্য কারুর রচনা সম্পাদন করতেন না। দুটো সম্পাদনের রীতি পৃথক। প্রমথবাবু একাই একশ'; সুধীন্দ্র একের মধ্যে অনেক এবং

অনেকের মধ্যে এক, কিন্তু সে একক মানুষ হিসেবেই লেখা যেত। দুজনই খেয়ালী, দুজনেরই আগ্রহ ক্রমেই কমে যায়। দুজনের লেখা বয়সের সঙ্গে আর সে-রকমটি থাকেনি, কারুর কম, কারুর বেশি, যেমন পরশুরামের হয়েছে। সুধীন পুনরুদ্ধার করছে জানি। সে হিসেবে দুটি সংশোধন করছে। কিন্তু ভুল চুকের মধ্যেও মজা ছিল। এত নির্দোষ লেখা কি পোষায়?

১২।৭।৫৯

এক বৎসর প্রায় নতুন বাংলা বই পড়িনি। বিশেষ লাভ হয়েছে কি? কিসেরই বা লোকসান? দু তিন বছরে সারা বাঙলাদেশে একটা পথের পাঁচালি বেরিয়েছে—তার উর্ধ্বে না হয়েছে সাহিত্য, না চিত্র, না সঙ্গীত, না ভাস্কর্য, না কিছু। তাই মনে হয়। অবশ্য ভুল হতে পারে, এবং দেশের ইতিহাসে দু তিন বছর নগণ্য। কিন্তু ১৯০৫।৬ সাল থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত, এক বৎসরের মধ্যে একটা না একটা কিছু হোতোই। এক একটা বৎসর ফলত যেন কাঁঠালের মতন। তবু, সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস এখনও আমার যায়নি। নীরদ চৌধুরীর কিন্তু গেছে।

* * *

কেন কোনো এক সময় একত্রে কাঁঠালের মতন এত ফল ফলে কেন? যেন খানিকটা প্রাকৃতিক নিয়ম। হয় ত্রিশ বার, না হয় একশ' বার। একশ' বার হোলো বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ পর্যন্ত। গত ত্রিশ বৎসরে সেই রবীন্দ্রনাথ থেকে গান্ধী, মতিলাল, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ ও জওহরলাল। জওহরলালকে বাদ দিলে প্রত্যেকেরই আশেপাশে অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের গদি লেগেছিল। তার পর থেকেই ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে পলিটিকস চর্চা আরম্ভ হোলো। দেশে পলিটিকস আসা মাত্রেই কালচারের ক্ষতি। পলিটিকসের অর্থই হোলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে কারবার, এবং তার বেশি নয়। তা যদি হয় তবে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা চলে না। যদি আমাদের Welfare State হয় তবে কালচারের ক্ষতি হবে। আমাদের এতদিনকার কালচারের প্রধান কথা বিপক্ষতা, non-conformity dissent; কিন্তু তার পর, অনেক পরে কালচারের ভবিষ্যৎ বোধ হয় সোশিয়ালিজমে।

* * *

পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপ ও এশিয়াতে একটা সনাতন পদ্ধতি (percunial philosophy) ছিল। এক এক করে য়ুরোপে কমতে লাগল। এশিয়াতে এখনও রয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই কমে যাবে। যদি বিজ্ঞান ও যন্ত্রের জন্য সনাতন পদ্ধতির ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে দোষটা কিসের? ক্ষতি ত বটেই, কিন্তু লাভও অনেক। আমার বিশ্বাস দুটোর সামঞ্জস্য চলে না—দুটোর ধর্মই আলাদা।

১৭।৭।৫৯

স্বামীর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে স্ত্রী না হয় ঘুমিয়ে পড়ে, না হয় রান্নাঘরে কাজ করতে যায়—অর্থাৎ চরমকালে অন্য কর্মে ব্যাপৃত থাকে। প্রায়ই ব্যাপারটা দেখেছি। কেন এমন হয়? রোগীকে সেবা করে অনেক দিনরাত জাগার পর ঘুমিয়ে পড়া স্বাভাবিক, কিংবা, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রোগী যেন আরামে ঘুমুচ্ছে মনে হয়, তাই মনে করে স্ত্রী কখনও কখনও সংসার করতে চলে যায়। আমার মনে হয়, সে সময় মাথায় কিছু থাকে না, যেন বোকা হয়ে যায়, তখন অভ্যস্ত কাজের দিকে মন পড়ে। পুরুষদের কিন্তু তা হয় না। মৃত্যুটা তাদের স্বার্থপরতা।

১৮।৭।৫৯

লক্ষ লোকে বই লেখে, কোটি লোক কথা কয়। সব কথাই দামী নয় নিশ্চয়। তবে কেন এত লেখে? সুখের ব্যাপার এই যে, কোটি কোটি লোক লেখে না। সকলেই যদি লিখত তবে পড়ত কে? লিখতে পারে না এইটাই চরম সুখ। লিখতে গেলেই ছাপাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পড়া বন্ধ করার প্রধান সুবিধা অবশ্য বেশি লেখা, কারণ যারা লেখে তারা অন্য বই পড়ে না। যেমন রাধাকমলবাবু। প্রায় পঞ্চাশখানা বই লিখেছেন, অন্যের বই পড়বেন কখন?

কত তৃতীয় শ্রেণীর বই-এর কত না শ্রাদ্ধ করেছি! এবং সত্যি কথা বলতে কি, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ বইই অধ্যাপকদের রচনা! কীন্‌সের লেখায় তবু নতুনত্ব আছে (সুইডিশ ইকনমিস্টদের কথা ছেড়ে দিলাম), তার পর হ্যারড্‌, তাঁকেও বোঝা যায়, তারও পর, ধরা যাক, কুরিহারা, কিন্তু তৎপরে কত ভারতীয় ব্যাখ্যার অবতারণা! সেটা সহ্য হয় না, কিন্তু পড়তে হবে, নচেৎ নতুন হওয়া যাবে না! এই রকম চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণীর অধোগতি অসহ্য! এ-সবের দরকার নেই, কিন্তু করতে হয়!

১৯।৭।৫৯

খুব বৃষ্টি পড়ছে। রাত্রে আধঘণ্টার জন্য বন্ধ হোলো। দুটো জোনাকী উড়তে লাগল—যেন প্রজাপতি—পাগলের মতন, উঁচু থেকে নীচুতে আর নীচু থেকে ওপরে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আবার অন্য জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, লাফিয়ে লাফিয়ে, নাচতে নাচতে—ভারী মজা! জোনাকী কি রাতের প্রজাপতি? জোনাকীর আলো সবুজে নীল রঙের।

২০।৭।৫৯

পূর্ণিমার চাঁদ সবুজ। একটা ছোট্ট ইংরেজী কবিতা পড়েছিলাম—মনে আসছে না—বেড়ার ধারে চাষার মুখের মতন!

* * *

কী আশ্চর্য! শুভ্রতা ঠিক দেখিনি, যা দেখেছি মেলভিলের Moby Dick-এর whiteness of the white থেকে। সেটা বোধ হয় প্রকৃতির শুভ্রতার চেয়ে এটা অনেক বেশি ধরণের শুভ্রতা। সেক্সপিয়ারের পরেই বোধ হয় মেলভিলের আবার বাহাদুরী।

[ক্রমশঃ]

কন্যা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী এবং—

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একটি আই-এ পরীক্ষার ছাত্রীর জন্য একজন গৃহশিক্ষক আবশ্যক। আবেদনকারীর ন্যূনপক্ষে গ্র্যাজুয়েট হওয়া প্রয়োজন; আহূত হলে তাঁকে নিজের খরচায় এসে সাক্ষাৎ করতে হবে। থাকা, খাওয়া এবং কন্যা শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়া, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী ও গান-জানা, হাতের কাজ প্রভৃতিতে নিপুণা। অন্যান্য বিষয় পত্রের দ্বারা জ্ঞাতব্য।

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
৬।১এ, মদন মিত্রের গলি
বারাকপুর
জিলা—২৪ পরগনা

কাগজটা হাতে করে বার তিনচার বিজ্ঞাপনটা পড়ে গেলেন লক্ষ্মীনারায়ণ, মানেটা ঠিক ধরতে পারছেন না। স্ত্রী বরজা দেবীকে হাঁক দিলেন—"ওগো, একবার এদিকে এসো তো শীগ্গির।"

এলে কাগজটা হাতে দিয়ে বললেন—"এই বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। কী ব্যাপার বলো তো?"

বিরজাও কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিরক্তিতে মুখটা বিকৃত করে নিয়ে বললেন—"আপিনটা ছেড়ে দাও তুমি।"

"ব্যস, যত দোষ আপিনের!"

"তা নয় তো কি? আর, সন্ধ্যের পরই তো তোমার যত লেখাপড়ার কাজ। আপিন চড়িয়ে ছাইভস্ম কি লিখেছ, পাঠিয়ে দিয়েছ, তারা ছেপে দিয়েছে। কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী—এখন ঠ্যাকাও গৃহশিক্ষকের পাল, কত ঠ্যাকাবে।"

"কি হয়েছে তোমাদের?"

—ছেলে পঞ্চানন কলম হাতে পাশের ঘর থেকে উঠে এল। মনস্তত্ত্বের প্রফেসার। মনের ব্যাপার নিয়েই একটা প্রবন্ধ লিখছিল। সব শুনে বিজ্ঞাপনটার দিকে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মুখ তুলে একটু হাসল, বলল—"এতো দেখছি ফিক্সড আইডিয়ার (fixed idea) ব্যাপার। বাবার মনে উঠতে-বসতে নাতনীর বিয়ের চিন্তা, যখন পাচ্ছেন না, নিজেই পাত্র হয়ে বসছেন—মাথায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে ধারণাটা—বিজ্ঞাপন লিখতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলবেন এ আর এমন বেশি কথা কি?"

"ফিকস্ড আইডিয়া যদি হয়ে থাকে তো সে তোর মেয়ের!"—চটে উঠলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। বললেন—"অষ্টপ্রহর আজেবাজে লেখা নিয়ে পড়ে থাকবি, হুহু করে বেড়ে উঠছে সেদিকে হুঁস নেই—আনতে বল বিজ্ঞাপনটা, পরশু তাকে যা লিখিয়েছিলাম, কপি করে পাঠিয়ে দিয়েছে কাল।—দেখাচ্ছি—বাবার ফিকস্ড আইডিয়া—কি মেয়ের!"

প্রায় সমস্তটুকুই নিজের মনে বকে যেতে হোল। পঞ্চু আবার ঘরে চলে গেছে। ঘটনাটুকু সবিস্তারে নোট করে রাখতে হবে সদ্য সদ্য। বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, একচুলও এদিক-ওদিক না হওয়াই ভালো।

"কৈ, ডাকুক, সরে পড়ল কেন?"—ছেলের প্রতিভূ হিসাবে তার মাকেই

একটু ব্যাঙের টোনে কথাটা বললেন লক্ষ্মীনারায়ণ। বিরজা দেবীও নিরর্থক-জ্ঞানে নিজের কাজে চলে যাচ্ছিলেন, বললেন—"দাঁড়াও, দেখতে হবে। থাক, আমিই ডাকছি, দরকার নেই ওর। ফ্রয়েডের কাছে মাথা মুড়িয়েছে, কিছু কি পদার্থ আছে ওর? মেয়ের সামনেই একটা বে-আব্রু কথা বলে বসবে—একটুও বাধবে না।"

ডাক দিলেন—"দিদিমণি! একবার এদিকে এসো তো ভাই। কোথায় গেলে?"

দোরের পাশ থেকেই সব শুনছিল অনিন্দ্য, উত্তর করল ছাতের রেলিঙের ধার থেকে—"এই যে, এখানে দাদু, ময়নাটাকে ছাতু দিচ্ছি।"

"আগে সেই বিজ্ঞাপনটা নিয়ে এসো তো, পরশু যেটা লেখালাম তোমায়। আছে তো?"

হাতেই ছিল। "যাবে কোথায়? এই তো রয়েছে"—বলতে বলতে এনে হাজির করল। নিরীহভাবে প্রশ্ন করল—"কেন, বলতো?"

"তোমার দাদুর ফিকস্ড আইডিয়া হয়েছে।"—একবার ছেলের ঘরের দিকে রুক্ষদৃষ্টিতে চাইলেন।

কাগজটা অনিন্দ্যার হাত থেকে নিয়ে পড়ে গেলেন। স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন—"এই দ্যাখো। ছেলেকেও দেখাওগে। নিজে লিখিয়েছি, দিদিমণি লিখেছে, নিজের হাতে কপি করে ডাকে দিয়েছে।......কি দিদিমণি, তাই তো?... ঐ নাও। তা এর মধ্যে ওরকম আদাড়ে কথা সব ঢুকে পড়তে পারে কখনও? তোর ফিকস্ড আইডিয়ার নিকুচি করেছে!...গোটা চারেক টাকা বের করে দাও শীগ্গির।...কামিজটা নিয়ে এসো তো দিদি-ভাই।"

"ছুটতে হবে কলকাতায় এখুনি!" —স্ত্রী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"না ছুটেও তো উপায় হতে পারে। একবার পোষ্টাফিসে গিয়ে ট্রাঙ্ক-ফোন করে দেখি কি ব্যাপারটা। সুদরে নিতে হবে তো, না, এই চলবে?......ফিকস্ড আইডিয়া!"—আর একবার ঘরের দিকে দৃষ্টি হেনে কামিজটা গায়ে দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও কনেকশ্যান পাওয়া গেল না কাগজের আফিসের সঙ্গে।

লক্ষ্মীনারায়ণ বিকালেও একবার চেষ্টা করলেন। ঐ অবস্থা। একটা গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় হরতাল, পিকেটিং, লাঠি-চার্জ, কাঁদুনে গ্যাস প্রভৃতির ব্যাপার চলছে।

সন্ধ্যার পর একটা চিঠিই লিখতে বসলেন, সকালের প্রথম ক্লিয়ারেন্সেই চলে যাবে। তারপর আরম্ভ করে ছেড়েই দিলেন, আপিনটা যেন একটু একটু লেগে আসছে মনে হচ্ছে। সকালেই দেবেন লিখে। দ্বিতীয় দফা বেরুতে চারদিন বাকি এখনও।

সকালে পুজো-অর্চনা সেরে জল-টল খেয়ে ধীরেসুস্থে লিখতে বসেছেন—কাগজের আফিস থেকে একস্‌প্রেস ডেলিভারিতে একখানি খাম এসে উপস্থিত হোল; ওপরে ঐ দৈনিক-কাগজেরই ছাপ। কলম রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি খুলে পড়লেন। লেখা আছে—

মহাশয়,

আপনার বিজ্ঞাপনটি নিয়ে আমরা বিব্রত বোধ করিতেছি খানিকটা। ভাষা খুবই অসংগত এবং বিজ্ঞাপনটি পাত্রের জন্য কি গৃহশিক্ষকের জন্য কিছু বোঝা যায় না। সাধারণভাবে আমাদের নিয়ম, মূলের হুবহু নকল করিয়া প্রেসে দিয়া দেওয়া। তথাপি অসংগতিটা বেশি মনে হওয়ায় ছাপা মুলতুবি রাখিয়া আপনাকে জানান স্থির করি আমরা; কিন্তু কলিকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামাদির জন্য প্রেসেও খানিকটা বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়ায় ভুলক্রমে বিজ্ঞাপনটি ছাপা হইয়া যায়। আমরা ইহার জন্য বিশেষ দুঃখিত। নিয়ম-বিরুদ্ধ হইলেও আপনার অবগতির জন্য আমরা মূল বিজ্ঞাপনটিই পাঠাইয়া দিতেছি এই সঙ্গে। এর পরের দফা আরও চারদিন পরে আগামী শুক্রবার ছাপা হইবে। সুতরাং পত্রপাঠ আপনার নির্দেশ জানাইয়া বাধিত করিবেন।

—কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগের চিঠি। যথারীতি নাম ইত্যাদি দেওয়া রয়েছে। সঙ্গে আর একখানি ভাঁজ করা কাগজ। লক্ষ্মীনারায়ণ তাড়াতাড়ি খুলে দেখলেন নাতনী অনিন্দ্যার হাতেরই লেখা। টেবিল থেকে কাগজটাও তুলে নিয়ে দুটোকে মিলিয়ে দেখলেন, একেবারে এক জিনিস।

দুপুরের পর, বেশ যখন নিরিবিলি হয়ে এসেছে, লক্ষ্মীনারায়ণ ওপর থেকে নীচে নেমে এলেন—অনিন্দ্যা যে ঘরটায় পড়ে। পড়ছিলই, তবে বইটা তাড়াতাড়ি মুড়ে সরিয়ে রাখল। হয়তো শরৎচন্দ্রই; ওটা আর বিশেষ ধরেন না। আর, ঐ জন্যই তো ভালো একটি শিক্ষক রাখা।
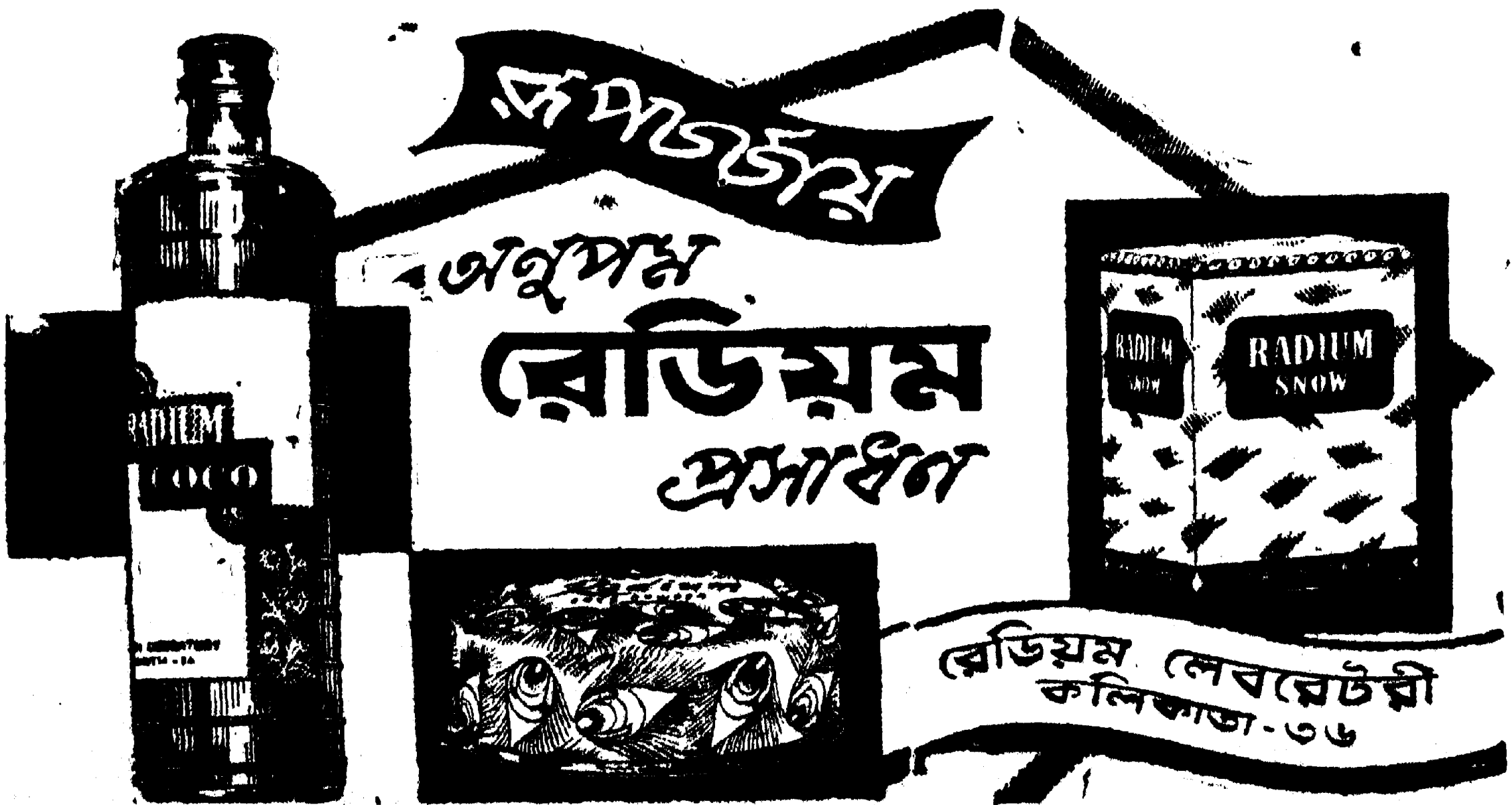
উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—"কী দাদু? নেমে এলে যে! আমায় তো ডাকলেই পারতে।"

"হ্যাঁ দিদি,"—একটা যে হাসি ঠেলে আসছিল সেটা পিষে দিয়ে গম্ভীর হয়েই প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মীনারায়ণ—"কি ব্যাপার বলো তো? কাগজওয়ালারা অরিজিনালটাই পাঠিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞাপনের; আমরা যেটা পাঠানো বিজ্ঞাপন নম্বর—বাঃ, এ কি!...... না দাদু, সত্যি বলছি—তোমার এই পা ছুঁয়ে বলছি......"

ধরে নিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। মুখে একটা হাসি ফুটে উঠেছে আদর-প্রশ্রয়ের। বললেন,—"কিন্তু তোরই যে হাতের লেখা দিদি, দ্যাখ না ভালো করে।......হ্যাঁরে, তাড়াহুড়োর মধ্যে নকল করে পাঠিয়ে দিয়েছিলি?"

প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মীনারায়ণ—কি ব্যাপার বলো তো? কাগজওয়ালারা অরিজিনালটাই পাঠিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞাপনের; আমার সেটা...

"আমরা যেটা পাঠিয়েছিলাম দাদু!"—বেশ উৎফুল্লই হয়ে উঠল অনিন্দ্যা। বিবেক পরিষ্কার না থাকলে সম্ভব নয়।

"ঠিক আছে নিশ্চয়। দেখি"—বলে ও'র হাত থেকে টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে, কিন্তু ওর মুখটা একবার রাঙা হয়ে উঠেই আবার যেন ছাইপানা হয়ে গেল। মুখ তুলে ব্যাকুল হয়ে উঠে বলে চলল—"না—আমি এ চিঠি পাঠাইনি দাদু—কখনও এ আমার দেখছিলই আবার, যেন সম্মোহিত হয়েই, মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল অনিন্দ্যা—"তাড়াতাড়িতে এইরকম যাতা লিখে পাঠাব? কী যে বলো দাদু! যেন বুঝে-সুঝে বলতে ভুলে যাচ্ছ দিন দিন।"

"কোনও বই টই পড়ছিলি না তো?"

চোখ আপনিই তাঁর একবার শরৎ-চন্দ্রের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। এদিকে হাসিটা লেগেই আছে মুখে, একটু বেড়েই যাচ্ছে যেন। অনিন্দ্যা আরও জ্বালাতন হয়ে উঠে ঝগড়াই আরম্ভ করে দিল এবার—

"বইয়ে ঐ সব লেখা থাকে? কোন্ বইয়ে বলো তো আমায়? আর, আর বই পড়ব, আবার লিখতেও থাকব? না দাদু, তুমি..."

"না, বই পড়ে মুড়ে রেখে।"—খুক খুক করে স্পষ্ট হয়েই বেরিয়ে এল হাসিটা এবার। পিঠে হাতটা চেপে বললেন—

"তা চটবার কি আছে এতে? ভুলই তো। কার না হয়?...ফিরে পাওয়া যায় না সে ভুলের বয়সটা—নৈলে......" বলতে বলতেই হাসি মুখে করে বেরিয়ে গেলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রোগেরই পূর্ব-লক্ষণ। ছেলে অবশ্য ওঁর ঘাড়েই চাপাচ্ছে; কিন্তু সে তো কিছু কথা নয়। সার কথা, রোগটা হচ্ছে ঐ কায়েমী হয়ে ব'সে থাকছে একটা ধারণা।

তাহলে তো চিকিৎসা দরকার। কোনও মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারের হাতে, আজকাল শোনেন অনেক গজাচ্ছে তারা।

কিন্তু দরকারই বা কি তার? আদি, অকৃত্রিম চিকিৎসা তো রয়েছে, আর তাতে কোন মনস্তাত্ত্বিক ওঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে?

বিকালের ডাকে সতেরখানা দরখাস্ত এসে পড়ল। সান্ধ্যভ্রমণ করে এসে সেই-গুলো নিয়ে বসলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। পাত্রের দিকেও আছে। আবার গৃহ-শিক্ষকের দিকেও আছে।

দেখে দেখে একজনকে বেছে নিলেন, যে দু'দিকেই চলে। দু' বৎসর পূর্বে মনস্তত্ত্বে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এম-এ পাস করেছে, এখন কলকাতার একটি কলেজে প্রফেসার। কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে অ্যামেরিকায় গিয়ে এই বিষয়েই চিকিৎসার ট্রেনিং নিয়ে ডাক্তার হয়ে আসতে চায়।

ছেলেটি, যাকে বলা যায়, কপাল ঠুকেই ঝেড়ে দিয়েছে দরখাস্তটা। থাকা-খাওয়ার দিকে নেই। শুকনো মাসিক একশত টাকা ক'রে চায়। বাড়ি নৈহাটী; প্রত্যহ কলকাতা থেকে ফেরবার পথে ঘণ্টা দুয়েক করে পড়িয়ে বাড়ি চলে যাবে।

ছেলেটিকে সাক্ষাৎকারে ডেকে, দেখে-শুনে নিয়ে নিয়োগ করেছেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। পরিচয়াদি জেনে নিয়ে অভি-ভাবক পিতাকে চিঠি দিয়েছেন—ছেলে যদি সদা সদাই আমেরিকা হয়ে আসতে চায় তো উনি সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

অবশ্য, চিকিৎসক হ'তে যাওয়ার আগে ওঁর নাতনীর চিকিৎসাটা যে হয়ে যাওয়া দরকার, এ সর্তটা আছেই।

কবিতা
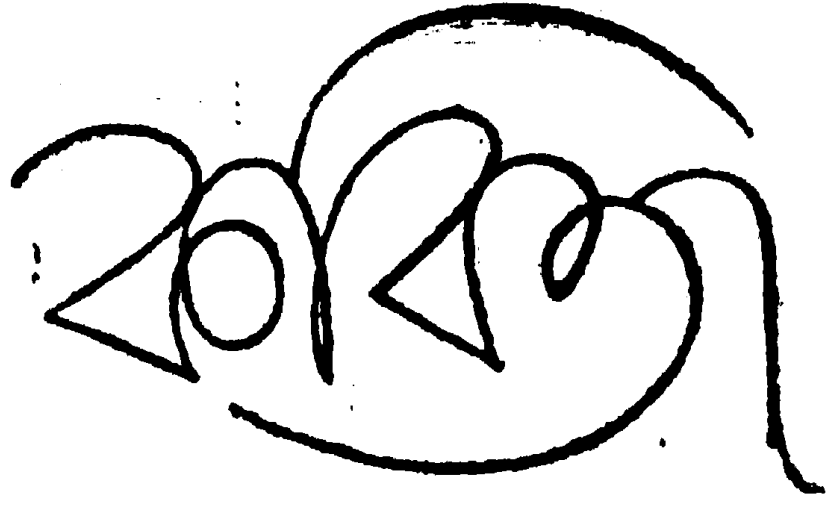
নেতা যখন নাইক দেশে

বনফুল

(১)

নেতা যখন নাইক দেশে, নিজেই তোরা এগিয়ে চল
সত্য হবে নেতা তোদের, নেতা হবে মনের বল।
গঙ্গা যখন খর-স্রোতে
নামল গিরি-শিখর হতে
কে ছিল তার নেতা তখন, দেখিয়েছিল কে তার পথ?
তাহার স্রোতেই তলিয়ে গেল অহংকারী ঐরাবত।

(২)

বিবেক তোদের হোক না নেতা, আদর্শেতে সমুজ্জ্বল,
চরিত্রকে নেতা করে' ওরে, নবীন, এগিয়ে চল।
নেতা যারা ভোট কুড়িয়ে
সেলাম করে', মুখ পুড়িয়ে,
তাদের কাছে হস্ত পেতে করিস না আর কাল-ক্ষয়
অভিনেতা ওরা সবাই, ওরা কেহই নেতা নয়।

(৩)

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তোদের চলতে হবে নিজেই পথ
বুকের জোরে টানতে হবে জগন্নাথের মস্ত রথ,
হৃদয়ে যার আসনখানি
শুনতে হবে তাহার বাণী
সেই বাণীকে মানতে হবে বিশ্বাসে ও নিষ্ঠাতে
অমর বাণী খুঁজতে হবে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে।

(৪)

খুঁজতে হবে গীতার পাতায়, মহৎ প্রাণের সংগীতে
তবেই তোরা পারবি যে রে বিশাল গিরি লঙ্ঘিতে।
বাইরে নেতা কোথায় পাবি
চোরের কাছে কিসের দাবী!
নিজের জোরে এগিয়ে যাবি দুঃসাহসী বীর-বেশে
আঁধার রাতে পথ চলবি ধ্রুবতারার নির্দেশে।

আর ডাকো না কেন

কৃষ্ণধর

ডাকতে ইচ্ছা হয় না, একবারও প্রথম নায়িকা
প্রতি শব্দে চমকে ওঠো, প্রতি কথা মনে হয় স্তব
পৃথিবীকে অসম্ভব ভালো লাগে, রৌদ্র কী যে বলবান
মনে হয় সাতটি ঘোড়া, তেজোদীপ্ত বলগা নিয়ে ছোটে
আমার কিংবা তোমার, তোমার অথবা আমার
সব ইচ্ছা নিয়ে, অন্যত্র, এখান থেকে অন্যত্র উধাও।

তুমি আর ডাকো না কেন, অবিশ্বাস কিংবা অভিমান,
আমি তো শৃংখলে বন্দী, আমাকে মুক্তি না দিলে
কী করে তোমার কাছে যাবো, অন্ধকার, তুমি সাক্ষী থেকো
আমি মরি মাথাকুটে, ভালবাসা রক্তলাল ফুলে
ডাক দিল কোন সকালে, কেউ জানল না
আমাকেই ভুল বুঝে অভিমানে সে দিয়েছে আড়ি।

অজ্ঞাতবাস থেকে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

রৌদ্রদাহে বেঁচে আছি। গাঢ় রাতে মায়াবী লণ্ঠন
বিজন বাতাসে জ্বলে, ডাকে দূরে স্থির সর্বনাশ।
শিয়রে নক্ষত্র, কাঁটা—অলৌকিক করেছে লুণ্ঠন
ঘনিষ্ঠ সংসার চিত্র...পুষ্প, ঘুম, শিথিল আকাশ।

নিজ ঘরে পরবাসী। তক্ষিত সূর্যের শালবনে
নির্বাচিত দীর্ঘ আলো একা যায় সুদূরে উদাস
রক্তের চপল চৈত্র...পদরেখা, ঘন প্রস্রবনে;
নিষিদ্ধ নদীর মতো ডাকে দূরে স্থির সর্বনাশ।
অতল শব্দের মালা ভেসে ওঠে নিষ্কাষিত নাম,
স্বপ্নে আসে সেই সব অনন্ত নৌকার জলবাহু...
তীব্রতম নৃত্য ফোটে—বক্ষোপাশে নয়নাভিরাম।
অতর্কিতে যৌবরাজ্য খন্ড করে নক্তচারী রাহু।

সম্প্রতি মেঘের দিকে তুলেছি শাণিত ক্ষুরধার...
উৎসর্গ তোমার নামে, আঙুলের কঠিন কুঠার।

গান্ধীজীর চরকা ও রবীন্দ্রনাথ

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

অন্যান্য ক্ষেত্রে মনের গভীর মিল সত্ত্বেও চরকা লইয়া গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মনের একটা গভীর অমিল দেখা দিয়াছিল। চরকাকে গান্ধীজী যে শুধু তাঁহার প্রবর্তিত ও পরিচালিত সকল আন্দোলনের প্রাণবিন্দুরূপেই রাখিয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে, গান্ধীজীর সকল আন্দোলনের পশ্চাতে গান্ধীজীর একটি ব্যাপক জীবনদর্শনই গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহা আমাদের নিকটে আজ-কাল আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে "গান্ধীবাদ"-রূপে। এই গান্ধীবাদের কেন্দ্রবিন্দুও হইল চরকায়। গান্ধীজী যে চরকার কথা বলিয়াছেন তাহার যেমন একদিকে মস্তবড় একটা ব্যবহারিক প্রয়োজনেরও দিক রহিয়াছে তেমনতর একটা প্রতীকধর্মী দিকও রহিয়াছে। চরকা ছিল গান্ধীজীর নিকটে তাঁহার অহিংসা-ধর্মেরই প্রতীক, আর অহিংসা-ধর্মই ছিল গান্ধীজীর সকল জীবনধর্মের কেন্দ্রে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, গান্ধীজীর অহিংসা কোনো নঞর্থক ধর্ম ছিল না, ইহা একটা সদর্থক ধর্ম; অহিংসার অর্থ হইল অসীম করুণা—সর্বভূতের প্রতি অসীম প্রেম। এই অহিংসা বা সর্বভূতে প্রেম যাহার মধ্যে রহিয়াছে সে যত কাজ করিবে তাহা হইল সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য। সমাজের সর্বস্তরের মানবের সহিত প্রেম-সম্বন্ধের যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন গান্ধীজী এই চরকার মধ্যে। তিনি বলিয়াছেন—

"আমার বিশ্বাস অহিংসার পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথই ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রহণীয় হইবে না। ভারতবর্ষের সেই অহিংসা ধর্মের প্রতীক হইল চরকা, কারণ, একমাত্র ইহাই হইল আর্তের বন্ধু, দরিদ্রের সম্পদদাতা। প্রেমের নিয়ম দেশ-কালের কোনো বন্ধন মানে না। আমার স্বরাজ তাই ভাঙ্গীকে লইয়া, ধেড়কে লইয়া—দুর্বলকে লইয়া; এ স্বরাজ দুর্বল হইতে দুর্বলতমের জন্য; চরকা ব্যতীত আমি অন্য কোনো কিছুর কথাই জানি না যাহা এই প্রকারের সকল স্তরের লোকেরই বাস্তব-স্বরূপ হইতে পারে।" ।। আর, কে প্রভু ও ইউ. আর. রাও সঙ্কলিত 'মহাত্মা গান্ধীর মন' গ্রন্থে উদ্ধৃত ।।

এই অহিংসা-বাদের সহিতই মহাত্মা গান্ধীর কর্মবাদও যুক্ত। সুতরাং গান্ধীজীর কর্মদর্শনের ক্ষেত্রেও চরকা প্রতীকস্বরূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চরকাকে তাহার প্রতীকধর্মী দিকে মোটেই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই; ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক দিয়া—শুধু মাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়াই দেখিয়াছেন এবং বিচার করিয়াছেন, সে বিচারে চরকা রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তিবিশেষের একটা যুক্তিহীন ঝোঁকের প্রতীকমাত্র রূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কোনো দিনই অনুকূল ছিল না। এই চরকার উপরে অতখানি জোর দিবার জন্য গান্ধীজীর সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেই যে একটা দৃষ্টির সংকীর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথ বার বার তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন—

"আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়-শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই।"

রবীন্দ্রনাথ চরকা বিষয়ে পৃথক প্রবন্ধ লিখিয়াও তাঁহার মতামত বিস্তারিতভাবে জানাইয়া দিয়াছেন; তাহাতে একটা বিরাট জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পক্ষে চরকা-কাটার মতন একটি কুটীরশিল্পের কি স্থান হইতে পারে, সেই স্থান হইতে তাহার প্রয়োজন-মূল্যকে বাহির করিয়া লইয়া তাহাকে যে একান্ত অযৌক্তিকভাবে একটা সর্বাত্মক মহিমা দান করা হইয়াছে—এই সব কথাকেই নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রয়োজনের দিক হইতে বস্ত্র-সমস্যার স্থান কি, মিলের সহিত প্রতি-যোগিতায় চরকার শক্তি কতটুকু, চাষীদের যখন ক্ষেতের কাজ থাকে না তখন বসিয়া চরকা কাটা লাভজনক কিনা—সর্বোপরি দেশের সব-জাতীয় লোকেরই দিনের মধ্যে কিছু সময় চরকা কাটিয়া হরণ করা একটি সাধু প্রস্তাব কি না—তিনি এই সকল প্রশ্নই তুলিয়াছেন এবং কিছু কিছু নিজের মতন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সব আলোচনারই মোটামুটি প্রতিপাদ্য এই যে চরকার পিছনে যতখানি অন্ধ ঝোঁক রহিয়াছে কোথাও ততখানি যুক্তি নাই। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, মহাত্মাজীর অভ্রভেদী ব্যক্তিত্বের মোহে পড়িয়াই দেশবাসী চরকা-খদ্দর সম্বন্ধে অতিমাত্র উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে, জিনিসটিকে ভাবিয়া চিন্তিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। গান্ধীজী অবশ্য এই কথাটা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ চরকা সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যুত্তরে গান্ধীজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, চরকাকে কংগ্রেস বা দেশবাসী কোনো ঝোঁকের মাথায় গ্রহণ করে নাই; যদি গ্রহণ করা হইয়া থাকে তবে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

"উপরের মন্তব্যকে তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) পক্ষে ভিতরের সারবস্তু বলিয়া ভুল করা উচিত হইবে না। চরকাকে অন্ধ বিশ্বাস হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে না যুক্তিপূর্ণ প্রয়োজনের জন্যই গ্রহণ করা হইয়াছে এ-বিষয়ে তিনি যেন আরও একটু গভীরে প্রবেশ করিয়া নিজেই জিনিসটি দেখিতে চেষ্টা করেন।"

চরকা-খদ্দর সম্বন্ধে এই সব প্রশ্ন এবং এই-জাতীয় আরও অনেক প্রশ্ন শুধু রবীন্দ্রনাথ তোলেন নাই, বহু লোক তুলিয়াছেন—দেশেও তুলিয়াছেন—বিদেশেও তুলিয়াছেন, তখনও তুলিয়াছেন—এখনও তুলিতেছেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তরও অসংখ্যভাবে গান্ধীজী তাঁহার সারা জীবন দিয়া গিয়াছেন; গান্ধীজীর জীবদ্দশায় গান্ধীপন্থী চিন্তাশীল কর্মি-গণ দিয়াছেন—এখনও দিতেছেন। এই প্রশ্নোত্তরের কোনও সমাধান নাই, কারণ এ প্রশ্নোত্তর তথ্য বা যুক্তি লইয়া নয়—

শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবে মহামানবের মিলন : আম্রকুঞ্জে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

ইহা হইল সমগ্র জীবন-দর্শন লইয়া। জীবনদর্শন কাহারই বিশুদ্ধ তথ্য তর্ক যুক্তির উপরে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া ওঠে মনে করি না; জীবনদর্শনের গোড়াপত্তন কতকগুলি সহজাত বিশ্বাস-প্রবণতায়; সেই বিশ্বাস-প্রবণতাগুলি নিজেকে একটা পূর্ণ রূপ দিবার জন্য আপনার অনুকূলে তথ্য-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া এবং বাছাই করিয়া লয়।

রবীন্দ্রনাথ চরকার বিরুদ্ধে যত তথ্য-তর্কের সমাবেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা আমার মনে হইয়াছে এইটি,—"এই জন্যই কবুল করতে লজ্জা হচ্ছে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্যন্ত চরকা আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায় নি।" এই মনের ভিতর হইতে দোল না খাইবার কথাটাই হইল সর্বাপেক্ষা বড় কথা। দোল খায় নাই কেন? দোল খায় নাই এইজন্য যে, চরকা-খদ্দরকে অবলম্বন করিয়া মানুষের জীবনযাত্রার যে মৌলিক নীতি মহাত্মা গান্ধীর মনকে দোলা দিয়াছে সেই নীতিগুলির রবীন্দ্রনাথের কাছে তেমনতর আবেদন ছিল না।

চরকার পশ্চাতে গান্ধীজীর যে গোটা-কতক মৌলিক কথা ছিল এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ হইল কায়িকশ্রম সম্বন্ধে একটা গভীর শ্রদ্ধা। আমাদের বর্তমান চিন্তাধারায় কায়িক-শ্রমের মূল্য হইল শ্রমোৎপাদিত বস্তুসমূহের আর্থিক মূল্যে। স্বাস্থ্যের জন্য শরীরচর্চার একটা প্রয়োজনকে আমরা স্বীকার করি বটে, কিন্তু সেই শ্রমকে যে উৎপাদন-কর্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই। বরঞ্চ শিক্ষিত সভ্য মানুষ যাঁহারা তাঁহারা সেই চর্চাটাকে নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যসনাদির সহিত যুক্ত করিয়া লইতেই ইচ্ছুক এবং অভ্যস্ত। আমাদের মধ্যে আরও এই-জাতীয় একটা শ্রেণী বিভাগের বোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অবিশ্যম্ভাবী বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে যে, এক-দল মানুষ কায়িকশ্রমের দ্বারা দুনিয়ার অবশ্য-প্রয়োজনীয় রসদগুলির জোগান দিয়া আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির ভিত্তিকে ধরিয়া রাখিবে, আর একদল মানসিক শ্রমে উপযুক্ত ও অভ্যস্ত মানুষ বুদ্ধি-চেতনার চর্চা ও বিকাশের দ্বারা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর দিককার কাঠামো গড়িয়া তুলিবেন এবং তাহাকে কারুকার্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। আমাদের এই বোধের পিছনে আবার কাজ করিতেছে অপর একটি বোধ যে, আমাদের কায়িকশ্রম আমাদের মানসিক শ্রম অপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তু; এইজন্য আমরা সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর মানুষ বলিতে মনে করি কায়িক-শ্রমনির্ভর মানুষকে; উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলিতে বুঝি পরশ্রমকে নির্ভর করিয়া যাঁহারা জৈবিক সত্তাকে বাঁচাইয়া রাখিবার এবং প্রয়োজনমত ইহাকে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখিবার ব্যবস্থা করেন; এইভাবে তাঁহারা যে শক্তি ও সময়কে বাঁচাইতে পারিলেন তাহা দ্বারা বিবিধ মানস শক্তির সাহায্যে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে উপরের দিকে জাগাইয়া দিতে পারেন।

গান্ধীজীর জীবনবাদে কায়িক ও মানসিক শ্রমের ভিতরকার এই পার্থক্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হইয়াছে; মানুষেরও যে কায়িক-শ্রমজীবী এবং মানসিক-শ্রমজীবী এই স্পষ্ট দুইভাগে বিভক্ত হইয়া লইবার কোনও অধিকার আছে গান্ধীজী তাঁহার সর্বশক্তি দ্বারা এই জাতীয় একটি মতের সক্রিয় বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। কোনও মনেন্দ্রিয়প্রধান মানুষের যে সম্পূর্ণভাবে অপরের শ্রমের উপরে নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে গান্ধীজী তাহা কিছুতেই

স্বীকার করিবেন না। তাঁহার মতে, সকলের মনন-দানের দ্বারা যেমন নিখিল মানবজীবনকে ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে, তেমনি সকলের কায়িকশ্রম দানের দ্বারাও মহামানবকে ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা না হইলে জগৎ হইতে শোষণ-নীতির কোনো দিনই অবসান হইবে না। শোষণনীতির পশ্চাতে সর্বদাই এই জাতীয় একটি মনোবৃত্তি সক্রিয় যে যাঁহারা মনের দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা কাজ করেন তাঁহারা সমাজদেহে একটি বিশেষ অধিকার লাভ করেন, এই বিশেষাধিকার হইল যাঁহারা কায়িকশ্রম করেন তাঁহাদের নিকৃষ্ট মনে করিয়া তাঁহাদের শ্রমকে স্বচ্ছভাবে নিজের ভোগে লাগাইবার অধিকার। গান্ধীজীর মতে শ্রমের মধ্যে তারতম্যকে প্রশ্রয় দিয়া যতদিন মানুষের মধ্যে এই বিশেষাধিকারের বোধ সক্রিয় থাকিবে ততদিন সমাজদেহ হইতে শোষণকে বন্ধ করিবার কোনও উপায় নাই।

মানুষের ভিতর হইতে শোষণ দূর করিতে হইলে মানুষকে সমবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। শ্রমের মধ্যে তারতম্যকে যদি আমরা স্বাভাবিক তারতম্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই তবে মানুষের মধ্যে তারতম্যের বোধও যে অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য গান্ধীজী বলিতেন, কবি হোন, শিল্পী হোন, বৈজ্ঞানিক হোন, শিল্পপতি হোন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হোন আর হাইকোর্টের বিচারপতি হোন—প্রতিদিনের কিছুটা সময় তাঁহাকে সুতা কাটিতেই হইবে; তাহা দ্বারা দেশের বস্ত্র-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান না হোক, মানুষের ভিতরকার কৃত্রিম ভেদ ভাবটা অন্ততঃ ঘুচিয়া যাইবে। আমি বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা এমন অভিজাত্য ও বিশেষাধিকার লাভ করিয়াছি যে দেশের সকল চাষী-শ্রমিকের শ্রমকে আমার বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এবং আমার সুখ-সুবিধার বিধান করিবার জন্য ব্যবহার করায় মানুষের নৈতিক সমর্থন রহিয়াছে, অন্ততঃ এই উগ্র ব্যবধানবোধের লাঘব হইবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিও দিনের মধ্যে অন্ততঃ যেটুকু কাল চরকায় সুতা কাটিবেন সেইটুকু কাল অনুভব করিবেন, দেশের যে অগণিত নরনারী মাঠে-ঘাটে, কলে-কারখানায়, সমুদ্রের গভীরে, খনির অন্ধকার সুড়ঙ্গে বসিয়া কঠিন শ্রমদানের দ্বারা মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে ধারণ করিয়া রাখিতেছেন তিনি তাঁহাদের হইতে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন নহেন, তিনিও তাঁহাদেরই একজন। মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার মূল প্রয়োজন দুইটি, অন্ন ও বস্ত্র। এই মূল প্রয়োজনের কাজে অল্পবিস্তর সকলকেই অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের বর্তমান জীবনের পারিপার্শ্বিকতায় কৃষিকার্যে শ্রমদান সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে; কিন্তু বস্ত্রের জন্য ঘরে বসিয়া চরকায় কিছু শ্রমদান সকলেই করিতে পারেন, তাই চরকার প্রতি এতখানি জোর দেওয়া হইয়াছে। নিজের এবং সমাজের অবশ্য প্রয়োজনের জন্য যে শ্রম তাহার ভিতরে কোনো কাজই হীন হইতে পারে না। এই জন্য দেখি নিজের হাতে পায়খানা পরিষ্কার করার প্রতি গান্ধীজী এতখানি জোর দিতেন। তাঁহার আশ্রমে কোনও নূতন কর্মী আসিলে পায়খানা পরিষ্কার দিয়া তাঁহার কর্মের শুরু হইত।

মহাত্মা গান্ধীকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল, একজন রবীন্দ্রনাথ বা একজন রমণকেও নিজের কায়িক শ্রমের দ্বারাই নিজের খাদ্য উৎপাদন করিতে হইবে এমন জিদ ধরিয়া থাকিব কেন? তাঁহাদের পক্ষে বসিয়া খাদ্যোৎপাদনের জন্য কায়িক শ্রম করা কি নিতান্তই সময় ও শক্তির অপব্যয় নয়? যাঁহারা হাতে কাজ করেন আর যাঁহারা মস্তিষ্ক দিয়া কাজ করেন, উভয়েই ত সমাজের কাজ করিতেছেন; আপনি যাঁহারা মস্তিষ্কের দ্বারা সমাজের কাজ করিতেছেন তাঁহাদের অন্ততঃ কায়িক শ্রমজীবীদের সমান করিয়া দেখিতে রাজি নন কেন? উত্তরে 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী লিখিয়াছেন—

"মানসিক কাজ অতি প্রয়োজনীয় এবং আমাদের জীবন-পরিকল্পনায় তাহার যে স্থান রহিয়াছে এ-কথায় কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যেটা সকলকেই করিতে বলি তাহা হইল কায়িকশ্রম। আমার মতে সেই দায়িত্ব হইতে কোনো মানুষেরই রেহাই পাওয়া উচিত নয়। ইহা তাঁহার মানস সৃষ্টির গুণও অনেক উন্নত করিতে সাহায্য করিবে। আমি একথা বলিতে পারি, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ দেহদ্বারাও কাজ করিতেন, মনের দ্বারাও কাজ করিতেন। তাঁহারা যদি নাও করিয়া থাকিতেন, তথাপি বলিব, বর্তমানকালে কায়িকশ্রম যে অবশ্যকরণীয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমি টলস্টয়ের জীবনের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি; একজন রুশীয় কৃষক বন্দারেফ তাঁহার দেশে যে 'রুটির জন্য শ্রমের নীতি' প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন তাহাকে টলস্টয় কিভাবে সর্বজনবিদিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহার প্রতিও লক্ষ্য করিতে বলি।"

এই 'রুটির জন্য শ্রমের নীতির মূল কথা হইল, প্রত্যেক মানুষকেই তাহার খাদ্য উৎপাদনের জন্য কায়িকশ্রম করিতে হইবে, ইহাই হইল প্রসিদ্ধ 'Bread Labour Theory'। রাশিয়ার কৃষক বন্দারেফ (Bondaref) প্রথমে এই মতবাদ প্রচার করেন; টলস্টয় এইখান হইতে তাঁহার প্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহার গল্পসৃষ্টিতে ও তাঁহার বাস্তব জীবনে এই মতবাদকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গান্ধীজী আবার এবিষয়ে টলস্টয়ের নিকট হইতেও প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। আর তাহারও পূর্বে রাস্কিনের 'আন্টু দিস লাস্ট' বইখানি হইতেও প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর চরকা এই কায়িকশ্রমের মর্যাদারও প্রতীক। এইজন্য তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় ১৩।১০।২১-এ বলিয়াছেন, "....A plea for the spinning wheel is a plea for recognising the dignity of Labour" —চরকার পক্ষে যে যুক্তি তাহা হইল শ্রমের মর্যাদা স্বীকারের পক্ষেই যুক্তি।"

গান্ধীজী কথিত এই আত্মনির্ভরশীলতা এবং শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের কোনও শ্রদ্ধা ছিল না এমন কথা আমরা যেন মনে না করি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে 'ধনীর দুলাল সৌখিন পুরুষ' বলিয়া একটা অপ-সংস্কার চলিত আছে। আমরা দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া দেখিয়াও অনেক সময় মনে ধারণা করিয়া লই যে, পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ একটু যেন বিলাসীই ছিলেন। কিন্তু আমরা অনেক সময় এই কথাটা ভুলিয়া যাই যে, এই সকল ছবি অধিকাংশই বৃদ্ধ বয়সের এবং বিদেশের। শান্তিনিকেতনে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিবেন কবি কত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন এবং পরের সেবা গ্রহণে কত কুণ্ঠিত ছিলেন। কবির শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের বহুদিনের ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক ও কর্মী পূজনীয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের

নিকটে শুনিয়াছি, তাঁহারা শান্তি-নিকেতনে আসিয়া অধিকাংশ অধ্যাপকই যখন নিজেদের কাজ নিজেদের হাতে করিয়া বেশ কঠোরতার মধ্যেই জীবন-যাপন করিতেছিলেন, তখন কবি নিজেও যতটা পারেন নিজেকে তাঁহাদের সংগে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি, তিনি কবিকে নিজের হাতে সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া মোটা সাঁওতালী বাটি গরম করিয়া ইস্তিরি করিতে দেখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি একদিনকার একটি গল্পও বলিয়াছেন। কবি তখন সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত হইয়া 'দেহলি' বাড়িতে বাস করেন। একদিন তিনি ঐভাবে সাঁওতালী বাটি গরম করিয়া কাপড়-জামা ইস্তিরি করিতেছিলেন, কবি সুকুমার রায় তখন গিয়া কবির ঘরে উপস্থিত হইয়াছেন। কবিকে ঐ কাজ করিতে দেখিয়া সুকুমার রায় বলিয়াছিলেন,—'দেখুন, ঐ সাঁওতালী বাটি দিয়া কাপড়-জামা ইস্তিরি করিতে আপনাকে দেখিলে আমাদের মনে কেমন কেমন লাগে, আমি আপনাকে একটা ইস্তিরি যোগাড় করিয়া দিব।' কবি নাকি গম্ভীরভাবে জবাব দিয়াছিলেন,—'দেখরে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার একটা যোগাড় করে দিয়েছিলেন, সেটা টেঁকে নি; তোকে আর দ্বিতীয় বার চেষ্টা করতে হবে না।'

এ-সকলের ভিতর দিয়া বোঝা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ আত্মনির্ভরতাকে আদর্শের দিক হইতে ভালোবাসিতেন, কায়িক শ্রমের মূল্য বিষয়ে তাঁহার কোনোদিনই উদাসিকতা ছিল না, শ্রদ্ধাই ছিল। কিন্তু ইহা একটা জিনিস, আর কায়িক শ্রমকেই জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনপন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া সেইভাবেই কায়িক শ্রমকে গ্রহণ করা অন্য একটি জিনিস। মহাত্মাজী সেই-ভাবেই যে শ্রমকে সারা জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কায়িকশ্রম ও মানসিক শ্রমকে সমমূল্যের বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না। তাঁহার লিখিত 'চরকা' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "যে-কোনো সমাজেই কর্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, সেখানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব।" 'Dignity of Labour' বা শ্রমের মূল্য বিষয়ে তিনি অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। এই 'চরকা' প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "কার্লাইল খুব চড়া গলায় dignity of Labour প্রচার করেছেন; কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া গলায় Indignity of labour সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে।" রবীন্দ্রনাথ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বিশ্বের মানুষের সাক্ষ্য কার্লাইলের মতের অনুকূল নহে।

গান্ধীজী জন্ম-কর্মী, রবীন্দ্রনাথ জন্মকবি। কর্মি-জীবন রবীন্দ্রনাথের ছিল না তাহা নয়, কিন্তু মানিতেই হইবে, তাহা মুখ্য ছিল না, তাহা রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের পরিপূরক-রূপেই তাঁহার কবিজীবনের সংগে সংগে গড়িয়া উঠিয়াছে। কর্মি-জীবনেও লক্ষ্য করিতে পারি, রবীন্দ্রনাথ ঠিক নিজের হাতের কাজ করিবার কর্মী ছিলেন— সে কর্মী তিনি ছিলেন তাঁহার সংগীত কবিতা গল্প-উপন্যাস নাটক-প্রবন্ধ ছড়া-ছবির সৃষ্টির মধ্যে; অন্য ক্ষেত্রে তিনি ভাব দিয়াছেন, পরিকল্পনা দিয়াছেন, কর্মপ্রচেষ্টাকে আনন্দময় করিয়া তুলিবার কৌশল দেখাইয়াছেন। এইজন্যে মনন ও শিল্প-সৃষ্টিকার্যের মধ্যে তিনি স্বভাবতঃই যে মহিমা অনুভব করিতেন, অন্য কোনো ক্ষেত্রেই তিনি তাহা করিতেন না। অন্যদিকে গান্ধীজীর হাতে-কার্মে কাজ দিয়া জীবন গড়িয়া ওঠা—হাতেকর্মের কাজের মধ্যেই তাঁহার জীবনযাপন; কায়িক শ্রমের মধ্যে তিনি তাই শুধু প্রয়োজন সিদ্ধির মূল্য দেখেন নাই, দেহ ও চিত্তশুদ্ধির মহিমা দেখিয়াছেন, চিত্তবিকাশ ও নির্মল আনন্দের সম্ভাবনা দেখিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পিত চরকার সংগে ইহার সব কিছুই জড়াইয়া আছে।

মহাত্মা গান্ধীর সকল লেখা ও ভাষণ পড়িলে এই কথাটি মনে হইবে যে, প্রয়োজনসিদ্ধির অতিরিক্ত আর একটা বড় মহিমা তিনি আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন কায়িক কর্মের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে গান্ধীজীর মনের গঠন এবং টলস্টয়ের মনের গঠন একেবারে এক বলিয়া মনে হয়। উভয়ের মধ্যেই এই একটা ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল যে কায়িকশ্রম শুধু প্রয়োজনসিদ্ধি করে না, কায়িকশ্রম আমাদের দেহমনের পরম পাবক, উহা আমাদের দেহকে গঠিত করে, পরিপুষ্ট করে, পবিত্র করে—আবার মনকেও গঠিত করে, পরিপুষ্ট করে এবং পবিত্র করে। ইহা আমাদের চিত্ত-পরিশীলনেরও সর্বক্ষেত্রে সহায়, সুতরাং আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহাই প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। কায়িক শ্রমের সম্বন্ধে এই মর্যাদাবোধ টলস্টয়কে পরিণত বয়সে আক্ষরিকভাবেই চাষী জীবনযাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। টলস্টয়ের গল্পগুলি পড়িলে অনেক সময়ই মনে হয়, মেহনতী মানুষের প্রতি যে তাঁহার দরদ ও শ্রদ্ধা ছিল শুধু তাহাই নহে; তাঁহার মনে যেন এই একটা বিশ্বাসই গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, কায়িক শ্রমোপ-জীবিগণই স্বাভাবিকভাবে সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া ওঠে; পরশ্রমনির্ভরতাই সকল অসদ্‌গুণের মূল কারণ। এই প্রসংগে টলস্টয়ের 'বোকা আইভান' গল্পটি বিশেষভাবে স্মরণ করা যাইতে পারে। সেখানে প্রথমেই দেখি যে, মানুষের পিছনে পিছনে যখন শয়তান বা 'ডেভিল' নাছোড়বান্দা হইয়া লাগে, তখন তাহার প্রথম চেষ্টাই হয় মানুষের গ্রাম্য শ্রম-নির্ভর জীবন হইতে মানুষকে বিমুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টা; ডেভিলের অপর চেষ্টা হইল, মানুষের মন হইতে সন্তোষকে দূর করিয়া দিয়া মানুষের মনকে নগদ টাকার দিকে—সোনার মোহরের দিকে—লুব্ধ করিয়া তোলা। এই ডেভিলের কাজ হইল পরকে শোষণ করিয়া, পরকে কঠিন পীড়ন করিয়া আত্মতোষণ ও আত্মপোষণের উদগ্র কামনাকে জাগ্রত করিয়া দেওয়া। ডেভিলের শেষ-চাতুর্য হইল, বুদ্ধির বড়াই লইয়া মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানান। ভাবখানা এই, যাহারা ছোট লোক তাহারাই শুধু কায়িকপরিশ্রম করে, যাহারা বড় লোক তাহারা শুধু বুদ্ধি দিয়া কাজ করে; তাহারা বুদ্ধি দিয়া এত কাজ করিতে করিতে মাথাটাকে একেবারে ফাটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে বলিয়াই গোমূর্খ কায়শ্রমোপজীবিগণের যাহা কিছু উন্নতি সাধিত হইতেছে। কিন্তু বক্তৃতার দ্বারা বুদ্ধির কাজ দেখাইয়া ডেভিলের কোনও লাভ হইল না, কারণ সে দেখিল যে, বোকা আইভানের দেশে গায়ের শ্রম না করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবার আর কোনও উপায়ই নাই। আইভানের দয়ায় যদি বা তাহার খাবার টেবিলে স্থান হইল, কিন্তু শেষ কোণে তাহাকে শেষ সৌভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল; কারণ আইভানের যে বোবা বোনটি টেবিলে সকলকে আহার পরিবেশন করে সে সকলের হাত পরীক্ষা করিয়া তবে খাবার দেয়। শ্রমের দ্বারা যাহাদের হাত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে তাহারা খাবার পাইবে সবচেয়ে আগে; যাহাদের নরম তুলতুলে হাত তাহাদের এক কোণে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, শ্রমিক মানুষের খাবার সরবরাহ করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহাই এই তুলতুলে হাত-ওয়ালা-দের কপালে জুটিবে।

টলস্টয়ের ক্ষেত্রে এই যে কায়িক শ্রমের একটা সর্বাতিশায়ী মর্যাদাবোধ

ইহাও শুধু তথ্য তর্ক যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না; ইহা কতকগুলি বিশ্বাস প্রবণতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। গান্ধীজীর ক্ষেত্রেও তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। তাঁহার জীবনের প্রতিষ্ঠায় তিনি তথ্য যুক্তির অবতারণা অনেক করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অনুপ্রেরণা সব চেয়ে বেশী আসিয়াছে তাঁহার বিশ্বাস-প্রবণতা, ব্যক্তিগত অনুভূতি-অভিজ্ঞতা হইতে। টলস্টয়ের সহিত গান্ধীজীর এ ক্ষেত্রে শুধু চিন্তা-অনুভূতির মিল আছে বলিয়া মনে হয় না, টলস্টয়ের প্রভাবও রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সর্বপ্রথমে অবশ্য প্রভাব পড়িয়াছিল রাস্কিনের পূর্বোল্লিখিত 'আনটু দিস্ লাস্ট' বইখানির। গান্ধীজী নিজে স্বীকার করিয়াছেন, বইখানি তাঁহার কাছে জীবন সম্বন্ধে একটা নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিল। সে দৃষ্টির প্রথম কথা বইয়ে রশিরোনামা 'Unto This Last' কথাটির মধ্যেই ব্যঞ্জিত রহিয়াছে। রাস্কিন বাইবেল হইতে এই 'Unto This Last' কথাটি ও তাহার ভাবটি গ্রহণ করিয়াছেন। কথাটি পাওয়া যায় যিশুখৃষ্টের এই প্রসিদ্ধ উক্তিটির মধ্যে —"Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is and go thy way. I will give unto this last even as unto thee." এইখান হইতেই রাস্কিন প্রেরণা লাভ করিলেন যে, প্রথমের জন্য যাহা করিতে হইবে শেষের জন্যও তাহাই করিতে হইবে। মানব সমাজের সেবার ব্রত গ্রহণ করিলে প্রথমেই এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে, প্রথম মানুষটির জন্য যাহা করিতে হইবে শেষের মানুষটির জন্যও তাহাই করিতে হইবে। আসলে মানুষের মধ্যে প্রথম আর শেষ নাই,—সবই সমান, যাহা কিছু করণীয় তাহা করিতে হইবে কৃত্রিম ব্যবস্থার জন্য অন্যায়ে অবিচারে আজ যে সমাজে 'শেষ' ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও। এই আদর্শই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে গান্ধীজীর সর্বোদয়ের আদর্শের মধ্যে। 'Unto This Last' হইতে গান্ধীজী আর শিখিলেন, প্রত্যেক মানুষেরই নিজের জীবনব্যবস্থার জন্য যতটা সম্ভব আত্মশ্রম-নির্ভর হইয়া উঠিতে হইবে, আর শ্রমের মধ্যে বা বৃত্তির মধ্যে কোনো ভেদ বা তারতম্য নাই; এখানে হীন-মধ্যম-উত্তমের কোনও প্রশ্নই ওঠে না; একজন আইনজীবী, একজন অধ্যাপক, একজন ধোপা বা নাপিত, একজন মুচি বা মেথর ইহাদের কাহারই শ্রম উত্তম বা হীন নয়।

আত্মশ্রমনির্ভরতার উপরে মহাত্মা গান্ধী যে জোর দিলেন তাহা অনেকখানিই হইল তাঁহার স্বধর্ম হইতে প্রসূত; এই স্বধর্মই তাঁহার ক্ষেত্রে চরকার প্রতি আনিয়া দিয়াছিল অতখানি ঝোঁক। রবীন্দ্রনাথের আবার স্বভাবজ যে স্বধর্ম তাহা তাঁহাকে বার বার করিয়া টানিয়াছে সুরে ছন্দে রঙে রেখায় নৃত্যে নাট্যে চিত্তমুক্তির দিকে। তিনি জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবোধ অনুভব করিয়াছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই এই সব দিকে; যে কর্মের সহিত তাঁহার এই স্বধর্মের যোগ নাই তাহা তাঁহার মনকে দোলা দিবে কি করিয়া; কোনও পরিসংখ্যানবিদ বিশেষজ্ঞ বা অর্থনীতিজ্ঞ যদি রবীন্দ্রনাথের নিকটে তথ্যযুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিতে পারিতেনও যে ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে এবং আর্থিক সমস্যার খানিকটা সমাধান করিতে মিল অপেক্ষা চরকা অধিক উপযোগী তাহাতেও রবীন্দ্রনাথ অতি খুশী মনে যে চরকাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহা মনে হয় না।

আসলে অসহযোগ আন্দোলন এবং ইহার ভিতরে প্রধানভাবে যে চরকার কার্যক্রম তাহাতে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মতবিরোধ ইহা শুধু একটা সাময়িক মেজাজ-মর্জির পার্থক্য-জনিত বিরোধ নয়—অনেকখানি মৌলিক ধাতুগত বিরোধ—মানসিক কাঠামো এবং সহজাত এষণার বিরোধ। নিউইয়র্ক হইতে ১৪।১।২১ তারিখের একখানি চিঠিতে কবি এণ্ড্রুজকে লিখিয়াছিলেন—

"স্বদেশী স্বরাজ্য সাধারণতঃ আমার দেশবাসীর মনে একটা গভীর উত্তেজনা সৃষ্টি করে; কারণ এই সকলের প্রয়োগ-ক্ষেত্রে যে অন্য সব কিছুকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার একটা ভাব আছে তাহা অনেকখানি উন্মাদনার সৃষ্টি করে। এ-কথা বলা যায় না যে এই তাপ ও আন্দোলন আমাকে একটুও স্পর্শ করে না। কিন্তু যেমন করিয়া হোক, আমার কবির ধাত বলিয়া এই জিনিসগুলিকে চূড়ান্ত প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমি অক্ষম।"

ঐ বৎসরের ৫ই মার্চের আর এক পত্রে এণ্ড্রুজকে আবার লিখিয়াছেন—

"কিছুদিন যাবৎ আমি ভারতবর্ষ হইতে আরও বেশী সংবাদ এবং সংবাদ-পত্রের কাটা অংশ পাইতেছি; এগুলি আমার মনে একটা বেদনাদায়ক দ্বন্দ্ব জাগাইয়া তুলিতেছে—এ দ্বন্দ্ব আমার জন্য যে একটি দুঃখ-যন্ত্রণার কাল অপেক্ষা করিতেছে তাহারই সূচনা দান করিতেছে। যে ভয়ানক উত্তেজনার ভাব আমার দেশে বহিয়া যাইতেছে তাহার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য আমি আমার মনের মেজাজ-মর্জিকে নূতন ঘাটে বাঁধিয়া লইবার যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমার সত্তার গভীরে কেন জাগিতেছে এই প্রতিরোধের সুর; ইহাকে দূর করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও ইহা নিজেকে রক্ষা করিতে চাহিতেছে। আমি স্পষ্ট কোনও উত্তর পাইতেছি না। আবার এই নৈরাশ্যের কালিমার ভিতর হইতে একটি হাসি ও একটি কণ্ঠস্বর ফুটিয়া উঠিতেছে, বলিতেছে,— "তোমার স্থান হইল 'জগতের সাগর বেলায়' শিশুদের লইয়া; সেইখানে তোমার শান্তি, সেখানে আমি তোমার সঙ্গে আছি। ......

"কিন্তু পিছন হইতে ঠেলা খাইয়া —সব দিক হইতে চাপাচাপিতে এই ভিড়ের মধ্যে আমি কোথায় আছি? আর আমার চারিদিকের এত গোলমালই বা কিসের? ইহা যদি একটা গান হয় তবে আমার সেতার ইহার সুর ধরিতে পারে —আমিও এই একতানে যোগ দিতে পারি, কারণ, আমি একজন সংগীতকার। কিন্তু এটা যদি একটা চিৎকার হয় তবে আমার কণ্ঠ ভাঙিয়া যায় এবং আমিও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে ডুবিয়া যাই। আমার কানকে খাড়া করিয়া এই কিছুদিন যাবৎ আমি ইহার মধ্যে একটা সংগীত শুনিবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু এই পরিকল্পনা—ইহার প্রচণ্ড শব্দরাশির দ্বারা আমার কাছে কোনো গানই করিতেছে না, ইহার ভিতরকার অ-কর্মের একটা পুঞ্জীভূত আশংকা আমার কাছে শুধু চিৎকার করিতেছে। আমি নিজের কাছে নিজে বলি, "তোমার দেশবাসীর ইতিহাসের এই চরম সংকটকালে তোমার দেশবাসিগণের সহিত যদি পা ফেলিয়া চলিতে নাও পার তবে এ-কথা কখনই বলিও না যে তুমিই ঠিক—তাহারা আর সকলেই ভ্রান্ত; শুধু তোমার সৈনিক হিসাবে যে কাজ তাহা ছাড়িয়া দাও—কবিরূপে তোমার নিভৃত কোণে চলিয়া যাও, জনসাধারণের নিকট হইতে ঘৃণা-অপমান লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

এই পত্রেরই শেষাংশে কবি বলিয়াছেন,—

"আমি বার বার করিয়া বলিতেছি, প্রকৃতিতে আমি কবি, আমি যোদ্ধা নই। আমার পরিবেশের সহিত এক হইয়া যাইবার জন্য যেটুকু দেয় আমি তাহার সবটুকু দিতে রাজী।

"আমি আমার দেশবাসীদের ভালোবাসি, তাঁহাদের ভালোবাসারও মূল্য দিই। তথাপি জানি আমার ভাগ্য আমাকে এমনভাবে বাছিয়া লইয়াছে যে যেখানে স্রোত আমার বিরুদ্ধে সেইখানেই বসিয়া আমাকে তরী বাহিতে হইবে। সমুদ্রের অপর পারে বসিয়া আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার কথা প্রচার করিতেছি. অদৃষ্টের কি পরিহাস!"
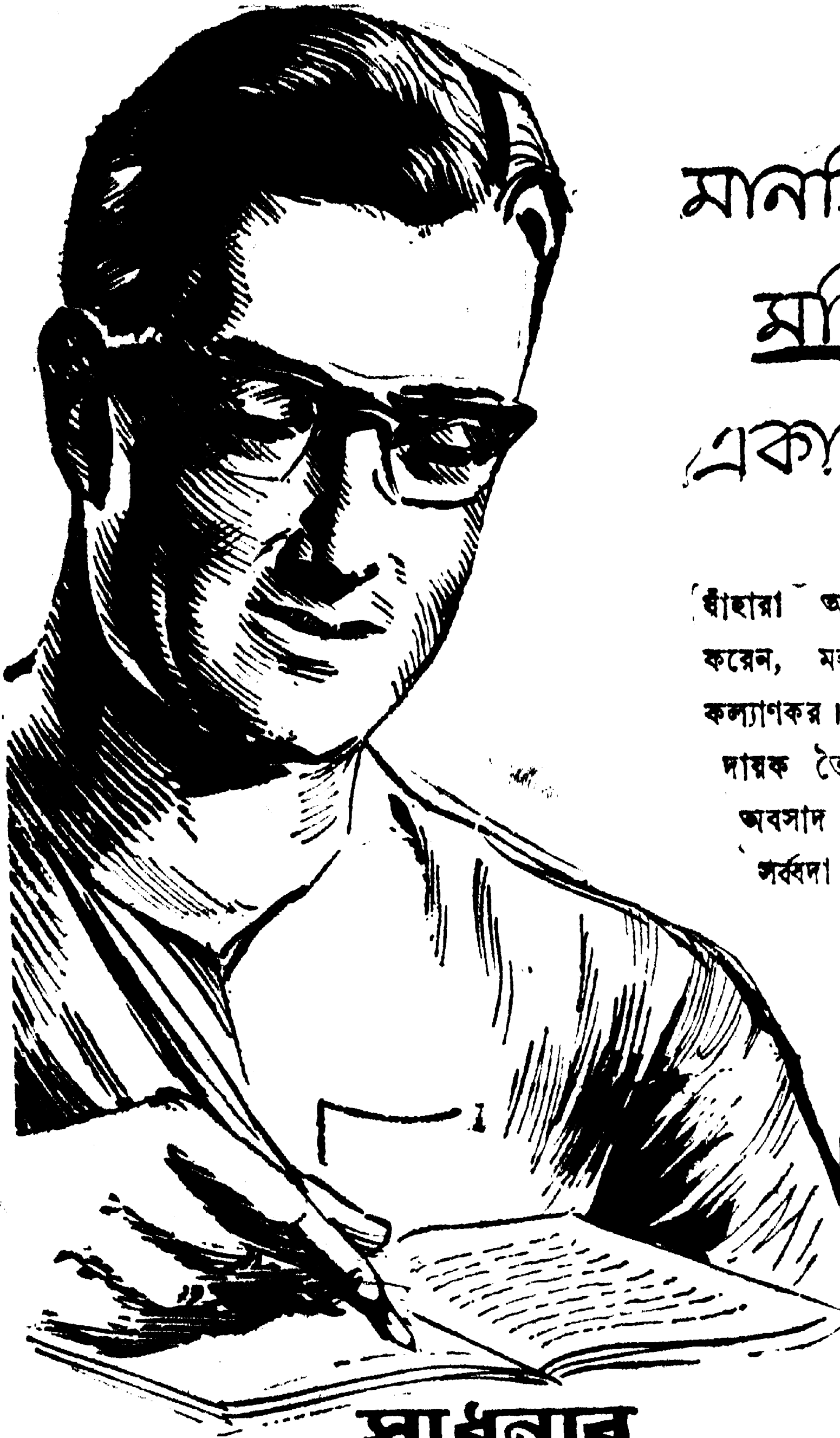
কহেন কবি কালিদাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—৭—
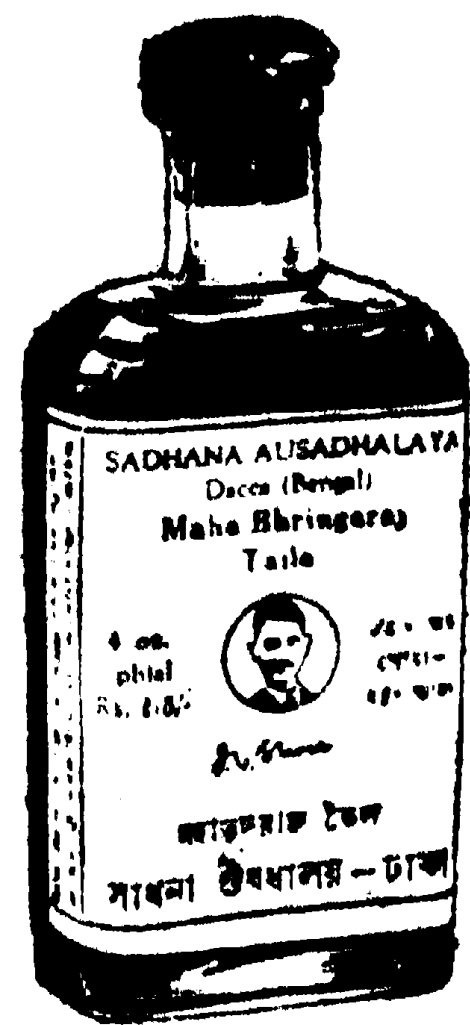
অপরাহ্নে আন্দাজ পাঁচটার সময় আমরা ক্ষীরের মালপুয়া লইয়া বসিয়াছি এমন সময় প্রমোদ বরাট আসিলেন।

মণীশবাবু কয়লাখনিতে গিয়াছেন, ফণীশ বাড়িতে আছে। ইন্দিরা এতক্ষণ আমাদের কাছেই ছিল, এখন বরাটকে দেখিয়া ভিতরে গিয়াছে। আসামী কে তাহা শুনিবার পর আমার মাথাটা হিজিবিজি হইয়া গিয়াছিল, এখন কতকটা ধাতে আসিয়াছে।

ইন্সপেক্টর বরাটের মুখখানা শুষ্ক, মন বিক্ষিপ্ত; সকালবেলা যে ইউনিফর্ম পরিয়া ছিলেন, এখনও তাহাই পরিয়া আছেন মনে হয়। তিনি আসিয়া হাস্যহীন মুখে পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিলেন, বলিলেন,—'এই নিন আঙুলের ছাপের ফটো আর রিপোর্ট। তিনজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ খামটি না খুলিয়াই পকেটে রাখিল, বরাটের মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—'আজ দুপুরে আপনার খাওয়া হয়নি দেখছি।'

বরাট মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'খাওয়া হবে কোত্থেকে। আপনার আসামী পালিয়েছে।'

ব্যোমকেশ এমনভাবে ঘাড় নাড়িল যেন ইহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল। তারপর বরাটকে বসিতে বলিয়া সে ফণীশের পানে চাহিল। ফণীশ দ্রুত অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। বরাট চেয়ারে হেলান দিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিলেন,—'শুধু আসামী নয়, মোহিনীও পালিয়েছে। দু'জনে ট্যাক্সিতে চড়ে হাওয়া হয়েছে। কনেস্টবলটা প্রাণহরির বাড়িতে পাহারায় ছিল, কিন্তু মোহিনীকে আটক করবার হুকুম তার ছিল না। ভুবন দাস ট্যাক্সিতে এসে র[illegible]কে হর্ন বাজালো, মোহিনী বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে চড়ে বসল। দু'জনে চলে গেল।'

ফণীশ এক থালা খাবার আনিয়া বরাটের সম্মুখে রাখিল, বরাট বিমর্ষ ভাবে আহার করিতে লাগিলেন। আমরাও মালপুয়াতে মন দিলাম। নীরবে আহার চলিতে লাগিল।

বৈষ্ণবীয় জলযোগ সমাধা করিয়া সিগারেট ধরাইবার উপক্রম করিতেছি, ব্যোমকেশ সমাদর করিয়া বলিল,—'এস এস বিকাশ। কাজ সেরে ফেলেছ তাহলে?'

'সেরেছি স্যার। আমার মাথা ফাটাবার তালে ছিল, তাতেই ধরা পড়ে গেল।' বিকাশ হাত-পা ছড়াইয়া একটা শোফায় বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—'দু'জনেই শালা।'

'দু'জনেই শালা—কাদের কথা বলছ?'

বিকাশ উত্তর দিবার পূর্বেই

'সেরেছি স্যার। আমার মাথা ফাটাবার তালে ছিল, তাতেই ধরা পড়ে গেল।'

বাহিরের দিক হইতে আর্দালি জাতীয় একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথায় গান্ধী টুপী, পরিধানে খদ্দরের চাপকান ও পায়জামা; তাই হঠাৎ তাহাকে চিনিতে পারি নাই। সে মাথার টুপী খুলিয়া মেঝেয় আছাড় মারিল। তারপর বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলিল,—'শালাদের ধরেছি স্যার।'

বিকাশ দত্ত। টুপী খুলিতেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে।

সুরপতি ঘটক প্রবেশ করিলেন। শৌখীন বেশবাস সত্ত্বেও একটু ভিজা-বিড়াল ভাব, চোখে সতর্ক বিড়ালদৃষ্টি। তিনি ঘরের পরিস্থিতি ক্ষিপ্র-মসৃণ চক্ষে দেখিয়া লইয়া বিনীত স্বরে বলিলেন,—'কর্তা আছেন কি? তাঁর সঙ্গে—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আসুন সুরপতিবাবু।'

বিকাশ সহসা খাড়া হইয়া বসিল,

একাগ্র চক্ষে সুরপতিবাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'এ'র নাম সুরপতি ঘটক? বড় অফিসের বড়বাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। কেন বল দেখি?'

বিকাশ সুরপতিবাবুর দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিল,—'এ'র দুই শালার কথা বলছিলাম স্যার। বিশ্বনাথ আর জগন্নাথ রায়। তারাই কয়লাখনিতে বজ্জাতি করছে।'

সুরপতির চোখে ভয় উছলিয়া উঠিল, তিনি শীর্ণকণ্ঠে বলিলেন,—'কী? কী? আমি তো কিছু—'

বরাট তাহার দিকে ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'সুরপতিবাবু, যে দু'টি ছোকরাকে আপনি আমাদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টায় ছিলেন, তারা আপনার শালা?'

সুরপতি বলিলেন,— 'মানে—তাতে কি হয়েছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়নি কিছু। কাল রাত্রে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে তিনজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আমরা মিলিয়ে দেখতে চাই, এই তিনজনের মধ্যে আপনি আছেন কিনা। —ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি সুরপতিবাবুর আঙুলের ছাপ নিন। মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে উনি এই ষড়যন্ত্রে কতদূর আছেন। ফণীশ, বাড়িতে রবার-স্ট্যাম্প কালির প্যাড আছে?'

সুরপতি একপা একপা করিয়া পিছু হাঁটিতেছিলেন, দ্বারের কাছাকাছি গিয়া তিনি পাক খাইয়া পালাইবার চেষ্টা করিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় মণীশবাবু ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন, দু'জনেই পড়িতে পড়িতে তাল সামলাইয়া লইলেন, তারপর সুরপতি ঘটক তুরঙ্গ গতিতে পলায়ন করিলেন।

মণীশবাবু এইমাত্র কয়লাখনি হইতে ফিরিয়াছেন, ঘরে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়-ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিলেন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, 'কী হচ্ছে এখানে? ...... ইন্সপেক্টর বরাট...... সুরপতি অমন লাফ মেরে পালালো কেন?'

বরাট বলিলেন, 'আপনি বসুন। আপনার খনিতে যারা অনিষ্ট করছিল তারা ধরা পড়েছে।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'ধরা পড়েছে!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ছেলেটির নাম বিকাশ দত্ত, ও আমার সহকারী। ইন্সপেক্টর বরাটের সঙ্গে পরামর্শ করে বিকাশকে হাসপাতালের আর্দালি সাজিয়ে খনিতে পাঠিয়েছিলাম। ও ধরেছে।'

মণীশবাবু বলিলেন,— 'কে— কারা—?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সুরপতি ঘটক এবং তার দুই শালা।'

'অাঁ! সুরপতি!' মণীশবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন— 'কিন্তু—সুরপতি! সে যে আমার অফিসে বিশ বছর কাজ করছে! তার এই কাজ!'

আমরা আবার উপবেশন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'মণীশবাবু, দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করলে মানুষ স্ত্রীর বশীভূত হয়, সুরপতিবাবু শালাদের বশীভূত হয়েছেন। খুব বেশী তফাৎ নেই।'

মণীশবাবু বলিলেন,—'কিন্তু কেন? ওরা আমার অনিষ্ট করতে চায় কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সেটা এখনো আবিষ্কার করা যায়নি। তবে আবিষ্কার করা শক্ত হবে না। আমার মনে হয়, যে মাড়োয়ারী আপনার খনি কিনতে চেয়েছিল সেই আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে। কিম্বা অন্য কেউ হতে পারে। সুরপতিবাবুকে চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়বে।'

'কিন্তু—সুরপতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু পেয়েছেন?'

'এখনো পাইনি। কিন্তু আঙুলের ছাপ নেবার নামে উনি যেরকম লাফ মেরে পালালেন, ওঁর মনে পাপ আছে।'

মণীশবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল তিনি যত না বিস্মিত হইয়াছেন, ততোধিক দুঃখ পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন,—'আপনারা বসুন। ফণি, তুমি আমার সঙ্গে এস। অফিসের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

জন্য সুরপতির—' তিনি সপ্রশ্ন নেত্রে বরাটের পানে চাহিলেন।

বরাট বলিলেন,—'সুরপতির ব্যবস্থা আমি করব।'

মণীশবাবু পুত্রকে লইয়া অফিসের দিকে চলিয়া গেলেন।

আমরা চারজন কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ অলসকণ্ঠে বলিল,—'ভুবনের নামে হুলিয়া জারি করেছেন নিশ্চয় ?'

বরাট বলিলেন,—'সারাদিন অতেই কেটেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আশাপ্রদ কোনো খবর নেই ?'

বরাট বলিলেন,—'চাল্লিশ মাইল দূরে একটা রেলওয়ে স্টেশন থেকে খবর পেয়েছি, একটা চালকহীন নম্বরহীন ট্যাক্সি সেখানে পড়ে আছে। লোক পাঠিয়েছি। হয়তো ভুবনের ট্যাক্সি, সে ওখানে ট্যাক্সি ছেড়ে ট্রেন ধরেছে।'

'বোম্বাই গেছে কি মাদ্রাজ গেছে কে জানে।'

'হুঁ। আজ উঠি।'

'আচ্ছা আসুন। আসামীকে ধরা আপনার কর্তব্য, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন জানি। তবু, যদি ওদের ধরতে না পারেন আমি খুশী হব।'

ইন্সপেক্টর বরাট একটু হাসিলেন।

।।পাঁচ।।

নৈশ আহারের পর মণীশবাবু শয়ন করিতে গিয়াছিলেন; ফণীশ চুপি চুপি আসিয়া আমাদের ঘরে ঢুকিল। আজ আমাদের ঘরে তিন জনের শয়নের ব্যবস্থা, বিকাশের জন্য একটি ক্যাম্প খাট পাতা হইয়াছে।

ঘরে তিনজনেই উপস্থিত ছিলাম, বিছানায় শুইয়া সিগারেট টানিতে-ছিলাম; বিকাশ কি করিয়া শত্রুদের ধরিল তাহারই গল্প বলিতেছিল। ফণীশকে দেখিয়া ব্যোমকেশ বালিসে কনুই দিয়া উঁচু হইয়া বসিল।

'এস ফণীশ।'

ফণীশ ব্যোমকেশের খাটের পাশে চেয়ার টানিয়া বসিল, অনুযোগের সুরে বলিল,—'কালই চলে যাবেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—হ্যাঁ, শালাবাবুরা যে রকম শাসিয়েছে তাড়াতাড়ি কেটে পড়াই ভাল। তুমি যদি বৌমাকে নিয়ে কলকাতায় আসো নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। বৌমাকে সত্যবতীর খুব পছন্দ হবে। বলিয়া যেন পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া একটু হাসিল।

ফণীশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—'গল্পটা শুনব।'

ব্যোমকেশ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, মাথার বালিসটা কোলের উপর [illegible] লইয়া বলিল, 'গল্প শুনবে—প্রাণহরির গল্প? বেশ, বলছি; কিন্তু গল্পটা গল্পই হবে, আগাগোড়া সত্য ঘটনা হবে না। অনেকটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতন।'

ফণীশ ভ্রূ তুলিয়া প্রশ্ন করিল। ব্যোমকেশ বলিল,—'বুঝলে না? যাঁরা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন তাঁরা সরাসরি ইতিহাস লেখেন না, ইতিহাস থেকে গোটা-কয়েক চরিত্র এবং ঘটনা তুলে নিয়ে সেই কাঠামোর ওপর নিজের গল্প গড়ে তোলেন। আমি তোমাকে যে গল্প বলব সেটাও অনেকটা সেই ধরণের হবে। সব ঘটনা জানি না, যেটুকু জানি তা থেকে পুরো গল্পটা গড়ে তুলেছি; কল্পনা আর সত্য এ গল্পে সমান অংশীদার। —শুনতে চাও ?'

ফণীশ বলিল,—'বলুন।'

ব্যোমকেশ নূতন সিগারেট ধরাইয়া গল্প আরম্ভ করিল—

ভুবনেশ্বর দাসকে দিয়েই গল্প

আরম্ভ করি। তার নাম শুনেও আমার সন্দেহ হয়নি যে সে বাঙালী নয়, ওড়িয়া। বাংলাদেশ আর উড়িষ্যার সংগমস্থলে যারা থাকে তারা দু'টো ভাষাই পরিষ্কার বলতে পারে, বোঝবার উপায় নেই বাঙালী কি ওড়িয়া। যদি বুঝতে পারতাম, সমস্যাটা অনেক আগেই সমাধান হয়ে যেত। কারণ মোহিনী উড়িষ্যার মেয়ে। দুই আর দুয়ে চার।

মোহিনী ভুবনেশ্বরের বৌ। যারা মেয়ে-মরদে গতর খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করে ওরা সেই শ্রেণীর লোক। ভুবন কাজ করত কটকের একটা মোটর মেরামতির কারখানায়। মোহিনী বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করত। আর দু'জনে দু'জনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। এই ভালবাসাই হচ্ছে এ গল্পের মূল সূত্র।

ভুবনের মনে উচ্চাশা ছিল, মোহিনীর দাসীবৃত্তি তার পছন্দ ছিল না। মোটর কারখানার কাজ করতে করতে মিলিটারিতে ট্রাক-ড্রাইভারের চাকরি জোগাড় করে সে চলে গেল; মোহিনীকে বলে গেল—টাকা রোজগার করে ট্যাক্সি কিনব, তোকে আর চাকরি করতে হবে না।

বছর দুই ভুবনের আর দেখা নেই। ইতিমধ্যে মোহিনী কটকে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়িতে চাকরি করছে; দিনের বেলা কাজকর্ম করে, রাত্তিরে বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যায়।

প্রাণহরি লোকটা অতিবড় অর্থ-পিশাচ। যেমন কৃপণ তেমনি লোভী। সারা জীবন টাকা-টাকা করে বুড়ো হয়ে গেছে, জুচ্চুরি দাগাবাজি ব্ল্যাকমার্কেট করে অনেক টাকা জমা করেছে, তবু তার টাকার খিদে মেটেনি। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তার মনে লোভ নেই, কিম্বা বুড়ো বয়সে সে লোভ কেটে গিয়েছিল। কিন্তু মোহিনী যখন তার বাড়িতে চাকরি করত এল তখন তাকে দেখে প্রাণহরির মাথায় এক কুবুদ্ধি গজালো, সে টাকা রোজগারের নতুন একটা রাস্তা দেখতে পেল। বড়মানুষের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা তার বাড়িতে জুয়া খেলতে আসে, তাদের চোখের সামনে মোহিনীর মতন মেয়েকে যদি ধরা যায়—

মোহিনীর দেহে যে প্রচণ্ড যৌন আকর্ষণ আছে তাই দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে প্রাণহরির মনে ভুল ধারণা জন্মেছিল। সে বড়মানুষের ছেলেদের ধাপ্পা দিয়ে মোহিনীর নাম করে টাকা নিত। কিন্তু মোহিনী ধরা-ছোঁয়া দিত না। কিছুদিন এইভাবে চলবার পর বড়মানুষের ছেলেরা বিগড়ে গেল, তারা টাকা ঢেলেছে, ছাড়বে কেন? তারা প্রাণহরিকে প্রহার দেবার মৎলব করল।

প্রাণহরি দেখল কটক থেকে কেটে না পড়লে মার খেতে হবে। কিন্তু মোহিনীকে তার দরকার, এমন মুখো-রোচক টোপ সে আর কোথায় পাবে? সে মোহিনীর কাছে প্রস্তাব করল তাকে সংগে নিয়ে যাবে। মোহিনীর আপত্তি নেই; তার স্বামী বিদেশে, তাকে দাসীবৃত্তি করে খেতে হবে, তার কাছে কটকও যা অন্য জায়গাও তাই। সে দেড়া মাইনেতে প্রাণহরির সংগে যেতে রাজি হল।

কিন্তু তারা কটক ছাড়বার আগেই ভুবন ফিরে এল। ভুবন চাকরি করে কিছু টাকা সঞ্চয় করেছে, কিন্তু ট্যাক্সি কেনার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। স্বামী-স্ত্রী মিলে পরামর্শ করল, তারপর ভুবন প্রাণহরির কাছে গেল। [ক্রমশঃ]

বলুন তো কী?

প্রশ্ন

১। সবচেয়ে পুরাতন রাজতন্ত্র কোন্ দেশে বিদ্যমান?

২। মাটি হতে অন্যান্য ধাতুর তুলনায় কোন্ ধাতু সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়?

৩। কোন্ খনিজ পদার্থকে টিস্যু কাগজের মত পাতলা করা যায়?

৪। কোন্ জন্তু সবচেয়ে ভারি বাচ্চা প্রসব করে?

৫। হাড়কে কি জ্যান্ত জিনিস বলে মনে করা যেতে পারে?

৬। আকারে পৃথিবীর মধ্যে বেশ বড় দেশ, কিন্তু জনসংখ্যায় কম—এই রকম দুইটি দেশের নাম কি?

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে কতগুলি দ্বীপ আছে?

[উত্তর অন্যত্র দ্রষ্টব্য]

দাদাকে মনে পড়ে

নরেন্দ্র দেব

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' গ্রন্থখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত হিসাবে বাংলা সাহিত্যে বেশ একটু নূতন[illegible] আস্বাদ এনে দিয়েছিল বটে, কিন্তু, গল্প উপন্যাসের মতো ভ্রমণকাহিনীও যে পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে সর্বপ্রথম এ পরিচয় পাওয়া যায় রায়-বাহাদুর জলধর সেনের ভ্রমণ-কাহিনীগুলির অপরিসীম জনপ্রিয়তায়। তিনি ছিলেন তদানীন্তন সাহিত্য-সমাজের সর্বজনীন 'দাদা'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—আপন স্নিগ্ধ সহৃদয়তার গুণে সাহিত্যসাধকদের হৃদয় জয় করেছিলেন।

আশী বছর তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। লেখা প্রকাশ হতে শুরু হয় যখন তিনি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে। সুতরাং তাঁর সাহিত্য-জীবন ৬৫ বছরের বেশি নয়। কিন্তু এরই মধ্যে নানা বিষয়ে তিনি প্রায় ৭০ খানি বই লিখে গেছেন। ভ্রমণকাহিনী, ছোটগল্প, উপন্যাস, জীবনী, শিশুপাঠ্য বই, পুরাতন কাহিনী, স্মৃতিকথা, অনেক কিছু। সেকালে এমন চিত্তাকর্ষক ভ্রমণকাহিনী আর কেউ লিখতেন না।

ভ্রমণকাহিনীগুলির মধ্যে এখানে-ওখানে এমন এক-একটি চমৎকার ঘটনার বিবরণ থাকতো যেগুলিকে খুব উচ্চ শ্রেণীর ছোটগল্প বলা চলে। এইগুলি পড়ে পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা তাঁকে ছোটগল্প লেখার জন্য তাগিদ শুরু করে। ফলে দাদা ছোটগল্প রচনায় হাত দেন। তাঁর 'নতুন গিন্নী', 'পরাণ মন্ডল', 'বড় মানুষ', 'এক পেয়ালা চা', 'বাতাসী', 'ছোটকাকী', 'কালো মেয়ে', 'গৃহশিক্ষক', 'বিধবা' প্রভৃতি শতাধিক ছোটগল্পের শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় যে দাদা বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজজীবন থেকেই তাঁর রচনার বিষয়বস্তুগুলি আহরণ করেছিলেন।

দাদার গল্প, উপন্যাসগুলি পড়লে বোঝা যায় যে সেই প্রাচীন সংকীর্ণ সমাজের কুসংস্কারাবদ্ধ যুগেও দাদা [illegible] উদারপন্থী। সমাজের অন্যায় বিধি-নিষেধের বিরোধী ছিলেন তিনি। অতি সামান্য তুচ্ছ কারণে নারীকে সমাজচ্যুত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশেষ করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে ধর্ষিতা তরুণীদের সমাজে পুনর্গ্রহণ করা তিনি অনুমোদন করতেন। বাল-বিধবাদের পদস্খলনকে তিনি জীবনের অসতর্ক মুহূর্তে একটা ক্ষণিকের ভুল বলে ক্ষমার চক্ষে দেখে তাদের নূতন করে জীবন-যাপনের সুযোগ দেওয়া সমর্থন করতেন। অল্প বয়স্কা বিধবা মেয়েদের পুনর্বিবাহে তাঁর সর্বান্তকরণে সম্মতি ছিল।
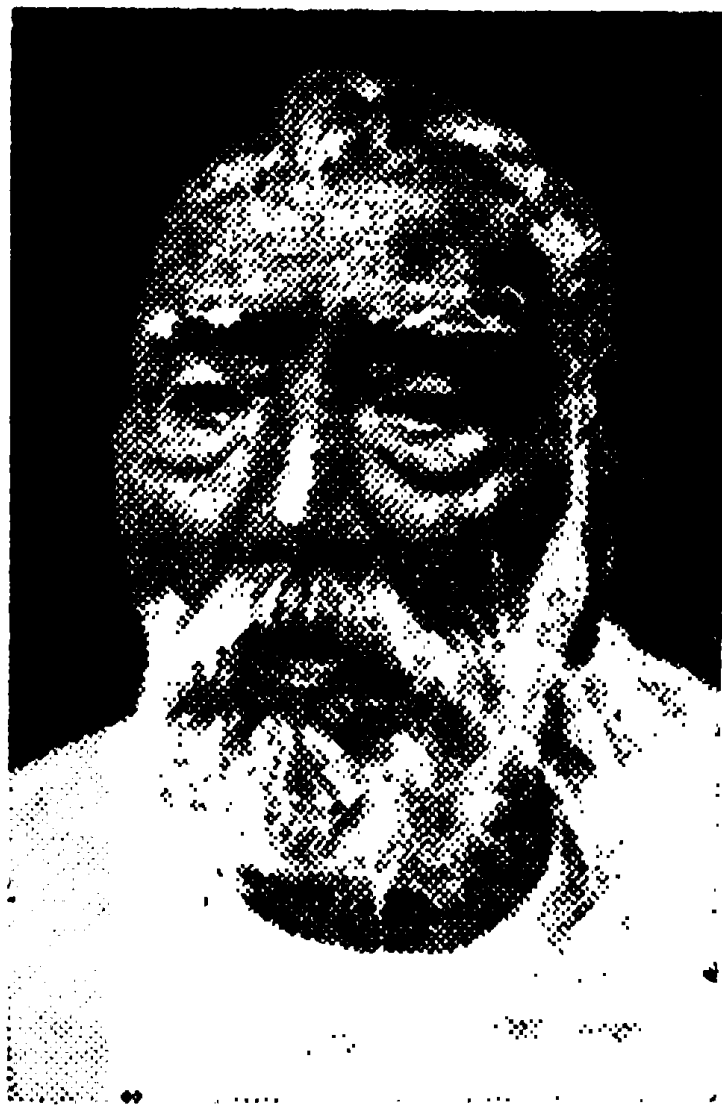
ভ্রমণের নেশা তাঁর সারা জীবনই ছিল। সেই যে একদা তরুণ বয়সে শোকার্ত হৃদয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন সেই পথের ডাক কানে পৌঁছলে তিনি আর ঘরে থাকতে পারতেন না। দাদার জন্ম হয়েছিল দ রি দ্র ঘরে। পিতা হলধর সেন ছিলেন এক দোকানের স্বল্প বেতনের কর্মচারী। কায়-ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতেন। পত্নী, তিন পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে কুমারখালি গ্রামের একটি পর্ণ কুটিরে বাস করতেন। দাদা ছিলেন তাঁর মধ্যম পুত্র। ছেলেদের জুতো, জামা তিনি কিনে দিতে পারতেন না। দাদা খালি পায়ে, খালি গায়েই মানুষ হয়েছিলেন গাঁয়ে। কিশোর বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। বড় ভাই সংসারের ভার নেন।

গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি দশ টাকা জলপানি পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দাক্ষিণ্যে তিনি কলকাতায় এসে এফ-এ পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সাংসারিক নানা বিপদ-আপদের ঘূর্ণীবাত্যায় পড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ইতিমধ্যে তাঁর বিবাহ হয়। অভাবের সংসার। উপার্জনের প্রয়োজন। দাদা গেলেন গোয়ালন্দ স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। এই সময় তাঁর জীবনে এসে পড়লো এক আকস্মিক পরিবর্তন। কলেরায় পত্নীবিয়োগ, এক মাসের মধ্যে মাতৃবিয়োগ তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয়কে এমনিই বিচলিত করে তুললো যে তিনি সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন উদাসী পরিব্রাজকের ন্যায় হিমালয়ের পথে।

কিন্তু, দেরাদুনে এক আত্মীয় তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। ঢুকিয়ে দিলেন সেখানে তাঁকে এক শিক্ষকতার কাজে। কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরুনো মানুষের কি আর সংসার কারাগার ভাল লাগে? পালিয়ে গেলেন তিনি হিমালয়ের আকর্ষণে কাজ ছেড়ে দিয়ে। প্রায় দুবৎসর পাহাড়ে-পর্বতে, শৈল-উপত্যকায় নানা তীর্থ ও মন্দির পরিভ্রমণ করে ফিরে এলেন তাঁর শূন্য ঘরে। ঘর-পালানো ছেলেকে বাঁধবার জন্য আবার তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। আবার শুরু হয় তাঁর সংসার-জীবন।

বছর তিনেক তিনি মহিষাদল রাজ-বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর চলে আসেন কলকাতায় বঙ্গবাসী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়ে। এই পত্রিকা সম্পাদনের কাজে তাঁর প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা' কাগজে।

বাংলার সাধক কবি, নির্ভীক, তেজস্বী, এই কাঙ্গাল হরিনাথই 'গ্রামবার্তা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। ইনিই দাদার ধর্মগুরু ও সাহিত্যগুরু। শিষ্যের যোগ্যতা বুঝে 'গ্রামবার্তার' সম্পাদনা ভার তিনি দাদার উপরই ন্যস্ত করেন।

'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করার পর তিনি 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদনা গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল 'বসুমতী' পত্রিকা সম্পাদনার পর তিনি পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের সনির্বন্ধ অনুরোধে 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদনে যোগ দেন। কিন্তু সন্তোষের জমিদার কবিবর প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর সাদর আহ্বানে 'হিতবাদী' ছেড়ে তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাদের, গৃহশিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। পরে সন্তোষ-রাজ ষ্টেটের দেওয়ানের পদও অলঙ্কৃত করেন।

কিন্তু যিনি জন্ম-সাহিত্যিক এসব কাজে তাঁর মন বসবে কেন। লক্ষ্মীর সদয় আকর্ষণ তাঁকে সরস্বতীর কুঞ্জবন থেকে বেশি দিন তফাৎ করে রাখতে পারলে না। 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার সম্পাদনা ভার নেবার আহ্বান আসতেই তিনি এই সুখের চাকরি হেলায় পরিত্যাগ করে চলে আসেন। এই 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা সম্পাদনকালেই তিনি 'ভারতবর্ষ' মাসিক-পত্র সম্পাদনা গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রিত হন। দাদাও সানন্দে এ কাজ গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই দায়িত্বই সুনামের সঙ্গে প্রতিপালন করে যান।

দাদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সূত্রেই। আমি তখন একজন কবিযশঃপ্রার্থী তরুণ লেখক। 'বাসন্তী', 'প্রবাহিনী' প্রভৃতি দু-একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা, দৈনিক 'সন্ধ্যা' এবং 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় সবে দু-একটি কাঁচা হাতের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। হাত যে আমার এতদিনে পেকেছে এ স্পর্ধা আমি করিনি, কিন্তু 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক, আমাদের সকলের অতি প্রিয় কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অকস্মাৎ অকাল মৃত্যু হওয়ায় আন্তরিক ব্যথিত হয়ে একটি যে শোকগাথা রচনা করেছিলুম দাদা সেটি সাদরে প্রকাশ করেছিলেন। সেই থেকেই আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি পড়ে। আমার অধিকাংশই রচনাই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিই আমাকে প্রথম প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়েও দিয়েছিলেন। নানা সাহিত্য সভায় ও সাহিত্য সম্মেলনে তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।

দাদার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা ক্রমে আত্মীয়তার পর্যায় এসে পৌঁছেছিল। এক-বার চলেছি তাঁর সঙ্গে মধ্য ভারত ভ্রমণে। দাদার বয়স তখন ষাট। আমার তিরিশের বেশি নয়। দুজনে এক গাড়ীতেই যাচ্ছি। একখানি সেকেণ্ড ক্লাস কুপে। তখন সেকেণ্ড ক্লাসে এটা পাওয়া যেতো এবং বার্থ রিজার্ভও হত। ধূমপান অভ্যাস হয়ে পড়েছিল সঙ্গদোষে। পাশে বসে দাদার নিরবচ্ছিন্ন টেনে যাওয়া বর্মা চুরুটের উগ্র সুরভি প্রতি নিঃশ্বাসে নাকে এসে আমার ধূম্রলালসায় ইন্ধন যোগা-চ্ছিল। কিন্তু সকল সাহিত্যিকের শ্রদ্ধেয় দাদা, পিতার বয়সী মানুষটির সামনে ধূমপান করবার স্পর্ধা সেদিন আমাদের ছিল না। আমাদের যৌবনকালে বয়ো-জ্যেষ্ঠদের সামনে নস্যে আওয়াজ দিয়েও তামাক খাওয়া চলতো না। কাজেই আমাকে বার বার উঠে গিয়ে ট্রেনের স্নানাগারে ঢুকে গোপনে ধূমপানের তৃষা নিবারণ করে আসতে হচ্ছিল।

আমার এই ঘন ঘন স্নানাগারে গতি-বিধি দাদার দৃষ্টি এড়ায়নি। কয়েকবার যাতায়াতের পর দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, এতবার তুমি ওঘরে ঢুকছো কেন? তোমার শরীর কি ভাল নেই? উদরাময়ে কষ্ট পাচ্ছ না তো? আমি অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে বললুম, আজ্ঞে, না, সে রকম কিছু নয়। শরীর আমার বেশ ভালই আছে। দাদা শুনে হেসে উঠে বললেন, বুঝেছি! তোমার ধোঁয়ার ছোঁয়াচ লেগেছে। আমার এই চুরুটের গন্ধই তোমাকে ওখানে ঠেলে পাঠাচ্ছে। তা দেখ ভায়া, তুমি তো স্কুলের নাবালক ছাত্র নও। বয়োঃপ্রাপ্ত যুবক। এ বয়সে ধূমপানে আসক্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে তুমি তোমাদের বনেদী ঘরের বংশগত, শিক্ষা ও সংস্কার-বশতঃ আমার মতো একজন বর্ষীয়ান লোকের সামনে ধূমপান করাটা অশিষ্টতা হবে বলে মনে করছো। এ রকম মনে হওয়া তোমার পক্ষে খুবই সঙ্গত। কিন্তু, ভেবে দেখ, তোমাকে আমাকে প্রায় দুদিন দু-রাত্রি একই ট্রেনের এই কামরায় কাটাতে হবে। যেখানে যাচ্ছি সেখানেও হয়ত একই ঘরে আমাদের থাকতে হবে। সুতরাং তোমাকে যে কত কষ্ট ও অসুবিধায় পড়তে হবে এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমিও তো একদিন তোমাদের সমবয়সী ছিলাম হে, এবং গুরুজনও যে আমাদের ছিল না তা নয়। আমি একজন ভুক্ত-ভোগী। সুতরাং যা পরামর্শ দিচ্ছি শোনো। যদি আরামে এই দীর্ঘপথ অতি-বাহিত করতে চাও তবে এই সংকোচ ও কুণ্ঠাটুকু ছাড়ো। আচ্ছা, বলোতো আমাকে, গুরুজনদের সামনে যদি পান খাওয়া নিষেধ না নয়, নস্য নেওয়াও যদি চলতে পারে, চা-পানও নির্দোষ বলে গ্রাহ্য হয়, তবে এই তুচ্ছ ধোঁয়াকে এত সম্মান দেওয়া কেন? এ অদ্ভুত শিষ্টাচারকে কোনও যুক্তি দিয়েই সমর্থন করা চলে না। ওদেশে পিতা পুত্রকে আগে সিগারেট দিয়ে তবে নিজে নেয়। নাও, ভাল ছেলের মতো পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করো দেখি। আর যদি এই কাঁচা গাঁজায় প্রোমোশান পেয়ে থাকো তো বলো আমি বাক্সটা বার করে দিই।

আমি একেবারে লজ্জায় জড়সড় হয়ে সুড় সুড় করে বার করে দিলুম পকেট থেকে আমার সিগারেট কেসটি। দাদা দেখে নেড়েচেড়ে বললেন, বাঃ বেশতো এটি! নিজে পছন্দ করে কিনেছো না কেউ উপহার দিয়েছে?

বললাম, যে বন্ধুটি আমায় সিগারেট খেতে শিখিয়েছে, সেই এটি আমাকে উপহার দিয়েছে।

তোমার বন্ধুর রুচির প্রশংসা করি। বলতে বলতে তিনি একটি সিগারেট বার করে আমার মুখে প্রায় গুঁজে দিলেন এবং কিছু বলবার আগেই নিজেই একটি দেয়াশলাই কাঠি জেলে ধরিয়ে দিলেন। আমি একেবারে বিস্মিত ও অভিভূত।

এর পর থেকে আর তাঁর সঙ্গে কোথাও যেতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হত না, বরং কতকগুলি বিশেষ সুবিধাই পাওয়া যেতো। যেমন, কুলি ভাড়া, গাড়ী-ভাড়া, মুটে ভাড়া, ট্রেণে খাবার খরচ, অনেক সময় ট্রেণভাড়া পর্যন্ত তিনিই দিতেন। দাদার বসুধৈব কুটুম্বকং, সেখানেই যেতেন হোটেল খরচা লাগতো না। ষ্টেশন থেকে লোক টেনে নিয়ে যেতো দাদা আর তাঁর এই ল্যাংবোট সঙ্গীকে তাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য। দাদার সঙ্গী হয়ে যাওয়ার

ফলে যেখানে গিয়েই উঠতুম একবারে জামাই-আদরে থাকা।

কত জায়গায় যে গেছি তাঁর সঙ্গে আজও ভুলিনি। বোম্বাই, ইন্দোর, আন্ডুয়া, পুণা, মাণ্ড, বরোদা, সৌরাষ্ট্র, এলাহাবাদ, বারাণসী, সারনাথ, গয়া আরও কত জায়গা। বাংলা দেশের মধ্যেও গেছি, মেদিনীপুর, জামসেদপুর, রাধানগর, মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দি। এছাড়া কাছাকাছি আরও অনেক জায়গা, যেমন বর্ধমান, চন্দননগর, শেওড়াফুলি, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, বালি, গুপ্তিপাড়া এমনি আরও অনেক জায়গা। রাধানগরের গল্পটা বলি। হাওড়া থেকে ট্রেনে গিয়ে কোলাঘাটে নামলুম। সেখানে স্টীমারে উঠে রাণীচকে গিয়ে অবতরণ। এখান থেকে রাধানগর যাবার উপায় একমাত্র পদব্রজে বা গরুর-গাড়ীতে। আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল রাজা রামমোহন রায়ের পৈতৃক ভিটা। সেখানে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভা উপলক্ষে সাহিত্য সম্মেলন। আমাদের সঙ্গে দাদা ও আরও কয়েকজন বর্ষীয়ান বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি পালকিরও বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং একটি প্রকাণ্ড ঐরাবত রেখেছিলেন। গরুর গাড়ীও কিছু ছিল। সঙ্গে লোকলস্কর লাঠি, লণ্ঠন। কারণ, রাণীচকে যখন নামি রাত তখন প্রায় ৯টা। অশক্ত বৃদ্ধেরা সকলেই প্রায় পালকিতে উঠলেন। অধ্যবসায়ীরা হাতীর পিঠে ভর করলেন। পদযাত্রায় যাঁরা অক্ষম তাঁরা অনেকেই গরুর গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। আমরা কয়েকজন দুঃসাহসী যুবক যানবাহনের পরোয়া না করে হেঁটেই রওনা হলুম। আমাদের কোনও কথা না শুনে অভ্যর্থনা সমিতির কোনও অনুরোধ না মেনে বৃদ্ধ জলধরদা আমাদেরই সঙ্গী হলেন। নৈশভোজ স্টীমারেই সেরেছি সবাই।

'রাজা রামমোহন কি জয়!' বলে আমরা পদযাত্রীর দল রওনা হলুম। জ্যোৎস্না রাত। বেশ লাগছিল। চলেছি তো চলেছিই। পথ আর ফুরোয় না। রাধানগরের কোনও চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। আমাদের পথপ্রদর্শকরা কেবলই আশ্বাস দিচ্ছেন—আর একটুখানি! ভাগ্যে পথের মাঝে মাঝে তাঁরা আমাদের বিশ্রামের আয়োজন করেছিলেন। ডাব, সরবৎ, ঠাণ্ডা জল, বাতাসা, মুড়কিও ছিল। অবশেষে রাধানগরে এসে পৌঁছলুম। তখন ভোর হয়ে এসেছে। গাছে গাছে পাখী ডাকছে। আমরা সবাই শ্রান্ত ক্লান্ত। কিন্তু দাদা ঠিক আছেন। হিমালয় ঘুরে আসা পরিব্রাজকের পা কি ক্লান্তি জানে! শুনলুম আমরা নাকি প্রায় কুড়ি মাইল পথ হেঁটে এসেছি! দূরত্বটা ঠিক মনে নেই।

দাদা সাহিত্যের কোনও বৈঠকই বাদ দিতেন না। যেখানেই দিবাবসানে সাহিত্যিকেরা সমবেত হয়ে আড্ডা জমাতেন দাদা সেখানে ঠিক হাজির হতেন। সেই সৌম্য মূর্তি শ্যাম জলধর। চোখে মোটা কালো চশমা। মুখে চুরুট। হাতে লাঠি। পরিধানে খদ্দরের ধুতি-চাদর ও পাঞ্জাবি। আমরা অবাক হয়ে ভাবতুম এ বয়সে তিনি কি করে পারেন এত ঘুরতে? কোথায় সেই পার্শী-বাগানে গিরীন্দ্রশেখর ও রাজশেখর বসুর বাড়ী; কোথায় সেই মাণিকতলায় পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনে মজলিস; কোথায় প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মানসী-মর্মবাণী অফিস; কোথায় বিডন স্ট্রীটে চারুচন্দ্র মিত্রের বাড়ী। দাদা সর্বত্রই একবার করে ঘুরে আসতেন। তিনি শালকিয়া গোবর্ধন সাহিত্য ও সঙ্গীত সমাজের সভাপতি ছিলেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি ছিলেন। সুতরাং এ দুই প্রতিষ্ঠানেও তাঁকে মাঝে মাঝে যেতে হত। এ ছাড়া তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত 'রবিবাসর' বলে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান আছে। এর সভ্য সংখ্যা পঞ্চাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রবিবাসরের প্রত্যেক অধিবেশন বসে সদস্যদের বাড়ী বাড়ী পালাক্রমে ঘুরে। দাদা ছিলেন এর স্থায়ী সভাপতি ও সর্বাধ্যক্ষ। রবিবাসরের কোনও অধিবেশনেই তিনি অনুপস্থিত থাকতেন না। এ ছাড়া তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে তাঁর দেশ কুমারখালিতেও ঘুরে আসতেন। সেখানে নদীর ধারে তিনি পাকা বাড়ী করেছিলেন।

কোনো সভার অধিবেশনেই তিনি বড় একটা মুখ খুলতেন না। তবে, যেখানে তিনি সভাপতি বা প্রধান অতিথি অথবা মুখ্য বক্তারূপে বৃত হতেন সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি দীর্ঘক্ষণ মর্মস্পর্শী ভাষণ দিতেন। বে-সরকারী মজলিশেও তাঁকে সহজে কারুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে দেখা যেত না। এর কারণ তিনি কানে শুনতে পেতেন কম। স্বাভাবিক কণ্ঠে কথাবার্তা তাঁর কানে পৌঁছত না। তবে কেউ যদি বেশ চেঁচিয়ে কিছু বলতেন তিনি শুনতে পেতেন এবং জবাবও দিতেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই একটু উচ্চগ্রামে থাকায় আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি বেশ আরাম পেতেন। আমরা যখন লিলুয়ার বাগান 'দেবালয়ে' থাকতুম, প্রতি শনিবার অপরাহ্ণে দাদা সেখানে আসতেন। পরে যখন বালিগঞ্জে হিন্দুস্থান পার্কে বাড়ী করে চলে আসি, দাদা আমাদের কাছে রোজই বিকেলে আসতেন।

দাদার কানের জোর কমলেও চোখের জ্যোতি অটুট ছিল। বয়স হবে তখন প্রায় ৭০ বছর। আসতেন উত্তর কলিকাতা থেকে হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে কোনো লোকাল ট্রেণ ধরে লিলুয়া স্টেশনে এসে নামতেন। আমাদের 'দেবালয়' ছিল অবশ্য একেবারে লিলুয়া স্টেশনের পাশেই। সুতরাং, তাঁকে আর বেশি দূর হাঁটতে হতনা। তিনি আমাকে যত ভালবাসতেন তার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসতেন আমার পত্নী রাধারাণী দেবীকে। তিনি বলতেন 'রাধা' আমার বড় মেয়ে। এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। তনয়ার তুল্যই স্নেহ করতেন তাঁকে। আমার বিবাহের সময় একাধারে তিনি হয়েছিলেন বরকর্তা ও কন্যাকর্তার। আমাকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করে বেড়িয়েছিলেন। বিবাহে কন্যাকে দেয় যৌতুক তিনি আশাতীত ভাবে দিয়েছিলেন এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন নিয়মিত জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব, 'পূজোর তত্ত্ব', তাঁর নিজের একাধিক কন্যা জামাতা থাকা সত্ত্বেও, আমাদের সমানে করে গিয়েছেন।

আমার পত্নী তাঁকে জ্যাঠামশাই বলতেন এবং পিতার অগ্রজের মতই শ্রদ্ধাভক্তি ও আন্তরিক ভালবাসতেন। জ্যাঠামশাই একদিন না এলে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। অসুখের খবর পেলে ছুটে যেতেন দেখতে। রাধার অসুখ শুনলে দাদাও অস্থির হয়ে দৌড়ে আসতেন। এই সময় একবার গল্প করেছিলেন যে, তিনি যখন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন সেই সময় তিনি এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পেরেছিলেন। যে কোনও রোগীর মাথায় হাত রেখে তিনি যদি অন্তরের সঙ্গে তার আরোগ্য কামনা করতেন,

রোগী সেরে উঠতো। আজ কিন্তু সে শক্তি তিনি হারিয়েছেন।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কাছে পাত্রের পণের দাবির তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি তাঁর সহানুভূতির সীমা ছিল না। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁর সহকর্মী ছিলেন। ভারতবর্ষের সম্পাদনায় তাঁর সহকারীরূপে কাজ করেছিলেন কিছুদিন। ইনি কিছুতেই তাঁর কন্যার জন্য একটি সৎ পাত্র সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। কারণ, কন্যাটি ছিল তাঁর শ্যামাঙ্গী। মায়ের অনুগ্রহে মুখে কিছু কিছু মারি-গুটির দাগ ছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অর্থ-সামর্থ্যও তেমন ছিল না। জলধরদা বন্ধুর এই বিপন্ন অবস্থা দেখে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে সেই কন্যার বিবাহ দিয়ে পুত্রবধূরূপে মেয়েটিকে বহু সমাদরে গৃহে নিয়ে এলেন। এরূপ উদারতা ও বন্ধুপ্রীতি ক'জন মানুষের থাকে জানিনা; যাঁদের আছে তাঁরা মহা-মানব নিঃসন্দেহ।

মানুষের আপদ-বিপদে এসে দাঁড়ানো, সাধ্যমত তাকে সবরকম সাহায্য করা তাঁর যেন স্বভাবগত চরিত্র ছিল। এমন খাঁটি মানুষ খুবই কম দেখা যায়। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের বাড়ী সামাজিক কাজকর্মে আমরা তাঁকে বহুবার কোমর বেঁধে খাটতে দেখেছি। মৃতের শেষকৃত্যেও তাঁকে নগ্নপদে শবযাত্রার অনুগমন করতে দেখেছি। তিনি ছিলেন প্রকৃতই একজন শ্মশানবন্ধু। এত বড় মহৎ প্রাণ আজকের দিনে দুর্লভ।

ইংরেজ সরকার যখন তাঁকে 'রায়-বাহাদুর' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেন, তখন তাঁর অনুরাগী সাহিত্যিক বন্ধুরা মিলিতভাবে তাঁর একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। দাদা কিন্তু এই সম্বর্ধনার উত্তরে বলেন, দেশশুদ্ধ আমার ভায়েরা আমাকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে যে 'দাদা' উপাধি দিয়েছে, এ তুচ্ছ রাজ-সম্মান আমার কাছে তার চেয়ে বড় নয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একটু অলস প্রকৃতির মানুষ। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সব সময় ঠিক মতন সচেতন থাকতেন না। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের পরবর্তী স্তবক কিছুতেই আর সময়ে লিখে উঠতে পারতেন না। একাধিক পত্র লিখে পর-বর্তী স্তবক পাঠাবার তাগিদ দিয়েও কোনও ফল হত না। শরৎচন্দ্র নিরুত্তর। এ জন্য সম্পাদকের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ছুটতেন দাদা এক রবিবার সকালে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাসায়। উপন্যাসের পরবর্তী স্তবক না পেলে তিনি উঠবেন না বলে আসন নিতেন শরৎচন্দ্রের লেখার ঘরে।

বৃদ্ধ জলধরদাকে হাঁপাতে হাঁপাতে অতদূর আসতে দেখে শরৎচন্দ্র বিব্রত হয়ে পড়তেন। অতিথি পরিচর্যার আয়োজন করে আনতেন। কিন্তু, দাদার এক কথা। যতক্ষণ না লেখা পাচ্ছি [illegible] এখানে জলগ্রহণ করব না। আমি অন-শনেই থাকবো। অগত্যা শরৎচন্দ্রকে তাঁর দপ্তর খুলে লেখার সরঞ্জাম নিয়ে বসতে হ'ত এবং ভারতবর্ষ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার জন্য তাঁর ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনার কিয়দংশ লিখে দিতেই হ'ত। এমনি করে দাদার তাগাদাতেই শরৎচন্দ্রের বহু রচনা উপসংহারে এসে পৌঁছতে পেরেছিল; নইলে 'জাগরণী', 'আগামী কাল' প্রভৃতি রচনার মত অসমাপ্তই থেকে যেত।

যদিও জলধরদাদার রচনা কোনদিনই শরৎচন্দ্রের লেখার স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি, তবু শরৎচন্দ্র এই সদাশয় মানুষটিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর রসগ্রাহীতাবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করতেন। বলতেন, ভাল লেখা, মন্দ লেখা চেনবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। নইলে, কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় আসা রাশিকৃত গল্পের মধ্য হ'তে উনি সুরেনের (সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) নামে লেখা আমার 'মন্দির' গল্পটিকে প্রথম পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে বেছে নিতে পারতেন না।

আমি প্রায় প্রতি রবিবারেই শরৎদার বাজে গিয়ে সারা সকালটা কাটিয়ে আসতুম। তাঁর বিচিত্র জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কত গল্পই না শুনতুম অবাক হয়ে। একদিন আমি যাবার পরই দাদাও এসে হাজির। শরৎদা সম্ভবতঃ দাদাকে সেদিন শূন্য হাতে ফেরাবার জন্য এক গল্প ফেঁদে বসলেন, আপনি কি এ খবর জানেন দাদা, বড় বৌ (শরৎদার স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী) আপনার লেখার ভীষণ ভক্ত! কাল দুপুরে ইজিচেয়ারে শুয়ে একটু আরাম করছি, হঠাৎ বড় বৌ আমার কাছে ছুটে এল একেবারে এই বৈঠক-খানায়, যেখানে সে ভুলেও ঢোকে না। চেয়ে দেখি, বড়বৌয়ের দুই চোখ একে-বারে জলে ভরা। হাতে রয়েছে দেখি আপনার লেখা 'অভাগী' বইখানা। তর্জন করে আমায় কি বললে জানেন? কী তুমি ছাই ভস্ম সব লেখ? পড়ে সুখ পাই না। এমনিতর একখানা বই লিখতে পারো না— যা' পড়লে চখের জল রাখা যায় না?

দাদা কিন্তু ভোলবার পাত্র নয়। ও প্রসঙ্গেই গেলেন না তিনি। সম্ভবত শরৎদার অর্ধেক কথাই তাঁর দুর্বল শ্রবণে পৌঁছয়নি। তিনি শুধু বললেন—আসছে মাসের লেখা কই শরৎ?

দাদার এই শ্রবণশক্তির স্বল্পতা ভারতবর্ষ সম্পাদনার কাজে কিন্তু খুব সহায়ক হয়ে উঠেছিল। ব্যর্থ মনোরথ লেখকদের অনেক অপ্রিয় ভাষণ তাঁর কর্ণ-কুহরে প্রবেশই করতো না। অনুরোধ-উপরোধে পড়ে এই ভালমানুষ লোকটি হয়ত কোনও কোনও লেখা ছাপবেন বলে নিতেন। কিন্তু, রচনাটি পড়ে যখন দেখতেন একেবারেই ছাপার অযোগ্য, তখন সেটির সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চ-বাচ্য করতেন না। স্রেফ চেপে যেতেন। কিন্তু লেখক ছাড়বে কেন? রীতিমত তাগাদা শুরু করতো। দাদাও, এ মাসে হলনা, ও মাসে যাবে বলে মাস ছয়েক কাটিয়ে দিতেন। শেষে লেখকের তাগাদার অধ্যবসায় দেখে বিপন্ন হয়ে বলতেন, তাইত হে, লেখাটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রেস থেকে হারিয়ে ফেলেছে। তখন-কার দিনে নকল রেখে লেখা পাঠাবার রেওয়াজ ছিল না। তাই অনেক ক্ষেত্রে সম্পাদক মহাশয় এ কৌশলে রেহাই পেতেন। কিন্তু একবার দাদাকে ভারি জব্দ হ'তে হয়েছিল। এক উদীয়মান কবি মস্ত সুপারিশ ধরে চার পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ কবিতা দিয়ে যায়। দাদা যথা-রীতি তাঁর সে কৌশল প্রয়োগ করলেন, অবশ্য কিছুদিন টাল-বাহানার পর। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র। তরুণ কবি কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হ'য়ে 'ভারতবর্ষ'র চিঠির প্যাডখানা টেনে নিয়ে ফস্ ফস্ করে সেই চার পাতা কবিতাটি লিখে দিয়ে গেল এবং বলে গেল এবার আর হারায় না যেন।

দাদার একটি মস্ত গুণ ছিল। তিনি প্রত্যেকটি লেখা নিজে পড়তেন এবং নতুন লেখকের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা দেখলে, তাকে সর্বপ্রকার উৎসাহ দিয়ে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ দিতেন। এ কথা হয়ত আমার মতো অনেকেই স্বীকার করবেন।

একটা মজার ঘটনা বলি। দাদার 'প্রবাসচিত্র' ও 'হিমালয়' ভ্রমণকাহিনী-

জুটির বহু সংস্করণ শেষ হ'য়ে যাবার পর হঠাৎ দেখা গেল বসুমতী পত্রিকায় রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় দাবী করেছেন যে, ও বই দুখানি জলধর সেনের নামে প্রকাশিত হ'লেও আসলে ও বই আমারই লেখা। আমি জলধর সেনের দিনপঞ্জীতে আঁচড়ানো হিমালয় ভ্রমণের যৎসামান্য 'নোট' থেকে এই বই দুখানি আগাগোড়াই লিখে দিয়েছি। আমরা তো স্তম্ভিত! ভাগ্যে দাদা তখনও জীবিত। জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার বন্ধু এসব কি লিখেছে? আপনার ভ্রমণ কাহিনীর সমস্ত গৌরব যে তিনিই দাবী করেছেন? দাদার মুখে মৃদু হাসি। বললেন, দীনেন্দ্র তো অনেক ঘুরেছে, কই এতদিনে 'বরোদা ভ্রমণ' একখানা লিখলে না কেন? ওঁরও দুখানা নিজের লেখা পল্লীচিত্র প্রভৃতি বই আছে, সেই লেখার সঙ্গে আমার লেখা মিলিয়ে দেখলেই তো বোঝা যাবে।

বললুম, আপনি প্রতিবাদ করুন। দাদা বললেন, করতে হয় তোমরা করো, আমি ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে নেই! অগত্যা 'বসুমতী' পত্রিকায় উভয়ের লেখা পাশাপাশি তুলে দিয়ে যখন প্রকাশ করে দিলাম, দীনেন্দ্রবাবুর দাবীর মূলে কোনও সত্য নেই, তখন ভদ্রলোক আমাকে কিছু কটূক্তি করে নিরস্ত হলেন।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা সম্পাদনায় দাদার একজন সহকারী ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি একেবারেই কিছু শুনতে পেতেন না। দেখা হলেই খাতা-পেন্সিল এগিয়ে দিতেন। বক্তব্য লিখে দিলে তিনি জবাব দিতেন। কিন্তু, দাদাকে নিয়ে মুস্কিল হ'ত এই যে, কখনো ভুলেও স্বীকার করতেন না যে তিনি কানে কম শোনেন। অথচ লোককে বলতেন আমার এই সহ-সম্পাদকটি একেবারে দুঃসহ! বীরেন ভায়া কারুর কথাই কানে তোলেন না। যাকে বলে 'বদ্ধ কালা!' আমাদের ভারি মজা লাগতো এঁদের পরস্পরের আলাপ শুনতে। বীরেন্দ্রনাথ বলতেন, জলধরদা আমার কোনও কথাই কানে তোলেন না! তবু, তাঁরা মিলেমিশে বেশ কাজ করতেন। কারণ দুজনেই তাঁরা আশ্চর্যরকম ভাল লোক ছিলেন।

দাদার সঙ্গে একবার ভারতের পুরাকীর্তি 'অজন্তা' এবং 'ইলোরা' গুহা-মন্দির দেখতে যাই। ফিরে এসে দাদা বললেন, তুমি কবি, যা দেখে এলে লিখে দাও। আমি ভারতবর্ষে ছাপবো। সেই আমার প্রথম ভ্রমণ কাহিনী লেখার হাতে-খড়ি। সমস্ত মাল-মশলা দাদাই সংগ্রহ করে এনে দিলেন। ভারত সরকারের 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার', গ্রিফিথ্‌স সাহেবের 'প্রত্নতত্ত্ব বিবরণ', ইংরাজীতে লেখা 'ভারতের প্রাচীন গুহা-মন্দির' এবং 'অজন্তা' ও 'ইলোরা' সম্বন্ধে একাধিক সচিত্র গ্রন্থ। রচনাটি ভারতবর্ষে প্রকাশের পর দাদা তাঁর 'মধ্যভারত' ভ্রমণ গ্রন্থে সেটি পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন। বলেছিলেন, বেশ ভাল লেখা হয়েছে।

জীবনে বহু লোককে দেখেছি এবং বহু লোকের সংস্পর্শেও এসেছি। কিন্তু এমন করে আর কারুরই প্রশস্তি রচনা করতে পারবো না—

হে পরিব্রাজক ঋষি
অহিংস অক্রোধ তপোধন!
সংসারে করেছো তুমি
পরহিতে জীবন অর্পণ।
ওগো মহাপ্রাণ!
সেবা ভক্তি প্রেমে তব
মিলিয়াছে মুক্তির সন্ধান।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

রঙের খেলা

পৃথিবীতে রঙ না থাকলে আমাদের খাওয়া-থাকা ইত্যাদি ব্যাপারে খুব যে একটা অসুবিধে হত তা নয়, কিন্তু আমাদের জীবনটা যে অনেকখানি ফ্যাকাশে হয়ে যেত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে পরার ব্যাপারে। রঙের সঙ্গে রঙের কতখানি মিল থাকবে আর কতখানি অমিল তা নিয়ে অন্তত মেয়েদের সাজপোশাকের বেলায় চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন ধরুন, রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যন্ত পরিচিত ও পুরনো গানের কয়েকটি লাইন : দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘিরি মেঘ-নীল বেশ, কাজল নয়নে, যূথি-মালা গলে, ইত্যাদি। ঘন কালো চুল, মেঘের মতো নীল শাড়ি, কাজল-কালো চোখ আর জুঁইফুলের মালা। লক্ষ্য করে দেখুন, এখানেও রঙের সঙ্গে রঙের সেই মিল বা অমিল। কিংবা ধরুন শেষের কবিতায় প্রথম সাক্ষাৎকারে লাবণ্যের বর্ণনা : মেয়েটির পরনে সরু পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে শাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। এখানেও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, লাবণ্যকে হাজির করা হচ্ছে একটি বিশেষ রঙের মোড়কে। তার শেষের কবিতার পাঠক নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, লাবণ্যর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে এই সাদা রঙের শুভ্রতাটুকুর প্রয়োজন ছিল।

আসলে আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও জীবনযাপনের পদ্ধতির সঙ্গে এক-একটি রঙ এক-একটি বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে আছে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে, কালো-সাদার চেয়ে রঙীন বিজ্ঞাপনে অনেক বেশি ফললাভ করা যেতে পারে। অন্যদিকে, সাদা কাগজের উপরে কালো হরফে ছাপা পোস্টারের দিকে সবচেয়ে কম লোকের নজর আকৃষ্ট হয়। আবার পাঠ্য পুস্তকের বেলায় কিন্তু আমরা এই সাদা কাগজ আর কালো হরফই পছন্দ করি।

কোনো কোনো রঙ তো আমাদের কাছে প্রায় প্রতীকের মতো হয়ে উঠেছে। যেমন, গেরুয়া। এটি আমাদের কাছে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক। যেমন, কালো। এটি ইউরোপীয়দের কাছে শোকের প্রতীক, সাম্প্রতিক কালে আমাদের কাছেও। আবার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ রঙের একেবারেই প্রবেশ নিষিদ্ধ। যেমন বিয়ের চিঠি কখনো সাদা কাগজে ছাপানো হয় না, শ্রাদ্ধের চিঠি কখনো রঙীন কাগজে নয়।

এমনি ভাবে ভাবতে বসলে আমাদের গোটা জীবনটাই একটা বর্ণ-সমাবেশ বলে মনে হতে পারে। যেমন দূরের কোনো নক্ষত্রের চরিত্র বিচার করতে হলে স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তার বর্ণালীকে চোখের সামনে মেলে ধরতে হয়, তেমনি আমাদের জীবনটাকেও মনে করা যেতে পারে কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সংশ্লেষিত হয়ে আসা একটি বর্ণসমাবেশ মাত্র।

আর রঙ নিয়ে মানুষের এই মাতামাতিকে খুবই স্বাভাবিক মনে হবে যদি আমরা মনে রাখি যে রঙের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষমতা স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই আছে। অবশ্য কোনো কোনো মাছ, পোকামাকড় ও পাখিও রঙ চিনতে পারে, কিন্তু বিবর্তনের উচ্চতর ধাপে একমাত্র মানুষের মধ্যেই এই ক্ষমতা থেকে গিয়েছে। মানুষের ভাষা যেমন একান্তভাবেই মানবিক তেমনি সীমাবদ্ধ অর্থে রঙের অভিজ্ঞতাও তাই।

অথচ, আগেই বলেছি, জীবনধারণের প্রয়োজনে রঙের কোনো প্রয়োজন নেই। খাদ্য বা আশ্রয়ের জন্যে রঙ চেনার ক্ষমতার ওপরে নির্ভর করতে হয় না।

মানুষের এই যে রঙ চেনার ক্ষমতা তা কিন্তু মানুষের কোনো একটি পৃথক ইন্দ্রিয় নয়। এটি তার দৃষ্টিশক্তিরই বিশেষ এক সূক্ষ্মতর রূপ। অর্থাৎ মানুষের রঙ চেনার ক্ষমতা হচ্ছে এমন একটি অনুভূতি যা তার চক্ষুইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ। এবং প্রয়োজনীয় অনুভূতি না হোক, খুবই প্রিয় অনুভূতি। শিল্প-সমালোচক জন রাস্কিন বলেছেন যে, রঙ হচ্ছে মানুষের কাছে "দৃশ্য জগতের সবচেয়ে মহৎ উপকরণ।"

স্বাভাবিক রঙ ও কৃত্রিম রঙ

প্রাচীনকালে কৃত্রিম রঙ তৈরির কোনো প্রক্রিয়াই মানুষের জানা ছিল না। কিন্তু তখনো নানা ধরনের রঙের ব্যবহার ছিল। সে-সময়ের অধিকাংশ রঙ তৈরি হত গাছগাছড়ার শেকড় থেঁতলিয়ে বা খনিজ পাথর গুঁড়ো করে। জান্তব পদার্থ থেকেও নানা ধরনের রঙ বার করা হত। যেমন, শামুকের খোলা গুঁড়ো করে তৈরি হত এক ধরনের বেগুনে রঙ।

প্রাচীন মিশরীয়রা ম্যালাকাইট ব্যবহার করত চোখে লাগাবার সুর্মা হিসেবে। এই ম্যালাকাইটের রঙ সবুজ। রসায়নের ভাষায় কার্বনেট অব কপার। আকরিক বা খনিজ তামা।

এবং, যে-কথা আগেই বলেছি, রঙের ব্যবহার চলতে চলতে এক-একটি রঙ হয়ে উঠেছে এক-একটি প্রতীক। লাল রাজশক্তির, সবুজ তারুণ্যের, গৈরিক বৈরাগ্যের, ইত্যাদি। এমন কি হাল আমলেও ট্র্যাফিক সিগন্যালের লাল আলো মধ্যযুগীয় রাজাদের মতোই ধমক দিতে চায় আর সবুজ আলো এক উচ্ছ্বসিত তারুণ্যকে বেগবান করে তোলে।

স্বাভাবিক রঙের যুগ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে তৈরি রঙ স্বাভাবিক রঙের চেয়েও অনেক বেশি জ্বলজ্বলে হয়। আর, হেন রঙ নেই যা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হয় না। আজকাল চামড়ার জুতো যে-কোনো রঙের হতে পারে। এমন কি হরেক রঙের টেলিফোনের ব্যবহার পর্যন্ত চালু হয়েছে। আর অনবরত চেষ্টা চলেছে আর কী কী চটকদার রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। বড় বড় রঙের কোম্পানিতে একদল বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হয়েছেন শুধু ঘরের আসবাবের রঙ সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্যে।

রঙের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

রঙ সম্পর্কে মানুষের এই চিরকালের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও রঙকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে জানার চেষ্টা কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু নিউটন থেকে এবং এই নিউটনই ১৬৬৬ সালে রঙের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

আজকাল স্কুলের ছেলেরাও এই তত্ত্বটি জানে। যে এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে নিউটন এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন তাও সকলের জানা। জানলার পর্দায় ছোট একটি ফুটো করে সূর্যের রশ্মিকে ঘরের ভেতরে আনা হয়েছিল। তারপরে একটি প্রিজম্ বা ত্রিশিরা কাঁচের ভেতর দিয়ে সেই রশ্মিকে চালিত করা হয়েছিল। দেখা গেল, ত্রিশিরা কাঁচের ভেতর দিয়ে চালিত হবার ফলে সূর্যের রশ্মি বেঁকে যাচ্ছে ও সাতরঙে ভেঙে পড়ছে। আকাশের রামধনুতে যে সাতটি রঙ দেখা যায় এখানেও সেই সাতটি রঙ। আবার এই সাতরঙা আলোকে অপর একটি ত্রিশিরা কাঁচের মধ্যে দিয়ে চালিত

করার ফলে দেখা গেল যে সাতটি রঙ মিলে গিয়ে আবার সেই গোড়ার সাদা আলো বেরিয়ে আসছে।

রঙের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভব এই গবেষণা থেকেই। সংক্ষেপে বলা চলে, সূর্যের সাদা আলোর মধ্যেই সবকটি রঙ রয়েছে। সূর্যের সাদা আলোকে এমনভাবে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব যাতে এই রঙগুলো আলাদা আলাদা ভাবে বেরিয়ে আসে।

ম্যাক্সওয়েল ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা পরবর্তী কালে এই নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। ফলে এ-বিষয়ে আরো প্রচুর তথ্য জানা গিয়েছে। সূর্যের সাদা আলোর মধ্যে সাত রঙের সাতটি আলো রয়েছে—শুধু এই বললেই এখন আর সব কথা বলা হয়ে যায় না। আসলে বিজ্ঞানীরা সূর্যের আলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এখন আর রঙের ওপরে তেমন জোর দিচ্ছেন না। সাধারণভাবে বলা চলে, সূর্যের আলোর মধ্যে রয়েছে নানান মাপের ঢেউয়ের আলো। খুব বড়ো মাপের থেকে খুব ছোট মাপের কিন্তু এর সমস্তটাই আমরা চোখে দেখতে পাই না। আমরা দেখি শুধু সেইকটি বিশেষ মাপের ঢেউকে যাদের রঙ আছে। অর্থাৎ বেগুনী থেকে লাল পর্যন্ত। বেগুনী পেরিয়ে যে-সমস্ত আলোকে আমরা দেখতে পাই না তাকে বলে আলট্রা-ভায়োলেট রে বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বেগুনী-পারের আলো। আর লাল উজিয়ে যে-সমস্ত আলোকে আমরা দেখতে পাই না তার নাম ইনফ্রা-রেড রে বা লাল-উজানী আলো। অবশ্য সূর্যের আলোর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির বেশির ভাগটাই পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে ওজোন-গ্যাসের একটি পর্দা আছে; এই পর্দায় আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

যাই হোক, আমরা রঙের আলোচনায় ফিরে আসি। এবার তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সূর্যের আলোই যদি সমস্ত রঙের উৎস হয়ে থাকে তাহলে কেন আমরা আপেলের রঙ লাল দেখি? কেন কাঁচা আমের রঙ সবুজ? পাকা চুলের রঙ সাদা? ইত্যাদি।

জবাব খুবই সহজ। আপেলের খোসা সূর্যের আলোর অন্য সমস্ত রঙকেই শুষে নেয়, শুধু লাল রঙটিকে ও সামান্য পরিমাণে হলদে রঙটিকে ফেরত পাঠায়। অর্থাৎ আপেলের খোসা থেকে এই রঙদুটি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। আপেলের হলদে মেশানো লাল রঙ এই কারণেই। কাঁচা আমের রঙ বা পাকা চাম্পার রঙ সম্পর্কেও এই একই ধরনের ব্যাখ্যা।

আকাশ নীল কেন?

কিন্তু আকাশের রঙ কেন নীল? সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের আকাশে কেন এত রঙের সমারোহ?

মনে করা যাক সমুদ্রের মাঝখান থেকে একটি আলোকস্তম্ভ উঠেছে আর সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে সেই স্তম্ভের গায়ে। দেখা যাবে, খুব বড় মাপের ঢেউ স্তম্ভটির গায়ে আছড়ে পড়ার পরে দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়, তারপরে স্তম্ভটি পার হয়ে যাবার পরে আবার জোড়া লাগে। কিন্তু ছোট মাপের ঢেউ স্তম্ভটি পার হতে পারে না। ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় আর ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ে। তেমনি সূর্যের আলো যখন বায়ুমণ্ডলের ওপরে আছড়ে পড়ে তখনো ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে। সূর্যের আলোর বড় মাপের ঢেউগুলো অনায়াসেই বায়ুমণ্ডলের বাধাকে পেরিয়ে যায় কিন্তু ছোট মাপের ঢেউগুলো ভেঙে-গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ে। এই বড় মাপের ঢেউগুলোর রঙ হচ্ছে লাল আর ছোট মাপের ঢেউগুলোর রঙ নীল। অর্থাৎ সূর্যের আলোর এই নীল রঙটাই ভেঙে-গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে-ছিটকিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত এই রঙটি যখন পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছয় তখন আমাদের মনে হতে থাকে সারা আকাশ থেকে নীল রঙ ঝরে পড়ছে। অর্থাৎ আকাশকে আমরা নীল দেখি।

তার মানে, বায়ুমণ্ডলের বাধা যত বেশি হবে ততই এই ভাঙচুরের ব্যাপারটা বেশি-বেশি পরিমাণে ঘটবে। সূর্য হয়ে উঠবে তত বেশি লাল। সকালে ও বিকেলে সূর্যের আলো তির্যকভাবে আসে বলে বায়ুমণ্ডলের বাধা বেশি। এই কারণে এই দুটি সময়ে এত রঙের সমারোহ। আর এই কারণেই গাগারিন বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে আকাশকে দেখেছেন কুচকুচে কালো। আর সূর্যকেও অন্য রকম দেখেছেন। পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে সূর্যের যে রূপ আমরা দেখি সেটি তার আসল রূপ নয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের আলো থেকে নীল রঙের বেশির ভাগটাই ছেঁকে বার করে নেয়। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, কাজেই চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে মানুষ কোনো সময়েই আকাশকে নীল বা সূর্যকে লাল দেখবে না।

রঙীন ছবি

ডঃ এডউইন এইচ. ল্যাণ্ড রঙীন ছবি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন এবং তাঁর গবেষণা থেকেই আশ্চর্য সমস্ত তথ্য জানা গিয়েছিল।

ডঃ ল্যাণ্ড একই দৃশ্যের দুটি ফটো তুলেছিলেন সাধারণ সাদা-কালো ফিল্ম্-এর ওপরে। প্রথম বার লাল ফিলটার ব্যবহার করে, দ্বিতীয়বার সবুজ ফিলটার ব্যবহার করে। প্রথম ছবিটি তিনি পর্দায় ফেললেন আবার একটি লাল ফিলটারের ভেতর দিয়ে এবং একই সঙ্গে দ্বিতীয় ছবিটিও কোনো ফিলটার ব্যবহার না করেই সেই একই পর্দার ওপরে ফেললেন। দেখা গেল, পর্দার ওপরে মূল দৃশ্যটি তার সমস্ত রঙ সমেত ফুটে উঠেছে।

এর ব্যাখ্যা কী? এতগুলো রঙ কোত্থেকে আসছে? মাত্র লাল ও সবুজ ফিলটার ব্যবহার করা হয়েছিল—কিন্তু ছবিতে নীল ও হলদে কেন এসেছে?

সাধারণ বুদ্ধি থেকে মনে হতে পারে, দ্রষ্টার চোখ এই এই রঙগুলো তৈরি করে নিয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে, সত্যিকারের রঙ না থাকলেও মানুষের চোখ অনেক সময়ে রঙ দেখতে পায়।

জবাবে অনেক কথা বলার আছে। কাজেই রঙীন ছবির আলোচনা পরবর্তী কোনো এক সংখ্যার জন্য মুলতুবী থাক।

মনঃসমীক্ষণবিদ ও রঙ

মনঃসমীক্ষণবিদরা কিন্তু বলেন যে, মানুষ রঙ দেখে চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে। যেমন, আপনি যদি চোখ বুজে থাকেন, তারপর দু-আঙুল দিয়ে চোখের পাতা টিপে ধরেন, তাহলে কয়েক সেকেণ্ড পরেই মনে হবে আপনি যেন চোখের সামনে কতকগুলো রঙ দেখতে পাচ্ছেন। বিপদে পড়লে চোখের সামনে সর্ষেফুলও নাকি দেখা যায়। এমনি ধরনের দৃষ্টান্ত আরো কিছু কিছু দেওয়া যেতে পারে। কোনো কোনো মনঃসমীক্ষণবিদ মনের সঙ্গে রঙের সম্পর্কের ওপরে এতই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তাঁদের ধারণা, কোন্ মানুষ কোন্ রঙকে পছন্দ করে তা থেকে তার চরিত্র সম্পর্কেও ধারণা হতে পারে। যেমন, সবুজ রঙ পছন্দ করলে বুঝতে হবে মানুষটি সুখী ও আয়াসী—অর্থাৎ উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের। এমনি ধরনের সিদ্ধান্ত।

মনঃসমীক্ষণবিদদের এ-সমস্ত মতামত কিছুকাল আগেও অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হত। কিন্তু ইতিমধ্যে রুশ বিজ্ঞানী পাভলভ কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স সম্পর্কে যুগান্তকারী গবেষণা করেছেন। ফলে মানুষের মনের ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ কতকগুলো দিক সম্পর্কে নতুন আলোকপাত হয়েছে। এ-বিষয়েও এত কিছু বলার আছে যে এ-আলোচনাও পরবর্তী কোনো সংখ্যার জন্যে তোলা রইল।

তবে আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি, আমি চোখ দিয়েই রঙ দেখি বা মন দিয়েই দেখি, আমার কিছু আসে যায় না। আমার কাছে দেখাটাই আসল। পৃথিবীতে এত রঙ আর আমি বেঁচে আছি—এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে।

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু..."

"যৌবনবেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি"

মহাকাশ বিজয়ের এক পর্যায়
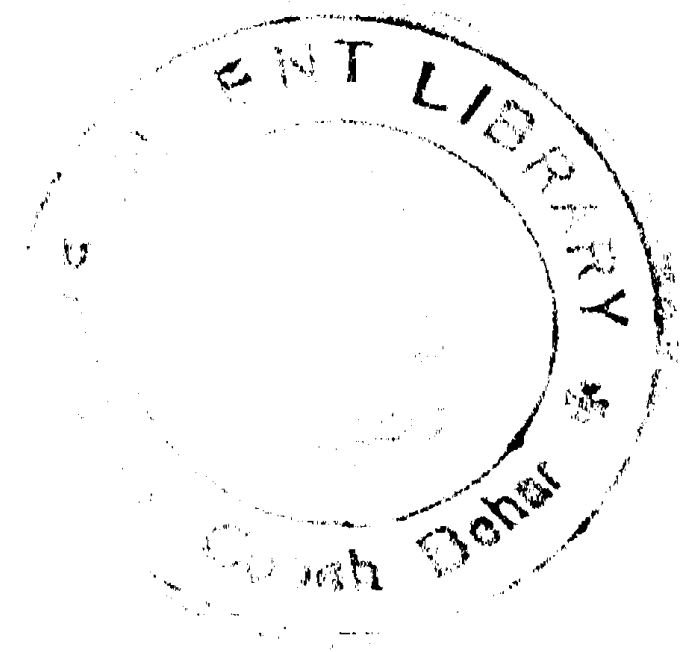
১১০০

প্রথম বারুদে ভরে হাউই ছাড়া হয় চীনে। আজকের রকেটের এই অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের খবর ইউরোপে এসে পৌঁছল ১৩০০ থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

১৭৮৩

গরম হাওয়া ভর্তি প্রথম বেলুন তৈরী হল। তার পর হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি বেলুন। ১৯০৩ সাল নাগাদ এরারশিপ তৈরী সম্ভব হয়।

১৮০৪

আজকের সমস্ত এরোপ্লেনের পূর্ব-পুরুষ হল সার জর্জ কেলীর মডেল গ্লাইডার, বিমান চালনার মূলে নীতিগুলি কেলীরই আবিষ্কার। সে হিসেবে তাঁকে আধুনিক এরোপ্লেনের আবিষ্কর্তা বলা চলে। মানুষ নিয়ে ওড়ার মত প্রথম গ্লাইডার তিনি তৈরী করেন ১৮৫৩ সালে। তখন তাঁর বয়স আশি।

১৯০৫
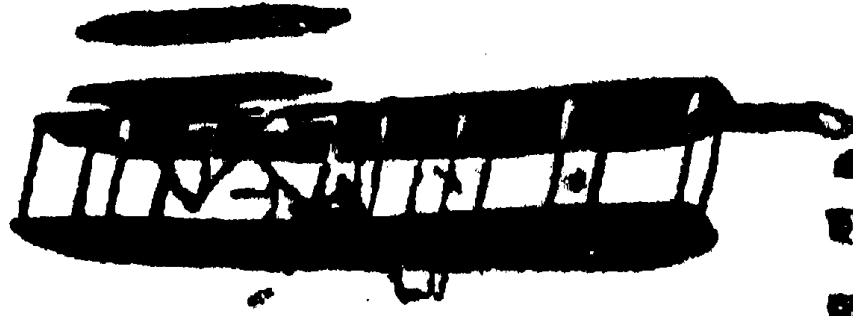
রাইট-ভাইদের ৩নং যন্ত্র। প্রথম এরোপ্লেন। এটি মোড় ফিরত, গোল হয়ে ঘুরত আর আধ ঘণ্টা ধরে উড়তে পারত। দু'বছর আগে রাইটরা প্রথম যন্ত্র-শক্তির সাহায্যে উড়তে সক্ষম হয়।

১৯০৯
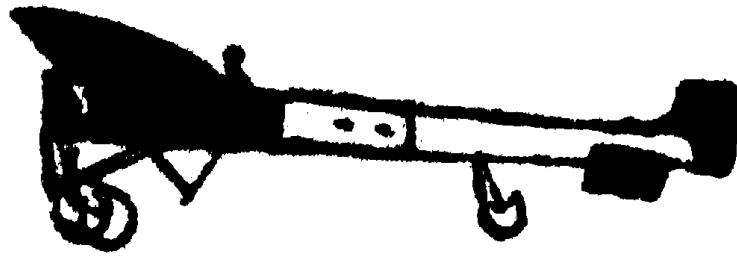
এই মনোপ্লেনটির সাহায্যে লুই ব্লেরিও চ্যানেল পার হন। এই বছরই এরোপ্লেন যন্ত্রটি পরিপূর্ণরূপে কার্য-করী হয়। শান্তি বা যুদ্ধের সময় সম্ভাব্য আত্মরক্ষার জন্যে কেবল নৌশক্তি আর যথেষ্ট বলে বিবেচিত হল না।

১৯২৬

আমেরিকার প্রফেসর আর এইচ গডার্ড প্রথম তরল ইন্ধন পরিচালিত রকেট ছাড়লেন। এর ফলে মহা-শূন্যে ভ্রমণ সম্ভব হয়। এই ধরণের বড় মাপের রকেটের ক্ষমতা যে কতদূর তা ১৯৪৪ সালে জার্মাণীর ভি-২ রকেট থেকে বোঝা গেল।

১৯৫৭

রাশিয়ার যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ স্পুটনিক ছাড়া হল পৃথিবীর চারদিকে ঘোরবার জন্যে এই প্রথম মানুষের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ। এই প্রথম মানুষের মহাশূন্য জয়; যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগবিদ্যায় নূতন যুগের সূচনা।

১৯৬১

ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে মানুষ নিয়ে এই প্রথম এক মহাশূন্য যান পৃথিবী প্রদক্ষিণ করল। গ্রহান্তর যাত্রার পথে রাশিয়ার যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

য়ুরি গাগারিন ১২ই এপ্রিল ২ই টন ওজনের মহাকাশযান "ভোস্টক"যোগে এই ঐতিহাসিক উড্ডয়ন সম্পন্ন করেন। মহা-কাশযানটির গতিপথ ছিল ১৫,০০০ মিটার (৪৯,২১০ ফুট) ঊর্ধ্বে।

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধ কুমার সান্যাল

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—আট—
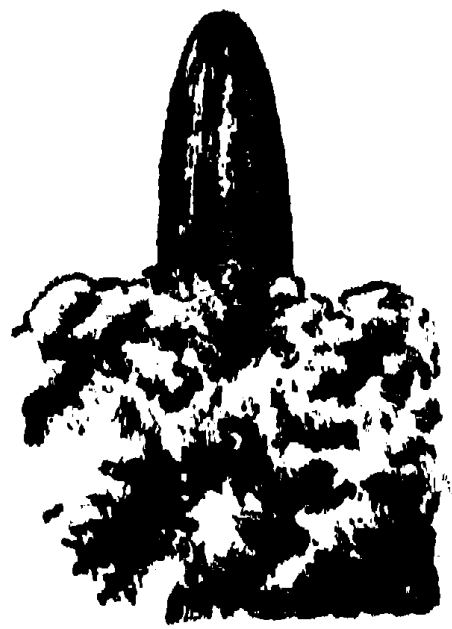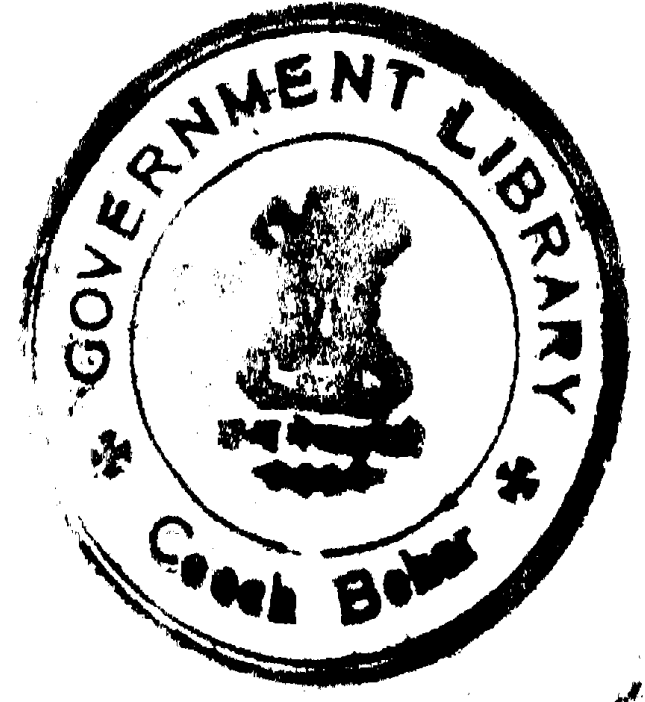
পাটনা এবং মাশিদি দুয়ের এত বড় একটা কাজ এত সহজে সিদ্ধ হবে, এটি জোর করে হেনারও কল্পনার অগোচরে ছিল। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীকে দেখে এসেছি গত কয়েক মাস ধরে। খাঁচার প্রতিটি ফাঁক ঠুকরেছে, ডানা ঝটাপটি করেছে, মাথা ঠুকেছে বেরোবার পথ না পেয়ে,—এবং দেখেছি তার রক্তক্ষরণ। এখন সে অর্জন করেছে তার অবারিত মুক্তি। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে সে এখন একান্তে শুয়ে থেকেছে। হেনা সারাদিন ধরে ঘুমিয়ে পড়ছে কখনো একা। তার জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যার প্রতিকার হয়ে গেছে।

আমার প্রাচীন অভ্যাস আমাকে ছাড়েনি। প্রায় সমস্তদিন আমার কাটল এই বাগানবাড়ির তদারকে। এর খাজনা-পত্র, মালীর মাইনে, ফুলের বাগান অব্যাহত রাখার খরচ, ইঁদারার সংস্কার, বাড়ীটি রং করা, ইলেকট্রিক লাইন মেরামত,—ইত্যাদি বিবিধ খুঁটিনাটি কর্তব্যের মধ্যে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল। বাইরের কোনও ব্যক্তি এলে আমাকেই বিলিব্যবস্থা করতে হয়, এইটিই চলে আসছে,—মালিকের পক্ষ বলতে তারা আজও আমাকেই চেনে। হেনা এখনও তাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু মাশিদিতে বসবাস করার জন্য আমরা আসিনি। কাজ শেষ করামাত্রই আমরা বিদায় নেবো, এই ব্যবস্থাটিই নির্দিষ্ট আছে। তা ছাড়া আমার দিক থেকে ঠিক এটি শোভন নয়, এবং সঙ্গতও নয়। আমার মনে প্রাচীন সংস্কারের সেই ভৌতিক উপদ্রব তেমনি ভাবেই কাজ করছে, নির্বিরোধের চেহারা পাল্টে দিয়েছে আমার রক্তের প্রবাহে,—তাকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নারীর সম্মান, মর্যাদা এবং নৈতিক শুচিতা রক্ষার অনেকখানি দায়িত্ব পুরুষের,—এটি আমি ভুলিনি, তা হেনা যতই আমার উপর তামাশা আর বিদ্রূপ করুক না কেন। আমি তার সমবয়সী হলেও এসব চিন্তাধারায় আমি তার চেয়ে অন্ততঃ দশ বছরের বড়। আমি ফিরে যাবার সুযোগ খুঁজছিলুম।

হেনা আধুনিক, বিপজ্জনকভাবেই আধুনিক। তার মনে সমাজরক্ষার দায় নেই। সে জানে মেয়ে মাত্রই পলাতকা। এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে পালাতে তার দ্বিধা নেই। সে মানিয়ে নেয়, এবং মিলিয়ে যায় যে কোনও ভিন্ন দেশের লোকযাত্রায়। পৃথিবীর বহু দেশের সমাজে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে শত শত বাঙালীর মেয়ে তলিয়ে গেছে কেউ খোঁজ রাখেনি। বহু দেশের মেয়ে আমাদের এখানে এসে মিলিয়ে রয়েছে পিছনের পায়ের চিহ্ন মুছে দিয়ে—কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু পুরুষ তার সমাজ রক্ষা করেছে চিরদিন,—প্রাচীন সংস্কারকে সে সহজে ভাঙাতে চায় না।

পৈতৃক সম্পত্তি ও নগদ টাকার পরিমাণের উপর বোধ করি সন্তানেরা নিশ্চিন্ত নিদ্রা নির্ভর করে। হেনার এই একান্ত ঘুম দেখে এক সময় বড়ই দুঃখিত হয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে বাধ্য হলুম। চেঁচিয়ে বললুম, তোমার বিরুদ্ধে একটা বিবাহ-মিলনের মামলা চলছে, সেটা স্মরণ আছে কি?

হেনা এবার ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঘুমের ঘোরেই সে হেসে বলল, বড্ড বাস্তববাগীশ তুমি, পার্থ।

শোনো, আজ রাত্রের প্যাসেঞ্জারে ফিরব, আমি আসছি একটু কাজ সেরে। এই বলে বেরিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হলুম।

এখন যাচ্ছ কোথায়? শোনো, কাছে এসেই না হয় দুটো কথা বললে!

না, আমার সময় কম। এখন আমি যাচ্ছি মন্দিরে—রাঙামা আর বুড়ো পিসির জন্যে প্রসাদ না নিয়ে গেলে মুখ দেখাতে পারব না—।

হেনা একটু বিমর্ষভাবেই বললে, তা হলে যাও! কেবলই বাইরের দিকে চোখ তোমার!

সকাল থেকে যে-গাড়িখানা মোতায়েন করেছি, সেখানা বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আমি বেরিয়ে গেলুম। কিন্তু বাগান ছাড়িয়ে গিয়ে পিছন ফিরে জানলা দিয়ে লক্ষ্য করলুম, হেনা আবার বিছানায় গড়াল। বিরক্ত হয়ে আমি গিয়ে গাড়িতে উঠলুম।

পথ মাত্র মাইল পাঁচেক। মন্দিরের গলির কাছাকাছি এসে গাড়ি রেখে কয়েক পা এগিয়ে বড় দরজাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। অপরাহ্নের আলো তখনও ছিল।

ভাগ্যের একটা মস্ত বড় বিদ্রূপ এই মন্দিরে আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল, সেটি স্বপ্নেও ভাবিনি। পায়ের চটি-জুতো এক কোণে রেখে এক সরা ফুল মিষ্টান্ন ইত্যাদি সংগ্রহ করে আমি সবেমাত্র কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় অদূরে লক্ষ্য করলুম কয়েকজন পাণ্ডাসহ দু'তিনটি ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে নরেন্দু চাপা গলায় কি যেন প্রলাপ আলোচনা করছে! ওদের দেখামাত্রই ভয় ও আড়ষ্টতায় পলকের জন্য একবার থমকিয়ে আমি ভিন্ন পথ ধরবার চেষ্টা পেলুম। নরেন্দুকে দেখে চমকে উঠেছিলুম।

কিন্তু [illegible] অত সহজে এড়িয়ে চলে যাবার উপায় ছিল

না। কয়েক পা এগোতেই পিছন থেকে ডাক পড়ল, পার্থ যে?

মুখ ফিরিয়ে তাকালুম, এবং নবেন্দুকে আমার পক্ষে চিনতে পারা উচিত কিনা, সেটি ভাবতে সময় নিলুম। নবেন্দু সহাস্যে আমার দিকে এগিয়ে এল, এবং আমি তখনই স্থির করলুম, আমার মুখে ঈষৎ মাত্র হাস্যরেখা প্রকাশ না পায়!

নবেন্দু বলল, অনেকদিন পরে দেখা। কেমন আছ?

নবেন্দু বলল, অনেকদিন পরে দেখা। কেমন আছ?

বললুম, আমার চেয়ে ভাল এখন আর কেউ নেই!

তুমি নাকি আজকাল মস্ত বড় চাকরি করছ?

জবাব দিলুম, পৈতৃক ব্যবসা নেই তাই চাকরি করি, এবং বিলেত-ফেরত বিশেষজ্ঞ তাই মোটা মাইনেও পাই!

সম্ভবত নবেন্দু আগে আমার এ চেহারা দেখেনি। তাই সে একটু কুণ্ঠার হাসি হাসল। পরে বলল, এখানে কবে এসেছ? কোথায় আছ?

চিরদিন যেখানে থাকি, সেখানেই আছি!

পাণ্ডা কয়েকজন সহ ভদ্রলোকরা আমার দিকে এবার এগিয়ে এলেন। নবেন্দু পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ইনিই আমার সেই বন্ধু পার্থ চৌধুরী, আর ইনি—

থাক্—আমি জবাব দিলুম, ভুল হচ্ছে নবেন্দু, আমি তোমার ঠিক বন্ধু নই, সহপাঠী মাত্র!

নবেন্দু এ ধাক্কাটা আশা করেনি। তাই শুধু একটু হাসল। পরে সকলের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ইনি মিঃ গুপ্ত, আমার আইন-পরামর্শদাতা, এঁরা মুহুরি, আর ওঁরা হলেন মন্দিরের পাণ্ডা—ত্রিলোচন তেওয়ারি আর সদানন্দ ঝা। বুঝতেই পারছ, আমরা মামলা উপলক্ষ্যেই আজ এখানে এসেছি!

মিঃ গুপ্ত এবার একটু গায়ে পড়েই বললেন, আপনার এই বয়েস, আপনি এসব বিশ্রী মামলায় জড়াতে গেলেন কেন, মিঃ চৌধুরী!

ফিরে দাঁড়িয়ে গুপ্তর আপাদমস্তক তাকালুম। পরে বললুম, কিছু মনে করবেন না। কথাটা আমিও ভাবছি। আপনি নিজে কিসের লোভে এই নির্বোধ নবেন্দুকে এমন নোংরা মামলায় জড়াচ্ছেন, সেটি আমার কৌতূহল।

নবেন্দু গলা তুলে এবার বলল, সেকথা উনি বুঝবেন, পার্থ।

আমি হেসে চলে যাচ্ছিলুম। গুপ্ত বললেন, মামলা একটা নয়, পর পর তিনটে। কিন্তু আপনার নিজের কেসটা খারাপ, মিস্টার চৌধুরী।

বললুম, তা হতে পারে, তার জন্য আমি প্রস্তুত!

হেসে গুপ্ত বললেন, তার চেয়ে আমি বলি কি, আপোষে আপনারা মিটমাট ক'রে নিন না কেন? স্ত্রীলোক-ঘটিত মামলায় জড়ালে আপনার চাকরির ওপর টান পড়তে পারে! আজকাল কত কষ্টে একটা ভাল চাকরি হয়!

আর কিছু বলবেন?—প্রশ্ন করলুম।

আমার চেহারাটা বোধ করি কাবুলি বিড়ালের মতো একটু ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। গুপ্ত আমার দিকে তাকিয়ে হয়ত বুঝলেন, তাঁর সদুপদেশ আমি গ্রাহ্য করিনে। সুতরাং তিনি বললেন, এ ছাড়াও একটা কথা আপনাকে বলা দরকার, বিবাহিত স্ত্রীকে স্বামীর কাছ থেকে সরিয়ে রাখাটা যথেষ্ট নিরাপদ নয়, মিঃ চৌধুরী!

নবেন্দু উত্তেজিত হয়ে বলল, এই পাণ্ডারা আমাদের বিয়ের সাক্ষী আছেন, মনে রেখ পার্থ। এ মামলা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কেউ জানেনা।

গুপ্ত বললেন, আপনার বিরুদ্ধে সামাজিক কলঙ্কের কথাটাও ভুলবেন না, মিস্টার চৌধুরী!

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবার আমি হাসলুম। বললুম, আমার সময় কম। আপনাদের প্রলাপ শোনবার জন্য আমি মন্দিরে ঢুকিনি। তবে হ্যাঁ,

আপনাকে একটি সৎপরামর্শ দিয়ে যেতে চাই মিঃ গুপ্ত।

বেশ ত, কি বলুন?

বললুম, মিথ্যে মামলা সব সময়েই সাজানো যায়, কিন্তু সেই মিথ্যার মধ্যেও সঙ্গতি থাকা দরকার। আপনাদের আরেকবার অনুরোধ করছি আমাকে ভয় দেখাবার দুশ্চেষ্টা করবেন না। একজনের স্ত্রী প্রমাণিত হ'লে তবে আরেকজনের সঙ্গে ব্যভিচারের কথা ওঠে! একটি শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে আগাগোড়া প্রতারণার ও ভয় দেখানোর ইতিহাসকে বিয়ে বলে না! আপনাদেরকে আমিই সতর্ক ক'রে দিচ্ছি।

মিঃ গুপ্ত প্রশ্ন করলেন, আপনি তাহলে সোজা পথে আসতে চান্না?

চোখ পাকিয়ে বললুম, থামুন, আপনার অভদ্র প্রশ্নের জবাব আমি দেবোনা, ওটা আপনার এই কাপুরুষ মক্কেলকে জিজ্ঞেস করবেন! নমস্কার।

নবেন্দু গলা বাড়িয়ে শুধু বলল, এ অপমান আমি ভুলবনা, পার্থ।

মন্দিরের ভিতরে ঢোকবার আগে মুখ ফিরিয়ে বললুম, বিশ্বাসঘাতক, যাও, বাকি জীবন এ্যানির গলা ধ'রে কাঁদোগে!

পুজো দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি, ওদের দলবল আর কেউ নেই, শুধু আমার পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিঃ গুপ্ত এবং তাঁর জনৈক মুহুরী। আমি কয়েক পা এগোতেই তিনি মিষ্ট কণ্ঠে আরেকবার ডাকলেন। বললেন, আপনাকে বন্ধুর মতন আরেকটি কথা বলছিলুম—!

যথেষ্ট হয়েছে মিঃ গুপ্ত। মন্দিরে অনেক বাঁদর এখনও চরে বেড়াচ্ছে! ওদের মাঝখানে গিয়ে বন্ধু খুঁজুনগে!

দ্রুতপদে বাইরে এসে জুতোটা পায়ে দিয়ে সোজা গিয়ে আমি আমার গাড়িতে উঠে বসলুম। গাড়িখানা ঘুরে আবার ফিরে চলল যশিদির দিকে। বুঝতে পারা গেল, নবেন্দু সদলবলে এসে উঠেছে তার মামার বাড়িতে।

আমি একটা হিংস্র আক্রোশে তখনও কাঁপছিলুম, এবং এই ব্যাপারে আমি যে এই প্রথম সংযম হারালুম, সেজন্য আমার মনে কোনও অনুশোচনা ছিল না!

বাড়ি ফিরে দেখি সন্ধ্যা হয়েছে, এবং মালিবৌ কখন্ যেন এসে হেনার ঘরে আলোটি জেলে দিয়ে গেছে। ভিতরে এসে সবিস্ময়ে দেখি, পরম নিশ্চিন্ত হয়ে গায়ের উপর একটি পাৎলা চাদর টেনে দিয়ে হেনা তেমনি অঘোরে ঘুমুচ্ছে!

অস্থিরভাবে বাড়িতে ফিরে এসেছিলুম, কিন্তু হেনার দিকে চেয়ে আমি থমকিয়ে গেলুম। মেয়েটা নির্বোধ, বেপরোয়া,—কিন্তু মন থেকে বলতে পারছিনে মেয়েটা অপরাধী, বরং মনে হচ্ছে নিষ্পাপ। যত তেজস্বিনীই সে হোক, সে জানে আমি তার সামনে এসে না দাঁড়ালে তার চলবেনা। সেই শিশুকাল থেকে তার এই মনোভাবের ব্যতিক্রম একদিনও হয়নি। তার এই নিশ্চিন্ত নিদ্রার মধ্যে সেই নির্ভরশীলতাই প্রকাশ পাচ্ছিল। আমার হাসি এল।

নিঃশব্দে জুতোটা ছেড়ে তার মাথার কাছে গিয়ে বসলুম এবং তার মাথার রেশমী চুলের এক গোছা মুঠোর মধ্যে ধ'রে ঈষৎ অস্থির কণ্ঠেই ডাকলুম, হেনা, ওঠো শিগগির—

হেনা চোখ খুলল। আমাকে এমন ক'রে তার মাথার কাছে বসতে দেখে অবাক হয়েই উঠে বসল। বলল, কেন, কি হয়েছে?

বললুম, চোখের ঘুম ছাড়াও। ব্যাপারটা শোনো!

হেনা উঠে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এসে আমার কাছাকাছি বসল। আমি আগাগোড়া ঘটনাটা তার কাছে বর্ণনা ক'রে গেলুম। হেনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনল।

মালি ইতিমধ্যে চা ইত্যাদি এনে আমাদের সামনে রেখে জানতে চাইল, আজ রাত ক'টার ট্রেনে আমরা যাব।

হেনা জবাব দিল, আজ যাবনা রে ভজুয়া। রান্না করগে।

ভজুয়া খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে চ'লে গেল।

চা খেয়ে হেনা দ্রুতগতিতে তার কাপড়-চোপড় বদলে নিয়ে বলল, এসো আমার সঙ্গে। ওদের মতলব বুঝেছি। ভজুয়া—ও ভজুয়া—?

ভজুয়া আবার এসে দাঁড়াল। হেনা বলল, চলত আমার সঙ্গে?

এবার প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, আমি কিন্তু নবেন্দুদের ওখানে যাবনা, হেনা!

হেনা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে ধিক্কার দিচ্ছি, তুমি ওই জন্তুটার নাম আবার উচ্চারণ করছ! নাও, বেরিয়ে এসো।

আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে কাছারি-পাড়ার দিকে অগ্রসর হলুম। হেনা বলল, ভজুয়া, দেখিয়ে দে ত' কোন্ রাস্তাটা দিয়ে গেলে পুলিস-সাহেবের বাড়িটা কাছে হবে?

ভজুয়া বলল, আচ্ছা দিদি, চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

এক সময় আমার কাঁধের পিছন দিয়ে হাত বাড়িয়ে হেনা বলল, আমার জীবনের নানা জঞ্জাল তোমাকে দিয়ে সরাচ্ছি পার্থ, কিন্তু জান আমার সকল স্বার্থপরতা তুমি ক্ষমা করবে। তোমার ঋণ কেমন ক'রে আমি শোধ করব জানিনে!

হাসি মুখে বললুম, তোমার চোখে এখনও ঘুমের আবিলতা রয়েছে! ওটা

'জেনে যাক্, তারপর দেনা শোধের কথা তুলো'।

হেনা হেসে উঠল। তারপর বলল, তুমি আজকাল আমার কোনও ভাল কথা শুনতে চাও না, পার্থ।

দু' তিনটি ঢেউ খেলানো রাস্তা ঘুরে একটি মস্ত বাগানবাড়ির ফটকের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। একজন সশস্ত্র সিপাই এগিয়ে এল। হেনা আমার আগে এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করল, প্রসাদজি আছেন?

জি, হাঁ।

এই কাগজটি একটু ভেতরে পাঠিয়ে দাও ভাই। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

লোকটি কাগজের টুকরো নিয়ে ভিতরে গেল। হেনা আমাকে বলল, বিষ্ণুপ্রসাদকে তোমার মনে নেই? বাবার অমন ভক্ত! সব ভুলে ব'সে আছ? উনি এখন এখানকার পুলিশ-সুপার!

সিপাইটি ফিরে এসে আমাদের দুজনকে ভিতরে নিয়ে গেল। সামনে মস্ত বাগান পেরিয়ে বড় বারান্দাটার উপরে এসে উঠলুম। সিপাইটি পথ দেখিয়ে একটি বড় ঘরে আমাদের এনে এক জায়গায় বসিয়ে আবার ফিরে গেল তার পাহারায়। মিনিট দুই পরেই এক সুশ্রী মহিলা এসে ঢুকলেন, এবং হেনাকে দেখেই উদ্দীপ্ত হয়ে ভাঙা ভাঙা বাঙলায় বললেন, আ কপাল, তুমি এত বড় হয়েছে হেনা? কবে এসেছ?

আজই সকালে এসেছি পিসিমা। আপনারা কেমন আছেন?

আমরা ভালই আছি। এ ছেলেটি কে?

হেনা হাসিমুখে বলল, চিনতে পারলেন না? ও যে খোকন!

বল কি? তোমরা মাথায় এত বড় হয়েছ, চেহারা গেছে বদলে,—কেমন ক'রে চিনব?

আমি হাসিমুখে নমস্কার জানালুম।

বিষ্ণুপ্রসাদ এবার এসে প্রবেশ করলেন এবং তখনই ঘরের মধ্যে আনন্দ কলরবের ঢেউ দেখা দিল। মিনিট পাঁচেক কাটল উভয় পক্ষের কুশল প্রশ্নাদিতে। আমি ওঁদের চিনতে পেরেছিলুম!

বিগত সাড়ে তিন বছর আগেকার থেকে সমস্ত কাহিনী অকপটে হেনা প্রকাশ ক'রে গেল। নরেন্দু বিশেষ একটা মতলবে তার কাছ থেকে একখানা ছাপা ফর্মে বিয়ের প্রতিজ্ঞাটা সই করিয়ে নেয়, কিন্তু বিয়ে তাদের হয়নি! মন্দিরে গিয়ে তাকে সিঁদুর মাখিয়ে একটা নির্জন বাড়িতে তাকে নিয়ে যায়। সেদিন সমস্ত রাত ধরে বৃষ্টির মধ্যে নরেন্দু তাকে সেই বাড়িতে আটকিয়ে রাখে। ভোরবেলা হেনা জোর ক'রে চলে যায়। তারপর তিন বছর ধরে নরেন্দু তার সামাজিক কলঙ্ক রটায়। আজ তাকে পাগল বানিয়ে নরেন্দু তাকে স্ত্রী বলে দাবি করছে! মামলা উঠেছে আদালতে। ইতিমধ্যে নরেন্দু তার লোকজন নিয়ে এসে মন্দিরের পাণ্ডাদেরকে সাক্ষী দেবার জন্য ঘুষ খাওয়াচ্ছে!

ঘুষ! বিষ্ণুপ্রসাদের চেহারা সহসা কর্কশ হয়ে উঠল।

এবার আমি কথা বললুম,—আজ্ঞে হাঁ, আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখে সেই সন্দেহই করেছি। ওরা সাক্ষী তৈরি করছে!

বিষ্ণুপ্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর তাঁর নোটবই বার ক'রে কতকগুলো কি যেন লিখতে লিখতে প্রশ্ন করলেন, পাণ্ডাদের নাম কি?

আমি বললুম, ত্রিলোচন তেওয়ারি আর সদানন্দ ঝা।

হেনার দিকে ফিরে তিনি প্রশ্ন করলেন, পাণ্ডারা কখনও তোমাকে দেখেছিল?

না—হেনা জবাব দিল।

তুমি এদের দেখেছ কখনো?

না। কোনও পাণ্ডাকেই আমি চিনিনে।

বিষ্ণুপ্রসাদ হাসিমুখে বললেন, তবে নিশ্চিন্ত থাকো গে। তোমার ভাববার কিছু নেই। দেওঘরের কেউ তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিতে যাবে না। এসব ব্যাপারে আইনের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। তা ছাড়া বিয়ের দরখাস্ত দেওয়া আর বিয়ে হওয়া এক কথা নয়।

ভদ্রলোক পাণ্ডা দুজনের নাম, মিঃ গুপ্ত ও নরেন্দুর নাম আবার টুকে নিয়ে বললেন, কলকাতায় কি হবে তা জানিনে, তবে এখান থেকে তোমাদের কোনও ভয় নেই।

এরপর নানাবিধ গল্পগুজব ও মিষ্টান্ন গ্রহণের পালা চলল। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা যখন বিদায় নিলুম, তখন একপ্রকার নিশ্চিন্তই অনুভব করলুম, এ মামলায় নরেন্দুর সুবিধে হবে না।

দেওঘরের কাহিনী বর্ণনায় বিষ্ণুপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রীর কাছে হেনা কিছু আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিল। সম্ভবত সেটি বিষ্ণুপ্রসাদ ভুলতে পারেননি। অন্য কারণ হতে পারে এই, রাজা ব্রজবল্লভ মাত্র পাঁচ বছর আগেও দেওঘরের কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরের পাত্র ছিলেন। তাঁর কাছে এখানকার নানা ব্যক্তির নানা ধরণের কৃতজ্ঞতাও ছিল। সুতরাং এই সকল কারণে বিষ্ণুপ্রসাদজি সমগ্র ব্যাপারটির প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ আরোপ করেছিলেন। স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল, তিনি আমাদের স্তোকবাক্য দেননি, এবং আমরা তাঁর ওখান থেকে চলে আসার পর তিনি এ বিষয়ে বিশেষভাবে কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

পরদিন সকাল দশটার গাড়িতে ফিরব বলে যখন দুজনে প্রস্তুত হচ্ছিলুম, সেই সময় এক চাপরাশি ফটক পেরিয়ে এসে সেলাম ঠুকে জানাল, পুলিশ সুপার সাহেব বেলা এগারোটার সময় তাঁর বাঙলোয় আমাদেরকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন!

চাপরাশি চলে যাবার পর ভজুয়াকে একখানা মোটর ধরে আনার জন্য পাঠালুম। হেনা এঘরে এসে বলল, ব্যাপার কি বলত?

তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললুম, আজ তোমার বিয়ে। শিগগির তৈরি হয়ে নাও।

তোমার মরণ!—হেনা রাগ ক'রে

নবেন্দু একবার দুর্বল দৃষ্টিতে পাণ্ডাদের দিকে তাকাল। তারপর বলতে বাধ্য হল, না, কেউ ছিল না।

বিষ্ণুপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন, বিয়ের নোটিস দিয়েছিলে দুজনে, কিন্তু এক মাসের মধ্যে সাক্ষীসাবুদ সহ তোমাদের প্রস্তাবিত বিয়ে রেজেস্ট্রি হয়েছিল কি?

নবেন্দু জবাব দিল, না।

মিঃ গুপ্ত অস্থিরতা বোধ করছিলেন। তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে বিষ্ণুপ্রসাদ হাসিমুখে এবার বললেন, বিয়ের প্রস্তাব, অথবা উভয়পক্ষের সম্মতি থাকা মানে বিয়ে নয়। কোনও যাগযজ্ঞ নেই, সাক্ষীসাবুদ নেই, অনুষ্ঠান নেই, দুপক্ষের কেউই জানে না, রেজেস্ট্রিও হয়নি।—এর মানে হচ্ছে এই, একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে স্তোক-বাক্যে ভুলিয়ে তুমি একদিন বর্ষার রাত্রে একটি নির্জন বাড়িতে কুমতলবে আটক ক'রে রেখেছিলে! মেয়েটি প্রায় সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করে ভোরের দিকে বেরিয়ে পড়ে। সমস্ত বিষয়টার স্থূল চেহারাটা হল এই!

মিঃ গুপ্ত বললেন, আদালতে গেলে এর অন্য দিকটাও প্রকাশ পাবে, মিঃ প্রসাদ।

আজ্ঞে তাই যাবেন—কলকাতার সেই বিচিত্র আদালতে! তবে এটা আমার এলাকা, মিঃ গুপ্ত!—এই ব'লে বিষ্ণু-প্রসাদজি একখানা টাইপকরা কাগজ উপস্থিত সবাইকে পড়ে শোনাতে আরম্ভ করলেন। সেটি একটি ঘোষণাপত্র। ঘোষণাটি এই কাহিনীকে কেন্দ্র করেই রচিত। সেটি সর্বসমক্ষে পাঠ ক'রে বিষ্ণুপ্রসাদজি পাণ্ডা দুজনকে বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, দস্তখৎ কিজিয়ে।

লোক দুটি অনুগত ভৃত্যের মতো একে একে কয়েকটি কাগজে সই করল।

ঘোষণাটি এক হাজার টাকা প্রাপ্তি-স্বীকারের একটি রসিদ মাত্র। টাকাটা দিচ্ছে নবেন্দু, কিন্তু সেই টাকা মন্দিরের ট্রাস্টিরা নিচ্ছে না, নিচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে দুজন পাণ্ডা। একজন মিথ্যা সাক্ষ্য-দানের জন্য টাকা দিচ্ছে, এবং অন্যপক্ষ মন্দির সংস্কারের নামে গোপনে এক-জনের কাছে টাকা নিচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটা ফৌজদারী!

বিষ্ণুপ্রসাদ বললেন, এই ক'খানা কাগজের ওপর সই করো, নবেন্দু! তুমি ওদের টাকা দিয়েছ এটি লিখে দাও।

নবেন্দু পর পর কয়েকটি কাগজে সই করতে বাধ্য হল। হেনা স্তব্ধ, হতবাক। আমি নীরব। সব শেষে সই করলেন বিষ্ণুপ্রসাদ নিজে, এবং তার পাশে তাঁর আপিসের একটি গোলাকার ছাপ দেওয়া হল। এই কাগজের একটি কপি যাবে কলকাতার আদালতে।

বিষ্ণুপ্রসাদ হেনার দিকে তাকিয়ে বললেন, এর একটি নকল তোমার কাছেও দিয়ে দিচ্ছি মা। তোমার কাজে লাগবে।

অত্যন্ত বিবর্ণ মুখে মিঃ গুপ্ত স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। তাঁর পক্ষে আর কিছুই করবার ছিল না।

হেনা তার প্রাপ্য একখানা শীলকরা কাগজ একসময়ে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগে সযত্নে রাখল এবং মিঃ গুপ্ত সেটি লক্ষ্য করলেন।

সভাভঙ্গের ঠিক আগে বিষ্ণু-প্রসাদজি বললেন, এর পরে [illegible] মামলা কলকাতায় চুলে'ত চলুক। তবে শ্রীমতী হেনা যদি মনে করেন, আপনারা অহেতুক তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করেছেন এবং সেজন্য তিনি যদি মান-হানির মামলা রুজু করেন তবে কি দশা হবে আপনাদের, আমি বলতে পারিনে। আচ্ছা, এবার আমি আপনাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাই।

আসবার সময় বিষ্ণুপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

বাইরে এসে নবেন্দুর বোধ হয় একবারটি ইচ্ছা হয়েছিল, আমাদের সঙ্গে একটু কথা বলে। একটি গাছতলায় সে মিঃ গুপ্তকে নিয়ে অপেক্ষা করে ছিল। কিন্তু হেনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না, সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠল। এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আরেককালে এসে কেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে মন থেকে মুছে যায়, হেনার মুখের চেহারায় সেদিন সেই নির্মম কাঠিন্য না দেখলে আমি হয়ত বিশ্বাস করতেই পারতুম না।

ওরা দুজন দাঁড়িয়ে রইল পথের ধারের গাছতলায়। ওদেরই সামনে দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল।

পরবর্তী আরও তিনটি দিন হেনার আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে হল। দিনের বেলাটা মন্দিরে, মাঠে, নন্দন পাহাড়ের আশে-পাশে, রিখিয়ার পথেঘাটে, বালা-নন্দ আশ্রমের আনাচে-কানাচে, ত্রিকূট পাহাড়ের বন্য মন্দিরের চত্বরে—কাটতে লাগল, এবং রাত্রের দিকে গান-বাজনার আসর বসতে লাগল। সেই আসরে একদিন এসে গান শুনে গেছেন সপরিবারে বিষ্ণুপ্রসাদজি। তিন দিন পরে ভজুয়া সপরিবারে পেয়ে গেল নতুন কাপড়-চোপড় আর বকশিস। হেনার প্রাণের দিগন্তজোড়া আকাশে নব-জীবনের গান মুখর হয়ে উঠেছিল!

তিন দিন পরে আমরা কলকাতায় ফিরলুম। আমরা জানতুম নবেন্দুরা আগেই ফিরে এসেছে। মামলার তারিখটি আমাদের মনে ছিল। কিন্তু যথা সময়ে জানা গেল, বাদীপক্ষ মামলাটি নিঃশব্দে প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, হেনার মধ্যে লুকিয়ে ছিল বিষধর কেউটে সাপ—এবার সে ফণা বিস্তার ক'রে বেরিয়ে এল। আমার নিষেধ এবং অনু-রোধ সে মানল না,—সে গিয়ে উঠল সোজা কলকাতার জনৈক শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞের কাছে। সেই মিত্র মহাশয় হলেন ব্রজবল্লভবাবুর বিশেষ বন্ধু। হেনা তাঁর কাছে সমস্ত কাগজপত্র গচ্ছিত করে নবেন্দুর বিপক্ষে মানহানির মামলা দায়ের করল। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী বহুদূর অবধি অগ্রসর হয়। আমি কিন্তু দুর্বল ও নি[illegible] নবেন্দুকে ক্ষমা করেছিলুম।

শনির দশা কাকে বলে আমার সঠিক জানা ছিল না। আমি যে হেনাকে ছেড়ে কোনমতেই পালাতে পারছিনে এবং আমার মনের মতন একটি বউ খুঁজে বার ক'রে ঘরকন্না ফেঁদে বসব—এমন অবসরও যে নেই, এইটিই বোধ হয় আমার শনির দশা। আমি যেন ধীরে ধীরে এইটি আবিষ্কার করছি, হয় হেনার সহস্রপাক উত্তীর্ণ হওয়া আমার সাধ্যাতীত, আর নয়ত সে আমাকে বশী-করণ করেছে! শেষেরটাই বোধ হয় সত্য, কেন না আমার ঠাকুরমার মুখে এই প্রকার অনেক গল্প আমার শোনা ছিল। ডাইনী, ডাকিনী, যোগিনী ও শাপিনী ইত্যাদি অনেক গল্প। এরা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতির বেশে প্রথমটা দেখা দেয়। এরা সব পারে।

কিন্তু শনির দশা কি শুধু আমারই? এই ডাকিনীর কুহকে প'ড়ে আমার এক-কালের পরম প্রিয় সহপাঠী নবেন্দুও যে এই দশায় এমন সাংঘাতিকভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে, একথা কি আগে জানতুম? শুনেছি শনির দশা ধনীর সন্তানদের পিছু পিছু চলে!

রণরঙ্গিনী মহাকালীর মতো খড়্গ-হস্তা হয়ে হেনা যখন 'অসুর-বিনাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঠিক সেই সময় ধনাঢ্য ইংরেজ ব্যবসায়ী মিঃ বুকলিন তাঁর তরুণী কন্যা শ্রীমতী এ্যানির সম্পর্কে একটি মস্ত ক্ষতিপূরণের মামলা নবেন্দুর বিরুদ্ধে দায়ের করলেন। এটি অত্যন্ত কলঙ্ককেন্দ্রিক মামলা। পৃথিবীর কোনও সমাজ কোনও যুগে কখনও যে ঘটনা বরদাস্ত করেনি, তারই সাংঘাতিক অভিযোগ ছিল নবেন্দুর বিরুদ্ধে। এই মামলার পটভূমিতে নবেন্দুর আপিসের প্রায় সকল কর্মী দাঁড়িয়েছে তার বিপক্ষে এবং এই মামলার বিবরণ যখন কাগজে ছাপা হল, হেনা শুধু বলল, এ আমি জানতুম!

খবরটি শুনে রাঙামামা হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলেন, এবং হেনাকে বললেন, তোরই জন্যে ছেলেটার জীবন এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল! (ক্রমশ)

পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে?

শ্রীবিদ্যাবিকর্ণ

পরীক্ষার মরশুম প্রায় শেষ হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার শেষ নেই. সারা বছর ধরেই পরীক্ষা। কত রকমের যে পরীক্ষা আছে তা অনেকেই জানেন না—জানার কথাও নয়। সাধারণ লোকে পরীক্ষা বলতে বোঝে আই, এ, আই, এস, সি, বি, এ, বি, এস. সি. বি, কম আর সেকেন্ডারী বোর্ডের স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেন্ডারী। মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত মাস পাঁচেক ধরে এইগুলির পরীক্ষা ও পরীক্ষণ চলে। পরীক্ষা শব্দটি সাধারণ অর্থে অর্থাৎ পরীক্ষা দেওয়া ও নেওয়া এই দুই অর্থেই এবং পরীক্ষণ শব্দটি কেবল পরীক্ষা নেওয়া অর্থে প্রয়োগ করছি। পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়, লিখে থিয়োরেটিকাল পরীক্ষা দেয় আর বিজ্ঞানের ছাত্ররা ল্যাবোরেটারিতে কিছু কিছু প্র্যাকটিকাল পরীক্ষাও দিয়ে থাকে।

পরীক্ষক পরীক্ষা করেন। তাঁরা খাতা দেখেন। ল্যাবোরেটারিতে ছাত্ররা কিভাবে মাপজোখ করে, গোনাগাঁথা করে, কোন জিনিসের সঙ্গে কি মিশিয়ে কি ফল ফলায় এসব তদারক করাও পরীক্ষণ ব্যাপারের অঙ্গ।

আমরা কিন্তু পরীক্ষা বলতে বুঝি খাতা লেখা ও খাতা দেখা। পরীক্ষা-কান্ডের এই দুটিই হল বৃহত্তম শাখা।

পরীক্ষার মরশুম শেষ হল—তার মানে বড় বড় পরীক্ষাগুলি দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের লেখার পালা সাঙ্গ।

এখন পরীক্ষকদের দেখার পালা: তারও কিছু কিছু শেষের পথে। আই, এ. আই, এস, সি'র কাজ অনেক-দূর এগিয়ে গেছে। বি, এ, মধ্যপথে। স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেন্ডারী, এবার নোতুন হয়েছে প্রি-ইউনিভার্সিটি,—এগুলিও বি. এ,র মতোই মাঝপথে আছে। বি, কম. পরীক্ষা এই শেষ হল, পরীক্ষণ শুরু হয়েছে।

এই কটা মাস ধরে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার অন্ত থাকে না। যারা পরীক্ষা দের তাদের তো আছেই; মা, বাবা, অভিভাবকদের আরও বেশী। কাজেই

লেখক একজন প্রবীণ শিক্ষা-বিদ। আমাদের দেশের পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারের প্রত্যেকটি পর্যায়ের বিষয়ে তিনি ওয়াকি-বহাল। পর-পর চারটি প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করবেন। অভিভাবকবৃন্দের যদি এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য থাকে, আমরা সাদরে তা প্রকাশ করব। আলোচনা সংক্ষিপ্ত, তথ্যনিষ্ঠ এবং যুক্তিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক।
—সম্পাদক

পথে বেরোলেই শোনা যায়—"রেজাল্ট বেরোচ্ছে কবে?"

এর উত্তর আমরা যা দিয়ে থাকি তা শুনে কারও কোনো লাভ হয় না। বলি, "এখনও দেরি আছে", নইলে বলি, "এই মাসের শেষের দিকে' অথবা "আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে তো বেরোনো উচিত কিন্তু যা দেখছি তাতে দ্বিতীয় কি তৃতীয় সপ্তাহও হতে পারে।" উত্তরে কেউ বলেন, "ও! তা হলে তো অনেক দেরি!" কেউ বলেন, "তা হলে তো বড় মুশকিলে পড়া গেল। ছেলেটাকে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভরতি করাব ভাবছিলাম। আই, এস, সি'র ফলটা না বেরোলে তো কিছুই করা যাবে না।" কেউবা সব অনিষ্টের দায়িত্ব হয় কংগ্রেসী নয় কম্যুনিস্টদের উপর চাপিয়ে দুটো চারটে কটু কথা বলে শান্ত হন।

তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতিকাল থেকে পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন পর্যন্ত সময়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ছ'মাস। ইন্টারমিডিয়েটের কথাই ধরছি। টেস্ট পরীক্ষা হয় ডিসেম্বরে। টেস্টে যে পরীক্ষার্থী পাস করল তারই শুরু হয়ে গেল উদ্যোগ পর্ব। জুনে যদি খবর বেরোয় তা হলে ছ'মাসই পুরো হচ্ছে। সুতরাং বিরক্ত হবার কারণ আছে বৈ কি।

তথাপি নিরুপায়। ফল প্রকাশের এক সপ্তাহ আগেও কেউ সঠিক বলতে পারে না কবে ফল বেরোবে। পরীক্ষা প্রক্রিয়াটাই বড় জটিল, নানা ভাগ, নানা বিভাগ, নানা গ্রন্থিতে সংযুক্ত। একটা গ্রন্থি কোথাও একটু ঢিলে হলেই গন্ডগোল। একজনের কাজ একদিন পিছিয়ে গেলে সমগ্র পরীক্ষার ফল সাত দিন পিছিয়ে যেতে পারে।

পরীক্ষা-পদ্ধতির বিবিধ ও বিচিত্র পর্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। পরীক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে অনেক অন্ধ সংস্কার আছে সেগুলির সংশোধন হওয়া আবশ্যক।

পরীক্ষা যেদিন শুরু হয়, কাজ আরম্ভ হয় তার অনেক দিন আগে। প্রথম কাজ প্রশ্নকর্তা নির্বাচন। আই. এ, আই, এস, সি'র কথাই বলছি। যে

পরীক্ষা মার্চ-এপ্রিল মাসে আরম্ভ হবে তার প্রশ্নকর্তা নিয়োগ করা হয় আগস্ট, সেপ্টেম্বরে অর্থাৎ প্রায় সাত আট মাস আগে।

পরীক্ষকের নাম সুপারিশ করেন একটি বোর্ড। বিভিন্ন বিষয়ের জন্যে বিভিন্ন বোর্ড আছে। প্রত্যেক বোর্ডেরই পুরো ন-জন করে সদস্য। বোর্ডগুলি কি-ভাবে তৈরি হয় সে কথা বারান্তরে বলব। শুধু প্রশ্নকর্তার নাম নয়, প্রধান পরীক্ষকের এবং সাধারণ পরীক্ষকদের নামও এঁরাই সুপারিশ করেন। তাঁদের সুপারিশ বিবেচিত হয় সিন্ডিকেটের দ্বারা। সিন্ডিকেটের হাতেই শেষ সিদ্ধান্তের ভার। তবে তেমন কোনো গুরুতর কারণ না থাকলে সিন্ডিকেট বোর্ডের মনোনয়নে হস্তক্ষেপ করেন না।

বোর্ডের সুপারিশ আর সিন্ডিকেটের অনুমোদন—এর মধ্যে বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়। সিন্ডিকেটের অনুমোদন পেলে কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশনস্ নিয়োগপত্র পাঠান।

এমনও হতে পারে নিয়োগপত্র যাঁকে পাঠানো হল তিনি ঐ পদ গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। রাজী না হওয়ার কারণ আছে। নিয়োগপত্রে বলা হয়, যে ব্যক্তি গৃহশিক্ষকতা করেন অথবা যিনি ঐ বিষয়ের অর্থ পুস্তক, বোধিনী বা সাহায্য পুস্তক লিখেছেন অথবা যাঁর কোনো নিকট আত্মীয়ের ঐ পরীক্ষা দেবার কথা আছে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করবেন না। যাঁরা যে বিষয় কলেজে পড়ান তাঁদের সেই বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেওয়াই হয় না। মনে করুন, অধ্যাপক 'ক' হাটখোলা কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। আই, এ, থেকে বি, এ, পর্যন্ত সব ক্লাসেই ইংরেজী পড়ান। বিধানমতে তাঁকে আই, এ, বা বি, এ, পরীক্ষায় ইংরেজীর কোনো পত্রের প্রশ্ন করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু হাটখোলা কলেজের অধ্যক্ষ 'খ' প্রবীণ লোক। তিনি কেবল বি, এ, ক্লাসে ইংরেজী পড়ান, আই, এ-তে পড়ান না। তাঁকে আই, এ'র প্রশ্নকর্তা করতে কোনো বাধা নেই।

যাই হোক মনোনীত প্রশ্নকর্তা যদি অসম্মতি জানান তো আবার সেই বোর্ড, আবার সেই সিন্ডিকেট। তার মানে আবার সেই মাসখানেকের ধাক্কা।

প্রশ্নকর্তার কথা যখন ধরেছি, তখন প্রশ্ন রচনার প্রসঙ্গও এসে পড়ছে। প্রশ্ন নিয়ে কত গন্ডগোল বাধে তা তো সবাই দেখছেন! প্রায়ই শোনা যায়,—প্রশ্ন কঠিন হয়েছে, সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন পড়েছে, প্রশ্নের ভাষা পড়ে বোঝা যাচ্ছে না—এই রকম আরও কত অভিযোগ। তাই নিয়ে খবরের কাগজে পর্যন্ত কত আন্দোলন।

আমরা বাইরের লোকরা ভাবি প্রশ্ন-কর্তারা বুঝি নিয়োগপত্র পেয়েই যা তা কয়েকটা মনগড়া প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দিলেন। আর বিশ্ববিদ্যালয় অমনি সেগুলো ছেপে ফেললেন।—তা নয়।

প্রশ্ন রচনা সম্পর্কে অনেকগুলি আইনকানুন আছে। প্রত্যেক প্রশ্নকর্তাকে সেগুলি ভাল করে পড়ে দেখতে হয়, অন্ততঃ তাঁদের দেখার কথা। এ রকম দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার যাঁরা নেন তাঁরা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হবেন এমন কথা ভাবা যায় না। দু-এক ক্ষেত্রে অনবধানতার জন্যে ত্রুটি ঘটে না এমন নয়, তখনই বিপদ বাধে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্ন রচনা সম্পর্কে যে নিয়মতালিকা বেঁধে দিয়েছেন, সেগুলি এই :

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষায় এমন কোনো প্রশ্ন করা হবে না যার উত্তরে পরীক্ষার্থীর স্বীয় ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করার প্রয়োজন হতে পারে। পরীক্ষার্থীর প্রদত্ত কোনো উত্তরে বা অনুবাদে তার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিশেষ কোনো মতামত প্রকাশিত হলেও কেবল সেই কারণেই কোনো আপত্তি করা চলবে না।

২। পরীক্ষার্থী সকল বিষয়ের উত্তরই যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লিখবে। এই নিয়ম প্রত্যেক প্রশ্নপত্রের শিরোদেশে মুদ্রিত থাকবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত সিলেবাস (পাঠ্য তালিকা) দেখে প্রশ্নকর্তা বিষয়ের পরিধি (Scope) নির্ণয় করবেন। বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের আদর্শ ও পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে তাদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় যে-সব পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট করে দেন তার থেকে।

৪। প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন রচনা করে তার কোনো প্রতিলিপি রাখবেন না।

৫। উত্তর লেখার জন্যে যতটুকু সময় নির্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তর লেখা সম্ভব এমনভাবে প্রশ্ন রচনা করতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্ন অসংগতরূপে কঠিন হবে না অথবা প্রশ্নের সংখ্যা অসংগত রকম বেশী হবে না। পাঠ্য বিষয়ের সকল অংশ থেকেই কিছু কিছু করে প্রশ্ন দিতে হবে। অর্থাৎ একটা বই যদি পাঠ্য থাকে তার প্রথম অর্ধেকটা থেকে সব প্রশ্ন দেওয়া হল শেষের অর্ধেক অস্পৃষ্ট থাকল—এমন না হয়। বছরে বছরে প্রশ্নের মানের লক্ষণীয় পরিবর্তন হবে না। অবশ্য তাই বলে প্রত্যেক বছর একই ধরনের প্রশ্ন করতে হবে এমন কথা নয়। যতগুলি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে প্রশ্নের সংখ্যা অবশ্যই তার চেয়ে কিছু বেশী থাকবে।

৬। না বুঝে মুখস্থ করলেই উত্তর করা যাবে এমন ধরনের প্রশ্ন করা উচিত হবে না।

বলুন তো কী?

উত্তর

১। ইংল্যান্ড।

২। আলুমিনিয়াম।

৩। অভ্র।

৪। হাতী—বাচ্চার ওজন ১৫০ থেকে ২০০ পাউন্ড পর্যন্ত।

৫। হাঁ, দেহের অন্যান্য অঙ্গের মত এরা জ্যান্ত এবং এদের জ্যান্ত রাখা যায়।

৬। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া।

৭। প্রায় ৭১১০, এর মধ্যে ৪,৫০০ দ্বীপের কোন নাম নাই।

শত বার্ষিকী দেশে দেশে

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

মহাকবি দান্তে আলিগিয়েরি

ঋজু গিরিশৃঙ্গের মত ব্যক্তিত্ব, একাধারে কবি, পন্ডিত, রাষ্ট্রনায়ক, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ—মধ্যযুগের উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী সম্পূর্ণ শরীরী রূপ ধারণ করেছে দান্তে আলিগিয়েরি-তে। দান্তের কবিকীর্তি তুষারমৌলি শৃঙ্গের মহিমায় বিরাজমান যা আজও সকলকে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত করে; উন্নত চিত্তে আনে শুদ্ধতা ও প্রশান্তি।

দান্তে-র জন্ম ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে আর্নো নদীর ধারে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে। রেনেশাঁস-এর তরঙ্গ-চঞ্চল এই মধ্যযুগীয় বিশাল নগরীর প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টিশীল আবেগপ্রবণতা দান্তের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত। ফ্লোরেন্স-কে দান্তে আপ্রাণ ভালবাসলেও সৎমায়ের মতো এই নগরী কবিকে বিতাড়িত করে। রাভেনা-তে নির্বাসনের দিনগুলি কবির ব্যর্থ হয়নি। এই নির্বাসনকালে তিনি বিশ্বশ্রুত 'ডিভাইন কমেডি' সমাপ্ত করেন। রাভেনা-তেই ১৩২১ খৃষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। শতক শতক-ব্যাপী নিস্তব্ধতার পরে ফ্লোরেন্স তার নির্বাসিত কৃতী সন্তানের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে।

দান্তের মহাকাব্যের আসল নাম 'কমেডিয়া'। এই 'কমেডিয়া' বহু জনপ্রিয়তা লাভ করলে জনসাধারণই পরে তার নামকরণ করে 'ডিভাইন কমেডি'। এই মহাকাব্য থেকে দান্তের সম্বন্ধে বহু তথ্যাবলী পাওয়া যায়। জানা যায় যে, ১২৬৫ থেকে ১৩০২ সাল অবধি দান্তের জীবন আশৈশব কেটেছিল ফ্লোরেন্সে। ফ্লোরেন্সের অভিজাত বিত্তশালী পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রাচীন রোমান রাজবংশের মধ্যেই এই পরিবারের উৎস নিহিত। দান্তে অন্তত নিজের শরীরে প্রবাহিত রোমান রক্তের সম্বন্ধে গর্বিত ছিলেন। 'ভিয়া দান্তে আলিগিয়েরি' রাজপথের ওপরে ছিল পূর্বপুরুষদের প্রাসাদ। দান্তেকে নির্বাসিত করার সময় দান্তের পরিবারের আবাস পুড়িয়ে দেওয়া হয় ও যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফ্লোরেন্স, রাভেনা ও ইতালির অন্যান্য অঞ্চলে দান্তের স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে।

ফ্লোরেন্সের বাইরে কিছু দূরে অবস্থিত ভিয়া বোকাচ্চো রাস্তার ওপরে ভিলা শিফানোইয়াতে দান্তের 'ডিভাইন কমেডির' অনেক সর্গ লিখিত হয়। এসব অঞ্চলে বিভিন্ন বাড়ী, সমিতির অফিস ও লাইব্রেরীতে দান্তের প্রাচীন পান্ডুলিপি ও বহু দলিল রক্ষিত আছে। দান্তের কাব্যের যে-যে পান্ডুলিপি 'লরেন্সিয়ান লাইব্রেরী'-তে রক্ষিত আছে তন্মধ্যে দান্তের ছেলে জাকোপো, ইমোলা, ওতিমো ও বোকাচ্চো-র ভাষ্য-সম্বলিত পান্ডুলিপি উল্লেখযোগ্য। আর্চাইবস্ অব্ স্টেটের গ্রন্থাগার 'বুক অব নেস' থেকে জানা যায় যে, পোপ ও রাজশক্তির মধ্যে একাধিপত্য নিয়ে যে বিবাদ হয় সেই সময় রাজশক্তির পক্ষে দান্তেও এই কলহে জড়িয়ে পড়েন। পরিণামে পোপের প্রভুত্ব সাব্যস্ত হওয়ায় দান্তে ও চোদ্দজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ওপরে ফ্লোরেন্স ত্যাগ করার নির্দেশ জারী হয়েছিল ১৩০২ সালে। ফ্লোরেন্স ছিল দান্তের লেখাপড়া ও জ্ঞান-আহরণের কেন্দ্র। বিভিন্ন বিদ্যাচর্চায় তিনি এত অধিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যে, বিরাট এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার সঙ্গে তাঁকে তুলনা করলেও অত্যুক্তি হয় না। দান্তের কাব্য পাঠ করলে এই ধারণা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে কখনো সৈনিক হিসেবে, কখনো রাজদূতের বৃত্তিতে কিম্বা অন্যতম রাজকর্মচারী হিসেবে। বিভিন্ন পেশায় জীবনে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। কথিত আছে এই সময়ে তিনি বিয়াত্রিচের প্রেমে পড়েন। এই বিয়াত্রিচের মৃত্যু তাঁকে 'কমেডিয়া' লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর দান্তে অবিরাম পাঠচর্চায় এত অধিক সময় অতিবাহিত করতেন যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছিল।

দান্তে ও তাঁর কাব্য 'ডিভাইন কমেডি'কে বুঝতে হলে ত্রয়োদশ শতকের শিল্প-সংস্কৃতিগত রাজনৈতিক জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়।

এ যুগে জ্ঞান-সাধনার সমস্ত শিখরে মানুষ নিজেকে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

মধ্যযুগীয় বিশ্বাসবাদের সঙ্গে আরিস্ততলের যুক্তিবাদের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা চলছিল। একদিকে যেমন, এর ফলে বেধেছিল সংঘাত—অন্যপক্ষে তেমনি খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বজ্ঞেরা প্রচার করছিলেন যে, ধর্মতত্ত্ব ও যুক্তিবাদে আসলে কোনো বিরোধ নেই। বুদ্ধিবাদীরা ক্ষুরধার শাণিত যুক্তি-

তর্কের অস্ত্রে প্রতিপক্ষের পুরাতন মূল্যবোধকে যাচাই করতে সচেষ্ট ছিলেন। যাবতীয় সাহিত্য, শিল্প-কলা পরিপুষ্টি লাভ করেছিল এই দ্বন্দ্বময় যুগের আবহাওয়ায়। তাই বলা যায়, 'ডিভাইন কমেডি' এই যুগের মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা, তার রাজনৈতিক, শিল্প-সংস্কৃতি-নীতিগত জীবনের একখানি দর্পণ। মানুষের ধর্মবিশ্বাস, পাপ-পুণ্যের বোধ, কর্ম ও প্রেম, এবং এতৎ-সঞ্জাত জটিল চিন্তা ও মননের দ্বন্দ্ব ও ঐক্যের বিচিত্র ইতিহাস এই মহাকাব্য।

দান্তে নির্বাসনের দিনগুলি কোথায় কোথায় অতিবাহিত করেন তাই নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে। তবে দান্তের কাব্যে বর্ণিত নিজস্ব উক্তি থেকে কিছু কিছু হদিশ মেলে। বহু জায়গার উল্লেখ আছে যেখান থেকে তিনি মহাকাব্যের পরবর্তী সর্গগুলি সমাপ্ত করার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

মহাকাব্য থেকে জানা যায় ১৩০২ থেকে ১৩০৫ সাল অবধি সময়কাল তিনি 'বোলোনা'-তে অতিবাহিত করেন। দান্তে নিজের অবস্থা বর্ণনা করেছেন তাঁর মহাকাব্যে এইভাবে যে, তিনি একজন তীর্থযাত্রী, ভাগ্যের ফেরে ইতালির পথে-পথে অঞ্চলে-অঞ্চলে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোনো গৃহস্থ-বাড়ী দেখে মনে হচ্ছে যে, ঐ বাড়ী বুঝি তাঁকে আশ্রয় দেবে। কিন্তু সেখান থেকে হতাশ হয়ে এগিয়ে যেতে যেতে সামনের বাড়ী দেখে আশ্রয়ের প্রত্যাশা মনে জাগরূক হচ্ছে। 'পারাডিসো' অধ্যায় থেকে জানা যায়; ভেরোনা-তে রাজদরবারে ১৩১৬ সাল অবধি প্রিন্স কান্ গ্রান্ড দেল্লা স্কালার আতিথ্য কবি গ্রহণ করেছিলেন। দান্তে আরো যে-যে রাজ-পরিবারের আশ্রয়ে ছিলেন তার মধ্যে ফ্লোরেন্সের কাছে অবস্থিত কাসেন্তিনো ভ্যালি-র 'কাউন্ত গিদি' পরিবারের কথা উল্লেখযোগ্য। কাসেন্তিনো ভ্যালি-র 'রোমেনা' 'পপ্পি' ও 'পর্সিয়ানো' দুর্গ-প্রাসাদে দান্তের বহু স্মৃতিচিহ্ন আছে। 'রোমেনা' প্রাসাদের বর্তমান কর্ত্রী কাউন্টেস দা গয়েত্তি রোমেনা প্রাসাদ ও ও দান্তের বিষয়ে বিংশতিপুরুষানুক্রমে প্রচলিত মুখরোচক গল্প আজও বলে থাকেন। মার্বেল ফলকে এখানে উৎকীর্ণ আছে যে, "নির্বাসিত জীবনের প্রথম ভাগে কাউন্ট গিদি-র আতিথ্যে এখানে বাস করেছিলেন বন্দিত আলিগিয়েরি।"

প্রবাদ আছে যে, রোমেনায় দান্তে-র অবস্থানকালে ফ্রান্‌চেস্‌কার প্রেমিক পাওলোর ন'বছরের মেয়ে মার্গেরিতা সেখানে এসে কিছুকাল ছিল। এরূপ অনুমান করা হয় যে, পাওলো ও ফ্রান্‌চেসকার প্রেম কাহিনী ও তাঁদের মর্মান্তিক জীবনাবসানের কাহিনী হয়তো মেয়ের কাছ থেকেই দান্তে সংগ্রহ করে মহাকাব্যের 'পার্গেটোরিও' অংশের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অবশ্য কম্পালডিনায় নিজে অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে পাওলো-কে দান্তে চিনতেন কেননা সেও ছিল এক অশ্বারোহী দলে। পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত 'রোমেনা'র দুর্গ-প্রাসাদ শিখরই দান্তের কল্পনায় অনুরঞ্জিত হয়ে 'পার্গেটোরিও'-এর পাহাড়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এর পরে রাভেনা-তে নির্বাসনে ১৩২১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। রাভেনাতে তাঁর স্মৃতি-মন্দিরে ১৯২১ সালে ষষ্ঠ শতবার্ষিকীর সময় পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট ফ্লোরেন্স থেকে এক প্রতিনিধি দল পাঠান ফ্লোরেন্সের এই কৃতী নির্বাসিত সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে। একদা পোপ কর্তৃক বিতাড়িত কবি মৃত্যুকালে একথা কল্পনাও করতে পারেন নি।

'কমেডিয়া', 'ভিটা নুভো', 'কনভাইভ', 'দ্য ভাল্‌গারি এলোকোয়েন্তিয়া', 'দ্য মনার্কিয়া', 'এপিস্তোলাস'— দান্তে রচিত গ্রন্থ তালিকা মোটামুটি এই।

বোকোচ্চোই দান্তের প্রথম জীবনীকার এবং তিনি ১৩৭৩ সালে ফ্লোরেন্সে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে দান্তের কাব্যের প্রথম ব্যাখ্যা করেন। বোকোচ্চো-এর শিষ্য ইমোলা ও দান্তের ছেলে জ্যাকোপো-র লাতিন ভাষায় রচিত ভাষ্যের পাণ্ডুলিপিও বর্তমান।

ছাপাখানার প্রচলন হলে ১৪৭২ সালে বিভিন্ন শহরে দান্তের কাব্যের তিনটি বিভিন্ন সংস্করণ ছাপা হয় এবং তা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৫০২ সালে বিখ্যাত অল্‌ডাস সংস্করণ ছাপা হয়। 'সোসিয়েতা দান্তেস্কা ইতালিয়ানা' দান্তের ষষ্ঠতম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯২১ সালে দান্তের মহাকাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ মুদ্রিত করেন।

ইতালির চারটি শহর—ফ্লোরেন্স, রোম, ভেরোনা ও রাভেনা বিশেষ করে দান্তের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত। ফ্লোরেন্স স্কোয়ার-এ বহু দান্তের বিরাট মর্মরমূর্তি আছে। ফ্লোরেন্সের গির্জায় দান্তের আবক্ষ প্রতিমূর্তি অঙ্কিত আছে। এই প্রতিমূর্তি শিল্পী গিয়োত্তো এঁকেছিলেন ১৩৩৪ সালে। ফ্লোরেন্সের যে অঞ্চলে দান্তের জন্ম হয়েছিল সেই আলিগিয়েরির বাসগৃহের এক অংশে একটি স্মারকচিহ্ন আছে। ইতালির বহু শহরেই দান্তের মর্মরমূর্তি স্থাপিত আছে। বহু শহরেই দান্তে-সমিতি আছে যাঁরা কবির কাব্য নিয়ে চর্চা করেন। ইতালির ইউনিভার্সিটিতে 'দান্তে অধ্যাপকের' বিশেষ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই দান্তের মহাকাব্যের অনুবাদ হয়েছে। হেনরী বয়েড, কেরী, লং ফেলো, জে, এ, কার্লাইল, মুস্‌গ্রেভ্, দান্তে গেব্রিয়েল রসেটি এবং আধুনিককালের ডরোথি সেয়ার্স, সেসিল ডে লুইস দান্তের অমর মহাকাব্যের অনুবাদক। বিষ্ণু দে-ও দান্তের মহাকাব্যের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন।

১৯২১ সালে ষষ্ঠতম শতবার্ষিকী সারা ইতালি, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে উদ্‌যাপিত হয়।

লন্ডন থেকে এই সময় ১৩২১ থেকে ১৯২১ অবধি দান্তের উপরে লিখিত যাবতীয় প্রবন্ধাবলী নিয়ে একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষায় আর্নল্ড থেকে এলিয়ট এবং দান্তের বিষয়ে জর্মান ভাষায় দান্তে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ভস্‌লার-এর পাণ্ডিত্য অদ্বিতীয়।

ইতালীর জাতীয় কবি দান্তে। রোমের ভাটিকান গির্জায় র‍্যাফেল অঙ্কিত চিত্র 'পার্নেসাস' ও 'ডিসপিউটা'-তে দান্তের দুটি ছবি র‍্যাফেল এঁকেছিলেন। ইতালীর রাভেনা চ্যাপেলে তাঁর স্মৃতি-সৌধটি শ্রেষ্ঠ ইতালিয়ান মার্বেলে রচিত। ফ্লোরেন্সের অশ্বারোহী সৈন্য-দলে দান্তে ১২৮৯ সালে কম্পালডিনোতে লড়াই করেছিলেন বলে, ঐ জায়গায় বিখ্যাত অশ্বারোহী সৈনিকের স্মৃতিতে একটি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে ১৯২১ সালে। ১৯২১ সালে ষষ্ঠ শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় ইতালির পৌর-সমিতি একটি ঘন্টা উপহার দিয়েছিলেন গির্জার কর্তৃপক্ষকে। সেই ঘন্টা প্রতি সন্ধ্যায় এই জাতীয় কবির সম্মানে ধ্বনিত হয়।

ডাক-বাংলো

জ্যোতিপ্রসাদ চক্রবর্তী

সুব্রামনিয়াম আয়ার সোজা হয়ে বসে বললেন,—জঙ্গলের গল্প আমিও দু'-চারটে জানি মিঃ শিখন্ড!

মিঃ ত্রিপাঠী চোখ বুঁজে সোফায় আধশোয়া হয়ে ছিলেন। চোখ না মেলেই বললেন,—সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে ও গল্প আর ভাল লাগছে না মিঃ আয়ার। অন্য কিছু বলুন—

টেবিলের ওপর রাখা রাইফেলটা নাড়া-চাড়া করতে করতে মিঃ শিখন্ড বললেন,—জঙ্গলে অন্য গল্প জমে না মিঃ ত্রিপাঠী। এ বুনো জঙ্গলের নিজস্ব একটা মোহ আছে—

জানালার দিকে চোখ রেখে নীরবে সিগারেট টানছিলেন কৃপাল সিং। কথাটা কানে যেতে একবার ফিরে তাকালেন শুধু। কথা বললেন না কোন।

রাঁচী-রোড রিজার্ভ ফরেস্টে সারাদিন বন্দুক-রাইফেল নিয়ে টো টো করে ঘুরেছেন এ'রা। দুটো বড় চিতল পাওয়া গেছে—আর কিছু হরিয়াল। রাত হলে ফিরে যাবার মতলব ছিল, কিন্তু জীপটা বিগড়েছে। রাঁচী ফিরে যাবার আশা ছেড়ে দিয়ে তাই এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন রাঁচী-রোড ডাক-বাংলোয়।

সামনে বিস্তৃত আঁকা-বাঁকা রাঁচী-হাজারীবাগ রোড তৈলমসৃণ পীচের সর্পিল দেহ নিয়ে পড়ে আছে পাহাড়ী পাইথনের মত। দুপাশে বড় বড় গাছের ঝুপসি অন্ধকার। অদূরে দিগন্ত-বিস্তারী রিজার্ভ ফরেস্ট। আশে-পাশে ছোট-বড় কয়েকটা পাহাড় আর ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রাম। গ্রামগুলি থেকে মাদলের শব্দ আসছে ভেসে। ঘন, নিকষ কালো অন্ধকার। মেঘের ঘনঘটা আকাশে। যে কোন সময় বর্ষণ শুরু হতে পারে। ক্লান্ত দেহে ও'রা বসে আছেন ডাক-বাংলোর প্রশস্ত ঘরে। টেবিলের ওপর বন্দুক-রাইফেল স্তূপীকৃত। আবলুশ কাঠের বিরাট টেবিলটার চারপাশে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছেন সবাই। কারো ঠোঁটে সিগারেট—কারো পাইপ। অফুরন্ত অবসর।

মিঃ শিখণ্ড বললেন,—জোর কপাল মিঃ সিং-এর, চিতলটা একেবারে সামনেই পড়ে গেল ও'র। খুব সময়মত ফায়ার করেছিলেন, না হলে নিমেষে উধাও হয়ে যেত ওটা—

কৃপাল সিং ফিরে তাকালেন,—যাই বলুন মিঃ শিখন্ড, চিতল মেরে শিকারের শখ মেটে না। এ ফরেস্টটা ব্যারেন—এক-আধটা শের না পেলে বড় নিরামিষ লাগে!

মিঃ আয়ার বললেন,—বাঘ শিকারের পদ্ধতি আলাদা মিঃ সিং। আমার মনে আছে, এই ফরেস্টেই, প্রায় মাইল ছয়েক ইন্টিরিয়রে বছর চারেক আগে একটা ম্যান-ইটার পেয়েছিলাম আমি।

মিঃ ত্রিপাঠী বললেন ভ্রূ কুঁচকে,—আবার সেই শিকারের গল্প! জীবনে আর কিছু দেখেননি নাকি মিঃ আয়ার!

বাইরে টিপ্‌-টিপ্‌ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। রাত আরো গভীর অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র কালো আকাশ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

ঠাকুর এল ডিসে ডিসে খাবার সাজিয়ে। হরিয়ালের রোস্ট হয়েছে—কয়েক পিস্‌ করে পাঁউরুটি, দুটি করে ডিম সেদ্ধ। সঙ্গে কফি। ভেতরে ভেতরে ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছিলেন সবাই। উৎসাহিত হয়ে তুলে নিলেন কাঁটা-চামচ।

খাওয়া চুকিয়ে মিঃ আয়ার নীরবে চুরুট টানছিলেন। ও'র দৃষ্টি জানালার বাইরে অন্ধকারে নিবদ্ধ। ডাক-বাংলোয় আজ অন্য কোন অতিথি নেই, এ'রাই চারজন শুধু। ঠাকুর-চাকরদের কলগুঞ্জন শোনা যাচ্ছে রান্নাঘরের দিক থেকে। তাছাড়া রাত নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে অদূরের গহন জঙ্গলের মধ্যে থেকে হিংস্র শ্বাপদের চীৎকার ভেসে আসছে। বিরামহীন কান্নার মত বৃষ্টি ঝরছে টিপ-টিপ্‌ করে। মিঃ আয়ার উন্মনা। ও'র দৃষ্টি

ভেসে চলে গেছে সুদূর অতীতের অন্ধকারে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন মিঃ ত্রিপাঠী, —কি বিপদেই যে ফেলল হতভাগা জীপটা! এদিকে আবার আকাশ ভেঙে জল এল—

—ভালই তো! মিঃ শিখণ্ড বললেন,—ঝড়-জলের রাতে বসে আছি ডাক-বাংলোর এই ঘরে—ও কোণে পড়ে আছে মরা চিতল দুটো—টেবিলে বন্দুক-রাইফেলের স্তূপ—মন্দ কী!

জানালা থেকে চোখ ফেরালেন মিঃ আয়ার। বললেন,—এমনি এক বর্ষা রাত মনে পড়ছে আমার। সেদিনও আকাশ ছিল এমনি অন্ধকার, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছিল সন্ধ্যে থেকে, পাশাপাশি বসে ছুটছি আমি আর মিসেস্ ঘোষ—

—প্রেমজ ব্যাপার নাকি? মিঃ ত্রিপাঠীর চোখে মুখে কৌতুক।

—দি আইডিয়া—মিঃ শিখণ্ড প্রায় লাফিয়ে উঠলেন উৎসাহে,—আজ রাতে শিকার-ফিকার থাক মিঃ আয়ার। এমন রোম্যান্টিক রাতে প্রেমের গল্পই বেস্ট টপিক্—

কৃপাল সিং হাসতে হাসতে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন,—মিষ্টি প্রেমের গল্প বলবার বা শুনবার বয়স কি আর আছে মিঃ শিখণ্ড? ওসব চলে কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে—যখন মনের মধ্যেও থাকে রোম্যান্স—

—প্রেমের আবার বয়স কি, মিঃ সিং? মিঃ ত্রিপাঠী বললেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে,—সাহিত্য, শিল্প বা জীবন, যাই বলুন, প্রেম সব কিছুতেই অবিচ্ছেদ্য। মানুষের জীবনে—তা সে যত কাঠ-খোট্টাই হোক, প্রেম একবার আসেই। সেই মিষ্টি ব্যথার স্মৃতিটুকুর দাম কম নয়। জীবনের পড়ন্ত বেলাতেও সেই স্মৃতির রোমন্থনে আছে আনন্দ। আপনি বলুন মিঃ আয়ার—

মিঃ আয়ার ভাবছিলেন। তাঁকে ঘিরে উদ্গ্রীব হয়ে বসলেন সবাই।

শুরু করলেন মিঃ আয়ার :—

একটুখানি ভূমিকা দিয়ে নিলে হয়ত জিনিসটাকে বুঝতে সুবিধে হবে আপনাদের। আমার মনটা ছোট-বেলা থেকেই গড়ে উঠেছিল যাযা-বরের মত। পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে যখন আচমকা পাবলিসিটি অফিসারের চাকরীটা পেয়ে গেলাম, তখন স্বভাবতঃই আমার ইচ্ছেটা পূরণ হল। দিল্লী থেকে আগ্রা, কানপুর থেকে এলাহাবাদ, শ্রীনগর থেকে করাচী, রামেশ্বরম থেকে ভাইজাগ —পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছি ক'টা বছর। এই সময়ে হঠাৎ আমার পার্মানেন্ট পোস্টিং হয়ে যায় ধুবড়ীতে। নাগা উপজাতিদের মধ্যে পবলিসিটির ভার পড়ে আমার ওপর। গল্পটা তখনকার।

তখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড্ ওয়র্ শেষ হয়েছে—কিন্তু চারদিকে তার ধ্বংসের ছাপ। মিলিটারী ব্যারাকগুলোর মুখ ভেতো বিরাট বিরাট ট্রেকারের ট্রাক। সবুজাভ খাকীর উর্দিপরা নিগ্রো সৈন্যরা তখনো কাঁচা টাকা ছড়াচ্ছে চারদিকে; ধুবড়ী শহরে কয়েকটি সামরিক দপ্তরের হেড-কোয়ার্টার্স বসেছিল—ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগল সেগুলো। আমার ডিপার্টমেন্টের কাজ বাড়ল ক্রমশঃ। ভীত পর্যুদস্ত লোকের মনে আবার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। তার জন্যে চলচ্চিত্র আছে, হ্যান্ডবিল আছে। প্রচুর লোকজন। নিঃশ্বাস ফেলার সময়ও নেই আমার। জীপে করে টহল দিয়ে বেড়াতে হয় রোজ পঞ্চাশ-ষাট মাইল করে। কখনো পাহাড়ে পাহাড়ে গিয়ে কাটাতে হয় দিনের পর দিন। উপজাতীয় লোকদের মাঝে বক্তৃতা দিতে হয়, ডেমনস্ট্রেশন দিতে হয়—

এই সময়টায় হঠাৎ সুব্রত ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল আমার।

আমারই এক অফিসের কেরাণী সুব্রত ঘোষ। কম করেও তখন আমার সব অফিসে শ' পাঁচেক কেরাণী-কর্মচারী কাজ করছেন। গুটি দশেক জুনিয়র অফিসার। সকলকে চেনা সম্ভব ছিল না। তবু চিনতেই হল সুব্রত ঘোষকে।

প্রথম দিন থেকেই বলি।

সুব্রত তখন ডিমাপুর সাব-অফিসে পোস্টেড। ওখানকার চার্জে আছেন এম, কারলেকর নামে একজন জুনিয়র অফিসর। কিছুদিন থেকেই ডিমাপুর সাব-অফিসের কাজে গাফিলতি দেখা যাচ্ছিল। বার বার নির্দেশ দিয়েও ফল হয়নি কোন। ফলে বাধ্য হয়ে কোন নোটিশ না দিয়েই যেতে হল ইন্স-পেক্শনে।

যা ভেবেছিলাম।

কারলেকর অফিসের ভার সুব্রতর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের কোয়ার্টার্সে দিবানিদ্রা উপভোগ করছেন। সারা অফিসে বিশৃঙ্খলা। পিওন দূরে দু'খানা বেঞ্চ জোড়া দিয়ে টানটান হয়ে শুয়েছে। অপর ক্লার্ক হরিচরণ শর্মা টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে টানছে সিগারেট। সুব্রত টাইপ করছে অফিসেরই একখানা চিঠি।

ঠিক এমনি সময়ে আমি গিয়ে হাজির।

শর্মা নিমেষে এ্যাটেনশন্ হয়ে দাঁড়াল। পিওনটা ছুটে এল আভূমি কুর্ণিশ করতে করতে।

সুব্রত উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আপনি স্যর, এমন অসময়ে—

ওর কথার জবাব না দিয়ে বললাম,—কারলেকর কোথায়?

মৃদু হাসল সুব্রত,—উনি তো এসময়ে অফিসে থাকেন না—তা খবর পাঠাবো কি?

—হ্যাঁ, পাঠান।—আমি বললাম নীরস কণ্ঠে,—আর শুনুন, আমি প্রত্যেকের কাজ ইন্সপেক্ট করব আজ। ঠিক যেমনটি আছে, দেখব। কোনরকম লুকো-চুরী করবার চেষ্টা করবেন না—

—সে চেষ্টা করেও কোন লাভ হবে না স্যার! তেমনি ধারালো হাসি হাসল সুব্রত।

কারলেকর এল শশব্যস্ত হয়ে। কৌশলে চেষ্টা করল আমায় অন্য দিকে আটকে রাখবার। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি, ডিমাপুর সাব-অফিসকে আজ শায়েস্তা করবই।

কারলেকরকে কঠোর স্বরে নিষ্ক্রিয় থাকতে আদেশ দিয়ে ইন্সপেক্শন শুরু করলাম আমি। সব ভণ্ডুল, সব গোল-মাল। একমাত্র সুব্রত'র কাজই রয়েছে যথাযথ, বাকী সব কিছুতে বোধ হয় হাত পড়েনি ছ' মাসেও।

কৈফিয়ত তলব করলাম কারলেকরের।

ইন্সপেক্শন শেষ করতে সন্ধ্যা নামল। আজ আর ফিরে যাওয়া চলে না ধুবড়ী।

সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করলাম,—এখানে ভাল হোটেল আছে মিঃ ঘোষ?

—হোটেল! সুব্রত হাসল,—হোটেল কোথায় এখানে? সবাই পালিয়েছে যুদ্ধের হিড়িকে। হোটেল-রেস্তোরাঁ, দোকান-পাট তুলে ব্যবসায়ীরা সব সরে পড়েছিল

প্রান্তরে। এখনো কেউ বিশেষ ফিরে আসেনি তাদের।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আমার। এখন উপায়? অফিসে তো আর সত্যি সত্যি রাত কাটানো যায় না। ওদিকে কারলেকরের আতিথ্য স্বীকার করাও অসম্ভব।

সুব্রত আমার দুশ্চিন্তা অনুমান করতে পারল বোধ হয়। একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে,—যদি কিছু মনে না করেন স্যর, আমার ওখানে থাকতে কি খুব অসুবিধে হবে আপনার?

কিন্তু সমস্যা সেখানেও। অফিসার হবার জ্বালা। কিন্তু উপায় নেই। সম্ভ্রম বজায় রাখতে গেলে না খেয়ে অফিসে রাত কাটাতে হয়।

অনন্যোপায় হয়ে বললাম,—কিন্তু আপনার অসুবিধে হবে না?

সুব্রত এবারে হাসল। বললে,—আমারই দাদা যদি আসতেন, তাঁকে কি না খাইয়ে অফিসে ফেলে রাখতাম স্যর? অসুবিধে মনে করলেই অসুবিধে—

অগত্যা ওর বাসাতেই উঠলাম গিয়ে। জীপটা পড়ে রইল সামনের মাঠে। ওর চাকরকে পাঠিয়ে বাজার করিয়ে আনল সুব্রত।

দুখানা মাত্র ঘর আর একফালি বারান্দা—তা ঘিরে নিয়ে আবার রান্নাঘর হয়েছে। আমি গিয়ে একখানা ঘর দখল করলাম।

স্ত্রী সুলতা ঘোষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সুব্রত। অদ্ভুত অ্যাকমপ্লিশড্ মহিলা। সুব্রতর মতই স্পষ্ট ও মিষ্টভাষী, মিতভাষীও বটে।

তা কী যত্নটাই যে করলে ওরা, কী বলব!

সে রাত্রে খাওয়ার আগে আমরা তিনজনে বসে অনেক গল্প করলাম। অফিসের গল্প নয় কিন্তু। সে রাত্রে অফিস এবং পদমর্যাদাটাকে ভুললাম প্রাণপণে। মিশলাম অন্তরঙ্গ হয়ে। এবং ওরাও।

ভারত পর্যটন সেদিন কাজে লাগল আমার।

মিসেস্ ঘোষ বললেন,—আপনি তো বহু দেশে ঘুরেছেন মিঃ আয়ার—শোনান না কিছু গল্প।

—দেশের গল্প তো পড়লেই জানা যায়—বললে সুব্রত,—আপনি বরং আপনার শিকারের কাহিনী শোনান স্যর। শুনেছি, আপনি খুব বড়ো শিকারী।

—বড়ো-সড়ো নয় মিঃ ঘোষ—আমি কুণ্ঠিত স্বরে বললাম,—তবে ওটা আমার একটা নেশা বটেই। কিন্তু সে-সব গল্প কি আর ভাল লাগবে আপনাদের—

—কী যে বলেন আপনি! সুলতা অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বললে,—নিন, শুরু করুন তো—

তা শিকারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা তো হয়েছে বই কি! কুমায়ুনের পাহাড় আর সুন্দরবনের জঙ্গল, মাইশোরের রিজার্ভ ফরেষ্ট আর নাগরা হিলসের গহন অরণ্য—এ সকলের সঙ্গেই তখন অল্প-বিস্তর পরিচয় ঘটে গেছে আমার। শিকার অভিযানের তো আর মা-বাপ ছিল না। এই সব থেকে বেছে বেছে কয়েকটা থ্রিলিং কাহিনী শোনালাম ওদের।

শুনতে শুনতে কখনো ওঁরা শিউরে উঠলেন ভয়ে, কখনো আতঙ্কের ছাপ পড়ল চোখে-মুখে, কখনো বা আনন্দের উচ্ছ্বাস। গল্প বলে এর চেয়ে বেশী আনন্দ আমি কখনো পাইনি।

সে রাত ভুলব না।

সুব্রতকে বললাম,—শুধু আমার কথাই বলে যাচ্ছি আপনাদের কথাও শুনি কিছু! আপনারাও তো সেই সুদূর বেঙ্গল থেকে এসে পড়ে আছেন এই ডিমাপুরে আউট-পোষ্টে। বলুন না আপনাদের কথা—শুনি—

সুব্রত লজ্জিতভাবে হাসল,—আমার জীবনে কোন গল্প তো দেখিনে স্যর। যদিও বা থাকে কিছু, তাও পারিনে ঠিকমত গুছিয়ে বলতে। সুলতা যদি রাজী থাকে, ও-ই বলুক কিছু—

আমি কৌতূহলী চোখে সুলতার দিকে তাকাতেই সে বললে হেসে,—আজ রাত হল মিঃ আয়ার। রাত জাগলে অসুবিধে হবে আপনার, আজ থাক। কাল তো আবার অনেকটা পথ ছুটতে হবে আপনাকে—

—তা হোক—আমি বললাম।

মিসেস্ ঘোষ কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল কিন্তু, বললে,—আপনি তো ধুবড়ী যাচ্ছেন কাল। আমার একটা উপকার করবেন?

—সানন্দে। আমি বললাম,—অবশ্য আমার সাধ্যের মধ্যে যদি হয়—

—আমায় একটা লিফ্‌ট দিয়ে দিন না ধুবড়ীতে, আপনি তো যাচ্ছেনই—সুলতা বললে।

—বেশ তো—আমি সোৎসাহে বললাম,—ধুবড়ীতে কোথায় যাবেন?

—বিদ্যাপাড়া রোডে।—সুলতা বললে,—দাদা ওখানে এসেছেন বদলী হয়ে, দেখা করব ভাবছি। কতদিন যে দেখিনি ওঁদের—

মিঃ আয়ার থামলেন একমুহূর্ত। উঠে জানালা দিয়ে দগ্ধ চুরুটটা ফেলে দিলেন বাইরে। তারপর বললেন সহাস্যে,—কি বলব মিঃ ত্রিপাঠী, সেদিন সুলতা যা খাইয়েছিল, জীবনে অমন সুস্বাদু খাদ্য খাইনি আমি। জানেনই তো, খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার নেই আমার। সুলতাকে জানিয়েছিলাম সেকথা—পাছে বিব্রত হয়। তা কি খাওয়ালেন জানেন? ব্রহ্মপুত্রের ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে একটা কচুর শাক, আর সাধারণ ডাল তরকারী। কিন্তু কী যে উপাদেয় লেগেছিল—বাঙালী মেয়েদের ওপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গিয়েছিল চারগুণ। কিন্তু যে কথা বলছিলাম—

পরদিন সুলতা এসে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙাল আমার।

—আর কত ঘুমুবেন মিঃ আয়ার—দরজায় ধাক্কা দিলে সুলতা,—সাতটা বাজে যে—

মনে হল, যেন ধুবড়ীর বাংলোয় শুয়ে আছি, বেয়ারা এসে দিয়ে যাচ্ছে বেড-টী। কিন্তু সুলতার কণ্ঠস্বরের সহজ আত্মীয়তার সুরে আমার তন্দ্রা ছুটল।

উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি।

সুলতার চাকর দেখি দাঁড়িয়ে আছে তোয়ালে, জল, মাজন নিয়ে।

বেরিয়ে আসতে সুলতা আবার বললে,—তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে নিন দেখি—জলখাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে—

—মিঃ ঘোষ কোথায়? চোখে জল ছেটাতে ছেটাতে বললাম আমি।

—বাজারে। রান্নাঘর থেকে জবাব দিল সুলতা।

জলযোগ করতে করতে বললাম হেসে,—অভ্যাসটা কিন্তু খারাপ করে দিচ্ছেন মিসেস্ ঘোষ। এত যত্নের

শতাংশও তো আশা করতে পারব না ঠাকুর-চাকরের সংসারে—

মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল সুলতা। কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে বললে, —মিঃ আয়ার, জীবনে সব কিছুই কি আর ঠাকুর-চাকরের কাছে আশা করা যায়!

ভুল করে হয়তো কোন দুর্বল স্থানে আঘাত করে ফেলেছি ভেবে মনে মনে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে থাকল আমার। এক রাত্রির পরিচয়ে প্রায় ভুলেই গেছি—আমি সুব্রতর ডিভিশনাল অফিসার আর ও আমার অনেক নীচের একজন সামান্য কেরাণী মাত্র। আমার তখন বয়স অল্প, মনটা তখনো অনেকটাই স্পোর্টস্‌ম্যান, পরকে আপন করে দেখবার ইচ্ছেটাও কম নয়।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, সুলতা হয়ত সহজ সত্যি কথাটাই বলেছে। তবু তার মধ্যে কোথায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি ব্যবধানের সুর। আমি ভিনদেশী, আমি অন্য সমাজের মানুষ, জীবনের আলাদা স্তরে আমার গতি-বিধি। সুলতার কথাটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইল কথাগুলি। আমার ঠাকুর আছে, চাকর আছে, তাদের উপর কর্তৃত্ব করি, প্রভুত্ব করি অর্থের সামর্থ্যে। সুলতা-সুব্রত'র সে সামর্থ্য হয়ত নেই, তবু ওদের যা আছে, আমার তা নেই। নেই সেই সুখী গৃহকোণ।

সুলতার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ভাল করে। সাধারণ শাড়ী-ব্লাউজে নিতান্তই আটপৌরে মেয়ে। শুধু চোখে-মুখে উজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তার ছাপ ওকে অনন্য করেছে।

ধীর কণ্ঠে বললাম আমি,—আপনার কথা হয়ত সত্যি মিসেস্ ঘোষ। কিন্তু তবু বলব, আমার প্রায় কোন আশাই অপূর্ণ থাকেনি। কিন্তু জোর করে কি বলতে পারি, সব পেয়েও শান্তি পেয়েছি, স্বস্তি পেয়েছি? পারিনে মিসেস্ ঘোষ, হয়ত কেউই পারে না—

—সেটা মানুষের স্বভাব—এবার মৃদু হাসল সুলতা,—মানুষ কোন অবস্থাতেই যে সন্তুষ্ট নয় মিঃ আয়ার। মানুষের সব অগ্রগতির মূলেই তো এই অসন্তোষ, এই অতৃপ্তি—

হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললাম, —[illegible] ফিরলেন না এখনো?

—কিন্তু কেন এখুনি—পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে সুলতা আবার বললে,—তবু এই নিত্য অতৃপ্তির মাঝেও আমরা একটু শান্তি চাই। সে শান্তি দিতে পারে আমাদের একান্ত আপন জনই শুধু। তাঁরা আর যেই হোক, ঠাকুর-চাকর নিশ্চয়ই নয় মিঃ আয়ার—

আমি বললাম আবার,—কিন্তু আটটা যে বেজে গেল। আর তো অপেক্ষা করতে পারিনে মিসেস্ ঘোষ—

—আমিও যাব ভেবেছিলাম যে—সুলতা ফিরে এল [illegible] অন্তরঙ্গতায়,—[illegible] গেলেন নাকি?

—ওঃ, ভুলে গিয়েছিলাম সত্যি, মাপ করবেন। বললাম আমি,—দশটার মধ্যে নিশ্চয়ই বেরুতে পারব আমরা—

—নিশ্চয়!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল সুব্রত।

ত্বরিৎ হাতে রান্না শেষ করে নিল সুলতা। আমরা ততক্ষণ স্নান সেরে প্রস্তুত। খাওয়া সরলাম তিনজন একসঙ্গে বসে।

খাবার মুখে সুলতা বললে সুব্রতকে—এই ক'দিনে খুব বেশী অসুবিধে বোধ হয় হবে না তোমার, কি বলো? পঞ্চম খাবা রইল—সব ও-ই করে দেবে। শনিবারের মধ্যে আমি নিশ্চয় ফিরব—কেমন?

সুব্রত বেরুল অফিসে। আমিও গাড়ী ছাড়লাম সুলতাকে পাশে বসিয়ে। আমার হাতে ষ্টীয়ারিং। জীপ ছুটল পার্বত্য চড়াই-উৎরাই ভেঙে তীর বেগে। ডিমাপুর থেকে ধুবড়ী।

একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে বললাম হেসে,—আপনার সাহস তো কম নয় মিসেস্ ঘোষ!

—কেন? সকৌতুকে বললে সুলতা।

—একদিনের পরিচয়ে এই পাহাড়ী পথে অনায়াসে সঙ্গ নিলেন আমার? আমি বললাম হাসতে হাসতে,—অথচ কতটুকু আমার জানেন আপনি? ধরুন, লোকটা আমি খারাপও তো হতে পারি।

সুলতা মধুর হাসল। এ হাসি ওর পক্ষেই সম্ভব।

স্থির অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে,—মেয়ে মানুষের পুরুষ চিনতে ভুল হয় না মিঃ আয়ার।

—হয় বইকি! আমি সকৌতুকে বললাম,—সব পুরুষই কিছু বিশ্বাস-যোগ্য নয়তো!

—হয়ত নয়—সুলতা সঙ্গে সঙ্গে বললে,—কিন্তু কি জানেন, সব পুরুষেরই প্রথম আশ্রয় নারীগর্ভ। পুরুষ নারীকে সবচেয়ে কখন বেশী ভালবাসে আর শ্রদ্ধা করে জানেন তো? নারী যখন মা হয়, তখন—মাতৃরূপেই পুরুষের সবচেয়ে প্রিয়। না হলে—

—না হলে কী?

—[illegible] কথা শুনে আপনার কোন লাভ নেই মিঃ আয়ার—সুলতা ঠোঁট চেপে হাসল।

আর অনুরোধ করা উচিত নয় জেনেও বলে ফেললাম,—যদি একান্তই আপত্তি না থাকে আপনার, তবে বলুন না মিসেস্ ঘোষ। এতখানি পথ পার হতে হতে না হয় আজ আপনার কাহিনীটাই শুনি। কাল কথা দিয়েছিলেন কিন্তু—

—বলতে আমি পারি মিঃ আয়ার—একটু ইতস্ততঃ করে সুলতা বললে,—তবে একটি সর্ত আছে। গল্পের মাঝে বা পরে কোন প্রশ্ন আপনি করতে পারবেন না—

—তথাস্তু—সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

মিঃ আয়ার থামলেন।

—আহা-হা, থামছেন কেন মশাই, —মিঃ শিখণ্ডি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন,—আচ্ছা বেরসিক তো আপনি। চালান, চালিয়ে যান—

মিঃ আয়ার আর একটা চুরুটে অগ্নি-সংযোগ করলেন। তারপর বলতে লাগলেন—জিপ ছুটছে হু-হু করে। ঝড়ো-হাওয়া এসে ঢুকছে খোলা দ্বার-পথে। আকাশে এমনি মেঘের ঘনঘটা। চূর্ণ কুন্তল আর শাড়ীর আঁচল উড়ছে সুলতার।

কয়েক মিনিট ভেবে নিয়ে সুলতা শুরু করল।

একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের কাহিনী। ছেলেটির সাতাশ, আর মেয়েটির উনিশ। নাম? ধরুন না, দীপক আর শিপ্রা। দীপক চাকরী করে, বাড়ীর অবস্থাও মোটামুটি খারাপ নয়। শিপ্রা কিন্তু গরীবের মেয়ে। মা-বাপ নেই। অভিভাবক দাদা পারেন না সংসার

চালাতে সামান্য আয়ে—তাই অনেক চেষ্টায় শিপ্রাও জুটিয়ে নিয়েছে একটি চাকরী।

এই রকম একটা অবস্থায় ওদের দুজনে পরিচয় হল, হল ঘনিষ্ঠতা এবং অবশেষে পরিণামে যা হয়ে থাকে—তাই হল। সুলতা ঢোক গিলে নিয়ে বললে,—অন্তঃসত্ত্বা হল শিপ্রা।

এবং সেই মুহূর্তে অধিকাংশ ভাব-প্রবণ, মেরুদণ্ডহীন ছেলে যা করে থাকে, দীপকও তাই করলে। চুপি চুপি বললে এসে,—ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিচ্ছি শিপ্রা, এটাকে—

কঠিন স্বরে শিপ্রা বললে,—না!

—কিন্তু এযে কলঙ্ক! ভীরু কণ্ঠে বললে দীপক।

কলঙ্ক কেন! শিপ্রার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা,—তুমি স্বীকৃতি দাও—

—বিয়ে! যেন আঁৎকে উঠল দীপক। যেন ভূত দেখেছে দিন-দুপুরে, এমনি ভাবে।

—ভয় পাচ্ছো? এগিয়ে এসে ওর দুটো হাত চেপে ধরল শিপ্রা,—দীপক যে ভুল হয়ে গিয়েছে, তার বোঝা আর না বাড়িয়ে সহজ পথে তার মীমাংসাটাই ভাল নয় কি?

—কিন্তু এ যে অসম্ভব? ভঙ্গুর কণ্ঠে দীপক বললে.—বিয়ে আমি এখুনি কেমন করে করব শিপ্রা? বাড়ীতেই বা মত দেবে কেন?

শিপ্রার সারা শরীরটাই যেন রী-রী করে উঠল রাগে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে,—যখন আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলে, তখন কি বাড়ীর মতটা নিয়ে এসেছিলে দীপক? প্রেম কি তোমার কাছে নিছক ছেলেখেলা?

দীপক রেগে গেল। বললে,—ভুল যদি হয়েই থাকে, তবে তাতে তোমারও হাত ছিল। তাই বলে আজীবন আমি সেই ভুলকে বয়ে বেড়াতে পারব না—

কী বললে! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল শিপ্রা,—এ-ই তোমার প্রেম! কিন্তু আমি, আমি কেমন করে মুখ দেখাব, বলতে পারো?

—বললাম তো চলো ডাক্তারের কাছে—

না! তীব্র প্রতিবাদ করল শিপ্রা,—আমি অন্যায় করিনি, ভুল করিনি। আমি কেন হত্যা করব আমার সন্তানকে? কেমন করে একথা তুমি বলতে পারলে দীপক? কিন্তু জেনে যাও তুমি, আমার এ সন্তানকে স্বীকৃতি দিতেই হবে তোমাকে—

—বিয়ে করে? যেন ব্যঙ্গ করল দীপকের উদ্ধত জিজ্ঞাসা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—দৃঢ়তর কণ্ঠে বললে শিপ্রা,—আমি যাব তোমার বাবা-মায়ের কাছে. প্রয়োজন হলে শরণ নেব আইনের। তোমার সব চিঠিপত্রই আছে আমার কাছে, আছে ফটো। দরকার হলে ব্যবহার করব সব—

ভীত হয়ে দীপক বললে,—এই কেলেঙ্কারী নিয়ে তুমি অদালতে যাবে শিপ্রা?

—যদি তুমি আমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার না করতে চাও—মুখ ঘুরিয়ে শিপ্রা বললে,—যদি আমার সন্তান পিতৃ-পরিচয় থেকে বঞ্চিত হবে বলে মনে করি—

—পারবে?

—কেন পারব না? রুখে উঠল শিপ্রা,—যে মানুষের কাছে প্রেম পশু-প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়, দায়িত্ব নেবার প্রশ্নে যার মাথায় বজ্রাঘাত হয়, যে নিজ সন্তানকে হত্যা করবার কথা বলতে পারে অবলীলাক্রমে, তার বিরুদ্ধে যে কোন অস্ত্র ব্যবহার করতে আমার সঙ্কোচ নেই।

বলতে বলতে ভারী হয়ে এল শিপ্রার গলা,—কিন্তু তোমার এ পরিচয়টা যদি আগে পেতাম দীপক, তবে কুকুরের মত বাড়ীর বার করে দিতাম তোমায়। কিন্তু হাত-পা আমার বাঁধা, তোমার স্বামীত্ব স্বীকার করা ছাড়া গতি নেই আমার—

বক্রকণ্ঠে দীপক বললে,—বেশ তাই হোক তবে। দশারণ্যে প্রকাশ পাক তোমার চরিত্র। আমিও প্রমাণ করব, তুমি চাকরী করতে, একাধিক পুরুষের সঙ্গে তোমার অবৈধ সম্পর্ক ছিল; প্রমাণ করব এ সন্তান আমার নয়—

শেষ হল না কথা, শিপ্রা ঝাঁপিয়ে পড়ল দীপকের মুখের ওপর। নখে-দাঁতে চাইল তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে।

অপমানাহত নাগিনীর কণ্ঠস্বরে জাগল প্রলয়ের সুর—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এ ঘর ছেড়ে। শয়তান, কুকুর কোথাকার—

চীৎকার শুনে ছুটে এলেন দাদা-বৌদি, কিন্তু দীপক ততক্ষণে রাস্তায়। শিপ্রার দুচোখের বহ্নিজ্বালা তখন রূপায়িত হয়েছে অশ্রুবন্যায়।

দাদা-বৌদির উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে, অবিন্যস্ত শাড়ীটাকেই কোনমতে গায়ে জড়িয়ে দ্রুত পায়ে শিপ্রা বেরিয়ে এল পথে। মনে মনে উচ্চারণ করল দারুণ শপথ। বার বার বলল মনের মধ্যে, কোন লজ্জা নয়, কোন সঙ্কোচ নয়, দ্বিধা নয় কোন। লুটিয়ে দিতে হবে পায়ের তলায় ওই জানোয়ারটার মাথা। তার জন্যে সর্বস্ব পণ শিপ্রার।

থামলেন মিঃ আয়ার।

মিঃ ত্রিপাঠী বলে উঠলেন,—কি হল, কি হল, থামছেন কেন? এই নিন, সিগার নিন আর একটা। এখন থামলে চলবে না মশাই—

—ক্ষিধেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে যে! মিঃ আয়ার হাসলেন মৃদু স্বরে।

—ড্যাম্ ইয়োর ক্ষিধে—রাগতঃ কণ্ঠে বলে উঠলেন কৃপাল সিং,—নো ডিস্টার-বেন্স নাউ। শুরু করুন জলদি—

বাইরে আকাশ ভেঙে নেমেছে বৃষ্টি। ডাক-বাংলোর কাচের শার্সি-দেওয়া জানালায় চট্‌পট্ শব্দে এসে আছড়ে পড়ছে বড় বড় জলের ফোঁটা। আকাশ-টাকে ফালা ফালা করে চিরে চিরে ফেলছে যেন বিদ্যুতের তীক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা। অনন্যোপায় মিঃ আয়ার অগত্যা শুরু করলেন আবার—

—হ্যাঁ, মিসেস্ ঘোষ ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, আজ এতদিন পর সেইভাবে বলা সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছেন। সব কথা মনেও নেই। আর যে লোক শিকার করে বেড়ায় তার পক্ষে গল্প জমানো সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাক, যা বলছিলাম—

তা শিপ্রা তো বেরিয়ে এল পথে। কলকাতার লেফ্‌-গিস্-গিস্ রাজ-পথে কুমারী জীবনের সবচেয়ে বড় লজ্জা আর অসম্মান মাথায় করে দাঁড়িয়ে তার মনে হল, এবার সে কোথায় যাবে? সাহায্য চাইবে কার? আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে সে যখন নিরুপায়ের মত চলতে চলতে এসে দাঁড়িয়েছে গড়িয়াহাটের মোড়ে, তখন আচমকা তার মনে পড়ল সমর সেনের নামটা। তারু স্বর্গত দাদার ক্লাস মেট, বর্তমানের নামী উকীল, সমর

সেন। কিন্তু একরাশ লজ্জা এসে যেন গ্রাস করল তাকে—একথা নিয়ে কেমন করে সে যাবে তাঁর কাছে?

অনেক ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত মন বাঁধল শিপ্রা।

লজ্জার সময় নয়। লজ্জা করলে মান বাঁচবে না, মনুষ্যত্ব বাঁচবে না। এক তীব্র প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি তাকে টেনে নিয়ে গেল উকীল সমর সেনের বাড়ীতে।

কেমন করে যে সমর বাবুকে সব গুছিয়ে বলতে পারল শিপ্রা, সব খুলে, মনের সকল অর্গল উন্মুক্ত করে, সে এক বিস্ময়। তবু পারল। বলতে বলতে তার দুচোখে জলের ধারা নামল, হাতের আঙুলে কাঁপন থরথরিয়ে।

তারপর এক সময় বললে,—আমার সব কথাই আপনাকে খুলে বললাম কাকাবাবু। এখন আমার মরা-বাঁচা আপনার হাতে—

গম্ভীর মুখে সব শুনলেন সমর সেন। দুচোখে তাঁর ঘনিয়ে এল ভ্রূকুটি। দাঁতে দাঁত চেপে, তীব্রকণ্ঠে বললেন তিনি,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা। সব চিঠিপত্র এবং ফটো যা কিছু তোমার সম্বন্ধে প্রমাণ হতে পারে বলে মনে করো, সব কালই এসে দিয়ে যেও আমায়। ওকে আমি জেলের ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়ব মাথা না নোয়ালে—

শ্রদ্ধানত একটি প্রণাম রেখে লজ্জারক্ত শিপ্রা বেরিয়ে এল।

এবং সাতদিনের মধ্যেই আদালতের সমন পেল দীপক।

চিন্তার অন্ত নেই দীপকের। তার সরকারী চাকরী—কোর্ট-কাছারী হলে চাকরীটা নিয়ে টানাটানি পড়বে! কিন্তু সেদিনে ওই ব্যাপারের পর আর কোন্ মুখে যাওয়া যায় শিপ্রার কাছে। তাছাড়া মিটমাট করে নেবার অর্থই তো বিয়ে করা। তাতে বাড়ীতে সব কিছু জানাজানি হয়ে যাবে—কী অপরিসীম লজ্জা!

সমন পেয়ে সেও গিয়ে ধর্ণা দিল এক উকীলের বাড়ীতে।

তারপর শুরু হল মামলা। কোর্টে লোকে লোকারণ্য। অভ্রান্ত প্রমাণ সমর সেনের হাতে—তাঁর তীক্ষ্ণ বাক্যজাল ঝড়ের মত উড়িয়ে নিয়ে গেল প্রতিপক্ষের সব যুক্তি। পর পর তিন দিন। তারপর যুক্তি-যুদ্ধ থামল, যখন, সকলেই বুঝল, দীপকের কোন আশা নেই। এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করলে দীপকও।

তারপর একদিন বিকেল।

চুপি চুপি দীপক এসে ঢুকল শিপ্রার ঘরে। সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরেছে শিপ্রা, চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ।

দীপককে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। বললে,—কেন এসেছ তুমি আবার? কী দরকার?

—যা হবার হয়ে গেছে শিপ্রা—[illegible] আকুতিতে শিপ্রার দুটি হাত জড়িয়ে ধরল দীপক,—আমায় তুমি বাঁচাও—

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল শিপ্রা,—লজ্জা করে না এখন ভিক্ষে চাইতে? সেদিনের কথাগুলি কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ?

করুণ কণ্ঠে দীপক বললে,—আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে শিপ্রা। মামলার কথা সব জায়গায় জানাজানি হয়ে গেছে। বাড়ীতে আমার মুখ দেখতে পর্যন্ত চায় না কেউ। শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা। অফিসে সাসপেন্ড করেছে—রায় বেরুলে চাকরীটাও হয়ত যাবে। তুমি আমায় বাঁচাও শিপ্রা—যা বলবে, আমি রাজী!

স্থির দৃষ্টিতে দীপকের চোখে চোখে তাকিয়ে শিপ্রা বললে,—তুমি এমন জীব একটা, যাকে করুণা যদি বা করা চলে, ভালবাসা চলে না। তোমাকে স্বামী বলে ভাবতে আমার মাথা মিশছে মাটিতে। কিন্তু এত অল্পে তোমায় ছেড়ে দেব, সে কোন বিশ্বাসে? তুমি যে বিশ্বাস-ঘাতক!

—জানি, অনুরোধ করবার অধিকার আমি হারিয়েছি,—দীপক বললে ক্ষীণ কণ্ঠে,—তবু বলছি, এবার তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারো শিপ্রা। আমায় আশ্রয় দিতে পারো। বাঁচাতে পারো অ-আমাকে—

—বিয়ে করে? সেদিনের দীপকের মুখের কথাটাই যে আজ শিপ্রার মুখে এমন কঠিন হয়ে বাজবে, কে ভেবেছিল!

তবু দীপক বললে,—না, ক্ষমা করে। তোমাকে বিয়ে করে এবং আমার কর্তব্য মেনে নিয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই শিপ্রা—

—জামিন?

—জামিন নেই। দীপক ক্ষণে হাসল,—যে একবার বিশ্বাস হারিয়েছে, তার কোন জামিনই তো গ্রাহ্য নয় শিপ্রা। জামিন, তোমার ক্ষমা—

—বেশ। স্থির কণ্ঠে শিপ্রা বললে,—চলো আমার সঙ্গে সমর সেনের বাড়ীতে। তিনি যা বলেন, তাই হবে—

এমনটি হবে, প্রবীণ উকীল সমর সেন তা জানতেন। তবু তিনি একবার বাজিয়ে নিলেন।

বললেন শেষে,—যদি কোন চক্রান্ত করে আপনি এসে থাকেন, তবে তার ফল কড়ায়-গণ্ডায় আপনাকে শুধতে হবে দীপকবাবু। মনে রাখবেন কথাটা—

বেরিয়ে এসে শিপ্রা বললে,—বিয়ে হবে রেজিস্ট্রী করে। সাক্ষী থাকবেন আমার পক্ষে সমর সেন এবং দাদা। তোমার দিক থেকে অন্ততঃ একজন চাই—

—সব আমি ব্যবস্থা করেই এসেছি শিপ্রা—সোৎসাহে দীপক বললে।

—আর একটি কথা,—ধীরে ধীরে, চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল শিপ্রা,—বিয়ের পর তিন বছর না গেলে ডিভোর্স সম্ভব নয়। এই তিন বছর একসঙ্গেই থাকতে হবে আমাদের, অন্ততঃ এক বাড়ীতে—গত্যন্তর নেই। কারণ এ নিয়ে আমি ঢাক পেটাতে চাইনে। কিন্তু সেই সুযোগ এক দিনের জন্যেও নিতে পারবে না তুমি। বরং তিন বছর পর মিউচুয়াল ডিভোর্সের জন্য প্রস্তুত থাকবে। রাজী?

—শিপ্রা! অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল দীপক।

—হ্যাঁ, এই চুক্তি। দাঁত চেপে শিপ্রা বললে,—আমি শুধু আমার সন্তানের স্বীকৃতি চাই, তোমার মত মানুষের স্বামীত্ব চাইনে দীপক। পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, চাকরী, সামাজিক সম্মান—তোমার এ সবকিছুর বিনিময়ে এই আমার সর্ত। বলো, রাজী?

অপমানাহত পাণ্ডুর মুখে দীপক বললে, তুমি যা বলবে তাতেই রাজী, এ কথা বলেছি আমি। তুমি যদি সত্যিই তাই চাও—

যথা নিয়মে অতঃপর হয়ে গেল বিয়ে।

দুই চকুরিয়া স্বামী-স্ত্রী এসে উঠল শ্যামবাজারের এক ছোট ফ্ল্যাটে। মাঝে কিন্তু তাদের পাহাড়-প্রাচীর। আর, এক অনাগত সন্তানের সম্ভাবনা। এক বাড়ীতে থেকেও মুখ দেখা-দেখি নেই,

কথা নেই একটিও। এমনকি একজনের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে চলে অপরে। অথচ পাশের লোকে জানে, তারা স্বামী-স্ত্রী।

সুলতা একবার আমার দিকে কটাক্ষ হেনে বললে, বলুন তো মিঃ আয়ার, পরিস্থিতিটা কেমন? দুজন সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে অফিসে যায়। ঝি রান্না করে, পাশাপাশি বসে খায় দুজনে। ছুটির দিনের দুপুর-বিকেলে এ ঘরে বসে কেউ আগতপ্রায় সন্তানের জন্য কাঁথা সেলাই করে, সেলাইকল চালিয়ে শিশুর পরিধেয় বানায়। ও ঘরে বসে অন্যজন ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে মোপাঁসা আর মম্। মাঝের দরজা খোলাই থাকে—দুজনেই দুজনকে দেখতে পায় তাকালে। অথচ কেউই তাকায় না। পরম নির্লিপ্ত একে অন্যের উপস্থিতি সম্বন্ধে। চোখে চোখ পড়ে না, প্রীতি প্রেমের বান ডাকে না, কথার ফোয়ারা ছোটে না। বলুনতো মিঃ আয়ার, এ কেমন কাহিনী? একি বিশ্বাস করবার মত? তবু এই-ই জীবন। বাস্তব হয়েও কল্পনার চেয়ে কম আশ্চর্য নয়।

তারপর সেই দিনটি এল।

ঝি ডেকে দিল গাড়ী, শিপ্রাকে পৌঁছে দিয়ে এল হাসপাতালে।

যাকে কেউ হৃদয়-নিংড়ানো স্বপ্ন দিয়ে কামনা করেনি কোনদিন, যাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ-আনন্দের বান ডাকবে না কখনো, সে এল। তবু তার প্রথম চোখ মেলে দেখা পৃথিবীতে চাঞ্চল্য জাগলো, নার্স-ডাক্তার বেড়ালো ছুটোছুটি করে। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে করতে শিপ্রা একটি ক্ষীণ কান্নার শব্দ শুনতে পেল।

দাদা বৌদি এসেছিলেন পরদিন। শিপ্রার কোলের কাছে শোয়ানো শিশুটিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা,—কী সুন্দর ছেলে হয়েছে তোর!

বিস্ময়-বিহ্বল চোখে শিপ্রাও দেখেছিল তার নাড়ী-ছেঁড়া প্রথম সন্তানকে। প্রথম আনন্দের রেশ কাটিয়ে একটা তীব্র আঘাত বেজেছিল বুকে, দীপকের ছেলে! ছিঃ!

হাসপাতাল থেকে বিদায়ের দিন নার্সকে আড়ালে ডেকে তার হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিতে সে সংকুচিত হয়ে বললে,—আবার কেন? খোকার বাবা এসে কাল তো মোটা বকশিস করে গেলেন আমাদের—

—খোকার বাবা! এত বড় বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল শিপ্রার জন্যে, কে জানত!

—হ্যাঁ—নার্স বললে হেসে, দীপকবাবু তো রোজই আসেন সন্ধ্যের পর। দেখে যান খোকাকে। আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেন। ছেলে হওয়ার দিন নিজে মিষ্টি কিনে খাইয়ে গেলেন আমাদের—

—ও!—একটা অদ্ভুত অনুভূতি শির শির করে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল শিপ্রার। এটা আনন্দের, না ক্ষোভের বুঝতে পারল না সে। তবু জড়িয়ে ধরল ছেলেকে এক অভূতপূর্ব আবেগে।

অনেকদিনের ছুটি শিপ্রার, অফিসের তাড়া নেই। খুশি খুশি মন। ছেলেকে নিয়ে কল্পনার রাশ আলগা করে দিয়েছে সে। গুনগুনিয়ে ঘুমপাড়ানী গান গায়। ছেলেকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, নোংরা পরিষ্কার করা—কাজের কি অন্ত আছে? খোকার জন্যে রাজ্যের খেলনা কিনে এনেছে সে। তার বিছানা-বালিশ, জামা-জুতো, খেলনা—রাশি রাশি।

পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকায় দীপক। কান পেতে শোনে শিপ্রার ঘুমপাড়ানী গান। শিশুটার হাসি-কান্নার রেশ এসে বাজতে থাকে কানে। হাতে মোপাঁসা-মম্ ধরা-ই থাকে—মনটা যায় উদাস হয়ে।

কী এক আশ্চর্য অনুভূতি জাগে তার প্রাণে। তারই ছেলে, অথচ ধরার ছোঁয়ারও অধিকার নেই তার। এক্তিয়ার নেই তার ভালো-মন্দের কথা চিন্তা করবার। বাপ হয়েও সে ফালতু। সে চুক্তিবদ্ধ। ঐ শিশুটাকেই একদিন নিষ্ঠুর হাতে উৎপাটিত করে ফেলতে চেয়েছিল সে। পিতৃত্বের মর্যাদা রাখেনি, আজ অধিকার দাবী করবে কোন মুখে?

তবু মাঝে মাঝে মনটা আঁকুপাঁকু করে। ছোট্ট নরম মাংসপিণ্ডটাকে দু হাতে তুলে ধরতে ইচ্ছে করে বুকে। কিন্তু সে যে অসম্ভব। সারাক্ষণ খোকাকে আগলে বসে আছে শিপ্রা। আদর করছে, ধমক দিচ্ছে, অভিমান করছে খোকার সংগে। দীপক সেখানে অযাচিত। দূর থেকে, বইয়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে দেখা ছাড়া আর তো করবার নেই কিছু।

এমনি একদিন—

খোকার জন্যে বোধ হয় দুধ গরম করতে রান্নাঘরে গিয়েছিল শিপ্রা। ঘরে ঢুকে দেখল, একী কাণ্ড—মেঝেয় একটি দামী পেরাম্বুলেটর!

বিস্ময় কাটতে পাশের ঘরের দিকে তাকাল শিপ্রা। সেখানে দীপক কী একখানা বইয়ের মধ্যে ডুব দিয়েছে।

অনেকখানি অসন্তোষের সঙ্গে একটুখানি হাসি ছড়িয়ে পড়ল শিপ্রার ঠোঁটে। খোকাকে এনে পেরাম্বুলেটরটায় শুইয়ে দিয়ে ঘরময় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ালো শিপ্রা।

কী ভয়ই যে হয়েছিল দীপকের। ভেবেছিল, পেরাম্বুলেটরটা পাশের ঘরে ঠেলে দিয়ে হয়ত সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেবে শিপ্রা। কিংবা ওটার দামটা হয়ত ছুঁড়ে ফেলে দেবে মুখের ওপর। কিছুই তো অসম্ভব নয়!

চাকার শব্দ পেয়ে আড় চোখে তাকিয়ে আনন্দে যেন নেচে উঠল দীপকের অন্তরটা। খোকাকে বুকে তুলে নিয়েছে পেরাম্বুলেটরটা!

এর পর ক্রমশঃ সাহস বাড়ল দীপকের। খোকার পোষাক এল রকমারী। ডাক্তারের পরামর্শমত খাবার এল খোকার,—দোলনা এল।

এমনকি, একদিন শিপ্রার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে খোকাকে কোলে তুলে নেবার দুঃসাহসও সঞ্চয় করে উঠতে পারল দীপক।

কিন্তু দেখে ফেলল শিপ্রা।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে,—এমন কথা তো ছিল না—

অপরাধীর মত দীপক বললে,—এমন মনটাও ছিল না যে—

—মনের ওপর দখল রাখতে হয়। একটু যেন স্নিগ্ধ শোনাল শিপ্রার কণ্ঠস্বর।

প্রশ্রয় পাওয়া বেড়ালের মত আবদার-ভরা সুরে দীপক বললে, কোন দখলই তো ছিল না কোনদিন। আজ খোকাই যে রাগ ছিঁড়ে ফেলছে বার বার—

—ওর ঘুমুবার সময় হয়েছে—শিপ্রা শান্ত গলায় বললে।

—আমিই দিচ্ছি ঘুম পাড়িয়ে। খোকাকে বুকে জড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করে বেড়াতে লাগল দীপক। আবৃত্তি করতে থাকল গুনগুন করে, শুনে শুনে মুখস্ত হয়ে যাওয়া শিপ্রার ঘুম পাড়ানী গান।

আড় চোখে দেখতে লাগল শিপ্রা। দৃশ্যটা চমকপ্রদ। হালকা হয়ে আসছে

মন। আশ্চর্য হালকা। বাপের কোলে খোকা। বাপ! দীপক, সেই দীপক, যে ডাক্তারের ওষুধ খাইয়ে—

—না, না, আমার কাছে দাও ওকে, আমাকে দাও! ভয়ে যেন আর্তনাদ করে উঠল শিপ্রা।

থমকে দাঁড়িয়ে শিপ্রার চোখে চোখে তাকাল দীপক। সেখানে নির্ভরতা নেই। ধিকিধিকি জ্বলছে অবিশ্বাসের ছায়া। ধীরে ধীরে খোকাকে এনে শিপ্রার কোলে নামিয়ে দিল দীপক।

ভঙ্গুর কণ্ঠে বললে,—আমাকে বোধ হয় এখন বিশ্বাস করা চলত শিপ্রা—

ব্যথাহত চোখে একবার দীপকের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল শিপ্রা। খোকাকে বুকে চেপে ধরে বললে ক্লান্ত গলায়,—না, না, তা নয়, সে কথা নয়—ও কথা বলতে চাইনি আমি—

ধীর পায়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল দীপক। নিরুত্তর।

আবার দিন কাটতে লাগল আগেকার মত।

রূঢ় আঘাত পেয়ে দীপক আবার গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। শিপ্রা নিজের ব্যবহারে সংকুচিত। হাজার হোক, বাপ তো। যত অপরাধই থাক অতীতে, তা কি ভোলা যায় না এখনো? ছেলেকে একবার কোলে তুলে নেবার অধিকারও কি সে হারিয়েছে?

অন্যায় হয়ে গেছে, মনে মনে ভাবল শিপ্রা। এমন করে খোকাকে ছিনিয়ে নেওয়া তার উচিত হয়নি।

এদিকে উপুর হতে শিখল খোকা। বসতে শিখল, তারপর শিখল হামাগুড়ি দিতে। এখন সারা ঘর চষে বেড়ায় সে। এ ঘর, ও ঘর।

মুখে আবার কথাও ফুটছে দুটি একটি করে। আধো আধো কথা।

কী নেমকহারাম ছেলে, শিপ্রা ভাবে, প্রথমেই বলতে শুরু করেছে বা-বা-বা-বা—। মা বলতে শিখল না প্রথমে? খিল খিল করে হাসে আবার দন্তহীন মুখে, হাততালি দেয়। দোলে বসে বসে। বলতে পারে না কথা! তবু বলা চাই—বা-ব্বা-ব্বা-বা! অবাক করলে!

দীপক পারে না নিজেকে শান্ত রাখতে। পারে না লোভ সামলাতে। ওর দুহাত যেন আকুলিবিকুলি করে খোকাকে কোলে তুলে নেবার জন্যে। কিন্তু—

চুলোয় যাক কিন্তু। সব দ্বিধা কাটিয়ে আবার একদিন খোকাকে সে টেনে নেয় বুকে।

শিপ্রা এসে দাঁড়ায় পাশে। মৃদু হেসে বলে—এক নম্বরের পাজী—

—কে! চমকে ওঠে দীপক। তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেয় খোকাকে।

—খোকাটা—খোকাকে দীপকের কোলে আবার তুলে দিয়ে হাসতেই থাকে শিপ্রা,—যেমন বাপ, তেমনই তো হবে। সে যাকগে,—এবার যে মুখে ভাত দিতে হবে খোকার—

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দীপক। বুঝতে পারে না এই সহানুভূতি কোন ভবিষ্যৎ তিরস্কারের পূর্বাভাস কিনা।

শিপ্রা আবার বললে,—বয়স তো আর কম হল না ছেলের—দশ মাসে পড়েছে। এখন মুখে ভাত না দিলে আর কবে হবে?

শিপ্রার চোখে কী আশ্বাস খুঁজে পায় দীপক, সে-ই জানে।

কিন্তু নির্ভয়ে এবং সোৎসাহে সে বলে,—ঠিকই তো। কালই আমি ডেকে আনব পুরুত-ঠাকুর। তারপর একটা দিন ঠিক করে, সব্বাইকে নেমন্তন্ন করে—

—হ্যাঁ—শিপ্রা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে যায়,—আর দেরী করো না, কালই ডেকে এনো—

আনন্দে, উত্তেজনায় বুকের রক্ত যেন লাফালাফি শুরু করে দীপকের। শিপ্রা রাগ করেনি, এতদিনে ওকে স্বীকার করে দিয়েছে সে। দিয়েছে আপন অধিকার। আজ আর কেবল শিপ্রার নয়, ওদের দুজনের খোকা।

আদরে আদরে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে খোকাকে, চুমোয় চুমোয় রাঙিয়ে দেয় সর্বাঙ্গ।

খিলখিল হাসে খোকা। ওদের দুজনের মাঝে সেতু বাঁধবার আনন্দ যেন খোকাকেও উদ্বেল করে তুলেছে আজ।

তার পরের দিনগুলি কি আশ্চর্য রকমের হালকা। কী হয়েছিল, সে চিন্তা মনে আসেনি কোনদিন। কী চুক্তি ছিল, তিন বছরেও মনে পড়েনি কারো।

দু ঘরের আগল ভেঙে একাকার হয়ে গিয়েছিল সব। খেয়াল ছিল না কারো। দুজনের মাঝখানে শুয়ে খোকা কল্-কল্—খল্‌খল্ হেসেছে—দুপাশ থেকে দুজোড়া তন্ময় চোখ দেখেছে সেই খেলা, সেই হাসি। দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে দুজনের চোখেই কখন নেমেছে দিগন্তপ্রসারী আনন্দের জোয়ার। সব দেয়াল ধ্বসে পড়েছে ঐটুকু ছোট ছোট কচি হাতের ধাক্কায়। সব অন্ধকার ঘুচে গেছে কোলভরা ওই শিশুর আলোয়।

অনেক, অনেকদিন পরে, হঠাৎ একদিন কথাটা মনে পড়েছিল শিপ্রার। হাসতে হাসতে দীপককে সে জিজ্ঞাসা করেছিল,—হ্যাঁ গো, বিয়ের তিন বছর পরেই তো ডিভোর্স করা যায়, না?

উজ্জ্বল হেসে উত্তর দিয়েছিল দীপক,—তিন বছর পরে আর যায় না। ততদিনে খোকারা এসে যায় যে—

থামলেন মিঃ আয়ার।

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন মিঃ শিখণ্ড,—কি বিপদ, আবার থামছেন!

মৃদু হেসে মিঃ আয়ার বললেন,—গল্প তো হয়েই গেল আমার—

—হয়ে গেল মানে? মিঃ ত্রিপাঠী প্রতিবাদ জানালেন,—এই না বললেন, গল্পটা মিসেস্ ঘোষের?

—ওঃ হো, সেটা বুঝি বলা হয়নি? সিগারের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মিঃ আয়ার বললেন,—মিসেস্ ঘোষ অবশ্য গল্পটা এখানেই শেষ করেছিলেন। প্রশ্ন করবার এক্তিয়ার তো ছিল না আমার, তাই সেদিন আর কিছু জানা যায় নি। বিদ্যাপাড়া রোডে মিসেস্ ঘোষকে নামিয়ে দিয়ে আমিও গিয়েছিলাম ফিরে।

কিন্তু গল্পটার শেষটুকু জানা গেল অনেক দিন পরে। আর প্রায় বছর খানেক বাদে আর একটা ইন্‌স্‌পেক্‌শনে ডিমাপুরে গিয়ে।

কাজ শেষ করে গা এলিয়ে বসেছি অফিসের চেয়ারে, সিগারেটটায় অগ্নি-সংযোগ করেছি সবে মাত্র, হঠাৎ মনে পড়ে গেল মিসেস্ ঘোষের গল্পটা। কৌতূহল একটা ছিলই, বুঝতেই পারছেন, শেষ পর্যন্ত আর তা দমন করা গেল না।

ডেকেই পাঠালাম সুব্রতকে।

ও এসে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করলাম আমি,—আচ্ছা সুব্রতবাবু, দীপক নামে চেনেন কাউকে? আপনাদের কোন পরিচিত ব্যক্তি?

মনে হল আমার, দীপক যেন চমকে উঠল একটু।

একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে বললে, আমারই ডাকনাম দীপক। কিন্তু, কেন বলুন তো?

—না এমনিই—আমি বললাম হেসে,—সেই রকমটাই আশা করেছিলাম আমি। আচ্ছা, আসুন এখন—

মিঃ শিখণ্ড বললেন সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে,—এটা আবার কি হল? এ যে প্রেমের সঙ্গে অপত্যস্নেহের একটা জগা-খিচুড়ী পাকিয়ে ফেললেন মশাই—

কৃপাল সিং তাঁর দাড়িতে পরম স্নেহে হাতটা বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—ও দুটো যে অঙ্গাঙ্গী মিঃ শিখণ্ড। একটা জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

যে বই একটা জাতির মুক্তি এনেছিল

আজ হতে ১০০ বৎসর আগে আমেরিকার এক বিখ্যাত মহিলা লেখক লিখেছিলেন—"যে জাতি তার অন্তরের ভিতরে অন্যায় ও অত্যাচার লুকিয়ে রাখে এবং তার কোন প্রতিবিধান করে না, সে জাতির মধ্যে ভীষণ বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে।" এই কথা লিখেছিলেন আমেরিকার মিসেস হ্যারিয়েট বিচার স্টো। সেই সময়ে আমেরিকার নিগ্রোদের দাসত্ব প্রথার উল্লেখ করে এই কথা তিনি লিখেছিলেন। পৃথিবীতে যে কটি বই নিষ্ঠুর সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রথা উচ্ছেদ করেছে, তার মধ্যে হ্যারিয়েট বিচার স্টোর Uncle Tom's Cabin একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গত ১৪ই জুন ১৯৬১ সালে লেখিকার দেড়শত বৎসর জন্মতিথি পূর্ণ হয়েছে। তাঁর জন্ম হয় ১৪ই জুন ১৮১১ সালে। তাঁর লিখিত মাত্র একখানা বই Uncle Tom's Cabin আমেরিকার জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা বলে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। আমাদের দেশে, অর্থাৎ বাংলা দেশে এই ধরনের ঘটনা বিরল নয়। বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র লিখিত 'নীলদর্পণের' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই সংগে এই বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করে পাদ্রী লঙ-এর বিচারকাহিনীও উল্লেখযোগ্য। সকলেই জানেন, 'নীলদর্পণে'র প্রকৃত অনুবাদক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এবং বিচারে লঙ সাহেবের জরিমানা হলে সেই টাকা কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ জমা দিয়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক, বিদেশী নীলকরদের অত্যাচার বইয়ের সাহায্যে চারদিকে প্রচারিত হয়ে পড়ার সংগে সংগে দেশে যে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হোল, তারই ফলে 'নীলকুঠি' ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

নূতন ঔপনিবেশিকরা যখন আমেরিকায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করল, তখন লোকাভাবে চাষবাস করা একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়ল। তখন জাহাজে করে হাজার হাজার শৃঙ্খলিত নিগ্রোদের আফ্রিকা হতে আমেরিকায় চালান দেওয়ার ব্যবসা আরম্ভ হোল। তারা সবাই ক্রীতদাস—[illegible] দিয়ে কেনা হয়েছিল, এবং চাষবাসের চুক্তি শেষ হয়ে গেলে সাধারণ চাকরভাবে এদের কেনাবেচা চলতো। তারা চিরকালের ক্রীতদাস, মুক্তিলাভের কোন উপায় ছিল না। ক্রীতদাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী শুনে ও দেখে হ্যারিয়েট বিচার স্টো অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। ফলে ৫ই জুন ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে National Era নামক একটা কাগজে তাঁর 'Uncle Tom's Cabin' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু ক্রমশঃ প্রকাশ্য লেখা হিসাবে এই লেখাটি দেশের সকলের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নাই। কিন্তু ২০শে মার্চ ১৮৫২ সালে যখন 'Uncle Tom's Cabin' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হোল, তখন দেশে যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো, তা পুস্তক প্রকাশের ইতিহাসে বিরল। সেই সময়ে প্রায় এক বৎসরের মধ্যে সর্বসমেত ৩০ লক্ষ বই বিক্রি হয়ে গেল। এবং অল্প দিনের মধ্যে ৩৭টি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

ক্রীতদাস প্রথার স্বপক্ষে যারা ছিল, তারা আর নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল না। তারা এই প্রথার স্বপক্ষে ১৪ খানি বই প্রকাশ করলো। মিসেস স্টো অবশ্য চুপ করে রইলেন না। তাঁর বইয়ে যেসব রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ ছিল, তা প্রমাণিত করবার জন্য A Key to Uncle Tom's Cabin নামে আর একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করে বিপক্ষদের ধূলিসাৎ করে দিলেন।

এই বিশ্ববিখ্যাত বইয়ের প্রচার বা অনুবাদ এই দুইটি জিনিস খুব বড় কথা নয়। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই পুস্তক প্রকাশের ফলে আমেরিকা হতে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ হয়। এই বই দাসত্ব প্রথার যে চিত্র অঙ্কিত করেছিল, তার ফলে আমেরিকা কেন পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশ হতে ক্রমে ক্রমে দাসত্ব প্রথা চিরলুপ্ত হয়েছে।

নতুন বই

কাদম্বরী—তারাশঙ্কর তর্করত্ন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রকাশক : এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ। ২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৪.০০ টাকা।

'কাদম্বরী'র মূল-লেখক সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রথিতযশা কাহিনীকার বাণভট্ট। কাব্যময় গদ্যের এমন নিদর্শন সংস্কৃতে খুব বেশী নেই। বাংলা গদ্যের আদিযুগে এই গদ্য কাব্যখানির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন তারাশঙ্কর তর্করত্ন। এবং তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবিতকালের মধ্যেই অনুবাদটির চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হ'য়ে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন দান করেছে।

তারাশঙ্কর বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কিন্তু অনুজ সাহিত্যিক। অন্যদিকে সময়ের হিসাবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। তাঁর অনুবাদের ভাষায় তাই বিদ্যাসাগরী গদ্যের বিলীয়মান ঝংকার ও বঙ্কিমী গদ্যের অনাগত পদধ্বনি শোনা যায়।

তারাশঙ্করের বিষয়ে সেইজন্যই বাংলা সাহিত্যের গবেষক এবং রসগ্রাহী পাঠকের কৌতূহল অপরিসীম। সে যুগের বঙ্কিমচন্দ্র, গঙ্গাচরণ সরকার এবং তাঁর পুত্র বিখ্যাত গদ্য লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার থেকে শুরু করে এ যুগের স্বনামধন্য সাহিত্য-রসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও প্রমথ চৌধুরী—সকলেই তারাশঙ্করের গদ্যশৈলীর বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা সকলেই যে প্রশংসা করেছেন, এমন নয়। সমালোচকদের কেউ 'কাদম্বরী'র ভাষাকে বলেছেন 'সরস', আবার অন্যে বলেছেন 'নীরস'। আবার কেউ সমস্ত বলেছেন, 'বাঙ্গালার জমকালো [illegible]

ভাষা। বাংলায় গদ্যচ্ছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস।' (গঙ্গাচরণ)—তেমনি অন্যে বলেছেন, "সে অনুবাদ অতি সংক্ষিপ্ত ও নীরস......... কাদম্বরীর বিশিষ্ট গুণ হচ্ছে কথারস নয়, কথার রস। এ রসে পণ্ডিত মহাশয়ের কাদম্বরী সম্পূর্ণ বঞ্চিত।" (প্রমথ চৌধুরী)।

একই অনুবাদের বিষয়ে সমালোচকদের এই বিপরীত মেরুর মতবাদ 'কাদম্বরী'কে যে সাহিত্য-পাঠকের কাছে খুবই কৌতূহলজনক করে তুলবে তাতে আর বিচিত্র কি!

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই অনুবাদটির সম্পাদনা ক'রে আমাদের একটি বহুদিনের অভাব পূর্ণ করেছেন। বিশেষ করে তাঁর ভূমিকাটি অতি সুলিখিত হওয়ায় ছাত্র এবং সাধারণ পাঠক উভয়েরই বিশেষ সুবিধা ঘটেছে। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি বলে একটা কথা বহুবার শুনতে শুনতে প্রায় সত্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আশুতোষবাবু এবং তাঁর সহকর্মী গবেষকগণ যে এদিকে নজর দিয়ে লুপ্তরত্ন উদ্ধার করে আমাদের সামনে এনে দিচ্ছেন এজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি।

নকল রাজা নকল রাণী—উত্তম পুরুষ। প্রকাশক— তুলিকলম। ১নং কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম—৫ টাকা।

ঔপন্যাসিক 'উত্তম পুরুষ' একজন ছদ্মবেশী শক্তিশালী শিল্পী। কাহিনীর সর্বত্র রয়েছে তার সহৃদয় চিত্তবৃত্তির স্বাক্ষর। পল্লীকিশোর সতীনাথ সহরে এল উকীল দয়াময়বাবুর সহায়তায় তাঁর মেয়ে রেবার গৃহশিক্ষক হিসাবে। সেখানে রেবা-সতীনাথের পরস্পর যে আকর্ষণ গড়ে উঠল তা পূর্ণতা লাভ করতে পারল না। সতীনাথকে বিয়ে করতে হ'ল এক পল্লীবালিকা অশিক্ষিতা সুভদ্রাকে। দয়াময়বাবুর আশ্রয়বিচ্যুত সতীনাথ, নরেনদা আর মধুবাবুর সাহচর্যে এলেও তারা তাকে বেঁধে রাখতে পারল না। সতীনাথ চাইল এক রক্ষিতা নারীর কন্যাকে মানুষ করে তুলতে, তাকে ভদ্রসমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু সুভদ্রা তা সার্থক হতে দিল না। সমাজের দুঃসহ সংস্কার, নারীর স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি আর রেবা, সুভদ্রা, সরযূর জীবন-প্রবাহ সতীনাথের দরদী মনটিকে সংসারবিমুখ করে তুললো। সতীনাথের মমত্ববোধ কোনরূপ স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত নয়, সে এই মমত্ববোধের দ্বারাই চেয়েছিল তার সান্নিধ্যে আগত মানুষদের সর্বপ্রকার দুঃখবেদনা দুর্বলতা দূর করে দিতে। কিন্তু পৃথিবী তাকে স্বীকার করে নিল না। সে পরের হাতের খেলনা হ'য়ে থাকতে চাইল না—নকল রাজা-রাণীর খেলা সাঙ্গ করে বেরিয়ে পড়ল তীর্থক্ষেত্রের দ্বারে দ্বারে।

সমস্ত কাহিনীটি একটি দার্শনিক চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। লেখকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চরিত্রসৃষ্টিতে। —প্রতিটি চরিত্রই মোটামুটি স্বাভাবিক স্বকীয়তায় বিকশিত। হৃদয়ের জটিল গ্রন্থিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে তিনি অনেকদূর কৃতকার্য হ'য়েছেন। সতীনাথের গৃহত্যাগ উপন্যাসের কাহিনী-রস সৃষ্টিতে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে তা আরও স্বাভাবিক করে তুলেছে। প্রচ্ছদের মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস প্রশংসনীয়।

তরুণ রবি—নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। কলিকাতা। দাম—চার টাকা।

'তরুণ রবি' রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের শ্রদ্ধা নিবেদন। অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বিশ্বভারতীর পূর্ব পর্যায়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসই ছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকাশক। এদিক দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে গ্রন্থ-প্রকাশ খুবই উপযোগী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

বইটিতে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ভাষায় আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবন, কর্ম ও সাহিত্যকৃতি। এবং 'পূর্বার্ধ' ও 'উত্তরার্ধ' এই দুই অংশে বিন্যস্ত বিষয়বস্তুতে একই গ্রন্থের আধারে ছোটদের এবং বড়দের কৌতূহল নিবৃত্তি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'য়েছে। এ জাতীয় পরিকল্পনায় কিছুটা কলেজ-পত্রিকার আবহাওয়া সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। কিন্তু লিখন-পারিপাট্যের গুণে লেখক সে ত্রুটি এড়িয়ে যেতে পেরেছেন, এটা ক্ষুদ্র কৃতিত্বের কথা নয়।

নাগরিকা—(বারোয়ারী উপন্যাস)। প্রকাশক— জাতিজিৎ প্রকাশনী। ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—চার টাকা।

'নাগরিকা' বারোয়ারী উপন্যাস, কিন্তু ঠিক বারো জন নয়, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নয় জন সাহিত্যিক এর লেখক।

এজাতীয় উপন্যাস বাংলায় প্রথম না হলেও এর অভিনবত্ব চিরকালই পাঠকদের কৌতূহল উদ্রেক করে। সূচনায় লেখকদের একটি তালিকা দেওয়া আছে। তাতে জানা যায়, অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এতগুলি লেখকের সমাবেশে একটি উপন্যাসকে তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যপথে টেনে নেওয়া অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। কিন্তু 'নাগরিকা' লক্ষ্যভেদ করেছে। কাহিনী বা চরিত্র, কোথায়োই খাপছাড়া চলার ছাপ নেই। সেজন্যে লেখকগণ এবং প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

অভিনয়-শিল্প ও নাট্য প্রযোজনা— শ্রীঅশোক সেন। এ, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

আলোচ্য পুস্তকখানি অভিনয়-শিল্প ও নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কে স্বল্প পরিসরের মধ্যে তথ্য-সংবলিত একটি মূল্যবান রচনা। প্রারম্ভেই 'অভিনয়-শিল্প' সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে লেখক বলেছেন, "ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা না থাকলে শিশির ভাদুড়ী Barrymore বা Coquelin-এর মত 'জিনিয়াস' হওয়া যায় না সত্য, কিন্তু শিক্ষার দ্বারা যে সুদক্ষ অভিনেতা সৃষ্টি করা যায় এ কথা তো আজ ইউরোপ, আমেরিকাতে প্রমাণিত সত্যরূপেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।" এ কথাটি সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। আমাদের দেশে কিছুকাল পূর্বেও অভিনয়-শিল্পকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল না—এই মূল্যবান শিল্পটি একপ্রকার অবহেলিতই ছিল। কিন্তু অধুনা এ সম্পর্কে সাধারণের একটা চেতনা এসেছে এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে—সুতরাং সেই সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের পুস্তকখানি বিশেষ কাজে লাগবে।

পুস্তকখানির শেষে স্যার হেনরী আরভিং, গর্ডন ক্রেগ্ ও শিশির ভাদুড়ী প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা অভিনেতা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মূল্যবান মন্তব্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, ফলে তথ্যের দিক দিয়ে পুস্তকখানি অনেকটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছে। নাট্যরসিক মাত্রেই এই পুস্তকখানি থেকে অভিনয় ও প্রযোজনা সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারবেন। বর্তমান নাট্য-জগতে এ ধরণের পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।

বাঁচতে সবাই চায়— অজীর বর্মন। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস্, পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা—১। মূল্য ৩-৭৫ ন, প।

ডেল্ কারনিগের বিখ্যাত রচনার ধরণে লেখা এই পুস্তকখানির মধ্যে 'ভয়কে জয় করুন', 'মনের যত

কারসাজি', 'সকলেই হিংসুটে' প্রভৃতি কতকগুলি মূল্যবান চিত্তাকর্ষক বিষয় মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে একান্ত ঘরোয়াভাবে আলোচিত হয়েছে। পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য এর মৌলিকতায়। কারণ, এ-ধরণের বই সাধারণতঃ বাংলাভাষায় দেখা যায় না, আর শিক্ষার দিক থেকেও বইখানির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। নিবন্ধগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি বাহুল্যবর্জিত পরামর্শ আছে, যাতে শিক্ষক, নেতা, অফিসার, ক্যানভাসার প্রভৃতি বহু শ্রেণীর লোক উপকৃত হবেন।

ব্যক্তি-জীবনের বহু বিয়োগান্ত ঘটনার মূলে অন্বেষণ করলে দেখা যায় যে, সেখানে রয়েছে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়। মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, বিষয়ের সচেতনতা ও কিছুটা আত্মজিজ্ঞাসা সম্পর্কে মানুষ যদি সজাগ থাকে, তবে সংসার ও জীবনযাত্রা অনেকখানি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। বর্তমান কৃত্রিমতার যুগে স্বাভাবিক হতে পারলে, বহু আপাত-জটিল সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যায়। বইখানি ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের ও আকর্ষণীয়।

চর্যাপদ— অতীন্দ্র মজুমদার। নয়া প্রকাশ, ২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫-০০ ন, প।

তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থে লেখক নতুন কথা কিছুই বলেন নি। এ কথা গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্বসুরিরা বিভিন্ন সময়ে চর্যাপদের যে সকল আলোচনা করেছেন, বর্তমান গ্রন্থে লেখক সে সকল আলোচনাই অবলম্বন করেছেন। 'চর্যাপদের অনুবৃত্তি' ও চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য', এই দুইটি অধ্যায়ে প্রধানতঃ লেখক কিছু নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। আলোচনার বিষয় ও ধারা অনুধাবন করলে দেখা যায়, গ্রন্থখানিতে চর্যাপদের কাব্যমূল্যের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অধিক পরিমাণে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে চর্যাগণের সংশোধিত পাঠ ও পাঠান্তর, আধুনিক বাংলায় রূপান্তর, রূপকার্থ, কঠিন কঠিন কোন কোন শব্দের অর্থ, টীকা ও একটি সংক্ষিপ্ত শব্দসূচীও দেওয়া হয়েছে। এগুলি গ্রন্থখানির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পক্ষে সাধারণ পাঠককে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ-ধর্মাচরণের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে 'চর্যা-চর্য বিনিশ্চয়' নামীয় একখানি প্রাচীন পুঁথি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন—তাতে পদের সংখ্যা ছিল 'ছেচল্লিশটি, একটি পদ খন্ডিত অর্থাৎ সাড়ে ছেচল্লিশটি'। এই ক্ষুদ্রাকার পুঁথিটি কিভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আবিষ্কৃত হয়, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক অতি যত্নসহকারে তাঁর সাবলীল ভাষায় ও স্বচ্ছন্দগতিতে এই ঘটনার একটি যুক্তিসম্মত সমাধানে উপনীত হবার চেষ্টা করেছেন। চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য বিচার করতে গিয়ে তিনি উপনিষদের সঙ্গে চর্যাপদের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। 'ধর্মকে যখন আত্মবোধের প্রয়োজনে নিয়োগ করা হয়, তখনই ভাবময়, রহস্যময় ও কাব্যময় রূপ গ্রহণ করে। এই রকম হয়েছে উপনিষদের ক্ষেত্রে, চর্যাপদেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।'

চর্যাপদের ভাষা বাংলা কিনা এ সম্পর্কে অনেকদিন একটা সন্দেহ ছিল, কিন্তু ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, চর্যাপদের ভাষায় এবং সেই ভাষার ব্যাকরণগত দিকটায় এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যেগুলি কেবল বাংলা ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং চর্যাপদের ভাষা যে বাংলা ভাষা এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

চর্যাপদের অনুবৃত্তি অধ্যায়ের মূল কথা নিজের মধ্যে পরমকে জানার বা উপলব্ধির ব্যাকুলতা। উপনিষদের মূল সুরের সঙ্গে চর্যাপদের ভাবের এই অংশের সঙ্গে অনেকাংশে সাদৃশ্য অনুভব হয়। নিজের মধ্যে যে মানুষ, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের সঙ্গে একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্ত ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্', তিনিই দেহহি বসন্ত বুদ্ধ। এইভাবে উপনিষদের সাধনা চর্যাপদের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় মানব ধর্মের সুপ্রাচীন সুমহৎ ঐতিহ্যকে প্রবাহমান রেখেছে।

লেখকের প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য। তত্ত্ব ও তথ্যের কাঠিন্য রচনার প্রসাদগুণে বহু ক্ষেত্রে মনোরম হয়ে উঠেছে। চর্যাপদ বাংলা কাব্যের ঊষালগ্নে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কস্বরূপ। এই জ্যোতিষ্ককে ঔজ্জ্বল্য, যুক্তি ও আবেগের মধ্যে দিয়ে লেখক বাঙালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। প্রাচীনতম বাংলা কাব্যের যে আলোচনা উক্ত গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে, তা সত্যই মূল্যবান। আমরা বিদ্বজনসমাজে গ্রন্থখানির সমাদর কামনা করি।

বড়ো পিসীমা— বাদল সরকার প্রণীত; অঞ্জলি বসু, ১২বি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। প্রাপ্তিস্থান—দাশগুপ্ত এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ; কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

বাদল সরকার রচিত "বড়ো পিসীমা" পড়ে আমরা আনন্দ পেয়েছি। বাংলা নাটকে নির্মল হাস্যরসের অভাব এই নাটক অনেকটা মেটাবে। একটি অপেশাদার নাট্যসংস্থার অভিনয়ের সমস্যা নিয়ে একটি জমাট নাটক ধীরে ধীরে climax-এ এসেছে। প্রায়ই ছোট humour আর situation যে কমেডী সৃষ্টি করেছে তা দর্শকমনকে রুদ্ধশ্বাস করে রাখবে। আমরা এই নাটকের বহুল প্রচার কামনা করি।

মতামত

'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু

'অমৃতে'র ৬ষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীদিলীপ রায়ের চিত্রপ্রদর্শনী সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত হ'য়েছে, তাতে আমার আপত্তি আছে।

প্রথম কথা, কেন অ[illegible]ক সংখ্যক ছবি দিয়ে সাজানো হ'য়েছে [illegible] প্রদর্শনী? এটা অনবধানবশতঃ নয়। এর আগেও শিল্পী শ্রী রায় শুনেছেন এই অভিযোগ, কেন শুধু বাছা বাছা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ছবি নিয়ে হাজির হননি রসিকদের সম্মুখে। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি,—দু' তিন বছর পর পর তিনি যে প্রদর্শনী করবেন, তাতে কোন বাছাই ক'রে বঞ্চনা করবেন না কাউকে। তিনি সুযোগ দেবেন তাঁকে আপাদমস্তক যাচাই করতে, যাকে বলে কার্ডস অন দি টেবল। তিনি বলেছেন, তাঁর কিছুই লুকোবার নেই, লজ্জিত নন তিনি কিছুর জন্য। তাঁর সবলতা ও দুর্বলতা উভয় দিকটাই পরীক্ষা করবার সুযোগ দেবেন তিনি দর্শকদের, যেহেতু এটা ওয়ান ম্যান শো। সমবেত একটি প্রদর্শনীতে কিন্তু এ নিয়ম পালন করা হয়নি, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে পঞ্চাশ জন শিল্পী যেখানে একাধিক (কেউ কেউ দশখানি) চিত্র দেখিয়েছেন সেখানে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্বাচিত করেছিলেন মাত্র একটি ছবি। আশা করি এটা পরিষ্কার হ'ল।

দ্বিতীয় কথা শিল্পী কেন শিক্ষায়তনে বা গুরুর নিকটে শিল্পচর্চা করেননি? তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি, তিনি বিশ্বাস করেন না যে শিল্প ব্যাপারটা আয়ত্ত করা যায় কারো কাছে শিক্ষাধীনতায়। তাঁর মতে, নকল করা যায় বটে, অনুকরণ কর যায় মুখস্থ করা যায় অন্যের বমন করা বিদ্যা কিন্তু শিল্পসৃষ্টি করা যায় না। শিল্প জিনিষটা কাউকে শেখানোও যায় না, দেখানো যায় মাত্র, ওটা নিজে নিজেই শিখতে হয়।

ড্রয়িং সম্পর্কে যে কথা বলা হ'য়েছে তা নিতান্তই মামুলী প্রত্যাশা, বিশেষ করে যখন একথা জানা যায় যে, শিল্পীর কোথাও হাতেখড়ি হয়নি। সন্দেহটা অস্বাভাবিক নয়, আর কিছুটা খুঁতখুঁত করবে সকলেই; কিন্তু ক্যামেরার উদ্ভাবনের পরে কে আর ড্রয়িং করতে মগ্ন বলুন? যারা ড্রইং জানতো তারা ড্রইং ভাঙছে। এ কথাটি গুরুত্বপূর্ণ, ভালো করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। ড্রইং বলবৎ ক'রছেন এখনও কমার্শিয়াল [illegible] আর্টিস্টরা, কিন্তু তাঁরাও মডার্ন আর্টে [illegible]রাটি অনুসরণ ক'রছেন তার ডিস্টর্সনের দিকে লক্ষ্য স্থির করলে দেখা যায়, প্রিমিটিভ বা চাইল্ড আর্টের দিকে তার অগ্রগতি। এই ড্রইং-এর ব্যাপারটাও কিন্তু পশ্চিমী আমদানী। রাধাকৃষ্ণর লীলার ছবি যখন রাজপুত বা কাংড়া স্কুলে দেখেন, তাতে কি খুব নিখুঁত ড্রইং আবিষ্কার করেন যা বাস্তবানুগ? আপনাদের মতে ড্রইং মানে তো একটি মডেলের অনুকৃতি? কিন্তু ভারতীয় অথবা প্রাচ্য চিত্রকলার ঐতিহ্য কি বাস্তবের অনুকরণ? তাহলে কেন বাধ্য করবেন এই বিরক্তকর অপ্রয়োজনীয় প্রয়াসে। যদি প্রমাণ ক'রতে পারেন দিলীপবাবুর একাধিক ফুলের ছবি অথবা পাখির ছবি, সেই পাখি বা ফুলের ছবির মতো না হয়ে গরুর গাড়ি, বা এয়ারোপ্লেনের মতো হয়ে গেছে, তা হ'লে তবু ড্রইং-এর কথা উঠবে। কিন্তু আপনি এমন উদাহরণ দেখাতে পারেননি।

সত্যিই বলুন তো চিত্রকলার মধ্যে এই ব্যাকরণ ব্যাপারটা কী? এটা কি একটা ভাষার মতো নাউন ভার্ব-এর প্রয়োজনীয় সম্বন্ধপাত? অথবা একটি চিত্র ফোটাতে রুচি গঠন ও রসের অবতারণাই আসল লক্ষ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন ওস্তাদ শিল্পীদের শিল্পকর্মের দিকে তাকালে কি অদ্ভুত বৈলক্ষণ্যই না চোখে পড়ে! আপনার নিশ্চয় অজানিত নয়, হার্বার্ট রীড-এর সেই প্রসিদ্ধ পরিহাসটি, "Take a common example — a tree, painted by a Chinese artist of the Sung Dynasty, a European of the renaissance or a modern, the only common element will be, that its roots will be on the ground and its branches in the air." অর্থাৎ একটি সুপরিচিত সহজ উদাহরণ নেওয়া যাক, একটি বৃক্ষ, তাকে বিভিন্ন শিল্পী যেমন ক'রে অঙ্কন করেন, তাতে তার বিভিন্ন রূপায়িত চিত্রগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ যে সাদৃশ্যটুকু থাকবে, তা হচ্ছে যে, তা আকাশের দিকে ঊর্ধ্বমুখী ও তার শিকড়গুলি মাটিতে প্রোথিত। সত্যিকার শিল্পসৃষ্টিতে কিন্তু গ্রামার সত্যিই শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তা নয়, বাধাস্বরূপও বটে। না হলে শিশুদের শিল্পক্রীড়া এতো রসোত্তীর্ণ হয় কি ক'রে? তারা কি গ্রামার নিয়ে মাথা ঘামায়?

শ্যামল মল্লিক, কলিকাতা

* * * ঘটনা প্রবাহ * * *

ঘরে—

১৬ই জুন—১লা আষাঢ় : কাছাড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভাষা-সত্যাগ্রহ স্থগিত—১৯শে জুনের প্রস্তাবিত হরতালও প্রত্যাহার—কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনারের সহিত আলোচনান্তে সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের সিদ্ধান্ত।

উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক উড়িষ্যার নবগঠিত বিধান সভার কংগ্রেসী দলের নেতা নির্বাচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার (১৯৬১) ফলাফল প্রকাশিত—আই, এ'তে শতকরা ৪১·১ জন ও আই, এস-সি'তে শতকরা ৪৮·৯ জন উত্তীর্ণ।

১৭ই জুন—২রা আষাঢ় : কাছাড়ের (করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও শিলচর) মোট ২৯০ জন আটক সত্যাগ্রহীর মুক্তিলাভ—মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের লইয়া শিলচরে বিরাট শোভাযাত্রা—দিল্লী আলোচনা ব্যর্থ হইলে পুনরায় আন্দোলনের হুমকী।

লোকসভায় কম্যুনিস্ট দলের সহকারী নেতা শ্রী এ, কে, গোপালনের ১২ দিন পর অনশন ভঙ্গ—রাজ্য সরকারের সহিত কৃষক সংঘের আলোচনায় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসার জের।

১৮ই জুন—৩রা আষাঢ় : ক্যাপ্টেন এন্ কুমারের নেতৃত্বে ভারতীয় অভিযাত্রী দল কর্তৃক নীলকণ্ঠ শৃঙ্গ বিজয়—হিমালয়ের সর্বাধিক দুর্গম শিখরের প্রথম সার্থক অভিযান।

করিমগঞ্জে পাঁচ হাজার লোকের বিরাট শোভাযাত্রা—বাংলাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা করার সম্মিলিত দাবী।

'জনগণের স্বার্থেই সরকার ফিল্ম সেন্সারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন'—বোম্বাই-এ 'ফিল্ম ফেয়ার' পুরস্কার বিতরণী উৎসবে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণ।

'গোয়া মুক্তি আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরই অঙ্গ'—বোম্বাই গোয়া মুক্তি আন্দোলন বার্ষিকী সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেননের ঘোষণা—বৃটেন ও ফ্রান্স পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের রক্ষাকর্তা সাজিয়াছে বলিয়া অভিযোগ।

১৯শে জুন—৪ঠা আষাঢ় : ভাষা আন্দোলন বানচাল করার জন্য হাইলাকান্দিতে (আসাম) বহিরাগত গুণ্ডাদের আক্রমণ—প্রকাশ্য দিবালোকে গুণ্ডামী, লুঠতরাজ ও অগ্নি সংযোগ—হাঙ্গামা দমনে পুলিশের গুলীবর্ষণ—৮ জন নিহত ও প্রায় ৫০ জন আহত।

জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত কাছাড় প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ—কাছাড় সংগ্রাম পরি[illegible] [illegible]—শিলচরে দশ [illegible] নর-নারীর বিক্ষোভ মিছিল।

২০শে জুন—৫ই আষাঢ় : দুই মাসের জন্য হাইলাকান্দি মহকুমাকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা—আসাম রাজ্যপাল জেনারেল এস এম শ্রীনাগেশের আদেশ জারী—করিমগঞ্জে ১৪৪ ধারা বলবৎ।

চতুর্দিক হইতে শিলচর আক্রমণের চেষ্টা—সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাদল কর্তৃক প্রতিরোধ—শিলচর সহরেও ১৪৪ ধারা জারী।

১লা জুলাই হইতে সারা ভারতে পণপ্রথা নিরোধক আইন চালু—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিলে সম্মতিদান।

'১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনকালে কেরল ও উড়িষ্যায় নির্বাচন হইবে না'—মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী ভি কে সুন্দরমের বিবৃতি—১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা।

২১শে জুন—৬ই আষাঢ় : হাইলাকান্দির গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক অগ্নি-সংযোগ ও লুঠতরাজ—দাঙ্গাপ্রপীড়িত শত শত নর-নারী শিলচরে উপনীত—শিলচর সহর ও উপকণ্ঠে কার্ফু জারী।

আগামী সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বামপন্থী দলগুলির যুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের সম্ভাবনা—১লা জুলাই বিভিন্ন বামপন্থী দলের মিলিত বৈঠকের উদ্যম।

নয়াদিল্লীর সরকারী মহলে আসামের বর্তমান বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা — হাইলাকান্দিতে মুসলিম লীগপন্থীদের গুণ্ডাবাজিতে কেন্দ্রের গভীর উদ্বেগ।

হাইলাকান্দির (আসাম) দাঙ্গা-হাঙ্গামার দায়িত্ব আসাম সরকারের—বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া সম্মিলিত ভাষা আন্দোলনকে বানচাল করার অপচেষ্টা—পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতৃবৃন্দের যুক্ত বিবৃতি।

২২শে জুন—৭ই আষাঢ় : আসামে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের দাবী—স্বতন্ত্র পার্টি নেতা শ্রী এন সি চ্যাটার্জির বিবৃতি—হাইলাকান্দির ঘটনা পূর্ব-পরিকল্পিত বলিয়া অভিযোগ।

ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ অঞ্চলে (পূর্ব পাকিস্তান) গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ সমর্থিত—ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের [illegible]পোর্ট—দিল্লীতে পাক হাই কমিশনের নি[illegible] ভারতের নোট অর্পণ।

কাছাড়ে দলে দলে পাকিস্তানী মুসলমানদের আত্মপ্রকাশের সংবাদ—ভাষা আন্দোলন দমনের জঘন্য ষড়যন্ত্র।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ভুটানের প্রতিরক্ষা ভার গ্রহণ—চীনের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে সীমান্তে বহু সৈন্য মোতায়েন।

২৩শে জুন উড়িষ্যার নূতন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ—জুলাই মাসের মাঝামাঝি রাজ্য বিধান সভার বৈঠক।

বাইরে—

১৬ই জুন—১লা আষাঢ় : 'আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে নিকিতা ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধানমন্ত্রী) সর্বশেষ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়'—জেনেভায় আণবিক নিষিদ্ধকরণ সম্মেলনে বৃটেনের মন্তব্য।

১৭ই জুন—২রা আষাঢ় : লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠনের সম্ভাবনা—শান্তি, নিরপেক্ষতা ও পুনর্মিলনের আবশ্যকতা সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী লাওস সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স বৌন উম ও কম্যুনিস্ট সমর্থক প্যাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুফানুভং-এর মধ্যে ঐক্যমত।

আমেরিকা কর্তৃক আরও একটি উপগ্রহ (ডিসকভারার—১৫) কক্ষপথে স্থাপন—প্রতি ৯১ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ।

'আণবিক পরীক্ষা বন্ধের আলোচনা (জেনেভা বৈঠক) ব্যর্থ হইলে জটিলতা বাড়িবে'— ক্রুশ্চেভের স্মারকলিপির উত্তরে আমেরিকার সতর্কবাণী—আলোচনা এখনও সফল না হওয়ায় রাশিয়ার উপর দোষারোপ।

১৮ই জুন—৩রা আষাঢ় : ভারতকে বিনা সর্তে মার্কিণ সামরিক সাহায্যদানের প্রস্তাব—প্রচারিত সংবাদে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে গভীর উদ্বেগ।

জুরিখে লাওসের তিনটি দলের তিনজন নেতার (প্রিন্স) বৈঠক—জাতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠন প্রশ্নে নিবিড় আলোচনা।

১৯শে জুন—৪ঠা আষাঢ় : নেপালে যে-কোন মুহূর্তে বিদ্রোহের আশঙ্কায় রাজা মহেন্দ্র বিচলিত—নিরাপত্তার জন্য রাজমাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতিকে জাপানে প্রেরণের সংবাদ।

লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে মতৈক্যের আশা—জুরিখে প্রিন্সত্রয়ের বৈঠকে নিরপেক্ষতাবাদী নেতা সৌভান্না ফৌমার ঘোষণা।

২০শে জুন—৫ই আষাঢ় : ২৫শে জুন লিওপোল্ডভিলে কঙ্গোলি পার্লামেন্টের অধিবেশন—কাসাভুবু ও নিজেঙ্গা সরকারের (ষ্ট্যানলেভিল ও লিওপোল্ডভিলের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার) মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত—পার্লামেণ্টারী ডেপুটিদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

অত্যাচারিত উত্তর অ্যাঙ্গোলাবাসীদের দলে দলে দেশত্যাগ—পর্তুগীজ বর্বরতায় এ যাবত প্রায় ৩৪ হাজার নর-নারী ও শিশু নিহত—'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বৃটেনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি।

২১শে জুন—৬ই আষাঢ় : লাওসের তিনটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে রাজ্যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন প্রশ্নে প্রাথমিক মতৈক্য—কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে চুক্তি।

'গোয়া, দমন ও দিউ'র মুক্তি বিষয়ে রাশিয়া উদাসীন থাকিতে পারে না'—মস্কোয় অনুষ্ঠিত সভায় রুশ-ভারত সংস্কৃতি সম্পর্ক সমিতির সভাপতি আকাদেমিশিয়ান নিকোলাই সিত্সিনের ঘোষণা।

কঙ্গোর কাসাভুবু সরকারের হাতে বন্দী কাতাঙ্গার প্রেসিডেন্ট মোসে শোম্বের মুক্তিলাভ — এলিজাবেথভিল হইতে প্রচারিত সংবাদ।

'আমেরিকা আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালাইলে রাশিয়াও সেই পন্থা অনুসরণ করিবে'—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের সতর্কবাণী।

২২শে জুন—৭ই আষাঢ় : লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে চূড়ান্ত মতৈক্য প্রতিষ্ঠা—জুরিখ বৈঠকের পর লাওসীয় তিনটি দলের প্রধানত্রয়ের যুক্ত ইস্তাহার।

মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর (ভারত) মধ্যে শীঘ্রই সাক্ষাৎকার—ওয়াশিংটন হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর মার্কিণ রাষ্ট্রদূত জেঃ কে গ্যালব্রেথের ইঙ্গিত।

দেশে বিদেশে

সুরের জাল :

আমরা তো হিমসিম খেয়েছি। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। গভীর জল থেকে আহরণ করব ব'লে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ট্রলার এনেছি, বিদেশী ধীবর এনেছি। কিন্তু কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। এগারো বছর এইভাবে কেটে গেছে—গভীর জলের মাছ গভীর জলেই থেকে গেছে। ইউরোপ আমাদের সাহায্যে লাগল না। এর পর প্রাচ্য দেশে জাপানীদের সাহায্যও আমরা প্রার্থনা করেছিলাম। সুইডেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ প্রাচ্য দেশের জাপানের মত দক্ষ মৎস্যশিকারী। এক বছর সেখানকার এক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চলে। কিন্তু সে সংস্থার সঙ্গেও কোন চুক্তি হয়নি। আলোচনা চলে বোম্বাইয়ের নিউ ইণ্ডিয়া ফিশারীজ মারফৎ—সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে নয়। এদিক দিয়েও আমরা হেরেছি। এখন চেষ্টা হচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে। পরিকল্পনার কথাটা ভাবলে অবাক হতে হয়। চারদিক সামাল না দিয়ে বা গণ্য না ক'রে এ কেমন পরিকল্পনা যে, এগারো বছর কেটে গেল মাছ আর জালে পড়ল না?

এদিকে যারা এ-বিষয়ে সত্যিই সিরিয়াস তাদের একটা কৌতুকপ্রদ খবর বেরিয়েছে। জাপানীরা সুরের জালে সংগীতের টানে মাছ ধরবে। জাপানীজ ফিসারি এজেন্সী—টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসারী ডিপার্টমেণ্টের সহায়তায় মেছো-আওয়াজের রেকর্ড করেছে। এই আওয়াজগুলোর আবার শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে। রেকর্ডে-ধরা আওয়াজকে বাড়ানোও হয়েছে; এই শব্দে মাছেদের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা হয়েছে। আওয়াজের মধ্যে আছে হুঁসিয়ারী, সঙ্গ কামনা ও পরিচিতির আওয়াজ। এসব আওয়াজ ছাড়াও শত্রুপক্ষের হুঙ্কার ছড়িয়ে দিয়েও ভীত-সন্ত্রস্ত মাছগুলোকে জালের দিকে খেদিয়ে আনা হবে।

দেশের মাছ সরবরাহ বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় জাপানীরা কত গভীরে গেছে; আর আমরা কয়েকটা কিনে আনা ট্রলারই চালাতে পারলাম না।

উল্লেখযোগ্য :

আমেরিকা নিজস্ব রাজস্ব থেকে নানা দেশে অর্থসাহায্য বা ঋণ দিয়ে থাকে—একথা আজ সর্বজনবিদিত। কেন দিয়ে থাকে এ প্রশ্নও উঠেছে এবং জবাব পাওয়া গেছে যে, অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নত করা। প্রেসিডেণ্ট এটিকে আরও পরিষ্কার ক'রে বলেছেন কম্যুনিজমের বিকল্পরূপে দাবী করে এমন অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া এ সাহায্য অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা। তিনি বলেছেন, এর আগে মার্কিণ করদাতাদের প্রচুর অর্থ বিদেশে সাহায্যের নামে হয় অপচয় করা হয়েছে নয়তো বেহিসেবী ক্ষয় হয়েছে; কিন্তু অপচয়ের দৃষ্টান্তের পাশাপাশি সদ্ব্যয় ও সফল পরিকল্পনার দৃষ্টান্তই অবশ্য বেশী। যারা আত্মনির্ভরতার জন্য সচেষ্ট নয় তাদের আমরা চিরকাল সাহায্য করতে চাই না—সুফল চাই। এই ব'লে তিনি মার্কিণ সাহায্যের এক নববিধান প্রবর্তন করেছেন। যে দেশ যথেষ্ট বলীয়ান, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, স্বাধীন ও আত্মনির্ভর হ'তে চায় তাদের সাহায্য করতে হবে এবং দেশভেদে সাহায্যের পরিমাপ ছাঁটাই-ফাঁপাই করতে হবে। সদ্ব্যয় ও অসার্থক ব্যয়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, লাওসে অর্থসাহায্যকে অসার্থক ব্যয় বলা যেতে পারে—এখানে যথাযথ অর্থব্যয় হয়নি। কিন্তু এমন উদাহরণ আছে যেখানে মার্কিণ সাহায্য না পৌঁছোলে সে দেশ কম্যুনিষ্ট হয়ে যেত। সদ্ব্যয়ের উদাহরণ হিসেবে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ করেন। তিনি কিছুদিন আগে ভারতে প্রাক্তন মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ এলসওয়ার্থ বাঙ্কারের সঙ্গে কথা কয়েছেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে মিঃ বাঙ্কার বলেছেন, মার্কিণ অর্থ ভারতে যেরকম সদ্ব্যয় হয়েছে এমন আর কোথাও হয়েছে বলে তিনি জানেন না। মিঃ বাঙ্কারের কথাটি উদ্ধৃত করার আগে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেন, আমি আপনাদের এমন দেশের দৃষ্টান্ত দিতে পারি যে, আমেরিকার এই (সাহায্য) প্রচেষ্টা না থাকলে সে দেশে কম্যুনিষ্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারত।

অর্থাৎ, কোন দেশকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার অর্থ সেদেশকে কম্যুনিষ্ট-আধিপত্যের আশঙ্কা থেকে রক্ষা করা এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সে দেশকে উন্নত করা। ভারতবর্ষকে এই

অর্থসাহায্য কম্যুনিস্ট আশঙ্কা থেকে মুক্ত করেছে এই হ'চ্ছে প্রেসিডেন্ট কেনেডির উল্লেখযোগ্য মন্তব্য। সম্ভবতঃ আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনায় অর্থ-সাহায্যের আশ্বাসও এই মন্তব্যের মধ্যে নিহিত।

আর একটা দিকও আছে। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও যুগোশ্লাভিয়াও ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক এবং ক'রে থাকে। এখানেও একটা অভিপ্রায় নিশ্চয়ই আছে। কম্যুনিস্টরা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং কোন দেশ পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী ঢঙে চলে এটি চায় না। তারা তাই পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত অনুন্নত দেশগুলোকে সাহায্য করতে চায়। একটা সুস্পষ্ট বিরোধে দুইটি পক্ষ দুইটি শিবির রচনা করেছে। পরস্পর-বিরোধী এই অভিপ্রায়ের মধ্যে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা কঠিন। এই দ্বিবিধ সাহায্য গ্রহণ ক'রে আমরা কোন জটিল আবর্ত সৃষ্টি করতে চলেছি কি না এটি ভাববার বিষয়। কেউ-ই কোন রাজনৈতিক স্বার্থসূত্র রাখছে না—একথাটি মেনে নিলেও এই দুইয়ের দ্বিবিধ অভিপ্রায়ের পটভূমিকা কি করে বিস্মৃত হওয়া যাবে?

শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গে ঃ

হিমালয়ের দুর্গম শৃঙ্গগুলি আর অপরাজেয় থাকবে না; কেননা, মানুষের জয়-পরাজয়ে ক্লান্তি নেই, একবার না পারলে শতবার দেখে এবং একদিন লক্ষ্যস্থানে পৌঁছোয়। পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট দীর্ঘকাল অপরাজিতের গৌরব নিয়ে উন্নতশির ছিল। বীর তেনজিং ও তাঁর সাথী হিলারী সে শির মানুষের অদম্য অধ্যবসায়ের কাছে নত করেছে। বহু উত্তুঙ্গ শীর্ষ-সন্নিবিষ্ট হিমালয়ের কোন অংশই আজ এই মানুষের অবিশ্রাম প্রচেষ্টা দুরধিগম্য রাখবে না। নীলকণ্ঠ শৃঙ্গ বিজয় এই প্রচেষ্টার আর একটি স্মারক চিহ্ন। এর আগে ছয়বার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে এবং সপ্তমবারে এই সাফল্যের বরমাল্য ভারতীয়দের গলায়ই পড়ল। এই অভিযাত্রী দলে ছিলেন ক্যাপ্টেন এন কুমার (নেতা), ফ্লাইট লেফটানাণ্ট এ কে চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মুলুকরাজ, ডাঃ আর সি রায়, শ্রী ও পি শর্মা, ফ্লাইট লেফটানাণ্ট এ জে এস গ্রেওয়াল। নীলকণ্ঠের উচ্চতা ২১,৬৪০ ফুট। এই উচ্চশীর্ষে আরোহণ করেছেন ঐ অভিযাত্রী দলের কনিষ্ঠ শ্রী ও পি শর্মা ও তাঁর দু'জন সঙ্গী শেরপা ফুরবা লাপ সাংগ ও ঢাক পাগিয়াল। প্রবাদ ছিল যে, এই শীর্ষ একেবারেই দুরধিগম্য। লক্ষ্য করার বিষয় এই সালেই অন্নপূর্ণা—৩ (২৪,৮৫৮ ফুট) শৃঙ্গটি জয় করা হয়েছে। সঙ্গে [illegible] স্মরণীয় ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে ত্রিশূলে (২৩,৩৬০ ফুট), পঞ্চচুলি (২২,৬৫০ ফুট), আবিগামিন (২৪,১৩০ ফুট), ক্যামেট (২৫,৪৪৭ ফুট), চো ওইও (২৬,৮৬৭ ফুট), মৃগথুনি (২২,৪৯০ ফুট) জয় হ'য়েছে। ১৯৫৯ সালে নন্দকোট (২২,৫১০ ফুট), বন্দরপাঞ্চ (২০,৭২০ ফুট) এবং চৌখাম্বা (২৩,২৪০ ফুট) শৃঙ্গেও মনুষ্যপদচিহ্ন পড়েছে।

নীলকণ্ঠ বিজয়ের পশ্চাতে এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরকেরও আশীর্বাদ আছে। নীলকণ্ঠ-বিজয়ী শর্মা দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের কৃতী ছাত্র। শিক্ষার্থী অবস্থায়ই তেনজিং শ্রীশর্মার মধ্যে সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। পর্বতারোহণে ছাত্র বটে, কিন্তু শ্রীশর্মার আসল বৃত্তি স্কুলের শিক্ষকতা। এই কৃতিত্বের পর তিনি পর্বতারোহণ বিদ্যায়ও শিক্ষকতা করতে পারবেন। শ্রীশর্মাদের দলে যে পাঁচজন শেরপা ছিলেন তেনজিংই তাঁদের নির্বাচন করেছিলেন। দলে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদেরও পর্বতারোহণে অভিজ্ঞতা ছিল। সত্যি, আগে যখন বিদেশীরা অপরিচিত হিমালয়ে বিচরণ ও আরোহণে আসত ও সাফল্যের মালা নিয়ে স্বদেশে ফিরত আমরা অধোবদনে তা শুধু শুনতাম। আজ দিনের পরিবর্তন হয়েছে। আজ আমরাও দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ের পথগুলির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলছি। এই সব পথপ্রদর্শকদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শুভ প্রচেষ্টা ঃ

কলকাতা ও সহরতলীর শিল্পাঞ্চলে যক্ষ্মারোগ নির্ণয়ের জন্য দুটি ভ্রাম্যমাণ স্ক্রিনিং ইউনিটের উদ্বোধন করেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ইউনিটের রেডিওগ্রাফী যন্ত্রে দৈনিক আট ঘণ্টায় পাঁচশত লোকের বুক পরীক্ষা করা যাবে। সারা বছর ধরে প্রত্যেক দিন ইউনিটের কাজ হ'লে ধরে নেয়া যায় ১,৮২,৫০০ লোকের বুক পরীক্ষা হবে। বাংলাদেশে এখনই সাত লক্ষ জানা-যক্ষ্মারোগী আছে কিন্তু তাদের চিকিৎসার জন্য মাত্র ৩,৫৯৯টি রোগীশয্যা আছে। প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে অপ্রতুল। কিন্তু শয্যাসংখ্যা ব্যয়সাপেক্ষ হেতু সহসা বৃদ্ধি করা যাবে এমন আশা করা যায় না। রোগনির্ণয়ের পর যেখানেই সম্ভব সাবধানে থেকে বাড়ীতেও আজকাল যক্ষ্মা চিকিৎসা করা যায়। সেখানে তাই রোগনির্ণয়টাই বড় কথা। সূচনায় যদি রোগ ধরা পড়ে তবে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থায় সে রোগ সারে এমন দৃষ্টান্ত আজকাল নগণ্য নয়। এইভাবে সারা বছর ঘুরে ঘুরে যদি লোকের বুক পরীক্ষা করা হয় তবে একটা মস্ত প্রাথমিক কাজ হ'য়ে যাবে। তারপর যক্ষ্মা হাসপাতালে স্থান পাওয়া যায় ভাল, না পাওয়া গেলেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা যাবে—লোকে সর্দি-কফ ইত্যাদি কথার আড়ালে আসল সত্যটি গোপন রাখতে পারবে না। রোগ যদি গোপন না থাকে তবে তা গোপনে বিস্তারেরও সুযোগ পাবে না। হাসপাতাল থেকে এ রোগ বিশেষ সংক্রামিত হয় না, কেননা, সেখানে জানা-রোগীদের মধ্যে নীরোগী আত্মীয়স্বজনে রোগ-বিস্তারের প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে। ১৯৫[illegible] সালে সোভিয়েট রাশিয়া চারটি ভ্রাম্যমাণ স্ক্রিনিং ইউনিট দেয়; তারই দুটি চালু হ'ল। আর দুটিও মফঃস্বল অঞ্চলে ব্যবহার করা হবে বলে কথা আছে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, আমাদের যা নেই, তা অপরে দিলেও ব্যবহারের যোগ্যতা প্রমাণ করতে আমাদের চার বছর কেটে গেল কেন? এই চার বছরে সাত লক্ষ ত্রিশ হাজার লোকের বুক পরীক্ষা হতে পারত। কর্তৃপক্ষের চার বছরে এক বছরের হিসেব একান্তই দুর্বোধ্য। সান্ত্বনা এই, তবু তো হ'ল!

আশা-নিরাশা ঃ

লাওসের প্রশ্নটি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলছে। একবার সমস্যা জটিলতার প্রান্তে যাচ্ছে, পরক্ষণেই হয়তো সমাধানের প্রান্তে ফিরছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিরতি হয়-হয় হয় না, শেষ পর্যন্ত হ'ল। তাও তো শোনা যাচ্ছে কোথাও কোথাও নাকি যুদ্ধ-বিরতি সর্ত লঙ্ঘনও হয়েছে। তবু জেনেভায় সম্মেলন বসল। কিন্তু সেখানে কাজ এগোয়-এগোয় এগোয় না। লাওসে এখন যুদ্ধ-বিরতি কমিশন আছে, ফিরে আসতে বাধ্য হয়নি। কেনেডি-ক্রুশ্চেভের মধ্যেও এ নিয়ে কথা হ'ল। সর্বশেষ হ'ল লাওসের শীর্ষ সম্মেলন। জুরিখের সংবাদে প্রকাশ, তিন প্রিন্সের কতকগুলো ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে। দক্ষিণপন্থী সরকারের ডেপুটি প্রধান-মন্ত্রী জেনাঃ ফুমি নোসাভান জানিয়েছেন, পরস্পরবিরোধী শক্তিগোষ্ঠী কয়টির সমন্বয় সাধনে মতৈক্য হয়েছে; অন্তর্বর্তীকালে বর্তমান সরকারই বজায় থাকবে। কোয়ালিশন সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি কি হবে এবং এখনই বা কি কর্তব্য হবে— সে-বিষয়েও মতৈক্য হয়েছে। এই সরকার কিভাবে গঠন করা হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে। মতৈক্য হয়নি বামপন্থী ও নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর দাবীগুলো সম্পর্কে—এদের দাবী হচ্ছে প্রস্তাবিত কোয়ালিশন সরকারকে সিয়াটো শিবিরের সংস্রব ত্যাগ করতে হবে।

অর্থাৎ এইটিই হ'চ্ছে ইতি গজ।

প্রেক্ষাগৃহ
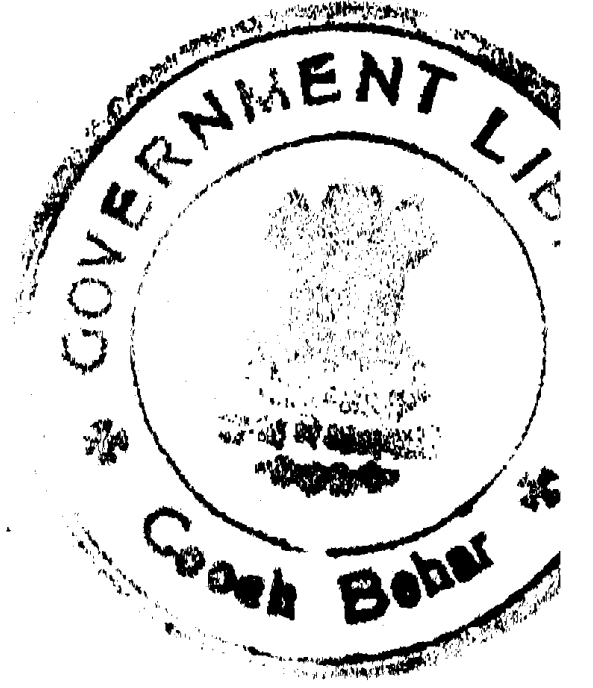
নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

অসম প্রতিযোগিতা : গেল ১৬ই জনুনের জের টানতে হচ্ছে। অর্থাৎ বিষয়-বস্তু একই—আমাদের বাঙলা দেশে তোলা বাঙলা ছবির ভবিষ্যৎ। বাঙলা ছবির আয়ের অসম বণ্টন-ব্যবস্থার জন্যে অর্থশালী ব্যক্তিরা বাঙলা ছবির প্রয়োজনার দিকে আদৌ এগচ্ছেন না এবং সেই জন্যেই বাঙলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশংকার কারণ ঘটেছে, এ-খবর আপনাদের আগেই দিয়েছি। সংগে সংগে পশ্চিমবংগ সরকার এবং আমাদের রাজ্যের কর্ণধার, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়কে অনুরোধ জানিয়েছি, আমাদের এই গৌরবময় শিল্পটিকে কি উপায়ে একটি সুস্থ অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সে সম্পর্কে অনতিবিলম্বে একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করতে। বাঙলা দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি ডাঃ রায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। সেই কারণে এই সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক চলচ্চিত্র শিল্পটিকেও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যে সব রকমে সাহায্য করতে তাঁকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। মনে রাখা দরকার, এই শিল্পের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্ততঃ পাঁচ ছ' হাজার কর্মীর পারিবারিক জীবনের ভালোমন্দ এর ওপর একান্তভাবে নির্ভর করছে। তাছাড়া এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আরও যে শতাধিক শিল্প জড়িত আছে, সেইগুলিরও উত্থান-পতন এই শিল্পটির সুস্থ-জীবনের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

অসম বণ্টন-ব্যবস্থার কথা ছেড়ে এইবার বাঙলা ছবির আয়ের দিকটাই চিন্তা করা যাক। আপনি, আমি এবং আর সকলেই জানি যে, বাঙলা ছবির আয় ক্রমেই কমে আসছে। বাঙলা ছবির বাজার একেবারেই অর্ধেক হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে। তারপর এই ভারতেই 'অধিক হিন্দী চালাও' আন্দোলনের চেউ বিহারের পাটনা ও ভাগলপুর, উত্তর প্রদেশের কাশী, লক্ষ্মৌ ও এলাহাবাদ, উড়িষ্যার কটক, পুরী প্রভৃতি জায়গাতে বাঙলা ছবির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। সব শেষে সুরু হয়, আসামের 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন, যার ফলে সিলেট, শিলং, জোড়হাট, ডিব্রুগড়, ডিগবয় প্রভৃতি সীমানার মধ্যেই আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও ভাবনার কথা এই যে, এতেতেও তার নিস্তার নেই। আজ বাঙালী জাতের মতোই বাঙলা ছবিকেও 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হ'তে হচ্ছে। তাই দেখি, পশ্চিম বাঙলার ২৭৫টি পাকা সিনেমা-হাউসের (প্রদর্শনী গৃহ) মধ্যে মাত্র ১৪টিতে শুধু বাঙলা ছবি দেখানো

"নেকলেস" ছবিতে সুনীতা।

শহরবিশিষ্ট আসামে বাঙলা ছবির প্রশস্ত বাজার আজ একেবারে শূন্যে পরিণত হতে চলেছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বাঙলা ছবির বাজার ক্রমেই সংকুচিত হতে হতে পশ্চিমবংগের হয়। আর কতকগুলি প্রেক্ষাগৃহ আছে, যেখানে কখনও বাঙলা এবং আবার কখনও হিন্দী ছবি দেখানো হয়ে থাকে। এমন অনেক প্রেক্ষাগৃহ আছে, যেগুলি শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত বলে অবাঙালী

"ডাক' ট্রীট" চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় নিশি

শ্রমিকদের চাহিদা মেটাতে হিন্দী ছবি দেখাতে বাধ্য। কিন্তু এমনও অনেক ছবিঘর আছে, যেগুলি মাত্র মুনাফা লোটবার অভিপ্রায়ে হিন্দী ছবি দেখিয়ে থাকে। হিন্দী ছবি যে মাত্র সারা ভারতে চলে, তা নয়: ভারতের বাইরে দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব এশিয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানেও তার গতায়াত। অথচ বাঙলা ছবির বাজার তার তুলনায় নিতান্ত ছোট—১/১০ বা ১/১২ ভাগ। কাজেই একখানি হিন্দী ছবির প্রযোজক তাঁর ছবির জন্যে যে-পয়সা খরচ করতে সমর্থ, বাঙলা ছবির প্রযোজক তার ১।৮ ভাগ খরচ করতেও ভরসা পান না। তাই বাঙলা ছবি ভিখারী চাণক্যের পর্ণকুটিরেই নাটকীয় রসকে কেন্দ্রীভূত করতে সচেষ্ট হয়, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভার বিলাসবহুল দৃশ্য হিন্দী ছবির সমৃদ্ধি ঘটাবার জন্যে সংরক্ষিত থাকে। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার চমকের সঙ্গে হিন্দী ছবিতে থাকে প্রাণমাতানো নাচ ও গানের সমাবেশ এবং নয়নমনলোভা সুন্দরীদের লাস্যভঙ্গী—এক কথায়, সাড়ে বত্রিশ মজা। চলচ্চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য যদি মনোরঞ্জন হয়,—এবং যদি কেন, সরকার প্রমোদ-কর নিয়ে আমাদের কানে ধ'রে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, চলচ্চিত্র নিশ্চয়ই একটি প্রমোদোপকরণ,—তাহ'লে হিন্দী ছবির প্রযোজক সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে তাঁর তূণের মারণ উচাটন, সম্মোহনী প্রভৃতি সব ক'টি বাণই প্রয়োগ ক'রে থাকেন। তাই হিন্দী ছবিতে আমরা সাধারণতঃ যে-গ্ল্যামারের বা চিত্তবিভ্রমকারী বস্তুর ছড়াছড়ি দেখতে পাই, বাঙলা ছবিতে তার কড়াক্রান্তিও পাইনি। লাবণ্যময়ী বিলাসিনী হিন্দী ছবির পাশে বাঙলা ছবিকে দুঃখিনী বিধবা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই দেখি, আজ শুধু কলকাতা সহরেই নয়, বাঙলার মফঃস্বলের চিত্রগৃহগুলিতেও হিন্দী ছবি দেখতে বাঙালী ছেলে, মেয়ে, বৌয়েরা ভিড় বাড়িয়ে তুলেছেন। এবং এই সস্তা আমোদে-ভরা হিন্দী ছবিগুলিকে পরিবেশকেরা চিত্রগৃহের মালিকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন বাঙলা ছবির চেয়ে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে। এই সর্বনাশা অসম প্রতিযোগিতায় বাঙলা ছবি ক্রমেই হটে যাচ্ছে, হেরে যাচ্ছে—আর আমরা নীরবে তাই দাঁড়িয়ে দেখছি।

বিবিধ সংবাদ

"সন্ধ্যা", "ঘরোয়া", "ভৈরবমন্ত্র" প্রভৃতি ছবির পরিচালক মণি ঘোষ সম্প্রতি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। আমরা তাঁর

পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করছি।

* * *

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা এবং উন্নত ধরণের চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্দীপনা সৃষ্টির সহায়তাকল্পে "সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে, এ-খবর আমরা আগের হপ্তাতেই দিয়েছি। একটি চা-চক্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে সমবেত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তাঁদের কর্ম-পন্থা আলোচনার মাধ্যমে বিদেশের বহু ভালো ভালো ছবি নিজেদের সভ্যদের মধ্যে দেখানোর পথে সেন্সারগত বাধা-বাধার কথা উল্লেখ করলেন, তা চলচ্চিত্র শিল্পানুরাগী মাত্রকেই ভাবিত ক'রে তুলবে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্য-দেশেই ব্যবস্থা আছে যে, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে দেখানো না হ'লে শিল্পানুরাগীদের নিয়ে গঠিত ফিল্ম সোসাইটি প্রভৃতির সভ্যদের দেখানোর জন্যে কোনো ছবির ওপর সেন্সারের খুব বেশী ধরাকাঠ থাকে না। কেননা, সেখানে ছবি দেখা হয় প্রমোদ-উপকরণ হিসাবে নয়, নিছক চলচ্চিত্র-শৈলীর বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে আলোচনার জন্যে। কাজেই এ-বিষয়ে ভারতীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের আইন-কানুন যত শীঘ্র পরিবর্তিত হয়, ততই মঙ্গল।

* * *

শোনা গেল, ভারতের বিভিন্ন শহরে পোলাণ্ডের চলচ্চিত্র-উৎসবের যে-আয়োজন আসন্ন হয়ে উঠেছে, তাতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোলিশ চিত্র "অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ড্‌স্‌" ছবিখানি দেখানো হবে না কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের নির্দেশে। তাঁদের মতে নাকি, ছবিটি দুর্নীতিকে সমর্থন করেছে, বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রচলিত মাপ-কাঠিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। কিন্তু যে মুষ্টিমেয় রসিকবৃন্দের ছবিটি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁরা কিন্তু "অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ড্‌স্‌"-এর প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ। চলচ্চিত্র উৎসবে জনসাধারণ এবং ব্যবসায় মারফত অর্থ রোজগারের কোন স্থান নেই। এখানে যাঁরা ভীড় করেন, তাঁরা শুধুই চিত্ররসিক—শিল্পান্বেষী। অতএব আবার নিবেদন করব, সেন্সার বোর্ড তাঁদের আইনের পরিবর্তন করুন অচিরেই।

* * *

স্বনামধন্য কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "উত্তরায়ণ" অন্যতম অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি হিসাবে সমাদৃত। লেখকের পরিণত জীবনের এই অনবদ্য সৃষ্টি "উত্তরায়ণ"-এর চিত্ররূপ ও পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন পারশমল দীপচাঁদের পক্ষে দীপচাঁদ কাঁকরিয়া। "অগ্রদূত" গোষ্ঠীর দুই বিখ্যাত কলাকুশলী বিভূতি লাহা ও যতীন দত্তের নির্দেশে এই বিরাট ও ব্যয়বহুল ছবির প্রায় বারো আনা দৃশ্য ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় এই নাটকের অন্তর্গত বহির্দৃশ্যাবলী ভারত সরকারের সেনাবিভাগের সহযোগিতায় গৃহীত হবার অপেক্ষায় আছে। বিখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—পাহাড়ী সান্যাল, অনিল চ্যাটার্জি, গীতা দে, শৈলেন মুখার্জি।

* * *

সুশীল মজুমদার প্রোডাক্টসন্স-এর নবতম সমাজ-চিত্র "কঠিন মায়া" মুক্তি প্রতীক্ষারত ছবির তালিকায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। ছবিটি কথা-শিল্পী গজেন্দ্রকুমার মিত্রের একটি নাটকীয় আবেগপূর্ণ রসাল কাহিনী অবলম্বনে রচিত। চিত্র-নাট্যরূপ দিয়েছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করছেন সুশীল মজুমদার।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানে সুর দিয়েছেন কালিপদ সেন। শিল্প-নির্দেশের দায়িত্ব নিয়েছেন সুনীতি

মিত্র। আলোক-চিত্র গ্রহণ করেছেন ঝিন্দের বন্দী-র আলোকচিত্র শিল্পী বিমল মুখার্জি। প্রধান দুটি চরিত্রে সন্ধ্যা রায় এবং বিশ্বজিৎ। অন্যান্য ভূমিকায়—অনুপকুমার, পাহাড়ী, জহর গাঙ্গুলী, কুমারী গৌরী মজুমদার, ভানু ব্যানার্জি, নবদ্বীপ, অজিত চ্যাটার্জি, দীপক দাস, গীতা দে, শ্যাম লাহা, অমর মল্লিক, কানু বন্দ্যোঃ, রাম চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী, নৃপতি চ্যাটার্জি।

ডিলক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ ছবিখানির পরিবেশক।

'শ্রেয়সী' নাটকের শ্বিশততম স্মারক উৎসব

গত মঙ্গলবার, ২০শে জুন ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত 'শ্রেয়সী' নাটকের শ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ষ্টার থিয়েটারের [illegible] শ্রীসলিলকুমার মিত্র এই উপলক্ষ্যে 'শ্রেয়সী' নাটকের কাহিনীকার শ্রীসুবোধ ঘোষ, নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত এবং এই নাটকের শিল্পী এবং নেপথ্যকর্মীদের বিবিধ মূল্যবান উপহারে সম্মানিত করেন। ষ্টার থিয়েটারের পক্ষ থেকে শ্রীছবি বিশ্বাস উপস্থিত অতিথি ও দর্শকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রেয়সী নাটকটি অভিনীত হয়।

জয় চিতোর এ সপ্তাহের একটি মাত্র হিন্দি চিত্র রজনী চিত্রের 'জয়-চিতোর' কলিকাতার নিউ সিনেমা, প্রভাত, প্যারামাউন্ট, পূর্বাশা, ন্যাশনাল, নব ভারত, পিকাডিলি, রিজেন্ট প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন—জশয়ন্ত ঝাবেরী; সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন—এস এন ত্রিপাঠী। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন—জয়রাজ, নিরুপা রায়, রাম সিং, সুন্দর, শ্যামকুমার, বিপিন গুপ্ত প্রভৃতি।

'চতুর্মুখ'

'চতুর্মুখ' সম্প্রদায় আগামী ১৫ই আগষ্ট রঙমহলে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নির্বোধ' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। নাটকটি 'ডস্টয়েভস্কি'র অমর উপন্যাস 'ইডিয়ট' অবলম্বনে রচিত।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন লোকনাথ চন্দ্র, অমর দত্ত, সুধীর দে, সবিতা মুখার্জি, প্রীতিকণা চৌধুরী, অমরেশ সেন, সত্য দাশগুপ্ত, তপন দাশগুপ্ত, তৃপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়, অনিল দত্ত, প্রাণতোষ লাহা, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, দীপক রায়, শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, অসীম চক্রবর্তী ও বীরেন ব্যানার্জি।

পরিচালনায় শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, সঙ্গীতে নির্মল চৌধুরী, আলোক-সম্পাতে রণজিত মিত্র ও দৃশ্যসজ্জায় বরেন মিত্র অংশগ্রহণ করবেন।

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

।। সিনেমা ।।

রূপবাণী, ভারতী, অরুণা—তিন কন্যা

মিনার, বিজলী, ছা[illegible]—ঝিন্দের বন্দী

উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা, আলোছায়া—পংকতিলক

রক্সি—নজরানা (হিন্দী)

হিন্দ, গণেশ, খান্না—শশুরাল (হিন্দী)

শ্রী, ইন্দিরা, রূপম—স্বরলিপি

প্যারাডাইস—জিস্ দেশমে গংগা বৈহতি হ্যায়

বসুশ্রী, বীণা—শাপমোচন

গ্লোব—*Scarface Mob*

মেট্রো—*Ben-Hur*

মিনার্ভা—*Moment of Danger*

এলিট—*The Wizard of Baghdad*

লাইট হাউস—*Inherit the Wind*

টাইগার—*Witness for the Prosecution*

ওরিয়েণ্ট, ম্যাজেস্টিক, মেনকা—আশকা পঞ্ছী (হিন্দী)

আলেয়া—মধ্যরাতের তারা

জ্যোতি, প্রিয়া, প্রভাত, রূপালী, নাজ, পূর্ণশ্রী—ডার্ক স্ট্রীট (হিন্দী)

দর্পণা, জনতা, গ্রেস, লোটাস, পার্কশো, ছায়া, কালিকা—ছোটে নবাব (হিন্দী)

চিত্রা—*Sign of the Gladiator*

নিউ সিনেমা, প্রভাত, প্যারামাউণ্ট—জয় চিতোর

।। থিয়েটার ।।

ষ্টার—শ্রেয়সী

রঙমহল—অনর্থ

মিনার্ভা—ফেরারী ফৌজ

বিশ্বরূপা—সেতু ও

গিরিশ নাট্যোৎসব প্রতি শনিবার

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

১৩ই জনু প্রথম টেস্ট খেলা শেষ হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ড সফরে আরও দুটি ম্যাচ খেলেছে—লিস্টার এবং কেন্ট কাউন্টি দলের বিপক্ষে। লিস্টার কাউন্টি দলকে অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে পরাজিত করেছে; কেন্ট দলের বিপক্ষে সফরের চতুর্দশ খেলাটি ড্র গেছে।

লিস্টার : ২৩৯ (এল আর গার্ডনার ১০২ নট আউট, এ্যালেন হোয়ার্টন ৭৪; ম্যাকেঞ্জি ৬০ রাণে ৫ উইকেট)। ও ১৭২ (ক্লিন ২৪ রাণে ৪, সিম্পসন ৫১ রাণে ৩, ম্যাকেঞ্জি ৪৫ রাণে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ৩৫৬ (পিটার বার্জ ১৩৭, কলিন ম্যাকডোনাল্ড ১০৫; ভ্যান গিলোভেন ৯৮ রাণে ৬ উইকেট) ও ৫৬ (কোন উইকেট না পড়ে)।

লিস্টার প্রথম ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ২৩৯ রাণ করে। গার্ডনারের নট আউট ১০২ রাণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য এই কারণে যে, ১৮৭৮ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের বিপক্ষে লিস্টার দলের এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। প্রথম সেঞ্চুরী করেন নিউ-জিল্যাণ্ড ক্রিকেট খেলোয়াড় স্টুয়ার্ট ডেম্পস্টার ১৯৩৮ সালে। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার দুটো উইকেট পড়ে মাত্র ৫৯ রাণ ওঠে।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৫৬ রাণে শেষ হয়—১৯২৬ সালের পর লিস্টারশায়ার কাউন্টি দলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার সর্বনিম্ন রাণের রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে দু'জন সেঞ্চুরী করেন। ভ্যান গিলোভেন ৯৮ রাণে ৬টি উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এইদিন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় লিস্টার দলের দুটো উইকেট পড়ে ৮১ রাণ ওঠে। তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে লিস্টার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৭২ রাণে শেষ হলে—খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৫৬ রাণ তুলতে অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে হয়। লাঞ্চের পূর্বের ১২ মিনিট এবং লাঞ্চের পরের ৪৫ মিনিট মোট ৫৭ মিনিটের খেলায় অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে ৫৬ রাণ তুলে দেয়।

অস্ট্রেলিয়া : ৪২৮ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লরী ১০০, ও'নীল ১০৪ নট আউট) ও ২০২ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নীল হার্ভে ৬৬। জোন্স ৪১ রাণে ৪)।

কেন্ট : ৩৪০ (৬ উইকেটে ডিক্লে-য়ার্ড। কলিন কাউড্রে ১৪৯; লিয়ারী ৫১; এ ফেবী ৫৯) ও ২৮৪ (৬ উই-কেটে। কাউড্রে ১২১, লিয়ারী ৬০)।

মাত্র সাত রাণের জন্যে কেন্ট জয়ী হতে পারেনি; খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল, ৬ উইকেট পড়ে কেন্টের ২৮৪ রাণ, আর সাতটা রাণ তুলতে পারলেই কেন্ট জয়ী হত। হাতে জমা ছিল ৪টে উইকেট। ঘড়ির কাঁটাই শেষ পর্যন্ত কেন্টের জয়লাভের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে খেলার ১৯০ মিনিট সময় থাকতে অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ২০২ রাণে (৫ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে ইংল্যাণ্ডকে ব্যাট করতে ছেড়ে

বিল লরী

[illegible]
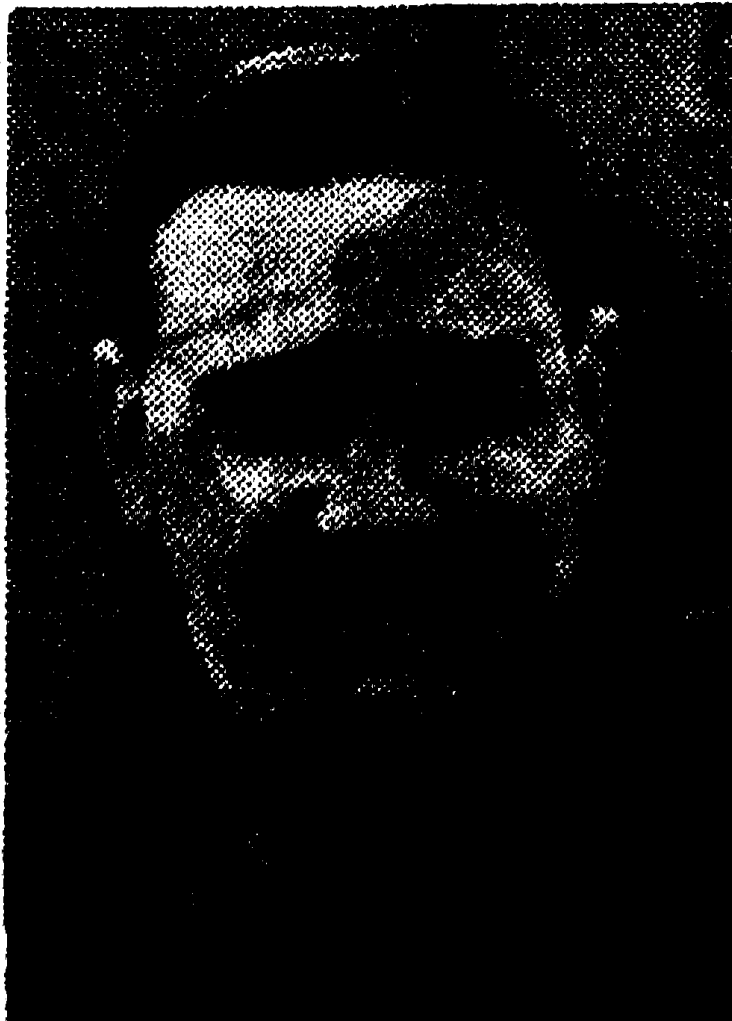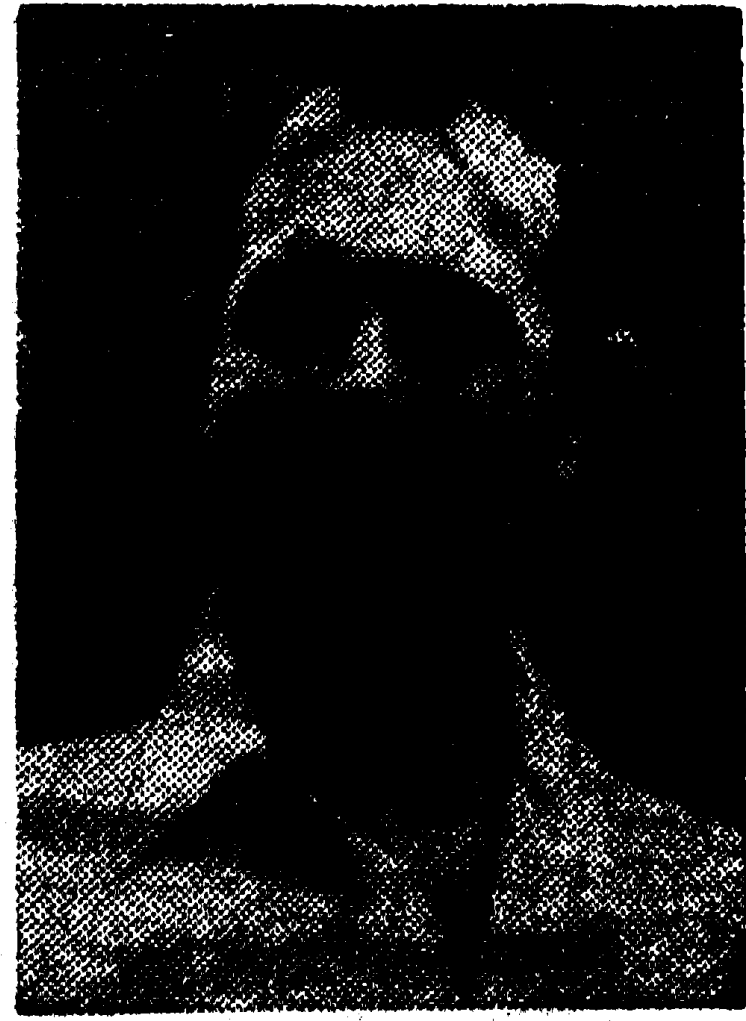
কলিন ম্যাকডোনাল্ড

দেয়। বাকি ১৯০ মিনিটের খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৯৯ রাণ করা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু কেন্ট দল অস্ট্রেলিয়ার এই চ্যালেঞ্জ সাহসের সঙ্গেই গ্রহণ করে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে খেলার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৮৪ রাণ তুলে দেয়—জয়লাভের প্রয়োজনীয় মাত্র ৭ রাণ তুলতে বাকি ছিল। ক্রিকেট খেলার আইন অনুসারে খেলার ফলাফল ড্র: কিন্তু নৈতিক দিক থেকে এ খেলায় কেন্টের জয়। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৪২৪ রাণে (৬ উইকেটে) এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ২০২ রাণে (৫ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে কেন্টকে সম্মুখ যুদ্ধে যে আহ্বান জানায় তার মধ্যে কেন্টের শক্তি সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ ধারণার অভাব ছিল। কেন্ট এই চ্যালেঞ্জের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয়—৬ উইকেটের ৩৪০ রাণে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং ২য় ইনিংসের ১৯০ মিনিটের খেলায় ২৮৪ রাণ তুলে দিয়ে। ব্যক্তিগত ক্রীড়া-চাতুর্যে অস্ট্রেলিয়াকে কেন্ট একহাত নিয়েছে। কেন্ট এবং ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী রাণ করেন। কাউড্রে তাঁর খেলোয়াড় জীবনে এই নিয়ে তিনবার একই ম্যাচের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব-লাভ করলেন। তাঁর পূর্বে সাফল্য: ১১০ ও ১০৩ (নিউসাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে, সিডনি, ১৯৫৪-৫৫) এবং ১১৫ নট আউট ও ১০৩ নট আউট রাণ (এসেক্সের বিপক্ষে, গিলিংহাম, ১৯৫৫)। চলতি ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই ধরণের সাফল্য কাউড্রে প্রথম করলেন। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ মরশুমের সফরে কোন খেলোয়াড় এখনও করতে পারেননি।

এক নজরে ফলাফল

ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণীর খেলা (১৮৭৮ থেকে ১৯৫৬)

মোট খেলা	জয়	ড্র	হার
৭২২*	৩১৭	৩০০	১০৪

১৯৬১ সালের সফর

(১৯৬১ সালের ২১শে জুন পর্যন্ত)

মোট খেলা ১৪, জয় ৫, ড্র ৯।

সেঞ্চুরী সংখ্যা

অস্ট্রেলিয়া ১৯

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৭

• একটি 'tied match' নিয়ে

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী (১৯): নর্মান ও'নীল ৪; বিল লরী ৪; নীল হার্ভে ৩ (১১৪, ১ম টেস্ট), পিটার বার্জ ৩; কলিন ম্যাকডোনাল্ড ২; ব্রেন বুথ ১; কেন ম্যাকে ১ এবং বব সিম্পসন ১।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বোচ্চ রাণ: ১৬৫ বিল লরী, সারে দলের বিপক্ষে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরী (৭)—কলিন কাউড্রে (এম সি সি এবং কেন্ট) ৩; জন প্রেসডী (গ্লামর্গান) ১; রমণ সুব্বা রাও (ইংল্যান্ড—১ম টেস্ট) ১; টেড ডেক্সটার (ইংল্যান্ড—১ম টেস্ট) ১; এল গার্ডনার (লিস্টারসায়ার) ১। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বোচ্চ রাণ: ১৮০ টেড ডেক্সটার, ১ম টেস্ট এজ-বাস্টন।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

টেস্ট খেলার তারিখ

(১৯৬১ সালের সফর)

২য় টেস্ট: লর্ডস।। জুন ২২, ২৩, ২৪, ২৬ ও ২৭।

৩য় টেস্ট: লিডস।। জুলাই ৬, ৭, ৮, ১০ ও ১১।

৪র্থ টেস্ট: ওল্ড ট্রাফোর্ড।। জুলাই ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ও ১লা আগষ্ট।

৫ম টেস্ট: ওভাল।। আগষ্ট ১৭, ১৮, ১৯, ২১ ও ২২।

ক্রিকেট খেলোয়াড়দের তীর্থস্থান

লর্ডস মাঠ

লণ্ডনের লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউণ্ড আপন ঐতিহ্যে এবং গৌরবে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ইংরেজ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছেও লর্ডস ক্রিকেট মাঠ এককথায় তীর্থস্থানের মতই পবিত্র এবং দর্শনীয়। ক্রিকেট-খেলোয়াড়-জীবনের সব থেকে বড় আকাঙ্ক্ষা—লর্ডস মাঠের টেস্ট খেলায় দলে স্থান পাওয়া। লর্ডস মাঠের ধুলো-বালি, আলো-বাতাস, মাথার উপরের আকাশ, তৃণাচ্ছাদিত কার্পেটের সুখ-স্পর্শ, লক্ষ লক্ষ চোখের উৎসুক দৃষ্টি—খেলোয়াড় জীবনের চরম কাম্য এবং পরম তৃপ্তি।

ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত আছে, অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠান এবং অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনের সূচনা হয়েছে খুব ছোট অবস্থা থেকে। লর্ডস মাঠের অধিকারী মেরীলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের জীবন-চরিত্র এই রকমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দু'শ বছরের বেশী আগে আর্টিলারী মাঠে আর্টিলারী গ্রাউন্ড ক্লাব নামে একটি ছোট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮০ সালে ক্লাবটি স্থান পরিবর্তন করে এবং ক্লাবের নামও বদলে যায়; নতুন নাম হয়—কনডুইট ক্রিকেট ক্লাব। ১৭৮৭ সালে ক্লাবটি লন্ডনের মধ্য-অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় এবং বর্তমান মেরী-লিবোন ক্রিকেট ক্লাব নামধারণ করে। মেরীলিবোন ক্রিকেট ক্লাব সংক্ষেপে এম-সি-সি নামে সুপরিচিত। এখন যেখানে ডরসেট স্কোয়ার সেখানেই ছিল ক্লাবের প্রথম লর্ডস মাঠ (১৭৮৭ থেকে ১৮১০)। পরে নর্থ ব্যাঙ্কে দ্বিতীয় লর্ডস মাঠ স্থাপিত হয়। ১৭১৪ সালে এম-সি-সি St. John's wood অঞ্চলে ৩য় লর্ডস মাঠ স্থাপন করে; অর্থাৎ যে মাঠে এখন খেলা হচ্ছে। লর্ডস মাঠের প্রতিষ্ঠাতার নাম টমাস লর্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় এম-সি-সি-র পদমর্যাদা একচ্ছত্র সম্রাটের সমান। ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনে কোন পরিবর্তন অথবা কোন কিছু সংযোজনা করার একমাত্র ক্ষমতা আছে এম-সি-সি কর্তৃপক্ষের। এক কথায় এম-সি-সি-কে ক্রিকেট খেলার আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বোচ্চ আদালত বলা যায়।

লর্ডস মাঠে ২২শে জুন, বৃহস্পতি-বার থেকে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলা সুরু হয়েছে। সুতরাং লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ইতিপূর্বে যে ১৯টি টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার বিবিধ রেকর্ড এই সময়ে পাঠকদের যথেষ্ট আগ্রহ বৃদ্ধি করবে।

লর্ডস মাঠের রেকর্ড

(১৯৬১ সালের ২১শে জুন পর্যন্ত)

মোট খেলা

১৯টি। অস্ট্রেলিয়ার জয় ৭, ইংল্যান্ডের জয় ৫ এবং খেলা ড্র ৭।

এক ইনিংসে সর্বাধিক রাণ

৭২৯ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩০।

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রাণ

ইংল্যান্ড: ৫৩ রাণ, [illegible]

অস্ট্রেলিয়া: ৫৩ রাণ, [illegible]

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ

ইংল্যান্ডের পক্ষে: ২৪০, ডব্লিউ আর হ্যামন্ড, ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে: ২৫৪, ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০

ডবল সেঞ্চুরী রাণ

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে: ২৫৪ ব্র্যাডম্যান (১৯৩০); ২০৬ নট আউট ডব্লিউ এ ব্রাউন (১৯৩৮)

ইংল্যান্ডের পক্ষে: ২৪০ ডব্লিউ আর হ্যামন্ড (১৯৩৮)

সেঞ্চুরী রাণ

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১৭

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ১৩

লর্ডস মাঠে দু'বার সেঞ্চুরী

মাত্র এই চারজন খেলোয়াড় লর্ডস মাঠে দু'বার সেঞ্চুরী রাণ করেছেন।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : (১) জ্যাক হবস (১০৭ রাণ, ১৯১২; ১১৯ রাণ, ১৯২৬); (২) শ্রেসবারী (১৬৪ রাণ, ১৮৮৬; ১০৬ রাণ, ১৮৯৩)

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : (১) ডন ব্র্যাডম্যান (২৫৪ রাণ, ১৯৩০; ১০২* রাণ, ১৯৩৮); (২) ডবলিউ এ ব্রাউন (১০৫ রাণ, ১৯৩৪; ২০৬* রাণ, ১৯৩৮)

লর্ডস মাঠে শেষ সেঞ্চুরী রাণ

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১০৪ এ এল হ্যাসেট, ১৯৫৩; ১০৯ কিথ মিলার, ১৯৫৩

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ১৪৫ এল হাটন, ১৯৫৩; ১০৯ ডবলিউ ওয়াটসন, ১৯৫৩

[১৯৫৬ সালের টেস্ট খেলায় কোন পক্ষের খেলোয়াড় সেঞ্চুরী রাণ করতে পারেননি]

প্রথম টেস্ট খেলায়—প্রথম সেঞ্চুরী

যে সব খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছেন। বিগত ১৭৯টি টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ১২ জন এবং অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৯ জন এইরূপ কৃতিত্বলাভ করেছেন। লর্ডস মাঠে এ পর্যন্ত যাঁরা এ রকম কৃতিত্বলাভ করেছেন তাঁদের নাম :

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ১৭৩ কে এস দলীপ সিংজী (১৯৩০); ১০৯ ডবলিউ ওয়াটসন (১৯৫৩)। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১০৭ এইচ গ্রাহাম (১৮৯৩)।

* নট আউট

পতৌদির নবাবের সাফল্য

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক পতৌদির নবাব ১৯৬১ সালের ইংলিশ ক্রিকেট মরসুমে সহস্র রাণ করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন। শক্তিশালী এম সি সি দলের বিপক্ষে তিনি সেঞ্চুরী রাণ (১০৮) ক'রে সহস্র রাণ পূর্ণ করেন। এই খেলার রাণ ধরে তাঁর মোট রাণ দাঁড়ায় ১০২৪, ১৮ ইনিংসের খেলায়। আগামী অক্টোবর মাসে এম সি সি ভারত সফরে আসছে। তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে টেস্ট খেলায় যোগদান করবেন। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মহলে তিনি 'টাইগার' নামে সুপরিচিত।

পতৌদির নবাব 'টাইগার'

উইম্বলেডন লন টেনিস

ইংল্যাণ্ডের লর্ডস ক্রিকেট মাঠ যেমন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মহা-তীর্থস্থান, তেমনি অপেশাদার লন্ টেনিস খেলোয়াড়দের কাছে লণ্ডনের সহরতলী উইম্বলেডন। টেনিস খেলোয়াড়রা উইম্বলেডন টেনিস কোর্টে শুধু খেলার সুযোগ লাভকেই জীবনের অনেকখানি পাওয়া মনে করেন। খেলায় খেতাব লাভের অর্থ স্বর্গ জয়। এই উইম্বলেডন টেনিস কোর্টে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় বিখ্যাত অল্ ইংল্যাণ্ড লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাটি আসল নামের থেকে উইম্বলেডন লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। খুব কম লোকই আসল নামটা ব্যবহার করেন। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে উইম্বলেডন লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপের পদমর্যাদা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশীপের সমান, যদিও সরকারীভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশীপ নামে প্রতিযোগিতাটিকে অভিহিত করা হয় না। টেবল টেনিস, ফুটবল, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলায় যেমন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশীপের ব্যবস্থা আছে লন্ টেনিস খেলায় অনুরূপ কোন ব্যবস্থা নেই। এর জন্যে কিন্তু টেনিস মহলে কোন ক্ষোভ নেই। ইংল্যাণ্ডের এই উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতাই ব্যক্তিগত বিভাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশীপের খেলা হিসাবে পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। তেমনি স্বীকৃতি লাভ করেছে ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা দলগত বিভাগের খেলায়। ঐতিহ্য এবং প্রাচীনত্বের দিক থেকে উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সমক[illegible] বিশ্ব ক্রীড়ামহলে খুব কমই [illegible]।

উইম্বলেডনের খ্যাতি শুধু টেনিস খেলা নিয়ে নয়, উইম্বলেডনের আর এক আকর্ষণ—তার মনোহারিণী বেশ-বিন্যাস, ছায়ায় ঘেরা তার স্নিগ্ধ পরিবেশ। মহিলাদের বিচিত্র সুঠাম দেহ-সজ্জায়, পরিপাটি নিখুঁত প্রসাধনে এবং চটুল হাসা-কৌতুকে উইম্বলেডন খেলার কয়েক দিন বিচিত্র মোহিনী-রূপ ধারণ করে। ফ্যাশানের রাজ-সিংহাসনে বসে আছে প্যারিস—উইম্বলেডনের স্থান তার পাশেই।

১৯৬১ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপের গুরুত্ব সব থেকে বেশী এই কারণে যে, প্রতিযোগিতার ৭৫ বৎসর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষ্যে ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী প্রত্যেককে ৭৫তম অনুষ্ঠানের স্মারক হিসাবে একটি ক'রে রৌপ্য-নির্মিত পেন্সিল উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

রমানাথন কৃষ্ণান

১৯৬১ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা ২৬শে জুন থেকে আগামী ৬ই জুলাই পর্যন্ত চলবে। প্রতি বছর প্রতিযোগিতা আরম্ভের পূর্বে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী

॥ খেলোয়াড়-জীবনের পরম তৃপ্তি ॥

১৯৬১ সালের উইম্বলেডন টেনিসে খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় পুরুষদের এক নম্বর খেলোয়াড় নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)।

খেলোয়াড়দের নামের একটি বাছাই তালিকা প্রকাশ করা হয়। খেলোয়াড়দের বিভিন্ন টেনিস প্রতিযোগিতায় সাফল্যের উপর ভিত্তি ক'রে এই তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়।

১৯৬১ সালের বাছাই তালিকায় পুরুষদের সিংগলস বিভাগে গত বছরের সিংগলস বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রেজার প্রথম স্থান লাভ করেছেন। এই বিভাগে মোট আটজন খেলোয়াড়ের নাম আছে—অস্ট্রেলিয়ার তিনজন এবং ইটালী, স্পেন, চিলি, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার একজন ক'রে খেলোয়াড়। ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান তালিকায় সপ্তম স্থান পেয়েছেন।

মেয়েদের সিংগলস খেলার তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সান্ড্রা রেনোল্ডস। গত বছরের বিজয়িনী ব্রেজিলের মারিয়া বুয়েনো অসুস্থতার কারণে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেছেন। আমেরিকার বিখ্যাত মহিলা খেলোয়াড় মিস ডার্লিন হার্ড এ বছরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন না। পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস বিভাগেও প্রথম স্থান লাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় জুটি। খেলোয়াড়দের নামের বাছাই তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই প্রাধান্যলাভ করেছেন। পুরুষদের সিংগলস খেলার তালিকায় ১ম ও ২য় স্থান, মহিলাদের সিংগলসে ২য়, পুরুষদের ডাবলসে ১ম ও ২য় এবং মিক্সড ডাবলসে ১ম স্থান পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তাছাড়া প্রতি বিভাগে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানও পেয়েছে।

ভারতবর্ষের এই ছ'জন খেলোয়াড়ের ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় যোগদান করার কথা আছে—রমানাথন কৃষ্ণান (গত বছর পুরুষদের সিংগলস্ খেলার সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন), প্রেমজিৎ লাল, জয়দীপ মুখার্জি, আখতার আলী, নরেশকুমার এবং জে ভি ডেহেভিয়া।

মহিলাদের সিংগলসে এক নম্বর খেলোয়াড়গত বছরের রানার্স-আপ সান্ড্রা রেনোল্ডস (ছবির ডানদিকে)। ট্রফি হাতে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ব্রেজিলের মারিয়া বুয়েনো।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সাত দিনে (১৯শে জুন থেকে ২৫শে জুন) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল : ইষ্টবেংগল দলের দু'টি খেলায় জয়, খিদিরপুর দলের বিপক্ষে মোহনবাগানের খেলা ড্র,

ইস্টার্ণ রেল দলের বিপক্ষে মহমেডান স্পোর্টিং দলের জয় এবং স্পোর্টিং ইউ-নিয়নের খেলা ড্র।

আলোচ্য সপ্তাহে ইস্টবেঙ্গল দল লীগের ফিরতি খেলায় ২—০ গোলে বি এন আর দলকে এবং ২—১ গোলে পুলিশকে পরাজিত ক'রে লীগের তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। দ্বিতীয়ার্ধের ১৫ মিনিটে পুলিশ প্রথম গোল দেয়। এক মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল গোলটি শোধ করে। এই দিনের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণভাগ যেমন একাধিক গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ নষ্ট করেছে, তেমনি পুলিশ দলের রক্ষণভাগ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে একাধিকবার আক্রমণ ব্যর্থ করেছে। বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ১৫টা খেলায় ২৭ পয়েণ্ট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান দলের থেকে সমান ১৫টা খেলায় ১ পয়েণ্টে এগিয়ে আছে।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান লীগের ফিরতি খেলায় ৪—০ গোলে হাওড়া ইউনিয়নকে পরাজিত ক'রে পরবর্তী খেলায় খিদিরপুরের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র করেছে। লীগের প্রথম খেলায় তারা ২—১ গোলে খিদিরপুরকে পরাজিত করেছিল। ফিরতি খেলায় মোহনবাগান দলকে দুর্ভাগ্য এবং ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথমার্ধের খেলার ১৮ মিনিটে দলের প্রধান নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় চুণী গোস্বামী খেলায় আঘাত পেয়ে বরাবরের জন্যে মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় খিদিরপুর দলের স্টপার এ ঘোষাল দু'বার হাত দিয়ে বল আটকে খেলার গতি প্রতিরোধ করেন—দ্বিতীয়বার করেন পেনাল্টি সীমানার মধ্যে হাত দিয়ে। দু'টি ঘটনাই রেফারী উপেক্ষা করেন। তাছাড়া অতি অল্পের জন্যে কয়েকবার খিদিরপুর গোল রক্ষা পায়। এসব দুর্ভাগ্যের উপর মোহনবাগান দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। উপর্যুপরি ১০টি খেলায় জয়লাভের পর মোহনবাগান তাদের পঞ্চদশ খেলায় মূল্যবান এক পয়েণ্ট নষ্ট করেছে।

বি এন আর লীগের ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে পরাজিত হয়ে পরবর্তী খেলায় কোনরকমে হাওড়া ইউনিয়নকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। দলের ত্রয়োদশ খেলায় উয়াড়ীর বিপক্ষে ৩—০ গোলে জয়ী হয়। আপ্পালারাজু এ মরশুমের তৃতীয় 'হ্যাট—ট্রিক' করেন। ইতিপূর্বে প্রদীপ ব্যানার্জি (ইস্টার্ণ রেল) খিদিরপুরের বিপক্ষে এবং ভারালু (বি এন আর) পুলিশের বিপক্ষে 'হ্যাট-ট্রিক' করেছেন। বর্তমানে তাদের খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ১৩টা খেলায় ২০ পয়েণ্ট, লীগের তালিকার ৩য় স্থান।

ইস্টার্ণ রেলওয়ে তাদের একাদশ খেলায় ৭—১ গোলে (গত সংখ্যায় ছাপার ভুলে ৭—০ ছিল, লীগের টেবলে নির্ভুল ছিল) হাওড়া ইউ-নিয়নকে হারিয়ে এ-মরসুমের সর্বাধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভের রেকর্ড করেছিল। কিন্তু পরবর্তী দ্বাদশ খেলায় তারা নাটকীয়ভাবে মহমেডান স্পোর্টিং দলের কাছে খেলার শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে লীগের খেলায় ৪র্থ পরাজয় বরণ করেছে। গোল হওয়ার পর বলটি সেণ্টার করার পূর্বেই খেলা সমাপ্ত হয়। অপ্রত্যাশিত এই পরাজয়ের জন্যে রেল দলের ব্যাক বি মিত্র সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন। খেলা ভাঙ্গতে মাত্র এক মিনিট বাকি। এই সময়ে অকারণ ফাউল করার দরুণ মহা-মেডান স্পোর্টিং দল ফ্রি-কিক পায়। ফ্রি-কিক থেকে এম গুহঠাকুরতা হেড দিয়ে গোল করেন। রেল দল এই দিনের খেলায় বিপক্ষ দল অপেক্ষা গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ পেয়েছিল বেশী; কিন্তু আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতায় গোল হয়নি।

দলের ত্রয়োদশ খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা ড্র করায় ১৩টা খেলাতে ১৬ পয়েণ্ট দাঁড়িয়েছে।

এরিয়ান্স আলোচ্য সপ্তাহে ২টো খেলাতেই জয়ী হয়েছে—পয়েণ্ট ১৭, ১৩টা খেলায়। এখন লীগের তালিকায় ৪র্থ স্থান।

বি এন রেলওয়ে এবং উয়াড়ীর বিপক্ষে উপর্যুপরি দু'টি খেলায় হার স্বীকার করে গত বছরের রাণার্স-আপ মহমেডান স্পোর্টিং পরবর্তী দু'টি খেলায় জয়ী হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে ১৪টা খেলায় ১৬ পয়েণ্ট।

২৫।৬।৬১

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

স্মরণীয়

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি
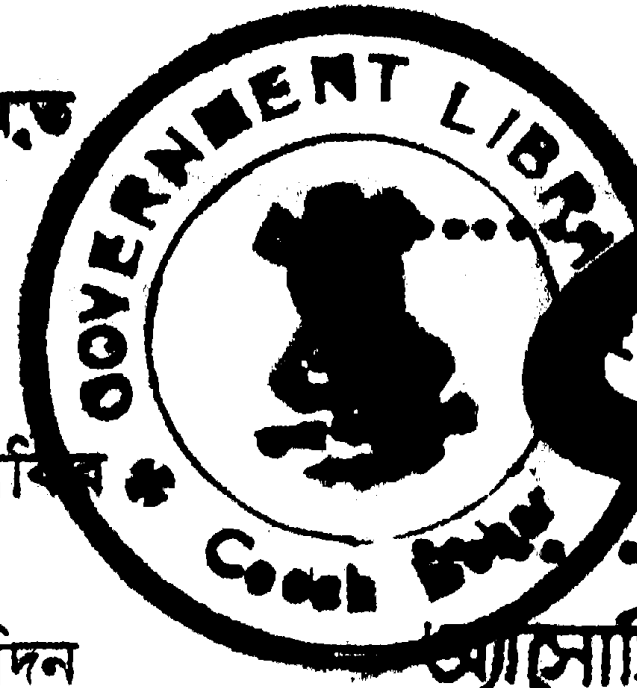
কিশোর-মনকে গড়ে তোলার পক্ষে
দেশ দেশ নন্দিত ভারতের আদিকবি বাল্মীকির
রামায়ণের শিক্ষা আজও অতুলনীয়
আপনাদের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিন

প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও সংসদ বাঙলা অভিধান সংকলয়িতা

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাসের **বাল্মীকি রামায়ণ** ২·৫০

ছোটদের মহাভারত ৩·০০

লেখকের চিত্তহরা ভাষায় ও প্রশান্ত রায়ের প্রতিভাদীপ্ত চিত্রাবলীতে গ্রন্থখানি সমুজ্জ্বল। অত্যুৎকৃষ্ট প্রচ্ছদ ছাপা বাঁধাই ও কাগজ।

শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছোটদের জন্য সদাশিবের পরবর্তী কাহিনী

সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড ১·৫০

৭ই জ্যৈষ্ঠের বই

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
দক্ষিণের বারান্দা ৪৲

বাণী রায়ের
সেই চেনা ছেলেটি ১·৭৫

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর দোতলার দক্ষিণের বারান্দাতে ছিল শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের আস্তানা। এইখানে ছিল তাঁর **শিল্পসাধনার** পীঠস্থান। এইখানেই বসত রবীন্দ্রনাথের **সকল** নাটকের রিহার্সালের আসর। এইখানেই দেশ-বিদেশের গুণীজনেরা আসতেন অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, **আবার এইখানেই** ঠাকুরবাড়ীর ছোট-ছোট বালক-বালিকারা প্রবীণ **অবনীন্দ্রনাথ** ও রবীন্দ্রনাথের **সঙ্গে** ছেলে-খেলা করত। সেই সকল কাহিনী ও ঘটনার **অজস্র** বিবরণ ও বর্ণনায় ভরপুর অবনীন্দ্র-দৌহিত্র শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই স্মৃতিকথা।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

উপন্যাস : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **আগামীকাল** ২·৫০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **হিয়ে হিয় রাখনু** ৩·০০ ॥ লীলা মজুমদারের **ঝাঁপতাল** ২·৭৫ ॥ বনফুল-এর **হাটে-বাজারে** ৩·৫০ ॥ বুদ্ধদেব বসুর **হে বিজয়ী বীর** ৩·৫০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **ঠিক-ঠিকানা** ২·০০ ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **কলকাতার কাছেই** ৬·০০ ॥ প্রতিভা বসুর **মালতীদির গল্প** ২·৫০ ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর **অনুষ্টুপ ছন্দ** ৪·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **কিশোর গান** ৫·০০ ॥ প্রবোধকুমার সান্যালের **অগ্রগামী** ৪·০০ ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের **হাসপাতাল** ৬·৫০ ॥ বিমল মিত্রের **নিশিপালন** ৪·৭৫ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **সৃষ্টি** ৫·৫০ ॥ অজিতকৃষ্ণ বসুর **প্রজ্ঞাপারমিতা** ৬·০০ ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **চতুষ্কোণ** ৩·২৫ ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **বার ঘর এক উঠোন** ৭·৫০ ॥ দেবেশ দাশের **রক্তরাগ** ৪·৫০ ॥ রামপদ মুখোপাধ্যায়ের **মেঘলা আকাশ** ২·০০ ॥ 'বিক্রমাদিত্য'র **অনোখীলাল পাখোটিয়া** ২·৫০ ॥ প্রশান্ত চৌধুরীর **স্বগতোক্তি** ৩·২৫ ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **অভিষেক** ৫·৭৫ ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষের **গান্ধর্ব** ৩·৫০ ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **জলপ্রপাত** ২·৭৫ ॥ বাণী রায়ের **আরো কথা বলো** ২·৭৫ ॥ চিত্রিতা দেবীর **দুই নদীর তীরে** ৬·৭৫ ॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের **সোহো স্কোয়ার** ২·৫০ ॥ চিত্তরঞ্জন মাইতির **অগ্নিকন্যা** ৩·০০ ॥

গল্পগ্রন্থ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **ডবল ডেকার** ৩·০০ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **পুতুল ও প্রতিমা** ৩·২৫ ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সিঁদুরে টিপ** ২·৫০ ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **মালাচন্দন** ৩·০০ ॥ দ্বারেশ শর্মাচার্যের **জ্যোতিষীর ডায়েরী** ২·৫০ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জন্ম ও মৃত্যু** ৩·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **কায়কল্প** ৩·৫০ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জাতিস্মর** ২·৫০ ॥ নিরুপমা দেবীর **আলেয়া** ২·০০ ॥ প্রবোধকুমার সান্যালের **অঙ্গার** ৩·০০ ॥ সন্তোষকুমার ঘোষের **পারাবত** ৩·০০ ॥ বিমল মিত্রের **পুতুলদিদি** ৩·০০ ॥ বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের **রূপহলুদ** ২·৫০ ॥ জ্যোতির্ময় ঘোষের ('ভাস্কর') **কাংশন** ৩·০০ ॥

কবিতাগ্রন্থ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **প্রথমা** ২·৫০ : **সম্রাট** ২·০০ : **সাগর থেকে ফেরা** ৩·০০ : **ফেরারী ফৌজ** ২·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **নীল আকাশ** ২·০০ ॥ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের **কবি-চিত্ত** ৪·০০। বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **একুশটা জেরে** ১·৫০ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **স্বনির্বাচিত কবিতা** ৪·০০ ॥ 'বনফুল'-এর **নূতন বাঁকে** ২·৫০ ॥ দেবেন দাশের **দূরের বাঁশরী** ২·৫০ ॥

তোমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ... মহাত্মা ... 'ক...'

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা ৩

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—শ্রীশৈল চক্রবর্তী

অমৃত

১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, মূল্য—৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ২২শে আষাঢ়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 7th July, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

মৃত্যুর দুই বৎসর পরে কাশীপুর শ্মশানঘাটে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের চিতাভূমিতে একটা স্মৃতিবেদী স্থাপনের উদ্যোগ আরম্ভ করা হয়েছে। গত শুক্রবার কলকাতার মেয়র সেই স্মৃতিবেদীর ভিত্তিপ্রস্তর মাত্র স্থাপন করেছেন এবং আশঙ্কা করা যায় যে, নিমতলা শ্মশানে রবীন্দ্র-স্মৃতিবেদীর যে দুর্দশা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ-দশ বৎসরের মধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছে, অচিরে শিশির-কুমারের স্মৃতিবেদীর উপরেও বঙ্গ-সংস্কৃতির সেই অবমাননা আত্মপ্রকাশ করবে। কেননা, বাংলা দেশে প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ যিনি একাদিক্রমে অভিনয়শিল্পে প্রথম ও অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে গিয়েছেন, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জীবনের কয়েক বৎসর সেই দুর্ভাগ্যের দ্বারাই লাঞ্ছিত হয়েছিল, যে দুর্ভাগা এই আত্মবিস্মৃত জাতি তার সংস্কৃতির নায়কদের অকুণ্ঠিত হস্তে উপহার দিয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার এই ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে বলেছেন যে, শিশিরকুমারের প্রতি আমাদের যে ঋণ তা 'ঋষিঋণ'। 'ক্ষেম ও যোগের দ্বারা এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। মধ্যবিংশ শতাব্দীর বিধ্বস্ত ও আদর্শচ্যুত বঙ্গসংস্কৃতির কক্ষে এই ক্ষেম ও যোগের বাণী প্রকাণ্ড পরিহাসের মত ধ্বনিত হবে সন্দেহ নেই। কারণ যে যুগে বঙ্গদেশ তার সংস্কৃতির ঋষিঋণ এই সৌম্য গম্ভীর উপাচারের দ্বারা পরিশোধ করতে পারত, বাংলার সেই নির্মল তাপদগ্ধ মহান ইতিহাসের অধ্যায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেই বোধকরি অবসিত হয়েছে। শক্তিমানের সেই সামর্থ্য সেদিন বঙ্গদেশে ছিল। এবং ছিল বলেই সেই যুগের সন্তানেরা সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে নাট্যে—শিশিরকুমার, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশ এবং মেঘনাদ প্রভৃতি অসংখ্য প্রতিভার বহ্নিমান দীপশিখার দ্বারা সংস্কৃতির পিতৃপুরুষদের ঋষিঋণ পরিশোধ করেছিলেন। দুর্ভাগ্য এই —বঙ্গদেশে সাংস্কৃতির এই সজীব ও তেজস্বী ধারা আজ স্তব্ধপ্রায়। এই আত্ম-ধিক্কার কঠিন শোনাতে পারে, কিন্তু কখনো কখনো তীব্র দুঃস্বপ্নের মত মনে হয় যে, সংস্কৃতির যে শ্মশান-ভূমিতে আমাদের জাতি আজ দণ্ডায়-মান সেখানে স্মৃতিপূজা কেবলমাত্র কর্পোরেশন-সৃষ্ট চিতাবেদী কিংবা ইঞ্জিনীয়ারের ক্রিয়াকৌশলে তৈরী-করা গ্যাসের অনির্বাণ শিখায় এসে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে কিছু শুষ্ক মাল্য, কিছু পরিত্যক্ত সংবাদ-পত্র, ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশ বাল্ব, বৎসরের কোনো একদিন গুটিকয় লোকের ক্যামেরামুখী উৎসুক দৃষ্টি এবং তার পর ভিক্ষার্থীর নৈশ বিশ্রম্ভালাপ—হায়! এই কি বর্তমান যুগের ঋষিঋণ?

নতুবা নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের শেষ জীবনকে হতাশ্বাস এমনভাবে আচ্ছন্ন করত না এবং তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বঙ্গসংস্কৃতির শোকাশ্রু এমনভাবে শুকিয়ে যেত না। বর্তমান কালের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, সর্বনাশা রাজনীতি বাংলাদেশকে চিন্তা, অধ্যয়ন, নিষ্ঠা ও নিবিষ্টতা থেকে সরিয়ে এনেছে। সাহিত্য, শিল্প, নাট্যকলা, নৃত্য-গীতাদি সমস্ত সুকুমার বৃত্তি এবং এমন কি বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রেও এই অনিবিষ্টতা এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট মূল্যহীন সাময়িকতা আজিকার বঙ্গদেশের রূঢ়তম বাস্তব। এই বাস্তবের জন্য কে দায়ী সেকথা স্থূলভাবে একবাক্যে নির্দিষ্ট করা নিশ্চয়ই যায় না। ক্ষয়িষ্ণু যুগ, সমাজ—অর্থনৈতিক বিবর্তন, রক্ত-ক্ষয়ী পার্টিশান এবং বাংলার মফঃস্বল সংস্কৃতির মৃত্যু এই সব বহুবিধ কারণ বর্তমান পটভূমিকে নিশ্চয়ই কালিমালিপ্ত করেছে। কিন্তু রাজ-নীতি এবং গভর্ণমেণ্ট, যাঁরা বর্তমান যুগে সংস্কৃতির বৃহত্তম পৃষ্ঠপোষক ও কর্ণধার, তাঁরা বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রকে বহুলাংশে বিপথগামী ও বিপর্যস্ত করেছেন—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, বিদ্যাবত্তা, মননশীলতা এবং সৎসংস্কৃতির পরি-চর্যা এই রাষ্ট্র এবং একান্তভাবে ভোটমুখী রাজনীতির ধর্ম নয়। এখানে বিগত ১৪ বৎসরের মধ্যে গুণীর অনাদর, সৎসংস্কৃতি ও শিল্পের পরিচর্যায় অনুৎসাহ, অথচ অন্য দিকে কুৎসিত 'গুণীজন সংবর্ধনা', পুরস্কার বৃত্তি ও পারিতোষিক আন্তঃসারহীন সংস্কৃতির প্রগলভতা ও দুর্নীতিকে সস্নেহে লালিত করেছে। যতদিন এই অসার সংস্কৃতি ও আত্মবিক্রয়েচ্ছু কলমচী, নর্তক ও নটেরা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত না হচ্ছে এবং নূতন বলিষ্ঠ সংস্কৃতি পুনরায় শিশিরকুমার প্রভৃতি শতাব্দীর জন্ম-লগ্নের জ্যোতিষ্কদের ন্যায় গভীর অহঙ্কারে আত্মপ্রকাশ না করছে, ততদিন বাংলার ঋষিঋণ পরিশোধ অসম্ভব।

॥ আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ॥

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন, এ-সংবাদে সকলেই মর্মাহত হবেন। খবরের কাগজে যেটুকু জানা গিয়েছে তাতে দেখা যায় যে, বন্দুক পরিষ্কার করার সময় হঠাৎ গুলীর আঘাত লেগে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র বাষট্টি বৎসর। কাজেই পশ্চিমী জগতের স্বাস্থ্য ও আয়ুর নিরিখে একে অকালমৃত্যুই বলতে হবে।

কিন্তু এইরকম অভাবনীয় মৃত্যু যেন হেমিংওয়ের শৈশব থেকেই নির্যাতনির্দিষ্ট। খেলাধুলো, সাঁতার, শিকার ও মুষ্টিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে তিনি যেরকম বে-পরোয়া ও বৈচিত্র্য-সন্ধানী হয়ে উঠেছিলেন, তারই প্রবর্তনায় তিনি জন্মভূমি আমেরিকা থেকে গেছেন সাংবাদিকতার বৃত্তি নিয়ে ইউরোপে, যোগ দিয়েছেন প্রথম মহাযুদ্ধে, গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এবং পরিণত বয়সে ছুটে গেছেন স্পেনীয় গৃহবিপ্লবের রণাঙ্গণে। সত্যি বলতে কি, বিপদের দিকে যেন তাঁর একটা অত্যন্ত তীব্র এবং স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। সাহিত্যের ভিতরও তিনি এক-দিকে যেমন নিপীড়িত মানুষের অন্তহীন বেদনার শরিক হয়েছেন, তেমনি আকস্মিক উপপ্লব যে আমাদের আজন্মসহচর, এটাও বারে বারেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্য, নিজেও তিনি প্রাণ দিলেন দুর্ঘটনার হাতেই।

হেমিংওয়ে ১৮৯৯ সালে আমেরিকার ইলিনয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উনিশ বছর বয়সের আগেই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করে আহত হন। যুদ্ধের এই বীভৎস ও নিদারুণ অভিজ্ঞতা প্রথম যৌবনেই তাঁকে যুদ্ধ-বিরোধী করে তোলে। পরবর্তী কালে (১৯২৯) প্রকাশিত 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্' উপন্যাসে এই অভিজ্ঞতাকে তিনি এমন শিল্পসম্মতভাবে রূপ দিয়েছিলেন যে, বইখানি আমাদের যুগের সাহিত্যে একটি কালজয়ী সম্পদ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তেমনি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা 'ফর হুম দি বেল টোলস'। হেমিংওয়ের পরিণত জীবন-দৃষ্টি এই শেষোক্ত বইতে এমনভাবে চরিত্র-রূপায়িত হয়ে উঠেছে যে, একে মহাকাব্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হেমিংওয়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ অবশ্য 'থ্রি স্টোরিজ অ্যান্ড টেন পোয়েমস্' (১৯২৩)। এই গ্রন্থটি তাঁর প্যারিস বাসের সময় এজরা পাউন্ড এবং গার্ট্রুড স্টাইনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয় এবং তখনই তিনি রসজ্ঞ সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তারপর অনেকগুলি গল্প-উপন্যাস রচনা করে প্রায় তিরিশ বছর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর 'দি ওল্ড্ ম্যান অ্যান্ড দি সী' (১৯৫২)। পরবর্তী বছরেই হেমিংওয়ে এই উপন্যাসের জন্যে পান পুলিটজার পুরস্কার এবং তারপরের বছরে (১৯৫৪ সালে) আসে তাঁর সাহিত্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি নোবেল পুরস্কার।

লেখক হিসাবে হেমিংওয়ে এক নতুন ধারার প্রবর্তক হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর ভাষা অত্যন্ত সরল এবং নিরাভরণ, অথচ বর্ণনার গুণে তার ভিতরে এমন একটি আবেগ ধ্বনিত হয়, যা একান্তই অননুকরণীয়। শব্দ-নির্বাচনের সূক্ষ্মতা, বাক্য গঠনের ইঙ্গিতময়তা এবং বিষয়বস্তুর নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনাই হেমিংওয়ের রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য। বাহুল্যবর্জিত এই আপাতসাধারণ ভাষার আকর্ষণ যে কত দুর্নিবার, তা দেশে-বিদেশে হেমিং-ওয়ের অসংখ্য অনুগামী লেখকের সংখ্যা দেখেই অনুমান করা যায় এবং এ-কালের বাংলা সাহিত্যও সে-তালিকা থেকে বাদ যায় না।

হেমিংওয়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন সেইজন্যে আনুষ্ঠানিক নয়, একান্তই আন্তরিক।

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২১।৭।৫৯

রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলে-ছিলেন, 'আমরা বাঙালীরা যে নতুন কিছু না করে থাক[illegible]পারি[illegible]' পারি না-র রি-টায় দীর্ঘ ঈ-কার টেনে দিয়েছিলেন। বিস্তর দৃষ্টান্ত দিলেন; শেষে গানের কথা হোলো, নিধুবাবুর টপ্পা থেকে যদুভট্ট আর গোঁসাইজী পর্যন্ত। নিধুবাবু ত' বুঝলাম, অর্থাৎ টপ্পা, সেটা সোরি মিঞাঁ থেকে ভাঙ্গা। কিন্তু বাকী এঁরা? রবীন্দ্রনাথের মতে এঁরাও নিজস্ব বাঙালীভাবে ধ্রুপদ গাইতেন।

বোধ হয় তাঁর কথাই ঠিক। রবীন্দ্রনাথ ত' নিজেই, ভীষ্মদেব পর্যন্ত তাই। ভীষ্মদেবের নতুনত্ব ছিল সম্পূর্ণ স্বকীয়, বাদল খাঁ সত্ত্বেও, এবং বাদল খাঁ নিজে কখনও গাইতেন না, হাত দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। ভীষ্মদেবের স্বকীয়তা ছিল "টপ্ খেয়ালে", এবং টপ্পার অঙ্গাই ছিল বাংলাদেশের। এমন নতুন ধাঁজে সেটা বসাত যে তার অনুকরণ করা যেত না। আজকালকার অল্পবয়স্ক গায়কবৃন্দ ভালোই গাইছেন, কিন্তু তাঁরা যেন অন্য লোকের মুখ থেকে তুলে নিচ্ছেন, হয় বড়ে গোলাম আলির, না হয় আমীর খাঁর। ভীষ্মদেবের যথার্থ নিজস্ব কৃতিত্ব ছিল।

আজকাল ভীষ্মদেব আর গায় না। কিন্তু দুপুর বেলা তাঁর রেকর্ড বেতারে শোনা যায়। আমি সত্যই সেজন্য কৃতজ্ঞ। আমার দুঃখ রবীন্দ্রনাথ ভীষ্মদেবের গান শোনেননি। প্রথমে হারমনিয়মের সঙ্গে গাইত, পরে অত্যন্ত আস্তে, মিষ্টি করে, এবং আরো পরে, তানপুরোর সঙ্গে। কণ্ঠও আগের তুলনায় আস্তে হয়ে যায়। আওয়াজ ছিল অদ্ভুত। সবটাই তার নিজস্ব। বহু বৎসর পূর্বে রাজসাহীতে ব্রজেন মৈত্রের বাড়ি প্রায় পাঁচ ছ ঘণ্টা গান গায়, অত্যন্ত আস্তে আস্তে। রবীন্দ্রনাথকে শোনাতে চেয়েছিলাম। জ্ঞান গোঁসাইএর মতন গুরুগম্ভীর গমকতান ছাড়া আর সব জিনিস সে কণ্ঠে আনতে পারত। কেন এই বয়সে গান ছেড়ে দিলে! শোনা

বার, ধর্মের জন্য। বিবেকানন্দও ত' গাইতেন।

২২।৭।৫৯

একজন সুন্দরী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে ক'জন দেখেছেন?' ধীরে ধীরে চার পাঁচজনের নাম করলেন। আমি একজনকেও দেখিনি, তবে দু এক জনের নাম শুনেছি। বিলেতে এই রকম সুন্দরীর নামডাক হোতো, ডাকের সুন্দরী। এ-দেশে কিন্তু তা হয় না—এঁরা সকলেই অসূর্যম্পশ্যা। সুন্দর পুরুষের নাম তবু ছিল। অমৃতবাবু (বোস) বলতেন, গাড়িতে জ্যোতিবাবু চলেছেন, রাস্তার মোড় থেকে দেখতে যেতেন। (রবীন্দ্রনাথ নাকি সুদর্শন ছিলেন না!) ভারতবর্ষে সৌন্দর্যের কদর নেই, অথচ শুনেছি কামশাস্ত্রের বচন। আমরা বড়ই দেহগন্ধী।

* * *

ইদানীংকার ছেলেমেয়েদের ঠিক মনে ধরে না। তাদের মধ্যে অনেক ভালো ছেলেমেয়ে নিশ্চয়ই আছে, মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু গড়পড়তা, তাঁদের একটা দোষ আছে। কোথায় যেন seriousness-এর অভাব, একটা যেন puritanism-এর খাঁকতি, যেন গোঁড়ামি নেই, ব্রাহ্মগিরি যেন কম। ব্রাহ্ম সমাজের অনেক দোষ ছিল, কিন্তু একরোখামির জন্য অনেক কিছু গুণও বর্তে ছিল। যথা জগদীশ বোস, হেরম্ব মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র থেকে বীরবল সাহিনী, প্রশান্ত মহালানবীশ, নির্মল সিদ্ধান্ত, সুশোভন সরকার পর্যন্ত। ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু হয়ে গেছে, এবং বাঙালী হিন্দুও সর্বহারা।

* * *

উত্তর ভারতে সর্বত্র পাঞ্জাবীরা ছেয়ে ফেলেছে। তাদের জন্য আমাদের বহু উপকার হয়েছে, তারা নিজেদের উপকার ত করছেই। এমন বলিষ্ঠ জাতি ভূভারতে নেই। জিনিস হিসেবে খায় ভালো, এবং আরো বেশি, কাপড় পরে ভালো। পড়াশুনার ওপর ঝোঁক যেন একটু কম, দিল্লী ও পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কিছু হচ্ছে। সেটা ঠিক ভালো কি মন্দ বুঝি না, বাঙলার মতন না হলেই ভালো। কর্মের দিকটা একটু বেশি জাগ্রত, পরে কি হবে বোঝা যায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক দিয়ে শেষে কি বেশি দিন চলবে? সকলে যদি কন্ট্রাক্টার হয় তবে এঞ্জীনিয়ার কে হবে?

২৩।৭।৫৯

আমাকে একজন প্রশ্ন করলে, 'তুমি আগেও ভালো গান শুনেছ, এখনও শুনছ। দুটোর মধ্যে, তোমার মতে তফাৎটা কি ও কেন?'

ভালো কি মন্দ বলা চলে না। দুটো, ভেবে দেখলে, দু রকমের। দুজনেই যদি ছায়ানট গায় তবে মনে হয় গড়পড়তা একই রকমের দাঁড়াবে। তবে ব্যাপার হোলো এই: দুজনে ঠিক একই ছায়ানট গায় না, একজনে অন্ততঃ ছায়া কিংবা নটমল্লার গাইবে, তানের সময় কিছু বদলে যাবে। সেই জন্য ঠিক একই রকম হবে না। সেখানে না হয় ছায়া তৈরি হোলো। যদিও ছায়া জিনিসটা বুঝি না, তার ওপর চাপান হোলো, ধরা যাক, ছায়া-কুসুম। অতএব মোটা থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম তৈরি হোলো ইত্যাদি। নতুনত্ব করতে গেলেই এই পন্থা, আর না হয় বিদেশী প্রভাব। মিশ্রনের এই বিপদ। সরল থেকে জটিলতার আশ্রয় নিতেই হয়।

এতদিন এই সরলতার অর্থ ছিল প্রায় পঞ্চাশটা রাগ। তারও বেশি ছিল, কিন্তু পঞ্চাশটা রাগেই কাজ চলত। এই ক'টা প্রধান রাগেরই ব্যবহার হোতো, অতএব প্রত্যেকটা রাগই ভালোভাবে, সম্পূর্ণভাবে গাওয়া হোতো। আমরাও তাই পঞ্চাশটা রাগের প্রত্যেকটিকে চিনতাম, এবং তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হোতাম। অপ্রচলিত রাগ শুনতাম কখনও কখনও, কিন্তু সেগুলো অদ্ভুত বোলেই।

এখন কিন্তু তা হয় না—পঞ্চাশ-খানার বদলে পাঁচশখানা। সেই পাঁচশখানার প্রত্যেকটি অবশ্য সুচারুরূপে ব্যবহৃত হয় না, তার প্রত্যেকটি established হয় না। Established হবার জন্য সময় চাই, এখন কিন্তু বিশ মিনিটেই শেষ। রাগের চেহারাটা হয়ত দশ মিনিট কেন পাঁচ মিনিটে ধরা পড়ল। কিন্তু ধ্যান রূপটি? তার আবহাওয়াটা? তার climate-টা? পাঁচশ গানের প্রত্যেকটির climate তৈরী করা অত্যন্ত শক্ত: পঞ্চাশখানের প্রত্যেকটির climate সোজা। একেই আমি অধিষ্ঠান বলি।

দ্বিতীয় কথা এই: পুরাতন রাগের গঠন ধীরে ধীরে ওঠে; তার একটা গঠন প্রক্রিয়া আছে; এবং প্রত্যেক গঠন ক্রিয়ার এক-একটি পকড়, এবং সেই পকড়ের নানা রকমের রীতি-নীতি। নতুন রাগের গঠন প্রক্রিয়া অদ্ভুত—সামান্য একটি কি দুটি স্বরের তফাতে যা কিছু ঘটল। এত অল্পতে construction হয় না, design হয় না, মিস্ত্রী হওয়া যায়, এঞ্জিনীয়ার হওয়া যায় না। এই অল্পতে যে নতুনত্ব সেটুকু বাহাদুরী।

আমার তৃতীয় কথা এই: বাহাদুরীটা ঠিক আসল নয়। বাহাদুরীর জন্য সৌন্দর্যটি ঠিক প্রকাশ পায় না। অদ্ভুত রকমের একটা combination সৃষ্টি করলাম, চমৎকার লাগল নিশ্চয়, কিন্তু মজাটা একটু অন্য ধরণের। মোটামুটি-ভাবে বলা চলে একটা ছেলেমানুষী বুদ্ধির cleverness, আর অন্যটা সত্যকার আনন্দের। বাঁয়া তবলাতে যেমন খালিফা আবেদ হোসেন আর চতুরলালের তবলা।

ব্যাপারটা হোলো যে আগেকার গানে স্থিরতা আছে, সৌম্যতা আছে, শান্তি আছে: এখনকারের গানে অস্থিরতা চঞ্চলতা, অধীরতা রয়েছে। এবং সেইটাই স্বাভাবিক, কারণ, সাহিত্যে, সমাজে, সর্বত্রই দ্রুতভাবে চলেছি, কোথায় চলেছি জানি না, তবে চলেছি, তাই যথার্থ না হলেও যথা-অর্থ। জীবনের গতি দ্রুত হচ্ছে, নতুনত্ব করতে যাচ্ছি, পঞ্চাশটার বদলে পঞ্চাশখানা গান শোনাচ্ছি, গাইছি, তাই শান্তি থাকছে না, আমার একটু অসোয়াস্তি লাগে।

এ কালের গানের নিন্দা করছি না। এ-গান আমার ভালই লাগে, তবে মধ্যে মধ্যে অস্বস্তি হয়। এত জটিল কেন, এত বাহাদুরী কেন, এত clever কেন? আগেও খানিকটা ছিল, কিন্তু এত বেশী নয় বোধ হয়। সংখ্যার আতিশয্য থেকেই গুণে পরিণত হয়।

২৪।৭।৫৯

ভারতবর্ষ নিয়ে এত গৌরব করে কেন! দর্শনে ভারতের সমকক্ষ গ্রীস, স্থাপত্যে ভারতের সমকক্ষ ইজিপ্ট, ভাস্কর্যে ভারতের সমকক্ষ আবার গ্রীস, চিত্রে অজন্তা ছাড়া বিশেষ কিছু নেই, গানে পশ্চিমী গানের চেয়ে আমাদের গান বেশী ভালো কিছুতেই বলতে পারব না, সাহিত্য আমাদের একপেশে; রইল বাকী কারুশিল্প, সেটা অবশ্য ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব। আর ভালো হকি, আর কুস্তী। বেশী দিন হকি কিন্তু আর চলবে না। কুস্তীটাও তাই। জাপানি

কুন্তী অদ্ভুত! অতএব এত বড়াই চলে না।

৭।৮।৫৯

সঙ্গীতের সাহায্যে সম্পূর্ণ সঙ্গীত ব্যাখ্যা করা যায় না।

চিত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ চিত্র ব্যাখ্যা করা যায় না।

সাহিত্য দিয়ে সাহিত্য-ব্যাখ্যাই সম্ভব।

সাহিত্যের সাহা[illegible] সঙ্গীতের ব্যাখ্যা সাহিত্যিক ব্যাখ্যা।

সাহিত্যের সাহায্যে চিত্রের ব্যাখ্যা সাহিত্যিক ব্যাখ্যা।

সাহিত্যের সাহায্যে সাহিত্যিক ব্যাখ্যাই যথার্থ।

Schweitzer যখন বাখ্ সম্বন্ধে লেখেন তখন সাঙ্গীতিক ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন, পারেন না।

Romain Rolland যখন বেঠ্‌ওভেন, মোৎসার্ট সম্বন্ধে লেখেন তখন তিনি প্রধানতঃ সাহিত্যিক।

আঙ্গিকের ব্যাখ্যায় যতটুকু সাহিত্য ততটুকু রাখতেই হবে। Neville Cardus, Robertson Glasgow এবং Arlot-এর লেখায় অত্যন্ত তফাৎ। Cardus-এর লেখা অপূর্ব, কিন্তু তাতে ক্রিকেট কম।

সাহিত্য অন্য সব কলাবিদ্যাকে গিলে ফেলেছে।

১৭।৮।৫৯

আমি আজ ডাঃ প্রকাশ ব্যানার্জিকে জিজ্ঞাসা করলাম :

"সত্য কথা বলতে কি, ১৯১৫।১৬ সাল থেকে লিখছি, এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত লিখেই যাচ্ছি। ফল কি ফলেছে! অথচ দেখছি, অনেকেই আমার পুরানো কথা তুলে নিচ্ছে। ভাষা দিয়ে নয়, ভাব দিয়ে। ১৯২৩।২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে যা লিখেছি, ১৯৫০ সালে তারই পুনরাবৃত্তি পাই। যাকে ঝাল খাওয়া বলে তাই হচ্ছে। এবং আমার কথা মনেই থাকে না। সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতিতেও তাই। তাই আমার মনে সন্দেহ হয়েছে যে, এতদিন যা লিখে আসছি তা সব বরবাদ হোলো।"

প্রকাশ কিন্ত অন্য কথা শোনালে। সে বল্লে যে, ফল ফলেছে। তবে তার প্রধান কথা এই, 'গত চল্লিশ বৎসর প্রায় বাংলার বাইরে রয়েছেন, বছরে একবার, দুবছরে একবারও কোলকাতা যান, অতএব বাংলার সঙ্গে আপনার যোগ দৈহিক নয়, মাত্র মানসিক। যে সব ছেলে আপনি তৈরী করেছেন তারাও বাঙালী নয়, তারা কেবল অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব জানে, সাহিত্য তারা বোঝে না, অতএব আপনার পারদর্শিতা তারা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙলার বাঙালী ছেলেদের শিক্ষিত সম্প্রদায়রা অনেকেই আপনার লেখা পড়ে, মন দিয়েই পড়ে, বুঝতে সকলে না পারলেও তারিফ করে। বরবাদ হয়েছে বলা যায় না।'

সত্যিই তাই—বাংলা দেশ থেকে আমি অনেকদিনই আলাদা। লিখি বাংলা, কিন্তু কিছু আড়ষ্টভাবে। যেন কাটা-কাটা, ছাড়া ছাড়া। ভাষার দোষ ত রয়েইছে। প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে আজকাল অনেকদিন মিশিনি। মজার কথা মনে হোলো—একবার লক্ষ্ণৌ-এ প্রবাসী বাঙালীদের দ্বিতীয়বার সম্মিলন হোলো। আমি তখন আলিগড়ে। যাবার জন্য নিমন্ত্রণপত্রও পেলাম না। একজন সাহিত্যিকের কাছ থেকে একটা পত্র পেলাম। লিখছেন যে, তিনি আমাকে সভাপতি করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা গ্রহণ করেননি। কয়েক সেকেন্ডের জন্য দুঃখিত হয়েছিলাম—আমি কি কিছুই লিখিনি? তার পরই ভুলে গেলাম। এতই ভুলে গেলাম যে, পাঁচ বছরে মনেই নেই।

মন থেকে এই ধরনের self-pity সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বোধ হয়, এই শেষ।

২৭।৮।৫৯

আজ হঠাৎ আমার সরকারী কাজে ইস্তফা দিলাম। দুটি কারণে : (১) সরকার আমাকে কোনো কিছুই সাহায্য করছে না। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও সাহায্য পাইনি। একলা কতদিন কাজ করব?

(২) কিছু না করে থাকার একটা মোহ আছে। কিছু না করে কিছুকাল থাকতে চাই। আগের তুলনায় আমার শরীর ভালোর দিকে যাচ্ছে মনে হয়, নিঃশ্বেস ফেলতে একটু যেন কম কষ্ট

হয়, সেই সুযোগে আরো একটু আরাম পেতে চাই। প্রায় চল্লিশ বছর অধ্যাপনা করলাম, এখার একটু জিরোবার সময় এসেছে। অবশ্য, কেদারবাবুর 'পেন্‌শনের পর' হবে না ত ? আপাততঃ কিন্তু ইস্তফা দিয়ে মনে যেন শান্তি পেয়েছি। তিলমাত্র ক্ষোভ নেই।

দেরাদুন গিয়ে কিছু ক্লাসিক সাহিত্য পড়া যাবে। অর্থনীতি আর সমাজতত্ত্ব নয়। ইতিহাস, ছবি ও গান—এ-কটা জিনিস থাকবেই।

৬।৯।৫৯

'মনে এলো'র রচনা বইএর সম্পৃক্ত। এখন কিন্তু তা নয়। বইএর অতিরিক্ত, অথচ খাঁটি দর্শন নয়। মাথার পিছনে বই নিশ্চয়ই আছে, কারণ পরমহংসদেব ছাড়া অন্য কোনো মানুষ নেই যার চিন্তা, ভাবনা বই থেকে জন্মায় না। অ-শিক্ষিত মানুষের কাছে চিন্তার বালাই নেই। (অবশ্য শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও অনেকেই তাই। অশিক্ষিত ব্যক্তির কাছে ভাবনা ওঠে, চিন্তা ওঠে না।) তবু, বইএর অজুহাতেই চিন্তা। বেশী পড়লে কিন্তু চিন্তা যায় গুলিয়ে, তখন আর খেই থাকে না। খেই ছাড়াবার জন্য বই কিছুকালের জন্য বন্ধ করতে হয়। তার পরেও কিন্তু কখনও কখনও চিন্তার খোরাক জোটে না। তখন চুপ করে থাকাই ভালো। তারিখের মধ্যে বহু ব্যবধান আছে। অর্থাৎ, মধ্যে মধ্যে চিন্তা আসে, কিন্তু চিন্তার সাতত্য আসে না। সতত চিন্তার অর্থই হোলো দর্শন। তাই মনে হয় আমার চিন্তার অন্তরালে দর্শন নেই। দার্শনিক মনোভাব আছে।

শুদ্ধ অবচেতনা বলে কিছু বস্তু আছে ? আমার মনে হয় নেই। বেশীর ভাগই সংস্কার, না হয় অধীত বিদ্যা। স্টাইনবেকের লেমি নামে এক চিত্র আছে, সেটা বোধ হয় বিশুদ্ধ অবচেতনা; কিন্তু সে একজনকে টিপে মেরে ফেল্লে। ফকনার-এর দক্ষিণী চরিত্রের নিগ্রো কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন। ফ্রয়েডের মধ্যেও বোধ-বিশুদ্ধ অবচেতনা নেই, ego, super-ego-র সংগে মেশান। ইয়ং-এর মধ্যে হয়ত আছে। কিন্তু collective unconscious কি বস্তু ঠিক জানি না। আমি ব্রাহ্মণ হয়েও কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের এই ধরণের কথা গ্রহণ করতে পারিনি, এখনও পারছি না।

মানুষ যখন কোনো অধীতবিদ্যা গ্রহণে পরাঙ্মুখ, তখনও অভ্যাসের বশে আরো বই পড়ে, আরো বিদ্যা অর্জন করে। কিন্তু বই পড়বার পর না-পড়ার মধ্যে হয়ত একটা স্বাধীনতা আছে, এবং সেই স্বাধীনতার আশীর্বাদে অ-শুদ্ধ অবচেতনা আশ্রয় করে। নীচে থেকে ওপরে ওঠে, কিন্তু ওপরে ওঠা থেকে নীচুতে যায় না। অবশ্য, নীচু আর ওপর বলে অবশ্য কোনো জিনিস নেই—এগুলো কথার কথা।

৭।৯।৫৯

ফ্রান্সে একটা সত্যকারের intellectual class আছে, তিন চারশ' বছর ধরে চলে আসছে। এখনও চলছে এবং আরো কিছুকাল চলবে। জার্মানিতে professional class রয়েছে, কিন্তু intellectual class নেই। ইংলন্ডে intelligent men and women আছে—কারণ বোধ হয় তার empiricism· ভারতে একদল ব্রাহ্মণ ছিল, এখন নেই। কোলকাতা প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এক ঝলক উঠেছিল, আজ তা খুঁজে পাই না। রাশিয়ায় দেখছি techno-bureaucrat ছেয়ে ফেলেছে। সাহিত্যিকদের চেয়ে সংখ্যায় তারা বেশী মনে হচ্ছে। আমেরিকায় কিন্তু বেশীর ভাগ managerial class, চায়নায় বোধ হয় কোনো নতুন দল তৈরী হয়নি। এক-কালে mandarin ছিল—এখন নেই। এটা মোটামুটি—অবশ্য তাইতেই কাজ চলে যায়।

১৫।৯।৫৯

আলিগড়ে নিমগাছ আর তোতা-পাখি—দুটো মিলে 'নিমতোতা'। তোতা নাম যেন কেমন ধারা ! নিমতোতা নামটি বেশ।

অনেক নিমগাছ এখানে, কিন্তু কোনো উপকারে আসে না। অন্ততঃ আমি ত দেখিনি। তোতাপাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে, দেখতে খাসা, তবে একটু যেন ঘাড়-কুঁজো, আর আওয়াজ যেন একটু রুখখু। তা হোক্। নিমগাছের ছায়া নরম, একটু বেশী নরম, নীচে ভিজে গন্ধ।

১৯।৯।৫৯

ক্রুশ্চেভ-এর বক্তৃতা ভালোই। আদর্শবাদীর কথা নয়, খাঁটি বস্তুতন্ত্রের কথা। বস্তুতন্ত্রের অধিক এই ব্যাপারটা। তবু বস্তুতন্ত্রের ওপর থেকেই উঠেছে। মোটেই ইয়ুটোপিয়ান নয়, একেবারেই নয়। তৎসত্বেও ক্রুশ্চেভের wisdom cool নয়, স্টালিনের যেমন ছিল। তাঁর স্বভাবই অন্য। একটু যেন বেশী কথা কন্। Cold War কমাবার জন্যই বেশী কথার প্রয়োজন ওঠে অবশ্য। যদি ইচ্ছা করতেন স্টালিন না কথা কয়েও সেটা থামিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর নিষ্ঠুরতার সীমা নেই, তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লোকটি বড়।

২০।৯।৫৯

আজ হঠাৎ বীরবল সাহিনীর কথা মনে উঠছে। কেন জানি না, অমনি। [illegible]২২ সাল থেকে আলাপ। প্রথম থেকেই [illegible], শেষকাল পর্যন্ত। সকলেই বলে যে, পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বোটানিস্ট। জানি না, তবে যথার্থ পন্ডিত বুঝতে পারতাম। ইংরেজী বলত চমৎকার। Paleobotanical Institute-এ তার প্রথম ও শেষ বক্তৃতা, আমার মতে, ইংরেজী সাহিত্যে দুর্লভ। অত্যন্ত সংযত তার ভাষা। লোকে জানত না, বাংলা দেশও চিনত না। বাংলা দেশে কজনই বা অ-বাঙালীকে চেনে! বীরবলের স্বভাব নিতান্ত বাল-সুলভ, ছেলেমেয়েদের সংগে আলো আর আগুন নিয়ে খেলা করত। ছবি ভালবাসত। পন্ডিতজী আর বিজয়-লক্ষ্মীর সংগে খুবই সৌহার্দ্য। আলমোড়া জেল থেকে জওহরলাল অনেক দিন পরে বেরুলেন, খালিতে, সংগে নিয়ে গেলেন বীরবল আর তাঁর স্ত্রীকে। দুজনই কেম্ব্রিজ।

একটা কথা মনে পড়ে। শীতকালের সন্ধ্যাবেলায় লক্ষ্ণৌ-এর নদীর ধারে একলা বেড়াতাম। একদিন তেমনই গেছি। সামনে হেড্‌লাইট জ্বলে উঠল—দেখি বীরবল। তার বাড়ি ছিল নদীর ধারে। গাড়ি বাড়িতে রেখে আমার সংগে বেড়াতে লাগল। অনেক পরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বীরবল, অত পলিটিক্স কেন কর ?' চুপ করে থেকে বল্লে, 'কেন করি তোমাকে বলি।' অনেক কথাই বল্লে। ব্যাপার এই, আত্মরক্ষার জন্য তাকে পলিটিক্স করতে হয়েছিল, না করলে সে মারা যেত। 'এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, ছাড়তে চেষ্টা করি, পারি না।' অত্যন্ত দুঃখ হোলো।

কয়েক বৎসর পরে, দুদিনের জন্য অসুখে পড়ল। বিশ্বাসই করিনি যে অত অসুখ। দুদিনেই শেষ। দাহের সময় পাশে ছিলাম। তার পর বীরবলের কোনো খবর রাখিনি, রাখতে চাইনি। তার মৃত্যু একটু অভাবনীয়। ভারতে যে পাঁচজন অধ্যাপক আছেন যা ছিলেন বীরবল তাঁদের মধ্যে একজন। সত্যকারের ভালো মাথা।

(ক্রমশঃ)

বৈজ্ঞানিক ডক্টর কৃষ্ণণ

অমিয়কুমার মজুমদার
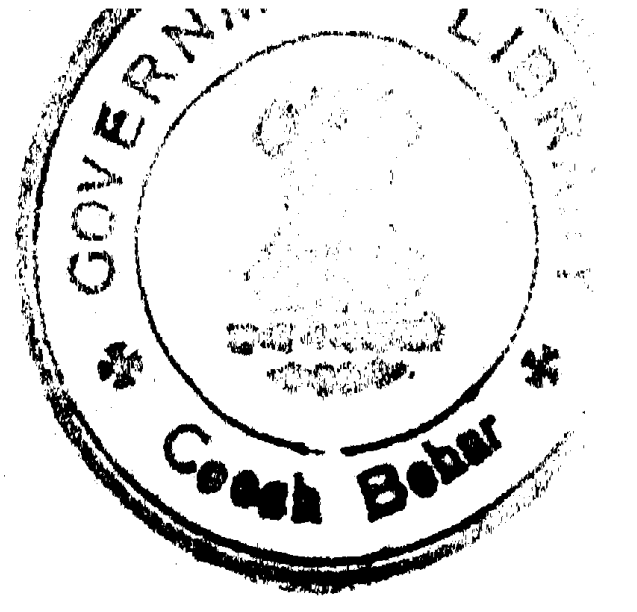
পদার্থবিদ্যার জগতে ডক্টর কারিয়ামাণিক্যম্ শ্রীনিবাস কৃষ্ণণ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে একটা বিরাট ছেদ এসে গেল। প্রায় পঁচিশ বছর বয়স থেকে শুরু হয় তাঁর বিজ্ঞানসাধনা—ধীরে ধীরে তার গতিবেগ বাড়তে থাকে, তারপরে দুর্দম হয়ে ওঠে। পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যেই খ্যাতিমান হয়ে পড়েন তিনি। প্রতিভার দীপ্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। এমনি সময়ে ব্যাধের মত প্রবেশ করল মৃত্যু। তার নিষ্ঠুর শরাঘাতে মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বিজ্ঞান সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধক কে, এস, কৃষ্ণাণ। সি, ভি, রমণের ডানহাত ভেঙে গেল।

আজ থেকে প্রায় বাষট্টি বছর আগে ঊনবিংশ শতকের অন্তপ্রায় অংশে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর মাদ্রাজের রামনাদ জেলার ওয়াতরাপ গ্রামে ডক্টর কৃষ্ণাণের জন্ম। গ্রামের স্কুল ও পরে শ্রীবিল্লিপাত্তুরে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর মাদুরায় আমেরিকান কলেজে ভর্তি হন। পরে মাদ্রাজের ক্রিশ্চয়ান কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হন। তারপরেই এল সমস্যা। ঐ কলেজেই কিছুকাল ডেমনস্ট্রেটররূপে কাজ করেন।

•

এবার এগিয়ে এল মাহেন্দ্রক্ষণ। বিখ্যাত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেংকটরমণ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক। মাদ্রাজ থেকে কৃষ্ণণ এলেন কলকাতায়। মনে অনেক আশা পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নের। দেখা করলেন অধ্যাপক রমণের সঙ্গে। জহুরীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন তরুণ ছাত্রটিকে। এম. এস-সি না পাশ করা সত্ত্বেও তাঁকে রিসার্চ স্কলার হিসেবে গ্রহণ করলেন। তখন অধ্যাপক রমণ তাঁর যুগান্তকারী 'রমণ-বিকিরণ' আবিষ্কারের গবেষণায় রত ছিলেন। তরুণ বিজ্ঞানী কৃষ্ণণের প্রতিভা ও অধ্যবসায় এসে যুক্ত হলো ঐ গবেষণার কাজে। আন্তর্জাতিক খ্যাত সি. ভি, রমণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিষ্য ডঃ কৃষ্ণণের নাম। স্বকীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত অধ্যাপক সমারফিল্ড প্রদত্ত বিশেষ বক্তৃতারূপে তিনি এক পর্যায়ের বলবিদ্যা বিষয়ে আধুনিকতম অবস্থার উপরে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অধ্যাপক সমারফিল্ডের একটি গবেষণা পুস্তক প্রণয়নেও অধ্যাপক কৃষ্ণণের অবদান সামান্য নয়।

১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করেন এবং বহু বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯২৭ সালে কলকাতায় তরল পদার্থের বিকিরণ এবং পরে অতিসান্দ্র তরল পদার্থ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের প্রশংসা অর্জন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি চুম্বক পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র কেলাসের স্পর্শকাতরতা পরিমাপণ প্রথা আবিষ্কার করেন। ১৯৩৩ সালে অধ্যাপক রমণ কলকাতা ত্যাগ করবার পর ডক্টর কৃষ্ণণকে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক মহেন্দ্রলাল সরকারের পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

"অপটিক্যাল প্রপার্টি অব ক্রিষ্ট্যালস এ্যান্ড এক্স-রে ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফি"—অধ্যাপক কৃষ্ণণের অন্যতম আবিষ্কার।

১৯৩৬ সালে ওয়ার্শতে "ইণ্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফোটো-লুমিনিসেন্স"এ তিনি যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে ইউরোপের বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেন এবং লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউট ও কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে তাঁর বক্তৃতামালা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। ১৯৪০ সালে তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নিযুক্ত হন। পরে তিনি ইণ্টারন্যাশনাল ফিজিক্স এবং ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক ইউনিয়ন-এর সহ-সভাপতি ছিলেন।

১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডঃ কৃষ্ণণ। এ সম্মান সুদুর্লভ। ১৯৫৬ সালে তিনি ঐ সংস্থার বৈদেশিক সহযোগী নির্বাচিত হন। এ সম্মানও সচরাচর মেলে না। কারণ সমগ্র বিশ্বে এই ধরণের সদস্য আছেন মাত্র ষাটজন।

আলোক-বিজ্ঞান ও আণবিক পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জন্মায় অধ্যাপক রমণের সংস্পর্শে এসে। রমণ-এফেক্ট ছাড়াও তিনি বহু জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন তা বলা হয়েছে। কলকাতার পর তাঁর কর্মক্ষেত্র হলো এলাহাবাদ। সেখান থেকে ভারত স্বাধীন হবার পরে নয়াদিল্লীতে জাতীয় পদার্থবিদ্যার গবেষণাকেন্দ্রে অধ্যক্ষ থাকাকালীন পদার্থবিদ্যার অনেক জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করেছেন।

পদার্থবিজ্ঞানীদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—একদল এক্সপেরিমেণ্টাল

ফিজিসিস্ট, আর একদল থিয়োরেটিক্যাল ফিজিসিস্ট। প্রথম দল পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে আসেন, দ্বিতীয় দল গণিতের কষ্টিপাথরে সবকিছু বিচার করেন। ডঃ কৃষ্ণণ মূলতঃ প্রথম পর্যায়ের বিজ্ঞানী হলেও তাঁর গাণিতিক জ্ঞান ছিল অপরিসীম। অধ্যাপক সমারফিল্ডের বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তিনি যে সব গাণিতিক প্রমাণ রচনা করেন তা বিস্ময়ের ব্যাপার।

অণুর অভ্যন্তরে সন্ধানী আলোকপাত কৃষ্ণণের অন্যতম প্রধান কাজ। কেলাসের আভ্যন্তরীণ গঠন এবং তার চৌম্বক ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ের পরীক্ষামূলক উপায় তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। গ্র্যাফাইট কেলাসে ইলেকট্রনের শক্তির বণ্টন নির্ণয় করে তিনি পদার্থবিদ্যার জগতে নতুন রাস্তা খুলে দেন। বর্তমানের সলিড ষ্টেট ফিজিক্স-এ তাঁর দান কম নয়। ১৯৪৭ সালে ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীতে অধ্যক্ষ হবার পর তাঁর গবেষণার বিষয় হলো থার্মিয়নিক্স।

কোন তড়িৎ-পরিবাহক বস্তু বা কণ্ডাকটরকে উত্তাপ দিলে তা থেকে ইলেকট্রন-প্রোটনের মত তড়িতাবিষ্ট কণিকা বা আয়ন বিনির্গত হয়। মার্কিন বিজ্ঞানী রিচার্ডসন বস্তুর উষ্ণতা এবং আয়ন নির্গমনের হারের মধ্যেকার সম্পর্ক তাত্ত্বিক ভিত্তিতে নির্ণয় করে এক নতুন বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। রিচার্ডসনের সূত্রে নানা সমীকরণের মধ্যে দুটি ধ্রুবাঙ্ক আছে। এর একটা বেশ জটিল ধরণের। অধ্যাপক কৃষ্ণণ তাঁর অসাধারণ মেধার সাহায্যে ঐসব জটিলতার সূত্রের মীমাংসা করেন। বের করেন সহজ পন্থা। বায়ুশূন্যস্থানে (ভ্যাকুয়াম) কোন সরু নল, দণ্ড বা কুণ্ডলীকে যদি বিদ্যুতের সাহায্যে উত্তপ্ত করা যায় তাহলে তার বিভিন্ন স্থানে উষ্ণতার তারতম্য হবে তাও আবিষ্কার করেন ডঃ কৃষ্ণণ।

এ কথা সত্যি ডঃ কৃষ্ণণের আবিষ্কারের গুরুত্ব সাধারণভাবে বোঝানো যায় না। তাঁর বিশালত্বের পরিমাপ আমরা হয়ত সঠিকভাবে করতে পারবো না। লর্ড রাদারফোর্ড, স্যার উইলিয়ম ব্যাগ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ঐ মানুষটির ঐশ্বর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিশ্বের সর্বত্র অভিনন্দিত হলেন এই নিরহঙ্কারী মানুষটি। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সমাবেশে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান জানানো হলো তাঁকে। শ্রদ্ধায় নত হলো তাঁদের হৃদয়।

১৯৫৮ সালে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। ভারতের পরমাণু গবেষণাগার স্থাপিত হবার পর নানাভাবে এই সংস্থাকে সাহায্য করেছেন তিনি।

ডক্টর কৃষ্ণণ শুধু বিজ্ঞানী নন, তিনি সাহিত্যিকও। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান বোঝেন, সাহিত্য জানেন না। আবার সাহিত্যিকের বেলা উল্টোটি। কৃষ্ণণ দুই-ই ছিলেন। দর্শন ও সাহিত্যে ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরক্তি। মাতৃভাষা তামিলের সংস্কারকের কাজে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। তামিল সাহিত্য ডক্টর কৃষ্ণণের প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধতর হয়েছে। দুরূহ বিষয় হৃদয়গ্রাহী করে বোঝাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অপরিসীম।

সঙ্গীত ও ব্রিজ খেলাও তাঁর প্রিয় ছিল। এত বড় বিজ্ঞানী তিনি—অথচ দম্ভহীন। অফিসে, বাড়ীতে, বাইরে তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ, স্নেহপ্রবণ ও সদালাপী।

সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে গেলেন ব্রিজ খেলাতে। ফিরে এসে বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। মাঝরাতে বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সচকিত হয়ে ওঠেন সবাই। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে সংবাদ দেওয়া হয়। আর তার দরকার হলো না। ১৪ই জুনের রাত সাড়ে বারোটাতে নিভে গেল প্রাণ-প্রদীপ।

সাম্প্রতিক সংবাদের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর

(প্রশ্ন)

১। সেদিন কে বলেছিলেন যে, মার্কিণ দেশের ৫০০ ট্রাকটারের পরিবর্তে দেশদ্রোহী ১,২৪১ জন বন্দীকে তিনি মুক্তি দিতে রাজী আছেন?

২। কঙ্গোর বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক বিবাদ মিটিয়ে একটি মাত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করবার ভার জাতিসংঘ (U, N,) গ্রহণ করেছে এবং সেজন্য বিভিন্ন দেশ থেকে প্রেরিত সৈন্যসংখ্যা কত?

৩। নিরপেক্ষদের শীর্ষ বৈঠক কি এবং এ বৎসরে কোথায় বসবে?

৪। ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যা এই বৎসরে ১লা এপ্রিলে আরম্ভ হয়েছে, তাতে বৈদেশিক শক্তি দ্বারা গঠিত (Aid IndiaClub) কত টাকা দিয়ে সাহায্য করবে?

৫। ভারতে সর্বপ্রথম 'সুপারসোনিক' (Supersonic) জঙ্গীবিমান সেদিন (এইচ-এফ-২৪) বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফটের কারখানায় নির্মিত হয়ে আকাশে উড়েছে। সুপারসোনিক গতিবেগের অর্থ কি?

[উত্তর অন্য পৃষ্ঠায় আছে]

পরিশেষ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্যামল সেন

[উপন্যাস]

।।এক।।

ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিও যোগ দিতে এঁটেল মাটির রাস্তা আরও বিপদ-সঙ্কুল হয়ে উঠল। জীপগাড়ির চাকা ষ্টীয়ারিং মানছে না, পিছলে এদিক-ওদিক হয়ে যাচ্ছে। ব্রেক কষেও ফল নেই, ঝড়ের ধাক্কায় কয়েক ঝোঁক ঠেলে-ঠেলে নিয়ে গেল গাড়ি। এটা বাড়বে, ঝড়-বৃষ্টি যেভাবে বেড়েই চলেছে এবং তাহলেই দুর্ঘটনা অনিবার্য; খানা-খন্দর, গাছের গুঁড়ি—কোথায়, কিসের ওপর যে ছিটকে পড়বে গাড়ি কিছুই ঠিক নেই। অন্ধকার রাত, হেডলাইট থেকেও না থাকার সমান।

তাড়াতাড়ি ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলতে হবে। ফেললও করে প্রশান্ত, গাড়িটাকে তার অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়তে হবে। ব্রেক একটু আলগা করে ঝড়ের সঙ্গে রফা করতে যাচ্ছিল, আবার কষে দিয়ে ক্লাচ টিপে গাড়ি একেবারে থামিয়ে ফেলে ব্যাগটা তুলে নিয়েছে, ওর ত্বরিত নির্দেশ মতো গোপেশ আর্দালিও উঠে পড়েছে, এমন সময় অনিবার্যটা যেন এসেই পড়ল! ঝড়ের একটা প্রবলতর ধাক্কায় জীপটা প্রায় ডিগবাজি খাওয়ার মতো হয়ে, একটু সামলে নিয়েই, একটা ঢালু পথ বেয়ে পিছলে ছুটল। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কয়েকটা মুহূর্ত। গোপেশকে লাফিয়ে পড়তে বলে নিজেও দেবে লাফ, এমন সময় জীপটা হঠাৎ একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, একটু কাৎ হয়ে। অন্য সময় যেটা ছিল বিপদ সেটা সম্পদে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার মাঝখানেই, একটু ডানদিক ঘেঁসে একটা পাঁকে ভর্তি খানা। যাওয়ার সময় এটার পাশ কাটিয়ে যেতে হয়েছিল, নোট করেও নিয়েছিল প্রশান্ত, জেলা-বোর্ডকে চিঠি দেবে, এখন এটাই বাঁচিয়েছে, মোটরের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি গিলে ফেলেছে। প্রায় মেসিনের ওপর পর্যন্ত। কিন্তু সে পরের ভাবনা পরে।

আপাততঃ একটা আশ্রয় দরকার। পকেট থেকে টর্চ বের করে চারিদিকে আলো ফেলে কোন সন্ধান পাওয়া গেল না; বৃষ্টি ভেদ করে চার-পাঁচ হাতের ওদিকে নজর যায় না। অগত্যা জীপই আশ্রয়। তাও টেঁকল না। একটা দমকা হাওয়ায় ওপরের আচ্ছাদনটা ছিঁড়ে খানিকটা উড়িয়েও নিয়ে গেল। ঠিক এই সময় কড়া একটা বিদ্যুতের ঝলকে কতকটা এই ধরনের একটা দৃশ্য গেল চোখে পড়ে। রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে বাঁদিকে একটা ঘরের আধখানা চাল দুমড়ে অপর আধখানার ওপর কর্কশ আওয়াজ তুলে উলটে পড়ল। বিদ্যুতালোকে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের আবছা দেখা; কিন্তু একটা বাড়ি যে রয়েছে কাছে এটুকু আবিষ্কার হোল; প্রায় কলম্বসের আবিষ্কারের মতোই; সব জিনিসের মূল্যই তো আপেক্ষিক, অবস্থা আর পরিবেশের ওপর নির্ভর করে।

বাড়ি মানেই আশ্রয়।......কিন্তু যার চালা উড়ে মাথার ওপর পড়েছে?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যেও এক ঝলক বিদ্যুৎ—কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গিয়ে থাকতে পারে তো বাড়িটাতে! এক মুহূর্তে ঝড়, বৃষ্টি, নিজেরা, জীপ, সব যেন অবলুপ্ত হয়ে গেল। সবই তো আপেক্ষিক। মনে পড়ে গেল জীপের মধ্যে একটা প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স আছে। "গোপা, নেমে পড়্" বলে সেটা তুলে নিয়ে নিজেও লাফিয়ে পড়ল বাঁ-দিকে। পড়ল রাস্তার ওপরেই। পাঁকের প্রায় সমস্তটাই ডানদিকে। একটু পিছলে যাওয়া, কি, জামা-কাপড় ভিজে মণখানেক ওজন বেড়ে যাওয়া—ওসব আর ধর্তব্যের মধ্যে নেই।

টর্চের হাত পাঁচেকের আলোর ঝাপসা রেখা সামনে করে চলল দুজনে। গোপেশ একবার আছাড়ই খেল ছোট-খাট গোছের। একবার টর্চটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে প্রশান্ত চলতে-চলতেই বলল—"উঠে আয় ঝট করে।"

একটা পায়ে হাঁটা সরু পথ রাস্তাটার ওপর উঠে এসেছে। লাইট ধরে নামতে গিয়ে নিজেও আছাড় খেতে-খেতে কোন রকমে নিল সামলে। পথটা প্রায় বিশ-পঁচিশ গজ রাংচিতের একটা বেড়ার পাশে-পাশে ভেতরের দিকে চলে গেছে। ঘাসে ঢাকা, লোকের চলাচল কম নিশ্চয়। সুবিধা হোল, আর এত পেছল নয়, পা চালিয়ে দিল প্রশান্ত।

ছোট্ট বাড়ি, মনে হোল ওই একখানা ঘর নিয়েই, যার আধখানা চাল গেছে উল্টে। হয়তো এতক্ষণ উড়েই গিয়ে থাকবে, ঝড়ের গর্জন আর বৃষ্টির ডাকে

বোঝবার তো জো নেই, কোথায় কি হোচ্ছে না-হোচ্ছে। হয়তো লোকও নেই; আলোর তো কোনও নিশানাই নেই এদিকটায়। কিন্তু তালা দেওয়া নয়, ভেতর থেকে বন্ধ। মানুষ থাকার লক্ষণ বলেই মনে হয় শেষ পর্যন্ত, অবশ্য থাকেই তো কি রকম আছে, কে বলবে?

ঘরের সংলগ্ন একফালি একটা বারান্দা। ঘরেরই একটা অংশ দেওয়াল দিয়ে আলাদা করা। দুটো সিঁড়ির ধাপ ভেঙে তার ওপর গিয়ে উঠেছে দুজনে: তারও আধখানা চাল নেই। হঠাং বড় নার্ভাস হোয়ে উঠেছে, উগ্ররকম একটা কিছু দেখবার মুখে বলেই বোধহয়। না ডেকে আগে কড়া নাড়াই দিল, জোরে, আরও জোরে। ডাকল—"কেউ আছেন ভেতরে?" গোপেশকে বলল—"দেখ্ তো, অন্য কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায় কিনা?"

গোপেশ চলে গেলে বন্ধ দরজার মাঝখানে মুখ দিয়ে আবার ডাকল—"কেউ আছেন বাড়িতে!" ঝড়-বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ডাকল, তারপর একটা কান জোড়ের মুখে ধরল চেপে।

"কে?"—হাওয়ায় দোল খেয়ে একটা আওয়াজ ভেসে এল। এঘর থেকে নয়। আরও ওদিকে কোথা থেকে। জোড়টুকুতে মুখ লাগিয়ে প্রশান্ত বলল—"কে আছেন একবার দোরটা খুলুন।"

ও একরকম শেষ করার আগেই এই ঘরের সংলগ্ন পাশের একটা ঘরের দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ হোল। একটু আলোও এসে পড়ল জোড়ের মুখে, সঙ্গে-সঙ্গে খড়ম খট-খট করে একটি লোক এগিয়ে আসার শব্দ। তারপরেই হঠাং একটা বিরতি। ওপর থেকে চাবুকের মতো বৃষ্টি এসে পড়ছে। প্রশান্ত দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল—"খুলুন না দোরটা একটু, কে আছেন।"

হুড়কো টেনে দিতে পাল্লা দুটো হাওয়ার দমকে পাশে আছড়ে পড়ছিল, লোকটি দুহাতে ধরে নিয়ে আধখোলা রেখেই প্রশ্ন করল—"কি দরকার?"

অদ্ভুত প্রশ্ন। চেহারাটাও একটু অদ্ভুতই। এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথায় বড়-বড় উস্ক-খুস্ক চুল। সবচেয়ে অদ্ভুত চোখের দৃষ্টিটা, কোঠরের ভেতর থেকে যেন তীব্র কি একটায় জ্বলছে—আক্রোশ কিংবা.....

থতমত খেয়ে গিয়ে আন্দাজ করার মুখেই প্রশান্তর খেয়াল হোল সদ্য শোকও তো হতে পারে—যেমন আশঙ্কাই করেছে সে। উত্তর করল—"না-ইয়ে—জিজ্ঞেস করতে এসেছি, কোন রকম অ্যাকসিডেন্ট—মানে, দুর্ঘটনা হয়নি তো এই ঝড়ে?"

"কোথা থেকে এসেছেন জিজ্ঞেস করতে—ঝড় মাথায় করে?"

একটু যেন উত্তরের সময় দিয়ে, "না, অ্যাকসিডেন্ট হয়নি কিছু," বলে আবার বন্ধ করতে যাচ্ছিল দরজা, পেছন থেকে একটা আওয়াজ এল—"বাবা"!

দোর চেপেই দাঁড়িয়েছিল লোকটি, ঘুরে দেখতে যে একটু ফাঁক পাওয়া গেল, তার মধ্যে দিয়ে প্রশান্ত দেখল, ও-ঘরের দরজায় একটি মেয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে, লালঠেনের স্বল্প আলোয় ছায়ার মতোই দেখাচ্ছে। এগিয়েই এল মেয়েটি, বাপের শরীরের আড়ালে-আড়ালে নিজের কাঁধ-পিঠের কাপড় টানতে-টানতে। পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত দিয়ে নরম করে বলল—"আসতে দাও ওঁকে, ভিজছেন।"

লোকটি ঘুরে চাইল প্রশান্তর দিকে, সামান্য একটু পরিবর্তন দৃষ্টিতে: কপাটের একটা পাল্লা ছেড়ে দিয়ে বলল—"আসুন।"

ভেতরে পা দিয়ে প্রশান্ত বলল—"আর একজন আছে।"

"আরও একজন!"—বেশ একটু বিরক্তভাবেই মেয়েটির দিকে চেয়ে অনুযোগের স্বরে বলল লোকটি।

গোপেশ এসে গেছে। মেয়েটি কণ্ঠস্বর আরও নরম করে বলল—"আসুন; কী রকম দুর্যোগ দেখছ না?"

নিষ্প্রয়োজন হলেও আতিথ্যের গ্লানিটুকু যেন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করল প্রশান্তকে—"আর কেউ নেই তো?"

উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রশ্নের মধ্যেই লোকটি দোর বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিয়েছে, মেয়েটি সেইভাবেই বাপের কতকটা আড়াল থেকেই সামনে হাত দেখিয়ে প্রশান্তকে বলল—"চলুন ঘরে।"

।। দুই ।।

বাপের একটু আড়ালে আড়ালে থাকার কারণটা খেয়ালও করেনি প্রশান্ত, এ ঘরে আসতে সেটা আপনা হতেই ওর নজরে এসে পড়ল।

ঘরে একটা মাদুর পাতা, একপাশে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে রাখা খান-কতক বই। তারই ওপর বসতে বলে, হাতের টিপে একটা ইশারা করে বাপকে নিয়ে ঘরের আর একটা দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটি, বেশি জড়সড় হয়ে যাওয়ার জন্যই প্রশান্তর নজরটা গেল পড়ে। শাড়িটা মলিন তো বটেই, কয়েক জায়গায় এমনভাবে ছেঁড়া-সেলাই করা যে, লালঠেনের স্বল্প আলোকেও স্পষ্ট চোখে পড়ে যায়। তাই থেকেই এতক্ষণে ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য গেল প্রশান্তর। ঐ রকমই উৎকট দারিদ্র্যের ছাপ চারিদিকে ও ঘরের মতো এটাও ওপরে গোলপাতায় ছাওয়া। ইটের দেয়াল, তবে তার পলস্তারা চারিদিকেই গলে-গলে পড়ছে। মেঝেটাও সিমেন্টের, তবে এত ভাঙ্গা-চোরা যে মাদুর পাতার জায়গা যেন ওইটুকুই আছে ঘরের মধ্যে। দুটি ছোট ছোট জানলা, দুটিরই একখানা করে পাল্লা নেই, তার জায়গায় ক্যানেস্তারা কেটে ফ্রেমে কাঁটি দিয়ে বসানো। তার একটাতে জং ধরে মাঝখানে কয়েকটা ফুটো হয়ে গিয়ে হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। খুব তোড়ের মুখে শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ উঠছে মাঝে মাঝে। আসবাবের মধ্যে ঘরের দুদিকে দুখানা চৌকি। এক-খানার একটা পায়া ভাঙ্গা, একখানির তিনটে; ইটের থাক পায়ার কাজ করছে। দুটোরই একধারে একটা করে বিছানা গোটানো। ঘরের এক কোণে দুখানা পুরোনো ট্রাঙ্ক, একটার ওপর একটা করে রাখা। নীচেরটায় একটা শাড়ি-ছেঁড়া নেকড়ার ঢাকনা। উল্টো কোণে একটা মাঝারি সাইজের আলমারি। কোণাকুণি করে দেওয়ালে খাটানো দড়ির আলনায় একটা ধুতি, একখানা শাড়ি আর একখানা কামিজ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখছিল প্রশান্ত, ও-অবস্থায় মাদুরে বসার প্রশ্নই আসে না। দেখা শেষ হয়ে যায় এক নজরেই, তবে দৃষ্টি আটকে আটকে। এই উৎকট দারিদ্র্যের চিত্রটির মধ্যে অদ্ভুত বৈষম্য এনে দিয়েছে দুটি জিনিসে—একটি খুব দামী ফ্রেমে বাঁধানো বিলাতী ল্যান্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, ঝড়ের জন্যই নামিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা, আর প্রায় এক ফুটেরও ওপর রোজের একখানি

আবক্ষ প্রতিমূর্তি—রবীন্দ্রনাথের বলেই মনে হয়।

ওর দেখার মধ্যেই লোকটি একলাই ঘরে একবার প্রবেশ করল। একবার প্রশান্তর ওপর সেই বিরূপ দৃষ্টি হেনে নীচেকার ট্রাঙ্কটা তুলে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল।

শুধু দারিদ্র্য নয়, বিড়ম্বিত দারিদ্র্যের একটা অ্যাপীল যেন চারিদিকে —তাইতে জানলার ছিদ্রপথে হাওয়ার ...ই শব্দটা যেন কান্নার মত শোনাচ্ছে। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি যেন হঠাৎ আরও উগ্র হয়ে উঠেছে মনে হয়। সেটা হয়ত এই জন্য যে, মনটা এইদিকে আটকে ছিল, হঠাৎ একটা সংকল্পে আবার বাইরে গিয়ে পড়েছে—বেরিয়ে যাবে একটা ছুতো করে —যত বড়ই দুর্যোগ হোক না কেন। নিরুপায়ভাবে, না জেনে এসে পড়েছে, কিন্তু এ লজ্জা আর বাড়ানো চলবে না। অজ্ঞান্তেই আসা, কিন্তু আর থাকলে সেটা হবে বড় নিষ্ঠুর, তার যেন ক্ষমা নেই।

একটা অজুহাত মনে মনে গড়ে নিচ্ছিল, এ অবস্থায় সহজও তো নয়, দুজনে এসে আবার প্রবেশ করল। মেয়েটির পরণে এবার একটা ডুরে শাড়ি, একটু বেশি ভাল যেন, তাইতে মনে হয় তোলা শাড়িই, পালে-পার্বনে পরবার। হয়তো ঐ একখানিই আছে। বলল — "বাবা তুমি জামাটা পরে নেবে না? বাদলে হাওয়া।"

—এ যেন আরও করুণ, চাপা পড়ছে না জেনেও চাপা দেওয়ার চেষ্টা। খুবই একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। প্রশান্ত বুঝছে, কিন্তু কোনও উপায় হাতড়ে পাচ্ছে না। বুঝছে, ওর দিক থেকে অন্তত গোপেশ্বর আর্দালিকে এ ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত; কিন্তু কোথায় সরাবে? অপর পক্ষে, মেয়েটি ঘরে না থাকলেও একরকম করে সামনে যায়, কিন্তু সেখানেও যেন মস্ত বড় একটা কিছু বাধা আছে। হয়তো আর ঘর নেই, কিংবা, যা বেশি সম্ভব, কোন কারণে বাপকে একা বসিয়ে রাখা সমীচীন মনে করছে না। একটু যেন মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ রয়েছে এইরকমই মনে হয় তো।

অন্তত একটু কথাবার্তা আরম্ভ হলেও বাঁচা যায়। হঠাৎ যেন একেবারে ফুরিয়ে গিয়ে অস্বস্তিটা আরও বাড়িয়েছে। শেষে লোকটিই আরম্ভ করল। বামজাটা আলনা থেকে টেনে নিয়ে গায়ে

দিতে দিতে প্রশ্ন করল—"তা আসছেন কোথা থেকে আপনারা?"

স্বরটা অনেক নরম এবার। প্রশান্ত একটা জায়গার নাম করল, বলল—"দেখুন না বিপদ. আসতে আসতে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গিয়ে মোটর বাধ সাধল। দাঁড়িয়ে ভিজতে হয়, এইসময় বিদ্যুৎ চমকে উঠতে এই বাড়িটা চোখে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি শরণাপন্ন হোতে হোল আপনাদের।"

সুবিধা পেয়ে যেন অপরাধ স্খালন করে নেওয়ার ভাব। ফল হয়েছে। মুখের ভাবটা আরও নরম হয়ে এসেছে লোকটির। প্রশান্তর নজরটা একবার মেয়েটির দিকেও গিয়ে পড়ল কি মনে হতে। এক দৃষ্টে বাপের দিকে চেয়ে কি যেন লক্ষ্য করছিল, যেন কতকটা সাহস পেয়েই বলল—"তা বাবা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস না চৌকিটার ওপর। আপনারাও বসুন এসে।"

প্রশান্ত কুণ্ঠিতভাবে বলল—"বিছানা রয়েছে তো......"

"তা থাক না।" মেয়েটি বলল। বাপও যোগ দিল—"হ্যাঁ, আসুন, বিছানা তো একধারে রয়েছে।"

ওদের প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়ে থাকবে দেখে, প্রশান্তকে এগিয়ে গিয়ে বসতেই হোল। গোপেশ্বর অবশ্য দাঁড়িয়েই রইল।

বেশ সহজ ভাবটা ফিরে আসছে একটু একটু করে। সেইজন্যই মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশান্ত বলল—"আপনিও বসুন না.........ঐ চৌকিটায়।"

মেয়েটি একবার পেছনটা দেখে নিয়ে তিন ঠ্যাং ভাঙ্গা চৌকিটার একটা কোণ বেছে নিয়ে বসল। নিশ্চয় ঘরের সহজ ভাবটা ফিরে আসবার জন্যেই বলল—খুব অল্প একটু হেসেই বলল—"শরণাপন্ন! ......যাক, বৃষ্টিটা তো মাথায় এসে পড়ছে না।"

বাপের দিকে চেয়ে বলল, —"কি বলো বাবা?"

"তা বৈকি। তবে......"

"বুঝেছি, তুমি যা বলতে চাও।" —আবার হঠাৎ সতর্ক হয়েই কথাটাকে যেন ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল মেয়ে। একটা কথা যে আগেই আসা উচিত ছিল, ইচ্ছা করেই চাপা দিয়ে রেখেছে, সেটা যে ওর নিজের মন্তব্যেই একেবারে সামনে এসে পড়বে, ভাবতে পারেনি। দৃষ্টিতে লাজ্যের জড়তা এসে পড়লেও জোর করেই প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"বাবা বলতে চান, আপনারা তো সেই ভিজে পোশাক-আশাকেই রয়েছেন ....একখানা করে শুকনো কাপড় হোলেও হোত, কিন্তু বাবারগুলো সব ঐ ঘরে ছিল তো......"

"উড়ে গেছে ঝড়ে?" —বাপেরই প্রশ্ন; মুখটা আবার থমথমে হয়ে গেছে। বেশ বিদ্রূপের টোন। মেয়ে বলল—"উড়ে যাবে কেন? ......তবে ভিজে গেল না? সেই কথাই বলছিলুম ও'কে। নৈলে..."

প্রশান্ত বুঝলো মিথ্যা দিয়ে মানিয়ে নিতে প্রাণান্ত হচ্ছে মেয়ে। আলনায় একটা শুকনো ধুতি রয়েছে সেটা কিন্তু দেওয়া চলবে না—এ কথাটাও তো পড়ছে এসে। দুজনের কথাই হালকা করে দেওয়ার জন্য একটু হেসেই বলল—"কিন্তু উনি মিছেই সে কথা ভেবে অশান্তি পাচ্ছেন।"

বাপের পানে চেয়ে বলল—"কাপড় শুকনো থাকলেও তো আমাদের কাজে আসত না।"

"কেন?" — সহজ বিস্ময়েই প্রশ্ন করলেন বাপ।

"আমাদের তো বেশিক্ষণ বসলে চলবে না।"

"সে কি, এই দুর্যোগ!"

মেয়েও অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে বলে উঠল—"এই দুর্যোগে বাইরে থাকে? তবু তো যেমন হোক একখানা চাল মাথার ওপর আছে।"

একটা যে অজুহাত খুঁজছিল. হঠাৎ পেয়ে গেছে প্রশান্ত, মিথ্যার ওপর মিথ্যাই। তবে একটা দুর্লভ, সঙ্কটত্রাণ মিথ্যা। বেশ গুছিয়েও বলল প্রশান্ত—ওকে একটা বিশেষ সরকারি কাজের জন্য ফিরে যেতেই হবে। মোটরটা একটু বিগড়ে গেছে, বোধহয় ভেতরে জল ঢুকে। ড্রাইভার আর একটা লোক দেখছে, ও ভাবল অবশ্য, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠে বাড়িটা নজরে পড়াতেই ভাবল, তাহলে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে না থেকে—

বাপ মেয়ে দুজনেরই ভ্রূ কুঁচকে গেছে, প্রশ্ন জেগে উঠেছে দৃষ্টিতে। তাইতেই মনে পড়ে গেল প্রশান্তর, সামলে নিয়ে বলল—"ঠিক এই সময় চালাটাও গেল উড়ে। দোমনা হয়েই ভাবছিলুম—যাই কি না যাই, এখুনি হয়তো ঠিক হোয়ে যাবে মোটর, আর দাঁড়ানো গেল না। কোনও দুর্ঘটনা হোয়ে গেল না তো ভেবে তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম।"

গোপেশের দিকে ঘুরে চেয়ে বলল—"যা তো, দেখে আয় তো গোপা, এতক্ষণ হয়তো হয়েও গেছে ঠিক।" পেছন দিকেই দাঁড়িয়েছিল, চোখ টিপে দিতেও অসুবিধে হোল না।

গোপেশ্বর বেরিয়ে যেতে খানিকটা চুপচাপই গেল, সবাই নিজের নিজের চিন্তা নিয়ে রয়েছে। শেষে আবার বাপই বললেন—"তাই বা কেমন করে হয়, হ্যাঁ মা? না হয় ঠিকই হয়ে গেল মোটর, কিন্তু এই দুর্যোগ মাথায় করে যাবেন কি করে?"

অনেকখানি কথা এবার। মেয়ে [illegible]

অভিন্ন বাইরের গর্জন আর ছিদ্রপথের ঘোঙানিতে ছিঁড়ে ছিঁড়েও তো যাচ্ছে কথা, প্রশ্ন করল—"কি যেন বললে বাবা?"

কথাটা আবার বলতে হোল বাপকে। শোনার পরও একটু যেন অন্যমনস্কই রইল মেয়ে, তারপর বলল—"কিন্তু বিশেষ কাজ যে বলছেন উনি। বড় কোনও অফিসই তো।"

সুযোগ বুঝে ভদ্রভাবে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টাটুকু বড় যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর সংকোচটা চাপা দেওয়ার জন্যই প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"শুনেছেন তো বাবা কি বলছেন? যেতে না গেলেই নয়?"

গোপেশ আর্ণীল বেশ চতুর ভাবটা উপলব্ধি করেছে এবং সংকোচটাও ধরতে পেরেছে। কেমন মতো মোটরের কাছে যায়নি, সময়ের আন্দাজ করে বারান্দা থেকেই ফিরে এল এবং খবরটাও দিল বুদ্ধিমানের মতোই, যাদের যা দরকার। বলল—"মোটর ঠিক হোয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ড্রাইভার রয়েও গিয়েছিল, নিশ্চয় ঝড়ের জন্যই শুনতে পাওয়া যায়নি।"

ঠিক এই সময় ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় জোর করাঘাত হোল এবং এরা কিছু বোঝার ওঠবার আগেই চিৎকার ঠেলে এল—"মা-মণি, দোর খোল শীগ্গির।"

"অনাথ-কাকা এসেছে!"—বলে মেয়ে উল্লসিত হোয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বাপও উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন।

।। তিন ।।

অনাথ-কাকা কোনও বিশেষ সম্বন্ধ ধরে কাকা নয়। পুরোনো চাকর বা ঐ ধরনের যে একটা কিছু, দেখা মাত্রই বোঝা যায়। কালো, নিম্নশ্রেণীর লোকের পাকাটে, কর্মঠ শরীর, একটা ছোট কাপড় কোমর বেঁধে পরা, তার ওপর একটা গামছা জড়ানো, গায়ে কিছু নেই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। মোটা, কাঁচাপাকা গোঁফ এক জোড়া।

ঘরে ঢুকেই ঝড়ের ওপর আওয়াজ তুলে বলতে বলতে আসছিল—"উঃ, কী দুর্যোগ! রাস্তায় আবার এক কাণ্ড দেখে এলুম—একটা মটোর গাড়ি পাঁকে গেঁথে গেছে—জনমানব কেউ কাছে-পিঠে নেই—তাদেরও উড়িয়ে নে' গেল কি........"

—এ ঘরের মধ্যে পা দিতেই চুপ ক'রে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটি দরজা এঁটে দিচ্ছে, বাপকেই প্রশ্ন করল—"এনারা?"

বাপ বললেন—"এঁদেরই মোটর তো।"

ভাবটা কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। ততক্ষণে মেয়েও খিল এঁটে ঘরে দাঁড়িয়েছে, প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"কিন্তু আপনার লোক এসে যে বলল কই, নাকি......"

"তাই তো!"—মাঝখানেই ওর কথাটা থামিয়ে দিয়ে প্রশান্ত গোপেশের দিকে ঘুরে চাইল। বলল—"তাহলে কি ওরা দুজনে আবার খুঁজতে বেরুল আমাদের?"

—মিথ্যেটুকু সঙ্গে সঙ্গে জুগিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার আবরণটা এতই স্বচ্ছ যে গোপেশের দিক থেকে মুখ ফেরানো শক্ত হয়ে পড়েছে।

"অবশ্য এক কাজ করা যায়....."

—মেয়েটিই বলছে। প্রশান্ত ঘুরে চাইতে বলল—"আপনারা গিয়ে যদি হর্ণটা বাজান তো যেখানেই থাকুক এসে পড়বে ওরা......"

ঠোঁটের কোথাও কি অতি-সূক্ষ্ম একটু হাসি লেগে আছে? মিথ্যেটা ধরা পড়ে যাওয়ার মতো বলেই বোধহয় সন্দেহটুকু হোল প্রশান্তর, নিজের মনের যে কুণ্ঠা তার প্রতিচ্ছায়া; তবে এটা খুব স্পষ্ট যে অনাথের আওয়াজ পাওয়া পর্যন্ত মেয়েটি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। যেন এতক্ষণে অনেকটা সাহস পেয়েছে। যদি কৌতুকবশেই এসে গিয়ে থাকে হাসিটুকু তো সেটা বেশ ভালো-ভাবেই সামলে নিয়ে বলল—"তা হলে

কিন্তু এ অবস্থার মধ্যে আপনাদের বাইরে যাওয়া চলবে না, ওরা খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লেও না।"

বাপের দিকে চেয়ে সমর্থন চাইল—"কি বল বাবা?"

"একটা বিশেষ কাজ ছিল।"—বেশ জড়িত কণ্ঠে উত্তরটা দিল প্রশান্ত।

"কাজ! এ-দুর্য্যোগে!" একটু স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল অনাথ। বলল—"বুঝলুম না হয় আছে কাজ,

বাঁধন। মোটকথা বেরুনো চলবে না এই ঝড়-বাদলে। ঐ তো বললুম—গেরস্তর অকল্যেণ। আমি তো অন্য কারুর কথা ভাবছিনে।" ওদিককার হুকুমে যেন শিলমোহর বসিয়ে স্বাতির দিকে ঘুরে বলল—"তা আমার একটা উপায় করো, কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে যে, যাহোক একখানা......"

স্বাতি কুণ্ঠিতভাবে বলল—"এসো, দেখি, ট্রাঙ্কটা ওপরে রয়েছে।"

ওকে অনুসরণ ক'রে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়াল; প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"কিন্তু এনারা যে........"

কর্তা জড়িত কণ্ঠে বললেন—"দেখছি তো, কিন্তু ওর উপায় আর কি করি? চাল নেহাৎ মাথার ওপর একখানা আছে......"

"শুকনো খান দুই কিছু হলেই তো হয়।......এই তো একখানা......"

—আলনার দিকে এগুচ্ছিল, কর্তা অতিমাত্র কুণ্ঠিত হ'য়ে বললেন—"লজ্জার ওপর লজ্জা দিচ্ছিস অনাথ?"

"দ্যাখো, বলেন লজ্জা দিচ্ছি। বাপ-মেয়ের কোমরে দিব্যি শুকনো কাপড়, অতিথি তারা ভিজে কালিয়ে রয়েছে—একটা অলক্ষণ......বেশ দাঁড়াও দেখছি ......চলো তো মা-মণি।"

দোর খুলে বেরিয়ে গেল দুজনে। ফিরতে একটু দেরি হোল, ফিরলও একলাই। তার কারণটা বোঝা যায়। দু-খানা শাড়ি নিয়ে এসেছে। ওদের সামনে গিয়ে এগিয়ে ধরে বলল—"পরতে হবে দুজনকে।"

দুজনেই হতচকিত হয়ে চেয়ে আছে। কর্তা স্খলিত কণ্ঠে বললেন—

"শাড়ি... পরবেন ওঁরা?"

"বেটাছেলের পরবার নয় জানি। কিন্তু অসুখটা তো আর হতে পারবে না। রাতটা তো সহজ নয়। আর, চলবে এরকম বরাবর। কাঁপতেছেন তো দেখছি।"

কর্তা প্রশান্তর দিকে চেয়ে সেইভাবে বললেন—"কথাটা তো মিছে বলছে না। থামবার কোন লক্ষণও তো দেখছি না।"

লোকটাকে যেমন নাছোড়বান্দা গোছের দেখাচ্ছে, প্রশান্ত সভয়ে শাড়ি দুটোর দিকে চেয়েছিল, বলল—"কিছু

"কি বল বাবা?"

বাপের পরিবর্তনটা আরও বেশি। সেই যে উগ্র কী একটা ভেতরে থেকে অপ্রসন্ন ভাব জাগিয়ে রেখেছিল সেটা একেবারে গেছে। বেশ সহজভাবেই হেসে বললেন—"তা কি করে হয়? ......আমার কি মনে হয় জান স্বাতি? —ঘর-দোরের অবস্থা দেখে ওঁরা সরে পড়তে চাইছেন।"

অনাথের দিকে চেয়ে বললেন—"শুনছিস ওঁদের কথা?......"

"কথাটা কি?"—অনাথ প্রশ্ন করে চারজনের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনল।

"মোটরটা এঁদেরই তো? বলছেন চলে যাবেন; এক্ষুণি।"

"হেতুটা?"—প্রশ্নটা কর্তাকেই করে প্রশান্তর দিকে চাইল।

কিন্তু যাবেন কি করে? মটোর রাস্তার পাঁকে দেখে এলুম, গিয়ে দেখবেন রাস্তাটাই ডুবে গেছে।"

সেকেন্ড কয়েক উত্তরের আশায় থেকে বলল—"না, যাওয়া হতে পারে না এ পেল্লয়ের মধ্যে।"

বেশ জোরের সঙ্গে কথাটা বলে ঘাড়টা গুঁজে গরগরই করতে লাগল—"সে হবে না—গেরস্তর অকল্যেণ—একে তো কসুর নেই অকল্যেণের......"

"কষ্ট হচ্ছে—ঘরের যা অবস্থা......" কর্তা আরম্ভ করেছিলেন, ঘুরে চেয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল—"মানুষ হচ্ছে, বালাখানা নয় তো, কুঁড়ে ঘরই; কিন্তু খোলা আকাশের চেয়ে তো ভালো?......আর, এ ছাপ্পর উড়বে না—নিকিয়ে নিন আমার কাছে—আমি

পরশুই বাঁধন দিয়েছি—আমার [illegible]

[illegible]

ফেরারই কাজ তো, বৃষ্টিতে ভেজা অব্যেস আছে।"

অনাথ হাত বাড়িয়ে এগিয়েই এল, বলল—"নেন্ তো ; আছে ক্ষেতি। এমন পেল্লায়ে বিষ্টি হলোই বা ক'টা যে অব্যেস থাকবে?......তুমিও নেও গো পেয়াদা সায়েব। তুমি আবার যেমন তাল-পাতার সেপাই দেখছি—অসুখ নিয়েই তো ঘোরাফেরা করতে হয়।"

"হ্যাঁ, তুই বরং নে গোপা" ভয়ে ভয়ে একটু হেসেই সায় দিল প্রশান্ত। বলল—"একটা পরে একটা গায়ে জড়িয়ে নে।"

"তা কি পারে? মনিব রইল ভিজে জামা-কাপড়ে......বেশ, শাড়ি পরতে নজ্জা তো আপনি বরং এক কাজ করো।"

এগিয়ে গিয়ে আলনা থেকে ধুতিটা টেনে নিয়ে বলল—"আমার এই ধুতিটা কোমরে জড়িয়ে নেও আপনি। রোসো, দোপাট করে লুঙ্গি ক'রে দেই। আনকোরা বেনারসী চেলি তো, আমার মতন গুটিয়ে পরতে পারবে না।"

"আর তুই?"—কর্তা প্রশ্ন করলেন।

"হচ্চে, হচ্চে"—বলে তাঁকে যেন একটু শাসনের ভঙ্গিতেই নিরস্ত করে ছেঁড়া ধুতিটা পাট করে প্রশান্তর হাতে তুলে দিল। ওর পরা শেষ হলে একখানা শাড়ি পাট করে নিজেই ওর গা, মাথা ভালো ক'রে মুছিয়ে দিল, তারপর সেটা গোপেশকে পরে নিতে বলে, গায়ে জড়িয়ে নেওয়ার জন্যে শুকনো শাড়িটা প্রশান্তকে দিয়ে কর্তার দিকে চেয়ে বলল —"বললুম অত ক'রে বর্ষা-বাদলের দিন —তা আজকের হাটে দিলে তখন কিছু কিনে রাখতে? লবাব খাঞ্জাখাঁর মতন কোমরে শুকনো কাপড় জড়িয়ে তামুক টেনে শরীলের তোয়াজ করলে চলবে আমার এখন?"

উত্তরের জন্য প্রশ্ন নয়, প্রতীক্ষাও করল না ; "মা-মণি একটু এসে বোস গো, আমি যাব আর এসব।......দোরটা দিয়ে দেও ভাই তাল-পত্তো।" গোপেশের দিকে চেয়ে শেষের কথাটা ব'লে বেরিয়ে গেল।

ঢাকা দিতে গিয়ে দারিদ্র্য যেন আরও জোরের সঙ্গে ঢাকনা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাপকে একা বসিয়ে রাখার বিপদ জেনেও স্বাতির ঘরের ভেতর আসতে বিলম্বই হোল। এলও, সে যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। তারপর, মানুষ যেটা এড়িয়ে যেতে চায় সেইটেই তো পায়ে এসে পড়ে, দরজা খুলতে দৃষ্টিটাও প্রথমে গিয়ে প্রশান্তর মুখের ওপরই পড়ল। চোর নয়, তবু যেন চোরের বাড়া সংকোচ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল স্বাতি।

যাই বলুক কাপড়-শাড়ির শুষ্ক স্পর্শ ভালই লাগছে, তারপরে, বোধহয় অনাথ না থাকার জন্যই জড়তাটাও আপাততঃ গেছে অনেকখানি, প্রশান্ত বলল—"আপত্তি করছিলাম বটে কিন্তু দেখছি অনাথ-কাকার ব্যবস্থাটাই ঠিক। ঠাণ্ডায় জ'মে আসছিলাম রীতিমতো।"

ঘরের পরিবেশটা আবার সহজ ক'রে আনার জন্যেই বলা, কথাক'টা কর্তার মুখের দিকে চেয়ে আরম্ভ ক'রে স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে শেষ করল। কর্তার সে ভাবটা একেবারেই গেছে, এখন যেন

খানিকটা অপ্রতিভই ; এ অবস্থায় সহজ মানুষের যেমন হওয়া স্বাভাবিক। স্বাতি অপ্রতিভ রীতিমতোই, ওর দিকে চেয়ে বললেও কোন একটা উত্তর দিতে পারল না কিছুক্ষণ পর্যন্ত, তারপর একটু হাসির চেষ্টা করেই বলল—"এও কষ্টই, তবে তার চেয়ে ভালো বৈকি। অসুখে পড়ে যেতেন।"

বাইরের তাণ্ডব একইভাবে চলেছে। জানলার রন্ধ্রপথে সেই গোঙানি, কার যেন কাতর আশ্রয়-ভিক্ষা। স্বাতি সেই-দিকেই মুখটা ফিরিয়ে বলল—"থামবে না নাকি আর আজ?"

আলোচনাটা আকাশের কথায় এসে পড়তে বেশ সাবলীল হয়ে এল। ঘরের দৈন্যের ব্যাপারটা ক্রমে পেছনে পড়ে গিয়ে যেন দু-পক্ষের মন থেকে মুছে গিয়েছে। স্বাতির হয়তো মুছে যাওয়া নয়, ধুতির কথায়, হাটের কথায়, সব প্রকাশ পেয়ে গিয়ে গা-সওয়াই হ'য়ে গেছে। সেইজন্যই, প্রশান্ত যখন বলল—অনাথের এ দুর্যোগে বেরুনোটা ভুল হয়েছে, অন্যায়ই বলা ঠিক, ও ম্লান হেসে উত্তর করল—"না, ঠিকই করেছে, এত ভেজার ওপর উপোষ করে থাকা চলবে না তো।"

যেন মরিয়া হয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো, যেভাবেই সামনে আসুক তার জন্যে প্রস্তুত থাকা।

তবু একটু পর্দার চেষ্টা করেই যাচ্ছে, বলল—"শুধু চাল-ডালে তো হয় না। তা হ'লে না হয়......"

শেষ করবার আগেই দরজায় দ্রুত করাঘাত পড়ল, হাওয়ার ওপর অনাথের গলার আওয়াজ উঠল—"মা-মণি, দোর খোলো গো!"

[ক্রমশঃ]

সাম্প্রতিক সংবাদের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর

উত্তর

১। কিউবার প্রেসিডেণ্ট ক্যাস্ট্রো এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলেছেন—যে সব কিউবাবাসী বিদ্রোহীরা গত এপ্রিল মাসে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ৫০০ শত মার্কিণ ট্রাকটারের পরিবর্তে সেই সব বিদ্রোহীদের তিনি মুক্তি দিতে রাজী আছেন।

২। মোট প্রেরিত সৈন্যের ⅓ অংশ ভারতীয় সৈন্য দ্বারা গঠিত। এবং এর সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ হাজার।

৩। এতদিন নানা ধরণের শীর্ষ বৈঠক (Summit Conference) বসত—বড় বড় পশ্চিমী দেশ ও রাশিয়ার মধ্যে বা রাজনৈতিক বিবাদ মেটাবার জন্য কয়েটি দেশের মধ্যে; এবারে পৃথিবীর নিরপেক্ষ দেশগুলি বিশ্বশান্তির জন্য একটি শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হবে। এই নিরপেক্ষ দলের নেতা হচ্ছেন মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো। ভারতবর্ষের পক্ষ হতে নেহরু এই (Neutralists' Summit Conference)এ যোগ দেবেন বলেছেন।

৪। মার্কিণ দেশ, পাঁচটি অন্য দেশ (ইংল্যাণ্ড, জাপান, কানাডা, ফ্রান্স পশ্চিম জার্মাণী) এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক সমবেতভাবে (Aid India Club) ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যের জন্য প্রথম দুই বৎসর ২,২২৫,০০০,০০০ ডলার ঋণ দেবে। এর মধ্যে মার্কিণ দেশের অবদান প্রায় অর্ধেক টাকা।

৫। 'সুপারসোনিক' অর্থাৎ এই জঙ্গী বিমান 'শব্দ' নামে একটি প্রাকৃতিক বেগবত্তাকে হার মানিয়ে আকাশে ছুটতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নতর বায়ুস্তরে শব্দ সাধারণত ঘণ্টায় ৭২০ মাইলের বেশী ছুটতে পারে না, 'সুপারসোনিক বিমান' এই শব্দগতিকে পরাস্ত করে এর চেয়ে দ্রুততর গতিতে ছুটতে পারে।

মহারত্ন প্রসঙ্গ

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

দুর্লভ জিনিস মাত্রই মানুষের ঐশ্বর্য-লালসা চরিতার্থ করার সামগ্রী। এবং সেই কারণেই সংসারে মণিরত্নের এতো দাম এবং মণিরত্নও সেই কারণে যেমন একদিকে ভোগবিলাসের সামগ্রী অন্যদিকে তেমনই বিপদের আকর। মণিরত্নের মধ্যে হীরাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়া আসিয়াছে এবং সেই কারণে ইতিহাসে ও পুরাণে অনেক হীরাজাতীয় মহামণির নাম পাওয়া যায় যার সংগে নানা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও চক্রান্তের কথা জড়িত আছে। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হীরার মধ্যে কোহিনুরের খ্যাতি সকলের চেয়ে অধিক। পুরাণের স্যমন্তক মহারত্নও রত্নশ্রেষ্ঠ, সুতরাং হীরক এবং ঐ স্যমন্তকের উপাখ্যানে আমরা পাই যে উহার জন্য বহু পরাক্রান্ত লোকেরও সর্বনাশ হয়—যাহা মহামূল্য হীরকের একটি আঙ্গিক।

মণিমালাকারের ভাষায় কথিত স্যমন্তক উপাখ্যানে আছে যে অনমিত্রের পুত্র নিঘ্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্রাজিত ভগবান সূর্যের নিরন্তর স্তুতি পাঠ করাতে একদিন দিবাকর সমুদ্রকূলে অবস্থিত সত্রাজিতের সম্মুখে আসিয়া বিরাজ করিলেন। সত্রাজিত দিবাকরের তেজোময় মূর্তি স্পষ্টভাবে দেখিতে না পাইয়া বলেন, ভগবন্! আমি আকাশে আপনাকে যে প্রকার অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় দেখিতে পাই, আজ আপনাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সেই-রূপই দেখিতেছি। আপনার প্রসন্নতার বা প্রসাদরূপের কোনও চিহ্নই দেখিতেছি না।

সত্রাজিত এই কথা বলায় সূর্যদেব আপনার কণ্ঠ হইতে স্যমন্তক মণি উন্মোচন করিয়া একপার্শ্বে রাখিতে, সত্রাজিত তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। তাঁহার বর্ণ তাম্রের ন্যায় ঈষৎ লোহিত, উজ্জ্বল, শরীর খর্ব, চক্ষু ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ। প্রত্যক্ষ দেখিয়া সত্রাজিত প্রণিপাত করিয়া স্তবাদি করিতে সূর্যদেব তাঁহাকে বরদানে ইচ্ছুক হইলেন। সত্রাজিত সেই মহারত্ন প্রার্থনা করায় অর্যমা তাঁহাকে স্যমন্তক প্রদান করিয়া প্রস্থান করেন।

সত্রাজিত সেই অমল মহারত্ন কণ্ঠে ধারণ করায় তিনি সূর্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত হইয়া দশদিক উজ্জ্বল করিয়া দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করেন। দ্বারকা-বাসিগণ তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে যাইয়া প্রণিপাতপূর্বক বলিল, ভগবন্! আপনাকে দর্শন করিতে সূর্যদেব এখানে আসিতেছেন। পুরুষোত্তম স্মিতমুখে বলিলেন, তোমরা যাঁহাকে সূর্য মনে করিতেছ তিনি রাজা সত্রাজিত। ইনি সূর্যদত্ত মহারত্ন স্যমন্তক ধারণ করায় সূর্যপ্রভ হইয়াছেন। তোমরা নির্ভয়ে তাঁহাকে দেখ।

সত্রাজিত প্রথমে স্যমন্তক নিজের কাছে রাখিলেন। ঐ মণির প্রভাবে রাজ্য-মধ্যে অনাবৃষ্টি, সর্প, অগ্নি, দুর্ভিক্ষ, এমন কি চোরেরও ভয় থাকে না, তাহার এই খ্যাতি ছিল। কিন্তু ঐ মণির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিয়াছে বুঝিয়া, পাছে তিনি উহা প্রার্থনা করেন এই ভয়ে সত্রাজিত নিজ কনিষ্ঠ প্রসেনকে তাহা সমর্পণ করেন।

প্রসেন একদিন স্যমন্তক মণি কণ্ঠে লইয়া মৃগয়া করিতে বনে যান। বনমধ্যে প্রবেশমাত্র এক সিংহ তাঁহাকে এবং তাঁহার অশ্বকে বিনাশ করিয়া ঐ মহারত্ন মুখে ধরিয়া চলিয়া যাইবার সময় ঋক্ষ-রাজ জাম্ববানের সম্মুখে পড়ে। ঋক্ষাধি-পতি সিংহকে সংহার করিয়া ঐ অমল মহারত্ন লইয়া নিজ আবাসগর্তে যাইয়া তাঁহার শিশুপুত্র সুকুমারককে খেলিবার জন্য প্রদান করেন। সুতরাং এই মহা-রত্নের জন্য প্রসেন, তাঁহার অশ্ব ও এক সিংহের প্রাণ যায়। অবশ্য পুরাণে আছে যে, অপবিত্র শরীরে ধারণ করিলে ঐ মহারত্নই ধারকের বিনাশের কারণ হয়।

এদিকে প্রসেন দীর্ঘকাল পরেও যখন ফিরিলেন না তখন যদুবংশীয়েরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক লাভের জন্য ইচ্ছুক হইয়াও যখন তাহা পাইলেন না তখন তিনিই প্রসেনকে বিনাশ করিয়া উহা লইয়াছেন, অন্য কেহ সে কাজ করে নাই। এই অপবাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদুসৈন্য সমবেত হইয়া প্রসেনের অশ্বের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বনে যাইয়া দেখিলেন প্রসেন অশ্বের সহিত সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়া ভূপতিত হইয়া রহিয়াছেন। সংগের লোকজনকে সিংহের পদচিহ্ন দেখাইয়া নিজের অপবাদ মোচন করিবার পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আরও অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইতে দেখা গেল যে সিংহও কোন ঋক্ষ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। দুর্লভ রত্নের উদ্ধার প্রয়াসে শ্রীকৃষ্ণ সেই ঋক্ষের পদচিহ্ন ধরিয়া কিছুদূর যাইবার পর এক পর্বতময় ভূখণ্ডে আসিয়া দেখিলেন পর্বতের গুহামুখে ঋক্ষের পদচিহ্ন গিয়াছে। সমুদয় যদুসৈন্যকে নীচে রাখিয়া সেই বিবরে প্রবেশ করিয়া তিনি

শুনিলেন যে কোনও ঋক্ষশিশুকে তাহার ধাত্রী সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছে, "সুকুমারক কাঁদিও না! এক সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়া যে মহারত্ন গ্রহণ করে তোমার পিতা ঋক্ষরাজ সেই সিংহকে নিহত করিয়া সেই মণি তোমাকে দিয়াছেন। এই মণি তোমারই হইল।"

স্যমন্তক মণি কোথায় সে কথা শুনিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ সেই কক্ষে যাইলেন। দেখিলেন সমস্ত কক্ষ তেজে আলোকিত করিয়া সেই মহারত্ন ধাত্রীহস্তে রহিয়াছে এবং সে তাই দিয়া ঋক্ষশিশুকে ভুলাইতেছে। এদিকে একজন অপরিচিত পুরুষ স্যমন্তকের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া ধাত্রী 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করায় তাহা শ্রবণমাত্র ঋক্ষরাজ জাম্ববান দ্রুতবেগে সেখানে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। সেই প্রচণ্ড যুদ্ধ দিনের পর দিন সমানে চলিতে লাগিল। আট দিন ঐ ভাবে কাটিলে পরে যদুসৈন্যেরা স্থির করিল যে, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় নিহত হইয়াছেন। জীবিত থাকিলে শত্রুজয়ে এতদিন তাঁহার লাগিত না। তাহারা দ্বারকায় ফিরিয়া ঐ মৃত্যু-সংবাদ রটাইয়া দিল। শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় বন্ধুগোষ্ঠী সেই কথা শুনিয়া তৎকালোচিৎ প্রেতকার্য সম্পন্ন করিলেন।

বান্ধবগণ সেই কার্যে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে অতি শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নপানাদি দান করায় যুদ্ধে ব্যাপৃত শ্রীকৃষ্ণের দেহমনে বিশেষ বল সঞ্চারিত হইল। তিনি আরও প্রবল শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে নিরাহারে ক্ষীণ ও প্রবল পরাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের ভীষণ প্রহারে ক্ষতবিক্ষত জাম্ববান, একুশ দিন যুদ্ধ করিবার পর নিস্তেজ হইয়া পরাজিত হইলেন।

প্রণিপাতপূর্বক পরাজয় স্বীকার করিয়া জাম্ববান বলিলেন, ভগবন্! আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আমার প্রভু, সমস্ত জগতের আধার যে নারায়ণ, আপনি তাঁহারই অংশে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। সমস্ত সুর, অসুর, যক্ষ ও গন্ধর্ব ইত্যাদি প্রাণী একত্রে যখন আপনাকে পরাজয় করিতে পারে না তখন আমা হেন নরাকার অল্পসত্ত্ব তির্যগযোনির অনুসারি ব্যক্তির সাধ্য কি যে আপনাকে পরাস্ত করে!

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানকে বলিলেন যে, তিনি পৃথিবীর ভারাপনোদনের জন্য অংশাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জাম্ববান তাহাতে প্রীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে হস্তস্পর্শ দ্বারা যুদ্ধের ক্লেশ দূর করিলেন। তাহার পর পুনর্বার প্রণিপাত করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ কন্যা জাম্ববতীকে সম্প্রদান করিলেন এবং সেই সঙ্গে স্যমন্তক মণিও দিলেন। এরূপ অনুগতজনের নিকট হইতে সেই মণি গ্রহণ অতি অকর্তব্য বিবেচনা করিয়াও আত্মকলঙ্ক মোচনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহা অগত্যা লইলেন এবং জাম্ববতী ও ঐ মহারত্ন লইয়া দ্বারকায় চলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমনে দ্বারকা আনন্দময় হইল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখে ঐ মণির সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিয়া সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি প্রদান করিয়া নিজেকে মিথ্যাপবাদ হইতে মুক্ত করিলেন। পরে জাম্ববতীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। সত্রাজিতের মনে ভয় ছিল, কেন না তিনি অকারণে শ্রীকৃষ্ণকে দোষী করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি তাঁহাকে নিজ কন্যা সত্যভামাকে প্রদান করিয়া প্রসন্ন করিলেন। ইতিপূর্বে অক্রূর, কৃতবর্মা ও শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ সত্যভামাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সত্রাজিতের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। সেই কন্যা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করায় সকলেই উহাতে নিজেদের অপমানিত বোধে রুষ্ট হইলেন। পরে তাঁহারা সকলে শতধন্বাকে বলিলেন, সত্রাজিত দুরাত্মা, কারণ সে আমাদের অবজ্ঞা করিয়া, আমাদের পূর্বকৃত অনুরোধ বিবেচনা মাত্র না করিয়া কৃষ্ণকে ঐ কন্যা দান করিয়াছে। তোমার উচিত উহাকে বিনাশ করিয়া স্যমন্তক গ্রহণ করা। যদি শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে তোমার সহিত বৈরিতা করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করিব।

ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন এই সংবাদ রটিল। দুর্যোধন যাহাতে ঐ সংবাদকে সত্য জানিয়া আর পাণ্ডবদিগকে কোনও সন্ধান না করেন এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডুনন্দনদিগের প্রেতকার্য করিবার জন্য বারণাবতে গমন করিলেন। ঐ অবসরে শতধন্বা সত্রাজিতকে সুপ্ত অবস্থায় নিহত করিয়া স্যমন্তক অপহরণ করিলেন। সত্যভামা পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য রথারোহণে বারণাবতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, আমার পিতা আমায় আপনাকে দান করায় শতধন্বা তাঁহাকে বধ করিয়া স্যমন্তক লইয়া গিয়াছে। এখন এ বিষয়ে আপনার কর্তব্য যাহা আপনি তাহা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদে মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াও কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সত্যভামাকে বলিলেন, সত্যে! ইহা শুধু তোমার পিতারই অবমাননা নয় ইহা আমারই অপমান। আমি ইহা কখনই সহ্য করিব না, ঐ দুরাত্মার আশ্রয় নাশ করিয়া উহাকেও বিনাশ করিব। সত্যভামাকে এইভাবে সান্ত্বনা দিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিলেন।

সেখানে বলদেবকে নির্জনে লইয়া বাসুদেব বলিলেন—দেখুন, সত্রাজিত ও প্রসেন দুজনেই নিহত অতএব স্যমন্তক এখন আমাদের দুজনের হইবে। অতএব আপনি উঠুন এবং রথারূঢ় হইয়া শতধন্বাকে বিনাশ করিতে উদ্যোগী হউন। বলরাম বলিলেন—তথাস্তু।

কৃষ্ণ বলরাম তাঁহার বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিতেছেন শুনিয়া শতধন্বা কৃতবর্মার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কৃতবর্মা

তাহার উত্তরে জানাইলেন যে, তিনি কৃষ্ণ-বলরামের সহিত সংগ্রাম করিতে অসমর্থ। তখন শতধন্বা অক্রূরের সহায়তা ভিক্ষা করিলেন। অক্রূর তাহাতে জানাইলেন যে, যিনি অতি প্রবল অসুরগণের বনিতা-বর্গের বৈধব্য সম্পাদন করিয়াছেন সেই পদাঘাতে জগত্রয় কম্পনকারী চক্রী ভগবান কৃষ্ণের সহিত এবং যিনি সুরাপানমুদিত-নয়ন-কটাক্ষে সকল শত্রুসৈন্য সংহার করিতে পারেন সেই মহিমাময় হলায়ুধের সহিত যুদ্ধ করিতে লোক-পূজিত দেবগণও যখন অসমর্থ তখন আমি কোথায় আছি। অতএব তুমি অন্যত্র দেখ।

নিরুপায় শতধন্বা তখন বলিলেন, যদি আপনি আমাকে রক্ষা করিতে না পারেন তবে এই মণিটি আপনার নিকট রাখুন। অক্রূর তাহাতে বলেন, দেখ, যদি তুমি অন্তিমদশাতেও কাহারো নিকট একথা প্রকাশ না কর, তবে আমি উহা রাখিতে পারি। শতধন্বা তাহাই স্বীকার করিয়া অক্রূরকে মণিটি প্রদান করিলেন। তাহার পর এক অতি দ্রুতগামিনী ঘোটকীতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। সেই সমাচার পাইয়া কৃষ্ণ ও বলরাম, শৈব্য, সুগ্রীব মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্ব-চতুষ্টয় যোজিত রথে আরোহণ করিয়া শতধন্বার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

শতধন্বার বাড়বা একদিনে শত যোজন পথ ধাবন করার পর দ্বিতীয় দিনে চালিত হওয়ায় মিথিলার নিকটস্থ বনপ্রদেশে প্রাণত্যাগ করিল। শতধন্বা অগত্যা পদব্রজেই চলিতে লাগিল। সেই মৃত বাড়বার নিকটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বলিলেন, আমাদের অশ্বগণ এখানে অমঙ্গল-সূচক ঘটনা দেখিয়াছে সুতরাং এই স্থান অতিক্রম করিয়া ইহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আপনার উচিত নহে। আপনি এখানেই রথে অপেক্ষা করুন। আমি একাকীই পদব্রজে ঐ অধর্মাচার শতধন্বাকে অনুসরণ করিয়া নিধন করিয়া আসিতেছি। বলরাম তাহাতে সম্মত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতপদে দুই ক্রোশ মাত্র গমন করিয়া পলায়নরত শতধন্বাকে দেখিতে পাইলেন এবং দূর হইতেই চক্র নিক্ষেপ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। কিন্তু তাহার পর শতধন্বার অঙ্গ-বস্ত্রাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও স্যমন্তক মণি পাইলেন না।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলদেবকে যখন বলিলেন আমরা অকারণ শতধন্বাকে বিনাশ করিলাম, যেহেতু জগতের শ্রেষ্ঠরত্ন সেই স্যমন্তক পাওয়া গেল না, তখন বলভদ্র অত্যন্ত কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ, তোমাকে ধিক্! তুমি এমনই ঐশ্বর্য লোভী! তুমি ভ্রাতা বলিয়াই তোমাকে ক্ষমা করিলাম, অন্য কেহ হইলে কখনই ক্ষমা করিতাম না। অকারণ মিথ্যা শপথ করিয়ো না, এই সোজা পথ রহিয়াছে যেথা ইচ্ছা যাও। আমার দ্বারকায় আর প্রয়োজন নাই, তোমার মত ভ্রাতা বা বন্ধু-বান্ধবেও প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিরস্কার করিয়া বলদেব আর ক্ষণকাল তথায় না থাকিয়া কৃষ্ণের অনুনয়-বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া বিদেহ নগরীতে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণ একাই দ্বারকানগরীতে ফিরিয়া গেলেন। বলরামকে বিদেহরাজ জনক মহাসম্মানের সহিত নিজ প্রাসাদে রাখিলেন। তিন বৎসর পরে বভ্রু ও উগ্র-সেনাদি যাদবগণ বিদেহ পুরীতে যাইয়া অনেক কথায় বলদেবকে বুঝাইলেন যে, কৃষ্ণ স্যমন্তক অপহরণ করেন নাই। তাহার পর তিনি দ্বারকায় ফিরিলেন। বলদেব বিদেহপুরীতে থাকিতে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন।

এদিকে অক্রূর সেই মহারত্ন লইয়া শঙ্কিত চিত্তে দ্বারকায় রহিলেন। যজ্ঞে ব্রতী ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে বধ করিলে ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হয়। বোধহয় এই উপায়ে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি দ্বিষষ্টি বৎসর কাল অনবরত দীক্ষারূপ কবচে নিজেকে আবৃত করিবার জন্য প্রতিনিয়ত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। স্যমন্তক হইতে প্রতিদিন অষ্টভার (৮×২০—১৬০ তোলা) স্বর্ণ জন্মাইত। অক্রূর সেই মহামণিপ্রসূত সুবর্ণরাশি যাগযজ্ঞে ব্যয় করিতে থাকিলেন। মহামণির প্রভাবে ঐ দীর্ঘকালে দ্বারকায় কোনও উপদ্রব, দুর্ভিক্ষ বা মড়কাদি ঘটে নাই।

ঐ সময়ের পর অক্রূরের দলের ভোজ-গণ সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনাশ করে। প্রতিশোধের ভয়ে ভীত অক্রূর ভোজগণের সঙ্গে দ্বারকা ছাড়িয়া পলায়ন করেন। এবং তাঁহার পলায়নের পরেই দ্বারকায় নানা উপসর্গ, সর্পাঘাত, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি উপদ্রব আরম্ভ হইল। কি কারণ দীর্ঘকাল পরে এরূপ দৈব-

বিড়ম্বনা উপস্থিত হইতে লাগিল তাহা স্থির করা কর্তব্য জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেব উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই মন্ত্রণাকালে অন্ধক নামে এক বৃদ্ধ যাদব বলিলেন, আমি দেখিয়াছি অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক যেখানে থাকিতেন সেখানে দুর্ভিক্ষ মড়কাদি উপদ্রব ঘটিত না। এক সময় কাশিরাজের রাজ্যে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হওয়ায় শ্বফল্ককে সেখানে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি যাইতেই সেখানে প্রচুর বর্ষণ আরম্ভ হয়। রাজ্যের এই উপকারে হৃষ্ট হইয়া কাশিরাজ শ্বফল্ককে তাঁহার কন্যা গান্দিনীকে সম্প্রদান করেন। এই কাশিরাজ কন্যা দ্বাদশ বর্ষ মাতৃগর্ভে থাকিলে পরে কাশিরাজ প্রশ্ন করেন যে, সে ভূমিষ্ঠ হইতেছে না কেন। তাহাতে কন্যা গর্ভ হইতেই উত্তর দেয় যে, যদি তাহার পিতা অতঃপর প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগকে একটি গোদান করেন তবে আরও তিন বৎসর পরে সে ভূমিষ্ঠ হইবে। সেই মত গোদানের ফলে তাহার জন্ম, সেই কন্যার নাম হয় গান্দিনী। এইরূপ গুণসম্পন্ন দম্পতী হইতে যখন অক্রূরের জন্ম, তখন তিনি দ্বারকা পরিত্যাগ করিলে এখানে মড়ক, দুর্ভিক্ষাদি হইবে না কেন? তিনি মহা অপরাধ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার গুণের তুলনায় তাহা ধর্তব্যই নহে।

যাদব কুলপতিগণ বৃদ্ধের বাক্য যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিয়া শ্বফল্ক-পুত্র অক্রূরকে ক্ষমা ও অভয়দান করিয়া দ্বারকায় ফিরাইয়া আনিলেন। অক্রূর নগরে আসিবামাত্র তাঁহার নিকটস্থিত স্যমন্তক মহামণির প্রভাবে অনাবৃষ্টি, মড়ক ও সর্পাদির উপদ্রব প্রশমিত হইল। দ্বারকা-বাসিগণ তাহাতে চমৎকৃত এবং বৃদ্ধ অন্ধক মহাসন্তুষ্ট হইলেন নিশ্চয়। কিন্তু অক্রূরের এই অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ শুধু বিস্মিত হইলেন না, উহা তাঁহার মনে চিন্তার উদ্রেক করিল। তিনি বিচার করিলেন যে, অক্রূর শ্বফল্ক ও গান্দিনীর সন্তান, শুধুমাত্র এই সামান্য কারণে দুর্ভিক্ষ ও মড়কাদি নিবারণের ক্ষমতার ন্যায় অত্যন্ত গুরুতর প্রভাব লাভ করতে পারেন না। উপরন্তু এক যজ্ঞের পর অন্য যজ্ঞ করতে যে, অফুরন্ত অর্থ সঙ্গতি প্রয়োজন, অক্রূর সে বিভবের অধিকারী নহেন, সুতরাং তাহাই বা আসে কোথা হইতে? এই দুই প্রশ্নের একই উত্তর—স্যমন্তক মহারত্ন। নিশ্চয়ই স্যমন্তক ইহারই নিকট আছে।

মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্য এক উপলক্ষে নিজ গৃহে সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিলেন। সেখানে সভাস্থলে উপস্থিত অক্রূরের সহিত নানা বাক্যালাপ ও পরিহাসের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, হে দানপতি! আমরা জানি যে, শতধন্বা আপনার নিকট অখিল জগতের সারভূত স্যমন্তক মণি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই মহারত্ন রাজ্যের অশেষ উপকারী, আমরা সকলেই ত তাহার ফলভোগী, সুতরাং তাহা আপনার কাছে থাকুক। কিন্তু বলদেব সন্দেহ করেন যে, উহা আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি। এই সন্দেহভঞ্জন ও আমার সন্তোষের জন্য সেই মণিটি একবার সভায় দেখান।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় অক্রূর উভয় সংকটে পতিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মণি ত আমার নিকটেই আছে, এখন কি বলি? মিথ্যা বলিলে ইহারা অনুসন্ধান করিয়া আমার বস্ত্রমধ্যে উহা পাইবে এবং সেটা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, ভগবন্ শতধন্বা এই স্যমন্তক মণি আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আপনি একদিন না একদিন চাহিবেন জানিয়া আমি এতকাল ইহা অতি কষ্টে রক্ষা করিয়াছি। ইহার ধারণে আমার মনে শান্তি নাই, আমি সমুদয় উপভোগে বঞ্চিত, সুখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারি নাই। শুধুমাত্র আপনারা মনে করিবেন যে, অক্রূর এতই অক্ষম যে এই অশেষ উপকারক মণিরত্নও ধারণ করিতে পারিল, এই ভাবিয়া আমি উপ-যাচক হইয়া আপনাকে ইহা সমর্পণ করি নাই। এখন সেই স্যমন্তক মহারত্ন গ্রহণ করিয়া যাঁহাকে ইচ্ছা প্রদান করুন, এই বলিয়া অক্রূর নিজ পরিধেয় বস্ত্রমধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণময় কৌটা বাহির করিয়া, তাহা হইতে স্যমন্তক বাহির করিয়া সভাস্থ যাদবগণকে প্রদর্শন করিলেন। মহারত্নের প্রভায় সমস্ত সভা-মণ্ডপ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যাদবগণ মণি দর্শনমাত্রেই অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত চতুর্দিক হইতে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন।

বলদেব মহারত্ন দর্শনে তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, কৃষ্ণ পূর্বেই অঙ্গীকার করিয়াছে ইহা আমাদের উভয়ের সম্পত্তি হইবে, অন্যদিকে সত্যভামা মনে করিতে লাগিলেন, ইহা যখন আমার পিতৃসম্পত্তি তখন আমারই হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মুখভঙ্গী নিরীক্ষণে নিজেকে চক্রান্তপতিত ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করিয়া সমুদয় যাদবের সমক্ষে অক্রূরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

দেখুন, আমি শুধু নিজ কলঙ্কা-পবাদ মোচনের জন্যই সকলকে এই মণিরত্ন দেখাইলাম। পূর্বে আমি স্বীকার করিয়াছিলাম যে, ইহা বলদেব ও আমার সাধারণ সম্পত্তি হইবে, কিন্তু ইহা সত্যভামার পিতৃধন, অতএব ইহা সত্যভামারই হওয়া উচিত। অন্যের ইহাতে লোভ বিধেয় নয়। কিন্তু অন্য কথাও আছে।

এই মণি পবিত্র ও ব্রহ্মচর্যব্রতী হইয়া ধারণ করিলেই ইহা রাজ্যের মঙ্গলজনক হয়। অপবিত্র ব্যক্তি ধারণ করিলেই ইহা তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে। এরূপ অবস্থায় আমি ইহা ধারণে অক্ষম, কেননা আমার ষোড়শ সহস্র মহিষী।

সত্যভামাই বা কি প্রকারে ইহা ধারণ করিবেন। তিনি কি মণির জন্য ব্রহ্মচর্য-ব্রতাবলম্বন করিবেন? আর্য বলদেব কি এই মণি ধারণের উদ্দেশ্যে সুরাপানাদি সমস্ত উপভোগ ত্যাগ করিবেন? দানপতি! এই বলদেব, এই সত্যভামা, আমি এবং যাদবগণ, আমরা সকলেই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, সমস্ত রাজ্যের কল্যাণের জন্য ইহা আপনিই ধারণ করুন। অন্য কথায় প্রয়ো-জন নাই, ইহা আপনার নিকট থাকিলেই রাজ্যের মঙ্গলকর হইবে। অতএব আপনিই ইহা ধারণ করুন, ইহার অন্যথা করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে অক্রূর তথাস্তু বলিয়া সেই মহারত্ন গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি অক্রূর নিজ কণ্ঠে সেই মহারত্ন ধারণ করিয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পুরাণে লিখিত আছে: যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই মিথ্যা কলংকাপনোদনের বৃত্তান্ত স্মরণ করে, তাহাকে সামান্য মিথ্যাপবাদ কখনও স্পর্শমাত্রও করিতে পারে না, তাহার ইন্দ্রিয়সকল অবিকৃত থাকে এবং পরিশেষে সে ব্যক্তি সমুদয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। ইতি স্যমন্তকোপাখ্যান।

মহামূল্য মহারত্নের স্বভাব এই যে, তাহার অধিকারীকে প্রচ্ছন্ন বিপদ-আপদের লক্ষ্য হইয়া থাকিতে হয়। স্যমন্তক উপাখ্যানে মণিমালাকার পুরাণের ভাষায় তাহাই বলিয়াছেন। স্যমন্তক মণিকে অমলমণিরত্ন বলা হইয়াছে। হীরক শ্রেষ্ঠের গুণাবলী বর্ণনায় যাহা আছে, যথাঃ—

কোটি সূর্য প্রতিকাশং
কোটিচন্দ্রসুশীতলং
অন্ধকারহরং বজ্রং বিজ্ঞেয়ং মহদুত্তমং
তস্য ধারণমাত্রেণ সর্বরোগং প্রশাম্যতি।

এবং হীরায় আকাশাংশের প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে বিমলং শুচি তীক্ষ্ণাগ্রং বলা হয়।

স্যমন্তক কি জাতীয় রত্ন ছিল জানি না। কিন্তু বর্ণনায় হীরার গুণা-বলীই পাওয়া যায়। বিপদ-আপদ যে মহামূল্য হীরার স্বভাবজনিত এই কথার উদাহরণরূপে এবার বলিব এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ হীরার কথা, যার নাম কোহিনুর। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অমৃতত্ব

পরিমল গোস্বামী

আমি বর্তমান যুগের অমৃত বুঝতে পারি, কিন্তু পৌরাণিক যুগের অমৃত আমার কাছে দুর্বোধ্য।

পুরাণে আছে বিষ্ণুর কাছে শক্তি ও অমরত্ব লাভের আশায় অসুরদের সঙ্গে রণে ক্লান্ত দেবতারা প্রার্থনা জানালে বিষ্ণু বললেন, সমুদ্র মন্থন করলে অমৃত পাওয়া যাবে।

সেই ব্যবস্থাই হল এবং বহু-মন্থনের পর অমৃত পাওয়া গেল।

সেই অমৃত দেবতারা পান করলেন। সোজা বাংলায়—খেলেন।

এই অমৃত খাওয়ার আগে কিন্তু দেবতারা মানুষের মতোই মারা যেতেন। এবং মন্থনের সময় যে বিষ উঠেছিল তা খেয়েও অনেক দেবতা মারা গিয়েছিলেন। বাকি বিষ অবশেষে শিব নিজে খেয়ে হজম করলেন। কি করে করলেন তা স্বয়ং শিবই জানেন। হয়তো পূর্ব থেকেই সাপের বিষ দেহে নিয়ে নিয়ে দেহকে 'ইমিউন' করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অমর হয়েছিলেন কি খেয়ে, পুরাণে সম্ভবত এর উত্তর নেই।

সমুদ্র মন্থন ঠিক কোন্ সময়ে হয়েছিল সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। আমি বি. সি. অথবা এ. ডি-র হিসাব ধারণায় আনতে পারি, পৌরাণিক যুগের কোনো অংশকেই ধারণায় আনতে পারি না। বড়ই গোলমেলে বোধ হয়। এক সত্য যুগেই দেখা যায় মানুষ ছিল একুশ হাত দীর্ঘ, এবং তাদের কেউ অসুখে মারা যেত না, সবই ছিল ইচ্ছামৃত্যু। অর্থাৎ মৃত্যুর বাসনা হলেই মুমূর্ষু সবাইকে ডেকে বলত, 'তাহলে এবারে আসি?'

কিন্তু এ তো গেল মানুষের কথা। দেবতারা অমৃতপূর্ব যুগে জন্মমৃত্যুর অধীন ছিলেন, কিন্তু অমৃতোত্তর যুগে শুধু জন্মাতেন, মরতেন না। আমার পক্ষে এমন অবস্থা ধারণা করা অসম্ভব। বাইবেল-প্রসিদ্ধ ইনক্-পুত্র মেথুজেলা এসব দেবতাদের কাছে শিশু। কারণ মেথুজেলার আয়ু ছিল মাত্র ৯৬৯ বছর। এই ৯৬৯ বছর পর তাঁর তো মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু দেবতাদের অমৃতোত্তর যুগে আর মৃত্যুই হয়নি।

আরও একটি জিনিস আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। সে হচ্ছে অমৃতের মাত্রা। প্রত্যেক দেবতা অমৃত এক মাত্রা (বা ড্রাফট্) খেয়ে অমর হয়েছেন, না

...আর আমি যাতে অমৃত হব না, তা নিয়ে আমি কি করব?

বেঁচে থাকার জন্য নিয়মিত মাত্রায় খেয়ে আসছেন, তা আমার জানা নেই। কিন্তু আসল সমস্যা এটি নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে তাঁদের বংশধরদের নিয়ে। কারণ যদি নিয়মিত খেয়ে অমর হতে হয়, তা হলে এতদিনে তাঁদের অনন্ত কোটি সন্তানাদি এত অমৃত কোথায় পাচ্ছেন। প্রত্যেকে দৈনিক এক ফোঁটা করে খেলেও সমুদ্রে যত বিন্দু জল আছে তার চেয়ে বেশি অমৃত ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। তাই তো বার বার মনে এ প্রশ্ন জাগছে—সমুদ্র মন্থনে কত অমৃত উঠেছিল। সমুদ্রের চেয়ে বেশি অবশ্যই নয়। এবং সে অমৃত তরল, না চূর্ণ।

ধরে নেওয়া যাক সবাই একমাত্রা করে খেয়েই অমর হয়েছেন, অতএব এটাও ধরে নেওয়া যায় যে, তাঁদের বংশধরেরাও অমর হয়েছেন। তা হলে একটা মোটামুটি হিসাব করে যদি ধরা যায় প্রতি দেবতার দশটি করে সন্তান হয়েছে, এবং তাঁদের প্রত্যেকের দশটি করে হয়েছে, এবং প্রত্যেক বংশধরের দশটি করে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তা হলে তাঁদের সংখ্যা এতদিনে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, মহাশূন্যে যতদূর স্থান আমরা কল্পনা করতে পারি, তাতেও তাঁদের স্থান-সংকুলান হয় না। আকাশে যত তারা আছে—দৃশ্য অদৃশ্য যত কিছু আছে, সব ভরে গিয়েও সংখ্যা যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে এবং তাঁদের বর্তমান অবস্থা কল্পনার অতীত।

কিন্তু সম্ভবত যে সব দেবতা অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁদের বংশধরেরা অমর নন। অর্থাৎ অমর দেবতারা নিজ নিজ বংশধরদের বংশ বংশ ধরে চোখের সামনে মৃত্যু দেখে আসছেন, অথচ তার কোনো প্রতিকার তাঁদের হাতে নেই। এই বংশ-ধরেরা যে অমর নন, তার আরও একটি প্রমাণ যাঁরা অমৃত খেয়েছিলেন, তাঁদেরই নাম আমরা জানি, তাঁরাই খ্যাত, কিন্তু তাঁদের অনন্ত কোটি উত্তরপুরুষের মধ্যে কারো ভাগ্যেই কোনো খ্যাতি জোটেনি, এমন কি তাঁদের নামও আমরা জানি না। তাঁরা অমর হলে তাঁদের এক আধজন অবশ্যই খ্যাত হতেন।

অনন্ত কোটি দেবতার অমরত্ব আমাদের কল্পনার অতীত। জন্ম আছে

অথচ মৃত্যু নেই, পার্থিব অভিজ্ঞতার বাইরে। আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করি—

"জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর
হায়রে জীবন-নদে।"

এ বিশ্বাস আমাদের মন থেকে তাড়ানো প্রায় অসম্ভব।

অমৃত বিষয়ে আরও একটি গুরুতর প্রশ্ন আছে। সেটি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। যাজ্ঞবল্ক্যের অপর স্ত্রী কাত্যায়নী ছিলেন গিন্নিজাতীয় স্ত্রীলোক। বার্ধক্যে যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ত্যাগ করবার সময় তাঁর সমস্ত জমানো ধনসম্পদ (ঋষিরা ধনী ছিলেন!) দুই স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলেন, তখন মৈত্রেয়ী বললেন, ধনসম্পদ লাভ করলে কি আমি অমৃত হতে পারব? আর আমি যাতে অমৃত হব না, তা নিয়ে আমি কি করব?

'আমি যাতে অমৃত হব না'—কথাটি লক্ষণীয়।

দেখা যাবে, দেবতারা অমৃত খেতে চেয়েছিলেন, আর ঋষিপত্নী অমৃত হতে চেয়েছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অমৃতে অমৃতে তফাত আছে। দুটি এক হলে খাওয়া এবং হওয়া কি করে সম্ভব? অমৃত যদি সোমরসের অপর নাম হয়, তা হলে কি বলতে পারতেন আমি সোমরস খাব এবং সোমরস হব? কেবলমাত্র ইংরেজি মতে স্পিরিট খাওয়া যায় এবং স্পিরিট হওয়া যায়। আর কোনো মতে চলে না। যেমন, 'নেকটার' শুধু খাওয়া যায়, হওয়া যায় না। নেকটার ইউরোপের পৌরাণিক অমৃত। এবং তা সুরার প্রায় সমান। এবং সোমরসও যে নেশার বস্তু তার প্রমাণ ইন্দ্র। তিনি অন্য সব দেবতার তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় সোমপ ছিলেন, এবং অমৃত এবং সোমরস এক অর্থেই ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। মনে হয় সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল তা ঠিক সোমরস নয়। অবশ্য পুরাণ বিষয়ে জোর করে আমি কিছু বলছি না, যদি কিছু জোর প্রকাশ পেয়ে থাকে তা স্রেফ অজ্ঞতার জোর।

অমৃতের উৎপত্তি প্রথমে দুধ থেকে। ধরিত্রীকে গাভী এবং ইন্দ্রকে গোবৎস বানিয়ে দেবতারা সোনার পাত্রে যে দুধ দোহন করেছিলেন, তা থেকে অমৃত উৎপন্ন হয়েছিল। এর মূলে সত্য আছে অনুমান করি, কারণ তা হলে ইন্দ্রের অতিরিক্ত পানাসক্তির একটা অর্থ পাওয়া যায়। একেবারে বাছুর অবস্থায় সোমপানের ফলে ইন্দ্র ইন্দ্রিয়াসক্ত খুব বেশি পরিমাণে হয়েছিলেন। অবশ্য এ অমৃতকেও যদি সোমরস বলা যায়।

এই দুগ্ধজাত অমৃত দুর্বাসার অভিশাপে সমুদ্রে পড়ে। তারপর সমুদ্র-মন্থনের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন: অমৃত কি কোনো বিশেষ পাত্রে সীল করা ছিল? নইলে সমুদ্রের জলে মিশে গেলে তা থেকে দুধ থেকে মাখন তোলার ভঙ্গিতে মন্থন করে, হাতী ঘোড়া প্রভৃতির সঙ্গে সামান্য একটুখানি অমৃত বার করার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

পাত্রে বদ্ধ অবস্থায় যে ছিল না এমন কোনো প্রমাণ সম্ভবত নেই। কারণ মন্থনে বিষও উঠেছিল। বিষও নিশ্চয় পৃথক পাত্রে ছিল। কিংবা বিষ ও অমৃত এক পাত্রে মেশানো থাকলে শুধু দেবতারাই বিষের ঘোল ফেলে তা থেকে অমৃতের মাখনটা তুলে নিতে পারেন। শুধু সমুদ্র মন্থন ব্যাপারটা মাঝে মাঝে মনে হয় দেবতারও অসাধ্য। অথচ হয়েছিল।

অতএব পৌরাণিক অমৃত সত্যই কি, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। এমন কি আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ হওয়া সত্ত্বেও না।

কিন্তু তবু আমাদের মনে অমৃত সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আছে। এবং সে অমৃত ঠিক খাওয়ার অমৃত নয়। কিছু পরিমাণ হওয়ার অমৃত। এবং যদি "অমৃত পান" কথাটি আমরা ব্যবহারও করি, তবু তা শুধু অভ্যাস-বশতঃ, আক্ষরিক অর্থে নয়। যেমন আমরা কোপার্নিকাসের নতুন আকাশ-বিজ্ঞান জানা সত্ত্বেও "সূর্য অস্ত গেছে" বলি, তেমনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-দেবতাকে উদ্দেশ করে বলেছেন—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

এ অমৃত খাওয়ারও নয় হওয়ারও নয়, যদিও 'পান' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ অমৃতের অর্থ ব্যাখ্যার অতীত কোনো মাধুর্য, একটা আনন্দময় পরিতৃপ্তি, কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থে কোনোটাই নয়। 'অমৃত পান', শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি রূপেই কবির মনে জেগেছে। ব্যাবহারিক ঐতিহ্য ভিন্ন ঐ কথার অন্য সার্থকতা বেশি নেই। জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথের দেহমনের ভিতর প্রবেশ করে চুক চুক করে অমৃত পান করছেন, এমন কখনই সম্ভব হতে পারে না। এখানে অমৃত মানে, জীবনের বা অস্তিত্বের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই। কবি নিজেই এর কথা অন্যত্র বলেছেন—

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু
চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম,
পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি—
সেথা নাহি যায় হাত নাহি যায় বাণী।...

জীবনের সকল চরিতার্থতা ও ব্যর্থতাকে ছাপিয়ে থাকে এই শ্রেষ্ঠ ধন, এই অমৃত। এই অমৃতের কোনো ব্যাখ্যা নেই, কোনো পরিচয় নেই তবু একেই যেন আমরা বেশি চিনি। অন্য অমৃতকে প্রাচীন যুগের দেবতারাই শুধু চিনতেন।

"—টক, টক! একদম সব টক রে....." শিল্পী: (অমিয় ঘোষ)

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধকুমার সান্যাল

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— নয় —

কলকাতা কেন্দ্রের আপিসে মাস দুই আমাকে তন্ময় হয়ে আমার নানা কাজে ডুবে থাকতে হয়েছিল। অনেক প্রকার যন্ত্রের আমদানি এবং বহুবিধ সামগ্রীর সরবরাহের হিসাবপত্র নিয়ে আমি ব্যস্ত ছিলুম। আমার চাকরিতে ছুটি ব'লে কিছু নেই। ছুটি আমাকে নিতে হয়।

ইতিমধ্যে প্রজাপতি তার ডানা মেলেছিল। সন্তোষকে সঙ্গে নিয়ে হেনা গিয়েছিল মুসৌরীতে। সেখান থেকে সে চিঠি লিখল, মনে করেছিলুম তোমাদের দুষ্ট আবহাওয়া থেকে সরে এসে কিছুকাল সম্পূর্ণ একা ঘুরে বেড়াব এবং তোমার বাঁকাবাঁকা কথা কিছুদিন আমার কানে যেন না ঢোকে তার চেষ্টা পাব। কিন্তু এখন দেখছি আমি তোমার হারমোনিয়ম্ মাত্র। আসলে গানটা তুমিই গাও, আমি শুধু অন্তর্টিপুনি সইতে না পেরে বেজে উঠি! এখানে আর আমার ভাল লাগছে না। কিন্তু আমার শরীর আর স্বাস্থ্যের যে-প্রকার উন্নতি ঘটেছে তাতে তোমার সামনে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব, তাই ভেবে ভয় পাচ্ছি।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই আমাকে চিঠির উত্তর দিতে হল। লিখলুম, তুমি কাছা-কাছি না থাকার জন্য আমার স্বাস্থ্যেরও কথঞ্চিৎ উন্নতি ঘটেছে। তোমাদের বাড়ির খদ্দের প্রায় ঠিক হয়েছে। আমি হয়ত শীঘ্রই রাঙামা ও ছোটকাকে নিয়ে হিনুর বাড়িতে রেখে আসব। সুরম আবার কোমর বেঁধে আমার বিয়ে দেবার জন্য এসেছে। তার মতিগতি আবার বদলেছে। সে এখন তোমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু আমার ইচ্ছা, বাকি জীবনটা তুমি মুসৌরীতেই কাটিয়ে দাও।

আমি জানি, যা লিখব হেনা ঠিক তার উল্টোটাই ধরবে। হলও তাই। আমার চিঠি পাবামাত্রই সে মুসৌরী থেকে রওনা হল। তার ধারণা আমার নাকি শরীর খুব খারাপ, এবং একটি দিনও তার পক্ষে আর মুসৌরীতে থাকা চলে না। স্ত্রীলোকের চিন্তার ধারা অতি বিচিত্র।

হেনার তুঙ্গে এখন বৃহস্পতি। তার পুরনো সামাজিক সম্মান প্রায় ফিরে এসেছে। নবেন্দু সংবাদপত্রের মারফৎ তার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করবে, আদালতে দাঁড়িয়ে একপ্রকার নাকখৎ দেবে, এবং প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে বাধ্য হবে। এ ছাড়া আরও আছে। আমি সমস্ত জীবন ধরে চাকরি করে যে পরিমাণ টাকা উপার্জন করব, হেনা তার বালিগঞ্জের বাগানবাড়িটি বেচে তার চেয়ে বেশি টাকা পাবে। আমার পক্ষে আনন্দের কথা এই, এই টাকার একটা মোটা অংশ আমারই গভর্ণমেণ্ট খাবে।— কে যেন কোথায় 'গোহত্যা' করেছিল, তাই দেখে 'পাগলের' কী আনন্দ! আমার আনন্দও প্রায় সেই প্রকার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসে যখন সুরমা ও খুড়িমার সঙ্গে গরম গরম চিংড়ির কাট্‌লেট ওড়াচ্ছিলুম, ঠিক সেই সময়টিতে একখানা গরম চাদর মুড়ি দিয়ে হেনা তার মুখচন্দ্রমাসহ দেখা দিল। এখন ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে,— হেনার তুঙ্গে বৃহস্পতি। তাকে দেখা-মাত্রই সুরমা হৈ হৈ করে উঠল এবং খুড়িমা সহাস্যে তাকে অভিনন্দন জানালেন। আমি যেন ভূমিকম্পের নাড়া খেয়ে একটু নড়ে বসলুম। কাটলেটের আসর একেবারে উল্লাসে উতরোল।

গায়ের চাদরখানা খুলে হেনা এক-পাশে রেখে এসে সর্বাগ্রে কাটলেটে কামড় দিল। সুরমা তার একখানা হাত ধরে সোচ্ছ্বাসে বলল, আমাকে মাপ করো হেনাদি, তোমার ওপর অনেকবার রাগ করেছি। আমার শ্বশুরবাড়িতে তোমার সুখ্যাতি হয়েছে খুব।

খুড়িমা বললেন, কতদিন ছিলি মুসৌরীতে?

তা প্রায় দেড় মাস।—হেনা বলল, এখন সেখানে বড্ড শীত।

আমি বললুম, কপালে ঘামের ফোঁটা দেখে বুঝতে পাচ্ছি বৈকি। কলকাতায় নবেম্বরের গরমে ফিরলে কেন?

বা, তাই বলে বাড়ি ফিরবে না?— সুরমা বলে উঠল।

বুড়িপিসি এবার পিছন থেকে এসে হেনার চিবুক নেড়ে বলল, ঘর দোর একেবারে অন্ধকার হয়ে ছিল। তাই ত বলি—।

খুড়িমা সকলের পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলেন। হেনা এবার বলল, রাঙামাকে নিয়ে তুমি হিনু যাচ্ছ কবে?

আমি বললুম, তোমার জন্যেই ত' অপেক্ষা করছিলুম। তুমি সই না করলে কাজ এগোচ্ছে না। জিনিসপত্র সরানো দরকার। তুমি নিজে কোথায় উঠবে তার ব্যবস্থা।

হেনা বলল, আমি থাকব রাশিদিতে।

একা থাকবি?—খুড়িমা প্রশ্ন করলেন।

হেনা বলল, তুমি চল না সঙ্গে?

সুরমা ফস ক'রে বলল, রাঙামাকে তুমি ছেড়ে থাকতে পারবে, হেনাদি?

চায়ে চুমুক দিয়ে হেনা বলল, রাঙামাই আমাকে ছেড়ে যেতে চান্। এসব কথা আর তুলিসনে, সুরমা। ছোট-কাকে আমি চেয়েছিলুম, রাঙামা রাজি নন্।

সুরমা কথা শুনল না। বলল, আচ্ছা খুড়িমা, তুমিই বল ত? হেনাদি কেমন ক'রে চিরদিন একা থাকবে? সে কেমন ক'রে হয়?

হেনা তার কথায় একেবারে হেসে লুটোপুটি। খুড়িমা শুধু বললেন, ওর পথ ওকেই ভাবতে দে' সুরমা!

সুরমা রাগ ক'রে বলল, তোমাদের এক কথা, খুড়িমা! মেয়েমানুষের পথ মেয়েমানুষ ভাববে? তা হলে চারদিকে ধেড়ে-ধেড়ে পুরুষমানুষ রয়েছে কি জন্যে? তার চেয়ে হাতের কাছে রয়েছে ছোড়দা, তুমি ওকেই বিয়ে কর না কেন, হেনাদি? এখন ত' তুমি ঝাড়া হাত-পা!

হেনা বলল, ছোড়দা কী এমন গুণবান যে, আমি তাকে বিয়ে করব?

বিয়ে করলে এত বড় বিষয়-সম্পত্তির মালিক হবে, সুন্দরী বৌ, পাঁচজনের একজন! তাহলে বল, ছোড়দাকে তোমার পছন্দ নয়! তোমার কপালে আরও অনেক দুঃখ আছে, হেনাদি—

এবার হাসি থামিয়ে আমি বললুম, হেনার সঙ্গে কোনও কালে আমার বনিবনা হয়নি, সেটা তুই ভেবে দেখেছিস, সুরমা?

শোনো কথা!—সুরমা বলল, নাই বা হল বনিবনা, ঘরকন্না করতে দোষ কি? এই ত' চার বছরের মধ্যে আমার তিন-তিনটে ছেলেমেয়ে হল,—একদিনও কি বনিবনা হয়েছে? কোন্ দেশে সব কথায় স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা হয় দেখাও দেখি?

তুলে তখনই তৈরি হয়ে বলল, দেখছ ত' খুড়িমা, বনিবনা একটুও নেই, তবু আমাকে ছেড়ে দুদণ্ড থাকতেই পারে না! বিয়ে এমন জিনিস!

সুরমা গদগদ কণ্ঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খুড়িমা সহাস্যে পিছন থেকে স্বামী-সোহাগিনীকে আশীর্বাদ জানালেন, এবং তাঁর সেই আশীর্বাদের ভাষা শুনে হেনা তার মুখের হাসির উপর আরেকবার আঁচল চাপা দিয়ে বাসনগুলি নিয়ে বাইরে চলে গেল।

খুড়িমা এবার বিদায় নিলেন। তাদের রাত্রির রান্নাবান্নার তাগিদ আছে। আমি এবার ধীরে সুস্থে গুছিয়ে বসলুম।

মনে করেছিলুম হেনা চলে গিয়েছে। কিন্তু সে যে আমার দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সেটি একবারও বুঝতে পারিনি। মিনিট পনেরো কুড়ি পরে সে এক প্লেট্ মটরশুঁটি সিদ্ধ নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল, এবং পিছনে-পিছনে দুই পেয়ালা চা নিয়ে এল বুড়িপিসি। রাত্রে কি রান্না হবে জানতে চেয়ে বুড়িপিসি যখন্ থমকিয়ে দাঁড়াল,—হেনাই ব'লে দিল, ডিমের পরটা আর মাছের কালিয়া। আমি খাব এখানে চরকিপিসি, মনে থাকে যেন।

আচ্ছা গো আচ্ছা—ব'লে চরকিপিসি চলে গেল।

চামচ দিয়ে মটরশুঁটি মুখে দিয়ে বললুম, আলোটা নিবিয়ে দাও।

হেনা বলল, কেন? ও আবার কি আহ্লাদ?

তোমাকে অন্ধকারে দেখি, জ্বল-জ্বল কর কিনা!

রাগ ক'রে হেনা বলল, আজেবাজে কথা বললে কিন্তু এখনই বেরিয়ে চ'লে যাব। আমি কাজের কথা শুনতে চাই।

হাসিমুখে বললুম, সুরমার ঘটকালিটা শুনতে শুনতে কিন্তু আমার মনে পাখি ডেকে উঠেছিল!

হেনা মটরশুঁটি চিবোতে চিবোতে বলল, শকুনিরাও ত' পাখি। থামো এখন, অন্য কথা হোক।

এবার বললুম, তুমি যে আমার মন ভোলাবার কাজে মেতে আছ, এর মূলে কারণটা কি বল ত?

হেনা সহাস্যে বলল, মন ভোলাচ্ছি প্রাণের দায়ে। তোমাকে দিয়ে সব কাজ উদ্ধার ক'রে নিতে চাই। তারপর তোমার ছুটি।

আমি হেসে একটু থামলুম। পরে বললুম, তোমার কাজকর্ম থেকে ইহ-

"তোমাকে দিয়ে সব কাজ উদ্ধার করে নিতে চাই। তারপর তোমার ছুটি।"

ও......মা......এই কথা বললে তুমি আজ হেনাদি? এরপর আমি শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাব কেমন ক'রে? আমার গলায় এক গাছা দড়িও জোটে না?

সুরমার এবম্বিধ আলাপে হেনা, খুড়িমা ও আমি হাসতে হাসতে প্রায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলুম। কিন্তু সুরমা তখনও থামল না, সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, আমার ভাইয়ের অপমানে আবার হেসে কুটিপাটি হচ্ছ? এই কলিকাল!

হেনা হাসতে হাসতে টক্কর খেয়ে খুড়িমার গলা জড়িয়ে পড়েছিল। আমি উঠে বাইরে পালাচ্ছিলুম। এমন সময় বুড়িপিসি ঘরে ঢুকে বলল, অ ছুঁড়ি, তোর দেওর গাড়ি নিয়ে এসে সেই কখন্ থেকে বসে আছে! ভাইয়ের ওপর খোঁটা তুলছিস ব'সে ব'সে, শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে না?

ওমা, তাই ত—একেবারে ভুলে গেছি।—সুরমা কাঁধের ওপর আঁচল

জীবনে ছুটি পাব কিনা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। তবে—

তবে কি?

তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার কিনা জানিনে। কিন্তু আমি তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে অন্ধকার দেখছি!

হেনা রাগ ক'রে উঠল। বলল, পার্থ, তোমার লজ্জা-শরম একেবারেই নেই। সব চেয়ে আমি দুঃখ পাব যদি তোমার সঙ্গে নতুন ক'রে মন জানাজানি করতে হয়। তোমার আমার মধ্যে অজানা কিছু নেই, অজ্ঞাত কিছু আছে তাও মনে করিনে। নবেন্দু এসে দাঁড়িয়েছিল মাঝখানে সাত আট বছরের জন্যে সেই মস্ত উৎপাতটা এবার সরে গেল! এবার আমাকে নতুন ক'রে নিজকে আবার গ'ড়ে তুলতে দাও!

প্রশ্ন করলুম, কি গড়বে?

এই জীবনকেই গড়ব!—হেনা বলল, বিশ-পঁচিশ বছর আগেও কথা উঠ্‌তে পারত, শ্যেন পক্ষীর নখের আঁচড় একবার যখন লেগেছে, সুখের পায়রা বোধ হয় আর বাঁচবে না! কিন্তু আজকে আর এটি সত্যি নয়, পার্থ। কালের ধাক্কায় মানুষ নিয়তই প্রভাবিত হচ্ছে, ব্যক্তিগত স্খলন পতনের নিন্দে আর সুখ্যাতি নিয়ে কেউ বসে নেই। বর্বরের পায়ের লাথি খেয়ে আজও মেয়েমানুষ মুখ থুবড়ে পথে পড়ে বটে, কিন্তু আজ নিজের হাত-পায়ের জোরে সে উঠতেও জানে! সেদিন আসতে আর দেরি নেই যেদিন তোমার সাহায্যও আর নিতে আসব না!

শেষের কথাটায় হেনার মুখে হাসি দেখা গেল ব'লেই তৎক্ষণাৎ প্রশ্রয় পেয়ে গেলুম। বললুম, তুমি কি সৃষ্টিতত্ত্বের লাইনে কিছু বলছ?

হেনা এবার তার মুক্তাদন্ত বিকশিত ক'রে বলল, না, আমি বলছি মাঝে মাঝে এসে শুধু তোমার কয়েকটা প্রিয় গান শুনিয়ে যাব!

দুঃখের কথা হেনা, প্রিয় ব্যক্তিকে বাদ দিলে প্রিয় গান তার অর্থ হারায়। —যাক্ আমার আসল কথাটা শোনো। নবেন্দু যে ক্ষতিপূরণের টাকাটা দিচ্ছে সেটা কি আমার পাওনা?

হেনা মুখ তুলে তাকাল। বলল, তোমার! তোমার জীবনে ধিক।

বললুম, তা হলে ওটা তুমিই নেবে বলছ?

পার্থ, তুমি আবার নোংরা পথে পা বাড়াচ্ছ!—হেনা বলল, এসব ঘৃণ্য বিষয় নিয়ে আমাকে ঘাঁটিয়ো না। ওসব টাকা উকীল-ব্যারিষ্টার খেয়ে নিকগে। তুমি রাঙ্গামা আর ছোটকার ব্যবস্থা আগে কর। আমি মুক্তি পেয়ে আমার নিজের পথে চ'লে যাই।

আমি হাসলুম এবং আমার এ হাসির তাৎপর্য হেনা জানে।

রাত্রে আহারাদির পর হেনাকে বিদায় দেবার সময় বলে দিলুম, তোমাদের বাড়ির ফাল্‌তু জিনিসপত্র নিলামের দোকানে পৌঁছে দেব। দোতলার ঘরের সেকালের আসবাবগুলো ভাল দামে বিক্রি হতে পারে। ছোটকার কিছু নেই। তবে রাঙ্গামার মালপত্র আমি হিনুর বাড়িতে দিয়ে আসব। কিন্তু আমার অনুরোধ, বাড়ি বিক্রির টাকার থেকে কিছু তুমি ছোটকা ও রাঙ্গামাকে দিয়ো।

হেনা বলল, ক্যামাক ষ্ট্রীটের বাড়ির কি করবে?

ওটা এটর্ণী আপিসের হেপাজতে থাকবে। তুমি যেখানেই থাক নিয়মিত ভাড়া পাবে। যশিদির বাড়ি তোমার, এবং রাঙ্গামার মৃত্যুর পর হিনুর সম্পত্তিও তোমার! এই সম্পর্কে সেই একজন অনির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর আমার হিংসা হচ্ছে, হেনা—

মানে? কে সে—?

সেই মহাভাগ্যবান চিরকালের রূপ-কথার রাজপুত্র! তুমি তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গিয়ে যার গলায় মালা দেবে! যে পাবে রাজকন্যে আর ষোল আনা রাজত্ব!

তোমার মুখখানা পুড়ে গেলে আমি খুশী হতুম!—রাগে ও বিরক্তিতে ঠক ঠক ক'রে হেনা বেরিয়ে চলে গেল।

এই বাগানবাড়ির প্রতি লোভ ছিল অনেকেরই। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে পাকাপাকি হল। এটর্ণী আপিস থেকে এক মাসের সময় তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। হেনা আমার সঙ্গে গিয়ে একদিন দলিলে সই করে দিয়ে এল।

এই এক মাসের মধ্যে দিন দশেকের জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল দিল্লীতে। যথাসময়ে আমি অবশ্য ফিরে আসছিলুম, কিন্তু হঠাৎ এক টেলিগ্রাম গেল হেনার কাছ থেকে আমার ওখানে। এটা অবশ্য আমাদের পক্ষে অভাবনীয়ই ছিল। আমরা কেউ ভাবিনি, ছোটকা এত শীঘ্র বিদায় নিয়ে চলে যাবেন।

দিল্লী থেকে ভোরের প্লেন ধরে বেলা এগারোটার মধ্যেই বাড়ি এসে পৌঁছলুম। দেখতে পাওয়া গেল ঘর-দোর তালা বন্ধ, এমন কি খুড়িমাকেও দেখছিনে ওবাড়িতে। সুতরাং ট্যাক্সি-খানা নিয়ে আমি সোজা হেনাদের ওখানেই এসে পৌঁছলুম।

অশৌচের বাড়িতে খুড়িমা সামান্য কিছু হবিষ্যান্নের আয়োজন করছিলেন। ভিতর মহলের দরদালানের এক কোণে হেনা চুপ ক'রে বসে রয়েছে,—তার চেহারাটায় যেন সর্বস্বান্তের ছাপটি সুস্পষ্ট। আমার খুড়তুতো ভাই দ্বিজু বাগানের কোণে বসে হবিষ্যির আগুনের

জন্য নারকেল পাতা জড়ো করছিল। রাঙ্গামা স্নান করে এইমাত্র ঘরে ঢুকলেন।

পায়ের জুতোটা ছেড়ে আমি মেঝের উপরেই একস্থলে বসলুম। আমি জানতুম ছোটকার মৃত্যুর বেদনা ক্ষণে ক্ষণে কোথায় তরঙ্গ তুলছে। হেনার দিকে আমি চাইতে পারছিলুম না। সে বোধ হয় চিরদিন এই কথাই মনে ক'রে এসেছে, তার মন্ত্রগুরু হলেন চিরজীবী, এবং তাঁর নিঃশব্দ প্রশ্রয়ের থেকে যে উৎসাহটা পাওয়া গিয়েছে এতকাল, সেইটিই হেনার সকলের বড় পাথেয়। ভয়হীন স্বাতন্ত্র্যের বীজমন্ত্র ছোটকার কাছেই পাওয়া, ছোটকাই দেখিয়ে এসেছেন বিদ্রোহী নবীনের মুক্তিপথ, ছোটকাই এনে দিয়েছিলেন আমাদের জীবনে একটি মহৎ অশান্তি এবং আত্মজিজ্ঞাসার ব্যাকুলতা।

খুড়িমা বললেন, যেদিন উনি শুনলেন এবাড়ি বিক্রির দিনস্থির হয়ে গেছে, সেদিন ও'র গলার আওয়াজ আর কেউ শোনেনি। এবাড়িতে ও'র কোনও অধিকার নেই। এ উনি জানতেন বৈকি, কিন্তু ভালোবাসার অধিকার অন্য জিনিস, পার্থ। আমি নিজে একদিন দেখে গেছি, ওই বাগানের ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, আর কাঠবিড়ালী পিঠের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করছে!

প্রশ্ন করলুম, ও'র কি হঠাৎ কোনও অসুখ করেছিল?

রাঙ্গামা চোখের জল মুছে বললেন, কোনও অসুখ ছিল না, পার্থ। আমারই সামনে সেদিন তামাশা ক'রে হেনা বলছিল, সামনের প'চিশ তারিখে এবাড়ির পাখির বাসা কিন্তু ভাঙ্গবে! তুমি যাবে হিনুর বাড়িতে!

ঠাকুরপো বললেন, তাই নাকি? আমাকে তা হলে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে যাস মা, হে'টে যেতে পারব না!

কেন?—হেনা জানতে চাইল। ঠাকুরপো বললেন, কেন কি রে, এ যে কষা অঙ্ক! সব মিলিয়ে রেখেছি! এবাড়ির প্রতি ধূলিকণা একটি একটি করে গুণেছি যে রে! সেই ধুলোয় সব অঙ্ক মিশে রয়েছে। যদি আমাকে ধুলোর বাঁধন থেকে ছি'ড়ে নিয়ে যেতে পারিস তবেই যাব! হেনা বলল, তোমার কথা শুনলে আমার ভয় করে ছোটকা। হিনুর বাড়িতে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না দেখো। সে বাড়িতে মস্ত বাগান তুমি পাবে!

রাঙ্গামা আবার চোখের জল মুছলেন। দ্বিজু এগিয়ে এসে নারকেল পাতাগুলি গুছিয়ে রাখল। হেনা ওদিকে বসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফু'পিয়ে ফু'পিয়ে কাঁদছিল।

পরশু দিন রাত্রে ছোটকা তাঁর অন্ধকার ঘরটিতে তাঁর নিত্য-অভ্যাসমতো যোগে বসেছিলেন। পাশের ঘরে হেনা পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ছোটকা সে-রাত্রে কিছু খাননি, কথাও বলেননি। কাল ভোরে তাঁকে কোথাও দেখতে না পেয়ে সবাই অস্থির হয়ে ওঠে। অবশেষে আমগাছের ডালে বাঁধা তাঁর সেই 'পাখীর বাসা' বাক্সটার ভিতরে ছোটকার মৃতদেহ পাওয়া যায়। বাক্সটা তাঁর নিজের হাতেই তৈরি, এবং ডালটা তিনি নিজের হাতেই বন্ধ করেছিলেন! হেনা তাঁর মুখাগ্নি করে। আগামী চব্বিশ তারিখে ছোটকার শ্রাদ্ধ—এই বাড়ি ছেড়ে যাবার আগের দিন।

ছোটকা তাঁর শেষ অঙ্কটা মিলিয়ে চলে গেলেন বটে, কিন্তু আমাদের অঙ্কে কিছু ওলোটপালট দেখা দিল। রায়চৌধুরী বংশের শিকড় উপড়ে ফেলতে লাগল আরও কিছুদিন। শ্রাদ্ধশান্তি সেরে রাঙ্গামা চললেন রাঁচিতে। সন্তোষকে নিয়ে আমাকে সঙ্গে যেতে হল। বুড়িপিসি একজন বিশ্বস্ত ঝি এনে হাজির করল। সে নাকি বামুনের মেয়ে। রাঙ্গামার সঙ্গে হিনুর বাড়িতে সে থাকবে। বাড়ির ঠাকুর বিদায় নিল।

সাতদিন পরে রাঙ্গামার সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি সেরে ফিরে এলুম কলকাতায়। এসে [illegible] তার বইপত্র বিছানা-বাক্স টাইপরাইটার প্রভৃতি নিয়ে শহরের কোনও একটি মেয়ে-হোস্টেলে গিয়ে ওঠবার চেষ্টা পাচ্ছিল। এমন সময় খুড়িমা এসে তাকে বাধা দিলেন এবং জোর ক'রে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে তুললেন। দ্বিজু তার ফাইফরমাস খাটবার ভার নিল।

আমার কাজ শেষ হল যেদিন বাগানবাড়ি বিক্রির টাকাটা হেনার নামে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করতে পারলুম। হেনাকে তার সমস্ত কাগজপত্র, দলিলাদি এবং টাকাকড়ির আনুপূর্বিক হিসাব সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে আরও দিন চার-পাঁচ লাগল। তারপরে একদিন হাসিমুখেই তার সামনে এসে দাঁড়ালুম। বললুম, এবার আমার ছুটি। এ ছুটি তুমিই দিতে চেয়েছিলে, হেনা।

বোধ হয় অজানা কোনও এক সাগরে ঝড় উঠেছিল, নয়ত কোনও এক মহাদেশের বিজন ভীষণ অরণ্যে দাবানল দাউ দাউ ক'রে জ্বলেছিল,—কিন্তু আমি জানিনে হেনার সেই চাহনির অন্তরালে কি ছিল! সেই চাহনিতে জ্বালা নেই,—কিন্তু ছোটকার মৃত্যুশোকের করুণ ছায়া সেই দুই দৃষ্টিতে তখনও সজল হয়ে ছিল।

শান্ত কণ্ঠে হেনা শুধু বলল, তুমি কি চ'লে যাচ্ছ?

হাঁ—। যাবার কথা ছিল বলেই চলে যাচ্ছি।

মুখ নীচু ক'রে হেনা কি যেন ভাবল। তারপর বলল, তাহলে খুড়িমার এখানে আমি কি করব?

আমি বললুম, যদি ভাল না লাগে তোমার ঘশিদির বাড়িতে চলে যেয়ো? যদি সেখানেও একলা মনে হয়, হিনুতে রাঙ্গামা রইলেন!

বেশ, তাই হবে।—ব'লে হেনা আমার সামনে থেকে স'রে গেল।

অপরিসীম ক্লান্তি ছিল তার সর্বদেহে ও মনে।

আমি ফিরে এলুম আমার ঘরে। আলোটা আজকে আর জ্বালব না—থাক্। জানালাটা খোলাই ছিল,—বিছানাটা তাই ঠাণ্ডা। এক পেয়ালা চা খাবার জন্য ঝোঁক পেয়ে বসেছিল, কিন্তু নিজকে চাবকিয়ে চুপ করিয়ে দিলুম। ঘড়িটায় দম দেবার দরকার ছিল, কিন্তু কেনই বা। সুটকেসটা গুছিয়ে রাখতে পারলে ভাল হত, কাল তাড়াহুড়ো করতে হত না। জুতোগুলো পালিশ করিয়ে নেবার সময় পাওয়া গেল না, এটি দুঃখের কথা।

আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। আমি নিজের কাছে সত্য নই, এই অগৌরব আমাকে বহন করতে হবে। আমার তামাশার সঙ্গে চাপা লোভ জড়ান ছিল, এর চেয়ে অসম্মানের কথা আর কিছু হতে পারে না। আমি আমার চিরদিনের বৈরাগ্য এবং মানসিক সংযম ও শালীনতা হারাব—এর চেয়ে আমার বিমান-দুর্ঘটনায় অপমৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। যখন সব চেয়ে বেশি দরকার ছিল হেনার কাছাকাছি থাকার,—তখন একেবারে তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার এই অসংযত আচরণের উৎপত্তি সংযম হারাবার ভয়ের থেকে। আজ হেনার সব কাজ প্রায় শেষ ক'রে দেবার পর আমার মনে ঢুকেছে ভয়। এ ভয় আমার মজ্জায় জড়ান, এ ভয় আমার রক্ষণশীল রক্তের সঙ্গে মেশানো। আমি চিরদিন রক্ষা করে এসেছি হেনাকে। দুঃখ, অসুবিধা, বিপত্তি, পথেঘাটের নানা উৎপাত, তার গতিবিধির নিরাপত্তা, তার সর্ববিধ দাবি ও ফাই-ফরমাস,—আমি ছাড়া আর কেউ তাদের দায়িত্ব বহন করেনি। কিন্তু আজ পিছিয়ে পড়ছি আতঙ্কে! প্রথমত সে ধনবতী, দ্বিতীয়ত সে সম্পূর্ণ একক,—তার সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই একটা সমাজনৈতিক কানাকানি রটনা আছে। মামলার কথা উঠেছে কাগজে, তাকে নিয়ে আলোচনা উঠেছে নানা সমাজে। ওর সঙ্গে জড়ানো রয়েছে নবেন্দুর নাম,—যে-নবেন্দুর নামে ধিক্কার উঠেছে দিগ্বিদিকে। আমার সান্নিধ্যের দ্বারা নতুন ক'রে হেনার অখ্যাতি না রটে। সে আমার প্রিয় বলেই আমি দূরে যেতে চাই।

কে?

আমি, খোকন!—বুড়িপিসি ঘরে ঢুকল,—আলো জ্বালনি কেন? শরীরটা ভাল নেই বুঝি?

বুড়িপিসি অন্ধকারে চায়ের পেয়ালা রাখল। তারপর আলো জেবলে বলল, হোক না এক আঁজলা টাকা, ছুঁড়ি যে পথে বসল! মা-বাপ নেই, সৎমা হল দেশছাড়া! খুড়ো ছিল মাথার ওপর, সেও পটল তুলল। 'লামডিঙেগর মরণ গাছের আগায়',—ঠিক তাই হল। মেয়েটা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে চা করল! আমি বলি, দাও বাছা, আমিই নিয়ে যাই! আহা, বনের পাখিও কে'দে যায়!

ওরে অভদ্র কাপুরুষ, উঠে বস। চেয়ে দ্যাখ্ কোথায় আগুন লেগে সব

ছারখার হল! বুড়িপিসির কথায় উঠে বসে দেখি, তখনও চায়ের পেয়ালায় ধোঁয়া উঠছে।

বিছানা থেকে নেমে বললুম, বুড়িপিসি, এটা চাপা দিয়ে রাখ, আমি হেনাকে ডেকে আনি।

বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ওদিকে ঘুরে খুড়িমার মহলে এসে ঢুকে বললুম, খুড়িমা, হেনা বুড়িপিসির কাছেই থাক্, দুজনে ভালই থাকবে। কাল সকালে হয়ত আমি চলেই যাব। কই হেনা, এস আমার সঙ্গে। ওর জিনিসপত্রগুলো দিয়ে যাস ত দ্বিজু?

খুড়িমার এদিকে তিনটি মাত্র ঘর। কাকার একটি নিজস্ব। অন্য দুটি ঘরে ও'দের সকলের কুলোয় না। খুড়িমা তাঁর স্বভাবস্নেহবশত হেনাকে এনেছিলেন বটে, কিন্তু আমার প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি জানালেন না। হেনা আমার দিকে একবার তাকাল। কি মনে করল, আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। কিন্তু মলিন হাসি হেসে খুড়িমার কাছে বিদায় নিয়ে সে আমার সঙ্গে এ বাড়িতে চলে এল। ভিতরে এসে বুড়িপিসিকে বললুম, যাও একে একে সব মালপত্র এনে পাশের ঘরে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ। হেনা এখানেই থাকবে।

তাই ত বলি, এই না জাত-কেউটের কথা!—বুড়িপিসি সোৎসাহে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে হেনা এ নয়—এ অন্য। চোখ দুটো শোকাচ্ছন্ন, অবসন্ন তার শরীর। আমি হেনার হাত ধরে ঘরে আনলুম।

তারপর বললুম, আমি সেই পুরনো-কালের বর্বর, সেই কাপুরুষ,—তাই আজ চিরকালের বন্ধু হয়েও তোমার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে ভয় পেয়েছিলুম। আমাকে ক্ষমা কর, হেনা।

হেনা ফুঁপিয়ে উঠল আমার গলার কাছে মুখ লুকিয়ে। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল সে গলা জড়িয়ে। আমি জানি আমাদের দুইজনের মাঝখানে যিনি যোগতন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলেন, তিনি আমাদের অভয় মন্ত্রদাতা ছোটকা। আজ ভাল ক'রে বুঝতে পারলুম, হেনা তার সর্বশক্তি কোথায় হারাল! হেনার মস্ত পরিবর্তন এসেছিল বিগত দুই সপ্তাহে। এমন কান্না হেনা আর কোনদিন কাঁদেনি আমার কাছে।

আমি বললুম, হেনা, তোমার কিছু হারায়নি, সব এখানে আছে। এই বাড়িতে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের অধিকার, যেমন আমার অধিকার চিরদিন তোমাদের বাড়িতে। ছোটকা গেছেন, কিন্তু তুমি নিরুপায় হওনি।

চা খেয়ে আমি উঠলুম। বুড়িপিসি ও দ্বিজু হেনার জিনিসপত্র এনে ফেলেছে। আমি গিয়ে মাঝখানের বড় ঘরটিতে দাঁড়ালুম, এবং ওরা চলে যাবার পর আমি নিজেই হেনার জিনিসপত্র বই বাক্স ইত্যাদি সযত্নে গুছিয়ে রেখে বড় পালঙ্কের উপর ওর ধোপদস্ত বিছানাটি প্রস্তুত ক'রে দিলুম। ওবাড়ির জানালা থেকে এক সময় খুড়িমা ডেকে বললেন, আমি তোদের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি পার্থ, বুড়িপিসি যেন আর রান্না চড়ায় না।

এধার থেকে আমি সাড়া দিয়ে বললুম, আচ্ছা খুড়িমা—

হেনাকে নিয়ে এসে আমি তার বিছানায় তুলে দিয়ে বললুম, কাল আমি যাব না, তোমাকে ব'লে রাখলুম। কবে যাব তুমিই তারিখ ঠিক করে দিয়ো।

আঁচল দিয়ে হেনা চোখ মুছল। পরে বলল, রাঙামামাকে অনুরোধ করেছিলুম, চল তোমার সঙ্গে হিনুর বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকি। রাঙামামা বললেন, এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোমার মুখ আর আমি দেখতে চাইনে, হেনা। বললুম, এতকাল ধ'রে তুমি আমাকে মানুষ করলে, সেই স্নেহ ভালবাসা কি কিছু নেই? রাঙামামা বললেন, যেখানে আমার শ্বশুরবাড়ির সম্মান জড়ান, সেখানে আমি তোমার নিজের মা হলেও তোমার পাপসঙ্গ ত্যাগ করতুম।

আমি বললুম, চুপ ক'রে যাও হেনা,—এ নিয়ে আর অভিমান রেখ না। রাঙামামা তাঁর বিশ্বাস নিয়েই থাকুন, সেই বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তুমিও চুপ ক'রে যাও।

হেনা বলল, তুমি কিছুই চোখে দেখনি পার্থ। রাঙামামা আমার সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করেছিলেন। সন্তোষের সাহায্যে আমাকে নিজে রান্না করে খেতে হত, ঠাকুর আমার খাবার ছুঁতো না। আমি নিজের ঘর ছেড়ে ছোটকার পাশের ঘরে জায়গা নিলুম, সেই রাগে রাঙামামা ছোটকার রান্নাও বন্ধ করেছিলেন। শেষের দিকে ছোটকার অন্ন জোটেনি। আমি এসে চরকিপিসির কাছ থেকে ছোটকার খাবার নিয়ে যেতুম। শুধু তাই নয় পার্থ, ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে রাঙামামা প্রায়ই যেতেন নবেন্দুর ওখানে, তোমাকে জড়িয়ে একটা নোংরা মামলায় আমাকে ফেলবার জন্য। সেটি ভাল করে জেনেই আমি পাটনা গিয়েছিলুম। রাঙামামা যাবার আগে তোমার আমার সম্বন্ধে পৃথিবীর সমস্ত নোংরা কথা খুড়িমা আর চরকিপিসির কানে তুলে দিয়ে গেছেন। ধোপার বস্তির মেয়েপুরুষের কাছেও আর আমার কোনও সম্মান নেই!

প্রশ্ন করলুম, এসব কথা এতদিন আমাকে বলনি কেন?

কি করতে তুমি?

ঘরের মধ্যে আমি পায়চারি করছিলুম। এক সময় থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, অন্তত আরেকটু কঠোর হতে পারতুম!

লাভ ছিল না পার্থ—হেনা বলল, বিধবার ব্যবস্থা তোমাকে যেমন করেই হোক করতে হত। বরং এই ভাল হয়েছে। ছোটকা মারা গেছেন, শান্তি পেয়েছেন। আমাকে যে রাঙামামা সঙ্গে

নেননি, এও বেশ ভাল হয়েছে। শোকের অবস্থায় তখন ঠিক বুঝতে পারিনি যে, রাঙামা হিন্দুতে বসেই আমার সম্বন্ধে নবেন্দুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিলেন। এমনও জানতে পেরেছিলুম, নবেন্দুর এটর্নীর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে উনি আমার উত্তরাধিকারসূত্র নিয়ে একটা অতি জঘন্য প্রশ্ন তুলেছিলেন।

মানে?—ফিরে দাঁড়ালুম।

থাক্ পার্থ—এ কথায় আর কাজ নেই।—হেনা বলল, আমার কান্না শুধু ছোটকাকে হারালুম ব'লে নয়। তুমি আজ আমাকে সকল অপমান থেকে মুক্তি দিলে,—এ কান্না আমার সেজন্যেও।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে খুড়িমা ওবাড়ি থেকে আমাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিলেন। বুড়িপিসি এসে এক সময় জানিয়ে গেল, আহা হবে না, সেই খেয়েছে কোন্ বেলায়! চারিদিকে ডামা-ডোল, কে কা'কে খেতে দেয়, বাছা? খাবার ঘরে তোমাদের জায়গা করেছি, হেনা।

এবার আমরা উঠে পড়লুম।

খেতে ব'সে হেনা বলল, এখানে কতদিন আমি থাকব?

যতদিন তোমার খুশি!

তুমি যাবার পরেও কি আমাকে এখানে থাকতে বল? যদি প্রশ্ন ওঠে?—হেনা আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমিও মুখ তুললুম। বললুম, প্রশ্ন যদি ওঠে আমার আড়ালে, তবে জবাব তুমিই দিও। এতকাল ধরে একই বাড়িতে দুজনে থেকে এসেছি বহুবার, কেউ কথা তোলেনি! শিশুকাল থেকে এইটিই চলে এসেছে। আজ যদি ভয় পাই, আমরাই ছোট হয়ে যাব।

হেনা বলল, আমি যদি হঠাৎ একদিন চলে যাই, তুমি রাগ করবে?

একেবারেই না।—আমি বললুম, তোমার যাওয়া তোমার আসা—দুই তোমার ইচ্ছে। যেখানেই প্রশ্ন, সেখানেই বাঁধন। যদি পায়ের দাগ নাও রেখে যাও, কিছুই বলব না। যদি জানতে পারি সুস্থ আছ, নিরাপদে আছ, সেই আমার আনন্দ! আমি তোমার পথে বাধা দেব না, হেনা। শুধু বলে রাখি এ বাড়িতে তোমার বিশ্রামের জায়গা চিরস্থায়ী হয়ে রইল। আমি তোমার ভালমন্দ সুখ-দুঃখ আশা ও নৈরাশ্যের কোনও খবর নিতে গিয়ে তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না। শুধু একটি অনুরোধ, যদি কখনও তোমার কোনও দরকার পড়ে, সেদিন আমাকে ডেক, আমি গিয়ে তোমার কাজ ক'রে দেব।

নতমুখে হেনা আমার কথাগুলি চুপ ক'রে শুনল।

একটি সপ্তাহ পরে আমি বিদায় নিচ্ছিলুম। কলকাতা আপিসের কাজের অজুহাতে আর কোনমতেই থাকা গেল না। হেনাও অনেকটা শান্ত হয়েছে, খানিকটা জোরও পেয়েছে। সর্বাপেক্ষা খুশী হলুম এইটি দেখে যে, নিজের ঘরখানি এবং সেই সঙ্গে আমারটিও সে সযত্নে গুছিয়েছে। মাঝে মাঝে বুড়িপিসি গলা বাড়িয়ে দেখে বলে গেছে, তা হবে না, হবারই ত কথা! যে যাই বলুক, আমি ত সেই দুজনেরই আঁতুড় কেটেছি! এখন না হয় গাছপালা ছেলে-মেয়ে! যা হবার কথা, তাই হয়।

আমার যাবার গোছগাছ আগাগোড়া হেনাই ক'রে দিয়েছিল। যাবার সময় সে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল। বলল, কথা বললেই ত' রেগে আগুন হবে! ফিরছ কবে?

হাসিমুখে বললুম, যেদিন হুকুম করবে?

হেনা যা কোনদিন করে না তাই করল। একটি লাল গোলাপ ফুল আমার বুকপকেটের পাশে গেঁথে দিল। পরে বলল, আমাকে মাশিদির বাড়িতে রেখে গেলেই পারতে। ওখানে বসে অর্গানটা বাজান যেত।

আমি বললুম, না, এখানে কয়েক-দিন তোমার থাকা দরকার। কিছু চিঠি-পত্র আসবে তোমার নামে। মামলাটার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। ট্যাক্সের ব্যাপারটাও এখনও মেটেনি। তাছাড়া ক্যামাক্ স্ট্রীটের বাড়ির দরুণ কাগজপত্র তৈরি হচ্ছে এটর্নীর ওখানে। দিন পনেরো আরও থাকো। আলমারির চাবি-গুলো যত্ন ক'রে রেখ।

হেনা চুপ ক'রে রইল। আমি বিদায় নিয়ে চ'লে গেলুম।

(ক্রমশ)

"...মিলাইবে গোধূলির বাঁশরীর সর্বশেষ সুরে।"

ভুবনেশ্বর

"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?"

বঙ্গদেশ

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

কলকাতার প্ল্যানেটোরিয়াম

চৌরংগী ও থিয়েটার রোডের মোড়ে ময়দানের ওপরে অনেক দিন থেকেই একটি বাড়ি তৈরি হচ্ছে। গোড়া থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে কলকাতার আরো হাজারটা বাড়ির মতো এটি নয়। বাড়িটার সবই যেন অদ্ভুত। একটানা খাড়া দেওয়াল বড় একটা নেই। অষ্টাবক্রের মতো বাঁকানো দুমড়ানো এর গাঁথুনি। কোথাও গোল, কোথাও চৌকো, আর সবকিছুকে ছাপিয়ে ঠিক মাঝামাঝি থেকে উঠেছে মস্ত একটি গম্বুজ। অবশ্যই অনতিদূরের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গম্বুজের মতো অতখানি উঁচু নয়, দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো এমন একটি ডানামেলা পরীও এখানে নেই—কিন্তু তবুও তাকিয়ে থাকতে হয়। কারণ এই কিম্ভূতদর্শন বাড়ি আর এই গম্বুজটিকে দেখে বুঝতে ভুল হয় না যে এখানে অন্য ধরনের কোনো কিছুর আয়োজন চলেছে।

আর আয়োজনটি যে কিসের তাও অজানা থাকার কথা নয়। বাড়ির সামনেই সাইনবোর্ড ঝোলানো আছে। কাজেই কৌতূহলী দর্শকের কাছে এখবর নিশ্চয়ই পুরনো হয়ে গিয়েছে যে এটি একটি নির্মীয়মান প্ল্যানেটোরিয়াম। বাংলায় বলা চলে নকল আকাশ তৈরির বাড়ি।

প্ল্যানেটোরিয়াম আসলে কিন্তু একটি যন্ত্রের নাম, যে-যন্ত্রের সাহায্যে গোটা আকাশটার খুব ছোট মাপের একটা নকল ছবি ফুটিয়ে তোলা চলে। এই যন্ত্রটিকেই বসানো হবে এই বাড়িতে। যন্ত্রের নামেই বাড়ির নাম। আর ওই যে মস্ত গম্বুজটা—ওটাই হবে নকল আকাশের আশ্রয়।

সহজেই অনুমান করা চলে, নকল আকাশ তৈরি করাটা নকল বুঁদির কেল্লা তৈরি করার মত সহজ ব্যাপার নয়। সাদা চোখে আমরা দেখি, আকাশের সূর্যটা যেন একটা আগুনের গোলা, তারাগুলো যেন আগুনের ফুলকি, ছায়াপথটা যেন ন্যাতা-বোলানো আলো, তারাপুঞ্জ যেন আলোর ফুল, চাঁদ যেন মস্ত একটা আলোর টিপ—এমনি আরো কত কি। সারা আকাশ জুড়ে চলেছে আলোর খেলা। কত তার রঙ, কত তার ভঙ্গিমা। হাজার বছর ধরে কাব্য ও সাহিত্য রচনা করেও মানুষ এই আকাশের বর্ণনা শেষ করতে পারেনি। হাজার বছরের গবেষণার পরেও বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো এই আকাশের অনেকখানিই রহস্যময় থেকে গিয়েছে।

এমনি যে-আকাশ তারই একটি নকল তৈরি করা হবে এই প্ল্যানেটোরিয়ামে। কাজটি বড় সহজ নয়। আকাশের যে-টুকু আমরা জানি-চিনি শুধু সেইটুকুর নকল তৈরি করতে হলেও আলো-কে নানান কায়দায় ভাঙতে হবে, নানান বিন্যাসে জোড়া লাগাতে হবে, নানান গতি-পথে ছুট দেওয়াতে হবে। হালের নাট্যমঞ্চের দৌলতে আলোর যত কসরতের সংগেই আমরা পরিচিত হই না কেন, আলোর সাহায্যে গোটা একটা আকাশ তৈরি করাটা আমাদের কাছেও অসম্ভব কল্পনার মতো ঠেকে।

কিন্তু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করা হয়েছে লেন্সের সাহায্যে। লেন্স সম্পর্কে আমাদের রোজকার জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তা থেকেই বলতে পারি, লেন্স কখনো আলোকে ছড়িয়ে দেয়, কখনো কেন্দ্রীভূত করে। আতস-কাচ নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন তাঁরাই জানেন আতস-কাচ ছড়ানো আলোকে একটি বিন্দুতে সংহত করে আনে। টর্চের আলোর সামনে যে লেন্সটি লাগানো থাকে তা দিয়েও টর্চের আলোকে রীতিমতো নড়ানো-চড়ানো যায় এ-অভিজ্ঞতাও সকলেরই আছে। ক্যামেরার লেন্স সম্পর্কেও অনেকেরই ধারণা আছে। তাছাড়া আজকাল তো আমরা অনেকেই দু-চোখের স্বাভাবিক লেন্স দিয়ে স্বাভাবিক দেখতে পাই না, সেজন্যে আরো দুটি কৃত্রিম লেন্সকে চশমার ফ্রেমে এঁটে চোখের সামনে তুলে ধরতে হয়।

এ থেকে এটুকু ধারণা বোধ হয় আমাদের পক্ষেও করা সম্ভব যে আলোকে যদি খুশিমতো ভাঙচুর করতে হয়, খুশিমতো রাস্তায় ছুট দেওয়াতে হয় তাহলে তা এই লেন্সের সাহায্যেই করা যেতে পারে। অবশ্যই যেমন তেমন লেন্স নয়। এই বিশ্ব-ব্যাপারের মতোই জটিল ও নিখুঁত।

প্ল্যানেটোরিয়াম যন্ত্রটিতেও থাকবে এমনি সব জটিল ও নিখুঁত লেন্স। গোটা একটি আকাশের চেহারা ফুটিয়ে তোলা হবে এইসব লেন্সের সাহায্যে।

কলকাতার এই প্ল্যানেটোরিয়ামে যে-বিশেষ প্ল্যানেটোরিয়াম যন্ত্রটি বসানো হবে তার নাম 'ৎসাইস'। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের (পূর্ব জার্মানির) বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কার্ল ৎসাইস-এর তৈরি। প্ল্যানেটোরিয়ামটি তৈরি করছেন কলকাতার বিড়লা ব্রাদার্স আর এই নির্মাণ-কার্যে সাহায্য ও সহযোগিতা করছেন কার্ল ৎসাইস। ভারতে এইটিই প্রথম প্ল্যানেটোরিয়াম।

এই যন্ত্রের সাহায্যে নকল আকাশে ফুটিয়ে তোলা হবে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রের ছবি। যন্ত্রটির মধ্যে এমন যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে যাতে যন্ত্রটিকে খুশিমতো ঘোরানো চলে। আর যন্ত্রটি ঘুরতে শুরু করলে নকল আকাশের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রও ঘুরতে শুরু করে।

যন্ত্রটি প্রায় পাঁচ মিটার উঁচু, যন্ত্রটির ওজন প্রায় ২,০০০ কিলোগ্রাম। এই যন্ত্রটিকে বসানো হবে গম্বুজ-ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে। এই ঘরে বসে কয়েক-শো দর্শক একসংগে প্ল্যানেটোরিয়ামের নকল আকাশ দেখতে পাবেন।

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলার জন্যে যন্ত্রটিতে আলাদা আলাদা প্রোজেক্টর আছে। প্রোজেক্টরের সাহায্যে কৃত্রিম আকাশে প্রায় ৯,০০০ তারার ছবি ফুটে উঠবে—যে তারা যতটা উজ্জ্বল ঠিক ততটা উজ্জ্বলভাবে, আর সাড়ে-ছয় গুণ বর্ধিত আকারে। তাছাড়া আছে কতকগুলো বিশেষ ধরনের প্রোজেক্টর যার সাহায্যে ছায়াপথ ধূমকেতু তারাপুঞ্জ ইত্যাদিকে ফুটিয়ে তোলা চলবে।

আকাশে জ্যোতিষ্করা ঠিক যেমন যেমন ভাবে চলাফেরা করে—হুবহু তারই একটা নকল ফুটিয়ে তোলা হবে এই নকল আকাশেও। তবে

আকাশে জ্যোতিষ্কদের চলাফেরাটা অনেকখানি সময় নিয়ে। নকল আকাশে সময়ের মাপটাকে অনেকখানি ছোট করে আনা হয়েছে। অর্থাৎ কয়েক বছরের চলাফেরাকে দেখানো হবে কয়েক মিনিটের মধ্যে। এ-দৃশ্য রোমাঞ্চকর। এমনও হতে পারে, আমাদের এই সৌর-মণ্ডলের একবছরের চলাফেরাটা এক-মিনিট সময়ের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। তাহলে চোখের সামনে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। দেখা যাবে, এই এক-মিনিট সময়ের মধ্যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পুরো একটা পাক দেওয়া হয়ে গেল। সংগে সংগে অন্যান্য গ্রহেরও পাক-খাওয়া চলেছে। যতক্ষণে পৃথিবী একটি পাক খেয়েছে ততক্ষণে বুধগ্রহ চারটি পাক খাওয়া শেষ করেছে। অঙ্কের হিসেবে আসা যাক, সূর্যের চার-দিকে পৃথিবীর একটি পাক খেতে যদি এক-মিনিট সময় লাগে, তাহলে বুধগ্রহের একটি পাক শেষ করতে সময় লাগবে ০·২৪১ মি, শুক্রগ্রহের ০·৬১৫ মি, মঙ্গলের ১·৮৮১ মি, বৃহস্পতির ১১·৮৬২ মি, শনির ২৯·৪৫৮ মি, ইউরেনাসের ৮৪·০১৫ মি, নেপচুনের ১৬৪·৭৮৮ মি, প্লুটোর ২৪৭·৬৯৭ মি।

গোটা ব্যাপারটা ঘটবে ঠিক বাস্তবে যেমন ভাবে ঘটে তেমনি ভাবে। এমন সূক্ষ্ম হিসেব বজায় রেখে এমন নিখুঁত ভাবে ঘটানো হবে যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হবে না—মানুষেরই হাতে তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের একটা নকলকে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনিতে এই পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা টের পাই না যে সূর্যের চারদিকে এই পৃথিবী সেকেণ্ডে কুড়ি মাইল বেগে পাক খাচ্ছে। নকল আকাশের দিকে তাকিয়ে এই ছুটন্ত পৃথিবীকে চোখে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে।

প্ল্যানেটোরিয়াম যন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে লেন্স। এই লেন্স হওয়া চাই খুবই সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। ৎসাইস প্রতিষ্ঠানের প্ল্যানেটোরিয়ামে বসানো হয়েছে টেসার লেন্স, যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। আশা করা চলে, আর কিছুকালের মধ্যে আমরাও এই বিশ্ব-জোড়া খ্যাতির সংগে কণ্ঠ মেলাতে পারব।

সৌরমণ্ডল

যে সৌরমণ্ডলের কথা এতক্ষণ ধরে বলা হল তার একটা চেহারা খুব সংক্ষেপে এখানে হাজির করা যেতে পারে।
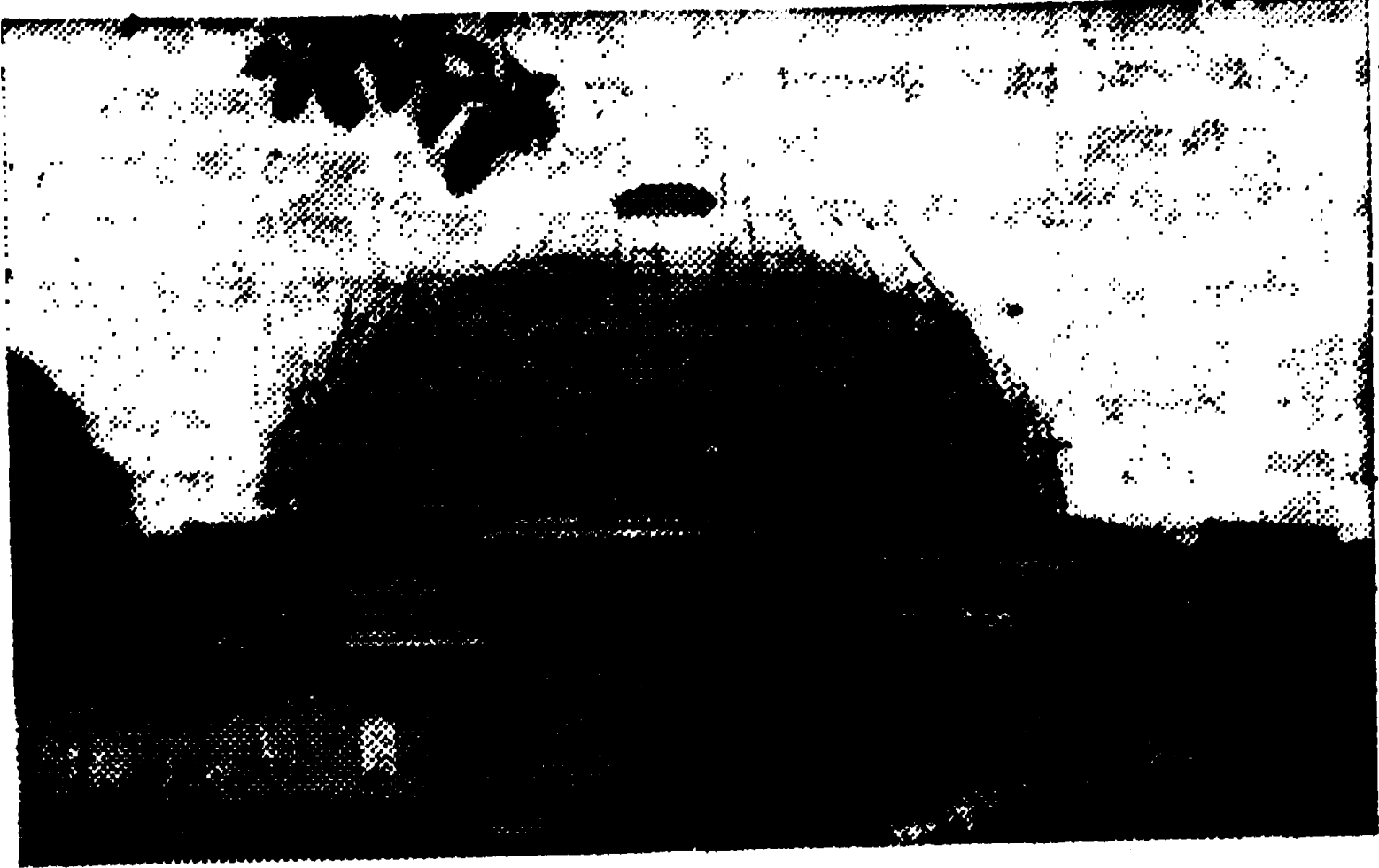
কলিকাতার নির্মীয়মান প্ল্যানেটোরিয়াম

আমরা জানি, গ্রহ-উপগ্রহ-গ্রহাণু-পুঞ্জ-উল্কাপিণ্ড-ধূমকেতু নিয়ে আমাদের এই সৌরমণ্ডল। ছোট-বড় নানান আকারের সব বস্তুপিণ্ড। কিন্তু কোনো-টাই স্থির নয়। প্রত্যেকেই সূর্যের চার-দিকে বিশেষ এক-একটি কক্ষে পাক খাচ্ছে।

সৌরমণ্ডলের সমস্ত বস্তুপিণ্ডের মধ্যে আকারের দিক থেকে সবচেয়ে বড় হচ্ছে গ্রহ। ছোট-বড় নয়টি গ্রহ আছে আমাদের এই সৌরমণ্ডলে। সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ। সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো। বুধ থেকে প্লুটো পর্যন্ত নয়টি গ্রহের পর-পর অবস্থান হচ্ছে এই:

গ্রহ	সূর্য থেকে দূরত্ব (কোটি মাইলে)
বুধ (Mercury)	৩·৬০
শুক্র (Venus)	৬·৭৩
পৃথিবী (Earth)	৯·৩০
মংগল (Mars)	১৪·১৭
বৃহস্পতি (Jupiter)	৪৮·৩৩
শনি (Saturn)	৮৮·৬১
ইউরেনাস (Uranus)	১৭৮·৩০
নেপচুন (Naptune)	২৭৯·৩০
প্লুটো (Pluto)	৩৬৬·৬০

আমাদের কাছে এই পৃথিবীই মস্ত বড় মনে হয়। কিন্তু ন'টি গ্রহের মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে প্রথম চারটি ক্ষুদে গ্রহের একটি। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনকে বলা হয় মহাকায় গ্রহ। বৃহ-স্পতি পৃথিবীর চেয়ে ভরের দিক থেকে ৩১৮·৪ গুণ বড়, আয়তনের দিক থেকে ১২৯৫ গুণ বড়। আবার বৃহস্পতির চেয়ে সূর্য ভরের দিক থেকে ১০৪৭·৪ গুণ বড়, আয়তনের দিক থেকে প্রায় হাজার গুণ বড়। পৃথিবীর ভর হচ্ছে একের পরে একুশটা শূন্য লিখে সেই সংখ্যাটিকে ৬·২ দিয়ে গুণ করলে যত হয় তত টন। নিচের ছক থেকে পৃথিবীর তুলনায় অন্যান্য গ্রহের আয়তন ও ভর সম্পর্কে ধারণা হতে পারে।

গ্রহ	আয়তন	ভর
বুধ	০·০৫	০·০৫৪
শুক্র	০·৯০	০·৮১৪
পৃথিবী	১·০০	১·০০০
মংগল	০·১৪	০·১০৭
বৃহস্পতি	১২৯৫	৩১৮·৪০০
শনি	৭৪৫	৯৫·২০০
ইউরেনাস	৬৩	১৪·৬০০
নেপচুন	৭৮	১৭·৩০০
প্লুটো	০·১	?

সৌরমণ্ডলের নটি গ্রহের মধ্যে সব-চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক গ্রহ হচ্ছে মংগল। এই গ্রহে বাতাসও আছে, জলও আছে এবং খুব সম্ভবত জীবনও আছে। গত একশো বছরে মংগলগ্রহ সম্পর্কে যত গবেষণা হয়েছে এমন আর অন্য কোনো গ্রহ সম্পর্কে নয়। পরবর্তী কোনো সংখ্যায় মংগলগ্রহ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

উপগ্রহ

বুধ ও শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। প্লুটোর আছে কিনা জানা যায় না। বাকি ছটি গ্রহেরই উপগ্রহ আছে।

পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র—সংখ্যায় একটি। মংগলগ্রহের উপগ্রহ দুটি, বৃহস্পতির বারোটি, শনির নয়টি, ইউ-রেনাসের পাঁচটি এবং নেপচুনের দুটি। প্রত্যেকটি উপগ্রহই নিজের নিজের গ্রহের দিকে সবসময়ে একই দিক ফিরিয়ে থাকে

—যেমন থাকে চন্দ্র আমাদের এই পৃথিবীর দিকে। কোনো উপগ্রহেই জল বা বাতাস নেই। প্রত্যেকটি উপগ্রহই আমাদের এই চন্দ্রের মতোই প্রাণহীন।

একমাত্র শনিগ্রহেরই নয়টি উপগ্রহ ছাড়াও আরো একটি বাড়তি ব্যাপার আছে। সেটি হচ্ছে একটি বলয়। আসলে একটি না বলে বলা উচিত তিনটি। প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকে বলে মনে হয় যেন একটি। একেবারে বাইরের দিকের বলয়টি ১০,১৫৯ মাইল চওড়া, মাঝখানের বলয়টি ১৬,৪৫০ মাইল চওড়া, আর ভেতরের বলয়টি ৯৮৫৯ মাইল চওড়া। বাইরের দিকের বলয়টির ব্যাস ১,৬৯,০০০ মাইল। এই বিরাট মাপের বলয় তিনটি কিন্তু কোথাও দশ মাইলের বেশি পুরু নয়। বলয়টি এত পাতলা বলেই পৃথিবী যখন শনিগ্রহের বিষুব-সমতলের বরাবর অবস্থায় পৌঁছয় তখন আর পৃথিবী থেকে বলয় তিনটিকে দেখা যায় না। অনভিজ্ঞ লোকের মনে হতে পারে, শনিগ্রহ তার বলয়গ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই বলয় তিনটি তৈরি হয়েছে একটি উপগ্রহ থেকে। উপগ্রহটি মূল গ্রহের এত কাছাকাছি চলে গিয়েছিল যে মাধ্যাকর্ষণের টানে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা একটু বোঝা দরকার কারণ আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রেরও একদিন এই অবস্থা হতে পারে। উপগ্রহ যদি মূল গ্রহের খুবই কাছাকাছি চলে আসে তাহলে গ্রহের টান উপগ্রহের কাছের দিকে হয় অপেক্ষাকৃত বেশি আর দূরের দিকে হয় অপেক্ষাকৃত কম। টানের এই বৈষম্য ঘটে বলেই উপগ্রহটি শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। কিন্তু ভেঙে যাবার পরেও টুকরো টুকরো অংশগুলো উপগ্রহের মতোই গ্রহের চারদিকে পাক খেয়ে চলে। চন্দ্র যদি কোনোদিন পৃথিবীর খুবই কাছাকাছি চলে আসে (যা অসম্ভব নয়) তাহলে চন্দ্রেরও এই অবস্থা হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে—

> বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
> মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
> পৃথিবীর পাঁজরের কাছে

কবিতায় যদিও চন্দ্রকে মৃত্যুদূত বলা হয়েছে, আসলে কিন্তু মরতে হবে তাকেই।

গ্রহাণুপুঞ্জ—

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে আছে অজস্র ক্ষুদে ক্ষুদে বস্তুপিণ্ড। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে গ্রহাণুপুঞ্জ। অনেকে মনে করেন, এই গ্রহাণুপুঞ্জ এককালে একটি অখণ্ড গ্রহ ছিল, কোনো কারণে বৃহস্পতির খুব কাছাকাছি চলে যাওয়াতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। একটি দুটি টুকরো নয়, ১৮০১ থেকে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে ১৬১৫টি গ্রহাণু, এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির ব্যাস ৭৬৭ কিলোমিটার, সবচেয়ে ছোটটির ব্যাস ৪০০ মিটার। প্রত্যেকটি গ্রহাণু বিশেষ বিশেষ কক্ষে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও আবর্তিত হচ্ছে।

ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড—

এ ছাড়া সৌরমণ্ডলে আছে ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড। ধূমকেতু হচ্ছে অজস্র ছোট-বড় বস্তুপিণ্ডের এক-একটা জাল। কখনো সূর্যের খুবই কাছাকাছি চলে আসে, কখনো সূর্য থেকে অনেক দূরে চলে [illegible]। সূর্যের খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত কোনো ধূমকেতুকেই দেখা যায় না। আর সূর্যের খুব কাছাকাছি আসার পরেই ধূমকেতুর মস্ত একটি লেজ গজায়, কখনো বা একটিরও বেশি। সবচেয়ে বিখ্যাত ধূমকেতুটির নাম হ্যালি-র ধূমকেতু। এটি শেষ দেখা গিয়েছিল ১৯১০ সালের ৭ই মে তারিখে, আবার দেখা যাবে ১৯৮৬ সালে।

আর উল্কাপিণ্ড হচ্ছে সৌরমণ্ডলের আকাশে ছড়ানো ছিটনো অজস্র বস্তুকণা। এই বস্তুকণাগুলোও উপবৃত্তাকার কক্ষে সূর্যকে পাক খাচ্ছে।

এই হচ্ছে আমাদের সৌরমণ্ডল। পৃথিবীর মানুষ আমাদের কাছে মনে হতে পারে এই সৌরমণ্ডলটা প্রকাণ্ড বৃহৎ একটা ব্যাপার। আসলে কিন্তু তা নয়। মহাবিশ্বের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর অবস্থান এই সৌরমণ্ডলের। এই আলোচনাও ভবিষ্যতের কোনো উপলক্ষের জন্যে তোলা রইল।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

সবচেয়ে বৃহৎ বিলুপ্ত স্তন্যপায়ী স্থলজন্তু
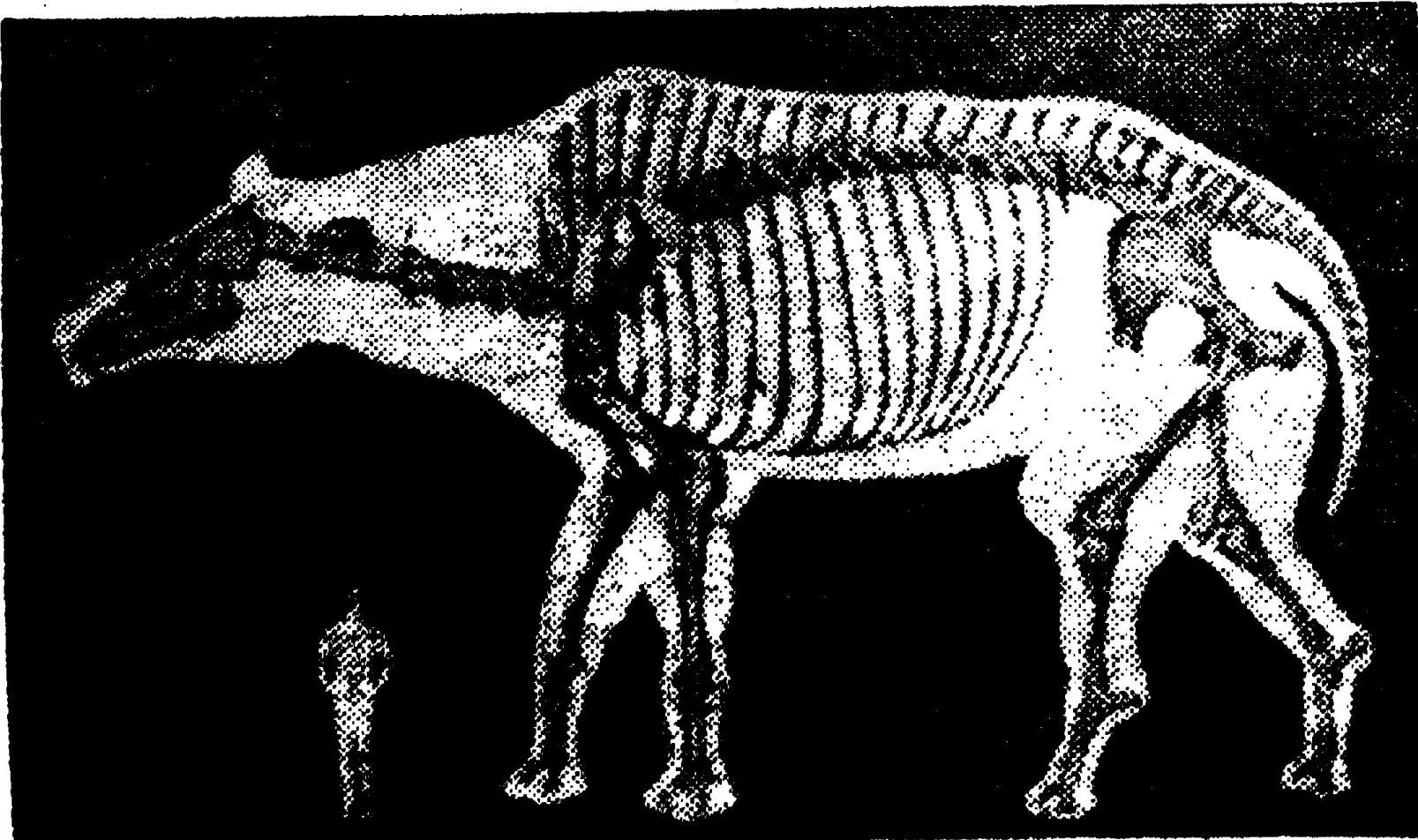
সবচেয়ে বৃহৎ বিলুপ্ত স্তন্যপায়ী জন্তু হচ্ছে—Baluchitherium. এই জন্তু পৃথিবীতে ৪০ মিলিয়ন বৎসর আগে বাস করত এবং এর উচ্চতা ছিল ১৭ ফুট।

গুমোট

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

অন্যদিনের মতই ফিরে এল সবাই। প্রথমে বনবিহারী। তারপর দিনেশ। রমানাথ আরো পরে।

একে একে আবার ফিরে গেল সবাই। প্রথমে দিনেশ। তাসের আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা দেয়া চাই তার। তারপর বনবিহারী। বিকেলের বাজারটা সে ছাড়া করবার কেউ নেই। রমানাথ কোথায় যান কেউ জানে না। এমন কি ছেলেরাও না। কিন্তু যখন ফেরেন, সবাই টের পায়। তটস্থ হয়ে ওঠে সবাই!

আজকেও আপিস থেকে ফিরে আবার বাইরে গেল দু'ভাই। বনবিহারী আর দিনেশ। সব শেষে রমানাথ। বাড়িটা তখনো শান্ত। শৈল আজ মুখ বুজে বসে আছে ঘরে। একবার বাইরে আসেনি। কিছুই বলেনি কাউকে। বাড়িটা তাই নিঃশব্দ। নিশ্চিন্ত সবাই।

তারপর অন্ধকার হয়। রাত্রি নামে। ঘরে-ঘরে আলো জ্বালিয়ে রান্নাঘরে যায় বড় বউ। এ বাড়ির ছোট বউ তখন ছেলে কোলে বারান্দায় পায়চারি করে। ঘুম পাড়ায় ছেলেকে। গুন-গুন করে ছড়া কাটে।

বারান্দার কোণে ছোট ছেলে-মেয়েরা পড়তে বসেছে। মাঝখানে টিম-টিম করে লণ্ঠনটা। এদিকটা অন্ধকার। আবছা অন্ধকারে পায়চারি করে ছোট বউ। আপন মনে ছড়া কাটে। কড়া নজর কিন্তু ছেলে-মেয়েদের ওপরেই।। একটু চুপ করলেই ধমকে ওঠে। সুর করে আবার পড়ে ওরা। এক সংগে গান গায় যেন।

ঠিক তখন। অন্যদিনের মতই ছেলে-মেয়েরা পড়ছিল। যেন তারস্বরে সুরবিহীন কোরাস গাইছিল। ছোট বউয়ের কোলে ছেলেটার চোখে জড়িয়ে এসেছিল ঘুম। রান্নাঘরে ঠিক সেই মুহূর্তে উনোনে কী একটা চাপিয়েছিল বড় বউ। বাইরে থেকেও সোঁ-সোঁ শব্দটা শোনা যাচ্ছিল। ফোড়ন পোড়া গন্ধে ছোট বউয়ের গলাটাও খুশ-খুশ করে উঠেছিল। কী দেখে ঘেউ-ঘেউ করে বাইরে অন্ধকারের দিকেই ছুটে গেল কুকুরটা। এবং ঠিক তখনই বড় বউয়ের ঘরেও শব্দটা হল! ঝন-ঝনিয়ে বেজে উঠল অনেকগুলি থালা-বাসন ভাঙার শব্দ! থেমে-থেমে, কেটে-কেটে, তারপর একটানা, অবিশ্রান্ত ধাতব শব্দের সংগেই শোনা গেল শৈলর অফুরন্ত গোঙানি! অর্থাৎ সেই চিরন্তন কান-সওয়া, প্রাণের গুমোট-ভাঙা বিলাপ!

ছোট বউ ভয় পেল। কোলের ছেলেকে দোলনায় চাপিয়ে প্রাণপণ চীৎকার করে উঠল, 'বড়দি, আয় তো।' গলাটা কেঁপে গেল! কথা গেল জড়িয়ে। ঘুমের ঘোরে বোবায় পেলে যেমন হয়, তেমনি অস্পষ্ট, ভয়ার্ত শব্দ বেরুল মুখ দিয়ে।

একবারে শুনল না বড় বউ।

আবার ডাকল। তারপরে আবার। ছোট বউয়ের গলাটা মনে হল কান্নায় ভাঙা।

রান্না ফেলে বাইরে ছুটে এল বড় বউ।

ছোট বউ তখনো বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না ঘরে।

বড় বউ বুঝল। এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কীরে, কী হল?'

—'ভেঙে চুরমার করল সব। খুকিকে হয়তো মেরে ফেলল!' বড় বউকেই জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল ছোট বউ।

বড় বউ দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। এমন সময় বাড়িতে একটা পুরুষমানুষ নেই!

ঘরের ভেতরে অন্ধকার। আলোটা নিবিয়ে দিয়েছে শৈল। বড় বউয়ের ছোট মেয়েটা এঘরেই! বড় বউ ভয়

পেল। তার সংগে ছোট বউ। আতংকে শিউরে উঠল তারা! শরীরে কাঁটা দিল! ছেলে-মেয়েরা পড়া ফেলে এই ফাঁকে পালিয়ে গেল কোথায়! বারান্দার কোণে একা-একা জ্বলতে থাকে লণ্ঠনটা। সেদিকে চোখ পড়ে না কারো। খেয়াল নেই।

কান্না শুনে ওপাশ থেকে উপেনই ছুটে এল স্বয়ং। আপিসের কাপড়-জামা পরনে। এখনো ঘরেই ঢোকেনি হয়তো। দরজা ঠেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে বললে, 'কী হল আবার?'

কান্না থেমে গেল। এতক্ষণে আশ্বস্ত হল দুজনেই।

ছোট বউ এগিয়ে এল সামনে। বারান্দার কোণ থেকে লণ্ঠনটা তুলে উপেনের হাতে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললে, 'অনেকদিন পরে আজ আবার শুরু করেছে। জিনিসপত্র ভেঙে তছ-নছ করছে। কোন সাড়া পাচ্ছিনে, খুকিটাকে হয়তো মেরেই ফেলেছে গলা টিপে!' বলতে বলতে আরেকবার শিউরে ওঠে ছোট বউ। শুনে নিজেকে মা প্রমাণ করার আপাতত একমাত্র সহজ উপায়—জ্ঞান হারাবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে কাঁপতে থাকে বড় বউ!

আলো হাতে ঘরে ঢোকে উপেন। ডাকে, 'শৈলদি!'

দেয়ালে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে বসেছিল। কাঁদছিল। অপলক চোখ থেকেই গড়িয়ে পড়ছিল জল। মাথাটা এলো-মেলো। আচমকা উপেনকে দেখে যেন চমকে ওঠে। লজ্জা পায়। আঁচলখানা বুকের ওপরে টেনে নেয় তাড়াতাড়ি।

উপেন আবার ডাকে, 'শৈলদি!'

এবার মাথায় আঁচল তুলে উঠে দাঁড়ায় শৈল। নিরুত্তর ছুটে পালিয়ে যায় ঘর থেকে। অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিয়ে বুঝি নিশ্চিন্তে চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করে। শৈল কাঁদে, চীৎকার করে আর বলে, 'কেন, কেন তোরা আমার পেছনেই এখনো লাগিস? সবই তো গেছে আমার! আমার সবই তো খেয়েছিস! আবার লোকটাকে ডেকে এমন করে লজ্জা দিস কেন আমাকে?'

আর দাঁড়াতে পারে না। উপেন চলে যায়। মুখে তার শৈলর কথার ছোঁয়াচ-লাগা লালিমা। লজ্জায় এত-টুকু হয়ে সে এখন পালিয়ে বাঁচে। ছোট বউ লক্ষ্য করে সব। কিছুই বলে না।

বড় বউ মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয়। ছোট বউ ভাঙা কাপ-ডিশের টুকরোগুলি কুড়িয়ে একপাশে জড় করে। ড্রেসিং টেবলের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। শৈল আজ আয়নাটাকেও আস্ত রাখেনি। এটা যে বড় বউয়ের বিয়ের পাওয়া! বাপ দিয়েছিল তাকে।

ছেলে-মেয়েরা আবার দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। অবাক চোখে দেখছে সব।

বুলি চেঁচিয়ে ওঠে, 'ও মা, উনোনে কী চাপিয়েছো? পুড়ে গেল যে!'

সত্যি, পোড়া গন্ধ বেরিয়েছে। বুলির কোলেই মেয়েটাকে ফেলে রান্না-ঘরে যায় বড় বউ। ছোট বউ তখনো নতুন করে ঘর গুছোতে ব্যস্ত।

আরো অনেকক্ষণ কাটে। রাত গভীর হয় আরো। ছেলে-মেয়েরা খায়। খেয়ে ঘুমোয়। শৈল কিন্তু বাইরে আসে না। খায় না। দরজায় খিল তুলে দিয়ে অন্ধকার ঘরে একলা নিজের সংগেই অসংখ্য কথা বলে-বলে এক সময় শান্ত হয়ে যায়। আজ আর কেউ ডাকে না তাকে।

বনবিহারী ফিরে আসে। বড় বউয়ের হাতে বাজারের থলেটা তুলে দিতে-দিতেই সব কথা শোনে। সেই পুরনো কথা। তার জানা কথা। সে তাই উত্তর করে না কিছুই। চুপ-চাপ শোবার ঘরে যায়। ভাঙা কাপ-ডিশগুলি দেখে। আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আংশিক পরি-মাণে আহত হয় শেষে। তবু শৈলর ওপরে রাগ করার যথার্থ কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে বিছানার ওপরেই বসে পড়ে। আস্তে, অনেকটা নিজের কানকে শোনাবার মত করেই বলে, 'এ বাজারে আয়নাটার বড় দাম। বেশ দামী আয়না এটা।' প্রায় শব্দ না করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বড় বউয়ের মুখের দিকে তাকাতে বুঝি সংকোচ বোধ করে। যেন তার বাপের দেয়া আয়নাটা এমন করে ভাঙার মূলে সে নিজে। অপরাধ তার। তুচ্ছ কারণ ছাড়া শৈল আর কিছু না। সে যে পাগল! নেহাতই অবুঝ। অবুঝকে বোঝাতে না-পারার অক্ষমতা যে তার ক্ষেপামির চেয়েও গুরুতর অপরাধ! শাস্তি তার নির্মম হলেও বনবিহারীর ক্ষীণতম আপত্তিটুকু পর্যন্ত আজ যেন সেখানে যুক্তিহীন। কারণ শৈল যে তারই মরা মায়ের পেটে-ধরা মেয়ে!

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে বড় বউ। অপরিসীম কুণ্ঠায় স্বামীর কালো মুখ-খানাই চেয়ে দেখে খানিকক্ষণ। বলার মত কথা, নাকি কথা বলার মত সাহস—কী খুঁজে পায় না বড় বউ?

বনবিহারী মুখ তোলে। 'মেয়েটা বেঁচে গেছে, না?'

যেন আয়নার চেয়ে সস্তা, সংসারে এখনো অসহায় আর পলকা প্রাণের মেয়েটা পাগলের হাত থেকে বেঁচে তাকে আশ্চর্য করেছে বেশী। সে খুশী হয়নি আদৌ!

মনে-মনে আহত হয় কি বড় বউ? কিন্তু সে কথা গোপন রেখেই বলে, 'কথাটা বাবা শুনলে কী ভাববেন বল তো?' যেন রাগ, আতংক, আফশোসের ব্যাপার না। এ বাড়ির একজন সেজেই লজ্জায় মাথা নুয়ে যাচ্ছে তার। নুইয়ে দিয়েছে তারই স্বামীর বোন শৈল!

—'কোন কথাটা?' জিজ্ঞাসু চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে বনবিহারী

—'ইস, ভেঙে আর আস্ত রাখেনি আয়নাটা!' কোত্থেকে চোখে জল আসে বড় বউয়ের। এত চেষ্টা করেও রোখা যায় না। বুকের ভেতরে গুমরে-গুমরে ওঠে পাথর-গড়ানো কান্না। দাম আর স্নেহের যোগফল আয়নাটার দিকে তাকিয়ে বড় বউ বনবিহারীর কথার উত্তর দিতে ভুলে যায়।

নিষ্ঠুর বিদ্রুপে ঠোঁট দুটো বেঁকে যায়। এক পলকে স্ত্রীর মুখ আর ভাঙা কাচের দিকে দায়সারা রকমে চোখ বুলিয়ে নেয় বনবিহারী। শেষে বেশ ঠাণ্ডা গলায় কথা কটি উচ্চারণ করে, 'ভাঙলে আর আস্ত থাকে না কিছুই। কথাটা কি নতুন শিখলে তুমি?' হেসে ফের বলে, 'কই, তোমার বাবার ভাবনায় কথাটা বললে না তো?'

—'কী আর বলবো!' নিদারুণ হতাশায় এবার নিজেই ভেঙে পড়ে বড় বউ। উদাস, ব্যথিত, চোখে ভাঙা

আয়নাটাকেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে। সমস্ত ঘর, ঘরের আসবাব, এমন কি নিজের মুখের বাঁ দিকের অংশটুকু পর্যন্ত কাচের টুকরোর ভেতর দিয়ে ভয়ংকর ভাঙা-চোরা, কদর্য, কুৎসিত দেখাচ্ছে এখন।

অন্তত সাময়িকভাবে এই বেয়াদপ মেয়েটাকেই বোবা করে রাখা যায়, মনে মনে তেমনি লাগসই কথাটাই হাতড়ায় দিনেশ।

রমানাথ তাঁর নিয়মিত ওষুধ খেয়ে অনেক রাত্রে টলতে-টলতে নিজের ঘরে ঢোকেন। সাড়া পেয়ে আজ আর বাইরে আসে না বড় বউ। মাত্র কয়েক ঘন্টার আলোড়নে ইতিহাসের যুগান্তকারী বিপ্লবের মতই তার-ও মনের গোপনে

—'এখন ভেবে ফল? তোমার বিয়ের আগেই আমার বোনটার মাথা বিগড়োলে ছিল ভালো। আমাকেই জামাই বানাবার লোভে পাগল হতেন না তোমার বাবা। শৈল [illegible] হল এই সেদিন।' জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে বনবিহারী। ঠাট্টার মত শোনায়। ভয়ংকর অহংকারী, নিষ্ঠুর মনে হয় স্বামীকে। বড় বউয়ের কানের ভেতর দিয়ে সেই কথা শুধু মর্মকেই স্পর্শ করে না, সমস্ত অন্তর যেন এক নিদারুণ বিষের জ্বালায় জ্বলতে থাকে তার। সে আর কথা বলে না। বলতে পারে না। কী এক অযাচিত অপমানের দুর্বোধ্য বেদনাই আজ তাকে বোবা বানিয়ে প্রায় পুতুলের মতই স্বামীর পাশে দাঁড় করিয়ে রাখে।

তাসের আড্ডা থেকে ফিরে আসে দিনেশ। ইনিয়ে-বিনিয়ে সব কথাই শোনায় ছোট বউ। বলে, উপেন ঠাকুরপো না এলে একটা সর্বনাশ ঘটত আজ!'

—'উপেন এসেছিল?' ভুরু কুঁচকে তাকায় দিনেশ।

—'হ্যাঁ, আর তাইতে দিদির কী লজ্জা! ঘোমটা টেনে ঘর থেকে পালিয়ে গেল উপেন ঠাকুরপোকে দেখেই তো!'

—'উপেনকে বেশী আমল দিও না তোমরা। ছোঁড়াটার মা-বোন জ্ঞান নেই। বাইরে খুব দুর্নাম।'

ভারি খারাপ লাগে এইবার। দিনেশের কথা শুনে মুখের সমস্ত কথাই যেন হারিয়ে যায়। মনের মধ্যে অপরিসীম অস্বস্তি নিয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকে ছোট বউ। দম আটকে আসে তার।

দিনেশ বলে, 'দিদির গায়ে হাত দিয়েছিল উপেন?'

—'কী যে বল! মাথাটা তোমারই খারাপ হল দেখচি।' ঝাঁঝিয়ে ওঠে ছোট বউ। দিনেশ চুপসে যায়। চুপ করে চোখে আগুন জেলে ছোট বউয়ের মুখের দিকেই চেয়ে থাকে। কী করবে, কেমন করে চিরদিনের মত "না হলেও
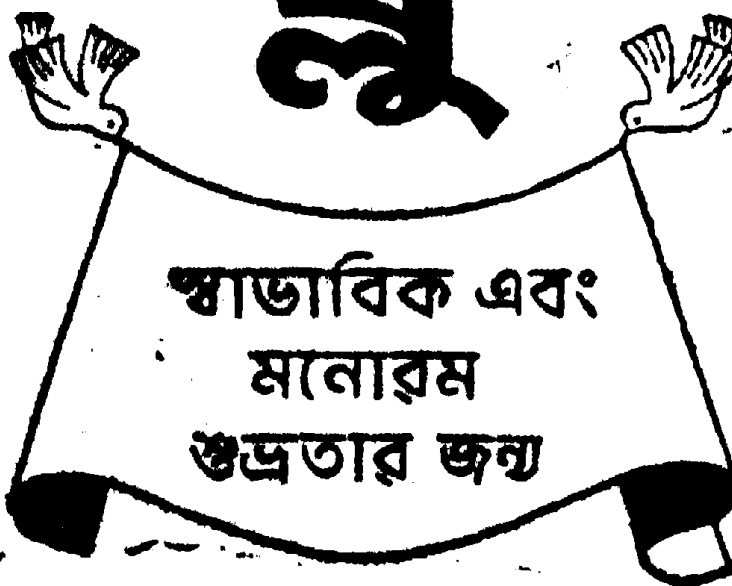
দেখা দিয়েছে এক বিষময় ঋতু-বদলের আভাস। এতদিনে মনটা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এ বাড়ির মানুষগুলিকেই অসহ্য লাগে তার। এই ইট-কাঠের মনোরম খাঁচায় দম আটকে আসে। ঘুমন্ত বন-বিহারীর পাশেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকে বড় বউ। রমানাথের গলা-খাঁকারি শুনে-ও বাইরে আসে না। প্রতিজ্ঞার আসন থেকে কর্তব্য আর টলাতে পারে না তাকে।

ছোট বউয়ের মনের গতি-ও আজ বিপরীতমুখী। দিনেশ ঘুমোয় না। মাথার কাছে আলো জেলে বই পড়া অনেক দিনের অভ্যাস তার। না-ঘুমোনোর বিলাস। এদিকে ছোট বউয়ের চোখে-ও ঘুম নেই। আলোটা অসহ্য লাগে তার। রমানাথের সাড়া পেয়ে বিছানায় উঠে বসে। আর এই প্রথম মাথার একরাশ মেঘল কালো চুলের গভীরে এক অননুভূত যন্ত্রণার আবিষ্কার করার চেষ্টায় অপরিসীম স্বস্তিতে মনটা ভ'রে ওঠে। দরজা খুলে বাইরে যায় ছোট বউ। রমানাথকে খেতে দেয়। দিনেশ আশ্চর্য হয়ে ভাবে, যা ছোট বউ কোনদিন-ই না, আজ ছোট বউ তা-ই। বইয়ের পাতায় কালো-কালো অক্ষরগুলো অজস্র পোকার মত কিল-বিল করে ওঠে এইবার। চোখ দুটো করকর করে। সুতরাং, আলো নিবিয়ে ঘুম না আসা ইস্তক আজ অনেক দিনের চেনা ছোট বউকেই নতুন করে বিশ্লেষণের উদগ্র ইচ্ছায় মনে-মনে নিষ্ঠুর, মরিয়া হয়ে ওঠে দিনেশ।

এদিকে খেতে-খেতে রমানাথের নেশা ছুটে যায়। আহা, কত কষ্টের, কত পয়সার নেশা তাঁর! ভেতরে-ভেতরে আফশোসের অন্ত থাকে না। মুখে বলেন, 'আমার মা-মরা মেয়েটা খেয়েছে বউমা?'

ছোট বউ সরে যায়। মুখটা ঘুরিয়ে দু'পা পিছিয়ে বসে। বিকৃত সুরে যথাসাধ্য শাসন আর বিরক্তি মিশিয়ে জিগ্গেস করে, 'আজকে-ও ওই বিষগুলি গিলেছেন, বাবা?'

রমানাথ বিচলিত হন না। থালা থেকে হাত তুলে বিমূঢ়ের মত ছোট বউকেই দেখেন খানিক। তারপর এ বাড়ির সকলের কাছেই অতি পরিচিত, প্রাণ-জুড়ানো সেই অমায়িক হাসিটি হাসেন। সামনের দাঁতহীন মাড়িতে জিভ কেটে বলেন, 'ছি, ছি! বউমা, গুরুজনকে এমন কথা কেউ বলে? তুমি দেখছি এখনো ছেলেমানুষ!' আবার থামেন। এক মুহূর্ত ঘোলাটে চোখ দুটোই ছোট বউয়ের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নেন। ফের বলেন, 'বিষ খাবো কোন দুঃখে মা? মরতে এক্ষুনি ইচ্ছে নেই বলেই তো ওষুধটা রোজ খাই। শৈলর মা মরে যাবার পর আমার বুকের ভেতরে যে কী অসুখই হল!' এ'টো হাতখানাই বুকের ওপরে রাখেন। চো'খ দুটো ছল-ছলিয়ে ওঠে। কান্নায় থম-থমে দেখায় মুখটা। বুকটা এতক্ষণে টন-টনিয়ে ওঠে ছোট বউয়ের। ধোঁয়া জমে-জমে এই ঘরটাই বুঝি অসহ্য অন্ধকার হয়ে আছে। দম আটকে আসে। বড় অস্বস্তি লাগে এই ঘরে। ছোট বউ আস্তে আস্তে উঠে যায়।

শীতের রাত। ঘুরঘুটি অন্ধকার বাইরে। একলা ঘরে শৈলর চোখে ঘুম আসে না। শিয়রের জানলা খুলে বাইরে তাকায়। কনকনে হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দেয়। পাল্লা দুটো তবু বন্ধ করে না। নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকে শৈল।

ভীষণ কুয়াশা হবে আজ। সকালেই চারদিক আবছা, ধোঁয়াটে হয়ে যাবে। বৃষ্টির মত শিশির পড়ছে বাইরে, থেমে-আসা বৃষ্টির মত। পাতা ঝরছে। টুপ-টাপ শব্দ হচ্ছে পাশের বাগানে। শৈল কান পেতে শোনে। অন্ধকার, আবছা কুয়াশার ভেতরেই কী খোঁজে। চোখে পলক পড়ে না।

ও পাশে উপেনের ঘর। এই শেষ রাত্রে আলো জ্বলছে ঘরে। বন্ধ জানলার একটা পাল্লা বুঝি ভাঙা। লাল আলোর তেরছা ফালিটা বাগানে শুকনো ঘাস-পাতার ওপরে লুটিয়ে কাঁপছে। যেন অন্ধকারকে খুঁচিয়ে জখম করতে চাইছে জং-ধরা একটা তলোয়ার! অন্ধকার নিথর, নিষ্কম্প্র। কুয়াশা চেপে ধরেছে চারদিক থেকে। ঠাণ্ডা বাতাসে কয়লা-পোড়া গন্ধ। উপেন হয়তো উনোনে আঁচ দিয়েছে। শেষ রাত্রেই রান্না সারে রোজ। ছেলেকে খাইয়ে নিজে খায়। চন্দনকে পাঠশালায় পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্তে আপিসে যায়। বউ নেই। মাস পাঁচেক আগে উপেনের মেয়ের মা হতে গিয়েই হাসপাতালে আরেকবার জেগে ওঠার প্রতিশ্রুতি না দিয়েই ঘুমিয়েছে। ছেলে জানে, ঘুম ভাঙলেই ফিরে আসবে মা! এদিকে দয়া দেখিয়ে জন্মাবার আগেই পৃথিবীর আলো-বাতাসটুকু বঞ্চনা করেছে মেয়েকে। ভালোই হয়েছে। অন্তত শৈলর কেন ভালো লাগে মেয়েটার মরার কথা ভেবে! বউটার জন্যে একদিকে কষ্ট, অন্যদিকে সুখের এক দোটানা মিশ্র অনুভূতিই তাকে বাঁধু করে রাখে। উপেনের জন্যে মায়াটা তাই খাঁটি হৃদয়সঞ্জাত কিনা বুঝে ওঠা দায়।

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে। জানলাটা উপেন খোলে না। কী কঠিন প্রাণ! কী অবুঝ! অনেক ভেবে তক্তপোশের তলা থেকেই কাঠের টুকরো কটা তুলে নেয় শৈল। জানলাটা লক্ষ্য করেই ছোঁড়ে। প্রথমে একটা। তারপর আরেকটা। তার-ও পরে আরো। কিন্তু বাগান পেরিয়ে একটা-ও জানলার কাছে পৌঁছয় না। মাঝখানেই পড়ে থাকে সব। ধুপ্-ধাপ্ শব্দ হয় কেবল। শৈলর এবার কান্না পায়। ভেবে-চিন্তে সে তাই কাঁদতে শুরু করে।

ঠিক তখনই। খুট করে জানলাটা খুলে যায়। বাগানের অনেকখানি জায়গা স্পষ্ট চোখে পড়ে এইবার। চারদিকে ধোঁয়া, অন্ধকার আর কুয়াশার মাঝখানে কেরোসিনের লালচে আলোটুকু কেমন বিবর্ণ। যেন মাংস-ধোয়া খানিকটা জল। শৈল চুপ। নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকে। জানলার পাশে আলো হাতে উপেনকে স্পষ্ট দেখা যায় না। মনটা তাই বিশ্রী বিরক্ত হয়ে ওঠে ফের।

লাল আলোর বৃত্ত পেরিয়ে, অন্ধকার আর কুয়াশার পাঁচিল ভেদ করে উপেন কিন্তু কিছুই দেখে না। শব্দ-ও শোনে না আর। জানলাটা আবার বন্ধ হয়ে যায়।

শৈল এবার দ্বিগুণ চীৎকারে বাড়ি মাথায় করে কাঁদে। ভোর হওয়ার আগেই বাড়ির মায় পাড়ার মানুষগুলিকে জাগিয়ে তোলার পরম দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে বুঝি!

দিনের বেলা চেনা ভার। দেখে বোঝার উপায় নেই আর। মনে হয় না পাগল। মাথার ভেতরে অতি যত্নে পোষা, চোখে না-দেখা পোকাগুলিকেই বুঝি সমস্ত দিনের জন্যে অপত্য আদরে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। শৈল তখন আরেক মানুষ।

দুপুরে বাড়ি ফাঁকা। বনবিহারী আপিসে যায়। দিনেশ তার পেছনে। রমানাথ খেয়ে-দেয়ে ঘুমোন। ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে-পাঠশালায়। কেবল কোলের ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে না-জেগে, না-ঘুমিয়ে পরম রমণীয় আলস্যে এ বাড়ির দুই বউয়ের দুপুর কাটে দু'জনে মিলে একলা। শৈল কোথাও

যায় না। নিজের ঘরেই খিল তুলে দিয়ে এই বয়সে-ও ছেলেমানুষির অন্ত নেই তার।

বড় বউ ছোট বউকে ডাকে। ফিস-ফিসিয়ে বলে, 'কাণ্ড দেখে যা।'

পা টিপে-টিপে জানলার পাশে এগিয়ে যায়। দেখে অবাক! বড় বউ হাসে। বলে, 'কী হচ্ছে ঠাকুরঝি?'

খেলাপাতির থালা-বাসনগুলি পায়ে ঠেলে, আদরে ন্যাকড়ার পুতুলটাকে কোলে তুলে নেয়। মুখখানা [illegible] ভয়ানক চিন্তিত, গম্ভীর মনে হয় শৈলকে। প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে, 'কিচ্ছু খায় না! এখন কী করি বলতো? ধারে-কাছে একটা ডাক্তার-ও কি থাকতে নেই তোমাদের? একটা কিছু হলে লোকটাকে কী কৈফিয়ত দেবো!' শৈল সত্যি-সত্যি চোখের জল মোছে এইবার।

ছোট বউ বলে, 'আমাকে দাও দিদি, ডাক্তার দেখিয়ে আনি।'

শৈল আশ্বস্ত হয়ে বলে, 'আগের জন্মে তুই আমার কেউ ছিলি। নইলে এত টান কেন আমার জন্যে।'

ছোট বউ আর কথা কয় না। বড় বউ বিরক্তি বোধ করে। বলে, 'আদিখ্যেতা! ওসব চেয়ে নে। বুলি এসে কান্না-কাটি শুরু করবে নইলে। সে আমি সইতে পারবো না।'

ছোট বউ চুপ করেই থাকে। দরজা খুলে শৈল পুতুলটা ছোট বউয়ের কোলেই তুলে দেয়। কিন্তু বড় বউয়ের কোলে মানুষের রক্তে-মাংসে গড়া জ্যান্ত মেয়েটাকে দেখে বুঝি আর লোভ সামলাতে পারে না। আবেদনের মতই অতি কাতর স্বরে বলে, 'বুকের দিকে চেয়ে দ্যাখো, বউদি! দাও না মেয়েটাকে! দুধ খেয়ে তেষ্টা মেটাক ও! আমি-ও শান্তি পাই একটু।' কাছে আসে। হাত বাড়িয়ে বড় বউয়ের মেয়েটাকেই ধরতে যায়। যেন ভয় পেয়ে পিছু হটে বড় বউ। বুকের ভেতরে আরো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে মেয়েকে।

চোখ দুটো ফের ছলছলিয়ে ওঠে শৈলর। 'তোমরা কী পাষাণ গো!'

রাত্রে দুই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা হয়।

দিনেশ বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে, 'কী করবো আমি? বাবার যদি তেমন চিন্তা থাকতো, তবে আজ অন্যরকম হাওয়া বইতো সংসারে। খুঁত বলতে সতীশের আয়টাই যা কম ছিল। নইলে সে পাষণ্ড ছিল না অমরবাবুর মত। পাঁচ বছরে-ও দিদিকে তাঁর মনে পড়ল না একবার, দেখলে?'

ছোট বউ ছেলেমানুষের মতই আবদার করে যেন। বলে, 'দিদিকে আবার বিয়ে দাও না কেন? আজকাল তো আকছাড় হচ্ছে এমনিধারা বিয়ে।'

দিনেশ কটমট করে তাকায়। ছোট বউ ভয় পায়। লজ্জা-ও। তবু দম ফুরিয়ে-আসা গ্রামোফোনের মতই বলতে থাকে, 'আমার মনে হয় দিদির মাথাটা তাহলে ভালো হবে।'

বলতে-বলতে হোঁচট খায়। দিনেশের চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায়। চোখে আগুন জ্বলছে। হয়তো বেশীক্ষণ এমনি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে বক-বক করলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ছোট বউ।

দিনেশ বলে, 'নিজেকে নিয়েও বুঝি এমনি সব কুৎসিত কথা ভাবো?'

ছোট বউ আর কথা বলতে পারে না। দুঃখে, অপমানে মনটা তার আর মন থাকে না। মাটিতে মিশে যেতে চায়। যেন সীতার মতই অসহিষ্ণু অনুতাপে মাথা নিচু করে মৃত্তিকার গহ্বর খোঁজে সে। চিরদিনের মতই মুক্তি চায়।

বড় বউ ঘরে ঢোকে। বলে, 'ঘুমোলে?'

—'না।'

আবার চুপ-চাপ। মশারির চারপাশ বিছানার নিচে গুঁজে দিতে দিতে স্বামীর গায়ে আস্তে ঠেলা দেয় বড় বউ। বলে, 'শুনছো?'

—'কী?'

—'একটা ভালো ডাক্তার দেখাও ঠাকুরঝিকে।'

—'ডাক্তার না, ভাবছি আবার বিয়ে দেবো ওর।' বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজে পরম নিশ্চিন্তে কথা বলে বনবিহারী। বলে, 'সতীশকে শৈল ভালবাসতো। জোর করে অমরের সঙ্গে বিয়ে দিলুম আমরা। সতীশ মারা গেল ওর জন্যেই। কিন্তু অমর যে মেরে ফেলছে শৈলকে! আবার বিয়ে করেছে শুনলুম। ছেলে-ও হয়েছে একটা। এদিকে শৈলর মাথাটা দিন-দিন বিগড়ে যাচ্ছে!'

বড় বউয়ের মুখে কথা সরে না। বনবিহারীর কথা শুনে আপাদমস্তক জ্বলতে থাকে তার। তবু তিক্ত কণ্ঠে জিগ্গেস করে, 'বিয়ে দিলেই বুঝি ভালো হয়ে যাবে তোমার বোন?'

—'বিয়ে তো না, ওটাই শৈলর ওষুধ।' বনবিহারী বুঝি আরো সহজ করেই কথাটা বোঝাতে চায়। বলে, 'এ কথাটা বোঝো না কেন, শৈল একটা মেয়ে? ঠিক তোমাদের মতই ওর রক্তে-ও ভালোবাসার জীবাণুগুলি এখনো মরে যায়নি। সংসারে আর পাঁচটা মেয়ের মতই স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর বাঁধার অদম্য ইচ্ছেটাই ওকে কাবু করে ফেলছে দিনকে দিন।'

বড় বউ যেন এসব কথা কানেই তোলে না। অন্য কথা বলে।

—'পান খেয়েছো?'

—'না।'

খিলিটা হাতে গুঁজে দেয় বনবিহারীর।

পান চিবোতে-চিবোতে বনবিহারীই ফের বলে, 'উপেনের বউটা মরে গেছে। ছেলেটা মা-মরা। শৈল উপেনকে ভালোবাসে জানো? ছেলেটার জন্যেই ভালোবাসে।' বলতে-বলতে পাশ ফিরে শোয়।

বুকের দোষ আছে বড় বউয়ের। হার্টফেল করার ভয়। যখন-তখন উত্তেজিত হতে বারণ করেছে ডাক্তার। তাই অনেক কষ্টে শান্ত কণ্ঠে বলে, 'ঘুম পাচ্ছে। একটু সরো। রাত এখন ক'টা বলতো? খুকিটাকে একবার তুলতে হবে। বুলিটা কেমন করে শুয়েছে দ্যাখো!' এমনি করেই বনবিহারীর সব কথাকে পাশ কাটিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায়। ঘুমের আগে

কঠিন জবাব দিয়ে লাঞ্ছনা করে তুলতে চায় না মন।

চীৎকার শুনে ছুটে এল উপেন। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা জ্বলছে। টন-টন করছে ব্যথায়। ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে চেঁচায়। দিনেশকেই ডাকে। তবু সাড়া নেই। দরজা খোলে না কেউ। এবার জোরে কড়া নাড়ে। খুলে যায়। কিন্তু দিনেশ না, সামনে দাঁড়িয়ে শৈল। মাথায় ঘোমটা টেনে, একরাশ খুশী আর লজ্জার অপরূপ প্রসাধনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তরল সুরে অভিযোগ করে যেন, 'তুমি কি হ্যাংলা গো! রাত্রে একলা থাকতে কষ্ট হয়! আমার-ও কি হয় না? হয়। তবু এমনি পাগল হয়ে রাত দুপুরে দরজার কড়া নেড়েছি কখনো?'

জলের বালতি হাতে আগুন নেবাতে চলেছে দিনেশ। সদর দরজায় আলো হাতে শৈলকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। গম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'কে, কে ওখানে?'

—'আমি রে, আমি।' বেশ বিরক্ত মনে হয় শৈলকে।

—'আরে কে?'

—'কেমন করে বলি! একালের মেয়ে তো নই যে, ঘাড়ে ধরে নাম নেবো লোকটার!' শৈল রেগে যায়।

মরমে মরে যায় উপেন। লজ্জায় মাথা তুলতে পারে না। মাথার ভেতরে ঝাঁ-ঝাঁ করে। বুকের সব রক্তই মুখে উঠে আসে। শৈলর কান গরম-করা কথাগুলি আর কান পেতে শোনা যায় না। উপেন এগিয়ে যায়। দিনেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিগগেস করে, 'কী হয়েছে দিনেশ?'

মনে-মনে জ্বলে ওঠে দিনেশ। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'তেমন কিছুই হয়নি। হলে খবর পেতে নিশ্চয়ই।' এক মুহূর্ত উপেনের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর চলে যায়। কিন্তু সেই খর দৃষ্টির আঁচে উপেনের মুখটা বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উপেন দাঁড়িয়েই থাকে। এক পা এগুতে পারে না। এখানে মাটির সঙ্গে নাট-বল্টু দিয়ে কে যেন পা দুটোই এঁটে দিয়েছে তার। নয়তো পাথর হয়ে গেছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে ভয়ানক। লজ্জায়, অপমানে মাথাটা ঝিম-ঝিম করে।

শৈল চমকে ওঠে। পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এ কি, রক্ত যে!'

—'ছুটে আসছিলাম। নখটা বুঝি উঠেই গেছে।' পায়ে কোন যন্ত্রণাই নেই! নির্বিকার, নিস্পৃহ উপেনের উক্তি।

লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে শৈল বলে, 'দাঁড়াও।'

উঠোন থেকে এক খাবলা দুর্বো তুলে নেয়। চিবিয়ে, থেঁতলে উপেনের পায়ের ওপরেই রাখে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বড় বউ দেখে সব। পরনের শাড়ি ছিঁড়ে উপেনের পা বেঁধে দেয় শৈল। অভয় দিয়ে বলে, 'আর কোন যন্ত্রণাই থাকবে না। রক্ত পড়বে না আর। এবার সেরে যাবে দেখো।'

অতি কুৎসিত, কেবলমাত্র প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য একটা অশ্লীল ছবি দেখার মতই ভয়ে ভয়ে দৃশ্যটা দেখে বড় বউ। ভয়ংকর ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে ওঠে। ছোট বউকে ঠেলা দিয়ে বলে, 'দেখলি, আদিখ্যেতার বহরটা দেখলি একবার।'

ছোট বউ উত্তর করে না কিছুই। আস্তে আস্তে আবার শোবার ঘরে যায়।

অসহায় আক্রোশে মনে-মনে ভীষণ ক্ষেপে ওঠে বড় বউ। ছোট বউয়ের রকম দেখে গা জ্বলে যায়।

উপেন বলে, 'যাই, চন্দন ঘরে একা।' এটা একটা কথাই নয়। কথা না-থাকার কৈফিয়ত। এখান থেকে কোনমতে পালিয়ে যাবার উপায়।

দরজার কাছে দু' পা এগিয়ে যায় শৈল। প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলে। গোপন কথা যেন।

—'আগুন লাগিয়েছিলুম। মশারির খানিকটা পুড়েছে শুধু। বড় বউটা পুড়েই মলো না তবু।'

আশ্বাসটা আন্তরিক কিনা বুঝতে চেষ্টা করে উপেন। কথা শুনে না চমকে পারে না।

শৈল বলে, 'কিন্তু কেউ জানে না কথাটা। তুমিও বল না যেন!'

চোখের তারায় ভয় আর বিস্ময়ের মাখামাখি। কিছু বা তিরস্কার। শৈল যেন অমন করে, অতখানি স্পষ্ট করে তাকাতে পারে না উপেনের দিকে। দরজাটা তাই মুখের ওপরেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে যায়!

চন্দন নেই। বিকেল থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না।

শুধু উপেন না। খবর শুনে এ বাড়ির মানুষগুলিও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। খুঁজছে সবাই।

বনবিহারীকে নিয়ে উপেন গেছে থানায়। দিনেশও তাসের আড্ডায় যেতে পারেনি। পাড়ায় বেরিয়েছে খোঁজে। আহা, মা-মরা ছেলে বলেই হয়তো এত টান মানুষের। রমানাথ পর্যন্ত একদিনের জন্যে ওষুধ খাওয়া স্থগিত রেখেছেন তাঁর। যা না খেলে বুকের ব্যথাটা বেড়ে যায়। শৈলর মাকেই মনে পড়ে বেশী।

আজকে-ও রান্না করছিল বড় বউ। ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে লক্ষ্মীর পটের কাছে বসে পাঁচালি পড়ছিল ছোট বউ। ছেলে-মেয়েরা একটি লণ্ঠনকে ঘিরেই অন্যদিনের মত বারান্দার সেই কোণটিতে বসে পড়ছিল। এক সঙ্গে কোরাস গাইছিল সবাই। রান্নাঘরের সিঁড়ির ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল কুকুরটা। ঠিক অন্যদিনের মতই ছিল সব। শুধু বিকেল থেকে শৈলর ঘরটাই বন্ধ।

হঠাৎ চমকে উঠল সবাই। চন্দনের চীৎকার শোনা গেল। আর শৈলর কান্না। এক সঙ্গে একই ঘরে।

ছোট বউ ছুটে এল। রান্নাঘরের চৌকাঠে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে গেল বড় বউ। ছেলে-মেয়েরা পড়া বন্ধ করে এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল ভয়ে। কথা নেই কারো মুখেই। নিঃশব্দ, নিস্পন্দ সবাই। উঠোনে কাঁঠাল পাতাটি পড়ার শব্দ শোনা গেল স্পষ্ট।

দরজায় কড়া নাড়ে ছোট বউ। চীৎকার করে ডাকে, 'দরজাটা খোলো তো দিদি!'

ভূমিকম্পে পৃথিবী টলোমলো! যেন এই মুহূর্তে দরজা খুলে বাইরে না

এলে ছাদ চাপা পড়েই মরবে শৈল। গলার স্বর এমনি কাঁপা। এমনি ভয়ার্ত ছোট বউ।

দরজা তবু খোলে না। শৈল চুপ। চন্দন-ও।

ছোট বউ আবার ডাকে। ডাকে না যেন কাঁদে।

মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। হাওয়াকেই ডেকে বলে বড় বউ, 'ছেলে তোমার কোথাও যায়নি, উপেন ঠাকুরপো। ভেবো না, ঠাকুরঝির কাছেই আছে।'

কথা না, মন্ত্র যেন বড় বউয়ের। দরজা খুলে হাসি-হাসি মুখেই শৈল এসে দাঁড়ায়। ছোট বউয়ের কোলে চন্দনকে দিয়ে একমুখ পরিতৃপ্তির হাসি হাসে। বলে, 'কী ছেলে গো বউ! মাকে মা বলে ডাকে না! কত সাধ্য-সাধনা, কত লোভ দেখানো! কিন্তু সাধ্যি কার ছেলের মুখে রা কাড়ে?'

ছোট বউয়ের বুকটা যে কেন টন-টন করে! কিসের ব্যথায় না জানি বুজে আসে গলাটা! কথা বলতে পারে না। চোখ ফেটে জল পড়বে এখুনি।

—'মা ডেকেছে তোমায়?' বড় কষ্টে, অস্ফুট স্বরে জিগগেস করে।

—ডেকেছে বৈকি! না ডাকলে কে ছাড়ে? নইলে দুদিন বাদে বড় হয়ে মা আর বাড়ির ঝিয়ের তফাতটুকু-ও যে বুঝবে না।' বিজয়িনীর মতই কথা বলে শৈল। কণ্ঠে তার অপরিসীম উল্লাস। কথায় আনন্দ। অনিন্দ্য রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা তার শরীরে, মনে সর্বত্র।

বড় বউ মনে-মনে কী ভাবে। শৈলর কথা শুনে কী যে হয় আজ! বুঝি মায়ায় বিগলিত হয়েই বলে, 'বিশ্বাস করিনে।' তারপর চন্দনের দিকে চেয়ে যেন অনুনয়ে ভেঙে পড়ে। 'ডাকো তো চাঁদু, ডাকো। মা ডাকো ওকে!'

চন্দন কিন্তু কিছুই বলে না। মা ডেকে অস্থির করে তোলে না শৈলকে। শুধু এক মুখ হাসি নিয়ে ছোট বউয়ের কোল থেকে শৈলর কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুকে মুখ লুকোয়।

শৈল বলে, 'থাক, বার বার মা ডাকতে লজ্জা করে ছেলের।' চন্দনকে বুকে জড়িয়ে এবার বড় বউয়ের দিকে তাকায়। বলে, 'কিন্তু কই, যার কথা বললে সে কোথায়?'

চুপ করে চেয়ে থাকে বড় বউ। কথা বলে না।

শৈল ঠোঁট মুচকে হাসে। লজ্জার হাসি। বলে, 'এখনো তোমার পাগলামি গেল না, বৌদি? এমন করে-ও হকচকিয়ে দিতে হয় মানুষকে? তুমি যেন কী!'

এর পরে-ও চুপ করে থাকা যায় না। মুখ বুজে সওয়া যায় না সব। সুতরাং মনে-মনেই বোঝাপড়া হয়ে যায়। দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে যে-যার।

সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে শয্যাশায়ী হয়েছেন রমানাথ। এ জীবনে আর কোনদিনই দুটিমাত্র পায়ের উপর শৈলর মায়ের দেয়া ব্যথা-ভরা বুক আর বিশ্বের যাবতীয় চিন্তার ভাণ্ডার মাথা সমেত দেহটার দায়িত্ব চাপানো যাবে না। পৃথিবীতে কত সকাল-সন্ধ্যা হবে। কিন্তু রমানাথ আর কখনো বাইরে যাবেন না। হয়তো আর কোনদিন নিয়মিত ওষুধ খাওয়া হবে না তাঁর। তিনি তাই চোখ বুজে অতি সম্ভাবিত একটি দিনের মুখ দেখে শিউরে ওঠেন। শৈলর জন্যে আর কিছুই করা গেল না! আক্ষেপ শুধু এইটুকু!

দায়িত্ব পালনের বিষম তাগিদেই রাতের নিশ্চিন্ত ঘুমটুকু-ও ভয়ংকর পাতলা হয়ে গেছে বনবিহারীর। দুরারোগ্য ব্যাধির মতই মাথার ভেতরে শৈলর জন্যে অহরহ চিন্তা। মাঝ রাতে উঠে দু' তিন ঘটি ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে-ও নিদ্রাদেবীকে বশীভূত করা যায় না। উপেন যদি চন্দনের মাসিকেই বিয়ে করে, বনবিহারীর বাধা দেবার সাধ্য নেই। কিন্তু যেমন করেই মাথা টিপে চুলে বিলি কাটুক না বড় বউ, জীবনে খাওয়া-পরার সুখ আর ঘুমের আরাম হয়তো আর কখনো পাবে না সে। শৈল যে তারই বোন, এই কথাটা বড় বউ যেন বোঝে না।

আবেগের ছেলেমানুষি ছোট বউয়েরই বেশী। শাড়ি-গয়নার মেরোসি অহংকারের মতই কান্না তার আরেক ভূষণ। তাই ঘুমের আগে দিনেশের অমন নিবিড়, নিষ্পেষিত ভালোবাসায় তার অস্বাভাবিক অমনোযোগ। অহংকারের মতই তার কান্নার এই নির্ভয় অসহযোগে শৈলর জীবনে আর কোন প্রয়োজন কিংবা অসম্পূর্ণতার কথা ভাবে না দিনেশ। বরং ছোট বউকেই নতুন করে খারাপ লাগে। তিন তিনটে ছেলে-মেয়ের মা হয়েও ছোট বউ কি নেকি!

তবু, কর্তব্যবোধের প্রেরণা কি জোরালো দিনেশের। নইলে উপযাচক হয়ে উপেনকেই দেখা দেবার মানে নেই। ঘরে ঢোকে না। বাইরে দাঁড়িয়েই বলে, 'বিষয়টা তোমার কাছে মজার হতে পারে। কিন্তু দিদির পাগলামির সঙ্গেই যে আমাদের মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়ানো, তোমার পক্ষে হয়তো সে কথা চিন্তা করার ক্ষমতা-ও নেই।'

—'কথাগুলির মানে করতে পারছিনে। একটু সহজ করে বল, দিনেশ।' উপেন এগিয়ে আসে।

দিনেশ ক্ষেপে যায়। বলে, 'ভালো কথা তোমার মাথায় ঢোকে না। তুমি তার অর্থ-ও বোঝো না জানি। বুঝতে চাও না। নইলে দিদি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সে পাগল। তার পাগলামির সুযোগেই আমাদের সংসারে একটা কুৎসিত ব্যাপার ঘটাতে চাও, যা আমরা কখনো ভাবিনি।'

উপেন বুঝি আহত হয়। বলে, 'ছিঃ, দিনেশ! একথা কেমন করে ভাবলে? শৈলদি যে আমার-ও দিদি। আমি তাকে তোমার মতই শ্রদ্ধা করি।'

—'সুতরাং, আমার অনুরোধ, শ্রদ্ধাটা বাড়িতে বসেই ক'রো। আমাদের বাড়িতে গিয়ে দিদিকে ক্ষেপিয়ে তুলো না, দোহাই!' শৈলর ভবিষ্যৎ দিনেশের

অন্তবড় ভাবনা। কিন্তু কর্তব্যবোধের যন্ত্রণাটা বুঝি তার চেয়ে-ও কঠোর।

দিনেশ আর দাঁড়ায় না। হন-হন করে বেরিয়ে যায়। একলা অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে উপেন।

অথচ এত ভাবনা ভেবে-ও কোন ফল হয় না। বাড়ির এতগুলি লোক তো শৈলর কথা ভেবেই পাগল। শৈল তবু কারো কথাই ভাবে না। এ বাড়ির মেয়ে হয়ে-ও বাড়ির মান-মর্যাদার জন্য যেন তত মাথা ব্যথা নেই তার।

বাড়িতে নেই শৈল। বড় বউ ভাবে। ছোট বউ ব্যস্ত হয়ে উপেনের বাড়ি যায়।

উপেন নেই। সেই কোন সকালে চন্দনকে না খাইয়েই বেরিয়ে গেছে আজ। চন্দন কিন্তু এক[illegible]েই। শৈল এখানেই। রান্না করতে [illegible]তে ডাকে, 'অ চাঁদু, তোর মামীকে বসতে [illegible]দে তো!'

আসন হাতে এগিয়ে আসে [illegible]দন। ছোট বউ বসে না। অবাক চোখে [illegible]খে সব। উপেনের রান্নাঘরের আজ শ্রী ফিরেছে। নিকানো মেঝেটা ঝক-ঝকে। আবর্জনা নেই কোথাও। হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাসন-কোসন পর্যন্ত ধোয়া-মাজা। ছোট বউ বোঝে, শৈলর কীর্তি এসব। এমন কি চন্দনকে দেখে-ও নতুন লাগে আজ। চান করিয়ে, ইজের-জামা পরিয়ে মাথা আঁচড়ে এ বাড়ির আসবাবের সঙ্গে ওকে-ও ঝক-ঝকে, তক-তকে করে তুলেছে শৈল।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলার ফুরসত পায় শৈল। হাসি মুখেই বলে, 'বুঝলি ছোটো, লোকটার কোন আক্কেল নেই। এক চিমটি কান্ড-জ্ঞান নেই মগজে।' কী ভেবে থামে। একমুহূর্ত চেয়ে থাকে ছোট বউয়ের দিকে। তারপর আবার বলে, 'তুমি অত সকালেই যদি যাবে, আমাকে বলে গেলে না কেন? একলা বাড়িতে ঐটুকু ছেলে যে ভয় পেয়ে মরবে!' ছোট বউকে না। তাকে সাক্ষী রেখেই উপেনকে উদ্দেশ করে গায়ের ঝাল মেটানো শৈলর।

ছোট বউ আস্তে কথা বলে। জিগগেস করে, 'কোথায় গেছে?'

—'জানিনে, কোন চুলোয় গেছে!' শৈলর কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি। আবার ভেজা গলায়, ছল-ছল চোখে বলে, 'আমার কপালটাই শুধু এমনি। নইলে সংসারে আরো তো মেয়ে আছে। ঘরের মানুষের সঙ্গে আমার মত মুখ দেখাদেখি বন্ধ কার?' আবার থামে। আরেকটু কাছে এসে যেন অতি দুঃখের কথাটাই গোপনে ছোট বউকে জানাতে চায়। বলে, 'আমি জানি রে ছোটো, ও আমাকে ভালোবাসে না। ঘেন্না করে। কিন্তু মেয়ে হয়ে আমি চুপ-চাপ থাকি কী করে? চাঁদুর মুখের দিকে তাকালে আমার যে কারো ঘেন্নাই আর মনে থাকে না!' শৈল এবার থামে। একটা কিছু উত্তরের প্রত্যাশা করে যেন।

ছোট বউ বলে, 'ঘরে চল, দিদি।'

শৈল হাসে। বলে, 'তুই কি পাগল হলি নাকি রে ছোটো? এখন কোথাও যাবার সময় নেই আমার। লোকটা এসে যদি ঘরে না পায় তাহলে আর লজ্জার সীমা [illegible] থাকবে না আমার। এতদিন পরে-ও যদি তৈরি ভাত দুটো ওর সামনে নিজের হাতে দিতে না পারি, তবে কোথায় মুখ লুকোবো বলতো? আমি যাবো না।'

যাবে না। জোর করে-ও নিয়ে যাওয়া যাবে না শৈলকে। অগত্যা ছোট বউকে ফিরে যেতেই হয়।

ছোট বউ যায়। উপেন কিন্তু কথায় ফেরে না। বলে, 'এ ভারি বিচ্ছিরি দেখায় শৈলদি। লোকের ভাবনার কথা [illegible]। কিন্তু তোমাদের বাড়ির লোকেরা কী মনে করছেন? দিনেশকে কী জবাব দেবো বলতো? না, না, তুমি যাও শৈলদি।'

শৈল এবার ডুকরে কেঁদে ওঠে 'শৈলদি, শৈলদি, শৈলদি! কান ঝালা-পালা হয়ে গেল শুনে। হ্যাঁ গো, তুমি কী? শুধু বাইরের মানুষের কথাই ভাববে? আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখবে না? পাগল বলে আমার মনের কথাটা কেউ বুঝবে না তোমরা?'

উপেন আর কথা বলে না। পারে না বলতে। শক্তি নেই। স্তব্ধ-বিস্ময়ে শৈলকেই দেখে। নতুন করে আবিষ্কার করে যেন। শুধু দেহ না, অকম্প্র, স্বচ্ছ জলের তলায় রুপোলি মাছের খেলার মতই শৈলর মনের কথা আজ পড়া যায়। পড়তে পারে উপেন। বুঝতে-ও।

শৈল কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ছুটে বেরিয়ে যায়। পালিয়ে যায় এবার।

দিন কয়েক সময় লাগে মন-স্থির করতে। উপায় খুঁজে বের করে উপেন। চন্দনের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না তেমন। সুতরাং শীতের শেষাশেষি কোথাও বেরিয়ে পড়ার মনস্থ করে। হাওয়া বদলের কথাটাই সবাইকে শোনায়। এক মাসের ছুটির দরখাস্তটা-ও মঞ্জুর হয়ে যায়। তলে-তলে কিন্তু বাসা বদলের চেষ্টাই করে উপেন। বদলির জন্যে হাঁটাহাঁটি করে আপিসে। মাস-খানেক পরে ব্যবস্থাটা পাকাপাকিই করে ফেলবে হয়তো।

বাইরে খালি রিক্সাটা দাঁড়িয়ে। বিছানা-বাক্স গুছিয়ে কয়েক মিনিট পরেই বেরিয়ে আসে উপেন। সঙ্গে চন্দন। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে,

পেছন ফিরে অবাক হয়ে যায়। [illegible]পা গলায় ধমকে ওঠে যেন। 'নেমে এ[illegible], নেমে এসো শীগগির!'

শৈল বুঝি শোনে না। নামে-ও না রিক্সা থেকে। নির্বিকারভাবে বসেই থাকে। উপেন এবার ভয় দেখায়। বলে, 'ডাকবো দিনেশকে?'

ওদিকে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সবাই। অবাক-বিস্মিত চোখে পাগলের পাগলামিই দেখছে। উপভোগ করছে সবাই। দিনেশ নেই। বনবিহারী [illegible] আসে। বড় বউ পেছনে। ছোট বউ আছে সঙ্গে।

শৈল এবার মুখ ফেরায়। উপেন দেখে। শৈল কাঁদছে। কথা বলতে পারছে না। থরথরিয়ে ঠোঁট দুটি কাঁপছে কেবল। বড় বউ বলে, 'ছিঃ ঠাকুরঝি! নেমে এসো। ওদের যেতে দাও।'

শৈল এবার হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে, 'না, যেতে দেবো না একলা। আমার নামে কলংক রটিয়ে কোথায় যাবে ও?' এ যেন ভেজা গলায় নিছক মেয়েলি আবদার না। পাগলের প্রলাপ না আদৌ। রীতিমত দাবী! অবাক হয়ে সবাই সে কথা শোনে। কিছুই বলতে পারে না কেউ। শৈল আজ সত্যি-সত্যি বোবা বানিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

বাইরে হৈ-চৈ শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে দিনেশ। শৈলর কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত। রাগে, লজ্জায় অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। দাঁতে দাঁত ঘষে দিনেশ। চোখ কট-মট করে শৈলকে দেখে। শেষে ফেটে পড়ে। চেঁচিয়ে বলে, 'ভালো চাস তো নেমে আয়, দিদি। নইলে চুলের মুঠি ধরে টেনে নামাবো। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখবো ঘরে। এখনো কথা শোন।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! শৈল যেন দেখতে পায় না দিনেশকে। কথা-ও শোনে না। পাথর হয়ে বসেই থাকে। বোবা হয়ে যায়।

দিনেশ এবার এগিয়ে আসে। শৈলর হাত ধরে জোরে ঝাঁকানি দেয়। সশব্দে গালের ওপরে পাঁচটা আঙুল ফুটিয়ে বলে, 'নেমে এলিনে?'

হঠাৎ কী মনে হল উপেনের। দিনেশের মুঠি থেকে শৈলর হাতটা ছিনিয়ে নেয়। অতি ধীরে এবং নিরুত্তাপ [illegible] কণ্ঠে বলে, 'ও আর নামবে না, [illegible]নেশ। তোমরা যাও। শৈলকে আমিই [illegible]য়ে যাচ্ছি।'

[illegible]নেশ বুঝি চমকে ওঠে। অবাক সবাই। কেবল ছোট বউ এগিয়ে [illegible]সে চন্দনকে শৈলর কোলে তুলে দেয়। বনবিহারী কি এসব দেখে খুশী হয়? স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে ঠিক আন্দাজ করতে পারে না বড় বউ।

পুতুলের মতই দাঁড়িয়ে একটা [illegible] দেখে সবাই। পায়ের কাছে বাক্স-বিছানা সাজিয়ে শৈলর পাশেই অজ নির্দ্বিধায় উঠে বসে উপেন। তাকে কি উৎফুল্ল দেখায়? সঠিক বুঝে ওঠার আগেই রিক্সাটা ছেড়ে দেয়। অন্ধকার গলিটা যেখানে শেষ হতে গিয়ে অর্থাৎ বড় রাস্তায় নিজেকে মিশিয়ে দিতে গিয়ে বাঁক নিয়েছে, একটা মস্তবড় রাজহাঁসের মতই প্যাক-প্যাক করতে করতে রিক্সাটা সেই দিকেই এগিয়ে যায়।

নিষ্প্রাণ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। চলন্ত রিক্সাটার দিকেই চেয়ে থাকে। দেখতে-দেখতে আর দেখা যায় না।

পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে?

শ্রীবিদ্যাবি[illegible]

প্রশ্নকর্তার বিপত্তি

প্রশ্নপত্র রচনা সম্পর্কে এত রকমের বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও প্রায় প্রতি বছরই কিছু না কিছু গোলমাল শোনা যায়। এক এক বছর গোলযোগ আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। প্রশ্নপত্রের গণ্ডগোলের জন্যেই দ্বিতীয়বার এমন কি তৃতীয়বারও নূতন করে পরীক্ষা নেবার দরকার হয়েছে। এ রকম ঘটনা যে সর্বদাই ঘটে তা নয়, তবে নিতান্ত বিরলও নয়। এ ছাড়া প্রশ্ন আগে থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারও আছে। কিন্তু সে কথা এ প্রসঙ্গে আনছি না।

একটা পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার্থীরা যখন বাইরে বেরিয়ে আসে তখন প্রশ্ন সম্বন্ধে তাদের মুখ থেকে অনেক রকমের মতামত শুনতে পাবেন। কেউ বলছে ভাল, কেউ বলছে খারাপ, কেউ বলছে সিলেবাসের বাইরে, কেউ বা 'কমন' পড়েনি বলে প্রশ্নকর্তা সম্পর্কে দু-চারটে কটু কথাও বলছে। কারও কারও মুখে শুনবেন,—এমন কোশ্চেন কখনো আসেনি, আবার কেউ বা 'রিপিট হয়েছে' বলে রাগ প্রকাশ করছে। অতি-প্রচলিত একটি সমালোচনা আছে—কোশ্চেন বড় 'লেংদি' হয়েছে।

ভাল-মন্দর তো কোনো বাঁধা-ধরা মান নেই কাজেই সেবিষয়ে আর বলার কি আছে? যে প্রশ্নের উত্তর ভাল করে তৈরি করা আছে তেমন প্রশ্ন গোটা-কয়েক এলেই মনে হয় ভাল। অপরিচিত প্রশ্ন দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায়, প্রশ্নও কাজে কাজেই খারাপ হয়। সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন এলে পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিচলিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। প্রশ্ন করবার ভার দেওয়া হয় যাঁদের উপরে তাঁরা সকলেই প্রবীণ, আপন আপন বিষয়ে তাঁরা অভিজ্ঞ এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশেষজ্ঞ। তাঁদের হাতে দুটো শক্ত প্রশ্ন বেরোতে পারে, কিন্তু পাঠ্যবহির্ভূত প্রশ্ন তাঁরা করবেন কেন? ভুল-চুক খুব সাবধান মানুষেরও ঘটে। ভুল করে কেউ যদি কর্তব্যে অবহেলা করেন তাহলে অবশ্যই তাঁর দণ্ড পাওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড বা এই জাতীয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানই পরীক্ষা নিয়ে থাকেন তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্নপত্ররচয়িতা নির্বাচন করেন। এখানে উমেদার-তদারকের সুযোগ কম; নেই বললেই চলে। প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রাক্‌স্নাতক পরীক্ষার প্রশ্নপত্ররচনার পারিশ্রমিক ৩২ টাকা অথবা তার কাছাকাছি। যোগ্য লোকেরা এ কাজ পাওয়ার জন্যে কেউ ব্যগ্র নন। যাঁরা এ কাজ গ্রহণ করেন তাঁরা অর্থের জন্যে করেন না। একটি প্রশ্নপত্র রচনার জন্যে যে পরিশ্রম করতে হয় পারিশ্রমিক তার অনুপাতে নিতান্তই সামান্য। তৎসত্ত্বেও যাঁরা এ কাজ নেন তাঁরা কর্তব্যবোধেই নেন এবং নিতান্ত আকস্মিক কারণ ছাড়া তাঁদের ভুল হওয়ার কথা নয়।

বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় যখন নিয়োগপত্র পাঠান তখন পরীক্ষণীয় বিষয় এবং পুস্তকাদির তালিকাও সেই সঙ্গে পাঠিয়ে থাকেন। প্রশ্নরচয়িতা সেগুলি দেখে তবে প্রশ্ন করেন। সিলেবাস দেখে বই তাঁকে নিজে সংগ্রহ করে নিতে হয়। নিজের না থাকলে লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে নিতে হয়। লাইব্রেরীতেও না পাওয়া গেলে বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে জোগাড় করবার দরকার হয়। গাঁটের কড়ি খরচ করে এক এক সময় কিনতেও হয়। উপায় থাকে না। আপনি মনে করুন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি নিয়োগপত্র পেলেন। চিঠি খুলে দেখলেন আপনাকে একটি প্রশ্নপত্র রচনা করতে অনুরোধ এসেছে। দু সপ্তাহের মধ্যেই পাঠালে চলবে, তবে সম্মতিপত্রটা এখনই পাঠান চাই। আপনি সম্মতিপত্র পাঠিয়ে দিলেন। তারপর দু সপ্তাহের মেয়াদ যখন শেষ হয় তখন সিলেবাস দেখে বইগুলি বের করতে আরম্ভ করলেন। দেখলেন একটি বই কম পড়ছে। আপনার নিজেরই ছিল কিন্তু কে নিয়ে গেছে ফেরত দেয়নি। আপনার নিজের কলেজ বন্ধ। শুক্র শনি ঈদের ছুটি, পরের দিন রবিবার। কলেজের লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখে নেবেন তারও উপায় নেই। সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। ইতিমধ্যে শেষ তারিখও শেষ হয়েছে। সোমবার গিয়ে দেখলেন বইটা তিন দিন আগেই বেরিয়ে গেছে। দায়িত্বরক্ষার জন্যে না কিনে উপায় কি? সব বই সর্বদা কিনতেও পাওয়া যায় না। তখন আরও বিপদ।

এত হাঙ্গামা করে যে ভদ্রলোক প্রশ্নপত্র রচনা করবেন, ঔদাসীন্যভরে তিনি কি যা খুশি লিখতে পারেন? দুর্নামের ভয়ও তো আছে!

বলতে পারেন,-নাম যার কেউ জানে না তার আবার দুর্নামের ভয় কি? কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। 'Confidential' বা 'গোপনীয়' চিহ্নিত অনেক বস্তুই কার্যতঃ সর্বসাধারণের অতিশয় সুপরিজ্ঞাত। তার কারণ সুস্পষ্ট। এখন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশী। পরীক্ষকের সংখ্যাও সেই অনুপাতে

বেড়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজের যত অধ্যাপক আছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পরীক্ষার পরীক্ষক। ইংরেজীর প্রত্যেকটি অধ্যাপকই পরীক্ষক আছেন। পরীক্ষক হতে চাননি বা পরীক্ষকতা পেয়েও নেননি এমন এক-আধজন থাকলেও থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁরা হলেন ব্যতিক্রম। বাংলার অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁরা পরীক্ষকতা পাননি তাঁদের সংখ্যা বড়জোর কুড়ি। তিন বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা হয়েছে অথচ পরীক্ষকতা চেয়ে পাননি, বাংলার অধ্যাপক এমন একজনও আছেন কিনা সন্দেহ। ইকনমিক্স ও সিভিক্সেরও চাহিদা ঠিক এই রকম। এই দুই বিষয়ের প্রায় সকল অধ্যাপকই পরীক্ষক। পরীক্ষকের সংখ্যা বেশী হলে প্রধান পরীক্ষকের সংখ্যাও বাড়ে। এখন এক একটা পরীক্ষার এক একটা পত্রেই (paper) প্রায় তিন-চারজন প্রধান পরীক্ষক থাকেন। যে বিষয়ের পত্রসংখ্যা বেশী (যেমন ইংরেজীর তিন) তার প্রধান পরীক্ষকের সংখ্যাও ঐ অনুপাতে বেশী হয়। বোর্ডের প্রধান পরীক্ষকের সংখ্যা পঁচিশ তিরিশ পর্যন্ত ওঠে।

যেখানে পরীক্ষকের সংখ্যাই এত বেশী সেখানে গোপনীয়তা রক্ষা হবে কেমন করে? বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকদের একটা সভা হয়ে থাকে। সে সভায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সকল প্রধান পরীক্ষক ও সকল পরীক্ষক উপস্থিত থাকেন।

মনে করুন আই-এ ইংরেজীর প্রথম পত্রের প্রসঙ্গে সভা। সে সভায় কমপক্ষে একশজন পরীক্ষক থাকবেন, প্রধান পরীক্ষকও তিন-চারজন, এ ছাড়া প্রশ্ন কর্তারও থাকবার কথা।

একই কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষক। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবেন না—এ কি সম্ভব? এ অবস্থায় নাম গোপন থাকে না, না প্রধান পরীক্ষকের, না প্রশ্নকর্তার।

তাই বলছিলাম দুর্নামের ভয়েও প্রশ্নকর্তাকে সাবধান থাকতে হয়। সিলেবাস খুঁটিয়ে দেখতে হয়।

প্রশ্ন সম্পর্কে আর একটা প্রচলিত অভিযোগের কথা সবাই শুনে থাকবেন, —'কমন' পড়েনি। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীরা যে সকল প্রশ্ন সম্পর্কে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল সেই প্রত্যাশিত প্রশ্নগুলি আসেনি বা কম এসেছে। এ অভিযোগ সব সময় অমূলক হয় না একথা সত্য, কিন্তু সে অপরাধ প্রশ্নকর্তার নয়। সব কলেজে সিলেবাস অনুসরণ করে পড়ানো হয়ে উঠে না। পাঠ্য অসম্পূর্ণ থাকে। ছাত্রসংখ্যা বেশী, অধ্যাপক-সংখ্যা অল্প, ঘরের অভাবে রুটিনে সব ক্লাসকে যতটা স্থান এবং যে পরিমাণ সময় দেওয়া আবশ্যক তা দেওয়া যায় না। উপস্থিতির শতানুপাতের (percentage of attendance) আইনটুকু রক্ষা করবার জন্যেই কৌশল করতে হয়। (সে কথা পরে বলব।) কাজেই কতকগুলি 'ইম্পর্ট্যান্ট' প্রশ্ন তৈরি করিয়ে দিতে হয়। যেখানে তাও হয় না সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা নোটবই ও টিউটোরিয়াল হোমের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। অধ্যাপক, নোটবই বা টিউটোরিয়াল হোমের 'সাজেশান'গুলিই হল 'কমন'। এর বাইরে থেকে প্রশ্ন হলেই সর্বনাশ।

'এমন কোশ্চেন কখনো আসেনি'—এও একটা চলিত অভিযোগ। পরীক্ষণীয় বিষয় ও পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে নিবদ্ধ থেকেও এমন প্রশ্ন করা যায় যার উত্তর লিখতে গেলে কেবল মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা কাজ হবে না। প্রশ্নকর্তারা কখনো কখনো এ ধরনের এক-আধটা প্রশ্ন দিয়ে থাকেন। ১০০ নম্বরের প্রশ্নপত্রের মধ্যে হয়তো একটা ১০ নম্বরের প্রশ্ন এল নূতন ধরনের। তারও দেখবেন বিকল্প আছে। কিন্তু হলে হবে কি? সবাই বলবে এমন প্রশ্ন কখনো আসেনি। সংবাদপত্র ও জনসাধারণ পরীক্ষার্থীর পক্ষই নেবেন। প্রশ্নকর্তার আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায় নেই। তিনি যে প্রশ্নকর্তা সবাই জানে কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে বলতে পারেন না। তাঁর প্রশ্নে যে কিছুমাত্র ত্রুটি নেই সে কথাও বাইরে বলা যায় না। আর এক অভিযোগ—'রিপিট' হয়েছে। অর্থাৎ গত বছরের কোনো কোনো প্রশ্ন এবারও পড়েছে। তাতে কি হয়েছে? প্রশ্নকর্তা যদি দুটো পুরাতন প্রশ্ন বিকল্প হিসাবে দিয়ে থাকেন তাতে আইন লঙ্ঘন করা হয় না, এবং তাকে অসংগতও বলা যায় না। যেখানে ছটা প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয় সেখানে সাধারণতঃ দশটা প্রশ্ন দেওয়া হয়ে থাকে। তার মধ্যে দুটো পুরাতন প্রশ্ন এলে আপত্তি করার যুক্তিসম্মত কারণ থাকে না। তবু আপত্তি ওঠে।

আর এক আপত্তি—'লেংদি' প্রশ্ন। 'লেংদি' বলতে বোঝায় সেই প্রশ্ন যার উত্তরটা হবে দীর্ঘ। উত্তর সংক্ষিপ্ত করে লেখার মধ্যেও একটা কৃতিত্ব আছে। একই প্রশ্নের উত্তর দুজনে লিখল—দুজনেরই উত্তর হয়তো নির্দোষ হল। তবু যার উত্তরের আয়তন অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, তার নম্বর বেশী পাওয়া উচিত। সংক্ষিপ্ত উত্তরও সম্পূর্ণ হতে পারে। এজন্যে অনুশীলনের আবশ্যক। বিদ্যালয়ে যদি সে অনুশীলন না হয় তো ছাত্রদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্নকর্তাকে শেষ পর্যন্ত যে দোষের ভাগী হতে হয়, তাঁকে রক্ষা করবে কে? কৌতুকের কথাও আছে। অনেক পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের আকার বড় হলেও 'লেংদি' বলে। সাহিত্যের প্রশ্নপত্রে সারাংশ লেখার জন্যে একটি অনুচ্ছেদ দিলেই চলে। আপনি ছাত্রদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে আরও দুটি বিকল্প অনুচ্ছেদ বসিয়ে দিলেন। ফলে প্রশ্নপত্রের এক বা দেড় পৃষ্ঠা আরও বেড়ে গেল। এতেও প্রশ্নপত্র 'লেংদি' হল। 'এত বড় প্রশ্নপত্র পড়তেই তো কত সময় চলে যাবে'—এ রকম আপত্তিও শোনা যায়।
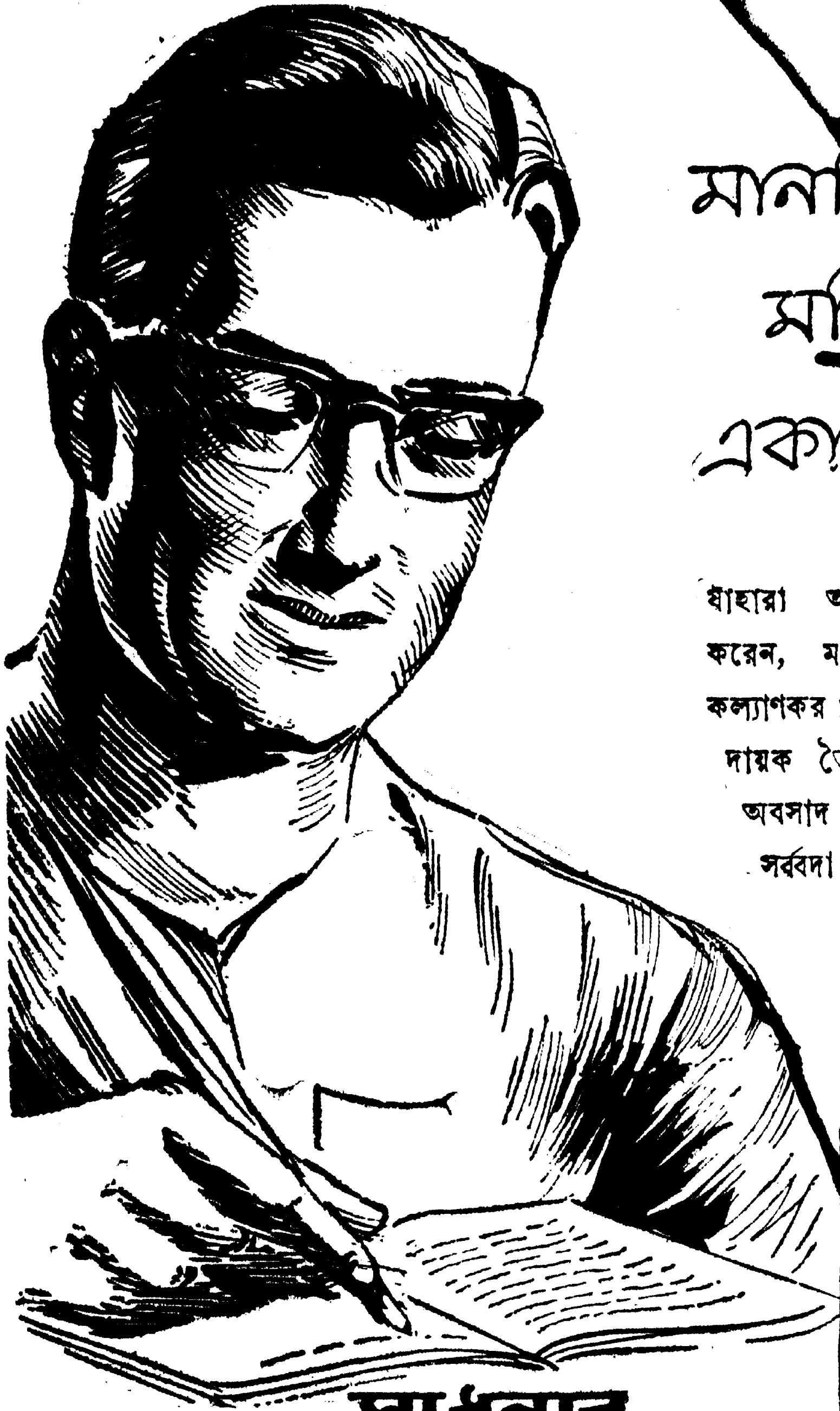
কহেন কবি কালিদাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
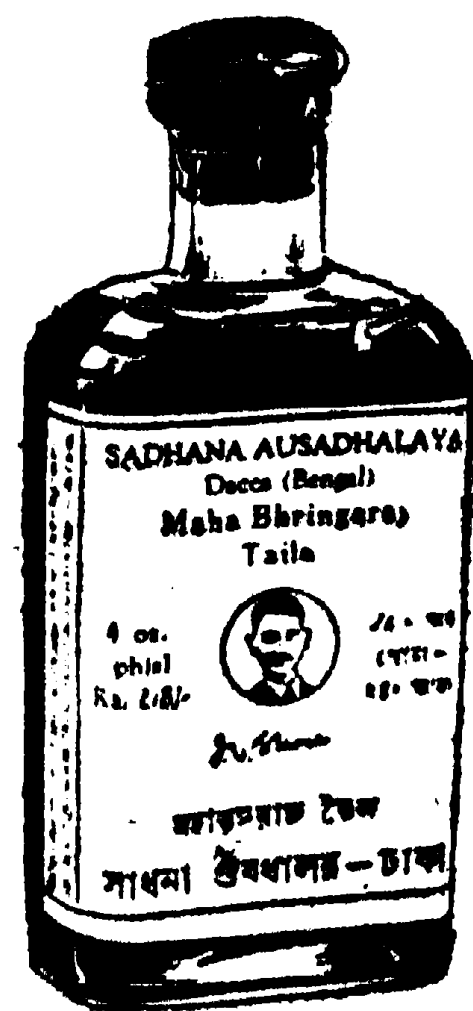
| উপন্যাস |

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভুবন প্রাণহরিকে টাকার কথা বলল: তার কিছু টাকা আছে, আরও আড়াই হাজার টাকা পেলেই সে নিজের ট্যাক্সি কিনতে পারবে। প্রাণহরি ভেবে দেখল, টাকা ধার দিলে ভুবন আর মোহিনী দুজনেই তার মুঠোর মধ্যে থাকবে; মোহিনীকে তখন হুকুম মেনে চলতে হবে। সে রাজি হল। রেজিষ্ট্রি দলিল তৈরি হল, তাতে ধার-শোধের শর্ত রইল—মোহিনীর মাইনের পনরো টাকা কাটা যাবে, ভুবন তার ট্যাক্সির রোজগার থেকে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা দেবে, আর প্রাণহরি নিজের দরকারে ট্যাক্সি ব্যবহার করবে তার জন্য পঁচিশ টাকা দেবে; এই ভাবে প্রতি মাসে পঁচাত্তর টাকা শোধ হবে।

সকলেই খুশী। ভুবন ট্যাক্সি কিনল। তিনজনে কয়লা শহরে এল। তারপর প্রাণহরি শহরের হালচাল বুঝে নিয়ে তার অভ্যস্ত লীলাখেলা আরম্ভ করল।

কয়লা ক্লাব হচ্ছে বড়লোকের আস্তানা, প্রাণহরি সেখানে গিয়ে ছিপ ফেলল। চারটি বড় বড় রুই কাৎলা তার ছিপে উঠল। সে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল।

জুয়া খেলার সময় মোহিনীকেও সকলে দেখল। বিশেষভাবে একজনের নজর পড়ল তার ওপর; অরবিন্দ হালদার চরিত্রহীন লম্পট, সে লোভে উন্মত্ত হয়ে উঠল। প্রাণহরি জুয়ায় চারজনকেই শোষণ করছিল, অরবিন্দ হালদারকে বেশী করে শোষণ করতে লাগল। অরবিন্দকে সে জানিয়ে দিয়েছিল যে, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া যায় না।

প্রাণহরির কাছে ছাড়পত্র পেয়ে অরবিন্দ হালদার সময়ে অসময়ে মোহিনীর কাছে আসতে লাগল। কিন্তু মোহিনী শক্ত মেয়ে, তাকে চোখে দেখে যা মনে হয় সে তা নয়। অরবিন্দের মতলব সে বুঝেছে, কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে তাকে তাড়িয়ে দেয় না। সে তার সঙ্গে খাতির করে কথা বলে, হয়তো হাসি মস্করাতেও যোগ দেয়, কিন্তু তার দেওয়া উপহার নেয় না। প্রাণহরি মোহিনীকে বোধ হয় ইশারা দিয়েছিল: ইশারার যতখানি স্বীকার করা সম্ভব মোহিনী ততখানি স্বীকার করে চলত। প্রাণহরি ঘুঘু লোক, স্পষ্টভাবে মোহিনীকে কিছু বলেনি; ভেবেছিল ইশারাতেই কাজ হবে। হাজার হোক মোহিনী নিম্নশ্রেণীর মেয়ে।

কিছুদিন চেষ্টা-চরিত্র করে অরবিন্দ বুঝলো, এ বড় কঠিন ঠাঁই। ওদিকে জুয়াতেও তারা অনেক টাকা হেরেছে। তারপর একদিন প্রাণহরির বেইমানি ধরা পড়ে গেল। জুয়া খেলা বন্ধ হল।

জুয়াতে যারা হেরেছিল তাদের সকলেরই রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অরবিন্দের রাগ হয়েছিল সব চেয়ে বেশী। কারণ সে শুধু জুয়াতেই ঠকেনি, অন্য বিষয়েও ঠকেছিল। ঠকেছিল এবং অপমানিত হয়েছিল। তাই সে একদিন তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে প্রাণহরিকে ঠেঙাতে গেল।

দৈবক্রমে যে ট্যাক্সিতে চড়ে তারা প্রাণহরিকে ঠেঙাতে গেল সে ট্যাক্সিটা ভুবন দাসের। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে অরবিন্দ বোধ হয় মোহিনীর সম্বন্ধে তার মনের আফসোস প্রকাশ করেছিল, ভুবন তার কথা শুনে বুঝল, প্রাণহরি দু হাজার টাকা নিয়ে তার বৌকে বিক্রি করেছে।

কয়লা শহরে ভুবনের বাসা ছিল না; প্রাণহরিও তার বাড়িতে ভুবনকে থাকতে দেয়নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ভুবন ফুরসৎ পেলেই চুপিচুপি এসে মোহিনীর কাছে রাত কাটিয়ে যেত। স্বামী-স্ত্রীতে কথা হত; হয়তো মোহিনী স্বামীকে ইশারা দিয়েছিল—বুড়োটা লোক ভাল নয়। ভুবন মনে মনে প্রাণহরিকে ঘৃণা করত। খাতকের সঙ্গে মহাজনের ভালবাসা বড়ই বিরল। কিন্তু ভুবন

সাবধানী লোক, সে বলত—ধারটা শোধ হলে ট্যাক্সি পুরোপুরি তার নিজের হয়ে যাবে, তখন তারা গাড়ি নিয়ে চলে যাবে, বুড়োর সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

প্রাণহরি যে এতবড় শয়তান তা ভুবন কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু যখন সে শুনল যে প্রাণহরি দু' হাজার টাকা নিয়ে তার বৌকে বিক্রি করেছে তখন তার মাথায় খুন চেপে গেল। দুনিয়ায় পয়সাওয়ালা লম্পট অনেক আছে, পরস্ত্রীর ওপর তারা নজর দেয়; তাদের ওপর ভুবনের রাগ নেই। কিন্তু ওই বুড়ো শয়তানটাকে সে খুন করবে।

খুন করবার সুযোগও হাতে হাতে এসে গেল। প্রাণহরির বাড়ির কাছাকাছি এসে চারজন আরোহী নেমে গেল। ভুবন ট্যাক্সির মুখ ঘুরিয়ে রাখল; তারপর সেও বেরুলো। তার হাতে মোটরের স্প্যানার।

ভুবন প্রাণহরির বাড়িতে প্রত্যহ দিনে রাত্রে দু'বার তিনবার এসেছে, সে জানতো বাড়ির পিছন দিকে ওপরে ওঠবার মেথর-খাটা সিঁড়ি আছে। সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে গেল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দোরে টোকা মারল।

দু' দিকের দোর বন্ধ করে প্রাণহরি নিজের ঘরে ছিল; সে বোধহয় জানতে পারেনি যে, তাকে চারজনে ঠেঙাতে এসেছে। কিন্তু সে হুঁসিয়ার লোক; টোকা শুনে স্নানের ঘরে গেল। তারপর যখন জানতে পারল যে ভুবন এসেছে তখন সে দোর খুলে দিল। কারণ ভুবনের ওপর তার কোনো সন্দেহ নেই।

দু'জনে শোবার ঘরে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল।

তাদের মধ্যে কোনো কথা হয়েছিল কিনা জানি না। ভুবনের বাঁ হাতে ছিল স্প্যানার, সে আচমকা স্প্যানার তুলে মারলো প্রাণহরির মাথায় এক কোপ। প্রাণহরি মুখ খোলবার সময় পেল না: তৎক্ষণাৎ পতন ও মৃত্যু।

ভুবন তখন সাবধানে সামনের দরজা খুলল। তার বোধ হয় মতলব ছিল সামনের দিকে সাড়াশব্দ না পেলে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে, পিছনের দরজা বন্ধ থাকবে। কিন্তু সামনে হয়ে তখন এরা চারজন সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছিল। তাই ভুবন সামনের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যে-পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে গেল। স্প্যানারটা সঙ্গে নিয়ে গেল। এখন পরিস্থিতি দাঁড়াল, সামনের দরজাও খোলা, পিছনের দরজাও খোলা। প্রাণহরির আততায়ী কোন দিক দিয়ে ঢুকেছে অনুমান করা শক্ত।

অরবিন্দ প্রথম বার প্রাণহরির দরজা বন্ধ পেয়েছিল; দ্বিতীয়বার চারজনে উঠে দেখল দরজা খোলা এবং প্রাণহরি গোন্দার ইহলীলা সম্বরণ করেছে। তারা দুদ্দাড় শব্দে পালালো। ট্যাক্সির কাছে ফিরে গিয়ে দেখল ট্যাক্সি-ড্রাইভার স্টীয়ারিং হুইলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। তারা ড্রাইভারকে জাগিয়ে শহরে ফিরে গেল।

ওদিকে মোহিনী রান্না করছিল সে কিছুই জানতে পারেনি। রান্নার ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দে দূরের শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল। রান্না শেষ হবার পর সে যখন দেখল বুড়ো খেতে নামছে না, তখন সে ওপরে গেল। সে দেখল প্রাণহরি মরে পড়ে আছে, সামনের এবং পিছনের দরজা খোলা। অরবিন্দের কথা তার মনে এল না। তার মনে এল ভুবনের কথা। যেখানে ভালোবাসা সেখানেই শঙ্কা। ভুবনকে সে ইশারা দিয়েছিল, বুড়ো লোক ভালো নয়। ভুবন বাইরে বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু তার ভিতরে আছে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের উগ্রতা। স্ত্রীর অমর্যাদা সে সহ্য করবে না।

মোহিনী মেয়েটা ভারি বুদ্ধিমতী। মড়া দেখেও তার মাথা খারাপ হল না, সে চট্ করে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। খুন যেই করুক, তাকে যেন পুলিস ধরতে না পারে। হত্যাকারী স্নানঘরের দোর দিয়ে ঢুকেছে এবং সেই দিক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছে, মোহিনীর তাতে সন্দেহ নেই। সে পিছন দিকের দরজা দুটো ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল, তারপর ট্রাক-ড্রাইভার মারফত পুলিসে খবর পাঠালো। কী সাংঘাতিক মেয়ে দ্যাখো, এতটুকু বাড়াবাড়ি করেনি। পুলিসকে ভুল রাস্তায় চালাবার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু করেছে।

মোহিনী আমাদের কাছে অনেক মিথ্যে কথা বলেছে, কিন্তু কখনো অনাবশ্যক মিথ্যে কথা বলেনি। ভুবনও তাই। আমার বিশ্বাস যে রাত্রে খুন হয় সেই রাত্রেই কোনো সময় ভুবন ফিরে গিয়ে মোহিনীকে সব কথা বলেছিল এবং তার [illegible] দেখা করে। এই

জন্যেই মোহিনী খুনের বাড়ি ছেড়ে যেতে চায়নি। ভুবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখা নিতান্ত দরকার।

যা হোক, আমি যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলাম তখন পুলিসের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়েছে চারজন আসামীর ওপর। মোটিভ্ এবং সুযোগ এদের পুরোদস্তুর বিদ্যমান। হয় এরা চারজনে একজোট হয়ে খুন করেছে, নয়তো ওদের মধ্যে একজন খুন করেছে অন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে।

পুলিসের সঙ্গে আমার মতভেদের কোনো কারণ ছিল না; তবু একজোট হয়ে খুন করার প্রস্তাবটা হজম করা শক্ত। সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা মধ্যভারতের ডাকাত নয়, তারা সমাজবাসী তথাকথিত সভ্য মানুষ। তারা দল বেঁধে খুন করবে না।

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন অন্য তিনজনের চোখে ধুলো দিয়ে খুন করে থাকতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে? সব চেয়ে বেশী সন্দেহ হয় অরবিন্দ হালদারের ওপর। সে শুধু জুয়াড়ী ঠকেনি, তার এক বিষয়ে ঠকেছে; যার জন্যে তার লজ্জার অবধি নেই। যে কথা সে কারুর কাছে স্বীকার করতে পারে না। লম্পটের লজ্জা এক বিচিত্র বস্তু; সে কেবল তখনি লজ্জা পায় যখন দু' হাজার টাকা খরচ করেও সে তার নির্লজ্জ কামনার বস্তু পায় না।

অনুসন্ধান আরম্ভ করে আমার খটকা লাগল। প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমার মনে মাথা তুলল সেটি হচ্ছে—মারণাস্ত্রটা গেল কোথায়? ডাক্তার ঘোষাল যে ধরনের বর্ণনা দিলেন সে রকম কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি; অরবিন্দের দলের কেউ যদি অস্ত্র আনতো তাহলে ফণীশ আর ভুবনের চোখ এড়াতে পারতো না। সুতরাং ওরা অস্ত্রটা আনেনি, নিয়েও যায়নি। তবে সেটা এল কোত্থেকে এবং গেল কোথায়?

দ্বিতীয় কথা, ডাক্তার ঘোষালের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, হত্যাকারী লোকটা ন্যাটা। ভেবে দ্যাখো, প্রাণহরির শোবার ঘরে একটা চেয়ার পর্যন্ত নেই; সে আততায়ীর দিকে পিছন ফিরে তক্তপোষের কিনারায় বসেছিল একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আততায়ী তাকে মেরেছে, আঘাত লেগেছে মাথার ডানদিকে সিঁথির মতন। সুতরাং আততায়ী ন্যাটা, তার বাঁ হাত বেশী চলে।

চারজন আসামীর মধ্যে কে ন্যাটা। খোঁজ করলাম। কয়লা ক্লাবে গিয়ে

দেখলাম, মৃগেন মৌলিক ডান হাতে টেনিস খেলছে, মধুময় সুর আর অরবিন্দ হালদার ডান হাতে তাস ভেঁজে তাস বাটছে এবং খেলছে। তখন ফণীশের দিকে কাঁচের কাগজ-চাপা গোলা ফেলে দেখলাম সেও ডান হাতে গোলা ধরল। ওরা কেউ ন্যাটা নয়।

কিন্তু ন্যাটা না হোক, ওদের মধ্যে কেউ সব্যসাচী হতে পারে। কাজেই ওদের একেবারে ত্যাগ করতে পারলাম না। ওরা ছাড়া সন্দেহভাজন আর কেউ নেই। মোহিনী খুন করেনি, তার খুন করবার ইচ্ছে থাকলে সে প্রাণহরিকে বিষ খাওয়াতো; তার মোটিভও কিছু নেই।

আমি কোনো দিকে দিশা খুঁজে পাচ্ছি না, এমন সময় এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল; যেন মেঘে ঢাকা অন্ধকার রাত্রে বিদ্যুৎ চমকালো। দেখলাম ভুবন তার ট্যাক্সির চাকার তলায় জ্যাক্ বসিয়ে বাঁ হাতে ঘোরাচ্ছে!

খুনের রাত্রে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভুবনেশ্বর দাস যে ওকুস্থলে উপস্থিত ছিল তা আমরা সকলেই জানতাম, অথচ তার কথা একবারও মনে আসেনি। একেই জি কে চেস্টারটন বলেছেন, অদৃশ্য মানুষ—Invisible Man.

অস্ত্রের সমস্যা এক মুহূর্তে সমাধান হয়ে গেল। স্প্যানার দিয়ে ভুবন প্রাণহরিকে মেরেছিল; ডাক্তার ঘোষাল মারণাস্ত্রের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে।

ভুবন বৌকে নিয়ে পালিয়েছে। ভারি বুদ্ধিমান লোক, আমি তাকে চিনেছি তা বুঝতে পেরেছিল। কোথায় গিয়ে তারা আস্তানা গাড়বে জানি না; মাদ্রাজ বোম্বাই কত জায়গা আছে। আশা করি প্রমোদবাবু ভুবনকে খুঁজে পাবেন না। কারণ, যদি খুঁজে পান নিশ্চয় তাকে সোনার মেডেল দিবেন না।

আর কিছু বলবার নেই। যদি কোনো কথা বাদ পড়ে থাকে তোমরা আন্দাজ করে নিতে পারবে। ভুবন আর মোহিনী চিরজীবন ফেরারী হয়ে থাকবে, যদি না ধরা পড়ে। প্রাণহরি পোদ্দারের নিষ্ঠুর লোভ দুটো মানুষের জীবন নষ্ট করে দিল, এ কাহিনীর মধ্যে এইটেই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

—সমাপ্ত—

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

লেখক সমবায়

কিছুকাল আগে সাহিত্যিকদের এক জমায়েতে সৈয়দ মুজতবা আলী বক্তৃতা প্রসংগে সাহিত্যিকদের মধ্যে যে পারস্পরিক ঈর্ষা এবং শ্রদ্ধার অভাব আছে তার উল্লেখ করেন। ফলে সভা-স্থলে কেউ কেউ গা টেপা-টেপি করেন, কেউ বলেন প্রকাশ্যে এ কথা না বললেই হত। সুতরাং বোঝা যায় কথাটি আলী সাহেব খাঁটি বলেছিলেন, তাই যথা স্থানে সংগে সংগে হিট্ করে। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, সাহিত্যিক-দের মধ্যে ব্যক্তিগত ঈর্ষা এবং বিদ্বেষ থাক্‌বেই, তবু প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের সেই গানের ভাষায়—'কখন হল ছাড়া-ছাড়ি গেলাম কে কোথায়, আবার দেখা যদি হল সখা, আয়রে বুকে আয়'। এখনও পোষাকী হৃদ্যতা বজায় আছে, পারস্পরিক কুশল প্রশ্ন ও শিষ্টাচার-সম্মত আলাপও হয়, আড়ালে যাই হোক্। এ অবস্থা ভারতের সর্বত্র। সম্প্রতি তরুণ কবি ডম মোরায়েস একখানি গ্রন্থ লিখেছেন ভারত পরিক্রমা করে। তাতে তিনি বোম্বাই শহরের সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি করেছেন এবং মুলকরাজ আনন্দের বক্তব্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এর কারণ সাহিত্যিকদের আত্মসচেতনত্ব, কিঞ্চিৎ অহমিকা, আর ব্যবসাগত ঈর্ষা, সুতরাং অতি স্বাভাবিক কারণ। আসলে কেউ মানুষ খারাপ নন। বৃত্তি এর জন্য দায়ী।

চিরদিন হয়ত এমন ছিল না; সাহিত্য অর্থকরী হওয়ার সংগে সংগে এইসব উপসর্গ এসে জুটেছে। আগের দিনে লোকে প্রশংসা করলে সংগত কারণেই করত, এখন প্রশংসা করলে সন্ধান করতে হয় এর পিছনকার হেতুটা কি! যাক্, আগের দিনের প্রসংগ না তোলাই ভালো, সমস্যা যখন বর্তমানের তখন বর্তমানেই ফিরে আসা কর্তব্য।

এই গৌরচন্দ্রিকার নির্গলিতার্থ এই যে, আমাদের সাহিত্যিকরা 'ওয়ার্কারস অব দি ওয়ারল্ড ইউনাইট' এই নীতিতে বিশ্বাসই নন। আমরা একতাবদ্ধ হতে পারি না বলে আমাদের বারো রাজ-পুতের তের হাঁড়ি। সংঘবদ্ধতা[illegible] কিছু করা বাঙালীর স্বভাবের বাইরে। আমাদের সাহিত্যের সভা-সমিতি জমে না। কোনো সাহিত্যিকগোষ্ঠী বা সমাবেশ গড়ে ওঠে না। সকলেই একক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। সাহিত্যিকদের সমবেত কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত করার মত কোনো প্লাটফর্ম নেই। যাই কেন আমরা করি না তার মোট ফল হয় শূন্য। এই কারণে একটা দলবদ্ধ সমিতি বা মঞ্চ থাকা প্রয়োজন। সকলে এই বিষয়ে চিন্তা করছেন, কিন্তু একটা সর্বজন-গ্রাহ্য কিছু গড়ে উঠ্‌ছে না।

বিজ্ঞানসম্মত সমবায় প্রথা অতি সাম্প্রতিককালে এ দেশে এসেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই সমবায় নীতি সম্পর্কে অনেক সময় ব্যয় করেছেন, তাঁর একটি ছোট গ্রন্থও আছে এই বিষয়ে। তিনি 'ভান্ডার' পত্রিকার জন্য যে কাজ করেছেন তা এই সমবায় আন্দোলনের সমর্থনে। নানা বিভাগে নানা ধারায় এই সমবায় নীতি আজ প্রচলিত। লেখকদের নিত্য প্রয়োজনে এই সমবায় নীতি যে কতখানি প্রয়োজনীয় তা আজকের দিনে বিশেষ-ভাবে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। লেখকরা সংঘবদ্ধভাবে সমবায় গঠন করে শুধু নিজেদের নয়, সেই সংগে নানা-বিধ প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী প্রকাশ করবেন, লাভের অংশ নিজেদের মধ্যে বখরা করে নেবেন, এর চেয়ে ভালো কর্ম আর হয় না। প্রয়োজন হলে নিজেদের 'বুলেটিন' বা পত্রিকা এই সমবায় মারফত গঠন করা সম্ভব। মহাকোষ, জীবনী-কোষ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এই সমবায়ের ভিত্তিতেই প্রকাশ করা সম্ভব। কোনো কোনো অঞ্চলে লেখকরা এই সমবায় নীতি গ্রহণ করে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং সেই সব অঞ্চলে কাজও আশানুরূপ হচ্ছে।

প্রথমে প্রকাশকরা একটা সমবায় সমিতি গঠন করেন, সমবায় ভিত্তিতে পাঠাগারের উপযোগী গ্রন্থাবলী প্রকাশে এ'রা উদ্যোগী হন। পুস্তকালয় সহায়ক সহকারী মন্ডল লিমিটেড নামে ১৯২৪-এর ৩১শে মার্চ গুজরাতে প্রথম এই ধরণের সমিতি গঠিত হয়। স্বর্গীয় শ্রীমতিভাই এন, আমিন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। যদিচ এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠাগারগুলির জন্য গ্রন্থ, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ক্রয় করে ন্যায্য-মূল্যে বিক্রয় করা, এ'রা (১) ছাত্রদের জন্য টেক্সট বই ছাপান এবং প্রকাশ করেন, (২) নিজেদের প্রেস আছে। [illegible]৫৮ পর্যন্ত এ'রা ৬৯ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে পনেরখানি পাঠাগার আন্দোলনের ইতিহাস এবং কলা-কৌশল, জীবনীকোষ, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি। এই মন্ডলের মূলধন ৩০-৬-১৯৫৮ তারিখে ছিল—৭,৩৩,২৪৩,১২ টাকা, এ'রা মোট লাভ করেছেন ২০,৬১২,৩৮ টাকা।

এই সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রকাশকদের, লেখকদের নয়। তবু লেখকরাও লাভবান।

কেরালার সাহিত্যিকরা ১৯৪৫-এ যে সমবায় সমিতি গঠন করেন তার নাম সাহিত্য প্রবর্তক কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, কোট্টায়েম। বারো-জন লেখক, কবি, উপন্যাসকার প্রভৃতি নিজেদের গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং নিজেরাই বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এ'দের কোনো ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না, অভিজ্ঞতা ছিল না। সংক্ষেপে এ'দের নাম S P C S। এক নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই সমবায় সমিতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল, এ'দের সাহিত্য-চিন্তা নূতন ধারায়, নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা হল নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বিশ্ব-সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থাবলী তাঁরা অনুবাদ করেছেন, ভারতীয় ভাষার গ্রন্থও অনুবাদ করেছেন। S P C S-এর উদ্দেশ্য (১) নতুন লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশের সমস্যা হ্রাস করা, (২) লেখক-দের ন্যায্য সম্মান-মূল্য দান, (৩) প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর উপযুক্ত বিক্রয় ব্যবস্থা, (৪) সাহিত্যকর্মকে সম্মানিত অর্থকরী কর্মে পরিণত করা। এ'দের প্রাথমিক মূলধন ছিল ১২৫ টাকা মাত্র। বারোজন সদস্য নিয়ে গঠিত এই সমিতির বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৩৭৫, মোট মূলধন ২,০০,০০০। কেরালার শতকরা নব্বইজন লেখক এর সংগে সংযুক্ত। ১০০০ সহযোগী সদস্য

আছেন, তাঁরা বিশেষ ক্রয় সুবিধা পেয়ে থাকেন। সদস্যগণ লিখিত প্রায় ১০০০ গ্রন্থ এ'রা প্রকাশ করেছেন। S P C S দাবী করেন বিগত দশ বছরে মালায়ালম সাহিত্যের শতকরা ত্রিশ ভাগ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এ'রা প্রকাশ করেছেন। এই সমিতি প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর শতকরা ত্রিশ ভাগ মূল্য পেয়ে থাকেন লেখক, তাছাড়া একটা বোনাসও তাঁর প্রাপ্য।

উপরের দুটি সমিতির বিস্তারিত বিবরণদানের উদ্দেশ্য এই যে, প্রকাশক এবং লেখকদের সমবায় সমিতি একটি লাভজনক এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তা পাঠকদের বিবেচনা করার পক্ষে সহায়ক হবে। গুজরাত এবং কেরালা-সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য আমি ন্যাশানাল লাইব্রেরীর এ্যাসিষ্ট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্তের কাছে ঋণী। তাঁর প্রবন্ধ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি।

আমাদের বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবীরা 'সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের একনিষ্ঠ অনুশীলনে রুচি এবং পরিচ্ছন্নবোধের প্রয়োজন' এই চিন্তা নিয়ে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে 'লেখক সমবায় সমিতি' গঠন করেছেন এবং রেজেষ্ট্রীকৃত করাও হয়েছে। এই সমিতির পুরোভাগে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী এবং সাংবাদিকদের নাম আছে, তবে বোধকরি একমাত্র স্বর্গতঃ অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ব্যতীত সক্রিয় সাহায্য আর বিশেষ কেউ করেননি। এই সমবায়ের সম্পাদক শ্রীচঞ্চল চট্টোপাধ্যায়। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশের লেখক সমবায়ের কর্মে বিশেষ সাড়া জাগেনি, অর্থাৎ সদস্যসংখ্যা এক বছরে তেমন বাড়েনি। সৎ এবং সুনির্বাচিত সাহিত্য প্রকাশের দায়িত্ব এ'রা গ্রহণ করেছেন। এ'রা জীবনীকোষ, গ্রন্থপঞ্জী, অভিধান, বিশ্বকোষ প্রভৃতি প্রকাশের আশা রাখেন। বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই লেখক সমবায় গঠন এক বিশিষ্ট পথচিহ্ন। লেখকদের জন্য আজ আমাদের দুঃস্থ সাহিত্যিক পরিজন সাহায্য ভান্ডার গঠন করতে হয়েছে। যে সব সর্বজনমান্য মৃত সাহিত্যিকদের পরিবারবর্গকে এই সাহায্য গ্রহণ করতে হয় তা জানলে পাঠকবর্গ স্তম্ভিত হবেন। লেখকের অবস্থাও নটের মত। অমৃত বসু বলেছিলেন—'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'। মৃত্যুর সঙ্গেই বাঙালী সাহিত্যিকেরও সব যায়। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা ভুলেছি, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্মৃতপ্রায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ক্রমে ভুলে যাব, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র সাফল্য তাঁকে আরো বহুকাল বাঁচিয়ে রাখবে। জগদীশ গুপ্তের, মোহিতলাল মজুমদারের পারিবারিক অবস্থা আজ অতি শোচনীয়।

এই সব কারণে বাংলা দেশের লেখক সমবায়ের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। যথাসময়ে একদল ভেদবুদ্ধিরহিত স্বার্থত্যাগী সাহিত্যিক এই কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের সামনে আছে কেরালার আদর্শ। যদি বাংলা দেশের সাহিত্যিক সমাজ এবং সাহিত্যানুরাগীরা নিজেদেরই স্বার্থে এই 'লেখক সমবায়কে' গড়ে তুলতে পারেন তাহলে একটা ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদিত হবে।

অতি অল্প মূলধনে এ'রা কাজ আরম্ভ করেছেন, সৎ সাহিত্যের পরিবেশনে এ'দের সংস্থা ক্রমে উন্নতিলাভ করবে। তরুণ লেখকদের উৎসাহ এবং প্রবীণের আশীর্বাদে যদি বাংলার সাহিত্যিকরা সমবেত প্রচেষ্টায় এই লেখক সমবায়কে জয়যুক্ত করে তুলতে পারেন তাহলে বাংলা দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মর্যাদা আরো বাড়বে, এই আশা করি।

নতুন বই

বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা—ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ। পরিবেশক : ভারতী লাইব্রেরী, ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলি-১২। দাম—চৌদ্দ টাকা।

'হাসো আর মেদস্ফীত হও'—কথাটা ইংরেজী সুভাষিতাবলীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও প্রবচনের হাটে তার দাম আছে। সে-দাম কষে দেখলে অনেক পান-মরা বাদ দিয়ে ইংরেজ মনের নিখাদ সোনাটুকুর সন্ধান মেলে। ডক্টর অজিতকুমার সেই সোনা কষে দেখতে এগিয়ে এসেছেন বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালী চরিত্রে। তিনি সরাসরি বঙ্গভারতীর অঙ্গনে না এসে হাসির উৎস খুঁজেছেন, তার শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব কোনো দিকটাই বাদ রাখেননি; এমনকি মানুষেতর প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের হাসির ব্যাখ্যাও করেছেন; বাঙালীর হাস্যবোধকে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেও বিচার করে দেখেছেন। আর তা করতে গিয়ে বাঙালী জীবনের আরশি বঙ্গ সাহিত্যের ছড়া, প্রবচন, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা থেকে শুরু করে

কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ পর্যন্ত তাঁর কষ্টিপাথরে নিখুঁতভাবে কষিত হয়েছে। তিনি এত কথা বলতে গিয়ে কোথাও দায় সারেননি, বুড়ি-ছোঁয়া করেননি, তাই তাঁর গ্রন্থখানি হয়ে উঠেছে হাস্যরসতত্ত্বের একখানি বৃহৎ কোষ বা সাইক্লোপিডিয়া। তাঁর পুস্তকখানি যে শুধু পন্ডিত এবং পরীক্ষার্থীজনের সহায়িকা হিসেবে রচিত একথা একবারও মনে হয় না, বরং তা রসলুব্ধ গৌড়জনগ্রাহ্য বলেই বার বার জানান দিয়ে যায়। তার কারণ, তাঁর তথ্য আর তত্ত্ব পরিবেশনে তিনি শুষ্ক পান্ডিত্যের ধারা অবলম্বন করেননি, তাঁর প্রসাদ-গুণ-জারিত ভাষা তাকে সরস করে তুলেছে, অথচ সে সরসতা তো ডক্টর শিরোপাকামীদের গবেষণা-গ্রন্থে বিরল (প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ্য যে, এখানি তাঁর ডি-ফিল উপাধির গবেষণা-গ্রন্থ)। তার উপরে তাঁর পুস্তকে বঙ্গ সাহিত্যের রসভান্ডার থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতিগুলিও পাঠককে প্রতিক্ষণেই হাতছানি দিচ্ছে বঙ্গ সাহিত্যের গভীরে প্রবেশের অন্তরঙ্গ আমন্ত্রণে, এইখানেই তিনি ওস্তাদ, হাজারো তারিফের দাবিদার। কিন্তু খুঁতানুসন্ধিৎসা সমালোচকের স্বভাব, সেই স্বভাব বজায় রাখতে গিয়ে বলতে হল, এহেন পুস্তকেও দু-একটি ত্রুটি চোখে পড়েছে। যেমন—বইখানির সাজানো-গোছানোটা তেমন মনে ধরেনি। তাছাড়া সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের বিচারে লেখক বড়ই কৃপণ। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সুলিখিত নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় যে ক'জনের রসের ভিয়েনের সন্ধান দিয়েছেন, তিনি তাও দেননি।

নজরুল-চরিত মানস— ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত। প্রকাশক: নবযুগ প্রকাশনী। পরিবেশক: ভারতী লাইব্রেরী, ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-১২। দাম— দশ টাকা।

নজরুল-স্মৃতির ফসল বাংলা দেশে বহু ফলেছে। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু-মণ্ডলীর মুজফ্‌ফর আহমদ, শৈলজানন্দ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, মঈনুদ্দীন, বেগম সামসুন নাহার ও হবিবুল্লা বাহার প্রভৃতি বহুজনই সে ফসল ফলিয়েছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহের হোসেন থেকে শুরু করে বহু সুধীজনই তাঁর মানসের নানাদিকের আলোচনাও করেছেন। কিন্তু এই প্রথম চরিত ও মানস নিয়ে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ রচিত হল। এইসব গ্রন্থের মুখ্য দোষ, যুগ এবং পরিবেশকে এড়িয়ে যাওয়া। অথচ যুগ এবং পরিবেশই কবিকে জন্ম দেয়, তাঁর প্রতিভাকে লালন-পালন করে। যুগই তাঁকে ঘিরে ধরে, আবার যুগকে কোথাও কোথাও উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মহান মহতো মহীয়ান হয়ে ওঠেন। ডক্টর সুশীলকুমার সে-দোষে দোষী নন। যে পরিবেশ কবিকে উৎক্ষিপ্ত করেছিল বাংলা সাহিত্যে, সেই পরিবেশকে তিনি চমৎকারভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন, বৈজ্ঞানিক এবং কবি-মন নিয়ে তিনি কবি-প্রতিভার বিশ্লেষণও করেছেন। কোথায় কবির ত্রুটি, কোথায় তিনি মহান তা বার বার তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণীতে ধরা পড়েছে। বইখানি সাজানোও হয়েছে নিখুঁতভাবে, কোথাও ত্রুটি চোখে পড়ে না। তবে পরবর্তী কবিদের উপর নজরুলের প্রভাব-সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বিতর্কের বিষয়। কোনো কোনো সমালোচকের কাছে সাম্প্রতিক মুসলিম কবিগণের উপরে তাঁর প্রভাবের অনুল্লেখ একটি বড় ত্রুটি হয়েই দেখা দেবে। এদিকে অন্য কবির কথা জানিনে, কিন্তু বেনজির আহ্‌মদ ও গোলাম কুদ্দুস তো তাঁরই সাক্ষাৎ-শিষ্য। তাছাড়া ইদানিং-এর পূর্ব-পাকিস্তানের কবিদের উপর তাঁর প্রভাবের পরিচয় দেওয়া হয়নি বলে কেউ-কেউ অভিযোগও করতে পারেন। সেখানে বক্তব্য, পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কবিকুল সুধীন্দ্র-জীবনানন্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত। শুধু এ'দের মধ্যে ফররুক আহমদের দল নজরুলের ইসলামি কবিতার ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন, কিন্তু তাঁর উদ্দীপনাময়ী কবিতার খাতে নিজেদের সৃষ্টিকে বহাতে পারছেন না। অথচ নজরুল তো মুসলিম জনসাধারণেরই প্রতীক।

রবীন্দ্র-চরিত— শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রণীত এবং পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতির পক্ষে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০, মূল্য দেড় টাকা।

কবিগুরুর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতির পক্ষে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-চরিত' গ্রন্থখানিকে রবীন্দ্রনাথের জীবন-চরিতের রূপরেখা বললে অত্যুক্তি হয় না। যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই রূপরেখারই প্রয়োজন, পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত সে উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক নয়। সেই উদ্দেশ্য হল 'বাংলা বর্ণজ্ঞান আছে অথচ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান নাই এমন লোকের' জন্যে একখানি রবীন্দ্র-জীবনী রচনা করা ও প্রকাশ করা। বলা বাহুল্য এরূপ লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয় এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য তথা জীবন সাধনার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটাতে হলে এই ধরনের একখানি সহজপাঠ্য ও সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে 'রবীন্দ্র-চরিত' নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

গ্রন্থকার শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য ক্ষুদ্র পরিসরে রবীন্দ্র-জীবনের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য ঘটনারই সমাবেশ করেছেন এ বই-এ। তবে বইখানিতে অতি দ্রুত রচনার ছাপ স্পষ্ট। সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে লেখা হলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যেও আরও তথ্য সন্নিবেশ করা যেত বলে মনে হয়। তা ছাড়া দ্রুততা-জনিত কিছু ভুলও চোখে পড়ল। উদাহরণ স্বরূপ ২৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'বিসর্জন প্রকাশিত হইল বাংলা ১২৯৭ সালে (ইং ১৮৯০), কবির বয়স তখন উনিশ।' এ উনিশ উনত্রিশ হবে নাকি? ৭৪ পৃষ্ঠার 'কলিকা' কবিতাটির শেষ স্তবকের উদ্ধৃতিতে ভুল আছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে'র স্থানে হবে 'চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে'। বাংলার গ্রাম-জীবনের সঙ্গে কবির যে পরিচয় হয়েছিল তার কথা এ বইখানিতে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলে ভাল হত। যাই হোক, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'রবীন্দ্র-চরিত' বইখানি প্রশংসার্হ। কবির দুই বয়সের দুটি সুমুদ্রিত প্রতিলিপি বইখানার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেছে। মুদ্রণ ও বাঁধাই সুন্দর।

গৃহকোণ
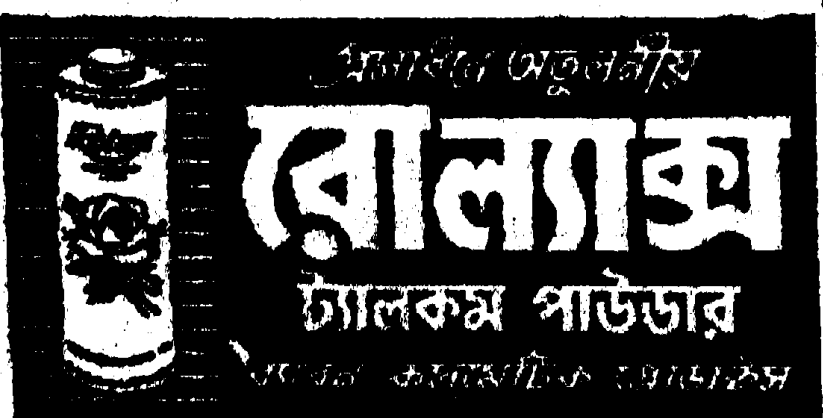
অণিমা বসু
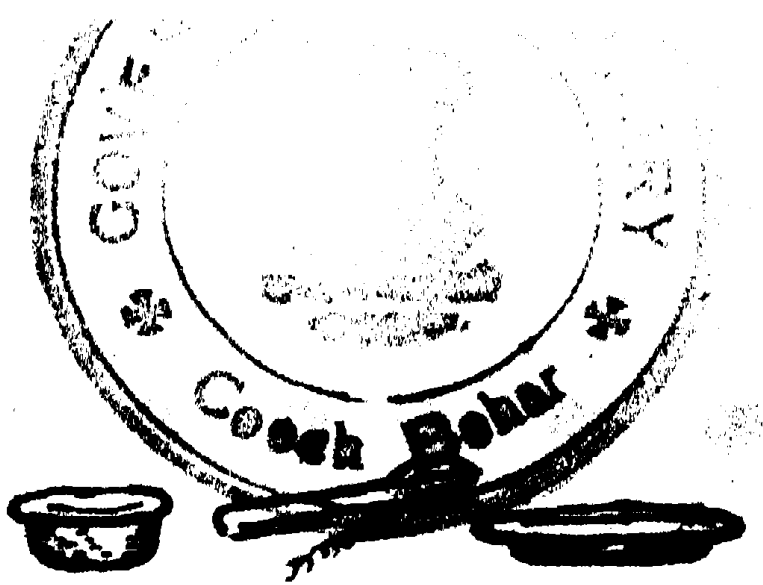
এটা গতির যুগ, দ্রুততার যুগ। কোনো কাজে-কর্মে—চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি কোনো ব্যাপারেই অযথা কালক্ষেপণ কেউ আজকাল বাঞ্ছনীয় মনে করে না। তাই আজকাল পৃথিবীর নানা দেশে জরুরী প্রয়োজনে যখন-তখন ব্যবহারোপযোগী অনেক জিনিস তৈরি হচ্ছে, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য। এই যেমন আমেরিকায় চা, কফি, ইত্যাদি। প্রয়োজন-মতো যখন-তখন এই সব পানীয় ব্যবহারে সে দেশে কোন হাঙ্গামা পোহাতে হয় না, প্রায় রেডি-মেড হিসাবেই মিলে। দুধ, চিনি, চা-কফি পৃথক পৃথক ভাবে মিশিয়ে পানীয় তৈরি করতে বেশ সময় লাগে, হাঙ্গামাও যথেষ্ট। তাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঐ বস্তুগুলোর এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে প্রয়োজনমতো এক লহমার মধ্যেই পানীয় হাজির করা যেতে পারে। জাপানও এ সব ব্যাপারে পিছিয়ে নেই, দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সেখানে শুধু চা-কফিই নয়, দরকার পড়লে বছরের যে কোনো সময়ে চেরি ফুলও পাবেন। আমেরিকাবাসীদের মনে একটা প্রতি-যোগিতার ভাব আছে,—কিভাবে সকলের আগে নতুন-কিছু করা যায়। প্রাচ্য দেশ-গুলোর আবার সে ভাব নেই; যখন হয় হবে, এই ভাব। তা সত্ত্বেও জাপান এই দিকে এতটা অগ্রসর হয়েছে যে আশ্চর্য!

বস্তুত গত কয়েক শতাব্দী যাবতই পাশ্চাত্য দেশসমূহে যখন-তখন-ব্যবহারো-পযোগী খাদ্যদ্রব্যাদির প্রচলন আছে। সুদূর পেরুর কথাই ধরুন। ওখানে আলুর গুঁড়ো ব্যবহৃত হচ্ছে বহু কাল থেকে। সারা রাত আলু বরফে জমিয়ে রাখা হয়; পর দিন ওগুলো খুব করে মাড়িয়ে জলটা বার করে ফেলে রেঁদে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে যে বস্তু তৈরি হল সেটা হচ্ছে ডেলা ডেলা আলুর গুঁড়ো। ঐ জিনিসটা কৌটা ভরতি করে রাখা হয় প্রয়োজনমতো ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। এস্কিমোরা ও রেড ইন্ডিয়ানরা বহু কাল আগে থেকেই এই ধরনের খাদ্য-বস্তুর ব্যবহার জানত। দীর্ঘপথযাত্রী রেড ইন্ডিয়ানদের পক্ষে জমিয়ে রাখা পেমিকান ও গোমাংস ছিল অপরিহার্য। আর দারুণ শীতের সময়েও শুকনো মাছ, শুকনো আঙুর ইত্যাদির উপরেই এস্কিমোদের নির্ভর করতে হত।

আমেরিকায় এই টিন ভরতি খাদ্য-বস্তুর প্রথম প্রচলন শুরু গৃহযুদ্ধের সময় থেকে। সৈন্যবাহিনীর দুঃখ-দুর্দশার ত যেন অন্তই ছিল না; তাতে আবার ছিল না ভাল কোনো পানীয়। অতি নিকৃষ্ট জাতীয় একটা গরম পানীয় তাদের দেওয়া হত। তার রংটা ছিল কফির মতো; কিন্তু আদতে সেটা যে কী চীজ ছিল বলা কঠিন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রক্ষিত আসল কফি বাজারে দেখা দেয় তার সত্তর বছর পরে, ব্রাজিলের কফি উৎপাদনকারীদের জরুরী তাগিদের ফলে। ব্যাপার এই যে, তখন কফি উৎপাদন ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক। বাড়তি কফি ফেলে দেওয়া হত সমুদ্রে কিংবা ব্যবহৃত হত কম্পপীয় যন্ত্রের জ্বালানি হিসাবে। মস্ত সমস্যা দাঁড়াল কফির উৎপাদন নিয়ে। এই সময়ে চকোলেট প্রস্তুতকারক নেস্‌লে কোম্পানী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রিজার্ভ করার ব্যাপার নিয়ে ভাবছিল। ব্রাজিলের কফি উৎপাদনকারীরা অগত্যা ঐ কোম্পানীর শরণাপন্ন হয় এবং তাতে কার একটা সমাধান হল ঐ সমস্যার। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমে-রিকার সৈন্যরা যে কফি পেল তাতে কফির আমেজ এবং রং পুরোপুরিই বর্তমান ছিল।

আর আজকাল ত কৌটাজাত খাদ্য-বস্তুতে ছেয়ে গেছে আমেরিকার বাজার। কেবল চা, কফিই নয়, হরেক রকমের পানীয়। প্রেসারাইজড্ পাত্রাদির আবি-র্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নানারকমের খাদ্যবস্তু রক্ষিত হতে লাগল। আর কেবল খাদ্যদ্রব্যই নয়? যথা, ক্ষৌরকার্যের সাবানের ফেনা, হেয়ার স্প্রে, দুর্গন্ধ দূর করবার রাসায়নিক দ্রব্য, কফি ক্রীম, কাটা-ছেঁড়ার ওষুধ এবং এমনকি মোটর গাড়ির তেল। রাসায়নিক গবেষণার ফলে আরো অনেক দ্রব্য রক্ষা করবার পদ্ধতি এখন জানা গেছে। এই যেমন ফলমূলের রস, সুপ, কেকের উপাদান, খোসা ছাড়ানো আলু ইত্যাদি হাজারো রকমের জিনিস।

দেখা যাচ্ছে, এই সমস্ত খাদ্যবস্তুর ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়ছে। পরিসংখ্যানটা একবার দেখুন। একমাত্র আমেরিকাতেই প্রতি তিন কাপ কফির এক কাপ তৈরি হয় রক্ষিত পাউডার থেকে। ইংরেজ জাতি কিন্তু নতুন-কিছু বড় একটা সহজে গ্রহণ করে না; তথাপি তারাও প্রতি তিন কাপ কফির দু'কাপই তৈরি করে থাকে পাউডার দিয়ে। ফ্রান্স অবশ্য এইসব বিষয়ে কিছুটা রক্ষণশীল: সে দেশের হার প্রতি আট কাপে এক কাপ। এই ব্যবসার কারখানার মালিকরা বছরে দশ কোটি ডলার ব্যয় করে থাকে কেবল যন্ত্রপাতি ও গবেষণায়। যে হালচাল, তাতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই ধরনের জিনিসপত্রের ব্যবহার দ্বিগুণ বেড়ে যাবে বলে মনে হয়। আর এইভাবে যদি বেড়ে চলে তাহলে ১৯৭১ সনের মধ্যে পারিবারিক জীবনযাত্রায় মস্ত পরিবর্তন এসে যাবে। তবে এমন কতকগুলো জিনিস আছে, যা নিশ্চয়ই প্রয়োজন মতো যখন-তখন পাওয়া যাবে না; এই ধরুন যেমন সাহিত্য, শিল্পকলা, সুখ ইত্যাদি!

আমাদের দেশে আজও পর্যন্ত চা, কফির পাউডারের প্রচলন হয়নি বটে; তবে কিছুকাল যাবৎ, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে নানা খাদ্যবস্তুর ব্যবহার শুরু হয়েছে; অবশ্য প্রায় সবই বিদেশ থেকে আমদানী। তবে কিনা এই ধরনের একটা শিল্প অনেককাল থেকেই প্রচলিত আছে এ দেশে, যদিও বিজ্ঞানসম্মতভাবে নয়। এই যেমন শুঁটকি বা শুকনো মাছ; তা ছাড়া আদিকাল থেকে ঘরে ঘরে আমসত্ত্ব, আমচুর, কুল, তেঁতুল, লেবুর আচার ইত্যাদিও তৈরি হয়ে আসছে—যদিও ব্যবসার খাতিরে নয়। ব্যবসার প্রয়োজনে আমের রসটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জমিয়ে রাখার কারখানা এ দেশে চলতে পারে এবং শুনেছি এই বিষয়ে গভর্ণমেন্টের একটা পরিকল্পনাও আছে।

প্রদর্শনী

কলারসিক

চার শিল্পী : এক প্রদর্শনী

ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে চারজন শিল্পীর একটি চিত্র-প্রদর্শনী সপ্তাহকাল চলার পর গত ২১শে জুন তারিখে শেষ
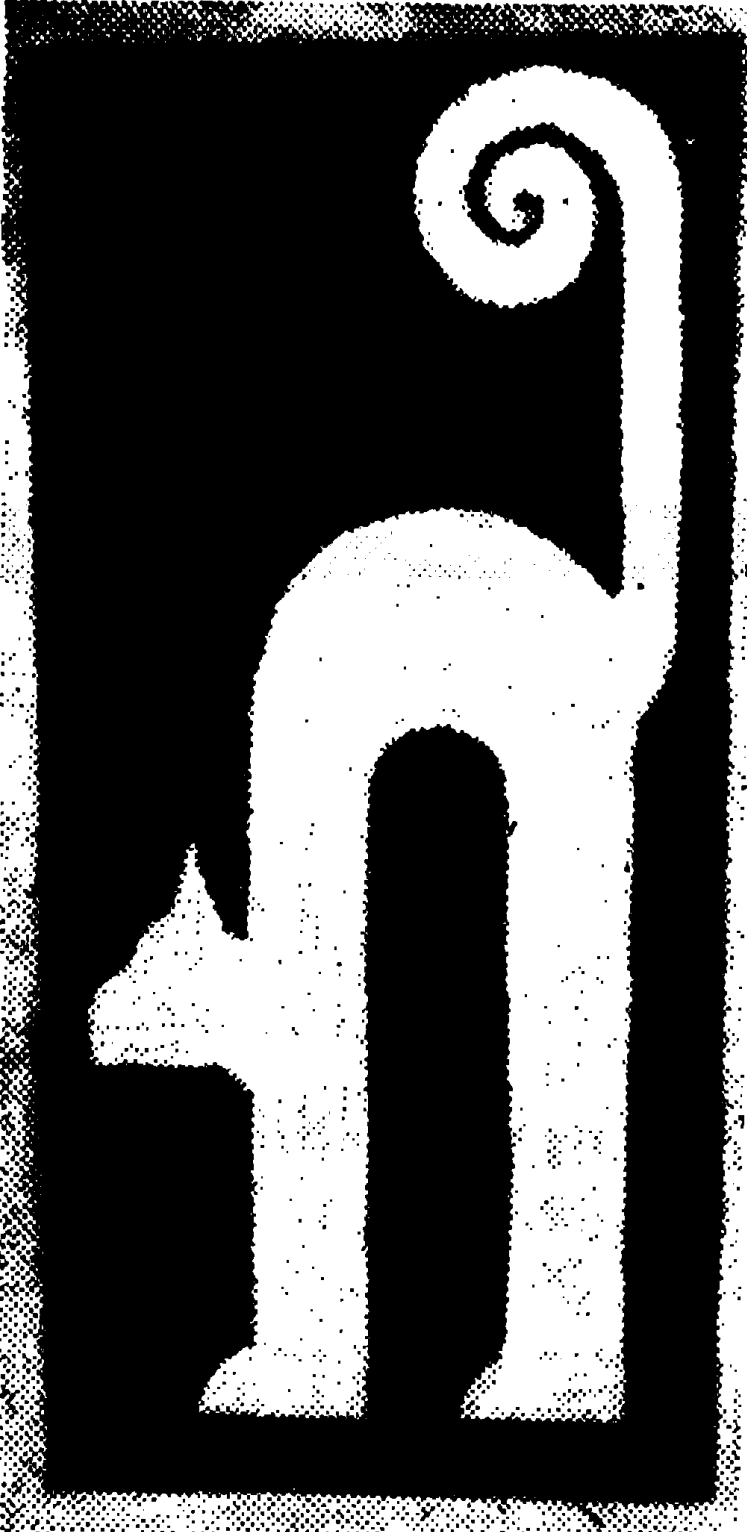
নিদ্রাভঙ্গের পর — তারাদাস চ্যাটার্জী

হল। চারজনই তরুণ শিল্পী। শ্রীমতী অনীতা রায়চৌধুরী ও শ্রীঅরুণকুমার মুখার্জী কলকাতার সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। শ্রীতারাদাস চ্যাটার্জী ও শ্রীমিলু ব্যানার্জীর ভাগ্যে কোনো একাডেমিক শিক্ষার সুযোগ ঘটেনি। এ'রা দু'জন নিজ প্রচেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন শিল্পকলার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে। তাই চারজন শিল্পী এক প্রদর্শনীতে মিলিত হলেও এ'দের চিত্র-নিদর্শনে পরিস্ফুট হয়েছে ভিন্ন মেজাজ, ভিন্ন সুর। শ্রীমতী রায়চৌধুরীর শিল্প-মাধ্যম মুখ্যতঃ অয়েল-প্যাস্টেল এবং ওয়াটার-প্যাস্টেল। শ্রী চ্যাটার্জীর মাধ্যমও ঐ একই মিশ্র রং। কিন্তু মন ও মেজাজ দু'জনের দু'দিকে ধাবিত। শ্রীমতী রায়চৌধুরীর আবেগপ্রবণ মনকে স্পর্শ করেছে বহুবর্ণ রঙের দ্যুতি ও প্রকৃতির সুরস্পন্দন। শ্রী চ্যাটার্জীর আবেগ বুদ্ধিতে পরিশুদ্ধ এবং বাস্তবধর্মী। শ্রী মুখার্জীর মাধ্যম গ্রাফিক কলা-কৌশল। 'উডকাট' ও 'লিনোকাট'-এর আলো-আঁধারীর খেলায় তিনি বিধৃত করেছেন আমাদের নিত্য দেখা জীবনের ছন্দিত রূপ। আর, শ্রী ব্যানার্জীর মাধ্যম মুখ্যতঃ তৈল-রঙ। সেই তৈল-রঙে তিনি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর লন্ডন-বাসের বিবর্ণ ছবি।

তবু এই চার শিল্পী এক প্রদর্শনীতে মিলেছেন। সম্ভবতঃ মিলতে বাধ্য হয়েছেন। বাঙলাদেশে তরুণ শিল্পীদের পক্ষে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করা বেশ ব্যয়সাধ্য। তা'ছাড়া একজন শিল্পীর ন্যূনতম যে পরিমাণ শিল্প-কর্ম একটি প্রদর্শনীর জন্য অপরিহার্য সব তরুণ শিল্পী সেই পরিমাণ চিত্র-নিদর্শন সৃষ্টি করতে পারেন না সব সময়। ফলে, দল-বদ্ধভাবে প্রদর্শনী করার প্রয়োজন অনু-ভূত হচ্ছে। এটা সুলক্ষণ। তরুণ শিল্পীরা এইভাবে প্রীতির সম্পর্ক যেমন গড়ে তুলতে পারবেন, তেমনি বাঙলার শিল্পরসিক ব্যক্তিগণ তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এই চারজন ভিন্ন-ধর্মী শিল্পীর মিলিত প্রয়াসকে তাই আমরা অভিনন্দন জানাই।

এই প্রদর্শনীতে প্রত্যেক শিল্পীর চখানা করে চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। [illegible] কক্ষের ৩২খানি ছবির মধ্যে কয়েকখানি ছবি আমার অন্ততঃ বেশ ভাল লেগেছে। শ্রীমতী অনীতা রায়-চৌধুরী তাঁর ভাবপ্রবণ মন নিয়ে 'ফাল্গুন' চিত্রে (২৫ নং) সবুজ রঙের উপর ঈষৎ হলুদ ও গোলাপী রঙের বর্ণলেপনের মাধ্যমে যে আবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন দর্শক-মনে তার আবেদন ব্যর্থ হয়নি বোধহয়। 'মর্মর' ও 'স্পন্দন' (২৭ ও ২৮ নং) চিত্রেও শিল্পীর বিমূর্ত ভাবাবেগে জলরঙ ও প্যাস্টেলের সংমিশ্রণে রঙ ও রেখায় আভাসিত হয়েছে বলা যায়। কিন্তু শ্রীমতী রায়চৌধুরীর ছবি দেখে একটা কথা আমার মনে হল। আধুনিক বিমূর্ত শিল্পকলার যাঁরা সাধক তাঁরা বাস্তবের ভাঙ্গা-চোরা, ছেঁড়া-খোঁড়া বা যন্ত্রণা-জর্জর জীবন ও মনকে যেভাবে তুলে ধরতে চাইছেন নানা রঙে আর রেখায়, শ্রীমতী রায়চৌধুরী কিন্তু তাঁর চিত্র-কলায় সেই যন্ত্রণা-জর্জর জীবনকে ধরার একটুও চেষ্টা করেননি। তাঁর রচ-নায় যেন গীতি-কাব্যের বিমূর্ত ভাবনাই রঙে-রেখায় ফুটে উঠতে চেয়েছে। ভাল

বিশ্রাম — অরুণ মুখার্জী

লাগে কিন্তু মনন-ক্রিয়ায় খুব বেশ নাড়া লাগে না তাঁর ছবি দেখে। শ্রীমতী [illegible] রায়-চৌধুরীর মধ্যে প্রতিশ্রুতি আছে। আশা করবো, শিল্পী হিসাবে তিনি সার্থক পরিণতির দিকেই অতঃপর যাত্রা করবেন।

শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়ের ছবি দেখে আনন্দিত হয়েছি। আমাদের দেশে 'উডকাট' কিংবা 'লিনোকাট'-এর মাধ্যমে চিত্র-সৃষ্টির দিকে খুব বেশী তরুণ শিল্পী অগ্রসর হচ্ছেন বলে মনে হয় না। অথচ, এই প্রাচ্য মহাদেশে চীন তার 'উডকাট' ও 'লিনোকাটে'র সাহায্যে বিশ্ব-বাসীকে মুগ্ধ করেছে। কী [illegible]ভাবে, কী নিষ্ঠা নিয়ে এই কাজে চীনা শিল্পীরা লিপ্ত, কলকাতার অনেক প্রদর্শনীতে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টির মধ্যে এই বিরাটত্ব নেই সত্যি কিন্তু নিষ্ঠা ও দক্ষতায় তা সমুজ্জ্বল। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের 'পাঠরতা' (২২ নং), 'সঙ্গীত-সাধক' (২৪ নং) ও 'বিশ্রাম' (২১নং) চিত্র তিনটি লিনোকাট হিসাবে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি এই চিত্রে লিনোকাটের সাহায্যে চমৎকার জমিন সৃষ্টি করে বিষয় অনুযায়ী যেভাবে আলো-ছায়ার বৈপরীত্যে সাদা ও কালো রঙকে ব্যবহার করেছেন তা সত্যি উপভোগ্য। তা'ছাড়া তাঁর চিত্র-সংস্থাপন এবং ড্রয়িং যেমন নিখুঁত, তেমনি জীবন্তরেখায় ছন্দিত। শ্রী মুখোপ্যাধ্যায়ের একটি মাত্রই 'উডকাটের' নিদর্শন ছিল এই প্রদর্শনীতে। ছবিটির নাম 'গ্রাম-প্রান্তে' (১৭ নং)। ছবিটিতে বিখ্যাত শিল্পী রমেন্দ্র চক্রবর্তীর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। অরুণবাবু শিল্পের যে মাধ্যম বেছে নিয়েছেন তাতে জয়যুক্ত হোন, আমরা এই কামনাই করি।

এই প্রদর্শনীতে শিল্পী তারাপদ চ্যাটার্জীর চিত্র বোধহয় সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছে। অল্প-শিক্ষিত এই শিল্পী 'ক্রীড়ারত' (৯নং) ও 'নিদ্রাভঙ্গের পর' (১৩ নং) ছবি দু'খানিতে যেভাবে দু'টি বিড়ালের ক্রোধ-উন্মত্ত রূপ এবং নিদ্রা-ভঙ্গের পর একটি বিড়ালের আলস্য ত্যাগের চেহারাকে অনচ্ছ (প্যাস্টেল) সাদা এবং ছাই-রঙের বলিষ্ঠ রেখার ছন্দে অঙ্কণ করেছেন তাতে তাঁর সূক্ষ্ম শিল্প-দৃষ্টির শুধু পরিচয় পাওয়া যায় না, শিল্পী-সত্তাকেও আমরা অনুভব করতে পারি। শ্রী চ্যাটার্জীর 'রিক্সাওয়ালা' বোধহয় এই প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র। বিমূর্ত শিল্প-নিদর্শন হিসাবে সত্যি এখানি সার্থক রচনা। সাদা জমিনের ওপরে হলুদ, নীল এবং কালো রঙের কয়েকটি বৃত্তের সাহায্যে শিল্পী রিক্সার গতি-বেগকে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই শিল্পীর ড্রয়িং এবং চিত্র-সংস্থাপনের দক্ষতা লক্ষ্য করলে মনে হয় না ইনি অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন। তারাপদবাবু জলরঙ ও প্যাস্টেলের সংমিশ্রণে 'উৎসব রাত্রি' কিংবা 'রাতের দৃশ্য' (১০ নং ও ১৫ নং) নামক বর্ণ-বৈচিত্র্যময় যে চিত্র দু'খানি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন তা কি বক্তব্যে এবং কি রূপায়ণ দক্ষতায় অতি সাধারণ স্তরকে মাত্র স্পর্শ করেছে বলে আমার ধারণা। এই শিল্পীর অন্য চিত্র-প্রদর্শনী দেখার জন্য আমরা সানন্দে অপেক্ষা করবো।

শ্রীমিলু ব্যানার্জীর শিল্প-শিক্ষা এবং শিল্প-চেতনা এখনো ভ্রূণ অবস্থায়। এ কথা বলার জন্য আমরা দুঃখিত। বিলাতের আইন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে গভীর মনোদুঃখে তিনি যেখানে আশ্রয় খুঁজেছেন সেটাও যে কঠিন ঠাঁই, আশাকরি সেকথা তাঁর অজ্ঞাত নয়। শিল্প-সাধনার কঠিন ব্রতে তাঁকে আরো শ্রম স্বীকার করতে হবে। এই প্রদর্শনীতে তিনিই একমাত্র শিল্পী যাঁর প্রায় সব শিল্পের মাধ্যম তৈল-রঙ। তৈল-রঙে তাঁর কোনো চিত্রই রসোত্তীর্ণতার ছাড়পত্র দাবী করতে পারে না। তবু এর মধ্যে 'সি ওয়াচড মি অল এলং' (৫ নং) ছবিখানি মন্দ নয়। তাঁর ছবিতে যেন একটি কান্না-মিশ্রিত ব্যাঙের সুর উপস্থিত। অথচ এই বক্তব্যকে রঙে-রেখায় এখনো বিধৃত করতে পারেননি শিল্পী। এটাই শ্রী ব্যানার্জীর ট্রাজেডি। এই ট্রাজেডির হাত থেকে মুক্ত হয়ে শ্রী ব্যানার্জী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোন, আমরা আজ শুধু এই কামনাই করি।

দেশের খবর

কয়েকটি দেশ একত্রিত হয়ে ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনাকে আর্থিক ঋণ দেবে স্থির করেছে। এই সম্মিলিত দেশগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'Aid India Club' Countries. এই সম্মিলিত দেশগুলি ঘোষণা করেছে যে, এই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার প্রথম দুই বৎসরে প্রায় ১,১০০ ক্রোর টাকা দেবে। এই সম্মিলিত দেশগুলির নাম হচ্ছে—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যান্ড, জাপান এবং ফ্রান্স। প্রত্যেক দেশের ঋণদানের পরিমাণ এইরূপ— মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১,০৪৫ মিলিয়ন ডলার, ইংল্যান্ড ২৫০ মিলিয়ন পাউন্ড, কানাডা ৫৬ মিলিয়ন ডলার, ফ্রান্স ৩০ মিলিয়ন ডলার, পশ্চিম জার্মানী ৪২৫ মিলিয়ন ডলার, জাপান ৮০ মিলিয়ন ডলার; World Bank এবং International Development Association ৪০০ মিলিয়ন ডলার। মার্কিনী ঋণ অনেক বছর ধরে শোধ করা চলবে। পশ্চিম জার্মানীর ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ ২৫ বৎসর ধরে শোধ করতে হবে।

* * *

১৯৬১ সালে ভারতের দশম-কল্পনা অনুসারে বাংলা সরকারের মোট আয় হচ্ছে—৮৮·১৭ ক্রোর; আর খরচ হচ্ছে—৮৯·২২ ক্রোর।

* *

১৯৬১ সালে ভারতের দশম বার্ষিকী লোকগণনা সম্প্রতি শেষ হয়ে গিয়েছে। তা হতে এই কয়টি তথ্য জানা গিয়েছে—

(১) দেশ হিসাবে প্রতি বর্গমাইলে সবচেয়ে বেশী লোকসংখ্যা হচ্ছে কেরালাতে, —১,১২৫ জন প্রতি বর্গ-মাইলে। এর পরেই হচ্ছে বাংলাদেশ; এখানে প্রতি বর্গমাইল হিসাবে লোক-সংখ্যা হচ্ছে ১০৩১। প্রতি বর্গমাইলে ছোট রাজ্যের (Union Territory) লোকসংখ্যা হচ্ছে এইরূপ—দিল্লী ৪,৬১৬ জন, লাকাডিভ, মিনিকয় এবং আমিনডিভি দ্বীপ ২,১৯২ জন, (২) প্রতি বর্গমাইলে সবচেয়ে কম লোক-সংখ্যার ষ্টেট এইরূপ—রাজস্থান ১৫২, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ২০, (৩) কেরালা এবং উড়িষ্যাতে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী। কেরালায় হাজার করা পুরুষের তুলনায় ১০২২ নারী এবং উড়িষ্যায় হাজার করা পুরুষের তুলনায় ১০০২ নারী আছে, (৪) নিম্নলিখিত ষ্টেটগুলিতে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম: পাঞ্জাবে প্রতি হাজার পুরুষে ৮৬৮ জন নারী; দিল্লীতে হাজার পুরুষের তুলনায় ৭৬৮ জন নারী আর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে হাজার পুরুষের তুলনায় মাত্র ৬১৬ জন নারী, (৫) ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা এইরূপ—১০৩,২১৫,৭৮০; এর মধ্যে ২৬,৯৬৫,৭২৮ জন নারী, (৬) শিক্ষিতের সংখ্যা কোন্ কোন্ ষ্টেটে সবচেয়ে বেশী ও কম—কেরালায় শিক্ষিতের সংখ্যা ভারতে সবচেয়ে বেশী —শতকরা ৪৬·২ জন। এরপর অন্যান্য ষ্টেটের শতকরা অনুপাত এইরূপ—জম্মু ও কাশ্মীর শতকরা ১৭·৭ জন, রাজস্থান শতকরা ১৪·৭ জন।

ঘটনা প্রবাহ

ঘরে—

২৩শে জুন—৮ই আষাঢ় ঃ সমগ্র কাছাড় জেলা তিন মাসের জন্য 'উপদ্রুত এলাকা' ঘোষিত—আসাম রাজ্যপাল এস্‌. এম্‌. শ্রীনাগেশ কর্তৃক আদেশ জারী।

উড়িষ্যায় ৪-মাসব্যাপী রাষ্ট্রপতি-শাসনের অবসান—শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের নেতৃত্বে সাতজন সদস্য লইয়া রাজ্যে নূতন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত।

২৪শে জুন—৯ই আষাঢ় ঃ ভারতে নির্মিত শব্দের-গতি-জয়ী প্রথম জঙ্গী বিমানের (এইচ এফ-২৪) সাফল্যজনক পরীক্ষা—বাঙ্গালোরে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীভি, কে, কৃষ্ণমেননের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী উড্ডয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন— বিমান-শিল্পের ইতিহাসে ভারতের বৃহৎ পদক্ষেপ।

ছাঁটাই বা অন্যভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত রেলকর্মীদের প্রশ্ন—সর্বরকম দণ্ড প্রত্যাহারকল্পে নিখিল ভারত রেলওয়ে কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের (ত্রিবান্দ্রম অধিবেশন) দাবী।

হৃষীকেশ যাওয়ার পথে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা—৩০ জন নিহত ও ৪ জন গুরুতর আহত।

২৫শে জুন—১০ই আষাঢ় ঃ সমগ্র কাছাড়ে পঞ্চম বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ সুরু—পাকিস্তান হইতে মুশিলমদের আগমনে উৎসাহদানের অভিযোগ।

ভাষা-সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে ২রা জুলাই (১৯৬১) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত কাছাড় নেতৃবৃন্দের বৈঠকের আয়োজন।

হাইলাকান্দিতে ভীতি প্রদর্শন, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ অব্যাহত—সর্বত্র গভীর আতঙ্কের রাজ্য বিরাজমান।

২৬শে জুন—১১ই আষাঢ় ঃ বাগজোলায় (কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী) উদ্বাস্তু শিবিরে পুলিশের গুলীতে ছয়জন নিহত—পুলিস ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ—প্রায় ৩০ জন উদ্বাস্তু ও চারিজন কনেষ্টেবল আহত—অনশনকারী উদ্বাস্তুদের অপসারণকালে হাঙ্গামা।

আসামের স্বয়ংশাসিত অঞ্চলে স্কটিশ ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা—সম্মিলিত খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় কংগ্রেস কমিটির সমর্থন।

'ভাষা-বিরোধ (আসামের সরকারী ভাষা সংক্রান্ত বিরোধ) মীমাংসায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর (শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী) প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে'—নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতির শিলং অধিবেশনের সিদ্ধান্ত।

২৭শে জুন—১২ই আষাঢ় ঃ ভাষা-সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ (কলিকাতা) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) কাছাড় নেতাদের বৈঠক—কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন ও উপমন্ত্রী শ্রীঅনিল চন্দের আলোচনায় যোগদান।

আসামে লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানীর অনুপ্রবেশে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন—কলিকাতার জনসভায় আসাম পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ—ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী।

২৮শে জুন—১৩ই আষাঢ় ঃ সরকারী কাজকর্মে কাছাড়ে অবিলম্বে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রবর্তন—আসাম সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ প্রদানের সংবাদ।

দার্জিলিং জেলাকে দ্বিভাষী বলিয়া ঘোষণার সিদ্ধান্ত—পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা কর্তৃক দার্জিলিং প্রসঙ্গ তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুমোদন।

কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ ও কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের দিল্লী যাত্রা—কলিকাতায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আলাপ-আলোচনা।

কয়লাখনির ভূগর্ভস্থ অগ্নির সম্প্রসারণে ঝরিয়া সহর বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা—বিহার সরকারের প্রচার বিভাগীয় মন্ত্রীর বিবৃতি।

২৯শে জুন—১৪ই আষাঢ় ঃ "ভাষা প্রশ্নে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত আলোচনা ব্যর্থ হইলে আসামে 'গৃহযুদ্ধের' আশঙ্কা— শাস্ত্রী-সূত্রের ভিত্তিতে ভাষা-সমস্যার সমাধান সম্ভবপর"—কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের উক্তি।

পশ্চিমবঙ্গে পরাজিত আসনগুলির (বিধানসভার) জন্য কংগ্রেসী প্রার্থী মনোনয়ন প্রশ্ন—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের বাসভবনে প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটির বৈঠক।

ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিং-এর (৫৯) দিল্লীতে পরলোকগমন।

বাইরে—

২৩শে জুন—৮ই আষাঢ় ঃ জেনেভায় লাওস সংক্রান্ত ১৪-জাতি সম্মেলনে তিনটি লাওসীয় দলেরই আপাততঃ যোগদান—জুরিখে প্রিন্সত্রয়ের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

২৪শে জুন— ৯ই আষাঢ় ঃ শীঘ্রই কঙ্গোলী পার্লামেন্টের নূতন অধিবেশনের অনুষ্ঠান—প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর আদেশনামা স্বাক্ষর।

'নিরস্ত্রীকরণ ও জার্মাণ শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য সংগ্রাম করিব'—কাজাখস্থানের রাজধানীতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ঘোষণা—রুশ অর্থনৈতিক অগ্রগতিই প্রধান হাতিয়ার বলিয়া মন্তব্য।

২৫শে জুন—১০ই আষাঢ় ঃ আগামী মাসে (জুলাই) লাওসে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা—নিরপেক্ষতাবাদী লাওসীয় নেতা প্রিন্স সৌভান্না ফৌমার আশা প্রকাশ।

ঘানা কর্তৃক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় রপ্তানী বে-আইনী ঘোষণা—বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে ঘানা সরকারের সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন।

রুশ এলাকার নিকট এখনও মার্কিণ গোয়েন্দা বিমানের গোয়েন্দাবৃত্তি—মস্কো বেতার ও 'প্রাভদা'র অভিযোগ।

২৬শে জুন—১১ই আষাঢ় ঃ পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী তৈলসমৃদ্ধ কুয়ায়েতকে ইরাকী প্রদেশরূপে গণ্য—১৮৯৯ সালের বৃটিশ রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি 'বে-আইনী' বলিয়া ইরাকী প্রধানমন্ত্রীর মেজর জেনারেল কাসেমের উক্তি।

লাওসকে সিয়াটোর তাঁবেদার করিয়া রাখার মার্কিণ চক্রান্ত—জেনেভায় ১৪-জাতি সম্মেলনে (লাওস সংক্রান্ত) নয়া চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন ইর সতর্কবাণী—লাওস সম্পর্কে ফরাসী-মার্কিণ খসড়া প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

২৭শে জুন—১২ই আষাঢ় ঃ সমগ্র কুয়ায়েতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা—দেশরক্ষাকল্পে কুয়ায়েতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখের সংকল্প—বৃটেন কর্তৃক কুয়ায়েতের উপর ইরাকের দাবী অস্বীকার।

কম্যুনিষ্ট চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গ্রহণের প্রশ্ন এখনও আমেরিকার বিবেচনাধীন—সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৃটেনের নিকট মার্কিণ সরকারের লিপি প্রেরণ।

২৮শে জুন—১৩ই আষাঢ় ঃ প্রলয়ঙ্কর বর্ষণ ও বন্যায় জাপানে প্রায় ৪ শত নর-নারীর মৃত্যু—হাজার হাজার লোক গৃহহারা।

জার্মাণী ও বার্লিনের প্রশ্নে পূর্ব-পশ্চিম বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি—কেনেডি (মার্কিণ প্রেসিডেন্ট) ও ক্রুশ্চেভের (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) পরস্পর পরস্পরের প্রতি হুমকী।

২৯শে জুন—১৪ই আষাঢ় ঃ একটি মাত্র রকেটের সহায়তায় যুগপৎ তিনটি উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সফল প্রয়াস—তিনটি উপগ্রহেরই স্বতন্ত্র পথে বিশ্ব প্রদক্ষিণ আরম্ভ।

কোয়ায়েতগামী খাদ্যবাহী মোটর লঞ্চের উপর ইরাকী জাহাজ হইতে গুলীবর্ষণ—সীমান্ত বরাবর দুই ব্রিগেড ইরাকী সৈন্যের সমাবেশ।

বার্লিনে নূতন সঙ্কটের আশঙ্কায় মার্কিণ মহলের কর্মতৎপরতা—ওয়াশিংটনে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী বৈঠক আহ্বান।

দেশে বিদেশে

সমাধানের পথে ?

দার্জিলিং জেলার পার্বত্যাঞ্চলে কতকগুলো বিশেষ রকমের সমস্যা আছে। সেগুলো যথাযথ নির্ণয়ের জন্য এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। সেই কমিটি যেসব সুপারিশ করেছেন সেগুলোর যথা-বিহিত করার ভার আর-একটি কমিটির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই কমিটিতে আছেন পুলিশমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্য-সচিব এবং উন্নয়ন কমিশনার। তদন্ত কমিটি ৩৭ দফা সুপারিশ করেছেন। সুপারিশগুলোর মধ্যে দার্জিলিং জেলাকে দ্বিভাষী বলে ঘোষণার এবং নেপালী ও বাংলাভাষাকে আঞ্চলিক ভাষারূপে সরকারী স্বীকৃতির সুপারিশও ছিল। রাজ্য সরকার এ সুপারিশ মেনে নিয়েছেন এবং বাকী সুপারিশগুলোরও অধিকাংশ মেনে নিয়েছেন। দার্জিলিং জেলাকে দ্বিভাষী ও নেপালী ভাষাকে সমস্বীকৃতি দেবার সংবিধানের বিধানমতো রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতির অনুমোদন চেয়ে পাঠিয়েছেন। তদন্ত কমিটির এই জেলার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি ও সমাজ-নীতির দিক থেকে আরও অন্যান্য সুপারিশ আছে। সেগুলো নেপালী ভাষাভাষীদের একাংশ কিভাবে গ্রহণ করবে জানি না; কিন্তু ভাষা সম্পর্কে এক শ্রেণীর নেপালীর মনোভাব একেবারেই আপোষহীন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, দার্জিলিং জেলার যে সংলগ্ন ভূখণ্ডে নেপালী ভাষাভাষীর প্রাধান্য, সেখানে নেপালীকেই একমাত্র সরকারী ভাষা করতে হবে। এই নিয়ে ২৫ তারিখে দার্জিলিংয়ে যে জনসভা হয় তাতে কংগ্রেসসহ সকল দলের লোকই বক্তৃতা দেন এবং সারা ভারতের জন্য প্রস্তাবিত রায় ফরমুলার সমালোচনা করেন, কিন্তু শাস্ত্রী ফরমুলার উদ্দেশে আংশিক সমর্থন জানায়।

নেপালীভাষীদের এই অনমনীয় ভাবের মধ্যে আগামী নির্বাচন সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত হ'তে পারছেন না। সেখানকার একটি আসন এখনই গোঁড়া নেপালীদের দখলে আছে, দু'টি কংগ্রেসের, দু'টি কম্যুনিষ্টদের। স্বভাবতই, সব দলই নেপালীদেব নিজেদের আওতায় রাখতে চাইছেন; সুতরাং গোঁড়া নেপালীদের শত-করা একশ ভাগ নেপালী ভাষা দাবীর মধ্যে কে কত অংশ পূরণ করতে রাজী, মনে হ'চ্ছে, তারই ওপর ওখানকার বিবর্তন ঘটবে। দুঃখের বিষয়, নেপালীরা একদিনে এই মনোভাব অবলম্বন করেনি। অভিযোগ যে অনেকদিনের তা ছ' বছর আগে তদন্ত কমিটি গঠনেই বোঝা যায়।

সাহিত্য-সম্রাট :

আজও তিনি সাহিত্য-সম্রাট—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তৎকালীন যুগের ক্ষীণ বাংলা-সাহিত্য-ধারাকে তিনি অকস্মাৎ গঙ্গার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়েছেন। যে-ভূমি আপাত-দৃষ্টিতে ঊষর ছিল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু গাছ, কিছু পরগাছা ছিল সেখানে যাদুস্পর্শের মতো বঙ্কিমচন্দ্র বিচিত্র সুঘ্রাণ ফলফুলের এক বিরাট উদ্যান রচনা করেছিলেন। যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে তিনি বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি করলেন, যে-উপন্যাস আজও তরুণ পাঠকের কাছে অনাস্বাদিতপূর্ব এবং প্রবীণ পাঠকের কাছে সুস্বাদু রোমন্থন। এখনও এমন দিন আসেনি, যখন বাংলাসাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করে গেছে। আজও 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি শোনা যায়, আজও কানে ভেসে আসে 'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' অথবা 'তুমি কি রোহিণি!' নগেন্দ্রের সেই খেদ, চন্দ্রশেখরের সেই মনস্তাপ, ভ্রমরের অবিচল বিশ্বাস এখনও পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে এবং সেই অরণ্যের মধ্যে বিস্ময়কর স্নেহপেলব কণ্ঠ : 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?'

শুধু কি উপন্যাস? বাংলা-সাহিত্যবাণীর কাঠামোটিতে তিনি এক একটি করে সুন্দর তার সন্নি-বেশ করেছেন; আজও সে ব্যঞ্জনা যেন অননুকরণীয়। কেবল শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র প্রবন্ধ নয়, বাংলার চাষীদের সম্বন্ধে এবং আরও বহু সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ কালক্রমেও ম্লান হয়নি। বাঙালীর ইতি-হাস নেই—একদিকে এই খেদ আর একদিকে কমলাকান্তের তীক্ষ্ম শ্লেষ। আজও কমলাকান্তের স্থলাভিষিক্ত কেউ হ'তে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্র কাউকে অনুকরণ করেননি, তিনি পথিকৃৎ এবং তিনি অননুকরণীয়—তাঁকে অনুকরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষমের ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করা অবশ্য সম্ভব। তাঁর জীবনরসের উপলব্ধি, জীবনে সংযমের তপস্যা, বহু দ্বন্দ্ব-পীড়িত বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি সাহিত্যে প্রতিফলিত করা আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যদি তাঁর উত্তরসাধকেরা করতে পারেন তবেই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে বাৎসরিক শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান সার্থক হবে।

সুপারসনিক :

শব্দের গতির চাইতেও দ্রুত যার গতি তার নাম সুপারসনিক। এই গতি-বেগে যে জঙ্গী বিমান তৈরী হয় তাকে বলে সুপারসনিক ফাইটার। ভারতবর্ষে এই সুপারসনিক জঙ্গী বিমান নির্মাণ হয়েছে এবং তা আকাশ-পরিক্রমা ক'রে এসেছে। পৃথিবীতে পাঁচটি দেশ এমন বিমান নির্মাণ করতে পারে; ভারতবর্ষ সেই কৃতী দলে ষষ্ঠ হ'ল। পৃথিবীতে ষষ্ঠ, কিন্তু এশিয়ায় সর্বপ্রথম। এই বিমান ভারতীয় বিমান-বহরের অংশ হবে। এই সাফল্য নিঃসন্দেহে আমাদের গৌরবের; আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতে দৃঢ়তর হবে। এর নামকরণ হয়েছে এইচ-এফ ২৪। প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ বিমানে উড়েছেন। কিন্তু যিনি উড়িয়েছেন তাঁকে নিয়ে আমরা একটু বিশেষ গৌরববোধ করতে পারি। তিনি হচ্ছেন উইং কম্যাণ্ডার শ্রীসুরঞ্জন দাস। আরও খবর এই যে, এয়ার ভাইস-মার্শাল রঞ্জন দত্তের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফটস লিমিটেড এই বিমান নির্মাণ করেছে। দু'জনই বাঙালী—এই আমাদের বিশেষ গৌরবের কারণ।

কারখানাটি বাঙ্গালোরে। এখানকার জার্মাণ ইঞ্জিনীয়ার ডঃ কুর্ট ট্যাঙ্ক এই নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধান করেছেন। এখানকার কর্মীরা ভারতীয়। সেখানে ভারতীয়দের কারিগরি অগ্রগতি নিশ্চয়ই আনন্দবহ। ব্যর্থতায় জনমানসে যে হীনমন্যতা আসে, সাফল্যে তার দ্বিগুণ আস্থা আসে। ভারতে তৈরি সুপার-

সনিক জঙ্গী বিমানে কোন খুঁত পাওয়া যায়নি। ওড়ার সময় কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়নি। সুপারসনিক জঙ্গী বিমান ঘণ্টায় ৭২০ মাইলের বেশী যেতে পারবে।

সুপারসনিক এমনিতে চালু হ'লে আমরা জেটচালিত বিমান যুগও পার হ'য়ে যাব। এখন জেট যুগ। যুগ বটে, কিন্তু যত বছরে যুগ হয় এ যুগ তেমন নয়। ঠিক ঠিক জেট যুগ বলতে বছর দুই। ইতিমধ্যে সুপারসনিক বিমানের আবির্ভাব। আসলে যুগটা রকেটের এবং বিমানচালকদের ইচ্ছা তাঁরা গাগারিনের মতো ঊর্ধ্বাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে আসেন। সে-যুগও বেশী দূরে নয়; কেননা, গাগারিন-শেপার্ডের পর ঐ যুগেরও সূচনা হয়েছে বলা যায়। রীতিমত চালু হ'তে যা কিছু সময়ের দরকার। কিন্তু আমাদের আনন্দ, আমরা এই অগ্রগতিতে কিছু অংশ নিতে পেরেছি।

সেতুবন্ধ ঃ

এরই নাম সভ্যতার পদক্ষেপ। এককালে রেল-সম্প্রসারণের সংগে সংগে নদীর ওপর সেতু নির্মাণ আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। পদ্মার পুলে নিয়ে কত কথা কত গাথা হয়েছে। গঙ্গার ওপর ব্রীজ বাঁধা হয়েছে। নদী এখন আর যাতায়াতের পথে তেমন বাধা নয় এবং এ বাধা ক্রমশই দূরীভূত হচ্ছে। ভারতবর্ষে মরুভূমি যেমন আছে তেমনি বহু নদীও আছে। স্বভাবতই হাঁটা পথে বা চলার পথে নদীগুলো অনতিক্রমনীয় বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষ চলার পথকে নির্বিঘ্ন ক'রে চলেছে। ভারতের পরিবহন ও যোগাযোগ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর ১৭ই জুন দামোদর ব্রীজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে সেই সভ্যতার অগ্রগতিকেই চিহ্নিত করলেন। হাওড়া-বাগনানের কাছে দামোদর নদের ওপর ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ব্রিজটি নির্মাণ করতে সাত বৎসর লাগল। কিন্তু কালস্রোতে সাতটা বছর কিছুই নয়। এ ব্রীজটি কলকাতা থেকে বোম্বাই অবধি ছয় নম্বর ন্যাশানাল হাইওয়েকে (জাতীয় সড়ককে) সংযুক্ত করল বা অবিচ্ছিন্ন গতি দিল। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ১০৫ মাইল। তারপর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে বিভিন্ন রাজ্য অতিক্রম ক'রে বোম্বাই পৌঁছেছে। এ পথের মাঝে আরও নদী আছে। সে সব নদীর ওপর সেতু-নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। দামোদর ব্রীজ সেই পরিকল্পনার দ্বিতীয় ব্রীজ। দামোদর ছাড়া পশ্চিমবঙ্গেই দুলুং, কংসাবতী নদী ও রূপনারায়ণ নদ আছে। ১৯৫৭ সালে দুলুং ব্রীজ হয়েছে, ১৯৬১ সালে হ'ল দামোদর ব্রীজ। কংসাবতীর ওপর সেতু-রচনা চলেছে; রূপনারায়ণের স্থান নির্বাচনই সমস্যা। এ সমস্যারও একদিন সমাধান নিশ্চয়ই হবে। তখন পশ্চিমবঙ্গের অনেকটা জায়গায় চলার পথ সহজ হ'য়ে যাবে।

পট-পরিবর্তন ঃ

লুমুম্বার মৃত্যুর পর কিছুদিন কেটে গেছে। কংগো রিপাব্লিকের বছর ঘুরে এল। ন'মাস আগে কংগোলিজ পার্লামেন্টের শেষ অধিবেশন হয়েছিল। ন'মাস পর আবার সে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসছে—২৫শে জুন। তার পাঁচ দিন পরেই রিপাব্লিকের প্রথম বার্ষিকী।

১২ই জুন থেকে গোপন আলোচনা চলছিল; রাষ্ট্রপুঞ্জ ছিল এই বৈঠকের প্রহরী। বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় কংগোলিজ সরকার ও প্রতিদ্বন্দ্বী লুমুম্বাপন্থীদের প্রতিনিধিবৃন্দ। উভয়পক্ষ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেছেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের মুখপাত্র তা পড়ে শোনান। চুক্তিনামায় প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুকে পার্লামেন্ট পুনরাহ্বানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পার্লামেন্ট বসবে লোভানিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ে, লিওপোল্ডভিল থেকে আট মাইল দূরে। সেখানেও প্রহরী থাকবে রাষ্ট্রপুঞ্জ। অধিবেশনকালে পুলিশ ও জাতীয় কংগোলিজ বাহিনী সুরক্ষিত জায়গায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র রেখে দেবে। পার্লামেন্ট সদস্য বা আর কেউই সশস্ত্র আসতে পারবেন না—, টাকা-পয়সাও আনবেন না। উভয় পক্ষ গোপন ব্যালট ভোট প্রথায় রাজী হয়েছেন। সরকারের ওপর আস্থাসূচক প্রস্তাবের ওপর এই ভোট হবে। কাটাংগাও যাতে এই অধিবেশনে অংশ নেয় সেজন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে সচেষ্ট হ'তেও অনুরোধ জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের অসামরিক প্রহরীরা পার্লামেন্টেই অবস্থান করবেন। অবশ্যই আশা করতে হবে যে, এই পার্লামেন্টে সুফল ফলবে; কিন্তু কংগোর জট এত সহজে ছাড়ানো যাবে ব'লে মনে হয় না। কেননা, কংগো আবর্তে কাটাংগা এক মস্ত প্রশ্ন। ওখানে বেলজিয়ামের নিঃশ্বাস শুনতে পাওয়া যায়। কংগোর আভ্যন্তরীণ গোলমাল মিটলে কাটাংগার কি পরিণতি হবে কূটনীতিকদের দাবা খেলায় তা এখনই বলা কঠিন। সর্বশেষ সংবাদ এই, মুক্তির আগে শোম্বের যে ভাব ছিল ও তার ভিত্তিতে চুক্তি হয়েছিল, কাটাংগার প্রেসিডেন্ট শোম্বে এখন তার উল্টো সুর গাইছেন।

একটুকু বাসা ঃ

বাসা-বাড়ীর সমস্যা মর্মে মর্মে বোঝেন না এমন মানুষ কলকাতায় বিরল এবং মুহুঃমুহুও এই সমস্যা ক্রমশঃ চাড়া দিয়ে উঠছে। কিন্তু কলকাতায় এ সঙ্কট যত তীব্র যত মর্মান্তিক এমন আর কোথাও নয়। বিশেষ ক'রে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা নিদারুণ। শিল্পশ্রমিকদের জন্য, সরকারী কর্মচারীদের জন্য অথবা উন্নয়ন পরিকল্পনায় যেসব বস্তিবাসী উচ্ছেদ হয় তাদের জন্য কিছু কিছু বাড়ী হয়, কিন্তু সেও প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশী নয়। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্তদের কোথাও ঠাঁই নেই। অন্য সব কিছু প্রয়োজন ছাঁটকাট ক'রেও বাড়ী ভাড়ার [illegible]টা দুর্বহ হ'য়ে ওঠে। তথাপি ঘর পাওয়া দুর্ঘট। কলকাতা করপোরেশনের সিটি আর্কিটেক্ট এক সাংবাদিককে বলেছেন, দশ বছরব্যাপী প্রতি বছর ২,৫০০ বাড়ী তৈরী হ'লে এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব। ১৯৬০-৬১ সালে হাজারখানেক দ্বিতল বাড়ী হয়েছে এবং ১,৫০০ পুরোনো বাড়ীর সম্প্রসারণ হয়েছে। এই সংখ্যাল্পতা হ্রাসের জন্য তিনি এবং ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান খোলা জায়গায় গগনস্পর্শী গৃহ-নির্মাণের পক্ষপাতী। একবার তিনি নাকি বর্তমান হগ মার্কেট ভেংগে ফেলে সে জায়গায় দশতলা গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। হগ মার্কেট এক-তলা এবং তিন একরেরও বেশী জমি জুড়ে আছে। তাঁর প্রস্তাব ছিলো প্রত্যেক তলায় ৭০,০০০ বর্গ ফুটের জায়গা থাকবে এবং তাতে অফিস ও বাসস্থানও হ'তে পারবে। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রতিপত্তিশালী কাউন্সিলারদের মনঃপূত হয়নি; তাঁরা ও প্রস্তাব নাকচ ক'রে দেন।

আর যা বাড়ী আছে তাদের মধ্যে শতকরা ৮০টির অবস্থা ভাল নয়। মেরামত হয় না। ১৯৬০ থেকে আজ পর্যন্ত ২২০০ বাড়ীওয়ালার ওপর মেরামতির নোটিশ গেছে। বাড়ীভাঙ্গার মামলাও ১৭০টির মতো আদালতে আছে সেই ১৯৫৬ সাল থেকে। অনেক বাড়ীর আবার বাইরেরটা দেখে ভেতর বোঝা যায় না। বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের লোকেরাও বড় একটা ভেতরে উঁকি মেরে দেখেন না। ফলে একদিন ভেতরটা ধ্বসে পড়ে। হরলাল মিত্র স্ট্রীটের একটি বারান্দা যেমন ধ্বসে পড়েছিল।

কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য ঠিক এখানেও নয়। মাথা গোঁজার মত ঠাঁইয়ের এত অভাব যে, লোকে ঐ মাথার ওপরে পড়-পড় বাড়ী পেলেও নিজেকে ধন্য মনে করে এবং শত বিপদের মধ্যেও আলো-জলহীন বাড়ীতে থাকা গেছে এই সান্ত্বনায় স্বস্তি পায়। মানুষের সভ্যতার বয়স কত হ'ল? যতই হোক, একটু নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব আজও ঘোচেনি মানুষের। এ আমাদের পরম লজ্জার বিষয়। ২৮-৬-৬১

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

নাট্য সমালোচনা : এরিক বে[illegible] বলেছেন, জনপ্রিয়তা এবং টিকিট বিক্রীর বহর দেখে কোনো নাটক এবং তার অভিনয়ের উৎকর্ষ বিচার করা ঠিক নয়। কিন্তু ঠিক কোন্ জিনিষটি উৎকর্ষ বিচারের মাপকাঠি হবে, দুঃখের বিষয়, সে-সম্পর্কেও তিনি কোনো যথার্থ হদিশ দিতে পারেন নি। দর্শক-সাধারণের খুব ভালো বিচার-ক্ষমতা নেই, তর্কের খাতিরে এ-কথা যদি মেনেও নেওয়া হয়, তাহ'লেও পন্ডিত এবং সমালোচকদের জ্ঞানগর্ভ অভিমত-গুলিকে মুখ বুজে মেনে নেবার সুযোগ মিলছে কোথায়? নাটক এবং অভিনয় সম্বন্ধে রায় দেবার সময় তাঁরাই কি একমত হন? একেবারে যা ভিত্তিভূমি, সেই নাট্যরীতি সম্পর্কেই দেখতে পাওয়া যায়, নানা মুনির নানা মত। 'ভিন্ন রুচিহি লোকঃ' এই প্রবাদবাক্যই কঠিন সত্যের রূপ ধ'রে দাঁড়ায়। অথচ আজ থেকে প্রায় ২৩০০ বছর আগে গ্রীক-পন্ডিত আরিস্তোতল সমালোচনা-পদ্ধতির মূল বিষয়বস্তু নিয়ে কতই না আলোচনা করে গেছেন। নকল করার প্রবৃত্তি থেকে আর্টের জন্ম হয়েছে (art is an imitation), এই কথা বলার পর তিনি নাটকের উপাদান-গুলিকে ছ'ভাগে ভাগ করেছেন : প্লট (নাটকের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক ঘটনাপরম্পরা), চরিত্র, রচনা-রীতি (diction), চিন্তাধারা, গান বা সঙ্গীত এবং দৃশ্য বা দর্শনীয় বিষয়-বস্তু। নাট্যরীতি সম্পর্কে [illegible]রিস্তোতলের মতবাদকে নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করেছেন বিখ্যাত প্রবন্ধকার বুচার। এবং আরিস্তোতলীয় প্রদত্ত কাঠামোর প্রতি লক্ষ্য রেখে অনায়াসেই নাট্য-সমালোচনা করা যায় আজকের দিনেও। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আরিস্তোতলীয় রীতির বিশদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে একটি নাটকের অভিনয় দেখে সাধারণ দর্শকের মনে যে-সব প্রশ্ন উদিত হয়, সেইগুলি নিয়েই আলোচনা করতে চাই।

(১) নাটকটি কি আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছিল? কিংবা যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছিল? এখানে মনে রাখা দরকার, দর্শক অভিনয় উপভোগ করেন মাত্র হেসেই নয়, বেশীর ভাগ সময়েই কেঁদেই। কে না জানে, পৃথিবীতে সর্ব দেশে, সর্ব কালে কমেডির চেয়ে ট্র্যাজেডি বেশী আদৃত হয়ে এসেছে। এমন কি, আমাদের সংস্কৃত নাটকগুলি মিলনান্ত হলেও তাদের ভিতরের ব্যথা-বিরহ-বেদনার দৃশ্যগুলিই তাদের উপভোগ্য ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে।

নাট্যকারকে প্রথমেই দর্শক-শ্রোতার চিত্তজয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। উপভোগ্যতা হচ্ছে নাটকের প্রধান গুণ: অপরাপর গুণ সম্পর্কে লোকে বিবেচনা করে পরে। এমন কি, আমরা এ-কথাও বলতে পারি, নাটকের আর কোনো গুণ না থাকলেও চলবে, যদি সে-নাটক উপভোগ্য হয়। মাত্র উপভোগ্যতা গুণবিশিষ্ট নাটক দেখবার পর দর্শকের মনে এমন কোনো দাগ পড়ে না, যার ফলে তার কোনো লাভ বা ক্ষতি হতে পারে।

তাহ'লে মাত্র উপভোগ্যতা গুণই কি একটি নাটকের পক্ষে যথেষ্ট?—না, তা নয়। উপভোগ্যতা ছাড়াও আজকের দিনে আরও কিছু গুণ থাকা দরকার। বিংশ শতাব্দীতে উপভোগ্য জিনিসের প্রচুর ছড়াছড়ি। প্রমোদবস্তু ব্যবসায়ের পণ্য হওয়ায় ব্যবসায়ীরা রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা বা রেডিও মারফত নিজেদের প্রোডাক্-সানকে জনচিত্তজয়ী করবার জন্যে প্রচন্ড প্রতিযোগিতা চালিয়েছে। কাজেই গোলাপী আইসক্রীম বা ললিপপ কিংবা কোকাকোলা যতই উপভোগ্য হোক না কেন, সম্পূর্ণ খাদ্যরূপে তাদের ব্যবহার করা যায় কি?

(২) নাটকটি কি একটি অনুভূতির বস্তু?

অনেকে এই "অনুভূতি" বলতে মনে করেন, বাস্তবজীবন থেকে কিছু

যান্ত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত "কাঁচের স্বর্গ" চিত্রে দিলীপ মুখার্জি এবং সবিতাব্রত।

ক্ষণের জন্যে কোনো দিবাস্বপ্নের রম্য-জগতে বিচরণ করা; বাস্তব জীবনে যেসব আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়নি, নাটকের পাত্রপাত্রীদের জীবনে সেইসব অলভ্য এবং অলব্ধ জিনিসের পূরণ দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করা। সামান্য মাত্রায় এই পলায়নপর মনোবৃত্তি কারুরই পক্ষে খুব ক্ষতিকর না হ'লেও ভাবালুতায় ভর্তি মেলোড্রামা দর্শককে রূঢ় বাস্তবজীবনের সম্মুখীন হবার সাহস থেকে ক্রমেই বঞ্চিত করে।

বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত এইসব মেলোড্রামা বা রোমান্টিক সিনেমাতে যেমন দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক সেই-ভাবে শেষ তিরিশ সেকেন্ডে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাৎ ক'রে বাজীমাৎ করতে পারি না কিংবা সমাজদ্রোহী বা ডাকাতকে খুন ক'রে আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার বদলে আদরিণী প্রিয়তমার কণ্ঠ-লগ্ন হয়ে 'চাঁদ চকোরে অধরে অধরে' করতে পাই না। কাজেই আজকের দিনে নাটক এবং তার অভিনয় এমন হওয়া উচিত, যা মানুষকে বাস্তব-জীবনের প্রতিটি সম্পর্কের উচিত-মূল্য নিরূপণে সাহায্য করতে পারে। "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ" — মানুষ যত বেঁচে থাকে, ততই তার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে আর্টের মাধ্যমেই বা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে না কেন? কেননা, যে-কোনো আর্ট-সৃষ্টিই বহু মানুষের অভিজ্ঞতা নিঙড়ানো নির্যাস বৈ ত' নয়। যে-লোক কালিদাস, রবীন্দ্র-নাথ, সেক্সপীয়ার, ইবসেন, বার্নার্ড'শ, শেকভ্ বা ইউজিন ও'নীলের লেখার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে, কত বিভিন্ন চরিত্র, কি বিচিত্র বর্ণচ্ছটাময় জগতের সঙ্গেই না তার ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটেছে; সে নিশ্চয়ই বুঝেছে, জগৎ ঠিক এমনটি হওয়া উচিত এবং এমনটি হওয়া উচিত নয়। সে লোক দৃঢ় পদে জগতের বুক দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে পারে, ব্যর্থতা তাকে কাবু করতে পারেনা, সে জানে, জীবনে সে একাই ঝড়ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হয়নি, দুঃখের তিমির রাত্রি পার হয়ে সে একাই পথ চলছে না—ভালোমন্দ, সত্যমিথ্যা, লাভ-লোকশান, ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে তার ধারণা অভ্রান্ত। এমন লোক নাটকের বিচারে অন্ততঃ ভুল করবে না।

(৩) নাটকের ভাষা কি কল্পপ্রসূ?

শব্দের ইন্দ্রজাল রচনার বিচিত্র ক্ষমতা। এমন কোনো জিনিসই নেই, যা শব্দের ব্রহ্মত্ব হরণ করতে পারে। সুন্দর ভাষার যে কি অপূর্ব সম্মোহনী শক্তি, তার উদাহরণ শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস বা সেক্সপীয়র-এ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। আজকের দিনে অতি বাস্তবতার আঘাতে জর্জরিত হয়ে বাঙলা ভাষাকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত কাঠখোট্টা রূপ ধারণ করতে দেখেছি: কিন্তু অপর দিকে তারাশঙ্কর, প্রবোধকুমার, অচিন্ত্য-কুমার, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, নরেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির ছন্দোময় গদ্য আমাদের মনে হতাশার কারণ জন্মাতে দিচ্ছে না। গদ্য বা পদ্য, যাই হোক না কেন, ভাষার জৌলুস বা চাকচিক্য নাটকে থাকতেই হবে। এইখানেই জীবন ও আর্টের মধ্যে পার্থক্য। আমরা জীবনের কোনো চরম মুহূর্তে একেবারে মূক হয়ে যেতে পারি কিংবা বিশ্রী, কিম্ভূতকিমাকারও হয়ে উঠতে পারি, কিন্তু অভিনয়মঞ্চের ওপর নাটকে কখনও নয়।

(৪) নাটকটি কি "নীতিসম্মত" বা "নীতিভ্রষ্ট"?

প্রশ্নটি অবশ্য অত্যন্ত কঠিন। কারণ "নীতি" সম্পর্কে একটি সর্ববাদীসম্মত সংজ্ঞা আজও সম্ভবতঃ আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত নাটক নিন্দিত হয়েছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগই হয়েছে নীতিবিগর্হিত ব'লে। প্রচলিত সামাজিক বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের এতটুকু ব্যত্যয় দেখা গেলেই কিংবা দেশের আইন-কানুনের বিন্দুমাত্র বৈপরীত্য প্রচারিত হ'লেই গেল-গেল রব প'ড়ে যায় এবং নাটকটিকে অপাংক্তেয়
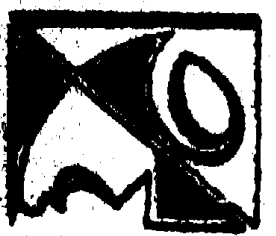
আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু পৃথিবীর বড়ো বড়ো চিন্তানায়ক বা ধর্মনেতাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের সময়ের রীতি-নীতি, ধর্ম-বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধেই কথা কয়ে গেছেন। অবশ্য তাঁদের অনেককেই—সোক্রেটিস, যীশুখৃষ্ট থেকে সুরু ক'রে আমাদের কালের মহাত্মা গান্ধীকে পর্যন্ত—তাঁদের বিরুদ্ধবাদিতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই বড়ো গোলমেলে। ইবসেন যখন "ঘোস্ট" নাটক লিখলেন, তখন সুইডেনের সমাজপতিরা তোবা তোবা ক'রে উঠেছিলেন নোংরা রুচিবিগর্হিত ঘটনাকে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল ব'লে। অথচ আজ আর "ঘোস্ট" প'ড়ে কেউ সে-কথা বলা দূরে থাকুক, চিন্তাও করেন না। যা পাপ, যা অন্যায়, তাকে এড়িয়ে না গিয়ে তার বীভৎসতাকে নগ্নভাবে চোখের সামনে তুলে ধরা যে বহু সময়েই ঢের বেশী কার্যকরী হয়, তা ম্যাকবেথ বা ক্রাইম অ্যান্ড পানিশ্‌মেন্ট পড়বার পরেও কি অস্বীকার করা যায়? যাঁরা সত্যিই বড়ো নাট্যকার, তাঁদের মধ্যে মানবতাবোধ এতটাই জাগ্রত যে, তাঁরা জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়িকতার গন্ডীকে নস্যাৎ ক'রে দেন তাঁদের লেখার ভিতর দিয়ে এবং তারই ফলে তাঁরা সর্বকালে এবং দেশে সমাদর পান।

(৫) নাটকটি থেকে কোনো শিক্ষা বা জ্ঞানলাভ হ'ল কি? বা নাটকটির কোনো বক্তব্য আছে কি?

কোনো নাটককে যদি শ্রেষ্ঠ নাটকের পর্যায়ভুক্ত হ'তে হয়, তাহ'লে তা মাত্র উপভোগ্য হ'লেই চলবে না, তার কিছু বক্তব্যও থাকা প্রয়োজন। অথচ একই নিশ্বাসে বলা হয় যে, নাটকটি যেন প্রচারধর্মী না হয়ে পড়ে। এখন জিজ্ঞাস্য, কিছু বক্তব্য থাকা এবং প্রচারধর্মী হওয়ার মধ্যে তফাৎটা কোথায়? কেউ কেউ বলেন, নাটকের মধ্যে যেসব মতবাদ শুনতে আমাদের ভালো লাগে না, তাকেই আমরা প্রচারের পর্যায়ে ফেলি; বলি—জ্ঞান বর্ষণ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আধুনিক যে-সব রুশ নাটকে আমরা কড়া কম্যুনিস্ট প্রোপাগান্ডার সাক্ষাৎ পাই, রুশী সমালোচকেরা তার মধ্যে কোনো রকম আর্টের ব্যত্যয় দেখতে পাননা, অথচ "উইন্টারসেট" নাটকে তাঁরা বুর্জোয়া প্রোপাগাণ্ডা দেখে নাসিকা কুঞ্চন করেন। তত্ত্বকথাও যদি আনাড়ির মত বক্তৃতার আকারে নাটকের মধ্যে স্থান পায়, তাও অসহ্য লাগে। অথচ যদি নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো শাশ্বত বাণী স্বতোৎসারিত হয়, তা নাটককে মহিমান্বিত করে। যে-কোনো মহতী আর্টের ধর্মই এই যে, তা থেকে কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করা যাবেই যাবে।

অবশ্য এতকথা বলার পরেও বলতে হয়, সকল বড় আর্ট-সৃষ্টির মতো একটি নাটক কেন অসামান্য হয়ে উঠল, তা ঠিক বিশ্লেষণ করে বলা যায়না। বহু বিশ্লেষণের পরেও একটা কি যেন থেকে যায়, যা কথার ধরাছোঁয়ার বাইরে। তখন মনে হয়, গোলাপ ফুল কেন সুন্দর, তা পৃথিবীর কেউ কি আজ পর্যন্ত বলতে পেরেছে?

—বিবিধ সংবাদ

এ হপ্তায় দু'খানি বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। বসুশ্রী, বীণা, লোটাস, সুরশ্রী, আলোছায়া ও শহরতলীর অপরাপর চিত্রগৃহে মোশান পিকচার ইন্‌ফর্‌মেশন পরিবেশিত কথাচিত্রম্‌-এর "দিল্লী থেকে কোলকাতা"। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান সম্প্রতি ইন্দো-জার্মান অ্যাসোসিয়েশানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া পরিবেশে তাঁর অনবদ্য নৃত্য-ভঙ্গিমায় মুগ্ধ করেন সমবেত বিশিষ্ট দর্শকমণ্ডলীকে।

সুশীল ঘোষ এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্রীমতী বাঁশরী লাহিড়ী। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন—জহর রায়, তরুণকুমার, উৎপল দত্ত, বঙ্কিম ঘোষ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, তপতী ঘোষ প্রভৃতি।

* * *

ভি এম এন প্রোডাকসান্সের চিত্রার্ঘ্য 'নেকলেস' ৭ই জুলাই রাধা, পূর্ণ ও প্রাচীতে এবং অন্যান্য ১২টি চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে।

মোপাসাঁর অমর কাহিনী 'নেকলেস' বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন। তারই ভিত্তি করে গঠিত এই চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন নবাগতা সুনীতা এবং ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, মঞ্জিনা দেবী, রমা দেবী, ভারতী দেবী গুপ্তা, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণী ঘোষ।

ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, চিত্রগ্রহণ করেছেন শ্রীদীনেন গুপ্ত এবং পরিচালনা করেছেন শ্রীদিলীপ নাগ।

* * *

পরিচালক তপন সিংহ এবার যে-ছবিতে হাত দিচ্ছেন, সেটি গড়ে উঠবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"-কে অবলম্বন করে।

* * *

"সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা"র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল গেল ২৪-এ জুন সকালে জ্যোতি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে। একজন বক্তা কর্তৃপক্ষের হয়ে অভ্যাগতবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, "সিনে ক্লাব অব ইন্ডিয়ার (?) জন্ম হয়েছে বিশেষ করে চলচ্চিত্র-কুশলীদের জন্যে, যদিও চলচ্চিত্রশিল্পের অনুরাগী প্রত্যেকেরই এই সংস্থার সভ্য হওয়ার অধিকার আছে।" তিনি আরও বললেন, "ভারতের বিভিন্ন সহরে অবস্থিত এই ধরণের সিনে ক্লাবগুলির একটি সর্বভারতীয় সংস্থার আওতায় আসা উচিত।" তাঁর এবং সকলেরই অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, "দি ফেডারেশন অব সিনে ক্লাবস্ অব ইন্ডিয়া"-গোছের নাম নিয়ে এই ধরণের একটি অখিল ভারতীয় সংস্থার জন্ম হয়েছে অন্ততঃ মাস পাঁচ-ছয় আগে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবোধ মিত্র উদ্বোধনী বক্তৃতায় জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাতেও তিনি এই ধরণের সিনে ক্লাব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল। পোলিশ কন্সাল মিঃ রোমান কাওয়িনস্কি তাঁর লিখিত ভাষণে পোলিশ চলচ্চিত্রের আধুনিক প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন।

* * *

"সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা"র উদ্বোধন উপলক্ষে সেদিন যে বিখ্যাত পোলিশ চিত্রখানি দেখানো হয়, তা হচ্ছে ১৯৫৭ সালের কেন্স্ ফেস্টিভ্যালে বিশেষ জুরী পুরস্কার প্রাপ্ত, আঁদ্রেজ ওয়াজদা পরিচালিত "কানাল"। পুডভকিন প্রভৃতি রুশ চিত্রপরিচালকেরা যে রিয়ালিস্টিক আর্টের সাধনায় আত্মনিবেশ করেছিলেন, তারই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন এই "কানাল"। ৮৬৫৮ ফুট দীর্ঘ ১০ রীলে সম্পূর্ণ এই ছবিটি নিষ্করুণ বাস্তবতার অনুগামী হয়েও অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থক হয়ে উঠেছে। নাৎসীবাহিনীর আক্রমণে পোলান্ড যখন জর্জরিত, তখন একটি মুষ্টিমেয় দল কিভাবে পরাধীনতার হীনতা থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে দুঃসহ দুঃখবরণ ক'রে ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, তারই মর্মন্তুদ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে। দলিলচিত্রেরই মতো বাস্তবধর্মী এই কাহিনীচিত্রে পরিচালক ওয়াজদা যে বিস্ময়কর সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁকে পোলান্ডের চলচ্চিত্র ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভে সমর্থ করেছে। ওয়াজদারই আর একটি শিল্পকর্ম হচ্ছে "দি অ্যাসেস অ্যান্ড ডায়ামন্ড" যা সম্প্রতি ভারত সরকারের সেন্সর বোর্ড দ্বারা প্রদর্শনের অযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 'কানাল' ছবিখানি কিছুকাল—বোধ করি, বছর দুয়েক আগে—কলকাতায় একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল।

* * *

গেল মঙ্গলবার, ৪ঠা জুলাই কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'বাণীতীর্থ' সম্প্রদায় 'শেষরক্ষা' অভিনয় করেছিলেন মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে।

* * *

ফিল্ম এন্টারপ্রাইজার্সের প্রথম চিত্র-নিবেদন "দুই ভাই"-এর সুটিং সুধীর

লিট্‌ল সিনেমার আগামী আকর্ষণ 'ডাকাতের হাতে' ছবিতে বুলুর ভূমিকায় শিশু শিল্পী মিত্রা সেন।

মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এগিয়ে চলেছে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত এই কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন—উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, তুলসী চক্রবর্তী শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, মাস্টার তিলক প্রভৃতি।

ছবিটিতে সুর যোজনা করছেন—হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। স্কাপস ফিল্মস ছবিটির পরিবেশনার ভার গ্রহণ করেছেন।

* *

পশ্চিমবঙ্গ চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির হয়ে শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী ছোটদের জন্যে যে পূর্ণাঙ্গ ছবিটি প্রায় শেষ করে এনেছেন, সেটি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত "ডাকাতের হাতে" অবলম্বনে গঠিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ লোক-সংগীতজ্ঞ নির্মলেন্দু চৌধুরী ছবিখানিতে সুরযোজনা করেছেন।

"অনর্থ"র শততম রজনী

গত ২রা জুলাই [illegible] চলতি নাটক "অনর্থ"র শততম রজনীর অভিনয় সুসম্পন্ন করে। অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় রচিত এই নাটকখানি বাংলার রসিকসমাজে তাঁর কাহিনীর বলিষ্ঠতায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। শিল্পীদের সমষ্টিগত অভিনয় নাটকের এক বিশেষ আকর্ষণ। বিভিন্ন চরিত্রে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করছেন—নীতীশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, কালী সরকার, হরিধন, জহর রায়, সত্য বন্দ্যোঃ, অজিত চট্টোঃ, নবদ্বীপ, দ্বিজু, ঠাকুরদাস, মিন্টু, সমর, বুবু, কেতকী দত্ত, কবিতা রায়, মমতা বন্দ্যোঃ, স্বপ্না, দীপিকা দাস, কুন্তলা চ্যাটার্জি ও শিপ্রা মিত্র প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিশেষ পুলিশ সংস্থার কর্মিবৃন্দ কর্তৃক আগামী ২৩শে আষাঢ় সন্ধ্যা ৬টায় "রবীন্দ্র-ভারতী" ভবনে কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ও মাননীয় আরক্ষাধ্যক্ষ শ্রী এস এন ডি সিলভা, আই পি এস যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন।

প্যার কি দাস্তান

মুক্তিপ্রাপ্ত একটি মাত্র হিন্দী চিত্র পুষ্পা ফিল্মসের 'প্যার কি দাস্তান' কলিকাতার জ্যোতি, গ্রেস, পূর্ণশ্রী, ভবানী প্রভৃতি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন—সন্তোষী, সংগীত—নাসাদ। বিভিন্নাংশে আছেন—অমিতা, সুদেশ, শোভা খোটে, মির্জা মুশারফ, মোহন চোটি, হেলেন, জহর, কৌল প্রভৃতি।

উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলন

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলন ২২৬।এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ গৃহাঙ্গনে নির্মিত এক সুরুচিসম্পন্ন মঞ্চে কবিগুরু রচিত সংগীত ও নৃত্যনাট্যের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। ২৪শে জুন, সন্ধ্যায় সম্মেলনের সদস্য ও অতিথিদের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের সুর সংযোজিত বেদগানে উৎসবের উদ্বোধন করেন 'সাধনার' শিল্পীবৃন্দ।

ঐদিন 'সাধনা'র শিল্পীবৃন্দ ডাঃ সৌরেন দে-র পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের রাগ-সংগীত পরিবেশন করেন।

শিল্পীরা শ্রী, কেদারা, সোহিনী, বেহাগ, তিলোক-কামোদ, পূর্বী প্রভৃতি রাগের ওপর কবিগুরু রচিত সতেরোটি

রেনেশাঁস ফিল্মসের প্রথম নিবেদন 'ঢেউ-এর পরে ঢেউ' ছবির পদ্ম চরিত্রে শম্পা।

অগ্রদূত পরিচালিত 'উত্তরায়ণ' চিত্রের একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়াল ভাঙ্গা গান পরিবেশন করেন।

সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রগীতিগুলি শ্রোতাদের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। একক সংগীতগুলির মধ্যে শ্রীমতী ঋণা মিত্রের কণ্ঠে কেদারা রাগে 'কে দিল আবার আঘাত', পূর্বী রাগে 'নিভৃত প্রাণের দেবতা', বেহাগের ধ্রুপদ 'স্বামী তুমি এসো আজ' এবং শ্রীমতী গীতা বসুর কণ্ঠে পূর্বী রাগে 'অশ্রু নদীর সুদূর পারে' বিশেষ মনোগ্রাহী হয়। শাস্ত্রীয় মতে রচিত গানের সংগে রবীন্দ্রনাথ রচিত বিভিন্ন রাগ-সংগীতের সমতা; বিভিন্নতা সম্বন্ধে সংগীতসহ আলোচনা ছিল এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। এই আসরে বিভিন্ন শিল্পীর সংগে যন্ত্রে সহযোগিতা করেন শ্রীরাজীবলোচন দে, রামচন্দ্র দাস, সুনীল ধর, কার্তিক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রথম দিনের অধিবেশনে বিশেষ আকর্ষণ ছিল শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বনানী ঘোষের কণ্ঠে সুনির্বাচিত কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত। শিল্পীদ্বয়ের সংগে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীকমল সেনগুপ্ত।

সম্মেলনের রবীন্দ্র-শতাব্দী জন্মজয়ন্তী উৎসবের দ্বিতীয় দিনের (২৫শে জুন) সন্ধ্যায় 'উত্তরী' সম্প্রদায় নৃত্য ও সংগীত সহযোগে কবিগুরুর 'বর্ষামংগল' পরিবেশন করেন। সূত্রধরের সুগ্রন্থনার সংগে আলোক-শিল্পীর আলোক-সম্পাতে, শ্রীমতী বনানী ঘোষ ও সংগীত-পরিচালক শ্রীসমর গুপ্তের কণ্ঠ-সংগীতের সংগে শ্রীমতী আরতি গুপ্তা, গীতা বক্সী, বুলবুল ঘটক, ঝর্ণা মিত্র প্রভৃতির নৃত্য উপস্থিত রসিকজনদের এক মায়াময় স্বপ্ন-জগতে নিয়ে যায়। এই দিন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে 'উত্তরী'র কয়েকজন শিল্পী একাধিক রবীন্দ্রসংগীত ও তার-সানাইয়ে রবীন্দ্র-রাগ পরিবেশন করেন।

উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলনের এই ৪৫তম মাসিক অধিবেশনটি উপস্থিত দর্শকদের হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকবে। এই প্রসংগে উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পরিচ্ছন্ন ক্রোড়পত্রিকার প্রশংসা করতে হয়।

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

।। সিনেমা ।।

রূপবাণী, ভারতী, অরুণা—তিন কন্যা
মিনার, বিজলী, ছবিঘর—ঝিন্দের বন্দী
উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা—পংকতিলক
রক্সি—নজরানা (হিন্দী)
ছিন্দ গণেশ, খান্না—শশুরাল (হিন্দী)
শ্রী, ইন্দিরা—স্বরলিপি
প্যারাডাইস—জিস্ দেশমে গংগা বৈহ্‌তি হ্যায়
গ্লোব—*Pepe*
মেট্রো—*Ben-Hur*
মিনার্ভা—*I confess*
এলিট—*Circle of Deception*
লাইটহাউস—*Sapphire*
টাইগার—*Sons and Lover*
চিত্রা—*Sign of the Gladiator*
ওরিয়েন্ট—আশ কা পঞ্ছী (হিন্দী)
দর্পণা, জনতা, পার্কশো, ছায়া,—ছোটে নবাব (হিন্দী)
নিউ সিনেমা, প্রভাত, প্যারামাউণ্ট কালিকা—জয় চিতোর
রাধা, পূর্ণ, প্রাচী, পদ্মশ্রী, অজন্তা—নেকলেস
জ্যোতি, গ্রেস, পূর্ণশ্রী—প্যার কি দাস্তান
বসুশ্রী, বীণা, লোটাস সুরশ্রী, আলোছায়া—দিল্লী থেকে কোলকাতা
সোসাইটি—মুগলে আজম

।। থিয়েটার ।।

ষ্টার—প্রেয়সী
রঙমহল—অনর্থ
মিনার্ভা—ফেরারী ফৌজ
বিশ্বরূপা—সেতু ও গিরিশ নাট্যোৎসব প্রতি শনিবার
আকাদমি অফ ফাইন আর্টস—বালুচর শাড়ী প্রদর্শনী

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট

ইংল্যাণ্ড : ২০৬ (সুব্বা রাও ৪৮। ডেভিডসন ৪২ রাণে ৫ উইকেট)
ও ২০২ (ব্যারিংটটন ৬৬ : পুলার ৪২। ম্যাকেঞ্জি ৩৭ রাণে ৫, ডেভিডসন ৫০ রাণে ২ ও মিশন ৬৬ রাণে ২ উইকেটে)

অস্ট্রেলিয়া : ৩৪০ (বিল লরী ১৩০ : ম্যাকে ৫৪ ; বার্জ ৪৬ : ম্যাকেঞ্জি ৩৪ : মিশন নট-আউট ২৫। ট্রুম্যান ১১৮ রাণে ৪ : ডেক্সটার ৫৬ রাণে ৩ : স্টেথাম ৮৯ রাণে ২ উইকেট।
ও ৭১ (৫ উইকেটে। বার্জ নট-আউট ৩৭। স্টেথাম ৩১ রাণে ৩, ট্রুম্যান ৪০ রাণে ২ উইকেট)

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেষ্ট ক্রিকেট ম্যাচে ৫ উইকেটে জয়ী হয়েছে। পাঁচটা টেষ্ট খেলার মধ্যে প্রথম টেষ্ট খেলা ড্র গেছে, ফলে অস্ট্রেলিয়া উপস্থিত ১—০ খেলায় এগিয়ে রইলো। আলোচ্য টেষ্ট খেলা নিয়ে লর্ডস মাঠে এই দুই দেশের মোট টেষ্ট খেলা হল ২০টা ; ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮, ইংল্যাণ্ডের জয় ৫ এবং খেলা ড্র ৭। গত ৫ বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া মাত্র একবার (১৯৩৪ সালে) লর্ডস মাঠের টেষ্ট খেলায় পরাজয় স্বীকার করেছে। ১৯৫৬ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' হারায় ; পাঁচটা খেলার মধ্যে একটা খেলায় জয়ী হয়েছিল তা এই লর্ডস মাঠেই। লর্ডস মাঠে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয় ১৮১৪ সালে, এম সি সি বনাম হার্ট-ফোর্ডসায়ার দলের। আলোচ্য ২য় টেষ্ট খেলা হল লর্ডস মাঠের ১৪৭তম ক্রিকেট খেলা।

লর্ডস মাঠের আলোচ্য দ্বিতীয় টেষ্ট খেলার উল্লেখযোগ্য বিষয় :

(১) ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়া দলের সাফল্য। অপর দিকে ইংল্যাণ্ড দলের উভয় ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়। অস্ট্রেলিয়া দলের ২য় ইনিংসে ইংল্যাণ্ডের বোলিং সাফল্য।

(২) প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার নবাগত টেষ্ট খেলোয়াড় বিল লরীর টেষ্ট খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরী। দলের বিপর্যয়ের মুখে ম্যাকের নির্ভীক ব্যাটিং ; অস্ট্রেলিয়ার শেষের তিনজন খেলোয়াড়—ম্যাকে (৫৪), ম্যাকেঞ্জী (৩৪) এবং মিশনের (নট আউট ২৫) দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা। অস্ট্রেলিয়ার শেষের দুই উইকেটের জুটিতে (ম্যাকে এবং ম্যাকেঞ্জীর ৯ম উইকেট : ম্যাকে এবং মিশনের ১০ম উইকেটের জুটি) দলের মোট ৩৪০ রাণের মধ্যে ১০২ রাণ।

(৩) ইংল্যাণ্ডের বোলার ব্রেন স্টেথামের টেষ্ট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উইকেট লাভের সাফল্য। ১ম ইনিংসের খেলায় ম্যাকডোনাল্ডকে আউট করে তিনি এই সাফল্য লাভ করেন। বর্তমানে তাঁর উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০৪টা, ৫৭টা টেষ্ট খেলায়, ইংল্যাণ্ডের ফ্রেডী ট্রুম্যানের ৪৩টা টেষ্টে ১৮২টা উইকেট : অস্ট্রেলিয়ার এ্যালেন ডেভিডসনের ৩৬টা টেষ্টে ১৪৭টা উইকেট।

(৪) উইকেট-কিপার হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার গ্রাউটের সাফল্য (২য় টেষ্টের ১ম ইনিংসে ৩টে এবং ২য় ইনিংসে ৫টা ক্যাচ, মোট ৮টা)। উইকেট-কিপার

এ্যালেন ডেভিডসন

বিল লরী

ব্রেন স্টেথাম

হিসাবে একটা টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক **ক্যাচ** নেওয়ার বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন **অস্ট্রেলিয়ার** গিল ল্যাংলী (৯টা ক্যাচ, **ইংল্যান্ডের** বিপক্ষে, লর্ডস, ১৯৫৬)। **মাত্র** একটা ক্যাচের জন্যে গ্রাউট বিশ্ব-রেকর্ড স্পর্শ করতে পারলেন না। তবে **প্রথম শ্রেণীর** এবং টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ক্যাচ নেওয়ার বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন গ্রাউট এবং তা এখনও **অক্ষুন্ন** আছে (প্রথম শ্রেণীর খেলার এক ইনিংসে বিশ্ব রেকর্ড—৮টা ক্যাচ, **ওয়েস্টার্ণ** অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ব্রিসবেন, **১৯৫৯-৬০**। এবং টেস্টের এক ইনিংসে **বিশ্ব** রেকর্ড—৬টা ক্যাচ, দক্ষিণ **আফ্রিকার** বিপক্ষে, জোহানেসবার্গ, **১৯৫৭-৫৮**)।

(৫) জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে **নেমে অস্ট্রেলিয়ার** সর্বকনিষ্ঠ ১৯ **বছরের খেলোয়াড়** গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জির **বোলিং সাফল্য** (৮১ রাণে ১ এবং ৩৭ **রাণে ৫ উইকেট**)। অপর দিকে প্রবীণ **ন্যাটা বোলার** এ্যালেন কিথ ডেভিডসনের **৪২ রাণে ৫** এবং ৫০ রাণে ২, মোট **৯২ রাণে ৮** উইকেট লাভ (৩৬টা টেস্ট **খেলায় ১৪৭**টা উইকেট)।

(৬) লর্ডস মাঠে লোকের চাহিদা **মত** টিকিট ছিল না। অতি উৎসাহী **দর্শকরা** মাঠের প্রবেশ-দ্বার খোলার ১২ ঘণ্টা আগে রাত্রিবেলায় সারি দিতে আরম্ভ করে। চারজন দর্শক তাঁবু ফেলে সারারাত্রি কাটিয়ে দেয়। খবরে প্রকাশ, টিকিটের দালালরা ৫ শিলিং দামের টিকিটের ২০ শিলিং দাম হাঁকে।

(৭) পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা চতুর্থ দিনেই শেষ হয়। পুরো একদিনের টিকিটের দামটা মাঠে মারা যায়।

অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিচি বেনো দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেন নি। কাঁধের ব্যথার দরুণ টেস্ট খেলার মত তাঁর সামর্থ ছিল না। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের সহ-অধিনায়ক নীল হার্ভে দল পরিচালনার ভার নেন। **অস্ট্রেলিয়া দলের সর্বকনিষ্ঠ** খেলোয়াড় ম্যাকেঞ্জিকে দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত করা হয়। এটাই তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা। ইংল্যান্ড দলেরও সামান্য রদবদল হয়। প্রথম টেস্ট খেলায় নির্বাচিত দল থেকে স্মিথ এবং এ্যালেনকে বাদ দিয়ে পিটার মে এবং টনি লক-কে দলভুক্ত করা হয়। আটটা টেস্ট খেলায় অনুপস্থিত থাকার পর পিটার মে পুনরায় খেলতে নামেন; তবে মে দল পরিচালনার গুরু দায়িত্বভার নেন নি; কাউড্রের নেতৃত্বে সাধারণ খেলোয়াড় হিসাবে খেলতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। অপর দিকে স্লো-লেফ্‌ট-আর্ম স্পিনার জি লক তিন বছর পর টেস্টে দলভুক্ত হলেন।

[illegible] কাউড্রে টসে জয়লাভ করলে ইংল্যান্ডের উপর্যুপরি ১২টা টেস্ট খেলায় জয়লাভের রেকর্ড হয়। এই জয়-লাভের মধ্যে কাউড্রের জয় ৯ বার এবং মে'র ৩ বার। টসে জয়ী হয়েও ইংল্যান্ড তার কোন সুবিধা কাজে লাগাতে পারে নি। লর্ডস মাঠের পীচ ব্যাটসম্যানদের অনুকূলে যাবে বলেই ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞমহলের দৃঢ় ধারণা ছিল এবং সেই কারণে তাঁরা ইংল্যান্ড দলকে টসে জয়ী দেখে বেশী রাণ আশা করেছিলেন।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ইংল্যান্ড ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রথম দিনের খেলায় ২০৬ রাণে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস শেষ হয়। দলের সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন সুব্বা রাও। দলের ১৬৭ রানে ৯টা উইকেট পড়ে যায়। শেষ উই-কেটে দুই বোলার স্টেথাম এবং ট্রুম্যান জুটি বেঁধে দলের আরও ৩৯ রান তুলে দেন। ট্রুম্যান ২৫ রানে বোল্ড হ'ন, স্টেথাম ১১ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। ফাস্ট ন্যাটা বোলার এ্যালেন ডেভিডসন মারাত্মক বল দিয়ে ৪২ রানে ৫টা উইকেট পান। তাঁর বল সকলকেই বেগ দেয়।

অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। দলের মাত্র ৫ রানে ১ম এবং ৬ রানে ২য় উইকেট পড়ে যায়; স্টেথাম বোল্ড করেন কলিন ম্যাক-ডোনাল্ডকে আর ট্রুম্যানের বলে সিম্পসন ক্যাচ তুলে আউট হন। প্রথম দিনের খেলায় নির্দিষ্ট সময়ে দু' উইকেট পড়ে অস্ট্রেলিয়ার ৪২ রান ওঠে।

খেলার ২য় দিনে ৮টা উইকেট পড়ে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে ২৮৬ রান দাঁড়ায়। ওপনিং ব্যাটসম্যান বিল লরী টেস্ট খেলায় তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী (১৩০ রান) করেন। এবারের ইংল্যান্ড সফরে এই নিয়ে তাঁর ৫টা সেঞ্চুরী হ'ল। প্রকৃতপক্ষে উইলিয়াম লরী অস্ট্রেলিয়াকে আলোচ্য টেস্টের খেলায় দ্রুত পতনের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন।

লরী এবং বার্জ (৪৬) ৩য় উই-কেটের জুটিতে দলের ৯৫ রান তুলে দেন। লরী তাঁর নিজস্ব ১০৬ রান করলে বর্তমান বছরের সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের পক্ষে ১০০০ রান পূর্ণ করার প্রথম সম্মান লাভ করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৮০ রানে এগিয়েছে —হাতে জমা আছে মাত্র দুটো উইকেট। নবম উইকেটের জুটিতে আছেন ম্যাকে (৩২) এবং ম্যাকেঞ্জি (২৯)।

তৃতীয় দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার **শেষ** তিনজন খেলোয়াড় কেন ম্যাকে (৫৪), গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি (৩৪) এবং ফ্রাঙ্ক মিশন (নট আউট ২৫) ইংল্যান্ডকে ৮৫ মিনিট সময় খাটিয়ে নেন এবং এই ৮৫ মিনিট সময়ে দলের আরও মূল্যবান ৫৪ রান পূর্ব দিনের ২৮৬ রানের সঙ্গে যোগ করেন। অস্ট্রেলিয়ার শেষের দিকের খেলোয়াড়েরা ইংল্যান্ডকে খুব ল্যাজে খেলিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিচিত্র চতুষ্পদ ক্যাঙগারুর ল্যাজের জোর মারাত্মক। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের ল্যাজের জোরও যে সেইরকম শেষের দিকে যাঁরা নেমেছিলেন তা প্রমাণ করেছেন। দলের মোট ৩৪০ রানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ৯ম উইকেটের জুটীতে ৫৩ রান এবং ১০ম উইকেটের জুটীতে ৪৯ রান মোট ১০২ রান ওঠে। খেলার ৩য় দিনে পূর্ব দিনের ২৮৬ রানের (৮ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৫ রান যোগ হ'লে ম্যাকেঞ্জি এবং ম্যাকের ৯ম উইকেটের জুটী ভেঙ্গে যায় —ম্যাকেঞ্জি নিজস্ব ৩৪ রান করে ট্রুম্যানের বলে বোল্ড হলেন। ম্যাকের সঙ্গে শেষ জুটি বাঁধলেন মিশন। তৃতীয় দিনের খেলার গোড়াতেই ম্যাকেঞ্জিকে আউট ক'রে ইংল্যান্ড যে আশার আলো দেখেছিল শেষ উইকেটের জুটি ম্যাকে এবং মিশনের খেলায় ইংল্যান্ডের খেলো-য়াড়রা সারা মাঠে সর্ষে ফুল দেখলেন। দলের ৩৪০ রানে ম্যাকে নিজস্ব ৫৪ রানে ইলিংওয়ার্থের বলে ব্যারিংটনের হাতে ধরা পড়লেন। শেষ উইকেটে ম্যাকে
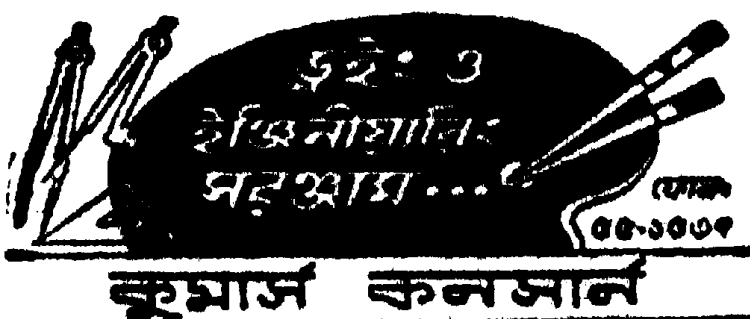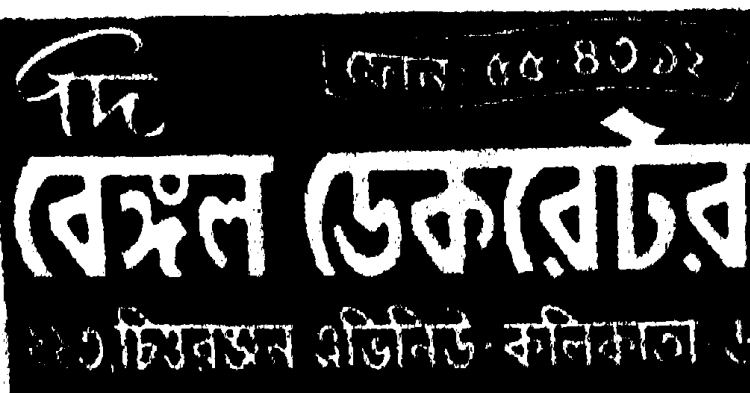
ফ্রেডী ট্রুম্যান

এবং মিশন ৭৭ মিনিট খেলে দলের ৪৯ রান তুলে দেন। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে খেলেছিল ৮ ঘন্টা ২২ মিনিট—তৃতীয় দিন ৮৫ মিনিট। লাঞ্চের বিরতির সময় দেখা গেল ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসে কোন উইকেট না পড়ে ৩১ রান উঠেছে। লাঞ্চের পরই দলের ৩৩ রানে ১ম উই-কেট পড়ে। ৩য় দিনের খেলার নির্দিষ্ট সময়ে ইংল্যান্ডের ৬টা উইকেট পড়ে, মাত্র ১৭৮ রান দাঁড়ায়।

৪র্থ দিনে ইংল্যান্ডের পূর্ব দিনের ১৭৮ রানের সঙ্গে বাকি চারটে উইকেটে মাত্র ২৪ রান যোগ হয়, ফলে ২য় ইনিংসের খেলা ২০২ রানে শেষ হয়। এই দিন ম্যাকেঞ্জি মাত্র তিন রান দিয়ে ৩টে উইকেট পান। প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ২য় ইনিংসের ৩৭ রানে মোট ৫টা উইকেট পান। চতুর্থ দিনে আর একটা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা, অস্ট্রেলিয়ার উইকেট-কিপার গ্রাউটের ক্যাচ ধরা। ইংল্যান্ডের ট্রুম্যান অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকেঞ্জির বলে খোঁচা মেরে একটা ক্যাচ তুলেন, বলটা বেশ দূরে পাল্লায় ছিল। কিন্তু গ্রাউট সটান শরীর ছড়িয়ে দিয়ে বলটা এক হাতে লুফে নেন্—বলটার মাটিতে পড়তে আর মাত্র পাঁচ ইঞ্চি বাকি ছিল। এই নিয়ে ওয়ালি গ্রাউট টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ১০০টা উই-কেট পাওয়ার গৌরব লাভ করলেন। গ্রাউট দ্বিতীয় টেস্টের ১ম ইনিংসে ৩টে এবং ২য় ইনিংসে ৫টা মোট ৮টা ক্যাচ লুফেন—মাত্র ১টার জন্যে তিনি বিশ্ব রেকর্ডের সমান করতে পারেন নি। ১৯৫৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার গিল ল্যাংলি একটা টেস্ট খেলায় ৯টা ক্যাচ লুফে বিশ্ব রেকর্ড করেন।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৬৯ রাণ তুলতে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কিন্তু ট্রুম্যান এবং স্টেথামের মারাত্মক বোলিংয়ের চোটে অস্ট্রেলিয়া দারুণ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। দলের ৪টে উইকেট পড়ে যায় মাত্র ১৯ রানে। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায় ৩৫, ৪টে উইকেটে। তখনও জয়লাভের জন্য ৩৪ রান বাকি ছিল। এর পর দলের ৫৮ রানে ৫ম উইকেট পড়ে।

দলের ৬৭ রাণের মাথায় পিটার বার্জ স্টেথামের বলে বাউন্ডারী করলে রাণ সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১, ৫ উইকেট পড়ে।

অস্ট্রেলিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৩ রান ক'রে ৫ উইকেটে জয়ী হয়।

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৪৪০ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ম্যাকডোনাল্ড ১৪০, বুথ নট আউট ১২৭, লরী ৭০, বেনো ৪৪, বার্জ নট আউট ৪৮) ও ৭২ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জার্মাণ ৮৫)

সামারসেট ঃ ২৯৮ (ডবলউ এ্যালে ১৩৪। ক্লাইন ৮৯ রাণে ৫ উইকেট) ও ২৩০ (৯ উইকেট। এ্যালে ৯৫, রো ৭১। গন্ট ৫০ রানে ৬ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল তাদের ইংল্যান্ড সফরের ১৭শ খেলায় সামার-সেট কাউণ্টি দলের বিপক্ষে খেলেছে। খেলা ড্র যায়।

বর্তমানে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছেঃ মোট খেলা ১৬; অস্ট্রেলিয়ার জয় ৬, খেলা ড্র ১০।

সামারসেট দলের ন্যাটা অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় বিল এ্যালের শতাধিক রাণের দরুণই সামারসেট মাত্র ৮ রাণের জন্যে 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি লাভ করে। খেলার ৩য় দিন অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে ২০২ রাণ করে ২য় ইনিংসের খেলার

কলিন ম্যাকডোনাল্ড

সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার ৪ ঘন্টা সময় হাতে পেয়ে সামারসেট ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। জয়লাভের জন্যে ৩৪৫ রাণের প্রয়োজন ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সামারসেট দলের ৯ উইকেটে ২৩০ রাণ উঠলে খেলাটি ড্র যায়। বিল এ্যালে ২য় ইনিংসে মাত্র ৫ রাণের জন্যে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন।

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া
তৃতীয় টেস্ট

তারিখ ঃ ৬, ৭, ৮, ১০, ১১ই জুলাই

লিডস্ মাঠ

লিডস মাঠে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত ১১টা টেস্ট খেলা হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪, হার ১ এবং খেলা ড্র ৬।

একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান লিডস মাঠে দু'বার তিন শতাধিক রাণ করার রেকর্ড করেন। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্টে তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যাটসম্যান লিডস মাঠের মাটিতে দাঁড়িয়ে ডবল সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। লিডসের উইকেটে এই দুই দলের টেস্ট খেলায় ডন ব্র্যাডম্যান ৪টি সেঞ্চুরী করে সর্বাধিক সেঞ্চুরী রাণ করার রেকর্ডও করেছেন।

আবার এই মাঠেই অস্ট্রেলিয়া একবার শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়; ১৯০২ সালে ইয়র্কসায়ার কাউণ্টি দলের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়া মাত্র ২৩ রাণ করে। এই রাণই অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে লিডস মাঠে এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রাণ করার নিদর্শন।

ইংল্যান্ডের মাটিতে এই দুই দেশের মধ্যে এ পর্যন্ত (৫ই জুলাই) ৮৩টা টেস্ট খেলা হয়েছে। ফলাফল—ইংল্যান্ডের জয় ২৪, অস্ট্রেলিয়ার ২২, এবং খেলা ড্র ৩৭, সুতরাং এখনও ইংল্যান্ড ২টি খেলায় জয় লাভের ব্যবধানে এগিয়ে আছে।

লিডস্ মাঠের রেকর্ড

(১৯৬১ সালের ৫ই জুলাই পর্যন্ত)

মোট খেলার ফলাফল

মোট খেলা ১১। অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪, ইংল্যান্ডের জয় ১ এবং খেলা ড্র ৬।

এক ইনিংসে সর্বাধিক রাণ

৫৮৪ অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩৪
৪৯৬ ইংল্যান্ড, ১৯৪৮

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রাণ

৮৭ ইংল্যান্ড, ১৯০৯
১৭২ অস্ট্রেলিয়া, ১৮৮৯

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ঃ ৩৩৪ ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০

ইংল্যান্ডের পক্ষে ঃ ১৪৪* এফ এস জ্যাকসন, ১৯০৫

সেঞ্চুরী রাণ

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ঃ ১১
ইংল্যান্ডের পক্ষে ঃ ৬

সর্বাধিক সেঞ্চুরী
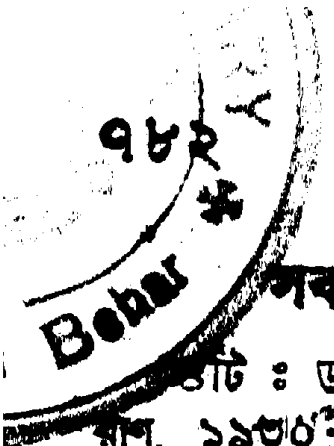
মোট : ডন ব্র্যাডম্যান, অস্ট্রেলিয়া (৩৩৪ রাণ, ১৯৩০; ৩০৪ রাণ, ১৯৩৪; ১০৩ রাণ, ১৯৩৮; ১৭৩* রাণ, ১৯৪৮)

লিডসে প্রথম সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ১৪৪* এফ এস জ্যাকসন, ১৯০৫; ১০০ জে টি টিল্ডসলি ১৯০৫।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১১৫ সি জি ম্যাকার্টনি, ১৯২১।

প্রথম টেস্ট খেলায় প্রথম সেঞ্চুরী

[যাঁরা ইংল্যান্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজ জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেন]

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১১২ নীল হার্ভে ১৯৪৮। ইংল্যান্ডের পক্ষে কোন খেলোয়াড় এ কৃতিত্ব লাভ করতে সক্ষম হন নি।

* নট আউট

হ্যাট্-ট্রিক

ইংল্যান্ডের পক্ষে : জে টি হিয়ার্ণি, ১৮৯৯

এক নজরে ফলাফল

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচ

(১৯৬১ সালের ৫ই জুলাই পর্যন্ত)

	মোট খেলা	ইংল্যান্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	খেলা ড্র
ইংল্যান্ডে	৮৩	২৪	২২	৩৭
অস্ট্রেলিয়ায়	৯৭	৩৮	৫৩	৬
মোট	১৮০	৬২	৭৫	৪৩

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

আলোচ্য সপ্তাহে (২৬শে জুন থেকে ২রা জুলাই) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল :

মোহনবাগান দলের বিপক্ষে ১—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলের জয়লাভ এবং পরবর্তী খেলায় ওয়াড়ীর সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলা ড্র। বি এন আর, এরিয়ান্স এবং ইষ্টার্ণ রেলওয়ে এই তিনটি দল আলোচ্য সপ্তাহে ২টো করে ম্যাচ খেলেছে এবং প্রত্যেকটি খেলা ড্র গেছে। মহমেডান স্পোর্টিং দল এরিয়ান্স ... ন্যাশনাল দলের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে পরবর্তী খেলায় ৩—১ গোলে রাজস্থানকে পরাজিত করেছে। লীগের প্রথমার্ধের খেলায় মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে এরিয়ান্স ও রাজস্থান খেলা ড্র করেছিল।

ইষ্টবেঙ্গল দল ১—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত ক'রে মোহনবাগানের থেকে তিন পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। সমান ১৬টা খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের তখন পয়েন্ট দাঁড়ায় ২৯, মোহনবাগানের ২৬। খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে, কিন্তু খেলার মান মোটেই উন্নত পর্যায়ের হয়নি; খেলায় জয়লাভের আনন্দ ছিল কিন্তু খেলা দেখার আনন্দ ছিল না। কোন দলই তাদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেনি।

মোহনবাগান দলের অধিনায়ক চুণী গোস্বামী এইদিনের খেলায় নামেন নি, আগের খেলায় আহত হয়ে পড়েন। স্টপার জার্ণেল সিং অনেক দিন অনুপস্থিত থেকে নেমেছিলেন; কিন্তু খেলা দেখে মনে হ'ল এখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন। চুণী গোস্বামীর অভাবই বড় ছিল; তাঁর অভাবে মোহনবাগান দলের আক্রমণভাগের খেলায় কোন সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণধারা রচনা করা সম্ভব হয়নি। খেলোয়াড়দের মধ্যে বুঝাপড়ারও যথেষ্ট অভাব ছিল।

দর্শক সমাগমের কথা বাদ দিলে কোন সময়েই মনে হয়নি ভারতবর্ষের দুই বিখ্যাত দলের মধ্যে খেলা হচ্ছে।

ইষ্টবেঙ্গল তার পরবর্তী সপ্তদশ খেলায় দুর্বল ওয়াড়ীকে হারাতে পারে নি—খেলাটি গোলশূন্যভাবে ড্র যায়। ফলে মোহনবাগানের থেকে আগের তিন পয়েন্টের ব্যবধান কমে উপস্থিত ২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে হারিয়ে পরবর্তী খেলায় দুর্বল দলের সঙ্গে খেলা ড্র করা—ইষ্টবেঙ্গল দলের এটা দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। পূর্বে মহমেডান স্পোর্টিংকে ৫—০ গোলে পরাজিত করে ঠিক পরের খেলায় ১—১ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে ড্র করে।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ১৭টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট করে ইষ্টবেঙ্গল দলের থেকে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে লীগের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। মোহনবাগান তার সপ্তদশ খেলায় ৩—১ গোলে পুলিশকে পরাজিত করে। লীগের প্রথমার্ধের খেলায় তারা একই গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল।

বি এন আর, এরিয়ান্স এবং ইষ্টার্ণ রেল দল প্রত্যেকেই তাদের দুটো ক'রে খেলা আলোচ্য সপ্তাহে ড্র করেছে। সমান ১৫টা খেলায় বি এন আর ২২ পয়েন্ট ক'রে ৩য়, এরিয়ান্স ১৯ পয়েন্ট করে ৪র্থ এবং ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ১৮ পয়েন্ট ক'রে ৫ম, স্থানে অবস্থান করছে। এরিয়ান্স খেলা ড্র করেছে মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইষ্টার্ণ রেল দলের বিপক্ষে। বি এন আর ড্র করেছে বালী প্রতিভা এবং খিদিরপুর দলের সঙ্গে। ইষ্টার্ণ রেল দল ১—১ গোলে জর্জ-টেলিগ্রাফ দলের সঙ্গে খেলা ড্র করে। মহমেডান স্পোর্টিং দলের ১৭টা খেলায় ২০ পয়েন্ট হয়েছে। ২।৭।৬১

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠাম আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকি[illegible] থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা : ৩

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ম[illegible]৪০ [illegible] পঃ
শুক্রবার, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৬৮ ব[illegible]ব্দ

Friday, 14th July, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

কলিকাতা কর্পোরেশনে গত শুক্রবারের অধিবেশনে যেভাবে সভাভংগ হয়েছে, তা নিশ্চয়ই অভূতপূর্ব নয়। কিন্তু রাজনীতির সহজশিক্ষার উপকরণ হিসাবে ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কলিকাতা কর্পোরেশনে সচরাচর যা ঘটে, "সেই পুরাতন কৌশলের পুনরাবৃত্তি, পরস্পরের প্রতি কটূক্তিবর্ষণ, লোহার পেপার-ওয়েট টেবিলে ঠুকে কান ফাটানো আওয়াজ, উত্তেজিত মুখগুলি থেকে অনর্গল বাক্যপ্রবাহ—সব কিছুই দ্রুতধাবমান নাটকীয় দৃশ্যের মত ঘটেছিল। এবং নাটকের শেষ দৃশ্যে বাধ্য হয়ে মেয়র কর্তৃক সভাভঙ্গের পর যবনিকাপাতন"। কিন্তু কর্পোরেশন রাজনীতির সহজশিক্ষার দিক থেকে ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্য যে, এই প্রাপ্তবয়স্ক উচ্ছৃঙ্খলতার অব্যবহিত পটভূমিটি হচ্ছে ধাপার মাঠ বিলিবন্দোবস্তের ব্যাপার। যে মাঠে কলিকাতার আবর্জনা স্তূপীকৃত করা হয় সেই দুর্গন্ধ, উর্বর, ফসলী ভূমিখণ্ড ইজারার প্রশ্নটি বহু লক্ষ টাকা এবং কয়েক ডজন কাউন্সিলারের স্বার্থের প্রশ্নের সঙ্গে গভীর এবং গূঢ় সম্পর্কে জড়িত আছে। কাজেই অতীতে চরের জমিতে জমিদারের লাঠিয়ালেরা যেমন দাঙ্গার হুঙ্কার তুলত, তেমনি এযুগে সেই লাঠিয়ালেরই সভ্যতম সংস্করণ—কাউন্সিলারেরা কর্পোরেশন সভায় হুঙ্কার তুলছেন—এ কথা রাজনীতির একান্ত সুবোধ ছাত্রেরাও অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই আবর্জনার রাজনীতি এবং জঞ্জালের কায়েমী স্বার্থ কর্পোরেশনের লালবাড়ীর প্রত্যেকটি কক্ষকে [illegible]একটা বিষাক্ত, দুর্গন্ধ চক্রান্তে [illegible]ীভূত করেছে। নতুবা যেমন এই দি[illegible] উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা সভাভঙ্গ ঘট[illegible]নার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তেম[illegible]ন কলিকাতার রাজপথে স্তূপীকৃত [illegible]আবর্জনা, বর্ষার সঞ্চিত জলে নগর[illegible] প্লাবিতদশা, বস্তির কুৎসিত মধ্যয[illegible]ীয় জীবন এবং আকণ্ঠ পরিপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীর বিভ্রাট ও দূষিত পানীয় জলের বিভীষিকা—কোনোটাই অনিবার্য হওয়ার কথা নয়।

কলিকাতার দুর্ভাগ্য এই আবর্জনা কিংবা উল্লিখিত পরিবেশ নয়—তার আসল দুর্ভাগ্য এই যে, কর্পোরেশনের লালবাড়ীর মধ্যে এই আবর্জনা একটা স্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়েছে এবং সেই মূলধনের বাৎসরিক বাঁধা ডিভিডেন্ড বহু রাজনৈতিক অংশীদারেরা প্রলুব্ধ হস্তে গ্রহণ করছেন। কলিকাতার দুর্দশা অদ্যকার দিনে দুঃসাধ্য সমস্যারূপে গণ্য হতে পারে না এবং প্রত্যেকেই একথা জানেন যে, 'ডেভেলপমেণ্টাল ইকনমি' বা উন্নয়ন-মূলক অর্থনীতির যুগে আজ যদি কলিকাতা নগরীকে বহুলাংশে ভেঙ্গে ঢেলে সাজাতে হয় তাহলেও অর্থের অভাব শেষ পর্যন্ত ঘটবে না। কিংবা সেই অর্থব্যয় শেষ পর্যন্ত অফলপ্রসূও হবে না। তথাপি গত ১৪ বৎসরে স্বাধীনতার উত্তরকালে কলিকাতা নগরীর স্বাস্থ্যবর্ধনের, আকার পরিবর্তনের কিংবা নূতন প্রকৃতি নিরূপণের বিন্দুমাত্র চেষ্টা ঘটেনি। এই দীর্ঘ ১৪ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৭ বৎসর পূর্বে জলসরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের নূতন একটা পাইপ লাইন স্থাপনের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, কলিকাতার বর্তমান ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটিই একমাত্র বৃহৎ পরিকল্পনা হিসাবে গণ্য হয়েছে। এবং এতেই কর্পোরেশনের মহারথীরা সাত বৎসর তপস্যায় কাটিয়েছেন! পুরাণের ভগীরথ ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই জাহ্নবীর ধারা কলিকাতায় প্রবাহিত করতে পারতেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই দুঃসাধ্য ব্রতটিও এখন পর্যন্ত উদ্‌যাপিত হয়নি এবং কবে হবে সে তারিখও অনিশ্চিত। এ যদি কেবলমাত্র ক্ষুদ্র মানুষের অক্ষমতার ব্যাপার হত, তাহলে খেদোক্তির দ্বারাই আমরা আত্মধিক্কার গ্রহণ করতাম। কিন্তু আসলে প্রশ্নটি অক্ষমতার নয়, পরিকল্পিত নিষ্ক্রিয়তার—যে নিষ্ক্রিয়তা আবর্জনার মূলধনের পথে লোভনীয় ডিভিডেন্ড প্রসব করে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ এই দুঃসহ অবহেলা ও দুর্নীতির মধ্যেই জীবনকে অভ্যস্ত করে তুলেছেন। কর্পোরেশনের প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা এবং গোপন অর্থলিপ্সা কলিকাতায় আজ পর্যন্ত কোনো গণবিক্ষোভে ধিকৃত হয়নি, যদিও শুনি, কলিকাতার নাগরিকেরাই ভারতবর্ষে সব চেয়ে সচেতনমনা। কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশন যে ৫৫ লক্ষ মানুষকে আজিকার দিনে এই বীভৎস মধ্যযুগীয় জীবনের পরিবেশে দুঃসহ যন্ত্রণায় বন্দী করে রেখেছেন, তার বিরুদ্ধে কোনো সার্থক প্রতিবাদ কি আজ পর্যন্ত ধ্বনিত হয়েছে? অথবা, হবে, এই আশা আছে?

কবিতা

মংপু
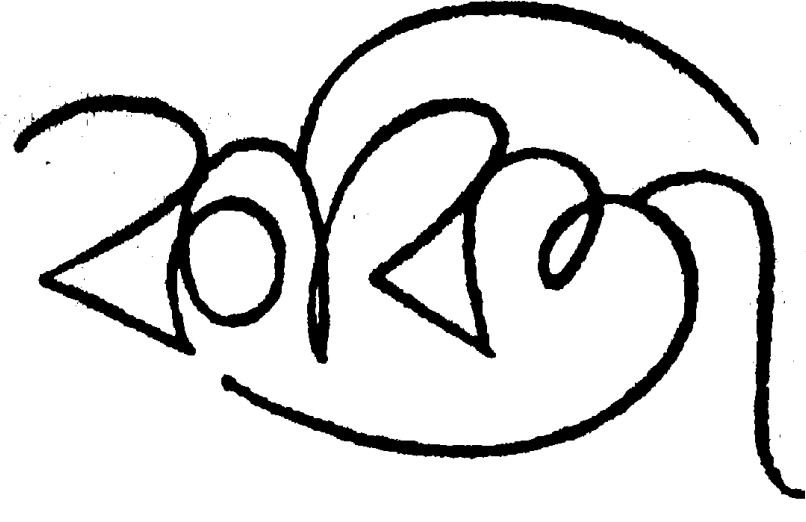
জগন্নাথ চক্রবর্তী

দিগন্তে ছাই রং ঢালা
ঊর্ধ্বে রেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার
এখানে বৈশাখ শেষে
দেখা হ'ল তোমার আমার।

এই রক্তকরবীর গুচ্ছ, আর
ওই ভুঁইচাঁপা
এরি মধ্যে তোমার স্বাক্ষর
রঙে রঙে কাঁপা।

তিক্ত সিংকোনার ডালে
রক্তিমাভ পাতা,
লেবুগন্ধী ঘাস আর আঙুরস্তবক
একসূত্রে গাঁথা।

ফুলের উৎসবে মাতে
বেগুনি-রং জাকারান্দা শাখা
চপল বৃষ্টিতে ধোয়া ঝরে-পড়া ফুল
সেই রঙে মাখা।

মংপুর আকাশে বনে
পাহাড়ে ও পাহাড় প্রান্তরে
একটি তুলির রং—আশ্চর্য তুলির—
শুধু খেলা করে।

বৃষ্টিতে ধোয় না রং
হাওয়ায় মোছে না,
মৃত্যুর ঝড়েও জানি
এ রং ঘোচে না।

মংপুতে বৈশাখী জলে
আঁকা এক জলরঙা ছবি
তার মধ্যে তুলি হাতে তুমি
বসে আছো কবি।

* * *

রাধা

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

যতই তাকে আড়ালে রাখো, মন—
পরিখা কেটে, পাহাড় গড়ো বাধার,
জলে-স্থলে সকল অঙ্গ ঘিরে
রয় যে বুকে বাহুবন্ধ রাধা।

দেয়াল তুলে দাও না সুতো ছিঁড়ে
স্থান-কালের হারাক সীমানা, তার;
আঁধারে জ্বালে ভালোবাসার মণি
দে[illegible] যে ভাঙে অথৈ কালো পাথার।
মন, তোমার গাঁটছড়ায় বাঁধা
রয় যে পিছে অনুগামিনী রাধা।

সহজ রঙ্গে বরং তুমি বাঁধো
দুবাহু দিয়ে তপ্ত বরতনু,
দেহের তটে হও শীতল ঢেউ
চন্দনের স্নিগ্ধ পরমাণু।

বাঁশির সেই রন্ধ্রে সুরে সুরে
নূপুর তার বাজে হৃদয় জুড়ে
মুক্তি সুখে, নকল বিধি-বাধার
দেয়াল ভাঙে,—সকল অঙ্গ ঘিরে
রয় যে বুকে বাহুবন্ধ রাধা॥

*

পাখি ডেকে যায়

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

নৈঃশব্দ্যে কিরূপে শোভা, তবু তার মুখের আদল
চিরকাল ধ'রে আছে চোখের বাহিরে, অশ্রুরূপে।
প্রচ্ছন্ন রেখেছি ফুল; বাগানের আঁধারে বাদল
করতালি দিয়ে ডাকে, বাতায়ন খুলে যায় চুপে।

রৌদ্র চোখে পড়ে, আর গাছের শিকড়, গোরস্থান;
যুবকের মুখ প'ড়ে আছে মৃত, শিমুল তলায়।
পাখি ডেকে যায়, তার শব্দে নেই প্রেমের সম্মান,
কুঠারে নাচাও শূন্যে, গান করো নিষ্ঠুর গলায়।

পাখি ডেকে যায়, আর যুবকের মৃত্যুর নিকটে
গোধূলির আলো কাঁপে, আনত মুখের পার্শ্বে, একা
বাতিদান নিষ্পলক, ফলকে রয়েছে লেখা নাম,
বাতায়ন খুলে যায়, বন্ধ হয়ে যায়; দৃশ্যপটে
নৈঃশব্দ্য কিরূপে বর্ণেগন্ধে শোভমান,—যায় দেখা।
কেবল মেলে না তারে, তার মুখ, নয়নাভিরাম!

* * *

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২২।৯।৫৯

সত্যেন (বোস) দিল্লী থেকে এসে দেখা করে গেল। ক'ঘন্টার জন্য, যতটুকু আসে ততটুকুই ভাল[illegible] সালে তার সঙ্গে পরিচয়, এখনও ঠিক তাই। অনেক কথা তার সম্বন্ধে বলতে চাই, পেরে উঠি না। মন্টুর (দিলীপ) মতন ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখতে পারি না, তার একটা record-এর sense রয়েছে, আমার নেই। আমার স্মৃতি বিশ্বাসযোগ্য নয়, এবং লিখে রাখতেও পারি না। আমার মন অবশ্য এলোমেলো নয়; আমার time-sequence-টা ঘড়ির কাঁটা দিয়ে চলে না। তাই সত্যেনের সম্বন্ধে কেবল একটা কথাই মনে হয়: সত্যেনের মতন একসঙ্গে হৃদয় ও মস্তিষ্কের অতটা উন্নত ব্যবহার কোথাও দেখিনি। তারই মধ্যে কিন্তু আবার বলি, হৃদয়টা আরও বড়—একটু কম হলেই চলত।

অঙ্কে, ফিজিক্সে, কেমিষ্ট্রিতে সে দিগগজ। শুনেছি, নিজে জানি না। দুবার Mathematical Physics সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়, কিছুই বুঝলাম না। একটা কেবল আশ্চর্য লাগল; প্রায় দুই ঘন্টা বলে গেল ইংরেজীতে, একবার আমি—কথাটা ব্যবহার করলে না, It can be argued; it may be often said, one can state—ইত্যাদি। খুব ভিড় হয়েছিল প্রত্যেকবার, কিন্তু সেখানে আমিই একমাত্র নালায়েক।

কিন্তু দু'একটা আশ্চর্যের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছি। আমি সেবার ইতিহাসে এম, এ, পরীক্ষা দিচ্ছি। পরীক্ষার ঠিক পূর্বেই আমার মেজ ভাই-এর মৃত্যু হোলো, আর আমারও অসুখ হোলো। এক সপ্তাহের জন্য প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম। আমার ছোট ভাই আমাকে বই পড়ে শোনাত। একদিন ভোরবেলা সত্যেন এসে হাজির। ভোরবেলাই আসত। বল্লাম ঈজিপ্ট পড়েছি, কিন্তু এসিরিয়া, হিটাইট প্রভৃতি কিছুই মনে আসছে না। আসুর-বানিপালের ৯২টা আর আসুরিরহীসের ৮২টা—কোনটা কি মনে নেই—কিছুই আসছে না। সত্যেন চুপ করে থেকে বল্লে, 'দে আমাকে।' দিলাম; সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে জিনিসটা ঠিক করে দিলে। তারপরে পরীক্ষায় তিনটি প্রশ্ন এলো, এবং ভালোই লিখলাম। কিছুদিন পরে ডাঃ গৌরাঙ্গ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা। তিনি Ancient East পড়াতেন, টাইপ করা ছাঁকা লেখা আমাদের মুখে বলতেন, আর আমরা লিখে নিতাম, অর্থাৎ অন্যে লিখে নিতো। একদিন টাইপের কাগজ

আনতে ভুল হয়েছে। তিনি নীরব। আমি বল্লাম, 'সার, আজ একটা বাঘের গল্প বলুন।' সে যাই হোক, গৌরাংগ-বাবু অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পরীক্ষার পর জিজ্ঞাসা করলেন, ধূর্জটি, আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেছি তোমার খাতা পড়ে, কখনও আমার ক্লাসে আসতে না, Ancient East পড়েছো বল্লে মনেও হয় না, অথচ লেখা-গুলি বেশ ভালোই হয়েছে?' উত্তর দিলাম, 'সত্যেন পড়িয়ে দিয়েছিল।' 'ও; সত্যেন! তাই বল!'

এই রকম ছোটখাট জিনিস। মাথার ব্যবহার বিশেষ কিছু দেখিনি, কিন্তু তার সবটাই মাথা। দেখেছি কিন্তু বেশী হৃদয়বৃত্তির। কত লোককে অজানিতে টাকা দিয়েছে, কত উপায়ে অন্যকে সাহায্য করেছে, মুখে মুখে পড়িয়ে দিয়েছে, কেউ বিপদে পড়লে তার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে, বন্ধুর ভাই যক্ষ্মা-রোগে বেশ্যাবাড়িতে পড়ে আছে, তাকে হাসপাতালে তুলে এনেছে, বন্ধুর বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে দেখলে আপন করে নিয়েছে। একদিনের কথা মনে হোলো। সেবার Indian Science Association-এ এক বাৎসরিক সভায় সে সভাপতিত্ব করছে। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষের লাট সাহেব, ওয়েভেল সাহেব, সকলকে খানা দিলেন, সেদিনকার সত্যেনই প্রধান অতিথি, আশা করেছিল সে এসে পৌঁছবে। রাত নয়টা পর্যন্ত এল না—অবশ্য তার পরেও নয়। ব্যাপারটা হয়েছিল এই ঃ দুপুরবেলা একজন পুরাতন হিন্দু স্কুলের বন্ধুর সংগে দেখা; তারই সংগে টাংগা চড়ে তার বাড়ি হাজির, এবং সেইখানেই সারাদিন সে আর তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সংগে গল্প করলে, রাত্রে খেয়েও এলো। ওয়েভেল সাহেবের সংগে আর দেখা হল না। পরের দিন লেডি ওয়েভেল জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হোলো Sailor boy—এলে না কেন, আমরা সব তোমার জন্যে বসেছিলাম।' আমতা আমতা করে একটা জবাব খাড়া করলে। সে ক'দিন কোলকাতার চাঁদনী থেকে একটা টুপি কিনে সারাদিন মাথায় পরেছিল। জামা কাপড়েরও সেই দশা। জ্ঞান মুখুজ্যে খবরটি দেয়।

এই রকম স্বাভাবিক ভাবে অ-স্বাভাবিক ব্যবহার করত—এখনও করে। স্বভাবটাই মেয়েমানুষের—কিন্তু ন্যাকামি বরদাস্ত করতে পারে না।

লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বারাণসী, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পন্ডিত আর তথাকথিত পন্ডিত দেখেছি। দু'একজন ছাড়া আর সবাই পলিটিসিয়ান, কেউ বেশী আর কেউ কম। (কোলকাতায় শুনেছি কেউ কেউ অসম্ভব পন্ডিত আছেন, এবং তাঁরা পলিটিসিয়ান নন।) দু'ধরণের পলিটি-সিয়ান পাওয়া যায়; এক ব্রিটিশ সরকারের বিপক্ষে আর কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। ইংরেজ এ[illegible] আপাতত নেই, অতএব কংগ্রে[illegible]ই বিপক্ষে বেশী। আদৎ কথা কিন্তু [illegible]ন্য। আমাদের প্রধান ব্যবহার হোলো [illegible]ক্ষা, এবং শিক্ষাই হোলো প্রধান [illegible]বহার, শিক্ষাই হোলো বুদ্ধির প[illegible]রচর্যা। বুদ্ধির চর্চা করে হৃদয়ের ওপ[illegible] মেউড়ি পড়ে। হৃদয়ের অ-ব্যবহার আমাদের স্বভাবে খুবই চোখে পড়ে। অবশ্য সংসারযাত্রায় খানিকটা ঢাকা থাকে। হৃদয়ের এই অ-ব্যবহারের অনেকখানি ব্যবহার খোলে শক্তির, পাওয়ারের, কাজে, কারণ বর্তমান যুগে দায়িত্বহীনতার বদলে সমাজ যেন অধিকার-প্রমত্ত হয়েছে, এবং অধিকারের অর্থই হোলো শক্তি, পাওয়ার, অর্থাৎ পলিটিক্স। সত্যেনের মধ্যে পাওয়ারের তিলমাত্র আকর্ষণ নেই। সে বিদ্যাবুদ্ধি আর হৃদয় নিয়েই কাটিয়ে গেল। সে 'পাওয়ার' বোঝে না, তাই মনে হয় বিশ্বভারতী থেকে চলে এলো, এবং বোধ হয়, জহরলাল, হুমায়ুন কবীরের কাছে অনেক খাতির পেয়েও, তার যথাযোগ্য, অন্ততঃ বাংলা-দেশে, খাতির পায়নি। তার মনুষ্যত্ব ধোঁয়ায় ও কতখানি আমরা ঠিক জানি

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আগামী ১১ই আগস্ট বর্ধিত আকারে বিশেষ প্রবন্ধ ও ছবিতে সুসজ্জিত হ'য়ে অমৃতের একটি **বিশেষ সংখ্যা** প্রকাশিত হবে। কিন্তু মূল্য যথারীতি ৪০ নয়া পয়সাই থাকবে। —সম্পাদক

না। ছেলেরা ভালোবাসে, এক হিসেবে যথেষ্ট, আবার অন্য হিসেবে নয়, এবং সেইটুকুই দুঃখ।

২৪।৯।৫৯

আলিগড় ছেড়ে যাচ্ছি এক সপ্তাহের মধ্যে। এখানকার ছাত্র ও শিক্ষকদের attitude কি?

পাঁচ বছর রইলাম মুসলমানদের স[illegible]এও বহু বৎসর। আমি [illegible] কিছুতেই হিন্দু মুসলমানদের পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না—সবই যুবক, ছাত্র, শিক্ষক। এর বেশী কিছু চোখে পড়েনি।

২৫।৯।৫৯

Arts বল্লে একদল বস্তু আছে; কিন্তু Art বস্তুটি কি arts-এর সাধারণ গুণনীয়ক? Art নিয়ে যা বিজ্ঞান—এবং সেটা বিজ্ঞান—তাকে আমরা নন্দনতত্ত্ব বলি—সেটা তত্ত্ব। নন্দনতত্ত্ব থেকে arts-এর কোনো একটি অংশ Art হতেও পারে, নাও হতে পারে। হতে পারে এই জন্য যে সাধারণ থেকে বিশেষ জন্মায়; কিন্তু হতেও পারে না এই জন্য যে সৌন্দর্যতত্ত্বর চাপে কোনো একটি অংশ মারা যায়। রবীন্দ্র-নাথ সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং বিশেষ বিশেষ কলাকে একত্রিত করেছিলেন, যথা চিত্রা-ঙ্গদা। নন্দনতত্ত্বকে তিনি কিন্তু বিশেষ স্থান দেন নি, তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। অবশ্য তাঁর লেখাই অবরোহী, deduc-tive, সেজন্য নন্দনতত্ত্ব তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। বস্তুতঃ তাঁর লেখাই synthesis মনে হয়। সাধারণতঃ অবশ্য নন্দনতত্ত্ব থেকেই একটা না একটা art-criticism শুরু হয়। সে দুটো আলাদা রাখাই ভালো—ভিন্ন ভিন্ন কলাবিদ্যার চর্চাই শোভন। তারপরে সৌন্দর্যতত্ত্ব।

ভারতীয় সংগীতে musical criti-cism নেই বল্লেই হয়, আছে পদ্য-সংক্রান্ত সৌন্দর্যতত্ত্ব। বিদেশী সংগীতে সবই আছে। কিন্তু যেন চিত্রানুগ, চিত্রই যেন বেশী। এবং সেটা স্বাভাবিক, কারণ কানের অভ্যাস এ যুগে কমে গেছে, চোখের অভ্যাসই খুব বেশী, যথা বিজ্ঞানে। আলাদা করে দেখাই ভালো মনে হয়। জীবনটা স্বল্প। সত্যই কি জীবনটা তাই?

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

জীবন্ত ফসিলের কাহিনী

শিরোনামা দেখে অনেকে নিশ্চয়ই হাসছেন। ফসিল আবার জীবন্ত হয় নাকি! আর জীবন্তই যদি হবে তবে আর ফসিল বলব কেন! অবশ্য কোনো মানুষ সম্পর্কে আমরা বলে থাকি, লোকটা যেন জীবন্ত ফসিল। এই বিশেষণটি প্রয়োগ করে আমরা অনেক সময়েই এই কথাটি বোঝাতে চাই যে এই আধুনিককালে বাস করেও [illegible] ধ্যানধারণা সেই মান্ধাতার আমলের। অর্থাৎ বহুকাল আগেই যা লুপ্ত হওয়া উচিত ছিল তা কালের অমোঘ ভবিতব্যকে ঠেকিয়ে রেখে টিকে আছে। আজ যদি পৃথিবীর কোনো অংশে একটি জীবন্ত ডাইনোসরকে দেখা যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেই ডাইনোসরকে বলব জীবন্ত ফসিল। এমনি এক জীবন্ত ফসিলের আবিষ্কারের কাহিনী শোনাতে বসেছি। ঘটনাটি জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ঘটনাটির সূত্রপাত আজ থেকে তেইশ বছর আগে ১৯৩৮ সালে। খ্রীষ্টমাস শুরু হতে তখনো কয়েক দিন বাকি। দক্ষিণ-আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলের জেলেরা পুরোদমে মাছ ধরছে। একদিন দেখা গেল, পাঁচ ফুট লম্বা আর মণখানেক ওজনের একটা মাছ একজনের জালে আটকা পড়েছে। সমুদ্রের জেলেরা এমনিতেই নানা ধরনের মাছ দেখতে অভ্যস্ত। সহজে তারা অবাক হয় না। কিন্তু এই বিশেষ মাছটিকে দেখে অনেক দিনের অভিজ্ঞ এই জেলেটিকেও অবাক হতে হল। এমন কিম্ভূত চেহারার মাছ সে আগে আর কখনো দেখেনি। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় যাদুঘরের কীপার মিস লাটিমারের কাছে জিম্মা দিয়ে এল মাছটিকে।

আর মাছটি দেখে শ্রীমতী লাটিমারও একেবারে থ'। এমনটি তিনিও এর আগে দেখেননি। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একটি চিঠি লিখলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন অগ্রগণ্য মৎস্যবিদ অধ্যাপক জে. এল. বি. স্মিথের কাছে। চিঠিটার ওপরে অধ্যাপক স্মিথ খুব বেশি গুরুত্ব দিলেন না। এমনি ধরনের চিঠি তিনি প্রতি মাসেই গণ্ডা কয়েক পেয়ে থাকেন। কোনো ক্ষেত্রেই আজ পর্যন্ত নতুন কিছু তাঁর চোখে পড়েনি। তবুও জবাবে তিনি লিখলেন যে শ্রীমতী লাটিমার যেন মাছটিকে সংরক্ষিত করে রাখেন। খ্রীষ্টমাসের পরে তিনি সময় করে একবার যাবেন।

শ্রীমতী লাটিমার চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু খ্রীষ্টমাস উৎসব বলে তো আর মাছের পচন বন্ধ করা যাবে না! মাছটা পচতে লাগল আর গলতে শুরু করল। পচা-গলা মাছটাকে জঞ্জালের মতো ফেলে দেওয়া ছাড়া শ্রীমতী লাটিমারের আর গত্যন্তর রইল না। আর ঠিক এমনি সময়ে অধ্যাপক এসে হাজির। মাছটিকে তিনি দেখলেন [illegible] তিনি অবাক হয়ে গেলেন যে তাঁর মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি চোখের সামনে এমন একটি জীবকে দেখছেন যা ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবার কথা। জীবাশ্মবিদেরা এই জীবটির সঙ্গে খুবই পরিচিত এবং এর নাম তাঁরা দিয়েছেন কোয়েলাকান্থ্ (Coelacanth)। জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, ক্রমবিকাশের ধারায় ডাঙার মেরুদণ্ডী জীবদের একেবারে গোড়ায় রয়েছে এই কোয়েলাকান্থ্। অথচ মাত্র দশ দিন আগেও এই জীবটি জীবন্ত অবস্থায় সমুদ্রের জলে চলাফেরা করেছে। ঘটনাটি অবিশ্বাস্য। অধ্যাপক স্মিথ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটি আজব বিজ্ঞাপন

১৯৩৯ সালে শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সেই ডামাডোলের মধ্যে কোয়েলাকান্থ্ সম্পর্কে অধ্যাপক স্মিথের লিখিত নিবন্ধটি বিশেষ কারও নজরে পড়ল না। কিন্তু অধ্যাপক স্মিথের তখন আর অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, একটি যখন পাওয়া গিয়েছে তখন চেষ্টা করলে আরো একটি কোয়েলাকান্থ্ সমুদ্রের তলা থেকে পাওয়া যেতে পারে। এবং তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন। মাদাগাস্কার ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মধ্যে ভারত মহাসাগরের যে অংশটিকে বলা হয় মোজাম্বিক প্রণালী সেটি হল তাঁর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। এই উপকূল বরাবর যেখানে যত গ্রাম আছে সর্বত্র তিনি চুঁড়ে বেড়াতে লাগলেন। জেলে-ডিঙিগ আর জাল নিয়ে নিজেও বেশ কয়েক বার পাড়ি দিলেন সমুদ্রে। জেলেদের কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করলেন এমনি ধরনের মাছ আগে আর কারও জালে উঠেছে কি না। আর প্রত্যেককে বারবার
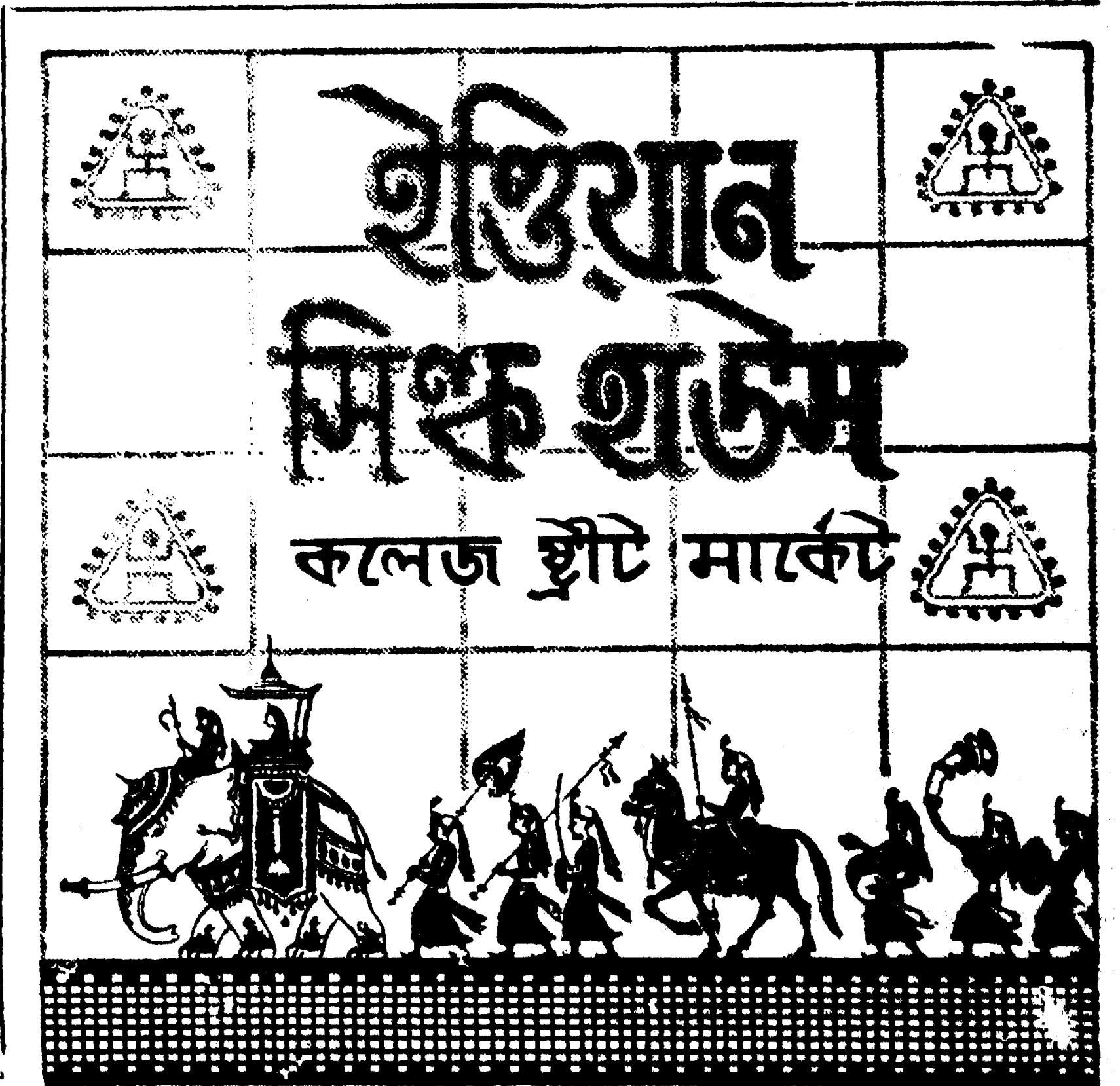
সাবধান করে দিলেন যেন এমনি ধরনের দ্বিতীয় আরেকটি পাওয়া গেলেই তাঁকে খবর দেওয়া হয়।

গ্রামে গ্রামে অদ্ভুত ধরনের একটি বিজ্ঞাপন বিলি হতে লাগল। বিজ্ঞাপনের ঠিক মাঝখানে কোয়েলাকান্থ্-এর ছবি আর ওপরে-নিচে তিন ভাষায় লেখা একটি ঘোষণা ঃ

"এই মাছটির দিকে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। এই মাছটির জন্যে হয়তো আপনি বড়লোক হয়ে যেতে পারেন। দেখুন মাছটির কেমন অদ্ভুত ধরনের জোড়া লেজ, কেমন অদ্ভুত ধরনের পাখনা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে এই মাছ আগে আর মাত্র একটিই পাওয়া গিয়েছে আর সেটি ছিল ৫ ফুট (১৬০ সে, মি,) লম্বা। কিন্তু আরো কয়েকটি মাছ আগে দেখা গিয়েছে। যদি কপালগুণে আপনি এমনি একটি মাছ ধরতে পারেন বা এমনি একটি মাছের সন্ধান পান তাহলে মাছটিকে কোনো রকম কাটাকুটি বা মাজাঘষা করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে আস্তো মাছটিকে ঠান্ডা ঘরে সংরক্ষিত করুন বা এমন কারও হাতে দিন যিনি মাছটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন। আর তাঁকে বলুন নিম্নলিখিত ঠিকানায় সঙ্গে সঙ্গে একটি তারবার্তা পাঠাতে ঃ অধ্যাপক জে, এল, বি, স্মিথ, রোড্স বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রাহাম্স্টাউন দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন। যদি আপনি দুটি মাছ ধরতে পারেন তাহলে প্রত্যেকটির জন্যে আপনাকে হাজার পাউন্ড হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হবে। রোডস্ বিশ্ববিদ্যালয় ও দক্ষিণ আফ্রিকা বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এই পুরস্কারের জন্যে জিম্মাদার থাকছে। যদি আপনি দুটির বেশি মাছ পান তাহলেও প্রত্যেকটিকেই সংরক্ষিত করুন, কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে প্রত্যেকটি মাছই প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রেও আপনাকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করা হবে।"

তিন ভাষায় লেখা এই বিজ্ঞাপনটি লোকের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল।

কোয়েলাকান্থ

আরো একটি জীবন্ত ফসিল

দ্বিতীয় কোয়েলাকান্থ্ যখন ধরা পড়ল ততোদিনে এই বিজ্ঞাপনটি দশ বছরের পুরনো হয়ে গিয়েছে আর সেই ১৯৩৮-এর পরে কেটেছে চোদ্দ বছর। এবারেও খ্রীষ্টমাস শুরু হতে আর কয়েক দিন মাত্র বাকি। ১৯৫২ সালের ২০শে ডিসেম্বর। কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের আঞ্জুয়ান দ্বীপের পূর্ব উপকূল এবারকার ঘটনাস্থল। চোদ্দ বছর ধরে গোটা এলাকাটি [illegible] জন্যে তৈরি হয়ে ছিল। মাছটিকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল ডেপুটি অ্যাড্মিনিস্ট্রেটরের কাছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠালেন মাদাগাস্কারে। চারদিকে এমন একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল যেন কোনো মহামান্য অতিথির পদার্পণ হয়েছে।

মাদাগাস্কার থেকে তারবার্তার জবাব আসতে দেরি হচ্ছিল। ইতিমধ্যে একটি ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপটেন খবরটা শুনে মাছটিকে নিজের তদারকে নিয়ে এলেন এবং সরাসরি তার পাঠালেন অধ্যাপক স্মিথের কাছে। অধ্যাপক স্মিথ সেই তার পেয়ে কি-করবেন ভেবে ঠিক করতে না পেরে টেলিফোন করলেন ডঃ মালানকে। ডঃ মালান সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক স্মিথের জন্যে একটি বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিন্তু এত কান্ড করার পরেও অধ্যাপক স্মিথ যখন এসে পৌঁছতে পারলেন ততোদিনে মাছটি দশ দিনের পুরনো হয়ে গিয়েছে। তবে এবারে আর আক্ষেপ করার তেমন কোনো কারণ ছিল না। কারণ মাছটি খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিল। প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই অধ্যাপক স্মিথ মাছটিকে দেখতে পেলেন। চোদ্দ বছরের প্রতীক্ষার পরে ঈপ্সিত বস্তুর এই দর্শনলাভ! মাছটির সামনে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক স্মিথ শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন।

আরো কয়েকটি

ইতিমধ্যে এই মাছটিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কূটনৈতিক সুতোয় টানাপোড়েন শুরু হয়ে গেল। সে সময়ে মাদাগাস্কারে প্রকৃতিবিজ্ঞান মিউজিয়ামের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ জে মিলো (Dr. J. Millot)। জরুরী কাজে তিনি গিয়েছিলেন প্যারিসে, ফিরে এসে সমস্ত শুনে তিনি রীতিমতো হৈ-চৈ কান্ড বাধিয়ে তুললেন। ফরাসী এলাকার সমুদ্র থেকে পাওয়া কোয়েলাকান্থ্ কিনা ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর হাতে চলে যাবে! এমন ব্যাপার কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ডঃ মিলো নিজেই তৎপর হয়ে উঠলেন। আবার নতুন করে বিজ্ঞাপন বিলি হতে [illegible] মোরো দ্বীপপুঞ্জের জেলেদের কাছে। এবারেও ১,০০,০০ ফ্রাঁ পুরস্কার। এই বিজ্ঞাপন হাতে নিয়ে ডঃ মিলোর সহকারীরা অক্লান্তভাবে জেলেদের সঙ্গেই রাত কাটাতে লাগলেন। জাল ও জেলে-ডিঙ্গি নিয়ে নিজেরাও পাড়ি দিলেন সমুদ্রে। প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে দস্তার লাইনিং দেওয়া বাক্স আর ফর্মালিডহাইড জমা করে রাখা হল। প্রত্যেকটি দ্বীপের শাসনকর্তাকে জানিয়ে রাখা হল যে কোয়েলাকান্থ্ ধরা পড়া মাত্রই জরুরী খবর পাঠাতে যেন বিলম্ব না হয়। আর খবর পাওয়া মাত্রই ডঃ মিলো যাতে যাত্রা করতে পারেন সেজন্যে ফরাসী বিমান বাহিনীর একটি বিমান সর্বক্ষণের জন্যে তৈরি হয়ে রইল।

এবারে কিন্তু পুরো এক বছরও অপেক্ষা করতে হল না। তার আগেই প্রত্যাশিত সুখবরটি পাওয়া গেল।

১৯৫৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। আঞ্জুয়ান দ্বীপের একজন জেলে গিয়েছিল গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে। রাত সাড়ে এগারোটার সময় তারই হাতে ধরা পড়ল প্রকান্ড একটি কোয়েলাকান্থ্। লম্বায় ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। ওজন ৮৭ পাউন্ড। মাছটিকে চিনতে তার একটুও বিলম্ব হল না। সঙ্গে সঙ্গে সে তীরে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল শাসনকর্তার কাছে খবর দিতে। খবর শুনে শাসনকর্তা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এলেন। এলেন তাঁর সহকারীও। সারা রাত ধরে চলল মাছের পরিচর্যা। ভোর হবার আগেই মাছটিকে যাত্রী বিমানে তুলে দেওয়া হল এবং দুপুরের মধ্যেই মাছটি পৌঁছে গেল মাদাগাস্কারের রাজধানীতে। সারা শহরের লোক বিমানঘাঁটিতে ভিড় করে দেখতে এল মাছটিকে।

১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে ধরা পড়ল আরো একটি কোয়েলাকান্থ্। ফেব্রুয়ারী মাসে আরো একটি। সবসুদ্ধু পাঁচটি। শেষ তিনটি কোয়েলাকান্থ্ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত করা হয়েছে। কোয়েলাকান্থ্-এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

হেমিংওয়ে

[illegible]

হিংসার যুগ সম্পর্কে বহু [illegible] বহুকাল ধরে অনেক কথা লিখেছেন, কিন্তু আরনেষ্ট হেমিংওয়ের মত স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে এই হিংসার যুগ সম্পর্কে তেমন কিছু কেউ বলতে পারেননি। এতখানি বাস্তবানুগ নৈর্ব্যক্তিক বক্তব্য আর কেউ উপস্থাপিত করেননি।

বর্তমান কালের পৈশাচিকতার তিন রকমের প্রতিক্রিয়া আছে,—সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ, তার অর্থ নৈরাশ্য। হাকসলীর ভঙ্গীতে নিরুদ্বিগ্ন উদাসীনতা, যা ব্যাপক এবং ধ্বংসলীলায় পালন করা অসম্ভব। আর তৃতীয় পন্থা সর্বপ্রকার পৈশাচিকতাকে সর্বতোভাবে যে কোনো উপায়ে বাধা দেওয়া।

হেমিংওয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্তমান কালের যে কোনো লেখকের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক ব্যবহারের সম্পর্কে অনেকে লিখেছেন, স্পষ্টভাবেই লিখেছেন। হিংসার কুটিল মূর্তি এমিলি জোলা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর রচনায়। হেমিংওয়ে তাঁর উপন্যাসে হিংসার সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে তাঁকে অনেক অভিযোগ শুনতে হয়েছে। তবে সে সব সমালোচকের দৃষ্টি অন্ধ।

হেমিংওয়ে দেহ এবং মনে ছিলেন ভীষণভাবে সুদৃঢ়। সাহিত্যিক অর্থে সাধারণের 'ললিত লবঙ্গলতা' মূর্তি মনে পড়ে, হেমিংওয়ে তা ছিলেন না। তিনি একজন ভালো মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, গভীর জলের মৎস্য শিকারী, বড়দরের শিকারী, আর ছিলেন দুঃসাহসী যুদ্ধ সংবাদদাতা।

মনে হয় হেমিংওয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ বা অদৃষ্ট সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। লেখকরা যে দর্শন তাঁর রচনার মধ্যে প্রচার করেন তিনি স্বয়ং সেই দর্শনে বিশ্বাসী একথা মনে করা ভুল। সেই কারণেই হেমিংওয়ের যাঁরা সমালোচক তাঁরা কিঞ্চিৎ ভুল করেছেন। 'দি কি[illegible]' নামক স্মরণীয় গল্পের ভয়ংকরত্ব[illegible] তাঁরা লেখকের মতবাদ বলে মনে ক[illegible] যে লেখক তাঁর রচনার সাফল্য [illegible]মনা [illegible]বেন তিনি তাঁর রচনার মধ্যে এমন[illegible] কিছু দে[illegible] পাঠকের মনে একটা গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এই প্র[illegible]ক্রিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি হেমিংওয়ের [illegible]জস্ব। তাঁর রচনার বক্তব্য বা আঙ্গিকের মাধ্যমেই সেই প্রতিক্রিয়া তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন, কোথাও আবার দুটি দ্রব্যেরই সমন্বয় ঘটানো হত। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজস্ব, তাই কাগজের ওপর কলম এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। হেমিংওয়ে তাঁর পাঠকের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পেরেছেন এই বক্তব্যও আঙ্গিকের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে।

হেমিংওয়ের সৃষ্ট চরিত্রাবলী দুঃসাহসিক ও নৃশংস পটভূমির মধ্যে প্রেম, ঘৃণা, ঈর্ষা প্রভৃতির চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট এবং তীব্র করে তুলেছে। যেন পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন : 'এই দেখ, এই ত' মানুষের আচরণ। নিষ্ঠুর, কুৎসিত, বীভৎস। তবু এই সত্য। কীটস যাই বলুন, যা সত্য, তা সর্বদা সুন্দর নয়।'

এর অর্থ এই নয় যে, হেমিংওয়ে সুন্দরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সৌন্দর্য বর্ণনার শক্তি তাঁর ছিল না। বরং সে শক্তি তাঁর প্রচুর পরিমাণে ছিল।

হেমিংওয়ের সততা, তাঁর বাস্তবানুগতা, সংসারকে নিরাভরণ এবং নিরাবরণ রূপে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা সততা এবং সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দেয়নি। সৌন্দর্য ও কুশ্রীতা যে পাশাপাশি বিচরণ করে তা তাঁর জানা ছিল। তবে তাঁর সৌন্দর্যজ্ঞান সাধারণ সংজ্ঞার মাপকাঠিতে বিচার করা যাবে না। তাই তাঁর আঁকা নিষ্ঠুরতা এবং কুশ্রীতার ছবি মাঝে মাঝে অতিশয় পীড়াদায়ক মনে হয়।

যদিও চেকভ এবং হেমিংওয়ের ষ্টাইলের মধ্যে অনেক পার্থক্য তবু উভয়ের লিখন পদ্ধতির মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে।

নিজের কালের বা আগেকার যে কোনো লেখকের চাইতে চেকভ বুঝেছিলেন যে, ভাবালুতা বর্জন করলেই ভালো ফল পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর রীতি অনুসারে নীতি প্রচারেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

এতদ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, চেকভ বা হেমিংওয়ে ভাবাবেগবর্জিত মানুষ ছিলেন, তাঁরা তাঁদের রচনার মধ্যে ভাবাবেগ প্রবেশ করতে দেননি। এ একটা সাহিত্যিক লিপিকুশলতা।

এ কালের পাঠক লেখকের মত নিজের মত বলে গ্রহণ করতে রাজী নয়, রচনা পাঠ করে নিজস্ব একটা সিদ্ধান্তে সে পৌঁছতে চায়। তারা ফ্রেমহীন ছবি চায়, লেখককে শিল্পী ভিন্ন অন্য কোনো ভূমিকায় দেখতে চায় না।

কাজের মধ্যে যদি ভাবাবেগ বা নীতির কথা আসে পাঠক সেটিকে তার আপন অনুভূতি হিসাবেই গ্রহণ করতে চায়, লেখকের নয়। তাই লেখক যদি কোনো বিশেষ ভাব জাগাতে চান, কিংবা নীতির ন্যায়দণ্ড ঘোরাতে চান তাহলে তাঁকে প্রাক-চেকভীয় লেখকদের চাইতে অধিকতর সূক্ষ্মতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। হেমিংওয়ে বিদগ্ধ-বিরোধী মানুষ ছিলেন না, যদিচ অনেক সমালোচক তাঁকে সেইভাবে আঁকতে চেয়েছেন। সব লেখকের মতই তিনি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছেন, যখন তাঁর ঊনচল্লিশ বছর বয়স তখন তিনি লিখেছিলেন 'To have and Have not', সেই গ্রন্থ অত্যন্ত

সমাজ-সচেতন গ্রন্থ। সাধারণ মানুষের চোখ দিয়েই তিনি বিশ্ব-সংসারকে দেখেছেন।

হেমিংওয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন এবং দেখেছেন নিজের চোখ দিয়ে, সেখানে তাঁর পরিক্রমা Conducted Tour নয়, ডি, এচ, লরেন্সও তাই করেছিলেন, সেইখানে তিনি লরেন্সের সমগোত্রীয়। নর-নারীর সম্পর্কে তাঁদের ধারণা সেকেন্ড হ্যান্ড নয়। তাঁর সৃষ্ট সৈনিক বা কর্মীদের পরিচিত মানুষ বলেই জানা যায়, তারা তাই যেমনটি আশা করা যায় সেই রকম কর্মই করে।

বাস্তবতা সম্পর্কে তাজা দৃষ্টিভঙ্গী সব বড় আর্টিস্টের কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই ভঙ্গীর ধারাবাহিক উন্নয়ন সম্ভব কিন্তু তা কাউকে শেখানো যায় না, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সে-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তাই মাস্টারপীস রচিত হয় ব্যক্তিগত সাহস, জীবনাদর্শ, ও নিষ্ঠার সমন্বয়ে। যে দৃষ্টিকোণে জীবনকে নিবিড়ভাবে দেখা যায় এবং যে অসামান্য শক্তি থাকলে জীবনের সেই রূপকে ফুটিয়ে তোলা যায়, হেমিংওয়ে পরিপূর্ণভাবে সেই শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

হেমিংওয়ের প্রথম গল্পের বই 'In Our Time' প্রকাশিত হয় ১৯২৫-এ। এই গ্রন্থের নামকরণ চার্চ অব ইংলন্ডের প্রার্থনা গ্রন্থ থেকে নেওয়া—'Give Peace in our Time, O Lord !' সেই গ্রন্থের প্রথম গল্পটির নাম 'Indian Camp'। ডাঃ এডাম আর তাঁর ছেলে নিক্ উত্তর মিচিগানে একটি ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। সেখানে ডাক্তারকে একটি সিজেরিয়ান অপারেশন করতে হয়, আর সেই অপারেশন করা হয় সাধারণ ছুরিতে এবং কোনো রকম চেতনা-নিবারণী ওষুধ প্রয়োগ না করেই। স্ত্রীলোকটির রুগ্ন স্বামী শুয়ে আছেন তার ওপরের বাঙ্কে। নীচে স্ত্রী চীৎকার করছে। আর ছোকরা নিক্ একটি বেসিন হস্তে বাপের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। একজন পুরুষ আর তিনজন নারী সেই প্রসূতিটিকে চেপে ধরে আছে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত। সব কাজ শেষ হওয়ার পর ডাক্তার আবিষ্কার করলেন যে স্বামীটি দুদিন ধরে এই চেঁচামেচি শুনেছেন, তিনি একটি ক্ষুর দিয়ে নিজের মাথাটা প্রায় কেটে ফেলেছেন।

গল্পটি ভালো করে পড়লে দেখা যাবে যে, আতংকের পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই লেখকের কাছে বড় নয়, ছোট ছেলেটির মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘট্ছে সেই কথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য। [illegible] কালে একজন ভীতু এবং [illegible]র্ভাস প্রকৃতির তরুণে পরিণত [illegible]। এই কাহিনীতে হেমিংওয়ে [illegible]কের এই চারিত্রিক দুটির হেতু বর্ণনা করেছেন। এই গল্পটিতে নিক এডামসকে নিয়ে অর্ধেকের বেশী জায়গা দেওয়া হয়েছে, বালক ও পরে যুবক নিক [illegible]ভাবে গড়ে উঠেছে তার কাহিনী। এই গ্রন্থে নিক সম্পর্কে আরো ছয়টি গল্প আছে, সেই হিসাবে গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলা যায়, গল্পগুলিও নিকের বাল্যকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত ধারাবাহিক হিসাবে রচিত।

এর পরবর্তী দুটি গল্পসংগ্রহ 'Men Without Women' এবং 'Winner Take Nothing' যথাক্রমে ১৯২৭ এবং ১৯৩৩-এ প্রকাশিত। এই গল্প-গ্রন্থেও দু-একটি নিক এডামসের গল্প আছে। 'The Killers' গল্পটির কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেখানেও নিক এক ক্লান্তিকর অবস্থা বিপর্যয়ে পড়েছে, দুর্দান্ত কয়েকজন গুন্ডার হাত থেকে সে পালাতে পারছে না পাছে তারা তাকে খুন করে। 'The Light of the World' গল্পে নিক বেশ্যাবৃত্তি এবং সমকামিত্বের জালে জড়িয়ে পড়ছে। তৃতীয় আর একটি গল্প 'Father and Sons' পিতার মৃত্যুতে সে ভীষণভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

'A Way You Will Never Be' গল্পে নিক যে অদৃষ্টকে এড়িয়ে চলতে চায় সেই অদৃষ্টের হাত থেকে সে নিষ্কৃতি চায়, তাতেই সে জড়িয়ে পড়ছে। হেমিংওয়ে কয়েকটি গল্প উত্তমপুরুষে লিখেছেন, সেগুলির নায়কও এই 'নিক্'। এবং একটি যুদ্ধকাহিনী 'Now I Lay Me' এই উত্তমপুরুষের 'আমি'টিকে নিক বলেই ডাকা হয়েছে। নিক এই গল্পে ইনসমনিয়ায় ভুগছে, যুদ্ধে আহত [illegible]ওয়ার পর।

এই নিক কি ধরনের ছেলে, তারপর অবশ্য মানুষ তা স্পষ্টই বোঝা যায়। তাকে সরল প্রকৃতির আদিম মানুষ বলে ভুল করা যায় না। সে সৎ, শক্ত-সামর্থ্য এবং অতিশয় স্পর্শকাতর। তার নার্ভের অভাব নেই অথচ সে নার্ভাস, এই নিককে ভালো করে জানলেই হেমিংওয়েকে জানা যাবে, আমাদের শরৎচন্দ্রের তৈরী নারী চরিত্রের মত, হেমিংওয়ের নায়ক নিক সর্বত্র ঘুরে ফিরে এসেছে অন্য নামে, অন্য গ্রন্থে। এই সব নায়কদের নিকের বাল্যকাল, নিকের বয়ঃসন্ধি ও যৌবনের অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। এই লোকটি মৃত্যুর আগে মরেছে হাজার মরণে, যদিচ সে বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, বাঁচতে শিখেছে, তবে যতদিন হেমিংওয়ে বেঁচেছিলেন তার নিষ্কৃতি ছিল না। হেমিংওয়ে এই চরিত্রটিরই জীবনেতিহাস যেন লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ এই চরিত্র ঠিক স্বয়ং হেমিংওয়ে নয়। এই নিক 'Fifty Grand'-এ জ্যাক, 'The Undefeated'-এ ম্যানুয়েল অপরাজেয় বুল ফাইটার। 'The Short Happy Life of Francis Macomber' নামক গল্পে ব্রিটিশ শিকারী ও পথনির্দেশক। 'The Gambler, The Nun and the Radio' নামক গল্পের নায়ক সায়েটানো, তার পেটে গুলি লেগেছে, তবু তার চোখে-মুখে যন্ত্রণানুভূতির এতটুকু চিহ্ন নেই, কিন্তু নিক, যার এই গল্পে নাম ফ্রেজার সে যন্ত্রণা চাপতে পারছে না বলে লজ্জিত। এই নায়কদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র অবশ্য হেমিংওয়ের সর্বশেষ উপন্যাস 'The Old Man and the Sea' উপন্যাসের বৃদ্ধ সান্টিয়াগো। তার অসীম সাহস, অপরিসীম ধৈর্য, তার সেই বৃহৎ মাছটি যখন হাঙরে টেনে নিল তখনও সে ভদ্র। জীবনে পরাজয় আছে কিন্তু সে পরাজয় কিভাবে সহ্য করা
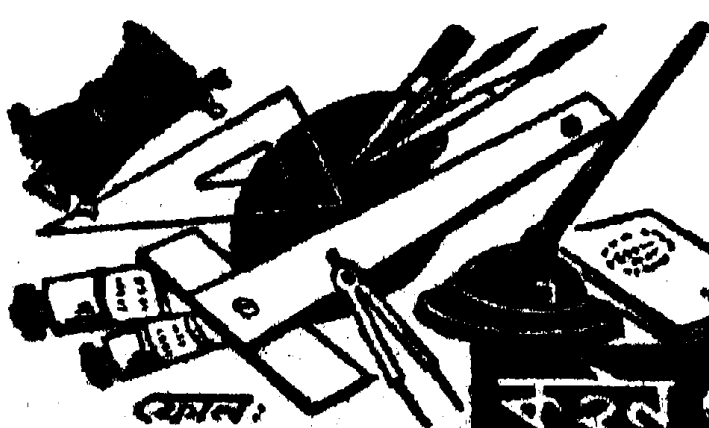
যাবে, গ্রহণ করা যাবে সেইটাই বড়ো কথা।

১৯২৬-এ প্রকাশিত হয় 'The Sun Also Rises'—এই গ্রন্থ অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিক্রী হয় অনেক বেশী, এবং লেখকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করে। এই উপন্যাসের নায়ক জেক বারনেস, তার আঘাত নিকের মত মেরুদণ্ডে নয়, পুরুষাঙ্গে। জেক যুদ্ধের ফলে পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে। সে প্যারীতে থাকে, রাতে ঘুমোতে পারে না, চীৎকার করে। তার সঙ্গীরা [illegible] জাতিক উদ্দেশ্যহীন কয়েকটি মানুষ, তারা সকলেই যুদ্ধের ফলে পথের ওপর ছিটকে এসেছে। হেমিংওয়ে বলেছেন 'you are all a Lost Generation'। এরা মদ খায়, মাছ ধরে, ষাঁড়ের লড়াই দেখে বেড়ায়। আর একজন তরুণী ব্রেট এ্যাসলীর সঙ্গে প্রেমলীলা আছে, সে জেককে ভালোবাসে, জেকও তাই, কিন্তু এ প্রেমের পরিণতি নেই। ব্রেট আর একজন যুদ্ধাহত ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহের উদ্দেশ্যে বাঁধা পড়ে, তবে সে শেষ পর্যন্ত আবার জেকের কাছেই ফিরে আসে। এই উপন্যাসটিও পরিণতিহীন—সেইটাই এই উপন্যাসের হয়ত বক্তব্য,—তাই নাম The Sun Also Rises। তিনি স্বয়ং বলেছেন এই নভেলের মূলকথা—

The earth abideth forever'

সমালোচকদের মতে হেমিংওয়ে দুখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখেছেন—একখানি The Sun Also Rises আর অপরটি A Farewell to Arms—শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। এই উপন্যাসে লেঃ ফ্রেডরিক হেনরী নিক এডামসের মত যুদ্ধে আহত হয়, এবার তার আঘাত হাঁটুতে, সুতীব্র যন্ত্রণাদায়ক আঘাত। হেমিংওয়ে স্বয়ং এই হাঁটুতেই আঘাত পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী। হেনরী রাতে ঘুমাতে পারে না, চিন্তা বন্ধ না করলে সে ঘুমাতে পারে না। রাতে ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখে। মিলানে সুস্থ হবার মুখে সে নার্সের প্রেমে পড়ে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য সেনা দল থেকে পালিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে যায়, সেখানে নার্স ক্যাথারিন প্রসবকালে মারা যায়। হেনরীর আর কোনো পথ নেই, সে যেন এক বিরাট জালে জড়িয়ে পড়েছে।

এই উপন্যাসটিও লেখকের লিপিকুশলতা ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। এই উপন্যাসটি অত্যন্ত যত্নসহকারে রচিত। আর এই বিষয়েও হেমিংওয়ের সঙ্গে আমাদের শরৎচন্দ্রের মিল। 'A Farewell To Arms'-এর শেষ পাতা হেমিংওয়ে উনচল্লিশবার লিখেছেন। আর 'The Old Man and the Sea' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়েছেন দুশোবার, তবে সন্তুষ্ট হয়ে ছাপতে দিয়েছেন।

'A Farewell To Arms'-এর বক্তব্যও সেই যুদ্ধ এবং প্রেম। গোড়ার দিককার দুটি রচনার ক্রমবিকাশের ফল [illegible] উপন্যাস। In Our Time-এ "Chapter V1" যেখানে নিক আহত হয়েছে [illegible] 'A Very Short Story' নামক [illegible]র গল্পটির এই ক্রমপরিণতি। এই উপন্যা[illegible] অতি সূক্ষ্মভাবে প্রেম ও যুদ্ধ সমান্তরাল ভাবে চলেছে—এবং কাহিনীর শেষে মনে হয় যুদ্ধ ও প্রেম একাত্ম হয়ে গেছে। দুটি বিভিন্ন কাহিনী নয়। একই কাহিনী।

হেমিংওয়ে এবং তাঁর কাহিনীর নায়কবৃন্দ সর্বদাই একাত্ম এবং অন্তরঙ্গ। সুগভীর দুঃখবাদ হেমিংওয়ের মজ্জাগত হয়ে গিছল। তাঁর নায়ক ফ্রেডরিক হেনরী তাঁর স্বদেশের অভিজ্ঞতার প্রতিমূর্তি। যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে তিক্ত মনোভাব নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন, আমেরিকার এক সংকটজনক কালের ইতিহাস।

১৯৩২-এ লিখিত 'Death in the Afternoon' এবং ১৯৩৫-এ 'Green Hills of Africa' খুব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থ ষাঁড়ের লড়াই নিয়ে লেখা আর দ্বিতীয়টি বৃহৎ শিকারের কাহিনী। উভয়বিধ বিষবস্তু সম্পর্কে লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল অপরিসীম। এই দুটি গ্রন্থই কিন্তু মৃত্যুর ইতিহাস, ষাঁড়ের মৃত্যু, ষাঁড়ের লড়াইকারের মৃত্যু, অশ্বের মৃত্যু, আর বৃহৎ শিকারে মৃত্যু—বিষয় হিসাবে মৃত্যু হেমিংওয়ের মনকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন রেখেছিল।

১৯৩৭-এ লিখলেন 'To have and Have Not'—এটিও উপন্যাস, অবশ্য হেমিংওয়ের সৃষ্টির উপযুক্ত নয়। কিন্তু এই গ্রন্থে স্পষ্টই বোঝা যায় লেখক এক নতুন অভিজ্ঞতার সামনে এসেছেন এবং কালে সেই অভিজ্ঞতা তাঁর লেখক-জীবনে এক উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করবে। হ্যারী মরগান সৎ জীবন যাপন করে স্ত্রী-পুত্র পালন করতে অক্ষম, তাই সে বাধ্য হয়ে নিজের পথ বেছে নেয়; সে একজন গুণ্ডা হয়ে মদ্য এবং মানুষ চোরা-চালানের কারবারে লিপ্ত হয়। পরিশেষে সে খুন হয়, মৃত্যুর পূর্বে সে জীবনের চরম অভিজ্ঞতা লাভ করে—মানুষের বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। হেমিংওয়েরও এই অভিজ্ঞতা। নিক এডামসকে দিয়ে যে-লেখকের ভাবাদর্শের শুরু এবং ক্রমবিকাশ ঘটেছে এইখানে সেই সুদীর্ঘ নির্বাসনের সমাপ্তি। একাকী মানুষের কোনো সুযোগ নেই। এই ১৯৩৭-এ যে সমাজ কুড়ি বছর আগে হেমিংওয়ে ত্যাগ করেছিলেন আবার যেন সেখানে পুনরাগমন করেছেন—এবার তার লড়াই "গণতন্ত্রের লড়াই"।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ হেমিংওয়েকে সমাজবিমুখতা থেকে সরিয়ে পৃথিবী আর মানুষের কাছে নিয়ে এসেছে। তিনি প্রথমে রাজভক্তদের দলে যোগদান করেন। 'The Fifth Column' নামক ১৯৩৮-এ প্রকাশিত নাটকে অনেক চমৎকার সংলাপ আছে। এবার নায়ক ফিলিপ, সেও অনিদ্রারোগী, রাতে সে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাকে তাই সহজেই চেনা যায়। এই লেখকই 'A Farewell To Arms'-এ বলেছেন এই জাতীয় রাজভক্তিমূলক বিশ্বাস এবং সেই হেতু

লড়াই করা 'অশ্লীল' কর্ম। এই সূত্র থেকেই রচিত 'For Whom the Bell Tolls' ১৯৪০-এ প্রকাশিত—এই ঘন্টাধ্বনি, শেষকৃত্যের ঘন্টাধ্বনি—কার জন্য ঘন্টা বাজছে জানতে চেয়ো না। এই ঘন্টা তোমার জন্যই বাজছে।

গ্রন্থের নায়ক রবার্ট জর্ডান স্প্যানিস সিভিল ওয়ারে একজন মার্কিণ ভলানটিয়ার হিসাবে লড়ছে। একটা ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য গেরিলা বাহিনী তাকে সেগোভিয়ার পর্বতমালার কাছে পাঠিয়েছে। ব্রিজ উড়িয়ে দিলে রাজভক্ত দলের অগ্রগমনের সুবিধা হবে। এই গেরিলা-গুহায় সে তিন দিন তিন রাত্রি কাটায়, নিজের সর্বনাশের আশায় সে বসে আছে এমন সময় মারিয়ার প্রেমে পড়ে, রিপাবলিক্যান মেয়রের কন্যা, তার পিতৃদেব খুন হয়েছে, সে ধর্ষিতা, এ সব স্প্যানিস ফ্যাসিস্ত বাহিনী ফ্যালানজিষ্টদের কর্ম। জর্ডান বোঝে এই আক্রমণ ব্যর্থ হবে, তবু জেনারেলরা তা বাতিল করতে চান না। সে ব্রিজ উড়িয়ে দিল, সাফল্য লাভ করে ফেরবার পথে আহত হল, মনে হল মরে যাবে। কিন্তু এই আত্মদানের কথা সে প্রত্যক্ষ করতে চায়। গ্রন্থ শেষ হয় তিক্ততায়।

এই উপন্যাসটিও একেবারে ত্রুটি-মুক্ত নয়। অত্যন্ত রোমান্টিক এবং ভাবাবেগপূর্ণ। এই গ্রন্থের পর হেমিংওয়ে প্রায় দশ বছর চুপ করে ছিলেন, তার প্রধান কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকা। ১৯৫০-এ প্রকাশিত হয় 'Across the River and into the Trees'—এই গ্রন্থে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছে।

কাহিনী দুর্বল, শান্তিকালের একজন সেনাবাহিনীর কর্ণেল ভেনিসে এলেন হাঁস শিকারে, সেখানে ছিল অতি তরুণী বান্ধবী, তারপর, মৃত্যু। ইনিও ফ্রেডরিক হেনরীর (A Farewell To Arms) মত সমানভাবে আহত। নায়িকাও ক্যাথারিন ও মেরিয়ার মত। এই নায়িকার নাম রেনাটা, সে তরুণী ইতালিয়ান কাউন্টেস। সমালোচকদের মতে এই কর্ণেল হেমিংওয়ের প্রতিরূপ।

এই গ্রন্থে যাঁরা হেমিংওয়ের প্রতিভার অপমৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা কিন্তু ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'The Old Man and the Sea' পাঠ করে মত পরিবর্তন করতে [illegible] গ্রন্থ এক নতুন জগৎ পাঠকের স[illegible]নে উপস্থিত করল, এক অনাবিষ্কৃত [illegible]গৎ। এই অতিক্ষুদ্র উপন্যাস [illegible] বড় গল্পও বলা যায় তা[illegible] নায়ক একজন বৃদ্ধ কিউব[illegible]সী মৎস্যশিকারী। রাশি দিন মৎস্যহীন অবস্থায় কাটাবার পর সান্টিয়াগো একা সু[illegible] সমুদ্রে সাহসভরে চলে গেল, সে[illegible]নে এক বিরাট মারলিন মৎস্য গেঁথে ফেলল। দুদিন দুরাত্রি বৃদ্ধ সমুদ্রে কাটিয়ে অতি কষ্টে মাছটিকে কায়দা করল। ঠিক সেই মুহূর্তে হাঙ্গররা সেই মাছটিকে কেড়ে নেবার উপক্রম করে, সে তাদের শেষ পর্যন্ত হত্যা করতে পারে। কিন্তু হাঙ্গররা মাছটির কঙ্কাল ছাড়া সবটুকু খেয়ে ফেলে, সেই কঙ্কালটুকু নিয়ে ক্লান্ত শরীরে বৃদ্ধ বাড়ি ফিরে এল। বিছানায় শুয়ে অন্য দিনের স্বপ্ন দেখে।

এই উপন্যাস সম্বন্ধে সমালোচকের সব চেয়ে বড় যুক্তি এই লোক নতুন কিছু না করে আপনাকেই অনুকরণ করেছেন এই নতুন রচনায়। কিন্তু এ উপন্যাসের অর্থ সুগভীর; সান্টিয়াগোর জীবনের বাণী অতি গভীর অর্থপূর্ণ। মানুষ বৃদ্ধ হয়, ভাগ্যহীন হয়, তবু তার সাহস থাকে, তার আদর্শ সে মেনে চলে, আঘাত খেয়েও হাল ছাড়ে না, তারপর পরাজয়ের মধ্য দিয়েই বিজয়মাল্য গলায় পরে। এই উপন্যাসে লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত কাহিনী রূপকের মাধ্যমে বর্ণিত। অপরাজেয় প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে জীবনের সংগ্রাম এবং তার মধ্যে এক প্রকার বিজয়লাভ সম্ভব। সমালোচকরা বলেন—এ হল গ্রীক ট্র্যাজেডি। এ আবার ক্রিশ্চান ট্র্যাজেডিও বটে, ক্রিশ্চান প্রতীক বিশেষতঃ ক্রুশবদ্ধ হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হেমিংওয়ের উপন্যাস বা গল্পের যে ক্রমবিকাশ 'Across the River and into the Trees'—এই উপন্যাসে তার সর্বোচ্চ পরিণতি।

হেমিংওয়ের নাকি অনেক অপ্রকাশিত রচনা আছে, তবে 'The Old Man and the Sea' প্রকাশের পর দুটি মাত্র গল্প প্রকাশিত হয়েছে। "এটলান্টিক মন্থলী"র শতবার্ষিক সংখ্যায় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। সে গল্পগুলি অবশ্য তাঁর খ্যাতির উপযুক্ত নয়।

হেমিংওয়ের জন্ম হয়েছিল ১৮৯৯ [illegible] ২১শে জুলাই শিকাগোর এক মধ্যবিত্ত পল্লী ওক পার্ক, ইলিনয়ে। বাবা ছিলেন ডাক্তার, পশু-শিকার এবং মৎস্য শিকারে আগ্রহ ছিল প্রচন্ড। পিতার এই গুণ পুত্র প্রচুর পরিমাণে পেয়েছিলেন। জননী ছিলেন ধর্মশীলা, সঙ্গীতকুশলা রমণী, তাঁর গুণ পুত্র পাননি। বাল্যকালের অভিজ্ঞতা হেমিংওয়ের জীবনে যে সুগভীর ছাপ রেখেছিল তার প্রমাণ নিক এডামস এবং হেমিংওয়ের অসংখ্য গল্প। তাঁর রচনায় আত্মজীবনীর ছাপ সর্বত্র পরিস্ফুট।

হেমিংওয়ে লেখক এবং ব্যক্তি হিসাবে একটি উপকথার চরিত্র। এক কল্পিত মানুষ, প্রকৃত মানুষ থেকে বার বার সরে দাঁড়িয়েছেন। আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে বুকের মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া অনুভব করেছেন।

মৃত্যুর পর সোভিয়েট সংবাদপত্র যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"Hemingway hated war and fascism and fought against them with Pen and bayonet. He is a great artist and a great man and will live eternally in our memory and in the books he left to the humanity".

তাঁর জীবনী এবং সাহিত্য বর্তমান দানবীয় যুগের এক বিস্ময়কর ইতিহাস হিসাবে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পরিশোধ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। চার ।।

আশ্বিনের শেষ ঝঞ্ঝাবৃষ্টি ছিল ওটা। কয়েকদিন থেকে আকাশ বেশ পরিষ্কার রয়েছে। ক্বচিৎ দু'একটা সাদা মেঘের স্তূপ উদ্দেশ্যহীন অলসগতিতে একদিক থেকে অন্যদিকে যাচ্ছে ভেসে। হেমন্তের অপরাহ্ন বেলা, একটা হিমেল ভাব এসে গেছে বাতাসে, আর কেমন যেন একটা মন-উদাস-করা সুর। তার খানিকটা হয়তো প্রশান্তর মনের প্রতিভাসই। সেদিনকার বর্ষার সেই দুর্ভোগ রেহাই দেয়নি। বেশ ভালো রকমই অসুখে পড়ে গিয়েছিল; বুকে সর্দি বসে গিয়ে ব্রংকো-নিমোনিয়া। দিনবারো ভুগে আজ চার-দিন হোল পথ্য পেয়ে বাসার কম্পাউণ্ডের মধ্যে হেঁটে বেড়াবার অনুমতি পেয়েছে ডাক্তারের কাছ থেকে। তারই সদ্ব্যবহার করে একটু ক্লান্ত হয়েই বারান্দায় আরাম-চেয়ারটায় এই এসে বসল।

প্রশান্ত রেলের কর্মচারী; ইঞ্জিনিয়ার। একটা নূতন পুল তৈয়ার হচ্ছে, তারই চার্জ নিয়ে এসেছে। নূতনটা চালু হয়ে গেলে পুরানোটা ভেঙ্গে ফেলা হবে, সব মিলিয়ে বছর তিনেকের কাজ, ছোটখাট একটা কলোনি গড়ে উঠেছে—কুলিদের লাইন, কেরাণীবাবুদের লাইন, পোস্টঅফিস, হাসপাতাল, ছোটখাট একটা বাজার। একটু তফাতে অফিসার শ্রেণীরের লোকেদের বাসা; ও নিজে, ওর একজন সাব-ওভারসিয়ার, একজন বিজলী-ঘরের ইনচার্জ; বাসাসুদ্ধ পোস্টঅফিসটাও এইখানেই। হাসপাতালটা আরও একটু দূরে উল্টোদিকে। তার ডাক্তারের বাসাও সেখানেই। তবে ডাক্তার এই পাড়াতেই এসে রয়েছে। প্রশান্তর অসুখের জন্যে নয়, আগে থেকেই। ডাক্তার চৌধুরী, পুরো নাম রজত চৌধুরী, প্রশান্তর পুরানো বন্ধু। ও কাজে ভর্তি হয়ে এলে দুই বন্ধুতে একসঙ্গে থাকবার জন্যে সাব-ওভারসিয়ারের সঙ্গে বাসাটা বদল করিয়ে নিল প্রশান্ত।

বারান্দায় একাই আছে বসে। একাই আছেও এখানে। অসুখের চিঠি পেয়ে মা এসেছেন, আর একটি ছোট বোন, উষা। মেয়ে নিয়ে তিনি ডাক্তারের বাসায় গেছেন বেড়াতে। ডাক্তারের বাসায় তাঁর বিধবা পিসি, বর্ষীয়সী; একটি বোন, বয়স সতের আঠার। নাম বিশাখা। ওদিকে নিজেকেই নিয়ে থাকতে হয়েছিল, দু'দিন থেকে সেই রাত্রের কথাটা বড় মনে পড়ে পড়ে যাচ্ছে। এখন যেন আরও বেশি করে; কেউ কাছে-পিঠে নেই, বিকালের আকাশটাও ওরই মতো কেমন যেন রোগ-পাণ্ডুর, গায়ে একটা র‍্যাপার জড়িয়ে তারই দিকে চোখ তুলে ভাবছিল প্রশান্ত।

ঝড়-বৃষ্টির প্রত্যক্ষ দিকটা কেটে গিয়ে বাকি যা তার সবটুকু যেন আজকের এই সুরে বাঁধা। কী নিদারুণ দারিদ্র্য! সেই দারিদ্র্য আবার কী একটা লজ্জাতেই না জড়িয়ে পড়ল! মেয়েটির মুখখানা মনে পড়ছে—স্বাতির,—এক-একটা ঝোঁক আসছে আর লজ্জায় এক-এক ঝলক রক্ত এসেই মুখখানাকে ছাই করে দিয়ে নেমে যাচ্ছে। একেবারে গোড়া থেকে। বাপের রূঢ়তা— ঐ রকম জীর্ণ ঘরে নিয়ে আসা—কাপড় ছাড়বার কথা বলতেও পারছে না মুখ ফুটে—অনাথ এসে সামলাতে আরও বেপর্দা, আরও নিষ্করুণই হয়ে উঠল যেন ব্যাপারটা। শাড়ি এগিয়ে দেওয়ার লজ্জা—স্বাতি হয়তো ভেতরের বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল ঝড়-বৃষ্টির ছাটে—দেখছিল পরিণামটা কি হয়—অনাথ অবশ্য সামলেই যাচ্ছে, বাপের ছেঁড়া কাপড়টা নিজের বক্ষে চালিয়ে পাট করে লুঙ্গি করে বানিয়ে দিল তাড়াতাড়ি, কিন্তু সেই আপনার-হাতে-আপনি-ধরা-দেওয়া মিথ্যের জন্যে তো আরও আসতে পারছে না স্বাতি। তারপর যখন এল—চোখাচোখি হয়ে গেল দুজনে।

বেচারি নামটাও কি পেয়েছে তেমনি করুণ! ......স্বাতি—একটি নক্ষত্র—অশ্রু ছলছল। যখন ঢুকল ঘরে বাইরে থেকে—বারান্দাই হোক বা যাই হোক—ছলছলই করছিল যেন চোখদুটি—বৃষ্টির ছাটই হয়তো, অত ম্লান মুখে সেটাও তো অশ্রু হয়েই দেখা দেবে—আর, লজ্জার ওপর লজ্জা বেচারির—

একেবারেই কি সামনাসামনি হয়ে পড়তে হয়।

অনাথও অত সামলেও শেষরক্ষা করতে পারল না। স্বাতি ওর কথা ধরে আর একটু সামলাবার চেষ্টা করেছিল—শুধু তো চাল-ডালে হবে না,—একটু পরেই অনাথ যখন ফিরল—গামছায় তরিতরকারি বাঁধা, দেখা গেল কাপড়ের খুঁটে যে জিনিসটা বাঁধা সেটা ডালই—অড়র-মুসুরি, যাই হোক; ভিজে কাপড়ের মধ্যে দিয়ে তার রংটা ফুটে বেরুচ্ছে। দু'মিনিটও হয়নি চাল-ডালের কথাটা বলেছে স্বাতি; অর্থাৎ ও-দুটো তো আছেই ভাঁড়ারে। কী যে হয়ে গেল মুখখানা!

কিন্তু এত দারিদ্র্য কেন? প্রশ্নটা আসে এই জন্য যে, ওদের দু'জনকে দেখে মনে হয় ওরা, শুধু একটু নয়, যেন অনেকখানিই ওপরের স্তরের মানুষ। শুধু চেহারাতেই নয়। আরও কটা নিদর্শন পেল প্রশান্ত। প্রথমত সেই চিত্র আর ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি। তারপর সেই যে কয়েকখানা বই ছড়ানো ছিল মাদুরে। অনাথ বাইরে থেকে ফিরলে রন্ধনের আয়োজনের জন্য দুজনেই এ ঘর থেকে চলে গেল। বাপ রইলেন শুধু, কিন্তু নির্বাক হয়েই। কথার অভাবেই একখানা বই তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যাবে প্রশান্ত, অনাথ এসে তাঁকেও ডেকে নিয়ে গেল। নিশ্চয় একলা ছেড়ে রাখতে চায় না স্বাতি। উনি চলে যেতে বইখানি খুলে দেখল প্রশান্ত। একখানি সংস্কৃত বই। দেব-নাগরী অক্ষরে ছাপা। সংস্কৃত একে-বারেই জানে না, দেবনাগরীও এক রকম তাই-ই। কুঁতিয়ে কাঁতিয়ে নামের পাতার যেটুকু পাঠোদ্ধার করতে পারল তাতে জানতে পারল ভবভূতির উত্তররাম-চরিত। বেশ মোটা বই, চামড়ায় বাঁধানো। বাইরে নামটা মেলাবার জন্যে বই মুড়ে দেখল পুটে শুধু ভবভূতি নামটাই লেখা রয়েছে, ইংরাজীতে, সোনার জলে; আর ভল্যুম ১। তার অর্থ, কবির কয়েকখানি বই একসঙ্গে বাঁধানো। তার নীচে ইংরাজীতে লেখা রয়েছে এম. এন, লাহিড়ী। নিশ্চয় স্বত্বাধিকারীর নাম।

টের পেল তাই-ই। সমস্ত রাতই কাটাতে হল ওখানে, ঝড়-বৃষ্টি শেষের দিকে কমে এলেও বেরুবার মত অবস্থা ছিল না। সমস্ত রাত জেগে তিনজনে গল্প করতে করতে বেশ একটা স্বচ্ছন্দতা এসে পড়েছিল, তাইতে খুব সন্তর্পণে পরিচয় জানতে গিয়েছিল প্রশান্ত, বইয়ের ঐ নামটা দিয়েই। কথাবার্তা বেশি স্বাতির সঙ্গেই হচ্ছিল, বাপ মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিলেন একটু-আধটু। এক সময় একটু সুযোগ পেয়ে ওঁর নামটা কি জানতে চাইল। স্বাতির কাছেই।

গল্পের ছন্দটা হঠাৎ যেন কেটে গেল। স্বাতি মুখ নীচু করে বাপের দিকে চাইল। বাপও যেন একটু থতমত খেয়ে সামলে নিয়ে বললেন—"তা বলো না মা, জানতে চাইছেন।"

একটু হেসে বললেন—"খুনী আসামী তো নয়। আমার নাম হচ্ছে......"

"না, থাক্।" —কুণ্ঠিতভাবে বাধা দিল প্রশান্ত। বলল—"বইয়ের পুটে দেখলাম এম. এন. লাহিড়ী......তাই..."

স্বাতি মুখ তুলে বলল—"ও আমার দাদুর নাম।"

চিন্তাটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে প্রশান্তর। যে প্রশ্নটা নিয়ে আরম্ভ করেছিল তাইতেই আবার ফিরিয়ে আনল মনটাকে।

কথাটা হচ্ছে ওরা যে স্তরে রয়েছে এখন, নেমে এসেছে বলাই ঠিক, সে-স্তরের নয়। আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে, তার সঙ্গে কৃষ্টির। ......বই-গুলো নাড়াচাড়া করেছিল প্রশান্ত ব'সে ব'সে, দু'খানা আনকোরা নূতনও, একটা বাঁধানো খাতা, স্বাতির নাম লেখা। স্বাতি যেন পড়ছে কিছু, যেন কোন পরীক্ষার প্রস্তুতিই, সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষাই হয়তো। এম-এ হতেই বা বাধা কি?

ওদিকটায় খুব চাপা দিয়ে গেছে। একবার বাপ বললেন—"মা, তোমার

বইগুলো পড়ে রয়েছে।" ওদের থেকে দেওয়া হয়েছে। স্বাতি জড়োসড়ো হয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা দেবদারু কাঠের বাক্সয় তুলে রাখল, বইগুলো, যেন সন্ধ্যা থেকে এইটেই সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে গেছে।

এ-স্তরের যে ওরা নয় এটা ঠিক। কি করে নেমে পড়েছে? বড় যেন করুণ। বড় উদাস করে দিচ্ছে মনটা।

কর্তার মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্যও নয়। তেমন কিছু নেইও [illegible]নে হোল। খাওয়া-দাওয়ার পর তি[illegible]জনে [illegible]সে গল্পগুজব করে যে রাত কাটাল তা[illegible] এইটেই টের পাওয়া গেল যে, মানুষটি অল্পভাষী, তবে মাঝে মাঝে যে একটু-আধটু যোগ দিচ্ছিলেন তার মধ্যে বেখাপ্পা একটি কথাও বলেননি। ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হোল আসবার সময়। উনি বরাবরই এক রকম এই ঘরেই ছিলেন, শুধু এক-একবার এক-আধ মিনিটের জন্যে যাচ্ছিলেন বেরিয়ে। রান্না হয়ে যাবার পর গোপেশ্বর আর অনাথ উনানের আগুনে পোষাক-আষাক-গুলো শুকিয়ে নিচ্ছিল, মোটা থাকি টুইল, দেরি হচ্ছে, দেখে দেখে আসছিলেন; শেষের দিকে ফিরতে একটু বেশিই দেরি হচ্ছে দেখে স্বাতি খানিকটা ইতস্ততঃ করে স্খলিত কণ্ঠে বলল—"একটা কথা আছে।"

একবার দরজাটার দিকে চকিতে চেয়ে নিয়ে বলল—"ইয়ে—মানে—আমাদের মার্জনা করবেন আপনি।"

বিস্মিত হয়েই চাইল প্রশান্ত। স্বাতি বলল—"বাবা একটু রূঢ় হয়ে পড়েছিলেন—যখন এলেন আপনি।"

হঠাৎ এ ধরনের কথা, তার ওপর কথাটা সত্যিও, সঙ্গে সঙ্গেই মুখে কিছু যোগালো না প্রশান্তর। তারপর কিছু একটা বলবার আগেই যেন তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা সেরে ফেলবার জন্যে স্বাতি বলল—"উনি ও রকম নন, মোটেই নন, শুধু একটা ব্যাপার হয়ে......সে থাক্, মানে এই রকম অবস্থায় কেউ হঠাৎ এসে পড়লে—এই রকম দুর্যোগের মধ্যে........"

এই পর্যন্তই বলতে পেরেছিল। এই সময় উনিও দোর খুলে ঢুকলেন ঘরে। হাতে প্রশান্তর শুকনো পোষাক-গুলো, হ্যাট পর্যন্ত। তুলে দিয়ে বললেন—"নিন, ছেড়ে ফেলুন শীগ্‌গির। দুর্ভোগ একটা।"

প্রশান্ত হাত থেকে নিয়ে হেসে বলল—"দু'তে দিলেন আর কই?"

উত্তর করলেন—"তা বটে, কিছুই তো নয়।"

তারপর হেসে, একবার মেয়ের দিকেও চেয়ে নিয়ে বললেন—"ওঁর সেই কথা স্বাতি—নাল্পে সুখমস্তি।"

স্বাতি প্রশান্তর মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে উঠল।

ওরা বেরিয়ে পড়ল সকাল হতে, ঝড়-বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। জীপ রইল পড়ে, লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেবে, মাইল দুয়েক পথ, হেঁটেই এল। [illegible] সময় উনি বেশ একটু জড়ো-[illegible]ড়া হয়েই রাস্তা পর্যন্ত এলেন। কা[illegible]টা প্রকাশ পেল একেবারে শেষ দি[illegible] প্রশান্ত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠেছে, উনি ওর ডান হাতটা দুহাতে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ-দুটি ছলছল করে উঠেছে; কিছু বলতে পারছেন না বলেই বলছেন না।

স্বাতি বলল—"আমি সে-কথা বলেছি বাবা ওঁকে। ......কিছু মনে করেননি উনি।"

চেয়ে রইলেন মুখের দিকে প্রশান্তর। বললেন—"ও রকম ঝড়-বৃষ্টিতে কেমন যেন মাথার ঠিক থাকে না। মাথার ওপর থেকে কুঁড়ের চালা-টুকুও তো সব যেতে বসেছিল।"

ওসব কিছু নয়; পরিহাসে, সৌজন্য-আলাপে দেখা গেল মাথা বেশ পরিষ্কারই আছে। তবে কুঁড়ের চালার

পেছনে একটা কাহিনী আছেই। সেটুকু কি হতে পারে?

।। পাঁচ ।।

অসুখের ক'টা দিনে কাজ বিস্তর পেছিয়ে গেছে, বিশেষ করে অফিসের কাগজ-পত্র সম্পর্কীয় যা কাজ; আরম্ভ করবার পর যেন নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত রইল না। তবু তারই মধ্যে, দুর্বলতার জন্য যখন ক্লান্তি এসে পড়ে, অফিসের ফাইল থাকে খোলা, শরীরটা চেয়ারের পিঠে এলিয়ে পড়ে, সে সময় মনটা আবার সেই রাতটিতে যায় চলে। ছবি-গুলি মনের সামনে ফুটে ফুটে ওঠে, আর গুটিকয় প্রশ্ন—কেন এ রকম? কিছু করা যায় না?......কে ওরা?

—যে-ক'টি প্রশ্ন সেদিন থেকেই উঠছে মনে, কিন্তু যাদের উত্তর জেনে নেওয়ার কোন সুযোগই যায়নি পাওয়া। তার কারণও ছিল। ও গিয়ে প'ড়ে এতই বিড়ম্বিত করে তুলেছিল ওদের দারিদ্র্যকে, ওদের মর্যাদায় এমন আঘাত দিয়ে বসেছিল যে নিজের দিক থেকে আর ও-ধরনের প্রশ্ন করা সম্ভব হয়নি। ওরা নিজে হ'তে তোলবার মানুষ নয়। শুধু তাই নয়, পাছে প্রশান্ত প্রশ্ন করে বসে কোন, তাই—ও কে, কি কাজ করে, কোথায় থাকে সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই প্রকাশ করেননি। না বাপ, না মেয়ে। পরিচয় নয়, শুধু নামটুকু একবার জানতে চেয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হোল তাতে আরও যেন ও-পথটা বন্ধ হয়ে গেল প্রশান্তর কাছে।......যেখানে এই অবস্থা, সেখানে আবার নিজে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার কথাই আসে না। শরীর সেরে আসতে লাগল, তার সঙ্গে কর্ম-চঞ্চলতা গেল বেড়ে। নদীর গর্ভের মধ্যে দিয়ে নতুন রেল টেনে গাড়ির চলাচল সাধিত করা হচ্ছে। পরের বছরের বর্ষা নামার আগেই পুলের কাজ সেরে ফেলতে হবে, তার জন্যে এ-কয়টা মাস এমন কিছু বেশি নয়। ধীরে ধীরে মিলিয়েই আসতে লাগল সেদিনের স্মৃতি।

অগ্রহায়ণের কয়েক দিন গেল, বেশ শীত পড়ে এসেছে। রবিবার। বাসার সামনের বারান্দায়, রোদে একটা আরাম-চেয়ারে গা এলিয়ে অফিসের কাগজপত্র দেখছিল প্রশান্ত, রোদ চলে যাওয়ার পরও একটা চুরুট ধরিয়ে সেই ভাবেই পড়ে রইল। কয়েক দিন হোল বোনটিকে নিয়ে মা চলে গেছেন বাড়ি, বাসার ভেতরটা বড় শূন্য মনে হচ্ছে, বিশেষ করে, অফিস না থাকায় আজ বাসাতেই কাটাতে হয়েছে বলে। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসতে গোপেশকে ফাইল-গুলো সরিয়ে রেখে ড্রেসিং-গাউনটা এনে দিতে বলল। নিয়ে এলে গায়ের ওপর বিছিয়ে দিয়ে সেইভাবেই চুরুট টেনে যেতে লাগল। অলস মনটাকে অফিসেরই একটা ছোট রকম সমস্যা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে।

সন্ধ্যাটা আরও গাঢ় হয়ে এল। উঠব-উঠব করছে, রাস্তায় একটা লোকের ওপর দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল। রাস্তার দু'ধারে চাইতে চাইতে এগিয়ে আসছে যেন কোন বিশেষ একটা [illegible]ড়ির খোঁজেই। শীতের জন্য সব বাসাই অবরুদ্ধ, এগিয়ে আসতে আসতে প্রশান্তকে বাইরে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল, যেন গৃহস্বামীর হাতের চুরুট আর বিলাতী ঢঙের পরিচ্ছদ দেখে প্রশ্ন করবে কিনা একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে।

প্রশান্তই প্রশ্ন করল—"কি চাই?"

উত্তর হোল—"ডাক্তারবাবুর ড্যারাটা খুঁজচি। হাসপাতালের উদিকে গেছনু, বললে নাকি ইদিক পানে চলে এসেছেন......সম্প্রতি।"

শেষের শব্দটা একটু থেমে গিয়ে জুড়ে দিলে, যেন ভাষায় একটু আভি-জাত্য আনবার জন্যই খুঁজেপেতে বের করেছে।

"তুমি এক কাজ করো—সোজা গিয়ে ডানদিকে ঘুরবে, তারপর বাঁদিকের প্রথমে যে রাস্তাটা পড়বে সেটা ছেড়ে......"

এইখানেই হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রশান্ত উঠে পড়ল; ড্রেসিং-গাউনটা পরতে পরতে বলল—"তুমি বরং দাঁড়াও, আসছি।"

বাসার সামনে একটু বাগান, তার-পরে রাস্তাটা। বারান্দার আলোটাও জ্বালায়নি, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে, তবে হঠাৎ খেয়াল হোল, গলাটা ছিল যেন চেনা। নেমে গিয়ে কাছাকাছি হতেই দেখল ঠিকই আন্দাজটা। বলল—"তুমি হঠাৎ।"

কণ্ঠস্বরে বেশ উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। লোকটি স্বাতিদের সেই ভৃত্যটি; অনাথ।

বোধহয় নূতন পরিবেশ বলেই অনাথের চিনতে একটু সময় লাগল। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপরেই হাত-দুটো কপালে ঠেকিয়ে বলল—"মশায়? গড় করি।"

"কি ব্যাপার? কারুর অসুখ নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তার।"

"তাই নাকি? অসুখটা?"

"ডিপথিরিয়া।"

চমকে উঠল প্রশান্ত। বলল—"ডিপথিরিয়া! ......কখন্ টের পাওয়া গেল? ......চলো তুমি আমার সঙ্গে, [illegible]ত শুনি।"

পাচক-ঠাকুর চাটুজ্যেকে হাঁক দিয়ে, বেরিয়ে যাচ্ছে জানিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। হন হন করে পা চালিয়ে দিয়ে বলল—"এসো, পাশে পাশে চলো। ডিপথিরিয়া বলছ—তা......"

"যে রকম অবস্থা তাতে ডিপ-থিরিয়া ভেন্ন অন্য কিছু তো হতে পারে না। মা-মণিও তাই বলছে—কর্তার অবিশ্যি চাপা দেওয়ার চেষ্টা—ঘাবড়ে যাবে তো মেয়েটা—কাল তো বেরুতেই দিলেন না আমায়—আজ মা-মণি নাকি নেহাৎ হেদিয়ে পড়েছে......"

"উফ্! একটা দিন দেরী করে ফেলেছ এর ওপর! রোগীর কথায়!"

"কতকগুলো যে দোষ রয়েছে আবার—সহজ রোগী হয় তবে তো এ'টে উঠবে মানষে......"

বেশি দূর নয়, রাস্তাটা শুধু কয়েকটা মোড় ঘুরে গেছে। রজত বাসাতেই ছিল, তাড়াতাড়ি ব্যাগে প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। প্রশান্ত আর ভেতরেও গেল না। জীপটা গ্যারেজ থেকে বের করে স্যাণ্ডেল পায়েই উঠে পড়ল রজত আর অনাথকে নিয়ে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে এসে পড়ল ওরা।

স্বাতি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে-ছিল; প্রশান্তর উপর দৃষ্টি পড়তে ভ্রূদুটো একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কিন্তু আর চেয়ে না থেকে ভেতরে নিয়ে গেল দুজনকে।

রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে পরীক্ষা করে রজত স্বাতির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"আগে কে দেখেছে?"

"আগে?"—প্রশ্নটা করেই একটা ঢোক গিলল স্বাতি। ভয়ে গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়ে কথাটা আটকে

গেছে। উত্তর দিল অনাথ, বলল—"আগে কাউকে আর আনতে দিলেন কই? দেরি করে বাড়াবাড়ি হতেই না মনে করুন, তাহলে পুল-কলোনি থেকে একেবারে বড় ডাক্তারকেই......"

ওকে হাতের ইশারায় থামিয়ে রজত আবার পরীক্ষা নিয়ে পড়ল। ঘরটা নিঃশব্দ; এবার যেন নিজের নিজের নিঃশ্বাসটুকুও সবাই বন্ধ করে ফেলেছে। প্রথমে হাঁ করিয়ে জিভ, গলা নিয়ে শুরু করেছিল, এবার বুক-পিঠ ভালো করে দেখে, আর একবার গলাটাও দেখে নিয়ে স্টেথোস্কোপটা হাতে [illegible] প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"ডিপথিরিয়া তোমায় কে বললে?"

"নয়?" উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"ধারে-কাছে দিয়েও যায় না। ফ্লু, যা চারিদিকেই হচ্ছে এখন, তাও এমন কিছু নয়, বুক-পিঠ ভালই আছে।...... গলাটা বোধহয় একটু বেশি খুস-খুস করছে?"

শেষের প্রশ্নটা করল কর্তাকেই। তিনি শুয়েই ছিলেন, একটু উগ্রভাবে চেয়ে বললেন—"উঠতে পারি আমি তাহলে?"

"তা পারবেন না কেন? তবে......"

"তাহলে উঠে ও হারামজাদার কানটা ধরে দুটো চড় কসিয়ে মনের জ্বালা মেটাই।" ঘাড় উল্টে অনাথের দিকে চেয়ে একটু হাঁপাতে হাঁপাতেই বললেন কর্তা, পরীক্ষার বহরে নিশ্চয় নিজেও একটু ঘাবড়েই গিয়ে থাকবেন। বলেই যেতে লাগলেন—"বলছি কিছু নয়, তা একেবারে বড় ভিন্ন ছোটখাট রোগের নাম তো আনবে না মুখে। মেয়েটাকেও ঐ করে ভয় পাইয়ে পাইয়ে এমন দলে টেনে নিলে যে......"

রজত বুকে বাঁ হাতটা চেপে বলল—"চুপ করুন আপনি, খানিকটা কাহিল তো রয়েছেনই।"

স্বাতির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"জ্বর কত? দেখা হয়েছিল?"

অনাথই একপা সামনে এসে উত্তরটা দিল, বলল—"পাড়ায় নিয়ে গেছে থারমেটার যন্তোরটা—এই জ্বর তো ঘরে ঘরে।"

—ধমক খেয়ে এতটুকু সংকোচের ভাব নেই। ভবিষ্যৎ বাঁচিয়ে জুড়েও দিল—"নিয়ে গিয়ে ভেংগেও দিয়েছে।"

রজত নিজের থারমোমেটারটা বের করে লাগিয়েই দিয়েছিল, বের করে লানঠেনের আলোয় দেখে নিয়ে বলল—"নিরানব্বই পয়েন্ট দুই। টেম্পারেচারও বেশি নেই।"

"ছেল বেশি। আমি যখন নাকি বেরুই।" —বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলল অনাথ।

"হ্যাঁ, একশ' পাঁচ ডিগ্রি!" দাঁতে পিষে মন্তব্যটুকু করে কর্তা উঠে বসলেন বিছানায়। রজতের দিকে চেয়ে বললেন—"মিছে খানিকটা হয়রানি আপনার; এই শীতের......" তারপরেই ওঁর দৃষ্টিটা প্রশান্তর ওপর গিয়ে পড়ল। পাশ ফিরে শুয়েছিলেন বলে এতক্ষণ টের পাননি। একটু চেয়ে থেকে বললেন— "আপনি? ......আপনাকে যেন......"

প্রশান্ত হাত-দুটো কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল, বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছেন আমায়। সেই ঝড়ের রাতে আমিই এসেছিলাম। পুল কলোনিতেই র[illegible] এর সংগে আচমকাই দেখা, অসুখের কথা শুনে তাড়াতাড়ি রজতকে জীপে উঠিয়ে নিয়ে চলে এলাম। [illegible]আবার আমার বন্ধুও।"

আবার প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললেন—"একটু যে চা দেবো, তা ও পাটই নেই বাড়িতে; কেউই খাই না আমরা।"

স্বাতি ওঁকেই প্রশ্ন করল—"পান খান না?"

প্রশান্তই উত্তর দিল—"না; কিছুর দরকারও নেই।"

রজতকে বলল—"ওঠ তাহলে। একটা কিছু ওষুধ লিখে দেবে?"

"ইনফ্লুয়েঞ্জা, তিন দিনের মেয়াদের পর আপনিই সেরে যাবে, আবার ওষুধ কেন?" —আপত্তি করলেন কর্তা।

স্বাতি বলল—"তবু একটা লিখেই দিন। অন্তত যাতে বাড়তে না পারে। বয়েস হয়েছে তো।"

অনাথ বলল—"আর খোরাক কি হবে সেটাও বলে দেন......"
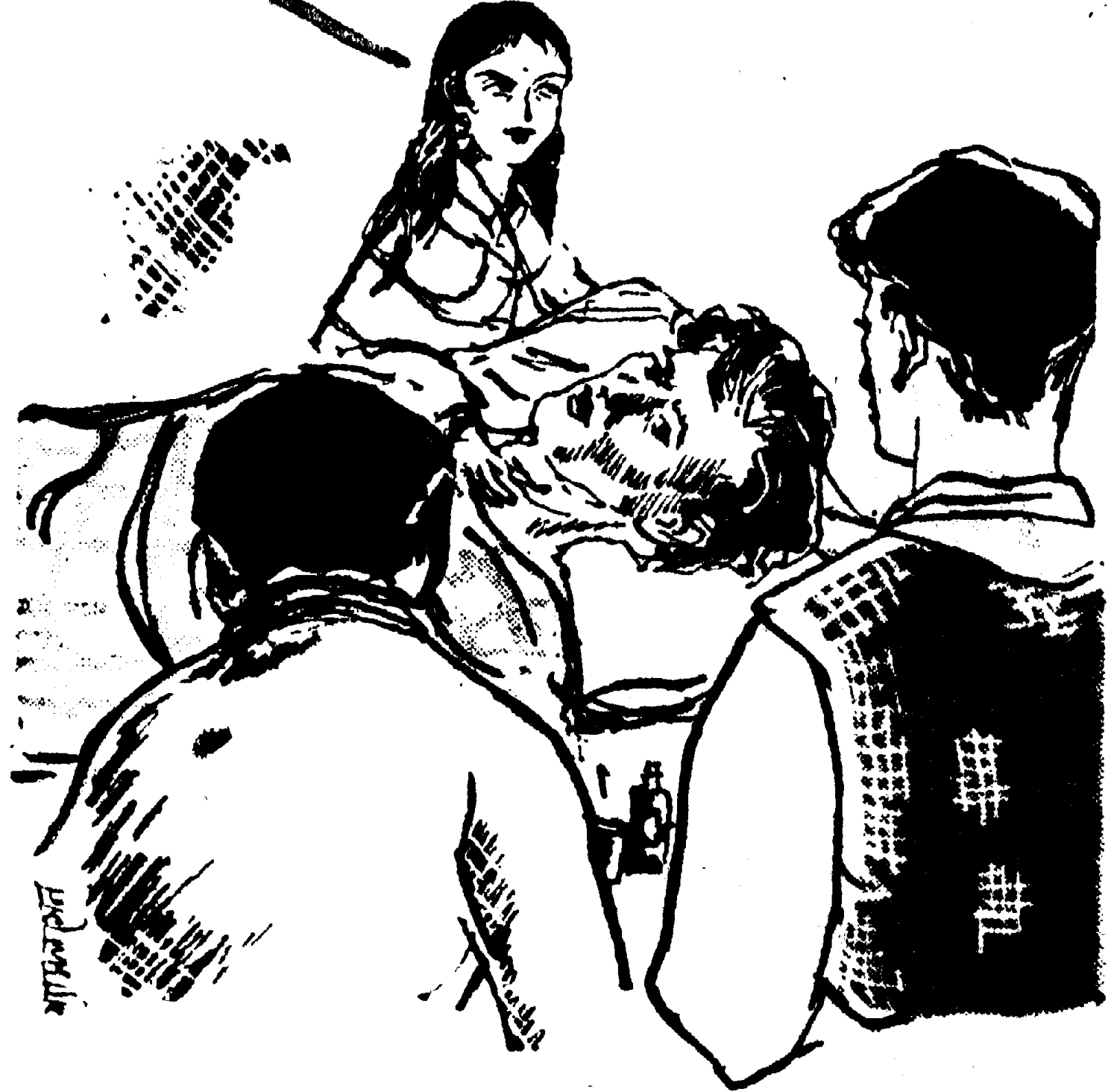
"উঠতে পারি আমি তাহলে?"

কর্তা ধিক্কারের দৃষ্টিতে অনাথের দিকে চাইতে সে বলল—"চটিও বদলাননি।"

বেশ চেষ্টা করেই যেন কর্তা সংযত করে রাখলেন নিজেকে, শুধু বললেন—"ডিপথিরিয়া যে!"

প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললেন—"দেখুন তো, আপনারও দুর্ভোগ।"

স্বাতিকে বললেন—"কথা না শুনে দেখলে তো কি কান্ডটা করলে দুজনে মিলে? যাক কি আর হবে? এখন এঁদের বিদায় করো। এঁর দুর্ভোগের তো আর প্রতিকার নেই কিছু।"

"খোরাক হবে খাঁটি দুধ, আপেল, বেদানা, নেসপাতি, আঙুর—যোগাতে পারবি তুই?"

একেবারে ফণা ধরে উঠেছেন কর্তা। কাগজ আনতে যাচ্ছিল স্বাতি, ঘুরে একটু ব্যস্ত হয়েই এগিয়ে আসছিল, অনাথই নিল সামলে। গোঁফ জোড়া ফুলিয়ে বলল—"তুমি চুপ করো দিকিন, রোগীর সব কথায় থাকতে নেই। চুপ করে থাক তুমি। বুঝলুম না হয় ডিপথিরিয়া হয়নি, তাই বলে তাকে টেনে আনতে হবে?"

ফণাটা নামিয়ে একটু ঘুরে বসলেন কর্তা।

(ক্রমশ)
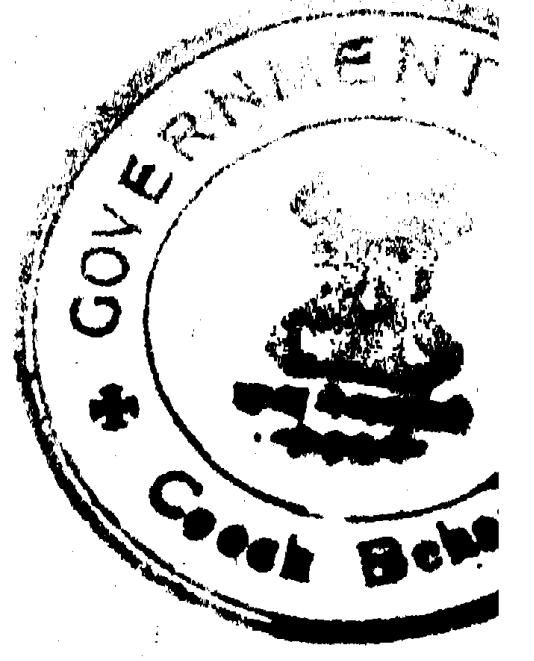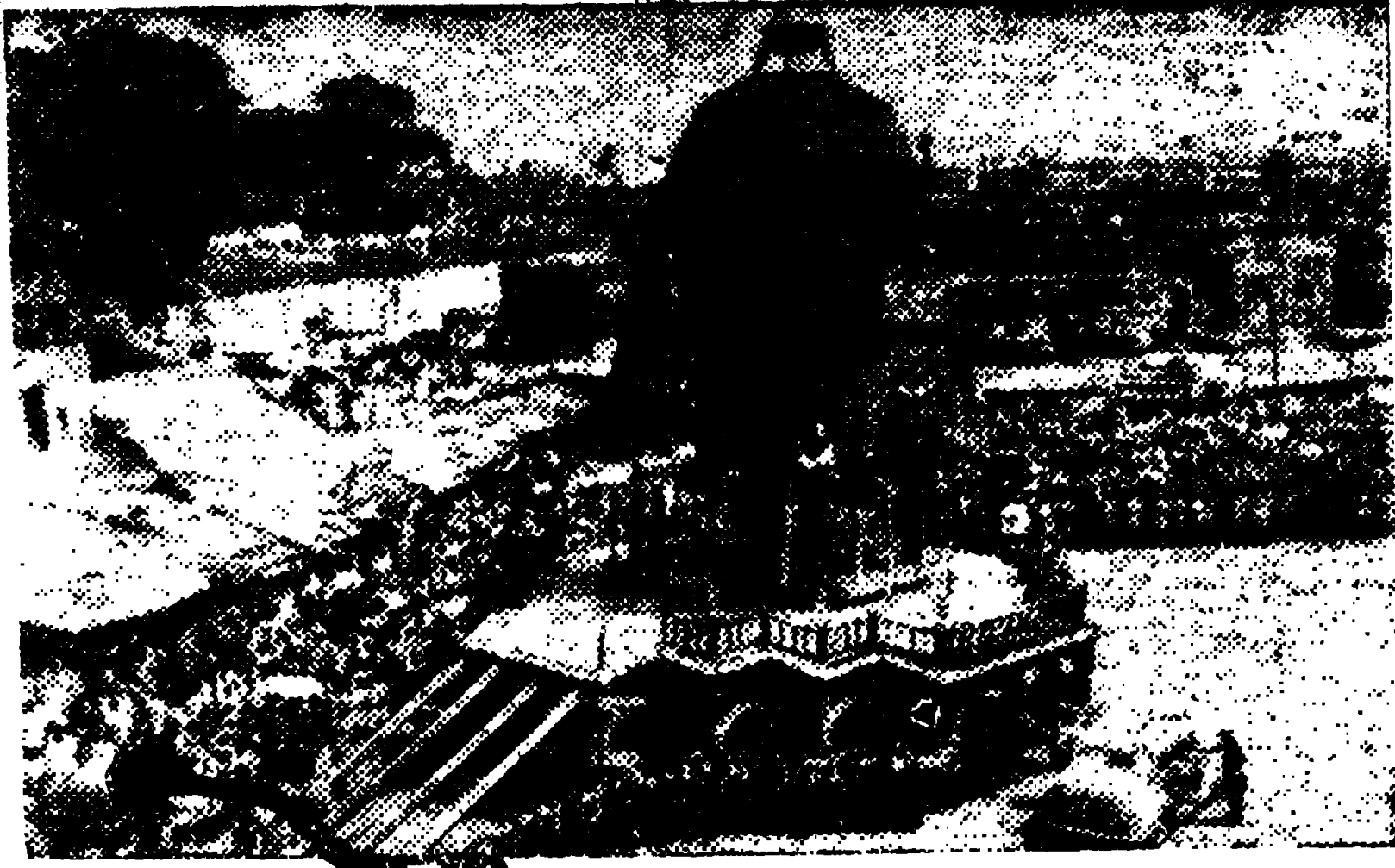
রথযাত্রা ঃ লোকারণ্য ঃ মহাধুমধাম

আশিস সান্যাল
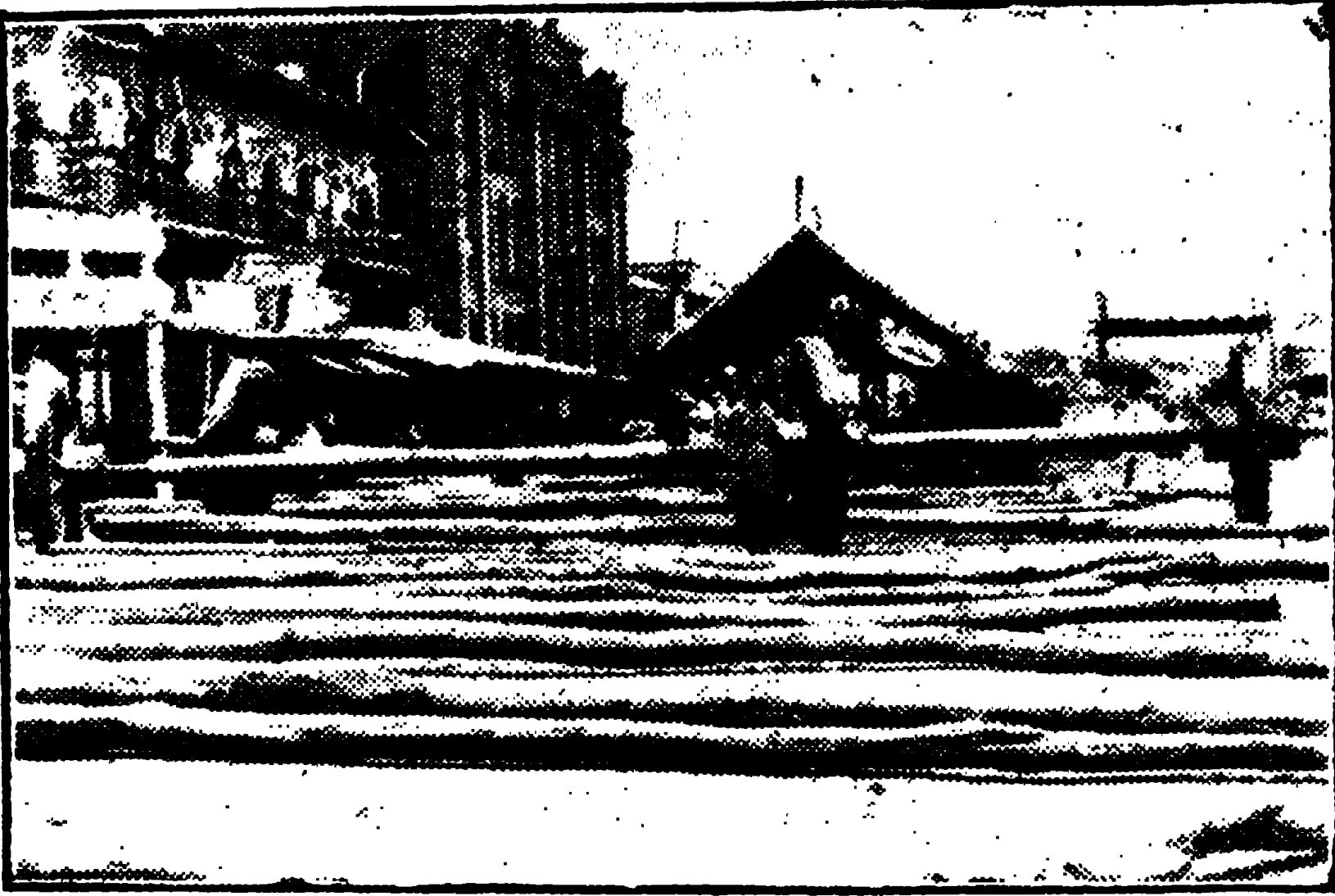
পুরীর রথ নির্মাণের জন্য রণপুরে অরণ্য থেকে সংগৃহীত কাষ্ঠখণ্ড

রথযাত্রা উৎসবটি আমাদের লৌকিক উৎসবগুলির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সমাজজীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতা কেবলমাত্র আজকের নয়। যেদিন থেকে এই উৎসবটির সূত্রপাত হয়েছে, সেদিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে এই নিকট আত্মীয়তা। যেন জন্মলগ্ন থেকেই এ এক মহান উৎসবের পরিণতি লাভ করেছে।

শিশু, বৃদ্ধ কিংবা মেয়েরা, সকলেই এই উৎসবের সাথী। এ এমন একটি উৎসব, যেখানে বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা সমবয়সী হয়ে উঠে। ভেদ থাকে না বালকে বৃদ্ধে। ভেদ থাকে না নারীতে

যুবায়। অন্ততঃ একটি দিকের প্রেক্ষাপটে এ কথা ভয়ানক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছু কেনা-কাটা চাই। কেউ দু পয়সার পাঁপড় ভাজার টুকরো মুখে পুরে আনন্দে মশগুল হয়ে আছেন, কেউ বা সুপুরি বা নারকেলের চারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন দোকানে দোকানে। আর যদি সৌখীন হন, মানে, নিতান্তই যদি ব্যবহারিক পরিবেশের বাইরে কিছুটা আনন্দ উপভোগের অভিলাষ আপনার থাকে, তবে আপনি হয়ত একটা বেল ফুলের চারা অবশ্যই কিনবেন। কেউ কিনবেন খেলনা, কেউ খাবেন দোলনা। ফেলনা এখানে কিছুই নেই। হ্যাঁ, আর যে যত বড়ই হন না কেন, তেলেভাজা খেতে ভোলেন না

পুরীর নির্মীয়মাণ রথের চাকা

কেউ। রথযাত্রা উৎসবের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এই রথের মেলা।

রথ টানার দৃশ্যটিও কম আকর্ষণীয় নয়। হাজার হাজার নর-নারী রথ টানার শোভাযাত্রায় যোগ দেন। পুরীর রথযাত্রা উৎসবটি সব দিক থেকেই ব্যাপকতা লাভ করেছে। ভারতের এবং ভারতের বাইরের লক্ষ লক্ষ লোক এই সময়ে সমবেত হন পুরীতে। প্রতিটি আশ্রয় স্থান জনপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সময়ে প্রায় এক মাস যাবৎ পুরী শহরে এক হাত আশ্রয় লাভের জন্য আগ্রহ এবং অর্থ ব্যয়ের অন্ত থাকে না। এমন কি অনেকে পথেঘাটে, বা অনাবৃত প্রান্তরের কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় নেন। রথস্থ জগন্নাথকে দর্শনের জন্য এত ব্যাকুলতা বোধ করি আর কোথাও নেই।

বাংলা দেশের রথযাত্রা উৎসবগুলির মধ্যে মাহেশের উৎসবটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। অবশ্য কোলকাতার উৎসবগুলিও সমারোহের দিক থেকে কোন অংশে কম নয়। কালীঘাট বা শেয়ালদা-র মেলায় বহু সংখ্যক লোক সমাগম হয়। সার্কাস খেলা কোলকাতার উৎসবগুলির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব হলেও এর আয়োজন আরম্ভ হয় কয়েক মাস আগে থেকেই। রথ নির্মাণের জন্য কাঠ, 'মাদলপঞ্জী'র বিধান অনুযায়ী মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমী থেকে সংগ্রহ করা আরম্ভ হয়। পুরীর বিখ্যাত রথটি নির্মাণের জন্য উড়িষ্যার দশপল্লা জেলার সংরক্ষিত রণপুর অরণ্য থেকে এই কাঠ আসে। পূর্বে অবশ্য রাজপ্রধানরাই এই কাঠ সরবরাহের দায়িত্ব নিতেন। এখন সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছেন উড়িষ্যার সরকার।

রথ নির্মাণের মধ্যেও নানা প্রকার সংস্কার আছে। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার জন্য প্রতি বৎসরই নূতন রথ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। শ্রীজগন্নাথের রথের নাম চক্রধ্বজ, শ্রীবলদেবের রথের নাম তালধ্বজ এবং শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথের নাম পদ্মধ্বজ। প্রতিটি রথের উচ্চতা যেমন ভিন্ন, বর্ণও তেমনি ভিন্ন। প্রথমটির বর্ণ পীত, দ্বিতীয়টির নীল এবং তৃতীয়টির বর্ণ কৃষ্ণ। প্রতি বৎসর নূতন করে রথাশ্ব, সারথি ও পার্শ্ব দেবতা শিল্পীদের দ্বারা নির্মাণ করানো হয়ে থাকে। রথের যে চারটি অশ্ব থাকে তাদের নাম রোচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা ও অমৃতা। দ্বারদেশে থাকেন ইন্দ্র, ব্রহ্মা, মারীচি প্রমুখ সপ্তর্ষি। এই মূর্তি নির্মাণ এবং অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণ শাস্ত্রোক্ত মতে করা হয়। রথযাত্রার দিন বিগ্রহকে মন্দির থেকে বাইরে এনে রথে সমাসীন করা হয়। নামাবার সময় 'ধীরপদ বিন্যাস' বলা হয়। যাতে বিগ্রহদের কোন রকম অসুবিধা না হয় তার জন্যে প্রতি ধাপে তুলোর গদী দেওয়া হয়। একে 'কাহন্তি বিজয়' উৎসব বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন প্রথানুযায়ী—উড়িষ্যার গজপতি মহারাজেরা স্বর্ণ মার্জনী দ্বারা পথ এবং রথ পরিষ্কার করে থাকেন। আজও এই সব প্রথা প্রচলিত আছে। চৈতন্য-মঙ্গলে বলা হয়েছে :–

'তব প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ মার্জনী লঞা করে পথ
সম্মার্জন।।
চন্দন জলেতে করে পথ নিষেচনে।
তুচ্ছ সেবা করে বসি রাজ সিংহাসনে।।

পুরীর মত প্রতি বৎসর নূতন করে রথ নির্মাণের প্রথা অন্যত্র প্রচলিত না থাকলেও রথগুলি নূতন করে সংস্কার করা হয় সর্বত্র। পুরীতে যে রথ নির্মাণ করা হয়, তা রথের পুণর্যাত্রা উৎসবটি শেষ হবার পরের দিনই রথের সমস্ত কাঠ নীলাম দরে বিক্রী করে দেওয়া হয়। অন্যান্য স্থানে অবশ্য রথটি তুলে রাখা হয়। পরের বৎসরের উৎসবের পূর্ব পর্যন্ত এটি প্রায় অবহেলিতভাবেই পড়ে থাকে।

রথযাত্রা যে একালেরই একটি লৌকিক উৎসব তা নয়। বহুদিন আগে থেকেই এর জনপ্রিয়তা ছিল। ঐতিহাসিক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র উল্লেখ করেছেন যে, বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন পাটলিপুত্রে রথযাত্রা উৎসব দেখেছিলেন। সেকালের উৎসবেও এমনি জনসমাগম হতো। প্রাচীন শৈব এবং জৈনদের মধ্যেও রথযাত্রার প্রচলন ছিল। বেদে রথ শব্দের উল্লেখ আছে। কঠোপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণেও রথের কথা নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, সত্য যুগে [illegible] রথ টেনেছিলেন। দেবতা, সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণও এই রথযাত্রার উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

রথের তলায় আত্মাহুতি দিয়ে প্রাণ বিসর্জনের কাহিনী জানা যায় সপ্তদশ শতক থেকে। কারণ, সেকালে সমাজের ধারণা ছিল যে, যদি রথের তলায় আত্ম-বিসর্জন দেওয়া যায় তবে 'অক্ষয় স্বর্গ' প্রাপ্তি ঘটে। এই সংস্কারে বহু লোক রথের চাকার নীচে প্রাণ বিসর্জন দিতেন। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীল 'কৃষ্ণ সেবা হইল না' এই আক্ষেপ করে রথের তলায় প্রাণ দেওয়ার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ব্রুটন সাহেব এই ধরনের আত্মাহুতি প্রত্যক্ষ করেন। ঐ শতকেই [illegible] এবং পরবর্তী শতকের ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে হ্যামিলটন অনুরূপ আত্ম-বলিদান দেখেছিলেন বলে জানা যায়।

উনিশ শতকের রথযাত্রার একটি আকর্ষণীয় বিবরণ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় আছে। বিবরণটি প্রধানতঃ কোল-কাতার রথযাত্রা প্রসঙ্গে। উৎসব এবং মেলার যে একটা হুজুক সেকালেও ছিল, তা সেখান থেকে কটি লাইন তুলে ধরলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কোলকাতার রথ উৎসব সম্বন্ধে সেখানে বলা হয়েছেঃ 'ক্রমে রথ এসে পড়লো। ফ্যাতো ব্যাতো পরব প্রলয় বুড়টে ; এতে ইয়ারকির লেশ মাত্র নাই, সুতরাং সহরে রথ পার্বণে বড় একটা ঘটা নাই ; কিন্তু কলিকাতায় কিছুই ফাঁক যাবার নয়।' সেকালের কোলকাতায় চিৎপুরের রথের উৎসব দেখবার জন্য প্রচুর ভিড় হতো। কেবলমাত্র ছেলে, বুড়োরাই যে এই উৎসব দেখতে আসতো, তা নয়। বাড়ীর অন্দর মহলের মহিলারাও এখানে যোগ দিতেন। এবং আজকের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না সেদিনের উৎসব। হুতোম লিখছেন—'রথের দিন চিৎপুর রোড লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ছোট ছোট ছেলেরা বার্ণিস করা জুতো ও সেপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি পরে, কোমরে রুমাল বেঁধে, চুল ফিরিয়ে, চাকর ও চাকরাণীদের হাত ধরে, পয়নালার উপর পোদ্দারের দোকানে ও বাজারের বারান্দায় রথ দেখতে দাঁড়িয়েচে। আদ্-বয়সী মাগীরা থাতায় থাতায় কোরা ও কলপ দেওয়া কাপড় পরে রাস্তা জুড়ে চলেছে; মাটির জগন্নাথ, কাঁঠাল, তালপাতের ভেঁপু পাখা ও সোলার পাখি বেধড়ক বিক্রী হচ্ছে; ছেলেদের দেখাদেখি বুড়ো বুড়ো মিনসেরাও তালপাতের ভেঁপু নিয়ে বাজাচ্ছেন।'

কথায় বলে ঠুঁটো জগন্নাথ। সেকালেও জগন্নাথকে নিয়ে কম ব্যাঙ্গ রসিকতা করা হয়নি। উৎসব মাত্রেরই যেমন একটা শৃংখলাহীন দিক আছে, এই উৎসবটিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরঞ্চ জগন্নাথকে নিয়ে ঠাট্টা, বিদ্রূপের দিকটাই ছিল বেশী। শোভাযাত্রায় প্রথমে যে কীর্তন গান হয়, সাধারণতঃ তা দর্শকদের কাছে পৌঁছবার আগেই বিশাল শব্দ

স্রোতের মধ্যে হারিয়ে যায়। হুতোম প্যাঁচা কাব্য করে লিখেছেন: 'দোয়ারেরা কি গাচ্চেন, তা তারা ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পাচ্ছেন না। দর্শকদের ভিড়ের ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভক্তিভরে মাত্‌লাম সুরে—

কে মা রথ এলি?
সর্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যাটো ঘোড়া,
চুড়োর উপর মুকপোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।'

জগন্নাথকে নিয়ে এই ধরনের নানা ছড়া গড়ে উঠেছে। মাহেশের রথের কথা রাধারানীর প্রসঙ্গে বংকিমচন্দ্রও উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও অন্যভাবে এই উৎসবটির একটা চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন:

"রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।'

এছাড়াও রথযাত্রা বা রথের মেলাকে নিয়ে আরও বহু প্রকার লৌকিক ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, সমাজ জীবনের সঙ্গে এই উৎসবটির আত্মীয়তা কত গভীর। এই আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়েছে বহুদিন আগে থেকেই। এখনও তার প্রবাহ ছুটে চলেছে সমান জনপ্রিয়তায়। এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ আজও সেই লোকারণ্য মেলা। মেলায় গেলে আমরা সকলের সঙ্গে এক-হয়ে যাই এই হল সব থেকে বড় লাভ।

পুরীর জগন্নাথদেবের রথ
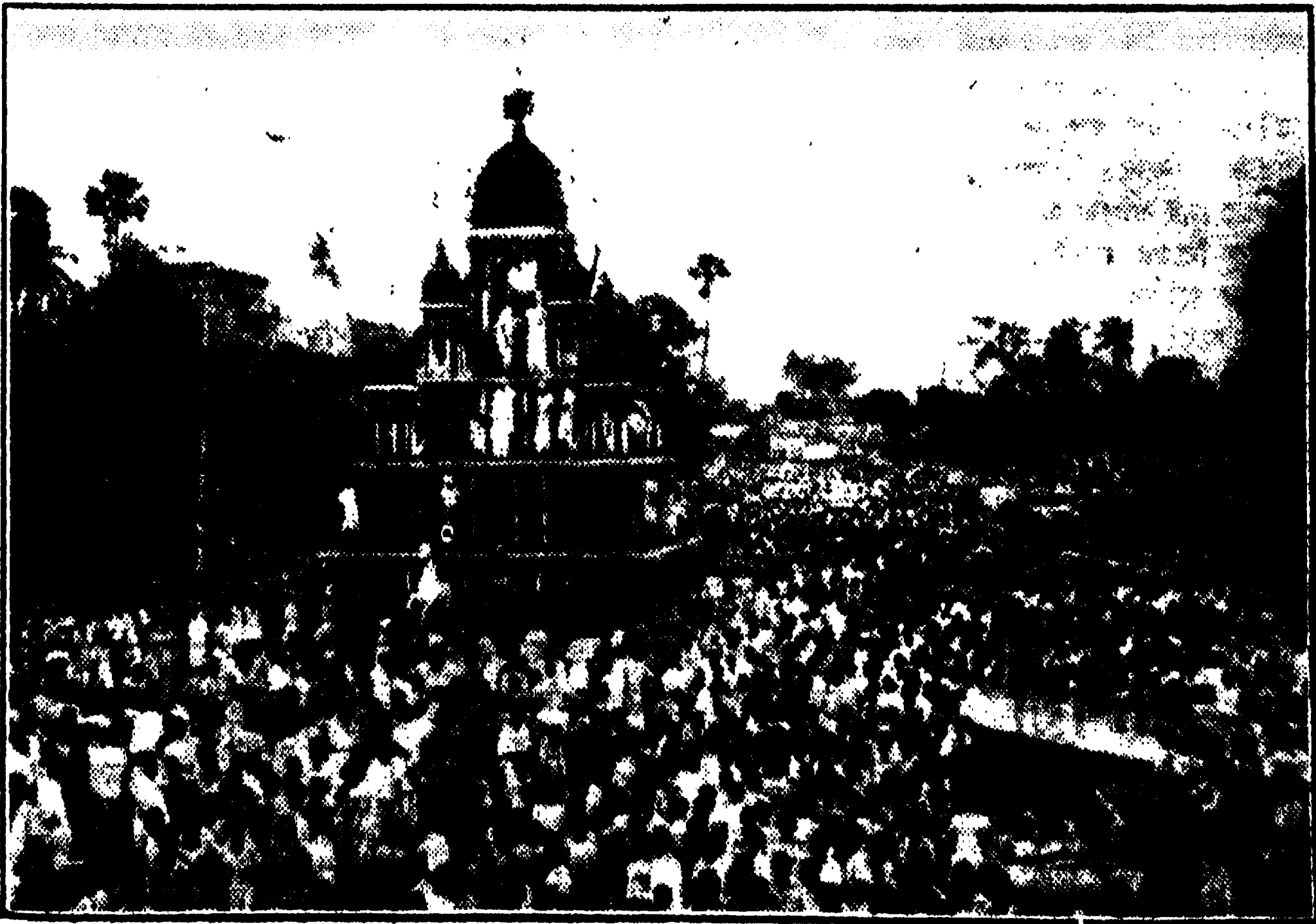
মাহেশের রথ

মতামত

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃতের' ৮ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শ্যামল মল্লিক দিলীপ রায়ের চিত্র সমালোচনার উত্তরে শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে গুটিকয়েক মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

শ্যামলবাবু (অথবা দিলীপবাবু?)র মতে শিল্প ব্যাপারটা কারো শিক্ষাধীনতায় আয়ত্ত করা যায় না; ওটা নিজে নিজেই শিখতে হয়। কথাটা আংশিক সত্য। কোন শিল্পগুরুই এমন দাবী করেন না যে, যে তাঁর কাছে শিল্পকলা শিক্ষা করতে আসবে তাকেই তিনি শিল্পী তৈরী করে দেবেন। শিষ্যের যদি প্রতিভা থাকে, গুরু তার প্রতিভা স্ফুরণে সাহায্য করতে পারেন এই পর্যন্ত। আদর্শ গুরু কোনদিনই শিষ্যকে বলেন না, তুমি আমার অনুকরণ কর। যিনি বলেন তিনি গুরু নন।

একটা কথা। শ্যামলবাবুর শিক্ষা-ব্যাপারটার ওপর এত বিতৃষ্ণা কেন? গুরুর কাছে বা শিক্ষায়তনে না শিখলেও বই পড়ে, ছবি দেখে বা মূর্তি নিরীক্ষণ ক'রে তো শিখতেই হয়। তার কারণ আকস্মিক বোধিতে আমাদের বিশ্বাস নেই। সেটা কি অন্যের 'বমন করা' (কথাটা সত্যিই বমনোদ্রেক করে) বিদ্যা নয়? আসল কথা অপরের কাছ থেকে শিখতে বা জানতে আমাদের হবেই। তারপরে সেই অর্জিত বা অধীত জ্ঞানের কতটুকু নিজের সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করে তা বুদ্ধির আলোকে বিচার করে দেখতে হবে।

তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ক্যামেরা উদ্ভাবনের পর ড্রইংএর আর প্রয়োজন নেই। কথাটা হাস্যকর। ড্রইং মানে কি কেবল বস্তুর নির্ভুল অনুকৃতি? এ তথ্য তিনি কোথায় পেলেন? এই ভুল ধারণার বশবর্তী হ'য়েই তিনি বলেছেন, রাজপুত বা কাঙড়া ছবিতে নিখুঁত ড্রইং খুঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তবানুগ না হ'য়েও ড্রইং নিখুঁত হ'তে পারে অন্ততঃ আর্টের ক্ষেত্রে। ড্রইং হচ্ছে রেখার বেষ্টনীতে বস্তুরূপকে ধরবার প্রয়াস—সে-রূপ প্রকৃতির নিছক অনুকৃতি হতে পারে আবার idealised-ও হতে পারে। প্রথমটিকে বলব photography দ্বিতীয়টিকে বলব art।

ড্রইং মানে নিছক বাস্তবানুকরণ নয়, suggestion of living f[illegible] তার অন্যতম উদ্দেশ্য। অতএব 'বিরক্তি-কর' হ'লেও ড্রইং শেখার প্র[illegible]ন অপ্রয়োজনীয় নয়। Disto[illegible]on-এর স্বাধীনতা শিল্পীর অবশ্যই আছে, কিন্তু সে distortion মানে twisting, misrepresentation নয়। আর আমার জানা এমন কোন সার্থক শিল্পী নেই—কি প্রাচীন কি নবীন—যিনি তাঁর ছবিতে Natural object-কে কম-বেশী distort না করেছেন। এ প্রসঙ্গে এক হাজার বছর আগেকার এক চীনা শিল্পীর মতামত আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়:

(A. WALEY — An introduction to the Study of Chinese Art, P. 169.)

P a i n t i n g is delineation; to measure the shapes of things, yet with grasps of Truth; to express outward form as outward form, and inner reality as inner reality. Outward forms must not be taken as inner realities. If this is not understood resemblance may indeed be achieved. but not pictorial truth. A 'resemblance' reproduces form, but neglects spirit; but Truth shows spirit and substance in like perfection......

আবার

.....There are two kinds of faults. Those that depend upon representation and those that do not.

আধুনিক শিল্পীরা প্রথম দোষটিকে বর্জন করতে গিয়ে (গভীরভাবে উপলব্ধি না করেই) দ্বিতীয়টিকে আঁকড়ে ধরেছেন। তার ফলে এ'দের ছবিতে distortion বিকৃতির পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে অথচ Truth-এর সাক্ষাৎ মেলেনি। শ্যামলবাবু বলেছেন 'মডার্ণ আর্টের' 'অগ্রগতি' এখন child art বা primitive artএর দিকে।

তবে কি যার মধ্যে যতো বেশী 'খোকাম' এবং 'আদিমতা' থাকবে তা কি ততো বেশী রসোত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে? তাছাড়া আর একটা কথা শ্যামলবাবুকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি, child art যদি এতো রসোত্তীর্ণ হয় lunatic art-এর তো আরো রসোত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। শিম্পাঞ্জী আর্ট তো ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

শ্যামলবাবুর সব শেষ বক্তব্য—চিত্রকলার মধ্যে ব্যাকরণ ব্যাপারটা কী? ব্যাকরণ হচ্ছে কতকগুলি নিয়ম যা শৃংখলা বজায় রাখতে সাহায্য করে। মুখের ভাষার ব্যাকরণ মুখের ভাষার discipline বজায় রাখে, ছবির ভাষার ব্যাকরণ ছবির discipline বজায় রাখে। ভাষার বাহন হচ্ছে অর্থবোধক শব্দ, ছবির বাহন হচ্ছে অর্থবোধক রেখা। কতকগুলি অর্থবহ শব্দের সুসমঞ্জস অবস্থানে গড়ে ওঠে একটি বাক্য, কয়েকটি অর্থবহ রেখার সুসমঞ্জস সংস্থাপনে গড়ে ওঠে একটি ছবি। মুখের ভাষার ব্যাকরণের মতো ছবির ভাষার ব্যাকরণও তাই অপরিহার্য এবং কোনক্রমেই তা বাধাস্বরূপ নয়। আর সবশেষে তিনি Read সাহেবের যে উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে চমকপ্রদ কোন কথা নেই। দুটি শিল্পক্রিয়া যদি স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয় তাহ'লে তারা পৃথক হতে বাধ্য, বিশেষতঃ একটি যদি প্রাচ্য আর একটি যদি পাশ্চাত্য হয়। সেক্ষেত্রে তাদের পার্থক্য fundamental. প্রাচ্য শিল্পের সঙ্গে গভীর পরিচয় না থাকার ফলেই Read সাহেব এক নিঃশ্বাসে Sung Painting, Renaissance Painting এবং Modern European Painting-এর নাম উচ্চারণ করে গেছেন। আমি কিন্তু এ তিনটিকে একাসন দিতে নারাজ।

নমস্কারান্তে ইতি—
হীরেন মুখোপাধ্যায়
আশুতোষ কলেজ, কলকাতা-২৬

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

'গন্ধ মন্থর অন্ধকার'

ভূতের গল্প

রাত প্রায় সাতটার সময় নমিতা যখন বাসায় ফিরল অসহ্য ক্রোধের জ্বালায় তখনও তার সর্বাঙ্গ জ্বলছে।

নাঃ! এখানে আর নয়। কালই সে চাকরিতে রিজাইন দিয়ে কলকাতায় চলে যাবে।

অথচ, কি আশ্চর্য, ছ'মাসের মধ্যে এ রকম সম্ভাবনার কথা একদিনও তো তার মনে হয়নি! বাপখুড়োর বয়সী লোক—শিক্ষাদীক্ষাহীন অপরিচ্ছন্ন রুচিহীন কুদর্শন, সবই সত্যি—কিন্তু তবু নমিতা রামজীবনবাবুকে আন্তরিক শ্রদ্ধাই করে এসেছে এতদিন। কাছে দাঁড়ালে গাটা একটু ঘিনঘিন করে হয়তো, কথাবার্তা শুনলে হাসি সামলানো দায় হয়ে ওঠে—বিশেষত নমিতার মত মেয়ের পক্ষে—কিন্তু তাঁর অসাধারণ বদান্যতার প্রমাণ তো তার চোখের সামনেই রয়েছে। তিনতলা হোস্টেলসমেত এতবড় বালিকা-বিদ্যালয়টা তাঁর একার টাকায় গড়ে উঠেছে, সরকারের কাছ থেকে এক পয়সাও সাহায্য তিনি নেননি। এখনও এর কাড়ি কাড়ি খরচ—এবং সে খরচও খুব সামান্য নয়—তিনি একাই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর চারিত্রিক সততা সম্বন্ধেও সন্দেহ করবার হেতু কোনদিন ঘটেনি। কোন রকম বদখেয়াল তাঁর নেই। মস্ত বড় কারবারী মানুষ ছিলেন এককালে, কিন্তু কারও সঙ্গে কোনদিন একটা পয়সা নিয়ে তঞ্চকতা করেছেন এমন অপবাদ তাঁর নামে কাউকে কখনও দিতে সে শোনেনি।

গ্রামের লোক সবাই রামজীবনবাবুকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে—সেও শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারেনি।

সেই মানুষ কি না আজ—!

ছমাস আগে চাকরি নিয়ে এখানে এসে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে রামজীবনবাবুর নাম সে শুনেছে। স্কুলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, স্কুলের তিনি পৃষ্ঠপোষক, স্কুলের জন্যে অকাতরে অর্থব্যয় করেন—অতি সজ্জন লোক, অমায়িক, নিরহঙ্কার—পলাশপুরের মত অজ পাড়াগাঁয়ে না জন্মে যদি তিনি শহরে জন্মাতেন তাহলে এতদিনে একটা দেশবিখ্যাত মানুষ হয়ে যেতে পারতেন—ইত্যাদি আরও কত কথা।

শুধু জিওগ্রাফির টিচার মনোরমা একটু রহস্যময় ভাবে মুখ টিপে হেসে বলেছিল, '[illegible] রামজীবনবাবুর কথা আপনি পরের মুখে যতই শুনুন না কেন নমিতাদি, নিজের চোখে একবার না দেখলে মানুষটির আসল রূপ আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না।'

পরদিন দুপুরেই তাঁকে সে দেখেছিল।

পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর বয়েস হবে ভদ্রলোকের। বেঁটে, কালো, বাবলাগাছের গুঁড়ির মত মজবুত শক্ত চেহারা, প্রকান্ড থ্যাবড়া মুখের মাঝখানে ভোঁতা চ্যাপ্টা নাক, আর তার নীচে একজোড়া ভোজপুরী প্যাটার্ণের শিংতোলা গোঁফ। গায়ে একটা আধময়লা গলাবন্ধ ছিটের কোট, পরনের ধুতি প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে, পায়ে ফাটাচটা ধূলিমলিন অ্যালবার্ট। মাথার চুলে জবজবে করে তেল মাখা—কি একটা সস্তা ফুলেল তেল, যার কটকটে উগ্র গন্ধ আধ মাইল দূর থেকে নাসারন্ধ্রকে উৎপীড়িত করে তোলে।

হাতের লোহা-বাঁধানো মোটা বাঁশের লাঠিটা ঠক্ ঠক্ করে ঠুকতে ঠুকতে নমিতার সামনে এসে দাঁড়িয়েই বিনা কারণে হ্যা-হ্যা করে খুব খানিকটা হেসে নিলেন, তারপর বাজখাঁই আওয়াজ তুলে আলাপ শুরু করে দিলেন ঃ

'এই যে আপনি এসে গেছেন দেখছি। বেশ বেশ! দরখাস্তে দেখেছিলাম বিদ্যের জাহাজ—তা চেহারাতেও দেখছি বেশ শানপালিশ আছে। তবে আর ভাবনা কি? এমন হেডমিসট্রেস এনে দিইছি, তোমাদের স্কুল তো এখন গড়গড়িয়ে চলবে। কি বলগো তোমরা সব দিদিমণির দল?'

রামজীবনবাবুর চেহারা ও সাজসজ্জা দেখে এবং তাঁর কথাবার্তা শুনে নমিতার ততক্ষণে প্রায় বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হয়েছে, ওদিকে ফুলেল তেলের আক্রমণে শ্বাসরোধ হতেও আর বেশি দেরি নেই।—এই রামজীবন তরফদার! এঁরই প্রশংসা শুনতে শুনতে কাল থেকে তার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এ তো একটা জন্তুবিশেষ! এঁরই তাঁবেদারি করে তাকে চাকরি বজায় রাখতে হবে!—নমিতার সমস্ত মন নিদারুণ বিতৃষ্ণায় একেবারে যেন কুঁকড়ে গেল।

অন্যান্য টিচারদের মুখে বিশেষ কোন ভাববিপর্যয় লক্ষ্য করা গেল না—রামজীবনবাবু বোধ হয় তাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে কম-বয়সী টিচার সেই মনোরমা, নমিতার মুখের দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছিল। হঠাৎ রামজীবনবাবুর নজর তার মুখের ওপর গিয়ে পড়ল এবং তখনই অভ্যস্ত ভারীস্বরে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'কি গো, বিচ্ছু দিদিমণি, অমন করে হাসছ যে?'

তারপর তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দ্রুত একবার নমিতার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, 'ও—বুঝেছি। পাড়াগেঁয়ে ভূতের কাণ্ড দেখে নতুন কলকাতা থেকে আসা এম-এ পাশ হেড্‌মিস্‌ট্রেস কি রকম হকচকিয়ে গেছেন তাই দেখে হাসছ—না? মজা দেখছ?'— তারপর নমিতার দিকে ফিরে বললেন, 'ও মেয়েটা বড় ফাজিল, বুঝলেন? এমনিতে বেশ ভাল মেয়ে, কিন্তু আড়ালে আমার

নামে যা-তা কথা সব বলে বেড়ায়, ফষ্টি-নষ্টি না করে একদণ্ড থাকতে পারে না। ওর সব কথা যেন বিশ্বাস করবেন না আপনি। —তবে আমাকে যদি পাড়াগেঁয়ে ভূত বলেই থাকে বিচ্ছু দিদিমণি, তো বিশেষ অন্যায় কিছু বলে নি। ভূত বৈ আর কি বলুন? লেখা-পড়ায় তো লবডঙ্কা—পেটে বোমা মারলে কোঁক্ করিনে; পাছে ক-অক্ষর বেরিয়ে পড়ে। কোন রকমে দাগা বুলিয়ে ইংরিজি বাংলায় নাম-সইটে করতে শিখেছি—ব্যাস্, ঐ পর্যন্ত! ছাপানো বই চোখের সামনে ধরলে হয়তো মাথা ঘুরে ভিরমি খাব।—জানেন? জীবনে কখনও আমাদের এই জেলার বাইরে যাইনি। আপনাদের কলকাতা শহরটা যে কেমন তা চোখে পর্যন্ত দেখিনি। আকাট মুখখু, কুয়োর ব্যাঙ!—তবে কি জানেন, আমাদের এই বাঁশবনের অন্ধকারে আমিই হলাম শেয়াল রাজা—হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা-'

হাসির ধমক একটু কমলে আবার বলতে শুরু করলেন, 'পাড়াগেঁয়ে ভূত—পাড়াগাঁয়ের হাটবাজারে ভুষিমালের কারবার করে অনেকগুলো টাকা হাতে এসে গেল। সে অনেক টাকা—বুঝলেন? যুদ্ধের বাজার ছিল তো তখন!—এখন এত টাকা নিয়ে করি কি তা বলুন? বে-থা করিনি, ঝাড়া-হাত-পা মানুষ—পিছুটান কিছুই নেই। এদিকে যুদ্ধের পর গ্রামটাও খুব জাঁকিয়ে উঠল, অনেক লোক বেড়ে গেল—ছেলেদের ইস্কুলে জায়গা নেই, মেয়েরা পড়তে পায় না, তাই'—দুই হাত ছড়িয়ে আছাড়-খাওয়া ব্যাঙের মত একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বললেন, 'তাই. কারবার গুটিয়ে ফেলে এই এক খেয়ালে টাকা-গুলো খরচ করতে আরম্ভ করেছি। হ্যা-হ্যা-হ্যা—বাতিক, বুঝলেন কিনা, বাতিক, পাড়াগেঁয়ে ভূতের একটা ভুতুড়ে বাতিক।'

হঠাৎ ঠকাস্ করে লাঠিটা মাটিতে ঠুকে উঠে দাঁড়ালেন : 'এখন চলি। আবার দেখা হবে, ঘন ঘনই দেখা হবে—আমিই আবার ইস্কুলের সেক্রেটারি কি না!'

লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে তিনি সেদিনের মত বিদায় নিলেন। কিন্তু সেই বিটকেল ফুলের তেলের গন্ধ ঘর থেকে বিদায় হতে আরও প্রায় দশ মিনিট লেগেছিল।

নমিতার শহুরে মনটা সেদিন তার নাকের মতই অনেকক্ষণ ধরে ঘৃণা ও বিরক্তিতে সিঁটকে ছিল। ভূত—ভূত—সত্যিই পাড়াগেঁয়ে ভূত! কিন্তু মনে মনে একথাও স্বীকার করতে সে বাধ্য হয়েছিল যে আর যাই হোক লোকটা বোকা নয়।

মাসখানেকের মধ্যেই নমিতা আরও অনেক কথা স্বীকার করতে বাধ্য হল। রামজীবনবাবু সত্যিই শ্রদ্ধেয় মানুষ—একদম সাঁচ্চা লোক, খাঁটি সোনা।

আজীবন শহরে বাস করেছে নমিতা। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ছাপ, [illegible]ত জামাকাপড় এবং ধোপদস্ত [illegible]লাপ-আচরণ না থাকলে কোন মানুষই ঠিক মনুষ্যপদবাচ্য হয় না। [illegible] রুচি ও সংস্কৃতিকে সে জীবনের অলংকার মাত্র নয়, জীবনের অংশ বলেই ভাবতে অভ্যস্ত চিরকাল।

কিন্তু এই পাড়াগেঁয়ে ভূতটা কয়েকদিনের মধ্যে তার সমস্ত বিশ্বাস ও ধারণা ওলটপালট করে দিল, তাকে বুঝতে শেখাল—খোসার ভিতর থাকে শাঁস এবং শাঁসটা সব সময়েই খোসার চেয়ে বেশি মূল্যবান।

রামজীবনবাবুর সঙ্গে তাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই মিশতে হয়—সেক্রেটারির সঙ্গে যেমন সব হেডমিসট্রেসকেই মিশতে হয়, বিশেষত পাড়াগাঁয়ের স্কুলে। তাছাড়া রামজীবনবাবু বেশি লেখাপড়া জানেন না বলে সেক্রেটারির দপ্তরের কাজ সবই প্রায় তাকে করতে হয়, তিনি শুধু ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সই মেরেই খালাস। প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয় এবং প্রতিদিনই দেখা করে ফিরবার সময় তার মনে হয় এমন মানুষ সে আগে আর কখনও দেখেনি।

এর মধ্যে প্রায় দুই পক্ষেরই অজ্ঞাতসারে রামজীবনবাবু তাকে আপনি ছেড়ে তুমি বলতে শুরু করেছেন এবং সেও স্কুলের বাইরে দেখা হলে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে শুরু করেছে।

স্বার্থপর আমরা সবাই—কেউ বা একটু বেশি কেউ বা একটু কম। তারই মধ্যে যার স্বার্থবুদ্ধি খুব কম তাকেই আমরা নিঃস্বার্থপর মানুষ বলে উচ্চ প্রশংসা দিয়ে থাকি। কিন্তু সত্যকার পরার্থপর মানুষ আমরা সংসারে কজন দেখতে পাই? পরের স্বার্থই যার একমাত্র স্বার্থ, পরের চিন্তাই যার একমাত্র চিন্তা, পরের কাজ করে বেড়ানোই যার একমাত্র আনন্দ, সে জাতের মানুষ কোন যুগেই সুলভ নয়। রামজীবনবাবু সেই দুর্লভ জাতের মানুষ।

এমন মানুষকে কি প্রণাম না করে থাকা যায়?

কিন্তু আজন্ম-অর্জিত সংস্কার সহজে যায় না। এখনও রামজীবনবাবুর হ্যা-হ্যা করা হাসি ও গ্রাম্য রসিকতা-গুলো শুনলে, তাঁর গায়ের গলাবন্ধ কোট ও হাতের লোহা-বাঁধানো লাঠি দেখ[illegible] তার মন বিরূপ হয়ে ওঠে—বিশেষ করে তাঁর মাথার ফুলেল তেলের সেই উৎকট গন্ধটা নাকে গেলেই তার গা গুলিয়ে উঠতে থাকে, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তবু সে মনকে চাবকিয়ে শায়েস্তা করে রাখে, কারণ সে জানে—এহো বাহ্য, এহো বাহ্য। খেয়ালী বিধাতা ছেঁড়া ন্যাতায় মুড়ে কোহিনুর রেখেছেন।

সেই মানুষ—একি করে বসলেন আজ! তবে কি সংসারে কাউকেই বিশ্বাস করা চলে না?

ব্যাপারটা সূত্রপাত হয় পরশু রাতে। কদিন থেকেই লক্ষ্য করছে নমিতা, বাজারের কাছাকাছি পথ দিয়ে চলবার সময় কতকগুলো দোকানদার-শ্রেণীর বখাটে ছোকরা তার সঙ্গ নিতে আরম্ভ করেছে। পিছন বা পাশ থেকে অনেকটা কাছে এগিয়ে আসে, শিস দেয়, পরস্পরের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ রসিকতা করে, হাসে, মাঝে মাঝে দুই এক কলি সিনেমার প্রেমের গান গেয়ে ওঠে।

কলকাতার মেয়ে নমিতা, এসব তার গা-সওয়া হয়ে গেছে—বিশেষ গ্রাহ্য করে না। তবে পাড়াগাঁয়ে এতদিন আছে, এ-রকম কিছু পূর্বে ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। কাজেই একটু অস্বস্তি অনুভব করেছে সে এই নতুন ধরনের উৎপাত শুরু হওয়ায়। কিন্তু এ নিয়ে কারও সঙ্গে কোন আলোচনা করেনি। নিজের মর্যাদা সে নিজেই রক্ষা করে চলতে পারবে এটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে।

কিন্তু পরশু রাতের ঘটনাটায় সে বেশ একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল—তার বাসাটা গ্রামের মধ্যে নয়, একটু বাইরে—স্কুল-বাড়ীর লাগোয়া। বুড়ী ঝি মানদার-মাকে নিয়ে বাসায় সে একাই থাকে। কাছেই এত বড় হোস্টেল রয়েছে, স্কুলের চাকর-দারোয়ান রয়েছে—সুতরাং কোন রকম ভয়ের সম্ভাবনাও কোন দিন তার

মনে জাগেনি। সেদিন রাত্রে সে সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার খাতা দেখতে বসেছে। মানদার-মা কাজকর্ম শেষ করে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে এবং যথারীতি সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকাতে শুরু করেছে। তখন সাড়ে নটাও বাজেনি, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের রাত—এর মধ্যেই সব নিষুতি হয়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ দুম করে একটা শব্দ হল—একটা বড় ঢিল বাইরে থেকে সজোরে সদর দরজার ওপর এসে পড়ল। চমকে মাথা তুলে চাইতেই নমিতার নজরে পড়ল, ডান দিকের জানালার বাইরে অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি—একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে।

'কে? কে ওখানে?'— ঈষৎ ভীত-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নমিতা। কিন্তু তার ফলে লোকটা জানালা থেকে সরে তো গেলই না, বরং দেয়ালের আড়াল থেকে আরও একজন তার পাশে এসে দাঁড়াল।

দুজনে ফিস্‌ফিস্ করে কি সব কথা বলল কিছুক্ষণ, তারপর তার দিকে চেয়ে চাপা সুরে হি-হি করে হাসতে লাগল। তারপর—সে কি কুৎসিত কন্ঠস্বর! এখনও মনে পড়লে পাঁকে পা পড়ার মত সর্বাঙ্গ ঘৃণায় শিউরে ওঠে : 'তোর পায়ে পড়ি দিদিমণি, দরজাটা একটিবার খুলে দে-না মাইরি!'

পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে মানদার-মাকে জাগিয়ে তুলল সে। বুড়ী ঝাঁটা হাতে করে রে-রে শব্দে তেড়ে এল, কিন্তু তখন আর জানালায় কেউ নেই। শুধু মানদার-মার উচ্চকণ্ঠের গালিগালাজের উত্তরে অন্ধকারের মধ্যে থেকে হেঁড়ে গলার ধমক শোনা গেল : 'চুপ কর্ হারামজাদী বুড়ী, নইলে দেব একদিন ঘাড় মটকে দফা ঠাণ্ডা করে।'

বলা বাহুল্য এ শাসানির ফলে মানদার-মা মোটেই ভড়কায়নি, বরং আরও তারস্বরে পাড়া মাতিয়ে চেঁচাতে শুরু করেছিল। —স্কুল থেকে দারোয়ান ও দফ্তরি লাঠি হাতে ছুটে এল, হোস্টেলের বুড়ো সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-মশাই চাকর-বাকর নিয়ে এসে জুটলেন —বড় রকমের একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

তখুনি রামজীবনবাবুর কাছে লোক ছুটল। বিশ মিনিটের মধ্যেই তিনি লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে অকুস্থলে এসে হাজির হলেন।

সমস্ত ব্যাপার শুনে ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ঈষৎ অদ্ভুত এবং উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে নমিতার দিকে চেয়ে রইলেন, যেন নিজের মনেই একবার বিড়বিড় করে বললেন, 'না—এতো ভাল কথা নয়—মোটেই ভাল কথা নয়!' —তারপর স্কুলের দারোয়ানকে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর রোজ নমিতার বাইরের বারান্দায় এসে শোবার নির্দেশ দিয়ে গম্ভীর মুখে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে চলে গেলেন।

তারপর এই দুদিন তাঁর সঙ্গে য[illegible]ই দেখা হয়েছে নমিতা লক্ষ্য করেছে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর, কি যেন গোপন চিন্তায় সর্বদাই অন্যমনস্ক হয়ে আছেন। মুখে সেই হ্যা[illegible] করা অট্টহাসি নেই, লাঠির ঠক্‌ঠকানির মধ্যেও যেন আগের সেই সুস্পষ্ট দৃঢ়তার অভাব দেখা দিয়েছে। ভদ্রলোক খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছেন ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু এত বেশি দুশ্চিন্তার কি আছে ভেবে পায় না নমিতা। এ রকম ব্যাপার তো ঘটেই থাকে, এবং ঘটলে তার প্রতিবিধান করতে হয়। প্রতিবিধানের ব্যবস্থা একটা করা হয়েছে, আপাতত তার চেয়ে বেশি কিছু করবার প্রয়োজনও নেই বলেই মনে হয়। কেন অকারণে এত ভাবছেন ভদ্রলোক?

রামজীবনবাবুর ভাবনার স্রোতটা যে একটা বাঁকা পথ ধরে মোড় ঘুরেছে তা নমিতা তখনও বুঝতে পারেনি।—বুঝেছে আজ সন্ধ্যার পর, এবং তারই ফলে তার এই অমানুষিক ক্রোধ, পদত্যাগ করবার এই সুদৃঢ় সংকল্প।

সন্ধ্যায় স্কুলে ছাত্রীদের একটা ফাংশন ছিল। নাচ, গান, বাজনা, আবৃত্তি, অভিনয় ও সর্বশেষে হালকা জলযোগ। ব্যাপারটার জন্যে সারাদিন নমিতাকে খুব খাটতে হয়েছে। রাত আটটার সময় সব চুকে-বুকে যাবার পর স্কুলবাড়ী যখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে তখন রামজীবনবাবু তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, 'দেখ তোমার সঙ্গে আমার একটা অত্যন্ত জরুরি কথা আছে। একটু নিরিবিলি জায়গায় তোমার সঙ্গে একা কিছুক্ষণ বসতে চাই।'

স্কুলের সেক্রেটারির কাছ থেকে, বিশেষ করে রামজীবনবাবুর মত সেক্রেটারির কাছ থেকে এ ধরনের অনুরোধ অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। নমিতা তৎক্ষণাৎ দারোয়ানকে তার নিজের ঘরটা খুলে দিতে বলল।

কিন্তু বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার দুপাশে দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসে পড়বার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল—রামজীবনবাবু কোন কথাই বলেন না। গম্ভীর মুখে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু নমিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মাথার সেই ফুলেল তেলের গন্ধে ঘরের আবহাওয়াটাও যেন একটা বুকচাপা দুঃস্বপ্নের মত ভারী হয়ে রইল।

ভদ্রলোকের হল কি? নমিতা মনে মনে একটু অধৈর্য হয়ে উঠল। অবশেষে তাকেই বাধ্য হয়ে কথা পাড়তে হল : 'কি বলবেন বলুন! আর কতক্ষণ এমন-ভাবে বসিয়ে রাখবেন? সারাদিন খাটা-খাটনির পর বড় ক্লান্ত লাগছে, রাতও হল অনেক—'

রামজীবনবাবু তার কথা শুনতে পেয়েছেন বলেও মনে হল না। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, 'আচ্ছা নমিতা, তুমি কোনদিন আয়নায় নিজের চেহারাটা ভাল করে দেখেছ?'

প্রশ্নটা এতই অদ্ভুত, এতই অপ্রত্যাশিত যে নমিতা যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তারপর নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে উত্তর দিল, 'তা দেখেছি বৈকি। কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন বলুন তো?'

রামজীবনবাবু আরও গম্ভীর, আরও অন্যমনস্ক হয়ে উঠলেন। অনেকটা যেন নিজের মনেই মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'দেখ তুমি এম-এই পাশ কর আর যাই কর বয়েসটা তোমার খুবই কম—অত্যন্ত কাঁচা চেহারা তোমার। তা ছাড়া—রূপ। নিজের রূপ সবারই ভাল লাগে, কিন্তু তোমার যা রূপ—পরের চোখে সেটা যে কেমন ঠেকে শুধু আয়নার দিকে চেয়ে তা তুমি কিছুতেই বুঝতে পারবে না। কাজেই—'

আবার তিনি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুব মারলেন। রামজীবনবাবুর কথা-বার্তার ধরন শুনে নমিতা সত্যই হত-ভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এ আলোচনার উদ্দেশ্য যে কি হতে পারে তাও সে

বুঝে উঠতে পারছিল না। সুতরাং সেও চুপ করে রইল।

'কাজেই—তোমার একজন গার্জেন দরকার।' —অনেকক্ষণ পরে রামজীবনবাবু কথা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি কথা বলছেন কেমন যেন থেমে থেমে, অনভ্যস্ত আড়ষ্ট কণ্ঠে—যেন মনের ভিতরকার অন্ধকার গহ্বর থেকে প্রতিটি কথা তিনি হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে টেনে বের করে নিয়ে আসছেন : 'একজন গার্জেন—যে তোমার দেখাশোনা করবে, বিপদে-আপদে তোমাকে রক্ষা করবে, মানে—তোমার জীবনের সব ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে—'

কথাটাকে হাল্কা করে তুলবার শেষ চেষ্টায় প্রায় মরীয়া হয়ে নমিতা তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তা আমার গার্জেন তো আপনিই রয়েছেন। এমন শক্তসমর্থ গার্জেন আর আমি কোথায় পাব?'

হঠাৎ একটু থতমত খেয়ে গেলেন রামজীবনবাবু। সেই অদ্ভুত উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে আবার কিছুক্ষণ নমিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'না, তুমি বুঝছ না কথাটা। আমি বলছি কি জান, তোমার একটা বিয়ে করা দরকার।'

এর আর কি উত্তর দেবে নমিতা? বহুবার বহু লোকের মুখে একথা তাকে শুনতে হয়েছে, বহু রকমের জবাব দিতে হয়েছে, বহু তর্ক করতে হয়েছে। আবার সেই পুরনো কথা!

'হ্যাঁ, তোমার বিয়ে করা বিশেষ প্রয়োজন—বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। কিন্তু—তুমি চলে গেলে আমার ইস্কুল তো বাঁচবে না। ছমাস আগে ইস্কুলটা কি ছিল? একটা গোয়াল—বুঝলে?—হরিঘোষের গোয়াল! মাস্টারনীরা পড়াত না, মেয়েরা পড়ত না—এদিকে আমার শুধু টাকার শ্রাদ্ধ হত। বাড়ী-ঘর চেয়ার-বেঞ্চি চাকর-দারোয়ান সবই ছিল, কিন্তু আসল কাজের বেলায় ঢু-ঢু। ইনস্পেক্‌টেসরা এসে সব দেখেশুনে খাতায় এমন সব কড়া কড়া কথা লিখে রেখে যেতেন যে মাঝে মাঝে মনে হত—দূর কর ছাই! কাজ কি আর এত হাঙ্গামায়—ইস্কুলটা তুলেই দিই। কাজ তো কিছুই হচ্ছে না, শুধু শুধু বদনামের ভাগী হই কেন?—কিন্তু আজ দেখ, ইস্কুলের একেবারে ভোল পাল্টে গেছে। দূর দূর গ্রাম থেকে মেয়েরা আসছে হোস্টেলে থেকে পড়বে বলে। কি—না, এ ইস্কুলে ভাল পড়ানো হয়, নিয়মিত পরীক্ষা নেওয়া হয়, মেয়েদের কড়া ডিসিপ্লিনে রাখা হয়, তাছাড়া লেখাপড়ার সংগে সংগে নাচ-গান-বাজনা ভদ্র আলাপ-আচরণ সবই শেখানো হয়। চারদিকে ইস্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। আমি তো জানি, এসব শুধু তোমার চেষ্টায় আর তোমার যত্নেই সম্ভব হয়েছে। তুমি এসেছ বলেই ইস্কুল বেঁচেছে, তুমি চলে গেলেই ইস্কুল মরে যাবে। ইস্কুলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তোমাকে এখানে রাখতেই হবে।......অথচ— তোমার বিয়ে না করলেও চলবে না।'

একটা অত্যন্ত অসম্ভব সম্ভাবনার আশংকা আস্তে আস্তে নমিতার মনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে তুলল।—তাই কি?—ছিঃ, তাওকি কখনও হতে পারে? কি আবোল-তাবোল ভাবছে সে?—কিন্তু যদি তাই হয়?—নমিতার মন ধীরে ধীরে শামুকের মত একটা শক্ত খোলের মধ্যে গুটিয়ে যেতে লাগল, মুখের ভাব রুক্ষ কঠিন হয়ে উঠল।'

'কাজেই, আমি বলছিলাম কি জান —মানে—ইয়ে—'

না—আর কোন সন্দেহ নেই। উগ্র ঝাঁঝালো কণ্ঠে নমিতা প্রায় ধমক দিয়ে উঠল : 'কি বলতে চান, বলে ফেলুন! অত কিন্তু-কিন্তু করছেন কেন?'

'মানে—তুমি আমাকেই বিয়ে করে ফেল না কেন? তাহলে দেখ, আমার ইস্কুলটাও বাঁচে, আবার এদিকে আমিও—'

'—আমার মত স্ত্রীরত্নকে মাথায় ধারণ করে কৃতকৃতার্থ হয়ে যান—না?'—ক্রুদ্ধা সাপিনীর মত ফোঁস করে উঠল নমিতা : 'এই কথা বলার জন্যে এত রাত পর্যন্ত এখানে আমাকে আটকে রেখেছেন আপনি?—একটু লজ্জা হল না আপনার এমন কথা আমার সামনে উচ্চারণ করতে? এইমাত্র আপনি আমার বয়েসের কথা, রূপের কথা বলছিলেন। নিজের বয়েসটা কত হল তা কখনও হিসেব করে দেখেছেন? আয়নায় নিজের রূপ কখনও দেখেছেন?—ছি ছি ছি! আমার সত্যিই লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে শুধু এই কথা ভেবে যে আপনার মত লোককে এতদিন আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করে এসেছি।'

রামজীবনবাবু একবার মাত্র কি একটা কথা বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু নমিতার ক্রোধতিক্ত বাগ্‌বন্যার প্রবল স্রোতের সামনে তাঁর সে ক্ষীণ প্রচেষ্টা তৃণখণ্ডের মত ভেসে গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি আর একটাও কথা বলেননি, মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে বসে বসে ক্রোধোন্মত্তা নাগিনীর সমস্ত ছোবলগুলি সহ্য করেছেন, তার সমস্ত বিষ হজম করেছেন।

স্কুল থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবার আগে নমিতা তার শেষ ছোবলের বিষদাঁতটি বসিয়ে দিয়ে এসেছে।

'গলায় দেবার দড়ি একটা জোটে না আপনার? আপনার মেয়ের বয়সী আমি—! হ্যাঁ, আপনার গলায় দড়ি দিয়েই মরা উচিত।'

রাত্রে কিছু সেদিন খেতে পারল না নমিতা। বিছানায় শুয়েও সারারাত ছট্‌ফট্‌ করে কাটাল—ঘুম এল না কিছুতেই।

একটা অশিক্ষিত গেঁয়ো চাষা—না হয় ধানচাল বেচে কিছু পয়সাই করেছে—তাই বলে তার এতখানি স্পর্ধা! বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চায়! আচ্ছা করে চাবকাতে পারলে লোকটাকে তবে মনের ঝাল মেটে!

কোনমতে রাতটা কাটলে হয়। কাল সকালে উঠেই সে শুধু নোটিস নয়, সরাসরি রেজিগ্‌নেশনই পাঠিয়ে দেবে। দুটো টাকার জন্যে ঐ অসভ্য ভূতটার সাহচর্য সে আর একদিনও সহ্য করতে রাজি নয়।......

কিন্তু নমিতার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হল না। রামজীবনবাবুই সব ভন্ডুল করে দিলেন।

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরুতেই প্রথম যে কথাটা নমিতার কানে গেল সেটা এই : গত রাত্রে রামজীবনবাবু গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

গলায় দড়ি!—নমিতার হৃৎপিন্ডের ওপর যেন আচম্‌কা একটা প্রচন্ড চাবুকের আঘাত এসে পড়ল, তার অন্তরাত্মা অমানুষিক আতংকের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে উঠল। সে কি কথা! —এই তো মাত্র ক-ঘন্টা আগে সে-ই রাগের মাথায় রামজীবনবাবুকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে বলে এসেছে। কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি—! না না, সে তো তার

মৃত্যুকামনা করেনি, রাগের ঝোঁক সামলাতে না পেরে কতকগুলো গালি-গালাজ করেছিল মাত্র। ও কথাগুলোও সে গালাগালি হিসাবেই ব্যবহার করেছিল—তার বেশি কিছুই তো তার মনে ছিল না।—তবে? তবে এ কি হল?......

লোকে অবশ্য কিছুই জানে না—কিছুই জানবে না, কিন্তু সে নিজে তো

......আপনার মেয়ের বয়সী আমি!

জানে! রামজীবনবাবুর মৃত্যুর জন্যে সে-ই দায়ী—সেই তাঁকে খুন করেছে, নিজের হাতে তাঁর গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে।—কেন সে অত বড় নিষ্ঠুর কথাটা তাঁকে বলতে গেল? কি ভূত চেপেছিল তার ঘাড়ে তখন? —এখন তাহলে সে কি করবে?

একবার মনে হল বাইরে ছুটে গিয়ে চীৎকার করে বলে, 'ওগো তোমরা সবাই শোন—রামজীবনবাবুকে আমিই খুন করেছি। আমি মহাপাপী, আমি খুনী—তোমরা আমাকে পুলিশে দাও, আমার যাতে ফাঁসি হয় তাই কর। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।'

কিন্তু হায় রে, কেউ তো তার কথা বিশ্বাস করবে না! মাঝখান থেকে সবাই ভাববে মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে।

সারাটা দিন একটা অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণার জ্বালায় নমিতা ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে লাগল। একবার দুপুরের দিকে অন্যান্য টিচারদের সঙ্গে রামজীবনবাবুর বাড়ী পর্যন্ত সে গিয়েছিল, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারেনি। যাঁর মৃত্যু-দন্ডাজ্ঞা সে কাল নিজের মুখে ঘোষণা করে এসেছে, আজ স্বচক্ষে তাঁর মরামুখ দেখবার সাহস তার হয়নি।

তা ছাড়া—নিজের ঘরে বসে সমস্ত ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভাবতে গিয়ে সে আরও একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর সত্য কথা আবিষ্কার করে বসল।

ইস্‌কুলটাকে বাঁচাতে হবে, ইস্‌কুলের হেড্‌মিস্‌ট্রেসের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে একজন গার্জেনও দরকার—কিন্তু রামজীবনবাবু শুধু এইজন্যেই তাকে বিয়ে করতে চাননি। পিছন দিকে চেয়ে আজ সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, তার সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে রামজীবনবাবুর মনটা ইদানীং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে উঠেছিল। বড় বেশি স্নেহ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাকে তিনি—এবং শুধু স্নেহই নয়—

রামজীবনবাবু বোধ হয় তাকে ভালোবেসেও ফেলেছিলেন।

কিন্তু কৈ? আজ তো কথাটা ভাবতে তার রাগ হচ্ছে না একটুও। বরং চোখ ফেটে কান্নাই আসছে।

তাকে ভালোবেসেছিলেন রামজীবন তরফদার। শিক্ষা ও সংস্কৃতির চক্‌চকে খোলসপরা কলকাতার একটি অল্প-বয়সী মেয়েকে ভালোবেসেছিলেন পলাশপুর গ্রামের একজন নিরভিমান সরল-স্বভাব প্রৌঢ় ব্যবসায়ী।

মস্ত বড় অপরাধ করেছিলেন তিনি। তাই নিজের প্রাণ দিয়ে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন।

কিন্তু আসল প্রায়শ্চিত্তের বোঝা তো তিনি চাপিয়ে গেলেন নমিতারই মাথায়। সারাজীবন ধরে তাকে এই প্রায়শ্চিত্তের তুষানলে দগ্ধে মরতে হবে, কিন্তু তার পাপের মত তার প্রায়শ্চিত্তও চিরকাল লোকচক্ষুর অগোচর রয়ে যাবে।

আপাতত একটা বিষয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই—রামজীবনবাবুর স্কুল ছেড়ে তার আর কোথাও যাওয়া চলবে না।......

আত্মহত্যা করবার আগে রামজীবন-বাবু যে চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন তার শেষের দিকেও তিনি এই অনুরোধই জানিয়েছিলেন:

'......নমিতা দেবীকে বার বার মিনতি জানিয়ে যাচ্ছি, তিনি যেন আমার ইস্‌কুল ছেড়ে না যান। তিনি চলে গেলে ইস্‌কুলকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। দড়ির ফাঁস গলায় পরে তারপর তাঁকে এই অনুরোধ জানাচ্ছি—কথাটা যেন তিনি মনে রাখেন। আরও একটা কথা। এ অঞ্চলে তিনি যতদিন আছেন, তাঁর কোন ভয় নেই। কেউ তাঁর দিকে উঁচু নজরে চাইতে পারবে না, তাঁর মাথার চুলের ডগাটিও ছুঁতে পারবে না—মরবার আগে আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। জীবনে কথার খেলাপ কখনও হয়নি, মরবার পরও হবে না। এখন থেকে তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয়।......'

এ রকম একটা অযৌক্তিক ও অবাস্তব প্রতিশ্রুতি তিনি না দিয়ে

গেলেও পারতেন। সম্পূর্ণ অন্য কারণে নমিতার আর এ স্কুল ছেড়ে যাবার উপায় ছিল না।

দিন চলছে। স্কুলও বেশ ভালই চলছে। একটিমাত্র মানুষ ছাড়া আর কোন কিছুরই অভাব নেই কোথাও। পাকা বিষয়ী লোক ছিলেন রামজীবন-বাবু—মৃত্যুর অনেক আগেই টাকাকড়ি বিষয় আশয় সম্বন্ধে পাকা রকম লেখা-পড়া করে রেখে গেছেন। ফলে স্কুল আরও জাঁকিয়ে উঠেছে—নমিতাও মেতে উঠেছে নানা রকম নতুন নতুন পরি-কল্পনা নিয়ে। তার আর আহার-নিদ্রার সময় নেই।

আজকাল পলাশপুর বালিকা বিদ্যালয় এবং তার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর নাম মাঝে মাঝে কলকাতার খবরের কাগজেও দেখা যায়।

ক্রমে ক্রমে বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল।

গ্রামের লোক এবং স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষিকারা কেউই রামজীবনবাবুকে ভোলেনি। প্রায়ই তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করে সবাই—এমন মানুষ কেন হঠাৎ এমন কাজ করতে গেলেন, তাই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হা-হুতাশ শোনা যায়। নমিতা সব শোনে, কিন্তু কিছুই বলে না। সে শুধু ভাবে—অবসর পেলেই চুপ করে বসে বসে ভাবে।

কিন্তু সম্প্রতি চিন্তাজগতের এই নিশ্চিন্ত আশ্রয়টুকুও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। তার ভাবনার একমুখী সুতোয় এমন কতকগুলো জট পাকিয়ে উঠতে শুরু করেছে যে, অতঃপর সে কি ভাববে, কি তার ভাবা উচিত—কিছুই আর সে বুঝে উঠতে পারছে না। তাকে কেন্দ্র করে কি যেন একটা ব্যাপার ঘটছে কোথায়—তার চেতনার নাগালের বাইরে! তার চারিপাশে দিনের আলোর স্পষ্টতা যেন একটা অস্বচ্ছ কুয়াশার পরিমন্ডলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতি-অভ্যস্ত মন্থর প্রবাহের মধ্যে অপরিচিত রহস্যের আকস্মিক ঘূর্ণি জেগে উঠছে।

কথাটা খুলে বলা দরকার।

কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। সেই সেদিনের ঘটনার পর থেকে স্কুলের দারোয়ান প্রতি রাত্রেই তার বারান্দায় এসে শুয়ে থাকে। হঠাৎ হোলির দিন রাতে সে এল না—সারাদিন ভাই-বেরাদারদের সঙ্গে হুল্লোড়-কীর্তন করে বেড়াবার পর সন্ধ্যায় সিদ্ধির মাত্রাটা বোধ হয় একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য নমিতার তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বিশেষ কিছু ছিল না। সেদিনকার বিশ্রী ব্যাপারটাকে একটা ব্যতিক্রম বলেই সে মেনে নিয়েছিল—অমন আকস্মিক বিপদ সব মানুষের জীবনেই মাঝে মাঝে ঘটে থাকে।

একাই তাকে সারা জীবন কাটাতে হবে—একা থাকতে ভয় করলে তার চলবে কেন? —তা ছাড়া মানদার-মা তো আছেই।

হাতের বইখানা সেদিন তেমন ভাল লাগেনি, তাই সকাল সকাল আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

অনেক রাত্রে বিনা কারণে এবং অত্যন্ত সহজে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক যেমন শুয়ে ছিল তেমনি আছে, শরীরে বা মনে চাঞ্চল্যের চিহ্ন-মাত্র নেই, শুধু প্রগাঢ় সুষুপ্তির পরিবর্তে পূর্ণ জাগরণ—ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে হঠাৎ সুইচ্ টিপে উজ্জ্বল বিজলী বাতি জেবলে দিলে যেমন হয় ঠিক তেমনি।

চোখ মেলে চেয়ে দেখল। পাশের জানালাটা খোলা রয়েছে—ঢেউ-খেলানো রাঙামাটির প্রান্তরে রোদে-পোড়া ঘাসের ওপর অফুরন্ত জ্যোৎস্নার প্লাবন। বেশিক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে।

জ্যোৎস্না সুন্দর, কিন্তু জ্যোৎস্না বিষণ্ণ। আকাশে চাঁদ হয়তো হাসে, কিন্তু মাটির পৃথিবীতে এসে জ্যোৎস্না হাসে না, কাঁদে, এবং কাঁদায়।—বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নমিতার দুই চোখ ধীরে ধীরে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

কিন্তু—ও কিসের শব্দ! সামনের ছোট বাগানটাতে কে যেন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ভারী পায়ের শব্দ, আর তার [illegible] ঈষৎ বিলম্বিত লয়ে লাঠির ঠক্‌ঠকানি।

নমিতার বুকের ভিতটা ছাঁৎ করে উঠল।—আবার! একদিন মাত্র দারোয়ান আসেনি, অমনি শুরু হল উপদ্রব!

অনেকক্ষণ চুপ করে বিছানায় গুটি-শুটি মেরে পড়ে রইল সে। মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল, কিন্তু উপদ্রবের তো কোন লক্ষণ দেখা যায় না! শুধু সেই অশ্রান্ত পদচারণা বাগানের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত—পায়ের শব্দ আর লাঠির শব্দ।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নমিতা মনে মনে হেসে উঠল।—দারোয়ান এসেছে। অনেক রাত্রে নেশার ঘোর কেটে যাবার পর সুপ্ত কর্তব্যবুদ্ধি আবার জাগ্রত হয়ে উঠেছে, তাই পাহারার কাজে ফিরে এসেছে। শয্যাগ্রহণের আগে উৎসব-উত্তপ্ত মাথাটাকে একটু ঠান্ডা করে নেবার জন্যে বাগানে পায়চারি করছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে মাথার পাশের ভেজানো জানালাটা খুলে সে মৃদুস্বরে ডাকল, 'দারোয়ান!'

কোন উত্তর নেই। শুধু পদচারণার শব্দ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল।

আবার ডাকল—একটু চড়া গলায়, 'দারোয়ান!'

কেউ উত্তর দিল না।

ছোট্ট একফালি বাগান। বাঁ দিকের হাত চারেক জায়গা ছাড়া সবটাই জানালা দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—পটে-আঁকা ছোট্ট একখানা ছবির মত। কিন্তু বাগানে কেউ নেই। দারোয়ান আসেনি।

হঠাৎ এক ঝলক দমকা হাওয়া খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে এসে ঢুকল

আর তারই সঙ্গে ভেসে এল উগ্র একটা সুগন্ধ। তার নাক মুখ চোখের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল গন্ধটা—চুল কাঁপিয়ে আঁচল উড়িয়ে হু-হু করে সুগন্ধির স্রোত বইতে লাগল, তাকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে আবর্ত রচনা করতে লাগল।

কিসের গন্ধ? কিসের গন্ধ?—খুবই পরিচিত যেন গন্ধটা! বেলফুলের? হাসনুহানার?—না না, আরও চড়া, আরও কড়া এই দুপুরে রাতে ভেসে আসা গন্ধ!—কোথায় যেন এর আগে এই গন্ধ সে—

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নমিতার সমস্ত শরীর কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল।—মনে পড়েছে! চিনতে পেরেছে সে গন্ধটাকে।

ঝনাৎ করে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে যখন বিছানায় ফিরে এল তখন সে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। বুকের ভিতর থেকে কি একটা বাষ্পপিন্ডের মত বস্তু ঠেলে উপরে উঠতে চাইছে—দম বন্ধ হয়ে আসছে, বোবা আবেগের উচ্ছ্বাসে তার সমস্ত দেহমন বোধ হয় এখুনি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।......

বাইরের বাগানে ততক্ষণে পুনরায় পদচারণা শুরু হয়ে গেছে।

দুই হাতে প্রাণপণে কান চেপে ধরে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে আচ্ছন্নের মত সে পড়ে রইল.

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে নমিতার মনে হয়েছিল সে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু সে তো প্রায় সমস্ত শেষ রাতটা জেগেই কাটিয়েছে। স্বপ্ন সে দেখল কখন?—না কি তার জেগে থাকাটাও স্বপ্ন?

তা ছাড়া, এখন তার মনে পড়ছে—এই তো প্রথম নয়। সে লক্ষ্য করেনি, বুঝতেও পারেনি হয়তো, কিন্তু কিছু-দিন ধরেই তো মাঝে মাঝে এই উগ্র কট্‌কটে সুগন্ধির ঝলক তার নাকে এসে লাগছে।

সেই মাতাল সাইকেল-রিকশা-ওয়ালাটা যেদিন তাকে একটা অভব্য অপমানসূচক কথা দেবার পরই হঠাৎ টাল খেয়ে পথের ওপরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় সেদিনও তো এই গন্ধস্রোত তাকে ঘিরে কিছুক্ষণ বয়ে গিয়েছিল।—কিন্তু সেদিন সে চিনতে পারেনি।

রেলওয়ে স্টেশনের সেই ঘটনাটার কথাও তার মনে পড়ল। কি বিশ্রী একটা কেলেংকারি সেদিন হতে বসেছিল—কিন্তু হয়নি, কারণ ঠিক সময়ে হঠাৎ তার—

কিন্তু সেদিনও কি স্টেশনের সমস্ত ভিড় ও হৈ-হল্লার মধ্যে এই গন্ধটাই তার ইন্দ্রিয়-চেতনার প্রান্তে এসে উঁকি মেরে যায়নি?

আরও কত ছোটখাটো ব্যাপার, প্রায়-ভুলে-যাওয়া কত টুকিটাকি ঘটনা। কত অসুবিধা, কত বিপদ-আপদ সে অতি সহজেই এড়িয়ে যেতে পেরেছে—দৈনন্দিন কর্মজীবনের কত ক্লান্তির, কত গ্লানির হাত থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে রেহাই পেয়েছে!

আর যখনই এমন কিছু ঘটেছে তখনই এই ফুলেল হাওয়ার গন্ধ তাকে ঘিরে একবার মুহূর্তের জন্য আত্ম-প্রকাশ করেছে।

ঐ লাঠির আওয়াজটাও কি সে মাঝে মাঝে শুনতে পায়নি তার পিছনে—সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন পথের বাঁকে বাঁকে? ভেবেছে হয়তো দূরে গ্রামের কেউ হাতুড়ি ঠুকছে, কিংবা হয়তো বনের মধ্যে কাঠ্‌ঠোকরাই হবে।

তবে কি?—তাহলে কি?—না না, এসব কি আজেবাজে চিন্তা তার মগজে বাসা বাঁধছে এসে! সে উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে, আধুনিক যুগের আধুনিকা। এমন একটা উদ্ভট সম্ভাবনার কথা তো স্বপ্নেও তার মনে হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু—

এই কিন্তু-টা যে কিছুতেই ঘুচতে চায় না, কাজের মধ্যে নিজেকে আরও
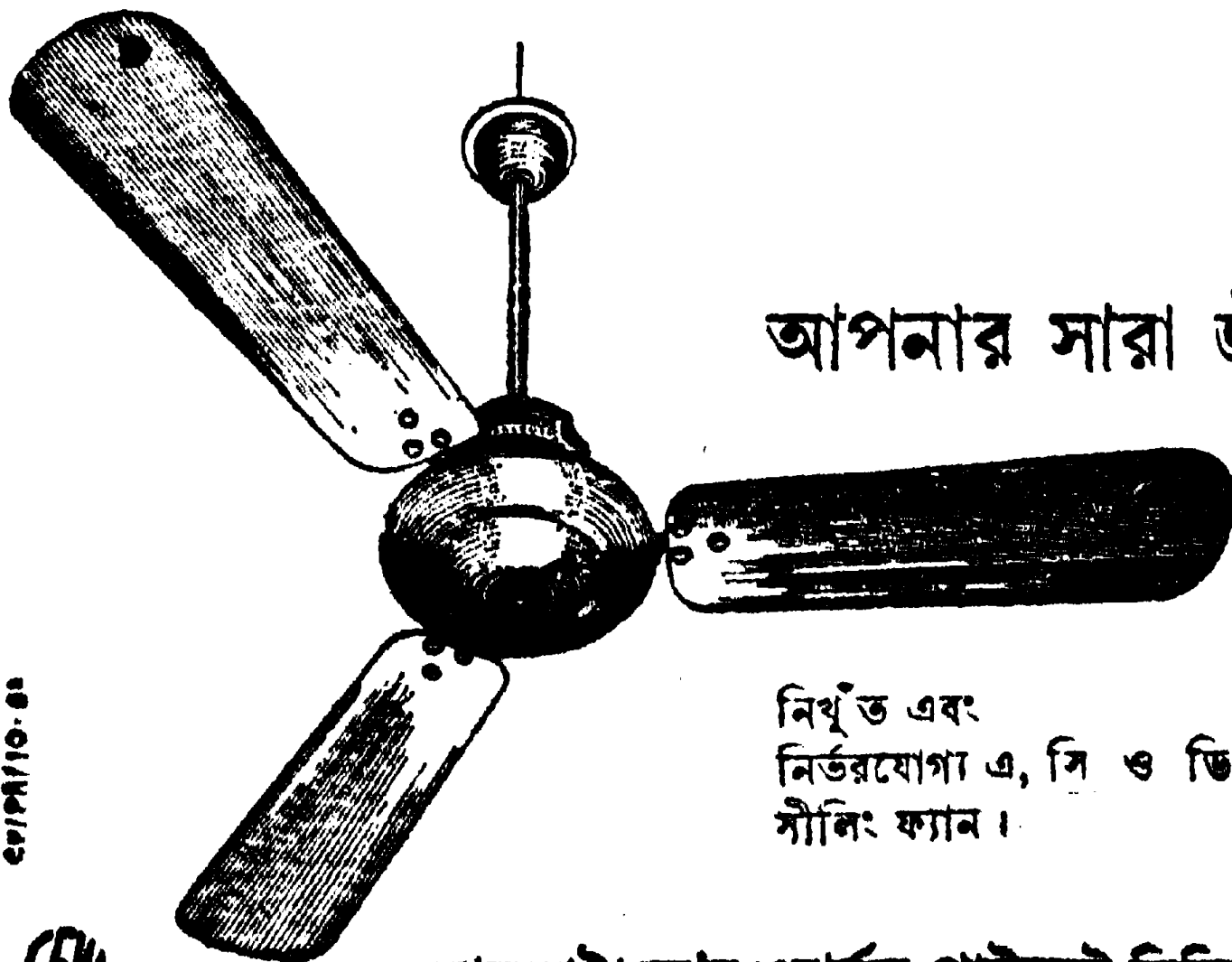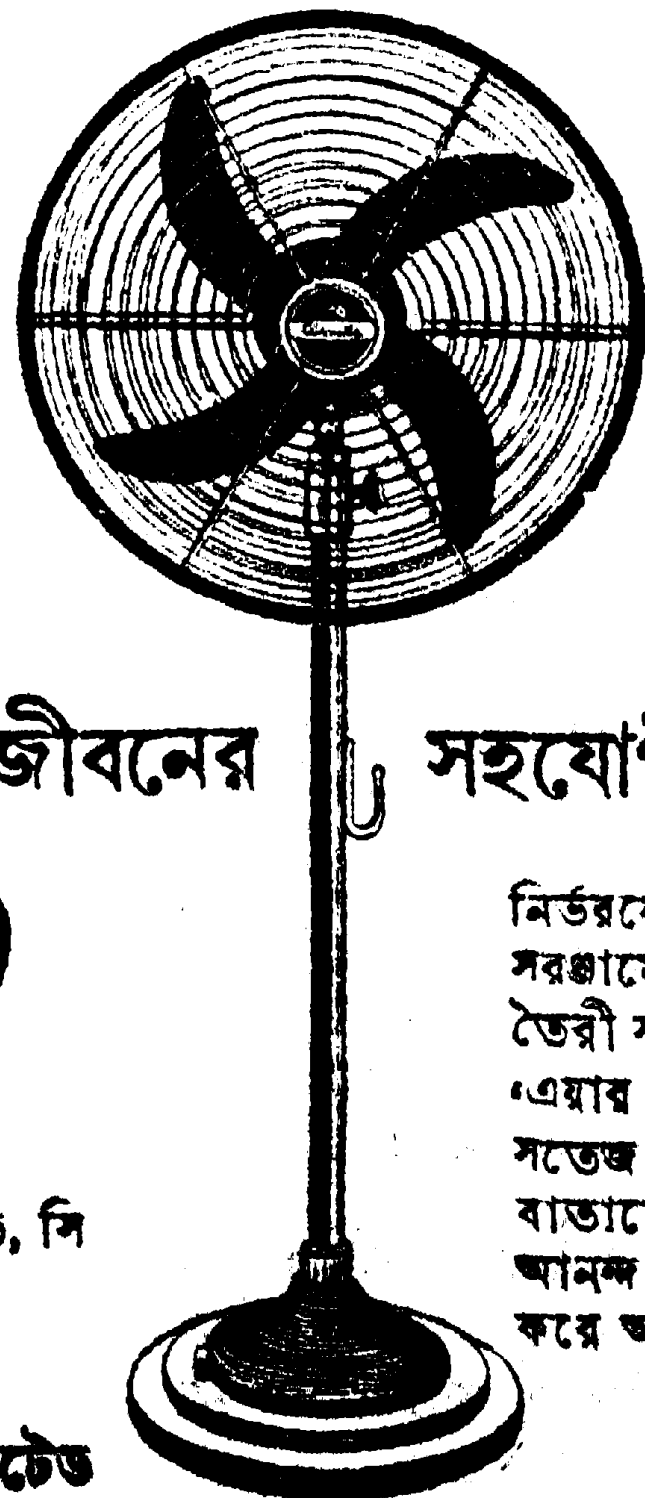
বেশি করে ডুবিয়ে দিল নমিতা—তিনজন লোকের কাজ একহাতে করে। চিন্তার অবকাশটুকু পর্যন্ত রাখতে চায় না জীবনে। কাজ না থাকলে ক্রমাগত আড্ডা দিতে থাকে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ সে অতিমাত্রায় সামাজিক হয়ে উঠল।

কিন্তু—তবু তো অবসর আসে, আসে চিন্তা! আর তখনই এমন সব ঘটনার কথা মনে পড়তে থাকে যাকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা কিংবা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না।

মাঝে মাঝে মনে হয় সে স্নায়বিক বিকারে ভুগছে—বোধহয় শীঘ্রই তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। নইলে যা কখনও হয় না, যা কখনও হতে পারে না—তার বেলাতেই বা তা ঘটতে যাবে কেন? কলকাতায় গিয়ে একবার ভাল করে ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন, নার্ভ-টনিক জাতীয় একটা ওষুধ খেলেও হয়। —একবার কি আর কারও সংগে একটু পরামর্শ করে দেখবে?

কিন্তু ওসব কিছু না করে একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে হয় না? সে নিজেও তো বোকা নয়, অশিক্ষিত নয়, কোন রকম কুসংস্কারও তার নেই। সে কেন পরের মুখে ঝাল খেতে যাবে? একবার যাচাই করেই দেখা যাক না—কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। বাস্তবিকই তো সে এখনও পাগল হয়ে যায়নি।

সেই ভাল। একবার যাচাই করে নেবে সে। যাহোক একটা ছুতো করে দারোয়ানকে জেলা শহরে পাঠিয়ে দেবে —আবার একটা রাত একলা থাকবে বাড়ীতে। মানদার-মার উপস্থিতি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়—অনুমতি পেলেই সে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করে দেবে, ঠেলে তুলে না দিলে সকাল হবার আগে আর তার ঘুম ভাঙবে না। তারপর—তারপর সে সারা-রাত জেগে বসে থাকবে, নাক আর কানকে সতর্ক প্রহরী রাখবে, যাচাই করে দেখবে—সে যা ভাবছে তা সত্য, না অলীক মনোবিকার মাত্র।

মন স্থির করে ফেলেছে নমিতা। আরও প্রমাণ না পেলে এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার সে বিশ্বাস করতে রাজি নয়।...

কিন্তু নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রমাণ সংগ্রহের সুযোগ সে পেল না। তার আগেই তার জীবনের আকাশে ঘনিয়ে এল এক সর্বনাশা বজ্রগর্ভ কালো মেঘ। পায়ের তলায় পৃথিবী উঠল টলে, চোখের সামনে সব আলো আড়াল করে নেমে এল এক ভয়ংকর বিভীষিকার কৃষ্ণ যবনিকা।

একখানা চিঠি।

সেই দিনই দারোয়ানকে সে শহরে রওনা করে দিয়ে এসেছে। —স্কুল থেকে ফিরে এলে মানদার-মা চিঠিখানা তার হাতে দিল। কে নাকি বন্ধ সদর দরজার তলা দিয়ে ভিতরে ঠেলে দিয়ে গেছে।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। বজ্রপাতের মতই সংক্ষিপ্ত এবং সাংঘাতিক —

'নমিতা দেবী,

আমি দর্জিপাড়ার হরেন মিত্তির—মনে আছে বোধ হয়, সেই যাকে একবার জুতো মারতে চেয়েছিলেন গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে!

আপনিও জানেন, আমিও সম্প্রতি জানতে পেরেছি—আপনার মা আপনার বাবার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। কিন্তু কথাটা ঊর্মিলা জানে না, তার শ্বশুর-বাড়ীর কেউ জানে না, আপনার স্কুলের কর্তৃপক্ষও জানেন না।

সম্প্রতি তিনখানা পুরনো চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। প্রমাণ হিসাবে যথেষ্টেরও অনেক বেশি।

আজ সন্ধ্যার পর ভুতুনির ডাঙার ওপাশের বটগাছতলায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। আপনাকে অনেক দিন দেখিনি। দেখা হবার পর আপনাকে জানাব, চিঠি তিনখানা ফেরত পেতে হলে কি মূল্য আপনাকে দিতে হবে।

যদি দেখা না করেন, কাল সকালেই দুখানা চিঠি দুই জায়গায় পাঠিয়ে দেব। তৃতীয় চিঠিখানা আমার কাছেই থাকবে।

—ইতি।'

অনেকক্ষণ চিঠিখানা হাতে করে ঘরের মধ্যে কাঠের পুতুলের মত সে বসে রইল। ভাল করে কিছু ভাববার ক্ষমতাও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে, মগজে যেন পক্ষাঘাত ধরেছে।

কিন্তু ভাবতে তো তাকে হবেই। দ্রুত ভেবেচিন্তে নিয়ে যা-হোক একটা কিছু স্থির করে ফেলতেই হবে। ......

সে যা জানে—সামাজিক মানুষের চোখে যত বড় কলংকের কথাই তা হোক না কেন, তার জন্যে তার কোন দুঃখ নেই, কোন শোচনা বা সংকোচ নেই। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মা তাকে সব কথাই খুলে বলে গেছেন—তাঁর সমস্ত লজ্জার কাহিনী, সমস্ত আনন্দের কাহিনী, সমস্ত গৌরবের কাহিনী।

কিন্তু যারা এখনও কিছু জানে না?

স্কুলের নতুন সেক্রেটারি গণেশ ডাকনাম সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত নীতিবাগীশ ধরনের মানুষ। এ খবর তাঁর কানে পৌঁছলে চাকরি তার কিছুতেই থাকবে না। আর হরেন মিত্তির যখন পিছনে লেগেছে, নতুন চাকরি জোগাড় করাও খুব সহজ হবে না। —কিন্তু সে জন্যে সে ভাবে না। লেখাপড়া শিখেছে, একটা পেট যেমন করেই হোক সে চালিয়ে নিতে পারবে। না—নিজের জন্যে তার কোন ভাবনাই নেই। কিন্তু ঊর্মিলা—!

ঊর্মিলা তার ছোট বোন। লেখা-পড়ায় ভাল নয়, কোনক্রমে থার্ড ডিভি-সনে স্কুল ফাইনালটা পাশ করেছিল, তার ওপরে আর উঠতে পারেনি। কিন্তু বড় লক্ষ্মী মেয়ে—যেমন লক্ষ্মী-প্রতিমার মত চেহারা, তেমনি মিষ্টি নরম স্বভাব। এরই মধ্যে শ্বশুরবাড়ীর সবারই সে মন জয় করে নিয়েছে—শাশুড়ী ননদের মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না।

মাত্র বছর দেড়েক আগে মায়ের রেখে-যাওয়া সমস্ত গহনা বেচে সে ঊর্মিলার বিয়ে দিয়েছে—সম্ভ্রান্ত ঘরে, সুশ্রী সচ্চরিত্র উচ্চশিক্ষিত পাত্রের সংগে। ঊর্মিলা সুখী হয়েছে।

কিন্তু হরেন মিত্তিরের কলুষ-হিংসার আগুন যদি তাকে স্পর্শ করে, তাহলে—তাহলে তো মুহূর্তের মধ্যেই তার সুখের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। —সম্ভ্রান্ত ঘরের এই সব চরিত্রবান ছেলেদের নমিতা চেনে। এদের মর্যাদা বড় ঠুনকো জিনিস, সামান্য একটু আঘাতেই ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এবং তখন তাদের প্রতিহিংসার নিষ্ঠুরতা কালসাপের ছোবলের চেয়েও নির্মম বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

তখন—তখন যা হবে, ঊর্মিলার মত মেয়ে কি তা সহ্য করতে পারবে? সে কি তারপরও বেঁচে থাকবে?

নমিতার মনে হল যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। জানালা-দরজা বন্ধ-করা

ঘরে উড়ন্ত চড়াই পাখির মত তার হৃৎপিন্ডটা যেন বুকের খাঁচার দেয়ালের মধ্যে হতাশার আতঙ্কে মাথা কুটে মরছে। —কি হবে? কি হবে?

কিন্তু মুহূর্তের এই দুর্বলতাকে নমিতা মুহূর্তেই ঝেড়ে ফেলে দিল। —ঊর্মিলাকে বাঁচাতেই হবে। সে যাবে হরেন মিত্তিরের সংগে দেখা করতে। চিঠি তিনখানা ঐ পাষন্ডের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতেই হবে। যত টাকাই সে দাবী করুক না কেন, প্রয়োজন হয় তো যথাসর্বস্ব বেচেও নমিতাকে তা দিতে হবে।

কিন্তু—হরেন মিত্তির কি শুধু টাকাই চাইবে? যদি সে—যদি সে—?

না না, ভয় পেলে চলবে না, তাকে শক্ত হতে হবে। সব রকম মূল্য দেবার জন্যেই তাকে প্রস্তুত হতে হবে। চিঠি তিনখানার বিনিময়ে হরেন মিত্তির যা চায় তাই পাবে।

সন্ধ্যার সময় সে মানদার-মাকে ডেকে বলল, 'বিশেষ দরকারী কাজে বাইরে বেরুচ্ছি, ফিরতে হয়তো একটু রাত হতে পারে। তুমি যেন আমার জন্যে বসে থেক না, সকাল সকাল পাট চুকিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো। আমার খাবার আমার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখ। ফিরে এসে খাব। আর দেখ, তুমি সদর দরজার হুড়কো বন্ধ করো না, আমি বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে যাচ্ছি। দারোয়ান আজ আসবে না। রাত্রে এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি করে তোমাকে জাগিয়ে তোলার হাংগামা কে পোহাবে বল?'

ভুতুনির ডাঙার ওপারে কাছেপিঠে কোন গ্রাম নেই, আছে শুধু দিগন্ত-বিস্তৃত শালবন। দিনের বেলাতেও ওদিকটায় বড় একটা লোক চলাচল দেখা যায় না। স্কুল-পাড়া থেকে পুরো দু-মাইল পথ, সন্ধ্যা হতে না হতেই নির্জন নিস্তব্ধতায় থমথমে হয়ে উঠেছে। তার ওপর আকাশে অসাময়িক মেঘের আবির্ভাবে সমস্ত আবহাওয়াটায় কেমন একটা বিষণ্ণ পান্ডুরতার ছোপ ধরেছে।

কিন্তু চরম আতংকের হতাশ্বাসে যার মন পাথরের মত ঠান্ডা আর পাথরের মতই কঠিন হয়ে গেছে নিসর্গের নির্জনতায় ভয় পাবার তার অবসর কোথায়?

শালবনের প্রায় কোল ঘেঁসে সেই প্রাচীন ঝুপ্সি বটগাছটা। তার নীচে ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের পুঞ্জীভূত নিবিড়তা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নমিতা তার হাতের টর্চের বোতাম টিপল। ঝক্‌ঝকে তলোয়ারের মত ক্রমবিস্তীর্ণ আলোকরশ্মি অন্ধকারের বুক চিরে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরে গেল।

কৈ! গাছতলায় কেউ তো তার জন্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে না। তবে কি হরেন মিত্তির এখনও আসেনি? —আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল নমিতা।

না, হরেন মিত্তির এসেছে—গাছতলাতেই আছে, তবে দাঁড়িয়ে নেই, চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে মাটির ওপর পড়ে আছে। কাঁধে-ঝোলানো রঙীন কাপড়ের থলিটা একটু দূরে ছিটকে পড়েছে, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে একটা বড় সাইজের টর্চ, দুটো সস্তা সিগারেটের টিন, একখানা সেলুলয়েডের চিরুনি—আর তিনখানা পুরনো খামের চিঠি। টর্চের আলো তাদের ওপর পড়া মাত্র চিঠি তিনখানা যেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে নমিতার মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠল।

হরেন মিত্তির মরে গেছে। কে যেন লাঠি মেরে তার মাথার খুলি ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মাথার চারিপাশে অনেকখানি মাটি রক্তে ভেসে গেছে। —প্রচন্ড আঘাত—লাঠিখানাও নিশ্চয় খুব ভারী আর মজবুত ছিল।

লোহা-বাঁধানো মোটা একখানা বাঁশের লাঠি নয় তো? ......ফুলেল তেলের উগ্র গন্ধে সমস্ত গাছতলার হাওয়া যেন মাতাল হয়ে উঠেছে।

অন্ধকার ডাঙার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত শান্ত পদক্ষেপে নমিতা ঘরের দিকে ফিরছে। আর তার কোন তাড়া নেই। গাছতলার সেই গন্ধের নেশা তার মনকেও বুঝি মাতাল করে তুলেছে। বড় বিচিত্র এই নেশা—যাতে চরম উত্তেজনার সংগে মিশে আছে পরম প্রশান্তি, যার সুগোপন আনন্দের কণামাত্র অংশও সে জীবনে আর কাউকে দিতে পারবে না, যা বিশ্বাস করা যায় না—শুধু অনুভব করা যায়।

পিছনে অন্ধকারের মধ্যে ঈষৎ বিলম্বিত লয়ের ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাতুড়ির আওয়াজ নয়, কাঠঠোকরার ঠোঁটের ঠোকর নয়—কাঁকুরে মাটির ওপর লোহা-বাঁধানো মোটা বাঁশের লাঠির শব্দ।

আর তার কোন সন্দেহ নেই।

কোন ভয়ও নেই আর। সত্যই সে আজ সম্পূর্ণ নির্ভয়। ....বাগানের গেটের কাছে এসে পেঁছবার সংগে সংগে ঝির্ ঝির্ করে অকাল-বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

সদর দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকেই নমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবল। তারপর আবার বাইরের দিকে ফিরে শূন্য বাগানকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'আকাশের গতিক দেখে মনে হচ্ছে জোর বৃষ্টি নামবে এখুনি। কেন বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মত ভিজে মরবেন? তার চেয়ে ভিতরে আসুন, আমি দরজা বন্ধ করে দিই।'

ফুলেল হাওয়ার স্রোত দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে নমিতার চারপাশে কুন্ডলি পাকিয়ে ঘুরতে লাগল।

শোবার ঘরের ভিতরে ঢুকে হাতের টর্চটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেমানুষের মত হালকা পায়ে অন্ধকারের মধ্যে অকারণে এক পাক ঘুরে নিল নমিতা—গুন্ গুন্ করে কি একটা গানের দু-কলি একবার গেয়েও বুঝি উঠল।

তারপর আবার ঘরের দরজার কাছে ফিরে গিয়ে ফাঁকা বারান্দার দিকে চেয়ে অত্যন্ত নরম গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আর লজ্জা করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, ভিতরে এস। শরীরটা বড় ক্লান্ত ঠেকছে, এখুনি আমি শুয়ে পড়ব। বুড়ো পাগলকে সাধাসাধি করার সময় আমার নেই। এস —ভিতরে এস!'

সংকোচ-মন্থর গন্ধস্রোত ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে। গন্ধের মদিরায় ঘরের অন্ধকার পাকা কালো আঙুরের গুচ্ছের মত মাধুর্যের ভারে টস্‌টসে হয়ে উঠছে। প্রত্যাশার আকুলতায় নমিতার সারা দেহ ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে।

আবেশ-বিহ্বল শ্লথ হস্তে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিট্‌কিনি এঁটে দিল। ....

নমিতা কি এতদিনে সত্য সত্যই পাগল হয়ে গেল?

''তোমার আনন্দ ঐ এলো দ্বারে''
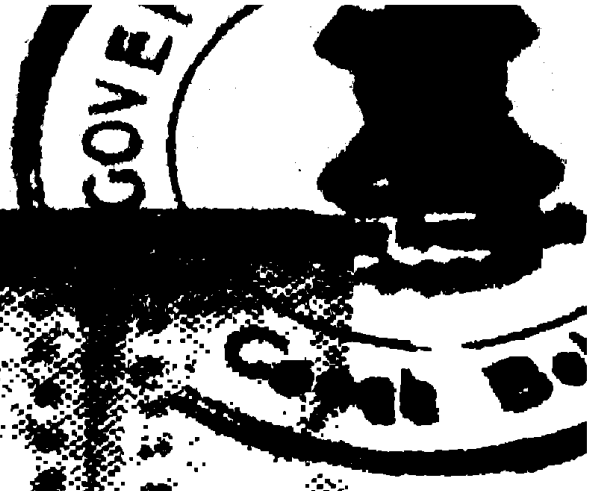
"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে—ময়ূরের মতো নাচেরে"

গল্প শেষের পর

ভ্রাম্যমাণ

ব্যাপারটার শুরু গত বছরে। পিয়ের লার্চার নামে প্যারিসের এক জুয়াচোর বেকায়দায় পড়ে ৩০ মাইল দূরে গ্রিজি লে প্লাতরে এক নির্জন খামারবাড়িতে আত্মগোপন করে। লার্চারের প্রধান পেশা মোটরগাড়ি চুরি এবং বেআইনীভাবে যন্ত্রপাতি আমদানি। পুলিশ তাকে উল্লেখ করে 'প্রেটি বয়' নামে। এখানে আত্মগোপন করে থাকার সময় মার্কিণ গোয়েন্দা-লেখক লায়োনেল হোয়াইটের 'দি স্ন্যাচারস' নামে অপহরক দস্যুদের সম্পর্কে লেখা বইয়ের ফরাসী তর্জমাটি সে পড়ে।

পড়ার পরই লার্চারের মাথায় ফন্দী খেলে যায়। সংগে সংগে সে প্যারিসে ফিরে এসে বন্ধু রেমন রোলার সংগে দেখা করে, বইটি তার হাতে দিয়ে বলে, "দ্যাখ্, টাকা রোজগারের উপায় এতে বাতলান আছে।"

রেমনের বয়স মাত্র চব্বিশ। দেখতে সুশ্রী, চটপটে সাহসী। পিয়েরের মত তারও টাকার দরকার খুবই। জন্মেছে, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির দিক থেকে ফ্রান্সের সব থেকে অনুন্নত অঞ্চল বৃটানিতে। সামাজিক সম্মান, অর্থ এবং নারীজাতির প্রতি রেমনের ঝোঁকটা একটু বেশিই। ফরাসী সেনাবাহিনী থেকে ছাড়া পাবার পর, অভিজাত বোধ হওয়ার এমন এক নাম গ্রহণ করে: রেমন দ্য বুফ'র। তার মা প্যারিসের কাছে এক কারখানায় কাজ করে। ভাড়া-করা নতুন মার্কিণী মোটর হাঁকিয়ে রেমন তার ছেলেবেলার বন্ধুদের বলে আসে, "শিগ্গিরিই নতুন একটা কারখানা খুলব। তোদের সবাইকেই কাজ দেব।"

বাস্তব, রেমনের কাছে ফুলঝুরির মত। যতক্ষণ আছে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। প্রায়ই, ভূতপূর্ব স্ত্রী জিনেতের সংগে দেখা করে, সেনাবাহিনীর পুরনো ভাই বেরাদারদের সংগে মদ খায় আর ইউরোপের এদেশ-সেদেশ করে বেড়ায়। উদ্দেশ্য: ছোটখাট ধরনের চোরাই চালান আর অবৈধ টাকা পয়সার লেন-দেন। কোপেনহেগেনে তার বড়মানুষী কথায় যারা মুগ্ধ হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল 'মিস ডেনমার্ক' ইঞ্জেলিস বোদিন। গত বছর লন্ডনে 'বিশ্ব সুন্দরী' প্রতি-যোগিতার অন্যতম প্রতিযোগিনী।

শিকার খোঁজার জন্য পিয়ের এবং রেমন সোশ্যাল রেজিস্টার ঘাঁটতে শুরু করে, শেষকালে ফ্রান্সের বিরাট এক ধনীর (যার মোটরগাড়ির, এবং ভারী যন্ত্রপাতির কারখানা আছে) একমাত্র পুত্র এরিক পুজোকে তারা বেছে নেয়, এবং এরিককে গুম করে। টাইপ-করা এক ছোট্ট চিরকুট এরিকের বাবার জন্য রেখে যায়। তাতে মুক্তিপণ বাবদ ৬ লক্ষ টাকা দাবী করা হয়েছে। ছেলেটিকে নিয়ে তারা গ্রিজি লে প্লাতরের খামারবাড়িতে এসে ওঠে। লার্চারের রক্ষিতা রোজান্দি লিমেজিক এরিককে পাহারা দিতে থাকে।

তিনরাত্রি পর আর্ক দ্য ত্রায়াম্ফের কাছে এক গলিতে রেমন অপেক্ষা করতে থাকে। এরিকের বাবা থলি হাতে হাজির হল। থলিতে ছয় লক্ষ টাকার নোট বোঝাই। চলতে চলতে শুনল সাংকেতিক নির্দেশ, "চাবিটা সংগে রাখুন।" শোনা মাত্রই থলিটা সে রাস্তায় ফেলে দিল। পলকের জন্য একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে রেমনের মুখটা সে দেখে নিল। পরদিন সকালে বাড়ির কাছে এক কাফের সামনে এরিককে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল।

এরপরই, যে গাড়িতে এরিককে তারা গুম করে এনেছিল, সেটা পুড়িয়ে ফেলে, এবং টাইপরাইটারটিকে সিন নদীর মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর রেমন এবং পিয়েরের কাছে জীবন এবং পৃথিবীর অর্থ বদলে গেল। পিয়ের কিনল একটা স্টুডিবেকার আর একটা ফিয়াট গাড়ি। রেমন কিনল একটা পুজো, একটা শেভ্রলে ইমপালা আর একটা থাণ্ডারবার্ড গাড়ি। ওদের বান্ধবী ইঞ্জেলিস আর রোজান্দি নিত্যনতুন পোষাকে প্রজাপতি হয়ে উঠল।

পুলিশে যথারীতি খবর দেওয়া হল। হন্যে হয়ে তারা অপরাধী খুঁজতে শুরু করে দিল। ফ্রান্স, স্পেন, তুরস্ক এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গোয়েন্দারা দশ হাজার জায়গায় ঢুঁ দিল। দেড় হাজার লোককে প্রশ্ন করল। দেড় হাজার পুজো সিডান (পুজো সিডানে গুম করা হয়েছিল) সার্চ করা হল, দু'হাজার সংবাদসূত্র অনুযায়ী তদন্তও হল। কিন্তু সবই বৃথা। আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা, ইন্টারপোল, নম্বরী ব্যাঙ্ক-নোটের এক লক্ষ তালিকা বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিল।

এর ছ'মাস পরে একজন ইন্টার-পোলের প্যারিস সদর দপ্তরে খবর দিল যে, রোজগারপাতি করে না কিন্তু দুটো লোক দেদার টাকা খরচ করছে। লোক দুটি: পিয়ের লার্চার এবং রেমন রোলা। খোঁজ করে, পুলিশ রেমনের ভূতপূর্ব স্ত্রীর কাছ থেকে জানল যে তার টাইপরাইটারটা রেমন ধার নিয়ে আর ফেরত দেয়নি।

এই বছরের জানুয়ারীতে পুলিশ, পিয়ের, রেমন এবং তাদের দুই বান্ধবীকে অনুসরণ করে সুইস সীমান্তের কাছে বিলাসবহুল স্কি খেলার কেন্দ্র মেগাভিতে হাজির হয়। রেমন ছবির মত সুন্দর এগার কামরার এক শালে ভাড়া করে। সেখানেই সবাই ওঠে। জাঁ সিমস রটম্যান নামে এক ডাক্তারীর ছাত্রও তাদের সংগে ছিল। অবশ্য সেও বান্ধবীহীন হয়ে থাকেনি। মিৎসুকো নামে ফরাসী-জাপানী এক নর্তকীর সংগে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। রাজকীয় খানাপিনা এবং উদ্দাম পাগলামির মধ্যে তারা অবকাশ যাপন করতে থাকে। কাছাকাছি আর এক জায়গায় ইঞ্জেলিস বদিস 'মিস কুর্শে-ভাল' মনোনীত হয়, হৈ-চৈ করে রেস্টু-রেণ্টে পার্টি দেওয়া হয়। মেগাভিতে এরিক এবং তার বাবা-মাও তখন ছিল।

এদিকে প্যারিসে পুলিশ নাগাড়ে খোঁজ-খবর নিয়ে চলেছে। অবশেষে রেমনের আগের স্ত্রীর হারানো টাইপ-রাইটারে টাইপ করা কতকগুলো চিঠি তারা বহু কষ্টে উদ্ধার করে মুক্তিপণের চিঠিটির সংগে মেলায়। অক্ষরগুলো হুবহু মিলে যায়। গত মার্চ মাসে পুলিশ শালে থেকে রেমন এবং ইঞ্জে-লিসকে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গীরা প্যারিসের পথে রওনা দিয়েছিল। পথেই তারা গ্রেপ্তার হয়। ৪৫ ঘন্টা জিজ্ঞাসা-বাদের পর রেমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। স্মেলিং সল্ট দিয়ে তাকে চাঙ্গা করা হয়। এরপর সে স্বীকার করে, লার্চারও স্বীকার করে। সিন নদীতে ডুবুরি নামিয়ে টাইপরাইটারটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। লার্চারের ফিয়াট গাড়ি থেকে মুক্তিপণের অবশিষ্ট ৭০ হাজার টাকা পাওয়া গেছে।

এই গুমের ঘটনাটি কিন্তু ফ্রান্সে খুব সহজভাবে নেওয়া হয়নি। শুধু টাকার জন্য এই কাজ করা হয়েছে, একথা অনেকেই মানতে চাইছে না। সংবাদপত্র প্রশ্ন তুলেছে: ওদের সংগে পুজো পরিবার একই জায়গায় অবকাশ যাপন করছিল, সেটা কি শুধু দৈবাৎ ঘটনা? পুজো কেন রেমনকে চিনল না? ফ্রান্সের পয়লা নম্বরের ফৌজদারী উকিল রেনে ফ্লোরিও হঠাৎ কেন অপ-রাধীদের পক্ষ নিতে ছুটে এল, দক্ষিণা পাবে না জেনেও?

পুলিশ জানিয়েছে, এই গুমের ব্যাপারে তৃতীয় আর এক ব্যক্তিও জড়িত। তার নাম শুনলে সারা ফরাসী দেশ বিস্মিত হয়ে যাবে। শিগ্গিরিই তার নাম প্রকাশ করা হবে।

কিন্তু সব থেকে মুস্কিলে পড়েছেন লায়োনেল হোয়াইট। তাঁরই লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে দুটি লোক এমন কান্ড ঘটিয়েছে শুনে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। কারণ তাঁর পরবর্তী কাহিনীটি পরিকল্পিত হয়েছে ব্যাঙ্ক ডাকাতির ভিত্তিতে!

মহারত্ন প্রসঙ্গ

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রকৃতি দেবীর ভাণ্ডারে স্বভাবজাত যে সকল পদার্থ পাওয়া যায়, তার মধ্যে হীরা কঠিনতম। সম্প্রতি রাসায়নিক ও ধাতুবিদ্গণ ট্যান্টালম ধাতু হইতে এক মিশ্রধাতু (alloy) প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার কাঠিন্য হীরার সঙ্গে তুলনীয়—কিন্তু উহা কৃত্রিম বস্তু। কাঠিন্য ছাড়াও হীরার অন্য গুণ আছে। ইহা দ্রাবকে গলে না, জল-বাতাস বা অন্য কোনও পদার্থের সংস্পর্শে দীর্ঘদিন থাকিলেও কলঙ্কিত হয় না। শত-শত বৎসরের ব্যবহারেও আঁচড় পড়িয়া বা ঘর্ষণের দরুণ নিষ্প্রভ হয় না। এক কথায় হীরা পদার্থ হিসাবে অজর ও অক্ষয়।

খনিজ হীরা স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় ছোট-ছোট স্ফটিকের টুকরার মত। সেই টুকরার মধ্যে যেগুলি স্বচ্ছ, নির্মল ও একবর্ণ, সেগুলি মণিরত্নের বাজারে যায়। অভিজ্ঞ মণিকার প্রত্যেকটি টুকরার আলোকপথ (optical axis) নির্ধারণ করিয়া উহা কর্তনের জন্য যন্ত্রশালায় পাঠাইয়া দেন। নিপুণ কর্তক তাহাকে যথাযথভাবে পল কাটিয়া, হীরাচূর্ণ দিয়া পালিশ করিয়া মহামূল্য রত্নে পরিণত করে। হীরা স্বভাবতঃ ষটকোণ ও অষ্টতলক (octahedron)। কাটিবার সময় প্রতিটি তলই ঐ অষ্টতলের কোনও একটির সমান্তরাল হওয়া উচিত, না হইলে সেই হীরাখণ্ডের আলোকপথ ঠিক মত খোলা হয় না।

নিপুণ কারিগরের কাটা ও পালিশ-করা হীরা সূর্যালোকে বা উজ্জ্বল আলোকে জ্যোতির্ময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দেখায়। শুধু তাহাই নহে, উহার ভিন্ন ভিন্ন মুখ হইতে নানা রংয়ের সপ্তরশ্মির ছটা ছড়াইয়া চোখ ঝলসাইয়া দেয়। বড় হীরা সেই জন্য সূর্যালোকে উল্কাখণ্ডের মত জ্বলিতে থাকে। বৈজ্ঞানিক বলেন, ঐ প্রভার প্রধান কারণ হীরার আলোকরশ্মি প্রতিসরণ-ক্ষমতা (refractive power)। হীরার প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) ২·৪১৭ হওয়ায় ইহা মণিরত্নের মধ্যে উজ্জ্বলতম, কেননা আলোকরশ্মি ইহার উপর পড়িলে তাহার অধিকাংশই রত্নের ভিতরে প্রতিফলিত হইয়া উহাকে জ্যোতির্ময় করিয়া তোলে। ইহার আলোক বিচ্ছুরণ (dispersion) ক্ষমতাও অত্যধিক হওয়ায় (লোহিত রশ্মি বিচ্ছুরণ অঙ্ক ২·৪০২, নীলরশ্মি ২·৪৬০) উহা ঐভাবে সপ্তরশ্মিতে জ্বলিতে থাকে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হীরা অঙ্গার কেলাস (crystalline carbon) মাত্র, এবং সেই হিসাবে উহা পেন্সিলের সীসের গ্রাফাইট ও পাথুরে কয়লার জাত-ভাই। কিন্তু গ্রাফাইটের বিক্রয় হয় পাউণ্ড বা কিলোগ্রাম হিসাবে, পাথুরে কয়লার বিক্রী টন হিসাবে, সেখানে হীরার ওজন ধরা হয় ক্যারাট হিসাবে। ইংরাজী ক্যারাটই চলতি ছিল আগে, যাহা ৩·১৭ গ্রেণ অথবা ·২০৫ গ্রামের সমান। এখন মেট্রিক ক্যারাটই বিদেশে চলে, যাহা ·২০০ গ্রাম অথবা ২০০ মিলিগ্রামের সমান। মোটামুটিভাবে ঐরূপ ৫৮ ক্যারাটে আমাদের এক ভরির সমান হয়। দাম হিসাবে হীরা, গ্রাফাইট ও পাথুরে কয়লায় কি প্রভেদ, সে-কথা কি বলা প্রয়োজন? শুধু এইমাত্র বলা উচিত যে, হীরার মূল্য কোনও নির্দিষ্ট হারে বাড়ে না, অর্থাৎ ১ ক্যারাট ওজনের হীরার তুলনায় ২০ ক্যারাট ওজনের হীরার দাম ২০ গুণ মাত্র নয়।

ইহার কারণ, প্রথমতঃ হীরা অতি দুষ্প্রাপ্য পদার্থ। উহা পাওয়া যায় আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকা রাজ্যে, সিয়েরালিওন নামক নতুন স্বাধীন রাজ্যে এবং কঙ্গোর কাটাঙ্গা অঞ্চলে; দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ব্রেজিল দেশে ও বোর্ণিও দ্বীপেও অল্পসল্প উহা পাওয়া যায় এবং ভারতেও ক্বচিৎ-কদাচিৎ। আগেকার দিনে হীরার আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল ভারতবর্ষই।

দ্বিতীয়তঃ হীরার মধ্যে মহামূল্য শুধু সেইগুলিই, যাহা স্বচ্ছ, নির্মল ও নির্দোষ এবং সেরূপ হীরা আরও দুষ্প্রাপ্য। অন্য হীরা, যাহা কাটা-ঘসা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার মূল্য অনেক কম।

তৃতীয়তঃ বড় হীরা—বিশেষ বড়, নির্মল ও নির্দোষ হীরা—অতি দুর্লভ বস্তু। চলতি কথায় 'সাত রাজার ধন মাণিক' বলিতে একটা অতি অসাধারণ ও দুর্লভ কিছু বুঝায় কিন্তু বাস্তবের ক্ষেত্রে এমন কয়েকটি ঐতিহাসিক হীরার কথা পাওয়া যায়, যাহার পরিচয় ঠিক ঐ কথায় দেওয়া যায়। গল্পের হীরা রাক্ষসের অন্ধকার ঘরে বন্দিনী সুপ্ত রাজকন্যার শিয়রে জ্বলিতে থাকে। বস্তুজগতে এমন হীরাও আছে, যাহা প্রখর সূর্যালোকে কিছুক্ষণ রাখিলে পরে, বা ঘর্ষণের পরে, অন্ধকারে স্নিগ্ধ আলোক দেয়। আমরা বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে দেখিয়াছি যে, কোন কোনও হীরা বায়ু নিষ্কাশিত নলে (Vacuum tube) রাখিয়া বিজলী

স্রোতের মধ্যে ফেলিলে (electric discharge) সুন্দর সবুজ আলোয় উদ্ভাসিত দেখায়।

প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন:—

গুণাঃ পঞ্চ সমাখ্যাতা দোষাঃ পঞ্চ
প্রকীর্তিতাঃ।
ছায়া বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো বজ্রাণাং
রত্নকোবিদৈঃ॥
ষটকোণত্বং লঘুত্বঞ্চ সমাষ্টদলতা তথা।
তীক্ষ্ণাগ্রতা নির্মলত্বমিমে পঞ্চ গুণাঃ
স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ

রত্নকোবিদগণ (রত্নবেত্তা পণ্ডিতগণ) হীরার পাঁচ প্রকার গুণ, পাঁচ প্রকার দোষ ও চারি প্রকার ছায়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ষট্‌কোণত্ব, লঘুত্ব, সমান অষ্টদলত্ব, তীক্ষ্ণাগ্রত্ব ও নির্মলত্ব এই পাঁচটি হীরকের গুণ।

প্রাচীনেরা আরও বলিয়াছেন:—

ষট্‌কোণশুদ্ধমমলং শুচি তীক্ষ্ণধারং
বর্ণান্বিতং লঘু সুপার্শ্বমপেতদোষং।
ইন্দ্রায়ুধাংশু বিসৃতিচ্ছুরিতান্তরীক্ষঃ
মেবংবিধং ভুবি ভবেৎ সুলভং ন বজ্রং॥

যে হীরক বিশুদ্ধ, ষট্‌কোণবিশিষ্ট, অতি নির্মল, তীক্ষ্ণধার, উত্তম বর্ণ-ভূষিত, লঘু, সুপার্শ্ব, নির্দোষ এবং যাহা হইতে ইন্দ্রায়ুধের প্রভা নিসৃত হয়, সেরূপ হীরক পৃথিবীতে অতি দুর্লভ।

হীরার মূল্য বিষয়ে প্রাচীনেরা একটি উদাহরণ দিয়াছেন:—

যত্তু বারিভবং নাভ দূর্বাপত্রজলচ্ছবি।
সুবর্ণমাচং তুলয়া তদ্বজ্রং কোটিভাজনং॥

যে (হীরক) জল হইতে উৎপন্ন, যাহার বর্ণ দূর্বাদলের উপর জলবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ এবং যাহার ভার (ওজন) এক তোলা পরিমিত, সেই হীরকের মূল্য কোটি মুদ্রা।

ঐ "কোটি মুদ্রা" কি মুদ্রা, তাম্র, রজত বা স্বর্ণ, সে-কথা স্পষ্ট ব্যক্ত না হইলেও, ঐরূপ হীরা কিরূপ মহামূল্য গণিত হইত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। হীরার আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) ৩·৫০ থেকে ৩·৫৬ পর্যন্ত্র হয়, সুতরাং ভাল হীরা 'লঘু' পদার্থ। ভারতীয় হীরা স্বভাবতঃ ষট্‌কোণযুক্ত ও সমান অষ্টদলবিশিষ্ট কেলাস (octahedral crystal) বা তাহার খণ্ড। সুতরাং বলা যায় যে, প্রাচীন-দিগের উত্তম হীরার বর্ণনা আজও ঠিক। অবশ্য আফ্রিকায় হীরা আবিষ্কারের পরে হীরার দুষ্প্রাপ্যতা কিছু কমিয়াছে, কিন্তু সেটা ছোট হীরা বিষয়েই বলা যায়। এবং আফ্রিকার হীরা স্পর্শে, ছায়ায়, জ্যোতির স্নিগ্ধতায় এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভারতীয় হীরার সমকক্ষ নয়।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সকল হীরাই ভারতীয়, যদিও এখন এ-দেশে হীরা অল্পই পাওয়া যায়। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলে হীরা পাওয়া যায় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরার খনি আবিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত ব্রেজিলই পাশ্চাত্য দেশে হীরার আকর হিসাবে খ্যাত ছিল। এখন আফ্রিকাই জগতে নূতন হীরার শতকরা ৯০ ভাগ যোগান দেয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ভারতবর্ষই ছিল শ্রেষ্ঠ হীরার জন্মস্থল বলিয়া খ্যাত। পুরাকালে, মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালের প্রথম দিকেও এ-দেশই ছিল হীরার প্রধান বাজার এবং জগতের সকল দেশ হইতেই লোক আসিত এখানে হীরার খোঁজে।

আগেই বলিয়াছি, জগতের সকল ঐতিহাসিক হীরাই ভারতীয় এবং সে-সকলের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বোধহয় কোহিনূর নামে খ্যাত, শত রাজার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এক হীরা। এই মহারত্ন প্রসঙ্গের প্রথম অংশে পৌরাণিক উপাখ্যানের কথায় বলিয়াছি, মহারত্ন কিভাবে লালসা ও আসক্তির মাধ্যমে সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। এবারে ইতি-হাসের কথায় বলিব, কোহিনূরের অধিকারীদিগের ভাগ্যের কথা।

ঐ মহারত্নের ইতিবৃত্তের প্রথমদিকে পাওয়া যায় কিছু কিংবদন্তী এবং কিছু অনুমানের বিবরণ। কেহবা ইহাকে মহাভারতের সূতপুত্র কর্ণের বা অঙ্গ-রাজ কর্ণের মুকুটমণি বলিয়া ৫০০০ বৎসর পূর্বের এক ধারা টানিয়াছেন। আবার কেহ বলেন, ইহা উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের অধিকারে ছিল। আরও পরের ইতিবৃত্তে আমরা পাই যে, মালওয়া বা মালব দেশ জয় করার পর আলাউদ্দিন যে মহারত্ন পাইয়াছিলেন, কোহিনূর সেই রত্নেরই অংশ। বাবর পাঠান বাদশাহ্ ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া যে বিপুল ধনরত্ন পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি অতি সুন্দর ও সুবৃহৎ হীরা ছিল। ইংরাজ ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ বলেন, সেই হীরাই কোহিনূর।

কোহিনূর নাম নাদিরশাহ্ দিয়া-ছিলেন, সুতরাং নাদিরশাহের দিল্লী লুণ্ঠনের পূর্বেকার কালে ঐ হীরা কোথায় কোন্ কোন্ রাজার পরম আসক্তির আকর ছিল এবং সকল রাজ-বংশের কিভাবে ভাগ্য বিপর্যয় হয় তাহার সঠিক বিবরণ কেহই দিতে পারে না। তবে ইতিবৃত্তগুলি পরীক্ষা করিলে মনে হয় যে, ঐ মহারত্ন ঐতিহাসিক কালে, প্রথম দেখা দেয় দাক্ষিণাত্যের কোনও নদীগর্ভে বা হীরার খনিতে। সম্ভবতঃ ফরাসী রত্ন-ব্যবসায়ী ও রত্নবিদ ট্যাভেরনিয়ে আওরংজীবের রত্নাগারে যে হীরা দেখিয়া-ছিলেন, সেইটিই কোহিনূরের আদি রূপ। বাবর যে হীরা আগ্রায় ইব্রাহিম লোদীর কোষাগারে পাইয়াছিলেন, সেটি হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয়ের সময় শের শাহের হস্তগত হইয়াছিল কিনা তাহা কোনও ইতিহাসে উল্লিখিত নাই এবং আকবরের বা জাহাঙ্গীরের ইতিবৃত্তেও ঐ প্রকার কোনও মহারত্নের উল্লেখ নাই। সুতরাং ট্যাভেরনিয়ে বর্ণিত হীরাই কোহিনূরের মূল হীরক মনে হয়।

ট্যাভেরনিয়ে মণিরত্নের বাণিজ্যের চেষ্টায় ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছয়বার ভারতে আসেন। তাঁহার ভারতের ভ্রমণবৃত্তান্ত, যাহা তাঁহার নানা প্রকাশিত বিবৃতিতে পাওয়া যায়, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী অনুবাদ-রূপে, ম্যাকমিলান কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত হয়। অনুবাদক ছিলেন ভি. বল (V· Ball); বল সাহেব ভারতের 'ইকনমিক জিওলজি' (অর্থকারি ভূতত্ত্ব) নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং দীর্ঘকাল সরকারী ভূতত্ত্ব-জরীপ অধ্যক্ষ হিসাবে সারা ভারত পর্যবেক্ষণ করেন। ইনি বিদ্বান হিসাবে খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং ভূতত্ত্ব, খনিজ-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। ইনি তাঁহার ঐ অনুবাদের শেষে নিজস্ব মতামত, পরিশিষ্ট হিসাবে দিয়া প্রমাণ করিয়া-ছেন যে, ট্যাভেরনিয়ে যে মহারত্ন আওরংজীবের মণিরত্নের মধ্যে দেখিয়া-ছিলেন (২রা বা ৩রা নভেম্বর, ১৬৬৫) এবং যাহাকে তিনি 'গ্রেট মোগল' হীরক নাম দিয়া চিত্রসহ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই কোহিনূর।

জেনারেল ডব্লিউ এইচ স্লীমান (General W· H· Sleeman)

কোম্পানীর কার্যে সারা ভারত ঘুরিতেন। তিনিও তাঁহার 'রামবল্‌স্ অফ অ্যান ইণ্ডিয়ান অফিসিয়াল' নামে ভ্রমণ-কাহিনীতে কোহিনুরের যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহাও ট্যাভেরনিয়ের বর্ণনা সমর্থন করে। এই দুই বিবৃতিতে কোহিনুরের যে ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, তাহাই এখন বলি।

ট্যাভেরনিয়ে 'গ্রেট মোগল' হীরা বিষয়ে বলিয়াছেন, 'আওরংজীবের রত্ন-কোষাধ্যক্ষ আকিল খাঁ প্রথমে যে মণিটি আমার হাতে রাখিলেন সেটি সেই বিরাট হীরক। উহা গোল, "রোজ" নক্সায় কর্তিত, এবং এক পার্শ্ব অন্যের চাইতে অনেক উঁচু। উহার তলদেশে একটা খাঁজ ছিল এবং তাহার ভিতরে একটু দাগ (flaw) ছিল। উহার বর্ণ, ছায়া ইত্যাদি অতি সুন্দর এবং ওজন ৩১৯½ রতি—যাহা আমাদের ২৮০ ক্যারাটের সমান—ভারতীয় রতি আমাদের ক্যারাটের ⅞ অংশ।'

'যখন মীরজুমলা তাঁহার মনিবের—গোলকোণ্ডা রাজের—প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া শাহজাহানের আনুগত্য গ্রহণ করেন, তখন এই মণিটি তিনি নূতন প্রভুকে প্রণামী হিসাবে দিয়াছিলেন। সে সময় ইহা কর্তিত হয় নাই এবং ইহার ওজন ছিল ৯০০ রতি অর্থাৎ ৭৮৭½ ক্যারাট।

'ইউরোপে হইলে এইটির অন্য ব্যবস্থা হইত। ইহা হইতে কয়েকটি উত্তম খণ্ড কাটিয়া লওয়া হইত এবং (তাহা সত্ত্বেও) ইহার ওজন শেষ পর্যন্ত অধিক থাকিত। ঐরূপ কর্তনের বদলে উহাকে ঘর্ষণের চাপে ছোট করা হইয়াছে (অর্থাৎ ঐ হীরার অধিকাংশই চূর্ণ করা হইয়াছে)। হর্টেন্সিয়ো বোর্জিয়ো নামক এক মণিকার ঐ কাজ করে। এবং মজুরীর বদলে তাহার ১০০০০্ টাকা জরিমানা হয়। রাজা (দিল্লীশ্বর) তাহাকে রত্নটি নষ্ট করার জন্য তিরস্কার করিয়া বলেন যে, উহার ওজন আরও অনেক বেশী রাখা উচিত ছিল। যদি হর্টেন্সিয়ো মণি কর্তন বুঝিতেন তবে রাজার ক্ষতি না করিয়া তিনি ঐ হীরার বৃহৎ খণ্ড রাখিতে পারিতেন।'

ট্যাভেরনিয়ে বলেন যে, ঐ 'গ্রেট মোগল' হীরা কৃষ্ণা নদীর পাশে কোল্লুর নামক স্থানের হীরাখনিতে পাওয়া যায়। কবে পাওয়া গিয়াছিল তাহার কোনও সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে মীর-জুমলা ১৬৫৬ বা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে উহা, স্বাভাবিক অবস্থায় শাহজাহানকে দিয়াছিলেন। এবং তাহার আট-নয় বৎসর পরে ট্যাভেরনিয়ে উহা কর্তিত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন।

বল সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, ট্যাভেরনিয়ে বর্ণিত হীরাই নাদিরশাহ লুণ্ঠিত কোহিনুর। ট্যাভেরনিয়ে অতিশয় অভিজ্ঞ রত্নবেত্তা ছিলেন এবং তিনি নিজে ওজন করিয়া ও অতি যত্নে নিরীক্ষণ করিয়া আওরংজীবের রত্নাগারের প্রত্যেকটি প্রধান রত্নের বিবরণ, ও স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। বাবর যে হীরা আগ্রায় পাইয়াছিলেন সে হীরা আওরংজীবের রত্নাগারে ছিল না নিঃসন্দেহ, থাকিলে তাহার নিখুঁত বর্ণনা ট্যাভেরনিয়ে রাখিয়া যাইতেন। বল সাহেবের মতে নাদিরশাহের পৌত্র শাহরুখ বোধহয় অবস্থার ফেরে ঐ কোহিনুর খণ্ডিত করিয়া এক হীরাখণ্ড বেচিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে উহার আকৃতি ও ওজনে কিছু প্রভেদ হয়। আকৃতির প্রভেদের কারণ সহজেই দেখা যায় যদি ট্যাভেরনিয়ে অঙ্কিত চিত্র ও উহার ১৮৫০ সালে বিলাতে লইয়া যাওয়ার সময়কার চিত্র—যাহা রত্নবিদ মিঃ টেনান্ট ১৮৫২ সালে প্রকাশিত করেন—মিলাইয়া দেখা যায়। নাদিরশাহের কোহিনুরের পাশ হইতে এক বা দুই টুকরা হীরা ছেনির কোপে কাটিয়া লইলে তাহার যে খণ্ডিত রূপ হয় মিঃ টেনান্টের চিত্রে তাহাই স্পষ্ট দেখা যায়। সুতরাং ট্যাভেরনিয়ে যে 'গ্রেট মোগল' হীরার বর্ণন করিয়াছিলেন তাহাই যে কোহিনুরে পরিণত হয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। মূল হীরা শাহজাহানের হস্তে মীর জুমলা দিবার আট নয় বৎসর পরেই ট্যাভেরনিয়ে উহা দেখিয়াছিলেন ও উহার ইতিবৃত্ত শুনিয়াছিলেন। সুতরাং মীর জুমলা প্রদত্ত সেই হীরাই যে কোহিনুরে পরিণত হয় তাহাও নিঃসন্দেহ। এখন ঐ মহারত্নের অন্যদিকের ইতিহাস দেখা যাউক।

কোহিনুরের ইতিহাসের যে অংশ নির্ভরযোগ্য মনে হয়, তাহার আরম্ভেই আমরা একটি ইতিহাসখ্যাত বিচিত্র চরিত্রের পরিচয় পাই, যাঁহার ঐতিহাসিক নাম মীর জুমলা। এই পারস্য দেশবাসী অভিজাত পরিবারের সন্তান দক্ষিণ ভারতে প্রথম আসেন এক পারস্য দেশীয় সওদাগরের কর্মচারী রূপে। ইনি অতি সুদর্শন পুরুষ ছিলেন এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায়, উচ্চ ও বিস্তৃত শিক্ষা-দীক্ষায় এবং প্রখর চাতুর্যের ও অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিত্বের গুণে সে যুগের ভারতে অদ্বিতীয় ছিলেন।

মাহমুদ মুয়াজ্জিম 'আমীর জুমলা' দক্ষিণ ভারতে গোলকোণ্ডা রাজের অধীনে রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইয়া দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেন। যে সময় বার্ণিয়ে, ট্যাভেরনিয়ে ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ফরাসী ব্যবসায়ী ও অভিজ্ঞ পর্যটক দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, সে সময়ে মীর জুমলা গোলকোণ্ডা রাজ্যের বৃহত্তম প্রদেশের শাসনকর্তা ও রাজের প্রধান সেনাপতি। বার্ণিয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মীর জুমলার কার্যকুশলতা ও বিচারবুদ্ধি এতই আশ্চর্য যে তাহা কল্পনারও অতীত। ট্যাভেরনিয়েও যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাও মীর জুমলার কার্যদক্ষতার আশ্চর্য পরিচয় দেয়। মীর জুমলা ক্রমে প্রবল ক্ষমতাশালী হইয়া ছিলেন এবং রাজ্যের অধিকাংশ হীরা খনি এবং ধনধান্যে শ্রেষ্ঠ অঞ্চলগুলি তাঁহার আয়ত্তে থাকায় তিনি বিপুল ঐশ্বর্যেরও অধিকারী হন। গোলকোণ্ডার রাজমাতা তখনও বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন এবং তাঁহার মীর জুমলার প্রতি গুপ্ত প্রণয়াসক্তি ছিল।

এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা গোলকোণ্ডা অধিপতির কানে যায় এবং সেই সঙ্গে মীর জুমলার প্রবল ক্ষমতাবৃদ্ধি ও অসীম ধন-দৌলতের কথাও তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। মীর জুমলার প্রতাপ খর্ব করিয়া ও তাঁহার ধন-দৌলত বাজেয়াপ্ত করিয়া, তাঁহাকে গোলকোণ্ডা হইতে বিতাড়ণের ব্যবস্থা করা হইতেছে, এই কথা টের পাইয়া মীর জুমলা আওরংজীবকে গোপনে পরামর্শ দেন গোলকোণ্ডা জয় করিতে। গোলকোণ্ডার অধিকারী হইলে দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনের অধিকার তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে আসিবে, একথা বুঝিতে আওরংজীবের দেরী হয় নাই। তিনি প্রচণ্ড বিক্রমে সেই রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং গোলকোণ্ডার কুতুবশাহী নৃপতিকে যুদ্ধে হটাইয়া শেষে গোলকোণ্ডা দুর্গে অবরুদ্ধ করিলেন। গোলকোণ্ডা দুর্গও যায় যায় হইয়া শেষ অবস্থায় আসিয়াছে এমন সময় বাদশাহের আদেশ আসিল যুদ্ধে ক্ষান্তি দিবার জন্য। শাহজাদা দারার কানে গোলকোণ্ডা আক্রমণের কথা পৌঁছাইতেই তিনি বুঝিতে পারেন যে

দাক্ষিণাত্যের বিপুল ধনবল ও জনবল আওরংজীবের অধিকারে যাইলে দিল্লীর রাজসিংহাসনের পথ তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া যাইবে। তিনি তটস্থ হইয়া শাহজাহানকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিলে পরে বাদশাহের আদেশ যায় যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য।

আওরংজীব যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। কিন্তু গোলকোণ্ডার জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীকে আওরংজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মাহমুদের সঙ্গে বিবাহ দিতে হইল এই শর্তে যে গোলকোণ্ডার কুতুবশাহী নৃপতির মৃত্যুর পর ঐ জামাতাই রাজমুকুট পাইবেন। গোলকোণ্ডারাজ আরও রাজী হইতে বাধ্য হইলেন যে, মীর জুমলা তাঁহার পরিবার পরিজন, সেনা, সামন্ত ও তোপখানা এবং যাবতীয় ধনদৌলত লইয়া আওরংজীবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে পারিবেন। বলা প্রয়োজন এখানে যে, কোহিনূরের মূল হীরা তখন মীর জুমলার হস্তগত হইয়াছে; কিরূপে ও কোথা হইতে, সে বিষয়ে ইতিহাস চুপ।

শাহজাহান তখন বৃদ্ধ। তিনি কাবুলে থাকিতে (১৬৫১ খৃঃ?) জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহকে কাবুল হইতে লাহোর পর্যন্ত অঞ্চলের রাজ-প্রতিনিধি (Viceroy) নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় পুত্র সুজা বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার, আওরংজীব নর্মদার দক্ষিণে সমস্ত প্রদেশের এবং কনিষ্ঠ মুরাদ বক্স গুজরাট ও মালওয়ার রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত ঐ সময়ই হইয়াছিলেন। শাহজাহানের তিন কন্যার মধ্যে জাহানারার পিতৃভক্তি এবং দারার প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম তো ইতিহাসে খ্যাত। মধ্যমা রোশনারা ছিলেন আওরংজীবের পক্ষে এবং কনিষ্ঠা মেহেরউন্নিসা বিলাসব্যসন নিয়াই মত্ত থাকিতেন। এ সকল কথা এবং আওরংজীবের পিতৃ সিংহাসন অধিকার ও ভ্রাতাদিগকে ধ্বংস করার বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নাই—সে কথা ভারতের ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লিখিত আছে। এখানে শুধু কোহিনূরের ইতিহাসই বিবৃত হইবে।

আওরংজীব নিজেও বিলক্ষণ চতুর ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি মীর জুমলাকে পাইয়া বুঝিলেন যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কার্যদক্ষতার অধিকারী ঐ ব্যক্তির পরামর্শ ও সহায়তা লক্ষাধিক সৈন্যের সমান। অন্যদিকে মীর জুমলা বুঝিতে পারিলেন যে কূটনীতি চালনায় আওরংজীবের সমকক্ষ কেহই নাই। উপরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আওরংজীব শুধু শৌর্যবীর্যের অধিকারী মাত্র ছিলেন না, সমরাঙ্গণে সৈন্য চালনায় তিনি অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। সুতরাং দুইজনের মধ্যে বুঝাপড়া হইল এবং মীর জুমলা চলিলেন দিল্লী—নিজের ও আওরংজীবের ভাগ্য পরীক্ষায় এক দান চালিতে। রোশনারা বেগম ছিলেন এই চক্রান্তের মধ্যে, তিনি পিতাকে (শাহজাহান) রাজী করাইলেন মীর জুমলাকে দিল্লীর দরবারে আহ্বান করিতে।

মীর জুমলা সেই আদেশ অনুযায়ী দিল্লী চলিলেন এবং সঙ্গে লইলেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্য পরিজন, যাহাতে দারা বা জাহানারার মনে কোনও সন্দেহ না জাগে। দিল্লীতে পৌঁছাইয়া তিনি বাদশাহকে নিবেদন করিলেন বহু মূল্যবান উপহার, যাহার মধ্যে ছিল ঐ ঐতিহাসিক হীরা খণ্ড। অল্পদিনের মধ্যেই মীর জুমলা দিল্লীর দরবারে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। ইতিপূর্বে আগেকার প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লা খাঁ মারা গিয়াছেন এবং শাহজাহনের সন্দেহ ছিল যে দারাই বিষ প্রয়োগ করাইয়া সাদুল্লার মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। উপরন্তু আসিল ঐ মহারত্ন, শাহজাহানের চক্ষু ঝলসাইতে।

মীর জুমলা শাহজাহানকে বুঝাইলেন যে দাক্ষিণাত্যে ঐ রকম হীরা মণিরত্ন অশেষ পরিমাণে আছে। যথেষ্ট সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি তাঁহার অধীনে দিলে তিনি দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া শাহজাহানকে অসীম ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করিতে পারিবেন। শাহজাহান তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী মীর জুমলার অধীনে দিতে। দারা ও জাহানারার চোখ খুলিল, তাঁহারা বুঝিলেন যে ঐ রকম সেনাবাহিনী এবং ঐরূপ কার্যক্ষম ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিযুক্ত সেনাপতি যদি আওরংজীবের সঙ্গে মিলিত হয় তবে দিল্লীর সিংহাসন তিনি যেদিন ইচ্ছা দখল করিতে পারিবেন, কেননা আওরংজীবের অধীনে ইতিপূর্বেই বিরাট সৈন্যদল মজুত ছিল। কিন্তু ধনলুব্ধ শাহজাহানের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল এবং তিনি সাদুল্লার মৃত্যুর পর দারাকে সন্দেহ করিতেন। তিনি মীর জুমলাকে ঐ সৈন্যবাহিনী সমেত আদেশ দিলেন যে দাক্ষিণাত্য জয়ের পর আওরংজীব ঐ অঞ্চলের সাধারণ শাসনের অধিকার পাইবেন, মীর জুমলার সৈন্য তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবে না। এবং দারা ও জাহানারার সন্দেহমোচনের জন্য তিনি অনেক আশ্বাস দিয়া মীর জুমলাকে রাজী করাইলেন তাঁহার স্ত্রী-পুত্র কন্যা-দের দিল্লীতে রাখিয়া যাইতে—তাঁহার বিশ্বস্ততার জামীন হিসাবে। মীর জুমলা ও আওরংজীবের চক্রান্তের আরও এক চাল সফল হইল।

দাক্ষিণাত্যে গিয়া মীর জুমলা স্ত্রী-পুত্রের অমঙ্গলের কথা ভাবিয়া প্রথমে আওরংজীবের সঙ্গে যোগদান করিতে রাজী হন নাই। পরে দুইজনে পরামর্শ করিলে পরে মীর জুমলাকে কপট বন্দী করা হইল, হাতে পায়ে রূপার বেড়ী দিয়া। দিল্লীতে সেই সংবাদ পৌঁছাইতেই দারার বুঝিতে দেরী হয় নাই যে কি চাল চলিতেছে। মীর জুমলার সৈন্যবল ও অতি উৎকৃষ্ট তোপখানা (artillery) আওরংজীবের হস্তগত হইয়াছে ইহাও তিনি বুঝিলেন। ইতিমধ্যে শাহজাহান অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন (১৬৫৮) এবং কিছুদিন পরে গুজব রটে যে তিনি মৃত। ঐ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই আওরংজীব প্রকাশ্যে সিংহাসন দখলের যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন—কিন্তু ছোট ভাই মুরাদকে বুঝাইয়াছিলেন যে সিংহাসনে বসিবে সে, তিনি লড়িবেন শুধু এই জন্য যাহাতে 'পিতৃহন্তা' ও বিধর্মী দারা এবং ধর্মভ্রষ্ট সুজা (সুজা সুন্নি মত ছাড়িয়া শিয়া মত গ্রহণ করিয়াছিলেন) দিল্লীর সিংহাসনে না বসে। ভ্রাতৃবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হইল যাহার শেষে শাহজাহান ও মুরাদ বক্স আজীবন বন্দী হইলেন এবং দারা ও সুজা নিহত হইলেন। দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন আওরংজীব। সে সবের বিবরণ এখানে অবান্তর, শুধুমাত্র বলা প্রয়োজন যে কোহিনূরের মূল হীরা আওরংজীবের রাজকোষে আসিল।

মীর জুমলার ইতিবৃত্তও এখানে অবান্তর, তবে একথাও বলা প্রয়োজন যে, শাহজাহান প্রেরিত সেনাবাহিনী, যাহার সেনাপতি ছিলেন কাসিম খাঁ এবং সহায়ক ছিলেন যোধপুররাজ যশবন্ত সিং,

উজ্জয়িণীর কাছে আওরংজীব ও মুরাদের সংগে যুদ্ধে হারিবার সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছাইলে ক্রোধান্ধ দারা মীর জুমলার স্ত্রী ও পুত্রের মুণ্ডচ্ছেদ এবং কন্যাদের বাজারে বেশ্যাদের নিকট বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু শাহজাহান বাধা দেওয়ায় তাহারা এই চরম দুর্গতি হইতে রক্ষা পায়।

কোহিনুর আওরংজীবের রাজকোষে আসিবার পর বিদেশী মণিকারের মুর্খতায় আকারে এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়ায় সে কথা আগেই বলিয়াছি। তারপর আওরংজীব দীর্ঘদিন যুদ্ধ-বিগ্রহে ও নানা অশান্তিতে কাটাইয়া দাক্ষিণাত্যে, আওরঙ্গাবাদের নিকটে মৃত্যুশয্যায় শুইলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল সাম্রাজ্যও ধ্বংসের পথে চলিল। দিল্লী-শ্বরের এই মুকুটমণি প্রায় ৮০ বৎসর বাদশাহের রাজকোষে থাকিবার পর পারস্য-রাজ নাদির শাহ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। নাদির শাহ ভারত লুন্ঠনে প্রায় ৯০ কোটি টাকার ধন-দৌলত পাইয়াও ক্ষান্ত হন নাই। দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ, রাজ-ধানীতে রক্তের স্রোত বহিবার পর, অনেক কষ্টে নাদির শাহকে শান্তি স্থাপনে রাজী করেন। সেই মৈত্রী বন্ধন 'পাকা' করিবার অছিলায় দিল্লীশ্বর ও নাদির শাহের মধ্যে পাগড়ী বদল হয়—নাদির শাহের মতে উহাই ছিল বন্ধুত্বের চরম নিদর্শন! অবশ্য মহম্মদ শাহ তাঁহার পাগড়ীর মধ্যে 'কোহিনুর' লুকাইয়া রাখিয়াছেন এ খবর দিল্লীশ্বরেরই কোন অন্তঃপুরচারিণী মারফত, পূর্বেই নাদির শাহ শুনিয়া-ছিলেন। মহারত্ন দর্শনে নাদির শাহ চমৎকৃত হইয়া বলেন, 'কোহ্-ই-নুর'—অর্থাৎ আলোকের পর্বত।

নাদির শাহ স্বভাবতঃই ক্রূরপ্রকৃতি ও নিষ্ঠুর ছিলেন। কোহিনুর লইয়া দেশে ফিরিবার পর সেই নির্দয় স্বভাব প্রায় উন্মাদ রোগে দাঁড়ায়। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তিনি তাঁহার পুত্র রিজাকুলি মির্জার দুই চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্য নাদির শাহ তাঁহার বিদ্রোহী সেনাপতি-দিগের হাতে নিহত হওয়ার পর বিদ্রোহিগণ রিজাকুলির পুত্র শাহরুখ মির্জাকে সিংহাসন ও কোহিনুর দেয়। শাহরুখ মেশেদ সহরে থাকিতেন।

নাদির শাহের সৈন্যবাহিনীতে আফ-গান অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন আহমেদশাহ আবদালি। নাদির শাহ নিহত হইবার পর যখন গোলযোগ চলিতেছে তখন আহমেদ শাহ সুবিধা বুঝিয়া, তাঁহার জিম্মায় যে যুদ্ধের তহবিল রক্ষিত ছিল তাহা লইয়া সদলে নাদির শাহের ছাউনি ছাড়িয়া কান্দাহার চলিয়া আসেন। সেখানে তাঁহাদের সহিত তুরিকি খাঁর সাক্ষাৎ হয়। নাদির শাহ ভারত অভিযানের পরে ভারত সাম্রাজ্যের পাঁচটি প্রদেশ, যথা কাবুল-টাট্টা, কান্দাহার, বক্কর, পেশওয়ার ও মুলতান, নিজের দখলে রাখিয়াছিলেন। আহমেদ শাহের সংগে সাক্ষাৎ হইবার সময় তুরিকি খাঁ ঐ পাঁচ প্রদেশের রাজস্ব লইয়া নাদির শাহের ছাউনিতে যাইতেছিলেন। আহমেদ শাহ তুরিকি খাঁকে নাদিরের কোতলের খবর দিয়া সেই রাজস্ব কাড়িয়া লওয়ায় তাঁহার অর্থবল ও সৈন্যবল পর্যাপ্ত হয় এবং তাহারই জোরে ঐ পাঁচটি প্রদেশ দখল করিয়া তিনি স্বাধীন আফগানিস্থান নামে নিজের রাজত্ব স্থাপন করেন। এখান হইতে তিনি পারস্যের খোরাসান প্রদেশে ও ভারতে যুদ্ধ অভিযান চালাইতেন।

ইতিমধ্যে এক বিদ্রোহীদল শাহরুখ মির্জাকে সিংহাসনচ্যুত ও অন্ধ করিয়া দেয়। আহমেদ শাহ সেই খবর শুনিয়া সসৈন্যে যাইয়া বিদ্রোহ দমন করিয়া শাহরুখকে সিংহাসন ফিরাইয়া দেন। সেই সংগে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তৈমুর শাহের সংগে শাহরুখের কন্যার বিবাহ দেন এবং 'চক্ষুহীনের' নিকট কোহিনুরের সৌন্দর্যের কি মূল্য' এই বলিয়া ঐ মহারত্নটিও আদায় করেন।

আহমেদ শাহের পর তৈমুর শাহ কাবুলের সিংহাসনে বসেন। তাঁহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জমান শাহ সিংহাসন পাইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প কয় বৎসরের মধ্যে জমান শাহের পরের ভ্রাতা মাহমুদ তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। জমান শাহ তাঁহার আশিক নামে এক বন্ধুর কাছে আশ্রয় চাহিতে, উপযুক্ত বন্ধু তাঁহাকে কয়েদ করিয়া মাহমুদকে খবর দেন। জমান কোহিনুর মণি তাঁহার কারাকক্ষের দেওয়ালের এক ফাটলে এবং কক্ষের মেজেয় গর্ত খুঁড়িয়া বাকি মণিরত্ন তাহাতে লুকাইয়া রাখেন। মাহমুদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কানাইয়া অন্ধ করেন ও মণিরত্ন-গুলি দিতে আদেশ করেন। জমান শাহ বলেন যে, সে সব তিনি নদী পার হওয়ার সময় জলে ফেলিয়া দিয়াছেন। দুই বৎসর পরে তৃতীয় ভাই সুলতান সুজা মাহমুদকে হটাইয়া সিংহাসন দখল করেন এবং জমান শাহের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে শুধু আশিক নয়, তাহার নিরাপরাধ স্ত্রী ও শিশু

সন্তানকেও কামানের মুখে বাঁধিয়া উড়াইয়া দেন! মাহমুদের চক্ষুও তিনি উৎপাটিত করিতে চাহেন কিন্তু তাঁহার মা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জমান শাহ তাঁহাকে ক্ষান্ত করেন। জমান শাহ সুলতান সুজাকে কোহিনুর ও অন্য মণিরত্ন কোথায় আছে দেখাইয়া দিলে তিনি সে সকল উদ্ধার করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মাহমুদ কারাগার হইতে পলাইয়া, সৈন্য-সামন্ত একত্র করিয়া পুনর্বার সিংহাসন দখল করেন। জমান শাহ ও সুলতান সুজা, দেশ ছাড়িয়া, পলায়ন করিয়া 'কোম্পানী বাহাদুরের' আশ্রয় ভিক্ষা করেন। কিন্তু সে সময় কোম্পানী বাহাদুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছিল লুধিয়ানা অঞ্চলে, পঞ্চনদের বাকী এলাকা ও পেশাওয়ার অঞ্চল তখন 'পাঞ্জাব কেশরী' রণজিৎ সিংয়ের দখলে। সুতরাং ইঁহাদের প্রথমে আশ্রয় নিতে হয় তাঁহার নিকট।

রণজিৎ সিং টের পাইয়াছিলেন যে, সুজার কাছে ঐ মহারত্ন আছে, এবং সেটি আদায়ের জন্য প্রথমে কাবুল সিংহাসন উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি এবং পরে কারা নিক্ষেপ ও সেই সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া তিনি কার্যসিদ্ধি করেন। রণজিৎ সিং কোহিনুর সোনার বালায় বসাইয়া পরিতেন। কোম্পানীর প্রতিনিধি তাঁহাকে উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন 'পাঁচজুতি'! সেই রণজিৎ সিং মরিবার পর যখন তাঁহার রাজত্ব কোম্পানী দখল করিল, তখন রণজিতের নাবালক পুত্র দলীপ সিং কোহিনুর দিয়াছিলেন কোম্পানীর সেনাধ্যক্ষকে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী সুতরাং কোহিনুর যায় লণ্ডনে, এবং আজও—আর একবার কর্তনের পর—রহিয়াছে সেখানে।

১৯১৩ সালে যখন আমি উহা টাওয়ার অফ লণ্ডনের রত্নাগারে দেখি, তখন মনে দুঃখ হয় এই ভারতীয় মহারত্ন বিদেশীর করতলগত হইয়াছে বলিয়া। কিন্তু উহার ইতিহাস জানিবার পরে এখন অতটা দুঃখ আর নাই!

গোলকোণ্ডায় উহা আবির্ভূত হইবার পূর্বে ঐ মহারত্ন কোথায় ছিল এবং কি ক্ষতি করিয়াছে জানা নাই, অবশ্য কিম্বদন্তী আছে যে উহা সামন্তকেরই অংশ। কিন্তু গোলকোণ্ডা রাজ্যে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গোলকোণ্ডায় কুতুবশাহী নৃপতিদিগের দুর্দিন ও পতন আরম্ভ হয়। তাহার পর শাহজাহান উহা পাইয়া প্রথমে বিদ্রোহ-বিপ্লব ও পরে কারাগারে বিষময় জীবন ভোগ করেন মৃত্যু পর্যন্ত। আওরংজীব সাম্রাজ্য পাইবার সময় হইতে শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিষম অশান্তিতে ছিলেন এবং মৃত্যু হয় রাজধানী হইতে বহু দূরে যুদ্ধ শিবিরে। কোহিনুর আশি বৎসরের মধ্যে দোর্দণ্ড প্রতাপ মুঘল সম্রাট, 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বর'-কে লুণ্ঠনকারী বিজেতার কৃপাভিক্ষু করাইয়া যায় পারস্যে। সেখানে তাহার অধিকারী নাদির শাহকে ঘাতকের হস্তে নিহত ও তাঁহার বংশকে ছারখার করিয়া কোহিনুর যায় কাবুলে। দুর্ধর্ষ আহমেদ শাহের উত্তরাধিকারীদের জীবন ও সিংহাসন যাতনাময় করিয়া উহা যায় পাঞ্জাব কেশরীর হস্তে। সে রাজত্ব প্রায় নিমেষের মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়া উহা যায় কোম্পানীর [illegible] কোম্পানী বাহাদুর কোহিনুর সাগর পারে পাঠাইয়াও রক্ষা পান নাই, আট, নয় বৎসরের মধ্যে তাহার 'বাহাদুরীর' রাজত্ব শেষ হয়। সবশেষে বলি সসাগরা বসুন্ধরার বিশালতম ও প্রচণ্ডতম শক্তিধর বৃটিশ সাম্রাজ্যের কথা। বৃটিশ সাম্রাজ্যে কোহিনুর যায় ১৮৫০ সালে। শত বৎসরের মধ্যে সে সাম্রাজ্যের কি হইয়াছে সে কথা সবাই জানে। কোহিনুর আজও রহিয়াছে লণ্ডনে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের কি হইতেছে তাহাও জগৎ দেখিতেছে। সুতরাং......'অপরা কিম বা ভবিষ্যতি' বলিয়া শেষ করি এই প্রসঙ্গ!

[কোহিনুরের তিন অবস্থার চিত্র॥ উপরে: ট্যাভেরনীয়ে অঙ্কিত 'গ্রেট মোগল' হীরা। নীচে: দক্ষিণে, টেনাণ্ট অঙ্কিত রঞ্জিৎ সিংহের কোহিনুর, বামে, বর্তমান কোহিনুর]

জানেন কী?

প্রশ্ন

১। পুরুষ ও নারী কোন বয়সে সব থেকে বেশী ভারী হয়?

২। মশা কত দ্রুত উড়তে পারে?

৩। কোন হ্রদ লম্বায় সবচেয়ে বড়?

৪। কাগজের মুদ্রার প্রচলন কোন দেশে সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়?

৫। কাঁচ তৈরী করার প্রধান উপাদান কি?

৬। সব অ্যাসিডের মধ্যে কোন মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়?

৭। সূর্য হতে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে?

৮। বিলে টিকিট লাগালেই কি টাকার প্রাপ্তি-স্বীকার সম্পূর্ণ হোল?

৯। হাজী বলা হয় কাদের?

১০। এই সব দেশের বা শহরের আধুনিক নাম কি—ক্রিষ্টিয়ানা, পারস্য, কন্সটাণ্টিনোপল, মেসোপটেমিয়া, আইবিরিয়া, আবিশিনিয়া, চোযেন, গল, ক্যালিডোনিয়া?

[উত্তর অন্যত্র আছে]

প্রতিবেশী সাহিত্য

প্রতীক্ষা

রচনা : এস কে পোট্টেক্কাট

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

। ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষী বিচিত্র দেশ। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও এখানে সংস্কৃতিগত ঐক্য রয়েছে। বর্তমানে ভাষাসমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করলেও ভারতের অখন্ডতা রক্ষার জন্যে প্রত্যেকটি অঙ্গ রাজ্যের স্থানীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যের সাহিত্যের বিষয়েও আমাদের সচেতন হওয়া কর্তব্য। কারণ শিল্প-সাহিত্যের রসাস্বাদনের ভিতর দিয়ে মানুষে মানুষে পরিচয় যতো গভীর হয় এমন আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। আমরা সেইজন্যে এবার থেকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার কয়েকটি গল্প অনুবাদ করে পরিবেশন করছি। অনুবাদক বাংলা এবং আরো আটটি ভারতীয় ভাষায় অভিজ্ঞ। সেজন্যে অনুবাদে মূল রচনার আস্বাদ অনেকটাই পাওয়া যাবে আশা করা যায়।।

॥ ভূমিকা ॥

(নারিকেলকুঞ্জেঘেরা দেশ কেরালা। মালয়ালম তার ভাষা। ঐতিহ্যসম্পন্ন, সংস্কৃতপ্রভাবান্বিত ভাষা। দক্ষিণ-ভারতের কাশ্মীর—কেরালা।

ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদ বা অনুকরণের মধ্য দিয়ে মালয়ালম সাহিত্যে উপন্যাস রচনা শুরু। ইংরেজীর পরেই বাংলা। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কেরালার পাঠক সমাজে শুধু জনপ্রিয়ই নন মালয়ালী কথাশিল্পীরাও এ'দের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। ছোট গল্পকে অবলম্বন করেই আধুনিক মালয়ালম সাহিত্যের বিকাশ। এই শতকের গোড়া থেকেই আজ পর্যন্ত মালয়ালম ছোট গল্পের ইতিহাস হল নিরবচ্ছিন্ন দ্রুত অগ্রগতির বিস্ময়কর রূপরেখা। মালয়ালম কবিতার মত ছোট গল্পেও যুগ-যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি, এ যুগের ধ্যানধারণা ও রূপরীতির প্রকাশ সুস্পষ্ট।

প্রথমেই জানাই যে, 'হিন্দুস্থান টাইমস' (নয়াদিল্লী) কর্তৃক আয়োজিত ১৯৫০ সালের বিশ্ব ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় ভারতীয় গল্পের মধ্যে প্রথম ও বিশ্বের গল্পসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে একজন মালয়ালী লেখক বৈকম বশীরের গল্প।

প্রথম যুগের ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনজনের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ওর্টুভিল কুঞ্জু-কৃষ্ণমেনন (১৮৬৯-১৯১৫) সত্যপ্রেমী ও ঈশ্বরবিশ্বাসী লেখক।

ওম্পাটি নারায়ণ পত্তুভাল (১৮৭১-১৯৩৬) এর গল্প আলঙ্কারিক। মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে তাঁর গল্পে।

সি কুঞ্জুরাম মেনন (১৮৯০—১৯৪১)। অনেকের মতে এ'র গল্পই সার্থক ছোটগল্প হিসেবে গ্রহণীয়।

আধুনিক লেখক-লেখিকাদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় যাঁরা তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ :

ল লি তা ম্বি কা অন্তর্জনম (১৯০৯—)।

অল্প বয়সেই মালয়ালম এবং সংস্কৃত শিখেছিলেন। তাঁর গল্পে পর্দানশীল নারীসমাজের জীবন যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে।

সরস্বতী আম্মা (১৯১৯—)।

তাঁর গল্পের নায়িকারা নারী জাতির মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত।

কারুরনীলকণ্ঠপিল্লাই (১৮৯৮—)।

১৯৪৫ থেকে কোট্টায়াম শহরের সাহিত্যিক সংঘের সম্পাদক ছিলেন কয়েক বছর। আধুনিক জীবনের সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলেন নিজের গল্পে।

নাগভল্লী আর এস কুরুপ (১৯১৭—)।

তাঁর মতে এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। এই বাণী বিঘোষিত হয়েছে তাঁর বহু গল্পে।

পোণকুন্নম ভর্কী (১৯১০—)।

তাঁর গল্পে কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি ধিক্কার হানা হয়েছে।

এস কে পোট্টেক্কাট দারিদ্র্যনিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে দক্ষতা ও সহানুভূতির সঙ্গে গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পী হিসেবে নিপুণ। ভ্রমণে দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর। তাঁর লেখায় এমন একটি স্বাদ পাওয়া যায় যা অন্য কারো ছোট গল্পে পাওয়া ভার। বর্তমান গল্পে এই স্বাদ পাবেন আশা করি। —অনুবাদক)

(মালয়ালম গল্প)

জেলা-হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা ঘরে এল। স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলছে। কাছেই তার বাড়ি।

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে গিয়ে তার নজর পড়ল 'ডাঃ সি, পি, মাধবন,

এম্-বি, বি-এস', সাইনবোর্ডের উপর একটি প্রজাপতি উড়ছে। বারান্দায় ক য়ে ক টি বেতের চেয়ার-টেবিল সাজানো। টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে জোলার গ্রন্থ—'নানা'। ঐ বইয়ের ভেতর দিয়ে উঁকি মারছে একটি টেলিগ্রামের খাম।

শোওয়ার ঘরে গেল সে। রান্নাঘর থেকে থালাবাসনের আওয়াজ আসছে। স্টেথোস্কোপটা খুলে গুটিয়ে কোটের পকেটে রেখে দিল। তারপর সেই সাদা লম্বা কোটটি খুলে রেখে দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবল।

জানলার রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে তেরছাভাবে রোদ পড়ছে ঘরে। রোদের রঙ বিচিত্র। ঘরেই যেন রামধনু রচিত হয়েছে।

ডাক্তার ঘরে একপাক ঘুরে আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উজ্জ্বল আরশির সামনে নিজেকে কেমন যেন কালো দেখাচ্ছে। গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে অন্যমনস্কভাবে আরশির দিকে তাকাল। গোঁফের একটি চুলে পাক ধরেছে। নাক চেপে ধরে টান মেরে উপড়ে ফেলল ঐ সাদা চুলটা। তারপর ওটাকে হাতে নিয়ে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে ফেলে দিল। মাথা নীচু করে ক্লান্ত পদক্ষেপে বারান্দায় এসে চেয়ারে বসল। আর একবার 'তার' পড়ল। 'নানা' বইয়ের যে পৃষ্ঠায় ঐ খামটি ছিল, আবার খামটি সে-পৃষ্ঠাতেই রেখে দিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা মনে গেঁথে গেছে। ভাবল হয়ত বউ এতদূর পড়ে পেজ্ মার্ক করার জন্য খামটা রেখেছে।

ঐ টেলিগ্রামটা সে পেয়েছে দুপুরে খেতে এসে। আবার পড়ল ওটা : বাবার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আজকেই রওনা হয়ে যাও। রাত্রের গাড়ীতেই আসবে বলে প্রতীক্ষায় থাকব।—লিলী।

তাকাল ঘড়ির দিকে। পাঁচটা পাঁচ।

পোনে সাতটায় শেষ ট্রেন।

পিছন থেকে শোনা গেল রাধার ছন্দোবদ্ধ পায়ের এবং শাড়ীর ফরফরে শব্দ। তার চলনে-বলনে একটি ছন্দ আছে, সুরও যে নেই তা নয়। কথা কানে এল, ওঠ চা হয়ে গেছে।

—হুঁ, উঠছি।

উঠছি বলেও ঠায় বসে রইল দেখে রাধা বলল, জর্জমাষ্টারকে দেখতে যাবে না?

—যাব।

রাধা জানে যে সে জর্জমাষ্টারের দত্তক পুত্র। তার সাহায্য না পেলে ডাক্তারী পড়া হতো না, হাসপাতালের এই চাকরীও পাওয়া যেতনা। তাকে শেষ বারের মত দেখার জন্য অবশ্যই যাওয়া উচিত।

আগে অবশ্য লোকে বলাবলি করতো, নিজের মেয়ের সংগে বিয়ে দেওয়ার জন্যই জর্জ তাকে সাহায্য করছে। বেচারী লিলী! আজ কোথায় যেন মাষ্টারী করছে। লিলীর সংগেই বিয়ে হত। লিলীকে ভালও বাসতো সে। কিন্তু হলো না। না হওয়ার কারণ কেউ জানেনা। হয়ত সে খৃষ্টান হতে চায়নি বলে অথবা রাধার সংগে যেদিন ট্রেনে দেখা হয়েছিল তার—সেই মুহূর্তটাই এমন ছিল যে, তাকে অন্য কোথাও নোঙর ফেলতে দেয়নি। রাধার রূপলাবণ্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল সে।

[illegible] দিক দিয়ে এসে তার পিঠের কাছে হাত রেখে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে রাধা শুধোল, আজকেই যাবে নাকি?

তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়ল ট্রেনের সময়। ঘড়ি দেখে নিয়ে টেলিগ্রামটা 'নানা'-র সেই পৃষ্ঠাতে আছে কিনা চোখ বুলিয়ে খাওয়ার ঘরে গেল।

পাকোড়া এবং অন্যান্য বৈকালিক খাবার খেতে খেতে ভাবল লিলীর জন্য সে একদিন কি রকম পাগলের মত ঘুরে বেড়াত!

—এই যা! রান্নাঘর থেকে চায়ের কাপ-কেট্লী পড়ে যাওয়ার শব্দ।

রাধা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বলল, চা পড়ে গেছে। একটু বসো। করে দিচ্ছি।

—থাক আর করতে হবে না। ঘড়ি দেখে হাত ধুয়ে উঠে পড়ল সে।

রাধা সংকোচে করুণ দৃষ্টি মেলে তাকাল। তার গালে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে ডাক্তার বলল, কাল সকালের গাড়ীতেই ফিরে আসব।

পথে নেবে দেখে সওয়া ছ'টা বেজে গেছে। একটা খালি ঘোড়ার গাড়ী যাচ্ছিল। ডেকে উঠে বসে গাড়োয়ানকে বলল, পনেরো মিনিটের মধ্যে ষ্টেশনে পৌছে দিতে পারলে আট আনা বক্‌শিস দেবো। সংগে সংগে ঘোড়ার পিঠে সপাং সপাং চাবুক পড়ল।

ঘোড়া ছুটেছে পক্ষীরাজের মত। আধ-মাইল যেতে না যেতে একটা কুঁড়ে ঘরের ভিতর থেকে একজন বুড়ো বেরিয়ে এসে চীৎকার করে ডাক্তারকে

কী যেন বোঝাতে লাগল। লোকটা চীৎকার করে কথা বলছে না হাউ-মাউ করে কাঁদছে ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। তবে তার ভাবভঙ্গীতে বোঝা গেল যে, তার মেয়ে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর। এক্ষুণি না গেলে হয়ত মেয়েটি মারা যাবে। বুড়োটা গাড়ীর পেছনে পেছনে ছুটলেও গাড়োয়ান থামায়নি। আট আনা পয়সা বকশিস তাকে পেতেই হবে। ডাক্তারও তাকে থামাতে বলেনি। অনেকদূরে ছোটার পর বুড়োটা থেমে গেল। দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

ষ্টেশন দূরে থেকে দেখা যাচ্ছে। আরো দূরের দিকে তাকাল ডাক্তার। মনে হচ্ছে গাড়ী আগের ষ্টেশনে পেণছে গেছে। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ঘড়ি দেখল। ছটা পঁয়ত্রিশ। আর মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ আছে। আশ্বস্ত হল।

হঠাৎ গাড়ীটা উল্টে রাস্তার ধারে পড়ে গেল। ঘোড়াটা একেবারে পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে পড়েছে। গাড়োয়ান বকশিসের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ঘোড়াকে খুব চাবুক মারতে লাগল। জিভ বের করে মাঝে মাঝে পা কাঁপিয়ে ঘোড়া কিন্তু তেমনি পড়েই রইল।

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। চোট লাগেনি। কাপড়ে ধুলোমাটি একটু লেগেছে। ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকাল। তখনও ছটা পঁয়ত্রিশ। বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রেন ষ্টেশনে এল। এবং মুহূর্তকাল পরে ঝক্ ঝক্ করতে করতে চলে গেল।

তখনও গাড়োয়ান সমানে ঘোড়াটাকে চাবুক মারছে। হঠাৎ একটা নীলরঙের ষ্টুডিবেকার গাড়ী ডাক্তারের কাছে এসে থেমে গেল।

—ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু ভিতরে আসুন। গাড়ীর ভিতর থেকে আল-কাতরায় চোবানো একটি কালোমূর্তি ডাকছে।

ডাক্তার দেখল মিলমালিক এস, চেট্টিয়ার ডাকছেন। ড্রাইভার নেবে দরজা খুলে দিল। ডাক্তার ভিতরে গিয়ে বসল।

—কী ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?

—ও কিছু নয়, আপনি চল্লেন কোথায়?

—এই আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস এখানে দেখা হয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছিলেন বলুন তো?

ডাক্তার সব ঘটনা বলল।

—যাক গাড়ী না পেয়ে শাপে বর হল। আমার বউয়ের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। চলুন আপনাকে এখনই যেতে হবে।

চেট্টিয়ারের গাড়ী ছুটে চলল তীব্র-গতিতে। রাস্তার ধারের ঐ বুড়োর কুঁড়ে ঘর থেকে হঠাৎ ভেসে এল বুক-ফাটা কান্নার আওয়াজ। ডাক্তারের চোখের সামনে ভাসল ঐ বুড়োর চেহারা, কানে বাজল ওর চীৎকার করে বলা কথাগুলো। মুহূর্তে ইচ্ছে হল গাড়ীটা থামিয়ে কি ঘটেছে জেনে আসে। কিন্তু গাড়ী চলছে বিদ্যুৎ-গতিতে। ডাক্তার ভাবছে, বুড়োর গর্ভ-বতী মেয়ে হয়ত এতক্ষণে মারা গেছে। তা নাহলে এ-ভাবে কান্নার রোল পড়ে না।

গাড়ী চেট্টিয়ারের ইমারতে ঢুকল। সোজা ডাক্তারকে নিয়ে গেলেন বউয়ের শোবার ঘরে। ডাক্তার ভেবেছিল চেট্টিয়ারের বউ হবে একটি কালীমূর্তি। ধপধপে বিছানায় পড়ে থাকবে একটি কুণ্ডলীপাকানো কালোশরীর। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হল। সুন্দর চিকণ চেহারা। এমন সুন্দরী ডাক্তার এর আগে কোনদিন দেখেনি। রাধার চেয়েও সুন্দরী। স্রষ্টার অবকাশ মুহূর্তের এক অপরূপ সৃষ্টি। চেট্টিয়ার নিশ্চয়ই তাকে পেতে অনেক টাকা ঢেলেছেন!

রাত্রের ডিনার খাইয়ে চেট্টিয়ার ডাক্তারকে বিদায় দিলেন। ওর হাতে গুঁজে দিলেন দশ টাকার পাঁচটি নোট। বাইরে ওই নীলগাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে বাড়ী পেণছে দেওয়ার জন্য।

রাত তখন দশটা। গাড়ী থামল বাড়ির সামনে। জ্যোৎস্নার আলোকে বেশ দেখাচ্ছে বাড়ির আশ-পাশটা। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। ভিতরের একটু আলোও বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। জ্যোৎস্নালোকে ডাক্তারের চোখে বাড়িটা চমৎকার দেখাল। রহস্যঘেরা একটি বাড়ি যেন।

বারান্দায় উঠে দরজায় দুতিনটা টোকা মারল। রাধা দরজাটা খুলে দিল। ভিতরে গিয়ে কোট খুলতেই বউ ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, কি হল, যাওনি?

রাধার প্রশ্নের জবাব দিয়ে তার দিকে কিছু একটা আবিষ্কার করার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাক্তার ভাবছে...... বউ জানতো যে আজ রাত্রে আমি ফিরব না। আমি তো রাধার নাম ধরে ডাকিনি। দরজায় কয়েকটি টোকামারার সংগে সংগে খুলে দিল কেন? এ নিশ্চয়ই কারও প্রতীক্ষায় বসেছিল......। এই ধরনের নানা কথা ডাক্তারের মগজে ঘুরপাক খেতে লাগল। লক্ষ্য করল এখনও রাধা বারান্দার দরজা একটু খুলে রেখেছে। বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রাধা। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় বসল।

—এখানে বস। বলে অন্য একটি জায়গা দেখাল ডাক্তার।

রাধা পুতুলের মত নির্দেশানুযায়ী বসল। টেবিলল্যাম্পের আলোতে লক্ষ্য করল রাধার চোখে ফোঁটা ফোঁটা জল।

ডাক্তার বউয়ের আপাদমস্তক লক্ষ্য করল। বউ আশমানী রঙের নতুন ব্লাউজটা পরেছে, বুকটা অর্ধনগ্ন। জ্যোৎস্নালোকে এ-পোশাক মন্দ দেখাবে না। একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে দেখে যেন তার মনে হল এ তার বউ নয়। অন্য কেউ সেজেগুজে তার কাছে অভিসারে এসেছে যেন। কার জন্যে বউ এত সেজেগুজে বসেছিল!

—দিব্যি দেখাচ্ছে তো তোমাকে। দেখে মনে হচ্ছে কোথায় যেন বেরোবে। তারপর একটু চাপাহাসি হেসে আঙুল-গুলো নিজের গোঁফে ঘোরাতে লাগল।

কথাশুনে রাধা থ বনে গেল। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিল দরজার দিকে। কিছু যেন লুকোতে চায় স্বামীর কাছে।

ঐ ভাবে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়াতে ডাক্তারের সন্দেহ আরো বাড়ল।

—তোমাকে এখানে বসিয়েছি বলে হয়ত অস্বস্তি বোধ করছ। এত উৎ-

কুণ্ঠিতভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? তারপর স্বর নীচু করে আবার বলল, কান খাড়া করে বসে থাকো...... কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত কারোর পদশব্দ শুনতে পাবে। তখন না হয় আমি দরজা খুলে দেব। সত্যিই তো, অত কান পেতে বসে থাকার কি আছে! আমি তো আছি। তুমি বরং উপন্যাস পড়।

'নানা' বইটা খুলল। আশ্চর্য! টেলিগ্রামের খামটা এখনও সেই পৃষ্ঠাতেই আছে। বউকে বলল, বসে বসে কার স্বপ্ন দেখছিলে বল তো?

রাধা কিছু বলল না। তখনই বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডাক্তার মনে মনে খুশী হলো। এক পৈশাচিক আনন্দে তার মন ভরে উঠল। আওয়াজটা তখনও শোনা যাচ্ছে। কান খাড়া করে শুনে বুঝল ওটা কারো পদশব্দ নয়। বাতাসে তালপাতা নড়ার শব্দ। অন্যমনস্কভাবে ঘরের ভিতর চারদিকে তাকাল। চোখ নিবদ্ধ হল দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবির উপর। বাৎসল্যভাব জাগল মনে। ছবিটি তার মেয়ের। একটি কালো কুকুরের গলা জড়িয়ে ধরা অবস্থায় ফটো তোলা হয়েছিল। মেয়েটির সাত বছর বয়সের তোলা ছবি। আজ থেকে দুবছর আগে। কুকুরটির নাম নোরী। মেয়েটির নাম মল্লী। কুকুরটিকে দেখতে না পেলে হাউমাউ করে কাঁদত মেয়েটি। খুব কেঁদেছিল যেদিন কুকুরটি লরী চাপা পড়ে মরেছিল। মল্লী দু'তিন দিন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। সবসময় কাঁদত। বায়না ধরেছিল নোরী যেখানে মারা গেছে সেখানে এক স্মৃতি-স্তম্ভ তোলার। মল্লী ছোট্ট এক কৌটায় পয়সা জমাত। ঐ কৌটোটা বাবার হাতে দিয়ে স্মারক-স্তম্ভের কথা বার বার বলছিল। এই ঘটনার দুচারদিন পরেই তার বদলি হল।

মল্লীর জন্মদিন আগামী মাসের দশ তারিখে। মাদ্রাজের 'কল্যানিকেতন বোর্ডিং স্কুলে' ভর্তি করানো হয়েছে মল্লীকে। জন্মদিনে ওর জন্য কি কি কেনা উচিত তাই নিয়ে বাবা-মার মধ্যে একটা বচসা হয়। বাবার মত পোশাক এবং মিষ্টি কেনা, মার মত একটা ফাউন্টেন পেন এবং জওহরলালের 'লেটারস টু দি ডটার' বই উপহার দেওয়া।

মল্লীর মা!......ডাক্তার আবার ভাবল রাধা সম্পর্কে। এতক্ষণ সে পাশেই বসেছিল, অথচ সে তার কথা চিন্তা করেনি। আশ্চর্য বিয়ের এতবছর পরেও রাধাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু কার পদশব্দ শোনার পরেই তো এ হারিয়ে যাবে। সংসারের আমার বলতে তখন একমাত্র মল্লীই থাকবে।

দূর থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। চিন্তায় ছেদ পড়ল, ঘড়ির দিকে তাকাল। ছটা বেজে প'য়ত্রিশ। যা ভেবেছে তাই। গাড়ী উল্টে যাওয়ার সংগে সংগে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিলিয়ে নিল ঘড়িটা। এগারোটা বেজে দশ। কানের কাছে রেখে শুনল টিকটিক আওয়াজ। কিন্তু একি, টিকটিক আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরেই। তাইতো চাবি দেওয়া হয়নি! মল্লীর মা-ই তো প্রত্যেকদিন চাবি দেয়। আজকাল বুঝি কাজে মন বসছেনা। কর্কশ গলায় বলল, আজকাল আর বাড়ির দিকে তাকানোর সময়ও মিলছে না বুঝি!

ঘরে খুব গরম লাগছে। উঠে পিছনের জানলাটি খুলে দিল। চোখ পড়ল জিলা হাসপাতালের ওপর। জ্যোৎস্নায় সেটি যেন স্নান করছে। মনোরম দৃশ্য। দিনের কোলাহল নেই, নেই রোগীদের আর্তনাদ। অন্য কারোর চীৎকার নেই। চারিদিকে নিস্তব্ধ শান্তি বিরাজ করছে। গাছের ছায়া আর জ্যোৎস্নার আলো মিলে চমৎকার এক ছায়াঘেরা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। ...... হঠাৎ মনে হল দরজায় কেউ টোকা মারছে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। একটা বাদুড় ঢুকে গেল ঘরে পাখনা পত্ পত্ করতে করতে। নিরাশ হয়ে মল্লীর মার দিকে আবার তাকাল। সে মাথা নীচু করে কী যেন ভাবছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটল। রাত্রের পাখীগুলো মাঝে মাঝে কলরব করে উঠছে। শোনা যাচ্ছে পেঁচার ডাক। রাত্রির কত বিচিত্র আওয়াজ...... কিন্তু সেই পায়ের শব্দ তো শোনা যাচ্ছে না। অনেক দূর থেকে একটি গানের কলি ভেসে এল। বহুপরিচিত গান।...... একুল ভাঙে ও-কুল গড়ে এই তো নদীর খেলা।

অনেকদূর থেকে গান শোনা যাচ্ছে। ডাক্তার জানে এ-গান গাইছে গাড়োয়ান রাজু। রাজুর জীবনকাহিনী অনেকেই জানে। লোকটার চেহারা কালো কুৎসিত, কয়লা। কিন্তু তার বউ ছিল খুব ফর্সা এবং সুন্দরী। অমন সুন্দর বউকে রাজু কি করে পেয়েছিল তা কেউ জানে না। বউকে রাণীর মত রাখবার জন্য রাজু কত খাটতো! মাঝে মাঝে গাড়ীতে কোন যাত্রী নিত না। বউকে বসিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোরাত। বউয়ের প্রতি তার এই টান দেখে অনেকে তাকে উপহাস করত।

ঘটনাটা আজ থেকে সাত বছর আগেকার। আজকাল তার বউয়ের সেই স্বাস্থ্য নেই। বিশ্রী দেখায় তাকে। মোমের মত কেমন যেন গলে গেছে। বুড়ী হয়ে গেছে। কিন্তু রাজু আজো তাকে নিবিড়ভাবে ভালবাসে। তার রোগ সারার জন্য শহরের হাসপাতালও ঘুরে এসেছে। বউয়ের কুষ্ঠরোগ সারাতে পারেনি। রোগের ভয়ে কেউ আজকাল তার গাড়ী ভাড়া করেনা। বেচারা রাজু!... এ-কুল ভাঙে ও-কুল গড়ে এইত নদীর খেলা। তার এই গানের শব্দ জ্যোৎস্নালোককে স্পর্শ করে বাতাসে ভর করে গাছপালাগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন ডাক্তারের কানে আসছে। আকাশের চাঁদ এখন ডুবছে। মোরগের ডাক শোনা গেল। এবার বুঝি পদশব্দ শোনা যাবে। হয়ত শেষরাত্রেই মোলাকাত্ করার কথা ছিল। আর বেশী দেরী নেই। ডাক্তারের মনের ভিতরটা হু-হু করে উঠছে। টক্-টক্-টক্-টক্! দরজায় কারোর টোকামারার আওয়াজ।

কান খাড়া করে শুনছে ডাক্তার। আবার টক্-টক্ আওয়াজ!

দরজার কাছে গিয়ে একবার বউয়ের দিকে পেঁচার মত তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল। রাধাও মাথা তুলে তার দিকে তাকাল। রাধার চোখেমুখে আতংক ফুটে উঠছে। তার মুখের দিকে আর তাকানো যায় না।

টক্-টক্ আওয়াজটা ডাক্তারের বুকে কাঁটার মত বিঁধছে। দরজার দিকে এগোনোর সময় ডাক্তারের বুক ধড়ফড় করছে। হাত-পা কাঁপছে।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার দরজা খুলল।

—স্যার টেলিগ্রাম।

—সেই ভৌতিক আলোতে পিওনের মাথার পাগড়ীটা কেমন যেন দেখাচ্ছে। পাগড়ীর যে রঙ খামেরও সে রঙ। লোকটা সইয়ের জন্য একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল। ডাক্তার কাঁপতে কাঁপতে পেন্সিল দিয়ে তাতে সই করে টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে বড় বড় চোখে টেলিগ্রামের দিকে তাকাল :

আপনার মল্লী আজ সন্ধ্যায় পাতকুয়োয় পড়ে গেছে। হাসপাতালে রাত এগারোটায় মারা গেল। আপনাদের অপেক্ষায় শবদেহ রেখে দিয়েছি। —মেট্রোন, কল্যানিকেতন।

প্রথম কারিগরি বিদ্যালয়

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

গল্প আছে, দুইজন দরিদ্র বালক গ্রামের পাঠশালায় পাঠ করিত—প্রতিদিন পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিত—"আজ কি খেয়ে এলে? তপ্ত ভাত? না—পান্ত ভাত?" একজনের বাড়ীতে চাউলের অভাবে পূর্বদিন রন্ধন হয় নাই—সে অনাহারে ছিল। সেদিন তাহার সহপাঠী প্রতিদিনের মত জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"মোটে মা রাঁধে না, তার আবার তপ্ত আর পান্ত!" ইংরেজের শাসনে সরকার লোকশিক্ষায় এত উদাসীন ছিলেন যে, সাধারণ শিক্ষারই সুব্যবস্থা ছিল না—কারিগরী শিক্ষা ত পরের কথা।

কিন্তু তখনই দেশের কোন কোন লোক কারিগরী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকার' শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাদিগের অন্যতম এবং তাঁহার চেষ্টায় একদিনে কলিকাতায় একটি কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের কথা। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ এলবার্ট এডওয়ার্ড ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় আসিবেন—সেজন্য উৎসবের আয়োজন চলিতেছিল। তখন সার রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালার (অর্থাৎ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার) রাজ্যপাল— "ছোটলাট"। শিশিরকুমার তাঁহার কোন কোন বন্ধুর সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন—যুবরাজের কলিকাতায় আগমন স্মরণীয় করিবার জন্য কলিকাতায় একটি কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে ভাল হয়। বন্ধুরা বলিয়াছিলেন, প্রস্তাবটি ভাল এবং দেশের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু উহার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব। শিশিরকুমার কিন্তু তাঁহার অভিধান হইতে "অসম্ভব" কথা বর্জন করিয়াছিলেন। কিরূপে আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করা যায়, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—কিন্তু প্রথমে উপায় কাহাকেও জানিতে দিলেন না। যুবরাজের আগমনের পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে শিশিরকুমার আলিপুরে ছোটলাটের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাকে শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব জানাইলেন। ছোটলাট প্রস্তাব সমর্থন করিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন, আবশ্যক অর্থের কি হইবে? তখন শিশিরকুমার তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ছোটলাটের সাহায্য চাহিলেন।

তিনি কোন কোন সূত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জিলার গোলকপুরের জমিদার হরিশচন্দ্র রায় এবং মুর্শিদাবাদ জিলার আজিমগঞ্জের ধনী জৈন ধনপত সিংহ ও লছমীপত সিংহ উপাধি লাভের জন্য লোলুপ ছিলেন। সরকার বলেন, উপাধি তাঁহারা বিক্রয় করেন না, কিন্তু তাহার জন্য "দক্ষিণা" দিতে হয়—*Titles are never sold, but they have to be paid for.* সাধারণতঃ সেই "দক্ষিণা" কোন জনহিতকর কাজের জন্য সরকারকে অর্থ-প্রদান। ধনপত সিংহ ম্যাজিষ্ট্রেটের মাধ্যমে সরকারকে তুষ্ট করিবার আশায় মুর্শিদাবাদ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে বহরমপুর কলেজের জন্য ৫০ হাজার টাকা দিবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। শিশিরবাবু বুঝিয়াছিলেন, ছোটলাট বলিলেই অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে উপাধিদানের আশা দিলে ইঁহারা ৫০ হাজার টাকা হিসাবে—দেড় লক্ষ টাকা দিবেন।

পরদিন প্রভাতেই ছোটলাট যুবরাজকে আনিবার জন্য ডায়মণ্ড হারবারে গমন করিবেন—স্থির ছিল। সময় বুঝিয়া শিশিরবাবু বলিলেন, পরদিন হইতে—যে কয়দিন যুবরাজ কলিকাতায় থাকিবেন, ছোটলাট তাঁহাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন; সুতরাং তাঁহার আর সময় হইবে না; কাজেই সেইদিনই কাজ শেষ করিতে হইবে, কারণ, প্রতিষ্ঠানটি যুবরাজের আগমনের স্মারকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ছোটলাট কিরূপে অত অল্প সময়ে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে, জিজ্ঞাসা করায় শিশিরবাবু বলিলেন, পরদিন সকাল সাড়ে ৬টায় ছোটলাট ডায়মণ্ড হারবার যাত্রা করিবেন—ছোটলাট যদি এই কয়জনকে সকাল ৬টার মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র দেন, তবে তিনি (শিশিরবাবু) আর সব ব্যবস্থা করিবেন।

প্রস্তাব শুনিয়া ছোটলাট বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, শিশিরবাবুর প্রস্তাব আদ্যন্ত ভুল, তিনি যাঁহাদিগকে চিনেন না সেই অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে—প্রদেশের রাজ্যপাল হইয়া কিরূপে লিখিবেন, তাঁহারা আসিয়া কার্যসিদ্ধির জন্য ৫০ হাজার টাকা করিয়া দিয়া যাউন? শিশিরবাবু কিন্তু কাজটি

যাহাতে হয়, সেজন্য বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন এবং এই সুযোগ ত্যাগ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। তিনি ছোটলাটকে বলেছিলেন, ঐ কয়জন রাজ্যপালের আমন্ত্রণ পাইলে সাগ্রহে আসিবেন এবং তিনি পরদিন প্রত্যূষে বেলা ৬টার পূর্বে তাঁহাদিগকে লইয়া আসিতে পারিবেন।

তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। শীতের রাত্রি; শীতও প্রবল। শিশিরবাবুর জয় হইল; ছোটলাট ঐ কয়জনকে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র শিশিরবাবুর হাতে দিলেন। পত্র লইয়া শিশিরবাবু সেই রাত্রিতে প্রবল শীতে তাঁহাদিগের গৃহে গৃহে গমনের জন্য যাত্রা করিলেন। মনে রাখিতে হইবে, সে সময়ে মোটরযান হয় নাই—ঘোড়ার গাড়ীই গমনাগমনের জন্য ব্যবহৃত হইত। শীতকাল, পথে গ্যাসের আলো। অদম্য উৎসাহে তিনি আলিপুরে ছোটলাটের বাসভবন হইতে বাহির হইয়া ঐ ব্যক্তি তিনজনের গৃহে গৃহে গমন করিয়া ছোটলাটের পত্র দিয়া আসিলেন এবং বলিয়া আসিলেন রাত্রি ৪টার সময় যাত্রা না করিলে প্রত্যূষ ৬টার মধ্যে ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

যে কথা—সেই কাজ। শিশিরকুমার রাত্রি ৪টার মধ্যে ঐ ব্যক্তিত্রয়কে লইয়া অন্ধকার শীতের রাত্রিতে আলিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভৃত্যদিগকে নির্দেশ দেওয়া ছিল, শিশিরকুমার আসিলে তাঁহাকে ও তাঁহার সহগামী-দিগকে ছোটলাটের শয়নকক্ষের সম্মুখস্থ বারান্দায় বসিতে দিতে হইবে।

আগন্তুকরা সেই শীতে বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি শেষ হইল—দিবালোকবিকাশ হয়-হয় এমন সময়ে ছোটলাট চক্ষু মুছিতে মুছিতে দ্বার মুক্ত করিয়া বারান্দায় আসিলেন, দেখিলেন—শিশিরকুমার ৩ জন অপরিচিত ব্যক্তিকে লইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ছোটলাট কণ্টস্বীকার করিয়া, রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহারা আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহারা যে দেশে কারিগরী শিল্প-বিস্তারের জন্য অর্থ দিতেছেন সেজন্য প্রশংসা জ্ঞাপন করিলেন। ধনপত সিংহ পাকা ব্যবসায়ী ও বিশেষ সতর্ক লোক। তিনি টাকার প্রতিশ্রুতি দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; কারণ, তিনি পূর্বে ঐ টাকা বহরমপুর কলেজে দিবেন বলিয়া জিলার ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইলে ম্যাজিস্ট্রেট যদি অসন্তুষ্ট হ'ন! শিশির-বাবু আপনি জিলার ম্যাজিস্ট্রেটকে "বাস্তু দেবতা" বলিতেন। তিনি ধনপত সিংহকে বলিলেন, জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ছোটলাটের অধীনস্থ কর্মচারী, সুতরাং ছোটলাটকে টাকা দিলে ম্যাজিস্ট্রেট রুষ্ট না হইয়া তুষ্টই হইবেন। তখন ধনপত সিংহের সংকোচ ও সন্দেহ দূর হইল। হরিশবাবু ৪৫ হাজার এবং ধনপত সিংহ ও লছমীপত সিংহ প্রত্যেকে ৪০ হাজার টাকা দিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কার্যসিদ্ধি করিয়া শিশিরবাবু ঐ ৩ জনকে লইয়া লাট-ভবন ত্যাগ করিলেন। ছোটলাট যুবরাজের সহিত সাক্ষাতের জন্য "রোটাস" জাহাজে যাত্রার আয়োজন করিলেন।

ইহা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনা।

পরদিন অপরাহ্নে যুবরাজ কলিকাতায় প্রিন্সেপঘাটে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। কলিকাতায় সমারোহ আরম্ভ হইল। কলিকাতা তখন বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী। সামন্ত রাজ্যসমূহের

শাসকরা যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠকরা যুবরাজের কলিকাতায় অবস্থানকালীন ঘটনাদির বিবরণ রাসেলের পুস্তকে পাইবেন। এই প্রসঙ্গে কবি হেমচন্দ্রের কবিতা উল্লেখ করিতে হয়—

"কোথা নৃপকুল নবাব আমীর,
রাজদরবারে হও হে হাজির,
করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা—
ছাড়ি সাচ্চা জুতা চুণীপান্না গাঁথা
বিলাতী বুটেতে পদ সাজাও

* * *

ভাব মোক্ষফল—রাজদরশন,
ভারতে দেবতা বৃটেন এখন
সেই দেবজাতি-মহিষীনন্দন
দরশনে পূর্বপাপ ঘুচাও।"

কলিকাতার উৎসবের আনন্দে রাজপুরুষেরা ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত। কিন্তু শিশিরকুমার জানিতেন—লোহায় যদি কিছু গড়িতে হয়, তবে তাহা উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতে তাহাতে আঘাত করিতে হয়। তিনি ছোটলাটকে বুঝাইলেন, যখন যুবরাজের কলিকাতায় আগমন স্মরণীয় করিবার জন্য কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তখন কলিকাতায় যুবরাজের উপস্থিতি কালেই তাহা ঘোষিত হওয়া সংগত। তিনি ছোটলাটকে ২৩শে ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার গৃহে এক সভায় সভাপতি হইয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও যাঁহারা সেজন্য টাকা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করিতে বলিলেন। সংবাদ প্রচারিত হইল। কলিকাতার জমিদার সভার (বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের) সদস্যরা শিশিরকুমারের মত একজন সাধারণ লোকের এই সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া সভায় আসিলেন না।

এদিকে ছোটলাট তাঁহার শরীররক্ষীদল পরিবেষ্টিত হইয়া ছোটলাট-ভবন হইতে ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত অশ্বারোহণে আসিয়া তথায় স্থানসঙ্গ অপেক্ষমান শিশিরকুমারের আনীত যানে আরোহণ করিয়া সভাস্থলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সভায় সভাপতিরূপে ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল দাতাদিগকে অভিনন্দন করিয়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলেন। যুবরাজের নামানুসারে বিদ্যালয়ের নামকরণ হইল—"এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স"। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় প্রথম কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইল—ধনীদিগের অর্থে, প্রকৃত জননেতার চেষ্টায়।

বিদ্যালয়টি এখনও জীবিত—কিন্তু জীবন্মৃত অবস্থায় চীৎপুর রোড ও নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে একটি গৃহের দ্বিতলে রহিয়াছে।

এই বিদ্যালয়ের জন্য সংগৃহীত অর্থের কতকাংশ পরে—ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার যখন ভারতে প্রথম বেসরকারী বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন সেই "এসোসিয়েশন ফর দি কালটীভেশান অব সায়েন্স" প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়। এই অর্থ-সাহায্য না পাইলে মহেন্দ্রলালের চেষ্টা অর্থাভাবে ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

শিশিরকুমার যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তদনুসারে অবশিষ্ট টাকা এখনও ন্যাসরক্ষকরা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—তাহার সুদ ও ছাত্রদের বেতনের টাকা হইতে বিদ্যালয় পরিচালিত হয়।

বিদ্যালয়ের কাজ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধভাবে চলিতেছে। কাজেই পরিবর্তিত রাজনীতিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার যদি উহা গ্রহণ করিয়া ঐ বিদ্যালয়ের অবশিষ্ট অর্থ ও অতীত অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করেন—উত্তর কলিকাতায় একটি পূর্ণাঙ্গ কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তবে শিশিরকুমারের অভিপ্রায়ানুযায়ী কাজ করা হইবে—বহু লোক কারিগরী শিক্ষা লাভ করিয়া অন্নার্জনের পথ পাইবে—বেকার-সমস্যা সমাধানের একটি উপায় হইবে—শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ শিল্পীর অভাব দূর হইবে।

সরকার মহেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠানটির ভার লইয়া উহা যাদবপুরে স্থানান্তরিত করিয়া উহার আবশ্যক বিস্তার সাধন করিয়াছেন। শিশিরকুমারের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম কারিগরী বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

জানেন কী?

উত্তর

১। পুরুষ সাধারণতঃ ৪০ বৎসরে এবং নারী সাধারণতঃ ৫০ বৎসরে।

২। মশা প্রতি সেকেণ্ডে ১০০ ইঞ্চি উড়তে পারে—অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ছয় মাইল।

৩। আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদ এবং আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা হ্রদ—উভয়ই লম্বায় ৪০০ মাইল।

৪। চীন দেশে।

৫। সিলিকা—বালি জাতীয় জিনিষ।

৬। হাইড্রোজেন।

৭। গড়পড়তা ৮·৩ মিনিট।

৮। না, টিকিটের উপর সই ও তারিখ দিতে হয়।

৯। যে সব মুসলমান মক্কায় তীর্থযাত্রা করে ফিরে আসে।

১০। ওসলো, ইরান, ইস্তাম্বুল, ইরাক, স্পেন, ইথিওপিয়া, কোরিয়া, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড।
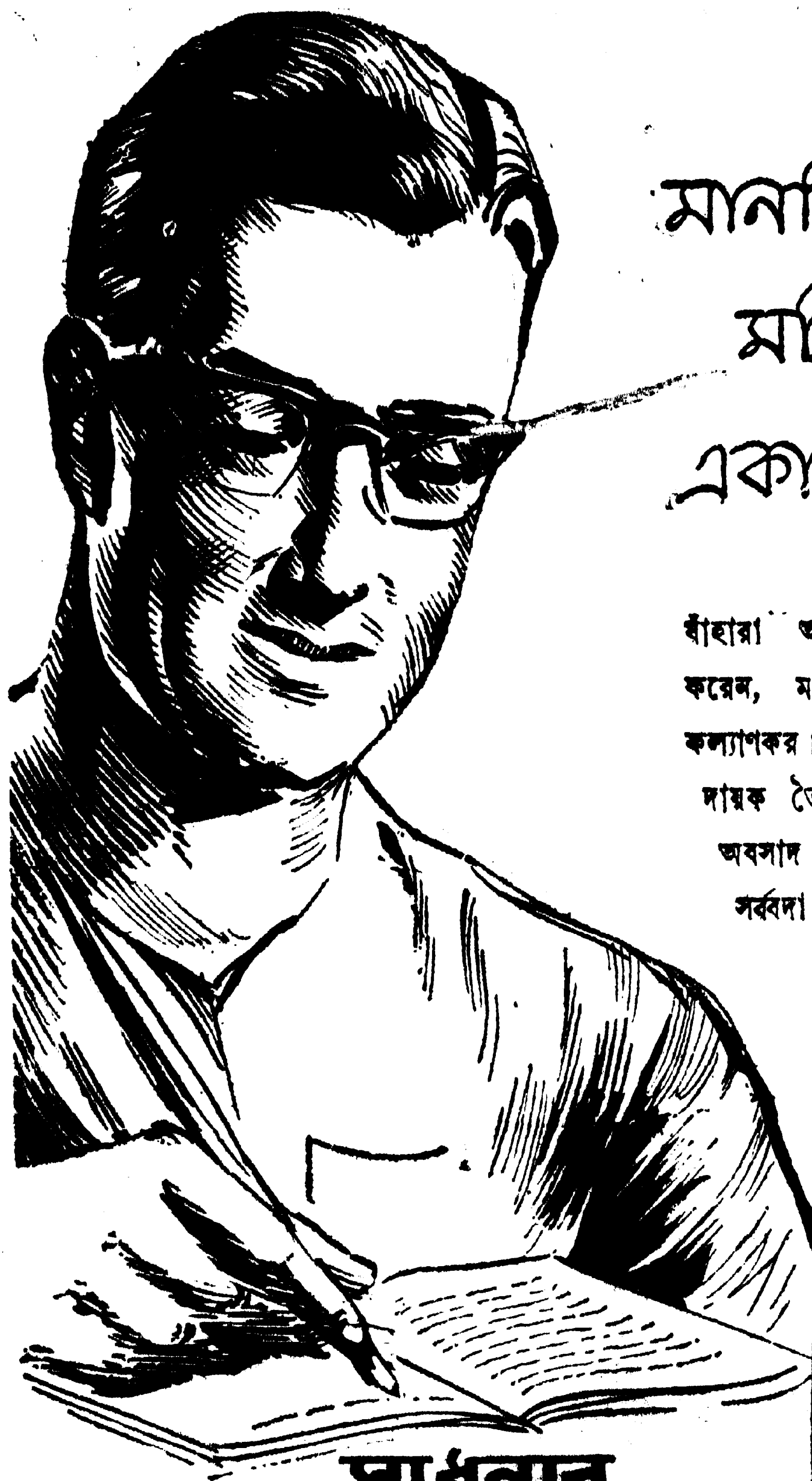
বিবাগী ভ্রমর
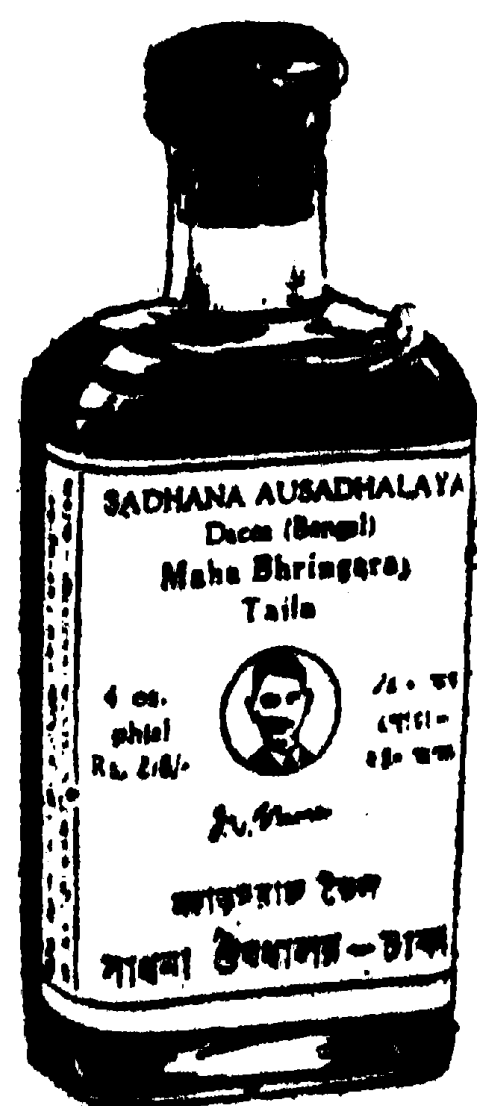
প্রবোধকুমার সান্যাল

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— দশ —

বোম্বাইয়ের কাজে এবার চাপ ছিল খুব বেশি। মনোযোগ ছিল প্রখর, সেই কারণে প্রায় মাস দুই কোথা দিয়ে কাটল অতটা হিসেব করিনি। এর মধ্যে বার তিনেক হেনার নামে টাকা পাঠিয়েছি, এবং সেই টাকার রসিদও যথাসময়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু এর মধ্যে যতগুলি চিঠি হেনা লিখেছে, কোনটিতেই টাকা প্রাপ্তির স্বীকৃতি নেই! কেবল একখানি পত্রে সে ইঙ্গিত করেছিল, এ বাড়িতে যতদিন আছি, ততদিন এ ঘরকন্নার দায়িত্ব আমার। তুমি যখন ফিরবে তখন তোমার।

হেনা আমাকে চিঠি দিচ্ছিল সপ্তাহে দুখানা—আমি লিখি আর নাই লিখি। সে বলছিল, দায়িত্ববোধ যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, তবে সেইটিই আমার বন্ধন। ভূতকে চোখে দেখা যায় না বটে কিন্তু তার বোঝাও আছে, তার ব্যাগার খাটাও আছে। আমি সর্বপ্রকার বৈষয়িক জীবন থেকে ছুটি চাই। আমার মনের স্বচ্ছন্দ অবকাশ কোথাও ক্ষুন্ন হবে এ আমি বরদাস্ত করব না। যেখানেই তোমার মোহ, সেখানেই তোমার বন্ধন, সেখানেই চিত্তের বিরোধ। মুক্তি আমি আজও পাইনি, পার্থ।

চিঠি দিয়ে জানতে চাইলুম, কা'কে বলছ মুক্তি?

হেনা লিখল, অভ্যস্ত ভাবনার পথ মুক্তির পথ নয়। স্বামী আর সন্তানের নিত্যভাবনা নিয়ে যে-মেয়ে দিন কাটায়, সে নিজের জালে বন্দী। ভালবাসার দ্বারা ঘরকন্নাকে সে সুন্দর করে বটে, কিন্তু বৃহত্তর ও ব্যাপকতর জীবন তার কাছে বঞ্চিত হয়ে রইল। প্রেমে মুক্তি নেই, কেননা ওটাও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। যখনই শুনি যৌবনের কতকগুলি স্বাভাবিক ধর্মের কথা, অমনি গা ঘিন ঘিন করে। প্রকৃতির তাড়নায় যে-রস-গদগদ ভাবটি বিকল্পে ভালবাসা নাম নেয়, সেটি জান্তব, সেটি জৈব। ওই অশুচি মনোভাবটি মুক্তিবিরোধী। দেহ থাকলেই মোহ, মানি বৈকি। কিন্তু আত্মাকে পিছনে ফেলে দেহকে এগোতে দেব না,—তার চেয়ে পাপ আর কিছু নেই। তুমি যখন আমার সামনে থাক, মনে হয় আমরা একই মন, দেহ আমাদের হারিয়ে যায়। সেই কারণে তোমার কাছে বসলেই আমি যেন অনন্ত মুক্তির আস্বাদ পাই।

যার চোখ আছে সেই দেখবে হেনা আমাকে তিল তিল ক'রে গড়ে তুলছে। রক্ষণশীল মনোবৃত্তির নামে আমার ভিতরে ছিল অনেক বক্রতা, নানান্ ভাবজটিলতা, বহুবিধ তির্যক চিন্তাভ্যাস। আজ সেগুলোকে সহসা যেন খুঁজে পাইনে। কেউ যদি নির্বোধের মতো বলে, হেনা আমাকে তার প্রাণাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করছে, নিরন্তর পুড়িয়ে পুড়িয়ে আমাকে অঙ্গারে পরিণত করছে,—তবে সে ভুল করবে। আমার মনের গুহায় গহ্বরে অন্ধকারে অনেক নিশাচর জীবের আনাগোনা ছিল; অনেক ছিল ফাটল, অনেক খানাখোন্দল,—আমি নিজেও যেগুলোর সন্ধান জানতুম না। হেনা আলো ফেলেছে তাদেরই পরে, তারা দৃশ্যমান হয়েছে, তারা বিশ্লেষণের মধ্যে এসেছে। ছোট লোভ, ছোট অসংযম, ছোট ছোট চিত্তবিকার ও বক্রতা, তারা অন্ধকারে চামচিকা-বাদুড়ের মতো উড়ে বেড়িয়েছে আমার চিন্তার আনাচে-কানাচে—যেমন তারা প্রাচীন ভগ্নাবশেষের আশে-পাশে ঘোরে,—তারা আজ আলোকিত হয়েছে, এবং আমি তাদেরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

একখানা চিঠিতে আমি লিখলুম, তোমার আমার সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হোক হেনা, কেননা এর মধ্যে কোনও দায়, কোনও উদ্বেগ নেই,—আসক্তির দ্বারা উভয়ের পথ অবরুদ্ধ নয়, বেদনায় ভাবনায় এ সম্পর্ক আতুর নয়। দূরে গেলে ব্যাকুলতা নেই, কাছে এলে আকুলতা নেই। এ সম্পর্ক আমাদের নিত্যমধুর।

হেনা লিখল, শোনো, এ একটা অন্য কথা। সব চিহ্ন মুছে দিতে হবে, এমন কি আমার পিছনের পায়ের চিহ্নও। যশিদির বাড়িখানা তোমার, কেননা ওর বাগানের প্রতিটি রক্তগোলাপে তোমার হৃৎপিণ্ড জড়ান। আমার গানে তোমার আনন্দ মিলে অনেক জ্যোৎস্না তাদের নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছিল! রাগ করো না পার্থ, ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়ি বিক্রি হচ্ছে তোমারই জন্যে, কেননা তুমি চিরদিন চাকরি করবে, এ ইচ্ছা আমার নয়। তা ছাড়া আরেক কথা, জীবন দিয়ে যা অর্জন করিনি, যার জন্য চোখের জল, কপালের ঘাম আর বুকের রক্ত খরচ করিনি, সেটাকে নিজের ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া যথেষ্ট সম্মানজনক নয়। তোমার অনুমতি পেলে আমি আনন্দিত হই।

বুঝতে পারা গেল হেনা তার কলকাতার পাট তুলে দিতে চাইছে। তার মনে কোন্ ভাবনাটা কাজ করছে সেটা সুস্পষ্টভাবে জানিনে, কিন্তু সেটি সাধারণও নয়, সামান্যও নয়। আমি উদ্বিগ্ন হব না তার জন্য, আমার দুর্ভাবনার দ্বারা তার বিচার-বুদ্ধির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করব না। সে বিকশিত হোক তার নিজের পথ দিয়ে, তার ভাবনার বৈশিষ্ট্যে।

হঠাৎ হেনা চিঠি বন্ধ করল।

দুই সপ্তাহকাল অবধি তার [illegible] খবর পেলুম না। পর পর [illegible] দিলুম, জবাব এল না। [illegible] থেকে ঔৎসুক্য, দুর্ভাবনা,

কোনটাই প্রকাশ করা চলবে না। হেনা যেখানে থামল, আমাকেও সেইখানে থামতে হবে। আমার আকুলতা তার পথের কাঁটা না হয় সেদিকে আমি সতর্ক ছিলুম। সে থাকবে শুধু আমার চিন্তায় আর কল্পনায়। তার গতিবিধির কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠাব,—এই প্রভুত্বের লোভ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি চুপ করে রইলুম।

হঠাৎ এক চিঠি এল সুরমার কাছ থেকে : ছোড়দা, এ বাড়ির সংগে তোমার কতটুকু সম্পর্ক আমি আজও বুঝতে পারলুম না। হেনাদি নিজের মনে বসে কত রকমের লেখাপড়া নিয়ে কাজ করছে, যখন তখন চিঠিপত্র টাইপ করছে, কখনো বা কাগজপত্রের ফাইল নিয়ে কোথায় যেন ঘুরে আসছে। আজ ক'দিন হল তোমার ঘরে একটা নতুন স্টীলের আলমারি বসিয়েছে, বোধহয় টাকাকড়ি রেখেছে। একদিন জানলা দিয়ে তার ঘরে দেখলুম, সে চোখের জল মুছছে। একদিন আমাকে বলল, জেনো ছোড়দাই যত নষ্টের মূল, সুরমা, সে আমার মৃত্যুর মতো। তুমি কবে আসছ জানিয়ো। আমার যেন ভাল মনে হচ্ছে না। হেনাদি বোধ হয় কোথাও চলে যাবে। তার মুখে চোখে যন্ত্রণার চেহারা দেখতে পাই।

চিঠিখানা পড়ে কোথায় কি যেন একটা লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠল। চুপ করে চেয়ে দেখলুম, অনেক উঁচুতে দাউ দাউ ক'রে উঠল সেই আগুন। না, ওটা আমার মতিভ্রম। আমি যত নষ্টের মূল, একথাটা উপলব্ধি করতে পারি। আমি আবাল্য লোহার কাছিতে বাঁধা। সেই বাঁধনে নৌকাখানা নোঙর করা। ঝড় এসেছে জীবনে, তুফান উঠেছে দরিয়ায়, এপারে ওপারে দূরে তটপ্রান্তের রেখা দেখা যায় না। কিন্তু যে-নৌকা কখনও ঘাটে বাঁধা থাকবে না, অদৃশ্যের সঙ্কেতে যাকে দিকচিহ্নহীন অকূলে ভেসে যেতে হবে,—সে ওই লোহার কাছির দুঃসহ বন্ধনে উৎপীড়িত হয়ে মাথা কুটছে তটের ধারে। তার মুক্তি নেই।

এমন সময় আমার কাছে সরকারি চিঠি এল, সামনের মাসের দুই তারিখে পার্চেজিং কমিশনের কাজে দুই সপ্তাহের জন্য আমাকে লণ্ডনে যেতে হবে। পত্রপাঠ আমার প্রস্তুত হওয়া দরকার, দিল্লীর মতো নিয়ে আমাকে যেতে হবে।

মন্দ কি, হেনা যদি আমার সংগে যায়? বিদেশের নামে হয়ত তার কতকটা উদ্দীপনা দেখা দিতে পারে! প্রায় সপ্তাহখানেক এখনও সময় আছে। তাড়াতাড়ি চেষ্টা করলে হয়ত ছাড়-পত্রাদির ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সেইদিনই সন্ধ্যার প্লেনে আমি কলকাতার দিকে রওনা হলুম। দম-দমে এসে যখন পৌঁছলুম, রাত অনেক।

সুটকেস আর ব্যাগ হাতে নিয়ে বাড়ির দরজায় গাড়ি থেকে নেমে যখন দাঁড়ালুম, বুড়িপিসি ঘুমচোখে দরজা খুলে দিল। হাসিমুখে বললুম, ভয় নেই বুড়িপিসি, খেয়ে এসেছি।

শোন' কথা!—বুড়িপিসি বলল, বলে, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি! কেউ কি খাওয়াবার কর্তা? বল না কেন, পাঁচ মিনিটে দিচ্ছি ডিমের ডাঁল্লা! হেনা যে বিলিতি উনুন এনেছে তোমার জন্যে! বোতাম টিপলেই হল, একেবারে দপদপিয়ে আগুন জ্বলে উঠবে।

জুতো ছেড়ে ঘরে ঢুকলুম। সুরমা জেগে উঠেছিল। ওঘর থেকে দৌড়ে এসে বলল, আর দুদিন আগে এলে না ছোড়দা, হেনাদি পরশু সন্ধ্যাবেলা চলে গেল!

ও, তাই নাকি?

হ্যাঁ গো ছোড়দা!— সুরমা বলল, চিরকাল খেয়ালী মেয়ে, জান ত? নিজের ঘরটা পর্যন্ত এলোমেলো করে রেখে গেল, চারদিকে সব ছড়ানো। ঠিক যেন ছোট ছেলের খেলাঘর। আমি ওর ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছি ছোড়দা।

আমি ধড়াচুড়ো ছেড়ে একখানা ধুতি জড়িয়ে যখন স্থির হয়ে একটু কললুম, সুরমা একগোছা মোটা ব্যর্ন সিন্দুরের চাবি এনে আমার সামনে রাখল। বলল, এই নতুন আলমারির চাবি, তোমার জন্যে রেখে গেছে!

এদিক ওদিক তাকিয়ে বললুম, ব্যাপার কি বল্ ত? নিজের ঘর নিজেই যেন আর চিনতে পারছিনে! নতুন পালঙ্ক, চেয়ারের সেট, মেঝের পার্শি-য়ান কার্পেট, দেয়ালে অয়েল পেন্টিং, নতুন টেবিল, নধর বিছানা,—এ যে ভানুমতীর খেল্!

সুরমা হাসছিল। বলল, সব পাগলের কাণ্ড! হেনাদির কাজে কে বাধা দেবে বল? দুমাস ধরে এ বাড়ির সব গুছোলো। ওঘরে দেখগে, তোমার জামা-কাপড় রাখার জন্য একেবারে দেয়াল-জোড়া ওয়ার্ডরোব এনেছে! কাঁচের জিনিস এনে খাবারঘর গুছিয়েছে। বড় এক ঠিকাদারকে ধরে ইংরেজি বাথরুম বানিয়েছে,—সব দেখগে যাও।

যথাসম্ভব বিনয়সহকারেই বলি, আমার নিজের আর্থিক সঙ্গতি নেহাৎ মন্দ নয়। বাড়ির যে অংশটা আমার একার, সেটা নিতান্ত সামান্য নয়। দোতলায় পাঁচ ছয়টি বড় বড় ঘর, কোলের কাছে মস্ত দরদালান। বাড়ির সব দিক ঘিরে বারান্দা। কিছু গাছ-পালাও আছে। নীচের তলাটায় রয়েছেন একজন বড় সরকারি কর্মচারী, তিনি ইংরেজ আমলের রায়বাহাদুর। আস-বাবপত্রাদিও আমার সব ঘরে প্রায় ঠাসা। কিন্তু হেনা যে কাণ্ডটা করে গেল সেটি বিচিত্র। আমার ঘরের পুরনো সবকিছুর পরিচয়কে সে যেন দুহাতে সরিয়ে দিয়ে গেছে, প্রত্যেকটি ঘরের স্বভাব প্রকৃতি বদলিয়ে দিয়েছে, এবং তার জীবনে যে অপূর্ণ ইচ্ছাগুলিকে সে অপরিতৃপ্ত ক্ষুধার মতো লালন করেছিল, সে-গুলিকে প্রকাশ করে গিয়েছে এ বাড়ির এঘরে ওঘরে। সামনে সে আজ রইল না, আপন কৃতিত্বকে সে কোথাও কোনও সামগ্রীর মধ্যেই প্রচার করে গেল না। নিঃশব্দেই নিজের সত্য পরিচয়কে প্রকাশ করে সে চলে গেল, এবং যে অনুমান আমি করেছিলুম, সেইটিই পরদিন নির্ভুল প্রমাণিত হল। স্টীলের আলমারি খুলেই সামনে যে ফাইলটি চোখে পড়ল, সেটির থেকে প্রত্যেকটি রসিদপত্র উলটিয়ে দেখলুম, একটি সামান্য সামগ্রীও সে নিজের নামে কেনেনি। কিন্তু ওই আলমারিটির এক একটি টানা চাবি ঘুরিয়ে খুলে যা প্রথমেই চোখে পড়ল, তাতে আমার মন

শুকিয়ে উঠল। একসঙ্গে এত নগদ টাকা আমি কখনও দেখিনি। ভয়ে ও ভাবনায় আমি তৎক্ষণাৎ টানাগুলি বন্ধ করে দিলুম। এ কথা আমার কাছে আর অস্পষ্ট রইল না যে, ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়ি সে এটর্নীর সাহায্যে বিক্রি ক'রে ফেলেছে।

বুড়িপিসি জোর করে সকালবেলায় আমাকে তার বড় রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। তারপর ধমক দিয়ে বলল, বল্ তুই খোকন, তোর বাপের দিব্যি, এমনটি কোথাও দেখেছিস কিনা!

আমি বিলেত-ফেরৎ লোক—উত্তেজনায় বুড়িপিসি সেকথা ভুলে গেছে। কিন্তু তাকে খুশী করার জন্যেই বলতে হল, না দেখিনি।

মস্ত ক্যাবিনেট-ইলেকট্রিক উনুন। সমস্ত ঘরখানা স্টীলের পেটি দিয়ে বাঁধানো। জল ও খাদ্যসামগ্রী রাখার ব্যবস্থা মনোরম। সুরমা পিছনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সব বর্ণনা করছিল।

এবার বললুম, সব ব্যবস্থাপনার মধ্যেই ত তার আনন্দের চেহারা দেখতে পাচ্ছি! তা হলে খাবার আগে হেনা কাঁদতে বসেছিল কেন?

উত্তর দেওয়াটা সুরমা অথবা বুড়ি-পিসির পক্ষে সহজ ছিল না। আমার সংগে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সুরমা বলল, তোমাকে সত্যি বলছি ছোড়দা, হেনাদি আমার সংগে ভাল করে কথাও বলত না। এ বাড়ি সাজাবার জন্যে দিনরাত খাটত কিন্তু তখন কেউ কিছু বলুক দেখি, রেগে একেবারে আগুন! কারো মানা শুনত না।

হাসিমুখে বললুম, তোরা কেন বলতে পারলিনে, হেনাদি, এবাড়ি সাজাবার কোনও অধিকার তোমার নেই? তুমি পরের বাড়ির মেয়ে!

তুমি ঠাট্টা করছ বুঝি ছোড়দা? তার সামনে দাঁড়াবার সাধ্যি ছিল কারো? আমরা কি চিনিনে তাকে? তার অধি-কার কি সে জানে না?

এটা আবার কি রে?—আমি থমকিয়ে দাঁড়ালুম দর-দালানের মাঝ-খানে,—এত বড় দেরাজ, মাথার ওপর চাইমিং ঘড়ি, কোলের কাছে রেডিয়ো,—ভেতরে কি আছে রে?

ও, দেখনি এতক্ষণ?—সুরমা একটা সুইচ টিপল এবং দেখতে দেখতে ইলেকট্রিক গ্রামোফোনে ভিতর থেকে করুণে-মধুরে যে গানটি বেজে উঠল, সেটি শুনে চুপ করে দাঁড়ালুম। এ-গানটি হেনারই গলায় গীত হয়েছে; মাত্র কয়েক মাস আগে আমারই সংগে গিয়ে এই গানটি সে গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করিয়েছিল। আমি দাঁড়িয়েই রইলুম এবং সুরমাও সুইচ বন্ধ করল না। যশিদির বাড়িতে সেই শুক্লপক্ষের দিনগুলিতে এই গান কয়টি বড় যত্নে সে আমাকে শুনিয়েছিল।

ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলুম, হেনা কি যশিদি গেছে?

না ছোড়দা—সুরমা বলল, অনেক দিন আগে একবার দিল্লীর কথা বলছিল বটে। কী যেন সব কাজের কথা। একদিন হেনাদি আমাকে চোখ পাকিয়ে বললে, মনে রাখিস সুরমা,—যে-ব্যক্তি অর্জন করে না, দেশের অন্নে তার অধি-কার নেই! আমি বললুম, তুমি ত মেয়েছেলে হেনাদি, তোমার অন্ন সব জায়গায় বাঁধা। হেনাদি রাগ করে বলল, ওটা ক্রীতদাসীর ভাষা, ওটা অশ্রদ্ধেয়।

আমি সেখান থেকে সরে গেলুম।

এটি আমার পক্ষে দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা,— এমন মনে করা কোনমতেই সম্ভব নয়। ভালবাসার ভিতরে যে ভাববিহ্বলতার অংশটুকু আছে, সেটি কেন আমাকে উদ্বেলিত ক'রে তুলছে না আমি জানিনে। প্রকৃতপক্ষে হেনা কোনওদিন আমাকে তার উত্তাল তরংগ-ভংগের মধ্যে আনেনি। চোখের মধ্যে তার সম্মোহনী ছায়া দেখিনি কখনও,—কারণ তার পদ্মপলাশের মতো আয়ত দুই চক্ষু আমারই চোখের সামনে ধীরে ধীরে পরম রসমাধুরী লাভ করেছে। তার দেহশ্রীর সমৃদ্ধির উপরে আমার রসকল্পনা কোনদিন বাসা বাঁধেনি,—কেননা অপরিচয়ের অভিনবত্ব সেখানে ছিল না। সেই স্বাস্থ্যের ইমারৎ আমারই সামনে নির্মিত।

আজ হঠাৎ মনে হল, দুর্ভাগ্য নবেন্দু, প্রস্ফুটিত শতদলের পাপড়ি ছিঁড়ে দেখতে গিয়েছিল, মৃদুগন্ধের মূলকেন্দ্রটা কোথায়! মনে করেছিল দেহটাই একমাত্র বাস্তব, মন তার অনু-গামী মাত্র। কিন্তু দেহ যে সেই দুর্লভ মনেরই বাহন মাত্র, হতভাগ্য একথাটা বুঝতে না পেরে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল।

পায়ের চিহ্ন সে কোথাও রেখে যায়নি, এটি কৌতুকের বিষয়। পিছনে ফেলে গিয়েছে তার সব আনন্দের আয়োজন, তার একাগ্র বাসনার এক একটি উপকরণ, কিন্তু পথের নিশানা কোথাও রেখে যায়নি। শিল্প প্রাধান্য পেয়েছে, শিল্পী অদৃশ্য হয়েছে। এ-বাড়িতে হেনা কোথাও রাখতে চাইল না আপন স্বাক্ষর, আপন প্রাধান্য, আপন স্বকীয়তা,—তাই সে মহৎ হয়ে উঠেছে প্রত্যেকটি রুচিসম্পন্ন সৌখীন

দামগ্রীতে, প্রতিটি আসবাবসজ্জার পরিপাটি বিন্যাসে।

ব্যাকুলতা আমার নেই, উদ্বিগ্ন আমি হব না। চলতি বুলি এই কথা বলে, মেয়ের সম্বন্ধে পুরুষের স্বাভাবিক দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব কিনা আমি জানিনে। কিন্তু এই কথা কেন ভাবব, পুরুষ পাশে না থাকলে মেয়েরা সাধারণত বিপদের দিকে পা বাড়িয়ে ফেলে! আমি কেন তাকে পাহারা দিতে যাব,—সে ত' সম্পত্তি নয়! আবাল্য যাকে দেখে আসছি, জেনে আসছি—আজ ছুটব কেন তার পিছু পিছু? মন জানাজানি যেখানে সত্য, বিচ্ছেদ সেখানে নেই! হেনা আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, বরং নির্মল অনাসক্তির দিকে টানছে। সে সুন্দর হচ্ছে তার বৈরাগ্যে। মহৎ বন্ধুত্ব ক্রমেই তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। সে যেন নিত্যই কাছে আসছে অশরীরী আনন্দময়ীর মতো। আজ আমার শয়নকক্ষের সকলখানে যার অগণ্য প্রতীক চিহ্ন ছড়ান, তার দিকে চেয়ে আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমার চেয়ে আনন্দে কেউ নেই, কেননা আমার মধ্যে দিব্য বিভায় তুমি যে প্রকাশিত!

এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি দিল্লী রওনা হয়ে গেলুম। কিন্তু যাবার আগে হেনার পুরনো একাউন্টে তার অধিকাংশ টাকা এবং নানাবিধ অলঙ্কার-পত্রাদি একটি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে গেলুম। আমার হাতে সময় ছিল কম, নৈলে দিল্লীর এখানে ওখানে হেনাকে একবার খুঁজে দেখতুম।

কিন্তু খুঁজে দেখাটা আমার পক্ষে লৌকিক বিবেচনা ছাড়া আর কিছু নয়। খুঁজতে আমি চাইনে। সে সত্য হয়ে রয়েছে আমার স্থির চিন্তার মধ্যে। যখন খুশি আসুক সে কাছে, খুলে রেখেছি আমার সকল দরজা তারই জন্যে,—আবার যখন খুশি এবং যেখানে খুশি সে চলে যাক্। বাঁধব না তাকে কোনদিন। মন দিয়েও নয়, চিন্তা দিয়েও নয়। আমি তাকে ধরতে চাইনে, সে এসে ধরা দিক্, এ কামনাও করিনে।

দিল্লী থেকে একদিন বিমানযোগে প্রথমে সান্তাক্রুজ এবং পরে লণ্ডন রওনা হয়ে গেলুম।

কিন্তু পরবর্তী মাত্র দুই সপ্তাহকাল নয়, এক মাসেরও কিছু বেশিদিন আমি নিরুদ্দেশ হয়ে রইলুম। আমার কর্মতৎপরতা ছিল, ছুটোছুটি এবং তদন্তের নানাবিধ দায়িত্ব ছিল। লণ্ডনে তখনও বসন্তকাল এসে পৌঁছয়নি, শহর তখনও কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে, বাতাস তখনও তুহিন-মিশানো। কাজ শেষ ক'রে হোটেলেই বাকি সময়টা থাকতুম। অবসরকালে অভিযানের দিকে মন যেতো না। আমি নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ ছিলুম, বাইরের হুজুগ দিয়ে আপন শূন্যতাটাকে ভরিয়ে তোলবার চেষ্টা পেতুম না। হেনা আমাকে অনুপ্রাণিত করে রাখত।

একদিন আবার উড়ে এলুম বোম্বাই হয়ে পালামের বিমান-বন্দরে। পার্চেজিং কমিশনের দুটি লোক একগাছা শুকনো গাঁদাফুলের মালা নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, এবং তারা যখন আমার কোট-প্যান্টের ওপর সেই বিসদৃশ মালাটা চড়ালো, তখন নিজেকে কিম্ভুতকিমাকার মনে হতে লাগল। এবম্বিধ রুচিবিকারের সামনে হেনা যে উপস্থিত নেই, এইটি আমার সান্ত্বনা।

নতুন দিল্লীতে একটি বাড়ির পিছনের অংশ আমার জন্য বরাদ্দ ছিল। এটি বাগান-ঘেরা নিরিবিলি অংশ! তিনখানি ঘর এবং ডাইনিং হল এবং মাঝখানে ছোটখাট একটি লাউঞ্জ। সামনের অংশটার সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই। পাচক ও চাকর ছিল দুজন।

বাড়ি ফিরে চিঠি ও কাগজপত্রের তাড়া পেলুম। ওর মধ্যে একটি চিঠি ছিল হেনার। বিস্ময়ের কথা এই, চিঠির খাম এবং কাগজ আমারই নামের ছাপ-মারা। হিসেব করে দেখলুম, প্রায় তিন মাস পরে হেনার হাতের লেখা চিঠি পেলুম। হেনা লিখছে : তোমার এই দিল্লীর বাড়িতে দিনতিনেক কাটিয়ে গেলুম খুব আনন্দে। তুমি যে তোমার লোক দুটিকে আমার কথা বলে রেখে গেছ, এজন্য খুব তারিফ করলুম। ওরা আমার খুব যত্ন নিয়েছে। ওদের বকশিস দিয়ো। লণ্ডন থেকে তুমি ক্লান্ত হয়ে ফিরবে আমি জানি, নৈলে আমার ওখানে তোমাকে নেমতন্ন ক'রে যেতুম। একটু সময় করে উঠতে পারলে আমারই আবার আসবার ইচ্ছা রইল। সম্প্রতি এক টাকা বেতনে আমি একটি সরকারি কাজ নিয়েছি। গঙ্গার ধারে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছি। তুমি যেন রাগ করো না, পার্থ।

ঠিকানা দিয়েছে কানপুর জেলার অন্তর্গত এমন একটি গ্রামাঞ্চলের, যার নাম কখনও শুনিনি। মাত্র সাতদিন আগে হেনা এসেছিল।

খানসামা এক সময় এসে গরম গরম একবাটি কফি ও কয়েকটা বাদাম দিয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল, হেনা ঠিকই বলেছে, আমি বড়ই ক্লান্ত। সেইজন্য জুতো ও জামা খুলে আমি গিয়ে কাউচের উপর গা এলিয়ে দিলুম। চোখ বুজে অনুভব করলুম, শূন্যেরও মস্ত একটা বোঝা মানুষকে অনেক সময় বইতে হয়! কিন্তু আমি ঠিক যেন বুঝতে পারলাম না, আমার জীবনটা একটা অর্থহীন মহাশূন্য হয়ে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিনা। আমার এই অন্তহীন শূন্যতার জন্য হেনার বিবেকের মধ্যে কি কোনও দংশন নেই? তার ওই নির্মম বৈরাগ্য কি আমার জীবনযাত্রাটাকে অর্থহীন করে তোলে নি? আমার চিন্তাধারা আজ হঠাৎ যেন পথ ঘুরে দাঁড়াল।

চট করে উঠে বসলুম কেমন একটা বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ায়। একটি বাদাম মুখে দিয়ে গরম কফিতে চুমুক দিলুম। আমি শ্লথপ্রাণ, এতে সন্দেহ নেই। আমি যে বঞ্চিত নই, উপেক্ষিত নই,—এটি বিশ্বাস করার জন্য যে মহৎ শিক্ষার প্রয়োজন, সেটি আমার নেই। আমার বুকভাঙ্গা ব্যথার নৈবেদ্য সে যদি কখনও অবহেলা করে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত, তবে বুঝতাম আমি সত্যিই বঞ্চিত! কিন্তু যে-মেয়ে আমার চির-

জীবনের সঙ্গী, আজ ক্লান্ত মনে তার উদ্দেশে অভিমান জানিয়ে নিজেকে কেন ক্ষুদ্রচিত্ত করে তুলি। ধিক্কার দিলুম নিজেকে।

কফির পেয়ালা শেষ করে আমি টেলিফোন ধরলুম আমার পরিচিত দর্জির দোকানে। ওদের একজনকে এখনই আসতে বললুম। খানসামা আমার শোবার ঘরে সুটকেসটি রেখে এল, জুতো জোড়াটা ঝেড়ে মুছে রাখল। পাচক এসে রাত্রির রান্নার হিসাব নিয়ে গেল।

শোবার ঘরটি তালাবন্ধ ছিল। খানসামা এসে খুলে দিল। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ল হেনার হাতের চিহ্ন। আসবাবপত্রগুলি একটু এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করে সে রেখে গেছে। এক জোড়া নতুন ডিজাইনের চপ্পল হঠাৎ চোখে পড়ল—এটি কানপুরের প্রসিদ্ধ বস্তু। বছর চারেক আগে আমার প্রথম বিলাত যাবার প্রাক্কালে হেনা তার ক্যামেরায় আমার একটি ছবি তুলেছিল, সেইটি আজ দেখছি রূপোর ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমার ঘরে ম্যান্টেল্‌-পিসের ওপর দাঁড় করানো। ঘরের মধ্যে ভুরভুর করছে কেমন যেন বাসি ফুলের গন্ধ। বৌদির বাড়িতে হেনা স্নান করে এসে দাঁড়ালে এই সুগন্ধটিই তার বাতাবরণে পাওয়া যেত। বুঝতে পারা গেল, হেনা এই ঘরটিতেই তিনটি দিন কাটিয়ে গেছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঞ্জাবী দর্জি এসে সেলাম ঠুকে হাসিমুখে দাঁড়াল। সেদিন বিলেত যাবার আগে এরাই আমাকে রাতারাতি একটি সুট বানিয়ে দিয়েছিল। আমি পাচক ও খানসামাকে ডেকে তাদের গায়ের মাপ নিতে

বললুম। ওরা একটু অবাক হল বটে, কিন্তু আমি প্রথমেই জানিয়ে দিলুম, যে-মেমসাব তোমাদের এখানে 'মেহমান' হয়েছিলেন, এ তাঁরই 'নজরানা'। ওদের আনন্দিত মুখের উপরে হেনারই দিব্যবিভাকে দেখে নিলুম এবং দর্জি ওদের গায়ের মাপ নিয়ে চলে যাবার পর আমি কুড়িটি টাকা ওদের হাতে বকশিস দিয়ে পুনরায় আমার ঘরে এসে দাঁড়ালুম!

চিঠির তাড়ার মধ্যে বাড়ির চিঠি ছিল দুখানা। খুড়িমা লিখেছেন, এ বাড়ির জন্যে ভাবিসনে। এখানকার খবর ভাল। রায়বাহাদুর দু মাসের ভাড়া দিয়েছেন, আমার কাছেই আছে। সুরমা শ্বশুরবাড়ি গেছে। বুড়িপিসি আমার এখানেই রান্নাবান্না করে। রাত্রে ও বাড়িতে শোয়।

দ্বিতীয় চিঠিখানা সুরমার। সে লিখছে, তোমার জন্যে আর আমি মুখ দেখাতে পারছিনে, ছোড়দা। কথায় কথায় অত বিলেত যাচ্ছই বা কেন? তবে কি আমার শ্বশুর যা সন্দেহ করেন তাই সত্যি? তুমি কি চৌধুরী বংশে কলঙ্ক মাখাবে এমনি করে? এই সেদিন হেনাদির একখানা চিঠি পেয়েছি। নিজের ঠিকানা দিতে সে ভুলে গেছে। আমার ছোট ছেলেটা খামখানা এমন নোংরা করে ফেলল যে, বুঝতেই পারলুম না হেনাদি কোন্ রাজ্যি থেকে চিঠি লিখল! যাই হোক, হেনাদি আবার প্রস্তাব করেছে অনিমাদির ছোট বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা! অনিমারা আমার খুড়তুতো ননদের মাসতুতো বোন, এদিকে আবার শাশুড়ীর সম্পর্কে ভাইঝি। একেবারে আপনাআপনি ঘর। তুমি আর অমত করো না, ছোড়দা। অন্তত হেনাদির কথাটাও রাখ। তোমার ভগিনপতি তোমার নামে নানা কথা শুনতে পাচ্ছে! তার মানসম্ভ্রম যেন থাকে, ছোড়দা। আমাকে যেন দড়ি-কলসী কিনতে না হয়!

সুরমার শ্বশুরবাড়িতে দু-চারবার আমি অবশ্য গিয়েছি। ওদের অবস্থা একটু ভাল, তবে হাতের মুঠো কিছু শক্ত। প্রত্যেক গরমকালে সুরমাদের কষ্ট হয়, সেজন্য গত বছর আমি কয়েকখানা ইলেকট্রিক পাখা ওদের বাড়িতে উপহার পাঠিয়ে ছিলুম। এখন দেখছি সুরমার ঘরের পাখাখানা না দিলেই পারতুম! কেননা ওর ঘরের কড়ি-কাঠে যে লোহার আংটা লাগানো আছে, তাতে মোটা দড়ি বেঁধে ঝুলতে পারলে আর কলসীর দরকার হত না।

এটা না হয় আমার আক্রোশ, কিন্তু পোড়ারমুখী সুরমা আজও এম-এস-সি পাস করা ঝানু মেয়ে শ্রীমতী হেনার পরিহাসটি অনুধাবন করতে পারেনি, এটিতে আমি সান্ত্বনা লাভ করলুম। হেনা আমাকে জানে, এবং ভাল করেই জানে। কিন্তু মেয়েমানুষ তার সামাজিক আবরণটি বজায় রাখার জন্য অনিমার ছোট বোনটিকে সামনে ধ'রে দিচ্ছে,—হেনার এই কূটবুদ্ধিটুকু আমি যে অনেকবার সানন্দে তারিফ করেছি! হেনা জানে, অনেক অগ্নি-পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছি।

সমস্ত রাত জেগে সুদীর্ঘ পত্র লিখলুম হেনার কাছে। কিন্তু পরদিন দপ্তরে গিয়ে ডাকে দেবার সময়টিতে চিঠিখানা বার করে কুচিয়ে ছিঁড়ে ফেললুম, এবং বিকালে সব কাজ গুছিয়ে আপিস থেকে বেরোবার আগে সহকারী সেক্রেটারীকে ব'লে এলুম, অনেক ছুটি আমার পাওনা,—দিনকয়েক বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি দিল্লীর বাইরে। সর্দারজিকে অনুরোধ জানিয়ো, তিনি যেন ছটফট না করেন!

আপনি কি অসুস্থ, স্যর?

ভয়ানক অসুস্থ! হয় মাথার ব্যথা, নয় বুকের গণ্ডগোল। যদি দরকার লাগে আমি মেডিক্যাল্ সার্টিফিকেট্ পাঠিয়ে দেবো।

আপিস থেকে বেরিয়ে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলুম। আমার খাবার কথা শুনে বাবুর্চি লেগে গেল নৈশভোজের আয়োজনে। কানপুরের গাড়ি রাত দশটায়।

তরুণ বয়সে একদিন ভাবতুম, জীবনকে গড়ে তুলব! কিন্তু সেটা কেমনতরো জীবন, চোখের সামনে স্পষ্ট হত না। আজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে যে-জীবনটায় দাঁড়িয়েছি, এটার দিকে নিজেই একদা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতুম। কিন্তু আজ জীবনের সকল ব্যাখ্যাই গিয়েছে বদলিয়ে। সেই আমার হারানো পুরনো দিনের কল্পনা তার অনেক অর্থ হারিয়েছে! কাজ গ'ড়ে তোলাটাই আজ বড়, নিজকে গ'ড়ে তোলাটা অকিঞ্চিৎকর। চাকরি করলে মাইনে পাই, বড় চাকরি করলে প্রতিষ্ঠা পাই, ক্ষমতায় উঠে দাঁড়ালে প্রতিপত্তি পাই,—কিন্তু সেই ব্যাপকতর, বৃহত্তর, বিরাটতর জীবন-রচনার নির্দেশ চাকরির মধ্যে পাই কি? হেনা যে মাত্র এক-টাকা মাইনেতে সরকারি কাজ নিয়েছে, সেটা কেমন, এ আমার জানা দরকার বৈকি। ট্রেনে শুয়ে এই সব এলোমেলো কথাই ভাবছিলুম।

প্রভাতকালে এসে নামলুম কানপুরের সুদৃশ্য ষ্টেশনে।

ওখানেই স্নানাদি সেরে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলুম। কিন্তু সত্যই যখন আমার সামনে চায়ের সঙ্গে আহার্য সামগ্রী এসে পেঁছিল, তখন একটা খেলো ধরণের মনোবিকার আমাকে পেয়ে বসল। মনে পড়ে গেল কয়েক মাস আগে পাটনা ষ্টেশনের কথা। টসটসে আঙুরের রসে সিক্ত হেনার আরক্তিম ওষ্ঠাধরের ছবি,—সেই ছবিতে অমৃতের যে-আস্বাদ ছিল, বিশ্বের কোনও গ্রহ-উপগ্রহে সেই অমৃত নেই!

কেবলমাত্র এক পেয়ালা চা গিলে সমস্তটার দাম চুকিয়ে আমি যখন বেরিয়ে এলুম, কয়েকটি অবাক চক্ষু পিছন থেকে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি জানিনে কানপুর জেলার বিস্তৃতি ও সীমানা কতদূর অবধি। আমি দিকভ্রান্ত, শুধু জানি সূর্য প্রদক্ষিণের পথ। আমার জানার দরকার নেই, গঙ্গার এপারে কানপুর এবং ওপারে উনাও জেলা কিনা। যদি দরকার হয়, গঙ্গার দুই পার দেখতে দেখতে যাব। হেনাকে যদি এপারে পাওয়া যায় ভাল, নৈলে ওপারে গিয়েই খুঁজব!

ষ্টেশনে ও ডাকঘরে প্রশ্ন করলুম, তারা গোটা দুই পথ অবশ্য বলে দিল,—যাওয়া না যাওয়া আমার ইচ্ছা। অবশেষে সরকারি এক দপ্তরে গিয়ে উঠলুম। তারা বিশেষ অঞ্চলটার নাম শুনেছে বটে তবে পথের নিশানা দিতে পারল না। অবশেষে পি-ডব্লু-ডি আপিসে এসে মোটামুটি একটা খোঁজ মিলল। বেলা তখন মধ্যাহ্ন।

মোটর ভাড়া পাওয়া গেল উচ্চ-মূল্যে, কেননা তাকে শূন্য গাড়ি নিয়ে ফিরতে হবে। ষ্টেশনের পাশ দিয়ে চওড়া সুন্দর পথটি ধরে গাড়ি ছুটল। দুই পারে বন-বাগান খেত-খামার এবং ছোট ছোট জনপদ পেরিয়ে অবশেষে দূরের বিমান-ঘাঁটি ছাড়িয়ে এক সময় গাড়ি এসে দাঁড়াল এক রেফুজি বস্তির ধারে,—অদূরে গঙ্গা। গাড়ি আর যাবে না, পথ ভাল নয়। জিপগাড়ি হলে যাওয়া যেত, আর নয়ত বয়েলগাড়ি। সব চেয়ে ভাল হাঁটা, নচেৎ নৌকা। নৌকায় গেলে বোধ হয় ঘন্টা দুই। নৌকাই ঠিক করলুম।

কেন যাচ্ছি জানিনে। হেনা টানছে না,—দুই ব্যাকুল বাহু সে বাড়ায়নি কোনদিন! কোমল-দুর্বল নারীর অশ্রুর আকর্ষণ এর মধ্যে নেই। ডাকার মতো ডাক তার দিক থেকে শুনিনি কস্মিন কালেও। অনভিজ্ঞ নির্বোধ কেউ যদি এসে বলে, এটি তোমার এক ধরণের প্রেমের আকর্ষণ,—আমরা দুজনেই তার

কথা হেসে উড়িয়ে দেব। এর মধ্যে মেদ-মাংসগন্ধী যৌবনের সেই লোভাতুর তাড়না নেই, কিন্তু আমার জীবনরথের নিত্যসারথীর আকর্ষণ এর মধ্যে নিশ্চয় ছিল বৈকি! হেনার কাছেই যাচ্ছি, কিন্তু হেনাকে উপলক্ষ্য ক'রে এগোচ্ছি কোন্ দিকে, সেইটিই ত' জীবনের সামনে একমাত্র জিজ্ঞাসার চিহ্ন!

আমার চোখে তন্দ্রা এসেছিল অসীম তৃপ্তিতে।

অপরাহ্ণের দিকে সেই মস্ত মহা-জনী নৌকাখানা যেখানকার ঘাটে এসে থামল, সেটি হিন্দুস্তানী এক [illegible] চারিদিকে তার সরষে-কলাই আর গম-ভুট্টার ক্ষেত। কিন্তু নৌকা ছেড়ে ছোট হ্যাণ্ড-ব্যাগটি হাতে নিয়ে যখন ঘাট ছেড়ে উপরে উঠে এলুম, তখন দূরে দূরে কয়েকটা কাঁচা-পাকা বাংলো ধরণের ঘর এবং নিকটবর্তী একটি দেবালয় দেখতে পাওয়া গেল। হাঁটিতে হাঁটিতে আমি সেই দিকে চললুম।

চারিদিকের দিগন্তজোড়া প্রান্তর এবং বনময় এক-আধটি গ্রামের পরি-বেশের মাঝখানে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে একটা আধুনিক কর্মকেন্দ্র। এক টুকরো নতুন সভ্যতা যেন চিরকালের দরিদ্র ও দুর্গম দেশের মাঝখানে ছিটকে এসে পড়েছে। কাছাকাছি এসে লক্ষ্য করলুম, আশেপাশে কেমন একটা কর্মচাঞ্চল্য। কোথাও একটা দপ্তর, কোথাও বিদ্যালয়, কোথাও ডাক্তারখানা, কোথাও বা প্রেক্ষা-গৃহ। এখানে ওখানে মালীরা ফুল-বাগানগুলিতে জলসেচন করছে। কেউ কাজ করছে ছোট ছোট খামারে।

অনেক খোঁজখবরের পর জানা গেল, একটিমাত্র বাঙ্গালী মেয়ে এখানে নানা কাজ নিয়ে আছেন বটে, তবে তিনি এই চৌহদ্দির ঠিক বাইরে তাঁর নিজের বাংলোয় থাকেন। তাঁর খুশিমতো তিনি এখানে আসেন-যান্। আসছে কাল দুপুরে তাঁর এখানে আসবার কথা আছে।

আমার প্রশ্নের উত্তরে দুটি স্থানীয় কর্মী দূরবর্তী একটা ঝোপঝাড়ের দিকে নির্দেশ করে বলল, ওই দিকে একটা চালাঘরে তিনি থাকেন। আজ আপনার সঙ্গে দেখা হবার উপায় নেই। তিনি পড়াশুনায় ব্যস্ত।

তা হলে উপায়?

এখানে গেষ্ট হাউসে আপনি রাতটা কাটাতে পারেন, তবে তার চার্জ দিতে হবে। কিন্তু বিছানাপত্র বিশেষ কিছু নেই, শুধু চারপাই একখানা পাবেন।

বললুম, ওতেই আমার হবে। গেষ্ট হাউসেই আমি থাকব। তবে তার আগে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, ও'র সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়।

লোকটি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করল না। বলল, উনি ও'র বাংলোয় বিশেষ কা'রো সঙ্গে দেখা করেন না। দেখা করতে গেলে উনি দুঃখিতই হন। তাছাড়া ও'র ওখানে মস্ত একটা কুকুর আছে। তবুও যদি আপনি যেতে চান, আমাদের মালীকে সঙ্গে নিয়ে যান।

লোকটা অসত্য বলেনি। অনেক কর্মী যখন আমাকে নিয়ে সেই ঝোপ-ঝাড়ের পাশ কাটিয়ে অদূরবর্তী চালাঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই সময় ঝোপের অদৃশ্য অন্তরাল থেকে [illegible] ভীষণ গলায় একটি কুকুরের ডাক শোনা গেল। আমি একটু কেঁপে উঠলুম।

অবহেলায় মলিন রঙ্গীন আলোয় সেটি ঠাহর ক'রে সঙ্গের লোকটিকে সহাস্যে বললুম, সুক্রিয়! অব যাইয়ে!

লোকটি ওখান থেকেই বিদায় নিল। তবে কুকুরটা এসে পৌঁছবার আগেই হেনা ছুটে এল, এবং উচ্ছ্বসিত অধীর উত্তেজনায়,—না থাক্, কুকুরটা একটু বোকা বনে গিয়ে শুধু ল্যাজ নাড়ছিল!

হেনা বলল, আমি জানতুম, আমি জানতুম তুমি স্থির থাকবে না। তুমি রাগ ক'রে ছুটে আসবে, এও আমি জানতুম পার্থ।

আমি সহাস্যে তার পিঠের দিকে

"......তিনি ঢলঢলে শালোয়ার ও দীর্ঘলম্বিত পাঞ্জাবি পরা শ্রীমতী হেনা......"

কুত্তে বড়ি হুঁসিয়ার হুঁ।—লোকটা হাসি মুখে বলল।

কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই যিনি সেই চালাঘরের দাওয়ায় বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালেন, তিনি ঢলঢলে শালোয়ার ও দীর্ঘলম্বিত পাঞ্জাবি পরা শ্রীমতী হেনা কিনা,

হাত বাড়িয়ে বললুম, এমন লম্বা বেণী কেমন ক'রে হল তোমার? মাথায় যে তোমার এত চুল, কোনদিন চোখে পড়েনি ত? এমন সর্বনেশে পাঞ্জাবি পরছ কবে থেকে?

উত্তরে হেনা আমার চোখ আর মুখে হাত চাপা দিল। (ক্রমশ)

পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে?

শ্রীবিদ্যাবিকীর্ণ

॥ মডারেশন ॥

প্রশ্নকর্তা যে প্রশ্ন রচনা করে পাঠালেন সেটাই যে সোজাসুজি ছাপাখানায় চলে যায় তা নয়। অন্ততঃ আরও একজন বা দুজন বিশেষজ্ঞ বসে প্রশ্নপত্রটি আদ্যন্ত পরীক্ষা করবেন। তাঁরা সিলেবাস মিলিয়ে দেখবেন। সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন এসে থাকলে তা বাদ দেবেন। সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের মধ্যেও যদি দেখা যায় প্রচলিত মানের থেকে খুব পার্থক্য ঘটেছে, তাহলে তাঁরা ঐ প্রশ্ন পরিবর্তন অথবা নূতন প্রশ্ন সংযোজন করে দেবেন। এ কাজ যাঁরা করেন তাঁদের নাম 'মডারেটার'। আমরা বাংলা নাম দিচ্ছি নিয়ামক বা প্রশ্ন নিয়ামক। 'মডারেশন'—নিয়ামন বা প্রশ্ন নিয়ামন।

এই মডারেশন বা প্রশ্ন নিয়ামনের কাজ যাতে সম্পূর্ণ নির্দোষ হয় তার জন্যে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন নিয়ামক ও প্রশ্নকর্তা একত্র বসে প্রশ্ন নিয়ামন করেন। এ সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় স্বভাবতঃই এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনুসরণ করেছেন ও করছেন।

বি-এ, বি-এস-সি, আই-এ, আই-এস-সি পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ামন সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম:

The Syndicate shall appoint a Moderator in each subject wherever possible; he shall moderate each question paper in consultation with the paper-setter concerned. It shall be the duty of the Moderator to see that the Rules and Regulations are strictly complied with.

In special cases the Syndicate may appoint more than one Moderator in a particular subject.

কোনো কোনো বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রগুপ্তির উদ্দেশ্যে প্রশ্নকর্তার সঙ্গে প্রশ্ন নিয়ামকের দেখা হতে দেন না। তাঁদের ধারণা প্রশ্ন নিয়ামকের নাম প্রশ্নকর্তার এবং প্রশ্নকর্তার নাম প্রশ্ন নিয়ামকের জানা সংগত নয়। প্রশ্নকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করে প্রশ্ন নিয়ামন করাই নিয়ামকের কর্তব্য এটাকে যাঁরা নীতি হিসাবে সংগত মনে করেন তাঁরাও কিন্তু সকলে কার্যক্ষেত্রে তা পালন করতে পারেন না। তার এক কারণ প্রশ্ন নিয়ামনের প্রয়োজন যখন ঘটে তখন একজনকে পেলে আর একজনকে পাওয়া যায় না। মনে করুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার ইতিহাস বিষয়ের ছটি অনার্স এবং তিনটি পাস, মোট নটি পত্র নিয়ামন করা হবে। নিয়ামনের দিন-ক্ষণ অনেক আগে থেকে ঠিক করে রাখা যায় না। সাধারণতঃ সপ্তাহখানেকের নোটিশে এ সব কাজ হয়। ইতিহাসের ন'জন প্রশ্নকর্তার মধ্যে তিন-চারজন বাইরের লোকও থাকতে পারেন। এক সপ্তাহের নোটিশে তাঁদের হাজির করা প্রায় অসম্ভব। সম্ভব হলেই বা তাঁরা আসবেন কেন? প্রশ্ন রচনার জন্যে যে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট আছে তার অতিরিক্ত আর কিছু পাওয়ার কথা নয়! কেবল হাওয়া বদলাবার জন্যে তাঁরা নিজেদের কাজ ক্ষতি করে কলকাতায় আসবেন—এটা কি আশা করা যায়? যিনি কলকাতায় থাকেন তিনিই বা নিজের কাজ কামাই করে নিজের গাড়িভাড়া খরচ করে মডারেটরকে পরামর্শ দেবার জন্যে ছুটে যাবেন কেন? কাজেই এই দিকটা দেখেও দেখা হয় না। প্রশ্নকর্তার পারিশ্রমিকের হার সেই মান্ধাতার আমলের। তার আর বদল হল না।

সেকেন্ডারী বোর্ডের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যায়। ওঁরা প্রত্যেক প্রশ্নপত্র রচনার জন্যে পারিশ্রমিকের হার বাড়িয়ে করেছেন ৭৫৲ টাকা। শুনতে ভাল মনে হয় কাজে কিন্তু ততটা নয়। প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন রচনার ভার নেন তা হলে প্রশ্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রশ্নের আদর্শ উত্তরও সংক্ষিপ্তভাবে লিখে দিতে হবে। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ভাল। প্রশ্নকর্তা নিজে যখন উত্তর লেখেন তখনই নিজের প্রশ্ন সম্বন্ধে যথার্থ বিচার করা সম্ভব হয়।

স্যার আশুতোষ সম্পর্কে গল্প শোনা যায়, সম্ভবতঃ সত্য ঘটনাই—তিনি একজন অঙ্কের প্রশ্নকর্তাকে ডেকে তাঁর কাছে বসিয়েই উত্তর লিখতে বলেছিলেন। তারপর কি হয়েছিল সেটা ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু এটা ঠিক যে এই বিচারই আসল বিচার।

মডারেটর বা নিয়ামক যতই নিয়ামন করুন মূলে প্রশ্নকর্তার উপরেই প্রধান ভরসা। তিনি যদি আপন দায়িত্ব না পালন করে থাকেন তা হলে নিয়ামকের পক্ষে বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। প্রাসঙ্গিক নিয়মকানুন অনুসরণ করে প্রশ্নপত্র রচিত হয়েছে কিনা সেই দিকে লক্ষ্য রাখাই হবে নিয়ামকের প্রধান কাজ।

It shall be the duty of the Moderator to see that the Rules and Regulations are strictly complied with — এর বেশী তাঁর কাছে আশা করা উচিত হবে না। কোনো

একটা প্রশ্নপত্রের সবকটা প্রশ্নের মান যদি একটু শক্ত বা সহজ মনে হয়, তিনি সবকটা বদলে নূতন আর একটি প্রশ্নপত্র রচনা করে দেবেন এমন কখনো হতে পারে না। আর তাঁর প্রশ্নই যে আসল প্রশ্নকর্তার চেয়ে ভাল হবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? দু-একবার এমন এমম কান্ডও ঘটেছে, নিয়ামক মূলে প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন কয়েকটা বদলে নূতন প্রশ্ন বসিয়েছেন। আর সেই নূতন প্রশ্ন নিয়ে তুমুল সমালোচনা হয়েছে। প্রশ্নকর্তার নাম তো, পূর্বেই বলেছি, জানা খুব সহজ। লোকে তাঁকে দোষ দিতে লাগল। তাঁর হল চোরের মা-র অবস্থা, কাউকে কিছু বলতে পারেন না। যে যা বলে চুপ করে হজম করেন।

এই নিয়ামন সম্বন্ধে এক প্রশ্নকর্তার মুখে শোনা একটি ঘটনার কথা বলছি। প্রশ্নকর্তা অতিশয় সুপরিচিত লোক। এক ডাকে সবাই তাঁকে চিনবে, কাজেই তাঁর নাম বলব না। তাঁর কাছে একই সংগে দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই পরীক্ষায় একই বিষয়ের প্রশ্নপত্র রচনায় অনুরোধ এসেছে। দুই পরীক্ষারই সিলেবাস প্রায় এক রকম পরীক্ষার মানও প্রায় সমান। তফাত কেবল দু-একটা পাঠ্য-পুস্তকে, অধিকাংশ পাঠ্য-পুস্তকেও মিল আছে। এই তফাতটুকু তিনি লক্ষ্য করেননি। যে কোনো কারণেই হোক এইটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে দুই সেট প্রশ্ন রচনা করলেন একই পাঠ্য-পুস্তক থেকে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েরই নাম করব না। মনে করুন ক আর খ। ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা অনুসরণ করে খ বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও প্রশ্ন রচনা হল। ক-এর তাতে ক্ষতি হল না কিন্তু খ-এর সমূহ সর্বনাশের কথা! প্রায় মাসখানেক পরে প্রশ্নকর্তার দৃষ্টি পড়ল খ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার দিকে— সেও নিতান্ত আকস্মিকভাবেই। দেখেই তাঁর মাথা ঘুরে গেল। প্রশ্নপত্র ছাপা হয়ে গেলে তো সর্বনাশ! তিনি ছুটলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। গিয়ে শুনলেন মডারেশন হয়ে গেছে। শুনে একটু নিশ্চিন্ত হলেন, মডারেটরের চোখে নিশ্চয় ভুলটা ধরা পড়বে এই ভেবে। তবু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবার জন্যে প্রশ্নপত্রের পান্ডুলিপিটা তিনি দেখতে চাইলেন। পান্ডুলিপি একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে গেলে প্রশ্নকর্তার পক্ষেও তা দেখা সহজ নয়—এ বিষয়ে সর্বত্রই নিয়মের খুব কড়াকড়ি। আর তা হওয়াই উচিত। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নপত্রের পান্ডুলিপি এল। মডারেটর মস্ত বড় লোক—প্রশ্নকর্তার চেয়েও নামী। দেখা গেল প্রশ্নপত্রের পান্ডুলিপির তলায় তাঁর স্বাক্ষর জ্বলজ্বল করছে। প্রশ্নপত্রের মধ্যে কিন্তু কোথাও একটি কালির আঁচড় নেই। বলা বাহুল্য সে প্রশ্ন ছাপা হয়নি। যিনি এ কাহিনী বিবৃত করেছেন তিনি বলেন, এটা সত্য ঘটনা, আমার তো বিশ্বাস হয় না। তবে এটা ঠিক যে এ রকম ঘটনা ঘটলেও কদাচিৎ ঘটে। অদূরকালের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে তো মনে পড়ছে না।

● ● ● ● ● ● দেশে বিদেশে ● ● ● ● ● ●

সালাজার ঃ

বিভিন্ন দেশে বা মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের আয়ু যতই নিঃশেষ হয়ে আসছে ততই এর প্রকৃতি উগ্র হয়ে উঠছে। যাকে লোকে বলে মরণ কামড়। পর্তুগালের আচরণে এই মরণ কামড়ই প্রকাশ পাচ্ছে। তার প্রকৃতিকে কেবল উগ্র বললে যথেষ্ট হয় না, নৃশংসই বলা উচিত। বিনা প্ররোচনায় আফ্রিকার পর্তুগীজ-এঙ্গোলায় বিস্তর রক্তপাত হয়েছে। তবু পর্তুগাল ক্ষান্ত বা ক্লান্ত হয়নি। ক্ষান্ত হবে না একথা পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ সালাজার দম্ভভরে সজোরে ঘোষণা করেছেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোর স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার কথা উঠতেই পারে না। সালাজার সরকার এঙ্গোলাকে পর্তুগালের জাতীয় ভূখন্ডের অঙ্গ হিসেবেই রক্ষা করবেন বলে সংকল্পবদ্ধ।

তিনি ন্যাশনাল এসেম্বলিতে তাঁর ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি গিনি, গোয়া, ম্যাকাও ও টাইমরের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, এদের স্বায়ত্তশাসন-অর্থই অপর রাজ্যের অংগীভূত হওয়া; অর্থাৎ এসব স্থানের পর্তুগাল-সার্বভৌমত্ব অপর দেশকে সমর্পণ করা। তাই তিনি বলেন, যতই অসুবিধা থাকুক বা যত স্বার্থত্যাগই করতে হোক, পর্তুগাল তার ভূখণ্ড রক্ষা করতে কৃতসংকল্প। এঙ্গোলার ব্যাপারে আমেরিকা সোভিয়েট রুশিয়ার দিকে ঝুঁকেছে বলে তিনি অনুযোগ করেন এবং কোন রকম অস্পষ্টতা না রেখে ঘোষণা করেন, ৯ই জুন রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা মেনে নেওয়ার বিন্দুমাত্র আশাও নেই। ঐ প্রস্তাবে দমননীতি সম্বরণের অনুরোধ ছিল।

কাসেম ঃ

কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে? ইরাক তো কুওয়েট চেয়ে বসল। কুওয়েটের শেখ বললেন, না। এদ্দিন যে সেখানে খবরদারি করছিল সেই বৃটিশ সিংহ বলল, না। আরবের অন্যান্য রাষ্ট্রও বলল না। চুক্তি যখন হয়েছে তখন বৃটেন স-জাহাজ সশস্ত্র সদলে সেখানে হাজির হয়েছে এবং চুক্তি রক্ষায় সর্বতোভাবে প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে এই আবেদনও প্রচার করা হয়েছে যে, অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন আরব রাষ্ট্রগুলি যেন ইরাকের শুভবুদ্ধি উদয়ের চেষ্টা করেন। আমেরিকাও স্বভাবতঃই সতর্ক হয়ে রয়েছে। কেননা, পৃথিবীর উত্তাপ যেন অনেকটা অনিশ্চিত তরঙ্গের মতো উঠছে পড়ছে। লাওস, কিউবা, কোরিয়া কঙ্গো, এঙ্গোলা, আলজেরিয়া— এবং বার্লিনে এই উদ্বেলিত ঢেউ ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে চলেছে। কুওয়েট সুরক্ষিত হয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্যের তদ্বিরে আবেদন পেশ করছে। এদিকে আরব লীগ কাউন্সিলে ইরাক প্রতিনিধি বলছেন, কে বলছে তাঁরা কুওয়েটের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে যাচ্ছেন? না —তো। তাঁরা বিষয়টাকে রাজনৈতিক উপায়েই নিষ্পত্তি করতে চান। আরও ভাল যে, এর মধ্যে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী কাসেমের ক্রুদ্ধ কন্ঠও শোনা [illegible] মনে হয়, যে অসি [illegible] হয়েছে বলে আশংকা [illegible] দিয়েছে, তা কোষবন্ধ হবে। কেননা, আজকাল ঝুঁকি অনেক —বিশেষ ছোট ছোট দেশের পক্ষে তো বটেই। বড়দের মধ্যেই লাগে-লাগে করে লাগে না। লাগে না বটে কিন্তু সারা পৃথিবীতে বিরোধের ঘূর্ণিটা কেমন পর্যায়ক্রমে ছুটোছুটি করছে। মস্ত বড় আগুনে প্রশ্ন রয়েছে বার্লিন—যার দুই প্রান্তে পারমাণবিক শক্তিধর সোভিয়েট রুশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র।

অশ্লীল ঃ

কি বই অশ্লীল এবং কি বই নয়? যুগে যুগে এই প্রশ্ন উঠেছে এবং তৎকালীন সমাজের মুখপাত্র শাসকবর্গের রুচি মতো এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেছে। সেদিন যে বই অশ্লীল ছিল আজ তাই সমাদৃত হচ্ছে অথবা সমাজ তাকে আর অশ্লীল মনে করছে না। এই ভাবদ্বন্দ্বের যূপকাষ্ঠে বহু সাহিত্যের বলি হয়েছে। ভালোমন্দ আজও যাচাই করার উপায় নেই, কেন না আজও সেই পরিবর্তনশীল রুচির ওপরই সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে। সুতরাং এ অভিযোগের নিরাকরণ করা বা শ্লীল-অশ্লীলের একটা স্থায়ী মানদন্ড করা অসম্ভব। লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—কেননা এ বইখানি ইংলন্ডে দীর্ঘকাল বিচার-বিবেচনার পর অশ্লীল-গন্ডীমুক্ত হয়েছে কিন্তু ভারতের অশ্লীলগন্ডীতে বন্দী হয়েছে। অতএব তর্ক চলছেই এবং আমরা মনে করি অনন্তকাল চলবে। তাই, এর খানিকটা মীমাংসার প্রয়াসে ভারতবর্ষের বড় বড় বন্দরে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের একটি করে তালিকা থাকবে, কোন বই আসতে দেওয়া উচিত বা উচিত নয় তা স্থির করতে এই তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা কাষ্টমস কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবেন। কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি-দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই তালিকাগুলো সেন্ট্রাল বোর্ড অব রেভিনিউয়ের হাতে দেওয়া হয়েছে। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা বিদেশাগত বই সম্পর্কে তড়িৎগতি অভিমত জানাবেন।

কথা উঠতে পারে, শাসক সম্প্রদায়ের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ রুচির প্রশ্নটি তো আরও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে —কারণ, তাঁরা আসলে ব্যক্তি এবং সেখানে ব্যক্তিগত রুচিই প্রবল। তবে হ্যাঁ, এত বাছতে গেলে, কারও ওপরই কোন ভার দেওয়া চলে না। চলে না বলেই বিতর্ক থেকে যায়, যারা আজ প্রবল নয় তারা কাল প্রবল হয়। এর মধ্যে [illegible] কথা স্বীকৃত যে, কাষ্টমস অফিসাররা তো সাহিত্য-বিষয়ে অভিজ্ঞ বিচারক নন, তাই এ গুরুভার একদল বিশেষজ্ঞের হাতে দেওয়া হল।

সূঁচ ঃ

স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা হামেসা এই আক্ষেপ শুনতাম আহা, সামান্য সূঁচ-সুতোর জন্যও আমরা কি পরমুখাপেক্ষী? তারপর অবিশ্যি অনেকদিন গড়িয়ে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, একটার পর একটা লম্বা পা বাড়িয়ে দুটো পাঁচসালা পরিকল্পনা শেষ করেছি তৃতীয় পদক্ষেপও হয়েছে। কিন্তু......

৪ঠা জুলাই বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ভারতের বিশেষ করে বাংলা দেশের সীবন শিল্প এক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে—কারণ সূঁচের অভাব। ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর-পোরেশন মারফৎ বিদেশ থেকে আনা সূঁচ যা বিলি করা হচ্ছে তা নগণ্য। অনেক যন্ত্র অকেজো হ'য়ে পড়ে আছে, আরও পড়ে থাকবে এমন আশংকা দেখা দিয়েছে।

এই— এইখান থেকেই আমাদের পরিকল্পনার রূপ ও প্রকৃতিটা ধরা পড়ে। বড় বড় উন্নত দেশগুলোর দৈত্যোচিত পদক্ষেপ আমাদের এত বিহ্বল করেছে যে, আমরা অসামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে ভারী হাতে ঋণ করেও ওদের তালে চলতে চেয়েছি। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র শিল্পের কথা কুটির শিল্পের কথা বলেছি বটে কিন্তু সেকথা অন্তরের উপলব্ধি থেকে নয়। আমরা কুটির শিল্পের বা ক্ষুদ্র শিল্পের ছোট-খাট প্রয়োজন মেটাবার জন্যও যে আনুষঙ্গিক বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে পারি এ ভাবনা আমাদের পায় নি। তাই স্বাধীনতা পাবার তের চৌদ্দ বছর পরও শুনছি সূঁচের অভাবে হোসিয়ারী শিল্প বন্ধ হতে চলেছে, অর্থাৎ আমরা এই কৃষি-প্রধান ব্যাপক বেকারের

দেশে পিরামিডের মতো গোড়া থেকে গড়লাম না বা গড়ছিনা, আমরা শ্ন্যে ভর করে পিরামিডের চ্ড়াটা গড়ছি। ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষ মনে না করে আমেরিকা বা ব্টেন মনে করলে এইসব মৌলিক ত্র্টি থেকে যাবেই।

ত্রিশ্ল :

কোন বাধাকেই বাধা বলে মানব না—কোন জাতির চিত্তে যখন এই ভাবটি জাগে তখন ব্ঝতে হবে ও জাতটিও জেগেছে। যাকে আজ দ্ঃসাধ্য অজেয় বলে মনে হচ্ছে তাকে সেভাবেই [illegible] না করে যখন জাতি বলে ঐ দ্ঃসাধ্যকে সাধ্যায়ত্ত করব অজেয়কে জয় করব তখন তার জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই অপরাজিতকে পরাজয় করার দ্র্লঙ্ঘ্যকে লঙ্ঘন করার প্রেরণা আজ লক্ষণীয়। পর্বতচ্ড়ায় ওঠার কৃতিত্ব ভারতীয়েরা এই অল্প কয়েক বছরেই প্রকাশ করেছে এবং তাদের সর্বশেষ কৃতিত্বের খবরও নয়াদিল্লীর ৫ই জ্লাইয়ের খবরে পাওয়া যাচ্ছে। এ খবরে প্রকাশ, নন্দাদেবী অভিযাত্রী দলেরই কয়েকজন ত্রিশ্ল পর্বতশীর্ষে উঠতে সমর্থ হয়েছেন। পর-পদানত অবস্থায় যে হীনমন্যতা সঞ্চিত হয়ে আমাদের সব রকমে কাতর করে রেখেছিল তা আজ দ্রীভূত হ[illegible] হচ্ছে এই সব কঠিন অভিযান তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আজ দেশের প্নর্গঠনে এমন সাহসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দ্র্গম যাত্রীরই দরকার। তাঁরা আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। ত্রিশ্ল শীর্ষের উচ্চতা ২৩,৩৬০ ফ্ট।

রকেট :

বড় কয়েকটি জাতির কাছে রকেট আজ করায়ত্ত। কিন্তু অনেক দেশেরই তা আজ অজ্ঞাত, স্তরাং, সেখানে শ্রোতার শ্র্তি ও দ্রষ্টার দৃষ্টিতেই শেষ—নিজের কি[illegible] করার নেই। এমন অনগ্রসর একটি দেশ অকস্মাৎ বিশ্বকে চমকে দিয়েছে; সে ইসরাইল। এই ইসরাইলও মহাশ্ন্যে রকেট ছ্ড়ে রকেট-কুলীনদের পঙক্তিতে আসন নেবার যোগ্য হ'ল। তেলআভিভের ৫ই জ্লাই তারিখের খবরে প্রকাশ, রকেটটি সম্প্র্ণ ইসরাইলে নির্মিত। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গ্রিয়েন বলেন, এটি ইসরাইলী বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব। নিঃসন্দেহ। এপর্যন্ত রকেট-য্গে অবস্থান করছিল ব্টেন, র্শিয়া, আমেরিকা, ইতালী, ফ্রান্স ও জাপান। এবার থেকে ইসরাইলও সে দলে নাম লেখালো। ইসরাইলের মতো ছোট দেশে যা সম্ভব হ'ল তা আয়তনে বৃহৎ বহ্ দেশকে লজ্জা দেবে। আমরা ইসরাইলের বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে আজ [illegible] আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

৬।৭।৬১

ঘটনা প্রবাহ

ঘরে—

৩০শে জ্ন—১৫ই আষাঢ় : "কাছাড়ের ভাষা-সমস্যা সমাধানে 'শাস্ত্রী ফরম্লা' উত্তম"—সাংবাদিক বৈঠকে (নয়াদিল্লী) প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর্র বিবৃতি—'রায় ফরম্লা' সম্পর্কে অস্পষ্ট মতামত প্রকাশ

[illegible] কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর (শ্রীঅশোক সেন) [illegible] কাছাড় প্রতিনিধি দলের দীর্ঘ আলোচনা—'শাস্ত্রী ফরম্লা' গ্রহণীয় নয় বলিয়া প্রতিনিধিবর্গের পক্ষ হইতে ঘোষণা।

পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহর্) প্রস্তাব অগ্রাহ্য—তুরায় অন্ষ্ঠিত সর্বদলীয় পার্বত্য নেতাদের সম্মেলনে স্স্পষ্ট অভিমত—স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনই একমাত্র সমাধান বলিয়া দাবী।

পরাজিত কেন্দ্রসম্হে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়ন—৯২টি আসনের মধ্যে ৮৫টি আসনের জন্য জন্য প্রাথমিক তালিকা সম্প্র্ণ।

'পাক্ বাহিনী কাশ্মীর অঞ্চল ত্যাগ না করিলে কোন আলোচনার প্রশ্নই উঠে না'—দিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর্র স্পষ্ট উক্তি।

১লা জ্লাই—১৬ই আষাঢ় : পশ্চিমবঙ্গের ম্খ্যমন্ত্রী 'ভারত-রত্ন' ডাঃ রায়ের (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) অশীতিতম জন্মদিনে বিভিন্ন মহলের শ্রদ্ধাঞ্জলি—মহাজাতি সদনে অন্ষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন।

পশ্চিমবঙ্গের আগামী সাধারণ নির্বাচন ব্যাপারে প্রস্তুতিপর্ব—৮টি বামপন্থী দলের সংয্ক্ত নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত।

২রা জ্লাই—১৭ই আষাঢ় : আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবীতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভের আহ্বান—পাহাড় অঞ্চলের জনগণের নিকট সর্বদলীয় পার্বত্য নেতাদের ব্যাকুল দাবী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদ্র শাস্ত্রীর সহিত কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধি দলের আলোচনা; (দিল্লী) ব্যর্থতায় পর্যবসিত—ভাষাগত সংখ্যালঘ্দের রক্ষাকবচ সংক্রান্ত স্মারকলিপি কার্যকরী করা সম্পর্কে প্রতিশ্র্তি দানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অক্ষমতার জের।

'শাস্ত্রী ফরম্লা'র প্রতিবাদে ৪ঠা জ্লাই-এর প্রস্তাবিত হরতাল—গোহাটি ছাত্র-সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আসাম মন্ত্রিসভাকে বাতিল করিয়া অবিলম্বে আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের দাবী—অখিল ভারত হিন্দ্ মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী অধিবেশনের প্রস্তাব।

৩রা জ্লাই—১৮ই আষাঢ় : সংশোধিত শাস্ত্রী ফরম্লায় ভাষা-সমস্যার আপাততঃ সমাধান—ভাষাগত সংখ্যালঘ্দের রক্ষা-কবচ সংক্রান্ত স্মারকলিপি কার্যকরী করিতে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিশ্র্তি—কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত।

পাক্ সমর্থকদের ভারত-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়া—অবস্থা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অখিল ভারত হিন্দ্ সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত—ম্সলিম

সম্মেলনের চক্রান্তে মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটির উদ্বেগ।

মহানদীতে ২৩ জনের সলিল-সমাধি—ধর্মজয়গড়ের নিকটে যাত্রী-বোঝাই ফেরী নৌকা জলমগ্ন হওয়ার জের।

৪ঠা জুলাই—১৯শে আষাঢ় : হাইলাকান্দিতে পুলিশের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে বিচার-বিভাগীয় তদন্ত—আসামের প্রধান বিচারপতি গোপালজী মেহরোত্রের উপর দায়িত্ব অর্পণ।

দক্ষিণ ভারতে ভয়াবহ বন্যায় ২৮ জনের মৃত্যু—মহীশূরের অধিকাংশ নদীতে জলস্ফীতি—বিভিন্ন জনপথ প্লাবিত।

'হয় দণ্ডকারণ্য যাও', না হয় শিবির ছাড়'—জুলাই-এর মধ্যেই অবশিষ্ট উদ্বাস্তু পরিবারের উপর নোটিশ জারী—শিবিরবাসী শরণার্থীদের পুনর্বসতি ব্যবস্থার শেষ পর্যায়।

৫ই জুলাই—২০শে আষাঢ় : কেরলে ভয়াবহ বন্যার ফলে ধ্বস নামায় ৭৩ জনের মৃত্যু—দুর্ঘটনাস্থলের সহিত যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—অভূতপূর্ব বন্যায় কেরলের সমগ্র নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হইয়াছে বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীথানু পিল্লাই'র উক্তি।

পাক্-ভারত নদী বিশেষজ্ঞ দলের ৭ই জুলাই হইতে ঢাকায় ৫ দিবসব্যাপী সম্মেলন।

মণিপুরের তামেনলং মহকুমা উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষিত—নাগা বিদ্রোহীদের সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের জের।

৬ই জুলাই—২১শে আষাঢ় : দক্ষিণ ভারতের অভূতপূর্ব প্লাবনে আরও ৩৪ জনের প্রাণহানি—ত্রিচুরে ১০ হাজার লোক গৃহহারা।

'ভাষার দাবী অগ্রাহ্য হইলে যে-কোন মুহূর্তে প্রবলতর আন্দোলন আরম্ভ'—নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতি ও সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের যুক্ত বিবৃতি।

পাকিস্তানে ভারতীয় ব্যাংকসমূহকে অনুদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা—ভারত-পাকিস্তান পুনর্বাসন মন্ত্রী সম্মেলনের (কলিকাতা) সিদ্ধান্ত—দুই দিবসব্যাপী বৈঠক শেষে যৌথ ইস্তাহার প্রচার।

'শিয়ালদহ-রাণাঘাট ও শিয়ালদহ-বনগাঁ লাইন বৈদ্যুতিকরণ কাজ ১৯৬৩ সালের গোড়ার দিকে শেষ'—শিয়ালদহ ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিবৃতি।

বাইরে—

৩০শে জুন—১৫ই আষাঢ় : নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনে রুশ-মার্কিণ প্রাথমিক আলোচনার সমাপ্তি—১৭ই জুলাই পুনরায় মস্কো-এ উভয় পক্ষের বৈঠকের সিদ্ধান্ত।

'কেন্দ্রীয় কঙ্গোলী সরকারের শীঘ্রই পতন ঘটিবে'—মুক্তিপ্রাপ্ত কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট জয়েস শোম্বের মন্তব্য।

'পর্তুগাল আপন উপনিবেশ রক্ষা করিতে নিতান্ত বদ্ধপরিকর'—লিসবনে পর্তুগীজ জাতীয় পরিষদে পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ সালাজারের ঘোষণা।

১লা জুলাই—১৬ই আষাঢ় : কুয়ায়েতে বৃটিশ সৈন্যের অবতরণ—হাণ্টার জেট বিমান বহর ও ১৪টি সেঞ্চুরী ট্যাঙ্ক প্রেরণ—সৌদী আরব সৈন্য বাহিনীরও কুয়ায়েতে প্রবেশ।

আলজিরিয়া বিভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আলজিয়াতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের অনুষ্ঠান—জনতার সহিত পুলিশের সংঘর্ষে ৩ জন নিহত।

২রা জুলাই—১৭ই আষাঢ় : রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্বস্তি পরিষদে কুয়ায়েত প্রসঙ্গ আলোচনা—কুয়ায়েত ও ইরাকের পক্ষ হইতে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত মার্কিণ ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জীবনদীপ নির্বাণ।

৩রা জুলাই—১৮ই আষাঢ় : 'আনুগত্যহীন যুদ্ধবাজ' চীনের বিরুদ্ধে রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের হুমকী—মাও সে তুং (গণচীনের রাষ্ট্রপ্রধান) আদর্শগত শান্তিচুক্তির প্রতিটি শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর (জেনারেল দো ইয়ং চ্যাং) পদত্যাগ—নূতন প্রধানমন্ত্রীর পদে লেঃ জেনারেল চ্যাং সং।

'কুয়ায়েত-এ মরু এলাকায় বৃটিশ সৈন্য নিয়োজিত—বিপদ কাটিয়া গেলেই সমস্ত বাহিনী প্রত্যাহৃত হইবে'—কুয়ায়েতের প্রধান শাসক শেখের ঘোষণা।

৪ঠা জুলাই—১৯শে আষাঢ় : কুয়ায়েত মরুভূমিতে বৃটিশ প্যারা সৈন্য মোতায়েন—৪০ মাইল সীমান্তে হাজার হাজার বৃটিশ সৈন্য সমাবেশ।

'অ্যাঙ্গোলায় যাহা করিতেছি, তাহাই [illegible]'—পর্তুগীজ পররাষ্ট্র দপ্তরের সদম্ভ ঘোষণা।

আরব লীগে কুয়ায়েতের সদস্য পদের আবেদন—ইরাকের 'ভেটো' প্রয়োগ—১২ই জুলাই পুনরায় লীগের অধিবেশন আহ্বান।

রাষ্ট্রসংঘ কমিটির সদস্যগণ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রবেশ করিলে গ্রেপ্তার করা হইবে—দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এরিক লো'র সতর্কবাণী।

৫ই জুলাই—২০শে আষাঢ় : মহাশূন্যে বহু পর্যায়বিশিষ্ট রকেট উৎক্ষেপণে ইস্রায়েলের সাফল্য—ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ।

আলজিরিয়া বিভাগের প্রতিবাদে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট—ফরাসী সৈন্যের গুলীতে ৫৭ জন নিহত ও দুই শতাধিক আহত।

কুয়ায়েত হইতে অবিলম্বে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ চাই—স্বস্তি পরিষদে বিতর্ককালে আরব সাধারণতন্ত্র ও রাশিয়ার দাবী।

৬ই জুলাই—২১শে আষাঢ় : 'উত্তর কোরিয়া আক্রান্ত হইলে রাশিয়া সর্বশক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিবে'—মস্কো-এ সোভিয়েট-উত্তর কোরিয়া মৈত্রী সভায় মঃ ক্রুশ্চেভের (প্রধানমন্ত্রী) ঘোষণা।

'পূর্ব জার্মাণী কোন অবস্থাতেই অস্ত্রধারণ করিবে না'—পূর্ব জার্মাণ রাষ্ট্রপতি হের ওয়াল্টার উইলব্রিখটের ঘোষণা। ৭-৭-৬১
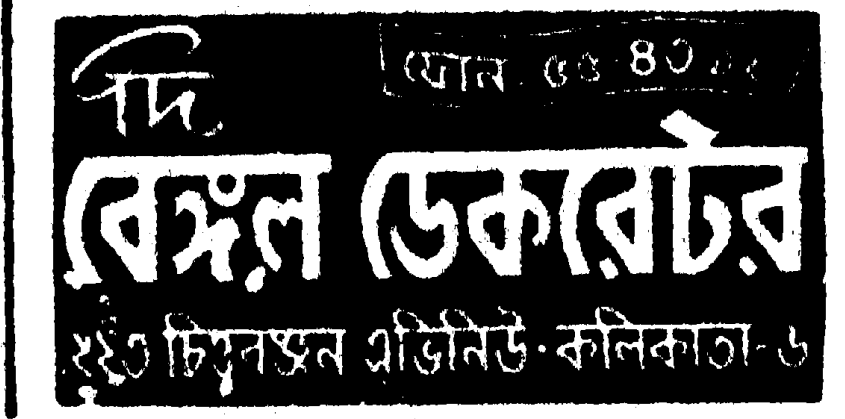
সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটি প্রিয় নাম, আর তাঁর সমস্ত রচনাকে অতিক্রম করে যে উপন্যাসখানি বাঙালী পাঠকের চিত্তকে আজো আকুল করে রেখেছে সে তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস—শ্রীকান্ত। এই গ্রন্থে সাহিত্য ও শিল্পকলার এক অভিনব রূপ আছে, যা উপন্যাসের চেয়ে বড়ো, যার মূল্য চিরন্তন। লেখক তাঁর রচনারাশির মধ্যে যে আত্মপরিচয় দান করেন জীবনী তারই একটা সুসংবদ্ধ প্রতিলিপি মাত্র। সাধারণ পাঠক শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তকে তাঁর আত্মজীবনী মনে করেন, শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী না হলেও, এই গ্রন্থ তাঁর কবি-মানসের আত্মপরিচয়। ব্যক্তি-জীবন ও কবি-জীবন এখানে একাত্ম হয়ে উঠেছে তাই বিখ্যাত কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার পরিণত বয়সে দ্বিতীয়বার 'শ্রীকান্ত' পাঠ করে মনে করেছেন যে 'একটি আত্ম-জীবনী কথা পাঠ করিলাম।' তবে তিনি একথাও বলেছেন যে 'শ্রীকান্ত একটা পৃথক কবি-কাহিনী মাত্র। উহাতে ব্যক্তি শরৎচন্দ্র নাই।' তবু 'শ্রীকান্তে'র কাহিনীতে পাঠক-পাঠিকা এমন কিছু পায় যা নিছক কল্পনা বলে মনে করে না। মোহিতলাল বলেছেন 'শ্রীকান্তের জবানীতে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী পাঠ করিয়াছি, তাহারই একটু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহকারে বিবৃত করিব।'

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' নামে ধারাবাহিক আলোচনা প্রকাশ করেন। পরে ঐ পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় ধীরে ধীরে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন এবং ১৩৫৭ সালে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থটির আয়তন বিরাট, মনোটাইপে ছাপা ডিমাই সাইজে প্রায় তিনশো ষাট পৃষ্ঠায় অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত তথা শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্রকে বিশ্লেষণ করেছেন মোহিতলাল এবং একথা স্পষ্ট কণ্ঠে বলা প্রয়োজন শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই জাতীয় গ্রন্থ এতাবৎ রচিত হয়নি।

একে আলোচ্য বিষয় শরৎচন্দ্র ও তাঁর শ্রীকান্ত এবং সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, এই মণিকাঞ্চন সংযোগে 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য-আলোচনা গ্রন্থের পুরোভাগে স্থান লাভ করবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই ধরনের বিস্তারিত বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বেশী নেই। তাই 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' পাঠে তৃপ্তি বোধ করছি। মোহিতলাল 'আত্মকাহিনী বনাম উপন্যাস' পরিচ্ছেদে বলেছেন, এই কাহিনী "পাঠকগণের জন্য উপন্যাস আকারে লিখিত হইলেও, উহা কতকটা আপনার মনের আপনাকে দর্শনের মত। এই আত্ম-দর্শনের ভঙ্গীটি সাহিত্যে অতিশয় নূতন—আপনাকেই দেখা বটে, কিন্তু এমন একটি আত্ম-নিরপেক্ষতা আছে যে, সে যেন অপর কাহাকে দেখার মত; উপন্যাসগত অপর সকল নরনারী সম্বন্ধে একটা অতি তীক্ষ্ম মানস-সচেতনতা আছে। কিন্তু শ্রীকান্ত নিজের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য অকপটতা ও বিচার-বিমুখতা—এমনকি, যেন সজ্ঞানতার অভাব রক্ষা করিয়াছে।" এই মন্তব্যটি অত্যন্ত মূল্যবান, এ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া—'। কয়েকজন নর-নারীর সংস্পর্শে এসে, তাদের সংঘাতে নায়কের চিত্তস্ফুরণ হয়েছে, তাছাড়া নায়ক সর্বত্র তেমন সুস্পষ্ট নন। সমালোচক তাই বলেছেন—"এই কাহিনীতে দুইটি ভাগ বা ধারা আছে, একটা লেখকের আত্মজীবন বা আত্ম-চরিত, আর একটি সেই জীবন সম্বন্ধে চিন্তা বা তাহার সমালোচনা।" তাই সমালোচকের ধারণা এই কাহিনী লেখকের নিজেরই অন্তরঙ্গ জীবন-কাহিনী, শ্রীকান্ত একটা ঔপন্যাসিক চরিত্র নয়।

শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বলছেন—"এতো কেবল কথা গেঁথে ছবি নয় গোঁসাই। এ যে সত্যি। তফাৎ যে ঐখানে। আমি পারবো, কিন্তু তুমি পারবে না। তোমার আঁকা কথার ছবি শুধু কথা হয়েই থাকবে।" শ্রীকান্ত এই কথায় শিউরে উঠে যেন আয়নায় নিজের প্রতিকৃতি দেখে চমকে গেল। মোহিতলাল বলেছেন— 'যে পরাজয় শ্রীকান্ত স্বীকার করিয়াছে এমন স্বীকৃতি এ গ্রন্থে আর কোথাও নাই।'

নিজের প্রকৃতি ও চরিত্রের এই সুস্পষ্ট সমালোচনায় তাই শ্রীকান্ত কোনও প্রতিবাদ করতে পারেনি। মোহিতলাল তাই "খাঁটি সাহিত্যিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের আত্মপরিচয় কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতে অগ্রসর" হয়েছেন, এবং আমার বিশ্বাস সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা যে বক্তব্য তিনি এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন তা যাঁরা শরৎচন্দ্রকে জানতেন, শরৎচন্দ্রের জীবনের যে সামান্যতম অংশ প্রকাশিত তার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত—'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' তাঁদের কাছে ভালো লাগবে এবং তাঁদের চোখের সামনে এক অনাবিষ্কৃত জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। মোহিতলালের মতে শ্রীকান্ত বিরহব্যথার কাব্য—এ লেখকের আত্ম-নিবেদন। 'এ ক্রন্দন নিঃসঙ্গ আত্মার নিরুদ্দিষ্ট আর্তরব।'

এই আলোচনা গ্রন্থে মোহিতলাল 'শ্রীকান্তের বাল্যজীবন', 'নারীর প্রেম', 'নেপথ্য কাহিনী' এই তিনটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'উপসংহার' বিভাগে রাজলক্ষ্মী ও কমললতা, শ্রীকান্তের পরাজয়, রাজলক্ষ্মীর শেষ, অভয়া, অন্যায়ের প্রতিকার ও মানুষের দুঃখ নিবারণ এবং 'পরিশিষ্ট' বিভাগে শ্রীকান্তকাহিনী ও পুনর্বিচার, ফল-শ্রুতি ও শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র এই [illegible]টি পরিচ্ছেদে যুক্তি, দৃষ্টান্ত এবং নিজস্ব ধারায় তথ্যাদি পরিবেশন করে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

শ্রীকান্তের বাল্যজীবনের গুরু, ইন্দ্রনাথ। এই গুরু তার আরও দুজন, একজন অন্নদাদিদি আর অপরটি কমললতা। ইন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে শ্রীকান্ত নিজের শক্তি ও দুর্বলতার পরিচয় পেয়েছে, সে কবি হয়েছে।—মোহিতলাল বলেছেন—'এ কবিত্ব অন্য-রূপ—ইহার প্রেরণামূলে আদৌ ভাব-সত্য নাই, আছে একটা মানুষ, একটা রক্তমাংসের বাস্তবমূর্তি।' ইন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই আরো অনেকে দেখেছে কিন্তু এভাবে তাকে আঁকতে পেরেছে কে? ভয়হীন ইন্দ্রনাথকে দেখে তাই শ্রীকান্তর মনে হয়েছিল—"ঐ লোকটি কে! মানুষ! দেবতা, পিশাচ? কে ও? যদি মানুষই হয় তবে ভয় বলিয়া কোনো বস্তু যে বিশ্ব-সংসারে আছে সে কথা কি জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়ে তৈরী?—" এই ইন্দ্রনাথই বলেছিল— 'মড়ার কি জাত থাকে রে!' নির্ভীকতা আর করুণায় গড়া ইন্দ্রনাথ কিশোর শ্রীকান্তকে প্রভাবিত করেছিল। শ্রীকান্ত তাই ইন্দ্রনাথকে ভালোবেসেছিল। শ্রীকান্তর জীবনের [illegible] জন্য এই ইন্দ্রনাথের প্রভাবই দায়ী। প্রভাত-জীবনে যে শ্রীকান্তকে নেশায় মাতিয়েছিল তার নাম ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের শক্তির মূল কোথায়—তার মধ্যে কপটতা ছিল না, অসত্যকে সে মনে ঠাঁই দেয়নি,

তাই তার এত সাহস, এত তেজ, তাই তার বিশুদ্ধ বুদ্ধি।

চিঠির মধ্যে অন্নদাদির ইতিহাস, নেশাখোর সাপুড়িয়া শাহজীর সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার কঠোর তপশ্চর্যা, সাপের কামড়ে শাহজীর মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনাবলী কাহিনী এবং শ্রীকান্তকে সমান তালে গড়ে তুলেছে। শ্রীকান্ত অন্নদাদিকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মোহিতলাল বলেছেন—'এই উপন্যাস এক হিসাবে একটি উৎকৃষ্ট **'Human document'** বা মানুষের সম্বন্ধে মানুষের হৃদয়ের সাক্ষ্য।' শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর পরে মোহিতলাল বাংলা দেশের আর দুজন কথাশিল্পীর কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেছেন, মনোজ বসুর 'মাথুর' আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি'। এই উল্লেখ এবং মূল্যায়ন মোহিতলালের সমালোচনার বৈশিষ্ট্য, তাঁর বক্তব্যে কার্পণ্য নেই, অনুদার মন্তব্য নেই। রাজলক্ষ্মীর মধ্যে এক বাল্য-প্রণয়ের রূপ ফুটে উঠেছে। পিয়ারী বাইজীর তাঁবুতে শ্রীকান্তকে ডেকে এনে নানাবিধ প্রশ্ন করে জর্জরিত করল, শ্রীকান্ত তাকে চিনতে পারল না. সেই 'নির্লজ্জার হাসি এবং কদর্য পরিহাস আমার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে লাগিল।'

সেই পিয়ারী রাত্রে আর এক রূপে এসে দাঁড়িয়েছে, অমাবস্যার রাতে সে শ্রীকান্তকে একা শ্মশানে যেতে দেবে না—'শ্মশানে-টশানে তোমার একা কোন মতেই যাওয়া হবেনা—কোন মতেই না।' শ্রীকান্ত বিস্মিত হয়, পিয়ারী বলে 'যদি যেতে না দিই, জোর করে যেতে পারো?' বিহ্বল শ্রীকান্ত প্রশ্ন করে 'কিন্তু যেতেই বা দেবেনা কেন?'—তারপর সহসা ঠিক চিনতে পারে—'এ সেই রাজলক্ষ্মী।'

এইটুকু মাত্র কথায় মমতার বেশী পরিচয় নেই, কিন্তু বাল্য-প্রণয়ের স্পর্শ আছে. পিয়ারী হেসে বলে—'জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত নিজেই যার বশ হয়ে আছি, তাকেও কি কথায় ভুলানো যায়?' নারী-চরিত্রের চিরন্তন মাধুর্য পিয়ারী বাইজীর কথায় ফুটে ওঠে। পতিতা নারী সম্পর্কে শ্রীকান্তর কোনো নৈতিক কুসংস্কার নেই বটে তবু তার আত্মাভিমান বা আত্মসম্মানের সংস্কার সুদৃঢ়। তাই সে পিয়ারীর প্রথম আহ্বানে সাড়া দেয়নি। কিন্তু রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত সম্বন্ধটি [illegible] উঠেছে এবং তার পরিসমাপ্তি সেই চতুর্থ পর্বে।

শ্রীকান্তর সন্ন্যাসী হওয়া, তার পথিমধ্যে নিদারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া, পাটনায় পিয়ারী বাইজীর কাছে সংবাদ প্রেরণ, পিয়ারীর সেবা ও পাটনায় শ্রীকান্তকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে পুরাতন প্রেম ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। নিয়মচারিণী রাজলক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত শ্রীকান্তকে বিদায় দেয়। পাছে শ্রীকান্ত আত্মভ্রষ্ট হয় এই ভয়। রাজলক্ষ্মীর নিয়তি তার প্রাণ, শ্রীকান্তর নিয়তি তার মন।

কমললতা ও শ্রীকান্ত এবং রাজলক্ষ্মী ও কমললতা এবং কমললতা এই তিনটি পরিচ্ছেদ অপূর্ব। কমললতার সুস্পষ্ট প্রেম নিবেদন এবং সহসা শ্রীকান্ত একদিন কমললতাকে বলল—'কমললতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পেয়েছ, প্রার্থনা করি, এবার যেন সুখী হও।' বৈষ্ণবী প্রশ্ন করেছিল—হঠাৎ তোমার কি হল গোঁসাই? এ যেন কচ দেবযানীকে বলল—'আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।।' শ্রীকান্ত সেদিন নিজের কথায় নিজেই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। রাজলক্ষ্মীর মত কমললতার চরিত্রে উত্থান-পতন ও ক্রমবিকাশ নেই, কিন্তু যা আছে তাই যথেষ্ট।

কমললতার মত স্নিগ্ধ ও সুন্দর চরিত্র বাংলা সাহিত্যেই বেশী নেই।

এইভাবে মোহিতলাল বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে শ্রীকান্ত তথা শরৎচন্দ্রকে juxtaposition-এ ফেলে সামাজিক শরৎচন্দ্র ও শিল্পী শরৎচন্দ্র একই ব্যক্তি তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। মোহিতলাল বলেছেন—'শরৎচন্দ্রের জীবনে শিল্পীকবি ও ব্যক্তিমানুষের মধ্যে কোনো ব্যবধান ছিল না।......রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যাহ্ন দীপ্তিকেও প্রতিহত করিয়া তিনি যে স্বতন্ত্রভাবে দীপ্তিমান হইতে পারিয়াছেন, তাহার কারণ—তাঁহার কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবনের ঐ এক দুর্লভ সাযুজ্য।'

মোহিতলালের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সমালোচকের তীক্ষ্ন দৃষ্টি, সেই সঙ্গে কবিমানসের সংযোগ থাকায় এই গ্রন্থে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মোহিতলাল গ্রন্থ শেষে বলেছেন—"জীবনে রোমান্স আছে, খুব বেশীই আছে, তার কারণ—ঐ নারী-চরিত্র, উহাদের, ঐ স্বভাবই সংসারকে নিত্য-রোমান্সে ভরিয়া রাখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ কবির ঊর্ধ্বতম কল্পনাও এই রোমান্সের কূল পায় না; ঐ নারী-স্বভাবের বিকাশ ও বিকার জগৎটাকে—অর্থাৎ পুরুষের জীবনক্ষেত্রকে—হয় অগ্নিক্ষেত্র নয় পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তোলে।"

শরৎচন্দ্র প্রেমকে অস্বীকার করে তার অনির্বচনীয় মাধুরী উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর এই বিচিত্র 'এপিক' উপন্যাসে, আর মোহিতলালের অপূর্ব লিপিকুশলতায় তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' একটা রক্তমাংসের মানুষ হয়েই গড়ে উঠেছেন, সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব ও সার্থকতা। *

---

* **শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র— মোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক: বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম দশ টাকা মাত্র।**

নতুন বই

শতবর্ষের শতগল্প— (প্রথম খণ্ড)—সংকলন গ্রন্থ। সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত। বেঙ্গল পাবলিসার্শ (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা—১২। মূল্য পনের টাকা।

ইদানীং সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের দিকে অনেক প্রকাশক উদ্যোগী হয়েছেন, এ এক শুভ লক্ষণ। অশেষ রত্নরাজির বাছাইকরা শোভন সংস্করণে পাঠকসাধারণের সমধিক আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক, তা ছাড়া সাহিত্য-সমালোচক এবং গবেষকদের কাছে এই সব সংকলন গ্রন্থ বিশেষ প্রয়োজনীয়। 'শতবর্ষের শতগল্প' সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ইতিপূর্বে একাধিক সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, বর্তমান গ্রন্থ তাঁর এক বিরাট প্রচেষ্টা। বিগত একশত বৎসরে বাংলা গল্পের আকৃতি ও প্রকৃতি গড়ে উঠেছে, তাই এক হিসাবে এই সংকলন বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিক নিদর্শন। এই সংকলনে সম্পাদক নিজস্ব ধারায় গল্প নির্বাচন করেছেন। ১৭৮৭ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত যে সব লেখকগণ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গল্প এই প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাসের' ফুলবাবু এর প্রথম গল্প আর মণীন্দ্রলাল বসুর 'লেখকের বিচার' এর শেষ গল্প। প্রথম খণ্ডে পঞ্চান্নটি গল্প আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনা 'ভিখারিণী'কে এই সংকলনে স্থান দিয়ে সম্পাদক বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ধারা হিসাবে এই ব্যবস্থা ঠিকই হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর 'বাহার দরবেশ'ও এই নীতি হিসাবেই নির্বাচিত হয়েছে। কালিপ্রসন্ন সিংহ, হরিশচন্দ্র মিত্র, অমৃতলাল বসু, স্বর্ণকুমারী, শরৎকুমারী, সরলাবালা সরকার, সুধীন্দ্র ঠাকুর, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুরেশ সমাজপতি ও সুরেন মজুমদার প্রভৃতির গল্প নির্বাচন বিশেষ প্রশংসনীয়। তবে এই সংকলনে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র দত্ত, মাণিক ভট্টাচার্য, স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী প্রভৃতির গল্প না থাকায় কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হয়েছে বলে মনে হয়। বিগত যুগের

জনপ্রিয় লোক হিসাবে এ'রা পরিচিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মূলতঃ কবি এবং নাট্যকার, তাঁর গল্পকার হিসাবে কোনো প্রসিদ্ধি নেই, তাঁর গল্পটি না থাকলেও কোনো ত্রুটি হত না। তবে সম্পাদকের নির্বাচনের ক্ষেত্র সীমিত, তাঁকে একশটি গল্প নির্বাচন করতে হয়েছে অনেক গল্পের মধ্য থেকে, তাই হয়ত কিছু বর্জন করতেই হয়েছে। তাঁর মুখবন্ধটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র জীবনীগুলিও তথ্যপূর্ণ। এমন একটি সুন্দর সংকলন গ্রন্থের জন্য সম্পাদক নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

লহ প্রণাম—(কবিতা) বিভা সরকার। এম, সি, সরকার এণ্ড সনস (পি) লিমিটেড। কলিকাতা—১২। মূল্য ১ টাকা ২৫ নঃ পয়সা। (পৃষ্ঠা—৪১)

পথের টানে—(ভ্রমণ কথা) বিভা সরকার। এম, সি, সরকার এণ্ড সনস্ (পি) লিমিটেড। কলিকাতা—১২। মূল্য ৩ টাকা ৫০ নঃ পয়সা। (পৃষ্ঠা—১৯০)

ইদানীং যে-কয়জন মুষ্টিমেয় মহিলা লেখিকা কবিতা লেখেন শ্রীমতী বিভা সরকার তাঁদের একজন। 'লহ প্রণাম' ছোট্ট কাব্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রচিত শ্রদ্ধার্ঘ, এগারোটি নির্বাচিত কবিতার সংকলন। কবিতাগুলির আকার অবশ্য দীর্ঘ—পঁচিশে বৈশাখ, নবারুণ, শেষ ব্রাহ্মণ, একটি নমস্কার, হিমাদ্রি প্রাণ প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের নারী, বাইশে শ্রাবণ ও রাজর্ষি কবিতার মধ্যে লেখিকা শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। ভাবস্নিগ্ধ শুভ্রশুচি মনের পরিচয় এই কবিতাগুলির প্রতি ছত্রে তাই সহজেই পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। প্রচ্ছদটিও সুন্দর।

শ্রীমতী বিভা সরকারের 'পথের টানে' গ্রন্থটি উপন্যাস নয়, যদিচ নামকরণ দেখে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পথের টানে লেখিকা বলেছেন এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে—, ছবির মত এ'কেছেন তাঁর কাহিনী। তা ছাড়া তীর্থ মাহাত্ম্য, তীর্থের ইতিহাস এবং পৌরাণিক ভিত্তি সব বিশদ বর্ণনা করেছেন। কলকাতা থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থে লেখিকার সঙ্গে পাঠকের যেন পর্যটন হয়ে যায়। তীর্থ-সলিলের পুণ্যবারি যেন পাঠককে অভিষিক্ত করে। মাধবী আর রাধার ক্ষণিক সান্নিধ্যও [illegible] আকৃষ্ট করে তোলে। 'পথের টানে' বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে একটি সুন্দর সংযোজন। প্রচ্ছদভূষণ মনোজ্ঞ।

আয়ুবের সঙ্গে— (রিপোর্টাজ)— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড। কলিকাতা—১২। দাম দু টাকা।

১৯৬০-এ পাকিস্তানের সর্বময় কর্তা ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ ন'দিনব্যাপী পূর্ববঙ্গ সফর করেন। সেই সময় দু'চারজন বিদেশী সাংবাদিক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই ন'দিন তাঁরা ট্রেনে, প্লেনে, ষ্টীমারে, লঞ্চে, মোটরে প্রায় ষোলোশো মাইল আয়ুব খাঁর সঙ্গে ঘুরেছেন। তাঁর বক্তৃতার নোট নিয়েছেন, প্রশ্ন করেছেন, সে প্রশ্ন যৌথ প্রতিরক্ষা থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত। হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে এসেছে তাঁকে দেখতে। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী চোখ এবং কান খুলে রেখে সফর করেছেন। যদিও এই সফর কনডাকটেড, তবু তাঁর কবি এবং সাংবাদিকের দৃষ্টিতে অনেক কিছু ধরা পড়েছে। অতিশয় সুখপাঠ্য ষ্টাইলে পূর্ববঙ্গের দশদিনের অবস্থানের ইতিহাস লিখেছেন কুশলী লেখক। তিনি একস্থানে লিখেছেন—"পূর্ববঙ্গকে কি দেখতে পেলাম?... না, পূর্ববঙ্গকে আমি দেখিনি, বুঝিনি। অন্ততঃ এমন-কিছু তার দেখতে পাইনি, আগে যা আমার দেখা ছিল না। এমন-কিছু জানতে পারিনি, আগে যা জানা ছিল না। কনডাকটেড ট্যুরের একটা মস্ত অসুবিধা হল এই। অন্যের চোখ দিয়ে তোমাকে দেখতে হবে, অন্যের মন নিয়ে তোমাকে জানতে হবে।" ইত্যাদি; এর মধ্যেই লেখকের সব কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থটি (মোট ৯০ পৃষ্ঠা) এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়, এবং তার পরেও মনে একটা প্রশ্ন জাগে, সেখানেই এই গ্রন্থের কৃতিত্ব। প্রচ্ছদে ফিল্ড মার্শালের টুপি এবং রিবণ আইডিয়া হিসাবে চমৎকার, তবে চিত্র হিসাবে তেমন সার্থক হয়নি।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনাঃ

নেকলেস : ভি, এম, এন প্রোডাকসন প্রাঃ লিমিটেডের চিত্র : ১০,৭৩২ ফুট দীর্ঘ ও ১১ রীলে সম্পূর্ণ; গী-দা-মোপাসাঁর মূল কাহিনী অবলম্বনে সংলাপ ও চিত্রনাট্য : মিহির সেন; পরিচালনা— দিলীপ নাগ; আবহ-সংগীত পরিচালনা : আলি আকবর খাঁ, চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত; শব্দগ্রহণ : দেবেশ ঘোষ ও মৃণাল গুহঠাকুরতা; শিল্প-নির্দেশ : সতোন রায়চৌধুরী; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়; ভূমিকায় : উত্তমকুমার, তরুণকুমার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, শিশির মিত্র, সুনীতা, রুমা, মলিনা, ভারতী, পদ্মা, তপতী ঘোষ, বাণী গাঙ্গুলী প্রভৃতি। ভোরা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় গেল ৭ই জুলাই থেকে রাধা, পূর্ণ, প্রাচী এবং শহরতলীর অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, চিত্রনাট্যকার এবং সংলাপরচয়িতা মিহির সেন মোপাসাঁর মূল কাহিনীর শুধু খোলটুকুই গ্রহণ করেছেন, তার রসবস্তু এবং বক্তব্যকে গ্রহণ করেননি। বড়-লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ যাবার জন্যে বান্ধবীর নেকলেস ধার নিয়ে সেইটি অনবধানতার জন্যে হারিয়ে ফেলে বান্ধবীর অজ্ঞাতে সেই নেকলেসের জুড়ী মিলিয়ে অপর একটি নেকলেস কেনবার জন্যে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে নানা রকম কৃচ্ছ্রসাধনের পর যখন সত্যিই সেই দ্বিতীয় নেকলেসটি কিনতে পারা গেল, তখন বান্ধবীর মুখ থেকে শোনা গেল যে, হারানো নেকলেসটি একেবারেই ঝুটো এবং তার দাম সত্যিকার জড়োয়া নেকলেসের মতো পঁচিশ হাজার না হয়ে কুল্যে পঞ্চাশটি টাকা। কিন্তু এই সামান্য গল্পটিই প্রায় অসামান্যের রূপ নিয়েছে চিত্রনাট্যকার, পরিচালক এবং আলোকচিত্রশিল্পীর নিবিড় সহযোগিতায়। আত্মভোলা প্রোফেসার সুপ্রিয়ার সঙ্গে বড়লোকের মেয়ে এবং ইঙ্গবঙ্গ ছাঁদে মানুষ মল্লিকার বিবাহের পর থেকে গল্পটি ঘটনাবিন্যাসের ফলে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার চমৎকারিত্বে, চিত্রগ্রহণের কম্পোজিসান ও লাইটিংয়ের অভিনবত্বে, আবহ-সঙ্গীত, ট্রেনের শব্দ ও অপরাপর আবহসৃষ্টিকারী শব্দ গুণে এবং সর্বোপরি নায়ক-নায়িকার চরিত্রের মানসিক আবেদনে ছোটখাট ত্রুটীবিচ্যুতি বাদ দিয়ে এমনই রসসিন্ধ হয়ে উঠেছে, যা দর্শককে গল্পের সঙ্গে সহজেই একান্ত করে তোলে। বিশেষ করে আলোকচিত্রশিল্পীর ক্যামেরা-

"আশায় বাঁধিনু ঘর" চিত্রে রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ

স্থাপনা, পাত্রপাত্রীদের নিবিড় করে দেখানো এবং আলোছায়ার সুসমঞ্জস বিন্যাসে ছবির বহু দৃশ্য মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। আমরা চিত্রনাট্যকার, পরিচালক এবং আলোকচিত্রশিল্পী— এই ত্রয়ীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তাঁদের শিল্পকর্মের জন্যে। আমরা বলেছি, গল্পটি 'প্রায়' অসামান্যের রূপ নিয়েছে। কারণ, গল্পটিই উপস্থাপনা ত্রুটীবিহীন হয়নি। প্রথমেই, কলঘরে গিয়ে মল্লিকা নেকলেসটিকে [illegible] ওয়াস-স্ট্যান্ডের ওপর খুলে রাখল, [illegible] পরিষ্কার বোঝা যায়নি এবং সুপ্রিয়র ডাকে সে বিভ্রান্ত হয়ে সেটিকে ভুলেই বা ফেলে আসবে কেন, তাও সম্ভাব্যতার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাছাড়া ছবিতে নেকলেসটি খোয়া যাওয়ার এক-মাত্র কারণ যখন চুরি ছাড়া আর কিছু নয়, তখন সুপ্রিয়র জ্ঞাতি কাকার চোর ধরবার জন্যে অত তম্বী কি বৃথাই গেল? আর নায়িকার মুখে সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া অন্ততঃ দুখানি গানকে —বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা এবং আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে—অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর লেগেছে। এবং এরও ওপর ছবির যেটি সবচেয়ে বড়ো ত্রুটী, সেটি হচ্ছে, ছবিটির মধ্যে গতির একটি সহজ ছন্দের অভাব; যার ফলে মনে হয়েছে, ছবিটি বহু জায়গাতেই নিজের সমতা বা balance হারিয়ে ফেলেছে।

ছবির বিভিন্ন দৃশ্যকে প্রায় নিখুঁত ভাবে বাস্তবানুগ করবার জন্যে শিল্প-নির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরী যে শ্রম স্বীকার করেছেন, তা সার্থক হয়েছে। বিশেষ করে সুপ্রিয়-মল্লিকার ব্যন্ডেল রোডের বাসাবাড়ীর নিকট দিয়ে ট্রেনের আনাগোনায় খালি বাস্তবই হয়ে ওঠেনি গল্পের বিশেষ সুরটিকে যেন মূর্ত করে তুলেছে।

আবহসংগীত গল্পের প্রয়োজন মিটিয়েছে স্বচ্ছন্দে— কোথাও তারের মূর্ছনায়, আবার কোথাও তবলাকে তরঙ্গায়িত করে আলি আকবর খাঁ গল্পের ধারাটিকে পরিচালকের কাছ থেকে ঠিক মত বুঝে নিয়ে যে আবহসংগীত রচনায় যথার্থই 'ওস্তাদ', তার প্রমাণ তিনি এ-ছবিতেও দিয়েছেন।

ছবির অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে আসে, নায়িকা মল্লিকার ভূমিকায় নবাগতা সুনীতার কথা। নবাগতা বলেই তাঁর অভিনয়ের মধ্যে একটা টাট্‌কা সজীবতার আভাস পাওয়া যায়, যাকে ইংরাজীতে বলি freshness আন্তরিকার গুণে তাঁর অভিনয় সহজেই মনকে স্পর্শ করেছে, যেমন একদিন করেছিল রাইকমলে কাবেরী বসুর অভিনয়। নায়ক সুপ্রিয়র ভূমিকায় উত্তমকুমার প্রথমে যেমন আত্ম-ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, তেমনই পেরেছেন শেষের দিকে স্ত্রীর গতি-বিধির প্রতি স্বামীর সন্দেহাকুল মনটিকে মূর্ত করে তুলতে। তবে এই ছবিতে এমন বিশেষ কোনো নাট্য-মুহূর্ত নেই, যা তাঁর অভিনয় প্রতিভার সম্যক্ প্রকাশে সহায়তা করতে পারত। এর পরেই সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রুমা দেবী নায়িকার বান্ধবী ইরার ভূমিকায়। ছবির অন্যান্য ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, দ[illegible] মুখোপাধ্যায়, তরুণ-কুমার, পদ্মা দেবী, [illegible] দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, জীবেন বসু এবং আরও অনেকে।

"নেকলেস" ছবিটি তার বহুবিধ অভিনবত্বে রসিক দর্শকজনকে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে।

দিল্লী থেকে কোল্‌কাতা : কথা-চিত্রমের প্রথম চিত্র; ৯৮২১ ফুট দীর্ঘ ও ১১ রীলে সম্পূর্ণ; **কাহিনী :** বীরেশ মুখোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা **:** সুশীল ঘোষ; সংগীত পরিচালনা **:** বাঁশরী লাহিড়ী; চিত্রগ্রহণ **:** গণেশ বসু; শব্দগ্রহণ **:** জে, ডি, ইরাণী; শিল্প নির্দেশনা **:** গৌর পোদ্দার; ভূমিকায় **:** বঙ্কিম ঘোষ, জহর রায়, উৎপল দত্ত, তরুণকুমার, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, অনুভা গুপ্ত, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। মোশান পিকচার্স ইন্‌ফরমেশন-এর পরিবেশনায় গেল ৭ই জুলাই থেকে বীণা, বসুশ্রী, লোটাস এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"দিল্লী থেকে কলকাতা" প্রধানতঃ হাসির ছবি। স্কুল ছাড়ার প্রায় বছর দশেক পরে এক রেলস্টেশনে দুই পুরোনো বান্ধবী—মিতা ও নন্দীর মধ্যে হঠাৎ দেখা। মিতা অযথা নিজেকে

বান্ধবীর চোখে বড় করবার জন্যে যখন বললে, সে বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক মানস বসুর স্ত্রী, অমনই নন্দীর মধ্যে জেগে ওঠে ফিল্মস্টার হবার সুপ্ত বাসনা এবং যখন মিতা মিথ্যা ওজর দিয়ে বলে, অবিবাহিতা হিরোইনকে পেয়ে তার পরিচালক-স্বামী তার প্রেমে পড়ে যেতে পারে, তখন নন্দীও মরিয়া হয়ে বলে—সে বিবাহিতা এবং সেই কারণে মিতার ভয় অলীক। এর পর দুই বান্ধবী পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একজন যায় কলকাতায়, আর একজন পুরী। কিছুকাল বাদে সত্যিই পালে বাঘ পড়ল। টেলিগ্রাম এল—স-স্বামী নন্দী আসছে। মিতার মাথায় বজ্রাঘাত! পরের আশ্রিতা মিতা, স্টুডিওতে এক্সট্রা সাপ্লায়ারের স্ত্রী মিতাকে রাতারাতি সাজতে হ'ল বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক মানস বসুর স্ত্রী। সম্পর্কিত দাদুর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়ীটিকেই সাহেবী কায়দায় কেতা-দুরস্তভাবে সাজিয়ে মিতা তার স্বামীকে স্যুট পরিয়ে মানানসই ক'রে নিচ্ছে, তখন অনুগৃহীত এক্সট্রার কথায় মনে পড়ল—তাই ত' * বাড়ীতে একটি 'বয়' নেই!—তখন নিজের স্বামীকে মিতা সাজাল বয় এবং অনুগৃহীত এক্সট্রা সাজল তাঁর স্বামী মানস বসু এবং এখন থেকেই হ'ল হাস্যকর পরিস্থিতির সূত্রপাত। নিজেদের ঝাঁকড়া-কল কোলিয়ারীর একজন কর্মচারীকে স্বামী সাজিয়ে নন্দী যখন মিতার সাজানো প্রাসাদে এসে উপস্থিত হল এবং দুই বান্ধবী নিজেদের মিথ্যা পরিচয়কে বজায় রাখবার জন্যে প্রাণান্ত হবার দাখিল, তখন সমস্ত জুয়াচুরি ফাঁস ক'রে দেবার জন্যেই যেন গৃহ-স্বামী দাদুর আবির্ভাব ঘটে এবং গল্পও শেষ হয় সশব্দে।

হাসির ছবিতে যাঁরা মানে খুঁজতে যাবেন, তাঁরা ঠকতে বাধ্য। 'দিল্লী থেকে কোলকাতা' ছবিরও তাই কোনো মানে নেই; এতে যা আছে—তা নিছক মজা। অবশ্য গোড়াতেই বলা হয়েছে, ছবিতে হাসির শুরু হয়েছে, মিতার স্বামীকে বয় সাজানো থেকে। অবশ্য অনুগৃহীত এক্সট্রা শোভনকে হিরো হিরো দেখতে এবং মিতার স্বামী মানসকে ভিলেন দেখতে; অতএব শোভন সাজুক স্বামী, আর স্বামী সাজুক বয়—মিতার এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ক'জন দর্শক ভোট দেবেন, সেটা ভাববার কথা। কিন্তু ঐ যে বলেছি, হাসির ছবিতে সব সময়ে মানে খুঁজতে নেই—তাতে মজা যায় হারিয়ে।

এই মজা উপভোগে দর্শককে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন তপতী ঘোষ মিতার চরিত্রে তাঁর বিচিত্র অভিব্যক্তিপূর্ণ অনবদ্য অভিনয় দ্বারা। বলতে পারতুম, ছবিটিকে তিনি একাই মাতিয়ে রেখেছেন, যদি না এক্সট্রা সাপ্লায়ার মানসের সহকারীরূপে শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির অনেকখানি অংশ জুড়ে থাকতেন এবং নিজের সাজসজ্জা চেহারা ও অঙ্গভঙ্গীপূর্ণ অভিনয় দিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। এ'দের দু'জনের পরেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হচ্ছেন দাদুবেশী উৎপল দত্ত। ছবির গোড়ার দিকে স্নেহপরায়ণ দাদুরূপে তিনি দর্শক-দৃষ্টিকে খুব বেশী আকৃষ্ট করবার সুযোগ পাননি; কিন্তু ছবির শেষাংশে তাঁর পুনরাবির্ভাব একটা রীতিমত দ্রষ্টব্য ব্যাপার এবং যেভাবে হাঁকডাক ক'রে তিনি দুই বান্ধবীর ধাপ্পাবাজি ধরিয়ে দিয়ে গল্পের সমাধান করলেন, তাতে তাঁর পাশে বাকী সব চরিত্রই কেমন যেন 'বেচারা' 'বেচারা' হয়ে গেল। অবশ্য, পরিচালক নিশ্চয়ই এই পরিস্থিতিই চেয়েছিলেন ব'লে মনে হয়। 'মানস'-বেশে নবাগত বঙ্কিম ঘোষ যেভাবে অতি সহজেই তাঁর চিত্রিত চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন, তাতে অভিনেতা হিসেবে তিনি অচিরেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। অনুভা গুপ্তার নন্দী চলনসইয়ের পর্যায়ের ওপরে উঠতে পারেনি। আর হতাশ হয়েছি নন্দীর সাজা-স্বামীর ভূমিকায় জহর রায়ের নিষ্প্রাণ অভিনয় দেখে; কথাও তাঁর এত বেশী জড়ানো যে বুঝতে রীতিমত কষ্ট হয়। শেষ দৃশ্যে আসল মানস বসুর পরিচালক রূপটিকে অভিনেতা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন অতি অল্পের মধ্যে। দারোয়ানজীও মন্দ নয়। শোভনরূপে তরুণকুমার অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।

চিত্রগ্রহণের কাজ খুব অসাধারণ কিছু না হলেও মন্দ নয়। হাসির ছবিতে একটু লাউড রেকর্ডিং করাই উচিত এবং শব্দগ্রহণে জে, ডি, ইরাণী তাই করেছেন। কিন্তু জায়গায় জায়গায় আবহসঙ্গীত অস্বাভাবিক উচ্চগ্রামের হয়েছে বলে বোধ হয়। বান্ধবী নন্দীর আগমনের আগে বাড়ীর ভোল পাল্টানো ব্যাপারে শিল্পনির্দেশক গৌর পোদ্দার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবির দু'খানি গানে সুরারোপে শ্রীমতী বাঁশরী লাহিড়ী বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। দ্বিতীয় গানখানিও একটি বিখ্যাত গানের অনুকৃতির (parody) মত শুনিয়েছে। আবহসঙ্গীতও কোনো অভিনবত্বের দাবী করতে পারে না।

হাসির ছবির পরিচালনায় পরিচালকের বাহাদুরী দেখাবার অবকাশ
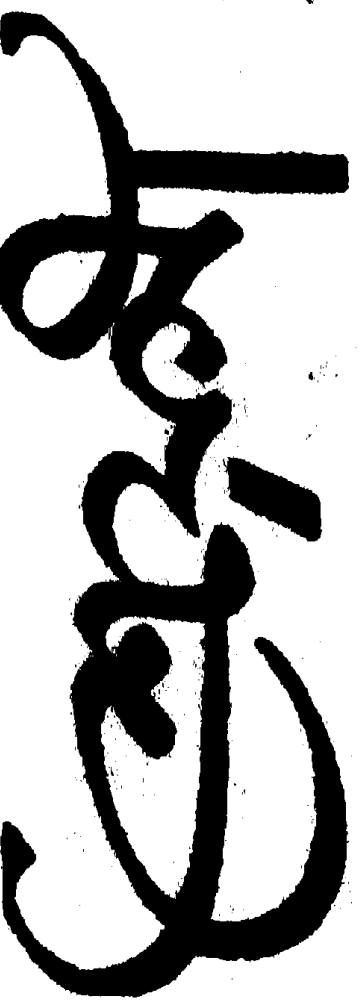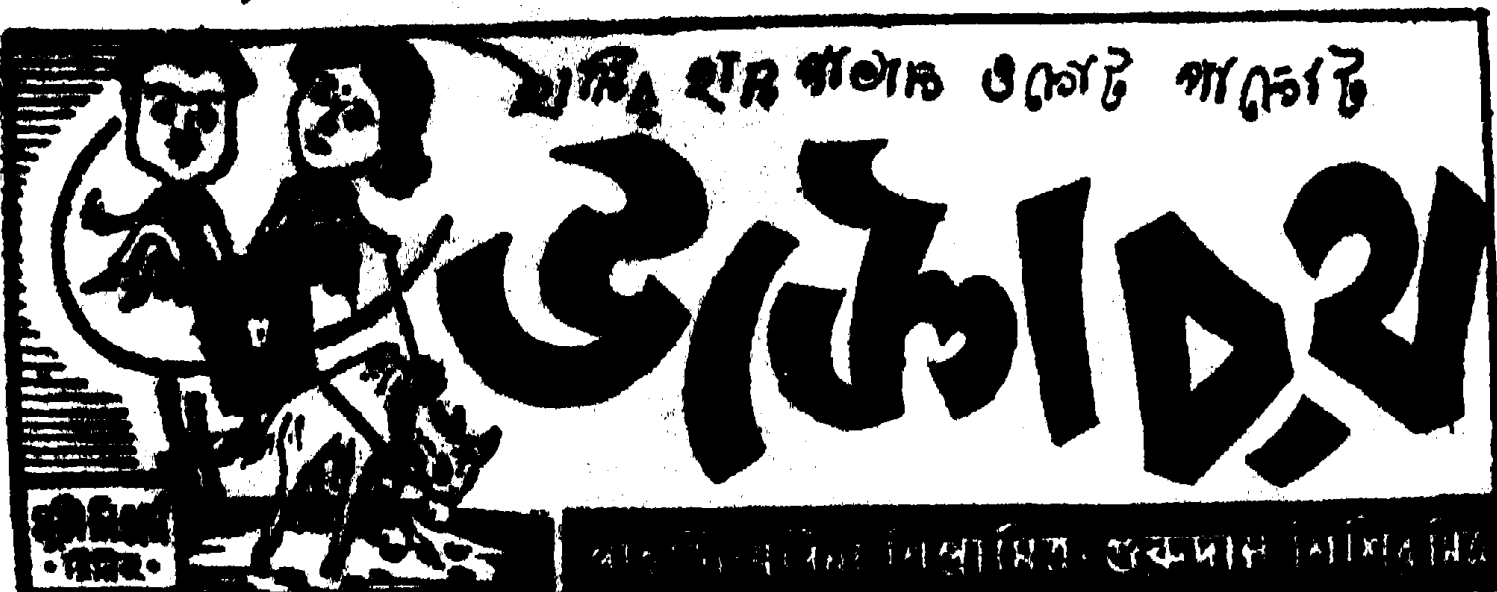
শ্রেণীর হয়। পরিচালক সুশীল ঘোষও তাঁর কাজ সাধারণভাবেই সম্পন্ন করেছেন।

বিবিধ সংবাদ

মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার্সের বিখ্যাত ছবি "বেন-হার" গেল হপ্তায় ২৫-তম সপ্তাহ অতিক্রম ক'রে কলকাতায় বিদেশী ছবির প্রদর্শনী ক্ষেত্রে একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করল। ১৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার থেকে ছবিটির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।

* * *

রজত-জয়ন্তী সপ্তাহে পদার্পণ উপলক্ষ্যে গেল ৫ই জুলাই সকালে মেট্রোর কর্তৃপক্ষ যে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন, তাতে মেট্রোর ম্যানেজার জনাব হাফেশজীর ভাষণ থেকে জানা গেল, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে তাঁরা সুলভ মূল্যে যে-বিশেষ বাইশটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা [illegible]ন, তার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন ৬৮টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা।

* * *

আজ শুক্রবার, ১৪ই জুলাই থেকে শ্রী, লোটাস, ইন্দিরা এবং শহরতলীর অপরাপর চিত্রগৃহে রূপভারতী ফিল্মস (প্রাঃ) লিমিটেডের "কাঞ্চনমূল্য" মুক্তিলাভ করবে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত শরৎ-পুরস্কার প্রাপ্ত এই কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালক নির্মল মিত্র। তরজা, কথকতা, লোক-সংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে ছবিটিতে গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন ছবির সুরকার নির্মলেন্দু চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

* * *

তারু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলা "ইংগিত" ছবিটির বিশেষত্ব এই যে, ছবির পাত্রপাত্রীদের মুখে কোনো কথা না থাকলেও ছবিটি বুঝতে কারুর কোনো অসুবিধে হবে না—অন্ততঃ এই দাবি করছেন ছবিখানির প্রযোজক। ছবিকে গতিশীল করতে অদ্ভুতভাবে সহায়তা করেছে আলী আকবর খাঁয়ের সৃষ্ট আবহসংগীত। ছবিটির দুইটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে দীপক মুখোপাধ্যায় ও ধীরাজ দাসকে এবং নায়িকার চরিত্রে লিলি চক্রবর্তীকে। এ ছাড়া আর সকলেই প্রায় নূতন মুখ।

* * *

মঞ্চতীর্থ নামে নবগঠিত নাট্য-প্রতিষ্ঠান আসছে ১৯শে জুলাই রঙমহল রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের শততম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁরই অনুপম সৃষ্টি 'দুই বোন'-এর নাট্যরূপাভিনয় করবেন। সন্তোষ সেন প্রদত্ত এই নাট্যরূপটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * *

আজ শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টায় থিয়েটার সেন্টারে 'চতুরঙ্গ' সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট নাটিকা—ভাব ও অভাব, গুরুবাক্য ও রোগীর বন্ধু—একত্রে 'কৌতুক' নাম দিয়ে এবং বনফুলের 'নব সংস্করণ' ও 'কবয়ঃ' অভিনয় করবেন।

* * *

গেল সোমবার ১০ই জুলাই মহাজাতি সদনে স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লা[illegible] একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের আ[illegible] করেছিলেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন শ্রী কে সি ভট্টাচার্য এবং শ্রমমন্ত্রী জনাব আব্দুস সত্তার। এবং পারিতোষিক বিতরণ করেছিলেন শ্রীমতী ঘোষাল।

* * *

কীর্তন-কলাভারতী শ্রীমতী শোভনা চৌধুরী খুব শিগ্গিরই মহাজাতি সদনে একটি ছয়দিনব্যাপী লীলা-কীর্তন সম্মেলনের আয়োজন করছেন। এই সম্মেলনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করতে চান, তাঁরা "নীহার বিন্দু" ১২৪।১বি, মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

খেলাধুলা

দর্শক
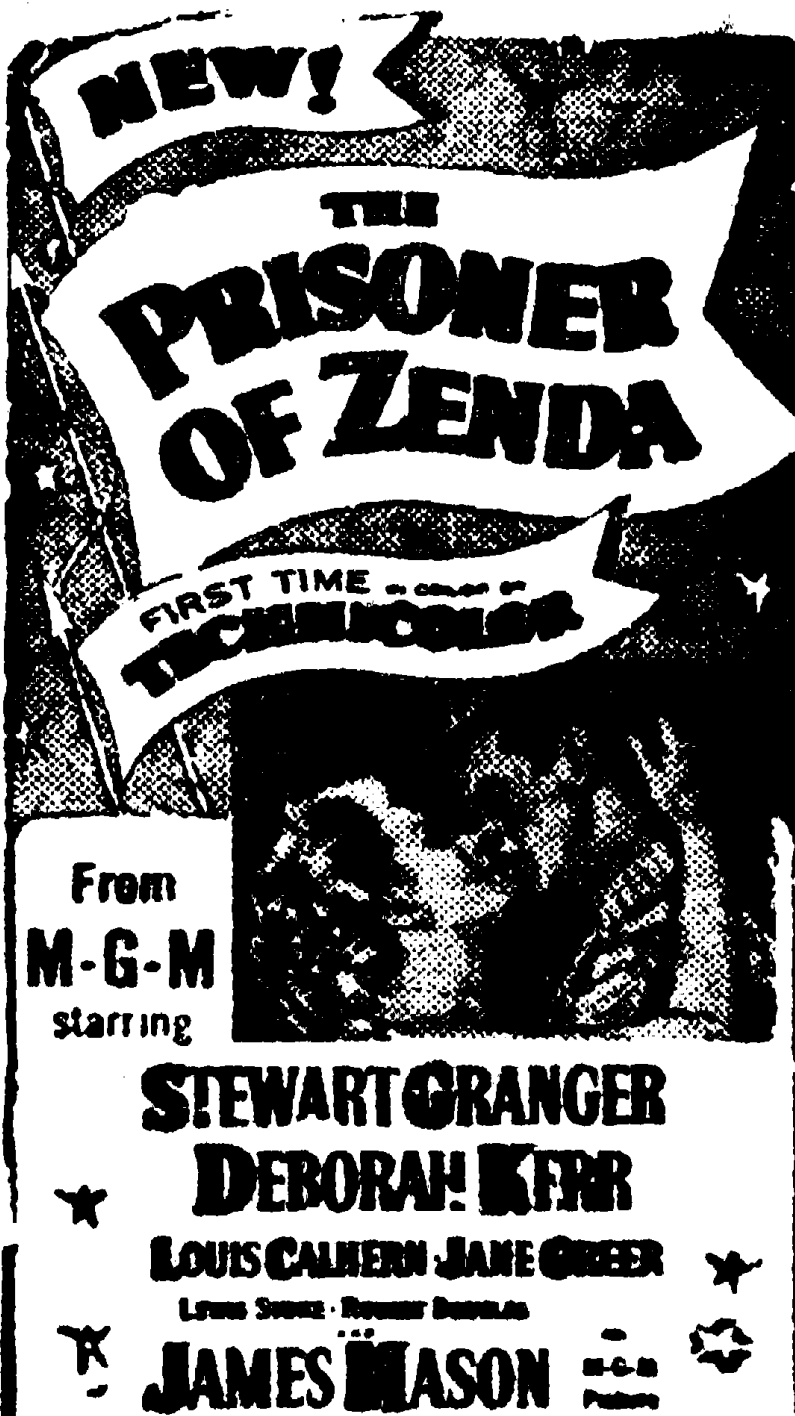
ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট

অস্ট্রেলিয়া :

২৩৭ (কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৫৪, নীল হার্ভে ৭৩। ফ্রেডী ট্রুম্যান ৫৮ রাণে ৫ উইকেট, জ্যাকসন ৫৭ রাণে ২, লক ৬৮ রাণে ২)

ও ১২০ (নীল হার্ভে ৫৩। ফ্রেডী ট্রুম্যান ৩০ রাণে ৬, জ্যাকসন ২৬ রাণে ২, এ্যালেন ৩০ রাণে ২)

ইংল্যাণ্ড :

২৯৯ (কলিন কাউড্রে ৯৩, জি পুলার ৫৩। ডেভিডসন ৬৩ রাণে ৫, ম্যাকেঞ্জি ৬৪ রাণে ৩)

ও ৬২ (২ উইকেটে। ডেভিডসন ১৭ রাণে ১, বেনো ২২ রাণে ১)

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো টসে জয়ী হন। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে টসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার এই প্রথম জয়; অপরদিকে উপর্যুপরি ১২টা টেস্ট খেলায় টসে জয়লাভের পর এই সিরিজে ইংল্যাণ্ডের প্রথম পরাজয়। টসের হার অশুভ হয়নি।

লিডস মাঠের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে অসমাপ্ত টেস্ট সিরিজের খেলার ফলাফল উপস্থিত সমান (১—১) করেছে। অনুষ্ঠিত তিনটি টেস্ট খেলার মধ্যে উভয় দলই একটি ক'রে খেলায় জয়ী হয়েছে। এখনও টেস্ট সিরিজের দুটো খেলা বাকি। অনেকেরই মন বলছে, ১৯৫৬ সালের ঘটনার কি পুনরাবৃত্তি হবে! ১৯৫৬ সালের টেস্ট সিরিজের ১ম টেস্ট খেলাটি ড্র যায়; লর্ডসের ২য় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয় এবং লিডস মাঠের ৩য় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড জয়ী হয়ে খেলার ফলাফল সমান দাঁড় করায়। ঘটনার এ পর্যন্ত এ বছরের টেস্ট সিরিজের খেলার ফলাফলের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে গেছে; এখন বাকি তিনটে খেলার ফলাফল কি দাঁড়াবে এই প্রশ্নই আজ ক্রিকেট খেলার আগ্রহশীল জনসাধারণকে দারুণ উৎসুক করে তুলেছে।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য ১৯৫৬ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ড 'রাবার' পেয়েছিল।

৩য় টেস্টে পিটার মে পুনরায় ইংল্যাণ্ডের দল-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। অপর দিকে রিচি বেনো টেস্ট খেলায় পুনরায় ফিরে আসেন। উভয় দলেই সামান্য খেলোয়াড় রদবদল করা হয়। ইংল্যাণ্ড দলের ২য় টেস্টের খেলোয়াড় রে ইলিংওয়ার্থ এবং স্ট্যাথাম ৩য় টেস্টে বাদ পড়েন। স্ট্যাথাম অবিশ্যি অসুস্থতার কারণে দলভুক্ত হননি। এই দুজনের জায়গায় স্থান পান ডেভিড এ্যালেন এবং লেসলি জ্যাকসন। এ্যালেন ১ম টেস্টে খেলেছিলেন। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সের একরকম বাতিল টেস্ট খেলোয়াড় লেসলি জ্যাকসন কি যোগ্যতায় দলভুক্ত হলেন, এই নিয়ে বেশ কিছুটা বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। গত বার বছরের মধ্যে জ্যাকসন কোন টেস্ট খেলেননি। এর আগে তিনি মাত্র একটা টেস্ট খেলেছিলেন ১৯৪৯ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে; মাত্র ৭ রান করেন এবং ৭২ রানে ৩টে উইকেট পান। ৩য় টেস্টের জন্যে ইংল্যাণ্ডের যে বারজন খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল তার মধ্যে জ্যাকসন ছিলেন না, ব্রেন ক্লোজকে বাদ দিয়ে তাঁকে নেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়া দলের ২য় টেস্টে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের থেকে কেবল মিশন বাদ পড়েছেন। লিডস মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ১২, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪, ইংল্যাণ্ডের ২, খেলা ড্র ৬। লিডস মাঠে এই দুই দেশের টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড প্রথম অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ১৯৫৬ সালের টেস্ট সিরিজে।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করে। দলের ৬৫ রাণে ১ম এবং ১৩৩ রাণে ২য় উইকেট পড়ে যায়। চা-পানের বিশ্রামের সময় দলের রাণ ছিল ২ উইকেট পড়ে ১৮৩: উইকেটে ছিলেন হার্ভে এবং ও'নীল। ৩য় উইকেটের জুটিতে তখন ৭০ রাণ, হার্ভে ৬৬ রাণ। চা-পানের বিরতির পরের এক ঘণ্টার খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ৭টা উইকেট পড়ে যায়। এই এক ঘণ্টার খেলায় মাত্র ২৫ রাণ যোগ হয় ১৮৩ রাণের সঙ্গে। ৯ম উইকেট পড়ে দলের ২০৮ রাণে। শেষ উইকেটে এ্যালেন ডেভিডসন এবং গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি জুটি বেঁধে অস্ট্রেলিয়ার এই দারুণ পতনের মুখ কিছু সময় রোধ করেন। ১০ম উইকেট পড়ে দলের ২৩৭ রাণে খেলা ভাঙ্গার ১৫ মিনিট আগে। ১০ম উইকেটের জুটিতে ২৯ রাণ ওঠে। চা-পানের পরের খেলায় ৫৪ রাণ ওঠে। ৮টা উইকেট পড়ে।

ফ্রেডী ট্রুম্যান এবং লেসলি জ্যাকসনের মারাত্মক বোলিংয়ের দরুণ অস্ট্রেলিয়ার এই বিপত্তি ঘটে। ১ম ইনিংসে ট্রুম্যান ৫৮ রাণে ৫ এবং জ্যাকসন ৫৭ রাণে ২টো উইকেট পান। কোন উইকেট না পড়ে প্রথম দিনের খেলার সামান্য সময়ে ইংল্যাণ্ডের ৯ রাণ ওঠে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৪টা উইকেট পড়ে ইংল্যাণ্ডের ২৩৮ রাণ ওঠে—৬টা উইকেট হাতে জমা রেখে ইংল্যাণ্ড ১ রাণের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। দলের ৫২ রাণে সুব্বা রাও নিজস্ব ৩৫ রাণ ক'রে আউট হন। ২য় উইকেটের জুটিতে পুলার এবং কাউড্রে ১১৫ মিনিটের খেলায় দলের ৮৬ রাণ তুলে দিয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। কাউড্রে আর ৭টা রাণ করলে সেঞ্চুরী করতেন। তৃতীয় দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ২৯৯ রাণে শেষ হলে ইংল্যাণ্ড ১ম ইনিংসের রাণ সংখ্যার ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার থেকে ৬২ রাণে এগিয়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস মাত্র ১২০ রাণে শেষ হয়। এবারও ট্রুম্যান আগুনের গোলা ছুঁড়লেন। এক সময়ে দেখা গেল, আধ ঘণ্টার খেলায় কোন্

রাণ না দিয়েই তিনি ২৪টা বলে ৫টা উইকেট নিয়েছেন— তাঁর ঝুলিতে ঢুকেছেন হার্ভে, ও'নীল, সিম্পসন, বেনো এবং ম্যাকে। ২য় ইনিংসেও হার্ভে দলের সর্বোচ্চ রাণ (৫৩) করেন। ট্রুম্যান ৩০ রাণে ৬টা, জ্যাকসন ২৬ রাণে ২টো এবং এ্যালেন ৩০ রাণে ২টো উইকেট পান। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৫৯ রাণ তুলতে ইংল্যাণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এবং ২টো উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৩ রাণ তুলে দেয়।

লিডস ম্যাচের তৃতীয় টেস্ট খেলায় যাঁরা ব্যক্তিগত সাফল্য লাভ করেছে, তাঁদের টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের সাফল্য বর্তমানে কি অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তারই পরিচয় পাওয়া যাবে নীচের পরিসংখ্যান থেকে।

অস্ট্রেলিয়া

	মোট খেলা	মোট রাণ	সর্বোচ্চ রাণ	সেঞ্চুরী সংখ্যা
নীল হার্ভে	৭২	৫৬৮৭	২০৫	২০
ম্যাকডোনাল্ড	৪৭	৩১০৬	১৭০	৫

ইংল্যাণ্ড

	মোট খেলা	মোট রাণ	সর্বোচ্চ রাণ	সেঞ্চুরী সংখ্যা
কাউড্রে	৫২	৩৪০৮	১৬০	৯
পুলার	১৪	১০৯৭	১৭৫	২

অস্ট্রেলিয়া

	খেলা	রাণ	উইকেট
ডেভিডসন	৩৭	৩০৭৮	১৫৩

ইংল্যাণ্ড

	খেলা	রাণ	উইকেট
ট্রুম্যান	৪৪	৪১২৪	১৯৩

উইম্বলেডন লন টেনিস

১৯৬১ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া চারটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে ওঠে—পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে কেবল অস্ট্রেলিয়ারই জুটি খেলেছিল এবং মিক্সড ডাবলসে চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে তিনজনই ছিল অস্ট্রেলিয়ার। পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছে তিনটি খেতাব, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা পায় একটি ক'রে। গত ৬ বছরের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৫ বার পুরুষদের সিংগলস খেতাব লাভ করলো এবং ১২ বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া পুরুষদের ডাবলস খেতাব পেল এই নিয়ে ৯ বার। ইংল্যাণ্ডই লন্ টেনিস খেলার প্রবর্তক এবং ইংল্যাণ্ডেরই চেষ্টায় লন্ টেনিস খেলা আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য অনেক দিন নেই। গত ২৫ বছরের খেলায় আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

১৯৬১ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলসের কোয়ার্টার ফাইনালে যে আটজন উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন বাছাই খেলোয়াড়; বাকি তিনজন বাছাই খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় কোন স্থানই পাননি। সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার (২ নং বাছাই খেলোয়াড়), ভারতবর্ষের রমানাথন কৃষ্ণান (৭নং), আমেরিকার চার্লস (চাক) ম্যাকিনলে (৮নং) এবং বৃটেনের মাইকেল স্যাণ্ডস্টার। সেমি-ফাইনালে চারজনের মধ্যে [illegible] তিনজন বাছাই খেলোয়াড়। এ বছরের প্রতিযোগিতা বৃটেনের কাছে আরও উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধ পরবর্তীকালের প্রতিযোগিতায় কোন বৃটিশ খেলোয়াড় কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারেনি; এ বছর দু'জন খেলোয়াড়—এম স্যাণ্ডস্টার এবং আর উইলসন খেলেছিলেন।

সেমি-ফাইনালে রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৮-৬, ৬-২ গেমে কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। ৫৮ মিনিটের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে 'চাক' ম্যাকিনলে (আমেরিকা) ৬-৪, ৬-৪, ৮-৬ গেমে মাইক স্যাণ্ডস্টারকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

ট্রফি হাতে পুরুষদের সিংগলস বিজয়ী রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)

ভারতবর্ষের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান রমানাথন কৃষ্ণান কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিযোগিতার ৪নং বাছাই খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সনকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করে উপর্যুপরি দু' বছর সেমি-ফাইনালে খেলার গৌরব লাভ করেন।

বৃটেনের এম জে স্যাণ্ডস্টারের সেমি-ফাইনালের খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ২৩ বছর পর বৃটেনের খেলোয়াড়কে সেমি-ফাইনালের খেলায় দেখতে পাওয়া গেল। এ বছরের প্রতি-

৪র্থ রাউণ্ডের খেলায় ইংল্যাণ্ডের ববি উইলসন গত বছরের চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের ১নং খেলোয়াড় নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। গত বছরের চ্যাম্পিয়ানকে পরাজিত করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়! এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ১৯৪০ সালে ফ্রেড পেরী অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক ক্রফোর্ডকে পরাজিত করে শেষ বারের

মত এই কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন।

মহিলাদের সিংগলস খেলার কোয়ার্টার ফাইনালে আটজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৬ জন ছিলেন বাছাই খেলোয়াড়।

সেমি-ফাইনালে বৃটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সমান সংখ্যক খেলোয়াড় উঠেছিলেন। একদিকের খেলায় ৬নং বাছাই খেলোয়াড় মিস ক্রিশ্চিন ট্রুম্যান (বৃটেন) ৬-৪, ৬-৪ গেমে মিস আর স্কুরম্যানকে (দঃ আফ্রিকা) পরাজিত করেন। অপরদিকে ৭নং বাছাই খেলোয়াড় এ্যাঞ্জেলা মার্টিমোর (বৃটেন) স্ট্রেট সেটে গত বছরের রাণার্স-আপ এবং এ বছরের ১নং খেলোয়াড় মিস সান্ড্রা রেনল্ডসকে (দঃ আফ্রিকা) পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য অঘটন ঘটনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ফাইনালে বৃটেনের দু'জন খেলোয়াড়কে খেলতে ৪৭ বছর পর এই প্রথম দেখা গেল।

ভারতীয় খেলোয়াড় প্রেমজিৎ লাল ২য় রাউন্ডে, আখতার আলি, নরেশকুমার এবং জয়দীপ মুখার্জি সিংগলস খেলার ১ম রাউন্ডেই পরাজিত হন।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছিলেন রমানাথন কৃষ্ণান। তিনি পুরুষদের সিংগলস খেলার সেমি-ফাইনাল এবং পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খেলিয়াছিলেন।

ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস ঃ রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-১, ৬-৪ গেমে চার্লস (চাক) ম্যাকিনলেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন। লেভার ১৯৫৯ সালে এ্যালেক্স ওলমেডো এবং ১৯৬০ সালে নীল ফ্রেজারের কাছে ফাইনালে পরাজিত হয়েছিলেন।

মহিলাদের সিংগলস ঃ মিস এ্যাঞ্জেলা মার্টিমোর (বৃটেন) ৪-৬, ৬-৪, ৭-৫ গেমে মিস ক্রিশ্চিন ট্রুম্যানকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় নীল ফ্রেজার এবং রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৮, ৬-৪, ৬-৮, ৮-৬ গেমে ফ্রেড স্টোলে এবং বব হিউইটকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। স্টোলে এবং হিউইট খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় কোন স্থানই পাননি।

মহিলাদের ডাবলস ঃ মিস কারেন হাণ্টজ এবং বিলি জিন মোফিট (আমেরিকা) ৬—৩, ৬—৪ গেমে তিন নম্বর বাছাই জুটি জেন লেহানী এবং মিস মার্গারেট স্মিথকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। মিস হাণ্টজ এবং মোফিট বাছাই তালিকায় কোন স্থান পাননি।

মিক্সড ডাবলস ঃ এক নম্বর বাছাই জুটি ফ্রেড স্টোলে এবং লেসলি টার্নার (অস্ট্রেলিয়া) ১১—৯, ৬—২ গেমে ৪নং বাছাই জুটি বব হো (অস্ট্রেলিয়া) এবং এডা বুডিংকে (জার্মানী) পরাজিত করেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

আলোচ্য সপ্তাহে (৩রা জুলাই থেকে ৯ই জুলাই পর্যন্ত) প্রথম বিভাগে ফুটবল লীগের খেলায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল ঃ

হাওড়া ইউনিয়ন দলের বিপক্ষে ৭—১ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলের জয়লাভ এবং ইস্টার্ণ রেল দলের বিপক্ষে ১—১ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা ড্র, বি এন আর দলের বিপক্ষে ৩—০ গোলে মোহনবাগান দলের পরাজয় এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিপক্ষে মোহনবাগানের গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র: ইন্টারন্যাশনাল দলের বিপক্ষে বি এন আর দলের খেলা ড্র (০—০)।

আলোচ্য সপ্তাহে ইস্টবেঙ্গল দল তিনটে ম্যাচ খেলেছে—২টো খেলায় জয় হয়েছে এবং একটা খেলা ড্র গেছে। বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল দলের ২০টা খেলায় ৩৫ পয়েন্ট উঠেছে। সমান ২০টা খেলায় ইস্টবেঙ্গল তাদের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের থেকে ৪ পয়েন্টের ব্যবধানে উপস্থিত এগিয়ে গেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানের তিনটে খেলায় একটা হার, একটা জয় এবং একটা ড্র। খেলার সব রকম ফলাফলই হয়েছে। পূর্বের সপ্তাহে ১৭টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট ছিল, এখন ২০টা খেলায় ৩১ পয়েন্ট। সমান ১৭টা খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে ২য় স্থানে ছিল; এখন ২য় স্থানে থাকলেও সে ব্যবধান ৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। এক সময় সমান ১৩টা খেলায় উভয় দলেরই সমান ২৩ পয়েন্ট ছিল; তারপর দেখা গেল ১৫টা খেলায় মোহনবাগান ১ পয়েন্টের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছে।

বি এন আর লীগের তালিকায় ৩য় স্থানে আছে—১৭টা খেলায় ২৫ পয়েন্ট।

সমান ১৭টা খেলায় এরিয়ান্স ২১ এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে ২০ পয়েন্ট পেয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং ১৯টা খেলায় অর্থাৎ ২টো বেশী খেলে ২৩ পয়েন্ট ক'রে লীগ-তালিকায় ৪র্থ স্থানে আছে।

ইস্টার্ন রেল ৭—১ গোলে হাওড়া ইউনিয়নকে পরাজিত ক'রে এ মরসুমের খেলায় সর্বাধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভের যে রেকর্ড করেছিল ইস্টবেঙ্গল সেই হাওড়া ইউনিয়নকেই ৭—১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত ক'রে ইস্টার্ন রেল দলের রেকর্ডের সমান অংশীদার হয়েছে। আলোচ্য সপ্তাহে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—পুলিশের বিপক্ষে রহমতুল্লার (মহমেডান স্পোর্টিং) হ্যাট্-ট্রিক। এ পর্যন্ত প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় চারজন খেলোয়াড় হ্যাট-ট্রিক করেছেন—প্রদীপ ব্যানার্জি (ইস্টার্ন রেলওয়ে), ভারালু এবং আপ্পালারাজু (বি এন আর) এবং রহমতুল্লা (মহমেডান স্পোর্টিং)।

৯।৭।৬১

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

"ভারতীর বই"

পড়বার ও পড়াবার মত

অশোক গুপ্ত
সংগ্রামী হিন্দুস্থান ২·৭৫

গোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী
রাষ্ট্রভাষা ৩·০০

জলধর চট্টোপাধ্যায়
সিঁথির সিঁদুর ২·৫০

নারায়ণচন্দ্র চন্দ
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৬·০০

কলীভূষণ বিশ্বাস
শারীরিক শিক্ষা ৬·০০

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য
(বাণীকুমার সংশোধিত)
হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস ৬·০০

বাসব দত্তা
গৃহস্থবধূর ডায়েরী ৭·০০

মুকুল সেনগুপ্ত
হারাণ মাষ্টারের ডায়েরী ২·০০

যোগেশচন্দ্র বাগল
মুক্তির সন্ধানে ভারত ১০·০০

সুপ্রকাশ রায়
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ১০·০০

ভারতী বুক ষ্টল
৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

—বিশিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি—

প্রতিভা বসুর মনোজ্ঞ উপন্যাস
- **মনে যদি ফুটলো কুসুম** ৪·৫০

বিভূতি গুপ্তের হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস
- **লাজ সন্ধ্যা** ৬·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
- **এক মুঠো আকাশ** ৫·০০

।। নতুন বই ।।

প্রতিভাবান লেখক মণি গংগোপাধ্যায়ের
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
কিশোরদের উপযোগী অপূর্ব জীবনী-গ্রন্থ। পত্রের মাধ্যমে অভিনব প্রকাশভংগীতে অসাধারণ। ২·৭৫

।। নতুন বই ।।

মেঘনাদবধ কাব্যের শতবর্ষ পূর্তিতে
বাণী রায় প্রণীত
মধু-জীবনীর নতুন [illegible]
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী ও সুদীর্ঘ গবেষণার আলোকে মাইকেল-জীবনীর নূতন বিশ্লেষণ। ৭·০০

—সাহিত্যের নানারূপ—

পরিমল গোস্বামী
- **স্মৃতিচিত্রণ** ৭·০০

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
- **[illegible]তের উপাখ্যান** ৩·০০

বিশ্বদেব বিশ্বাস
- **কাঞ্চনজংঘার পথে** ২·৫০

মায়া বসু
- **চেনা-অচেনা** ৩·০০

কল্পলোক পত্রিকা ও পুস্তক তালিকার নমুনা কপির জন্য লিখুন ঃ

গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণোয়ালিশ স্ট্রীট কলিঃ-৬

প্রকাশিত হইল ! সুজনীর বই ! !

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

দু চোখের দেখা ৩·০০

'হাটের আবহাওয়াতে আনন্দের আমেজ চকচক করছে। একজন হেঁকে উঠল ঃ

আয় খন্দের নড়ে চড়ে
চিংড়ী মাছের ঘাড়ে চড়ে।

আর একজন তার চেয়েও জোরে চেঁচিয়ে চমকে দিল সবাইকে ঃ বাবু, এবার পুজোয় বুক ধড়ফড় শাড়ী, কিনুন তাড়াতাড়ি।'

এরকম অজস্র রসরচনা দিয়ে ভরা দু চোখের দেখা। লেখকের মনোবিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও সমবেদনার সমন্বিত জীবন-বেদের নতুন ভাষ্য এই গ্রন্থ।

সুজনীর অন্যান্য বই ঃ

চিত্ত সিংহের ঃ **জলবিম্ব** ৩·০০
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঃ **কুয়োতলা** (যন্ত্রস্থ)

পরিবেশক ঃ **মিত্রালয়**, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ইম্পিরিয়াল-চা

দেশ-বিদেশের সকল ক্রেতার কাছে সমান প্রশংসিত।

প্রাঃ ইম্পিরিয়াল ... লিঃ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

অমৃত

১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, মূল্য ৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 21st July 1961.
40 Naye Paise

স্বাধীনতা পাওয়ার পর গত ১৪ বৎসরে ভারত সরকার বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিতর্কে বহু ক্ষেত্রেই মীমাংসা করে উঠতে পারেননি। কাশ্মীর, ভারত-চীন সীমান্ত, গোয়া ইত্যাদি বড় বড় সমস্যা প্রচুর বাগ্মিতা এবং লিপিচাতুর্য সত্ত্বেও সমাধানের দিকে এক পাও এগোয়নি। এই পটভূমিতে যখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, লণ্ডনে অবস্থিত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ভাগ-বাটোয়ারার বিষয়ে বৃটেন, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ মোটামুটি একমত হতে পেরেছে তখন আশ্বস্ত না হ'য়ে পারা যায় না।

আপাতদৃষ্টিতে, এক্ষেত্রে বিরোধের যা বিষয়বস্তু ছিল সেটা অকিঞ্চিৎকর মনে হ'তে পারে। কিন্তু ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীটা ঠিক কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান তা মনে রাখলে বর্তমান মীমাংসার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

এই লাইব্রেরী অন্য দশটা গ্রন্থাগারের মতো কেবল বই সাজিয়ে রাখার গুদাম-ঘর নয়, দস্তুরমতো একটি গবেষণা-গৃহ, এবং ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য দেশগুলির বিষয়ে গবেষণা করার এতো বিচিত্র উপাদান অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই লাইব্রেরীতে স্থান পেয়েছে ৭০ হাজার ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত ভারত-সম্পর্কিত বই; তাছাড়া আছে ২৪ হাজার বাংলা, ২০ হাজার সংস্কৃত ও প্রাকৃত, ২০ হাজার উর্দু এবং অজস্র অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লিখিত বই। প্রাচ্য দেশীয় অন্যান্য ৮০টি ভাষার বইও সংখ্যায় কম নয় এখানে। আর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি যে কত আছে তা বলে শেষ করা যায় না। বলা বাহুল্য পাণ্ডুলিপিগুলি সবই কাগজে লেখা নয়— শিলাপট্ট, তাম্র-পট্ট, ভূর্জপত্র ইত্যাদিতেও লিখিত হ'য়েছে অনেকগুলি। এই বিভাগে সংগৃহীত ইউরোপীয় পাণ্ডুলিপির সংখ্যা হল প্রায় এক হাজার। প্রাচ্য-দেশীয় পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ২০ হাজারের কম নয়। তাছাড়াও রয়েছে বহু অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির ছিন্নপত্র ও ভগ্নাবশেষ।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। এর-পর রয়েছে শিল্পকলার এক সুবৃহৎ সংগ্রহশালা, এবং তাতে স্থান পেয়েছে দেড় হাজার ভারতীয় মিনিয়েচার, দু'হাজার পারসিক

সম্পাদকীয়

মিনিয়েচার এবং বহু পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ-কারীর হাতে ভারতীয় বিষয়বস্তুর উপরে আঁকা ছবি। সেই সঙ্গে আছে আলোকচিত্র—তাতে ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন প্রাচ্য দেশগুলির প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের এত ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায় যে বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয়। শুধু নৃতত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোকচিত্রই রয়েছে তিরিশ হাজারের বেশি!

এই হল ইণ্ডিয়া অফিস লাই-ব্রেরী। একে লাইব্রেরী না বলে ভারতচর্চার পীঠস্থান বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, এই লাইব্রেরী সংহারক মনোভাবের ত্রিশূলের খোঁচায় ত্রিধা-বিভক্ত হয়নি। বরং বাইবেলে বর্ণিত সালোমনের বিচারকাহিনীর মতো, এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে সন্তানের ভাগবাটোয়ারার উল্লেখমাত্রেই আসল মা প্রতিবাদ করেছেন। এবং অত্যন্ত সুখের কথা, সেই আসল মায়ের গৌরব এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তিনটি দেশেরই প্রাপ্য।

স্থির হয়েছে, লাইব্রেরীটিকে তিন টুকরো ক'রে এক-একটি বিকলাঙ্গ প্রতিষ্ঠান তিনটি দেশের প্রতিপাল্য না ক'রে, প্রত্যেকটি দেশকেই কিছু আসল ও কিছু আসলের হুবহু প্রতিলিপি বা প্রতিরূপ দিয়ে গঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধি-কারী করা হবে। বিজ্ঞান আজ এতদূর উন্নত যে, এই নকল করার কাজ অত্যন্ত নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই বাটোয়ারার কাজ নিষ্পন্ন হবে ব'লে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

সে আশা অবশ্য আমাদেরও। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা দরকার। ভাগা-ভাগির ব্যাপারে সংখ্যা, আয়তন বা ওজনই সাধারণতঃ নিরিখ হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে বা গবেষণার প্রয়োজনে কোন্ গ্রন্থ বা উপকরণ কতোখানি মূল্যবান তার পরিমাপ তো সংখ্যা, আয়তন বা ওজন দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না.— সে মূল্য নির্ধারিত হয় গুণগত উৎকর্ষের দ্বারা। তাই দফাওয়ারী হিসাবে কোনো পক্ষ ন্যায্য ভাগে বঞ্চিত না হলেও প্রকৃত উত্তরাধি-কারের নিরিখে ফাঁকি পড়ে যেতে পারে।

আমরা ভারতবাসীরা সমস্ত রকম বিরোধ এবং বিফলতার ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বৈদান্তিক মনোভাবাপন্ন। সেজন্যে আগে থাকতেই এদিকে সচেতন থাকা ভাল।

কবিতা
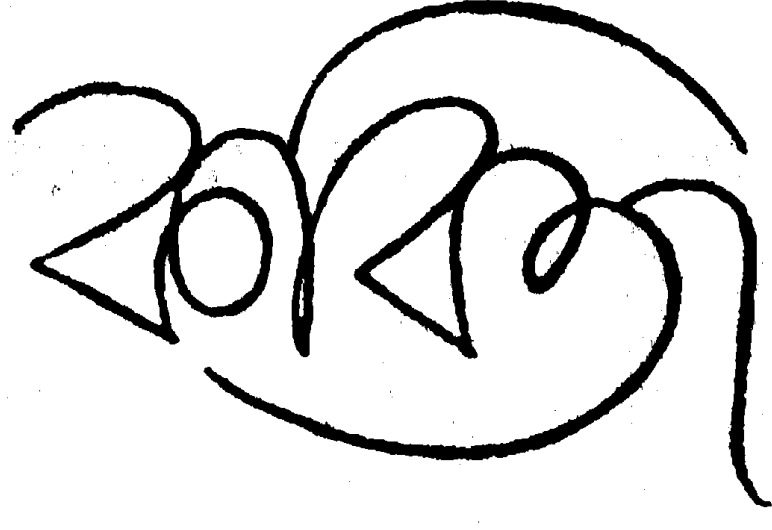
ও বাড়ীর মেয়ে

জসীম উদ্‌দীন

ওদের বাড়ীতে না আসিয়া যদি আসিতে মোদের ঘরে,
সিঁদুর পড়িলে তোলা যায়-মেঝে রাখিতাম সাফ ক'রে।
সেইখান দিয়ে রঙিন পায়েতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া যেতে,
কত রকমের নাচের নক্‌সা যাইতে যে তুমি পেতে।
জানালায় পোষা শুকশারী তোমা শোনাইত রূপকথা,
তোমার খোঁপার লাগিয়া উঠানে ফুটিত ঝুমকো লতা।
সুশীতল জল কলস জুড়িয়া গাহিত সুখের গান,
সুশীতল ছায়া উঠান জুড়িয়া দুলিত শাখীর দান।
নক্সী কাঁথার ইন্দ্রপুরী যে রহিত বিছানে আঁকা,
রঙিন সিকার লহরে খেলিত দু'খানি তালের পাখা।

তুমি যদি আজ মেয়ে না হইয়া হলুদে পাখিটি হয়ে
মোদের বাগানে হলুদ চিঠিটি আনিতে পাখায় বয়ে,
আমরা তোমার গান শুনে শুনে লিখিতাম কত ছড়া—
তোমার মুখের মমতা জড়ান ওমনি আদর ভরা।

তুমি ও বাড়ীর মেয়ে না হইয়া ফুলটি হইয়া হাসি
মোদের বাগানে পাতার আড়ালে উঁকি ঝুঁকি দিতে আসি,
মোদের ঘরের রাঙা প্রজাপতি পাখায় বাতাস ধরি—
গুন্ গুন্ করে গান শোনাইত মনের মতন করি।

তুমি যদি এলে, ও-বাড়ীতে কেন মেয়েটি হইয়া এলে,
লক্ষ যোজন দূরে সেই বাড়ী চাহিলে দেখা না মেলে।
কি এমন হত এ-বাড়ীতে এলে আঁখির ফটিক ঘরে,
কাজল রেখার দেয়াল রচিয়া রাখিতাম তোমা ধরে।
হায়রে, ও-বাড়ী দূরে-দুরান্ত অন্তবিহীন পথ,
শ্রান্ত আমার জরায় জীর্ণ মানস লোকের রথ।

পঁচিশে বৈশাখের বনস্পতি

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

বৃদ্ধ বনস্পতি সে যে। রৌদ্রদগ্ধ পথের পৃথিবী
দিনের দুঃসহ দৈর্ঘ্যে পিপাসার্ত ক্লান্ত হয়ে এলে
ছায়ার প্রশান্তি দিয়ে ঢেকে দেয় তাঁর ধূলিগুলি;
তখন সন্ধ্যার স্তব ঘন হয় ধূসর বিকেলে।

সেই বৃদ্ধ বনস্পতি, পিতামহ বিবর্ণ জগতে
রেখেছে মাটির পাত্রে মৃত্যুহীন বলিষ্ঠ প্রত্যয়,
মানব আত্মার এই অভ্রভেদী দুঃখ অপমান,
এই ইতিহাস আজ শেষ কথা নয়, নয়, নয়।

রাত্রির শিবির ভেঙে আলোকের জয়ধ্বনি বাজে
সে বৃদ্ধ বনস্পতির জন্ম যেন পঁচিশে বৈশাখে,
রৌদ্রের অরণ্যে দেখি ছায়াচ্ছন্ন শাখা প্রশাখার
[illegible] [illegible] আশীর্বাদ, এ মৃত্যুকে প্রণাম জানাকে।

বৃষ্টিধারায়, রৌদ্রে

তরুণ সান্যাল

বৃষ্টিধারা ধুয়ে গেছে উত্তরীয়, অধুনা চপল
হাওয়ার উল্লাস, মগ্ন অন্ধকারে ঘুমন্ত, দ্রবণে,
কেঁপে ওঠে নগ্ন বক্ষ, কেঁপে ওঠে যুগল উৎপল,
বহে যায় মণিহারে, স্রোতে, বৃষ্টিধারে, অন্যমনে।
আমি এই উল্লাসের, উৎসবের, ধাবন্ত প্রবাহে
তরল আগুন হাতে খেলা করি ভয়াল ক্রীড়ায়—
এসো, দুরন্তের রঙ কপালের রক্তিমায়, দাহে,
এসো দুঃখে সমর্পিত, কবি হে, সে আবিষ্ট পীড়ায়।

কিছু শোক, শবযাত্রা, ঢোল কাঁশি খঞ্জনি ও খই
চতুর্দিকে ঘিরে থাকে শব্দে, দানে—ছড়ায়ে, লুটায়ে
চিতায় মাংসের গন্ধ, নতুপর শিখার অথই—
প্লাবনে যাবার আগে গা ভাসাই বয়সের বায়ে।
মুখে বৃষ্টিধারা যাবে ধুয়ে গেছে মলিনতা, ধূলি,
এখন শিশুর মত নগ্ন দেহে আগুয়া জড়াবো।
দূরে রোদসির শূন্যে অদৃশ্য সুদূর বাহুগুলি
বায়ুভূত সম্ভাবনা হয়ে ডাকে, ঐখানে যাবো।
আলো, চতুর্দিকে দুঃখ, অন্ধকার, চতুর্দিকে হাসি,
এখনও বন্দরে আছি, প্রস্তুতি, হে জাহাজের বাঁশি॥

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৬।৯।৫৯

যা কিছু লিখেছি পড়েছি তাই থেকে মনে হয় যে আমার মন বড়ই সন্দেহাকীর্ণ। যেখানে deductive সেখানেই বিশ্বাস জমে ওঠে। Inductive হওয়ার অর্থই বোধ হয় scepticism।

বুদ্ধ, যীশু, অন্যান্য মীষ্টিক একই ধরণের যেন কথা বলেন। ঠিক বুঝতে পারি না। শ্রীঅরবিন্দর divine message-এর রচনাগুলি কিন্তু যেন বুদ্ধি-প্রধান। এটা মনে হয় উচিত নয়, কিন্তু........। বিবেকানন্দের সৃষ্টিও যেন প্রধানতঃ রাজযোগের, তাও নয় অবশ্য, তবু......। কষ্টও পাই, তা হোক গে। মনটাই যেন viscous—। স্থায়ী বন্দোবস্ত নেই, ভারসাম্য নেই, কাদাও নয়, থক্‌থকে।

২৮।৯।৫৯

বন্দরনায়ক মারা গেলেন। মারা যাবার সময় আততায়ীকে করুণা করতে বলে গেলেন। একটা অসম্ভব রকমের ঐতিহ্য তাঁর ভেতরে বসে গেছে। পরে বৌদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় সিংহলের সমস্যা মনেই আসে না। কিন্তু খবরের কাগজে বোধ হয় মাতামাতি করবে। সেটা হবে অন্যায়।

২৯।৯।৫৯

আজ নাসীর খাঁর (?) মুখ থেকে, 'সওতন ঘর নাজা, হা মোরে সেঁইয়া' শুনলাম। প্যাঁজ-রশুন ছাড়া এ ঠুংরী-দাদরা আর কারুর গলা দিয়ে নাবে না। আদৎ কথা, কথার উচ্চারণ, তারপর কন্ঠের আওয়াজ, দুয়ে মিলে এক অদ্ভুত সমাবেশ হয়। খেয়ালে অধারঙ-সদারঙের ঢং কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, যদিও আমার কাছে অন্ততঃ মুসলমানের কন্ঠেই বেশী ভালো শোনায়। রামকৃষ্ণ ভাজে আর ফৈয়াজের গায়ন পৃথক হলেও দুই-ই চমৎকার তবু যেন ফৈয়াজেরই আরো বেশী মনোহারী। ধ্রুপদে কিন্তু হিন্দুরই

আধিপত্য। অবশ্য গোয়ালিয়রের ওমরাও খাঁ, জাকরুদ্দিন, আলবন্দে, নসীরুদ্দিনের ধ্রুপদ মন দিয়েই শুনেছি; তাদের মুখের সংস্কৃত উচ্চারণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ, নসীরুদ্দিনের নামই ছিল পণ্ডিত নসীরুদ্দিন। তৎসত্ত্বেও হিন্দুদের মুখের ধ্রুপদ যেন 'শুদ্ধ বাণী, শুদ্ধ আচার', যেন প্রক্রিয়াটিই বিশুদ্ধ। ঠুংরী-দাদরা প্রভৃতি মুসলমানদের। বহু বৎসর পূর্বে মির্জাপুরের কাছে বিরহী গ্রামে যাই; সীতা যখন লঙ্কায় যাচ্ছেন তখন পায়ের নূপুর ফেলতে ফেলতে উড়ে গেলেন, রামচন্দ্র সেই নূপুর কুড়িয়ে পান, তারই নাম 'বিরহী'। সেখানে যা কাজরী শুনি তার তুলনা দেখিনি। বেশীরভাগই ঝাঁপতালের ওপর। বারাণসী, ফৈজাবাদেরও কাজরী খুবই ভালো। চৈতী কিন্তু হিন্দুদের। সেটার মধ্যে লোকসঙ্গীতই প্রধান বটে, কিন্তু তারা রীতিমত sophisticated। লক্ষ্ণৌ-এর গা ঘেঁষে গেছে এরা। একবার কৈসার বাইয়ের ঠুংরী নিয়ে আলোচনা করি—সেটা যেন বোম্বাই-এর ঠুংরী। উত্তরপ্রদেশের ঠুংরী, বিশেষ করে লক্ষ্ণৌ-এর ঠুংরী, অন্য ধরণেরই, বেনারসের ঠুংরী থেকে কিছু পৃথক। মীরা ব্যানার্জির পাঞ্জাবী 'পানি ভরেলি' আর রোসনুলন বাই-এর বেনারসী 'পানি ভরেলি'—দুটোয় আকাশ-পাতাল তফাৎ। 'আজাবেলি' কথার উচ্চারণই আলাদা, 'ঝমাঝম' অন্য জাতের। রোসনুলান বাই-এর 'পানি ভরেলি' যদি না শুনতাম মীরা ব্যানার্জির 'পানি ভরেলি'ই ভাল লাগত। রোসনুলন বাই বেনারসের লোক, একটু কাশীর গন্ধ আছে, কিন্তু তাঁর আদৎই হোলো মুসলমানী। কাশীর বিদ্যাধরী, সুদ্ধেশ্বরী, কমলেশ্বরী এমন কি গিরিজা দেবীও চমৎকার গান, কিন্তু রোসনুলনের ঠুংরী, দাদরা, কাজরী, সমকক্ষ কুত্রাপি নেই। বহুকাল পূর্বে এক ছিলেন মৈজুদ্দিন—তিনি non-pariel। ঠুংরীর তিনি ছিলেন বাদশা। মৈজুদ্দিনের ঠুংরী এবং রমজান মিঞার টপ্পা মনে করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি। তাঁদের সম্বন্ধে একবার ভেবেছিলাম কিছু লিখব, কিন্তু বিধি বাধ সাধলে।

৩০।৯।৫৯

আজ ত্রিশে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯। ৩৫ বৎসর ইউনিভার্সিটিতে কাজ করলাম এবং আরো তিন বৎসর সরকারের নোকরী। শেষ বছর বিনা মাইনের economic adviser। চিরটাকাল উত্তরপ্রদেশে। এ দেশের গ্রীষ্মকালে বড় বেশী গরম, তাছাড়া সবই ভালো। এদের ভদ্রতা, কথাবার্তা, চাল-চলন, ব্যবহার একটু যেন উঁচু ধরণের। এদের ভদ্রতার মানই উঁচু। পরশু থেকে যে কদিন বাঁচব সে কদিনের বেশীর ভাগটা দেরাদুনে থাকব, যদিও সেটা এখন পাঞ্জাবী সহর।

অন্যকথা মনে উঠছে। ভারি মজা লাগে। প্রায় চব্বিশ বৎসর লেকচারার ছিলাম, বছর দুই পরে রীডার, তারপরই প্রোফেসার এবং শেষে ডিপার্টমেন্টের কর্তা। এগুলো লক্ষ্ণৌ-এ। তার পর আরো পাঁচ বছর আলিগড়ে—সেখানেও কর্তা। তবে লেকচারার ছিলাম বেশীর ভাগ সময়। কিন্তু আমার ওপর তিলমাত্র আঁচ পড়ে নি, দু'একদিনের ঘটনা ছাড়া। কর্তা হয়েও কর্তৃত্ব করতে পারিনি। ব্যাপারটা আমার ধাতেই বসেনি।

বই পড়াটাই আমার ধর্ম। পুরোদস্তুর বই খান-পাঁচেক লিখেছি, অন্য সব টুকরো, ছিটেফোঁটা, প্রবন্ধ। কখনও কখনও, কোথায় কোথায় কিছু সারবস্তু আছে নিশ্চয়। আমি বলতাম, "We are third raters, trying desperately to be second rate. I want to remain a lecturer because I deserve a lectureship in a free India. My maximum should be that and nothing more; কিছু আদর্শবাদ ছিল নিশ্চয়, কিন্তু আমি জানতাম না। I took it in my stride.

নানা সম্বন্ধে বই পড়েছি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি। কিছু বিজ্ঞানও। কেন পড়েছি তা জানি না। ভালো লেগেছে তাই পড়েছি—পড়বার জন্য পড়িনি।

পড়ার মধ্যে বিস্তর দোষ ছিল। সংস্কৃত পড়তে পড়তে ছেড়ে দিলাম। বাড়িতে আমার শিক্ষক ছিলেন সতীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তিনি Honours Standard-এ অঙ্ক কষাতেন। তাও ছেড়ে দিলাম। অনেক দূর এগিয়ে ফ্রেঞ্চও ভুলে গেলাম। এ তিনটি আমার প্রধান দুঃখ।

বিস্তর অন্য দুঃখ আছে। লোকে বলে আমি বুদ্ধিসর্বস্ব। তা ঠিক নয়। বুদ্ধি মানে যদি Aristotelian syllogism হয় ত আমি ঠিক সেই হিসেবে লজিক্যাল নই। বরঞ্চ আমার মন ডায়লেকটিক্যাল। সুধীনের (দত্ত) মনও ডায়লেকটিক্যাল, সে 'যদিচ', 'তথাপি', 'যদ্যপি', ইত্যাদি দিয়ে নিজেকে বাঁধে। আমি বাঁধি না, চলি; সুধীন চক্রবৎ খানিকটা ঘোরে। ভাষায় আমার বাক্য পরিষ্কার খোঁজে না, লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে, যাকে বলি staccato। সুধীন harmonic, contrapuntal।

লেখায়, বাক্যে আমার বিস্তর দোষ আছে। আমি বাঁধি না—চলি, এইটাই আমার প্রধান কথা। তার দোষগুণ আছে, গুণের চেয়ে দোষই বেশী। এই চলার পথে অনেক দুঃখ এসে জোটে। দুঃখ ঠিক বলব না, বলব বাধা-বিপত্তি।

পড়েছি কিছু নিশ্চয়, এবং সেইসঙ্গে পড়িয়েছি। রোজ দুঘন্টা, তারপর এক টিউটরিয়াল। প্রোফেসার হয়ে অবধি সপ্তাহে ঘন্টা ছয়েক। প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রী আসত। বই-এর কথাই বেশী কইতাম, গল্প গুজোবও রোজই চলত। (বুদ্ধদেববাবু আমার সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন সেটা ভুল।) ভালোমন্দ শিক্ষকও আসতেন। কতরকমের ছেলে-ছোকরাই না আসত! (পরীক্ষা দেবার পর বিয়ে করে রাত্রে টাঙ্গায় চড়িয়ে বউ নিয়ে হাজির। সেরাত্রে দুজনকে আলাদা জায়গায় শোয়ালাম। পরের দিন সকালে চা খেয়ে অন্য দেশে পালিয়ে গেল। এখন বড় চাকরী করছে।) গত তিন বছর আলিগড়ে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারতাম না, তাদের পড়াইনি, সামান্য টুকিটাকি সেমিনার নিতাম, গল্প করতাম।

শুনেছি তিন-চার দশক ছাত্রদের আমি 'মানুষ' করেছি। কথাটা ভুল, মানুষ আমি করিনি। এতদিনে মাত্র গুণে চার-পাঁচটি ছাত্র পেয়েছি। তারা এক হিসাবে মানুষ নয়, বাঁদর, অর্থাৎ তাদের স্বভাবে ভারসাম্য নেই। বাকী সব সাধারণ, ছাঁ-পোষা লোক, চাকরী করে খায়, উন্নতি করে ইত্যাদি। তার বেশী নয়। দেখা করতে আসে অনেকে. বলে 'উয়ো জমানা গুজর্‌ গিয়া'। জানিনা গিয়েছে কিনা। তবে বদলেছে নিশ্চয়। প্রত্যেকেই বলছে প্রতি বৎসর Standard পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু competitive পরীক্ষায় বছরে অন্ততঃ দশ-বারটা ভালো ছেলে বেরুচ্ছে দেশ থেকে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝি না। সাধারণে ইংরেজী শিক্ষার বহর কিছু কমেছে; নীচে থেকে ওপরে ঠেলে যাবচ্ছে বোধ হয় হিন্দী। হিন্দীর জন্য standard

কমেছে বলা যায় কি? ওঠা-নামা ব্যাপারটা অতটা সাংখ্যিক নয় যাতে গুণগত হতে পারে। গুণগত এখনও নয় বলেই মনে হয়। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু এখনও গুণগত হয়নি নিশ্চয়। সবই ভালো ছেলে বেরুচ্ছে তা নয়, কিছু আসছে মনে হয়। গড়পড়তা শতকরা প্রায় ৪১ জন নিম্ন-শিক্ষা পাচ্ছে শুনলাম, বিশ বছরে ৬০ হবে। তখন গুণে পরিণত হবার সুবিধা হবে। ব্যাপারটা এই ঃ ভারতে একটা প্রকান্ড বিপ্লব হল না, তাই সংখ্যা দিয়েই গুণে আনতে হবে। বিপ্লব যখন হোলো না, তখন কেবল [illegible]রি-বর্তনের হার কিছু বদলাতে হবে—তার বেশী কিছু না। এইসব ভেবেচিন্তে মনে হয় 'উয়ো জামানা চলা গিয়া' কথাটা একরকম ভাববিলাস।

আর একটা কথা মনে আসে। আমি ঠিক অধ্যাপক নই। অধ্যাপকীয় মনোভাব আমার আছে নিশ্চয়; তার চেয়ে বেশী বুদ্ধিপ্রবণতা; আরো বেশী সন্দেহা-কীর্ণতা। শেষে দাঁড়ায় অনধ্যাপকীয়তা। সে বস্তুটা কি ভেবে পাই না। প্রথম কথা, অনেকগুলি বিজ্ঞানকে একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা, যেটা ঠিক অধ্যাপকীয় বিশেষজ্ঞতা নয়। সেজন্য ছেলেদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়েছে জানি। নিজের ক্ষতি আরো।

গান আমাকে অধ্যাপকীয় মনোভাব থেকে অনেক বাঁচিয়েছে। যদিও গানে পাগল ছিলাম তবু যেন সেটা বুদ্ধির দিক থেকেই ফুটে উঠেছে। Emotive value।

আমি প্রথম প্রথম গ্রাহ্য করিনি। পরে বোধহয় করেছি, তবে অন্যভাবে। সাহিত্যিক emotion আমার মনে বিশেষ স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথে সাহিত্য ও সঙ্গীতের হরগৌরী মিলন আছে। মোটামুটি প্রধানতঃ musical emotionই আমার প্রাণে সাড়া দেয়। সে musical emotionগুলি আমার অধ্যাপকীয় মনোভাবের অতিরিক্ত। গান, বাজনা শুনে আমার পক্ষে পুরোপুরি প্রফেসার হওয়া অসম্ভব। কেবল গান নয়, ছবি, আকাশ-বাতাস, নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আমি অন্য রকম হয়ে যাই। বৃষ্টি এলো ঝমঝম করে, ছেলেদের ছুটি দিয়েছি, কোকিল ডাকলেও তাই, শীতের আমেজও তাই, গাছের পাতা ঝরলেও তাই— কেবল ছুটি দিতে চাইতাম, কিন্তু বেশী দিতে পারতাম না। রাধাকমলবাবু সামান্য বকতেন, বেশী কিছু নয়, নিজের বই নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

গল্প, কথাবার্তা—সাধারণ মানুষের অপেক্ষা অনেক বেশী কথা কইতাম। যাকে 'কিস্সা' বলে তা করতাম না। আড্ডাই দিতাম, তবে অন্যভাবে। অন্যের কথাও শুনতাম। তবে নিছক গাল-গল্প হোতো না এবং সেইখানেই পার্থক্য ছিল। সাহিত্যিক বাক্যভঙ্গী ছিল সেই পার্থক্যের সম্বল। তাতে ধার থাকত একটু বেশী। বন্ধুরা দুঃখিত হতেন না, মজাই পেতেন। অফিসিয়াল লেকচার দিয়েছি, কিন্তু কথাবার্তার ধরণেই আমার লেকচার হোতো। তার ফলে আমার অনধ্যাপকীয় মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। যা ইচ্ছা হয় তাই বলতাম, ভালোমন্দ সবকিছুই। অর্থ-নীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, সব টেনে

আনতাম। দৃষ্টান্ত দিতাম সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি থেকে। যা মনে এলো তাই করেছি, কেউ বাধা দেয়নি।

স্বাধীনতা পেয়েছি খুবই বেশী। তার ফলে অনধ্যাপকীয় ভাবটাই বেশী এসেছে। সাধনা কিছু হয়ত করেছি। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধন কখনও করিনি। এতে ক্ষতিও হয়েছে, লাভ হয়নি তাও বলতে পারি না।

১।১০ রাত্রি

এতগুলো বিদায় সম্ভাষণ পেলাম। খুবই আশ্চর্য ঠেকছে। আলিগড় এত ভদ্র জানতাম না। হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী, অ-বাঙ্গালী, প্রত্যেকেই চমৎকার ব্যবহার করলেন। ভাইস চান্সলার বড় পার্টি দিলেন। অমলের (বোস, ইংরেজীর প্রোফেসার) বাড়ি খেলাম রাত্রে। নিতান্ত নিজের মানুষ মনে হোলো। সেখানে কিন্তু একটা বোকামি করে ফেল্লাম, যেটা উচিৎ ছিল না। হিমাংশু মুখুজ্যের সঙ্গে (ধর্মসমাজ কলেজের অধ্যাপক) পুরাতন কথা তুলছিলাম। হঠাৎ বলে ফেল্লাম, "আচ্ছা, এত বৎসর সাহিত্য করছি, বড় সাহিত্যিক নই, ছোট সাহিত্যিক, তবু প্রবাসী বাঙ্গালীর অধিবেশনে সাহিত্যিক সভাপতি হোলাম না কেন? লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আলিগড়ে এসেছি, সেখানে দ্বিতীয়বার সাহিত্য-বাসর বসেছে, সেবারও সভাপতি হওয়া দূরের কথা নিমন্ত্রণ পর্যন্ত পেলাম না। ব্যাপারটা কি জানো? ব্যাপারটা Snobbery। গানের সভাপতিত্ব নিশ্চয়ই একবার করেছি, কিন্তু সাহিত্যে কি কিছুই করিনি?' এ-কথা আমার বলা নিশ্চয়ই উচিৎ হয় নি, মনে রাখলেই পারতাম। হঠাৎ কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়লাম।

রাজপুরে অনেক সন্ন্যাসী থাকেন। রাস্তা দিয়ে যান দেখি। থাকবার মতন জায়গা বটে, বেশী ঠান্ডা নয়, গরমও নয়। সামনে, চারধারে পাহাড়, আর দূনের উপত্যকা। সংসার ছেড়ে অনেকেই থাকেন, দু'একজন ছাড়া। কিন্তু সন্ন্যাসীদের সংসার ছেড়েও সংসারী। একেবারে ছেড়েছুড়ে দিয়ে নির্জনে গুহায় কিংবা বরফের ওপর থাকা সেটা এক হিসেবে logical। আমি কিন্তু একজন ঘোর বৈদান্তিক দেখেছি. তিনি গ্রামে, পুকুরের ধারেই থাকতেন। কিন্তু সংসারী না হয়েও সংসারী, এরেন empirical গোছের। তবু, যা পায় যায় তাই ভালো। পৃথিবী থেকে একটু দূরে থাকাই ভালো, মন্দের ভালো।

৫।১০

ঝিরঝিরে হাওয়া; corot-র ছবি; চিরুণী চেরাও নয়; স্থাপত্যের কোনটির সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না। সঙ্গীতে নিশ্চয়ই আছে—মোৎসার্ট; রবি ঠাকুরের কয়েকটি গানে, যেন মোলায়েম, আদি নেই, অন্ত নেই, মধ্যকালীন, হালকা হাওয়ার মতন, কখন আসে কখন যায়। হেমন্তের কল্যাণ নয়, শীতের শেষও নয়; বসন্ত যেন এলো বলে। আইভি কম্পটন বার্নেট, দ' লা মেয়ারের রচনার মতন। তাই মনে হয় ঠিক যেন corot-র ছবি।

১৬।১০

ফ্রয়েড নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা মনে হয় অবান্তর। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাম নিশ্চয়ই কিছু ছিল, তবে অতিশীঘ্র সেটা Sublimated হয়ে গেছে। আগেকার কবিতায়, নভেলে অন্ততঃ বারচারেকে, আর বোধহয় কখনও ছোট গল্পে কাম ছিল, কিন্তু অন্য সাহিত্যের তুলনায় লঘু। অবচেতনার খেলা নিশ্চয়ই, কিন্তু অবচেতনা থেকে কাম, কিংবা কাম থেকে অবচেতনা এবং কাম ছাড়া অন্য কিছু নয়, এই ধরণের ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের বেলা অচল। যদি অবচেতনা বলতে হয় ত' তাঁর চিত্রে, কিন্তু সেখানে কাম খুঁজে পাওয়া হয়ত যাবে কিন্তু Sublimation-এর রূপটাই যেন বেশী চোখে পড়ে। ভারতীয় সমাজে এছাড়া অন্য উপায় ছিল না। আমাদের সমাজচিন্তা Sublimation-এরই পরিপন্থী। বিবাহটা নিতান্তই সামাজিক আচার, সেজন্য অবচেতনা দৈহিক কামে পরিণত হয়নি। সবটাই Sublimated হয়ে গিয়েছিল কিনা জানি না,, তবু গার্হস্থ্য ধর্মে তারই সুযোগ হয়েছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিমূলক বিবাহে অবচেতনা থেকে দেহগন্ধী কামই বেশী আসে। এ হিসেবে তারই সুবিধা, তারই প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাম মোটেই প্রকট হয়নি। আমার মতে এটা এক রকমের ভালোই হয়েছিল। অনেকে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিতান্ত abstract। গোরা, ঘরে-বাইরে কি Lolita-র মতন হবে।

২৫।১০।৫৯

দিল্লী থেকে রেডিও শুনলাম শ্রীরাগ সম্পর্কে। বিসদৃশ লাগল শুনে যে, পুরানো শ্রীতে শুদ্ধ রেখাব ও শুদ্ধ ধৈবত লাগে। আগে যাই থাক না কেন, 'নতুন' শ্রীতে কোমল রেখাব, কোমল ধৈবত ও পঞ্চম বাদী থাকা চাই। ধৈবত অতিকোমল বলতেও রাজি। ভালো ওস্তাদের কাছে গৌরী, মালিগৌরীও শুনেছি। গৌরী বলতে তিনকড়ি ও আমার দাদা, ত্রিপুরার কণ্ঠে 'পাগলা বাবা পাগলি আমার মা' যা শুনেছি তার তুলনা নেই। 'মার নাম শ্যামার' মধ্যে শ্যামা বলবার সময় দাদার গলা কেঁপে উঠত। এরকম কণ্ঠ এক দিলীপ ছাড়া আর কারুর গলায় আসত না, যদিও গান কারুর কাছে শেখেনি। দাদা হালিসহরের সিদ্ধেশ্বরীতলার ঘাট থেকে '[illegible] বাবা পাগলি আমার মা' গানটি গাইছে, আর আমরা নদীর ওপার থেকে সে গলা শুনতে পেতাম। এত জোর যে ঘরের কাচের দরজা ঝন ঝন করে উঠত। দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গেল, আর গাইত না।

ছয় রকমের শ্রী শুনেছি, শ্রী, পুরবী পুরিয়া, পুরিয়া-ধ্যানশ্রী, মালিগৌরী ও গৌরী প্রত্যেকটি আলাদা। তারপর অন্য রাগিণীর সঙ্গে আদান-প্রদান। পুরবী, কিংবা পুরবী-কল্যাণ গিরিজাবাবুর মুখেই শুনেছি। বেশী মেলা-মেশা পছন্দ করতাম না, তবে কানের অভ্যাস, অনেকদিন রপ্ত হয়ে গেলে সবই সহ্য হয়। বর্ণসংকর অতটা ভালো লাগে না, যা হচ্ছে।

আজ কাল দুদিন ধরে রেডিওর গান শুনলাম। গত সপ্তাহে রেডিও-সঙ্গীতও শুনেছি। লাগল ভালো কিন্তু সেদিন রেকর্ডে রামকৃষ্ণ ভাজে, বন্দু খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, তারপরে হীরাবাই ও তাঁর বোন সরস্বতী রাণে। রামকৃষ্ণর কাফী-কানাড়ার জাতই আলাদা। বন্দু খাঁর সারেঙ্গীও পৃথক শ্রেণীর। ফৈয়াজ তখন মৃত্যুমুখে। তৎসত্ত্বেও ফৈয়াজ। হীরাবাই কিন্তু সে শ্রেণীর নয়। অত্যন্ত সুকণ্ঠ, আবদুল করিমের মেয়ে, অতএব আবদুল করিমের গায়কী। মারাঠিদের গঠন-চাতুর্য খুবই বেশী, তবে যেন একটু যান্ত্রিক হয়ে যায়। আমার মতে কেশর বাই-ই বর্তমানের শ্রেষ্ঠ গায়িকা, এক এক সময় মনে হয় বোধ হয় বা আর্টিস্ট হিসেবে বড়ে গোলাম আলির চেয়েও বড়। কণ্ঠে নাকি সুর মোটেই নেই, আ-আ করে গান এবং আলদিয়া খাঁর তানেরই মতন তান-কর্তব ভাঙতে ভাঙতে ওপরে ওঠে। অনেকের মনে হয় তাঁর তান একঘেয়ে, আমার মনে হয় তা নয়, মোটেই নয়, তবে একই ধরণের। রামকৃষ্ণ ওয়াজের প্রত্যেকটি কাজই নতুন, স্বতন্ত্র ও বিচিত্র।

[ক্রমশঃ]

বাংলার মেলা

যোগেশচন্দ্র বাগল

মেলা—মিলন, সম্মিলনও বলিতে পারেন। কিসের মেলা? যেখানে বহুজনের সমাবেশ সেখানেই তো মেলা। শুধু বহুজন নয়, বহু জিনিসপত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় না হইলেও গৃহস্থের পক্ষে দরকারী। আবার মানুষ ও জিনিসপত্রের সমাবেশেই শুধু মেলা নয়, এখানে রকমারী আমোদ-প্রমোদেরও আয়োজন চলে। এই সকল মিলিয়াই তবে মেলা।

মেলা কথাটি যেমন আমাদের একেবারে নিজস্ব তেমনি ইহার আয়োজনও চলিতেছে প্রাচীন কাল হইতে। আমরা পাঁজিকায় রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দশরা, শিবরাত্রি, চৈত্র-সংক্রান্তি কত রকম উৎসবের এবং উৎসবের মূলীভূত দেবদেবীর ছবি দেখি। এই এক একটি উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া মেলা বসে। রথযাত্রার সময় রথের মেলার কত প্রসিদ্ধি! যেখানেই ঘনবসতি সেইখানেই রথের মেলার আয়োজন হইয়া থাকে। কলিকাতায় রথযাত্রার দিন হইতে উল্টারথ পর্যন্ত দীর্ঘপথব্যাপী বড় মেলা বসে। কত লোক কত বিচিত্র গাছপালা, পাখী ও তৈজসপত্রাদির আমদানী ও ক্রয়-বিক্রয় হয় কদিনে। পুরীর রথযাত্রা উৎসব একটি ঐতিহাসিক বস্তু। হুগলী জেলার 'মাহেশের' রথ এবং তদ্‌সংলগ্ন বিরাট মেলার কথা কে না জানে! ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল এক সময় খুবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই জন্মাষ্টমী কি জানেন? শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া এই জন্মাষ্টমী উৎসব। কতকাল ধরিয়া এই উৎসব প্রতিপালিত হইতেছে তাহার খবর কে রাখে!

আরও কয়েকটি বড় বড় মেলা-উৎসবের কথা এখানে বলি। পল্লী অঞ্চলে নদীর মোহানায় অথবা কোথায়ও কোথায়ও দুইটি তিনটি নদীর সংগমস্থলে দুর্গা-প্রতিমা নিরঞ্জন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। দূর দূর পল্লী হইতে নৌকায় প্রতিমা বিস্তর এখানে জমায়েত হয় নদীতে নিরঞ্জন বা বিসর্জনের জন্য। তীরে মেলা বসে। এ সব ত বেশ বড় বড় মেলা। দেশজ কৃষিদ্রব্য এবং শিল্পদ্রব্যের বিকিকিনি হয় এখানে। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে ছোট বড় মাঝারি কত পুতুল ওঠে এই দিনের মেলায়। বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের জন্যে কর্তারা অভিরুচি মত পুতুল কিনিয়া আনেন। ব্যবসায়ীরা সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুরের ভক্ত, তাহারা এক একটি করিয়া গণেশও কিনিয়া লন এই দিনটির মেলা হইতে। নদীতীরে মেলা, নদীর মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জন। এ দুইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলে মাঝ দরিয়ায় 'বাচ খেলা'। কি লম্বা লম্বা ছিপ্ নৌকা! তালে তালে বৈঠা ফেলিয়া পঁচিশ ত্রিশ জন দাঁড়ি বায়ু-বেগে নৌকা ছুটাইয়া চলে! বিভিন্ন দলে প্রতিযোগিতা হয়। সে কি অপূর্ব দৃশ্য! বাচ্‌খেলা না হইলে দশহরার মেলা যে অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

চৈত্র-সংক্রান্তির মেলার কথায় আসা যাক্। বৎসর শেষ। নূতন বৎসরকে আবাহন জানাইবার জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুতি চলে। শিবের গাজন, চড়কপূজা, এসব অনুষ্ঠান দ্বারা পূর্ব বৎসরকে বিদায় দেওয়া হয়, আবার নূতন বৎসরকে স্বাগতও জানান হয়। সংক্রান্তির দিনে সকাল থেকে মেলার তোড়জোড় শুরু হয়। বৈকালে পল্লীর নির্দিষ্ট প্রান্তে মেলা বসে। পল্লীর মেয়েরা কি প্রাপ্তবয়স্ক কি অপ্রাপ্তবয়স্ক পল্লীর কোন মেয়েরই হাটেবাজারে যাওয়া রীতিবিরুদ্ধ। এই দিনটিতে কিন্তু তাহার খানিকটা ব্যতিক্রম ঘটে। পল্লীর অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা প্রায় সবাই ছেলেদের মত মেলায় যায় এবং নিজ নিজ ইচ্ছামত খেলনা ও খাবার জিনিস ক্রয় করে। চড়ক-পূজার একটি অংগ ছিল বাণফোঁড়া। সরকার বাহাদুর সেই ১৮৬৬ সনে আইন করিয়া উৎসবের এই অংগটি নিষিদ্ধ করিয়া দেন। চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা প্রায় সর্বত্র। আমরা যাহারা পল্লীতে মানুষ তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই চৈত্র-সংক্রান্তির মেলার কথা বলিতে পারি। কলিকাতায়ও চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে এক বিরাট মেলা বসে ছাতুবাবুর বাজারে—বিডন ষ্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ বরাবর।

শিবরাত্রির মেলা পল্লীর আর একটি প্রধান আকর্ষণ। শিবচতুর্দশীতে মহিলারা নিরম্বু উপবাস করেন। এই দিন যে যাঁহার অভীষ্টস্থলে পূজা-নৈবেদ্য দিয়া থাকেন। শিবের মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া শিবরাত্রির মেলা। এখানে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই যোগ দিবার অধিকার। পূজা-উৎসব একদিকে, অন্যদিকে বিবিধ দ্রব্যের বিকিকিনি। এ দিনকার জনসমাবেশ অন্য সমুদয়কেই যেন ছাপাইয়া যায়। মেলা কোথায়ও কোথায়ও দিবারাত্রি চলে। চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা এবং শিবরাত্রির মেলায় গীতবাদ্য, কথকতা, পালাগান প্রভৃতিও স্থানে স্থানে আয়োজিত হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির মেলায় দেখিয়াছি মুসলমানেরা জারীগান করিয়া সাধারণের আনন্দবর্ধন করে।

পূজা-উৎসবাদি ব্যতিরেকে বৎসরের বিভিন্ন সময় বিশেষতঃ শীত ও গ্রীষ্ম-কালে নানাস্থানে বহু মেলা বসিয়া থাকে। কোথায়ও কোন সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া মেলা বসিয়া যায়। আবার কোথাও কোন মহাজন বা ধনী খোস-খেয়ালে এক সপ্তাহ বা এক মাস যাবৎ মেলা বসাইয়া থাকেন। ইহাতে স্থানীয় লোকের অর্থাগমের সুবিধা তো হয়ই উপরন্তু দূর দূর পল্লীর উৎপন্ন দ্রব্যাদির সমাবেশে সেই সব অঞ্চলের সাধারণ লোকের বেশ দু'পয়সা আয়েরও পন্থা হইয়া থাকে। কোন সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হইয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন। কোথাও আবির্ভাব এবং কোথাও দেহ-রক্ষার দিনটিকে স্মরণে রাখিবার জন্যও মেলার অনুষ্ঠান করা হয়। বীরভূমের অন্তর্গত কেন্দুবিল্বের মেলার কথা আমরা অনেকেই জানি। কবি জয়দেবের লীলাক্ষেত্র এই কেন্দুবিল্ব। এই মেলায়

মাধ্যমে তাঁহাকে স্মরণ মননের সুযোগ হয় আমাদের।

গত শতাব্দীতে, ১৮৫৫ ও ৫৬ সনে পাদ্রী লং একখানা নূতন-ধরনের পঞ্জিকা সংকলন করিয়াছিলেন। এই পঞ্জিকায় তিনি বাংলাদেশের প্রায় দেড়-শত মেলার একটি ফিরিস্তি লিপিবন্ধ করেন। দূর দূর জেলার মেলার কথাও ইহা হইতে বাদ যায় নাই। ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, যশোহর (খুলনা তখনও স্বতন্ত্র জেলা হয় নাই) নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, বীরভুম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি প্রায় সমুদয় জেলা হইতেই সরকারী পদস্থ কর্মচারীদের সহায়তায় লং সাহেব এই সব মেলার খবরাখবর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলের ও ইহা একটি তীর্থক্ষেত্র বলিয়া আসমুদ্র-হিমাচল হইতে বহু সাধুসন্ত সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষ এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। মকর-সংক্রান্তির দিনই সাগর-স্নান প্রশস্ত কিন্তু মেলাটি এই দিনের আগে ও পরে কয়েকদিন চলে। ব্যবসায়ীরা এখানে ভিড় জমায়। যেখানে মানুষের সমাবেশ সেখানে বিচিত্র দ্রব্যাদিরও আমদানী ও ক্রয়-বিক্রয় হয়। এই মেলায় এত জনসমাবেশ হয় যে, সরকার শান্তিরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ আয়োজন করিয়া থাকেন। বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও যাত্রীসাধারণের সেবাকার্যে পূর্ব হইতেই নিজেদের নিয়োজিত করে। এই মেলা নিখিল ভারতীয় হইয়াও বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব গৌরব এবং কুম্ভমেলার মতই ইহা মর্যাদা লাভের দাবী রাখে।

মেলা সম্পর্কে বলিতে গেলে গত শতাব্দীর একটি যুগান্তকারী মেলার কথাও স্বতই মনে উদিত হয়। এটি করা হইত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সমাবেশের সুযোগ লইয়া একটি জাতীয় সম্মেলনেরও অনুষ্ঠান হইত। এখানে জাতীয় ভাবোদ্দীপক সংগীত, কবিতা-পাঠ ও বক্তৃতাদি হইত। শ্রোতৃমন্ডলী জাতীয় ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত। মেলার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল ব্যায়াম, কুস্তি প্রদর্শন। বাংলার ও বাংলার বাহিরের কুস্তিবীরদের মল্ল-ক্রীড়া, ব্যায়াম কসরত প্রভৃতি হিন্দু-মেলার একটি প্রধান আকর্ষণ হইয়া উঠে। এই মেলা কলিকাতায় এবং কলি[illegible]ার উপকণ্ঠে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইত। ইহা একাদিক্রমে চৌদ্দ বৎসর চলিয়াছিল।

হিন্দুমেলার আদর্শে কলিকাতা হইতে দূর দূর অঞ্চলেও প্রতি বৎসর এই ধরনের মেলা বসিত। পল্লী অঞ্চলের মেলায় যাত্রা, কথকথা, অভিনয় প্রভৃতির সঙ্গে মল্লদের কুস্তি কসরতও দেখান হইত। পল্লীর কৃষিদ্রব্যাদির বিকিকিনি

রথের মেলা

জেলায় আয়োজিত মেলাসমূহের বিষয় সংগ্রহ করা যায় না কি?

এখানে আরও দুই একটি বিশেষ মেলার কথা বলা আবশ্যক। শান্তি-নিকেতনের ৭ই পৌষের মেলার বিষয় হয়ত অনেকেই জানেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ ব্যাপারটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে এই মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে ও উপদেশে এই মেলাটি এক সময় সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাতে যোগ দিয়া আনন্দলাভ করে।

কুম্ভমেলা বাংলার বাহিরে অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য এখানে কিছু বলিব না। কিন্তু এই মেলার মতই নিখিল ভারতীয় আর একটি মেলা বসে গঙ্গাসাগরে প্রতি-বৎসর মকর-সংক্রান্তি দিবসে। মেলায় স্থানীয় লোকেদের ভিড় হয় খুব, তবে সাধারণ মেলা মোটেই নয়। আর বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই উহার প্রতিষ্ঠা। আগে বলিয়াছি চৈত্র-সংক্রান্তিতে বাণফোড়া আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে জনসাধারণের মনে যে কিছু বিক্ষোভ না দেখা দিয়াছিল এমন নয়। কিন্তু তখনকার নব্যশিক্ষিত মানুষের মন ইহার উপর বিরূপই হইয়া ছিল! সরকার ইহার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন। তবে তখন কিন্তু নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে এক রকমের জাতীয় ভাবনাও দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। এই জাতীয় ভাবনাকে সাধারণের মনোমত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যেই 'হিন্দুমেলা' নামে একটি অভিনব মেলা বাংলা ১২৭৩ (১৮৬৭ খৃঃ) সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে কলিকাতায় স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র এবং সহায়ক জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের যুবকগণ। অন্য দশ রকমের মেলার মত কৃষিজ ও উটজ দ্রব্যাদির সমাবেশ হইত এখানে। আমোদ-প্রমোদেরও আয়োজন চলিত। তখনও যেসব শিল্পিক শ্রেণী জীবিত ছিল তাহাদের স্বহস্তে তৈরী শিল্পদ্রব্যাদি এখানে প্রদর্শিত হইয়া সাধারণকে তৃপ্তিদান করিত। মূল হিন্দু-মেলায় যেসব মহিলা স্বহস্তে তৈরী শিল্পদ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেন, তাহার উৎকর্ষ বিচারে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইত। উৎকৃষ্ট ব্যায়ামকুশলীদের হিন্দুমেলার পক্ষে পদকাদি পুরস্কার দানেরও ব্যবস্থা ছিল।

আজকাল মেলার স্থান 'প্রদর্শনী' অধিকার করিয়াছে। সাম্প্রতিক কালেও কলিকাতায় এবং অন্যান্য বড় শহরে কত প্রদর্শনী হইতেছে। কিন্তু বাংলার পল্লীর মেলাসমূহের প্রয়োজনীয়তা এখনও পূর্ববৎ অনুভব করা যায়। এই মেলা-গুলির সুনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশজাত কৃষি ও শিল্প দ্রব্যাদির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সুযোগ বিস্তর।

পরিশোধ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্যামল সেন

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ছয় ॥

স্বাতি ভোরেরই ছিল। প্রেস্‌ক্রিপ-শনটা লেখা হয়ে গেলে আঁচলের গেরো খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল রজতের দিকে। রজতের দৃষ্টি তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরের চারিদিক একবার চকিতে ঘুরে এল, সে বলল—"এসব কেন? থাক।"

কর্তার মুখটা হঠাৎ অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন—"না, 'থাক্' কেন? ওটা নিতেই হবে।"

তখনই কিন্তু ও ভাবটা বদলে নিয়ে বললেন—"ফি না নিলে—বুঝতেই তো পারছেন—স্বাতি কথায় কথায় ডেকে পাঠাবে।"

একটু হেসে বললেন—"হাঁচি পেলে যে একটু হাঁচব নির্বিবাদে তার উপায় থাকবে না। নিন ওটা।"

কথাটাকে হাল্কা করে দেওয়ায় একটু উৎসাহ পেয়েই রজত আবার আপত্তি করে কি বলতে যাচ্ছিল, প্রশান্ত বাধা দিয়ে বলল—"বেশ তো প্রায় এক জায়গাতেই রয়েছি বলে ফি হিসেবে না নিতে চাও, স্বাতি দেবীর জরিমানা বলে তো নিতে পার।"

পাঁজরায় বাঁ হাতটা লাগিয়ে বলছিল, একটু আঙ্গুলের টিপও দিয়ে দিল।

"দিন তবে"—বলে হাতটা বাড়িয়ে নোটটা নিল রজত। বুক-পকেটে গুঁজে রাখতে রাখতে উঠে পড়ে বলল—"বেশ, তাহলে আসি। আপনি কিন্তু সাবধানেই থাকবেন একটু।"

কর্তা বললেন—"আমার নিজের খেয়ালমত থাকা নয়তো, ওরা যেমন রাখে। তা সাবধানের কসুর দেখছেন কিছু?"

দুজনেই দুজনকে নমস্কার করে ঘুরেছে, রজত আবার ফিরে দাঁড়াল, বলল—"কিন্তু একটা কথা আমার রাখতে হবে। ওটা একটা বিলিতী পেটেণ্ট ওষুধ, আমাদের হাসপাতাল ছাড়া কাছে-পিঠে কোথাও পাওয়া যাবে না। ওটা অনাথকে দিয়ে ঐখান থেকেই আনিয়ে নেবেন।"

চোখ নামিয়ে একটু কি ভাবলেন কর্তা—'হ্যাঁ' আর 'না'-র মধ্যে দ্বন্দ্ব বোধহয়—চোখ তুলে একটু কৌতুক-রহস্যের দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"মেয়ে আসে বাপ-মাকে ঋণে জড়াবার জন্যে, না গো মা স্বাতি?"

দুজনের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে কথাটা বলে রজতকে বললেন—"বেশ, তাই নিয়ে আসবে। কাল যাবেখন। আজ তো রাত হয়ে যাবে ফিরতে।"

ওরা ঘুরতে এবার উনিই আবার ফেরালেন, বললেন—"শুনুন।"

ফিরে দাঁড়াতে প্রশান্তকেই সামনে পেয়ে বললেন—"বলছিলাম, হাস-পাতালে তো ভালো রকম পথ্যেরও ব্যবস্থা থাকে।" —একটু হাসি নিয়েই মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এবার প্রশান্তই চোখ নীচু করে একটু ভাবল। হয়ে পড়েছে একটু লুব্ধ কৌতুক-রহস্যের সুযোগটা নেওয়ার জন্য। তার-পর তার হঠাৎ সংস্কৃত বইগুলোর কথা মনে পড়ে গেল, সেদিন যে দেখেছিল; বলল—"কথাটা ঠিক, তবে আপনার জন্যে পাঠানো যায় না তো। উনসত্তর জাতে ঘাঁটাঘাঁটি করছে তো।"

ওঁর মর্যাদা ধরেই রহস্যের উত্তর-টুকু দিয়ে বেরিয়ে এল রজতের পেছনে পেছনে। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

একটু নীরবেই কাটল, তারপর প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল—"দেখলে?"

"দেখলাম বৈকি।" উত্তর করল রজত, বলল—"তুমি যে সেই চালার আধখানা উড়ে যাওয়ার কথা বলেছিলে ঝড়ে, সেটাও তো মেরামত হয়নি; অথচ প্রায় মাস দুয়েকের কাছাকাছি হয়ে গেল না?"

"অথচ কোন রকম সাহায্য করবারও উপায় নেই। দেখলে তো ফি নেবে না বলতে কি রকম হয়ে উঠলেন। উগ্রই বলতে হয় না কি?"

"সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম তোমায় প্রশান্ত। নোটটা বুক-পকেটে

থেকে আমায় যেন বি'ধছে। কোন উপায়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না? অন্য কোন ছুতো করে?"

"সম্ভব বলে তো মনে হয় না। ওঁর এই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি ডেলিকেট (delicate)। যতই মিলিয়ে দেখছি মনে হচ্ছে ওঁদের দারিদ্র্য নিয়ে কেউ 'আহা' বলবে এইটে উনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। আমার সেদিনের অভিজ্ঞতা তো বলেইছি তোমায়। অভদ্রতা ভিন্ন কিছু বলা যায় না। কিন্তু যতই দেখছি বেশ বুঝতে পারছি এই ব্যাপার। সেদিন তো দারিদ্র্য আরও প্রকাশ হয়ে পড়বার কথা, আশ্রয় দিতে হবে, আহারও। সে যে কী বিপর্যস্ত ভাব মেয়ে আর বাপের! উনি এত রূঢ় হয়ে উঠলেন—এ রকম চেহারা যে প্রথমটা সত্যিই ভেবেছিলাম একদম পাগলের সামনেই পড়ে গেলাম বুঝি......"

আবার নিস্তব্ধতা এসে পড়ল দুজনের মাঝে। জীপটা বাসার সামনে এসে পড়লে প্রশান্ত বলল—"এসো, চা খেয়ে যাও। বাড়িটা খালি, আরও ভাল লাগছে না।"

গাড়ি গ্যারেজে তুলে রেখে দুজনে ঘরে গিয়ে বসল। প্রশান্ত আগেকার কথার জের ধরেই বলল—"অথচ এদিকে আলাপ-আলোচনায় মানুষটি কেমন সহজ দ্যাখো।"

"শুধু সহজ বললেই হয় না। বেশ ধারালো বুদ্ধি, অবস্থা বুঝে সিচুয়েসন সামলে নেবার ক্ষমতা রয়েছে। বেশ একটু ঠাট্টার ভাবও সঙ্গে—হাসপাতালে পথ্যের কথা যখন বললেন—লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়—খুব সূক্ষ্ম......"

"তাই তো আমি আর এগুতে সাহসও করলাম না। মনে হোল হয়তো আবার ঘা দিয়েই বসব।"

ওঁদের নিয়েই খানিকটা রাত পর্যন্ত আলোচনা চলল দুই বন্ধুতে। নিতান্তই অল্প পাঁচ-সাত ঘর নিয়ে একটি কৃষক পল্লী, এখানে পরিবারটি যেমন বেমানান তেমনি অসহায়। দুই বন্ধুরই সহানুভূতি গিয়ে পড়েছে, অথচ এমন একটা প্রবল বাধা রয়েছে যে কিছু করবার উপায় নেই। অনেক রকম আন্দাজ করল দুজনে—কে হতে পারে, কি উপজীবিকা। মুশকিল হয়েছে, ঘরে সোমত্থ মেয়ে, যাওয়া-আসা করে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের রাস্তা বন্ধ। এমন অবস্থায় কৌতূহল পরিহার করাই সমীচীন মনে হোল; অন্তত সংযত রাখা। ঠিক হোল, রজত ডাক্তার মানুষ, দেখবে এদিক-ওদিক থেকে যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারে। খুব সন্তর্পণে; ওঁদের আত্মমর্যাদায় যেন একটুও না আঘাত লাগে।

রজত যাওয়ার জন্য উঠল, প্রশান্ত নোটটা চেয়ে নিল, বলল—"দাও, দেখি যদি ওটার কোন ব্যবস্থা করতে পারি। তুমি আর এক কাজ করবে, অনাথ কাল যখন ওষুধ নিতে আসবে তাকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও।"

সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকবে অতোখানি মনোবল অনাথের নেই। কাজের চাপ, রাত্রেও সামলাতে হয়, টেবিলে বসলও প্রশান্ত, কিন্তু কোন মতেই আজ আর মন বসাতে পারল না। রসুইয়ে ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে খাবার দিয়ে দিতে বলে, একটা নভেল হাতে করে বিছানায় লেপটা টেনে নিয়ে শুয়েছে, দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হোল।

ওর ঘরের দরজারই; ঘরটা বাইরের দিকের বারান্দা-সংলগ্ন। প্রশান্ত প্রশ্ন করল—"কে?"

উত্তর হোল—"আমি অনাথ ভাণ্ডারী।"

প্রশান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল বিছানায়। কাউকে না ডেকে নিজেই দোর খুলে দিতে যাচ্ছিল, মনে পড়ল ভেজানই আছে। বলল—"চলে এসো।"

প্রবেশ করতেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল—"কি খবর! তুমি যে সদ্য সদ্য......"

"খবর আর ভালো হতে পেলেন কই?" —হাতে একটা বড় লাঠি রয়েছে, গাঁঠে গাঁঠে পেতলের পাত মোড়া, সেইটের ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল অনাথ। একটু একটু হাঁপাচ্ছে।

আতঙ্কে প্রশান্তর মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরুবার আগেই বলল—"বলছিনু—খবর আর ভালো হতে পেলেন কই! বড় কর্তা যে বিঘোরে মারা গেলেন......"

"মারা গেলেন! বল কি?" —উত্তেজনায় পা দুটো লেপের মধ্যে থেকে নীচে নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল প্রশান্ত, অনাথ বলল—"লাহিড়ী বংশের ঐ রোগ, এই তিন পুরুষ ধরে দেখছি তো। ডাক্তারে বললে রক্ত মাথায় চাপ বেঁধে উঠেছে, ধরাকাটের ওপর থাকতে হবে, কর্তা বললেন আমার কিছু হয় নি—সেই পূর্ববৎ আহার, সেই পূর্ববৎ সব কিছু—তারপর একদিন হুট করে......"

"ওহে শোন," অধৈর্যভাবে বাধা দিয়ে বলল প্রশান্ত—"এ'র বাবার কথা থাক, আমি জানতে চাইছি, ইনি, মানে স্বাতি দেবীর বাবা—ইনি কেমন আছেন। তুমি সাত তাড়াতাড়ি চলে এলে—হাঁপাচ্ছ......"

"চলে না এসে সর্বনাশ ঘটাব আবার একটা? বংশের ধারা তো জানি: একটার পর একটা এই রকম

আহাম্মক করে সামনে দিয়ে বেরিয়ে যান—তুই শালা ব'সে ব'সে দেখ্। এবার আবার ঘাড়ে ঐ একটা আইবুড়ো মেয়ে......"

"তুমি একটু সংক্ষেপ করে বলো বাপু। জিজ্ঞেস করছি—যেমন দেখে এসেছিলুম অন্তত সেই রকম আছেন তো?"

"তা আছেন। তবে আবার গিয়ে সেই রকমটি দেখতে পাবেন এ রকম মুচলেকা তো লিখে দিতে [illegible]ছিনে। আছেন ওপরে ওপরে—বাপ যেমন ছিলেন......"

"'থামো।" —হাত উঁচিয়ে থামিয়ে দিয়ে প্রশান্ত চাটুজ্যেকে ডেকে দু'কাপ চা করে দিয়ে যেতে বলল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে, সেকালের পরিবারভুক্ত পুরোনো চাকরদের মুদ্রাদোষ, এক কথার সঙ্গে পাঁচ কথা টেনে এনে বলা, বিশেষ করে পারিবারিক ইতিহাস থেকে। নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য একটা কথাও মনে হয়েছে ওর, সেইটে ধরে বর্তমান ছেড়ে অতীতেই গিয়ে পড়ল, বলল—"সে আর ভয় নেই, ভালো ডাক্তারের হাতে পড়েছে, নিশ্চিন্দি থাকো তোমরা, তোমার মা-মণিকেও আড়ালে ডেকে বলে দিও। ......তাহলে তুমি তিন পুরুষ ধরে এ'দের সঙ্গে রয়েছ?"

"কেন, আমার বাপ আবার এনার ঠাকুদ্দার খাস তাঁবেদারি করে যায়নি? আমার ঠাকুরদাদা আবার তানার বাপের লেঠেলদের সর্দার ছেল না? তারপর আবার......"

"ডাকাত ছিলেন তিনি?"

উবু হয়ে বসেছিল অনাথ, লাঠিটা শুইয়ে রেখে একটু চেপে গুছিয়ে বসল। বলল—"কোন জমিদারটা ছেল না সেকালে আমায় বলতে পারেন? স্বরূপগঞ্জের রায়েরা, উদিকে ভুবন গাঁয়ের দত্তরা, তারপর দক্ষিণে যান—সুরুপের গোঁসাইরা, কোনটের নাম করবেন করুন—আমি দেখিয়ে দোব—আজ কারুর নাতি হাইকোর্টের বালিস্টর, কারুর ছেলে জেলা কোর্টের জজ—তা হোন না কেন, তবে সুতো ধরে ওপরে উঠে গেলে সবার তো ঐ এক কাহিনী—বাপ-পিতেমোর দিনের কথা বলছি—যার যত বড় শক্ত লাঠি, যে যত লুটে-পুটে আনতে পারলো সে তত বড় জমিদার। তা জমিদারই বলুন কিংবা

রাজাই বলুন—দেখেছি তো সে কোল-বোলাও।"

"তাহলে জমিদারের বংশ এঁরা?"—প্রশ্নটা করে চুপ করে রইল একটু প্রশান্ত। এরপর কিভাবে পরিচয়টা এগিয়ে নিয়ে যায়? জমিদার থেকে একেবারে এত নীচে!

অনাথও চুপ করেই বসে রইল। মুখটা গম্ভীর, ঠোঁট-দুটো বারকয়েক কুঁচকে কুঁচকে উঠল, যেন অনেক কষ্টে একটা কথা ভেতরে চেপে রেখেছে। ঠাকুর চা নিয়ে এল।

প্রশান্ত একটা কাপ নিয়ে অনাথকে বলল—"তুমিও একটু খেয়ে নাও। পুরোনো চাকর, ভয় পেয়ে মনে হচ্ছে যেন ছুটেই এসেছ। এমন তো মোটরেই চলে আসতে পারতে আমাদের সঙ্গে।

ঠাকুর রেকাবির ওপরই দুটো কাপ বসিয়ে নিয়ে এসেছে। এদিকে কোন উত্তর না দিয়ে অনাথ একটু যেন বিরক্ত-ভাবেই তার দিকে চেয়ে বলল—

"তুমি কী গো ভাই? একটা গেলাস নিয়ে এসো যেমন-তেমন হোক।"

ঠাকুর একটা কাঁচের গেলাসে চাটুকু ঢেলে নিয়ে এলে সেটা হাতে নিয়ে বাইরে চলে গেল; তখনই প্রায় এক চুমুকেই শেষ করে ফিরে এসে দেয়ালের এক-পাশে রেখে দিয়ে আবার সেইভাবে বসল, তারপর গোঁফজোড়া হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিয়ে বলল—"তহলে দেখছি আপনি না বলিয়ে ছাড়লেন না। আপনাদের সঙ্গে মোটরে করে এলে ফিরে আর ঘরে ঢুকতে হোত আমার?"

"চটে যেতেন?" —প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

উত্তর দিল না কোন অনাথ, ভাবটা যেন—একথাও জিজ্ঞেস করতে হয়? বলল—"আর এই যে ওষুধ নিয়ে যাব, মিছে কথা বলেই তো ঘরে সাঁদ করাতে হবে। ভেতর থেকে হাঁক দোব—'কে কড়া নড়লে'—ব'লে। তারপর শিশি হাতে করে ফিরে গিয়ে বলা—ডাক্তার-বাবু আপন লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেছেন। সুবিধে, মেয়ের পড়া নিয়ে য্যাখন বসেন, জ্ঞানগম্যি তো আর থাকে না কিছু। তা এসব ধরি না, চার পুরুষ ধরে নুন খাচ্ছি, না হয় বললুম খানিকটা মিথ্যে, যুধিষ্ঠিরকেই বলতে হোল, অনাথ ভাণ্ডারী তো কোন ছার্। এসব ধরিনে। কাল্ হয়েছে আগেকার সেই দরাজ জমিদারি মেজাজ নিয়ে।"

"যায়নি এখনও?" —প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"গেছে কি করে বলবেন তা ক'ন? একটা নমুনো তো স্বচক্ষেই দেখলেন।"

"কি?" —আন্দাজটা বোধহয় করতে পেরেছে, তবু প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"তুলতুম না কথাটা। তোয়েরই তো ছিলুম, তা যা করেই হোক। তবে ডাক্তারবাবু য্যাখন নেব না বলে হাত গুটিয়ে বসলেন, ত্যাখন......"

কথাটা টেনে নিয়ে চোখ তুলে সন্তর্পণে একটু মুখের দিকে চাইল অনাথ।

প্রশান্ত বলল—"তুমি কি ফিয়ের টাকাটার কথা বলছ?"

একটা যেন ঘা খেল অনাথ, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল—"সে—ঐ তো বলুন, যে করেই হোক, তোয়ের তো ছিলুমই, মা-মণি বেঁধেই তো রেখেছেল আঁচলে, বাড়িয়েও তো ধরলে......"

গর্বে, রাগে, অভিমানে বেশ পুরনো কাহিনী ধরে চলছিল, হঠাৎ যেন কেমন ধারা হয়ে গেছে অনাথ, যেন গলায় কথাগুলো বেধে গিয়েই চুপ করে গেল; মাথাটা নামিয়েও নিল একটু।

প্রশান্তর কাছে নোটটা রয়েছে বলেই এ সুযোগটা আর ছাড়ল না, যদিও একটু দ্বিধাগ্রস্ত হোলই প্রথমটা। বলল—"হ্যাঁ, বেশ মনে করিয়ে দিয়েছ অনাথ, আমিই বলব ঠিক করেছিলুম, তারপর ভুলে গেছি। ইয়ে......মানে......রজত—ঐ ডাক্তার আর কি—আমার বন্ধুই তো—টাকা ও নিতে চাইলে না—আমায় বললে, তুমি যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত দিতে পার......আবার কথা হচ্ছে সর-কারি ডাক্তার, নিতেও তো পারে না ফি......তুমিই এটা হাতে রাখো......ওঁদের কাউকে বলে কাজ নেই......"

পকেট থেকে নোটটা বের করে বাড়িয়ে ধরে নিজের ঝোঁকেই বলে যাচ্ছিল, অতটা বুঝতে পারেনি, "নাও ধরো"—বলে হাতটা আর একটু বাড়িয়ে ধরতেই অনাথ পা দুটো জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, বলে চলল—"ও ইঞ্জিয়ারবাবু, আমি এ কি সমিস্যেয় পড়লুম বলেন—কী পাপ করেছিলুম আমি—জানছি উদিকে অপরাধী হচ্ছি, মহাপাতক করছি ঐ দেবতুল্যি মানুষকে মিথ্যে বলে—ইদিকে আমি যে ডাক্তার-বাবুর মতন দরাজ বুকে হাত গুটিয়ে নোব সে ক্ষ্যামতা আমার কোথায়?......এক দরাজ বুক নিয়ে উনিই আছেন বসে, কি করে যে চলছে এক আমিই জানি কি মা-মণিই জানে—দুধের মেয়ে, দিন দিন যে কী হয়ে যাচ্ছে বাবু—এমন জায়গায় এসে পড়েছি—একটু 'আহা' বলবে, বিপদে-আপদে একটু পাশে এসে দাঁড়াবে, এমন মনিষ্যি নেই একটা—গরীব চাষা-ভুষো, তাদেরই বা দোষ কি?......এক জিদ ধরে বসে আছেন, নড়বেন না এখান থেকে—এক-দিন মা-মণিকে বোঝাচ্ছেন পাণ্ডবদের সেই অজ্ঞাতবাসের কথা—সেই যে এক-দিন হাঁড়ি খালি, সিবুঠা এসে হাজির—ছল করে খেতে চাইলেন—দৌপদী ঠাকুরুন দেখলেন একটি ভাতের সঙ্গে একগাছি শাক পড়ে আছে হাঁড়ির এক কোণে—ও বাবু, দুধের মেয়ে মা-মণিকে আর কত বুঝতে হবে? কত আর বুক বাঁধবে?......"

পরিচয় খুঁজছিলই প্রশান্ত, অনাথ আপনা হতেই দিয়ে যাচ্ছে, মন্দ লাগছিল না, কিন্তু হঠাৎ যে এই রকমটা দাঁড়াবে তা ভাবতেই পারেনি! প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে কী যে করবে ঠিক করতেই পারল না, তারপর একটু ঝুঁকে এগিয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল—"চুপ করো অনাথ! চুপ করো। ওঠা-নামা এ তো আছেই সংসারে, কি

আর করবে? আমিও তো এতটা জানতাম না, ভুল হয়ে গেছে।'"

খানিকক্ষণ চুপচাপই গেল। অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে প্রশান্ত। আশংকাই ছিল, কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে কোথায় ঘা দিয়ে বসবে, সেটা যে অনাথ থেকেই শুরু হবে ভাবতে পারেনি। নোট-সুদ্ধ হাতটা আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে চুপ করে বসেই রইল কিছুক্ষণ।

তারপর প্রথম ঝোঁকটা কেটে গেলে বুঝল এ দুর্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় [illegible] ওরাই ভুল হবে। জানাই দরকার যতটা পারা যায়, আর তার সূত্র অনাথই। জেনে নিয়ে যতটা করতে পারা যায়, নয়তো ব্যর্থ পূর্ব-মর্যাদার যূপকাষ্ঠে বলি পড়বে পরিবারটি। একটা কথা বলেছে অনাথ—সে ডাক্তারের মতো দরাজ বুকে হাত গুটিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু সদ্য সদ্য আবার হাতটা বাড়াতেও মন সরছে না প্রশান্তর।

ছেড়েই দিল ওদিকটা, ওষুধের কথাটা মনে পড়ে গেছে, সেইটে ধরেই বলল—"থাক্ ওসব কথা এখন, তোমায় তো ওষুধটা নিয়ে যেতে হবে। রাতও হয়ে যাচ্ছে, অনেকটা পথ যেতেও হবে।......"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুর কাছেই এসেছিলুম— ভাবলুম ইঞ্জিয়ারবাবুর বাসার সামনে দিয়েই যখন যাচ্ছি......"

চিন্তার স্রোতটা চলছিলই ভেতরে ভেতরে, প্রশান্ত দাঁড়িয়ে উঠল। রজতকে আর আনতে চাইল না আপাতত এর মধ্যে, বলল—"ওষুধ তো হাসপাতালে, ডাক্তারবাবু হয়তো নেইও বাসায়, তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

ড্রেসিং-গাউনটা টেনে নিয়ে গ্যারাজে নেমে জীপটা বের করল, চাটুজ্যেকে বাসার দরজা বন্ধ করে নিতে বলে, অনাথকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিছু যে করতে পারছে, বুকটা যেন ভরে আসছে তাতে। ওষুধটা নিয়ে বাসার দিকে ফিরে আসতে আসতে তেমাথার মাথায় গাড়ি থামিয়েছে, অনাথ নামতে যাচ্ছে, ডানদিকে জেলাবোর্ডের সড়কটা, প্রশান্ত বলল—"দাঁড়াও, নামতে হবে না।"

বাসার দিক থেকে গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে, ডানদিকেই চালিয়ে দিল।

ভীতই হয়ে পড়েছে অনাথ, তবে আজ্ঞেঁর অনগ্রহ লজ্জা: কি বলবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। শেষে যখন বেশ খানিকটা গেছে, ভাবটা সাধামত গুছিয়ে নিয়ে বলল—"ও ইঞ্জিয়ারবাবু, দেবতা হয়েই তো এয়েছেন আমাদের বরাতে, কিন্তুন......"

প্রশান্ত বলল—"যা বলবে বুঝেছি, কিন্তু আমি তো যাচ্ছি না ভেতরে—পারি কখনও যেতে? তোমায় নামিয়ে দিয়ে রাস্তা থেকে ফিরে আসব। না হয় খানিকটা এদিকেই নামিয়ে দোবখন। গল্প-সল্প খানিকটা বিলম্বই হয়ে গেল তো তোমার। আরও দেরি হলে জবাবদিহিতে পড়ে যাবে।"

"তাহলে এইখানেই দেন না নামিয়ে, কতটুকুই বা আর?"

"আর খানিকটা যাই।" —কিছু করতে পেরে যে আনন্দের একটা জোয়ার এসেছে মনে তাইতেই যেন ঠেলে নিয়ে চলল।

গাড়িও জোরেই চলেছে। কথার মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। অনাথ চঞ্চলভাবে একটু উঠে পড়েই বলল—"আর নয় ইঞ্জিয়ারবাবু, এসেই তো পড়লুম, শব্দ যাবে মোটরের......"

"বেশ, তাহলে এখানেই নামো"—বলে প্রশান্ত আস্তে আস্তে গাড়িটা দিল থামিয়ে। দুদিকের অন্ধকারে অত বুঝতে পারেনি, ঐটুকু বলতেও গাড়িটা আবার খানিক এগিয়ে গেছে, থামাতে থামাতে বাড়িটার প্রায় সামনেই গিয়ে দাঁড়াল। অনাথ নামতে নামতেই থমকে গিয়ে ডেকে উঠল—"মা-মণি!"

।। সাত ।।

মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি-শক্তিও খুব স্বচ্ছ নয়, অনাথ বুঝতে পারেনি, তবে প্রশান্ত একটু আগে থাকতে দেখেছিল—একটি মেয়ে এদিকেই আসতে আসতে মোটরের আলো দেখেই ঘুরে গিয়ে রাস্তার ধার দিয়ে হন হন করে আবার সামনের দিকে চলেছে। গাঁয়ের কোন মেয়ে হবে মনে করে আর ও-দিকটা ভাবেনি। ও সম্ভাবনাও তো মনে আসে না। আলোটা এগিয়ে আসছে দেখে ভয়েই ঘুরে গিয়েছিল, তবে সেটা ছিল সঙ্কোচের ভয়। মোটরটা কাছে এসে থেমে আসছে দেখে মেয়েটি অন্য ধরনের ভয়ে প্রায় ছুটেই কয়েক পা

গিয়ে নেমে পড়েছে রাস্তা থেকে, এই সময়টা অনাথের নজরে পড়ল।

ডাক শুনে বিস্ময়ের সঙ্গে নিশ্চয় একটু সাহস পেয়ে ঘাড়টা ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন রাং-চিত্রের বেড়ার একটু আড়ালও হয়ে গেছে।

অনাথ গাড়ি থেকে নেমে এগুতে এগুতে প্রশ্ন করল—"মা-মণি, তুমি ইদিকে কোথা থেকে এসতেছ, এই অন্ধকারে, একা?"

"তুমি মোটরে এলে?" —অসংলগ্ন-ভাবে প্রশ্ন করল স্বাতি।

"হ্যাঁ, এই যে ইঞ্জিনিয়ারবাবু নিয়ে এলেন, নিজে!" —হঠাৎ পুলকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে অনাথ; এই একটু আগেই কত কথা হয়ে গেল, কত ঘটা করে বলবার সে সব। এই উদ্দীপনার চোটেই একটা ভুলও করে বসল, একটু আগেরই সতর্কতার কথা ভুলে প্রশান্তকেও ডাক দিয়ে বলল—"একটু নামবেন না দয়া-ঘেন্না করে?"

গাড়িতে স্টার্ট দেয়নি প্রশান্ত। সেটা তবু বোঝা যায়, কিন্তু এই মূঢ় আমন্ত্রণে হঠাৎ মূঢ়ের মতোই কেন যে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল সেটা সে নিজেই বুঝতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র অনুশোচনা, সে যেন এককালে শত বৃশ্চিকের দংশনে। স্বাতি বোধ-হয় সেদিনের সেই ছেঁড়া-সেলাই-করা শাড়িটাই রয়েছে পরে। আজ আর বাবা সামনে নেই আড়াল দিতে, ওকে এগুতে দেখে যেন কি করবে ভেবে না পেয়ে আগাছার ঝোপেই একপা পেছিয়ে গেল।

জড়ভরতের মতো একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পড়ে নমস্কার করে প্রশান্ত বলল—"কিন্তু, আমায় এক্ষুনি যেতে হবে, বিশেষ কাজ আছে।" —যেন ওরই অনুরোধে নেমে এসেছে।

স্বাতি নমস্কারটা ফিরিয়ে দিতেও ভুলে গেল, কিংবা হয়তো শাড়ির কোথাও মুঠিয়ে ধরা থাকা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। উত্তরও যে দিল সেটা অনাথের কথারই, তারই দিকে চেয়েও; বলল—"তোমার এত দেরী হয়ে গেল দেখে......দেখলাম বাবাও ঘুমিয়ে পড়েছেন......তাই ভাবলাম না হয় একটু এগিয়ে......"

"দেরি হয়ে গেল দেখেই আমি বললাম—তাহলে চলো জীপে করেই রেখে আসি।" —সুযোগ পেয়ে সামলাবার চেষ্টা করছে প্রশান্ত। স্বাতি এবার করুণ নেত্রে চাইল তার দিকে, বলল—"আপনাদের কত যে দয়া!"

পালা করে চেয়ে যাচ্ছিল অনাথ, সান্ত্বনার কথাটুকুতে কি ছিল, ওদের দুজনের মুখেও একসঙ্গেই একটু হাসি ফুটে উঠল। নিশ্চয় উৎসাহই পেল অনাথ,

"......তাহলে চলো জীপে করেই রেখে আসি"

বেশ ভালো লাগছে অনাথের—সেই জন্যেই কথার বেশ সঙ্গতি রক্ষা করতে পারছে না। একটু অনুযোগের হাসি হেসে বলল—"কিন্তু মা-মণি, তুমি ওঁকে পেন্নামটা করতে ভুলে গেছ, অথচ উনি করলেন। আর ওকি, আগাছার মধ্যে কেন? রেতের জঙ্গল, লতাপাতা, কত কি সব......"

বেরিয়ে আসতে হোল স্বাতিকে, উপায় না থাকায় জড়তাটাও কেটে গেছে খানিকটা; অন্ধকারটাও রয়েছে, তা ভিন্ন অনাথের অন্তরালটুকুও পেল। লজ্জিত-ভাবে নমস্কারটুকু সেরে নিয়ে বলল—"কিছু মনে করবেন না।"

"সে মনে করবার মানুষই নন উনি।" —হাসিটুকু ঠোঁটে ধরে রেখে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে আরও একটা অসংগত কথা বলে ফেলল; বলল—"তাহলে যদি একটু পায়ের ধুলোও দিতেন, এসেই য্যাখন পড়েছেন।"

স্বাতির হাসি-হাসি মুখটা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। কাতর দৃষ্টিতে এবারও যেন নিরুপায় হয়েই প্রশান্তর দিকে চেয়ে আরম্ভ করল—

"কী যে ভালো হোত তাহলে, কিন্তু......"

"সে আমি জানি। ......তুমিই তো বললে অনাথ, কর্তাকে লুকিয়ে তোমরা দু'জনে পরামর্শ করে নিয়ে আনতে গেছ ওষুধটা, ভুলে গেলে? ......আমি তাহলে এখন যাই স্বাতি দেবী। কিছু ভাববেন না; ওষুধটা খাইয়ে যাবেন।"

"কিছু কথা শোনেন না। কী মুশকিলে যে পড়েছি। জিজ্ঞেস করুন না অনাথ-কাকাকে।"

—চোখটা ছলছল করে উঠল। অনাথ একটু শাসনের টোনেই বলে উঠল —"এই দ্যাখো, বোকা মেয়ে! আর কাঁদে, এনারা রয়েছেন।"

মুখটা ওরই ঘাড়ে গ'ুজে দিল স্বাতি, প্রায় তখনই আবার তুলে নিয়ে একটু ধরা গলায় বলল—"চলো কাকা, বাবা উঠে পড়বেন।"

এবার নমস্কারটা করতে ভুলল না, তবে হাত তোলার সংগে কথাটা আর উচ্চারণ করতে পারল না। গলাটা ধরে গেছে।

প্রশান্ত বলল—"আপনি কিছু ভাববেন না, আমরা রয়েছি। দরকার পড়লেই অনাথকে পাঠিয়ে দেবেন, তেমন বোঝেন তো কর্তাকে না জানিয়েই। আর........"

কি বলতে যাচ্ছিল, খেয়াল হোল, ও আগে না গেলে স্বাতির যাওয়ায় অসুবিধা আছে। আর একবার নমস্কার করে ঘুরল মোটরের দিকে।

দু'পা গেছে, ঠান্ডার জন্যে পকেটে ডান হাতটা চলে যেতেই নোটটা হাতে ঠেকল। একটু দ্বিধা, তারপরই ঘুরে ডাক দিল—"অনাথ একবার আসবে?"

"আজ্ঞে, এই যে" —এক রকম ছুটেই এল অনাথ।

স্বাতি দাঁড়িয়েই পড়েছিল। ঠিক হয় না মনে করেই হোক বা বাবার উঠে পড়ার ভয়েই হোক, "আমি এগুচ্ছি অনাথ কাকা" বলে এগিয়েই গেল বাড়ির দিকে।

প্রশান্ত মোটরের কাছেই নিয়ে গেল অনাথকে। একবার ঘুরে দেখল স্বাতি সন্তর্পণে দোর খুলে ঘরে প্রবেশ করছে। অনাথকে বলল—"একটা কথা আছে অনাথ, কিন্তু কর্তার কথা তো বাদই দাও, তোমার মা-মণিও ঘুণাক্ষরে জানতে পারবেন না।"

"কথাটা কি ইঞ্জিয়ারবাবু? পেটে সেঁদুলে পেট চিরে ফেললেও কেউ বের করতে পারবে না, এই আপনাকে বলে থুলুম।"

"এই নোটটা রাখতে হবে।" বের করে এগিয়ে ধরল প্রশান্ত, বলল—"আর কিছু নয়, হাতটা খালি থাকা ঠিক নয়। শক্ত না হোক, অসুখই তো কর্তার একটা।"

"তা দেবেন দ্যান ইঞ্জিয়ারবাবু। কী যে এ টাকার রিতিহাস!" —নিয়ে ট্যাঁকে গ'ুজে বলল—"তা দেন, আমি দাসানুদাস, আমার হাত পেতে নিতে দোষ নেই।"

"কিন্তু তোমার মা-মণি যদি জিজ্ঞেস করে? করবেই তো জিজ্ঞেস।"

একটু ভাবল অনাথ, বলল—"ওষুধ নিলেন, তা কই ডাক্তারবাবুর চিঠেটো তো ফিরে পেলুম না। বলি, দেবেন তো?"

প্রশান্ত বাঁ পকেটে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে প্রেস্ক্রিপশনটাও বের করে দিল। বলল—"ঠিক আছে......; তাই বোল।"

গাড়ির পা-দানে উঠতে উঠতে ঘুরে বলল—"কাল একবার ওদিকে আসতে পারবে? না হয় বোল—কেমন থাকেন, রিপোর্ট চেয়েছেন।"

"বলবেন—রোগ কোথায় যে তুই ঘটা করে রিপোর্ট দিতে যাবি! মানুষটাকে তো জানেন না। ......তবে, এস্‌বো; এস্‌বো বৈকি। কাল আপনাদের উদিকেই হাট। এসবো বিকেলের দিকে। ......ওকি, পা দুটো যে তুলে ফেললেন। সিচরণের পদরজ তো পেতে হবে একটু। ......না, না, ভুঁয়ে এসে দাঁড়ান।"

উঠতে যাচ্ছিল, হাসতে হাসতে নেমে ঘুরে দাঁড়াল প্রশান্ত, বলল —"ওর আর কি দাম আছে?"

"বেশি আর কি এমন, ধুলেই তো, তবে অনেক ব্যাটার কপালের তেলক-চন্দনের চেয়ে তো বেশি গো।"

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল—"দ্যান।"

ডান হাতটা স্যান্ডেল পরা পায়ের নীচে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বুকে কপালে ঠ্যাকাল। [ক্রমশঃ]

সবুজ লণ্ডন

দক্ষিণারঞ্জন বসু

হোটেল ওয়ালডর্ফ,
লণ্ডন,
১লা জুন, ১৯৬১

প্রিয়বরেষু,

লণ্ডনে এসে আপনাকে চিঠি দেওয়া হয়নি। লণ্ডন ছাড়বার আগে সে দায় সেরে যাচ্ছি। আর বিষয়টাও পেয়ে গেলাম ভালো, তাই লিখতেও ইচ্ছে হলো।

বি বি সি বিচিত্রার শ্রীযুক্ত বিনয় রায় আমার অনেক দিনের বন্ধু—সত[illegible] এবং সমধর্মী সাংবাদিক! আমার খবর পেয়ে এক বিকেলে তিনি আমার হোটেলে এসে হাজির। বল্লেন, এবার লণ্ডনে এসে সব চেয়ে আপনার যা ভালো লাগছে সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে হবে 'বিচিত্রা'য়। রাজি হলাম, কারণ দক্ষিণা যা-ই হোক সে লোভটা বড়ো কম নয় এই ফরেণ এক্সচেঞ্জের টানের দিনে। কিন্তু বলবার বিষয়টা কি হবে তা নিয়ে একটু ভাবতে হলো। হঠাৎ মনে হলো, পশ্চিমের এই মহানগরীতে আমি যতবারই এসেছি প্রতিবারেই তার সবুজ রূপ আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে। তাই 'সবুজ লণ্ডন' বিষয়েই কিছু বলবো ঠিক হলো। বন্ধুবর খুশি হয়েই বিদায় নিলেন।

সেই ব্যবস্থা মতোই বি বি সি-তে আমার কথিকাটি রেকর্ড করিয়ে এলাম সেদিন। লণ্ডনের বিখ্যাত এ্যালডুইচ এলাকায় আমাদের হোটেলের প্রায় মুখোমুখি বি বি সি ভবন 'বুশ হাউস'। কাজেই প্রায় বিনা পরিশ্রমে যেটুকু পারিশ্রমিক মিলে গেলো তার প্রায় পুরোটাই লাভ। কথা বলা, সে তো কয়েক মিনিটের ব্যাপার!

আর জানেনই তো বেতার ভাষণের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব কথা বলা সম্ভবও নয়। তাই এ চিঠি লিখতে বসে দেখছি বিচিত্রায় যা বলে এসেছি লণ্ডন ছাড়বার আগে সবুজ লণ্ডন বিষয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি কথা আমার কলমের ডগায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইছে। অবশ্য সেজন্যে ভয় পাবার কারণ নেই আপনার। সংবাদপত্র সম্পাদনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কলমকে কন্ট্রোল করার শিক্ষা মোটামুটি আয়ত্ত করতে পেরেছি বলেই বিশ্বাস। তাই আপনার বিরক্তি উৎপাদনের পূর্বেই আমার কলমকে আমি নিরস্ত করতে পারবো, তেমন ভরসা আমার আছে।
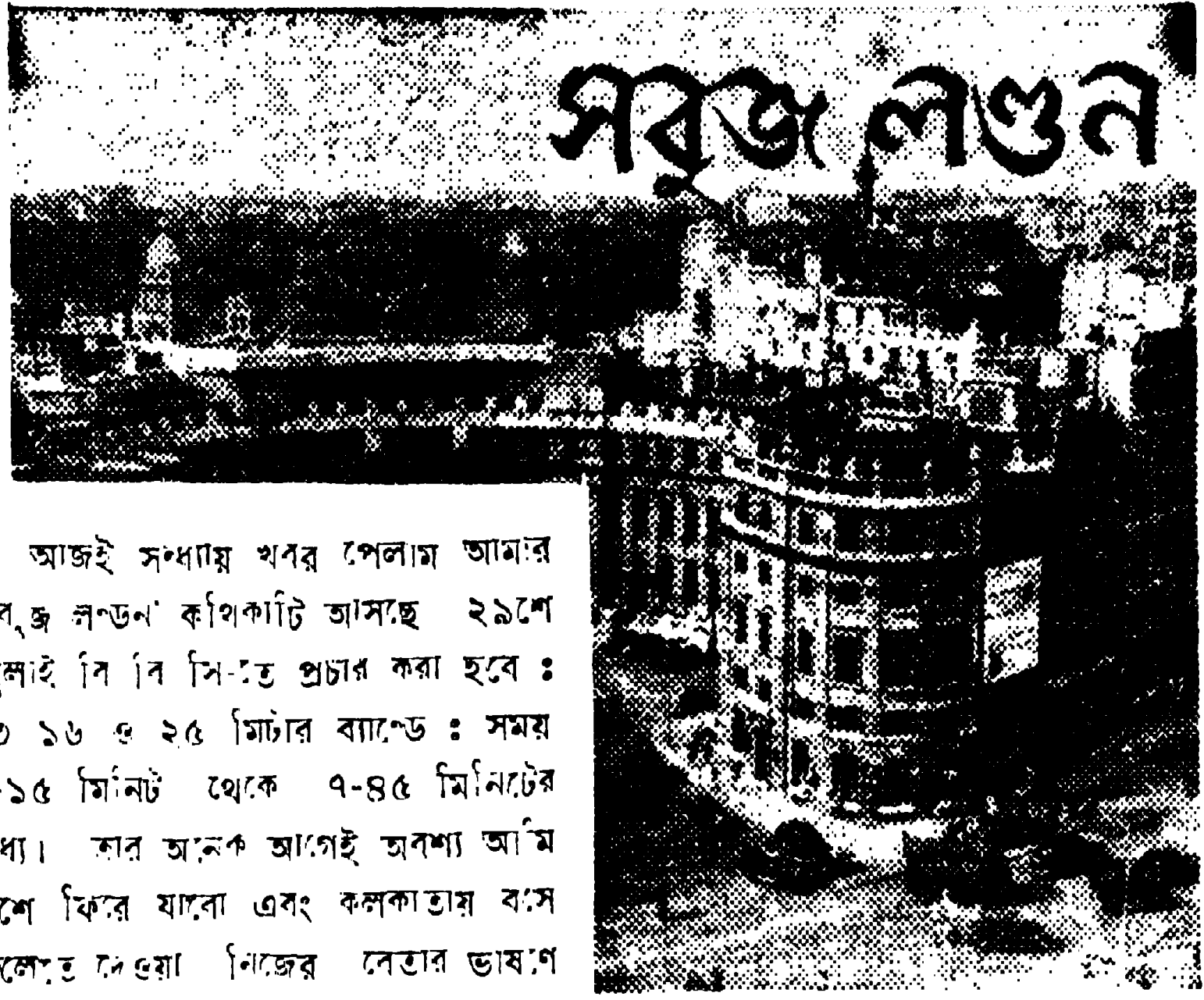
আজই সন্ধ্যায় খবর পেলাম আমার 'সবুজ লণ্ডন' কথিকাটি আসছে ২৯শে জুলাই বি বি সি-তে প্রচার করা হবে : ১৩ ১৬ ও ২৫ মিটার ব্যাণ্ডে : সময় ৭-১৫ মিনিট থেকে ৭-৪৫ মিনিটের মধ্যে। তার অনেক আগেই অবশ্য আমি দেশে ফিরে যাবো এবং কলকাতায় বসে বিলেতে দেওয়া নিজের বেতার ভাষণে 'সবুজ লণ্ডন'কে নতুন করে অনুভব করার সুযোগ পাবো। কি মজা, তাই না! কিন্তু তারও আগে সে সম্পর্কে আমার বেতার বক্তব্যের চেয়েও বেশি কিছু আপনি জেনে ফেলছেন এই চিঠির মাধ্যমে।

বাস্তবিকই নানা কারণেই লণ্ডনকে এখন বন্ধু বলেই মনে হয়। ভাষার অসুবিধে বলে কিছু নেই। সর্বত্রই যেন অনেকটা পরিচিত পরিবেশ। কলকাতার সঙ্গে লণ্ডনের যে অনেক মিল! তাইতো বার বার লণ্ডনে আসবার পরেও আবার লণ্ডনে আসতে মন চায়। আর এও স্বীকার করবো ১৯৪৭-এর আগে লণ্ডন সম্পর্কে যতো বিরূপতাই থাক না, আজ আর তার লেশমাত্রও আমার মনে নেই। কারণ আজ আমরা সমান সমান। বন্ধু—ভারত আর গ্রেট বৃটেন।

আমার প্রথম লণ্ডন পরিদর্শন ঘটে উনিশ শ' ছাপ্পান্নয়। সেবার আমি আমেরিকা যাত্রী। মধ্যরাত পার করে দিয়ে নেমেছিলাম এসে লণ্ডন বিমান বন্দরে। রাত্রির নীরবতাকে ভেদ করে দীর্ঘপথ বাসযাত্রী হয়ে হোটেলে এসে উঠেছিলাম সাউথ কেনসিংটনে। সে রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা, আমার প্রথম লণ্ডন দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে আমার সেবারের ভ্রমণ কাহিনীতে। তা হলেও সেই প্রথম অভিজ্ঞতার স্মৃতি আজো যেন তাজা হয়ে মন জুড়ে রয়েছে। ডানবামে ক্রমাগত ঘূর্ণিপাক খেয়ে চলছিলো আমাদের বাস। দু'পাশে লাল-নীল-হলদে আলোর ছড়াছড়ি। মণি-মুক্তো হীরে-পান্নার রোশনাই-এর মতো মনে হচ্ছিলো। বৃটিশ সম্রাজ্ঞীর মুকুট-শোভা যেন! চারিদিক থেকে আহরণের দ্যোতক বুঝি এসব? চলতে চলতে মন ভারি হয়ে উঠছিলো এমনি নানা প্রশ্নে।

দিনের আলোয় রূপসী মহানগরীকে প্রত্যক্ষ করে পরদিন আরও মুগ্ধ হয়েছিলাম। এদেশের হিসেব মতো তখন গ্রীষ্ম চলছিলো। বাসন্তী শীতের মেজাজী আরামের রেশ তখনো ছিলো বর্তমান। খুবই মজা লাগছিলো ঘুরে বেড়াতে। ঝরঝরে রোদ। থরথরে শীতের গায়ে রূপোর গয়না। ফুলে ফুলে সূর্য-শোভা। পাতায় পাতায়। ঘাসে ঘাসে। দিকে দিকে হাসির ফোয়ারা। সূর্য-প্রেমেই যেন মাতোয়ারা সব।

এবার লণ্ডনে এসেছি একেবারে ভরা বসন্তে। মে মাসের শেষার্ধের শুরুতে। ক্যালেণ্ডারের হিসেবে ২৩শে জুন থেকে এদেশে 'সামার' আরম্ভ। তারও প্রায় একমাস আগের লণ্ডন অনারূপা।

সে যাই হোক, লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার বা নেলসন কলমের তেমন কোনো আকর্ষণ নেই আমার কাছে। এমন কি আমেরিকার অনুকরণে হাল আমলে নির্মিত বা নির্মীয়মান স্কাই-স্ক্রেপার বিল্ডিংগুলোরও নয়। ঐতিহ্যময় লণ্ডনের পটভূমিকায় আমার চোখে সেগুলো বরং পীড়াদায়ক। লণ্ডনে বার বার আমায় যা আকর্ষণ করে তা তার সবুজ সমারোহ। তাই আজ লণ্ডন সম্বন্ধে লিখতে বসে তার অতুলনীয়

স্থাপত্য-ভাস্কর্য নয়, পবিত্র টেমস-এর দৃশ্যাবলী কিংবা তার চতুর্দিকের বিপণি-শ্রেণীও নয়, বার বার কেবলি তার সবুজ সজ্জার কথা মনকে আন্দোলিত করছে। শুধু রাজপথের দু' পাশের গাছগুলোই নয়, লণ্ডনের পার্কগুলোর কথাও কি কখনো ভোলা যায়? লণ্ডনের শাদা মানুষগুলো খুব শাদা-সিধে নয়, ওদের অনেককেই এবং অনেক কিছুই আমার খুব ভালো লাগেনি। কিন্তু লণ্ডনের সবুজ বাগানগুলো সত্যি অম্লান, ওরা সত্যি আনন্দ দেয়—অপার আনন্দ!

সত্যি কথা, লণ্ডনে এসে সেন্ট জেমস পার্কে লেকের তীরে বসে দু'-একটি সন্ধ্যা কাটাইনি এমন একবারও ঘটেনি। শুধু আমার মতে নয়, অনেকেরই মত সেন্ট জেমস লণ্ডনের সবচেয়ে সুন্দর পার্ক।

সেদিনও সন্ধ্যায় সেই পার্কে গিয়ে বসেছিলাম। রৌদ্র-ছায়ার খেলা চলছিলো তখন। এখানে ওখানে জোড়া জোড়া লোকেদের আনন্দ-হাসির উচ্ছলতা। আঁকা বাঁকা দীর্ঘ লেকের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো অনেকে। নানা জাতের হাঁস ও জলচর পাখিরা সাঁতার কাটছিলো আর খেলছিল লেকের বুকে এধারে ওধারে। সেদিকে নজর না পড়ে পারে কারুর? বিশেষ করে পেলিক্যান কয়টির দিকে। সঙ্গের বন্ধু বলছিলেন এই লেকের এক দল হাঁসের কথা। বছরের পর বছর ধরে এরা নাকি গ্রীষ্ম পড়তেই সাইবেরিয়া অঞ্চলে চলে যায়, আবার শীতের আরম্ভে ফিরে আসে। শীতের দিনে আরো অনেক আগন্তুক পাখিদের, বিশেষ করে গালেদের এখানে ভিড় জমে। বিহঙ্গ-বিজ্ঞানী বা বিহঙ্গ-বিলাসীদের পক্ষে এ পার্কটি সত্যি চমৎকার। লেকের সেতু পেরিয়ে আমরা যখন উত্তরে সেন্ট জেমস প্যালেসের দিকে চলে এলাম, রোদ তখন পড়ে এসেছে। পার্কে লোকের ভিড়ও পাতলা হয়ে এসেছে।

পশ্চিমে বিখ্যাত বাকিংহাম প্রাসাদকে মাঝখানে রেখে সেন্ট জেমস পার্ক প্রাসাদের চৌহদ্দি কোণাকুণি যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গ্রীন পার্কের দিকে। নাম মাহাত্ম্যেই গ্রীন পার্ক সপ্রকাশ। ফুলের হাসির কোনো কলরব নেই এখানে। মৌশুমী ফুলেরা বিচিত্র বর্ণসুষমায় ক্রেস্তেগজে মঞ্চে এসে পাল্লা করে নেচে যায় না কখনো। শুধু সবুজেরই মেলা এ পার্কে। মহানগরীর রাজপথ এর কিছু অংশকে এবার গ্রাস করেছে চোখে পড়লো। প্রয়োজন হয়ে থাকলেও এ আফশোসেরই কথা বলতে হবে।

তারই পরে প্রায় সাতশ' একর বিস্তৃত বিশ্ব-বিশ্রুত হাইড পার্ক। মাঝখানে শুধু যানবাহনবহুল পিকাডেলি সড়ক। হাইড পার্কের সার্পেন্টাইন লেকে ছেলেমেয়েরা বাচ খেলে, সাঁতার কাটে, রাজহাঁসেরা ঘুরে বেড়ায় দেখতে বেশ লাগে। চারদিকের সবুজের মধ্যে একটি ঘেরা জায়গায় নানা জাতের খরগোসদের ছুটোছুটি সত্যি ভারি আনন্দ-দায়ক। উত্তরে মার্বেল আর্চ পেরিয়ে স্পীকার্স কর্ণার। এখানে নানা দেশের নানা মতের বক্তারা বক্তৃতা দেন। অনেক নীরস বক্তৃতাও এই সবুজ পরিবেশে সরস হয়ে ওঠে। তাই শ্রোতার বড়ো একটা অভাব ঘটে না কখনো।

এই হাইড পার্কই কিন্তু সবচেয়ে বড়ো পার্ক নয় লণ্ডন শহরে। তারও চেয়ে অনেক বড়ো রিজেন্ট পার্ক। নয়শ' একরেরও বেশি স্থান নিয়ে তার বিস্তার। এখানকার জু' অর্থাৎ পশু-শালা দেখতে ছোটদের সঙ্গে বড়োদের ভিড়ও বড়ো কম হয় না। কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য, গ্রীষ্মে এই পার্কে যে ওপেন এয়ার থিয়েটার ও অর্কেস্ট্রার ব্যবস্থা হয়ে থাকে তা সত্যি সত্যি অপূর্ব।

হ্যাঁ, কেনসিংটন পার্কের কথা বলা হয়নি। অবশ্য এ পার্ক হাইড পার্কেরই জুড়ি, এক হিসাবে তারই বর্ধিতাংশ। তবু এ পার্ক আমার কাছে বিশেষ স্মরণীয়। কারণ, এরই মুখোমুখি দু'টি হোটেলে দু'বার আমি কয়েক দিন করে কাটিয়ে গিয়েছি। ঘরের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে কতোদিন কেনসিংটন পার্কের সবুজ সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছি। ছুটির দিনের সকাল বেলায় বেড়াতে বেরিয়ে ছোটদের খেলার আনন্দমত্ততা দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

লণ্ডনের সব পার্কই যেন একটি স্বতন্ত্র পরিবারভুক্ত। প্যারিসের পার্কগুলোর মতো মূর্তি ও ফোয়ারার বাহুল্য চোখে পড়ে না এখানকার কোনো পার্কে। কেয়ারীকরা গাছের কৃত্রিমতা চোখে পড়ে না বিশেষ কোথাও। অবশ্য টেমস-এর পশ্চিম-তীরবর্তী ফুলে-ফুলময় কিউ গার্ডেনের কথা স্বতন্ত্র। তার সঙ্গে প্যারিসের রাজকীয় পার্কের যেন একটু মিল আছে। এওতো রাজা তৃতীয় জর্জ ও রাণী শার্লটের প্রাসাদ-বাগিচা, প্যারিসের রাজোদ্যানের সঙ্গে তাই একটু মিল থাকারই কথা। চারদিকে সাজানো গোছানো সুন্দর একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন এই কিউ গার্ডেন। কিন্তু বাগান ছাড়াও প্রাসাদ, প্যাগোডা ইত্যাদি অনেক কিছু দেখার রয়েছে সেখানে।

যাই হোক, লণ্ডনের সব পার্কই শীতে নিষ্পত্র ও রিক্ত-শাখা এবং নানা বর্ণমহিমায় বল্কলহীন বৃক্ষকাণ্ড ধূসর আকাশের পটভূমিতে একটা বিশিষ্টতা এনে দেয়। কিন্তু এখন বসন্ত যায় যায়। তাই চতুর্দিকে এখন কচি সবুজের আনন্দ-হিল্লোল। আসন্ন গ্রীষ্ম-চেতনায় এই সবুজই ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠতে থাকবে।

আবার যদি আমি কখনো লণ্ডনে আসি, তখনো মানুষ, প্রকৃতি ও পাখিদের বন্ধুত্বের মধুর পরিবেশ এই পার্কগুলোই হবে আমার এখানকার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা হয়নি। আমাদের দেশের অবস্থা মনে করেই তা বলতে হচ্ছে। কোনো পার্ক যাতে কেউ নোংরা না করে তার জন্যে দশ পাউণ্ড পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে লণ্ডন মিউনিসিপ্যাল আইনে। কিন্তু এই দণ্ডদানের সুযোগ বড়ো একটা ঘটে না এখানে। কারণ এখানকার প্রত্যেকটি মানুষ শহরের সৌন্দর্য রক্ষায়, রাস্তাঘাটের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সর্বদা সজাগ। তেমন চেতনা, তেমন নাগরিক-বোধ আমাদের কবে আসবে বলতে পারেন?

কাল সকালেই জেনেভা রওনা হচ্ছি। প্যারিস হয়ে দেশে ফিরবো। তার আগে হয়তো আমার আর একটা চিঠি পাবেন। তাতে এদেশের সংবাদপত্র সম্বন্ধে কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে। এখন রাত একটা। তাই এখানেই শেষ করছি।

প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা জানবেন।
ইতি, আপনাদের
দক্ষিণারঞ্জন বসু

চিঠিখানি লেখকের সাম্প্রতিক বিদেশ ভ্রমণ কালে স্বদেশের জনৈক সাহিত্যিককে লিখিত।

শেষ পর্যন্ত

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রাত তখন নটা; ক্লাবেই সদ্য খাওয়া-দাওয়া সেরে ক্লাবের দোতলার বারান্দায় নিরালা কোণে চেয়ারে বসে ক্ষিতীশ চক্রবর্তী সিগার সেবন করছেন, সামনে ছোট টেবিলে হুইস্কি আর সোডার বোতল, মাঝে মাঝে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। তিনি চেয়ে আছেন বাইরে আকাশের পানে— মনের মধ্যে চিন্তার লহর বইছে।

ক্লাবের বয় এসে জানালো, এক সাহেব এসেছেন...দেখা করতে চান।

ক্ষিতীশের যেন চমক ভাঙ্গলো। তিনি বললেন, বাঙ্গালী সাহেব? না—

—বাঙ্গালী সাহেব।

ক্ষিতীশ বললেন, এখানে নিয়ে এসো—আর একখানা চেয়ার দিয়ো।

বাঙ্গালী সাহেবকে এবং সেইসঙ্গে একখানা চেয়ার পৌঁছে দিয়ে বয় চলে গেল।

বাঙ্গালী সাহেবকে উদ্দেশ করে ক্ষিতীশ বললেন—বসুন।

বাঙ্গালী সাহেব চেয়ারে বসলেন; বসে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি ক্ষিতীশ চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ। আপনি?

তিনি বললেন, আমার নাম শেখর সান্যাল, ইনসপেক্টর, ক্যালকাটা পুলিশ, ডি-ডি...মানে, বিশেষ জরুরী কাজে আপনাকে বিরক্ত করতে এলুম।

—পুলিশ! ক্ষিতীশ খুব আশ্চর্য-বোধ করলেন, বললেন— আমার সঙ্গে পুলিশের প্রয়োজন?

শেখর সান্যাল বললেন, আছে প্রয়োজন......বম্বি...মিড্ল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার করুণাময় মিত্রকে আপনি নিশ্চয় জানেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু খবর জানতে এসেছি।

ক্ষিতীশ বললেন—কেন, করুণাময় কি করেছেন?

শেখর সান্যাল বললেন—তিনি কি করেছেন, তা জানি না। কাল রাত্রে তিনি বাড়ী ফেরেননি, আজও তাঁর কোন পাত্তা নেই! তিনি নিরুদ্দেশ!

ক্ষিতীশের দুচোখ হলো বিস্ফারিত; তিনি বললেন—বলেন কি! বয়স হয়েছে......বিচক্ষণ মানুষ— অতবড় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার— দায়িত্ববোধ আছে। তিনি নিরুদ্দেশ হবেন কি!

এই পর্যন্ত বলে ক্ষিতীশ চুপ করলেন—শেখর সান্যালের দুচোখের অবিচল দৃষ্টি তাঁর মুখে নিবদ্ধ। একটা উদ্যত নিশ্বাস রোধ করে ক্ষিতীশ বললেন—তাঁর স্ত্রী শুনেছি পুরী গিয়েছেন, সেখানে তাঁর কাছে......

বাধা দিয়ে শেখর সান্যাল বললেন, তাঁর স্ত্রী কাল বিকেলে পুরী থেকে ফিরে এসেছেন— রাত্রে করুণাময় বাড়ী ফিরছেন না দেখে তিনি ব্যাঙ্কের কেশিয়ারকে ফোন করেছিলেন— কেশিয়ার বলেছেন, ব্যাঙ্ক থেকে তিনি ঠিক সময়ে বেরিয়ে গেছেন, কোথায় যদি গিয়ে থাকেন, তিনি বলতে পারেন না। তখন তিনি ভোরে ডি-ডি'র ডেপুটি সাহেবকে ফোন করে এ খবর জানান, ডেপুটি সাহেব আমাকে ডাকিয়ে তাঁর সন্ধান নেবার ভার দিয়েছেন। আমি সারাদিন করুণাময়বাবুর যত আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী বাড়ী গিয়ে সন্ধান নিয়েও কোনো পাত্তা পাইনি।...... শেষে সন্ধ্যার সময় ব্যাঙ্কের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার আমাকে বললেন—আপনি বিকেলে করুণাময়বাবুর কাছে গিয়েছিলেন তাঁর ব্যাঙ্কে...... আপনার সঙ্গে তিনি গিয়ে আপনার ক্লাবে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করবেন, কথা হয়েছিল, তিনি শুনেছেন......তাই এখন আপনার কাছে এসেছি তাঁর সম্বন্ধে খবরাখবর নিতে।

ক্ষিতীশ বললেন—হ্যাঁ একথা ঠিক। আমি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম—তিনি বললেন, আমার সঙ্গে ক্লাবে আসবেন, ক্লাবেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করবেন আমার সঙ্গে ...বলেছিলেন স্ত্রী পুরী গিয়েছেন, বাড়ী নির্জন লাগে......মানে তাই—

শেখর সান্যালের দৃষ্টি পলকহীন— ক্ষিতীশের মুখে নিবদ্ধ... শেখর সান্যাল বললেন—ব্যাঙ্ক থেকে আপনারা এক-সঙ্গে বেরুলেন......তাঁর মোটরে? না, ট্যাক্সিতে?

ক্ষিতীশ বললেন—তাঁর মোটরেই এলুম, এসে তিনি গাড়ী ছেড়ে দিলেন। বললেন, কত রাত্রি হবে—ড্রাইভারকে কেন কষ্ট দেওয়া...ট্যাক্সিতে ফিরবেন।

শেখর সান্যাল বললেন—তখন কটা বেজেছে?

ক্ষিতীশ বললেন—তখনো সন্ধ্যা হয়নি, প্রায় ছটা হবে! দুজনে এসে খানিকক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলি... তারপর খাওয়া-দাওয়া। খাওয়া-দাওয়া সেরে এই-খানে বসে গল্পস্বল্প এবং হুইস্কি পান —নানা কথার মধ্যে ঠিক হলো, সামনের রবিবারে দুজনে যাবো সিঁথিতে নন্দ বোসের পুকুরে মাছ ধরতে...... দিব্যি সুস্থ মানুষ, মনে কোনো রকম উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিনি। আর সে মানুষ ...আপনি বলছেন, নিরুদ্দেশ!

শেখর সান্যাল বললেন, আপনার সঙ্গে তাঁর বহুকালের পরিচয়।

—নিশ্চয়, বেশ দৃপ্ত কণ্ঠে ক্ষিতীশ বললেন—পঁচিশ বছরের পরিচয়—স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়েছিলুম। —ভালো কথা, কোনো এ্যাকসিডেন্ট? যে দিন-কাল পড়েছে, বিচিত্র নয়!

মাথা নেড়ে নিশ্বাস ফেলে শেখর সান্যাল বললেন, না। আমরা কোনো হাসপাতালে সন্ধান নিতে বাকি রাখিনি।

নিশ্বাস ফেলে ক্ষিতীশ বললেন— তাইতো আপনি অবাক করলেন! সব মিস্ট্রী...ভৌতিক ব্যাপার যেন!

ক্ষিতীশের মুখে শেখর সান্যালের দৃষ্টি অবিচল, চকিতক্ষণের জন্যও সে দৃষ্টি সরছে না! শেখর সান্যাল বললেন

—ক্লাব থেকেই দুজনের বিদায়-গ্রহণ হল্লো?

—না, না, ক্ষিতীশ বললেন— গল্প করতে করতে আমার মনে পড়লো, ভালো এক বোতল ব্র্যাণ্ডি পেয়েছি, বোতলটা এখনো খোলা হয়নি—দুজনে... বললুম করুণাকে—করুণা বললে—বেশ কথা! তখন দুজনে ক্লাব থেকে বেরিয়ে আমার ফ্ল্যাটে এলুম।

—ট্যাক্সিতে?

—হ্যাঁ।

—কোথায় আপনার ফ্ল্যাট?.....

—পার্ক সার্কাসে, পার্ক হাউস বলে যে মস্ত পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী, সেই বাড়ীর তিনতলায় দুটো কামরা নিয়ে আমি থাকি—ব্যাচিলর মানুষ...হা হা হা...

শেখর সান্যাল বললেন—ক্লাব থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটে কখন পৌঁছলেন?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ক্ষিতীশ মিনিটক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—তখন কটা? তা—হ্যাঁ, রাত সাড়ে নটা, কিংবা পৌনে দশটা।

—তিনি আপনার ফ্ল্যাটে কতক্ষণ ছিলেন?

ক্ষিতীশ বললেন— ব্র্যাণ্ডির বোতল খোলা হল ...তারপর দুজনে বসে পান, সেইসঙ্গে গল্প-সল্প......

—হুঁ! শেখর সান্যাল বললেন—আপনার ফ্ল্যাট থেকে তিনি কখন গেলেন?

—ঠিক এগারোটা... ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজতেই করুণা বললে—এগারোটা বাজলো—এবার উঠি। বলে সে চলে গেল।

—আপনার ফ্ল্যাটে লিফট আছে?

—নিশ্চয়। তবে করুণা লিফটে নামেনি—বললে, বেল টিপে দাঁড়িয়ে থাকা—তার চেয়ে এই ভগবানের দেয়া পা দুখানার সদ্ব্যবহার করে সিঁড়ি বয়ে নেমে যাওয়া ভালো। এই কথা বলে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

—আপনি তাঁর সঙ্গে নীচে নেমেছিলেন?

—না, আমার কামরার দরজাতেই আমাদের গুড্-নাইট।

শেখর সান্যাল বললেন—আপনার সঙ্গেই তাহলে তাঁর শেষ দেখা! মানে, আপনি তাঁকে সবশেষ দেখেছেন!

ক্ষিতীশ বললেন—এক রকম তাই। অবশ্য ফ্ল্যাটের সদরে রাত এগারোটা থেকে একজন বেয়ারা থাকে মোতায়েন... এত বড় ফ্ল্যাটে কখন কে বেরোয় কখন কে ফেরে তাদের সুবিধের জন্য। সে হয়তো তাকে শেষ দেখেছে!

শেখর সান্যাল কি ভাবলেন, ভেবে বললেন, হুঁ আমি তাহলে এখন আসি, আপনাকে বিরক্ত করলুম—ক্ষমা করবেন। উপায় নেই...পুলিশ অফিসার...স্টার্ণ ডিউটি।

ক্ষিতীশ বেশ একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—না, বিরক্ত করা নয়।... তবে আপনি ভাবিয়ে তুললেন— তবে আমার মনে হয়—এখান থেকে বেরুবার পর কোথাও আটকে পড়েছেন! কোথায় যাবেন? তিনি আসবেন নিশ্চয়।

শেখর সান্যাল বললেন—আটকে পড়লেও তিনি ব্যাংক কামাই করবেন... এইখানেই তো দুর্ভাবনা। তাঁর স্ত্রী কি রকম উতলা হয়েছেন!...

তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে ক্ষিতীশ বললেন—হবেনই তো। ছেলে-মেয়ে নেই, শুধু স্বামী-স্ত্রী দুটি...... দুজনে কী ভাব! আমরা তামাসা করে বলি—কপোত-কপোতী!

শেখর সান্যাল বিদায় নিয়ে চলে এলেন।

(২)

খবরের কাগজে এ-ব্যাপার নিয়ে দুদিন খুব হৈ-চৈ চললো—বড় বড় হেডিংয়ে ছাপা—বিচক্ষণ ব্যাংক ম্যানেজার নিখোঁজ। মন্তব্য বেরুলো, অনেকের অনুমান, ব্যাংকের তহবিল তছরুপ করে তিনি ফেরার—কিন্তু এ অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—ব্যাংকের একটি কপর্দকও খোয়া যায়নি! তার কারণ তিনি অতি সাধুসজ্জন ব্যক্তি। কেউ কেউ ইঙ্গিত করেছেন, হয়তো নারী-ঘটিত দুর্বলতা—কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে সে-দুর্বলতা তাঁর আদৌ ছিল না। তাঁর অতিবড় শত্রুও তাঁর সম্বন্ধে এমন অপবাদ দিতে পারেন না। কোনো কাগজে মন্তব্য বেরুলো, নিশ্চয় পাকিস্তানী হানা।

কদিন ট্রামে-বাসে, মাঠে-ঘাটে, অফিসে, আদালতে, কলেজে—এ ব্যাপার নিয়ে কতরকম জল্পনা-কল্পনা চললো। পুলিশ জোর তদন্ত চালিয়েছে—এখনো কোনো ফল পাওয়া যায়নি! তারপর...

দেশে নিত্য নূতন হুজুগ— আজ পাকিস্তানী হামলা-- কাল গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডে দেড়শোযাত্রী-বোঝাই ছুটন্ত বাস পথের ধারে বড় গাছে ধাক্কা লেগে উলটে পড়ে যাত্রীর দল কাবার। কাজেই এসব হুজুগের চাপে করুণাময়ের নিরুদ্দেশের ব্যাপার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

শেখর সান্যাল জোর-তদন্ত করছেন—চারিদিকে চোখকান সজাগ রেখে তিনি চলেছেন। চারিদিকে সন্ধান করছেন। যথারীতি কাজ চলেছে... এ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার বসেছেন ম্যানেজারের চেয়ারে—লেনদেনের কাজে কারো কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ করুণাময়ের আত্মীয়বন্ধু ছাড়া 'পাবলিক' তাঁর কথা ভুলে গেছে: আর তাঁর স্ত্রী? স্ত্রীর কথা না বলাই ভালো।

এক মাস পরে......

ক্ষিতীশ চক্রবর্তী কাশ্মীর-ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন। কলকাতা থেকে তিনি যাবেন দিল্লী, তারপর দিল্লী থেকে কাশ্মীর। যাবেন প্লেনে। লগেজ তিনি বেলা দশটা নাগাদ প্লেনের অফিসে নিয়ে গিয়ে বুক করে এসেছেন—একটা ট্রাংক, একটা সুটকেশ আর বেডিং—সঙ্গে থাকবে শুধু তাঁর এ্যাটাচি কেস। ফ্ল্যাট ছেড়ে তিনি এসেছেন ক্লাবে, ক্লাব থেকে যাত্রা!

যাত্রার পূর্বে তিনি ক্লাবের সেই বারান্দায় বসে হুইস্কি পান করছেন—বয় এসে কার্ড দিলে—কার্ডে নাম শেখর সান্যাল...... ক্যালকাটা পুলিশ, ডি-ডি।

তিনি খুব বিরক্ত হলেন—যাত্রার পূর্বক্ষণে এ আবার কি আপদ। কিন্তু

পুলিশ অফিসার...... কি করেন, বয়কে বললেন—এখানে পাঠিয়ে দাও।

শেখর সান্যাল এলেন—বললেন, নমস্কার। আবার আসতে হলো বিরক্ত করতে! নিরুপায় পুলিশ-অফিসার...... ডিউটি-বাউন্ড!

মনের বিরক্তি মনে চেপে ক্ষিতীশ বললেন—পেলেন করুণাময়ের সন্ধান?

শেখর সান্যাল বললেন—না। কটা পয়েন্ট...সেগুলো ক্লীয়ার করতে চাই, তাই আমার আসা। আপনি শুনলুম, কাশ্মীর যাচ্ছেন—ভূস্বর্গ—হাউ [illegible] নাকি! আজই যাচ্ছেন?

ক্ষিতীশ বললেন— এখনি। প্লেনে দিল্লী যাচ্ছি...... বার্থ রিজার্ভ......

এই পর্যন্ত বলে তিনি হাতঘড়িতে টাইম দেখলেন, তারপর বললেন, আমার সময় খুব অল্প— চটপট সেরে নিন......

শেখর সান্যালের চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি......তিনি বললেন— কিন্তু এসব কাজ তো হুট্ বলতে চটপট সারা চলে না মিস্টার চক্রবর্তী। তবে হ্যাঁ—মিথ্যা আপনার সময় নষ্ট করবো না।

শেখর সান্যাল বললেন—আপনি ক্লাব থেকেই এয়ারপোর্টে চলেছেন—তার কারণ? আপনার ফ্ল্যাট......

ক্ষিতীশ বললেন—এরও কৈফিয়ৎ দিতে হবে? আমি চোর, না, বাটপাড়...? এর কারণ, কাল হলো মাসের পয়লা তারিখ......তাই আজ ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে এসেছি...আজ চলে না এলে ফ্ল্যাটের এ মাসের ভাড়াটা দিতে হবে—জাস্টে এ বিট্ একনমিক্যাল!

শেখর সান্যাল বললেন—আপনি সেদিন বলেছিলেন, সে-রাত্রে করুণাময়-বাবু সিঁড়ি দিয়ে আপনার ফ্ল্যাট থেকে নেমে গেলেন...... আপনি তাঁর সঙ্গে নীচে নামেননি এবং সে রাত্রে আপনি মোটে নীচে নামেননি বা ফ্ল্যাট থেকে বেরোননি!

—না। কিন্তু এ পুরোনো কথা আবার হঠাৎ......

বাধা দিয়ে শেখর সান্যাল বললেন, কারণ আছে—হ্যাঁ, আপনি কতদিনের জন্য কাশ্মীরে চলেছেন?

—যাচ্ছি যখন খরচ করে—এক মাস, দেড় মাস থাকবো ভাবছি...অবশ্য যদি ভালো লাগে?

—কি কি লগেজ নিচ্ছেন সঙ্গে?

ক্ষিতীশ বললেন—একটা ট্রাংক, একটা সুটকেস আর বেডিং—সেগুলো এয়ার-অফিসে বুক করে দিয়ে এসেছি ...সংগে থাকবে একটা এ্যাটাচি-কেস। ট্রাংকে কি জিনিস আছে, তাও বলতে হবে?

শেখর সান্যাল বললেন—না, তা জিজ্ঞাসা করবো না। তবে মনে করে দেখুন তো—একটা ট্রাঙ্ক আপনি নর্থ ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে সেখানকার স্ট্রং রুমে ডিপজিট রেখে এসেছেন কিনা?

দুচোখ বিস্ফারিত করে ক্ষিতীশ বললেন—ও হ্যাঁ—আপনি তো সে কথা জিজ্ঞাসা করেননি! সে ট্রাংকে আমার বৈষয়িক কাগজপত্র আছে আর দামী-দামী ফামিলি-কিউরিয়ো প্রভৃতি আছে। যখনি আমি বাইরে যাই, সেটা ব্যাংকের স্ট্রং রুমে ডিপজিট রেখে যাই। দামী জিনিসপত্র সংগে নিয়ে ঘোরার প্রয়োজন নেই!

দু'মিনিট অবিচল দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের দিকে চেয়ে থেকে শেখর সান্যাল বললেন—সে ট্রাংকটি আমি সার্চ করতে চাই—তারজন্য কোর্টের অর্ডার আছে......দেখুন।

ক্ষিতীশ বললেন— বেশ... দেখুন —এই নিন তার চাবি। একথা বলে তিনি চাবি দিতে উদ্যত হলেন।

শেখর সান্যাল বললেন—উঁহু তা হবে না। আপনার সামনে ট্রাংক খুলে সার্চ করবো। আপনি আমার সংগে ব্যাংকে যাবেন এখনি—আপনি নিজের হাতে চাবি দিয়ে ট্রাংক খুলবেন।

ক্ষিতীশ বেশ বিরক্ত হলেন, বললেন—এ কি জুলুম আপনার? আমি এখন কি করে যাবো? আমাকে যেতে হবে দমদম্ এয়ারপোর্টে...আপনি চান আমি প্লেন মিস্ করবো? এতগুলো টাকা লোকসান —তাছাড়া হয়রানি।

ঈষৎ হেসে শেখর সান্যাল বললেন,—নো হেল্প—দিস ইজ রুটিন ওয়ার্ক!

ক্ষিতীশ হাতঘড়ির দিকে চাইলেন—শেখর সান্যাল বললেন—আসুন, সহজ-ভাবে না এলে আমাকে 'আনপ্লেজান্ট স্টেপস্' নিতে হবে— তাতে আপনার ইজ্জত থাকবে না।

নিরুপায় হতাশ কন্ঠে ক্ষিতীশ বললেন—কিন্তু...

তাঁর কথা শেষ হলো না। শেখর সান্যাল বললেন—কথা বাড়াবেন না। আসুন...।

ক্ষিতীশকে আসতে হলো—ক্লাবের বাইরে পথে শেখর সান্যালের ট্যাক্সি—ক্ষিতীশকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে শেখর সান্যাল তাঁর পাশে বসলেন।

ট্যাক্সি চললো হেস্টিংস স্ট্রীটে নর্থ ব্যাংকের দিকে...

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ট্র্যাফিক-সিগন্যালের জন্য ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে হলো... ট্যাক্সিতে দুজনের মুখে কথা নেই।...... ট্যাক্সি থামবামাত্র ক্ষিতীশ ট্যাক্সির দরজা খুলে লাফিয়ে পথে নামলেন......নেমেই দে ছুট!

কিন্তু পথে বেশ ভিড়...শেখর সান্যালও সংগে সংগে ট্যাক্সি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরলেন—ভিড়ের মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্য...... ক্ষিতীশকে ধরে ট্যাক্সিতে তুলে তাঁর হাতে শেখর সান্যাল পরালেন হ্যান্ড-কাফ্, বললেন—আমার অপরাধ নেই! ইউ কমপেল্ড মী... ট্যাক্সি আবার চললো......

ক্ষিতীশ বললেন—আপনার এমন সন্দেহ......

শেখর সান্যাল বললেন—আপনার ফ্ল্যাটের বয় বলেছিল—সেদিন রাত এগারোটায় আপনি ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছিলেন একলা—সংগে আর কেউ ছিল না—তারপর আপনি আবার একলা ফ্ল্যাটে ফিরেছিলেন রাত একটার পরে—সেই থেকে আপনার ওপর আমরা নজর রেখেছি। আমার লোক প্লেন-পোষাকে আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করছে।...আজ বেলা এগারোটা নাগাদ একটা ট্রাংক নিয়ে আপনি ব্যাংকে রেখে আবার ফ্ল্যাটে ফিরেছিলেন—তারপর বেলা দুটো নাগাদ এয়ার-অফিসে যান লগেজ বুক করতে—সেখান থেকে ক্লাবে আসেন। ও ট্রাংকের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা...... সন্দেহ হবার কথা, হবে না কেন, বলুন?

—হুঁ, কিন্তু এক মাস কেটে গেল, এখনো......

শেখর সান্যাল বললেন—আপনার ফ্ল্যাটের লিফটম্যান আর সদরের দরোয়ান দুজনকেই অনেক জেরা করে শুধু জেনেছিলুম—ফ্ল্যাটে এসেছিলেন দুজন —ফ্ল্যাট থেকে রাত এগারোটায় একা আপনি বেরুলেন— দুজন নন—আবার রাত একটার পর আপনি একলা ফ্ল্যাটে ফিরেছেন। তখন থেকে আপনার ওপর নজর রেখেছি...আজ ঐ ট্রাংকটি ব্যাংকে পাঠিয়েছেন—হঠাৎ কাশ্মীর যাত্রা—ঐ ট্রাংকের সম্বন্ধে সন্দেহ—তাই সার্চ করবার হুকুম নিয়ে এসেছি। ......আপনি আজই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে এসেছেন—ফ্ল্যাট সার্চ করে কিছুই পাইনি......তবে আপনার একটা কামরায় আরকের গন্ধ পাই, আমার বিশ্বাস ঐ ট্রাংকেই পাবো করুণাবাবুর সন্ধান... ...

ক্ষিতীশ বললেন— শেষরক্ষা যখন হলো না তখন বলতে ক্ষতি কি—তাঁর ব্রান্ডির গ্লাসে বিষ উগ্র রকমের......... তাতেই আধ ঘন্টার মধ্যে সবশেষ। তারপর বেরিয়ে যাই ফ্ল্যাট থেকে......বয় ভাববে, করুণাময়ই বেরিয়ে গেলেন। ফিরে আসবার সময় ভেবেছিলুম—বয়টা ঝিমুবে—দেখতে পাবে না—কিন্তু তা হলো না! তারপর নিজের কামরায় এসে বড় ট্রাংকে করুণার দেহখানা দুমড়ে-দুমড়ে ঠেশে বন্ধ করলুম...। আরকের গন্ধ বলচেন! হ্যাঁ......স্ট্রং একটা 'ডিসইন্ফেকটান্ট' দিয়েছিলুম... তারপর সুযোগ খুঁজছিলুম— বেশ কিছুদিন কাটলে ট্রাংকটি ব্যাংকের ভল্টে ডিপজিট রেখে সরে পড়বো। এসব ডিপজিট কোনো ব্যাংক কোনোকালে খোলে না......ডিপজিটের জন্য ছ'মাসের টাকা দিয়েছি।

শেখর সান্যাল বললেন—কিন্তু এতকালের বন্ধু তাঁকে হঠাৎ...

নিশ্বাস ফেলে ক্ষিতীশ বললেন—জীবনে এমন একটি অপকর্ম করেছি—যে-কথা করুণা ছাড়া আর কেউ জানে না —যদি সে প্রকাশ করে, তাহলে আমার সাজার সীমা থাকবে না। এজন্য তার কাছে কেনা গোলামের মতো বাস করছিলুম—দীর্ঘকাল এই অস্বস্তি ভোগ... তাই......

নর্থ ব্যাংকে ট্রাংক খুলতে পাওয়া গেল তার মধ্যে করুণাময়ের মৃতদেহ... এবং......

তারপর......সে কথা ক্ষিতীশের যা হলো যাঁরা নিত্য খবরের কাগজ পড়েন, তাঁরা জানেন! অতএব......

পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে?

• শ্রীবিদ্যাবিবর্জন
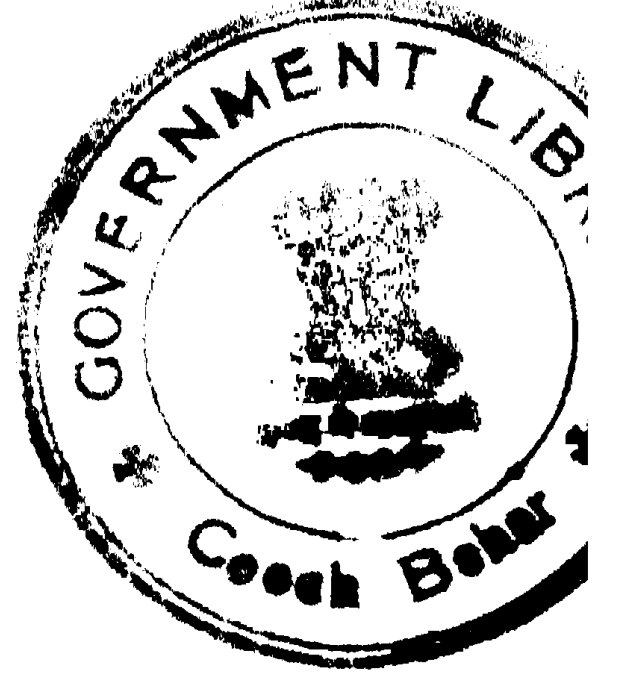
॥ পরীক্ষণ পদ্ধতি ॥

সম্পাদক জিজ্ঞেস করছেন, "কি মশায় ফল বেরোবে কবে? তিন সংখ্যা তো হল?"

বললাম, "পরীক্ষাই হল না, এরই মধ্যে ফল? এই তো সবে প্রশ্নপত্র মডারেশন শেষ হয়েছে।"

সম্পাদককে বড় ম্রিয়মাণ বোধ হল। বোঝা গেল, পুজো আসছে। এখন পরীক্ষার ফলের ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের উপসংহার করা দরকার।

মডারেশনের পর প্রশ্ন ছাপা হল—ছাপা হল কড়া পাহারায়, রাখাও হল কড়া পাহারায়। পরীক্ষার সময় পাঠানো হবে কেন্দ্রে কেন্দ্রে। সব কেন্দ্র কাছে নয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষার ভৌগোলিক সীমা আন্দামান পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই সেখানেও প্রশ্নপত্র পাঠাতে হয়।

পরীক্ষার পর উত্তরপত্র ফেরত আসার পালা। সব খাতা ফেরত আসবে প্রধান কর্মকেন্দ্রে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারপরিধি এখন অনেকটা সংকুচিত হয়ে এসেছে। বাঁকুড়া বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী এবং নবলব্ধ মানভূম এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়েছে। তবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিধি ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বৃহত্তর। কোন কোন অঞ্চলের পথঘাটও অসুবিধাজনক, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি জায়গা থেকে উত্তরপত্র আসতে স্বভাবতঃই কিছু দেরি হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা আসবে বিশ্ববিদ্যালয়ে, বোর্ডের খাতা বোর্ডের অফিসে। এবার ভাগ-বাঁটোয়ারা। পরীক্ষকের সংখ্যা কত? কাকে কত খাতা দেওয়া হবে? কতজন প্রধান পরীক্ষক? এক একজন প্রধান পরীক্ষকের অধীনে কতজন পরীক্ষক? প্রত্যেক পরীক্ষক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত খাতা দেখতে পারবেন? নির্দিষ্ট সময় সাধারণতঃ এক মাস বা কিছু বেশী। এই সময়ের মধ্যে শ'তিনেক খাতা দেখতে হয়। কখনো কখনো চার পাঁচ শ' পর্যন্ত।

যেখানে পরীক্ষক-সংখ্যার অনুপাতে খাতার সংখ্যা বেশী, সেখানে ছ'শ খাতাও এক একজন দেখে থাকেন। কেউ অসুস্থ হয়ে খাতা ফেরত দিলে সুস্থ পরীক্ষকদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। দেখা গেছে, তার পরেও তাঁদের মধ্যে অনেকে সুস্থ থাকেন।

পরীক্ষিত খাতা প্রধান পরীক্ষকের বাড়িতে ফেরত দিতে হয়। এটাই হল সাধারণ নিয়ম। দূরের পরীক্ষকরা ডাকে পাঠান, কেউ বা পাঠান রেলওয়ে পার্সেলে। কখনো পরীক্ষক সোজাসুজি পাঠান প্রধান পরীক্ষকের নামে। কখনো বা বিশ্ববিদ্যালয়ে খাতা আসে। সেখান থেকে প্রধান পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হয়। প্রতিষ্ঠান অনুসারে ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সব খাতা এক সঙ্গে পাঠানো হয় না, পরীক্ষকরা কিছু কিছু খাতা দেখেন আর কিছু কিছু পাঠান। চার পাঁচ কিস্তিতে পরীক্ষিত খাতা প্রধান পরীক্ষকের কাছে ফেরত আসে। সাধারণ রীতি এই। তবে পরীক্ষকরা এক এক সময় এর ব্যতিক্রম ঘটান। কেউ কেউ ঠিক সময়ে খাতা ফেরত দেন না, চিঠি দিলে নিরুত্তর থাকেন, তারপর এক্সপ্রেস চিঠি, টেলিগ্রাম প্রভৃতি চলতে থাকে। এরপর এক সময়ে খাতা আসে বটে, কিন্তু বরাত মন্দ হলে সে খাতা দ্বিতীয়বার দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে। এমন দেখা গেছে, পরীক্ষক প্রথম দিকে খাতার বাণ্ডিল খোলেননি। কলেজের কাজ (?), বাড়ির অসুখ-বিসুখ, ভাইয়ের বিয়ে, বাড়ি তৈরি হচ্ছে তার জন্যে সিমেণ্ট সন্ধান আর রবীন্দ্র জন্মোৎসব এই সব ক'রে কাটিয়ে দিলেন দু-তিন সপ্তাহ। তারপর শুরু করলেন খাতা দেখা—পড়ি কি মরি করে খাতার পাতার উপরে চলল লাল নীল পেন্সিলের ঘোড়দৌড়। (হায়! পেন্সিলের দাগও কি সব সময় স্পষ্ট পড়ে?)

প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশ সামনে আছে, কিন্তু দেখবার সময় কই? সে নির্দেশ অনুসরণ করে একটুখানি সময় দিয়ে যাঁরা দেখেন তাঁদের কাজ ত্রুটি-হীন হয়, ঠিক সময়ে তাঁরা খাতা ফেরতও দেন। এক দল পরীক্ষক সময়ের অল্পতার জন্যে সর্বদা আক্ষেপ করেন। কিন্তু চার-শ'র উপরে অতিরিক্ত আরও এক'শ খাতা দিতে চাইলে বিরক্ত হন না, প্রত্যাখ্যানও করেন না। আসলে সময় যত কমই হোক না কেন, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আড়াই ঘণ্টা খাটলে বার থেকে পনেরটি পর্যন্ত খাতা সহজে দেখা যায়। এক মাসে শ'-চারেক খাতা দেখা সেই কারণে কঠিন নয়। কোনো কোনো পরীক্ষক সময়াভাবে কিছু কিছু খাতা ফেরত দিয়ে থাকেন। কিন্তু তার সংখ্যা শতকরা একও হবে না। শতকরা অন্ততঃ তিরিশজন পরীক্ষক ঘণ্টার

দশখানা খাতা দেখতে পারেন এবং পরীক্ষার মরশুমে দেখেও থাকেন।

প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশের কথা বলেছি। সেটা কি রকম তা বলছি। বিষয় এবং পরীক্ষা অনুসারে সে নির্দেশ যে ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কতকগুলি নির্দেশ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সমান। প্রবেশিকা, ইন্টার, বি-এ, বি-এস-সি— অর্থাৎ যে-সব পরীক্ষার পরীক্ষার্থী-সংখ্যা বেশী, সেই সব পরীক্ষার পরীক্ষকদের এই রকমের নির্দেশ দেওয়া হয় :

১। পরীক্ষার কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে হবে। খাতা ফেরত দেবার শেষ তারিখ এই। এই তারিখের মধ্যে খাতা ফেরত দিতেই হবে, কোনক্রমে অন্যথা করা চলবে না। পরীক্ষিত সব খাতা এবং সম্পৃক্ত সকল মার্কশীট ঐ তারিখের মধ্যে (পরে নয়) প্রধান পরীক্ষকের হস্তগত হওয়া চাই।

২। কাজ ও সময়ের পরিমাণ হিসাব করে পরীক্ষক প্রতিদিন সমানুপাতে কাজ করবেন। এবং প্রতি সপ্তাহে সমানুপাতে খাতা পাঠাবেন। অর্থাৎ চার-শ' খাতা যদি এক মাসে দেখবার কথা থাকে, তা হলে প্রতি সপ্তাহে তিনি একশ' করে খাতা দেখে প্রধান পরীক্ষককে পাঠাবেন। আর তাঁর উচিত হবে প্রতিদিন তের চোদ্দটি করে খাতা পরীক্ষা করা।

৩। খাতার প্যাকেট এবং মার্ক-শীট আলাদা করে পাঠাবেন, এক সঙ্গে পাঠাবেন না। (একটা খোয়া গেলেও আর একটা দিয়ে কাজ চলবে।)

৪। মার্কশীটের চারটে ফর্দ। একটি প্রধান পরীক্ষকের, দুটি দু'জন ট্যাবুলেটরের, আর একটি পরীক্ষকের নিজের। এই চারটি ফর্দই পরীক্ষককে পূরণ করতে হবে। পরীক্ষকের অংশটি তিনি নিজের কাছে রেখে বাকী তিনটি প্রধান পরীক্ষকের কাছে পাঠাবেন।

৫। খাতা দেখার সময় লাল নীল পেন্সিল দিয়ে ভুল কাটবেন। যতগুলি উত্তর লেখার কথা তার চেয়ে বেশী লিখলে সেই বাড়তি উত্তরগুলির পাশে দাগ দিয়ে লিখে দেবেন 'অতিরিক্ত'। তাতে নম্বর দেবেন না।

এই সাধারণ নির্দেশ ছাড়া প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কেও নির্দেশ থাকে।

ধরুন, একটা প্রশ্নের তিনটে অংশ। মোট নম্বর ধরা আছে ১৫। কোন্ অংশের উত্তর কি রকম এবং কতখানি হওয়া উচিত এবং কোন্ অংশের জন্য কত নম্বর দেওয়া হবে তার নির্দেশ-দানও প্রধান পরীক্ষকের কর্তব্য।

মনে করুন, একটি অঙ্কের প্রশ্নপত্রে ছাপা হল :

"প্রমাণ কর একটি ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল তিন সমকোণের সমান।"

কোনো ছেলে 'তিন সমকোণের' না দেখেই দুই সমকোণের সমান প্রমাণ করে দিলে। কোনো ছেলে তিন সম-কোণের সমান প্রমাণ করবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। কেউ বা যেমন তেমন করে তিন সমকোণের সমান প্রমাণ করে ছাড়লে। কেউ লিখল,—এই প্রশ্ন ভুল। কেউ এক লাইন উত্তর লিখে আর অগ্রসর হল না।

এ রকম বিপত্তি মাঝে মাঝে ঘটে। তাই প্রধান পরীক্ষককে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হয়। তাঁকে ভেবে রাখতে হয় কত রকমের উত্তর হতে পারে এবং কোন্ উত্তরে কি নম্বর দিতে হবে। তাঁর নির্দেশ সকলের মনোমত না হতে পারে, কিন্তু যেখানে বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পরীক্ষার্থীর সমস্যা, সেখানে সর্বজন-সম্মত না হোক, অন্ততঃ অনেকজন-সম্মত একটা সমাধান বের করতে হবে। সে সমাধান সম্পূর্ণ নির্দোষ না হলেও সর্বজনের ক্ষেত্রে সমান হবে তো! সেইটে সর্বাগ্রে আবশ্যক। প্রশ্নের দোষে যে বিপদ ঘটে তার ফলে পরীক্ষার্থীর বিশেষ ক্ষতি হয় না। শিক্ষক সমিতি থেকে সংবাদপত্র পর্যন্ত সকলেই পরীক্ষার্থীর পক্ষে, কাজেই তারা না লিখলে অথবা এক লাইন লিখলেও নম্বর পেতে পারে।

এত করেও সব নিয়মাবলী নিশ্ছিদ্র করা যায় না। পরীক্ষকের বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করতেই হয়। পরীক্ষার্থীর প্রধান আশ্রয় তিনিই। তিনি যদি কৃপণ হন, সত্তর যে পাবে তাকে পঞ্চাশ করে দিতে পারেন। আর তাঁর হাত যদি দরাজ হয় পঞ্চাশকে টেনে সত্তরে তুলতে বাধবে না। তবে কৃপণের সংখ্যাই বেশী মনে হয়। গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে বি-এ অনার্স এবং এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী খুব কম উঠছে। ছেলেমেয়েদের বিদ্যেবুদ্ধি এতখানি কমে গেল—একথা মানি কেমন করে?

পরীক্ষার খাতাগুলি ফিরে এল প্রধান পরীক্ষকের কাছে। অমনি স্ক্রুটিনি আরম্ভ হল। স্ক্রুটিনি মানে পরীক্ষিত খাতার ভুলচুক দেখা। প্রধান পরীক্ষক নিজেই স্ক্রুটিনীয়র নির্বাচন করেন। পরীক্ষকদের মধ্যে থেকেই স্ক্রুটিনীয়র নেওয়া হয়।

প্রধান পরীক্ষক তাঁর প্রয়োজন অনুসারে স্ক্রুটিনীয়রের সংখ্যা স্থির করেন। ধরুন, একজন প্রধান পরীক্ষকের হাতে দশ হাজার খাতার ভার। তিনি চারজন কি পাঁচজন স্ক্রুটিনীয়র নিয়োগ করলেন। গড়-পড়তা দু-হাজার বা আড়াই হাজার খাতা স্ক্রুটিনি করতে হবে এক এক জনকে। স্ক্রুটিনির ব্যবস্থা যতদূর জানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল। স্ক্রুটিনিতে পরীক্ষকদের যে কত ভুল ধরা পড়ে তা বললে অবিশ্বাস্য মনে হবে। এই ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীদের অনেক উপকার হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, এম-এস-সি পরীক্ষার খাতা স্ক্রুটিনি করা হয় না কেন তাই ভাবি।

প্রধান পরীক্ষক নিজেও পরীক্ষিত খাতার শতকরা অন্ততঃ পাঁচটি খাতা নিজে পরীক্ষা করেন। কেউ কেউ স্ক্রুটিনির পরেই এ কাজটা করেন। স্ক্রুটিনীয়রের অসাবধানতার জন্যে দু-একটা ভুল দৃষ্টি এড়িয়ে রয়ে গেলে প্রধান পরীক্ষকের নজরেও পড়তে পারে। এই সময়ে প্রধান পরীক্ষক বুঝতে পারেন কোন্ পরীক্ষকের পরীক্ষার মান ও প্রণালী কি রকম। প্রয়োজন হলে তিনি পরীক্ষককে ডেকে পাঠাবেন, পরীক্ষকের ভুল দেখলে জানাবেন। যিনি কঠোর তাঁকে একটু সদয় হ'তে বলবেন। যিনি অতিশয় অমায়িক তাঁকে একটু সংযত হবার জন্য উপদেশ দেবেন।

এবার মার্কশীটগুলি পাঠাতে হবে ট্যাবুলেটরের কাছে। মার্কশীটের তিন ফর্দ আছে প্রধান পরীক্ষকের কাছে। তার এক ফর্দ নিজে রাখবেন। আর দু ফর্দ কেটে পাঠাবেন দু-জন ট্যাবু-লেটরের কাছে। এ'দের কাছে সকল প্রধান পরীক্ষক মার্কশীট পাঠাবেন। এ'রা প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সকল বিষয়ের সকল পত্রের নম্বর একত্র করে যোগ দেবেন। সম্পাদক মশায়কে জানাচ্ছি, এ'দের কাজ শেষ হলেই ফল ঘোষণা করা হবে।

প্রতিবেশী সাহিত্য

॥ তেলুগু ॥

॥ ভূমিকা ॥

দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার মধ্যে একমাত্র অন্ধ্র বা তেলুগু সাহিত্যেই সংস্কৃতের প্রভাব সর্বাধিক। তেলুগু দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্তের মধ্যে যেন সেতুবন্ধ রচনা করেছে।

তেলুগু সাহিত্যের জন্ম এগার শতকে হলেও সপ্তম শতক এবং তৎপরবর্তী রাজরাজাদের শাসন-বিভাগীয় দলিলপত্রাদি থেকে উক্ত শাসকদেরও আগে যে এর জন্ম তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আদি তেলুগু কবি নান্নায়া থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে বিরাট সাহিত্যসম্ভার সৃষ্ট হয়েছে তার ইতিহাস রচনা আজকের উদ্দেশ্য নয়। শুধু মাত্র তেলুগু ছোট গল্পের ধারার সংক্ষিপ্ততম পরিচয় পরিবেশনাই উদ্দেশ্য। প্রথমেই জানাই যে, ১৯৫১ সালের আন্তর্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় একটি তেলুগু গল্প দ্বিতীয় স্থান পায়। এই গল্পের নাম 'গালিওয়ালা'। রচয়িতার নাম পালাগুম্মি পদ্মরাজু। তেলুগু ছোট গল্পের নাম তিনটি—পিট্টাকথা, চিন্না-কথা এবং কথানিকা। তেলুগু সাহিত্যে উপন্যাস লেখা শুরু হওয়ার পরেই ছোট গল্প লেখার চলন শুরু হয়। প্রথমে সার্থক ছোট গল্প লেখার কৃতিত্ব গুরজাড়া আপ্পারাওয়ের। তাঁর 'দিদ্দুবাটু' (পরিবর্তন) এবং অন্যান্য গল্পে চরিত্রের একটা বিশেষ দিক কিংবা একটা বিশেষ ঘটনা ঐ গল্পসমূহের সীমার মধ্যে এমনভাবে ঢেউ তুলে যায় যে, গল্প শেষ হওয়ার পরও তার দোলা থামে না। তাঁর পরে সার্থক ছোট গল্প-রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুড়িপাটি ভেংকটচলম। তাঁকে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে মোঁপাসা ও লরেন্সের সংগে তুলনা করা হয়। চরিত্র ফোটানোর জন্য তাঁর গল্প গড়ে ওঠে, মানুষের অন্তর্জগতকে খুলে ধরবার জন্য তাঁর গল্পে বাইরের ঘটনা এসেছে। নীতি ও ধর্মের শাসনের চেয়ে মানুষের হৃদয়কেই তিনি উঁচু আসনে বসাতে চেয়েছেন। —অনুবাদক।

আমার কি দোষ

রচনা : গুড়িপাটি ভেংকটচলম্

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

সমাজে আমার ঠাঁই নেই। চার্চে ঢোকা নিষেধ। আমার বাবা মা আত্মীয়-স্বজন কেউ কাছে ঘেঁষতে দেয় না। বান্ধবীরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আমি পাপী। আমার চিন্তা পাপচিন্তা। আমার বাবা মা স্বামী ভগবান খৃষ্ট অন্তরাত্মা সবাই বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আমি গোঁয়ার্তুমি করে পাপ পথে পা বাড়িয়েছি। যা ঘটেছে ঠিক তাই পুণ্যাত্মাদের কাছে বলছি।

অল্পবয়সে আমি কয়েকটি বিষয় জেনেছি : ব্যাটাছেলে এবং মেয়েছেলের মধ্যে স্রষ্টার সৃষ্টির পার্থক্যের চেয়েও মানুষের সৃষ্ট প্রভেদ অনেক বেশী। ব্যাটাছেলেরা যা করে তার অনেকটাই মেয়েদের কাছে অকেজো। একে অন্যের সংগে মিলেমিশে থাকতে নেই। মেয়েরা ও ছেলেরা দূরে দূরে থাকতে হয়। আরও কিছুদিন পরে জানলাম, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে প্রচন্ড এক রেষারেষি আছে। ইঁদুর-বিড়াল সম্পর্ক। বিড়াল ইঁদুরের কাছে গেলে ইঁদুরের জীবন-হানির আশংকা, ইঁদুর বিড়ালের কাছে গেলেও আশংকা তারই। পুরুষের সংগে বন্ধুত্ব পাতালে অথবা পুরুষ বন্ধুত্ব পাতাতে এগিয়ে এলে অঘটন কিছু ঘটবেই এবং সম্পূর্ণ দোষটাই পড়ে তখন মেয়েদের ঘাড়ে। গোড়ায় মেয়েরা এড়িয়ে যায়, ছেলেরা কাছে টানতে চায়। ব্যতিক্রম কিছু লোকের মধ্যে থাকতে পারে। দু-একটা বিড়ালও তো থাকতে পারে যারা ইঁদুর ধরতে পারে না। পুরুষ যত ভালই হোক, কাছে ঘেঁষতে দিতে নেই। কখন কি ঘটে যায় কে জানে! তাছাড়া, বিড়ালদের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। মানুষের মধ্যেও বিড়ালতপস্বীর অভাব নেই। পুরুষদের ঢং দেখে গোড়াতেই দূরে দাঁড়াতে হয়। তাদের বুঝিয়ে দিতে হয় 'আমি অমন মেয়ে নই, অমন করলে বাড়ীতে জানিয়ে দেব কিন্তু! তাছাড়া, তুমি আমার দাদার মত।' নানাছলে এড়িয়ে যেতে হয়। মেয়েরা বলতে পারবে না : পুরুষ মানুষের সংগে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার পথ আমি দেখব। আবার একথাও বলতে পারবে না, পুরুষ মানুষের দরকার আছে। তারা না থাকলে চলবে কি করে—বাঁচতেই পারব না। আমার জীবনে তাদের প্রয়োজন আছে।

মেয়েরা অদ্ভুত জীব! হ্যাঁও বলতে পারবে না নাও বলতে পারবে না। পুরুষ মানুষকে দেখলে লজ্জা পেতেই হবে। পুরুষ মানুষ এগিয়ে এসে জোর দেখাবে—সেখানেই যেন মেয়েদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অল্পবয়স থেকেই ছেলেদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই নিজেকে সমর্পণ করতে হয়।

মেয়েদের একটি মাত্র লক্ষ্য : বিয়ে। তাতেই মুক্তি। মেয়ে হয়ে জন্মানো কেন? বিয়ের জন্য, সন্তান প্রসবের জন্য। তাদের কোলেপিঠে মানুষ করার জন্য।—তারপর তাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য। আর ছেলে হয়ে জন্মানো? চাকরী করবে, রোজগার করবে। খাটবে ক্ষেতে-খামারে অফিসে-আদালতে অথবা ব্যবসায়ে। আমাদের খৃষ্টানদের মধ্যে কিছু মেয়ে চাকরী করে। তাও অর্থ-নৈতিক কারণে। যে মেয়ে বিয়ে করে না সমাজের চোখে সে এক বিচিত্র জীব। সে মেয়ে যতই ভাল হোক তাকে নিয়ে বহু আষাঢ়ে গল্প মুখে মুখে ছড়ায়। বিয়ের অর্থ—একজন পুরুষকে একটি নারীর উপর অত্যাচার করার অধিকার আইনত মেনে নেওয়া। অত্যাচার শুধু একজন করবে, সারাজীবন। কোন রেহাই নেই। স্বামীকে ভাল না লাগলেও মুখ ফুটে কিছু বলার উপায় নেই। অভিনয় করে যেতে হবে—স্বামী আমার মনের মত। স্বামী খারাপ একথা মনেও আনতে নেই। এ যেন দোকানের মিষ্টি। দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করতে হবে। কেনার পর মিষ্টি খেতে হয়। কিনেছো যখন খেতেই হবে। সমস্তটা খেতে হবে। প্রত্যেকদিন, তা না হলে বউ কিসের। অনিচ্ছা প্রকাশ করলেই আইন-সমাজ সবাই

একসঙ্গে ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। শুধু কি তাই, স্বামীর অবস্থাও তাই। অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরানোর উপায় নেই। যতই আকর্ষণীয় হোক মুখ ঘুরিয়ে থাকতেই হবে। বউয়ের কাছে সবসময় এমন ভাব করতে হবে যেন সেই সবচেয়ে সুন্দরী, নিদ্রায়-জাগরণে স্বামী তারই চিন্তা করে।

এই হল বিয়ে।

তখন স্কুলে পড়ি। বার বছর বয়সে একটা ঘটনা ঘটল। একটা অংক পারছি না, পাড়ার এক ছেলের কাছে গেলাম অংকটা করিয়ে নিতে। বাবা তা লক্ষ্য করে ধমক দিয়ে বলল, ওর কাছে গেলি কেন? তোর ক্লাসের মেয়ে রাজাম্মার কাছে যেতে পারিস না?

রাজাম্মাদের বাড়ি অনেক দূরে। তাছাড়া তার সংগে আমার আড়ি। বাবা ওসব কথা না শুনে গর্জে উঠে বলল, ব্যাটাছেলেদের তোর কি দরকার? আর কোনদিন গেলে পিঠের চামড়া তুলে দেব।

আর একদিনের ঘটনা: আমার মাস্টারমশাই আমার সংগে কথা বলতে বলতে হাঁটছিলেন। আমাদের দুজনের পিছনে অন্য স্কুলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে টিপ্পনী কাটছিল। এই ব্যাপারটা মার কাছে কে যেন লাগাল। মা আমাকে মারল। 'বাবাকে জানিয়ে দেব' বলে শাসালো। না জানানোর জন্য হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে অনুরোধ করলাম বটে, কিন্তু সেদিন বুঝতে পারিনি আমার দোষ কোথায়।

আর একদিন—বড়দিন উপলক্ষ্যে বনভোজনে গেছি সবাই। অনেক ছেলে-মেয়ে জুটেছে। একটা পনর বছরের ছেলে এসে ছোট্ট এক মেয়ের কাছ থেকে লাট্টু কেড়ে নিয়ে ঘোরাতে লাগল। মেয়েটি কাঁদছে, আমি ভাবছি কি করব। কিছুক্ষণ পরে তার এক অসতর্ক মুহূর্তে হাত থেকে লাট্টু কেড়ে নিলাম। ছেলেটি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। এই ঘটনা আমাদের খৃষ্টান পুরোহিত-মশাই লক্ষ্য করে বাবাকে বললেন। বাবা সেদিন রাত্রে আমাকে খুব মারল। বুঝলাম কাউকে সাহায্য করার জন্যও ব্যাটাছেলেদের সংগে ঝগড়া করতে নেই। আমি এমন কী অপরাধ করেছি যে, ছেলেটা আমাকে ঠেলে ফেলে দেবে! অপরাধ হয়তো অনেকদিন আগেই ঘটে গেছে! আমার মেয়ে হয়ে জন্মানোর দিন।

আর একবার, আমার তের বছর বয়সে পুরোহিতমশাইয়ের মেয়ে রত্নাম্মার কাছে গেলাম। ঘরে সে নেই। সেদিন তার জন্মদিন ছিল। তার প্রাইজের বইগুলো দাঁড়িয়ে দেখছি। পুরোহিতমশায়ের বোন-পো এসে আমার সঙ্গে দুএকটি কথা বললো। ছেলেটি দেখতে শুনতে মন্দ নয়। বেজায় লজ্জা পেল তাকে দেখে। আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ার তাল করছি। হঠাৎ সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম ঘরে। পরে রত্নাম্মাকে বললাম। সে শুধু হাসল। মনে রাগ হলো আমার, ভাবলাম সে হয়ত বিরাট একটা অপরাধ করেছে। এই ধরনের বিষয় চেপে রাখতে নেই। তাছাড়া চার্চে যে নীতিজ্ঞান দেয় তাতে এগুলো অপরাধ। তাতেও রত্নাম্মা হাসল। হয়ত সে ভেবেছে যে, ওর পিসতুতো ভাইয়ের নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছি। তারপর সোজা মার কাছে গিয়ে বলে দিলাম। মা এসব শুনে রত্নাম্মাকে সবকথা জানিয়েছি বলে উল্টে গাল দিল, বাবাকে জানাল। বাবা আমার হাত-পা বেঁধে ছড়ি দিয়ে সপাং সপাং করে মারতে মারতে বলল, 'আর কোনদিন করবি এমন কাজ? তাও আবার পুরোহিত-মশাইর বাড়ীতে? লোকটা একবার টের পেলে তোর এ জীবনে আর বিয়ে হবে? আমি ডুকরে উঠে কাঁদতে কাঁদতে একটিমাত্র কথা বলছিলাম: আমার কি দোষ।

এই ধরনের ঘটনার পরে ব্যাটা-ছেলেদের সম্পর্কে আমার মনে দারুণ ভয় ঢুকল। সব সময় পালিয়ে পালিয়ে থাকতাম, ওদের ধারেকাছেও ঘেঁষতাম না। কেউ কোন ইংগিত করলে তা আর বাড়িতে বলতাম না। ব্যাটাছেলেরা তো তা করতে পারে। তাদের বেলায় সাতখুন মাপ। নেহাৎ কার নামে কিছু রটলেও কনের বাবা-মাকে ছেলের বাবা-মা বলবে: অল্পবয়সের ছেলেরা একটু-আধটু ওরকম করেই থাকে। কনের বাবা-মা ঐকথাতেই গলে যায়। মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয় ঐ ছেলের সংগে। আর মেয়েদের বেলায়? একটু কিছু রটলেই হলো, ব্যাস্ আর রক্ষে নেই। কানে কানে রটে যাবে। সারা গ্রামের লোক জেনে যাবে। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তিলকে তাল করবে। নীরব সত্যের চেয়েও সরব মিথ্যা লোকে বেশী লুফে নেয়।

আমার বয়স তখন পনরো। আমাদের পাশের বাড়ির ভাড়াটেরা চলে গেল। নতুন ভাড়াটে এল। ওদের ঘর আর আমাদের ঘরের মাঝে একটি দরজা। দুদিকেই খিল দেওয়া ছিল তাতে। নতুন ভাড়াটেরা মাত্র দুজন—এক বিধবা বুড়ী আর তার নাতি। নাতির বয়স আঠার। পড়াশোনা করে না। মস্তানি করে বেড়ায়। গাঁয়ের মস্তানদের সংগে তার বন্ধুত্ব। ওরাও খৃষ্টান। আমাকে দেখার প্রথম দিন থেকেই আমার উপরেই তার চোখ। দু'একবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে ইশারা করে ডেকেছিল। মার কাছে বলে দিয়েছিলাম। মা উল্টে আমাকেই গাল দিল।

সেদিন রবিবার। আমার মাথাধরায় চার্চে যাইনি। ঘরে আমি একা শুয়ে আছি। দুঘরের মাঝের দরজাটা খোলার শব্দ হল। ভয় পেয়ে হঠাৎ উঠে বসে দেখি আমার সামনে ভেংকটস্বামী দাঁড়িয়ে। রাত তখন সাতটা। আলসেমি করে বাতি ধরাইনি। উঠে বাতি ধরাতে গেলে সে বাধা দিল।

বললাম, এখানে এলে কেন?

—তুমি তো ডাকলে।

—মানে? আমি কেন তোমাকে ডাকতে যাব? চলে যাও বলছি, না হলে চীৎকার করে লোক ডাকব।

—পরোয়া করি না। আশপাশের বাড়ীতে কেউ এখন নেই। সব চার্চে গেছে। আর যদিও বা দুএকজন থাকে ক্ষতি কি। আমি তো তোমার কাছে এসেছি তুমি কেন ডেকেছ জানতে।

সে হয়তো বুঝতে পেরেছে আমি তাকে ভয় দেখাচ্ছি। আসলে লোক ডাকবো না। ডাকাডাকি করলে লোক হয়ত আসবে। কিন্তু সমস্ত দোষ তো পড়বে আমার ঘাড়েই। সবাই ওর কথা বিশ্বাস করবে, আমি তাকে ডেকেছি। তারপর বাবার হাতে খেতে হবে প্রচন্ড মার।

অবাক হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। অসহায় বোধ করছি। কি করব

বুঝতে পারছি না। হঠাৎ সে আমাকে ধরে টেনে হিঁচড়ে খাটের কাছে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।......

রাত আট-টা নাগাদ বাবা-মা ফিরল। আরও বেশী মাথাধরার ভান করে শুয়ে পড়ে রইলাম। সাধাসাধি করলেও খেতে উঠিনি। হয়ত আমার মুখ দেখেই সব বুঝে নেবে। খুব ভয় করল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুখে কোন ছাপ আছে কিনা প্রথমেই দেখে নিলাম আরশিতে। পাঁচ-ছদিন ভয়ে বুকটা টিপ টিপ করছিল। তারপর থেকে আমি যেন ভেঙ্কটস্বামীর বাঁদী হয়ে গেলাম। ও যা বলত তাই করতে হতো। আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিত কবে কোথায় তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমাকে যেতেই হতো। ঐ দরজার খিল জোরে এঁটে দিতাম। কিন্তু তার অঙ্গুলি হেলনে আমাকেই সেটা খুলতে হত। ওর জন্য আমাকে ঘর থেকে টাকাপয়সা চুরি করতে হত। জিনিসপত্রও চুরি করতে হত—না দিয়ে উপায় নেই। বাগে পেয়েছে। গররাজি হলেই হাটে হাঁড়ি ভাঙবে। তার ব্যবহার, তার চালচলন, তার রাগ তার হাসি তার চাউনি সমস্ত কিছুই আমার অত্যন্ত খারাপ লাগত। তবু আমি নিরুপায়। কাকেই বা জানাব। কেই বা এর প্রতিকার করবে। তবু সহ্য করেছি। কিন্তু পারিনি একদিন। সাপের মত ফুঁসে উঠে ফণা তুলেছিলাম। সেদিন সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তালবাগানে। বন্ধুদেরও নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। শেষ পর্যন্ত সেদিন ওর পায়ে পড়েও নিস্তার পাইনি।

ইচ্ছে করল মার কাছে সবকিছু খুলে বলি। কিন্তু পরক্ষণেই ভীষণ ভয় করল, খুব মারধোর করে যদি বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তারচেয়ে না বলাই ভাল। অত্যন্ত পঙ্কিল হয়ে উঠল আমার জীবন। আমার চাউনিতে আমার কাজ-কর্ম সমস্ত কিছুর মধ্যে যেন চৌর্য-বৃত্তির ছাপ সুস্পষ্ট।

শেষ পর্যন্ত একদিন সব প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমাদেরই ঘরে ভেঙ্কট-স্বামী আমাকে জোর করে জড়িয়ে ধরেছিল। ঠিক সেই সময়ে মা ঢুকল ঐ ঘরে। তৎক্ষণাৎ আমাকে ছেড়ে সে মাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি থ বনে গেলাম। মুহূর্ত মধ্যেই মা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর।

কারণ জিজ্ঞেস করল না। মুখে কিছু বললও না। পাছে কেউ শুনে নেয় এই ভয়ে। খুব কষে আষ্টেপৃষ্টে আমাকে বেঁধে চাবুক কষতে লাগল। তারপর চুলের ঝুঁটি ধরে টেনেহিঁচড়ে সমানে ঘুষি-লাথি মারতে লাগল। হঠাৎ এক সময় গলা টিপে ধরল...তারপর সেই অবস্থাতেই ছেড়ে দিয়ে বিড় বিড় করতে লাগল। বাবা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে সব বলল। কথাটা কানে ঢুকতেই বাবা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে একটা লাঠি নিয়ে আমাকে সমানে পিটুতে লাগল। মাথা কেটে গেল—কালো মেঝেতে লাল রঙের ধারা বইল। তবুও ছাড়া-ছাড়ি নেই। মুখে কাপড় পুরে দিয়েছে। সেই অবস্থাতেই আমি কাঁদছি...।

এত মার খেয়েছি বলে আমার দুঃখ ছিল না। ভাবলাম, যাক ভেঙ্কটস্বামীর কবল থেকে এবার মুক্তি পেয়েছি। ও নিশ্চয়ই পালিয়েছে। ওকে দেখতে পেলে বাবা আর আস্ত রাখবে না। কিন্তু পরের দিন তাকে দেখতে পেয়েও বাবা কিছু বললেন না। শুধু আমাকে শাসিয়ে বললেন, এবার যদি ভেঙ্কটস্বামী এঘরে আসে আমাকে বলিস। সেদিন ঘরের এককোণে লুকিয়ে আমাকে বলল বাড়িতে কেউ না থাকার ভান করতে। বাবার এই টোপ ভেঙ্কটস্বামী গিলল। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। সে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাবা লাঠি তুলল।

—খবরদার বলছি! লাঠির একটা ঘা-ও যদি আমার পিঠে পড়ে তাহলে......

—কি করবে তুমি?

—হাটে হাঁড়ি ভাঙব। ঢি ঢি পড়ে যাবে আপনার মেয়ের নামে।

—তাই কর। তোমার কথা কে বিশ্বাস করবে? তার আগে আমিও তোমাকে পুলিসে দেবো।

—ওরা বিশ্বাস করবে না। এই দেখুন আপনার মেয়ের হাতের লেখা চিঠি।

চট করে বাবা ঐ চিঠিটা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। ভেঙ্কটস্বামী হেসে বলল, অমন চিঠি আমার কাছে আরও পঞ্চাশটা তোলা আছে। অগ্নিদৃষ্টিতে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, একথা সত্যি? মাথা পেতে স্বীকার করলাম।

—তাহলে কিছুই না-জানার ভান আর করলে কেন?

তারপর আর রক্ষে নেই। বাবা আমার চুলের ঝুঁটি ধরে আছড়ে মেঝেতে ফেলে প্রচন্ডভাবে মারল। হঠাৎ কি হলো! ভেংকটস্বামী বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, ওকে অত মারলে আমি সহ্য করব না। নিয়ে যাব এখান থেকে। মুহূর্তে বাবার মুখের সমস্ত রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। বিবর্ণমুখে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

তারপরেও ভেংকটস্বামী স্বাভাবিক-ভাবে আমাদের ঘরে যাতায়াত করত। দিনেরাত্রে যখন খুশি আসত যেত। বাবা-মা ওকে দেখেও না দেখার ভান করত। ওর বন্ধুবান্ধবেরা আমাদের ঘরে এলেও তাদের সংগে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করত। মা নিজের হাতে একবার চা বানিয়ে ভেংকটস্বামীকে খাইয়েছিল।

মেয়েরা বোধহয় এই প্রকৃতির যুবকের প্রতি অল্পদিনের মধ্যেই আকৃষ্ট হয়। ভেংকটস্বামীকে আর আমার মন্দ লাগল না।

সেদিনের ঘটনার পর থেকে আমার বাড়ির লোক আদাজল খেয়ে পাত্রের খোঁজ করতে লাগল। প্রতিজ্ঞা করেছিল মাসখানেকের মধ্যে আমার বিয়ে দেবেই। সেদিন বুঝিনি ওরা কেন এত উঠেপড়ে লেগেছিল। আড়ি পেতে একদিন শুনলাম বাবা-মা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে :

—একমাসের মধ্যে হয়ত পারা যাবে না।

—পারতেই হবে। বলা যায় না কখন কি ঘটবে। ভাল করে জিজ্ঞেস করেছো তো? ইতিমধ্যে কোন অঘটন ঘটেনি তো আবার?

—না, গত বুধবারেই তো ওর...

—ও কিছুতেই আসা বন্ধ করবে না। মাসখানেকের মধ্যে পাত্র খোঁজা কি চাট্টি-খানি কথা!

—যেকোন একটি পাত্র খুঁজে নিয়ে এস। অত সাতপাঁচ ভেবে কাজ নেই। ও যে কান্ড করেছে তাতে ওর পাত্র জোটাই ভাগ্যি।

—অত অসুবিধা হলে শেষ পর্যন্ত এই ভেংকটস্বামীর সংগেই ওর বিয়ে দেওয়া যাবে।

—না! আমি তা ভাবতেই পারি না। ওরা তো মেথর।

আমরা তেলি খৃষ্টান। ওরা মেথর খৃষ্টান। ওর সংগে আমার বিয়ে হলে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। আমার উপরে জোর করে অত্যাচার করার অধিকার তার আছে। কিন্তু আমাকে প্রকাশ্যে বিয়ে করার সামাজিক স্বীকৃতি নেই।

সবকিছু জানাজানি হওয়ার আগেই আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল বাবা-মা। ওদের চোখে ঘুম নেই। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করছে না। বাবার শরীর অর্ধেক হয়ে গেছে। ওদের দিকে তাকালে আমার বিশ্রী লাগে। আমার মত সবসময় ওদের মনে একই ভয়। কি জানি কখন ভেংকটস্বামী ক্ষেপে গিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয়। আশপাশের কারো নজরে পড়ে যাবে—এই ভয়ও কম নয়। আর, একবার ঢি ঢি পড়ে গেলে শত চেষ্টা করেও আমার বিয়ে দিতে পারবে না। বিয়ে না দিয়ে আমাকে রাখবে কোথায়। বয়স্থা মেয়ে যেন বাবা-মার গলার কাঁটা। এঁটো জিনিস দেবতার পাতে দেওয়া যায় না। একটি পুরুষ যে মেয়েকে এঁটো করে, সে মেয়েকে আর কেউ বিয়ে করে না। খুব জোর রক্ষিতা হিসেবে রেখে দয়া দেখাতে পারে। ওটা পুরুষের বেলায় দোষ নেই। মন যার উপরেই পড়ে থাক শরীরটা নিয়ে গিয়ে একটি মেয়েকে ঘরে তোলে। মেয়েদের বেলায়, যতই সে সুন্দরী, সরলা, ধৈর্য-শীলা, সর্বত্যাগিনী নির্দোষ হোক না কেন বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। সে মেয়ের জীবনে সর্বনাশের খাঁড়া নেবে আসে।

শেষ পর্যন্ত এক হাসপাতালের কম্পাউন্ডারকে পাওয়া গেল। লোকটার বয়স কম। তার প্রথম পক্ষের বউ মারা গেছে। ওর সংগে আমার বিয়ে হোল। বিয়ের পর আমার প্রতি তার কত টান। মনে হল আমাকে সে গভীরভাবে ভালবাসে। ও আমাকে যত বেশী ভালবাসতো আমি মনে তত বেশী ব্যথা পেতাম। প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছে করছিল অতীতের সব কথা ওকে জানিয়ে দিই। মাকে বললাম, ওকে সব জানিয়ে দেব। কথাটা শুনেই মা ভেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। ঘর থেকে দূর করে দেবে বলে ভয় দেখাল। ভেংকটস্বামী হয়ত মনে মনে গভীরভাবেই আমাকে ভালবাসত। আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় গোপনে হাউ-মাউ করে কেঁদেছিল। বিয়ের আগে আমাকে পরামর্শ দিয়ে-ছিল বিয়ের সময় উঠে যেতে। আমি উঠে গেলে সে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল। সেদিন ওর কথা শুনিনি বলে আজ নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে। সেদিন সত্যিই তার কথা রাখতে পারিনি। খুব ভয় পেয়েছিলাম—চার্চ আমাকে দূর করে দেবে—ফাদার ঘৃণা করবে, সমাজ থেকে বিতাড়িত হব।

বাবা-মার সেদিনের ওই ফিস্ ফিস্ কথার পর পনরদিনের মধ্যেই আমার বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর আমার বাপের বাড়ির লোক হিসেবে ভেংকটস্বামী মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখেশুনে যেত। আশ্চর্য পরিবর্তন! সব সময় দূরে দূরে থাকত। নির্বিকার-ভাবে বসে থাকত। ঘরে আমি একা থাকলেও কোন আজেবাজে কথা বলত না।

একদিন সে মদ খেয়ে এসে সমানে বকতে লাগল। বার বার বলল, তোমার বিয়ের পর তোমাকে ভোলার জন্যই আমি বেশী করে মদ খাচ্ছি।...তোমার স্বামীকে বাগে পেলেই রামধোলাই দিয়ে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব।

তারপর সে চলে গেল। কিন্তু সপ্তাখানের মধ্যে আবার এল। পীড়া-পীড়ি করতে লাগল টাকার জন্য। সেদিন মদ খেয়ে এসেছিল বলে আমি দুকথা শুনিয়েছিলাম। আমার স্বামীর কানে ওসব কথা গেলে যে কতবড় সর্বনাশ হত তাও জানিয়ে দিলাম। তারপর আমার দেওয়া টাকা হাতে নিয়ে 'আর কোনদিন এ পথ মাড়াব না' বলে চলে গেল।

কিন্তু তারপর থেকে তিনচারদিন অন্তর একবার এসে টাকা চাইত। ভয়ে হাতে যা থাকত তা দিয়ে দিতাম... আমার হাতে আর কানাকড়িও নেই। যখন তখন ওঁর কাছে নানাবায়নায় টাকা চাইতে লাগলাম। উনিও কিছুটা সন্দেহ পোষণ করতেন। কিছুদিন পরে ভেংকটস্বামী আমার গয়নাগাটি, থালা-বাসনও চাইতে লাগল। তার চালচলন, কথাবার্তা লক্ষ্য করে আমার শ্বশুর-বাড়ির কেউ কোনরকম সন্দেহ করেনি।
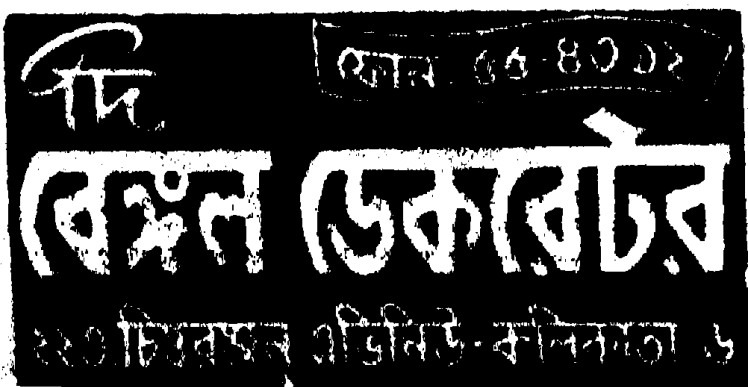
গায়ে দু'একটি গয়না না থাকায় উনি একদিন জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, হারিয়ে গেছে। উনি বিরক্ত হয়ে ভবিষ্যতে যাতে কোনকিছু না হারায় তারজন্য সাবধান করে দিলেন।
—জিনিসটা তো আমার, হারিয়ে গেছে বলে আমাকে অত বকছ কেন?

—তোমার? তোমার আবার কিসের! তুমি আর আমি কি আলাদা?

—কই, তোমার হাতঘড়ি হারিয়েছে বলে আমি তো কিছু বলিনি তোমায়!

—সেটা তো আমার। তুমি বলবার কে?

—এ-জিনিসগুলোও তো আমার, তুমি কেন বকছ?

—এইতো মস্তবড় একটা ভুল করে বসলে, তুমি আমার। তোমার সমস্ত জিনিসও আমার, বুঝলে?

এ-এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমার গয়না আমার নয়। আমার বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া গয়নাগাটিগুলোও আমার নয়!

এই ঘটনার তিনদিনের দিন আবার ভেংকটস্বামী এল। হাজার মাথাকুটে চাইলেও কানাকড়ি না দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। সন্ধ্যের সময় দেখি ও'র পিছনে পিছনে ভেংকটস্বামী আসছে। ধক করে উঠল আমার বুকটা। উনি তাকে ঘরের ভিতর আসতে বললেন। দরজায় খিল এটে আমার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, এই লোকটি মদ খেয়ে রাস্তার উপরে তোমার নাম করে চিৎকার করে যা-তা বলছিল। ওর কথা কি সত্য বলে মনে কর তুমি?

ভেংকটস্বামীর নেশা তখন ছুটে যাচ্ছে। লজ্জা পেয়ে আমার সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

—ওকেই জিজ্ঞেস কর।

—করেছি। এখন তোমার মুখেই শুনতে চাই।

—অল্প বয়সে...তখন কিছু বুঝতাম না।

—কিছু না বুঝেই কি আমাকে বিয়ে করেছো? তোমার পেটে এত কুটিলতা আছে বলে জানতাম না। তুমি এত নীচ! ছিঃ...

তারপর উনি নিজের দিদিকে ডেকে এনে একেবারে সভা বসিয়ে দিলেন। ভেংকটস্বামী এ-সব কথা আর কাউকে জানাবে না বলে শপথ করল। কিন্তু ওর কথায় উনি বিশ্বাস করেননি। মদ-খোরের কথায় কে বিশ্বাস করে। উনি ভাবলেন, হাটে হাঁড়ি ভাঙবেই। সমাজে মাথা উঁচু করে চলা যাবে না। অতএব আমাকে নিয়ে আর ঘর করা উচিত নয়।

তারপর একটা গাড়ী ডেকে আমার কিছু কাপড়চোপড়, জিনিসপত্র তাতে তুলে দিয়ে বিদেয় করে দিলেন। গাড়ী ছাড়ার সময় অবশ্য বললেন, কয়েকদিন কাটিয়ে এস। দিদি এখন খাপ্পা হয়ে আছে। তোমার জন্য বাড়িতে দারুণ অশান্তি শুরু হবে।

গাড়ীতে আমি একা। অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পর দেখি পিছনে পিছনে ভেংকটস্বামী আসছে।

—তুমি আসছ কেন?

—ওরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে যে। তোমার কাছে যে জিনিস-পত্রগুলো আছে ওগুলো একটা একটা করে বিক্রী করে আমাদের সংসার চালাব।

ওর সংগে ঘর করার অর্থ যে কী তা আমি হাতে হাতে বুঝি। তাই তার সংগে পথেই ঝগড়া করে তাকে দূর করে দিয়ে আবার আমার পথচলা শুরু হল। বাপের বাড়িতে পৌঁছালাম পরের দিন বিকেলে। ক্ষুধার জ্বালায় পেট চোঁ-চোঁ করছে। সবাই আমার দিকে কেমন যেন এক বিশ্রী ধরনের দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। মনে হল শ্বশুরবাড়ির ঘটনার খবর ইতিমধ্যে এখানে পৌঁছে গেছে। আমার ধারণা সত্য। ওরা ইতিমধ্যেই খবর পাঠিয়েছে যে, আমি ভেংকট-স্বামীর সংগে পালিয়েছি। বহু লোক জমে গেল। আমার সংগে সংগে ওরাও পেছনে পেছনে আসছে। চীৎকার করে টিটকারী মারছে। ঘরে ঢোকার সংগে সংগে দড়াম করে মা দরজা বন্ধ করে দিল।

ফাদারের সংগে কথাবলার অনুমতি পাইনি, সমাজের চাপে বাপের বাড়িতেও আমার স্থান হল না। চার্চেও আমার ঢোকা নিষেধ।

ভেংকটস্বামী এগিয়ে এল। একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে আমাকে সেই ঘরে রাখল। তার ওটুকু সাহায্য নিয়ে কি আমি ভুল করেছি! কিন্তু গাঁয়ের লোক মনে করল যে, তাদের সন্দেহই সত্য। তারপর আর কেউ আমাকে কোন-রকমে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল না। আমার ছায়া মাড়াত না কেউ। আমাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নিত।

ভেংকটস্বামী আরও বেশী করে মদ খেতে লাগল। এই ঘরে উঠার পর থেকে ও কোনদিন এঘরে ঢোকেনি। আমার এই ঘরের বারান্দায় কুকুরের মত মুখ গুঁজে হাত-পা গুটিয়ে পড়ে থাকত। মাঝে মাঝে নেশার ঘোরে আমাকে এভাবে পথে বসিয়েছে বলে অনুতপ্ত হত। বিড় বিড় করে অশ্লীল গালাগাল দিয়ে নিজেকে বকত। হা-হা করে কেঁদে উঠত। হয়ত সে আমাকে গভীরভাবেই ভালবাসত। তাই অনুতাপের তুষানলে জ্বলেপুড়ে মরছে।

আজকাল আমার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ আমার সংগে কথা বলে না। আমার ধারে কাছেও ঘেঁষে না। যীশুখৃষ্টের কাছেও প্রার্থনা করার জন্য আমার চার্চে ঢোকা নিষেধ।

যীশু নাকি ছোটখাট পাপকাজ ক্ষমা করেন। আমার মত বড় ধরনের পাপীর ক্ষমা নেই। কিছু পাপের নাকি অনুতাপ করলেই ক্ষালন হয়। কিন্তু আমার পাপ অনুতাপ-অনুশোচনায় ক্ষালন হওয়ার নয়। আর, আমিই বা অনুতাপ করব কেন? যা ঘটেছে তার জন্য আমি কতটুকু দায়ী!

আমদের গ্রামে খুব নামকরা একজন বিচারক থাকেন। নিজের বিয়েকরা বউকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একটিকে নিয়ে ঘর করেন। প্রায় হেসে বলেন, ন্যায়-নীতি-বউ এ-সব কিছু নয়। সব বোগাস! পুরোহিতমশাই মাসের খুব অল্পদিনই ঘরে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতে যে লোকটা পুরোহিতের বউয়ের সংগে হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি করে—তাদের কথা বলার মত বুকের পাটা কারোই নেই। কিন্তু আমার কথা আলাদা।

স্বামীর সংগে যারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর করছে, আমার ঘটনা শুনে যাদের মন আমার প্রতি ঘৃণায় গুলিয়ে উঠছে,—তাদের কাছে আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন, বলুন আমার কি দোষ। আমার অবস্থায় পড়লে আপনারা কি করতেন?
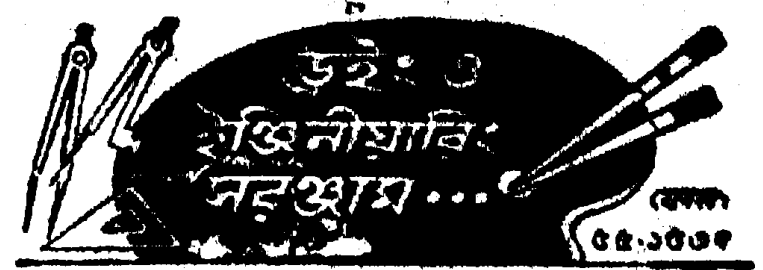
বালি ও রাবণ—বালিবিজয়ম্

ভারতের নৃত্যকলা

॥ কথাকলি ॥

ভারতের নৃত্যগুলির মধ্যে কথাকলি নানাদিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। প্রথম দৃষ্টিতে যা চোখে পড়ে, সে হল এর রূপসজ্জা। তাছাড়া বেশভূষা, নৃত্য-ভঙ্গিমা এবং নাট্য রূপায়নের ক্ষমতার দিক দিয়েও 'কথাকলি' অনন্য। ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত কেরালা রাজ্যেই এই নৃত্যকলার জন্মস্থান। নবম শতাব্দী থেকে এর উদ্ভব ঘটলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব এসে পৌঁছানোর পর পঞ্চদশ শতাব্দীতেই এর বিশেষ প্রসার ঘটে। বৈষ্ণব প্রভাব এবং তারপরে রামায়ণের বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক গীতি-পালা রচিত হ'য়েছে 'কথাকলি' নৃত্যের সাহিত্যে। কথাকলির প্রাণ হল তাই সঙ্গীত এবং ছন্দোময় নৃত্যের সুপ্রয়োগ।

দুঃশাসন—[illegible]

ভীম—দুর্যোধনবধম্

ভীম ও দুঃশাসন—দুর্যোধনবধম্

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

কোয়েলাকান্থ্

১৯৩৮ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে আফ্রিকার সমুদ্র থেকে কিভাবে পাঁচটি কোয়েলাকান্থ্ পাওয়া গিয়েছিল সেই কাহিনী গত সংখ্যায় বলেছি। কিন্তু কোয়েলাকান্থ্ নিয়ে কেন এত হৈ-চৈ হয়েছিল তা বুঝতে হলে বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মাছটিকে চিনে নেওয়া দরকার।

মাছ বলছি বটে কিন্তু ছবির দিকে ভালো করে তাকালে বোঝা যাবে, সাধারণ মাছের সঙ্গে এই মাছটির অনেক তফাৎ। মাছের পাখনাগুলোর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। পিঠের দিকে প্রথম পাখনাটি বাদ দিলে অন্য সমস্ত পাখনা সাধারণ মাছের মতো একেবারেই নয়। সাধারণ মাছের পাখনাতে থাকে পর্দা দিয়ে আটকানো সারি সারি কাঁটা আর এই কাঁটাগুলো সরাসরি মাছের শরীরের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে। ছবির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, সাধারণ মাছের মতো পাখনা এই মাছটিতে মাত্র একটিই আছে—তা পিঠের দিকে প্রথম পাখনাটি। অন্য সমস্ত পাখনার বেলায় দেখা যাবে, মাছের শরীর থেকে প্রথমে বেরিয়ে এসেছে এক ঢিবি মাংস আর মাংসের ঢিবি থেকে বেরিয়েছে কতকগুলো কাঁটা। এমনি ধরনের ঢিবি-পাখনাওলা মাছ হাজার চেষ্টা করলেও বাজারের সাধারণ মাছের মধ্যে একটিও পাওয়া যাবে না। বাজারে মাঝে মাঝে অদ্ভুত চেহারার সমুদ্রের মাছ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চেহারা যতোই অদ্ভুত হোক, এমনি ধরনের ঢিবি-পাখনা কারও নেই। এ তো গেল বাইরে থেকে দেখা।
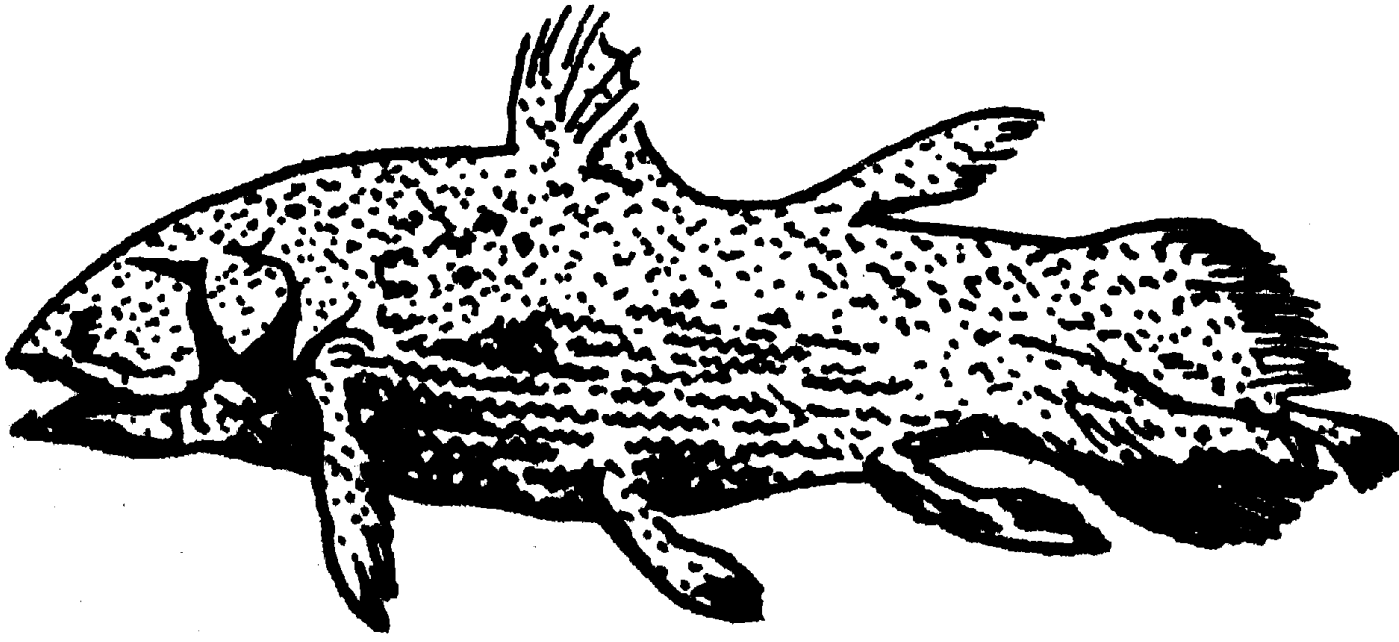
এই ঢিবি-পাখনাকে কাটাকুটি করেও বড় অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে। মানুষের হাতের মতো এই ঢিবি-পাখনাতেও তিনটি হাড় (হিউমারাস, রেডিয়াস, আলনা)। তাছাড়াও আছে কতকগুলো ছোট ছোট চ্যাপ্টা হাড় যেগুলোকে মানুষের কব্জির সঙ্গে তুলনা করা চলে।

তার মানে, কোয়েলাকান্থ্-এর পাখনা সাধারণ মাছের পাখনার মতো পল্‌কা নয়। জলের মধ্যে শুধুমাত্র শরীরের ব্যালান্স রাখার জন্যে এমন শক্তসমর্থ হাড়গোড়ওলা পাখনার দরকার ছিল না। কোয়েলাকান্থ্-এর পাখনা পুরোপুরি পাখনা নয়, অনেকখানি পা-ও। এই পাখনা-পায়ের সাহায্যে কোয়েলাকান্থ্-এর পক্ষে মাটিতে হামা গুড়ি দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। সাধারণ মাছের পল্‌কা পাখনা এ-কাজের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত।

কোয়েলাকান্থ

ডাঙ্গায় ফুসফুস—জলে ফুলকো

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোয়েলাকান্থ্ চেষ্টা করলে পাখনা-পা দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে ডাঙ্গায় উঠে আসতে পারে। কিন্তু তারপরে? ডাঙ্গায় উঠে এলে কি কোয়েলাকান্থ্কে অন্যান্য সাধারণ মাছের মতো খাবি খেতে হবে না? এখানেই কোয়েলাকান্থ্-এর অপর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা ওঠে।

কোয়েলাকান্থ্-এর মুখটাকে হাঁ করিয়ে মুখের ভেতরটা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এই মাছের নাকের ফুটো-দুটোর সঙ্গে তার গলার সরাসরি যোগ আছে। বাইরে থেকে দেখলে নাকের ফুটো সাধারণ মাছেরও আছে— কিন্তু সাধারণ মাছের বেলায় নাকের ফুটো গলা পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এদিক থেকে কোয়েলাকান্থ্-এর সঙ্গে ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের খুবই মিল। ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীব নাক দিয়ে দুটি কাজ করে— ঘ্রাণ নেওয়া ও নিশ্বাস নেওয়া। নাক দিয়ে নিশ্বাস নেওয়াটা তখনই সম্ভব হয় যখন নাকের ফুটোর সঙ্গে গলার শ্বাসনালীর সরাসরি যোগ থাকে এবং শ্বাসনালী শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় ফুসফুসে। সাধারণ মাছ নাকের ফুটো দিয়ে শুধু ঘ্রাণই নিতে পারে শ্বাস নিতে পারে না। সাধারণ মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা চলে ফুলকোর সাহায্যে। জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় অক্‌সিজেন থাকে। মাছের ফুল্‌কো এই অক্‌সিজেনকে টেনে নিতে পারে। কিন্তু কোয়েলাকান্থ্-এর বেলায় দেখা যাচ্ছে, এই জীবটির সাধারণ মাছের মতো ফুলকোও আছে, আবার ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের মতো গলা পর্যন্ত প্রসারিত নাকের ফুটোও আছে। তার মানে, কোয়েলাকান্থ্-এর পক্ষে মুখ বন্ধ করেও শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া সম্ভব। আর ডাঙ্গায় নিশ্বাস নিতে হলে শুধু নাকের ফুটো থাকাই যথেষ্ট নয়, ফুসফুসও থাকা দরকার। কোয়েলাকান্থের বেলায় আমরা ধরে নিতে পারি যে তার পট্‌কা দুটিই ফুসফুস হয়ে উঠেছে।

এবারে বোধ হয় বোঝা যাচ্ছে কেন কোয়েলাকান্থ্ নিয়ে এত হৈচৈ হয়েছিল। জীবজগতের বিবর্তনে এটি এমন এক সময়ের নিদর্শন যখন জলের জীব ডাঙ্গায় উঠে আসবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কোয়েলাকান্থ্ মাছ বটে কিন্তু সাধারণ পাখনাওলা মাছ নয়। কোয়েলাকান্থের ঢিবি-পাখনাকে যদিও ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের পায়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে কিন্তু ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোয়েলাকান্থের নেই। আবার কোয়েলাকান্থ্ মাছের মতো জলেও শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে, ডাঙ্গায় মেরুদণ্ডী জীবের মতো ডাঙ্গাতেও শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে। অর্থাৎ কোয়েলাকান্থ্কে বলা চলে উভচর জীব।

কোয়েলাকান্থ্ সম্পর্কে আরো একটি লক্ষ্য করার বিষয় আছে। তা

হচ্ছে এর লেজ। ছবির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, এই মাছের লেজটি যে ঠিক কোথায় শুরু তা বলা শক্ত। সাধারণ মাছের মতো এই মাছের লেজটি শরীর থেকে পৃথক হয়নি। ফলে মাছের মূল শরীরটারই তলার দিকের খানিকটা অংশকে বাধ্য হয়ে আমাদের লেজ বলতে হচ্ছে। এই লেজ থেকেই মাছটির প্রাচীনত্ব টের পাওয়া যায়। এই প্রাথমিক ধরনের লেজবিশিষ্ট জীবটি কখনোই অর্বাচীন হতে পারে না।

জল থেকে ডাঙগায়

এবারে আমাদের সময়ের দিক থেকে ৩২ কোটি বছর পিছিয়ে যেতে হবে। পুরাজীবীয় যুগের ডেভোনিয়ান উপযুগ শুরু হয়েছে। পৃথিবীর ভৌগোলিক চেহারা মোটেই এখনকার মতো নয়। উত্তর আমেরিকা, আট্‌লান্টিক ও উত্তর ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে প্রকাণ্ড এক মহাদেশ। ট্রপিক অঞ্চলের মতো আবহাওয়া। কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি। আর এই মহাদেশটিকে দক্ষিণ দিকে ঘিরে রয়েছে যে সমুদ্র সেই সমুদ্রে নানা অদ্ভুত ধরনের মাছের বাস। এই মাছের দঙ্গলের মধ্যে একটি মাছ আমাদের চেনা। তা হচ্ছে কোয়েলাকান্‌থ্‌।

কিন্তু ডাঙগার দিকে তাকালে আমরা দেখব, উদ্ভিদ বলতে শুধু রয়েছে ছোটখাটো ঝোপঝাড় আর প্রাণী বলতে কয়েক জাতীয় পোকামাকড় ও বিছে-জাতীয় জীব। অর্থাৎ, ডাঙগার জীবন সবেমাত্র শুরু হয়েছে বলা চলে। কিন্তু ডাঙগার জীবনের এতখানি প্রসার হয়নি যে আমরা বলতে পারি জীবজগৎ ডাঙগাকে বা মহাদেশকে জয় করেছে। জীবজগতের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারব, মহাদেশকে সত্যিকারের জয় করতে পেরেছে মেরুদন্ডী জীবরা। পোকামাকড় বা বিছে-জাতীয় জীবের পক্ষে মহাদেশকে জয় করা একেবারেই অসম্ভব। মেরুদন্ডী জীবরাই ডাঙগায় বাস করতে শুরু করার পরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। গোটা পৃথিবীটাই হয়ে উঠেছিল তাদের বাসস্থান। এবং মানুষ আসবার অনেক আগেই মেরুদন্ডী জীবরা মহাদেশ-বিজয় সম্পূর্ণ করেছিল।

কিন্তু ৩২ কোটি বছর আগে ডেভোনিয়ান উপযুগের শুরুতে এসে দেখা যাচ্ছে, মেরুদণ্ডী জীবরা তখনো জলেই বাস করে। সমুদ্রের জলে তো বটেই, এমন কি মহাদেশের অভ্যন্তরের নানা জলাধারেও। আগেই বলেছি, মহাদেশের আবহাওয়াটা ছিল ট্রপিক। কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি। সহজেই অনুমান করা চলে, অনাবৃষ্টির সময়ে মহাদেশের অভ্যন্তরের জলাধারগুলি শুকিয়ে যেত—গোটা মহাদেশটি হয়ে উঠত প্রায় মরুভূমির মতো। এই অবস্থায় শুধু সেইসব জীবই টিকে থাকতে পারত, ডাঙগার জীবন যাদের শরীরের গড়নের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল না। আমরা আগেই আলোচনা করেছি কোয়েলাকান্‌থ্‌ এমনি ধরনের একটি উভচর জীব।

আর সেই সময়ে কোয়েলাকান্‌থ্‌-ধরনের আরো একটি মাছ ছিল যার নাম রিপিডিস্‌টিয়া (Rhipidistia)। ঠিক তেমনি ঢিবি-পাখনা, তেমনি নাকের ফুটো যার সাহায্যে ডাঙগাতেও নিশ্বাস নেওয়া চলে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, এই রিপিডিস্‌টিয়া জাতের মাছ থেকেই ডাঙগার মেরুদন্ডী জীবদের সূত্রপাত।

অবশ্যই ব্যাপারটা রাতারাতি ঘটেনি। পুরোপুরি ডাঙগার জীবের আবির্ভাব হতে আরো কয়েক কোটি বছর সময় লেগেছিল। আজ থেকে ২৮ কোটি বছর আগে যখন ডেভোনিয়ান উপযুগ শেষ হয়ে কার্বনিফেরাস উপযুগ শুরু হচ্ছিল তখনো উভচর জীবদেরই আধিপত্য চলেছে। তবে এরা নামেই উভচর, অধিকাংশ সময়ে জলেই বাস করে। এদের যদিও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজিয়েছে কিন্তু তা এতই দুর্বল যে ডাঙগায় বাস করার উপযুক্ত নয়। কিন্তু আরো ছ-কোটি বছর পরে পার্মিয়ান উপযুগে এসে দেখা যাচ্ছে, উভচর জীবরা অধিকাংশ সময়ে ডাঙগাতেই বাস করে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গও যথেষ্ট সবল।

যাই হোক, আমরা গোড়ার আলোচনায় ফিরে আসি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোয়েলাকান্‌থ্‌ যদিও নিদর্শন হিসেবে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু কোয়েলাকান্‌থ্‌ জীবজগতের বিবর্তনের কোনো একটা সরাসরি ধাপ নয়। কোয়েলাকান্‌থ্‌ সম্পর্কে আমরা শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব যে জীবজগতের বিবর্তনে কোনো এক সময়ে এমনি ধরনের জীবের আবির্ভাব হয়েছিল। অর্থাৎ কোয়েলাকান্‌থ্‌কে যদি মানুষের পূর্বপুরুষ বলতেই হয় তবে তা নিতান্তই জ্ঞাতি-সম্পর্কে। কোয়েলাকান্‌থ্‌ যদি সত্যিই জীবজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে সরাসরি একটি ধাপ হত তাহলে এই ১৯৩৮ সালে এই জীবটিকে কখনোই আফ্রিকার সমুদ্রে জীবন্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যেত না।

যেমন আজকের দিনে হিমালয়ের যে তুষার-মানবের কথা বলা হচ্ছে, তাকে যদি সত্যিই খুঁজে পাওয়া যায় আর সত্যই দেখা যায় যে সে যতটা না বন-মানুষ তার চেয়ে বেশি মানুষ—তাহলেও এ-কথা কিছুতেই বলা চলবে না যে, এই তুষার-মানবটি মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষ। এক্ষেত্রেও নিতান্তই জ্ঞাতি-সম্পর্ক। সরাসরি সম্পর্ক থাকলে আজকের দিনে আর এই তুষার-মানবটির কোনো অস্তিত্ব থাকত না। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, স্যার এডমন্ড হিলারী সম্প্রতি হিমালয় থেকে নেমে এসে ঘোষণা করেছেন যে তুষার-মানবের কোনো অস্তিত্ব নেই। তার মানে, এদিক থেকে বিচার করলে বলা চলে, স্যার হিলারী তুষার-মানবকে জাতে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন।

কথাটি যদি স্পষ্ট না হয়ে থাকে সেজন্যে আবার বলছি। বিবর্তনের প্রক্রিয়া কোয়েলাকান্‌থ্‌ পর্যন্ত এসে থেমে যায়নি। অথচ এত কোটি বছর পরে কোয়েলাকান্‌থ্‌ সেই কোয়েলাকান্‌থ্‌-ই রয়ে গেল। তার মানে আমরা বলতে পারি, কোয়েলাকান্‌থ্‌ হচ্ছে বিবর্তনের প্রক্রিয়ার একটি অ-সফল প্রচেষ্টা। বা বিবর্তনের মূল সড়ক থেকে বেরিয়ে আসা একটি অন্ধ গলি। কাজেই কোয়েলাকান্‌থের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সরাসরি একটি ধাপ হিসেবে নয়, বিবর্তনের বিশেষ একটি ধাপের সমকালীন নিদর্শন হিসেবে।

* * *

ভারত মহাসাগরের সার্ভে

য়ুনেস্কো থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভারত মহাসাগরের সার্ভে করার যে-পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে

তাতে এখনো পর্যন্ত বাইশটি দেশ যোগ দিয়েছেন। এই বাইশটি দেশের সাহায্যে ও সহযোগিতায় ভারত মহাসাগর সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হবে।

এই সমীক্ষা-কার্যে জাহাজ পাওয়া গিয়েছে ৪৫টি। ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে এই সমীক্ষা-কার্য চূড়ান্ত পর্যায় পেঁছিবে। যেসব বিষয়ে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে তা হচ্ছে—সমুদ্রের ঢেউ, রাসায়নিক পদার্থ, সামুদ্রিক জীব, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্র-তলদেশের পর্বতমালা। য়ুনেস্কো ও বৈজ্ঞানিক ইউনিয়নসমূহের আন্তর্জাতিক পরিষদ এই সমীক্ষা-কার্য পরিচালনা করবেন।

ভারত মহাসাগর সম্পর্কে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের আগ্রহ খুবই বেশি। তার কারণ, আজ পর্যন্ত ভারত মহাসাগর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য খুবই কম আবিষ্কৃত হয়েছে। আর, তাছাড়া, ভারত মহাসাগরের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোনো মহাসাগরের নেই।

ভারত মহাসাগর সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে বছরে দু-বার এই মহাসাগরের বায়ুপ্রবাহে পরিবর্তন ঘটে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ও শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। অর্থাৎ প্রতি ছ-মাসে একবার করে বাতাসের গতিমুখ পালটে যাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্রের ঢেউয়ের গতিমুখও পালটে যায় আর তার ধাক্কা গিয়ে পেঁছিয় সমুদ্রের জীব-জগতেও। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অথচ এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে তেমন কোনো গবেষণাই হয়নি।

এখনো পর্যন্ত যেটুকু গবেষণা হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে এই মহাসাগরে এমন প্রচুর সম্পদ-ভাণ্ডার রয়েছে যা এখনো পর্যন্ত কোনো কাজেই লাগানো হয়নি। বিশেষ করে, এই মহাসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এই সমীক্ষা-কার্যের ফলে ভারত মহাসাগরের তলদেশের ভূ-সংস্থানের একটি মানচিত্রও প্রস্তুত করা হবে।

ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, চীন, ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদি বাইশটি দেশের সহযোগিতায় এই সমীক্ষা-কার্য চলবে।

ভ্রম-সংশোধন

রাউরকেলা থেকে শ্রীআলোক চৌধুরী একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি এই :

"চতুর্থ সংখ্যা 'অমৃতের' (২রা জুন) "বিজ্ঞানের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে 'এই প্রথম ভারতের মাটি থেকে ডাইনোসরের ফসিল' আবিষ্কারের কথা পড়ে আশ্চর্য হলাম। ডক্টর পামেলা রবিনসন পরিচালিত অভিযানের ডাইনোসর-জীবাশ্ম আবিষ্কার অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু ডাইনোসর আবিষ্কার ভারতের মাটিতে এই 'প্রথম' নয়। জবলপুরে এবং মধ্যপ্রদেশে ওয়ারোরোর ৮ মাইল উত্তরে পিসদুরাতে ল্যামেণ্টাস্তরে ডাইনোসর-জীবাশ্ম এর আগে পাওয়া গিয়েছে। ফন হয়েন ও মেট্‌লীর মতে, এগুলি টুরোনিয়ান অর্থাৎ মধ্য ক্রিটোসিয়াস উপযুগের এবং এগুলির সাথে ম্যাডাগাস্কার, ব্রাজিল এবং প্যাটাগোনিয়ায় প্রাপ্ত টুরোনিয়ান ডাইনোসরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এগুলিও ছোট ছোট টুকরো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এখানে প্রাপ্ত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ডাইনোসর হল—টিটানোসরাস ইণ্ডিকাস, ল্যামেটোসরাস ইণ্ডিকাস ও লেপ্‌লোটাসরাস ম্যাডাগাস্কারিয়েনসিস। Palaeontologica Indica (New Series) Vol. 21, pt. one-এ এবং G. S. I. প্রতিষ্ঠানের ৫৩নং রেকর্ডে এই ফসিলগুলির বিস্তৃত বিবরণী আছে। ভারতীয় ভূস্তরবিদ্যার যে কোন পাঠ্যপুস্তকেও এগুলির উল্লেখ আছে।

আরেকটি কথা। বর্তমানে, নবজীবীয় যুগের ছ'টি ভাগ ধরা হয়, পাঁচটি নয়। প্যালিওসিনকে আগে ইওসিনের প্রাচীনতম অধ্যায় বলে ধরা হত, কিন্তু বর্তমানে এটিকে একটি স্বতন্ত্র উপযুগ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।"

এই ভ্রম-সংশোধনের জন্যে শ্রীআলোক চৌধুরীকে অশেষ ধন্যবাদ।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

যান্ত্রিক মনুষ্য হাউই

সম্প্রতি আমেরিকায় একটি অদ্ভুত নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে—এর নাম মনুষ্য হাউই (man rocket)। এই যন্ত্রটি ওজনে ১০০ পাউণ্ড—পিঠের ওপর বেল্ট দিয়ে বাঁধা থাকে এবং এর মধ্যে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ভরা থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সৈন্যরা অনায়াসে নদী, সমুদ্রতীর ইত্যাদি ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে ২০ ফিট পর্যন্ত উঁচুতে উঠে লাফাতে লাফাতে উড়ে অতিক্রম করতে পারে। যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য, গতি পরিবর্তনের জন্য এবং ওঠবার ও নামবার জন্য সবরকম কলকব্জার ব্যবস্থা আছে। এই যান্ত্রিক হাউয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। নিখুঁত অবস্থায় এলে এই যন্ত্রের উপকারিতা পূর্ণমাত্রায় বুঝতে পারা যাবে।

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধকুমার সান্যাল

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— এগার —

কুকুরটা নিশ্চিন্ত হয়ে চালাঘরের দাওয়ায় গিয়ে শান্ত হয়ে বসল। ওটা যেন কোন্ গ্রামের কুকুর, এখানে এসে সহজে জায়গা পেয়ে গেছে। আহার ও বাসস্থানের বিনিময়ে হেনার ঘরে পাহারা দেয়।

হেনার চালাঘরটি বেশ পছন্দসই। এটি সে নিজেই তৈরি করিয়েছে লোক-জন লাগিয়ে। মাটির মোটা দেওয়াল রং করা, উপরটা পাতা ছাওয়া। দুটি দরজা এবং চারটি জানলা—সবগুলিই কাঁচা কাঠের। ঘরের মেঝে মাটিলেপা। একটিমাত্র ঘর বলেই ঘরটি বেশ বড়। বৃহৎ একখানা চৌকি, তারই উপর কয়েকখানা চাটাই পাতা। সেখানে বই কাগজ ফাইল মিলিয়ে কতকগুলি ইংরেজি সাময়িক পত্র, লেখাপড়ার সরঞ্জাম এবং একটি টিনের বাক্স অগো-ছাল অবস্থায় রয়েছে। রান্নাবান্নার ব্যাপারটা একেবারেই সামান্য—বাইরে কাঠের একটি উনুন। বাসনপত্র অধি-কাংশই কাঁচ, এলুমিনিয়ম ও কলাই। লোহার তাওয়া এবং চিমটে বাদ নেই। কেরোসিনের একটা স্টোভ রয়েছে এক কোণে। নেয়ারের একখানা চারপাইয়ের উপর যেমন-তেমন একটা বিছানা পাতা!

ঘরের মধ্যে এনে বড় চৌকির উপর আমাকে বসিয়ে মধুর হাসি হেসে হেনা বলল, চাঁদমুখখানি দেখে মনে হচ্ছে পেটে কিছু পড়েনি! মেজাজও তিরিক্কে! দাঁড়াও, একটু আগে দুধ ফুটিয়েছি। ভুট্টার খই, আখের গুড় আর দুধ,—বেশ চমৎকার খাওয়া!

সহাস্যে বললুম, বললেই যদি তবে শিগগির দাও।

এক মিনিটের মধ্যে হেনা আমাকে খেতে দিল। ভোজ্যবস্তু অতি উপাদেয়।

খেতে খেতে বললুম, তোমার সাজ-সজ্জাটা কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি! শালো-য়ার আর পাঞ্জাবির সঙ্গে একখানা উড়ুনি থাকে, তোমার উড়ুনি কই?

বেরোবার সময় উড়ুনি চড়িয়ে যাই।—হেনা জবাব দিল।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার ছমছমে অন্ধকার জমেছে। আলো জ্বালার দরকার ছিল। ঘরে আছে তিন চার রকমের আলো। তেলের প্রদীপ, মোমবাতি, হারিকেন লণ্ঠন, এবং পেট্রোমাক্স। আমি বললুম, পেট্রোমাক্স জ্বাললে তোমাকে দেখে চোখ ঝলসাতে পারে, ওটা থাক্। দাওয়ায় রাখ হারিকেন, ভেতরে তেলের প্রদীপ জ্বালো!

হেনার মুখে চোখে যে-আনন্দটা দেখা যাচ্ছে, সেটার তাৎপর্য কিন্তু আমার পক্ষে বুঝতে পারা কঠিন। শুধু বললুম, আমার বহু নালিশ আছে তোমার বিরুদ্ধে হেনা, একে একে সব বলব, আর তুমি একে একে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে!

তেলের আলোটা ও হারিকেন এক-সঙ্গে জ্বালতে-জ্বালতে হেনা হাসল। বলল, বেশ, ভাল কথা। আগে খেয়ে-দেয়ে ঠান্ডা হও। পায়ে পড়ে সমস্ত রাত ধ'রে ক্ষমা চাইব, তা হলে হবে ত?

একটু অবাক হলুম। বললুম, কিন্তু আমি যে বলে এলুম গেস্ট-হাউসে গিয়ে রাত্রে থাকব?

বেশ, তাই থেকো। সেখানে গিয়েই মাথা ঠুকে কেঁদে আসব?—হারিকেনটা নিয়ে হেনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার আলোটা দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হল। প্রদীপের আলোয় চারি-দিকে চেয়ে হেনার এই নিভৃত বসবাসের চেহারাটা বেশ ভালই লাগছিল।

আমি আমার জলযোগ শেষ ক'রে উঠে মাটির কলসী থেকে জল নিয়ে পাত্রটা ধুয়ে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখলুম। চৌকির জিনিসপত্রগুলি গোছালুম। হেনার বিছানাটা ঝেড়ে-ঝুড়ে পাতলুম। এমনি সময় বাইরে তার গলার আওয়াজের সঙ্গে হারি-কেনের আলোটা দেখতে পেলুম। হেনা এসে দাওয়ায় উঠল, এবং একটি হিন্দু-স্থানী বৌ এক গাগরা জল এনে রাখল। প্রৌঢ়া বৌটি আমাকে সবিনয়ে অভি-বাদন জানিয়ে কাঠের উনুনটায় ফুঁ দিতে বসে গেল। কুকুরটা কয়েক হাত দূরে স'রে গিয়ে বসল। একটি ছোট টুকরিতে হেনা এনেছে আলু, ডিম ও ছোট একটি লাউ।

আমি গায়ের কোট এবং পায়ের জুতো-মোজা খুলছি দেখে হেনা ঘরে এল এবং টিনের বাক্সটি খুলে সে যখন একটি ঢিলা পায়জামা ও একখানি ধুতি বার করল, আমি সবিস্ময়ে বললুম, ধুতি পেলে কোত্থেকে?

হেনা বলল, এখানে আসবার আগে তোমার বাক্স থেকে এ দুটি তোমার বোনের চোখে ধুলো দিয়ে এনেছিলুম। জানি একদিন তোমারই কাজে লাগবে। তোমার পাঞ্জাবি আর গেঞ্জিও আছে আমার বাক্সে!

উনুনটা ধরিয়ে মসলা পিষে দিয়ে বৌটি তখনকার মতো চ'লে যাবার পর ধুতিখানা কোমরে জড়িয়ে আমিও হেনার সঙ্গে রান্নার কাজে লেগে গেলুম। হেনা তার প্রথম কাজটি ভুলল না। সর্বাগ্রে এক পেয়ালা চা আমার জন্য বানিয়ে দিল। আমি যখন দাওয়ার ধারে হারিকেন ও কুকুরটির মাঝখানে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বেশ জমিয়ে বসলুম, হেনা তখন ঘরে গিয়ে শালোয়ার ছেড়ে এক-খানা শাদামাটা শাড়ি পরল এবং তার দীর্ঘ দোলায়মান বেণীটি খুলে এলো-

খোঁপা ঘুরিয়ে বেঁধে এল। আমার চোখ দুটো যেন বাঁচল এতক্ষণে। বাইরে এসে আমার পাশে ব'সে হেনা নিজেই বলল, পাঞ্জাবী পোষাকটা এখানে বেশি কাজে লাগে। হাঁটাচলার সুবিধে হয়, পরিচয়টাও ঢাকা পড়ে। এখানে পাঞ্জাবী মেয়ে-পুরুষ বেশি।

তুমি এখানে কি কর?—জিজ্ঞাসা করলুম।

আমি কাজের হিসেব নিই। অংকগুলো মিলিয়ে দেখি। নতুন কাজের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করি। তা ছাড়া পড়াতে হয়, গ্রামে গ্রামে লোক ডেকে নানা কথা বোঝাতে হয়। কারিগরি কাজ শেখাই। স্বাস্থ্যরক্ষার কথা বলি।—তোতাপাখি যেন সব মুখস্থ বলে গেল।

হেনার সব কথা শুনলুম। পরে বললুম, ঘরের খেয়ে এত দূরে বনের মোষ তাড়াতে এলে কেন? চাকরি করবে অথচ মাইনে নেবে না এই বা কেমন?

হাসিমুখে হেনা বলল, যেদিন জানব এটা চাকরি, সেইদিনই সব ফেলে পালাব—এ কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রেখেছি। আর মাইনে? একমনে কাজ করব বলেই ত' মাইনের কথা ভাবিনে! তুমি যদি কালকের দিনটা থাক, তোমাকে ঘুরিয়ে সব দেখাব।

প্রশ্ন করলুম, তুমি নিজের খরচে ঘর বানাতে গেলে কেন? এখানে কি তোমার থাকবার জায়গা ছিল না?

হেনা বলল, ছিল, তবে স্বাধীনতা ছিল না। পরের রুচিতে থাকা আর খাওয়া, ওঠা আর বসা,—সে সইবে না! আমি নিয়মনীতির দাসত্ব করতে আসিনি, পার্থ। বাধ্যবাধকতা আমার কিচ্ছু নেই।

আমি চুপ ক'রে গেলুম। এক সময় হঠাৎ হেসে হেনা বলল, তুমি এলে একেবারে হাকিম সাহেব! আসামীকে যেন কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছ! এত দূরে এলুম, সেত' দূরেরই টান! যেখানে খুশি যাব, যেমন খুশি থাকব। দেশটাই ত আমার!

চায়ের পেয়ালাটা মুখ থেকে নামিয়ে বললুম, এসব কথা শুনতে ভাল। কিন্তু আত্মীয়-বন্ধু পরিচয় সব ছেড়ে এখানে থাকবেই বা কেমন করে?

হেনা আবার হাসল। বলল, এটি তোমার ঘরকুনো মনোবৃত্তি, পার্থ। ওই যে বৌটি এসেছিল, ওর নাম দেওকী।—এতদিন ধরে দেখছি ওকে। ওর চেয়ে আপন ত' কেউ নেই আমার! অল্পে তুষ্ট, সহজে কৃতার্থ, আনন্দের নিঃস্বার্থ সংগী, অসময়ের বন্ধু। ওরা কি আমার পরম আত্মীয় নয়?

ওরা নিশ্চয় জানে টাকা কড়ি তোমার প্রচুর আছে?

ছি ছি, কী নোংরা তোমার মুখ, পার্থ?—হেনা আমার দিকে তার বাঁকা বৃহৎ চক্ষুতারকা ফেরাল। পুনরায় বলল, ওরা জানে কিচ্ছু আমার নেই, আমার সব শূন্য। আমার কিছু থাকলে ওরা দূরে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে সেলাম ঠুকত, কিছু নেই বলেই কাছে এসে বসে। তবে হ্যাঁ, তোমার কথাটা ওরা জানে

প্রশ্ন করলুম, কতটুকু জানে?

কলকণ্ঠে হেনা হেসে উঠল।—যতটুকু আমি নিজে জানি!

হাসি চেপে আমি বললুম, ওরা কি জানে খেয়েদেয়ে আমি গেষ্ট-হাউসে রাতটা কাটাতে যাব?

ছুরি দিয়ে হেনা আলু কাটছিল। হঠাৎ সেখানা রেখে সে ঘুরে আমার মুখোমুখি বসল। তারপর সোজা আমার চোখের উপরে তার দুই চোখ রেখে স্পষ্টকণ্ঠে বলল, ওরা শুধু এইটুকু জানে না যে, প্রায় এক বছর থেকে তোমার আন্তরিক ঘৃণা আর গভীর অশ্রদ্ধা বয়ে বেড়াচ্ছি; ওরা একথা জানে না মেয়েমানুষের একটি দিনের দুর্বলতাকে এ জীবনেও তুমি ক্ষমা করতে পারবে না; ওরা জানে না এক অসচ্চরিত্র লম্পটের কদর্য লালসার কাছে তুমি তোমার চিরদিনের বন্ধুকে বলি দিতে চেয়েছিলে! ওরা শুধু সরল বিশ্বাসে এইটুকু জানে, নেয়ারের ওই চারপাইখানা তোমার, কাঠের ওই চৌকিখানা আমার! আর শুনতে চাও?

হেনা আপন আবেগ নিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আমি পেয়ালাটা রেখে একটু হাসলুম। অদূরবর্তী কুকুরটা একবার মুখ তুলে বোধ করি আমাদের সঠিক সম্পর্কটা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমার হাসিটুকুর দিকে তাকাল। আমি নিজেই এবার ছুরি দিয়ে আলু ও পেঁয়াজ এবং ছোট লাউটি কুটতে ব'সে গেলুম। বুঝতে পারা গেল, আমার সংশয়াচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীল মনকে হেনা আজও ক্ষমা করেনি! সে এখানে পরম আনন্দেই একা ভরপুর ছিল। আমি এলুম, তাই দুঃখ এল আমার সংগে, এল তার উদ্বেলতা, এল তার ব্যাকুলতা।

মিনিট দশেক গেল। আমি জানি একই বেদনায় এবং একই যন্ত্রণায় আমরা আলোড়িত হচ্ছি। সুতরাং আমি উঠে গিয়ে তার হাত ধরে ডেকে আনব এবং সে বর্ষার মেঘের মতো মুখ নিয়ে আবার এসে রান্নায় বসবে,—তেমন উৎসাহ আমি প্রকাশ করতে পারলুম না। বরং তার অসমাপ্ত কাজটাই হাতে তুলে নিয়ে আমি রাঁধতে বসে গেলুম। মন্দ কি, হেনা বিশ্রাম নিক্।

লাউয়ের ঘণ্ট রান্নাটা আমার পক্ষে সোজা ছিল। ওর মধ্যে বেশি পরিমাণ লংকা দিয়ে হেনার চোখ দিয়ে একটু জল বার করা যায় কিনা সেটি ভাবতে সময় নিলুম। উনুনের পাশে ঢাকা-দেওয়া একটি কলাইয়ের পাত্রে দুধ ছিল, ওটার দ্বারা কোনও নতুন ধরনের চাটনি বানানো গেলে হেনাকে একটু চমকে দেওয়া যেত। লাউ সাধারণত স্বভাব-সংযত। কিন্তু আগুনে আর জলে সেটা টগবগ ক'রে যখন ফুটতে লাগল, আমি ওর মধ্যে নিজের প্রকৃতিকেই যেন দেখতে পাচ্ছিলুম। ওটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসার পর আমি আমার ধুতির কাঁস এবং কোঁচা শক্ত ক'রে বাঁধলুম। তারপর এলুমিনিয়মের কড়াটা নামিয়ে বুঝলুম, সামান্য রান্না-বান্নার অজুহাতে দেশের বৃহত্তর নারী-সমাজ পুরুষজাতিকে কি প্রকার ধাপ্পা দিয়ে নিজেদের কাজ গুছিয়ে এসেছে এতকাল! এরপর জলের মতো সব সোজা। এ পাশে ঘিয়ের বাটি, ও পাশে মসলাদি,— এ হাতে আলু, ও হাতে পলাণ্ডু,—মাঝখানে ডিম। অতএব উনুনের ভিতরে কাঠ একটু নেড়ে দিয়ে হাসিমুখে আমি রণক্ষেত্রে নেমে পড়লুম। অস্ত্র-উপকরণ সব প্রস্তুত। চারিদিকের অন্ধকারের মাঝখানে যেন হোমকুণ্ড রচনা ক'রে ঘৃতাহুতি দিচ্ছি। আজ যেন প্রথম আমার পাকস্পর্শ।
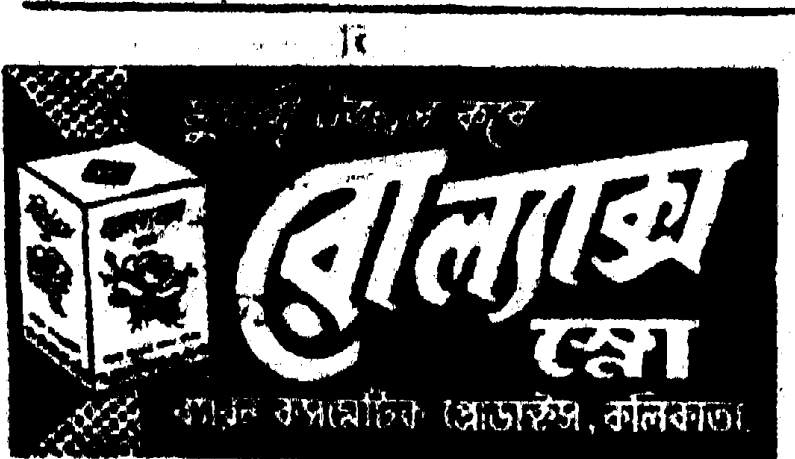
কুকুররূপী ধর্মরাজ শুধু আমার সাক্ষী।

আমার বিশ্বাস, ঘরের মধ্যে লুকিয়ে সুগন্ধ তরকারির ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দগুলি হেনা কান পেতে শুনেছিল। নিশ্চয় জানি, ঠিক সময়টিতে তা'র আবির্ভাব ঘটবে। মেয়েরা চিরকাল রান্নার 'ঠাকুর' রাখতে পারলে ভারি খুশী হয়!

টগবগ-টগবগ ক'রে ফুটছে ডিমের ডাল্লা আপন যন্ত্রণায়। যত দগ্ধ হচ্ছে, যত উদ্বেলিত হচ্ছে অগ্নিপীড়নে—ততই তা'র স্বাদ হচ্ছে মধুর। ঘিয়ে-মসলায়-পিঁয়াজে-আলুতে-ডিমে ধীরে ধীরে মিলছে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে সমস্তটা আনছে কেমন একটা ঐক্য, একটা সমন্বয়,—যাকে বলে সংহতি! আমি উল্লসিত হচ্ছিলুম।

অন্ধকারে কা'র যেন পায়ের আওয়াজ হল। চট করে মুখ তুলল কুকুরটা। কিন্তু তখনই এসে দাঁড়াল দেওকী-বৌ। হাতে তার ঢাকা-দেওয়া একখানা পিতলের পরাত। মিষ্টকণ্ঠে সে বলল, চাপাটি বনাকে লায়া হুঁ, সাব।

সত্যিই ত, রান্নাটাই ভাবছিলুম, ভাত-রুটির কথা কই মনে ছিল না ত? আমি শশব্যস্তে সেই চাষী বৌয়ের হাত থেকে পরাতটি নিয়ে বললুম, বহুৎ মেহেরবানি, মাইজি—

বৌটি সস্নেহ হাসি হেসে আবার অন্ধকারের দিকে ফিরে গেল। বুঝতে বাকি রহিল না, তার বাসা খুব কাছা-কাছি। থালার ঢাকাটা খুলে একবার দেখে নিলুম, ঘি-মাখানো গরম গরম মোটা-মোটা রুটি। প্রত্যেকখানিই যেন চন্দ্রমুখী! না, লোভ আমার নেই!

ডিমের তরকারি নামিয়েই ছুটলুম ঘরের মধ্যে। কিন্তু ভিতরে এসে থম-কিয়ে দাঁড়ালুম। তেলের আলোটা প্রায় নিবে এসেছিল। আমি একটা বড় মোম-বাতি নিয়ে জ্বাললুম। হেনা ঘুমোয়নি, তক্তাখানার ওপর নিঃসাড়ে পড়েছিল। আমার ঠিক কি করা উচিত বুঝতে না পেরে একবার তাকে ডাকলুম। হেনা শুধু বলল, আমি জেগেই আছি।

বললুম, থাকবেই ত। তরকারির সুগন্ধে ঘুম আসবে কেন? কিন্তু কই, তুমি ত' ঠিক অতিথি সংকার করছ না?

অতিথি তুমি নও, সে তুমিও জান।

হেসে বললুম, তবে কে আমি?

হেনা বলল, তুমিই তার জবাব দাও!

কতক্ষণ চুপ ক'রে রইলুম, পরে বললুম, যদি জবাব না দিই তাহলে কি আমাকে গেস্ট-হাউসে পাঠিয়ে দেবে? সেখানে কিন্তু বিছানাপত্র কিছু নেই!

হেনা চুপ ক'রে রইল। আমি বললুম, আমি কে—আবাল্য এই প্রশ্ন ঘুরছে! তোমাদের বাড়িতে ছোটবেলায় সারাদিন তোমার সঙ্গে খেলে বেড়িয়েছি। স্কুল-কলেজে বরাবর একসঙ্গে। কত ভ্রমণ করেছি দু'জনে নানা দেশের নানা অঞ্চলে।— বিলেত গেলুম-এলুম। তোমার আর নবেন্দুর সব গণ্ডগোলের হেস্তনেস্ত হল। তোমার পারিবারিক এবং বৈষয়িক সমস্যার মীমাংসা হল আমার হাত দিয়ে। কিন্তু আমি ত' তোমাকে একবারও প্রশ্ন করিনি, আমার বাড়ি অমন সুন্দর ক'রে তুমি যে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে এলে, সে কা'র জন্যে? আগে বল, তুমি কে আমার? আমার জবাব আমি না হয় দিয়েই যাব কাল যাবার আগে! তুমি বল ত তুমি আমার কে?

আমার উত্তেজনার চেহারা কি প্রকার হেনা জানে। আমি আবার বললুম, তুমি কোন্ অধিকারে আমার বাড়িতে অত দামের আসবাবপত্র আর ওই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা রেখে এসেছ? কোন্ অধিকারে তুমি দিল্লীর বাড়িতে গিয়ে-ছিলে? কোন্ অধিকারে আমাকে এখানে তুমি টেনে এনেছ? কে তুমি, জবাব দাও?

হেনা এবার উঠল। তার মুখের চেহারাটা ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। তক্তাপোশ থেকে নেমে সে এবার একখানা নতুন গামছা বা'র ক'রে আমার কাঁধের উপর ছুঁড়ল। তারপর বলল, থাক্ অনেক বক্তৃতা হয়েছে। বাইরে চলো মুখ হাত ধোবে। বাজে কথা নিয়ে আমাকে রাগিয়ো না!

হারিকেনটা নিয়ে সে আগে-আগে চলল। ভিতরের দিকে চারদিক-ঘেরা তার স্নানের একটি জায়গায় আমাকে এনে ছেড়ে দিয়ে হারিকেন-লণ্ঠনটি রেখে সে চলে গেল। মনে হচ্ছে আমার বক্তৃতাটায় বেশ কাজ দিয়েছে! স্নান করতে করতে আমার হাসি পাচ্ছিল।

ফিরে এসে দেখি হেনা খাবার-দাবারগুলি সব যত্নে এনেছে। কাঁচের ডিস পেতেছে খানচারেক। কাঁচের গেলাস নিয়েছে গোটাদুই। নিজে মাটিতে বসে আমার জন্য আসন পেতে দিয়েছে। আসনে বসে আমি বললুম, আমার

বিশ্বাস, আমার চেয়ে কুকুরটার বেশি ক্ষিধে পেয়েছে!

ওকে আগেই দিয়েছি, তুমি বসো!

বললুম, কেমন রে'ধেছি শিগগির খেয়ে দেখো! অনেক তপস্যা ক'রে আমার মতন বন্ধু পেয়েছিলে হেনা, মনে রেখ।

ঘি-মাখানো 'চন্দ্রমুখীরা' তখনও গরম ছিল! আমরা খেতে ব'সে গেলুম। হেনা বলল, তপস্যা করেছিলুম বলেই ত' তোমার রান্না খেতে পেলুম! কী সুন্দর স্বাদ হয়েছে, খেয়ে দেখ! কালও আমাকে রে'ধে খাইয়ে যেয়ো। সত্যি, এমন চমৎকার ঘণ্ট খাইনি কখনও! তোমার হাতে যাদু আছে, পার্থ।

ঈষৎ স্তিমিত উৎসাহে আমি বললুম, লাউয়ের ঘণ্টে কাঁচা ঘিয়ের গন্ধটা যেন কেমন লাগছে না? একটু পানসে মনে হচ্ছে! বেশি জল দিয়ে ফেলেছি!

তা হোক, চুমুক দিয়ে খাও,—জল থাকলেই বা!

হেনা পরম তৃপ্তি সহকারে বাটিসুদ্ধ ঘণ্ট চুমুক দিয়ে খেল। তারপর ডিমের তরকারি টেনে নিল। আমি সগৌরবে ওর দিকে এবার তাকালুম। বলতে ইচ্ছা হল, আমার দিল্লীর বাবুর্চিকে আমিই রান্না শিখিয়েছি! হেনা বড় আনন্দে খাচ্ছিল।

কিন্তু আমিই এক সময় আর্তনাদ ক'রে উঠলুম। বললুম এ রাম, খাব কি করে? নুন দিইনি যে! একদম মিষ্টি।

হোক না মিষ্টি—হেনা বলল, চিনি দিয়েছ তাতেই হল! সবাই নুন খায়, আমরা না হয় মিষ্টিমুখ করলুম! আমি চমৎকার খেয়েছি!

তুমি আমাকে তামাশা করছ হেনা, এ সব একেবারে অখাদ্য! দেখে এসো তোমার কুকুরও খায়নি! তুমি এই গরুর জাব খেলে কেমন ক'রে? না, না—এ আমি খেতে পারব না, তুমি আবার রে'ধে দাও! আমার এখনও বেশ ক্ষিধে রয়েছে!

হেনা হাসিমুখে উঠে হাত ধুয়ে আবার তরকারিটা উনুনে চাপাল, এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই ওই একই ডিমের তরকারিটুকু যাদুমন্ত্রসিদ্ধ হয়ে আবার আমার কাছে ফিরে এল। শুধু যে আমি খেয়ে খুশী হলুম তা নয়, হেনাকেও খেতে বাধ্য করলুম।

অতঃপর দেওকী-বৌ এক সময় সাড়া দিয়ে এসে দাঁড়াল এবং ঘরের থেকে একে একে সমস্ত বাসন ও অবশিষ্ট ভোজ্য সামগ্রীগুলি নিয়ে চলে গেল।

ভোর হবার কতকটা আগে কোন্ একটা সময়ে ছাৎ ক'রে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে কুকুরটা গোঁ গোঁ করছে। হারিকেনটা খোলা দরজার কোণে টিপটিপ করছিল।

বিছানা ছেড়ে আমি উঠলুম। চৌকিতে হেনা শুয়েছিল এইটি দেখতে দেখতে কাল রাত্রে নেয়ারের খাটে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এখন দেখছি সে কখন্ যেন দাওয়ার উপর চাটাইখানা পেতে মাথার তলায় হাত দিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে আলোটা সামান্য বাড়িয়ে সেদিনকার রাজা ভবানীপ্রসাদের নাতনীর এই দরিদ্র শয্যায় শুয়ে ঘুমোবার ছিরিটা ভাল ক'রে দেখলুম। কি ভাগ্যি, এই ঠাণ্ডায় একখানা চাদর জড়িয়ে নিয়েছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোনও শিয়াল অথবা হায়না হয়ত মনে ক'রে থাকবে এটা একটা মৃতদেহ, কুকুরটা তাই ক্রুদ্ধ হয়ে ফুলছিল। কিন্তু আমি বিস্ময় বোধ করলুম, কুকুরটার ওপর হেনার নির্ভরশীলতা দেখে। কেননা তার নিদ্রা যেমনই নির্ভয়, ঠিক তেমনই নিশ্চিন্ত।

উবু হয়ে বসে হেনাকে ডাকলুম। হেনা চোখ খুলে তাকাল। আমি বললুম, তুমি এমন ক'রে লজ্জা দেবে জানলে আমি আসতুম না, হেনা।

নিদ্রাজড়িত চোখে হেনা বলল, কেন, আমি ত বেশ ঘুমিয়েছি!

না, তুমি ওঠো।—আমি তার হাত ধরে তুললুম। বললুম, চল, এখনো ভোর হয়নি, আরেকটু ঘুমিয়ে নাও।

হেনাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নেয়ারের খাটে শুইয়ে চাদরখানা তার গায়ে ঢাকা দিয়ে দিলুম। আলো ফুটতে তখনও কিছু দেরি ছিল। বিছানাটার মধ্যে কিছু উত্তাপ তখনও রয়েছে, তারই মধ্যে মুখখানা ঘষে হেনা বলল, ঘুম যদি ভাঙিয়েই দিলে তবে কাছে বসো, অন্ধকারেই কথা বলি।

আমি তার মাথার কাছে এসে বসলুম। হেনা বলল, আমাকে কোনদিন কি তুমি একটি ভাল কথা বলতে পার না?

বললুম, দাঁড়াও, একটু গুছিয়ে বসি। তোমার আক্রমণটা ঠিক কোন্ দিক [illegible] আসছে, একটু ভেবে নিই। নাও, এবার বল। যদি হঠাৎ রেগে উঠি, তোমার চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে পারব!

হেনা বলল, তামাশা থাক্, এবার জবাব দাও? বলতে পার কেন তোমার মনের খোঁজ পাওয়া যায় না? আমি অশুচি ব'লে ক্ষমাও কি করবে না কোনও দিন? আমার প্রতি অশ্রদ্ধাটা কেন তুমি মজ্জাগত ক'রে রাখলে, পার্থ? তুমি যখনই বল তুমি রক্ষণশীল, আমি তখনই ভয়ে-ভয়ে তোমাকে চেয়ে দেখি।

এবার শান্তকণ্ঠেই বললুম, আগে একটা কথার জবাব দাও, হেনা। আজ সকালে কি আমি চ'লে যাব?

হেনা বলল, তুমি ত' একবারও বলনি যে, তোমার যাবার ইচ্ছে নেই?

বাঃ বেশ বললে! যে-মেয়ে সমস্ত ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, আমার সঙ্গে একবার পরামর্শও করল না, তার কাছে এসে থাকতে চাইব কেমন করে? এ তুমি কি বলছ? আমার জোর কোথায়?

হেনা চুপ ক'রে রইল।

আমি পুনরায় বললুম, আজ সকালে তোমার এখানকার দপ্তরে গিয়ে দাঁড়ালে আমার সম্বন্ধে যে-কৌতূহল দেখা দেবে, সেকথা কি তুমি ভেবে রেখেছ?

আমি নির্বোধ নই, পার্থ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।—হেনা জবাব দিল। পুনরায় বলল, ভয় পেয়ো না, মিথ্যে কথা আমি বলিনে। মিথ্যে সম্পর্ক বানিয়ে জোড়াতালিও দিইনে। এখানে তুমি যতদিন খুশি থাকতে পার।

এবার হে'ট হয়ে হাসিমুখে বললুম, যদি গালমন্দ না কর তাহলে সাহস ক'রে একটি কথা বলি। গতকাল বিকেলে

অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কী সুন্দর তুমি!

গায়ের চাদরখানা সরিয়ে হেনা ধড়-মড়িয়ে উঠে বসল। বলল, ছি পার্থ, তোমার মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনব, তার চেয়ে গঙ্গায় ডুবে মরব সে ভাল! তুমি অন্য কথা বল। এই বুঝি তোমার বাছা বাছা ভাল কথা? শুধু শালোয়ার আর পাঞ্জাবি দেখে তুমি বুঝি চঞ্চল হয়েছিলে? তক্ষুণি বলনি কেন, আমি ছেড়ে ফেলতুম?

আমি উঠে গিয়ে এবার চৌকিতে বসলুম। বললুম, তোমার কপাল পোড়া, আমার মুখ থেকে সুখ্যাতি শুনতে চাও না! আরে বাপু, মুগ্ধ হয়েছিলুম শুধু তোমার স্বাস্থ্য আর যৌবনের সৌন্দর্য দেখে নয়। এত কৃচ্ছ্রসাধন আর আত্মনিগ্রহের মধ্যেও তুমি যে আরও দীপ্ত হয়ে উঠেছ, সেইটি দেখে অবাক হয়েছিলুম।

হেনা বলল, খোঁজ নিয়ে দেখেছ কি, এর কারণটা?

কেমন ক'রে ঢুকব তোমার মনের গুহাগহ্বরে? মেয়েই শুধু জানে মেয়ের অন্তররহস্য। কেউ সেটি প্রকাশ করে উল্লাসের ভাষায়, কেউ বা চোখের জলে। তুমি আনন্দ পেয়েছ তোমার অসীম মুক্তির পথে, বড় জীবনের হাওয়া লেগেছে তোমার গায়ে। তোমার ছোট-কার জীবনশিল্প তোমার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

হেনা একবার বাইরের দিকে তাকাল। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল, ভোরের চিহ্ন চিকচিক করছে। কাছে সরে এসে হেনা আমার হাত ধরে আবার নেয়ারের খাটিয়ার ওপর তুলে শুইয়ে দিল, তারপর চাদরখানা গায়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মুখ নামিয়ে বলল, পাখি ডাকেনি এখনও, বড় তারাটা দপদপ করছে। আরেকটু ঘুমোও, আমি গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসে তোমার চা ক'রে দেব।

হাসিমুখে হেনার একটি হাত ধরে বললুম, পাখি যদি এখনো ঘুমিয়ে, তবে আরো দু' একটা কথা শুনে যাও! বল আমি তোমার কে? তুমি কে আমার?

কবির ভাষায় বলব?—হেনা আমার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই দু'হাতে আমার মাথাটা ধ'রে বলল, তুমি আকাশ, আমি ধরিত্রী! লক্ষ লক্ষ যুগ ধ'রে তোমার এই অপরূপ মুখখানির দিকে চেয়ে রইলুম, কিন্তু কই, আশা মিটল না ত?

শক্ত করে হেনার হাত দুখানা ধরলুম এবার। বললুম, তুমি-আমি দুজনেই এই এক বছরে অনেক বদলে গেছি, হেনা। কিন্তু প্রথম তুমিই আমার বুকে কাঁপন ধরিয়েছ, আমার জীবন-মরণের উপর তুমিই প্রথম ঝড় তুলেছ! বল, একথা কি সত্যি নয়?

সত্যি!—হেনা বলল, তুমি দূরে যেতে চেয়েছিলে, আমিই বার বার টেনে এনেছি। কিন্তু আমার পক্ষে সব চেয়ে অপমানজনক একটা মিথ্যে কল্পনা তোমার মনকে পেয়ে বসেছিল, আমি নাকি পরস্ত্রী। যতবার ওকথা তোমার মুখে শুনেছি ততবার তোমার ওপর আমার ঘেন্না হয়েছে। আজও তোমার সব পীড়ন আমি হাসিমুখে সইব পার্থ, —কিন্তু তুমি যেন কখনও আমার মুখের ওপর আমার চেহারার সুখ্যাতি কর না! ওর মধ্যে আমি নবেন্দুর নোংরা গলার আওয়াজ পাই!

আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছিল। হেনা তার গামছা আর ঘটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ডাকল, আয়। চ্ছু, চ্ছু......

কুকুরটা গেল তার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটের দিকে। কাছেই গঙ্গা।

সুখের মধ্যে আমারও অস্বস্তি ছিল হেনার মতো। চোখ বুজেই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, পৃথিবীর সব দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য এইটিকেই ঘিরে কি গড়ে ওঠেনি? আদি কথায় এইটিই ত' আছে—তুমি আর আমি! পুরুষ আর মেয়ে! উভয়ের

ভিতরকার ব্যক্তিগত সম্পর্কটা বলা হয়নি, লৌকিক ব্যাখ্যা দেওয়া নেই, সামাজিক রীতি ও নীতি স্বীকৃত নয়—শুধু তুমি আর আমি! একজন সম্ভাষণ করছে অন্যজনকে; অশ্রুবর্ষণ করছে একজন অপরের জন্য। বাঁশি বাজাচ্ছে একজন, গৃহত্যাগ করছে অন্যজন। পুরুষ-পাখি কূজন গুঞ্জন করছে, মেয়ে-পাখি তাই শুনছে প্রাণের টানে। রাজহংস চলেছে আকাশপথে আপন সাথী সঙ্গে নিয়ে। কাব্যের মধুর ব্যঞ্জনা উদ্বেলিত হচ্ছে দুইজনকে ঘিরে—যাদের মধ্যে কোনও প্রকার পারিবারিক ও সামাজিক যোগ নেই। কিন্তু সেই কাব্যের প্রয়োগ জীবনে যদি ঘটে প্রতিবাদ ওঠে কেন? আমাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা যদি অনির্ণেয় হয়ে থাকে, যদি বলি আমরা জন্ম-জন্মান্তরের পথ ধরে এসেছি সাম্প্রতের স্রোতপ্রবাহে, এবং এই প্রবাহেই ভেসে চলে যাব ভবিষ্য জন্মবিবর্তনের ভিতর দিয়ে, তাহলে আপত্তি উঠবে কোন্ দিক থেকে? লোকে বলতে পারে, আমাদের এই বর্তমানের জীবনটা যে নেহাৎ বাস্তব এবং গদ্যময়, তার উপায় কি? সে ক্ষেত্রে হেনার কথাটাই তুলে ধরব,—গদ্য হলেও গদ্যকাব্য, এবং এটা জাত-কাব্যেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ!

ঘুমের ভান করেই পাশ ফিরে পড়েছিলুম, কেননা এক সময় শুনতে পেলুম ভিজা কাপড়ে সপসপিয়ে হেনা ঘরে এসে ঢুকল, এবং আমি সত্যিই ঘুমোচ্ছি কিনা এটি নিরীক্ষণ ক'রে সে কাপড়-চোপড় বদলে নিল। অতঃপর যথাসময়ে যখন আমি উঠে বসলুম,—তখন দাওয়ার উপরে রক্তিম রৌদ্রের আভা পড়েছে। হেনা কেটলী থেকে পেয়ালায় চা ঢালছিল। আমি গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলুম।

তুমি অত ভোরে স্নান কর শীত করে না?

হেনা বলল, অভ্যেস করে নিয়েছি। অন্য দিন আরো আগে যাই। দেওকী সঙ্গে থাকে, নয়ত কুকুরটা। চা খেয়ে তুমিও স্নান করে এস।

কাল সন্ধ্যায় যেটাকে ঝোপঝাড় মনে হয়েছিল, আজ সকালে দেখি সেটা এক প্রশস্ত আমবাগানের প্রারম্ভ। সেই বাগান বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। তারই নীচে-নীচে প্রথম বসন্তের পাতা ঝরেছে অনেক, এবং প্রভাতের রৌদ্রের আলোয় ও গাছের ছায়ার যেন এক অমরাবতীর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই আমবাগানেরই পশ্চিম প্রান্তে জনশূন্য তটের নিচে দিয়ে বিবাগিনী গঙ্গা বয়ে চলেছে। বটের ঝুরি এবং বৃদ্ধ অশ্বত্থের ডালপালা জলের উপর নেমে গিয়ে একটি স্নিগ্ধ ছায়াময় ক্রোড় রচনা করেছে। হেনার গঙ্গাস্নানের পক্ষে ওটাই একটা আব্রুর কাজ করে বুঝতে পারা গেল। আমি সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে একটু একটু করে উপভোগ করছিলুম।

আন্দাজ ঘণ্টাখানেক পরে যখন স্নানে নেমেছি, উপরদিকে মুখ তুলে হঠাৎ দেখি, হেনা ছুটে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। ওখান থেকেই সে চেঁচাচ্ছে, আর বেশিদূরে যেয়ো না পার্থ, বুঝেছ? ওইখানেই ডুব দাও—তুমি সাঁতার জান না—

তটের প্রান্তে নেমে এসে সে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলল, ওটা যে আঘাটা, ওখানে গেলে কেন মরতে? তখন কি ছাই মনে ছিল, তুমি সাঁতার শেখনি! এদিকে সরে এস—

একটা ডুব দিয়ে আমি জলঝরা মুখ তুলে হেনার দিকে চেয়ে হাসলুম। বললুম, সাঁতার শিখে তবে আঘাটায় আসা ভাল, এই বলছ?

কথাটার মানে কিছু নেই, কিন্তু ব্যঞ্জনাটা হেনার কানে ঠেকে থাকবে। সে হাসল। বলল, আঘাটা দিয়ে সাঁতরে পাছে পালাও, সেজন্যে আগেই আমি সাঁতার শিখে রেখেছি। নাও, এবার উঠে এস। নৈলে আমি ঝাঁপ দিয়ে তুলে আনব!

নিরিবিলি গঙ্গা হু হু করছিল। দূরে দূরে এক আধখানা মহাজনী নৌকা চলেছে। আমবাগান পেরিয়ে তরুণ রৌদ্রের রশ্মি পড়েছে গঙ্গার এক ধারে। স্নান সেরে আমি উঠে এলুম। ওদিকে হেনা আমার বিব্রত অবস্থাটা হাসিমুখে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ তার দিকে ফিরে বললাম, হাসছ যে?

হেনা বলল, পুরুষমানুষও যে সর্বনেশে হয় তাই ভাবছিলুম!

না, সত্যি বললে না। আমি হাসিমুখে বললুম, এতক্ষণ অনিমার ছোটবোনের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ভাবছিলে তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

কলকণ্ঠে হেনা হেসে উঠল। তারপর বলল, সুরমাকে বোকা বানাবার উপায় ও ছাড়া আর কি ছিল? তুমিও বুঝি বিশ্বাস করেছিলে?

আমি বললুম, সাপের হাঁচি বেদের চিনতে তাই বিশ্বাস করিনি! চল এবার।

ঘরে এসে পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে নিলুম। কিন্তু ঘরটি এই সময়টুকুর মধ্যে সুশ্রী ক'রে তোলা হয়েছে। চৌকির ওপর আর একটা বিছানা পড়েছে। লেখাপড়ার সরঞ্জামগুলি সুবিন্যস্ত। মেঝেটি পরিচ্ছন্ন। এরই সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে হেনার শুচিস্মিত মূর্তিটি,—সর্বপ্রকার বন্ধন এবং বাধ্য-বাধকতার বাইরে এই পরম কল্যাণীয়ার প্রদীপ্ত আভাটুকু ঘরখানিকে যেন পুণ্যময় করে রেখেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমি হেনাকে লক্ষ্য করছিলুম। এই ঘরের বাইরে ওই আমবাগান, ওই গঙ্গার এপার ওপার, এখানকার স্থানীয় কর্মকেন্দ্র, বাইরের বিশ্বজগৎ—কোনটাই আমার কাছে আর কোনও অর্থবহন করে না, এবং ওদের অস্তিত্বটাই আমার কাছে অলীক হয়ে উঠেছে।

আমার হ্যান্ডব্যাগে হেনার প্রিয়বস্তু বাদাম ও কিসমিস এনেছিলুম সেটি মনে ছিলনা। এবার উভয়ের জলযোগের পাত্রে তাদের দেখা মিলল। লুচি, হালুয়া, ক্ষীরের ছাঁচ, ডিমসিদ্ধ,—কোনটাই বাদ যায়নি। হেনা বলল, আজ দুপুরে তোমাকে দেব বাদাম-কিসমিস দেওয়া পোলাও আর ইলিশ মাছ। মুগের ডালের সঙ্গে পোরের ভাজা। খেয়ে উঠে পাঞ্জাবী লাস্যি। আমাদের ব্লকে খবর পাঠিয়েছি।

আমি চাকরি ছেড়ে দেব, হেনা! এখানে এসে থাকব।

হেনা আমার মুখের দিকে তাকাল। পরে বলল, স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত গেছ, সেখানকার ইস্কুলে ইকনমিকস পড়েছ, ডিগ্রি এনেছ, মোটা মাইনের চাকরি করছ,—সে-চাকরি ছাড়বে কি জন্যে?

তোমার জন্যে!

হেনা কতক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, বেকার পুরুষ এবং তার কোনও একটা নেশা,—এ দুটোয় মেয়েরা ভয় পায়, তা জান?

আমি বললুম, তুমি কি আমার নেশা?

ভয় করে পাছে নেশা হয়ে উঠি — হেনা বলল, দুজনে পুড়ে-পুড়ে ছারখার হই, তাই ভয় করে।

এ ভয় কেন তোমার বল ত?

রাগ করো না পার্থ,— হেনা আমার পিঠের উপর হাত রেখে বলল, তুমি একটু সাবধানী, তোমার মেরুদণ্ডের জোর একটু কম। সেকাল আর একালের মাঝখানে তুমি দোলা খাচ্ছ! তোমার বাঁধ একবার ভাঙলে কি চেহারা তোমার দাঁড়াবে, ভয়ে ভয়ে তাই ভাবি।

প্রশ্ন করলুম, কিন্তু এমনি করে কতদিন চলবে?

ওই দেখ, সেই পুরনো কথাই তুমি জানতে চাইছ, পার্থ। তুমি পরিণতির কথা ভাবছ, কেননা জীবনের একটা বিশেষ নক্সা না দেখতে পেলে তোমার চলে না! আমি কিন্তু কোনও পরিণাম নিয়ে মাথা ঘামাইনে। তুমি আমি আছি, এই সত্য চিরদিন আমাদের সামনে থাক্।

আমি চুপ করে রইলুম। হেনা পুনরায় বলল, সবচেয়ে কঠিন কাজ, কি জান পার্থ? নিজের কাছে একান্তভাবে সত্য হওয়া! নিজেকে জানা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান! দর্শনশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পাঠ আত্মদর্শন। হঠাৎ কেন চাকরি ছাড়বে তুমি? কেন ভেঙে-চুরে ফেলবে তোমার সাফল্যময় কর্মজীবনটা—যেটি তুমি ধীরে ধীরে সযত্নে নির্মাণ করে তুলেছ?

এবার বললুম, তুমিই ত' একদিন আমাকে চাকরি থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলে?

হেনা বলল, মিথ্যে বলনি। সেইজন্যেই দুখানা বাড়ি বিক্রির টাকা আর যশিদির বাড়ির দানপত্র তোমার আলমারিতেই রেখে দিয়ে এসেছি। ওসবই তোমার, আমার নয়। আমি চাই মুক্তি, মানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুক্তি! সমস্ত ভারতবর্ষের ধুলোয় ধুলোয় আমার সেই অবারিত মুক্তি যেন উড়ে বেড়ায়! একদিন ছোটকার পায়ের কাছে বসে এই প্রতিজ্ঞাই তুলে নিয়েছিলুম, পার্থ! আমার শুধু ভয় করে পাছে তোমার জীবনে আমার সম্বন্ধে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়!—বলতে বলতে আবেগে তার গলা ধরে এল।

মুখ তুলে হঠাৎ হেনার দিকে তাকালুম। বললুম, যে ব্যক্তি হাসিমুখে যথাসর্বস্ব ছেড়ে দিচ্ছে, নিজের চোখের জলে সে বাঁধা পড়ে কেন, হেনা?

হেনা সহসা দুই বাহু দিয়ে আমাকে ধরে আমার কাঁধের ওপর ডুকরে উঠল। বলল, এ চোখের জল তুমিই শুকোতে দিচ্ছ না, পার্থ। কাঁদতে কাঁদতেই আমাকে বাঁধন ছিঁড়তে হবে, কেননা তুমি দুঃখ দিচ্ছ অনেকদিন থেকে। এবার তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। এখনও সময় আছে পার্থ, এখনও তলিয়ে যাইনি তোমার মধ্যে! তোমার সাংঘাতিক টান ছিঁড়ে আমি কোনমতেই পালাতে পারছিনে।

আমি বললুম, বেশ, একথা আমি মনে রাখব হেনা। তুমি আনন্দে থাক, নিরাপদে থাক, এই ইচ্ছে জানিয়েই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কিন্তু একটি অনুরোধ, আমাকে তুমি কিছু দিতে চেয়ো না, ও বিষয়ে আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

হেনা তার ডান হাত বাড়িয়ে আমার মুখখানা চেপে ধরল। (ক্রমশ)

ওই দেখ, সেই পুরনো কথাই তুমি জানতে চাইছ, পার্থ।

সাম্প্রতিক সংবাদ-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

১। European Common Market জিনিসটা কি? এতে ইংল্যান্ড সম্প্রতি যোগদান করবে—ইচ্ছা প্রকাশ করায় কমনওয়েলথ্ দেশসমূহে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে কেন?

২। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর অমূল্য পুস্তক-সম্পদ নিয়ে ইংল্যান্ড, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে কেন? এবং এর মীমাংসার কি উপায় হয়েছে?

৩। সর্বসমেত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য-সংখ্যা এখন কত? জাতিপুঞ্জ এখন কয়টি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত?

(উত্তর অন্যত্র আছে)

প্রদর্শনী

কলারসিক

ইন্দোনেশিয়ার কারু-শিল্প প্রদর্শনী

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমানাকে অতিক্রম করে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি একদা আধিপত্য বিস্তার করেছিল ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সিয়াম, কম্বোডিয়া, চম্পা ও ইন্দোনেশিয়ায়। আজও এই সব দেশের স্থাপত্য-ভাস্কর্য, চারু ও কারুকলা তথা জীবন-চর্চার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির স্রোতধারাকে খুঁজে পাবেন অনুসন্ধিৎসু দর্শক। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির জীবন্ত ঐতিহ্যকে এখনো বহন করছেন অগণিত মানুষ। সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে আবদ্ধ এই বিশাল ভারতকে আজ আবার নতুন করে জানার এবং উপলব্ধি করার সময় উপস্থিত হয়েছে। জাগ্রত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে নিত্য নতুন লুপ্ত ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ সেই সব দেশের সঙ্গে আমাদের যত বেশি যোগাযোগ ঘটে ততই মঙ্গল।

সম্প্রতি এমনি এক যোগাযোগের ফলে আমরা ইন্দোনেশিয়ার কিছু ঐতিহ্যময় শিল্পবস্তু দর্শনের সুযোগ পেয়েছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার অধ্যক্ষ ডঃ ডি-পি ঘোষ গত জানুয়ারী মাসে ইন্দোনেশীয় সরকারের শিক্ষা-দপ্তরের আমন্ত্রণে পরিদর্শনকারী অধ্যাপকরূপে সেখানে যান। ছয় সপ্তাহ মাত্র তিনি ইন্দোনেশিয়ায় ছিলেন। এই সময় জাকার্তা, বান্দুং, মালাং, জোগজাকার্তা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন তিনি 'ইন্দোনেশিয়ার শিল্প ও স্থাপত্যকলা', 'বুদ্ধ-মূর্তির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যাত্রা', 'ভারত-ইতিহাসের সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পট' ও 'ভারত-শিল্পের আদর্শ' প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেছেন, তেমনি সত্যিকার প্রত্নতাত্ত্বিকের মত পশ্চিম জাভা, মধ্য জাভা, পূর্ব জাভা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থান থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন ঐতিহ্যময় কারু-শিল্পের ৮১টি অমূল্য সম্পদ।

ডঃ ঘোষ কর্তৃক আশুতোষ চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত এই সব শিল্প-দ্রব্য ও ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ভারত-সংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শনের প্রায় দুই শতাধিক আলোকচিত্র নিয়ে বর্তমানে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ আশুতোষ মিউজিয়মের ত্রিতলে এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। শুধু গবেষক-ছাত্রেরা নয়, এই প্রদর্শনী দেখে সাধারণ মানুষও ইন্দোনেশিয়ার কারু-কৃতিত্বে যেমন বিস্মিত হবেন তেমনি ভারতবর্ষ সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার উপর কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তারও প্রত্যক্ষ পরিচয় জেনে নিতে পারবেন।

পশ্চিম জাভার বারোটি শিল্প-দ্রব্য এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ১০টি বান্দুং এবং ২টি জাকার্তা থেকে সংগৃহীত। আমাদের দেশে রামায়ণ—মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে পুতুল নাচের পুতুল নির্মিত হয়। বান্দুং-এর পুতুলগুলিও পুতুল নাচের পুতুল। নাম এর 'ওআয়াঙ পুতুল।' মহাভারতের অর্জুন ও ঘটোৎকচকে আশ্চর্য কারু-কৃতিত্বে যেভাবে দারু ও বস্ত্রের সাহায্যে চিত্রিত করা হয়েছে সত্যি তা অপূর্ব শিল্প-সুষমা মণ্ডিত। শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, দারু-মূর্তি নির্মাণের ভারতীয় ঐতিহ্যের দিক থেকেও এই পুতুলগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। তবে স্থানীয় প্রভাবও যে এই পুতুলগুলিকে বৈশিষ্টময় করে তুলেছে সে-কথা অনস্বীকার্য। দারু-নির্মিত অর্জুনের একটি অসমাপ্ত মস্তকও (১২নং) সকলের ভাল লাগবে বোধ হয়। বান্দুং-এর কারু-শিল্পীদের নিপুণ শিল্প-দক্ষতা এই সব দারু-মূর্তিকে যেন বাঙময় করে তুলেছে। কদলীপত্রেও যে এই জাতীয় পুতুলকে চিত্রিত করা যেতে পারে এখানে প্রদর্শিত ৩ ও ৪নং চিত্র না দেখলে তা সহজে বিশ্বাস হত না। ঘটোৎকচ ও সুভদ্রাকে শিল্পী কদলীপত্রের সাহায্যেই চিত্রিত করেছেন। জাকার্তার বাঁশের চাঁচের মাদুর এবং হাতব্যাগও দুটি উৎকৃষ্ট শিল্পবস্তু।

ওআয়াঙ পুতুল ॥

মধ্য জাভা থেকে সংগৃহীত হয়েছে ১৯টি শিল্পদ্রব্য। এককালে মধ্য জাভা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। অষ্টম-নবম শতাব্দী কালে শৈলেন্দ্র রাজবংশের আমলে বৌদ্ধ-ধর্মের অনেক কীর্তি-কাহিনী বিধৃত হয়ে আছে এখানকার মঠে-মন্দিরে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মও যে এখানে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় তারও চিহ্ন নানা শিল্পকলায় পরিস্ফুট। এই প্রদর্শনীতে কচ্ছপের খোলের সাহায্যে নির্মিত কৃষ্ণ-বলরামের মূর্তি ((২২ ও ২৩নং) ও চামড়ার সাহায্যে প্রস্তুত ছায়া-নৃত্যের রাম-লক্ষ্মণের সুন্দর পুতুল দুটি (২৫ ও ২৬নং) ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির জ্বলন্ত প্রমাণ। ইন্দোনেশিয়ার লোকশিল্পীরা এখনও এই ঐতিহ্যকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করছেন। জোগজাকার্তার অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বাটিকের কাজ ও চর্ম-শিল্পের নিদর্শন গুলি সত্যি মনোরম। চামড়াকে কাগজের মত কেটে তারপর নানা রঙে চিত্রিত করে ছায়া-নৃত্যের জন্য যে এমন সুন্দর পুতুল সৃষ্টি করা যায়, এ অন্ততঃ আমার জানা ছিল না। এগুলিকে বলা হয় 'ওআয়াঙ কুলিট।' আমাদের দেশের ছায়া-নৃত্যের জন্য এগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বালি থেকে সংগৃহীত নারিকেল মালার প্রস্তুত অপূর্ব কারুকার্যময় কণ্ঠহার, টেবিল ল্যাম্পের ঢাকনা, দারু-নির্মিত মুখোস ও বিষ্ণু-গরুড়ের মূর্তি, হাড়ে প্রস্তুত দেবী-মূর্তি, তালপত্রে তৈরী নানাবিধ শিল্প দ্রব্য ও রামায়ণের কাহিনী চিত্রিত একখানি পাণ্ডুলিপি—নিঃসন্দেহে এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বালি-দ্বীপের কারু-শিল্পীদের বিস্ময়কর এই শিল্প-সৃষ্টিকে ডঃ ঘোষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করায় তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। 'এত নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে নারিকেল মালার মত সামান্য দ্রব্য দিয়ে কণ্ঠহার সৃষ্টি করা যায় কিংবা কাঠের গায়ে ফুটিয়ে তোলা যায় বিষ্ণু-গরুড়ের অলংকৃত অবয়ব'— এই বিস্ময়বোধেই আলোড়িত হবে প্রতিটি দর্শকের মন। তারপর সেই দর্শকেরা যদি একটু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ভারতীয় লোক-শিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে তাকান তাহলে নিশ্চিত বুঝতে পারবেন বালি-দ্বীপের এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল উৎস কোথায়।

মোটকথা ঃ আমরা এই প্রদর্শনী দেখে ইন্দোনেশিয়ার কারু-শিল্পীদের প্রতিভায় যেমন মুগ্ধ, তেমনি ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক মৈত্রীবন্ধনকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছি বলেও খুশী।

আর্তি

কৃষ্ণকলি

বিন্দুবাসিনীর কাশিটা আজকাল বেড়েছে, ফলে সব সময় প্রায় শোয়া অবস্থা। কাশতে কাশতে গলা [illegible] ডাকলো—বৌমা!

—যাই মা।

অমলা সম্ভবত রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল, শাশুড়ীর ডাকে ভিজে কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে কাছে এসে দাঁড়াল—মা কিছু বলছেন?

—কার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি যেন, টুকাই আবার উপরে এসেছে নাকি?

শুচিবায়ুগ্রস্ত শাশুড়ী ছোট ছেলেপিলে পছন্দ করে না, অমলা সভয়ে ঢোক গিললো—ওর মা আজ হাসপাতাল গেল—বোধ হয় আজকালের মধ্যে।

চুলোয় যাক বাছা, ওসব আদিখ্যেতার কথা শুনতে চাই না। বিন্দুবাসিনী মুখ ঘুরিয়ে নিল,—মা তো হাসপাতাল গেল শুনলুম, ও ছেলে কি তবে এখনকার মত তোমার ঘাড়ে চাপালো নাকি?

—মা যে কি বলেন, বালক নারায়ণ.

—অমলার মুখের কথা শেষ হয়নি, বাইরে হুড়মুড় করে কি যেন পড়লো। কিছু ভাঙ্গার শব্দ। বিন্দুবাসিনী মুখের একটি বিচিত্র ভঙ্গি করলো, —যাও বাছা, তোমার জ্যান্ত নারায়ণ কি ভেঙ্গে-চুরে খান খান করলো, দেখগে।

শব্দ শুনেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে অমলা, যা ভেবেছে ঠিক তাই, দালানের রোদে আচারের শিশিটা বসিয়ে গেছিল, টুকাই সেইটে তুলতে গিয়ে—ভেঙেছে। আম-তেলের আচার চারিদিকে ছড়ান। তিন বছরের টুকাই তার মধ্যে পরমানন্দে পা ছড়িয়ে বসে আচার খাচ্ছে।

অমলা তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে কোলে তুলে নিল, এবং এতবড় অপকর্ম করার অপরাধে বকতে গিয়ে টুকাইয়ের গালে একটি চুমু দিল—দুষ্টু ছেলে, তোমার জন্যে আমি বকুনি খাই।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আগামী ১১ই আগস্ট বর্ধিত আকারে বিশেষ প্রবন্ধ ও ছবিতে সুসজ্জিত হ'য়ে অমৃতের একটি

বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে। কিন্তু মূল্য যথারীতি ৪০ নয়া পয়সাই থাকবে। —সম্পাদক

—খাও খাও—! টুকাই একখণ্ড আম মুখের মধ্যে পুরে নির্বিবাদে ঘাড় নাড়লো।

টুকাই-অমলা প্রসঙ্গে পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়—অমলারা বাড়ীওলা, টুকাইসহ ওর মা, বাবা এ বাড়ির নীচের তলার ভাড়াটে। ওপর নীচের ব্যবধান মাত্র সিঁড়ির মাথায় বসানো একটি দরজা। দরজাটি প্রয়োজনের বাইরে খোলা হয় না।

মাত্র মাস ছয়েক হল টুকাইয়ের বাবা অবনী এ বাড়ি এসেছে। স্বামী-স্ত্রী, একটি শিশু টুকাই। উপস্থিত আর একটি হতে টুকাইয়ের মা মণিমালা হাসপাতালে গেছে। মণিমালার সঙ্গে অমলার ভাব গলায় গলায়। কলকাতায় মণিমালার মা বাপ, ভাই বোন কেউ না থাকায় এ বিপদের দিনে ছেলে রাখার পক্ষে অমলাই ভরসা। নিঃসন্তান অমলা টুকাইকে ভালবাসে।

নির্জন দুপুরের শান্ত সমাবেশে, নিজের ঘরে খাটের ওপর টুকাইকে নিয়ে শুয়েছে অমলা। ও পাশের ঘর থেকে বিন্দুবাসিনীর নাসিকাধ্বনি ভেসে আসছে। অমলারও যে ঘুম না পাচ্ছিল এমন নয়, কিন্তু টুকাইয়ের জন্য সেটি

হওয়া অসম্ভব। সুতরাং গল্পের মহড়া দিয়ে দুজনকেই জেগে থাকতে হয়।

—হাঁ-রে টুকাই?

অমলার শাড়ীর আঁচল দাঁত দিয়ে কাটছিল টুকাই।

সাড়া তুললো—উঁ।

—তোকে কে ভালবাসে রে?

—মা। নির্দ্বিধায়।

—তোর মাকে? কিছু ইতস্তত করে।

—বাবা। অবিশ্যি টুকাইকে একটু ভাবতে হয়।

অমলার মুখখানা অকস্মাৎ যেন আরক্ত হয়ে উঠলো। চিকে ঢাকা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে বহুবার দেখা বহু খণ্ড দৃশ্যের ছায়া ছায়া ঘটনা ছায়া-ছবির মত সামনে এসে দাঁড়ায়। টুকাইকে একটু কাছে টেনে নিল।

—তুই জানলি কি করে?

টুকাই ভেবে বললো—দেখেছি।

টুকাই কি দেখেছে না দেখেছে জিজ্ঞাসা করার সাহস হল না অমলার। শুধু নির্জন দুপুরের স্তব্ধতার সীমানা ধরে একটি বলিষ্ঠ মানুষ,—শিক্ষায় দীক্ষায় ভালবাসার সমস্ত দিক দিয়ে যোগ্যতার পরিচয় নিয়ে অমলার সামনে হাজির হল।

স্বামীর তর্জন-গর্জন, শাশুড়ীর মিথ্যা সন্দেহ নিয়ে বিষিয়ে বিষিয়ে কথা বলার ফাঁকে বারান্দা থেকে দেখেছে অমলা—অবনী মণিমালা দুজনে রান্না করছে, খাচ্ছে, বেড়াচ্ছে, গল্প করছে, গান গাইছে—যেন ছুটে চলা একটা প্রাণবন্ত আনন্দের ঝরনাধারা।

অমলার যদি ঐ রকম হ'ত? মনের অগোচরে পাপ নেই, অমলা গোপনে কেঁদেছে, আর মণিমালার জায়গায় নিজেকে অভিষিক্ত করেছে।

কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে ঐটুকু ছাড়া অমলার সংগে আর কোন পরিচয় আজ অবধি হয়নি অবনীর। কারণ, একতলা ও দোতলায় ব্যবধান স্বর্গ-মর্ত্যের সমকক্ষ হয়েছিল এতদিন।

কিন্তু আজ?

আজকের কথাটাই ভাবছে অমলা। ছ-মাসের পরিচয়হীনতার সমস্ত আড়ষ্টতা কেমন যেন ভেংগে চুরে খান খান করে দিচ্ছে। মণিমালার ছেলেপিলে হবে, হাসপাতাল যাবে গাড়ী এসেছে—। যাবার আগে ব্যথার যন্ত্রণায় বিবর্ণ মণিমালা অমলার দুটো হাত ধরেছিল।

—ভাই অমলা।

মণিমালার অবস্থা দেখে অমলার চোখে জল এসেছিল প্রায়। অমলা নিজেকে সামলে সুদৃঢ় গলায় সাহস দিয়ে বলেছিল,—তোমার কোন ভাবনা নেই, টুকাইয়ের ভার আমি নিচ্ছি।

—শুধু টুকাই কেন, ওঁকেও একটু দেখ। এভাবে ফেলে কখনও যাইনি। ও মানুষটার বড় কষ্ট হবে।

অমলা একথায় জবাব দিতে পারেনি। না পারলেও ক্ষতি নেই, জবাব না দেবার কারণ মণিমালার এই ছ-মাসে কিছু অজানা নয়।

মণিমালা চলতে গিয়ে আবারও থমকে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল,—তাছাড়া যদি না ফিরি। শরীরের যা অবস্থা, যদি না—

অমলা মণিমালাকে ছোট্ট করে ধমক দিয়েছিল—ও আবার কি কথা? না ফিরি, না ফিরি মানে?—ও কথা বলবে না—ছিঃ—

হঠাৎ চোখটা ফেরাতে যেতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। অবনী ওর দিকে চেয়ে আছে। দৃষ্টির মধ্যে স্বচ্ছ সুন্দর একটা কৌতুকের ভাব ছিল যেন। অবনী যেন কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু যা বলতে পারছে না সেটা চোখের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। যেন কিছু প্রত্যাশা, কিছু কৌতুক, অথবা চিন্তা করে দেখতে গেলে আরও অন্য কিছুও হতে পারে। কিন্তু এরকম হবে কেন? জীবন-মরণ সংকটাপন্ন স্ত্রী—বাঁচবো কি, পুনরায় ফি[illegible]া কি সন্দেহ নিয়ে যে চলেছে, এবং ছ-মাসের দেখায় যাকে অতি প্রিয়তমা স্ত্রী বলে জেনে এসেছে, তার ঐ অবস্থায় চোখের ভাষায় অবনীর কি অর্থবোধক দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল তখন?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কখন অমলা ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঘুমটা ভেংগে গেল সদরে খুট খুট করে কড়া নাড়ার শব্দে। জেগে উঠেও কান পেতে শুনলো সদরে কড়া নাড়ার আওয়াজ হচ্ছে বটে। ঘড়ির দিকে তাকাল, বেলা দুটো। এসময় তো স্বামী গজাননের ফেরার কথা নয়,—পাশের বাড়ির রেডিওতে অনুরোধের আসর হচ্ছিল, খেয়াল হল, আজ শনিবার বটে। সম্ভবত অবনী অফিস থেকে এসেছে।

এতক্ষণে টুকাইও ঘুমিয়েছে। অমলা ঘুমন্ত টুকাইকে কোলে তুলে নিল,

—এই দুষ্টু ছেলে, এমন অসময়ে ঘুম কিসের রে? মাকে দেখতে যাবি? হাস-পাতালে মায়ের কাছে যাবি?

মায়ের নামে টুকাই ঘাড় নাড়লো,

—যাব।

টুকাইকে কোলে নিয়ে নিচে নেমে এল অমলা। পাশের ঘর থেকে শাশুড়ীর নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সদরের খিলটা খুলে অমলা ঘোমটা টেনে এক পাশে সরে দাঁড়াতেই অবনী প্রবেশ করলো।

দুপুরের রোদে অবনীর শরীর ঘামে ভেজা। অমলার কোলে ছেলে দেখে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে থমকে দাঁড়াল।

—কি টুকাইবাবু বন্ধুমার কোলে চড়ে খুব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ তো? এ্যাঁ?

বাপকে দেখে টুকাই সেইদিকে হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু ছেলেকে নেবার জন্য আগ্রহ দেখাল না অবনী। চলতে চলতে বললো,—দাঁড়াও বাবা, দাঁড়াও, জামা-

কাপড় ছাড়ি! গা হাত-পা ঘামে ভেসে যাচ্ছে। বাপরে বাপ, আজ কি গরম!

কথাগুলো বলতে বলতে অবনী চলে গেল। সদরটা খোলা রয়েছে, অমলা খিল তুলে উপরে চলে এল।

গরম দিনের বেলা, দীর্ঘ ও মন্থর গতিতে কাটছে। টুকাইকে রেখে অমলা সেলায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসলো। ব্লাউজের হাতায় এমব্রয়ডারী করছিল, ফুল তোলার কাজে কিছু বিঘ্ন ঘটেছে, আজ কদিন হল হলুদ রং-এর সুতো নেই।

একতলায় খোলা কলের ছড়ছড়ে আওয়াজ, চটির ফটফটে শব্দ, এটা-ওটা জিনিসের টুকিটাকি নাড়াচাড়া—। অমলা সেলাই-বাক্সর সুতো নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খোজাখুঁজি করলো। হলুদ সুতোর এতটুকু অবশিষ্ট নেই যাতে গোলাপী রং-এর ফুলের মাঝের জমিটুকু ভরাট করে।

অমলা খুঁজে পেতে কিছু পয়সা বার করে টুকাইকে কোলে নিয়ে সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। টুকাইকে নির্দেশ দিল,—বাবাকে ডাক তো!

—বাবা।

শিশুকণ্ঠের অস্পষ্ট শব্দ। অবনী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। নিচু থেকে দুধাপ সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে অমলা। অবনী ছেলের দিকে চাইলো।—কি খবর টুকাইবাবু? বেশ তো বধূমার কোলে আছ দেখছি আবার বাবা বাবা কেন?

একথার জবাব দেওয়া টুকাইয়ের ক্ষমতার বাইরে। অমলাই কথা বললো। মাথায় ঘোমটা, নত দৃষ্টি। বললো—ও নয়, আমি ডেকেছি।

পরমাশ্চর্য ব্যাপার। ছ-মাসের মধ্যে অবনী কোনদিন অমলাকে এমন সামনা-সামনি দেখেনি। ওর চোখে বিস্ময়ের চমক লাগলো। বললো,—আমার কি সৌভাগ্য!

অমলা ঠোঁট ওল্টালো,—কে জানে, দুর্ভাগ্যও তো হতে পারে।

—আরে বাবা, আপনি তো কথাও জানেন বেশ। অবনী সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এল। একটু হেসে বললো—অথচ আপনাকে নিয়ে মণির সঙ্গে আমি রীতিমত তর্ক করেছি। বলেছি, আপনার ইচ্ছে আছে বলেই সেই মধ্যযুগীয় প্রথায় এখনও চিকের ঘেরাটোপে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন।—মণি কিন্তু আমার কথাটা বিশ্বাস করতো না।

অমলা চোখ তুলে চাইলো,—কি বলতো?

—বলতো, আপনি খুব চাপা মেয়ে।

—হবেও বা! একজন মেয়ের কাছে আর একজন মেয়ের কোন কিছু চাপা থাকে না। কথা শেষ করে অমলা পয়সা সুদ্ধ হাতখানা বাড়িয়ে ধরলো,—আমায় একটা সুতো এনে দিতে হবে। হলুদ রং-এর। পারবেন?

অবনী একটু হসালো,—না পারার কিছু নেই। তবে পারাটা পছন্দ হলে হয়।

—মণির যদি পছন্দ হয়, আমারও না হয়ে যাবে না। হাঁ, ভাল কথা, মণিকে হাসপাতালে দেখতে যাবেন তো?

—যাব, আপনাদেরও যেতে বলেছে।

অমলা কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, উপর থেকে বিন্দুবাসিনীর গলা ভেসে এল—বৌমা, বলি অ বৌমা—

—যান আপনার ঘণ্টা বেজেছে। অবনী হাসলো।

অমলা উপরে চলে এল। বিন্দু-বাসিনী দিবানিদ্রা শেষে পানের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে। পুত্রবধূকে দেখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো,—কার সংগে কথা বলছিলে?

কার সংগে আবার কথা বলছিলুম। অমলার চোখে বিস্ময় ঘনালো,—টুকাইকে নিয়ে তো আমি ও ঘরে—

—ওঘরেই তো ছিলে, সেই তো শুনতে পেলুম, সামনের বাড়ীর হত-ভাগাটা বুঝি বৌদি বৌদি করে আবার জানলায় এসেছিল?

—সন্দেহ করা যাদের বাতিক তাদের কথায় আর কি জবাব দেব বলুন।

অমলা দাঁড়াল না, চলে গেল। কিন্তু গেলেও কথার মধ্যে হুল ছিল। সেটুকু রেখে গেল। বৌ-এর ধারণাতীত স্পর্ধায় বিন্দুবাসিনী প্রায় মূক। এক সময় ফেটে পড়লো—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি তাহলে মিথ্যে কথা বলছি? তোমার স্বভাবখানা আমার জানা নেই। আসুক আমার গজু, সত্যি মিথ্যে সেইখানে হবে।

গজু ওরফে গজানন বিন্দুবাসিনীর ছেলে। ঐ এক ছেলে নিয়েই বিধবা বিন্দুবাসিনী। ছেলেকে মনের সাধে মানুষ করার জন্য সযত্ন প্রচেষ্টা করেছিল। পয়সার তেমন অভাব নেই। স্বামীর বড়-বাজারে ভুষিমালের দোকান আছে। তারই দৌলতে কলকাতার উপকণ্ঠে একখানি বাড়ী আছে, সুতরাং সংসার চালনার জন্য অভাবগ্রস্ত হবার আশা কম।

কিন্তু বিত্ত থাকলেও বিদ্যাস্থান চিরদিনই গজাননের দুর্বল। বিন্দু-বাসিনী দুবছরের শিশুর হাতে প্রথম ভাগ তুলে নিয়ে অচল অধম পড়াবার জন্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে চেষ্টা কোনদিনও সফল হয়নি।

বার তিনেক ম্যাট্রিকে ফেল করার পর গজানন যথারীতি পিতার ভুষিমালের দোকান আলো করে আসছে। আগেই বলেছি, পয়সার অভাব ছিল না, সুতরাং বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে বিয়েও করেছে। আজ প্রায় দশ বছর হয়ে গেল, ওদের বিবাহিত জীবন কাটছে। কিন্তু এখনও অবধি ওদের কোন ছেলেমেয়ে না হওয়ায়—তার সমস্ত নির্যাতনের দায়টা অমলাকেই একা বহন করতে হয়।

অমলা সমস্ত জিনিসটা হাসিমুখে বহন করারই চেষ্টা করে। ছেলে হয়নি

বলে বেদনায় চোখের জলে ঘরের ধুলো না ভিজিয়ে বরং অতি স্বচ্ছন্দে গণ্ডিবদ্ধ ঘরটুকুর মধ্যেই ঘুরে ফিরে বেড়ায়। নিজেকে সাজায়, দেখে হয়তো আত্ম-সর্বস্বর মত নিজেকে ভালওবাসে। অথচ স্বামীর উপর কোন প্রীতি শ্রদ্ধা নেই। সমস্যাটা এইখানেই।

গজাননের দোকান থেকে ফিরতে রাত হয়। আজ যেন একটু বেশী হয়েছে। অমলা রান্না-বান্না সেরে ঘরের মধ্যে বসেছিল, বিন্দুবাসিনী বারান্দায়।

গজানন দোকান থেকে ফিরে সোজা মায়ের কাছে যায়, হাতের জিনিসপত্র রাখে, হাত-মুখ ধোয়, বিশ্রাম করে—অমলা এসে জলখাবার গুছিয়ে দেয়।

আজ অমলা গজাননের আগমন কান পেতে শুনলো, কিন্তু উঠলো না। একটু পরে গজানন নিজেই এল। চোখ-মুখ কুঞ্চিত, রাগত।—আজ আবার মায়ের সঙ্গে কি বাঁধিয়েছিলে? দুপুরে কার সঙ্গে কথা বলছিলে শুনি?

সেলাইয়ের সুতোটা দাঁত দিয়ে কেটে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভাবে অমলা বললো,—যার সঙ্গে ইচ্ছে।

কেঁচোকে ফণা তুলতে দেখে বিস্মিত হয় মানুষ। গজানন বৌ-এর সাহস দেখে থতিয়ে গেল। বললো,—ভদ্দর ঘরের বৌ-ঝি যার সঙ্গে ইচ্ছে কথা বলবে? বাঃ, বাঃ, অনেক গুণ হয়েছে তো! বাঃ বন্ধুর সঙ্গে মিশে খুব বাহার খুলেছে দেখছি! ঘর থেকে এবার রাস্তায় নেমে পড়। সেইটুকুই তো বাকি আছে।

অমলা সূঁচে সুতো পরাতে পরাতে বললো,—তোমাদের জ্বালায় এবার তাই হবে।

অমলার দুর্জয় সাহস এবং নির্লিপ্ত ভঙ্গিমা গজাননের গোল চোখে ভয়ের আমেজ মেশালো। বললো,—কি, এবার কি হবেটা শুনি?

—যা তোমরা চাও, যা তোমরা ভাব। অমলার গলার স্বর হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে এল। বললো,— যা তোমাদের মুখে আসবে তাই বলবে, সন্দেহ করবে, মিথ্যে বলবে, এর বেশী তো কোনদিন করনি,—তাই যা করেছ, তাই হবে।

গজানন বৌকে ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসার প্রকাশ সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ছিল। খানিকটা লেখাপড়া-জানা বুদ্ধিমতী স্ত্রীর মনের নাগাল পাওয়া যেন ওর সাধ্যাতীত! সুতরাং বৌ-এর কাছে আজ সভয়ে ঘন হয়ে বসলো,—কি হবে, কি করতে চাও সেইটাই খোলসা করে বল না।

—কি আবার বলবো? যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাব।

হাতের সেলাইপত্র গুটিয়ে অমলা উঠে গেল সামনে থেকে। বেশী কথা বলার মত প্রবৃত্তি ছিল না, ইচ্ছা তো নয়ই। শুধু হঠাৎ কেমন সারা মন জুড়ে কিছু না-পাওয়ার বেদনা অস্থির করে মারতে লাগলো। সমস্ত বুকখানা জুড়ে সব কিছু ফাঁকা হয়ে যাবার যন্ত্রণা উদ্বেল করে তুলতে লাগলো যেন। এবং তারই সূত্র ধরে বহু দূরে থাকা কোন গণ্ডগ্রামের ততোধিক গণ্ড কোন ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার বাবা, ষ্টেশন-সংলগ্ন ক্ষুদ্র কোয়ার্টারে মা, বোন, ছোট ভাইগুলির আবেগমধুর ভালবাসা বড় বেশী স্মরণীয় হয়ে চঞ্চল করে তুললো।

সেদিন রাতে অমলা খেল না। স্বামী, শাশুড়ীকে খাইয়ে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে জল ঢেলে রান্নাঘরে শেকল তুলে চলে এল। ঘরে এসে দেখলো গজানন প্রচণ্ড বেগে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। একটা মাদুর পেতে মেঝের উপর শুয়ে পড়লো অমলা।

পরের দিন সকালবেলা, ভাল করে তখনও কুয়াশা কাটেনি, অমলা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। সারা রাত ভাল করে ঘুম হয়নি, তার উপর না-খাওয়া এবং মেঝের মাদুর-শয্যা—সব মিলিয়ে শরীর দুর্বল ও আড়ষ্ট করে তুলেছে।

নীচে নেমে এল অমলা। বাড়ির পিছনে খিড়কি দরজার কাছে পাতকুয়া, জল আনতে হবে। জল আনার কাজটি সাধারণতঃ ঝিই করে, তবু আজ অমলা নিজেই গেল।

পিছনের খিড়কি দরজা খোলা। দাঁড়ি বালতি ডুবিয়ে জল তোলার আগেই দাঁতন করতে করতে অবনী এসে দাঁড়াল।—কি আশ্চর্য! আপনি যে?

অমলা মাথার উপর কাপড় তুলে দিল। —কেন আসতে নেই?

—আসতে আছে কি নেই সে আপনারাই জানেন। আজ বুঝি খুব সকালে ঘুম ভেঙেছে?

—কাল ভাল ঘুম হয়নি। যা গরম গিয়েছে। বাপরে!

—গরমের দোষ দিয়ে লাভ নেই। অবনী সকৌতুকে হাসলো,—ঘুম কেন হয়নি জানা আছে। মান-ভঞ্জনের পালা কিছু কিছু কানে যাচ্ছিল। উঃ কি তোষামোদ!

কথাগুলো বলতে বলতে হাতের দাঁতনটা ফেলে অমলার সামনে হেঁট হয়ে হাত পাতলো অবনী।

—হাতে একটু জল দিন তো!

অমলা হাতে জল ঢালতে ঢালতে চাপা গলায় বললো,—কেউ যদি দেখে ফেলে।

—আমিও তো তাই ভাবছি। অবনী হাত-মুখ ধুয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। —হঠাৎ আপনার এত সাহস দেখে আমি সুদ্ধ অবাক হচ্ছি। যাকগে সে কথা। কাল খাননি কেন?

—কি হবে সে কথা শুনে। অমলা অন্যদিকে চাইলো—আমার ভাগ্যের

অন্ধকারে আপনি কিছু আলো আনতে পারবেন না। শুধু দুঃখ বাড়বে।

—তবু!

—বললাম তো কোন লাভ নেই। একটা অচল বস্তুর সঙ্গে একটা সচল বস্তু মিশে যখন এক হয়ে যাবার দশায় ধরে—সেই সময় সামনে এসে যদি কেউ মনে পড়িয়ে দেয়,—তুমি যা হচ্ছ তুমি তা নও।—সেই নয় এদিক না ওদিক হবার যন্ত্রণা আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

অমলা ঠিক কি বলতে চাইছে, অবনী বুঝে উঠতে পারলো না। সুতরাং অমলার কথার জবাব না দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

কথা শেষ করে অমলা বালতিটা হাতে তুলে নিল। উপরে পায়ের শব্দ, কথার কিছু কিছু আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে,—গজানন ও বিন্দুবাসিনী উঠে পড়েছে বোধহয়।

যাবার সময় অমলা একটু হেসে বললো,—টুকাই উঠলে উপরে পাঠিয়ে দেবেন।

রবিবারের সকাল। ক্ষুদ্র সংসারে কাজ কিছু বৃহৎ নয়, তবে এ কাজের মধ্যে কোথাও বৈচিত্র্যও নেই। সেই একঘেয়ে চিরাচরিত কাজে ছক-বাধা গণ্ডিবদ্ধ পরিবেশ। গজাননের কাজের রবি, সোম নেই, সুতরাং ভুষিমালের আড়তদারীতে হাজিরা দিতে রবিবারের সাতসকালেও ভাতের হাঁড়ি চাপাতে হয়।

গজানন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই হাঁক-ডাক চেঁচামেচি ব্যস্ততা। হাতের কাজ একবার শেষ করে আনলেও শেষ হয় না। গজানন চিৎকার করে সে কাজের কথা অস্বীকার করছে, সুতরাং গণ্ডমূর্খ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মানুষটা বেরিয়ে না যাওয়া অবধি বিরক্ত অমলার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার উপায় নেই।

রবিবারের দুপুরবেলা বিন্দু-বাসিনীকে রামায়ণ পড়িয়ে শোনাচ্ছিল অমলা। বিষয়বস্তু স্বামীর পতনে মন্দোদরীর বিলাপ। অমলা আপন মনে পুঁথি পড়ে চলেছে, এদিকে শাশুড়ীর নাক থেকে ফুরুৎ ফুরুৎ করে শব্দ হচ্ছে।

অমলা জানে ঘুমের সুযোগে পড়া থামালেই বিন্দুবাসিনীর ঘুম ভাঙবে। সুতরাং সে চেষ্টা না করে অমলা পড়েই চলেছে।

কিন্তু বইয়ের দিকে নজর থাকলেও সতর্ক কানটা নীচের দিকে পড়ে আছে। টুকাই কাঁদছে। চিৎকার করে মা মা করে কাঁদছে। অথচ অবনী ঘরে থাকা সত্ত্বেও ওর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আরও অনেকক্ষণ পড়ার পর লক্ষ্য করলো অমলা শাশুড়ীর ঘুম গাঢ় হয়েছে। নাকের মৃদু শব্দ প্রবলতর। বই নামিয়ে আস্তে করে উঠে দাঁড়ায় অমলা। শাশুড়ীর ঘুম ভাঙবার সম্ভাবনা নেই, ও ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার চিকের কাছে এসে দাঁড়াল। চিকের ফাঁক দিয়ে অবনীর ঘর স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে অবনী শুয়ে, পাশে ক্রন্দনরত টুকাই।—ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে। কিন্তু পারছে না, অবনী ওর একখানা পা মুঠি করে চেপে ধরে আছে।

ঘুমালে মানুষ কি অসহায় হয়ে পড়ে! মনে মনে কথাটা যেন উচ্চারণ করলো অমলা। তারপর এক সময় নীচে নেমে এল। খুব লঘু পায়ে।

অবনী সম্ভবতঃ ঘুমাচ্ছে। নতুবা অলস ভাবে চোখ বুঁজে আছে,—বাপের হাতে বন্দীত্ব দশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সমানে চেঁচিয়ে চলেছে টুকাই।

কাছে গিয়ে টুকাইকে নিতেই হাতে একটা টান পড়লো। অবনী চোখ চেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসেছে। চুলগুলো এলো-মেলো, ঈষৎ ঘুমের আমেজ থাকায় চোখের দৃষ্টি রক্তাক্ত। বললো,—কি আস্তে পায়ে এসেছেন, আমি শুনতে পাইনি।

—ঘুমোলে মানুষ শুনতে পায়?

অবনী একটু অপ্রস্তুত হাসলো—কাল টুকাইয়ের জন্যে ঘুমোতে পারিনি। সারা রাত জ্বালাতন করেছে,—তাই আজ কি রকম যেন—

—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? অমলা একটা বিচিত্র কায়দায় ঠোঁট উল্টে দিল।—বাব্বা, মানুষকে দেখে মানুষ এমন ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়! আপনি ঘুমিয়েছেন, আমি এসেছি। তাতে কি হয়েছে। আমি কি বাঘ?

উত্তর দিতে অবনীর চোখ দুটো একবার জ্বলেই নিবেছে। বললো,—বাঘ না হোক বাঘিনী তো বটে!

সন্ধ্যা তখনও উত্তীর্ণ হয়নি। ঠাকুর-ঘরে দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাচ্ছিল অমলা, নীচ থেকে গজানন চেঁচাচ্ছে।—অ মা, বলি ওগো, আরে বাবা, এরা সব আছে না মরেছে।

বিন্দুবাসিনী ছাদে গিয়েছে। পাশের বাড়ির কার সঙ্গে যেন কথা বলছে, শোনা যাচ্ছে।—সুতরাং অমলাই বাইরে বেরিয়ে এল। ততক্ষণে নীচ থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে গজানন উপরে উঠে এসেছে।

অমলা জানতে চাইলো।

—ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

—কাকে এনেছি দেখ না! মা কৈ?

—ছাদে।

মায়ের জন্য মাথা না ঘামিয়ে, গজানন অন্ধকার সিঁড়ির দিকে তাকালো,—ওগো, শুনছো এদিকে চলে এস, কোন ভয় নেই, ও আমার ওয়াইফ; ভাল লোক। চলে এস—

গজাননের কথা শেষ হবার আগে একটি বুড়ী উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। কুঁজো হয়ে গেছে, শীর্ণ চেহারা, মাথার চুল শনের মত পাকা। পরণে একখানি মলিন থান কাপড়।

বুড়ী কোন মতে উঠে এসে, অমলার সামনে হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেললো। বললো,—ভদ্দরলোকের বৌ মা, শুধু অবস্থার ফেরে পড়ে—আমি তোমার সব কাজ করবো।

অমলা ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত কিছুই বুঝতে পারলো না। গজানন ওর গোল
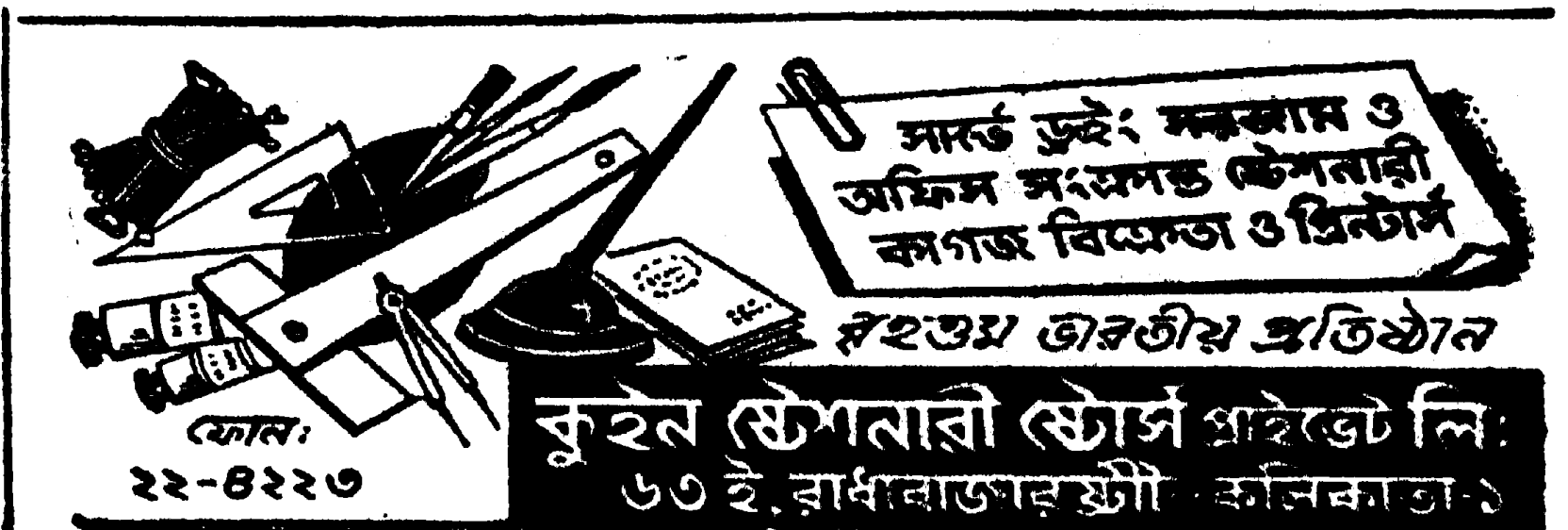
গোল চোখ আরও গোল করে বোঝালো, —বুড়ী কিন্তু আসল কায়েত, আমি যাবা যাকে তাকে আনিনি। মাকে তুমি একটু বুঝিও!

মাকে বোঝালেও এবং বামুন কায়েত সমস্যার মীমাংসা হলেও আসল ব্যাপারটার ধোঁয়া অনেক পরে স্বচ্ছ হল।

রাতে শুয়ে ঘটনাটা বলছিল গজানন। পূর্ববঙ্গের কোন দেশে যেন বুড়ীর বাড়ি। দেশ ভাগাভাগীর পর কলকাতায় এসে আস্তানা গেড়েছিল। একলা নয়, ছেলে-বৌ, নাত্তি-নাত্তনি। সংসারটি বড়ই বলা যায়। কিন্তু সে সংসার চালাবার ক্ষমতা ছেলের নেই। ছেলে ছুতোর-মিস্ত্রীর কাজ করে, সারাদিন যা পায় তাতে দিন চলে না। ফলে নিজেদেরই অর্ধাহার, অনাহার। তার মধ্যে বুড়ীকে কেউ পছন্দ করে না। ইতিমধ্যে বুড়ীর গা, হাত, পা সব ফুলে যায়। পেটের অসুখ। অনেক চেষ্টা-চরিত্ত করে বুড়ীর ছেলে বুড়ীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। বুড়ী অনেক-দিন হাসপাতালে ছিল, অসুখও সারে। ছুটি পেয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে এসে ছেলে-বৌ কাউকে আর দেখতে পায় না। সেই থেকে বুড়ী হন্যে হয়ে পথে পথে ঘুরেছে। পথেই গজাননের সঙ্গে আলাপ। বুড়ো হয়েছে বলে যে কাজ-কর্ম করতে পারে না—একথা সত্যি নয়। ভাল মত দুটো পেট পুরে খেতে পেলে গায়ে-গতরে এখনও বেশ খাটতে পারে নীরদবালা।

রাতে শুয়ে আস্তে আস্তে বোঝাচ্ছিল গজানন। নিজের ভাষণ শেষ করে অন্ধকারে পানের ছোপ ধরা দাঁত মেলে হাসলো। বললো,—ধরতে গেলে বুড়ীর তিন কুলে কেউ নেই, তুমি যেন কিছু বকাঝকা করো না বাপু।

অমলা কি যেন ভাবছিল। আস্তে গলায় বললো,—আমি কি শুধু সবাইকে বকাঝকাই করি, ভালবাসতে জানি না?

—না, তা মানে—ইয়ে, গজানন ভয়ে ভয়ে ঢোক গিললো। বললো,—তা ছাড়া রাতদিনের কাজেকর্মে তোমারও তো একজন লোকের দরকার।

—আচ্ছা থাক, আমার দরকারের হিসেব আর তোমায় কসতে হবে না।

একটা গভীর প্রশান্তিতে চোখ বুজলো অমলা।

চারদিন পরের ঘটনা। মণিমালার একটি মেয়ে হয়েছে। লাল রঙের মেয়ে ন্যাকড়ায় জড়ান, তারই মধ্যে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। কদিন পর, আজ একটু আগে মণিমালা হাসপাতাল থেকে এসেছে, অবনী আনতে গিয়েছিল। মণিমালা শোবার ঘরে একপাশে আলাদা বিছানায় বসে, অমলা এল, ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে মাথার কাপড় একটু নামালো। - কর্তা নেই তো!

মণিমালা হাসলো—বাবারে বাবা, থাকলেই কি তোমায় খেয়ে ফেলে দিত। ঢং!

"[illegible] কি দোষ! ছাগল কি আর ইংরিজি পড়তে পারে।"
শিল্পী—চণ্ডী লাহিড়ী

—ঢং তো ঢং। অমলা একটু কাছে এগিয়ে এল,—মেয়ে কেমন হয়েছে দেখাও।

—দেখাব কেন? একদিন গিয়ে-ছিলে?

মণিমালার অভিমানসূচক কথার কায়দায় অমলার মুখও বিষণ্ণ হল। —কি করে যাব ভাই, সব তো জান।

মণিমালা সবটুকুই জানে বটে। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে, কাপড়ের পুঁটুলী উঁচু করে ধরলো।—মেয়ের রং লাল হয়েছে ভাই, এ নির্ঘাৎ কালো হবে

—তা সবাই কি ফর্সা হয়।

—তা তো হয় না বুঝলাম, কিন্তু মেয়েকে তো পার করতে হবে। এক রাশ কড়ি লাগবে যে। আসবে কোথা থেকে? মেয়ের বাপ তো গরীব কেরানী।

—মেয়ের বাপকে এখন থেকেই কড়ি জমাতে বল।

অমলা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে পরিচিত জুতোর আওয়াজ পেতে থেমে পড়লো। অবনী আসছে।

অমলা মাথার উপর কাপড় টেনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। —আমি যাই মণি, —আর হ্যাঁ, তুমি সেদিন যাবার সময় টুকাইয়ের বাপকে দেখাশোনা করার কথা বলে গিয়েছিলে। আমি কিছুই করতে পারিনি। একদিন একবেলা দুটো খেতে অবধি দিতে পারিনি।

—তাতে কি হয়েছে,—মণিমালা শশ-ব্যস্তে বাধা দিল,—তখন মরণাপন্ন অবস্থা, কি বলেছি না বলেছি খেয়াল নেই, নয়তো তোমার অবস্থা কি আমার অজানা।

জুতোর শব্দ আরও কাছে এগিয়ে এল। বিষণ্ণ গলায় অমলা বললো—দূরে দাঁড়িয়ে দেখতাম লোকটা হোটেলে খাচ্ছে, কিন্তু কি বলবো, এমন অবস্থা হয়নি যে, শাশুড়ীকে বলে কিছু করি—

জুতোর শব্দ প্রায় ঘরের কাছে এসে গেছে। লজ্জায় কুণ্ঠিত অমলা কথাগুলো সব শেষ না করেই অবনীর পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেল।

দেশে বিদেশে

বারুদ :

কথাটা রাজ্যের এক মন্ত্রীর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। বলা যায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়েছে। কেননা, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তির পক্ষে এই সত্যটি চেপে [illegible] শক্ত। সে পরিবেশ হচ্ছে পশ্চিম বাংলার বেকার সমস্যা। আরও সোজা এবং বাংলাভাষায় বলতে হয় বাঙালীদের বেকার সমস্যা। একথাটা আজ স্বীকার করা এবং পরিষ্কার ভাষায় বলা দরকার যে, আজ বাঙালীদের মধ্যে যে বে[illegible]-সমস্যা তার বহুলাংশই অবাঙালী লোক-নিয়োগকর্তাদের বাঙালী-অপ্রীতি অথবা অবাঙালীদের স্বদেশবাসীপ্রীতি। সন্দেহ নেই, ঐতিহাসিক ঘটনা বিবর্তনে আজ বাংলা দেশের শিল্পসম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত অবাঙালীদের হাতে এবং সে শক্তি তাঁরা মেধা, কৃতিত্ব ও যোগ্যতার সংগেই অর্জন করেছেন। কিন্তু সে তাঁদের মালিকানার বা পরিচালনার কাঠামো—সে কৃতিত্ব কেউ দাবী করছে না—দাবী এই, অন্যান্য কাজে যে-লোকের দরকার তা এদেশে বাঙালীদের মধ্য থেকে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের নেওয়া হোক। এখানে উপযুক্ত ও যোগ্য লোক পাওয়া গেলে রাজ্যান্তর থেকে কেন লোক আনা হবে, এই প্রশ্ন। যদি এই জেদ হয় যে, আমি মালিক আমার যাকে খুসী তাকে রাখব, তবে সে কোন আপোষের কথা হবে না, তাতে হৃদয়বত্তারও পরিচয় পাওয়া যাবে না। আজ পশ্চিম বাংলায় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় তিন লক্ষ বেকারের নাম পড়েছে। যাদের পড়েনি তাদের সংখ্যাটাও অনুমেয়। কেননা, শুধু নাম লেখাতে যে হয়রাণি তা অনেকেই ভুগতে রাজী নয়, অনেকে অজ্ঞ, অনেকের লজ্জা এবং অনেকের সংস্কার নাম-লেখানোয় বিঘ্ন ঘটিয়েছে। কিন্তু ঐ তিন লক্ষের দিকে তাকিয়েই শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সত্তার লোক-নিয়োগকর্তাদের বলেছেন—ও বারুদের স্তূপ।

হিসেবে দেখা যাচ্ছে সরকারী ক্ষেত্রে ১৯৬০ সালের জুন থেকে ১৯৬১ সালের মে পর্যন্ত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ ১১,৬৭৯ জনের কাজ হয়েছে, কর্মখালির নোটিশ পাওয়া গেছল অবশ্য ২৩,৪৪৪; পক্ষান্তরে বেসরকারী ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে মাত্র ৬,০৩৯ জনের যেখানে কর্মখালির নোটিশ ছিল ২৬,৮৪২। অর্থাৎ বেসরকারী ক্ষেত্রে লোকনিয়োগকর্তারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ লোক নিতে —এবং বলা বাহুল্য, এই প্রার্থীদের অধিকাংশই বাঙালী—নারাজ। এদেশের লোকের কি হয় না হয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অন্ধ থেকেই তাঁরা লোক নিয়োগ করবেন এবং শ্রমমন্ত্রীর বৈঠকে কেউ কেউ নাকি একটু মেজাজও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কি রাস্তায় রাস্তায় পল্লীতে পল্লীতে ক্রমবর্ধমান বেকার বাহিনীর বিপদ বাড়িয়ে যাবেন?

গাগারিন :

আজ আমরা বৃটিশ শাসনমুক্ত: আজ আমাদের স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে, ও জাতটি যে বড় সে তাদের উদার হৃদয়-বত্তার জন্য। সোভিয়েট রুশিয়ার সংগে তাদের মতাদর্শের শত ব্যবধান আছে, আজ বার্লিন প্রশ্নে তারা দুই বিরুদ্ধ শিবিরে, কিন্তু এমন একটা জায়গা আছে যেখানে বৃটিশ প্রাণশক্তি কোন ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রসীমা মানে না। লন্ডনে যখন মহাকাশবিজয়ী গাগারিন নামলেন হাজার হাজার লন্ডনবাসী মুক্ত কণ্ঠে হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল—সোভিয়েট দূতাবাস পর্যন্ত বিমান ঘাঁটি থেকে ১৫ মাইল পথের পাশে-পাশে গাগারিন অকুণ্ঠ অভ্যর্থনা পেয়েছেন। যোগ্য লোকেরা, গুণী লোকেরাই গুণী ও যোগ্য লোকের সমাদর জানে। ইংলণ্ডের রাণী মেজর উরি গাগারিনকে ভোজসভায়ও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মেফেয়ার হোটেলের সব চাইতে ভাল কামরায় বিনা পয়সায় থাকার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন হোটেলের কর্তৃ-পক্ষ; অবশ্য গাগারিনের পক্ষে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এটি একটি গুণগ্রাহিতার দৃষ্টান্ত।

শ্রমিকেরা যখন কারখানা থেকে ছুটে বেরিয়েছেন, অফিসভবন থেকে কেরাণীরা রাস্তায় এসেছেন, গিন্নীরা 'হাতা-খুন্তি' ফেলে অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন কি তাঁরা একবার বিশ্বব্যাপী মতদ্বৈধের কথা মনে রেখেছেন?—না, তাঁদের মতোই একজন মানুষ বহু স্বপ্নের বহু কল্পনার মহাশূন্য থেকে ফিরে এসেছে, বিজ্ঞান-জয়ের মূর্তপ্রতীক সেই মানুষটিকে দূর-দেশাগত আত্মীয়ের মতো কৌতূহল ও আগ্রহে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এসেছেন? রাষ্ট্র যাবে, ভূগোলও বদলাবে, কিন্তু মানুষের কীর্তি সবার ওপরে—ওর কোনো রাষ্ট্রিক বা ভৌগোলিক সীমা নেই। বৃটিশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে লর্ড হ্যালিসামের বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের সচিব মিঃ ফ্রান্সিস টার্ণবুল গাগারিনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "মহাশূন্যে প্রথম মনুষ্যচালিত ভ্রমণ-আধারে আপনি যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন তা বৃটিশ জন-সাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছে।" গাগারিনও যোগ্য উত্তর দিয়েছেন : "আমরা এই সাফল্য কেবলমাত্র সোভিয়েট জনসাধারণের সাফল্য ব'লে মনে করি না, পৃথিবীর সকল জাতির প্রগতি, সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তির লক্ষ্যে একে আমরা মানব জাতির সাফল্য বলেই মনে করি।"

গাগারিন জাপানেও আমন্ত্রিত হয়েছেন। ভারতবর্ষেও আমন্ত্রিত হয়েছেন। মানুষের প্রগতিপথে গাগারিন আজ বিশেষ অর্থবহ; আমরা এখন গাগারিনের যুগে বাস করছি—সে যুগ গতির যুগ, মহাব্যোমপথে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে আনা-গোনার যুগ। গাগারিনকে উপলক্ষ্য ক'রে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষারই পরিতৃপ্তি চাইছে পৃথিবীর মানুষ গাগারিনকে প্রত্যক্ষ দর্শনে।

চুরি :

রেলপথে যাত্রীদের আনাগোনা অন্ধকারে বিপদসঙ্কুল ক'রে দিয়ে চোরেদের সুদিন চলছে। কিন্তু কি ক'রে যে এ বিপদ কাটানো যাবে এবং যাত্রীদের আনাগোনার পথ আলোকিত ও নির্বিঘ্ন করা যাবে তাই ভেবে ভেবে রেলকর্তারা একেবারে চুপ মেরে যাবার উপক্রম। শুধু হাওড়া-শেয়ালদা সেকশানেই এই অবস্থা, স্থানান্তরের কথা বাহুল্য। এ বছরেরই ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এপ্রিল মাসে হাওড়া সেকশানে ৪৭০০০ টাকার বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি চুরি হয়েছে, আর, শেয়ালদা সেকসানে লোকসানের (বা চুরির) পরিমাণটা হচ্ছে ৬৩,০০০ টাকা—অর্থাৎ দুইয়ে মিলিয়ে ১,১০,০০০ টাকা!! কিন্তু এতো শুধু একটি দ্রব্যের হিসেব, চুরির মাল তো আছে, আয়না, আসন, জলপাত্র প্রভৃতি চুরিতে ঐ তিন মাসে একমাত্র শেয়ালদা সেকসানেই ৪২,০০০ টাকা খোয়া গেছে এবং ৯২০টি গাড়ী এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে রেল কর্মচারীদের যোগসাজসে এই চুরি হয়ে থাকে। উঁচু ক্লাশে আর এক ধরণের অপরাধ প্রবণতা দেখা যায়। দেখা যায়, এখানকার আসনগুলো ছুরি দিয়ে কাটা নয়তো ফুটো করা। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান হ'লে কি হবে অপরাধপ্রবণ বিকৃতি আছে যে মাথায়। কিন্তু তাও বোধ

হয় নয়। মূল কথা সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে কোন দেশপ্রেম নেই, সচ্চরিত্রও নেই।

পাগল :

প্লাবন-বিক্ষুব্ধ কাবেরী নদী ফুলে ফেঁপে উন্মত্তের মতো ছুটে চলেছে। এরই মধ্যে একটি মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাগল। তাকে চিকিৎসার জন্য ভবানীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ২৩॥ ফুট অবধি স্ফীত জলস্রোতের মধ্যে কাউকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বললে বা দেখলে সবাই একবাক্যে বলবে পাগল। আত্মীয়স্বজন আর্তনাদ ক'রে উঠল। কিন্তু কে তাকে উদ্ধার করতে যাবে? পাগলামি! আত্মীয়-স্বজন জেলা কালেক্টরের কাছে আবেদন জানালো, সাহায্য করুন, তিনি বললেন, এই দারুণ বন্যায়, পাগল নাকি?

সবাই সিদ্ধান্ত করলেন, পাগল মারা গেছে, আত্মীয়স্বজন শোকাবেশ ধারণ করল। সন্ধ্যে নাগাদ খবর হল, সাত মাইল ভাঁটিতে পল্লীপালয়ম সেতুতে সে নিরাপদ জীবন নিয়ে আছে; মৃত্যুস্পর্শের কোন চিহ্ন নেই। কালেক্টর শুনে বললেন, সন্তরণ নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, কিন্তু এ কীর্তি তো কেউ স্বীকার করবে না। লোকটা পাগল কিনা, তাই।

পান :

আমাদের দেশে তিন সত্য বলে একটা কথা আছে। কোন কথার পরে পরেই দেওয়ালের অলক্ষ্য কোনো কোণে যদি টিকটিকি ডেকে ওঠে তো বক্তা তিন টোকা দিয়ে বলে, তিন সত্য। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনবার একটি বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু একটি খবরে জানা গেল আমাদের প্রতিবেশী কোন এক রাজ্যের কোথাও কোথাও এমন প্রথা আছে যে, একটা পান দু'টুকরো করলেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। যাদের কিছুতেই বনিবনাও হচ্ছে না তারা অন্তত এক মুহূর্তের জন্য একটা পানকে স্পর্শ করে মিলিত হবে, তারপর একদিকে স্বামী আর একদিকে স্ত্রী ঐ পানটাকে বিপরীত দিকে টানতে থাকবে—পান লোহা নয়, তাই ওটি অসহ্য টানে নির্ঘাত দু'টুকরো হয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের টানে ওদের যে বিয়ে হয়েছিল অথবা বিয়ের পর যে টান (হয়তো) হয়েছিল তাও ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে যাবে।

তিন তুড়ি মেরে তিন শব্দোচ্চারণের চাইতে এটা কিছু ব্যয়-সাপেক্ষ, কেননা, অন্তত একটা পান তো ছিঁড়ে নষ্ট করতে হয়। সংস্কারবশত নিশ্চয়ই এ গ্রামে পান কেউ খাবে না।

ঘটনা প্রবাহ

ঘরে—

৭ই জুলাই—২২শে আষাঢ় : মাদ্রাজ রাজ্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব বন্যা—কাবেরী নদীর জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব—কেরলে বন্যায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা—সহস্র সহস্র লোক সাহায্য-কেন্দ্রে স্থানান্তরিত।

কাশ্মীর সীমান্তে পাক সৈন্যদের ঘন ঘন গুলীবর্ষণ—যুদ্ধবিরতি সীমা অতিক্রম করিয়া খাদ্যের সন্ধানে পাকিস্থানীদের ভারত প্রবেশ।

আগামী সাধারণ নির্বাচন প্রসঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মনীতি ঘোষণা—পি-এস-পি'কে বাদ দিয়া বামপন্থী নির্বাচনী জোট গঠনের সিদ্ধান্ত—কলিকাতায় চার দিনব্যাপী বৈঠকের পর পার্টির রাজ্য-পরিষদ কর্তৃক বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

কলিকাতা বন্দরের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্য—দুই কোটি দশ লক্ষ ডলার ঋণদানের কথা ঘোষণা।

৮ই জুলাই—২৩শে আষাঢ় : কাবেরী বদ্বীপ অঞ্চলে বন্যার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ—তাঞ্জোর শহরে (মাদ্রাজ) ছয় হাজার বন্যার্তের ভীড়—বৈতরণী ও ব্রাহ্মণী নদীর জলোচ্ছাসে উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত।

কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে কর বৃদ্ধি প্রস্তাব পৌরসভা কর্তৃক অগ্রাহ্য—অবস্থা সমীক্ষার জন্য পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে কমিটি নিয়োগের কথা।

'যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার ভিত্তিতে কাশ্মীর বিভাগ পাকিস্থান মানিবে না'—দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্র, সীমান্ত অঞ্চল ও পুনর্বাসন মন্ত্রী লেঃ জেনারেল কে এম শেখের ঘোষণা।

মণিপুরের উখরুল মহকুমায় তিনটি সার্কেল সংরক্ষিত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা।

৯ই জুলাই—২৪শে আষাঢ় : পাকিস্থানের আবার কাশ্মীর আক্রমণের গভীর ষড়যন্ত্র—'আজাদ কাশ্মীরে' ব্যাপক সামরিক তৎপরতা।

বন্যার তাণ্ডবে উড়িষ্যার ১০২টি গ্রাম ও ত্রিশ হাজার নর-নারী বিপন্ন—মাদ্রাজে কাবেরী নদীর প্লাবন অব্যাহত—ভাঙ্গনরোধে সৈন্যবাহিনী তলব।

কাছাড়ে মুসলমানদের বেপরোয়া আচরণ—পুলিশের নিকট হইতে ধৃত বন্দীদের ছিনাইয়া লইবার দলবদ্ধ চেষ্টা—শিলচরের অনতিদূরে ঘটনা।

দ্রাবিড়দের জন্য পৃথক রাজ্য 'দ্রাবিড়ানন্দ' গঠনের দাবী—স্বতন্ত্র বিদর্ভ রাজ্য গঠনের দাবীতে নাগ-বিদর্ভ আন্দোলন সমিতির নেতার অনশন।

১০ই জুলাই—২৫শে আষাঢ় : জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ভাবগত সংহতি বিধানের গুরুত্ব—সর্বস্তরের সরকারী কর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আবেদন।

উড়িষ্যার বন্যায় বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিমানযোগে খাদ্য সরবরাহ—কটক হইতে ভীত নরনারীদের পলায়ন—কাবেরীর বন্যায় তাঞ্জোরে (মাদ্রাজ) দুই লক্ষ লোক বিচ্ছিন্ন—সৈনিকদের সাহায্যে উদ্ধারকার্য পরিচালনা—আসামে ব্রহ্মপুত্র ও দিহং নদীতে প্লাবন।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের (পশ্চিমবঙ্গ) স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল (১৯৬১) প্রকাশ—শতকরা ৪৩ জন রেগুলার ও ২৫.৩ জন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ।

পি-এস-পি'কে বাদ দিয়া নির্বাচনী ঐক্য গঠন—কলিকাতায় ৮টি বামপন্থী দলের প্রতিনিধিদের বৈঠক।

১১ই জুলাই—২৬শে আষাঢ় : ভারতের বৈদেশিক সাহায্যলাভের বিরুদ্ধে পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের কুৎসা রটনা—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিস্ময় প্রকাশ—পরিস্থিতি ঘোরালো হইলে তাহার জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকিবার আহ্বান।

কাবেরীর বন্যায় তাঞ্জোরের উর্বর শস্যাঞ্চল জলাশয়ে পরিণত—৭২ হাজার বন্যার্ত নর-নারীর শহরে আশ্রয় গ্রহণ—কেরলে বন্যায় তিন কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট।

'কাশ্মীর যুদ্ধ-বিরতি রেখা লঙ্ঘন করা হইলে ভারত সর্বশক্তি দ্বারা বাধা

দিবে'—পাকিস্থানের প্রতি কেন্দ্রীয় দেশ-রক্ষা সচিব শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননের সতর্কবাণী—'রাষ্ট্রপতি কিম্বা প্রধান-মন্ত্রীও ভারতের এক ইঞ্চি জমি ছাড়িতে পারেন না।'

আগস্ট মাসে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়-ঐক্য-সাধন সমস্যা আলোচনা—শ্রীনগরে উত্তর আঞ্চলিক পরিষদের বৈঠকে সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

১২ই জুলাই—২৭শে আষাঢ় : বহির্জগতের সহিত পুণার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন—পান্শেৎ বাঁধের ভাঙ্গনে মুথা নদীতে প্রবল বন্যা—প্লাবিত শহর হইতে ছয় হাজার নর-নারী অন্যত্র স্থানান্তরিত—কাবেরীতে আরও প্লাবন হইতে পারে বলিয়া সতর্কবাণী।

কাছাড়ের জেলা কংগ্রেসত্রয় বাতিলের হুমকী—গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ—আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তরফ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ।

উদ্বাস্তু শিবির বন্ধের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হইবে না—পশ্চিমবঙ্গ ও উদ্বাস্তুদের কল্যাণেই দণ্ডকারণ্য পরি-কল্পনা—উদ্বাস্তু সংস্থাগুলির (পশ্চিম-বঙ্গ) নিকট কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার পত্র।

২০শে জুলাই শিলচরে গুলীবর্ষণ-তদন্ত কমিশনের অধিবেশন।

১৩ই জুলাই—২৮শে আষাঢ় : নির্বাচনে নারী ও সংখ্যাল্পদের উৎসাহ-দানের সিদ্ধান্ত—কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি কর্তৃক নীতি নির্ধারণ—দিল্লীতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর ঘোষণা।

বন্যাপ্লাবিত পুণা শহরে নিদারুণ জলাভাব—বন্যায় এ যাবৎ ৩৮ জনের প্রাণহানির সংবাদ—ব্রহ্মপুত্রের জলো-চ্ছ্বাসে আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেনের যোগদানের প্রশ্ন—বৃটিশ বিমান-মন্ত্রী পিটার থর্ণিক্রফটের সহিত দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দীর্ঘ আলোচনা।

কেনেডির (মার্কিণ প্রেসিডেন্ট) সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য নভেম্বরে শ্রীনেহরুর ওয়াশিংটন গমন—নয়াদিল্লীর প্রামাণ্য মহলের সংবাদ।

বাইরে—

৭ই জুলাই—২২শে আষাঢ় : কম্যুনিষ্ট চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে গ্রহণের প্রশ্ন—আমেরিকা কর্তৃক প্রস্তাব বিবেচনার বিষয় সরকারীভাবে সমর্থিত।

লাওস সম্পর্কে আলোচনায় পুনরায় অচলাবস্থার উদ্ভব—আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অংশগ্রহণের প্রশ্নে লাওসের তিনটি রাজনৈতিক দলের মতভেদ।

'পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ ও নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন একই সঙ্গে মীমাংসা করিতে হইবে—মার্কিণ লিপির উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়নের দাবী।

স্বস্তি পরিষদে বৃটিশ প্রস্তাবে রাশিয়ার 'ভেটো' প্রয়োগ—অবিলম্বে কুয়েয়েত হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের দাবী।

৮ই জুলাই—২৩শে আষাঢ় : সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক দেশরক্ষার ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত—পরিবর্তিত অবস্থার জন্য আমেরিকা ও তাহার 'ন্যাটো' মিত্ররাই দায়ী—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের অভিযোগ।

কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত-পাক্ বিরোধে আমেরিকার সর্বাত্মক সমর্থন না পাইলে জোট ত্যাগ—করাচীতে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের ইঙ্গিত—১১ই জুলাই হইতে ওয়াশিংটনে কেনেডি-আয়ুব বৈঠক।

৯ই জুলাই—২৪শে আষাঢ় : দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন সামরিক শাসক লেঃ জেনারেল দো ইয়ং চ্যাং গ্রেপ্তার—বর্তমান নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ।

মস্কোয় অভূতপূর্ব শক্তিশালী সামরিক বিমান মহড়া—মহড়ায় নতুন ধরনের কয়েকখানি বিমান সহ ১০০টি বিমানের যোগদান।

সিন্ধু নদের বন্যায় পশ্চিম পাকি-স্তানে বিপর্যয়ের আশঙ্কা—সুক্কুর ও লারকানা জেলা উপদ্রুত অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত।

১০ই জুলাই—২৫শে আষাঢ় : পর্তু-গীজ জাহাজে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড—২৬ জন নিহত ও দুই শতাধিক নিখোঁজ—মোজাম্বিকের উত্তরে দুর্ঘটনা।

ছয় বৎসরে দশ সহস্রাধিক অফিসার ও সৈনিক নিহত—আলজিরিয়াকে কুক্ষিগত রাখিতে যাইয়া ফ্রান্সের খেসারত।

১১ই জুলাই—২৬শে আষাঢ় : কমন-ওয়েলথে বিভেদ ঘটাইয়া সাধারণ বাজারে যোগদান চলিবে না—বৃটেনের নিকট অস্ট্রেলিয়ার সাফ কথা—আলোচনা শেষে যুক্ত বিজ্ঞপ্তি।

আয়ুব খানের (পাক্-প্রেসিডেন্ট) আমেরিকা সফরের পিছনে ভারত-বিদ্বেষী ভূমিকা—ভারতকে সাহায্য দান না করার জন্য আমেরিকাকে প্ররোচিত করার মতলব।

১২ই জুলাই—২৭শে আষাঢ় : ওয়াশিংটনে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার—পাকিস্থানকে অর্থনৈতিক সাহায্যদান ও কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা।

দক্ষিণ কোরিয়ায় জলাধারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ১১৪ জন নিহত হওয়ার সংবাদ।

কাসাব্লাঙ্কায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ৭৮ জন নিহত—চেকোশ্লোভাক বিমানের সমস্ত যাত্রীর প্রাণহানি।

'বিপর্যয়কারী পরাজয় না চাহিলে আমেরিকার নীতি পাল্টাইতে হইবে'—লাওস পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্যকালে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন্ লাই'র ঘোষণা।

১৩ই জুলাই—২৮শে আষাঢ় : ওয়াশিংটনে কেনেডি-আয়ুব বৈঠকে চূড়ান্ত পর্যায়ে কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচনা—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট পাকিস্থান পরি-দর্শনে আমন্ত্রিত—বৈঠকান্তে উভয় নেতার যৌথ ইস্তাহার।

পূর্ব জার্মাণীর সহিত পৃথক শান্তি চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ—সোভিয়েট ইউনি-য়নের নিকট পশ্চিম জার্মাণীর স্মারকলিপি প্রেরণ।

লাওসের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে লাওস সমস্যা সমাধানের চেষ্টা—জেনেভায় চতুর্দশ জাতি লাওস সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন কর্তৃক নয়া খসড়া পরিকল্পনা পেশ।
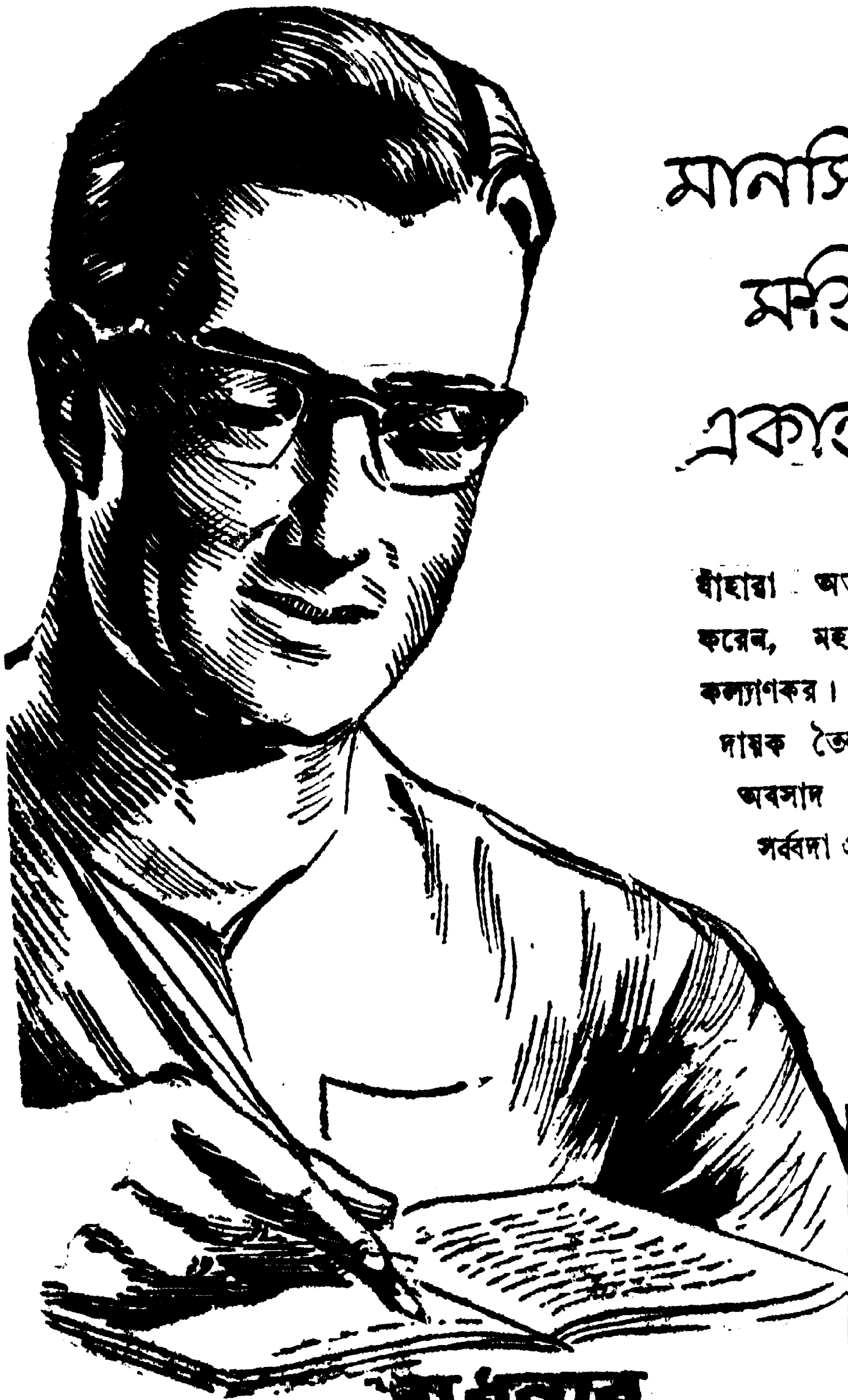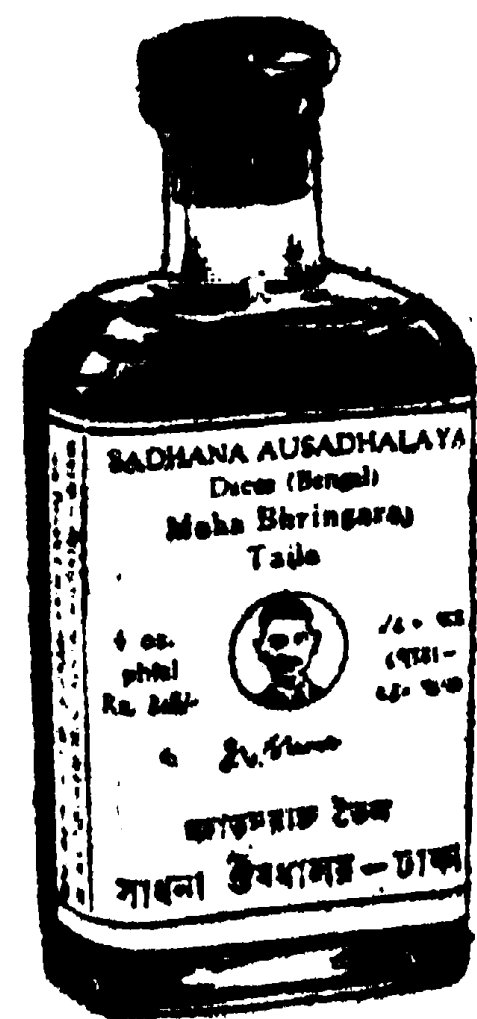
বুদ্ধদেব বসুর সফর-অভিজ্ঞতা

আজকাল আমেরিকা-ইউরোপ ভ্রমণ বাঙালী বা ভারতীয়দের পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়; যিনি সফর করেন তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীটাই আসল কথা।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যের একজন সুবিদিত লেখক। তিনি সম্প্রতি আমেরিকা ও ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। শ্রীবসু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিদেশ থেকে কি অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন জানবার জন্য কিছু সাহিত্যিক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের বাসভবনে এক বৈঠকে সমবেত হয়েছিলেন। শ্রীসরকার পি-ই-এন পশ্চিম-বঙ্গ শাখার অবৈতনিক সম্পাদক। তাঁরই আহবানে এই বৈঠক বসে রবিবার ৯ই জুলাই।

শ্রীবসু বললেন : তিনি ভারত সরকার বা ইউনেস্কোর উদ্যোগে এ সফর করেননি বা বিদেশে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সংগেও তাঁর এ সফরের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে অধ্যাপনার জন্য গিয়েছিলেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই আনুষ্ঠানিক সকল ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। একখানা 'রাউন্ড দ্য ওয়ার্লড' টিকিট কেনা হয়েছিল। এ টিকিটে আক্ষরিক অর্থে সব পৃথিবী ঘোরা যায়—অস্ট্রেলিয়া বাদে।

"প্রথমে রেংগুনে, রেংগুন থেকে হংকং, হংকং থেকে জাপানে গেলাম।" সেখানে তাঁকে কিছু বক্তৃতা দিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী বছর ব'লে ভারতীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে বিদেশের আগ্রহ বেড়েছে এবং শ্রীবসুকেও তাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে হয়েছে। জাপান থেকে তা শুরু। হনলুলু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচী-প্রতীচী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানেও কিছু বলতে হয়েছে। নিউ ইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়েও তিনি পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

নিউ ইয়র্কের যে-হোটেলে শ্রীবসু থাকতেন, সে-হোটেলটিতে অনেক সাহিত্যিক থেকেছেন। সেখানে তাঁর বা তাঁদের ভালই কেটেছে (শ্রীবসুর স্ত্রীও সংগে ছিলেন, এ বৈঠকেও শ্রোতা ছিলেন, তাঁর ছেলে-মেয়েও)।

॥ সাহিত্যের আসর ॥

"কাজের শেষে পাঁচ সপ্তাহ সময় হাতে ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ইউরোপের অনেক জায়গা দেখা গেছে। আমেরিকার সংগে আগেও পরিচয় ছিল, এবারও হ'ল।

"অনেকে বলেন, দু'-এক দিনে কিছু দেখা বা জানা যায় না। আমারও তাই ধারণা ছিল। কিন্তু এমন শহর আছে যা চোখে দেখলে জীবন সার্থক হয়। আমাদের অনেকের পক্ষে ইউরোপ বা পাশ্চাত্ত্য দেশে বিস্মিত হবার জিনিস থাকে। তবে মূলতঃ খুব বিস্ময়ের থাকে না, কেননা, আমরা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই জানি। বিভিন্ন ভাষা না জেনেও বিদেশী হয়েও অনেক বন্ধু পেয়েছি। তাঁদের বলেছি, আমাদের সুবিধে এই আমরা আপনাদের অনেক কিছু জানি, আপনারা আমাদের বিষয়ে জানেন না।"

শ্রীবসু একটু হাসলেন। তারপরে বললেন, "আজ দেড়শ' বছর যা নিয়ে লেখালেখি হ'চ্ছে তা বলব এবার। সে হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার সমৃদ্ধি—শুধু আর্থিক নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিও। বিপুল তাদের ঐশ্বর্য। আমাদের দেশে কেন হচ্ছে না?" জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীবসু; সম্ভবত আত্মজিজ্ঞাসা। তাই জবাবটাও তিনি দিলেন। "জগৎ ভরে সবাই জানে ভারতবর্ষের সব চাইতে বড় সমস্যা দারিদ্র্য। এখনও তাই। এমন দারিদ্র্য আর কোথাও নেই। শুনতে শুনতে লজ্জা পেতাম। বলতাম, হ্যাঁ, দারিদ্র্য আছে কিন্তু আরও জিনিস আছে। আমরাও ব'লে থাকি, দারিদ্র্য, কি হবে, ইত্যাদি। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের সমস্যা-গুলির দারিদ্র্যই সম্পূর্ণ কারণ নয়।"

শ্রীবসু জার্মাণীতে গিয়ে অবাক হয়েছেন। পূর্ব বার্লিনে এখনও ধ্বংসা-বশেষ আছে, পশ্চিম বার্লিনে বড় একটা চোখে পড়েনি। "এ কম কথা নয়। ১৯৪৫-৪৭-এ জার্মাণী আর দাঁড়াতে পারবে বলে ভাবিনি, আজ সে যে-কোন দেশের সমকক্ষ। জার্মাণ মার্ক'ও আজ মার্কিণ ডলারের সমান। সেখানকার পণ্য উৎকৃষ্ট। ১২৫ টাকায় টাইপরাইটার পাওয়া যায় দেখে অবাক হয়ে গেছি। আমরা পারি না কেন? আমার মনে হয়, এর পেছনে একটা চরিত্রের কথাও আছে। জাপান ১০০ বছরের মধ্যে স্থান পেয়েছে। সেও যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে; কিন্তু আজ যদি কাউকে চোখ বেঁধে টোকিও শহরে ছেড়ে দেওয়া হয় তার মনে হবে এ নিউ ইয়র্ক। জাপানের গ্রামাঞ্চলেও গেছি। চাষীর বাড়ী দেখে মনে হয়েছে, হ্যাঁ, এ মানুষের বাসের উপযোগী বাড়ী। কোনো জাপানী 'ইন'-এ (Inn) ঢুকলে মনে হবে মন্দিরে ঢুকলাম (যদিও আমাদের দেশের মন্দির তেমন পরিচ্ছন্ন নয়)। তাদের সময়নিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠা বার বার অনুভব করেছি। আর, মনে হয়েছে, আমাদের মধ্যে সত্যি-কারের দেশপ্রেম নেই। স্বদেশের শিল্প-সংস্কৃতি রক্ষার কোন আগ্রহ আমাদের নেই।

"প্রশ্ন হ'তে পারে, দেশপ্রেম কাকে বলে? এই দেশে জন্মেছি বলে নয়। শৈশবের স্মৃতি, যৌবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলেই স্বদেশের প্রতি এই আকর্ষণ বোধ করি। সব দেশেই আছে। কিন্তু আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভাবালুতার অংশটি যেন বেশী, আমরা এর দোষগুলোও প্রশ্রয় দিতে চাই, অন্য জায়গার ভালো জিনিসের প্রতি তেমন আগ্রহ নেই।

"আমার একটু শিল্পকলার দিকে ঝোঁক আছে। ইউরোপে দেখেছি একটি ছোট শহরেও এ সব সযত্নে রাখার আয়োজন আছে; মাস্টারপীস ছাড়াও সব রকমের জিনিস তারা সযত্নে রক্ষা করে। কিন্তু কলকাতায় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এক ঘন্টায় আধুনিক শিল্পকলা বোঝা যায়। বিদেশী এলে আমাদের কিছু দেখাবার থাকে না।"

সামাজিক জীবন সম্পর্কে বলেন, নিউ ইয়র্ক বড় শহর; এখানে ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য শহর এমন পরিচ্ছন্ন যে, বিশ্বাস করা যায় না। শ্রীবসু জিজ্ঞাসা করেন : "এ কি শুধু অর্থে হয়? ওদেশে যেন প্রত্যেকের যত্ন আছে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্রদের খাবার জায়গাও পরিচ্ছন্ন এবং খাদ্যও বিশুদ্ধ। লক্ষ্য করেছি, আমাদের এখানে দশজনে যা করে, ওখানে একজন স্ত্রীলোক তা করে। তাদের দৈহিক শক্তির কথা ছেড়ে দিলেও এরা যেন প্রতিটি মিনিট কাজ করে।" তাই শ্রীবসুর মনে এই প্রশ্ন উঠেছে, সদ্‌গুণের ফলে ওদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে, না, আর্থিক উন্নতির ফলে সদ্‌গুণ এসেছে?

এর উত্তরে তিনি বলছেন, তাঁর মনে হয়, রেনেসাঁসের সময় যে মানসিক বোধ জেগেছিল তাই থেকেই এ সব সদ্‌গুণ এসেছে। সে গুণগুলি আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এ কি জলবায়ুর

দোষ?—যে জলবায়ুতে তাড়াতাড়ি খাবার পচে যায়? তেমনি আত্মাও কি পচে যায়?

শ্রীবসুর মতে ভেদাভেদটা অবশ্য আর্থিক কারণে হ'তে পারে; কিন্তু তাও তো সেখানে কারণ নয়। আমাদের দেশে ড্রাইভার—ড্রাইভার; ওদের দেশে ড্রাইভার মিস্টার। তার সঙ্গে বসে খেতে তো খারাপ লাগে না। সে মানুষ। সেখানে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং সে জানে, সে কোথাও অপমানিত হবে না।

"আমাদেরও সদ্‌গুণ আছে; কিন্তু পরশ্রীকাতরতা দোষটা যেন কিছু বেশী। কারও মধ্যে কৃতিত্ব দেখলে যেন সহ্য করতে পারি না। অন্য দেশেও ঈর্ষা আছে; কিন্তু কোন কৃতী লোককে দোষারোপ ক'রে নামিয়ে দেবার চেষ্টা কোথাও লক্ষ্য করিনি। আমরা যাকে অশ্লীল বলি, এমন পত্রিকা ওদের দেশে আছে, কিন্তু কেবলমাত্র কুৎসা প্রচারের জন্য কোন কাগজ আছে ব'লে জানি না।"

প্রসঙ্গত শ্রীবসু আর একটি অভাবের কথা উল্লেখ করেন। জাপানে গেলে খাঁটি জাপানী মানুষ, জাপানী পরিবেশ, জাপানী আহার, পরিবেষণ প্রথা ইত্যাদি পাওয়া যায়। "কিন্তু আমরা কি খাঁটি বাঙালী চরিত্র-লক্ষণ কোন বাঙালীকে দেখাতে পারি? খাঁটি বাঙালী পরিবেষণ-রীতিতে তেতো ডাল থেকে আরম্ভ ক'রে খাঁটি বাঙালী আহারের আয়োজন দেখাতে পারি? শুনেছি, কলিকাতা কর্পোরেশনের অগাধ টাকা, তাঁরা কি পারেন না এমন একটি সর্বাঙ্গীণ খাঁটি বাঙালী পরিবেশকে রক্ষা করতে?"

অনুলেখক—পুলকেশ দে সরকার

সাম্প্রতিক সংবাদ-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর

উত্তর

১। প্রায় আড়াই বৎসর আগে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মাণী, ইটালী, লাক্সেমবার্গ ও হল্যান্ড—এই ছয়টি দেশ সম্মিলিত হয়ে একটি বাণিজ্যিক জোট (European Common Market) গঠন করেছে। একে সংক্ষেপে ই. সি. এম বলে। এই জোটের প্রধান উদ্দেশ্য পরস্পরকে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ও এই ছয়টি দেশের বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। এতদিন ইংল্যান্ড এই জোটে যোগদান করেনি। ১৯৬০ সালে ইউরোপে আর একটি বাণিজ্যিক জোট স্থাপিত হয়। এতে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড যোগদান করে। এই জোটের উদ্দেশ্য হল পরস্পরের সাহায্যে দেশের বাণিজ্য প্রসার। এর নাম ইউরোপিয়ান ফ্রী ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন (সংক্ষেপে এফ্‌টা)। উপরের জোটকে ইনার সিক্স (Inner Six) এবং পরেরটিকে আউটার সেভেন (Outer Seven) বলা হয়। এখন ইংল্যান্ড ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটে যোগদান করবে বলে সংকল্প করেছে। এতে কমনওয়েল্‌থ্ দেশসমূহে প্রবল আপত্তি উঠেছে। তারা মনে করে, কমন মার্কেটে ইংল্যান্ড যোগদান করলে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্যে কমনওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত দেশগুলির বিশেষ ক্ষতি হবে। E C M দেশগুলি পরস্পর বাণিজ্যে যে সুযোগ-সুবিধা পাবে, তা কমনওয়েল্‌থ্ দেশগুলি পাবে না।

২। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, কিন্তু লন্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর কোন মীমাংসা এপর্যন্ত হয়নি। প্রাচ্য-সম্পর্কিত গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, চিত্রাবলী ও অন্যান্য দলিল-সম্বলিত এই লাইব্রেরী সর্ববৃহৎ ও অমূল্য সম্পদ। এই লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত পুস্তক-সংখ্যা ৭০ হাজার, বাংলা পুস্তকের সংখ্যা ২৪ হাজার, উর্দু ২০ হাজার, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ২০ হাজার। এছাড়া মারাঠী, পাঞ্জাবী, তামিল, গুজরাটী, ফারসী এবং তেলেগুতে লিখিত বই প্রচুর। এছাড়া পাণ্ডুলিপির সংখ্যা অগণ্য। তাছাড়া এই লাইব্রেরীর প্রাচ্য চিত্র-সংখ্যা অতুলনীয়। এই সব জিনিসের ভাগাভাগি নিয়েই এই তিন দেশের মধ্যে বিরোধ আজ কয়েক বৎসর ধরে চলছে। এই লাইব্রেরীকে তিন খণ্ড করলে প্রত্যেকেই লাইব্রেরীর কিছু কিছু অমূল্য সম্পদ থেকে বাদ পড়বে। তাই অনেক দিন পরে বিজ্ঞানের সাহায্যে ভাগাভাগির কথা উঠেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমস্তই হুবহু নকল করা যায়। তাই এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সমস্যার মীমাংসার কথা উঠেছে। আর দ্বিতীয় পন্থার কথা উঠেছে—প্রিভি কাউন্সিলের বিচার-বিভাগীয় কমিটির মারফৎ আইনের সাহায্যে এর একটা মীমাংসা করে নেওয়া।

৩। গত বৎসর আফ্রিকার অনেকগুলি পরাধীন রাজ্য স্বাধীনতা লাভ করায় বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সভ্য-সংখ্যা ৯৯টি দেশ। সাধারণভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চারিটি রাজনৈতিক দল আছে: (১) পশ্চিমী দল (Western Powers), এই দলের প্রধান সভ্যরা হচ্ছে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মাণী, ফ্রান্স ইত্যাদি, (২) কম্যুনিস্ট দল—এই দলে আছে রাশিয়া, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ইত্যাদি, (৩) আফ্রিকা-এশিয়ার দল (Afro-Asian Party), আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এই দলভুক্ত, (৪) নিরপেক্ষ দল—এই দেশরা পশ্চিমী বা কম্যুনিস্ট কোন দলেই যোগদান করেনি। এই দলের প্রধান সভ্য হচ্ছে—ভারতবর্ষ, বর্মা, থাইল্যান্ড, আফগানিস্থান, সম্মিলিত আরব রিপাবলিক, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ রোমাঞ্চকর-সাহিত্য ॥

বোধকরি কোন পাঠকই হলফ করে বলতে পারবেন না যে, জীবনে তিনি একখানিও রোমাঞ্চকর বই পড়েননি। শীতের রাত্রে কম্বল বা লেপ গায়ে দিয়ে একখানি লোমহর্ষক হত্যারহস্য বা বহু মূল্যবান হিরকখণ্ডের রহস্য-জনক অন্তর্ধান, কিংবা ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত সিন্দুক থেকে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে হাজার হাজার টাকার নোটের হাতবদল, কার মনে দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করেনি!

আজ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে যাঁদের জন্ম হয়েছে তাঁরা বাল্যে বা কৈশোরে লুকিয়ে লুকিয়ে দীনেন্দ্র-কুমার রায়ের 'রহস্যলহরী সিরিজ' বা পাঁচকড়ি দে'র বই নিশ্চয়ই পড়েছেন। এবং দেহের রক্ত এক নিমেষে দধিতে পরিণত হয়েছে। মোট কথা, রোমান্স যেমন মানুষের মনের একটা খাদ্য, রোমাঞ্চও মানুষের মনকে কম দোলা দেয় না। বাংলা সাহিত্যে রোমাঞ্চকর গল্প, উপন্যাস প্রায় অপাংক্তেয়, তার ফলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যোমকেশ' এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পরাশর বর্মা' ছাড়া আর কিছু উল্লেখযোগ্য রোমাঞ্চকর সাহিত্য ইদানীংকালে নেই। কোনও শক্তিমান সাহিত্যিক রোমাঞ্চকর সাহিত্য রচনায় আগ্রহান্বিত নন, যদিচ যে সব লেখক শুধু রোমাঞ্চকর সাহিত্য রচনা করেই গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদি করে-ছেন তাঁদের ঈর্ষা করার লোকেরও অভাব নেই। চুরি, জুয়াচুরি, গুমখুন, রাহাজানির ঘটনাকে উপজীব্য করে যে অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক এবং রোমাণ্টিক ঘটনা লেখা যায়, এ সংবাদ সাহিত্যিক-মাত্রের অজানা নেই। তবু এই পথে সহজে কেউ পা বাড়াতে চান না জাতি-চ্যুতির আশঙ্কায়। শক্তিমানদের দ্বারা অবহেলিত হয়ে কথাসাহিত্যের এই একটি বিভাগ একেবারে অক্ষম এবং অর্বাচীনের একচ্ছত্র অধিকারে চলে যাচ্ছে এবং সেই অক্ষম রচনায় দুধের অভাবে পিটুলি গোলা যেমন একদা অশ্বত্থামাকে আনন্দ দিয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের পাঠক অশ্বত্থামারা সেই পিটুলি গোলা পান করেই আনন্দ উপভোগ করছেন। দেশে কিন্তু তাই বলে রোমাঞ্চকর ঘটনার অভাব নেই। পার্কের বেঞ্চের তলায় কার কাটা হাত পাওয়া গেল, কলকাতা শহরের রাজ-পথময় নারীদেহের বিভিন্ন অংশ দক্ষযজ্ঞের পর ছিন্ন সতীদেহের মত ছড়ানো হল, দুপুরবেলা অসুস্থ গৃহিণীকে ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী সেজে এসে কলেজে-পড়া ভদ্র যুবক গলা টিপে মেরে রেখে গেল, এ-সব ঘটনা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই জানেন।

নীতিবাগীশ মহল থেকে কথা উঠতে পারে যে দেশে ভীষণ নৈতিক অবনতি দেখা যাচ্ছে, চুরি ডাকাতি বেড়ে যাচ্ছে, অতএব এই জাতীয় গ্রন্থ লেখা উচিত নয়। যেমন সিনেমা বন্ধ না করলে অবৈধ প্রেমের প্রসার রোধ করা যাচ্ছে না ইত্যাদি। তাঁদের কিন্তু এ কথা জানা প্রয়োজন যে, রোমাঞ্চকর কাহিনী না থাকলেও এবং যখন ছিল না তখন চুরি বা খুন ইত্যাদি কিছু কম হয়নি। সিনেমা যখন ছিল না অবৈধ প্রেম তখনও অবাধে প্রচলিত ছিল। সুতরাং "রোমাঞ্চকর কাহিনী বন্ধ করো" এই আন্দোলনের প্রয়োজন হবে না। অথচ স্নায়ুশিরা যখন ক্লান্তিতে অবসন্ন, মন যখন ভারাক্রান্ত, তখন এই লঘু সুরের কাহিনী পড়তে কার না ভালো লাগে। এবং সেই গ্রন্থ যদি সুলিখিত হয়, সর্বজ্ঞ এবং সর্ব-ব্যাপী গোয়েন্দার অবিশ্বাস্য বুদ্ধি-প্রভাবে সেই জটিল রহস্য ধীরে ধীরে সরল হয়ে পড়ে, একে একে যেমন দুই হয়, তখন দেখা যায় ঠিক সেইভাবেই অতি সাধারণ নিয়মে অঙ্কের মত সব মিলে যায়। গোয়েন্দার কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে যায় এবং যা ছিল বিজড়িত জটিল রহস্যজালে, তা পরি-ষ্কার জলের মত সহজ হয়ে আসে। অপরাধী ধরা পড়ে, ধরা দেয়, কিংবা অত্যন্ত বিক্রমশালী হলে শেষ মুহূর্তে আত্মহত্যা করে বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যায়। যে-পাঠক অসীম উত্তেজনায় এতক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে এই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক রহস্যকাহিনী পাঠ করে-ছিলেন তাঁর স্নায়ুশিরা স্নিগ্ধ হয়, তিনি গোয়েন্দার অসাধারণ বুদ্ধি এবং প্রতিভার তারিফ করতে করতে ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজিয়ে শান্তি-দায়িনী নিদ্রাদেবীর প্রসন্ন আশীর্বাদে ধন্য হন।

এখন প্রশ্ন এই, যে সৎ-সাহিত্যিকরা এই জাতীয় ঘটনাকে উপজীব্য করে রোমাঞ্চকর সাহিত্য পরিবেশন করবেন কিনা। করা উচিত কিনা—কিংবা যদি করেন তা'হলে সাহিত্যিক হিসাবে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ আছে কিনা। এ সবেরই উত্তরে একটিমাত্র কথা বলা বলা যায়, সৎ-সাহিত্যিক মাত্রেরই কর্তব্য সাহিত্যের মান উন্নয়ন করা এবং পাঠকের রুচি গঠনে সহায়তা করা। তা যদি হয়, তাহলে কিছু সংখ্যক দায়িত্ব-জ্ঞানহীন তথাকথিত রোমাঞ্চ-লেখক-সাহিত্যিকের হাতে এই সব অনাথ পাঠককে ছেড়ে দেওয়া কি কর্তব্য হবে? সাহিত্য-পাঠকের মুখ চেয়ে এবং সস্তা দরের রোমাঞ্চ রাবিশ থেকে তাদের নিষ্কৃতি দেওয়ার কি প্রয়োজন নেই? সৎ-সাহিত্যিকের রোমাঞ্চকর সাহিত্য পরিবেশনের দায়িত্ব আছে এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথ অনুসরণ করে অন্য সাহিত্যিকরাও এই বিভাগে মন দিলে সাফল্য ও সুফল লাভ দুই-ই হবে।

শার্লক হোমসের নাম ইংরাজী শিক্ষিত পাঠক মাত্রেরই পরিচিত। তার পাইপ, টুপি, লেন্স এবং বেকার স্ট্রীটের বাড়িটি ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের চাইতে কম বিখ্যাত নয়। ইংরাজী সাহিত্যে পি, জি, ওডহাউসের বিখ্যাত চরিত্র 'জীভস' জনপ্রিয়তায় শার্লক হোমসের কাছা-কাছি যেতে পারে। এর পর আগাথা ক্রিষ্টির পোইরো চরিত্রের নাম করা যায়।

ডিটেকটিভ উপন্যাসের কোনও শিল্প-মূল্য নেই, কেননা এই উপন্যাস জনপ্রিয় ননসেন্স মাত্র এ কথা বলার কোনও যুক্তি নেই। যা জনপ্রিয় তা যে মূল্য-হীন একথা বলা চলে না। অনেক মহাকাব্য, মধ্যযুগীয় ধর্মীয় চিত্রসম্পদ আধুনিককালের আত্মসচেতন কবিতা বা ছবির সঙ্গে এক সারিতে বসতে পায় না, তার মানে এ নয় যে, সেগুলি নিরর্থক। সাহিত্যিক উত্থান-পতনের ইতিহাস যাঁদের জানা আছে তাঁরাই জানেন যে আজ যে গ্রন্থ বা গ্রন্থকার খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে, কাল তাঁর চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তুলসীদাস বলেছেন ঃ 'তোঁহে জনমি পুনঃ তোঁহে সমায়ত সাগর-লহরী সমানা'—তেমনই সাগর-লহরীর মত সাগরে [illegible] সাগরেই মিলিয়ে যায় এই সাহিত্যিক

খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে রেনি ফুলোপ মিলার এবং এরিক মারিয়া রিমার্ক প্রভৃতি লেখকরা ঔপন্যাসিক সমাজের অনুমোদন লাভ করেছিলেন। তার আগে তা সম্ভব ছিল না।

যে-সাহিত্যিক-আঙ্গিক স্পষ্টতঃ হত্যা বা রাহাজানিকে উপন্যাসের পক্ষে গ্রহণযোগ্য উপজীব্য বলে মনে করে, সেখানে চিন্তা করা প্রয়োজন যে তার উদ্দেশ্য কি শুধুই রোমাঞ্চ বা থ্রিল সৃষ্টি করা। অনেক রোমাঞ্চকর উপন্যাসই কুলিখিত। তার উপজীব্য এবং বক্তব্য অনেক সময় বিভীষিকাময় এবং আতঙ্ককর। কিন্তু রোমাঞ্চিত হওয়ার আইনগত অধিকার পাঠকের নিশ্চয়ই আছে। যে পৃথিবীতে আজ আর বিস্ময়কর কিছু নেই, সাহসিক বা দুঃসাহসিক বলে কোনো কিছু কর্ম নেই, সেই যুগে রোমান্স-বুভুক্ষু পাঠকের মন বিকল্প ব্যবস্থায় কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারে না। সংশয় এবং সন্দেহের দোলায় দোল খেতে খেতে পাঠকচিত্ত অবিশ্বাস্য কাহিনীতে মন দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়ে যায়। পরে অর্থাৎ সামান্য কিছু পরেই তা শ্লেটেরে লেখার মত মন থেকে একেবারে মুছে যায়—এই হল রোমাঞ্চকর উপন্যাসের অবস্থা।

আলেকজাণ্ডার ডুমা খাঁটি রোমান্স-লেখক ছিলেন। নাটকীয় জ্ঞান, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, জাঁকজমক এই সব জুড়ে ডুমার যে জগৎ সে জগৎ পাঠককে রোমাঞ্চিত করে।— কেবল লোমহর্ষক ঘটনার পর ঘটনা, প্রতি কথায় খুন, যুদ্ধ, বিপদের মুখ থেকে বিস্ময়কর উপায়ে নিষ্কৃতি। যেমন ব্যারনেস ওক্রেজীর "স্কারলেট পিম্পারনেলে'র স্যার পারসী ব্লাকনি, তিনি যেন ডুমার ড'আরটাগননের নতুন সংস্করণ। 'মনোকোল'-পরা চোখ নিয়ে পারসী ব্লাকনি যখন তাঁর প্রায়-অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেন তখন পাঠকের তা বিশ্বাস করতে বাধে। তারপর আরো চরিত্র এসেছে, বুলডগ ড্রামণ্ড, আরসেনি লুপিন, সাইমন টেম্পলার, ফু মাঞ্চু এ সব চরিত্র রোমাঞ্চকর সাহিত্য-পাঠকের অপরিচিত নয়।

বিখ্যাত জনপ্রিয় থ্রিলার রচয়িতা পিটার চেইনীর রোমাঞ্চকাহিনী, হত্যা, গুমখুন এবং মদ্যপদের কাহিনীতেই ভরপুর।

রোমাঞ্চকর কাহিনীকে এক হিসাবে ক্রশওয়ার্ড পাজ্ল বা দাবা জাতীয় খেলাও বলা যায়। লেখকের গল্প-বলার ক্ষমতায় পাঠক অভিভূত হয়ে আত্মহারা হয়, দ্বিতীয়তঃ খুন-জখমের কাহিনীর নায়কের ওপর কোনো রোমান্টিক অনুরাগ জন্মায় না। পাঠক সেখানে আইন প্রতিপালক উত্তম নাগরিক। হত্যাকারী ধরা পড়ুক এবং তার শাস্তি এই তাঁর একমাত্র কামনা। তা ছাড়া অপরাধ যত সূক্ষ্ম ততই তার সমাধান জটিলতর, পাঠক সমাধান চিন্তা করে সেই তার ক্রসওয়ার্ড, সেই তার দাবা খেলা। শার্লক হোমস মানুষটি ভদ্র, বিদগ্ধ, অনেক বিষয়ে গভীর জ্ঞান, এবং কেবল 'নিছক পরোপকার প্রবৃত্তি' বশে তিনি অপরাধীকে ধরে বেড়ান। তাঁর ত্রুটী এবং দুর্বলতার ফলে পাঠক তাঁকে ভালোবেসে ফেলে। শার্লক হোমস তাই রোমাঞ্চকর সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র।

সবচেয়ে সার্থক হত্যাকাহিনী বা রহস্যকাহিনীতে সৎ-উপন্যাসের সবগুলি গুণ থাকাই প্রয়োজন। মানবিক আবেদন এবং বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী হলে পাঠকচিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়। শার্লক হোমসের মত আর যে দুটি বিখ্যাত চরিত্র আছে রোমাঞ্চকর সাহিত্যে তাদের একজন জি, কে, চেস্টারটনের সৃষ্টি ফাদার ব্রাউন। এই ফাদার ব্রাউন আর মিস মারপ্ল্ প্রায় সমধর্মী চরিত্র। দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত, সহৃদয় এবং সদাশয়। ফাদার ব্রাউন দেখতে চান পাপের ফলে আত্মার কি প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানব মনের গভীরে ডুব দিয়ে তিনি রহস্যের সন্ধান করেন। তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির কাছে সহজেই সব ধরা পড়ে। তাঁর নম্রতা চতুরতার প্রতিষেধক।

মিস্ মারপ্ল্ ফাদার ব্রাউনের যেন মহিলা সংস্করণ। ফাদারের পীঠস্থান তাঁর চার্চ। আর মিস্ মারপ্ল্, তাঁর জগৎ সেণ্ট মেরী মিড নিয়েই আছেন। আর একটি চরিত্র উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেটি ফরাসী লেখক জর্জেস সিমেনন'র "মেইগ্রেট"।

অপরাধমূলক কাহিনী রচনার আঙ্গিক এবং কৌশল বর্তমান কালে এতই পরিবর্তিত হয়েছে যে, শার্লক হোম্স এখন সেকেলে মনে হয়। এখনকার লেখকরা অপরাধী সম্পর্কে একটা নিরপেক্ষ মনোভঙ্গী রেখে দেন। যা কিছু সূত্র তা গোড়া থেকেই ফাঁস করে দেওয়া হয়। অপরাধী একটা দোর্দণ্ড-প্রতাপ শয়তান নাও হতে পারে। এখনকার রহস্যকাহিনীতে আতঙ্ক বা লোমহর্ষক ঘটনার সমাবেশ নাও ঘটতে পারে। এ দিনের কাহিনীর তাই অন্যরূপ। তার মধ্যে নাটকীয়ত্ব আছে, বাস্তবতা আছে, মানবিকতা আছে, অর্থাৎ এক কথায় সৎ-উপন্যাসের যা কিছু মাল-মশলা তা রোমাঞ্চকর উপন্যাসেও পাওয়া যায়। বহু অপরাধীর সঙ্গে জীবন্ত চরিত্রের মিল আছে, ঘটনার সঙ্গেও। সমস্যাটাও পরিপূর্ণভাবে মানবিক।

এই সব কারণেই বাংলা সাহিত্যের এই অবহেলিত দিকটিতে শক্তিমান সাহিত্যিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

নতুন বই

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ—(ইতিহাস)— হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত। [illegible]তী লাইব্রেরী, কলিকাতা—৯। মূল্য ছ টাকা।

অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহধর্মিণী বর্তমান শতকের প্রথম ভাগের ইতিহাস সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং তাঁদের সেই পরিশ্রমের ফল হিসাবে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। মূল দলিল দস্তাবেজ ও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, সমসাময়িক কালের মনীষীদের নিকট থেকেও তাঁদের গবেষণা সম্পর্কে অভিমত ও উপদেশ গ্রহণ করেছেন। সেই সব কারণে এই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। ১৯০৫ থেকে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক, শিল্প-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে, জাগরণ দেখা যায় বর্তমান গ্রন্থ সেই যুগান্তকারী আন্দোলনের ইতিহাস। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা, স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, যুগ-প্রবর্তক বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্র-দর্শন, যুগান্তরের স্বরাজ সাধনা, স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায় ও স্বদেশী আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি—এই ক'টি বিষয় বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, যুগপ্রবর্তক বিপিনচন্দ্র, যুগান্তরের স্বরাজ সাধনা অতিশয় মূল্যবান তথ্যসমাবেশে পরিপূর্ণ। যুগ-প্রবর্তক বিপিনচন্দ্র পরিচ্ছেদটি পাঠকালে মনে হয় এই মনীষীটি আমাদের দেশে একরকম উপেক্ষিত, বিপিনচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাসের প্রয়োজন আছে। পরিশিষ্ট অংশে শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'যুগান্তর' পত্রিকা ও বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টা সম্পর্কে যা লিখেছেন তা বিশেষ মনোজ্ঞ। বিশেষতঃ ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অতি স্পষ্ট এবং সময়োপযোগী। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। তার জন্য গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। তিনি যথার্থই বলেছেন—"ভবিষ্যতে যাঁহারা

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস লিখিবেন তাঁহারা এই গ্রন্থের সাহায্যে অনেক আয়াস ও পরিশ্রমের হাত হইতে ত্রাণ পাইবেন।" স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে বহু শিক্ষিত ব্যক্তিরও জ্ঞান অতি অস্পষ্ট, সুতরাং এই গ্রন্থটি একটি বিশেষ অভাব পূরণ করল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্বদেশী যুগের কয়েকজন মনীষীর চিত্র সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

Reader's Digest Condensed Books — Reader's Digest Association (London) — Rs. 12/-

রিডার্স ডাইজেস্ট কন্‌ডেনসড্‌ বুকস্‌ ইতিমধ্যেই অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একই খণ্ডে চারখানি বৃহৎ গ্রন্থ একত্রে পাওয়া এবং আকারে সংক্ষেপিত হওয়ার ফলে পাঠকেরও সুবিধা। প্রথম খণ্ডটি জোসেফ কেসেলের বিখ্যাত উপন্যাস The Lion, এর কাহিনী কিঞ্চিৎ অসাধারণ, শিশুর সঙ্গে পশুর প্রেম এবং পরিণতি বিয়োগান্ত। আফ্রিকার সিংহের পোষ্য দশ বছরের মানবকন্যা এবং তার কাহিনী সাধারণ গল্প নয়। কিলমানজারোর পাদদেশের পটভূমিতে রচিত এ এক বিচিত্র কাহিনী। পরবর্তী গ্রন্থ এলভিন মস্কো রচিত Collision Course —ব্যক্তিগত সাংবাদিকতার ইতিহাস। কুয়াশার অন্ধকারে সুইডিস্‌ জাহাজ 'ষ্টকহোম' ইটালিয়ান বিলাস-তরণী 'এণ্ড্রিয়া ডোরিয়া'র সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামের রোমাঞ্চকর মুহূর্ত ও আদালতের পরবর্তী কাহিনীর নাটকীয় পরিবেশন চমৎকার। জন মুরের September Moon ব্রিটিশ পল্লী অঞ্চল নিয়ে রোমান্টিক কাহিনী গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ গতিশীল। সর্বশেষ গ্রন্থটি পুলিটজার প্রাইজ প্রাপ্ত The Way West লেখক এ, বি গুথ্‌রী। ওরিজনের পথ ধরে আমেরিকার পত্তনীর যুগে যে অভিযাত্রী দল ওয়েস্ট অঞ্চলে দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন তাঁদের কাহিনী।

সংক্ষেপিত আকারে গ্রন্থগুলির কোনোরূপ অঙ্গহানি বা রসভঙ্গ হয়নি এইখানেই রিডার্স ডাইজেস্ট কন্‌ডেনসড বুকের বৈশিষ্ট্য।

এই ভুবনে—রঞ্জন বিশ্বাস। প্রকাশক —আভেনিয়ু। ২৩৮বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৯।

জলবিম্ব—চিত্ত সিংহ। প্রকাশক—সৃজনী। ৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭।

লেখকদ্বয় সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত, সুতরাং এখনই তাঁদের সাহিত্যকৃতির সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যায়, হাত কাঁচা নয়। কি বলতে হবে তা না জানলেও কেমনভাবে বলতে হবে তা এঁরা দুজনেই জানেন। এঁদের সম্পর্কে এইটাই বড় কথা। রঞ্জন বিশ্বাসের কথনভঙ্গি অত্যন্ত ঝরঝরে। ঘটনা সংস্থাপনে এঁর দক্ষতা আছে। মূল চরিত্র মতি রীতিমত আকর্ষণীয়।

বর্তমান কালের তথাকথিত এক ধরনের বুদ্ধিজীবী, যারা নিজেদের প্রাজ্ঞ ভেবে অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে চিন্তা করে কথা বলে, জীবনযাপন করে—এই রকমের এক চরিত্রকে দক্ষতার সঙ্গে চিত্ত সিংহ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। গদ্যভঙ্গি নায়ক চরিত্রের সঙ্গে সংগতি রেখেই অমার্জিত। দ্বিতীয় অংশ ঋতুর কথা অনেকখানি বাস্তবানুগ। অনুশীলন করলে চিত্ত সিংহ ভাল লিখবেন।

রূপস্নান—(গল্প) : রাজসিংহ। দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোম্পানি। কলিকাতা-১২। দাম দু'টাকা।

'রূপস্নান', 'রাজসিংহ' নামক ছদ্মনামধারী লেখকের এগারোটি ছোট গল্পের সংকলন। ভূমিকায় লেখক বলেছেন : "ক্ষণিক মুহূর্তে ভাবনায় যে সমস্ত আলোককণা আমার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সেইগুলোর প্রতি যথার্থ সততা রেখে নির্ভীকতার সঙ্গে আমি সেইগুলোকে প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছি।" এবং সেইভাবেই তিনি শিল্পীর কর্তব্য পালন করেছেন। লেখক এই জাতীয় বাচালতা কাটিয়ে উঠলে কালে হয়ত কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন। কারণ, তাঁর বক্তব্য তীক্ষ্ণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্ট। লেখাগুলির মধ্যে অনাবশ্যক ভাবাবেগ এবং ম্যানারিজম এসে পড়ায় রস অনেক স্থলে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যে লেখক 'ত্রয়ী' গল্প লিখতে পারেন একটু অনুশীলন করলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল। সাম্প্রতিককালে নিঃশেষিত প্রায় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ নিয়ে লিখে তিনি এক হিসাবে ভালোই করেছেন। প্রচ্ছদপট সুন্দর নয়।

একটি ছবির জন্ম কাহিনী

প্রভাতকুমার দত্ত

তখন ১৯২৪ সাল। বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক আইজেনণ্টাইনের নাম বিশেষ কেউ জানে না। ঐ বছরেই সবেমাত্র তিনি তাঁর প্রথম ছবি তুলেছেন যার নাম Strike। ছবিটিতে জার-আমলে এক ধাতু-তৈরীর কারখানায় সামগ্রিক ধর্মঘটের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য জারের পুলিস বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের আলেখ্যও এতে আছে। Strike ছবিটি সোভিয়েট সরকারের নজরে পড়ে। কাহিনীর চিত্রগত আদর্শ ও রূপায়ণ তাঁদের খুবই ভাল লাগে। সরকার মনে করেন এই ধরনের ছবিই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় বিশেষ প্রয়োজন। রুশ সরকার আইজেন-ণ্টাইনকে ১৯০৫ সালের বিপ্লবের উপর এক ছবি তোলার জন্য নিযুক্ত করলেন।

নতুন কার্যভার পেয়ে আইজেন-ণ্টাইন প্রথমেই ঠিক করলেন যে, তিনি আগে থাকতে ঠিক করা কোন চিত্র-নাট্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হবেন না। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সব-চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে একত্র করে সেগুলিকে জারের নৃশংসতার পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলবেন। লেনিনগ্রাডে তিনি কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তখন ১৯২৫ সাল। ডকুমেণ্টারি ধরনের ছবি, বেশীর ভাগই বহির্দৃশ্য স্টুডিওর সেটে কাজ করার তেমন সুযোগ নেই। ছবি তোলার কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আইজেন-ণ্টাইন হঠাৎ এক অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। লেনিনগ্রাদের আকাশে কিছুদিন থেকে সূর্যের একেবারে দেখা নেই। সূর্যের আলো না থাকলে ক্যামেরায় বহির্দৃশ্যগুলি ভালো করে তোলাও সম্ভব নয়। আর সূর্যের মুখ কবে দেখা যাবে সে আশায় বেশীদিন অপেক্ষা করাও যায় না। আইজেনণ্টাইনের আগে থাকতে ঠিক ছিল যে, ১৯০৫ ছবিটিতে ওডেসা ও সেবাস্টোপল বন্দরে অনুষ্ঠিত নৌবিদ্রোহের ঘটনাটি অন্তর্ভুক্ত করবেন। সমগ্র ১৯০৫ ছবিটিতে রাশিয়ার দক্ষিণাংশের এই একটি মাত্র ঘটনা থাকবে। তাই লেনিনগ্রাদে অপেক্ষা না করে তিনি সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণে—ওডেসা ও সেবাস্টোপলের দিকে।

এরপর ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। ওডেসা বন্দরে এসে তার ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া সিঁড়ি দেখে পরিচালকের ১৯০৫ সম্পর্কিত ছবির পরিকল্পনা একেবারে ওলটপালট হয়ে গেল। ওডেসার সিঁড়ির উল্লেখ আইজেন-ণ্টাইনের চিত্রনাট্যের পরিকল্পনার মধ্যে মোটেই ছিল না। ছবি তুলতে এসে ওডেসার এই সিঁড়ি দেখে তাঁর মনে হোল যে, এখানে সমবেত নৌবিদ্রোহী-দের প্রতি সহানুভূতিশীল জনতার উপর জারের বন্দুকধারী কশাক সৈন্য-বাহিনী যে নৃশংস গুলিচালনা করেছিল শুধুমাত্র সেটুকুকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ এর সমগ্র বিপ্লবের মর্মকথাকে প্রকাশ করা যায়। একটা সম্পূর্ণ আরশি খণ্ড-খণ্ডভাবে ভেঙে গেলেও খণ্ডের মধ্যে যেমন সমগ্রের ছবি ধরা পড়ে তেমনি অংশ যদি বিশিষ্ট (typical) হয় তবে তার মধ্যে সমগ্রের মূল উৎকর্ষ ধরা পড়ে। ওডেসার তীরে ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত Potemkin জাহাজের বিদ্রোহ সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বলা যায়। Potemkin ঘটনার মধ্যে ছিল ১৯০৫ সালের সমগ্র বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি। আর বিশেষের মধ্যে সমগ্রের স্বাদ যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন সমগ্রকে রূপ দিয়ে লাভ কি? আইজেনণ্টাইনের এই ধরনের মত বদলানোতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। অনেকে একথা বলেন যে, আইজেনণ্টাইন যখন ওডেসার সিঁড়ির ধারে অবস্থিত ডিউক রিচলুর মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে টিল সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিচ্ছিলেন তখন সেগুলির টপ্‌কে টপ্‌কে নীচে নেমে যাওয়া দেখে Potemkin-এর বিদ্রোহের দৃশ্য তাঁর মনে এসেছিল। কিন্তু এটা যে কাহিনী মাত্র, একথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে পরিষ্কার-ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ওডেসার সিঁড়ির ধাপে ধাপে নেমে যাওয়ার যে গড়নভঙ্গী সে জিনিসটাই Potemkin-এর মার খাওয়া ছত্রভঙ্গ জনতার দৃশ্যটি তাঁর মানসপটে প্রতি-ফলিত করেছিল।

আইজেনণ্টাইন Potemkin জাহা-জের বিদ্রোহের ছবি তোলায় মনঃস্থির করলেন বটে কিন্তু আসল জাহাজটির অস্তিত্ব বা সেটা কেমন দেখতে ছিল তা তো কারুর জানা নেই। আসল জাহাজটি থাকলে ছবির প্রামাণিকতা অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। আইজেনণ্টাইন অনেক সন্ধানের পর খবর পেলেন যে, Potemkin না থাকলেও তারই সমগোত্রীয় জাহাজ Twelve Apostles বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় একটি উপসাগরের খাঁড়ির

মধ্যে নোঙর বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। জায়গাটি নির্জন এবং সাধারণ জাহাজ চলাচলের পথ থেকে দূরে থাকার জন্য Twelve Apostles বিধ্বংসী শক্তিসম্পন্ন মাইনের সঞ্চয় ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। বহুদিন খোলা জায়গায় অব্যবহৃত পড়ে থাকার জন্য জাহাজটির খোলের অংশটাই শুধু অক্ষত অবস্থায় ছিল, ডেকের উপরকার কেবিন ইত্যাদি যা কিছু সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আইজেনষ্টাইনকে খোলা ডেকের উপর সব কিছু নির্মাণ কাজ পুরানো নক্সার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজেকে করে নিতে হয়েছিল। এছাড়া পরিচালককে আরও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। জাহাজটি সমুদ্রতীরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে নোঙর ফেলা ছিল, এই অবস্থায় ডেকের উপর থেকে ছবি যেভাবেই তোলা হোক না কেন তীরের খাড়াই পাহাড়শ্রেণী ক্যামেরার range-এর মধ্যে এসে পড়বে। অথচ দেখাতে হবে Potemkin জাহাজের সমস্ত ঘটনা ঘটছে তীর থেকে দূরে খোলা সমুদ্রের মধ্যে। অবশ্য জাহাজ তেরচাভাবে ৯০ ডিগ্রী কোণ করে ঘুরিয়ে নিলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু ঘোরাবার সময় খোলের 'বিস্ফোরক'-গুলিকে নাড়াচাড়া করা চলবে না। এই সমস্যার সমাধান অবশ্য আইজেনষ্টাইন করেছিলেন। তবে ডেকের উপর ক্যামেরা ও অন্যান্য দলবল নিয়ে কাজ করার সময় পায়ের তলাকার মাইনগুলির সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়েছিল। Potemkin ছবি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তোলা হয়েছিল তা ভাবলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। আইজেনষ্টাইন তখন যে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর কাছে তখন কোন বাধাই বাধা বলে মনে হয়নি।

এই হোল একটি ছবির জন্মকথা। আইজেনষ্টাইনের ঠিক পরেকার এবং সাম্প্রতিককালের বহু চিত্রপরিচালক আলোচ্য বইটি থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন। অনাগতকালের চিত্র পরিচালকরাও এভাবে উপকৃত হবেন। কারণ আজ Potemkin ছবি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবিরূপে বিশ্ববাসী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। যদিও আমাদের এই প্রবন্ধ Potemkin নামক ছবির জন্মকথা নিয়ে তবু এই ছবির টেকনিকগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা আশা করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমত Potemkin ছবিতে পরিচালক Shock attraction নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিকের প্রবর্তন করেছেন। এইভাবে টেকনিকটি ছবিতে রূপায়িত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটছে ওডেসা বন্দরের সেই বিখ্যাত সিঁড়িতে। কসাকেরা নৌবিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশকারী জনতার উপরে আক্রমণে উদ্যত। পর পর কয়েকটি দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। ক্লোসআপে একটি কসাক ছোরা হাতে আক্রমণে উদ্যত; ক্লোসআপে একটি নারী যার চশমা ভেঙে সমস্ত মুখ রক্তাপ্লুত, একদল কসাক সারিবদ্ধভাবে বন্দুক চালানোয় রত; এক যুবতী মাতা তাঁর বুক হাত দিয়ে চেপে অথচ রক্তের ধারা বাধা মানছে না; মাতার হাত থেকে খসে-পড়া বাচ্চার গাড়ীটি বাচ্চাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ক্রমশ গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি দৃশ্যই স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে তোলা অথচ এগুলিকে এমন নতুনভাবে সাজানো হয়েছে যে, দর্শক তাঁর নিজ মস্তিষ্কের চিন্তার পারম্পর্য দিয়ে অর্থোদ্ধার করে নিতে পারেন। তার দর্শকের মস্তিষ্কের ধারা দিয়ে তাঁর চিন্তার পারম্পর্যকে জাগানো হয়েছে বলেই সমগ্র ছবিটির চিত্রগত আবেদন এত জোরালো। অবশ্য পরিচালক ছবিতে তাঁর এই টেকনিকের খুবই পরিমিত ব্যবহার করেছেন।

Potemkin ছবির দ্বিতীয় টেকনিকগত বৈশিষ্ট্য হোল পরিচালকের পর্দার সময় এবং আসল সময়ের মধ্যে পার্থক্যের আবিষ্কার। সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, আসল সময় জিনিসটাকে একেবারে সরিয়ে ফেলা যেতে পারে। মানুষের জীবনের কোন সংকটময় মুহূর্তে তার অতি সাধারণ একটি ভঙ্গীর উপর বেশি জোর দিয়ে লাভ কি? দুঃখের মুহূর্তগুলি যেন মনে হয় অনন্ত, আবার সুখের সময় পলক ফেলতেই নিশ্চিহ্ন হয়। আইজেনষ্টাইন তাই সময়কে বাড়াবার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তগুলিকে বিলম্বিত করায় প্রয়াসী ছিলেন। Potemkin-এর একটি ঘটনা নেওয়া যাক। রেশন সরবরাহের গণ্ডগোলের দরুণ অর্ধভুক্ত এক নাবিক ওপরওলার কাছে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু প্রতিদানে তার ভাগ্যে জোটে অপমান ও লাঞ্ছনা। নাবিকটি এরপর অফিসারদের মেসে প্লেট পরিষ্কার করতে করতে দেখে একটি প্লেটে লেখা রয়েছে এই কথাগুলি : "Give us this day our daily bread"। দেখার সঙ্গে সঙ্গে নাবিকটি গুমরে উঠে এবং ঐ ডিসটিকে আছড়ে ভেঙে ফেলে। একটি ডিস ভেঙে ফেলা মুহূর্তের ঘটনা। কিন্তু মুহূর্তটির গুরুত্ব বিরাট। গুরুত্ব নাবিকটির দিক থেকে যেমন তেমনি ছবির পরিণতির দিক থেকেও। Potemkin জাহাজের সমস্ত নাবিকের সামগ্রিক বিদ্রোহের পূর্বাভাস এর মধ্যে রয়েছে। তাই আইজেনষ্টাইন ডিস ভাঙার দৃশ্যটিকে পর্দায় বেশি সময় পর্যন্ত রেখে তাকে নানাদিক থেকে দেখিয়েছেন। একই ঘটনার ছবি তিনি নানা কোণ থেকে গ্রহণ করেছেন, তারপর প্রত্যেকটি 'Shot'কে কেটে একটার ঘাড়ে আরেকটা চাপিয়ে দেখিয়ে গেছেন। একই দৃশ্যের বিভিন্ন শটকে পর পর ঘনভাবে এবং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানোর জন্য পরিচালকের উদ্দেশ্য সার্থক সফলতায় মণ্ডিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, Shock attraction এবং আসল সময়কে পর্দায় বিলম্বিত করার মিলিত রূপকেই আইজেনষ্টাইনের বিখ্যাত Montage প্রথা বলা হয়ে থাকে। পূর্ববর্ণিত বাচ্চার গাড়ী, ছাত্র, প্রার্থনারত মা আর উদ্যত ছোরা হাতে কসাক পর পর দেখানো এই দৃশ্যগুলির মধ্যেই Montage প্রথা সার্থক রূপে লাভ করেছে।

প্রেক্ষাগৃহ
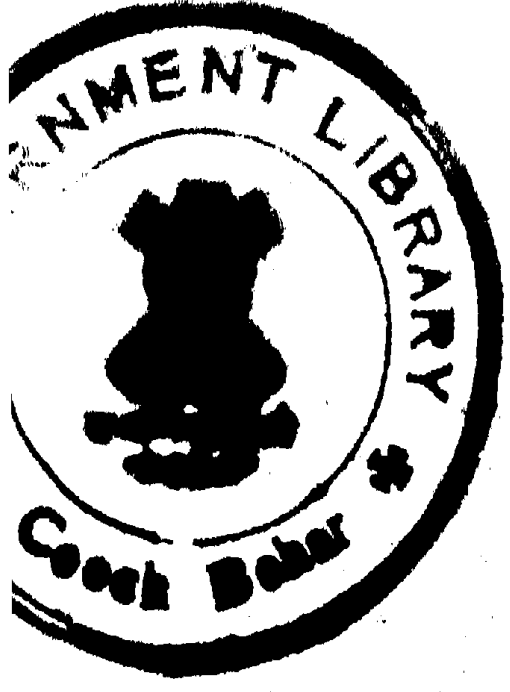
নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

চলচ্চিত্র—প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, সাধারণের জন্য এবং শিশুদের জন্য :

মাদ্রাজের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম্ কোনো এক শিশু-সাহিত্য সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছেন, "কোনো ছবিরই 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' মার্কা হওয়া উচিত নয়—কেননা, 'সাধারণের জন্য' মার্কাওলা ছবির চেয়ে 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য'-ছবি শিশুমনে ঢের বেশী ঔৎসুক্যের সঞ্চার করে থাকে। ......শিশুদের জন্যে নিষিদ্ধ ছবিকে বয়স্কদের জন্যেও নিষিদ্ধ করতে হবে।"

পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবীর মত নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের প্রতি লোভ মানুষের চিরন্তন। যেই বলা হল, অমুক কাজটি ক'র না, অমুক বইখানি প'ড় না, অমুক ছবিটি দেখ না, অমুক জায়গায় যেও না, অমনি মানুষের মন ছোঁক ছোঁক করবে, সেই বিশেষ কাজটি করতে, সেই বিশেষ বইটি পড়বার জন্যে, সেই বিশেষ ছবিটি দেখবার জন্যে এবং সেই বিশেষ জায়গায় যাবার জন্য। খালি শিশুদের ক্ষেত্রে নয়, সকল মানুষের সম্বন্ধেই এ-কথা খাটে। তবু সভ্য-জগৎ হাজারো রকম বিধিনিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ। সভ্যতার দোহাই দিয়ে, সামাজিকতার দোহাই দিয়ে, ধর্মের দোহাই দিয়ে, নীতির দোহাই দিয়ে, রুচির দোহাই দিয়ে, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা-রক্ষার দোহাই দিয়ে কত রকমই না 'নেতি'-বাচক অনুজ্ঞা আমাদের পথরোধ করে দাঁড়ায় জীবনের প্রতি পদে পদে। কিন্তু সৃষ্টিধর্মী যে শিল্পী, তাকে ঠেকাবে কোন্ জাগতিক বাধা? তাই গ্রীক ভাস্কর্যে দেখি, নগ্ন নরনারীর অপরূপ দেহসৌন্দর্য, ভারতীয় মন্দির-গাত্রে দেখি, প্রেমলীলার বিচিত্র কারু-কার্য, ইউরোপীয় চিত্রকলায় দেখি নারী-অবয়বের অপূর্ব সুষমা, কালিদাসের কুমারসম্ভব, জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি রচনায় দেখি, আদিরসের বিস্তৃত চিত্র। সারা পৃথিবীময় ছড়ানো আছে এমন কত শত শিল্প-সৃষ্টির উদাহরণ। কিন্তু গুণাবধারণের ক্ষমতা কি সকলেরই আছে? শিল্প-সৃষ্টির প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে হলে যে নির্বিকার রসানুভূতির প্রয়োজন, তার অধিকারী ক'জন? কোটীকে গোটিক বৈ ত' নয়। উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীত শুনতে গেলে যেমন মার্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকার সঙ্গে সঙ্গে কান থাকাও দরকার, তেমনই চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের বিশেষ রীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকার সঙ্গে সঙ্গে ছবি বা মূর্তি দেখবার বিশেষ চোখটিও থাকা দরকার

বিভূতিভূষণ মুখার্জি রচিত ও নির্মল মিত্র পরিচালিত রূপ-ভারতীর "কাঞ্চনমূল্যে" চিত্রে রাজলক্ষ্মী, ছবি বিশ্বাস এবং বাসবী নন্দী।

তার প্রকৃত রসটুকু উপভোগ করবার জন্যে। নইলে রসবিকার ঘটতে বাধ্য।

ফিল্ম-শিল্প পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ আর্ট। কিন্তু জনপ্রিয়তায় তা অপর সকল আর্টকে অতি সহজেই পরাস্ত করেছে। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্চাভিনয়ের থেকে ফিল্ম অন্ততঃ পঁচিশ গুণ জনপ্রিয়তার দাবী করতে পারে। এবং দর্শকমনের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাও এর অন্য সকল আর্ট থেকে অনেক, অনেক বেশী। বিষয়ের গুণে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে কোনো কোনো ফিল্ম আদিরসপ্রধান, বীভৎস, মর্মন্তুদ বা ভীতিব্যঞ্জক হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। এবং এই কারণেই সেগুলি সুকুমারমতি বালক-বালিকার দর্শনের অযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। শিল্পসৃষ্টির রসাবধারণে অধিকারী-অনধিকারী ভেদাভেদ চিরদিনই ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। শিশুমনে কোনো বিষয়ে ঔৎসুক্য হলেই যে সব সময়েই তা চরিতার্থ করতে হবে, এমন বিধান নিশ্চয়ই কেউ দেবেন না। কাজেই "প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য"-ছবি দেখবার প্রতি অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হ'লে তাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার পন্থার সুষ্ঠু প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়।

হৃষিকেশ মুখার্জি পরিচালিত এ-ভি-এম প্রোডাকসনের "ছায়া" চিত্রে আশা পারেখ এবং সুনীল দত্ত

নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি শিশুমনের এই আগ্রহ আবার উল্টোদিকে "শিশুদের জন্য"-মার্কাওয়ালা ফিল্মগুলির প্রতি তাদের বীতরাগ করে তোলা আদৌ বিচিত্র নয়। অন্ততঃ ইংলণ্ডের একটি সমীক্ষা থেকে এই সত্য প্রকট হয়েছে যে, বিশেষ করে শিশুদের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রগুলি দেখতে ছেলেমেয়েরা একে-

বারেই নারাজ। তারা মনে করে, ছবিগুলি এমনই নিরামিষ জাতীয় যে, তাদের আনন্দ দেবার পক্ষে তারা আদৌ যথেষ্ট নয়—ছবিগুলি নেহাৎই 'ছেলে-ভুলোনো' ব্যাপার। ভারত সরকারের শিশু চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের হয়ে তোলা 'জলপরী'র অদৃষ্টও যে-খুব আলোকোজ্জ্বল হয়েছে, তা ব'লে ত' মনে হয় না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের "ডাকাতের হাতে'র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করব এবং আশা করব কি যে, ইতিহাস পাল্টে যাবে?

মহেশ কাউল পরিচালিত ও অনুপম চিত্র প্রতিষ্ঠানের "পিয়ার কী পিয়াস" চিত্রে হনি ইরাণী।

চিত্র সমালোচনা ঃ

কাঞ্চনমূল্য ঃ রূপভারতী ফিল্মস্-এর ছবি; ১৩৭০৪ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ঃ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল মিত্র; পরিচালনা ঃ নির্মল মিত্র; সঙ্গীত পরিচালনা ঃ নির্মলেন্দু চৌধুরী; চিত্রগ্রহণ ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত; শব্দগ্রহণ ঃ মৃণাল গুহ-ঠাকুরতা, সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত সরকার; শিল্পনির্দেশনা ঃ সুনীল সরকার; সম্পাদনা ঃ অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা ঃ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসিত মণ্ডল, ভূমিকায় ঃ ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, বাসবী নন্দী, অপর্ণা প্রভৃতি। আর. ডি. বি অ্যাণ্ড কোম্পানীর পরিবেশনায় গেল ১৪ই জুলাই থেকে শ্রী, ইন্দিরা, লোটাস এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "কাঞ্চনমূল্য" একটি রসসিদ্ধ রচনা। এতে স্বরূপ মণ্ডলের মুখ দিয়ে তিনি যে-গল্পের অবতারণা করেছেন, তাতে গল্পের চেয়ে চিত্র আছে বেশী এবং সে-চিত্র হাস্যকৌতুক রসে আগাগোড়া ভরপুর। 'বিয়ের সময় কনে না থাকলেও বিয়ে আটকায় না,' নিজের এই অদ্ভুত তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে স্বরূপ নিজেরই বাল্যকালের যে-কাহিনী বিবৃত করে, তার ঘটনাকাল গেল উনিশ শো শতকের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের যুগ, যে-যুগে সধবা এবং বিধবা পার্টির দলাদলিতে বাঙলা দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিভূতিবাবু এই দলাদলির ভয়াবহ ও বিষময় রূপটি সম্বন্ধে গল্পের গোড়ার দিকে সামান্য একটু ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন; পরে তাঁর প্রধান উপজীব্য হয়েছে কৌতুক-রস। তাই বিদ্যাসাগরের শোক-সভাপর্ব মাথা ফাটাফাটিতে শেষ হবার পর যখন বিধবা-বিবাহে পৌরোহিত্য করবার অপরাধে ছাপোষা অনাদি ঠাকুরের ভিটে মুগুরধারী সধবা পার্টি দ্বারা আক্রান্ত হয়, ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ যেন শূন্য হতে আবির্ভূতা হন অনাদির বর্ষীয়সী বিধবা শ্যালিকা ব্রেজঠাকরুণ একেবারে রণরঙ্গিনীরূপে এবং বাড়ী চড়াওয়ের কারণ শোনামাত্র সদর্পে ঘোষণা করেন, তিনি নিজেই তাঁর ভগ্নিপতির সঙ্গে বিধবা-বিবাহ করতে এসেছেন, কারুর সাধ্য থাকে ত' এগিয়ে এসে এ-কাজে তাঁকে বাধা দিক। ব্যস, এর পর থেকে শেষ পর্যন্ত ব্রেজঠাকরুণই হয়ে ওঠেন বইয়ের কেন্দ্র-চরিত্র এবং তারই ফলে অনাদি ঠাকুর দারিদ্র্য ও সুদখোর রাজীব ঘোষাল দ্বারা যতই নিপীড়িত হন, তার মর্মান্তিকতাকে ছাপিয়েও ব্রেজঠাকরুণের বহুবিধ লীলা বালক স্বরূপ মণ্ডলের সহায়তায় কৌতুকের নির্ঝর বইয়ে চলে প্রতিনিয়তই, যাতে সমস্ত ঘটনাটাই

পাঠক এবং দর্শকের কাছে পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

চিত্রনাট্যকারেরা মূল গ্রন্থকারের মতোই স্বরূপ মণ্ডলের জবানিতে ছবির কাহিনীকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন এবং কাহিনীকারের ভাবধারা বা spirit-কে যতদূর সম্ভব অক্ষুন্ন রেখেছেন। কিন্তু যেখানে প্রধানতঃ রঙ্গ-রসের মাধ্যমে দর্শকমনোরঞ্জনবিধান করতে হয়, সেখানে চিত্রনাট্য আরও গতিশীল হওয়া প্রয়োজন। আজকের দিনের চিত্রনাট্যেও যাত্রার [illegible]য়ে যেখানে সেখানে বাউলের আবির্ভাব চিত্রনাট্যকারদের কল্পনাশক্তির ক্ষীণতারই পরিচয় বহন করে। বিধবা-বিবাহের উগ্র সমর্থকের আত্মহত্যা করে স্ত্রীকে বিধবা-বিবাহের সুযোগ দেবার চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, তখন অত্যন্ত যুগোপযোগীভাবে বিপক্ষ দল দ্বারা তর্জার আয়োজন করা হয়েছে; কিন্তু রুচিহীন অঙ্গভঙ্গীসহ সেই তর্জাকে অতখানি সময় নিয়ে অত ফলাও করে দেখানো অপরিহার্য ছিলনা বলেই মনে হয়। ঠিক সমানই-ভাবে সংক্ষিপ্ত করবার অবসর ছিল রামায়ণ গানের দৃশ্যটিকে।

ছবির অভিনয়াংশ মোটের ওপর একটি উচ্চমান বজায় রেখেছে। বহুদিন বাদে বড় রাজলক্ষ্মী তাঁর অভিনয়-প্রতিভা দেখাবার অবসর পেলেন ব্রেজঠাকরুণের ভূমিকায়। তাঁর স্বাভাবিক বাচনভঙ্গী আজও বহু অভিনেত্রীর শিক্ষণীয়। অবশ্য তাঁর ভাবগদগদ সহানুভূতিসূচক কথাগুলি আজকের দর্শকের কানে একটু অস্বাভাবিকভাবে সুরেলা ঠেকে। অনাদি ঠাকুরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। হাড়-কেপ্পন চশমখোর রাজীব ঘোষালের ভূমিকায় বিকাশ রায়ের সাজসজ্জা অতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, তাঁর অভিনয়ও ঘোষাল-চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে। কিন্তু কয়েকটি জায়গায় তাঁর বাচন এবং চলাফেরা তাঁর সাজা-বয়েসের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম হয়নি। গোঁফের বাহারওলা গাঁজাখোর ছিরুর ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অনবদ্য অভিনয় করে দর্শকদের হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। এসব ভূমিকায় তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর প্রধান সাকরেদ-রূপে অনুপকুমারও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুঅভিনয় করেছেন। ছ'আনি জমিদার দেবনারায়ণের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়কে মানিয়েছেও যেমন চমৎকার, তেমনই সুঅভিনয়ের গুণে তাঁর গৃহীত চরিত্রের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। বালক স্বরূপরূপে ভানু-নন্দন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় তার বুদ্ধিদীপ্ত স্বচ্ছন্দ অভিনয় দিয়ে দর্শকহৃদয় জয় করতে পেরেছে। অনাদি ঠাকুরের মেয়ে নেত্য-বেশে বাসবী নন্দী গ্রাম্য মেয়ের শান্ত অসহায় রূপটিকে চমৎকার ফুটিয়েছেন। তর্জাওলা তুলসী চক্রবর্তী একটি দৃশ্যেই মাত করে দিয়েছেন। এ-ভূমিকায় তাঁর জুড়ী নেই। রামায়ণ-গাইয়ে ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর আবহের সৃষ্টি করেছিলেন। জমিদারের ভূমিকায় কমল মিত্র স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করেছেন।

ছবিটিতে গানের অত্যন্ত বাহুল্য। বহু গানকে বাদ দেওয়া যেতে পারত এবং তর্জা ও রামায়ণ-গানকে অনেক ছোট করার অবসর ছিল। বইয়ের ঘটনাটি ঘটেছিল গতযুগে এবং গ্রাম্য পরিবেশে। একথা মনে রেখেও জিজ্ঞাসা জাগে, মাত্র লোকসংগীত ছাড়া অন্য সংগীতের কি স্থান হতে পারত না এ ছবিতে? মনে হয়, নির্মলেন্দু চৌধুরীর সংগীত-প্রতিভা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন এই ছবির কাহিনী নয়। এবং এই একই কারণে ছবির আবহ-সংগীত কোনো নূতনত্বের দাবি নিয়ে দেখা দেয়নি।

জরাসন্ধ রচিত ও মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত মহাশ্বেতা ছায়াচিত্রমের "ন্যায়দণ্ড" চিত্রে রাধামোহন ভট্টাচার্য ও ছায়া দেবী।

ছবির চিত্রগ্রহণ সাধারণ পর্যায়ের। শিল্প নির্দেশনার কাজ কোথাও অত্যন্ত সুন্দর, কোথাও সাধারণ, আবার কোথাও অত্যন্ত খারাপ। সম্পাদকের প্রচুর কাঁচি চালাবার অবসর ছিল। যেভাবে অশ্বপৃষ্ঠারূঢ় দেবনারায়ণের সঙ্গে দরজার চৌকাটে দণ্ডায়মানা নেত্যর চারি চোখের মিলন ঘটানো হয়েছে, তা পল্লীললনার স্বাভাবিক লজ্জাকে নিঃসন্দেহে লজ্জা দিয়েছে। এ-দৃশ্য যত কম স্থায়ী হ'ত, ততই হ'ত শোভন।

পরিচালক নির্মল মিত্র কোন রকম বাহাদুরীর প্যাঁচ না দেখিয়ে ছবিটিকে সহজ পথে এগিয়ে যেতে দিয়েছেন এবং এইখানেই তাঁর বাহাদুরি।

রঙ্গকৌতুকেভরা "কাঞ্চনমূল্য" যে অগণিত চিত্ররসিকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অনায়াসেই করতে পারি।

বিবিধ সংবাদ

"বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প শ্চি ম ব ঙ্গ স্থি ত চিত্রগৃহসমূহের মালিকগণ আজ হইতে পুনর্বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত তাঁহাদের চিত্রগৃহগুলি বন্ধ রাখিবেন।"— এই বিজ্ঞাপন দেখে চিত্ররসিকমাত্রই দুঃখিত হবেন। সংবাদে প্রকাশ, রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার নাকি বলেছেন, "চিত্রগৃহের মালিকেরা প্রথমে ন্যূনতম বেতন চালু করুন। যেসব মালিকের এ-ব্যাপারে অসুবিধা আছে, তাদের কথা সরকার পরে বিবেচনা করবেন।" আইনসম্মত নিম্নতম বেতন চালু করার দাবি নিয়ে সিনেমাগৃহের কর্মী ও মালিকের মধ্যে মতদ্বৈধতার ফলে বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও আমোদপ্রমোদের প্রধান মাধ্যম চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী যদি সত্যিই বি, এম্, পি, এ-র বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ থাকে, তা'হলে এর চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। এই অচলাবস্থা দূর করবার জন্যে আমরা রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে সক্রিয় হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

* * *

"স্বরলিপি"র অসামান্য সাফল্যের পর জনতা পিকচার্স যে-ছবিতে হাত দিচ্ছেন, তা হবে উত্তমপুরুষ রচিত "বাসর" অবলম্বনে গঠিত। আশা করা যাচ্ছে, পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি এর স্যুটিং আরম্ভ করতে পারবেন।

* * *

এ-ভি-এম-এর নবতম হিন্দী ছবি "ছায়া"র সর্বভারতীয় মুক্তি হবে এই বছরের ৪ঠা আগস্ট তারিখে। হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সুনীল দত্ত, আশা পারেখ, ললিতা পাওয়ার, নাজির হোসেন, অসীমকুমার, অচলা সচদেব, ভারতী রায় ও নিরূপা রায়। সলিল চৌধুরী ছবিটিতে সুরযোজনা করেছেন।

* * *

শৈলেশ দে রচিত এবং মনোজ ভট্টাচার্য পরিচালিত দেবী প্রোডাক্‌সন্সের "ডাইনী"র চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। ছবি বিশ্বাস, প্রশান্তকুমার, গঙ্গাপদ বসু, দিলীপ রায়, সীতা মুখোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, গীতা দে, মাস্টার বাবু প্রভৃতি বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়সমৃদ্ধ এই ছবিখানির চিত্রগ্রহণ ও সুরযোজনা করেছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও কালোবরণ।

* * *

এক আশাবাদী যুবকের বৈচিত্র্যময় জীবনের চিত্ররূপ হচ্ছে শ্রীমান পিকচার্সের সামাজিক চিত্র "মধুরেণ"। বিধায়ক ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটির পরিচালনা করেছেন শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। এর বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, সন্ধ্যারাণী, কবিতা রায়, পদ্মা দেবী, নিভাননী, মাস্টার দীপক, কুমারী কৃষ্ণা এবং আরও অনেকে। সুরযোজনা করেছেন কালীপদ সেন। চণ্ডিকা পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি আস্‌চে আগস্টে রাধা, পূর্ণ প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে।

* * *

২৩-এ জুলাই, রবিবার সকাল ১০টায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার ইউনিট শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত "চার দেয়াল" মঞ্চস্থ করবেন। আলোকসম্পাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাপস সেন।

* * *

আস্‌চে ২৫-এ জুলাই, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউ এম্পায়ারে সর্বজনপ্রিয় নাট্যসংস্থা বহুরূপী রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" অভিনয় করবেন। তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, আরতি মৈত্র প্রভৃতি বহুরূপীর নিয়মিত শিল্পীরাই বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

আজ কাল পরশু

এ সপ্তাহের একটি মাত্র যে বাংলা ছবি রূপবাণী, ভারতী, অরুণা এবং সহর ও সহরতলীর ৮টি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে তা হল 'চলচ্চিত্রালয়'-এর 'আজ কাল পরশু'। রচনা ও পরিচালনা করেছেন নির্মল সর্বজ্ঞ। সংগীত পরিচালনা করছেন অপরেশ লাহিড়ী। রূপায়ণে আছেন : কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী মুখার্জি, তপতী ঘোষ, অনুপকুমার, সবিতাব্রত, অপর্ণা দেবী, রাজলক্ষ্মী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্র-পরিচালক সুশীল মজুমদার।
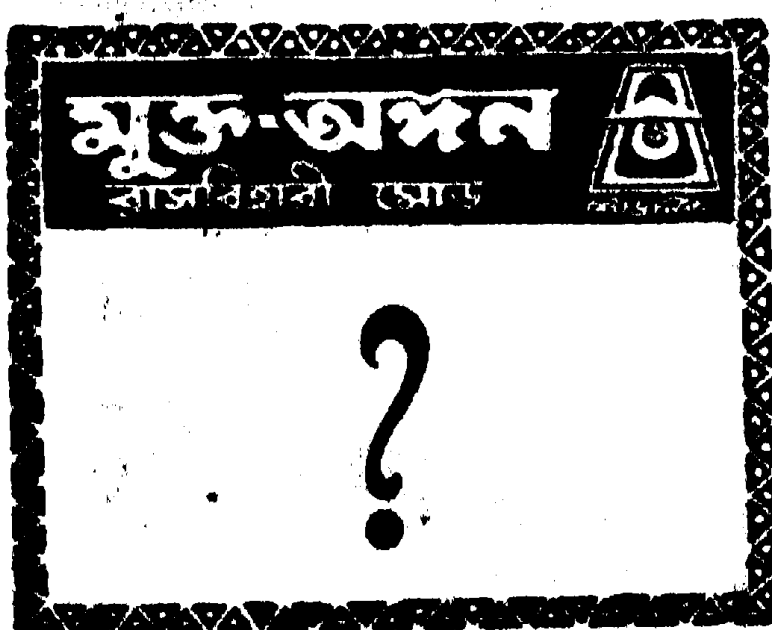
খেলাধুলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ড সফর

১৯৬১ সালের ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল দ্বিতীয় পরাজয় বরণ করেছে ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স দলের বিপক্ষে একদিনের খেলায়। তাদের প্রথম পরাজয় ঘটে ইংল্যান্ডের হাতে লিডস মাঠের তৃতীয় টেস্টে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল উপর্যুপার দুটি খেলায় একই উইকেটের ব্যবধানে (৮ উইকেট) হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স দলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্টের ৬ জন খেলোয়াড়কে নামিয়েছিল। দু'-ঘন্টার খেলায় অস্ট্রেলিয়ার **১ম** ইনিংস মাত্র ১৪৯ রাণে শেষ হয়। জিম মেল-ভীলের মারাত্মক বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার এই শোচনীয় বিপর্যয় ঘটে। মেলভীল অস্ট্রেলিয়ার প্রথম পাঁচজনকে আউট করেন। এক সময়ে **৯টা** বলে তিনি **৩টে** উইকেট পান। মেলভীল মোট **৬টা** উইকেট পান ৪৬ রাণে। দুটো উইকেট হারিয়ে ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স দল জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ তুলে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮ **উইকেটে** জয়লাভের গৌরব লাভ করে।

এ পর্যন্ত (**১৬ই** জুলাই) ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের খেলার ফলাফল নিম্নরূপ দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ১৯। অস্ট্রেলিয়ার জয় ৬, হার ২ এবং খেলা ড্র ১১।

॥ ব্যক্তিগত শত রাণ ॥

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ২৫

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে : ৯

॥ টেস্ট সেঞ্চুরী ॥

অস্ট্রেলিয়া (২) : ১১৪ **নীল হার্ভে (১ম টেস্ট) এবং** ১৩০ **বিল লরী (২য় টেস্ট)।**

ইংল্যান্ড : ১১২ রমন সুব্বা রাও এবং ১৮০ টেড ডেক্সটার (১ম টেস্ট)।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী (২৫): বিল লরী—৬, নর্মান ও'নীল ৫, নীল হার্ভে ৩, পিটার বার্জ ৩, কলিন ম্যাক-ডোনাল্ড ৩, ব্রেন চার্লস বুথ ২, রোনাল্ড সিম্পসন ২, কেনেথ ম্যাকে ১।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরী (৯) : কলিন কাউড্রে ৩ (**এম** সি সি এবং কেন্ট); একটা করে সেঞ্চুরী করেছেন: জন প্রেসডী (গ্লামর্গান), রমন সুব্বা রাও এবং ডেক্সটার (ইংল্যান্ড), গার্ডনার (লিস্টারশায়ার), ডবলউ এ্যালে (সামারসেট) এবং জি পুলার (ল্যাংকাসায়ার)।

উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী : ১৪৯ ও ১২১—কলিন কাউড্রে (কেন্ট)। **অস্ট্রে**লিয়ার পক্ষে কোন খেলোয়াড়ই **এ**-পর্যন্ত আলোচ্য সফরের খেলায় **এই** কৃতিত্বলাভ **করতে** পারেন নি।

উপভোগ্য ক্রিকেট খেলার জন্য ৮,০০০ পাউন্ড পুরস্কার

ব্রিটেনের টোবাকো ফার্ম ডবলিউ ডি অ্যান্ড এইচ ও উইলস ঘোষণা করেন, ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরীজে প্রতি টেস্টের বিজয়ী দলকে

১৯৬১ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনাল খেলার শেষে বিজয়ী রড লেভার (ডান দিকে) এবং বিজিত রমানাথন কৃষ্ণাণ

তাঁরা ৫৬০ পাউণ্ড পুরস্কার প্রদান করবেন। তাছাড়া প্রতি টেস্টে যে দলটি প্রতি ১০০ বলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত রান সংগ্রহ করতে পারবে তারাও অনুরূপ আর একটি পুরস্কার লাভ করবে।

৪০০ পাউণ্ডের পুরস্কারগুলি প্রদান করা হবে এইভাবে : (১) টেস্ট সিরিজে দ্রুততম শতরাণ করার জন্য (২) সর্বাধিক সংখ্যক উইকেট পাওয়ার জন্য; (৩) সিরিজে ব্যক্তিগত রানের দ্রুততম হারের জন্য (সর্বনিম্ন রাণ ২০০); (৪) সিরিজে সর্বাধিক সংখ্যক ক্যাচ পাওয়ার জন্য (হিসাবে উইকেট-রক্ষককে ধরা হয়নি); (৫) টেস্ট সিরিজে ১৫টির অধিক উইকেট পাওয়ার জন্যে উইকেট-রক্ষককে; (৬) এক ইনিংসে সর্বাধিক সংখ্যক উইকেট পাওয়ার জন্যে বোলারকে। এই পুরস্কারের মোট পরিমাণ হবে অতিরিক্ত ২,৪০০ পাউণ্ড।

হেনলি রিগাটা

লণ্ডন সহর থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে টেমস নদীর তীরস্থ সহর হেনলি। সহরটি 'হেনলি-অন-টেমস' নামে সুপরিচিত। হেনলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে এবং বাৎসরিক বাচ প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় বহু সংখ্যক দেশ-বিদেশের নর-নারীর সমাবেশ হয় এই সহরে। প্রতি জুন-জুলাই মাসে টেমস নদীর বুকে বাচ প্রতিযোগিতার মেলা বসে। প্রতিযোগিতার রাজকীয় নাম—হেনলি রয়েল রিগাটা। এই বাচ প্রতিযোগিতার জনপ্রিয়তা শুধু লণ্ডনে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে। প্রতিযোগিতায় কোন দেশের পক্ষে যোগদানের বাধা-নিষেধ নেই। ১৯৫৪ সালে রাশিয়া সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। উপর্যুপরি পাঁচবার যোগদানের পর দু'বছর (১৯৫৯-৬০) রাশিয়া যোগদান করেনি। পুনরায় ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল।

হেনলি রয়েল রিগাটা প্রতিযোগিতার কোন একটি অনুষ্ঠানে জয়লাভের গুরুত্ব বাচ খেলায় বিশ্ব খেতাব লাভের সমান। প্রতিযোগিতার মোট ৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীনত্ব এবং কৌলিন্যের দিক থেকে গ্র্যাণ্ড চ্যালেঞ্জ কাপ প্রতিযোগিতাকে শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানের সম্মান দেওয়া হয়। আট দাঁড়ির এই অনুষ্ঠান প্রথম স্থাপিত হয় ১৮৩৯ সালে। এ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে জয়ী হয়েছে ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং রাশিয়া।

১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার সেণ্ট্রাল ক্লাব এক লেংথের ব্যবধানে ইংল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত এবং বহু বারের বিজয়ী লিয়েণ্ডার ক্লাবকে পরাজিত ক'রে তিনবার গ্র্যাণ্ড চ্যালেঞ্জ কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে।

১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পাঁচটি অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে চারটির ফাইনালে ওঠে এবং দু'টিতে জয়ী হয়। ১৯৬১ সালের মোট সাতটি অনুষ্ঠানের মধ্যে বৃটেন তিন, রাশিয়া দুই, অস্ট্রেলিয়া এবং ফিনল্যাণ্ড একটি ক'রে অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে।

ডায়মণ্ড স্কালস (১৮৪৪ সালে স্থাপিত) অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার স্টুয়ার্ট ম্যাকেঞ্জি জয়ী হয়ে পাঁচবার জয়লাভের কৃতিত্ব লাভ করেছেন। হেনলি বাচ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে এই অনুষ্ঠানেই প্রথম বিদেশী দাঁড়ি হিসাবে প্রথম সাফল্য লাভ করেন ১৮৯২ সালে হল্যাণ্ডের একজন স্কালার।

হেনলি রয়েল রিগাটা প্রতিযোগিতা বিরাট নিয়ন্ত্রণ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। আগে স্থানীয় অধিবাসীরা, যারা এই প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়ের দিক দিয়ে লাভবান হত, তারাই প্রতিযোগিতার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করত। ১৮৪১ সালে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা বাবদ ১৫৪ পাউণ্ড (প্রায় ২,০০০ টাকা) ব্যয় করে। আজ এই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮,০০০ পাউণ্ডেরও (৫·০৬ লক্ষ টাকা) বেশি। পুরস্কারের মূল্য বাবদ খরচ ১৮৪০ সালে ছিল ৬৮ পাউণ্ড (৯০৫ টাকা)। বৃদ্ধি পেয়ে আজ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,০০০ পাউণ্ড (৪০,০০০ টাকা)।

নিউজিল্যাণ্ড সফরে ইণ্ডিয়ান ওয়াণ্ডারার্স হকি দল

ভারতীয় অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় উধম সিংয়ের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ওয়াণ্ডারার্স হকি দল সম্প্রতি নিউজিল্যাণ্ড সফর শেষ করেছে। মোট ২৬টি খেলার মধ্যে ভারতীয় দল ২৩টি খেলায় জয়ী হয়ে অপরাজেয় সম্মান লাভ করেছে। ভারতীয় হকি দল ১৯শে মে তারিখে দমদম বিমানঘাটি থেকে নিউজিল্যাণ্ড সফরে যাত্রা করে। নিউজিল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় দল তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলে—১ম টেস্টে ২—১ গোলে, ২য় টেস্টে ৩—১ গোলে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। ৩য় টেস্ট ১—১ গোলে ড্র যায়।

কৃষ্ণান কর্তৃক রড লেভার পরাজিত

নেদারল্যাণ্ডের স্কিইভনিংগেন সহরে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনী টেনিস খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান ৬-৪, ৪-৬, ১০-৮ গেমে ১৯৬১ সালের উইম্বলেডন সিংগলস চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়ার রড লেভারকে পরাজিত করেছেন। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য, ১৯৬১ সালের উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণান পুরুষদের সিংগলস খেলার সেমি-ফাইনালে লেভারের কাছে হার স্বীকার ক'রেছিলেন।

পেশাদার ও সখের টেনিস খেলোয়াড়

লন্ টেনিস জগতে পেশাদার এবং অপেশাদার অর্থাৎ সখের টেনিস খেলোয়াড়দের নিয়ে এক মহা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা আজকের নয়, বহুকালের। পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের খেলায় যথেষ্ট পরিমাণ আকর্ষণ আছে। নামকরা সখের টেনিস খেলোয়াড়দের নিয়েই আজ এক বিরাট পেশাদার টেনিস সমাজ গড়ে উঠেছে। কিন্তু সরকারী সখের টেনিস মহলে পেশাদার খেলোয়াড়রা বহুদিন থেকেই একঘরে হয়ে আছেন। বিভিন্ন দেশের টেনিস এসোসিয়েশনগুলি তাঁদের আভিজাত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সখের এবং পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যবধানের এক বিরাট প্রাচীর তুলে রেখেছেন। ইণ্টারন্যাশনাল লন্ টেনিস ফেডারেশনের অধীনস্থ দেশগুলির টেনিস প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড়রা কোন মতেই সখের খেলোয়াড়দের সংগে যোগদান করতে পারেন না। খ্যাতনামা সখের খেলোয়াড়দের সখের খেলোয়াড়জীবন খুব বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাফল্য লাভের সংগে সংগে তাঁদের কাছে মোটা টাকার চুক্তিতে লোভনীয় প্রস্তাব আসে; বহু খ্যাতনামা সখের খেলোয়াড় এইভাবে সখের খেলোয়াড়-জীবন ছেড়ে দিয়ে পেশাদার-জীবন গ্রহণ করেছেন। ফলে বিশ্বখ্যাত সখের লন্ টেনিস প্রতিযোগিতাগুলিতে খেলার মানের অসম্ভব রকম অবনতি ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস ফেডারেশনে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং অস্ট্রেলিয়া এই চারটি দেশের প্রভাবই খুব বেশী। বৃটেন এবং আমেরিকা পেশাদার খেলোয়াড়দের পক্ষে; অর্থাৎ তারা প্রতিযোগিতায় সখের খেলোয়াড়দের সংগে পেশাদার খেলোয়াড়দের যোগদানের সমর্থক। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এই ধরণের প্রস্তাব সমর্থন

করে না। অস্ট্রেলিয়া তাদের গোঁড়ামি ত্যাগ করতে রাজী নয়।

জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মানুষের যোগ্যতা এবং প্রতিভার স্বীকৃতি অর্থের মাধ্যমে দেওয়ার প্রচলন আছে। কিন্তু টেনিস খেলায় সেই অর্থই আজ যত অবজ্ঞার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টেনিস খেলায় এই অর্থের লেনদেনকে এক শ্রেণীর কর্তৃপক্ষ আত্মসম্মানের দিক থেকে সুনজরে দেখেন না। পেশাদার খেলোয়াড়রা তাঁদের কাছে তাই অবজ্ঞার পাত্র।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

আলোচ্য সপ্তাহে (১০ই জুলাই থেকে ১৬ই জুলাই পর্যন্ত) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল ঃ

আলোচ্য সপ্তাহে ইস্টবেঙ্গল দল তিনটে খেলাতেই জয়ী হয়েছে—এরিয়ান্স দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে প্রথমার্ধের লীগের খেলায় প্রথম পরাজয়ের প্রতিশোধও নিয়েছে। মোহনবাগান, বি এন আর এবং মহমেডান স্পোর্টিং প্রত্যেকে একটা ক'রে পয়েণ্ট নষ্ট করেছে; এরিয়ান্সকে তিনটে এবং ইস্টার্ণ রেল দলকে দুটো পয়েণ্ট হারাতে হয়েছে।

লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। আলোচ্য সপ্তাহে তারা ১—০ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ, ৩—০ গোলে খিদিরপুর এবং ১—০ গোলে এরিয়ান্সকে পরাজিত করে মোট ২৩টা খেলায় ৪১ পয়েন্ট তুলেছে।

লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের আর মাত্র ৫টা খেলা বাকি। অন্যদিকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান দলেরও বাকি ৫টা খেলা। বি এন আর দলের বাকি ৯টা। মোহনবাগান এবং বি এন আর দলের মধ্যে যে কোন একদল যদি তাদের লীগের বাকি খেলাগুলিতে জয়ী হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল দলকে সরাসরি লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের খেতাব পেতে ৫টা খেলায় অন্ততঃ ৬ পয়েন্ট তুলতেই হবে। লীগের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মোহনবাগান দলের থেকে সমান ২৩টা খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল উপস্থিত ৫ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ জয়লাভের পথে কোন রকম শক্ত বাধা নেই।

লীগ তালিকায় প্রথম পাঁচটি দল

(১৬ই জুলাই পর্যন্ত)

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল	২৩	১৯	৩	১	৫৮	৮	৪১
মোহনবাগান	২৩	১৬	৪	৩	৪৩	১০	৩৬
বি এন আর	১৯	১১	৬	২	২৩	৬	২৮
এরিয়ান্স	২০	৮	৮	৪	২০	১৪	২৪
মহঃ স্পোর্টিং	২০	৮	৮	৪	২২	১৫	২৪
ইস্টার্ণ রেলওয়ে	১৯	৭	৮	৪	২৬	১২	২২

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান আলোচ্য সপ্তাহে তিনটে খেলার মধ্যে দুটোতে জয়ী হয়েছে এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করে মূল্যবান এক পয়েন্ট নষ্ট করেছে।

বি এন আর দলও একটা মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করেছে পুলিশের সঙ্গে খেলা ড্র করে। এখন তাদের ১৯টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট।

এরিয়ান্স আলোচ্য সপ্তাহে তিনটে খেলেছে—ফলাফল ড্র, জয় এবং হার। এরিয়ান্সের ২০টা খেলায় ২৪ পয়েন্ট উঠেছে। উপস্থিত লীগের তালিকায় মহমেডান দলের সঙ্গে চতুর্থ স্থান। ইস্টার্ণ রেল দল দুটো খেলাই ড্র করেছে; ফলে তাদের উপর্যুপরি ৭টা খেলা ড্র গেল। তাদের ১৯টা খেলায় দাঁড়িয়েছে ২২ পয়েন্ট। তারা এরিয়ান্স এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলকে প্রায় ধরে ফেলেছে। ১৬।৭।৬১

উইম্বলেডন লন টেনিসের ইতিহাস

[১]

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র পুরুষদের সিঙ্গলস খেলা নিয়ে ১৮৭৭ সালে আরম্ভ হয়। মহিলাদের সিঙ্গলস খেলা ১৮৮৪ সালে, পুরুষদের ডাবলস খেলা ১৮৭৯ সালে, মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেলা ১৯১৩ সালে প্রতি-

ইস্টবেঙ্গল বনাম এরিয়ান্স দলের লীগের ফিরতি খেলা ঃ এরিয়ান্স দলের গোলের সামনে একটি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য
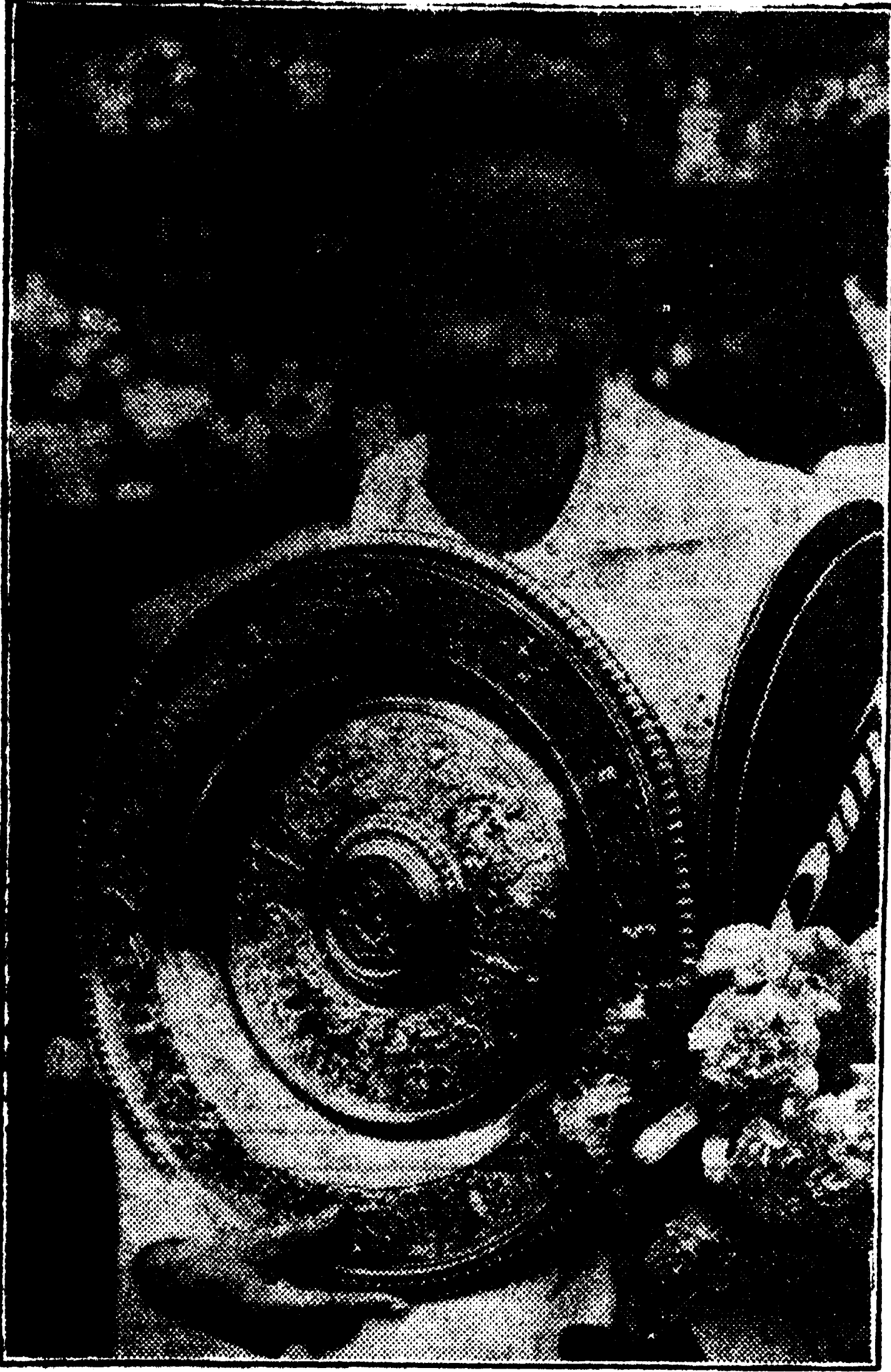
ট্রফি হাতে ১৯৬১ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার মহিলাদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান মিস এ্যাঞ্জেলা মর্টিমার (ইংলণ্ড)

যোগিতার অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পায়। গত ৮৫ বছরের (১৮৭৭ থেকে ১৯৬১) মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭৫ বার। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ মোট দশ বছর (১৯১৫-১৮ এবং ১৯৪০-৪৫) বন্ধ ছিল। ১৮৭৭ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় একাধিপত্য লাভ করেছিলেন ডবলিউ রেনশ এবং ডোহার্টি পরিবারের দুই ভাই আর এফ ডোহার্টি এবং এইচ এল ডোহার্টি। ডবলিউ রেনশ মোট ৭ বার সিঙ্গলস খেতাব পান, তার মধ্যে উপর্যুপরি ৬ বার (উপর্যুপরি ৬ বার—১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ এবং ১৮৮৯)। তাঁর যমজ ভাই ই রেনশ একবার, ১৮৮৮ সালে সিঙ্গলসের ফাইনালে জয়ী হ'ন। ডোহার্টি ভ্রাতৃ-দ্বয়ের মধ্যে আর এফ ডোহার্টি সিঙ্গলস খেতাব লাভ করেন উপর্যুপরি ৪ বার (১৮৯৭-১৯০০) এবং এইচ এল ডোহার্টি উপর্যুপরি ৫ বার (১৯০২-১৯০৬)। এ'রা দু'জন একটানা জয়ী হ'ন—ফাঁক রেখে কখনও খেতাব পাননি। প্রতিযোগিতার প্রথম দিকের কয়েক বছর ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যেই প্রতিযোগিতাটি সীমাবদ্ধ ছিল—অপর কোন দেশের খেলোয়াড়ের যোগ-দানের অধিকার ছিল না। সুতরাং ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রাই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে। ১৯০৭ সালে প্রথম বহিরাগত খেলোয়াড় হিসাবে সিঙ্গলস খেতাব লাভ করেন অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা খেলোয়াড় এন ই ব্রুকস। পরবর্তী দু'বছরে (১৯০৮-১৯০৯) ইংল্যান্ডের এ গোর জয়ী হ'ন। তারপরই ইংল্যান্ডের প্রাধান্য দীর্ঘ বছর লুপ্ত হয়। নিউজিল্যাণ্ডের এ এফ উইলডিং উপর্যুপরি ৪ বার (১৯১০-১৯১৩) চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করে সেই যে বহিরাগত খেলোয়াড়দের জয়লাভের শুভ সূচনা করলেন, সুদীর্ঘ ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ ছিল। ফ্রেডরিক জন পেরী উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৩৪-১৯৩৬) জয়ী হয়ে শেষ বারের মত ইংল্যাণ্ডের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর ১৯৩৬ সালের পরবর্তী প্রতি-যোগিতায় ইংল্যাণ্ড কোন খেতাব লাভ করতে পারে নি। ইংল্যাণ্ডের বাইরের দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা ১৬ বার, অস্ট্রেলিয়া ১১ বার, ফ্রান্স ৭ বার এবং নিউজিল্যাণ্ড ৫ বার উইম্বলেডন প্রতি-যোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব লাভ করেছে। নিউজিল্যাণ্ডের এ এফ উইলডিং উপর্যুপরি ৪ বার (১৯১০-১৩) সিঙ্গলসে জয়ী হয়ে বহিরাগত খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বাধিক বার জয়-লাভের গৌরব লাভ করেন। শুধু তাই নয়, ১৯১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত আর কোন খেলোয়াড় উপর্যুপরি এত বেশী বার জয়ী হননি। শেষ ৩ বার করে জয়ী হয়েছেন আমেরিকার ডবলিউ টি টিলডেন এবং ইংল্যান্ডের ফ্রেডরিক পেরী; ২ বার করে ফ্রান্সের বোরোত্রা লাকোস্তে, কোশে এবং পেত্রা; আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ (১৯৩৭-৩৮) এবং যুদ্ধ-পরবর্তী-কালের প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬ সাল থেকে) অস্ট্রেলিয়ার এল এ হোড।

ফ্রান্স ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত উপর্যুপরি মোট ৬ বার সিঙ্গলস খেতাব নিয়ে বহিরাগত দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক বার উপর্যুপরি খেতাব লাভের রেকর্ড করে। এই সময়ে ফ্রান্সের পক্ষে খেলেছিলেন বিখ্যাত চারজন খেলোয়াড়—বোরোত্রা, লাকোস্তে, কোশে এবং পেত্রা। সিঙ্গলস খেতাব ছাড়াও ফ্রান্স ১৯২৫ থেকে ১৯৩৩ সালের পুরুষদের ডাবলসে ৫ বার জয়ী হয়—বোরোত্রা, লোকোস্তে, কোশে এবং ব্রু'য়ো-এর সহযোগিতায়।

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ

কোকিল ডেকেছিল ৩·২৫

"...আলোচ্য বইটিতে পনেরোটি ছোট গল্প আছে। বিভূতিভূষণের রচনার বৈশিষ্ট্য নির্মল হাস্যরস। কোনও গল্পেই তার অভাব নেই।...এই গল্পগুলি পড়তে পড়তে মন সজীব হয়ে ওঠে। গল্পগুলির মধ্যে ঘটনা-সংস্থাপনা ও লেখকের প্রকাশ-ভঙ্গি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। অথচ কোন গল্পেরই বিষয়বস্তু উদ্ভট নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই এই ছোটগল্পগুলি সরস হয়ে উঠেছে। অথচ এজন্যে লেখকের কোনও প্রয়াস নেই।...এই গ্রন্থের যে কোনও ছোট গল্পই ধরা যাক না, তা যে অভ্রান্তভাবে বিভূতিভূষণেরই রচনা তা গল্পটি শেষ করতে না করতেই বুঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কোকিল ডেকেছিল', 'এল-এল', 'লঙ্কাকাণ্ড' প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে।" (আকাশবাণী, কলিকাতা)

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

উপন্যাস : কাঞ্চন-মূল্য ৫·৫০ : রিক্‌শার গান ৫·০০ ॥
গল্পগ্রন্থ : কায়কল্প ৩·৫০ : শারদীয়া ৩·২৫ ॥
ছোটদের : পোনুর চিঠি ২·০০ : হেসে যাও ২·০০ ॥

ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা ২·৫০

একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। ব্রহ্মবাধব এক ক্ষণজন্মা অবিস্মরণীয় বাঙালী। উভয়েরই জন্ম-শতবার্ষিকী এই বৎসরটি। ব্রহ্ম-বান্ধব আজ বিস্মৃতপ্রায়। তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে আমরা 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা' প্রকাশ করেছি। ইহাতে 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি', 'বাঙলার পালপার্বণ' ও 'আমার ভারত উদ্ধার' এই তিনটি একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে ব্রহ্মবান্ধবের একটি ফটো ও তাঁহার হস্তলিপির আলোকচিত্র সম্বলিত দুইখানি ছবি দেওয়া হয়েছে।

স্মরণীয় ৭

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই আষাঢ়ের বই

নবেন্দু ঘোষের উপন্যাস
প্রথম বসন্ত ২·৫০

অজিতকৃষ্ণ বসুর
সানাই (উপন্যাস) ২·৫০

সদ্য প্রকাশিত

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
দক্ষিণের বারান্দা ৪৲
[শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলালের স্মৃতিকথা]

বাণী রায়ের
সেই চেনা ছেলেটি ১·৭৫
[লোফারের চমকপ্রদ দুঃসাহসিক কাহিনী]

আমাদের প্রকাশনার কয়েকখানা উল্লেখযোগ্য ও উপহারযোগ্য গ্রন্থ :

উপন্যাস : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **মৌসুমী** ৩·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **হিয়ে হিয় রাখনু** ৩·০০ ॥ লীলা মজুমদারের **ঝাঁপতাল** ২·৭৫ ॥ 'বনফুল'-এর **হাটে বাজারে** ৩·৫০ : **জলতরঙ্গ** ৪·০০ ॥ প্রতিভা বসুর **মনোলীনা** ২·৫০ ॥ অমলা দেবীর **ছায়াছবি** ২·০০ ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর **অনুষ্টুপ ছন্দ** ৪·০০ ॥ প্রবোধকুমার সান্যালের **ইস্পাতের ফলা** ৩·৫০ ॥ বিমল মিত্রের **কন্যাপক্ষ** ৩·০০ ॥ অনুরূপা দেবীর **উত্তরায়ণ** ৫·৫০ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **সৃষ্টি** ৫·৫০ ॥ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **দিবারাত্রির কাব্য** ৩·২৫ ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **নীল রাত্রি** ৩·৫০ ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের **কৃষ্ণকলি নাম তার** ৫·৫০ ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **এক ছিল কন্যা** ৬·৫০ ॥ চিত্রিতা দেবীর **দুই নদীর তীরে** ৬·৭৫ ॥ শচীন্দ্র মজুমদারের **লীলা-মৃগয়া** ৩·০০ ॥ কণাদ গুপ্তের **পূর্ব-মীমাংসা** ২·৫০ ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **অভিষেক** ৫·৭৫ ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষের **গান্ধর্ব** ৩·৫০ ॥

গল্পগ্রন্থ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **পুতুল ও প্রতিমা** ৩·২৫ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **ডবল ডেকার** ৩·০০ ॥ নবেন্দু ঘোষের **পঞ্চম রাগ** ৩·২৫ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **রূপহলুদ** ২·৫০ ॥ বিমল মিত্রের **পুতুলদিদি** ৩·০০ ॥ জ্যোতির্ময় ঘোষের ('ভাস্কর') **ফাংশন** ৩·০০ ॥ শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সিন্দুর টিপ** ২·৫০ ॥

কবিতা গ্রন্থ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **প্রথমা** ২·৫০ : **সম্রাট** ২·০০ : **ফেরারী ফৌজ** ২·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **নীল আকাশ** ২·০০ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **স্বনির্বাচিত কবিতা** ৪·০০ ॥ 'বনফুল'-এর **নূতন বাঁকে** ২·৫০ ॥ দেবেশ দাশের **সুদূর বাঁশরী** ২·৫০ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **সাগর থেকে ফেরা** ৩·০০ ॥

বিবিধ : অনাথনাথ বসুর **সূক্তিসমুচ্চয়** (সংস্কৃত-সুভাষিত-সংগ্রহ) ৩·৫০ [পৃথিবীতে তিনটি রত্ন আছে—জল, অন্ন আর সুভাষিত। মূঢ় লোকে শুধু পাষাণখণ্ডকেই রত্ন বলে।]
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের **ক্যাকটাস** (সরস প্রবন্ধ গ্রন্থ) ৩·০০ ॥ কাজী আবদুল ওদুদের **শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর** ৪·০০ ॥ ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের **নিজের ডাক্তার নিজে** ২·৭৫ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ** ৩·৫০ ॥ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটমি** (সচিত্র) ৩·০০ ॥ নলিনীকান্ত সরকারের **হাসির অন্তরালে** (সচিত্র) ৩·০০ ॥ শান্তিদেব ঘোষের **গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য** (সচিত্র) ৩·০০ ॥

পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হলো

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **মালাচন্দন** (৪র্থ মুদ্রণ) ৩·০০ ॥ হুমায়ুন কবীরের **শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব** (২য় মুদ্রণ) ১·৫০ ॥ বিনয় ঘোষের **বাদশাহী আমল** (২য় মুদ্রণ) ৬·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **তুমি আর আমি** (৪র্থ মুদ্রণ) ২·৩০ ॥ বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের **কাঞ্চন-মূল্য** (৫ম মুদ্রণ) ৫·৫০ ॥

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন ৩৪ ২৬৪১ গ্রাম: কালচার

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০.০০	টাকা ২২.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০.০০	টাকা ১১.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫.০০	টাকা ৫.৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা ঃ ৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	
৯৫৫	সম্পাদকীয়	
৯৫৬	দুটি কবিতা ঃ (কবিতা)	—শ্রীবাণী রায়
৯৫৭	ঝিলিমিলি	—শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৯৬১	বিপ্রলব্ধা (গল্প)	—শ্রীদীপক চৌধুরী
৯৬৮	সিন্ধী সাহিত্য	—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
৯৭১	পরিশোধ (উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, মূল্য—৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 28th July, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

বিক্ষুব্ধ ছাত্রেরা রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে সেদিন সম্পূর্ণ শূন্যহস্তে ফেরেনি। শিক্ষামন্ত্রী তাদের সঙ্গে দেড় ঘন্টাব্যাপী সাক্ষাৎকারে সম্মত হয়েছিলেন এবং সাক্ষাৎকার শেষে অতি প্রাঞ্জল, নাতিদীর্ঘ এবং সমস্ত হতাশাভঞ্জনকারী একটি পরিসংখ্যান তালিকাও শিক্ষামন্ত্রীর সদয় হস্ত থেকে উপহার পাওয়া গেছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই পরিসংখ্যান তালিকা দিয়ে দেশের শিক্ষার সঙ্কট এবং তরুণ জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা কী ঢাকা দেওয়া যাবে? ইন্টারমিডিয়েট, স্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেণ্ডারী এবং প্রি-ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় মোট প্রায় ১ লক্ষ ছাত্র এ বছর ব্যর্থকাম হয়েছে। এই ১ লক্ষ তরুণ জীবনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কোন্ আশা, কোন্ শিক্ষা, কোন্ জীবিকার প্রত্যাশা আছে? ভগ্ন মনোবল, সুযোগহীন, ভবিষ্যৎহীন এই ১ লক্ষ ছেলেমেয়ে জীবনের কোন্ গ্লানি এবং ব্যর্থতার মধ্যে আশ্রয় খুঁজবে? অথবা এরা যাবে রক্‌বাজিতে, উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডামীর রাস্তায়,—নোংরা জীবনের উচ্ছন্ন ডাস্টবিন্ যেখানে? পাশ-করা ছাত্রদের জন্য শিল্পমন্ত্রী একটি আশাব্যঞ্জক ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স উপহার দিয়েছেন। সেই ফাঁপানো, এবং অর্ধসত্য ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের বিশ্লেষণে প্রবেশ করার পূর্বে সহৃদয় শিক্ষামন্ত্রীকে শুধু স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, পাশ-করা ছাত্রদের বাদ দিলেও শিক্ষা সমস্যার আরও একটা দিক আছে—১ লক্ষ ফেল-করা ছাত্র আছে, বিদ্যালয় যাদের ফিরিয়ে নিতে চাইবে না, কলেজ যাদের প্রত্যাখ্যান করবে এবং অভিভাবকেরা যাদের সম্বন্ধে ক্লান্ত এবং হতাশ। সেই হতভাগ্যেরা নিশ্চয়ই জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার মার্কা নিয়ে জন্মায়নি। পাঠ্য কেতাবের জগতে না হোক্, অন্যক্ষেত্রে তারা দিতে পারে এমন ক্ষমতা, দক্ষতা এবং শক্তি এই তরুণদেরও ছিল। শিক্ষা দপ্তর তাদের জন্য কোন্ সুযোগ, কোন্ আশ্রয় রচনা করে দিয়েছে?

শিক্ষামন্ত্রী শুধু এই একটি কথা চিন্তা করুন : যে সমাজ প্রতি বছর ১ লক্ষ তরুণ জীবনের সম্ভাবনাকে বলি দিতে বাধ্য হয়, যেখানে ১ লক্ষ নবযৌবনের আশা প্রতি বছর ধিক্কার মাথায় নিয়ে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই সমাজের বৃহৎ রক্তক্ষরণ কিভাবে বন্ধ হবে?

পাশ-করা ছাত্রদের ভর্তির স্থান সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর হিসাবটি যদি সত্য হয় তাহলে কলেজে ভর্তির স্থানাভাবের কথা তো উঠতেই পারে না, বরং বহু কলেজে ছাত্রাভাবের সমস্যা দেখা দেবে! (এমনকি তৃতীয় বিভাগের ছাত্রেরাও জামাই আদরে ভর্তির জন্য আমন্ত্রিত হতে পারেন—এমন সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিচ্ছে!) কারণ তাঁর হিসাব অনুযায়ী মোট উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যার চেয়ে কলেজের আসন সংখ্যা অন্তত কয়েক হাজার বেশী আছে। বলাবাহুল্য, কলেজের দরজায় মাথা ঠুকে-ঠুকে যাঁরা ক্লান্ত হয়েছেন, সেই অভিভাবকদের প্রতি এই ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স একটি নির্মম কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয়। (শিক্ষা দপ্তরের মেজাজ ভাল ছিল, তাই ছাত্রদের মাথায় গুরুতর কিছু বর্ষণ না ক'রে একটু লঘু পরিহাস বর্ষণ করা হ'য়েছে মাত্র!) কিন্তু পরিহাস যেমন অতিরঞ্জন ছাড়া হয় না, তেমনি এই ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌টিও অতিরঞ্জন এবং অর্ধসত্য ছাড়া রচিত হয়নি। প্রথমত, কমার্স ক্লাসের আসন সংখ্যা ঐ তালিকায় যোগ দেওয়া বিভ্রান্তিকর। কারণ কমার্স ক্লাসে সদ্যোত্তীর্ণদের জন্য যদি অর্ধেক আসন শূন্য থাকে, বাদবাকি অর্ধেক দখল করেন অতীতে পাশ-করা এবং চাকুরীজীবী ছাত্রেরা। দ্বিতীয়ত, টেকনিক্যাল স্কুলের যে ৪ হাজার আসন সংখ্যা দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে অন্তত ৩ হাজার আসন ইন্টারমিডিয়েট বা প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ-করা ছাত্রদের জন্য নয়। ঐগুলি ক্লাস এইট্, নাইন্ অবধি পড়া, কিংবা প্রবেশিকায় ব্যর্থকামদের জন্য। তাছাড়া মফঃস্বলের বহু কলেজের আসন সংখ্যা যোগ দিয়ে মোট যোগফল তাঁরা ফাঁপিয়েছেন, কিন্তু সেখানে উপযুক্ত কম্বিনেশানের অভাব, ত্রিবার্ষিক পাঠ্যক্রমের অভাব এবং ছাত্রাবাস না থাকার সমস্যার দরুণ বহু আসন শূন্য থাকতে বাধ্য। এমনকি

গ্রামের স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে কলকাতায় কলেজ হস্টেল সন্ধান করা ছাড়া বহুক্ষেত্রেই আর কোনো উপায়ান্তর থাকে না।

কিন্তু আসল সমস্যাটা শুধু স্থানাভাবের নয়। বাঙলা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে রুটিন্ এ্যাডমিনস্ট্রেশান চালানোর যোগ্যতাও যাঁদের নেই, তাঁরাই দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিপ্লব আনয়নের দায়িত্ব নিয়েছেন। ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন এবং কলকাতার বৃহৎ কলেজগুলির আয়তন হ্রাস করা—নিঃসন্দেহে দুইটি বিপ্লবাত্মক পরিকল্পনা। এর সঙ্গে বিদ্যালয় পর্যায়ে একাদশ শ্রেণীর হায়ার সেকেন্ডারীও প্রবর্তিত হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলির উদ্ভাবন, চিন্তা এবং অর্থ-সাহায্য সমস্তই এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। কিন্তু এখানে মাছিমারা কেরানীরা এই বিপ্লবের কর্ণধার হয়েছেন। কাজেই অন্তবর্তীকালের বিভ্রাটে কয়েক লক্ষ ছাত্রের ভবিষ্যৎ যে পণ্ড হবে, কয়েক লক্ষ তরুণ জীবনের স্বপ্ন এই রথচক্রতলে পিষ্ট হবে, একথা অজ্ঞাত নয়। কিন্তু বাঙলার বুদ্ধিজীবী সমাজ ইতিমধ্যেই পুষ্টিহীনতায়, বুভুক্ষায় এবং বেকারীতে জীর্ণ। তার দেহ থেকে এত রক্ত ক্ষরণ কী সইবে? এই ছন্নছাড়া হতভাগ্য তরুণগণ প্রকাশ্য বিক্ষোভ হয়ত আর মিছিল তৈরী করে রাইটার্স বিল্ডিংস এবং বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করতে যাবে না, কিন্তু সুযোগহীন, জীবিকাহীন এবং প্রতারিত যৌবন নিশ্চয়ই সমাজের কাছ থেকে অন্য জায়গায়, অন্য ভাষায় আরও মর্মান্তিক জবাবদিহি আদায় ক'রে নেবে।

* * *

কবিতা

দুটি কবিতা

বাণী রায়

॥ নির্ঝরের স্বপ্ন ॥
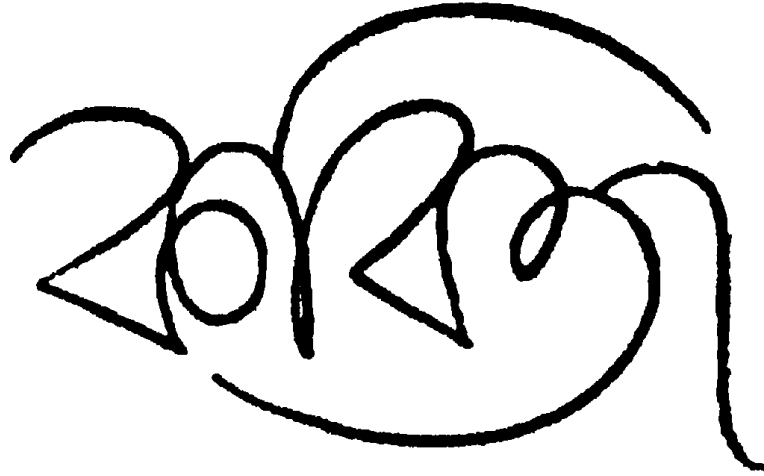
জটিল পাইনে নম্র পথের দুধারে
উত্তাল সমুদ্র যেন—পাথর, পাথর!
পাহাড়ের বুকে চিরে ঝর্ণার যে ধার,
সেখানে বাধার শিলা ভেঙে একাকার।

হে নবীন শ্যামতরু, বেদনা আমার
অলস দিনের পটে লিখেছ স্বপ্নটি;
তুমি এলে ছায়ানটে ঝর্ণা ধারার,
বাঁধনা তোমার তরী আমার পাড়ায়।

জীবনও অমনি স্রোত—শুধু ভেসে যায়
কোনদিন বলে না তো কোথায় যাবার;
স্রোত, তুমি আর একটু হওনা দুর্বার,
ভেঙে নিয়ে ভাসাও না বাধার পাহাড়।

॥ কাক ॥

তুমি এসেছিলে আমার নির্জনতার অবকাশে:
যে নির্জনতা পাহাড়ের মত আমাকে গ্রাস করেছে,
আমার সমতলকে;
যার শিখা উঠেছে আকাশে,
কিন্তু পায়নি সে আকাশ,
অথচ মাটিও ছেড়ে এসেছে সে উর্ধমুখী।

এই নির্জনতার ভারপিষ্ট আমার জানলায়
কালো মখমলের একটি মূর্তি;
পায়ের নখে, ঠোঁটের ডগায় তার কলরব।

চমকে উঠলাম—
অপাংক্তেয় আমার ঘরে কে এলো?
কে এলো? সে কি চায়?
দেখলাম কালো মখমলী কাক,
কালো রঙের পালকে বুঝি আমার ব্যথার সান্ত্বনা,
রাত্রি যেমন নিদ্রা দেয় কালো রূপে তার,
তেমনি কালো কাক এলো আমার জানলায়
ব্যথার শান্তি নিয়ে।

মানুষ যেখানে সুন্দর, সেখানে কাকই আমার মিত্র।

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিনায়ক রাও পটবর্ধনের বিলাস-খানী শুনলাম। তার মধ্যে শুদ্ধ মধ্যম মাত্র দুবার শুনলাম। জমল না। অনেক-দিন আগে শুনেছি, ঠিক কোথায় মনে পড়ছে না, টোড়ী গাইতে গাইতে ভুল করে শুদ্ধ মধ্যম দিয়ে ফেল্লেন, আকবার বাদশা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তানসেন বল্লেন, 'বিলাসখানী বন্ গিয়া'। গল্পটি গল্প, কিন্তু অতদিন শুনে শুনে বিলাসখানী টোড়ী আমাদের ধাতে বসে গিয়েছে, আমাদের আর ভুল হয় না। পটবর্ধন গাইলেন ভালোই, শুদ্ধ তবু যেন গঠন-শৈলীতে ফাঁক ছিল। আমার মনে হয় অত্যন্ত উঁচু পর্দায় গাওয়ার ফলে এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো কোনো গান নীচু পর্দায় গাইতেই হয়, যেমন মিঁয়া কি মল্লার, টোড়ী, দরবারী কানাড়া: চড়িয়ে গাইতে হয় আড়ানা, ভৈরবী ইত্যাদি।

বোম্বাইএ আবদুল করিমের প্রভাবই বেশী, যাকে বলে ছড়াছড়ি। সাওয়াই গন্ধর্ব থেকে রাজগুরু পর্যন্ত সবাই আবদুল করিমের শিষ্য। অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠ! অবশ্য, আবদুল করিম নিজেই যন্দেশী তৈরী করেছেন।

মালবিকা (কানন) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা গান গেয়ে থাকে। তার বাবার কাছ থেকেই পেয়েছে, রবি রায় শ্রীকৃষ্ণ রতনজানকরের প্রিয় শিষ্য, তবু যেন একটু আলাদা। মালবিকা সত্যই ভালো গাইছে।

কি জানি কেন যন্দেশী গানই ভালো লাগে। আজকাল শুনতে পাই কম। তবু কিছু বড়ে গোলাম আলি, আমীর খাঁ, নিশার হুসেন খাঁর কাছেই পাওয়া যায়। এরা আমার মতে দ্বিতীয় শ্রেণীর, এখনকার প্রথম শ্রেণীর।

দিলীপ, বকুবাবু আর সচ্চিদানন্দর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। প্রশংসার যোগ্য। আশ্চর্য! মন থেকে পুঁছে গিয়েছিল। সচ্চিদানন্দর মতন হিন্দী ও উর্দু উচ্চারণ দেখা যায় না। যাকে enunciation বলে সেটা তাঁরই ছিল। আর ছিলেন ঘোরতর বাবু। যখন

কোলকাতা থাকতেন ভিড় পড়ে যেতো। বাঙালীর মতন গলা মিষ্টি কোথাও হয় না।

২৭।১০।৫৯

আমার বাড়ির ওপরই শুখনো নদী, বর্ষা ছাড়া জল থাকে না। জমির ওপর মধ্যে মধ্যে সৎকার করে; মাটিতে পোঁতে, মরা পোড়ায়। আমার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, তবু বেশ দেখা যায়। পুলিশে কিছু করতে পারে না, লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ শেষ করে। শেষ আর কি, আধখানা ফেলে চলে যায়। আমার স্ত্রীর অবস্থা ভাবা যায় না। তিন চারদিন মড়ার মতন পড়ে থাকে, এক একবার উঠে নদীর দিকে কাঠের পুতুলের মতন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এবার দেখলাম দুদিন মাত্র—ক্রমে বোধ হয় থাকবে না, পুলিশে বন্ধ করে দেবে।

আমার একবার এমনি হয়েছিল। আমি তখন ছেলেমানুষ, স্কুলে পড়ি বারাসতে। শীতের রাত্রে পুলিসের বড় কর্মচারী মারা গেলেন। কখন মারা গেছেন টেরই পাইনি। হঠাৎ চোখ খুলে বিছানার মধ্য থেকেই শুনলাম দূরে কুড়ুল কোপানির শব্দ হচ্ছে—বিছানার পাশে বাবা, মাকে যেন দেখতে পেলাম না। মনে হোলো বাঁশ কাটার শব্দ, কেউ বোধ হয় মারা গেছে, সিদ্ধেশ্বরবাবুই নিশ্চয়, তার পর কী ভীষণ চীৎকার! তার পরের সারাদিন পর্যন্ত চোখ বুজে পড়ে রইলাম, কিছুতেই বিছানা থেকে উঠলাম না। অনেক বৎসর ধরে গভীর রাতে ঐ বাঁশ কাটার শব্দ কানে আসত। মৃত্যুর শব্দ ক্রমেই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। সব ফুরিয়ে যায়, যেন, কিন্তু এই পঞ্চাশ বছর পরে হঠাৎ গভীর রাতে বাঁশ কাটার শব্দ কানে এলো।

২৯।১০।৫৯

দ' গল আর জোন অব আর্ক এক গোত্রের মনে হয়। দুজনের কর্ম resistance-এর ঘোরফের। প্রধান কথা দুজনের এই : ফ্রান্সের নীচু অবস্থা থেকে ওপরে তোলা। ফরাসী দেশের Sovereignty, তার glory, তার prestige, দুজনেরই একই কর্তব্য। দ' গল তাই চেয়েছিলেন, তাই আমেরিকান ও ইংরেজ তাঁকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, এখনও করেন। অত্যন্ত দাম্ভিক মানুষ, কিন্তু সেটা কি ব্যক্তিগত না জাতীয় দম্ভ? তৎসত্ত্বেও নিতান্ত কর্মী পুরুষ। Democratic freedom চান না, চান বোধ হয় human freedom। Fraternity কেউ চান না দেখছি। ব্যক্তি-স্বাধীনতা চায় freedom of the individual। তার মানে কম, আমাদের দেশে। খেতে পাই না ত' আবার মানবিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা!

৩০।১০।৫৯

আঁদ্রে জীদ দেখছি দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। ভালেরি, মরিয়াক, মালরো, এদের সমকক্ষ নয়। কারণ বোধ হয় জীদ খাপছাড়া, তার মধ্যে সত্যকারের সাতত্য নেই। ভালেরি অন্য জিনিস, যেটা বলতে চান সেটা পুরোপুরি বলেন, বুঝতে পারি না সেটা অন্য কথা। ভালেরি অখণ্ড নন, তাঁর কাছে বহু জিনিস, নতুন চিন্তা আসে, এবং যেটা আসে সেটা সমগ্রভাবেই আসে। নতুন চিন্তা যেসব আসে সেগুলো হয়ত সাধারণের জন্য নয়। বুঝলো না বুঝলো তাতে ভালেরির আসে যায় না। জীদের ধারণা সম্পূর্ণ নতুন নয়, সাধারণের রকমফের। Pederasty-ও নতুন নয়, যেটা রয়েছে তাকেই সাজান। এমন কোনো লেখা জীদে আছে সেটা সত্যই অভিনব? ভালেরিতে আছে। মরিয়াকের জগতই ভিন্ন, জগতটাই নিজের জগত। মালরো-ও তাই, এমন কি তার নন্দনতত্ত্বে। (ঠিক নন্দনতত্ত্ব বলা যায় কি? বোধ হয় art-history and art-criticism-এর সমন্বয়।)

ইংলণ্ডে অবশ্য আঁদ্রে জীদের মতনও গদ্য লেখক নেই। কবিতায় অবশ্য আছে এলিয়ট আর গ্রেভস। আজ ক'মাস ধরে Times Lit. Sup-এর বার-চোদ্দজন লেখকের স্কেচ্ বেরুচ্ছে। তাঁরা বোধ হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকও নন। ইংলণ্ডের এবম্বিধ পতন হোলো কেন? Angry men, Beat Generation—এ'রা নিতান্ত নিম্ন স্তরের লেখক। অবশ্য ইংলণ্ডের প্রচার হোলো কেন? কারণ বোধ হয় এই যে এমন propaganda পৃথিবীর কুত্রাপি নেই। তবে দশ বছর পরে ধরা পড়ে সে,—20's, 30's, forty's and fifty's। ফ্রান্সে কিন্তু বহু দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক রয়েছে।

২।১১।৫৯

যাকে আমি শেষ কথা বলি সেইটাই মনে আসছে।

আমরা মধ্যযুগের মানুষ, অর্থাৎ Sidgwick, Marshall, Tanssig, Bastable পড়ে মানুষ হয়েছি। এই ছিল ১৯৩৫ পর্যন্ত। তার বছর পাঁচেক আগেই পৃথিবীর দুরবস্থা হোলো, আর Keynes লিখলেন General Theory। একেবারে চমকে উঠলাম। তাঁর আগেও ছিল Treatise, খুবই ভালো লেখা, কিন্তু এমনটি আর নয়, brilliant নয়, কিন্তু ভীষণভাবে নাড়া দিলে। কিন্তু তাতেই স্রোতে Marx গেল ভেসে। Keynes তাকে underworld of economics-এর দরজায় হাজির করলে। অত্যন্ত দাম্ভিক লোক Keynes। কিন্তু Swedish economists-রা দেখলেন যে কীনস্ ছাড়াও তাঁদের দু-চারটে কথা আছে। আমেরিকানরা post-Keynesian শুরু করলেন, এবং তার বেশী ভাগ অংক। ইতিমধ্যে কিন্তু অনুন্নত পৃথিবীর লোকেরা বুঝলে যে Keynes যেন একটু অন্য ধরণের, তাদের ইকনমিক্সের সঙ্গে Keynesian ইকনমিক্স খাপ খাচ্ছে না। এখন কিন্তু post-Keynesian ইকনমিক্সই চলছে।

একটা কিন্তু প্রকাণ্ড জিনিস বাদ পড়ে গেল। Schumepeter একজন বড় ইকনমিষ্ট, Keynes-এর মতনই। তিনি Marx-কে সমালোচনা করতেন, তবে সমঝে। তিনি Marx-কে great man বলে ফেল্লেন। অবশ্য রাশিয়া, চায়না ইত্যাদিরা Marx-কে মানছে। আর পশ্চিম য়ুরোপ আর আমেরিকার মানছে না, সকলেই post-Keynesian। আমাদের কাছ থেকে Marx বাদ পড়ে গেল।

ভারতের কি অবস্থা? সবই আমরা Keynesian। পুরোপুরি Keynesian নই, অথচ, তবু Keynesian। আমরা অবশ্যই Marxist নই। Keynes-এর সঙ্গে Marx-এর রফা করতেও পারিনি। পণ্ডিতজী Marx-কে (Marxism কে?) পুরাতন বলে ঘোষণা করেছেন। (তাঁর Surplus Value না-পড়ে, না পড়ে?) অবশ্য আমরা তাই মেনে নিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতিভূ। অথচ এক হাজার কোটি লোক, দু'হাজার কোটিরও বেশী অনুন্নত পৃথিবী, Marx-এর অনেক কথাই ত' নতুন! আমরা নতুন মানছি না। কেন এমন হোলো?

এক হোলো, আমরা এখনও ইংরেজের দাস, দাসানুদাস, তস্য-দাস,

ইংরেজী ছাড়া পড়ি না, ইংরেজী ছাড়া ভাবি না। ইংরেজেরই অনুকরণ করি—তাই আমাদের এই Culture-lag। দাস মনোভাব আর Culture-lag—এই দু-এর সাহায্যে আমাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। লোকে বলবে Marx পড়লেও, এমন কি পড়লেই, (এ দুটো এক নয়) আমরা দাস হয়ে যাব। এক শ' বছর ইকনমিক্স, ষাট-সত্তর বছর marginal utility-র দাসত্বও করেছি। Marxism-এরও ত' কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সে যাই হোক, একটা বড় কথা : Keynes ত্রিশ বৎসরে post-Keynesian, non-Keynesian, anti-Keynesian হয়েছে; Marxism-এ, অন্ততঃ দু'হাজার কোটির অনুন্নত অর্থনীতিতে প্রায় একশ বছর এখনও চলছে। ব্যবধানটি ইচ্ছাকৃত? Marx-এর greatness এবং Keynes-এর talent, বড় talent—এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই কিছু আছে। মূল কথার, মূল বক্তব্যে Marx ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন, না দিলে Cold War কেন? Keynes-এর মূলের এক অংশ তাই ছিল; যে অংশটি নাড়া দিতে পেরেছেন সেখানে Joan Robinson, leftist Keynesianism, অর্থাৎ Marxist পন্থী।

এই আমার মনে হয়।

৪।১১

Tama, একটা জাপানী poodle-এর ছবি, Manet-র আঁকা। Manet-র অনেক ছবি দেখেছি, এটা কিন্তু চোখে পড়েনি। কাল রাতে প্রথম দেখলাম। আজ সকাল থেকে দেখছি। কালো-শাদা কুকুর, কাঠের জানলা, দু-ধারে ডান্ডা, একটা ডান্ডা বাঁকাভাবে রাখা। কুকুরটি ছোট্ট, চোখ দুটি লাল, তারই সামনে এক টুকরো কাপড় পড়ে আছে, তার ধারটাও লাল, বাকীটা কালো। চোখ আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। চারটি পা-ই সোজা দাঁড়ান, চুল ভরা, গায়েও চুল। Tama অত্যন্ত জীবন্ত, dynamic।

এ-ধরণের poodle বড্ড yap-yap করে। খ্যাঁক খ্যাঁক করছে সর্বদা। কিন্তু এখানে চুপ করে আছে, জিবটা বেরিয়ে রয়েছে। জিব লাল, কাপড়ের ধারও লাল। তিনটি লালে ছবিটা জ্বল-জ্বল করছে। কালো আর লালের অপূর্ব সমাবেশ। বোধ হয় Velasquez-র Infanta Margareta থেকে কুকুরটি Manet ধার করে নিয়েছিল, Wilenski বলছেন। আমার তা মনে হয় না। এটা যেন নিজস্ব।

১২।১১

এক মাসেরও বেশী প্রতি সন্ধ্যায় ঘন্টা দু'এক ধরে কোলকাতা থেকে রেডিও শুনি। অনেক দিন যাবৎ কোলকাতা কেন্দ্র শুনিনি। কোলকাতায় আওয়াজ স্পষ্ট হচ্ছে। হাজার মাইল দূরে থেকে তাই।

পল্লীমঙ্গল মোটের ওপর ভালোই। বেচু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ ও উচ্চারণ চমৎকার। যাঁরা দিল্লী থেকে বাংলার খবর বলেন তাঁদের চেয়ে ইনি অনেক ভালো। দু-চারটি দোষ আছে। (১) কথার মধ্যে অনেক গান ঠিক খাপ খায় না। অনেক সময় গ্রামোফোন সঙ্গীত পল্লীমঙ্গলের সঙ্গে কখনও কখনও মেলে না। (২) 'গোবিন্দ' একটু এক-ঘেঁয়ে, অন্য চরিত্র নেওয়াই উচিত মনে হয়। (৩) মধ্যে মধ্যে একাধিক বক্তৃতা কেবল বক্তৃতা। পল্লীমঙ্গলের ভাষাই ব্যবহার করা ভালো। (৪) এক এক সময় ভিন্ন ভিন্ন পর্বগুলি মীড়ের মতন মোলায়েম হয়ে যায় না। যেন Staccato থেকে যায়। তৎসত্ত্বেও বেশ, অনেক রকমের জিনিস এতে থাকে।

বাংলায় খবর বলা সত্যই কঠিন। বাংলার কথ্যভাষা ক্রমেই শক্ত হচ্ছে, এবং সেজন্য উচ্চারণও আকণ্ঠবদ্ধ। এক হিসেবে দেখতে গেলে এটা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হচ্ছে বলা চলে। অবশ্য অন্যদিক থেকে মনে হয় যে বাংলা ভাষা দুভাগ হয়ে গেল, এক মধ্যবিত্তের বাংলা, আর যে বাংলা গ্রামের লোকে ব্যবহার করে। হিন্দীও তাই হচ্ছে, অত্যন্ত সংস্কৃতবহুল হয়ে পড়ল। ঠিক কি হওয়া উচিত জানি না। দেশজ বাংলা চালু করলে মন্দ হয় না। সংস্কৃত শব্দ দেশজ শব্দের অন্তরালে ব্যবহার করলেই ভালো হয়—প্রথম থেকেই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হবে না। খবরের কাগজের ইংরেজী অনুবাদ থেকে বিশুদ্ধ বাংলায় পরিবর্তন করা যায় বটে, কিন্তু বাংলা কি করা যায় না। জগা-খিচুড়ী একটু হোলোই বা! সাধারণ লোকে কি দিল্লীর কৃত বাংলা পড়ে বুঝতে পারে? মনে হয়, পারে না।

সাড়ে আটটার সময় মধ্যে মধ্যে যে খেয়াল হয় সেগুলি বেশ। দ্বিতীয় শ্রেণীর। তার বেশী নয়। আরম্ভ করেন চমৎকার। কিন্তু দ্রুত তান কর্তবের সময় স্বরচ্যুতি ঘটে। আদত কথা; আমরা বড্ড 'আতায়ী', যার-তার কাছে গান শিখে

ছেড়ে দিই, ওস্তাদ হয়ে যাই। এ'দের গঠনের অভাব খুবই। আস্থায়ীর দিকটা খাশা, তারপর গঠন নিতান্ত দুর্বল। যে ভুল মারাহাট্টিরা করে না কিন্তু, তাদের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁধা-ছাঁদা, তার ফলে একটু mechanical হয় অবশ্য।

আধুনিক গান? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনোটাই বুঝি না। রাগ? কোনো রাগ নেই, রাগের মিশ্রণও নেই, একটু আবছাগোছের ছবি ভেসে ওঠে, তাও কখনও কখন। আধুনিক গান এত কাঁদে কেন? আর যখন কাঁদছে না তখন নাচছে এবং তাও খেমটা। বাঙালী মেয়েরা কেন এ-গান শেখে? কারা এদের গান শেখায়? নতুনত্বের কি এতই মোহ? নতুনত্ব নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু নতুনত্বের পর একটা কিছু নতুন ভাব ফোটা ত' চাই! তা হচ্ছে না; এরা নতুন, অত্যন্ত নতুন এবং নতুন ছাড়া আর কিছু নয়।

একদিন সংস্কৃত ভাঙ্গা বাংলা বক্তৃতা শুনেলাম। মন্দ লাগল না। হিন্দীর মাধ্যমে আরো চলবে।

১৪।১১

দিলীপ স্মৃতি-চারণ শেষ করল মনে হচ্ছে। সত্যেন, কৃষ্ণপ্রেম এবং শেষের লেখাটি ভালো। অলৌকিক রহস্য আমার মাথায় আসে না। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে পণ্ডিচেরী প্রয়াণ আমার অনেকটা জানা। কিন্তু জয়দা (জয়গোপাল মুখুয্যে) দিলীপকে কি বলেছিল জানতাম না। মন্টু ঠাকুরের সঙ্গে রফা করতে চায়, জয়দা বলেছিলেন। রফা শেষ পর্যন্ত মন্টু করেনি। মন্টুর পণ্ডিচেরী যাওয়াই উচিৎ ছিল।

সে পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে ভালো করেই মিশেছিল। আমার কাছে সেইটাই খুব বড়। বিলেত থেকে ফিরে আসবার সময় ও তার পরে যে গান গাইত তার তুলনা নেই। বিশেষতঃ তার বাবার গান— 'আজি তোমার কাছে ভাসিয়ে যায় অন্তর আমার'-এর কি তুলনা মিলবে? 'রাঙা জবা' গাইবার সময় ফুল ফুটিয়ে দিতো। এটাও বড়। উৎকৃষ্ট বই পড়ত, এবং বই পড়ে ভাবত। এটাও বড়। সে কালে ধর্মের আহ্বান তার কাছে প্রথম। সেটা আমি বড় হয়ত বলেছি, কিন্তু সবচেয়ে বড় হয়ত বলিনি। তারমধ্যে একাধিক দোষ হয়ত আছে, আমি কিন্ত দোষ দেখিনি। দম্ভ হয়ত ছিল শুনেছি। কিন্ত সেটা ছেলেমানুষী বাচালতা মাত্র। তার মতন সরলতা আমি কোথাও দেখিনি। মোট কথা সে Vital plane-এর লোক খাঁটি সাত্ত্বিক নয় প্রাণবান। এমন বিশুদ্ধ প্রাণবান লোক আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশের সে একজন 'উত্তম' পুরুষ।

১৫।১১

"When you reach the Polodes, tell them that the Great Pan is dead". Paxos-এর দ্বীপ থেকে এক শব্দ শোনা গেল, "—Great Pan is dead." Plutarch-এর এই কথাই শেষ।

কখনও মনে হয় এলিজাবীথান যুগের ইংলণ্ডে, অন্ততঃ Midsummer Nights Dream-এ একটা প্রতিধ্বনি এসেছিল, কিন্তু তার পরেই শেষ—আর হয় নি, Pan আর এলোনা।

"The poet says, 'dear city of Cecrops'. Wilt thou not say, 'dear city of God?' মার্কাস অরেলিয়াসের কথাটা কানে বাজছে। Dear City of God?" একটা কবিতা। পৃথিবীতে যত কবিতা আছে সে সব সূর্যমণ্ডলেই থাকতে পারে, ছায়াপথের অন্তরালে নেই। সেখানে অত্যন্ত ঠান্ডা।

১৬।১১

আত্মজীবনী লেখা এ যুগে সম্ভব নয়, অর্থাৎ সত্যকারের আত্মজীবনী। রুশোর পর থেকে শেষ, এবং বোধ হয় মনটেন-এ প্রথম, যদিও মনটেন আত্মজীবনী লেখেন নি, personal essayই লিখে গেছেন। জীবনের সব ঘটনা বলা যায় না, এমন কি সর্বপ্রধান ঘটনাগুলিও। কামের দিকটা কখনও প্রকান্ড, কখনও তুচ্ছ। ভারতবর্ষের সে দিকটা নিতান্ত কম, বাৎসায়ন সত্ত্বেও। সেটা সামাজিক বিধিব্যবস্থায় চাপা পড়ে, কিছুই থাকে না। যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রোমান্টিকভাবে জীবন নির্বাহ করেন তাঁরা অবশ্য একথা স্বীকার করবেন না। এটা মানব যে ভারতবর্ষের অনেকাংশ জীবন কামের দৈন্যে নিতান্ত সাধারণ হয়ে উঠেছে এবং বোধ হয় সেইজন্যই আত্মজীবনী লেখা একেবারে অসম্ভব।

কামাতুর লোকের জীবন আজকাল একপ্রকার নভেল হয়ে পড়েছে। নভেলের এত ছড়াছড়ি আশ্চর্য লাগে। রুশোর আত্মজীবনী এখন ত' এক-প্রকারের নভেল। চেলিনি, ক্যাসানোভা, পীপস্ প্রত্যেকেই নভেল লিখেছেন।

বাকী রইল মনটেন। তাঁর প্রত্যেক লেখাই personal essay। অবশ্য সে আমি ছোট-আমি নই, বড়-আমি, কিন্তু বিশ্বদর্শনের ভূমিকায় নয়। মনটেন এমন একটি স্তরের মানুষ, যার উচ্চতা ও গাম্ভীর্য তাঁরই যোগ্য। সেখানে তিনি নিতান্ত ব্যক্তিগত।।

১৭।১১

সৈয়দ আয়ুব স্ত্রী-পুত্র সমেত এখানে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে। কিন্তু তিনি সত্যই অসুস্থ, তবে সামলে উঠেছেন। তাঁর ছেলের নাম পুষণ—খাসা নামটি।

আয়ুবের সঙ্গে যা বুঝলাম তা এই ঃ সে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চায়, পুরোপুরিই চায়। যে সমাজ তার কাছে বাঁধা তার সমাজ বুদ্ধিগত। আমার সমাজ বুদ্ধিগত এবং সংসারগত। আয়ুবের সংসার, সমাজবোধ বোধ হয় নেই, তার সমাজ সম্পূর্ণ নিজস্ব। তার কাছে cultural freedom-এর অর্থ আছে। আমার কাছে তার মূল্য কম, কারণ আমার ওপর সংসারের চাপ রয়েছে। তবে সমাজবন্ধন যাচ্ছে, যদিও এখনও যায়নি। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নষ্ট হতে বসেছে, কিন্তু election-এর সময় জাঁতাকলের মতন বসেছে। নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় এখনও যায়নি। বিবাহ ব্যাপারে নীচের স্তরে বন্ধন কিছু ছিল না, কিন্তু আচার যথেষ্ট রয়েছে, যদিও তার রূপ বদলেছে— মেয়েরা পেটিকোট পরে। আয়ুবের পৃথিবী—বিদেশী। তার cultural freedom বুঝতে পারছি না। (ক্রমশ)

বলুন তো কী?

প্রশ্ন

১। গৃহপালিত পাখী (Poultry) বলতে কোন পাখীদের বোঝায়?

২। হাতের কোন আঙ্গুলটি সব চেয়ে বেশী চেতনাদায়ক (Sensitive)?

৩। সাংসারিক খরচের মধ্যে কোন চারিটি খরচ সব চেয়ে বেশী?

৪। কোন মহাদেশে সব চেয়ে বেশী ভাষা কথিত হয়?

৫। ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার সাধারণতঃ এক মাইল দৌড়তে কত সময় লাগে?

৬। পৃথিবীতে সব চেয়ে কত নিম্নতম তাপ পাওয়া যায়?

৭। ফলের রস গেঁজে উঠলে কি গ্যাস ছাড়ে?

৮। ঘড়ির ভিতরে মণি (Jewel) দেওয়া হয় কেন?

৯। কোন খাদ্যদ্রব্য পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী খাওয়া হয়?

১০। চোয়ালের কোন অংশে সব চেয়ে বেশী চাপ পড়ে?

[উত্তর অন্যত্র আছে]

বিপ্রলব্ধা
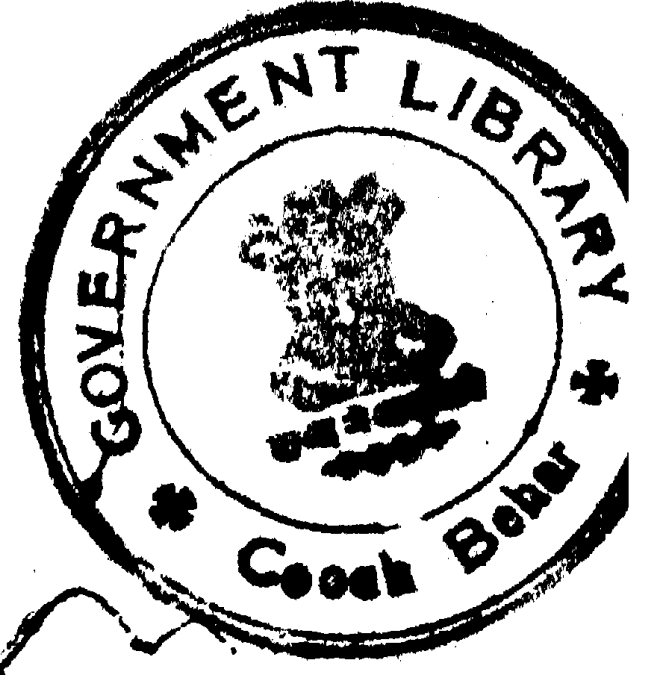
দীপক চৌধুরী

আপনারা অবাক হবেন জানি। আমি যে বাঙালী তাও আপনারা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আপনারা বলবেন, হয় আমি অ-বাঙালী নয়তো উন্মাদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আজ ঘোষণা করছি যে, সারা জীবনে একটিও গল্পের বই আমি পড়িনি—উপন্যাস তো নয়ই। কেন পড়িনি তার কারণটা আমার জানা নেই।

অথচ আমার মা উপন্যাস পড়তে খুব ভালবাসতেন। দুপুরবেলা তিনি ঘুমুতেন না। প্রায় প্রত্যেকদিনই এক-একটা নতুন উপন্যাস প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলতেন তিনি। আমরা ঠাট্টা ক'রে বলতাম, মায়ের পান-জর্দার নেশা নেই বটে, কিন্তু উপন্যাসের নেশা বড় প্রবল। তাঁর এই দ্রুত-পঠনের অভ্যাস দেখে আমরা সবাই অবাক হ'য়ে যেতাম। বাবা কিনতেন ছোটগল্পের বই। বছর দশেক পর আমাদের জনক রোডের বাড়িটা গল্প-উপন্যাসের একটা লাইব্রেরী হ'য়ে দাঁড়াল। বড়দার কাছে শুনেছি আমার যখন জন্ম হয় তখন আঁতুড়ঘর থেকে বই-এর আলমারিগুলো বার করে আনবার সময় পাননি বাবা। তার ফলে গল্প-উপন্যাসের জগতেই জন্ম হ'ল আমার।

কিন্তু সারাজীবনে একটিও গল্প-উপন্যাস আমি পড়ে উঠতে পারি নি। ব্যাপারটা খুবই বিচিত্র মনে হয়, তবুও বলছি আমার স্বীকৃতির মধ্যে মিথ্যা ভাষণের চেষ্টা একেবারেই নেই। ইস্কুলের লেখাপড়া শেষ ক'রে কলেজে এলাম, তখনও মাসিক কিংবা সাপ্তাহিকের পাতা উল্টে দেখি নি। লেখাপড়ায় আমার সুখ্যাতি ছিল খুব। প্রতিটি পরীক্ষা পাশ করেছি প্রথম হয়ে। আজ তো আমি জেলা-শাসক, যার ইংরেজী নাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। চাকরি করছি তাও প্রায় দশ বছর হ'য়ে গেল। বিয়ে করেছি দু' বছর আগে। সত্যি কথা বলতে কি আগামীকাল আমাদের বিয়ের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হবে। সেই জন্য আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা আমার বাংলোয় একটু আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা হয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পর, খেয়াল গান গাইবেন ওস্তাদ দবিরুদ্দীন খাঁ। এটা পাহাড় অঞ্চল। তিনি এখানে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছেন।

এখানে আমি বদলি হ'য়ে এসেছি মাস খানেক আগে। আজ সন্ধ্যেবেলা অফিস-ঘরে বসে ছিলাম আমি। মিউনিসিপালটির চেয়ারম্যানসাহেব একটু আগেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বড় মিষ্টি-স্বভাবের মানুষটি। আলাপ-আলোচনায় সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া গেল। শুনলাম, তিনি বাংলা মাসিকপত্রে মাঝে মাঝে ছোটগল্প লেখেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর নামটা আমার কখনো চোখে পড়েছে কি না। লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে রেখেছিলাম মিনিট দুই। তারপর বলেছিলাম তাঁকে, "না, চোখে পড়ে নি। এমন অপরাধের মার্জনা নেই...জানেন, আজও আমি একটিও গল্প-উপন্যাস পড়ি নি।"

চেয়ারম্যানসাহেব কি ভাবলেন জানি না, চলে গেলেন তিনি। ফ্রয়েডসাহেব বেঁচে থাকলে হয়তো বা আমার অচেতন মনের রহস্যটা কামজ ব'লে ঘোষণা করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর বিশ্লেষণটা আমার মনঃপূত হ'তো না। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা দেখাতে হ'তোই।

চেয়ারম্যানসাহেব চলে যাওয়ার পর ভাবছিলাম যে, আগামীকাল থেকে গল্প পড়তে আরম্ভ ক'রে দেব। পাঁচ দশ দিন চেষ্টা করলে হয়তো গল্প পড়ার প্রতি ঝোঁক আসবে। তারপর আনন্দের উৎস খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না।

রাত আটটার সময় এখানকার পুলিশসাহেব দেবেন ধর এসে উপস্থিত হ'ল আমার অফিস-কামরায়। খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। দেবেনকে একটু উত্তেজিত মনে হ'ল। ভাবলাম, শহরের কোথাও বুঝি দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে গিয়ে থাকবে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হে খবর কি?"

আমার হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিল সে। প্যাকেটের ওপরে আমার নাম

লেখা রয়েছে। জিজ্ঞেসা করলাম, "চিঠি না কি?"

"আজ্ঞে না—পাণ্ডুলিপি ব'লে মনে হচ্ছে।"

"কোথায় পেলে এটা?"

"ধর্মশালায়। দিন সাতেক আগে একজন শিল্পী এসে উঠেছিলেন ওখানে।"

"ও হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি। মহীতোষ লাহিড়ী। খুব ভালো ছবি আঁকে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আগামীকাল একটা চিত্র-প্রদর্শনী খোলার কথা ছিল। ওয়ান ম্যান শো—" দেবেন ধর হঠাৎ থেমে গেল। ওর কথাবার্তা বলার ভাবভঙ্গী দেখে আমার সন্দেহ হ'ল কি একটা গুরুতর কথা যেন ঘোষণা করবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু বলবার সাহস পাচ্ছে না। প্যাকেটটা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আমি বললাম, "আগামীকাল সকালে ওর চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করবার কথা ছিল আমার। আমি নিজেও দু'-একখানা ছবি ওর কিনতাম। পয়সার খুব অভাব ছিল মহীতোষের। কাল সকালে আমি অবশ্যই যাব—"

দেবেন ধর ইতস্তত করতে করতে বলে ফেলল, "মহীতোষবাবু মারা গিয়েছেন।"

"মারা গিয়েছেন?"

"মনে হয় আত্মহত্যা করেছেন।"

"বলো কি দেবেন!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হ'ল। গোটা পনরো তৈলচিত্র পড়েছিল মেঝের ওপর। তারই মাঝখানে শিল্পীর মৃতদেহ।...সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার তৈলচিত্রগুলো শুধু একজন ভদ্রমহিলাকে কেন্দ্র ক'রেই আঁকা। আপনি কি শবদেহটা একবার দেখবেন?"

"মর্গে নিয়ে যাও, কাল সকালে ধর্মশালা হ'য়ে মর্গে যাব আমি।"

দেবেন ধর চলে গেল। আমার তবু সন্দেহ হ'ল আরও দু'একটা জরুরী কথা গোপন ক'রে গেল সে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। অক্টোবর মাস, ঠাণ্ডা পড়েছে খুব। প্রতি ঘরেই চুল্লীতে আগুন জ্বলছে। ইজি-চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেলাম চুল্লীর কাছে। মহীতোষের লেখা চিঠিখানা ওখানে ব'সে পড়ব। তার আগে দোতলায় উঠে গিয়ে দেখে এলাম প্রমীলা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে। বড্ড শীতকাতুরে। পাহাড় অঞ্চলে সে আসতে চায়নি। প্রমীলার বিশ্বাস, কলকাতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর আবহাওয়া ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। কলকাতার সব কিছু ওর ভাল লাগে। এমন কি মশা-মাছির কথা উল্লেখ করলেও প্রমীলা বলে, "আহা ওরা তো থাকবেই। ভালমন্দ মিশিয়েই মানবচরিত্র তৈরি হয়। কোন্ শহরটা ষোলো আনা ভাল? কোন্ মানুষটা ষোলো আনা সৎ?"

অফিস-কামরায় ফিরে এলাম আমি। বয়-বাবুর্চিরা সবাই চলে গিয়েছে। পরিবেশের বুকে ঘন নৈঃশব্দ্য। শীতকালের রাত্রে নিঃসর্গ-চর্চার ইচ্ছা হয় না। জানালা খুলে পর্বতচূড়ার দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে। চব্বিশ ঘণ্টাই আগুনের তাপের কাছে চলাফেরা করতে হয়। ধর্মশালায় কি ক'রে যে সাতটা দিন কাটিয়েছিল মহীতোষ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে। আমার এখানে থাকবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। বলেছিলাম, ধর্মশালায় চিত্র-প্রদর্শনী খুললে ধনীলোকেরা কেউ সেখানে যাবেন না। আমার কোনো পরামর্শই কানে নেয় নি সে। আমার প্রস্তাব শুনে একটু শুধু হেসেছিল। দারিদ্র্যের শত চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলাম আমি। ওর হাসিটা ছিল সামাজিক প্রতিবাদের মতো প্রখর। জেলা-শাসকের বাংলোর মতো ধর্মশালাটা কেন যে আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর নয় তেমন প্রশ্নটা প্রচ্ছন্ন ছিল ওর হাসির তলায়। আমার বিশ্বাস, মহীতোষের মনের স্বাভাবিক অবস্থা লোপ পাওয়ার মূলে রয়েছে একটা ভয়—কমপ্লেকস্। এই ভয়টা যে কি তা আমার জানা নেই। ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আজ সে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা জন্মাল আমার।

ইজি চেয়ারে বসে চুল্লীর দিকে পা ছড়িয়ে দিলাম। প্যাকেটটা খুলে ফেললাম আমি। উল্টেপাল্টে দেখলাম, লম্বা সাইজের পনরো পাতার চিঠি। বন্ধু বলে আমায় সম্বোধন করেছে মহীতোষ। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তাম আমরা। তারপর সে ভর্তি হল আর্ট কলেজে। আমি গেলাম আই-এ পড়তে। মহীতোষ হস্টেলে থাকত। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। আর্ট কলেজের অধ্যাপকরা বলতেন, উত্তর-কালে মহীতোষ উঁচুদরের শিল্পী বলে সুখ্যাতি অর্জন করবে। পাস করার পর নিজেই একটা স্টুডিও খোলে। বৌবাজারের একটা সরু গলির মধ্যে স্টুডিওটা ভাড়া নিয়েছিল। একটা পুরনো বাড়ির একতলার পেছন দিকে একখানা ঘর। আলো-বাতাস ঢুকবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ওটা ছিল রান্না-ঘর। মহীতোষ নিজেও তা জানত। বাড়িওয়ালা ঘরখানার পূর্ব ইতিহাস গোপন করেন নি। কিন্তু মহীতোষের

আর কোনো উপায় ছিল না। অতো সস্তায় এর চেয়ে উজ্জ্বলতর ঘর সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। পুরনো আস্তরের ওপর বাড়িওয়ালা চুনকাম করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেয়ালের রং শাদা হল না কিছুতেই। রাজমিস্ত্রী মহীতোষকে বলে গিয়েছিল, "চুনের কোনো দোষ নেই বাবু, দোষ সব বাড়িটার। ইঁটের গায়ে পর্যন্ত রোগ ধরেছে, মহাব্যাধি। বাড়িটা এখন ভেঙে ফেলা দরকার ইত্যাদি।" মনে মনে হেসে উঠেছিল মহীতোষ। গড়বার কাজ করবার জন্যই ঘর ভাড়া নিয়েছে সে। ভাঙবার দায়িত্ব ওর নয়, ইতিহাসের।

এই ঘরে বসে ছবি আঁকত মহীতোষ, ঘুমতও এইখানে। সৃষ্টিকর্মের প্রেরণা পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে বালিগঞ্জের দিকে বেড়াতে যেত। দু-একটা ঘরোয়া সভাসমিতিতে যোগ দিয়েছে সে। বড়লোকের ড্রইং-রুমে বসে শিল্পকলার আধুনিক ব্যাখ্যা শুনেছে সমালোচকদের মুখ থেকে। সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই ধনীলোক। তাঁদের কাছ থেকে দু-একটা তৈলচিত্রের অর্ডার পাবে আশা করেই মহীতোষ যেত আলোচনায় যোগ দিতে। কিন্তু বছর খানিক যাওয়া-আসার পর সে বুঝতে পারল, যাঁরা সমালোচক তাঁরা পয়সা দিয়ে ছবি কেনেন না।

তা সত্ত্বেও মহীতোষের শিল্পকর্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ল অনেকের। সুখ্যাতিও অর্জন করতে লাগল সে। পয়সা যা রোজগার করছিল তাতে সংসারটা চলে যাচ্ছিল কোনো রকমে। মহীতোষের যে বাবা মা বেঁচে ছিলেন তা আমি জানতাম না। তাঁরা থাকতেন মেদিনীপুর জেলার এক গন্ডগ্রামে। একটি বোনও ছিল। পয়সার অভাবে বোনটির বিয়ে তাঁরা দিতে পারেন নি। প্রতি মাসে মণিঅর্ডারযোগে তাঁদের টাকা পাঠাত মহীতোষ।

এমনিভাবে বছর পাঁচেক কেটে গেল বৌবাজারের স্টুডিওতে। এই নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্যেও শিল্পকর্মের ব্যাঘাত ঘটে নি। মনটা ওর কল্পনার পুষ্পরথে চেপে উড়ে বেড়িয়েছে পৃথিবীর দিকবিদিকে। জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দের দিকে নজর দেয় নি, কল্পনার ঐশ্বর্য বেড়েই গিয়েছে শুধু। এই সময় পরিচয় হয় একটি মেয়ের সংগে। তার পিতা একজন স্বনামধন্য শিল্প-সমালোচক। বিত্তশালী পরিবার। সমালোচকের ড্রইং-রুমে পরিচয় হয় মেয়েটির সংগে। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মহীতোষ। দ্বিতীয় দর্শনে মেয়েটির কথা শুনে পাগল হয়ে গেল সে। শিল্পজ্ঞান অসাধারণ। পিতার চেয়েও বেশি চতুর। শিল্পের জগতটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ইয়োরোপের বড় বড় আর্ট-গেলারী দেখে এসেছে ষোল বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে। এখন মেয়েটির বয়স কুড়ি।

দু'পাতার মধ্যে এই ইতিহাসটুকু শেষ করেছে মহীতোষ। মেয়েটির নাম কোথাও উল্লেখ করে নি। ভাবলাম পরে হয়তো নামটা জানতে পারব আমি। বাকী তেরো পাতার মধ্যে দু'একবার অন্তত তার নামের সংগে পরিচয় ঘটবে আমার।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম। মনে হচ্ছে এবার আসল গল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে আমায়। এই আমার প্রথম গল্প পড়া। মন্দ লাগছে না। পরিচিত বন্ধুর জীবনী পড়ছি বলেই হয়তো বাকী তেরো পাতার প্রতি আকর্ষণ জন্মেছে। কেউ যদি এখন আমার হাত থেকে পাতা'কটা ছিনিয়ে নিয়ে যায় তা হলে হতাশায় ভেঙে পড়ব আমি। রাত্রিতে ঘুমতে পারব না। উত্তেজনাটা উড়ো-জাহাজের আওয়াজের মতো মাথার ভেতরে অস্বস্তির সৃষ্টি করবে।

রাত দশটা বেজে গিয়েছে। হঠাৎ যদি প্রমীলার ঘুম ভেঙে যায় তা হলে আমায় সে দেখতে পাবে না। ভয় পেতে পারে। হঠাৎ ভয় থেকে অসুস্থ হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। কাল আমাদের বিয়ের দু'বৎসর পূর্ণ হবে। খাওয়া-দাওয়া এবং জলসার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রমীলাকে সুস্থ থাকতে হবে। এই ভেবে দোতলায় উঠে গেলাম আমি। ওকে বলে আসাই ভাল যে, অফিসে বসে একটা জরুরী সরকারী ফাইল পড়তে হচ্ছে আমায়। আরও ঘন্টা দুই সময় লাগবে।

গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে প্রমীলা। কাঠের মেঝেতে পা দিয়ে আওয়াজ করলাম। দরজা খোলার সময়ও শব্দ হল জোরে। তাতেও ওর ঘুম ভাঙল না। আবার আমি ফিরে এলাম অফিস-কামরায়।

চিঠিটা পড়তে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে প্রশ্ন উঠল একটা : মহীতোষ আমাকে কেন চিঠিখানা লিখল? মৃত্যুর আগে ওকে আমি বহুবার অর্থসাহায্য করেছি। কিন্তু মৃত্যুর পরে তো আর কিছু আমার করবার নেই। মহীতোষ কি আমার ঘাড়ে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে গেছে?

বার কয়েক দেখা হয় মেয়েটির সংগে। মহীতোষ তাকে ভালবাসল।

এই আমার প্রথম গল্প পড়া।

ড্রইং-রুমের বাইরে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে। পার্ক স্ট্রীটের চা-এর দোকানে বসে গল্প করে। রাত্রে ডিনার খায় বড় বড় হোটেলে। সবচেয়ে বেশি দামের সীটে বসে ছবি দেখে। প্রথম দু'দিন পয়সা দিয়েছিল মহীতোষ। তারপর দিতে লাগল মেয়েটি। এতো কাছে বসে এতো টাকা খরচ করতে আগে কখনো দেখেনি মহীতোষ। ত্রিশ টাকার বিল দিতে শ-টাকার নোট ভাঙায় মেয়েটি। মার্কেটে ঢুকে প্রায়ই শাড়ি কাপড় কেনে। শ-টাকার নোটগুলো গলে যেতে এক ঘন্টাও সময় লাগে না। এইসব দেখে-শুনে মহীতোষের মধ্যে একটা বিচিত্র মনোভাবের সৃষ্টি হল। যেমন করেই হোক টাকা রোজগার করতে হবে। চব্বিশ ঘন্টাই টাকার কথা চিন্তা করে। মেয়েটিকে বিয়ে করতে হলে টাকার দরকার—হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা চাই। বন্ধুবান্ধবদের কাছে অভাবের কথা উল্লেখ করে টাকা ধার করতে লাগল। মেয়েটিকে জানতে দিল না কিছুতেই। তাকে সে মাঝে মাঝেই বলে, "আজ ঢেংকানলের রাজার কাছ থেকে বড় অর্ডার পাওয়া গেল।" এক সপ্তাহ পর আবার সে ঘোষণা করে, "রাজ-পুতনা থেকে একজন ধনীলোক এসেছেন। তাঁর মায়ের একটা পুরো পোর্ট্রেট এঁকে দিতে হবে। হাজার দশেক দাম চেয়েছি।"

ধার করবার মতো কলকাতায় আর বন্ধু রইল না। প্রত্যেকের কাছ থেকেই বার কয়েক টাকা ধার করেছে সে। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস ছিল, মহীতোষ একজন উঁচুদরের প্রতিভা। ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, সক্ষম এবং কর্মঠ করে রাখতে না পারলে শিল্পজগতের ক্ষতি অন্য কাউকে দিয়ে আর পূরণ করা চলবে না।

ছবি আঁকা বন্ধ করল মহীতোষ। বৌবাজারের স্টুডিওতে মন বসছে না আর। চব্বিশ ঘন্টাই টাকার কথা ভাবছে। ভাবতে ভাবতে স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ল। অজ্ঞাতসারে ওর অচেতন মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসল ভয়। টাকা না থাকার ভয়, টাকা না পাওয়ার ভয়। মেয়েটির সংগে দেখা হওয়ার সময় পকেটে যদি অন্ততঃ একখানা শ-টাকার নোট না থাকে তা হলে সে পথ চলতে পারে না। ট্রামে উঠতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে যায়। হাতলটা ধরতে গিয়ে দেখে ট্রামটা ওর নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তা-চ্ছন্নতা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

মনে হল দোতলার ঘরে প্রমীলা হাঁটাহাঁটি করছে। এগারোটা বেজে গিয়েছে। প্রায় মধ্যরাত্রি। এমন সময় প্রমীলার ঘুম কখনো ভাঙে না। আমাকে না দেখলে হঠাৎ হয়তো ভয় পেয়ে যেতে পারে ভেবে আবার আমি শয়ন-কামরায় উঠে এলাম। ঘরের দেয়ালে খুব কম শক্তির একটা নীল রং-এর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে বিছানাটা পরিষ্কার দেখা যায়। না, প্রমীলা ওঠে নি। গভীর নিদ্রায় ডুবে রয়েছে সে। ভাল করে পরখ করবার জন্য বিছানার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। বার দুই নাম ধরে ডাকলাম। সাড়া দিল না সে। ওকে জানিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। সরকারী ফাইল নিয়ে ব্যস্ত আছি, সেই কথাটা বলে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমতে পারত প্রমীলা। যাক, ঘুম যখন ভাঙলো না তখন আর ওকে বিরক্ত করে লাভ নেই। ছ'হাজার ফুট উ'চুতে বসে শীতের রাত্রির কথা ভাবতেও শরীরের রক্ত বরফ হয়ে আসে। এখন শুধু রাত্রি নয়, মধ্যরাত্রি। পাহাড়ের গায়ে জমাট বাঁধা বরফ। লেপের তলায় আরাম করে ঘুমচ্ছে প্রমীলা—ঘুমক। জাগিয়ে দিলেই আরামটুকু নষ্ট হবে। আমি এবার পা টিপে টিপে নেমে এলাম নিচে।

ভয়ের জগতে বাস করছে মহী-তোষ। বন্ধুদের সামনে গিয়ে হাত পাততে ভয় পাচ্ছে সে। চিঠি লিখতে লাগল তাদের কাছে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কাজ করতে পারছে না। ঘর-ভাড়া ছ'মাসের বাকী পড়েছে। এক গেলাস জল গড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘরে একজন লোক নেই। একশো তিন ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ওকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। দোকানে গিয়ে ওষুধও কিনতে হয়। ইত্যাদি।

আমি তখন বর্ধমানের এস-ডি-ও। মহীতোষের কাছ থেকে আমিও এক-খানা চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠি পড়ে এতো বেশি বিচলিত বোধ করলাম যে, তক্ষুণি চাপরাশীকে ডেকে বললাম, "এই তিনশো-টা টাকা টি-এম-ও করে পাঠিয়ে দিয়ে এসো। আজই কলকাতা পৌঁছনো চাই। দেরি করো না—এখুনি চলে যাও।"

মেয়েটি টের পেল না কিছুই। ট্যাক্সি ভাড়া করে মহীতোষ তাকে নিয়ে গেল ডায়মণ্ড হারবার। সেখান থেকে কাকদ্বীপ। ডাক-বাংলোয় খাওয়া-দাওয়া করল। নিরিবিলিতে গাছতলায় বসে গল্প করল সারাটা দুপুর। পাশাপাশি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিল ওরা। তারপর গাছের ব্যবধানটাও আর রইল না। মেয়েটির কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করল মহীতোষ, "আর আমি অপেক্ষা করতে চাই নে।"

"কি চাও তুমি?" জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি।

"বিয়ে করতে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তা হলে কাল সকালেই তোমার বাবার কাছে কথাটা তুলতে চাই।"

"দায়িত্ব নিতে পারবে কি, মহীতোষ?" প্রশ্নের মধ্যে সন্দেহের সুর শুনতে পেল মহীতোষ। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার। মেয়েটি কি তবে বিশ্বাস করে না যে, মহীতোষের ব্যাঙ্কে টাকা আছে অনেক? টাকা না থাকলে ট্যাক্সি চেপে কি করে সে কাকদ্বীপ এল?

মেয়েটি ওর জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না। বলল সে, "বাবার কাছে প্রস্তাব তুলে লাভ নেই। আমাদের বিয়ে তিনি কিছুতেই অনুমোদন করবেন না। যে-চোখ দিয়ে তিনি শিল্পবিচার করেন সেই চোখ দিয়ে শিল্পীদের দেখেন না বাবা। জাগতিক ব্যাপারে তাঁর বিচারের মাপকাঠি একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা। জীবন থেকে শিল্পকে পৃথক করে দেখেন—"

"তা কখনো হয়?" মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল
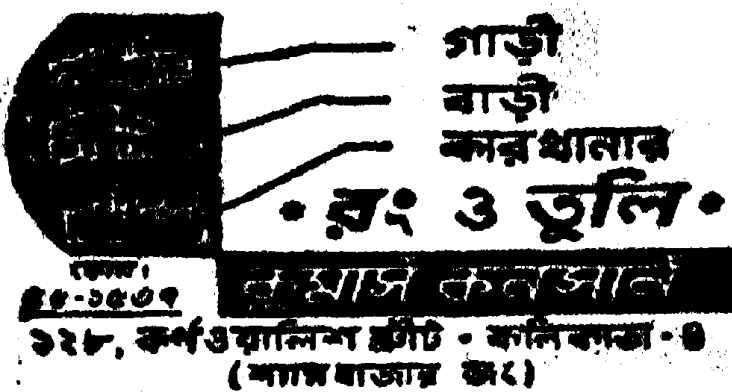
মহীতোষ, "তা কখনো হয় না। আমার জীবনই হচ্ছে আমার শিল্পকর্ম।"

"কিন্তু শিল্পচর্চায় দ্বারা বাবাকে বিয়ের ব্যাপারে রাজী করানো অসম্ভব হবে।"

"তা হলে কি করব আমি?" অসহায়ের মতো অনুচ্চ স্বরে প্রশ্ন করল মহীতোষ। কন্ঠনালী শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। কাকদ্বীপের চতুর্দিকেই জল। মহীতোষের তবু মনে হল, সাহারার বুকে তাঁবু ফেলেছে ওরা। বালির সমুদ্রে ঝড় উঠেছে বুঝি।

একটু পরেই মেয়েটি বলল, "বাবার অমতে বিয়ে করতে পারবে?"

"পারব।" শতছিন্ন স্নায়ুতন্ত্রকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করল মহীতোষ।

"তা হলে দায়িত্ব নেওয়ার প্রশ্ন উঠে পড়ছে, মহীতোষ।"

"দায়িত্ব বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?"

"টাকা। অন্ততঃ হাজার দশেক টাকা তোমার থাকা চাই। বাবার কাছ থেকে কানাকড়িও পাওয়ার আশা করো না।" গাছের গুঁড়িতে সুস্থিরভাবে হেলান দিয়ে বসল, মেয়েটি।

অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল মহীতোষ। হাসিটা মিলিয়ে যাওয়ার সময় বিকৃত একটা আওয়াজ বেরুলো। ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ পার হয় নি। কাকদ্বীপের বাতাসে আর্দ্রতার উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে না। মহীতোষের আদ্দির পাঞ্জাবিটা তবু ভিজে উঠতে সময় লাগল না। টস টস করে কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। বিকৃত হাসির ধাক্কা লেগে চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরের দিকে। যেন হাড় দুটো আত্মপ্রত্যয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণসূচক ভঙ্গী করে দাঁতের ওপর দাঁত চাপল মহীতোষ।

মেয়েটির মনে তবু নির্ভরতার জোর এল না। প্রশ্ন করল সে, "তোমার হাতে কি হাজার দশেক টাকা নেই?"

"নেই!" গুলী-খাওয়া সাপের মতো দেহটাকে ঘাসের ওপর উল্টে-পাল্টে মহীতোষ শেষ পর্যন্ত কাত হয়ে বসে বলতে লাগল, "দশ হাজার

নয়, বিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে রয়েছে। বোধহয় মরচে ধরে গেল।"

"তা হলে ভয় করবার কারণ নেই।" উঠে পড়ল মেয়েটি।

"ভয় আমি পাচ্ছি নে—"

"তোমার মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না।" ট্যাক্সির দিকে হাঁটতে লাগল মেয়েটি।

মহীতোষও উঠে পড়ল। ট্যাক্সিতে বসে মেয়েটি বলল, শুধু হাজার দশেক টাকা হাতে থাকলেই ঝুঁকি নেওয়ার সাহস পাব আমি।"

"বেশ তো বিয়ের আগে দশ হাজার তোমার হাতে নগদ তুলে দেব—"

"হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে তা হলে।" ট্যাক্সির দূর-কোনায় হেলে বসল মেয়েটি। মহীতোষের মনে হল, ওর স্পর্শ বাঁচাবার চেষ্টা করছে সে।

ডায়মণ্ড হারবার রাস্তা ধরে ট্যাক্সিটা ফিরে চলল কলকাতা। বেহালা পর্যন্ত আর কোনো কথা হল না। কথা বলবার ইচ্ছে নেই মহীতোষের। হাঁপিয়ে পড়েছে সে। চলন্ত ট্যাক্সির দু'দিক দিয়ে হাওয়া ঢুকছে। নইলে আদ্দির পাঞ্জাবিটা ভিজে থাকত তখনও।

গভর্ণমেন্টের টাকা তৈরির কারখানাটার সামনে পেঁৗছে মেয়েটি বলল, "যা করবার তাড়াতাড়ি করো।"

"কতো তাড়াতাড়ি?" নতুন সমস্যার সন্ধান পেল মেয়েটির কথায়।

"এই ধরো দিন পনরো। হ্যাঁ, পনরো দিনের চেয়ে এক ঘন্টাও বেশি নয়। আজ চৌঠা, উনিশে ফাল্গুন রাত সাড়ে আটটার লগ্নে আমার বিয়ে।" ঘোষণাটা জজসাহেবদের রায়ের মতো শোনালো। আপীল করবার দরকার বোধ করল না মহীতোষ। শুধু বলল, "ফিক্সড্ ডিপোজিট। ব্যাঙ্কে গিয়ে তুলতে যে কঘণ্টা সময় লাগবে—" একটু থেমে মহীতোষই জিজ্ঞাসা করল, "পাত্র ঠিক আছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। আমাদের চেনা পরিবার। কথাবার্তা সব পাকা করেছেন বাবা। ছেলেটি আমায় একবার দেখেও গিয়েছে। বড় চাকরি করে।"

"তা তো করবেই—" অসূয়কের মতো নিন্দাসূচক মন্তব্য করল মহীতোষ, "ধরবার ব্যবস্থা থাকলেই মেয়েরা ছাড়বার কথা ভাবে। ব্যাপারটা তুলনামূলক। উনিশ তারিখের আগে যদি আরও বড় চাকুরের সন্ধান আসে তা হলে তোমার বাবা পুরো ফাল্গুন-টাই অপেক্ষা করতে রাজী থাকবেন। তুমি কি করবে তখন?"

"তোমার জন্য অপেক্ষা করব। পুরো ফাল্গুনটাই যদি তোমার হাতে থাকে তা হলে টাকা যোগাড় করা সহজ হবে। আমি এইখানেই নামব, মহীতোষ। এটা কোন্ জায়গা?"

"চৌরঙ্গী।"

'ফারপোর' সামনে নেমে গেল মেয়েটি।

এক নিশ্বাসে গল্পটা পড়তে পারছি না। জমে উঠেছে গল্প। মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি পড়লে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। রাত মাত্র একটা। বাকী রাতটা কাটবে কি করে আমার? গল্প পড়তে পড়তে রাতটা শেষ করে দিতে চাই আমি। তারপর সোজা অফিস-কামরা থেকে চলে যাব ধর্মশালায়। মহীতোষ আত্মহত্যা করেছে। সে নেই। তা হোক। সে তার শিল্পজগতটিকে হত্যা করে যায় নি। কাল সকালে গিয়ে চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করব আমি। একটা ছবি অন্তত কিনব ওর।

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম। সিঁড়িতে পা-এর আওয়াজ শুনতে পেলাম। চমকে উঠলাম আমি। প্রমীলা তো ঘুমুচ্ছে। যদি সে জেগে গিয়ে থাকে তা হলে সে পা টিপে টিপে নিচে নামবে কেন? ওপরে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ডাকবে আমায়। ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে যদি নিচে নেমে এসে থাকে তা হলে এখানেই ঢুকে পড়বে প্রমীলা। মিনিট দু'তিন কেটে গেল। কেউ এল না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। শয়ন-কামরায় ঢুকে প্রমীলার নাম ধরে বারকয়েক ডাকলামও। বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া গেল না। আলগোভাবে কপালের ওপর হাত রাখলাম ওর। তাতেও সে নড়ে-চড়ে উঠল না। ঘুমের এমন গভীরতা আগে কখনো চোখে পড়ে নি আমার। একটু যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হল আমার। প্রমীলা, কি তবে জেগে রয়েছে? সন্দেহাকুল মন নিয়ে আবার আমি ফিরে এলাম অফিস-ঘরে। চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলাম। কিন্তু মনের একাগ্রতা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই সন্দেহ হচ্ছে আমাদের শোবার-ঘরে প্রমীলা হেঁটে বেড়াচ্ছে। অস্বস্তিতে সময় কাটছে ওর।

কেন যে সে জেগে থাকবে তার কারণ কিছু খুঁজে পেলাম না আমি। বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বছর পূর্ণ হবে কাল। আমার বিশ্বাস, প্রমীলাকে আমি চিনি। এমন সদা-হাস্যময়ী মনখোলা মেয়ের সঙ্গে আগে কখনো আমার পরিচয় হয়নি। প্রমীলাকে আমি সারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ওর দিক থেকেও কোনো বিচ্যুতি ঘটেছে ব'লে আমার জানা নেই।

দশ হাজার টাকা যোগাড় করার উপায় খুঁজে বার করতে পারল না মহীতোষ। ট্যাক্সির মিটারের মতো এক একটা দিন খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় না। টেলিফোনে কথা হয়। কিন্তু টাকার কথা উল্লেখ করে না কেউ। মহীতোষের মনোভাব থেকে মেয়েটি বুঝতে পারে টাকার জন্য ভাবনার কোনো কারণ নেই। উনিশ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় না মেয়েটি। মহীতোষ টেলিফোনের তারের মারফত রোমান্টিক হ'য়ে ওঠে। বলে, "তোমার বাবার ধার্য-করা তারিখেই বিয়ে করব আমরা। বিকেলবেলা বিয়ের চেলি প'রে চলে এসো তুমি। পার্ক স্ট্রীটে ফ্ল্যাট নিচ্ছি। 'ফারপো' রেস্তরাঁর দোতলার বারান্দায় অপেক্ষা করব আমি। তুমি ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা উঠে আসবে দোতলায়।"

বোধহয় দিনটা ছিল এগারোই ফাল্গুন। গোবিন্দপুরে গিয়েছিল মহীতোষ। শিল্পী-সম্মেলনীর প্রধান অতিথি হয়েছিল সে। বক্তৃতা দিতে গিয়ে হঠাৎ সে পড়ে যায় মঞ্চের ওপর। সভার উদ্যোক্তারা ভয় পেয়ে গেল। একজন উদীয়মান শিল্পীর যদি
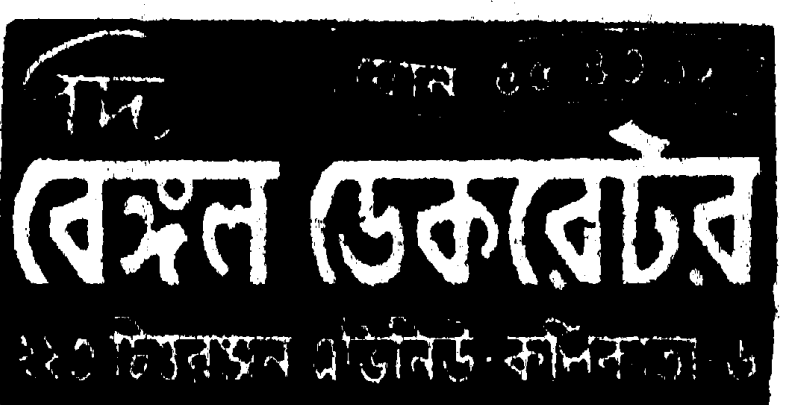
অকালমৃত্যু ঘটে তা হলে দুঃখের আর সীমা থাকবে না। ওখানকার ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে রোগ কিছু ধরতে পারলেন না। মৃগী রোগের লক্ষণগুলোও স্পষ্ট নয়। তবে? তবে তার কি হল? উদ্যোক্তাদের ডেকে মহীতোষ বলল, "রোগ খুব গুরুতর। চিকিৎসা করাবার পয়সা নেই। আমার নামে একটা ফান্ড খুলতে পারো?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—" সোৎসাহে স্বীকৃতি জানালো উদ্যোক্তারা।

"কাল তা হলে তোমরা আমার বৌবাজারের স্টুডিওতে এসো। কাগজপত্র, চাঁদার খাতা সব ছাপিয়ে রাখব আমি।"

"কখন যাব?"

"বিকেলের দিকে। কাগজপত্র ছাপিয়ে আনাতে ঘণ্টা পাঁচেক সময় লাগবে তো।"

কাগজপত্র দু'দিন আগেই ছাপিয়ে রেখেছিল মহীতোষ। শিল্পীর 'জীবন-রক্ষা ফান্ড' খুলে ফেলল ছেলেরা। উনিশ তারিখের বিকেলবেলা পর্যন্ত চাঁদা যা উঠল তার মোট অঙ্ক পাঁচ শো টাকাও হল না। উদ্যোক্তারা বলল, "এই টাকা দিয়েই এখন চিকিৎসা আরম্ভ করা হোক।"

পথ-ভুল-করা পর্যটকের মতো হতাশায় ডুবে গেল মহীতোষ।

দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিলাম আমি। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঠে পড়ে। বরফে আবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গলিত সোনা। কুয়াশার আবরণ অপসারিত হয়েছে। আজও দেখলাম সনাতন সত্য পর্বতচূড়ায় রৌদ্রালোকে সমুদ্ভাসিত। কুয়াশার আবরণ তাকে ঢেকে রাখতে পারেনি। গলা-সোনার স্রোত গড়িয়ে পড়ছে পর্বতের চূড়া থেকে।

শেষ পাতাটা পড়তে আরম্ভ করলাম। মনে পড়ে, শিল্পীর 'জীবন-রক্ষা ফান্ডে' আমিও কিছু টাকা পাঠিয়েছিলাম। আজ বুঝতে পারছি, সেই টাকাটা ওর কোনো কাজে লাগেনি। মহীতোষের জীবনটা রক্ষা করতে পারলে আমি নিজেও আজ গৌরবান্বিত বোধ করতাম। এমন একটি প্রতিভার অকালমৃত্যুর জন্য গোটা সমাজটাই কি দায়ী নয়? মেয়েটিকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়বার প্রবৃত্তি মেয়েদের স্বভাববিরুদ্ধ। ভাবপ্রবণতা যতোই কেন গভীর হোক না, নির্দিষ্ট পথের বাইরে পা ফেলতে ভয় পায়। বৌবাজারের স্টুডিওটা শিল্পের প্রাণকেন্দ্র হলেও জীবনযাপনের পরিসর তাতে নেই।

তা সত্ত্বেও উনিশ তারিখে বিকেলবেলা চৌদি পরে মেয়েটি চলে এসেছিল ফারপো রেস্তরাঁর দোতলায়। অপেক্ষা করেছিল এক ঘণ্টারও ওপর। মহীতোষ আসেনি। স্টুডিয়োর অন্ধকারে চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে বসে ছিল সে। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, মেয়েটি হয়তো বৌবাজারের ঠিকানা খুঁজে এখানে এসে উপস্থিত হতে পারে। রাত সাড়ে আটটার লগ্নটা পার হ'য়ে যাওয়ার পর বেড়াতে বেরিয়েছিল মহীতোষ। হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এসেছিল 'ফারপো' রেস্তরাঁ পর্যন্ত। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়েছিল দোতলায়। অপরিচিত ভিড়ের মধ্যে মেয়েটিকে দেখবার আশা করেনি সে। তবুও তার উপস্থিতির কথা কল্পনা ক'রে স্বস্তি পেয়েছিল মহীতোষ। তারই নির্দেশ দেওয়া জায়গায় নায়িকা এসে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করেছিল। নায়ক আসেনি। বিপ্রলব্ধার হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে মেয়েটি। এতোক্ষণে বিয়ের মন্ত্র পড়াও শেষ হয়েছে তার। রক্ষা পেল মহীতোষ।

পনেরো পাতার চিঠিখানা ফেলে রাখলাম টেবিলের ওপর। আমার অবচেতন মনটা চেয়েছিল চিঠিখানা খোলাই প'ড়ে থাক। তাতে প্রমীলার হয়তো চোখে পড়বে এটা। কেন যে প্রমীলাকে দিয়ে চিঠিটা পড়াতে চাই আমি তার কারণটা এখনো আমার পরিষ্কারভাবে জানা নেই। প্রমীলা ছোট গল্প পড়তে ভালবাসে। হয়তো সেই জন্যই গল্পটা ওকে দিয়ে পড়াতে চাইছি আমি।

আমার অফিস-কামরায় ঢুকে পড়ল প্রমীলা। জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার, সারা রাত ব'সে কি পড়ছ?"

"ছোটগল্প।"

"তুমি তো গল্প কখনো পড়ো না।"

"কাল রাত থেকে পড়তে আরম্ভ করেছি। নেশা ধ'রে গিয়েছিল।" উঠে পড়লাম আমি। প্রমীলা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি এক্ষুণি বাইরে চললে?"

"হ্যাঁ। কিছু বলবে?"

মাথা নিচু ক'রে রাখল প্রমীলা। চোখ দুটো আমাকে দেখতে দিচ্ছে না। প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, চোখ দুটো ওর ভিজে রয়েছে। ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলাম আমি, "কিছু বলতে চাও কি?"

"হ্যাঁ। আমিও কাল সারা রাত ঘুমোই নি।"

"ধর্মশালা থেকে ফিরে আসি, তারপর তোমার গল্পটাও শুনব।"

দেবেন ধরকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মশালায় এলাম। দরজার সামনে পুলিশ-পাহারা রয়েছে। সেলাম ক'রে তারা সরে গেল একধারে। দেবেন বলল, "আপনি ভেতরে যান, আমি বাইরেই থাকি।"

ঘরের মেঝেতে ছবিগুলো ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে। একটা ছবিও ফ্রেম করা নেই। পয়সার অভাবের জন্যই বাঁধাতে পারে নি মহীতোষ। প্রত্যেকটা ছবি আমি হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলাম। শিল্পবিচারে আমার বিন্দুমাত্র দক্ষতা ছিল না। অভিজ্ঞতারও অভাব ছিল খুব। তবু প্রতিটি ছবি আমার চোখে খুবই সুন্দর লাগল। দেবেন কাল রাতে মিছে কথা বলেনি। প্রত্যেকটা ছবি একই মেয়ের। তাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি এঁকেছে সে। রং আর তুলির সাহায্যে ক্যানভাসের ওপর নবজীবনের স্পন্দন তুলেছে মহীতোষ। এমন সৃষ্টির তুলনা মেলা সহজ নয়। ছবিগুলো সব গুছিয়ে নিলাম আমি। প্রমীলাকে দেখাব।

আমার বিশ্বাস, এই মেয়েটিকে প্রমীলা চেনে।

সিদ্ধা সাহিত্য

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

মহাকবি হোমারের মৃত্যুর পর সাতটি দেশ তাঁর জন্মভূমিত্ব দাবি করেছিল।

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে যে অধ্যায়টিকে সিদ্ধা সাহিত্য নামে অভিহিত করা হয় তার ক্ষেত্রেও এই বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা এর দাবিদার। কার দাবি মানব আর কার দাবি মানব না সে বিচার করবার আগে গোড়ার ইতিহাসটা জানা দরকার। ভাবাবেগের যেখানে সহজেই উদ্দাম হয়ে ওঠবার আশঙ্কা সেখানে যুক্তির বাঁধটা একটু শক্ত করে বাঁধাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অর্ধশতাব্দী আগে সিদ্ধা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল না। নেপাল দরবারের লাইব্রেরির হাতে-লেখা পুঁথির মধ্যেই তার অস্তিত্ব ছিল সীমাবদ্ধ এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর হাতে না পড়লে হয়তো আজও তা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকত। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে শাস্ত্রী মশায়ের সম্পাদনায় "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" বেরোল। বইটি হলো চারটি পুঁথির সঙ্কলন : (১) চর্যাচর্য বিনিশ্চয়, (২) সরোজবজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নপাদের দোহাকোষ আর (৪) ডাকার্ণব। ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসের একটি অলিখিত এবং অনুমিত অধ্যায় লিখিত হল এবং প্রমাণিত হল এই গ্রন্থের আবিষ্কারে। অপভ্রংশের স্তর পেরিয়ে আর্যভাষা যখন ঠিক পরের ধাপে পা বাড়াচ্ছে এই গ্রন্থের চর্যা ও দোহাবলীর মধ্যে তার তখনকার রূপটি দেখতে পাই। আদি-রূপ সম্পূর্ণ অবিকৃত রয়েছে এমন কথা বলি না। অবিকৃত থাকার কথা নয়। রচনা যখনকার, লেখা তো তার অনেক পরের। কতবার নকল হয়েছে কে জানে? তবু যা আছে তারও মূল্য কম নয়।

হিন্দী এসেছে শৌরসেনী অপভ্রংশ থেকে। চর্যাপদের অনেক স্থলে এই শৌরসেনীর প্রভাব সুস্পষ্ট। শৌরসেনী অপভ্রংশ পুরোপুরি হিন্দীতে পরিণত হতে কয়েক শতাব্দী লাগল। তারই মাঝামাঝি সময়ের যে রূপ সেটির নাম দেওয়া হল অবহট্ঠ। প্রাকৃত পৈঙ্গলে অবহট্ঠ ভাষায় রচিত অনেকগুলি কবিতা পাই। রাজপুতানায় এই অবহট্ঠ ভাষাকে বলা হত পিঙ্গল। রাজপুত কবিরা 'ডিঙ্গল' কিনা স্থানীয় রাজস্থানী ভাষায় যেমন কাব্যরচনা করতেন, তেমনি 'পিঙ্গলে' কাব্যরচনারও কমতি ছিল না। আসলে শৌরসেনী বা পশ্চিমী অপভ্রংশ আর তারই কনিষ্ঠ অবহট্ঠ একসময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুদূর পঞ্জাব থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত এর অধিকার ছড়িয়েছিল। তাই দেখছি বাংলাদেশের বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকরাও এর হাত এড়াতে পারেননি। বৌদ্ধ দোহাগুলি তার নিদর্শন। কাজেই প্রাচীন হিন্দী বা প্রাচীন হিন্দীর অব্যবহিত আগের রূপ কিছুটা যে এই দোহাগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়াও একটি কথা আছে। ভাষার নাম কি শুধু স্থান আর পাত্র দিয়েই নির্ণয় করব? গুণ দিয়ে নয়? ভাব দিয়ে নয়?

প্রকৃতি বিচার করে পণ্ডিতেরা সিদ্ধাচার্যদের সাহিত্যের ভাষাকে সন্ধ্যা ভাষা নাম দিয়েছেন—সন্ধ্যা কিনা আলো আঁধারি—অর্থাৎ যে ভাষার কিছুটা বুঝি আর কিছুটা বুঝি না। সেকালের সাধকরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধনা করতেন জনসাধারণকে তা জানাতে চাইতেন না। তাই তাঁদের সাধনার গূঢ়তত্ত্ব এমনি ধারা হেঁয়ালির মত ভাষা দিয়ে আবৃত করে রাখা হত। এ ভাষা তারাই বুঝত যারা তাঁদেরই পথের পথিক।

আবার কেউ কেউ বলছেন, সন্ধ্যা নয়, এ ভাষার নাম সন্ধা (নয়ে ধয়ে য-ফলা আ কার নয়, শুধু ন য়ে ধ যে আকার)। সম্ পূর্বক ধা ধাতু থেকে উৎপত্তি। তার মানে হয় বিশেষ উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় নিয়ে ব্যবহৃত ভাষা। অর্থাৎ কিনা যে ভাষার বাচ্যার্থ ছাড়া একটি স্বতন্ত্র গূঢ়ার্থ আছে তাই হল সন্ধা ভাষা। তা সে সন্ধাই হোক আর সন্ধ্যাই হোক আলোচ্য পদগুলির ভাষা যে অধিকাংশ স্থলেই দ্ব্যর্থক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যটা পরিষ্কার করা যাক।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই।।
অঙ্গন ঘরপণ স্থন তো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী।।
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ
কানেট চোরে নিল কাগই মাগঅ।।
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ।।
অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।
কোড়ি মাঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইড়।

এর বাচ্য অর্থ হচ্ছে :

কাছিমের দুধ দুয়ে পাত্র এত ভর্তি হয়ে গেল যে, আর ধরছে না। গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়। আঙ্গিনায় গৃহকর্ম। ওগো বধূ শোন, মাঝ রাতে চোরে নিল কানের অলংকার, শ্বশুর পড়ল ঘুমিয়ে, বৌ রইল জেগে, কানের গয়না যে চোরে নিল। কার কাছে গিয়ে চাই? দিনের বেলায় বৌটি কাক দেখলে ভয় পায়। আর রাতের বেলায় যায় কামরূপে। কুক্কুরীপাদ এই চর্যা গাইলেন। কোটির মধ্যে একটির হৃদয়ে তা প্রবেশ করল।

এর গূঢ়ার্থ একটি আছে, কিন্তু সেটি আপনার আমার পক্ষে দুর্বোধ্য। আমরা না বুঝি, এই অভিপ্রায় নিয়েই চর্যাকররা এ জাতীয় চর্যা লেখেন। তবু দু-চারটি শব্দের গভীরার্থ বলি। তাতে জ্ঞানবৃদ্ধি না হলেও কৌতূহল কিছুটা চরিতার্থ হবে। যেমন,—

'দুলি' শব্দের অর্থ সকল রকমের দ্বৈতভাব।
'পিটা' হল নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র।
'রুখ' কিনা দেহরূপ বৃক্ষ।
'তেন্তলি' হচ্ছে বক্রগামী বোধিচিত্ত।
'কুম্ভীর' যোগসাধনার কুম্ভক।
'বহুড়ী' অবধূতিকা।
'কানেট' কি? না—প্রকৃতিদোষ।
'সুসুরা' শ্বাস।
'দিবস' চিত্তের ব্যুত্থানাবস্থা।
'রাত্রি' নিলয়ের অবস্থা
'কামরু' কিনা সহজিয়াদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ উষ্ণীষকমল।

এযে সহজে লোকের বোধগম্য হবে না, কুক্কুরীপাদ সে কথা পূর্বেই বলে গেছেন—

কোড়ি মাঝে একু হিঅহিঁ সমাইড়।

আর একটি প্রহেলিকা বলছি :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতিআবেশী।।
বেঙ্গ সংসার বড্ হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ।।
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে।।
জোগো বুধী সোই নিবুধী।
জো ষো চৌর সোই সাধী।।
নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ।।

অর্থাৎ—

টিলার ওপরে আমার ঘর, সেখানে প্রতিবেশী নেই,
হাঁড়িতে ভাত নেই কিন্তু অতিথির নিত্য আগমন।

বেঙ্গ কি কখনো সাপকে তাড়াতে পারে?
দোহা দুধ কি বাঁটের মধ্যে আবার ঢোকে?
বলদ বিয়োল আর গাই হল বাঁঝা।
তিন সন্ধ্যা পাত্র ভয়ে দুধ দোয়া হয়।
যে বুদ্ধিমান সেই আস্ত নির্বোধ।
যে চোর সেই হল সাধু।
নিত্য নিত্য শেয়াল যুদ্ধ করে সিংহের সঙ্গে।
ঢেণ্ঢণপাদের গীত অল্প লোকেই বোঝে।

এতো গেল আক্ষরিক অর্থ। এরও গভীরার্থ অবশ্য একটি আছে। যেমন, 'টাল' হচ্ছে মহামুখচক্র, 'পড়বেষী' হল চন্দ্রসূর্যরূপে দৈবতাভাস, হাড়ী হল দেহভান্ড, 'ভাত' কিনা সুংবৃত্তি বোধিচিত্ত। না, গভীরার্থ নিয়ে আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া বোধ হয় সংগত হচ্ছে না।

প্রহেলিকার এই ধারা পরবর্তীকাল পর্যন্ত চলেছিল। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি' থেকে কবীরের একটি পদ উদ্ধৃত করে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্ঃ

কৈ সেং নগরি করোঁ কুটবারী।
চঞ্চল পুরিষ বিচক্ষণ নারী।।
বৈল বিয়াই গাই ভাঈ বাঁঝ।
বছরা দুহৈ তীনুং সাঁঝ।।
মকড়ী ধরি মাখী ছ ছি হারী।
মাস পসারি চীহল রখবারী।।
মুসা খেবট নাব বিলইয়া।
মীড়ক সোবৈ সাপ পহরইয়া
নিত উঠি স্যাল স্যংঘসুং ঝুঝৈ।
কহৈ কবীর কোঈ বিরলা বুঝৈ।।

সে নগর রক্ষা করব কেমন করে, পুরুষ যেখানে চঞ্চল আর নারী হল বিচক্ষণ?

বলদ বিয়োয় আর গাই হয় বাঁঝা।
তিন সন্ধ্যাই বাছুর দোহান হয়।
মাছি ধরল মাকড়সাকে, ছাড়াতে চেষ্টা করেও পারল না।
মাংসের পসার—চিল তার রক্ষক।
ইঁদুর হল নেয়ে আর বিড়াল হল নৌকা।
ব্যাং আছে শুয়ে আর সাপ তাকে দিচ্ছে পাহারা।
প্রতিদিন উঠে শেয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে।
কবীর বলেন কেউ কদাচিৎ বোঝে।

কবীরের ভণিতায় অনুরূপ আর একটি পদ পাওয়া যায়। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর চর্যাগীতি পদাবলীতে সেটি উদ্ধৃত করেছেনঃ

অব কেয়া করে গান গাঁব কতুআলা।
শব মাংস পসারি গীধ রাক্ষ উআলা।।
মুষকী নাও বিলাই কনডারী।
শোএ মেড়ুক নাগ পহারী।।
বলদ বিআও এ গাভী ভঈ বাঞ্ঝা।
বাছুরি দুহাও এ দিন তিন সাঞ্ঝা।।
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে।
কহে কবীর বিরল জন বুঝে।।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের যে সাধনার কথা সিদ্ধা সাহিত্যের উপজীব্য সে হল তান্ত্রিক সাধনা। এ সাধনারও দুটি দিক্—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। এই সাধকদের যে সাধনা সে হল অন্তরঙ্গ সাধনা। এই দেহই তাঁদের কাছে ব্রহ্মান্ডের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ব্রহ্মান্ডের যাবতীয় সত্য এই দেহের মধ্যেই নিহিত আছে, সাধনার দ্বারা সে সত্যের উপলব্ধি হবে। সেই সত্যই বুদ্ধ। তিনি অশরীরীরূপে শরীরের মধ্যে অবস্থান করছেনঃ

অসরির কোই সরি রহি লুক্কো।
জো তহি জানই সো তহি মুক্কো।।

এই শরীরের মধ্যে অশরীরী কেউ লুকিয়ে আছেন। যে তাঁকে জানে সেই মুক্ত হয়। সাধক বলছেনঃ

ঘরেই ত তিনি আছেন, বাইরে তাঁর খোঁজ করছ বৃথা।

ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।

—দেখছ ঘরেই আছেন পতি। তবু প্রতিবেশীকে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছ।

পই দেক্খই পড়িবেশী পুচ্ছই।

সাধক আর পন্ডিতদের মধ্যে তফাত এইখানেই। সাধকরা সাধনার দ্বারা জ্ঞান অর্জন করেন, কিন্তু সত্যের দেখা পান না। তাঁরা সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন কিন্তু—

দেহহিং বুদ্ধ বসন্ত ন জাণই।

দেহের মধ্যেই যে বুদ্ধের বাস এ তত্ত্ব তাঁরা জানেন না।

সরহপাদ এই দেহরূপ তীর্থের প্রশস্তি গেয়েছেন এইভাবেঃ

এথু সে ঘুরসরি জমুণা
এথু সে গঙ্গা সাঅরু
এথু পআগ বণারসি
এথু সে চন্দ দিবা অরু।।
কথেত্তু পীট উপপীঠ এথু
মইং ভমই পরিটঠও।
দেহা সরিসঅ তিত্থ মইং
সুহ অন্ন ণ দীটঠ ও।।

এই দেহেই সুরসরিৎ যমুনা, এই দেহেই গঙ্গাসাগর। প্রয়াগ বল, বারাণসী বল, চন্দ্র বল, সূর্য বল সব এই দেহে। কি ক্ষেত্র, কি পীঠ, কি উপপীঠ—এইখানেই। অনেক ঘুরে এই সার বুঝেছি। দেহের মত এমন তীর্থ আর নেই। অন্য সুখও দেখা যায় না।

এই দেহকে অবলম্বন করেই তাঁরা সহজানন্দের সাধনা করেছেন। সেই মহাসুখসাধনার কথাই চর্যা ও দোহার ছত্রে ছত্রে পরিব্যাপ্ত।

সাহিত্য কখনও জীবন-নিরপেক্ষ হতে পারে না। চর্যা সাহিত্য একজাতীয় সাধক সম্প্রদায়ের সাধনার পরিচায়ক হলেও তৎকালের সমাজের ছবি এর মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এমন একান্ত অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ছবি কোন সচেতন সাহিত্যস্রষ্টার হাতে ফুটত কিনা সন্দেহ।

কয়েকটি পদে শবর শবরীর ছবি পাই। উঁচু উঁচু পর্বতে তাদের বাস, জনসমাজ থেকে দূরে। শবরী ময়ূরের পালক দিয়ে অঙ্গসজ্জা করে, গলায় পরে গুঞ্জার মালা। শবরেরা বন ঘিরে জাল দাঁড় দিয়ে হরিণ শিকার করত। ডোমেরাও বাস করত নগর থেকে দূরে।

নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
তারা তাঁড় তৈরী করত, চাঙ্গারি বুনত।
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গেড়া।
নৌকায় চড়ে তারা যাওয়া আসা করত।
আইসসি জাসি ডোম্বী কাহারি নাবে।
কার নৌকায় চড়ে তুমি আস আর যাও?

এরা পাটনীর কাজও করতঃ

বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্গুরু পাঅ পএং জাইব পুণু জিণ-উরা।।
পাঞ্চ কেড়ুআন পড়ন্তেং মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণ-দুখোলেং সিঞ্চহু পানী ন পইসই সান্ধী।।

ডোমনী তুমি বেয়ে চল বেয়ে চল, পথে দেরি হল।
সদ্গুরুর চরণ প্রসাদে জিনপুর যেতে হবে।।
পাঁচটি বইঠা পড়ছে, সামনে পিছনে কাছি বাঁধা।
গগনরূপ সেঁউতি দিয়ে জল সেঁচো, দেখো যেন জোড়মুখে না জল ঢোকে।

পাটনীরা কড়ি বুড়ি নিয়ে যাত্রী পার করত। তবে এ ডোম্বীর কথা স্বতন্ত্র, এরা

কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
কড়িও নেয় না বুড়িও নেয় না স্বচ্ছন্দে পার করে দেয়।

জলদস্যুরা সেকালে লুঠপাট করত। ধনীর ভাঁড়ারে সোনারূপার অভাব ছিল না। গৃহস্থের ঘরে চাষের জন্যে বলদ আর দুধের জন্যে গরু পোষা হত। বড়লোকেরা হাতী পুষতেন। মাহুত হাতীকে চালনা করত। দাবা খেলে লোকে অবসর বিনোদন করত। শুঁড়িরা বাখর দিয়ে মদ তৈরি করত। তাদের দোকানের সামনে এমন চিহ্ন থাকত যা দেখে মদ্যপরা বুঝতে পারত এটি মদের দোকান। তাই দেখে ভিতরে ঢুকত। কিন্তু 'পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা।' যে গ্রাহক একবার ঢুকত সে আর বেরোত না। চর্যাকাররা নরচরিত্র সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। আমরা দেখছি এ যুগেও ওখানে যে ঢোকে সে আর বেরোয় না।

পরিশেষ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্যামল সেন

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। আট ।।

প্রশান্ত যে অনাথকে আসতে বলল তা তার কাছ থেকে সব কথা শোনবার জন্যেই। দেখল, যা অবস্থা, অনধিকার-চর্চা মনে করে চোখকান বুজে থাকা অন্যায়ই হয় এর পর। আসল ব্যাপারটা না জানলে কোন্ পথে, কিভাবে ও'দের সহায়তা করা যেতে পারে বুঝতেও পারা যাচ্ছে না। আর, সেদিকে কিছু করতেই হবে যে রকম করেই হোক।

একটা কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই দু'দিনের আলাপ-পরিচয়ে, কর্তা কোন কারণে নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে 'অজ্ঞাতবাস' পছন্দ করলেও অনাথ আর স্বাতি যেন চায় কেউ পাশে এসে দাঁড়াক। স্বাতি অবশ্য অনাথের মত হাত পেতে কিছু নিতে পারবে না, তবে এটা তো স্বাভাবিকই যে পিতার ঐ অবস্থা, এক ঐ অনুগত ভৃত্যের ভরসায় যথেষ্ট বল পাচ্ছে না মনে।

সব জানতে হবে। একটা সুবিধে হোল যে বাপের অজ্ঞাতে মেয়ে আর ভৃত্যের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আছে, এই বোঝাপড়ার নিভৃতে হয়তো প্রশান্তরও জায়গা করে নেওয়া অসম্ভব হবে না।

পরের দিনই এল না অনাথ। তবে এলে সুবিধাও হোত না। হেড আফিসের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতে হয়, বাসায় এসেই প্রশান্ত খবর পেল বড় সাহেব বিনা নোটিশেই হঠাৎ তত্ত্বাবধানে আসছেন। তখন থেকেই ঘুরেঘারে সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখতে হোল। তারপর দিনটাও যে তাঁকে দেখাতে শোনাতে কোথা দিয়ে কেটে গেল যেন বুঝতেই দিল না প্রশান্তকে। পরের দিন, পূর্ব দিনের অতিরিক্ত মেহনতের জন্য মনটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকায় স্বাতিদের চিন্তাটাই প্রবল হয়ে রইল মনে। কয়েকবারই মনে হোল—হয়তো অসুখটাই বেড়েছে কর্তার, একবার দেখে আসলে হয় রজতকে সঙ্গে নিয়ে—কিন্তু কোথা থেকে সেই সংকোচটা এসে এসে পড়তে লাগল—সমর্থ, সুন্দরী মেয়ে, অসুখ আসলে তেমন কিছু ছিলও না তো......

দোটানার মধ্যে পড়ে মনটা বড় বিষন্ন হয়ে আছে। আফিসে আর গেল না। বাড়িতেই কতগুলো কাজ নিয়ে বসেছিল, অভিনিবেশ হোল না। তবু লোকের যাওয়া-আসা আছে, টেলি-ফোনের দৌরাত্ম্য আছে, প্রশান্ত একবার রিসিভারটা তুলে নিয়ে আফিসে জানিয়ে দিল—তার শরীরটা বিশেষ খারাপ, নিতান্ত জরুরী কিছু না হলে কেউ যেন না আসে বা তাকে যেন ফোন না করা হয়।

আরামকেদারায় হেলান দিয়ে চুরুটের ধোঁয়ায় অবিন্যস্তভাবে কি সব রচনা ক'রে যাচ্ছিল নিজের মনে, এমন সময়, ভেতরে দেওয়াল ঘড়িতে দু'টা বেজে যাওয়ার পর অনাথ হাট-বাজার করবার একটা মাঝারি গোছের থলি হাতে করে উপস্থিত হোল।

প্রশান্ত উঠে বসল চেয়ারটায়, বলল—"এই যে অনাথ এসে গেছে। কর্তার কি খবর? কাল কই এলে না তো?"

"মোটেই ভালো নয়।"—কাল না আসা সম্বন্ধে কিছু না ব'লে, শুধু ঐটুকু মন্তব্য করে অনাথ পেতল বাঁধানো লাঠিটা পাশে রেখে উবু হ'য়ে সামনে বসল। বলল—"ভালো মোটেই নয়। কথা হচ্ছে, ব্যাধিটা যেখেনে, সেখেনে তো চিকিচ্ছে হচ্ছে না, তা'হলে ভালো যে থাকবেন তা কি ক'রে সেটুকু বুঝিয়ে বলুন আমায়।"

"কেন, ফল হোল না ওষুধে?"—উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"খেলে কে আপনার ওষুধ যে ফল হবে?......'তোরাও দায় পেয়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছিস, বুড়ো বয়েসে আমায় খয়রাতী ওষুধ খাওয়াতে চাস্—সব গেছে, শুধু দেহটা নিয়েও চিতেয় উঠতে দিবিনি।'......এ কথা শোনার পর আর কে ও ওষুধ খেতে বলবে তা ক'ন আমায়। খবর মোটেই ভালো নয়।"

"তা হলে এক কাজ করো। ডাক্তারকে দিয়ে একটা অন্য ওষুধ

লিখিয়ে দিচ্ছি, সস্তা দেখে, নিয়ে যাও হাটের ডিস্‌পেনসারী থেকে।"

"সে ওষুধ এগিয়ে দেবে কে? কার ঘাড়ে হয়তো মাথা আছে সেটা কন্‌?"

"বুঝলাম না।" বিমূঢ়ভাবে বলল প্রশান্ত।

"বোঝা শক্ত। এই যে এতটুকু থেকে খেদমৎগারি করছি লোকটার, আমিই কি বুঝেছি যে দুটো দিন দেখে আপনি বুঝে নেবেন! ওনার কথা হচ্ছে— এই যে একটা মানুষ ওপরপড়া হয়ে উবগার ক'রে গেল, তার ওষুধ না খেয়ে বাজারের ওষুধ আনিয়ে খেলাম— অপমানের কথা নয় তার পক্ষে? একটা বড় আঘাত দেওয়া হবে না? এই হচ্ছে ওনার কথা—পষ্ট। ও ওষুধও খাওয়া হবে না, খয়রাতী, তাতে দেহ অশুদ্ধ হয়ে যাবে: ওষুধ কিনেও আসবে না। উনি বৌ-রাণীমার মতন শুদ্ধু শরীল নিয়ে চিতেয় উঠবেন, মা-মণি কে'দে কে'দে অস্থিচম্মসার হয়ে মরবে, অনাথ আবাগের-বেটার ভাগ্যে জেলে পচে মরা।"

রাগে-বিরক্তিতে মুখটা ঘুরিয়ে নিল অনাথ। প্রশান্ত প্রশ্ন করল—"বৌ-রাণীমা কে ছিলেন, স্বাতি-দেবীর মা?"

হাত দুটো কপালে ঠ্যাকাল অনাথ, বলল—'সতীসাধ্বী পুণ্যবতী মানুষ ছেলেন, এ বনবাসে আসবার মাস দুই পরেই তো দেহ রাখলেন। তারপর থেকেই না মেয়েটার আরও ঐ হাড়ির হাল—নিজেও চাইবে না নিজের দিকে, চাইবার নোকও নেই,—নইলে ঐ নাকি মা-মণির রং? ঐ নাকি চুল? ঐ নাকি ......" আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

একটা কথা বলতে দপ্তটা এসে পড়ে, —বেশ গুছিয়ে একধার থেকে আগা-গোড়া সব শুনবে, সে আশা নেই। কথার ফাঁক খ'ুজে যাচ্ছে প্রশান্ত; ঐ ক'রে ক'রে যতটা জানতে পারে। প্রশ্ন করল—"এলেন কতদিন এখানে এ'রা? ছিলেন কোথায় আগে?"

"এলেন—আশ্বিনে আশ্বিনে দুই বছর গিয়ে এই কটা মাস। এলেন কোথা থেকে, বা কি ক'রে, বা কেন, সেটা......"

দ্বিধাভরেই একটু যেন থেমে যেতে অজ্ঞাতবাসের কথাটা মনে পড়ে গেল প্রশান্তর, বলল—"বারণ থাকে তো না হয় থাক।"

"এই দেখুন, আপনার কাছেও নাকি বারণ থাকবে! ব্যামো হলেও তো ডাক্তারকে বলতে বারণ, কিন্তু তাহলে চলবে? আর চলবে না বলেই তো ডাক্তারবাবুকে নে'যেতে হোল, বলতে হোল সব কথা। আপনাদের তো হবেই বলতে। কেন, যেখেনকার কথা সেখেনে কারুর জানতে বাকি আছে যে অত বড় মানুষটা রাতারাতি......"

"থাকই ওটা আজ অনাথ।"—কেমন একটা কুণ্ঠা এসে গেল টাল-বাহানা করার ভাব লক্ষ্য ক'রে, বলল,—"একদিন তখন সবটুকু শোনা যাবে তোমায় বসিয়ে, আজ আমারও হাতে কাজ রয়েছে, সময় নেই। তবে একটা কথায় মনে বড় খটকা লাগল, যদি মানা না থাকে....."

"কথাটা কি? আপনাকে বলব, তা মানা থাকলে শুনছেই বা কেটা? আপনি একেবারে দেল খোলসা ক'রে জিজ্ঞেস করুন না।"

"ঐ যে তুমি তখন বললে না— তোমায় জেলে পচে মরতে হবে ?"

"হবে না মনে করছেন?"—ন'ড়ে-চড়ে, লাঠিটা আর একটু সরিয়ে রেখে গুছিয়ে বসল অনাথ, বলল,—"তাহলে এটা শুনুন অবধান ক'রে, তারপরেও যদি মনে করেন, দেশে আইন নেই, সি'দ কেটেও ফাঁকি দিয়ে দিব্যি খাঞ্জা খাঁ নবাবের মতন হাওয়া খেয়ে বেড়ান যায়, তাহলে তাই। কিন্তু তা হবে না এটা আপনাকে নিকে দিতে পারি। একবার চাপা দিলেন, দু'বার চাপা দিলেন, তারপর একদিন ধম্মের কল বাতাসে নড়বেই, আপনি চাপা দিতে চান, অন্যের নজরে যাবে পড়ে, দারোগা-সেপাই ডেকে নে'সবে, সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি, সঙ্গে সঙ্গে জেল। বলুন এ কথার নড়চড় আছে?"

"তা তো নেই, কিন্তু এমন গর্হিত কাজ করতেই বা যাবে কেন?"

"না করে উপায় কি বলুন?"

"চুরি করবে—সি'দ-কেটে!"—রহস্য পরিষ্কার হবে কি, আরও যেন গুলিয়েই দিচ্ছে মাথা।

"তার মধ্যে মা-মণিও রয়েছে, দু'-জনের যোগসাজস করেই কাজটা করা তো। সে কথা যদি বলি দারোগাকে, মা-মণিও সাক্ষী দিয়ে বলে, হ্যাঁ, আমারও যোগসাজস ছেল, তাহলে হয়তো খালাস পেয়েও যেতে পারি, কিন্তু ওনার নামটা তো আর পাপ মুখ দে' বের করা চলবে না। চলে তো তাও বলুন।"

স্তম্ভিত হয়ে গেছে প্রশান্ত ভেতরে ভেতরে। এমন একটা অবস্থা, আর একটুও এ প্রসঙ্গ বাড়াতে গেলে কী শুনতে হবে ভেবে পাচ্ছে না। হু'স হোল, চুরুটটা নিভে গেছে। দেশলাই জেললে আবার অগ্নিসংযোগ করতে করতে একটু ভেবে নিল, তারপর এই বিরতি-টুকুতে ওদিকটা যেন ভুলেই গেছে, এইভাবে ধোঁয়ার আড়ালে ভ্রূদুটো কু'চকে বলল—"দ্যাখো! তোমায় কেন যে ডেকেছিলাম ভুলেই গেলাম। শীত-কালের বেলা, দেরিও তো হয়ে যাচ্ছে
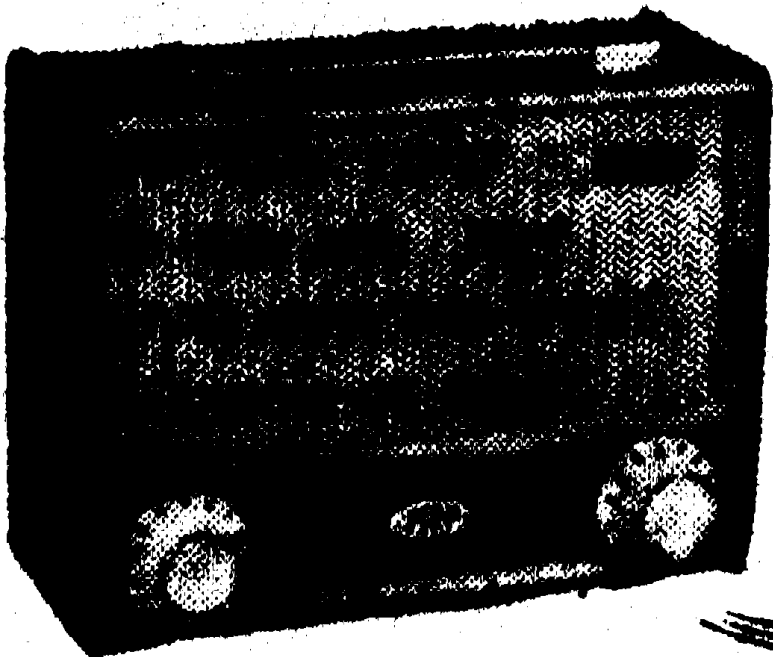
তোমার হাটবাজার করবার। আবার এতটা পথ। তাহলে না হয় আজ......"

"তা হোক দেরি, হাটসুদ্ধ তো কিনে নিতে যাচ্ছিনে।" আবার নড়েচড়ে বসল অনাথ, বলল—"অবিশ্যি হাট-সুদ্ধও কিনেছে এই লাহিড়ী বংশেরই লোক। কর্তার বাবাই। হাটের দখলদারি নিয়ে একসময় তাঁনাদের শালা-ভগ্নীপতের মধ্যে খুব একচোট চলেছিল মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কী নয়? খেয়ালী মানুষ, একদিন কি মনে হোল, পাত্র-মিত্র নিয়ে হাটে গিয়ে উপস্থিত। কর্তা আসবেন, খবরটা খুব চারিয়ে গেছল। এনারাও গাড়ি থেকে নেমে হাটে ঢুকেছেন, পেয়াদা-বরকন্দাজ রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে চলেছে, অন্য দিক থেকে সম্বন্ধী সান্ডেলমশাইও এসে উপস্থিত—তাঁনার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। মাঝামাঝি এসে কাছাকাছি হতেই—শালা-ভগ্নীপতে তো কথাবার্তা নেই ত্যাখন,— ওদিক'কোর এক-জন এদিক'কোর একজনকে রুদ্দেশ করে বললেন—'স্যান্ডেলমশাই জিজ্ঞেস করছেন, আজ লাহিড়ীমশাই স্বয়ং স্বশরীলে হাটের পাহারাদারি করতে এলেন নাকি?' এদিক'কোর মোসায়েব-দের মধ্যে ছিলেন বটকেষ্ট দত্তমশাই, অমন মুখফোড় লোক ভু-ভারতে হয়নি। কথাটা না পড়তে পড়তে বললেন— 'স্যান্ডেলমশাই নাকি কুটুম্বিতের জোরে আপনিই হাটের তোল্লা অন্দায় করতে আসবেন শোনা গেল, তাই কত্তাকে নিজেই আসতে হোল বেত হাতে করে পাহারা দিতে।' ......মুখের মতন জবাব তো একেবারে, 'তোল্লা' হোল মাল্লিককর পেয়াদা হাটের দোকানীদের কাছ থেকে বেসাতির খানিকটা করে যা আদায় করে—আলু, বেগুন, শাক, বেনে-মশলা—যা এল বাজারে, মায় গুগলি-খুঁচোচিংড়ি, শুঁটকি মাছ পর্যন্ত। মুখের মতন জুতো, কত্তা কি বকশিষ কল্পবেন—আবার জানান্ দিয়ে করা চাই তো বকশিষটা—বললেন, আজকের হাটের তাবৎ মাল তিনি কিনে নিয়ে মোসায়েবদের দিয়ে দিলেন; আদ্দেক হিস্যে দত্তমশায়ের, যিনি জবাবটা দিলেন, আদ্দেক বাকি সবাই ভাগাভাগি করে নেবেন। অবিশ্যি মাল কি ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে সবাই?—হিসেব করা হোল, তিনি দামটা দোকানীদের দিয়ে দিলেন. তারা সেটা এনাদের হাতে তুলে দিলে. আবার যেমনকার খরিদ-বিক্রী তেমুনি চলল।

চারদিকে রব উঠে গেল লাহিড়ীমশাই হাট কিনে দান করেছেন, দত্তমশাই স্যান্ডেলমশাইয়ের মুখে কালি মাখিয়ে দেওয়ায়।"

চেয়ে রইল প্রশান্তর মুখের দিকে। একটা কিছু বলা দরকার বলেই প্রশান্ত মন্তব্য করল—"জমিদারি মেজাজ।"

অনাথ বলল—"কতকটা ঠিক, আবার কতকটা ঠিকও নয়। কথাটা হচ্ছে, জমিদার হলেই কি মেজাজ হয়? কেন, জমিদার তো স্যান্ডেলমশাইও ছিলেন, কৈ, খুঁজেপেতে একটা লাগসই পাল্টা জবাব দিতে পারলেন না তো। ট্যাকা রয়েছে, দেওয়ার ইচ্ছে থাকলে হাজারটা রাস্তা ছেল। তা নয়, যেমন ট্যাকা থাকবে, তেমনি আবার এইটেও থাকা চাই তো।"

বুকের মাঝখানটায় ডান হাতটা চেপে কথাটায় টীকা করল অনাথ। প্রশান্ত বলল—"সে কথা একশ'বার।"

সেই ভয়টা লেগে রয়েছে, প্রশ্ন করল—"তাহলে আবার কবে আসছ?"

মনে হোল কথাটা যেন কানেই যায়নি অনাথের। একঝোঁকে মনিবদের পূর্ব গৌরবের কথাটা বলে এসে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বুকটাও জোরে ওঠানামা করছে। একটু চেয়েই রইল স্থিরভাবে, তারপর মুখের দীপ্তি আবার নিভে এল। বলল—"সেই কথাই কইছিলুম। বলি, আজই না হয় তালপুকুরে আর ঘটি ডোবে না, কিন্তু চেরকালটা তো আর এইরকম ছেল না। তা সেই লাহিড়ী বাড়ির বৌ ষ্যাখন বাড়ি থেকে বার হলেন সোয়ামীর হাত
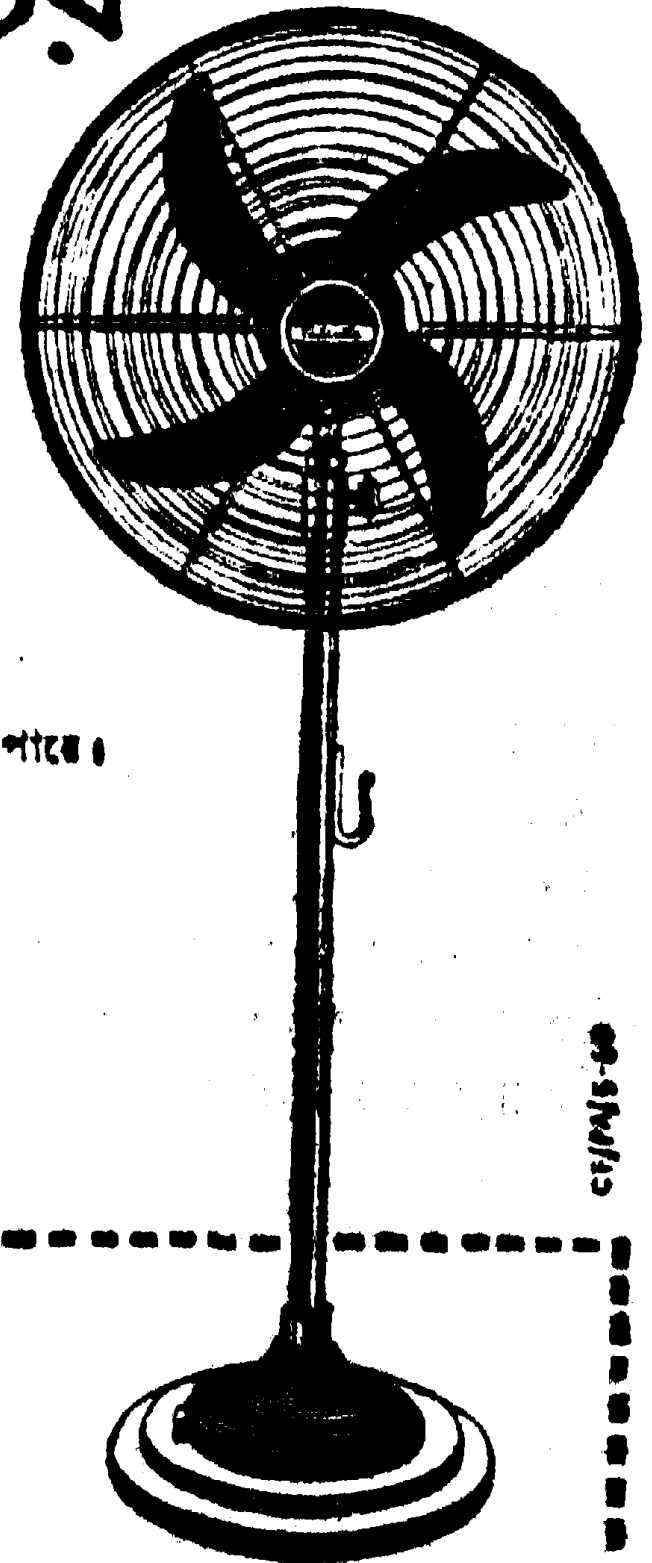
ধরে, ঐ দুধের মেয়ে সঙ্গে নিয়ে, ত্যাখন সম্বল তো মাত্র গায়ে যে ছাল্কা পাঁচখানি গয়না ছেল, তাই।"

"বল কি!"—কথাটা বলে মুখে আর কথাই যোগাল না খানিকক্ষণ; তারপর আবার প্রশ্ন করল,—"অ, আসতেই বা হোল কেন ঘর ছেড়ে সবাইকে?"

"কাহিনীটে তো দীগ্‌ঘ। ইদিকে আপনি আবার বলছেন হাট-বাজার করগে যা। য্যাখন এলেন ত্যাখন অবিশ্যি একদিনের লুটিসেই আসতে হোল, তবে যে ব্যাপারের জন্যে লুটিস সেটা তো একদিনেই হয়নি। সেটার গোড়াপত্তন হোল সেই দিনই যেদিন বড়কত্তা লাহিড়ীমশাই চোখ বুজলেন। চোখ বুজতেই অবিশ্যি সবার আসা পিরথিমিতে— তাঁনার বাবাকেও বুজতে হয়েছিল, আপনিও বুজবেন একদিন, আমাকেও যম রেহাই দেবে না। তবে ও'নারা চোখ বুজবার কালে যেমন উপযুক্ত লোকের হাতে ওনাদের ধন গচ্ছিত রেখে গেলেন, লাহিড়ীমশাই মরে যেতে সিটি তো হতে পেল না। একেবারে অপদার্থ মানুষের হাতেই তো পড়ল জমিদারিটা।"

"কেন, স্বভাবের দোষ-টোষ..."

"আপনি যে হাসালেন।" —ওরূপ বিবরণে যে কথাটা আগেই মনে আসে সেই কথাটাই আরম্ভ করেছিল প্রশান্ত, অনাথ বাধা দিয়ে একটু হেসেই উঠল, বলল— "রাজার ছেলের ও দোষে তো রাজ্য যায় না। যাতে যায়, যাতে গেল, সেই দোষটা ক'ন থেকে ঢুকেই না জেরবার করে দিলে একেবারে। বলি, পুঁথি-কেতাব নিয়ে পড়ে থাকলে কি রাজ্য চালান যায়? অথচ এ'নার সেই রোগ ঢুকল একেবারে সেই ছেলেবেলা থেকে। বড়কত্তা য্যাতদিন বেঁচে ছিলেন ত্যাতদিন না হয় চলল, উনি গতাসু হওয়ার পরও যে সেই সুধু বই আর বই. তাইতেই কাল হোল কিনা। সব ব্যবস্থা গিয়ে পড়ছে কর্মচারীদের হাতে, মাথার ওপর কেউ নেই, তারা নিজের নিজের আখের ক'রে নেবে না তাল বুঝে? আস্তে আস্তে আদায়-পত্র কমে এল, এমন কি লাটের টাকা যোগাতে দু'একখানা মহালও বাঁধা পড়ল, কোন হু'স নেই। হু'স হবে কি; এই সময় মা-মণিরও একটু নেকাপড়া করবার মতন বয়েস হয়ে এয়েচে ইদিকে, উদিক থেকে একেবারে নজর ফিরিয়ে তাঁনাকে নিয়ে পড়লেন। বইয়ের পাট যে লাহিড়ী বাড়িতে ছেল না, তা নয়, এতবড় পুরতন জমিদার বংশ, বইয়ের পাট থাকবে না একেবারে, সে কি কথা! সায়েব বাড়ি থেকে আমদানি করা ভালো ভালো আলমারিতে সোনার জলে বাঁধানো মোটা মোটা বই সব—ইঞ্জিরি, বাংলা, সংস্কেত, চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে। তা দেখুন না লয়ান ভরে কত দেখবেন, কিন্তু সেসব তো কখনও নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে নেমে এসে অঘটন ঘটায় নি। এ'নার সময় তাই হোল।"

ঠাকুর চা নিয়ে আসতে অনাথকেও এককাপ চা দিয়ে যেতে বলল প্রশান্ত। বাইরে গিয়ে সেটুকু একচুমুকে নিঃশেষ করে আবার এসে যথাপূর্ব বসল অনাথ। আরম্ভ করে দিল—"আলমারির বাইরে পিরথিমিটে কি রকম তা এক-খানি বইয়েও জানত না, কত্তার টাইমে এক উঠছে তো এক নামছে, লাইবুড়ির ফরাসে বইয়ের গাদা—মা-মণি বড় হয়ে উঠতে আরও সমারোহ—চাপাই পড়েছেন বইয়ের গাদায় দুজনে। শুধু দুজনেই বা কেন, সারা জমিদারিটাই বলুন না —এই য্যাখন অবস্থা যাচ্ছে, সেই সময় বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন রায়-মশাই এসে উপস্থিত।......আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হবে বৈকি—প্রায় চোদ্দ-পনের বছর পরে।

কত্তার প্রাণের বন্ধু। এর আগে, কত্তা য্যাখন কালেজে পড়ছেন কলকাতায় থেকে, লাহিড়ীমশাই বেঁচে, সেই সময় ও'নার যাতায়াত ছেল। কত্তার যা নাম ও'নার তাই নাম, তাইতে ও'নারা স্যাঙ্গাৎ বলেই নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা চালাতেন, খুব হ্যালায়-গলায় দুজনে, কত্তার মতনই পড়াশোনার ঝোঁক, য্যাখন আসতেন মাসকে মাস থেকে যেতেন। আবার বছর পনের পরে হঠাৎ এসে উপস্থিত।

গোদের ওপর বিষফোঁড়া, উনি এসে এক নতুন ফ্যাচাং তুললেন, ব্যবসা করতে হবে। কলকাতার উদিকে খবর রটেছে, জমিদারি আর রাখবেনা সরকার বাহাদুর, আইন করে কেড়ে নেবে, উদিকপানে য্যাত জমিদার তাঁনারা নাকি জমিদারি বেচে ঐ কম্ম করছে, বাঁচতে চান তো কত্তাকেও তাই করতে হবে আইন হয়ে যাবার আগে। জপাতে লাগালেন ক'দিন ধ'রে। ও'কে আর জপানো কি, জমিদারি কী আচে, কতটা আচে, যায় তো এমনি যায়, কি, ব্যবস্থা করতে যায় এসব বাজে কথা নিয়ে ও'নার তো ভারি মাথাব্যথা। তবে নায়েব-

"গোদের ওপর বিষফোঁড়া...এক নতুন ফ্যাচাং তুললেন, ব্যবসা করতে হবে।"

গোমস্তাদের গরজ ছেল বৈকি, গেলেই তো তাঁনাদের রুজি গেল, তাঁনারা উল্টো-দিকে টানতে লাগল। খবরটা যে সত্যিই ছেল সেটা তো পরে টেরই পাওয়া গেল, তবে ওসব অণ্ডলে যে একটু কানাঘুষো উঠেছিল, এনারাই কিছু নয় কিছু নয় বলে চেপে-চুপে রাখছেল। মোদ্দা কথা, শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল যে নগদ টাকা যা বের করতে পারা যায় তার সঙ্গে ত্যাখনকার মতন একটা ছোট মহাল বেচে যা পাওয়া যায় সেই টাকাটা মিশিয়ে ব্যবসায় নামতে হবে। আপাতত পরীক্ষে হিসেবে। বেশ ক'দিন রইলেন রায়মশাই, আর একটা মহাল গেল, তারপর ট্যাকা-কড়ি গুছিয়ে নিয়ে দুই সাঙ্গাতে কলকাতায় চলে গেলেন। সেই-খেনেই নিজে হতে বুঝেসুঝে দেখবেন সব, সেইখেনেই দলিল-দস্তাবেজ সব তোয়ের হবে।

ব্যবসা ইস্‌টার্ট করে দিয়ে দিন পনের পরে কত্তা আবার লাইবুড়িতে এসে ঢুকলেন মেয়েকে নিয়ে। তাকে ব্যবসা বলব কি একটা রাঘববোয়াল বলব আজ অবধি তো থির করে উঠতে লারলুম ইন্‌জিয়ারবাবু। রায়মশাই মাঝে মাঝে আসেন, ট্যাকা নিয়ে যান, ব্যবসা নাকি হু হু করে চলছে, আরও ফলাও করবার জন্যে আরও পুঁজি দরকার—এই করে করে বছর কয়েকের মধ্যে য্যাখন আর কিছু রইল না বিশেষ, এই সময় শোনা গেল সত্যি আইন হয়ে যাচ্ছে; তারপর গেলও। যা ছেল, সুরকার বাহাদুর সব কেড়েকুড়ে নিলে, কতদিনে কত করে কি সব খেসারৎ দেবে নাকি। তা কি পেলেন, কবে পেলেন, বা কখনও পাবেন কিনা কিছু জানিনে। নফর মানুষ, অতটা তো কিছু বুঝিও না, শুধু দেখছি চারিদিকে যেন লুট পড়ে গেছে, আর অমন যে বোল-বোলাও—হিসেব করে গেলে তিন পুরুষ থেকে তো দেখে আসছি— তা যেন কর্পূরের মতন উবে গেল আস্তে আস্তে।

জিজ্ঞেস করবেন—তা ব্যবসা ফলাও হয়ে উঠেছে, যেমন ইদিকে যাচ্ছে তেমনি আবার ইদিকে আমদানিও তো হচ্ছে। কি জানি ইন্‌জিয়ারবাবু, হলে তো ভালই ছেল। শুনতুমও তো অমুক অমুক জমিদার এই করে নাকি আগে থাকতে সাবধান হয়ে ঘর সামলে নিয়েছে নিজের নিজের। ভালই তো। নিজে বই নিয়ে আছেন, বন্ধু এসে পরামর্শ দিলে, ব্যবসা দিন দিন ফলাও হয়ে উঠছে, মন্দ কি করে বলি? কিন্তু—সে আমি বাইরে কান পেতে থাকতুম ইন্‌জিয়ারবাবু, রায়মশাই য্যাথন এসতো—তা কখনও ট্যাকা গুণতে দেখলুম, কি নোট—খাজাঞ্চিখানায় এক-কালে দেখেছি তো—তা তো পাপ চক্ষুতে পড়ল না। এলেই গুজগুজ, ফুসফুস— তাই থেকেই কান পেতে শুনে যা টের পেতুন তা এই যে, লাভের অংশ এখন নিজেরা না নিয়ে ব্যবসাতেই ঢালা হচ্ছে। উনিও নিচ্ছেন না এক পয়সা, ইনিও না নেন সেইটেই চলতি ব্যবসার পক্ষে নাকি ভালো। আর দেখতুম যাওয়ার আগে কি সব কাগজ-পত্রে দস্তখৎ দিচ্ছেন কত্তা। এসবই

লাইব্রেড়ি ঘরে হোত। ওটা দেউড়ির একটেরেয়. কাজের কথা য্যাখন হোত মা-মণিকে সরিয়ে দেওয়া হোত। দুধের মেয়ে করতই বা কি থেকে তা বলুন।

আজ্ঞে না, ফলাও ব্যবসার ট্যাকা এল ঘরে, উঠল লোহার সিন্দুকে, চম্ম-চক্ষুতে এদিশ্য কখনও দেখলুম না। সেরেস্তা উঠেই গেছে—দেউড়ি করছে খাঁ-খাঁ—ভেতর বাড়িতে গেলুম তো বৌ-রাণীমার মুখ শুকনো। আপন বলতে তো সতীলক্ষ্মী ঐ একাই— তা কি বুঝতেন না বুঝতেন জানিনে, কিন্তু মুখ ফুটে তো সোয়ামীর কথার ওপর কোন কথা বলেন নি কখনও। আত্মীয়-কুটুমের যাওয়া-আসা কমে এয়েছে—সুখের পায়রাই তো সব, কিছু পুষ্যি দেউড়ি আঁকড়ে পড়ে আছে—তা আত্মীয়ই হোক বা পুষ্যিই হোক, কারুর মুখের আগেকার সেই জলুষ নেই— একটা যেন আতঙ্ক, কি হবে! কি হচ্ছে! জলুষ যদি দেখতে হয় তো কত্তার মুখে দেখুন আর মা-মণির মুখে দেখুন।"

ধ'ুয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে শুনছিল প্রশান্ত, একটু চকিত হয়েই ঘুরে চাইল।

অনাথ বলে চলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশেষ করে শেষের দিকে, সব য্যাখন একেবারে ফাঁকা হয়ে এসেছে। আগে উদিকে দুজনেই ছিলেন নিব্বিকার-নিব্বিরোধ, কত্তা স্বয়ং ভোলানাথ মহাদেব, মা-মণি তাঁর কন্যে সাক্ষেৎ সরস্বতী-ঠাকরুণ— নিজেদের তালেই আছেন, দুনিয়াটার কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে কোন হু'স নেই। শেষের দিকে, ঐ যে বললুম, য্যাখন একটার গায়ে একটা সব্বনাশ এসে পড়ে অবস্থা একেবারে কাহিল, সেই সময় দেখা গেল মানুষ দুটো একেবারে মাটির পুতুল নয় নেহাৎ, সাড় আছে। জিজ্ঞেস করবেন ব্যাপারখানা কি? ব্যাপার আর কিছু নয়, মা-মণি পাশের পড়া পড়ছেল, বাপে-বেটিতে তাই নিয়ে এতদিন মজ-গুল ছেল, সেই পাশ দিয়েছে। তা নাকি আবার এমন যে—মা-মণি তো বাড়িতেই বাপের কাছে পড়েছেন, ইস্কুলে পড়েও সে রকম পাশ কেউ দিতে পারে না। তা সে দেখবার মত ইন্‌জিয়ারবাবু, কটা দিন সেই কী হাসি যে দেখেছিলুম, বিশেষ করে মা-মণির মুখে, তা পুব্বেও কখনও দেখিনি, আর পরেও কখনও..."

বলতে বলতে মুখখানা আলো হয়ে উঠেছিল, যেন সেদিনকার আলোতেই, হঠাৎ যেন নিভে গেল। অনাথ বলল— "আর হাসি দেখলুমই বা কবে বলুন। মা-মণির মুখে বলতে গেলে সেই তো শেষ হাসি। কলকাতায় এসে এর পরেও তো পাশ দিলে একটা, এবার বাড়িতে কত্তামশাই, বাইরে কলেজ, এবার তো ফাস্টো হয়েই পাশ দিলে— দেখলুম তো সিদিনকের মুখও।...... কত্তার অবিশ্যি সেইভাব— প্রেথম পাশের বেলায় কত্তার হাতের একটা আংটী গেছল, এবার আর একটা আংটী বেচে দান-খয়রাতও হোল, কিন্তু মা-মণি তো আর সে মা-মণি নেই। প্রেথম পাশ দেবার মতন না হলেও আত্মীয়-কুটুম আর দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব ডেকে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছেল। সেই হিড়িকেই সমস্ত দিনটা এক রকম গেল কেটে। সন্ধ্যের পর সবাই চলে গিয়ে বাড়ি খালি হয়ে যেতে কি একটা দরকারে ওনাকে খু'জতে গিয়ে দেখি ছাতের রেলিঙের ধারে উদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ গিয়ে পেছনে দাঁড়িয়েছি তো, ডাক দিতে— ওমা এবে কাঁদছে!...... 'বলি, কান্না কিসের মা-মণি, এমন সুখের দিন'—বলতে না বলতেই উল্টে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কচি মেয়ের মতন ফুলে ফুলে......"

অনাথ হঠাৎ মুখটা দুটো হাতে ঢেকে একেবারে হাউ হাউ করে কে'দে উঠল। কে'দেই চলল খানিকটা, মাঝে মাঝে বুকের ভেতর থেকে—'ওফ্-ওফ্' শব্দ আর 'কী দেখতে বে'চে আছি—কেন গেলুম না আগে?' একটু সামলে নেওয়ার পরও চুপ ক'রে বসেই রইল খানিকক্ষণ, তারপর চোখদুটো গামছার খু'টে ভালো ক'রে মুছে নিয়ে বলল— "কথাটা বুঝলেন না? অবিশ্যি কত-দিনই বা বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় এসেছে, বছর দুই মাত্তোর; কিন্তু এই বছর দুইয়ে অনেক কিছু যে দেখলে, দুধের মেয়ে যে দেখে দেখে বুড়ি হয়ে গেল ইন্‌জিয়ার বাবু। জানে তো এ দান খয়রাৎ আর ভোজের রিতিহাস—এ মা-সরস্বতীকে ঘরে আনতে সাতপুরুষের মা-লক্ষ্মীকে বৈকি ক'রে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করতে হোল, এটাতো আর বুঝতে বাকি নেই ত্যাখন। আগের পাশের দিনের মতন নেচে-কু'দে বেড়াবে কি, চোখের জলে ছাদ ভেজাচ্ছে ভর্-সাঁঝের বেলায়। সে বুকে জড়িয়ে, পিঠে হাত বুলিয়ে কি থামানো...... "

"হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল,—একটা কথা তুমি ছেড়ে এসেছ অনাথ।—তখন কি যেন বলতে যাচ্ছিলে তুমি আর তোমার মা-মণি—দুজনে যোগ-সাজস ক'রে..."

—হঠাৎই মাঝখান থেকে কেন যে প্রশ্নটা ক'রে বসল প্রশান্ত তা সেই জানে। অনাথ বলল—"সেই কথাতেই তো আসছি ইন্‌জিয়ার বাবু, ওদিক থেকে একটু গোড়া বে'ধে না নিয়ে এলে কিসের ওপর কি হোল সঠিক বুঝতে লারবেন তো। এবার আবার সেই প্রেথম পাশের দিনের কথা বললেই সব হদিস পেয়ে যাবেন। দুটো পাশ দিতে হাতের আর একটা আংটী বেচে খাওয়া-দাওয়া দান-ধ্যান হোল তো, প্রেথম পাশের সময় যেটা যায় সেটা ছেল ভালো হীরের আংটী একটা। আর ত্যাখন দেশেরই বাড়ি, সামান্য ইদিক-উদিক কিছু রয়েছেও—ঘটাটা বেশ রাজসুয় গোছেরই হয়েছেল উরই মধ্যে; লাহিড়ী বাড়ির মেয়ে পাশ দিলে যেমন হওয়া উচিত—অবস্থা ছাড়িয়েও। তবে লাহিড়ী বাড়ির সেইটেই শেষ কাজও।...আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। তালপুকুরে তখন জল শুকিয়ে এসে তলার পাঁক দেখা দিয়েছে। বাড়িটি ছাড়া আর কিছু নেই, তারও মেরামতের অভাবে আর ছিরি-ছাঁদ নেই কিছু। সবার মনটা খাঁ-খাঁ করছে সব্বদা। কর্তারও বৈকি, য্যাতই কেন আপন-ভোলা মহাদেব হোন, কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, পড়ছেই তা চোখে। যজ্ঞি-টুকু হয়ে যেতে আরও যেন মনে হোল জায়গাটা গিলতে আসছে। এই সময় ঠিক জ্ঞক বুঝে একদিন রায়মশাই

কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত। যজ্ঞিতে নেমতন্ন গেছল বইকি, যাবে না?—একেবারে কত্তার ডান হাত কী রকম বুদ্ধি খাটিয়ে সামলে রেখেছেন উদিকটা! নেমতন্ন ঠিকই গেছল, তবে ঠিক সেই সময়টা নাকি কাজের খুব বেশি চাপ পড়ে গেছে, আসতে পারেন নি। ক'দিন বাদ দিয়ে এলেন।

এসে দেখেশুনে সলা দিলেন—এ ছিবড়ে নিয়ে পড়ে থেকে আর কি হবে, কলকাতায় চলে আসুন। সেখেনে ব'সে নিজের ফলাও কারবার নিজের চোখে দেখাশোনা করতে পারবেন; ইদিকে মেয়েটা ভালো, তাকে পছন্দ মতন ভালো কালেজে দিতে পারবেন। কথাটা সংগত, কত্তা রাজি হলেন, কবেই বা গররাজি হয়েছেন ও'নার কোন্ কথায়? বৌ-রাণীমা তো এ গাঁ, এ দেউড়ি ছেড়ে বনে গিয়ে থাকতে পেলেও বত্তে যান। তাই হোলও।"

অনাথ হঠাৎ আবার ছেড়ে দিয়ে একটা অদ্ভূত দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল প্রশান্তর মুখের দিকে। প্রশান্ত তেমনি বাইরের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলে শুনছিল, বিরতিটুকু বিলম্বিত মনে হওয়ায় ঘুরে চেয়ে বলল— "তারপর?......ও! কিছু বলবে আমায়?"

আরও যেন কেমনধারা হয়ে গেল অনাথের মুখটা। একটানা দ্রুতই বলে আসছিল, কণ্ঠের লয় বদলে দিয়ে বলল —"হ্যাঁ, ইন্‌জিয়ারবাবু বলব একটা কথা। মা-মণি সুবিধে দেখে আপনাকে বলে দিতে বলেছেন, স্মরণ ছেল না, আচমকা মনে পড়ে গেল। কথাটা হচ্ছে —ইয়ে—মানে, আপনি যিদিন পেরথমে আমাদের বাড়ি এসেন, সেই পেল্লায় ঝড়-বাদলের রেতে— কত্তা—ইয়ে—মানে, একটু যেন—কী যে বলি......"

"হ্যাঁ অনাথ, মনে হয়েছিল যেন—যেন পছন্দ করেননি তিনি আমাদের আসাটা......"

—কথাটা মুখ দিয়ে বের করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না বলেই প্রশান্ত নরম করে বলে দিতে অনাথ একটু এগিয়ে ওর পাদুটো চেপে ধরল, কাতরস্বরে বলল—"ওটুকু ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে ভুলে যেতে হবে ইন্‌জিয়ারবাবু, মা-মণি ব্যাগাত্তা করে বলেছে যেতেই হবে ভুলে। দেবতা-মানুষ কত্তা—সে আপনি দু'দিন যাওয়া-আসা করলেই"—

"ও কি করছ অনাথ, ছিঃ!" ঝুঁকে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল প্রশান্ত, বলল—"সেটুকু কি আমায় যাওয়া-আসা ক'রে তবে বুঝতে হবে? কেন, সেদিনই কি টের পাইনি? দেখলুম কোন কারণে —হয়তো ওরকম ঝড়-বৃষ্টির জন্যেই—একা মানুষ—মেয়ে সঙ্গে......"

"ঐ ঝড়-বৃষ্টিই ইনজিয়ারবাবু, আর কিছু নয়। ঐ রকম পেল্লায় ঝড়-বিষ্টি —তা এমনি আপন মনে হয়ে যাক না, গেরাহ্যি নেই, গুছিয়ে-গাছিয়ে বরং আরও চাড় ক'রে মা-মণিকে নিয়ে পড়াতে বসেন—ছিষ্টি রসাতলে যাক না কেন, গেরাহ্যি নেই—কিন্তু তার মধ্যে কেউ যদি এল-গেল—আজ্ঞে হ্যাঁ, এলেও আবার গেলেও—তো আর মাথার ঠিক থাকে না। এমনি তো তার কারণ হয়েছেল কিনা। পেরথম পাশের যজ্ঞির ক'দিন পরে সেবারে যে রায়মশাই এল, ঠিক সিদিনকার মতন ঝড়-বাদলের দিন —বন্ধুই, কিন্তু শেষ আঘাতটা দিতে শত্তুরই হয়ে তো ঢুকল ঘরে—তারপর যিদিন বেরুলেন শেষ বারের মতন সাত-পুরুষের ভিটে ছেড়ে সিদিনও—ভালোই ছেল আকাশ, হঠাৎ ঈশেন কোণ থেকে মেঘ এসে কী রসাতল কাণ্ড! বেরুবার ইচ্ছে ছেল না কত্তার—সে কুক্ষণে না বেরুলে হয়তো উল্টেও যেত পাল্লা—কিন্তু রায়মশাই জিদ করে বসল—কে জানে জাপিয়ে-জাপিয়ে ঠিক করে এনেছে, আবার যদি বদলে যায় মন। বিষ্টি নয় ইন্‌জিয়ারবাবু, ওপর থেকে কত পুরুষের তানারা যেন ঘড়া-ঘড়া চোখের জল ফেলছে—তারই মধ্যে উফ্, তারই মধ্যে ইন্‌জিয়ারবাবু, বৌ-রাণীমার আর মা-মণির হাত ধ'রে......"

আবার ভেঙেগ পড়ল অনাথ। প্রশান্তও অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, একটু চুপ করে থাকার পর বলল—"স্থির হও অনাথ, কেঁদে তো ফল নেই। তোমার মা-মণিকে বোল, আমি সে কথা মোটেই ধ'রে বসে নেই, আর সেই রাতেই তো দেখলাম, ও'রা কত ভালো, কত বড়। চুপ করো তুমি।" [ক্রমশঃ]

রঙ-বেরঙ

বিশ্ববারা

।। নাক নিয়ে নাকাল ।।

নাক নিয়ে নাকাল হবার সত্যিই কিছু আছে কি?

সিরাণো ডি বার্জেরা-র নাটুকে নাক নয়, নাকেশ্বরী ভূতিনীর সর্বনেশে নাক নয়, এমন কি বিয়ের বাজারে বাতিল খাঁদা নাক-ও নয়। নেহাৎই আমার আপনার নাক কি সুবিধে পেলে কম নাজেহাল করে ছাড়ে? শীতকালের ধোঁয়া-ধুলো বা বর্ষাকালের জলকাদা পেলেই নাক মশাই সাইনাস আমদানী করে নিজের অস্তিত্ব জানান দেন।

সাইনাসের ভুক্তভোগীরা বলবেন ও রোগের চিকিৎসা নেই।

দর্শনী না ফেললে যে সব ডাক্তাররা রোগীর মুখ দেখতেও রাজী নন, তাঁরাও বিনামূল্যে সাইনাস রোগীদের মহামূল্যে সব উপদেশ দিয়ে থাকেন। গরম সেঁক লাগান, অন্ধকারে শুয়ে থাকুন, ড্রপ লাগান, নতুন স্প্রে ব্যবহার করে দেখেছেন কি?

শেষ অবধি বলে বসবেন—যান মশাই অপারেশন করিয়ে আসুন। নইলে ওই মাথাধরা, চোখজ্বালা, গলা খুসখুস, ঘাড় ব্যথার হাত থেকে নিস্তার নেই। কিন্তু আজকাল ডাক্তারেরাই বলছেন, ধৈর্য ধরুন। সার্জনের চকচকে ছুরি কাঁচির দয়ার ওপর নাকটিকে সমর্পণ করবার আগে নতুন নতুন চিকিৎসা হাতড়ে দেখুন।

বছরের পর বছর যাঁরা সাইনাস-এ কষ্ট পান, হঠাৎ যদি রোগীর বন্ধু সেজে তাঁদের কেউ বলে বসেন—ওর থেকে ব্রেণ টিউমার দাঁড়াবে মশাই, কত দেখলাম! তাঁরা হয়তো তখন সোজা একজন ই, এন, টি-র কাছে ছুটবেন। বলবেন—দরকার নেই ভেবেচিন্তে। দিন ছুরি চালিয়ে।

তবু ডাক্তাররা ভেবেছেন। ভেবে, চিন্তা করে তাঁরা সাইনাসাইটিসকে কাবু করবার নানা রকম পথ হাতড়িয়েছেন।

আমাদের নাকের হাড়ের দুই পাশে, চোখের ওপরে, গালের হাড়ে সবশুদ্ধ আটটি সাইনাস ক্যাভিটি আছে। নাক দিয়ে নিশ্বাস টেনে ফুসফুসে পেণছে যাবার আগে এই গর্তগুলোতে ঘুরে-ফিরে তবে বাতাস ঠিক ঠিকানায় পেণছয়।

সাইনাস ক্যাভিটির নাকি কোন প্রয়োজনই নেই। ওয়াশিংটন য়ুনি-ভার্সিটির ডক্টর প্রোত্রউজ প্রমুখ চিকিৎসকরা বলেন, আমাদের শরীরে সাইনাস প্রমুখ আরো দুটি একটি উপসর্গ আছে, যা না থাকলেও চলতো। ওরা একেবারেই ফালতু। ফালতু যখন, তখন ফালতুর মতো চুপচাপ থাকলেই হয়।

তা হয় না। নাকের ভেতর এবং সাইনাস-এর ক্যাভিটি একই রকম শৈল্মিক ঝিল্লী দিয়ে ঢাকা। এবং এই মিহি স্যাঁৎসেঁতে পর্দাটি আসলে একটি ছোটখাটো এয়ারকণ্ডিশনার। নিশ্বাসের বাতাস থেকে ধুলো এবং জীবাণু টেনে নিয়ে বাতাসটিকে শুদ্ধ করে ফুসফুসে পাঠিয়ে দেওয়াই তার কাজ।

ঠাণ্ডা, এ্যালার্জি, ধোঁয়া, ধুলো, এমন কি, আবহাওয়ার পরিবর্তন, এর যে কোন কারণে নাকের ভেতরের পর্দাটি যেই স্ফীত হয়ে ওঠে, তখনই সাইনাসে গোলমাল সুরু হয়। নাকের প্যাসেজ বন্ধ হলেই সাইনাসে ময়লা জমে, ব্যাকটিরিয়া জন্মাতে সুরু করে।

জোসেফ কিনকেভ প্রমুখ ডাক্তার-দের মতে বড় বড় শহর হচ্ছে নাকের এই সর্বনেশে অসুখটির উপযুক্ত ক্ষেত্র। শহরের ধোঁয়া, ধুলো, বন্ধ বাতাস সর্বদা নাকের সঙ্গে লড়াই করবার ফিকির খুঁজছে। কখনো কোনমতে একবার প্যাসেজটি বন্ধ হোক, সঙ্গে সঙ্গে সাইনাসাইটিস দেখা দেবে। ধোঁয়া এবং কুয়াশা একসঙ্গে বাতাসকে ভারী করলে ত' কথাই নেই। এই সেদিনই নিউ-ইয়র্কে ধোঁয়া এবং কুয়াশার উপদ্রবে ট্রাফিক পুলিশরা দলে দলে সাইনাসে কাত হয়ে পড়েছিল।

তাঁরা বলেন, শহরের বাতাস চলা-চল যত অবাধ হবে, সাইনাসের উপদ্রবও ততই কমবে।

তাঁরা বলেন, অন্যান্য অসুখ-বিসুখের যেমন ফলপ্রদ ওষুধ বেরিয়েছে, সাইনাসের তেমন কোন চিকিৎসা নেই। তবে এ্যান্টিবায়োটিকের যুগে সাইনাসও অনেকটা কাবু, দুর্বল।

তাঁরা বলেন, সাইনাসকে ঘরোয়া সর্দির মতো অবহেলা করা ঠিক নয়, কেননা সাইনাস বেশ চেপে ধরলে শ্বাস-প্রণালীর অন্যান্য অসুখ দেখা দিয়ে রোগীর জীবনান্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

তাঁদের আরো অভিযোগ আছে। নাককে নাকি আমরা অবহেলা করি। চুল, চোখ, ঠোঁট, দাঁত এবং কান এদের সুন্দর দেখাবার জন্যে কত রকম ফন্দী-ফিকির খুঁজি। কিন্তু নাক! বেচারী নাক-এর জন্যে কোন সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ চিন্তা করেন না।

প্রেম এবং সাহিত্যে নাকের কোন ঠাঁই নেই। চুল এবং চোখ ত' বটেই, কান সম্পর্কেও কবিদের উচ্ছ্বাসের কমতি নেই। ঝিনুকের গোলাপী বুকের মতো সুন্দর কান, এ সদৃশ উপমা বিরল নয়। কিন্তু নাক নিয়ে কেউ এক লাইন কবিতা লিখেছেন?

এক সময় কোন কোন পার্বত্য জাতির মধ্যে প্রণয় নিবেদনের ভাষাই ছিল পরস্পরের নাক শোঁকা।

তাদের খবর আর কেউ রাখে না। শাস্তি পাবার কাজ করলে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের নাক কেটে নেওয়া হতো। এক সময় এক জবরদস্ত সাহেব বিহারের গ্রামে ক্যাম্প ফেলেছিলেন। একটি মেয়েকে নিয়ে তার স্বামী উপস্থিত। মেয়েটিকে মিথ্যে সন্দেহ করে তার নাক কেটে নিয়েছে গ্রামের পঞ্চায়েত। এখন জানা যাচ্ছে মেয়েটির কোন দোষ নেই। অতএব সাহেব যেন নাকটি সেলাই করে দেন।

সাহেবের ডাক্তারী বিদ্যেও আসত। তিনি মেয়েটিকে শুইয়ে সেলাই করবার তোড়জোড় করছেন, এমন সময় একটা কাক এসে নাক নিয়ে উড়ে চলে গেল। হতাশহৃদয় স্বামী মশাই খাঁদা বৌ-কে নিয়েই বাড়ী ফিরলেন।

অবশ্য শূর্পনখার গল্প থাকতে পুরনো নথিপত্র ঘাঁটবার দরকার কি! এখন ত' আর সে শাস্তি দেওয়া চলে না।

পরের কথা শুনতে যাঁরা ভাল-বাসেন, সেই সব অধিক কৌতূহলীদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্য জানাতে হলে ইংরেজীতে বলা হয় 'Nosey Parker'। হতভাগ্য নাক!

এখন নাককে আমরা একটি মাত্র কাজ দিয়েছি। খত দেওয়া। কাজে না হোক, কথায়ও নাকে খত দেওয়া উচিত আমরা বলে থাকি। এবং নাকের পক্ষে সেটা যথেষ্ট অপমানজনক। সেই জন্যেই, নাক সর্বদা ফিকির খুঁজছে। কেমন করে মানুষকে নাকাল করতে পারে। সেই জন্যেই শীতকাল আর বর্ষাকালের ওপর তার পক্ষপাতিত্ব।

এবং নাককে যাঁরা অবহেলা করেন, তাঁদের জব্দ করবার জন্যে—না, কোন অসাধারণ নাক নয়, তাঁদের নিজস্ব অতি সাধারণ নাকই তাঁদের নাকাল করে নাকানি-চোবানি খাওয়াতে পারে।

সেই জন্যে ডাক্তাররা বলছেন, নাককে অবহেলা করা ঠিক নয়। যিনি সাধুজনের মত অগ্রাহ্য করবেন, নাক-ই তাঁকে নাকাল করবে।

একটি আশ্চর্য ফুল

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নটরাজ তন্ময় হয়ে বসেছিল। সামনে জলচৌকির ওপর মোটা কাগজ একখানা। শুধু কালো রঙে একটি ছবি শেষ করতে করতেই অন্ধকার হয়ে গেল পার্টিশান-করা ঘরের এ ধারটায়। ছোট জানালা দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি এসে গায়ে লাগছিল। ওর কিন্তু আর কোন খেয়ালই ছিল না। একটু নড়ে বসতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। চোখ দুটো আপনা-আপনি বুজে এলো। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল নানা রঙের নানা ভাব। ভাবতে হয় না। মনের ওপর আপনা-আপনি রঙের পর রঙ আসে, ছবির পর ছবি। ইচ্ছে করেও মনের এই অবস্থাটা এড়াতে পারে না।

একটি ফুল দেখছিল নটরাজ। বড় বড় দুটি মাত্র পাপড়ি। গাঢ় লাল রঙের শুকনো একটা গাছের ছোট ডাল থেকে ফুটেছে, উজ্জ্বল হলুদ রঙের দুটি পাপড়ি। একটি আশ্চর্য ফুল। দেখতে দেখতে ছবিটার অর্ধেকটা কেটে গেল। বাকী অর্ধেকটায় ফুটে উঠলো নীল রঙের একটি লম্বা মুখ, তার বড় বড় চোখদুটি উজ্জ্বল, হলুদ পাপড়ি দুটির মত।

অদ্ভুত আশ্চর্য সব রঙ আর ছবি মনের ওপরে ভেসে ওঠে। এমনি একটা অবস্থা মাঝে মাঝেই ওর হয়। ওর তখন নিজের সত্তা বলে আর কিছু প্রায় থাকে না। অনেক গভীর কোথায় একটা স্পন্দন থাকে মাত্র। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে সম্বিত ফিরে আসে।

আজও ঠিক এমনি অবস্থাতে কতক্ষণ ছিল ওর মনে নেই। বাইরের বোধটা যখন ওর এলো তখন ও শুনতে পেলো সুনন্দার গলা।

—কি গো, ঘরে আছো?

নটরাজ ধীরে ধীরে তুলিটা হাত থেকে নামাল। পার্টিশনের ওপাশ থেকে ঘরের ভেতরে এসে বললে,—কখন এলে?

সুনন্দার স্বর বিরক্তিতে ভরা। —বাঃ! পাঁচ মিনিট হয়ে গেল দাঁড়িয়ে আছি।

নটরাজ শুধু বললে,—বোস।

বলে নিজে ঘরের কোণে পাতা নীচু চৌকিটার ওপর বসল। সুনন্দাও এসে বসল। ঘরটা বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। সুনন্দা বললে,—কি হোল, আলো জ্বালো?

—আলো!—বলে নটরাজ এদিক ওদিক হাতড়ে বললে,—দেশলাইটা—।

সুনন্দা আরও বিরক্ত হয়ে বললে,—নেই তো! আচ্ছা, এতো বলি, ইলেক-ট্রিকের কনেকশনটা নিলেই হয়, তা কিছুতেই নেবে না। আপত্তিটা কি শুনি?

নটরাজ একটু চুপ করে থাকে। তারপর শান্ত স্বরে বলে,—রাগ কোর না। মানে, কি জান, ও আলোর ঝাঁজটা এত বেশী, যেন চেঁচাচ্ছে মনে হয়।

—আলো চেঁচায়!—সুনন্দা হেসে ফেলে।

নটরাজ অপ্রস্তুত হয়ে বলে,—মানে ঠিক বোঝাতে পাচ্ছি না। মোমবাতির আলোটা বেশ ঠাণ্ডা, নরম। ওতে ছবির রঙটা বেশ বোঝা যায়। ছবির মেজাজটা বেশ ঠাণ্ডা মনে হয়।

সুনন্দা খিল খিল করে হেসে ওঠে। —ছবির মেজাজ! নাঃ! তোমার ক্রমেই যা উন্নতি হচ্ছে দেখছি। আর কিছুকাল তোমার সঙ্গে থাকলে আমারই মাথাটা যাবে।

নটরাজ এ কথার কোন উত্তরই দেয় না। উঠে বাইরে বেরিয়ে যায়। বোধহয় বাইরের অন্য কোন ভাড়াটের কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে আসে। ঘরে এসে আলো জ্বালে। মোমবাতি।

সুনন্দা মুখখানা নীচু করে বসে ছিল। তাকায় নটরাজ। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মুখ সুনন্দার। সামান্য বৃষ্টিতে গুমট গরমে ঘেমে উঠেছে মুখখানি। একটু চাপা নাকের দুপাশে চোখের কোল নীলাভ। একটি যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। নট-রাজের চোখে ছবি ভেসে ওঠে। অপরূপ এক যন্ত্রণা-ক্লান্ত গাঢ় খয়েরী মুখ। উজ্জ্বল তামার মত চোখে উত্তেজনা আর লালসার জ্বালা। কামারশালের হাপরের মত হাঁপায়, তবু আগুন বাড়িয়ে তোলে।

নটরাজ নিষ্পলক চোখে দেখছে।

চোখ তোলে সুনন্দা।—আর তো চলে না নটরাজ!

এর চেয়ে যদি সুনন্দা কেঁদে ফেলত, তাও ভাল ছিল। নটরাজ তেমনি তাকিয়ে থাকে।

সুনন্দা বলে,—একেবারে বাঁচতে ইচ্ছে হয় না আর। ছোট ভাইটা আজ বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বাবা মারা যাবার পর মায়ের তো সবই গেছে। দু গাছা রুলি মাত্র ছিল, সেই দুটো নিয়ে পালিয়েছে।

নটরাজ বলে,—কোথায় গেছে?

—বোধহয় বম্বে। কিছুদিন ধরেই বলছিল, বম্বে গিয়ে সিনেমায় নামব। কতকগুলো খারাপ বন্ধু জুটেছিল। ক্লাস এইটে দুবার ফেল করলে! আমি আর কি করব বলো তো নটরাজ?

হতাশায় চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে আসে ওর।

নটরাজ চুপ করে বসে থাকে।

সুনন্দা একটা নিশ্বাস ফেলে বলে,—মা কাঁদছেন, কিন্তু দোষটা মায়েরই বেশী। মা-ই ওকে আদর দিয়ে দিয়ে এই অবস্থায় এনেছেন। বাড়িতে আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে হয় না।

নটরাজ নীরব।

সুনন্দাই বলে,—সকালের টিউ-শানিটাও এ মাস থেকে গেল। কি করে যে চলবে জানি না।

সুনন্দার মুখখানা ঘেমে উঠেছে আবার। শাড়ির আঁচলে কপাল মুছে তাকায় নটরাজের দিকে।

নটরাজ ধীরে ধীরে বলে,—আজ একটি ছবি এ'কেছি। দেখবে?

—ছবির আমি কিছু বুঝি না। চলো, দেখি।

পার্টিশনের ওপারে গিয়ে আর একটি মোমবাতি জ্বালে নটরাজ। ছবিটা তুলে ওর হাতে দেয়।

সুনন্দা ভ্রূ কুঁচকে ছবিটা কিছুক্ষণ দেখে বলে,—দুটো বাঁদর শুয়ে আছে, মাথার কাছে ওটা কি? কি যে আঁকো, মাথামুন্ডু কিছু বোঝবার উপায় নেই।

নটরাজ চুপ করে থাকে। আজ দুপুরে ও দেখেছিল ভারী সুন্দর একটি ছবি রাস্তার ফুটপাথে। দুটি ভিখিরীর মেয়ে শুয়ে আছে ফুটপাথে। তাদের মাথার কাছে মুখকাটা রাস্তায় ফেলে দেয়া দুটি ডাব। বোধহয় ভেবেছিল ডাবের ভেতরের পাতলা শাঁসটুকু খেতে পাবে ওরা। খাবার সময় আর হয় নি, তার আগেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অপূর্ব একটি ছবি। নটরাজ অনেকক্ষণ ধরে দেখলো, জানলো, উপলব্ধি করলো একটি কঠোর কারুণ্যের ছবি।

সেইটিই এ'কেছে আজ।

সুনন্দা বলে,—যা দ্যাখো, তাই আঁকো না কেন?

নটরাজ গম্ভীর হয়ে বলে,—যা শুধু দেখি, তাই আঁকি না। যা জানি, তাই আঁকি।

—জানা আর দেখায় তফাতটা কি?

নটরাজ এবার একটু হাসে।—তফাত অনেক। তুমি বুঝবে না।

সুনন্দা হেসে ওর চুলগুলো নেড়ে দেয়, বলে,—অমনি রাগ হোল তো! থাক্ বাবু, আমার বোঝবার দরকার নেই। তোমার ছবি, তুমি একা বুঝলেই হবে।

নটরাজ ছবিটা রেখে চুপ করে বসে থাকে।

সুনন্দাও চুপ করে বসে থাকে। সময় কাটে। অন্ধকার ঘরে মোমবাতিটা অর্ধেকের ওপর পুড়ে যায়।

এক সময় সুনন্দা একটা নিশ্বাস ফেলে বলে,—যাই। বাড়ি যেতে আর ইচ্ছে হয় না!

নটরাজ ধীরে ধীরে বলে,—এখানেই থাকো না।

সুনন্দা তাকায়। গম্ভীর হয়ে বলে, —তোমার কাণ্ডজ্ঞানও নেই। তোমার এখানে রাত্তিরে থাকার অর্থটা জানো? কাল সকালে মুখ দেখাতে পারব?

—কেন পারবে না?

—তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। তোমাকে নিয়ে হয়েছে আরেক বিপদ!

—তবে আসো কেন?

সুনন্দা নটরাজের চোখের ওপর চোখ রাখে। ঠাণ্ডা শান্ত দুটি চোখ নটরাজের। ও আস্তে আস্তে যেন আপন-মনেই বলে,—একটু শান্তি পাই, তাই আসি।

নটরাজ চুপ করে থাকে।

সুনন্দা ওঠবার আগে বলে,—একটা চাকরির খোঁজ দিতে পারো?

নটরাজ বলে,—চাকরি করবে? তা' তাপসবাবুকে বলে দেখতে পারি।

তাপসবাবু!—সুনন্দার ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে,—ওই যে মোটা মত ভদ্দর-লোক তোমার কাছে আসে। মাঝে মাঝে তোমার ছবি কিনে নিয়ে যায়?

—হ্যাঁ, ওর তো অনেক ব্যবসা আছে বলে শুনি।

সুনন্দা তাকে দেখেছে। তাপস মজুমদার। মোটা-সোটা ভদ্রলোক। হাঁ-টা মস্ত বড়। চাকার মত মুখ। প্রচুর পয়সা। ছবি কেনবার ঝোঁক আছে, সেটা আধুনিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসবার একটা চেষ্টা মাত্র। তার ভেতরে অন্য চেষ্টাও আছে। সুনন্দার সঙ্গে সেধে দু একবার সে আলাপও করেছিল। এই ঘরেই। নিমন্ত্রণ করেছিল, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিলো। সুনন্দা আমল দেয় নি।

সেই তাপস মজুমদার!

সুনন্দা বলে,—লোকটা ভাল নয়।

—হতে পারে। কিন্তু টাকা আছে। তুমি টাকা চাও তো?

সুনন্দা যে টাকা চায়, এ কথা অস্বীকার করতে পারে না।

ঘুরিয়ে বলে,—তুমি যদি কমার্শিয়াল আর্ট রপ্ত করতে, তবে কি আমার এ অবস্থা হোত।

নটরাজ নিজের চুলে আঙুল বুলিয়ে একটু হাসে।—তবে আমাকে বিয়ে করে ফেলতে পারতে! কিন্তু কি জান, আর্ট যে কি করে কমার্শিয়াল হয়, এ আমি আজও বুঝি না। মনে হয়, ওই কথাটার ভেতরেই ভুল রয়েছে, যেমন সোনার পাথর-বাটি।

সুনন্দা হেসে ফেলে,—ধন্য মাথা তোমার। সব লোক ভুল বলছে, তুমিই ঠিক বলছ! লোকে পাগল বলবে না তো কি বলবে তোমায়?

নটরাজ এ কথার জবাব দেয় না।

—চললুম।—সুনন্দা বেরিয়ে যায়।

নটরাজ সেখানেই চুপ করে বসে থাকে। একটি গাঢ় খয়েরী সুপুষ্ট যৌবন, চোখের তারা দুটি যেন বেরিয়ে পড়েছে ধূমকেতুর মত। কি অপূর্ব ছবি এই সুনন্দা। লালসা আর উত্তেজনার কি ভীষণ গতি, কি ভয়াবহ যন্ত্রণা। নটরাজ স্তব্ধ হয়ে দেখে মনের ওপরে ভেসে-ওঠা এই ছবি। তবু সুনন্দাকে ওর ভাল লাগে। এই জন্যেই ভাল লাগে। এ যুগের এমন একটি যন্ত্রণার ছবি আর কারো ভেতর ও দেখতে পায় না।

ও জানে সুনন্দা ওকে ভালবাসে। কিন্তু সুনন্দার সবচেয়ে আক্ষেপ এ ভালবাসায় জ্বালা নেই, উত্তেজনা নেই, তাই বোধকরি মাঝে মাঝে তীব্র অভিযোগ করে বসে, আক্ষেপের ওর অন্ত নেই।

নটরাজ মনে মনে হাসে।

ও জানে সুনন্দা হয়তো কোনদিন এ যন্ত্রণার উত্তেজনার ভয়াবহ বেগে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, ভেঙে পড়বে

একেবারে, সেদিন নটরাজকে ওর প্রয়োজন হবে, তার আগে নয়।

ও মাঝে মাঝেই আক্ষেপ করে,—ও বাঁচতে চায়।

তার মানে, ও জীবনে প্রচন্ড গতি চায়, দৌড়োতে চায়, হাঁপাতে চায়, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠতে চায়। এ কালের এ মানসিকতার ব্যতিক্রম সুনন্দা নয়।

নটরাজ আরও একবার [illegible] হাসে।

ফুলের ছবিটি কাছে টেনে নেয় নটরাজ। ফুলের দুটি মাত্র পাপড়ি। ফণার মত আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছে যেন। আকাশটা রক্তের মত লাল করে দেয় নটরাজ। উজ্জ্বল হলুদ দুটি পাপড়ি। নটরাজ জীবন দেখছে। জীবনের অব্যক্ত আবেগ।

দিনদুই পরে তাপস মজুমদার এলো। নটরাজ কিছুমাত্র ভণিতা না করে বলল,—একটি চাকরি দিতে পারেন?

তাপস মজুমদারের বড় হাঁ-টা আরও বড় হয়।—কি ব্যাপার? আপনার জন্যে?

—না। একটি মেয়ের জন্যে।

তাপস মজুমদার চতুর। বুদ্ধিমান। বলে,—মেয়েটিকে দেখতে হয়।

—আপনি দেখেছেন। সুনন্দাকে দেখেননি?

তাপস একটি সিগারেট বাড়িয়ে দেয় নটরাজের দিকে। নিজে একটা সিগারেট ধরায়। দামী সিগারেট। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে,—দেখে থাকব, অত মনে নেই। ঠিক আছে। পাঠিয়ে দেবেন। দেখব। নোতুন কি আঁকলেন দেখি। মিসেস সাহা-কে সেদিন আপনার দুখানা ছবি প্রেজেন্ট করলাম। উনি খুব খুশী হয়েছেন।

নটরাজ সিগারেটটা ধরিয়ে আস্তে বলে,—মিসেস সাহা কে?

তাপস হাসে।—আমাদের মিষ্টার সাহা, মানে গভর্ণমেণ্টের লাখ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট যাঁর হাত দিয়ে বেরোয় তাঁর ইয়ে। এঁরা আবার মডার্ণ আর্টের ভীষণ ভক্ত। ছবি প্রেজেন্ট করলে ভারী খুশী। মিষ্টার সাহা তো মিসেস সাহার কথায় ওঠেন-বসেন। মানে যাকে বলে—।

নটরাজ গম্ভীর স্বরে বলে,—আপনি কি এইজন্যে আমার ছবি কেনেন?

তাপস মজুমদার চতুর। তেমনি গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে,—আমি আর কিই বা কিনতে পারি। তবে শিল্পীকে ভালবাসি, তাই এই সব সার্কেলে আপনার ছবি চালু করে দিতে পারলে আপনার যদি কিছু উপকার হয়, তাই—। আমার কাজও হয়, আপনার কাজও হয়।

নটরাজ সিগারেটটা ফেলে দেয়। তাপসকে ছবির ঘরে, অর্থাৎ পার্টিশনের ওপাশে নিয়ে যায়। তাপস ছবি দেখে, ছবি বোঝবার চেষ্টা করে, তারপর এক-সময় চলে যাবার আগে একটা কার্ড দিয়ে যায়। বলে যায়, সুনন্দাকে দেখা করতে।

পরের দিন সুনন্দা আসে। নটরাজ তখন প্যাস্টেলের সংগে তেলরঙ মিশিয়ে একটা নোতুন ধরনের কাজ করছিল। ছবিখানায় বিশাল আকাশ, তার চেয়েও সুদূর বিশাল মাঠ। এই পর্যন্ত আঁকা হবার পর ছবিটি কিছুই হোল না বলে বোধ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ছবিটিতে এখন একটিমাত্র বিন্দুর অভাব। এই বিন্দুটি সমস্ত ছবিটির প্রাণ, জীবন্ত করে তুলবে ছবিটিকে।

গভীরভাবে তন্ময় হয়ে গেছে নটরাজ। একটুখানি ছোট একটি বিন্দু। একটি নারীযৌবন। টকটকে লাল শাড়ি, মাথায় একটি বোঝা। খুব ছোট এই বিন্দু। বিরাট পটভূমিতে প্রাণের স্পন্দন উঠল। এ বিন্দুজ্ঞান যে কত সাধনায় আসে, তা শিল্প যারা বোঝে তারাই জানে। এই লাল টুকটুকে শাড়ি, অতি ক্ষুদ্র মেয়েটি না থাকলে সমস্ত মাঠ ঘাট আকাশ অর্থহীন হয়ে যেতো।

সুনন্দা ঘরে ঢুকে চুপ করে বসে রয়েছে।

মাথা তুললো নটরাজ। কার্ডটি বার করে সুনন্দার হাতে দিলো।—কাল যেও।

সুনন্দা কার্ডটি ওর হাত-থলিতে রাখলো। কথা বলল না।

নটরাজ আবার ছবির কাজে মন দিল।

সুনন্দা চুপ করে বসে থেকে এক সময় উঠে চলে গেল। এ রকম বহুদিনই হয়েছে। সুনন্দা এসেছে, বসেছে, একটা কথাও বলেনি, চলে গেছে। তবু সুনন্দা আসে। না এসে পারে না।

এর পর প্রায় আঠারো দিন কেটে গেছে। সুনন্দা আসেনি। ও আসেনি তা জানবার কিছুমাত্র কৌতূহল নটরাজের হয়নি। হয়তো চাকরি পেয়েছে তাই আসেনি। নয়তো চাকরি পায়নি, তাই আসেনি। নটরাজের এ সব চিন্তায় মাথা ঘামান স্বভাব নয়। ও ছবির কাজ নিয়ে পড়ে রয়েছে দিনরাত্তির। দিনে একবার মাত্র কুকারে সেদ্ধভাত একটু মাখন দিয়ে খাওয়া, আর কাজ করা। ভাড়াটে-ভর্তি বাড়িটার সংগেও ওর যেন কোন সম্পর্ক নেই। ও একেবারে একা। মানুষ আসে। যাঁরা ছবি দেখতে চান, ছবি ভালবাসেন তাঁরা আসেন। শিল্পী বন্ধু দু একজন আসে। আবার চলে যায়।

সুনন্দা চাকরি পেয়েছে সত্যি। আশাতীত ভাল চাকরি।

তাপস মজুমদার অতি বিনীত-ভাবেই ওকে বলেছে,—আপনার চাকরি দরকার, আমাকে আগে বললেই পারতেন। এখন তো তেমন ভাল কিছু খালি নেই—।

সুনন্দা চুপ করে শুনে গেছে।

—একটা কাজ আছে। আমার শেয়ারের ফাইলপত্রগুলো ঠিকঠাক রাখা, আর তার একটা খাতা তৈরী করে ঠিকমতো সব রিটার্ণ গেল কিনা দেখা। আমার নিজের সব শেয়ারের কথা বলছি। আমার পার্সোনাল কাজ। তা বেশী তো দিতে পারব না। তিনশ' টাকা মাসে দিতে পারি। তবে কোম্পানীজ্ এ্যাক্ট আপনাকে পড়ে নিতে হবে। পারবেন?

মাসে তিনশ' টাকা! সুনন্দার কপালে ঘাম দেখা দেয়। হাসবার চেষ্টা করে বলে,—তা পারব না কেন?

—মানে পরে আরও বাড়িয়ে দোব। কাল থেকেই তা হলে আসুন।

তারপরদিন থেকেই অফিস করতে শুরু করেছে সুনন্দা। বিকেলে বাড়িতে গিয়ে কোম্পানীজ্ এ্যাক্ট মুখস্থ করতে হচ্ছে। নটরাজের কাছে যাবার একটু সময়ও পাচ্ছে না।

দিন দশেক পরে ওর শাড়িটা দেখে বললে তাপস,—শোন, আমার পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট, একটু ভাল পোষাক না পরলে, মানে—কিছু মনে কোর না, এই দুশ' টাকা নাও, ভাল শাড়ি জামা কিনে নাও। এটা এ্যাড্ভান্স দিলাম। পরে যখন হোক—।

সুনন্দা লজ্জিত হয়। কথাটা সত্যি। আজ তার শাড়িটা একটু ছেঁড়াও ছিল। তাপস মজুমদার মানুষটি মন্দ নয়। সবদিকে লক্ষ্য আছে।

টাকাটা তার সত্যিই প্রয়োজন ছিল। খুশী হোল সুনন্দা।

তাপস মজুমদারের ব্যবহারে একটু অসংযম নেই। তাছাড়া ক্রমেই খুব আন্তরিক হয়ে উঠছে। সুনন্দা ভুল করে মানুষটাকে খারাপ ভেবেছিল। আর একবার লজ্জিত হয় সুনন্দা।

শুধু কি এই? মাস দুয়েকের ভেতরেই বেশবাস পালটাবার সংগে সংগে সুনন্দার মনে হোল বাড়িটাও পালটাতে হয়। একটি ফ্লাট ভাড়া নিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। পাওয়া যে যায় না তা নয়, কিন্তু আগাম সাতশ' টাকা চাইছে। সাতশ' টাকা কোথায় পাবে ও?

তাপস মজুমদারকে বলতে হোল সংকোচ কাটিয়ে। তাপস তাকাল ওর দিকে নীলরঙের পাড়হীন সিল্কের শাড়ির দিকে, কোমরের অনেকটা ওপরে আঁট করে পরা ভেলভেটের পেটিকোটের দিকে। হাসল, তাকাল ওর সুক্ষ্ম কাজলের রেখা টানা চোখের দিকে।

হাসল, বললো,—সাতশ' টাকা। বেশ কাল নিও।

সুনন্দা হাঁপ ছাড়লো। ওই নোংরা বাড়ির ঘরটা এতদিন পরে ছাড়তে পারবে ভেবে আনন্দে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাসল একটু।

তাপস মজুমদার টাকা দিলো। এবারেও রসিদ নিলো একটা।

সুনন্দা বাড়ি বদলে গেল নটরাজের কাছে।

নটরাজ তাকালো। সুনন্দার সিল্কের শাড়ির আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। মুখে ঘাম নেই, পাউডারের প্রলেপ।

সুনন্দা নিজেই অনেক জবাবদিহি করলো এতদিন না আসবার জন্যে। কত কাজ। এমন কি তাপসবাবুর ইনকাম-ট্যাক্সের হিসেবগুলোও ওর রাখতে হচ্ছে, একটু সময়ও পাচ্ছে না।

নটরাজ কিছুই বললো না। আঁকছিল, আঁকতেই লাগল।

সুনন্দা ওর তুলিটা কেড়ে নিলো। —চলো, আমার নোতুন বাসায়!

নটরাজ ওর উচ্ছ্বলতায় অবাক হোল না। বললো,—আজ সময় নেই।

সুনন্দা তার নোতুন বাসার বর্ণনা শুরু কোরল।—তুমি তো আমার বাসায়ও থাকতে পারো। ওবাড়ির বাথ-রুমটাও তোমার এ ঘরের চেয়ে ভাল।

নাটরাজ হাসল।—লোকে কি বলবে তোমার বাসায় গেলে?

—অত কাউকে কেয়ার করিনে!

ওর ওই সাহস আর বিশ্বাসের মূলে টাকার অংকের ওপর নির্ভর করছে, টাকার ওঠানামায় মনের ওঠানামা! নটরাজ আবার হাসল। কথা বললো না।

যাবার আগে সুনন্দা দ্বিধাহীন স্বরে জানালো,—প্রায় ঘোষণা করলো,—যাই বলো মিষ্টার মজুমদার মানুষটি ভাল। মিছিমিছি ওকে খারাপ ভাবতুম।

নটরাজ তুলিটা হাতে তুলে নিলো। সুনন্দা চলে গেল।

এইভাবেই মাস ছয়েক কেটেছে। তাপস মজুমদারের ব্যক্তিগত হিসেবপত্রও সবই এখন সুনন্দাকেই রাখতে হয়। কোম্পানীর ব্যবসা ছাড়াও অনেক রকমের ব্যক্তিগত ব্যবসা আছে। ক্রমে জানতে পারে সুনন্দা।

একদিন বিকেলের দিকে প্যাকিং ডিপার্টমেন্টে দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা। কতকগুলো জরুরী জিনিস প্যাক করাতে হবে। যাবে রোমে, এয়ারে। তাড়া দেবার জন্যে গিয়ে দেখলো কয়েকখানা ছবি। প্রথম ছবিটা খোলা ছিল। চমকে উঠলো সুনন্দা!

একি! এ ছবি এখানে কোথা থেকে এলো! এ যে নটরাজের আঁকা ছবি! এ ছবিটা যখন আঁকে, তখন সুনন্দা দেখেছে। রাজপুতানার গ্রামের কয়েকটি ল্যাণ্ডস্কেপ। রাজপুতানা থেকে ঘুরে এসে এঁকেছিল নটরাজ। বছর দেড়েক আগে।

সুনন্দা কিছুই বুঝতে পারে না ভাল করে।

প্যাকিং শেষ হবার পর তাপস মজুমদারের ঘরে যায় ও। তাপস

মজুমদার তখন দিল্লীর সরকারী একটি কনট্রাক্টের রেট্ ঠিক করছিলো। দাঁড়িয়ে রইল সুনন্দা।

পাঁচটা বেজে গেছে। অফিস ফাঁকা হয়ে এসেছে।

তাপস মজুমদার তার চাকার মত বড় মুখখানা তুললো,—বোস। কিছু বলবে?

সুনন্দা বসলো না। বললো খুব সঙ্কোচ নিয়ে,—কয়েকখানা ছবি রোমে পাঠান হচ্ছে। তার ভেতরে যেন নটরাজের আঁকা ছবি আছে মনে হোল।

তাপসের হাঁ-টা বড় হোল একটু। চোখ দুটো ছোট হোল।—ছবিতে নাম আছে?

সুনন্দা কিছুটা অবাক হয়ে কিছুটা সংশয় নিয়ে বললে,—না, নাম তো দেখলাম না।

তাপস মজুমদার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো। হেসে উঠল।—তোমাকে মিথ্যে বলে লাভ? ছবিটা ওঁরই আঁকা। নামটা আমি মুছে দিই রঙ দিয়ে। কিছু নয়।—ওঁরা তো বাইরে ছবি বিক্রি করতে পারবেন না? তাই ওঁদের ভালর জন্যেই ছবিগুলো আমি প্যারিস, রোম, লণ্ডন, সব জায়গায় পাঠাই। ও সব জায়গায় আমার এজেন্ট আছে।

সুনন্দার বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। অবাক হয়ে বলে ফেলে,—আপনার হিসেব রাখতে গিয়ে দেখেছি, আপনি তো বিল করেন অনেক বেশী দামে!

তাপস কলমটা দাঁতে কামড়ায়। তারপর কলমটা ফেলে একটা সিগারেট ধরায়।—অনেক বেশী আর কই? তবে ব্যবসা করতে গেলে লাভ মানুষ করেই থাকে।

বলেই জোরে হেসে ওঠে।—ব্যবসা বড় কঠিন জিনিস সুনন্দা! আমার সঙ্গে আছো, আস্তে আস্তে বুঝবে। টাকা পাবার অনেক পথ আছে, ভেবে নিতে হবে, দেখে নিতে হবে। সব শিখিয়ে দেবো তোমাকে। নিজের মত করে তোমাকে গড়ে নেবো।

সুনন্দা স্তম্ভিত হয়ে তাকায়। কান দুটো ওর গরম হয়ে ওঠে। ভেতরে তোলপাড় হতে থাকে। এমনি করে দিনের পর দিন নটরাজকে ঠকাচ্ছে এ লোকটা? নটরাজের ছবির এত দাম? নটরাজ কি এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে? মুখখানা ওর রাঙা হয়ে ওঠে।

তাপস মজুমদার বুদ্ধিমান।

সুনন্দা কোন কথা বলবার আগেই বলে,—শোন, ভাল কথা, তোমাকে যে তেরোশো টাকা আগাম দিয়েছিলাম, ওটা দেবার একটা ব্যবস্থা করো।

সুনন্দা যেন জোরে ধাক্কা খায় একটা। তাকায়।

তাপস তাকিয়ে থেকেই বলে,—এখন না পারো, থাক। সামনের মাসে তোমার কন্‌ফার্মেশনের সময় একশ টাকা মাইনে বাড়বে, তখন দেখা যাবে। বাড়ি যাও।

সুনন্দা আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে পড়ে অপিস থেকে। তাপস মজুমদারের একটা ভয়াবহ চেহারা ও দেখতে পেয়েছে। ভয়ে ঘৃণায় ওর সর্বাঙ্গ ঘেমে ওঠে।

ও সব বলবে নটরাজকে। সব বলবে আজ। চাকরি ছেড়ে দেবে কাল থেকে। নটরাজের এমন সর্বনাশ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। কিছুতেই নয়।

ওখান থেকে সোজা নটরাজের ঘরে চলে আসে সুনন্দা। ও যেন ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। সব না বলা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই।

নটরাজ সেই ফুলের ছবিটি শেষ করছে আজ। উজ্জ্বল হলুদ দুটি পাপড়ি।

সুনন্দা এসে ওর চৌকির ওপর বসে পড়ে। হাঁপাতে থাকে।

নটরাজ শব্দ শুনে তাকায়। কথা বলে না।

সুনন্দা একটু জিরিয়ে নিয়ে ওর কাছে যায়। হাত পা তখন ঠান্ডা হয়ে এসেছে সুনন্দার। ভীষণ উত্তেজনার পর ক্লান্তিতে ঠান্ডা হয়ে ঝিমিয়ে পড়ছে সুনন্দা।

চোখের ওপর ভেসে ওঠে তাপস মজুমদারের বড় হাঁ-টা—আর চাকার মত মুখ। টাকাটা কি শোধ করতে পারবে? সামনের মাসে একশ' টাকা মাইনে বাড়বে। তোমাকে আমি নিজের মত করে গড়ে নোব।

সুনন্দা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় নটরাজের দিকে। নটরাজ তাকায়, ওর চাউনি দেখে বলে,—কিছু বলবে? কাজটা শেষ করে নিই। বোস।

সুনন্দা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরোয় না। জোর করে যেন নিশ্বাস ফেলতেও ভয় করছে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভেতরটা যেন মোচড়াচ্ছে।

ও আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

রাস্তায় নেমে একটু যেতেই পাশে দাঁড় করান একটা গাড়ি থেকে একটি স্বর শোনা যায়।—উঠে এসো।

চমকে কেঁপে ওঠে সুনন্দা। এ গলা তার চেনা। ভাল করে তাকিয়ে দেখে এ গাড়িও তার চেনা। সন্ধ্যা উতরে গেছে। রাস্তার আবছা আলোয় ভাল করে ঠাওর করতে পারেনি ও।

ওর পা দুটো যেন আপনা-আপনি গাড়ির কাছে যায়।

ওর হাত ধরে গাড়িতে উঠিয়ে নেয় তাপস মজুমদার। ড্রাইভার গাড়ি চালায়। তাপস একটু হেসে শুধু বলে,—আমি জানতুম, তুমি এখানে আসবে।

তারপর ডানহাতটা ওর কাঁধে তুলে দিয়ে ওকে কাছে টেনে নেয়।

নটরাজ ছবিটা উত্তজনে শেষ করেছে। গাঢ় খয়েরী শুকনো গাছের ডালে একটি ফুল। উজ্জ্বল হলুদ দুটি বড় বড় পাপড়ি রক্তের মত লাল আকাশটাকে যেন ছুঁতে চেষ্টা করছে—রক্তাক্ত আকাশটাকে উজ্জ্বল করে তুলবে বলে।

নৃত্যভঙ্গিমা—মৃণালিনী সারাভাই

ভারতের নৃত্যকলা

।। ভারত-নাট্যম ।।

ভারতের নৃত্যগুলির মধ্যে ভারত-নাট্যম্ হল প্রাচীনতম। কেবল তাই নয়, সাতশ' বছর আগেও উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারতেই ভারত-নাট্যম ছিল সর্বাপেক্ষা প্রচলিত নৃত্যকলা। কালি-দাসের সময়ে উজ্জয়িনীতে যে ভারত-নাট্যমের প্রচলন ছিল তা 'মেঘদূত' পাঠ করলেই বোঝা যায়। বাংলার কবি জয়দেব যে সমস্ত 'অষ্টপদী' রচনা করেছিলেন তাও কবির পত্নী পদ্মা-বতীর গীত-নৃত্যে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। দক্ষিণ ভারতে ভারত-নাট্যম কিছুকাল আগে পর্যন্তও অত্যন্ত জনপ্রিয় নৃত্যকলা হিসাবে পরিগৃহীত ছিল। ভারত-নাট্যমের সঙ্গে প্রথমাবধিই আধ্যাত্মিক ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে এই নৃত্য দেবারতির অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'য়ে উঠে-ছিল। ভারত-নৃত্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ

নৃত্যভঙ্গিমা—সারদা

তরুণীগণ 'দেবদাসী' নামে বিশেষ সম্মানের অধিকারিণী হ'য়েছিলেন সে অঞ্চলে। উত্তর ভারতে অবশ্য এই নৃত্য-কলা বারম্বার বিদেশী আক্রমণের ফলে ক্ষয়িষ্ণু হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া অন্যান্য ধরণের নৃত্যের প্রভাবও এসে পড়ে ভারত-নাট্যমের মধ্যে।

যাই হোক দক্ষিণ ভারতেও এই নৃত্যকলা বেশী দিন সম্মানের সঙ্গে টি'কে থাকতে পারেনি। ভারতের পরাধীনতার শেষপর্যায়ে একদিকে যেমন এই নৃত্যের মধ্যে অনাচার প্রবেশ করে, অন্যদিকে তেমনি সরকারী এবং বে-সরকারী সমস্ত শ্রেণীর কাছেই অবহেলিত হ'তে থাকে। পরিশেষে, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের জাতীয় জাগরণের প্রবল আবেগে রাজনৈতিক দিকের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিকেও আলোড়ন ওঠে, আর সেই প্লাবনের দিনেই পুনরুজ্জীবন ঘটে ভারত-নাট্যমের। বর্তমানে এই নৃত্যকলা ভারতের সর্বত্রই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করা হয়, সাধারণ মানুষও সানন্দচিত্তে সমবেত হন এ নৃত্যের দেবদুর্লভ আকর্ষণে।

দুটি বিশিষ্ট নৃত্য ভঙ্গিমা

চিদম্বরম্ মন্দিরে উৎকীর্ণ নৃত্যমূর্তি

মনস্বী ইয়ুং ও ভারতীয় চিন্তা

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

যাঁরা সত্যকে দর্শন করেন, তাঁরা হচ্ছেন ঋষি, আর যাঁরা মননশীল, যাঁদের চিন্তা গতানুগতিক নয়, তাঁরা হচ্ছেন মুনি। এই অর্থে প্রখ্যাত মনোবিদ্ কার্ল গুস্তাভ্ ইয়ুংকে মুনি বলতে কোনো বাধা নেই। এই মনস্বী পুরুষ সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন।

মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের দু'জন অনুগামী শিষ্য পরবর্তীকালে চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। মনোবিদ্যায় এঁদের দু'জনেরই দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এঁদের একজন হচ্ছেন এড্লার, আর একজন ইয়ুং। এঁরা দুজনেই মানসিক রোগের চিকিৎসার দুটি বিশিষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

বহু গ্রন্থ রচনা ক'রে ইয়ুং মনোবিদ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই তিনি অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন।

পরিণত বয়সে ভারতীয় যোগদর্শনের দিকেও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারতের' রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংখ্যার জন্যে তিনি 'Psycho-analysis and the Yoga' নামে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যোগদর্শন ভারতের একটি অদ্ভুত আবিষ্কার। মনকে কেমন করে জয় করতে হয়, সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেমন ক'রে একটি লক্ষ্যের অভিমুখ করতে হয়, ঋষি তার নির্দেশ দিয়েছেন। যোগীদের সাধন-পদ্ধতিও পতঞ্জলি সুস্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ইয়ুং বলেছেন, ভারতের যোগশাস্ত্র অবশ্য বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে। সুতরাং সেটা আমাদের উপযোগী নয়। আমাদের এমন পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে, যেটা আমাদের ঐতিহ্য ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়।

ফ্রয়েড বলেছেন, আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে নির্জ্ঞান মনের অজ্ঞাত ইচ্ছার দ্বারা। মনোবিকলন বা Psycho-analysis এর ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, আমাদের যে সকল কামনা অশোভন বা সমাজ-বিরোধী, সেগুলোকে আমরা অবচেতন মনে ঠেলে দিই। এই কামনাগুলো অনেক সময়ে ছদ্মবেশে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে চরিতার্থতা লাভ করে। ফ্রয়েডের মতে আমাদের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে কাম। অবশ্য, এই কাম সম্পর্কে অনেক সময়ই আমরা সচেতন নই। আমাদের ভেতর যে সব মহৎ প্রবৃত্তি রয়েছে,— যথা পরোপচিকীর্ষা, স্বদেশপ্রেম, মানবতা, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি,—সেগুলোও এই আদিম প্রবৃত্তিরই উন্নতি বা ঊর্ধ্বগতি (Sublimation) মাত্র। মানবীয় কর্ম-ধারার উৎসমুখে এই যে আদিম প্রবৃত্তি রয়েছে, তাকে ফ্রয়েড বলেছেন 'লিবিডো'। কিন্তু ইয়ুং এই কথাটিকে ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টার মূলে থাকে কাম (Sex-impulse), জীবন-তৃষ্ণা বা জিজীবিষা (Will to live) অথবা ক্ষমতালোলুপতা (Will to power)। এক কথায় বলতে গেলে এই লিবিডো মানুষের সকল দৈহিক ও মানসিক শক্তিরই (neuro-psychic energy) উৎস। তান্ত্রিক সাধক যাকে বলেন কুণ্ডলিনী-শক্তি তার সঙ্গে এই 'লিবিডো' কথাটির মিল রয়েছে। মানুষের এই কুণ্ডলিনী যখন জেগে ওঠে, তখন সে দুর্লভ শক্তির অধিকারী হয়। তান্ত্রিক সাধনা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে স্বীকৃতিদান করেছেন ও তাকে কেমন ক'রে ঊর্ধ্বগামিনী করতে হয়, তারও নির্দেশ দিয়েছেন। এই যে, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা কুণ্ডলিনীকে মূলাধার থেকে সহস্রারে পৌঁছে দেওয়া, এর তাৎপর্য হচ্ছে, অধোগামিনী প্রবৃত্তিকে ঊর্ধ্বগামিনী করা। এমনি করেই পশু-মানব ধীরে ধীরে দেব-মানবরূপে নতুন জন্মলাভ করে। একেই মহাত্মা খৃষ্ট বলেছেন 'being born again'।

ফ্রয়েড বলেন, আমাদের স্বপ্নের ভেতর দিয়ে যে অজ্ঞাত বাসনা চরিতার্থ হয়, সেটা প্রায়ই আমাদের অতীত জীবনের, আমাদের শৈশবের কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফ্রয়েড মনোবিকলনের সাহায্যেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু ইয়ুং আবার মনোবিশ্লেষণের ফলেই ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেন, স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ক'রে প্রায়ই রোগীর জীবনের কোনো বর্তমান সমস্যার প্রতি তার মনোভাবটি সুস্পষ্ট হয়। এটি অবশ্য রোগীর নির্জ্ঞান মনেরই ব্যাপার।

ইয়ুং-এর মতে আমাদের নির্জ্ঞান মনের দুটো দিক আছে, একটি ব্যষ্টিগত (personal) ও আর একটি সমষ্টিগত (collective বা racial)। এর সঙ্গে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা করা চলে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, মানুষের চিত্ত হচ্ছে কতকগুলো সংস্কারের সমষ্টি। এই সংস্কারের কতকগুলি অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত, আর কতকগুলো প্রাক্তন বা জন্মান্তরীণ।

মনস্তত্ত্ববিদ্ ইয়ুংএর মতে সংসারের মানুষকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়,—বস্তুকেন্দ্রিক বা (Extrovert)

ও আত্মকেন্দ্রিক বা (Introvert)। যারা প্রথম শ্রেণীর মানুষ, বস্তুজগৎ বা বহির্জগৎ সম্পর্কে তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই, কিন্তু নিজের ভেতরে দৃষ্টি দেবার এদের যেন মোটেই অবসর নেই। জীবনে এরা হয় আশাবাদী, আর সামাজিক মানুষ বলেই এরা হয় জনপ্রিয়। অবস্থা বিশেষে পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতেও এরা কুণ্ঠিত হয় না। আর যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ তারা নিজেকে নিয়েই বিব্রত থাকে, বাইরের জগৎ সম্পর্কে এদের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। দৃষ্টি এদের অন্তর্মুখী। এরা প্রায়ই হয় অসামাজিক ও নৈরাশ্যবাদী। এক হিসাবে এরা হচ্ছে স্বার্থপর। তবে এদেরই ভেতর থেকে অনেক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবির উদ্ভব হয়। প্রথম শ্রেণীর মানুষেরা হয় কাজের লোক (Men of action) আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা হয় চিন্তাশীল (Men of contemplation)।

ইয়ুং বলেন, সংসারে তৃতীয় শ্রেণীর লোকও আছে, এদের বলা যায় উভকেন্দ্রিক বা Ambivert। এদের কৌতূহল যেমন বাইরের জগতের দিকে, তেমনি অন্তর্জগতের দিকে নিবন্ধ। এরা নির্জনতা-প্রিয় অথচ সামাজিক, চিন্তাশীল অথচ কর্মী। গোল্ডস্মিথের (Goldsmith) Deserted Village কবিতার ধর্মযাজকের মত এ'দের মন ভূমি ও ভূমার ভেতর সেতুরচনা করতে পারে। সংসারে এ'দের সংখ্যা বিরল কিন্তু এ'রা শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের ভাষায় এ'রা হচ্ছেন "True to the kindred points of Heaven and Home".

ইয়ুং আবার মানুষকে চারটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতেও ভাগ করেছেন। যথা—(১) যারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বাস করে, (২) যারা চিন্তার জগতে বাস করে, (৩) যাদের ভেতর হৃদয়াবেগ প্রবল, (৪) যাদের ভেতর রয়েছে প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা Intuition। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, এই প্রকোষ্ঠগুলো দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের দ্বারা পৃথক নয়। ভারতের প্রাচীন ঋষি যখন মানুষকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, তখন তিনিও প্রাধান্যের দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, প্রকৃতিভেদে মানুষের সাধনার পদ্ধতিও হবে আলাদা. তাই সত্ত্বগুণী মানুষের জন্যে দেবাচার, রজোগুণীর জন্যে বীরাচার

মনস্বী ইয়ুং

আর তমোগুণীর জন্যে পশ্বাচারের বিধান দেওয়া হয়েছে।

কোন কোন পণ্ডিত মানুষকে প্রধানত চার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যথা—(১) প্রসন্নচেতা বা The elated type, এরা আশাবাদী কিন্তু এদের ভেতর গভীর জীবনজিজ্ঞাসা জাগে না. (২) বিষণ্ণচেতা বা The depressed type, এরা নৈরাশ্যবাদী কিন্তু এদের ভেতর আছে একটা গভীর জীবনদৃষ্টি, (৩) কোপনস্বভাব বা The irritable type, এরা অগ্নিদাহ্য পদার্থের মতো দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠে ও তারপর খপ্ ক'রে নিভে যায়, (৪) অস্থিরচিত্ত বা The unstable type। শাস্ত্রকার বলেছেন, এরা ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট হয়, সুতরাং এদের অনুগ্রহও ভয়ংকর।

ফ্রয়েড, এড্লার ও ইয়ুং, তিনজনেই মানুষের মনের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন, ফলে, মনো-ব্যাধির চিকিৎসার তিনটি ধারার প্রবর্তন হয়েছিল, কিন্তু এই ত্রিধারা কখনও মিলিত হ'তে পারে নি। এই তিনজন মনীষীই ছিলেন চিকিৎসক, কিন্তু এ'দের ভেতর ইয়ুংএর প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয় প্রকৃতির কিছু সাদৃশ্য ছিল। অতীন্দ্রিয় বা অতিলৌকিক জগতের প্রতি তাঁর মনের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল।

ভারতবর্ষে মনোবিজ্ঞান ছিল দর্শনের অঙ্গীভূত। আলাদা করে এ বিজ্ঞানের চর্চা হয় নি। তবু উপনিষদে, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে, মহাভারতে, পুরাণে, তন্ত্রশাস্ত্রে, চিকিৎসাশাস্ত্রে ও বৌদ্ধদর্শনে মনস্তত্ত্বের প্রচুর আলোচনা রয়েছে। মানসিক রোগের চিকিৎসাও যে ভারতবাসীদের জানা ছিল, তারও প্রমাণ আছে চরক-সংহিতা প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রে। একালে প্রাচীন ভারতের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সর্বাংগীণ ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া উচিত। তা হ'লেই যাঁরা পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা সহজেই প্রাচ্য চিন্তাধারার সঙ্গে এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আবিষ্কার করতে পারবেন। আর এইরূপ আবিষ্কারের ফলেই আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয়ে উঠবো এবং আধুনিক জ্ঞানের আলোকে প্রাচীন শাস্ত্রের ও পুরাতন শাস্ত্রের আলোকে একালের বিজ্ঞানের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে পারবো।

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধকুমার সান্যাল
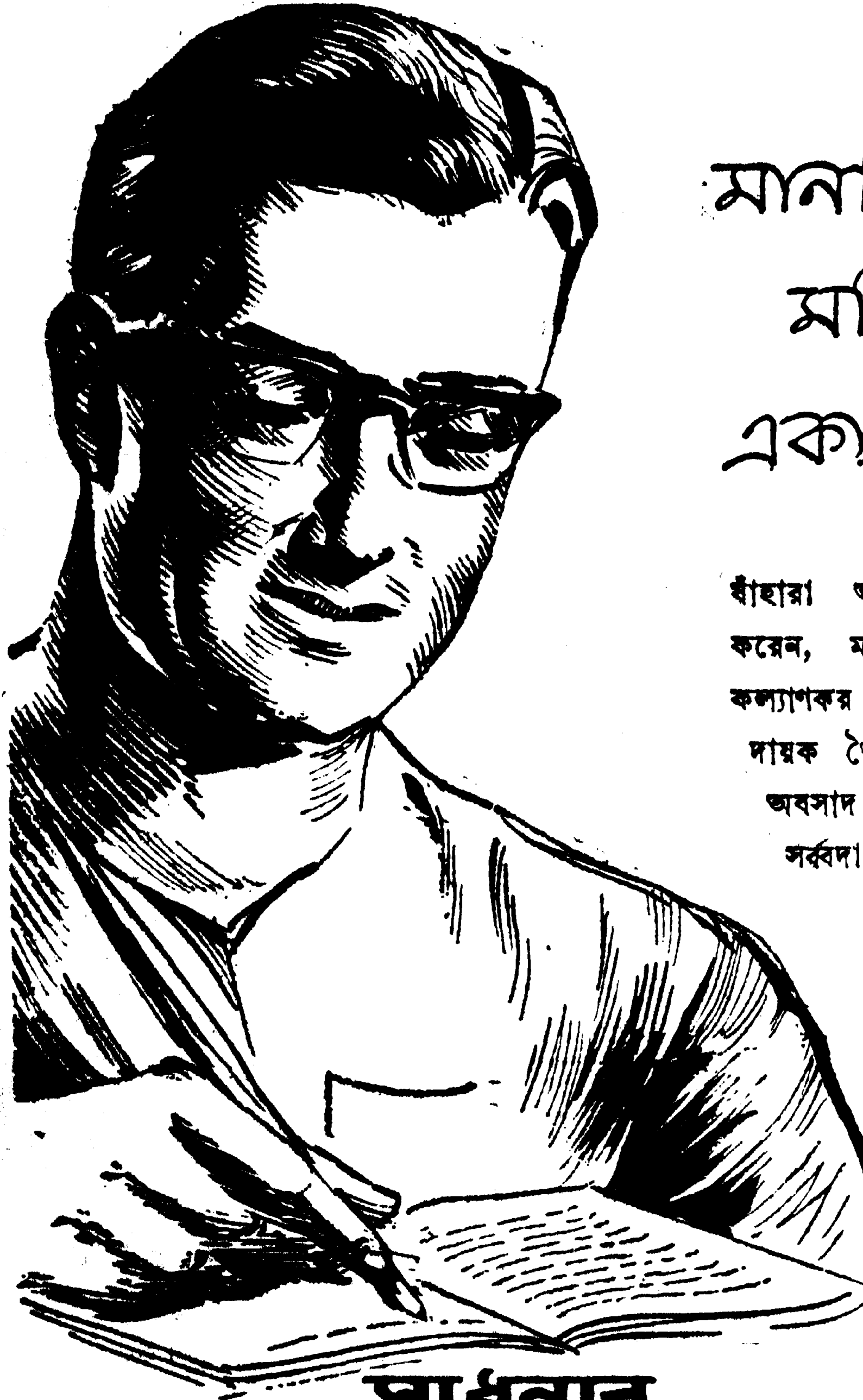
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— বার —

ভাল গান শুনতে শুনতে আমার দুই চোখে তন্দ্রা নেমে আসে, হেনা একথা জানত। মধ্যাহ্নের আহারাদির পর কতক্ষণ আমরা আলাপ করেছি, এবং কখনই বা সে গুনগুনিয়ে গান ধরেছিল, এটি আমার মনে নেই। কুকুরের ডাকে আমার ঘুম ভাঙল।

মাথা তুলে দেখি হেনা ঘরে নেই। শুধু বাইরের আমবাগানের ওদিক থেকে নতুন বসন্তকালের পাখীর কলকূজন শুনতে পাচ্ছিলুম। কুকুরটা আরেকবার গোঁ গোঁ ক'রে ডেকে উঠল লক্ষ্য ক'রে আমি বাইরে এলুম।

একখানা জিপগাড়ি এসে কাঁচা রাস্তাটার উপর দাঁড়িয়েছে, এবং দুটি যুবক এই চালাঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। আমাকে দেখে সবিনয়ে নমস্কার জানিয়ে একজন বলল, আমাদের অফিসার আপনাকে কাল আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, আজ তাই আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন—

আচ্ছা, মিনিট দুই দাঁড়ান, আমি তৈরি হয়ে নিই।

পাঞ্জাবি এবং পায়জামা প'রে নিলুম। বুঝতে পারা গেল, গাড়ি পাঠানোটা হেনার কাজ। সে আগেই ব'লে রেখেছিল, ওরা উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানিয়ে না নিয়ে গেলে তুমি যেয়ো না।

চটিজুতোটা পায়ে দিয়ে বাইরে এসে কুকুরটার মাথায় হাত চাপড়ে শান্ত ক'রে গাড়িতে এসে উঠলুম। একটি যুবক সহাস্যে বলল, আপনার কাছে আমরা বিশেষ থ্যাংকফুল্ হচ্ছি। এ গ্রামে এসেছেন আপনি, এই আমাদের আনন্দ।

অন্য যুবকটি জিপখানা ঘুরিয়ে কাঁচাপথ পেরিয়ে চলল পাকা রাস্তাটার দিকে। প্রশ্ন করে জানা গেল এদের মধ্যে একজন সিন্ধুদেশের লোক। কিন্তু তার সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ ও স্বাস্থ্যশ্রী দেখে বুঝবার উপায় নেই যে, সে রের্ফুজী। সিন্ধুদেশের আমিষ রান্নার সুস্বাদ যে আমার অতি প্রিয়, এটি শুনে যুবকটি খুব আনন্দিত হল। অন্য যুবকটির বাড়ি বুন্দেলখন্দে।

এখানকার গ্রামাঞ্চলে বড় একটি কাজের কেন্দ্র গড়ে উঠেছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একথাটি অবশ্য এখানে প্রকাশ করা চলে না যে, এর সংগে হেনার যতটুকু যোগ, আমার আকর্ষণ এবং ঔৎসুক্যও ঠিক ততটুকু। লক্ষ্য করবার বিষয়, একটি আধুনিক মন এখানে এসে জায়গা নিয়েছে। মানুষের কল্যাণকর্মের জন্য মানুষের উদ্বেগ উঠেছে জেগে। আর্তের জন্য সেবাব্যবস্থা, জীবনযাত্রার আবশ্যিক উপকরণসৃষ্টি, স্বাস্থ্যরক্ষার মূল নীতিগুলি পালনের জন্য শিক্ষাপ্রচার, এবং অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টা,—এইগুলি এখানকার প্রধান কর্মসূচী।

এখানকার প্রধান পরিচালক মহাশয় আমাকে অভ্যর্থনা ক'রে গাড়ি থেকে যেখানে নামালেন, তার দুধারে দাঁড়িয়েছিল অনেকগুলি পুরুষ ও মহিলাকর্মী। একটি ছোট মেয়ে এসে একটি ফুলের তোড়া আমার হাতে দিল। বুঝলুম আবহাওয়াটি আগে থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতঃপর পরিচালক মহাশয় বিশেষ যত্ন এবং সমাদরের সংগে তাঁর দলবলসহ আমাকে নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

অবশেষে এক সময় তিনি আমাকে এনে হাজির করলেন একটু দূরবর্তী এক বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে। এটি মূল কর্মকেন্দ্র থেকে পৃথক। ভদ্রলোক আমাকে বললেন, এই বিভাগটির দায়িত্ব যিনি নিয়েছেন সেই মহিলাই আপনার হোস্ট্। এটিকে বিদ্যালয় বলা চলে।

সামনে মস্ত বেড়াদেওয়া বাগান। বড় বড় আমগাছ আশেপাশে। ফুলের গাছ বসেছে অজস্র। এক পাশে একটি নলকূপ। বাগানের প্রান্তে মস্ত লম্বা একটি চালাঘর। তার দেওয়ালগুলি চিত্রিত। সমস্ত চালাটা অনেকগুলি ঘরে ভাগ করা, এবং প্রতি ঘরের দরজায় এক একটি পরিচয় লেখা। পরিচালক মহাশয় ভিতরে যাবার আগে একটু গলা নামিয়ে বললেন, আপনি জানেন কি, মিস রায়চৌধুরী এখানে কোনও পারিশ্রমিক নেন না? শুধু তাই নয়, উনি নিজে অজস্র টাকা খরচ ক'রে এই ঘরদোর আর বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে উনি প্রথমেই ব'লে রেখেছেন, যেদিন ও'র ইচ্ছে হবে সেইদিনই উনি চ'লে যাবেন! উনি এখানে স্থায়ী নন্। ও'কে এখানে কোনো উপায়ে রাখতে পারলে অবশ্য অনেক কাজ হ'ত। কর্তৃপক্ষকে একথা আমি লিখে পাঠিয়েছি।

ও'র এখানে কাজের রেকর্ড কেমন?—প্রশ্ন করলুম এক সময়ে।

ব্রিলিয়াণ্ট্! প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কাজ এখানে একমাত্র উনিই বোঝেন!—ও'র পড়াশুনোও যেমন, উনি খোঁজখবরও তেমনি রাখেন!—প্রশংসায় গদগদ হয়ে ভদ্রলোক আমাকে চালাঘরে তুললেন। ও'র কানে কানে একসময় বললুম, কিন্তু উনি ত' হিন্দুস্তানী ভাষা জানেন না?

পরিচালক মহাশয় হা স লে ন। বললেন, যাঁরা এখানকার শিক্ষিত কর্মী,

তাঁরাই ও'র ছাত্রছাত্রী। উনি সাধারণ মেয়ে নন্, মিঃ চৌধুরী। কোনো ভাষা না জানা ও'র কাজের পক্ষে বাধা ঘটায় না। আসুন—

বড় ঘরটিতে আমরা প্রবেশ করলুম। সামনেই একখানা বৃহৎ কালো বোর্ডে কয়েকটি ফিগারের সংগে চকখড়ি দিয়ে কতকগুলি অংক কষা ছিল। অধ্যাপিকা শ্রীমতী হেনা রায়চৌধুরী এতক্ষণ একটি পয়েন্টার হাতে নিয়ে সেগুলি তাঁর ছাত্রছাত্রীদেরকে বুঝাচ্ছিলেন। আমরা কয়েকজন এসে ঢুকতেই ক্লাস-সুদ্ধ সকলে উঠে দাঁড়ালেন, এবং শ্রীমতী অধ্যাপিকা সহাস্যে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। ওইটুকুর মধ্যেই লক্ষ্য করলুম, হেনার পরনে শালোয়ার আর পাঞ্জাবি, গায়ের উপর জড়ানো উড়ানি। পায়ে ফিতেবাঁধা জুতো এবং পিছনদিকে বেণীটি তার কতদূর নীচে পর্যন্ত নেমে লোল ফণায় দংশনের বস্তু খুঁজে ফিরছে, সেটি বর্ণনা করতে গেলে সংস্কৃত কাব্যের সাহায্য নিতে হয়!

নমস্কার বিনিময়ের পালাটা শেষ হবার পর অধ্যাপিকা সবিনয়ে বললেন, কেন্দ্রীয় সরকারের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন এজন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ!

ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট বয়স্ক। তাঁরা অংক এবং বিজ্ঞানের নানাবিধ জটিল প্রশ্ন নিয়ে এখানে আলোচনা করেন। সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পদার্থ ও রসায়ন, কৃষি ও গৃহশিল্প, ছোট ছোট অর্থনীতিক প্রচেষ্টা,—যার থেকে অর্থকরী কাজগুলি সহজে আয়ত্ত করা যায়, —এসব বর্ণনা একটি একটি ক'রে শুনতে হল। অধ্যাপিকা তাঁর কর্মবিধি ও অনুষ্ঠানসূচী আমাকে বিশেষ যত্নের সংগে বোঝাতে লাগলেন। তাঁর সংগে আমার এই বাহ্যিক আলাপ-আলোচনাটি দেখে কোনমতেই কল্পনা করা যায় না যে, আমরা একই ঘরে থাকি, এক পাতে খাই, কথায় কথায় কলহ বাধাই এবং শেষ পর্যন্ত কেমন একটা খেলো ধরনের প্রণয়সূত্রে আবন্ধ হয়ে আপোষ-রফা করি। হেনা বোধ হয় জাদু জানে।

পরিচালক মহাশয় আমার এই আগমনে প্রীত হয়ে যে বক্তৃতাটি করলেন তার আসল কথাটি হল এই, এখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য আমি যেন অধ্যাপিকাকে একটু প্রভাবিত করি। গভর্ণমেণ্ট চান্ প্রতিভাশালী কর্মী,—যাঁরা সুস্থ এবং সমৃদ্ধ জীবনরচনার কাজে সরকারকে সাহায্য করবেন। শ্রীমতী রায়চৌধুরীর স্বার্থত্যাগ, অধ্যবসায়, তাঁর যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য, এবং সর্বোপরি তাঁর গঠন কৌশল আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে!

প্রবীণ ছাত্রছাত্রী কয়েকজন বক্তৃতা করলেন। অবশেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য আমাকে একবারটি মুখ খুলতে হল।—"আপনাদের এখানে আমি নতুন, কিন্তু আপনাদের কাছে যে আন্তরিক স্নেহ ও সমাদর লাভ করলুম সেটি পরমাত্মীয়ের। আপনাদের অধ্যাপিকার মতো বিদুষী, মহিলার নিকট আতিথ্য লাভ করে আমি এখানকার কর্মধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছি। আমিও আপনাদের সংগে তাঁকে এই অনুরোধ জানাই, তিনি এখানকার গ্রামাঞ্চলের জীবনকে উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী ক'রে তোলার জন্য এইখানেই তাঁর স্থায়ী কর্মকেন্দ্র নির্মাণ করুন। এখানে এসে যে নিবিড় আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করলুম সেটি আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

চালাঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় হেনা আমাকে নত হয়ে অভিবাদন জানাল, এবং আমিও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলুম। হেনা সেটি একবার দেখে নিল।

ফিরে এসে আমি যখন আমবাগানের আশেপাশে পায়চারি করছিলুম, তখন অপরাহ্ন। দূরের থেকে দেখলুম, জিপ-গাড়িখানা এসে এক সময় হেনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। ঘরের কাজগুলি ইতিমধ্যে সেরে রেখেছে দেওকী, এবং তার 'মরদ' হেনার সর্বপ্রকার বাজারহাট ক'রে রেখে দিয়েছে।

আমিও ব'সে থাকিনি, কারণ এটি সাম্যের যুগ। কাপড়চোপড় গুছিয়েছি, বিছানাগুলি বিনাস্ত করেছি এবং হেনা তার চিরাভ্যাসমতো যা কিছু ওলোট-পালট ক'রে গিয়েছিল তা সযত্নে যথা-যোগ্য স্থানে তুলে রেখেছি।

আমার বক্তৃতাটা কূটনীতির দিক থেকে সম্ভবত হেনার ভাল লেগে থাকবে। সেই কারণে আমি যখন ঘরে উঠে এলুম,—সে এমনভাবে আমার গায়ের উপর প'ড়ে আদর জানাল, যার প্রকাশ্য চেহারাটায় যথেষ্ট সংযমের পরিচয় ছিল না। একপ্রকার সমাদর দেখলে হেনার ছোটবেলার পুতুলখেলাটার কথা আমার মনে পড়ে যায়। যাই হোক, এবার আগেভাগে শালোয়ার আর পাঞ্জাবি ছেড়ে সে শাড়ি আর সাধারণ জামা চড়িয়ে নিল। তারপর হাসিমুখে বলল, বিনুনিটা রাখলুম তোমার জন্যে। রাত্রে যখন ঘুমোবো তখন তুমি গেরো খুলে দিয়ো। দাঁড়াও, তোমার চা করি।

বললুম, কাল আমি চলে যাব, হেনা।

উনুনের কাছে বসে হেনা বাঁকা চোখে চেয়ে হাসল। বলল, আমার মাথার বেণী এত লম্বী নয় যে, তোমার পা দুটো বেঁধে রাখব।

আমি গেলে তোমার ঘর ত' আবার সেই ফাঁকা!

হেনা হাসিমুখে বলল, তোমার দিল্লীর ঘরও ত ফাঁকা! দুজনের ঘরই যদি শূন্য থাকে, কে কা'র জন্যে দুঃখ করবে বল? তাহলে কালই যাবার ঠিক করলে?

তা করলুম বৈকি।

হেনা আমাকে চা দিল। চা'য়ে যখন চুমুক দিচ্ছি, হেনা বলল, চল, ঘাটের ধারে গিয়ে বসি। তোমাকে আজ গান শোনাব। তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ,

পার্থ। আগেকার মতো তোমার প্রাণ থেকে সাড়া ওঠে না! কি হয়েছে বল ত?

আমি বললুম, তুমি সহজে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ, আমি কিন্তু ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছি।

আমার মন না ওঠে, তাহলে এটাকে কি শুধু নেশা বলবে?

হেনা উঠে এসে আমার হাত ধরে তুলল। হাসিমুখে বলল, চল। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম। দূরে যাওয়াটাকে ছেড়ে যাওয়া বলে না। যেখানেই

কাল আমি চলে যাব, হেনা।

ভয়? কেন?

তোমার আঁচল ধরে আছি শক্ত ক'রে, —তুমি যদি ছাড়িয়ে নাও কোথায় ঠিক্‌রে যাব জানি নে।

চায়ের পেয়ালাটা রেখে হেনা বলল, এইটিই মোহ, পার্থ। এইটিকেই নেশা বলছিলুম। এই নেশাকেই ভালবাসা বলে ওদেশের লোক, আমরা কিন্তু বলিনে। মোহ যাদেরকে পেয়ে বসে তারা এক আঁচল থেকে অন্য আঁচলে ঘোরে। দেখলে ত' নবেন্দুর দশা? তুমি কেন এই মোহ ছাড়িয়ে উঠবে না, পার্থ? একটা কথা বিশ্বাস কর তুমি, এই নেশায় যদি তুমি ডুব দাও, আমিও যে তোমার সঙ্গে নামতে থাকব! তুমি সংযতস্বভাব বলেই না আমার মাথা উঁচু! ওরা আজ তোমাকে যেটুকু সম্মান দিল, সেটুকু মনে মনে আমি ত' গ্রহণ করলুম!

এবার আমি স্খলিত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালুম,—তোমাকে ছেড়ে যেতে যদি

তুমি যাও, আমার ঘর ভরেই ত তুমি থাকবে! চল—

আমবাগানের তলা দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে আমরা ঘাটে এসে পেঁাছলুম। বোধ হয় শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী কি সপ্তমী, —গঙ্গার উপরে জ্যোৎস্না পড়েছিল। কুকুরটা কতদূর এল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, তারপর নিজেই আবার ফিরে গেল। মৃদু স্নিগ্ধ হাওয়া দিয়েছে গঙ্গার ওপর দিয়ে। গত কয়েকদিনে আমরা একটি বিশেষ জায়গা পছন্দ করেছিলুম। সেখানে এসে দেখি, দেওকী কখন্ আগে-ভাগে এসে একখানা চাটাই, কম্বল ও গোটা দুই বালিশ রেখে গেছে। হাতের পাশে রেখেছে একগাছা লাঠি এবং একটি গাছের আড়ালে রেখে গেছে নিবু-নিবু একটি হারিকেন লণ্ঠন। আমরা কিয়ৎক্ষণ পায়চারি করে ওখানে এসে বসলুম। অন্ধকার ততক্ষণে ঘন হয়েছে।

হেনা সঙ্গে এনেছিল একখানা হালকা গরম চাদর, সেখানা ঝুপ করে আমার উপর ফেলল। চাদরখানা খুলে গায়ে জড়িয়ে নিলুম।

এ যেন অনন্তকালের থেকে একটি বিচ্ছিন্ন টুকরো। এ জীবনে যাকে সব চেয়ে বেশি ক'রে জানি, যাকে জানতে মনোজগতের এক রহস্য থেকে অন্য রহস্যের দিকে চিরকাল অভিযান করে চললুম, তাকে নিয়ে সর্বাপেক্ষা এক অজানা অঞ্চলে কয়েকটি অতি মধুর দিন কাটিয়ে গেলুম। নিবিড় আনন্দে দিশাহারা হয়েছি অনেকবার, বেদনার মাধুর্যে রোমাঞ্চিত হয়েছে মন অনেক-দিন। কিন্তু তবু জানি, সর্বাপেক্ষা নিকটে যে-মেয়ে রইল চিরদিন, সে অনেক দূরের, দুজনের মাঝখানে আমাদের লক্ষ যোজনের ব্যবধান!

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় হেনার মুখখানা স্পষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু সেই মায়ালোকে তাকে মনে হচ্ছিল অপার্থিব। অনেকবার সবিস্ময়ে ভেবেছি, জীবনযাপনের এই কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যে তার দেহলাবণ্য এবং স্বাস্থ্যশ্রী এমন প্রদীপ্ত থাকে কেমন করে? বিধবার ঘরে সে চিরদিন মানুষ, সেখানে ভোগবিলাসের উপকরণ ছিল সীমাবদ্ধ,—অনেক ছিল অব্যবস্থা আর বিশৃঙ্খলা। এখানে সে একাহারী, অত্যন্ত শাদামাটা তার আহার্যসামগ্রী, —প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোথাও কিছু নেই। এখানে সঙ্গীর অভাব, আনন্দের আয়োজন কোথাও নেই,—এটাকে স্বেচ্ছানির্বাসন বললে ভুল হবে না। কিন্তু আশ্চর্য, কোনটা স্পর্শ করেনি হেনাকে,—যেন সে নিজের ভিতর থেকে কেমন একটা শক্তি নিরন্তন আহরণ করে, যেটার প্রভায় সে নিত্য প্রদীপ্ত। তার শক্তির এই উৎস কোথায় আজও বুঝতে পারিনি।

হেনা?

হেনা আমার দিকে ফিরে বলল, কি?

বললুম, তুমি এখানে অনেক টাকা এনেছিলে জানি, কিন্তু সেকি অফুরন্ত?

হঠাৎ টাকার কথা তুললে কেন?—হেনা জানতে চাইল।

বললুম, যে-ব্যক্তি পরের জন্যে শুধু খরচ করে অথচ উপার্জন করে না, তার হাত কি এখনও শূন্য হয়নি? আমি তোমার জন্যে কিছু টাকা এনেছি হেনা।

হেনা বলল, অসুবিধে কি জান, এখানে টাকা রাখার জায়গা নেই। নিজের খরচের টাকা মিঃ মালকানির কাছে রাখতে লজ্জা করে। তোমাকে বলা হয়নি, দেওকীর ঘরকন্না আমাকেই দেখাশুনো করতে হয়। তবে আসছে মাস থেকে ওর স্বামী একটা কাজ পাবে। ঘরে আমি টাকা রাখব কেমন ক'রে? যদি একটু বড়মানষি করি সেটা লোকের চোখে ঠেকে। এখানে থাকতে গেলে নিজকে অনেক বিষয়ে বঞ্চিত করতে হয়, পার্থ।

বললুম, যেখানে যাবে সেখানেই এই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।

না, এবার আমি অন্য ব্যবস্থা করব। তবে এখনই কিছু ঠিক ক'রে বলা যাচ্ছে না। ভবিষ্যতের কথা আমি অত ভাবতে পারিনে, পার্থ।

হেনা চুপ ক'রে গেল। তারপর হঠাৎ এক সময় সে কলকলিয়ে হেসে উঠল। বলল, তুমি নিশ্চয় হাত গুণতে জান, তাই টাকা এনেছ! আমি দিল্লী গিয়েছিলুম শুধু কি তোমার চাঁদমুখ দেখবার জন্যে? তোমার রোজগারের টাকা আমার কাছে সব চেয়ে মিষ্টি!

আমি চুপ ক'রে রইলুম। হেনা এক সময় গুনগুনিয়ে উঠল :

"না না না, ডাকব না, ডাকব না,
অমন করে বাইরে থেকে ডাকব না—"

এ গানটি আমার বিশেষ প্রিয়, হেনা জানত। কিন্তু আজকের এই পটভূমিতে এ গান অন্য ব্যঞ্জনা নিল। যশিদির সেই বাগানবাড়িতে ব'সে বার বার যে গানটি শুনেছি, এখানে এই অন্ধকার গঙ্গার সামনে চন্দ্রহসিত অনন্ত গগনের নীচে তার কেমন একটা ভিন্ন অর্থ দাঁড়াল। এই কামনা, এই বেদনা এবং এই আরাধনা—এ যেন অনাদি অনন্তকাল-ব্যাপী কোনও এক বৈকুণ্ঠলোকের বিরহ বিলাপ, এর সঙ্গে দিগদিগন্তজোড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অশ্রুসজল বাসনা বিজ-ড়িত। আমি যেন কোন্ গ্রহলোকে অবলুপ্ত হয়েছিলুম।

গান থামল। হেনা হাসল। হেসে বলল, তুমি কাছে থাকলে গলার মধ্যে গানের কথাগুলো যেন কাঁদতে বসে। কিন্তু তুমি কাছে না থাকলে গান গাই-বার কথাও মনে থাকে না!

আমি চুপ করেই ছিলুম। এবার বললুম, যে-মানুষ সব চেয়ে কাছে রয়েছে জানি, তার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে মন বায়না ধরে কেন?

হেনা হেসে উঠল। বলল, ওই আকুলতাই অসংযমের ভূমিকা, পার্থ। ওটা থাকতে না আছে শান্তি, না সত্যি-কার আনন্দ। শোন তবে সেবারের কথা। পাটনা থেকে তোমার সঙ্গে সেই যে যশিদির বাড়িতে গিয়ে উঠলুম, মনে করে দেখ,—সে কি শুধু দিন ধরে শুধু ঘুমোচ্ছিলুম প'ড়ে প'ড়ে? মোটেই না? বাঘিনী নিঃসাড় হয়ে ওৎ পেতে ছিল তোমার জন্যে! তোমার হাসির টুকরো, পায়ের আওয়াজ, প্রতি আনাগোনা, প্রতিটি সঞ্চার—মনে মনে লেহন কর-ছিলুম! তুমি একবার আমাকে ছুঁলে আর রক্ষে ছিল না, পার্থ! কিন্তু আশ্চর্য তুমি, তোমার সেদিনকার নিস্পৃহ স্বভাব-সংযত পৌরুষ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেদিন আমার শরীরের শত সহস্র শিরা উপশিরা, অন্ত্রতন্ত্র, মেদমজ্জা, প্রতিটি দেহকণা, হৃৎপিণ্ডের প্রতি রক্তবিন্দু সর্বগ্রাসী বাসনায় দাউ দাউ ক'রে জ্বলছিল। কিন্তু বিজ্ঞানপড়া মেয়ের চোখ দুটো ছিল খোলা, এবং

মস্তিষ্ক নির্মোহ। বোধ হয় সেইজন্যেই সেদিন বিছানায় প'ড়ে নিজের ভিতরকার রাস-রসরঙ্গ দেখে যেমন মুগ্ধ হচ্ছিলুম, তেমনি শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলুম তোমার পায়ের কাছে। তবে কেন আজ তুমি বায়না ধরে হাত বাড়াচ্ছ, পার্থ? তোমার ত্রিসীমায় সংযমের অভাব ত' নেই!

একটু হেঁট হয়ে হেনা হাত বাড়িয়ে আমার চিবুক নেড়ে দিয়ে মৃদু গলায় বলল, বুকের ওপর যার আস[illegible] চিরকালের জন্যে স্থির হয়ে রয়েছে, সে ত' কেবল সামান্য পুরুষ নয়,—সে যে আমার জীবনের পুরুষোত্তম। কাল তোমাকে হাসিমুখে ছেড়ে দিতে আমার একটুও বাজবে না, পার্থ। যত দূরে যাবে' ততই কাছে আসবে।—আচ্ছা, এবার চোখ বুজে থাক, তোমাকে একটি মীরার ভজন শোনাই! এরপর গাইব তোমার আরেকটি প্রিয় গান: "রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার যাবার আগে—।"

পরদিন যথাসময়ে জিপগাড়িখানা কানপুর ষ্টেশনে আমাকে পেঁাছিয়ে দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, দুপুর বেলাকার ডাকগাড়ি ধরে সন্ধ্যার পরে আমি দিল্লী পেঁাছেছিলুম। গত প্রায় এক সপ্তাহকাল অতি পরিচিত সভ্য জগতের বাইরে গিয়ে যেন একটা আত্মবিলুপ্তি ঘটেছিল। সে অবস্থাটা কেমন জানিনে, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসে সমগ্র দিল্লীকে মনে হচ্ছে অচেনা: যেন পূর্বজন্মের স্বপ্নকথাগুলি কেমন একটা বিভ্রান্ত অবস্থায় শুনতে এসেছি! পথঘাট কিছু চিনতে পারিনি। দরিয়াগঞ্জের পথ ছেড়ে লালকেল্লার পাশ দিয়ে ফিরোজশা কোট্‌লা পেরিয়ে যাবার সময় মনে হচ্ছিল আমি এক ভিন্ন গ্রহলোকের মানুষ। মনে মনে বলছিলুম, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!

কোন্‌খানে!—আমি জানিনে। নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসে শ্রান্ত দেহে যখন একটু শুয়ে পড়বার কথা ভাবছিলুম, অভিমানে যেন ভিতরটা উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। নতুন পোশাক চড়িয়ে আমার পাচক এবং খানসামা যখন সামনে এসে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়াল তাদের ঠিক কি বলা উচিত আমি ভেবে পেলুম না। নিজকে যেন বড় শূন্য, বড় দরিদ্র, বড় পরিত্যক্ত মনে হল। ঘর ছেড়ে এখনই চলে যেতে ইচ্ছা করল, নিরুদ্দেশ পথে ঘুরে ঘুরে নিজের এই বেদনাটাকে রাত্রির ওই নক্ষত্রখচিত গগনের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল! হেনা আমাকে বুঝতে পারেনি, আমিও হেনাকে বোঝাতে পারিনি। কিন্তু এ জীবন এমন ক'রে শূন্য হলে আমার চলবে না!

রাত্রির রান্নার কিছু দেরি ছিল। খানসামা যথারীতি যন্ত্রচালিতবৎ এক পেয়ালা গরম কফি ও কয়েকটা বাদাম রেখে গেল। আমি মনে মনে সমস্তটার বিরুদ্ধে কেমন যেন আর্তচিত্তে নিষ্ফল প্রতিবাদ জানাচ্ছিলুম।

পরদিন যথাসময়ে হাসিমুখে দপ্তরে গিয়ে হাজির হলুম, এবং মাত্র এক সপ্তাহকালের মধ্যেই যে আমি সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছি এজন্য আমার অধস্তন সহকর্মীরা এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানাল। ওরা আমার কর্মতৎপরতা দেখে কোনমতেই বুঝতে পারল না যে, আমার অনেকখানি অংশ এখনও ফিরে আসেনি। বলা বাহুল্য আমার চেম্বারে বসে অগণিত ফাইলের মধ্যে দেখতে দেখতে আমি ডুবে গেলুম।

যা ভয় করেছিলুম তাই। দিন তিনেক পরে একখানা নোটিশ এসে আমার টেবিলে হাজির হল। এমন চাকরি আমার ভাগ্যে জুটেছে যে, কোথাও আমাকে স্থির থাকতে দেবে না। উড়িষ্যা রাজ্যের বিশেষ প্রজেক্টের জন্য আগামী সতেরই তারিখে ভারি যন্ত্রপাতিসহ বড় একখানা বিলেতী জাহাজ কলকাতায় এসে পেঁাছবার কথা। সুতরাং উনিশ তারিখে যে তিনজন বিশিষ্ট কর্মচারী উক্ত মালপত্র তদন্ত করতে যাবেন, আমি যেন সেই তিনজনের একজন হই। মোট এক সপ্তাহ সময় এর জন্য নির্দেশ করা হয়েছে, এবং আমরা কলকাতায় গিয়ে যথাসময়ে যন্ত্রবিশেষজ্ঞগণের দেখা পাব। বিষয়টি জরুরী। নোটিশের ওপর লালকালির ছাপমারা।

হেনার ওখান থেকে ফিরে এসে এক পত্রে আমি হেনা ও তার সহকর্মিগণকে অভিনন্দন জানিয়েছিলুম। সে পত্র যথাস্থানে পেঁাছতে কি প্রকার সময় লাগতে পারে, এবং তার জবাব হেনা লিখবে কতদিনে,—সেইটি আমি গবেষণা করছিলুম। হেনার চিঠি লেখার অভ্যাস একেবারেই কম। একমাত্র আমাকেই সে চিঠি লেখে নিয়মিত। কিন্তু আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ড থেকে চিঠি আসতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে বেশি সময় লাগে ভারতের এক জেলার গ্রাম থেকে অন্য

জেলার গ্রামে চিঠি গিয়ে পেঁছতে। অনেক ক্ষেত্রে টেলিগ্রামের আগে চিঠি গিয়ে পেঁছয়। সুতরাং আমাকে এক প্রকার নিরুপায় হয়ে যখন হেনার চিঠির অপেক্ষা করতে হচ্ছিল, তখন এই নোটিশ পেয়ে আমি আরেকখানি চিঠি দিলুম: আগামী আঠারই তারিখে আমি কলকাতায় পেঁছচ্ছি, তোমার জন্য কিছু করার থাকলে বাড়ির ঠিকানায় অবিলম্বে চিঠি পাঠিয়ো। আগামী পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত কলকাতায় থাকব, ছাব্বিশে দিল্লী ফিরব।

ছোটবেলায় শুনেতুম মেয়েরাই চিঠির জন্য হা-পিত্যেশে বসে থাকে। গোপনপত্র আনাগোনার জন্য বাড়ির ঠিকে-ঝি এবং ডাকপিয়ন—এরা দুজন অপ্রকাশ্যে বকশিস পায়। যে-নতুন-বৌয়ের স্বামী বিদেশে চাকরি করে, সেই বৌ শ্বশুরবাড়িতে এসে নাকি সর্বাগ্রে খোঁজে কচি একটি দেবর আছে কিনা। সেই দেবর এনে দেয় খাম আর চিঠির কাগজ এবং ঠিকানা জটিল হলে সেটাও লিখে দেয়। তা ছাড়া চিঠির ভিতরকার ভাষাটা যদি কিছু প্রাদেশিক বুলি সমাকীর্ণ হয়, তবে ওখানা সংগোপনে রেজিস্টারী করে দিয়ে আসে ওই দেবর। একালে সব উলটো। মেয়ে সাইকেল চড়ে, পুরুষ নাচে! মেয়ে চাকরি করে, পুরুষ তার ঘর সামলায়! মেয়ে পায়জামা পরে, পুরুষ লুঙ্গি। মেয়ে পার্টি দেয়, পুরুষ রাঁধতে বসে! আমি হেনার চিঠির জন্য হাঁ করে বসে থাকা সত্ত্বেও যাবার দিন পর্যন্ত পোড়ারমুখীর চিঠি এল না, এবং দাঁতে দাঁত ঘষে হাতের মুঠি পিছন দিকে লুকিয়ে খানসামাকে বলে গেলুম, সেই মেমসাব যদি এর মধ্যে এসে পড়েন তবে তাঁকে এখানে থাকতে বলো। আমি এক হপ্তা বাদে ফিরব।

হেনার জন্য শুকনো মেওয়া ফল, খান দুই শাড়ি, মাথার তেল, সাবান ও শ্যাম্পু, একটি বিস্কুটের টিন, কয়েকখানা সচিত্র সাময়িকপত্র— এগুলি রেখে গেলুম। কি জানি সেই ক্ষণমর্জি সম্পন্না মেয়ে যদি হঠাৎ আসে, এবং অপেক্ষা না করেই চলে যায়! পালাম বিমানঘাঁটি থেকে প্লেনে ওঠে ভাবছিলুম, বাস্তবিক, এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে কে কবে থেকেছে? প্রতি পদক্ষেপে আমার জীবনে স্বপ্নের দোলা! কাছে সে নেই, দূরে থেকেও অনিশ্চিত, তার গতিবিধি জানব না, তার কর্মনীতি অনির্দিষ্ট, ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট, তার আসা-যাওয়ার পথ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—অতএব আমার নিজের জীবনও তার খেয়ালখুশির সঙ্গে বাঁধা। সেদিন রাত জেগে হেনা সব কথাই বলল। কিন্তু এ প্রশ্ন করল না, আবার কবে আসছ! গানের মধ্যে বিরহ-বিচ্ছেদের বেদনা ঢুকিয়ে আমার মতো উজবুকের চোখেও সে জল টেনে আনল সেই জ্যোৎস্নারাত্রে! কিন্তু কই, একথা একবারও বলল না, তোমার জন্যে আমি পথ চেয়ে থাকব। দুজনে দেখা যখন হয়, তখন আনন্দে দুজনের সামনে থেকে যেন নিখিল বিশ্ব হারিয়ে যায়, কিন্তু চোখের আড়ালে এলেই অমনি কাকস্য পরিবেদনা! এবম্বিধ ভালবাসা ঠিক আমার হজম হচ্ছে না!

সকালের নরম রৌদ্রের ভিতর দিয়ে আমাদের বিমানটি ভেসে চলেছে। নিচের দিকে ঈষৎ কুয়াশার ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা নদী দেখা যাচ্ছিল। নদীর ধারে ধারে মস্ত শহর; অতি ক্ষুদ্র পুতুলের বাক্সর মতো ঘরবাড়িগুলি চোখে পড়ছে। এদিকে নদী ওদিকে নদী, কিন্তু কোন্‌টি গঙ্গা বা যমুনা, কোনটি কানপুর বা আগ্রা—কেমন করে বুঝব? বিমানের কল্ বিগড়ে গিয়ে যদি হেনার কাছাকাছি নামতে বাধ্য হতুম তাহলে এখনই তাকে বলতুম, হেনা, যখনই কাজের কথা বলতে গেছি, তুমি আমাকে বক্তৃতায় ভুলিয়েছ! হেসে, কেঁদে, কাৎ হয়ে, চিৎ হয়ে, এপাশ-ওপাশ ফিরে—আমার মতন ভবীকে শুনিয়ে এসেছ বক্তৃতা, এবং আসল কথাটা এড়িয়ে গেছ! কিন্তু জেনেছ কি, ভবী ভুলবার নয়? কামিনীর মুখে নৈতিক বক্তৃতা শুনে আর কতদিন হাততালি দেব বলতে পার? তুমি বিজ্ঞানের বিদুষী ছাত্রী মানলুম, কিন্তু যৌবনের বিচিত্র বিজ্ঞানের দু'একখানা বই কি তুমি আজও ওলটাওনি? চুম্বক-পাথরটি তুমি রেখেছ নিজের কাছে আঁচলের আড়ালে,—বেশ্। কিন্তু যে গতিতে বারে বারে তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছ,—সেই দ্রুতগতিতেই যে আমাকে কাছে টানছ? এই টানা-পোড়েনের কৌতুকের খেলা চলবে আর কতকাল? আর কতকাল এমন করে তোমার নিত্যশুভার্থীকে দগ্ধ করবে?

অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, এবারও বিমান-দুর্ঘটনা হল না এবং এবারও আমার ইন্‌স্যুওরেন্সের দশটি টাকা লোকসান গেল! বলা বাহুল্য, ক্ষতিপূরণের দরুণ এক লক্ষ টাকা হেনার নামে এসাইন্ করা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরেও যে ওকে একটু জব্দ করব, সে সুযোগ এবারেও হারালুম।

এই সেদিনও হেনার চালাঘরে শুয়ে বলছিলুম, তোমার এই গঙ্গায় যদি আমার নৌকো ডুবে যেত, তুমি কোনদিন টেরও পেতে না যে আমি তোমারই কাছে আসছিলুম!

অন্ধকারে বিছানা থেকে মাথা তুলে জ্বলজ্বলে দুই চোখ আমার ওপর রেখে হেনা বলল, ডুবে যেতে! যতদিন আমি থাকব বেঁচে, ততদিনের মধ্যে কখনও যদি তোমার পায়ে কাঁটা ফোটে তখন আমাকে বলো! কিন্তু যেদিন থেকে তুমি আমার সততায় সন্দেহ করতে আরম্ভ করবে সেইদিন থেকে তোমার বিপদ এবং সেইসঙ্গে আমার অপমৃত্যুরও আরম্ভ হবে! পার্থ, তুমিই আমার অস্তিত্ব।

এসব 'বৈজ্ঞানিক' দর্শন আমি বুঝিনে। কিন্তু থাক্, কাজ নেই। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করে গেলুম! বিমানখানা এক সময়ে নিরাপদে দমদমে এসে নামল। ঈশ্বর, তুমি সাক্ষী, হেনার নিন্দে আমি করিনি!

বাড়ি এসে পৌঁছতে দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেল। বুড়িপিসি ছিল

খুড়িমার ওখানে। আমার ডাকে ছুটতে ছুটতে এল। বলল, ওমা, এ যে মেঘ না চাইতেই জল! মুখখানি যে শুকনো! দাঁড়াও বাছা, চাবিটে আনি।

ভাঁড়ার ঘরে কোথায় যেন চাল-ডালের হাঁড়ির মধ্যে বুড়িপিসি চাবি লুকিয়ে রাখে। সেখান থেকে চাবি এনে সে খুটখাট করে এক একটি ঘর খুলে দিল। বলল, চিঠিপত্তর সব গুছিয়ে রেখেছি তোমার টেবিলে, খোকন। আমি যে দুবেলা ঘরদোর ঝাড়ি মুছি!

থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, একটা কথা বললে রাগ করবে, বুড়িপিসি?

বুড়িপিসি তৎক্ষণাৎ খাড়া হয়ে উঠল। বলল, অসৈরোন বললে কে না রাগ করবে? বল—

আমি সবিনয়ে বললুম, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। হেনা থাকলে এক্ষুণি দুটি ভাতে-ভাত চাড়িয়ে দিত!

কেন, আমি পারিনে?— বুড়িপিসি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, ক্ষুদে ননদ এলেন খোঁটা দিতে! এ ঘরে কি অভাব আছে কিছু? হেনা! হেনা রেঁধে দেবে তোমাকে? রান্নার ভয়ে সে বিয়ে করল না, আইবুড়ো হয়ে রইল!

বুড়িপিসি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইলেকট্রিকের ক্যাবিনেট্ উনুনে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিল। ওদিক থেকে খুড়িমা সাড়া দিলেন।

জবাব দিয়ে বললুম, আমি স্নান সেরে আসছি, খুড়িমা—

বাথরুমের চাবি আমিই প্রথম খুললুম। হেনা সেদিনও বলে দিয়েছে, এই বাথরুমটি শুধু তোমার একার। অন্য কেউ ব্যবহার করলে আমি দুঃখিত হব। চাবি তোমার কাছে রেখ।

আমিও এই নতুন সজ্জিত স্নানের ঘরে প্রথম ঢুকলুম। ধারাযন্ত্রটি আগা-গোড়া এনামেল করা। দেওয়ালে একটি সুন্দর বাক্স আঁটা। তার মধ্যে সাবান, তেল, ক্রীম, পাউডার, শাম্পু, চিরুনি, দাঁত মাজনের এবং দাড়ি কামাবার প্রত্যেকটি সামগ্রী, গা রগড়াবার রবারের বুরুশ ইত্যাদি ইত্যাদি। এদিকের হ্যাঙ্গারে রয়েছে খানচারেক তোয়ালে। কাঁচের তাকে একখানা কারবলিক সাবান। মাথার উপরে ঝুলছে ছোট একখানি পাখা। ঘরটি আগাগোড়া ইতালীয়ান টালিতে মোড়া। এ ছাড়া এখানে ওখানে যা রয়েছে সমস্তই আধুনিক ফ্যাশনের সাক্ষ্য।

আগাগোড়া সব দেখেশুনে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে আবার চাবি দিয়ে অন্যত্র স্নান করতে চলে গেলুম। এ যেমন আছে তেমনিই থাক্।

স্নান সেরে বাইরে এসে দাঁড়াতেই খুড়িমা এগিয়ে এলেন। হেসে বললেন, খুব ছেলে যা হ'ক। সেই যে গেলি একখানা চিঠি পর্যন্ত নেই!

বড্ড কাজের চাপ, খুড়িমা। যত দিন যাচ্ছে কাজে ডুবছি।

হেনার খবর পেলি কিছু?

হ্যাঁ, সে ভালই আছে। কানপুরে চাকরি নিয়েছে। সে এখন অনেক উঁচুতে, নাগাল পাবার যো নেই।—আমি হাসলুম।

খুড়িমা বললেন, বেশ বেশ, বড় আনন্দের কথা। একটা কাজ নিয়ে যদি এক জায়গায় শান্ত হয়ে থাকে, সেই খুব ভাল। খবরটা পেয়ে আমি বাঁচলুম। তুই থাকবি কদিন, খোকন?

দু'চারদিন আছি, খুড়িমা—

বুড়িপিসি টেবলের ওপর গরম-গরম ভাতের থালা এনে রাখল। মাছ-ভাজা এবং ডিমের কালিয়া দেখে খুড়িমার দিকে চেয়ে হাসলুম। খুড়িমা বললেন, বুড়িপিসিকে আবার রাঁধাতে গেলি কেন? আমার সব রান্না ছিল। এখনও আমি খেতে বসিনি রে।

বুড়িপিসি গিয়ে খুড়িমার ভাতের থালাও আমার সামনে এনে দিল। আমরা দুজনে বসে গেলুম। বুড়িপিসি দুজনের ভাতে গাওয়া ঘি ঢেলে দিল। অতঃপর দই, কলা এবং সন্দেশ এনে রাখল দু'জনের থালার পাশে।

বড়দিদির কোনও খবর পেলে, খুড়িমা?

খেতে খেতে খুড়িমা বললেন, নতুন কিছু নেই। সেই ভাগলপুরেই লাবণ্য আছে। তবে রাঙাদিদি যে কারণে রাঁচি গিয়ে রইল, ঠিক সেই কারণেই লাবণ্য এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিল!

বটে? আর সুরমা?— আমি সকৌতুকে প্রশ্ন করলুম।

ওর আবার ছেলেপুলে হবে কিনা, তাই শ্বশুরবাড়িতেই আছে।— খুড়িমা বললেন, শোন্ খোকন, যদি রাগ না করিস একটা কথা বলি।

মুখ তুলে খুড়িমার দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, সামনে এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে নিন্দের মুখ বন্ধ হয়ে যায়! তোকে আর হেনাকে আমি সবচেয়ে বেশি করে জানি বলেই তোদের নিন্দে আমি সইনে। কিন্তু চারদিকে যখন নোংরা কথা রটতে থাকে, তখন কা'র মুখে হাত চাপা দেব বলতে পারিস?

এবার হাসিমুখে বললুম, তোমার কথার কি জবাব দেব ঠিক বুঝতে পারছিনে, খুড়িমা।

খুড়িমা বললেন, তোরা দু'জনেই সামনে থেকে সরে গেলি, কথাটা তাই চারদিকে ঘোরালো হয়ে রটেছে। নবেন্দুর মামলাটাই যত নষ্টের মূলে। সকলের চোখ পড়েছে সেইজন্যে। দুঃখের কথা কি জানিস খোকন, মেয়ে-মানুষের নামে অপযশ রটলে কেউ অবিশ্বাস করতে চায় না। হেনাকে অনেকবার একথা বলেছি।

আমি বললুম, সবটাই মিথ্যে অপযশ নয়, খুড়িমা—কিছু সত্যি আছে বৈকি। কিন্তু অপযশটাই হেনার পক্ষে একমাত্র সত্যি নয়। নিজের ক্ষমতায় নিজের জীবনকে শুচিশুদ্ধ করে যে উঠে দাঁড়িয়েছে, নিন্দে তার পা পর্যন্ত এসে পৌঁছবে না কোনদিন! এ তুমি নিশ্চয় জেন, খুড়িমা।

খুড়িমা খুশী মুখে খেতে খেতে বললেন, হেনা যদি সবাইকে ছেড়ে সব ভাসিয়ে দিয়ে একাই গিয়ে বিদেশে রইল, তাহলে সে এবাড়ি এমন ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে গেল কেন?

এবার আমি হেসে উঠলুম। বললুম, খুড়িমা, এতক্ষণে তোমার মনের কথা বুঝলুম!

বুড়িপিসি রান্নাঘরে যাবার আগে ফস ক'রে বলে গেল, মন না মতিভ্রম!

খুড়িমা হাসিমুখে বললেন, সন্দেহটা যে হেনাই ধরিয়ে দিয়ে গেল রে!

আমি বললুম, খুড়িমা, কোনও রহস্যই হেনা রেখে যায়নি! তরোয়ালের ঝকঝকে ফলার মত সে স্পষ্ট। কিন্তু মেয়ে সে। পরের ঘর গুছিয়ে দিয়েই তার আনন্দ, ওটাই তা'র প্রকাশ। তুমি ভুল করেছ, আমি তার মনের খবর জানিনে। সে-মেয়ে কাছের নয়, সে অনেক দূরের, আমাদের নাগালের বাইরে। সে যদি তার মনের কথা কোন-দিন জানায়, তোমাকে আমি লিখে পাঠাব।

খুড়িমা আমার মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বললেন না। আমাদের খাওয়া শেষ হয়েছিল। তিনি এক সময় হাত ধুয়ে এসে আঁচল খুলে টাকা বার ক'রে বললেন, এইনে খোকন, তোর তিন মাসের বাড়িভাড়ার টাকা।

(ক্রমশ)

এলোপাতাড়ি ইতিহাস

দুলকেশ দে সরকার

কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য ১৭৫৬ সালের অক্টোবর মাসে মাদ্রাজ থেকে এক অভিযাত্রী দল রওনা হ'ল। চারটি রণপোত, ৯০০ ইউরোপীয় সৈন্য ও ১,৫০০ সেপাই। এদের নেতৃত্বভার ছিল ক্লাইভ আর ওয়াটসনের ওপর। ডিসেম্বর নাগাদ গঙ্গাতীরে ফলতায় পৌঁছোনো গেল। সেখানে ইংরেজ উদ্বাস্তুদের কি দুর্দশা! হাতের কাছে যা ছিল তাই নিয়েই ক্লাইভ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ক্লাইভের চরিত্রে এই দুঃসাহসই বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালেও এই দুঃসাহসই তাঁকে সফলকাম করেছে।

২৭শে ডিসেম্বর ক্লাইভ কলকাতার দিকে রওনা হ'লেন। কলকাতার বাম-তীরে কলকাতার দক্ষিণে বজবজ গ্রামে যে দুর্গ ছিল তাতে আঘাত পড়ল। সিরাজের দৃষ্টিবিভ্রান্তির জন্য তিনি নদীকে আশ্রয় করলেন। ইচ্ছে ছিল গ্রামের কিছুটা উত্তরে—অর্থাৎ গ্রাম ও শহরের মাঝামাঝি জায়গায়—সৈন্যদের নামাবেন। তাহলে নিরুপায় দুর্গটি আত্মসমর্পণ করতে পারে। এডমিরাল সায় দিলেন না। তখন নৌকো ক'রে ক্যাপ্টেন কুটকে সসৈন্য বজবজের দিকে পাঠানো হ'ল। ক্লাইভকে ভাঁটিতে সসৈন্য নামিয়ে দেওয়া হ'ল। নিশাকালে জলা-ভূমির ওপর দিয়ে চলল পদযাত্রা। গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়লেন ২৯শে ডিসেম্বর।

ক্লাইভ সঠিক খবর পাননি। তিনি শুনেছিলেন কুট দুর্গে অবতরণ করেছেন। মানিকচাঁদ দু'তিন হাজার সৈন্য নিয়ে দু' মাইল দূরেই ছাউনী ফেলেছেন তা জানতেন না। ক্লাইভ তাঁর সেনাদলকে তিনটি ভাগে সাজিয়ে রেখেছিলেন। এমন সময় মানিকচাঁদ অতর্কিতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রত্যুৎপন্নমতি না থাকলে তাঁর দেহ ও ভবিষ্যৎ জীবন এখানেই খণ্ডিত হয়ে যেত। একটিমাত্র গুলীতেই সংঘর্ষের মোড় ফিরে গেল। গুলীটা মানিক-চাঁদের পাগড়ী ভেদ ক'রে গেছল। অমনি তিনি আতঙ্কে কলকাতার দিকে ছুটলেন। দুর্গ হাতে এল, ১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারী ক'লকাতার পুনরুদ্ধার হ'ল।

ক'লকাতায় যখন ইংরেজরা ফিরলেন তখন তাঁদের ভিখিরীর অবস্থা। কোম্পানীর ভাতা ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই। কারবার গেছে, সম্পত্তি গেছে, ঘরগুলো ধ্বংসে কিংবা পুড়ে গেছে। সেণ্ট অ্যানির গীর্জা ধ্বংসস্তূপ মাত্র; দুর্গের ভেতরকার ভালো ভবনটি ভেঙে মসজিদ করা হয়েছে। তবু এই নিয়েই এডমিরাল ওয়াটস, কুট আর ক্লাইভের মধ্যে সে কি ঝগড়া। সবাই এ দুর্গের দাবীদার। শেষে এই মীমাংসা হ'ল যে, এডমিরাল ওয়াটস দুর্গের চাবি দেবেন কুটকে, কুট দেবেন ক্লাইভকে।

জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি নবাব আবার কলকাতার দিকে অভিযান পরি-চালনা করলেন। খুব সহজেই জয় হবে এই ছিল তাঁর আশা। শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল আগের মতোই। শহরের মাঝখানে এক ইটের দুর্গ, প্রান্তসীমায় মারাঠাদের প্রতিরোধে ১৭৪৩এ কাটা দীর্ঘ খাল। এই খাল চীৎপুর থেকে শুরু এক মাইল পুবে গিয়ে আধ মাইল-টেক দক্ষিণ-পূর্বে গেছে। এর পর এর-ওর বাগানবাড়ীর পাশ কাটিয়ে সার্কুলার রোডের সমান্তরাল রেখায় সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। দু' জায়গায়, আজ যাদের নাম গ্যাস স্ট্রীট আর বৌবাজার স্ট্রীট তারা এর ওপর দিয়ে গেছে পুবে। আরও দক্ষিণে গিয়ে খাল গেছে হারিয়ে।

নবাবের সৈন্যসংখ্যার তুলনায় ক্লাইভের সৈন্যসংখ্যা ছিল নগণ্য। কিন্তু ক্লাইভের মধ্যে যে অদম্য দুঃসাহসিকতা ছিল তার কিছুই ছিল না নবাবের মধ্যে। ক্লাইভ চোখ চেয়ে দেখলেন গঙ্গানদী প্রবাহের সুবিধে। এটি ইংরেজদের আয়ত্তেই ছিল। শহরের উত্তরে একটা সুরক্ষিত দুর্গে ইংরেজ সৈন্যদের জমায়েত করা হ'ল। নবাব এদের পাশ কাটিয়ে লবণ হ্রদ আর মারাঠা খালের মাঝামাঝি জায়গায় শিবির ফেললেন। তাঁর কিছু সৈন্য খাল পার হ'য়ে রাস্তা-গুলোর প্রবেশমুখ অবরোধ ক'রে রইল। নবাব স্বয়ং আমিচাঁদের বাগানে আস্তানা গাড়লেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা হবে ৪০,০০০; ক্লাইভের সর্বসাকুল্যে ১,৩৫০ জন ইউরোপীয় সৈন্য আর ৮০০ দেশী সেপাই, অর্থাৎ দু' হাজারের সামান্য কিছু বেশী। সংখ্যাটা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু নবাবের মতো সৈন্য তাঁরা পাবেনই বা কোথায়? রসদের অভাব, শ্রমিকের অভাব, ভৃত্যের অভাব। একবার একটা আপোষের চেষ্টা হ'ল। কিন্তু নবাব রণক্ষেত্র ছাড়তে রাজী নন। ক্লাইভ তখন আক্রমণের জন্যই প্রস্তুত হ'লেন।

ভারতীয় যুদ্ধ যেন দাবা খেলা। রাজা গেলেন তো সব গেল। ক্লাইভের একথা জানা ছিল। ঠিক করলেন পাশ কাটিয়ে পেছন দিক থেকে অতর্কিতে নবাবকে বন্দী করবেন। ভোর রাত্রি তিনটেয় যাত্রা শুরু হ'ল, ছ'টায় ইংরেজরা শত্রুশিবিরে প্রবেশ করলেন, যুদ্ধ চলল, কিন্তু আটটা নাগাদ রণক্ষেত্রে ইংরেজদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

কিন্তু প্রকৃতি একটু বাদ সাধল। কুয়াসা ছিল, এতক্ষণে তা আরও কিছু ঘন হয়েছে। পথ দেখা যায় না। রাস্তা হারিয়ে ফেললেন ইংরেজরা। তবু হাতড়ে হাতড়ে খাল বরাবর সেতুমুখে এসে পড়লেন। তারপর একটা আক্রমণ চেষ্টা বিশৃংখলায় পর্যবসিত হ'ল। কোনমতে ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে কামান টানতে টানতে, দুটো কামান আর একশত লোক হারিয়ে কলকাতা পৌঁছোলেন।

কিন্তু ফল হ'ল। নিজের নিরাপত্তার জন্য আর সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে পিছু হটলেন। আপোষ

প্রস্তাবও পাঠালেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল—ইংরেজদের পণ্য ও গ্রামগুলো ফিরিয়ে দেবেন নবাব, ক্ষতিপূরণ দেবেন, আগেকার সুযোগ-সুবিধেগুলি মেনে নেবেন, মুদ্রা ও দুর্গ তৈরীর অনুমতি দেবেন। উভয়ের মধ্যে প্রতিরক্ষণ-মৈত্রীও প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

কিন্তু ইংরেজেরা ফরাসীদের দিকে চোখ ফেরাতেই নবাব ফরাসীদের যোগ-সাজসে ইংরেজদের আরও একবার আক্রমণের সংকল্প নিলেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে-দেশী সমর্থনের ভূমিতে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তা ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গেছে। সেনাপতি মীরজাফরের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠছে, মুর্শিদাবাদের মহাজন জগৎ শেঠ ইংরেজদের পক্ষপাতী। ক্লাইভ সকল দ্বিধা কাটিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হ'লেন। ২৩শে জুন পলাশীর মাঠে ছোট্ট একটা অনুল্লেখ্য সংঘর্ষের পর নবাব পর্যুদস্ত হ'লেন। মীরজাফর বসলেন মসনদে।

অনেক টাকার দাবী এল নতুন নবাবের কাছে : কোম্পানীকে ১০,০০,০০০ পাউণ্ড, ইংরেজ অধিবাসীদের ৫,০০,০০০ পাউণ্ড, দেশী অধিবাসীদের ২,০০,০০০ পাউণ্ড, আর্মেনিয়ানদের ৭০,০০০ পাউণ্ড। স্থলসেনা, নৌসেনা, কাউন্সিলেরও কিছু চাই। নতুন শাসনকে যারা সমর্থন করেছে সেই হিন্দু-মুসলমানেরাই বা বাদ যাবে কেন? নবাবের রাজস্ব ভাণ্ডারে আছে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড। তবে হ্যাঁ, ইংরেজরা এখন অর্ধেক বাকীটা তিন বছরের • কিস্তিতে নিতে রাজী আছেন।

বেচারা মীরজাফর চাপের চোটে গোপনে ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন। সাতটা ওলন্দাজ জাহাজ বঙ্গোপসাগরে হাজিরও হ'ল। ক্লাইভ মীরজাফরের দিকে সংশয়ের দৃষ্টিপাত করলেন। মীরজাফর বললেন, ওদের এখুনি শাসন করে আসছি। গেলেনও, কিন্তু আসল ব্যাপারটা চাপা রইল না। ক্লাইভের সঙ্গে তখন ২৪০ জন ইউরোপীয় ৮০ জন গোলন্দাজ, আর, ১২০০ সেপাই। ভাবনায় পড়ে গেলেন। কি অজুহাতে এবং কি শক্তিতে মীরজাফরকে নিরস্ত করা যাবে?

ওলন্দাজরা বড় গোলমাল শুরু ক'রে দিল। ইংরেজদের পতাকা ছেঁড়ে, নৌকো লক্ষ্য ক'রে গুলী চালায়, শস্য, জাহাজ, লোক, কামান কেড়ে নেয়। ক্লাইভ ভালো একদল সৈন্যকে ভাঁটিতে পুরোনো দুর্গে রাখলেন, কর্ণেল ফোর্ডকে বললেন, উত্তরে সসৈন্যে বরাহনগর আর শ্রীরামপুর দখল করতে; যেন চুঁচুড়াও বিপন্ন হয়।

২৩শে অকটোবর গঙ্গার পশ্চিম তীর সাঁকরাইলে ১,৫০০ সৈন্য নাম'নো হ'ল। আরও খানিকটা ভাঁটির দিকে কমোডোর উইলসন আক্রমণ চালালেন। ঘণ্টা দুইব্যাপী প্রবল নৌ যুদ্ধে ওলন্দাজেরা সম্পূর্ণ পরাজিত হল। আবার ওদিকে ফোর্ড স্থলসৈন্যকেও সক্ষতি চুঁচুড়ায় ফিরতে বাধ্য করল. কিন্তু পরদিনই আর এক জায়গায় সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হ'ল, লোক কম ছিল, কিন্তু অবস্থিতির সুবিধেও ছিল। ক্লাইভকে জানাতে ক্লাইভ ফোর্ডকে আক্রমণের ইঙ্গিত দিলেন।

নবাব মীরজাফর একটা ঘোড়ার চাল চেলেছিলেন। একশ' ঘোড়সওয়ারকে পাঠিয়েছিলেন ফোর্ড কি করে-না-করে দেখতে, আর, যে পক্ষ জিতবে সে পক্ষে যোগ দিতে।

যুদ্ধ হল, রীতিমত রক্তক্ষয়ী বেপরোয়া যুদ্ধই হল। একটা খালের কাছে এসে প্রতিপক্ষ হকচকিয়ে গেল এবং পালাতে শুরু করল. সেই সময় নবাবের ঘোড়সওয়ারেরা ছুটল পলায়নপর প্রতিপক্ষের পেছনে। রণক্ষেত্রে মারা গেল ১২০ জন ইউরোপীয়, ২০০ মালয়ী। আহত হল ৩০০। বন্দী হলেন সেনাপতিসহ ১৫ জন অফিসার ও ৪০০ সৈন্য। যে সামান্য কয়েকজন পালালো তার মধ্যে চুঁচুড়ায় পৌঁছোতে পারল মাত্র ১৬ জন। মীরজাফর ও ওলন্দাজদের কপাল একই সময়ে ভাঙল।

কলকাতায় ফিরে ইংরেজদের সবচাইতে বড় সমস্যা দাঁড়ালো দুর্গ নির্মাণ। ক্লাইভ এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং ডিরেক্টারদের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন। তিনি কিছু দক্ষ কারিগর পাঠাবার জন্যও বলেছিলেন। তিনি এক সময় জানান যে, ৩০ ফুট চওড়া ও ১২ ফুট গভীর পরিখা কাটা হয়ে গেছে, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সর্বদিকই রক্ষার সুব্যবস্থা হয়েছে। এক কাপুরুষতা ছাড়া এ দুর্গ অধিকার করার সাধ্য ওদের হবে না। সব কাজ দশদিনে শেষ হ'য়ে যাবে।

কিন্তু তা হয়নি, ক্লাইভ কলকাতা ছেড়ে যাবার সঙ্গে আবার সেই অনন্ত আলোচনার প্রবাহ চলল। ক্যাপ্টেন রবার্ট বার্কার দুর্গ সম্প্রসারণের আর একটি প্রস্তাব দিলেন। বার্কারকে নক্সা করতে বলা হ'ল; কিন্তু ক্যাপ্টেন জন ব্রোহিয়ার অনুমোদন না করা পর্যন্ত ওর রূপায়ণ স্থগিত থাকল। জন ব্রোহিয়ার এসে আর এক প্রস্তাব করলেন। ক্লাইভ ফিরে এসে এ-সব পরিকল্পনা একেবারে ছেঁটে ফেললেন। নতুন দুর্গটির ছক কষলেন। নির্বাচিত জায়গাটার এক পাশে ছিল জঙ্গল, সে কেটে ফেললেই হ'ল। আর এক পাশে নদী তীরে শেঠ বসাকদের দু'শ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দপুর গ্রাম ছিল, দু'শ বছর ধরে এখানে গোবিন্দজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গোবিন্দপুরবাসীদের উত্তর কলকাতায় স্থানান্তরিত করার দরকার হ'ল। ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিকল্প জায়গা দেওয়ারও ব্যবস্থা হ'ল।

যতদিন না নতুন দুর্গ হ'চ্ছে ততদিন পুরোনো দুর্গটা সামরিক প্রয়োজনে রাখা হ'ল। কোম্পানীর সমস্ত পণ্য ওখান থেকে সরিয়ে ওটাকে সেনা-নিবাসে পরিণত করা হ'ল। পলাশী যুদ্ধের তিন বছর পর পূর্বদিককার গেট আর "অন্ধকূপ" কয়েদখানার মাঝামাঝি জায়গায় একটা গীর্জা তোলা হ'ল। কলকাতায় ফিরে আসার পর ইংরেজদের পর্তুগীজ গীর্জায় যেতে হ'ত। কিন্তু মেরামতের অভাবে ওর একেবারে যা-দশা হয়েছিল। তখন একটা হিসেব করা হ'ল এবং হাজার আড়াই টাকায় এর যথাসাধ্য সংস্কার হ'ল। বড় ছোট গীর্জা। অথচ ২৫ বছর এইটিই ইংরেজদের একমাত্র গীর্জা ছিল। এর কারণ বোঝা দায়। কেননা, ইংরেজরা তো সেণ্ট এ্যানির গীর্জা ধ্বংসের জন্য নবাবের কাছে ক্ষতিপূরণও পেয়েছিল। কিন্তু সেই পুরোনো গীর্জা পুনর্নির্মাণের বদলে এখন যার নাম ড্যালহৌসী স্কোয়ার তার উত্তরদিকে কারওয়েল সাহেব কোম্পানীর কেরাণী ব্যারাক করলেন। সেকালের রাইটার্সদের ভবন।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত
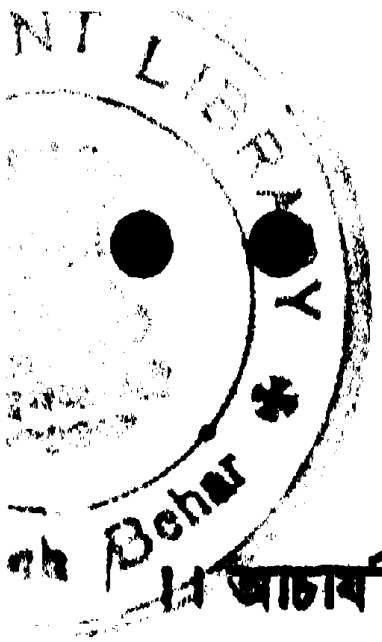
।। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ।।

এ সপ্তাহে বিজ্ঞানের কথা বলব না। বলব একজন বিজ্ঞানীর কথা। আগামী ২রা আগস্ট যাঁর শতবার্ষিক জন্মদিবস। এই মানুষটির সম্পর্কে একজন ইংরেজ বলেছিলেন, "এই চিররুগ্ন ব্যক্তির সকল শক্তি নিঃশোষিত হয়ে যাবে দেশের কল্যাণে। কিন্তু তাঁর স্মৃতি বেঁচে থাকবে ও পরবর্তীকালে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অবশ্যই বিস্মৃত হননি। তিনি এখনো বেঁচে আছেন টেক্‌স্‌ট্‌-বইয়ের পৃষ্ঠায় ও কলকাতার একটি রাস্তার নামে এবং অবশ্যই বেঁচে থাকবেন ডাক-তার বিভাগের আয়োজিত স্মারক ডাকটিকিটের মধ্যে। কিন্তু ভারতের বা বাংলাদেশের বিজ্ঞান-সাধনার মধ্যে তিনি এখনো বেঁচে আছেন কিনা তা বলা শক্ত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছেন 'লাইফ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্‌সেস্‌ অফ এ বেঙ্গলি কেমিস্ট'। মনে হতে পারে, এই নামের মধ্যে 'বেঙ্গলি' শব্দটি হয়তো না থাকলেও চলত। কিন্তু বইটি পড়লে যে-কোন পাঠক বুঝতে পারবেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শুধু রসায়নবিদ ছিলেন না, বাঙালী রসায়নবিদ ছিলেন। তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার শেকড় ছিল এই বাংলাদেশের মাটিতে। তিনি যদি শুধুই রসায়নবিদ হতেন তাহলে হয়তো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিপুলতর হত। তিনি যদি শুধুই বাঙালী হতেন তাহলে সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা হয়তো ব্যাপকতর হত। এককভাবে তিনি কোনো একটি নন। সম্মিলিতভাবে তিনি দুই-ই।

এই বাঙালী রসায়নবিদের শতবার্ষিক উপলক্ষে তাঁর আত্মজীবনী থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠকদের উপহার দিতে চাই। এই বইটি আজকাল কেউ পড়েন কিনা আমি জানি না। স্কুলের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকেও এই বই থেকে কোন অংশ নেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমার তো মনে হয়, এই বইটি পড়লে এমন একজন সংগ্রামী ও অধ্যবসায়ী মানুষের পরিচয় পাওয়া যাবে যাঁকে আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরতে পারি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানী হিসেবে বড়ো ছিলেন, না শিক্ষক হিসেবে, না সমাজসেবী হিসেবে তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে—কিন্তু তাঁর মতো চরিত্রবান বিবেকবান স্বার্থত্যাগী মানুষের দৃষ্টান্ত খুব বেশি চোখে পড়ে না।

আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন যে ১৮৭৪ সালটি তাঁর জীবনে একটি ঘটনার জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

তখন তাঁর বয়স তেরো, ক্লাশ সেভেনে পড়তেন। সেই সময়ে ভয়ংকর আমাশয় রোগে তিনি আক্রান্ত হন। এমন ভয়ংকর ছিল সেই রোগ যে তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয়। এবং অবস্থাপন্ন বাপের যথাসাধ্য চিকিৎসাতেও কোনো ফল হয় না। রোগ ক্রমেই বেড়ে চলে এবং তাঁর স্বাস্থ্য চিরকালের মতো ভেঙে যায়। অথচ অসুখের আগে তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খুবই ভালো। প্রচণ্ড খেতে পারতেন, প্রচণ্ড-ভাবে হৈ-হৈ ছুটোছুটি করতেন। মাত্র তেরো বছর বয়সেই এই অটুট স্বাস্থ্যের আনন্দ চিরকালের মতো ঘুচে গেল।

কিন্তু শরীর ভাঙলেও সেই তেরো বছর বয়সেও তাঁর মন ভাঙেনি। তিনি লিখছেন : "এক হিসেবে এই অসুখ আমার কাছে ছদ্মবেশী আশীর্বাদ বলেই মনে হতে লাগল। একটা ব্যাপার আমি সব সময়েই লক্ষ্য করেছি যে ক্লাশের পড়াশুনাটা কখনো খুব বেশি এগোয় না। ক্লাশে কতক ছেলে আছে যাদের মাথা নেই, কতক ছেলে মাঝারি গোছের, কতক ছেলে আবার খুবই মেধাবী ও খুবই ভালো। এই সবাইকে একসঙ্গে একদলে জুড়ে দেওয়া হয় আর তার ফলে পড়াশুনা যেটুকু হয় তা এই সবকিছুর মোট একটা গড় মাত্র।" তারপরে তিনি বলছেন যে খুব ভালো ছেলেরাও ক্লাশে খুব বেশি শিখতে পারে না। আবার অনেক সময়েই ভালো ছেলেদের মনে এমন একটা অহমিকা গড়ে ওঠে যা তাদের গোটা ভবিষ্যৎকেই মাটি করে দেয়। এ জন্যে অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে ক্লাশের সেরা ছেলেরা উত্তরজীবনে সেরা মানুষ হতে পারে না। এ-প্রসঙ্গে তিনি চারটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। লর্ড বায়রন, রবীন্দ্রনাথ, স্যার ওআল্‌টার স্কট ও এডিসন। স্যার ওআল্‌টার স্কটকে তাঁর মাস্টারমশাই বলতেন "গর্দভ—একেবারেই গর্দভ"। এডিসনকে এই বলে স্কুল থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল যে ছেলেটি আস্ত নিরেট।

যাই হোক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তারপরে লিখেছেন যে স্কুলের বাঁধাধরা রুটিন থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর বাবার ছিল মস্ত লাইব্রেরি আর তাঁর দাদা সেই লাইব্রেরিকে আরো মস্ত করে তুলেছিলেন। তিনি সেই লাইব্রেরির মধ্যে একেবারে ডুবে রইলেন। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান—কোনো বিষয়ই তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল না। যে-সব ইংরেজি বইয়ের তিনি নাম উল্লেখ করেছেন (যেমন, জুলিয়াস সীজার, মার্চেণ্ট অব ভেনিস) তার পুরোপুরি রসগ্রহণ করা তেরো বছরের ছেলের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। কিন্তু এমন খুঁটিয়ে তিনি বইগুলো পড়েছিলেন যে প্রায় ষাট বছর পরে আত্মজীবনী লিখতে বসে তিনি লিখছেন যে এত বছর পরেও

তিনি সেই সমস্ত বইয়ের কিছু কিছু অংশ মুখস্থ বলে দিতে পারেন।

এই সময়েই বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। তেরো বছরের ছেলেটি এক-একটি কিস্তি গোগ্রাসে গিলত ও পরবর্তী কিস্তির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। অন্যদিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন তার প্রিয় লেখক। বঙ্গদর্শন ছাড়াও তৎকালীন অধিকাংশ পত্রিকা (যেমন, সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরর ইত্যাদি) তিনি নিয়মিত পড়তেন।

এই ফিরিস্তি শুনে মনে হতে পারে, তেরো বছর বয়সে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিতান্তই অকালপক্ক বালক ছিলেন। কিন্তু এই অকালপক্ক বালকের অপর একটি কীর্তি শুনলে চমকে উঠতে হবে। একদিন তাঁর চোখে পড়ল যে লাইব্রেরির শেলফে একটি বই পড়ে আছে, খুব সম্ভবত পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কেনা। বইটির নাম 'প্রিন্সিপিয়া ল্যাটিনা'। লেখকের নাম স্মিথ। ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার বই। তেরো বছরের ছেলের কাছে এই বইয়ের কোনো আকর্ষণই থাকা উচিত নয়। কিন্তু ছেলেটি দমল না, ল্যাটিন ভাষা শিখবে বলে উঠে-পড়ে লাগল। ছেলেটি ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ উপক্রমণিকা পড়েছে এবং সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ল্যাটিন ভাষার আশ্চর্য মিল রয়েছে। তেরো বছরের ছেলের পক্ষে এই আবিষ্কার আজকের পরীক্ষা-পাশের জন্যে বই মুখস্থ করার যুগে বিস্ময়কর মনে হতে পারে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে গিলক্রিস্ট বৃত্তি পেয়েছিলেন এবং পড়াশুনা করার জন্যে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন—এ খবর সকলেই জানেন। কিন্তু তেত্রিশ দিনের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রাটি তাঁর কি-ভাবে কেটেছিল তা হয়তো অনেকের জানা নেই। আত্মজীবনীতে তিনি লিখছেন যে ইংলণ্ডে যাবার সময়ে তিনি কয়েকটি বই সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই বইগুলো বার বার পড়েই তাঁর সময় কেটেছিল। বইগুলোর নাম শুনলে বোঝা যাবে যে ভাবীকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদের জ্ঞানান্বেষণ কত বিচিত্র পথে ধাবিত হয়েছিল। বইগুলো হচ্ছে এই : স্মাইলসের স্ক্রিপ্ট, স্পেনসারের ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অব সোসিওলজি, কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রভাত চিন্তা, রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ যাত্রীর পত্র, বস্‌ওয়েলের লাইফ অফ জনসন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার ক্রাম ব্রাউন-এর অধীনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। বিজ্ঞানের এই ছাত্রটির আরেকটি কীর্তি এখানে উল্লেখ করা চলে। ১৮৮৫ সালে লর্ড ইডেনস্‌লেই ঘোষণা করলেন যে 'ভারতবর্ষ—সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে' এই বিষয়ের ওপরে লিখিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকে পুরস্কৃত করা হবে। বিষয়টি রসায়নের ছাত্রের পক্ষে খুব যে উপযুক্ত তা বলা চলে না। কিন্তু তবুও এই ছাত্রটি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল।

আত্মজীবনীতে অল্প কয়েকটি লাইনে বলা হয়েছে কি-ভাবে সেই ছাত্রটি প্রতিযোগিতার জন্যে তৈরি হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় এ-সম্পর্কে যত বই ছিল তার কোনোটিকেই ছাত্রটি বাদ দেয়নি। তারপরে তার এই উপলব্ধি হল যে ইতিহাস বুঝতে হলে অর্থনীতি জানা দরকার। তখন শুরু হল অর্থনীতি অধ্যয়ন। এ-সব ছাড়াও ছাত্রটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষজ্ঞদের লেখা সমস্ত প্রবন্ধ পড়েছিল। একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্যে এতখানি উদ্যোগ-আয়োজন করতে হলে যে কি-পরিমাণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকা দরকার তা আজকের এই পল্লবগ্রাহিতার যুগে হয়তো অনুমান করাও সম্ভব নয়।

উত্তরজীবনে এই নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল দেশের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি এবং অবশ্যই দেশাত্মবোধ। কথাটা হয়তো মামুলি শোনাল তাই একটু ব্যাখ্যা করে বলছি।

সকলেই জানেন যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৬ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস্‌সি পাশ করেছিলেন এবং তারপরে মাত্র এক বছরের গবেষণার পরেই লাভ করেছিলেন ডি-এস্‌সি উপাধি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন, "সেকালে বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার ঘটনা কদাচিৎ ঘটত—অন্তত হাল আমলের মুড়ি-মুড়কি বিলোবার মতো এত সহজ ছিল না।" ডক্টরেট ডিগ্রি পাবার পরে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে-যুগে একজন ভারতীয়ের পক্ষে এটি ছিল দুর্লভ সম্মান। ডক্টরেট পাবার বছরেই তাঁকে হোপ প্রাইজ স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরো কিছুদিন ইংলণ্ডে থেকে গেলেন।

দেশে ফিরে এসে কলকাতায় পা দিয়ে প্রথম যে-কাজটি তিনি করেছিলেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলছি. "কেম্বিনে আমার মালপত্র জমা রাখলাম। হাতে একটি পয়সাও ছিল না। আট টাকা ধার করতে হল। কলকাতায় আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল; এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। প্রথম যে-কাজটি করলাম তা হচ্ছে একটি ধুতি ও একটি চাদর ধার করে নিয়ে আমার পুরনো বিজাতীয় পোশাকটি বদলে ফেলা।"

কিন্তু বিদেশের এই কৃতী ছাত্রটিকে নিজের দেশে এক বছর বেকার বসে থাকতে হয়েছিল। সে-যুগে ভারতীয়দের পক্ষে দায়িত্বপূর্ণ অধ্যাপনার পদ পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—দুজনকেই নিতান্ত ভারতীয় হওয়ার জন্যেই দায়িত্বপূর্ণ অধ্যাপনার পদ পেতে যথেষ্ট দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল। যাই হোক, ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৮৮৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত বেকার থাকার পরে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনার পদ পেলেন। তারপরে কিছুদিন কাটল শিক্ষক হিসেবে

কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবং নতুন পরিবেশের সংগে নিজেকে মানিয়ে নিতে। তারপরে তিনি নিজস্ব গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করার মতো অবস্থা তৈরি করতে পারলেন।

এই অবস্থায় এই বিদেশে শিক্ষা-প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র ও বিখ্যাত কলেজের অধ্যাপক যে-বিষয়ে গবেষণা শুরু করলেন তা আপাত-বিচারে খুবই মামুলী। বাঙালীর খাদ্য তেল ও ঘিয়ের ভেজাল। তাঁর নিজের ভাষায়—"সাধারণ বাঙালীর যা খাদ্য তার মধ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ যেটুকু থাকার তা আছে শুধু সরষের তেলে ও ঘিয়ে। কিন্তু বাজারে সরষের তেল ও ঘি নামে যা বিক্রি হয় তা মোটেও খাঁটি নয়।" সে-সময়ে অনেকেই হয়তো তাঁর কাছ থেকে পণ্ডিতী ধরনের কোনো গবেষণা আশা করেছিল। কিন্তু সকলকেই হতাশ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পুরো তিনটি বছর মেতে রইলেন এই তেল আর ঘি নিয়ে। ১৮৯৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হল তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধ : "কয়েকটি ভারতীয় খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ—প্রথম খণ্ড, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও তৈল"।

ঘটনাটি হয়তো সামান্য। কিন্তু এই সামান্য ঘটনার মধ্যেই বাঙালী রসায়ন-বিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মহৎ জীবনের সূত্রপাত।

মারকিউরাস নাইট্রাইট সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের যুগান্তকারী গবেষণার কথা সকলেই জানেন। অধ্যাপক আর্মস্ট্রং যে তাঁকে 'মাস্টার অফ নাইট্রাইট্স' আখ্যা দিয়েছিলেন তাও হয়তো জানা ঘটনা। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে, শিশুদের কি-ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত তা নিয়েও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অনেক চিন্তা করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি : "বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যাল্পতা দেখে আমি খুবই বিচলিত বোধ করলাম। আমি ভাবতে শুরু করলাম যে আমি নিজেই রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণি-বিদ্যার ওপরে কয়েকটি প্রাথমিক গ্রন্থ রচনা করব।" তারপরে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে ইংরেজিতে এ ধরনের অজস্র বই রয়েছে। অথচ ভূ-বৈচিত্র ও জীব জগতের বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশের সংগে অন্য কোনো দেশের তুলনা হয় না। গোটা বাংলাদেশকেই বলা চলে প্রকৃতির গবেষণাগার। কাজেই বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিজ্ঞান শেখাতে হবে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে জাগিয়ে তুলে আর সত্যিকারের উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতকে চোখে দেখার মধ্যে দিয়ে। নিজের চোখে দেখে তারা ভাবতে শিখুক যে বেড়ালের সংগে কুকুরের তফাৎ কোথায়। ভাবতে ভাবতে আরো বেশি করে দেখুক। দেখতে দেখতে আরো বেশি করে ভাবুক। এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান শেখাবার জন্যে তিনি নিজেই একটি বই লিখলেন : প্রাথমিক প্রাণিবিজ্ঞান।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে বলার কথার শেষ নেই। তিনি ছিলেন বাঙালীদের মধ্যে একজন সত্যিকারের বাঙালী। রসায়নবিদদের মধ্যে একজন সত্যিকারের রসায়নবিদ। আর কয়েক দিনের মধ্যেই এই মহান বাঙালী রসায়নবিদের শতবার্ষিক জন্মোৎসব পালিত হবে। এই উপলক্ষে আমরা যদি তাঁর আত্মজীবনীটি একবার পড়ি তা'হলে হয়তো তাঁর প্রতি আমাদের ঋণ সম্পর্কে অবহিত হতে পারব।

শুধু হাসি

রেখা রায় মৌলিক

দুজন স্কুলের ছাত্র দুষ্টুমী করে-ছিলো। হেডমাষ্টার মশায় দুজনকে ডেকে স্কুলের ছুটীর পর তা'দের প্রত্যেকের নাম দুশো বার করে লিখতে বললেন। একজন ছাত্র কুড়িবার নাম লেখার পর হেডমাষ্টার মশায়কে বললে, 'স্যার ও এর মধ্যে দুশোবার ওর নাম লিখে ফেলেছে।'

হেডমাষ্টার মশায় বললেন, 'কি করে।'

ছেলেটি বললে, 'ওর নাম 'হরি' আর আমার নাম 'গোদাভরলু আপ্পলা-রাজু সত্যনারায়ণঃ রাও গারু'।

* *
*

বড়বাবুর ভাগ্নেকে বড়বাবু নিজেই ষ্টেনোগ্রাফারের চাকুরী দিয়েছেন। একদিন ম্যানেজিং ডিরেক্টার সাহেব ওকে ডাকলেন। এই ডিক্টেসনটা তাড়াতাড়ি লিখে টাইপ করে নিয়ে আসুন। ডিক্টেসন দেওয়া যখন শেষ হোলো তখন ষ্টেনোগ্রাফার ছেলেটা বললে, 'স্যার আপনি 'ডিয়ার স্যার' আর 'ইউরস ফেইথফুলী'র মধ্যেকার কথাগুলি আর একবার ডিক্টেসন দিন।'

* *
*

স্বাস্থ্যের মাষ্টার ছেলেদের বলছেন, 'ভুলেও তোমরা পশুপক্ষীকে চুমু খাবে না।' একজন ছাত্র বললে, 'কেন স্যার।'

মাষ্টার বললেন, 'ওদের গায়ে কত রকমের ময়লা যে থাকে, তা'তে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। এ বিষয়ে কেউ কি কোনো উদাহরণ দিতে পারো?' একজন বললে, 'পারি স্যার, আমার কাকীমা আমাদের সুন্দর কুকুরটাকে রোজ চুমু খেয়ে আদর করতেন।'

মাষ্টার বললেন, 'তারপর'?

'একদিন কুকুরটা মরে গেলো।'

* *
*

মৃত্যুপথযাত্রী এক জমিদার দুজন যুবককে বললে, 'আমার এত বড় বাগান বাড়ী, এত বিঘা জমি যার দাম দু লক্ষ টাকা কে নিতে চাও।' আমি নেবো...।

'আমার সুন্দরী মেয়েকে কে বিয়ে করবে।'

আমি..............।

'আমার দু লক্ষ টাকার পলিসী কে নেবে।'

আমি........... আমি।

'আমার সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দেনা কে শোধ করবে।'

প্রথম যুবকটি দ্বিতীয় যুবকটিকে ধাক্কা দিয়ে বললে, 'সবতো আমি নিলাম। এটা অন্ততঃ আপনি নিন।'

লাওস

অজিতকুমার তারণ
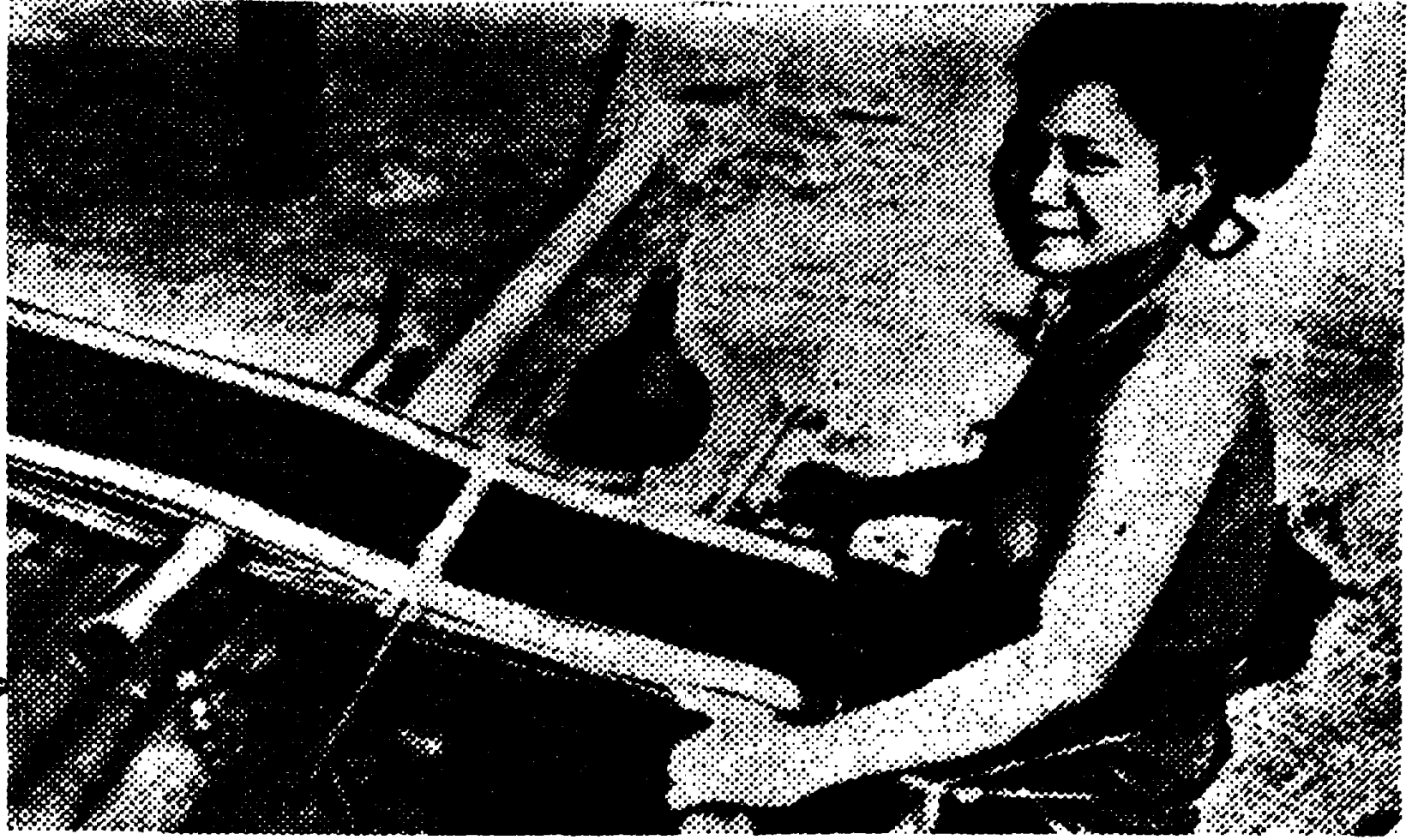
১৯৫৪ সালের ২০শে জুলাই তারিখে জেনেভায় একটি চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। সেই চুক্তি অনুসারে বৃটিশ ও রুশ প্রধানদের যুগ্ম-সভাপতিত্বে সৃষ্ট হয় একটি আন্তর্জাতিক তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন। উক্ত কমিশনের সভাপতি ভারত আর সদস্য ক্যানাডা ও পোল্যান্ড রাষ্ট্রদ্বয়, উদ্দেশ্য ইন্দোচীনে শান্তি ফিরিয়ে আনা। কিন্তু ১৯৫৭ সালে নানা প্রতিকূল ঘটনায় ইন্দোচীনের লাওস রাজ্যে আরব্ধ কার্য শেষ না করেই কমিশনকে ফিরে আসতে হয়।

কিছুদিন পরেই আবার লাওসে জ্বলতে লাগল ধিকি ধিকি করে যুদ্ধাগ্নি। গেল বছরের জুলাই মাসে বেজে উঠল রণদামামা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি লাওসে। এবছরের প্রথম ভাগ হতেই ওখানকার পরিস্থিতি উঠল চরমে। প্রয়োজন বোধে, ঐ কমিশনকেই পুনর্জীবিত করে পাঠানো হ'ল লাওসে। ৮ই মে তারিখে। তা ছাড়া, নানাভাবে এখন চেষ্টা ও উদ্যোগ চলছে লাওসের বিরোধী দলগুলির মধ্যে পুনরৈক্য স্থাপনের জন্য।

কার্যোপলক্ষে প্রথম তদারকী কমিশনের সংগে লাওসে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল তাই দেশটাকে বেশ কিছু দিন স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি।

নদীনালা, পাহাড় ও অরণ্যময় ইন্দোচীনের পশ্চিমাংশ হল লাওস। আয়তন প্রায় এক লক্ষ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা খুবই কম, মাত্র ত্রিশ লক্ষ। দেশটি অত্যধিক পাহাড়-পর্বত ও জংগলে পরিপূর্ণ বলে ওখানে লোক-বসতির বিশেষ সুবিধে নেই। লাওসবাসীদের সংগে শ্যাম (বর্তমানে থাইল্যান্ড) দেশবাসীদের রয়েছে খুবই সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য, কারণ ওরা প্রথমে এসেছিল ওই দেশ থেকেই। সেটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। তার আগে থাকতেই লাওসের পার্বত্য এলাকার উত্তরাংশে কোংশালী এবং সামনুয়া জেলায় পার্বত্য মিউ জাতীয় লোকেরা বাস করছে। তারা বেশীর ভাগই শিকারী, কেউ কেউ চাষাবাদও করে। অত্যন্ত সরল জীবনযাত্রার মধ্যে তারা খায় দায় ও আনন্দে নেচে গেয়ে সময় কাটায়। যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা সভ্যজগতের কোনো খবরেরই ধার ধারে না তারা। এই মিউরা একটা ব্যাপারে কিন্তু খুবই সচেতন—কাউকেই

বস্ত্রবয়নরতা লাওস নারী

ওদের ফটো তুলতে দেয় না। ওদের মনে রয়েছে একটি বদ্ধমূল ধারণা, যারই ফটো তোলা হবে সে-ই নাকি মারা পড়বে। ওরা কথা বলে 'জগা খিচুড়ি' বা পাঁচ-মিশেলি ভাষায়।

অন্যান্য লাওসবাসীরা ব্যবহার করে থাকে থাই ভাষার সংগে মিশ্রিত লাওসিয়ান ভাষা। লাওসের পুরানো রাজধানী লুয়াং প্রভাং এবং বর্তমান প্রশাসনিক কেন্দ্র ভিয়েংচিয়েংতে আলাপ করেছি ফরাসী ভাষাভাষী বহু লোকের সংগে। ওসব অঞ্চলে এবং অন্যান্য জায়গায় ব্যবসার-বাণিজ্যে লিপ্ত বহু ভারতীয়ের সংগে চেনাশুনা করেছি। দেখেছি এই সব ব্যবসায়ীদের ওদেশে সম্মানও যেমন প্রচুর প্রতিপত্তিও তেমনি গভীর।

লাওজ রাজ্যে বনসম্পদ রয়েছে অজস্র, আর আছে টিনের তিন চারটি বড় বড় খনি। মেকং নদীর কাছাকাছি জায়গাগুলি খুবই শস্য-শ্যামলা ও উর্বরা। মাঝে মাঝে ঐ নদীর বন্যাস্রোত এসে লাওসবাসীদের ঘর-বাড়ির খুবই ক্ষতি করে থাকে, তাই বেশির ভাগ লোকই বাস করে কাঠের তৈরী উঁচু টঙের মত ঘরে।

ফরাসী শাসকেরা লাওসের শিক্ষা-দীক্ষা বা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাপারে করেনি কিছুই। ওরা দেশটিকে শুধু শোষণই করেছে। আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, শাসকদের সৃষ্ট নানারূপ বাধা নিষেধের জন্য লাওসবাসীরা বহির্জগতের সংগে মেলামেশা করবার সুযোগ পায়নি। ১৯৫৪ সালে স্বাধীনতা লাভের পর তারা উঠে পড়ে লেগেছে দেশোন্নতির কাজে।

দেশটির আরও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল সেখানকার মন্দিরগুলি। ওখানকার মন্দির দেখতেও যেমন সুন্দর সংখ্যাতেও তেমনি অজস্র। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশের মত সেখানে পান্ডা-পুরুতদের অত্যাচার নেই। মন্দিরের আবহাওয়া বেশ শান্ত এবং পবিত্র।

লাওস রাজ্যে রেলপথ নেই এক ইঞ্চিও। পাঁচ-ছ'টি বিমান বন্দর এবং কুড়ি পাঁচিশটি ছোট ছোট বিমান অবতরণ ক্ষেত্র রয়েছে। ওখানকার মেকং ব্যতীত অন্যান্য নদী মাত্র চার পাঁচ মাসকাল নাব্য থাকে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরাই ওখানকার প্রধান অধিবাসী। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে দেশের লোকেদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার। সারা লাওসে রয়েছে মাত্র পাঁচটি কলেজ, একটি মাত্র উচ্চ বিদ্যালয়, একটি 'লাইসি' (ধর্মসংক্রান্ত বিদ্যালয়) এবং সাতশ' সত্তরটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

লাওসবাসীদের মধ্যে বহুবিবাহ এবং অস্থায়ী বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে। অস্থায়ী বিবাহের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীকে কোর্টে হাজির হয়ে চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। আবার বিবাহের পরে, এক বৎসর অন্তর অন্তর প্রয়োজন অনুযায়ী বিবাহ-চুক্তি বাতিল অথবা বিবাহিত জীবনের আয়ু বা মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে হয় কোর্টে গিয়েই।

ওখানকার লোকেরা তাঁত-শিল্প, কৃষি, বাঁশ ও বেতের কাজ এবং নাচগানে খুবই সুদক্ষ। তারা খুবই মিশুকে, নিরীহ, শান্তিপ্রিয় আর অতিথিবৎসল। যেখানেই গেছি, দেখেছি আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের ওরা খুবই সুনজরে দেখে আর শ্রদ্ধাও করে যথেষ্ট। আমাদের 'তেগোর' (রবীন্দ্রনাথ), তাঁর শান্তি-নিকেতন আর 'চন্দ্রবোস' (নেতাজী), ভারতের সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা, আর বিশেষ করে ম্যাজিক বা যাদু-বিদ্যার বিষয়ে তারা খুবই আগ্রহশীল।

দেশে বিদেশে

ভাষা :

সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ১০ই ও ১১ই তারিখে দুদিনব্যাপী মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহবান করেছেন। এটি সত্যিই আশার কথা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু একদিন স্বীকার করেছিলেন, ভাষা যে এমন একটি গম্ভীর জিনিস তা তিনি আগে বুঝতে পারেননি। বিশেষ ক'রে বুঝতে পেরেছেন আসামে ভাষা-দাঙ্গার পর। এরপর অনেকে অনেক প্রস্তাব করেছেন। ভাষা নিয়ে কাছাড়ে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন হয়েছে; আবার তাকেই বানচাল করার জন্য সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা দাঙ্গা করেছে। এরই মধ্যে একদিন আমাদের পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক সর্বভারতীয় ভাষা সমস্যার উদার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ডাঃ রায়ের প্রস্তাবের মোটামুটি সারমর্ম এই যে যেখানে কোন ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা ৫ বা ততোধিক সেখানে সেই ভাষা সরকারী মর্যাদা পাবে। তাঁর এই প্রস্তাব অনেকেই সমীচীন মনে করেছেন, অনেকেই করেননি। যাঁরা মনে করেননি তাঁদের মধ্যে শ্রীজওহরলাল নেহরুও অন্যতম। কিন্তু অন্য কোন সম্ভাব্য বিকল্প গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবও কেউ করেননি। ভাষা সমস্যাকে এইভাবে আর এড়িয়েও যাওয়া যায় না। এক জায়গায় একে সীমাবদ্ধ করতেই হবে। এক আসামেই অসমীয়া ছাড়া বাংলা ও পার্বত্য অঞ্চলের পার্বতীয় ভাষাভাষীরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ক্রমশই সংঘবদ্ধ দাবী উত্থাপন ক'রে চলেছে; আশঙ্কা আছে, অন্যত্রও এই সমস্যা দেখা দেবে। যেমন পশ্চিম বাংলায় দার্জিলিং অঞ্চলের পাহাড়ীরা, বিহারবাসীরা আপন আপন ভাষার সত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সুতরাং দমনের পথে পীড়নের পথে না গেলে সমাধান একটা করতেই হবে। কি সে সমাধান? ডাঃ রায় একটি প্রস্তাব রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রীরা এরই ওপর ভিত্তি ক'রে মতামত দিতে পারবেন। অন্যান্য রাজ্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এখনই বলা যায় যে, যে সব রাজ্য একটি ভাষায় প্রাধান্যের পক্ষপাতী তাঁদের কাছে ডাঃ রায়ের বহুভাষী রাজ্যের প্রস্তাব আদৌ মনঃপূত নয়। সুতরাং, একদিকে বহুভাষী রাজ্যের প্রস্তাব আর একদিকে একভাষী রাজ্যের প্রস্তাব— সর্বরাজ্যের গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব যদি করতেই হয় তবে এ দুটোর কোনটাই হবে না, হয়তো মাঝামাঝি নয়তো আংশিক একটা আপোষ প্রস্তাব হ'তে পারে। তবু বৈঠকের সাফল্য নির্ভর করছে মুখ্যমন্ত্রীদের দূরদর্শিতা, সংখ্যালঘুদের প্রতি সহানুভূতি ও জাতীয় সংহতি রক্ষায় আগ্রহের ওপর।

বাধা :

দীর্ঘকাল যাবৎ পশ্চিম বাংলার মধ্যশিক্ষা পর্ষদটি বাতিল অবস্থায় আছে এবং এখন এর একটি কার্যকরী কাঠামো মাত্র বজায় আছে। বাতিল করেছেন সরকার এবং কাঠামোটির সংস্কারও করেছেন সরকার। তথাপি রাজ্য সরকার ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাঝখানে একটা গোঁজ যেন থেকে গেছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওপর রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের অবাধ অধিকার বা প্রতাপ সম্ভবত সর্বব্যাপী নয়। সম্প্রতি ক'টি ভাষা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়ানো হবে তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিতর্ক হ'য়ে গেছে এবং বিতর্কে জিতেছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। স্বভাবতই রাজ্য সরকারের পক্ষে এ পরাজয় হজম করা শক্ত। তাই তাঁরা অর্ডিনান্স ক'রে পর্ষদের ক্ষমতা আরও সংকুচিত করতে যাচ্ছেন। এই অর্ডিনান্সবলে ১৯৫০ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা আইনটির সংশোধন করা হবে। মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্ডিনান্সের ভাষায় পরিষ্কার ক'রে বলা হয়েছে যে, পর্ষদ আইন মোতাবেক অধিকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি মেনে চলবেন। রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে মাঝে মাঝে এই সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন। এখন পর্ষদের ক্ষমতা সরকার-নিযুক্ত এডমিনিস্ট্রেটর মারফৎই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ১৯৫০ সালের আইনে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে পর্ষদের কিছু স্বাধীনতা ছিল। আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনকালে এই অর্ডিনান্সকে বিধিবদ্ধ ক'রে নেওয়া হবে।

যারা কলাসাহিত্য বিষয়ে পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য সংস্কৃত ভাষাকে আবশ্যিক করা হবে কি হবে না, রাজ্য সরকার ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে এই নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। প্রস্তাবিত অর্ডিনান্সবলে বা অর্ডিনান্স বিধিবদ্ধ হলে এ বিরোধের অবসান হবে বলে মনে করা যায়। রাজ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষার পর ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষান্তরে কি কি ভাষা পড়া উচিত তা নির্ণয়ের জন্য এক কমিটি নিয়োগ করেন। রাজ্য সরকার সামান্য সংশোধন ক'রে কমিটির সুপারিশগুলো গ্রহণ করেন; তাতে সংস্কৃতকে মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক করার পরামর্শ ছিল। সরকার তদনুযায়ী পর্ষদকে নির্দেশ দেন। কিন্তু পর্ষদের এডমিনিস্ট্রেটর এ নির্দেশ মানেন না, কেননা, তাঁর মতে, রাজ্য সরকারের এমন নির্দেশদানের এক্তিয়ার নেই। কোন্ ভাষা পড়ানো হবে কি হবে না তা পর্ষদই স্থির করবেন। সরকার বিপরীত মত পোষণ করাতেই অর্ডিনান্স জারীর কারণ। বিতর্ক থাক, শিক্ষাক্ষেত্রে এর কি সুফল হবে একথা রাজ্য সরকার যতক্ষণ না প্রতিপন্ন করতে চাইছেন ততক্ষণ অর্ডিনান্স বা সংশোধিত আইনটিও তর্কসাপেক্ষ থেকে যাবে।

শঙ্কা :

বাইশ বছর আগে বার্লিনকে কেন্দ্র করেই বিশ্বযুদ্ধ বেঁধেছিল। তারও ২৫ বছর আগে এই বার্লিনকে কেন্দ্র

করেই আর একটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। এই অর্ধশতাব্দীরও কিছু কম সময়ের মধ্যে বার্লিনকে কেন্দ্র করেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে? এই আশঙ্কা জাগবার কারণ দেখা দিয়েছে। আমরা অবশ্যই আশা করব যুদ্ধোদ্যত শক্তিমানেরা যুদ্ধসূচনার পূর্বেই সংযত হবেন এবং পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখবেন। কিন্তু বার্লিনসমস্যা নিয়ে পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও সোভিয়েট রুশিয়ার দিক থেকে যে সব উক্তি, পুনরুক্তি ও উক্তি প্রকাশ পাচ্ছে তা শান্তিকে বজায় রাখবার লক্ষণ নয়। পশ্চিমী শক্তিবর্গ মঃ ক্রুশ্চেভকে এই ব'লে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে, সোভিয়েট রুশিয়া যদি বার্লিনে পশ্চিমী শক্তিবর্গের অধিকারকে বিলুপ্ত করেন তবে মারাত্মক ও বিপজ্জনক পরিণতি দেখা দেবে। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স এই পশ্চিমী শক্তিবর্গ। গত সোমবার তাদের পক্ষ থেকে এই মর্মে একটি নোট সোভিয়েট মস্কো কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়েছে।

এর সংগে সংগে আরও একটি স্রোত বইছে ইউরোপে—যার ঢেউ ভারতেও লেগেছে। ইংরাজী অক্ষরে এর সংক্ষিপ্ত নাম সি-ই-এম, পুরো অক্ষরে যা হচ্ছে কমন ইউরোপীয়ান মার্কেট। বাংলা অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় সে হচ্ছে ইউরোপীয় বারোয়ারী বাজার। বন-এ এর একটি সম্মেলন হচ্ছে। এক বছর আগে প্রেসিডেণ্ট দ্য গল পশ্চিম জার্মাণ চ্যান্সেলার ডাঃ কনরাড আদেনারকে বলেছিলেন যে, ইউরোপীয় বারোয়ারী বাজারের শীর্ষস্থানীয় ছয়টি দেশের উচিত হবে তাঁদের পররাষ্ট্র নীতির সংযোগসাধন করা। এই উদ্দেশ্যে অথবা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বার্লিনসংকট ও ইউরোপীয় রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তের জন্য ১৮ই জুলাই ছয়টি শীর্ষস্থানীয় দেশের প্রতিভূবর্গের মিলিত হবার কথা। তার আগে পশ্চিমী শক্তিবর্গের হুঁসিয়ারী ফতোয়াটি মস্কো কর্তৃপক্ষের হাতে পড়েছে। পশ্চিম জার্মাণীর চ্যান্সেলারের এতে সায় আছে এ ধরেই নেওয়া যায়, কেননা, চ্যান্সেলার আদেনারের সাম্প্রতিক উক্তিগুলো খুব নরম নয় এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সুরে মেলানো। তবে হ্যাঁ, একটা শান্তি চুক্তি সবারই কাম্য এবং তা শান্তিপূর্ণ উপায়েই হোক—পশ্চিমী শক্তিবর্গের নোটে এ কথাও বলা হয়েছে।

ভর্তি:

আমাদের পরিকল্পনার এই আর একটি ত্রুটি। কেননা, পরিকল্পনা মানেই আগামী সম্ভাব্য তথ্যাবলী গণ্য ক'রেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের রচনা চলে। কিন্তু দেখছি, বেকার সমস্যার সুংগে যেমন শিল্পোন্নতির বা কর্মসংস্থানের কোন যোগাযোগ নেই, শিক্ষাক্ষেত্রেও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্থান সংকুলানের কোন যোগাযোগ নেই। দেশ স্বাধীন হবার আগে বিদেশী শাসক সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কারও জন্মায়। তার মধ্যে একটি কুসংস্কার ইংরাজী ভাষা-বিদ্বেষ ও তার সংগে সংগে ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন। আমরা ঘোষণা ক'রে দিলাম ইংরাজীর বদলে হবে হিন্দী এবং এই একমাত্র যুক্তিতে যে, ইংরাজী বিদেশী ভাষা। আর ঘোষণা করলাম, ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে ওটাকে সর্বতোভাবে দেশী করতে হবে। এর মধ্যে অন্ধ আবেগই বেশী এবং এই অন্ধ আবেগেই আমরা সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হ'লাম। শিক্ষার্থীর মগজে তিনটের বদলে পাঁচটা ভাষা চাপালাম—আর মাতৃভাষায় শিক্ষার যথার্থ আয়োজন না ক'রেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষাকে দিলাম ঢিলে ক'রে। আর করতে লাগলাম কি? —না, রাতারাতি স্কুল ফাইনাল (আগের ম্যাট্রিক) পদ্ধতি বদ্লে ১১-শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নামে শিক্ষাক্ষেত্রে এক অসহ্য অরাজকতার সৃষ্টি করলাম। উচ্চতর মাধ্যমিকের পুঁথি ঠিক হ'তে না হতেই প্রথম পরীক্ষা হ'য়ে গেল, অল্প কয়েকটি স্কুলে এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকতে থাকতেই কার্যত স্কুল ফাইনাল বাতিল ক'রে দিলাম। তেমনি কলেজে। কেননা, কান টানলে মাথা আসে। স্কুলে ১১, আর কলেজে তিন—এই নিয়ে হাইয়ার সেকেণ্ডারী আর প্রি-ইয়ার ডিগ্রী কোর্স। প্রথমত স্কুল ফাইনাল একেবারে উঠে যেতে কতগুলি যে পাঁচসালার দরকার হবে, কেউ হিসেব করে বলতে পারেন না (ফলে, ইতিমধ্যে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ)। সুতরাং জনসাধারণ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের পথ থাকবে রুদ্ধ। একেতো দেশ স্বাধীন হবার পর বেসরকারী প্রচেষ্টা বন্ধ হ'য়ে গেছে—শিক্ষা কার্যত এখন সরকারের কুক্ষিগত। কিন্তু সরকারের ইচ্ছা ও সংগতিও সীমাবদ্ধ। তাঁদের সর্তে রাজী না হলে কোন স্কুল কলেজ চালানোই মুস্কিল। তবু জনসাধারণের মনে শিক্ষার আগ্রহকে ঠেকাবে কে? তারা স্কুল চাইবে, কলেজ চাইবে, ভর্তি হতে চাইবে। আশ্চর্য লাগে, এ বিষয়ে সরকারের যেন কোন পরিকল্পনা নেই। শিক্ষা সম্পর্কে যত কিছু কথা শোনা যায়, তার বেশীর ভাগ কথার কথা, আর তাঁদের খেয়ালখুসী মোতাবেক আপগ্রেড করা—যত অর্থ এতেই বায়। হাইস্কুলগুলিকে হাইয়ার সেকেণ্ডারী করার অর্থ আরো দালান-কোঠা, আরও আসবাবপত্র, সরঞ্জাম এবং আরও শিক্ষক। টাকা দিলে দালান-কোঠা আসবাবপত্র সরঞ্জাম হয়—সে হচ্ছেও, কিন্তু শিক্ষক? সে কি ইঁটের-ভাটিতে তৈরী হবে? সে জন্য যা ব্যবস্থা আছে তা যৎসামান্য। এদিকে কলেজী শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য কলেজগুলিতে শিফটে শিফটে হাজার হাজার ছেলেকে পড়ানো নিষিদ্ধ হয়েছে। ভাল কথা, কিন্তু এই উদ্বৃত্ত ছেলেদের জন্য অতিরিক্ত কলেজ ক'টি হয়েছে? ফতোয়া দিয়ে একটা রীতি বন্ধ করা যায়, কিন্তু ফতোয়া দিয়ে কলেজ তৈরী হয় না। কিন্তু ফতোয়া দিয়ে রীতি যেমন বন্ধ করা যায়,

সাধারণের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সহজাত সংস্কার তাকে উৎপাটন করা যায় না। শিক্ষাকে স্কুলে থাকতেই দু'ভাগে ভাগ করা হবে—বিজ্ঞান ও কলা; ভাল কথা। কিন্তু আগাগোড়া এর সুসম্বন্ধ ব্যবস্থা কোথায়—যাতে নানাবিধ ছাত্রদের (স্কুল ফাইনাল, হাইয়ার সেকেন্ডারী, প্রি-ইউনিভার্সিটি) জটিলতা নিয়ে হন্যে কুকুরের মতো ছুটতে হয় না? নেই। তাই ভর্তির সমস্যা ক্রমশই একটা বিস্ফোরণের প্রকৃতি নিচ্ছে। নেবেই। তারও ওপর থার্ড ডিভিসন ও ফেল-করা ছাত্রদের সমস্যাই বা কি হবে? কেনই বা এত ফেল করে? কে বলবে?

বাও :

তিউনিসিয়ানরা তিউনিসিয়ায় ফরাসী বাহিনীর অস্তিত্ব সর্বাংশে নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রাম সুরু করেছে ব'লে খবর পাওয়া গেল। বিজার্তায় ফরাসীদের একটা সামরিক ঘাঁটি আছে। তিউনিসিয়ান স্বেচ্ছাসেনারা ১৯শে জুলাই সকাল থেকে ঐ ঘাঁটিতে যাবার পথ অবরোধ করতে আরম্ভ করে। তাদের উদ্দেশ্য দেশ থেকে ফরাসী বাহিনীর এই শেষ অস্তিত্বটুকুও বিলুপ্ত করা। প্রত্যেকটি পথাবরোধে ৫০ জন ক'রে স্বেচ্ছাসেনা হাতে হাতে পাথর সাজাবার কাজে নিযুক্ত হয় আর পুলিশেরা গাড়ী থামিয়ে যাত্রীদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। ১৮৯৪ সাল থেকে ফরাসীদের এই সামরিক ঘাঁটিটি আছে। সেখানে এখন ফরাসী সৈন্য সংখ্যা হবে ৫০০০। ফরাসী সেনারা তিউনিসিয়া ছাড়ো এই দাবীর পেছনেও ৫০০০ তিউনিসিয়ান ছাউনী ফেলেছে। ফরাসী সেনাদের পাহারা ফাঁড়ি ছেড়ে দেবার দাবীও তিউনিসিয়ায় উঠেছে।
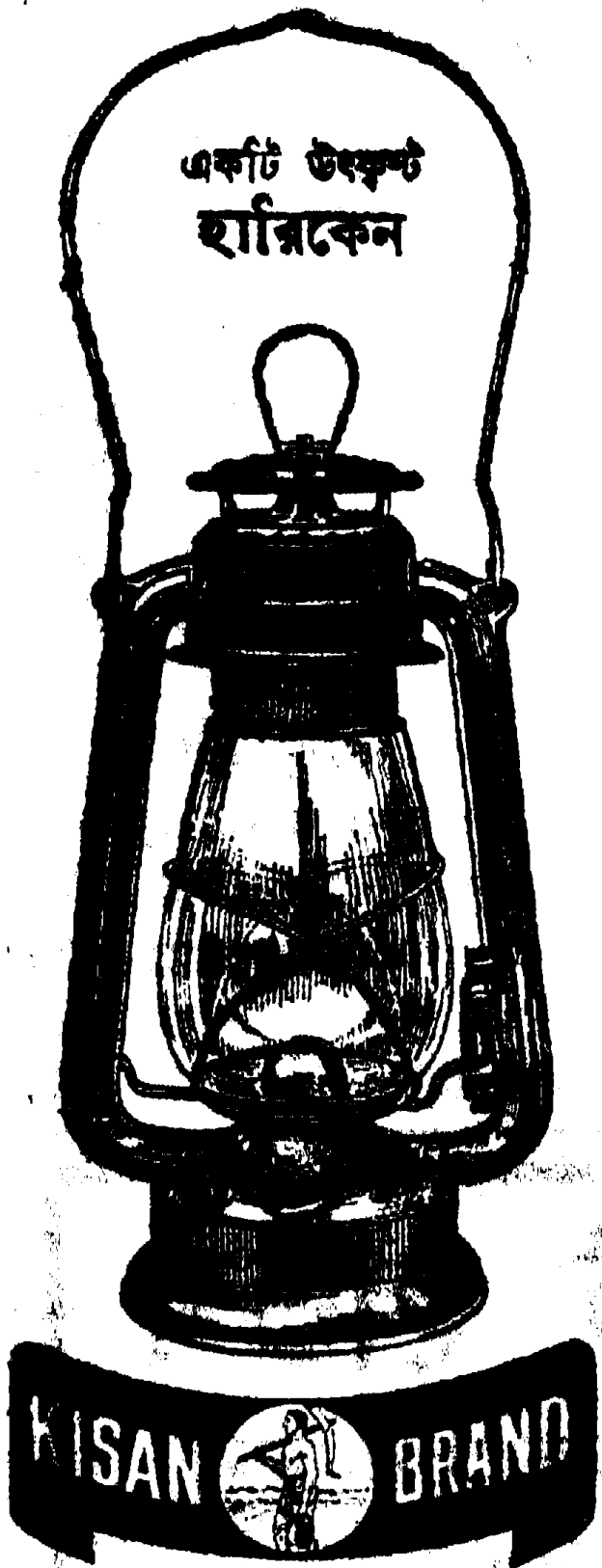
কিন্তু ফরাসীরাও বসে নেই। ফরাসী প্রচারমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ফরাসী ছত্রী সৈন্যদের বিজার্তার নৌ ও বিমানঘাঁটির শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাঠানো হ'চ্ছে। ফরাসী সরকার তিউনিসিয়াকে জানিয়ে দিয়েছেন, বিতাড়ন করতে চাইলেও তাঁরা বিতাড়িত হ'তে রাজী নন। তবে আলাপ করতে রাজী আছেন—যদি এ-সব বিক্ষোভের অবসান ঘটানো হয়। অর্থাৎ সেই পুরোনো প্রেস্টিজের প্রশ্ন। বিজার্তায় এখনও যে ৫০০০ সৈন্য আছে, তা খেলার জন্য রাখা হয়নি। বিজার্তাকে একটা ঘাঁটি হিসেবেই রাখা হয়েছে। সারা জগৎ এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিশ্চিত সূচনার মুখে। তার প্রকৃতি কি হবে, দক্ষ সামরিকবিদরাও সে হিসেবের নাগাল পেতে না পারেন। এমন অবস্থায় কেউই কিছু ছাড়তে রাজী নয়—যদি না নিতান্ত বাধ্য হয়। তিউনিসিয়া ফরাসীদের স্বদেশ নয়, উপনিবেশ; সেখানে তার থাকার ও কর্তৃত্ব করার কোন নৈতিক অধিকার নেই। তবু সে সেখানে থাকতে চায়, সৈন্য রাখতে চায়, বিমান ও নৌ-ঘাঁটি রাখতে চায়। সাম্রাজ্যভোগী ছাড়া এই মনোভাবের মধ্যে আর কেউ যুক্তি খুঁজে পাবেন না। তিউনিসিয়ার লোকেরা তিউনিসিয়ার সর্বময় কর্তৃত্ব চায় এবং চাওয়াই স্বাভাবিক—কিন্তু ইতিহাসের একটি অন্ধকারক্ষণে তিউনিসিয়া বিদেশের পদপীড়িত হয়েছে, আজ সে সম্পূর্ণ মুক্তি চায়। কিন্তু সে মুক্তি সহজ নয়। ফ্রান্স আজ আর প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি নয়, তবু তার সাম্রাজ্য চাই। পৃথিবীতে এত অশান্তির মূলে এই সাম্রাজ্যবিস্তৃতির, সাম্রাজ্যরক্ষার কামনা। এর অবসানের জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে মানুষকে—অন্তত এ বিষয়ে কোন দ্বিমত বা সংশয়ের অবকাশ নেই।

তৃতীয় :

যে তৃতীয় মানব মহাকাশ পরিক্রমা ক'রে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁর নাম ক্যাপ্টেন ভার্জিল 'গাস' গ্রিসম। তিনি আমেরিকান এবং দ্বিতীয় আমেরিকান মহাকাশচারী। প্রথম আমেরিকান মহাকাশচারী হচ্ছেন এলান শেপার্ড। এবং সর্বপ্রথম মহাকাশচারী মানুষ হচ্ছেন সোভিয়েট রুশ দেশের য়ুরি গাগারিন।

গ্রিসম ১১৫ মাইল উর্ধ্বাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এক সময় তাঁর ব্যোমযানের গতি ছিল ঘন্টায় ৫,৩১০ মাইল। তিনি পনের মিনিট উড়ন্ত অবস্থায় ছিলেন। ১১ সপ্তাহ আগে এলান শেপার্ড'ও তাই ছিলেন।

কিন্তু একটু ত্রুটি ঘটেছে অবতরণ-কালে। যে ক্যাপসুলটায় তাঁর সফরের তথ্য তা অতলান্তিক মহাসাগরে তলিয়ে গেছে। আশঙ্কা হচ্ছে আর তা উদ্ধার করা যাবে না। তবে এই ক্যাপসুলটি তলিয়ে যাবার আগে আর একটি হেলিকপ্টার গ্রিসমকে ধরে ফেলে।

হেলিকপ্টারবাহী র‍্যান্ডলফের ডেকে বেরিয়ে এসে গ্রিসম খুসী মনে হাসলেন। তিনি দুদিন গ্রেট বাহাম দ্বীপপুঞ্জে বিশ্রাম করবেন।

হেলিকপ্টারে তোলা হ'লে গ্রিসম প্রথমে যে কথা বললেন, তা এই: 'নাক ঝাড়ার একটা কিছু দিন তো; মাথায় সাগরের জল গেছে।' মনে হয় হেলিকপ্টার ধরে ফেলার আগেই তাঁর ককপিটে জল ঢুকে গেছল। যখন উড়ছিলেন, তখন খুব খুসী—চমৎকার সব ঠিক হ্যায়। ২১শে জুলাই সকাল ৭-২০ মিনিটে তিনি মহাকাশ যাত্রা করেছিলেন।

গ্রিসমকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

ঘটনা প্রবাহ

ঘরে—

১৪ই জ্বলাই—২৯শে আষাঢ় : বৃটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদানের প্রশ্নে ভারতের সমস্যা—দিল্লীতে ভারত-বৃটেন আলোচনার পরিসমাপ্তি—বৃটেন কর্তৃক ভারতের স্বার্থরক্ষার বিষয় স্মরণ রাখার আশ্বাস দান।

কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা ও ভীমা নদীতে বন্যার ফলে মহীশূর রাজ্য বিপন্ন হওয়ার আশংকা—তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি হুঁসিয়ারী—তিস্তা ও করলা নদীর জলোচ্ছ্বাসে জলপাইগুড়ি সহরের বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার (প্রথম) ফলাফল প্রকাশ—বিজ্ঞান শাখায় শতকরা ৬২·৭ জন ও কলা শাখায় শতকরা ৬৭·৭ জন কৃতকার্য।

১৫ই জ্বলাই—৩০শে আষাঢ় : "সামরিক সাহায্য গ্রহণ ভারতের পররাষ্ট্র নীতির পরিপন্থী—আমেরিকার নিকট ট্যাংক ক্রয় সম্পর্কে পাক্ প্রেসিডেন্টের (আয়ুব খান) অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা"—আয়ুব-কেনেডি যৌথ ইস্তাহারের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীভি. কে. কৃষ্ণমেননের মন্তব্য।

১৬ই জ্বলাই—৩১শে আষাঢ় : পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সিনেমা হলে প্রতীক ধর্মঘট পালন—কলিকাতার বেশীর ভাগ চিত্রগৃহেই প্রদর্শনী বন্ধ—সিনেমা কর্মচারীদের নিম্নতম মজ্বরী না দেওয়ার জের।

শিবসাগর ও জোড়হাটে (আসাম) পাঁচ সহস্রাধিক পরিবার বিপর্যস্ত—বুড়ী দিহাং ও ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় অসংখ্য গ্রাম জলমগ্ন—অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষ্ণা নদীর বন্যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত।

১৭ই জ্বলাই—১লা শ্রাবণ : পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪ শত চিত্রগৃহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ—ধর্মঘটী সিনেমা কর্মীদের ন্যূনতম বেতন চাল্ব করার দাবীতে অটুট মনোভাব—অনশনব্রতী কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি—অবস্থার অবনতিতে রাজ্য শ্রমমন্ত্রীর গভীর উদ্বেগ।

ডিব্রুগড় ও নাহারকাটিয়ার সহিত অবশিষ্ট আসামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন—মণিপুর উপত্যকার তিনটি নদীতেই ক্রমবর্ধমান প্লাবন—বিশ্বামিত্রি নদীর আকস্মিক বন্যায় বরোদা সহর জলমগ্ন।

কাছাড়ের তিনটি জেলা কংগ্রেস কমিটিকে বাতিলের চেষ্টার জের—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর নিকট করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্বেগপূর্ণ তারবার্তা—হাই কম্যান্ডকে হস্তক্ষেপ করার দাবী জ্ঞাপন।

১৮ই জ্বলাই—২রা শ্রাবণ : কলিকাতার কলেজসমূহে ছাত্রভর্তির সমস্যায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব—ছাত্র সংস্থাসমূহের ২১শে জ্বলাই 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত—বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ।

চলচ্চিত্র শিল্প কর্মচারীদের অনশন ধর্মঘট অব্যাহত—আরও কয়েকটি কেন্দ্রে ধর্মঘটের প্রসার—২৫শে জ্বলাই মধ্যে সর্বনিম্ন বেতন চাল্ব করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সার্কুলার জারী।

১৯শে জ্বলাই—৩রা শ্রাবণ : 'ভারত কাশ্মীরের উপর নূতন আক্রমণ বরদাস্ত করিবে না—কাশ্মীরের গণভোটের কথা বলা বাতুলতা মাত্র'—শ্রীনগরের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর স্পষ্ট ঘোষণা।

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমাশিল্পে অচল অবস্থা অব্যাহত—লেবার কমিশনারের আহ্বানে আয়োজিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে পরিস্থিতি আলোচনা।

২০শে জ্বলাই—৪ঠা শ্রাবণ : রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দিল্লীতে গুরুতর অসুস্থ—আন্ত্রিক রক্তক্ষরণরোগে আক্রান্ত—উদ্বেগজনক অবস্থায় নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত।

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমাশিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধের অবসান—ন্যূনতম বেতন চাল্ব করা সম্পর্কে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে মীমাংসা—চারদিন পর মালিকপক্ষ হইতে সিনেমা হলগুলি পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত।

হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের সমস্ত স্কুলই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ—ছাত্র ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য সরকারের কার্য-ব্যবস্থা।

বাইরে—

১৪ই জ্বলাই—২৯শে আষাঢ় : কুয়ায়েত হইতে ইংরেজদের সরিয়া পড়ার দাবী—কুয়ায়েতের উপর প্রভুত্ব না ছাড়িলে যুদ্ধ ঘোষণা—ইরাকী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কাসেমের সতর্কবাণী।

১৫ই জ্বলাই—৩০শে আষাঢ় : আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের প্রশ্ন রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রেরিত—ত্রিশক্তি জেনেভা বৈঠক কার্যতঃ ব্যর্থতায় পর্যবসিত—প্রসঙ্গটি সাধারণ পরিষদের আলোচ্যসূচীভুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী-জেনারেলের নিকট ইঙ্গ-মার্কিণ যৌথ প্রস্তাব।

'কঙ্গোলী পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান ও অনুষ্ঠান দুই-ই বে-আইনী'—কাসাভুবু (কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট) ও রাষ্ট্রসংঘের নিকট কাতাঙ্গা সরকারের তারবার্তা।

১৬ই জ্বলাই—৩১শে আষাঢ় : কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসার্থ নেহরুর (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) আলোচনায় মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডি সম্মত—ওয়াশিংটন বেতারে পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

আঙ্গোলায় আফ্রিকানদের সহিত পর্তুগীজ সৈনদের তুমুল যুদ্ধ—প্রায় পাঁচশত আফ্রিকান নিহত।

১৭ই জ্বলাই—১লা শ্রাবণ : খান আব্দুল গফুর খানের প্রায় তিনশত অনুগামীকে গ্রেপ্তারের সংবাদ—রাষ্ট্রবিরোধী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের কঠোর ব্যবস্থা।

উত্তর কাতাঙ্গাকে ৩৬ ঘণ্টা মধ্যে নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণার দাবী—কাতাঙ্গা সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘের চরমপত্র সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

১৮ই জ্বলাই—২রা শ্রাবণ : সিংহলে সিরিমাভো বন্দরনায়ক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব—অর্থনৈতিক ও সিংহলী-তামিল ভাষা সমস্যা সমাধানে সরকার ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ।

'বার্লিনে পশ্চিমীদের অধিকারচ্যুতির চেষ্টা করা হইলে বিপদ দেখা দিবে'—সোভিয়েট স্মারকলিপির উত্তরে ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী শক্তিত্রয়ের যুগপৎ সতর্কবাণী।

১৯শে জ্বলাই—৩রা শ্রাবণ : ফরাসী বিমানের উপর টিউনিসীয় বাহিনীর গুলীবর্ষণ—বিজের্তা হইতে ফরাসীদের হটাইবার জন্য টিউনিসিয়ার সংগ্রাম—ফরাসী নৌ ও বিমান ঘাটির শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্যারিস হইতে ছত্রী সৈন্য প্রেরণ।

মার্কিণ সামরিক প্রস্তুতি বর্ধিত করার তোড়জোড়—বার্লিন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির ঘোষণা।

২০শে জ্বলাই—৪ঠা শ্রাবণ : বিজের্তায় প্রচণ্ড সংগ্রামে শতাধিক টিউনিসীয় ফৌজ নিহত—রকেট ও বোমার সাহায্যে ফরাসীদের আক্রমণ—ফ্রান্স-টিউনিসিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন—নিরাপত্তা পরিষদের (রাষ্ট্রসংঘ) বৈঠকের দাবীতে টিউনিসীয় সরকারের উদ্যম।

"অর্ধ লক্ষ 'আজাদ কাশ্মীর' স্বেচ্ছাসৈন্য কাশ্মীর অভিযানের জন্য প্রস্তুত"—পাকিস্তানী সংবাদপত্রসমূহে ফলাও করিয়া সংবাদ প্রচার।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

।। বহু-ভাষা শিক্ষার স্বপক্ষে ।।

আচার্য হরিনাথ দে বহুভাষাবিদ্ ছিলেন একথা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁর নামের সঙ্গে এক সারিতে বসানো যায় এমন নাম আর বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। হরিনাথ দে বহু বিদেশী ভাষার সঙ্গে শিক্ষা করেছিলেন আরবি, উর্দু, ফারসী প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় ভাষা। ইদানীং কালে আমাদের বাংলাদেশে বিদেশী ভাষা শিক্ষার দিকে কিছু আগ্রহ বেড়েছে। ফলে এলায়েন্স ফ্রান্সেসে, কিংবা মোক্ষমূলের ভবনে ফরাসী, জার্মানী শিক্ষা দেওয়া হয়, রুশভাষা শিক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর ভিড় কম হয় না। উদ্দেশ্য যাই হোক মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় জ্ঞানার্জন সব ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয়।

আমাদের ভারতবর্ষে অনেকগুলি ভাষা, এবং সেই সব ভাষার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ সমৃদ্ধ। গুজরাতিভাষা সম্পর্কে এককালে আমাদের জ্ঞান ছিল যে ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলির মধ্যে সেই ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ। গুজরাতিভাষায় এতাবৎকাল বাংলা সাহিত্যের যে-পরিমাণ অনুবাদ হয়েছে তা আর কোনও ভারতীয় ভাষায় হয়নি। যাঁরা আমেদাবাদ অঞ্চলে গিয়েছেন তাঁরাই জানেন সেখানকার সাধারণ মানুষও শরৎচন্দ্র পড়েছেন এবং বাংলাভাষায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম তাঁরা মুখস্থ বলতেও পারেন। গুজরাতি সাহিত্যিকেরা বাংলা-সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই এই ট্রাডিশন গড়ে উঠেছে এবং বাংলাভাষার সঙ্গে গুজরাতি ভাষার অনেকটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে যেমন আছে গুজরাতি মেয়ে এবং পুরুষদের চেহারার সঙ্গে বাঙালী মেয়ে এবং পুরুষের।

তেলেগু ভাষায় বাংলাদেশের অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে, সেখানকার সাহিত্যিকেরা অকপটে স্বীকার করেছেন যে বাংলা-সাহিত্যের দ্বারা তাঁরা অনেকাংশে প্রভাবিত। এমন কি যাঁদের আধুনিক তেলেগু কবিতার সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে তেলেগু আধুনিক কবিতার মেজাজ এবং আঙ্গিকের বেশ সাদৃশ্য আছে।

তামিল সাহিত্যিকেরা শুধু যে বাংলাভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী তামিল ভাষায় অনুবাদ করেছেন তা নয় তাঁরা তামিল ভাষায় লিখিত গ্রন্থ বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছেন।

মালয়ালাম লেখকরাও বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থাদি তাঁদের ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল।

উড়িষ্যার মানুষে বাংলার প্রতিবেশী, সেই ভাষার সঙ্গে বাংলার প্রভূত মিল আছে? যেমন মিল আছে সেখানকার মানুষের সঙ্গেও। সেই কারণে লক্ষ্য করেছি, উড়িষ্যার সাধারণ মানুষও সাগ্রহে বাংলা সাহিত্যের অতি-সাম্প্রতিক গ্রন্থ পাঠ করে আনন্দ পান।

অসমীয়া ভাষাও বাঙালীর কাছে অপরিচিত নয়, শুধু আকারে নয় বাংলাভাষার সঙ্গে তার অক্ষরগত মিল পর্যন্ত আছে। কিন্তু সেখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বর্তমান মনোভাব বাঙালী পাঠকমাত্রেরই পরিচিত, সুতরাং বিশেষ মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশ দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সঙ্গে অতিশয় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশের নেতাদের সমমর্মিতাই এই বন্ধুত্বের অন্যতম কারণ। মারাঠীভাষায় বাংলাদেশের অনেক নাটক এবং উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। একা মামা বড়েরকর গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটক এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাস মারাঠীতে অনুবাদ করেছেন।

সখারাম গণেশ দেউস্কর তো বাংলাভাষায় সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছেন এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন।

পাঞ্জাবী সাহিত্যিকরাও পিছিয়ে নেই, তাঁরাও বাংলাভাষার বহু গ্রন্থ গুরুমুখীতে এবং উর্দুতে অনুবাদ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সেই প্রদেশে অপরিচিত নন।

এতক্ষণ আমাদের রাষ্ট্রভাষার উল্লেখ করা হয়নি তার কারণ রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার অনেক যোগ, অনেক বাঙালী হিন্দীতে সদ্ গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বাংলাভাষা ও হিন্দী ভাষার সঙ্গে সংযোগ ঘনিষ্ঠ থাকায় পারস্পরিক আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। বাঙালী চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় সর্বপ্রথম হিন্দী উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র 'সরস্বতী' প্রকাশ করেন এলাহাবাদ থেকে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বিশাল ভারতের'।

বাংলাভাষায় সাম্প্রতিক কালে প্রেমচাঁদ, মহাদেবী বর্মা প্রভৃতির রচনা অনূদিত হয়েছে, ছোটগল্পাদিও অনূদিত হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে কিছু কিছু প্রদর্শক সাহিত্য বাছাই করে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সেই সব রচনার মধ্যে অতি সাম্প্রতিক কালের লেখকের রচনাও আছে।

তবু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সংযোগসূত্র ঢিলে হতে বসেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে দেশপ্রেমের Common cause যে ভাবে সারা ভারতকে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ায় রুটি এবং রুজির লোভে প্রদেশে প্রদেশে ভীষণ মন কষাকষি, কেউ কাউকে দেখতে পারে না, পারস্পরিক অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞার বাহুল্য দেখে মনে হয় 'সেই তুমি, সেই আমি সেই প্রেম গেল কোথা?'

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, গগনবিহারী লাল মেহতা, শ্রীপ্রকাশ, হরেকৃষ্ণ মহতাব, বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক, গোপাল রেড্ডি, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী প্রভৃতি প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দ উত্তম বাংলা জানেন, বাংলায় বক্তৃতাদি করতেও সমর্থ। অনেক বিদেশী চমৎকার বাংলা বলেন, মার্কিণ মহিলা লীলা রায়, চেকোশ্লোভাক মহিলা মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়, বেলজিয়ান পাদ্রী ফাদার ফাঁলো, রাশিয়ান মহিলা ভেরা নাভিকোভা প্রভৃতির মুখে যে বাংলাভাষা শুনেছি তাতে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। অপরের মুখে মাতৃভাষা শুনলে ভালো লাগে এবং ডেল কার্নেগীর "বন্ধুত্ব লাভের প্রকৃষ্ট উপায়" গ্রন্থে উল্লেখ আছে কিনা জানি না তবে একথা নিশ্চয়ই বলা যায়, হৃদয় জয় করার এমন সুন্দর উপায় আর নেই।

আমরা যখন শুনি রবীন্দ্রনাথের রচনা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে তখন আমাদের হৃদয় ভরে ওঠে। তেমনই অন্য দেশের, অন্য প্রদেশের সাহিত্যিকের রচনা বাংলাভাষায় অনূদিত হলে সে প্রদেশের সঙ্গে আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ একক প্রচেষ্টায় যে 'বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি' স্থাপন করেছেন সেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং ভারতের

বাইরের কিছু ছাত্র-ছাত্রী চমৎকার বাংলা শিখেছেন।

অন্ধ্র-সাহিত্য পরিষদ ও ভারতী তামিল সঙ্ঘ তেলেগু ভাষা ও তামিল ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করেছেন এই কলকাতা শহরে, অনেকে শিখছেন, এবং আমার মনে হয় এই সুযোগ সকলের গ্রহণ করা উচিত।

হিন্দী ভাষার স্বপক্ষে প্রচার করার উদ্দেশ্য আমার নেই, হিন্দী ভাষা শেখার ব্যাপারে আপত্তি কারো থাকা উচিত নয়। বরং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে হিন্দী শিক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারত এর মূল্য বুঝেছেন এবং সেই কারণে সেখানকার মানুষ বেশ চমৎকার হিন্দী শিখছেন। অগ্রসর হচ্ছেন অন্যান্য প্রদেশের চাইতে হিন্দীতে বিশেষ পারদর্শী হয়েছেন।

বাঙালী ইংরেজীতে ইংরেজ আমলের গোড়ায় বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তার ফলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তার উপকার হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, সে ভাষা শিক্ষায় যদি কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়ে থাকে তাহলে সংস্কৃত থেকে গড়ে ওঠা নাগরী অক্ষরের হিন্দী শিক্ষা করতে আপত্তি কি! অন্য ভাষা শিখতেও বা বাধা কোথায়! বহু ভাষাবিদ্‌ হলে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় একথা স্বীকার্য।

আর প্রদেশে প্রদেশে মিল হওয়া সম্ভব পরস্পরের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা নিয়ে পরিচিত হওয়ায়। হরিনাথ দের প্রতিভা সকলের নেই, তবে অন্ততঃ চার পাঁচটি ভাষা অনায়াসে শেখা যায়, বিশেষ করে ভাষা যদি ভারতীয় হয়।

নতুন বই

রাজায় রাজায়, (উপন্যাস) প্রাণতোষ ঘটক। এম, সি, সরকার এ্যান্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা—১২। নয় টাকা।

এ কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইদানীং যে 'পর্ব-উপন্যাস' লেখার দিকে বাংলার সাহিত্যিকরা আগ্রহান্বিত হয়েছেন তার পথ-প্রদর্শক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। তাঁর 'আকাশ-পাতাল' নামক সুবৃহৎ রচনা তাঁকে খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর আলোচ্য উপন্যাস 'রাজায় রাজায়' তাঁর সেই পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবে।

ইংরেজ যখন বাংলাদেশে ধীরে ধীরে তার অক্টোপাশের বাহু বিস্তার করছে এই পর্ব-উপন্যাসটির কাল সেই কাল। সেই সোনার অতীতের পট-ভূমিকায় 'রাজায় রাজায়' রচিত। এই উপন্যাসটির এক হিসাবে বিশেষ মূল্য আছে। প্রাচীন বাংলার সামন্ততন্ত্রের এমন নিখুঁত চিত্র সংখ্যায় বেশী নেই। একটা সম্পূর্ণ কালের ছবি লেখক এই উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। রাজা কালীশংকর এবং তাঁর ভাই কাশীশংকরকে ঘিরে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। ছোটভাই কাশীশংকর শক্তিমান পুরুষ, তার দৃঢ় চরিত্র এবং আত্মবিশ্বাস তাকে এই উপন্যাসটিতে একটি মহৎ ভূমিকা দান করেছে। নারী-চরিত্রের মধ্যে সে যুগের সমাজের অন্তঃপুরের আলেখ্য সুন্দর ফুটেছে। এই বৃহৎ উপন্যাসটি তাই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের আগ্রহ এবং কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। কল্পনার বলশালীতা এবং লিখনভঙ্গীর নিপুণতায় 'রাজায় রাজায়' বাংলা উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট পথ-চিহ্ন। প্রচ্ছদ মনোরম।

মায়ামারীচ— উপন্যাস। সুনীলকুমার ঘোষ। সুরভি প্রকাশনী। ১, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য : ৩.৫০ নয়া পয়সা।

মায়ামারীচ গত মহাযুদ্ধের সময়ের যুদ্ধযুগের একটি করুণ চিত্র। যুদ্ধ, মহামারি আর মড়ক নিয়ে বাংলা উপন্যাস আগে রচিত হয়নি, একথা সত্য নয়; কিন্তু মায়ামারীচে মনুষ্যত্বের যে-আবেদন মনকে নাড়া দিয়ে যায় ঠিক তেমনটি বোধ হয় আর কোথাও নেই। এর প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে আমাদের আলাপ রয়েছে। বিমল, বিকাশ, জগদু, অনিল-বাবু, সত্যবাবু, অতনু ভট্চায, সীতা—এরা সবাই কেরানী। কিন্তু এদের রূপ বিভিন্ন, এদের আবেদনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আবার মেজ সাহেব রায়বাহাদুর ব্যোমকেশ লাহিড়ী থেকে সিং সাহেব পর্যন্ত—এদেরও আমরা চিনি। সুরমা, কেটি মিটার, মিসেস খাস্তগীর—টাইপ চরিত্র হলেও আমাদের চিন্তার খোরাক জোগায় তারা।

সুনীলকুমার ঘোষ সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নন; কিন্তু এইটিই তাঁর সর্ব-প্রথম, এবং সার্থক উপন্যাস। চরিত্র-বিশ্লেষণের দক্ষতা ছাড়াও, তাঁর ভাষার মুন্সীয়ানা পাঠককে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত দ্রুতবেগে টেনে নিয়ে যায়। বাংলার সাহিত্যিকরা আজ নব-দিগন্তের উন্মাদনায় মুখর। সেদিক থেকে মায়ামারীচ বাংলা উপন্যাসে একটি সার্থক যোজনা।

ঋগ্বেদ—(প্রথম অষ্টক)—ডঃ মতিলাল দাশ। ভারত সংস্কৃতি পরিষৎ, ব্লক কে, প্লট, ৪৬৭, নিউ-আলিপুর, কলিকাতা (৩৩)। দাম পাঁচ টাকা।

ভূমিকা পাঠে জানা গেল যে, দানবীর প্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় ভারত সংস্কৃতি পরিষদের বেদ প্রচারের জন্য সহস্র মুদ্রা দান করেন এবং তাঁর বদান্যতায় ঋগ্বেদ প্রথম অষ্টকের পদ্যানুবাদ যা লেখক বহুদিন পূর্বে জলপাইগুড়িতে করেছিলেন তা এতদিনে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য বেদাভিজ্ঞ পাঠকের বেদের সঙ্গে সুষ্ঠু পরিচয় সাধন, সেই উদ্দেশ্য কতখানি সার্থক হবে বলা কঠিন, কারণ পদ্যাংশ অতিশয় দুর্বল হওয়ায় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে এবং স্থানে স্থানে হাস্যকর মনে হয়। তবে প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনায় লেখক গদ্যে যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হৃদয়গ্রাহী এবং অত্যন্ত মূল্যবান, সেই কারণে মনে হয় তিনি গদ্যপথেই যদি নিজের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখতেন এবং পুরাতন রচনা প্রকাশের মোহ ত্যাগ করতে পারতেন তাহলে তাঁর শ্রম এবং উদ্যম দুই সার্থক হত।

রবীন্দ্রায়ন—(প্রথম খণ্ড)—স্মরণ-গ্রন্থ —পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত। বাকসাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দশ টাকা।

পুলিনবিহারী সেন বিশ্ব-ভারতীর সুযোগ্য সম্পাদক, রবীন্দ্র-রচনাবলীর সুদক্ষ সংগ্রাহক এবং তাঁর এই সাহিত্য-গবেষণা ও সম্পাদনার খ্যাতি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। রবীন্দ্রনাথের বহু অপ্রচলিত রচনা তিনি উদ্ধার করেছেন, এবং রচনার ও প্রকাশের সন, তারিখ, যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন আর সেই অতুলনীয় সাহিত্য-সম্ভার পরিবেশনে অতুলনীয় সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন, একথা বাংলা-সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। পুলিনবিহারী সেন মহাশয় রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দুই খণ্ডে বিরাট স্মরণ-গ্রন্থ বা Commemoration Volume প্রকাশের সঙ্কল্প করেছেন এবং তার প্রথম খণ্ডটি রবীন্দ্রায়ন নামে প্রকাশিত হয়েছে।

এই খণ্ডে রবীন্দ্র-সাহিত্য-গবেষকগণ লিখিত ষোলোটি প্রবন্ধ এবং অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, বোরিস জর্জিয়েফ, অতুল বসু, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি শিল্পীদের আঁকা বারোখানি দুর্লভ চিত্র এবং আলোকচিত্র সংযোজিত হয়েছে। চিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং কয়েকটি বহুবর্ণ সমন্বয়ে মুদ্রিত। এই চিত্রগুলি গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে এবং অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

প্রথমেই আছে স্বর্গতঃ অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অসম্পূর্ণ রচনা রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প কথায় সাহিত্যাচার্য যে প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন তাতে চিন্তার প্রয়োজন আছে। তিনি বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথকে প্রচারের প্রলোভন আমাদের ত্যাগ

করতে হবে, কি বিদেশে কি ভারতবর্ষে।" —কারণ বড় সৃষ্টিকে বিদেশী বলে যারা অগ্রাহ্য করে বঞ্চিত হয় তারাই। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিন জগৎ'। এই প্রবন্ধে আছে কলিকাতা, শিলাইদহ এবং শান্তিনিকেতন এই তিন জগতে কবির বিচরণ ও মানসিকতার স্ফুরণ সম্পর্কে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আলোচনা। শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে উপনিষদিক প্রকাশভঙ্গী তাঁর অসংখ্য লেখায় কিভাবে দেখা দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস', রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীন ভারতের যে-সব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত করেছিল—কালিদাস তাঁদের অন্যতম। অতীত ভারতের সঙ্গে বর্তমান ভারতের আত্মিক মিলন ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে। শ্রীসুকুমার সেন লিখেছেন 'রবীন্দ্র কবিতায় ভাষা-ব্যবহার।' রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ভাষা গঠন করেছিলেন নিজস্ব রীতিতে এবং কিভাবে প্রাচীন কবি এবং দেশী-বিদেশী—নানা শব্দ সংগ্রহ করে তার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন—এই প্রবন্ধে লেখক তার অতি সুন্দর পরিচয় দান করেছেন, এই প্রবন্ধটি এই সংকলনের অতি মূল্যবান রচনা। তেমনই মূল্যবান বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের শব্দ'। বহুকাল এমন প্রবন্ধ চোখে পড়েনি। ত্রিশটি উপবিভাগে ভাগ করে তিনি রবীন্দ্রনাথের শব্দব্যবহারের একটি মূল্যবান তালিকা রচনা করেছেন। অমলেন্দু বসুর 'রবীন্দ্রনাথের বাক্ প্রতিমা' এবং সুনীলচন্দ্র সরকারের 'আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব' প্রবন্ধ দুটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় মহৎ গ্রন্থের পরিচয় স্বল্প পরিসরে সুষ্ঠুভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যে লেখকদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং বক্তব্যের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সব কারণে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ন' অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে। এই গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারে সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন।

নিজেকে জান—(জ্যোতিষ চর্চা)—(১ম খণ্ড) স্বামী প্রজ্ঞাচৈতন্য ভারতী। প্রাপ্তিস্থানঃ মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দুই টাকা।

গ্রন্থকার পদ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী মাসফল বিবরণ রচনা করেছেন। এই কার্যে তিনি চব্বিশ বছর কাল পরিশ্রম করেছেন এবং কঠিন অঙ্কশাস্ত্রকে সরস করার চেষ্টা করেছেন। এই জাতীয় যে সব গদ্যাকারে রচিত গ্রন্থ দীর্ঘদিন ধরে বাজারে চালু আছে, বর্তমান গ্রন্থের সঙ্গে তার প্রচুর মিল আছে। সুতরাং মনে হয় গণনা নির্ভুল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য—(গবেষণামূলক প্রবন্ধ)—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা— কলিকাতা-৯। মূল্য আট টাকা।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় গবেষণা গ্রন্থের লেখক হিসাবে সুপরিচিত হয়েছেন। তথ্য ও তত্ত্বের নিষ্ঠাপূর্ণ পরিবেশনে তাঁর কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে অরুণকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু গবেষকরূপে এই গবেষণা কর্মে লিপ্ত হন এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর এই গবেষণালব্ধ ফল ডি. ফিল ডিগ্রীর জন্য পেশ করেন এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন করেন। এই কর্ম তিনি বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সম্পন্ন করেছেন। এক হিসাবে তাই "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য" সম্প্রতি প্রকাশিত হলেও অরুণকুমারের প্রথম বৃহৎ সাহিত্যকর্ম বলা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থটির পরিপূরক সংকলন 'ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবিতার সংকলন'। এই দুখানি গ্রন্থ একত্রে পাঠ করা কর্তব্য। তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবিতার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে পাঠক যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করবেন। ১৮৫৮ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত যে কাল সেই কালের কবিদের কাব্য এবং কাব্যাদর্শ সম্পর্কে অরুণকুমার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। প্রস্তাবনায় প্রাগাধুনিক বাংলা গীতি-কবিতা সম্পর্কে আলোচনান্তে লেখক রেনেসাঁ ও গীতি-কবিতার বিলম্বিত আবির্ভাব, প্রেম-কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গার্হস্থ্য জীবনের কবিতা, প্রকৃতি-কবিতা, বিষাদ কবিতা ও তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা সম্পর্কে এই বিরাট গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। পরিশিষ্টে ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনাটুকুও মূল্যবান।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, পূর্বসূরীদের আমরা সহজেই বিস্মৃত হই। একথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে আধুনিককালের অধিকাংশ পাঠকের ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের সঙ্গে পরিচয় পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে স্কুল-জীবনেই শেষ। রবীন্দ্র-পূর্ব এবং রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের কীর্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রশংসনীয় নয়। লেখক অশেষ শ্রম স্বীকার করে খ্যাত এবং অখ্যাত কবিদের বিভিন্ন ধরনের কবিতার উল্লেখ এবং উদ্ধৃতির দ্বারা প্রকাশ-রীতি, বক্তব্য, ছন্দবিন্যাস, অলংকরণ, ও ভাষাভঙ্গীর পরিচয় দান করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে বিভিন্ন কবিরা কিভাবে পরস্পরের কাছে ঋণী, কিভাবে প্রভাবিত, লেখক বিশ্লেষণ সহকারে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এই গবেষণা গ্রন্থ নিঃসন্দেহে উৎসাহী পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করবে।

বাংলা কাব্যে শিব—(গবেষণা প্রবন্ধ): ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং (প্রাঃ) লিমিটেড্— কলিকাতা—৭। মূল্য দশ টাকা।

শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য ইদানীং কালের সাহিত্য-গবেষকদের মধ্যে খ্যাতিলাভ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থ তাঁর ডি. ফিল ডিগ্রীর জন্য রচিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং শশিভূষণ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ও উপদেশে রচিত।

লেখক গ্রন্থারম্ভে সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ দিয়ে ভারত শিব, বঙ্গ শিব, এবং শিবরূপ সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির মূলাধার ছিল কৃষি, তার সঙ্গে শিবের যোগ কিভাবে হয়েছিল তা আজো বিচার্য। এর সঙ্গে বৈদিক রুদ্র দেবতার

কোনোরকম মিল নেই। কিন্তু কালক্রমে অনার্য শিব এবং বৈদিক রুদ্রদেব একাত্মা হয়ে গিয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি আর্য-অনার্য ভাবনার সমীকরণে গঠিত। লেখক তাঁর বক্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বে ন্যায্য কারণেই শিব ধারণার ঐতিহাসিক এবং শাস্ত্রীয় রূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাঁর সেই প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে শুধুমাত্র ভারত শিব, বঙ্গ শিব এবং শিবরূপ এই তিনটি বিভাগ নিয়েই একটি বিরাট গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। লেখক বাংলাদেশে এবং বাংলা কাব্যে শিবকে নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে এই রূপান্তর সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ, বিচিত্র দেশ। এদেশে দেব-দেবীকে মানুষ শুধু ভয় করে না ভালোবাসে, তাই মহাদেব এখানে জামাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি ভিখারী, ভাঙড় ভোলানাথ, শ্মশানে-মশানে অনুচর নিয়ে ঘুরে বেড়ান আর আমাদের কন্যা উমা (শিবানী) সেই ভোলানাথের সংসারের গৃহিণী হয়ে অশেষ কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করেন। তাই আমরা বোধনের সময় গান গাই 'এবার উমা এলে আর উমাকে পাঠাবো না' এবং নবমীর রাত্রে অনুনয় করি 'নবমী নিশি আর পোহায়ো না' কারণ তাহলেই উমাকে শ্বশুরঘরে যেতে হবে। এখানে শিব রুদ্র মূর্তি নিয়ে আসেননি, তিনি এদেশে ভোলানাথ।

লেখক কাব্যে মানব শিব পর্যায়ে শিবের এই দেবত্ব থেকে মানবত্বে নামা, তার গৃহচিত্র, প্রেমিক রূপ, কামুক রূপ, মাদকী রূপ, ঔদরিক রূপ, বিতণ্ডিণ, বিদূষক এবং সর্বশেষে বাঙালীর শিব-কথা অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে শিবের স্থান অতি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শৈব সাহিত্য পর্যায়ে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র থেকে দ্বিজ রামচন্দ্র এবং অন্যান্য স্বল্পখ্যাত কবিদের প্রসংগ অবতারণা করেছেন। এবং পরিশেষে বাঙালী মানস ও শিব সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলেছেন। অতঃপর আধুনিক যুগে পৌঁছে আধুনিকতম কবিদের কবিতা পর্যন্ত আলোচনা ও উল্লেখ করেছেন, এ কার্য কম দায়িত্বের নিদর্শন নয়। লেখক বাংলা কাব্যের সব যুগেই তাঁর আলোচনার বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাফল্যলাভ করেছেন।

পাদটীকা যথাস্থানে সন্নিবেশিত না হওয়ায় পাঠকের একটু অসুবিধা হয়। তাছাড়া পূর্ব ইতিহাসের তথ্যাদি সঙ্গত কারণেই লেখককে সংক্ষেপ করতে হয়েছে, তার ফলে কোনো কোনো তথ্য অত্যন্ত আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে গেছে, এতে পাঠকমনের অপূর্ণতা থেকে যায়।

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য যে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেছেন তার প্রমাণ এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। বাংলার সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও লোক-সংস্কৃতির কি নিবিড় সংযোগ লেখক তা তথ্য ও প্রমাণ সহকারে আলোচনা করেছেন বলেই গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে।

রৌদ্রধারা—(কবিতা)—কনক মুখোপাধ্যায়। প্রতিশ্রুতি— কলিকাতা-১২। দাম দু'টাকা।

শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সংকলন 'রৌদ্রধারা'য় তাঁর বিগত পাঁচ বছরে রচিত কবিতাবলী সংগৃহীত হয়েছে। এই কবিতাগুলি নানা সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং সাহিত্যরসিক সমালোচক ও সম্পাদকদের প্রশংসালাভ করেছে। কবিতাগুলি নিতান্ত কাঁচা হাতের রচনা নয়। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুন্দর।

রাণী এলিজাবেথ—অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১·৭৫।

কয়েকখানি মনোরম ফটো-চিত্রসহ রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের এই জীবন-কথা উপভোগ্য ভাষায় রচনা করেছেন গ্রন্থকার। সাম্প্রতিক কালে রাণীর ভারত-ভ্রমণের জন্য এই গ্রন্থ জনসাধারণের কৌতূহল নিরসনের সহায়ক হবে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

অবশেষে শুভবুদ্ধিই বাঙলাদেশের চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর অচলাবস্থার অবসান ঘটাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম-মহাধ্যক্ষ শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের বিচক্ষণ মধ্যস্থতায় চিত্রগৃহের মালিকপক্ষ নীতিগতভাবে ১৮-৫-৬০ তারিখে সরকার-বিঘোষিত ন্যূনতম পারিশ্রমিক প্রদান সম্পর্কীয় বিজ্ঞপ্তি মেনে নেওয়ায় এবং এই পারিশ্রমিক প্রদানের হার অনুযায়ী বেতন দিতে চিত্রগৃহ মালিকদের অসুবিধার কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে, সরকারের তরফ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কলকাতা এবং এবং মফঃস্বলের বি-এম্-পি-এর সভ্য-শ্রেণীভুক্ত চিত্রগৃহের দরজাগুলি কয়েকদিন বন্ধ থাকবার পর আবার গেল শুক্রবার, ২১-এ জুলাই থেকে চিত্রামোদী সাধারণের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। এই সম্পর্কে বেঙ্গল মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রদর্শক-শাখার সভাপতি শ্রীজালানের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর আশা করা অন্যায় হবে না যে, শ্রমিক ও মালিক—উভয় পক্ষই বর্তমান সরকারের শ্রম-নীতির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বাঙলার চিত্রপ্রিয় জনসাধারণের নির্দোষ আনন্দ উপভোগের প্রধান অবলম্বনটিকে চিরকালের জন্যে বাধামুক্ত রাখবেন।

পোলিশ সিনেমা :

পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র-শিল্প গেল তিন-চার বছরের মধ্যে পৃথিবীর চলচ্চিত্র-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছে বেশী ক'রে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯—এই তিন বছরে পোল্যাণ্ডের সাতটি গল্পচিত্র (feature film) এবং তিনটি দলিলচিত্র আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। যে-কোনও দেশের পক্ষে এটা খুবই গর্বের কথা। অথচ শুনে বিস্মিত হবেন, পোল্যাণ্ডের সিনেমাশিল্প গেল যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল—সব ক'টি স্টুডিও সমস্ত যন্ত্রপাতি সমেত শত্রুর নিষ্ঠুর আঘাতে হয়ে গিয়েছিল চূর্ণ-বিচূর্ণ—তাদের অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র ছিল না। এমন কি, চিত্রজগতের সঙ্গে সংশিলষ্ট কলাকুশলী এবং শিল্পীদের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধের বিভীষিকাময় জীবন যাপনের পরেও যাঁরা বেঁচেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকেই অঙ্গহীন, রুগ্ন এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র-শিল্প নবজন্ম লাভ করল। এবং এই শিল্পকে সব রকমে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এলেন পোলিশ সরকার।

আজকে পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র-শিল্প হচ্ছে একটি সরকারী সংস্থা। ওখানকার তিনটি শহর—লুজ, ব্রেজ্‌লো এবং ওয়ারশ'তে তিনটি বড় স্টুডিও আছে, যেখানে সাধারণতঃ গল্পচিত্র বা feature film তোলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া দলিল-চিত্র (documentary), কার্টুন-চিত্র, কথা-কওয়া-পুতুল চিত্র (puppet film) এবং পরীক্ষামূলক (experimental) চিত্র তোলবার জন্যে কয়েকটি ছোট ছোট স্টুডিও-ও আছে। ঠিক যুদ্ধের পরেই পোল্যাণ্ডে বছরে মাত্র দু'খানি ক'রে বড়ো ছবি তৈরী হয়। সেই সংখ্যা বেড়ে ১৯৫৯-৬০

"ডাকাতের হাতে" চিত্রে রিতা ও পল্লব। চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি ছবিটির প্রযোজক এবং শান্তি চৌধুরী পরিচালক

সালে হয়েছিল মাসে দু'খানি ক'রে, অর্থাৎ বছরে চব্বিশখানি। শোনা যাচ্ছে, পোলিশ সিনেমাশিল্পের কর্ণধারেরা বছরে অন্ততঃ তিরিশখানি ছবি সম্পূর্ণ করবার সংকল্প নিয়েছেন।

কিন্তু মাত্র সংখ্যার জন্যে নয়, উন্নত মানের জন্যেই যে পোলিশ চিত্র-রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে এ-কথা আগেই উল্লেখ করা গেছে। এবং এই মানোন্নয়নের দিকে প্রথম চেষ্টা শুরু হয় ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে। যুদ্ধের পরেই লজ শহরে পোলিশ সরকার যে চলচ্চিত্র শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সেইখানে শিক্ষালাভ করবার পর স্নাতক হয়ে নতুন নতুন পরিচালক এবং চিত্রধর (Cameraman) এই শিল্পে এসে যোগ দেন। এই নতুনেরা তাঁদের সঙ্গে এনেছিলেন নতুন চিন্তাধারা, নতুন পদ্ধতি, নতুন বিষয়বস্তু। এ'দের চিন্তা হ'ল, কি ক'রে উন্নততর চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে কি উপায়ে সেই উন্নত চলচ্চিত্র দেখবার জন্যে দর্শক আকর্ষণ করা যায়। সংখ্যায় বেশী চলচ্চিত্র, উন্নতমানের চলচ্চিত্র এবং প্রচুর দর্শক—এই তিনটি চাহিদাকে পূরণ করবার জন্যে তাঁরা দেশের শিক্ষিত, উন্নতরুচির এবং প্রগতিপন্থী নেতৃস্থানীয় লোকেদের সঙ্গে আলোচনা চালালেন ঝড়ের বেগে। অদম্য কর্মস্পৃহা তাঁদের প্রতিনিয়তই আকুল ক'রে তুলছিল কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে; তাই তাঁরা আলোচনার সময়টাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিলেন। এই আলোচনার ফলেই ১৯৫৬ সালে জন্ম নেয় গুটি আষ্টেক শিল্পীগোষ্ঠী। প্রতিটি গোষ্ঠীতে আছেন কয়েকজন ক'রে পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, চিত্রধর বা ক্যামেরাম্যান ও ব্যবস্থাপক। এবং এদের মাথার ওপর আছেন একজন ক'রে অভিজ্ঞ চিত্র-পরিচালক, যিনি এ'দের সকলের

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের নব-নাটক "ফেরারী ফৌজে"র একটি দৃশ্যে বিধান মুখোপাধ্যায়, অরুণ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সুশীল মজুমদারের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্র 'কঠিন মায়া'য় সন্ধ্যা রায়

কাজের ওপর নজর রাখেন এবং এঁদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি রক্ষা করেন।

প্রতিটি গোষ্ঠীরই শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে এক একটি বিশেষ আদর্শ আছে। এবং যদিও সমগ্র শিল্পটির ব্যবসাগত দায়িত্ব পোলিশ সরকারের,তবু প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের আদর্শ অনুযায়ী চিত্রনির্মাণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন—পুরোপুরি আর্থিক দায়িত্ব বহন করা সত্ত্বেও সরকার শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে একটুও মাথা ঘামান না। আদর্শগতভাবে ভিন্ন এই আটটি শিল্পীগোষ্ঠীর মিলিত সংস্থার নাম—"দি অ্যাসোসিয়েশন অব ফিল্ম প্রোডিউসার্স" (চিত্র-প্রযোজক সমিতি)। এই সমিতির কাজ হচ্ছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চিত্রগ্রহণের জন্যে সাউণ্ড স্টেজ ঠিক করে দেওয়া, অভিনেতা-অভিনেত্রী চুক্তিবন্ধ করা, নির্মিত চিত্রের প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি বৈষয়িক কর্ম।

এই আটটি গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে নামকরা গোষ্ঠী হচ্ছে—KADR। এই কাডর গোষ্ঠী শুধু যে পোল্যাণ্ডের চিত্রপ্রিয় জনসাধারণেরই সমাদর লাভ করেছে, তা নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুরস্কার লাভ করে প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছে এই কাডর গোষ্ঠীই। এই গোষ্ঠীর পুরোভাগে আছেন পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক ইর্জি কাওয়ালেরোউইক। মাত্র ৩৮ বছর বয়স্ক এই অত্যন্ত সাদাসিদে ভদ্রলোকটির স্ত্রী হচ্ছেন বিখ্যাত মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী লুসিনা উইনিকা। কাওয়ালেরোউইক ক্র্যাকো শহরের ফিল্ম ইন্সটিটিউটে শিক্ষা লাভ করবার পর প্রথমে কয়েকজন পরিচালকের সহকারিতা করেন। এই সময়ে তিনি কয়েকটি চিত্রনাট্যও রচনা করেন এবং তারই মধ্যে একটিকে অবলম্বন করে "ভিলেজ" নামে একটি চিত্রও নির্মাণ করেন। একটি পোলিশ গ্রাম্য-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা ও সংঘাত নিয়ে রচিত এই ছবিখানি কার্লোভি ভেরী চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরিচালিত, আইগর নেভার্লে রচিত উপন্যাস "এ নাইট অব রিমেমব্র্যান্স"-এর চিত্ররূপ যখন পরের বছর ঐ কার্লোভি ভেরীর উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সম্মান লাভ করে, মাত্র তখনই তিনি একজন সার্থক চিত্র-পরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এরপর তিনি কাডর-গোষ্ঠীর হয়ে প্রথম যে ছবি পরিচালনা করেন, তার নাম হচ্ছে "দি শ্যাডো" (The Shadow।) এই ছবিতে তিনি পোল্যাণ্ডের আধুনিক ইতিহাসের তিনটি যুগ দেখিয়েছেন—প্রথম, নাৎসী অধিকারের যুগ, দ্বিতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনবার জন্যে লড়াইয়ের যুগ এবং তৃতীয় হচ্ছে—দেশকে পুনর্গঠিত করবার দুশ্চর সাধনার যুগ। এই সময় থেকেই তিনি মহৎ শিল্পের সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করেন। মানবীয় মনস্তত্ত্বের জটিলতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্প-রীতির প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ভেনিস উৎসবে তাঁর "নাইট ট্রেন" ছবির জন্যে
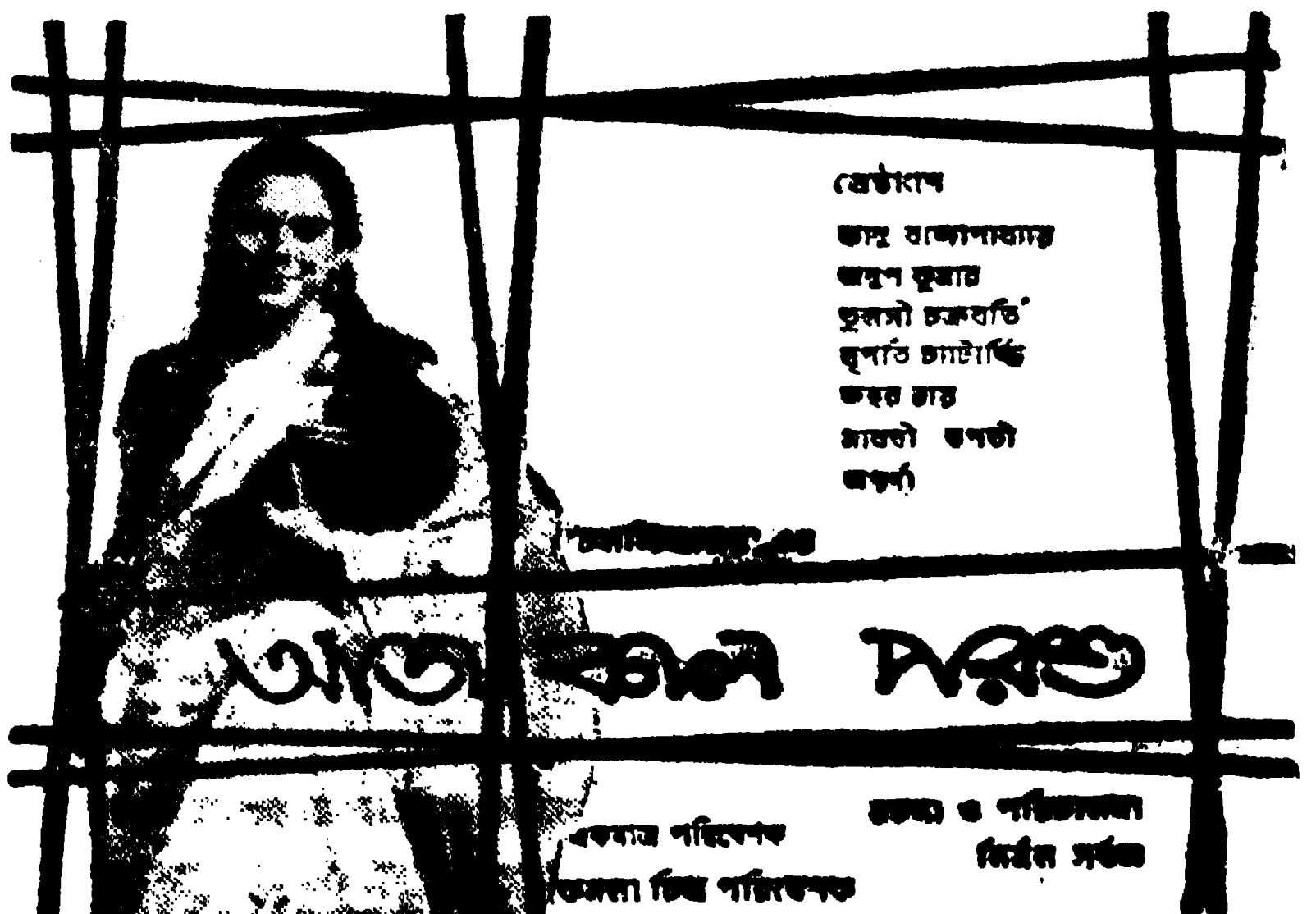
"মিলিশ্ ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড" দ্বারা পুরস্কৃত হন।

এই চিত্রে পরিচালক তাঁর নিজের ভাষাতেই "অনুভূতির জন্যে মানুষের ক্ষুধা, মানুষের উদগ্র আগ্রহ"কে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি দর্শকের সামনে মানুষের অবচেতন মনের এমন কথাকে খুলে ধরতে চেয়েছেন, যা সাধারণতঃ অকথিতই থেকে যায়, বা ব্যক্ত করতে মানুষ কুণ্ঠা অনুভব করে।

কাওয়ালেরোউইক-এর পরই যে দু'-জন পরিচালকের নামোল্লেখ করতে হয়, তাঁরা হচ্ছেন আঁদ্রেজ ওয়াজ্‌দা এবং মানুক। দু'জনের শিল্পরীতি হচ্ছে ভিন্নধর্মী। ওয়াজ্‌দা হচ্ছেন প্রধানতঃ রোমান্টিক; কাজেই এঁর ছবি দেখে মানুষের হৃদয় ভাবাপ্লুত হয়। ওয়াজ্‌দার ছবির আবেদন হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের কাছে। কিন্তু মানুক-এর ছবির আবেদন মানুষের অন্তঃকরণে; মানুক-এর ছবি দর্শককে ভাবায়। মানুক উত্তেজনা পছন্দ করেন না; তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে অনেকটা নীরবতার মাধ্যমে তাঁর বিষয়বস্তুকে দর্শক সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তাঁর শিল্পরীতি তরঙ্গ তোলে না—মনের গভীরে আবেদন পৌঁছে দিয়ে মানুষকে ভাবনার পথে এগিয়ে দেয়।

ওয়াজ্‌দার বয়স এখন ৩৪; দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ। যুদ্ধের পর ক্র্যাকো শহরে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শেখবার পর তিনি লজ-এর চলচ্চিত্র শিক্ষাকেন্দ্র থেকে স্নাতক হন। এরপর অত্যন্ত অল্পকালের জন্যে আলেক্‌জাণ্ডার কোর্ড-এর সহকারী থাকবার পর তিনি ১৯৫৪ সালে "জেনারেশন" নামে একখানি চিত্র স্বাধীনভাবে পরিচালনা করেন। এই ছবিতে তিনি জার্মানদের অবস্থিতির বিরুদ্ধে পোলিশ যুবকদের যুদ্ধের বিষয় দেখিয়েছেন। এর তিন বছর পরে তাঁর প্রথম সার্থক ছবি 'কানাল' (তারা জীবনকে ভালোবেসেছিল) মুক্তিলাভ করে এবং কেনস্ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে রৌপ্য বৃক্ষ (Silver palm) দ্বারা পুরস্কৃত হয়। পৃথিবীর প্রায় কুড়িটি দেশে ছবিটি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা লাভ করেছে। এই সেদিনও আমরা কল্‌কাতায় এই বাস্তবধর্মী ছবিটি দেখে ভাবাপ্লুত হয়েছি। ১৯৪৪ সালে ওয়ারশ'তে যে-জনতার উত্থান হয়েছিল, তারই একটি মর্মন্তুদ চিত্র এই ছবির মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত চিত্র হচ্ছে, "অ্যাসেস্ অ্যান্ড ডায়ামণ্ড"। এই ছবিতে নায়ক একজন নেতাকে হত্যা করবার জন্যে আদিষ্ট হয়; সেই নেতার একমাত্র অপরাধ তার রাজনৈতিক আদর্শ। 'হত্যা করা উচিত, কি নয়?' —এই দ্বিধায় পড়েন নায়ক। শেষ পর্যন্ত দলের প্রতি আনুগত্য নায়কের মনে বড়ো হয় এবং নিরপরাধ জেনেও সে সেই নায়ককে হত্যা করে। পরে দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু বরণ করে সে অনুশোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। ছবির বিষয়বস্তু ও শিল্প-সৌন্দর্যের গুণে ছবিটি প্রসিদ্ধ চিত্রপরিচালক রেণে ক্লেয়ারের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে এবং ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে চলচ্চিত্র সমালোচকের পুরস্কার (film Critic's Prize) লাভ করেছে। এরপর ওয়াজ্‌দা "লোটনা" (Lotna) নামে যে ছবিখানি করেন, তাতে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের তৎকালীন শাসকবৃন্দের অকর্মণ্যতার কথা বিবৃত হয়েছে অতিমাত্রায় প্রতীকতার (Symbolism) সাহায্যে। এবং সেই কারণে ছবিটি সাধারণের কাছ থেকে খুব বেশী প্রশংসা পায়নি।

সুধীর মুখার্জি পরিচালিত ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজার্সের "দুই ভাই" চিত্রে সুলতা চৌধুরী ও উত্তমকুমার

মানুক্-এর বয়স এখন ৪০। স্থাপত্যবিদ্যা ও আইন অধ্যয়নের পর ইনিও লজ-এর চলচ্চিত্র শিক্ষাকেন্দ্রে পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ-বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি প্রথমে একজন সংবাদ চিত্রধর (news cameraman) হিসেবে নিজের জীবন আরম্ভ করেন। পরে
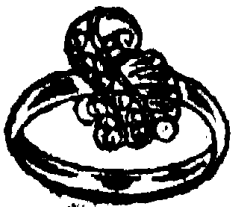
শুরু করেন দলিল-চিত্র পরিচালনা। তাঁর অন্যতম দলিল-চিত্র "দি ব্লু ক্রশ" ভেনিস ফেস্টিভ্যালে পুরস্কার লাভ করে। তিনি কাডর-গোষ্ঠীর হয়েই সর্ব-প্রথম পূর্ণাঙ্গীন চিত্র পরিচালনা করেন —"ম্যান অন দি ট্রাক্স্"; এইটিই কাডর-গোষ্ঠীর দ্বিতীয় চিত্র। এই ছবিতে মানুক্ একজন সৎ প্রাচীনধর্মী রেল-ইঞ্জিনীয়ারের বিয়োগান্ত জীবন চিত্রিত করেছেন। বিজ্ঞানসম্মত কোনোও নতুন যন্ত্রপাতি বা প্রথা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই ছিল তাঁর স্বভাব এবং এরই জন্যে তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়। অতিমাত্রায় রক্ষণশীল এবং প্রাচীনপন্থী বলে যারা তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে, তাদের নিন্দা করেছেন পরিচালক এবং ইঞ্জি-নীয়ারের পক্ষ সমর্থন করে বিবেচনা-হীনতার বিরুদ্ধেই কথা বলা হয়েছে ছবিতে। মানুক্-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর "ইরেকা" ছবিতে। এতেও তিনি যথার্থ বীরত্ব কাকে বলে, তাই একটি রাজনৈতিক ঘটনার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন। এই ছবির ভিতর দিয়ে পরিচালকের প্রতিভা এবং শিল্পরীতি সম্যক প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছে।

কাডর-গোষ্ঠীর পুরোধা কাওয়ালে-রোউইক-এর ডান হাত হচ্ছেন নবীন সাহিত্যিক তাদেউস্ কনুইকি; ইনিই এই গোষ্ঠীর সমস্ত চিত্রনাট্যের ওপর খবরদারি করেন অর্থাৎ যে কোনও চিত্র-নাট্যের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরি-বর্জন সম্পর্কে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত। এক সময়ে তিনি জাঁ লাস্কোয়াস্কি নামে একজন চিত্রধর এবং দুজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাহায্যে "লাস্ট ডে অব সামার" নামে একখানি ছবি করেন। এই ছবিটি বর্তমান জগতে ভাবালুতা মূল্যহীন এবং যথার্থ সুখ মরীচিকা-মাত্র—এই কথা বলতে চেয়েছিল। এবং এরই জন্যে ভেনিস্ ফেস্টিভ্যালে একটি পুরস্কারও পেয়েছিল। এই প্রথম প্রয়াসে সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন যে, ভবিষ্যতে তিনি একদিন ক্যামেরাম্যান হবার আশা রাখেন, যেদিন তিনি হাতের কাছে এমন একটি বিষয়-বস্তু পাবেন, যা রুপোলী পর্দা ছাড়া অন্য কোথাও দেখানো সম্ভব নয়। কাডর-গোষ্ঠীতে নতুন লোকেরও স্থান আছে। মাত্র বছর দুই আগে লজ-এর একজন স্নাতক, কাজিমিয়ার কুজ-কে পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনটি ছোট গল্পকে একসঙ্গে গেঁথে তিনি "দি ক্রশ অব ভ্যালার" নামে যে-ছবি করেছিলেন, তার সাফল্যে উৎসাহী হয়ে তিনি "নো ওয়ান ইজ্ কলিং" নামে আর একখানি ছবি করেছেন। কুজ বলেন যে, তিনি সাধারণ লোকের জীবন নিয়ে ছবি করতে ভালোবাসেন, যাদের জীবন রয়েছে বর্তমানের বাস্তব জগতের বাস্তব সমস্যার ভিড়। কাডর-গোষ্ঠীর আর একখানি ছবি "ফেয়ার-ওয়েল টিল টোমরো"রও পরিচালক হচ্ছেন যানুস মোর্গেন্‌জ্‌টার্ণ, যিনি সবে লড্জ্ স্কুল থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়েছেন। এই গোষ্ঠীতে একজন যুদ্ধ-পূর্বকালের পরিচালক আছেন; এ'র নাম লিওনার্ড বুকোয়স্কি। ইনি এই গোষ্ঠীর জন্যে "এ রেণী জুলাই" নামে একখানি কমেডি চিত্র করবার পর পোলিশ সাবমেরিণ "ওর্জেল"-এর বিচিত্র কাহিনী অবলম্বনে যে-ছবি করেছেন, তা মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাস্তবধর্মিতার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে।

এ ছাড়াও কাডর-গোষ্ঠী পরীক্ষা-মূলকভাবে যেসব ছবি নির্মাণ করেছে, তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পুরস্কার লাভ করেছে, "ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ.........", "হাউস", 'দি সোমনাম-বুলিস্টস' এবং "অ্যাটেন্‌সান্-পেন্টিং"।

পোলিশ ফিল্ম-শিল্প নিয়ে বলতে গিয়ে মাত্র কাডর-গোষ্ঠী নিয়ে এতকথা বলবার কারণ হচ্ছে এই যে, এই গোষ্ঠীটিই পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র-শিল্পকে আন্তর্জাতিক সম্মান এনে দিয়েছে এবং পৃথিবীর চিত্ররসিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। আমাদের দেশে অক্টোবর মাসে পোলিশ চলচ্চিত্রের যে উৎসব হবে বলে ঘোষিত হয়েছে, তাথেকেও নিশ্চয় করে প্রমাণিত হবে যে, "KADR Group of the Film Producers presents" .... এই কথা ক'টি একটি অদৃশ্য টাইপরাইটার থেকে যখন বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, তখনই দর্শক একখানি অসাধারণ চিত্র দেখবার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।

বিবিধ সংবাদ

সম্পূর্ণ রামায়ণ

এ-সপ্তাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান চিত্র অমর মহাকাব্য হোমি ওয়াদিয়ার নিবেদন "সম্পূর্ণ রামায়ণ" কলিকাতার নিউ সিনেমা, প্রভাত, কালিকা, দর্পণা, ইণ্টালী, মৃণালিনী, মেনকা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন বাবুভাই মিস্ত্রী, সঙ্গীত পরিচালনা—বসন্ত দেশাই, নৃত্য পরিচালনা—গোপী-কৃষ্ণ, বিভিন্নাংশে আছেন :—অনিতা গুহ, মহীপাল, সুলোচনা, ললিতা পাওয়ার, অচলা সহদেব, উমা দত্ত, কৃষ্ণকুমারী, রাজকুমার, বদরীপ্রসাদ, ও বি এন ব্যাস।

চিত্রটি পরিবেশন করছেন বিলি-মোরিয়া লালজী।

* * *

গেল ১৪ই জুলাই, রথযাত্রার দিন বিমল ঘোষ প্রোডাক্‌সান্সের প্রথম ছবি "বধূ"র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শৈলেশ দে রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। একটি কলাকুশলী গোষ্ঠীর ওপর চিত্র-

পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংগীত পরিচালনা করবেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছবির চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করবেন ছবি বিশ্বাস, বসন্ত চৌধুরী, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, বিশ্বজিৎ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পীরা।
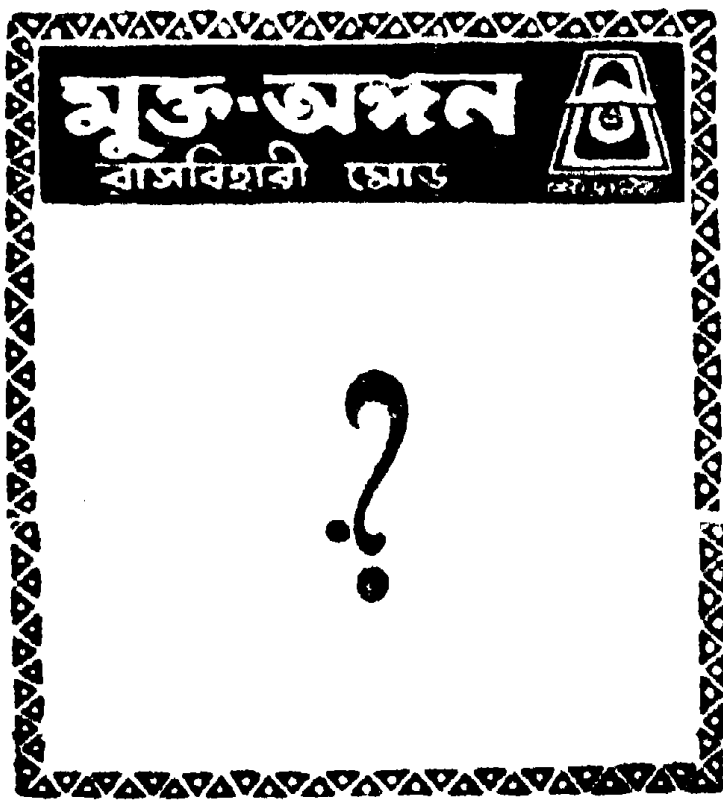
* * *

শ্রীতারাশংকরের পরিচালনায় প্রমথ চৌধুরী লিখিত "বীণাবাঈ"-এর শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল গেল রবিবার, ২৩-এ জুলাই ক্যালকাটা মুভি-টোন স্টুডিওতে। অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধকরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ এবং বর্ধমানের মহারাণী অধিরাণী।

• • •

গেল ১২ই জুলাই ব্র্যাবোর্ণ রোডের ম্যাক্সমুলার ভবনে জার্মান-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত একটি বৈঠকে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সমবেত সুধীবৃন্দকে তাঁর অসামান্য সেতার বাজনা দ্বারা আপ্যায়িত করেছিলেন।

• • •

গেল হপ্তার ডামাডোলে যেমন কোনও বাঙলা ছবি মুক্তি পায়নি, এ হপ্তায় তেমনি একসঙ্গে দু'খানা ছবির প্রদর্শনী শুরু হয়ে গেল।

জ্যোতিরূপা ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানের "পলাতক" চিত্রের একটি নাটকীয় মুহূর্তে রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

কঠিন মায়া

এ সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য মুক্তি-প্রাপ্ত চিত্র 'কঠিন মায়া' সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় উত্তরা, উজ্জ্বলা ও পূরবীতে মুক্তি লাভ করেছে। কাহিনীকার গজেন্দ্রকুমার মিত্র। সংগীত পরিচালনা করেছেন কালীপদ সেন। বিভিন্নাংশে আছেন—বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা, রবীন মজুমদার, জহর গাঙ্গুলী, রাজলক্ষ্মী, সুপ্রিয়া, অমর মল্লিক, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি।

আজ কাল পরশু

গত সপ্তাহের মুক্তিপ্রাপ্ত যে বাঙলা চিত্রটি চলচ্চিত্রের অচল অবস্থার দরুণ মুক্তিলাভ করেনি এ সপ্তাহে সেই চিত্রটি মুক্তি পেয়েছে রূপবাণী, ভারতী অরুণা এবং সহরতলীর বহু চিত্রগৃহে। রচনা ও পরিচালনা করেছেন নির্মল সর্বজ্ঞ। রূপায়নে আছেন:—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী মুখার্জি, তপতী ঘোষ, অনুপকুমার, অপর্ণাদেবী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায় এবং স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার।

একটি উপভোগ্য নাট্যানুষ্ঠান

গেল ১৪ই জুলাই শুক্রবার চতুরঙ্গ সম্প্রদায় থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে নিতান্ত একটি ঘরোয়া পরিবেশে কয়েকটি নাতি-দীর্ঘ ও অতিক্ষুদ্র নাটিকা পরিবেশন
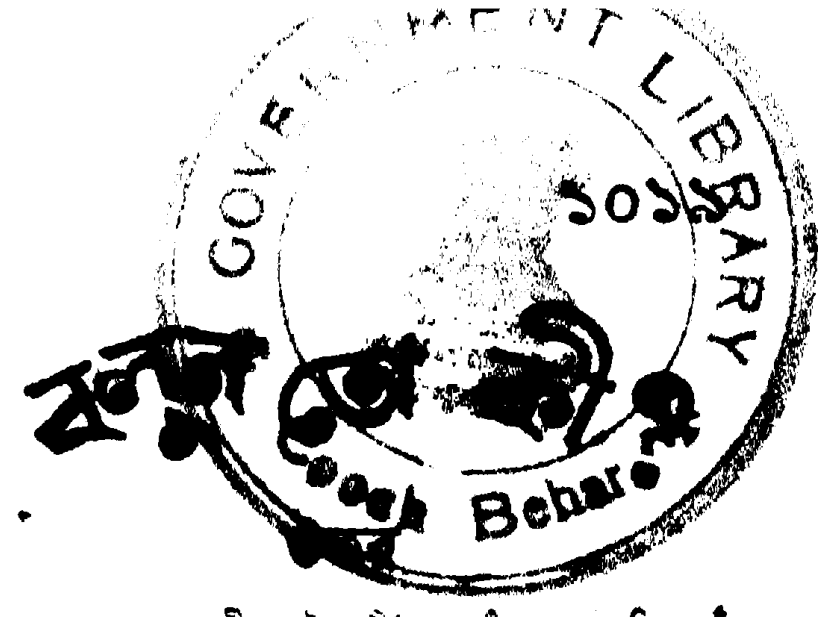
করেন। রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক থেকে তিনটি অতিক্ষুদ্র ব্যঙ্গাত্মক নাটিকা 'ভাব ও অভাব', 'গুরুবাক্য' এবং 'রোগীর বন্ধু'—"কৌতুক" নামে পরিবেশিত হয়। বস্তুতপক্ষে এই ধরণের এতো ক্ষুদ্র ভাবগত নাটিকা যে এতো রসোত্তীর্ণ হতে পারে তা এই অভিনয় দেখবার আগে ভাবা যায়নি, অপর দুটি নাটিকা ভান পর্যায়ের, রচনা 'বনফুল'। প্রথমটি অসবর্ণ বিবাহের প্রচলিত বিরোধিতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ রচনা—'নব সংস্করণ' এবং দ্বিতীয়টি Clifford Box প্রণীত The Poetasters of Ispahan অবলম্বনে রচিত ব্যঙ্গাত্মক রসরচনা—"কবয়ঃ"। দুটি নাটিকাই সমষ্টিগত অভিনয়ে সহজ প্রয়োগধারায় সুঅভিনীত এবং রসোত্তীর্ণ। নাটিকাগুলি পরিচালনা করেছেন বরুণ দাশগুপ্ত।

বিপ্লবী সম্বর্ধনা

মিনার্ভা থিয়েটার কর্তৃক শতাধিক বিপ্লবীকে আগামী ২৯শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় সম্বর্ধনা জানান হইবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন :—ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বিপ্লবীদের অভ্যর্থনা করিবেন। স্বনামধন্য সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সংগঠনীর রবীন্দ্র স্মরণোৎসব

সংগঠনী (উদয়পুর) সাংস্কৃতিক বিভাগের উদ্যোগে গত ১৩ই জুলাই মহারাষ্ট্র নিবাস হলে রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশী' কবিতার নাট্যরূপ "কিনু গোয়ালার গলি" এবং "ক্ষুধিত পাষাণ" নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। নাটক দুটির নির্দেশনায় ছিলেন অহীন্দ্র ভৌমিক। অভিনয়ে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন —পরেশ ঘোষ, সাধন দে, দিলীপ ঘোষ, সত্যেন সাহা, শম্ভু রায়, প্রাণেশ সাহা, অহীন্দ্র ভৌমিক, মানিক রায়, অনামিকা ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বন্দিতা ঘোষ। তবলা সংগত করেন রবি বিশ্বাস ও সংগীত পরিচালনা করেন শংকর রায়চৌধুরী। আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা ও আবহসংগীত প্রশংসনীয়।

শিক্ষার্থীর অভিনয়

কলিকাতার শৌখিন নাট্য সম্প্রদায় "শিক্ষার্থী" গত ১০ই জুলাই বহরমপুরে 'সূর্য হাউসে' নাট্যকার শ্রীঅনিলবরণ দত্ত রচিত "একি হ'লো" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

দিলীপ সিংহ, রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জি, মীনা বসু, শীলা দাশগুপ্তা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। সংগীত পরিচালনায় শ্রীঅজিত পাণ্ডে কৃতিত্ব দেখান।

পরিচালনায় ও বিশিষ্ট চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন নাট্যকার স্বয়ং।

টুকিটাকি

ইটালীর আর একজন পরিচালকের নাম পৃথিবীর চলচ্চিত্র জগতের সংগে পরিচিত হতে চলেছে—পরিচালক ডুইলিয়ো কোলেটি। ছবির নাম—'দি কিং অফ পোগিওরেলি'। এখনও ছবির কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়নি, তবে মুক্তির শুভমুহূর্তের দিনটি খুবে সন্নিকটে। প্রথমে অবশ্য ইউনাইটেড স্টেটে ছবিটি মুক্তি পাবে। আমরা আশা করবো এই ছবির প্রথম সূচনায় পরিচালক ডুইলিয়ো কোলেটি ইটালীর সুনাম বজায় রেখে পরিচিত হবেন জনসাধারণের কাছে।

* * *

একটি ঐতিহাসিক ছবির বিরাট প্রস্তুতি। চিত্রে রূপায়িত করার পূর্বে পরিচালক যোসেফ ম্যাংকিউইজ চিত্রনাট্যে বিশেষ মন দিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই হলিউডের 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স'-এর স্টুডিওতে দুমাস ধরে একটানা কাজ শুরু হবে। তারপর শীতের প্রথমে পরিচালক সদলবলে বহির্দৃশ্য তুলতে রওয়ানা হবেন ইটালী ও মিশর দেশে। ছবিটির নাম 'ক্লিওপেট্রা'। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কাহিনীকে যথাযথ চিত্রে রূপ দিতে পরিচালক মিশরের 'নাইল' নদীর বাঁকে ক্লিওপেট্রার সময়ে যে মনুমেন্টগুলি ছিল তা ছবিতে ব্যবহার করবেন।

বলতো দেখি

১। মুরগী, টার্কী, হাঁস, পাতিহাঁস, গিনি মোরগ (Guinea Fowl), কুক্কুট জাতীয় পাখী।

২। তর্জনী।

৩। খাদ্য, আশ্রয়, কাপড়, যাতায়াত।

৪। এশিয়া, প্রায় ১০০-র চেয়ে বেশী ভাষা কথিত হয়।

৫। এক মাইল দৌড়তে ১ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড লাগে।

৬। Absolute Zero, অর্থাৎ—৪৬০ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা—২৭৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

৭। কার্বন ডায়ক্সাইড।

৮। কারণ এরা অত্যন্ত শক্ত ও কঠিন, তাই সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

৯। চাল।

১০। মাড়ির দাঁতের উপর—এই দুই দাঁতের চাপ পড়ে ১০০ হতে ১৬০ পাউণ্ড চাপের মত।

খেলাধুলা

দর্শক

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

দীর্ঘ আট বছর পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পুনরায় প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। তারা প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান খেতাব লাভ করে ১৯৪২ সালে এবং শেষবার চ্যাম্পিয়ান হয় ১৯৫২ সালে। ইস্টবেঙ্গল দল এ পর্যন্ত মোট ৭ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ১৯৬১ সালের সাফল্য এই কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ইস্টবেঙ্গল দল আটজন স্থানীয় তরুণ খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় লীগের খেলায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে। এর আগের ৬ বছরের সাফল্যের মূলে ছিল বহিরাগত খেলোয়াড়দের অবদান। গত শনিবার (২২শে জুলাই) মোহনবাগানের বিপক্ষে লীগের ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল ১—০ গোলে জয়লাভ করায় এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ২৫টা খেলায় ৪৫ পয়েণ্ট। এখনও তাদের ৩টে খেলা বাকি। কিন্তু লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রশ্নে এই তিনটে খেলার ফলাফলের কোনই গুরুত্ব নেই।

২৫টা খেলায় তারা ৬০টা গোল দিয়ে মাত্র ৮টা গোল খেয়েছে। সুতরাং বাকি ৩টে খেলায় এই গোল দেওয়ার সংখ্যা এবং পয়েণ্ট বৃদ্ধির সুযোগ এখনও তাদের রয়েছে। ইস্টবেঙ্গল দলের অধিনায়ক বলরাম ২৫টা খেলায় ২২টা গোল দিয়ে গোলদাতার তালিকায় সর্বাধিক গোল দেওয়ার কৃতিত্ব হিসাবে শীর্ষস্থান লাভ করে রয়েছেন। তিনিও এই সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দুটি খেলাতেই বলরামের গোলে ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মাত্র ৬টি বেসামরিক দল লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছে। এদের মধ্যে দুটি ইউরোপীয়—ক্যালকাটা এবং ডালহৌসী এবং বাকি ৪টি ভারতীয়—মহামেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে। ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান খেতাব পায় মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৩৪ সালে। মহমেডান স্পোর্টিং এ পর্যন্ত ৯ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯৩৪-৩৮) লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে লীগ খেলার ইতিহাসে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার যে রেকর্ড করে তা আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের এই বিরাট সাফল্যের মূলে ছিল বহিরাগত খেলোয়াড়দের দান। সারা ভারতের বাছাই বলিষ্ঠ মুসলমান খেলোয়াড়দের নিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং এক সর্বভারতীয় শক্তিশালী মুসলমান ফুটবল দল গড়ে তুলেছিল। এই রকম সর্বভারতীয় দল গঠন দুটি কারণে সম্ভব হয়েছিল—সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাম্প্রদায়িক প্রভাব। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের এই সাফল্য কোনমতেই স্থানীয় ফুটবল খেলার অভিব্যক্তি নয়, বরং এই সাফল্যই বাংলা দেশের ফুটবল খেলার ক্রমবিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আত্মসম্মানবোধের তাড়নায় এবং সমর্থকদের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বড় ক্লাবগুলি বহিরাগত খেলোয়াড় আমদানী করতে বাধ্য হয়। ফলে বাংলার স্থানীয় অনেক নামকরা খেলোয়াড় বড় ক্লাবে খেলার সুযোগ থেকেই কেবল বঞ্চিত হয় না, জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় (সন্তোষ ট্রফি) বাংলা দলেও তারা স্থান পায় না।

বাংলা সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েও অন্যান্য প্রদেশের কাছে করুণা এবং অবজ্ঞার পাত্র হয়ে আছে এই কারণে যে, বাংলার সাফল্যে স্থানীয় খেলোয়াড়দের থেকে বহিরাগত খেলোয়াড়দের অবদান বেশী। বিজয়ী বাংলা দলে বেশীর ভাগ বহিরাগত খেলোয়াড়রাই স্থান পেয়েছে।

মোহনবাগান ক্লাব দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় ১৯৩৯ সালে। মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং মাত্র এই দুটি দলই ৯ বার চ্যাম্পিয়ান হয়ে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় ইতিহাসে সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড করেছে। এদের পরই স্থান ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের। তারা লীগ পেয়েছে ৮ বার। ভারতীয় দলগুলির মধ্যে উপর্যুপরি বেশী বার লীগ পেয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং ৫ বার (১৯৩৪-৩৮) এবং মোহনবাগান ৩ বার (১৯৫৪-

লীগ কাপ

ইস্টবেঙ্গল দলের লীগ জয়

সাল	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
১৯৪২	২৪	২১	৩	১	৬৪	৯	৪৫
১৯৪৫	২৪	১৬	৭	১	৫১	৮	৩৯
১৯৪৬	২৪	২০	৩	১	৭০	১১	৪৩
১৯৪৯	২৬	২২	১	৩	৬৮	১০	৪৫
১৯৫০	২৬	১৯	৭	০	৫৩	৯	৪৫
১৯৫২	২৬	১৭	৬	৩	৫০	৫	৪০
১৯৬১*	২৫	২১	৩	১	৬০	৮	৪৫

* তিনটি খেলা বাকি।

মোহনবাগান-ইস্টবেংগল দলের ফুটবল লীগের দ্বিতীয় খেলায় তিনজন ভূতলশায়ী হয়েছেন—নীচে সুকুমার সমাজপতি (ইস্টবেংগল), তাঁর ওপরে জার্ণেল সিং এবং ডানদিকে অমিয় ব্যানার্জি (মোহনবাগান)

৫৬)। এ ছাড়া উপর্যুপরি ২ বার ক'রে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মোহনবাগান (১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৫৯-৬০), ইস্ট-বেঙ্গল (১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৯-৫০) এবং মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৪০-৪১)।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তৃতীয় ভারতীয় দল হিসাবে ১৯৪২ সালে এবং ইস্টার্ন রেল-ওয়ে চতুর্থ দল হিসাবে ১৯৫৮ সালে প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে মাত্র নয়টি দল অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। এদের মধ্যে ছয়টি সামরিক দল এবং তিনটি বেসামরিক দল—ক্যালকাটা (১৯১৯ ও ১৯২২), মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৪৮) এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (১৯৫০)।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৬১ সালের পূর্বে যে ছয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে সেই কয়েকবারে লীগের খেলায় রানার্স-আপ হয়েছে মোহনবাগান ৩ বার, মহমেডান স্পোর্টিং ২ বার এবং ভবানীপুর একবার। ১৯৪৯ সালে ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব রানার্স-আপ মহমেডান স্পোর্টিং দলের থেকে সাত পয়েন্ট এবং ১৯৫০ সালে রানার্স-আপ মোহন-বাগানের থেকে পাঁচ পয়েন্ট বেশী পেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ পায়। ১৯৪৫-৪৬ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়—এবং এই দু'বারই রানার্স-আপ খেতাব পায় মোহনবাগান। লীগের খেলায় ইস্টবেংগল ক্লাব বেশী গোল দেওয়ার রেকর্ড করেছে ১৯৪৬ সালে—গোল দেওয়ার সংখ্যা ৭০ এবং খাওয়ার সংখ্যা মাত্র ১১টা।

এ বছরের লীগের খেলায় রানার্স-আপ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থান লাভের মীমাংসা এখনও হয়নি। মোহনবাগান এবং বি এন আর যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থান পেতে পারে অথবা এই দুইয়ের যে কোন একদল। আর একটা বিষয়েও কোন মীমাংসা হয়নি, প্রথম বিভাগ থেকে কোন্ দল দ্বিতীয় বিভাগে নামবে। লীগ খেলার প্রারম্ভে সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল এ বছর থেকে ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগে 'ওঠা-নামা' চালু হবে। কিন্তু এখন আবার জোর তোড়জোড় চলছে, প্রথম বিভাগ থেকে কোন দলের নেমে যাওয়ার প্রশ্ন বাদ দিয়ে কিভাবে প্রথম বিভাগে আরও কয়েকটি ক্লাবকে প্রমোশন দেওয়া যায়।

আরও মজার খেলা দেখবেন, আগামী কয়েক দিনের খেলায়; যে সব ক্লাব প্রথম বিভাগ থেকে 'নেমে' যাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে আজ হাবুডুবু খাচ্ছে তখনই দেখবেন উপরতলার ক্লাবের কাছে কেমন পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় ২২।৭।৬১

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগে বে-সামরিক দলের সাফল্য—

মোহনবাগান—১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৯ ও ১৯৬০ **সাল** (৯ বার) রেকর্ড।

মহঃ স্পোর্টিং—১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪৮ ও ১৯৫৭ সাল (৯ বার) রেকর্ড।

ক্যালকাটা—১৮৯৮, ১৯০৭, ১৯১৬, ১৯১৯, ১৯২০, ১৯২২, ১৯২৩, ১৯২৫ (৮ বার)।

ইস্টবেংগল—১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫২ ও ১৯৬১ সাল (৭ বার)।

ডালহৌসী—১৯১০, ১৯২১, ১৯২৮, ১৯২৯ সাল (৪ বার)।

ইস্টার্ণ রেল—১৯৫৮ সাল।

উপরের ছয়টি দলের মধ্যে এক সময়ের দুর্দ্ধর্ষ ক্যালকাটা এবং ডালহৌসী ক্লাব আজ বেশ কয়েক বছর ধরে দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলছে।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া
চতুর্থ টেস্ট

তারিখ : ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩১শে জুলাই এবং ১লা আগস্ট

ওল্ড ট্রাফোর্ড

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের বিশেষতঃ এখানের বেশীর ভাগ টেস্ট খেলাই ড্র গেছে। ম্যাঞ্চেস্টারের দুর্যোগ-পূর্ণ আবহাওয়া এবং অতিবর্ষণ এর জন্য দায়ী। অতি বর্ষণের দরুন ১৮৯০ ও ১৯৩৮ সালের টেস্ট খেলা তো আরম্ভই হয়নি। ওল্ড ট্রাফোর্ড ইংল্যান্ডের পক্ষে খুবই পয়মন্ত মাঠ। এই মাঠে অস্ট্রে-লিয়ার কাছে ইংল্যান্ড শেষ পরাজিত হয়েছে ১৯০২ সালে। এক সময় অর্ধ-শতাব্দীর অধিক কালের মধ্যে ইংল্যান্ডকে এই মাঠের টেস্ট খেলায় কোন দেশের কাছেই হার স্বীকার করতে হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৫৬ সালের ৪র্থ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের স্পিন বোলার জিম লেকার এই ওল্ড ট্রাফোর্ড

মাঠে নীচের দু'টি বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

(১) এক ইনিংসে ১০টি উইকেট (৫৩ রাণে)।

(২) একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট (৯০ রাণে ১৯টি)।

ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের রেকর্ড

(১৯৬১ সালের ২৬শে জুলাই পর্যন্ত)

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

মোট খেলা ১৭। ইংল্যাণ্ডের জয় ৪, অস্ট্রেলিয়ার জয় ২, খেলা ড্র ১১।

এক ইনিংসে সর্বাধিক রাণ

৬২৭ (৯ উইকেটে) ইংল্যাণ্ড, ১৯৩৪
৪৯১ অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩৪

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রাণ

৭০ অস্ট্রেলিয়া, ১৮৮৮
৯৫ ইংল্যাণ্ড, ১৮৮৪

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ১৫৪* কে এস রঞ্জিৎ সিংজী ১৮৯৬

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১৩৭ এস জি ম্যাক্‌কেব্‌ ১৯৩৪

সেঞ্চুরী রাণ

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ১১
অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৬

প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ১০২* ডবলউ গান, ১৮৯৩

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১০৮ এফ এ আয়ারডেল, ১৮৯৬

সর্বাধিক সেঞ্চুরী

২টি : এফ এস জ্যাকসন, ইংল্যাণ্ড (১২৮ রাণ, ১৯০২ এবং ১১৩ রাণ ১৯০৫)

প্রথম টেস্ট খেলায় প্রথম সেঞ্চুরী

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার খেলায় নিজ জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী :

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ১৫৪* কে এস রণজিৎসিংজী, ১৮৯৬। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে কোন খেলোয়াড় এ কৃতিত্ব লাভ করেন নি।

প্রথম টেস্ট খেলা

ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে সর্বপ্রথম টেস্ট খেলার তারিখ : ১০ই জুলাই, ১৮৮৪ (ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া)

মোট রাণ

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ৬৩৮২ (২০৫ উইকেটে)

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৫৭৩৮ (২৫৩ উইকেটে)

ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থার নাম ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স। বর্তমানে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত সদস্য দেশ ৬টি—ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান। এক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এই সংস্থার সভ্য ছিল; কিন্তু কমনওয়েলথ সংস্থার গাটছাড়া কেটে বেরিয়ে আসার দরুণ দক্ষিণ আফ্রিকা ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে সদস্য পদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই দক্ষিণ আফ্রিকাকে কিভাবে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে সভ্য হিসাবে পুনরায় নেওয়া যায় তারই এক তোড়জোড় তলে তলে করেছিলেন এম সি সি কর্তৃপক্ষ। গত ১৯শে জুলাই তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয় লর্ডস মাঠে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের যে সভা ডাকা হয়, সেই সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিকে শুধু পর্যবেক্ষক হিসাবে থাকার এক প্রস্তাব আনে এম সি সি। অন্যান্য সদস্য দেশের মতই ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান নিছক সৌজন্যের খাতিরেই এই প্রস্তাবের কোন বিরোধিতা না ক'রে সম্মতি দেয়। কিন্তু কোন একটি প্রতিষ্ঠাবান সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সংবাদ ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানকে সজাগ করে দেয়। প্রকাশিত সংবাদে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পর্যবেক্ষক হিসাবে সভায় নিমন্ত্রণ করার আসল উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে পড়ে। আসল উদ্দেশ্য ছিল খিড়কির দোর দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সভ্য পদে বরণ ক'রে নেওয়া। প্রকাশিত এই সংবাদকে ভিত্তি ক'রে বর্ণ-বৈষম্য বিরোধী দেশ ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুপ্রবেশে প্রবল আপত্তি জানায়।

সভায় ধীর-স্থির হয়ে বসে কূটনীতির চালে ফেলে কাজটা হাসিল করার যে সব পরিকল্পনা ছিল তা শেষ পর্যন্ত আসল মৎলবটা ফাঁস হওয়ার ফলে ভেস্তে যায়। ১৯শে জুলাই তারিখের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার অনুপ্রবেশ নিয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা চলে কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। প্রসংগটি পরবর্তী অধিবেশনের জন্যে মুলতুবী রাখা হয়েছে মাত্র, এম সি সি এখনও হাল ছাড়েনি।

কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত দিল্লী, জোহানেসবার্গ এবং বুলাওয়েতে বিভিন্ন দিক থেকে গভীর ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং দিল্লী ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি সর্দার সুরজিৎ সিং মাঝিথিয়া ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথভুক্ত দেশ নয় এবং তাকে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে সভ্যভুক্ত করা যায় না। তাঁর মতে, বর্ণ-বৈষম্যমূলক নীতি ক্রিকেট খেলায় কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

বুলাওয়েরর রোডেসিয়ান ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ লী ওয়াকডেন দক্ষিণ আফ্রিকার সদস্য পদলাভ সম্পর্কিত গৃহীত প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

বনফুলের

হাটে বাজারে (উপন্যাস) ৩·৫০
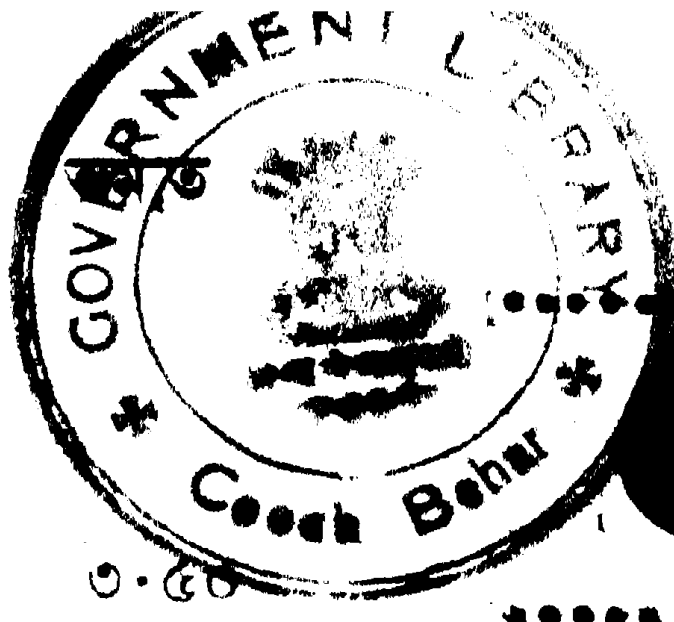
* * * Rabindranath cherished the hope of welcoming the Poet of the people who would possibly come from the downtrodden and give real expression to their aspirations. Banaful's Sadashib is a man of high status but identifies himself with the masses with wonderful agility. Though idealistic in view, the story is most realistic. But Banaful's realism is never crude and vulgar, it is dynamically bold, vivid and living. "Haate Bazare" is not only a novel, it is an experiment—a clever admixture of poignant thoughts on many burning problems of the day and will be read with interest."

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

(উপন্যাস ঃ) **ভীমপলশ্রী** ৫·০০, **জলতরঙ্গ** ৪·০০, **ওরা সব পারে** ২·৫০, **দুই পথিক** ২·৫০, **নূতন বাঁকে** (কবিতা) ২·৫০, **কঞ্চি** (নাটক) ১·২৫, **মধ্যবিত্ত** (নাটক) ২·০০, **শিক্ষার ভিত্তি** (প্রবন্ধ) ২·৭৫।

ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা ২·৫০

একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। ব্রহ্মবান্ধব এক ক্ষণজন্মা অবিস্মরণীয় বাঙালী। উভয়েরই জন্ম শত-বার্ষিকী এই বৎসরটি। ব্রহ্মবান্ধব আজ বিস্মৃতপ্রায়। তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা' প্রকাশ করা হলো।

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই আষাঢ়ের বই

নরেন্দ্র ঘোষের উপন্যাস

প্রথম বসন্ত ২·৫০

অজিতকৃষ্ণ বসুর

সানাই (উপন্যাস) ২·৫০

সম্প্রতি প্রকাশিত

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

দক্ষিণের বারান্দা ৪৲

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলালের স্মৃতি-কথা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কৃষ্ণকলি নাম তার ৫·৫০

আমাদের প্রকাশনার কয়েকখানা উল্লেখযোগ্য ও উপহারযোগ্য গ্রন্থ ঃ

উপন্যাস ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **সপ্তপদী** ২·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **তুমি আর আমি** ২·০০ ॥ লীলা মজুমদারের **ঝাঁপতাল** ২·৭৫ ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর **অনুষ্টুপ ছন্দ** ৪·০০ ॥ প্রবোধকুমার সান্যালের **ইস্পাতের ফলা** ৩·৫০ ॥ বিমল মিত্রের **কন্যাপক্ষ** ৩·০০ ॥ অনুরূপা দেবীর **উত্তরায়ণ** ৫·৫০ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **সৃষ্টি** ৫·৫০ ॥ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **চতুষ্কোণ** ৩·২৫ ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **নীল রাত্রি** ৩·৫০ ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **এক ছিল কন্যা** ৬·৫০ ॥ চিত্রিতা দেবীর **দুই নদীর তীরে** ৬·৫০ ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **অভিষেক** ৫·৭৫ ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষের **গান্ধর্ব** ৩·৫০ ॥

গল্পগ্রন্থ ঃ নরেন্দ্র ঘোষের **পঞ্চমরাগ** ৩·২৫ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **রূপহলুদ** ২·৫০ ॥ জ্যোতির্ময় ঘোষের (ভাস্কর) **ফাংশন** ৩·০০ ॥ শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সিঁদুর টিপ** ২·৫০ ॥

কবিতা গ্রন্থ ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **প্রথমা** ২·৫০ ঃ **সম্রাট** ২·০০ ঃ **ফেরারী ফৌজ** ২·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **নীল আকাশ** ২·০০ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **স্বনির্বাচিত কবিতা** ৪·০০ ॥ বনফুল-এর **নূতন বাঁকে** ২·৫০ ॥ দেবেশ দাশের **সুদূর বাঁশরী** ২·৫০ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **সাগর থেকে ফেরা** ৩·০০ ॥

বিবিধ ঃ অনাথনাথ বসুর **সূক্তিসমুচ্চয়** (সংস্কৃত সুভাষিত-সংগ্রহ) ৩·৫০ ॥ [পৃথিবীতে তিনটি রত্ন আছে —জল, অন্ন আর সুভাষিত। মূঢ় লোক শুধু পাষাণখণ্ডকেই রত্ন বলে॥] বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের **ক্যাকটাস** (সরস প্রবন্ধ গ্রন্থ) ৩·০০ ॥ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটমি** (সচিত্র) ৩·০০ ॥ নলিনীকান্ত সরকারের **শ্রদ্ধাস্পদেষু** ২·৫০ ॥

পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হলো

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের **কাঞ্চনমূল্য** (৫ম মুদ্রণ) ৫·৫০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **তুমি আর আমি** (৪র্থ মুদ্রণ) ২·৩০ ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **মালাচন্দন** (৪র্থ মুদ্রণ) ৩·০০ ॥ হুমায়ুন কবীরের **শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব** (২য় মুদ্রণ) ১·৫০ ॥ বিনয় ঘোষের **বাদশাহী আমল** (২য় মুদ্রণ) ৬·০০ ॥

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪ ২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

সূচিপত্র

সূচিপত্র

নতুন বই

শক্তিপদ রাজগুরুর

মধুকান ২·০০

মনের মানুষ ২·০০

শ্রীপারাবত

আহির ভৈরোঁ ৪·০০

ঝড় থামবে ২·৫০

আমি সিরাজের বেগম (২য় মুদ্রণ)

বিশ্ববন্ধু সান্যাল

কেয়াঞ্জলি ২·৫০

শংকর গুপ্ত

যে নামে ডাকো ২·০০

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চারবোন ৩·৫০

অভিসারিকা ৩·০০

কুমারেশ ঘোষ

ইংরেজের দেশে ৪·০০

মনোজ ভট্টাচার্য অনুদিত

মুল্যাঁরুজ ৭·৫০

ডেথ অব আইভান ইলিচ ২·০০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

মনের কথা ২·৫০

শান্তি রায়

আমি ৩·০০

দেবকুমার বসু

বাংলা নাটক ৩·০০

(১৮৫২—১৯৫৭)

গ্রন্থ জগৎ

৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,

কলি—১২

অভিজিতের নবতম প্রকাশন :

আশাপূর্ণা দেবীর

কেশবতী কন্যা

মূল্য : তিন টাকা

অভিজিৎ প্রকাশনী • ৭২-১, কলেজ স্ট্রীট • কলিঃ-১২

নগদ অথবা সহজ কিস্তিতে

ইণ্ডিয়া (আই ই ডব্লিউ) পাখা ও মার্ফি রেডিও এবং অন্যান্য সকলপ্রকার পাখা, রেডিও, ট্রানজিষ্টার, বহনযোগ্য অলওয়েভ ও লোক্যাল রেডিও, রেফ্রিজারেটার, উষা সেলাইকল, ঘড়ি, পাম্প, মোটর, টাইপরাইটার, প্রেসার কুকার, বাদ্যযন্ত্রাদি, আসবাবপত্র ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা।

৫টি কিস্তিতে লইলে অতিরিক্ত লাগে না।

অনুমোদিত ডিলার

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং

২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, দ্বিতল, কলিকাতা—১।

ফোনঃ ২২-৩০৯৬, ২২-৬৯৩৮

নির্মাতার মূল গ্যারাণ্টিসহ নূতন ষ্টক হইতে সরবরাহ করা হয়।

অনন্যা বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম ও একমাত্র চয়ন পত্রিকা

প্রথম সংখ্যার লেখক-সূচী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ হেমলতা ঠাকুর
পরিমল গোস্বামী ॥ বিমল কর ॥ রমাপদ চৌধুরী
ডক্টর সুহৃদ মিত্র ॥ শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
এম্মা ইয়ানচেভা ॥ নজরুল হক ॥ সন্তোষকুমার দে ॥
নিখিল সরকার ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী
অমিতাভ চৌধুরী ॥ সেবাব্রত গুপ্ত ॥
ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় একটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার ॥
দু'রঙে ছাপা অজস্র রেখাচিত্র ও আলোকচিত্রে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ॥
অঙ্গসজ্জা করেছেন—পূর্ণেন্দু পত্রী

আগামী ৭ই আগষ্ট প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রতি সংখ্যার দাম—৮০ নয়া পয়সা।

বার্ষিক চাঁদা— ন' টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা—দেড় শতাধিক ॥

কার্যালয় ॥ ৭৯/৫বি, লোয়ার সার্কুলার রোড। কোলকাত-১৪ ॥

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৪২	কবিকণ্ঠ	—শ্রীসন্তোষকুমার দে
৪৭	বিবাগী ভ্রমর (উপন্যাস)	—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
৫৪	প্রাচীন ভারতের চিকিৎসার ধারা	—শ্রীবিশ্বনাথ রায়
৫৫	মতামত	—শ্রীশৈলেন ঘোষ
৫৭	প্রতিবেশী সাহিত্য ঃ আদিম রিপু (পাঞ্জাবী গল্প)	—শ্রীঅমৃত প্রীতম
৬০	দেশে বিদেশে	
৬২	ঘটনা প্রবাহ	
৬৩	বিজ্ঞানের কথা	—শ্রীঅয়স্কান্ত
৬৬	সমকালীন সাহিত্য	—শ্রীঅভয়ংকর
৬৯	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনান্দীকর
৭৬	খেলাধুলা	—শ্রীদর্শক

শিল্পী ঃ শ্রীচারু খাঁ

// অগ্রদূত //

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩শ সংখ্যা, মূল্য—৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 4th August, 1961
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

আগ্নেয়গিরির জঠরের ন্যায় একদা বঙ্গমনোভূমির ভিতরেও প্রকাণ্ড অগ্নিদাহন শুরু হয়েছিল। সেদিন সেই মনোভূমির ভিতর থেকে যে জ্বলন্ত প্রতিভার স্রোত অর্ধশতাব্দীব্যাপী উৎসারিত হয়েছিল, সেই স্রোতধারায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আবির্ভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ঘটনা। কারণ সেদিনের সেই উজ্জ্বল, উত্তপ্ত মনোভূমি শুধু সাহিত্য বা রাজনীতি নয়, শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আত্মস্ফূর্তির জন্য প্রকাণ্ড আবেগ নিয়ে অস্থির অপেক্ষায় ছিল। ইতিহাসে নূতন যুগের আবির্ভাব ঘটার আগে তার পূর্বলক্ষণস্বরূপ কতকগুলি চিহ্ন দেখা দিতে থাকে। তাপদগ্ধ মনোভূমি থেকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অগ্নিপ্রবাহ আরম্ভ হয় এবং তারপরে অকস্মাৎ একদিন আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতো সেই মনোভূমির জঠরাগ্নি থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্নিময় প্রতিভার স্রোত সমস্ত বাধাবন্ধ বিদীর্ণ করে দিয়ে আবির্ভূত হয়। যে যুগজননী রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর ঊষাকাল পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশকে অমৃতশিস্য দান করে গেছে, তার মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আবির্ভাবও যে ঘটবে, সেকথাও ইতিহাস আগেই ইঙ্গিত করে গিয়েছিল। কারণ তাঁর পূর্বসূরী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইতিপূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এবং চিন্তার প্রধান ধারাগুলি আচার্যের জীবনে এত সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত যে, প্রতিভার বংশানুক্রম হিসাবে বিদ্যাসাগরকে আচার্যের পূর্বপুরুষরূপে চিনতে কোনো কষ্ট হয় না।

অবশ্য বাঙ্গালার আত্মস্ফূর্তির তাড়নাকে তিনি বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর মন্দিরে পথ দেখিয়েছিলেন। বলা-বাহুল্য যে, সেখানে তিনি এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র একই প্রচেষ্টার ধারাবাহক। বাঙ্গালী মন তৎকালে নূতন দিগন্ত আবিষ্কারের অভিযানে নানাদিকে যে জয়যাত্রা আরম্ভ করেছিল, আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেই জয়যাত্রায় বাঙ্গালী মনের একটি ধারাকে নিয়ে এসেছিলেন লেবরেটরির কক্ষে। সমাজের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক ভিত্তি ছাড়া এই অভিযান বা জয়যাত্রা সম্ভব হতে পারে না, যেমন আদ্যকার দিনে রাশিয়ার মহাকাশ যাত্রাও একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক-বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়া সম্ভব হয়নি। এগুলি আকস্মিক আবিষ্কারের প্রশ্ন নয়। দীর্ঘ, প্রশস্ত এবং সমগ্র সমাজব্যাপী বিপুল প্রস্তুতির ফলস্বরূপ এই অমৃতশিস্য সম্ভব। কাজেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের রাসায়নিক গবেষণা, তথ্যানুসন্ধান ও সাফল্যের পশ্চাতে, কিংবা আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের পটভূমিতেও সমাজের বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি ছিল। তাছাড়া সমাজ আরও একটি অমূল্য সম্পদ এঁদের দান করেছিল—নিষ্ঠা ও নিবিষ্টতা।

কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের পার্থক্য এইখানে যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রুদ্ধদ্বার গবেষণাকক্ষে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ ছাত্ররূপে নিজের জীবন আবৃত এবং অতিবাহিত করেননি। তাঁর চরিত্রের এইখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব সুস্পষ্ট। যত সময় তিনি লেবরেটরির কক্ষে যাপন করেছেন তার চেয়ে বেশী সময় গেছে সমাজ-হিতৈষণায়— বন্যাত্রাণে, রাজসাহীর গ্রামে গ্রামে নৌকায়, অনাহারে ও অর্ধাশনে, পল্লীসংগঠনকর্মে এবং 'বাঙ্গালী শিল্পসংস্থা' প্রতিষ্ঠায়! শুধু মননশীলতার চর্চায় যে কোনো জাতি বাঁচতে পারে না, তার সৃজনশীল চিন্তাধারাকে লেবরেটরির এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠ থেকে শ্রমশিল্পের কারখানায় এনে প্রয়োগ করা যে প্রয়োজন, একথা আচার্য যেভাবে অনুভব করেছিলেন, বাঙ্গালার নবজাগরণের আন্দোলনে তেমনভাবে আর কেউ অনুভব করেনি। বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড দৃঢ় করা দরকার—এই চেতনা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সম্ভবত এইজন্য যে, তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে বাঙ্গালার অর্থনীতির দুর্দশা প্রত্যক্ষ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এবং অজ্ঞাতসারেই হোক্ জ্ঞাতসারেই হোক্, বোধহয় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বঙ্গ-সংস্কৃতির অবক্ষয়েরও অন্যতম প্রধান কারণ স্বরূপ দেখা দেবে এই অর্থনৈতিক দুর্বলতা।

সনাতনী চিন্তা ও কুসংস্কারের বন্ধন থেকে সমাজকে মুক্তি দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি পথপ্রদর্শকেরা বাঙ্গালা দেশকে নবজাগরণের আন্দোলনে প্লাবিত করেছিলেন এবং মননশীল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে অবক্ষয়ের ইঙ্গিতরূপে এই আন্দোলনের মধ্যে এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনেও কতকগুলি সংস্কার জন্মলাভ করেছিল। তারই প্রকাশ্য সাক্ষ্য হচ্ছে : চাকুরীবৃত্তির সংস্কারাশ্রিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং তাঁদের নিছক কেতাবীয়ানা, সরস্বতীর দরজায় ভীড়ের আতিশয্য, ব্যর্থতা এবং কেরানীর অনিবার্য উৎপাদন। ইতিহাস আচার্যকে নিয়োগ করেছিল এই অবক্ষয়ের পূর্ব লক্ষণগুলির সঙ্গে লড়াই করবার জন্য। চাকুরীবৃত্তির সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়ে বাঙ্গালী মনকে তিনি শ্রমশিল্পের পথ দেখাতে চেয়েছিলেন। সে পথে আমরা এখনও বেশীদূর অগ্রসর হতে পারিনি। কিন্তু যতটুকু পেরেছি, তার পথিকৃৎ এই আত্মত্যাগী, আজীবন রুগ্ন শীর্ণ সন্ন্যাসী।

কবিতা
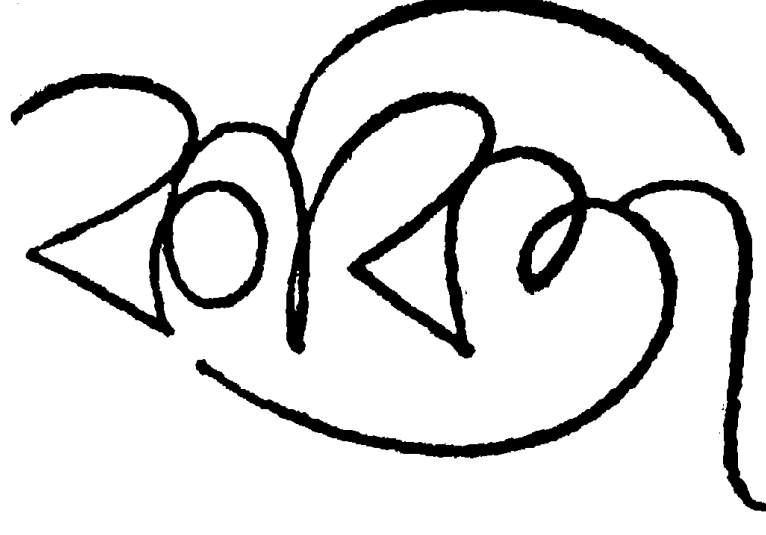
কুয়োতে কে জল তোলে

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মাঝে মাঝে মনে হয়
নির্জন দুপুরে
কুয়োতে কে জল তোলে—

যেন কার দীর্ঘহাতে
দড়ি ঘোরে,
ক্ষীণ আর্তনাদ তুলে
ঘোরে কপিকল,
সমস্ত দুপুর ভরে
কুয়োতে কে জল তোলে
জল তোলে
জল।

ছল ছল ছলচ্ছল
ঝরে পড়ে জল,
ফিরে পেতে চায় তার
আপন অতল।
সমস্ত দুপুর ভরে
শুনি অবিরল,
জল তোলে কার হাত
আর ঝরে জল।
কুয়োতে কে জল তোলে
জল তোলে
জল।

এত জল তোলা হলো,
তবু তো পিপাসা—
মানুষের পৃথিবীর আকাশের ভাষা।
হয়তো এ তৃষ্ণা নয়,
তারো বেশী কিছু
এ শুধু জলের নেশা
তাই তোলে জল।

গোপন গভীর মোহে
বেদনার গহন অতল—
তারি বুক শূন্য করে
জল তোলে
জল
সময়ের দীর্ঘ হাতে
জীবনের চাকা ঘোরে
ঘোরে দড়ি
ঘোরে কপিকল—
কুয়োতে কে জল তোলে
জল তোলে
জল।

প্রতিরোধ

ফণিভূষণ আচার্য

না, আর কখনো আমি ও আগুনে পাখা পোড়াবো না।

অনেক জ্বলেছি আমি অহরহ মৃত্যুর প্রণয়ে
একী এ যন্ত্রণা রাখো সূর্যাস্তের মেঘে মেঘে,
রাত্রিদের চোখে
জোনাকিরা পুড়ে মরে, আর আমি জ্বলি
তোমার দুচোখে আমি রেখে আসি আমার গোধূলি।

তারপর রিক্ত হই সর্বস্বান্তে, হৃদয়ে বসুধা
মেলে ধরে আদিগন্ত নিরাকার আঁধারের মন
কোথাও বকুল বুঝি মৌন আর্তনাদে ভেঙে পড়ে
আকাশ, আকাশ, তুমি আমার হৃদয়ে মুখ রাখো।

আমাকে ডেকোনা আর, তোমার দুর্লভ মন ভাটিয়ালি রাতে
কখনো চেয়োনা দিতে, কোনদিন বৃষ্টির রুমালে
দুপুরের আকাশটা মুছে নিয়ে সূর্য জেনলে দেবে
এবং বিকেল এক সর্বরিক্ত নির্বাক বিস্ময়ে

আত্মার গভীরে লিখবে ঈশ্বরের মৌন পরাভব।

না, আর কখনো আমি ও আগুনে পাখা পোড়াবো না।
দেখেছি মাটিতে ঝরে গোধূলির রক্তিম যন্ত্রণা
হৃদয় অশান্ত বড়ো কুড়িয়েছে অবাক বিস্ময়ে
বিষণ্ণ রাত্রিরা ঘরে ফিরে ফিরে আসে, অন্ধকারে
আত্মাকে বিক্ষত করে। আমাকে ডেকোনা তুমি, আর

তোমার দুচোখে আমি আমার হৃদয় জ্বালবোনা।

*
* *
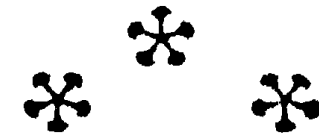
সেলিম হিল

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কে সাজালো এত দৃশ্য? কে পরালো মেঘের উধাও
পাহাড়ের মৌনতায়? কিছু স্থির ফুলের উজ্জ্বল
অবিনাস্ত সারাদিন। ব্যস্তপথে ঝরণা কোথাও
খেলা করে। শ্রাবণের অকস্মাতে অরণ্য উতল
কাহার ইঙ্গিতে বল? বাতায়নে মেঘের সঞ্চয়।
কে সাজালো এত দৃশ্য? চতুর্দিকে প্রশ্নের বিস্ময়।

ঝরণাতলার কিছু নির্জনতা নিয়ে সারাদিন
খেলা করবো। আমি ওই ধাপ সিঁড়ি চায়ের সবুজে
হরিণের মত বন্য। তারপর হৃদয়ের ঋণ
শোধ করে চলে যাবো অগোছাল দৃশ্যের অবুঝে।

অপ্রধান বহু কথা মুখোমুখি বসে এই স্থানে।
কেউ কাছে কেউ দূরে ছায়াচ্ছন্ন এই নির্জনতা
ঢেকে দেয় অন্তরাল। সমতল ভূমির প্রস্থানে
উত্থান পতনে বাজে প্রস্তরের মৌন প্রসন্নতা।

কে সাজালো এত দৃশ্য? রৌদ্রে ঝরে মেঘ দ্যুতিময়।
নিসর্গে অজস্র ঘ্রাণ। বাতায়নে ব্যহত হৃদয়।।

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৮।১১।৫৯

নামজাদা লেখকের নাম পড়ি, ধরা যাক্ রাসেল। অসম্ভব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু ইংলন্ড চলছে, পশ্চিমী সভ্যতা চলছে, পৃথিবী চলছে তাঁর কথায়? চালায় politician-রা, তাঁদের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক কম। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এমন কি নিতান্ত জনসাধারণ মানুষেরা যুদ্ধ চাচ্ছেন না। কিন্তু পলিটিসিয়ানরা চাচ্ছেন। তাও তাঁরা বলছেন তাঁরা ঠিক চাইছেন না, তবে, কারা চাইছেন? অবশ্য একদল লোক আছেন যাঁরা শস্ত্রের ব্যবসা করেন। তাঁদের পরও অন্য কথা আছে। এ'দের চেয়ে বেশী দায়িত্ব ভাবাবেশের, (emotions)। ভাবাবেশ দেশে এলে যুদ্ধ তৈরী হতে বিলম্ব হয় না। তার বিপক্ষে রাসেলের বুদ্ধি কি করবে? ডিমক্রাসীর সামনে ভেসে যাবে! জনগণের এই ধরণের ডিমক্রাসী থাকবে না, থাকতে পারে না! হয়ত অন্য ধরণের ডিমক্রাসী উঠবে। রাশিয়ার জনগণ শান্তি চায়। কিন্তু ক্রেমলীন? সেটাও চাচ্ছে না—চমৎকার কথা! হয়ত এদের ডিমক্রাসী আর ওদের ডিমক্রাসী অন্য রকমের। জানি না, হয়ত, কিংবা হয়ত বা নয়।

১।১২।৫৯

সুচিত্রা মিত্রের উচ্চারণ-ভঙ্গী এবং গীতি-ভঙ্গী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গান তারই কণ্ঠে সবচেয়ে মধুর, অবশ্য ইদানীংকারের ভেতর। সেই আকরে তারই গান গায়। সবচেয়ে ভালো গান সেই গেয়ে থাকে। অর্থাৎ নির্বাচন তারই শ্রেষ্ঠ। সব গান সকলের মুখে জমে না। তার গলায় প্রাণ ভরে যায়। অঞ্জলি সুরের শ্যাম-কল্যাণ বেশ লাগল। অস্থায়ী ও তান কর্তব ভালো। তার যদি বিয়ে না হয়ে থাকে এবং সে যদি ভালো ওস্তাদের হাতে পড়ে, তবে সে গাইয়ে হবে। তীব্র মধ্যমটি স্বচ্ছ, শুদ্ধ মধ্যম একটু যেন আড়ষ্ট। দুটি মধ্যমের উপযুক্ত সমাবেশ যেন হোল না। তবু, বেশ। লালচাঁদ বড়ালের মুখে শ্যাম-কল্যাণ শুনেছিলাম; তখন খুবেই ভালো লাগত।

কিছুতেই আধুনিক (বাংলা) গান পছন্দ করতে পারছি না—অশ্রাব্য।

২।১২।৫৯

আমার বন্ধুর মেয়ে মারা গেল। লক্ষ্মী মেয়ে, এম, এ, দর্শনে প্রথম

শ্রেণী প্রথম; সীজারিয়ান অপারেশনের পর রক্তহীনতা থেকে তাকে বাঁচাতে পারা গেল না। মা-বাপের এক সন্তান। দুঃখের অবধি নেই। প্রাণটা যেন কেঁদে উঠল। কিন্তু কেন? দুঃখ এই ছোট সংসারে, সূর্যমন্ডলে দুঃখ নেই, সেখানে কালের নিয়ম, তারও শেষে গ্যালাক্টিক পরিবেশ, সেখানে দুঃখ নেই, সে-সংসারের নিয়ম পর্যন্ত হয়ত নেই, যদি থাকে তবে তার নিয়ম অন্য রকমের, সেখানেও দুঃখ নেই। তবু এ-যুগের নিয়ম দুঃখের। তিনটে ভিন্ন পরিমন্ডল।

৭।১২।৫৯

"রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র......" এবং মানে বৈপরীত্য, অনুযায়ী, কিংবা সুতরাং। তিনটি তিন রকমের মনোভাব প্রসূত, কিন্তু একত্রে এবং বলা হয়। বৈপরীত্য অর্থে সম্পূর্ণ পৃথক এবং বিরোধাত্মক, অনুযায়ী হোলো পারস্পর্য। সুতরাং মানে খানিকটা পৃথক খানিকটা মিল। এখানে এবং অর্থ কি?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎদার দেখা হয় প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে, কমলালয়ে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ সেদিন সকালে কোনো বিদেশ থেকে ফিরেই ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সন্ধ্যায় দেখা করতে এলেন। আমরা অনেকেই জুটেছি। শরৎদা শিবপুরের গায়ক মন্মথ দত্তকে নিয়ে এলেন, কিন্তু বোধহয় জানতেন না যে রবীন্দ্রনাথ আসছেন। একটু দেরী করেই রবীন্দ্রনাথ এলেন। শরৎদা গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আসতেই তামাক ছেড়ে উঠে সোজা পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লেন, 'আমি শরৎ।' একটু স্মিতহাস্যে বল্লেন, 'শরৎ?' একটু নীরব থেকে বল্লেন, 'তোমার লেখাই একমাত্র পড়ি।' এটা বোধহয় ভদ্রতাই মনে হলো। কিন্তু এইটুকু বলবার পরই আরম্ভ করলেন, 'কিন্তু আমার কিছু বলবার কথা আছে।' তারপর আরম্ভ হোলো বস্তুতান্ত্রিকতা, তার শেষ কথা। শরৎদা বল্লেন, 'আমি বহুবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছি।' একবারের কথা। এখনও মনে পড়ে, তখন শরৎদা নতুন নেশা করতে শিখেছেন, নেশার ঝোঁকে রুটির সঙ্গে গুড় না খেয়ে রেড়ীর তেল খেয়ে ফেল্লেন। বাবা একটা প্রচন্ড থাপ্পড় মারলেন এবং তারই ফলে প্রথম পলায়ন। রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, তিনি এ-সব কিছুই দেখেননি, শাসের পর্দার ভেতর থেকে উঁকি মেরে বজরা থেকে ও-পারের মানুষ দেখা মাত্র। প্রমথবাবু বল্লেন, 'এই ঠিক, এইটাই বাহাদুরি।' মন্মথ দত্তের গান শুরু হোলো, কথাবার্তাও থেমে গেল। শরৎদা কথাবার্তার মধ্যে একটু অন্তরালে গেলেন, বোধহয় আফিমের লোভে।

তা হলে দাঁড়াল এই যে দুজনের সম্বন্ধ বিপরীত। অবশ্য আমরা সকলেই জানি, দিলীপও লিখেছে, যে শরৎদা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভীষণ ভক্ত। কিন্তু ভক্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা দুর্জয় অভিমান ছিল। প্রমাণ হয় গান্ধী নিয়ে, কিন্তু অভিমানটা ছিল প্রথম। রুঢ় আলোচনা তিনি মৌখিকভাবে করতেন। বই ফেরত নিয়ে তিনি প্রথম চলে আসেন। তবু ছিল ভক্তি, ঠিক শ্রদ্ধা নয়। এই শ্রদ্ধার অভাবই হোলো বৈপরীত্যবোধের প্রথম কারণ, তারপর লেখার বৈপরীত্য। শরৎদা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ এবং লোকে বহুবার রপ্ত করেছিলেন, তবু শরৎদার চমৎকারিত্ব রবীন্দ্রনাথের নয়, বঙ্কিমের সংস্করণ। সংস্করণই বলতে হবে; তাই বোধহয় হিন্দীভাষীরা শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে প্রধান বলেছেন।

শরৎদা রবীন্দ্রনাথের অনুযায়ী নয়, বঙ্কিমের। শরৎদা এবং রবীন্দ্রনাথ—দুজনের জাত আলাদা। গোটের সঙ্গে ক্লপস্টক।

১০।১২।৫৯

ভাব উঠল সকলের আগে; তারপর কথিত বাক্য এলো; তারও পরে লিখিত ভাষা। যদিও ভাব, বাক্য, ভাষা মিলে-মিশে যায় তবু তিনটে জিনিস কালানুসারে অন্ততঃ পৃথক থাকে। ভাবের রূপ পায় বাক্য ও ভাষায়। এইখানেই গলদ! ভাব বস্তুটা অস্পষ্ট, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ। সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণতা থেকে অভ্যুদয় হোলো বাক্য ও ভাষা; তার মধ্যে বাক্য হোলো অপেক্ষাকৃত কম অস্পষ্ট, সেই বাক্য সম্পূর্ণ হোলো আবার; সেই সম্পূর্ণতা থেকে এল আবার লিখিত ভাষা। সেটাও আবার অস্পষ্ট; কিন্তু আরো কম, কিন্তু তবু থাকল আবার সম্পূর্ণতা। যোগী-ঋষিদের কথা ভাষা শুনেছি। তাঁদের কথা হয় অ-কথ্য না হয় parable। অনেক সময় তাঁদের গম্ভীর গম্ভীর কথা নিতান্ত ছেলেমানুষী। রামকৃষ্ণদেবের parable ছিল অতুলনীয়। যোগী-ঋষিদের মৌনী হওয়াই ভালো। আর না হলে যন্ত্রসংগীত বাজান উচিত। তাঁদের

হয় একতারা না হয় তানপুরো হওয়াই ঠিক। স্বরসম্পূর্ণ ভাবের সংগে যন্ত্র-সংগীতের মিলই বেশী—কথ্য ভাষায় যেন বিধর্ম হয়ে যায়।

১৭।১২।৫৯

অতিথি এলেন, খাওয়ালাম-দাওয়ালাম, সাধ্যাতীত যত্ন করলাম, তাঁরাও কৃতজ্ঞ হলেন, এমন কি আদর-আপ্যায়নে অভিভূতও হলেন। তাঁরা এলেন, তাঁরা গেলেন, কিন্তু কিছু কি থেকে গেল? আফ্রিকা-আরব দেশ থেকে যখন অভ্যাগতরা এখানে আসেন, তখন অবশ্য আদর-যত্ন করি, কিন্তু আমাদের মনে, তাঁদেরও মনে, সাড়া পড়ে না। কিন্তু আমেরিকা-রাশিয়া থেকে যদি কেউ মহাপুরুষ পদার্পণ করেন তখন দুজনের মনে না হোক একজনেরও মনে আশা-ভরসা জেগে ওঠে। আমরা মুখে কিছু বলি না, কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করি অর্থ, টাকা। তাঁরাও হিসেব কষেন, মুখে কিছু বলতে চান না। পৃথিবীর বড় বড় দেশের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা টাকা চাইছি এবং তাঁরাও দিচ্ছেন, হিসেব করে। লেন-দেনের মধ্যে ভদ্রতা নিশ্চয়ই কিছু আছে, কিন্তু তারও বেশী ব্যবসা-বুদ্ধি। অতিথিদের সম্ভাষণ করছি, আর চাইছি টাকা! কালচার-বিনিময় নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা টাকার লেন-দেন। এরমধ্যে রয়েছে অ-ভদ্রতা।

আমি জানি উন্নত দেশের কাছ থেকে অবনত দেশ ধার নেবেই নেবে। ইংরেজদের কাছে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মাণী, দক্ষিণ-আমেরিকা ধার নিয়েছেন, এখনও নিচ্ছেন; আফ্রিকার অধমর্ণতার ত' কথাই নেই। ধারের চোটে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ স্বাধীনতার নামে পরাধীন হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষেরও এই দুর্দশা— খাদ্য আমাদের জুটছে না, তার ওপর industrialisation-এর চাহিদা, তারও ওপর সংখ্যাধিক্য। ইকনমিস্টরা এই মোটা কথাগুলি তুললেও এতটা ধার নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের political স্বাধীনতা হ্রাস পাচ্ছে বলেন কি? এ'রা বলেন politics is not our pigeon.

না হয় লোহ-লক্কড়ের অতটা দরকার ছিল না, না হলে ডি. ভি. সি, ভাকড়া নাই হোতো, না হয় শাক-মুলো খেয়েই থাকতাম, না হয় মানুষ দিয়েই কাজ চালাতাম। আধুনিকতার যুগে শুনেছি এ-সব দরকার। আমারও মন চায়, প্রাণ চায়, আমিও আধুনিক, কিন্তু মনের নীচে, প্রাণের তলায় একটা কিছু আছে যার অভাবে আধুনিকতা মেলে না। গান্ধীর কথা মনে হয়, স্বাধীন হতে আমরা পারলাম না।

২০।১২।৫৯

আবার আমার মনে হচ্ছে যে কোলকাতা শহরে intellectual class তৈরী হোলো না। ভালো মন্দ জানি না, তবে বুঝলাম, হোলো না। বছর দশেক মাত্র পরিচয়ের আড্ডায় কিছু হয়েছিল। আর বোধ হয় হয়েছিল খানিকটা রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের কোনো একটা সময়ে। সে যাই হোক, ত্রিশ সালের পর আর হয়নি। অনেক কারণ আছে—ইদানীংকার একটি কারণ এই—বাংলা দেশে জন দশ-বার লেখক একটা বা দুটি গোষ্ঠী বানিয়েছেন, এবং তাঁরাই লেখকদের বৃত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছেন, বাকী অন্যদের কিছুই থাকছে না। এ'দের লেখার মূল্যে বিশেষ কিছু নেই, অর্থ আছে। যাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক হোতে পারতেন তাঁদের লেখা বাজারে কাটতি হয় না। প্রথম শ্রেণীর ত' নেইই। সুধীন দত্তের গদ্য ও পদ্য সামান্য কিছু বিক্রী হচ্ছে, কিন্তু বই-এর আসরেই যা কিছু। তার snob-value-ই বেশী। বিষ্ণু দে আর একজন ইনটেলেক্চুয়াল, তাঁর বই কাটে না। অবশ্য তিনি লিখে যাচ্ছেন। অথচ সেই দশ-বারজনের লেখার অন্ত নেই। শুনলাম একজনের আগত চতুর্থ বই-খানির দাদন খাটছে। এ-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের স্থান কোথায়? অন্ততঃ হাজার দুয়েক কপি ত বিক্রী হওয়া চাই! তা হচ্ছে না। এই রকম racket হলে intellectual class-ও সৃষ্টি হতে পারে না। সমাজ উচ্ছন্ন যাচ্ছে। কিন্তু ফরাসী দেশের সমাজও তাই। আজ থেকে নয়, প্রায় পঞ্চাশ বছরের ওপর। তবু সেখানে intellectual class আছে, এবং হচ্ছে। ফ্রান্সে অবশ্য সবই বাড়াবাড়ি, কিন্তু এখানে ত কিছুটা হওয়া উচিত ছিল!

২৫।১২।৫৯

বড়দিনের ছুটি। কিন্তু আকাশে বাতাসে ব্যস্ততা নেই। আমি অবশ্য যেতে পারিনি, কিন্তু বাজারে শুনলাম চাঞ্চল্য নেই। আমরা না হয় খৃষ্টান না হলুম, কিন্তু বড়দিনের ছুটিটা মারা গেল কেন? ইংরেজের সবই রয়েছে, কিন্তু বড়দিনের ছুটিটা গেল কেন? সব প্ল্যানিং-এর কাজে পাগল হয়ে আছে নাকি! অথচ শুনছি যে কেরানীরা কাজ করতে চান না। দশ-বার দিন তাঁদের বড়দিনের ছুটি দিলে মন্দ হয় না। কাজ তাঁরা যখন কিছুতেই করবেন না, বেশী ছুটি দিয়ে দেখলে হয়!

(ক্রমশঃ)
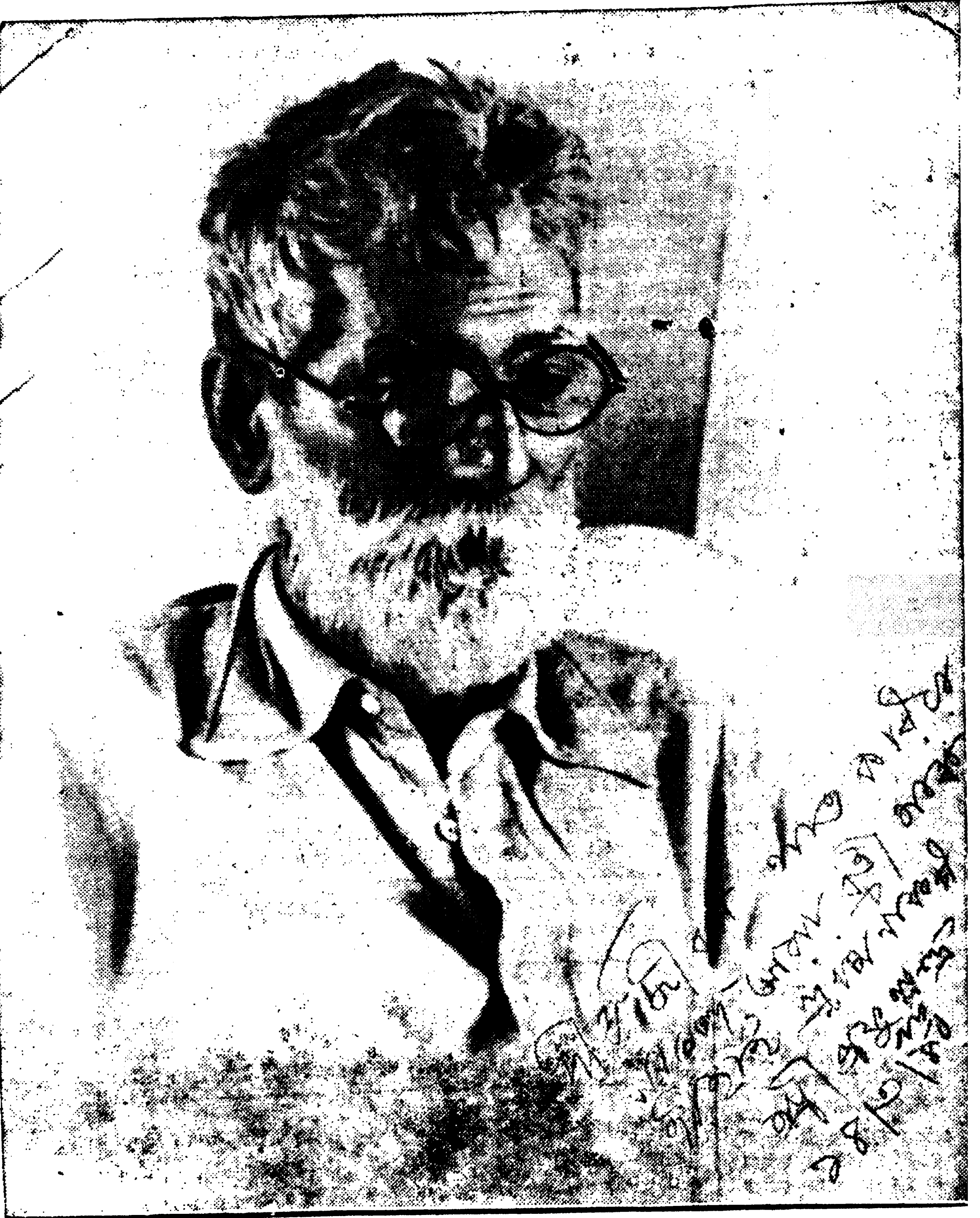
জন্ম : ২রা আগস্ট ১৮৬১ ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ॥ মৃত্যু : ১৬ই জুন ১৯৪৪

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সংহত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে কখন সম্ভব হোত না। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।"

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙলার ও বাঙলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ করা আমাদের সাধ্যের বাহিরে; গল্পে, গানে, কবিতায়, নাট্যে, প্রবন্ধে, সমালোচনায় বাঙলা সাহিত্যে এই মহারথী তাঁহার প্রতিভার অমর অবদানে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে বিজয়মাল্য আহরণ করিয়া আনিয়াছেন। বঙ্গ-জননীর লজ্জানত শিরে তিনি বিজয়-তিলক পরাইয়া দিয়াছেন। বাঙলাভাষা আজ যে পৃথিবীর সর্বত্র আদৃত তাহার মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রাণপণ চেষ্টা। বাঙালী হইয়াও বাঙলাভাষা পাঠ করা ইংরাজ রাজত্বের প্রথম যুগে শিক্ষিত সমাজের রুচিবিকার বলিয়া গণ্য হইত। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লইয়া তথাকথিত শিক্ষাসমাজকে যথেষ্ট বিদ্রূপও করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাহিত্যক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু আত্মচেতনা প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে গড়িয়া উঠে নাই, একথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরও অনেক দিকপাল মাতৃভাষার উন্নতির জন্য এবং ভাষাকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল ইহা ঠিক। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে প্রাণশক্তি তাঁহাদের প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ অতি দুস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া পথ খুঁজিয়া লইতেই তাঁহাদের অনেকটা শক্তির অপব্যয় করিতে হইয়াছিল। সাধারণ লোক তখনও যেমন সাহিত্যের ধার ধারিত না, এখনও তেমনি তাহার সন্ধান রাখে না। রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষকালেও যে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে তেমন আস্থাবান ছিলেন না, তাহা অনায়াসে বলা যায়। বঙ্কিমের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলে অবশ্য এই অবস্থা ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার গতিবেগ খুব বেশী ছিল না। ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দিলেন, তাঁহার চিত্তের ঐশ্বর্য ও ভাষার ভাণ্ডার লইয়া। কমপক্ষে ৩০ বৎসর বাঙলা সাহিত্য তাঁহার অলোকসামান্য সৃজনীশক্তি ও অতুলনীয় কাব্যপ্রতিভার মাধুর্য উপভোগ করিতে পারিয়াছে, এবং কোন প্রকার অতিশয়োক্তি না করিয়াই বোধ হয় বলা যায় সর্বদেশ সর্বকালে শ্রদ্ধানতশিরে তাঁহার সার্থক সৃষ্টির পূজা করিবে। রবীন্দ্রনাথের গুণকীর্তন করার আজ প্রয়োজন কিছু আছে বলিয়া মনে করি না। বাঙলার এই সত্যকার গুণীর গুণকীর্তন সমস্ত জগতেই হইতেছে। বিজ্ঞাপন দিয়া বক্তৃতা দিয়া প্রচার করিবার মত প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের হয় নাই। তাঁহার প্রতিভার অমর অবদানে আমাদের এই পরিষদ আজ ধন্য হইয়াছে। তাই পরিষদের বিশেষ কর্তব্য হইতেছে তাঁহার স্মৃতি-পূজার। বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া আজ আমরা ধন্য হইব। আমাদের অভিশপ্ত জাতীয় জীবন তাঁহার অস্তাচল গমনে আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জানি না, ভগবানের আশীর্বাদে কবে আবার নূতন ঊষার অরুণোদয় হইবে।

মাত্র এই কয়টি কথা বলিয়াই আমি আজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিতেছি। *

* ১৩৪৮ সালের ২০শে ভাদ্র সাহিত্য পরিষদে আচার্যদেব শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসুর অংকিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচনকালে এই অভিভাষণ দেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

গত শতাব্দীর শেষ দশক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপক। কলেজের কাজ আর তাঁর নিজের তৈরী ঔষধের গবেষণাগারের কাজের অবসরে বসে বসে বই পড়েন। বই পড়তে তাঁর চিরদিনই ভাল লাগত। জীবনস্মৃতির এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "আমি প্রায় ভ্রমক্রমে রাসায়নিক হইয়াছিলাম। ইতিহাস, জীবন-চরিত, সাহিত্য এই সব দিকেই আমার বেশী ঝোঁক।" এই সময়ে বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশেষতঃ রসায়ন বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের বৃত্তান্ত সংক্রান্ত বইগুলির প্রতি তিনি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন টমসন, কপ প্রভৃতি মনীষীদের রচনাদি তাঁকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি বিশেষ উৎসাহী করে তুলেছিল। যদিও কপের Geschichte বইটি খুবই দুরূহ তবুও ঐতিহাসিক পটভূমিকার জন্যে তিনি সে বইটিও মনোযোগের সঙ্গে পড়েছিলেন। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীতে একদিন তিনি বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী বার্থেলোর L' Alchimistes Grecs বইটি পেলেন। বইটি রসায়ন বিজ্ঞানের পুরাযুগ ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভিত্তিতে লেখা। আচার্য রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেললেন। কিন্তু বইটিতে ভারতের প্রাচীন রসায়ন জ্ঞানচর্চার কোন উল্লেখ ছিল না। তখন তিনি বার্থেলোকে একটি সুদীর্ঘ পত্রে জানালেন যে, ভারতেও পুরাকালে রসায়ন শাস্ত্রের যথোচিত চর্চা ছিল এবং বহু রসায়ন সামগ্রী ও রাসায়নিক ভারতের সেই বিস্মৃত যুগে বিদ্যমান ছিল। বার্থেলো পত্রপাঠ তাঁকে এক পত্র লিখলেন, "আপনার গবেষণার চিত্তাকর্ষক ফলাফলের সংবাদে পুলকিত হইলাম। ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় এশিয়াখণ্ডেও যে বিজ্ঞানের সার্বভৌম এবং নৈর্ব্যক্তিক রূপের সমাদর ও চর্চা চলিয়াছিল, তাহা জানিয়া আনন্দ হইল। আমার এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের এতদিন পর্যন্ত এই ধারণা যে ভারতবর্ষ ও চীন দেশে যে সামান্য পরিমাণ রসায়ন জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা গ্রীস হইতে মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর দিয়া সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ...আপনি যে ভারতীয় মৌলিক রসায়ন তত্ত্বের উল্লেখ করিলেন, তাহার বিষয়ে আমি খুবই জানিতে ইচ্ছুক। সে সব বই-এর কোন ইংরাজী বা ইউরোপীয় ভাষায় সংস্করণ আছে কি? যদি থাকে তাহা হইলে আমাকে যদি তার কিছু পাঠাইতে পারেন ত খুবই বাধিত হইব। আপনাকে হয়ত অনেক বিরক্ত করিলাম, অনেক প্রশ্নই আপনাকে করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু জানিবেন আমার এই ঔৎসুক্য আপনিই জাগাইয়া তুলিয়াছেন।"

এই চিঠিখানি আচার্য রায়ের জীবনে একটি বিরাটতম প্রেরণা। এই বিষয়ে আচার্য রায়ের জীবনস্মৃতিতে আছে, "একজন শীর্ষস্থানীয় রসায়নবিদ জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। অথচ যৌবনের উৎসাহে

সলিল বসু

রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহান্বিত, আর আমি যুবক হইয়াও যথোচিত উৎসাহ সহকারে কাজে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, এবং কার্যে নূতন উৎসাহ আসিল।" বার্থেলোর অনুরোধক্রমে তিনি 'রসেন্দ্রসার সংগ্রহ' নামীয় একটি সংস্কৃত গ্রন্থের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিলেন। বার্থেলো তাঁর এই প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে বিখ্যাত ফরাসী পত্রিকা Journal des Savants-এ একটি প্রবন্ধ লিখলেন এবং পত্রিকাটিও তিন খণ্ডে সমাপ্ত রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসের সংকলন আচার্য রায়কে পাঠিয়ে দিলেন। এই বইগুলি পড়ে তিনি ঠিক করলেন যে হিন্দু রসায়ন বিজ্ঞানের উপর একটি বই লিখবেন। এই সময়ে আর একটি উদ্দীপনাময় ঘটনা ঘটল। আচার্য রায় একদিন সন্ধ্যেবেলা এসিয়াটিক সোসাইটির সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সভার কাজ আরম্ভ হতে তখন কিছু দেরী থাকায় তিনি কতকগুলি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। ১৮৯৭ সনের অক্টোবর মাসের Journal des-Savants পত্রিকাটির একটি পাতায় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। একি রহস্য! একি বিস্ময়। আনন্দবেদনা বিজড়িত একি অনির্বচনীয় অনুভূতি! প্রবন্ধটি বিজ্ঞানী বার্থেলোর লেখা। প্রবন্ধের এক জায়গায় মহামনীষী বিজ্ঞানী আচার্য রায়কে ভারতের একজন বিশিষ্ট প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী বলেই অভিহিত করেছেন। এই প্রবন্ধ পড়ে তাঁর শরীরে এক অপূর্ব শিহরণ খেলে গেল। তাঁর নিজের ভাষায়, A thrill as it were passed through my body। সেই দিন থেকেই তিনি প্রবৃত্ত হলেন তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ A History of Hindu Chemistry প্রণয়নে।

হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে রসায়নের বিভিন্ন যুগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়ুর্বেদিক যুগ—প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, দ্বিতীয় পরিবর্তন যুগ—৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, তৃতীয় তান্ত্রিক যুগ—১১০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আর সবশেষে চতুর্থ যুগ ১৩০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে রসায়ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই খণ্ডের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় মূল সংস্কৃত পুঁথিগুলির ইংরাজী অনুবাদ সংযোজন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে আচার্য রায় বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করে দিলেন, যে পৃথিবীর বৃহত্তর অংশ যেদিন অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সেদিন এই ভারতবর্ষে জ্ঞানের চর্চা এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিল। ইউরোপীয় মনীষীরাও সেদিন আচার্য রায়ের এই মহান কীর্তিকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

এই বইখানিই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। আচার্য রায় সেদিনের ভারতে না জন্মালে ভারতের রসায়ন শিল্পপ্রতিষ্ঠা কালক্রমে ঠিকই হত, বিজ্ঞান কলেজ ও কেমিক্যাল সোসাইটিও কালে প্রতিষ্ঠিত হত ঠিকই, কিন্তু Hindu Chemistry-র মত বিজ্ঞান-ইতিহাস সংকলন হত কিনা সন্দেহ! কারণ আচার্য রায়ের পর এই নিয়ে খুব বেশী আর অগ্রসর হওয়া যায়নি। আচার্য রায় যে সব সমস্যার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি, তার বেশীর ভাগ আজও অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।

জাতীয় সম্পদের মূলে বিজ্ঞানের শক্তি

॥ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ॥

বিজ্ঞান সাধনার ফলে ইয়োরোপ ও আমেরিকা আজ পৃথিবী জয় করিয়াছে। শিল্পে, বাণিজ্যে, অর্থে, স্বাস্থ্যে ও দুর্জয় ক্ষমতায় জগতের মধ্যে তাহারা আজ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিজ্ঞান অনুশীলনে একাগ্র সাধনা করিয়া তাহারা যেরূপ দ্রুত ও আশ্চর্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়। আমাদের এই দরিদ্র দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে, জাতীয় শক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞানের সাধনা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন। আজ যে ইয়োরোপ ও আমেরিকা জাতি হিসাবে সকল দিক দিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে বিজ্ঞান সাধনাই তাহার মূলে। বিজ্ঞান চর্চার ফলেই আজ আকাশের বিদ্যুৎ তাহাদের আজ্ঞাবাহিনী দাসী! জলপ্রপাতের গতি, নদ-নদীর তরঙ্গবেগ, সূর্যরশ্মির উত্তাপ, আজ তাহাদের পদানত ভৃত্য, তাহারা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সাহায্যে দূর দূরান্তের লোকের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছে। বেতারবার্তার সাহায্যে অগাধ সমুদ্রে ভাসমান তরীর সঙ্গে প্রতিক্ষণে যোগ রাখা সম্ভব হইয়াছে। উড়োজাহাজে তাহারা দেশ-দেশান্তরে ছয় মাসের পরিবর্তে আজ ছয় দিনে উত্তীর্ণ হইতেছে। রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতি বিস্ময়কর ও অদ্ভুত আবিষ্কারের দ্বারা আজ পৃথিবীর লোকের বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। বিজ্ঞান আজ ও-দেশের মানুষকে পৌরাণিক ঋষি-তপস্বী বা দেবতাদের ন্যায় প্রভূত শক্তি ও সম্পদের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে।

জাপান আজ ইয়োরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞান সাধনার বলে কত অল্পদিনের মধ্যেই না এশিয়া মহাদেশের সকল জাতি অপেক্ষা সকল দিক দিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন চীনও ক্রমশঃ এই বিজ্ঞানের শিক্ষায় দীক্ষালাভ করার ফলে জগতে অজেয় হইয়া উঠিবে। জাপানকে ইয়োরোপ ও আমেরিকা আজ সম্মান ও সম্ভ্রম দেখাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীদের সম্মান কোথাও নাই। ইয়োরোপ আমেরিকা ত দূরের কথা, তাহারা আফ্রিকা, নিউ-জিল্যাণ্ড, ফিলিপাইনেও সকলের অবজ্ঞার পাত্র। ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে মানুষের মত বাঁচিতে হইলে আমাদের সকলকে বিজ্ঞান সাধনায় একাগ্রমনে ব্রতী হইতে হইবে। যতদিন না এদেশের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন হইতেছে, ততদিন আমাদের দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য ও পরাধীনতা ঘুচিবে না।

দেশের ছেলেমেয়েরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল। তাহাদের মধ্যে যেমন স্বদেশানুরাগ উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, সেইরূপ বিজ্ঞান সাধনায় অনুরাগী হইয়া উত্তর-জীবনে যাহাতে তাহারা এই মহৎ কার্যে ব্রতী হয়, এখন হইতে তাহাদের সেইরূপ শিক্ষার দ্বারা মনোবৃত্তি গঠন করা আবশ্যক।

আজকাল দেখিতে পাই—"পুরাকালে আমাদের দেশে সমস্তই ছিল, য়ুরোপ ও আমেরিকা এখনও সেখানে পৌঁছাইতে পারে নাই"—এই বলিয়া অনেকেই ছেলেদের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু একথা কেহই তাহাদের বলেন না যে, ভারতবাসী তাহাদের সেই প্রাচীন সাধনা হইতে বিরত হওয়ার ফলেই তাহাদের আজ দুর্দশার অন্ত নাই। উচ্চ শিক্ষার নামে কেবল কতকগুলি বড় বড় বই মুখস্থ করিয়া এদেশের ছেলেরা বেকার অবস্থায় ঘরে বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছে। পূর্বপুরুষদের অধুনাবিলুপ্ত বাহাদুরীর বড়াই করিয়া, আর বেদ-বেদান্ত উপনিষদের দোহাই পাড়িয়া জাতির দুঃখ ঘুচিবে না, দারিদ্র্যও দূর হইবে না। নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকিবার জন্য একালে তাহারা কেবল মুখে বড় বড় কথা বলিতেছে, কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে কেহই অগ্রসর হইতেছে না। দুঃখে, দৈন্যে, রোগে, অনাহারে, দাসত্বের নিষ্পেষণে জর্জরিত হইয়া তাহারা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র জীবন ও ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টায় পরস্পর বিরোধ ও আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক বিজ্ঞানের সাধনায় যতদিন না তাহারা নিজেদের মিলিত শক্তি নিয়োগ করিতে শিখিবে ততদিন দেশের ও জাতির উন্নতির কোন আশা নাই।

আধুনিক বিজ্ঞান জগতে য়ুরোপ ও আমেরিকা এমন কি জাপানও অগ্রণী হইয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহারা আজ শ্রেষ্ঠ ধনী ও প্রভাবশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ও নিত্য-ব্যবহারের অসংখ্য জিনিস-পত্র ঔষধ ও প্রসাধনসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান জগতের যত শিল্প বাণিজ্য ও বিজ্ঞানবিহীন দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করিতেছে। ভারতবর্ষ তাহাদের একটি মস্ত বড় ক্রেতা। এদেশের বাজার বিদেশী জিনিসে ভরিয়া গিয়াছে। আমরা নির্বিচারে সেই সমস্ত
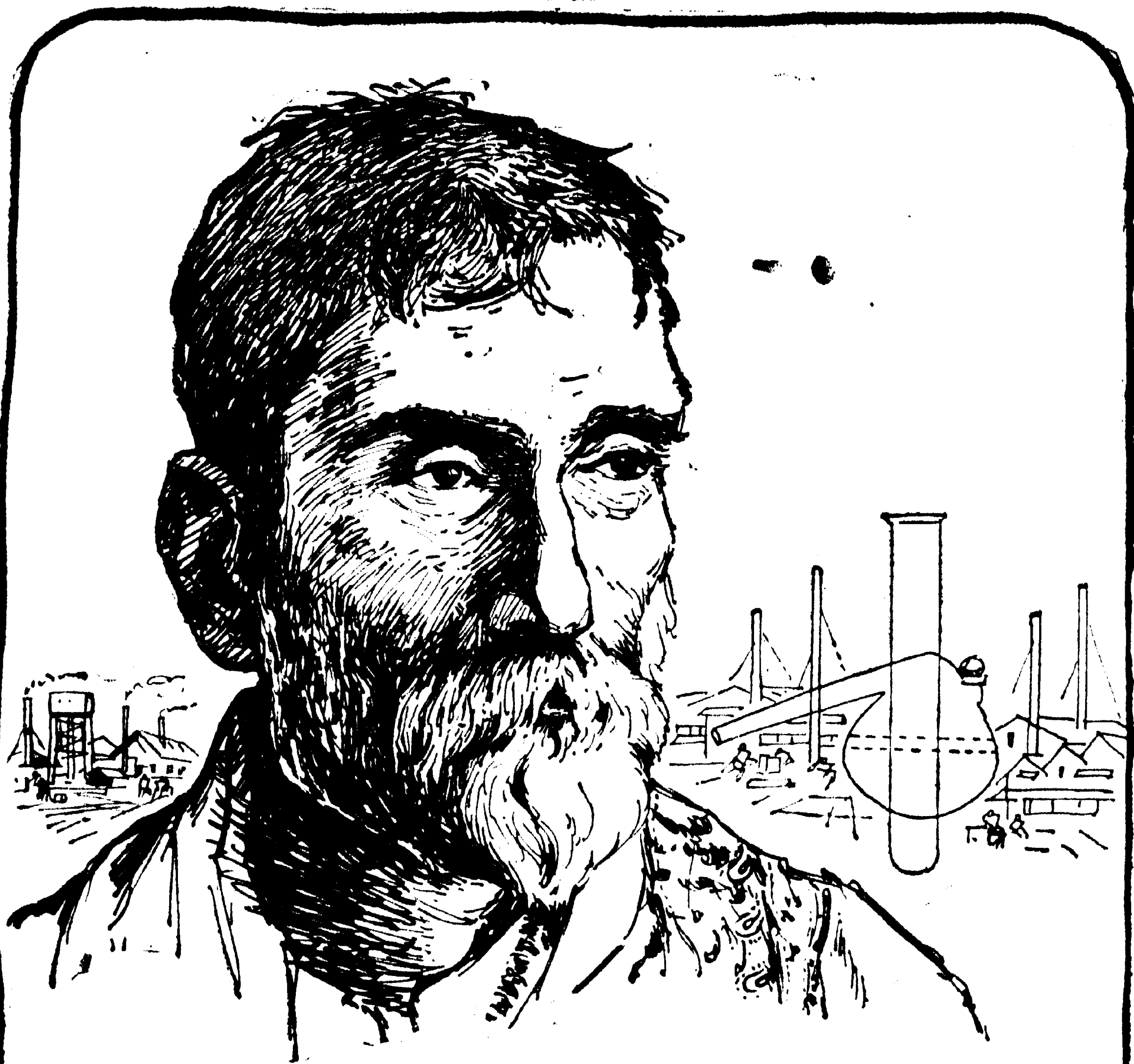
কিনি, ফলে আমাদের কষ্টার্জিত পয়সা অবাধে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা যতই ধনী হইয়া উঠিতেছে, আমরা ততই দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি।

মাত্র ষাট সত্তর বৎসরের মধ্যেই জাপান যে আজ পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইতে পারিয়াছে, সে কেবল বিজ্ঞান অনুশীলনের গুণেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা উপশাখায় জাপান যে কত রকমেই উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার সম্যক আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র ফলিত বিজ্ঞানের দুই-একটি স্থূল উদাহরণ দিলেই তাহা অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে। আজ জাপান আমাদের এই ভারতবর্ষ হইতেই প্রচুর ফেলা-ছড়ানো অকেজো লোহার টুকরো-টাকরা, কুচো লোহা, কাঁচা লোহা ও পিগ আয়রণ অত্যন্ত সস্তা দরে কিনিয়া লইয়া তাহা হইতে মজবুদ পাকা লোহা ও ইস্পাত তৈয়ারী করিতেছে। সেই ইস্পাত হইতে বিবিধ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, অস্ত্রশস্ত্র-কামান, বন্দুক, রণতরী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নিজেরা ব্যবহার করিতেছে ও দেশ-বিদেশে বিক্রয় করিয়া রাশি রাশি অর্থ উপার্জন করিতেছে। জাপান খেলনা, পুতুল, বাইসিকেল, বিবিধ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ার করিয়া শুধু যে নিজেদের অভাবই পূরণ করিতেছে তাহাই নহে, দেশ-বিদেশে চালান দিয়া পৃথিবীর বাজার হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে।

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিল রাজা রামমোহন রায়ের আমল হইতে; অর্থাৎ জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষালাভ করিবার সত্তর বৎসর পূর্বে। কিন্তু ভারতবর্ষ য়ুরোপের সাহিত্য লইয়াই ভুলিয়া রহিল ; জাপান বাছিয়া লইল—বিজ্ঞান। ফলে সত্তর বৎসরের মধ্যে জাপানে হইল নবীন সূর্যোদয়, কিন্তু দেড়শত বৎসরেও ভারতবর্ষ "যে তিমিরে সেই তিমিরে" রহিয়া গেল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে তোতাপাখীর মত মুখস্থ করিয়া কেবলমাত্র পরীক্ষায় পাশ করিবার উদ্দেশ্যে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কত হাজার হাজার ছেলে আই-এস-সি, বি-এস-সি, এম-এস-সি পাশ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন ছেলে পরবর্তী কালে বিজ্ঞান সাধনাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে?

অনেকের মুখে শুনিতে পাই অর্থের অভাবেই বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। কিন্তু একথা সত্য নয়। কত অশিক্ষিত, কপর্দকশূন্য মাড়োয়ারী, বিহারী, পাঞ্জাবী এদেশে আসিয়া দিনান্তে মাত্র একমুষ্টি ছাতু খাইয়া কত কষ্ট স্বীকার করিয়া ক্রমে বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। এদেশের ছেলেদের চাই ব্যবসায়ে সেই আগ্রহ, যাহা সকল কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিবার ও জয়ী হইবার শক্তি দিতে পারে। সুখের বিষয় যে, চাকরির অভাবে কোন কোন ছেলের মতিগতি আজকাল ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়াছে। দেশের লোকের উচিত তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া দেশীয় পণ্য গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা। বিদেশী দ্রব্যের তুলনায় নিকৃষ্ট হইলেও, বিলাসিতা ব্যাপারে ত্যাগ স্বীকার করিয়া দেশের বৃহৎ কল্যাণের মুখ চাহিয়া দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ ও পোষকতা দান করা কর্তব্য। নচেৎ কোন দিনই আমাদের শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে না, এবং আমাদের দুঃখও দূর হইবে না। পরাধীন জাতির বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে বাবুগিরি করিতে লজ্জা পাওয়া উচিত।

॥আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র॥

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে আমরা ভুলিনি। বাঙালিকে ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর তাড়না নিশ্চয়ই কেউ কেউ স্মরণ করতে পারেন, এমন কি তাঁর 'চা-পান না বিষ-পান' কথাগুলিও সকলে বিস্মৃত হন নি। কিন্তু উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি। তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী (২ আগস্ট, ১৯৬১) এই কারণেই বিশেষভাবে স্মরণীয় যে উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে "নিজে জয়কীর্তি স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে।" তিনি বলেছেন, "কাজেই ছিল আমার আনন্দ।" তাঁর এই ঘোষণার মধ্যে অত্যুক্তি নেই এতটুকু।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের চার অধ্যায়কে আমরা এইভাবে সাজাতে পারি : ছাত্র, অধ্যাপক—বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী ও সমাজ-সেবক। প্রথমটির কথা বাদ দিলে শেষ তিনটি অধ্যায়ের বিবর্তন আকস্মিক মনে হতে পারে। এবং আপাতদৃষ্টিতে যাকে আমাদের আকস্মিকতা মনে হয় প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে তার অভাব ছিল না। জনৈক য়ুরোপীয় যে তাঁকে ভাবাবেগচালিত বলে বর্ণনা করেছেন তার কারণ, অনুমান করি, এই আকস্মিকতা। প্রফুল্লচন্দ্র নিশ্চয়ই সংবেদনশীল মনের অধিকারী ছিলেন—যথার্থ মানুষ মাত্রেই তাই—কিন্তু তাঁকে শুধুই ভাবাবেগ-চালিত বলে মনে করা বৃহত্তম প্রমাদ। তাঁর মধ্যে ভাবাবেগ কোথায়? সেটা কি দেখতে পাওয়া যাবে—রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ না-করে প্রেসিডেন্সি কলেজেই জুনিয়র গ্রেড অধ্যাপকের পদে থেকে গবেষণায় আত্মনিয়োগের সংকল্পে? এ-শুধু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরিচয়। তবে কি ভাবাবেগ আছে গবেষণাগারের চার-দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এসে অকস্মাৎ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্তে? এ-শুধু বাঙালির জীবন-সাধনার একটি মারাত্মক ত্রুটি সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ আর দেশবাসীর কাছে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াস। এ-সবের মধ্যে আকস্মিকতা আছে, কিন্তু সাধারণত্বের মাপকাঠিতে মহত্ত্বের বিচার চিরকালই অচল।

বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা বলেছি। কিন্তু একদা যাঁকে ইংরাজি সাহিত্য 'যাদু করিয়াছিল' সেই প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবার পর অকস্মাৎ কি করে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তার সুস্পষ্ট হদিশ মেলে না। আর বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর এই আপাত-আকস্মিক আকর্ষণ এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে এফ-এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে তিনি শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে রসায়ন শাস্ত্রের বক্তৃতা শুনেই ক্ষান্ত থাকেন নি, ক্লাসে একস্পেরিমেন্টে অসন্তুষ্ট হয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে একটি রীতিমতো ল্যাবরেটরী পর্যন্ত স্থাপন করে ফেলেছিলেন। অতঃপর এফ-এ পাঠকালেই গোপনে গিলক্রিস্ট বৃত্তির জন্য পরীক্ষাদান এবং বিলেত গিয়ে (১৮৮২) এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এসসি উপাধি লাভ তাঁর এই বিজ্ঞান-প্রেমেরই পরিণতি।

অবশ্য বিজ্ঞান না হলেও, জ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে সহজাত ছিল তার প্রমাণ পাই যখন দেখি নিতান্ত বালকবয়সেই—কারো নির্দেশে নয়, সম্পূর্ণ নিজেরই উৎসাহে—সেক্সপীয়রের 'অজ্ঞতা হল ঈশ্বরের অভিশাপ, জ্ঞানের পাখায় চড়েই আমরা স্বর্গে পৌঁছতে পারি' লাইনটি তিনি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছেন। কী প্রবল কৌতূহলের দ্বারা তিনি যে ঐ সময়েই আক্রান্ত হয়েছিলেন তা বুঝতে পারি যখন দেখি পণ্ডিত পিতার মুখে উল্লেখ শুনে বেকনের

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

॥জীবনী পঞ্জী॥

১৮৬১ খৃঃ ২রা আগষ্ট খুলনা জেলার অন্তর্গত রাড়ুলি গ্রামে জন্ম। পিতা হরিশচন্দ্র রায়।

১৮৭০ খৃঃ কলিকাতায় আগমন। হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য স্কুল ত্যাগ—গৃহে শিক্ষারম্ভ। দু'বছর পরে আরোগ্যলাভ করে এলবার্ট স্কুলে ভর্তি হন।

১৮৭৯ খৃঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন কলেজে এফ-এ ক্লাসে ভর্তি হন।

১৮৮০ খৃঃ দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, বি এ ক্লাসে যোগদান—"গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ" বৃত্তিলাভ।

১৮৮২ খৃঃ বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলাত যাত্রা, এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বি-এস-সি ক্লাসে ভর্তি, রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি অনুরক্তি।

১৮৮৫ খৃঃ বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৮৮ খৃঃ রাসায়নিক গবেষণা কার্যে ডি-এস-সি উপাধি লাভ— এই গবেষণা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় "হোপ প্রাইজ"লাভ। এ সময়ে "India before and after Mutiny" নামক পুস্তিকা রচনা।

১৮৮৯ খৃঃ প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত, কলেজের ল্যাবরেটরিতে গবেষণা আরম্ভ—বিশেষ প্রতিবন্ধক হল কলেজ ল্যাবরেটারীর অসম্পূর্ণতা। এ সময়ে তিনি জগদীশচন্দ্রের বাসায় থাকতেন—উভয়ে বিলাতে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৮৯৩ খৃঃ প্রথম বাংলা রচনা 'সরল প্রাণি-বিজ্ঞান' (সচিত্র) প্রকাশিত।

১৮৯৫ খৃঃ স্মরণীয় বৎসর—দীর্ঘ সাধনার ফলশ্রুতি মার্কিউরাস নাইট্রেট (Mercurous Nitrate) আবিষ্কার। প্রথিতযশা রাসায়নিক-মণ্ডলী কর্তৃক এই আবিষ্কারের প্রশংসা।

১৯০৪ খৃঃ—বাঙলা সরকার কর্তৃক বিদেশে রাসায়নিক গবেষণাগার পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ।

১৯০৬ খৃঃ সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞান গবেষণা পুস্তক 'নব্যরসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' প্রকাশিত।

১৯০৮ খৃঃ—রাজসাহীর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

১৯১০ খৃঃ চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব

১৯১১ খৃঃ প্রেসিডেন্সী কলেজে রাসায়নিক বিভাগের প্রধান কানিংহামের মৃত্যুর পর প্রফুল্লচন্দ্রের ঐ পদলাভ। "নাইট" উপাধি লাভ।

১৯১২ খৃঃ— বেঙ্গল কেমিক্যাল লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়। এখন বেঙ্গল কেমিক্যাল মাণিকতলায় ১১ বিঘা জমির উপর অবস্থিত— স্থানঅভাববশতঃ ১৯১৯-২১ খৃঃ পাণিহাটিতে ১৫০ বিঘা জমির ওপর কারখানা খোলা হয়।

লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহা-(Congress of the Universities of the Empire) সম্মেলনে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও প্রফুল্লচন্দ্র উভয়ের যোগদান, ডার্হাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রফুল্লচন্দ্রকে অনারারী ডি এস-সি উপাধিদান।

১৯১৬ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ— তারপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপণা ও গবেষণা কার্য করেছেন'

১৯১৮ খৃঃ—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হয়ে বক্তৃতাদানের পরিবর্তে যে টাকা পান তা উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করেন।

১৯২০ খৃঃ "হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস" (History of Hindu Chemistry)-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়—এই কার্যে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে বার্থেলোর উৎসাহ ও সাহায্য— হিন্দু রসায়ন শাস্ত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত। এর প্রথম খণ্ডে রসায়নী বিদ্যা চার যুগে বিভাগ করা হয়েছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে (Science Congress) সভাপতিত্ব, সেই সভায় "বর্তমান ভারতে বিজ্ঞানের আবির্ভাব" বিষয়ে বক্তৃতা।

১৯২১ খৃঃ—খুলনার দুর্ভিক্ষে সাহায্য —"রিলিফ কমিটি" গঠন—যথাসাধ্য সহায়তা।

১৯২২ খৃঃ—উত্তরবঙ্গের বন্যা, প্রফুল্লচন্দ্রের "বেঙ্গল রিলিফ সোসাইটি"র সাহায্য কার্য।
—বিজ্ঞান চর্চার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ হাজার টাকা দান।

১৯২৩ খৃঃ—আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিদান-সভায় সভাপতিত্ব।

১৯২৪ খৃঃ—সিরাজগঞ্জ ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯২৬ খৃঃ—মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিদান-সভায় বক্তৃতা।

১৯৩১ খৃঃ সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩২ খৃঃ—"হিন্দু রাসায়নিকের অভিজ্ঞতা" নামক গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩৪ খৃঃ-Chemical Society of London- এর Honorary Fellow নিযুক্ত।

১৯৩৬ খৃঃ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Emeritus অধ্যাপকনিযুক্ত।

১৯৪৪ খৃঃ—১৬ই জুন কলিকাতা কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে দেহত্যাগ।

পরিশোধ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্যামল সেন

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনাথ গামছার খুঁটে চোখ দুটো মুছে নিয়ে একটু চুপ ক'রে বসেই রইল, তারপর আবার আরম্ভ করল—"সেই থেকে কলকাতার বাড়িতেও কেউ যদি এই রকম ঝড়-বাদলে এসে পড়ল, কিম্বা বারান্দাটুকুতেই উঠে দাঁড়াল তো এই রকম হ'য়ে যেতেন। অবিশ্যি য্যাখন টের পেলেন বন্ধু কী সব্বনাশটাই করেছে। মানুষটা এমনি সত্যিই সদাশিব ইন্-জিয়ারবাবু, তবে আঘাতটা তো দারুন, কালেজার মধ্যি কোথায় ঘা দিয়েছে কে জানে?

কাহিনী দিনকের দিন ধ'রে বলতে গেলে বছর কাবার হয়ে যাবে, অল্পটুকু নয় তো। সংক্ষেপেই বলি। কলকাতায় ওনাদের ভাগে খানতিনেক বাড়ি ছেল; তার দুটো ভাড়ায় খাটত, একটা খালি পড়ে থাকত—গাঁ থেকে কেউ এল-গেল তো রইল,—মামলা-মোকদ্দমা আছে, কলকাতা বেড়ানো আছে, আগে এইসব ছেলও তো। গিয়ে সবাই উঠলেন সেই বাড়িতে। সবাই মানে, সব বাদসাদ দিয়ে আমরা পাঁচজন আর কি, কত্তা, বৌ-রাণীমা, মা-মণি, আমি আর বাতাসীর মা, অধীনের পরিবার। সে বিবাহ হয়ে ইস্তক এই বাড়িতেই তো বৌ-রাণীমার খাস্ দাসী হয়েছেল। মেয়েটা অনেক-দিন আগেই যায়, দুভ্ভোগের কপাল নয় আর কি, মাগিও কলকাতায় এসে বেশিদিন টিকল না।

কলকাতায় এসে একদিন রায়মশাই আফিস ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন কত্তাকে মোটরে ক'রে। বাড়ি ছেড়ে আসায় যে খানিকটা মুসড়ে পড়েছেলেন, আফিস ঘুরে এসে আবার দুটো দিন যেন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তবে ঐ ঘুরে আসাই সার। খুব নাকি বড় আফিস—কর্মচারী-পেয়াদায় গীজগীজ করছে। তা করুক, কিন্তু এক পয়সা আয়ের সঙ্গে তো সম্পর্ক নেই। সংসার চলে, কিছু কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা এনেছিলেন, তারপর দুটো বাড়ির ভাড়া, যা এক রকম বন্ধই হয়ে গেছল। আদায় করবার লোক নেই; ইদিকে কত্তাও দেখেন না—সেই ভাড়াটা ঠিক মতন আসতে লাগল, তা বাকি-বকেয়া সমেতই। তবে মনে করেছেন কত্তা এসে পড়তে নাকি? রামঃ! কত্তা আবার সেই মেয়ের ন্যাকা-পড়া নিয়ে পড়েছেন, ঐ করতেই তো আসা। মা-মণি কালেজে যাচ্ছে, বাপে-বেটিতে বই নিয়ে রয়েছেন মেতে, চাল-ডাল-দুধ-কয়লার মতন তুশ্চু বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করতে যাবেন! যদি জিগোন তাহলে আদায়-পত্তর হ'তে লাগল কি ক'রে তো বলব এই লাঠি-টুকুর জোরে।"

অনাথ শক্ত করে পেতল-বাঁধানো লাঠিটা একবার মুঠিয়ে ধ'রে হাতটা নেড়ে দিল। একবার গোঁফ জোড়াটার ওপর দিয়ে বাঁ হাতটা বুলিয়ে এনে বলল—"এ লাঠি ঠাকুদ্দার হাতের ইন্-জিয়ারবাবু, ছেলের হাত হয়ে এখন এই নাতির হাতে উঠেছে। হাতের অবিশ্যি আর সে জোর নেই, তবে লাঠি তো অনেক দেখেছে, অনেক ফয়সালা করেছে এককালে, হক্কের ভাড়া আদায় ক'রে আনবার ক্ষ্যামতাটুকু রাখে এখনও। তা একবার শুধু শানের ওপর ঠক ঠক ক'রে দুটো ঘা দিয়ে দাঁড়ালেই হোল। মোট কথা, আফিস থেকে কিছু আসুক, না-আসুক—যা আয় তা দিয়ে তো পুঁজি বাড়ানোই হচ্ছে, কত্তা নিজে গিয়ে দেখেও তো এলেন কবার— কী জাঁকজমক আফিসের!—তা কপাট ডিঙিয়ে ইদিকে কিছু নাই আসুক, কলকাতায় দুটো বছর একরকম সুখে-স্বস্তিতেই কেটে গেল। তার কারণ, লোক তো চারটি, বাতাসীর মাও এর মধ্যে বুদ্ধি করে দুদিনের জ্বরে সরে পড়ল টুপ করে। সংসার হাল্কা, উদিকে মাসের গোড়ায় লাঠি গিয়ে হক্কের ট্যাকা আদায় করে আনছে, চলতে লাগল ভালোই। তবে আবার ঐ ভালো করে চলাই কাল্ হোল কিনা।"

"কেন?"—ঘুরে চেয়ে প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"কেন তা বুঝলেন না? কষ্টটা যদি গোড়া থেকেই হোত তো গলদটা কোথায় সেটা ধরবার একটা তাগিদ থাকত তো। দিব্যি চলে যাচ্ছে, সোতোরাং সেটুকু আর হতে পেল না।

এইবার রায়মশাইয়ের কথায় একটু আসা যাক্। কত্তা কলকাতায়, দুই

স্যাঙাতে এক শহরেই রয়েছেন, তা বলে তানার আসা-যাওয়া যে বেড়েছে কিছু—আজ্ঞে না, মোটেই নয়। এতদিন যে ছেলেন এনারা তার মধ্যে বার চারেক, কি হদ্দ পাঁচবার এসেছিলেন—ভয়ঙ্কর ব্যস্ত, এলেই দেখতুম ওপরের ছাতে গিয়ে গুজগুজ ফুসফুস কি সব হোত, আর সেই সব্বনেশে দস্তখৎ, কী সব ইস্টাম্পোর কাগজে—আমার আবার একটু আড়িপাতা রোগ আছে তো-দেখতুম।

"এ'রা কখনও ও'র বাড়ি যাননি?"—আবার ধরে প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"না ইনজিয়ারবাবু। ঐখানে কত্তার মস্ত বড় একটা অভিমান ছেল, কিছু না হোক, বংশটা তো সেই পুরনো লাহিড়ী বংশই। অত পেয়ারের স্যাঙাৎ কলকাতাতেই রয়েছে, তা একদিন এনাদের বলা, কি নেমন্তন্ন করা, কিছু নয়। এনাদের দিক থেকেও—'কোথায় থাকো, কিরম থাকো'—সে-সব কিচ্ছু নয়। এল, মা-মণিও চা তোয়ের ক'রে এক পেলেট খাবার সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা পেন্নাম করে এল, ব্যস, ঐ পর্যন্ত। বৌ-রাণীমাও সে-কেলে মানুষ; সোয়ামীর বন্ধু এল, আজকালকার মতন এসে খাতির অভ্যথ্যনা করবেন সে-দিকে কখনও যাননি, এখানে এসেও রেওয়াজ ভাঙলেন না। মোট কথা, ওরই মধ্যে একটু মেলামেশা থাকলে হয়তো গায়ের গন্ধে কখনও টের পাওয়া যেত—মানুষ নয়, আস্ত-খেকো বাঘ; স্যাঙাৎ নয়, দুশমনের ওপর দুশমন—তা সেটুকু আর হ'তে পেল না।

এইভাবে দুটো বছর কেটে গেল। মা-লক্ষ্মী এর মধ্যে আস্তে আস্তে ছেড়ে যেতে লাগলেন। মা-মণির দুটো পাশ দেওয়ার কথা আপনাকে বলেছি। একটু যে খাওয়া-দাওয়া হোল তাতে মনে করলুম গাঁয়ের পুকুর থেকেই মণ খানেক মাছ ধরিয়ে আনিগে না হয়। কত্তা বলেই খালাস, হাতের আংটি বেচে টাকাটা দিয়ে নেমন্তন্ন করে বেড়াতে লাগলেন প্রাণ খুলে, ব্যবস্থা তো এই অধীনের হাতে—তা সে অনেক দিন থেকেই এইভাবে চলে আসতেছে—মাছের ব্যবস্থাটা গাঁ থেকেই করবার জন্যে আমি শুধু বৌ-রাণীমাকে ব'লে রাতারাতি বেরিয়ে পড়লুম। সেখেনে গিয়ে দেখি, ব্যবসা বাড়ির ভেতর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। চারখানা মটোর-গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, গাড়ি না টেরাক কি বলেন আপনারা।—তার একখানা আসবাবপত্রে বোঝাই হয়ে গেছে, বাকিগুলো হচ্ছে। জনপাঁচেক লোক লেগে রয়েছে। লাঠিটা সঙ্গেই থাকে তো, লোকগুলোকে একধার থেকে পাট ক'রে ফেলতে যাচ্ছিলুম, দেখি খোদ রায়মশাই তদারক করছেন। বললেন, কত্তার মত নিয়েই সব বিক্রী হয়ে গেছে, একটা কাগজও দেখালেন পকেট থেকে বের করে। পড়তে তো জানিনে, তবে কত্তার দস্তখতের টানটা দেখা আছে—বুঝলুম এসব ওপর ঘরে গিয়ে গুজগুজ ফুসফুসের পরিণাম। আর পুকুরে মাছ ধরাবার আহিংকেটা থাকে, আপনিই বলুন না? ন্যাজ মুখে করে চলে এলুম। বৌ-রাণীমাকে আর বললুম না; এ মনের-আগুন ছড়িয়ে আর লাভ কি? এমনি তো কম জ্বালায় জ্বলছেন না। বললুম—দেখবার লোক নেই, মাছ আর বয়ে আনবার মত পাওয়া গেল না।

মাস তিনেক পরে একদিন বাজার করতে গিয়ে হঠাৎ নিতাইচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'কি নিতাই, তুমি গাঁ ছেড়ে এখানে?'...দেউড়ির দেখাশোনা নিতাই-ই করত, বললে—দেউড়ি, পুকুর, বাগান—গাঁয়ের যা কিছু সব বিক্রী হয়ে গেছে, ও কলকাতাতেই একটা চাকরি নিয়ে রয়েছে এখন।

বললুম না আর বৌ-রাণীমা কি মা-মণিকে, কত্তা কি বলুন না। কাউকেও জিগ্যেসলুম না। বিক্রীর টাকা? বললুম না বাগান-বোয়াল ব্যবসা হাঁ ক'রে রয়েছে! যেখান থেকে না আসছে, ক্ষিদে তো মেটাতে পারছে না আর। কত্তা দিব্যি আছেন। মা-মণিকে তিনটে পাশের পড়া পড়াচ্ছেন, আর কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। না, ওনার নিজেও সতীলক্ষ্মী তো টের পাচ্ছেনই ভেতরে ভেতরে যে সব ফোঁপরা হয়ে আসছে, একদিন বৌ-রাণীমা কত্তার পাতের সামনে বসে বাতাস করতে করতে বললেন—মা-মণির বিয়ের সন্ধান তো আর না করলেই নয়। কত্তা বেশ নিশ্চিন্দি হয়ে একটু হেসেই বললেন—সে ভাবনা আমার নয়, স্যাঙাতের। আমার সঙ্গে ভাগাভাগি হয়ে গেছে, আমি নিয়েছি স্বাতির এদিককার ভার, ও নিয়েছে ওদিককার ভার। বৌ-রাণীমা বললেন—'বড় ভারটাই তো নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন তিনি দয়া করে। তা কিছু সন্ধান-টন্ধান পেয়েছেন? দ্যান? জিজ্ঞেস করেছ?'

কত্তা বললেন—'এই দ্যাখো মেয়েলি বুদ্ধি! জিজ্ঞেস করতে গেলে আঘাত পাবে না মনে?'

ঐ একবার। যেন মনের গরল ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবার ভয়ে আর ওকথা তোলেননি সতীলক্ষ্মী।

এদিকে আঘাত দেওয়ার ভয়ে জড়ো-সড়ো, ঠিক এই সময় শেষ আঘাতটাই এসে পড়ল ওদিক থেকে। মাসের [illegible] তো মারমুখো হয়ে উঠল—লাঠিটা সঙ্গে নিয়ে যেতুম বলে সেতঁহের চক্ষে দেখত না তো—বলে—'ভাড়া! বাড়ি বিক্রী হয়ে যাদের ভাড়া পাওনা তারা তো নিয়ে গেছে, আবার ভাড়া কিসের? লাঠির জোর?'—সেতঁহের চোখে তো দেখত না, একরাশ শুনিয়ে বিদেয় করে দিলে।

আর তো না বললে চলে না, পেট চলবে কি করে? কত্তাকেই বললুম আগে, গোপানেই। কত্তা বললেন—'তুই খেপলি নাকি আদারে? তা আগে [illegible] আমায় একটু জিজ্ঞেস করতে হয়। তোর বৌ-রাণীমাকে আর বলে কাজ নেই কথাটা, মেয়েছেলে অতটা বোঝে না তো। বাড়ি বিক্রীই হয়ে গেছে। ব্যবসাতে হঠাৎ একটা ঘাটতি এসে পড়ে খানচাল হওয়ার জোগাড় হয়েছিল—স্যাঙাৎ কোন রকমে সামলে নিলে, দুজনে কিছু কিছু করে দিয়ে ও আবার ঠিক হয়ে যাবে'.....সুধোলুম—'তা চলবে কি করে? ভরসা তো ঐ দুটো ভাড়া।' বললেন—'মাসে মাসে কিছু ফেলে রেখে আসিসনি? এ বড় কাঁচা কাজ করেছিস বোহসেবীর মতন। জমিয়ে যেতে হয় কিছু করে, মানুষের দায় আছে, বিপদ আছে।' বললুম—'হিসেব করতে তো শিখলুম না কারুর কাছে সারা জীবনভোর, তা এখন উপায় কি?'

"কিছু বলিনি এ বাবদ ইনজিনিয়ার-বাবু, তা একটু খোঁচা যেন না দিয়ে আর পারলুম না। চুপ করে একটু ভাবলেন, একবার দিষ্টিটে হাত দুটোর ওপর গিয়ে পড়ল, আংটির খোঁজে—আর কি—সৌখিক তো মানুষ। তারপর একটু যেন উল্লাসে উঠেই বললেন—'হয়েছে রে অনাথ, টাকার জন্যে তুই ভাবিস নি। সবাইকে যদি সব কথা ভাবতেই হবে তো চলবে কি করে? টাকার জন্যে তুই ভাবিস নি, জোগাড় হয়ে যাবে।'

"আর তো রাস আলগা দেওয়া যায় না ইনজিনিয়ারবাবু এ-লোককে। এর ওপর আবার কর্জ করে বসবেন কি, কি করবেন কে জানে। বললুম—'তা জোগারটা হবে কি করে? কোনও রাস্তা তো চোখে ঠেকছে না।' .....বললেন—'ঠেকে না তোদের চোখে কিছুই। চোখ বুজে থাকবি তো কি করে ঠেকবে? শোন্, তোর বৌ-রাণীমাকে বলে কাজ নেই, মেয়েছেলে ওরা একটুতেই ভেবড়ে যায়—ব্যাঙ্কে যে গয়নাগুলো আছে তার একখানা বের করে নিয়ে আপাতত তো চলুক—স্যাঙাৎ বলেছে মাস-খানেকের ওয়াস্তা, তারপরে আবার সামলে যাবে। তুই বা, নাহক ভেবে সারা হচ্ছিস।'

এর পরই স্যাঙাতের মোক্ষম

ভাঙ্গল, তবে ত্যাখন ভাঙ্গলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি?—

পরের দিন বিকেল বেলা ব্যাংক থেকে য্যাখন ফিরে এলেন, চেহারা দেখে আর চেনা যায় না; চোখ-মুখ বসে গিয়ে সে যেন কতকালের রুগী। গয়না আমিই নিয়ে গিয়ে ট্যাকার ব্যবস্থা করব, বাঁধা দিয়েই হোক, চাই বেচেই হোক এই রকম কথা হয়েছিল; বাইরের বারান্দায় ওপিক্ষে করে বসেছিলুম, রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে চোরের মতন আস্তে আস্তে উঠে এসে চুপি চুপি বললেন,—'সব্বনাশ হয়েছে অনাথ, স্যাঙাৎ আমায় পথে বসিয়ে কোথায় সরে পড়েছে।'

ব্যাংকে গয়না গচ্ছিৎ রাখার ব্যবস্থা রায়মশাই-ই করেছিলেন, তার রসিদ, বাক্সর চাবি সব তানারই কাছে, না ডাকার অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বাসার খোঁজে গিয়ে দ্যাখেন, সে নামের গলি আছে, কিন্তু কোন বাড়ি নেই। আর নম্বরের কথা না ভেবে গলির ডাইনে-বাঁয়ে যত বাড়ি সবতেই ধাক্কা দিয়ে খোঁজ নিলেন এটা ওমুক রায়ের বাড়ি কি না। কেন হবে বলুন না? ভাবলেন বোধহয় এদানি হঠাৎ বাড়ি বদল করেছেন, গেলেন আফিসে। হলঘর-ভরা সে আফিসের কোন পাত্তাই নেই, তার জায়গায় কাটের দেয়াল দিয়ে ভাগ করা ছোট ছোট খুবরির মধ্যে চারখানা নতুন আফিস। তাদের একটাতে খবর পেলেন রায়-লাহিড়ী কোম্পানী তো অনেকদিনই দেউলিয়া হয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছে। ওরাই এই খবরটুকু দিলে, তবে রায়মশাই কোথায় থাকেন, কি করছেন সেসব কিছুই বলতে পারলে না। ছুটলেন ব্যাংকে। খবর পেলেন ওনার নামে ব্যাংকে কোন বাক্স গচ্ছিৎ ছেল না। এক-এক, ঐ নামের অমুক রায়ের নামে একটা ছেল গচ্ছিৎ, তা মাস-চারেক হোল তিনি খালাস নিয়ে গেছেন।

ভাঙ্গল স্যাঙ্গাতের মোহ। তবে, বললুম না?—ত্যাখন ভেঙ্গেই বা কি, না ভেঙ্গেই বা কি? এর ঠিক দুদিন পরে নুটিস এসে হাজির, দিন-চারেকের মধ্যে এবাড়িও খালি করে দিতে হবে। ব্যাপার কি?—না, রায়-লাহিড়ী কোম্পানীর দেনার দায়ে এবাড়ি বিক্রী হয়ে গেছে। উদিককোর কাহিনী এইখেনেই শেষ ইন্‌জিয়ারবাবু, অবিশ্যি অনেক বাদসাদ দিয়ে। দিন-কোর দিন যে কী করে কাটছেল সে তো আর বলে শেষ করা যাবে না, শুনেই বা করবেন কি? কাহিনীটে উদিককোর মোটামুটি এই।"

চুপ করল অনাথ। প্রশান্ত প্রশ্ন করল—"তারপর—এখানে আসা? অবশ্য বলতে যদি তোমার কোন বাধা না থাকে।"

কথাটা আরও এইজন্য বলল যে দেখল রায়মশাইয়ের নামটা যেন বেশ সাবধানেই এড়িয়ে গেল অনাথ, নাম-সাদৃশ্যে যাতে কত্তার পরিচয়টা বেরিয়ে না পড়ে। অনাথ আগের মতোই একটি দীর্ঘ ভূমিকা আমদানি করল— ওকে বলবে বৈকি—ওকে না বললে চলবে কেন—কর্তা যাই বলুন, ও তো বুঝছে এখন এরাই দুজন ওদের সহায়-সম্বল। ভূমিকাটুকু করে আবার হেঁট হয়ে একটু চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ মুখটা তুলে প্রশ্ন করল—"আচ্ছা, এটা কেনই বা হয়, আর কি করেই বা হয় কইতে পারেন ইন্‌জিয়ারবাবু? আপনি বিদ্বান, অনেক দেখেছেন-শুনেছেন, আপনি নিয্যস পারবেন বলতে, আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আজ পর্যন্ত তো কোন হদিস পেলুম না। কথাটা হচ্ছে, যে দোষ করলে, বন্ধুর ভেক ধরে এসে অমন করে তার সব্বনাশ করলে— সেই কোন্ কালেজের দিন থেকেই তো তোড়-জোড় করছেল— তা সে দিব্যি বুক ফুলিয়ে এই কলকাতা শহরেই বেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, হয়তো মটোর-গাড়ি হাঁকিয়েই— তার লজ্জা নেই সরম নেই, য্যাত লজ্জা-সরম এসে জড়ো হবে কত্তার মাথায়?—যে কিনা সম্পূর্ণ নির্দুষী, যে কিনা বন্ধু বলে বিশ্বাস করে সবকিছু তার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে রইল!"

চুরুট টেনে যেতে লাগল প্রশান্ত, এক সময় হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল— "ওটা আপন-আপন স্বভাবের ওপরই নির্ভর করে তো অনাথ। তবে এটুকুতে কি কোন সন্দেহ আছে যে অত চোখ-কান বুজে বিশ্বাস করে যাওয়াটাও একটা বিষম্ লজ্জার কথাই? কী মনে হয় তোমার?"

হাত দুটো একত্র করে যেমন উবু হয়ে বসেছিল অনাথ সেইভাবে চুপ করে বসেই রইল একটু, তারপর আরম্ভ করল— "নুটিসটা এল, সে সময় মা-মণি কালেজে। কত্তামশাই যেন কেমনধারা হয়ে গেছেন, ওরা চলে গেলে আমায় বললেন কথাটা যেন এখন না বলি দুজনার কাউকে, উনি একটা উপায় ঠাওরাচ্ছেন, প্রায় ঠিকই হয়ে গেছে, একেবারে পাকা করে নিয়ে ত্যাখন নিজেই প্রকাশ করবেন কথাটা। সমস্ত দিনটা এমনি গেল। ওনার চা ফুরিয়েছে, এদানি বাড়িতে দুরকম চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বৌ-রাণীমা— আমাদের তিনজনের একরকম আর ওনার একরকম— আগেকার মতনই উৎকৃষ্ট চা, মাত্র ঐ একটি শক ছেল তো জীবনে—ফুরিয়ে গেছে, সন্ধে-কালে নে'সতে যাচ্ছি বাজার থেকে, কত্তা বাইরের বারান্দায় পাইচারি করছিলেন, জিগ্যেস করলেন— 'কোথা যাস?'— শুনে বললেন,— 'থাক্ তুই আগে একটা কথা শোন অনাথ। তোকে সকালে ত্যাখন বললুম না যে কাউকে বলে কাজ নেই, একটা বিহিত করব?— তা করতুম, এমন শক্ত কিছু নয়, ভিকিরী হয়ে পড়েছি, কিন্তু মুখ্যু ভিকিরী নয় তো, কলকাতা জায়গা, পড়তা খারাপ পড়েছে— অমন বড় ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে গেল—(ত্যাখনও শাক দিয়ে মাছ ঢাকাটা একবার লক্ষ্য করে যাবেন ইনজিয়ারবাবু, কিনা বড় ব্যবসা, বরাত দোষে নষ্ট হয়ে গেছে!)—পড়তা খারাপ, কালেজে না হয় নিদেন একটা ইস্কুলেও একটা ভালো মাষ্টারি জুটে যেতোই, কিন্তু......'

"চুপ করে গেলেন। বেশ মনে আছে তো সেদিনকার কথা একটি একটি করে। বলতে বলতে খামোকা চুপ করে গেলেন। বললুম—'তাহলে তাই করুন না। চারটে পেট চলেই যাবে আপাতত, তারপর ব্যবসার দিকটা আবার সামলে গেলে—যেতেও তো পারে,— ত্যাখন আবার ছেড়ে দিলেই হবে।'

"আমিও মনে করলুম ইনজিয়ার-বাবু—কাটাঘায়ে নুনের ছিটে না দিয়ে একটু ঠান্ডা মলমই না হয় লাগিয়ে দিলুম—ব্যবসা যে কোথায় উঠেছে তা তো জানছিই। দাঁড়িয়ে পড়ে বলছিলেন, খপ করে দুহাতে আমার ডান হাতটা ধরে ফেললেন; বললেন—'বড্ড লজ্জা—বড্ড লজ্জারে অনাথ—দেশে মুখ দেখাতে না পেরে পালিয়ে এসেছি, কলকাতাতেই বা আর মুখ দেখাব কেমন ক'রে? এক কাজ কর অনাথ—সকাল হওয়ার আগেই কোথাও আমাদের লুকিয়ে ফেল—যেন-যেন......'

—আর কথা বেরোয় নি ইনজিয়ার-বাবু। কাঁদতে দেখিনি ভোলানাথকে, সতী যেতেও কাঁদেনি—ভ্যাবাচাকা মেরে গেছলেন—সেই একবার দেখলুম ইনজিয়ারবাবু— আমার হাতে মাথাটা চেপে চোখের জলে ভাসিয়ে দিলে হাত-খানা—ওফ্! ওফ্!......"

নিজেও আবার ভেঙ্গে পড়ল অনাথ।

একটু এমনিই কাটল, তারপর অস্বস্তিকর অবস্থাটা একটু কাটিয়ে দেওয়ার জন্যেই প্রশান্ত ঠাকুরকে ডেকে চা তোয়ের করে আনতে বলল। অনাথ চোখ দুটো মুছে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"আমায় আর চা দিতে মানা করে দেন ইনজিয়ারবাবু, সুদু আপনার তরেই আনুক।"

"কেন গো, একটু খেতে, ঠান্ডা রয়েছে তো। হাট সেরে এতটা যেতে হবে আবার।"

"আপনি ত্যাখন বললেন, রাদেশ্বী অমান্য করতে নাড়লুম, নৈলে চা সেই-

দিনই ছেড়ে দিয়েছি। বাড়ি থেকেই উঠে গেছে।"

"হঠাৎ ?"

"কত্তা তো আর দোকান থেকে চা আনতে যেতে দিলেন না। এইটেই নাকি বড় পেয়ারের জিনিস ছেল, বললেন— 'থাক, অনাথ, শকের আর কিই বা রাখতে পারলুম যে এইটেকেই ধ'রে রাখতে হবে? পারিস্ তো যেমন বেরিয়েছিস্, আর পাপপুরীতে না ঢুকে সিদে চলে যা বরং, দেখ যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারিস। কপালে টেঁকল না, এ যেন লুটিস পাওয়া ইস্তকই মনে হচ্ছে কার বাড়িতে রয়েছি—কার ঋণ বাড়াচ্ছি, হাঁপিয়ে উঠছি অনাথ।'

"সেই থেকে আর এক খেয়াল ঐ মাথায় ঢুকে বসল— ঋণ-ঋণ একটা আতঙ্ক। ভাবটা এই— কত জন্ম ধরে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে এয়েছি তাই এই করে সুদে-আসলে শোধ করতে হোল। তাই এবাড়িতে আসা পর্যন্ত তারিখ ধরে আমায় ভাড়া আদায় দিয়ে যাচ্ছেন—নিতেও হচ্ছে আমায় হাত পেতে, নৈলে......"

"বুঝলুম না তো।"—বাধা দিল প্রশান্ত।

"বাপ-পিতেমোর বাড়ি কোথায় কি আছে জানিওনে ইনজিয়ারবাবু। আছে কিনা, থাকলে কারা ভোগ করছে, তাও না। ক'পুরুষ ধরেই তো দেউড়িতেই মানুষ। এটুকু আমার মাতুলসম্পত্তি। মাতামো শিধর সরকার এদিককোর ডাকসাইটে জমিদার পুরুষোত্তম ঠাকুরের সর্দার-লেঠেল থাকাকালীন এইটে করেন। তা লেঠেলদের শেষ পরিণাম তো সেই এক, অত পাপ মা-ধরণী সইবে কি ক'রে? আমাদের দিকে আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি, প্রাশ্চিত্তির পুরো হবে তবে তো ছাড়পত্র পাব—আছি পিত্তিরক্ষে করে এখনও, উদিকে মাতুলবংশ একেবারে ফর্শা। এযে একেবারে ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে —অত তাড়াতাড়ি কি ব্যবস্থা হবে, হবেই বা কোত্থেকে?—সে কথাও আছে, তা ভেন্ন নিখোঁজ হয়ে অজ্ঞাতবাস করতে হয় তো এমন আরামের জায়গা তো আর ভু-ভারতে পাওয়া যাবে না—তামাম জঙ্গল, খুঁজে পেতে, ছ'সাত ঘর হেলো চাষার ঘর— পান্ডবেরা বোধহয় এইখানেই এসে কাটোছেলেন। আমি বৌ-রাণীমার কাছে একটা ছুতো ক'রে সেই রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়লুম। লোক ছেল বৈকি—চাষের মাঠ আর বাসের ঘর তো খালি থাকে না; মালিকের খোঁজ-খবর নেই, ভোগ দখল করবার লোক জুটে গেছল। লাঠিটে সঙ্গেই থাকতো—তাদেরও রাতারাতি অজ্ঞাতবাসের পথ ধরিয়ে, দোরে কুলুপ এঁটে, বনবাদাড় ভালো করে কেটে-ছেঁটে পক্কের-ঝক্কের করে তার পরদিন সন্ধ্যের একটু আগে ফিরে গেলুম আমি।

"মাথা খারাপ হয়ে গেছল বলতে হয় বৈকি, অন্তত সেদিনকার সব কথা যাখন মনে পড়ে। জিদ ধরলেন সেই রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়বেন।...... 'সে কি কত্তামশাই! সে অজ বনগাঁ—কাছেও নয়, রেতে সেখেনে কি ক'রে যাওয়া যাবে?' ......না, 'হেঁটে যাব, যাখন পোঁছুই, যাতক্ষণে পোঁছুই—দিনের আলোয় আর আমি বেরুতে পারব না অনাথ— গাঁ থেকে বেরিয়েছিলুম, একটা কথা ছেল, জমিদারি সবারই যাচ্ছে, ছেড়েছুড়ে ব্যবসা করতে যাচ্ছি; এখান থেকে আর কোন্ মুখ নিয়ে বেরুব দিনের আলো থাকতে ?'

"কোনমতেই শুনবেন না। বৌ-রাণীমা আর মা-মণি বোঝাতে এলে চটে উঠলেন—'তাহলে তোমাদের যদি এতই মায়া বসে থাকে যে দু'দন্ড কাটিয়ে যেতে পার—বেশ, তোমরা থাকো, আলোয়-আলোয়ই এসো'খন, আমায় যেতে দ্যাও।'

"বৌহসেবী বলে মুখনাড়া খেলুম, কিন্তু সত্যিই বৌহসেবী হলে কি সংসারটা চালিয়ে আনতে পারি এই ক'বছর ধ'রে? ঐ আয়ের মধ্যে থেকেও কিছু কিছু রাখলুম বাঁচিয়ে। কী আর উপায়? একটা মোটর ঠিক করে আনলুম। একটুখানি পথ নয়তো। যেখানে বড় রাস্তা থেকে আমাদের কাঁচা শড়কটা বেড়িয়েছে সে পজ্জন্ত ঠিক বিয়াল্লিশ মাইল, পাথর পোতা আছে, তায় রাত্তির বেলা। আরও একটা উপদ্রব চলছে ক'দিন থেকে, বলা নেই কওয়া নেই, বিষ্টি। অবিশ্যি সেদিনটা সমস্ত-দিন ভালোই গেছে, তবু গাঁইগুঁই করে ডেরাইভার সেদিক দিয়েও খানিকটা দর তুলে নিলে—দৈবীসৈবীর কথা তো বলা যায় না। গরজ বড় বালাই, কত্তা কোনমতেই শুনবেন না। করকরে আশিটি ট্যাকায় ফুরন হোল ইনজিয়ারবাবু। একটা বিছানার বড় মোট, দুটো ট্রাঙ্কে কাপড়-চোপড় এদিক-ওদিক যা আটল, একটা থলের মধ্যে কিছু বাসন-কোশন আর দিন-দুইয়ের মত চাল-ডাল নিয়ে বেরিয়ে পড়া ঠিক হোল। খেয়েদেয়ে। বাকি সব আমি ওনাদের বসিয়ে রেখে পরে নিয়ে যাব। অবিশ্যি খাওয়া-দাওয়ার কারুরই ইচ্ছে ছেল না, থাকতে পারে কখনও? কোন্ না ঐতেও বেশ খানিকটা রাতও হয়ে যাবে। হ'য়েও তো গেল, আর তাইতেই তো ওনার সেই কুষ্ঠির ক্যাণ্-লগ্নটুকু এসেও পড়ল।"

প্রশান্ত কৌতূহলী দৃষ্টিতে ফিরে চাইল।

"আজ্ঞে, ক্ষ্যাণ-লগ্ন ভেন্ন আর কি বলব তাকে?—গাঁয়ের বাড়িতে শত্রু ঢুকল—আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে; সেখেন থেকে বেরুলেন, আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে; সিদিন রেতেও তাই। সন্ধ্যেয় বেরিয়ে

"বড্ড লজ্জা, বড্ড লজ্জারে অনাথ......"

পড়লে পথে যা হবার হোত, এ মোটর এসে ওপিক্কে করছে, জিনিষপত্র উঠবে, হঠাৎ আকাশে গুম-গুম-গুম। ডেরাই-ভার বে'কে বসল, যাবে না। কাহিনী বাড়িয়ে লাভ নেই, এতো আর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের পালা শোনাচ্ছি না, ট্যাকাটাকে পুরোপুরি একশ' করিয়ে নিয়ে আদ্দেকটা আগাম হাতিয়ে মোটর ছেড়ে দিলে ডেরাইভার। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিষ্টি-বাদল নামল বৈকি, তা কখনও বাদ যায়? ঝড়তি-পড়তি যা হাতে ছেল, সব এই সময়টার জন্যে জুগিয়ে রেখেছিল তো দ্যাবতা, আকাশ ফুটো করে নাব্যে দিলে। বেরুনোও তাই, এখেনে এসে বাড়ি ঢুকতেও তাই। তার আর বিবরণ কেন দিতে যাই কষ্ট ক'রে?—আপনার ওপর দিয়েও তো গেল সিদিনকে। তাই বলি—ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে ভুলে যাবেন, মানুষটা কি সাধ করে ক্ষেপে ওঠে ও ধরনের বিষ্টি-বাদল দেখলে?—ভাবে আবার বুঝি কে স্যাংগাৎ হয়ে ঢুকল ঘরছাড়া করে বের করতে। দোষ দেবেন কি ক'রে?

"এর সংগে সেই ঋণ-ঋণ আতংক। সিদিন আবার একেবারেই কেমনধারা হয়ে গেছেন তো, সেই ঝড়-বিষ্টি মাথায় করে মটোর থেকে বাড়ি ঢুকতে যাব, দরজার চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।...'আবার কি হোল? ভেতরে চলুন, ভিজে যে নেয়ে গেলুম সবাই।' ......না, 'তোকে ভাড়া নিতে হবে বাড়ির।'......বুঝুন অবস্থাটা, সেই পাহাড়ে বিষ্টিতে দাঁড়িয়ে শপথ করিয়ে নিয়ে তবে বাড়ি ঢুকলেন। তারপর থেকে এই দু'বছর ধরে আমাদের এই ছেলে-ভুলুনো খেলা চলছে, আমার আর মা-মণির।"

একটু চুপ করে সেইভাবে জোড়-করা হাত দুটোয় রগ চেপে বসে রইল অনাথ। প্রশান্তও নিজের চিন্তা নিয়ে আস্তে আস্তে চুরুট টেনে যেতে লাগল।

এক সময় অনাথ আবার আরম্ভ করল—

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ছেলেভুলুনো খেলা ছাড়া আর অন্য নাম কি দেওয়া যায় একে? একদিক থেকে দেখতে গেলে মানুষটা শিশুর মতনই সরল তো। হওয়া চাই, এইটুকুই বোঝে, কোথা থেকে হচ্ছে, কি ভাবে হচ্ছে সিদিকি বিশেষ খোঁজ-খবর নেই; আপনি যা বুঝিয়ে দেবেন নিব্বিচারে বুঝে নেবে। এখানে আসতে ভগবান সেই আগের রোগটা আরও বাড়িয়ে দেওয়ায় ইদিক দিয়ে একটু সুবিধেই হোল। এখন অষ্ট-পহরই মা-মণির পড়াশোনা নিয়ে থাকেন, নিজেরও কিছু বই আছে, গাঁ থেকে আসবার সময় যে ক'খানা সংগে নিয়ে এসেছিলেন, বাকি তাবৎ লাইব্রেড়ি তো জমিদারি-বাড়ি-ঘরের সংগে ব্যবসার গব্ভে গেল—সেই ক'খানা ওলটান পালটান, কি সব হিজিবিজি নিকে খাতা বোঝাই করেন আর মা-মণিকে পড়ান, অন্যদিকে আর গা নেই। আগেই বলেছি, ভাড়ার ট্যাকা থেকে কিছু কিছু জমিয়ে এসেছিলুম। ওনাকে বলিনি, জানি মা-মণি আবার পাস দিলে ফের একটা যজ্ঞি আছে তো, আর হাতে আংটি নেই, হয়তো বাড়ি-টুকুতেই হাত পড়বে, তার চেয়ে এটা থাক। শ' পাঁচেক ট্যাকা ছেল, তাই থেকে একশ' ট্যাকা মটোর ভাড়ায় টেনে নিলে, কিছু কলকাতা থেকে মালপত্তর-গুলো এনে ফেলতেও খরচ হয়ে গেল। তেমনি আবার কিছু হাতেও এল। কলকাতায় আসবাব পত্তোর, খাট চৌকি যা ছেল, কিছু সৌখীন জিনিষ—কত্তার আর মা-মণির নেতান্ত পেয়ারের দু'-একখানা বাদ দিয়ে—সব বেচে এলুম তো—সব মিলিয়ে দু'শ তেত্রিশটে ট্যাকা আর বারো আনা আমার হাতে রইল। ট্যাকাটা ওনাকে বুঝিয়ে দিয়ে বৌ-রাণীমার হাতে দিতে গেলে কে'দে ফেললেন ইনজিয়ারবাবু, বললেন—তোর কাছেই রাখ্ অনাথ, একমুঠো করে খেতে দিস তিনজনকে।

"তা তিনজনের ভার তো বেশীদিন বইতেও দিলেন না সতীলক্ষ্মী। এখেনে আসবার পর দুটো মাসও গেল না, একদিন সোয়ামীর কোলে মাথা রেখে চক্ষু বুজলেন। ভোগা নয়, কিছু নয়, এক যদি বলেন সারা জীবনটা ধরে তবে অমন করে ভুগলেটা কে?

"সেই দু'শ তেত্রিশ ট্যাকা বারো আনা—তিনটে মানুষ—এই পোড়া পেটটাকেও তো ধরতে হয়—অনেক খেয়েছিস্ তিন পুরুষ ধ'রে, এবার বন্ধ দে বললে তো শুনবে না— তা ও'কটা ট্যাকা আর ক'দিন টেনে নিয়ে যাওয়া যায় বলুন না। মাগ্যিগণ্ডার দিন, সুবিধের মধ্যে এই যে চাইলেই যে হাতের কাছে এটা-ওটা-সেটা পাবে সে উপায় নেই, তার সংগে আরও একটা সুবিধে, কি দিয়ে ভাতের থালাটা এগিয়ে দিচ্ছে মেয়ে বাপের সামনে, কি দিয়ে নিজে গেরাস তুলছে মুখে তা খোঁজ নেওয়ার লোক নেই কাছে-পিঠে, সুবিধে অনেক অজ্ঞাতবাসে—তবু ট্যাকাটা তো ঐ। টেনে-বুনে দেড়টা বছর পজ্জন্ত কোন রকমে চালিয়ে নে' গেলুম, তারপরেই বৌ-রাণীমার গয়নায় হাত দিতে হোল তো। তাই বা ক'খানা? শখের কিছু তো আর ছেল না জীবনে—চারগাছা করে চুড়ি, একটা সোনার পাতে মোড়া শাঁখা, একটা হাল্কা চেন-হার আর একটা পাথর-বাঁধানো নাকছবি। গয়নার যা ছেল, খাস আর খানদানি—সবই তো ব্যাংকের নামে রায়-মশাইয়ের সিন্দুকে গিয়ে উঠেছে। বলতে হোল কত্তাকে। চটেই তো গেলেন —'তোরা বেহিসেবী, কাণ্ডজ্ঞান নেই, সব যদি পেটেই পুরব তো ঐ যে একটা মেয়ে রয়েছে, কিছু নয়তো দু'খানা গয়না দিয়েও তো বিদেয় করতে হবে—অনেক ভাবতে হয় মানুষকে, শুধু পেটের কথা ভাবলেই চলে?'

সমীচীন কথাই তো ইনজিয়ারবাবু, বাপের মতনই। কিন্তু সেই যে বলে গেছে, শুধু কথায় তো চি'ড়ে ভেজে না, পেট যে সব পেয়াদার বড় পেয়াদা। এক এক করে যেতে লাগল। কিন্তু দেখলেন তো ওর মধ্যে হার আর চুড়ি ক'গাছার যা একটু দম। আরও চারটে মাস কাটল কোন রকম করে, তারপর একদিনের কথা......সেদিনের কথাটা মনে পড়ে গেলে ইনজিয়ারবাবু......"

—জানলার বাইরেই দৃষ্টি ফেলে চুরুট টানার সংগে সংগে শুনে যাচ্ছিল প্রশান্ত, এবার বিরতিটা আরও দীর্ঘ হওয়ায় ঘুরে প্রশ্ন করতে গিয়ে দ্যাখে গামছার খুঁটে চোখ মুছছে অনাথ। ও তাড়াতাড়ি আবার ঘুরিয়েই নিল মুখটা। নিশ্চয় অভাবের চরমে এসে সেদিনকার এ একটা এমনই কাহিনী যা এত সহ্য-করা বুকেও দাগ কেটে ব'সে গেছে। প্রশান্ত একটু সময় দিল। তার-পর যেন হঠাৎ চকিত হয়ে উঠে বলল—"হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে অনাথ; আমি একটা অফিসের কথা মনে পড়ায় এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম।...তোমার তো দেরিও হয়ে গেল, হাট ভেংগে যাবে না যেতে যেতে?"

"আপনি ত্যাখন চুরির কথা সুধোচ্ছিলেন না? সি'দেল চোর হতে গেলুম কেন?...তা সিদিনকোর কথা না হয় নাই শুনলেন—লাভ তো নেই কিছু —মোদ্দা কথাটা এই যে বৌ-রাণীমার গয়নাগুলো যেতে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে ঐ দুধের মেয়েটাকেও বুঝি শেষ পজ্জন্ত হারাতে হয়। আমার চোখেও ধুলো দিয়ে নাগাড়ে উপোস দিয়ে যাচ্ছে, প্রেথমে একবেলা, তারপর একদিন, তারপর......থাক সে কথা। আমি যেমন কত্তাকে ভাঁওতা দিয়ে যাচ্ছি, ও-ও তেমনি দিচ্ছে আমায়—আমার কাছ থেকে শিখে নিয়ে।

চেপে ধরতে বললে—'বাবার ভাবনা নিয়ে ছিলুম অনাথকাকা, কিন্তু আর ভেবে তো কুল পাচ্ছিনে, যেতে দাও আমায় মার কাছে এবার।......একজন কমলে, হালকাও হবে আর একটু।'

ওর বয়েস এই ঠিক উনিশ বছর সাত মাস আর এই কটা দিন ইনজিয়ার-বাবু, এই তো সিদিন জন্মাল, কত নাচ গান, বাজনা-বাদ্যি হোল। তা বয়েস না হলে কি আর বুড়ো হতে নেই? কোন্

বুড়িটা ওর চেয়ে বেশি দেখেছে তা ক'ন না আমায়?

সমিস্যে নয়?—এই যদি মনের কথা হয় তো কোন্‌দিন কি ঘটিয়ে বসে কে বলতে পারে? পেটের ভাবনার ওপর এই এক নতুন সমিস্যে, কি করে যে কাটতে লাগল তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাই? সবক্ষণ চোখে চোখে রাখা, মতিগতি খারাপ, কখন্ কি ক'রে বসে। ইদিকে অষ্টপহর আগলে ব'সে থাকাও তো যায় না, অন্য ধান্দা আছে, তারপর এই সময় আবার মুশকিল হোল, কত্তাও মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাচ্ছেন—কোথায় নাকি ইস্কুল হওয়ার কথা হ'চ্ছে, কে নাকি তার ছেলেমেয়েকে মাষ্টার রেখে পড়াতে চায়—মাঝে মাঝে ভোলানাথেরও ধ্যান ভাঙ্গে তো, সেই আর কি। দুব্‌ভাবনায় কাটতে লাগল ইনজিয়ারবাবু। কিন্তু জন্মাতে দেখেছি, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করলুম—সে-মেয়ে ভাঁওতায় আমার ওপর টেক্কা দিয়ে যাবে এতো হয় না। একটা দিন ছেড়ে দিতে হোল, আবার কত্তা বাড়ি থাকলে তো হবে না। তারপর দিন বিকেলে তিনি আবার কামিজ গায়ে দিয়ে উড়ুনিটে নিয়ে বেরিয়েছেন, মা-মণি রকে মাদুর পেতে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছেল, আমি যেন বাইরে থেকে এইমাত্র এলুম এইভাবে সামনে এসে বললুম—'তাহলে এই আমিই আগে-ভাগে স'রে পড়ছি গো মা-মণি, একবার বলে যাওয়া দরকার, তাই.....'

শেষ করতেও হোল না—'কোথায় যাচ্ছ অনাথকাকা।'—বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল একেবারে।...বললুম—'যেখানে গেলে সব জ্বালা মেটে, এই তার ওষুধ'—ব'লে ডেলাটা মুখের দিকে তুলেছি, একেবারে বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, হাতটা দু'হাতে ধ'রে ফেললে। তারপর হাতটা নাকের কাছে টেনে নিয়ে—'ও কাকা, এযে আপিন।' বলে এক চিৎকার। দেউড়িতে দু'একজন বুড়ি খেত তো, জানে আপিন জিনিষটা কি।......

—আজ্ঞে না, সে মার্বেলগুলির মতন এক ডেলা, অত আপিন কোত্থেকে জোগাড় করব? খয়েরের ডেলা, হাট থেকে কিনে তার আগের দিনই একটু আপিন মিশিয়ে গন্ধটা ঠিক করে রেখেছিলুম—নেতান্ত আর ছেলেমানুষ নয় তো যে রং দেখেই ভাঁওতায় পড়ে যাবে।

দুঃখের কাহিনী, ইনজিয়ারবাবু, যেটাই শুরু করব এই রকম লম্বাই হয়ে যাবে তো। কত বলব, কতই বা শুনবেন আপনি? সংক্ষেপে—সেই সিদিন গিয়ে চুরির পরামর্শটা হোল দু'জনে মিলে..."

সমস্তটাই ক্লাইম্যাক্সের দিকে, তারপর শেষে আবার এই. ত্রস্ত কৌতূহলে মুখের দিকে চাইল প্রশান্ত, চোখ দুটো যেন ঠেলে আসছে।

একটু নড়েচড়ে বসল আবার অনাথ, বলল—মা-মণি উপোষ করে মরুক, চাই, আমি আপিন খেয়েই মরি, আসলে মরল তো যে-লোকটা বেঁচে রইল, মানে কত্তাবাবু। অনেক ভেবেচিন্তে এবার শেষে মা-মণির গয়না দু'খানায় হাত দেওয়া সাবাস্ত হোল খুড়ো-ভাইঝিতে। বুকের রক্ত ইনজিয়ারবাবু, কিন্তু উপায় তো ছেল না। গাঁয়ে কিছু ধারও হয়ে গেছে, অবিশ্যি চাল-ডালেই, সাত-আটখানা ঘর নিয়ে গরীব গাঁ, দেয়ই বা কোথা থেকে তারা?

দিতেই হয় গয়নায় হাত। কিন্তু সমিস্যে হচ্ছে এবার তো বৌ-রাণীমার মতন সহজ নয়, কথাটা পাড়া যায় কি করে কত্তার কাছে? শেষে ঐ মা-মণিই সলাটা দিলে ইনজিয়ারবাবু, বললুম না? ভোলানাথের বেটি সরস্বতী-ঠাকরুণই তো। তবে অবিশ্যি দুষ্টু-সরস্বতীর বুদ্ধি, তা দুষ্টু আর ভালো, দুজনা তো আর আলাদা নয়, যেমন প্রেয়োজন মনে করে, সাজে। বলল—'বাবাকে বলতে গেলে তো হবে না অনাথকাকা, চাকরি-চাকরি বাই রয়েছে, আর হয়তো ফিরবেনই না বাড়ি। তুমি চুরি করিয়ে দাও গয়না ক'খানা।' ......'সে কি গো! চুরি করিয়ে দ্যাও কি বলিস?' না,—'ঠিকই বলছি, চুরি হয়ে গেছে বলে সিঁদটা দেখিয়ে দিয়ে কোথাও বন্দক দিয়ে কিম্বা বেচেই নিয়ে এসো টাকাটা। বাবা বুঝতে পারবেন না অত।'......'বেশ, তুই যেন বাবার চেয়ে বুদ্ধিমান, ছেলে-ভোলানো ক'রে দিলি বুঝিয়ে তানাকে, কিন্তু সিঁদ কেটে চুরি করে আবার সোনা ফিরিয়ে দেবে এমন নিরেট বোকা চোর কোথায় পাচ্ছি আমি?...'না, তোমারও বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে কাকা। চোর ডেকে আনতে হবে কেন? নিজেই একটা সিঁদ কেটে দেখিয়ে দিলে, তারপর কাদা দিয়ে আবার জুড়ে দিলেই হবে ইট ক'খানা। শুনেছিলুম আমাদের কলেজের দারোয়ান নাকি একবার নিজের ঘরে ঐ ক'রে চুরি করে বাসন-পত্তর সরিয়ে ফেলেছিল, ভাঙ্গা বাক্স দেখিয়েছিল—মতলবটা, তাহলে কলেজ থেকে সাহায্য পাবে, মেয়েরাও চাঁদা তুলে কিছু দেবেই। তার ভুল হয়েছিল, সিঁদের ইট-সুরকি সব ভেতরের দিকেই থেকে গিয়েছিল, ঘরের মধ্যে থেকেই ব'সে ব'সে সিঁদটা কেটেছিল কিনা। তা তুমি তো আর সে-ভুলটা করতে যাচ্ছ না, বাবা সন্দেহ করতে পারবেন না একটুও।'

বললুম—'ধন্যি মা তোর কালেজ, আর ধন্যি তার দারোয়ান।'...কিন্তু উপায় তো নেই, সাতপাঁচ ভেবে হতেই হোল রাজি, বনতেই হোল চোর। খানিকটে আবার ধম্মকথাও তো শোনালে এর ওপর—তার ছেল কুমতলবে হাত নোংরা করা, আমার তো তা নয়। বুঝিয়ে তো দিলে আমায় যে আমার যে চুরি-করা তা গেরস্তর কল্যেণেই।

গয়না-গাঁটির শখে মেয়েও মার মতনটি তো একেবারে। গায়ে পাঁচখানা পাঁচ রকম থাক্ এমন খেয়ালটা তো কখনই ছেল না। গাঁয়ে থাকতে তবু হাতে রুলির সঙ্গে চারগাছা করে সোনার চুড়ি পরত, ইদিকে কালেজ ঢোকা ইস্তক সে সব গিয়ে মাত্তোর ঐ দু'গাছা করে রুলিতে দাঁড়িয়েছেল তো, আর দু'কানে দুটো দুল; কালেজে নাকি চুড়ি পরা ফ্যাশান নয়।......আজ্ঞে গয়না ছেল বইকি—সে কি কথা? অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে উদিকে বরাবরই তো হয়ে গেছে, কিন্তু সে সব তো হয়েছেল স্যাঙ্গাত-কাকার ভাগোই, মায়ের গয়নার সঙ্গে সে সবও গিয়ে মাত্তোর এই ক'খানায় ঠেকেছিল, তার মধ্যে থেকেও চারখানা চুড়ি একদিন চোরের পেটে অন্তধ্যান হোল। যদি বলেন গেল তো আটখানাই গেল না কেন তো বলি চারটে যে বাঁচল সে ঐ হতভাগা চোরের সলা-পরামর্শেই। প্যাঁটরায় আটখানাই তোলা ছেল, আমিই বললুম—একেবারে সবগুলো যাবে কেন, দু'খানা ক'রে প'রে নে, তারপর সিঁদ কাটলেই হবে।

ঘা খেয়ে খেয়ে মনটা এতই অসাড় হয়ে গেছল, এদিকে সিঁদ দেখে আর চুরির কথা শুনে খুব যে ভেঙ্গে পড়লেন কত্তা এমন নয়। বরং পাছে মা-মণি ভেঙ্গে পড়ে সেই জন্যে কি একটা সংস্কেত শোলোক আউড়ে বললেন—দুঃসময়েও ভগবান নাকি একেবারেই ভোলেন না, তাই ঐ চার-খানা প'রে নেওয়ার সুবুদ্ধিটুকু জুগিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই চোর বনবার কথা ত্যাখন বলছিলুম আপনাকে ইনজিয়ারবাবু। সেও তো অনেক দিন হয়ে গেল। তপ্ত বালিতে জলের ফোঁটা, সে কটা ট্যাকা আর কদ্দিন বলুন না। আবার তো চুরির পরামর্শ আঁটতে হবে খুড়ো-ভাইঝিতে মিলে। আর, বারে বারেই যে লোকের চোখ এড়িয়ে যাবে চোরে এই বা কে বলতে পারে? অব্যেস নেই তো, আঁৎঘাতও জানা নেই, সেবারেই গা ছমছম ক'রে ভির্মি লাগার মতন হয়ে পড়েছেল। এমনি চোখে না পড়ে গেলেও কেউ হয়তো দেখবে সিঁদ কাটতে কাটতে হাক্লান্ত হয়ে চোর অজ্ঞান অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে।"

[ক্রমশ]

সমকালীন মার্কিন কবিতা

অরুন কুমার মোদক

"বেশ কিছুদিন যাবৎ, ত্রিশ বছরেরও বেশি দিন বলা যেতে পারে, কোন তরুণ কবির এমন কোন কবিতা আপনার চোখে পড়েনি, যার মধ্যে কোথাও না কোথাও এলিয়টের দোদুল্যমান ছন্দের সুরের একটা ছোঁয়া লেগে না আছে।" কথাটা বলেছিলেন পুলিৎসার পুরস্কার পাওয়া কবি স্ট্যানলী কুনিৎস। "হার্পার্স ম্যাগাজিন" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি একথা লিখেছিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে আমেরিকার সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তার অধিকাংশগুলির সুর শ্লেষাত্মক; এগুলি বিষয়মুখী ও বক্তব্যকে অনেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছাকৃতভাবে বক্র করা হয়েছে।

এসব ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে কবিতার বহিরঙ্গ।

তার একজন সাহিত্য সমালোচক ডাডসন জেরোম "এন্টিওক রিভিউ" পত্রিকায় লিখেছিলেন : "আধুনিক কবিতা বাহ্য আড়ম্বরসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। এটা খুব দৃষ্টিকটু, তাই বেরসিকদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যুক্তিজাল বিস্তার করতে হয়েছে।"

রবার্ট লোয়েল

আধুনিক কবিতাকে সমর্থনের ব্যাপারে টি এস এলিয়টের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছে? সমালোচক হিসেবেও এলিয়ট কম লেখেন নি। তিনি লিখেছেন, "কবিতা নিয়ে একান্তে বসে যে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তারই আনুষঙ্গিক সৃষ্টি হল আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচনাটি।" ফলে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচনাটি আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা ও তার জাতি-প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত এক আলোচনা প্রবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে নিছক তত্ত্বকথা হয়ে দাঁড়ায় নি।

এলিয়ট বলেন, "কাব্যানুশীলন এখন ধর্মচর্চার রূপ গ্রহণ করেছে।"

শাপিরো

এলিয়টের গুণমুগ্ধ ভক্তগণ এই নীতির চর্চা করেছেন। বহু শিক্ষায়তনে এগুলি শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। এই তত্ত্বের কোন কোন দিক যে অনিবার্য-

রূপেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে এবং একে কেন্দ্র করে যে বড় রকমের তর্ক-যুদ্ধ ও সমালোচনার ঝড় উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর একজন পুলিৎসার পুরস্কার বিজয়ী কবি কার্ল শ্যাপিরো ১৯৬০ সালে সবচেয়ে বড় বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধে এবং তাঁর লেখা "ইন ডিফেন্স অব ইগনোরেন্স" নামক গ্রন্থে। নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর অধ্যাপক ৪৭ বছর বয়সের কবি শ্যাপিরো লিখেছিলেন :

"ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে বিপ্লব" শুরু হওয়ার আগে কবিতা-পাঠকদের ধারণা ছিল কাব্য এমন একটি কলাশিল্প যার একটা বিশেষ ধর্ম বা রূপ আছে...... কাব্য হল জাতীয় বা ব্যক্তি-সত্তারই প্রকাশ।" শ্যাপিরো বলেন যে, এলিয়টের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদের নীতি অনুসারে "কাব্যের কোন বিশেষ ধর্ম বা রূপ নেই। কাব্য এখন আর শুধু ধর্ম, দর্শন বা যুক্তিবাদের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই, এই সবকিছুকে নিয়েই এখন কাব্যের রস সৃষ্টি হয়।" বুদ্ধিজীবীর আত্মপ্রকাশের যত প্রকার ক্ষেত্র আছে সেগুলি এখন কাব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে আছে। যত তিক্তই হোক, যত ঈশ্বর-ঘেঁষাই হোক, যত পবিত্রতা বা যত গোঁড়ামিই এর মধ্যে থাক, আর স্বতঃস্ফূর্ততা, মৌলিকতা ও স্বাধীনতার প্রতি এর বিদ্বেষ যত গভীরই হোক না কেন, এলিয়টের আদর্শের মধ্যে শ্যাপিরো কাব্যের প্রতি অতিনীতিবাদীর বিদ্বেষের সমস্ত কিছু লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে আধুনিক মার্কিণ কাব্যের ওপর ডি এইচ লরেন্স, উইলিয়াম কার্লস উইলিয়ামস, ব্লেক, ওয়াল্ট হুইটম্যান এবং রোমান্টিকতাবাদী ও মানবতাবাদী অপর সকল লেখকের প্রভাব যতদূর সম্ভব সুশৃংখলার সঙ্গে দূরীভূত হয়েছে।

যে সকল মহিলা বা পুরুষ কবি এলিয়টের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাঁদের কবিতা বিশ্লেষণ করলে উপরের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হয়। সন্দেহ দেখা দিয়েছে সত্যই এগুলি কি তিক্ত, এগুলি কি খুব বেশি ঈশ্বর-ঘেঁষা হয়ে পড়েছে? অথবা এগুলি কি গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিয়েছে বা এর মধ্যে কি স্বতঃস্ফূর্ততা, মৌলিকতা ও স্বাধীনভাবের অভাব রয়েছে?

১৯৫০ সালে ফিরে যাওয়া যাক। এই সময় জন কিয়ার্ডি "মধ্য শতাব্দীর মার্কিন কবিবৃন্দ" নামক সংকলন-গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন। এই সংকলনগ্রন্থে পনরো জন কবির রচনা স্থান পেয়েছিল। এদের মধ্যে শ্যাপিরোর কবিতাও ছিল। এ'দের বিষয় লিখতে গিয়ে কিয়ার্ডি লিখেছিলেন :

"এ'রা সকলেই এলিয়টের কাব্য ও সাহিত্য সমালোচনার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, তবে একবার শোনার পর তাঁরা নিজেদের রুচি অনুসারে এগুলি গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছিলেন।" কিয়ার্ডি ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের কাব্য গতির কাব্য নয়, বরং বলা যায় বহু বৈচিত্র্য ও দুরূহতা রয়েছে এর মধ্যে। কিয়ার্ডির মতে এগুলি নীতিবিষয়ক কবিতা তো নয়ই, বরং এগুলিকে ব্যক্তিগত গুণাবধারণের কবিতা বলা যেতে পারে।

রিচার্ড এবারহার্টের মত কবির কাব্যে নিছক গোঁড়ামির পরিবর্তে রোমান্টিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ঐ পনেরো জন কবি অধুনা কি ধরণের কবিতা লিখছেন? যে তরুণদের তাঁরা শিক্ষাদান করছেন, যাঁদের সমালোচনা করছেন তাঁদের ওপর কোন্ কোন্ প্রভাব কাজ করছে? এলিয়টের আদর্শানুসারী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্যাপিরো যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তাতে তিনি ইতিমধ্যেই কিছুটা সাফল্যলাভ করেছেন বলে জাডসন জেরোম মনে করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, তৃতীয় ও চতুর্থদশকে যে বিশেষ ধরণের কবিতা রচনা করা হত অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিরা সেই ধরণের কবিতা এখন ক্রমেই কম রচনা করছেন। তাঁরা বরং অধিক পরিমাণে সেই ধরণের কবিতাই লিখছেন যা বর্ণনাত্মক, যার ভাষায় গল্প ও প্রবন্ধের মত মন্তব্যের সমাবেশ ঘটেছে। জেরোম এ'দের রচনায় স্বতঃস্ফূর্ততা, মৌলিকতা ও স্বাধীনতার অভাব দেখতে পান নি, তিনি এ'দের রচনায় দেখেছিলেন রবার্ট ফ্রস্টের নাটকীয়তা ও সাধারণ বুদ্ধির ছাপ। শ্যাপিরো কিন্তু এ'দের রচনায় পূর্বোক্ত গুণগুলির অভাব লক্ষ্য করেছিলেন এবং তা এলিয়টের প্রভাবের ফল বলে অভিহিত করেছিলেন।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। "হার্টস নীড্‌ল" নামক কাব্যগ্রন্থখানি লিখেই তরুণ কবি ডব্লিউ ডি স্নডগ্রাস ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন এবং তাঁর এই প্রথম গ্রন্থখানিই ১৯৬০ সালে পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করে। সুসংহত কল্পনা, ব্যক্তিগত ভাবাবেগের প্রাণবন্ত প্রকাশ এবং বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্ন মন্তব্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে এই কাব্যে। অন্য যে সকল কবি এলিয়টের গোঁড়ামি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন তাঁরা হলেন রবার্ট হাফ ও লুই সিম্পসন। রবার্ট হাফ কাব্য রচনায় ছন্দ ও মিলের ওপর নির্ভর করেন খুব বেশি। সিম্পসনের সবচেয়ে প্রিয় কবিতাটি তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "এ ড্রীম অব গভর্ণরস"-এর অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটি বর্ণনাত্মক। কবিতার ভাষায় বাস্তবতার ছাপ রয়েছে, সুনির্দিষ্ট বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে এতে।

রবার্ট লোয়েলের "লাইফ স্টাডিজ" নামে কাব্যগ্রন্থখানি ১৯৬০ সালে কবিতায় 'জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কার' লাভ করে। এই গ্রন্থে ব্যক্তিগত স্পর্শের ছাপ যে রকম দেখা যায়, অন্য কোথাও সে রকম দেখা যায় না। লোয়েল ১৯৪৭ সালে পুলিৎসার পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি কঠিন শব্দের প্রয়োগে যে ধরণের কবিতা পূর্বে রচনা করতেন তা ছিল দুর্বোধ্য। এখন তিনি মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের দিকে মন দিয়েছেন। এই ছন্দের আশ্রয়ে তিনি রচনা করেছেন আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচিত্র—নিজের পরিবার, মাতাপিতার কথা, এবং মানসিক অসুস্থতা থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাঁর সংগ্রামের কথা তিনি অকপটে লিখেছেন এইসব কবিতায়। এই পরিবর্তনের মধ্যে স্ট্যানলী কুনিৎস পরবর্তী দশকে কাব্যের রাজ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হবে তারই আভাস দেখতে পেয়েছেন। কুনিৎস বলেছেন যে, উপন্যাসের অনেক উপাদান যে কবিতারও উপাদান হয়ে উঠতে পারে লোয়েল তার প্রমাণ দেখিয়েছেন।

বর্তমানে অন্য যে সকল কবি কাব্য রচনা করে চলেছেন কবি ও সমালোচক জন বেরীম্যান তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁরা নতুন যুগের জন্য প্রস্তুত হয়ে চলেছেন। কার্ল শ্যাপিরো সম্পর্কেও একথা সত্য বলে তিনি মনে করেন। শ্যাপিরো সম্পর্কে বেরীম্যান লিখেছেন : "তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা এখনও লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।" যে সকল প্রভাবের ফলে মার্কিন কবিতা রূপলাভ করেছে এখন সেগুলির মূল্যাবধারণ করার সময় এসেছে।

নিষ্কৃতি

অজিত কৃষ্ণ বসু

চন্দনপুর স্টেশনে যদি কখনো নামেন, আর গেটে টিকেট কালেক্টরের হাতে আপনার টিকেটখানা সঁপে দিয়ে স্টেশন ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ান, তাহলে সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবেন প্রাণকান্ত মালাকারের হোটেল-রেস্তোরাঁ, তার সামনে একখানা সাইনবোর্ড লেখা :

পানারাম

সন্তৃপ্তিতে পান ও ভোজনের একমাত্র স্থান। ভিতরে মা-ভগিনীদের বসিয়া খাইবার সুবন্দোবস্ত আছে।

সেবক—শ্রীপ্রাণকান্ত মালাকার

চন্দনপুর স্টেশনটি ছোট হলেও বহু মানুষের যাতায়াত-ধন্য। এবং পানারামে পান ও ভোজন দুইই সত্যি সত্যি তৃপ্তিকর; কারণ প্রাণকান্ত গলাকাটা ব্যবসাদার নয়, তার নীতি হচ্ছে কত কম পয়সায় অতিথি নারায়ণদের কত বেশী ভালো আর খাঁটি জিনিস খাওয়ানো এবং পান করানো যায় সেদিকে যথাসাধ্য নজর রাখা।

"পানারাম" নামটা একটু খটকা জাগাতে পারে, তাই বলি প্রাণকান্তের দোকানটির নাম ঠিক করা হয়েছিল "প্রাণারাম"। অর্থাৎ এখানে পান ভোজনাদি করলে প্রাণে আরাম বোধ হবে। এ ছাড়া প্রাণকান্ত'র 'প্রাণ'ও রয়ে গেল নামটার ভেতর। কিন্তু চন্দনপুরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাইনবোর্ড-শিল্পী হরিচরণ—কি ছিল বিধাতার মনে!—সাইনবোর্ড লিখবার সময়ে 'প'য়ে র-ফলাটা বসাতে ভুলে গেল। সেই ভুলটা আর শোধরানো হল না। র-ফলাটা সাইনবোর্ডে থাকলেও বেশীর ভাগ মুখে অনুচ্চারিতই থাকবে, অতএব র-ফলাটা না দিলে মহাভারত বা রামায়ণ অশুদ্ধ হবে না, হরিচরণের এই যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন প্রাণকান্তর বিধবা মা হরবিলাসিনী। এবং প্রাণকান্তর মত মাতৃভক্ত ভালোমানুষ যে কোনো যুগে দুর্লভ।

প্রাণকান্ত বয়সে যুবক, চেহারায় ভালো, লম্বায় চওড়ায় আর গায়ের জোরে চন্দনপুরের চ্যাম্পিয়ন, অথচ ভারি ঠান্ডা, মিষ্টি মেজাজের মানুষ। প্রাণকান্তকে প্রাণকান্ত বানাতে ব্যাকুলচিত্ত মেয়ের অভাব ছিল না চন্দনপুরে, আর চন্দনপুরের মেয়েরা খুব পর্দানশীনও নয়। তারা অনেকে প্রাণকান্তর কাছাকাছি এসে তার সঙ্গে খাতির জমাবার জন্য মতলব করেই আসত পানারামে, আর ভেতরে যেখানে 'মা-ভগিনীদের বসিয়া খাইবার সুবন্দোবস্ত আছে' সেইখানে বসে খেতো। খেতে খেতে নানা ছলে নানা অজুহাতে প্রাণকান্তর মনোযোগ—এবং মন—আকর্ষণ করতে চেষ্টা করত। প্রাণকান্তর মনে যে দোলা একেবারেই লাগত না এমন কথা হয়তো বলা যায় না, কিন্তু কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রাণকান্তর খাতির দানা বাধবার সুযোগ পেত না—সেদিক দিয়ে প্রাণকান্তকে আগলে রাখতেন প্রাণকান্তর মা হরবিলাসিনী। তিনি জানতেন ছেলের যে বয়স, চেহারা আর স্বাস্থ্য, তাতে মেয়েদের নজর তার ওপর পড়বেই, আর ছেলেরও মন ঝুঁকবেই মেয়েদের দিকে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়লেই তাঁর একমাত্র ছেলে হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাতে তিনি রাজী নন। অথচ ছেলের বয়সের ধর্ম কাজ করবেই, ছেলে যদি সন্দেহ করে মা তাকে নিজের আওতায় রাখবার জন্যেই তাকে বিয়ে দিতে চাইছেন না, তাহলে ফল খারাপ হতে পারে, তাই হরবিলাসিনী ছেলেকে আশ্বাস দিয়ে চলেন—ছেলের যে বৌ আনবেন তিনি সে হবে এ অঞ্চলের সেরা সুন্দরী। ছেলের আশা জীইয়ে রাখবার জন্যে পাত্রীর পর পাত্রী দেখেন, শেষ পর্যন্ত কোনো পাত্রীই পছন্দ হয় না, অর্থাৎ পাত্রী যত বেশী পছন্দসই তত বেশী অপছন্দ হয়।

পানারাম-এর পসার রীতিমতো ভালো। তার একমাত্র মালিক হিসেবেও

বিয়ের বাজারে প্রাণকান্ত উঁচুদরের পাত্র। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বাবারা প্রধানত এই কারণেই প্রাণকান্ত সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। আর বিবাহার্থিনী মেয়েরা কি কারণে আগ্রহিনী ছিল সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু মেয়েদের এবং মেয়েদের বাবাদের সংগে প্রাণকান্তর সম্পর্ক মৌখিক ভদ্রতা ছাড়িয়ে কখনো অন্তরংগ-তার দিকে পা বাড়াতে পারেনি। তার কারণ সদা-হুঁসিয়ার হরবিলাসিনীর কড়া পাহারা। পানারাম-এর ঠিক পিছনেই হরবিলাসিনীর সংসার, মানে তিনি আর পুত্র প্রাণকান্ত। পানারাম-এর সব কিছু দেখা-শোনা করতেন হরবিলাসিনীই— তাঁর আড়ালে তাঁকে সবাই বলত 'জাঁদরেল মেয়েমানুষ'—প্রাণকান্ত নামে মালিক হলেও কার্যত ছিল তার মায়ের সহকারী, মা'র কথায় উঠত, মা'র কথায় বসত, কোনো একটা অতি সাধারণ ব্যাপারেও স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ক্ষমতা তার ছিল না।

হঠাৎ একদিন মারা গেলেন হরবিলাসিনী। আধা অনাথ প্রাণকান্ত পুরোপুরি অনাথ হল। খানিকটা অন্ধকার দেখল চোখে। যে সব মেয়ের এবং মেয়ের বাবার নজর ছিল প্রাণকান্তর ওপর, তাদের চিত্ত নৃত্য করে উঠল আনন্দে, এইবার প্রাণকান্তর ওপর আক্রমণ চালানো সহজ হবে। চারিদিক থেকে আক্রমণে ভারি বেকায়দায় পড়ে গেল লম্বা চওড়া পালোয়ান ভালোমানুষ প্রাণকান্ত। চারদিক থেকে বহু সাপ যেন গিলতে আসছে একটি ব্যাঙকে, সে ব্যাঙের নাম শ্রীপ্রাণকান্ত মালাকার। শেষ পর্যন্ত প্রাণকান্ত-ব্যাঙকে আত্মসাৎ করল যে সর্পিনী, তার নাম সৌদামিনী। মায়ের গংগাপ্রাপ্তির পর যে ক'টি মাস প্রাণকান্ত নিজের বুদ্ধিতে 'পানারাম' চালিয়েছিল, সেই কয়েক মাসের ভেতরেই প্রাণকান্তর ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে একজন দুজন করে এমন খদ্দেরের দল গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, যাদের নীতি "আজ বাকি, কাল নগদ"। পানারামের ভেতরে চার দেয়ালে চারটি সাইনবোর্ডে একই বচন লেখা ছিল : "আজ নগদ, কাল বাকি"। সাইনবোর্ডের এই বাণীকে খদ্দেররা যখন হরবিলাসিনীর স্বর্গবাসের সুযোগ নিয়ে বুড়ো আঙুল দেখাতে শুরু করেছিল, তখন কিছুটা চক্ষুলজ্জায় কিছুটা অন্তরের দরদে নগদের জন্য জোর করতে পারেনি প্রাণকান্ত। বিশেষ করে বিশু খুড়ো, কানাই মামা আর নকুড়দার জন্যে মনের কোণে একটু নরম জায়গা ছিল প্রাণকান্তর। এ'রা খেতে পারতেন প্রচুর, খাওয়ার শখও এ'দের প্রচন্ড, কিন্তু পকেটে ছিল পয়সার অভাব। হরবিলাসিনীর গংগাপ্রাপ্তিতে এই ভোজনবিলাসীরা খুশীই হয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন স্বাধীন প্রাণকান্তর আমলে "আজ বাকি, কাল নগদ" নীতি যতদিন খুশি অম্লানবদনে চালানো যাবে।

কিন্তু সৌদামিনী প্রাণকান্তর জীবন-সংগিনী হওয়ার পরদিন থেকেই প্রাণকান্ত আর স্বাধীন রইল না। ভালোমানুষ স্বামীকে কেউ যেন ঠকাতে না পারে এইজন্যে পানারামের হাল নিজের হাতে ধরল সৌদামিনী। ধারে খেতে এসে বিতাড়িত হলেন বিশু খুড়ো, কানাই মামা আর নকুড়দা। প্রাণকান্ত অনেক ইতস্তত করে শেষকালে সাহস জমিয়ে নিয়ে বললে "ছিঃ সৌদামিনী, এ'রা বলতে গেলে আমার পিতৃতুল্য, এ'দের—"

"গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করতে পারলে খুশী হতুম।" বলল সৌদামিনী। "তোমার মতো ভালোমানুষি চক্ষুলজ্জা থাকলে ব্যবসা তিনদিনে পাটে উঠবে। আমরা তো আর দানছত্র খুলে বসিনি।"

মৃদু প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সৌদামিনীর ধমক খেয়ে থেমে গেল প্রাণকান্ত। বৌর দাপটে ঠান্ডা হয়ে পৌরুষে একটু আঘাত লাগল বটে, তবু খানিকটা খুশীও হল প্রাণকান্ত। তার ভালোমানুষ নিরীহ মনটা একটা শক্ত আশ্রয় খুঁজছিল, সেই আশ্রয় হল শক্ত মেয়ে সৌদামিনী, হরবিলাসিনীর সুযোগ্যা পুত্রবধূ। পানারাম-এর পরিচালনা সম্বন্ধে এখন প্রাণকান্ত একেবারে নিশ্চিন্ত; এখন গায়ে ফুঁ দিয়ে সে অনায়াসে বেড়াতে পারে, পানারামের ভার দক্ষ হাতে বুঝে নিয়েছে সৌদামিনী।

শুধু শক্ত নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বলেই নয়, সৌদামিনীর মধ্যে অনির্বচনীয় মাধুর্যের স্বাদ পেয়েছিল প্রাণকান্ত, তার মনে হয়েছিল তার জীবন সুধায় ভরে দিয়েছে সৌদামিনী। সোজা ভাষায়, প্রেম করে সৌদামিনীকে বিয়ে করেনি, বিয়ে করে সৌদামিনীর প্রেমে পড়ে গেল প্রাণকান্ত। একটি মুহূর্ত যেন চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না সৌদামিনীকে। সৌদামিনী যেন বুঝতে পারে প্রাণকান্তর এই দুর্বলতা, আর বুঝতে পারে বলেই আরো বেশী করে জানে প্রাণকান্ত তার হাতের পুতুল।

কিন্তু সৌদামিনী একটু বাড়াবাড়ি শুরু করল যেন। নানা রকমের দোষ-ত্রুটির অজুহাতে পানারাম থেকে একটি একটি করে লোক ছাঁটাই করে দিয়ে তাদের জায়গায় তার বাপের বাড়ীর চেনা লোক এনে বসাতে লাগল সৌদামিনী। প্রতিবারই মৃদু আপত্তি জানাতে গিয়ে সৌদামিনীর ধমক খেয়ে থেমে যেতে হল প্রাণকান্তকে। প্রতিবারই সৌদামিনী বলল, "থামো। যা বোঝো না তা নিয়ে কথা কইতে এসো না।"

পুরোনো লোক ছাঁটাই করে নতুন লোক বসিয়ে ব্যবসায় কিছু ক্ষতি হল না, পানারামের ব্যবসা বরং ঢের বেশী বেড়ে গেল সৌদামিনীর সুদক্ষ পরিচালনায়। সুতরাং প্রাণকান্ত ভাবলে সৌদামিনী যা ভালো বোঝে তাই করুক, তার ওপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবার দরকার নেই।

এই পর্যন্ত প্রাণকান্ত আর সৌদামিনীর যুগল জীবন মোটামুটি ভালোভাবেই কাটছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

ফাটল ধরবার সূত্রপাত হল যখন সৌদামিনী জানাল বিধবা মাকে আর বড়দাকে সে কাছে এনে রাখবে। সৌদামিনী যাই করুক, সে হোল বিয়ে-করা স্ত্রী, সহধর্মিণী, যাকে বলে জীবন-সঙ্গিনী। কিন্তু বিয়ে করেছে সে শুধু সৌদামিনীকে, সৌদামিনীর স্বর্গীয় বাবার সংসারকে নয়, অতএব শাশুড়ী আর সম্বন্ধীর বোঝা সে ঘাড়ে নিতে যাবে কেন?

"বোঝা ? ? ? ? ?" ভীষণ বিস্মিত আর ব্যথিত হয়ে বলে উঠল সৌদামিনী। "ও'রা আসতে রাজী হলে জানবে আমাদের অনেক ভাগ্যি। মা আর দাদা এলে যে একেবারে সর্বদিক দিয়ে নিশ্চিন্দি। তোমার আর আমার তখন কিছুই দেখতে হবে না।" অর্থাৎ ও'রা দুজন দয়া করে এলে হাতে স্বর্গ পাবে এরা দুজন।

এলেন সৌদামিনীর বিধবা মা ভবকামিনী আর সৌদামিনীর বিপত্নীক দাদা হলধর। এ'রা দুজনে এসে ক্রমে এমনভাবে জুড়ে বসলেন যেন পানারাম-এর এরাই আসল মালিক, প্রাণকান্ত যেন পোষ্য ঘরজামাই। বড় অসহায় বোধ করতে লাগল প্রাণকান্ত। দেখলে অমন যে 'জাঁদরেল' মেয়ে সৌদামিনী সেও ভবকামিনীর দাপটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছে। নিজে যা ভালো বোঝেন তাই করেন ভবকামিনী। সৌদামিনীর কোনো কথাই টেকে না তাঁর কাছে। পানারাম পরিচালনা, টাকাকড়ির হিসাব নিকাশ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু পরামর্শ দরকার, গোপনে করেন পুত্র হলধরের সঙ্গে, কন্যা সৌদামিনীর ছেলেমানুষি বুদ্ধির ওপর তাঁর একেবারেই বিশ্বাস নেই। টাকাকড়ির হিসেবেও জামাই প্রাণকান্তকে নাক গলাতে দিলেন না শাশুড়ী ভবকামিনী। বললেন "এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কেন বাবা, আমরা থাকতে? নিশ্চিন্দি হয়ে সব ছেড়ে দাও আমাদের ওপর। তাছাড়া, হলধর আমার চৌকশ ছেলে। ওর হাতে দেখবে তোমার কেমন সব দিক দিয়ে বাড়বাড়ন্ত হয়। শুধু চুপ করে দেখে যাও তুমি, কথাটি বোলো না।"

কথা না বলে এই দুর্ভাগ্যকেই মেনে নিয়েছে মহা মনোদুঃখে প্রাণকান্ত।

সৌদামিনী খুশী। তার মা আর দাদা পাকাপোক্ত হাতে হাল ধরেছেন, আর কোনো ভাবনা নেই। মাতগর্বে আর ভ্রাতৃগর্বে তার বুক ফুলে উঠল। আর প্রাণকান্তর বুক ফুলে উঠল অসহ্য রাগে।

নিজের ঘরে নিজের দোকানে 'পরবাসী' হল প্রাণকান্ত। অবশেষে একদিন যখন জানা গেল ভগ্নিপতির ধনে পোদ্দারি করে করে হলধর মণ্ডলের প্রবীণ প্রাণে নবীন সখ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, বিপত্নীক হলধর নতুন করে সপত্নীক হবার বাসনা পোষণ করছেন এবং তারই আগাম হিসেবে চুলে কলপ লাগাচ্ছেন, তখন রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠল প্রাণকান্ত মালাকার। সে দিব্যচোখে দেখতে পেল সম্বন্ধী হলধরের দ্বিতীয় পক্ষ এসে এদের সকলের কর্ণধারণ করে সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেছেন। অথচ এ নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাচ্ছে না সৌদামিনী! মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি মেয়েটার?

কিন্তু না, মাথা খারাপ হয় নি সৌদামিনীর। মরিয়া হয়ে নিভৃতে ডেকে সৌদামিনীকে মনের কথা বোঝাতে গিয়েই প্রাণকান্ত টের পেল মাকে আর দাদাকে এনে গদিতে বসিয়ে তার ফল দেখে নিজেই ভেতরে ভেতরে আফশোস করে মরছে সৌদামিনী।

সৌদামিনীও অস্বস্তি বোধ করছে জেনে একটু আশ্বস্ত বোধ করে প্রাণকান্ত বলল, "তাহলে ও'দের এবার আপন ঘরে ফিরে যেতে বলে দাও না। মাসে মাসে বরং কিছু টাকা পাঠিয়ে দেওয়া যাবে'খন। ঘাড়ের ওপর এ অত্যাচার আর সইছে না।"

সৌদামিনী জিভ কেটে বললে, "ওমা, অমন কথা কি আপন মাকে আর মায়ের পেটের দাদাকে মুখ ফুটে বলতে পারি আমি? তোমার বাড়ী-ঘর তোমার দোকান-ব্যবসা, তুমিই বলো না বলবার।"

প্রাণকান্ত বললে, "কিন্তু জামাই হয়ে কি করে অমন কথা বলি?"

ভগবান প্রাণকান্তকে যেমন বিরাট দেহ দিয়েছেন, চক্ষুলজ্জা দিয়েছেন তার চাইতেও বিরাট। তাই প্রাণকান্ত ভাবলে মুখ ফুটে সে কিছুতেই এ'দের বিদায় নিতে বলতে পারবে না, সুতরাং এ'দের যন্ত্রণা থেকে তার বুঝি আর নিষ্কৃতি নেই। গভীর হতাশায় আর মনের জ্বালায় দিন আর রাত কাটাতে লাগল প্রাণকান্ত মালাকার।

পানারামের প্রায় লাগোয়া "চন্দনপুর টকীজ" ছবিঘর। সেখানে তিন রাত যাদুর খেলা আর সম্মোহন বিদ্যা প্রদর্শন করবেন যাদুকর "এমরে"। পোস্টারে পোস্টারে চেহারার বাহার বাড়ল অনেক দেয়ালের আর ল্যাম্প-পোস্টের, তাছাড়া হ্যাণ্ডবিলও বিলি করা হল অনেক। কৌতূহলের শিহরণ জাগল সারা চন্দনপুরে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর 'এমরে'-র অলৌকিক যাদু এবং সম্মোহন লীলা

না দেখলে জীবনটাই ব্যর্থ হবে, এই ধরনের একটা ধারণা চালু হয়ে গেল বিভিন্ন বয়সের অনেক চিত্তে।

এই অনেক চিত্তের একটি চিত্ত প্রাণকান্ত-শাশুড়ী ভবকামিনীর। "জামাই, চলো একদিন যাদুবিদ্যে আর মোহনবিদ্যে দেখে আসি।" বললেন তিনি প্রাণকান্তকে। "হলধর বলছিল এমনটি নাকি আর কখনো দেখা যায়নি।"

প্রাণকান্তর বোধ করি তেমন ইচ্ছে ছিল না, তবু শাশুড়ীর জোরালো ইচ্ছায় অর্থাৎ হুকুমে রাজী হতেই হল তাকে। একদিন—যেদিন "অদ্যই শেষ রজনী"—সন্ধ্যাবেলা "চন্দনপুর টকীজ" ছবিঘরের একেবারে পয়লা সারিতে গিয়ে যাদুবিদ্যে আর মোহনবিদ্যে দেখবেন বলে বসলেন ভবকামিনী, জামাই প্রাণকান্ত আর মেয়ে সৌদামিনীকে নিয়ে। হলধর তখন পানারামের গদিতে বসে—যাদুকর "এমরে"র কেরামতি তিনি দেখে গেছেন প্রথম রজনীতেই।

হরেক রকম তাক-লাগানো যাদুর খেলা দেখালেন যাদুকর 'এমরে'—সুন্দরী তরুণীকে করাত দিয়ে কেটে দু-টুকরো করে আবার জুড়ে দেওয়া, সুন্দরীকে সম্মোহিত করে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা ইত্যাদি দেখে ভবকামিনী বিস্ময়ে সবাক।

এর পর 'এমরে' শুরু করলেন তাঁর অত্যাশ্চর্য সম্মোহন বিদ্যার খেলা। দর্শকদের ভেতর থেকে কচি, মাঝারি, ঝুনো নানা বয়সের নানা ধরনের মানুষকে স্টেজে ডেকে নিয়ে সম্মোহিত করে তাদের নানা রকমে নাচালেন, ওঠালেন, বসালেন, হাসালেন, কাঁদালেন, নানা ভঙ্গীতে অভিনয় করালেন, নানা-রকম জানোয়ারের ডাক ডাকালেন, আরো এমনি সব অদ্ভুত কান্ড করালেন যাতে হলসুদ্ধ সবাই মজা আর বিস্ময় দুইই উপভোগ করল।

শেষের দিকে প্রাণকান্তর সামনে এসে যাদুকর 'এমরে' বললেন, "আপনি একবার দয়া করে স্টেজে আসবেন কি?"

আগেই বলেছি প্রাণকান্ত মহা পালোয়ান হলে হবে কি, তেমনি মহা লাজুকও বটে। স্টেজে উঠে এতগুলো লোকের মুখোমুখি দাঁড়াতে রাজী নয় সে। মাথা নেড়ে জানাল "আজ্ঞে না।"

কিন্তু শাশুড়ী ভবকামিনী নাছোড়-বান্দা। বললেন, "ছি ছি, ভয় পাচ্ছ, কেন? দেখো, তোমায় ও কিছু করতে পারবে না। যাও, মেয়েমানষি কোরো না।"

হঠাৎ যেন কি ভেবে শাশুড়ীর আদেশ শিরোধার্য করে স্টেজে উঠে গেল প্রাণকান্ত। পালোয়ানী চেহারার প্রাণকান্ত গিয়ে দাঁড়াল রোগা যাদুকর 'এমরে'র মুখোমুখি। জামাতা-গর্বে মুখে হাসি ফুটে উঠল ভবকামিনীর। "জামায়ের সামনে কতটুকু দেখাচ্ছে ঐ যাদুওয়ালাকে। দেখলি সদু? দেখবি জামাইকে কিচ্ছু করতে পারবে না ও।"

'এমরে' বললেন, "বসুন।" সঙ্গে সঙ্গে স্টেজের ওপর একটা চেয়ারে বসে পড়ল প্রাণকান্ত। প্রাণকান্তকে ঘিরে তার গা ঘেঁষে নানা কায়দায় হাওয়ায় হাত বুলোতে লাগলেন যাদুকর সম্মোহনবিশারদ 'এমরে' বলতে লাগলেন, "ঘুম—ঘুম—ঘুম নেমে আসছে আপনার চোখে। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন—আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।......"

"একি হলো সদু? জামাই সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল যে।" ভীষণ ভাবিত হয়ে উঠলেন ভবকামিনী। দেখা গেল স্টেজের ওপর চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রাণকান্ত, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে।

'এমরে'-র সম্মোহনী আদেশে প্রাণকান্ত সেই সম্মোহিত অচেতন অবস্থায় নানা রকম অদ্ভুত কান্ড করে দেখাল, মায় দেবাদিদেব মহাদেবের প্রলয় নৃত্য পর্যন্ত। প্রাণকান্তর প্রলয়-নৃত্যে স্টেজ কেঁপে উঠতে লাগল, আর তার ভীমকণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল "ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম।" কান্ড দেখে হলসুদ্ধ সবাই স্তম্ভিত। পালোয়ান প্রাণকান্তকে ক্ষীণকায় যাদুকর অমন অবলীলাক্রমে সম্মোহিত করে এমন সব কান্ড করাতে পারবেন, একথা চন্দনপুরে কে কল্পনা করতে পেরেছিল? 'এমরে'-র অত্যাশ্চর্য সম্মোহন শক্তির এই অসামান্য প্রমাণ পেয়ে হল-সুদ্ধ সবাই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ।

কিন্তু ভীষণ মুশকিল বাধল এর পর। সম্মোহনের যে যাদু প্রাণকান্তর ওপর চালিয়েছিলেন 'এমরে', সেই যাদু আর কিছুতেই তিনি ছাড়াতে পারলেন না। এর আগে যাদের সম্মোহিত করেছিলেন তাদের সম্মোহনমুক্ত করতে তাঁকে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি, চোখের সামনে বার কয়েক হাততালি দিয়ে তাঁদের যেমনি জেগে উঠতে বলেছেন অমনি তাঁরা জেগে উঠেছেন। কিন্তু প্রাণকান্তর চোখের সামনে হাত-তালি দিতে দিতে আর "আপনি জেগে উঠছেন—জেগে উঠছেন—জেগে উঠেছেন" বলতে বলতে তিনি হয়রান হয়ে উঠলেন, তবু প্রাণকান্ত জেগে উঠল না। শেষ পর্যন্ত আধবোজা চোখে ঘুমের ঘোরে অচেতন মানুষ যেমন করে হাঁটে, সেই ভাবে এগিয়ে চলল স্টেজ ছেড়ে। ভয় পেয়ে তাকে থামাতে গিয়ে তার হাতের এক মৃদু ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন যাদুকর 'এমরে'। পড়েই আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন "আপনারা ধরে রাখুন ওকে। নইলে ভয়ানক একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। এখনো ওঁর জ্ঞান হয়নি, সম্মোহন ছোটেনি এখনো।"

প্রাণকান্তকে থামাতে গেলেন তারিণী তরফদার। তিনি এককালে কুস্তি-টুস্তি লড়তেন, এখনও মাঝে মাঝে ডন বৈঠক করেন। তিনিও প্রাণ-কান্তর বাঁহাতের ঠেলা সামলাতে পারলেন না। দু-চারজন নওজোয়ান এক-সঙ্গে প্রাণকান্তকে রুখতে গিয়ে ধাক্কা
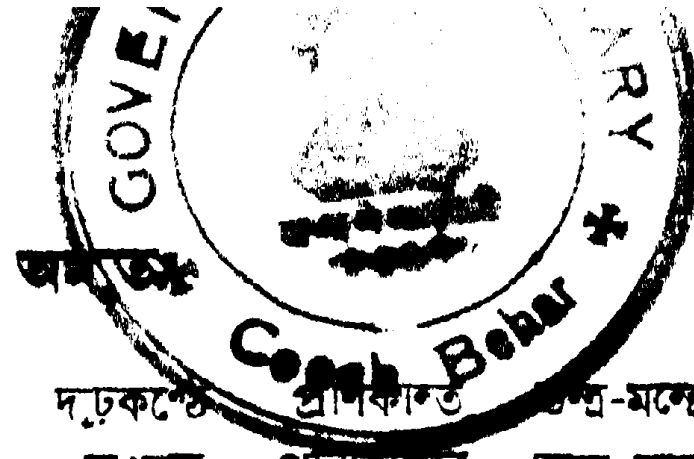
খেয়ে নিরস্ত হল। তারপর কেউ আর প্রাণকান্তর রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়াতে সাহস পেলো না।

ভীতা চকিতা সৌদামিনী আর ভবকামিনীও প্রাণকান্তর পিছনে পিছনে যেতে যেতে ভাবনায় অস্থির। তখনো সম্মোহিত প্রাণকান্ত যেন স্বপ্নের ঘোরেই এগিয়ে চলল অদূরবর্তী "পানারাম"এর দিকে। পানারামে প্রাণের আনন্দে পানাহারে মত্ত ছিল পানারামের অনেক বাঁধা খদ্দের আর নতুন খদ্দের। তারা প্রাণকান্তকে ঐভাবে ঢুলু ঢুলু চোখে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল। নেশা করেছে নাকি প্রাণকান্ত মালাকার? কি আশ্চর্য! নেশা করবার লোক তো নয় প্রাণকান্ত। একজন বললে, "নেশা নয়, হিপনোটিজম, যাকে বলে সম্মোহন। এমন মন্তর লেগেছে এখনো তার ঘোর কাটেনি। দেখছ না চোখ দুটি আধখোলা ঢুলু ঢুলু?"

প্রাণকান্ত সোজা চলে গেল যেখানে বসেছিলেন তার প্রবীণ সম্বন্ধী হলধর মণ্ডল; বসে 'ক্যাশ' মেলাচ্ছিলেন বোধ হয়। দেখলে মনে হয় পানারামের তিনিই মালিক। প্রাণকান্তকে অমন অভাবনীয় অদ্ভুত ভংগীতে এগিয়ে আসতে দেখে হলধর মণ্ডল বললেন, "ব্যাপার কি পরাণকান্ত?"

প্রাণকান্ত এগিয়ে এসে বাঁ-হাতে তার ঘাড় চেপে ধরলে, তারপর তাঁকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে রাস্তার দিকে নিয়ে যেতে লাগল। এতগুলো পানাহার-রত খদ্দেরের সামনে এভাবে নাকাল হয়ে হলধর মণ্ডল বললেন "আহা হা, কর কি, কর কি পরাণকান্ত?"

বাঁ-হাতের এক ধাক্কায় হলধরকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে সম্মোহিত প্রাণকান্ত ধীরকণ্ঠে বলল, "ফের যদি পানারামের চৌকাঠ মাড়াতে দেখি তো তুলে আছাড় মারব।"

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে হলধর মণ্ডল বললেন, "এর মা—মা মানে কি প—প পরাণকান্ত?" এমনিতে তোৎলান না হলধর; তাঁর এই তোৎলামির কারণ অপমান, ক্রোধ আর বিস্ময়ের সম্মিলিত উত্তেজনা।

বাঁ-হাতে হলধরের ঘাড় ধরে আবার একটি প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে তেমনি ঢুলু ঢুলু চোখে অপলকনয়নে ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে প্রাণকান্ত বললে "আবার কখনো পানারামের চৌকাঠ মাড়ালেই মানেটা একেবারে হাতে কলমে টের পাবে। কীচক বধ করে ছাড়ব।" বলে ঘাড়ে বাঁ-হাতের আংগুলের চাপ দিতেই বিষম চীৎকার দিয়ে হলধর মণ্ডল আর্তনাদ করে উঠলেন "ছা - ছা - ছাড় প - প - পরাণকান্ত। লা - লা - লাগে যে।"

ছেড়ে দিল প্রাণকান্ত। পাকা দাড়িওয়ালা বেচারাম চাটুজ্যে বললেন "এ-সব তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যাপার বড় ভয়ানক, যাকে বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। প্রাণকান্ত কি আর প্রাণকান্ততে আছে, যে তোমায় সম্বন্ধী বলে চিনতে পারবে? মন্তরের মেয়াদ যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ প্রাণকান্ত একেবারে আলাদা মানুষ।"

কিন্তু এভাবে বলতে গেলে গল্প অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তাই সংক্ষেপে বলি সে রাতে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হল হলধর মন্ডলকে। তাঁকে বাড়ীতে ঠাঁই দিতে কিছুতেই রাজি হলো না

সম্মোহিত প্রাণকান্ত। ভবকামিনীকেও সে কিছুতেই চিনতে পারল না শাশুড়ী বলে, আর রাজিও হলো না এই 'অপরিচিতা' বৃদ্ধাকে ঘরে ঠাঁই দিতে। ভবকামিনী যতই বলেন "হ্যাঁ বাবা প্রাণকান্ত, আমি যে তোমার শাশুড়ী বাবা। চিনতে পারছ না আমাকে?" প্রাণকান্ত ততই তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে "হুঃ। শাশুড়ী না হাতী। বলে, জন্ম বয়সে কখনো চেহারাই দেখলুম না, উনি হলেন আমার শাশুড়ী!"

ভবকামিনী বলেন "একে চেনো তো বাবা? সৌদামিনী, তোমার বিয়ে করা বৌ, আমার মেয়ে। আমি ওর গর্ভ-ধারিণী মা।"

ঢুলু-ঢুলু আধ-বোজা চোখে যেন আধ স্বপ্নের ঘোরে প্রাণকান্ত বসে "তার প্রমাণ? প্রমাণ ছাড়া আমি কোনো কথা বিশ্বাস করিনে।"

ভবকামিনী ঐকান্তিক অনুরোধে সৌদামিনী তাঁর স্বপক্ষে সাক্ষী দিতে গিয়ে প্রাণকান্তর ধমক খেয়ে থেমে গেল। "আমার কথার ওপর যে কথা কইবে বা আমার কথার অবাধ্য যে হবে, তার টুঁটি চেপে মেরে ফেলব।" বলল সম্মোহিত প্রাণকান্ত। এ যেন প্রাণকান্ত নয়, সম্পূর্ণ আলাদা এক মানুষ। আলাদাই বটে, নইলে একটু পরেই হঠাৎ আবার ব্যোম ব্যোম ধ্বনিতে মেতে উঠল কেন?

স্বামীর অবস্থা দেখে বিষম ভয় পেয়ে যাদুকর 'এমরে'-কে এক রকম পাকড়াও করেই আনাল সৌদামিনী। 'এমরে' এলেন, বাধ্য হয়েই—ভীত, চিন্তিত, পরম উদ্বিগ্ন। স্টেজে অনেক 'হিপনোটিজম' করেছেন তিনি, কিন্তু এমন তাজ্জব ব্যাপার তাঁর জীবনে কখনো ঘটে নি। এমন ভীষণ সাফল্য আর কখনো হয় নি তাঁর।

সম্মোহিত প্রাণকান্তকে নিভৃতে পরীক্ষা করলেন সম্মোহন-বিশারদ যাদুকর 'এমরে'। মুখের সামনে হাওয়ায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কি যেন কথা-বার্তাও কইলেন তার সংগে। তারপর ফিরে এসে গম্ভীর মুখে বললেন "কিছু করতে পারলুম না। বশীকরণের একেবারে ব্রহ্মাস্ত্রটি ছেড়েছি। ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। ওঁর শরীর অমন তাগড়া দেখে মনটা যে অত নরম তা বুঝতে পারি নি।"

"তা'হলে উপায়??" সৌদামিনী আর ভবকামিনীর প্রশ্ন।

যাদুকর 'এমরে' বললেন "দিন-তিনেক উনি এই ভাবেই থাকবেন। আপনারা ওঁর মত মতো চলবেন কোনো-রকমেই ওঁকে এতটুকু উত্তেজিত করবেন না। ক্ষেপে গেলে উনি খুনও করে ফেলতে পারেন।"

"তিনটে দিন ঠিকমত সামলে রাখলেই হবে তো বাবা?" ভবকামিনীর প্রশ্ন। "তারপরই আবার প্রাণকান্তকে ঠিক আগের মতোই ফিরে পাবো তো?"

সম্মোহন-বিশারদ 'এমরে' বললেন, "না-মা, সে হতে পুরো একটি বছর। এই এক বছর মেয়াদের ভেতর উনি যে কোনো মুহূর্তে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ এই মূর্তি—এমন কি এর চেয়েও সাংঘাতিক মূর্তি ধারণ করে বসে খুন-খারাবিও করে ফেলতে পারেন, যদি কোনো কারণে মন এতটুকু উত্তেজিত হয়।"

পাশে দাড়িওয়ালা বেচারাম চাটুজ্যেও এসে হাজির হয়েছিলেন সম্মোহন-বিশারদ যাদুকর 'এমরে'কে দেখে। তিনি বললেন "অনেকটা মৃগী ব্যামোর মতো আর কি। এই দিব্যি ভালো মানুষ, বাইরে থেকে কিছু বুঝবার জো নেই, হঠাৎ ধপাস্ করে পড়ে ভিরমি যাওয়া শুরু হয়ে গেল। চব্বিশ ঘন্টা হুঁশিয়ার থাকতে হয়।"

গল্পের বাকি অংশটুকু আরো সংক্ষেপে বলি। এই এক বছর মেয়াদের ভেতর প্রাণকান্তর নাগালের ভেতর না থাকাই পৈতৃক প্রাণটির পক্ষে নিরাপদ মনে হল হলধর মন্ডলের আর ভবকামিনীর। জামাই প্রাণকান্ত এম্নিতে তো ভালোমানুষ, কিন্তু ঐ সর্বনেশে বশীকরণ মন্তরটা যখন ওর ওপর ভর করবে তখন তো আর প্রাণকান্ত প্রাণ-কান্ত থাকবে না। প্রাণকান্তর ঐ আলাদা রূপের স্বাদ আর পেতে চান না হলধর।

অতএব অন্তত বছর খানেকের জন্যে পানারামের মায়া কাটিয়ে মাকে নিয়ে পৈত্রিক ভিটায় ফিরে গেলেন হলধর মন্ডল। এক বছর বাদে বশীকরণের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে আবার পানারামে চলে আসবার কথা ভাবা যাবে।

আর প্রাণকান্ত ভাবল, "বছর-খানেকের জন্যে তো নিশ্চিন্দি। তার-পরের কথা পরেই ভাবা যাবে'খন।"

"জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে" চন্দনপুরে টকীজএ যাদুকর 'এমরে'র অতুলনীয় যাদু ও সম্মোহন বিদ্যার প্রদর্শনীর মেয়াদ এক সপ্তাহ বাড়াতে হল।

যাদুকরের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে চন্দনপুরের প্রবীণ নাগরিক বেচারাম চাটুজ্যে তাঁকে একটি সোনার মেডেল উপহার দিলেন। তার পুরো খরচা যোগাল প্রাণকান্ত মালাকার।

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

'ক্রন্দসী' মানে কি?

'প্রদোষ' ও 'প্রত্যূষ'-এর মধ্যে তফাত কোথায়?

শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিকে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' পাঠ লিখি, মহিলাদের ক্ষেত্রে কি পাঠ লিখব?

স্নেহের পাত্রকে কি জানাই? 'আশীষ' না 'আশিস'?

'বহুব্রীহি' তো একটি সমাসের নাম। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কি?

'কেতকা' কোন্ দেবতার নাম?

'মামদো' কোন্ জাতের ভূত?

'শিঙাড়া' কোথা থেকে এল?

পিতার কাছ থেকে যে সম্পত্তি পাই সেটা 'পৈতৃক' না 'পৈত্রিক'?

'পেঁপে' ও 'পেয়ারা' কোন্ দেশের শব্দ?

'অপরাহ্ণ' না 'অপরাহ্ন'? 'সায়াহ্ণ' না 'সায়াহ্ন'? 'আহ্ণিক' না 'আহ্নিক?' —কোন্ বানান শুদ্ধ?

'বৃংহিত' কোন্ জন্তুর ডাক?

'বৃষভানু' কার পিতা?

'বৃহন্নলা' কার নাম?

'বেঙ্গমা বেঙ্গমী' কী পাখি?

'পঞ্চবাণ' কি কি?

'বেত্রবতী' কোথায়?

'বেপথু'র কি অর্থ?

'বেদ' ও 'বেদান্ত'—এ দুয়ের মধ্যে তফাত কি?

'বৈদূর্য' কিসের নাম?

'মলম্বা-অম্বর' মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শব্দ কোথায় ব্যবহার করেছেন এবং কি অর্থে?

'মর্তমান' কোথা থেকে এল?

'ময়না তদন্ত'—এর 'ময়না' শব্দ কোন্ দেশী? এর অর্থ কি?

'হাসনুহানা' কোন্ ভাষার কথা? কোন্ ফুলের নাম?

'হিজরী' সাল কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে?

'কুটজ' কি ফুল?

'কীচক' কার শ্যালক?

'রংগ' 'রঙ্গ'—কোন্‌টা শুদ্ধ?

'নীপবন' কিসের বন?

'কুঁড়াজালি' কিসের জাল?

'কুনকী' কোন্ জাতীয় হাতি?

'কুপোকাত'—এর আসল মানে কি?

'অজাতশত্রু' কার নাম?

'অজাতশ্মশ্রু' মানে কি?

লিখতে লিখতে পড়তে পড়তে এই রকম নানা প্রশ্ন মনে জাগে। হয়তো তার অনেক উত্তর জানা কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে না। বলে দিলে মনে পড়ে।

আসল কথা চর্চা নেই। আলোচনা করলে শক্ত জিনিসও মনে থেকে যায়। আলোচনার অভাবে সহজ কথাও ভুলে বসি।

অনেক ভুল বানান, ভুল অর্থ, ভুল উচ্চারণ আমরা মনে মনে পোষণ করি—নির্ভুল এই ধারণা নিয়েই। এক এক দিন তাই নিয়ে লজ্জা পেতে হয়। একবার ঠকলে বা ঠেকলে আর ভুল হয় না। না ঠেকেও শেখা যায়। একদিন দুটি ছেলে গিয়ে অধ্যাপককে জিগেস করছে, "সার, ফাইললজির ক্লাসটা কত নম্বর ঘরে হবে?" অধ্যাপক জবাব দিলেন, "ফাইলসফি যে ঘরে হচ্ছে তারই পাশে।"

যে ছাত্র প্রশ্ন করেছিল সে ঠকে শিখল। সঙ্গে যারা ছিল তারাও শিখল, শুনেই শিখল ঠকে বা ঠেকে নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে এদের কেউ সারা জীবনে ফিললজি (Philology)-কে ফাইললজি বলবে না।

শব্দকল্পদ্রুমের তলায় প্রতি সপ্তাহে আসর বসবে—না ঠেকে শেখার আসর। এ সপ্তাহের প্রসঙ্গ 'কথার মানে'।

প্রথম আসর

কথার মানে

[দশ-টি শব্দ দেওয়া হল। প্রত্যেক শব্দের পাশে কয়েকটি করে অর্থ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটিমাত্র অর্থ ঠিক। আপনি যেটি ঠিক বলে মনে করছেন সেটি দাগ দিয়ে কিংবা একটি কাগজে লিখে রাখুন। উত্তর অন্যত্র আছে। সবগুলি শেষ না করে উত্তর দেখবেন না। যদি আট বা আটের বেশী প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন তা-হলে বুঝতে হবে বাংলা শব্দের উপর আপনার বেশ দখল আছে। পাঁচ থেকে সাত পর্যন্ত শুদ্ধ হলেও মন্দ নয়।]

১ অকুতোভয়

(ক) অদ্ভুত। (খ) কৌতূহলী। (গ) ভয়ার্ত। (ঘ) অসমসাহসিক।

২ কিশলয়

(ক) আমের মুকুল। (খ) শিরীষ। (গ) নবপল্লব। (ঘ) ফুল।

৩ গোরোচনা

(ক) গোমূত্র। (খ) গোময়। (গ) পিউড়ি। (ঘ) গোরুর গাড়ি।

৪ চম্পূ

(ক) ছোট চাঁপা ফুল। (খ) বৃহৎ সৈন্যদল। (গ) একজাতীয় কাব্য। (ঘ) নাটকবিশেষ।

৫ তপতী

(ক) তপস্যায় যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। (খ) ছায়া। (গ) অগ্নি-শিখা। (ঘ) চন্দ্র।

৬ ধূপছায়া

(ক) ধূপের মত কালো। (খ) রোদ আর ছায়া। (গ) ময়ূরকণ্ঠী। (ঘ) আবছা।

৭ পরুষ

(ক) ক্রোধী ব্যক্তি। (খ) কর্কশ। (গ) পুরুষোচিত। (ঘ) পরিহাস।

৮ বরাঙ্গনা

(ক) বেশ্যা। (খ) সুন্দরী। (গ) নববিবাহিতা বধূ। (ঘ) বরযাত্রী।

৯ বিপ্রলম্ভ

(ক) প্রলাপ। (খ) বিলম্বিত। (গ) ব্রাহ্মণের লাভ। (ঘ) বিয়োগ।

১০ মিতাক্ষরা

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রবর্তিত ছন্দ। (খ) অল্পভাষী। (গ) গ্রন্থের নাম। (ঘ) মিথ্যাবাদী।

মালবিকাগ্নিমিত্রম-এর একটি দৃশ্য

নৃত্যভঙ্গিমা : কুমুদিনী লাখিয়া

কালিয়দমন নৃত্যে : গোপীকৃষ্ণ

ভারতের নৃত্যকলা

॥ কথক ॥

'কত্থক' মানে যিনি গল্প বলেন। কত্থক নৃত্যও প্রথমে ছিল অঙ্গ-ভঙ্গিমার দ্বারা কাহিনী বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভারতের অন্যান্য নৃত্যের মতো কত্থকও মন্দিরের আবহাওয়ায় দেবারতির অঙ্গ হিসাবে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু মোগল আমলে রাজকীয় গুণগ্রাহিতার ফলে এই নৃত্যকলা ক্রমে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে পড়ে।

সাধারণ লোকের রসাস্বাদন এতে ব্যাহত হলেও রুচিবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এর মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের সন্ধান পান। কিন্তু একটা বিষয়ে অন্যান্য চিরায়ত নৃত্যকলার সঙ্গে কত্থকের পার্থক্য আছে।—এই নৃত্যকলায় নব-রূপায়ণের সুযোগ যথেষ্ট। নৃত্যশিল্পী নিজের প্রতিভা অনুযায়ী প্রতিবারই এই নৃত্যে নতুন সংকেত ও অভিনয় সংযোজন করতে পারেন। তবে মূলত এই নৃত্য প্রাচীন কাঠামোর উপর নির্ভর করেই রূপায়িত হ'য়ে ওঠে। কত্থকের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল 'পায়ের কাজ', 'চক্র' বা ঘূর্ণন, 'অভিনয়' এবং নৃত্যের আনুষঙ্গিক হিসাবে অত্যন্ত সরল সুরের সংগীতের ব্যবহার।

নৃত্যসজ্জা : তারা চৌধুরী

*

ঠুংরি আন্দাজ : কুমুদিনী লাখিয়া

কবিকণ্ঠ
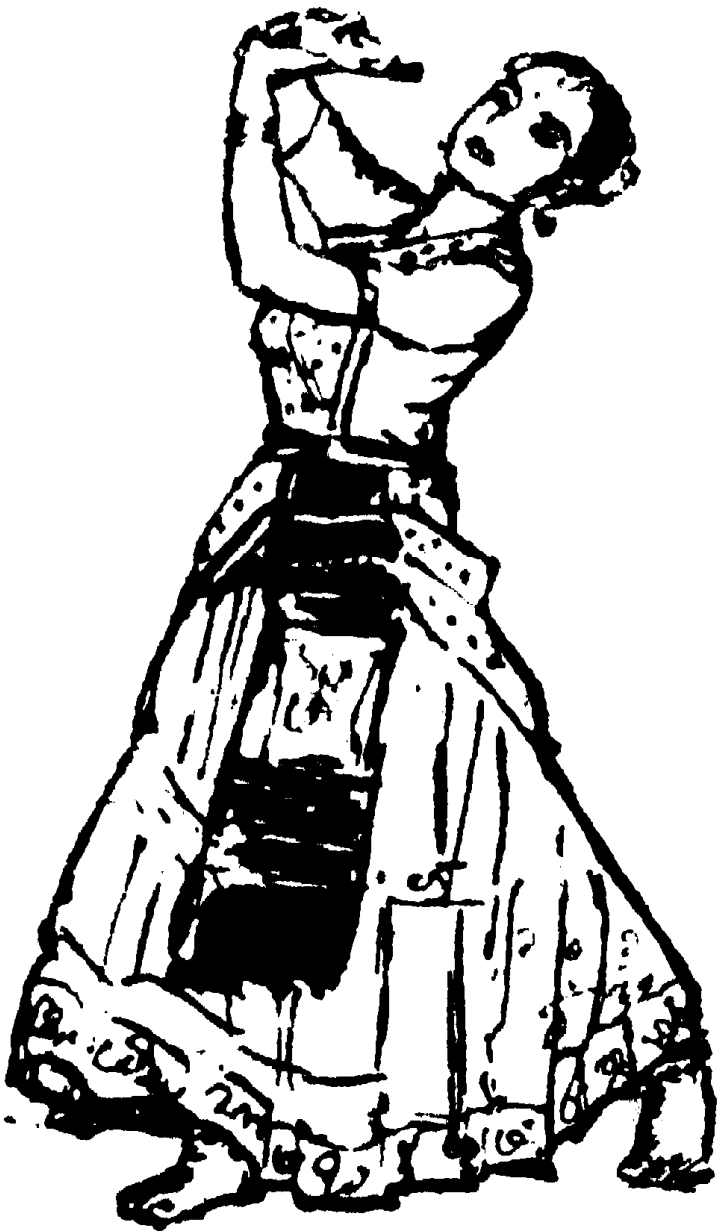
সন্তোষকুমার দে

আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার অমৃত-মধুর সান্নিধ্য অনুভব করি প্রধানত তাঁর বিপুল কাব্যের মধ্যে। তাঁর বহুবিধ রচনা ব্যতীত তাঁর অঙ্কিত চিত্রও কবির সৃজনশক্তির আর-একটি দিকের পরিচয় বহন করে। দেশে-বিদেশে তোলা সংখ্যাতীত আলোকচিত্রের মাধ্যমেও কবিকে বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্ন বেশে এবং বিভিন্ন পরিবেশে আমরা দেখতে পাই; এমনকি চলচ্চিত্রে কবির সচল মূর্তিও দেখা যেতে পারে। তাঁর মহাপ্রয়াণের শোকগম্ভীর পরিবেশও চলচ্চিত্রে বিধৃত আছে।

আর আছে কবির নিজকণ্ঠের গান ও আবৃত্তি, বাংলায় এবং ইংরেজিতে। স্বদেশে এবং বিদেশে গৃহীত কবিকণ্ঠের এই সব অমূল্য ভাষণ, আবৃত্তি এবং গানগুলি শুনলে কবির বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে এবং স্বরমাধুর্যে কবিকে যেন আরও নিবিড়-সান্নিধ্যে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় কবির যতগুলি গান, বক্তৃতা ও আবৃত্তি রেকর্ড করা হয়েছিল তার সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়াও দুষ্কর, রেকর্ডও যে সব নেই তা বলাই বাহুল্য। কিছু গিয়েছে বিদেশের কারখানায়, কিছু গিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমাবর্ষণে, আবার কিছু গিয়েছে উপযুক্ত সতর্কতা ও দূরদর্শিতার অভাবে। তবে তা নিয়ে আর অনুশোচনা করে লাভ নেই। এখনও যা আছে তার পরিমাণও নেহাত উপেক্ষণীয় নয় এবং বস্তুত পৃথিবীর আর কোনও দেশের আর কোনও যুগন্ধর কবির নিজকণ্ঠের এত রেকর্ড আছে বলে জানা যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করছি।

নিজকণ্ঠের রেকর্ড ব্যতীত কবির রচিত গান, নাটক প্রভৃতির রেকর্ডের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। আর কোনও দেশের আর কোনও কবির একক সৃষ্টির সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না,—কি সংখ্যাগত বিচারে কি গুণগত বিচারে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে বলেছিলেন—

> 'জগৎ কবিসভায় মোরা
> তোমার করি গর্ব,
> বাঙালি আজ গানের রাজা,
> বাঙালি নয় খর্ব।'

সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের আর কিছুই যদি সৃষ্ট না হত তবু শুধু গানগুলিই কবিকে চিরস্মরণীয় করে রাখত। বস্তুত বাঙালীর গীতি-ঐশ্বর্যভাণ্ডারে কীর্তনের মত রবীন্দ্র-সঙ্গীতও বাঙালীর একান্ত নিজস্ব সম্পদ। কবি নিজেও গানের মধ্যেই আপনার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"মাঝে মাঝে গান রচনার নেশায় যখন আমাকে পেয়েছে তখন আমি সকল কর্তব্য ভুলে তাতে তলিয়ে গেছি। আমি যদি ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই সকল দুরূহ গানের আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয় সুখ পেতুম, কিন্তু আপন অন্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে মূর্তি দেবার যে আনন্দ সে তার চেয়ে গভীর।"

তিনি তাই গেয়েছিলেন—

> "গানের ভিতর দিয়ে যখন
> দেখি ভুবনখানি
> তখন তারে চিনি আমি
> তখন তারে জানি।"

গানের ভিতর দিয়েই কবি অতি সহজে সাবলীলভাবে অথচ কি বিপুল বৈচিত্র্যে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। আশৈশব সঙ্গীত সাধনার পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলে গান রচনায় ও সুরসাধনায় সহজপ্রবণতা অতি বালককাল থেকেই তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে তিনি কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের কাছে অভিনন্দিত এবং পিতৃদেবের কাছে পুরস্কৃতই হননি, তাঁর গান ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দিরেও গীত হতে থাকে এবং অচিরে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত', 'প্রভাত-সঙ্গীত' প্রভৃতি নামকরণেও তাঁর নীতিপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত' নামক বিখ্যাত গীতিগ্রন্থের অনেকগুলি গান সেই স্ফুটনোন্মুখ কবির হাতেই সৃষ্ট হয়েছিল। বর্তমানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তার সেই ছিল ভিত্তিভূমি। ভগবদ্‌-ভক্তির উচ্চগ্রামে বাঁধা ভক্তিরসস্নিগ্ধ সেই সব গান উপাসনা মন্দির হতে ঘরে ঘরে বিস্তার লাভ করেছিল এবং সেই বিস্তারে সহায়তা করেছিল প্রথমে ফনোগ্রাফ, পরে গ্রামোফোন রেকর্ড। তখনও রেডিও আবিষ্কৃত হয়নি। সবাক চলচ্চিত্রও ছিল না, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের নাটকে রবীন্দ্রনাথের গান তখনই ব্যবহার শুরু হয়েছে। তাঁর ভ্রাতার লেখা নাটকের জন্য "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" গানটি হতে সেই যে নাটকের জন্য গান রচনা শুরু হল তাই ক্রমে নানা গীতি-নাট্য ও নৃত্য-নাট্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্লাবনধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

যদিও 'রাজা ও রাণী' নাটক এক সময় সাধারণ রঙ্গালয়েও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং 'চিরকুমার সভা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি নাটক সৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল তবু অন্যান্য রবীন্দ্র-সঙ্গীত ব্রহ্ম-সঙ্গীতের মত জনপ্রিয় হতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। ফনোগ্রাফ এবং গ্রামোফোনের রেকর্ড রবীন্দ্র-সঙ্গীত জনপ্রিয় করে তুলতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

সে সময়ে রেডিও বা সবাক্ চলচ্চিত্র ছিল না; সে যুগে তাই রেকর্ড জনসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু এখন রেডিও, সবাক চলচ্চিত্র, এমনকি টেলিভিসানের যুগেও রেকর্ডের কার্যকারিতা নষ্ট হয়নি; বরং যখন খুশি, যেখানে খুশি, যত বার খুশি বাজিয়ে শোনার পক্ষে রেকর্ডই একমাত্র উপযুক্ত মাধ্যম—তা সে ডিস্‌ক্ রেকর্ড হোক বা টেপ্ রেকর্ডই হোক। দীর্ঘ সময় ধরে বাজবার উপযোগী লং প্লেইং রেকর্ড এবং যন্ত্রতন্ত্র রেকর্ড করে নেওয়া এবং বাজিয়ে শোনাবার পক্ষে উপযোগী টেপ রেকর্ড যে যুগান্তর এনেছে তার ফলেও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এ সবই অতি অল্পদিনের ঘটনা; রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে যখন তিনি বিদেশে গিয়েছেন তখন এ সবের কিছু

কিছু প্রচলন শুরু হয়েছিল; তাঁর দেহাবসানের পরে রেকর্ডিং পদ্ধতির আরও উন্নতি হয়েছে। কবির নিজকণ্ঠের রেকর্ড বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে রেকর্ডিং পদ্ধতির ক্রমবিকাশের ধারাটির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ তাই আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ। তখন কবির বয়স ষোল বৎসর মাত্র। নবীন যুবক রবীন্দ্রনাথ তখনই সুগায়ক হিসাবে বন্ধুমহলে সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন। এই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দেই আমেরিকায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসন তাঁর কথাবলা যন্ত্র বা 'ফনোগ্রাফ' আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রে একটি ধাতব নলের গায়ে (Tin Foil) স্বরকম্পন রেকর্ড করা হত এবং আবার তা বাজিয়ে শোনা যেত। শিল্পী ফ্রান্সিস ব্যারড অঙ্কিত বিখ্যাত 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' চিত্রখানিতে যন্ত্রে প্রভুর কণ্ঠে নিজনাম শুনে একটি কুকুর কেমন তন্ময় হয়ে বসে সে ডাক সাগ্রহে শুনছে তা দেখানো আছে। কথাবলা যন্ত্রের ঐ আশ্চর্য শক্তি কুকুর অপেক্ষা মানুষের কাছে আরও বিস্ময়কর বোধ হত সন্দেহ নেই এবং কিছুদিনের মধ্যেই ফনোগ্রাফ যন্ত্র ভারতবর্ষে, বিশেষ করে ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলিকাতায় আমদানি হ'তে লাগল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য—"হিজ মাস্টার্স ভয়েস" চিত্রখানিতে ফ্রান্সিস ব্যারড প্রথমে কুকুরের সম্মুখে একটি এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্র বসিয়েই এ'কেছিলেন; পরে যখন গ্রামোফোন কোম্পানী চিত্রখানি ক্রয় করেন এবং নিজেদের উৎপন্ন গ্রামোফোন মেসিন ও রেকর্ডের 'ট্রেডমার্ক' হিসাবে ব্যবহার করতে মনস্থ করেন তখন পুরানো ফনোগ্রাফ যন্ত্রের বদলে নব-আবিষ্কৃত ডিস্‌ক্ রেকর্ডসহ গ্রামোফোন কুকুরের সম্মুখে বসিয়ে চিত্রখানি নতুন করে আঁকানো হয়। ফ্রান্সিস ব্যারডের এই চিত্রখানিই এখন জগদ্বিখ্যাত হয়েছে।

অবশ্য এদেশে যে ফনোগ্রাফ যন্ত্র আমদানি হয় তা এডিসনের প্রথম আবিষ্কৃত যন্ত্রের উন্নত সংস্করণ। বেল ও টেইনটার নামক দুজন তরুণ বৈজ্ঞানিক ১৮৮১ সালে এডিসনের যন্ত্রের কিছুটা সংস্কার সাধন করেন। তাঁরাই ধাতব নলের গায়ে মোম লাগিয়ে তার উপর রেকর্ড করে অধিকতর স্পষ্ট ও মিষ্ট স্বর উৎপাদন করতে সক্ষম হন। এই মোমলাগানো নলের রেকর্ড (Cylindrical record) ব্যবহার করেছেন এমন লোক এখনও এদেশে অনেকে জীবিত আছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় এই যন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। আচার্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনকথায় এই যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডক্টর কালিদাস নাগ প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন—"স্বদেশী যুগে মোমের রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুর যা আমরা শুনেছি তাও লুপ্ত হয়েছে; আধুনিক রেকর্ডে কিছু পুরাতন গান উঠেছে সেটা আশার কথা।"

এই মোমের রেকর্ডগুলি (Cylindrical record) কেন লুপ্ত হল তারও একটু ইতিহাস আছে।

এডিসনের ফনোগ্রাফ •যন্ত্র আবিষ্কারের এগারো বছর পরে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এমিল বার্লিনার নামক একজন জর্মন বৈজ্ঞানিক চাকতি রেকর্ড (disc record) তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সাতাশ বৎসর। বার্লিনার-এর চাকতি রেকর্ড-ই এখন সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, তার কারণ এই রেকর্ড ব্যবহার করা সহজ, তৈরী করাও সহজ, ফলে এখন পর্যন্ত এই জাতীয় রেকর্ডই সর্বত্র চলছে। সিলিণ্ড্রিক্যাল রেকর্ড এই ডিস্‌ক্ রেকর্ডের তুলনায় ব্যবহার করাও অসুবিধাজনক, তৈরী করাও অসুবিধাজনক, তাই প্রতিযোগিতার মুখে অচিরেই মোমের সিলিণ্ড্রিক্যাল রেকর্ড উঠে গেল, আজ আর কোথাও সে জাতীয় রেকর্ড ব্যবহৃত হয় না।

কিন্তু আমাদের দেশে এক সময় ঐ সিলিণ্ড্রিক্যাল রেকর্ড খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এদেশে ডিস্‌ক্ রেকর্ডের কারখানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বার্লিনারের আত্মীয় এবং প্রথম সহকারী ফ্রেডারিক গেইসবার্গ নামক একজন তরুণ রেকর্ডিং এঞ্জিনিয়ার ডিস্ক্ রেকর্ড তৈরী করবার উদ্দেশ্যে প্রথম ভারতবর্ষে আসেন এবং গহরজান মালকাজান প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ গায়িকাদের গান রেকর্ড করে বিলাতে নিয়ে যান। জার্মানিতে সেই গানগুলির রেকর্ড তৈরী হয়ে এদেশে আসে এবং অচিরেই বিশেষ জনপ্রিয় হয়। ১৯০৫ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীর ভারতীয় শাখা খোলা হয় এবং ক্রমবর্ধমান রেকর্ডের চাহিদা মেটাতে ১৯০৭ সালেই কলকাতায় এশিয়ার সর্বপ্রথম রেকর্ড তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৯, বেলেঘাটা রোডে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হতে ভারতীয় গানের রেকর্ড ভারতবর্ষেই তৈরী শুরু হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছেচল্লিশ বৎসর।

পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সাতাশ বৎসর, তখন ফনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং তার কয়েক বৎসরের মধ্যেই যখন সে যন্ত্র ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে আমদানি হতে থাকে তখন রবীন্দ্রনাথ নবীন যুবক, তাঁর তখন বয়স ত্রিরিশের কাছাকাছি। এ কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন কবির বাল্যবন্ধু হেমেন্দ্রমোহন বসু। হেমেন্দ্রমোহন 'কুন্তলীন' কেশতৈল এবং 'দেলখোস' গন্ধসার প্রস্তুতকারক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

"চুলে মাখো 'কুন্তলীন'
মুখে মাখো 'দেলখোস'
পানে খাও 'তাম্বুলীন'
ধন্য হোক্ এইচ্ বোস্—"

এই মনোরম ছড়াটি হয়ত অনেকে বিজ্ঞাপনে পড়েছেন বা লোকমুখে

শ্‌নেছেন বলে স্মরণ করতে পারবেন। 'এইচ, বোস—পারফিউমার' নামক বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হেমেন্দ্রমোহন কেবল গন্ধবস্তুর ব্যবসায়ী ছিলেন না, তিনি যে সাহিত্য-রসিক ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর প্রবর্তিত 'কুন্তলীন' প্‌রস্কার। আজ আকাদামি প্‌রস্কার, রবীন্দ্র-প্‌রস্কার প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় প্‌রস্কারের অভিনন্দনলাভের স্বারা সাহিত্যিকরা যে সমাদর ও সম্মান লাভ করেন, এক সময় 'কুন্তলীন' প্‌রস্কারেই তার স্‌চনা দেখা দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্দির' গল্পটি 'কুন্তলীন' প্‌রস্কার পাওয়ায় সাহিত্যের ইতিহাসে 'কুন্তলীন' প্‌রস্কার চির-স্মরণীয় হয়ে আছে। মনে হয়, 'কুন্তলীন' প্‌রস্কার প্রবর্তনে এবং বাৎসরিক 'কুন্তলীন' সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের পশ্চাতেও হয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ছিল। এ অন্‌মান এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বন্ধ্‌ ছিলেন এবং প্রায়ই তাঁর গ্‌হে আসতেন। সেখানে তিনি গানও করতেন— তাই হেমেন্দ্রমোহন যখন এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্র আনিয়ে বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার গান দিয়ে 'বোসেস রেকর্ড' বের করলেন তখন কবি নিজেও অনেকগ্‌লি গান রেকর্ড করেছিলেন। মনে রাখতে হবে কবির তখন বয়স তিরিশের কাছাকাছি, কন্ঠ সতেজ ও স্‌রেলা, তাই সেই মোমের রেকর্ডেও কবির গান খ্‌ব স্পষ্ট ও মিষ্ট শোনাত। এ বিষয়ে ডক্টর কালিদাস নাগ যা লিখেছেন তা আগেই উল্লেখ করেছি।

রেকর্ডিং যখন শ্‌র্‌ হয়েছিল তখন বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে স্বরবৃদ্ধির কৌশল আবিষ্কৃত হয়নি, তাই সে সময় যার কণ্ঠে যত জোর থাকত তার রেকর্ড তত স্পষ্ট হত। ইউরোপে ক্যার্‌সো, মেলবা প্রভৃতি শিল্পীর কণ্ঠ উচ্চগ্রামে উঠেও স্পষ্ট ও মিষ্ট থাকত বলেই রেকর্ডিং শিল্প গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। সে য্‌গেও রবীন্দ্রনাথের নিজ-কন্ঠের রেকর্ড যে স্পষ্ট ও মিষ্ট শোনাত তাতেই প্রমাণিত হয়—তিনি সতেজ স্‌কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। অবশ্য তার আরও প্রমাণ আছে। তিনি যখন হিন্দ্‌মেলায় স্বরচিত "হিন্দ্‌মেলার উপহার" কবিতাটি পাঠ করেন তখন তাঁর বয়স তেরো বৎসর নয় মাস মাত্র (১১ই ফেব্র্‌য়ারী, ১৮৭৫)। সে সময় মাইক্রোফোন চাল্‌ হয়নি কিন্তু বালক-কবির কন্ঠস্বর জনসভায় সকলেই শ্‌নতে পেয়েছিলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বালক-কবির উচ্চ কণ্ঠস্বরের বিষয় তাঁর আত্মজীবনীতে সানন্দে উল্লেখ করেছেন। একবার রাণাঘাটে নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ যখন গান গেয়েছিলেন—নবীনচন্দ্র পরম প্‌লকিত হয়ে অন্‌ভব করেছিলেন—সে গান যেন "গ্‌হ প্‌র্ণ করিয়া, ছাদ ভিন্ন করিয়া, আকাশ ম্‌খরিত করিতেছে।" কবির সেই উচ্চগ্রামে বাঁধা স্বরঐশ্বর্য মোমের রেকর্ডে অনেকটা ধরা গিয়েছিল, কিন্তু পরে তাঁর কন্ঠের উচ্চতা হ্রাস পায়। এমন কি পরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে যখন তিনি একবার বক্তৃতা করেন সে সভায় উপস্থিত শহিদ সারওয়ার্দি তার বিবরণে বলেছেন, কবির দেহসৌষ্ঠবের সংগে তাঁর কন্ঠের ম্‌দ্‌তা বিস্ময় স্‌ষ্টি করেছিল, কারণ সভাকক্ষে অতি অল্প লোকেই তাঁর কথা স্পষ্টভাবে শ্‌নতে পেয়েছিল। তবে পরবর্তী জীবনের রেকর্ডগ্‌লিতে আমরা তাঁর কন্ঠের ম্‌দ্‌তা লক্ষ্য করলেও কিন্তু মিষ্টতার অভাব দেখি না।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গ্রামোফোন কোম্পানীর ভারতীয় কারখানা স্থাপনের পর কবি দীর্ঘদিন আর রেকর্ড করেন নি, এমন কি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের আগে তাঁর রচিত কোন গান রেকর্ড হয়েছে কিনা তা নিয়েও কেউ কোন অন্‌সন্ধান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না—যদিও দেশীয় রাগপ্রধান বাংলা গান রেকর্ড হওয়ার সংগে সংগে অনেক জন-প্রিয় 'রবীন্দ্র-সংগীত' 'ব্রহ্ম-সংগীত' পরিচয়ে তখনই রেকর্ড হতে শ্‌র্‌ হয়েছিল। তবে সে য্‌গের রেকর্ডে ঐ গানগ্‌লির রচয়িতা হিসাবে কারো নাম দেওয়া হত না। পরে শিল্পীর নামের সংগে গীতিকারের নামও উল্লেখ করা শ্‌র্‌ হয়। যতদ্‌র জানা যায়, ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম তাঁর রচিত গানের রেকর্ডের জন্য গীতিকার হিসাবে সম্মানদর্শনী পান।

এ সময়ে পেশাদার গায়িকার কন্ঠেই রবীন্দ্র-সংগীত রেকর্ড হতে থাকে। দেশবন্ধ্‌ চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী কুমারী অমলা দাশ 'মিস্‌ দাশ' নামে যখন রবীন্দ্র-সংগীত রেকর্ড করেন তাই হয় এদেশের অভিজাত শ্রেণীর মহিলার সর্বপ্রথম রেকর্ডিং। কবি কিন্তু সেই 'বোসেস রেকর্ডে' গাইবার পর নিজে আর রেকর্ড করতে সম্মত হননি। তবে এই সময়ের মধ্যে বিদেশে তাঁর বক্তৃতা রেকর্ড হয়েছিল। ১৯২১ সালে ১লা জ্‌ন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির ভাষণ রেকর্ড করা হয়।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর গ্রামোফোন কোম্পানীর সংগে কবি-গ্‌র্‌র একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তাতে কবি অনেকগ্‌লি রবীন্দ্র-সংগীত রেকর্ড করবার অন্‌মতি দেন এবং নিজেও রেকর্ড করতে সম্মত হন। কঠিন অধ্যবসায়ের সংগে কবিকে প্‌নঃ-প্‌নঃ অন্‌রোধ করে রেকর্ড করতে সম্মত করিয়েছিলেন তৎকালীন রেকর্ডিং প্রতিনিধি স্বর্গীয় ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য। কবি সেই সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর ১০৬নং আপার চিৎপ্‌র রোডের রিহার্সাল র্‌মেও গিয়েছিলেন এবং বেলেঘাটার কারখানাতে রেকর্ড করতে গিয়েছিলেন,—কারণ বহনযোগ্য রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি কিছ্‌ই তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এই সময়ে কবি যে সব রেকর্ড করেন তারমধ্যে আবৃত্তিই বেশি, গান কম। বিষয়গ্‌লি 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস্‌' এবং কলাম্বিয়া রেকর্ডে

প্রকাশিত হয়েছিল। পরে হিন্দুস্থান রেকর্ডেও তিনি অনেকগুলি বিষয় রেকর্ড করেন।

এখন কবির গান ও আবৃত্তি যা রেকর্ডে পাওয়া যায় তার পরিমাণ চল্লিশের কাছাকাছি। এবার শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে একখানি লং প্লেইং রেকর্ডে কবির এগারোখানি গান ও আবৃত্তি বেরিয়েছে। সাধারণ শ্রেণীর রেকর্ডে কবির কণ্ঠে তেইশটি বাংলা এবং ছটি ইংরেজি বিষয় পাওয়া যায়। এ বাদে আমাদের দেশের রেডিওতে দেওয়া ভাষণ ও আবৃত্তির কিছু রেকর্ড আছে. বিদেশে রেডিওতে এবং সাধারণ কোন সভায় দেওয়া ভাষণ ও আবৃত্তির কিছু রেকর্ডও পাওয়া গিয়েছে। এবার কবির জন্মশতবার্ষিকীর দিনে ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায় রেডিওতে "Voice Across The Years" শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে কবির কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি আবৃত্তির রেকর্ড শোনানো হয়েছিল। এই রেকর্ডগুলি সহজলভ্যভাবে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্র-অনুরাগীদের বিশেষ আনন্দের কারণ ঘটবে। এই রেকর্ডগুলির মধ্যে কবির বিখ্যাত কবিতা— "ভগবান তুমি যুগে যুগে'-এর ইংরেজি অনুবাদ Age after Age", 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীকৃত ইংরেজি সারানুবাদ এবং 'ঝুলন' কবিতাটি কবিকণ্ঠে শুনলে মন সত্যই অভিভূত হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে একটি আনন্দ সংবাদ না বলে পারছি না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কবি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার রেকর্ডের কথা উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বোমা-বর্ষণের ফলে বহু মূল্যবান বস্তুর সংগে সেই রেকর্ডও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কিন্তু পরে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক যত্নে সেই নষ্টপ্রায় রেকর্ডের আংশিক পুনরুদ্ধার করেছেন এবং তার একটি রেকর্ড-করা 'টেপ' পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে উপহার পাঠিয়েছেন। এই বক্তৃতাটি ইংরেজিতে বলা—"Message of The Forest"। প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে জ্ঞান ও সম্প্রীতির মহিমা ঘোষিত হয়েছিল বর্তমান জগতে বিবদমান জাতিদের সমক্ষে তার মহৎ দৃষ্টান্ত কবি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। এই মূল্যবান ভাষণটিও জনসাধারণের পক্ষে সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন।

ইউরোপে-আমেরিকায়-রাশিয়ায়, এক কথায় পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই আজ রবীন্দ্র-সংগীত বিশেষভাবে সমাদৃত। রবীন্দ্র-সংগীতের সুরে বহু খ্যাতনামা বিদেশী গায়ক-গায়িকা এবং যন্ত্রশিল্পী বহু ভাষায় গান গেয়েছেন, অর্কেস্ট্রা বাজিয়েছেন, সে সব বিষয় বহুবার রেকর্ডও হয়েছে। পাশ্চাত্য-সংগীতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণাও চলছে।

পরিশেষে দেশবাসীর নিকট একটি নিবেদন জানাই। সহজলভ্য চালু রেকর্ডে কবিকণ্ঠে যেসব আবৃত্তি গান প্রভৃতি পাওয়া যায় তা বাদে আর কোন পুরাতন রেকর্ড, বিশেষ করে প্রাচীন 'মোমের রেকর্ড' যদি কারো সন্ধানে থাকে তবে লেখককে এই পত্রিকার ঠিকানায় অনুগ্রহ করে জানালে প্রাচীন সংগীত উদ্ধারের বিশেষ সহায়তা করা হবে।

শব্দকল্পদ্রুম

॥ কথার মানের উত্তর ॥

১ (ঘ) কুতঃ=কোথাও। যার কোথাও থেকে ভয় নাই। অসমসাহসিক। নির্ভীক।

২ (গ) নবপল্লব।

৩ (গ) পিউড়ি নামক হলদে রং। প্রবাদ—এই রং গোরুর মাথা বা গোরুর পিত্ত থেকে পাওয়া যায়।

৪ (গ) গদ্যপদ্যময় কাব্য।

৫ (খ) ছায়া। সূর্যপত্নী।

৬ (খ) হিন্দীতে ধূপ মানে রোদ।

৭ (খ) কর্কশ। নিষ্ঠুর।

৮ (খ) বর=সুন্দর। অঙ্গনা=রমণী।

৯ (ঘ) বিয়োগ। কলহ।

১০ (গ) বিজ্ঞানেশ্বর রচিত উত্তরাধিকার ইত্যাদি নির্দেশক স্মৃতি-গ্রন্থবিশেষ।

শিল্পী ঃ অমিয় সেন

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধকুমার সান্যাল

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—তের—

বুড়িপিসি পূর্বজন্মে বোধ হয় পুলিশে কাজ করত। এ জন্মে সেই প্রাক্তন সংস্কার ত্যাগ করেনি। আমার অনুপস্থিতিতে আমার মহলে পাছে কোনও ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশ করে সেদিকে তার প্রখর চক্ষু ছিল। হেনা কয়েকদিনের জন্য আমার পাশের ঘরটিতে বাস ক'রে গেছে এবং আমি নিজে হেনার ঘরটি সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছিলুম, বুড়িপিসি এটি ভোলেনি। সেইজন্য দুবেলা এ দুটি ঘর নিজের হাতে সে ঝাড়া-মোছা করেছে, ধুনো দিয়েছে, সন্ধ্যার আলো জেবলে শাঁখ বাজিয়েছে। অতঃপর ঘরে তালা দিয়ে চাবিগুলি সযত্নে রেখেছে হাঁড়িকুড়ির মধ্যে। সুরমা এসেছে, চলেও গেছে,—কিন্তু তার জন্য অন্য ঘর। এস, থাকো, খাও দাও, শ্বশুরবাড়ি চলে যাও! এর বেশি আর খাতির চেয়ো না! আজকাল বাপের সম্পত্তি মেয়েও নাকি পায়, কিন্তু ভাইয়ের সম্পত্তির ওপর বোনের অধিকার দিয়েছে কি কোথাও?

এবার এসে দেখছি বুড়িপিসি একটা ঠিকে-ঝি রেখেছে। সে বাসন ধোয়, ঘর-দালান ধোওয়া-মোছা করে। বুড়িপিসির বয়স হয়েছে।

হেনার ঘরে হেনার নিজের জিনিস-পত্র কম ছিল না। কিন্তু রাজা ভবানীপ্রসাদের শেষ উত্তরাধিকার পৌত্রীতে অর্শাবার ফলে যে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি হেনার চোখে জঞ্জাল-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেগুলি সাহেবপাড়ার দোকানে নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। তার কমিশন ও অন্যান্য খরচ বাদে সব টাকা আমারই কাছে গচ্ছিত। যাই হোক, হেনার ঘরটি আমি নিজে সাজিয়ে রেখেছিলুম। তার ঘরের একটি দেওয়ালে সোনালি ফ্রেমে বাঁধিয়ে একখানা পূর্ণাবয়ব আয়না দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম, যদি কোনদিন তার 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা' তনুলতাটি ওর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়,—তবে সেটি লুকিয়ে আমি দেখব! আজ যদি হেনা তার শালোয়ার, পাঞ্জাবি এবং ওই কালসর্পফণাসম বেণীটি সহ এসে এই মুকুরের সম্মুখে হাস্যবিগলিত হয়ে দাঁড়ায়, এবং আমি যদি সহসা পিছন থেকে এসে তার দুই চোখ টিপে ধরি, তাহলে দেবলোকে ইন্দ্রসভার উর্বশীও হয়ত নাচের আসরে কিছু বিমনা হয়ে ওঠে বৈ কি।

কিন্তু থাক, এসব চিন্তাবিভ্রম আমার পক্ষে শোভন নয়। হেনার কাছ থেকে এই আমিই ত' কিছুদিন আগে সংযমের পাঠ শিখে এসেছি!

পরবর্তী কয়েকদিন সরকারি নানা কাজে নানা সহকর্মীকে নিয়ে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল বটে, কিন্তু আমি একটা বিশেষ চিন্তাসংকটে এসে পৌঁছেছিলুম। সেটি নিতান্ত ব্যক্তিগত বলেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দেখতে পাচ্ছি হেনা চারিদিকে নিন্দিত হচ্ছে, এবং এও দেখছি সেই ইতর নিন্দার সঙ্গে একাধিক পুরুষ বিজড়িত। হেনার পক্ষে নাকি অসম্ভব কিছু নয়, এবং সে যে বিদেশে কাজ নিয়ে গেছে, এটি তার মক্ষিকাবৃত্তি রক্ষার একটি অজুহাত মাত্র। আমি, অর্থাৎ এই চির-নির্বোধ ও হতভাগ্য পার্থ চৌধুরী শুধু রাজকন্যা শ্রীমতী হেনার তল্পি-বাহক মাত্র। আমি নাকি হেনার ঈষৎ বাঁকা কটাক্ষ, একটু হাসির টুকরো, সামান্য একটু স্পর্শ, দু'একটি স্তোক-বাক্য,—এতেই খুশী হয়ে তার বডিগার্ডের কাজ করি! সর্বাপেক্ষা কৌতুকের কথা এই, আমার শোবার ঘরে বুড়িপিসি চিঠির যে তাড়াটা সযত্নে রেখেছে তার মধ্যে বেনামী চিঠির সংখ্যা দশ বারো খানা,—এবং সেই-গুলির ভিতরেই এবম্বিধ হাস্যকর কথাগুলি লিখিত। গত কয়েকদিন যাবৎ একটি বিষয় লক্ষ্য ক'রে চিন্তিত হয়েছি, খুড়িমাও কতকটা যেন এইসব জনশ্রুতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আমি গিয়ে ও'দের মহলে দাঁড়ালে যেন আশপাশে একটা গাম্ভীর্য থমথম করতে থাকে।

বিপদে, দুঃখে এবং দুর্যোগে সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের অনেকেই সহানুভূতি জানিয়ে যায়। কিন্তু সহসা অতি সৌভাগ্যলাভের ফলে যদি তাদের স্তর থেকে কেউ উঁচুতে ওঠে,—তবে দেখা দেয় ঈর্ষা ও গাত্রদাহ। নিন্দার জন্ম ঈর্ষায়। হেনার প্রচুর টাকা, মামলায় তার সগৌরব জয়লাভ, তার অবাধ স্বাধীনতা, নির্দায় জীবন, স্বচ্ছন্দ বিচরণ, এগুলি অনেকের পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু সন্দেহ কি!

আশার বিরুদ্ধে আশা পোষণ করছিলুম, যদি ওই চিঠির তাড়ার ভিতরে হঠাৎ হেনার হাতের চিঠি একখানা পেয়ে যাই! কিন্তু মিথ্যাই খোঁজাখুঁজি! অতগুলি পাপের মধ্যে একবিন্দু পুণ্য থাকলে ওগুলি শুচি-শুদ্ধ হয়ে যেত! কিন্তু তা হল না। মনে হতে লাগল, এতক্ষণ ধরে আমি কেবল নোংরাই ঘাঁটলুম।

হেনা আমাকে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে ফেলে গেছে। তার টাকাকড়ির ব্যাপারগুলো এমন এলোমেলো হয়ে রয়েছে যে, আমি একা তার প্রতিকার করতে পারিনে। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাগজ-পত্রের জটিলতার মধ্যে ঢুকলে সহজে আমি বেরিয়ে আসতে পারব না। আমার স্টীলের আলমারির মধ্যে সে রেখে গেছে অনেক টাকা, কিন্তু তার

সম্বন্ধে নির্দেশ কিছু নেই। চেক বইতে আগাগোড়া সই ক'রে দিয়ে গেছে চোখ বুজে, এবং আমিও চোখ বুজে তার সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করতে পারি। তিন পুরুষের দরুণ পুরণো অলঙ্কার-গুলি পুঁটলি বেঁধে রেখে গেছে এক কোণে। আমি যদি হঠাৎ আজ বিয়ে ক'রে নতুন বৌয়ের কাছে আলমারির চাবিটা ফেলে দিই তবে যে-পরিমাণ গলায়-গলায় ভালবাসা পাই তার শতাংশের এক অংশও অদ্যাবধি হেনার কাছে পাইনি। হেনা যেন আমাকে সর্বস্ব দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে, পাছে আসল বস্তুটি চেয়ে বসি! সম্ভবত তার এই ইচ্ছা, আমি যেন বাকি জীবন তার বিষয়সম্পত্তির দারোয়ানি করি। লোকে যে নিন্দে করে তার সবটাই মিথ্যে নয়!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল,—হেনা বলত, অর্থই অহঙ্কার, ভুলে যেয়ো না, পার্থ। দরকারের বেশি টাকা থাকলেই আত্মাভিমান জন্মায়। স্বল্পে তুষ্ট তারা যারা স্বল্পবিত্ত। সম্পদ্ হল ক্ষমতার বাহন, সেই জন্য ধনীমাত্রই লোভী। আমার নিজের বলতে কিছু থাকবে না, সেই আমার অহঙ্কার। আমি দিতে পারি সেইটি আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয় হোক। প্রবৃত্তির দাসত্ব আমাকে করতে হবে না, সেই আমার পরম মুক্তি! তুমি আমাকে লোভ দেখিয়ো না, পার্থ।

আমি বলতুম, সব ছাড়লে জীবন কাটাবে কি দিয়ে? ভাত কাপড় আসছে কোত্থেকে? মাথা গোঁজবার জায়গা কই? বুড়ো বয়সের সংস্থান হচ্ছে কেমন ক'রে?

হেনা বলত, আমি কাজ করব সেই আমার সংস্থান। এই বৃহৎ দেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই হাতে কাজ তুলে নেব, দেশের ভাগ্যবিধাতা আমাকে ফেলবেন না! সোনার তাল পাহারা দিয়ে অন্ধকারের আড়ালে যদি পড়ে থাকি, সে যে ভয়ানক অপমৃত্যু! আমাকে বাইরে বেরতে দাও পার্থ, নিজকে ছড়াতে দাও,—অসীম মুক্তির মাঝখানে গিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে আমাকে বাঁচতে দাও। আমার প্রাণশক্তিকে এ যুগে আর বেঁধে রাখতে চেয়ো না!

হেনার অনুপ্রাণিত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করত, এবং আমি তার চোখমুখের চেহারায় গৃহগতপ্রাণা গৃহস্থকন্যার আভাস দেখতে পেতুম না। প্রকৃতপক্ষে হেনার পরিচয়টা আগাগোড়া অসাধারণ। সে মানুষ হয়েছে যেখানে, সেটা একপ্রকার যক্ষপুরী। সামাজিক জীবন তার ছিল না বললেই হয়। উচিত-অনুচিতের বিধিনিষেধ তার জন্য ছিল না। আমি ছাড়া সঙ্গী সে খুঁজে পায়নি, এবং আমি যে তার বিপরীতধর্মী একটা পুরুষ মানুষ—এ খবরও সে নেয়নি। একথা তার মনেই হয়নি যে, বিশেষ বয়সের সন্ধিকাল থেকে আমাকে লজ্জাশরম ক'রে চলা উচিত। আমি তার দিকে চেয়ে থাকলে সে একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করত, কি দেখছ?—এবং আমি যখন বলতুম, না, কিছু না!—তখন সে পুনরায় নিশ্চিন্ত হয়েই আগের কথায় ফিরে আসত। এক একবার মনে হতো, হেনা যেন এক তপোবনে মানুষ হচ্ছে, যার চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রাচীর,—বাইরের আধুনিক-কালের হাওয়ার পথ যেখানে অবরুদ্ধ। এর ফল খুব খারাপ হয়নি। পড়াশুনোর বাইরে তার মন গেল না, এবং বিজ্ঞান-গবেষণাগারে ঢুকে সে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এল সেটি অনন্য। এর বাইরে তার যে-জীবন, সেটি তার ছোটকাকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেটি অভিনব। সেখানে পেয়ে গেল একটা স্বচ্ছন্দ মুক্তির মন্ত্র। আপন খেয়াল-খুশিতে চল, শাসনের বালাই কোথাও নেই, বন্ধনবোধ হল মানসিক ব্যাধি, সামাজিক বিধিনিষেধ আত্মপ্রকাশের শত্রু! ছোটকা ছিলেন তাঁর নিজের জগতে কবি, শিল্পী, দার্শনিক, —তিনি আপন প্রাণলোকে ছিলেন সম্রাট! হেনা তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। ছোটকা হেসে বলতেন, মেয়েরা বিয়ে করে কেন জানিস্? পায়ের শেকলের ঝমর-ঝমর আওয়াজটি শুনতে মিষ্টি লাগে তাই জন্যে। হাতে কাঁকন, ওটা হ্যাণ্ডকাফ,—বন্দিনীর দিকে চেয়ে পুরুষ খুশী হয়ে কাঁকন নিয়ে কবিতা লেখে! আর শাড়ি পরায় কেন জানিস্?—যাতে দৌড়ে পালাতে না পারে! তোরা বোকা, তাই তোদের দিয়ে বাচ্চা মানুষ করিয়ে নেয়, আর নিজেরা মজা ক'রে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে সম্পত্তি ভোগ করে! আর তোরা? তোরা ত' ভাত-কাপড় পেলেই খুশী। তবে নিতান্ত কান্নাকাটি যদি করিস তাহলে ওই দু' একটা সোনার গয়না! সব দেশেই মেয়ে মানে মেড্—ঝি রে ঝি!

হেনা কলকণ্ঠে হেসেই অস্থির। ছোটকা বলেন, আরও আছে রে। মায়ের কোলে শিশুকে বসিয়ে ওরা ছবি তুলে বলে, মাতৃত্বই নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়! যাদের প্রাণে আবার একটু ভয় আছে, তারা বলে, না গো না, শুধু মাতৃত্ব নয়, —ওর সঙ্গে সতীত্ব না মেলালে খুঁটি শক্ত হবে কেন? অতএব সতী নারীর জয়জয়কার চিরদিন!

হেনা আর আমি হেসে গড়াগড়ি দিতুম। কিন্তু কালক্রমে একথা বুঝতে পেরেছিলুম, ছোটকার ওই পরিহাসগুলির ভিতর থেকে হেনা কেবল যে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়েছে তাই নয়, ওর থেকে উজ্জ্বলন্ত শিখাটাকেও সে কাজে লাগিয়েছে। আমি ধীরে ধীরে এবং দিনে দিনে যেন এই বিপ্লববাদিনীকে চেনবার চেষ্টা পাচ্ছিলুম।

সাত দিনের জন্য এসেছিলুম, কিন্তু ভারি যন্ত্রপাতির তদন্তের কাজ দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় নিল। দিল্লী থেকে নির্দেশ এল, উড়িষ্যার প্রতিনিধিদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তাঁরা এসে পৌঁছলেন আরও দু'দিন পরে। অতঃপর নানাবিধ খুঁটিনাটি নিয়ে প্রতিদিন চার পাঁচ

ঘণ্টা ধ'রে আলাপ আলোচনা চলতে লাগল, এবং কথায় কথায় আমাকে দিল্লীতে ট্রাংক কল্ ক'রে নির্দেশ নিতে হচ্ছিল।

এমনি সময়ে একদিন খুড়িমা আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বুড়িপিসি তখন রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। বললুম, কি হুকুম, বল খুড়িমা—

খুড়িমা হাসিমুখে এসে বসলেন। বললেন, তোর সংগে কথা বলতে গেলে তোকে খুঁজে বার করতে হয়। সমস্ত দিন তুই বাইরে।

আমিও হেসে বললুম, তুমি বুঝি হেনার কথা বলবে? আমি বলি ওর আলোচনা থাক্ খুড়িমা। সে যখন নিন্দে-সুখ্যাতির বাইরে চলে গেছে, তখন আমরা তাকে ছেড়েই দিই।

খুড়িমা বললেন, না রে, তার কথা বলতে আসিনি। দ্বিজু আজ ক'দিন থেকে নরেন্দুর কথা বলছে,—নরেন্দু নাকি ঘোরাফেরা করছে এখানে ওখানে আমাদের বাড়ির আনাচে কানাচে—

দীর্ঘকাল পরে নরেন্দুর উল্লেখ শুনে একটু সচেতন হলুম। বললুম, দ্বিজুর সংগে নরেন্দুর বুঝি আজকাল মেলামেশা হচ্ছে? ব্যাপারটা কি শুনি?

খুড়িমা বললেন, দ্বিজুকে সে ধরেছে, তোর সংগে সে একবারটি দেখা করতে চায়।

আমার সংগে? সে কেমন ক'রে সম্ভব খুড়িমা?—আমি বললুম, তা ছাড়া তার সংগে সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। যতদিন সম্ভব তার সংগে মিষ্ট ব্যবহার ক'রে এসেছি, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে তার ধাপ্পা আর জোচ্চুরি ধরা পড়ার পর আমি তাকে ক্ষমা করতে আর প্রস্তুত নয়, খুড়িমা। দ্বিজুকে তুমি ব'লে দিয়ো।

খুড়িমা বললেন, আচ্ছা, দ্বিজুকে না হয় আমি মানা করে দেব। কিন্তু কথাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে রাঙাদিদির সংগে। এর মধ্যে নরেন্দু নাকি গিয়েছিল রাঁচিতে, রাঙাদিদি জামাই-আদরে রেখেছিলেন!

আমি চুপ ক'রে খুড়িমার মুখের দিকে একবার তাকালুম। পরে বললুম, এ সব নোংরামি যাদের পক্ষে সম্ভব তারা করুক, খুড়িমা। আমি এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইনে। আমি

আশ্চর্য হই এই ভেবে, বিমাতাদের চেহারা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায়!

খুড়িমা বললেন, নবেন্দু কি উদ্দেশ্য নিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে চায় জানিনে, তবে আমি দ্বিজুকে স্পষ্ট জানিয়ে দেব। তুই এখানে কতদিন আছিস বল দেখি?

আমি জানিনে, খুড়িমা। যেমন হঠাৎ এসেছি, তেমনি হঠাৎই একদিন চলে যাব।

খুড়িমা তখনকার মতো বিদায় নিলেন। সন্ধ্যার দিকে আমার ডিনার পার্টি ছিল উড়িষ্যার প্রতিনিধিদের সঙ্গে। আমি যখন যাবার তোড়জোড় করছি তখন চা নিয়ে বুড়িপিসি ঘরে ঢুকল। পেয়ালাটা হাতে নিয়ে আমি বললুম, আচ্ছা, তুমি কই একদিনও ত' খরচপত্তর চাইলে না, বুড়িপিসি? তোমার ঘরকন্না চালায় কে? রোজগার-পাতি আছে নাকি?

বুড়িপিসি হঠাৎ আগুনের শিখার মতো সোজা হল, এবং যথারীতি তার ঘাড় কাঁপল। বলল, কি বললে? চালাই কেমন ক'রে? কল্পনা চৌধুরী বুঝি আসে টাকা দিতে? মুখ সামলে কথা বলিস, খোকন।

আহা, রাগ কর কেন, বুড়িপিসি? মেয়েছেলে আজকাল কত রকমে রোজগার করে, তা জান?

কত রকমে?—বুড়িপিসি চিৎকার ক'রে উঠল, মুখ সামলে কথা বলিস। চার কুড়ি বয়স হতে চলল, বাপ বলিনি কাউকে। তোর ঠাকুরদাদা বলে গেছে আমি বাউনের মেয়ে! আজ তুই কিনা আমার জম্ম-কম্ম নিয়ে কথা তুলিস? আমি এখনও জাত-ধম্ম নিয়ে আছি, তা জানিস?

বুড়িপিসি হাউচাউ করতে লাগল। আমি পালিয়ে বাঁচলুম।

খুড়িমাকে মিথ্যে বলিনি। চার পাঁচ দিন পরে হঠাৎ এক সময় কলকাতা ছাড়বার জন্য জিনিসপত্র গোছাতে বসলুম। গত কয়েকদিন থেকে আমার যে চিন্তাসঙ্কট ছিল, তারই ভিতর থেকে আমি আমার ভবিষ্যৎকালের কর্ম-পন্থা স্থির ক'রে নিয়েছিলুম। এ কথাটা নিশ্চিতভাবেই আমার মধ্যে শিকড় নিয়েছে, এই অনিশ্চয়তার থেকে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমার অনির্ণীত জীবন-ব্যবস্থার উপরে অদৃশ্যের সঙ্কেত একটি রয়েছে, এটি উপলব্ধি করতে পারি। মধ্যরাত্রির অর্ধ-জাগ্রত তন্দ্রায় আপন ধমনীর রক্ত-প্রবাহের মধ্যে শুনতে পাই অকূলের একটি আহ্বান। স্বপ্নে দেখি, মহা-সমুদ্রের বেলাভূমির উপর দিয়ে ধূসর একটা ছায়ালোকের দিকে আমার পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে যাচ্ছে। গতির সেই চির-কালীন চাঞ্চল্য যেন কোথাও আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। পিছন থেকে কে ঠেলছে জানিনে, সামনের দিকে আকর্ষণ করছে কে—তাও স্পষ্ট নয়। কিন্তু আমার থামবার যো নেই। আমি যেন সেই আবহমানকালের মহাজনতার গতিপন্থার পন্থী। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক—পথের ধূলির তিলক আমাকে তুলে নিতে হবে ললাটে। ধূলোয় ধূলোয় নিত্যকালের পথিকের মতো আমাকেও ধূসর হতে হবে।

হঠাৎ বুড়িপিসি ঝড়ের মতো এসে ঘরে ঢুকল। মুখে তার একগাল উদ্দীপনার হাসি। বলল, একবার দেখোসে, কে এসেছে। তাই ত বলি, আমগাছে কি কাঁঠাল ফলে?

কে এসেছে?

ওমা, শোনো কথা। চাঁদ উঠলে কি আবার আঙুলে দিয়ে দেখাতে হয়? সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে দেখোগে!

যা সন্দেহ করেছিলুম তাই। নিচের সিঁড়িতে নেমে সামনেই দেখি নবেন্দু কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে। আমাকে মুখো-মুখি দেখে একটু জড়োসড়ো হয়ে সে বলল, তোমার সঙ্গে একবারটি দেখা করবার জন্যে এসেছি, পার্থ।

পলকের মধ্যে আমার মুখে চোখে কখন যে কাঠিন্য এসেছিল বুঝতে পারিনি। কিন্তু নিজের বাড়ি বলে আমাকে সংযত হতে হল। বললুম, আমার যে বড্ড সময় কম, ভাই।

নবেন্দু বলল, তোমাকে না দেখে একদিন থাকতে পারতুম না। আজ তোমাকে দেখেও থাকতে পারছিনে। কেঁদে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হচ্ছে!

বললুম, তোমার আসার উদ্দেশ্যটা একটু তাড়াতাড়ি বল।

নবেন্দুর কাপড়-জামার এবম্প্রকার মালিন্য আগে দেখিনি। সে চিরকাল সৌখিন এবং ফিটফাট। দেখতে পাচ্ছি ক্ষৌরকর্মটা সে একেবারেই ভুলে গেছে। পায়ের জুতো জোড়াটাও তার অপরি-চ্ছন্ন দেহসজ্জার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে। সে তার শুষ্ক এক বোঝা মাথার চুল মুখের উপর থেকে সরিয়ে দুটো রাঙা চোখ তুলল আমার দিকে। বলল, তুমি ত' জান আমি প্রত্যেকটি মামলায় হেরে গিয়েছি?

তা হবে। আমি খবর রাখিনে।—জবাব দিলুম।

নবেন্দু একবার নিজের পায়ের দিকে তাকাল। পরে মুখ তুলে বলল, আমাকে কয়েকটা টাকা তুমি ভিক্ষে দাও, পার্থ।

এবার আমি থমকিয়ে দাঁড়ালুম। বললুম, ভিক্ষে! মানে? এটা কি তোমার কোন নতুন ধরনের ছদ্মবেশ? মতলবটা খুলে বল ত?

সিঁড়ির রেলিংয়ের ওপর নবেন্দু ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধরাগলায় বলল, ষ্টক এক্সচেঞ্জের পাশা খেলায় একবারও জিতিনি, পার্থ। অনেকেই জেতে, অনেকেই বাঁচে......কিন্তু আমার মৃত্যু ঘটে গেছে, ভাই। আজ তোমার কাছে কোনও অভিসন্ধি নিয়ে আসিনি, পার্থ। শুধু ক্ষমা চাইতে এসেছি। তোমার ক্ষমা আমার বড় দরকার।

বললুম, তোমার মুখে মদের গন্ধ পাচ্ছি,—এটা কি যখন-তখন খাও?

খাব না!—নবেন্দু বলল, একশ'বার খাব! বাইশ বছর বয়সে অত সম্পত্তি যে পায়, অত বড় কারবার যার হাতে আসে, —সে স্থির থাকবে কেন, পার্থ? শুধু মদ কেন, ওটার সঙ্গে যা কিছু মনে পড়ে তাও সব চাই একটার পর একটা! এটার তেষ্টা মেটে না, ওটার খিদেও মরে না!

এবার আমার কাঠিন্য কতকটা বেন কি কারণে কোমল হয়ে এসেছিল।

বললুম, তুমি কোন্‌টা চাইতে এসেছ? টাকা, না ক্ষমা?

দুটোই, বুঝলে বন্ধু, দুটোই চাই!—নবেন্দু রেলিংটা একটু শক্ত ক'রে ধরল। পরে বলল, সেদিন গিয়েছিলুম তোমার বন্ধু হেনার সেই বাগান-বাড়িতে! ক্ষমা চাইব ব'লেই গিয়েছিলুম, ভাই। হ্যাঁ, মিথ্যে নয়, একটু টলছিলুম বৈকি! ওমা কতকগুলো মিস্ত্রি মজুর আর ঠিকেদার আমাকে ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিল! তবু আজ

আমাকে কয়েকটা টাকা ভিক্ষে দাও, পার্থ।

তোমাকে বলি ভাই, বিশ পঁচিশবার প্রণয়াসক্ত হয়েছি বটে—হ্যাঁ হ্যাঁ, ইতর ভদ্র মিলিয়ে,—কিন্তু কেউ না, কেউ না, —একজনও কেউ না হেনার মতন!

হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে আমি বললুম, শোনো নবেন্দু, ক্ষমা আমার কাছে চাইবার দরকার নেই,—ওসব কাহিনী থেকে আমার মন স'রে গেছে। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি। এ ভিক্ষে নয়, পুরনো বন্ধুত্বের চিহ্ন। কিন্তু একটি অনুরোধ জানাই, আর কোনও দিন আমার সামনে তুমি ভাই এসো না!

ক্ষমা তুমি করবে না?

ক্ষমার কথা ওঠে না। তোমার অপরাধ অন্যের কাছে,—আমার কাছে নয়।

হঠাৎ ডুকরে উঠল নবেন্দু। বলল, পায়ে ধরলেও কি তুমি ক্ষমা করবে না?

দাঁড়াও, তোমার টাকা এনে দিচ্ছি!

না, চাইনে টাকা!—চিৎকার ক'রে উঠল নবেন্দু, তারপর সহসা পকেট থেকে একখানা ছোরা বার ক'রে বলল, বল ক্ষমা করবে কিনা, নৈলে তোমার সামনে নিজের বুকে এটা বসাব!

আমি হেসে তার হাত থেকে জোর ক'রে ছোরাখানা কেড়ে নিলুম। কিন্তু বাইরে তখন একজন রিক্সাওয়ালা নবেন্দুর জন্য চেঁচামেচি করছিল। সর্বাপেক্ষা মুস্কিল, এ পাড়ায় নবেন্দু যথেষ্টই পরিচিত। এই ফাঁকে উপরে উঠে এসে দেখি, বুড়িপিসি কাঠ হয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ছোরাখানা কোনমতে লুকিয়ে নিয়ে আমি ঘরে এলুম, এবং আমার কোটের পকেটে যা কিছু হাত ঢুকিয়ে পেলুম তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে দেখি, রিক্সাওয়ালা ভিতরে ঢুকে নবেন্দুর হাত ধরে টানাটানি করছে। আমি ধমক দিয়ে লোকটাকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললুম।

পানাদির মাত্রা সম্ভবত নবেন্দুর কিছু বেশি হয়ে থাকবে, সেইজন্য সে রেলিংয়ের উপর বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। আমি নেমে আসতেই সে মুখ তুলল। বিলোল দৃষ্টিতে জড়িত-স্বরে সে বলল, আমাকে ক্রিমিনল্‌ বলেই তুমি জানলে পার্থ,—বেশ, তাই জেনে রাখ। কিন্তু এই ক্রিমিনল-এর একটা কথা বিশ্বাস করবে আজ?

আমি নবেন্দুকে থামাবার চেষ্টা পাচ্ছিলুম। কিন্তু সে ভ্রুক্ষেপও করল না। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, মামলা করেছিলুম, নিন্দে রটিয়েছিলুম, পাগল হয়েছিলুম,—কিন্তু কেন, শুনেছ কি হেনার মুখে? বিশ্বাস কর পার্থ, মুখের গ্রাস মুখে তুলতে সে দেয়নি! সে-রাত্রির মরণ-বাঁচনের যুদ্ধে আমিই হার মেনে বন্য জন্তুর মতন হাঁপাচ্ছিলুম! হেনা ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল!

আমি এসব শুনতে চাচ্ছিনে, নবেন্দু!—আমি কঠোর হলুম।

নবেন্দু হাসল। বলল, বঞ্চিতের পরাজিতের চিত্তক্ষোভ সেদিন চারিদিকে ছোবল মেরে ঘুরেছে! তুমি তার কতটুকুই বা শুনেছ, মাই ডিয়ার? আচ্ছা যাচ্ছি, থ্যাঙ্ক ইউ, ভাই—

এই যে, টাকা নিয়ে যাও—?

ও, হ্যাঁ, দাও!—এ কি, এত টাকা? আমি যে ভেবেছিলুম তুমি পাঁচটা টাকা দিয়ে তাড়াবে, পার্থ? এ যে মস্ত এক গোছা?

বললুম, হ্যাঁ, ওতেই আমাদের প্রাচীন বন্ধুত্বের দাম শোধ হবে,—এবার তুমি বেরিয়ে পড়, ভাই।

দরজার কাছ পর্যন্ত নবেন্দু এগিয়ে একবার থমকিয়ে পিছন ফিরল। তারপর সে কেঁদে উঠল হাউ হাউ ক'রে। স্খলিত, ভগ্ন এবং অশ্রুসজল কণ্ঠে চেঁচিয়ে সে বলল, না, না, এটা কাল্‌চার নয়, পার্থ। ভাগ্যের দোষে পা পিছলে নিচের দিকে পড়ে গেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে টেনে তুললে না—বরং লাথি মেরে আরও নামিয়ে দিলে। একে কাল্‌চার বলে না, পার্থ। তুমি বললেও না, হেনা বললেও না। আজ ছোটক

বেঁচে থাকলে তার কাছে আমি জায়গা পেতুম।

নবেন্দু তার কান্না চেপে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

কোনদিন কোনও কারণে আমার চোখে কখনও জল আসেনি। কিন্তু আমার গলার ভিতর থেকে এমন কিছু একটা উঠে আসছিল, যার আবেগ সামলাতে না পেরে নবেন্দুকে ডাকবার জন্য ছুটেই বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। বোধ হয় এইটিই মনে এসেছিল, নবেন্দুর হাত ধরে ফিরিয়ে এনে ওর ভিতরকার নিপীড়িত মানবাত্মাকে শান্ত করি। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে খপ ক'রে খুড়িমা আমার একখানা হাত ধরলেন। বললেন, ছি, তুই কেন যাবি? ভেতরে আয়। দেখছিসনে নবেন্দুর মাথার ঠিক নেই? পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে রাস্তায়, রায়বাহাদুর পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছেন! চুপ কর খোকন, যাবার সময় চোখের জল ফেলতে নেই!

দূরে রিক্সা থেকে নবেন্দুর মদমত্ত কণ্ঠের আওয়াজ তখনও শুনতে পাচ্ছিলুম,—একে কালচার বলে না...বলে না ...বলে না......

পরদিন কানপুর ষ্টেশনে যখন নামলুম,—মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেছে। ষ্টেশন থেকেই দিল্লীর দপ্তরে একটি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানালুম, বিশেষ ব্যক্তিগত কারণে এখানে আটকে পড়েছি, শীঘ্রই ফিরব।

আমি জানতুম আমার অনুপস্থিতি অসুবিধাজনক বোধ হবে না। গতকাল থেকেই আমি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিলুম।

স্থানীয় সরকারি দপ্তরে একখানা গাড়ির জন্য আমি আগেভাগে জানিয়ে রেখেছিলুম। সুতরাং একখানা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে যখন পি-ডব্লু-ডি'র আপিসে লটবহরসমেত গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন আমাকে আর বেগ পেতে হল না। একজন ভদ্রলোক টেবিল থেকে উঠে এসে আমার করমর্দন করলেন, এবং যেহেতু এটি আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন, সেই কারণেই একখানা জিপ-গাড়ির জন্য পঁচিশটি টাকা আমি জমা দিলুম। ভদ্রলোকটি কোন্ একস্থলে টেলিফোন ক'রে দিয়ে বললেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপনার গাড়ি আসছে।

আমি ততক্ষণে জিনিসপত্র নামিয়ে টাঙ্গাভাড়া চুকিয়ে দিলুম।

শহরের জামাই যখন মফঃস্বলের গ্রামে শ্বশুরবাড়ি যায় তখন তার সঙ্গে কি কি লটবহর থাকা সম্ভব তাই ভাবছিলুম। গ্রাম যত উন্নতই হোক, অষ্ট্রেলিয়ান মাখনের টিন সেখানে দুষ্প্রাপ্য। শুকনো মেওয়া ফল, লজেন্স, ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুট, ওভালটিন, মহীশূরের চন্দন সাবান, চা ও কফি, কড়াপাক সন্দেশ, বেণী বন্ধনের ফিতা ও চিরুণী, বর্ণাঢ্য কাটা কাপড়ের কয়েকটি টুকরো, কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর শাড়ি ও ব্লাউস-পিস ইত্যাদি, এবং সর্বোপরি একটি শেলাইয়ের কলসহ কয়েক ডজন টিপ-বোতাম, এগুলি গ্রামাঞ্চলে সহজলভ্য আমার মনে হয় না। এ ছাড়া স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য নানা সামগ্রী—যেগুলি অপ্রকাশিতব্য। আমি ভারবাহী জীবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলুম। কিন্তু দেবী প্রসন্নহাস্যে বরদান করবেন এই ছিল আমার সান্ত্বনা।

জিপগাড়িখানার ড্রাইভার এসে সেলাম ঠুকে মালপত্রগুলি ভিতরে তুলে নিল, এবং আমি গিয়ে তার পাশে বসলুম। আসবার সময়ে এলাহাবাদ ষ্টেশনে প্রাতরাশ খেয়েছিলুম, সুতরাং আহারাদির তাড়া নেই। হেনার ওখানে গিয়ে গঙ্গাস্নান করব সর্বাগ্রে, তারপরে সামনে থাকবে সেই দূরবিস্তৃত আমবাগান। জনতার কোলাহল সেখানে নেই, দ্বন্দ্ব ও নিন্দা সেখানে ধূমায়মান নয়। বঞ্চিত জীবনের চিত্তক্ষোভ, নৈরাশ্যের হাহাকার, কূটনীতির কপটতা—এরা সেখানে নেই। সেই নিভৃতলোকের প্রাণগঙ্গায় অবগাহন ক'রে আমার বহু রাত্রির বিনিদ্র চক্ষে নামবে মধুর তন্দ্রা, এবং কে জানে, সেই তন্দ্রাবিলোল চক্ষে চেয়ে শুনব হয়ত ললিত কোমল কণ্ঠে মীরার ভজন!

এর আগে এই পথে এসেছিলুম তখন নববসন্তের বোধনের কাল। সে প্রায় দু'মাস আগেকার কথা। এখন প্রখর রৌদ্র ফুটেছে মাঠে ময়দানে। জিপগাড়িখানা দ্রুত গতিতে চলেছে, এবং এক সময়ে পাকা পথ ছেড়ে যখন মৃন্ময় মাঠের কাঁচা পথটিতে নেমে এল, তখন মাঠের ধুলো আর বাধা মানল না। ড্রাইভার একটু হেসে বলল, বড্ড ধুলো, এবার আপনার একটু 'তকলিপ' হবে, হুজুর।

আমিও নীরবে একটু হাসলুম। কিন্তু সে-হাসির অর্থ ভিন্ন প্রকার। মনে মনে বললুম, তুমি কি কখনও তীর্থপথে অভিযান করেছ ভাই? ধুলোয় আর কাঁকরে গড়াগড়ি দিয়েছ কখনও? কপালের ঘাম, চোখের জল আর মুখের ফেনা—কখনও কি গড়িয়েছে সেই আনন্দের যাত্রায়? তা হলে জানতে এও সেই তীর্থপথ! এই পথও গিয়ে পৌঁছবে সেই তারই তীর্থকুটীরপ্রান্তে,—যেখানকার গৃহাঙ্গনে আমার ঝঞ্চা-বিক্ষুব্ধ জীবনের একটি পরম আশ্রয় করুণ প্রেমের মতো দুবাহু বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ড্রাইভার, ধুলো তোমার কাছে শুধুই ধুলো: আমি দেখছি প্রতি ধূলিকণায় পরমানবিক শক্তি।

জঙ্গলের প্রান্তপথ অতিক্রম ক'রে আমরা এসে পৌঁছলুম সেই সুপরিচ্ছন্ন গ্রামে। হঠাৎ যেন চারদিকের পট-পরিবর্তন ঘটল। পাকা পথ মসৃণ, সুন্দর সবুজ খেলার মাঠ, শাদা রেলিং-ঘেরা স্বচ্ছ সরোবর, পুষ্পোদ্যানবেষ্টিত এক একটি বাড়ি, দূরে মস্ত এক ওয়াটার টাওয়ার, এখানে ওখানে সরকারি কর্মকেন্দ্র, সুসজ্জিত নরনারীর আনাগোনা, অদূরে একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র, আশে পাশে বড় বড় পাকা এ্যাসবেসটসঢাকা বাংলো। চারদিক যেন কর্মমুখর। আমরা যেন এক টুকরো আধুনিক সভ্যতার মাঝখানে এসে পৌঁছলুম।

এবার আর আমার অজানা কিছু নেই। হাস্যোৎসাহিত মুখে ড্রাইভারকে বলে দিলুম, ডান দিকের পথ ধরে সোজা গঙ্গার দিকে। গোটা কয়েক শাল-শিশমের ঝাপড়া জঙ্গল পেরোলেই আমবাগানের আরম্ভ। সামনেই খোলা গঙ্গা। তার আগে বাঁ হাতি দেওকীদের চালা পেরোলেই লতানে গোলাপ আর যুঁই ফুলের ঝাড়ঘেরা গোলপাতার চালা। কাছাকাছি গেলেই ভারি গলায় একটি কুকুর ডেকে উঠবে। ভয় নেই, কুকুরটি আমাকে চেনে। আমার ভারি অনুগত।

যথানির্দিষ্ট পথ ধ'রে গাড়ি এসে পৌঁছল সেই ঝাপড়া জঙ্গল ছেড়ে আম-

বাগানের ধারে। কাছাকাছি এসে গোলপাতার চালাটা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কই, কুকুরটা ত' ডাকল না? আমার গা যেন ছমছমিয়ে উঠল। দণ্ডকারণ্যে মায়ামৃগ পালিয়ে যাবার পর রামচন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছিলেন আশ্রমে সীতা-সকাশে!! তিনি দেখেছিলেন 'বামে সর্প, শৃগাল দক্ষিণে'। আমি দুটোর একটাও দেখতে পাইনি। সুতরাং গাড়ি থেকে নেমে এসে এদিক-ওদিক যখন সন্ধান করছিলুম সেই সময় হেনার ঘরের ভিতর থেকে দেওকী-বৌ বেরিয়ে এসে সসম্ভ্রমে আমাকে নমস্কার জানিয়ে খবরটা দিল।
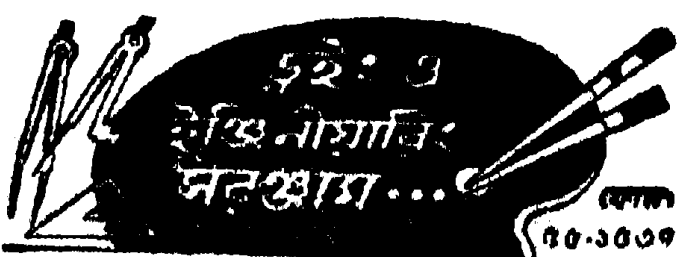
হেনা আজ প্রায় দেড় মাস হতে চলল এখান থেকে চলে গেছে এবং ফিরবে কিনা সেকথা ব'লে যায়নি। এ ঘরের সমস্ত সামগ্রী, এমন কি এই চালাঘরটি পর্যন্ত দেওকী-বৌকে সে দিয়ে গেছে! এখন কোথায় সে আছে দেওকী-বৌ জানে না! এই কিষেণগাঁওর লোকেরা হেনার অভাবে অতিশয় বিমর্ষ! কুকুরটিকে হেনা গ্রামান্তরে পাঠিয়ে দিয়ে গেছে!

জিপগাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে বড় সুটকেশটি খুলে একটি বাণ্ডিল বার ক'রে নিয়ে এলুম। ওর মধ্যে ছিল দেওকী ও তার মরদের জন্য শাড়ি ও ধুতী। কিছু মেয়েলি সামগ্রী, যৎকিঞ্চিত শুকনো খাদ্যবস্তু। বাণ্ডিলটা দেওকীর হাতে দিয়ে বললুম, এটি তোমাদের 'ইনাম'। মেমসাবের ইচ্ছা ছিল এগুলি তোমাদের জন্য আনি!

দেওকী-বৌয়ের হাসিমুখখানি আনন্দিত, কিন্তু হাতখানা আড়ষ্ট। সুতরাং ওটি দাওয়ার উপর রেখে আমি বিদায় নিয়ে এলুম। গাড়িতে ওঠবার আগে ড্রাইভারের কাছে ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে হল। অতএব এই গাড়িতেই আমি কানপুর ফিরে যাব!

গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরবার পথে দুজন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখে আমি গাড়ি থামালুম। এঁরা আমাকে দেখেই চিনলেন এবং সহাস্যে নমস্কার জানালেন। আমি আলগোছে হেনার কথাটা পাড়লুম। তাঁরা একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, ওঁর অসুবিধে হচ্ছিল প্রথম থেকেই। ওঁর নক্সার সঙ্গে এখানকার মিল ঘটেনি।

মিল ঘটেনি কেন?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, আমরা এখানে দিল্লীর নির্দেশ কতকটা মেনে চলি। কিন্তু উনি বলেন, স্থানীয় জন-সাধারণের প্রয়োজনের দিকে চোখ না রাখলে শুধু নির্দেশ পালন অর্থহীন। চাকরি আর জনকল্যাণকর্ম এক বস্তু নয়!

আমি চুপ ক'রে ছিলুম। দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন, কি জানেন, প্রতিভার পথ চলতি বিধি-নিয়মের বাইরে যায়। সেই জন্য পদে পদে প্রচলিত শাসন শৃঙ্খলার সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধে। একদিন হঠাৎ আমরা শুনলাম দেবীজি নেই। এখানকার একজন বিশিষ্ট এবং প্রতিভা-শালী কর্মী মণিপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেছেন।

এখন তাঁরা কোথায়?

আমরা ঠিক জানিনে, তবে শুনে-ছিলুম তাঁরা গেছেন মধ্যভারতে। ওই-দিকেই যেন কোথায় মণিপ্রসাদের দেশ।

আমি একটু থমকিয়ে মাথা নিচু করেছিলুম। প্রথম ভদ্রলোকটি বললেন, মণিপ্রসাদকে আপনার মনে থাকার কথা নয়। তবে এখানে যেদিন আপনাকে সংবর্ধনা দেওয়া হল, সেইদিন সব চেয়ে বেশী উৎসাহী ছিল মণিপ্রসাদ। সেই আপনাকে গাড়ি ক'রে ঘোরায়। ছেলেটি দেখতেও যেমন, স্বভাবটিও তেমনি মিষ্ট। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাকেও এখানে রাখতে পারলুম না!

সহাস্যে নমস্কার জানিয়ে আমি ওঁদের কাছে বিদায় নিলুম। অপরাহ্ন-কালে শেষ চৈত্রের প্রখর রৌদ্র ধু-ধু করছে চারদিকে। জিপগাড়ি সেই ধূলিধূসর মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটল পাকা রাস্তার দিকে। এখান থেকে কানপুর স্টেশন অনেক দূর। দিল্লীর গাড়ি রাত্রের দিকে।

প্রান্তরের ঘূর্ণীধূলির উপর নীল-বেগনী মিলানো একপ্রকার বাষ্পধূমে যেন বীভৎস একটা প্রেতচ্ছায়ার প্রতি আমার তাপদগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। কান পেতে শুনলুম আমারই বুকের মধ্যে নবেন্দুর অশ্রুসজল আর্তকণ্ঠ ধ্বনিত-প্রতি-ধ্বনিত হয়ে উঠল: ভাগ্যের দোষে যে বন্ধু পা পিছলে নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে, তাকে তোমরা টেনে তুললে না,— বরং লাথি মেরে আরও নিচে নামিয়ে দিলে। একে কালচার বলে না, পার্থ। বলে না......বলে না! তুমি বললেও না, হেনা বললেও না।

ড্রাইভার ঠিক পথেই যাচ্ছিল। তবু সময়টাকে মনে হচ্ছে যেন অন্তহীন কাল। অবশেষে যখন স্টেশনে এসে পৌঁছলুম, তখন নিজেকে মনে হতে লাগল ভাগ্য-বিড়ম্বিত, উপেক্ষিত, এবং অপমানিত।

(ক্রমশ)

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসার ধারা

বিশ্বনাথ রায়

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটছে, তখন অতীতের দিকে তাকানো আপাত-দৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হবে। বর্তমান বিজ্ঞানে চিকিৎসার উন্নতিও হয়েছে প্রচুর। কিছুকাল আগেও যে রোগ চিকিৎসার বাইরে ছিল আজ তার নিরাময় চিকিৎসকের করায়ত্ত। তাই এ যুগে বসে প্রাচীনকালের কথার কিছু তাৎপর্য আছে কি না এ কথা মনে হতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস দেখলে শুধু এই কথাই মনে হয়, আমরা পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে শিক্ষিত হয়ে সামাজিক ছন্দ হারিয়ে ফেলছি। আমরা ইংরেজী বিদ্যায় শিক্ষিত, ইংরেজী শিক্ষাধারায় চিকিৎসা করি, কিন্তু আমাদের দেশের লোক ভারতীয়। তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের ভাবধারা মিল খায় না, তাই অহেতুক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সেই কারণে নিজের দেশকে জানার জন্যে অতীতচর্চা একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয়। প্রবন্ধের শিরোনামা দেখলে বোঝা যাবে একটি বিশেষ দিকেই এখন আমরা আলোচনা করছি।

ছাত্র-নির্বাচন থেকেই শুরু করা যেতে পারে। বর্তমান কালে চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্র-নির্বাচন হয় সর্বপ্রথম পরীক্ষার নম্বর দেখে। বিগত পরীক্ষায় যদি খুব ভাল নম্বর ওঠে, সে ছাত্রের ভর্তির সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। দ্বিতীয় বিবেচনা—অভিভাবকের অর্থ-নৈতিক অবস্থার মান। অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না থাকলে সহজে চিকিৎসা-শিক্ষায় প্রবেশ করার সুযোগ পাওয়া যায় না। এবং এই দুইটি ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলে তবে ছাত্র বা ছাত্রীরা সাধারণতঃ চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে অনুমতি পায়।

প্রাচীনকালেও সেই একই পদ্ধতি ছিল। ছাত্র গৌরবর্ণ, উন্নতনাশা, দৃঢ়চেতা, উচ্চবংশজাত না হলে সেকালে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের অনুমতি পেতেন না।

বর্তমান কালের সবচেয়ে সমস্যা তরুণ চিকিৎসকের, ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান ছাড়া কোন তরুণ চিকিৎসক উপযুক্ত গুরুর শিষ্যত্বলাভ করতে পান না। অন্ধের মত তার পুঁথিগত বিদ্যা সম্বল করে সমাজের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। তারপর বহু ভ্রান্তি, বহু প্রবঞ্চনা, বহুতর অভিজ্ঞতার মূল্যে দিয়ে যখন তিনি পাকা চিকিৎসক হয়ে ওঠেন, তখন জীবনের সায়াহ্ন সামনে উপস্থিত। মনে কর্মের উদ্দীপনা স্তিমিত, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন ম্লান। দৈনন্দিন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে মন ক্ষতবিক্ষত, তিক্ত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির লেশমাত্রও থাকে না। রোগী, রোগ ও অর্থের মধ্যে একটি আঙ্গিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চিকিৎসক প্রায় ভুলতে বসেন, তিনিও একজন সাধারণ সামাজিক মানুষ। এই নিঃস্পৃহ যোগাযোগ আমাদের সমাজে পীড়াদায়ক।

অতীত-ভারতের চিকিৎসাধারার দিকে তাকালে ভারতীয় সভ্যতার আলো বেশ ভালভাবে চোখে পড়ে। অতীত-ভারত বলতে হিন্দু-সভ্যতা কালের কথা বলছি। সে সময়ে তক্ষশীলা, বারাণসী ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপনা হত। তখনকার কালের ছাত্র-নির্বাচনের পদ্ধতি খানিকটা পূর্বেই বলা হয়েছে। ঐ ভাবে নির্বাচন করে শতকরা কুড়ি থেকে ত্রিশ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হত। নির্বাচিত ছাত্রদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হত এবং প্রত্যেকটি দলের জন্য একজন গুরু থাকতেন। তিনি তাদের সর্বতোভাবে শিক্ষা দিতেন এবং তাঁরই অনুমোদনের পর রাজা তাদের চিকিৎসা করবার অনুমতি দিতেন। চিকিৎসা শিক্ষাদানের পদ্ধতির দিক দিয়ে সেযুগে প্রধানত হাতে-কলমে (প্রাক্‌টিক্যাল) শিক্ষারই আদর ছিল।

অত্রির সন্তান আত্রেয় ছিলেন সে যুগের একজন দিকপাল চিকিৎসক। তাঁর ছাত্রদের কাছে তিনি প্রায়ই নানা-রকমের পরীক্ষা নিতেন। ছাত্রদের শিক্ষা-দানের শেষে বলতেন, বন থেকে যে কোন বস্তু নিয়ে আসতে। তবে একটি সর্ত। যা আনবে, তা চিকিৎসা ব্যাপারে কাজে লাগাতে হবে। বিফল হলে শিক্ষায় অকৃতকার্য হবে। ছাত্ররা নানারকমের ওষধি চয়ন করে আনতো, এবং তার প্রত্যেকটিই কোন না কোন ওষুধের কাজে লাগতো। একদিন আত্রেয়র সর্ব-প্রিয় ছাত্র জীবক, অনেকগুলি গাছ-গাছড়া আনেন। তার সঙ্গে একটি দড়ি আনেন এবং আত্রেয়র সামনেই দড়িটিতে একটি গিঁট দিয়ে ফেলেন। আত্রেয় প্রশ্ন করেন, এই গিঁট চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি কাজে লাগবে? জীবক নিরুত্তর। কোন উত্তর খুঁজে পান না তিনি এবং কিছুতেই ঐ গিঁটটিকে কোন কাজে লাগাতে পারেন না। আত্রেয় নিজে ফাঁসটি পরীক্ষা করে বলেন, এটা তো অনায়াসে কাজে লাগানো যায়। যদি কোন লোককে সাপ অথবা কোন বিষাক্ত কীটে কামড়ায় তাহলে এই ফাস দিয়ে বাঁধলে, বিষ আর উপরের দিকে উঠতে পারে না। এই ফাঁস-গেরোই বর্তমানকালের 'রিফ্‌ নট্‌'। জীবক পরবর্তীকালে গৌতম বুদ্ধের দেহ-চিকিৎসক হয়েছিলেন।

কার্যকরী পরীক্ষার পর পুঁথিগত বিদ্যার পরীক্ষা হত। অধ্যাপক একটি শলাকা নিয়ে ছাত্রদের সামনে দাঁড়াতেন। ছাত্ররা সামনে সারি বেঁধে বসতো। অধ্যাপক সেই শলাকা দিয়ে বেদের যে কোন পাতা খুলে দিতেন। যে পাতা বেরিয়ে পড়ত, সেই পাতা থেকে পরীক্ষা দিতে হত। সর্বরকম পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে পরীক্ষক কৃতী ছাত্রের নাম রাজার কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং রাজা সর্বসমক্ষে তাঁকে প্রকৃত চিকিৎসক বলে স্বীকার করে নিতেন। এই সমাবর্তন উৎসবে বিদায়ী ছাত্রদের শপথ গ্রহণ করতে হত। অধ্যাপক তাঁর শপথ-লিপিকা উচ্চৈস্বরে পাঠ করতেন এবং ছাত্ররা সেই মত প্রতিজ্ঞা করতেন। চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ সকলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তেন,—যদি তুমি অর্থ, যশ এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ-লাভের বাসনা করে থাক, তাহলে চিকিৎসক হিসাবে, গো, ব্রাহ্মণ, পশু-পক্ষী প্রত্যেকেরই চিকিৎসার বিধান করবে। তুমি ব্যক্তিগত কারণে যতই ব্যস্ত থাক না কেন, তোমার রোগীর যন্ত্রণা ও ক্লেশ দূর করবার জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করবে। রোগীর মনকে কোন কারণেই, কোনরূপ আঘাত দেবে না। মনে থাকে যেন চিকিৎসকের কাছে রোগীই সর্ব-প্রথমে বিবেচ্য, তারপর তার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা। চিকিৎসা বিষয়ে কোনরূপ জাল-জুয়াচুরির কল্পনাও করবে না।

তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-ব্যবহার যেন অত্যন্ত রুচিশীল হয়। মাতাল অথবা দুশ্চরিত্র হবে না অথবা দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে কখনও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবে না। সর্বদা ভদ্রভাবে, সত্য, ন্যায় এবং মিষ্ট কথা বলবে।

কোন গৃহে বিনা আহ্বানে যাবে না। নিজের জ্ঞানের বিষয় দম্ভ প্রকাশ করবে না। কোন বাড়িতে সেই বাড়ির লোক ছাড়া একা প্রবেশ করবে না। গৃহস্বামীর অবর্তমানে কোন মহিলার সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। রোগীর অবস্থা শোচনীয় হলেও সে বিষয় রোগীকে কিছু বলবে না এবং তাকে জীবন-বিষয়ে হতাশ করে দেবে না। কোন গৃহে গিয়ে সেই বাড়ির মহিলা এবং পরিচারিকাদের সঙ্গে কোনরূপ হাসি-তামাসা করবে না। কোন নারীকে তার নামের পূর্বে শ্রীমতি প্রভৃতি যুক্ত না করে শুধু নাম ধরে ডাকবে না। তাদের সঙ্গে কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা করবে না। স্মরণ রেখ, তার গৃহের সমস্ত সম্মান তোমার উপর ন্যস্ত।

শপথের শেষ অংশে চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ বলতেন, চিকিৎসকের পোষাক শ্বেতবর্ণের হওয়া উচিত। চুল এবং নখ সর্বদা ছোট ছোট করে কাটবে। অন্য চিকিৎসকের সঙ্গে কোনরূপ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হবে না। প্রত্যেকে চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রত্যেকের সহযোগিতা করবে।

শপথ গ্রহণের শেষে রাজা প্রত্যেককে চিকিৎসক আখ্যা দিতেন।

চিকিৎসাবিষয়ে সে যুগের পাঠ্যগ্রন্থ ছিল আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে বহু মত আছে। কেউ বলেন ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদের জন্মদাতা। ধন্বন্তরী সুশ্রুতদেবের গুরু ছিলেন। ধন্বন্তরী তার বিদ্যার পুঁজি সুশ্রুতকে দান করে যান এবং সুশ্রুত নিজের বিদ্যা তাতে সংযোজন করে সুশ্রুত-সংহিতা রচনা করেন। চরকের মত, তার গুরুদেব ভরদ্বাজই হলেন প্রথম মানুষ যিনি আয়ুর্বেদ ইন্দ্রের কাছ থেকে পান। ভরদ্বাজের কাছ থেকে আত্রেয় আয়ুর্বেদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন এবং আত্রেয় তার শিষ্যদের মধ্যে ঐ জ্ঞান বিতরণ করে দেন। আত্রেয়র প্রধান শিষ্য ছিলেন অগ্নিবেশ। এই অগ্নিবেশের কাছ থেকেই চরক আয়ুর্বেদের বিষয় জ্ঞাত হন এবং পরবর্তীকালে নিজের জ্ঞানের সংযোজনে চরক-সংহিতা রচনা করেন।

সুশ্রুত সে যুগের শ্রেষ্ঠ শল্য-চিকিৎসক ছিলেন। সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসায় রোগীকে অজ্ঞান করার ওষুধ ব্যবহার করতেন এবং সে ওষুধ গাঁজা জাতীয় মাদকদ্রব্য থেকে তৈরী করা হত। তিনি কুড়ি রকমের ধারালো এবং একশো রকমের ভোঁতা অস্ত্র ব্যবহার করতেন। ধারালো অস্ত্রের নাম ছিল শস্ত্র এবং ভোঁতা অস্ত্রের নাম যন্ত্র। তাছাড়া পাঁচ প্রকারের ছুঁচও তিনি ব্যবহার করতেন। সেলাইয়ের জন্য সাধারণত ঘোড়ার লেজের চুল, চামড়ার টুকরো এবং পশু-অন্ত্রের ফালি ব্যবহার করতেন। অস্ত্র-শল্যে তিনি যে বিধিব ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, আজও তা ভাবতে বিস্ময়কর মনে হয়। বর্তমানকালের সার্জন অন্ত্র অপারেশনের জন্য অ্যাট্রমাটিক্ নিডল্ ব্যবহার করেন। তা না হলে অন্ত্রের কোমল অংশ নষ্ট হয়ে যায়। সুশ্রুতের অন্ত্র-সেলাই-পদ্ধতি ছিল ভারি অদ্ভুত ধরনের। তিনি অনেকগুলো জীবন্ত কালো ডেঁয়ে পিঁপড়ে সংগ্রহ করতেন। তারপর কাটা অন্ত্রের ক্ষতমুখের দুটি দিক [illegible] তেন এবং জোড়ের মুখে পিঁপড়ে ছেড়ে দিতেন। পিঁপড়েগুলো তাদের স্বভাবধর্ম অনুসারে জোড়ের মুখে কামড়ে ধরতো। এইভাবে ভালো ক'রে কামড়ে ধরার পর, তিনি পিঁপড়েগুলোর কোমরের অংশ থেকে তাদের মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিতেন। ফলে মরা পিঁপড়ের মুখের দিকটা ক্লিপের মতো অন্ত্রের জোড়ায় আটকে থাকত।

সেযুগে ভেষজ বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। অনুরাধাপুরে বৌদ্ধযুগে একটি বিরাট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে চিকিৎসার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। অন্য রোগ তো বটেই, ক্যাস্টেলানী সাহেবের মতে, তখন দুরারোগ্য বসন্ত রোগেরও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা ছিল।

সত্যামৃত

সবিনয় নিবেদন,

৬ষ্ঠ সংখ্যা 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীসলিল বসু লিখিত 'রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগ' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কিছু বলার আছে।

রবীন্দ্রনাথের 'নমো যন্ত্র' গানটি সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে যে এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ নাকি যন্ত্রের প্রশস্তি করেছেন। উপরোক্ত প্রবন্ধের লেখককে এই ভ্রমাত্মক ধারণা প্রবন্ধাকারে প্রচার করতে দেখে বিস্মিত হলাম।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সংস্কারমুক্ত করার জন্য বিজ্ঞান চর্চাকে স্বাগত জানিয়েছেন—তার স্বাক্ষর পাই আমরা 'বিশ্ব পরিচয়' পুস্তক রচনায়; কিন্তু বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে তিনি যে সমদৃষ্টিতে দেখেছিলেন—একথা বলেননি।

'যন্ত্র' শব্দটি বাংলায় ব্যাপক অর্থ বহন করে। সব সময় যন্ত্র শব্দটি যে বিজ্ঞানের পরিপূরক তা নয়। প্রস্তর যুগের মানুষের হাতিয়ার গুলিকেও যন্ত্র নামেই অভিহিত করতে হয়—কিন্তু এই যন্ত্র ব্যবহারকারী প্রাগৈতিহাসিক মানবের বুদ্ধির বিকাশকে বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা তা নৃতত্ত্ববিদ বলতে পারবেন।

'নমো যন্ত্র' গানটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মোটেই যন্ত্রবন্দনা করেননি—গানটির আকরগ্রন্থ 'মুক্তধারা' নাটকের মূল ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়। অম্বা, বটুক আর শিবতরাই-এর প্রজাদের নিবিড় বেদনায় প্রভাবিত না হয়ে—উত্তরকূটের নাগরিকদের সমর্থিক জয়োচ্ছ্বাসকে রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠচিত্তবন্দনা বলবার সময় লেখক নিজেও দ্বিধামুক্ত ছিলেন না—যে জন্য তিনি গানটি উদ্ধৃত করবার সময় সযত্নে তৃতীয় পংক্তিটি বাদ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যদি স্বয়ং যন্ত্রকে বন্দনা করতেন—তাহলে নিশ্চয়ই তাকে 'বস্তু বিশ্ববক্ষদংশ ধ্বংস বিকট দন্ত' বলে বর্ণনা করতেন না। তাছাড়া কবির দুই সহস্রাধিক গানের মধ্যে আর কোন গানেও যন্ত্রবন্দনা দেখি না।

আলোচ্য গান, তথা নাটকটি রচনা করবার সময় তার তৎকালীন মানসিকতা ও চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করা একান্তই প্রাসঙ্গিক। ১৩২৮ সালের ৪ঠা মাঘ কবি একটি পত্রে লেখেন, 'আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলাম—শেষ হয়ে গেছে তাই আজ ছুটি—এর নাম 'পথ'।' এই 'পথ' নাটকটিই পরে 'মুক্তধারা' নামে পরিচিত হয়। এই সময় কবির মন একটি বিশেষ সুরে বাঁধা ছিল। তাই দেখি ১৩শে ফাল্গুন তিনি লিখলেন,—

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে
যাই চলে যাই মুক্তি সুখে

ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে।
আবার ঐ দিন লিখলেন,

ফিরে চল মাটির টানে,

যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে। এছাড়া আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—১৩২৯ সালের গোড়ার দিকে হলকর্ষণ স্থাপন উপলক্ষে তিনি লিখলেন, 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল'—কলেরায়, পরবর্তীকালে একই উপলক্ষে লিখলেন, 'হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল'। এটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, কবি মানুষের কল্যাণে যন্ত্রনিয়োগ সমর্থন করলেন কিন্তু সেই যন্ত্রের জয়গানে মুখরিত হলেন না। এমতাবস্থায় 'নমো যন্ত্র' গানটিকে কবির যন্ত্র-বন্দনা বলার কোন সঙ্গত যুক্তি নেই।

বিনীত নমস্কারান্তে—
শৈলেন ঘোষ, কলিকাতা।

ইনি হাল ছাড়েননি...

১৯৫৮ সালে জামশেদপুরের নতুন ব্লাস্ট ফার্নেসটির জন্যে একটা 'বড় ঘণ্টার' দরকার হয়। এই ২০ টন ওজনের জিনিসটি তৈরী করতে যে উঁচু ধরণের ঢালাই ও মেশিনিং-এর প্রয়োজন ছিল তা উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পেলেও করা খুবই শক্ত হোত। কিন্তু ১৯৫৮ সালে আমাদের দেশে সেই সব যন্ত্রপাতি পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই প্রায় সবাই যখন বড় ঘণ্টাটি বাইরে থেকে আমদানী করা ছাড়া গত্যন্তর নেই ব'লে ধরে নিলেন তখন একজন তাতে সায় দেননি। ইনি একজন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, কুশলী, তরুণ ইঞ্জিনীয়ার—এঁর নাম এন. পি. নায়েক।

প্রতিদিন কারখানার কাজের পর অবসর সময়ে এ বিষয়ে কাজ করতে করতে নায়েক ক্রমশঃ ঘণ্টাটির মাপজোখের হিসেব ও নকশা তৈরী ক'রে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু ক'রে একটা ছোট বোরিং মেশিনকে অদল-বদল ক'রে এই কাজটি করবার মত একটা নতুন যন্ত্রও তৈরী করলেন। এবার ঢালাই ও জটিল মেশিনিং-এর কাজ শুরু হল এবং অল্পকালের মধ্যেই নায়েক ও তাঁর সহকর্মীরা একটি 'বড় ঘণ্টা' তৈরীতে কৃতকার্য হলেন, যা নির্ধারিত মাপজোখ অনুযায়ী একেবারে নিখুঁত। নায়েকের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার জন্যে টাটা স্টীল তাঁকে ১০,০০০৲ টাকা পুরস্কার দিলেন। কারখানার কর্মীদের ভেতরে নতুন প্রেরণা জাগাবার জন্যে টাটা স্টীলের গত দশ বছরের যে পরিকল্পনা চালু ছিল, এইটিই সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

নায়েকের মত লোকেরা জামশেদপুরের একটি চমৎকার ঐতিহ্যের ধারা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন যা জামশেদজী টাটার এই উৎসাহদীপ্ত বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়: "ভারতীয়গণ নিজেরাই কাজ করতে শিখুক"।

জামশেদপুর

ইস্পাত নগরী

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 5095

প্রতিবেশী সাহিত্য

।। পাঞ্জাবী গল্প ।।

॥ ভূমিকা ॥

(পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব বীর-প্রসবিনী। বার বার বৈদেশিক শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে এই বীরদের। তাই ভারতের সবচেয়ে রণাঙ্গভূমি হয়েছে এই পাঞ্জাব। বৈদেশিক আক্রমণ, পাঞ্জাবী ভাষা সম্পর্কে ইংরেজদের নীতি, বিভিন্ন ধরনের পাঞ্জাবীলিপি প্রভৃতির ফলে পাঞ্জাবী সাহিত্যের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে পাঞ্জাবী সাহিত্যের নবযুগের শুরু। সেই কালান্তরের পর্যায় আজও চলেছে। গত এক শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় ভাবধারা ও রহস্যবাদের মূল সুরটির মধ্যে বাস্তববাদ আর প্রগতিশীলতার যে একটি সুর মাথা তুলবার চেষ্টা করে আসছিল, গত পনের বছরে তার সুস্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ আত্ম-প্রকাশ দেখতে পাই পাঞ্জাবী সাহিত্যে। আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের বহ্নি-জ্বালা পাঞ্জাবকে বিধ্বংস করায়, পাঞ্জাবী জীবনকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দেওয়ায়—পাঞ্জাবী সাহিত্যে তা একটা নূতন ধারার সংযোগ সাধন করে গেছে। তাই আজিকার পাঞ্জাবী সাহিত্য কর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং আরও জীবনধর্মী।

আধুনিক পাঞ্জাবী কথাসাহিত্য বলতে ছোটগল্পের কথাই সর্বাধিক উল্লেখ্য। এই সাহিত্যের কবিতা ও উপন্যাসের তুলনায় এই বিভাগটি অনেক সমৃদ্ধ। সর্দার গুরুবক্স সিং, অমৃত প্রীতম, সন্তসিং সেখোঁ, কর্তারসিং দুগ্গল, দেবিন্দর সত্যার্থী, সুজান সিং, নওতেজ সিং প্রমুখ প্রবীণ-নবীন বহু লেখকের নাম উল্লেখ্য।

আধুনিক কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই শ্রীমতী অমৃত প্রীতমের নাম করতে হয়। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পও যেন এক-একটি হীরের টুকরো। আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তাঁর মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। মনের এই ব্যথা—সূক্ষ্ম মানবীয় অনুভূতি, লালিত্য ও উপস্থাপনার মুন্সীয়ানার ফলে তাঁর অধিকাংশ গল্প ও কবিতায় রূপ পেয়েছে। ১৯৫৬ সালে অমৃত প্রীতমকে তাঁর কবিতাসংগ্রহ 'সুনেহুড়ে'র জন্য সাহিত্য আকাদেমীর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।

—অনুবাদক)

আদিম রিপু

রচনা : অমৃত প্রীতম

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

লোকটা আমাদের আপিসেই চাকরী করছিল। ছ মাসও হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য, তার সম্পর্কে সকলের মনেই একটা কৌতূহল। লোকটা কারো সংগে কথা বলেনি। আর যদিও দু-একটা কথা বলেছে তা আপিসের কোন কাজে ঠেকে। ক্যান্টিনে একা সে বসত। কত লোকে কথা বলে সেখানে, কিন্তু সে থাকত নীরব। জগতের সাতে-পাঁচে সে নেই। প্রায় মাথা নীচু করে থাকত। যতবার তার চোখের দিকে তাকিয়েছি ততবারই লক্ষ্য করেছি তার চোখ গরুর চোখের মত নির্বিকার। তার চোখে কোন ভাষা নেই। মাঝে মাঝে তাকে দেখে মনে হয় সে যেন পাথর বনে গেছে।

তার গায়ের রঙ আর স্বাস্থ্য সাধারণ লোকের চেয়ে সুন্দর। আমাদের মেয়ে-মহলেও তার কথা কয়েকবার উঠেছিল। কিন্তু ওঠাই সার। তার সম্পর্কে বেশী কিছু কেউ বলতে পারত না। মহিলা-মহলে তার প্রসঙ্গ বুদ্বুদের মত উঠত, আর পরমুহূর্তেই মিশিয়ে যেত।

কালেভদ্রে সে আমার হাতের বই বা পত্র-পত্রিকা চেয়ে নিত। কিন্তু কোনদিন কোন বইয়ের সম্পর্কে মন্তব্য করতে শুনিনি। তাকে দেখে আমার মনে হত সে যেন সংসার-সমুদ্র অনেক কষ্টে সাঁতরে পেরিয়ে এসেছে। তার জামা-কাপড় এখনও ভিজে। তার গায়ে লোনা জল আর মিঠে মাটির গন্ধ।

আমাদের ক্যাণ্টিন ভেঙে গড়া হচ্ছে। অনেকে নিজের সিটে চা আনিয়ে খেত। অনেকে ক্যান্টিনের আশেপাশে দাঁড়িয়ে গরম চা খেত। একদিন সেও দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। অদূরে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। আমার হাতে একটি পত্রিকা। সে ঐ পত্রিকা চাইল। হাতে নিয়ে নব-বিবাহিতদের পাতা খোলার পরমুহূর্তেই তার হাত থেকে চায়ের কাপটি পড়ে গেল। সেও ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল। আমরা সবাই হৈ-চৈ করে তাকে তুলে এনে আপিসে বসিয়ে বাতাস করলাম।

কিছুক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফেরার পর বললাম, আপনার শরীর ভাল নেই, আপনি বাড়ি চলে যান।

—ঐ পত্রিকাটা একটু নেব?

—নিন।

—একটা ছবি কেটে নেব?

—কাটতে পারেন। পত্রিকাটাই নিয়ে যান না।

পরের দিন সে আপিসে আসেনি, তার পরের দিনও না। অনেক দিন পরে শুনলাম চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়েছে।

এই ঘটনার এক মাস পরে আমি একটা চিঠি পেলাম। তাতে লেখা আছে:

'আপনার হাত থেকে যে পত্রিকাটি নিয়েছিলাম তাতে আমার সন্তানের মায়ের ছবি ছিল। গত মাসের আগের মাসের বাইশ তারিখে তার বিয়ে হয়েছে। ছবিতে তাকে সুন্দর দেখায়, কিন্তু আমি জানি কোন ছবিতেই তার সৌন্দর্য ধরে রাখা যায় না। আমার চোখে কবিতা আছে, ক্যামেরার চোখে তো তা নেই। তাকে দেখে মনে হয়েছিল যেন স্বপ্ন দেখছি।

'মাঝে মাঝে আমি আমার বাচ্চাকে দেখতে পাই। আমি অবশ্য নিজের চোখে তাকে কোনদিন দেখিনি। কিন্তু আমার কল্পনায় আমার বাচ্চার মায়ের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ ঐ শিশুর মধ্যে প্রতি-ফলিত হয়। কাজল টানা ডাগর চোখ। ঠোঁট আরক্তিমতায় ভরা। আমাকে যেন শিশুটি ডাকছে 'পাপ্পা' বলে। তারপর আমি যখন ঐ শিশুকে ধরতে যাই—সেই মুহূর্তেই যেন তার শরীর বেয়ে রক্তের ধারা নামে। কিছুক্ষণ পরে আর আমি আমার শিশুর শরীরকে হাতের মধ্যে পাই না। শিশুটি আর শিশু নেই, রক্ত হয়ে গেছে। আমার হাত রক্তে থপ্ থপ্ করছে।

'আমি যেন শুনতে পাই আমার বাচ্চার মা আমার শোয়ার ঘরের দরজায় খট-খট করে আওয়াজ করছে। রাত্রের

অন্ধকারে, কালো মাটির উপর গুটি গুটি পা-পা করে এসে আমার ঘরে ঢুকছে।

'আমি টের পাই না কখন আমি স্বপ্ন দেখছি—আমি জানি না আমি কখন ঘুমিয়ে থাকি, কখন থাকি জেগে। আমার বাচ্চার মা মাঝে মাঝে আমার হাত জড়িয়ে ধরে পায়ে মাথা কোটে। আমি আমার দুই হাত প্রসারিত করে তাকে আলিঙ্গন করি, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। আমার শরীর কেঁপে ওঠে। আমার রক্ত খরস্রোত হয়। আমার শিরা-উপশিরা-গুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমি নিজেকে ...জানি না আমার জীবনটা কেন এমন হোল......জানি না জীবন আমার সঙ্গে কেন এই ধরনের রসিকতা করল।......তাও একবার নয়—দু-দু বার।

'আজ থেকে পনের বছর আগে আমি এক সুন্দরী তন্বীকে বিয়ে করে-ছিলাম। অনেকেই তাকে বিয়ে করবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর বিয়ে হল আমার সঙ্গেই। আমি যেন আকাশের চাঁদকে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পেলাম। ওকে নিয়ে ভালভাবেই ঘর করছিলাম। প্রায় মনে হত অনেককে হারিয়ে দিয়ে আমি এমন সুন্দর বউকে পেয়েছি! কিন্তু অত সুখ ভাগ্যে সইল না। তিন মাস পরেই এমন জায়গায় চাকরী বদলি হয়ে গেল যেখানে বউকে নিয়ে যেতে পারি না। সেখান থেকে তিন দিন অন্তর বউয়ের কাছে চিঠি লিখতাম। চিঠির মধ্যে আমি নিজেকে উজাড় করে মেলে ধরতাম। উত্তরগুলো অবশ্য অনেক প্রতীক্ষার পরে পেতাম। আট মাস পরে বাড়ি ফিরলাম। গভীর রাত্রে বউ স্বপ্ন দেখছে। বউয়ের মুখে শুনলাম অন্য এক পুরুষের নাম। বুকটা ধক করে উঠল। কানে কে যেন বিষ ঢেলে দিয়েছে. মাথা ঘুরছে। নিজের কানকে অবিশ্বাস হচ্ছে। নিজের অস্তিত্বের ওপরেও সন্দেহ জাগছে। কিছুদিন পরে বউ মনের কথা বলে দিল। আমাকে তালাক দিল।

'আমার স্বপ্নের অমন সুন্দর রেশমী শাড়ীকে ইচ্ছে করলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারতাম, ওর তালাককে অস্বীকার করে ওকে নাস্তা-নাবুদ করে ছাড়তে পারতাম। আমি পুরুষ, পুরুষের রাজত্বে আমার শক্তি কম নয়। কিন্তু আমি তা করিনি। কারণ সেই রেশম বস্ত্র ছিঁড়লেও আমি নিজের হাতে পাব একটা টুকরো, সম্পূর্ণ শাড়ীটা তো আর পাব না। তাই মেনে নিলাম তার তালাক। তাকে স্বাধীনতা দিলাম।

'তারপর আর বিয়ে করতে ইচ্ছে করল না। চাকরী করে মাসে আটশো টাকা পেতাম। সব টাকা উড়িয়ে দিতাম মেলা করে। খুব নেশা করতাম। ভুলেও কোন তন্বীর মুখের দিকে তাকাতাম না। তবে যদিও বা চোখ পড়তো তৎক্ষণাৎ বোতলের পর বোতল মদ খেয়ে তাকে ভোলবার চেষ্টা করতাম। এক হোটেলে বেশী দিন খেতাম না। নামীদামী হোটেলে যেতাম। অথচ সেখানে নাচ দেখতাম না।

'এইভাবে বছরগুলো কেটে যেতে লাগল। অনেক দূরের এক শহরে আমার বদলি হয়ে গেল। তারপর লড়াইয়ের সময় আমার একটি পা এমনভাবে ভেঙে গেল যে দীর্ঘ ছয় মাস হাসপাতালে কাটাতে হল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পেনসন পেয়ে গেলাম।

'আমার মা আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবাও মারা গেলে। ভাইগুলো বিভিন্ন জায়গায় চাকরী করছে। হাসপাতালে ছ মাস মদ খেতে পারিনি। ছাড়া পেয়ে আর খাইনি।

'যে কথা বলছিলাম। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যে ঘরে উঠেছি তার পাশেই ছিল বিরাট এক বাড়ি। এক পুলিশ অফিসারের বাংলো। তার বাগানে নানা ঢংয়ের এবং রঙের ফুল। সুন্দর সুন্দর গাছগুলো যেন তার বাড়িকে ঘিরে রেখেছে। ঐ ফুল গাছের ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে আসে আমার ঘরে।

'আবার আমার ভাগ্যে স্বপ্ন নামল। আমার ঘরের জানলার সামনে পড়ে ঐ বাংলোর একটি জানলা। ঐ জানলা যে ঘরের সেই ঘরে থাকে ও বাড়ির একটি সুন্দরী মেয়ে। ঐ জানলাকে ঘিরে পদা ... আছে ছোট ছোট কয়েকটি ফুলের লতা। মাঝে মাঝে সুযোগ পেয়েছি মেয়েটিকে দেখার।

'কতবার নিজের চোখকে সংযত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। বার বার আমার চোখ ঐ জানলার উপরে নিবদ্ধ হত। মাঝে মাঝে রাত্রে আমার ঘুম হত না—মাঝরাতেও উঠে পড়ে ঐ জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। নিজের ঘরের আলো নিবিয়ে দিতাম যাতে ঐ তন্বী আমার চোখের আগুন দেখতে না পায়।

'তারপর এক নওজোয়ান ও-বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগল। মেয়েটির ঘরেও তাকে ঢুকতে দেখেছি। তার উপস্থিতিতে মেয়েটির হাসি শুনেছি। প্রাণ খুলে সে হাসতে পারে। আমার বুক গুঁড়িয়ে যেত। মেজাজ বিগড়ে যেত। তার হাসি অসহ্য। কানে আঙুল দিয়ে মাথা নীচু করে ঘরে বসে থাকতাম।

'এই ঘটনার কিছুদিন পরে দেখলাম ঐ ঘরে একটি লেডী ডাক্তার ও নার্স ফিস-ফিস করে কথা বলছে।

'কতবার ভেবেছি ঐ তন্বীর দিকে তাকালে মন কেন এত মোচড় খায়।
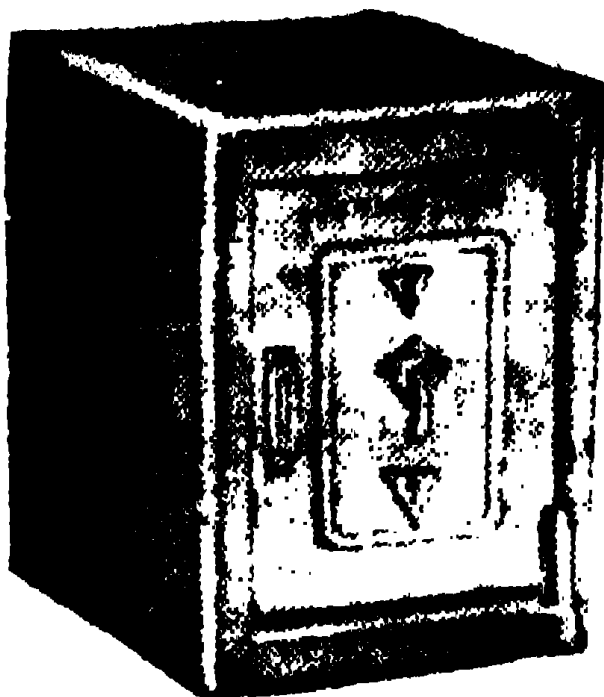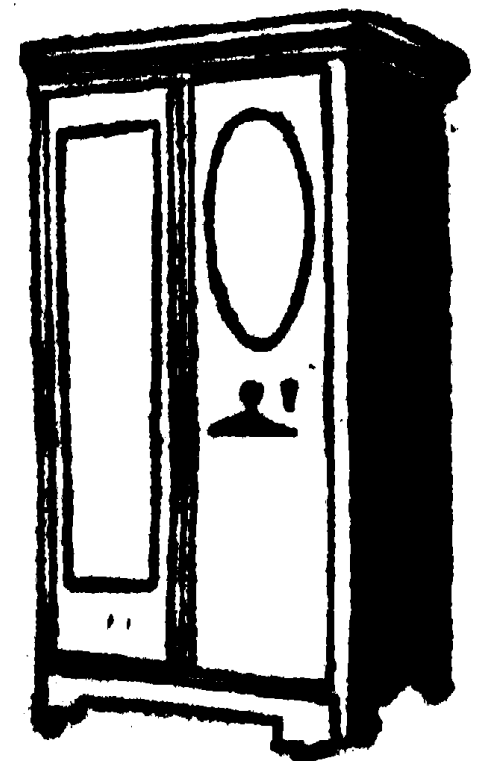
ভাবতে ভাবতে চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যেত। আবার ভেবেছি ঐ ঘরে ডাক্তার এল কেন। নার্স আকারে-ইঙ্গিতে কি যেন বোঝাচ্ছিল।

'এর চার দিন পর তাকে দেখেছি। তার মুখ যেন রোদ-খাওয়া গোলাপের মত শুকিয়ে গেছে—ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'তার পরের দিন মধ্যরাত্রে আমার ঘরের কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুললাম। আশ্চর্য হলাম। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করলাম।

—দশ মিনিটের জন্যে আপনার ঘরে ঢুকতে পারি? —ক্ষীণ নারীকণ্ঠ।

'আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। সরে দাঁড়ালাম।

'তার শরীরটা কাপড়ে কেমন সুন্দর-ভাবে যেন জড়িয়ে গেছে।

—আপনার ওপর আমার কোন অধিকার নেই। কিন্তু তবু বলছি আপনি সাহায্য না করলে আজ রাত্রেই আমি মারা যাব।

'আমি নিজের মনকে নিজে প্রশ্ন করছিলাম আমার সাহায্য সে কি গ্রহণ করবে......আশ্চর্য সে আমার সাহায্য-প্রার্থিনী! নিজের মুখে সে সাহায্য চাইছে! কিন্তু মুখ ফুটে আমি কিছু বলতে পারলাম না।

—আপনার মুখের একটি কথা আমাকে বাঁচাতে পারে।

—আমার......আপনি যা চান...।

—চাওয়ার কথা নয়। আমার প্রার্থনা। বলেই সে আমার পা ধরে ফেলল। তার কাঁপা ঠোঁটে বেরিয়ে এল, আমি একটা অপরাধ করে ফেলেছি। সব দোষ আপনাকে মাথা পেতে নিতে হবে।

'গত চার দিন ধরে ওঘরে যে একটা ফিসফাস চলছিল আমি তা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তবু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আমি কি সাহায্য করব বুঝতে পারছি না।

—আমি কুমারী......আমি একটা অপরাধ করেছি। বাবার চোখের সামনে দাঁড়ানো নিষেধ......ওরা আমার কাছে নাম জিজ্ঞেস করছে...... আমি কি বলব!

—নিজের মেয়েকে ক্ষমা করতে পারেন, পরের ছেলেকে ক্ষমা করতে পারবেন না কেন? আপনি নাম বলে দিন।

—নিজের মেয়েকে নিজের হাতে মারতে পারেন না, কিন্তু পরের ছেলেকে শাস্তি দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করবেন না।

—আপনি কি চান?

—আপনি তো একা মানুষ। চাকরীর প্রতি আপনার কোন টান নেই। আপনার নিজের কোন ঘর-সংসারও নেই। কোন বন্ধন নেই। পিছুটান নেই। আপনি রাতারাতি—আজ রাত্রেই এই ঘর ছেড়ে অন্য কোন শহরে পালিয়ে যান। কাল সকালে বাবাকে আমি আপনার নাম বলে দেব।

'মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগেকার ঘটনাই যেন পুনরাবৃত্ত হল। চৌদ্দ বছর আগে এমনি এক রাত্রিতে আমার বউ পায়ে মাথা কুটে আমার কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছিল। অন্য কারো হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্য। আর আজ......চৌদ্দ বছর বাদে... এক তন্বী আমার পায়ে মাথা কুটছে তাকে বউ বলে গ্রহণ করার জন্য......স্বামী হিসেবে মিথ্যা অভিনয় করার জন্য...... আমার হাতে-পায়ে জড়িয়ে সে চায় অন্য কাউকে বাঁচাতে।

—ও'র কিছু হলে আমি বাঁচতে পারব না।

—আপনার বাবা তাকে ক্ষমা করতেও তো পারেন।

—ক্ষমা করলেও উনি আমার বাবার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না। অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় তাঁকে পড়তে হবে।

—এ ভাবে কি এই সমস্যার সমাধান হবে? তারপর সে যাবে কোথায়? সে যদি আপনাকে ছেড়ে—

—না। দু-চার মাস পরেই ও'র পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসবে তখন বাবা ও'র সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে নিশ্চয়ই রাজী হবেন।

'বলেই সে আমার পা আবার জড়িয়ে ধরল। অসহ্য! ওর আঙুলের ছোঁয়ায় আমি যেন বিদ্যুতের স্পর্শ পাচ্ছি। আমার রক্তে খরস্রোত......আমি তার বাচ্চার বাবা... এই তন্বী আমার বাচ্চার মা......আমার রক্ত টগবগ করছে...... শরীরটা টলছিল......

—আপনি রাজি না হলে আমি আজ রাত্রেই মারা যাব।

'সম্বিৎ ফিরে পেলাম। কেউ কি নিজের সন্তানের মার মৃত্যু চোখের সামনে দেখতে পারে......আমি তাকে দুই হাতে ধরে একটি চেয়ারে বসালাম।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কি কথা? —বলুন।

—এত রাত্রে একা আমার ঘরে ঢুকতে আপনার ভয় করেনি?

—রাস্তার দুধার নিস্তব্ধ হওয়ার পর এসেছি। আপনি রাজি হলে কারো কোন বিপদ নেই। আর গররাজি হলে আজই আমার জীবনের শেষ রাত্রি। আমি দৃঢ়-সংকল্প করে এসেছি।

'তার কথাগুলো ক্রমশ ভারি হয়ে আসতে লাগল।

—আপনার জানলার উপর আমার চোখ নিবদ্ধ থাকত আপনি কি তা লক্ষ্য করেছেন? —কি খেয়াল হল হঠাৎ এই প্রশ্ন করে বসলাম।

—করেছি। করেছি বলেই ভরসা পেয়ে আপনার কাছে এসেছি। সে মাথা নীচু করে বলল।

'ওর কথাগুলো যেন বিষের মত আমার গলা দিয়ে ভেতরে যেতে লাগল। সারা শরীরে জ্বালা ধরে গেল। আশ্চর্য, পরমুহূর্তেই শরীরটা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি যেন বরফ হয়ে গেলাম।

—আপনি ঘরে ফিরে যান। আজ রাত্রেই আমি পালিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে।

'তারপর আমি নিজের হাতে তাকে চেয়ার থেকে তুলে দাঁড় করালাম। আমার

হাতে হাত দিয়ে সে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আমার পা স্পর্শ করল। তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার দুটো হাত তার নিজের মাথায় রেখে আমার দিকে ডাগর ডাগর চোখে তাকিয়ে রইল। আমার বুক কেঁপে উঠল। বললাম, আমার সন্তানের মা তুমি!

'সে আবার আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল। শেষবারের মত আমি তাকে দেখলাম। তার সেই ফ্যাকাসে মুখে এখন গোলাপী রঙ। তার চোখে-মুখে আনন্দের আভাস।

'সেই রাত্রেই আমি ঐ শহর ছেড়ে দিলাম। পালিয়ে গেলাম অনেক দূরে। পেন্সন যা পেতাম তাই আমার যথেষ্ট। কিন্তু সময় কাটানোর জন্য এই নূতন চাকরী নিয়েছিলাম। নূতন চাকরী পেয়ে কিছুদিন মন্দ কাটল না। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই আমি প্রায়ই এক শিশুর স্বপ্ন দেখতাম।......আজকাল ঘন ঘন দেখি। আমার শিশুর রূপরেখা যেন তার মায়েরই অনুকৃতি। তারও চোখ ডাগর ডাগর। কচি-কচি লাল লাল আঙ্গুলগুলো বাড়িয়ে সে আমাকে ডাকে 'পাপ্পা' বলে। তারপর আমি নিজের হাত ছড়িয়ে তাকে কোলে তুলতে যাই।......

'আপনার হাত থেকে আমি যে পত্রিকাটি নিয়েছিলাম, তাতে আমার সন্তানের মায়ের ছবি ছিল। গত মাসের আগের মাসের বাইশ তারিখে তার বিয়ে হয়েছে।

'সেদিন রাত্রে আমার খুব জ্বর হয়েছিল। জ্বরটা কদিন ছিল। প্রায়ই প্রলাপ বকতাম। আর স্বপ্ন দেখতাম। আমার বাচ্চাকে কোলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতাম। কচি শিশুটিকে ধরার পরে কেমন যেন আমার হাতে ধরা পড়ত রক্ত। আঁজলা-আঁজলা রক্ত আমার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ত। আমার কাপড় ভিজে যায় রক্তে। চাপ-চাপ রক্তে আমার হাত ছপ্‌ছপ্‌ করতে থাকে।

'আপনাদের ওখানেও চাকরী করতে আমার ভাল লাগল না। এখন পালাচ্ছি আসামের জঙ্গলের দিকে।

'আপনার পত্রিকা থেকে ঐ ছবিটি কেটে নিয়ে আমার ডায়েরীর পাতায় এঁটে দিয়েছি। যতই হোক সে তো আমার সন্তানের মা। এই ছবিতে তাকে বেশ হাসি-খুশী দেখাচ্ছে। তার আনন্দ-উজ্জ্বল ভাবকে নিজের মধ্যে সঞ্চার করব। এইভাবে চেষ্টা করব একটু বেঁচে থাকার।'

দেশে বিদেশে

সর্বনেশে :

আমেরিকার "চিকাগো সান টাইমস্‌" সংবাদপত্রে যে-খবর বেরিয়েছে, তা মারাত্মক। বার্লিন প্রশ্নে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নাকি একটা কোরিয়ান যুদ্ধের মতো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সংবাদপত্রটির ওয়াশিংটন-সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, যদি গতানুগতিক প্রতিরক্ষা-পদ্ধতি ব্যর্থ হয় তো তবে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি এইচ-বম ছাড়ার জন্যও প্রস্তুত থাকবেন। তবে আশ্বাস পাওয়া গেছে, সে এখনই নয়, সব পথ ব্যর্থ হলেই ঐ সর্বনেশে পথ নেওয়া হবে। আমরা ভাবছি, নেওয়া হ'লে তো হয়েই গেল। নেওয়া হবে এমন মানসিক অবস্থাও কিন্তু কম বিপজ্জনক নয়। আমরা আশা করব, অমন মানসিক অবস্থায় কাউকেই যেন পৌঁছোতে না হয়। আর ঐ যে কোরিয়া যুদ্ধের মতো যুদ্ধ—এ-কথারও কি মানে হয়? যুদ্ধ একবার বাঁধলে কোথায় কবে যে তার শেষ হবে, এ যদি যুদ্ধচালকদের হাতে থাকত, তবে তো হিটলারের পরিকল্পনা সার্থক হতে পারত। তা হয়নি, কেননা, যুদ্ধ তো একতরফা পরিকল্পনা নয়। যুদ্ধ ব্যাপারটি বড় জটিল, কেননা, একটা জটিল অবস্থার মীমাংসা না হলেই লোকে লাঠি ধরে। আজকাল লাঠির দিন নেই, তীর-ধনুকের দিন নেই, আজকাল হাইড্রোজেন বোমার দিন--রকেটের যুগ। যুদ্ধ শুরু হ'লে তা বিশ্বময় ছড়াবে এবং কোথা থেকে কে যে কোন্‌ আয়ুধ ছাড়বে কে জানে? মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং এক বাণী দিয়েছেন, বাণী নয়, রুশিয়ার প্রতি সতর্কবাণী। তিনি একদিকে স্বদেশে প্রতিরক্ষা খাতে আরও অর্থ-বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়েছেন (তাতে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ দাঁড়াবে ৪৭,৫০,৬১,১৩,০০০ ডলার), অন্যদিকে রুশিয়াকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে নিতান্ত নম্র মনে করার কারণ নেই, তারা স্বার্থপরও নয়, বিচ্ছিন্নও নয়। বার্লিন একক নয়—সেখানে আমেরিকা আছে, বৃটেন আছে, ফ্রান্স আছে—ন্যাটোর প্রতিশ্রুতি আছে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গও প্রেসিডেণ্ট কেনেডির উক্তি সমর্থন করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন বলছে, যুদ্ধই যদি চাও তো যুদ্ধ হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও বিশ্বের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন; শিগ্‌গিরই একটা যুদ্ধ বাধবে আশঙ্কা করছেন। দেখা যাচ্ছে, কিছুদিন আগেও যে শান্তির সম্ভাবনা আছে মনে হচ্ছিল, আজ যেন তা মরীচিকার মতো বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

চমকপ্রদ :

ইংলণ্ড অন্তর্গত ডিভনসায়ার থেকে এক চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেছে। এক আবাদের মালিক তাঁর গোশালায় টেলিভিশন বসিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, এতে গরুর চিত্ত উৎফুল্ল থাকে এবং দুধ বেশী পাওয়া যায়। বহু গরুর গানের কান আছে। ওঁরই এক প্রতিবেশী তাঁর গোপালের জন্য রেকর্ড বাজান। তিনিও তাই টেলিভিশন বসিয়েছেন। অধ্যাপক হ্যালডেন প্রভৃতি বিজ্ঞানীবিদ্‌দের ধারণা যে, মানুষ যদি জন্তু, পাখি, কীট-পতঙ্গের ভাষা আয়ত্ত করতে পারত, তবে সহজেই তাদের বশীভূত করা যেত এবং তাদের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদান ক'রে প্রয়োজনমতো শাসন ও পালন করা যেত। ওদের সুখ-দুঃখের কথা আছে, ভাষা আছে, সে-ভাষা বিশেষ জন্তু, বিশেষ পাখি, বিশেষ কীট-পতঙ্গের মধ্যে আছে; হতে পারে, মানুষের ভৌগোলিক ভাষা যেমন পৃথক, এদের ভাষারও তেমনি তারতম্য আছে। কিন্তু তাদের জীবনেও যে সংগীত আছে এবং সংগীতে আনন্দ হয়, দুগ্ধোৎপাদনে বিলিতী গোয়ালারা সেই রসোপলব্ধি কাজে লাগালেন এইটিই চকমপ্রদ।

নৌকাডুবি :

দেশের নানা স্থানে নৌকাডুবির সংখ্যা নাকি এত বেড়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছেন এবং শিগ্‌গিরই এর প্রতিকারে কিছু বিধি-বিধান প্রণয়নের কথা ভাবছেন। সংখ্যাটা কত, তা অবশ্য প্রকাশ পায়নি, কিন্তু এ-রকম নৌকাডুবির খবর কেবল দিল্লী নয়, অন্ধ্র, আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকেও পাওয়া গেছে। এ-সব নৌকাডুবিতে মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। এই নিয়ে কর্তৃপক্ষ জুলাই মাসের শেষেই পরামর্শ করতে বসছেন।

গোখেল কমিটি নৌকাডুবির কারণ অনুসন্ধান করেছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, মেলা বা উৎসব উপলক্ষে নৌকায় আরোহীর আধিক্য ঘটে; নৌকার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় এমন সংখ্যক যাত্রী নৌকায় ওঠে; টাল সামলাতে না পেরে নৌকা ডুবে যায়। প্রস্তাব করা হচ্ছে, ফেরীঘাটে যাত্রী নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি করতে হবে এবং দেখতে হবে যেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা যথেষ্ট করা হয়। রাজ্যসরকারের স্ব-রাজ্যে এই ধরণের নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। তৎসত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বারংবার রাজ্যসরকাগুলিকে এ-বিষয়ে অবহিত ক'রে আসছেন। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র ও উড়িষ্যায়ই জলপথ বেশী। সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলিকে, বিশেষ করে ফেরী পারাপারের দিকে কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে। নৌকার সামর্থ্য ও যোগ্যতা সম্পর্কেও মাঝে মাঝে যাচাই করার এবং রেজিষ্টার করার প্রস্তাবও হয়েছে। গোখেল কমিটি যে-সব তথ্যে উপনীত হয়েছেন বা কমিটি যে-সব প্রস্তাব করেছেন, তার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারসমূহকে বিধিবিধান সম্পর্কে আরও কড়া হবার জন্য নির্দেশ দেবেন। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী যাত্রীকে উঠতে দেওয়া হবে না এবং ফেরী-বোটের সঙ্গে বয় বা লাইফ-বেল্ট জাতীয় প্রাণরক্ষক সরঞ্জাম রাখার নির্দেশ দেওয়া হবে।

যেখানে ফেরীঘাটে টিকিট কাটা হয়, সে একরকম ভালো, নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধে: কিন্তু যেখানে তা নয়, সেখানে যাত্রীরাই এমন তাড়াহুড়া করে ও বিশৃঙ্খলা ঘটায় যে, তাদের সংযত করা যায় না, কূলেই নাও ডোবে আর কি। যাত্রীদের এই প্রকৃতিও কোন কোন দুর্ঘটনার মূলে নেই এমন বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ফেরীচালক বা মাঝিদের দুর্নীতিও অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণ —এমন উদাহরণ আছে। যেখানে দুশ'র বেশী যাত্রী নেওয়া উচিত নয়, সেখানে ৩০০ যাত্রী নেওয়া হয়েছে। মাল বহনের তো সীমা-পরিসীমা নেই। ডুবো ডুবো অবস্থায় এদের জলে ভাসানো হয়। সুতরাং কড়া নজর তো চাই-ই—কেননা, সেখানেও শৈথিল্য ঘটতে পারে—রাজ্যবাসীদের বিশৃঙ্খল প্রকৃতিও বদলানো দরকার।

কোম্পানী :

জুন মাসে ১৯৬১ সালের যে তিন মাস কেটে গেল, সে সময়ে পূর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় ৯ কোটি টাকার অনুমোদিত পুঁজির ১২৯টি নতুন কোম্পানীর উদ্ভব হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নতুন কোম্পানীর সংখ্যা ১১৮ এবং তাদের অনুমোদিত পুঁজির পরিমাণ ৭,১৭,১৬,০০০ টাকা। এর ১২টি পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী এবং পুঁজির পরিমাণ ৪,৫০,৪৫,০০০ টাকা। ১০৩টি প্রাইভেট কোম্পানী, পুঁজির পরিমাণ ২,৬৬,৭১,০০০ টাকা। আর তিনটি অন্য কোম্পানী। এ-সব কোম্পানীর মধ্যে আবার একটিরই অনুমোদিত পুঁজি বা মূলধন দুই কোটি টাকা।

এই গেল গড়ার দিক, অথবা ভালর দিক। কিছু ভাঙার দিক বা মন্দের দিকও আছে। ২৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকার মূলধনের তেরটি কোম্পানী লিকুইডেশানে একেবারে তলিয়ে গেছে, ৭২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার মূলধনের ২২টি কোম্পানী ভেঙে গেছে, ৬৯৯টি কোম্পানীকে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানী আইন ভঙ্গ করার জন্য তেরশ' মামলা হয়েছে।

কিন্তু আসল মামলা সামাজিক—কর্ম-সংস্থানের মামলা। সাধারণের স্বার্থ হচ্ছে কতটা কর্ম-সংস্থান হ'ল, কতটা বেকার-সমস্যার সমাধান হ'ল। এই যে ৯ কোটির ১২৯টি নতুন কোম্পানী হল, এ কাদের, এবং এ-দেশবাসীর বেকার সমস্যার কতখানি সমাধান করল, এইটেই বড় কথা। কেননা, এ-কথা আজ আর গোপন নেই যে, ভিনদেশীয় মালিকের কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় এ-দেশের বেকার সমস্যার কোন সুরাহা হয় না। তা যদি না হয় তবে এই বাহ্যিক পরিসংখ্যানগত সমৃদ্ধি দিয়ে রাজ্যবাসীর কি হবে? বরং ওটি আর এক অতিরিক্ত দায়স্বরূপ হবে। কেননা, রাজ্যবাসীর স্বার্থবিমুক্ত এই সব কোম্পানী এই রাজ্যেরই ঘাটতি খাদ্য বা উপাদানে ভাগ বসাবে। রাজ্যবাসীরও কল্যাণ হবে, সমগ্র ভারতেরও কল্যাণ হবে, এমন হলেই নতুন কোনো কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগই আদরণীয়।

শিল্পায়ন :

নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, আমেরিকার ৮০ জন "বাঘা" শিল্প-নায়ক ভারতবর্ষে আসছেন। ভারতবর্ষে বে-সরকারী মার্কিণ অর্থবিনিয়োগের সমস্যা ও সুযোগ সম্পর্কে ভারত সরকারের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করবেন। আলোচনাটা অবশ্যই রুদ্ধদ্বারকক্ষে হবে। বৈঠক হবে নয়াদিল্লীতে অক্টোবর কি নভেম্বর নাগাদ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের কেন্দ্রীয় তৈলমন্ত্রী ঐ বৈঠকে ভারতের তৈল-নীতিরও একটা ব্যাখ্যা উপস্থিত করবেন। এ-কথাটিও সংবাদদাতা জানাতে ভোলেন নি যে, যে আশিজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী আসছেন, তাঁরা সামান্য লোক নন। আমেরিকার বাইরে যে ডলার-প্রবাহ দেখা যায়, তা নিয়ন্ত্রণের অনেকখানি হাত এঁদেরই। সুতরাং এ বৈঠকটি ভারতের শিল্প-ব্যবসায়ের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে অনায়াসেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ভারত যেন ঋণগ্রস্ত না হয় এও দেখতে হবে।

সুপুরি :

কিছুতেই সে সুপুরিটা ছাড়বে না —দুই তোলা সোনার লোভ দেখালেও নয়। এই সুপুরির মালিক শিলংয়ের এক খাসিয়া রমণী। সুপুরিটা তার বড় প্রিয়।

কি রহস্য এই সুপুরির? তা আজ অবশ্য সবাই জানে এবং দলে দলে প্রত্যক্ষ করছে, প্রণতি জানাচ্ছে ঐ সুপুরির উদ্দেশে। সুপুরির উদ্দেশে ঠিক নয়, ঐ সুপুরিতে যে একটি মূর্তি খোদিত আছে, তার উদ্দেশে।

সুপুরির খোসাটা ছাড়াবার পরই ঐ মূর্তি প্রকাশ পায়। দেখা যায়, সুপুরির গায়ে প্রাচীন এক খাসিয়ার মাথা খোদাই করা। চুল আছে, কপাল আছে, চোখ আছে, কান আছে, কানে প্রাচীন ধরণের দুল আছে, ঠোঁট, চিবুক —সব পরিষ্কার।

এখন এই দুর্লভ এবং দুই তোলা সোনা যার কাছে তুচ্ছ, সেই সুপুরিটিকে একটি বোতলে রাখা হয়েছে এবং দলে দলে লোক আসছে পাগলের মতো দর্শনের ইচ্ছায়। অনেকেই শ্রদ্ধায়, ভয়ে ঐ সুপুরির গায়ে খোদিত প্রতিমূর্তির উদ্দেশে আভূমি প্রণতি জানাচ্ছে।

ঘটনাপ্রবাহ

ঘরে—

২১শে জুলাই—৫ই শ্রাবণ : কলেজসমূহে ভর্তি সমস্যার প্রতীকার দাবীতে কলিকাতায় ছাত্রদের বিক্ষোভ সভা—বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলিকাতা) উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্র ও শিক্ষামন্ত্রী (পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর নিকট ৮-দফা দাবী সম্বলিত স্মারক-লিপি পেশ।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে যুক্তরাষ্ট্র-সফরে আমন্ত্রণ--নভেম্বরের (১৯৬১) প্রথমার্ধে ভারতীয় নেতার যুক্তরাষ্ট্র-সফর—কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ জন গলব্রেথের ঘোষণা।

২২শে জুলাই—৬ই শ্রাবণ : ইস্টবেঙ্গল দলের সপ্তমবার (১৯৬১) লীগ চ্যাম্পিয়ন (ফুটবল) হওয়ার গৌরব লাভ।

নেহরু-নুন চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ী ইউনিয়ন বিভাগ সম্পর্কে পাক্-ভারত ঐক্যমত—ঢাকা বৈঠকান্তে কলিকাতা ফিরিয়া ভারতীয় প্রতিনিধি দলের উক্তি।

২৩শে জুলাই—৭ই শ্রাবণ : 'বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দিলে ভারতে রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাহত হইবে'—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার গভর্ণর শ্রী এইচ ভি আর আয়েঙ্গারের মন্তব্য।

দক্ষিণ ভারতে পুনরায় বন্যার প্রকোপ—উপর্যুপরি বর্ষণের দরুণ মাদ্রাজ, মহীশূর ও কেরলের নদীগুলিতে যুগপৎ প্লাবন—বন্যাস্ফীত যমুনায় নৌকাডুবিতে ১৭ জনের প্রাণহানি।

২৪শে জুলাই—৮ই শ্রাবণ : রাষ্ট্রপতির রোগমুক্তির জন্য ২৬শে জুলাই 'জাতীয় প্রার্থনা দিবস' পালনের আহ্বান—জনসাধারণের নিকট উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের আবেদন।

আসাম সরকারের প্রতি গৌহাটি ছাত্র সংগ্রাম কমিটির হুঁসিয়ারী—'শাস্ত্রী ফরমুলা' বাতিল না করিলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালানো হইবে।

২৫শে জুলাই—৯ই শ্রাবণ : ছাত্রভর্তি সমস্যার সমাধান দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা) কয়েক শত ছাত্রের অবস্থান ধর্মঘট—১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সক্রিয় আন্দোলন না চালাইতে উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্রের আবেদন।

উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের উপর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার অর্পণ—ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের (রাষ্ট্রপতি) অসুস্থতার দরুণ সাময়িক ব্যবস্থা।

ভয়াবহ বন্যায় কটক জেলার ৬১টি গ্রামে প্রায় দুই লক্ষ নর-নারী বিপন্ন—কৃষ্ণা নদীতে অব্যাহত জলস্ফীতি—কেরলের বন্যায় এযাবৎ ১১৬ জনের জীবননাশ।

২৬শে জুলাই—১০ই শ্রাবণ : 'কাহারও হুমকীতে কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত নতিস্বীকার করিবে না'—জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সুস্পষ্ট ঘোষণা।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ছাত্র-বিক্ষোভ—কলেজী শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার দাবী—২৮শে জুলাই বর্ধমানে ছাত্র-ধর্মঘট—যাদবপুরে দুইজন ছাত্রের অনশন সুরু—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত।

২৭শে জুলাই—১১ই শ্রাবণ : পেট্রোল কোম্পানীসমূহের কর্মচারী-ধর্মঘটের চতুর্থ দিনে অবস্থার অবনতি —সরকার কর্তৃক ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষণা।

বারৌণিতে তৈল শোধনাগার স্থাপনের কাজ আরম্ভ—প্রথম পর্যায়ে নির্মাণ কার্যের জন্য রাশিয়া হইতে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম আমদানীর সংবাদ।

বাইরে—

২১শে জুলাই—৫ই শ্রাবণ : বিজের্তায় ফরাসী ছত্রী ও সাঁজোয়া বাহিনীর প্রবেশ—সড়কে সড়কে লড়াই-এর সংবাদ—ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধে টিউনিসীয় প্রেসিডেন্ট হাবিব বোরগুইবার দৃঢ় সংকল্প।

মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণে আমেরিকার দ্বিতীয় সাফল্য—রেডস্টোন রকেটযোগে ১১৫ মাইল উর্ধ্বে উঠিয়া ১৫ মিনিট পর ক্যাপ্টেন ভার্জিল গ্রিসমের (তৃতীয় মহাশূন্যচারী) নিরাপদে অবতরণ।

২২শে জুলাই—৬ই শ্রাবণ : টিউনিসিয়ায় অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতির আহ্বান—বিজের্তায় আমদানী করা সকল সৈন্য অপসারণের নির্দেশ—রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তি পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত।

কঙ্গোয় ভারতীয় সৈন্যদলের (রাষ্ট্রসংঘ সংশ্লিষ্ট) পরিচালক ব্রিগেডিয়ার রাজা কাতাঙ্গাস্থ রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত।

২৩শে জুলাই—৭ই শ্রাবণ : পূর্ব রেকর্ড অতিক্রম করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের শীঘ্র নূতন মহাশূন্য জয়ে যাত্রা —সোভিয়েট মহাশূন্য বিজয়ী মেজর ইউরি গ্যাগারিন কর্তৃক চন্দ্রলোক গমনে আশা জ্ঞাপন—মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ অভিমুখেও অভিযান চালনায় আগ্রহ।

বিজের্তার যুদ্ধে (ফরাসী-টিউনিসীয়) প্রায় ৭ শত টিউনিসীয় নিহত ও এক হাজারের অধিক আহত—প্রেসিডেন্ট বোরগুইবা কর্তৃক দাগ হ্যামারশীল্ডকে (রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী-জেনারেল) টিউনিসে আসার জরুরী আমন্ত্রণ।

২৪শে জুলাই—৮ই শ্রাবণ : লাওসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ঘোষণার মুখবন্ধ প্রণয়ন ব্যাপারে জেনেভা চতুর্দশ রাষ্ট্র-সম্মেলনে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা—দুই ঘন্টাব্যাপী গোপন অধিবেশনের সুফল।

প্রেসিডেন্ট বোরগুইবার জরুরী আহ্বানে রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ডের বিমানযোগে টিউনিস উপস্থিতি—ফ্রান্স কর্তৃক বিজের্তায় আরও নূতন সৈন্য আমদানীর সংবাদ।

২৫শে জুলাই—৯ই শ্রাবণ : রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ অনুযায়ী সৈন্যাপসারণে ফ্রান্সের অসম্মতি—টিউনিসিয়া কর্তৃক বিজের্তা প্রসঙ্গ পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত।

২৬শে জুলাই—১০ই শ্রাবণ : 'আক্রমণ প্রতিরোধে পাশ্চাত্যরা দুর্বল বলিয়া মনে করা ভুল'—রাশিয়ার প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবাণী—বার্লিন সংকট সম্পর্কে ভাষণ প্রসঙ্গে মার্কিণ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনার উল্লেখ।

বহু প্রতীক্ষিত কঙ্গোলী পার্লামেন্টের অধিবেশন পুনরারম্ভ—পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি পরিষদে লুমুম্বা পন্থীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা।

২৭শে জুলাই—১১ই শ্রাবণ : রাষ্ট্রসংঘকে উপেক্ষা করিয়া অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজদের নরহত্যা যজ্ঞ—জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবীতে হ্যামারশীল্ডের (রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল) নিকট ৩৯টি দেশের নোটিশ।

মার্কিণ প্রতিরক্ষা-ব্যয় বৃদ্ধির জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রস্তাব—১৯৬২ সালের বাজেট সংশোধনের জন্য কংগ্রেসে সুপারিশ।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত
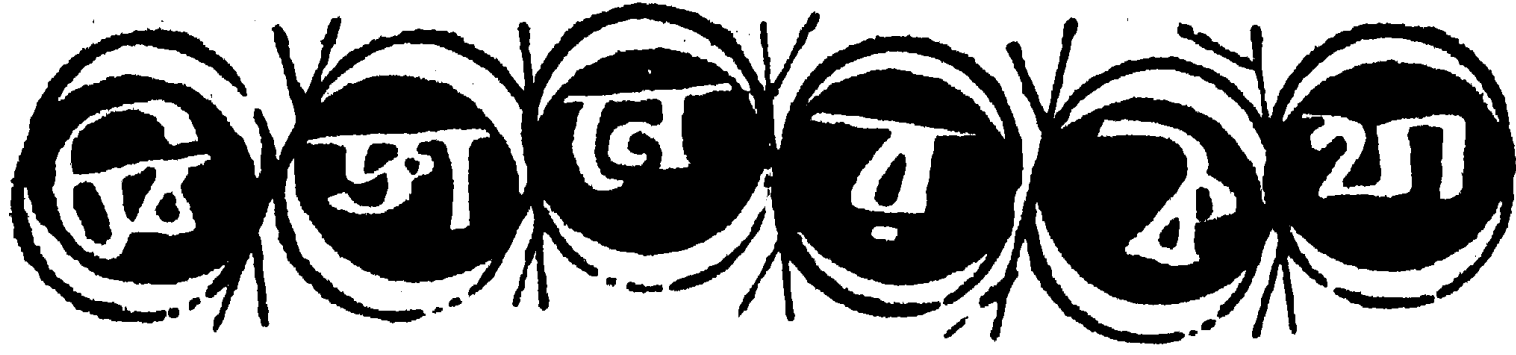
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ

লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম,
তাহারে ধরিল জ্বরে,
নিল সে আমার কালব্যাধিভার
আপনার দেহ-'পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন,
বন্ধ হইল নাড়ী।
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে,
এতদিনে গেল ছাড়ি।

আজ থেকে সাতষট্টি বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' থেকে এই লাইন চারটি নেওয়া হয়েছে। বসন্ত রোগে মৃত্যু তখনো পর্যন্ত কত সহজ ছিল। আধুনিক কোনো কবি কিন্তু এত সহজে এই লাইন চারটি লিখতে পারবেন না। কারণ বসন্ত রোগে মৃত্যু আজকের দিনে নিতান্তই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। অবশ্য আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত প্রতি বছরেই বসন্ত রোগে কিছু লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু আমরা এও জানি যে, এই মৃত্যু অনায়াসেই ঠেকানো সম্ভব। সুতরাং আধুনিক কোনো কবিকে পুরাতন ভৃত্যের মৃত্যু ঘটাতে হলে জটিলতর কোনো রোগের কথা বলতে হবে। যেমন, করোনারী থ্রম্বসিস বা ক্যানসার। এমন কি টাইফয়েড, নিউমোনিয়া বা যক্ষ্মা আজকাল আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। এই কারণেই, লক্ষ্য করে দেখবেন, আধুনিক কাব্যে ও সাহিত্যে মৃত্যুকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপঘাতের চেহারা দিতে হয়। হয় আত্মহত্যা কিংবা কোনো একটা দুর্ঘটনা।

কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'রাসমণির ছেলে' গল্পটি স্মরণ করুন। অল্প কয়েক দিনের বিকার-জ্বরে রাসমণির জোয়ান ছেলে কালীপদর মৃত্যু হল। রবীন্দ্রনাথের ভা ষা য়— (ভবানীচরণ) "সকালবেলায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখ-চোখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার গা যেন আগুনের মতো গরম। কাল অর্ধেক রাত্রি সে লজিক মুখস্থ করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।...রাসমণির কাছে চিঠি গেল; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টা মাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল—সেই ধ্বনিগুলি তাঁহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।" এই গল্প পঞ্চাশ বছর আগে লেখা। তখনো পর্যন্ত এই ঘটনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ছিল। কিন্তু হালের গল্পলেখকরা এত সহজে পার পাবেন না। কয়েক দিনের বিকার-জ্বরে আধুনিক কোনো কালীপদর মৃত্যু হওয়াটা আজকের দিনে অস্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হবে।

আসল কথাটা এই যে, গত কয়েক বছরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এমন আশ্চর্য অগ্রগতি হয়েছে যে অধিকাংশ ব্যাধিই এখন আর দুরারোগ্য নয়। অকালমৃত্যু এখন খুবই কম! করোনারী থ্রম্বসিস বা ক্যান্সার বা এ-ধরনের অন্য যে-সব রোগ এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি জয় করা যায়নি—তাও সাধারণত বার্ধক্যের রোগ। মানুষের আয়ু সব দেশেই বেড়ে গিয়েছে, এমন কি মানুষের যৌবনও। আমাদের দেশে এত অপুষ্টি ও ভেজালের মধ্যে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আমরাও তা বুঝতে পারি। আমাদের বাবারা বা ঠাকুর্দারা চল্লিশেই নিজেদের প্রৌঢ় বলে মনে করতেন। কিন্তু আমাদের কালে এসে দেখা যাচ্ছে চল্লিশেও প্রায় ভরা যৌবন। মেয়েদের মধ্যে কুড়িতে বুড়ী হবার নিদর্শন এখন খুঁজে পাওয়াই ভার। আর তারুণ্যের প্রতিযোগিতায় হালের চল্লিশোত্তীর্ণাদের কাছেও বঙ্কিমের নায়িকাদের সম্ভবত হার মানতে হবে।

যাই হোক, তাহলে কথাটা হচ্ছে এই যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্যাধি ও জরাকে অনেকখানি জয় করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রেখে যদি আমরা আগামী কয়েক বছরের কথা ভাবতে চেষ্টা করি তাহলে খুব সম্ভবত আমাদের ভাবনা হবে একেবারেই অসম্পূর্ণ। কারণ দশ বছর আগে এই আমরাই কি ভাবতে পেরেছিলাম যে, টাইফয়েড বা নিউমোনিয়া বা যক্ষ্মা এত সহজে নিরাময় হতে পারে। প্লেগ ও কলেরা এক সময়ে প্রায় নিমেষের মধ্যে হাজার হাজার প্রাণসংহার করত। এখন আর তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমন কি আমাদের দেশেও নয়। হাইড্রোফোবিয়া রোগ এক সময়ে মানুষের কাছে আতঙ্কের মতো ছিল। এখন এই রোগের চিকিৎসা নিতান্তই সাধারণ ও মামুলি হয়ে গিয়েছে। এমনি ভাবে ভাবতে চেষ্টা করলে দেখা যাবে, দুরারোগ্য রোগের তালিকায় শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকছে কয়েক ধরনের মনসিক রোগ ও ক্যানসার জাতীয় রোগ। ক্যানসার নিয়ে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত দেশে বিপুল গবেষণা শুরু হয়েছে এবং আশা করা চলে যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই রোগটিও আর দুরারোগ্য থাকবে না।

আর শুধুই কি ব্যাধির চিকিৎসা! হালের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে কলকাতার একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত একটি ছোট্ট খবর আমি এখানে তুলে দিচ্ছি—"মৃতজাত শিশুর জীবন সঞ্চার॥ বৃটিশ সার্জনের বিস্ময়কর কৃতিত্ব॥ লণ্ডন, ৩রা জুন—একটি মৃতজাত শিশুর বক্ষদেশ চিরিয়া জনৈক সার্জন কর্তৃক অঙ্গুলি দ্বারা হৃদপ্রদেশ সংবাহনের ফলে শিশুর জীবন সঞ্চার হইয়াছে। বৃটিশ সার্জিকাল ইতিহাসে এবং সম্ভবতঃ সমগ্র বিশ্বে ইহা রেকর্ড। প্রাণহীন শিশুর জন্মের ১৫ মিনিট পরে এবং অক্সিজেন ও অন্যান্য জীবন-সঞ্চারক ঔষধ ব্যর্থ হইলে সার্জন শেষ চেষ্টা করেন। তিনি তাহার বক্ষদেশ চিরিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ক্ষুদ্র হৃদয়ের সন্ধান করেন এবং কিছুক্ষণ সংবাহনের ফলে সামান্য স্পন্দন অনুভব করেন। বর্তমানে শিশু বাঁচিয়া উঠিয়াছে। সোমবার ওয়েস্টমিনিষ্টার হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে।" অবশ্য এমনি ধরনের খবর পড়েও আজকাল আমরা আর খুব বেশি অবাক হই না। আমরা যেন ধরেই নিয়েছি যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অসাধ্য এখন আর কিছুই নেই। এ-অবস্থায় প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও উদ্দাম কল্পনাশক্তির অধিকারী না হলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ

সম্পর্কে কিছু ভাবা বা বলার চেষ্টা করা চলে না।

সম্প্রতি কয়েকজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ২০১০ সালের, অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরের সময়ের একটি ছবি এ'কেছেন। এই ছবির একটি অংশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথাও বলা হয়েছে। বিষয়টি এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে, আমি কিছু কিছু অংশের বিবরণ দিতে চাই।

ভবিষ্যতের একটি ছবি

কল্পনা করা যাক আমরা এই ভবিষ্যতের কোনো একটি সার্জিক্যাল ক্লিনিকে হাজির হয়েছি।

এই ক্লিনিকটিকে দেখে আমাদের অবাক হতে হবে। এখানকার সবই যেন অদ্ভুত। আমাদের ধারণার সঙ্গে কোনো মিলই নেই।

পা টিপে টিপে আমরা এক রোগীর কামরার সামনে দাঁড়ালাম। রোগী ইশারায় আমাদের ভেতরে ঢুকতে বলল। রোগীর নাগালের মধ্যেই কতকগুলো সুইচ ও বোতাম। এই সমস্ত সুইচ ও বোতামের সাহায্যে সে রেডিও চালাতে বা বন্ধ করতে পারে, তার বিছানার মাথার দিকটা ওঠাতে বা নামাতে পারে, জানলার খড়খড়ি খুলতে বা বন্ধ করতে পারে, ঘরের আলো জ্বালাতে বা নেভাতে পারে বা এমনি ধরনের আরো অনেক কিছু করতে পারে।

সেখান থেকে পাশের ঘরে গিয়ে দেখলাম যে, মস্ত প্যানেলের সামনে একজন মহিলা বসে আছেন। তাঁর চোখের সামনে রয়েছে সারি সারি টেলিভিশনের পর্দা। এই মহিলাটি হচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। টেলিভিশনের মাধ্যমে তিনি গুরুতর রোগে আক্রান্ত রোগীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রয়োজন ঘটলেই যে-কোনো মুহূর্তে তিনি নার্স ও সংশ্লিষ্ট ডাক্তারকে খবর দিতে পারবেন। ওদিকে বৈদ্যুতিক থার্মোমিটার ও পালসিমিটারের সাহায্যে রোগীদের শরীরের উত্তাপ ও নাড়ীর স্পন্দনের খবর লেখা হয়ে চলেছে।

তারপর আমরা গেলাম রোগনির্ণয়-কামরায়।

ডাক্তার বসে আছেন টেবিলের সামনে। টেবিলের ওপরে একটি লাউড-স্পীকার। সামনে রোগী। লাউডস্পীকার থেকে কতকগুলো তার গিয়ে লেগেছে রোগীর বুকে।

ডাক্তার বললেন, 'স্টেথিস্কোপ।'

আমরা কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে স্টেথিস্কোপ-জাতীয় কোনো পদার্থ দেখতে পেলাম না। আমাদের অবস্থা দেখে ডাক্তার কথাটাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বললেন, 'রেডিওস্টেথিস্কোপ।'

লাউডস্পীকার থেকে নানান রকমের অদ্ভুত সব আওয়াজ বেরোতে লাগল। হৃদ পিণ্ডের মধ্যে রক্ত-চলাচলের আওয়াজ। সুরশিল্পী যেমনভাবে বাজনা শোনেন তেমনিভাবে ডাক্তার রক্ত-চলাচলের আওয়াজ শুনতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ধরেই কাচের বুক-কেসের মতো একটা পদার্থ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। তার গায়ে বড়ো বড়ো হরফে লেখা—'ডায়াগনোসিস' অর্থাৎ রোগ-নির্ণয়। এবারে এই পদার্থটির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার তাঁর সহকারীকে বললেন, 'ইলেকট্রনিক কম্পিউটর চালিয়ে দাও।'

এতক্ষণে বোঝা গেল যে, এই যন্ত্রটি হচ্ছে রোগনির্ণয়-করার ইলেকট্রনিক কম্পিউটর।

রোগীকে বসানো হল বিশেষ একটি চেয়ারে। তারের সাহায্যে যন্ত্রটির সঙ্গে তার হাতের, পায়ের ও ঘাড়ের সংযোগ করা হল। তারপরে যন্ত্রটিকে চালু করতেই ঝিকমিক করে উঠল ইনডিকেটর ল্যাম্প। টিকটিক করে বাজতে লাগল রীলে সুইচ। অর্থাৎ রোগীর পরীক্ষা-কার্য শুরু হয়েছে। তার নাড়ীর স্পন্দন, তার শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তের চাপ ইত্যাদি সমস্ত কিছু পরখ করা হচ্ছে যন্ত্রের মাধ্যমে। তারপরেই একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। যন্ত্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তিনটি রোগের নাম। আমাদের মনে হল যন্ত্র যেন বলছে, 'সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে দেখে আমি এই তিনটি রোগের নাম করলাম। ইচ্ছে করলে আমি আরো হাজারটা রোগের নাম বলতে পারতাম। কিন্তু আমার মতে আসল রোগ এই তিনটির মধ্যে যে-কোনো একটি। আমার যতদূর সাধ্য আমি করলাম। এবারে আপনি ঠিক করুন এই তিনটির মধ্যে কোন্ রোগে রোগী ভুগছে।'

ডাক্তার বললেন, 'রেডিও-লোকেটর।'

এবারে পর্দার ওপরে ফুটে উঠল রোগীর শরীরের ভেতরকার সমস্ত অংশ—হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী, অন্ত্র, ইত্যাদি। ডাক্তার খুঁটিয়ে সমস্ত কিছু দেখলেন।

এইভাবে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই রোগীর রোগনির্ণয় হয়ে গেল।

তারপরে আমরা গেলাম অপারেশন-ঘরে।

ঘরটি বড়ই অদ্ভুত। না আছে ছুরি-কাঁচি, না আছে অপারেশন টেবিল, না আছে রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ। থাকার মধ্যে আছে একটি মাত্র বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও রোগীর বসার জন্যে একটি মাত্র চেয়ার।

আমরা দেখলাম, চেয়ারে একজন রোগীকে বসানো হয়েছে, রোগীর সামনে বিশেষ একটি অবস্থানে রয়েছে সেই যন্ত্রটি। আর যন্ত্রের ভেতর থেকে কেমন অদ্ভুত একটা গুনগুনে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

ডাক্তার বললেন, 'এই রোগীর যকৃতে পাথর হয়েছে। তাই যকৃত অপারেশন করা হচ্ছে।'

আমরা বললাম, 'এ তো ভারি মজার অপারেশন দেখছি। ছুরি নেই, কাঁচি নেই, রোগীকে হাত দিয়ে ছুঁতে হচ্ছে না পর্যন্ত!'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক তাই। এই যে যন্ত্রটি দেখছেন, এই যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে আলট্রা-সাউন্ড তরঙ্গ। অর্থাৎ এমন এক ধরনের শব্দ-তরঙ্গ যা শোনা যায় না। এই তরঙ্গ কুড়ি মিনিটের মধ্যেই যকৃতের পাথরকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবে।'

ডাক্তার আরো অনেক কিছু বলে গেলেন। আমরা শুধু এটুকু বুঝতে

পারলাম যে চিকিৎসা-বিদ্যায় শ্রবণ-অতীত শব্দতরঙ্গকে নানাভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে।

তারপরে আমরা গেলাম পাশের আরেকটি অপারেশন-ঘরে। এই ঘরটিকে দেখে অপারেশন-ঘর বলে চিনতে আমাদের বিশেষ অসুবিধে হল না। অপারেশন টেবিলটি একটু অন্য ধরনের। শুধু কতকগুলো সুইচ টিপেই সেই টেবিলটিকে খুশিমতো যে-কোনো অবস্থানে নিয়ে আসা চলে। ঘরের বাতিগুলো থেকে যে-আলো বেরিয়ে আসছে তা যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি বীজাণুকেও ধ্বংস করে। ঘরটি ঝকঝকে পরিষ্কার।

কিন্তু আমরা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, টেবিলের ওপরে সার্জনের ঠিক সামনেটিতেই একটি টেলিভিশনের পর্দা রয়েছে কেন।

সার্জন বোধ হয় আমাদের মনের প্রশ্ন ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, 'এটা সাধারণ টেলিভিশনের পর্দা নয়। এর সঙ্গে একটি এক্স-রে যন্ত্র লাগানো রয়েছে। এমনিতে অন্ধকার না হলে এক্স-রে ছবি দেখা যায় না। কিন্তু এই টেলিভিশনের পর্দায় উজ্জ্বল আলোতেও এক্স-রে ছবি দেখা যাবে। ওই দেখুন, এক্স-রে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাটির পেটে একটি পেরেক রয়েছে। বাচ্চাটি খেলা করতে করতে এই পেরেক গিলে ফেলেছিল। অপারেশন করবার সময়ে এই ছবি দেখেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিতে পারব আমি কতখানি কেটেছি আর আমাকে আরো কতখানি কাটতে হবে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, আজকাল কিন্তু কাটা-কুটি করার জন্যে আমরা আর ছুরি ব্যবহার করি না.....'

শুনে আমরা তো থ'! বলেন কি ভদ্রলোক!

ততোক্ষণে সার্জন তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'অ্যানীস্থেসিয়া।'

এবারও বিশেষ ধরনের একটি যন্ত্র দেখা গেল। যন্ত্রের মধ্যে তৈরি হল একটি তরঙ্গায়িত বৈদ্যুতিক কারেন্ট। এই কারেন্ট ঘুম পাড়িয়ে দিল রোগীকে। ডাক্তার বললেন, 'আগেকার কালে রোগীকে অজ্ঞান করবার জন্যে ক্লোরোফর্ম বা এ-জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করে আমরা রোগীকে কী যন্ত্রণাই না দিতাম! বিশেষ করে জ্ঞান ফিরে আসার পরে রোগীর যা অবস্থা হত তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু রোগীকে অজ্ঞান করবার জন্যে এই যন্ত্রের সাহায্য নিলে কোনো অবস্থাতেই কোনো রকম যন্ত্রণা বা অস্বস্তি হয় না।'

একটু পরে সার্জন আবার বললেন, 'তাহলে শুরু করা যাক।'

তখন ছাত্ররা চলে গেল পাশের ঘরে। সেখানে দেওয়ালের গায়ে রয়েছে মস্ত টেলিভিশন-পর্দা। এই টেলিভিশনের সাহায্যে ছাত্ররা অপারেশন দেখবে। এই ব্যবস্থার সুবিধে এই যে সত্যিকারের অপারেশন-ঘরে অনাবশ্যক ভিড় থাকে না।

তারপরে শুরু হল সত্যিকারের অপারেশন।

ছুরির বদলে যে-জিনিসটাকে সার্জন হাতে তুলে নিলেন সেটিকে দেখতে অনেকটা ছুঁচলো পেনসিলের মতো। পেনসিলের ভোঁতা দিক থেকে একটা তার বেরিয়ে সার্জনের কাঁধের ওপর দিয়ে পাক খেয়েছে।

তারপরে আমরা যে-দৃশ্য দেখলাম তা আমরা অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। সার্জন সেই পেনসিলটাকে রোগীর চামড়ার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলেন। দেখা গেল যে চামড়া কেটে দু-ফাঁক হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য, কাটা জায়গা দিয়ে এক ফোঁটাও রক্ত বেরোচ্ছে না।

তখন সার্জন আমাদের বুঝিয়ে বললেন যে অপারেশনটি করা হয়েছে আলট্রা-সাউণ্ড বা শ্রবণ-অতীত শব্দ-তরঙ্গের ছুরি দিয়ে। আর এই তরঙ্গের এমনই বৈশিষ্ট্য যে রক্ত সঙ্গে সঙ্গে দানা বাঁধে। কাজেই রোগীর শরীরে যে-ভাবেই কাটাছেঁড়া করা হোক না কেন, এক ফোঁটাও রক্তপাত হয় না।

সার্জন আমাদের বললেন যে, রক্তপাত বন্ধ করার চেয়েও আরো অনেক বেশি প্রয়োজনীয় একটি দায়িত্ব এই আলট্রা-সাউণ্ড ছুরির সাহায্যে পালন করা যাচ্ছে। শ্রবণ-অতীত শব্দতরঙ্গ জীবাণুকে ধ্বংস করে। অপারেশন চলবার সময়ে যদি জীবাণুনাশক প্রক্রিয়াটিও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে তা'হলে সার্জনের পক্ষে তার চেয়ে বড় স্বস্তির কারণ আর কিছু হতে পারে না।
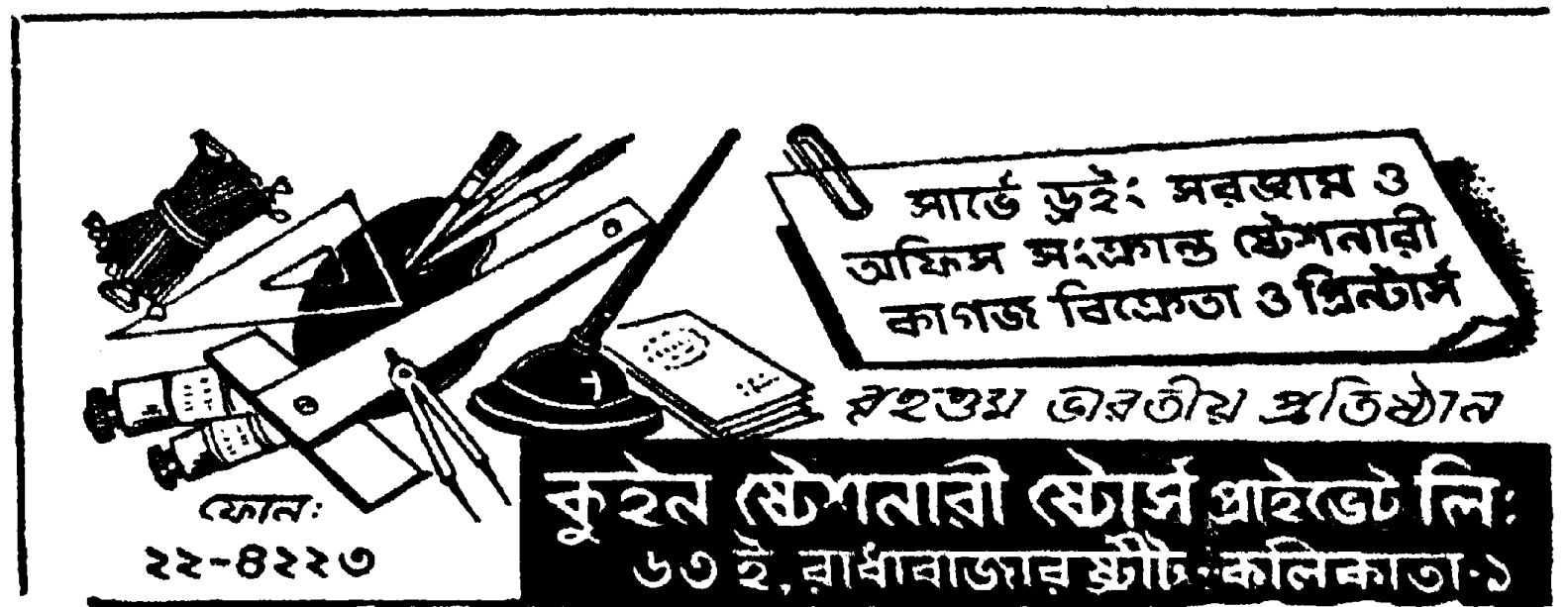
অপারেশন শেষ হবার পরে সার্জন বললেন, 'আঠা'।

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম। সত্যি সত্যিই আঠা-জাতীয় একটি পদার্থ নিয়ে আসা হল। তারপরে চামড়ার সঙ্গে চামড়ার মুখ লাগিয়ে বেমালুম জুড়ে দেওয়া হল সেই আঠা দিয়ে। ব্যাপারটা প্রায় গিয়ে দাঁড়াল সুকুমার রায়ের সেই কীর্তিমান হাতুড়ে ডাক্তারের কেরামতির মতোই।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীর বিবরণ এখানেই শেষ নয়। এরপরেও আছে কৃত্রিম হৃদপিণ্ডের কাণ্ডকারখানা। কৃত্রিম হৃদপিণ্ডের কথা অবশ্য এখনই খবরের কাগজে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এ-ব্যাপারটার মধ্যে আর কোনো বিস্ময় থাকবে না। সে-সময়ে চিকিৎসকরা খুশিমতো একটি কৃত্রিম হৃদপিণ্ড রোগীর বুকে লাগিয়ে আসল হৃদপিণ্ডকে মেরামতের জন্যে বার করে নিতে পারবেন।

তারপরেও শেষ কথাটা বলে নিই। আমাদের দেশের হাসপাতালে আগামী পঞ্চাশ বছরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এইসব আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা না দেখতে পেলেও আমাদের আক্ষেপের কোনো কারণ থাকবে না। পর্যাপ্ত সংখ্যক বেড, চিকিৎসার বন্দোবস্ত আর রোগীর প্রতি চিকিৎসকের সহৃদয় মনোযোগ—আমাদের দেশের হাসপাতালে আগামী পঞ্চাশ বছরে এইটুকু উন্নতি হলেই আমরা খুশি।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

উপহারের বই—

সরদা আইন পাশ হওয়ার প্রাক্কালে নাকি এক ফাল্গুনে চার হাজার কপি 'গীতাঞ্জলি' বিক্রী হয়েছিল। তখনকার কালের হিসাবে বিক্রয়ের অঙ্কটা চমকপ্রদ। এমন কি যুগান্তকারী বলা যায়। বিবাহের উপহারে বই দেওয়াটা কবে থেকে ফ্যাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জানি না, তবে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও সাধারণতঃ বিবাহের উপহারে যে সব বই উপহার দেওয়া হত তার দাম ছিল এক টাকা মাত্র। মলাটে তুলো দেওয়া, তার ওপর চকচকে সিল্কের বাঁধাই, যথা রজনীকান্ত সেনের 'বাণী' ও 'কল্যাণী'। কোনো কবিতা-গ্রন্থের এত বেশী সংস্করণ বোধ করি তখনকার কালে আর হয়নি। তারপর এল কমলিনী সাহিত্য-মন্দিরের এক টাকা সিরিজের মনোহর সংস্করণ। ভিতরে হেমেন্দ্র মজুমদারের দু' তিনখানি বহুবর্ণ ছবি, লেখকও সব ক্ষেত্রেই নামকরা, গ্রন্থের নামও চিত্তচমকপ্রদ, যেমন চারু বন্দ্যোর—"রূপের ফাঁদ"। তবে একথাও বলা প্রয়োজন যে সুরুচিসম্পন্ন উপহারদাতা দীর্ঘকাল শুধু রবীন্দ্রনাথেই তাঁদের নির্বাচন সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তাই 'বলাকা' 'চয়নিকা', 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'মহুয়া' প্রভৃতি উপহার গ্রন্থ হিসাবে কিছু কম বিক্রী হয়নি। ক্রমশঃ বই বিবাহের উপহারে একটা অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সস্তায় সুরুচিসঙ্গত উপহার দ্রব্য এমনটি আর নেই। দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই রুচির পরিচয় এই উপহার গ্রন্থ।

কালক্রমে উপহারের ক্ষেত্রও আর শুধু শুভ-বিবাহেই সীমাবদ্ধ নয় যদিচ অধিকাংশ প্রকাশক বৈশাখ থেকে শ্রাবণ আর অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস বই বিক্রীর অনুকূল কাল বা সীজন বলে মনে করেন, কারণ শুভ-বিবাহ এই কটি মাসেই ঘটে থাকে, এবং তাঁদের নির্দেশে বা সুপরামর্শে অনেক লেখকও তাঁদের গ্রন্থের নামকরণ পর্যন্ত সেই ভাবেই করেন,—শুভ, কন্যা, লগ্না, বরণ, মালা প্রভৃতি কথাগুলি আগে বা পরে বসিয়ে অনেকগুলি নানাবর্ণের মলাটযুক্ত গ্রন্থ বাজারে এই উপহার সামগ্রী হিসাবেই চালু আছে।

গ্রন্থ উপহার কিন্তু অন্য অনেক উপলক্ষে দেওয়া শুরু হয়েছে, যেমন ছোট ছেলেমেয়েদের জন্মদিন, বড়দের জন্মদিন, উপনয়ন, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার পর, স্থানান্তরে বদলী, বড়বাবুর অবসর গ্রহণ, শুভ-বিবাহ, এমন কি পারলৌকিক অনুষ্ঠানেও গ্রন্থ উপহারের রেওয়াজ আছে।

ছোটদের বই সাধারণতঃ অনেক ছবিওলা সেই সঙ্গে নামকরা লেখকের হলেই ভালো হয়। নতুবা অনুবাদ (সংক্ষেপিত) গ্রন্থ, যেমন শেক্সপীয়রের গল্প, ইলিয়াড, লা মিজারেবল, গালিভারের ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি। কিংবা ভল্লুক শিকার, কুম্ভীর শিকার, সুন্দরবনের বাঘ, বা হিমালয়ের চূড়ায়, কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলে প্রভৃতি দুঃসাহসিক কাহিনী। এই সব গ্রন্থের মূল্য দুই থেকে আড়াই টাকার মধ্যে। প্রচ্ছদ মনোরম এবং ত্রিবর্ণরঞ্জিত। সুতরাং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রকাশকরাও জানেন যে দাতার রুচি কোন্ দিকে এবং সেই চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যেই তাঁরা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে অপর কোনো প্রবন্ধে আলোচনা করা যাবে।

বড়দের জন্মদিনে কি বই দেবেন? এখানে দুটি জিনিস বিচার্য, গ্রহীতার রুচি ও বয়স। যদি উচ্চশিক্ষিত হন তাহলে তাঁর বৃত্তি অনুযায়ী উপহার গ্রন্থ নির্বাচিত হয়, সেই গ্রন্থ হয় সাধারণতঃ ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ। তবে সদ্য নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত গ্রন্থাদিরও জনপ্রিয়তা বেশী। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের বই (দেশী ও বিদেশী), উত্তম কবিতা গ্রন্থ ইত্যাদি দেওয়া যায়। সমকালীন জনপ্রিয় গ্রন্থ, যথা 'দৃষ্টিপাত' কিংবা 'পরমপুরুষ' এই সব উপলক্ষে উপহার দেওয়া হয়ে থাকে।

উপনয়নে বাঁধা উপহার,—উপনিষদের বাংলা অনুবাদ (উদ্বোধন), বিবেকানন্দ-চরিত, গীতা, রবীন্দ্রনাথের বই কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে, এক ক্ষেত্রে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপহার পেতে দেখেছি। ভ্রমণ কাহিনীও দেওয়া হয়ে থাকে উপনয়ন উপলক্ষে।

পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট হলে আগে বাঁধা উপহার ছিল ডিক্সনারী, এখন দেওয়া হয় সাম্প্রতিক জনপ্রিয় উপন্যাস, গল্প বা সংকলন গ্রন্থ। কিংবা পরবর্তী কালে পাঠ্যদশায় যা প্রয়োজন হতে পারে। যে সব বিদ্যালয়ে এখনও বাৎসরিক পুরস্কার দান প্রথা চালু আছে সেখানেও এই ব্যবস্থা, তবে জীবনী গ্রন্থের একটা বিশেষ সম্মান আছে বিদ্যালয়ে।

পদস্থ কর্মচারীদের স্থানান্তরে বদলী উপলক্ষে পুস্তক উপহার দেওয়া রীতি আছে, সেখানেও গ্রহীতার ব্যক্তিগত রুচি ও বয়সের দিকে লক্ষ্য রেখে উপহার দেওয়া হয়। সাধারণতঃ চাঁদা তুলে এই উপহার দেওয়া হয় বলে ভালো বাঁধাই রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের সংগ্রহ বা দশ-পনেরো টাকার সংকলন গ্রন্থ উপহারের এই প্রকৃষ্ট সুযোগ। অবসর গ্রহণেও অনুরূপ ব্যবস্থা, তবে তখন অবসরগ্রহীতা পঞ্চাশ পার হয়েছেন, পঞ্চত্বপ্রাপ্তির প্রস্তুতিতেই তাঁর সময় কাটবে, তাই সেই দিকে লক্ষ্য রেখে দাও 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', বড়জোর পরিষদ 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' বড়জোর পরিষদ সংস্করণ বঙ্কিম বা রমেশ গ্রন্থাবলী।

শুভ-বিবাহের উপহারে সব দেওয়া যায় গীতা থেকে গীতাঞ্জলি। কেননা বিবাহিত জীবনের পরিধিটা বিস্তৃত এবং রুচিও বয়সের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। তাই উপন্যাস, গল্প, কবিতা, সংকলন গ্রন্থ প্রথম সারিতে। তারপর সংকলন গ্রন্থ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা

প্রভৃতি। ধর্মগ্রন্থ যথা : সারদামণির জীবনী (উদ্বোধন), লীলাপ্রসঙ্গ, মহিয়সী ভারত নারী, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদি। অর্থাৎ চরিত্র-গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই দাতা শেষোক্ত গ্রন্থ বিশেষ করে কনেকে উপহার দেন। বেশ রঙচঙে ছাপা ভ্রমণ কাহিনীর চাহিদা আছে, এবং বিবাহ-বাসরে পরিব্রাজকের পর্যটন কাহিনী কিংবা তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গও উপহার দিতে লক্ষ্য করা গেছে। মার্ক্সীয় দর্শন বা মহাকাশে অভিযান জাতীয় গ্রন্থাদি এখনও উপহার দেওয়া বোধহয় রেওয়াজ হয়নি, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে উপহারও পাওয়া যায় দেখেছি।

পারলৌকিক অনুষ্ঠানে পাইকারি দরে গীতা, ছোট্ট রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি উপহার দিতে দেখা যায়। যাঁরা সম্পন্ন তাঁরা শোভন সংস্করণ গীতা দান করেন, আবার সহস্রনামের পকেট গীতাও দান করতে দেখেছি।

এই বিস্তারিত তালিকা দানের উদ্দেশ্য এই যে, বাংলা গ্রন্থের প্রচারের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে এবং আমাদের প্রকাশকরা তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করে কিভাবে এই বাণিজ্য সম্প্রসারণের একটা উন্মুক্ত দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন তা চোখের ওপর তুলে ধরা।

লাভ হোক, বই বিক্রী হোক এই বাসনা প্রকাশক এবং লেখক উভয়েরই আছে। কিন্তু সেই লাভ কিভাবে করা যায় তার কয়েকটি স্থূল প্রক্রিয়া ছাড়া সূক্ষ্ম উপায় তাঁদের জানা নেই, বা জানা থাকলেও তাঁরা সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন।

শীতকালে ময়রারা নলেন গুড়ের সন্দেশের বিজ্ঞাপন দেন, সন্দেশ যাঁর প্রয়োজন তিনি ত' কিনবেনই। কিন্তু নলেন গুড়ের সন্দেশ উঠেছে এই মূল্যবান সংবাদটুকু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করলে ভোজনরসিকের রসনায় লালা ক্ষরিত হতে পারে এবং তিনি চার আনা থেকে এক টাকার সন্দেশ কিনতেও পারেন। এই রকম আরো অনেক রকম পণ্যের নাম করা যায়—ঋতুভেদে রুচিভেদ।

আমাদের প্রকাশকরা যদি বিবাহ বা উপনয়নের লাল তারিখ যে সময় পাঁজিতে থাকে সেই সময় উপহারযোগ্য পুস্তকাবলীর নাম বিজ্ঞাপিত করে ক্রেতার চোখের সামনে তুলে ধরেন, তাহলে ক্রেতা নির্বিচারে যা-হয় তা-হয় না কিনে বিচারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। এ ছাড়া কোন্ উপলক্ষে কি জাতীয় গ্রন্থ দেওয়া যায় তার আলাদা তালিকা রচনা করে ক্রেতার চোখের সামনে তুলে ধরা যায়।

বর্তমান লেখকের সম্প্রতি হুগলী জেলার এক মফঃস্বল শহরে যে জাতীয় গ্রন্থাদি উপহার হিসাবে দেওয়া হয় তা লক্ষ্য করার সুযোগ ঘটেছে। তার নমুনা আমাদের খ্যাতিমান লেখক এবং প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন প্রকাশকের সামনে যদি ধরে দেওয়া যেত তাহলে খুশী হতাম। অতি তৃতীয় শ্রেণীর লোকের লেখা একালের বটতলার বই মফঃস্বলের বাজার ছেয়ে আছে। সেখানে সদ্‌গ্রন্থের প্রবেশ সম্ভব নয়। অতি উচ্চ কমিশনে কলিকাতার এক জাতীয় পুস্তক বিক্রেতা মফঃস্বলে এই সব বই সরবরাহ করেন আর সেই সব বই বিশেষ করে শুভ-বিবাহের বাজার গ্রাস করেছে। এর মধ্যে দু' একজন খ্যাতিমান লেখকের অল্প-বয়সে লেখা কপিরাইট-বেচা বইও আছে।

পুস্তক বিক্রেতা সমিতির বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বই-এর বাজারের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। শুধু কাউণ্টার নয়, তার বাইরে আছে এক বিরাট অনাবিষ্কৃত জগৎ, যেখানে ক্রেতা অতি সুবোধ বালক—অর্থাৎ 'সে যাহা পায় তাই গ্রহণ করে, ইহা দাও উহা দাও বলিয়া চিৎকার করে না।' সেই শান্ত, সুবোধ বাংলা গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষকদের রুচি নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট নয়, কিন্তু হাতের কাছে সদ্‌গ্রন্থের অভাবে প্রয়োজনের সময় তারা যা-হয় একটা কিছু কিনতে বাধ্য হন। যেখানে ফাঁক আছে সেখানেই আছে ফাঁকির সুযোগ, সেই 'ভ্যাকুয়াম' পূর্ণ করার জন্য অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পাঠক, লেখক, প্রকাশক এবং বঙ্গ সাহিত্যের স্বার্থে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বিবেচনা করি।

নতুন বই

মাটির পথ—(উপন্যাস) উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ডি, এম, লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম সাড়ে ছয় টাকা।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে একটি সুপরিচিত নাম এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সুখপাঠ্য গল্পলেখক, জনপ্রিয় উপন্যাসকার এবং বিচিত্রা সম্পাদক ছিলেন সেযুগ এবং এযুগের মানুষের মধ্যে প্রায় সর্বশেষ সংযোগ সেতু। তাঁর উপন্যাসগুলি দীর্ঘকাল বাঙালী পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছে, এই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। আঙ্গিক, রূপকল্প এবং উপন্যাসের উপজীব্য বিগত ত্রিশ বছরে এক বৈপ্লবিক ভঙ্গীতে পরিবর্তিত হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ কালের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে তাঁর পুরাতন টেকনিক পরিবর্তন করেননি, বরং জমিয়ে, গুছিয়ে, সরল ভঙ্গীতে বলা তাঁর কাহিনীর মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য সরসতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'মাটির পথ' উপন্যাসটি মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রকাশকালে মূল লেখক কোনো-রূপ পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে

পারেননি, তবু 'মাটির পথ' উপন্যাসে উপেন্দ্রনাথের সেই চিরন্তন বৈশিষ্ট্য আশাবাদ ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের নায়িকা সীমা ও দিলীপ আর তাদের সঙ্গে আছেন সীমার দাদা হিমাংশু আর বৌদি মালতী। এঁদের ঘিরে কাহিনী গড়ে উঠেছে। ধনী পরিবার, দিলীপ ও সীমার পূর্ব-প্রণয় ছিল, বিয়ে হবে ঠিকঠাক। সীমা শিক্ষিতা, সুরুচি-সম্পন্না, দিলীপকে ভালো লাগে এই পর্যন্ত। কিন্তু স্বামীত্বে বরণ করতে মন সরে না। তারা মনস্থির করতে পারে না। দিন কাটে। এর মধ্যে নন্দীহাটার গ্রাম, সেখানকার পণ্ডিত আর তাঁর টোল। গ্রামের পরিবেশ এবং সরলতা সীমাকে নতুন পথের ইঙ্গিত দেয়। সে ইঙ্গিত মাটির পথের ইঙ্গিত। কিন্তু পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহে দুজনের বন্ধুত্বে চিড় খেয়ে গেল—তার মূলে আর একজন শিক্ষিতা তরুণী, সুজাতা। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ভুল ভাঙার সূচনা এবং মিলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উপেন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের রচনা এই উপন্যাস। শহরের ও গ্রামের মানুষকে তিনি অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন। তাই তাদের জীবনের একটা দিক তিনি নিখুঁত আলোকচিত্রের মত এই উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। ঘটনা-বিন্যাসের নাটকীয়তা এবং পরিণতির সুরুচিসম্পন্ন ইঙ্গিত 'মাটির পথ'কে উপন্যাস হিসাবে সার্থক করেছে।

অতল জলের আহ্বান (উপন্যাস)—প্রতিভা বসু। এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স (পি) লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শ্রীমতী প্রতিভা বসু বাংলা সাহিত্যের যে কয়জন মুষ্টিমেয় মহিলা লেখিকা আছেন তাঁদের অন্যতমা। গল্প-বলার ভঙ্গী, সহজ এবং অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গী এবং শব্দ-নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনার সাফল্যের হেতু। কয়েকটি জনপ্রিয় উপন্যাসের লেখিকা এবং চলচ্চিত্রে তার রূপায়ণের জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁর কাহিনী-বিন্যাসের ভঙ্গিমা পাঠককে অতি সহজেই আকৃষ্ট করে।

'অতল জলের আহ্বান' শ্রীমতী প্রতিভা বসুর সাম্প্রতিক উপন্যাস। কাহিনীটি নূতন না হলেও পুরাতন এসেছে এদিনের রূপে। সাবিত্রী, সতী, লটি এই তিন কন্যার কাহিনী 'অতল জলের আহ্বান'। সে কথা শুধু মেয়েরাই জানেন, যে কামনা নারীর অন্তরের, যে কল্পনার গহনে তাঁরা বিচরণ করেন 'অতল জলের আহ্বান' উপন্যাসে আছে তারই করুণ মধুর কাহিনী।

শ্রীমতী প্রতিভা বসুর অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতায় উপন্যাসটি সার্থক হয়েছে। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ প্রকাশকের খ্যাতির উপযোগী।

নীলাঞ্জনা—সুমথনাথ ঘোষ। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে এস, এন, রায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৭্।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে সুমথনাথ ঘোষের নাম সুপরিচিত। সম্প্রতি প্রকাশিত আলোচ্য উপন্যাসখানি তাঁরই রচিত একখানি আধুনিক সমস্যামূলক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

কলেজের পরিবেশে প্রণবেশ ও অনুশীলার সম্পর্ক নিয়ে উপন্যাসখানির আরম্ভ। মামুলী ধারার তথাকথিত আদর্শ প্রেমের অজুহাতে গুরুজনদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে, রেজেস্ট্রী মতে প্রণবেশ ও অনুশীলার বিবাহ। দারিদ্র্য, বাস্তব-জীবনের অবশ্যম্ভাবী সংঘাত, মানসিক দ্বন্দ্ব, উভয়ের ভুল বোঝাবুঝি প্রভৃতি চলতি ঘটনা নিয়ে মূল আখ্যান-অংশের দ্রুত পট-পরিবর্তন। নায়ক-নায়িকার জীবনে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল একদিকে নবজাত শিশু মিণ্টুর আগমনে এবং অপর দিকে দুঃস্বপ্নের মত প্রণবেশের জীবনে প্রীতিকণার আবির্ভাবে। ঠিক সেই সময় মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তে সত্যজিৎকেও পাওয়া গেল বিয়োগান্ত পরিণতির ইন্ধন যোগাবার জন্য। প্রণবেশ ধাপে ধাপে অবনতির চরম স্তরে নেমে গেল—মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সে আদালতের চোখে অনুশীলাকে ভ্রষ্টা প্রমাণ করে তাকে ডিভোর্স করল। কিন্তু প্রণবেশের সমস্ত উদ্যম, সমস্ত আশা সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেল যেদিন প্রীতিকণার বাড়ি থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে সে কুকুরের মত ফিরে এল। প্রণবেশ নিজেকে হারিয়ে ফেলল—সংসারে তার আর কোথাও স্থান নেই......জেল থেকে ফিরে বিকলাঙ্গ, খঞ্জ প্রণবেশকে দেখা গেল—তার শেষ আশা নির্মূল হয়ে গেছে। হতাশ প্রাণে, বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে চলে গেল সেই অদ্বিতীয় পথে, যেখানে যুগযুগান্ত ধরে মানব যাত্রী চলেছে। অনুশীলা আজ কোথায়? তার খবর কেউ রাখে না, তবে দুঃখ হয় মিঃ মদনলালের জন্য; ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেদনা নিয়ে তিনি আজও সম্ভবতঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশে-বিদেশে—সান্তাক্রুজ বিমানঘাটি থেকে তিনি কায়োপলক্ষে বিলেত গিয়েছেন সত্য, কিন্তু মনে হয় আজও তিনি অনুশীলাকে ভুলতে পারেননি।

উপন্যাস হিসাবে কাহিনীর দিক থেকে 'নীলাঞ্জনা' যে সার্থক সৃষ্টি তা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণ বৃদ্ধি থেকেই উপলব্ধি হয়। বহিরাবরণ আকর্ষণীয় ও নয়নানন্দকর।

মন্দা-নন্দার দেশে—শুভংকর। প্রবর্তক পাবলিশার্স। ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৪্ টাকা।

সম্প্রতি একটা ঝোঁক দেখা যায় যে আমরা ইতিহাসকে নিছক ইতিহাস বা ভ্রমণ-কাহিনীকে শুধুমাত্র ভ্রমণ-কাহিনী হিসেবে নিতে পারছি না। তার মধ্যে এসে যাচ্ছে গল্পের ঝোঁক, রোমান্সের আমেজ বা উপন্যাসের মৌতাত। পাকা লেখকের হাতে পড়লে অবশ্য এইসব নিয়েও সমগ্র সৃষ্টি অন্য এক রূপ পায়। কিন্তু সে দক্ষতা অর্জন করতে হয় বহুদিনের সাধনায়। অথচ সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিষয়মাহাত্ম্যে যা ইতিহাস কিংবা ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে উল্লেখযোগ্য হতে পারত, শুধুমাত্র গল্প বলার ঝোঁক সামলাতে না পারার জন্যে তা না হয় সাহিত্য না ভ্রমণ-কাহিনী। শুভংকরের 'মন্দা-নন্দার দেশে', আমার ধারণায়, ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে যে উজ্জ্বলতা পেতে পারতো, তা উল্লিখিত কারণে অনায়ত্ত রয়ে গেছে। শব্দ ব্যবহারে লেখকের অন্যমনস্কতাও লক্ষ্যণীয়। পরবর্তী সংস্করণে লেখক যদি এদিকে একটু মনোযোগ দেন তবে পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বাড়তে পারে।

ময় যশ এবং সুনাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে অর্থোপার্জন করে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে, এ-বিষয়ে চলচ্চিত্র-প্রযোজনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেরই এককভাবে এবং সমবেতভাবে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের উৎপাদন, পরিবেশন, প্রদর্শন— এই তিনটি বিভাগেরই আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্ভবতঃ অনুসন্ধান করবার পর এই শিল্পকে ন্যূনতম বেতন আইনের অধীন কর্ম-নিয়োগ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁদের ১৮-৫-৬০ তারিখের ঘোষণা দ্বারা। সম্প্রতি প্রদর্শন বিভাগের অর্থাৎ সিনেমাগৃহের কর্মীরা এই ন্যূনতম বেতন আইন চালু করবার জন্যে যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তার ফলাফল পাঠকদের অজানা নয়। কিন্তু যেখান থেকে চলচ্চিত্রের জন্ম, সেই উৎপাদন কেন্দ্র—স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরীগুলির কর্মীরা তাঁদের ক্ষেত্রেও এই আইন মাত্র কাগজে-কলমে না থেকে বাস্তবভাবে কবে থেকে চালু হবে, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন চলচ্চিত্রকুশলীদের সংস্থা— সিনেটেকনিসিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তারের সামনে। এর জবাবে শ্রী সাত্তার নীতিগতভাবে যে-কথা বলেন, তার যাথার্থ সম্বন্ধে কোনো নিয়োগকর্তা বা মালিকই দ্বিমত হতে পারেন না। তিনি বলেছেন, শ্রমিকদের বেতন প্রদান যে-কোনও শিল্পের প্রধান দায়িত্ব এবং প্রতিটি শিল্পকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র উৎপাদন-শিল্পে বহু ক্ষেত্রেই কর্মীদের বেতন অনাদায়ী থেকে যায়, এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে শ্রমদপ্তর দ্বারা "ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট" ইসু করার পদ্ধতি প্রচলনের দাবি জানালে শ্রমমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, কর্মীদের পারিশ্রমিক প্রদান যখন শিল্পের প্রধান দায়িত্ব তখন কোন সেন্সর বোর্ড কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতিদানের পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সেই বিশেষ চলচ্চিত্র সম্পর্কে সকল কর্মীর পারিশ্রমিক সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই মর্মে এক "ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট" দেওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করে দেখতে পারেন। যদিও শ্রী সাত্তার চলচ্চিত্র স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরীর মালিকদের যথাশীঘ্রসম্ভব ন্যূনতম বেতন কার্যকরী করবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন, তবু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, যেমন একটা মোটরগাড়ি চালাতে গেলে পেট্রলের দরকার হয়, তেমনি ন্যূনতম বেতন দাবি করবার আগে চলচ্চিত্র উৎপাদন-শিল্পের ঐ ব্যয়ভার বহন করবার সামর্থ্য আছে কিনা, তাও দেখা দরকার। মন্ত্রীমহোদয় সম্ভবতঃ অধিকাংশ বাঙলা ছবির আর্থিক অসাফল্যের কথা স্মরণ করেই এ-কথা বলেছেন; কিন্তু চলচ্চিত্র কুশলীদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক পাবার দাবি অন্নবস্ত্র সংস্থানের দাবি, বেঁচে থাকার দাবি এবং সেই কারণেই কোনো অজুহাতেই এই দাবিকে ঠেকিয়ে রাখা উচিত হবে না। বিশেষ যখন, সরকার সম্ভবমত অনুসন্ধান করবার পরেই এই ন্যূনতম বেতন আইন চালু করবার পরামর্শ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্প খালি বেঁচে থাকুক, এই কামনাই যথেষ্ট নয়; এই শিল্প যেন উত্তরোত্তর পৃথিবী-

॥চিত্র সমালোচনা॥

কঠিন মায়া : সুশীল মজুমদার প্রোডাক্‌সন্স-এর ছবি: ১৩৬০৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : গজেন্দ্রকুমার মিত্র; চিত্রনাট্য : বিনয় চট্টোপাধ্যায়; পরিচালনা : সুশীল মজুমদার; সংগীত পরিচালনা : কালিপদ সেন; চিত্রগ্রহণ : বিমল মুখোপাধ্যায়; শব্দধারণ : সুশীল সরকার; সম্পাদনা : সুবোধ রায়; শিল্পনির্দেশ : সুনীতি মিত্র; ভূমিকায় : জহর গাঙ্গুলী, বিশ্বজিৎ, পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, রাজলক্ষ্মী, সন্ধ্যা রায়, দীপিকা দাস, গৌরী মজুমদার প্রভৃতি। ডিলাক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় গেল ২৭শে জুলাই থেকে উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

কাহিনীকার গজেন্দ্রকুমার মিত্র "কঠিন মায়া" বইয়ের নিবেদনে কবুল করেছেন, কোনো চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের তাগিদে তিনি তাঁর মূল ছোট গল্পকে বাড়িয়ে উপন্যাসের আকারে দাঁড়-

তাস ফিল্মের আগামী চিত্র "কানামাছি" চিত্রে ভানু ও পাহাড়ী।

করিয়েছেন এবং পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, রচনাটি প্রধানতঃ চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই এগিয়েছে। এ সত্ত্বেও চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায় সম্ভবতঃ গল্পটিকে যুগোপযোগী করবার জন্যে কাহিনীকারের উপন্যাসরূপের বহু পরিবর্তন পরিবর্জন এবং পরিবর্ধন করেছেন। এমন কি নায়ক সর্বেশ্বরের যে-রূপ কাহিনীকার কল্পনা করেছেন, সেই "শ্রীহীন, লম্বা, একহারা চেহারা, মাথার চুলগুলো বিবর্ণ, গায়ে একটি ময়লা কোট" ইত্যাদিকে বেবাক বিসর্জন দিয়ে তাকে পুরোপুরি সিনেমার হিরো করে তুলতে চেয়েছেন দেহেমনে তরুণ, সদ্য বি-কম পাশ সুদর্শন যুবক। শুধু তাই নয়, গল্পের সর্বেশ্বর নানা রকমে রোজগার করে এবং মাঝে মাঝে পিসিমাকে দু-পাঁচ টাকা পাঠায়। কিন্তু ছবির সর্বেশ্বর পিসিমার পাঠানো টাকায় মেস-খরচা দেয় এবং নিজে নিষ্কর্মা—বন্ধুবান্ধবদের রেসের টিপ দিতেই ব্যস্ত।......বইয়ে দেখি, সর্বেশ্বর 'একটি বছর পনেরো-ষোলর মেয়ে বালতি হাতে বোধ করি নীচের কলতলায় জল আনতে' যাচ্ছে দেখে তাকে ডেকে আলাপ করে—'শুনছেন, শুনুন' বলে। ছবিতে টেঁপি নিজেই যেচে আলাপ করে সর্বেশ্বরের সঙ্গে।... এ-রকম বহু পরিবর্তনই নজরে পড়বে 'কঠিন মায়া'-পাঠকের ছবি দেখতে গিয়ে। গল্পটির চিত্ররূপ দেবার জন্যে সব ক'টি পরিবর্তনই অবশ্য প্রয়োজনীয় কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ করবার অবকাশ আছে।

হৃষিকেশ মুখার্জি পরিচালিত এ. ভি. এম-এর হিন্দী চিত্র 'ছায়া'র নায়ক-নায়িকা সুনীল দত্ত ও আশা পারেখ।

নায়ক সর্বেশ্বর বিবাহ-ভীতিগ্রস্ত যুবক, গ্রামের পিসীর আদরের ভাইপো। বনমালী ঘোষাল যখন কারসাজি করে নিজের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্যে তাকে প্রায় আশীর্বাদ করে ফেলে, তখন তার বিবাহ-ভীতি আরও উৎকট হয়ে ওঠে এবং স্নান করবার ছুতোয় বেরিয়ে প'ড়ে লম্বা দৌড় দেয় নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। কলকাতার মেসে ফিরেও যখন সে আবিষ্কার করে, বনমালী তাকে সেখানে পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে, তখন সে নিরুপায় হয়ে গিয়ে ওঠে বন্ধু সুনীলের ওখানে এবং বারো ঘরে বারো ফ্যামিলি-ওলা বাড়ীর সিঁড়ির কোণে কয়লা রাখবার জায়গাটি ভাড়া নিয়ে এক রকম নিরুদ্দেশ বাস করতে থাকে। এইখানেই অন্যতম ভাড়াটে মহিমবাবুর মেয়ে টেঁপি সর্বেশ্বরের খুব ভক্ত হয়ে পড়ে। যদিও এরমধ্যে কোনো তরফেই প্রেমের ছিটেফোঁটা ছিল না। কিন্তু বামুনপিসি কোথাকার এক বাউন্ডুলে ছেলের সঙ্গে টেঁপির গুজুরগুজুর-ফুসুরফুসুরকে সুনজরে দেখলেন না এবং যখন সর্বেশ্বরের টাকায় মহিমবাবু বামুনপিসির কাছ থেকে বন্ধকী হার-ছড়া ছাড়িয়ে টেঁপির গলায় দিয়ে বললেন, সর্বেশ্বর ওটা টেঁপির বিয়েতে যৌতুক দিয়েছে, তখন বামুনপিসি হৈ-হৈ-রৈ-রৈ করে ঘোঁট পাকালেন, তাতে মহিমবাবুও হতবুদ্ধি হয়ে সর্বেশ্বরকে ধরে বসলেন টেঁপিকে বিয়ে করবার জন্যে এবং এই প্রস্তাবে সর্বেশ্বরও যথারীতি পলায়ন করে ফিরে এল মেসে। কিন্তু এখানে এসে সেই শুনল, বনমালী এখনও তার আশা ছাড়েনি, তখন সে 'রেলগাড়ী যদ্দূর নিয়ে যায়, তদ্দূর যাবে' মনস্থ করে বেরিয়ে পড়ল। পথে সে পেয়ে গেল একজন দার্শনিক ক্যানভাসারের কাছ থেকে সংকটমোচন মাদুলি এবং জ্বরের মহৌষধ; আর তাই ফিরি করতে করতে সে এসে উঠল এক নামগোত্রহীন পল্লী-গ্রামে তেলেভাজার দোকানী বিপ্রদাস ভট্টাচার্যের বাড়ীতে, যেখানে থাকে 'মনে মধু জিভে বিষ' পুঁটি—বিপ্রদাসেরই ছোট বোন। ধীরে ধীরে এই পুঁটিরই আকর্ষণ অমোঘ হয়ে ওঠে তার কাছে এবং শেষ পর্যন্ত পুঁটির বিবাহবাসরে উপস্থিত হয়ে বনমালী ঘোষালের মেয়ের সঙ্গে পুঁটিকে-বিয়ে-করতে-আসা বরের বিবাহ ঘটিয়ে নিজে পুঁটিকেই বরণ করে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্যজীবনকেও।

একটি ঘনিষ্ঠ নাট্যবস্তু হয়ে ওঠবার পক্ষে এই গল্পটির অসুবিধা আছে অনেক। তারমধ্যে প্রধান হচ্ছে, গল্পের নায়ক এক হলেও গল্পটি আসলে অন্ততঃ তিনটি গল্পের সমষ্টি : (১) সর্বেশ্বর, পিসিমা, বনমালী ইত্যাদি, (২) সর্বেশ্বর, মহিমবাবু, টেঁপি, মলয় ইত্যাদি, (৩) সর্বেশ্বর, বিপ্রদাস, পুঁটি ইত্যাদি। নায়কও যেমন ক্রমাগত এক
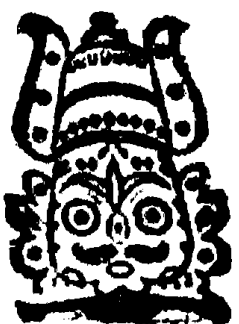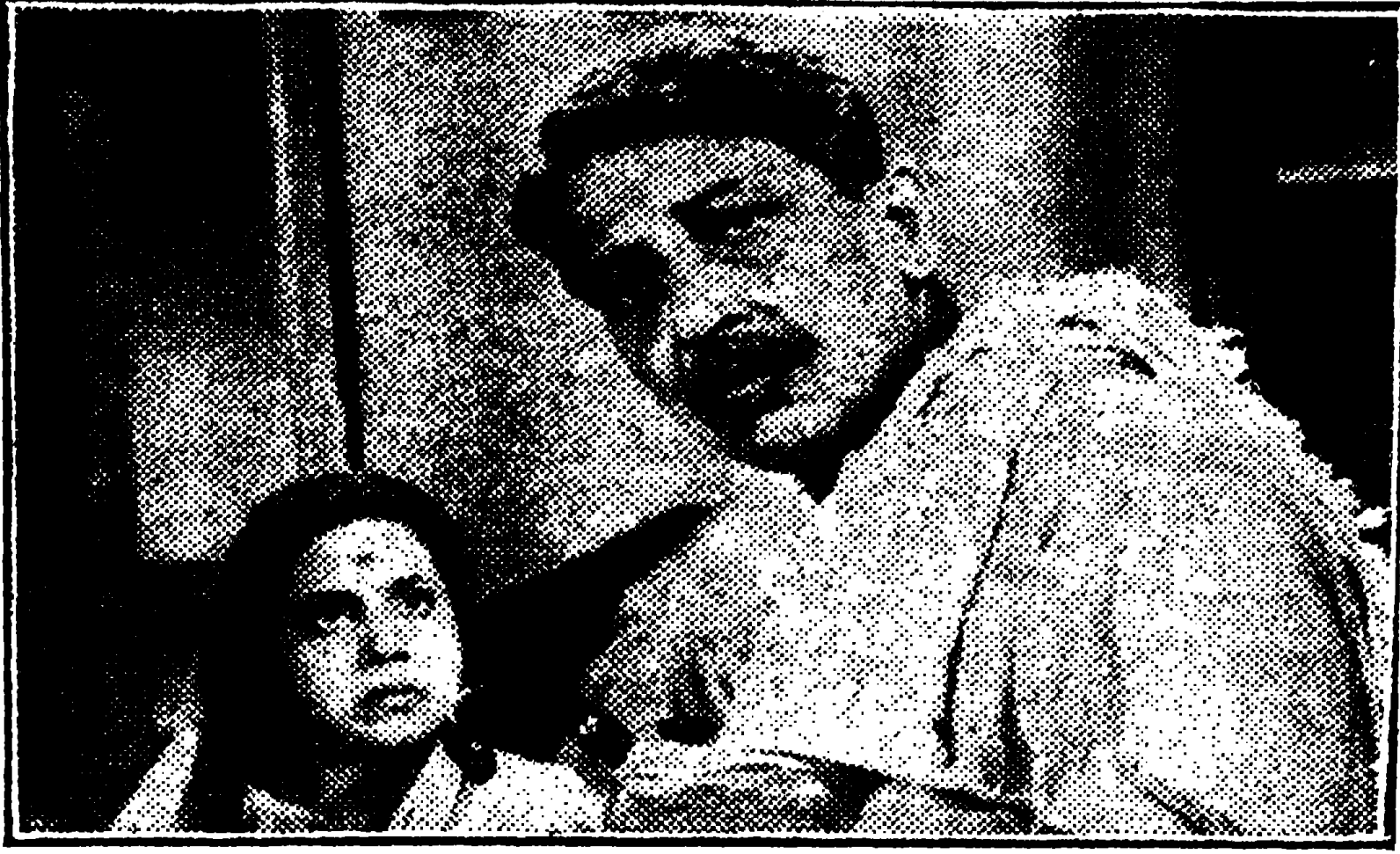
চিত্রালয়ের 'আজ কাল পরশু' চিত্রে কানু ব্যানার্জি ও অপর্ণা দেবী।

জায়গা থেকে আর জায়গায় সরে গেছে, গল্পও তেমনি তারই সঙ্গে সঙ্গে সরে চলেছে—হয়ে পড়েছে episodical। তাই গল্পে অনেক মানুষের ভিড় এবং সেই ভিড়ে সবকিছু হারিয়ে গেছে। বিবাহ-ভীতিগ্রস্ত সর্বেশ্বরকে নিয়ে হয়ত একটি নিরবচ্ছিন্ন হাসির ছবি তৈরী হওয়া সম্ভব ছিল কিন্তু 'কঠিন মায়া' হাসির ছবি হয়নি। 'প্রতি রাত্রে যে-ট্রাজেডি অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলে বারোটি কামরায় বারোজন লোক না থেকে বারোটি ফ্যামিলি বাস করতে বাধ্য হয়,' এই ধরণের বাণী এবং প্রতিটি মেয়েকে ছেড়ে আসবার পরেই সর্বেশ্বরের মুখে 'এমন মানব জমি রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলাতো সোনা'-গান দেওয়া সত্ত্বেও 'কঠিন মায়া' হাসির ছবি হয়নি; অনাবশ্যক বুকুনি এবং ঘটনাসর্বস্ব চিত্রে পরিণত হয়েছে, যা দর্শক মনে বেশীরভাগ সময়েই সাড়া জাগাতে পারে না। ছবির মধ্যে দর্শকেরা উপভোগ করেছে মাত্র দুইটি জিনিস—এক, অনুপকুমার অভিনীত মলয় চরিত্রটিকে এবং দুই, সন্ধ্যা রায়ের তারুণ্যকে। সন্ধ্যা রায়ের মুখে-দেওয়া চাঁচাছোলা কথাগুলি যদি স্পষ্ট এবং শ্রবণগ্রাহ্য হত, তাহলে সেগুলিও দর্শকদের আনন্দ দিত, সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ জায়গাতেই তা হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত এবং অস্পষ্ট।

আগেই বলেছি, অভিনয়ে মাত করেছেন অনুপকুমার। যেখানে উনি এসেছেন, যতক্ষণ উনি দৃশ্যের মধ্যে থেকেছেন, সেইখানে এবং ততক্ষণ লোকে তাঁকেই দেখেছে এবং দেখে হেসেছে, হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেয়েছে। বর্তমান বাঙলা চিত্রজগতে হাস্যাভিনেতা হিসেবে ও'র জুড়ি নেই, এ-কথা উনি বারংবার প্রমাণিত করেছেন এই ছ
মাধ্যমে। এ'র পরেই চোখে ধরবার ম
অভিনয় করেছেন বনমালীর ভূমি
জহর গাঙ্গুলী। টেঁপির ভূমিকায় ন
গতা কুমারী গৌরী মজুমদার চরি
চিত অভিনয় করে তাঁর চিত্রাবতর
সার্থক করেছেন; মাত্র সর্বেশ্ব
বিদায় দৃশ্যে তাঁর চোখ, মুখ এবং ক
স্বর চরিত্রের বেদনাকে ঠিকমত ফু
তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। নায়ক সর্বেশ্ব
ভূমিকায় বিশ্বজিতকে মানিয়েছে চ
কার এবং আগাগোড়া তিনি স
সুঅভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমি
পাহাড়ী সান্যাল, অমর মল্লিক, কেষ্ট
মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, দিলীপ
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, স
রায়, দীপিকা দাস, রবীন মজুম
প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকায় যথাযথ অভি

করেছেন। দার্শনিক ক্যানভাসার-বেশে পরিচালক সুশীল মজুমদার সুন্দর একটি টাইপ সৃষ্টি করেছেন, সুন্দর মেক-আপ এবং বাচনের সাহায্যে।

ছবির চারখানি গানই সংগীত, যদিও সন্ধ্যা রায়ের মুখের গানখানির খুব বেশী প্রয়োজন ছিল না। সাধক রামপ্রসাদ শ্যামা-সংগীত রচনা করেছেন —"মনরে কৃষি কাজ জান না" এবং কাহিনীকার গজেন্দ্র মিত্র সর্বেশ্বরের মুখে গানখানি দিয়েওছেন। কিন্তু টেঁপির কাছ থেকে বিদায় নেবার পর যেভাবে সর্বেশ্বরকে দিয়ে ঐ গান গাওয়ানো হয়েছে, তা অত্যন্ত রুচি-বিগর্হিত এবং ভক্তিমূলক গানের প্রতি অশ্রদ্ধার পরিচায়ক। কাহিনীকার বিবাহভীত সর্বেশ্বরের কণ্ঠে ঐ জায়গায় দিয়েছেন—'মা, আমায় ঘুরাবি কত? চোখঢাকা বলদের মত?' এবং তা অতীব সুষ্ঠু।

ছবির কলাকৌশলের কাজ সাধারণ পর্যায়ের।

আজ কাল পরশু: চলচ্চিত্রালয়ের ছবি; ১০,৫৯৯ ফুট দীর্ঘ এবং ১২ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা, রচনা ও পরিচালনা: নির্মল সর্বজ্ঞ; চিত্রগ্রহণ অজয় মিত্র ও ননী দাস; সংগীত-পরিচালনা: অপরেশ লাহিড়ী; আবহ-সংগীত-পরিচালনা: শৈলেশ রায়; শব্দ-ধারণ: জে ডি ইরানী; সম্পাদনা: শিবসাধন ভট্টাচার্য; ভূমিকায়: কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সবিতাব্রত, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী, সুশীল মজুমদার (অতিথি অভিনেতা) প্রভৃতি। কমলা চিত্র পরিবেশকের পরিবেশনায় গেল ২৮শে জুলাই থেকে রূপবাণী, ভারতী, অরুণা ও অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

অর্থনৈতিক অব্যবস্থার প্রচণ্ড পেষণে আজ সাধারণ বাঙালী কেরানীর জীবন জর্জরিত, তার সংসারের সবকটি প্রাণীই অনশনক্লিষ্ট, ঋণভারে সে পঙ্গু। কেরানীর সংসার অভাবের সংসার; তাই সে-সংসারের ছেলেমেয়ে না পায় শিক্ষার সুযোগ, না পায় পেট ভরে খেয়ে হেসেখেলে বেড়াবার সুবিধা। যদিই বা কোনো ছেলে ওই সদাবঞ্চিত জীবনের মধ্যে থেকেও অসাধারণ অধ্যবসায়ের জোরে হঠাৎ বি-এ পাশটা করে ফেলে, সেও বছরের পর বছর ধরে আফিসপাড়ার দরজায় দরজায় ঘুরে একটা চাকরী পায়না এবং নিজের শিক্ষার অসার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সমাজের একটা ভার বলে মনে করতে সুরু করে।—এই অতি সত্য কথাটাই বলতে চাওয়া হয়েছে 'আজ কাল পরশু' ছবির মাধ্যমে। এবং এই

সংলাপহীন চিত্র "ইংগিতে"র একটি দৃশ্যে প্রতুল চৌধুরী ও লিলি চক্রবর্তী।

উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু নিষ্ঠাবান অভিজ্ঞ কেরানী হরিমোহনবাবু কেনই যে মধ্যে মধ্যে আফিসে দেরীতে পৌঁছোন, একজন অকর্মণ্য ম্যানেজারের ব্যক্তিগত আক্রোশে কেনই বা তাঁর দীর্ঘকালের চাকরী চলে গেল, আফিসের সর্বময় কর্তা কেনই যে আফিসের দৈনন্দিন খবরাখবর রাখেন না, এ-সব প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মনে

আসে এবং এদের কোনো সংগত উত্তর মেলে না বলেই ছবির গল্পের বাধুনিকে বহু জায়গায় দুর্বল বলে মনে হয়। নইলে ছবিটি বহির্দৃশ্যসমৃদ্ধ হওয়ায় এবং বহু বাস্তবধর্মী দৃশ্যের সংযোজনায় একটি অসাধারণ শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারত।

অভিনয়ে আদর্শ কেরানী হরিমোহনের ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায় সংযত জীবন্ত বাস্তবধর্মী অভিনয় করে চরিত্রটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন; সময় সময় মনে হয়, অভিনয় দেখছি না একটি রক্তমাংসের কেরানীর মর্মবেদনাকে প্রত্যক্ষ করছি। এবং তাঁর সংগে পুরোপুরি তাল রেখে অভিনয় করেছেন হরিমোহনের সহধর্মিণীর ভূমিকায় অপর্ণা। একটি ছাপোষা কেরানীর স্ত্রী হয়ে পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা হওয়া যে কি ঝকমারি, তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অপর্ণা। অনুপকুমারকে আমরা হাস্যরসের অভিনেতা রূপে দেখতেই অভ্যস্ত। এ ছবিতে তাঁর গৃহীত ভূমিকা কিন্তু আদৌ হাস্যরস পরিবেশন করেনি। বি-এ পাশ ছেলের চাকরীর চেষ্টায় ব্যর্থতা এবং সেই কারণে কলেজ জীবনের সঙ্গিণী অসীমার প্রেমে যথারীতি সাড়া দিতে অক্ষমতা—দুই-ই তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে ফোটাবার চেষ্টা করেছেন বটে. কিন্তু মনে হয়েছে, এ ভূমিকার জন্যে তিনি নন, অন্য কেউ। তুলসী চক্রবর্তী মুখে বিষ অথচ সহানুভূতিশীল বাড়ীওয়ালার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। রেণুর ভূমিকায় তপতী ঘোষ চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন; কিন্তু তাঁর "এই ঘুম ঢুলঢুল" গানটি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়ভাবে মামুলী ধরণে চিত্রিত হয়েছে। তরুণের প্রেমাস্পদা অসীমার ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায় সংযত অভিনয় করেছেন। নৃপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছোট্ট ভূমিকাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। অপরাপর ভূমিকা চলনসৈ।

ছবির বহির্দৃশ্যগুলি সুন্দরভাবে এবং সুকৌশলে নেওয়া হয়েছে। অন্তর্দৃশ্যগুলি—বিশেষ করে আফিসের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য—অত্যন্ত বাস্তবানুগ। "কেন আঁধার—হায় এত আঁধার" গানের দৃশ্যে অন্ধকারত্ব ঢের বেশী পরিস্ফুট করে দেখাবার সুযোগ ছিল।

ছবিতে আবহ-সংগীত বিভিন্ন দৃশ্যের মর্মকথা উদ্ঘাটনে অত্যন্ত সাহায্য করেছে।

প্যার-কী-পিয়াস : অনুপম চিত্রের ছবি; ১৪,৩৯১ ফুট দীর্ঘ ও ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : মুখরাম শর্মা; পরিচালনা : মহেশ কাউল; সংগীত পরিচালনা : বসন্ত দেশাই; চিত্রগ্রহণ : সজু নায়ক; ভূমিকায় : নিশি, শ্রীকান্ত, হনি ইরাণী, মনোরমা, ডেভিড, যশোধারা কাটজু প্রভৃতি। গেল ২১শে জুলাই থেকে রক্সি, গ্রেস, প্রিয়া, চিত্রা প্রভৃতি চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সুশীল মজুমদার প্রোডাকসন্সের 'কঠিন মায়া' চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও জনৈক শিল্পী।

ভারতের প্রথম গেভাকলার সিনেমাস্কোপে তোলা এই ছবিটি সার্থকনামা। ছবিটিতে গোড়া থেকে শেষ অবধি যে

"সম্পূর্ণ রামায়ণে"র একটি দৃশ্যে অনীতা গুহ ও মহীপাল।

ঘটনাস্রোত বয়ে গেছে, তার প্রধান উপজীব্য হ'ল স্নেহের জন্যে তৃষ্ণা। এ-তৃষ্ণা কখনও ছোট মেয়ের মনে, কখনও মায়ের মনে, আবার কখনও দু'জনেরই মনে। সন্তানহীনা জননীর গভীর মনোবেদনা এতে যেমন চিত্রিত হয়েছে, তার চেয়েও বেশী করে চিত্রিত হয়েছে অনাথ শিশুর মনে মায়ের স্নেহ পাবার জন্যে আকুল পিপাসা। ছবিটিতে দৃশ্যপটের চূড়ান্ত বাহার এবং নাচগানের ছড়াছড়ি থাকা সত্ত্বেও ছবির মূলরস কোথাও ব্যাহত হয়নি। এতে অযথা প্রেমের দৃশ্য সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। এবং এর জন্যে ধন্যবাদ দিই পরিচালক মহেশ কাউলকে।

"প্যার-কী-পিয়াস" ছবির প্রধানতম আকর্ষণ হচ্ছে অনাথ বালিকা গীতার ভূমিকায় হনি ইরাণীর অসামান্য অভিনয়নৈপুণ্য। সুখদুঃখ, হাসিকান্না, সংশয় অভিমান—সকল মনোভাবকেই এই শিশু-অভিনেত্রী এমন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বাচনে, চলনে, অঙ্গভঙ্গী ও মুখাবয়বের কুঞ্চনের দ্বারা অভিব্যক্ত করেছেন যে, দর্শককে মুহুর্মুহু বিস্মিত হতে হয়। ছবিতে নিশি, ডেভিড, শ্রীকান্ত প্রভৃতি অন্যান্যেরা চরিত্রানুগ সু-অভিনয় করলেও হনি ইরাণীর আশ্চর্য অভিনয় আর সকলকেই ম্লান করে দিয়েছে এবং মাত্র এই শিশু-অভিনেত্রীটিকে দেখবার জন্যেই "প্যার-কী-পিয়াস" চিত্রমোদী মাত্রেরই দর্শনীয়।

বিবিধ সংবাদ

"পলাশের রং"

পরিচালক সুশীল ঘোষের আগামী চিত্র "পলাশের রং।" নবগঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠান স্বস্তিকা ফিল্মস-এর তরফ থেকে বি, এন, বাহেতী ছবিখানি প্রযোজনা করছেন।

বিভিন্ন চরিত্রে আছেন বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, অসীমকুমার, মঞ্জুলা সরকার, জহর রায়, গীতা দে এবং নবাগতা সুতপা মজুমদার প্রভৃতি।

ছবিখানির সুর-সৃষ্টিতে আছেন ভি, বালসারা, আলোকচিত্রে গণেশ বোস, শিল্প নির্দেশে গৌর পোদ্দার, শব্দগ্রহণে জে, ডি, ইরাণী এবং সম্পাদনায় থাকবেন শিব ভট্টাচার্য।

ছায়া

এ সপ্তাহের একটি মাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী চিত্র এ, ভি, এম-এর "ছায়া" ৪ঠা আগষ্ট কলিকাতার ওরিয়েণ্ট, বসুশ্রী, বীণা, ম্যাজেষ্টিক এবং সহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। পরিচালনা করেছেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এবং সুর সংযোজনা করেছেন সলিল চৌধুরী। বিভিন্নাংশে আছেন সুনীল দত্ত, আশা পারেখ, নাজির হোসেন, নিরূপা রায়, ভারতী রায়, ললিতা পাওয়ার প্রভৃতি।

* * *

ভারত নাট্য পরিষদ

আগামী সোমবার, ২২শে শ্রাবণ (ইং ৭ই আগষ্ট) রঙমহল রঙ্গমঞ্চে ভারত নাট্য পরিষদের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'র অভিনয় হবে।

* * *

নাট্যকার সম্মেলন

নাট্যকার সঙ্ঘের উদ্যোগে আগামী ৫ই ও ৬ই আগষ্ট নাট্যকার সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীহুমায়ুন কবীর ৫ই আগষ্ট তারিখে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ৬ই আগষ্ট নাটক বিষয়ক আলোচনায়—যথাক্রমে সাহিত্যিক
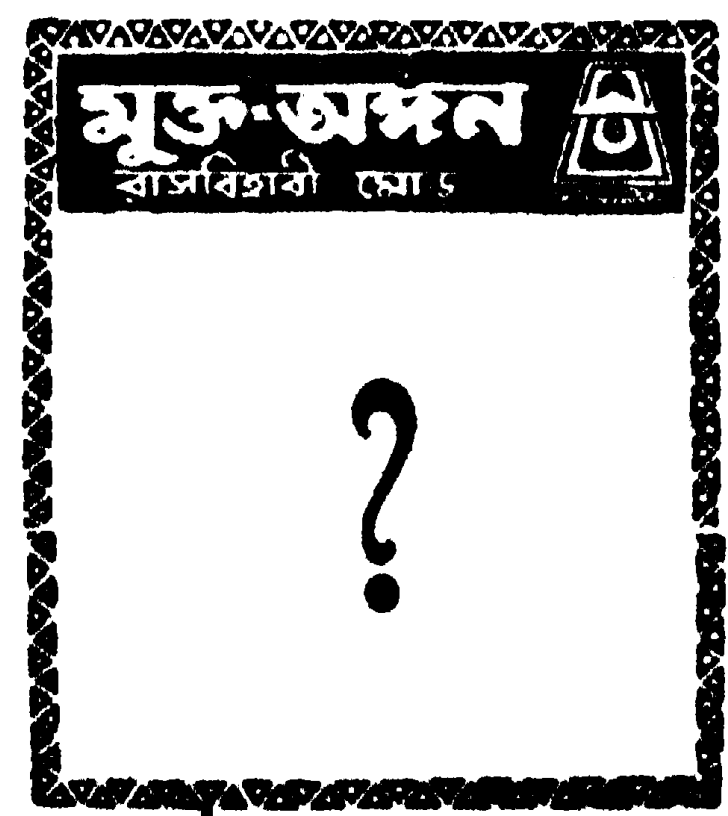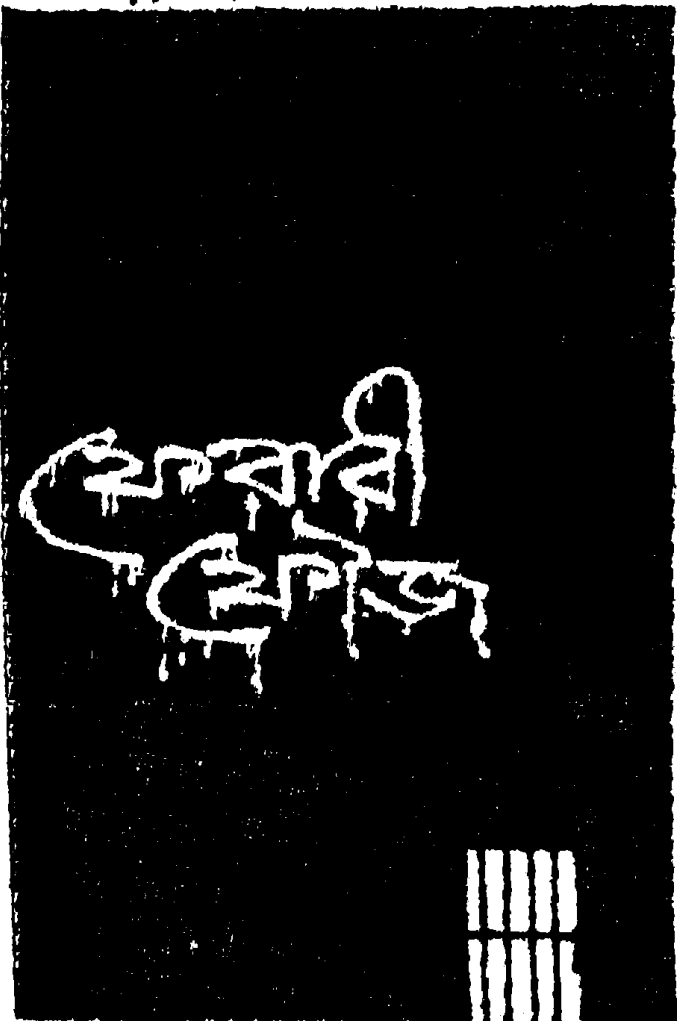
ও ব্যবহারিক বিভাগের সভাপতিত্ব করবেন।

লোক নাট্যম

লোক নাট্যম দু'খানি মৌলিক নাটক 'সবাই রাজা' ও 'গ্রন্থ' সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশনের পর তাদের তৃতীয় মৌলিক নাটক 'সাইকোথেরাপী' মঞ্চস্থ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

আগামী ১৯শে আগষ্ট শনিবার 'শ্রী শিক্ষায়তন', ১১, লর্ড সিংহ রোড কলিকাতা-১৬ মঞ্চে 'সাইকোথেরাপী' অভিনীত হবে। নাট্যকার বিমল গুপ্ত স্বয়ং নাটকখানি পরিচালনা করছেন।

* * *

গেল ২৯শে জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শতাধিক যোদ্ধাকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। বিপ্লবীদের পুরোভাগে ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং থিয়েটারের পক্ষে তাঁদের অভ্যর্থনা করেছেন যুগান্তর-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

* * *

আজ, ৪ঠা আগষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রঙমহল রঙ্গমঞ্চে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" অভিনয়ের আয়োজন করেছেন।

টুকিটাকি

ইংলণ্ডের 'মিরিশ' প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের একটি বৃহত্তম প্রয়াস। গত তিন বছর ধরে বিশ্ব চলচ্চিত্রে সমানভাবে স্বকীয়তা বজায় রেখে এ'রা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি পরিবেশন করেছেন। যেমন, বিলি উইলডার-এর পরিচালনায় 'সাম লাইক ইট হট' ও 'দি এ্যাপার্টমেন্ট' এবং জন ফোর্ডের 'দি হর্স সোলজার্স'।' এ বছরে 'মিরিশ' প্রতিষ্ঠানটি একটি নতুন পরিকল্পনার কথা ভেবেছেন। সম্প্রতি হলিউডের বিখ্যাত পরিচালকদের দিয়ে এ'রা কতগুলি বিশেষ ছবি করবেন। বিভিন্ন পরিচালকদের মধ্যে রয়েছেন বিলি উইলডার, ফ্রেড জিনেম্যান, উইলিয়ম উইলার, রবার্ট উইস এবং জন স্টার্জেস প্রমুখ গুণিব্যক্তিরা। এই ছবিগুলির জন্য প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত এ'রা খরচা করবেন বলে জানিয়েছেন।

যাত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত "কাচের স্বর্গ" চিত্রে মঞ্জু দে।

সম্প্রতি বিখ্যাত প্রবীণ সোভিয়েত সাহিত্যিক এ, সুভিস্কি-র আত্মজীবনীর কাহিনী নিয়ে যশস্বী পরিচালক আই ফ্রেজ 'রেড হেড' ছবিটি তুলে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছেন। জার-শাসিত আমলে রাশিয়ার অগণিত শিশুর জীবনে কি ভাগ্য নিরূপণ করতো তারই একটি জীবন্ত নিদর্শন পরিচালক এই ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। 'রেড হেড'এর ভূমিকায় শিশু অভিনেতা সলোতারিয়েফকে পরিচালক যেভাবে অভিনয় করিয়েছেন তা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এত সহজভাবে অভিনীত হয়েছে বলেই সম্পূর্ণ ছবিটি দেখতে বসে অনেকেরই চোখে জল এসেছিল। অতীতের সেই ঘৃণিত জার আমলের নিদারুণ পরিবেশটুকুর জন্য যে করুণ ছবি দর্শকের মনে প্রতিফলিত হয়েছে তার জন্য পরিচালককে ধন্যবাদ জানাই।

* * *

অল্পদিনের মধ্যেই হলিউডের চিত্রজগত থেকে আমরা দু'জন মহান শিল্পীদ্বয়কে হারালাম। একজন গ্যারী কুপার ও তাঁর আগে ক্লার্ক গেবল। এ'দের স্থান আজ শূন্য। তবে নতুন দিনের নতুন নায়ক যে এ'দের স্থান পূর্ণ করবেন না একথা বলি না, কিন্তু তাঁদের মত সমানগুণের অধিকারী হবেন না। বর্তমানে হলিউডে যে কজন গুণী অভিনেতা আছেন তাঁদের বয়স এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। অতি প্রবীণ, প্রবীণ এবং নবীন। অতি প্রবীণদের মধ্যে হলেন স্পেন্সর ট্রাসি, ফ্রেড্রিক মার্চ, জেমস ক্যাগনে, হেনরী ফনডো, জেমস স্টুয়ার্ট, রবার্ট টেলর, কারি গ্র্যান্ট ও জন ওয়েন প্রভৃতি। প্রবীণদের মধ্যে রয়েছেন গ্রেগরি পেক, উইলিয়ম হোল্ডেন, গ্লেন ফোর্ড, মার্লন ব্র্যান্ডো, কার্ক ডগলাস, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, রিচার্ড উইডমার্ক এবং চার্লটন হেষ্টন। নবীন যাঁরা এসেছেন তাঁরা হলেন জ্যাক লেমন, পল নিউম্যান, সিডনি পয়েটিয়ার ও রক হাডসন প্রভৃতি অভিনেতারা। এছাড়া দু'জন নবীন অভিনেতার শিল্পীজীবনের সম্ভাবনা রয়েছে। একজন স্টিভ ম্যাকউইন অপরজন জেমস গার্নার। এখন এ'রা র‍্যাঙ্কের টেলিভিশনে অভিনয় করছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড সফর

তৃতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ডের কাছে ৮ উইকেটে হার স্বীকার করার পর অস্ট্রেলিয়া ৪র্থ টেস্টের আগে পর্যন্ত ৪টি দলের সঙ্গে খেলেছে। ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্সের বিপক্ষে একদিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে পরাজিত হয়। নর্টিংহ্যামসায়ার এবং নর্দহ্যামসায়ার দলের বিপক্ষে খেলা ড্র যায় এবং অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে মিডলসেক্স দলকে পরাজিত করে। ২৫শে জুলাই তারিখ পর্যন্ত খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে :—খেলা ২২ অস্ট্রেলিয়ার জয় ৭, হার ২, ড্র ১৩।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী (২৯): লরী ৭, ও'নীল ৬, হার্ভে ৪, বার্জ ৩, ম্যাকডোনাল্ড ৩, বুথ, ম্যাকে এবং সিম্পসন ২।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরী (৯) :—কাউড্রে (এম সি সি এবং ইংল্যাণ্ড) ৩, রমন সুব্বারাও (ইংল্যাণ্ড) ১, ডেক্সটার (ইংল্যাণ্ড) ১, প্রেসডী (গ্লামর্গান) ১, গার্ডনার (লিস্টারসায়ার) ১, এ্যালে (সামারসেট) ১ এবং পুলার (ল্যাঙ্কাসায়ার) ১।

অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রাণ : ১৬৮ কেন ম্যাকে (মিডলসেক্স দলের বিপক্ষে)। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বোচ্চ রাণ : ১৮০ টেড ডেক্সটার (ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ১ম টেস্ট)।

"ব্যক্তিগত শতরাণ"

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ২৯

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে : ৯

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

অস্ট্রেলিয়া : ৩৬৪ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) হার্ভে ১৪০, সিম্পসন ৭৭, বুথ ৫৯)।

নর্টিংহ্যামসায়ার : ১২৫ (জি মিলম্যান ৪৬। ক্লিন ১৬ রাণে ৫ এবং ম্যাকে **৩৬ রাণে ৪ উইকেট)**
ও ২২২ (৭ উইকেটে। নর্মান হিল ৯৮, পুল ৫৫। ডেভিডসন ৩২ রাণে ৫ উইকেট)।

খেলার ফলাফল ড্র।

অস্ট্রেলিয়া : ৩১৩ (নর্মান ও'নীল ১৪২) ও ১৭৩ (লরী ১০০)।

নর্দহ্যামটনসায়ার : ২৮৯ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নর্মান ৬৬ এবং রেনোল্ডস ৬০) ও ১৯৭ (৬ উইকেটে। নর্মান ৪৮, লাইটফুট নট আউট ৫৭। ডেভিডসন ৪২ ৩ উইকেট)।

খেলার ফলাফল ড্র।

নর্দহ্যামটনসায়ার মাত্র ১ রাণ তুলতে পারলেই এ মরসুমে প্রথম কাউণ্টি দল হিসাবে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলকে পরাজিত করার গৌরবলাভ করতো।

অস্ট্রেলিয়া : ৩১৬ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কেন ম্যাকে ১৬৮, বুথ ৫৩) ও ২৬ (কোন উইকেট না পড়ে)।

মিডলসেক্স : ১৫৩ (রাশেল ৪৬। বেনো ৩৮ রাণে ৪, কুইক ৩৭ রাণে ৩ এবং ডেভিডসন ২৫ রাণে ২) ও ১৮৫ (বেনো ৩২ রাণে ৫ এবং হার্ভে ৮ রাণে ৪ উইকেট)।

লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে মিডলসেক্স কাউণ্টি দলকে পরাজিত করে। অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিচি বেনো দুই ইনিংসের খেলায় মোট ৭০ রাণে ৯টা উইকেট পান। নীল হার্ভে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় একই রাণের উপর (১৮৫) ১৪·৩ ওভার বলে মিডলসেক্স দলের শেষের তিনজন খেলোয়াড়কে আউট ক'রে বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করেন।

ওল্ড ট্রাফোর্ড—৪র্থ টেস্ট

(তৃতীয় দিনের খেলা পর্যন্ত ফলাফল)

ম্যাঞ্চেস্টারের মেঘ খুবই অভিমানী—অল্পতেই ঝর-ঝর ক'রে ঝরে পড়ে। এখানের ক্রিকেট খেলায় বৃষ্টি-বাদলের হস্তক্ষেপ চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ফলে অনেক টেস্ট খেলাই ভণ্ডুল হয়েছে; অনেক টেস্ট খেলাতেই একদল জয়লাভের ষোল আনা সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে গো-হার থেকে অপর দল সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে হাসিমুখে বাড়ী ফিরেছে। বৃষ্টি-বাদল নিয়েই ম্যাঞ্চেস্টারের ক্রিকেট খেলা। ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্ট ক্রিকেট মাঠকে বলতে পারেন দুই দলের টেস্ট খেলার বিধাতা-পুরুষ। এখানে অনেকটা ভাগ্যের খেলা—টসের হার-জিত।

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা প্রথম সুরু হয় ১৮৮৪ সালের ১০ই জুলাই। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই মাঠে উভয় দেশ ১৭টা টেস্ট খেলেছে। খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে ১১টা। জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৬টা টেস্ট খেলায়—ইংল্যাণ্ডের জয় ৪টে এবং অস্ট্রেলিয়ার জয় ২টো। দু' দু'বার—১৮৯০ ও ১৯৩৮ সালে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা বৃষ্টির দরুন আরম্ভই হয়নি। খেলা আরম্ভ হয়ে বৃষ্টির দরুন খেলা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে এমন অনেক ঘটনা আছে; কিন্তু বৃষ্টির দরুন খেলা একেবারে আরম্ভ না হয়েই খেলা বাতিলের নজির টেস্ট ক্রিকেট খেলার সারা ইতিহাসে মাত্র এই দুটি। হিসাবের খাতায় এ খেলা দু'টো পরিত্যক্ত এবং অমীমাংসিত হিসাবে ধরা হয়েছে। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে অস্ট্রেলিয়া শেষ জয়ী হয়েছে ১৯০২ সালে আর ইংল্যাণ্ড ১৯৫৬ সালে। ১৯০৫ সালের পর সুদীর্ঘকাল এখানে জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। ১৯৫৬ সালে ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৫৬ সালের টেস্টে ইংল্যাণ্ডের জিম লেকার ভিজে উইকেট পেয়ে অস্ট্রেলিয়ার দারুণ বিপর্যয় ঘটিয়ে দু'টি বিশ্ব-রেকর্ড করেন—এক ইনিংসে ৫৩ রাণে ১০টা উইকেট (এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড) এবং ৯০ রাণে ১৯টা উইকেট নিয়ে একটা টেস্ট খেলায় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার গৌরব। লেকার অল্পের জন্যে প্রতি ইনিংসে ১০টা ক'রে উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করতে পারেন নি—এ গৌরব আজও কেউ পায় নি।

বিখ্যাত ল্যাঙ্কাশায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দলের এই ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে অস্ট্রেলিয়া বিশেষ দাঁত বসাতে পারেনি—মাত্র ২টো জয়। যুদ্ধোত্তরকালে এখানের তিনটে টেস্ট খেলা বৃষ্টির দরুন ভেস্তে যায় এবং এই তিনটের কোনটাতেই অস্ট্রেলিয়া প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। ১৯৪৮ সালে ডন্ ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া দল ৪—০ খেলায় জয়ী হয়। কেবল ওল্ড ট্রাফোর্ডের টেস্ট খেলা ড্র যায়। ঐ টেস্ট সিরিজের মাত্র এখানের টেস্ট খেলাতেই ইংল্যাণ্ড প্রাধান্য লাভ করে—কিন্তু বরুণদেব ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সদয় ছিলেন না—শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিই ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়—খেলা পরিত্যক্ত হয়। আর একবার, ১৯৫৩ সালে পর পর তিনটে টেস্ট খেলা ড্র যাওয়ার পর ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪র্থ টেস্ট খেলা হয়। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে খেলার শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়াকে ইংল্যাণ্ড কোণঠাসা করেছে—মাত্র ৩৫ রানে ৮টা উইকেট ফেলে দিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার হার চোখে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মাঠে অস্ট্রেলিয়ার ত্রাণকর্তা হিসাবে অকস্মাৎ উপস্থিত হ'লেন বরুণদেব। খেলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়া কপাল জোরে সে যাত্রাও রেহাই পেল। তাই ইংল্যাণ্ডের লোকে বলে, ওল্ড ট্রাফোর্ডের টেস্ট খেলা ক্রিকেট

খেলা নয়, লোকের সঙ্গে পরিহাস করার খেলা।

অস্ট্রেলিয়া : ১৯০ (উইলিয়াম লরী ৭৪, বুথ ৪৬। স্টেথাম ৫৩ রাণে ৫ এবং ডেক্সটার ১৬ রাণে ৩ উইকেট) ও ৬৩ (কোন উইকেট না পড়ে—অসমাপ্ত)

ইংল্যান্ড : ৩৬৭ (পিটার মে ৯৫, ব্যারিংটন ৭৮, পুলার ৬৩, এ্যালেন ৪২। সিম্পসন ২৩ রাণে ৪, ডেভিডসন ৭০ রাণে ৩ এবং ম্যাকেঞ্জি ১০৬ রাণে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো টসে জয়ী হয়ে প্রথমে দলকে ব্যাট করতে পাঠান। পর পর দুটো টেস্টে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক পিটার মে কথার বাজিতে হেরে যান। কিন্তু টসে জিতেও অস্ট্রেলিয়া তার সুযোগ-সুবিধা পুরো নিতে পারে নি। দলের মাত্র ৮ রানে ১ম উইকেট পড়ে; তারপর ৫১ রানে ২য়, ৮৯ রানে ৩য় এবং ১০৬ রানে ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের পর মাত্র আধ ঘণ্টা খেলা হয়—বৃষ্টি নামায় সে দিনের মত খেলা বন্ধ হয়ে যায়—৩½ ঘণ্টার খেলা নষ্ট হয়। প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়ার ৪ উইকেট পড়ে মাত্র ১২৪ রান ওঠে। অস্ট্রেলিয়ার ওপনিং ব্যাটসম্যান উইলিয়াম লরী ৬৪ রান এবং ব্রেন বুথ ৮ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

হিসাব নিয়ে দেখা গেল ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে বিগত ১৮টি টেস্ট খেলায় বৃষ্টিপাতের দরুন খেলার নির্দিষ্ট সময় থেকে ১০৩ ঘণ্টা ধুয়ে গেছে—এ যেন বরুণদেবের 'সেঞ্চুরী' রান।

দ্বিতীয় দিনের ৯০ মিনিটের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বাকি ৬টা উইকেটে ৬৬ রান যোগ হয়ে মোট রান দাঁড়ায় ১৯০। লরী এবং বুথ ৫ম উইকেটের জুটিতে ৪৪ রান করেন—লরী নিজস্ব ৭৪ রান ক'রে দলের ১৫০ রানে আউট হ'ন। লরী এল-বি-ডবলিউ হয়ে আউট হ'ন স্টেথামের বলে।

প্রধানতঃ স্টেথাম এবং ডেক্সটারের বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপর্যয় ঘটে। স্টেথাম মোট ৫৩ রাণে ৫টা উইকেট পান। (১ম দিন ৯-০-৩৫-২ এবং ২য় দিন ১২-৩-১৮-৩)। ডেক্সটার ১ম দিন মাত্র ২ ওভার বল করে ৬টা রাণ দেন কিন্তু কোন উইকেট পান না। তবে ২য় দিন তিনি অস্ট্রেলিয়ার শেষ তিনজন খেলোয়াড়কে আউট করেন মাত্র ১০ রাণ দিয়ে (৪-৪-২-১০-৩)। গত ৩য় টেস্ট খেলায় ট্রুম্যানের মারাত্মক বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করেছিল (৮৮ রাণে ১১টা উইকেট)। কিন্তু ট্রুম্যান আলোচ্য টেস্টের ১ম ইনিংসে মাত্র ১টা উইকেট পান ১৪ ওভার বলে ৫৫ রাণ দিয়ে।
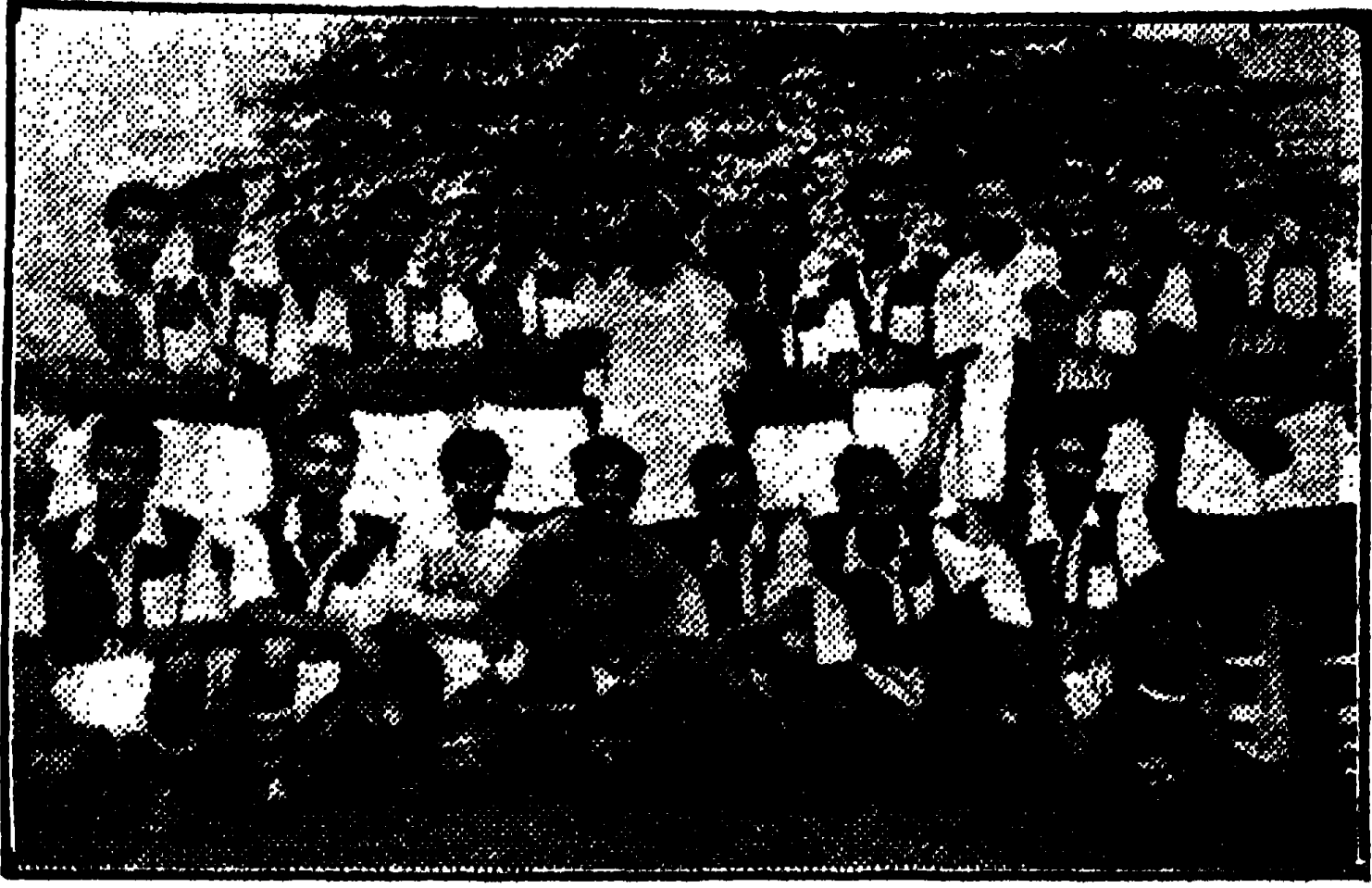
দ্বিতীয় ডিভিসন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান বাটা স্পোর্টিং।

লাঞ্চের আগে ইংল্যান্ড ৫০ মিনিট ব্যাট করে। এই সময়ে ১টা উইকেট পড়ে ইংল্যান্ডের ১৭ রান ওঠে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায়, ইংল্যান্ডের ৩টে উইকেট পড়ে রান দাঁড়িয়েছে ১৮৭, অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের রানের থেকে মাত্র ৩ রান কম; এদিকে হাতে জমা ৭টা উইকেট।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ৩৬৭ রাণে শেষ হলে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার থেকে ১৭৭ রাণে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক পিটার মে মাত্র পাঁচ রাণের জন্যে সেঞ্চুরী রাণ করার সম্মান পাননি। দলের ২১২ রাণে পিটার মে এবং রেন ক্লোজ আউট হন। এরপর কেন ব্যারিংটনের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলায় ইংল্যান্ড বিশেষ লাভবান হয়। ব্যারিংটন নিজস্ব ৭৮ রাণ করেন—তাছাড়া ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে উইকেট-কীপার জন মারের সঙ্গে দলের ৬০ রাণ এবং ৭ম উইকেটের জুটিতে ডেভী এলেনের সঙ্গে দলের ৮৬ রাণ তুলে দেন। চা-পানের বিরতির পরের খেলায় হঠাৎ ইংল্যান্ড দলের দারুণ পতন আরম্ভ হয় —সিম্পসনের লেগ-ব্রেক বোলিংয়ে। এক সময়ে সিম্পসন মাত্র ২ রাণ দিয়ে ৩টে উইকেট পান; মোট উইকেট পান ৪টে ২৩ রাণে। ডিভিডসন পান ৩টে ৭০ রাণে।

চা-পানের বিরতির সময় ইংল্যান্ডের ৩৬১ রাণ ছিল ৭ উইকেট পড়ে; কিন্তু পরবর্তী ২৫ মিনিটের খেলায় ইংল্যান্ডের ৩টে উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৬ রাণে। এই তিনটে উইকেট পান লেগ-ব্রেক বোলার সিম্পসন। চা-পানের বিরতির পরের খেলায় সিম্পসন মাত্র ২ রাণ দিয়ে ৩টে উইকেট পান।

অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসে ৮০ মিনিটের খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ৬৩ রাণ তুলে ইংল্যান্ডের থেকে ১৭৭ রাণের ব্যবধান কমিয়ে ১১৪ রাণে দাঁড় করায়।

॥ ভারত সফরে এম, সি, সি ॥

আগামী শীতকালের ক্রিকেট মরসুমে এম সি সি ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসবে। এখনও চূড়ান্তভাবে দল গঠন করা হয়নি। ঊনত্রিশজন খেলোয়াড়কে আমন্ত্রণ করা হয়েছে মাত্র। এই ২৯ জন খেলোয়াড়ের নামের তালিকায় পিটার মে, কলিন কাউড্রে, ব্যারিংটন, লক, স্টেথাম, পুলার, মারে, এ্যালেন, ডেক্সটার, ট্রুম্যান, মাইক, স্মিথ প্রভৃতি সব খেলোয়াড়রা, যাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬১ সালের টেস্ট খেলায় যোগদান করেছেন তাঁরাও আছেন। ডার্বিসায়ার দলের জ্যাকসন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এ মরসুমে মাত্র একটা টেস্ট খেলেছেন; তাঁর বয়সের দিক বিচার ক'রে তাঁকে কেবল বাদ দেওয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত কতজন নামকরা খেলোয়াড় ভারত সফরের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন তা এখনও জানা যায়নি। তবে এম সি সি কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, একটি শক্তিশালী দলই তৈরী হবে। ভারতবর্ষের ক্রীড়ামোদীরা এম সি সি'র এই আশায় খুব বেশী ভরসা পায় না; কারণ এর আগে এম সি সি কোন বারই শক্তিশালী দল পাঠাতে পারেনি। ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা নাকি ভারতবর্ষের ক্রিকেট সফরে কোন রকম উৎসাহ বোধ করেন না। তাঁদের ধারণায় ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলার যোগ্য পাত্র নয়; তাছাড়া ভারতবর্ষের জলবায়ু তাঁদের

॥ মারডেকা ফুটবলে ভারতীয় দল ॥

বাঁদিক থেকে : উপরের সারি : থঙ্গরাজ, নারায়ণ, চন্দ্রশেখর, ত্রিলোক সিং, রহমন ও অরুণ ঘোষ; **মধ্যের সারি :** জার্ণেল সিং, রাম বাহাদুর, কেম্পিয়া, ফ্রাঙ্কো, প্রদীপ ব্যানার্জি ও চুণী গোস্বামী; **নীচের সারি :** কানন, বলরাম, এস সমাপেতি, রহমতুল্লা ও ইউসুফ

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের পক্ষে নাকি ক্ষতিকর। রাজারহালে খাওয়া-দাওয়া, জামাই আদর এবং হাত খরচের টাকা—এ সমস্তই ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা টেস্ট খেলোয়াড়দের প্রলুব্ধ করতে পারেনি।

পতৌদির নবাব 'টাইগার'

গত ২০শে জুলাই পতৌদির নবাব (২০) চোখে অস্ত্রোপচারের পর ব্রাইটন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। কিছুদিন আগে পথের দুর্ঘটনায় তিনি আকস্মিকভাবে চোখে গুরুতর আঘাত পান। বর্তমান মরশুমে তাঁর পক্ষে আর ক্রিকেট খেলা সম্ভব হবে না।

তিনি বলেছেন, "এই দুর্ঘটনায় তিনি কিছুমাত্র মনোবল হারাননি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমার চোখটি রক্ষা পেয়েছে।" কবে থেকে পুনরায় তিনি ক্রিকেট খেলা আরম্ভ করতে পারবেন জানা যায়নি।

এই দুর্ঘটনার পর তিনি বহু সহানুভূতিসূচক পত্র পান। ভারতের একজন ক্রিকেট অনুরাগী তাঁর নিজের একটি চক্ষুদানের প্রস্তাব পর্যন্ত করেছেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে লীগের খেলার অপ্রত্যাশিত ফলাফলের যে পূর্বাভাষ দিয়েছিলাম তা সত্যে পরিণত হয়েছে। কয়েকদিন ধরে খেলার মাঠে লোকের মুখে মুখে একটা কথা জোর চলেছিল—লীগের নীচের দিকের দলগুলির খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল হবে। লোকের মুখের কথা ফলে গেল। ঘটনাটা যদি 'কাকতালীয়' হয় তবে বলবার কিছু নেই; কিন্তু দুই পক্ষের যোগসাজসে যদি হয়ে থাকে তাহলে বাংলা দেশের ফুটবল খেলায় দুর্দিন খুবই ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে হবে।

লীগের খেলায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ফলাফল

স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২ : মোহনবাগান ১
মোহনবাগান ০ : ইস্টার্ণ রেলওয়ে ০
রাজস্থান ২ : ইস্টবেঙ্গল ১
বালী প্রতিভা ২ : মহমেডান স্পোর্টিং ০
বি এন আর ১ : খিদিরপুর ১
ইন্টারন্যাশনাল ২ : এরিয়ান্স ১

৩০।৭।৬১

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী

অমৃত

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড ১৪শ সংখ্যা মূল্য—৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday 11th August, 1961
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

আগামী ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের চতুর্দশতম স্বাধীনতা দিবস। আমরা চৌদ্দ বৎসর পূর্বে এই তারিখে যখন স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম তখন ইতিহাস যে মহান আশীর্বাদ ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর শিরে বর্ষণ করেছিল, আজ সেই আশীর্বাদ আমরা গভীর ও মৌন চিত্তে স্মরণ করছি। কিন্তু সেই আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা যেমন গত চৌদ্দ বৎসর যাবৎ বিশেষভাবে বঙ্গদেশকে কাতর ও দুর্বল করেছে, তেমনি অন্যদিকে এই এক যুগের মধ্যে আমরা নিঃসন্দেহে অগ্রগামিতার একটি নূতন অধ্যায় রচনা করতে সমর্থ হয়েছি। স্বাধীনতার আশীর্বাদ ও চ্যালেঞ্জ গত এক যুগের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকায় বিপুল বিস্তৃত দুইটি মহাদেশের কোটি কোটি মানুষের মুক্তির অভিযানের দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নূতন পর্ব শুরু করেছে। এই পর্বের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন-পাশমুক্ত কোটি কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও অভিযান যেমন প্রতিফলিত, তেমনি দরিদ্র অনগ্রসর শোষণশীর্ণ মানুষের দুঃসাধ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দৃশ্যও অঙ্কিত হয়েছে। সদ্যোমুক্ত আফ্রিকা কিংবা কয়েক বৎসর পূর্বেকার ভিয়েতনামের ইতিহাস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের বেদনা ও রক্তের দ্বারা আপ্লুত।

কাজেই ভারতবর্ষে চৌদ্দ বৎসর পূর্বে লক্ষ লক্ষ নরনারীর গৃহহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা, প্রশাসনিক বিভ্রান্তি, অর্থদৈন্য, পণ্যদ্রব্যের কৃচ্ছ্রতা এবং রাজনৈতিক হতাশার দ্বারা যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, তা রাজনৈতিক ইতিহাসে অভাষিত নয়। এই ইতিহাসে ১৫ই আগস্টের পৃষ্ঠাটি যদিও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, তথাপি এই পৃষ্ঠার বহু অক্ষর আজ অশ্রুসিক্ত এবং বেদনা-বিবর্ণ। কারণ বিশেষভাবে আমরা বাংলা দেশে প্রায় অর্ধ কোটি নরনারী গৃহহীন ও ছন্নছাড়া হয়েছি, এই এক যুগের মধ্যে বাংলার সচেতন মনোভূমির উপর দিয়ে অর্থনীতির ও বেকারির বহু প্রচণ্ড আঘাত গেছে এবং যাচ্ছে; এবং আমরা ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে ভাষাহীন ও দুর্বল সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছি। এর ফলে আমাদের যুবকেরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। সমাজের অন্তঃস্থল থেকে গভীর মর্মবেদনার বাণী নানা ঘটনা উপলক্ষ্য করে কখনো বিক্ষোভে, কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাসে এবং কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট আত্মাবমাননার ধিক্কারে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সমাজ ও মানুষ আজ ১৫ই আগস্ট তিরঙ্গা ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে অশ্রু ও অভিবাদন দুই-ই গৌরবময়ী ভারত জননীর উদ্দেশে নিবেদন করবে সন্দেহ নেই।

তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, গোটা এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের গণমুক্তি অভিযানের অবশম্ভাবী এই বেদনা ও চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারতবর্ষ বিগত চৌদ্দ বৎসরে যে অগ্রগতির ইতিহাস রচনা করেছে তা এই দুই বৃহৎ মহাদেশের মধ্যে তাকে নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকা দান করেছে। কেন না, এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে আমরা পৃথিবীর দুইটি বৃহত্তম সাধারণ নির্বাচন, গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ দুইটি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ভারতবর্ষের সংবিধান-রূপে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের একটি শ্রেষ্ঠ দলিল রচনা করেছি। নিঃসন্দেহে এই তিনটি ঘটনা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয়।

যে সময়ে নভশ্চারী মানুষ পৃথিবীর দেড়শত মাইল দূরে গম্ভীর নিঃসীম মহাকাশে নতুন বিশ্বের দিগন্ত অবলোকন করছে, সেই সময়ে আমরা ভারি ও বৃহৎ শিল্পের প্রথম বনিয়াদটুকু শুধু স্থাপন করেছি এবং এখনো আমাদের শতকরা ষাট ভাগ নরনারী প্রাচীন কৃষি যুগের চিন্তা ও জড়তার দ্বারা শৃঙ্খলিত সন্দেহ নেই। কিন্তু রাশিয়ায় মাত্র চল্লিশ বৎসরে এই বিপুল বিস্ময়কর মহাক্রান্তি সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষ যদি আপনার শক্তিকে খুঁজে পায়, যদি বিভ্রান্তি ও হতাশার দ্বারা আমরা আচ্ছন্ন না হই এবং ক্ষমতার দম্ভ যদি আমাদের মস্তিষ্ককে বিকৃত না করে, তাহলে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যময় এই চল্লিশ কোটি নরনারীর জয়যাত্রাও নিশ্চয়ই আধুনিক বিজ্ঞানের, শিক্ষার ও সংস্কৃতির লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে মানুষের নিরবধি ও নিঃসীম উচ্চাশার মহাকাশ ভেদ করবে। সেই অদ্ভুত সম্ভাবনা আমাদের ১৫ই আগস্টের সংকল্পে রোপিত হোক।

বাঙালী সাংবাদিকের আন্তর্জাতিক সম্মানলাভ

বাংলা দেশ এবং বাংলা ভাষা এবার বহুরকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও একটি সুখবর আমাদের অত্যান্তই শ্লাঘার কারণ হয়েছে—'যুগান্তর' পত্রিকার সুযোগ্য সাংবাদিক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ম্যাগসেসাই আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীচৌধুরী অবশ্য প্রথম ভারতীয় নন, তাঁর আগেও দেশকর্মী হিসাবে শ্রীচিন্তামন দেশমুখ এবং সমাজনেতা হিসাবে আচার্য বিনোবা ভাবে এই পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য সারা ভারতে শ্রী চৌধুরীই প্রথম পুরস্কৃত হলেন।

শ্রী চৌধুরীর এই সম্মাননায় আমরা যে কেবল সহকর্মী হিসাবেই গৌরবান্বিত বোধ করছি তা নয়, তাঁর সত্যনিষ্ঠার ও স্বাধীনচিত্ততার জন্যে বাংলা ভাষা যে আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হল এজন্যেও আমরা গর্বিত।

অনেকেরই হয়তো জানা আছে, ম্যাগসেসাই পুরস্কারটি প্রতিষ্ঠিত হয় ফিলিপাইনের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট

অমিতাভ চৌধুরী

র‍্যামন ম্যাগসেসাইয়ের দ্বারা। নোবেল পুরস্কারের আওতায় যে ধরণের সমাজ-সেবামূলক কর্মকে সম্মানিত করা যায় না সেইসব দেশের ও জাতির হিতকর কর্মপ্রচেষ্টাকে সম্মান জানানোই ছিল ঐ মহাপুরুষের উদ্দেশ্য। পুরস্কারের বিষয় হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে এই পাঁচটি ক্ষেত্রের অবদান—সাংবাদিকতা ও সাহিত্য, সমাজ নেতৃত্ব, আন্তর্জাতিক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা, জনসেবা ও প্রশাসনিক সেবা। প্রতি বছরই এই পাঁচটি বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়।

শ্রী চৌধুরী অতি তরুণ বয়সেই তাঁর নির্মল বিবেক এবং আপসহীন ন্যায়নিষ্ঠার দ্বারা যে সম্মানের অধিকারী আজ হয়েছেন, তাতে তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও তাঁকে অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। দীর্ঘ জীবন লাভ করে তিনি বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে এইভাবে স্বদেশের মঙ্গল-সাধনে ব্রতী থাকুন এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

কবিতা
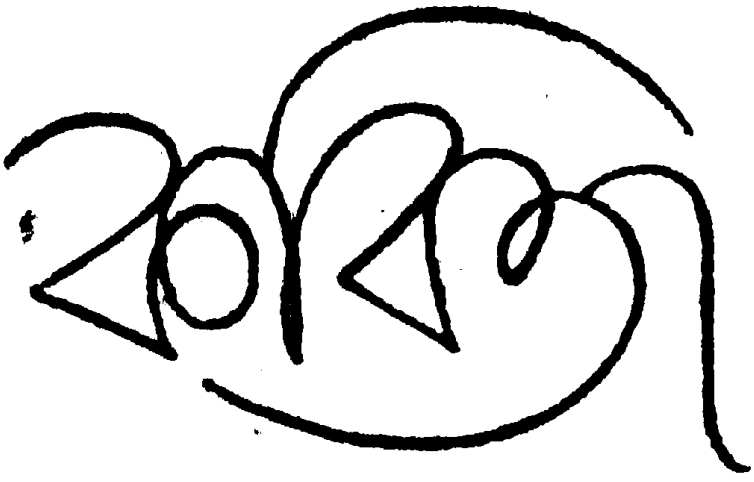
ধন্বান্তারিং

মনীশ ঘটক

তোমার কল্যাণ স্পর্শে সুপ্তা পৃথিবীর
মোহনিদ্রা ভঙ্গে বক্ষে উন্মত্ত অধীর
জাগ্রত গতির স্পৃহা। আলোকের রথ
উদ্ভাসিয়া চলে দূর ভবিষ্যের পথ।
অশেষের শেষ হয়, অন্ত অনন্তের,
মেঘমন্দ্রে জয়ধ্বনি ওঠে জীবনের।
স্রষ্টার আশীষ শিরে বহি বৈজ্ঞানিক
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে আজিকে পথিক।
দুর্যোগ ঘনায় কভু। সঘন সংশয়
ক্ষণে ক্ষণে সগর্জনে ছিন্ন করি লয়
অবিচ্ছিন্ন যাত্রাপথ করকালাহ্বনে,
স্তব্ধ হয় বৈতালিক আহত মূর্চ্ছনে।
দীপ্তি তব দীর্ণ করি চূর্ণ মেঘাম্বর
রশ্মিপাত করে পুনঃ ধ্রুব সত্য 'পর॥

অথচ আকাশ বলো নীল

বিষ্ণু দে

অথচ আকাশ বলো নীল
কলকাতার ও আহত আকাশ!
ধুলোয় ধোঁয়ায় তিলাতিল
ফুসফুসের ধূসর সন্ত্রাস,
দুর্গতের বিবর্ণ নিখিল
যেখানে ঊর্ধ্বে প্রতিভাস।
তবু তো আকাশ ভাবো নীল।

সমুদ্রে কোথায় পলাতক!
নদীমাতৃদেশের নদীর
হেজে-মজে তরঙ্গ-আশ্লেষ
থেমে যায়, সর্বত্র খাতক।
অন্তর্জলী প্রেম চায় দেশ,
নিরুদ্দেশ নায়িকা বধির,
তবু প্রাণ জলে টলোমলো,

তবুও সমুদ্র নীল বলো!
ঢেউ তোলো গহীন হৃদয়ে
এখনও বাংলার নদী দেখে,
উচ্ছ্বাসে দুই বাহু বাঁধো
শূন্যের কো বুকে রেখে
আকৈশোর স্মৃতির বিজয়ে
প্রাকৃতিক সত্যের বিস্ময়ে।

তাহলে দৈনিক ধোঁয়া ধুলো
কেন বলো করে রুদ্ধশ্বাস?
ঘরের কোণায় কি আকাশ
নীল নয়? কারো বাহুপাশ
তোলে না কি তরঙ্গ-আভাস?
প্রাকৃতিক সত্যের আশ্বাস
বাবুদের পুচ্ছ রেনেসাঁসে
উড়ে পুড়ে গেল পরচুলো?

ঝিলিমিলি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৭।১২।৫৯

আজ রিপন কলেজের কথা মনে আসছে। আমাদের সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ হয়নি। সে সময় রিপন কলেজেরই নামডাক ছিল। প্রেসিডেন্সী, স্কটিশ চার্চ, সিটি, বঙ্গবাসী প্রভৃতি কলেজ থেকে রিপন কলেজে পড়তে আসত। বিকেলের দিকে প্রায়ই কৃষ্ণকমলবাবু অধ্যাপকদের ঘরে এসে বসতেন। বিপিনবাবু তাঁর কথা লিখেছেন। আমরা জনপাঁচেক ছেলে ঘরের কোণে বসতে পেতাম। ব্যোমকেশ মুস্তাফী, জ্ঞান ঘোষ, এমন কি ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইও আসতেন। রামেন্দ্রসুন্দর যাগযজ্ঞের খসড়া করছিলেন, সে সম্বন্ধে কৃষ্ণকমলবাবু অনেক কথাই বলতেন। একবার যেন মনে পড়ে যে, তিনি গুরুদাসবাবুর D. L.-এর পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তখন তিনি মাত্র B. A.—উপযুক্ত পরীক্ষকের অভাবে তিনি বাকী পরীক্ষা দিলেন না। একটি কথা কিন্তু পরিষ্কার মনে পড়ে—কোনো একটা ব্যাপারে তিনি দু লাইন সংস্কৃত কবিতা উদ্ধার করলেন, কিন্তু কে লিখেছে তা তিনি জানেন না ; খাবার কিংবা মুদীর দোকান থেকে একটা পাতা উড়ে এল, সেই পাতা থেকে এই কবিতাটি মনে ছিল : সেটা প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে ! এই ঘটনাটি আমার সামনে ঘটে।

রামেন্দ্রসুন্দরের অনেক কথাই মনে আসে। আমার জীবনে তাঁর প্রধান দান হোলো বৈজ্ঞানিক উপায়—methodology। আজ কিন্তু সেটা মনে আসছে না। আসছে কিন্তু জানকীবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। প্রগাঢ় বল্লে কিছুই বলা হোলো না, অভিন্ন হৃদয়। জানকীবাবু ও ক্ষেত্রবাবু একই স্কুলে পড়তেন বোধ হয়। এনট্রান্স পরীক্ষার পর জানকীবাবু বল্লেন, 'খেতা, শুনলাম একজন কাঁথি থেকে ফার্ষ্ট হয়েছে, চ' তাকে দেখে আসি।' দুজনে গেলেন, বোধ হয় হিন্দু হোস্টেলে, কথাবার্তা বিশেষ কিছু হোলো না। জানকী বল্লেন, 'কিন্তু চোখ

দুটো ভয়ানক জবুজবুলে। But, I shall disclose the bracket next year। তিনি ও রামেন্দ্রসুন্দর নীচ দুজনে একত্রে প্রথম হন। ক্ষেত্রবাবু তারও নীচে হলেন। জানকীবাবু বাগ্নায় দুয়ার্কি দিতেন, বেহালাও বাজাতেন, আর ক্ষেত্রবাবু বাজাতেন ঢোল আর পাখোয়াজ। তৎসত্ত্বেও জানকীবাবু বইয়ের পড়া পড়তেন, আর ক্ষেত্রবাবু ঘুমুতেন। আমাদের কলেজে কার্মাইকেল সাহেব এলেন—গুরুদাসবাবু একটা গান বাঁধলেন, 'এস রাজপ্রতিনিধি বঙ্গ-শিরভূষণ, হইনু আমরা ধন্য পেয়ে তব দরশন'—জানকীবাবু গৌড়-সারঙ্গে গান বেঁধে দিলেন, আর দিলেন ক্ষেত্রবাবুর পাখোয়াজে ঝাঁপতাল। গানের সুরটা মোটেই সুবিধের নয়, তবু গুরুদাসবাবু!

ক্ষেত্রবাবু মারা গেলেন। ঘাটে নিয়ে গেলাম। এসে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এলাম। তিনিও বিছানায়। চোখ দিয়ে কেবলই জল পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ নীরব থেকে বল্লেন, 'বেদান্ত তার মতন কেউ বুঝতো না। সেই ছিল প্রধান।' আমার মনে পড়ে, হাত নীচু করে মাথা লুকিয়ে সনম্র হাসা, সামান্য লজ্জিত হয়ে রামেন্দ্রবাবু তাঁর ভাষা সংশোধন করছেন। ক্ষেত্রবাবুর ঠাকুরাণীর কথার মতন অমন সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় বেদান্ত চর্চা বাংলা ভাষায় হয়নি। আজকাল তাঁর লেখা বাংলা দেশে কাটে না।

জানকীবাবু আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। তবে ইংজেরী ঠিক কিনা তাই জানি না। ক্লাসের ছেলেরা তাঁকে সংস্কৃত ক্লাসে যেতে বলতেন, আমি জানি, তিনি দুদিন গিয়েছিলেন, না শুনে পড়িয়েও ছিলেন। আমাদের ইংরেজী ক্লাসে একদিন property কথাটায় আটকে গেলেন—পরের ছয় দিন ঐ property-র ব্যাখ্যা চলল, Hindu, Moslem, English Laws of property নিয়ে। আরেক-দিন Wordsworth-এর Intimations আরম্ভ করলেন। বল্লেন, ইংরেজরা Wordsworth বোঝে না—হিন্দুরা বোঝে: এবং তারই ঝোঁক চলল প্রায় দুই সপ্তাহ। জানকীবাবু কোনো জিনিসও শেষ করতে পারতেন না—Tempest-এর এক act, Wordsworth-এর দুটি কবিতা, আর Carlyle-এর একটা লেকচার। এই নিয়ে দু বৎসর কাটল। বিষয় শেষ করতেন না, বিষয়গুলি জানতেন। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক—নীল প্যাণ্টালুন, তার ওপরের নোংরা শার্ট, তারও ওপর একটা ছেঁড়া শাল—মুখ ধুতেন না, দাড়িও সব সময় কামাতেন না। কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে অন্য ট্রামে চড়বার জায়গায় হাইকোর্টে চড়ে বসতেন, তাঁকে মজসিদ স্ট্রীটে [illegible] ছে দিয়ে আসত।

> **'অমৃতে'র এই সংখ্যায় স্থানাভাবে 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যা থেকে এই বিভাগের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হবে।**
>
> **সম্পাদক—'অমৃত'**

আর ডান হাতে থাকত নস্যি। এই লোক অনর্গল ইংরেজী ও সংস্কৃতে বক্তৃতা দিতে পারতেন। দর্শনে জ্ঞান ছিল অসাধারণ, আমি কিন্তু দর্শনের লেকচার শুনিনি।

বিপিনবাবু ছিলেন ইংরেজীতে এম-এ, পড়াতেন ইতিহাস। আমি ইতিহাস তখন পড়তাম না, কিন্তু তবু তাঁর ক্লাসে যেতাম। তাঁর মতন ইংরেজী বলা আমাদের সময় ছিল না, এক পার্সিভাল আর, এম, ঘোষ ছাড়া। তিনি ছিলেন discipline-র পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল করুণ।

এর পরে এলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। অত্যন্ত লাজুক, কিন্তু কী অদ্ভুত তাঁর পাণ্ডিত্য! ইংরেজী, ইতিহাস ও দর্শনে ছিল তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি। অতটা পণ্ডিত ধরা যেত না, কিন্তু পরিচয় পেলে তার অবধি থাকত না।

এই ধরনের encyclopaedic mind-এর ছোঁয়াচ আমাদের মনে লেগেছিল। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন খামখেয়ালী, eccentric। ইদানীংকার অধ্যাপকেরা বিশেষজ্ঞ এবং অত্যন্ত normal, অর্থাৎ খবরের কাগজে পলিটিক্স্ করেন, আর একাধিক বাচ্ছা হয়। আমাদের eccentric হওয়াও হোলো না। অবশ্য সেজন্য লেখাপড়ায় পাগল হওয়া চাই।

১।১।৬০

বছরের প্রথম দিন। হোলো কি কিছু জানি, কি হবে তাও আন্দাজ করতে পারি। হোলো কি? চাঁদে ছেঁদা; আর আফ্রিকার বিপ্লব। আন্দাজ করি, আফ্রিকার বিপ্লব আরো দ্বিগুণ বাড়বে, এবং ইন্দোচীনে গোলমাল কমবে। শান্তি আশা করি খানিকটা পাব। কিন্তু আফ্রিকায় বালির ফাঁদ নয়, এবার চোখের বালিও নয়, এবার রক্তে বালি। আফ্রিকা টগবগ্ করে ফুটছে। কাগজে কিন্তু বেশী চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে কেবলই জহরলাল! বিংশ শতাব্দীর মানুষ প্রথম অর্ধাংশে রাশিয়ান, আর বাকী অর্ধাংশে আফ্রিকান। আজ ত্রিশ বৎসর বলে আসছি, এখনও বলছি। ইংরেজ অত্যন্ত ধূর্ত, Commonwealth করে ফেলছে, এবং ফেলবে—কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে? চলবে না, চলবে না, চলবে না! Dark Anger-এর সামনে white danger থাকবে না, কিছুতেই থাকবে না। কল-কব্জা বাড়বে নিশ্চয় অনেকখানি, কিন্তু tradition ভাঙতেও একশ বছর। তার পর দেখা যাবে।

৩।১।৬০

বোম্বাই-এর ডাক্তারের চাহিদা বেশী নয়; মাদ্রাজেও তাই; দিল্লীতে কিছু বেশী; কিন্তু কোলকাতায় তার শেষ বেশ নেই। এখানকার ডাক্তারদের ফীজ্ অনেকেরই বত্রিশ, আরো বেশী চৌষট্টি, আরো আরো বেশী শুনেছি একশ বারো। তার ওপর রক্ত পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা ইত্যাদি বত্রিশ আর চৌষট্টি। বিশেষজ্ঞদের একই। একবার একদিনের রোগীর পাল্লায় পড়লে একশ টাকা। ইংলণ্ডে, সুইজারল্যাণ্ডে, কোলকাতার অর্ধেক, রাশিয়ায় কিছুই লাগে না। শুনেছি ভিয়েনাতেও অনেক কম। কোলকাতায় ডাক্তারী ইকনমিকসটা কি? Competition কি বোম্বাই, লণ্ডনে নেই? এমন উগ্রভাবে ধনিকতন্ত্রের শোষণ আর কোথাও বোধ হয় দেখিনি। আমি কেবল ডাক্তারদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই সোশিয়ালিষ্ট হব। আমরা কি নিরঙ্কুশভাবেই এই অত্যাচার সহ্য করে যাব!

(ক্রমশঃ)

আমাদের জাতীয় পতাকা

সব দেশে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক হচ্ছে জাতীয় পতাকা। আমরা যে পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলে গ্রহণ করেছি, তার ক্রমবিকাশের একটা ঐতিহ্যময় ইতিহাস আছে। স্বাধীনতা অর্জনের পথে নানারকম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এই পতাকা আমরা পেয়েছি; অজস্র অত্যাচার, বিপ্লব, দুর্যোগ, দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে এই জাতীয় পতাকা অর্জন করেছে দেশবাসী এবং তা সকলের উপরে উড্ডীন রাখবার জন্য অবমাননাও সহ্য করতে হয়েছে কম নয়। এই সব আত্মত্যাগের স্মৃতি আমাদের কাছে অত্যন্তই পবিত্র। তাই জাতীয় পতাকা সর্বসময়ে আমাদের নমস্য ও পূজনীয়। তাছাড়া এই জাতীয় পতাকাই সমস্ত দেশের ও সমস্ত জাতির অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের প্রতিভূ।

এই জাতীয় পতাকার সাম্প্রতিক ক্রমবিকাশের সূচনা হয় ১৯০৬ সনে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। কলকাতার পার্শিবাগানের কাছে গ্রীয়ার পার্কে ১৯০৬ সনের ৭ই আগস্ট সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী সঠিক খবর এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই পতাকাটি সমান্তরালভাবে লাল, হলদে ও সবুজ রংয়ের কাপড়ে রচিত হয়েছিল। এতে অঙ্কিত ছিল আটটি প্রতীকমূলক সাদা পদ্ম ফুল, 'বন্দেমাতরম' শব্দ, একটি সূর্য ও একটি অর্ধচন্দ্র। এই হোল আমাদের প্রথম জাতীয় পতাকা।

১৯০৫ ও ১৯০৭ সনের মধ্যে ইউরোপে ভারতের স্বাধীনতাকামী ভারতীয় বিপ্লবীরা যে দল গঠন করেন, তাঁদের নেতা ছিলেন শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও পার্শী মহিলা ম্যাদাম কামা। ১৯০৭ কিংবা ১৯০৫ সনে প্যারীতে কিংবা বার্লিনে এঁরা দ্বিতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এটি উপরে বর্ণিত প্রথম পতাকার প্রায় অনুরূপ। এই পতাকার উপরের অংশে ছিল একটি পদ্ম ও সাতটি তারা (সপ্তর্ষি)।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

এরপর তৃতীয় জাতীয় পতাকার উদ্ভব হয় ১৯১৭ সনে অ্যানে বেসান্ট ও লোকমান্য তিলকের 'হোম রুল' আন্দোলনের সময়ে। তখন পতাকার আকৃতিতে বেশ পরিবর্তন এসে গেল। এই জাতীয় পতাকা সমান্তরালভাবে পাঁচটি লাল ও চারটি সবুজ রং-এর কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরী হল। পতাকার উপরে বাঁদিকে ছিল ব্রিটিশ 'ইউনিয়ন জ্যাক'। এছাড়া এই পতাকায় ছিল সাতটি তারা, একটি অর্ধচন্দ্র ও একটি তারা। 'হোম রুল' আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্ত শাসন লাভ করা। সেইজন্য পতাকাটিও তারই প্রতীক হিসাবে পরিকল্পিত হল। কিন্তু জাতীয় পতাকায় 'ইউনিয়ন জ্যাকের' ছাপ থাকায় এই পতাকা কোন দিনই জাতীয় পতাকা বলে দেশবাসী গ্রহণ করেননি।

১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধী যখন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন করে সূচনা করলেন, তখন নতুন জাতীয় পতাকার বিশেষ আবশ্যকতা অনুভূত হল। স্বাধীনতার নতুন আদর্শ ও প্রয়োজনের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্য নতুন জাতীয় পতাকার দরকার হল। ১৯২১ সনে বিজয়ওয়াদা এ-আই-সি-সির অধিবেশনে একজন অন্ধ্র যুবক তার নিজের কল্পিত একটি জাতীয় পতাকা মহাত্মা গান্ধীর হাতে দেয়। এই পতাকাটি দুইটি প্রধান জাতি—হিন্দু ও মুসলমানের প্রতীকস্বরূপ লাল ও সবুজ রংয়ে তৈরী ছিল। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুসারে এই দুই রংয়ের সঙ্গে সাদা রং যোগ করে দেওয়া হল। এই

শ্রীজওহরলাল নেহরু

সাদা অংশ হল ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতির প্রতীক। তা ছাড়া পতাকার উপর অঙ্কিত হোল ভারতের প্রগতির চিহ্ন হিসাবে একটি চরকার মূর্তি। এই হল ভারতীয় ত্রিবর্ণ পতাকার জন্ম-ইতিহাস।

মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদন পেলেও কংগ্রেস অনেক বৎসর এই পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলে গ্রহণ করেনি। সরকারীভাবে গৃহীত না হলেও আমাদের সর্ববিধ জাতীয় ব্যাপারে, সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে এই পতাকাই তখন ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯২৯ সনে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে যখন 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন এই পতাকাই উত্তোলন করা হয়েছিল। এরপর ১৯৩১ সনে করাচী শহরে এ-আই-সি-সি'র অধিবেশনে জাতীয় পতাকা পরিকল্পনায় বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়।

এই কমিটি নানা জল্পনা-কল্পনার পর সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্জন করে পূর্বকল্পিত ত্রিবর্ণ পতাকাই জাতীয় পতাকা বলে গ্রহণ করেন। এই পতাকাই আমাদের আধুনিক জাতীয় পতাকার

১৯১৭

১৯০৭

১৯২১

১৯৩১

১৯৪৭

অগ্রদূত। পতাকার জন্য নির্বাচিত হল এই তিনটি রং—গেরুয়া, সাদা ও সবুজ। পরিষ্কারভাবে বিজ্ঞাপিত হল, এই তিনটি রং সম্প্রদায় বিশেষের প্রতীক নয়। গেরুয়া রংয়ের অর্থ হচ্ছে—সাহস ও ত্যাগ; সাদা রং—সত্যতা ও শান্তি এবং সবুজ—বিশ্বাস ও বীরত্ব। পতাকার সাদা অংশের উপর অঙ্কিত হোল নীল রংয়ের চরকা। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত আমাদের সর্বপ্রকার জাতীয় উৎসবে বা আন্দোলনে এই পতাকাই উত্তোলিত হয়েছে আসমুদ্র হিমালয় ভারতের প্রতিটি শহরে ও গ্রামে।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতার উদ্বোধনের কিছু আগে ভারতের সংবিধান রচনার জন্যে আহূত কন্‌স্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে ২২শে জুলাই শ্রীজওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করলেন এবং তাঁর এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। নবপরিকল্পিত পতাকাও তিনি এই সভায় সকল সভ্যকে দেখালেন। পূর্ব-কল্পিত জাতীয় কংগ্রেস পতাকার সঙ্গে এই জাতীয় পতাকার বর্ণের বা মর্মার্থের কোন পার্থক্য ছিল না। কেবল চরকার পরিবর্তে পতাকার সাদা অংশে একটি চক্র স্থাপিত হল। সারনাথে অশোক স্তম্ভের উপরে যে 'ধর্মচক্র' খোদিত আছে, জাতীয় পতাকায় চক্রটি হল তারই প্রতিরূপ।

ভারতে সংবাদপত্র ও সরকার
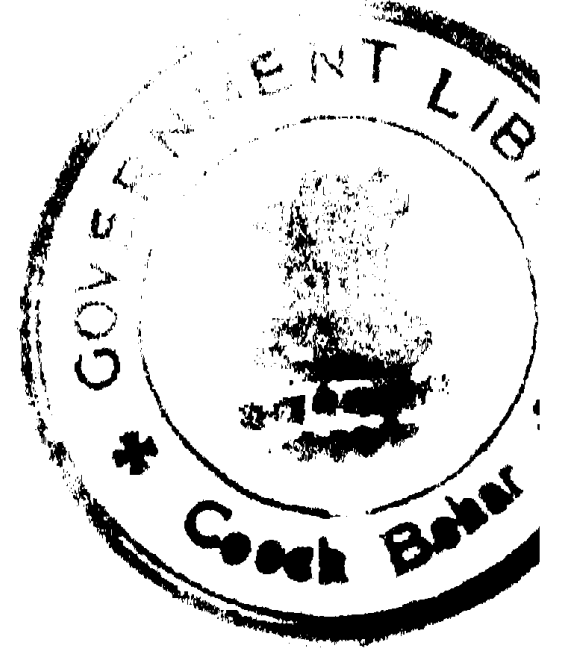
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মেকলে লিখিয়াছিলেন—ইংরেজ যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবে তখন তাহার স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে কেবল কতকগুলি খালি মদের বোতল।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন স্তব্ধ হয়ে যাবে তখন কী বিস্তীর্ণ পংকসজ্জা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।"

উভয়ের কথাই সত্য; কিন্তু অর্ধসত্য। আমেরিকান রাজনীতিক ব্রায়ান যথার্থই বলিয়াছেন,—ইংরেজ ভারতবর্ষের কিছু কিছু উপকার করিয়াছে; কিন্তু সে তাহার জন্য যে মূল্য আদায় করিয়াছে তাহা ভয়াবহ।

এদেশে সংবাদপত্র ইংরেজকৃত উপকারের অন্যতম। স্বৈরশাসনের সহিত সংবাদপত্রের কখনও সম্প্রীতি থাকিতে পারে না। সেইজন্য ইংরেজও এদেশে শাসন কর্তৃত্ব পাইয়া সংবাদপত্রের প্রবর্তন চাহে নাই। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম বোল্টস নামক একজন ইংরেজ কলিকাতায় সংবাদপত্র প্রবর্তনের চেষ্টা করিলে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজের পথে ইউরোপে যাইতে নির্দেশ দেন। কাজেই তাঁহার পক্ষে সংবাদপত্র প্রকাশ সম্ভব হয় নাই। তখন ইংরেজের অধিকৃত স্থানে নিয়ম ছিল শাসকরা ইচ্ছা করিলে যে-কোন বিদেশীকে এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারিতেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হিকী নামক এক ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় এদেশে—কলিকাতায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার পত্রের নাম "বেংগল গেজেট"। বলা বাহুল্য এই পত্র ইংরেজদের জন্য প্রচারিত হইত। তখন কলিকাতার ইংরেজ সমাজ দুর্নীতিদুষ্ট; কাজেই সংবাদপত্রখানিও ব্যক্তিগত কুৎসা প্রভৃতি প্রকাশ করিত। প্রকাশের দশ মাসের মধ্যেই ইহা সরকারের বিরাগভাজন হয়। তখন ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গবর্ণর—তিনি

রাজা রামমোহন রায়

ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতে আসিবার পথে জাহাজেই এক সহযাত্রীর পরিণীতা পত্নীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধে বদ্ধ হন। পরে তিনি ঐ সহযাত্রীকে টাকা দিয়া তাঁহার পত্নীর সহিত বিবাহবিচ্ছেদ করাইয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার

লোকমান্য তিলক

পূর্বেই উঁহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিবাহের সংবাদ "গেজেটে" প্রকাশিত হওয়ায় হেস্টিংস ক্রুদ্ধ হইয়া হিকীর সর্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। হিকী সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রকাশিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়া গেজেট"। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ডুয়েন নামক এক ব্যক্তি "ইণ্ডিয়ান ওয়ালর্ড" প্রকাশ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সরকারের বিরাগভাজন হয়েন। তখন স্যার জন শোর বাংলার গবর্ণর। ঐ বৎসর ২৭শে ডিসেম্বর লাটপ্রাসাদ হইতে এক পত্রে ডুয়েনকে লাটপ্রাসাদে যাইতে বলা হয়। তিনি মনে করেন, তিনি কয়েকদিন পরেই ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইবেন কোন সূত্রে এই সংবাদ পাইয়া লাট তাঁহাকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি যথাসময়ে লাটপ্রাসাদে উপস্থিত হইলে গবর্ণরের খাসমুন্সী তাঁহাকে বলেন—"আপনি যে ঠিক সময়ে আসিয়াছেন ইহাতে আমি আনন্দিত।" ডুয়েন তাঁহাকে উত্তর দেন—"আমি ঠিক সময়েই আসিয়া থাকি। গবর্ণর ভাল আছেন ত?" খাসমুন্সী বলেন—"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।" ডুয়েন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন—"সে কি? আমি মনে করিয়াছি তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।" তখন খাসমুন্সী জলদগম্ভীর স্বরে বলেন—"গবর্ণরের আদেশ অনুসারে আপনাকে বন্দী করা হইল।" একদল সৈনিক উপস্থিত ছিল; তাহারা ডুয়েনকে বলপূর্বক টানিয়া লইয়া গেল এবং দুর্গে তিন দিন বন্দী থাকিবার পর তাঁহাকে একখানি জাহাজে তুলিয়া ইংল্যাণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী সংবাদপত্র সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। একটি নিয়ম অনুসারে সংবাদপত্রে প্রকাশের পূর্বে প্রকাশ্য বিষয় সরকারী কর্মচারীকে দেখাইয়া তাঁহার অনুমোদন লইতে হইত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো নির্দেশ

দেন—সংবাদপত্রে প্রকাশকের নাম প্রকাশ করিতে হইবে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস ছাপিবার পূর্বে প্রকাশ্য বিষয় দেখাইয়া লইবার নিয়ম আরও কঠোর করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সিল্ক বাকিংহাম "ক্যালকাটা জার্ণাল" পত্র প্রকাশ করিয়া যোগ্যতা সহকারে তাহা পরিচালিত করিতে থাকেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নির্বাসিত করা হয়। তাঁহাকে নির্বাসিত করিবার পরেই কলিকাতার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচক কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিয়া সেগুলি মঞ্জুর করিবার জন্য (১৫ই মার্চ, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ) সুপ্রীম কোর্টে দাখিল করা হয়। দুই দিন পরেই নিম্নলিখিত ছয়জন বাঙ্গালী ঐ সকল নিয়মের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করেন ঃ—চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

এই ছয়জনের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হয় এবং বিচারক মন্তব্য করেন, যে-দেশে স্বাধীন শাসনতন্ত্র নাই সেদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।

এইরূপে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে ইংল্যাণ্ডে যাইয়া রামমোহন রায় এই বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনাও নামঞ্জুর করা হয়। রামমোহন রায়ের

শিশিরকুমার ঘোষ

আবেদনের ফলে বিষয়টি ইংল্যাণ্ডে আলোচিত হইয়াছিল। রামমোহন ইংল্যাণ্ডের আদালতে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায়, তখনই এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁহাদিগের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে সরকার সংবাদপত্রের সহিত কোনরূপ অপ্রীতিকর ব্যবহার করেন নাই। স্যার চার্লস মেটকাফ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বড়লাট হইয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদানের সংকল্প করিলে তাঁহার আইন-মন্ত্রী মেকলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মে তারিখে সে সম্বন্ধে আইন উপস্থাপিত করেন। সেই আইন অনুসারে ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে সরকারের অনুমতি না লইয়াই সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন; তবে রাজদ্রোহ প্রভৃতির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

এই ব্যবস্থায় এদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন এবং তাঁহার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য কলিকাতায় একটি সুরম্য গৃহ নির্মাণ করান (মেটকাফ হল)। কিন্তু মেটকাফের এই কার্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকরা প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন নাই। ফলে তাঁহাদিগের সহিত মতান্তর হেতু মেটকাফ পদত্যাগ করেন। ইহার পর প্রায় বিশ বৎসর সংবাদপত্রকে কোনরূপ উত্যক্ত করা হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহ এদেশে ইংরাজ-প্রাধান্যের ভিত্তিতে আঘাত করে। সেই সময় বড়লাট লর্ড ক্যানিং (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচক আইন প্রবর্তিত করিলে কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাহার প্রতিবাদে তাঁহার পত্র (হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার) বন্ধ করিয়া দেন। মেটকাফ যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন সরকার সে বিষয়ে কর্মচারীদিগের মত গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এলফিনস্টোন ও মনরো বিভিন্ন কারণে স্বাধীনতা প্রদানে আপত্তি করেন। এলফিনস্টোন মত প্রকাশ করেন, সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দিলে ভারতীয় সৈনিকগণ অর্থাৎ সিপাহীরা এমন সকল বিষয়ের আলোচনা করিবে যে, তাহাতে তাহাদিগের ইংরেজ সরকারের আনুগত্য ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। মনরো সুস্পষ্টরূপেই বলিয়াছিলেন বিদেশী শাসনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্ভব নহে। এদেশে সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দিলে দেশীয় লোকের সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইবে তাহা বিদেশী শাসনের

মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে। তিনি বলেন, সংবাদপত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি—দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করাই স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।
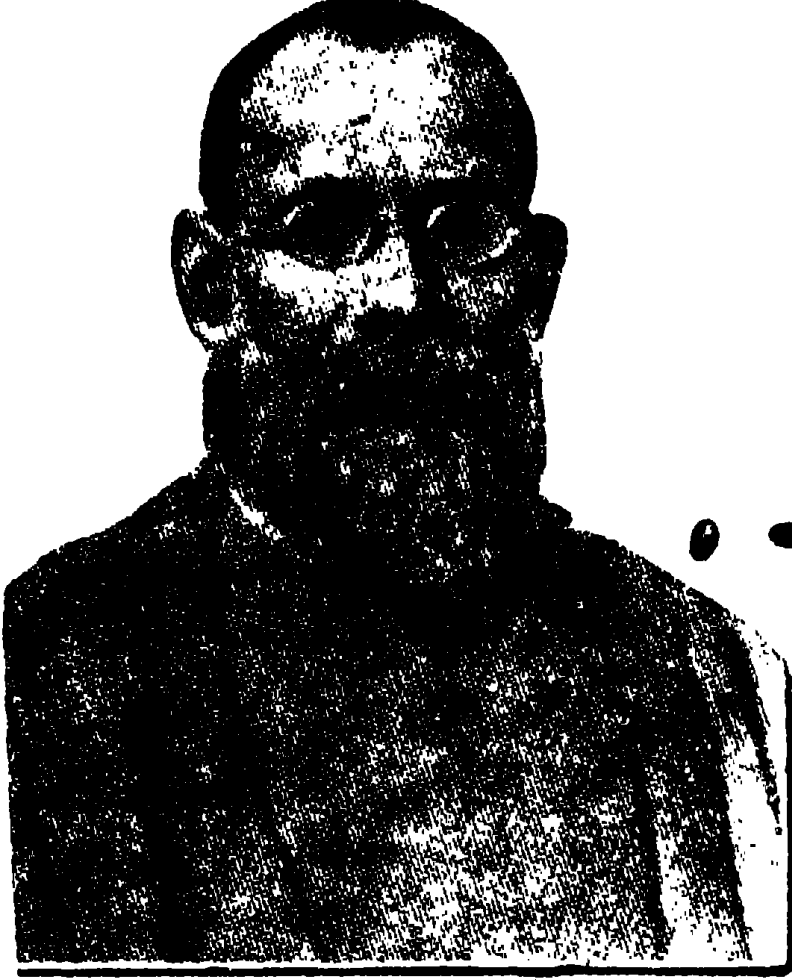
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেশে সংবাদপত্র সেই কর্তব্য পালন করিলে এদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিবে।

ইহার পরেই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটনের শাসনকালে নূতন আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইন কেবল ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল। ইহার পূর্বে সংবাদপত্র সম্বন্ধে যে সকল আইন বিধি-বন্ধ হইয়াছিল তাহার কোনটিই ইংরেজীপত্রে ও দেশীয় ভাষায় প্রচারিত পত্রে ব্যবহার-বৈষম্য করে নাই। এই আইনে এমন বিধিও ছিল যে, প্রকাশের পূর্বে প্রকাশ্য রচনা সরকারী কর্ম-চারীকে দেখাইয়া তাঁহার অনুমোদন লইলে সংবাদপত্রের আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। কিন্তু তৎকালীন ভারত সচিবের নির্দেশে এই বিধি ত্যক্ত হয় (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ ১৬ই অক্টোবর)। এই বৈষম্যমূলক আইন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্র সম্বন্ধে যে আইন হয় তাহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার ছোটলাট টেম্পল লিখিয়াছিলেন, তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বাংলা সংবাদপত্র কোনরূপে ইংরেজ শাসনের বিরোধী নহে। আর তাহার পর বৎসরই ছোটলাট ইডেন লেখেন বাংলা সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি আপত্তি-জনক—এমনকি সময় সময় রাজদ্রোহ সমর্থক। প্রকৃত কথা এই যে, ছোটলাট হইয়া ইডেন সংবাদপত্র "হাত করিয়া" কাজ করিবার চেষ্টা করেন। তখন বাংলায় ভারতবাসীর শক্তিশালী ইংরেজী সংবাদপত্র "হিন্দু পেট্রিয়ট" আর বাংলা সংবাদপত্র "অমৃতবাজার পত্রিকা"। "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল জমিদার সভার পক্ষ হইতে ঐ পত্র পরি-চালিত করিতেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কৃষ্ণদাস ছিলেন "কৌশলী"। ইডেন "অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষকে ডাকিয়া বলেন, কৃষ্ণদাস তাঁহার কার্য সমর্থন করিবেন; শিশিরকুমার তাহা করিলে তাঁহারা তিন-জন বাংলা শাসন করিতে পারিবেন। শিশিরকুমার সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলেন—দেশে অন্তত একখানি স্বাধীন সংবাদপত্র থাকা প্রয়োজন। তখন ইডেন পূর্বোক্ত মন্তব্য করিয়া বড়লাট লিটনকে আইন প্রণয়নে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিপন্ন করা হইবে সেইজন্য তিনি রাতা-রাতি "অমৃতবাজার পত্রিকা" ইংরেজী পত্রে পরিণত করেন। "অমৃতবাজার পত্রিকা" এইরূপে অব্যাহতি পাইলেও "সোমপ্রকাশ" অব্যাহতি লাভ করেন নাই। এই "সোমপ্রকাশ" প্রধানতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখপত্র ছিল। "সোমপ্রকাশের" পরিচালকরা পত্র প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। এই সময় বিলাতে পার্লামেন্টে গ্লাডস্টোন এই

আইন সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নির্বাচনে বিলাতের প্রধানমন্ত্রী হইয়া তিনি যখন লর্ড রিপণকে এদেশে বড়লাট করিয়া প্রেরণ করেন তখন তাঁহাকে এই বৈষম্যমূলক আইন রদ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ ঐ আইন প্রত্যাহার করেন।

ইহার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "বঙ্গবাসীর" বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু সে মামলায় জুরাররা একমত হইতে পারেন নাই এবং আসামীদিগের পক্ষে ব্যারিস্টার জ্যাকসন যে আইনের তর্ক তোলেন তাহাতে বিব্রত হইয়া সরকার জমিদার সভার মাধ্যমে মামলা মিটাইয়া ফেলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দন্ডবিধিতে রাজদ্রোহ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা ছিল তাহা কঠোর করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহ সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং অন্যান্য ধারাও প্রযুক্ত করা হয়। "বঙ্গবাসীর" মামলায় কলিকাতা হাইকোর্ট তৎকালে প্রচলিত ধারার যে ব্যাখ্যা করেন তাহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলেও আইনসঙ্গত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বাল গঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে যে রাজদ্রোহের মামলা হয় তাহাতে বিচারক (স্ট্রেচি) বলেন—"Disaffection was the absence of affection"! এই মামলায় তিলকের আঠার মাস সশ্রম কারাদন্ড হয়। ইহার পরবর্তী রাজদ্রোহের বড় মামলা বাল গঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। এই বৎসরই সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বড়লাট লর্ড মিন্টো সরকার ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আর এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় সদস্যরা এই আইনে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও পন্ডিত মদনমোহন মালব্য ইহার তীব্র সমালোচনা করেন।

সরকার কিভাবে এই আইন অনুসারে এদেশে সংবাদপত্রসমূহকে বিপন্ন করিয়াছিলেন তাহার হিসাব সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত করা হইয়াছিল : (১) "বম্বে ক্রণিকল" পত্রকে প্রথমে দুই হাজার ও পরে দশ হাজার টাকা জামিন দিতে হয়। ইহার সম্পাদক হরনিম্যানকে নির্বাসিত করা হয়। পুনরায় পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়া পত্র প্রচারিত হইলে ঐ জামিন বাজেয়াপ্ত করিয়া দশ হাজার টাকা জামিন তলব করা হয়।

(২) "অমৃতবাজার পত্রিকা"র প্রথম জামানত পাঁচ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া দশ হাজার টাকা জামিন তলব করা হয়।

(৩) "ট্রিবিউন" পত্রের দু হাজার টাকা জামিন তলব করা হয়।

(৪) "পঞ্জাবী" পত্রের দু হাজার টাকা জামিন তলব করা হইলে পত্র প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

(৫) মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রের দু হাজার টাকা জামিন লওয়া হয় এবং পঞ্জাবে ও ব্রহ্মে উহার প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়।

(৬) এলাহাবাদের "ইন্ডিপেন্ডেন্ট" পত্রের দু হাজার টাকা জামিন তলব করিয়া পঞ্জাবে ও ব্রহ্মে উহার প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়।

ইহা ভিন্ন নিম্নলিখিত পত্রসমূহেরও জামিন তলব করা হইয়াছিল। "ইয়ং পেট্রিয়ট", "হিন্দভাষী", "সিন্ধ সমাচার", "হিন্দু এ্যাডভোকেট", "বিজয়া", "স্বদেশ মিত্রম", "দেশভক্তন", "প্রতাব", "সংকল্প" প্রভৃতি।

অবস্থা এইরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, উষানাথ সেন এবং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক স্বরাষ্ট্র সদস্য স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্টের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং প্রস্তাব করেন যে সংবাদপত্রে সম্পাদকের নাম প্রকাশিত হইবে; সরকার ইচ্ছা করিলে সম্পাদককে অভিযুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু সংবাদপত্রের ছাপাখানা প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন না। এই আলোচনার ফলে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া মত প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক সমিতি গঠিত হয়।

স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্ট, জমুনাদাস দ্বারকাদাস, মোহনলাল, শেষগিরি আয়ার, সাহাবুদ্দিন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মীর আশাদ আলী, ঈশ্বর সরণ।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই তাঁহাদিগের রিপোর্ট দাখিল করেন।

আইন পরিবর্তিত হইল বটে, কিন্তু সরকারের পক্ষে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থাপিত করা সহজসাধ্যই রহিল। কারণ, ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ১২৪এ ধারা তখন এত রূপান্তরিত হইয়াছে যে, নানা কারণে তাহা প্রয়োগ করা যায়। প্রথমে উহা নিম্নলিখিত রূপ ছিল :

"Whoever attempts to excite feelings of disaffection to the Government established by law in British India, shall be punished with transportation for life or for any term, to which fine may be added, or with imprisonment for a term which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine."

পরে উহা হয়:—

"Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or

by visible representation or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards Her Majesty or the Government, or promotes or attempts to promote feelings of enmity or ill-will between different classes of Her Majesty's subjects, shall be punished with transportation for life or any shorter terms, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to ten years, to which fine may be added, or with fine."

কাজেই নানা অভিযোগে সরকার সংবাদপত্র সম্পাদক প্রভৃতিকে [illegible] করিতে থাকেন।

এমন কি যখন প্রাদেশিক সরকারে দ্বৈত ভাব হয় তখন বাঙলায় সচিবরাও সরকারের অংশ বলিয়া "বসুমতীর" বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা উপস্থাপিত করেন। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন—সচিবরা সরকারের পরামর্শদাতা—তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে রাজদ্রোহ হয় না।

আইনে ব্যাপক ক্ষমতা থাকিলেও—তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া—ভারত সরকার "অর্ডিনান্স" জারি করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করিতে থাকেন। তাহার কৈফিয়তে বড়লাট আরউইন বলেন—যে আশা করিয়া সরকার ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের বিধিবদ্ধ আইন প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, সে আশা ফলবতী হয় নাই। অর্থাৎ সরকার সংবাদপত্রের সমালোচনা বন্ধ করিতে পারিতেছিলেন না।

ইংরেজ ভারতবর্ষ খণ্ডিত করিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া যাইলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; রাজা না থাকায় রাজদ্রোহ অসম্ভব হয়।

দুঃখের বিষয় স্বায়ত্তশাসনাধীন ভারতে ও আসামে সংবাদপত্রের প্রকাশ-সংকোচক আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন—কলিকাতা ও আসামে বহু সংবাদপত্রে যেভাবে আসামের ব্যাপার আলোচিত হইতেছে, তাহা তাঁহার অনভিপ্রেত।

তবে আমরা আশা করি, ভারতের নাগরিকরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সংকোচক কোন আইন বিধিবদ্ধ করিতে দিবেন না; কারণ—সংবাদপত্রই গণতন্ত্রের রক্ষক; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইলে গণতন্ত্র অর্থহীন হওয়া অনিবার্য।

ভবনগরে নির্মিত জাতীয় গবেষণাগার

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

সুধীরচন্দ্র সরকার

স্বাধীনতা লাভের অনেক পূর্ব থেকেই ভারতে সর্ববিধ উন্নতির জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রস্তাব অনেকেই মধ্যে মধ্যে উত্থাপন করছিলেন। এইরূপ একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনা সর্বপ্রথম উপস্থিত করেন দাক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার স্যার এম, বিশ্বেশ্বরায়া। ১৯৩৪ সনে তাঁর Planned Economy for India নামক বইয়ে দশ-বার্ষিক এক পরিকল্পনার কথা লেখেন তিনি। এরপর ১৯৩৮ সনে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস ভারতের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সর্ববিধ উন্নতির জন্য National Planning Committee নামে একটি সমিতি গঠন করে। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে এই কমিটির কাজ মাত্র কিছুদূর অগ্রসর হয়। এই কমিটি একটি প্রশ্নমালা ও পরিকল্পনা বিষয়ে কয়েকটি পুস্তিকা প্রচার করে।

১৯৪১ সনের জুন মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর ভারতে নানা বিষয় পুনর্গঠনের জন্য কয়েকটি Reconstruction Committee স্থাপিত করে। এই সূত্রে ১৯৪৪ সনে Department of Planning and Developments-ও স্থাপিত হয়। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েকটি বেসরকারী পরিকল্পনা প্রচারিত হয়। তার মধ্যে এই কয়টি প্রধান—

(১) দেশের কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী দ্বারা পরিকল্পিত Bombay Plan. (২) এম, এন, রায় পরিকল্পিত People's Plan ও (৩) এস, এন, অগ্রবাল পরিকল্পিত Gandhian Plan.

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রধান কাজ হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক বিষয়ে ভারতের সর্ববিধ উন্নতির প্রচেষ্টা করা। ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে জটিল সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সমস্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ বা স্থগিত ছিল।

কিন্তু ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতালাভের পর পথ, মত ও নীতি সবই বদলে গেল। তখন দেশ-শাসনের একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য হল সর্ব বিষয়ে জাতিকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলা। এই জন্যে ১৯৫০ সনের মার্চ মাসে আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট একটি Planning

Commission গঠন করে। ১৯৫১ সনের জুলাই মাসে Planning Commission ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ (মার্চ) পর্যন্ত একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রচার করে। এই খসড়া পরে পরিবর্তিত আকারে ১৯৫২ সনে পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল—জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং বিভিন্ন প্রকারে সাধারণের জীবনযাত্রার বিভিন্ন পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া। স্থির হয়, এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে ভারতের মানবিক শক্তি ও আর্থিক সম্পদ পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করার নীতি গ্রহণ করতে হবে। ধনী ও নির্ধনের মধ্যে আয়, ধন-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে যে অসমতা আছে তা ক্রমেই সমতার দিকে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে যে বৈষম্য আছে, তা ক্রমে লুপ্ত করে সমতা আনতে হবে। পরিকল্পনার প্রথম অবস্থায় সর্ববিধ উৎপাদনের দিকে বেশী নজর দিলেও, আমাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র এই একদিকে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। এতে সর্ববিধ উন্নতি সম্ভবপর নয়। আমাদের কর্মপদ্ধতি এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে দেশের সমস্ত লোক কাজ করবার সমান সুযোগ পায়, কেউ যেন বেকার না থাকে; রোগ ও অক্ষমতার হাত হতে মুক্তিলাভ করে। তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল, ১৯৫১ হতে ১৯৫৬ সনের মধ্যে জাতীয় আয়কে ৯,০০০ কোটি টাকা হতে ১০,০০০ কোটি টাকায় বাড়ানো। অর্থাৎ শতকরা ১১ টাকা বৃদ্ধি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্রথম প্ল্যানকে প্রধানতঃ প্রস্তুতির পরিকল্পনা বলা যেতে পারে। দ্রুতভাবে কেমন করে দেশের সর্ববিধ উন্নতি, বিশেষতঃ উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয়, তার ভিত্তিস্থাপন করা। প্রথম প্ল্যানের আওতায় ২,৩৫৬ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত খরচ হয়েছিল, ২,০১৩ হাজার কোটি টাকা।

কৃষি উন্নতি, জলসেচ, বৈদ্যুতিক শক্তিউৎপাদন বৃদ্ধি করা ছিল প্রথম প্ল্যানের মুখ্য উদ্দেশ্য। তারপর যাতায়াতের পথ ও যানবাহনের উন্নতি। এই তুলনায় শিল্পোন্নতির দিকে ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এই প্রথম প্ল্যানের বিভিন্ন খাতের খরচ এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হোল—

	যথাযত খরচ (কোটি টাকা)	সমগ্র ব্যয়ের গড়পড়তা অংশ
কৃষি ও সামাজিক উন্নতির জন্য......	২৯৯	১৪·৮
জলসেচ বৈদ্যুতিক শক্তিউৎপাদনের জন্য......	৫৮৫	২৯·১
শিল্প ও খনি সংক্রান্ত ব্যয়......	১০০	৫·০
যানবাহন ও যাতায়াতের পথের জন্য......	৫৩২	২৬·৪
সামাজিক সেবার জন্য......	৪২৩	২১·০
বিবিধ......	·৭৪	৩·৭
মোট	২,০১৩	১০০·০

যদিও স্থির ছিল, প্রথম প্ল্যানের খরচ হবে ২,[illegible]৩ হাজার কোটি টাকা, কিন্তু শেষে দেখা গেল প্রকৃত খরচ হয়েছে—১৯৬০ হাজার কোটি টাকা। প্রথম প্ল্যানের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল এইভাবে—

রাজস্ব হতে অর্থপ্রাপ্তি (রেলের দান সমেত)...	৭৫২	কোটি টাকা
জনসাধারণের কাছ হতে ঋণ (Public loans)	২০৫	„
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের টাকা ও অপ্রতিষ্ঠিত ঋণ (Unfunded debt)...	৩০৪	„
মূলধন হতে প্রাপ্ত বিবিধ অর্থ...	৯১	„
	১৩৫২	„
বিদেশ হতে সাহায্য ও ঋণ...	১৮৮	„
Deficit financing (ঘাটতি রাজস্ব) হতে সংগৃহীত অর্থ	৪২০	„
	১,৯৬০	„

সরকারী মতানুসারে প্রথম প্ল্যানের প্রধান উদ্দেশ্যের প্রায় সবগুলিই সফলতা লাভ করেছিল। সব রকম ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ও দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতিও প্রায় দূরীভূত হয়েছিল। জিনিসপত্রের মূল্য শতকরা ১৫ টাকা কমছিল। জাতীয় আয় (National income) বেড়েছিল শতকরা ১৮·৪ হিসাবে; অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সনের জাতীয় বাৎসরিক আয় ৮,৮৫০ কোটি টাকা থেকে ১৯৫৫-৫৬ সনে ১০,৪৮০ কোটি টাকা হয়েছিল। জনপ্রতি গড়পড়তা বাৎসরিক আয় এই কয় বৎসরে বেড়েছিল ১০·৪, অর্থাৎ বাৎসরিক জনপ্রতি গড়পড়তা আয় ২৪৬ টাকা থেকে ২৭৪ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ ছাড়া জনপ্রতির খাদ্য পরিমাণও বেড়েছিল গড়পড়তা ৮-এ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ১৯৫৯ সনের ১৫ই মে পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—(১) জাতীয় আয় শতকরা ২৫ হারে

বৃদ্ধি করা, (২) মৌলিক ও ভারী শিল্পের উপর বেশী জোর দিয়ে দেশে দ্রুত শিল্পোন্নতি করা, (৩) চাকুরীর ক্ষেত্রে সুযোগ ও সুবিধার ব্যাপকভাবে বিস্তার-সাধন করা, (৪) জনসাধারণের মধ্যে আয়ের ও ধন-সম্পদের অসমতা দূর করা এবং সকলের মধ্যে সমভাবে অর্থনৈতিক সুযোগ ও সুবিধার বিস্তৃতি ঘটানো।

ঠিক হয়েছিল, দ্বিতীয় প্ল্যানের জন্য মোট খরচ হবে ৪,৮০০ কোটি টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় প্ল্যানের প্রধান প্রধান খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ছিল এই রকম—

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থ বণ্টন

(কোটি টাকা)

	কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট	মোট টাকা
কৃষি ও সামাজিক উন্নতি	৬৫	৫০২	৫৬৮
জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১০৫	৮০৮	৯১৩
শিল্প ও খনি	৭৪৭	১৪৩	৮৯০
যানবাহন ও যাতায়াতের রাস্তা	১,২০৩	১৮২	১,৩৮৫
সামাজিক সেবা	৩৯৬	৫৪৯	৯৪৫
বিবিধ	৪৩	৫৬	৯৯
মোট—	২,৫৫৯	২,২৪০	৪,৮০০

	(প্রথম প্ল্যান—কোটি টাকা) মোট খরচ	সমস্ত টাকার শতকরা হার	(দ্বিতীয় প্ল্যান—কোটি টাকা) মোট খরচ	সমস্ত টাকার শতকরা হার
কৃষি ও সামাজিক উন্নতি	৩৫৭	১৫·১	৫৬৮	১১·৮
জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৬৬১	২৮·১	৯১৩	১৯·০
শিল্প ও খনি	১৭৯	৭·৬	৮৯০	১৮·৫
যানবাহন ও যাতায়াতের রাস্তা	৫৫৭	২৩·৬	১,৩৮৫	২৮·৯
সামাজিক সেবা	৫৩৩	২২·৬	৯৪৫	১৯·৭
বিবিধ	৬৯	৩·০	৯৯	২·১
মোট	২,৩৫৬	১০০·০	৪,৮০০	১০০·০

বে-সরকারী খরচ

(Private investment)

উপরে দ্বিতীয় প্ল্যানের খরচের কথা যা লেখা হয়েছে, তা সমস্তই সরকারী খরচের খাতে (Public Sector). এ ছাড়া বে-সরকারী ক্ষেত্র (Private Sector) আছে। অর্থাৎ বে-সরকারী শিল্প বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই দ্বিতীয় প্ল্যান খাতে খরচ করে পরিকল্পনার পূর্ণতা দান করবে। প্রথম

ভিলাই ব্লাস্ট ফার্ণেস
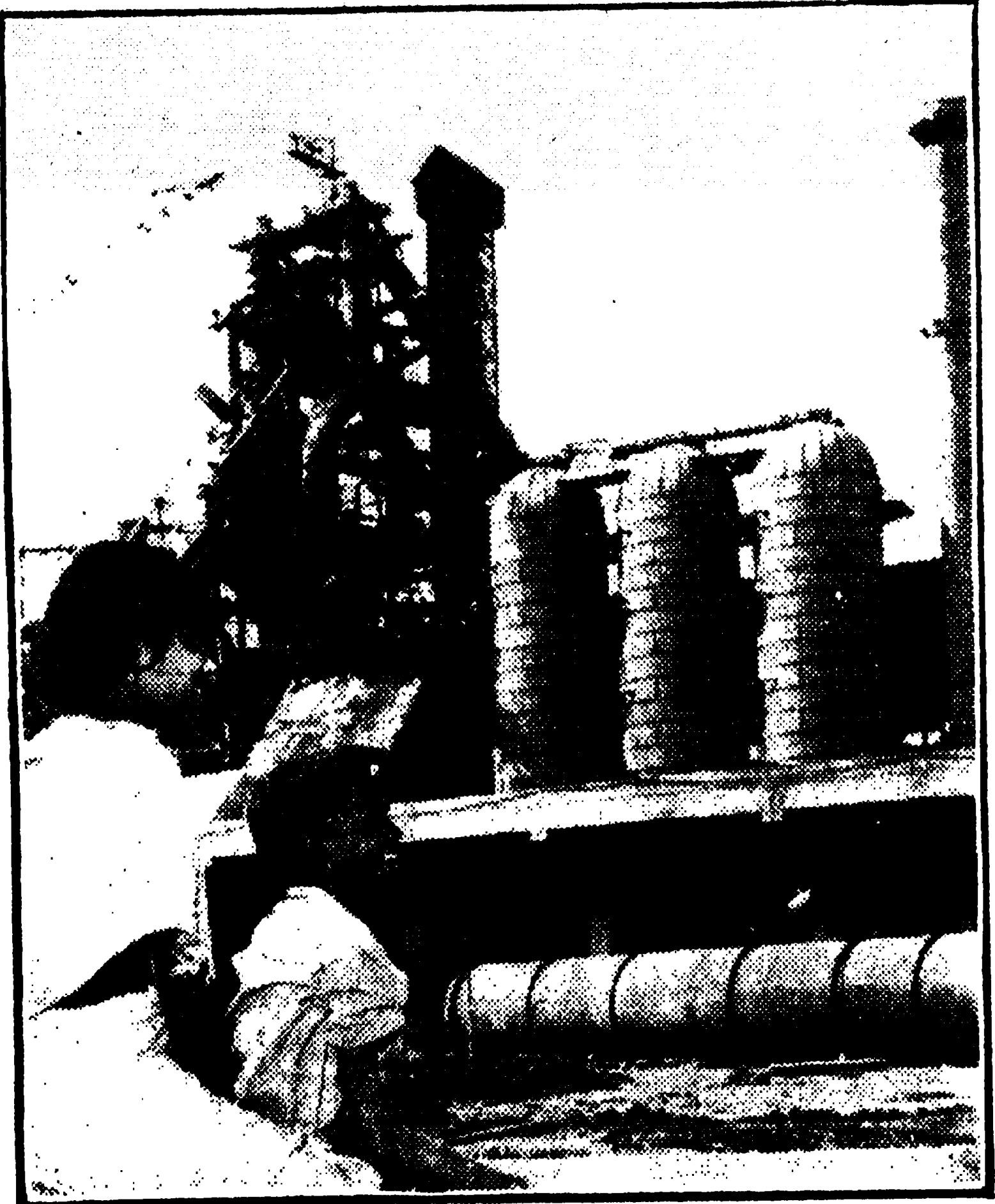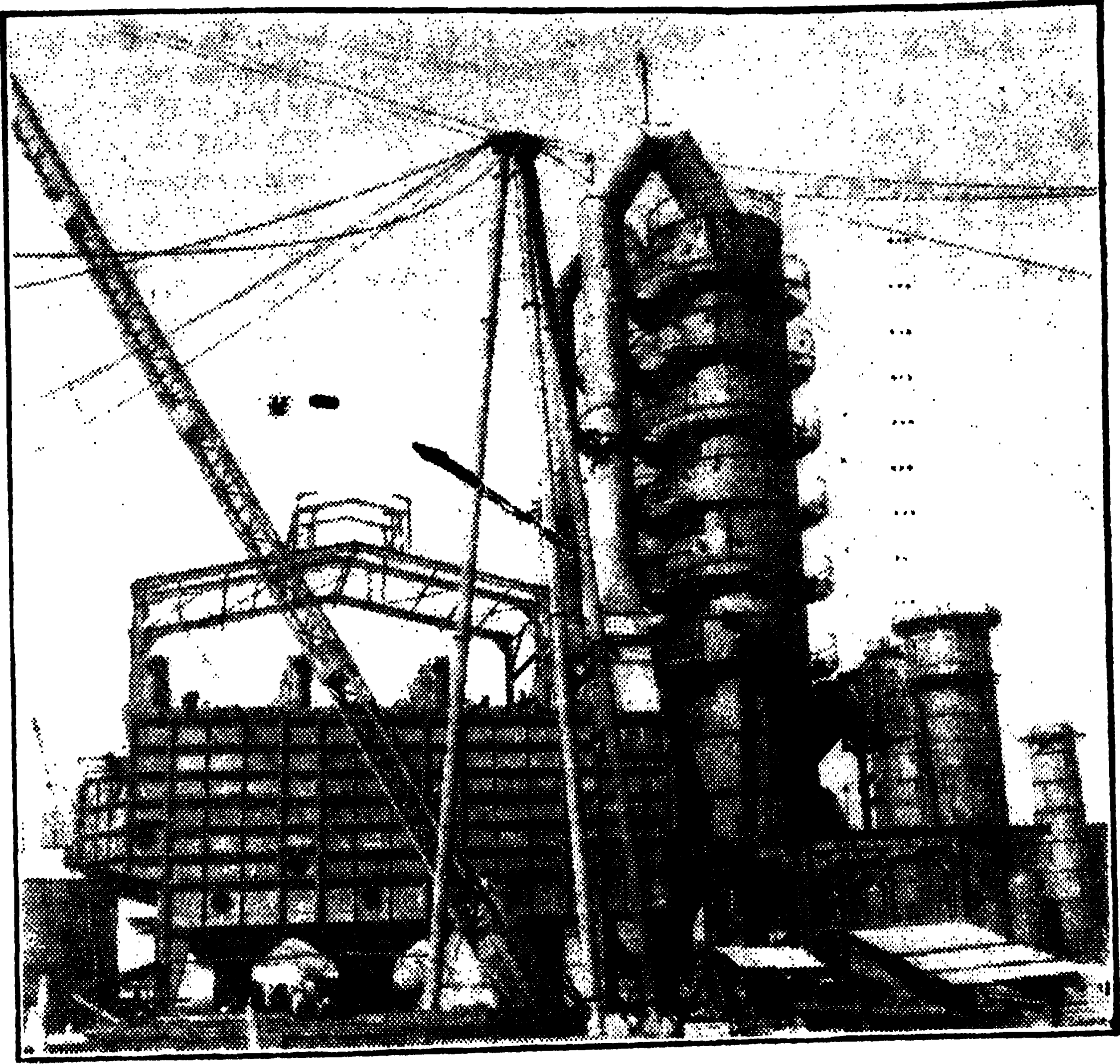
রাউরকেল্লা ব্লাস্ট ফার্ণেস

পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানে ঠিক হয়েছিল মোট সরকারী ও বে-সরকারী ব্যয় হবে মোটামুটি ৩,১০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ তুলনায় শতকরা ৫০ : ৫০। আর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ও বে-সরকারী খাতে মোট খরচ হবে ৬,২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সরকারী ও বে-সরকারী খাতের অনুপাত হচ্ছে ৬১ : ৩৯।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্ল্যানে প্রধান প্রধান জিনিসের সম্ভাব্য বৃদ্ধি

নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে দুটি প্ল্যানে প্রধান প্রধান জিনিসের উৎপাদন কতটা বেড়ে যাবে—

পরে পুনরায় উপরোক্ত এই সম্ভাব্য বৃদ্ধির হিসাব আরো বাড়ানো হয়েছে—

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	**শতকরা বৃদ্ধির হার ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬০**
খাদ্যদ্রব্য (লক্ষ টন)	৬৫০	৭৫০	১৫
গুড় (লক্ষ টন)	৫৮	৭১	২২
পাট (লক্ষ বেল)	৪০	৫০	২৫
চা (লক্ষ পাউন্ড)	৬,৪৪০	৭,০০০	৯
লোহা (লক্ষ টন)	৪৩	১২৫	১৯১
কয়লা (লক্ষ টন)	৩২০	৬০০	৫৮
মোটরগাড়ী (সংখ্যা)	২৫,০০০	৫৭,০০০	১২৮
সিমেন্ট (লক্ষ টন)	৪৩	১৩০	২০২

কারণ লোক-বৃদ্ধির সঙ্গে সমস্ত জিনিসের হিসাব বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের হিসাব পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্ল্যানের অর্থ-সংগ্রহ

দ্বিতীয় পরিকল্পনার চরম লক্ষ্যে পূর্ণভাবে পৌঁছতে হলে যে অর্থ লাগবে তা এইভাবে সংগৃহীত হবে বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল—

	কোটি টাকা
১৯৫৫-৫৬ সনের উদ্বৃত্ত টাকা	৩৫০
অতিরিক্ত কর	৪৫০
জনসাধারণ থেকে ঋণ গ্রহণ (Market loan)	৭০০
ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ (Small Savings)	৫০০
রেলওয়ে থেকে উদ্বৃত্ত টাকা	১৫০
প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও অন্যান্য গচ্ছিত টাকা	২৫০
বিদেশ হতে সংগৃহীত টাকা	৮০০
Deficit financing (Stareing balance, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি হতে টাকা)	১,২০০
ঘরোয়া সম্পদের উন্নতি করবার জন্য অতিরিক্ত পন্থা অবলম্বন করে ঘাটতি টাকা পূরণ—	৪০০
মোট—	৪,৮০০

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজে এগিয়ে গিয়ে ২।৩ বৎসর পরে দেখা গেল, ৪৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা এক রকম অসম্ভব। সেইজন্য প্ল্যানের কাঠামোকে পরিবর্তিত করতে হল। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে দুই-ভাগে ভাগ করা হল—প্রথম ভাগের নাম হল—Part A of the Plan এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম হল—Part B of the Plan। প্রথম ভাগে ৪,৫০০ কোটি টাকা খরচ করা ঠিক হল, আর বাকী ৩০০ কোটি টাকা Part B of the Plan-এ খরচ হবে। এই Part A of the Plan-এর ৪,৫০০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ২,৫১২ কোটি টাকা, আর প্রদেশগুলি দেবে ১,৯৮৮ কোটি টাকা।

দুই পরিকল্পনার ফলাফল—

দুই পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হয়েছে। এখন দেখা যাক সব বিষয়ে
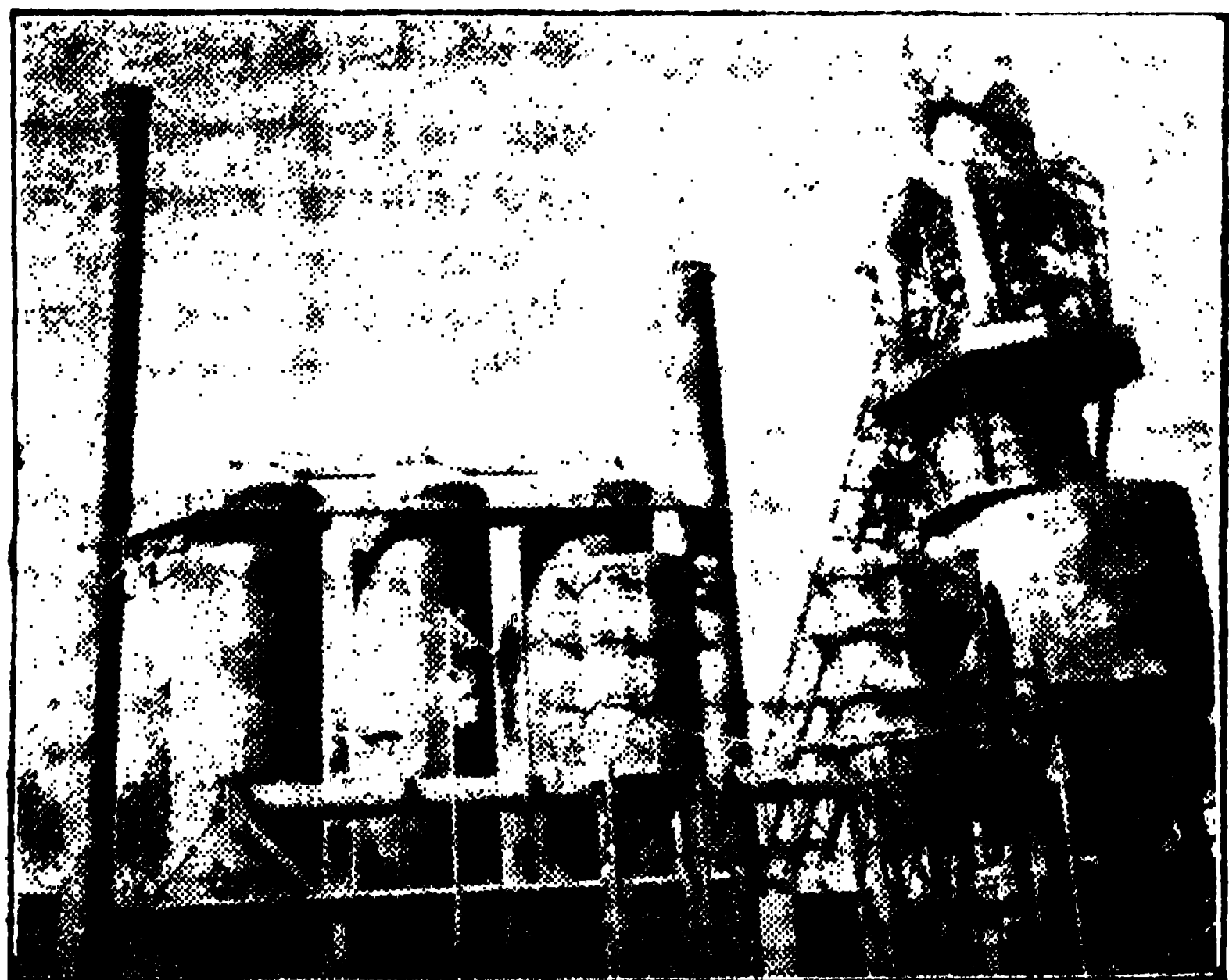
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট
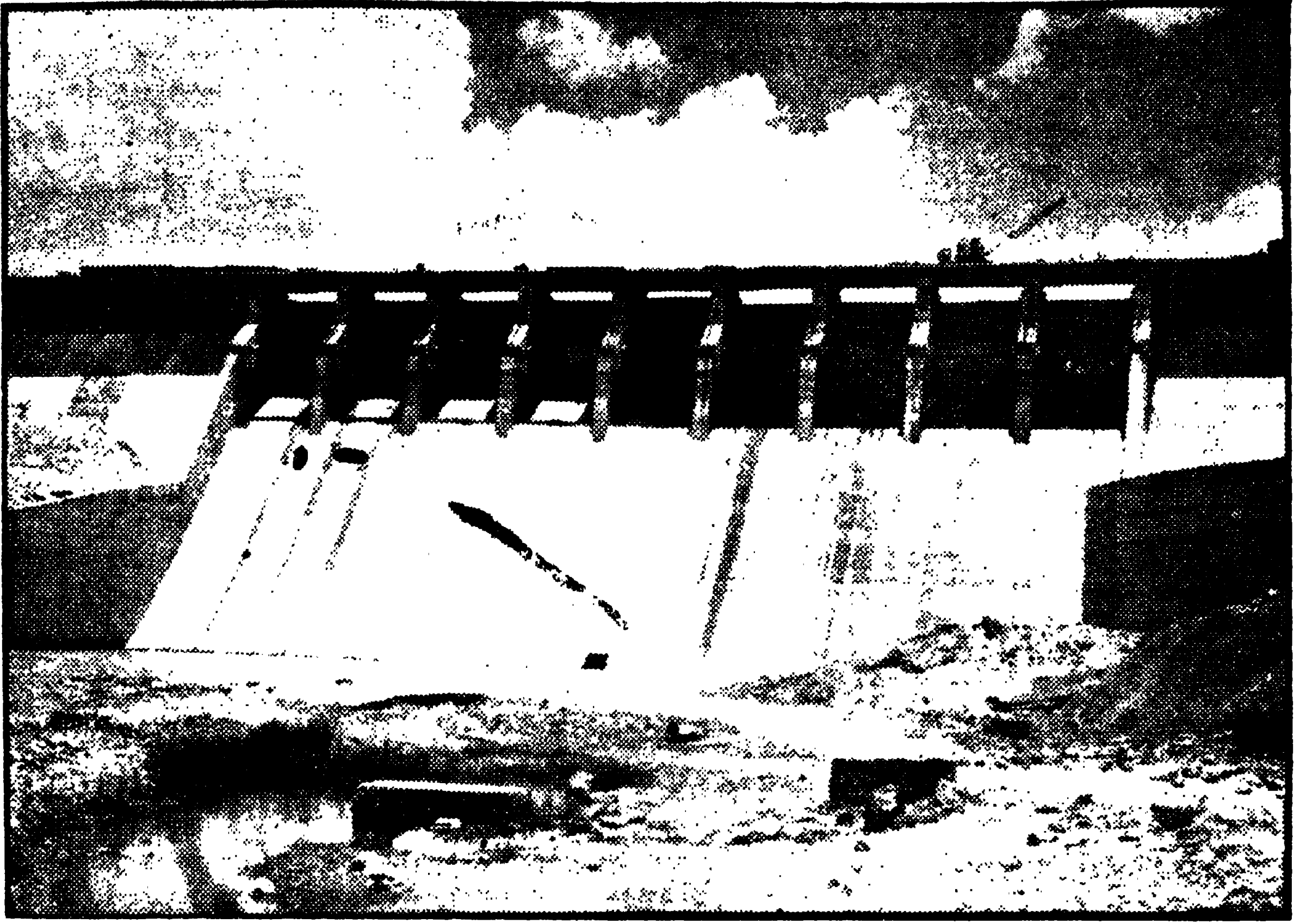
কোনার বাঁধ

দেশের উন্নতি কতটা এগিয়েছে। এখানে আমরা এই কয় বৎসরের জাতীয় আয় ও জনপ্রতি বাৎসরিক আয়ের হিসাব দিচ্ছি, তা থেকে জানতে পারা যাবে দেশে উন্নতি-মানের পরিমাপ কি।

উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতি বৎসরে গড়পড়তা শতকরা ৫ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি। এই হিসাবে প্রথম প্ল্যান থেকে তৃতীয় প্ল্যানের শেষ পর্যন্ত, এই ১৫ বৎসরে (১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৫-৬৬) দেশের

জাতীয় ও জনপ্রতি গড়পড়তা আয়—

(কোটি টাকার হিসাবে)

	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
কৃষি ও আনুষঙ্গিক উন্নতি	৫,০২০	৫,২৫০	৫,০১০	৫,৫৮০	-
খনি ও কারখানা-উৎপাদিত ছোট ছোট জিনিস—	১,৭৬০	১,৮৪০	১,৮৬০	১,৮৭০	-
বাণিজ্য, যানবাহন ও যাতায়াত	১,৯৭০	২,০৮০	২,১১০	২,২১০	-
অন্যান্য কাজকর্ম ও পেশাদারী কাজ	১,৭৩০	১,৮৩০	১,৯১০	২,০৩০	-
জাতীয় আয়	১০,৪৮০	১১,০০০	১০,৮৯০	১১,৬৯০	১১,৭৫০
জনপ্রতি গড়পড়তা আয়	২৭৩·৬	২৮৩·৫	২৭৭·১	২৯৩·৬	২৯১·৩

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্ল্যানিং কমিশন ১৯৬০ সালের জুন মাসে তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করেছে। তৃতীয় প্ল্যানের একটি

জাতীয় আয় বাড়বে শতকরা ৮০, কাজেই তৃতীয় পরিকল্পনা সার্থক হলে দেশের অবস্থা যে ভালই হবে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তৃতীয় প্ল্যান কার্যকরী করতে হলে মোট সরকারী খরচ হবে ৭,২৫০ কোটি টাকা। এর সঙ্গে বেসরকারী খরচ

(Private Sector) যোগ দিলে মোট টাকা হবে ১০,২০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্ল্যানের বিভিন্ন খাতে কিভাবে অর্থ ব্যয় হবে তার মোটামুটি হিসাব এই রকম—

	২য় প্ল্যান	৩য় প্ল্যান (কোটি টাকা)	২য় প্ল্যানের সমস্ত ব্যয়ের শতকরা খরচ	৩য় প্ল্যানের সমস্ত ব্যয়ের শতকরা খরচ
কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার খরচ	৩২০	৬২৫	৬·৯	৮·৬
সামাজিক উন্নতি ও সমবায়	২১০	৪০০	৪·৬	৫·৫
বৃহৎ ও মাঝারি জলসেচের খরচ	৪৫০	৬৫০	৯·৮	৯·০
বৈদ্যুতিক শক্তি	৪১০	৯২৫	৮·৯	১২·[illegible]
গ্রাম্য ও অন্যান্য ছোট শিল্প	১৮০	২৫০	৩·৯	৩·৪
ব্যবসা ও খনিজ দ্রব্য	৮৮০	১,৫৮০	১৯·[illegible]	২০·৭
যানবাহন ও যাতায়াত	১,২৯০	১,৪৫০	২৮·১	২০·০
সমাজসেবা	৮৬০	১,২৫০	১৮·৭	১৭·২
Inventories	-	২০০	-	২·৮
মোট	৪,৬০০	৭,২৫০	১০০·০	১০০·০

উন্নতির পথে

দুটি পরিকল্পনা ১০ বৎসর পূর্ণ করে তৃতীয় পরিকল্পনা ১১ বৎসরে পড়ছে। অতএব সমস্ত দেশের উন্নতির হিসাব-নিকাশ করতে হলে এই দশ বৎসরের কাজ ভালভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। এখানে সম্পূর্ণভাবে এর বিস্তৃত তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাই একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া যেতে পারে—

১। বৈজ্ঞানিক উন্নতি—দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৫টি বৈজ্ঞানিক ল্যাবোরেটারী স্থাপন; যেমন National Chemical Laboratory, Poona, National Physical Laboratory, New Delhi; Central Fuel Reseach Institute, Jealgora Bihar); Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta; National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur, Central Drug Research Institute Lucknow, Central Road Research Institute, New Delhi, ইত্যাদি।

২। আণবিক শক্তি গবেষণার জন্য বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী ট্রম্বে দ্বীপে বিরাট আণবিক গবেষণাগার ও কারখানা।

৩। স্বাস্থ্যের জন্য পিম্প্রিতে পেনিসিলিন উৎপাদনের কারখানা এবং দিল্লীতে এবং আলোয়াইতে ডি-ডি-টি কারখানা স্থাপন।

৪। জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন—এই দুইটি অত্যাবশ্যকীয় [illegible]পারে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। ১৯২৫ পর্যন্ত সর্বভারতে বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ ছিল ১,৬২,৩৪১ K W; ১৯৪৫ সনে বৃদ্ধি পেয়ে এই বৈদ্যুতিক শক্তি হয় ৯,০০,৪০২ K W; আর ১৯৬০ সনে আরও বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র ভারতের বৈদ্যুতিক শক্তি হয়েছে ৩৮,৭৩,১৬৬ K W।

বোখারো, নাঙ্গাল, তুঙ্গভদ্রা, হীরাকুদ, দামোদর ভ্যালি, চম্বল, দুর্গাপুর, কুণ্ডা, কোরবা, মাচকুণ্ড, কয়না, উমট্রু, ইত্যাদি প্রধান প্রধান বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কর্ম পরিকল্পনা।

৫। লোহ ও ইস্পাত উৎপাদন—দেশে প্রচুর পরিমাণে লোহখনি থাকায়
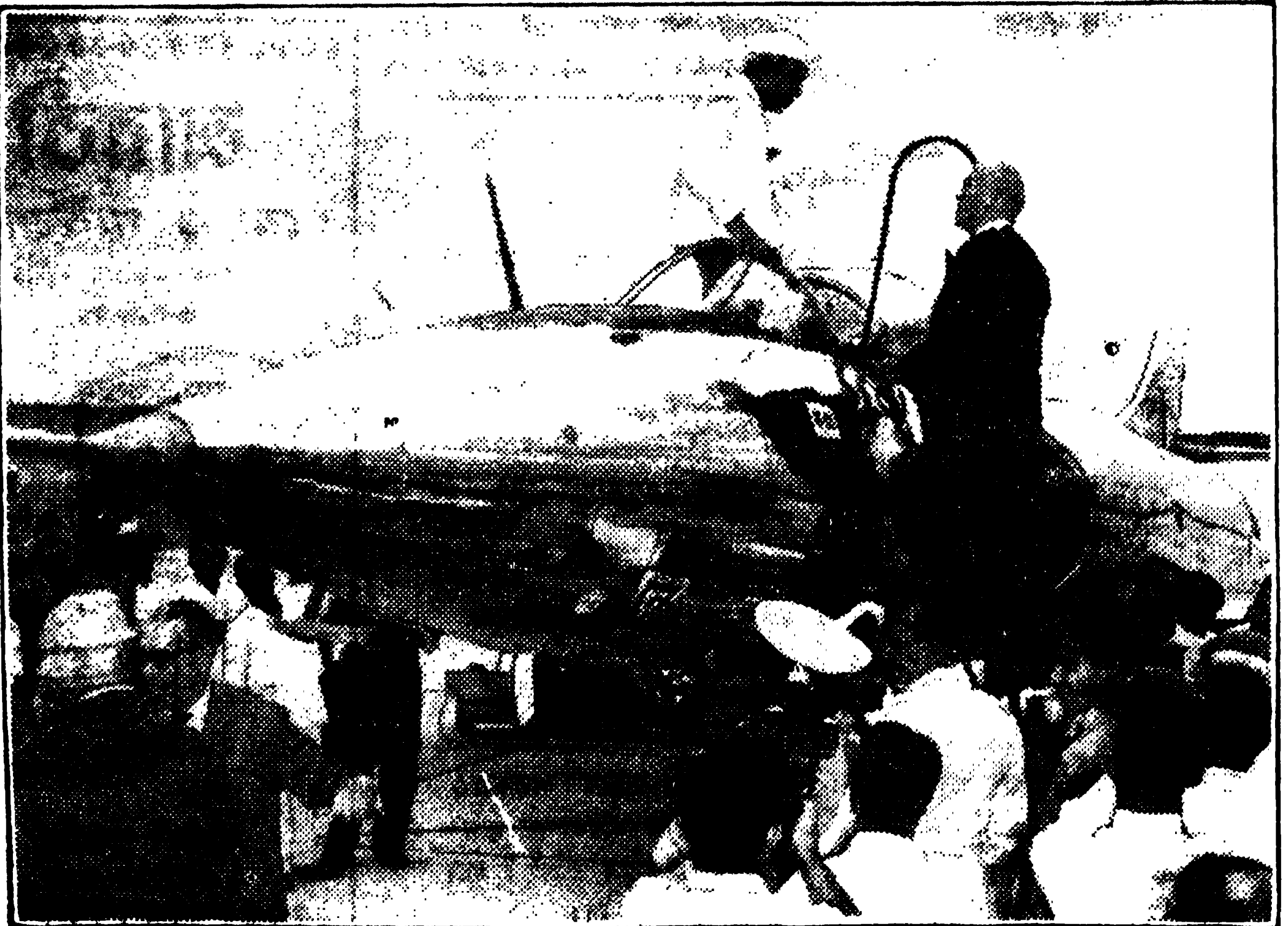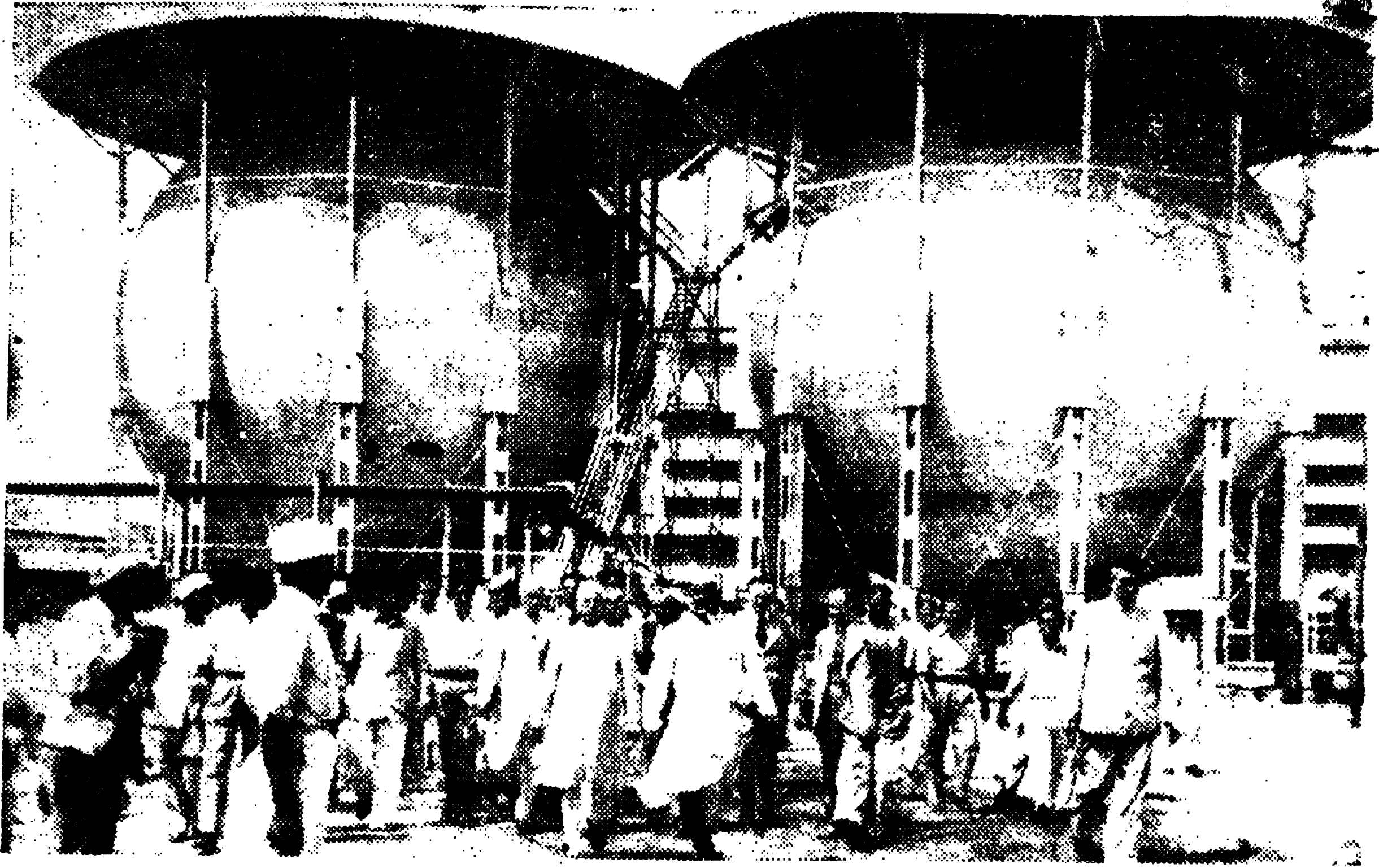
সিন্দ্রি সার উৎপাদন কারখানা

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি বিরাট লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই তিনটি বিরাট কারখানা স্থাপন হয়েছে—রুরকেলায় (উড়িষ্যা), ভিলাইতে (মধ্যপ্রদেশ) এবং দুর্গাপুরে (পশ্চিম বাংলা)। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই তিনটি কারখানা চালু হয়ে প্রচুর পরিমাণ ইস্পাত প্রস্তুত করছে।

৬। চিত্তরঞ্জনে রেলওয়ে এঞ্জিনের কারখানা—চিত্তরঞ্জনে রেলওয়ে এঞ্জিন উৎপাদনের জন্য বিরাট কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এখানে প্রতি বৎসর ১৬৮টি এঞ্জিন প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজের নিকটবর্তী পেরাম্বুরে গভর্ণমেন্টের বিরাট Integral Coach Factory স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৯-৬০ সনে এই কারখানা হতে ৪৪৮টি রেলগাড়ী প্রস্তুত হয়েছিল।

৭। জাহাজ তৈরী— বিশাখাপত্তনে এক বিরাট জাহাজ তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এর নাম Hindustan Shipyard। এখান হতে এ পর্যন্ত সমুদ্রগামী ২৪টি জাহাজ ও দুটি ছোট জাহাজ প্রস্তুত হয়েছে। কোচিনে আর একটি এই ধরণের কারখানা স্থাপিত হবে।

৮। বাঙ্গালোরে বিমান তৈরীর জন্যে Hindustan Aircraft নামে একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এই কারখানা ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য নানা রকম বিমান প্রস্তুত করে।

৯। বিহারে সিন্দ্রিতে সার প্রস্তুতের জন্য বিরাট কারখানা। এই কারখানায় বাৎসরিক ৩,৩০,০০০ টন এমোনিয়াম সালফেট সার প্রস্তুত হয়।

১০। ১৯৫৮ সনে Oil India (Private) Ltd. নামে গভর্ণমেণ্ট একটি কোম্পানী স্থাপন করেছেন। দেশে যেখানে যেখানে পেট্রোল পাবার সম্ভাবনা আছে, সেইসব স্থানে অনুসন্ধানাগার স্থাপন, মাটি খুঁড়ে তেল উত্তোলন করা—এইসব বিবিধ কাজ এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত।

১১। ১৯৫৮ সনে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক Indian Refineries (Private) Ltd. স্থাপন। বিদেশ হতে ময়লা তেল আমদানী করে পরিষ্কার করা এই কারখানার কাজ।

এছাড়া আরও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেছেন। যেমন টেলিফোন কারখানা, অশোক হোটেল, ভুপালে ভারী ইলেকট্রিক জিনিস প্রস্তুতের কারখানা, জয়পুরে লবণ প্রস্তুতের কারখানা, টেলিপ্রিন্টার তৈরীর কারখানা, মধ্যপ্রদেশে নিউজপ্রিন্ট প্রস্তুতের কারখানা। এই ধরণের বহু কারখানা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলস্বরূপ দেশে স্থাপিত হয়েছে।

অবশ্য এটা সকলেই স্বীকার করেন, অন্যান্য নানা বিষয়ে, যেমন Standard of living, জাতীয় আয়, জনপ্রতি লোকের বাৎসরিক আয় ইত্যাদি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যা বিস্তৃতির দাবী করেন, তা প্রকৃতপক্ষে সর্বস্থানে স্বীকার্য নয়। দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় অনেক দাবীই একটু সন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ ও ভারতাত্মার স্বপ্ন

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির অপূর্ব ভাষায় একদিন আমরা শুনেছি—

আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—
যার লাগি নর-দেব চিররাত্রিদিন
তপোমগ্ন; যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত মহাবীর সবে
গিয়েছেন সংকটযাত্রায়; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়; সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান—আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কবিগুরুর এই নমস্কার ভারতের সত্যসাধনাকে যেন মূর্ত করে ধরে তুলেছে। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে যে কথা তিনি বলেছিলেন, প্রায় ঠিক সেই কথাই তিনি গান্ধীজীকে বলেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের সময়—মানবসত্তার অনন্ত বিকাশ সর্ব মানবের মিলনের মধ্যে। তাব ভবিষ্যৎ নারায়ণে, নারায়ণী সেনায় নয়। স্বরাজ স্বাধীনতা আমাদের সত্যকার লক্ষ্য নয়—আমাদের [illegible] আসল মানুষের জন্য—নিজের চারপাশে নিজের হাতে যে শৃঙ্খল সে গেঁথেছে তা থেকে তাকে মুক্তি পেতে হবে—প্রজাপতিকে বলতে হবে গুটির ভিতর না ঢুকে আকাশের উদার আতিথ্যকে গ্রহণ করো।

যুগযুগান্ত ধরে এই বিরাট বিশাল দেশের পথে ঘাটে বনে প্রান্তরে, কন্যাকুমারী থেকে বদরিকায়, পরশুরাম ক্ষেত্র থেকে দ্বারকায়, তার উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে, তার তরঙ্গমুখর সমুদ্রতটে বসে আছেন জ্ঞানীগুণীধ্যানীর দল, চলেছেন ভক্তেরা কর্মীরা। এই সেদিনও আমরা পেয়েছি রামমোহন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে, গান্ধীজীর মত যুগন্ধর কর্মীকে, রবীন্দ্রনাথের মত অলোকসামান্য কবিকে, শ্রীঅরবিন্দের মত যোগক্ষেম মহাতাপসকে।

১৫ই আগষ্ট এই কথাটাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দিনটি আমাদের দেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় যোজনা করেছে, এই দিনটি আবার মহাসাধক শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য আবির্ভাবের দিনও বটে। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই দিনটি। অনেক নিরাশাকেও সে বহন করে এনেছে এক সার্থকতার তীরে। আজ আমরা কল্পনা করছি আরো মহত্তর সম্ভাবনায়, বৃহত্তর সৃষ্টির, উন্নততর জীবনমানের। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে মানুষ যে শুধু খেয়ে পরে বাঁচবে তা নয়, তার জীবনে আসবে বৈচিত্র্য, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, আশা, যা প্রকাশ পাবে প্রেরণায়, কাজে, ভাবে, চিন্তায়, উপলব্ধিতে—ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। মানুষের হাতে বিজ্ঞানের শক্তি হবে কল্যাণের যন্ত্র—সে মহালক্ষ্মীর পাদপীঠে যেন সকলেরই স্থান হয়, অন্ন বহু হয়।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যে-সব মনীষীরা এই স্বপ্ন দেখতেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন প্রধান হোতাদের একজন। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ বলে মায়ের নামে মায়ের মন্দির গড়বেন মায়ের ভক্তরা, সন্তানের দল। তার নাম হবে 'ভবানী মন্দির'। এমন একটি পরিকল্পনার লিপি হাতে হাতে ঘুরতো তখন কর্মীদের। আহ্বান জানাচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সহযোগীরা। তাঁরা পেয়েছেন আদেশ। ভগবান রামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—মন্দির গড়ো। সাধারণ লোকে জানে শ্রীঅরবিন্দ একজন মহাযোগী, মহাতাপস, মহাসাধক। তাঁর পণ্ডিচেরী আশ্রমের নামের সঙ্গেও সকলেই সুপরিচিত। তাঁর আর একটি পরিচয়ও সকলে সশ্রদ্ধ স্মরণ করে যে, তিনি এককালে উগ্র রকমের স্বাদেশিক বিপ্লবপন্থী ছিলেন 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি'। এই কবি-মনীষী দিকপাল তীর্থংকর মহানের সামগ্রিক ছবি যে

পরিপূর্ণ মহাজীবনের, মহাশরণের আভাস দেয়, তার কথা বলতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা না হোক, অনধিকার। রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ অধিকারীরাই সে কথা বলতে পারেন। "প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে—ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালাবেন......শৃন্বন্তু বিশ্বে।"

শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু ছিলেন একশো বছর আগের প্রগতিপরায়ণ বাঙালী সমাজের একজন সুযোগ্য নেতা। সে এক অপূর্ব সমীকরণের যুগ—একদিকে ধাক্কা দিচ্ছে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, তার রাষ্ট্রবোধ, তার চিন্তা, তার মনন, তার জীবনযাত্রার পদ্ধতি আর একদিকে ভারতের পুরাতন ঐতিহ্য, সমাজবিন্যাসের রীতি-নীতি। মননের ইতিহাসে ঘটছে ঋতু পরিবর্তন। এই যুগেরই একটি মানুষ ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ—রাজনারায়ণের জামাতা। তাঁরই তৃতীয় পুত্র শ্রীঅরবিন্দ বা 'অরো' যাঁর জন্য আই-সি-এসএর মহামহিমান্বিত সৌভাগ্য কল্পনা করেছিলেন তাঁর পিতা। ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ১৫ই আগষ্ট এই পুণ্য আবির্ভাবের শুভ লগ্ন। সাত বছর বয়সেই তাঁকে বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল—ম্যাঞ্চেষ্টার গ্রামার স্কুল থেকে লণ্ডনের সেণ্টপলস্, সেণ্টপলস্ থেকে কেমব্রিজের কিংস কলেজ, তারপর আই-সি-এস পরীক্ষা। পরীক্ষা পাশ হলেন, চাকরী পেলেন, কিন্তু নকল ঘোড়সোওয়ার হওয়া হলো না—ঐ পরীক্ষা তিনি দিলেন না বা দিতে চাইলেন না। সে নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক ভুল বোঝাপড়া হয়েছে। অর্থাভাব, পিতার অমনোযোগ প্রভৃতি এসব কারণ ত ছিলই, সব চেয়ে যেটা ফুটেছে সেটা হচ্ছে তাঁর মর্মগত অনিচ্ছা। ১৮৯৩ সালে চোদ্দ বছর পরে তিনি ভারতে ফিরলেন। এখানকার মাটিতে পা দিয়েই তাঁর মনে যে অদ্ভুত ভাবান্তর হয় এবং তিনি যে এক ভূমাময়ীর স্বপ্ন দেখেন সে কথা তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি। বরোদাবাসের চোদ্দ বছর তিনি একান্তভাবে বাণীর সাধনা করেছেন—বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ শুধু নয় ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন সব ভাষারই পুস্তক তিনি পড়ছেন। শ্রদ্ধেয় দীনেন্দ্র রায়ের বইএ দেখি যে, প্যাকিং কেস ভর্তি হয়ে তাঁর জন্য বই আসতো। তিনি লিখে চলেছেন কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, অন্তরের ধ্যানের নির্দেশে। ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতায় এলেন—এতো আগমন নয়—এ হলো আবির্ভাব। সারাদেশ বেয়ে তখন এক ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে বাংলাদেশকে খণ্ডিত করার প্রশ্ন নিয়ে। বাংলার মাটি, বাংলার জল ধন্য হোক্ পুণ্য হোক, কবি সেই গান গাইছেন, রাজনীতিকরা জোর গলায় মিটিং করছেন, বয়কট্ করছেন—চতুর্দিকে এক নূতন উন্মাদনা, এক জনজাগরণ—পূর্বে বিশাল বরিশালে কুলিশবাহী পুলিশ প্রভুদের অত্যাচারে বাংলার মন সন্ত্রস্ত। এমনি শুভমুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যাবর্তন। মোটে চার বছর তিনি কলকাতায় ছিলেন—সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম, যুগান্তর, কর্মযোগিন্ নিয়ে। রাজনীতি বিপ্লবনীতি করছেন কিন্তু আত্মসমাহিত। দেশের জন্য অদ্ভুত মমত্ববোধ আবার নিরাসক্তও। এই সময়েই তিনি তাঁর স্ত্রীকে কয়েকটি পত্র লেখেন। তার মধ্য দিয়ে তখনকার দিনের শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্ট হয়েছেন অপূর্বভাবে—আমার তিনটে পাগলামী আছে—প্রথম পাগলামি এই—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে জ্ঞান, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়েছেন সে সবই ভগবানের। যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকী রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। ......কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া সত্যি সত্যি যাহা দরকার তাহা কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা...... তুমি মত দিলেই......

দ্বিতীয় পাগলামীর কথা বলতে গিয়ে স্ত্রীকে লিখলেন—ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হইবে... এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই—যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

তৃতীয় পাগলামীর কথা লিখতে গিয়ে তিনি দেশমাতৃকাকে চিন্ময়ী মা রূপে যে দেখতেন তারই আভাস দিলেন —লোকে স্বদেশকে জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-

পত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?
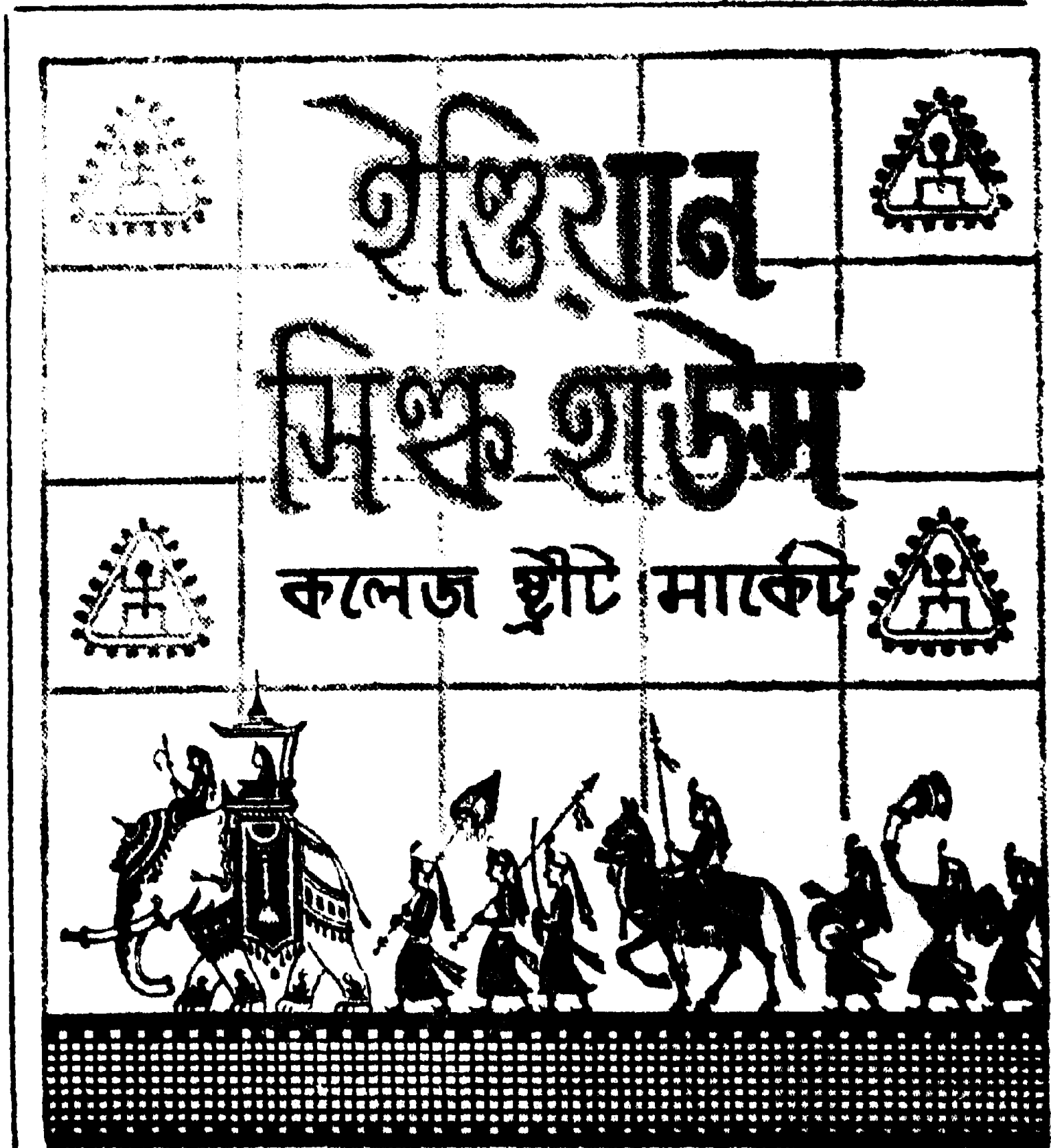
তিনি যখন পণ্ডিচেরীতে চলে যান তাঁর উত্তরপাড়া বক্তৃতা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়েছিলো। সেই সময় অনেকে বলেছিলো তিনি যে শুধু রাজরোষ থেকে পলায়ন করলেন তা নয়, তিনি escapist-যোগের ধোঁয়ার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। অবশ্য অনেকে বিশ্বাস করতো যে যোগবলে বলীয়ান হয়ে তিনি দেশকে উদ্ধার করবেন। মনে পড়ছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা—Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, the agitation ceases, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. His words will be echoed and reechoed....". এই স্বদেশাত্মার মূর্ত প্রতীককেই রবীন্দ্রনাথ সেদিন নমস্কার জানিয়েছিলেন বন্ধনহীন লোভহীন অবন্ধনকে। বিশ বছর পরে এই মহামানবকেই, দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগল্ভ স্তব্ধতায় সমাসীন মৌনকেই, আবার নমস্কার জানিয়ে এলেন—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। স্বদেশী যুগে ব্রহ্মবান্ধব তাঁকে নাম দিয়েছিলেন—মানস সরোবরের অরবিন্দ।

এর পরের যুগ আত্মসমাহিতির যুগ। সেদিন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য জন্মদিনে যখন স্বাধীনতা এলো সেদিন তিনি বললেন—আজ এক অধ্যায়ের শেষ, আর এক অধ্যায়ের শুরু। নতুন রাষ্ট্র যে গঠিত হল—তার আছে অপরিসীম সম্ভাবনা (untold potentialities) যা সমগ্র মানব জাতিকে রাষ্ট্রিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করবে। তিনি আরও বললেন যে আমার জন্মদিনে যে এই শুভলগ্নটি এল, আমার কাছে তার অর্থ হচ্ছে যে ভাগবতী শক্তি আমার কাজের সমর্থন করেছেন—ভারতবর্ষের কাজ হবে "to live also for God and the World as a helper and leader of the whole human race". ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। মনে পড়ছে তাঁর কথা—

সিংহাসনে সমাসীন নৃপতি থেকে ওই যে কুলি কাজ করছে, সন্ধ্যা-বন্দনায় ঊর্ধ্বনেত্র ব্রাহ্মণ হতে ওই যে অস্পৃশ্য পঞ্চম দূরে পালাচ্ছে সবই ভগবান।

এস, মায়ের ডাক শোন—আহ্বান এসেছে। তিনি ত বসে আছেন আমাদের হৃদকমলে—পূজার জন্য, দেবার জন্য, পরিস্ফুট হবার জন্য। সেই ভাগবতী শক্তি যে তমসাচ্ছন্ন, তাই তো তার কাজ হচ্ছে না—সন্তানরা যে ডাকছে না, সাহায্য চাইছে না। তুমি যদি শুনে থাক তাঁর ডাক, তোমার বুকে যদি গুমরে উঠে থাকে তাঁর পদধ্বনি, তবে ছিঁড়ে ফেলে দাও তোমার কালো পর্দা, ভেঙে ফেল আলস্যের, অহমিকার অচলায়তন—ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর—মাতৃপূজার অঙ্গনে এস সবাই—যে যা পার তাই নিয়ে এস—যেটুকু সাধ্য পূজা কর তাঁর—দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, অর্থ দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, প্রার্থনা দিয়ে—ফিরে যেয়ো না—বরপুত্র সঙ্ঘ বিরাজ হে—

সেদিন এই ছিলো শ্রীঅরবিন্দের আহ্বান। আজ সেই জিনিসই রূপান্তরিত হয়ে বিশ্বমানবকে ডাকছে অমৃতের অধিকারী হতে। সেই বন্দনার মন্ত্রই সত্য হোক—। এই তপস্যায় কোন বিরোধ নেই, বিবাদ নেই, সঙ্ঘ-সম্প্রদায় নেই। এই সাধনা যেন আমাদের কর্মবিমুখ না করে, তামসিকতায় লিপ্ত না করে, রাজসিকতায় মত্ত না করে, সাত্ত্বিকতায় অহংকৃত না করে। ভারতাত্মার সেই চিরন্তনী প্রকৃতিকে যেন আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, বিচার করে গ্রহণ করতে পারি, প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে পারি, প্রেম দিয়ে সেবা করতে পারি, নতুন করে প্রকাশ করতে পারি বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটরীতেই হোক, তপস্বীর আশ্রমেই হোক, সংসারীর অঙ্গনেই হোক—সমস্ত তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা দীনতা নীচতার ঊর্ধ্বে উঠে, মানুষের বুদ্ধির রুচির অভ্যাসের অনেকোর স্তর পেরিয়ে স্বার্থ-ক্ষুধান্ধ না হয়ে। তাই আজ রৌদ্ররাগিনীর দীক্ষা নিয়ে যেমন

বেদমন্ত্রে হে বজ্রী তোমার করি স্তব

তেমনি

Inscribe the long romance of Thee and Me

কেননা

অর্ঘ তোমার আনিনি ভরিয়া
বাহির হতে
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের
আপন স্রোতে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য

মনীন্দ্র রায়

একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গৃহীত যে, ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষ ঘটেছিল বাংলা দেশে। কিন্তু ব্যাপারটা আকস্মিক নয়। অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী প্রতিভা মহাকবি মধুসূদন ও জাতীয়তা-মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও গ্রন্থাবলী আলোচনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। দে[illegible] যায়, ইংরেজ তার জাহাজ বোঝাই করে [illegible] গোলাবারুদ আর বাণিজ্যসম্ভারই আনেনি, সেই সঙ্গে এনেছিল বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের অমর গ্রন্থাবলী। তাই একথা আজ নিশ্চিতই বলা যায় যে, একহাতে ইংরেজ পরপীড়নের অস্ত্র প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য হাতে নিজের অজ্ঞাতে সে তুলে দিয়েছিল নিজেরই মরণাস্ত্র।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুধু কি তাই? কেবল আধুনিক চিন্তাধারার বাহন ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেই ক্ষান্ত হয়নি ইংরেজ। তাদের মিশনারীগণ দিলেন বাংলা ভাষার প্রথম ছাপাখানা, প্রথম ব্যাকরণ এবং প্রথম সংবাদপত্র (সমাচার দর্পণ, মে, ১৮১৮ সাল)। যদিও এগুলির লক্ষ্য ছিল এদেশে খৃষ্টধর্মের প্রচার, তবু বাংলার মাটিতে জাতীয়তাবোধের মহীরুহ অঙ্কুরিত হওয়ার আগে আধুনিক চিন্তাধারার ভাবপ্লাবন তাকে গ্রাস করে রেখেছিল। আর সে প্লাবনের স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়েছিল প্রধানত সাহিত্যের ভিতর দিয়ে।

বাংলা দেশে এই যে আধুনিক জগতের চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ, তার কারণ হল ইংরেজ-রাজত্ব। ইংরেজরা বাংলা অঞ্চলেই প্রথমে তাদের শাসন-বিস্তার করেছিল। সে শাসনে অত্যাচার ছিল যথেষ্টই, কিন্তু নতুন গড়া এই উপ-নিবেশটিকে রক্ষা করার জন্যেই ইংরেজকে তখন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন করতে হয়েছিল। এবং তারই ফলে নতুন এক অস্তিত্বের দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে গেল সেদিনের নবশিক্ষিত বাঙালীদের চোখের সামনে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেকালের নবযুবকের দল যে কী আগ্রহে সেই নতুন জগতের প্রাণদায়িনী শক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন তা নবযুগের আরবোপন্যাসের দৈত্যের মতো এই মহা-শক্তিধর অস্ত্রগুলি কেবল ঈপ্সিত কর্তব্য শেষ করেই পাত্রের মধ্যে ফিরে যেতে পারেনি, বাঙালীর ঘরে ঘরে এনে দিয়েছে [illegible] আত্মপ্রকাশের [illegible] আকাঙ্ক্ষা।

আসলে এই জেগে ওঠার প্রেরণাই হল গোড়ার কথা। একটা জাতি যখন চোখ মেলে তাকিয়ে নিজের অস্তিত্বের বিষয়ে সচেতন হয়, তখনই তার মানসের মধ্যে জাগে ভাব-প্রকাশের তড়িৎপ্রবাহ। আর তখনই শুরু হয় সাহিত্যের কাজ।

রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার পর একথা আজ সকলেরই জানা যে সাহিত্য শব্দটির গোড়ায় রয়েছে 'সহিত', অর্থাৎ সকলের সঙ্গে এক হওয়ার বাসনা। সাহিত্যের ধর্মই হল সকলের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা, সকলের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টা। সেই অন্বেষণের তাগিদেই বাংলা দেশে জেগে উঠেছে আধুনিক সাহিত্যের প্রথম স্ফুরণ। আবার অন্য দিকে, সাহিত্য তার ঐক্যবন্ধনে কিছু দূর অগ্রসর হতেই ঐ একই অন্বেষণের প্রেরণায় দেখা দিয়েছে জাতীয় চেতনার প্রাণস্পন্দন।

মধুসূদন দত্ত

বাংলা সাহিত্য আর বাঙালীর জাতীয় আন্দোলন তাই আজন্ম সহচরী এবং পরস্পরের পরিপূরক। কখনো সাহিত্য দিয়েছে জাতীয় আন্দোলনে প্রেরণা, আবার কখনো-বা জাতীয় আন্দোলন এনে দিয়েছে সাহিত্যের মধ্যে নবীন প্রাণশক্তির প্লাবন। একটি ছাড়া অন্যটি হত অসম্পূর্ণ এবং শক্তিহীন।

॥ ২ ॥

বলা বাহুল্য বাংলা সাহিত্য আর আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা বর্তমান নিবন্ধের আয়তনে অসম্ভব ব্যাপার। একাধিক গ্রন্থের মধ্যেও তার

জাতীয় প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন আলোচনা সম্ভব কিনা সন্দেহ। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সুখী ভবিষ্যতের সম্মুখীন হ'য়ে আজ এই অবহেলিত বাংলা দেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এবং তার ততোধিক অবহেলিত সাহিত্যের বিষয়ে কিছু না বলা সজ্ঞানে সত্য গোপনের মতোই অপরাধজনক। সেই অন্যায় থেকে কিছুটা মুক্ত হওয়ার জন্যেই সংক্ষেপে একটা আলোচনার সূত্রপাত করা হল এখানে।

রাজা রামমোহনের (১৭৭৪—১৮৩৩) কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনিই আমাদের আধুনিক গদ্যের স্রষ্টা। অবশ্য সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; সমাজ সংস্কারই ছিল তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের বিষয়। কিন্তু সেই পথে অগ্রসর হতে গিয়ে বাংলা ভাষার মারফত প্রচারকার্যই হল তাঁর প্রধান সহায়। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাতে আমাদের ভারতীয় জীবনযাত্রার ভিতরে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছিল, রামমোহন তাকে সমন্বয়ের পথে চালিত করতে চেয়েছিলেন। তাই একদিকে যেমন তিনি শুরু করলেন সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন, স্ত্রীজাতির অধিকার সমর্থনে আন্দোলন, অন্যদিকে তেমনি তিনি একেশ্বরবাদের প্রচার কামনায় প্রকাশ করলেন 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই দুখানি রচনাই সাধারণ পাঠকের জন্যে রচিত প্রথম বাংলা বই। এবং এতে একই সঙ্গে বাঙালীর মনের [illegible] এনে দেওয়া হল যুক্তিবাদের প্রতি আগ্রহ, জাতিগত অতীত ঐতিহ্যের বিষয় শ্রদ্ধা এবং মাতৃভাষার অপরিসীম ক্ষমতার উপর বিশ্বাস।

রামমোহনের পর বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১)। রামমোহনের হাতে তৈরী নতুন বাংলা গদ্যে তিনিই আনলেন সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন। অবশ্য বিদ্যাসাগরও ঠিক সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। কিন্তু দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে, বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বাল্যবিবাহ নিবারণ ইত্যাদি আন্দোলনের প্রচারকার্যের জন্যে বাংলা গদ্যকে তিনি নতুন করে ঢেলে সাজালেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দোস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।" আর শুধুই কি তাই, বিদ্যাসাগরের মতো
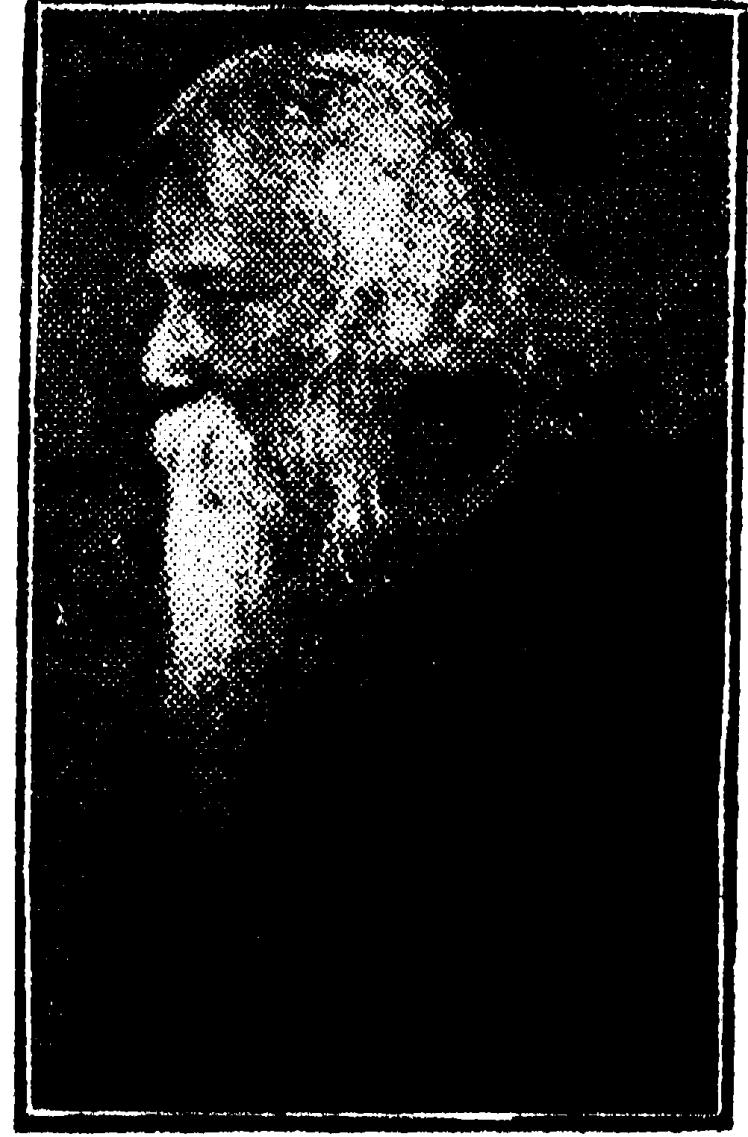
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বভাবে ও চরিত্রবলে এমন খোল আনা ইউরোপীয় এবং সেই সঙ্গে স্বজাত্যবোধে ও আচার-আচরণে এমন নিরঙ্কুশ বাঙালী আর কেউ হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর হাতে বাংলা ভাষাও তাই জাতীয়তা-বোধের উন্মেষেরই প্রকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়েছে আজীবন।

বিদ্যাসাগরের সুসংস্কৃত গদ্য প্রকৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—৯৪)। একাধারে তিনি বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ এবং জাতীয়তা মন্ত্রের ঋষি। তাঁর বিষয়ে বাঙালী পাঠকের কাছে তো বটেই, ভারতীয় পাঠকের কাছেও নতুন করে বলা নিরর্থক। শুধু তাঁর 'আনন্দমঠ' বা 'বন্দেমাতরম' গান নয়, তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনই আমাদের পরম গৌরবের বিষয়। তাঁর সাহিত্যকৃতি এবং তৎ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনের' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তে অনুভব করিলাম।...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।" বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে এর চেয়ে ভালো করে বলা অসম্ভব। শুধু এই সঙ্গে যদি মনে রাখা যায়, সাহিত্যকর্মকে তিনি কী দৃষ্টিতে দেখতেন

তাহলেই বোঝা যাবে, দেশের মঙ্গল চিন্তা তাঁর কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। তিনি 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'-এ লিখেছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।...যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য।"...বলাই বাহুল্য এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, অত্যন্ত সচেতন ভাবে 'দেশের' ও 'মনুষ্যজাতির মঙ্গল-সাধনাই' ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মূলমন্ত্র। এবং সে সাধনায় তিনি কী বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাও আমরা সকলেই জানি।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয়তার উন্মেষ ঘটেছিল বঙ্কিমচন্দ্রেরই ঋষি-কল্প ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রসাদেই কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং বাংলা দেশের জাতীয়-মানসের উদ্বোধনে সমধিক উল্লেখযোগ্য হ'য়ে থাকবে মহাকবি মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩) এবং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০—৭৩) নাম। আজন্ম বিপ্লবী শ্রীমধুসূদন একদিকে যেমন বাংলা ছন্দকে পয়ারের শিকল খুলে মুক্তি দিলেন 'অমিত্রাক্ষরে'র প্রবাহমানতায়, অন্যদিকে তেমনি রামায়ণের প্রাচীন কাঠামো উল্টে দিয়ে রাবণ ও ইন্দ্রজিতের চরিত্রের মধ্যে ঘোষণা করলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পুরুষাকারের নতুন বাণী। আর নাট্যকার দীনবন্ধু যে প্রকৃতই 'দীনবন্ধু' ছিলেন তা তাঁর 'সধবার একাদশী' এবং বিশেষ করে 'নীলদর্পণ' নাটক রচনার উৎসাহ থেকেই স্বতঃপ্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য। সেটা হল, মধুসূদনের হাতে 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজি অনুবাদ, এবং পাদ্রী লঙের নামে সে অনুবাদ মুদ্রিত হওয়া, আর এই রাজদ্রোহকর নাটকের প্রকাশক হিসাবে আদালতের বিচারে লঙ সাহেবের নামে জরিমানা ধার্য হলে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রণেতা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক তৎক্ষণাৎ জরিমানার টাকা জমা দিয়ে দেওয়া। এ সব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বাঙালী সাহিত্যিকেরা সেদিন দেশের জন্যে কতোদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। নাটকের দিক থেকে দীনবন্ধুর এই ঐতিহ্য পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪—১৯১১) যে কী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন, এ-কথাও আমরা সকলেই জানি।

॥ ৩ ॥

যাই হোক, এইভাবে বাংলা সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দী পার হ'তে না হ'তেই বাংলার সাহিত্যাকাশে দেখা দিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১)। আজ তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীর বৎসরে ভারতাত্মার বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে যা কিছু বলা হবে তাই হবে পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের বহুপূর্বে, মধুসূদনেরও আগে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২—১৮৫৮) এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭—৮৭) দেশাত্মবোধক কবিতায় বাংলার জাতীয়-মানসে যে প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল, এবং মধুসূদন ও তাঁর পরবর্তী কবিদ্বয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) এবং নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭—১৯০৯) কাব্য প্রচেষ্টায় যে-আগ্রহ তীব্রতর হ'য়ে উঠেছিল তার পরম চরিতার্থতা ঘটেছে রবীন্দ্রনাথেরই সাধনায়।

তের বৎসর বয়সে লিখিত 'হিন্দু মেলায় উপহার' (বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত) কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভিতর যে স্বাজাত্যবোধক প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অম্লান ছিল। ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সময় 'রাখিবন্ধন' উৎসবে যোগদান ও বহু স্বদেশী গান রচনা, নোবেল পুরস্কার লাভ করে (১৯১৩) বাংলা সাহিত্য এবং ভারত-

র্ষকে বিশ্বসভায় সম্মানিত করা, জালি-ওয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি প্রত্যর্পণ (১৯১৯) থেকে শুরু করে শেষবয়সে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত বাংলার রাজবন্দীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার দাবীতে আহূত ময়দানের জনসভায় সভাপতিত্ব করা প্রভৃতি রবীন্দ্র-জীবনের এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে। দেখা যায়, এক দিকে কাব্য-সাহিত্যের দ্বারা তিনি তাঁর স্বজাতির মনে অপরিসীম জীবনতৃষ্ণা জাগ্রত করেছেন, আবার অন্য দিকে প্রত্যক্ষ কর্মজগতের আহ্বান এলে অত্যাচারিত স্বদেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়াতেও তিনি দ্বিধা করেননি। তাঁর সর্বত্রগামী প্রতিভা কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, শিক্ষা ও গ্রাম-সংগঠনের দিকেও নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করে গেছে। তাই মহাত্মা গান্ধী যখন রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করেছেন তখন তার মধ্যে কেবল 'কবি'র প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়নি, আনুগত্য জ্ঞাপন করা হ'য়েছে এমন এক ব্যক্তিত্বের কাছে, যিনি মানবতায়, স্বজাত্যবোধে এবং অন্তরের সুগভীর প্রজ্ঞায় বর্তমান জগতে অতুলনীয়—একমাত্র প্রাচীনকালের সত্যদ্রষ্টা সৌম্যদর্শন ঋষির সঙ্গেই যিনি তুলনীয়।

কাজেই জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবদান কতখানি, এর পরিমাপ করতে যাওয়া অসাধ্যসাধনের সামিল। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, রবীন্দ্রনাথ না জন্ম গ্রহণ করলে আমাদের জাতীয়চেতনা কিছুতেই এত দ্রুত এবং গভীরভাবে আন্দোলিত হত না, ভারতের মর্মবাণী ব্যাপ্তি লাভ করত না সারা পৃথিবীতে। আজ স্বাধীন ভারতের অধিবাসী হ'য়ে বিশ্বসভায় যে সম্মান ও প্রীতির অধিকারী আমরা হ'য়েছি, সেটা অনেকাংশেই রবীন্দ্রনাথের অবদান তা যেন আমরা কখনো বিস্মৃত না হই।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসে দেখি, বাঙালী সাহিত্যিকগণ রবীন্দ্রনাথের পর থেমে থাকেননি, বরং উত্তরোত্তর আরো এগিয়ে গেছেন স্বাজাত্যবোধের উন্মেষের দিকে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮) এবং কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯—) নাম বাংলার সাহিত্যাকাশে এক-একটি ভাস্বর জ্যোতিষ্কের মতো দীপ্যমান হ'য়ে আছে। কেউ কি ভুলতে পারবে 'মেবার পতনের' মন্ত্রণা, 'পথের দাবির' দুর্জয় অভিযান, বা বিদ্রোহী কবির অপ্রতিরোধ্য আহ্বান—

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু
দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে,
যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

... ...

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা,
দিবে কোন বলিদান?

আমরা বাঙালী, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, এজন্যে আমরা গর্বিত। সুগভীর দেশপ্রেমের যে ঐতিহ্য আমরা বহন করে এসেছি, সে বিষয়ে যেন সচেতন থাকি, আজকের দিনে এই হবে আমাদের ঐকান্তিক সঙ্কল্প।
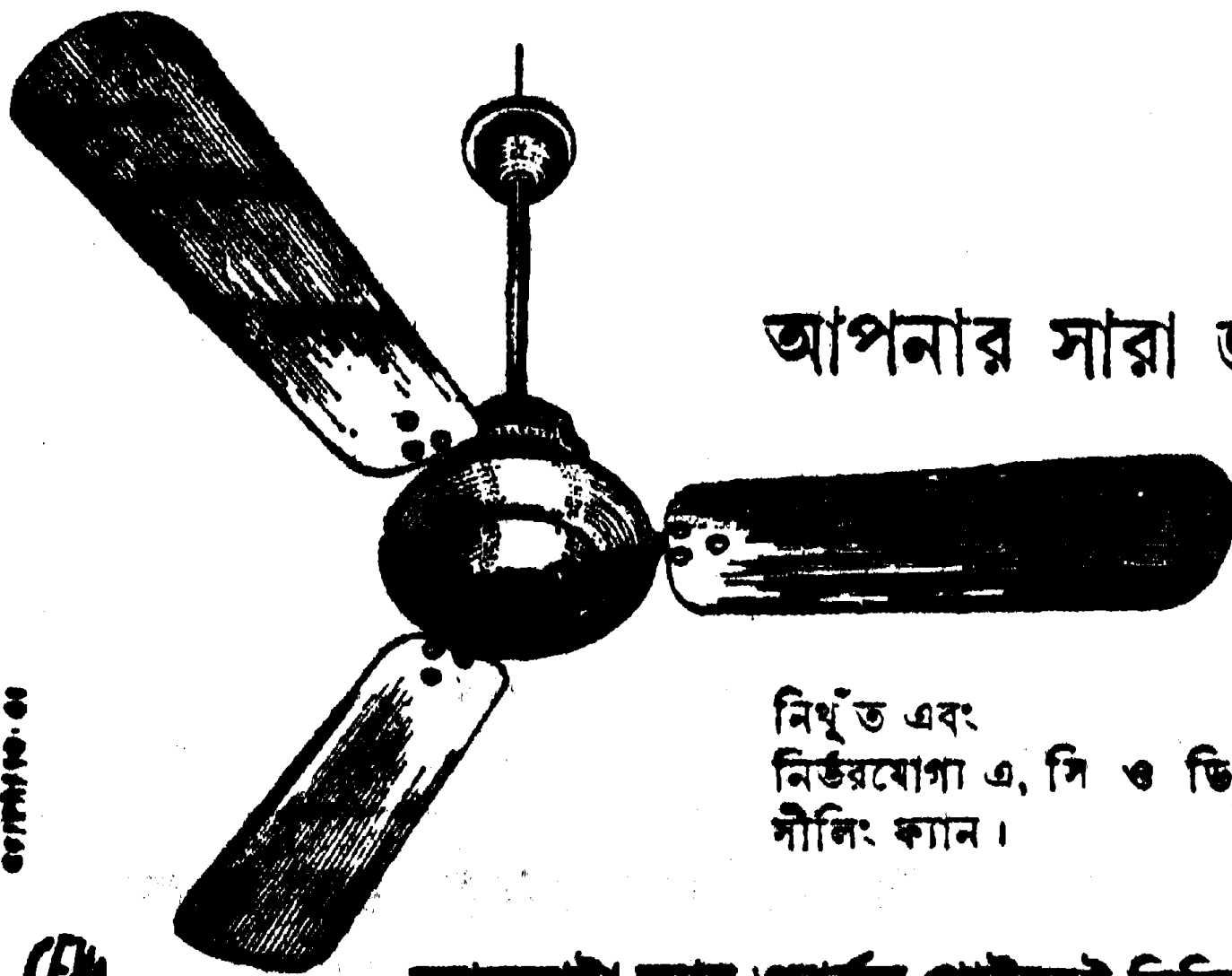
স্বদেশী আন্দোলনে রঙ্গালয়ের ভূমিকা

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

মুখমণ্ডল যেমন মানুষের হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ, তেমনই কোনো জাতির রঙ্গমঞ্চ সেই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত করে। আমাদের বাঙলাদেশেও এর অন্যথা হয়নি। তাই জাতির মনে যেদিন থেকে ইংরেজ শাসনের কঠিন নাগপাশ হ'তে মুক্তি পাবার জন্যে চেতনার সঞ্চার হয়, সেই দিন থেকেই তা মূর্ত হয়ে ওঠে আমাদের রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ

পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ক্লাইভের চক্রান্তে যেদিন ইংরেজ কবলিত হয়, সেদিন ভারতবাসী তথা বাঙালীর অন্তরাত্মাকে প্রতিফলিত করবার জন্যে জব চার্ণক প্রতিষ্ঠিত শহর কলকাতায় বাঙালীর কোনো রঙ্গালয় ছিল না। শিক্ষা-বিকিরণের সঙ্গে আনন্দ পরিবেশনের ভার তখন ছিল যাত্রা, কথকতা, কবিগান, কবির লড়াই, পাঁচালী, তর্জা প্রভৃতির ওপর। বেশীর ভাগ সময়েই পৌরাণিক কাহিনী এই সব প্রমোদানুষ্ঠানের প্রধান উপজীব্য হ'লেও সমসাময়িক ঘটনাবলীর—তা সে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ধর্ম সম্বন্ধীয়, যা-ই হোক না কেন—চিত্র এবং আলোচনা মূল কাহিনীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং কখনও কখনও অত্যন্ত অসংলগ্নভাবেও উপস্থিত করা হ'ত। তাই এই সমস্ত যাত্রা বা কবিগানের মধ্যেও প্রক্ষিপ্ত অংশ হিসেবে ভারত-মাতার বন্দিনীদশা, পরাধীনতার বেদনা, ইংরেজ-প্রশস্তি প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়।

ইংরেজ-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালী যেদিন ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, কেতা-কায়দাকেও আত্মস্থ ক'রে ইয়ং বেঙ্গলে রূপান্তরিত হ'ল সেই দিন সে শহর কলকাতার ডোমতলা লেনে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় "সাঁ সুসি"-র প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কবে সে তার নিজের জন্যে এমনি একটি রঙ্গালয় স্থাপন করতে পারবে, এই চিন্তা ক'রে। পয়ার এবং ত্রিপদী-সর্বস্ব বাঙলা পদ্য এবং শতকরা অন্ততঃ পাঁচশটি উর্দু বা ফারসী-শব্দবহুল বাঙলা গদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃ ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী অবশ্য প্রথমে ইংরেজী ভাষায় লিখিত নাটক নিয়েই রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল; কিন্তু হেরোসিম লেবেডেফের বেংগলী থিয়েটার দেখবার পর বাঙলা ভাষাতেও নাটক লিখিয়ে নিয়ে তা অভিনয় করা চলে, এই শুভ বুদ্ধি তার মনে জাগ্রত হয়। সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে বাঙালী যে সচেতন, তার প্রথম প্রমাণ বাঙালীর রঙ্গালয় দেয় জয়রাম বসাকের বাড়ীতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন-কুল-সর্বস্ব" নাটক অভিনয় ক'রে। সে হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহের দু' বছর আগেকার অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের কথা।

ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর কিন্তু ইংরেজের প্রতি মোহ চ'লে যেতে বেশী সময় লাগেনি। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ষাট বছর যেতে না যেতেই বাঙালী বুঝেছিল, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ইংরেজ এ-দেশে এসেছে নিজেরই গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধের জন্যে, ভারতবাসীর প্রতি করুণা দেখাবার জন্যে নয়। তাই ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফল—বঙ্কিম, মধু, হেম, নবীন, দীনবন্ধু—সকলেরই লেখায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগল স্বদেশের প্রতি অকুণ্ঠ প্রীতি এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে দুঃসহ ক্ষোভ। সিপাহী বিদ্রোহের সময়

দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়

ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজের আচরণ এবং বাঙলাদেশের চাষী প্রজাদের ওপর নীল-করদের অত্যাচার ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মনকে ইংরেজের কুশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলল।

পাঠক মাত্রই জানেন যে, বাঙলা-দেশের প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ "গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার" ১৮৭২ খৃস্টাব্দে যে-নাটক নিয়ে দর্শক-সমাজের সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন, তা হচ্ছে দীনবন্ধু মিত্র রচিত "নীলদর্পণ"—নীলকরের অত্যাচার জর্জরিত বাঙালার গ্রাম-সমাজের একটি মর্মন্তুদ চিত্র। এরই ঠিক তেরো বছর পরে, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ভারতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় শিক্ষিত ভারত-বাসীর জাতীয়তাবোধকে সংহত করবার

জন্য। কিন্তু এই জাতীয়তাবোধের প্রথম সূত্রপাত করেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "সীতারাম" উপন্যাসে, যা ১৮৮৪ সালে ধারাবাহিকভাবে 'প্রচার' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র "চাঁদশা ফকিরের" মুখে তিনি প্রথম হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা পাঠকদের শোনান। ১৮৮৬ সালে বঙ্গের নটগুরু গিরিশ-চন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরোধ করেন তাঁর "সীতারাম"-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করবার জন্যে। কিন্তু নানা কারণে গিরিশ-চন্দ্রের পক্ষে বঙ্কিমের এই অনুরোধ সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ দেশপ্রেমের বন্যা বহাতে সুরু করেন ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে এবং তা দেশাত্মবোধক বঙ্কিম-রচনা "সীতারাম"-এরই নাট্যরূপ দিয়ে। "মিনার্ভাতে" গিরিশচন্দ্র প্রদত্ত নাট্যরূপ দেখে দর্শকসমাজে এক অভূত-পূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মিনার্ভার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ক্লাসিক থিয়েটারেও "সীতারাম"-এর অভিনয় আয়োজন করেন। এর পর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নিয়ে যে-জাতীয়তাভাবোদ্দীপক নাটক গিরিশচন্দ্র মঞ্চস্থ করেন, সে হচ্ছে তাঁরই রচিত "সৎনাম।" কিন্তু মৌলভী মুজিবর রহমান প্রমুখ কয়েকজন মুসলমান নেতার অনুরোধে মাত্র তিন রাত্রি অভিনয়ের পরই "সৎনাম" বন্ধ হয়ে যায়। এটা হচ্ছে ১৯০৪ সালের কথা। এই বছরই ডিসেম্বর মাসে মিনার্ভায় অভিনীত হয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের যুগান্তকারী নাটক "প্রতাপাদিত্য।" দিল্লী সিংহাসনের বিরুদ্ধে বাঙালী প্রতাপের বিদ্রোহকে বাঙালী দর্শক সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিবেশে উপস্থাপিত ক'রে প্রচুর উদ্দীপনা লাভ করেছিল। বাঙালীর স্বাদেশিকতাকে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে গিরিশচন্দ্র "রাণাপ্রতাপ" নাটক লিখতে সুরু করেন। কিন্তু তিনি যখন দ্বিতীয় অঙ্ক প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছেন, তখন তাঁর কানে গেল, স্টার থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্র-লাল রায় লিখিত "রাণাপ্রতাপ" মহলায় পড়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে "রাণাপ্রতাপ" লেখা বন্ধ করে দেন। স্টারে "রাণাপ্রতাপ" অভিনীত হয় ১৯০৫ সালের ২২শে জুলাই। রাণাপ্রতাপের অমিত শৌর্য এবং অসামান্য দেশপ্রেম শিক্ষিত দর্শক-সাধারণের মধ্যে এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ঠিক এরই প্রায় পনেরো দিন পরে, ১৯০৫-এর ৮ই আগস্ট তারিখে বাঙলা-দেশে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়। এই স্বদেশী আন্দোলনের ভিতরেই ১৯০৫-এর ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটার পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থাপিত করেন গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা।" দুর্ভাগা সিরাজের বাঙালী প্রজার প্রতি অসামান্য মমতা, চক্রান্তকারী পার্ষদ-বৃন্দকে আসন্ন শত্রু সম্পর্কে সতর্কী-করণ, কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা—এই সব দৃশ্য বাঙালী দর্শককে এক দিকে যেমন দেশপ্রেমে মাতিয়ে তোলে, অন্য দিকে তেমনই ইংরেজের প্রতি প্রচন্ড বিরূপ করে তুলতে সাহায্য করে। করিম চাচা-বেশী গিরিশচন্দ্রের মুখের "সাহেব, বড় জবর লোক তুমি। বাঙলা কি, সমস্ত ভারতবর্ষ তোমাদের!" শুনে বাঙালী-দর্শক প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠত। ১৯০৬ সালের জুন মাসে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক "সিরাজদ্দৌলার" অভিনয় দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই জুন মাসেরই ১৬ই তারিখে মিনার্ভা গিরিশচন্দ্রের "মীর কাশিম"-কে মঞ্চস্থ করেন। বাঙালার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলী' কাগজে এই নাট্যাভিনয়ের অপূর্ব সাফল্য সম্পর্কে তাঁর লেখনী চালনা করেন। "সিরাজদ্দৌলা" এবং "মীর কাশিম" নাটক যে দর্শক-সমাজকে মাত্র দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে, তাই নয়;
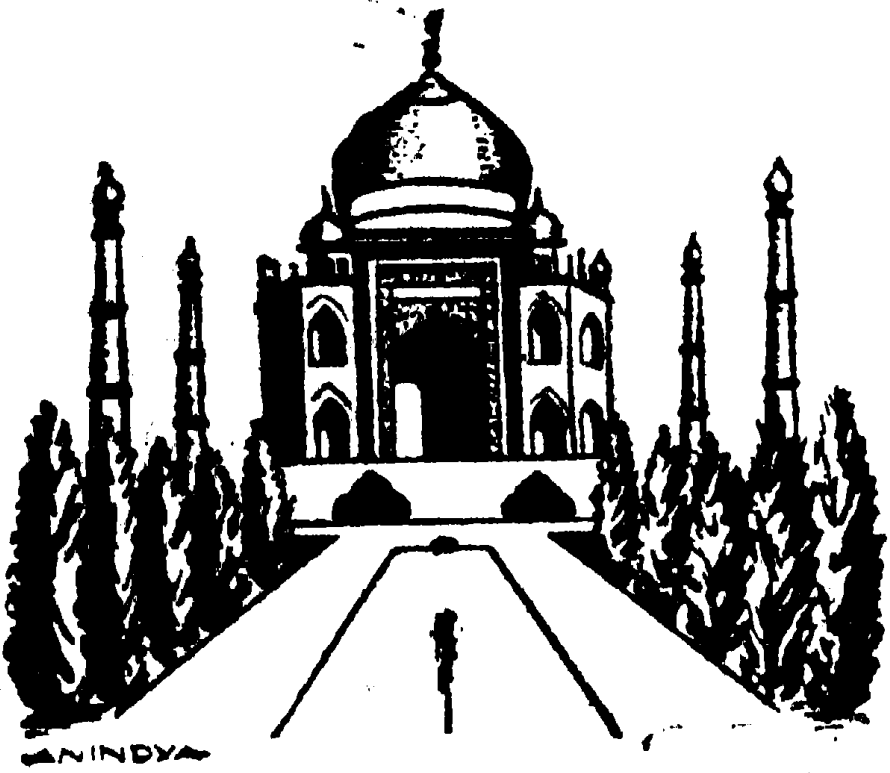
এই নাটক থেকে শিক্ষিত বাঙালী প্রথম জানতে পারে যে, ইতিহাসের নামে সিরাজ বা মীর কাশিম সম্বন্ধে তাদের যে-কথা শোনানো বা জানানো হয়েছে তা' মিথ্যার নামান্তর মাত্র।।

আগেই বলেছি, ১৯০৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর "সিরাজদ্দৌলা" মঞ্চস্থ হয়। ঠিক এর পাঁচ সপ্তাহ পরে ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জনের সরকারী আদেশে বাঙালাদেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়। ঐ তারিখেই ক্লাসিক থিয়েটার "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ" নামে একটি নাটিকার অভিনয় করে। "মীর কাশিম"-এর পরে ১৯০৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর অভিনীত হয় দ্বিজেন্দ্রলালের "দুর্গাদাস"। দুর্ধর্ষ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে রাঠোর দুর্গাদাস এবং রাজসিংহ অমিতবিক্রমে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে দ্বন্দ্ব করেছিলেন, তারই উদ্দীপনাপূর্ণ চিত্র দর্শকমনকে দেশের জন্যে সর্বস্ব পণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। দেশ তখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রদ করবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মরণপণ ক'রে আন্দোলন চালাচ্ছে। বাঙলার ঘরে ঘরে রাখীবন্ধন উৎসবের অনুষ্ঠান চলছে। ভারতের জনমানস জেগে উঠেছে পরাধীনতার বন্ধনমুক্তির আপ্রাণ চেষ্টায়। শিবাজীর স্বপ্নকে বাঙলার কবি অপরূপ কাব্য-সুষমায় ভ'রে রূপ দিচ্ছেন—"এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।" বালগঙ্গাধর তিলকের উপস্থিতিতে বাঙলাদেশ শিবাজী জয়ন্তী উৎসবে মেতে উঠেছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে বাঙলার রঙ্গমঞ্চ থেকে অভিনীত হ'ল গিরিশচন্দ্র রচিত "ছত্রপতি শিবাজী"। ১৯০৭ সালের ১৭ই আগস্ট মিনার্ভা এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর কোহিনুর রঙ্গমঞ্চ যুগপৎ এই নাটক অভিনয় ক'রে বাঙলাদেশকে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল দেশপ্রেমের দুরূহ পথে এগিয়ে যেতে। তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "হিতবাদী"র মারাঠি সম্পাদক সখারাম গণেশ দেউস্কর "ছত্রপতি শিবাজী"র প্রাণোন্মাদিনী শক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

মিনার্ভাতে যখন "মীর কাশিম" অভিনীত হচ্ছিল, তখন স্টার ১৯০৬ সালের ৪ঠা আগস্ট ঐ একই মীর কাশিম চরিত্র নিয়ে লিখিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদের "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" মঞ্চস্থ করেন। অমৃতলাল মিত্র অভিনীত "মীর কাশিমের" চরিত্র দর্শকদের চিত্তকে উদ্বেলিত ক'রে তুলত। যখন মিনার্ভা এবং কোহিনুরে গিরিশচন্দ্রের "ছত্রপতি শিবাজী" নিয়ে ব্যস্ত, তখন স্টার থিয়েটার এমন একখানি নাটক মঞ্চস্থ করলেন, যার নায়ক হচ্ছে বাঙলার ঘরের লোক এবং সত্যপরায়ণ নির্ভীকচেতা ব্রাহ্মণ বলে যার খ্যাতি শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্ব কালের একটি কলঙ্কমসীলিপ্ত ঘটনা; এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বিলাতের পার্লামেণ্টে পর্যন্ত তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তাই স্টার যখন ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত "মহারাজ নন্দকুমারকে" মঞ্চস্থ করলেন, তখন দর্শকমহলে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল এবং এর অভিনয় দেখবার জন্যে কাতারে কাতারে দর্শক আগমন হ'তে লাগল। ১৯০৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মিনার্ভাতে মঞ্চস্থ হ'ল দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত নাটক "মেবারপতন।" মেবার-পতনের গানগুলি দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত অপরাপর জাতীয় সঙ্গীতের মতই জন-প্রিয় এবং দেশপ্রেমাত্মক। এর পর যে-নাটক বাঙালী দর্শককে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে, সেটি হচ্ছে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ রচিত "বাঙলার মসনদ।" এই নাটকে বাঙলার মসনদে আলিবর্দীর প্রতিষ্ঠার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নাটকটি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই মঞ্চস্থ করা হয়।

১৯০০ থেকে সুরু ক'রে ১৯১০ পর্যন্ত এগারো বছর বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি একের পর এক যে-সব দেশাত্মবোধক নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে, তা দেখে দেশের নাট্যপ্রিয় শিক্ষিত জনসাধারণের মনে দেশের প্রতি কর্তব্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে পরা-ধীনতার শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলবার জন্যে একটি অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। বাঙলা-জানা ইউরোপীয় সমাজ এবং বিশেষ করে কলকাতার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি এই সব নাট্যাভিনয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি বারংবার আকৃষ্ট করেন এবং এ ধরণের উত্তেজনাপূর্ণ রাজদ্রোহমূলক অভিনয় চলতে দিলে ইংরেজ রাজত্ব অতি শীঘ্রই রসাতলে যাবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করতে থাকেন। ইংরেজ মহলের এই আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালে প্রবর্তিত একটি বিশেষ আইনের বলে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর", "আনন্দমঠ", "সীতারাম", গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা", "মীরকাশিম", "ছত্র-পতি শিবাজী", ক্ষীরোদপ্রসাদের "মহা-রাজ নন্দকুমার", "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতি বহু নাটকের অভিনয় বন্ধ ক'রে দেন। কিন্তু বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতাও এর মধ্যে এমনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জনমতের কাছে নতিস্বীকার ক'রে বঙ্গভঙ্গ রদ করতেই হয়—কার্জনের settled fact-কে unsettled করতেই হয়, এবং বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়।

স্বাধীনতার পথে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিল সম্বন্ধীয় আন্দোলন ও ভারতীয়দিগের দ্বারা লর্ড রিপনের সম্বর্ধনা।

(এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' লিখেন:—"দ্বেষক ইংরেজ সম্প্রদায়ের সহিত......আর [আমাদের] গোল মিটিবে না।")

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।

("A safety valve for the escape of great and growing forces".)

নিয়মানুগ আন্দোলন—প্রতিবাদ, আবেদন ও নিবেদন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ান-দিগের হস্তে ইটালীর পরাভব ও পরে জাপান কর্তৃক রাশিয়ার পরাভবে শ্বেতকায়দিগের যুদ্ধে অজেয়ত্বে বিশ্বাস বিনাশ—

"It inevitably roused the latent dislike of foreign rule."

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন—লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন।

বাঙলা-বিভাগ—প্রতিবাদে "স্বদেশী" ও বয়কট আন্দোলন সন্ত্রাসবাদ বা Physical force movement বোমা ও রিভলবার ব্যবহার—গুপ্ত সমিতি সংগঠন। "স্বরাজ" দাবী।
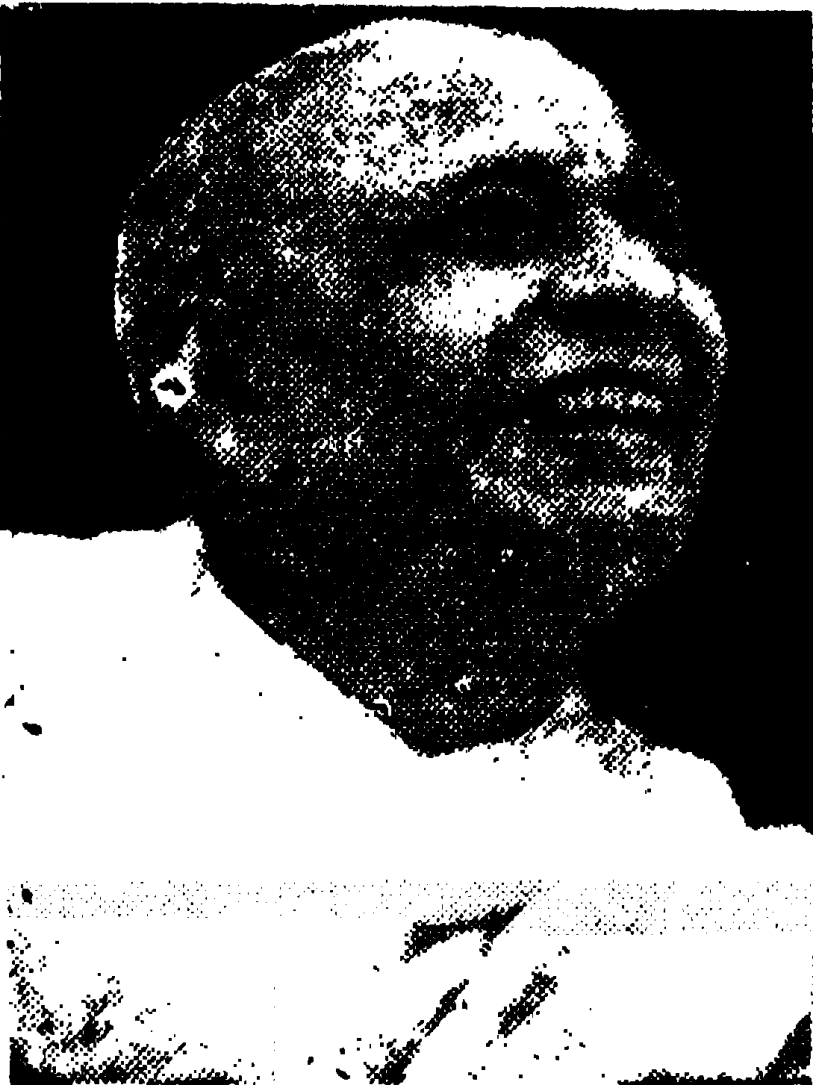
বল্লভভাই প্যাটেল্

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিদেশের সাহায্যে ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়নের চেষ্টা।

মহাত্মা গান্ধী

১৯০৬—কংগ্রেসে "স্বরাজ" শব্দের প্রথম ব্যবহার।

১৯১১—বঙ্গভঙ্গ রদ।

১৯১৯ সালে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয় আন্দোলন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড।

১৯২০ সালে ভারতে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ।

১৯২৭—কংগ্রেস কর্তৃক সাইমন কমিশন বর্জন ও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ।

১৯২৯—২৬শে জানুয়ারী "পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ" প্রস্তাব গৃহীত।

১৯৩০, ১২ই মার্চ ডান্ডি অভিযান ও আইনঅমান্য আন্দোলন।

বৃটিশ সরকারের চন্ডনীতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া। রাসবিহারী বসুর জাপান হইতে ভারত স্বাধীন করার প্রচেষ্টা এবং এশিয়ায় এশিয়াবাসীর অধিকার ঘোষণা।

১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোল টেবিল এবং ১৯৩২ সালে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক—গান্ধী আরউইন চুক্তি।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন।

১৯৩৭ সালে নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলন।

১৯৩৯—কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ।

১৯৪২—"ভারত ছাড়" আন্দোলন।

১৯৪৩—সুভাষচন্দ্রের "আজাদ হিন্দ ফৌজ" ও "আজাদ হিন্দ সরকার" গঠন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিদেশে রাসবিহারীর কার্য-ভার গ্রহণ—ভারতীয় জাতীয় বাহিনী পুনর্গঠন ও ভারত আক্রমণের প্রচেষ্টা। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।

১৯৪৬—বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ।

দিল্লীতে লাল কেল্লায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈনিকাদির বিচারে সিপাহীদিগের মনোভাব; ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে বিদ্রোহ; পুলিসের ধর্মঘট। ক্ষমতা হস্তান্তর।

সুভাষচন্দ্র বসু

পরিশোধ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্যামল সেন

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ নয় ॥

চুপ করে শুনে গেলে এক বৈঠকেই রাত কাবার করে দিতে পারত অনাথ। কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তার স্রোত চলছিল প্রশান্তর মনে, ওর কাহিনীর গোড়ার কথাটা ধরে, অর্থাৎ স্বাতিদের নিরুপায় দারিদ্র্য। একটা সংকল্পও গড়ে উঠেছিল যে অত অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে কিছু একটা করতেই হবে। অনাথের শেষের কথাগুলোর একটা সুযোগ পেয়ে, আর ফিকড়ি বের করবার আগেই বলল,—"ও হবেই অনাথ, কত সাবধানে থাকবে তুমি? তারপর তোমার হাতে যদি হাতকড়ি ওঠে তো ওদের দু'জনের কি অবস্থাটা হবে তা একবার ভেবে দ্যাখো!"

এতটা ভেবে দেখেনি নিশ্চয় অনাথ। কথাটা হাল্কাভাবেই বলেছে, জানে নির্জন পরিবেশে নিজের ঘরে সিঁদ দেওয়া অত শক্ত নয়, ও ধরনের বিপদের সম্ভাবনাও নেই তাতে। প্রশান্তর মুখে শুনে কিন্তু বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েই গল্পের সূত্র ভুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ওর মুখের পানে, একটু পরে বেশ বিহ্বল স্বরেই বলল,—"ভেবে কি দেখিনি ইন্‌জিয়ারবাবু? দেখেছি; কিন্তু উপায় ঠাহর করতে পারছি কৈ? তাই না মনে করলুম যাই তানার কাছে—অগতির গতি তিনি......"

"উপায় একটা ঠাউরেছি আমি, একমাত্র উপায়। এখন তুমি যদি রাজি হও। যদি-ফদি নয়, হতেই হবে রাজি, নৈলে কি যে হবে, আমার মাথায় তো আসছে না। চুরির কথাটা খানিকটা জানাজানি হয়েই গেছে গাঁয়ে—সতর্কই থাকবে তো তারা।"

ভোজটা বেশ কড়া করে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল। আরও বিহ্বলই হয়ে উঠেছে অনাথ, বলল,—"কি উপায়, ক'ন।"

"তোমার মা-মণির চুড়ি কটা ছাড়িয়ে আন।"

"তাহলে তো এবার তাদের ঘরে সত্যিকার সিঁদ দিতে হয় ইন্‌জিয়ারবাবু, সে ক্ষ্যামতা কোথায় আমার?"—মুখের পানে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই বলল অনাথ।

"তার দরকার নেই, টাকা দিয়েই ছাড়িয়ে আন......"

"ট্যাকা কোথায় পাব? দুশো ট্যাকায় বাঁধা, সে তো পেটের মধ্যে চলে গেছে। বেচবই বলে আরও দশটা ট্যাকা নে'সলুম তারই কাছ থেকে কত্তার অসুখে......"

"আমি দিচ্ছি টাকা......"

অনাথের মুখটা এক মুহূর্তেই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ছাইপানা হয়ে গেল, বলল—"আপনি দেবেন!......আপনি দেবেন ইন্‌জিয়ারবাবু—কিন্তু কত্তা তো কারুর দান—এমন কি কারুর ঋণও......"

"এই দ্যাখো! সব গোলমাল ক'রে ফেলছে অনাথ ঘাবড়ে গিয়ে! কত্তা টের পান কোথা থেকে? তিনি কি বাঁধা দেওয়ার কথাটা জানেন যে ছাড়িয়ে আনার কথাটা বলতে হবে তাঁকে?"

"তাওতো বটে, কত্তা তো জানেন চুরিই গেছে।"—মুখটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল অনাথের। তখনই আবার একটু নিষ্প্রভ হয়ে গিয়ে বলল—"কিন্তু মেয়েও যে বাপকা বেটি ইন্‌জিয়ারবাবু, কেঁউ দান করছে জানলে......"

"দান?"—কথাটা বলে চোখ খানিকটা কপালে তুলল প্রশান্ত, বলল,—"আমি পেটের দায়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে এই নির্বান্ধব দেশে চাকরি করতে এসেছি অনাথ, দান ক'রে বেড়াব সে ক্ষমতা কোথায়? ঋণ হিসেবেই দোব আমি। আর দোব সেও কি তোমার মা-মণিকে? ঋণ নেবে তুমি, অবশ্য, যদি চাও। আমি যে তোমার মুখে এতক্ষণ ধরে কথাগুলো শুনলাম তাতে তো আমার এ বিশ্বাসটুকু দাঁড়িয়েই গেছে যে তোমার হাতে আমার টাকা মারা যাবে না। আজ এঁদের অবস্থা খারাপ, তবে কর্তা মুখ্যু নন, উদ্যোগীও রয়েছেন, একটা কিছু আয়ের পথ ধরলে তখন, যেমন করে এসেছ শুনলাম, তাই থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তুমি আমার পাওনা মিটিয়েই দেবে। অবিশ্যি এককালে দেবে কি কিস্তিবন্দী করে, সুদটুক

কিছু দিতে পারবে কি শুকোই—অতটা ধরি না, কাবলিওয়ালা নয়তো একেবারে......"

আরও বাড়াতে যাচ্ছিল, দ্যাখে চোখ দুটো চকচক করছে অনাথের, থেমে গিয়ে বলল—"এই হচ্ছে আমার কথা, এখন দ্যাখো ভেবে-চিন্তে তুমি। ক্যা-মণি তোমার আসছে কোথায় এর মধ্যে যে তার মতামত নিয়ে ভাবনা?"

চোখ দুটো গামছার খুঁটে একটু মুছে নিয়ে নড়েচড়ে গা'টাকে বেশ একটু শক্ত ক'রে নিয়ে বসল অনাথ, যেন ভেতরের সংকল্পেই: বলল—"আমি মোব ইন্‌জিয়ারবাবু। নেহাত যদি পরমায়ু না থাকে, করব কি?—নৈলে ট্যাকা আপনার ডুববে না।......আর পরমায়ু আছেই এখন, এইগুলো ব'সে ব'সে দেখতে হবে তো।"

"বাঃ! আর তোমার পরমায়ু না থাকলে আমি যে মারা যাই অনাথ, আমার টাকার ভুজান দেবে কে ব'সে ব'সে!"
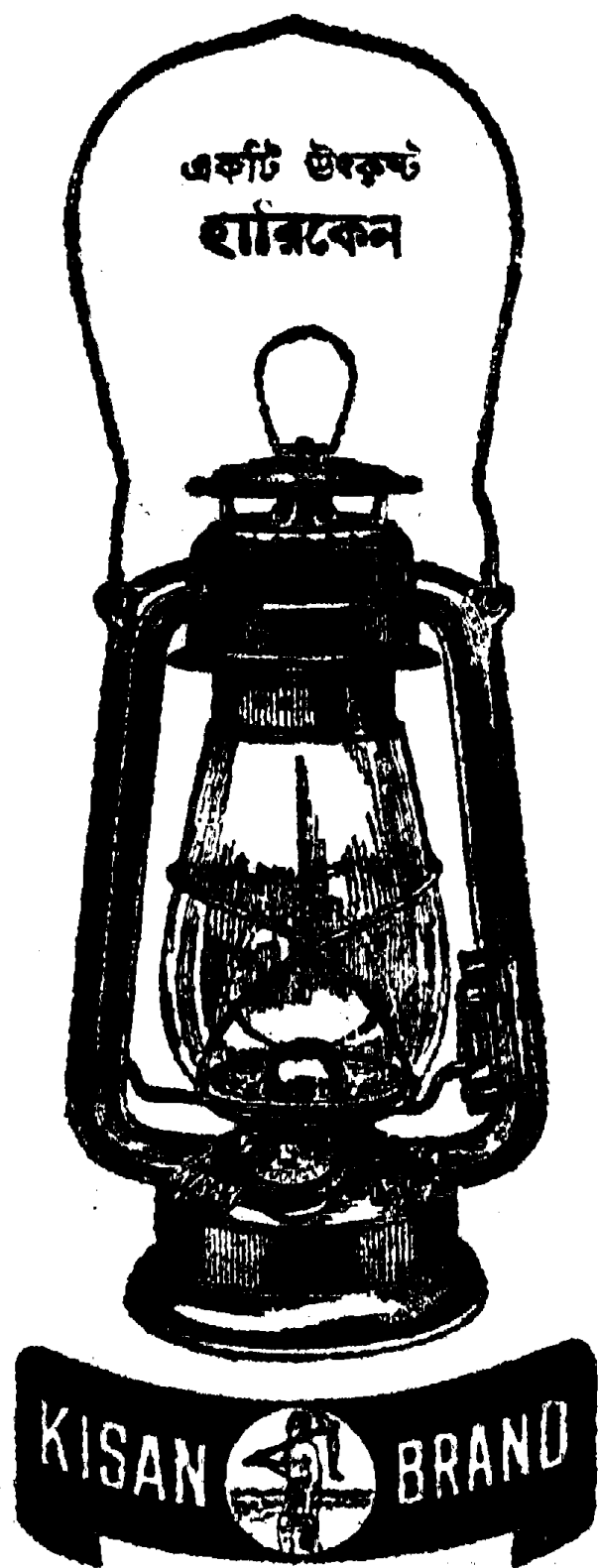
আবার চোখ তুলে এমন বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যে, এক পশলা জল ঝরঝর করে ঝরেই পড়ল অনাথের চোখ থেকে, এবার অবশ্য হাসির সংগে মিশে।

এর পর কে যেন প্রশান্তকে ভেতর থেকে ঠেলে নিয়ে গেল স্বাতিদের বাড়ির দিকে। টাকা বের করে দিয়ে অনাথকে হাটের দিকে বিদায় ক'রে জীপটা গ্যারাজ থেকে বের করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অত যে সংকোচ, সমর্থ মেয়ে ঘরে, বিনা প্রয়োজনে গিয়ে পড়া, সেটা কোথায় যেন উবে গেল, যেন ধর্তব্যের মধ্যেই কিছু নয়।

একটা ওজুহাত ঠিক করে নেবে। পথেই। তার জন্য অপেক্ষা করতে পারছে না। মিথ্যা অবশ্য বলে না, তবে মিথ্যার ওপরে হঠাৎ একটা শ্রদ্ধা এসে গেছে; মিথ্যা যে এমনভাবে সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারে, দোষের ভাগী না ক'রে, কোন রকম খুঁত না রেখে, এতে সত্যই একটা ভরসা এসে গেছে! রাস্তাতেই হাতড়ে বের করে নেবে একটা মানানসই, যেমনটা অনাথের কাছে চালিয়ে দিল, কর্জ দিচ্ছে ব'লে।

হাতঘড়ি উল্টে দেখল সাড়ে চারটে বাজে। না বিকেল, না সন্ধ্যা। একটু না হয় বসেই যাবে? না, বরং ভালো, বলবে আফিস থেকে বাসায় আসবার পথে এক-বার ঘুরে যাচ্ছে, ভেবেচিন্তে আসা নয়, আকস্মিক খেয়াল।

ভালোই হোল। মিথ্যার বন্যা যে নেমেছে মনের মধ্যে, তা অনেক সমস্যাই একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আর সামান্য দেরি করলেও গুড়লগ্নটা বেরিয়ে যেত।

জীপ ছেড়ে ও-ও বাড়ির পথটাতে নেমেছে, ওদিক থেকে স্বাতির বাপ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন; পেছনে স্বাতি। একটু থমকে গেলেন ওকে দেখে, দুজনেই।

প্রশান্ত এগিয়ে গিয়ে বলল—"আপনি কোথায় যেন বেরুচ্ছেন; তাহলে ভালোই আছেন। আফিস ফেরত ভাবলাম একবার দেখে আসি, অনাথকে বলেছিলাম খবরটা দিয়ে আসতে, তা......"

"হাটের দিকে গেছে সে, হয়তো ফেরবার সময় আপনার বাসা হয়ে আসবে। আসুন ভেতরে।" স্বাতিই বলল। বাপের দিকে চেয়ে বলল—"বাবা তাহলে একটু বসে যাবে?"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন কর্তা, একটু যেন বিরক্তও। বললেন—"আমি না হয় চট করে একটু ঘুরেই আসব? তোমরা গল্প সল্প করনা একটু ততক্ষণ।"

একটু অস্বস্তি এসেই গেল—অবশ্য শুধু স্বাতি আর প্রশান্তর মধ্যে। তবে প্রশান্তর আজ জোগাচ্ছে বেশ, বলল—"তেমন দরকার থাকে তো না হয় আমার জীপে ক'রে ঘুরিয়ে আনতাম আপনাকে।"

এবার অস্বস্তিটা কর্তার; সে বিরক্ত ভাবটা গেছে খেড়ে। যেন তারই প্রতিষেধ হিসাবে একটু গা এলিয়ে বললেন—"না, আপনি মিছিমিছি আবার কষ্ট করতে যাবেন কেন? একে আফিস থেকে সোজা চলে এসেছেন।......না গো মা স্বাতি, চলো বসিগে ভেতরে গিয়ে। উনি কষ্ট করে এলেন খোঁজ নিতে। অনাথ আসুক, ওদের নাহয় বলে পাঠাব'খন কাল সকালে আসবে।......ক্ষীরির নিমন্ত্রণ তাহলে চ'লে যাক বাড়ি, আর দরকার কি?"

চৌকাঠ ডিঙোতেই একটা পরিবর্তন চোখে পড়লো প্রশান্তর; সামনের ঘরের চালাটা মেরামত হয়েছে, আর একটু যেন সাজানো ঘরটা। কিছুই নয়: দেয়ালের একধারে তিনটে নূতন-কেনা মোড়া, বসবার জন্য, অন্যদিকে একটা চৌকি, মনে হোল সেই ভেতরের চৌকিরই একটা যেন মেরামত করে এনে রাখা হয়েছে; তার ওপর একটা নূতন মাদুর পাতা। ছবি-ওলা একটা দিনপঞ্জি টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে।

এই ঘরেই, বোধহয় একটা মোড়ার ওপরই বসবার জন্য পা বাড়িয়েছে; স্বাতি বলল—"আসুন ভেতরেই বসবেন চলুন।"

একটু অপ্রতিভ ভাবেই বলল। কর্তাও বললেন—"হ্যাঁ তাই চলুন, একটু গরমও আছে ওটা।"

যেন স্বাতির ভেতরের সংকোচটা প্রকাশ করে দিয়েই একটু হেসে বললেন—"এটা অনাথ বৈঠকখানা করে সাজিয়ে রেখেছে—লাটবেলাট কেউ এসে গেলে।"

ভেতরের ঘরে একটা চৌকি, তবে তার ইটগুলো সরে কাঠের পায়া বসছে, গোটানো বিছানার নীচে একটা নূতন মাদুরও পাতা। পরিবর্তনের দীনতায় কোথায় যে একটা লজ্জা রয়েছে তার জন্যে এবারেও অপ্রতিভভাবেই চৌকিটার দিকে

দেখিয়ে স্বাতি বলল—"বসুন।......বাবাও বোস' তুমি।"

একটু বিব্রতভাবে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"আমি অনাথ কাকার বৈঠকখানা থেকে একটা মোড়াই তুলে নিয়ে আসি।"

হেসেই কথাটা বলে পাশের ঘর থেকে একটা মোড়া তুলে নিয়ে এসে বসল সামনাসামনি হয়ে। অর্থাৎ এ-নূতন ব্যবস্থার মধ্যে ও নেই; একা অনাথেরই মাথা থেকে বেরিয়েছে সবটুকু।

চালু হয়ে এল আলাপ ক্রমে। ঐ মিথ্যা কথাটা ধরেই—অনাথ খবরটা দিয়ে এল না—কাল থেকেই মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে—তবে হেড অফিস থেকে বড় সাহেব হঠাৎ ইনসপেকশনে আসায় নড়তে পারছিল না। ইনসপেকশনের কথা নিয়ে কাজের প্রকৃতির সম্বন্ধেও কয়েকটা কিকাড়ি বেরুল বাপ মেয়ের কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নে—শুনেছে তো খুব বড় কাজ—এত প্রত্যক্ষভাবে জানাবার তো সুযোগ পায় নি এর আগে, প্রধানত ঐ অবলম্বন করেই আলাপ-আলোচনা চলল।

একটা জিনিস প্রশান্তর দৃষ্টি এড়ালো না; সেই ছমছমে ভাবটা যেন লেগেই রয়েছে কর্তার, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। আর, এবার শুধু ও'রই নয়, যেন স্বাতিরও। অনেকটা, কেউ এসে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত বসে থাকলে যেমন হয়। কর্তার দিকটা বোঝা যায়, যেন হয়েই আসতে চান সেই কোন কাজের জায়গা থেকে; তবে স্বাতির দিকেরটা ঠিক বুঝতে পারছিল না প্রশান্ত। এও ভাবছিল, হয়তো সন্দেহই, তার ওপর হঠাৎ মাঝখানে প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে উঠতে পারছিল না। তারপর এক সময় এক জায়গায় শেষ করে দিয়ে উঠেই পড়বে, এমন সময় অনাথ বেশ হন্তদন্ত হয়েই রেশনব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে মুখে প্রশ্নটা নিয়েই প্রবেশ করল—"ইনজিয়ারবাবু এয়েছেন কলোনী থেকে?"

চৌকাঠে পা দিয়েই প্রশান্তকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে কি বলতে যাচ্ছিল—আজ মিথ্যেটা বেশ রপ্ত করা আছে বলেই প্রশান্তর জুগিয়ে গেল, বলল—"কি করব? তুমি তো এলে না আমায় খবরটা দিতে......"

বুঝল কি বুঝল না, ও প্রসঙ্গটাই ছেড়ে দিয়ে ভেতরের দিকে এগুতে এগুতে অনাথ স্বাতিকে ডেকে বলল—

"মা-মণি একবার এসো তো ইদিকে, শীগ্গির।"

সেই ছমছমে ভাবটা এক মুহূর্তেই সরে গিয়ে স্বাতির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে প'ড়ে প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"আপনি একটু বসুন, আসছি এখুনি।"

একটু পরে ও ঘরে আসতে প্রশান্ত আবার উঠতে যাচ্ছিল, বলল—"বসে যান, চা খেয়ে যাবেন। এক্ষুনি হয়ে যাবে আমার।"
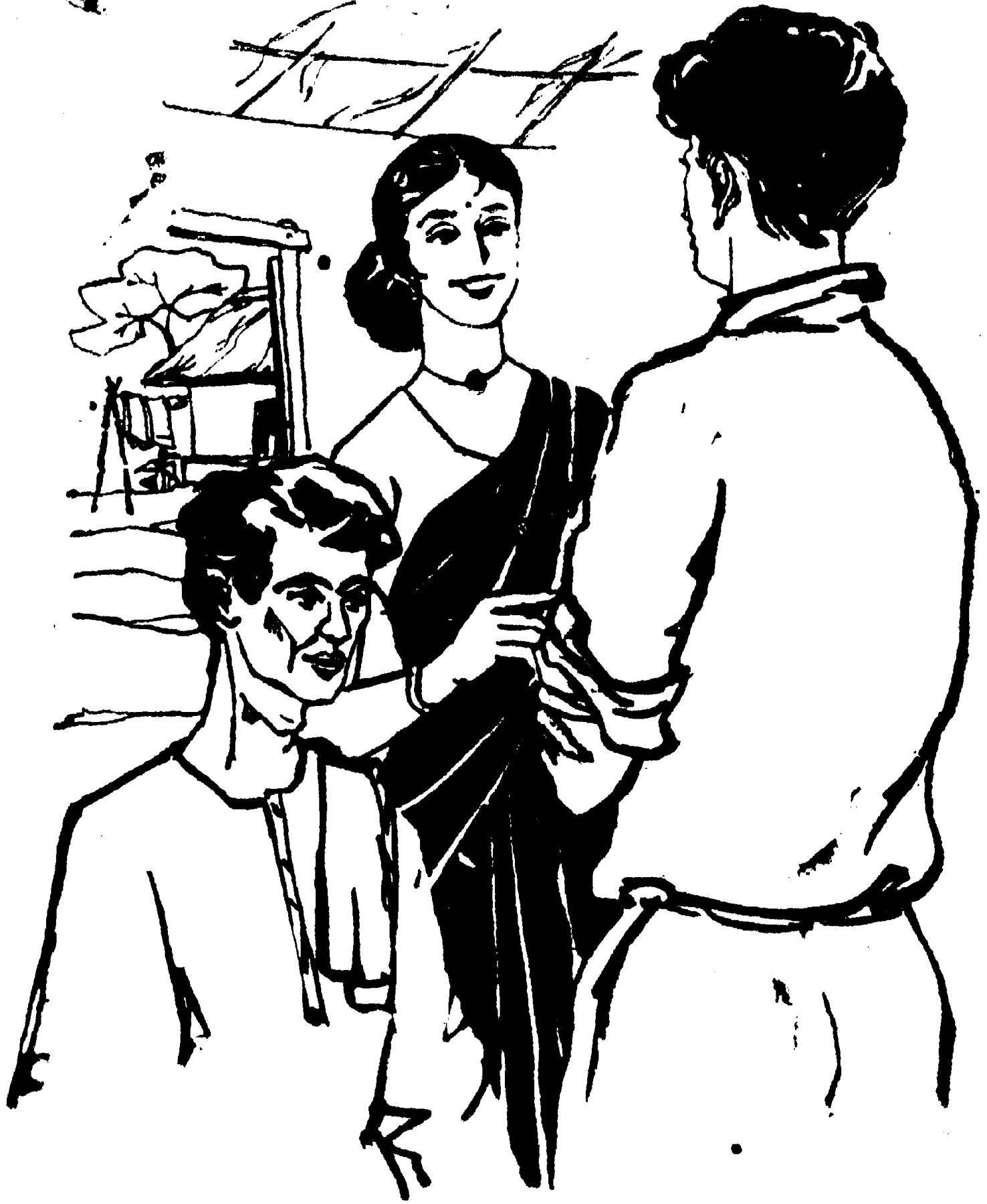
"বসে যান, চা খেয়ে যাবেন"

যেন কোন আপত্তি শুনবে না বলেই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল।

চায়ের সঙ্গে নিয়ে এল খানিকটা হালুয়া, চারখানা বিস্কুট।

ঐ ছিল ওর অশান্তির কারণ এতক্ষণ। একটা লোক বলছে অফিস থেকেই সোজা এখানে চলে এসেছে, তাকে একবার মুখ ফুটে বলতে পারা যাচ্ছে না কিছু না হোক চাটুকু দিয়েও একটু সৎকার করি। প্রশান্ত যখন আপত্তি করল—ঐ কথাটাই বলল, সোজা তো অফিস থেকে এখানেই চলে এসেছে। এমন একটি সূক্ষ্ম হাসির আমেজ ঠোঁটে করে বলল, প্রশান্তর বুঝতে বাকি রইল না, অনাথের মুখে ইতিমধ্যে সব শুনেছে। হয় অনাথ তখন তার ইঙ্গিতটা ধরতেই পারেনি, না হয় উৎসাহের মাথায় তার মা-মণিকে সব বলেই দিয়েছে বিকালের কথাগুলো। খুব বড় গলা ক'রে বলবার কথাও তো। একটা ভয় লেগেই রইল, টাকার কথাটাও না ফাঁস করে দিয়ে থাকে।

এই নিয়ে বার দুই স্বাতির কাছে প্রশান্তর মিথ্যা ধরা পড়ল, প্রথমবার সেই মোটর নিয়ে। সেই দুর্যোগের রাত্রে, প্রথম দিন।

স্বাতি হাসে বেশ সামলে নিয়েই, কিন্তু যত সামলাবারই চেষ্টা করুক, ফুটেই ওঠে হাসিটুকু।

॥ দশ ॥

অনাথ যে এত শীঘ্র এসে পৌঁছাল তার কারণ সে হাটে যায়নি। হাটে যাবে

ব'লে খানিকটা এগিয়েছে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল আসার সময় প্রশান্তর পায়ের ধুলো নিয়ে আসা হয়নি আজ। ভুলই একটা, কলোনী ছাড়িয়ে খানিকটা চলেও এসেছে, এগিয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু অস্বস্তিটুকু বেড়েই চলল। প্রথম দিন অত ঘটা ক'রে পায়ের ধুলো নিল, অমন লাগসই কথাটাও বলল প্রশান্তর আপত্তিতে, আর, আজ কোথায় আরও ঘটা করে নেবে, না, ভুলেই চলে এল একেবারে। অস্বস্তিটা বাড়তে বাড়তে এক সময় দাঁড়িয়েই পড়তে হোল।

তবু, শুধু এর জন্যেই ফিরে যেতে কেমন একটু যেন লজ্জাও করে। দোমনা হয়ে দাঁড়িয়েই রইল একটু। তারপর একটা বুদ্ধি খাটাল। দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখল লোকজন কেউ নেই এদিকটায়। রাস্তার ধারেই একটা বনগ্যাঁদার ঝোপ, আর একবার চারদিকে দেখে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে গামছাটা পাকিয়ে একটা ছোট্ট বিড়ের মত করে তার একধারে একটু ঘন ডাল-পালা দেখে লুকিয়ে রাখল।

তারপর ফিরে চলল।......মনটা বেশ হাল্কা হয়েছে। একটা যে খাশা বুদ্ধি জুগিয়ে গেল তালের মাথায়, তার জন্য আরও হাল্কা হয়েছে। বলবে গামছাটা ভুলে ফেলে গেছে—বলবে, সেদিন প্রশান্ত যে বলল, ওর পায়ের ধুলোর আর দাম কি, তা দেখুক মিলিয়ে আছে কিনা দাম,—খানিকটা বাজে মেহনৎ তো করতেই হোল। পাবে না ওখানে, তা, তাতে তো পায়ের ধুলোর মাহাত্ম্য আরও বেড়েই যাবে—অত বড় ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে একটা গামছাও হারাবে না?

ওর মনটার মধ্যে সরলতার সঙ্গে একটা ছেলেমানুষী আছে, সেটা বেড়ে গেছে আজ, যা সব হোল তাতে কম একটা আনন্দের জোয়ার তো ঠেলে উঠছে না মনে।

গিয়ে দেখল প্রশান্ত নেই। ঠাকুর চাটুজ্জ্যে বলল—এইমাত্র মোটরে করে তাদের বাড়ির পথেই বেরিয়ে গেল। প্রশ্ন করে জানল, কিছু বলে যায়নি, তবে অফিসের কাজে দূরে কোথাও যায়নি, তাহলে বলেই যায় সাধারণতঃ।

একটু নিরাশ হয়েই ভাবতে ভাবতে ফিরছিল, তারপর হঠাৎ খেয়ালটা উঠল মাথায়। হাটে আর গেল না। কলোনীর নিজের প্রয়োজনের জন্য একটা কো-অপারেটিভ স্টোর্স আছে, নিত্য-প্রয়োজনের সব রকম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। গামছাটা বনগ্যাঁদার ঝোপ থেকে তুলে নিয়ে এসে সেইখানেই গিয়ে ঢুকল। র‍্যাশন ব্যাগে টিনের ঘি, মাখন, সুজি, ময়দা, চা, চিনি, বিস্কুট প্রভৃতি যা কিছু আঁটাতে পারল, তাড়াতাড়ি কিনে পা চালিয়ে দিল বাড়ির দিকে।......গেছে নিশ্চয় ওদের বাড়িতেই প্রশান্ত। না গিয়ে থাকে অন্য দিন কাজে লাগবে। অনিশ্চিতই বা কেন?—একদিন কর্তাকে দিয়ে নিমন্ত্রণই করাবে দু'জনকে মা-মণির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে—চিঠি দিয়ে আসবে কর্তার—অত আত্মীয়তা ক'রে অসুখের কথা শোনামাত্রই ছুটে ছিল দুজনে, দুটো ফিয়ের টাকা ঠেকিয়ে দিয়েই দায়িত্ব সারা হয়ে গেল? লাহিড়ীবাড়ির তাই নাকি প্রথা?—তাই নাকি হয়ে এসেছে এতকাল?......

চিন্তার মধ্যেই রাস্তার একটা মোড় ঘুরে দেখল, জীপটা ওদের বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খুশীর ঝোঁকেই আরও এক কাণ্ড করে বসল অনাথ। স্বাতি চা, হালুয়া, বিস্কুট নিয়ে এসে প্রশান্তর সামনে চৌকির ওপর রেখে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করছে, অনাথও চা আর একখানা রেকাবিতে হালুয়া আর বিস্কুট এনে কর্তার সামনে দাঁড়াল। এতই আকস্মিক যে কর্তা যেন বিস্ময়ের কূল পাচ্ছেন না। স্বাতিও এমন হাঁ করে ওর মুখের পানে চেয়ে আছে যে বেশ বোঝা যায় তাকেও এ সম্বন্ধে কিছু জানায়নি অনাথ; কিছু একটা ব'লে—হয়তো নিজের খাওয়ার কথাই—খানিকটা বেশী আয়োজন করে গেছে। অনাথ নিজে কিন্তু একেবারেই সপ্রতিভ। কর্তার বিমূঢ়ভাব দেখে বলল—"সে তো বুঝছি, কিন্তু আপনি না খেলে ঐ উনি খাবেন?......দেখুন না হাত গুটিয়ে বসে আছেন। ......কি ইন্‌জিয়ারবাবু?"

বিস্ময়ের সীমা নেই, প্রশান্তেরও, একটু আগেই তো ও'র চা-ছাড়ার কাহিনীটা ওরই মুখে শুনল। কাপটা তোলবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল একটু, অপ্রতিভভাবে টেনে নিয়ে বলল—"না...... ও'কেও খেতে হবে বৈকি।"

"ঐ দেখুন। আর ডাক্তারবাবুও কি বলেছেন তাও শুনুন......" শোনাবার জন্যে চেয়ে রইল প্রশান্তর মুখের দিকে।

প্রশান্ত যন্ত্রচালিতের মতো বলল,—"বলছিল বৈকি, রজত—অনাথও ছিল

তো—বলছিল—এই সময় ও'র একটু খাওয়ার দিকে নজর রাখা—আর চা'টা একটা মাইলড স্টিমুলেণ্টও তো—তাছাড়া নূতন শীত পড়েছে......"

"তা রাখবি তবে তো খাব, না, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকবি?'—প্রশান্তর স্খলিত কণ্ঠের চায়ের গুণগানের মধ্যেই অনাথকে কথাটা বলে, প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললেন—"ও ব্যাটার পাল্লায় পড়বেন না আপনি।"

যেন একটা চক্রান্তের মধ্যে পড়ে নিরুপায় হয়েই চায়ের কাপটা তুলে নিলেন। একবার চাইলেনও অনাথের দিকে। অনাথ স্বাতির দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"তুমিও গিয়ে একটু মুখে দিয়ে নাও গে মা-মণি, নাহক বেঁজি-বেড়ালের পেট ভরিয়ে তো লাভ নেই। আমি রইলুম এখেনে।"

গোঁফ জোড়াটা ফুলিয়ে তার ওপর দিয়ে ডান হাতের চেটোটা টেনে দিয়ে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু সেই পেতল বাঁধানো লাঠিটা হাতে নেই।

স্বাতির পেটে হাসি গুড়-গুড়িয়ে উঠছিল, পালিয়ে বাঁচল।

ওদের খাওয়া হয়ে গেলে আধেক হালুয়াসুদ্ধ কর্তার রেকাবিটা তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল অনাথ। একবার প্রশান্তর খালি রেকাবিটার ওপরও নজরটা গিয়ে যেন তেরছাভাবে পড়ল। সবটুকু না খেয়ে পরিত্রাণ নেই ভেবে প্রশান্ত খালি করে ফেলেছিল, মনে হোল যেন একটু নিরাশ হয়েছে অনাথ। মনে পড়ে গেল ওর পায়ের ধুলোর মাহাত্ম্যের কথা—আর কিছু না হোক, হয়তো প্রসাদ হিসাবেও কিছু আশা করেছিল।

একটা পর্ব শেষ হোল। অপ্রীতিকর নিশ্চয় নয়, তবে খানিকটা অস্বস্তিকর তো বটেই; স্বাতি ফিরে এলে আবার চালু হোল গল্পসল্প। এবারে যেন আরও একটু বেশ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে দিয়ে। সদ্য-অফিস-ফেরত অতিথির অসৎকারের চিন্তা নেই স্বাতির মনে; সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসতে কোথায় সেই খাওয়ার তাগিদটা সরে গেছে কর্তার মন থেকে, প্রশান্তরও কোন ব্যস্ততা নেই। অধিকন্তু লাগছেও বেশ ভালো। আজ মনটা তো নানা কারণেই আছে বেশ ভালো। তবু একবার নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে যখন ওঠবার কথা বলল, কর্তাই বললেন—"তাড়াতাড়ি কিসের?

গাড়ি রয়েছে, উঠে বসলেই তো পৌঁছে যাবেন।"

যেন আপনা হতেই প্রশান্তর দৃষ্টি একবার স্বাতির দিকে ঘুরে গেল। বাপের কথায় উৎসুক দৃষ্টিতেই চেয়েছিল ওর মুখের পানে, একটু যেন থতমত খেয়ে সামলে নিয়ে বলল,—"আর যেমন একটানা খাটুনি গেছে বলছেন কাল......"

"তা বইকি, একটু রিল্যাক্সেশন্ দরকার।"—কর্তা ওর কথাটা পূর্ণ ক'রে দিলেন। বললেন—"মাঝে মাঝে তো চলে এলেই পারেন, গাড়ি রয়েছেই, আর এই তো পথ।"

প্রশান্ত হেসে বলল—"আমরা হাতুড়ি-পেটা মানুষ, বেশ তো খাপ খাই না সব জায়গায়, সেই ভয়।"

কর্তা বোধহয় কলম-পেষাদের সঙ্গের অভিজ্ঞতা নিয়েই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, থমকে পড়তে স্বাতি বলল—"ওটা আমাদের মতন লোকেদের পরিহার করে থাকার একটা মিথ্যে ছুতো, তাই না বাবা? যাদের হাতে হাতুড়ি-বাটালি তারাই তো আজকের পৃথিবীটা গড়ে তুলছে। বলুন।"

দু'সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে প্রশান্তর দিকেই অনুযোগের দৃষ্টি তুলে বলল—"একটা মিথ্যে অপযশ জিনিসগুলোর।"

কর্তার মনে ঘুরে এসেই গেল নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা খানিকটা। তবে লঘুকণ্ঠেই একটু হেসে বললেন—"কলমের যশটাই কি সত্যি মা, অন্ততঃ যতখানি করে তোলা হয়?"

তারপর যেন ওটুকু তিক্ততাও মন থেকে মুছে ফেলে বললেন—"থাক্, স্কুল-ডিবেটের সেই—'পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দ্য সোর্ড' (Pen is mightier than the sword)—না, বলব হ্যামার (Hammer)?"

বেশ একটা ঘরোয়া পরিবেশ দাঁড়িয়ে গেছে, যার জন্যে এক সময় প্রশান্ত ও'র ওকে সমীহ করে 'আপনি' বলবার জন্য অনুযোগও করল, তারপর আরও একটা প্রসঙ্গ এনে ফেলল যেটা কতকটা যেন অনধিকার চর্চার মতোই শোনায়।

বিশেষ করে সে-বিষয়ে আগেই একটু কৌতূহল দেখিয়েছিল বলে। বলল—"আপনি যেন কোথায় যাচ্ছিলেন আজ, আমিই বাধা হয়ে দাঁড়ালাম, ঠিক করেছেন সকালে যাবেন।'

সঙ্কোচটা যায়নি দেখে বলল—"আমি তাহলে মটোরটা পাঠিয়ে দিতে পারতাম। না, নিজে আমায় আসতে হবে না। ড্রাইভিং জানে এমন লোক আছে আমার।"

একটু ছন্দপতন হোলই যেন। একটু অপ্রস্তুত হয়েই এসেছে প্রশান্ত, লাহিড়ী-মশাই হেসেই বললেন—"ব্যবস্থাতো ভালই। কিন্তু যাওয়া-আসা ক'রে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেলেই পাওয়ার মতন কাজ; রথে চড়ে গেলে চলবে না।...না গো মা স্বাতি?"

মুখটা নীচু ক'রে একটু ম্লান হাসি হাসল স্বাতি।

কর্তা আর স্থায়ী হতে দিলেন না ঘরের এ গুমোট ভাবটা। হেসেই প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললেন—"মাষ্টারির উমেদারি ......প্রাইভেট টিউটার।"

আজ দুষ্টু সরস্বতী যেন জিহ্বার আসন পেতেছেন প্রশান্তর; মিথ্যা সরস্বতী বললেই আরও স্পষ্ট হয় কথাটা। শুধু, কি করে যে সত্যের, কল্যাণের ফসল ফলিয়ে যাচ্ছেন তা এক তিনিই জানেন। একটু দেরিও তো হোল না, ও'র কথার সঙ্গে সঙ্গে মনে করবার মতো ক'রে চোখ দুটো কপালে তুলে বলল—"এই দেখুন, আসল কথাটাই ভুলে বসে আছি, যার জন্যে আফিস থেকে ছুটে আসা। অনাথের চা-হালুয়া চাপা দিয়ে দিলে নাকি? রজত আমায় বলছিল—ওর বোনের বছর দুয়ের মধ্যে ম্যাট্রিকটা প্রাইভেটে করিয়ে দিতে চায়—লোক খুঁজছে—তা এ অজ পাড়াগাঁয়ে কোথায় পাবে—শেষে আমার হঠাৎ মনে পড়ে যেতে ......তা আপনি যদি দয়া ক'রে......"

—হঠাৎ সাফল্যের উত্তেজনায় শরীরটা একটু একটু কাঁপছে, মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। লাহিড়ীমশাই হেসেই শান্ত কণ্ঠে বললেন—"তা বেশ তো, আসবে।"

কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল সাফল্যে বাধা আছে। সেইটুকু আন্দাজ করেই "কিন্তু......" বলে কথাটা স্পষ্ট করতে যাচ্ছিল, উনিও যেন উদ্দেশ্যটা আন্দাজ ক'রেই হেসে বললেন—"কিন্তুর কিছু নেই তো। যথেষ্ট সময় আমার। আর, পথও বাঁধা।" স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন—"কি গো মা?"

উল্লসিত হয়ে উঠেছে স্বাতি, তবে উদ্দেশ্যটা ও-ও বুঝেছে, তাইতে উল্লাসটা চাপা। বলল—"আমি তো তাহলে বর্তে যাই বাবা। আর কিছু না হোক, সঙ্গী পাই একজন। মরে গেলুম যে!......তুমি সেখানে পড়াতে গেলেও বসিয়ে রাখব।"

সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্ত বলল—"আমি ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম—আর বাইরে পড়াতে যাওয়ার কথা আসে না তো......। ......তাহলে আমার মনের সন্দেহটা বলেই ফেলি—আপনি বোধ হয় বলতে চান......"

"বুঝেছি। আপনি বোধ হয় চান আপনাদের কাছ থেকে একটা দক্ষিণা আদায় করি।"—ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বললেন লাহিড়ীমশাই।

একটু যেন এলিয়ে গেল প্রশান্তর দেহটা। "তাহলে... " বলে একটু নিষ্প্রভ ভাবেই আরম্ভ করেছিল, আবার বেশ সোজা হয়েই বসে বলল—"সে

আমার বোন হ'লে হ'তে পারত। রজত রাজি হবে না যে।"

"কেন ?"

"কেন ?......কেন ?......"

কারণটা বের করবার জন্যেই যেন ঘুরে ফিরে চাইল একটু চারদিকে, তারপর উৎসাহের সঙ্গেই বলে উঠল,—"বাঃ, আপনি তো নিজেই সে পথ বন্ধ করে দিয়েছেন—ফি'টা নেওয়ালেন না জোর করে সেদিন ?"

যুক্তিটা কি হতে পারে আগেই বোধ হয় স্বাতির মাথায় এসে গিয়েছিল, বাপের পরাভবে মুখটা ঘুরিয়ে এবার স্পষ্ট করেই হেসে ফেলল। তবে তখনই আবার গম্ভীর হয়ে গিয়েই বাপকে সমর্থন করে প্রশান্তকে বলল—"ডাক্তারের ফি আর টিউটারের মাইনে ?"

"বাঃ, তফাতটা কোথায়, বলুন ? না স্বাতি দেবী, আপনি অন্যায়ভাবে ওঁর পক্ষ নিচ্ছেন। যুক্তি কোথায় আপনাদের দিকে ?......না, আপনি অন্তত আমার দিকে হোন—মানে, যুক্তির দিকে আসুন। অন্তত এই জন্যে যে বিশাখার পড়াটা তাহলে বন্ধই থাকবে। বেশ, উনি অল্প নিন, কিন্তু একেবারে কিছু না নেওয়ার পথ উনি নিজে হাতেই যে বন্ধ করে দিয়েছেন এ কথাটা মানতেই হবে—আপনাদের দু'জনকেই।"

॥ এগারো ॥

একটা দিনে ঘটনাস্রোত একেবারে এতটা এগিয়ে যাবে এটা কেউ আশা করতে পারেনি। এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে দু'দিকের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। দুই বন্ধুতেই এই দুঃস্থ পরিবারটিকে যতদিক দিকে সাহায্য করা যায় তার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠল।

ভগ্নীর পড়াশুনা নিয়ে রজতের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। অনেকটা নিরুপায় হয়েই। ব্যাপারটার সঙ্গে ওদের পারিবারিক ইতিহাস জড়িত। বিশাখা ওদের কলকাতার বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করছিল। বাবা ভবানীপুরে একজন প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার, কিন্তু প্রায় বছর দুই পূর্বে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করায় দুই পক্ষের মধ্যে একটা মনোমালিন্য এসে যায়। এবং কিছুদিনের মধ্যেই চাকরি পাওয়ার পর রজত পিসিমা আর ভগ্নীকে নিজের কাছে সরিয়ে নেয়। এরপর থেকে চাকরিস্থলই ওদের তিনজনের বাড়ি; বিশাখার পড়াশুনোর কোনও নিশ্চয়তা নেই এবং সুযোগ তথা নিশ্চয়তার অভাবে কোন তাগিদও নেই বা পরিষ্কার ধারণা নেই রজতের মনে। ভবিষ্যতে সুবিধা হয়তো নাম লিখিয়ে দেওয়া হবে, ইতিমধ্যে বিবাহের কোন সুযোগ এসে পড়ে তো পড়াশুনা ঐ পর্যন্তই। এই রকম চলছিল।

এক-আধদিন কথাটা উঠেছিল দুই বন্ধুর মধ্যে, একেবারে গোড়ার দিকে, রজত যখন নূতন চাকরি নিয়ে আসে। তাও নেহাত স্কুল-বিতর্কের মতোই; অলস ধূমপানের মধ্যে কতকটা অবসর-বিনোদনের আকারেই। প্রশান্ত সপক্ষে, রজত বিপক্ষে। বিপক্ষে এজন্য নয় যে সে একেবারেই বিরোধী; হয়তো এই কারণেই যে সে অপরাধী, আত্মসমর্থনে না নেমে উপায় ছিল না।

কোন পথ খোলাও তো ছিল না, তাই ও প্রসংগটাও ওঠেনি আর। নূতন কাজের হিড়িকে আর মনেও ছিল না, দু'জনের কারুরেই। তারপর নিতান্ত আকস্মিকভাবেই প্রশান্ত আবিষ্কার করল একটা পথ। নিতান্ত স্বাতিদেরই একটা সুরাহা হিসাবে। রজত রাজি হয়ে গেল। স্বাতিদের জন্যে একটা সহানুভূতি জন্মেই গিয়েছিল, উপরন্তু বোধ হয় বিশাখারও সুরাহার কথা ভেবে থাকবে। শুধু পড়াশুনার দিক দিয়েই নয়; সেটাতো আছেই। প্রশান্তর সেই বিশাখার পক্ষ নিয়ে তর্ক করাটা ওর ভালো লেগেছিল। একটা নূতন চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে। অবসর সময়ে ভাবে কখন কখন একটা রঙীন সম্ভাবনার কথা।

চারদিক দিয়েই যতটা সম্ভব সুবিধা করে দিল প্রশান্ত। দুপুরের আহার সেরে, খানিকটা বিশ্রাম করে বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময়—আফিসে যায় নিজেই ড্রাইভ করে। ঠিক হোল এর পরই গোপেশ্বর ড্রাইভ করে বিশাখাকে রেখে আসবে স্বাতিদের বাসায়। ওর ফিরে আসবার ব্যবস্থা হোল সন্ধ্যার একটু আগেই ; মোটামুটি ঘন্টা দুয়েক পড়াশুনা করে। মাইনের কথা ওরা কি করে তুলবে ভাবছিল, লাহিড়ীমশাই নিজে তুলে সহজ করে দিলেন। একটু হেসে বললেন,—"এর মধ্যে আসল কথাটাই তুলতে দেখছি আপনারা ইতস্তত করছেন। আমি বলি—ওটা থাকই না, আমি না হয় বেশি করে অসুখে পড়েই কল দোব, শোধ হয়ে যেতে থাকবে।"

ওরা দু'জনে ঠিক করল—ও-কথা আর তুলবে না, যথাসময়ে বিশাখা গিয়ে পায়ের কাছে পাঁচখানি করে দশ টাকার নোট রেখে দেবে।

তাও করা হোল না শেষ পর্যন্ত। মাসটা পূর্ণ হয়ে এলে সাত-পাঁচ ভেবে প্রশান্ত এ-বিষয়ে স্বাতিকে নিজেদের যুক্তি পরামর্শের মধ্যে নিয়ে আসাটা সমীচীন বলে মনে করল। যেটা আন্দাজ করে করল, দেখল সেটা ঠিকই। স্বাতি বলল—হাত পেতে কিছু নেওয়া, বিশেষ করে এমন লোকেদের কাছ থেকে যাঁরা ওদের এতবড় বন্ধু হয়ে উঠেছেন, ওঁর পক্ষে শুধু কণ্টকর নয়, বাধ্যতার মধ্যে মর্মন্তুদই হয়ে পড়বে। ওরও ইচ্ছা ছিলই না, তবে রজত যে শুনবে না, এবং পরিণামে মাঝখান থেকে বিশাখার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, প্রশান্ত বুঝিয়ে দিতে এ কথাটা বুঝল। ও ভেবেচিন্তে পরামর্শ দিল—লেনদেনের ব্যাপারটা নেপথ্যেই থাক—টাকা পয়সার দিকটা বরাবর অনাথই দেখে এসেছে, কি এল না এল ওই দেখবে।

বেশ ভালো সমাধান। প্রশংসা করল প্রশান্ত; আরও মাসখানেকের ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে প্রশংসার অনেক কিছু তো পেয়েছে আরও, জিভ চুলকায়। বলল—"যে বলেছিল স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ংকরী তাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হয় স্বাতি-দেবী, বোঝাপড়া করতে চাই তার সঙ্গে।"

বলবার ঝোঁকে ডান হাতটাতে আপনিই ঘুঁষি পাকিয়ে গেছে, সেইদিকে একটু আড়ে চেয়ে নিয়ে স্বাতি হেসে বলেছিল—"আমি মেয়েদের দিক থেকে তার ওপর শোধ নিয়ে বিশেষণটা না হয় আপনাকেই দিচ্ছি, তাতে যদি শান্ত হন। একটা প্রলয়েরই তো তোড়জোড় দেখছি।"

হ্যাঁ, অনেকখানিই কাছাকাছি হয়ে পড়েছে দু'জনে এই একটা মাসের মধ্যে। তার একটা কারণ ওদের দু'জনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া রয়েছে—একটা কথা যা বাইরে গোপনীয়, কিন্তু ওদের নিজেদের নয়। সেটা হচ্ছে, ওর বাবাকে যতটা সম্ভব নিশ্চিন্ত এবং এ-অবস্থায় যতটা সম্ভব সুখী করে রাখতে হবে, এবং তা অনেক কিছুর সহযোগে যার সম্বন্ধে উনি কিছুই জানবেন না, জানবে শুধু প্রশান্ত আর স্বাতি।......গোপন কথা হোল আত্মীয়তার স্বর্ণসূত্র।

স্বাতিদের এখানে প্রশান্তর আসাটাও গেল বেড়ে। রজতের এখানে একটু একটু করে পশার হচ্ছে। সমস্ত অঞ্চলটা বিরল-বসতি, তবে দূরে দূরে কয়েকটা বড় গ্রাম আছে, কিছু কিছু করে ধনী লোকও, ভালো ডাক্তারের চাহিদা আছে। যানবাহন সাইকেল কিংবা গোরুর গাড়ি। আরম্ভ হোল তাইতেই; পরে প্রশান্ত যখন টের পেল, জীপেরই করল ব্যবস্থা। প্রথমে গোপেশ্বরই রইল নিয়ে যেতে নিয়ে আসতে,

তবে ইতিমধ্যে বন্ধুকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে এবিষয়ে আত্মনির্ভর করে তুলল। রাস্তা খারাপ (সব জায়গায় যেতেও পারে না জীপ) তবু পথ চলার দিক দিয়ে জীপগাড়ি অনেকটা সব্যসাচীই। রুগীর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে, নেহাত না পারলে, সাইকেলটাকে ঘাড়ে ক'রে নেয়, নামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, রজত বাকি পথটুকু তাইতেই নেয় সেরে। তবে জীপের সাহায্য নেয় কমই; তেমনি দূরে হোল, কিংবা তেমনি খারাপ কেস্, তবেই। একদিন বিকালে এইরকম একটা কলে গিয়ে আটকে পড়ল। যখন ফিরল, রাত প্রায় আটটা। লাহিড়ীমশাই খবর নিতে অনাথকে পাঠিয়েছেন, আরও একটু দেখে নিয়ে প্রশান্ত নিজেই উঠবে বিশাখাকে নিয়ে আসবার জন্য, এমন সময় রজত এসে উপস্থিত হোল। কেস্‌টা খুব বাঁকাপথ ধরেছিল, ভালো করে সামলে দিয়ে তবে এসেছে।

প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গেই জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেল অনাথকে তুলে নিয়ে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতে পারল না। অনাথকে সন্ধ্যার পরই পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু অনাথ মানেই গল্প, তাই সে সম্ভাবনার সুযোগ নিয়ে স্বাতি এর মধ্যে এক কান্ড ক'রে বসেছে। প্রশান্ত গিয়ে দ্যাখে বাড়ির এদিকে কেউ নেই; ভেতরের দিকে গিয়ে দ্যাখে লাহিড়ীমশাই রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে এক হাতে পিরিচ আর এক হাতে কাপ নিয়ে চা পান করছেন, ভেতরে কোমরে আঁচল জড়িয়ে স্বাতি কড়ার মধ্যে প্রবলবেগে খুন্তি নেড়ে যাচ্ছে, একটু তফাতে বিশাখাও অনুরূপ সজ্জায় বাটনা বাটায় রত। পেছন থেকে অংগ সঞ্চালন আর শিল-নোড়ার শব্দসুষমার দেখে মনে হয় কাজটাকে যতটা সম্ভব গুরুত্ব দিয়েই সমস্ত শক্তি নিয়ে লেগে গেছে সে।

কড়া-খুন্তি আর শিল-নোড়ার দ্বৈতনির্ঘোষের জন্যই এদের আসার কথাটা টের পাওয়া যায়নি, লাহিড়ীমশাইয়ের নজরে পড়তে উনি স্বাতিকেও বললেন। স্বাতি ঘুরে দেখে কোমরে জড়ানো আঁচলটা খুলে তাড়াতাড়ি সম্বৃত করে নিল নিজেকে, বিশাখাও। দাঁড়িয়েও উঠল বিশাখা।

সংকোচের মধ্যে পড়ে গেছে প্রশান্তও: হঠাৎ-ই তো, আর গার্হস্থের একেবারে মাঝখানটিতে। তবে সংকোচটা উভয় পক্ষেই খুব ক্ষণস্থায়ীই হোল। একটা অন্য ফিকড়ি বেরুল ব্যাপারটুকুর মধ্যে থেকে। প্রশান্ত ভেবেছিল স্বাতিদের নিজেদের জন্যেই রোজকার মতো রাত্রির আয়োজন। সেই হিসাবেই যখন বিশাখাকে বলল ও সামলে দিক, ঘরে গিয়ে বসছে প্রশান্ত, লাহিড়ীমশাই জানিয়ে দিলেন আয়োজনের মধ্যে ওরাও এসে পড়েছে, বরং ওদের দুজনই আসল উপলক্ষ্য। এরপর একদিকের আপত্তি আর একদিকের জিদ-অনুরোধের মধ্যে সংকোচটা কেটে গিয়ে সব বেশ সহজই হয়ে এল।

জিদটা অবশ্য স্বাতির দিক থেকেই বেশি। ভেতরের কথা—অনাথকে পাঠিয়ে দিয়েই ও মতলবটা এ'টে কাজে নেমে পড়েছিল, কিন্তু যুক্তি হিসাবে সোজা কথাটাই ধরল, বলল—বিলম্ব দেখে করতে হয়েছে ওকে ব্যবস্থাটা—ও তো ধরে নিয়েছিল, বিশাখাকে তাহলে বুঝি থেকেই যেতে হোল রাত্রিটা; তা শুকিয়ে তো রাখা যায় না।

তর্ক উঠল একটু। প্রশান্ত বলল—"বেশ তো, তা খেয়ে নিক বিশাখা। যেমন বলছেন আমার জন্যে আয়োজন তো হওয়ার কথাও নয়।"

"বিশাখা যে বললে আপনি নিশ্চয় আসবেনই নিতে।" স্বাতি তর্ক তুলল। "তাহলে আয়োজনের দরকারটাই তো ছিল না।"—উত্তর দিল প্রশান্ত।

"বাঃ।......তা কেন?......তা কি ক'রে হয়?......বাঃ।"—খুন্তি হাতেই একটা ভালো উত্তর খুঁজে বের করবার চেষ্টা করল স্বাতি ওর দিকে চেয়ে, তারপর যেন হার মেনে ওদিকটাই ছেড়ে দিয়ে বলল—"নাঃ, আপনি বসুন গিয়ে ভেতরে। নিয়ে যাও বাবা তুমি ওঁকে। একে জানিই না রাঁধতে—এর ওপর বাজে তর্ক এনে ফেললে নুন-মসলার গোলমাল হয়ে আরও যে কি কান্ড হবে!...না, খেয়ে যেতে হবে দু'জনকেই।"

আনাজগুলো ভাজছিল, মসলাগোলা ঢেলে দিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজটুকু বন্ধ করে দিয়ে তর্কটা ঐখানেই শেষ করে দিল। আবার লাহিড়ীমশাইয়ের দিকে চেয়ে বলল—"বাবা, শুনলে না?"

উনি বিশেষ কিছু অংশ গ্রহণ করেননি এই বিতর্কে; শুধু হাসি দিয়ে মেয়েকে যেটুকু সমর্থন করা যায় তাই করে যাচ্ছিলেন—যেন এই নিশ্চিন্ততার জন্যই যে স্বাতি রেহাই দেবেই না। উপভোগই যে করছেন সবটুকু, পূর্ণ-সমর্থন আছে ওঁর, এটা প্রকাশ পেল অন্যভাবে। স্বাতির প্রশ্নে চায়ের কাপটা একটু বাড়িয়ে ধরে বললেন—"তোমাদের চা আর আছে কেটলিতে? তাহলে দিতে আর একটু। হয়েছে ভালো।"

সময় পেয়ে আবার তর্ক উঠল। প্রশান্তর হঠাৎ যেন নেশা ধরে গেছে তর্ক করবার। বলল—"বিশাখাও দেখছি ওঁর দিকেই হয়েছে। লেগেও গেছে বেশ উৎসাহের সঙ্গে, তারপর কৈ আমার হয়ে একটা কথাও তো বললে না।"

"ওর এটা গুরুগৃহ।"—কথাটা হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল স্বাতি যে সবার মধ্যেই একটু হাসি পড়ে গেল। ও-ও গাম্ভীর্য ভেঙ্গে যোগ দিল একটু।

প্রশান্ত যেন লাহিড়ীমশাইকে সাক্ষী মেনেই বলল—"এর ওপর তাহলে আর কি বলা যায় বলুন।"

তখনই আবার স্বাতির দিকে চেয়ে বলল—"কিন্তু দেখছি তো গুরুর কাছ থেকে ভাঙ্গিয়েই নিয়েছেন আপনি—নিয়ে নিজের শিষ্যা করে নেওয়ার মতলব এ'টেছেন।"

"ঠিকই তো।" উত্তর করল স্বাতি। সঙ্গে সঙ্গে বিশাখার দিকে চেয়ে বলল—"তুমি ওঁর কোনও কথার উত্তর দেবে না বিশাখা। নতুন গুরুর আদেশ।"

উপভোগ করছিল সবচেয়ে অনাথ। মুখে একটি হাসি নিয়ে পেছন দিকে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, একটু এগিয়ে গিয়ে বলল—"আমারও একটা কথা বলার হক্ আছে মা-মণি, আয়োজন তো বিদুরের খুদ-কুঁড়ো, এর জন্যে আবার ওনাকে কেলেশ দেওয়া কেন? আমিই বাটনাটা......" বলতে বলতে দু'পা এগিয়েছে, স্বাতি যেন জ্বালাতন হয়ে বলে উঠলো—"আঃ, তুমিও আবার এসে অনাথকাকা! এখন বাগড়া দেবে, তারপর দেখবে কে বেশী খুঁত ধরতে পারে, তোমাদের যা কাজ।" চা ঢালছিল লাহিড়ীমশাইএর কাপটা নিয়ে। বলল—"এঁদের নিয়ে যাও বাবা ঘরে, লক্ষ্মীটি।"

বেশ রাত হয়ে গেল। ওরা যখন ফিরছে, মাঝপথেই রজতের সঙ্গে দেখা; কোন বিপদ আশংকা করে, হয়তো মোটরের কিছু গোলমাল—একজন মেকানিক ড্রাইভারকে নিয়ে আসছিল।

নিজের বাসার বারান্দায় বসে ছিল প্রশান্ত। সময়টা মাঘের শেষ। শীত আছে, বিশেষ করে গভীর রাত্রি তো, তবু সেই শীতল হাওয়ায় বসন্তও যেন কোথা থেকে এসে তার আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে এক একবার। শুক্লপক্ষের প্রথম দিক—বোধ হয় অষ্টমী কি নবমী, আকাশে অর্ধস্ফুট জ্যোৎস্না। এর সঙ্গে আজ যেটুকু হোল তার কোথায় একটি বেশ মিল রয়েছে যেন—এই রকম নীরব, এই রকম অর্ধস্ফুট। এও কি জ্যোৎস্নার শতদল হয়ে ফুটবে না কোন পূর্ণিমায়?

চাঁদ একেবারে পশ্চিমে নেমে গেলে প্রশান্ত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

(ক্রমশ)
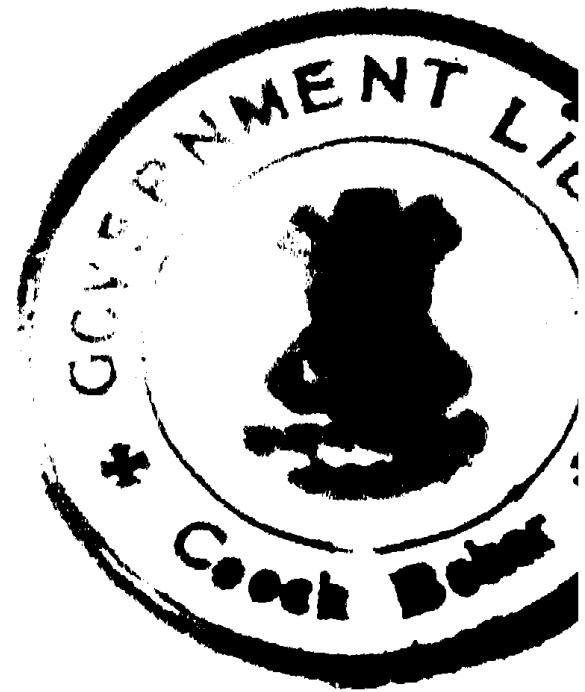
দেশে বিদেশে

॥ বাজার ॥

যদি বলা যায়, বাজারই দীর্ঘকালের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলেছে, অত্যুক্তি হয় না। কালক্রমে এই বাজারকে উপলক্ষ্য ক'রেই উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি আপদ পৃথিবীর মানুষকে ক্লিষ্ট করেছে। কে কার মাটিতে বাজার বসাবে এই নিয়ে বড় বড় বিবাদ হ'য়েছে, আজও হচ্ছে। এই চলতি বাজারেই দুটি শ্লোগান ক'দিন থেকে বড্ড বেশী কানে আসছে। ওতে যদি আমরা জড়িয়ে না পড়তাম তা'হলে হয়তো উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু উপায় নেই। আমরা ব্রিটিশ কমনওয়েলথে আছি: বৃটেনের সঙ্গে আমাদের বহু স্বার্থ জড়িত। বিশেষ এই বাজার। সম্প্রতি এই বাজারে সব চাইতে বড় শ্লোগান ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট বা সংক্ষেপে ই, সি, এম; এরই সমসাময়িক শ্লোগান হচ্ছে এফটা বা ইউরোপীয়ান ফ্রী ট্রেড এসোসিয়েশান। বৃটেন জানিয়েছে সে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট বা ইউরোপীয় বারোয়ারী বাজারে আছে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মাণী, ইতালী বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গ। ইউরোপীয় এই বারোয়ারী বাজারে বৃটেন যোগ দেবে কিনা এই নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। পদস্থ ব্যক্তিরা কমনওয়েলথ দেশগুলি সফর ক'রে ফিরেছেন, উদ্দেশ্য, কমনওয়েলথ দেশগুলির প্রতিক্রিয়া বুঝে আসা। কমনওয়েলথের নিজস্ব একটা বাজার আছে। বৃটেন যদি ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ভিড়ে যায় তবে কমনওয়েলথ দেশগুলির ক্ষতি হবে কিনা। ভারতবর্ষের অনেকেই আপত্তি জানিয়েছেন; তাঁরা আশঙ্কা করেন, ভারতের কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে এর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে। সফরকারী পদস্থ ব্যক্তিরা অবশ্য আশ্বাসও দিয়েছেন। এ মাসের শেষে পার্লামেণ্টে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ইউরোপীয় বাজারে যোগদানের ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই দলের এক সদস্য এই প্রস্তাবের জন্য তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেছেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান বলেছেন, চূড়ান্তভাবে যোগদানের আগে, প্রত্যেকটি বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হবে এবং তারপর পার্লামেণ্টের অনুমোদনের জন্য আসা হবে। শ্রমিক বিরোধী দলনেতা মিঃ গেটস্কেল বলেছেন, যোগদানের শর্তগুলো চূড়ান্ত করার আগে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীবর্গের সম্মেলন ডাকবেন কি? বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এমন একটি সম্মেলন হলে আমি সবচাইতে বেশী খুশী হব। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে প্রত্যেকটি প্রশ্নে কমনওয়েলথের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। এদিকে জানা গেল, ইউরোপীয়ান ফ্রী ট্রেড এসোসিয়েশান বা এফটার সদস্যরাও এই ইউরোপীয় বাজারে যোগ দেবেন। এফটায় আছে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ড। আমরা ভাবছি, বাজারটা যখন নিছক স্বার্থের তখন—যারা গোষ্ঠীবহির্ভূত থাকছে বা থাকবে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হবে না তো? কারণ, দল বাঁধে লোকে আত্মরক্ষার জন্যই, অর্থাৎ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা।

॥ গৃহহীন ॥

লোক-গণনার মোটামুটি হিসেবে জানা গেছে কলকাতার ফুটপাথে ১৯,০০০ লোক ঘুমোয়। এরা সবাই ভিখিরী নয়। এদের মধ্যে রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা ও অন্যান্য শ্রমজীবীও আছে। এদের কোনো আস্তানা বা আশ্রয় নেই। সারাদিন পরিশ্রমের পর এরা, পথচারীদের আনাগোনা যখন কমে আসে তখন ফুটপাথে গা ঢেলে দেয়। লোক-গণনার হিসেব চূড়ান্ত হয়নি এবং জানা যায়নি, কেবল ঘুমোনো নয়, হামেসা যারা ফুটপাথে থাকে (এমন কি সপরিবারে থেকে বংশবৃদ্ধি করে), তাদের সংখ্যা কত; তাদের এই অস্তিত্বের সামাজিক তাৎপর্য কি। এরা গৃহহীন এবং একেবারেই নিরলম্ব। কিন্তু কলকাতায় আশ্রয় বা আবাস স্তরে স্তরে ভাগ করা যায়। এমন গৃহ আছে যা গৃহপদবাচ্য নয়, কিন্তু সেখানে মানুষ বাস করে। এমন পল্লী আছে যেখানে সুস্থ লোকের মুহূর্ত অবস্থানও সম্ভব নয়; সেখানে মানুষ আছে। যারা কোনকালেই ফুটপাথে নামতে পারবে না, সংস্কার বা অভ্যাস বা রুচিবশে বস্তিতেও কুটির নিতে পারবে না অথবা পারে না, গৃহাভাবের সমস্যা তাদের কাছে এক ভীষণ সংকটের মতো দেখা দিয়েছে। প্রথমত ভাড়া বেড়েছে, তা তারা দিতে রাজী আছে, তবু পাওয়া যায় না। সন্দেহ নেই, যত বাড়ী ভাড়ায় পাওয়া যায় তার অন্তত দুই তিনগুণ চাহিদা আছে। যত চাহিদা তত ভাড়া বাড়ে। কিন্তু ভাড়াও সমস্যা নয়, কেন না, বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন আছে, বাড়ীওয়ালারা এখন সে পথ মাড়ান না। ভাড়াটা সর্বোচ্চ অংকরেখায়
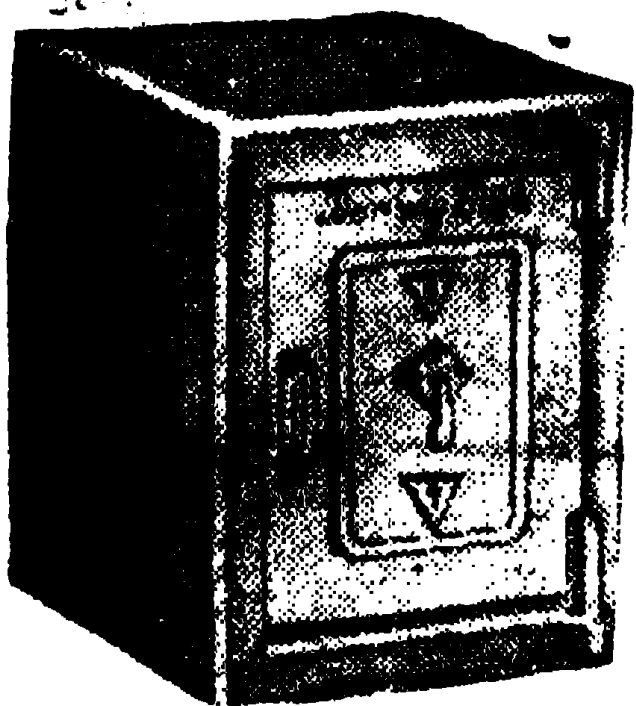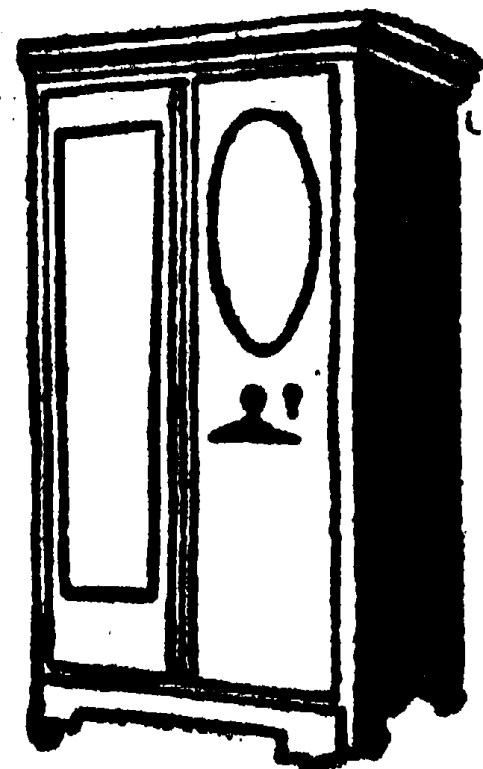
রেখে অন্য নানা উপায়ে ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে অলিখিত টাকা আদায় করে থাকেন কোনো কোনো বাড়ীর মালিক। এমনও গল্প শোনা যায় যে, ভাড়াটিয়াদের গরজের আগাম টাকা দিয়েই বাড়ী তৈরী হয়ে যায়; অর্থাৎ নির্মীয়মান অবস্থায়ই বাড়ী ভাড়া হয়ে যায়। তবু যদি বাড়ী পাওয়া যেত! একই ঘরে মস্ত এক পরিবার; এর নৈতিক প্রশ্ন তো নেই-ই, একই ঘরে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। বাড়ীতে অতগুলো লোক এক ঘরে, স্বাস্থ্যের কথা ওঠেই না, মানসিক স্থৈর্য কি ক'রে থাকবে? এই রকম পাশাপাশি ঘরে এক একটি পরিবার। পরস্পরের কলহ, নিন্দাবাদ, অসূয়া দ্রুতগতিতে বাড়ে। তবু এই একটি ঘর না পেলে ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হ'তে পারছে না।

এই সামাজিক সমস্যাটি সম্পর্কে আমাদের ঔদাসীন্য পরম লজ্জার। মানুষের খাদ্যসমস্যা ও খাদ্যোৎপাদন যেমন অগ্রাধিকার পায়, বাসস্থানও তেমন অগ্রাধিকার পায় না কেন? খাদ্য-সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানও যদি হয় তবে নীতি বলুন, স্বাস্থ্য বলুন বা অন্যান্য সামাজিক বা মানসিক প্রশ্ন বলুন, সব কিছুরই বহুলাংশে সুরাহা হয়। স্বামী-স্ত্রীর জন্য ঘর চাই, ছেলেমেয়ের পড়ার জন্য ঘর চাই, রোগীর জন্য ঘর চাই। গোটা জাতকে সর্বতোভাবে সুস্থ ক'রে বাঁচাতে চাইলে সকল সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরই এই সমস্যাটিকে যুদ্ধকালীন জরুরী সমস্যা বলে মনে করা উচিত। আজকে যুব-শক্তির মধ্যে আমরা নানা রকম ত্রুটি খুঁজে ফিরি, কিন্তু তাদের পরিবেশ এবং ২০।৩০।৫০ বছর আগেকার কলকাতার পরিবেশকে যারা তুলনা করতে পারেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন, ছেলেরা সন্ধ্যেবেলা থেকে রাততক বাড়ীর বাইরে রাস্তায় কেবল আড্ডার জন্যই কালহরণ করে না। মোট কথা, এই একটি অনিবার্য সমস্যার জন্য গোটা জাতটাই সর্বতোভাবে ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে।

॥ গোরেশ্বর ॥

আসাম সরকার গৌহাটি গুলী-বর্ষণ ও গোরেশ্বর হাঙ্গামার বিচার বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট দুটি প্রকাশ করেছেন এবং কমিশনের মন্তব্য ও সুপারিশ মেনে নিয়েছেন। গৌহাটি গুলীবর্ষণ তদন্ত রিপোর্টে গুলীবর্ষণ সযৌক্তিক বলা হয়েছে। গোরেশ্বর তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, এখানকার হাঙ্গামার সঙ্গে গৌহাটি গুলীবর্ষণের কোনো সংস্রব নেই। এই হাঙ্গামা আকস্মিক নয়, পূর্বপরিকল্পিত। বিক্ষিপ্তও নয়, বেশ সুসম্বদ্ধভাবে এ পরিচালিত হয়েছে এবং এর পেছনে এমন লোক ছিল যাদের অবলম্বিত পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং বাস, ট্রাক, জীপ, এমন কি আগ্নেয়াস্ত্রও জোগাড় করতে পেরেছিল। রাজ্য সরকারের স্মারকলিপি অনুসারেই এই হাঙ্গামা ২৫টি গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল; ৪,০১৯টি কুটির ও ৫৮টি আধাপাকা বাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস নতুবা বিনষ্ট বা অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। এই সব বাড়ীতে ১,৫০০ পরিবার বাস করত। হাঙ্গামায় নরজন মারা গেছে, তার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। গৃহগুলি বাঙালীর এবং হতাহতেরাও বাঙালী; ১০০ জন আহত হয়েছে। রাজ্যসরকারের হিসেব মতো অগ্নিদাহ ও লুণ্ঠনে যথাক্রমে ৪,০৮,৮০০ এবং ১,৩৬,৫৫০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। ৪ঠা জুলাই থেকে ৬ই জুলাই অবধি হাঙ্গামা চলে। হাঙ্গামাকারীরা নয়টি বাস, অনেকগুলি ট্রাক, লাঠি, দা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে। লুণ্ঠিত দ্রব্যও বাস ও ট্রাকে নেওয়া হয়েছে। কোনো রকম মন্তব্য না করে আমরা তদন্ত কমিশনের দুটো রিপোর্টই কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি (যিনি বলেছিলেন, গোটাকতক পর্ণ কুটির মাত্র গেছে!) ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে (যিনি বলেছিলেন, সম্পূর্ণ নিরাপদ!) পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

কমিশন বলেছেন, হাঙ্গামা নিবারণ-যোগ্য ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। কমিশন কয়েকজন অফিসারের শৈথিল্য সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন এবং রাজ্য-সরকার তা মেনে নিয়েছেন।

গৌহাটি গুলীবর্ষণ তদন্ত কমিশনের ভার ন্যস্ত হয়েছিল তৎকালীন আসাম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী সি, পি, সিনহা এবং গোরেশ্বর হাঙ্গামা তদন্ত কমিশনের ভার ন্যস্ত ছিল আসাম হাই-কোর্টের বিচারপতি গোপালজী মেহে-

রোয়ার উপর। আসাম সরকারকে ধন্যবাদ যে তাঁরা রিপোর্ট দুটি বের করার সংসাহস দেখালেন।

॥ ঘূর্ণিবায়ু ? ॥

"আর কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। আপনাআপনিই আবার যুদ্ধ শুরু হবে। তখন সারা তিউনিসিয়া আর আলজেরিয়া প্রবল এক ঘূর্ণিবাতার মধ্যে পড়বে।" তিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট মিঃ হবিব বুরগুইবা এক মার্কিণ সংবাদদাতার সংগে আলোচনাকালে এই কথাগুলো বলেন। প্রসংগটি ছিল তিউনিসিয়া। তিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট স্বীকার করেন যে, বিজার্তা সংকটের পর তিউনিসিয়ার পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তন করতে হবে। কারণ, "ফ্রান্স যখন আমাদের বোমা ফেলে আর সাহায্য করে অন্য দেশ, তখন পরিবর্তনের কথা ভাবতেই হবে। পশ্চিমের সংগে বন্ধুত্ব ছিল বলে রুশিয়া বা চীন আগে সাহায্য করতে চায়নি। এখন নতুন করে মিতালী পাতানোর কথা ভাবতেই হবে। গোলমালটা বাধল এই জন্য যে আমরা সব রকম ফরাসী দখলের অবসান দেখতে চেয়েছি। মীমাংসার পথে অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। কিন্তু ফরাসীরা (বিজার্তার) ঘাঁটিটা বাড়িয়েই যাচ্ছিল। এই হল উটের পিঠে শেষ তৃণখণ্ড। তখন আমি ঘাঁটি অবরোধের সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রতীক প্রতিবাদ। রাষ্ট্রপুঞ্জ সাহায্য করতে পারে বৈকি। যদি না পারে তো ওর থাকার কি দরকার? তবে সেই আরণ্যক আইনই হ'ল—আন্তর্জাতিক আইনের হ'ল মৃত্যু। আমাদের ভূখণ্ড থেকে ফরাসী সৈন্য অপসারণে আমেরিকা সাহায্য করুক না। এখান থেকে শেষ ফরাসী সৈন্যটি না যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের শেষ হবে না।" মার্কিণ সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, ফরাসীরা যদি না যায় তো আপনি কি আবার যুদ্ধের আদেশ দেবেন? উত্তরে তিনি সর্বপ্রথম উদ্ধৃত কথাগুলো বলেন এবং সেই সংগে বলেন, আমাকে আর যুদ্ধারম্ভের হুকুম দিতে হবে না। যুদ্ধ আপনাআপনিই শুরু হবে। তখন ঘূর্ণিবায়ু।

॥ লরী ॥

কলকাতা থেকে আর একটি কৌতুকপ্রদ খবর পাওয়া গেছে। লরী ধর্মঘটের ফলে ২রা আগষ্ট কলকাতা, হাওড়া ও শহরতলী পথে লরী চলাচল করেনি। কৌতুকপ্রদ এই কথাটি নয়। কৌতুকপ্রদ হচ্ছে এদিন কোথাও মারাত্মক দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। লরীর সংখ্যা নাকি হাজার ছাব্বিশ। নাগরিকেরা অতঃপর লরী ধর্মঘটের কথা শুনে হয়তো বলবেন, আজ নিশ্চিন্ত, পথ চলায় কি আরাম!

॥ বিপর্যয় ॥

কলেজ-ভর্তির কথাটা আরও একবার বলতে হয়। আমরা জানি, স্কুলে ভর্তি হওয়া কম কঠিন ব্যাপার নয়—যদি স্কুল বাচাই-বাছাই করা যায়। সব স্কুলে সব ছাত্র ভর্তি হ'তে পারে না এবং খারাপ স্কুলে ভাল বা মেধাবী ছাত্রও নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে জেনেও অভিভাবকদের গত্যন্তর থাকে না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে-ছেলে প্রথম দিকে ভালো করতে পারেনি, সে ক্রমশঃই ভালো করতে থাকে। তবু এ-সমস্যা নিয়ে আমরা অত মাথা ঘামাই না যত ঘামাই কলেজ ভর্তি নিয়ে; কেননা, এখানে অপচয়টা যেন প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। কেন, কলকাতায় এই ভিড়, স্থানাভাব এবং বিপর্যয়? এ-কথাটা সরকারের জানা। তাঁরা জানেন, সরকারী কলেজ সংখ্যালঘু, ভালো বে-সরকারী কলেজ যা আছে, তা কলকাতায়, মফঃস্বলের কলেজগুলিতে কেবল বিজ্ঞান পড়ার অসুবিধে নয়, কলা শাখারও মনোমত বিষয় নিয়ে পড়তে পারা যায় না—অনার্স নিয়ে তো নয়ই। আবার ঐ অনার্স না নিলে না হয় মর্যাদা না পাওয়া যায় স্নাতকোত্তর শিক্ষার পাশপোর্ট। এমন অবস্থায় যখন রাজ্যসরকারের শিক্ষামন্ত্রী বা শিক্ষা-বিভাগ বলেন, মফঃস্বলের ছেলেগুলো এখানে মরতে আসে কেন, তখন এই সজ্ঞান ঔদাসীন্যে বিস্মিত হ'তে হয়। কলকাতায়, প্রেসিডেন্সী কলেজ একটিই আছে, আর কোথায় আছে পশ্চিমবংগে? অথবা বেবোর্ণ কলেজও একটিই, আর কোথায় আছে? বে-সরকারী সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজও কলকাতায়, আর কোথায় এর সমপর্যায়ের কলেজ? বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা কলকাতায় যা আছে, মফঃস্বলে তার সিকি অংশ আছে? কলকাতায় নানা বিশিষ্ট ব্যক্তি আসেন, সেমিনার, বক্তৃতামালা কলকাতায়ই হয়। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ন্যাশনাল লাইব্রেরী—সবকিছু কলকাতায়। কলকাতায় যত মেডিকাল কলেজ, বড় বড় হাসপাতাল, কলকাতার আশেপাশেই দু'-তিনটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। মফঃস্বলে ক'টা মেডিকাল কলেজ আছে? স্কুল বলে যা ছিল, তাও তো ডাঃ রায় তুলে দিয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কথা কল্পনাই করা যায় না। কার্যত ব্যবস্থা হবে কলকাতাকে সব শিক্ষার কেন্দ্র করা আর বলা হবে মফঃস্বলের ছেলেরা এখানে কেন? কেন, তারা কি এ-রাজ্যের অধিবাসী নয়—কলকাতায় থাকেনি বলে কি তাদের ভালো শিক্ষা পাবার অধিকার কিছু কম? সরকার প্রত্যেকটি মফঃস্বল কলেজে, বিজ্ঞান অনার্সের অবাধ সুবন্দোবস্ত করুন, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী অথবা কলকাতার মতো সমপর্যায়ের কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করুন, মফঃস্বলের ছেলেরা অন্ততঃ ওসব শিক্ষার জন্য কেউ আসবে না কলকাতায়। মফঃস্বলে আইন পড়াবার, কমার্স পড়াবার কোন ব্যবস্থা নেই। কেন নেই? মফঃস্বলের ছেলেরা এসব পড়তে আসবে না এখানে? কার্যত, মফঃস্বল অঞ্চলকে, শিক্ষা বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে কানা করে রেখে মফঃস্বলের ছাত্রদের জন্য কলকাতার পথ রুদ্ধ করার আর্তনাদ সুস্থতার লক্ষণ নয়। রাজ্য-সরকার অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রে মফঃস্বল ও কলকাতার প্রতি সমদৃষ্টি দিন, সুফল পাবেনই।

৩-৮-৬১

ঘটনা-প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২৮শে জুলাই—১২ই শ্রাবণ : কলেজে ছাত্র-ভর্তির সমস্যা সমাধানে উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্র (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ও ছাত্র-প্রতিনিধিদের দীর্ঘ আলোচনা—সংশিলষ্ট আন্দোলনের সমর্থনে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে ছাত্রদের ধর্মঘট পালন।

আগামী সাধারণ নির্বাচনে (১৯৬২) ভোটদাতার সংখ্যা ২১ কোটি হইবার সম্ভাবনা—সংসদীয় কেন্দ্রসমূহের জন্য সাদা ও বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য গোলাপী ব্যালটপত্রের প্রস্তাব।

২৯শে জুলাই—১৩ই শ্রাবণ : বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা) প্রাঙ্গণে ছাত্রদের পাঁচদিবসব্যাপী অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাহৃত— দ্বিতীয় পর্যায়ে কলেজে কলেজে আন্দোলন (ভর্তি প্রভৃতি সমস্যার সমাধান দাবীতে) চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯৬২) শেষ সপ্তাহে দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান—ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের সম্মতি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্রী কে. ভি. কে. সুন্দরমের ঘোষণা।

৩০শে জুলাই—১৪ই শ্রাবণ : আসাম পরিস্থিতি প্রসঙ্গে নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত আসামের অন্যতম সচিব মিঃ মৈনুল হক চৌধুরীর দীর্ঘ বৈঠক—কাছাড়ের সাধারণ রাজনৈতিক প্রশ্ন ও পার্বত্য অঞ্চলের অবস্থা বিশেষভাবে পর্যালোচনা।

গোয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি পরিবর্তনের দাবী—বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের প্রস্তাব—দিল্লীতে ছয় দিবসব্যাপী জাতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি।

৩১শে জুলাই—১৫ই শ্রাবণ : যাত্রী ভীড় হ্রাসের জন্য কলিকাতায় শূন্যপথে কিংবা ভূগর্ভ দিয়া বৈদ্যুতিক যান চালনার জরুরী প্রয়োজনীয়তা—কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্পোরেশনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ীর ভাষণ।

গৌহাটি ও গোরেশ্বরের হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ—কমিশন কর্তৃক গৌহাটিতে গুলীচালনা সমর্থন—গোরেশ্বরের ঘটনা পূর্বে পরিকল্পিত বলিয়া মন্তব্য।

১লা আগষ্ট—১৬ই শ্রাবণ : দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বাসভবনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ইস্তাহার সাব্-কমিটির বৈঠক— পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার (১৯৬২) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।

নার্সিং হোমে (দিল্লী) ১১ দিন অবস্থানের পর রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রত্যাবর্তন—আরও কিছুকাল চিকিৎসাধীন থাকার কথা।

২রা আগষ্ট—১৭ই শ্রাবণ : আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান-গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী—কলিকাতার বিভিন্ন স্থলে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত— নানা সভায় আজীবন শিক্ষাব্রতী ও দরদী মহামানবের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন।

সাংবাদিকতায় কৃতিত্বের জন্য শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ('যুগান্তর'-এর সহ-সম্পাদক) কর্তৃক ১০ হাজার ডলার ম্যাগসেসাই পুরস্কার লাভ—ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম গৌরব অর্জন।

দাদরা ও নগরহাভেলির (পর্তুগীজ কবলমুক্ত ছিটমহল) ভারতভুক্তির আয়োজন—লোকসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনকালে আবশ্যক বিল উত্থাপনের প্রস্তুতি।

৩রা আগষ্ট—১৮ই শ্রাবণ : 'তৃতীয় পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিক) ভারতবাসীর সামর্থ্যের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ'—চূড়ান্ত রিপোর্টে স্বাক্ষরদানের পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য— পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনেই রিপোর্ট (৭৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী) পেশ।

সরকারী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতির পরিবর্তন দাবী—সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের উদ্যোগে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদ-দিবস পালন।

॥ বাইরে ॥

২৮শে জুলাই—১২ই শ্রাবণ : মার্কিণ সিনেটে সামরিক খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের দাবী গৃহীত—কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকার না করার পূর্ব সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা।

পর্তুগালের সহিত পশ্চিম আফ্রিকান রাজ্য সেনেগালের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন, সেনেগাল সরকারের কার্য-ব্যবস্থা।

২৯শে জুলাই—১৩ই শ্রাবণ : কলিকাতা মহানগরীর বহুমুখী উন্নয়নের জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন কর্তৃক ১৪ লক্ষ ডলার সাহায্য মঞ্জুর— ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের (নিউইয়র্ক) পক্ষ হইতে ঘোষণা।

১৯৮০ সালের মধ্যে সোভিয়েট-বাসীদের বিনামূল্যে খাদ্যদান—সোভিয়েট ইউনিয়নের সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিংশ বার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষিত— ২০ কোটি সোভিয়েটবাসীকে বিনামূল্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সরবরাহেরও প্রতিশ্রুতি।

আণবিক পরীক্ষা পুনরারম্ভ না করার জন্য ভারতের দাবী—রাষ্ট্রসংঘের নিকট উপস্থাপিত স্মারকলিপি মারফত সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শক্তিগুলির নিকট অনুরোধ।

৩০শে জুলাই—১৪ই শ্রাবণ : ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিউনিসিয়াকে সাহায্যদানে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র প্রস্তুত— অবিলম্বে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণের আয়োজন।

'জার্মান বা বার্লিন সমস্যা লইয়া কোন যুদ্ধ বাধিবে না'—পূর্ব জার্মান সরকারের ঘোষণা।

৩১শে জুলাই—১৫ই শ্রাবণ : ইউরোপের সাধারণ বাজারে যোগদানের জন্য বৃটেনের আগ্রহ—আলোচনা চালাইবার আবেদন জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ—কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।

ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে মালয়, ফিলিপাইন এবং থাইল্যাণ্ডের মিলিত সংস্থা গঠন—সংশিলষ্ট তিনটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণের যৌথ ঘোষণা।

১লা আগষ্ট—১৬ই শ্রাবণ : 'ন্যাটো'র আণবিক অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি সম্পর্কে পশ্চিম জার্মানী ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতৈক্য—বিদেশী বিমান সংক্রান্ত পূর্ব জার্মানীর নির্দেশ কার্যকরী।

বিজার্তা সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন আহ্বানের দাবী—প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত উদ্যম।

২রা আগষ্ট—১৭ই শ্রাবণ : কম্যুনিষ্ট চীনের রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদভুক্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বাধা দিয়া যাইবে—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডী ও জাতীয়তাবাদী চীনের (চিয়াং চীন) ভাইস-প্রেসিডেন্ট চেন চং-এর যুক্ত ইস্তাহারে সদম্ভ ঘোষণা।

'বৃটেনের সাধারণ বাজারে যোগদানের প্রশ্ন আলোচনার জন্য কমনওয়েলথের সম্মেলন আহ্বান করা হইবে'—কমন্সসভায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের উক্তি।

৩রা আগষ্ট—১৮ই শ্রাবণ : এই বৎসরের (১৯৬১) মধ্যেই জার্মান শান্তি চুক্তি সম্পাদনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের বিবৃতি—পশ্চিমী ত্রিশক্তির নিকট নোট প্রেরণ।

'টিউনিসীয় বন্দীদের প্রতি সদাচরণ দাবী, অন্যথা পাল্টা ব্যবস্থা'—ফ্রান্সকে লক্ষ্য করিয়া টিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বোরগুইবার সতর্কবাণী।

অমরলতা

আশাপূর্ণা দেবী

রোদে ঝাঁ ঝাঁ দুপুর।

বেরোতে ইচ্ছে হচ্ছে না, কাজে মন বসছে না, হঠাৎ বাইরে কড়া নড়ে উঠল। ভাবলাম মন্দ কি, যদি কেউ খানিক আড্ডা দিতে আসে!

আড্ডা দিতে নয়, ওরা দুজনে এসেছে একসঙ্গে প্রণাম করতে। এই মাত্র বিয়ে করে এসেছে, আমারই কাছে আগে এসেছে আনন্দে ছলছল করতে করতে।

আমার নিতান্ত স্নেহের পাত্র-পাত্রী দুটি। আমি ওদের অনেক ব্যাকুলতা, অনেক উৎকণ্ঠা, অনেক বিরহাশংকা আর অনেক সংগ্রামের সাক্ষী। দুপক্ষেরই অভিভাবকবর্গ আটকাতে চেয়েছিল এ বিয়ে, শেষ পর্যন্ত ওরাই জয়ী হয়েছে। ওদের প্রেম ওদের শক্তি জুগিয়েছে। আমার কাছে ছিল ওদের প্রেমের সমর্থন। হয়তো আমি ওদের অভিভাবক নয় বলেই ছিল।

পাশাপাশি বসলো ওরা, আমার সামনাসামনি। বিয়ের সজ্জা নেই বলে দেখালো দীর্ঘদিনের বিবাহিত দম্পতির মত: কিন্তু ওই যে ওদের চোখের স্বপ্নাভাসটুকু, মুখের পরিতৃপ্তির মধুর মসৃণতাটুকু, ওই তো বিবাহ-সজ্জা।

তাকিয়ে দেখলাম।

কত সহজ কত স্বচ্ছন্দ এরা! পরস্পরকে জেনে বুঝে মিলেছে, তাই ওদের চোখে নেই আশংকার ধূসর কুয়াশা, দেখে বেশ লাগল। এইতো সুন্দর, এইতো স্বাভাবিক, অথচ এখনো কী প্রথাই রয়েছে দেশজুড়ে! সেই প্রাচীন অর্বাচীন প্রথা! সেই নাপিত পুরুত, ভাঙা কুলো, চালকলা শ্রাদ্ধ পিণ্ডি, সেই গাঁটছড়া, গায়ে হলুদ, হাতে সুতো সাত পাক, ধোঁয়া আগুন, উপোস মাথাঘোরা, আরও কত অসংখ্য! ভাবতে গেলেই মাথা ঘুরে আসে।

বলে 'লাখকথা নইলে বিয়ে হয় না'। আর লক্ষটা উপকরণ নইলেই কি হয় এই হতভাগা দেশে? এ প্রথা যে এখনও কি করে বলবৎ রয়েছে, ভেবে দিশে পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বিস্ময়কর—সম্প্রদান! আস্ত একটা সাবালক মেয়ে হয়তো গ্র্যাজুয়েট, হয়তো তারও অনেক বেশী, অভিভাবক তাকে ধরে অজানা অচেনা একটা বরের হাতে 'দান' করছেন! বুদ্ধিসুদ্ধিসম্পন্ন পুরো একটা মানুষ দাতা আর গ্রহীতার মাঝখানে জড় বস্তুর ভূমিকাটুক নিয়ে বসে থাকছে গায়ে গহনা-পত্র জড়িয়ে।

তবু মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দেয় এই ব্যতিক্রমেরা। এইটুকুই আশা।

বললাম ওদের, "এমন দিনে এসেছিস, কি খাবি তাই বল।"

ওরা হৈহৈ করে উঠল, 'অসম্ভব বাস্, এখন আবার খাওয়া! কিচ্ছুটি না। বিরাট খাওয়া হয়েছে আজকে—" কনে অপাঙ্গে বরের দিকে দৃষ্টি হেনে হেসে বলল, "ও আজ আমাকে 'মোকাম্বো'তে খাইয়েছে।"

হেসে বললাম, "তবু ভাল। ভাবছিলাম আজ হয়তো শুধু মানস-ভোজেই—"

বর হেসে উঠল; "মোটেই তা' নয়। খাওয়ানো হয়েছে দস্তুরমতো পার্স হালকা করে। খেয়ে নিয়ে সোজা রেজিস্ট্রী অফিসে, সেখান থেকে সোজা এই আপনার কাছে। এখন আর কিচ্ছু চলবে না।"

"একেবারে কিচ্ছু না?" বললাম, "কফি? শরবৎ?"

"উঁহু, শুধু এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল।"

জল দিতে গিয়ে হঠাৎ মনে হ'ল ওদের মুখে ওই যে পরিতৃপ্তির মধুর মসৃণ ছায়া, ওর মধ্যে কি 'মোকাম্বো'র

অবদানও কিছু কাজ করছে! কিন্তু কেন মনে হল?

ওদের জন্যে একসেট্ বই রেখে-ছিলাম, দেখে খুশীতে উছলে উঠল ওরা, কিন্তু নিল না, বলল, "আজ থাক, এখন বাড়ী ফিরছি না। সিনেমার টিকিট কাটা রয়েছে, ম্যাটিনী শোয়।"

"ম্যাটিনী শো? এই গরমে!"

মেয়েটা রহস্যময় মধুর হাসি হাসল, "ইভ্‌নিঙের আর একটা কাটা আছে। একটা ও আমাকে দেখাচ্ছে, একটা ওকে আমি দেখাচ্ছি।"

"মন্দ নয় তো!" হেসে উঠলাম, "সংসার করতেও এই নীতি না কি? একবেলা ও তোকে খাওয়াবে, একবেলা তুই ওকে খাওয়াবি?"

"উঁহু! মোটেই না", ছেলেটা হেসে ওঠে, "সে বিষয়ে খুব ওস্তাদ! বলেছে ওর টাকা ও শুধু যা খুশি করবে, আর যত খুশি শাড়ী কিনবে।"

আবার হাসি আমি, "আসল খরচাটাই তো তা'হলে বেচারা নিজের ভাগে রেখেছে! শাড়ীর খরচ পোহাতে না হলে তোর আর খরচাটা কি?...যাক, উঠেছিস এক্ষুণি?"

"হ্যাঁ, আর না গেলে সিনেমা শুরু—"

"বইগুলো নিলি না তাহলে?"

"আজ নেব না। সুবিধেমত একদিন একটা প্রীতিভোজ দেব ভাবছি, সেদিন দেবেন।"

তাও তো বটে, সবই তো নিজেদের করতে হবে ওদের, মা বাপ তো বিমুখ।

"যাবেন সেদিন, দেখবেন ফ্ল্যাটটা কি রকম গুছিয়ে নিয়েছি।"

"তাই না কি? এর মধ্যে গোছালি করে?"

"যবে থেকে পাওয়া গেছে ফ্ল্যাটটা। এই দিন পনেরো ধরে ওই কর্মই তো হচ্ছে দু'জনে। চষে বেড়াচ্ছি কলকাতার বাজার।"

"একটা পর্দা খুঁজতে সেদিন?" ঝঙ্কার দিয়ে ঝলমলিয়ে হেসে উঠল কনে বরের দিকে দৃষ্টি হেনে। সেই ঝলমলে মুখে সাদা সিঁথিটা একটু কেমন বেমানান লাগল আমার চোখে। বলে ফেললাম, "সিঁদুর পরবি না?"

ও আবদার আর অভিযোগের সুরে বলে উঠল, "দেখুন না সেই নিয়েই তো এতক্ষণ ঝগড়া হচ্ছিল। আমার এত ভাল লাগে সিঁদুর, ও বলছে পরতে দেবে না।"

ছেলেটার দিকে শাসনচক্ষু ফেললাম আমি, "কেনরে, এ কথা বলেছিস কেন?"

"বলেছি, একটা অর্থহীন কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেব না বলে। ফিলজফিতে এম, এ, মেয়ের এই সেকেলে সাধটা অমার্জনীয়।"

"নেল্‌পলিশ লিপস্টিকের মত ওটাকেও একটা প্রসাধনের দ্রব্য বলে মেনে নিতে পারিস।"

"দেখলে তো?" মেয়েটা বরের দিকে চেয়ে হৈ হৈ করে দুহাতে তালি দিয়ে উঠল চটাপট, "ঠিক এই কথাই বলছিলাম না আমি?...বুঝলেন, এতক্ষণ ধরে আমিও এই যুক্তিই দেখাচ্ছি, তা কিছুতে মানছে না। বলছে, আমি না কি ভিতরে ভিতরে সেই প্রপিতামহীর সংস্কারগ্রস্ত। যাক্‌গে ও যখন শুনবেই না!"

চলে গেল ওরা।

খুশীতে ডগমগ করতে করতে।

ভাবলাম সংসার করা ওদেরই সার্থক। নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো দু'টি পাখীর বাসা বাঁধার মত সাধ আর সাধ্য দিয়ে ওদের সংসারকে ওরা রচনা করছে।

কি ছিল আগের আমলে। ছিঃ। মেয়ের সংসার গুছিয়ে দেবার দায়িত্ব মেয়ের বাপের, বাপ উচিতমত 'ঘর-বসত' দিতে না পারলো তো মেয়েকে তার বাবার নাম ভুলিয়ে ছাড়া হ'তো। অথচ কী বা অপূর্ব সেই উপকরণ! বাসন কোসন বঁটি কাটারী শিল জাঁতা এই তো! এই নিয়েই সংসার পাতা। কিন্তু তাই বা পাততে পেত কে? উপকরণ তো গিয়ে জমা হ'ল শাশুড়ীর সিন্দুকে। কোনকালে যদি শাশুড়ী মরে, আর অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে যদি ভাইয়ে ভাইয়ে মনোমালিন্য ঘটিয়ে ভাসুর দ্যাওরদের থেকে আলাদা হয়ে আসা সম্ভব হয়, তবেই তো নিজের সংসার?

কী বিশ্রীই ছিল!

এখন হয়তো অতটা নেই, কিন্তু কতই বা বদলেছে? শুধু যারা এই এদের মত প্রেমকে সম্বল করে পরস্পরের হাত ধরে সাহস করে বেরিয়ে পড়ে পৃথিবীর হাটে, তারাই আস্বাদ পায় সত্যিকার সংসারের। এই তো জীবন, সভ্য সুন্দর স্বাভাবিক!

বারবার মনে মনে বললাম, ওরা ঠিক করেছে, ওরা সত্য পথ চিনেছে। শুধু মনে হ'ল, তবে পথকেই বড় বেশী চিনেছে এ যুগের ছেলেমেয়েরা, পথেই সুখ এদের, পথেই খুশী। এরা ঘর বাঁধে, কিন্তু ঘর এদের বাঁধতে পারে না।

নইলে, এইমাত্র বিয়ে করে এসে দু'দুটো সিনেমা দেখবে এরা, হয়তো বা তারপরেও ঢুকবে কফি হাউসে, অবশেষে ক্লান্তি আর অবসাদের বোঝা নিয়ে ফিরবে ওদের সেই "বাজার-চষে-বেড়িয়ে সাজিয়ে তোলা" ঘরে।

কিন্তু আর বেশীক্ষণ ভাববার সময় ছিল না। আমাকেও এখন ঘরের মায়া কাটাতে হবে। তিনটের গাড়ীতে ব্যান্ডেল যেতে হবে। আর সেও এক বিয়েরই ব্যাপার। মামাতো ভাইয়ের ছেলের পাকা দেখা।

না গেলে 'আত্মীয় অপরাধ'।

আজ পাকাদেখা, আবার ক'দিন পরে ছুটতে হবে বিয়েতে। সেই নাপিত পুরুত গায়ে হলুদ গাটছড়া, ছ্যাঁচড়া ছোলার ডালের বিয়ে! পেটেন্ট ছাঁচ! জ্ঞানোন্মেষ থেকে কত শতই দেখলাম! ভাবছি আর হৃৎকম্প হচ্ছে।

শুনতে পাচ্ছি কনেকে নাকি পাত্র-পক্ষের কেউ এখনো পর্যন্ত চাক্ষুষ

দেখেননি, ফটো দিয়েই কাজ সারা। লক্ষ্মৌ না কাণপুর কোথাকার যেন কনে, দু'পক্ষের কারুরই সুযোগ হয়নি যোগাযোগ স্থাপন করবার, পত্রযোগে যোগ ঘটিয়েছেন দূর-সম্পর্কের এক প্রবাসী-আত্মীয়, যিনি না কি ওপক্ষেরও কেউ। উক্ত 'দূর-আত্মীয়' যদি ও পক্ষকে টেনে এ পক্ষে 'দুরাত্মা'র ভূমিকা গ্রহণ করে বসে থাকেন, বলার কিছু নেই। তেমন ঘটলে 'কপাল' নামক নন্দ ঘোষকেই দায়ী করা হবে।

অথচ মামাতো ভাইয়ের এই [illegible] দস্তুরমত উচ্চশিক্ষিত, এবং নাকি নানা ব্যাপারে অতি-প্রগতিশীল, তথাপি অ-দেখা কনেকে বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই।

এই আদিমকালের বর্বর প্রথাটা যে কবে দূর হবে! সসৈন্যে হানা দিয়ে কন্যা আর জিনিসপত্র লুঠ করে আনার বিকল্প ব্যবস্থায় বরযাত্রীর বাহিনী নিয়ে গিয়ে যৌতুক দানসামগ্রী এবং বস্ত্রালঙ্কার সমেত কন্যাকে প্রায় লুঠ করে আনার এই প্রথা!

কিন্তু আজকে কি আমার ভাগ্যে শুধু বিয়ে আর বরকনে! আশ্চর্য বটে!

গাড়ী কোন্নগরে থামতেই হুড়-মুড়িয়ে উঠে পড়ল এক বিবাহবাহিনী। মুহূর্তে গাড়ীতে এক হুলস্থূল কান্ড! কারণ শুধু বর নয়, **বরকনে**! আর তাদের সঙ্গে তাদের সদ্যলব্ধ বিরাট সম্পত্তিভার। কুলিদের পদভারে গাড়ী টলমলিয়ে উঠল।

এখানে গাড়ীর নিশ্চলতার মেয়াদ মিনিট দেড়েক, সেইটুকুর মধ্যে সেই ট্রাঙ্ক সুটকেস বিছানা বালিশ থালা বাটি ঘড়া পিলসুজ • বই কাস্কেট চৌকী শেতলপাটি ইত্যাদির পর্বত গাড়ীস্থ করে ফেলা সোজা ব্যাপার তো নয়!

বরকর্তার হাঁকাহাঁকি, গাড়ীতে তুলে দিতে আসা দলের মধ্যে কন্যাকর্তার বারবার সাবধান বাণী, কনের সঙ্গের ঝিয়ের কাংস্যকণ্ঠের আশ্বাস বাক্য এক-যোগে তুফান তুলেছে, তারই অন্তরালে সেঁথি সেই চিরপরিচিত লাল শাড়ী পরা বধূমূর্তি! এক সমবয়সী সখীর হাত ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছে। হয়তো ওটি পিঠোপিঠি বোন, হয়তো বা আর কেউ, তারও এখন আর ক্ষমতা নেই সান্ত্বনা-দানের, অতএব সেও মুহ্যজনের পথ অনুসরণ করেছে।

বরের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, সে একবার বরকর্তার একবার কন্যাকর্তার আর একবার সঙ্গের যুবকবাহিনীর প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছে, এবং কোনদিকেই দিতে পারছে না।

কুলিরা নেমে যেতেই বিদায় গ্রহণের পালা।

ছেলেগুলো খুব সম্ভব একশো এগারো নম্বরের যাত্রী, তাই "আচ্ছা সমীরদা, (তাই মনে হ'ল, 'মণিদা'-ও হতে পারে) আচ্ছা বৌদি, তা'হলে চলি, পাশের গাড়ীতেই রইলাম" বলে সদলে নেমে গেল স্রোতের ঢেউয়ের মত। আর কন্যাকর্তা "কিরে খুকু, কাঁদছিস কেন? ছি ছি, বোকা মেয়ে, আজকাল বুঝি কেউ কাঁদে?" বলে নিজেই প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন মেয়েমানুষের মত। কনের কান্না এবার উত্তাল হ'ল, তবু সে নীচু হয়ে প্রণাম করলো বাপের পায়ে হাত দিয়ে, এবং এই ভয়ংকর অভিভূত অবস্থাতেও সামাজিকতা বিস্মৃত না হয়ে শ্বশুরেরও পদস্পর্শ করে মাথায় ঠেকালো।

সঙ্গে সঙ্গে বরও অনুকরণ করলো সেটা।

কন্যাকর্তা তা'র মাথায় হাত দিয়ে জড়িতস্বরে বললেন, 'আমার বড় আদরের জিনিস বাবা, তুমি দেখো!' তারপর পাঞ্জাবির হাতার কোণে চোখ মুছতে লাগলেন।

সমবয়সী সেই মেয়েটি রুদ্ধকণ্ঠ কষ্টে আয়ত্তে এনে বললো, "জামাইবাবু, দেখবেন? কথা রাখবেন। মনে আছে তো?"

কে জানে সে তার জামাইবাবুকে কোন শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়ে নিয়েছে। এইবার বরের গলা শুনতে পেলাম, ধরা ধরা ভারী ভারী, তারও কি এই ভিজে আবহাওয়ার ছোঁয়াচ লাগল? বলল সে সেই ধরা গলায়, "বাঃ তুমি তো কালই আসছো।"

"তা' আসছি—" বলতে বলতে নেমে গেল সে।

নেমে গেলেন বরকর্তা কন্যাকর্তা উভয়েই।

একজন আশ্বাস দিয়ে গেলেন, "ওদের গাড়ীতেই আছি—" আর অপর-

জন দাঁড়িয়ে রইলেন প্লাটফর্মে হৃত-সর্বস্বের মত কেমন এক শূন্যদৃষ্টি মেলে।
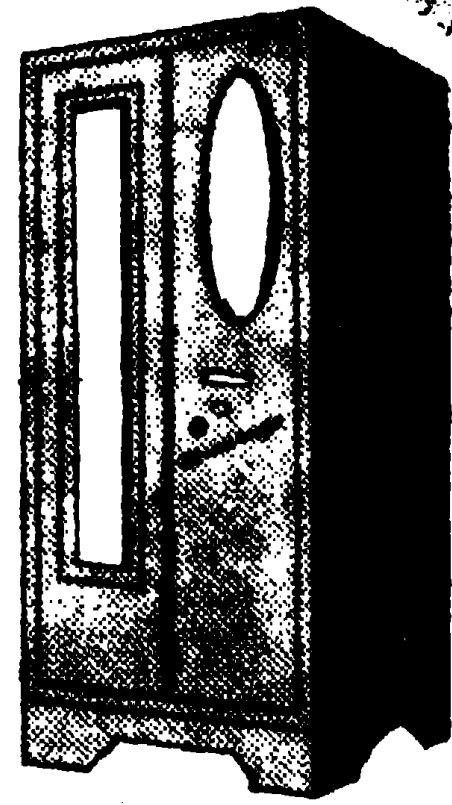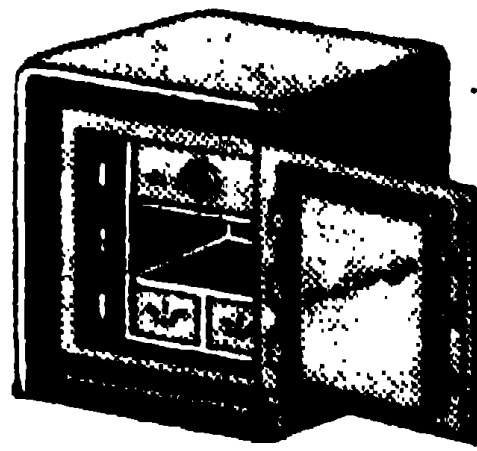
এতগুলো ঘটনা ঘটল কিন্তু ওই দেড়মিনিটেই। সিনেমার ছবির মত চোখের সামনে ঝপাঝপ ছায়া ফেলল, চলে গেল, তারপর চলন্ত গাড়ীর পর্দায় রইল শুধু গাঁটছড়া বাঁধা বরকনে, আর মাটিতে [illegible] থাকা ঝিটা।

কনের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, মাথাটা নীচু, সীঁথিমোরখানা ঝুলছে আধখানা গাল ঢেকে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেটা, সেটা হচ্ছে সীমন্তের সীমা অতিক্রম করা সিঁদুরের বাড়াবাড়ি।

ভাবলাম মফঃস্বলী কাণ্ড বটে, এক 'থান' সিঁদুর সবটাই বোধকরি ঢেলেছে মাথায়। সারা মাথা লালচে, আর সেই লালের প্রাচুর্যের মাঝখানে চিক্-চিক্ করছে নতুন সোনার টিক্‌লিটি।

সর্বাঙ্গেই স্বর্ণচ্ছটা।

শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে জরির সোনার ঝিলিক্।

একদিনের রাজারানী!

তবে রাজার অবস্থা আপাততঃ কিছু বিপর্যস্ত। সজ্জার মধ্যে বাসি চন্দন, বাসি মালা, লাটখাওয়া চেলির জোড়, আর গরদের পাঞ্জাবি। বাসর-রাত জাগার রুক্ষ চুল, আর বোধকরি কুশণ্ডিকার হোমের ধোঁয়ায় মুখ শুকনো মলিন। রণক্লান্ত সৈনিকের মতই দেখাচ্ছে বরকটা।

সোজাসুজি তাকিয়ে থাকতে পারছি না। লজ্জা করছে। ভিড়ের মধ্যে, গোলমালের মধ্যে, পারা যায়। তবু কৌতূহল হচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত করছি।

ওরা যে পরস্পরের পূর্ব-পরিচিত, এমন সন্দেহ করতে পারি—তেমন কোন প্রমাণ দেখছি না। বর ওই ক্রন্দনাভিভূতার প্রতি বারবার দৃষ্টিপাত করলেও, কনে চকিতের জন্যও না! সে খালি ফুলে ফুলে কাঁদছে।

সঙ্গের ঝিটা সান্ত্বনা দিয়ে তার মানল, 'ভয় কি আমি তো [illegible] বলে ভরসা দিয়েও ভরসা জোগাতে পারল না, তেষ্টা পেয়েছে কিনা, খিদে পেয়েছে কিনা, ডাব খাবে কিনা ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নে কনের বিরক্তি সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু করতে না পেরে শুয়েই পড়ল হতাশ হয়ে।

আমি বসে আছি জানলায় মুখ বাড়িয়ে।

বাহ্যজ্ঞানশূন্যের মতই আছি। যেন হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল জীবনে কখনো যাইনি। সাতজন্মেও দেখিনি দুপাশের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা!

তবে কিনা টের পাচ্ছি বর দাসীকে প্রশ্ন করছে, "এত কান্নার কী আছে, তোমাদের দিদিমণির? কালকেই তো দেখতে পাবে সবাইকে।"

সান্ত্বনাটা অবশ্য ফিকে ফিকে শোনাল, তবে উত্তরটা ফিকে হল না। কাংস্যকণ্ঠে ধ্বনিত হল "জামাই-বাবুর এক কথা! এ কী আর আপনার জনকে দেখতে না পাওয়ার শোক? বলি চিরটা কালের মত পরগোত্তর হয়ে গেল তো! এর পর তো বাপ ভাই হবে কুটুম্ব!"

সঙ্গে সঙ্গে আরও জোর উচ্ছ্বাসের আভাস।

"তোমাদের দিদিমণিকে শুতে বল না একটু। কাল সারারাত তো—"

"বললাম তো! ও মেয়ে না খাবে, না শোবে। কাল থেকে ডাহা উপোস চলছে। এতখানি বেলা, সুধু একটু-খানি লেবুর শরবৎ খেয়ে আছে।"

ছোটখাট আরও দু'একটা কথা শুনতে পাচ্ছি মধ্যে মধ্যে।

কিছু না হোক একটু চা খেলে ভাল হত এ রকম উপদেশের আভাস পেলাম। খেতে রাজী হলে সামনের স্টেশন থেকেই নেওয়া যাবে তাও শুনলাম, তারপর আর কিছু না। নিঃশব্দ।

জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ বীরত্ব জাগল, ভাবলাম কেন, ক্লাসের দাবি সাধারণের গাড়ী, আমিও টিকিট কেটে উঠেছি, তাকিয়ে থাকব বেশ করব।

ঘাড় সোজা করলাম।

ঝি মেঝেয় গুটিসুটি, কনে সীটের উপর দেয়ালমুখী হয়ে গুটিসুটি, শুধু বর সেদিকে তাকিয়ে বসে আছে নিষ্পলকনেত্রে। মমতা-মমতা করুণা-করুণা দৃষ্টি মেলে।

আজন্মের আশ্রয়কে মাত্র কুটুম্ব সম্পর্কে পর্যবসিত করে যে মেয়েটা চির-দিনের মত 'পরগোত্তর' হয়ে ওর কাছে এসে পড়েছে, তাকে এক্ষুণিই ভালবাসতে শুরু করল না কি ও?

ঝনাৎ করে থেমে গেল গাড়ী। থেমেছে ভদ্রেশ্বর স্টেশনে।

ওঃ এখানেই তা'হলে নামবে এরা।

মুহূর্তে আবার সেই পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেই হৈ চৈ হুলস্থুল, সেই ডাক হাঁক কুলি কামিন, সেই ট্রাঙ্ক সুটকেস বাসন বিছানা নিয়ে টানাটানি। জগঝম্প কাণ্ড একেবারে!

এখানেও যে মাত্র মিনিট দুই।

কুলির হাত থেকে পিলসুজটা গড়িয়ে পড়ল, সোরগোল করে। কনে

ধড়মড় করে উঠে বসেছে, মুখের সেই আবরণটা গেছে সরে, চোখে আর জল নেই. রয়েছে শুধু একটা ব্যাকুল অসহায় দৃষ্টি। বাপের বাড়ীর পুরনো দাসী যে গাড়ী থেকে নেমে পড়েছে সে দিকে তা'র খেয়াল নেই, সেই ব্যাকুল অসহায় দৃষ্টিটি আরতির প্রদীপের মত তুলে ধরেছে. মাত্র ঘণ্টা কয়েকের দেখা ব্যক্তিটির দিকে, যার সংগে হয়তো এখনো একটাও কথাই হয়নি।

সে দৃষ্টি যেন বলতে চাইছে—'এই তো, এই বার তো গিয়ে পড়বো নিষ্ঠুর জনারণ্যের মাঝখানে. সেখানে তুমি আমায় দেখবে তো?'

আমি যে আর এখন জানলার বাইরে তাকিয়ে পল্লীবাংলার প্রাকৃতিক শোভা দেখছি না. সে ওদের খেয়াল নেই। বর তার সেই মমতা-মমতা করুণা-করুণা দৃষ্টিটিতে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে আলগা করে ওর কাঁধের ওপর রেখেছে একটা হাত, মৃদুস্বরে বলছে "ওঠ, এসে গেলাম।"

"নেমে এস নেমে এস—" বরকর্তা মোটঘাটের সংখ্যা মিলিয়ে নিতে নিতে আদেশ জারি করছেন, "নেমে এস, গাড়ী ছেড়ে দিল যে! আঃ কী মুস্কিল, আগে থেকে একটু ঠিক হতে হয়—"

বাপের আদেশে ত্রস্ত বর দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই টান্ পড়ল পিছনে, চাদরে আর আঁচলে গাঁটছড়া। কনেরও অতএব আর নির্লিপ্ত থাকা চলল না. নেমে পড়তে হ'ল. তাড়াতাড়িই হ'ল। গাড়ী চলতে শুরু করেছে।

আবার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছি। সামনের দিকে নয়, যে পথটা ফেলে চলে এসেছি সেই দিকে।

দেখা যাচ্ছে ওদের।

স্টেশনের বাইরে কোথাও কোনখানে হয়তো গাড়ী অপেক্ষা করছে, এখন চলেছে হেঁটে হেঁটে। সব সামনে মোটঘাট সামলে বরকর্তা, পরবর্তী দল সেই পাশের গাড়ীর তরুণ দল, আর সকলের পিছনে বরকনে। অনেকটা আগুপিছু হবার উপায় নেই ওদের, বাঁধা পড়েছে দু'জনে, চলতে হচ্ছে একসংগে।

গাড়ীর গতি দ্রুত হয়ে উঠেছে, ওরা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে এল। আর এক মুহূর্ত পরেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। ওই অপসৃয়মান লাল চেলির আবছা ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভারী একটা কাব্যিভাব জেগে উঠল মনে।

মনে হ'ল ওই যারা একসংগে এগিয়ে চলেছে ওরা যেন অনন্ত কালের বরবধূর প্রতীক, যুগ যুগ ধরে চলেছে ওরা পরস্পরের সংগে গ্রন্থিবন্ধ হয়ে!

হরণ করেই হোক, আর বরণ করেই হোক, চিরদিনই একজন আর একজনকে নিয়ে চলেছে তার জন্ম পরিবেশের পরিচিত গণ্ডি থেকে আপন ঘরে। সেখানেই রয়েছে ওই বধূর পরম সার্থকতা!

সংসার রচনার উপকরণ ওদের হাতেই থাক, আর হাত-ছাড়াই হোক, চিরদিনের সংসার ওরা রচনা করে আসছে কোন একখানে।

ওরা চলেছে, অমনি করেই নিত্যকালের বরবধূ চলবে অজানার পথে।

গাড়ীর গতি কখন যেন দ্রুত হয়েছে, সামনের ওই সীটটার কে যেন এসে বসেছে, দেখিনি তাকিয়ে। রুক্ষ রুক্ষ 'ছুটন্ত' প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল একেই কি বলে [illegible]কার? সমস্ত যুক্তি আর সমস্ত বুদ্ধির উপর থেকে মাথা তুলে সে বলে ওঠে 'এই তো ঠিক, এই তো বেশ!'

কোথায় থাকে এর শিকড়? কিছুতেই নির্মূল হয় না সে?

এই কি অমরলতা?

বিবাগী ভ্রমর

প্রবোধকুমার সান্যাল
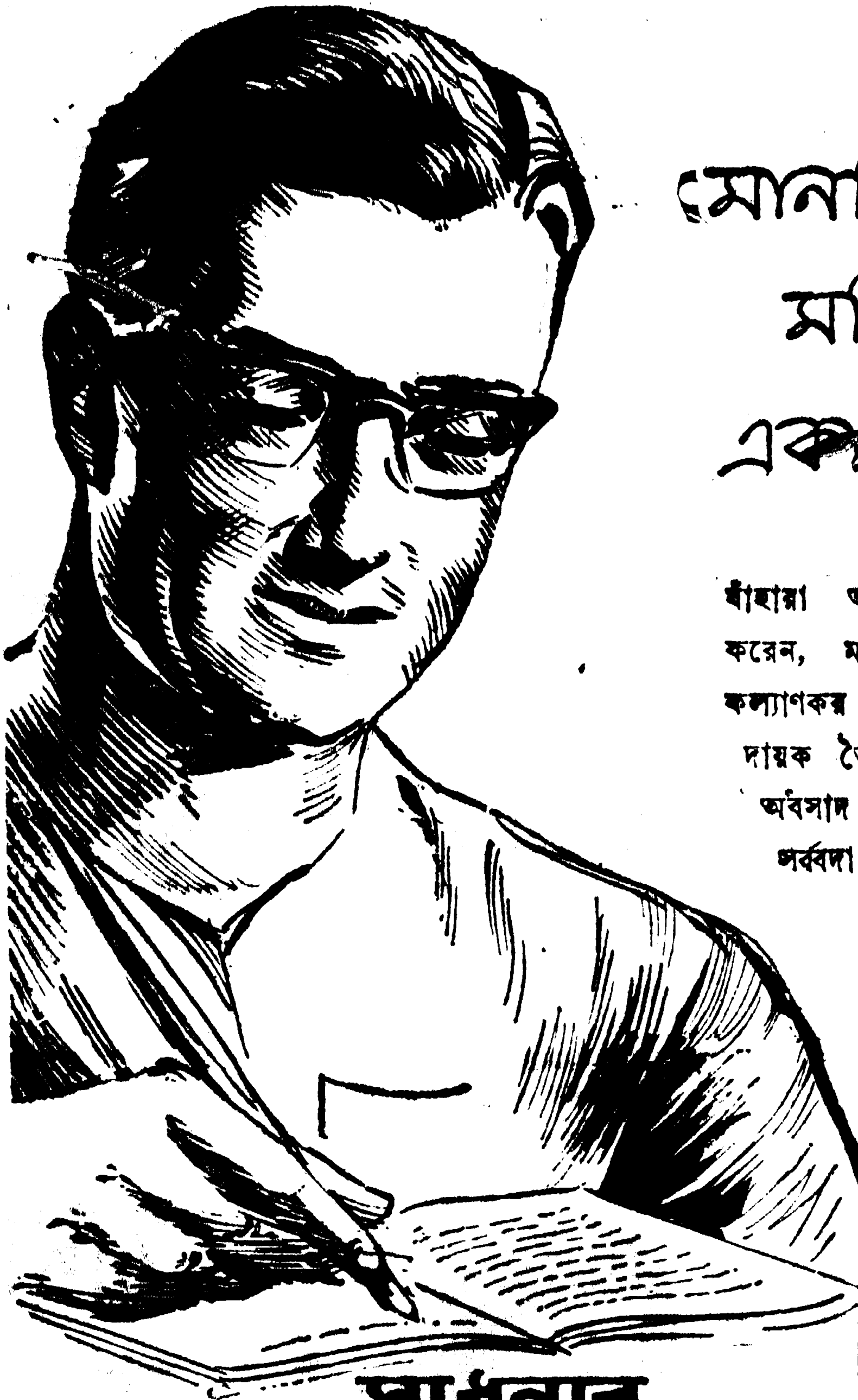
(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—চোদ্দ—

পরবর্তী ছয় মাস কাল কেমন ক'রে আমার কাটল, এ প্রশ্ন যদি কেউ করে—আমি তার সঠিক জবাব দিতে পারব না। যদি কেউ বলে তুমি একটা অসীম বিরহ-লোকের মধ্যে বাস করেছ, আমি সেকথা স্বীকার করব না। আমার বিশ্বাস আমি একাগ্রভাবে নিজকে নিয়ে ছিলুম এবং নিজের চারিদিকে এমন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করেছিলুম, যার বাহ্যিক কাঠিন্য লক্ষ্য ক'রে আমি নিজেই চমৎকৃত হয়েছি। ঝড়ে, ঝঞ্ঝায়, বন্যায় এবং নানা-বিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর প্রাণহানি ঘটে, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র শম্বুক তার কঠিন বহিরাবরণের অন্তরালে নিশ্চিন্তে বাস করে। বাহিরের জগৎসংসারকে আমি পরিত্যাগ করেছি অথবা সবাই আমাকে পরিত্যাগ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছে, এটি নির্ণয় করার চেষ্টা পাইনি।

দিল্লী শহরের কোন কোনও অলক্ষ্য কোণে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে যান-বাহনের সংখ্যা গণনা করেছি একমনে। কুতবের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কত-দিন তার উচ্চতা বিচার করেছি, এবং আগামী তিন্-চারশ' বছরের মধ্যে যমুনা নদীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে কিনা, এ নিয়ে বহুদিন আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি। আমার সুবিধা ছিল এই, সহ-কর্মীগণের বাইরে আমার বন্ধু-বান্ধব বিশেষ ছিল না, এবং সামাজিক জীবনে সকলকে বাদ দিয়ে অনায়াসে আমি সম্পূর্ণ একক জীবন যাপন করতে পারতুম।

দিল্লীতে নাকি এ বছর প্রবল বর্ষা হয়েছিল। তা হবে। সেই বর্ষা কবে এবং কোন্ ফাঁকে বিদায় নিয়েছিল সেটি আমার মনে নেই। সমগ্র গ্রীষ্ম-কালটা দিল্লীবাসীরা ঘরের বাইরে মাঠে ঘুমোয়,—ঘরের মধ্যে রাত্রিযাপন কারও পক্ষেই নাকি সম্ভব নয়। কিন্তু আমার [illegible] রাত্রি কেমন ক'রে ঘরের বিছানার মধ্যে কাটল, সে-খোঁজ আমি নিজেও নিইনি। আমার খানসামার ধারণা, আমি অঘোর নিদ্রায় অচেতন থাকতুম। কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস, আমি দেহত্যাগ ক'রে চ'লে যেতুম! সেই ক্ষুদ্র পতঙ্গ রাত্রির অন্ধকার পেরিয়ে নিষ্প্রাণ ভীষণ দিক্‌চেতনাহীন মহাকাশের ভিতর দিয়ে চলে যেত সর্বহারা শূন্যে! কেন যেত জানিনে; এই অন্তহীন ভুবর্লোকের বাইরে সেই পতঙ্গ কোথাও কিছু অন্বেষণ ক'রে ফিরত কিনা—তাও আমার অজ্ঞাত।

হেনা বলত, যেখানে ব্যাকুলতা সেখানেই প্রাক্তন সংস্কার, সেইটিই জন্মজন্মান্তরের মোহবন্ধন। আকর্ষণ বিকর্ষণের বাইরে এসে দাঁড়াও। বিরহটা বেদনায় ভ'রে ওঠে দেহকামনায়। মেয়ের কাছে কিছু চাও ব'লেই তার অনু-পস্থিতিতে তোমার চোখে জল আসে। মেয়েও কাঁদে, কেননা তারও অন্তস্তন্ত্র কামনার রসে সিক্ত হয়। এইখানে সে পরমুখাপেক্ষী! এই লালসের চক্রান্ত থেকে আমি মুক্তি চাই, পার্থ। কেবল-মাত্র যৌবনের আকর্ষণ আমার দুচোখের বিষ।

মেয়ে কোথাও যন্ত্রী নয়,—হেনা বলত, মেয়ে হল উপকরণ,—সে যন্ত্র। আমরা আনন্দের উপকরণ, তাই আমা-দের নন্দিনী নাম রেখেছে! খোঁজ নিয়ে দেখো, একদা উলঙ্গ নন্দিনীকে অতিকায় হিংস্র জন্তুর সামনে ছেড়ে দিয়ে আনন্দ পেত এককালের নরপশুরা। একালের নরপশু এই সেদিন লক্ষ লক্ষ উলঙ্গ মেয়েকে ঢুকিয়ে দিল গ্যাস-চেম্বারে! আমরা আসরে গিয়ে নাচিনি, তোমরা আমাদেরকে নাচিয়ে দেখেছ কোন্ ভঙ্গীটি তোমাদের নেশার খোরাক যোগায়! তোমরাই চেয়েছ নোংরা বস্তিতে আলো জেবলে মেয়ে ব'সে থাকুক সারা রাত, এবং সভ্যজগতে নাইট ক্লাবের বিবস্ত্রা মেয়েরা লজ্জাহীন হয়ে তোমাদের আশেপাশে ঘুরুক। থাক পার্থ, এসব কথা তুলো না! মেয়ে কোনও কালে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়নি!

আমি কি হেনাকে চেয়েছিলুম? যদি চেয়ে থাকি, তবে কেন? জন্তু আর মানুষের সেই চিরকালীন লক্ষ্যই কি আমাকে হাত বাড়াতে অনুপ্রাণিত করে-ছিল? সেই সেকালের গুহা থেকে একালের গৃহ? সেই একই প্রাচীন প্রবৃত্তির পুনরাবৃত্তি? সেই আগম এবং নির্গমের আদিম বিবর্তনচক্র? হেনার জন্য আমার এই ছটফটানি কেন?

হেনা বার বার বলেছে, আমার মেরুদণ্ড দুর্বল। কঠিন ব্রতের দুর্বহ বোঝা আমার পিঠে ধরে রাখতে পারিনে, সেই বোধ করি আমার দুর্বলতা। আমি নিষ্ক্রিয়, কিন্তু নিষ্কাম নই—হেনা বোধ করি এটি বিশ্বাস করে। আমার আপাত সংযমের অন্তরালে যে প্রচণ্ড অস্থিরতা আছে, হেনা সেটি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে নিতে চায়। হেনা বলে, তুমি সবল হবে সেই দিন, যেদিন তোমার মোহ ঘুচবে!

আমার আপিসের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি আমার প্রতি তুষ্ট নয়। আমাকে নিয়ে বিরোধ একটা চলছে কোথাও আমার অলক্ষ্যে—যেটার সন্ধান আমি পাইনে। সকল কাজেই আমার কেমন একটা প্রতিরোধ প্রকাশ পাচ্ছিল। ফাইলের খবর আমি যেন আর রাখতে পারছিনে। অনেক সময়ে টেবলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি, এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনু-রোধে সাড়া দিতে পারিনে। মাঝখানে একবার মাত্র আমাকে বোম্বাই যেতে হয়েছিল, কিন্তু ফিরে আসবার পর একটি বিশেষ রিপোর্ট নিয়ে যে

বিতর্কের সৃষ্টি হয়, সেটিতে আমার গৌরব বৃদ্ধি হয়নি। কলকাতায় যাবার জন্য বারম্বার নির্দেশ আসা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যের অছিলায় আমি আমার ঘরের বিছানায় প'ড়ে থাকতুম। কালক্রমে দেখতে পাওয়া গেল, আমার পদমর্যাদা নিয়ে সহকর্মীমহলে কথা উঠেছে। কিন্তু এ সকল সমস্যার প্রতিবিধান করার জন্য আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন কোনও একটা অজানা নদী ও সমুদ্রের অকূল এবং ধূসরবর্ণ মোহানার দিকে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছিলুম।

দিল্লীতে শীতের কাঁটা দেখা দিয়েছিল। একদিন আপিস কামাই ক'রে যখন বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে যথারীতি নিদ্রা দেবার আয়োজন করছি সেই সময় আমার খানসামা একখানা চিঠি এনে টিপাইয়ের উপর রাখল। চিঠি অনেক এসেছে অনেকবার। অনেক চিঠি খুলিনি, অনেক চিঠি খুলে ভিতরে নাম দেখে আর পড়িনি। এ চিঠি হেনার, হাতের লেখা দেখে চিনলুম।

চিঠিখানা ওইভাবেই রেখে দিয়ে চাদরখানা গায়ের উপর টেনে পাশ ফিরে চোখ বুজলুম। জ্ঞান-সঞ্চয়ের প্রথম ধাপ নাকি কৌতূহল, অনেকে বলে। প্রাণের প্রথম চিহ্নই নাকি কৌতূহল। আমার কৌতূহল নেই এই আমার অহঙ্কার। সকল প্রকার জানার বাইরে একটি বিশেষ চেতনার মধ্যে আমার মন চ'লে যেতে চাইছে। সেই চেতনালোকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, সংগ্রাম-সংঘর্ষ নেই, স্নেহমোহ নেই। ঔৎসুক্য থাকবে না তার চতুঃসীমায়। মানসের সেই নিগূঢ় কুহেলিকাচ্ছন্ন পথ ধ'রে আমার মন চলেছে। কাম্যবস্তু আকর্ষণ করবে না তাকে পিছন থেকে, বিরাগ-বিদ্বেষ তার পথরোধ করবে না। সে চলবে একা অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। তার সঙ্গী নেই।

আমি নিদ্রার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলুম, কিংবা অজ্ঞানের মধ্যে, কিংবা আমার পায়ের চিহ্ন সেই দূর অজানা বালুবেলার উপর দিয়ে ধূসর মোহানার দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল কিনা, আমার মনে নেই। আমি জানিনে কতক্ষণ প'ড়ে ছিলুম সেই নিলীন তন্দ্রায়, সেই অস্বাভাবিক অভিভাবের মধ্যে—যেটা দুঃখ বেদনা আনন্দ এবং হর্ষ রোমাঞ্চের অতীত। অতি সংগোপনে যে অভিনব একটি পৃথিবী আমি আমার ইচ্ছানুচেতনায় সৃজন করেছিলুম, সেটা যেন দাঁড়িয়েছিল অনৈসর্গিক একটা আলো-অন্ধকারের সন্ধিশূন্যে,—আমার তন্দ্রার ভিতর দিয়ে যেখানে পরম পিপাসার্ত ভ্রমর সন্ধান করে বেড়ায় তার শেষ পরিতৃপ্তি। সেখান থেকে ফিরতে আমার কিছু সময় লাগল বৈকি। গায়ের চাদরখানা এক সময় সরিয়ে আমি ধীরে সুস্থে উঠে বসলুম।

চিঠিখানা খোলবার আগে এক পেয়ালা কফি দিতে ব'লে চোখে মুখে জল দিয়ে এলুম। আমার ভয় ছিল পাছে দুঃসংবাদ শুনি। কিন্তু চিঠিখানা খুলে একটু অবাক হলুম প্রথম সম্ভাষণটি দেখে। হেনা এর আগে কখনও লিখেছে, প্রিয়, কিংবা সুহৃদ্বরেষু, কিংবা সুপ্রিয়। এবার একেবারে শ্রীচরণেষু। ভক্তির কি ঘটা।

"তুমি দীর্ঘকাল আমার খোঁজখবর নাওনি, এজন্য আমি আনন্দিত। ঠিক সময়ে আমিই তোমাকে খুঁজে নেব। কানপুর ছেড়ে আমি অনির্দিষ্টের পেছনে ধাওয়া করেছি। বদ্ধজলা আমি চাইনে, চাই প্রবাহ। তোমার বাড়িতে ব'সে এই চিঠি লিখছি! আমরা চারজনে মিলে তোমার এখানে এক সপ্তাহকাল ছিলুম। আসছে কাল চ'লে যাব। বুড়িপিসির অসুখ করেছিল, তাই সে নীলুকে আনিয়ে রেখেছে। তোমার এখানে পাঁচখানা ঘরে আমরা চারজন ছড়িয়ে আছি। তোমার বিছানাটা আমি ব্যবহার করছি, ক্ষমা করো। তুমি ভুলে গেছ, ষ্টীলের আলমারিটা আমার এবং বাথরুমটি তোমার। তুমি আলমারি খুলে আমার সর্বস্ব গুছিয়ে রেখেছ, কিন্তু বাথরুমটি ব্যবহার করনি। আমার সংগে যারা এসেছে তারা কেউ বাঙ্গালী নয়। তাদের রান্না আমিই করেছি। এখানে এসে খুড়িমার মুখে তোমার বন্ধু নবেন্দুর কাহিনী শুনলুম। নবেন্দুর এই পরিণাম ঘটবে আমি অনুমান করেছিলুম কিন্তু তোমার ভাবাবেগ আমার কাছে একটু নতুন লাগল। আমার সন্দেহ হয় তুমি বোধ হয় মাঝখানে কানপুরে গিয়ে আমার খোঁজ করেছিলে! আমাকে পাওনি সেই রাগে বাড়িতে চিঠি দেওয়া বন্ধ করেছ। তুমি কি ভেবেছ আমি জানি। কিন্তু জীবন তখনই বড়, কাজ যখন সেই জীবনকে
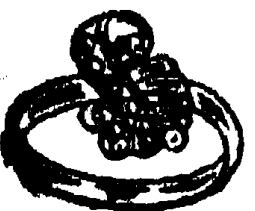
ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে! আমি মস্ত কাজে নেমেছি।

"কাল আমরা চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানতে চেয়ো না। আশীর্বাদ কর একদিন আমার সব কাজের হিসেব যেন তোমাকে দিতে পারি। এখান থেকে কিছু টাকা আমি নিয়ে যাচ্ছি, তার হিসেব আলমারিতেই রইল। তোমার অনুমতি ছাড়া টাকা নেওয়া অন্যায় জানি। তাই ভিক্ষে নিয়ে যাচ্ছি। এ-কদিন তোমার ঘরটিতে বড় আনন্দে কাটল। মেয়েমানুষের মন কিনা, [illegible] পরের জিনিসে ভারি লোভ। ভাবছিলুম এ বাড়ির যা কিছু সবই ত' আমার!

"তিন দিন আগে ট্রাঙ্ক কল্ ক'রে তোমার আপিসে জেনেছি, তুমি দিল্লীতেই আছ। তোমার জন্য আমি উদ্বিগ্ন নই। জানি যে-নিরাপদ আসনে তোমাকে বসিয়ে রেখেছি তুমি সেখানেই আছ। মুশকিল শুধু এই, তুমি সরকারি কাজে লিপ্ত, তোমাকে কাছে রাখার উপায় নেই। তোমার অবসরকাল সীমাবদ্ধ, তোমার ছুটি পরের মুখ-চাওয়া, এবং তোমার কর্মজীবন বিধি ও নিষেধে নিয়ন্ত্রিত।

"আমার ঠিকানা কিছু নেই। ঠিকানা মানেই ত' নিশ্চয়তা! স্থায়ী আস্তানা যদি খুঁজি, একদিন ওই আস্তানাটাই আমাকে বাঁধবে। আজ যেটি ভালবাসার বস্তু, কাল সেইটিই শৃঙ্খল। ঠিক এই কারণে অতিথিশালা আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। কানপুরের সঙ্গে আমার কল্পনার মিল ঘটেনি, তাই কানপুরের সেই গঙ্গাতটস্থ গ্রাম ছেড়ে এসেছি। পাছে আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তুমি নিজকে মেলাতে না পার সেই ভয়ে তোমাকে এতদিন খবর দিইনি!

"কোথায় আমি থাকব নাই শুনলে। আমার ঝুলির মধ্যে আমার আপিস, ভাগ্যটা আছে পথে-বিপথে ছড়িয়ে, এবং আইডিয়াগুলো আছে আঁচলে বাঁধা। ইতিমধ্যে প্রায় মাস দুই বেরিয়েছিলুম দেশপর্যটনে। কোন্ দেশে বাস করি জানা দরকার বৈকি। দেখা মানেই অভিজ্ঞতা। আমার এ অভিজ্ঞতার দরকার ছিল। তুমি ভয় পেয়ো না, পার্থ—। কোনও এক কালের সভ্যতায় যেমন একদা সব পথ গিয়ে মিলত রোমনগরে, তেমনি আমারও সকল পথ একদিন মিলবে তোমার পায়ের কাছে গিয়ে। তোমাকে আনন্দ দিতে পারিনি বটে, কিন্তু তোমার অসীম ক্ষমার মধ্যে একদিন নিশ্চয় আশ্রয় পাব।

"জীবনের সর্বাঙ্গীণ নিবিড়তার আস্বাদ পাব ব'লেই আমার নৌকা অকূলে ভাসিয়েছি। এখানে খুড়িমার মুখে আমার নৈতিক চরিত্রের যে কল্পিত কলঙ্কের কাহিনী শুনে যাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে আমার নৌকা সবাই [illegible] ধাক্কা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে চায়! ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটি কোনমতেই বরদাস্ত করা চলে না যে, একটি ঘরছাড়া মেয়ে সর্বপ্রকার শাসন-বাঁধনের শৃঙ্খল ছিঁড়ে আপন অবারিত ও স্বচ্ছ আনন্দের সন্ধানে দিকবিদিকে ছুটে বেড়াবে! আমার দেহের সামনে ও পিছনের কোন কোনও অংশে নাকি কিছু কিছু মেদ-মাংসের সুশ্রী সম্পদ বর্তমান। আমার গায়ের বর্ণ ও লাবণ্যে নাকি নির্বোধ পুরুষের চিত্তোদ্‌ভ্রান্তি নিহিত। আমার পোড়া দেহ এই "শত্রু-" দলের দ্বারা পরিবেষ্টিত ব'লেই নাকি পতঙ্গরা এসে মাথা ঠুকতে থাকে! খুড়িমার মুখে এসব কথা শুনে হাসব কি কাঁদব জানিনে।

"এবারও ভাবছিলুম, আলমারির চাবিটা চরকীপিসির কাছে রেখে যাই, কিন্তু ভরসা হল না। চরকীপিসির আয়ু আর বেশিদিন নয় মনে হ'ল। তোমার কাছে দ্বিতীয় চাবিটা আছে, এটা বিশ্বাস ক'রে এ-চাবি সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি। আমার প্রণাম নিয়ো। ইতি হেনা।"

হেনা এবং আমার উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে কোনও বৈদান্তিক ব্যাখ্যা আছে কিনা আমি বিশ্লেষণ করিনি। জীবনটা অর্থহীন এবং উদ্দেশ্যবিহীন,—এসব লাইনে চিন্তা করতে আমার বাধে। কি কি পাইনি এবং কি [illegible] কি পেলে সুখী হতে পারতুম, এগুলি নিতান্তই হিসেব বুদ্ধির কথা। আমি জীবন সংগ্রামের দ্বারা বিড়ম্বিত নই, কিন্তু জীবন-যাপনের ধারাটা নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন এসেছে বৈকি। এ প্রশ্ন পরোক্ষভাবে তুলেছে হেনা। সে আমার কাছে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলছে না, কিন্তু আমি দিনে দিনে যেন নিজের কাছে স্পষ্ট হচ্ছি। যদি এক কথায় বলতে পারতুম হেনাকে নিয়ে আমি ঘর-গৃহস্থালী করতে চাই, তা হলে উভয়ের নানাবিধ চিন্তাসমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু সেখানে হেনা তরবারির মতো সুস্পষ্ট। সেখানে সে মোহবন্ধনহীন, তার ধাতু ভিন্নপ্রকার। সে জানে বিবাহ থেকেই বন্ধ্যতার সৃষ্টি, এবং স্বামী মানেই বাধ্যবাধকতা। তবে কি আমিই চাই তাকে দিয়ে এই বন্ধ্যতা স্বীকার করিয়ে নিতে? না, এও সত্য নয়।

কিন্তু আমার নিজের এই ধরনের জীবনযাত্রাটার কোনও নতুন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। অনেক দিন ধ'রে
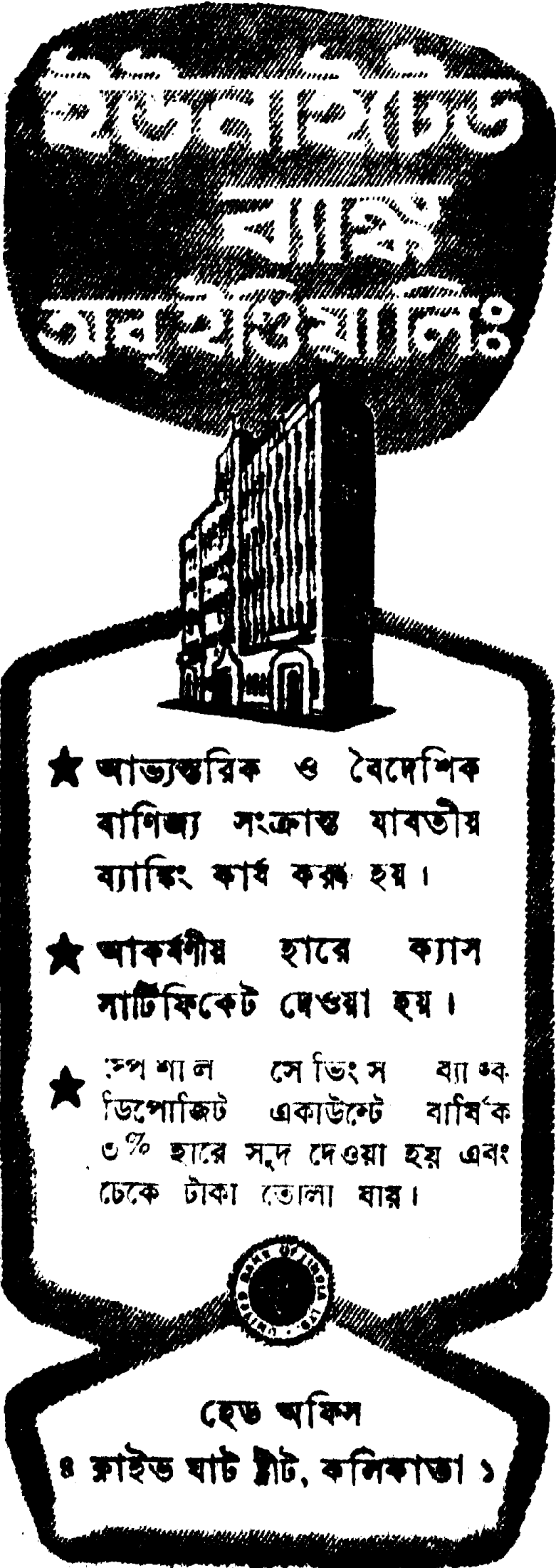
ভেবেছি, আমার এই কর্মজীবনের শেষ লক্ষ্যটা কোথায়! দেশের মধ্যে যে বিরাট কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলছে, আমি কি তারই একজন ক্ষুদ্র কর্মী! আমার কর্মের মধ্যেই কি আমার বিদ্যার সার্থকতা? আমি কি চারিদিকের এক প্রকাণ্ড নিয়মানুগত্যের দ্বারা পরিচালিত? ভবিষ্যৎ কালের অর্থনীতিক আদর্শের কাছে আমার পক্ষ থেকে বশ্যতা স্বীকৃত আছে কি? তবে আজ ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে কর্মীজীবনের সংঘর্ষ আমার মধ্যে মাথা তুলছে কেন বুঝতে পারছিনে। এই কি আমার কৃতকর্মের প্রতিবিম্ব? এই কি চেয়েছিলুম?

বিলেতে গিয়েছিলুম বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে আসার জন্য! অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যলাভ ক'রে যোগ্যতার আসনে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। এই আমার ব্যক্তির প্রকাশ, এইটি আমার অভিব্যক্তি। কিন্তু দিনানুদৈনিক এই কর্মের পথই কি আমার উন্নতির পথ? ক্রমোচ্চতর আসন এবং আর্থিক ক্রমোন্নতি,—এই গণনা নিয়ে কি চিরদিন আমাকে কাটাতে হবে? লোভ, মোহ এবং নিত্যপ্রত্যাশা নিয়ে ঘর করব বারোমাস? আজ যদি হঠাৎ আমি বলি, বেতন চাইনে, আসন চাইনে, আনুগত্য চাইনে, পদমর্যাদায় আমার প্রয়োজন নেই, বিধিনিষেধ বাধ্যবাধকতা আমার জন্য নয়,—শুনবে কেউ? আমার এই অতৃপ্তির [illegible] ঘটছে কেমন ক'রে? কেন সর্বান্তঃকরণে এই কর্মজীবন প্রথম থেকেই গ্রহণ করতে পারিনি?

পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব নাকি পুরুষকে উন্নতির পথে উদ্দীপ্ত করে। জীবনসংগ্রাম সেখানে প্রবল, যেখানে পাঁচজনের মুখে অন্ন যোগাতে হয়। সেই পাঁচজন আমার নেই। রসিকজন বলতে পারে, হেনা যদি তোমার শূন্য ঘরটি আলো ক'রে থাকত তা হ'লে তোমার এই বৈরাগ্য ঘুচে যেত না কি? কিন্তু মানুষ ত' নিত্যই অবস্থার দ্বারা নিরূপিত হচ্ছে! যে-চিত্তশক্তি হেনাকে সর্বপ্রকার শাসন-বাঁধনের বাইরে নিয়ে গেছে, সেই একই শক্তির দ্বারা আমিও যে নিয়ন্ত্রিত! প্রাণশক্তি একই, আমরা তার দুটি প্রকাশ মাত্র।

আপিস থেকে আমি স্বাস্থ্যের অজুহাতে দীর্ঘকালের জন্য ছুটি নিয়েছিলুম। কলকাতায় গিয়ে কিছুকাল বিশ্রাম নেব, এটি আমার পক্ষে রুচিকর মনে হয়নি। যৌবনধর্মের টিকাকার যারা তারা পরামর্শ দিতে পারত, এই বৃহৎ দেশের পথে বেরিয়ে পড় এবং তোমার সেই চক্রবাকীকে খুঁজে বার কর। অন্য কাজ তোমার নেই! তোমার সকল সমস্যার মীমাংসা সেখানেই হবে!

এটাও রুচিকর মনে হচ্ছে না। হেনা নয়,—ডাক আছে অন্য দিক থেকে। বিচ্ছেদ বেদনায় বিষণ্ণ আমি নই, কিন্তু আমি প্রশ্নে জরোজরো। কোথাও কারও স্নেহচ্ছায়ার তলায় গিয়ে সান্ত্বনা লাভ করতে চাইছিনে, আমি চাইছি এই অধীর আত্মজিজ্ঞাসার প্রকৃত স্বরূপ দেখে নিতে। অন্ধ কোনও আসক্তি আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কিনা সেটি আমার পক্ষে বিচার ক'রে দেখা দরকার। আমার অন্তর্বাসনার বৃহৎ একটা দরখাস্ত মেলে ধরেছি কিনা সেটিও আমার জানা চাই। আমি আনন্দ খুঁজতে গিয়ে সুখের সন্ধান করছি কি? বেদনা কি আমার এত বড় হয়েছে যা নিয়ে আমি শ্রাবণের সকরুণ আকাশকে দু'হাতে আলিঙ্গন করতে পারি? আপন প্রকৃতির মধ্যে সেই মহৎ সংযমকে আবিষ্কার করতে পেরেছি কি, যার সাহসে হেনার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হব না?

[illegible]দিল্লীর পথে পথে এই কথা নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। চোখে দেখলেও হয়ত বিশ্বাস করবে না আমার আপিসের সহকর্মীরা, রেওয়া ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীশালায় পুঁটুলি মাথায় দিয়ে শুয়ে কী যন্ত্রণায় আমার একটি রাত্রি কেটেছিল! কারও পক্ষেই জানবার উপায় ছিল না, সিন্ধি রেফুজির হোটেলের ময়লা বেঞ্চিতে ব'সে আমার অলস মধ্যাহ্ন কেটে গেল কতদিন! পোষাকটা নাকি পরিচয়। সেই পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে বৃহত্তর জনজীবনের মধ্যে তলিয়ে যেতে আমার সময় লাগেনি। দেখতে পাচ্ছি প্রতি মানুষের মধ্যে রয়েছে বিরাট গল্প, প্রতি জীবনের মধ্যে রয়েছে বেদনার কাহিনী। আমি ওদেরই লোক। ওদের বক্ষস্পন্দনে স্পন্দিত, ওদেরই সুখ-দুঃখ-বেদনায় আন্দোলিত। সহসা কবে যেন একদিন শহরতলীর প্রান্তে এক ময়দানের ধারে নিজকে আবিষ্কার করলুম,—আমি বসে আছি এক গানের আসরে। আরাবল্লীর শিরদাঁড়ার পাথর কাটা হচ্ছে আশে-পাশে, ঝোপ-জঙ্গল সাফ হচ্ছে এখানে ওখানে। ধুলো উড়ছে প্রচুর চারিদিকে। সেই শ্রমিক পল্লীর ধুলোবালির মাঝখানে ভিড়ের মধ্যে আমিও এক ঠাঁই বসে গেছি। বেশ লাগছে ভাল। ওদের সঙ্গে ময়লা পা-জামা আর শার্ট, পায়ে পুরনো চটি আর কপালে রুমালখানা বেঁধে ব'সে থাকতে লাগছে মন্দ নয়। স্নান করিনি কয়েকদিন, ভোজনং যত্রতত্র, এবং শয়নং হট্টমন্দিরে! এ একটা নতুন বিলাস আমার পক্ষে, একটা নতুন রস, নিজকে নিয়ে মস্ত কৌতুক। এ পরিচয় আমার সত্য নয় জানি, কিন্তু আমার আত্মাভিমানের মৃত্যু হোক! আমি চাইছি আমার পুরনো জীবনের বিনাশ, আমার আত্মার নবজন্ম, আমার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্বংস। আমার এই সৌখীন বৈরাগ্য-বিলাসের নিচে একটা মহৎ কান্না

জমা আছে, সেটা আমার ইষ্টমন্ত্রের মতো। এই পংজি নিয়েই চেনা জগতের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে চাইছি। চাইছি হারিয়ে যেতে এমন একটা পথে—যে-পথ আমাকে নিয়ে যাবে বিপুল অপরিচয়ের দিকে। আমি নষ্ট করতে চাই আমার রক্ষণশীল মন, আমার অন্তঃসারশূন্য বিদগ্ধের বেড়াজাল, আমার অভ্যাসগত ভাবনার ধারা।

গান গাইছে দুটি বড় বড় মেয়ে এবং একটি পুরুষ। এরা দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের বাসিন্দা, সেইজন্য গানের সুরের সংগে কিছু গুজরাটি দরদ এনেছে। প্রখর সূর্যের আলোয় ধূলি-মলিন ঘাগরা ঘুরিয়ে গানের এক একটা কলিতে ধুয়ো তুলছে, যেটি বক্ষপঞ্জরের কোনও একটা নিগূঢ়লোকে গিয়ে মর্মাহত করে। তখন দেখতে পাওয়া যায় এই দিনমানের প্রখর সূর্য মিথ্যে, চারিদিকের জনজটলা, আরাবল্লীর ধূলি-ধূসরতা, যানবাহনের সশব্দ আনাগোনা এবং কর্মব্যস্ত নগরের কোলাহল—সমস্তই অবাস্তব। তখন কেউ নেই আমার এপাশে ওপাশে! তখন আমি নিবিড়, একাগ্র, প্রগাঢ়। তখন রাজহংস উড়ে গেছে অনন্ত শূন্যে, নীলপদ্মের অক্লান্ত অন্বেষণে বিবাগী ভ্রমর এক মেরু থেকে অন্য মেরুপথে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তখন দেখতে পাই সেই অন্তর্গূঢ় কান্না গলার দিকে ঠেলে উঠেছে, চিরবিরহলোকের দিগন্তজোড়া বিষণ্ণতা চেয়ে রয়েছে আমার দিকে যুগ-যুগান্তকাল ধ'রে, জীবন মন্থন করে উঠেছে বেদনার বিহ্বলতা! তখন উপলব্ধি করতে পারি ওই পথবাসিনী রাজপুতানীর পায়ের ঘুঙুরের সংগে আমার হৃৎপিন্ডের আর্তস্বর ডুকরে ডুকরে বাজছে!

দীর্ঘক্ষণ পরে চেয়ে দেখলুম মেয়ে দুটির মুখের দিকে। দেখতে পাওয়া গেল, যা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। ওদের গান শুধু অভ্যাস-চালিত, যন্ত্রগতিবৎ। ওদের কটাক্ষে বিদ্যুতের ক্ষণচাতুর্য প্রকট,—এবং ওরা আপন আপন দেহ-তারুণ্যের দিকে পুরুষের লোলুপ চক্ষুকে কেবলই টানছে, কথায় কথায় ওরা তরঙ্গ তুলছে যৌবনে,—জনতার চক্ষু সেখানে রসসিক্ত। কণ্ঠে তুলছে কেমন একটা কারুণ্যের সংবেদন,—হৃদয় সেখানে অভিসিক্ত হচ্ছে!

আমি উঠে চলে গেলুম আমার নিজের পথে। কিন্তু আমি একটা নতুন ধরনের রস পাচ্ছিলুম আমার এবম্বিধ উচ্ছৃঙ্খল ভ্রমণে। এমনি সময় একদিন কার্নাল স্টেশনের ধারে এক শিখ হোটেলে হঠাৎ আমার বাড়ির খানসামার সংগে দেখা হয়ে গেল। এখানে নাকি তার বোনের শ্বশুরবাড়ি। বোনের অসুখের খবর পেয়ে সে হঠাৎ চলে এসেছে।

আজ আমার বরাত ভাল। কেননা আজ অনেককাল পরে দাড়ি কামিয়ে জামা কাপড়ে সাবান ঘ'ষে স্নান করেছি। নচেৎ খানসামার কাছে অত্যন্ত লজ্জায় পড়ে যেতুম। প্রায় আড়াই মাস হল আমি বাড়ি নেই।

আমি যেন একটা ভিন্ন গ্রহলোকে এতদিন বাস করছিলুম, এবং মরজগতের সংগে আমার সমস্ত যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। খানসামা নিয়ে এল সেখানকার সংবাদ। সেলাম ঠুকে সামনে দাঁড়িয়ে সহাস্যবদনে বলল, আমার আপিসের বড় বড় কর্মচারীরা আমাকে খুঁজে গেছে অনেকবার। আমাকে ন ইয়োরোপে পাঠাবার একান্ত দরক এবং তাঁরা আমার সর্বশেষ ঠিক পাবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। আমার না দেড় মাসের ছুটি ফুরিয়ে গেছে অনে আগে। আমার ওখানে চিঠিপত্র ব হয়েছে নাকি অনেক। সরকারি মহ আমাকে নিয়ে হৈ চৈ চলছে।

তা হবে, ও ব্যাপারে আমার [illegible] কম। খানসামা একসময় বলল, হে মেমসাবের চিঠি এসেছিল পরপর তি খানা। কিন্তু তিনি চিঠির জবাব পেয়ে মাত্র দিন পনের আগে আম ওখানে এসে ওঠেন! তখন আমরা [illegible] জানি না আপনি কোথায়। মেমস আপনার দপ্তরে ছুটোছুটি লাগি দেন্। আপিসে কেউ কিছু বলতে পা না। কলকাতায় আপনি নেই তি জানেন—।

খানসামা একবারটি চুপ ক'রে থে পুনরায় বলল, তা ছাড়া আপনি কাগ

চোপড় বিছানা সুটকেস কিছু সঙ্গে নেননি, আপনার জুতো জামা মনোহারী 'সামান' সব পড়ে রয়েছে দেখে মেমসাব ভয় পেয়ে যান্—। আপনার ঘরের কাগজপত্র, চিঠি-চাপাটি তিনি সব ওলোট-পালট করেন। 'হুজুর, অব ওয়াপষ চলিয়ে—'

ফিরে যাবার ঔৎসুক্য আমার আপাতত ফিরব, যখন ভিতর থেকে ফিরবার তাগিদ আসবে। আমি জানি, আমাকে না পেয়ে হেনা ছুটে গেছে যশিদিতে, সেখান থেকে হিন্দু, তারপর কলকাতায়। কলকাতায় সে আমায় খুঁজবে, যেমন খুঁজেছে দিল্লীতে। অতঃপর সে আবার ফিরে যাবে তার সেই অজ্ঞাত কর্মস্থলে—যেখানকার সন্ধান সে আজও আমাকে দিতে চায়নি!

খানসামাটাকে কিঞ্চিৎ প্রভুভক্ত মনে হচ্ছিল। সে অলক্ষ্যে মাঝে মাঝে আমার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করছিল। আমি এবার বললুম, শোনো বিশুনলাল, 'দুনিয়া অপনা কানুনসে চলেগা'। তুমি-আমি তার জন্যে মিথ্যে ছটফট ক'রে মরি কেন? ভয় পেয়ো না, অত সহজে সরকারি 'নোক্‌রি' যায় না। তুমি দেখো, ওটাও চলবে নিজের নিয়মে। সঙ্গে আমি কিছু আনিনি বলছ? জন্মকালে কি সঙ্গে ক'রে কিছু এনেছিলুম যে, সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে? ওসব কিছু না বিশুনলাল, 'কুছ শোচনা নহি', —সব ঠিক হয়ে যাবে—

বিশুনলালের চোখে মুখে দেখা গেল, এ প্রকার দর্শনতত্ত্ব ঠিক তার পক্ষে বোধগম্য হচ্ছে না। সে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, কিন্তু মেমসাব একটু যেন অন্য কথা বলছিলেন। তাঁর ভয় পাছে আপনি—

আমি খুব হেসে উঠলুম। বললুম, আরে, তুমি বয়স্ক লোক হয়ে ...তে পার না যে, পৃথিবীসুদ্ধ মেয়েদের প্রকৃতি এক এবং তাদের চিন্তার গতি বিচিত্র! তিনি নিজে একটুও ভয় পাননি, কিন্তু তোমাদেরকে ভয় পাইয়ে যাওয়াটা তাঁর ভাল লেগেছিল,—বুঝেছ বিশুনলাল?

বিশুনলাল মনোবিজ্ঞানের ছাত্র নয়, সুতরাং কথাটা বুঝতে তার কিছু অসুবিধা হল। সে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে এক টুকরো কাগজ বার ক'রে বলল, এই তাঁর ঠিকানা,—তিনি আমাদের সকলকে এই ঠিকানা দিয়ে গেছেন। কোথাও আপনার দেখা পেলেই যেন তাঁর কাছে আমরা জরুরী টেলিগ্রাম করি!

ঠিকানাটা দেখবার জন্য আমার কৌতূহল তেমন নেই, এটি লক্ষ্য ক'রে বিশুনলাল একটুখানি অবাক হল। আমি হেসে বললুম, ঠিক আছে, ব্যস্ত হয়ো না বিশুনলাল। জন্তু-জানোয়ার তাদের ঠিকানা বদল করে না,—তারা থাকে জঙ্গলে। মানুষ তার জীবনবৈচিত্র্যবোধের জন্যেই বারে বারে ঠিকানা বদলায়! আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—

বিশুনলাল হাঁ ক'রে আছে দেখে আমি আর কথাটা বাড়ালুম না। এদিকে আমার ট্রেনও এসে পড়েছিল। আমি তাড়াতাড়িতে বললুম, কিচ্ছু ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যাচ্ছি এখন বিশেষ কাজে। আরেকটা কথা, আমার কিছু টাকার দরকার হতে পারে বিশুনলাল। তোমার নামে যদি কেউ আমার চিঠি নিয়ে যায়, তার হাতে কিছু টাকা দিয়ো।

বিশুনলাল আমাকে স্মরণ করিয়ে বলল, আপনার যে-টাকা আমার কাছে গচ্ছিত আছে তার থেকেই কি দেবো, হুজুর?

বেশ, তাই দিয়ো।—এই ব'লে আমি গাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

গড়মুক্তেশ্বরের মেলায় যখন পৌঁছলুম তখন সকালের রোদের উপর দিয়ে অল্পস্বল্প মেঘলা করেছে। নদীর ওদিক থেকে হু হু করে' উত্তরের বাতাস এসে হাজার হাজার শীতার্ত যাত্রীদের হাড়-পাঁজরা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এ বছর শীত পড়েছে প্রচুর। কিন্তু আমার সঙ্গে উপযুক্ত শীতবস্ত্র না থাকায় একটু অসুবিধাই হচ্ছিল।

অগণিত হোগলা এবং তেরপলের তাঁবু পড়েছিল চতুর্দিকে। কিন্তু আমার জন্য একটা নিশানা রেখে গিয়েছিলুম। সংখ্যাতীত তাঁবু ও চালাগুলির মধ্যে একটির গায়ে বাবলাগাছের একটি ডালে বেঁধে রাখা ছিল দু' টুকরো লাল ও সাদা কাপড়। সেই নিশানাটার দিকে লক্ষ্য রেখে যাত্রীজটলার ভিড় কাটিয়ে একসময় আমি যথাস্থানে এসে উপস্থিত হলুম।

বছর চৌদ্দ বয়সের একটি সুশ্রী ও ফুটফুটে ছেলে আমারই জন্য তাঁবুর ধারে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল। ছেলেটির নাম সুরযকিষণ কাপুর। কিন্তু কিষণ বলেই তাকে সবাই ডাকে। আমাকে দেখামাত্রই সে সহাস্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আগয়া শেঠজি, নমস্তে!

আমিও হেসে বললুম, যাও, লকড়ি লাও, আগ লাগাও—

দশটি টাকা তার হাতে দিতেই সে উদ্দীপ্ত হয়ে বাইরে ছুটল। আমিও আমার দুই কানের উপর দিয়ে রুমাল বেঁধে গরম উনুনটার ধারে শীতে জবুথবু হয়ে বসলুম। এটি আমাদের রুটির দোকান।

একটি ছোট্ট কাহিনী আমার চলতি জীবনের সঙ্গে সম্প্রতি জড়িয়ে গেছে, সেটি বিশুনলালের কাছে প্রকাশ করতে আড়ষ্ট বোধ করেছিলুম। দিল্লীর কয়েক মাইল দূরে চানামণ্ডি নামক গ্রামের একটি ছেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গড়মুক্তেশ্বরের মেলায় আসছিল দোকান খুলতে। সঙ্গে তার পুঁজি ছিল দুটি টাকা এবং জামার পকেটে পাটকরা দুখানা রুটি। বিনা টিকিটে আসছিল, তাই কার্নাল ষ্টেশনে সে ধরা পড়ে। সঙ্গের দুটি টাকা জরিমানা দিয়ে সে ষ্টেশনের বেঞ্চিতে কাঁদতে বসে। আমি কার্নালে গিয়েছিলুম আমার সহকর্মী এবং একান্ত সুহৃদ্‌ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হরনাথ সিংকে দেখতে। আমি তার কঠিন ব্যাধির খবর জানতুম। হরনামের

সংগে সাক্ষাৎ ক'রে কার্নাল স্টেশনে এসে কিষণকে একস্থলে ব'সে কাঁদতে দেখি এবং তার সংগে আলাপ করি। অতঃপর তাকে সংগে নিয়ে গড়মুক্তেশ্বরে যাই, তাকে তারিফ করছিলুম। সে খাবার পর আমি দ্রুতহস্তে একখানা ছুরি নিয়ে আলু ও পেঁয়াজ কুটতে বসে গেলুম। উনুনটার মধ্যে ছাইচাপা আগুন ছিল,
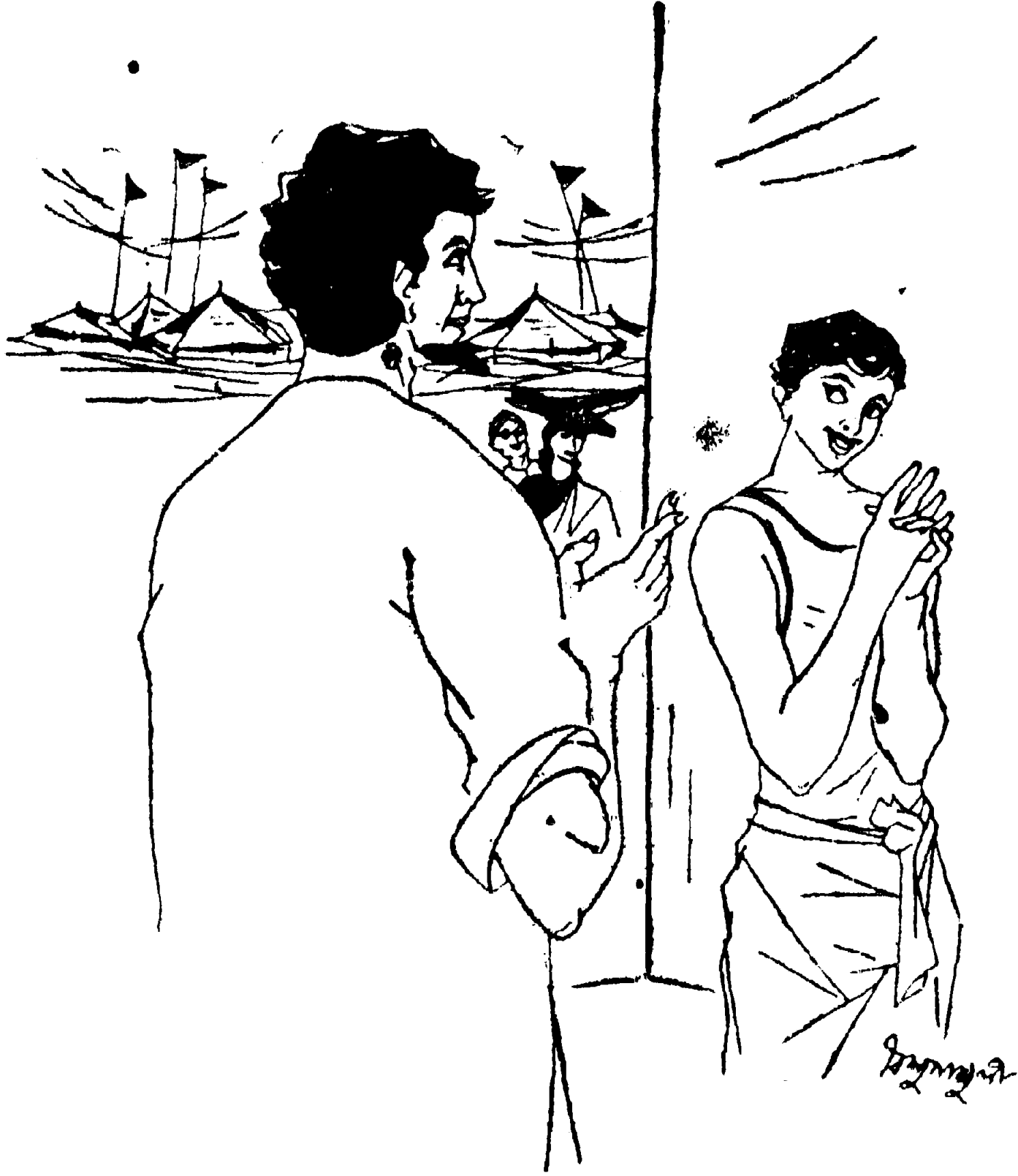
"আগ্যায়া শেঠজী, নমস্তে"

তাঁবু-চারপাই-চাটাই এবং তাওয়া-কড়াই-চামচ ইত্যাদি কিনি ও ভাড়া করি। কিন্তু এতেই আমার নিজস্ব তহবিল শেষ হয়ে আসে। সেই কারণে দ্বিতীয়বার কার্নালে গিয়ে হরনামের কাছে একশত টাকা ধার করে যখন ফিরছি সেই সময় বিশুনেলাল আমার পথে এসে দাঁড়ায়! কিষণকে আমার ভারি ভাল লেগেছিল, কারণ প্রথম দিনেই সে তার দু'টাকা পুঁজির কাহিনীটি আমাকে বলে।

যাত্রী সাধারণের সোরগোল এবং কর্মব্যস্ততার ভিড় সরিয়ে এক সময় কিষণ তার মালপত্র নিয়ে এসে হাজির হল। মাথায় ক'রে এনেছে দুখানা মোটা কাঠের গুঁড়ি। ঝুলিতে এনেছে দশ সের আটা। তার সংগে আলু ও পেঁয়াজ মিলিয়ে পাঁচ সের। এ ছাড়া চা, চিনি দুধের গুঁড়ো নুন আর লাল মিরিচসহ হলুদ। আমি উঠে আগে উনুন ধরাতে বসে গেলুম। কিষণ তার উপর ময়লা এলুমিনিয়মের কেটলীতে চায়ের জল বসিয়ে আবার দৌড়ল বিস্কুট, কেক এবং বনস্পতি ঘি আনতে। আমি

সুতরাং ধীরে ধীরে কাঠে আগুন ধরতে লাগল।

চায়ের জল ফোটবার আগেই কিষণ এসে হাজির, এবং সোৎসাহে আমাকে কাজ করতে দেখে সে কণ্ঠায় [illegible] হয়ে বলল, শেঠজি, আপনি কেন মেহনৎ

করছেন? আম এসব জানি। আমি যে একাজ করতুম প্যাটেলনগরের দোকানে!

সে কাজ গেল কেন, কিষণ?

সলজ্জভাবে কিষণ জবাব দিল, ওরা পেট ভ'রে খেতে দিত না!

দশ মিনিটের মধ্যে কিষণ সর্বাগ্রে আমার জন্য এক গেলাস ফুটন্ত চা প্রস্তুত করল, এবং আমি যখন তার একাংশ [illegible]চারেক বিস্কুট তাকে জোর ক'রে খাওয়াতে [illegible]লুম, সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, শেঠজি, এতে যে আপনার লোকসান হবে! চারখানা বিস্কুটের দাম দু' আনা!

ছেলেটার প্রখর হিসাব বুদ্ধির কথা শুনে আমি হেসে ফেললুম। বললুম, আমি কি তোমার সেই প্যাটেলনগরের দোকানদার?

উনুনের উপর বড় কড়াইখানা কিষণ চাপাল। নিচের দিকে কাঠের গুঁড়ি ততক্ষণে ধরেছে। আগে সে কড়াইতে খানিকটা জল ঢালল, এবং সেই জল যখন বেশ কসকসে গরম হল, কিষণ কড়াইখানা ধুয়ে ফেলল। তারপর কড়াই বসিয়ে আলুর পরিমাণের দিকে একবার তাকিয়ে সে আন্দাজে খানিকটা বনস্পতি ঘি ঢালল।

আমি আলু ও পেঁয়াজ কাটায় যেটুকু সময় নিলুম সেইটুকুর মধ্যেই সে চা-বিস্কুট খেয়ে নিল। পরে বলল, আপনার দশ রুপিয়ার হিসেব আমি এখনই দেবো শেঠজি। তবে আপনার হাতের মুঠো শক্ত রাখতে হবে। এই হোটেলের কারবারে আপনি প্রতি এক টাকায় সওয়া দো রুপিয়া পাবেন!

ছেলেটার চেহারা থেকে ধূলিমালিন্য সরিয়ে দিতে পারলে একটি অতি রূপবান বালক বেরিয়ে আসতে পারত। ওর এখনও ধারণা, আমি ওকে খাটিয়ে ব্যবসা ক'রে নিচ্ছি লাভবান হবার জন্য! সাধারণত এ ধরনের কারবার মেলা প্রভৃতিতে হয়ে থাকে। অতঃপর পেঁয়াজ ও আলু ধুয়ে সে কড়াইতে একসঙ্গে ঢেলে দিল, উপযুক্ত পরিমাণ লঙ্কা ও হলুদের গুঁড়ো এবং নুন ছড়িয়ে দিল কড়াইতে। তারপর বড় খুন্তিখানা নিয়ে সে সমস্তটা ভাজতে বসে গেল।

আমি ততক্ষণে আটা মাখতে বসে গেছি। এক সময় বললুম, আমরা দুজনে প্রথম কয়েকখানা গরম গরম রুটি ও ভাজি আগে খেয়ে নেব, বুঝলে কিষণ?

কিষণ একটু অবাক হয়ে খুন্তিখানা থামিয়ে বলল, ক্যা কয়তেহে' সাব? নিজেরাই খাব তবে বেচব কি? লাভই বা কি করব? নিজেদের পেট একটু মেরে রাখলে তবেই না পয়সা? এখানে মেলা থাকবে এক মাস। আপনার মেহেরবানিতে যদি দোকানখানা থাকে, তবে আপনি কম-সে-কম সাড়ে-তিন-চারশ' টাকা লাভ পেয়ে যাবেন। আপনার মূলধনের টাকা আমি পাঁচদিনেই তুলে দেব।

ছেলেমানুষের উৎসাহ দেখে আমি সকৌতুকে হাসছিলুম। সে যখন আলুর উপরে দু'ঘোটা জল ঢেলে দিয়ে আটার তালটা দলাই-মলাই করতে লেগে গেল, আমি তখন প্রশ্ন করলুম, তোমার মা-বাবা কোথায় কিষণ?

কোই নহি।—কিষণ জবাব দিল।

কেউ নেই? তবে চানামণ্ডিতে থাকো কা'র কাছে?

একটু থতিয়ে কিষণ বলল, একজন মেয়েছেলেকে দিদি বলি। তার কাছেই থাকি। তাদের খাবার দাবারের বন্দোবস্ত করে দিই। ফাই-ফরমাস খাটি।

আমি বললুম, তুমি একমাস পরে ফিরে গিয়ে যদি তোমাদের গাঁয়ে এমনি একখানা দোকান বসাও, মন্দ কি?

আটা শানতে শানতে কিষণ বলল, চানামণ্ডিতে আমি আর ফিরব না, শেঠজি।

ফিরবে না? কেন?

উনুনে তরকারি ফুটছিল। কিষণ খুন্তি দিয়ে একবার সেটা ওলোট-পালট করে দিল। পরে বাইরের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল, শীতের হাওয়ায় গরম গরম তরকারির সঙ্গে ফুলকোর আকর্ষণে এরই মধ্যে কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ খরিদ্দার দাঁড়িয়ে গেছে। তরকারির সুগন্ধটা ক্ষুধার উদ্রেক করেছে সন্দেহ নেই! কিষণ তাদের দিকে চেয়ে বলল, এক ফুলকো এক আনা, এক প্লেট্ সব্জি দো' আনা।

খরিদ্দাররা প্রস্তুত হয়েই এসেছিল।

আমার প্রশ্নটা আরেকবার কিষণকে স্মরণ করিয়ে দিলুম। তখন সে বলল, দিদির তহবিল থেকে পাঁচটা টাকা আমি না বলে নিয়েছিলুম, শেঠজি। দিদির কাছে আমার যাবার আর মুখ নেই!

বললুম, ওঃ এই কথা! তা বেশ ত', পাঁচ টাকা নিয়েছ, ফেরৎ দেবার সময় দশ টাকা দিয়ো?

না, শেঠজি। একবার চুরি করলে চিরকালের চোর! যদি আমাকে দেখতে পায় চানামণ্ডির সর্দাররা, আর আস্ত রাখবে না! আমি অন্য মুলুকে চ'লে যাব, শেঠজি। কপালে থাকলে খেটে খাব!

আমি তার পিঠ চাপড়ে সস্নেহে বললুম, ভয় নেই কিষণ, আমি যাব তোমার সঙ্গে। চুরি এক জিনিস, আর অভাবে প'ড়ে ছেলেমানুষের পক্ষে হাত সাফাই করা অন্য জিনিস। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। আর যদি তা'রা ক্ষমা না করে, তুমি-আমি দু'জন কোনও একটা শহরে গিয়ে আধাআধি বখরায় একটা ভাল হোটেল খুলব! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, কিষণ।—এই বলে আমার দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের জন্য আমি নিজেই উনুনের আগুনের উপরে জল-মুদ্ধ কেটলীটা বসিয়ে দিলুম।

(ক্রমশ)

সহ-বাস

তারপর প্রতিজ্ঞা করেছিলুম আর তোমাদের নিয়ে কখনো গল্প লিখবো না। লিখলেও তোমাদের মত যাদের চিনি-জানি, একসংগে এককালে উঠেছি, বসেছি, হেঁটেছি তাদের কথা আর নয়। খুব শিক্ষা হ'য়ে গেছে! দূর থেকে তোমাদের নমস্কার করছি! গল্পকে এমন সত্যি করে তুলতে পার, আর নিজের গায়ে মাখতে পার আগে কি জানতুম! সেবার কেতকী কি কান্ড করেছিল মনে আছে নিশ্চয়ই? কেঁদে-কেটে একশা! শেষ পর্যন্ত বড়সাহেবের কানে গিয়ে উঠলো. অফিসময় রাষ্ট্র হ'ল, এক কেতকী সহস্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল! গল্পের কেতকী অমন কুৎসিত হ'বে ভাবতে পারিনি। তোমাদের নিয়ে অনেক শিক্ষা হ'য়ে গেছে! বিশ্বাস কর কোন শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে সেদিন কেতকীকে নিয়ে গল্প লিখিনি। কিন্তু গল্প লেখার পর পাঁচ মুখে নানা কথা শুনে মনে হয়েছে. না লিখলেই ভাল ছিল—কেতকী অমন কে জানতো! তোমরা যাই বল, আমি আর কোনদিন কেতকীকে সুন্দরী বলতে পারবো না। আমার গল্পটা যদি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারতুম!

[মানি তোমরা সকলেই সুন্দরী, কিন্তু কেতকী যেন বিশেষ। চোখে দেখেই মনে মনে বাঃ বাঃ করে ওঠার মত। কোন চোখের চাওয়া অমন মন-প্রাণ অধিকার করতে পারে জানতুম না! সবাই স্বীকার করবে শুধু চোখ নয়, সমস্ত অবয়ব কেতকীর অদ্ভুত ভাবব্যঞ্জক! সেইখানেই আমার ভুল হয়েছিল। তোমাদের সংগে এক রকম ক'রে মিশতুম, হেসে গল্প করে, আলাপ ক'রে কখনো বা লঘু পরিহাস করে সময় কাটিয়ে দিতুম! বিশেষ করে তোমাদের সম্বন্ধে কোনদিন ভাবিনি, রমেন, সুরেন, হীতেন, সন্তোষ, সুশীল যেমন তোমরাও তেমনি—প্রয়োজনে ঘর জুড়ে জিনিস রাখার মত. সহকর্মী, সহকর্মিনী! কিন্তু কেতকী ভাবিয়েছিল. অমন চোখ, মুখ, নাক, দেহ, না ভেবে প্যারিনি! তোমরা কেউ লক্ষ্য করনি কেতকী আসার পর কতবার দোতলায় উঠে গিয়েছি হিসাব ছিল না! অকারণ নিশ্চয়ই নয় ওপর-নীচ করাটা?

কেতকী আমাকে আনন্দ দিয়েছিল. কেতকী আমাকে বেদনাও দিয়েছিল। আমি সেই কেতকীর রূপের ব্যাখ্যা করে গল্প লিখেছিলুম, কিন্তু তার অর্থ বিপরীত হয়ে দাঁড়াল। আমাকে তোমাদের বড়সাহেব নির্বাসন দিলেন। স্বর্গ হ'তে বিদায়!]

তোমরা কেমন আছ জানি না, আমার একদা সহকর্মীরা তোমাদের নিয়ে কেমন অফিস ক'রছে তাও জানি না! শুনেছি অফিসটা নাকি অনেক বড় হ'য়ে গেছে. বড়সাহেব তোমাদের দল অনেক ভারি করে দিয়েছেন। দিল্লি থেকে ঢালাও নির্দেশ এসেছে। দরাজ হাতে বড়সাহেব তোমাদের নিয়োগপত্র বিলি করেছেন। ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি হ'য়েছে কি? (আমার কেমন সন্দেহ হয় তোমরা আবার কোনদিন না পাকিস্তানের মত আলাদা হবার প্রস্তাব নিয়ে মিছিল বার কর! কর কর আমার খুব সমর্থন আছে!)

কিন্তু সেই তোমাদের নিয়েই গল্প হ'চ্ছে! নির্লজ্জের মত তোমাদের কথাই বলছি আবার। কেতকী, মাধবী, শান্তা, সুধা, গৌরী, বীণা, ইন্দিরা, সুমিতা, ছন্দা, সন্ধ্যা কত নাম যে এক এক করে মনে পড়ছে, কিছুতে মন থেকে সরাতে পারছি না; বলতেও পারি না, তোমরা যাও, তোমাদের নিয়ে স্মৃতিমন্থন করবার সময় নেই—নাকে কানে খত দিয়েছি আর কখনো যদি তোমাদের নিয়ে গল্প লিখি! লিখলেও চেনা-জানা সম্পর্কে তোমাদের নিয়ে কখনোই না!

মোচাকে মাছি লেগে থাকার মত বাসের ভিড়টা ভিতর থেকে ঠেলে এসে বিপজ্জনক ভাবে বাইরে ঝুলছে। পড়ি-কি মরি অবস্থা। বাসটা একবার থেমে গেলে আর বুঝি চলবে না, মুখ থুবড়ে পড়বে!

বাসকে তবু থামতে হয়! যাত্রী ওঠে, নামে। ঠেলাঠেলি, ছোটাছুটি, মারামারি, কুটি-আঁকড়ে হাবুডুবু!

প্রথমটা কেউ-ই বুঝতে পারেনি, সমস্বরে মার মার করে উঠল—আবার ঘণ্টা দিলে কেন? বাঁধলে কেন? পিছনের বাস চলে গেল যে!

একটা গুরুতর অপরাধের কৈফিয়ৎ নিতে যাত্রীরা মারমুখী। বাসটা এমন ভাবে থেমেছে যেন আর কখনো চলবে না, এই থামা ওর শেষ থামা।

কিন্তু না; মুহূর্তকাল মাত্র, জাহাজ চলে গেছে নদীর পাড়ে ঢেউ ভাঙার মত আমরা কিছুটা টের পেলুম; তারপর বাসটা যখন সত্যি সত্যি উর্ধ্বগামী হল তখন হঠাৎ কারণটা অনুধাবন করা গেল।

এই 'স্টপে' বাঁধবার জন্যে তোমাদের কেতকী কখন নির্দেশ দিয়েছিল। ভিড়ে আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি কখন-কি-ভাবে আশপাশে ঢেউ তুলে কেতকী ঠিক জায়গাটিতে এসে নেমে পড়েছিল। চোখে না দেখে আমরা যারা বিরক্ত হ'য়েছিলুম তারাই আবার হাত মুড়ে পা মুড়ে গা-গতর হেলিয়ে, টেরে-বেঁকে জায়গা করে দিয়েছিলুম। আমি বুঝতেই পারিনি যে, ঠিক এই সময় এই 'স্টপেই' কেতকী নামবে, আবার এমন ভাবে যেন ও'র নামা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু দেখবার বা শোনবার বস্তু নেই। অন্তত এই বাসে।

সবে স্টার্ট নিয়ে বাসটা চার চাকা এক করেছে, জানলা দিয়ে ভিড়ের মধ্যে তোমাদের কেতকীকে স্পষ্ট দেখলুম। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথের উপর উঠছে। কেমন পরিশ্রান্ত অন্যমনস্ক যেন। আর কিছু দেখবার আগেই বাস-জানলার সীমানা পেরিয়ে গেল।

তারপর কিছুতে মনে করতে পারলুম না তোমাদের অফিসটা এমন একটা অখ্যাত জায়গায় কবে উঠে এল! কই, এত খবর দাও, এখবর তো কোনদিন দাওনি যে তোমাদের অফিস স্থান পরিবর্তন করেছে? আর যদিও তোমাকে কোনদিন কেতকীর কথা জিজ্ঞেস করিনি, তা হ'লেও তোমার উচিত ছিল কেতকীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাকে সম্যক অবহিত করা। একদিন আমাকে নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেছিলে—বলেছিলে বুড়ো বয়সের কি যেন!

বড় কাহিল মনে হল তোমাদের কেতকীকে! অসুখ-বিসুখের দরুণ কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আমি যেমনটি

দেখেছিলুম তেমনটি আর ও নেই। শুধু রোগা-রোগা নয় কেমন যেন শ্রীহীন। কি হয়েছিল?

কিছু না? তা হ'লে—

কখন অন্যমনস্ক হ'য়ে তোমাদের মাঝখানে ফিরে গেছি। অনেকদিনের কথা, কিন্তু স্মৃতি অম্লান, অনুভূতি স্পষ্ট! দেখতে পেলুম সেদিনকার তোমরা ক'জন আমার চারপাশে। নতুন অফিস, আমি তোমাদের কাজ শেখাব বলে গেছি। তোমাদের কেউ আমাকে দাদা বল, কেউ বা বাবু বলে সম্বোধন করছো। আমার অবস্থা তোমাদের বোঝবার কথা নয়। প্রথম প্রথম তোমাদের গা ঘেঁসে বসতে, দাঁড়াতে, কথা কইতে বেশ সঙ্কোচ আর জড়তা বোধ করতুম, আমি প্রৌঢ়, চাকরির মেয়াদ প্রায় বিশ বছর কমিয়ে দিয়েছি—এই সময় তোমাদের সাহচর্য সহকর্মী হিসাবে—

থাক সে-সব কথা। আর ক'টা বছর যা হোক করে কাটিয়ে দিতে পারবো। আমাদের অফিসে একটিও মেয়ে-কর্মী নেই। বিশ্বাস করবে আমাদের টেলিফোন অপারেটরটা পর্যন্ত পুরুষ, তাও বয়স্ক—বড় বদমেজাজী, খিটখিটে? প্রাইভেট 'কল্' দেবার কোন উপায়ই নেই!

বিশ্বাস কর পৃথিবীর এদিকটা আজো বড় অন্ধকার। এখানে ফিরে আসতে আমার পুরোন সহকর্মীরা তোমাদের সঙ্গে একত্রে কয়েক বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক গল্প বানিয়েছিল, আমার মুখের কথায় সে-গুলো মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিল। খুব উৎসাহ আর উৎসুক্য দেখেছিলুম। উৎকট কৌতূহল তোমাদের সম্বন্ধে। স্বর্গে অপ্সরা যেন তোমরা।

বিশ্বাস কর, আমি তাদের নিরাশ করেছিলুম। তোমাদের সম্বন্ধে সহবাসের অভিজ্ঞতার কথা কিছুতে সহজ করে ব্যক্ত করতে পারিনি। নিরাসক্তভাবে বলেছিলুম, কেমন আবার? তোমরা যেমন! দশটায় আসে পাঁচটায় যায়, কাজ-কর্ম করে, ফাইল খোলে, ফাইল বন্ধ করে। খায়-দায়, বেড়ায়, ঘুমোয়!

তারপরও আরো অনেক প্রশ্ন। কিন্তু সে-সব তোমাকে শোনাব না, শুনে কাজ নেই। রাগ হবে, যা-তা ভাববে।

এই আমার কথাই ধরো না। কেতকী আসবার পর তোমাদের অফিসে কি কাণ্ড শুরু হয়েছিল। ফাইলপত্র সব বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, দরকার না থাকলেও সহকর্মীদের আনাগোনায় দোতলার ঐ ঘরটা পীঠস্থান হয়ে গিয়েছিল!

বুকে হাত দিয়ে এখন সত্যি করে বলতো, কেতকীকে নিয়ে আমি যে-গল্প লিখেছিলুম তাতে ঐ-সব চাঞ্চল্য তোমাদের অসূয়া মনোভাব এবং পরিবেশের রমণীয়তা ছাড়া আর কি লিখেছি? তোমাদের অফিসটা আর অফিস ছিল না কেতকীর আগমনের পর। সোজা কথা এই তো?

তা নয়, সেদিন তোমরা আমাকে পরম শত্রু ভেবেছিলে—শেষ পর্যন্ত আমাকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লে! কিন্তু ভেবে দেখলে না, সেদিন আমি তোমাদের সবার ভাল করতে চেয়েছিলুম। অফিসের মধ্যে একটি বিশেষ মেয়েকে নিয়ে অত আদিখ্যেতা, আদর হবে কেন? মানলুম, কেতকী অনিন্দ্য-সুন্দরী, এবং আবভাবে চালচলনে অনন্যা!

কবুল করছি গল্পের শেষটা একটু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলুম। বোধ হয় তোমরা সবাই চটেছ সেই জন্যে।

একদিন দেখা গেল, হীরেন হন্তদন্ত হ'য়ে বড়সাহেবের ঘরে 'স্লীক' করতে গিয়ে মুখে আচমকা দরজা লেগে যেন ফিরে এল। অনেকক্ষণ সে গুম হয়ে নিজের আসনে এসে বসেছিল। তোমার মনে আছে, অফিসের ছুটির পর সে তার প্রাণের বন্ধু নীতীশকে বলেছিল

—কথাটা তুলে দিচ্ছি—'একটা পা তখনো দরজার বাইরে, এক হাতে 'স্পীক কেসের' ফাইলটা, কাত হ'য়ে কনুই দিয়ে দরজা ঠেলেছি, তারপর পিছু হটেছি, ভয়ে পড়ি-কি-মরি করে করিডর দিয়ে ছুটে চলে এসেছি—'

তারপরও অনেকক্ষণ হীরেন গুম হ'য়ে উদাসভাবে নিজের সীটে বসেছিল। কথা খুঁজে খুঁজে জিভটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হীরেন চোখেও ঝাপসা দেখেছিল, বড়সাহেবের ঘরের দোর-গোড়া থেকে ফিরে এসে সামনে বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে নাকি ওর মনে হয়েছিল, ঘড়ির কাঁটা ঘুরে অদ্ভুত একটা সময়ের সঙ্কেত করেছিল। মাথা ঘুরে গিয়েছিল ঠিক, কিন্তু তা বলে ঘড়ির কাঁটা ঘুরবে কেন?

কিছুতে হীরেন আর কিছু বলে না। নীতীশ অধৈর্য হ'য়ে পড়েছিল, অফিস ফেটিয়ে সবাই চলে গিয়েছিল, ফরাশ এসে এক এক করে সব ঘরের উপর-নীচে আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করছিল, ওপারে বড়রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও স্তিমিত হ'য়ে এসেছিল, তারা ফুটে ফুটে উঠেছিল আকাশে—তোমাদের অফিসের সামনে যে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা, ফুল ফোটা সবে শেষ হয়ে, আবার পাতা ধরেছে—তার মাথার একটা তারা চাইতে চাইতে কেমন যেন চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল।

নীতীশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তারপর কি দেখলি বল্ না বড়সাহেবের ঘরে, বেম মেরে গেলি কেন?'

হীরেন কি শুনছে যেন খেয়াল করতে পারছে না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে। সোরগোড়ায় কলের গানের কুকুরের মত ফরাশটা হীরেনের ঘরের আলোটা নেভাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

নীতীশ উঠে পড়ে বন্ধুর পিঠে এক ঘা চাপড় মেরে বললে, 'তুই পাগলের মত বসে থাক, আমি চল্লেম। এ আবার কি!'

তারপর হীরেন সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশ্যভাবে অফিসে এমন সব কাণ্ড করতো যাকে পাগলামী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তোমাদের মধ্যে কেতকীই খুব বিরক্তি প্রকাশ করতো। একদিন বুঝি অফিসের সিঁড়ির মুখে ওদের হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল। তোমরা মেয়েরা

সেদিন বড়সাহেবকে নালিশ করেছিল, লিখিত অভিযোগও জানিয়েছিলে হীরেনের বিরুদ্ধে শীলতাহানির।

কিন্তু 'চার্জশিট' দেবার আগেই হীরেন বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল। শেষ যেদিন অফিসে এসেছিল পরণের কাপড় ছেঁড়া, চুল রুক্ষ, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যবহারে সেদিন পাগলামীর লক্ষণ কিছু প্রকাশ না পেলেও ঘাড় ধরে ওকে বড়সাহেব অফিস থেকে বার করে দেবার হুকুম দিয়েছিলেন। ছেলেদের মধ্যে একটি পাগলকে তোমাদের যে ভয়!

তারপর কিছুদিন হীরেনের পাগল হওয়ার কারণ নিয়ে অফিসে অনেক গবেষণা হ'য়েছিল। প্রথমে হেরিডিটরি কিনা সেটা জানবার চেষ্টা হ'য়েছিল। সেদিক থেকে কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। কোন পুরুষে হীরেনদের কেউ পাগল ছিল না। কারণটা অনেকটা রহস্যাবৃত রয়ে গেল।

কিন্তু সত্যি কি তাই? হঠাৎ একটা লোক কাজ করতে করতে পাগল হ'য়ে যাবে কেন? নতুন যারা ভর্তি হ'য়েছিল তাদের মধ্যে হীরেনই ব্রাইট আর কাজে চটপটে। মনে নেই হীরেনকে প্রমোশন দেবার কথা উঠেছিল, কেবল বয়স কম বলে স্থগিত ছিল? যাক গে সে কথা।

আমরা হীরেনের চিকিৎসার জন্যে একটা ফান্ড তৈরী করেছিলুম। সবাই কিছু কিছু দিয়েছিলুম। তোমরা মেয়েরা ছেলেদের দ্বিগুণ চাঁদা দিয়েছিলে। অথচ শীলতাহানি এবং অসৌজন্যের জন্যে তোমাদের অভিযোগ ছিল সেদিন সর্বাধিক। পেলে তোমরা হীরেনকে কামড়ে, খামচে শেষ করে দিতে! তুমিই তো আমাকে একদিন বলেছিলে, 'আহা বেচারা! কেমন আছে?'

'আছে ভাল। কিন্তু আর কোনদিন এখানে ফিরে আসবে না। মাথাটা একেবারেই গেছে!'

'মানুষ চিনতে পারে? কথা বলে?'

'পারে। বলে, বড় আশ্চর্য! আমি খুন করবো।'

'কি আশ্চর্য? কাকে খুন করবে?'

'তা কিছু আর বলতে পারে না। ওর চোখ দুটো এমন করুণ মনে হয়, দেখলে কষ্ট হয়!'

ক্রমশ অফিসের ভিড়ে হীরেনের রোগের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম। চিকিৎসা-ফান্ডেরও আর তেমন জোর ছিল না। হীরেনের বাবা প্রতি মাসেই আসতেন মাইনের দিনে। প্রথম প্রথম সবাই মানবতা বোধ করলেও, লক্ষ্য করেছিলুম সহকর্মীরা বিরক্ত হয়েছিল। টের পেয়ে ভদ্রলোক আর আসেননি।

তোমার মনে আছে গল্পের শেষটা, মানে উপসংহার কি ছিল? একটি ছেলে শুধু শুধু পাগল হল, কারণটা কেউ জানল না? জ্বলন্ত শিখার মত একটি রূপ পতঙ্গকুলকে আকৃষ্ট করলে, নির্বুদ্ধি যে সে কেবল পুড়ে মরল? হীরেনের কথা ছিল, কিন্তু তা প্রচ্ছন্নভাবে। সবার সঙ্গেই কেতকীকে আমি যুক্ত করেছিলুম, বড়সাহেবের সঙ্গে একটু বেশী করে। কেতকীর উন্নতিটা তো তোমরা দেখেছিলে। তোমাদের সবার জুনিয়র, কিন্তু তোমাদের সবাইকে কেতকী মেরে দিয়েছিল। কারণটা কি?

গল্প লিখলেও, সত্যি কথা বলবো, আমিও বড়সাহেব হ'লে ঐরকমই করতুম। অফিসের মাথায় হাত বুলিয়ে কেতকীর কটাক্ষে হৃদয় বিদ্ধ করতুম। স্বাধিকারবোধ তোমাদের কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হ'তো না। কিসে কম তোমরা যে অফিসে তোমাদের প্রমোশন হ'লেই কথা উঠবে? তোমরা এখনো নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয় বলে আমার গল্পটার অন্য মানে করে কেতকীর সঙ্গে চোখের জল মিলিয়ে সেদিন একটা কাণ্ড করেছিলে! আমার আর কি, তোমরাই ভুল করলে! কেতকী তোমাদের সবাইকে এবার আরো টেক্কা দেবে, তোমাদের চোখের ওপর এমন সব কাণ্ড করবে তখন বুঝবে! তখন আমার কথা মনে করো। আমার গল্প পড়ে তোমরা বলেছিলে মেয়েদের আমি অপমান করেছি, অফিসের কুৎসা রটনা করেছি, চাকরি-

করা মেয়েদের ছোট করেছি। রেগে তোমাদের একজন বলেছিল আমাকে দেখে নেবে, এমন অবস্থা করবে যে উঠে আর পথ্যি করতে হ'বে না। অর্থাৎ—

তোমাদের বড়সাহেব বিপিনবাবু তোমাদের কথায় সেই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু না-পেরে রেগে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এ সব কি লিখেছেন? জানেন আপনাকে রিভার্ট করতে পারি!'

চুপ করে শুনে বলেছিলুম, 'কি সব? কারণটা কি?'

বিপিনবাবু আমার চেয়ে বয়েসে বড়ই হ'বেন, কিন্তু অনেককাল বড়-সাহেবগিরি করছেন বলে স্বাস্থ্যটা ভালই আছে, আমার চেয়ে ছোটই মনে হয়। তার ওপর তোমাদের কল্যাণে আজকাল আরো ফিট্‌ফাট থাকেন, নব্য যুবক বোধ করেন। রাগটা ঠোঁটে আর চোখে প্রজ্জ্বলিত করে বললেন, 'অফিসের স্ক্যান্ডাল করেছেন, আমি অবশ্য পড়িনি, কি সব গল্প লিখেছেন!'

হাসি চেপে বললুম, 'গল্প! পড়ে দেখুন দয়া করে।'

দশদিন পরেই আমার পতন হ'য়েছিল। নিজের অফিসে ফিরে এলুম। বেশ আছি। আমাদের বড়সাহেব তোমাদের বড়সাহেবের মত নন, কে কোথায় কি করল তার খোঁজ রাখবেন! তাঁর গুহায় পোঁছন আমাদের মত ইতরজনের পক্ষে গিরিশৃঙ্গ লঙ্ঘনের সামিল! তাসের দেশের মত অদৃশ্য নিয়ম-শৃঙ্খলায় আমাদের অফিস চলছে! অফিসের কাজ ছাড়া এখানে মনের কোন বাড়তি কাজই নেই, হৃদয়বৃত্তির উত্তাপে উত্তপ্ত হবারও কারণ নেই। সব বাঁধা-ধরা, অফিসে আসার দিনটি থেকে, অফিস ছেড়ে চলে যাওয়ার দিনটি পর্যন্ত ছককাটা! দুঃখ, অভিমান, মন-কষাকষি, রাগ, দ্বেষ, মন দেওয়া-নেওয়া কিছুই না! বিশ্বাস কর বেশ আছি। কাজ ছাড়া আর কিছুর ধার ধারি না। আমাকে নিয়েও কারো মাথা ব্যথা নেই। সত্যি গল্প লিখলেও কেউ কিছু বলে না, মিথ্যে গল্প লিখলেও কেউ তেড়ে আসে না, গলায় হাত দিয়ে কারণ জানতে চায় না।

বাস থেকে কেতকীকে নামতে দেখে তোমাদের কথা মনে পড়ল। বেশি করে ওকে নিয়ে সেই গল্পটার কথা। কি এমন গল্প যে সেদিন অত উষ্ণতার কারণ হ'য়েছিল, আমি তো প্রায় ভুলে গেছি। কত গল্প তো অমন রোজ লেখা হ'চ্ছে, পাতা উল্টে যাওয়ার মত মনের আড়াল হয়ে যাচ্ছে, কে মনে রাখছে!

আরো কেতকীকে দেখে মনে হল, সেদিন আমার মনে কেতকীর সম্বন্ধে যে-সব কথা প্রাধান্য লাভ করেছিল তার কোন কারণ ছিল না। বেচারা! গল্পে যাই লিখি ঐ তো তোমাদের কেতকী, ভ্রষ্ট কুসুমের মত ম্লান, বিগলিত! ওকে অত বড় ক'রে সকলকে জড় করে অস্বাভাবিক একটা মানবিক বৃত্তিকে কটাক্ষ করার কোন মানে হয় না। কোন দোষই ও করেনি—ভগবান ওকে রূপ দিয়েছেন, সেই রূপে সে ভুবন ভোলাবে, আশ্চর্য কি! হ'লেই বা চটুল, অস্থির? রূপ কোন্‌কালে স্থির, গম্ভীর?

খুব বেশি লেট হয়নি। অফিসে পোঁছতে। পাঁচ মিনিট। হাজিরে খাতাটা পিয়নের হাতে ছিল, সিঁড়িতেই আটকেছি। সই করে ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠে এসে বুড়ী ছুঁয়েছি, বুড়ো বয়েসে পরিশ্রমটা একটু বেশি হয়েছে, বেশ কিছুক্ষণ দম নিয়ে সামলাতে হল। তোমাদের সঙ্গে যখন কাজ করেছি, তখন চল্লিশ ছিল, এখন তার সঙ্গে আরো পাঁচ-ছ' বছর যোগ কর। আধ-বুড়ো তো নিশ্চয়।! উপর নীচ করলে বুক ধড়ফড় করে।

সুস্থির হ'য়ে জল খেয়ে ফাইল খুলে বসলুম। আমাদের অফিসটা যেখানে সেখানে ট্রাম-বাসের ঘড়ঘড়ানি নেই, একটেরে নির্জন। সামনে জানালা-গুলো খুলে দিলে হু-হু ক'রে বাতাস আসে, প্রাণ জুড়িয়ে যায়! 'পেপার-ওয়েট' না হলে কাগজপত্তর সামলান দায়। সরকারী অফিস সব সময় ষ্টেশনারী জিনিস পাওয়াও যায় না, আমরা ইঁট-পাটকেল কুড়িয়ে এনে 'পেপার-ওয়েট' করি।

উন্মুক্ত জানালা দিয়ে খুব হাওয়া আসছিল। হাওয়া নিরাকার, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। আশ্চর্য, এক এক করে উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে হাওয়ার

সঙ্গে তোমরাও যেন এসে হাজির হ'লে, আমার আশপাশে তোমাদের কলকাকলি, অলংকার আর আঁচলের খস্‌খসানি শুনতে পেলুম। আমি আবার তোমাদের সঙ্গে সহ-বাস করতে এসেছি। একটা নতুন অভিজ্ঞতায় ভরপুর হ'য়ে উঠেছি। শিহরিত, পুলকিত, শঙ্কিত হচ্ছি।

হঠাৎ কেতকী এসে আমার সামনে দাঁড়াল। স্ফুরিত অধরে রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, মিথ্যে করে কেন আমার বদনাম করলেন? আপনি জানেন আমার জন্যে হীরেন পাগল হ'য়েছে! ছোটলোক, ইতর কোথাকার!'

মুখ বুজে সহ্য করলুম। কেতকীকে ভাল লাগলেও এই ব্যবহার ভাল লাগেনি। গল্প গল্প, এ যারা বোঝে না তাদের সঙ্গে আবার কি তর্ক করবো আর নারী-পুরুষের ব্যাপার অংক নয় যে কষে দেখিয়ে দেবো।

মনে হ'ল তোমরাও কেতকীর পিছনে আছ। আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলা বৃথা। মিথ্যে করে কিছু না বললে তোমরা বিশ্বাসও করবে না। আর আমি তো জানি না হৃদয়বৃত্তির কোন ভাবই অবিকল প্রকাশ পায় কিনা। গল্পটা সেই কারণে হয়তো তোমাদের সত্যি মনে হ'য়েছে! আমার দুর্ভাগ্য!

কুপিতা কেতকীকে সমধিক রূপসী মনে হল। মনে মনে কামনা আমায় উদ্বেল হ'য়ে উঠল। যা কোনদিন কল্পনাও করিনি, হাত বাড়িয়ে কেতকীকে ধরতে গেলুম।

হাওয়ায় কাগজ-পত্তর উড়ে ছত্রাকার হ'য়ে গেল। আশপাশের সবাই হা-হা করে উঠল। উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলুম। প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ভাবলুম হঠাৎ এ দিবাস্বপ্নের মানে কি। অকারণে আমিও পাগল হলুম নাকি, বড়সাহেবের ঘরে 'স্পীক' করতে গিয়ে কোনদিন ফিরে আসিনি তো? এই সবেমাত্র কত দিন পরে চলন্ত বাস থেকে কেতকীকে নেমে যেতে দেখেছি কেবল!

কিছুতে কাজে মন বসাতে পারলুম না। ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে কেতকীকে বলে আসি, তোমাকে নিয়ে যে-গল্প লিখেছি আগাগোড়া বানান। হীরেনকে তুমি পাগল করতে যাবে কেন? ও আপনিই পাগল হ'য়েছে!

একটা 'এন্‌গেজমেণ্ট' করবার অভিপ্রায়ে তোমাদের অফিসে ফোন করলুম। অপারেটর গোকুলবাবুকে অনেক তোয়াজ ক'রতে হ'ল এর জন্যে। সিগারেট, পান, চা ঘুষ দিয়েছি। একি তোমাদের মিস্ দে যে বললেই 'কনেকশন' দিয়ে আড়ি পাতবে!

কিন্তু ফোন-এ কেতকীকে পেলুম না। তোমাদের অপারেটর বোধ হয় নতুন, নামটাই শোনেনি দেখছি। নীতীশকে ডাকলুম। নীতীশ ফোন ধরলে। তার কাছেই সব খবর জানলুম। একটু অবাক হলুম।

কেতকী তোমাদের অফিস ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় কাজ করছে। হীরেনকেই নাকি সে বিয়ে করেছে। দুটো সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়েছে। অফিসের পরে মেয়ে-পড়ানর কাজ করে। হীরেনের মাথা ঠিক হ'লেও আজও বেকার। সুতরাং—

আর একটা কথা তোমরা কিছু জান নাকি—নীতীশ তো গলা নীচু করে বললে—হীরেন একটা শক্ পেয়ে সেদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল?

"আমি ভাবতে পারিনি ও কোনদিন এমনি বিশ্বাসঘাতিনী হবে......দেখে আমার বুদ্ধি লোপ পেল, মনে হল অন্ধকারে অতল গহ্বরে পড়ে গেছি।... দিব্যি হর-পার্বতী হ'য়ে ওরা বসে আছে! Frailty thy name is woman!"

এক টুকরো কাগজে লেখাটা নীতীশের হস্তগত হ'য়েছিল হীরেনের টেবিল পরিস্কার করতে করতে। (ওরা মানে কেতকী আর বিপিনবাবু, আমি আন্দাজ করছি।)

হীরেনের মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ হিসেবে এ কথাটা আমরা সেদিন কেউ-ই ভাবিনি। সন্দেহও করিনি। আমার বানান গল্পটা বোধ হয় টের পেয়েছিল, তাই অপ্রিয় সত্য মিথ্যার রূপে তোমাদের সকলকেই আঘাত করেছিল। আমার পতন হ'য়েছিল।

এখন দেখছি পতন কেবল আমারই হয়নি, কেতকীরও হ'য়েছিল। তোমরা নিশ্চয়ই কেতকীর মত মেয়ের এ-হেন পতন সমর্থন করো না!

প্রদর্শনী

॥ কলারসিক ॥

লোকশিল্পের একটি মনোরম প্রদর্শনী

পৃথিবীর সব দেশের লোক-শিল্পের ভাষা যে এক, তা গত ২১শে জুলাই ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্ ভবনে অনুষ্ঠিত পোল্যাণ্ডের লোক-শিল্পের প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে আবার নতুন করে উপলব্ধি করা গেল। লোকায়ত মানুষের সহজ-সরল অনাড়ম্বর মনে তাঁদের লৌকিক ও ধর্মীয় জীবনকে সুন্দর করে সাজাবার যে স্বাভাবিক বাসনা, তাই নানা তুচ্ছ উপকরণের সাহায্যে শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে সেই স্মরণাতীত কাল থেকে বারংবার আত্ম-প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে হয়তো এই লোক-শিল্পের ভাববস্তু ভিন্নতর রুচি ও ভঙ্গীকে ভিত্তি করে কখনো কখনো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে সব দেশের লোক-শিল্পের প্রকাশ-রীতি আর মূল আবেদনের মধ্যে কোথায় যেন এক আত্মিক যোগাযোগ রয়েছে; এরি ফলে যে-কোনো দেশের লোক-শিল্পের সম্মুখীন হলে তার মধ্যে অতি-পরিচিত রূপ-লাবণ্য ও প্রকাশ-ভঙ্গী খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রদর্শনীতে এসে পোল্যাণ্ডের লোক-শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় লোক-শিল্প ও তার প্রকাশ-রীতির তেমনি অনেক সাদৃশ্যই খুঁজে পাবেন দর্শকেরা।

কাগজ কেটে তৈরী নানা জীব-জন্তুর আকৃতি-প্রকৃতি, পাখি, ফুল, লতা-পাতা প্রভৃতির অজস্র ভঙ্গীর ও বিন্যাস-পদ্ধতির ৯৯টি নিদর্শন আছে এই প্রদর্শনীতে। এই বিশেষ মাধ্যমেই যা আমরা দর্শন করেছি, তার থেকেই অনুমান করতে পারি, পোল্যাণ্ডের লোক-শিল্পের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যকে। প্রকৃতপক্ষে, পোল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও কারু-শিল্পকে কেন্দ্র করে এখনো লোক-শিল্পের জীবন্তধারা প্রবহমান। কাগজ কেটে শিল্প-সৃষ্টি করা এই ধারারই এক বিশেষ রূপ। গ্রামের চাষী-পরিবার ইষ্টার কিংবা খৃষ্টমাসের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তে তাদের ঘর-গৃহস্থালী সাজাবার জন্য রঙ-বেরঙের কাগজ কেটে যে অলংকরণ শিল্পের জন্ম দিয়েছে সত্যি তা মনোমুগ্ধকর। গ্রামের মেয়েরাই সাধারণতঃ এই শিল্প-সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে গ্রামাঞ্চলে ঘর সাজাবার জন্য এই শিল্পধারার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বলে পোলিশ
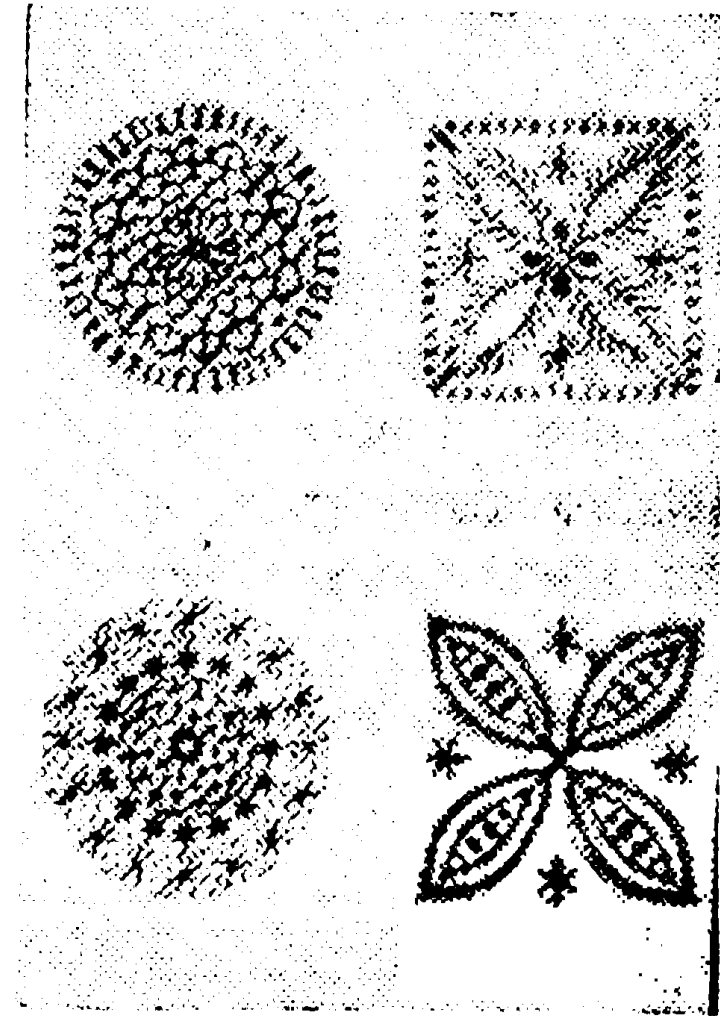
দূতাবাসের কর্মকর্তারা আমাদের জানালেন সেদিন।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। রঙীন কাগজ এবং শোলার বিচিত্র ফুলে একদা বাঙালীর পূজা-প্রাঙ্গণ, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও ব্রত-পার্বণের শুভক্ষণ ঝলমল করে উঠতো। এখনো তার স্মৃতি এবং ঐতিহ্য বাঙলাদেশ থেকে মুছে যায়নি। কিন্তু এই শিল্পধারা আর বোধহয় দীর্ঘকাল টিকে থাকবে না। বাঙালীর আর্থিক সংকট এবং জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে অবহেলা লোক-শিল্পের দ্রুত অবলুপ্তির পথ প্রশস্তই করে দিচ্ছে। অথচ, পোল্যাণ্ডের মত আমাদের দেশের চাষী পরিবারও ঘর সাজাবার জন্য লোক-শিল্পের সুন্দরতম সৃষ্টিকে ব্যবহার করে তাদের সৌন্দর্যানুভূতিকে প্রকাশ করতে পারতো। যা পোল্যাণ্ডে সম্ভব হলো আমাদের দেশে তা কেন সম্ভব নয়, এই প্রশ্ন যদি কোনো দর্শকের মনে জাগে, তবে খুশি হবে আমার মন।

যাহোক, এই প্রদর্শনীতে পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ও বাঙলাদেশের লোক-শিল্পের নক্সা ও ভঙ্গীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য আশ্চর্য-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, কুরপী অঞ্চলের কাগজের নক্সায় মূর্ত হয়েছে জটিল বৃত্ত ও জ্যামিতিক ভঙ্গী। এ-যেন ঠিক আমাদের বাঙলাদেশের আল্পনার পদ্ধতিকে অনুসরণ করে রচিত। সত্যি, এগুলি যেন কাগজের আল্পনা। প্রদর্শিত ৯২, ৯৩, ৯৪ ও ৯৫নং নিদর্শনগুলি এরি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবার লাওইজ অঞ্চলের কাগজের নক্সায় একটি প্যানেলের মধ্যে হয়তো কোনো বিবাহ-উৎসবকে রূপ দিয়েছেন শিল্পী। ওয়ারশ অঞ্চলের শিল্পধারায় বিভিন্ন ভঙ্গীর সুষম ছন্দিত রূপ, জীব-জন্তু, গাছ-পালা প্রভৃতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কাগজ কেটে তৈরী তিনটি ঘোড়ার গতিময় ভঙ্গীর (৬২নং) নিদর্শনটি কিংবা ঘোড়ায়-টানা গাড়িখানি (১৩নং) বাঙলাদেশের ঢাকা অঞ্চলের কারু-শিল্পের নিদর্শন বলে হয়তো ভুল করবেন অনেকে। বাঁকুড়ার পোড়া-মাটির শিল্প-নিদর্শন, বিশেষ করে মনসা-ঘটের বিন্যাস-পদ্ধতি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা হঠাৎ ৩৬, ৩৮ ও ৪০নং কাগজের নক্সাগুলি দেখলে একটু চমকে উঠবেন। মনে হবে, বিষয়বস্তুতে ভিন্ন হলেও, এই দুই নক্সায় যেন একই রূপ ফুটে উঠেছে। ৬৪ ও ৬৭নং নক্সা আমাদের ডাকের সাজ কিংবা শাড়ির আঁচলের নক্সাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। অনেকগুলি পাখির আকৃতি-প্রকৃতি এবং তার বিন্যাস-কৌশল বাঙলাদেশের লোক-শিল্পের মতো। বাঙালী দর্শক এই প্রদর্শনী দেখে তাই প্রচুর আনন্দ পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

•

অন্যান্য বৈদেশিক দূতাবাস যদি মাঝে মাঝে এমনি করে তাঁদের দেশের লোক-শিল্পের নিদর্শন আমাদের কাছে তুলে ধরেন, তবে সত্যি ভাল হয়। পোলিশ দূতাবাস এ-কাজে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করায় তাঁদের আমরা অভিনন্দিত করছি। এই উপলক্ষে কয়েকটি পোলিশ দলিল-চলচ্চিত্রও দর্শকদের জন্য প্রদর্শিত হয়।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

মহাকাশচারী চতুর্থ ব্যক্তির নাম মেজর জার্মাণ স্টিপানোভিচ টিটভ। বয়স ২৬, ১৯৩৫ সালে জন্ম। এক শিক্ষকের পুত্র। বিয়ে করেছেন, কোনো সন্তান নেই। ইনি সোভিয়েট রুশিয়ার মানুষ এবং সেখানকার দ্বিতীয় মহাকাশ-চারী। গাগারিনের চাইতে এক বছরের ছোট। গাগারিন বিশ্বের অথবা সোভিয়েট রুশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চারজন মহাকাশচারীর মধ্যে প্রথম; দ্বিতীয় মার্কিণ শেফার্ড, বয়স ৩৭; তৃতীয় মার্কিণ গ্রিসম; চতুর্থ রুশবাসী টিটভ। গাগারিন ১২ই এপ্রিল ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে ১১২ থেকে ২০৩ মাইল উঁচুতে ২৭,০০০ মাইল পৃথিবী পরিক্রমা করেন—প্রদক্ষিণকাল একবারের কিছু বেশী। উর্দ্ধ[illegible] অবস্থিতি-কাল ১০৮ মিনিট। শেফার্ডকে ৫ই মে ১১৫ মা[illegible] দূরবর্তী ঊর্ধ্বাকাশে নিক্ষেপ করা হয়েছিল; অবস্থিতিকাল ১৬ মিনিট। তাঁর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৫০০০ মাইল। গ্রিসম ২১শে জুলাই অনুরূপ দূরত্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন; অবস্থিতিকাল ১৫ মিনিট; গতিবেগ ঘণ্টায় ৫,৩১০ মাইল। এরপর টিটভ : যে-সময়টায় লিখছি (৭ই আগষ্ট অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকা) তখনও তাঁর মাটিতে নামার খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি ১,২৫,০০০ মাইল পরিক্রমা করেছেন। তাঁর ১৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার কথা।

মেজর জার্মাণ স্টিপানোভিচ টিটভ

সবচাইতে মজার কথা, সেই দূরবর্তী মহাকাশ থেকে টিটভ কথা বলেছেন নীচে মাটির মানুষের সঙ্গে। রাত্রে শোবার আগে মস্কোকে জানিয়েছেন, গুড নাইট, মস্কো। মাঝে মাঝেই বলেছেন, চমৎকার আছি, ভাল আছি।

সর্বশেষ খবর, টিটভ ২৫ ঘণ্টাব্যাপী পৃথিবী প্রদক্ষিণের পর নির্বিঘ্নে পৃথিবীর মাটিতে নেমেছেন। আজ বিজ্ঞান কোথায় গিয়ে পেঁছোচ্ছে। এ জয়যাত্রা মানুষের—মানুষের বিজ্ঞানের।

গৃহকোণ

॥ ছবি সেনগুপ্তা ॥

'অতিথি' কথাটির সঙ্গে সাধারণ গৃহস্থ মাত্রেই পরিচিত। এমন একটিও সংসার বুঝি এদেশে খুঁজে বের করা দুষ্কর, যে সংসারে মাসের মধ্যে এক কিংবা একাধিক দিন এই বিশেষ শ্রেণীর জীবটির শুভ (!) আবির্ভাব না ঘটে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, প্রায় আত্মীয় অথবা আত্মীয়ের মত, গৃহস্থের সঙ্গে অতিথির এমনতর নানাবিধ সম্পর্ক থাকতে পারে। অবশ্য এছাড়াও অন্য কয়েক শ্রেণীর অতিথির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। যেমন, বাড়ির কর্তার অপিসের কলিগ। ঐ অপিস-কলিগটিকে কর্তা হয়ত সস্ত্রীক নিজের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন বিশেষ কোন উপলক্ষে, অনাত্মীয় শ্রেণীর অতিথি হলেও ওই ভদ্রলোক সংসারে কয়েক ঘণ্টার সাময়িক অতিথি হিসেবে গণ্য হবেন। তাছাড়াও আছে বাড়ির মেয়ের বান্ধবী, ছেলের বন্ধু, গিন্নীর দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই, কর্তার পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব, অতিথি আছে হাজারো রকম। অবশ্য তা বলে যে কোন পরিচিত, অল্প পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই সব সময় আমাদের কাছে কাম্য অতিথি না হতে পারে। সবার ওপরে আমরা সমান আগ্রহ পোষণ করি তা-ও নয়। অতিথি বলতে বিশেষ এক ধরণের আগন্তুক মানুষকেই বোঝায় যাদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, যাদের কাছে পেলে আমরা খুশী হই, যাদের আবির্ভাব আমাদের এতটুকু বিরক্তির উদ্রেক করে না, সত্যিকারের বিচারে অতিথি বলতে আমরা তাদেরই বুঝি।

যাদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ' কথাটি সত্যিকারের বাঞ্ছিত ব্যক্তিকে চিনে নেবার পক্ষে খুবই মূলবান সন্দেহ নেই। কিন্তু একালে পরস্পরের ভেতরের এই ঘনিষ্ঠ হৃদয়ের সম্পর্কটি আকার আকৃতিতে এত ক্ষীণ আর দুর্বল হয়ে পড়েছে (অণুবীক্ষণ-যন্ত্রীরা ক্ষমা করবেন।) যে, সমাজে এখনও দু'একজন যারা হৃদয় নামক বস্তুটিকে বিধাতার সেরা উপহার বলে কদর করে থাকেন, হৃদয় ব্যাপারের এ'হেন শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটতে দেখে তাঁদের মধ্যে হৃৎকম্প উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক।

একথা তো সবাই জানেন যে, আমরা আমাদের চার দেয়ালের সীমাবদ্ধ গৃহ-কোণে নিকটতম আত্মীয়-পরিজন নিয়ে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করতে ভালবাসি এবং সেই ভালবাসার মূলে কিছু জৈবিক এবং সুস্থ মানবিক কামনা আমাদের মধ্যে অহরহ কাজ করে চলেছে। তেমনি গৃহ-কোণের বাইরে যে সামাজিক জীবন আছে ছড়িয়ে তার সম্পর্কে আমাদের আগ্রহও কিছু কম নয়। এই সামাজিক জীবন আমাদের কখনো প্রতিষ্ঠা দেয়, কখনো চরিত্রের সদ্‌গুণাবলির উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করে। সহজ করে বলতে গেলে ঘরের বাইরে পা বাড়ালেই আমাদের নানা পরিচিত চরিত্রের ব্যক্তিদের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করতে হয়। পরস্পরের সঙ্গে স্নেহপ্রীতি শ্রদ্ধার বিনিময় হৃদয়-চর্চারই লক্ষণ এবং এই হৃদয়-চর্চা পরস্পরের ভেতরের সখ্যতার সম্পর্ককে দৃঢ় করে, পরস্পরের ভেতরের সব রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে হৃদয়ের দিক দিয়ে মানুষকে উদার এবং মহৎ করে তোলে।

এই পারস্পরিক হৃদয় বিনিময়ের [illegible] যে এযুগে শীতের শীর্ণ নদীর মত করুণ এবং দীনদশাগ্রস্ত হয়ে এসেছে হৃদয় ব্যাপারে অনুভূতিপ্রবণ মানুষ মাত্রেই তা জানেন। দু'দুটো যুদ্ধের করাল ছায়া পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক অমানুষিক অঘটন ঘটিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার বোধ হয় মানুষের চিত্তবৃত্তির ব্যাপারে হৃদয়ের অন্তর্ধান। কি সাহিত্য, কি শিল্প-সৃষ্টিতে, কি ব্যবহারিক জীবনে সব ক্ষেত্রেই একটা স্পষ্ট দ্বিধার ভাব

পরিলক্ষিত হচ্ছে। হৃদয়ের বদলে বুদ্ধির চর্চা প্রবল হয়েছে। কিন্তু শুধু বুদ্ধি অথবা শুধু যুক্তির কচকচিতে যে সমস্যার প্রকৃত সমাধানের বদলে তার জটিলতাই বাড়ে—সমস্যার সমাধানের জন্য যে হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলির জাগরণ প্রয়োজন এ বিষয়ে এখন বোধ হয় অবহিত হবার দিন এসেছে।

অতিথি সমস্যার প্রসঙ্গে এত কথার অবতারণা আপাতদৃষ্টিতে বাহুল্য মনে হতে পারে কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক নানাবিধ সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ সমস্যাটিও যুদ্ধ-পরবর্তীকালের সভ্যতার সংকটকালীন অবস্থার একটি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সে হিসেবে বিষয়টি একেবারেই অবহেলার যোগ্য নয়।

সমস্যাটি এদেশে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়া থেকে শুরু হয়েছে এবং যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক ওলট-পালট অথবা বিপর্যয় এই সমস্যার আগুনে সবচেয়ে বেশী ইন্ধন জুগিয়েছে। দেশ-জোড়া অর্থনৈতিক দুর্বিপাক, মানুষে মানুষে বিবাদ-বিসম্বাদ-জনিত দ্বন্দ্ব এই সবকিছু আমাদের জীবনের সুস্থ শান্ত বহমান স্রোতকে ব্যাহত করেছে, ফলে বদ্ধজলার মত পাঁক উঠেছে ঘুলিয়ে। পরস্পরে অবিশ্বাস, সন্দেহ, আত্মকেন্দ্রীক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া এই সবকিছুই এক একটি পৃথক দ্বীপপুঞ্জের মত এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এর ফলে আত্মসর্বস্বতা প্রশ্রয় পেয়েছে, একে অপরের সমস্যা সমাধানে আগ্রহ পোষণ করার বদলে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলাকে মনে করেছি অধিকতর শ্রেয়। ফলে যা হবার তাই হয়েছে; একের দুঃখ যেমন আমাদের গা স্পর্শ করছে তেমনি অপরের আনন্দের আমরা ভাগীদার হতে পারছি না।

অতিথি-সমস্যার মূলে আছে পারস্পরিক জীবনযাত্রার ভেতরের এই নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধ-পরবর্তীকালের অর্থনৈতিক সঙ্কট একত্র হয়ে ব্যাপারটাকে রীতিমত অমানবিকতার পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে। একজন অতিথি হঠাৎ বাড়িতে এলে সবার আগে সচরাচর যে প্রশ্নগুলি আমাদের মনে জেগে ওঠে তা হ'ল এই ঃ প্রথমতঃ তাকে যথোচিত আপ্যায়ন করার মত যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য আমাদের আছে কিনা, দ্বিতীয়তঃ তার জন্য একটি পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা, তৃতীয়তঃ গৃহস্থের জীবন-প্রণালীর রুচি এবং বিশেষ গঠনের সঙ্গে আগন্তুক অতিথির রুচির মিলন ঘটা সম্ভব কিনা। একটি জিনিস লক্ষ্য করলে চোখে পড়বে যে, এ সবকিছুর মূলে আছে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাপনের সংকটের মূল কারণ এই একটি। ফলত এই একটি কারণের আবর্তে পড়ে অন্য অনেক অপ্রধান কারণও মাঝে মাঝে প্রধান কারণের ভূমিকায় অভিনয় করে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, কোন ক্ষেত্রেই আমরা এই দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাতে পারিনি—ঘটাতে পারি না।

গৃহস্থ ও আগন্তুক অতিথির ভেতরকার সম্পর্কটি এমন হওয়া প্রয়োজন যার ফলে উভয়তঃ একটা খোলা সারল্যের মেজাজ অনুভব করা যায়।

একথা অতিথির উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, সামর্থ্যের অভাব না হলে কোন গৃহস্থ তার বাঞ্ছিত অতিথির আপ্যায়ন ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটে এটা কখনোই আন্তরিকভাবে চান না। গৃহস্থের আর্থিক সংগতির একটা মোটামুটি ধারণা তার গৃহস্থালীর দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। অতিথি গৃহস্থের আর্থিক সংগতির পরিমাপ করতে নিজের চোখ দুটিকে সজাগ রাখবেন এবং গৃহস্থের বিশেষ আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে তার আপ্যায়নের যে রকমফের হবে সে বিষয়ে আগে থাকতে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবেন। সবকিছুর পরেও স্বীকার করে নিতেই হবে যে অর্থনৈতিক সংকট একান্তই মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে প্রভাবিত করে বটে, কিন্তু হৃদয়ের সদগুণাবলির আধার যে মন তাকে দৈনন্দিন জীবনের সব সমস্যা সব গ্লানি থেকে ঊর্ধ্বে রাখার প্রয়াসই হল জীব হিসাবে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার একমাত্র উপায়। সংকটের আবর্তের জটিলতাকে নৈতিকভাবে জয় করতে পারলে তবেই জাগতিক এবং ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে মানবিকতাবোধের একটা সুস্থ সমন্বয় ঘটান যাবে। সমস্যার পথে সবার আগে স্থিতধী হতে হবে। সুষ্ঠু সমন্বয়ের পথই সমস্যাকে জয় করার পথ। সমস্যা যত তীব্রই হোক এই সমন্বয়ের পথে তার আংশিক সমাধানের গোড়ার বীজমন্ত্রটি লুকনো রয়েছে। একথা সব ব্যাপারে সব সময়ের জন্য স্মরণ রাখা ভাল।

সমকালীন সাহিত্য

• অভয়ঙ্কর

॥ বাংলা উপন্যাসে 'স্বদেশ' ॥

ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল পরাধীন ছিল, পরাধীনতার গ্লানি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলাদেশের বুকে বেজেছিল গভীর হয়ে, তাই তার প্রভাব বাঙালীর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে পড়েছিল গভীর হয়ে। পৃথিবীর সব দেশেই গণজাগরণের মুহূর্তে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছেন কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" মন্ত্র ১৯৪৭ পর্যন্ত হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে, প্রাদেশিক ভাষার বাধা সেদিন এমন দুরধিগম্য হয়ে ওঠেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা 'বন্দেমাতরম'কে একেবারে না ভুললেও একরকম ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দিয়েছি। এই বন্দেমাতরম ধ্বনি বা বন্দেমাতরম সঙ্গীত সারা অঙ্গে শিহরণ জাগায়নি পঞ্চাশোর্ধে এমন ভারতীয় খুব কমই আছেন।

'আনন্দমঠের' ভবানন্দের কণ্ঠে 'সুজলাং, সুফলাং' শুনে বিস্মিত মহেন্দ্র বলেছিল—'এ ত' দেশ, এ ত' মা নয়!'

ভবানন্দ উত্তরে জানিয়েছিল—'আমরা অন্য মা জানি না, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী-পুত্র নাই, ঘর-বাড়ি নাই। আমাদের আছে কেবল সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, শস্যশ্যামলা—'

ব্যাপারটি বুঝে মহেন্দ্র বললেন, 'তবে আবার গাও।'

ভবানন্দ বললেন : "ব ন্দে মা ত র ম"!

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই ইতিহাস রচিত হয়। ইতিহাসের মতে সন্ন্যাসীরা ডাকাত মাত্র—লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তারা অন্য মূর্তিতে উপস্থিত। ১২৮৮ সালে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাস যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন এক গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করবে কে জানত!

লেখক বঙ্কিমচন্দ্র আবেগভরে বলেছিলেন—"হায় আবার কি আসিবে মা? জীবানন্দের মত পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধারণ করিবে কি?" বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল, বাঙালীর ঘরে শান্তি এবং জীবানন্দরা বার বার আবির্ভূত হয়েছে।

'আনন্দমঠ' প্রকাশের ছাব্বিশ বছর পরে ১৩১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'গোরা' শুধু যে বাংলা-সাহিত্যের এক অদ্বিতীয় উপন্যাস তা নয়, সমালোচকদের মতে য়ুরোপীয় মাপকাঠিতে 'গোরা'ই সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস।

গোরা জাতিতে আইরিশ। শৈশবে মার মৃত্যুর পর কৃষ্ণদয়ালবাবু ও তাঁর স্ত্রী তাকে পুত্ররূপে পালন করেন। গোরা কিছুই জানত না, বড় হয়েও নয়। বিনয় গোরার বন্ধু—পরেশবাবুর মেয়ে ললিতাকে সে বিয়ে করে, আর পরেশবাবুর পালিত কন্যা সুচরিতাকে গোরা বিয়ে করে আত্ম-পরিচয় জানার পর। হিন্দু সমাজ ও আনন্দময়ীকে গোরা আন্তরিক শ্রদ্ধা করত। ভারতবর্ষকে পাওয়ার জন্য সে সাধনা করেছে, গোঁড়া বলে সে হিন্দু সমাজের দিকেই নজর রেখেছিল, যেদিন স্বদেশের প্রতি তার সামগ্রিক দৃষ্টি পড়ল সেদিন তার সকল সাধনা সার্থক হল। যেদিন সে জানল, সে কোনো সমাজের মানুষ নয় তখন সে পরেশবাবুর কাছে গিয়ে মুক্তিমন্ত্র চায় :

"আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু, মুসল-

মান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হবে না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।”

পরাধীন ভারতের মুক্তিমন্ত্রে-উদ্বুদ্ধ গোরা ভাবে : 'দেশ বলিতেই ইনি, সমগ্র ভারতের মর্মস্থানে, প্রাণের নিকেতনে, শতদল পদ্মের ওপর ইনি বসিয়া আছেন। আমরা ইঁহারই সেবক। দেশের দুর্গতিতে ইহার অবমাননা। সেই অবমাননায় উদাসীন আছি বলিয়াই আমাদের পৌরুষ আজ লজ্জিত।”

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে সেদিনের শিক্ষিত সমাজের মনে পরাধীনতার জ্বালা কি প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল তার পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'গোরা' সার্থক উপন্যাস হলেও এর বিষয়বস্তু গুরুভার হওয়ায় 'গোরা'র জনপ্রিয়তা তেমন আশাপ্রদ হয়নি।

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'চার অধ্যায়'। এর আগে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' (১৩৪১)। বাংলার বিপ্লববাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্পর্কে লেখেন : “বঙ্গ-বিচ্ছেদ উপলক্ষ করিয়া যে আলোড়ন উপস্থিত হয়। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব হঠাৎ একদিন তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা প্রবাহিত করেন।” তারপর কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বলেন : “রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।” এই কথাগুলি বলেই তিনি চলে যান। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের এই মর্মবাণী, এই আভাস অংশটুকু বর্তমান সংস্করণে পরিত্যক্ত।

এই উপন্যাসের নায়িকা এলা মনে মনে জানে সে ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমাজের নয়, দেশের। বিবাহের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করে। দেশের কাজে সে আপনাকে উৎসর্গ করেছে, আটাশ বছরের যৌবনে পৌঁছে এলা দুর্বল হয়ে পড়ল অতীনের সংস্পর্শে এসে। সে অতীনকে বলে :

“...তুমি সেইখানে নিয়ে যাও, যেখানে তোমার আপন বিশ্ব আপন অধিকার।” দেশপ্রেমের কঠোর সাধনায় পরাজয় ঘটে মানবিক প্রেমে।

রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি সমসাময়িক মেজাজের উপযোগী হয়নি, তাই 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল, এমন কি সরকারী আনুকূল্যের ইঙ্গিতও কেউ কেউ করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ভালোরকম জানেন তাঁরাই স্বীকার করবেন নিজস্ব মতবাদে তিনি অচল অটল থাকতেন, কোনো রকম প্রতিকূল সমালোচনা তাঁকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। 'চার অধ্যায়' তাঁর বিশ্বাসমাফিক বাংলার বিপ্লববাদের এক পরোক্ষ সমালোচনা।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বাংলার সাহিত্যে এবং বাঙালীর জীবনে এক অবিস্মরণীয় উপন্যাস। ১৩২৯-৩৩ সালে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৩ ভাদ্র মাসে পুস্তকাকারে প্রায় প্রকাশের সংগে সংগেই সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। প্রচার কিন্তু বন্ধ রইল না, গোপনে ছড়িয়ে এই বই প্রচারিত হয়েছে বিপ্লবের সমর্থনে। বিপ্লবীদের প্রতি এমন সশ্রদ্ধ উক্তি আর কারো রচনায় এমন সার্থক হয়ে ফুটে ওঠেনি :

“তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সব দিয়াছ, তাই দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়। তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ।......দুঃখের দুঃসহ গুরুভার সহিতে পারো বলিয়াই ত' ভগবান এত বোঝা তোমার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তিপথের অগ্রদূত।

পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার!"

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী বাংলার বিপ্লবীদের ছিল বাইবেল। প্রায় সমগ্র অংশ অনেকের মুখস্থ ছিল। নিষিদ্ধ পুস্তক, তাই গোপন মুদ্রণ কিংবা হাতের লেখা কপি এখনও দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের নিজেরও এই গ্রন্থটির প্রতি অসীম মমতা ছিল। অন্তরংগ মহলে আলাপ-আলোচনায় তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠত। এমন কি রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস সম্পর্কে কটাক্ষ করায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র কঠোর ভাষায় কবিকে একটি পত্র লিখেছিলেন। উমাপ্রসাদবাবু অবশ্য সে চিঠিখানি কবির কাছে পাঠাননি, এতদিন পরে সেটি প্রকাশিত হয়েছে।

'পথের দাবী'র সব্যসাচীর মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : "দেশের ভালো করার ভার আমি নিইনি, আমি স্বাধীন করার ভার নিয়েছি। আমার বুকের আগুন নেভে শুধু দুটি জিনিষ দিয়ে এক নিজের চিতাভস্মে, আর নেভে যেদিন শুনবো ইউরোপের ধর্ম, সভ্যতা, নীতি সমুদ্রের অতলগর্ভে ডুবে গিয়েছে।"

এই ছিল সেদিনের বাংলার বিপ্লবীদের মনোভাব।

'পথের দাবী' প্রকাশের পর বাংলাদেশে পুলিশী উৎপাত প্রবল হয়েছিল, অনেক সাহিত্য লালবাজারে, ইলিসিয়াম রোতে ভস্মীভূত হয়েছে। ১৯৩০-৪২ পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে দেশপ্রেমের কথা তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশ পায়নি।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে দেশব্যাপী মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ওদিকে রেংগুণের পতন হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। স্বদেশে গান্ধীজীর ভারত-ছাড়ো আন্দোলন। আবার বাংলার সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের জোয়ার জাগল। অনেক গল্প ও উপন্যাসে অত্যন্ত সাহসিক উক্তি লক্ষ্য করা গেল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেকগুলি উপন্যাসের উপজীব্য দেশপ্রেম। মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' বিপ্লবীদের কাহিনী। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। এই উপন্যাসের আঙ্গিক ও বক্তব্য অতি বিচিত্র, তাই লেখক এই প্রথম গ্রন্থেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-প্রেমের কথা নানাভাবে এসেছে। তার মধ্যে উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ আছে সন্দেহ নেই। যুদ্ধ, বিপ্লব প্রভৃতির মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগের প্রাচুর্য থাকবে। সংখ্যায় কম হলেও বাংলা-সাহিত্যে বিদেশী শাসকের আমলে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হয়েছে স্বদেশ-প্রেমের প্রচারে। সবচেয়ে যা প্রশংসনীয় তা এই যে, বাঙালী সাহিত্যিকের রচনায় 'আর্ট' ক্ষুন্ন করে 'প্রপাগান্ডা' কোথাও প্রবল আকার ধারণ করেনি।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বাধীনতার পর সাহিত্যিক সমাজে সাহস ও সত্যনিষ্ঠার তেমন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। কোদালকে কোদাল বলাই সাহিত্যিকের সর্বপ্রধান ধর্ম। এই সত্যটি বিস্মৃত হলে বাংলা-সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যাবে।

নবীন ভারতে সাহিত্যিকের দায়িত্ব আরো বেড়েছে, যা প্রয়োজনীয় তার
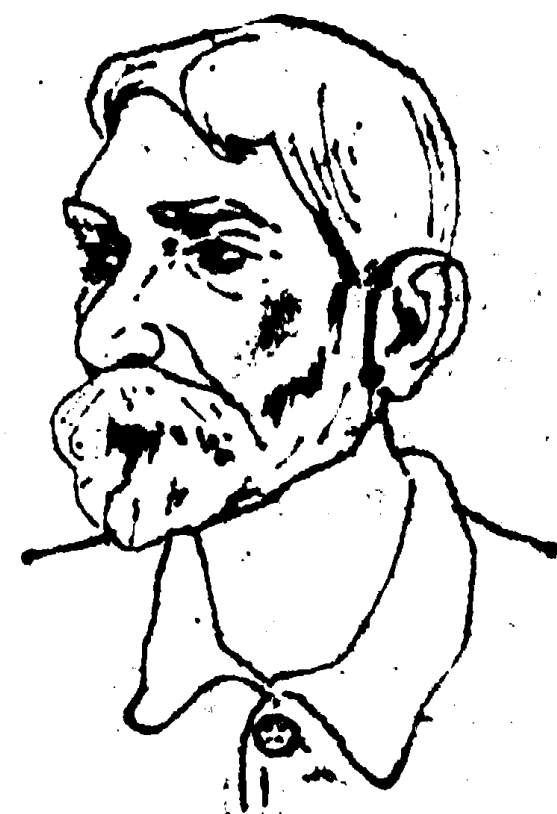
প্রশংসা এবং প্রচার এবং যা দেশের পক্ষে সর্বনাশকর তার প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন। স্বাধীনতা পাওয়ার পর সাহিত্যিকের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়নি।

পরিশেষে স্বীকার করা প্রয়োজন, এই প্রবন্ধের কিছু তথ্য এবং অংশ বর্তমান লেখকের অন্যত্র প্রকাশিত রচনা থেকে সংগৃহীত।

নতুন বই

পাড়ি— (উপন্যাস) জরাসন্ধ। বাক-সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা।

'জরাসন্ধ' এই ছদ্মনামের আড়ালে যে মানুষটি লুকিয়ে আছেন তিনি একজন সিদ্ধ-সাহিত্যিক। অর্থাৎ শিক্ষানবীশি না করে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন, সাহিত্য-জীবনে দীর্ঘকাল শিক্ষানবীশী করতে হয়নি। যেমন কেদার বন্দ্যো, পরশুরাম প্রভৃতি। তাই তাঁর 'লৌহকপাট' আজ বাঙালী পাঠকের মুখে মুখে এবং তাঁর উপন্যাস এত জনপ্রিয়। 'পাড়ি' উপন্যাসটি স্বল্পায়তন কিন্তু তার বক্তব্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তারা এক সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, জীবনের চলমান স্রোতে তারা যেখানে এসে পৌঁছায় সেখান থেকে ফেরার পথ তার জানা নেই। অতীতকে ভোলার চেষ্টা করতে হয় তারাকে, তার সঙ্গে ভোলার চেষ্টা করে তার বংশগত ঐতিহ্য এবং সংস্কার—কিন্তু তার এই বিচিত্র জীবন-পরিবেশে তার নারীত্ব বিকশিত হয়ে ওঠে। বলিষ্ঠ পৌরুষ এবং জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা, এবং আপন মহিমায় পরিতৃপ্তি ও পরি-পূর্ণতার পথে এগিয়ে যায়—এই কাহিনী। লেখক অপরূপ সূক্ষ্ম রচনা-কৌশলে এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই বস্তুনিষ্ঠ কাহিনীকে রূপায়িত করেছেন তাঁর 'পাড়ি' উপন্যাসে। 'জরাসন্ধ' বাংলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন বিছিয়েছেন। 'পাড়ি' তাঁর বিজয় মুকুটের আর একটি মাণিক্য। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা পরিচ্ছন্ন।

মাটি ও মানুষ (উপন্যাস)—দিগিন্দ্র-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রজ্ঞল বুক হাউস। ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা।

প্রখ্যাত নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই উপন্যাসটি সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম উপন্যাস। দেশ-বিভাগের পর বাস্তুহারা দুর্ভাগা নরনারীদের জীবন নিয়ে অনেক গল্প এবং উপন্যাস রচিত হয়েছে, বর্তমান উপন্যাসটি সেই শ্রেণীর গ্রন্থে নবতম সংযোজন কিন্তু এই উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য আছে, এর বক্তব্য গতানুগতিক নয়। পূর্ববঙ্গের কৃষি-জীবীরা চলে এসেছে ঘর-দোর ছেড়ে পশ্চিম বাংলায়, তারা এখানে বাস্তুহারা শরণার্থী। দেশ-ঘাট তাদের জানা নেই, রাজনীতির ঘোরপ্যাচ বোঝে না, সেই ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সরলপ্রাণ কয়েকটি নর-নারীর জীবনের ব্যথা ও বেদনার ইতি-হাস 'মাটি ও মানুষ'। এই হতভাগ্য নর-নারীদের প্রতি লেখকের সহানুভূতি সমগ্র উপন্যাসে সুস্পষ্ট। তারা জমি চায়, পুনর্বাসনের উপযোগী বাসভূমি, কর্মের জন্য কৃষিভূমি, সরকারী অনুগ্রহে জীবনধারণ তাদের অনেকের কাম্য নয়। স্থানীয় কৃষিজীবীদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা কুচক্রীর চক্রান্তে শত্রুতায় পরিণত হয়। স্থানীয় কিষাণ যুবা রাখাল এবং বাস্তুহারা তরুণী বাসনা এই আবর্তে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমন সময় এল দণ্ডকারণ্যের ডাক, একদল বলে এখানেই থাকি, আর একদল যেতে চায় দণ্ডকারণ্যের গহনে—বাসনাও রাখালকে ছেড়ে সেই দণ্ড-কারণ্যেই চলে যায়। মৃত আত্মাকে সঞ্জীবিত করবে সেই দেশের মাটি। দিগিনবাবুর রচনার গুণে একটি অপূর্ব সাময়িক কাহিনী 'মাটি ও মানুষ'-এ রূপায়িত হয়েছে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুন্দর।

এক যে ছিল রাজা (উপন্যাস)—দীপক চৌধুরী। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

দীপক চৌধুরীর গল্প ও উপন্যাস অল্পকালের মধ্যে 'অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর রচনার সর্বপ্রধান গুণ শ্লেষাত্মক বক্তব্য এবং অনন্যসাধারণ ঝরঝরে ভাষা। "এক যে ছিল রাজা" বর্তমানের পটভূমিকায় রচিত শ্লেষাত্মক উপন্যাস। গজানন মুখুজ্যে প্রবীণ বিপ্লবী। আন্দামানে নির্বাসিত ছিলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছু পরে মুক্ত পেলেন। ইতিমধ্যে বন্ধুরা কেউ মন্ত্রী, কেউ বড় ব্যবসায়ী। গজানন এই মওকায় কিছু করবেন এই আশায় মাথায় গান্ধী

টুপি এ'টেছিলেন, সঙ্গে দুলাল দত্ত আরেক বিপ্লবী। কলকাতা শহরে পদার্পণ করে তাঁদের মোহভঙ্গ হল, পরিচিত মহলে তারা অবাঞ্ছিত, আবার তারা আউটরাম ঘাটে ফিরে আসে—হুইস্কি খেয়ে স্বপ্ন দেখে। অতীত ও বর্তমানের ব্যর্থতায় ভরা বিলাতী মদের বাক্স মাথায় করে তারা ঢুকে পড়ে জীবনের লালবাজারে। দীপক চৌধুরী অতি অল্প কথায়, অতি সহজে এমন এক বিচিত্র জীবনের ইঙ্গিত করেছেন যা রসিক পাঠককে বিস্মিত [illegible] ছাপা এবং অহিভূষণের কার্টুনগুলি চমৎকার।

শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ—

(রবীন্দ্র-শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ), প্রকাশক—বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম পাঁচ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র-শতাব্দী জয়ন্তী সমিতির উদ্যোগে এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি প্রকাশিত। বাংলা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং অধ্যাপকের সমন্বয়ে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। তার সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু এবং কর্মাধ্যক্ষ ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। দুঃখের বিষয় এই কমিটির সদস্যগণের মধ্যে রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং বিমলচন্দ্র সিংহ আজ পরলোকে। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র [illegible] ভূমিকায় বলেছেন, "জয়ন্তী উৎসর্গের জন্য প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া বিশিষ্ট লেখকবর্গের নিকট অনুরোধপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তদুত্তরে যে কয়টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে প্রায় সবগুলিই প্রকাশিত হইল।" লেখকসূচী [illegible] হয় আশানুরূপ সাড়া 'বিশিষ্ট লেখকবর্গ' দিতে পারেননি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচনাটি পুনর্মুদ্রণ। অন্যান্য প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ', শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ', শচীন সেনের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে গণ-আন্দোলন', তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারত-ধর্ম' [illegible]ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে বর্ষা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতীশ রায় ও প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ দুটিতে নূতনত্ব আছে। এমন একটি সুমুদ্রিত মূল্যবান গ্রন্থের মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা নির্ধারিত করে প্রকাশকগণ বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দান করেছেন।

সেকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা—

ক্ষেত্র গুপ্ত ও কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত। গ্রন্থগৃহ, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

আমাদের দেশে ব্যঙ্গ সাহিত্য বা সরস রচনা প্রায় অনাদৃত অথচ এই সরস রচনায় সিদ্ধহস্ত সাহিত্য-সাধকের অভাব নেই এবং বাঙালীর মুখে আজও যদি কিছু থাকে ত' সেই ঈশ্বর গুপ্তের 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।' সেই রঙ্গভরা দেশের দুজন কৃতী সাহিত্যিকের সম্পাদনায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কৌতুক কবিতার সংকলন বিশেষ প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। কুক্কুরীপাদ, বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও রামেশ্বর থেকে রবীন্দ্রোত্তরকাল পর্যন্ত প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য কবির কবিতা এই সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। সম্পাদকদ্বয়ের অভূতপূর্ব পরিশ্রমে এমন এক-

খানি সর্বাঙ্গসুন্দর সংকলন গ্রন্থ সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। প্রচ্ছদে কালীঘাটের পটের অনুকরণে অঙ্কিত ছবিটি সুন্দর এবং উপযুক্তভাবে সন্নিবেশিত। 'যষ্ঠিমধু' নামক একমাত্র হাসির মাসিকের সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ ও ক্ষেত্র গুপ্তকে ধন্যবাদ জানাই এই রত্নরাজি উদ্ধরণ করে আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে উপহার দানের জন্য।

গল্পে গীতা—ক্ষেত্রমোহন ভাদুড়ী; প্রকাশক-লেখক, ৯, পশুপতি বোস লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১-৩৭ নঃ পঃ।

গীতা একখানি জটিল গ্রন্থ। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্রহ্মবিদ্যা— যা যোগের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। গীতার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কর্মের কথা। আলোচ্য গ্রন্থে কর্মকেই মুখ্যতঃ গ্রহণ করে, আধুনিক যুগচেতনার ওপর ভিত্তি করেই ছাত্রোপযোগী গীতা রচনা করা হয়েছে। লেখকের বর্ণনা-ভঙ্গী ও ভাষা প্রশংসনীয়। গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে শ্রদ্ধেয় ডঃ যতীন্দ্র-বিমল রায় চৌধুরীর ভূমিকাটি।

বিখ্যাত বিচার কাহিনী—বিশু মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

বিশু মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ। দীর্ঘকাল পরে কয়েকটি নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজিত হয়ে এই পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। কার্ক-ফুলাম হত্যা-রহস্য, পাকুড়া হত্যাকাণ্ড, সামসেদবাঈ হত্যাকাণ্ড, প্লেগ-জীবাণুঘটিত হত্যাকাণ্ড, পাগলা খুনের মামলা, সতীদাহ রহস্য, রাজার কামলীলা ও রতনবাঈ জৈনের ফাঁসি এই আটটি বিখ্যাত বিচার কাহিনী এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিচার কাহিনী অতি-সাম্প্রতিক। লেখক শুধু যে কাহিনীটুকু পরিবেশন করেছেন তা নয়, সাক্ষ্য প্রমাণ, আসামী পক্ষের উকীলের যুক্তি এবং বিচারকের চূড়ান্ত রায় যথাযোগ্যভাবে পরিবেশন করায় একটি মূল্যবান দলীল হিসাবেও এই গ্রন্থটি সংরক্ষিত হবে। কলঙ্কময় বীভৎস জীবনের কাহিনী হিসাবেও এই সব বিচার কাহিনী রোমাঞ্চকর উপন্যাসের চেয়ে মনোরম ও চিত্তচমকপ্রদ। কুশলী লেখক অপূর্ব সংযম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্যগুলি পরিবেশন করায় গ্রন্থটি অতিশয় সুখ-পাঠ্য হয়েছে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুন্দর।

দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—বেংগল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা—১২।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান কবি, গদ্য সাহিত্যে তাঁর এই প্রথম পদক্ষেপ। 'দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ' আকারে বৃহৎ। চরিত্র সংখ্যাও বহু। কাল্পনিক সমস্যাকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই উপন্যাসের মানুষগুলিও কাল্পনিক। পড়তে ভালই লাগে। উপরি হিসাবে কিছু ইংরেজী শব্দও জানা হয়ে যায়। লেখকের পরবর্তী উপন্যাসের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় আমরা রইলাম।"

কেনা গোলাম— কালিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—নব বলাকা প্রকাশনী। ৪, নবকৃষ্ণ লাহা লেন, কলিকাতা—৩৬।

কালিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতিবান। ভাষায় [illegible] আর গল্পও তৈরী করতে জানেন। 'কেনা গোলাম' আকারে বৃহৎ কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখক কাহিনীকে সামলিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। কম কৃতিত্বের কথা নয়।